ও' হেনরী

রচনাসমগ্র

ভাষান্তর

সুবোধ চক্রবর্তী

ম নী ষা

১৫ই আগস্ট ১৯৫৯
(স্বাধীনতা দিবস)

প্রকাশক ঃ
মণি সান্যাল
মনীষা গ্রন্থালয় (প্রাঃ) লিঃ
৪/৩বি বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

মুদ্রক ঃ
শম্ভুনাথ চক্রবর্তী
লক্ষ্মী নারায়ণ প্রেস
৪৫/১/এইচ/১৪ মুরারী পুকুর রোড, কলিকাতা-৫৪

উৎসর্গ

বিশিষ্ট সমাজদরদী ও সাহিত্যানুরাগী
শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়ের করকমলে

সুবোধ চক্রবর্তী

সূচীপত্র

দ্য ট্রিমড ল্যাম্প ১
এ ম্যাডিসন স্কোয়ার অ্যারাবিয়ান নাইট ৮
দ্য পেন্ডুলাম ১৩
দ্য বায়ার ফ্রম দ্য ক্যাক্টাস সিটি ১৬
দ্য রুবাইয়েত অব এ স্কচ হাইবল ২০
টু থ্যাঙ্কস গিভিং ডে জেন্টেলমেন ২৪
দ্য ফেরী অব আনফুলফিলমেন্ট ২৭
দ্য মেকিং অব এ নিউইয়র্কার ৩০
দ্য পারপেল ড্রেস ৩১
ব্রিকডাস্ট রো ৩৪
দ্য ব্যাজ অব পুলিশম্যান ও'রুন ৪০
দ্য টেল অব এ টেন্টেড টেনার ৪২
এ মিড সামার নাইট'স ড্রিম ৪৫
দ্য গিলি পার্টি ৪৮
দ্য লস্ট ব্লেন্ড ৫২
এলসি ইন নিউইয়র্ক ৫৫
দ্য কাউন্ট অ্যান্ড দ্য ওয়েডিং গেস্ট ৬০
দ্য অ্যাসেসর অব সাকসেস ৬৪
দ্য সোস্যাল ট্রাঙ্গেল ৬৭
দ্য ফরেন পলিসি অব কোম্পানি-৯৯ ৭০
দ্য কান্ট্রি অব এলুশন্ ৭৪
দ্য ফোর মিলিয়ন
(দ্য গিফ্ট অব দ্য ম্যাজাই) ৭৮
ম্যান এবাউট টাউন ৮১
লস্ট অন ড্রেস প্যারেড ৮৪
মেমোরিস অব এ ইয়েলো ডগ ৮৮
সিস্টারস অব দ্য গোল্ডেন সার্কেল ৯১
অ্যান আনফিনিশড স্টোরি ৯৪
টবিন'স পাস্ ৯৭
দ্য রোমান্স অব এ বিজি ব্রোকার ১০২
দ্য লাভ ফিলট্রে অব আইকে
স্কোয়েন্টিন ১০৪
দ্য ফারনিশ্ড রুম ১০৭
দ্য স্কাইলাইট রুম ১১১
দ্য ক্যামিং-আউট অব ম্যাগি ১১
দ্য গ্রীন ডোর ১১
দ্য কপ অ্যান্ড দ্য অ্যানথেম ১২৩
ম্যাম্মোন অ্যান্ড দ্য আর্চার ১২৭
দ্য ক্যালিফ, কাপিড অ্যান্ড দ্য ক্লক ১৩১
দ্য ব্রিফ ডিবাট অব টিল্ডি ১৩৫
এ কস্মোপোলাইট ইন এ কাফে ১৩৮
বিটুইন রাউন্ডস্ ১৪২
বাইক্যুরিয়ার ১৪৫
স্প্রিংটাইম এ'লা কোস্ট ১৪৭
এ সার্ভিস অব লাভ ১৫০
অ্যান অ্যাডজাস্টমেন্ট অব নেচার ১৫৪
আফ্টার টোয়েন্টি ইয়ার্স ১৫৭
ফ্রম দ্য ক্যাবী'স সিট্ ১৬০
দ্য ভয়েস অব দ্য সিটি ১৬২
লিটল স্পিক ইন গারনেরেড ফ্লুট ১৬৬
দ্য কম্প্লিট লাইফ অব জন হপকিন্স ১৬৮
ওয়ান থাউজেন্ড ডলারস্ ১৭২
দ্য শক্স্ অব ডুম ১৭৬
এ লাইকপেনি লাভার ১৮০
হোয়াইল দ্য অটো ওয়েটস্ ১৮৪
দ্য প্লুটোনিয়ন ফায়ার ১৮৮
দ্য ডিফিট অব দ্য সিটি ১৯১
স্কোয়ারিং দ্য সার্কল ১৯৪
দ্য ক্যাস্টার অব দ্য সোল ১৯৭
ট্রান্সিয়েন্টস্ ইন আরকাডিয়া ২০০
এক্সট্রাডিটেড ফ্রম বোহেমিয়া ২০৩
দ্য ক্যারিয়ন কল ২০৬
দ্য ফুল কিলার ২১০
দ্য সিটি অব ড্রেডফুল নাইট ২১৫
এ ফিলিস্টাইন ইন বোহেমিয়া ২১৭
দ্য র‍্যাথস্কেলার অ্যান্ড দ্য রোজ ২১৯
দ্য হারবিন্জার ২২২
নিমিসিস অ্যান্ড দ্য ক্যান্ডিম্যান ২২৫

সূচীপত্র

রোজেস, রাসেস অ্যান্ড রোমান্স ২২৯
ফ্রম ইচ্ অ্যাকোরডিং টু হিস
অ্যাবিলিটি ২৩১
দ্য মেমেনটো ২৩৪
অপশনস ১৯০৯ দ্য থার্ড ইন্‌গ্রেডিয়েন্ট ২৩৯
এ পুয়োর রুল ২৪৫
দ্য রোজ অব ডিক্সি ২৫১
স্কুলস্ অ্যান্ড স্কুলস্ ২৫৬
সাপ্লাই অ্যান্ড ডিমান্ড ২৬২
টু হিম হু ওয়েটস ২৭০
দ্য মোমেন্ট অব ভিক্টরী ২৭৫
নো স্টোরি ২৮০
হি অলসো সার্ভস ২৮৫
বেস্ট সেলার ২৯১
থিম্বল, থিম্বল ২৯৬
দ্য হাইডিং অব ব্ল্যাক বিল ৩০৩
দ্য হেড হান্টার ৩১১
দ্য হায়ার প্রাগমেশন ৩১৮
রাস ইন আরব ৩২২
দ্য ব্যুরিয়েড ট্রেজার ৩২৭
রোডস্ অব ডেস্টিনি ৩৩২
বাঁ দিকের পথ ধরে ৩৩৩
ডান দিকের পথ ধরে ৩৩৮
প্রধান সড়ক ধরে ৩৪৩
দ্য ডিস্কাউন্টার অব মানি ৩৪৭
নেক্সট টু রিডিং ম্যাটার ৩৫১
দ্য লোনসাম্ রোড ৩৬১
দ্য গার্ডিয়ান অব দ্য অ্যাকোল্যাড ৩৬৭
দ্য এন্‌চান্টেড প্রোফাইল ৩৭২
আর্ট অ্যান্ড দ্য ব্রণকো ৩৭৭
দ্য প্যাসিং অব ব্ল্যাক ঈগল ৩৮৫
ফোবি ৩৯১
এ বি[illegible] রিফরমেশন ৪০০
সালভাডর ৪০৫
ফ্রেন্ডস ইন সান রোজারিও ৪১১
দ্য এমানসিপেশন অব বিলি ৪২৩
চার্সেজ লা ফেমি ৪৩২
এ ডাবল ডাইড ডিসিভার ৪৪১
দ্য রেঁনেসাস অ্যাট চার্ল রয় ৪৫৩
এ ডিপার্টমেন্টাল কেস ৪৬৬
দ্য হালবেরডিয়ার অব দ্য লিটল
রাইনশ্লস ৪৭৬
অন বিহাফ অব দ্য ম্যানেজমেন্ট ৪৮৪
হুইসলিং ডিক'স খ্রীস্টমাস স্টকিং ৪৯৩
দ্য জেন্টল গ্র্যাফটার ৫০১
দ্য এ্যাথিক্স অব পিগ ৫০৫
হোস্টাজেস টু মোমাস ৫১২
হার্টস অ্যান্ড ক্রুসেস ৫২৬
দ্য হ্যান্ডবুক অব হাইমেন ৫৩৩
দ্য টেম্পার্ড উইন্ড ৫৪৫
ইননোসেন্ট অব ব্রডওয়ে ৫৬২
এ কল লোন ৫৬৬
দ্য হায়ার অ্যাবডিক্শন্ ৫৭১
এ মিডসামার মাসক্যুয়েরাড ৫৮৬
দ্য অক্টোপাস ম্যারুন্ড ৫৯২
জেফ পিটারস অ্যাজ এ
পারসোন্যাল ম্যাগনেট ৬০২
দ্য চেয়ার অফ ফিল্যানথ্রো
ম্যালমেটিক্স ৬১২
দ্য একসাট সায়েন্স অব ম্যাট্রিমোনি ৬১৯
শেয়ারিং দ্য উফ্ ৬২৫
কনসিয়েন্স ইন আর্ট ৬৩৩
দ্য ম্যান হায়ার আপ ৬৪০
হার্ট অব দ্য ওয়েস্ট ৬৫৪
দ্য পিমিয়েন্টা প্যানকেক ৬৫৯
টেলিমেকাস ফ্রেন্ড ৬৭১
হাইজিয়া অ্যাট দ্য সোলিটো ৬৭৮
অ্যান আফটারনুন মিরাকল ৬৯১

সূচীপত্র

র‍্যাপিড অ্যা লা ক্যারটে	৬৯৭
দ্য স্ফিনক্স অ্যাপল	৭০৯
দ্য ক্যাবালেরোস'স ওয়ে	৭২৪
দ্য মিসিং কর্ড	৭৩৪
দ্য চ্যাপারাল প্রিন্স	৭৪০
ক্রিস্টমাস বাই ইন্‌জাংশন	৭৪৯
দ্য রিফরমেশন অব ক্যালিয়োপ	৭৫৬
স্ট্রিক্টলি বিজনেস	৭৬২
দ্য ডে রেসারজেন্ট	৭৭০
বেবিস ইন দ্য জাঙ্গল	৭৭৪
দ্য পয়েট অ্যান্ড দ্য পিসেন্ট	৭৭৮
দ্য র‍্যাব অব পিস্‌	৭৮২
দ্য আন্‌নাস্‌ কোয়ান্টিটি	৭৮৫
দ্য গার্ল অ্যান্ড দ্য গ্র্যাফট্‌	৭৮৯
দ্য থিংস দ্য প্লে	৭৯২
এ র‍্যাম্বল ইন অ্যালচাসিয়া	৭৯৮
দ্য মিউনিসিপ্যাল রিপোর্ট	৮০৬
এ বার্ড অব বাগদাদ	৮১৫
কম্পলিমেন্টস অব দ্য সিজন	৮২১
এ নাইট ইন দ্য নিউ অ্যারাবিয়া	৮২৭
দ্য ড্যুয়েল	৮৩৩
হোয়াট ইউ ওয়ান্ট	৮৩৬
সাইছে অ্যান্ড দ্য স্কাইস্ক্রেপার	৮৪০
দ্য গোল্ড দ্যাট গ্লিটার্ড	৮৪৩
দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড দ্য ডোর	৮৪৭
দ্য হাইপোথিসিস অব ফেইলিয়োর	৮৫৪
দ্য থিয়োরি অ্যান্ড দ্য হাউন্ড	৮৬০
কলওয়ে'স কোড্‌	৮৬৬
এ মেটার অব সিন এলিভেশন	৮৬৯
গার্ল	৮৭৫
সোসিওলোজি ইন সার্জ অ্যান্ড স্ট্র	৮৭৮
দ্য র‍্যানসম অব রেড চিফ	৮৮০
দ্য ম্যারী মান্থ অব মে	৮৮৮
এ টেকনিক্যাল এরর	৮৯১
সুট হোমস অ্যান্ড দেয়ার রোমান্স	৮৯৪
এ স্যাকরিফাইস হিট	৮৯৯
দ্য রোডস্‌ উই টেক	৯০২
এ ব্ল্যাকজ্যাক বারগেনার	৯০৪
দ্য সঙ্‌ অ্যান্ড দ্য সার্জেন্ট	৯১২
ওয়ান ডলার্স য়োর্থ	৯১৫
ক্যাবাজেজ অ্যান্ড কিংস	৯১৮
ফক্স ইন দ্য মর্নিং	৯১৯
লোটাস অ্যান্ড দ্য বটল	৯২৩
স্মিথ	৯২৬
কট্‌	৯২৮
কুপিডস্‌ একসাইল নাম্বার টু	৯৩১
দ্য ফোনোগ্রাফ অ্যান্ড দ্য গ্রাফট	৯৩৩
মানি ম্যাক্স	৯৩৯
দ্য অ্যাডমিরাল	৯৪৩
দ্য ফ্ল্যাগ প্যারামাউন্ট	৯৪৫
শ্যামরক অ্যান্ড দ্য পাম	৯৪৯
দ্য রেমন্যান্টস্‌ অব দ্য কোড	৯৬১
সু'জ	৯৬৪
শিপ্‌স	৯৬৭
মাস্টার্স অব আর্টস	৯৭০
ডিকি	৯৭৪
রুজ এট নইর	৯৭৮
টু' রিকলস্‌	৯৭৯
দ্য ভিটাগ্রাফোস্কোপ	৯৮৪
শেষ কাবাব রান্না	৯৮৪
সমুদ্র সৈকতে লেখা	৯৮৫
তার চোখের তারায়	
ফুটে উঠেছে মৃত্যুর চিহ্ন	৯৮৫
ক্যাবেজেস অ্যান্ড কিংস (উপন্যাস) [illegible]	

দ্য ট্রিমড ল্যাম্প

প্রশ্নটার তাৎপর্য দু'রকম আছে। অন্যটার কথাই আলোচনা করা যাক। প্রায়ই 'শপ-গার্ল' কথাটি কানে আসে। প্রকৃতপক্ষে শপ-গার্ল বলে কারো অস্তিত্বই নেই। বহু মেয়ে আছে যারা দোকানের কাজে লিপ্ত। এর মাধ্যমেই তারা পেটের ভাত জোগাড় করে। তা-ই যদি হয় তবে তাদের জীবিকাই কেন তাদের পরিচয় হবে? আমাদের উচিত উপযুক্ত বিচার করা। ফিফ্‌থ এভিনিউর মেয়েদের তো আমরা বিবাহিতা মহিলা বলে আখ্যা দেই না। এ স্বীকার করতেই হবে যে, শপ-গার্ল বলে আমরা তাদের সুবিচার করি না।

ন্যানসি্ আর লু যথার্থই অভিন্ন হৃদয়া বান্ধবী। বাড়িতে প্রয়োজনীয় খাবারের অভাব থাকায় তাদের কাজের ধান্ধায় শহরে পাড়ি জমাতে হয়েছিল। লু তখন বিশ বছরের যুবতী আর ন্যানসির চলেছে উনিশ। উভয়েই অজ পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, সুদর্শনা। নাট্যশালার খাতায় নাম লেখানোর ইচ্ছা আদৌ কারো ছিল না। বরাতগুণে সস্তা ও মার্জিত রুচির একটা বোর্ডিংয়ে তাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই জুটে গেল। উভয়ের চাকরিও জুটে গেল। বেতন পেত মাস গেলে। তাদের বন্ধুত্বও অটুট রয়ে গেল।

মাস ছয়েক পরের কথা—লু একটা লন্ড্রীতে জামা-কাপড় ইস্ত্রি করার কাজ করে। তার গায়ে আলখাল্লা গোছের ঢিলেঢালা একটা লাল জামা, মাথায় বে-মানান, প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বড়সড় আর চার ইঞ্চি লম্বা পালকের একটা টুপি আর সাদা পশমের তৈরী পঁচিশ ডলার দামের একটা স্কার্ফ ও মাফলার। চোখের মণি দুটো হাল্কা নীল আর দু'গালে লালচে আভা। খুশী যেন তার সর্বাঙ্গে টলমল করছে, উপচে পড়ছে।

আর ন্যান্সি? পাঠক-বন্ধু, ন্যানসি'কে তো আপনি শপ-গার্ল আখ্যাই দেবেন কারণ, আপনি তো এতেই অভ্যস্ত। পৃথিবীতে ধরণ ধারণের কোন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই। কিন্তু সব যুগে ও সবকালেই নিত্য নতুন ধরন-ধারণের তল্লাশ করে থাকে। ধরন ধারণের একটা নমুনা তুলে ধরছি—সামনের দিকটা চূড়োর মত তুলে দিয়ে চুলের গোছাটাকে পিছনের দিকে কষে বেঁধে দেওয়া। সস্তা দামের তৈরী হলেও স্কার্টটা বাহারী বটে। বসন্তের দমকা বাতাসের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য পোশাকে পশমের সুরক্ষার কিছুমাত্রও ব্যবস্থা নেই। তার মুখমণ্ডলে শপ-গার্লের ছাপই যেন সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। আর তার চোখের তারায় বঞ্চিত নারীদের বিরুদ্ধে ঘৃণিত নীরব বিদ্রোহ স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। আর তাতে অচিরেই ভ্রাতৃশোধ নেবার বাসনার ছাপও স্পষ্ট। সে সরবে হেসে ওঠার সময়ও সে ছাপটুকু মিলিয়ে যায় না। ঠিক এরকমই চাহনি লক্ষিত হয় রাশিয়ার চাষাভুষোদের চোখের তারায়। আর গেব্রিয়েল যেদিন আমাদের সংহার করতে আসবে সেদিন যারা টিকে থাকবে সেদিন তাদের চোখে মুখেও একই দৃষ্টি নজরে পড়বে। সে দৃষ্টি প্রত্যক্ষ করে পুরুষদের লজ্জিত হওয়া উচিত। কিন্তু তার বদলে তারা মস্করায় লিপ্ত হয় সুতোয় বাঁধা ফুলের তোড়া তাদের লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারে, লাভ করে আত্মপ্রসাদ।

টুপিটা মাথা থেকে নামিয়ে বিদায় নেবার মুহূর্তে লু ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বলে উঠবে—'তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে।' আর ন্যান্সি? সে-ও মিষ্টি হাসির প্রলেপে তার রসিকতার ভাবটাকে আড়াল করে দেবে।

তারা উভয়েই ড্যাম-এর প্রতীক্ষায় মোড়ে দাঁড়িয়ে। সে ছিল লু-র বাধা ক্রেতা। বিশ্বাসীও? না, এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। যাকে বলে, যখন যেমন হাতের মুঠোয় আসে।

লু-ন্যান্সি-র দিকে ঘাড় ঘোরাল। ছোট্ট ক'রে বলল—'ন্যান্সি, তোমার শীত লাগছে না? আচ্ছা, তুমি কেমন ধারার মেয়ে বল তো! হপ্তায় মাত্র আট ডলার পেয়ে পুরনো সে দোকানটাতে চাকরি করছ! গত হপ্তায় আমি কত কামিয়েছি, জান? সাড়ে আঠারো ডলার। তবে দোকানে ফিতে

বেচার মত ইস্ত্রি করার কাজটা সোজা নয়। হ্যাঁ, এ কাজে পয়সা আছে, স্বীকার করতেই হবে। আমরা যে ক'জন ইস্ত্রির কাজে লেগে রয়েছি কারো রোজগারই দশ ডলারের কম নয়। আর কাজটাকে সম্মানের দিক থেকে কমতি বলেও আমি অন্ততঃ জ্ঞান করি না।'

' —হোক গে!' ন্যান্সি বলল—তুমি যা-ই পাও, হপ্তায় আটটা ডলার আর শোবার হলঘরই যথেষ্ট। মোদ্দা কথা, সজ্জন এবং সুপরিবেশেই থাকতে আমি বেশী পছন্দ করি। আর এরকমই আমার পছন্দ মাফিক সুযোগ আমি পেয়েছি। মাত্র দিন কয়েক আগেই তো আমাদের দস্তানা বিভাগের এক যুবতী পিট্সবার্গের এক ইস্পাতের কারিগর, বা ওরকমই একটা লোককে বিয়ে করল। দেখবি, একদিন আমিও একজনকে গেঁথে ফেলব। সঙ্গতি সম্পন্ন কাউকে পেলেই লটকে যাব। বিভাগীয় কাজে লেগে থাকা এক মেয়ের বরাতে এর বেশী আর কি জুটবে, বল তো?'

—ডান-এর সঙ্গে ওখানেই তো আমার প্রথম দেখা ও আলাপ পরিচয় হয়।—গর্বের সঙ্গে লু বলল। 'জামার কলার ইস্ত্রি করাতে রবিবার সে এসেছিল। আমি তখন ইস্ত্রি করে চলেছি। সেদিন এলা ম্যাগিনিস অসুস্থ ছিল। তার জায়গাতে—প্রথম বোর্ডে আমি ইস্ত্রি করছিলাম। আমাদের সবারই ইচ্ছা প্রথম বোর্ডে কাজ করি।' উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে লু এবার বলল—'সে বলেছে, আমার হাত দুটোর ওপরই নাকি প্রথম প্রথম তার নজর যায়, বেলনের মত গোলগাল হাত দুটো কী সুন্দর! আমার জামার হাতা দুটো গোটানো ছিল। আসলে তাদের হাবভাব দেখলেই চেনা যায়। স্যুটকেসে জামা কাপড় নিয়ে এসে দুম্ করে ধাক্কা দিয়ে আচমকা দরজা খুলে ফেলে।'

ন্যান্সি বলল—'লু, তোমার পছন্দ খুবই খারাপ। এরকম একটা কোমরবন্ধ কি করে পর ভেবে পাইনে!'

চোখের তারায় ক্ষোভের ছাপ ফুটিয়ে তুলে লু তার কথার উত্তর দিতে গিয়ে বলল— এ কোমরবন্ধটার কথা বলছ? ষোল ডলার দিয়ে কিনেছি। আসলে কম সে কম পঁচিশ ডলার তো দাম হবেই। এখানে এক মহিলা ইস্ত্রি করাতে দিয়ে গিয়ে আর নেয় নি। মালিক শেষ পর্যন্ত বিক্রি করে দিলেন। দেখতে পাচ্ছ, পুরো কোমরবন্ধটাই হাতে নক্সা করা। তোমার বিশ্রি কোমরবন্ধটার কথা ভাব তো একবারটি।

ভ্যান এলস্টাইন ফিশার-এর কোমরবন্ধটা দেখে আমি নিজে হাতে এটা তৈরী করে নিয়েছি। মেয়েদের বক্তব্য, এটা তৈরী করতে গুদাম থেকে বারশ' ডলারের বিল পাঠানো হয়। আর মাত্র দেড় ডলার খরচ করে আমি নিজে হাতে আমারটা তৈরী করে নিয়েছি। ফুট দশেক দূর থেকে দেখলে চিনতে পারবে না। কোন্টা তার আর কোন্টা আমার।'

কণ্ঠস্বরে স্বাভাবিকতা বজায় রেখে লু এবার বলল—'ভাল কথা, পেটে কিল মেরে তুমি যদি বড়লোকি চাল দেখাতে চাও তবে আমার আর আপত্তির কি থাকতে পারে। আমার কথা যদি জানতে চাও তবে বলব, দিনভর কঠোর পরিশ্রম করে যা রোজগার করব তা দিয়ে নক্সা করা ঝলমলে পোশাকই ব্যবহার করব।'

তাদের কথোপকথনের মাঝখানে ডান এসে হাজির হল। গম্ভীর স্বভাবের যুবক। গলায় সাদামাঠা ধরনের একটা নেক-টাই। ইলেকট্রিক মিস্ত্রির কাজ করে। হপ্তায় ত্রিশ ডলার রোজগার করে। লু-র দিকে রোমিও-র মত বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। সে ভাবল, লু-র কোমরবন্ধটা যেন একটা মাকড়সার জাল, যাতে জড়িয়ে পড়তে যেকোন পতঙ্গ উদ্ভ্রান্তের মত ছুটে আসবে।

লু আবেগ মধুর কণ্ঠে বলল—বন্ধু মিঃ ওয়েন্স, মিস ডানফোর্থ-এর সঙ্গে করমর্দন কর।'

করমর্দনের জন্য হাতটা এগিয়ে দিয়ে ডান ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বলল—মিস ডানফোর্থ, লু প্রায়ই আপনার কথা বলে। আজ পরিচয় হওয়ায় খুবই আনন্দ পেলাম।

ন্যান্সি তার সঙ্গে করমর্দন সারতে গিয়ে তার আঙুলের সঙ্গে নিজের আঙুলগুলি ছুঁইয়ে বলল—'ধন্যবাদ! লু-এর মুখে আপনার কথাও বহুবার শুনেছি।'

সশব্দে হেসে লু বলল—ন্যান্সি, একটা কথা, মিসেস ভ্যান এলস্টাইন ফিশার-এর সঙ্গেও তুমি এভাবেই করমর্দন কর কি?

ন্যান্সি গম্ভীর স্বরে তার কথার উত্তর দিল—আমি যদি করিই তুমিও অনায়াসেই এমনটা করতে পার।

না, অবশ্যই না। এ হাত দিয়ে আমার পক্ষে তা করা সম্ভবই না। এমন ভঙ্গীতে করমর্দন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এমন বড়লোকিপনায় করমর্দন সারতে হলে আঙুলে হীরের আংটি থাকা দরকার। আগে সেরকম ক'টা আংটি জোগাড় করি, তারপর না হয় চেষ্টা করব।

কায়দাটা আগে রপ্ত করে নাও, তবেই আংটি জোটানোর ব্যাপারটা সহজ হয়ে উঠবে।

মুখের মুচকি হাসিটুকু অব্যাহত রেখেই ডান বলল, আমি মনে করি, আপনাদের উভয়কে টিফানির দোকানে নিয়ে গিয়ে তর্কাতর্কির ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করার ক্ষমতা আমার নেই। তার চেয়ে বরং একটা রঙ্গ-নাটিকা দেখে আসা যেতে পাবে। আমি টিকিট সংগ্রহ করে এনেছি। আসল হীরের আংটি পরে করমর্দন সারা যখন সম্ভবই নয় তখন রঙ্গমঞ্চের হীরের আংটি দেখে এলে হয় না?

লু তার হাতের মুঠোর ভদ্রলোকটির গায়ে প্রায় গা লাগিয়ে চকচকে পোশাকে সজ্জিতা হয়ে বনময়ূরীর মত ছোট ছোট পা ফেলে হাঁটছে, সাদামাটা পোশাক পরে ন্যান্‌সি পিছন পিছন হেঁটে নাট্যশালার দিকে এগিয়ে চলেছে।

বৃহদায়তন বিভাগীয় বিপনিকে কেউ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি দিতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি না। তবে ন্যান্‌সির কর্মস্থলটা তার চোখে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই তুলনীয়। সেখানকার দ্রব্যসামগ্রী রুচি শিল্পতা ও সংস্কৃতির পরিচয়ই বহন করে। বিলাসের পরিবেশে কেউ বাস করলে তাকে তো বিলাসী না হয়ে উপায় নেই। খরচাপাতির টাকা তুমি বা অন্য কেউ যে-ই দিক না কেন।

সে যেসব ক্রেতার কাছে দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি করে তাদের বেশীর ভাগই মহিলা। তাদের পোশাক আশাক, ভাবভঙ্গী আর সামাজিক মর্যাদা সবই মানদণ্ড হিসেবে গণ্য হয়। ন্যান্‌সি যা কিছু শিখেছে সবই তাদের দেখে। মোদ্দা কথা, প্রত্যেকের কাছ থেকে হাঁসের মত জলটুকু ফেলে রেখে দুধটুকু, মানে ভাল শিক্ষাটা বেছে নিয়েছে। যার মধ্যে যেটুকু ভাল দেখেছে, সেটুকুই সে নিয়েছে। যার হাঁটা চলা, বন্ধুকে আপ্যায়ণ কবাব ভঙ্গীটুকু পর্যন্ত। সামাজিক সদাচার আর সুরুচির পরিমণ্ডলে বাস করায় গভীরতর একটা পরিণতিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়াও তার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে। সুঅভ্যাসকে সুনীতির চেয়েও শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা হয়। আর সৎ আচরণকে হয়ত বা সুনীতির চেয়েও শ্রেষ্ঠত্বের আসন দেওয়া হয়। বাবা-মার কাছ থেকে যে সুশিক্ষা তুমি লাভ করেছ তা হয়ত তোমার নতুন ইংল্যাণ্ডের বিবেককে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হবে না। কিন্তু সোজা পিঠওয়ালা একটা চেয়ারে বসে যদি তুমি 'ত্রিশির কাঁচ আর তীর্থযাত্রা' কথাটা চল্লিশবার মনে মনে বলতে পার তবে অতি বড় শয়তানও তোমার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে পথ পাবে না। ঠিক তেমনি ন্যান্‌সিও যখন ভ্যান এলস্টাইন ফিশার-এর স্বর ও ভঙ্গী অনুকরণ করে কথা বলে তখন তার অস্থির চিত্তের ভেতর দিয়ে শিষ্টতার দায়বদ্ধতার শিহরণ জেগে ওঠে।

সে বিভাগীয় বিপনি থেকে শিক্ষালাভের আর একটি উৎস ছিল। যেখানেই দেখা যাবে তিন-চারটে শপ-গার্ল একত্রিত হয়ে অর্থহীন আলোচনার সঙ্গে তাদের হাতের ব্রেসলেটের রিনিঝিমি আওয়াজ মিশিয়ে দিচ্ছে তখন যেন ভেবে বসবেন না যে এথেল্‌ কোন্‌ কায়দায় চুল বেঁধে তার সমালোচনা করতেই তারা সেখানে জড়ো হয়েছে। এসব আলোচনা থেকেই ন্যান্‌সি আত্মরক্ষার কৌশল রপ্ত করে নিয়েছিল। আর মেয়েদের ক্ষেত্রে আত্মরক্ষায় সাফল্য লাভ করার অর্থই হচ্ছে জয়ী হওয়া। ন্যান্‌সি-র ক্ষেত্রে একথা পুরোপুরি প্রযোজ্য।

বিভাগীয় বিপনির পাঠ্যসূচী বহুমুখী। কোন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়ত বা মেয়েদের জীবনের লক্ষ্যে পৌছবার এতখানি উপযুক্ত করে তুলতে সক্ষম হয় না। কি সে লক্ষ্য? লক্ষ্যটি হচ্ছে, বিয়ের লটারিতে পুরস্কারটা হস্তগত করা। বিপনিতে তার কাজের জায়গাটা গানের ঘরের লাগোয়া হওয়ায় সে অনায়াসেই শ্রেষ্ঠ সুরকারদের গান শুনে শুনে সেগুলো আয়ত্ত করে নিল।

ন্যান্‌সির এ উচ্চাকাঙ্খার ব্যাপারটা বিপনির অন্য কর্মী-মেয়েরা ধরে ফেলে। এবার থেকে বরমাল্য পরাবার মত কোন যুবককে তার কাউন্টারের দিকে এগোতে দেখলেই তারা অনুচ্চকণ্ঠে বলত— ন্যান্‌সি, তোমার বাঞ্ছিত টাকার কুমীর আসছে, দেখ।

পুরুষদের একটা স্বভাব, সঙ্গী মেয়েরা যখন কেনাকাটায় মেতে যায় তখন তারা রুমালের কাউন্টারের সামনে বারবার চক্কর মারে আর ক্যাম্ব্রিকের চৌকোণা টুকরো হাতে নিয়ে নাড়াচাড়ায়

মেতে ওঠে।

ন্যান্সির মেকী বড়লোকী ভাবসাব আর তার সত্যিকারের রূপোর জৌলুসের আকর্ষণ আছে যার ফলে তার সামনে দিয়ে বহু যুবকই ঘুরঘুর করে। তাদের মধ্যে কেউ টাকার কুমীর হওয়া তো অসম্ভব নয়। আর অবশিষ্টরা ধনীদের অনুকরণকারী ভদ্রবেশী বাঁদরের মতই। ন্যান্সি উভয় দলের মধ্যে পার্থক্যটুকু বোঝার ক্ষমতা রপ্ত করে ফেলেছে।

রুমালের কাউন্টারের একদম শেষে একটা জানালা রয়েছে। সেটা দিয়ে ন্যান্সি দেখতে পায় বিপনির ক্রেতাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য সারিবদ্ধভাবে গাড়ি দাঁড়িয়ে। সেগুলো দেখে সে বুঝতে শিখল গাড়িগুলোর আকৃতি যেমন স্বতন্ত্র, ঠিক তেমনই গাড়ির মালিকগুলো স্বতন্ত্রতা বজায় রাখছে, ছোট-বড় যাকে বলে।

একদিন এক সুদেহী ভদ্রলোক চার-চার ডজন রুমাল কিনে ফেলল আর কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়েই হাসিমাখা মুখে কথা বলে ন্যান্সির সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেলল। সে কাউন্টার ছাড়তেই একটা মেয়ে গম্ভীর স্বরে বলে উঠল—'ন্যান্স। এটা কেমন হ'ল, লোকটাকে আমলই দিলে না তুমি? দেখে তো মনে হ'ল লোকটা রীতিমত একজন ধনকুবের।

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে ন্যান্সি জবাব দিল—। কার কথা বলছ? ওই যে—ওই লোকটা ? তাকে তোয়াক্কা করার কোন মানেই হয় না। আমি নিজের চোখে দেখেছি, নিজেই গাড়ি চালিয়ে এসেছে। একটা বারো অশ্বশক্তি সম্পন্ন যন্ত্র আর এক আইরিশ বদমাইস। লক্ষ্য করেছিলে কি, তা-ও আবার কিনেছে কতগুলো রেশমী রুমাল, গায়ে চাপিয়েছে নকল কাপড়ের পোশাক পরিচ্ছদ। খাঁটি ভদ্র ও মালদার না হলে আমার মন গলে না, বুঝলে?

বিপনিতে দুটো রুচিশীলা মহিলা কর্মী চাকরি করে। তাদের কয়েকটি পয়সাওয়ালা বন্ধু আছে। তারা মাঝে মধ্যে তাদের সঙ্গেই নৈশভোজ সারতে যায়। একদিন তারা ন্যান্সিকেও সঙ্গে করে নিয়ে গেল। নববর্ষের সন্ধ্যার জন্য সেখানকার টেবিলগুলো এক বছর আগেই সংরক্ষিত হয়ে যায়। দু'জন ভদ্রলোক বন্ধু সঙ্গে রয়েছে। একজনের মাথা জুড়ে টাক। চুলের চিহ্নমাত্র নেই। আমরা চোখে আঙুল দিয়ে প্রমাণ করে দিতে পারি, যারা অগাধ সুখ-বিলাসের মধ্যে দিন কাটায় তাদের মাথার চুল উঠে যায়। আর দ্বিতীয়জন এক যুবক। ধনী আর সৌখিন রুচিসম্পন্ন। দুটো ব্যাপারে এটা ধরা যায়। সে বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বলল, সবগুলি মদের বোতলই ছিপি আঁটা। সেই সঙ্গে তার সার্টের কাফ লিংক দুটো হীরের। যুবকটা ন্যান্সির প্রতি অদম্য আকর্ষণ বোধ করল। তার প্রকৃতি আর রুচিবোধ শপ-গার্লদের দিকে তাকে যেতে উৎসাহিত করল।

পরদিনই সে বিভাগীয় বিপনিতে হাজির হ'ল। সরাসরি চলে গেল ন্যান্সির কাউন্টারে। আইরিশ রুমাল বাছতে বাছতে তাকে সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব করে বসল।

ন্যান্সি আগন্তুক যুবকের প্রস্তাবে সম্মতি দিল না। ফুট দশেক দূরে দাঁড়িয়ে ঝলমলে পোশাকে সজ্জিতা একটা মেয়ে আড়চোখে তাকিয়ে আর উৎকর্ণ হয়ে ব্যাপারটা লক্ষ্য করল।

যুবক ক্রেতাটা বিদায় নেবার পর সে গল্প ছেড়ে গালমন্দ করে ন্যান্সিকে একেবারে নাজেহাল করতে লাগল।

ধ্যুৎ! তুমি কেমন বোকা হাঁদা মেয়ে হে! ওই যুবকটা রীতিমত এক ধনকুবের। বুড়ো ভ্যান স্কিটলস-এর আপন ভাগ্নে, জান? কথাবার্তাও তো সেভাবেই বলল। তোমার মাথাটাথা বিগড়ে গেছে নাকি ন্যান্স? ভেবে পাচ্ছিনে, তুমি এটা করলে কি করে! ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়ে তুলে ন্যান্সি বলল—'তাই নাকি? তার কথায় রাজি হই নি বলে? লোকটা যে ধনকুবের নয় এটা কিন্তু তোমার বোঝা দরকার ছিল। বছরে বিশ হাজার ডলার পারিবারিক ভাতা সে পায়। ব্যাস, কেবলমাত্র সেটাই তার খরচ করার অধিকার আছে। সেদিন নৈশভোজ সারতে সারতে এই লোকটার কথা সে বলছিল।

পোশাক আশাকে কেতাদুরস্ত মেয়েটা আর কয়েক পা এগিয়ে এসে ভ্রূ কুঁচকে ন্যান্সির দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাকাল। কর্কশ স্বরে ন্যান্সিকে লক্ষ্য করে কথাটা ছুঁড়ে দিল—তুমি কেমনটা চাও, জানতে পারি কি? এটাই কি তোমার পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে কর না? সলমোন হওয়ার সাধ হয়েছে নাকি তোমার? তুমি কি গ্লাডস্টোন ডোরি, স্পেনের অধিপতি! রকফেলার বা তাদেরই

সমগোত্রীয় কারো গলায় বরমাল্য পরাবার বাসনা করেছ?

ন্যান্‌সি ভেতরে ভেতরে ফুঁসতে থাকলেও নিজেকে সামলে নিয়ে বলল—ব্যাপারটা পুরোপুরি বিত্তসম্পদকে কেন্দ্র করে নয়, সে রাত্রে নৈশভোজ সারতে সারতে তার বন্ধু তার মিথ্যে ভাষণ ধরে ফেলেছিল। এক মেয়েকে কথা দিয়েও তাকে নাকি দেখাতে নিয়ে যায় নি। আসলে মিথ্যাবাদীকে আমি বরদাস্ত করতে পারি না। মোদ্দা কথা, লোকটা আমার অপছন্দ। সত্যিকারের একজন মানুষকেই আমি অন্তর থেকে চাইছি, যাকে বলে সত্যিকারের একজন কর্মী-পুরুষ, বুঝলে এবার?

চোখে-মুখে বিতৃষ্ণার ছাপ ফুটিয়ে তুলে কর্কশ স্বরে মেয়েটা বলে উঠল—'তোমার উপযুক্ত স্থান একমাত্র হাসপাতালের ওয়ার্ড, বুঝলে? কথাটা বলেই সে পিছিয়ে নিজের জায়গায় চলে গেল।

ন্যান্‌সি হপ্তায় আট ডলার রোজগার করে, এরকম উচ্চাশা নিয়ে দিন কাটাতে লাগল। শুকনো রুটিতে পেট ভরে দিনের পর দিন কোমরবন্ধটাকে আঁটতে আঁটতে অজ্ঞাত পুরুষকে শিকার করার প্রত্যাশায় দিন কাটাতে লাগল। তার চোখে-মুখে ভেসে উঠতে লাগল অদৃষ্টের চক্করে পড়া পুরুষ-শিকারীদের হর্ষ-বিষাদ ক্লিষ্ট হাসির ছাপ। তার বিপনিটি অরণ্যের সামিলই বটে। বহুবারই লম্বা শিং ও বড় মাপের শিকার জ্ঞান করে বারবার বন্দুক উঁচিয়ে ধরেও প্রতিবারই মনমরা হয়ে বন্দুকের নলটাকে নামিয়ে নিয়েছে। আবার নতুন শিকারের খোঁজে ওৎ পেতে অপেক্ষা করতে লাগল।

তার বান্ধবী লু? সে ইতিমধ্যেই বরাত ফিরিয়ে নিয়েছে। প্রতি হপ্তায় পাওয়া সাড়ে আঠার ডলার থেকে ঘরভাড়া ও আহারাদি বাবদ ব্যয় করে ছ'ডলার। আর বাকি অর্থ পোশাক-পরিচ্ছদ বাবদ ব্যয় হয়ে যায়। ন্যান্‌সির তুলনায় রুচি ও জীবনযাত্রার মান উন্নত করার চিন্তায় নিজেকে লিপ্ত রাখার অবকাশ তার খুবই কম। সারাদিন গরম ইস্ত্রি হাতে নিয়ে তাকে কেবল কাজ আর কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে হয়। ইস্ত্রি গরম থাকলে তো আর থামার কথা ভাবাই যায় না। আর আসন্ন সন্ধ্যার আকাঙ্খিত আনন্দ অনুষ্ঠানের ভাবনা মাঝে মধ্যে মাথায় এসে ভর করে। রঙ-বেরঙের আর দামী পোশাক-আশাক তাকে ইস্ত্রি করতে হয়। সে জন্যই হয়ত ইস্ত্রি নামক যন্ত্রটার মাধ্যমে তার ভেতরে পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতি আকর্ষণ উত্তরোত্তর বেড়েই চলে।

দিনের শেষে হাতের কাজ ফুরিয়ে গেলে ডান তার জন্য বাইরে অধীর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। মাঝে-মধ্যে কৌতূহল-মিশ্রিত চাহনি মেলে লু-র পোশাকের দিকে তাকিয়ে থাকে। কারণ, পোশাকের চেয়ে লোক দেখানোর প্রয়াসই তার মধ্যে বেশী থাকে। ডান কিন্তু এতে খুশী নয়। পথচারীরা তার পোশাক আশাকের দিকে কৌতূহলী নজরে তাকিয়ে থাকলেও মোটেই আমল দেয় না।

তবে এ-ও সত্য নয় যে, লু তার বান্ধবীকে তেমন ভালবাসে না। ব্যাপারটা ধরতে গেলে রুটিনে দাঁড়িয়ে গিয়েছে, লু আর ডান যখন, যেখানে বেড়াতে যাবে ন্যান্‌সি তাদের সঙ্গে যাবেই। এ উপরি ব্যয়ের বোঝা ডান নির্দ্বিধায়, হাসিমুখেই বহন করে। বরং বলা যেতে পারে, ভ্রমণে বেরোলে লু রং জোগায়, ন্যান্‌সি জোগায় সুর, আর ব্যয়ের বোঝা বয় ডান। রেডিমেড পোশাকে সজ্জিত হয়ে সহযাত্রী বন্ধুটি পরমানন্দে তাদের সঙ্গদান করে। তাদের মেলামেশায় তিলমাত্র ব্যাঘাতও ঘটায় না। এমন সব ভাল মানুষ আছে যার উপস্থিতিতে সবাই নিজেদের ভুলে থাকে—সে এমনই একজন। আর সে অনুপস্থিত থাকলে তার কথা বড্ড বেশী করে স্মৃতির পটে ভেসে ওঠে।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, এরকম হাল্কা আনন্দ-অনুষ্ঠানে ন্যান্‌সি-র মত উন্নত ও মার্জিত রুচিসম্পন্না মেয়ের কাছে কিছুটা বিতৃষ্ণা তো মনে জাগেই। তবে সে-ও উদ্ভিন্ন যৌবনা। মানুষকে ভোজনরসিক করে তোলাই তো যৌবনের ধর্ম। সেক্ষেত্রে রুচির ব্যাপারটা প্রাধান্য পায় না।

একদিন লু তার বান্ধবী ন্যান্‌সি-কে বলল—একটা কথা। ডান-এর ইচ্ছে, আমি এখনই তাকে বিয়ে করি। আমি বিয়েটিয়ের হাঙ্গামায় যাব কেন, বল তো? আমি সত্যিকারের স্বাধীন। এখন আমি আমার টাকাকড়ি যেভাবে খুশি খরচ করতে পারি। কিন্তু বিয়ের পর? তখন তো সে আমাকে চাকরি করতেই দেবে না। মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে আবার মুখ খুলল—ভাল কথা, ন্যান্‌স। তুমি আদ্যিকালের বিপনিটাতে কেন পড়ে রয়েছ? মনের মত খাবার বা ভাল পোশাক পরিচ্ছদ কিছুই জোগাড় করতে পার না। তুমি রাজি থাকলে আমাদের লন্ড্রীতে তোমার একটা কাজের ব্যবস্থা

করে দিতে পারি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আরও কিছু বেশি পেনি রোজগার করতে পারলে তোমার এমন হিসেব করে খরচ করার দরকার পড়বে না।

মুচকি হেসে ন্যান্সি বলল—'আমি হিসেব করে খরচ করি এমনটা তো আমার মনে হয় না লু। একটা কথা শুনে রাখ, আমি বরং একবেলা খাব, আধ-পেটা খেয়ে দিন কাটাব তবু যেখানে আছি সেখানেই থাকতে আগ্রহী। তবে সুযোগের প্রতীক্ষায় আমি আছি, চিরদিন সেখানে পড়ে থাকব না, শুনে রাখ। আমি সেখানে নিত্য নতুন শিক্ষা লাভ করছি। ধনকুবের নিয়েই আমার কাজ হলেও তাদের আমি মোটেই বরদাস্ত করতে পারিনে।

লু চোখে-মুখে বিদ্রূপাত্মক হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বলল—একটা কথা ন্যান্স, তোমার ধনকুবেরটাকে কি কব্জা করতে পেরেছ?

না। আজ অবধি কাউকে নির্বাচন করতে পারিনি। জোর তল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছি।

সে কী হে! এখনও তল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছ? ব্যাপার কি, কাউকেই কি পাত্তা, মানে কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছ না? তার মালকড়ি না হয় কিছু কমই থাকল, ক্ষতি কি? ধ্যুৎ! তুমি রসিকতা করছ, টাকার কুমীরগুলো আমাদের কথা নিয়ে মাথা ঘামায় না।

যদি মাথা ঘামাত তবে আখেরে তাদেরই লাভ হত। স্বাভাবিক কণ্ঠেই ন্যান্সি জবাবটা ছুঁড়ে দিল। মানে কিভাবে টাকা জমানো যায় এটা আমরা কেউ না কেউ তাদের শিখিয়ে দিতে পারতাম।

খিল খিলিয়ে হেসে লু বলল—'শোন, কেউ যদি আমার মুঠোর মধ্যে আসতে চায় আমি কিন্তু তাকে ঠিক বাগিয়ে নেব। আসলে তাদের চরিত্র সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণা নেই বলেই তুমি এমন কথা এত সহজেই বলতে পারছ। সাধারণ মানুষ আর ধনীদের মধ্যে ফারাকটা বুঝতে হলে তাদের আরও কাছে গিয়ে দেখতে হবে। তুমি কি বুঝছ না, কোটটার চেয়ে ওই লাল সিল্কের লাইনিংটা একটু বেশীই গাঢ়, কি, বুঝতে পারছ?'

কই, আমার চোখে তো তেমন কিছু লাগছে না। আসলে রোদ-বৃষ্টিতে তোমার জামার রঙটা জ্বলে যাওয়ায় তার পাশে সেটাকে বেশী লাল দেখাচ্ছে।

ভাবে গদগদ স্বরে ন্যান্সি এবার বলল—'মিসেস ড্যান এলস্টাইন ফিশার-এর জ্যাকেটটার মতই কিন্তু এ জ্যাকেটটার কাট ছাট বলতে পার, হুবহু একই কায়দায় তৈরী। তিনি যে জ্যাকেটটা সেদিন গায়ে দিয়ে এসেছিলেন সেটার কথা বলছি, বুঝেছ তো? এটার জন্য আমাকে খরচ করতে হয়েছে ৩.৯৮ ডলার। আমার মনে হয় প্রায় ১০০ ডলার বেশী দিয়ে তাকে জ্যাকেটটা কিনতে হয়েছে।

লু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল—হতে পারে, স্বীকার করছি। আমার বিশ্বাস, এ পোশাক পরে তোমার পক্ষে কোন ধনকুবেরকে ছিপে গাঁথতে পারবে না। শোন, তোমার আগেই যদি আমি কোন ধনকুবেরকে কব্জায় নিয়ে আসতে পারি তবে অবাক হবার কিছুই থাকবে না। মুহূর্তের জন্য ন্যান্সির মুখের দিকে তাকিয়ে লু এবার বলল—কি, মিথ্যে বলেছি?

ন্যান্সি এ কথার কি জবাব দেবে ভেবে না পেয়ে নীরব চাহনি মেলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

একজন কৃতী দার্শনিক ছাড়া দু'বন্ধুর মতাদর্শের যথাযথ মূল্য নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নয়।

লণ্ড্রীর ভাপসা গরমে ইস্ত্রি নিয়ে মেতে থেকে লু ভালভাবেই দিন গুজরান করে যেতে লাগল। যা বেতন পায় তাতে খাওয়াদাওয়া ও পোশাক-পরিচ্ছদের জন্য খরচখরচা করে সুখেই আছে। কিন্তু মাঝে মধ্যে ডান-এর পরিচ্ছন্ন ও রুচিহীন পোশাক-আশাক দেখে তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়। ডান যে তার পরিবর্তনহীন, একান্ত অনুরাগী আর প্রতিদিনের সঙ্গী।

আর ন্যান্সির ব্যাপার স্যাপারই আলাদা। হাজার হাজার ছাড়া সে ভাবতেই পারে না। পরনে সিল্কের পোশাক, গায়ে জড়োয়ার গহনাপত্র, পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান গন্ধদ্রব্যাদি, নাচ-গান-বাজনা প্রভৃতি তো নারীর জন্যই তৈরী হয়েছে। আর এসব তো জীবনেরই অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই এসব তার নাগালের মধ্যেই থাকা চাই। ইসাউ-র মত তার পক্ষে তো নিজের সঙ্গে বেইমানী করা সম্ভব নয়। এগুলোর ওপর তার জন্মগত অধিকার, তবে তার আর খুবই সামান্য।

হ্যাঁ, ন্যান্সি তো এরকম পরিবেশেই মানুষ হয়েছে। সস্তা দামের খাবার খেয়ে আর অল্পদামের

পোশাক পরেই সে তুষ্ট। এ বয়সেই সে মেয়েদের চরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পেরেছে। এবার মন দিয়ে পুরুষ নামক জাতের বিচার করতে, তাদের অভ্যাস আর যোগ্যতা যাচাইয়ে আত্মনিয়োগ করেছে। আজ না হোক কাল তার বাঞ্ছিত শিকারটাকে হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে আসবেই। কিন্তু সে নিজেকে প্রবোধ দিয়েছে, সে শিকারটা তার কাছে শ্রেষ্ঠতম হবে। ছোট কিছু নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।

এভাবেই সে তার সেঁজুতিকে সেই কবে থেকে জ্বালিয়ে রেখেছে, যাতে স্বামীরত্নটি আসার সময় হলে তাকে বরণ করে নেওয়া সম্ভব হয়।

ন্যান্সি আর একটা শিক্ষা লাভ করেছে, এমনও হতে পারে নিজের অজান্তেই সেটা লাভ করেছে। তার আদর্শের মূল্যমান ক্রমে পাল্টাতে আরম্ভ করেছে। ডলারের কথাটা ক্রমে তার মন থেকে মুছে যাচ্ছে, আর ক'টা অক্ষর যেমন 'সম্মান', 'সত্য' আর 'দয়া' শব্দ কটা ক্রমে মনের কোণে জেগে উঠতে শুরু করেছে। উদাহরণস্বরূপ এমন একজনের কথা উল্লেখ করছি সে এক গভীর বনে হরিণ শিকার করতে অভ্যস্ত। শেওলা আর আগাছায় ছাওয়া ছোট্ট একটা উপত্যকা সে দেখতে পেল, সেখানে ছোট একটা বেগবতী নদী কুলকুল রবে তাকে বিশ্রাম আর আরামের আহ্বান জানায়। এরকম পরিস্থিতিতে তার বর্শাটা ভোঁতা হতে বাধ্য।

এক সন্ধ্যায় ন্যান্সি বিপনি থেকে বেরিয়ে সিক্সথ এভিনিউ দিয়ে লন্ড্রীটার দিকে হেঁটে চলল। লু আর ডান-এর সঙ্গে একটা গীতিনাট্য দেখতে যাওয়ার কথা।

ন্যান্সি লন্ড্রীর কাছে যেতেই ডান বিষণ্ণমুখে সেখান থেকে বেরিয়ে এল।

ন্যান্সি'কে দেখেই ডান ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারণ করল—আমি জানতে এসেছিলাম, লু এখানে কিছু বলে গেছে কিনা।'

লু? লু-র কথা বলছেন? সে এখানে নেই?

হ্যাঁ, লু-র কথাই বলছি। আমি ভেবেছিলাম, আপনি সব জানেন। গত সোমবার থেকে এখানে তো আসেইনি, বাড়িতেও ছিল না।

তার মানে?

তার যাবতীয় জিনিসপত্র নিয়ে সে এ জায়গা ছেড়ে চলে গেছে। লন্ড্রীর এক মেয়েকে নাকি সে বলে গেছে, হয়ত চলে যাবে। ন্যান্সি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল—'কেউ তাকে কোথাও দেখতে পায়নি?'

রীতিমত গম্ভীর ও কর্কশ স্বরে ডান এবার বলল—'লন্ড্রীর কর্মচারীদের মুখে শুনলাম, গতকাল তারা তাকে একটা মোটরে করে যেতে দেখেছে। আমার মনে হয় যেসব ধনকুবেরদের নিয়ে তুমি আর লু দীর্ঘদিন ধরে ভাবনাচিন্তা করতে তাদেরই কারো সঙ্গে সে চম্পট দিয়েছে।

ন্যান্সি জীবনে আজই প্রথম ভয়ে কুঁকড়ে গেল। কাঁপা কাঁপা হাতটাকে সে ডান-এর জামার হাতার ওপর রাখল। তারপর বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বলল—ডান, আমাকে একথা বলার অধিকার আপনার নেই। আর জেনে রাখবেন, এ সবের সঙ্গে আমি জড়িতও নই, বুঝলেন?'

ডান আমতা আমতা করে বলল—'আমি সে রকম কিছু ভেবে কথাটা বলি নি, বিশ্বাস করুন।' মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে নিয়ে আগের মতই নরম স্বরে এবার বলল—'আজ রাত্রের শো-র টিকিট পকেটে আছে। আপনি যদি ইচ্ছে—'

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ন্যান্সি তার কথায় আন্তরিকতার ছোঁয়া পেয়ে বলে উঠল—'ডান, আমি তোমার সঙ্গে যেতে রাজী আছি।'

এ ঘটনার তিন মাস পরে এক সন্ধ্যায় লু-র সঙ্গে ন্যান্সি-র আবার মুখোমুখি দেখা হল।

বিপনির মেয়েটা একটা পার্কের গা দিয়ে লম্বা লম্বা পায়ে পথ পাড়ি দেওয়ার সময় শুনতে পেল কে যেন তার নাম ধরে ডাকাডাকি করছে। সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। চোখের পলকে লু দৌড়ে এসে তাকে জাপ্টে ধরল। উভয়ের জিভের ডগায় হাজার কর্কশ প্রশ্ন এসে ভিড় করল। কিন্তু কেউ-ই কাউকে আক্রমণ করতে পারল না। ঠিক তখনই ন্যান্সি-র নজরে পড়ল, লু-র বরাত খুলেছে। সে গায়ে চাপিয়েছে বহুমূল্য লোমশ কোট, আর মণি-মুক্তোর অলঙ্কার ঝলমল করছে। এলাহি ব্যাপার।

ন্যান্‌সি মুখ খোলার আগেই লু গলা ছেড়ে বলে উঠল—'বোকা মেয়ে কোথাকার! তুমি আজও সে দোকানেই কাজ করছ। তোমার গায়ে তো আগের মতই সস্তা দামের ও নোংরা পোশাক দেখতে পাচ্ছি। ভাল কথা, তোমার সে বড় শিকার ধরার কাজটা কত দূর এগিয়েছে? এখনও কাজ হাসিল করতে পারনি, তাই না?'

লু এবার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে ন্যান্‌সি-র দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল। তার সর্বাঙ্গ দিয়ে অত্যুজ্জ্বল একটা দ্যুতি যেন ঠিকরে বেরোচ্ছে। চোখের মণি দুটো মুক্তোর চেয়েও বেশী ঝকমক করছে। আর গাল দুটো গোলাপের আভার চেয়েও লাল হয়ে উঠেছে।

তোমার অনুমান অভ্রান্ত। এখনও সেই বিপনিতেই কাজ করছি। তবে আগামী হপ্তাতেই কাজটায় ইস্তফা দিয়ে দেব। আমার বাঞ্ছিত শিকারটাকে আমি হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে নিয়েছি। বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম শিকার। লু তুমি এখন আর কিছু মনে করবে না তো। আমি ডানকে বিয়ে করতে চলেছি। ডান এখন আমার—একান্তভাবেই আমার। লু, ঠিক কাজ করেছি তো?

কম বয়সী একটা নতুন পুলিশ পার্কের বাঁক ঘুরে এগিয়েই দেখতে পেল, বহুমূল্য লোমশ কোট পরা এবং আঙুলে হীরের আংটি পরে এক মহিলা পার্কের লোহার রেলিঙের ওপর ঝুঁকে ডুকরে কেঁদে চলেছে। আর সাধারণ পোশাক পরা রোগাটে খেটে-খাওয়া চেহারার একটা মেয়ে তাকে নানাভাবে প্রবোধ দিচ্ছে। পুলিশটা নতুন চাকরি পেয়েছে। তাই হয়ত ব্যাপারটাকে আমল না দিয়ে, না দেখার ভান করে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। কারণ তার তো আর অজানা নয়, এসব ব্যাপার স্যাপারে তার মত শক্তিধরের কিছুই করার নেই। তবে হ্যাঁ, সে হাতের লাঠিটাকে মাটিতে এমনভাবে ঠুকতে ঠুকতে এগিয়ে যেতে লাগল যে, তা থেকে স্পষ্ট শব্দটা হয়ত আকাশের দূরতম নক্ষত্রটা পর্যন্ত চলে গেল। মহিলাটা অনবরত কেঁপেই চলেছে।

এ ম্যাডিসন স্কোয়ার অ্যারাবিয়ান নাইট

সন্ধ্যায় ফিলিপস্‌ কারসন চামার্স'কে ডাকের চিঠি ক'টা দিয়ে গেল। স্বাভাবিক চিঠিগুলোর মধ্যে দুটো চিঠির গায়ে একই বিদেশী পোস্টঅফিসের সীলমোহর মারা রয়েছে।

একটা খামের মুখ খুলতে একটা মেয়ের ফটো দেখতে পেল। আর দ্বিতীয় চিঠিটা খুবই বড়—অনেক কিছু লেখা। অন্য একটা মেয়ের লেখা চিঠি। চিঠি তো নয় যেন মধুর প্রলেপ দেওয়া বিষের ট্যাবলেট। খামের ভেতর থেকে যে মেয়েটার ফটো বের করেছে তার সম্বন্ধে মিষ্টি-মধুর ভাষায় বক্রোক্তিতে ভরা চিঠিটা।

একবার পড়েই চামার্স চিঠি কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ময়লা কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিল। তারপর দামী কার্পেট বিছানো মেঝেতে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল। সে খাঁচাবন্দী জানোয়ারের মত যেন দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। আর কোন মানুষ যখন সন্দেহের বশে বন্দী হয় সে-ও এমনি করেই দাপাদাপি করে।

এক সময় তার মানসিক অস্থিরতা ক্রমে থিতিয়ে এল। প্রায় স্বাভাবিকতা ফিরে পেল। ঠিক তখনই ফিলিপস্‌ ঘরে ঢুকল। সে সব সময়ই এমন ধীর পদক্ষেপে ঘরে ঢোকে। তার এ কাজটাকে একমাত্র জিনের আবির্ভাবের সঙ্গেই তুলনা করা চলে। ফিলিপস্‌ ক্ষীণ কণ্ঠে বলল—'আপনি কি নৈশভোজ বাড়িতে সারবেন, নাকি বাইরে থেকে—'

বাড়িতেই খাব। আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই খেয়ে নেব।

ফিলিপস্‌ পিছন ফিরে দরজার দিকে পা বাড়াতেই চামার্স বলল, 'শোন, স্কোয়ারের ধার দিয়ে আমি বাড়িতে ফেরার সময় দেখলাম, সেখানে বহু মানুষ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে। আর একজন লোক উঁচু একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে কিসব বলছে। লোকগুলো সেখানে জড়ো হয়েছে কেন? আর কেনই বা তারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে, বলতে পার?

স্যার, বলতে পারেন লোকগুলোর মাথাগোঁজার জায়গা বা খাবর দাবার কিছুই নেই। উঁচুতে দাঁড়ানো লোকটা তাদের রাত্রি কাটানোর মত জায়গার ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করছে। তার বক্তব্য শোনার জন্যই চালচুলোহীন লোকগুলো সেখানে জড়ো হয়েছে, তবে টাকাকড়িও কিছু দেয়। সে টাকায় যে ক'জনের মাথা গোঁজার জায়গা জোগাড় হয়, সে তাদের একটা বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে। সে আশাতেই সবাই সেখানে জড়ো হয়ে তীর্থের কাকের মত তার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। যে আগে হাজির হয় তার বরাতেই মাথা গোঁজার জায়গা আগে জুটে যায়।

শোন ফিলিপস্ আমাকে যখন রাত্রের খাবার দেবে তখন তাদের মধ্য থেকে একজনকে এখানে ডেকে আনবে। চামার্স বলল।

ফিলিপস্ জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তার মুখের দিকে তাকাল। চামার্স এবার বলল—কারণ, সে আমার সঙ্গে নৈশভোজ সারবে।

অপ্রত্যাশিত বক্তব্যটা শুনে ফিলিপস্ থতমত খেয়ে বলল—। ডে-কে আ-ন-ব? কিন্তু কা-কে?

যাকে ইচ্ছে ডেকে আনবে। তবে এটুকু খেয়াল রেখো লোকটা যেন একটু ভদ্র—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়, বুঝলে?

চামার্স খলিফার ভূমিকা পালন করবে এটা ভাবতেও উৎসাহ পাওয়া যায় না। তবে এর মাধ্যমে এক ঘেয়ে রাত্রি কাটাবার একটা ফিকির খুঁজছে। ঝিমিয়ে পড়া মনটাকে চাঙা করে নেওয়ার জন্য অসংযত, উদ্ভট অ্যারাবিয়ান নাইটের মত বড় রকমের কিছু একটা সে চাইছে।

ফিলিপস্ আধ ঘণ্টার মধ্যেই কাজ মিটিয়ে ফেলল। মোমবাতির হাল্কা আলোয় টেবিলের ওপর দু'জনের উপযোগী খাদ্যবস্তু সাজিয়ে ফেলল। তারপর মাথা গোঁজার জায়গার জন্য উদ্বিগ্ন ভিখারীদের মধ্য থেকে শীতার্ত একজনকে অতিথি হিসেবে বাড়িতে ডেকে আনল। ধর্মগুরুর মতই তাকে আহ্বান ও আদর আপ্যায়ণ করতে লাগল। আবার চুরি করতে এসে ধরা পড়ে যাওয়া আসামীর মত আচরণও মনে করা যেতে পারে।

এরকম চরিত্রের লোককে একমাত্র দুশ্চরিত্রই আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। তাকে দেখে মনে হ'ল আগন্তুক লোকটাকে ঘষেমেজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নেওয়া হয়েছে। ঘরের আসবাবপত্র ও অন্যান্য সামগ্রীর মাঝে সে সম্পূর্ণ বেমানান। লিকলিকে চেহারা, ফ্যাকাশে বিবর্ণ। চোখ দুটো গর্তে বসা। ফিলিপস্-এর চিরুণি দিয়ে সাধ্যমত চেষ্টা করেও তার চুলগুলোকে পথে আনা সম্ভব হয় নি। পথের বে-ওয়ারিশ কুকুর তাড়া খেয়ে যেমন চোখের তারা দুটোতে ভারি হতাশা আর ক্ষোভের ছাপ ফুটিয়ে তোলে ঠিক তেমনি দৃষ্টিতে সে তাকিয়েছিল। চামার্স যখন গোল খাবার টেবিলটার বিপরীত দিক থেকে উঠে দাঁড়াল তখন লোকটাকে এতটুকুও বিব্রত মনে হ'ল না।

তুমি সম্মত হলে তোমাকে সঙ্গে করে রাত্রের খাবার খেতে পারলে আমি আনন্দিতই হব।—গৃহকর্তা চামার্স কথাটা বলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

রাস্তা থেকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসা অতিথি খেঁকিয়ে ওঠার স্বরে বলল—'আপনি যাকে পাশে বসিয়ে রাত্রের খাবার খেতে চাইছেন তার নামটা অবশ্যই আপনি জানতে আগ্রহী, কি বলেন? প্লুসার আমার নাম।

চামার্স সঙ্গে সঙ্গে বলল—'আমি বলার জন্য মুখ খুলছিলাম, আমার নাম চামার্স। এখন বল তো, তুমি টেবিলে আমার সামনাসামনি বসতে রাজি আছ?'

ফিলিপস্ পিছন থেকে চেয়ারটা ঠেলে এগিয়ে দিল। প্লুসার বসল। ফিলিপস্ মাছ ও জলপাইয়ের দুটো প্লেট দু'জনের দিকে এগিয়ে দিল।

প্লুসার যেন এবারে খেঁক খেঁক করে উঠল—চমৎকার! চমৎকার! হরেক রকম খাবারেরই বন্দোবস্ত করা হয়েছে, তাই না? শীতের শুরুতেই নির্ভেজাল প্রাচ্য প্রথার আপনিই প্রথম খলিফা যার মুখোমুখি বসে ভোজ সারা আমার বরাতে জুটল। আর আমি সারিতে তেতাল্লিশ নম্বরে দাঁড়িয়েছিলাম, ভাবতেও অবাক লাগে। আমি তখন গণনার কাজ সবেমাত্র সেরেছি ঠিক সে মুহূর্তেই আপনার প্রেরিত বাহনটি গিয়ে আমাকে রাত্রের খাবার সারার জন্য আমন্ত্রণ জানাল। পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হবার সৌভাগ্যের মতই ব্যাপার ছিল আজ রাত্রের জন্য একটা বিছানা জোটাতে পারা।

আমার জীবনের করুণ কাহিনী আপনি কিভাবে শুনতে চান বলুন তো? প্রতিটা পদ পরিবেশনের সময় টুকরো টুকরো পরিচ্ছেদ, নাকি খাবারের পাট চুকিয়ে কফি ও চুরুট টানতে টানতে এক সঙ্গে সম্পূর্ণটা একবারে?

চামার্স জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে আগন্তুকের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে এরকম ব্যাপার তোমার জীবনে এটাই প্রথম নয়, আগেও ঘটেছে।'

পরম পূজনীয় পয়গম্বর নুরের নামে শপথ করে বলছি—না। শুনুন, বাগদাদ শহরে যেমন মাছির অভাব নেই, ঠিক তেমনই নিউইয়র্ক শহরের বুকে ক্ষুদে হারুণ-অল-রসিদ বহু ছড়িয়ে আছে। কম সে কম কুড়ি দিন আমাকে পেট ভরে খেতে দিয়ে আমার জীবন কাহিনী শোনার জন্য আমাকে আটকে রেখেছে। একটা কথা মনে রাখবেন, কোন কিছুর বিনিময় ছাড়া আপনাকে কিছু দেবে এরকম লোক নিউইয়র্কে একটাও খুঁজে পাবেন না। এখানে কৌতূহল আর দাতব্য পরম আত্মীয়ের মত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকে। বহু লোক আছে যারা দু'চারটে ডাইস বা সামান্য সজ্জির ঝোলের বিনিময়ে আপনার সম্পূর্ণ জীবন কাহিনী শুনে নেবে। পাতাল রেলের ছোট্ট স্টেশন পুরনো বাগদাদে যখন কেউ আমাকে খাবার খাওয়ানোর জন্য অভ্যর্থনা করে নিয়ে যায় তখন আমার কর্তব্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল থাকি। পথ চলার সময় সদর রাস্তায় মাথাটাকে তিনবার ঠুকে ঠিক করে ফেলি খাবারের বিনিময়ে, দাম হিসেবে কোন্ মনগড়া কাহিনীটা আমি বলব। আমি গোড়াতেই বলে রাখছি, আমি স্বর্গীয় টমি টাকার-এর উত্তরসুরী, যিনি এক সময় সামান্য খারের বিনিময়ে নিজে সুর বেচে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

চামার্স গম্ভীর স্বরে বলল—তোমার গল্প শোনার কৌতূহল বা আগ্রহ কোনটাই আমার নেই। আমি বলে রাখছি, হঠাৎই ঝোঁকের শিকার হয়ে আমি আমার সঙ্গে বসে রাত্রের খাবার খাওয়ার জন্য লোক পাঠিয়ে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিকে আনিয়েছিলাম। প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমার কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্য তোমার তিলমাত্রও কষ্ট স্বীকার করার দরকার নেই।

কী যা-তা বকছেন! অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে ঝোলটা গলা দিয়ে নামাতে নামাতে আগন্তুক এবার কর্কশ স্বরে বলে উঠল—'কি যে বলেন, আমি এর জন্য এতটুকুও মনঃক্ষুণ্ণ হই না। সত্যি বলতে কি, আমরা যখন বিছানা পাবার আশায় এভাবে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াই তখন আমাদের এরকম কাজের জন্য দর বাঁধাই আছে। পৃথিবীতে আমাদের এমন দুর্গতি, এটা অনেকেই জানার জন্য কৌতূহলাপন্ন হয়। এক টুকরো স্যান্ডউইচ আর এক পেয়ালা বীয়ারের জন্য তাদের জানাই মদ গেলার জন্যই আমাদের দুর্গতি। আর যে গো-মাংস বাঁধাকপির ঝোল আর এক কাপ কফি খেতে দেয় তাদের কাছে পরিবেশন করি নির্মম নিষ্ঠুর এবং অত্যাচারী জমিদারের গল্প—ছ'মাস হাসপাতালের বেডে কাটাবার আর চাকরি খোয়াবার গল্প। গরুর শিরদাঁড়ার উপাদেয় মাংস আর শোবার বিছানা যে দেয় তার কাছে বলি ওয়াল স্ট্রীটে বরাতের ফেরে পড়া আর দুঃসময়ের কবলে পড়ে দ্রুত পতনের গল্প। তবে হ্যাঁ, সত্যি বলছি এখানকার মত প্রস্তাব আমি এই প্রথম শুনলাম। স্বীকার করছি, এসবের বিনিময়ে বলার মত গল্প আমার জানা নেই। মিঃ চামার্স, বিশ্বাস করুন, আপনি যদি শুনতেই চান তবে আমি সত্যি কথাই আপনার কাছে ব্যক্ত করব। তবে এ-ও সত্যি, মনগড়া গল্পের চেয়ে সে কাহিনী বিশ্বাস করা আপনার পক্ষে আরও বেশী কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।'

ফিলিপস্ এক পেয়ালা কফি আর চুরুটের বাক্সটা টেবিলের ওপর রাখল। আর আরব অতিথি অদ্ভুত স্বরে হেসে বলল—শেরার্ড প্লুসার-এর নাম কোনদিন শুনেছেন কি?

ভ্রূ কুঁচকে, মুখে চিন্তার ছাপ এঁকে চামার্স বলল—আমার বিশ্বাস, তিনি একজন চিত্রশিল্পী ছিলেন। বছর কয়েক আগেও তার খুব খ্যাতি ছিল। এর-ওর মুখে নামটা শোনা যেত।

পাঁচ বছর আগে। ব্যস, তারপর এক ঢেলা শিসের মত আমি ডুবে যাই। আমারই নাম শেরার্ড প্লুসার। দু'হাজার ডলারের বিনিময়ে আমার শেষ ছবিটা বিক্রি করেছিলাম। তারপর থেকে মাগনা ছবি আঁকার জন্যও কেউ আমাকে তলব করে না।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চামার্স প্রশ্নটা করতে বাধ্য হল—এরকমটা হওয়ার কারণ?

হাসির ব্যাপারই বটে! আজ অবধি আমি নিজেই কারণ সম্বন্ধে ধারণা করতে পারিনি। কিছুদিন আমি কর্কের মত ভেসে যেতে লাগলাম। হাতে আসতে লাগল একটার পর একটা কাজ। আমার

চারদিকে মানুষের ভিড় লেগেই থাকত। খবরের কাগজওয়ালারা পঞ্চমুখে আমার সুখ্যাতি করতে লাগল। একটা ছবি শেষ হলেও সেটার দিকে তাকিয়ে একজন অন্য একজনের সঙ্গে অনুচ্চকণ্ঠে বলাবলি করত।

অল্পদিনের মধ্যেই আমি প্রকৃত সমস্যাটা ধরে ফেলতে পারলাম। আমার ভেতরে এমন একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল যার ফলে যার ছবি আঁকতাম তার চরিত্রেরে গোপন দিকটা আমার ছবিতে ফুটে উঠত। আমি তিলমাত্রও বুঝতে পারতাম না কেন এমন কাণ্ড হচ্ছে। সঙ্গে যারা ছবি আঁকতে বসত তারা তো রেগে একেবার অগ্নিশর্মা হয়ে উঠত। বেঁকে বসত। ছবিটা নিতে কিছুতেই রাজি হ'ত না।

একবার এক পরমা সুন্দরী সর্বজনপ্রিয় মহিলার ছবি এঁকেছিলাম। আঁকার কাজ মিটে গেলে তাঁর স্বামী ছবিটার দিকে মুহূর্তের জন্য তাকিয়েই চোখে-মুখে বিচিত্র একটা ভাব ফুটিয়ে তুললেন। ব্যস, পরের হপ্তায়ই তিনি ডিভোর্সের মামলা রুজু করে দেন।

এক প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক মালিক আমাকে দিয়ে নিজের ছবি আঁকান। আঁকার কাজ সেরে ছবিটা আমার স্টুডিওতে টাঙালাম। তাঁর পরিচিত একজন সেখানে এসে ছবিটা দেখতে পেলেন। এক নজর দেখেই আঁৎকে উঠে বললেন—হায়! সত্যি সত্যিই কি তিনি এরকম দেখতে? আমি জবাব দিলাম—আমি অবিকল তাঁর চেহারার মতই ছবিটা এঁকেছি।

আগন্তুক বললে—সেকী! এর আগে তাঁর চোখে এরকম ভাবতো নজরে পড়েনি। এখন ভাবতেই হচ্ছে, আজই আমার ব্যাঙ্ক একাউন্ট তুলে নেব। মুহূর্তকাল নীরবে কাটিয়ে প্লুসার আবার মুখ খুলল—হ্যাঁ, ব্যাঙ্কে তিনি গিয়েও ছিলেন। ব্যাঙ্ক একাউন্ট ইতিমধ্যেই গভীর জলে তলিয়ে গেছে, ব্যাঙ্ক মালিক বে-পাত্তা।

ব্যস, অল্পদিনের মধ্যেই আমার কারবার শিকেয় উঠে গেল। নিজের গোপন জঘন্য প্রবৃত্তি ফাঁস হয়ে পড়ুক এটা কারোই অভিপ্রায় নয়। তারা আপনার সঙ্গে হীন আচরণ করতে পারে বটে, কিন্তু ছবির মাধ্যমে তা প্রকাশ করতে রাজী নয়। তারপর থেকে ছবি আঁকার একটাও অর্ডার না পাওয়ায়, অনন্যোপায় হয়ে সে কাজ থেকে সরে দাঁড়াতেই হল।

একটা খবরের কাগজে কিছুদিন শিল্পীর চাকরি করলাম। তারপর লিথোগ্রাফীর কাজও করলাম। কিন্তু সেখানেও একই চক্করে পড়ে গেলাম। কোন ফটো দেখে ছবিটা আঁকলে তার মধ্যে এমন ভাব ফুটে উঠত যা আসল ছবিতে একেবারেই অনুপস্থিত। আমার চোখে কিন্তু সে সব ভাব স্পষ্ট ধরা পড়ত। আমার আঁকা ছবি নিয়ে হৈহৈ-রৈরৈ পড়ে গেল। বিশেষ করে মেয়েরা ত রীতিমত উঠে পড়ে লাগল। ফলে চাকরিটা খোয়াতেই হল। উপায়ান্তর না দেখে মদের বোতলকেই একমাত্র অবলম্বন জ্ঞানে আঁকড়ে ধরলাম। ক'দিন যেতে না যেতেই বিনা পয়সায় বিছানা সন্ধানকারীদের খাতায় নাম লেখালাম আর মুখে অদ্ভুত অদ্ভুত কাহিনীর অবতারণায় মেতে গেলাম।

পূজ্যপাদ খলিফা, আপনি এসব কথা শুনতে অস্বস্তি ও অবসাদ বোধ করছেন? যদি আজ্ঞা করেন তবে ওয়ালস্ট্রীটের দুর্ঘটনার কাহিনীটা ব্যক্ত করতে পারি। তবে সে কাহিনী শুনতে হলে কিন্তু চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা জল ঝরাতে হবে। কিন্তু আশঙ্কা হচ্ছে, আপনার দেওয়া এত ভাল ভাল খাদ্যবস্তু উদরস্থ করার পর আপনার চোখ দিয়ে জল ঝরানো খুব সমস্যার ব্যাপারই হবে। অবশ্য এসব শোনার পরও যদি—

তাকে থামিয়ে দিয়ে চামার্স বলে উঠল,—আরে না, তোমার কথাগুলি খুবই ভাল লাগছে। একটা কথা, তোমার সব ছবিতেই কি অবাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ধরা দিত, নাকি কিছু ছবি তোমার তুলির নিষ্ঠুরতার কবল থেকে অব্যাহতি পেতে পারত, বল ত?

প্লুসার ম্লান হেসে বলল, কোন কোন ছবি তো অব্যাহতি পেতই। তবে সেগুলির অধিকাংশ শিশু, গুটি কয়েক নারী আর পুরুষ। সবাই যে খারাপ নয় এ-তো আপনিও মানেন। ভাল মানুষের ছবি ভাল হওয়াই স্বাভাবিক, তাই না? আমি তো আগেই বলে রেখেছি, সব কথা যথাযথভাবে বোঝাতে পারি না। তবে আমি সব সত্যি কথাই বলছি—হুবহু সত্যি কথা।

সেদিনেরই ডাকে আসা ফটোটা চামার্স-এর টেবিলে পড়ে রয়েছে। তিনি ছবিটা প্লুসার-এর হাতে তুলে দিয়ে ফটোটার একটা স্কেচ এঁকে দিতে বললেন।

এক ঘণ্টা ধরে ছবিটা নিয়ে মেতে থাকার পর প্লুসার সদ্য আঁকা ছবিটা চামার্স-এর দিকে এগিয়ে দিতে গিয়ে বলল—এই নিন, ছবিটা আঁকা হয়ে গেছে। এবার সরবে একটা হাই তুলে সে বলল, বড়ই অবসাদ বোধ করছি। কাল রাত্রিটা নির্ঘুমভাবেই কেটেছে, জানেনই তো। হে ধার্মিকদের সেনাপতি, এবার যে আমাকে বিদায় নিতে হয়।

প্লুসার-এর পিছন পিছন দরজা পর্যন্ত গিয়ে চামার্স তার হাতে কয়েকটা বিল গুঁজে দিয়ে বলল,—এগুলো রাখ।

উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে প্লুসার বলল,—অবশ্যই! অবশ্যই নেব। এসবই রসাতলে যাওয়ার পথ করে দেবে। সুখাদ্য আপ্যায়ণের জন্য অশেষ ধন্যবাদ। আজ রাত্রে পালকের বিছানায় ঘুমোতে ঘুমোতে বাগদাদের খোয়াব দেখব। ভোর হলেও এটুকুও স্বপ্ন হয়ে উঠবে না আশা রাখছি। পরম পূজনীয় খলিফা, বিদায়!

প্লুসার বিদায় নিলে অস্থিরচিত্ত চামার্স ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। সদ্য আঁকা স্কেচটা টেবিলের ওপর তেমনি নিশ্চল নিথরভাবে পড়ে রইল। সে বার বার চেষ্টা করল, ছবিটার কাছে যায়, হাতে নিয়ে চোখের সামনে ধরে, পারল না। অজানা এক আতঙ্ক তার মন প্রাণ জুড়ে রয়েছে, ছবিটা থেকে তাকে তফাতে থাকতে বাধ্য করছে। এক সময় পাশের চেয়ারটায় দুম্ করে বসে পড়ল। অস্থির মনকে-সুস্থির করতে চেষ্টা করল। বৃথা চেষ্টা। কিছুতেই মানসিক স্থিরতা আনতে পারল না।

উপায়ান্তর না দেখে চামার্স উদ্ভ্রান্তের মত চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। ঘণ্টা বাজিয়ে ভৃত্য ফিলিপস্‌কে তলব করল।

ফিলিপস্ ছুটে এলে চামার্স বলল, মিঃ রেইনেসান নামে এক কিশোর চিত্রশিল্পী থাকে। কোনটা তার ঘর, তোমার জানা আছে!

হ্যাঁ, জানি। একেবারে ওপরের তলার একটা ঘরে—' তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই চামার্স বলে উঠলেন, তার ঘরে গিয়ে অনুরোধ জানাও, যেন একবারটি আমার সঙ্গে দেখা করে।

ফিলিপস্-এর মুখে চামার্স-এর অভিপ্রায়ের কথা জানতে পেরে রেইনেসান তার ঘরে হাজির হ'ল।

কোন রকম ভূমিকা না করেই চামার্স কণ্ঠস্বরে ব্যস্ততা প্রকাশ করে বলল, মিঃ রেইনেসান, টেবিলে একটা স্কেচ আছে। আপনি সেটা দেখে শিল্প নৈপুণ্য এবং ছবিটার বৈশিষ্ট্য যদি ব্যক্ত করেন তবে বড়ই আনন্দিত হব।

আগন্তুক কিশোর শিল্পী দু'পা এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে ছবিটা তুলে চোখের সামনে ধরতেই চামার্স আগ্রহান্বিত হয়ে বলল কি বুঝছেন? কেমন আঁকা হয়েছে, বলুন তো?

দেখুন, ছবি হিসেবে কিন্তু তারিফ করার মতই ছবি বটে। নিপুণ তুলির টানে আঁকা। আর পুরোপুরি বাস্তবতার ছাপ আছে, স্বীকার করতেই হবে। সত্যি বলতে কি দীর্ঘ কয়েক বছরের মধ্যে এমন ভাল একটা ছবি দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নি।

আসল ছবি, চোখ মুখ আর বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কোন মন্তব্য—

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে রেইনেসান বলল,—মুখাবয়বটা বাস্তবিকই চমৎকার। মনে হয় স্বর্গভ্রষ্টা কোন অপ্সরা বুঝি—

কার ছবি এটা? অনুগ্রহ করে বলবেন কি?

আমার সহধর্মিনীর। তিনি সম্প্রতি ইওরোপ পর্যটনে ব্যস্ত। কথা বলতে বলতে তার পিঠ চাপড়ে আবার মুখ খুলল। মিঃ রেইনেসান, ছবিটা আপনি দেখে যান। এটা দেখে আপনি তুলির টানে আপনার জীবনের উৎকৃষ্টতম ছবিটা আঁকুন। আর টাকার ব্যাপারটা? সেটা আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। কথাটা বলেই সে বার কয়েক মৃদুভাবে তার পিঠ চাপড়াতে লাগল।

দ্য পেণ্ডুলাম

নীল পোশাক পরিহিত মেষপালক যুবকটা গল্প ছেড়ে চিৎকার জুড়ে দিল—একাশি নম্বর স্ট্রীট, অনুগ্রহ করে তাদের বেরিয়ে আসতে দিন।

ব্যস, হুড়মুড় করে এক পাল মেষ বাইরে বেরিয়ে এল। অন্য আর একপাল পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি গুঁতোগুঁতি করতে করতে ব্যস্ত পায়ে দূরে চলে গেল। জন পার্কিন্স তার মেষগুলিকে মুক্ত করে স্টেশনের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এসে সেগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে বাসার দিকে এগিয়ে চলল।

দু'বছর আগে জন বিয়ে করেছে। একটা ছোট্ট বাড়িতে সপরিবারে থাকে। বিস্ময়হীন জীবন। দিনের পর দিন একই কাজ এবং উপায়ে দিন গুজরান করার জীবন তার কাছে একই ছকে বাঁধা, এক ঘেয়ে হয়ে উঠেছে।

জন ভাবতে ভাবতে মেষগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল, বাড়ির দরজায় তার জন্য অপেক্ষা করছে হিমশীতল ক্রিম ও স্কচের মিষ্টিমধুর গন্ধভরা একটা মুখ। সে কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই মুহূর্তের জন্য তাকে আলিঙ্গন করে ছোট্ট করে একটা চুমু খাবে। তারপর অভ্যর্থনা করে তাকে নিয়ে যাবে ঘরের ভেতরে। সে কোটটা খুলে বারান্দার মেঝেতে ফুরফুরে বাতাসে শরীর এলিয়ে দিয়ে বসবে। সান্ধ্য পত্রিকার পাতায় চোখের মণি দুটোকে বুলাবে, জাপানী আর রুশদের হানাহানির খবরের ওপর। তারপর সে গতানুগতিক খাদ্যবস্তু দিয়ে রাতের খাবার সারবে, করবে একঘেয়ে উপাদানে উদর পূর্তি।

সাড়ে সাতটায় নড়বড়ে আসবাবপত্রের ওপর খবরের কাগজের পাতা বিছিয়ে দেবে। ফলে ওপর তলার ইয়া তাগড়াই লোকটা যখন জোর কদমে ব্যায়াম শুরু করবে তখন ছাদের পলিস্তারা খসে পড়লে তার আসবাবপত্রের সর্বনাশ করতে পারবে না।

নাটকের অভিনেত্রী হিলি আর মুলি ঠিক আটটায় হলঘরের লাগোয়া ঘরটায় এমন হুটোপাটা করে চেয়ার টানাটানি করে মহলা জুড়ে দেবে যে, নায়েকরা হপ্তায় পাঁচশ ডলারের চুক্তিপত্রে তাদের স্বাক্ষর নেওয়ার জন্য তাদের পিছুন পিছুন তাড়া করবে। তার একটু বাদেই লোকটা জানালার গায়ে বাঁশিটা নিয়ে গা-জ্বালা করা সুরে বাজাতে শুরু করবে। জন পার্কিন্স-এর এসব ব্যাপার স্যাপার সবই নখদর্পণে।

জন পার্কিন্স এ-ও জানে, সোয়া আটটায় সে যখন টুপিটা নিতে যাবে ঠিক তখনই তার বৌ ফ্যাঁসফ্যাসে গলায় বলে উঠবে, জন কোথায় যাচ্ছ জানতে পারি?'

ম্যাক্‌ক্লস্কির বাড়ি একবারটি যাব ভাবছি। সেখানে সবার সঙ্গে দু'একটা বাজি খেলার ইচ্ছে। টুপিটা হাতে নিতে নিতে জন জবাব দেবে। সম্প্রতি এটাই তার নিত্যকারের কাজ হয়ে উঠেছে।

দশটা বা এগারোটা বাজলে জন হয়ত বাড়ি ফিরবে। কেটি তখন ঘুমে বিভোর হয়ে থাকবে। আবার বিয়ের ইস্পাতের বেড়িটাকে ঘষে মেঝে ঝকঝকে চকচকে করে তোলার জন্য হয়ত বা নির্ঘুম অবস্থায় কাটাবে। ন্যায়বিচারের প্রত্যাশায় ফ্রগমোর অতিকায় বাড়িটার বাসিন্দারা যখন কামদেবের শরণাপন্ন হবে তখন এসব ব্যাপারের জন্য কামদেবকে অবশ্যই কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

জন আজ বাড়ির দরজায় পা দিয়েই একেবারেই অভাবনীয় এবং ভয়ঙ্কর এক পরিস্থিতির মুখোমুখি হ'ল। মুখে একগাল হাসি ফুটিয়ে কেটি এসে তার সামনে দাঁড়াল না। তিন-ত্রিমটে ঘরের পরিস্থিতি ভয়াবহ। তার যাবতীয় জিনিসপত্র ঘরময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে দেখা গেল। জুতো জোড়া, চুল কোঁকড়ানোর ক্লিপ, পাউডারের কেস, কিমানো আর মাথার বো সবকিছু ঘরের মেঝে, চেয়ার আর ডেসিং-টেবিলের ওপর অগোছালভাবে পড়ে রয়েছে।

ঘরের দিকে চোখ পড়তেই জন-এর চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। ভাবল, কেটি তো ইতিপূর্বে কোনদিনই এরকম করে নি। তারপর যখন চিরুনিটার দিকে চোখ পড়ল তখন তার বুকের ভেতরে কে যেন হাতুড়ির আঘাত হানল। সে দেখল চিরুণির দাঁতগুলির ফাঁকে তার মাথারই এক গোছা বাদামী চুল জড়িয়ে রয়েছে। ভাবল, কেটি তো রোজই চিরুণির গায়ে লেগে থাকা চুলগুলি

ম্যান্টেলের ওপরের নীল বাটিটায় রেখে দেয়। তবে আজ নিশ্চয়ই মানসিক চাঞ্চল্য বশতঃ ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

গ্যাসের জেট-এর গায়ে সুতো দিয়ে একটা ভাঁজকরা কাগজের দিকে হঠাৎ জন-এর চোখ পড়ল। সে ব্যস্ত হাতে সেটাকে খুলে চোখের সামনে ধরল। চিঠিটা তার স্ত্রী লিখেছে। আর তাকে উদ্দেশ্য করেই লেখা। চিঠির বক্তব্য মোটামুটি এরকম—কেটি একটা টেলিগ্রাম পেয়েছে, তার মা গুরুতর অসুস্থ। সাড়ে চারটার ট্রেনটা ধরার জন্য সে বেরিয়ে গেছে। তার ভাই স্যাম সেখানে ডিপোতে তার সঙ্গে মিলিত হবে। বরফের বাক্সে ঠাণ্ডা মাংস রাখা আছে। আর গয়লাকে দুধের দাম বাবদ পঞ্চাশ সেন্ট যেন দিয়ে দেয়। গত বসন্তে সে দুধের দাম পেতে সমস্যায় পড়েছিল। তার বিশ্বাস, তার মায়ের গলার পুরনো ব্যথাটা হয়ত আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। গ্যাস মিটার সম্বন্ধে কোম্পানী চিঠি লিখতে বলেছে। ওপরের ড্রয়ারে তার ভাল মোজা জোড়া রাখা আছে একথা লিখতেও সে ভোলেনি। সবশেষে লিখেছে আগামীকাল আবার সে তাকে চিঠি লিখবে। চিঠির শেষে কেটি স্বাক্ষর করেছে।

দু'বছর হ'ল জন-এর বিয়ে হয়েছে। এ দু'বছরে সে আর কেটি একটা রাত্রিও আলাদা জায়গায় কাটায় নি। বিস্ময় বিমূঢ় জন বারবার চিঠিটার ওপর চোখ বুলাতে লাগল। তাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় এই প্রথম ছেদ ঘটল। এজন্য তার মধ্যে বিস্ময় এমন করে জমাট বেঁধেছে। যে কালো ফুটিফুটি চাদরটা গায়ে দিয়ে সে রোজ খেতে বসে সেটা চেয়ারের পিঠে দলা হয়ে পড়ে রয়েছে। ব্যস্ততার জন্য সাপ্তাহিক পোশাকগুলো এলোমেলো হয়ে পড়ে রয়েছে। তার প্রিয় বাটার-স্কচ রাখার কাগজের প্যাকেটটা মুখবাঁধাই রয়ে গেছে। খবরের কাগজটা মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। সেটা থেকে ট্রেনের সময়-সারণির জায়গাটা কেটে নেওয়া হয়েছে। ঘরটার অবস্থা এমন এলোমেলো যেন ঘরের জীবন ও আত্মা বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্যত্র চলে গেছে। ঘরময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা নিষ্প্রাণ জিনিসগুলির মধ্যে দাঁড়িয়ে জন এক অভাবনীয় নিঃসঙ্গতা অনুভব করতে লাগল।

কয়েক মুহূর্ত হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থাকার পর জন ঘরটাকে গোছাতে আরম্ভ করল। স্ত্রীর পোশাক-পরিচ্ছদে হাত দেওয়ামাত্র তার সর্বাঙ্গে যেন আতঙ্কের সঞ্চার ঘটল। সে আজ অবধি কোনদিন মুহূর্তের জন্যও ভাবেনি তার প্রাণেশ্বরী কেটি'কে ছেড়ে কিভাবে বেঁচে থাকবে। কেটি তার জীবনের সঙ্গে এমন ওতঃপ্রোতভাবে মিশে গেছে যে, সে-ই ছিল তার শ্বাসক্রিয়ার অপরিহার্য বায়ু। আজ সে এমনভাবে তার কাছ থেকে দূরে চলে গেছে যে, সে যেন কোনদিনই তার সান্নিধ্যে ছিল না। কিন্তু ব্যাপারটা তো মাত্র দিন কয়েকের। খুব বেশী হলেও এক বা দু'সপ্তাহের। কিন্তু তার মনে হচ্ছে তার নিরাপদ ও গতানুগতিক বাড়িটার দিকে মৃত্যুই হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

জন ধীর-পায়ে এগিয়ে গিয়ে বরফের বাক্সটা থেকে ঠাণ্ডা মাংস বের করে আনল। কফি তৈরী করল। এবার বিষণ্ন মনে একা একাই খাবারের থালা নিয়ে বসল। তার বাড়িটা ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে। খাবার টেবিল থেকে উঠে সে জানালাটার সামনে গিয়ে বসল। দৃষ্টি তার পথের দিকে। ধূমপান করতে ইচ্ছা করল না।

জানালার বাইরের পৃথিবী তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। বোকামি আর আনন্দের ফোয়ারা ছোটা নাচের আসরে যোগদানের জন্য জানালার বাইরের শহরটা তাকে চিৎকার করে ডাকাডাকি করছে। আজকের রাত্রে সে স্বাধীন। সে যেকোন অকৃতদার যুবকের মত আনন্দ স্ফূর্তিতে গা ভাসিয়ে দিতে পারে, কাউকে জবাবদিহি করতে হবে না। সারা রাত্রি মজা লুঠলেও ক্রোধোন্মত্তা কেটি তার অপেক্ষায় পথ চেয়ে বসে থাকবে না। ভোরের আলো না ফোটা অবধি ম্যাক্ক্লস্কির আসরে বল্গাহীন আনন্দ স্ফূর্তির মধ্য দিয়ে সারাটা রাত্রি অনায়াসেই সে কাটিয়ে দিতে পারে। যে বিয়ের বাঁধন তাকে এসব হৈ-হল্লোড় থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল আজ তা শিথিল হয়ে গেছে। কেটি অনুপস্থিত—সরে গেছে।

জন নিজের মানসিক পরিস্থিতিকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে অভ্যস্ত নয়। চার দেওয়ালে ঘেরা ঘরটার মধ্যে বসে তার অসুবিধার আসল কারণটা হঠাৎ নির্ভুলভাবে আবিষ্কার করতে পারল। সে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করল, সুখী জীবন অব্যাহত রাখতে কেটি-র উপস্থিতি অপরিহার্য।

ছক বাঁধা প্রাত্যহিক জীবনের ব্যস্ততার জন্য জন কেটি-র ওপর তার প্রকৃত মানসিকতা অবচেতন

মনের অতল অন্ধকারে ডুবেছিল। এ মুহূর্তে কেটি-র অনুপস্থিতিতে সেটা যেন হঠাৎ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। কথায় যে বলে, সুকণ্ঠী পাখিটা যতক্ষণ না উড়ে যায় ততক্ষণ আমরা তার মধুর কণ্ঠের মূল্য উপলব্ধি করতে পারি না।

জন আত্মসমালোচনা করতে বসল। সে স্বগতোক্তি করল। আমি দু'বার রং করা নাইট ছাড়া তো কিছু নই। কেটির সান্নিধ্যে রাত্রি না কাটিয়ে প্রতি রাত্রেই আনন্দ-স্ফূর্তি করতে বেরিয়ে গেছি। আর্ত অভাগী কেটি রাত্রিগুলি কাটিয়েছে নিঃসঙ্গতার মধ্যে। আর আমি অনাবিল আনন্দ-স্ফূর্তির মধ্যে ডুবে রয়েছি। সত্যি আমি একটা অপদার্থ। তার সব ক্ষতি আমাকে পুষিয়ে দিতে হবে। তাকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে আনন্দ-স্ফূর্তি করব। এখন থেকে ম্যাকক্লস্কির দলের সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেললাম। এখন থেকে একমাত্র কেটি-ই হবে আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী।

সত্যি, আনন্দ-স্ফূর্তির পূজারীদের নাচের দলে যোগদানের জন্য জানালার বাইরের পৃথিবীটা জনকে হাতছানি দিয়ে ডাকাডাকি করছে। আর যুবকের দল ম্যাকক্লস্কির আখড়ায় জুয়াখেলায় ডুবে গেছে। কিন্তু তারা জন-এর মধ্যে কোনরকম আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারল না। তার একান্ত আপনজন, যাকে সে অবজ্ঞাভরে নিজের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল আজ সে দূরে চলে গেছে। কিন্তু তাকে যে তার পেতেই হবে। সেই আদ্যিকালে দেবদূত যে আদিম নামক লোকটাকে একদিন স্বর্গোদ্যান থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল, আর যা-ই হোক জন যে তার উত্তরসুরী। জন-এর ডানদিকে চেয়ারটার হাতলে কেটির নীল রঙের জামাটা দলামোচড়া করে ফেলে রাখা আছে। তাতে এখনও কেটি-র গায়ের গন্ধ জড়িয়ে আছে। সেটা হাতে তুলে নিয়ে সে মন্ত্রমুগ্ধের মত নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইল। কই, কেটি তো এমন নির্বাক ছিল না! তবে? জন-এর চোখের কোণে জলবিন্দু দেখা দিল। কেটি ফিরলেই পরিস্থিতি পাল্টে যাবে। তাকে এতদিন তাচ্ছিল্য করার ক্ষতি জন এবার পূরণ করে দেবে। তাকে ছাড়া জীবন যে নিরর্থক, সে আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছে।

ঠিক সে মুহূর্তেই দুম্ করে দরজাটা খুলে গেল। কেটি দরজায় দাঁড়িয়ে। জন বিস্ময় মাখানো দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে নীরবে বোকার মত তাকিয়ে রইল।

কেটিই প্রথম মুখ খুলল—ফিরে আসার পর কী যে ভাল লাগছে! মন-প্রাণ শান্ত হ'ল। শোন, মায়ের ব্যামোটা তেমন কিছু নয়। ডিপোতে স্যাম-এর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তার মুখেই শুনলাম, মায়ের ব্যামোটা সামান্য কিছু সময়ের জন্য একটু মাথাচাড়া দিয়েছিল। টেলিগ্রাম করার পর কিছুক্ষণের মধ্যেই মা রোগের উপসর্গটাকে সামাল দিয়ে দিয়েছেন। তাই ফিরতি ট্রেন ধরেই আমি চলে এলাম। সবার আগে এক কাপ কফি খাওয়া দরকার।

ফ্রগমোর বাড়িটার তিনতলার রাস্তার দিকের ঘরগুলিতে নিত্যকার ছক বাঁধা কাজকর্ম নিয়মমাফিকই চলছে। বাজনা বাজছে, স্প্রিং-এ হাত উঠল, গিয়ারটাকে ঠিকঠাক করা হ'ল, গাড়ির চাকাও ছক বাঁধা পথেই চলতে লাগল।

জন দেখল, সোওয়া আটটা বাজে। টুপিটা হাতে নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল।

কেটি তার মুখের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলে উঠল, কোথায় চললে শুনি?

স্বাভাবিক গলায়ই জন জবাব দিল—একবারটি ম্যাকক্লস্কির বাড়ি থেকে চক্কর মেরে আসি। তাদের সঙ্গে দু'-একটা বাজি খেলব ঠিক করেছি।

দ্য বায়ার ফ্রম দ্য ক্যাক্‌টাস সিটি

ক্যাকটাস শহরটা টেক্সাসের অন্তর্গত। সে শহরটার স্বাস্থ্যকর পল্লীটায় জ্বরটর তো হয়ই না, এমন কি সর্দি-কাশি ধরনের ব্যামোও হয় না। আর শুকনো দ্রব্যসামগ্রী বেচার 'নাভারো অ্যান্ড প্লাট' নামক দোকানটাও অবজ্ঞা করার মত নয়।

ক্যাকটাস শহরের বিশ হাজার অধিবাসী নিজেদের পছন্দ মাফিক দ্রব্যসামগ্রী নিজের হাতে কেনাকাটা সারে। আর অধিকাংশ রূপার মুদ্রা নাভারো অ্যান্ড প্লাট—এর ক্যাশবাক্সে জমা পড়ে। তাদের পাকাবাড়িটা এতখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে যে, সেখানে একডজন ভেড়া অনায়াসে চরতে পারে। তাদের দোকানে মোটর গাড়ি থেকে শুরু করে পঁচাশি ডলার মূল্যের মহিলাদের অত্যাধুনিক ফ্যাশানের কুড়িটা পৃথক-পৃথক রঙবিশিষ্ট কোট ও সাপের চামড়ার নেকটাই পর্যন্ত সবকিছুই কেনা যায়। কলোরাডো নদীর পশ্চিম তীরের অঞ্চলগুলির মধ্যে তারাই প্রথম পেনি চালু করে। গোড়াতে তাদের পেশা ছিল পশুচারণ। তবে হ্যাঁ, তাদের ব্যবসা-বুদ্ধি খুবই প্রখর। তারা অন্ততঃ এটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছে, ঘাসের বাজার উঠে গেলেও পৃথিবীর গতি কোনদিনই স্তব্ধ হয়ে যাবে না।

দোকানটার বড় পার্টনার নাভারো। তার বয়স পঞ্চান্ন। আধা স্প্যানিশ এ ভদ্রলোকটি রুচিশীল। প্রতি বসন্তে মালপত্র খরিদ করার জন্য একবার করে নিউইয়র্কে ঢু মারেন। এ বছর দীর্ঘ পদযাত্রায় যোগদান করতে তিনি কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হলেন, ভীত হয়ে পড়লেন। বয়স হয়েছে তো। দিনে শোবার সময় হওয়ার এক ঘণ্টা আগে থেকে তিনি ঘনঘন ঘড়ির ওপর চোখ বোলাতে থাকেন।

ছোট পার্টনারকে তিনি বললেন—, জন, শোন, তোমাকেই এ বছর মালপত্র খরিদ করতে যেতে হবে, বুঝলে? প্লাট-এর চেহারায় ক্লান্তির ছাপ নজরে পড়ল। সে বলল, শুনেছি, নিউইয়র্ক নাকি একটা মৃত নগরী। তা সত্ত্বেও আমি যাব। যাবার সময় কিছু সময়ের জন্য স্যাম এপ্টোনে নেমে একটু আনন্দ-স্ফূর্তি করে নেওয়া যাবে।

দু'সপ্তাহ বাদে প্লাট একজন নিম্ন ব্রডওয়েের জিজবস অ্যান্ড সন কোম্পানির জামা প্যান্টের পাইকারী দোকানে ঢুকল। তার গায়ে কালো রঙের ফ্রককোট, পরনে টেক্সাসের স্যুট, আর নরম ও সাদা টুপি মাথায়, তার গলায় কালো নেকটাই।

বৃদ্ধ জিজবস-এর দৃষ্টি শ্যেন পাখির মত তীক্ষ্ণ, হাতির মত স্মরণশক্তি আর চোখের পলকে মনটা চনমনিয়ে ওঠে। কালো মেরু-ভল্লুকের চক্কর মারতে মারতে দোকানের চৌকাঠে পা দিতেই প্লাট-এর মুখোমুখি হলেন; হাত বাড়িয়ে করমর্দন সারলেন। তারপর মুখ খুললেন—মিঃ নাভারো, টেক্সাসের বাড়িতে কেমন আছেন, বলুন তো? এ বছর যাত্রা-পথটা তার কাছে একটু দীর্ঘই মনে হচ্ছে, ঠিক বলিনি? তার পরিবর্তে মিঃ প্লাটকেই আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সে কী মশাই! আপনার দূরদর্শিতা খুবই প্রখর দেখছি! এসব আপনি কি করে জানলেন, ভেবে পাচ্ছি নে! প্লাট ভ্রূ কুঁচকে বলল।

জিজবস ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বললেন জানি, কিছুই আমার অজানা নয়। আর এ-ও জানতে পেরেছি, নাভারো অ্যান্ড প্লাট দশ হাজার ডলারের বদলে পনের হাজার ডলারের মালপত্র খরিদ করবে। যাক গে, সে সব কথা আগামীকাল আলোচনা করা যাবে। এবার সবার আগে আমার নিজের অফিসের একটা চুরুট খান, তবেই রিও অ্যান্ড গ্র্যান্ডি আর এরকমই কয়েকটা জায়গা থেকে গোপনে পাচার করা চুরুটের স্বাদ পেয়ে যাবেন। মশাই, সবই তো গোপনে পাচার করা মাল।

তখন বেলা পড়ে যাওয়ায় সেদিনকার মত কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। দু'ঠোঁটের চাপে আকড়ে রাখা চুরুটটার খুব সামান্য অংশই পুড়েছে, সে অবস্থাতেই প্লাট'কে সেখানে বসিয়ে রেখে জিজবস ছেলের সঙ্গে দেখা করতে চলে গেলেন। ছেলে তখন অফিসে যাবার উদ্যোগ করছে।

জিজবস বললেন, মিঃ প্লাট'কে সঙ্গে নিয়ে আজ রাত্রেই তুমি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব কিছু দেখিয়ে আনবে, মনে রেখো। আর একটা কথা, তারা আমাদের দশ বছরের পুরনো ক্রেতা। মিঃ নাভারো এখানে পা দিলে সময়-সুযোগ পেলেই আমরা দাবা খেলায় মেতে উঠতাম। কিন্তু মিঃ প্লাট-এর

বয়স কম, যুবক। তাকে আমোদ প্রমোদে ডুবিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে, বুঝলে?

মুচকি হেসে আবে বলল—'ভাল কথা, তা-ই হবে। আমি তাকে সঙ্গে নিয়েই বেরোচ্ছি। হোটেল এস্টর-এ ভোজ সেরে 'প্রাচীন আপেল গাছের নিচে' ফনোগ্রাফ নাটকটা শুনতে শুনতে সাড়ে দশটা পেরিয়ে যাবে। আর মিঃ টেক্সাস ঘুমে বিভোর হয়ে পড়বেন।

কাজের জন্য তৈরী হয়েই প্লাট পরদিন সকাল দশটায় দোকানে হাজির হ'ল। জিজবস তার দেখ ভাল করার জন্য নিজে ব্যস্ত পায়ে এগিয়ে এলেন। নাভারো অ্যান্ড প্লাট বেশ বড় মাপের ক্রেতা। নগদ টাকার বদলে প্রাপ্য বাট্টা মিটিয়ে দিতে তার কোনদিন এতটুকুও ভুল হয় না। টেক্সাস যুবকটা জিজবস কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে বলল, আপনাদের এ শহরের জল স্বাস্থ্যপ্রদ সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের ক্যাকটাস শহরের আলোর ব্যবস্থা এর চেয়ে অনেক উন্নত। গতরাত্রে আপনার ছেলের সঙ্গে কয়েকটি জায়গা বেরিয়ে আমার এ অভিজ্ঞতা হয়েছে। তাই ভাবছি, এখানে হয়ত আমার পক্ষে বেশীদিন থাকা সম্ভব হবে না।

মিঃ প্লাট, আমাদের ব্রডওয়েতে তো খুবই ভাল আলো জ্বলে, ঠিক কি না?

হ্যাঁ, তা আলো পড়ে বটে। তবে ছায়াও পড়ে অনেকই। আপনাদের এখানকার ঘোড়াগুলো আমার খুবই পছন্দ হয়েছে। অস্বীকার করতে পারব না।

জিজবস কথা বলতে বলতে তাকে বিভিন্ন প্রকার স্যুটের নমুনা দেখাতে ওপরতলায় নিয়ে গেলেন। তাঁর ডাকে মিস আশার নামে এক উদ্ভিন্ন যৌবনা মেয়ে ব্যস্ত পায়ে তার কাছে এসে দাঁড়াল। 'নাভারো অ্যান্ড প্লাট' তার দিকে তাকিয়েই চমকে উঠল। সে এই প্রথম অনুভব করল তার জীবনে গৌরবের এক অত্যাশ্চর্য অত্যুজ্জ্বল আলোর আবির্ভাব ঘটল। সে যুবতীটির দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তার আকস্মিক মানসিক ভাবান্তর এবং অর্থপূর্ণ চাহনিটুকু মেয়েটার নজর এড়াল না। মেয়েটার স্বভাব বিরুদ্ধ হলেও তার রক্তিম মুখে ছাপ ফুটে উঠল।

মিস আশার জিজবস অ্যান্ড সন কোম্পানির এক জীবন্ত মডেল। সুদর্শনা, চোখের তারা অত্যুজ্জ্বল অথচ শান্ত। মোদ্দা কথা, ক্রেতার মনের কথা বোঝার ক্ষমতা তার অস্বাভাবিক।

হাল্কা রঙের কয়েকটা প্রিন্সেস গার্ডনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে জিজ্‌বস্ বললেন, মিঃ প্লাট, এগুলো আপনার ওখানকার জলবায়ুর পক্ষে খুবই উপযোগী হবে বলেই আমি মনে করি। এবার মিস আশার-এর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, আগে এগুলোই ওনাকে দেখাও।

জীবন্ত মডেলটা যেন বিদ্যুৎগতিতে ভেতরে ঢুকে গেল। পর মুহূর্তেই বেরিয়ে আবার সামনে দাঁড়াল। প্রতিবারই নতুন পোশাকে নিজেকে সাজিয়ে নিয়ে আসে আর প্রতিবার তার চেহারার চাকচিক্য বৃদ্ধি পায়। আর প্রতিবারই সে যেন নতুন রূপ নিয়ে পরিপূর্ণ আত্মসংযমের প্রতিমূর্তি হয়ে ক্রেতার সামনে দাঁড়ায়। আর ক্রেতা বেচারা বজ্রাহতের মত নিশ্চল নিথরভাবে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। জিজবস কিন্তু পোশাকের কাটছাট সম্বন্ধে অনবরত সুখ্যাতি করেই চলেছেন। আর মডেল যুবতীটা মুখে অস্পষ্ট ও ব্যবসায়িক হাসি ফুটিয়ে সামনে দাঁড়ায়।

দেখা সেরে প্লাট-এর মধ্যে ইতস্ততের ভাব ফুটে উঠল। জিজবস-এর মধ্যে সংশয় দেখা দেয়, পোশাকগুলি বুঝি প্লাট-এর ঠিক মনের মত নয়, অন্য কোন দোকানে ঢু মেরে যাচাই করার কথা ভাবছে। আসলে কিন্তু প্লাট-এর ভাবনা অন্য দিকে, সে ক্যাকটাস শহরের বনেদি পরিবারদের বাসস্থলের এলাকায় একটা থাকার মত বাড়ি পাওয়া যাবে কিনা ভাবছে, ভাবী স্ত্রীকে নিয়ে থাকার উপযোগী বাড়ি। আর ওদিকে তার ভাবী স্ত্রী ড্রেসিং-রুমে পোশাক বদলাতে ব্যস্ত।

মিঃ প্লাট, পোশাকগুলির ব্যাপারে আজকের রাত্রিটা না হয় ভাবনা চিন্তা করুন। কালই সিদ্ধান্ত নেবেন। তবে এখন ভাল পোশাক এত কম দামে অন্য কেউ-ই দিতে পারবে না, আমি জোর গলায় বলতে পারি। মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে আবার মুখ খুললেন—মিঃ প্লাট, নিউইয়র্ক শহরটা হয়ত আপনার ঠিক মনের মত নয়। তবে আপনার বয়সও তো কম, মেয়েদের সান্নিধ্যের অভাব বশতঃ মনটা বিষিয়ে উঠতে পারে। এক রূপসী যুবতী যদি আজ রাত্রে আপনার সঙ্গে রাত্রের খাবার খেতে যায় আপত্তি আছে? আমার ওই যুবতী কর্মচারীটা কিন্তু মেয়ে হিসেবে খুবই ভাল। আশা করি তার সঙ্গ আপনাকে আনন্দ দেবে। আপত্তি আছে?

চোখ দুটো কপালে তুলে প্লাট বলে উঠল, সে কী! আমার সঙ্গে তো তার সামান্যতম পরিচয়ও

নেই। আর আমার সম্বন্ধে তার কিছু জানাও নেই। এমন একজন অপরিচিত যুবকের সঙ্গে তিনি বেরোতে উৎসাহী হবেন?

যাবে, অবশ্যই যাবে। আপনার সঙ্গে আমি পরিচয় করিয়ে দেব।

কথা বলতে বলতে জিজবস মিস আশার'কে ডাকলেন। সাদা শার্ট ও কালো একটা সাধারণ স্কার্ট পরে শান্ত সমাহিত ভাব নিয়ে মিস আশার এসে তাঁর চোখে মুখে জিজ্ঞাসার ছাপ এঁকে মালিকের সামনে দাঁড়াল।

জিজবস ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে আশার'কে লক্ষ্য করে বললেন—'শোন, মিঃ প্লাট-এর সঙ্গে তুমি আজ নৈশভোজ সারলে তিনি আনন্দিত হবেন। আশা করি তুমি তাঁকে সঙ্গদান করবে।

সঙ্গদান করতে পারলে আমিও কম আনন্দিত হব না। এবার প্লাট-এর দিকে ফিরে বলল, কখন বেরোতে হবে বলুন তো?

সাতটা নাগাদ, অসুবিধে হবে?

না, অসুবিধের আর কি থাকতে পারে। আমি তৈরীই থাকব। তবে একটা কথা, সাতটার আগে যেন আসবেন না। কারণ এক স্কুল-শিক্ষিকার সঙ্গে এক ঘরে আমি থাকি। কোন পুরুষ মানুষকে ঘরে ঢুকতে দিতে তিনি আপত্তি করেন। আমি তৈরী হয়েই থাকব। আপনি আসা মাত্র আমি বেরিয়ে যাব।

কালো ফিল্ম পোশাকে সজ্জিতা মিস আশার রাত্রি সাড়ে সাতটায় প্লাট-এর সঙ্গে একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকল। প্লাট-এর জানা নেই এ কাজটা তার সারাদিনের কর্তব্য কর্মের মধ্যেই পড়ে।

প্লাট একটা চেয়ার টেনে বসতে বসতে রেস্তোরাঁর এক কর্মচারীকে ডাকল। এক যুবক এসে অভিবাদন করে সামনে হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়াল। প্লাট তাকে ভাল ভাল খাবারের নাম উল্লেখ করে দু'জনের জন্য রাত্রের খাবার আনতে বলল।

মিস আশার একটা শুকনো মার্টিনি, ভাল পানীয়ের কথা বলল।

মুহূর্তের মধ্যে কর্মীটি আশার-এর আদেশ অনুযায়ী পানীয়ের একটা বোতল টেবিলে দিয়ে গেল।

প্লাট বোতলটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই মিস আশার'কে প্রশ্ন করল—কি এটা? কিসের বোতল?

ককটেল।

আপনি একটা বিশেষ ধরনের চায়ের অর্ডার দিয়েছিলেন, এটাই আমি অনুমান করেছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি, মদ। কিন্তু আপনি তো এটা পান করতে পারবেন না। ভাল কথা, আশার তো আপনার পদবী। আপনার প্রথম নামটা কি, দয়া করে বলবেন কি?

আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুরা আমাকে হেলেন নামে সম্বোধন করে।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্লাট এবার বলল, জান হেলেন, তৃণভূমিতে বসন্তের ফুল ফুটলেই আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে একজনের নাম উঁকি মারে?

কার?

যাকে আমি জীবনে কোনদিন দেখিনি। যার কণ্ঠস্বর পর্যন্ত কোনদিন শুনিনি। গতকাল তোমাকে মুখোমুখি দেখেই আমি নিঃসন্দেহ হয়েছি, এতদিন তুমিই আমার মন-প্রাণ জুড়ে ছিলে। আগামীকাল আমি বাড়ি যাচ্ছি, তোমাকেও কিন্তু আমার সঙ্গে যেতে হবে। আমার এটুকু প্রত্যয় আছে, তুমি যাবে। আমার এ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাবার কারণ, গতকাল তোমার চোখের দিকে তাকিয়েই আমি তোমার সম্মতি পেয়ে গিয়েছিলাম। অমত করে ফয়দা কিছুই হবে না, যেতে তোমাকে হবেই। কথা বলতে বলতে কোটের পকেট থেকে ছোট্ট একটা বাক্স বের করে এবার বলল, দেখ, তোমার জন্য আমি একটা উপহারও কিনে এনেছি। কথাটা শেষ করেই দু'ক্যারাট হীরের একটা অত্যুজ্জ্বল আংটি হেলেন-এর দিকে এগিয়ে দিল।

হেলেন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হাতের কাঁটা চামচটা দিয়ে আংটিটা প্লাট-এর দিকে সরিয়ে দিল।

প্লাট আবেগে উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে বলল—হেলেন, আমি একজন রীতিমত ধনকুবের লাখ লাখ টাকার মালিক। তোমার জন্য পশ্চিম টেক্সাস শহরে চমৎকার একটা বাড়ি তৈরী করে দেব, বিশ্বাস কর।

আগের মতই চোখে মুখে তাচ্ছিল্যের ছাপ ফুটিয়ে তুলে হেলেন বলল, দেখুন, আপনি যত বড় টাকার কুমীরই হোন না কেন, আমাকে কেনার সাধ্য আপনার নেই। তবে আপনাকে যে এভাবে প্রত্যাখ্যান করতে হবে এটা কিন্তু আমি আগে ভাবিনি। তবে এ-ও সত্য যে, আপনাকে দেখে আমি অন্য সবার চেয়ে স্বতন্ত্র প্রকৃতির বলেই ধরে নিয়েছিলাম। এখন দেখছি, আমারই ভুল, আপনারা সবাই একই ছাঁচে তৈরী।

সবাই? মানে, সবাই বলতে তুমি আর কার কথা বলতে চাইছ?

আপনার মত যত ক্রেতা—সবার কথাই। আপনাদের সঙ্গে রাত্রের খাবার টেবিলে না বসলে আমাকে চাকরিটা খোয়াতে হবে। তাই আমাকে আপনাদের সঙ্গদান করতেই হয়। আপনারা এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন, যা খুশি প্রস্তাব দিয়ে বসেন। অন্য ক্রেতাদের থেকে আপনাকে আলাদা করে ভেবেছিলাম। আমারই ভুল হয়েছে।

প্লাট হঠাৎ অভাবনীয় খুশি হবার ভান করে সজোরে টেবিলে একটা চাটি মেরে বলে উঠল, 'ব্যস, পেয়ে গেছি। উত্তরদিকের নিকলসন আবাসনটা ভেঙে সেখানে মনোলোভা একটা বাড়ি তৈরী করে নেওয়া যাবে। ওক গাছের একটা বাগান ছাড়াও একটা প্রাকৃতিক হ্রদ বাড়িটাকে প্রায় ঘিরে রেখেছে। কী চমৎকার সে প্রাকৃতিক পরিবেশ ভাষার মাধ্যমে কারো মধ্যে তার ধারণা সঞ্চার করা সম্ভব নয়।

দেখুন, আমার জন্য আপনার মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার হওয়ার জন্য আমি যারপরনাই অনুতপ্ত। আসলে মিঃ জিজবস-এর দোকানে যতদিন চাকরি করব ততদিন আমাকে আপনার মত ক্রেতাকে তোয়াজ করতে হবেই। তবে আপনি যে স্যুটটা কিনবেন সেখানেই আমাকে যেতে হবে, এমন প্রত্যাশা যেন ভুলেও করবেন না।

তবে কি সব ক্রেতারাই তোমাকে আমার মত প্রস্তাব দেয়?

খেলা, স্রেফ খেলা করে। সবাই আমাকে নিয়ে খেলায় মাতে। তবে আপনি যে অন্য সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন একথা স্বীকার না করে উপায় নেই। হীরের কথাটা তারা কেবল মুখেই উচ্চারণ করত। আর আপনি হীরের আংটি সঙ্গে করে নিয়েই এসেছেন। তাই বলছি কি, আপনি সত্যি তাদের চেয়ে স্বতন্ত্র।

একটা কথা হেলেন, তুমি এখানে কতদিন কাজ করছ, বলতো?

আট বছর। গোড়ায় ক্যাশ ডিপার্টমেন্টে ছিলাম। তারপর প্যাকিংয়ের কাজ করতে হয়। তারপর যেতে হয় দোকানে। বড় না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই ছিলাম। এখন পোশাক-পরিচ্ছদের মডেলের ভূমিকা পালন করছি, দেখলেনই তো। কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলে সে প্লাট-এর দিকে তাকিয়ে বলল, একটু মদ হলে খাবারগুলো হয়ত এত শুকনো লাগত না।

না। কিছুতেই তোমাকে আর মদ খেতে দেব না। কালই তোমাকে নেওয়ার জন্য আমি দোকানে যাচ্ছি। আমার ইচ্ছে আমরা এখান থেকে রওনা হওয়ার আগে একটা মোটরের ব্যবস্থা করে ফেল। এ একটা জিনিসই আমাদের এখান থেকে নিয়ে যাবার মত আছে। আমি চাই, তুমি পছন্দ করে...।

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই হেলেন বলে উঠল, ধ্যুৎ! যত্তসব বস্তাপচা কথা! ওটাও বাদ দিয়ে দিন। এসব কথা শুনে শুনে আমার কানে তালা লেগে যাবার জোগাড় হয়েছে।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে তারা একটা পার্কের গা দিয়ে, নিরিবিলি পথ ধরে এগোতে লাগল। মডেলের চোখে পার্কের অত্যুজ্জ্বল আলো পড়ে চিকচিক করতে লাগল।

হেলেন বলল, কিছু মনে করবেন না, একটা কথা বলছি। আপনাকে দেখেই কেন যেন আমি ধারণা করেছিলাম, অন্য দশজনের চেয়ে আপনি একটু আলাদা। এখন দেখছি, আপনারা সবাই সমান, যাক, বলি আপনি কি আমাকে জায়গা মত পৌঁছে দেবেন, নাকি পুলিশের শরণাপন্ন হতে হবে?

প্লাট হেলেনকে তার বোর্ডিং-এর দরজায় পৌঁছে দিল। তারা কয়েক মুহূর্ত বারান্দায় মুখোমুখি দাঁড়াল। প্লাট হাত বাড়িয়ে তার কোমরটা জড়িয়ে ধরতেই হেলেন শরীরের সবটুকু শক্তি নিঙড়ে তার মুখে একটা ঘুষি মারল। একটা আংটি মেঝেতে পড়ে গেল।

হেলেন মেঝে থেকে আংটিটা কুড়িয়ে প্লাট-এর হাতে গুঁজে দিয়ে কর্কশ গলায় বলল, 'মশাই,

আপনার অকেজো আংটিটা নিয়ে মানে মানে এখান থেকে বিদায় হন।

এটা সে আংটিটা নয়। এটা তো বিয়ের আংটি। আপনি কি এ আংটিটার কথাই আমাকে বলেছিলেন। তবে কি আপনি সত্যি সত্যি—'

তার মুখের কথাটা শেষ হবার আগেই ভেতর থেকে দরজাটা খুলে গেল।

প্লাট বিদায় নিতে গিয়ে হাত তুলে বলল, শুভ রাত্রি। কাল দোকানে আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে। বিদায়!

হেলেন ব্যস্ত পায়ে ঘরের ভেতর ঢুকে গিয়ে দুম করে খাটের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। এক সময় সে উন্মাদিনীর মত চিল্লিয়ে উঠল—'আগুন! আগুন!

স্কুল-শিক্ষিকা—আগুন? কোথায় আগুন? কিসের আগুন?

আমারও তো একই জিজ্ঞাস্য এম্‌সা। ভাল কথা, তুমি তো ভূগোল পড়াও। তোমার জানা থাকারই কথা, ক্যারাকাস শহরটা কোথায়, কোনদিকে বলতো? কেমন সে দেশটা?

স্কুল শিক্ষিকা ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বললেন, ক্যারাকাস? সেটাত ভূমিকম্পের দেশ। নিগ্রো, বানর আর ম্যালেরিয়ার বাস সেখানে। আর দেখা যাবে আগ্নেয়গিরি।

এদের কাউকেই আমি ডরাই না। আমি কালই সেখানে চলে যাব। হেলেন দৃঢ়তার সঙ্গেই কথাটা বলল।

দ্য রুবাইয়েত অব এ স্কচ হাইবল

বব ব্যাবিট মদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। এখন আর সে মদের বোতল স্পর্শও করে না। বলতে চাইছি, বোহেমিয়ার অভিধানটা খুললেই দেখতে পাবেন, সে আর নেশার ধার-কাছ দিয়েও যায় না। জল দিয়ে গলা ভিজিয়েই সে দিন গুজরান করে নিচ্ছে।

বব কেন মদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করল তার ভাটির মালিকের তো অবশ্যই তা জানতেই হবে।

সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় কোন লোক যদি স্বীকার করে জীবনে কোনদিন মদ তাকে গ্রাস করেছে তবে মনে করা যেতে পারে, তার শোধরাবার সম্ভাবনা আছে। আর কেউ যদি বলে গতরাত্রে আমি গলা পর্যন্ত মদ গিলেছি তবে তার কফির গ্লাসে মদ মিশিয়ে দিতে হবে আর এর জন্য পিতার কাছে প্রার্থনা করা চাই। এক সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার সময় ব্যাবিট মনের মত একটা ব্রডওয়ে রেস্তোরাঁয় ঢুকল। একে রেস্তোরাঁ না বলে বার বলাই উচিত। সব সময় সেখানে তার তিনটা বন্ধুর দেখা পেত। ব্যস, সবাই ককটেল গিলতে গিলতে চটকদার গল্প জমিয়ে বসত। ফলে বাড়ি ফিরতে অনেক রাত্রি হয়ে যেত।

আজ বাড়ির চৌকাঠে পা দিতেই ব্যাবিট-এর কানে এল কে যেন বলছে—কালরাত্রে ব্যাবিট গলা পর্যন্ত মাল গিলেছিল।

ব্যাবিট ঘরে ঢুকে দেওয়ালের গায়ে ঝোলানো বড় আয়নাটার দিকে তাকাতেই সে সচকিত হয়ে সোজাভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল। মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে পড়েছে। প্রকৃত ব্যাপারটা আজ এই প্রথম সে ধরতে পারল। এতদিন সবাই তাকে ঠকিয়েছে আর সে-ও নিজের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেছে। তার ধারণা ছিল, মদ খাওয়াটা নিছকই একটা মজার ব্যাপার। কিন্তু মদ খেলে সে যে একটা বদ্ধ মাতাল বনে যায় সেদিকে তার কিছুমাত্রও খেয়াল ছিল না। পাড় মাতাল অবস্থায় সে যা কিছু বলত সবই অর্থহীন, তাকে প্রলাপ ছাড়া অন্য কিছু ভাবাই যেত না। না, সে আর কোনদিনই মদের গ্লাস ছোঁবে না।

সে বারে ঢুকে এক ছোকরা কর্মীকে ডেকে এক গ্লাস মিনারেল ওয়াটার দিতে বলল। তার কথায় দলের সাকরেদরা থমকে গেল। তারা নিঃসন্দেহ ছিল, সে তাদের দলে ভিড়ে মদের অর্ডার দেবে।

কৌতূহল নিবৃত্ত করতে গিয়ে তাদের একজন বলে উঠল—, বব কি মদ ছেড়ে দিলে নাকি?

হ্যাঁ। শুকনো গলায় ব্যাবিট জবাব দিল।

দলের একজন অসমাপ্ত গল্পটা আবার বলা শুরু করল।

ব্যাবিট ডাইস আর নিকেলের মুদ্রা ক'টা পকেটে চালান দিয়ে বার থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামল।

এক সময় ব্যাবিট-এর বাড়ি-ঘর-সংসার সবই ছিল। এটা অন্য একটা কাহিনী হলেও এতে জানা যাবে ভাল আর মন্দ অভ্যাসের কথা। কাহিনীটা এরকম—

মুলিভান জেলা গল্পের প্রেক্ষাপট। সেখান থেকে কাহিনীটা শুরু হয়ে গড়াতে গড়াতে অন্যদিক ধেয়ে চলে। রূপসী তন্বী যুবতী জেসী গরমের ছুটি কাটাবার জন্য মাউন্টেন স্কুইস্ট হোটেলে এসে উঠেছিল। বব তখন সবে কলেজের পাঠ শেষ করেছে। তাদের দেখা হয়ে গেল। পরিচয় হ'ল। সে পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। শুভলগ্নে তাদের বিয়ে হয়ে গেল। ব্যস, কাহিনী এটুকুই। গল্পটা শুরু হতে না হতেই চোখের পলকেই শেষ হয়ে গেল।

কিন্তু জুলাইয়ের সে দিন ও বিশেষ মুহূর্তগুলি? না, সে কাহিনী বিস্তারিতভাবে আমি তুলে ধরছি না। সে সম্বন্ধে সম্যক ধারণা নিতে গেলে রোমিও জুলিয়েট-এর পাতায় নিজেকে লিপ্ত রাখুন। অব্রাহাম লিংকন-এর বুক কাঁপানো সনেট— 'কিছু লোককে তুমি বুদ্ধু বানাতে পার' আর ডারউইন এসব পড়া চাই।

একটা কথা কিন্তু আমি না বলে পারছি না, যারা ওমর খৈয়াম-এর রুবাইত ছিল তাদের উভয়েরই অনুকরণযোগ্য। ওমর খৈয়াম-এর প্রতিটা কবিতা তাঁদের ঠোঁটের ডগায়, না, সব নয়, কিছু কবিতা বেছে তারা মুখস্থ করেছিল।

পাহাড়ে ঘেরা, সবুজে ঢাকা মনোরম এক পরিবেশে জেসি বসত আর ব্যাবিট তার পিছনে দাঁড়িয়ে তার হাত দুটো ধরত। তারপর নিজের মুখটাকে ধীরে ধীরে নামিয়ে জেসি-র মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে বুড়ো তাঁবুওয়ালার ভাল-লাগা কবিতাগুলো এক-এক করে আবৃত্তি করতে মেতে যেত। তখন পর্যন্ত তাদের কারো জিভই মদের স্বাদ পায় নি।

ব্যাবিট ও জেসি উভয়েই বিশ্বাস করত, সুরা একটা প্রতীক ছাড়া কিছু নয়। আর যার গুণগান করা হ'ত তিনি কোন না কোন দেবদেবী প্রেম বা জীবন হওয়াও অস্বাভাবিক নয়।

যাক, যে কথা বলছিলাম, তারা বিয়ে করেছে। বিয়ের পর তারা নিউইয়র্কে চলে এসেছে। ব্যাবিট তার কলেজের ডিপ্লোমা দেখিয়ে এক অফিসে একটা চাকরি জোগাড় করে ফেলল। বেতন সপ্তাহে পনের ডলার। দোয়াতে কালি ভরা ছিল তার কাজ। দু'বছর পর তার বেতন হ'ল সপ্তাহে পঞ্চাশ ডলার। এবারই সে বুঝল মদের স্বাদ কেমন।

ছোট একটা ঘর আর রান্নার একটা কুঠরি নিয়ে ছিল তাদের সংসার। জেসি মফঃস্বল শহরের মেয়ে বলে তার সবচেয়ে বেশী নজর ছিল মসলাপাতি ও চিনির ওপর। ঘরের দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখত মাছ ধরার জাল। চমৎকার একটা কাপবোর্ড কিনে আনল। আর ব্যাঞ্জো বাজানো আরম্ভ করল, শিখেও ফেলল। ইতালী বা ফরাসী রেস্তোরাঁয় তারা সপ্তাহে দু'-তিনদিন খাওয়া দাওয়া সারত।

জেসি-র হাতে ককটেল-এর গ্লাস উঠল। বাড়িতে ডিনারের পর একটা করে সিগারেট না হলে তার চলে না। তারপর বাইরের দু'-একটা দম্পতির সঙ্গে আলাপ পরিচয় হ'ল। ক্রমে হৃদ্যতাও জন্মাল। কাপবোর্ডে মদের বোতল জমা হ'ল। সদ্য পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে ডিনারের আয়োজন, মদ আর নাচানাচি সবই চলতে লাগল। জীবন সীমাহীন, বাধা নিষেধহীন হয়ে উঠল। সামাজিক বাধা-নিষেধ ও নিয়মকানুন শিকেয় উঠল।

ব্যাবিট অল্প সময়ের মধ্যেই তার দলের লোকজনদের সঙ্গে মিশে গিয়ে নাচ শিখতে মেতে গেল। গলা পর্যন্ত মদ গিলল। মদে চুর হয়ে বাড়ি ফিরতে শুরু করল। জেসি ঘরের দরজা খুলে তাকে ঘরে ঢুকিয়ে নেয়। ব্যস, কাঁপা-কাঁপা পায়ে জেসি-র হাত ধরে নাচের নামে লাফালাফি শুরু করে দেয়। নিজেকে সামলাতে না পেরে বার বার চৌকাঠ ও দেওয়ালে গুঁতো খেয়ে একটু পর পরই মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। জেসি টেনে হিঁচড়ে কোনরকমে তাকে তুলে নেয়, দাঁড় করায়। আবার শুরু হয় উভয়ে উদ্দাম নাচ। আবার কখনও বা ব্যাবিট মেঝেতে আছাড় খেয়ে পড়ে গেলে জেসি সরবে হেসে উঠলে ব্যাবিট খাটের সব ক'টা বালিশ তার ওপর ছুঁড়ে দিয়ে তার হাসি, তার

বেলেল্লাপনা বন্ধ করে দেয়।

এভাবে দিন গুজরান করতে করতে ব্যাবিট একদিন যেন সম্বিত ফিরে পেল। এ সন্ধ্যায় সে ঘরের চৌকাঠে পা দিয়েই দেখল, লম্বা এপ্রন গায়ে চাপিয়ে জেসি চিংড়ি মাছের খোলস ছাড়াচ্ছে। এবার থেকে সিঁড়িতে ব্যাবিট-এর জুতো: শব্দ পেয়েই বাড়ির বুড়ি ঝি ঝটপট জেসি-র দু'কানে তুলে গুঁজে দিতে লাগল। এতে গোড়ার দিকে জেসি রেগে একেবারে কাঁই হয়ে যেত। আসলো উদ্দাম উচ্ছল জীবনটার প্রতিই সে ক্রমে আসক্ত হয়ে পড়তে লাগল। তার মধ্যে প্রত্যয় জন্মাল, এটাই জীবন, এটাই জীবনের স্বাভাবিক গতি।

ব্যাপারটা টের পেয়ে ব্যাবিট এক সন্ধ্যায় শিকারী বিড়ালের মত নিঃশব্দে, সাধ্যমত পা টিপে টিপে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে ঘরে ঢুকল। জেসিকে চুমু খেল বার-কয়েক। তারপর বারান্দায় নড়বড়ে চেয়ারটায় শরীর এলিয়ে দিয়ে খবরের কাগজের পাতায় চোখ বোলাতে লাগল। আর এদিকে বুড়ি ঝি হাতের তুলো হাতে নিয়েই হতভম্বের মত দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইল।

ব্যাপারটা জেসি-র মধ্যে আতঙ্কের সঞ্চার করল। বঁটি আর চিংড়িমাছের বাটিটা ফেলে রেখে দৌড়ে ব্যাবিট-এর কাছে গিয়ে বলল—, তোমার কি শরীর খারাপ? হঠাৎ এমন গম্ভীর হয়ে গেছ দেখে আমি আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি। বল, কি হয়েছে, কেন এমন করছ?

ব্যাবিট খবরের কাগজের পাতায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই নিস্পৃহভাবে জবাব দিল—'কই, কিছু হয়নি তো! হবে আবার কি?

পাঠক-বন্ধুরা, একটা কথা, আপনার গৃহিনীর চোখে যদি আপনার কোন অস্বাভাবিকতা ধরা পড়ে, তিনি যদি কারণ জানার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করে দেন তবে তার প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে তাঁকে বলবেন, আকস্মিক ক্রোধ বশতঃ আপনার ঠাকুরমাকে আপনি হত্যা করেছেন; একটা অনাথ আশ্রম আপনি লুঠ করে এসেছেন, সে অনুতাপ জ্বালাতেই আপনি দগ্ধে মরছেন অথবা বলবেন, আপনার সর্বস্ব নিঃশেষে ভেসে গেছে। কিন্তু পারিবারিক শান্তি সুখের প্রত্যাশা যদি আপনি তিলমাত্রও করে থাকেন তবে আপনি অবশ্যই বলবেন না, কই কিছু হয়নি তো। হবে আবার কি?

জেসি-র মধ্যে সন্দেহের বীজ দানা বাঁধল। চিংড়ি মাছ কুটতে কুটতে বার-বার আড়চোখে ব্যাবিট-এর দিকে তাকাতে লাগল।

জেসি রাত্রের খাবার সাজাতে গিয়ে স্কচ-এর বোতল আর দুটো গ্লাসও অন্যান্য পাত্রের সঙ্গে টেবিলের ওপর রাখল। ব্যাবিট চোখে-মুখে বিতৃষ্ণার ছাপ ফুটিয়ে তুলে ঘাড় নেড়ে বলল, না, জেসি, আমি মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি! ও বস্তু আর স্পর্শ করব না। তবে তুমি খেলে আমি আপত্তি করব না। তুমি অবশ্যই খেতে পার। আমি মদের পরিবর্তে মিনারেল ওয়াটার খাচ্ছি।

চোখ দুটো কপালে তুলে সবিস্ময়ে জেসি বলে উঠল, তুমি—মানে তুমি মদ ছেড়ে দিয়েছ! মদ আর তুমি খাবে না? এ যে বিশ্বাস করতেও উৎসাহ পাচ্ছিনে ব্যাবিট! ভাল কথা, কিন্তু মদ ছাড়ার কারণ কি, বল তো?

খবরের কাগজের ওপর চোখের মণি দুটো স্থির রেখে ব্যাবট জবাব দিল, মদ খেয়ে আমি কোন উপকার পাচ্ছিলাম না। আচ্ছা জেসি, তুমি কি আমার এই কাজটাকে সমর্থন জানাচ্ছ না?

সমর্থন? অবশ্যই সমর্থন করি। আমি সুস্থ স্বাভাবিক মস্তিষ্কে কাউকে মদ খাওয়া, ধূমপান করা বা যখন তখন শিস দিতে বলতে পারি না। অতএব এতে যে আমার পূর্ণ সমর্থন আছে আশা করি তোমাকে খোলসা করে বলতে হবে না।

ব্যাবিট রাত্রের খাবার সারতে সারতে টেবিলের ওপরে রক্ষিত মদের বোতলটার দিকে যে বার কয়েক আড় চোখে তাকায়নি এটা সত্য নয়। তবে প্রতিবারই সেই মাতাল বন্ধুটার কথাগুলো তীরের ফলার মত তার বুকের ভেতরে বার-বার খোঁচা মারতে লাগল। প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য তার মুখটা অধিকতর কঠিন হয়ে উঠতে দেখা গেল।

জেসি-র মুখটাকে জমাটবাঁধা বিষণ্ণতা গ্রাস করে ফেলতে লাগল। সে নিঃসন্দেহ হ'ল। যে নকল আনন্দ-উচ্ছ্বাস-আবেগ উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ে তারা এতদিন বেঁচেছিল, দিন গুজরান করছিল তা মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। সে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে ব্যাবিট-এর চোখের দিকে তাকাল। তার চোখের তারায় স্পষ্ট দেখতে পেল, নারী নির্যাতনেচ্ছু কোন স্বামীর অপরাধবোধের বধূনির্যাতনকারীর অত্যুগ্র

আগ্রহের ছাপ।

শান্তস্বরে জেসি বলল—আচ্ছা, আমি কি জানতে পারি, আমাকেও কি তোমার পথের পথিক হতে হবে, মানে মদ ছাড়তে হবে?

সে কী কথা! আমার ওপর শুধু শুধু বিরূপ মনোভাব পোষণ কোরো না। তুমি যদি মনে কর মদ খাওয়া দরকার, অবশ্যই খাবে। আমি তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে—

তাকে মুখের কথাটা শেষ করতে না দিয়েই জেসি বলল, দেখ আজকের রাত্রিটা খুবই ঠাণ্ডা। তবে আজ এক আধ গ্লাস খাই, কি বল?

অবশ্যই খাবে। আমি তো বললামই, মন চাইলে তুমি অবশ্যই খাবে। আরে, তোমার তো আর আমার মত মদে মত্ত হয়ে রাস্তা ঘাটে অসঙ্গত কিছু করার সম্ভাবনা নেই। একমাত্র একথা চিন্তা করেই আমি মদের বোতল থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছি। তুমি যা করার করে নাও। তারপর চল ব্যাঞ্জো নিয়ে বসি। মন চাইলে নাচতেও বাধা নেই।

না। লোকমুখে শোনা যায় মদের নেশাটা খুব খারাপ। তা-ই যদি সত্য হয়, আর আমরা যদি নিজেদের শোধরাতেই চাই তবে ব্যাঞ্জো বাজানোর মত বদ অভ্যাসটাকেও আমাদের এড়িয়ে চলতে হবে।

ঘরের মধ্যে অখণ্ড নীরবতা নেমে এল। উভয়েই আধ ঘণ্টা কাল মুখে কুলুপ এঁটে বসে রইল।

এক সময় হাতের খবরের কাগজটা রেখে ব্যাবিট চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। দু' পা এগিয়ে গিয়ে সে জেসি-র কাঁধে আলতোভাবে একটা হাত রাখল। তারপর নিজের মুখটাকে তার মুখের দিকে ধীরে-ধীরে নামিয়ে নিল।

ঠিক সে মুহূর্তেই দেওয়ালে টাঙানো একটা ছবির দিকে জেসি-র দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'ল। সেটা মুলিভান জেলার পাহাড়, পাহাড়ে বন আর স্রোতস্বিনী নদীর ছবি। ব্যাবিট যখন খৈয়াম-এর কবিতা আবৃত্তি করতে আরম্ভ করল তখন সে স্পষ্ট অনুভব করল তার হাতের মুঠোর মধ্যে আবদ্ধ জেসির হাত তিরতির করে কেঁপে চলেছে।

ওমর খৈয়াম-এর কবিতার বিষয়বস্তু পেয়ালা ভরে নাও, অনুশোচনার শীতের পোশাকটাকে বসন্তের জ্বলন্ত আগুনে পুড়িয়ে ফেল। সময়ের পাখিটা এখনই আকাশে ডানা মেলবে, ওই তো সেটা ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে।

কবিতা আবৃত্তি শেষ করে হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে স্কচ-এর বোতলটা নিয়ে গ্লাসে ঢালতে লাগল।

জেসি যন্ত্রচালিতের মত লাফিয়ে উঠে হাত বাড়িয়ে এক ঝটকায় গ্লাসটাকে মেঝেতে ফেলে দিল। গ্লাসটা টুকরো টুকরো হয়ে ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল। তারপর উদ্ভ্রান্তের মত দৌড়ে গিয়ে ব্যাবিট-এর গলাটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরল। আবেগ মধুর স্বরে সে বলল, সুপ্রিয় বব, এটা নয়, এ কবিতাটা নয়। অন্য কবিতা, যে কবিতায় বলেছে—প্রিয়, তুমি আর আমি কি এ দুঃখের সংসারে বাস করার জন্য তার সঙ্গে হাত মেলাব? আমরা কি তাকে টুকরো টুকরো করে দিতে পারি না? তারপর তাকে নিজের মনের মত করে তৈরী করে নেব।

ব্যাবিট ম্লান হেসে জুতোর গোড়ালি দিয়ে কাঁচের কুচিগুলোকে চূর্ণবিচূর্ণ করতে করতে বলল, কি আর হবে, সেটা ত ভেঙে গুড়িয়েই গেছে।

বাড়ির মালিক মিসেস পিকেন্স, উৎকর্ণ হয়ে গ্লাস ভাঙার শব্দ আর কথাগুলো শুনে আপন মনে বলে উঠল, এই রে! মিঃ ব্যাবিট আবার মদ গিলে বাড়ি ফিরেই মাতলামি জুড়ে দিয়েছেন! অথচ কিন্তু তার গিন্নিটা কী ভাল মানুষ! যাকে বলে সত্যিকার সতীনারী!

টু থ্যাঙ্কসগিভিং ডে জেন্টেলমেন

সত্যি কথা বলতে কি এ দিনটা একান্তভাবেই আমাদের। কেবলমাত্র এ দিনটাতেই আমরা, যে সব আমেরিকানরা প্রতিষ্ঠা লাভ করে বিশেষ ব্যক্তিটি হয়ে উঠতে পারিনি তাঁরা সবাই পুরনো বাড়িতে ফিরে যাই। সেখানে বারান্দায় বসে কুড়মুড় করে বিস্কুট চিবোতে চিবোতে অবাক হয়ে তাকিয়ে ভাবি, সাবেকি আমলের জলের পাইপটা যেন কত কাছে চলে এসেছে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট পবিত্র এ দিনটা আমাদের উপহার দিয়েছেন। অতীতের গোড়া ধার্মিক প্রবরদের কিছু কথা আমরা শুনতে পাই বটে। কিন্তু তাদের কাউকে স্মরণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তারা যদি আমাদেব দেশে আসার জন্য উৎসাহী হন তবে আমরা যথাসাধ্য পথ আগলে দাঁড়াব। প্লিমাউথ পাহাড়টাকে আমাদের বেশী পরিচিত লাগে। টার্কি ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে আমাদের টার্কি খাওয়া ঘুচে গেছে। টার্কির বদলে আমাদের মুরগির মাংস খেয়েই উদর পূর্তি করতে হয়। আমাদের এসব ধন্যবাদ জ্ঞাপক অনুষ্ঠানের কথা আগেই শহরবাসীদের মধ্যে কেউ অবশ্যই জানিয়ে দেয়।

জলভূমির যে স্থানে লাল জাম জন্মে তার পূর্বের বড় শহরটায় এই 'থ্যাঙ্কসগিভিং"ডে' তো সম্প্রতি একটা প্রতিষ্ঠানের রূপ নিয়েছে। প্রতি বছর নভেম্বরের শেষ বৃহস্পতি বারটা বছরের মধ্যে মাত্র একটা দিন যখন খেয়াঘাট বরাবর বিস্তৃত আমেরিকার ভূমিকার ব্যাপারটাকে সবাই একবাক্যে মেনে নেয়। দিনটা কিন্তু একমাত্র আমেরিকাবাসীদের দিন বলে স্বীকৃত। এমন একটা দিনে কেবলমাত্র আমেরিকাবাসীদেরই উৎসব।

তবে এবার গল্পটা শুরু করা যাক, যেটা প্রমাণ করবে মহাসাগরের এপারে আমরা এমন এক ঐতিহ্যের অধিকারী যা আমাদের ইংল্যান্ডের ঐতিহ্যের চেয়ে অনেক দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি ও প্রাচীনতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে—সে জন্য আমাদের কর্মশক্তি এবং উৎসাহ-উদ্যমকে ধন্যবাদ জানাতেই হয়।

ঝর্ণাটার বিপরীত দিকের রাস্তাটার ডানদিকে, পূর্বদিক থেকে ইউনিয়ন স্কোয়ারে প্রবেশ করার পথের গায়ে তৃতীয় বেঞ্চে স্টাফি পেট বসে রয়েছে। গত ন'বছর ধরে প্রতি বছর থ্যাঙ্কসগিভিং ডে-তে সে এ বেঞ্চে ঠিক একটার সময় এসে বসে। আর এখানে বসার পর প্রতি বছর তার জীবনে ঘটে থাকে চার্লস ডিকেন্সের কাহিনীর মতই কোন ঘটনা, যার ফলে তার বুকটা ফুলে ওঠে।

প্রতি বছরের মত সে একই স্থানে, প্রতি বছরের সে স্থানটাতে স্টাফি পেট-এর উপস্থিতিটা বৎসরান্তের ক্ষুধার্তদের জন্য ততটা নয় যতটা তার বহুদিনের অভ্যাসের ফলে। তবে এ-ও সত্য যে, মানবদরদীরা বলেন এরকম সময়ের ব্যবধানেই গরীবরা ক্ষুধায় কাহিল হয়ে পড়ে। এটা অবশ্যই অভ্যাসের ফল।

স্টাফি পেট সবে একটা ভোজ সেরে এসেছে, গলা পর্যন্ত ঠেসে খেয়েছে। অতএব সে ক্ষুধার্ত নয়। তার চোখ দুটো দেখলে মনে হয় যেন দুটো শুকনো গুজবেরি ফল কোটর দুটোতে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার জীর্ণ জামার কলারটা অগোছালভাবে ওল্টানো, বোতামগুলো ঢিলে হয়ে গেছে। ভাঁজকরা জামাটা বুক অবধি খোলা। নভেম্বরের বাতাসে বরফের গুঁড়ো ভেসে এসে গায়ে বিঁধছে। তাই ঠাণ্ডাটা খুবই কড়া, হাড়ে পর্যন্ত কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছে।

একটু আগে স্টাফি পেট যে ভোজটা সেরে এসেছে তা ছিল ক্যালোরিতে ভরপুর। খাদ্যবস্তুর তালিকায় ছিল ঝিনুকের মাংস থেকে শুরু করে টার্কি-রোস্ট, প্লাস পুডিং পটেটো চিপস্, চিকেন স্যালাড আর আইসক্রীম সমেত বহু সুখাদ্য। তাই তো গলা অবধি খাদ্যবস্তু গিলে পরম তৃপ্তি সহকারে বাইরের পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে। একেবারে অভাবনীয়ভাবেই ভোজটা বরাতে জুটে গিয়েছিল।

ফিফ্‌থ্ এভিনিউর শেষ প্রান্তের লাল ইটের দালানটার গা দিয়ে সে যাচ্ছে। সে বাড়িটায় দুই প্রবীণা, পরিবারের দুই প্রাচীন ব্যক্তি থাকে। প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি তারা বড়ই শ্রদ্ধাশীলা। তার নিউইয়র্ক শহরটার অস্তিত্বকেই মানতে নারাজ, আর তাদের বিশ্বাস থ্যাঙ্কসগিভিং ডে-টা কেবলমাত্র ওয়াশিংটন স্কোয়ারবাসীদের জন্যই পালন করা হয়। বহুদিনের পুরনো একটা অভ্যাস তারা মেনে

চলে—বাড়ির পিছনের দরজায় একটা চাকরকে বসিয়ে রাখে। তাদের বলা আছে, দুপুরের পর প্রথম যে ক্ষুধার্ত লোককে সে পথ দিয়ে যেতে দেখবে তাকে অভ্যর্থনা করে বাড়িতে নিয়ে এসে যেন পেটপুরে খাইয়ে দেয়। পেট পার্কে যাবার সময় সে পথেই যাচ্ছিল। লাল ইটের সুবিশাল বাড়িটার নায়েবরা তাকে সাদর অভ্যর্থনা করে বাড়িতে নিয়ে এসে দুর্গ প্রাসাদটার প্রচলিত পুরনো রীতি অনুযায়ী তাকে পেট ভরে খাইয়ে দেয়।

পেট দশ মিনিট নিষ্পলক চোখে সোজা সামনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার পর তার মনে অত্যুগ্র আগ্রহ জাগল, চারদিকটা ঘুরে ঘুরে একবারটি দেখবে। বাঁ দিকে ঘাড় ঘোরানো মাত্র তার চোখের মণি দুটো যেন কোটর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে এল, শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়ে এল। ছোট-ছোট কাঁপা কাঁপা পা দুটো পথের ওপর ঘসতে আরম্ভ করল।

কারণ, সে বুড়োটা ফোর্থ এভিনিউ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তার বেঞ্চটার দিকেই অগ্রসর হচ্ছে।

গত ন'বছর যাবৎ-ই 'থ্যাঙ্কসগিভিং' অনুষ্ঠান দিন-এ এ বুড়োটা গুটিগুটি সেখানে হাজির হয়। পেট'কে বেঞ্চটায় বসে থাকতে দেখে। বুড়োটা এটাকেই পুরনো ঐতিহ্য করে তুলতে চাইছে।

পর পর ন'বছর ধরে থ্যাঙ্কসগিভিং ডে-তে পেটকে সে এ বেঞ্চটাতেই পেয়ে যায়। তাকে নিয়ে রেস্তোরাঁয় যায়। আর তাকে সুখাদ্যে নৈশভোজ করায়। ইংল্যান্ডে থাকতে নায়েবরা তার অজ্ঞাতেই সারত। এটা একে নতুন দেশ, তার ওপর ন'টা বছর ত আর কম কথা নয়। বুড়োটা এক মার্কিন মুলুকের দেশব্রতী। আর নিজেকে মার্কিন ঐতিহ্যের একজন অগ্রদূত জ্ঞান করে।

বুড়োটা রাজকীয় ভঙ্গীতে তার প্রিয় থ্যাঙ্কসগিভিং অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। পেট কিন্তু এ অনুষ্ঠানে কোন আনুষ্ঠানিক জাতীয়তাবোধের স্পর্শ উপলব্ধি করে না, ইংল্যান্ডের ম্যাগল কাটা বা প্রাতরাশে জ্যামের সঙ্গে যেমনটা লক্ষ্য করা যায়। তবে এটা ত সে সিঁড়িরই একটা ধাপ। মধ্যযুগের প্রচলিত একটা প্রথা। এতে অন্ততঃ নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, নিউইয়র্ক শহর—আমেরিকাতেও এ প্রথা প্রবর্তন করা যেতে পারে।

বুড়োটা রোগাটে আর দীর্ঘদেহী, ষাটবছর বয়স্ক। কালো পোশাক পরিহিত। নাকের ডগায় রয়েছে আদ্যিকালের একটা চশমা যেটা বার-বার খসে পড়তে চায়। মাথার চুল গত বছরের চেয়ে অনেক পাতলা ও সাদা হয়ে গেছে। আর লম্বাটে শরীরটা বেশী রকমই বাঁকা বেতের লাঠিটার ওপর ঝুঁকে পড়েছে।

দীর্ঘদিনের উপকারী বুড়োটা কাছে এগিয়ে আসছে দেখে পেট ঝট করে বেঞ্চটায় সোজা হয়ে বসে থরথর করে কাঁপতে লাগল। রাস্তার নেড়ি কুত্তা তাড়া করলে কোন মহিলার সঙ্গের গোলগাল কুকুরের বাচ্চা যেমন যেভাবে কাঁপতে আরম্ভ করে। শরীরটা বেঞ্চের সঙ্গে এঁটুলির মত সেঁটে না থাকলে সে হয়ত দৌড়ে সেখান থেকে চম্পটই দিত।

বুড়োটা তাকে দেখেই বলে উঠল, শুভ প্রভাত, আপনি সুস্থ স্বাভাবিক দেহেই আরও একটা বছর সুন্দর এ পৃথিবীটাকে উপভোগ করছেন। আর একটা মাত্র সৌভাগ্যের জন্যই আমাদের উভয়ের কাছেই থ্যাঙ্কসগিভিং ডে-টা কাম্য। দেখুন, আপনি আমার আপনজন হয়ে গেছেন। তাই বলছি কি, আপনি আমাদের বাড়ি গেলে সুখাদ্যে আপ্যায়ণ করব, কথা দিচ্ছি। আর এরই ফলে আপনার শরীর আর মন উভয়ই চাঙা হয়ে উঠবে, সন্দেহ নেই।

গত ন'বছর ধরে প্রতি থ্যাঙ্কসগিভিং ডে-তেই বুড়োটা একই কথার পুনরাবৃত্তি করে। ফলে তার কথাগুলোই যেন আজ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে গেছে। এদিনটার সঙ্গে একমাত্র স্বাধীনতা ঘোষণার দিনটার তুলনা করা যেতে পারে, অন্য কোন দিনের সঙ্গে অবশ্যই নয়। প্রতি বছরই বুড়োটার মুখে একথা শুনলেও আজ তার মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা মাত্র পেট-এর চোখ দুটো জলে ঝাপসা হয়ে উঠল।

পেট গোড়া থেকেই ভেবেছে এবং আজও ভাবছে, বুড়োটা কেন এমন কাতরস্বরে কথাগুলো উচ্চারণ করেন। তার তো জানা নেই প্রতিবারই তার মনের কোণে একটা বাসনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে—ওহো, উত্তরসূরী হিসাবে যদি একটা ছেলে থাকত! যে ছেলে প্রতি বছর থ্যাঙ্কসগিভিং ডে-তে এখানে এসে পেট'কে জোর গলায় বলতে পারত, "আমার বাবার স্মৃতিরক্ষার্থে।" তবেই থ্যাঙ্কসগিভিং অনুষ্ঠানটা একটা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে যেত।

বুড়োটার কোন আপনজন, আত্মীয় পরিজন কেউ-ই নেই। পাহাড়ের বিপরীতে পাথরের একটা পুরনো বাড়িতে সে থাকে। শীতে দক্ষিণ আমেরিকার ফুশিয়া ফুলগাছ লাগায় ও পরিচর্যায় নিজেকে লিপ্ত রাখে, বসন্তে ইস্টার উৎসবে শোভাযাত্রায় যোগদান করে, গ্রীষ্ম পড়তেই নিউ জার্সিতে চলে যায়। পুরো গ্রীষ্মকালটা সেখানেই কাটায়। বারান্দায় আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে এমন এক প্রজাপতির কথা আলোচনা করে কোন না কোনদিন যার দেখা পাবেই। আর হেমন্তে তার কাজ পেট'কে আপ্যায়ণ করে হরেক রকম খাদ্যবস্তু সহযোগে রাত্রের খাবার খাইয়ে তৃপ্ত করা। ব্যস, এটুকুই তার সারা বছরের কাজের ফিরিস্তি।

পেট নির্নিমেষ চোখে প্রায় আধমিনিটকাল বুড়োর দিকে তাকিয়ে রইল। লক্ষ্য করল, প্রতি বছরই তার মুখের রেখাগুলোর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। আর বুকের ওপরের নেকটাইটাতে আগের মতই বো করা রয়েছে। পোশাক পরিচ্ছদও আগের মতই কেতাদুরস্ত। ফ্যাকাশে ধূসর গোঁফ জোড়ার শেষাংশ যত্ন করে পাকানো।

পেট হঠাৎ মুখে এমন একটা শব্দ করল যা বুড়োর পূর্বপরিচিত। আসলে এটা তার দিক থেকে আমন্ত্রণ গ্রহণের সম্মতিসূচক শব্দ। পরমুহূর্তেই সে মুখ খুলল 'মশাই' আমি আপনার সঙ্গে যেতে সম্মত। আর এতে আমি বাধিতই হ'ব। আমি খিদেয় কাতর। খিদেয় খুবই কষ্ট পাচ্ছি।

বুড়ো তাকে দক্ষিণ দিকের রেস্তোরাঁটায় নিয়ে গেল। আগে যেখানে রাত্রের খাবার সারা হয়েছে সে টেবিলে তাকে নিয়ে বসল। সবাই তাদের চিনতে পারল। রেস্তোরাঁর কর্মীরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল—'থ্যাঙ্কসগিভিং অনুষ্ঠান সারতে অন্য বছরের মত হাজির হয়েছেন।

বুড়োর নির্দেশে পরিবেশনকারীরা টেবলে স্তূপাকারে খাদ্যবস্তু সাজিয়ে দিল। পেট মুহূর্তমাত্র দেরী না করে কাঁটা চামচ হাতে তুলে নিল। বেশ বড়সড় একটা টুকরো কেটে নিল। এর আগে কোনদিন কোন বীরযোদ্ধা তার শত্রুসৈন্যকে ঘায়েল করেনি।

চপ, টার্কি, সুপ, সব্জি ও মটরশুঁটি প্লেটে দিতে না দিতেই পেট চোখের পলকে উদরস্থ করতে লাগল। একজন প্রকৃত নাইটের মত সে কাঁটা চামচ চালানোর কাজ অব্যাহত রাখল। বুড়ো তার চোখে-মুখে যে তৃপ্তির হাসিটুকু লক্ষ্য করল তা মিলিয়ে দেওয়ার মত বে-রসিক ও নিষ্ঠুর সে অবশ্যই নয়।

এক ঘণ্টার মধ্যেই পেট তার মুখে যুদ্ধ জয়ের হাসি ফুটিয়ে তুলল। চেয়ারে হেলান দিয়ে খোশ মেজাজে বুড়োকে লক্ষ্য করে বলল—খিদের সময় এমন ভাল ভাল খাবার খাওয়ালেন যার জন্য একবার নয়, শত-সহস্রবার ধন্যবাদ জানাতেই হয়।

পরমুহূর্তেই অত্যুজ্জ্বল চোখের মণি দুটো মেলে বুড়োর দিকে তাকিয়ে নিয়ে চেয়ারটাকে সশব্দে পিছনে ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

বুড়ো রূপোর মুদ্রাগুলো গুণে পকেটে ফেলার আগে তিনটে নিকেলের মুদ্রা পরিবেশনকারীর হাতে গুঁজে দিল।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে পেট উত্তর দিকের পথ ধরল আর বুড়োটা দক্ষিণ দিকের পথে এগিয়ে চলল।

পেট হাঁটতে হাঁটতে প্রথম বাঁকটার কাছে গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বুড়ো পেঁচা যেভাবে তার পাখা দুটোকে ছড়িয়ে দেয় ঠিক তেমনি ভাবেই সে তার পুরনো ছেঁড়া পোশাকটাকে ফুটপাতের ওপর বিছিয়ে দিল। রৌদ্র ক্লান্ত ঘোড়ার মত পোশাকের বিছানাটার ওপর শরীরটাকে এলিয়ে দিল।

এক সময় অ্যাম্বুলেন্স এসে ফুটপাত ঘেঁষে, শায়িত পেট-এর পাশে দাঁড়াল। চালক আর কম বয়সী সার্জন তার ওজন দেখে মৃদুস্বরে তিরস্কার করল। তার মুখে মদের গন্ধ পাওয়া গেল না। রাত্রের খাবার পেটে নিয়ে স্টাফি পেট হাসপাতালে ভর্তি হ'ল।

নতুন একটা রোগের খোঁজে ডাক্তাররা বিভিন্নভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে লাগলেন।

এক ঘণ্টা যেতে না যেতেই আর একটা অ্যাম্বুলেন্স এসে হাসপাতালের সামনে দাঁড়াল। অবাক কাণ্ড! স্টেচারে করে বুড়োটাকে নামিয়ে আনা হ'ল। অন্য আর একটা বেডে শুইয়ে দিয়ে ডাক্তাররা সিদ্ধান্ত নিল অ্যাপেন্ডিসাইটিস। কারণ, এ রোগের যাবতীয় লক্ষণ তার চেহারার মধ্যে লক্ষিত

হচ্ছে।

এক ঘণ্টা বাদেই বেডের কাছে এগিয়ে এলেন একজন ডাক্তার আর নার্স। তারা রোগী দুটোর ব্যাপারে আলোচনায় মগ্ন হ'ল।

ডাক্তার মন্তব্য করল—ওই বুড়োটাকে দেখে তোমার কি মনে হচ্ছে সে অনাহারের রোগী? আমার বিশ্বাস, সে কোন প্রাচীন বনেদী পরিবারে আত্মম্ভরিতার শিকার হয়েছে। সে নিজে আমাকে বলেছে, গত তিনদিন তার পেটে দানাপানি পড়েনি। ভাবা যায়!

দ্য ফেরী অব আনফুলফিলমেন্ট

পথের বাঁকে জনস্রোতের মধ্যে নোম থেকে আসা লোকটা গ্রানাইট পাথরের মত নিশ্চল-নিথরভাবে দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখের তারায় এখনও বরফের নীলচে আভা নজরে পড়ছে।

স্থাবরের মত দাঁড়িয়ে-থাকা লোকটা শেয়ালের মত ধূর্ত ও সতর্ক।

সিক্সথ্ স্ট্রীট ধরে এগিয়ে-আসা দ্রুত ঘরমুখী অগ্রসরমান মানুষের জোয়ারের সঙ্গে মেয়েটা সিয়েবার-ম্যাসন থেকে এখানে হাজির হয়েছে। নোম থেকে আসা লোকটা তার দিকে দৃষ্টি ফেরাল। প্রথম দর্শনেই সে বুঝল মেয়েটা রূপসী—রূপ-শৌর্যের আকার। তার রূপের আভা চোখে ঝলসে যায়। তারপর লক্ষ্য করল, কুকুরে টানা স্লেজ গাড়ীর মত ধীর-মন্থর গতিতে মেয়েটা হেঁটে চলেছে। তৃতীয় উপলব্ধি হ'ল যে, তাকে নিজের করে পাওয়ার জন্য আকাঙ্খা তার মধ্যে ক্রমেই প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠছে। আসলে নোম থেকে আসা মানুষরা এরকম তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিতে অভ্যস্ত। ক'তদিনের মধ্যেই সে উত্তরে ফিরে যাবে। তাই কাজটা ঝটপট সেরে নেওয়াও খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সিয়েবার-ম্যাসন-এর সুবিশাল ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের হাজার হাজার মেয়ে-কর্মী গলিপথটা দিয়ে জোয়ারের জলের মত দ্রুত এগিয়ে চলেছে। কিন্তু নোম থেকে আসা লোকটার অন্তরের অন্তঃস্থলে নতুন-জীবনের জোয়ার লেগেছে। সে জনস্রোতের মধ্যে ভিড়ে গিয়ে নবাগতা মেয়েটার পিছু নিল।

মেয়েটা সোজা তেইশ নম্বর রাস্তা ধরে লম্বা-লম্বা পায়ে পথ এগিয়ে যেতে লাগল। তার বাদামী চুলের গোছা গোছগাছ করে বাঁধা, কোটিদেশ চোখে লাগার মত চমৎকার এবং কালো স্কার্টটা তার মিতব্যয়িতা এবং রুচিশিলতার স্বাক্ষর বহন করছে।

নোম থেকে আসা কামজ্বালায় জর্জরিত লোকটা দশগজ দূরে দূরে থেকে মেয়েটাকে অনুসরণ করতে লাগল।

সিয়েবার-ম্যাসন-এর মেয়ে-কর্মী মিস ক্ল্যারিবেল কলবির হাঁটতে-হাঁটতে ফেরীঘাটের প্রতীক্ষালয়ে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। আর খুবই লম্বা-লম্বা পায়ে ছুটে গিয়ে ছেড়ে যাবার জন্য তৈরী খেয়া নৌকোটাতে উঠে পড়ল। নোম থেকে আসা লোকটা তিন লাফে দশগজ পথ পাড়ি দিয়ে নৌকোয় উঠে পড়ল। বরাতগুণে মেয়েটার পাশের সিটটা জুটে গেল।

দোতলার কেবিনের বাইরে ফাঁকা নির্জন-নিরালা জায়গা খুঁজে পেয়ে মিস কলবি বসে পড়ল। রাত্রিটা ঠাণ্ডা নয়। তাই ফেরীর যাত্রীদের কৌতূহলী লোভাতুর নজর আর একঘেয়ে আলোচনা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার জন্যই সে এখন নিরিবিলি একটা জায়গা বেছে নিয়েছে। ক্লান্তিতে চোখের পাতা বার-বার জুড়ে আসতে চাইছে। আসলে আগের রাত্রিটা সে পূর্বাঞ্চল পাইমারী মৎস্যজীবিদের সহকারীদের দু'নম্বর 'ক্লাব'-এর বলনাচের আসরে মেতে ছিল। ঝিনুক-ভাজা খেয়ে রাত্রি কাটিয়েছে। তাই মাত্র ঘণ্টা তিনেক ঘুমোবার সুযোগ পেয়েছিল।

কেবল তা-ই নয়, দিনটাও খুবই ঝুট-ঝামেলার মধ্যে কেটেছে। রাজ্যের যত খুঁতখুঁতে ক্রেতারা স্টোরে জড়ো হয়েছিল। তার ওপর মাল নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় তার বিভাগের একটা ক্রেতা যা

নয় তাই বলে হৈ-চৈ জুড়ে দেয়। আর তার অভিন্ন হৃদয়া বান্ধবী মাসি টুটহিল কে অন্য একটা মেয়ের সঙ্গে দুপুরের খাবার খেতে দেখেও সে কম মর্মাহত হয়নি।

সিয়েবার-ম্যাসন থেকে আসা মেয়েটার মন খুবই নরম ও সহমর্মী। চাকুরে ও স্বাধীন মেয়েরা ঠিক যেমনটা হয়ে থাকে। যে যুবক তার সঙ্গে প্রেম-ভালবাসা করতে আগ্রহী তার পক্ষে মেয়েটার মানসিক অবস্থা খুবই অনুকূল। মেয়েটা মনে-প্রাণে চায় চার দেওয়ালে ঘেরা ছোট্ট একটা ঘর, উদার ও সহমর্মী মন, শক্তিশালী বাহুর আশ্রয় বিশ্রাম—স্বস্তি। তবে ঘুমে মিস ক্ল্যারিবেল-এর চোখ দুটো বারবার বুজে আসতে চাইছে।

তার পাশে, একেবারে কাছাকাছি এসে বসল শক্তিশালী সুদর্শন যুবক। চমৎকার পোশাকটা তাচ্ছিল্যেব সঙ্গে পরেছে, টুপিটা হাতে ধরা। কয়েক মুহূর্ত পরে সে বলল, 'কিছু মনে করবেন না, আপনার সঙ্গে কথা বলছি। আমি আপনাকে পথে জনস্রোতের মধ্যে দেখেছিলাম। তারপর থেকেই—হ্যাঁ, তারপর থেকে—'

সিয়েবার ম্যাসন, ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের কর্মী-মেয়েটা শান্ত স্বরে জবাব দিল—সে কী! তাই বুঝি? আচ্ছা, একটা কথা বলবেন, আপনার মত লোকদের হাত থেকে আমি কি কোনদিনই অব্যাহতি পাব না? পেঁয়াজ খাওয়া থেকে হ্যাটসিন পর্যন্ত সবই তো ব্যবহার করে দেখেছি। ফ্রেডি, আপনি এবার নিজের পথ দেখুন।

মহাশয়া, বিশ্বাস করুন আমি অবশ্যই সে চরিত্রের মানুষ নই। প্রকৃত সজ্জন বলতে যা বোঝায় আমি ঠিক তা-ই। পথচারীদের মধ্যে আপনাকে দেখার পর থেকে আপনার পিছন ছাড়তে পারি নি। আমি নিশ্চিন্ত যে, এখনই যদি আপনার সঙ্গে কথা না বলি তবে এমন বিরাট শহরে ভবিষ্যতে আপনার সঙ্গে কথা বলার আর সুযোগ পাব না, দেখাও হবে না। তাই একাজ আমাকে করতেই হল।

মিস কলবির অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকাল। না, মেয়েদের মনজয়কারী পুরুষদের মত তার মধ্যে স্বার্থগৃধ্নুতা অনুপস্থিত বলেই সে উপলব্ধি করল। সে ভাবল, দেখাই যাক না, সে কি বলতে চাইছে। এতে হয়ত বা তার পক্ষে মঙ্গলই হবে।

মিস কলবির চোখে-মুখে কৃত্রিম তাচ্ছিল্যের ছাপ ফুটিয়ে তুলে স্বাভাবিক স্বরেই বলল—কিন্তু ভুলে যাবেন না, অসঙ্গত কোন কথা আর আচরণ আমি বরদাস্ত করব না। আর যদি নেহাৎই শিষ্টতা হারিয়ে ফেলেন তবে কিন্তু আমি ম্যানেজারকে তলব করব।

নোম-এর যুবকটা তার পাশের খালি জায়গাটায় ধীরে-ধীরে বসল। তার মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করল। যাকে বলে একেবারে পঞ্চমুখে প্রশংসা করা। এতদিন একটা মেয়ের চোখের তারায় যে ছাপটুকু এতকাল সে বৃথাই হন্যে হয়ে খুঁজেছে তার পাশে বসে থাকা রূপসীর চোখে সে সেটা খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু সে কি তাকে কোনদিন পছন্দ করবে? কিন্তু নিজের বাঞ্ছা পূরণ করতে সে চেষ্টার ত্রুটি করবে না। মেয়েটার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে সে এবার বলল, 'আমার নাম হেনরী—হেনরী ব্রেডেন।'

মেয়েটা রসিকতার স্বরে বলল—'আপনার নাম হেনরী? আপনার নাম জোন্স নয়, হেনরী—সত্যি কি?'

হেনরী-ই বটে। নোম শহর থেকে আসছি। পথে আমি আপনাকে দেখি, আপনি আমাকে দেখেননি, ঠিক কিনা?

ঠিকই। আসলে পথ চলার সময় আমি কারো দিকে তাকাই না।

আমি কিন্তু আপনার দিকে তাকিয়েছিলাম, স্বীকার করছি। তবে এ-ও সত্য যে, এর আগে আমি কোন মেয়ের দিকে তাকাই নি।

মেয়েটা চোখ বুজে অন্যমনস্কতার ভান করল। নোম-এর যুবকটা অধিকতর আন্তরিকতার স্বরে বলল, মিস, প্রথম দর্শনেই আপনাকে আমার এত ভাল লেগে গেছে যে, অন্য কেউ-ই আমার মনে এমন করে দাগ কাটতে পারেনি।

মেয়েটা অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকাল। নোম-এর যুবকটা তার বক্তব্য অব্যাহত রাখল—আমি বুঝতে পেরেছি, আপনি আমার সম্বন্ধে কোন ধারণাই নিতে পারছেন না। এটাই

স্বাভাবিক। কিন্তু আপনি কি আমাকে একটা সুযোগ দিয়ে যাচাই করে নিতে পারেন না? আমার অনুরোধ, অন্ততঃ একটা সুযোগ দিয়ে দেখুন আমি নিজেকে আপনার আশানুরূপ করে তৈরী করে নিতে পারি কিনা।

মেয়েটার মাথাটা ধীরে ধীরে কাৎ হতে হতে এক সময় যুবকটার কাঁধের ওপর নেমে এল। অচিরেই সে সুখ-নিদ্রায় মগ্ন হয়ে গেল। সে তখন মৎস্য ব্যবসায়ী সহকারীদের বল-নাচের আসরের স্বপ্নে মশগুল হয়ে গেল।

নোম-এর যুবকটা তেমনিভাবেই বসে রইল। ঘুমের ভানটার কথা সে বুঝতে পারেনি। তবে এটা যে মেয়েটার আত্মসমর্পণ নয় এটুকু বোঝার মত জ্ঞান-বুদ্ধি তার আছে। খুশিতে তার মনটা ডগমগিয়ে উঠল। তবে শেষ পর্যন্ত সে ভাবল, কাঁধের ওপর তার মাথা রাখার ব্যাপারটা একটা উৎসাহজনক প্রাথমিক পদক্ষেপ, তার সাফল্যের প্রথম পদক্ষেপ। এ পরিস্থিতির সুযোগ নেওয়াটা সঙ্গত হবে না।

এক বিন্দু খাদ তার সন্তুষ্টিকে স্তিমিত করে দিল। ভাবল, নিজের সম্বন্ধে কি সে খোলসা করে বলে ফেলেছে। তার আশা, নিজের জন্যই যে কেউ তাকে পছন্দ করুক, কাছে টেনে নিক।

সে আবার মুখ খুলল, মিস, আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। ক্লোনডাইক-এ জুনু থেকে শুরু করে সার্কল শহর আর সম্পূর্ণ ইডকোন পর্যন্ত সবাই আমাকে ভালভাবেই জানে। যখন বরফের দেশে তিন-তিনটা বছর ক্রীতদাসের মত কাজ করছিলাম তখন বহু রাত্রি আমাকে বরফের ওপর শুয়েই কাটাতে হয়েছে। তখন আমি একটা কথাই ভেবেছি, কোন না কোনদিন এমন কেউ আমার জীবনে আসবে যে আমাকে মনে-প্রাণে ভালবাসে। আজ না হোক কাল সে মানুষটার দেখা আমি পাবই। আর সে মানুষটাকে আজ আমি পাশে পেলাম। টাকার মূল্য অবশ্যই আছে, তবে যাকে ভালবাসা যায় তাকে পাশে পাওয়াটাই সবচেয়ে বড় কথা। একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, কোনদিন যদি কোন পুরুষকে তোমার স্বামীর আসনে বসাতেই হয়, মানে বিয়ে করতেই হয় তবে তার কাছে কি চাইবে তুমি, বল তো?

কি চাইব? টাকা! নগদ টাকা!

মিস কল্‌বির-এর ঘুমের ভান করে কথাটার মধ্যে এটাই বুঝাচ্ছে যে, স্বপ্নের ঘোরে সে যেন সিয়েবার-ম্যাসন নামক ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের কাউন্টারে অবস্থান করছে।

একসময় হঠাৎ তার মাথাটা একদিকে ঝুঁকে পড়ল। তার মুখ চটে গেল। সোজা হয়ে বসল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, নোম থেকে আসা যুবকটা কেটে পড়েছে।

সে কী! আমি ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম নাকি! কী অবাক কাণ্ড, সাদা মাথা দুটো গেল কোথায়! সাদা মাথা দুটো—কোথায়!

দ্য মেকিং অব এ নিউ ইয়র্কার

বহু কিছু ছাড়া কবি হিসাবেও র‍্যাগলস-এর পরিচিতি ছিল। সবাই তাঁকে একজন ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলে বলেই জানে। আবার তার সম্বন্ধে এ কথাও বলা চলে যে, তিনি ছিলেন চিত্রশিল্পী, দার্শনিক, প্রকৃতিবিজ্ঞানী, পর্যটক আর একজন আবিষ্কর্তা। তবে হ্যাঁ, সবার উর্ধ্বে তিনি ছিলেন একজন কবি। কিন্তু খুবই অত্যাশ্চর্য ব্যাপার, তিনি কোনদিন একটা ছত্র কবিতাও লেখেন নি। কিন্তু কবিতাকেই তিনি নিজের জীবনের সমান জ্ঞান করেন। যদি তিনি লিখতেন তবে তাঁর 'ওডিসি' লিমেরিক-এ পরিণত হয়ে যেত। আবারও বলছি, র‍্যাগ্‌লস্ একজন কবি ছিলেন।

র‍্যাগ্‌লস্-এর বৈশিষ্ট্য যদি লেখা হ'ত তবে সেটাই শহরের সনেটগুচ্ছে পরিণত হয়ে যেত। মেয়েরা যেমন আয়নায় নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখে ঠিক একই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে তিনি শহরটাকে দেখেছেন। আর শিশুরা ভাঙা পুতুলের মধ্যে কিছু আঠা ও করাতের গুড়ো, আর জঙ্গলের জন্তু-জানোয়ার বিষয়ে যারা লেখে তারা সে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চিড়িয়াখানার খাঁচাগুলোকে দেখে, ঠিক সে দৃষ্টিতেই তিনি শহরটাকে দেখেন।

র‍্যাগ্‌লস্-এর চোখে শহরটা কেবলমাত্র ইট-কাঠ-পাথর আর শহরবাসী মানুষই নয়, শহরের নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য আর স্বাতন্ত্র্যতাপূর্ণ আত্মার অস্তিত্ব বর্তমান। আর আছে তার নিজস্ব স্বাদ, অনুভূতি, মৌলিকতা আর জীবনের সম্মিলিত রূপকেও তিনি কম প্রাধান্য দেন না।

র‍্যাগ্‌লস্ কবিত্বের তাগিদে প্রায় চতুর্দিকের দু'হাজার মাইল পায়ে-হেঁটে পাড়ি দিয়েছেন। আর শহরগুলোকে তিনি নিজের অন্তরের অন্তঃস্থলে গেঁথে নিয়েছেন। তিনি কখন পায়ে-হেঁটে আবার কখনও বা ভাড়া করা গাড়িতে উল্কার বেগে ছুটে গেছেন। এ কাজে তিনি সময়কে এতটুকুও আমল দেন নি। আর কোন শহরে মনের ছোঁয়া পেলেই তার গোপন আবেদন উৎকর্ণ হয়ে শুনেছেন। তারপরই তিনি উদ্ভ্রান্তের মত অন্য শহরের উদ্দেশ্যে ছুটেছেন।

র‍্যাগ্‌লস্ অস্থিরচিত্ত, খেয়ালি প্রকৃতির। তিনি এমন একটা পৌর ব্যবস্থা দেখতে পেলেন না যা তাঁর সমালোচকদের কল্পনা শক্তিকে প্রলুব্ধ করত।

র‍্যাগ্‌লস্ চোখ খোলামাত্র একটা মনোলোভা গন্ধ উপলব্ধি করলেন। পর মুহূর্তের একটা নরম হাত তার কপাল স্পর্শ করে। ঘাড় ঘুরিয়েই দেখেন, প্রাচীনকালের রাজকন্যার সাজে সজ্জিতা এক যুবতী। তার নীল চোখের তারা দুটো মানবিকতার সমত্বে ভরপুর।

এক বয়স্ক ব্যক্তি র‍্যাগ্‌লস্-এর টুপিটা হাতে করে তার পাশে দাঁড়িয়ে। অভিজ্ঞতার প্রতিমূর্তি তিনি। বেপরোয়া গাড়ি চালানোর বিরুদ্ধে দীর্ঘ ভাষণ দানে ব্যস্ত।

কাছের রেস্তোরাঁ থেকে নিষ্কর্মা একটা লোক মদের-গ্লাস হাতে দৌড়ে বেরিয়ে এল।

নিষ্কর্মা লোকটা র‍্যাগ্‌লস্-এর মুখের কাছে মদের গ্লাসটা ধরে বলল—এ স্পোটটা গলায় ঢেলে নিন।

চোখের পলকে তাদের ঘিরে বহু লোক জড়ো হয়ে পড়ল। সবার মুখেই জমাটবাঁধা উৎকণ্ঠার ছাপ। দুটো পুলিশ হন্তদন্ত হয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। অতিরিক্ত লোকদের ঠেলে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিল। মোটাসোটা এক বুড়ি চেঁচিয়ে কর্পূর আনতে বলল। খবরের কাগজ বিক্রেতা একটা কাগজ দলামোচড়া করে র‍্যাগ্‌লস্-এর পথের কাদায় তার হাতের দলায় গুঁজে দিল। নোটবুক-হাতে এক যুবক তাঁর নামটা জানার জন্য বারবার একে-ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল।

ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে অ্যাম্বুলেন্স হাজির হল। ভিড় ঠেলে সার্জন ভেতরে ঢুকে গেলেন।

র‍্যাগ্‌লস্ মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বললেন, মিছে মিছে উতলা হবেন না আপনারা। আমি ভাল, সুস্থই আছি।

সিল্ক আর সার্টিনের পোশাক পরিহিতা যুবতী রুমাল দিয়ে র‍্যাগ্‌লস্-এর কপালের রক্তের ছোপ মুছে দিল।

র‍্যাগ্‌লস্ নতুন শহরটার প্রকৃত রূপের সন্ধান পেয়েছেন।

তিনদিন হাসপাতালের সিটে কাটাবার পর তাঁকে ছুটি দেওয়া হ'ল। ছুটি পাওয়ার পরও তিন

ঘণ্টা হাসপাতালে ছিলে·

হাসপাতালের নার্সরা একটা সংঘর্ষের শব্দ শুনতে পেল। ছুটোছুটি করে গিয়ে তারা জানতে পারল, র‍্যাগ্‌লস্ একটা রোগীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে আহত করে দিয়েছেন। হতভাগা একটা মালগাড়ির ধাক্কা খেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।

নার্স দৌড়ে গিয়ে র‍্যাগ্‌লস্'কে এরকম আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বললেন, 'আমাকে এখানে ফেলে রেখেই লোকটা শহরে চলে যাচ্ছিল। তাই তো আমি—'

শহরে? কোন্ শহরে?

র‍্যাগ্‌লস্ একই স্বরে জবাব দিলেন—'নিউইয়র্ক।'

দ্য পারপেল ড্রেস

বেগুনি রংটা ছেলেপুলেদের কাছে খুবই আদরনীয়। সম্রাটদের বক্তব্য এ রংটা তাদের খুব মনপছন্দ। লালের সঙ্গে নীল বং-এর মিশ্রণে যে সুন্দর-মনোলোভা রং-এর সৃষ্টি হয় সেটা সর্বত্র ভালমানুষদের দ্বারা সমাদৃত হয়। আর সব মেয়েদের কাছেই রংটা সমাদর পায়। হ্যাঁ, এটাই ফ্যাশান। বর্তমানে সবাই তো বেগুনি রং-ই পরে। পথের দিকে অনুসন্ধিৎসু নজরে তাকালেই রংটা খুবই দেখা যায়। তবে অন্যসব রং-এর সে চল নাই তা-ও নয়।

যেকোন বিকেলে টুয়েন্টি থার্ড স্ট্রীটের দিকে দৃষ্টিপাত করলে বেগুনি রংটাই বেশী করে চোখে পড়বে।

বি-হাইড স্টোর-এব খোলা চোখ ও তেঁতুল রঙের চুলওয়ালা মেয়ে সাইডা, ঝুটা মুক্তোর ব্রোচ পরিহিতা মিষ্টি-মধুর কণ্ঠী মেয়ে গ্রেস'কে লক্ষ্য করে বলল—'জান, থ্যাঙ্কসগিভিং ডে উপলক্ষে দর্জিকে দিয়ে আসার জন্য একটা বেগুনি রং-এর পোশাক তৈরী করাচ্ছি।

গ্রেস কতগুলি দস্তানা বাক্সে ঢোকাতে ঢোকাতে বলল, তাই নাকি? আমি কিন্তু লাল রংটাই বেশী পছন্দ করি। ফিফথ্ এভিনিউতে কিন্তু লাল রং-ই বেশী দেখতে পাবে। আর একটা কথা, লাল রং-ই কিন্তু পুরুষদের বেশী পছন্দ।

সাইডা বলল, তুমি যা-ই বল না কেন, আমি কিন্তু বেগুনি রং-ই বেশি পছন্দ করি। আর বুড়ো শ্লেগেল বলেছে, অষ্টআশি ডলারে সেটা করে দেবে। তাছাড়া একটা স্কার্ট আর একটা ব্লাউজ-কোটও আমি তৈরি করিয়ে নেব মনস্থ করেছি।

তোমার কি বিশ্বাস, মিঃ রামজে বেগুনি রংটা পছন্দ করে? আমি গতকাল তার মুখে শুনেছি, গাঢ় লাল রংটা সবচেয়ে বেশী আকর্ষণীয়।

আমি সে কথার ধার ধারি না। মোটেই পাত্তা দেই না। মোদ্দা কথা, আমার বেগুনি রং পছন্দ। আর অন্যে যে রং পছন্দ করে করুক।

উপরোক্ত কথোপকথনের মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয় বেগুনি-প্রিয় মানুষেরা ভুলও করতে পারে। আর কোন একটা মেয়ে যদি মনে করে বেগুনি রং তার পছন্দ তবে অন্যে যে যা-ই বলুক না কেন, বেগুনি রং-এর পোশাকই সে ব্যবহার করবে।

আর কোন সম্রাট যদি মনে করেন বেগুনি পোশাক চিরদিনই তাঁর গায়ে থাকবে, তবে বুঝতে হবে বিপদ শিয়রে পৌঁছে গেছে।

সাইডা আট-আটটা বছর ধরে খুব হিসাব করে খরচ করে আঠার ডলার জমাতে পেরেছে। তা দিয়ে সে পছন্দ মাফিক বেগুনি কাপড় কিনেছে। আর পোশাক তৈরী করার মজুরি বাবদ চার ডলার দিয়েছে শ্লেগেলকে। ব্যস, তারপরই পছন্দমাফিক একটা পোশাক পরতে পারবে। এর চেয়ে মনোলোভা পোশাক কি-ই বা হতে পারে।

প্রতিবছর থ্যাঙ্কসগিভিং ডে-তে বী-হাইড স্টোরের মালিক বুড়ো ব্যাচম্যান কর্মচারীদের

নৈশভোজ খাওয়ান। তারপর থেকে, তিন শ' চৌষট্টি দিন অর্থাৎ পুরো একটা বছর ধরে রোজ তার কর্মীদের ভোজের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং আগামী ভোজ সভার আশাদান করেন। অতএব আগামী ভোজসভার আনন্দের প্রত্যাশায় কর্মীরা পূর্ণ উদ্যমে কাজ চালিয়ে যায়।

ব্যাচম্যান নৈশভোজের ব্যবস্থা করেন দোকানের হল ঘরেই লম্বা একটা টেবিল পেতে। সামনের মোড়ের রেস্তোরাঁ খাবার সরবরাহ করে। পরিবেশনও তারাই করে। মনে রাখতে হবে বী-হাইভ মোটেই একটা সাজানো গোছানো ডিপার্টমেন্টাল স্টোর নয়। সেটা এতই ছোট যে, সেটাকে একটা এম্পোরিয়াম বলাই শ্রেয়। আর প্রতিটা থ্যাঙ্কসগিভিং ডে-র নৈশভোজে মিঃ রামজে তাঁর কর্মীদের—'

এই যাঃ। মিঃ রামজে-র প্রসঙ্গে আলোচনাটা তে গোড়াতেই সেরে নেওয়া দরকার ছিল। সবুজ বা বেগুনি রং-এর চেয়ে তাঁর গুরুত্ব অনেক, অনেক বেশী।

মিঃ রামজে হেড ক্লার্কের কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

আমিও তার পক্ষেই। দোকানের অন্ধকার কোণ দিয়ে যাতায়াতের সময় তিনি ভুলেও কখনও মেয়েদের হাতে চিমটি কাটেন না। দোকান ফাঁকা থাকলে, অর্থাৎ খদ্দের না থাকলে তিনি রসদ দিয়ে দিয়ে এমন সব কথা বলেন যা শুনে মেয়ে-কর্মীরা হো-হো করে হেসে ওঠে। তারা কিন্তু তখন জি বার্নাড একা থাকা ভাবে না, বলেও না। তিনি যথার্থই একজন ভদ্রলোক, অস্বীকার করার উপায় নাই। আর তিনি একটু বিচিত্র ও মৌলিক চরিত্রের মানুষ। আর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে একটু-আধটু পাগলামি তার মধ্যে লক্ষিত হয়। তাঁর মতে, যে খাবারদাবার মানুষের পক্ষে উপযোগী তা খাওয়া মোটেই ঠিক নয়। আরাম বিলাসের মধ্যে দিন কাটানোর ব্যাপারটাকে তিনি মোটেই বরদাস্ত করতে পারেন না।

দোকানের প্রতিটা মেয়ে কর্মী প্রতি রাত্রে রামজে হবার স্বপ্ন দেখে। কারণ এই যে, মিঃ রামজে পরের বছরই তাকে দোকানের অংশীদার করে নেন। তারা ভালই জানে, বুড়োটাকে হাতের মুঠোয় নিতে পারলে বিয়ের কেকটা উদরস্থ করার আগেই তার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পাগলামি মাথা থেকে নামিয়ে ফেলতে দেরী হবে না।

তবে হ্যাঁ, বুড়ো রামজে নৈশভোজের ব্যবস্থা করার ব্যাপারে খুবই ওস্তাদ। দু'জন ইতালীয় বেহালা হাতে তৈরীই থাকে। আর মামুলি নাচের ব্যবস্থা তো থাকেই। আর বুড়োর মন ভোলানোর জন্য বেগুনি আর লাল—দু' প্রস্থ পোশাক রাখা হয়। আর আটটা মেয়ে-কর্মীর জন্যও পোশাক তৈরী থাকে।

গ্রেসও কিছু টাকা জমিয়েছে। একটা তৈরী-পোশাক কিনবে। শরীর স্বাস্থ্য ভাল থাকলে তৈরী-পোশাকই'ত ভাল। অহেতুক দর্জির দুয়ারে ধর্না দেওয়ার দরকার কি? এরকম চেহারাধারীদের জন্যই তো তৈরী পোশাক দোকানে রাখা হয়।

থ্যাঙ্কসগিভিং ডে-র আগের রাত্রে সাইডা অন্যদিনের চেয়ে একটু তাড়াতাড়িই বাড়ি ফিরল। তার তো ভালই জানা আছে, বেগুনি রং-ই তাকে মানায় ভাল। মিঃ রামজেও তো তাকে একই কথা বলছেন। তাঁরও নাকি বেগুনি রং খুব পছন্দ, লাল রং-কে মোটেই বরদাস্ত করতে পারেন না। বাড়ি ঢুকেই সে সবার আগে ড্রয়ার খুলে চারটা ডলার বের করল। এবার প্লে গেল-এর দর্জি দোকানের উদ্দেশ্যে বেরোবে ঠিক করল। পোশাকটা আনতে যাবে।

গ্রেসও একই বাড়িতে, সাইডার হল ঘরের ওপরে থাকে। সাইডা দর্জির দোকানে যাবার জন্য বেরোতে যাবে ঠিক তখনই তার কানে এল বাড়িতে মালকিন গ্রেস'কে যা নয় তাই বলে গালমন্দ করছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই গ্রেস ডুকরে কাঁদতে কাঁদতে সাইডার ঘরে গেল। চোখ মুছতে মুছতে সে বলল, জানো বুড়িটা আমাকে বলছে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে। আমার কাছে চার ডলার পাবে। এরই জন্য আমার বাক্সটা হল ঘরে ঢুকিয়ে তালা দিয়ে দিয়েছে। আমার কাছে একটা সেন্ট পর্যন্ত নেই যে অন্য কোথাও গিয়ে উঠব।

সাইডা বলল, আজ না থাক, কাল তো ছিল।

তা ছিল বটে। সেটা তো পোশাক করতে খরচ করে ফেলেছি। আমি মনে করেছিলাম, বকেয়া ভাড়ার জন্য তিনি আগামী সপ্তাহটা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। কিন্তু—

সাইডা তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই পকেট হাতড়ে চারটা ডলার বের করে গ্রেস-এর হাতে গুঁজে দিল।

ডলার চারটে হাতে পেয়েই গ্রেস উল্লসিত হয়ে বলল, বাঁচালে সাইডা। আগে নচ্ছাড় বুড়ির ভাড়াটা তো শোধ করে আসি। ফিরে এসে নতুন পোশাকটা পরব। চল, পোশাকটা দেখে আসবে। চমৎকার মানাবে। আর ডলার চারটে আমি হপ্তায় এক ডলার করে দিয়ে শোধ করে দেব, কথার হেরফের হবে না।

থ্যাঙ্কসগিভিং ডে।

দুপুরবেলা ভোজের ব্যবস্থা। গ্রেস নতুন পোশাক পরে পৌনে বারোটায় সাইডার ঘরে এল। লাল পোশাকে তাকে বড্ড ভাল দেখাচ্ছে। পুরনো একটা চেভিয়ট স্কার্ট ও নীল জামা পরে সাইডা জানালার পাড়ে বসে সূঁচ-সুচ দিয়ে জামায় ফুল তোলায় ব্যস্ত।

গ্রেস ঘরের দরজায় পা দিয়েই সাইডাকে সূঁচ-সুচ নিয়ে বসে থাকতে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল 'সে কী! তুমি এখনও সাজগোজ সার নি যে!' কথা বলতে বলতে সাইডার দিকে পিছন ফিরে বলল, 'জামাটা পিঠের দিকটা ঠিক হয়েছে কি না? কিন্তু তুমি এখনও পোশাক পরনি, সাজগোজও কিছুই—

আমি ভোজের আসরে যাচ্ছিনে। আমার পোশাকটা দর্জি তৈরীর কাজ শেষ করতে পারে নি।

সাইডা, বড়ই দুঃখ পেলাম। কেবলমাত্র দোকানের কর্মী বন্ধুরাই তো ভোজের আসরে উপস্থিত থাকবে। তাই বলছি কি, অন্য একটা পোশাক পরে চল না কেন। এনিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না।

শোন, আমি ভেবেছিলাম, বেগুনি রং-এর পোশাকটা পরেই ভোজের আসরে যাব। সেটা যখন পেলামই না তখন মনস্থির করে ফেলেছি যাব না। যাক গে, লাল পোশাকে কিন্তু তোমাকে ভারী সুন্দর মানিয়েছে! তুমি ভোজের আসরে চলে যাও, দেরী হয়ে যাবে।

সাইডা সকালটা জানালার পাড়ে বসেই কাটিয়ে দিল। আর ভোজের সময় পেরিয়ে গেলে বাকি সময়টুকু কাটাল দোকানে।

মাংসের হাড়ের টুকরো নিয়ে মেয়েরা হাসি মস্করা জুড়ে দিয়েছে তা সাইডার কানে ভেসে আসতে লাগল। আর চাপা হাসিঠাট্টা নিয়ে বুড়ো ব্যাচম্যানের গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। আর? মিসেস ব্যাচম্যানের মেদবহুল দশাসই শরীরে হীরের গলার হার, মিঃ রামজে'কে দেখল সবার আরাম-বিলাসের দিকে নজর রেখে চলেছেন। কারো এতটুকুও অসুবিধা না হয় এটাই তার একমাত্র লক্ষ্য।

বিকেল চারটেয় সাইডা ধীর-পায়ে দর্জি শ্লেগেল-এর দোকানে গিয়ে ব্যাজার মুখে বলল, আমি দুঃখিত, পোশাকের মজুরির চার ডলার এখনই আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

শ্লেগেল গর্জে উঠল, সে কী কথা। কালও তো জোর তাগাদা দিয়ে গেছ, পোশাকটা যেন সময় মত পাওয়া যায়। আর এখন মুখ গোমড়া করে দাঁড়িয়ে কেন? পোশাকটা সকালেই হয়ে গেছে, নিয়ে যাও।

পর মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল, 'যাকগে, যা হবার হয়ে গেছে। যে কোন মানুষেরই সমস্যা দেখা দিতে পারে। পোশাকটা যখন তৈরী হয়েই আছে, নিয়ে যাও। মজুরী পরেই দিও। দোকানে পড়ে থাকলে আমারও ত ফায়দা কিছু হবে না। দু'বছর ধরে তোমাকে আমার দোকানের সামনে দিয়ে যাতায়াত করতে দেখছি। দর্জির কাজ করি বলে কি মানুষের মনের কথা জানতে পারি না? তুমি এটা নিয়েই যাও, সুবিধা মত মজুরিটা দিয়ে যেয়ো। এটা পরলে তোমাকে চমৎকার মানাবে। এই নাও, নিয়ে যাও।

সাইডা দর্জি শ্লেগেলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে পোশাকটা হাতে নিয়ে লম্বা-লম্বা পায়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এল। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হ'ল। বৃষ্টিকে পাত্তা না দিয়ে ভিজে পুড়ে সে বাড়ি ঢুকল।

সাইডা কেন থ্যাঙ্কসগিভিং ডে-তে ভিজতে ভিজতেই বাড়ি ফিরল তারা ধনকুবেররা, গাড়ি করে চলাফেরা করেন তাদের এটা উপলব্ধি করার ক্ষমতা নেই। আর যেসব মেয়েদের পোশাকের আলমারিটাই একটা বুড়োরা হিসাবের খাতায় রক্ষিত তার তো বোঝার ক্ষমতাই নেই।

সাইডা বিকাল পাঁচটায় সদ্য তৈরী পোশাকটা পরে রাজপথে নামল।

বৃষ্টি পড়েই চলেছে। পথিকদের কেউ ছাতা-মাথায়, কেউ বা বর্ষাতির বোতামগুলি ভাল করে এঁটে দ্রুত পা চালিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটছে। এত ব্যস্ততার মধ্যেও তাদের অনেকেই ঘাড় ঘুরিয়ে বেগুনি পোশাক পরিহিতা খুশিতে ডগমগ সাইডার দিকে বিস্ময়-মাখানো দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। রূপসী যুবতী সাইডা ঝড়-জলের মধ্যেও এমনভাবে হাঁটছে যে, সে যেন গ্রীষ্মের মেঘহীন আকাশের তলায় একটা বাগানে পায়চারি করছে।

আবারও একই কথার পুনরাবৃত্তি করছি, যেসব মহিলার বটুয়া ভর্তি ডলার, পোশাকে আলমারি ঠাসা এটা বোঝার মত ক্ষমতা তাদের নেই। তারা তো উপলব্ধি করতে পারবে না, ভাল ভাল জিনিসের কামনা বাসনাকে বুকের গোপন অন্তরালে ঢেকে রেখে একটা বেগুনি পোশাক আর উৎসবের দিনের সমন্বয় সাধন করতে আট মাস না খেয়ে বেঁচে থাকার ব্যাপারটা কি! ঝড়-তুফান-শিলাবৃষ্টি বা বরফ পড়লেই বা তাকে ঠেকাবে কে?

গামবুট, বর্ষাতি বা ছাতা কিছুই নেই। একমাত্র সম্বল বেগুনি পোশাকটা পরেই সে পথে নেমেছে। মাথায় আকাশও যদি ভেঙে পড়ে পরোয়া নেই। ক্ষুধাতুর একটা হৃদয় বছরে একটা দিন ত আনন্দটুকু উপভোগ করবে। তার আঙুলের ডগাগুলো বেয়ে জল পড়তে লাগল।

সাইডা একটা বাঁক ঘুরতেই কার যেন মুখোমুখি হ'ল। লোকটা তার পথ আগলে দাঁড়িয়ে। চোখ তুলে তাকাতেই দেখল, মিঃ রামজে। উৎসাহ ও অন্তহীন প্রশংসায় তার চোখের তারা দুটো ঝকঝক করছে।

আবেগ-উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে মিঃ রামজে বলে উঠলেন, নতুন পোশাকটা চমৎকার হয়েছে। আপনাকে মানিয়েছেও খুবই। ভোজের আসরে আপনার অনুপস্থিতি আমাকে যারপরনাই হতাশ করেছিল। আজ অবধি যত মেয়ের সান্নিধ্যে এসেছি তাদের মধ্যে আপনার বুদ্ধি বিবেচনা বাস্তবিকই অতুলনীয়। প্রতিকূলতার মুখোমুখি দাঁড়াবার মত স্বাস্থ্যকর ও উৎসাহব্যঞ্জক আর কিছুই নেই। আপনি সে কাজটাই করেছেন বলে আমি খুবই খুশি হয়েছি। আমি কি আপনার সঙ্গে পা মিলিয়ে হাঁটতে পারি।

সাইডার মুখে বক্তিম ছোপ ফুটে উঠল। কোন কথা নয়, কেবল সশব্দে একবারটি হাঁচল।

ব্রিকডাস্ট রো

ব্লিংকার রীতিমত মনঃক্ষুণ্ণ হ'ল। শিক্ষা-সংস্কৃতি, গুরুত্ব আর বিষয়-আশয়ের দিক থেকে নিম্নস্তরের কেউ হলে হয়ত বা গলা ছেড়ে গালাগালিই করে উঠত। ব্লিংকার কিন্তু খুবই সচেতন সে যথার্থই একজন ভদ্রলোক। এ কাজটাকে ভদ্রলোকরা সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে চলে। তাই তো সে চোখে-মুখে বিরক্তির ছাপ এঁকে দু' চাকার যানটাকে গণ্ডগোল হুজ্জুতির কেন্দ্র উকিল ওল্ডপোর্ট-এর ব্রডওয়ে অফিসের পথে এগিয়ে নিয়ে চলল। ব্লিংকারদের বহুদিনের জমিদারীর এজেন্ট ওল্ডপোর্ট।

চোখে বিরক্তির ছাপ এঁকে ওল্ডপোর্ট-এর দিকে মুখ তুলে ব্লিংকার বলল, আমি তো মাথামুণ্ড কিছুই বুঝছি না আমাকে দিয়ে কেন সব সময় কতকগুলো বাজে কাগজপত্র দস্তখত করানো হচ্ছে। আজ সকালেই আমার চলে যাবার কথা ছিল। মালপত্রও বাঁধাছাদা সেরে ফেলেছি। কিন্তু এখন দেখছি কাল সকাল অবধি অপেক্ষা করতেই হবে। রাত্রে ট্রেনে কোথাও যাওয়া আমার অপছন্দ। আমার বাছা-বাছা ক্ষুরগুলোকে হয়ত অজানা কোন বাক্সে রাখা হয়েছে। দুরভিসন্ধি—নির্ঘাৎ এটা একটা দুরভিসন্ধি। এখন আমাকে হাঁদা বোকা কোন নাপিতের দরজায় ধর্না দিতে হবে। লিখতে গিয়ে কাগজে নিব আটকে যায় না এমন একটা কলম দিন। এরকম কলমে সই করতে আমি বিরক্তি বোধ করি, মোটেই পছন্দ করি না।

বুড়ো উকিল ওল্ডপোর্ট বলল, আরে, সবচেয়ে খারাপ খবরটা তো তোমাকে এখনও দেওয়াই হয়নি। টাকার কুমীর মানুষগুলোর কী যে কষ্ট বলার মত নয়! নথিপত্রগুলো সই করার জন্য এখনও তৈরী করাই হয়নি। আগামীকাল সকাল এগারটায় সেগুলো তৈরী করে তোমাকে সই করার জন্য দেব। তোমার আরও একটা দিন বরবাদ হবে। নাপিতটা আরও দু'বার একজন ব্রিংকার-এর নাক ধরে টানাটানি করবে। একবার চুলকাটার কষ্টটা যে তোমার সহ্য করতে হচ্ছে না এটাই তো তোমার বরাত ভাল, মনে করতে হবে।

দেখুন, আরও বহু নথিপত্রে সই করার বাকি না থাকলে আমি এ মুহূর্তে আপনার কাছ থেকে যাবতীয় কাজকর্ম নিয়ে নিতাম।

ম্লান হেসে বুড়ো উকিল ওল্ডপোর্ট বললেন, দেখ হে, আমার এক পুরনো ও অভিন্ন হৃদয় বন্ধুর ছেলে না হতে তবে তোমাকে হাঙরের মুখে ঠেলে দিতে দ্বিধা করতাম না। নিজেই কাজকর্ম যা কিছু তোমার হাতে তুলে দিতাম। আলেকজান্ডার, আগামীকাল আরও ত্রিশটার মত কাগজপত্রে সই করার ব্যাপার ছাড়াও ব্যবসা-বিষয়ক একটা কাজের ভারও তোমাকে দেব। ব্যবসার কাজ, মানবিক অধিকারের ব্যাপারও মনে করতে পার। পাঁচ বছর আগে তোমাকে কাজটা সম্বন্ধে আভাস দিয়েছিলাম। কোথায় যাবার জন্য তুমি ব্যস্ত ছিলে, তাই তখন আমার কথাটাকে আমল দাও নি। ব্যাপারটা এখন আবার চাঙা হয়ে উঠেছে! সম্পত্তিটা কিন্তু—

হায় ঈশ্বর! অবাক বিস্ময় সম্পত্তি! মিঃ ওল্ডপোর্ট, বিষয়-আশয়, সিলমোহর, গালার গন্ধ আর দস্তখত যা কিছু আগামীকালই মিটিয়ে নেওয়া যাবে। কাল সকাল এগারটায় এখানে আসার ব্যাপারটা মাথায় রাখার কসুর কবব না। বিদায় মিঃ ওল্ডপোর্ট।

ব্রিংকার-এর বিষয়-আশয় হচ্ছে, কিছু জমি-জিরাত, বাড়িভাড়া বাবদ কিছু আয় আর কিছু পৈত্রিক সম্পত্তি।

এক সময় বুড়ো উকিল ওল্ডপোর্ট তাঁর ঝরঝরে গাড়িটায় ব্রিংকাবকে সঙ্গে নিয়ে শহরে তার যেসব বিষয় সম্পত্তি আছে সবই দেখিয়ে দিয়েছিলেন। বহু বড় বড় পাকাবাড়ি আর ছোট ছোট বাড়ি সবই দেখিয়েছিলেন। সে খুশিই হয়েছিল। তবে এও সত্য যে, তার হাত খরচের জন্য বুড়ো উকিল যে পরিমাণ অর্থ ব্যাঙ্কে জমা রেখেছিলেন বাড়িগুলো দেখে কিন্তু তার মনে হয়নি এমন বিপুল অর্থ বাড়িভাড়া থেকে জমানো সম্ভব।

ব্রিংকার সন্ধ্যায় একটা ক্লাবে নৈশভোজ সারতে গেল। সেখানে কয়েকজন বুড়ো হুইস্ট খেলায় ব্যস্ত। ব্যস, তারা ছাড়া আর কেউ-ই সেখানে নেই। তারা তার দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকালেও দু'-চারটে কথা ভদ্রভাবেই বলল। সবাই শহর ছেড়ে চলে গেল। তাকে কিন্তু আটকে রাখা হ'ল একটা কাগজে স্বাক্ষর করার জন্য। সে যে কী দুঃখ হ'ল তার তা আর বলার নয়।

ব্রিংকার সংস্থার বুড়ো সদস্যদের দিকে পিছন ফিরে ম্যানেজারকে ডেকে বলল, সাইমন্স, কোনি দ্বীপে চললাম। কথাটা এমনভাবে জুড়ে দিল, নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে লোকে যেভাবে বলে থাকে।

সাইমন্স ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বলল, মহাশয়, আমি তো মনে করছি, আপনি কোনি দ্বীপেই অবস্থান করছেন।

পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে ব্রিংকার রবিবারের স্টিমবোটের সময় সারনি দেখে নিল।

ক্লাব থেকে বেরিয়েই সে একটা গাড়ি পেয়ে গেল। মিনিট কয়েকের মধ্যেই নর্থ রিভারের জেটির সামনে গাড়িটা থামল। সে ঝটপট টিকিট কেটে ওপরের ডেকে কোনরকমে একটা জায়গা জোগাড় করে বসে পড়ল।

ক্যাশ-টুলে এক রূপসী যুবতী বসে। তার রূপের আভায় ঝলসে যাওয়ার জোগাড় হ'ল। মেয়েটার রূপ সৌন্দর্য চোখে লাগার মত বলে ইচ্ছা না থাকলেও সে বেহায়ার মত তার দিকে বার বার আড়চোখে তাকাতে লাগল। তার খেয়ালই নেই যে, সে একজন রাজপুত্র। তাই এবার থেকে সে সহজ দৃষ্টিতেই মেয়েটার দিকে তাকাতে লাগল।

আর এ-ও সত্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে না হলেও মেয়েটা তার দিকেই বার বার তাকাতে লাগল।

দমকা বাতাসে ব্রিংকার-এর মাথার টুপিটা উড়ে যাবার উপক্রম হ'ল। কোন রকমে সে হাতচাপা

দিয়ে সেটাকে ঠেকাল। মেয়েটা তার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছোট্ট করে হাসল।

চেরীফুলের মত সুন্দর সাদা পোশাক পরা মেয়েটাকে কেমন যেন একটু বিমর্ষ দেখাচ্ছে। ব্লিংকাব ধীর-পায়ে এগিয়ে গিয়ে তার পাশে বসল।

হাসিটুকু যথাসাধ্য চেষ্টা করে চেপে রেখে মেয়েটা গম্ভীরমুখে বলল, আমাকে দেখে আপনি কোন সাহসে মাথা থেকে টুপিটা খুললেন, জানতে পারি?

টুপি? কই, আমি তো টুপি খুলিনি মহাশয়া। এবার নিজের ভুলটা সামলাতে গিয়ে সে বলল, কিন্তু মহাশয়া, আপনাকে দেখার পরও টুপিটা না খুলে থাকা যায়, আপনিই বলুন?

ক্রোধোন্মত্তা বাঘিনীর মত মেয়েটা গর্জে উঠল, দেখুন মহাশয় কোন অপরিচিত লোকের সঙ্গে কেউ পরিচয় করিয়ে না দিলে আমি পাশে বসতে দেই না।

ব্লিংকার নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেয়েটার পাশ থেকে উঠে পড়ল। কিন্তু পরমুহূর্তেই তাকে ঠোঁট টিপে হাসতে দেখে আবার তার পাশের সিটটাতেই ধপাস্ করে বসে পড়ল। একটু নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসল।

মেয়েটা যেন আগেই জানে সে কোথায় যাবে এরকমই দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, আপনি বেশি দূর যাবেন না, তাই না?

ব্লিংকার তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল, আপনি কোনি দ্বীপে চলেছেন নাকি?

সে কি মশায়! হঠাৎ এরকম প্রশ্ন করার অর্থ? দেখছেন নাকি আমি পার্কে সাইকেল চালাচ্ছি? বিস্ময় ও অধৈর্যভাবে মেয়েটা প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল।

আর আমি? ইট-সিমেন্ট দিয়ে কারখানার একটা চিমনি গাঁথছি। পর মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে অনুরোধের স্বরে বলল, মহাশয়া, আমরা উভয়েই কি একসঙ্গে কোনি দেখতে যেতে পারি না? আমি একেবারেই সঙ্গী সাথী ছাড়াই চলেছি। জায়গাটা এর আগে কোনদিন দেখা হয়ে ওঠেনি।

মেয়েটা মুখে পূর্ব গাম্ভীর্যটুকু অব্যাহত রেখেই বলল, দেখুন আমি আপনাকে সঙ্গদান করব কিনা তা নির্ভর করছে আপনার আচার-আচরণের ওপর। পথে যেতে যেতেই আমি আপনার আবেদনটার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা, মানে সিদ্ধান্ত নেব।

ব্লিংকার সাধ্যমত ভাল ব্যবহারের মাধ্যমে প্রয়াস চালাতে লাগল যাতে তার আবেদনটা বাতিল না হয়ে যায়। মেয়েটার মন জয় করাই তার একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়াল। কিছু দূর যেতে না যেতেই তারা পরস্পরের কাছে সহজ হয়ে পড়ল। উঁচু চিমনিতে ইটগাঁথা অর্থাৎ উঁচু মহলের শিষ্টাচারের স্থান দখল করল মন খোলসা করে কথাবার্তা আলাপ আলোচনা। সবচেয়ে বড় কথা, মেয়েটার গন্তব্যস্থল সেদিকে অবস্থিত বলেই তারা ধরতে গেলে গোড়া থেকে মন খোলসা করেই আলোচনা চালাতে লাগল। কথাবার্তার মাধ্যমে ব্লিংকার জেনে নিল মেয়েটার নাম ফ্লোরেন্স। বয়স ত্রিশ বছর। সাজ পোশাকের দোকানে টুপি সেলাইয়ের কাজে লিপ্ত। অভিন্ন হৃদয়া বান্ধবী এলার সঙ্গে আধুনিক সামগ্রীতে সাজানো গোছানো একই ছাদের তলায়, একই ঘরে থাকে। এলা একটা জুতোর দোকানের হিসাবরক্ষকের কাজে নিযুক্ত। একটা সেদ্ধ ডিম আর এক গ্লাস দুধ হলেই একজনের সকালের খাবার সারা হয়ে যায়।

তার নাম 'ব্লিংকার' এটা শোনামাত্র ফ্লোরেন্স গলাছেড়ে হেসে উঠল। হাসি থামিয়ে এক সময় সে বলল, মহাশয়, একটা কথা কি জানেন? আপনার কল্পনাশক্তি খুবই প্রখর তা কিন্তু আপনার নাম থেকেই অনুমান করা সম্ভব। স্মিথ নামের অধিকারী এ নামটা থেকে সান্ত্বনা কিছু না কিছু পাবেই।

হাসি আনন্দ আর রসিকতার জোয়ারে ভাসতে ভাসতে তারা ঢেউয়ের তালে তালে দুলতে দুলতে এগিয়ে চলল।

ব্লিংকার নীরব হ'ল। চোখের তারায় জমাটবাঁধা কৌতূহল আর মনে সমালোচনার জাল বুনতে-বুনতে নিষ্পলক চোখে সে প্যাগোডা মন্দির আর বাগানবাড়ি দেখতে লাগল। স্টিমারবোটের বিভিন্ন বয়সী যাত্রী ও হকারদের হৈ হট্টগোল ধৈর্যচ্যুতি ঘটাবার জোগাড় করল। কিন্তু ব্লিংকার-এর মনের ওপর যাত্রীরা তার মন ও সহানুভূতিকে ভীষণভাবে নাড়া দিল। বিশেষ করে যাত্রীদের বিকৃত রুচি ও অশালীন কথাবার্তা তাকে খুবই মর্মাহত করল।

বিরক্তিকর পরিস্থিতির হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য ব্লিংকার ঘাড় ঘুরিয়ে ফ্লোরেন্স-এর দিকে তাকাল। তার চোখেমুখে হাসির প্রলেপটুকু এখনও অব্যাহত রয়েছে। আর চোখের তারার উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট সুখের ছাপটুকু ব্লিংকার-এর নজর এড়াল না। তার চোখ দুটোতে ভবিষ্যৎ সুখের ছাপ। মনের মানুষ, আত্মার আত্মীয় তো সঙ্গে কাছাকাছি— গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে। এই তার ভদ্র বন্ধু, স্বপ্নপুরীর রাজপুত্র।

পাশে বসে-থাকা মেয়েটির এরকম দৃষ্টির অর্থ ব্লিংকার বুঝতে পারল না। তবে একটা অলৌকিক প্রভাবে রূপসী কোনির প্রকৃত রূপটাকে চাক্ষুষ করে নিতে পারল।

নিম্নরুচির মানুষের কুৎসিত আলাপ আলোচনা আর অশ্রাব্য কথাবার্তা এখন আর তার কানে আসছে না। তার বদলে তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে হাজার হাজার ভদ্র আর আদর্শবাদী মানুষের মুখাবয়ব। মেকি আর গিল্টি করা মানুষের ভিড়ে সে দেখছে ভবসভ্য মানুষকে। আর এক আদর্শ সন্ধানী ভার্নকে দেখছে পাশে, একেবারে তার গা ঘেঁষে ভেসে থাকতে।

বাজভিখারী ব্লিংকার নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে আদর্শবাদীদের ভিড়ে নিজেকে মিশিয়ে দিল। ঘাড় ঘুরিয়ে সে ফ্লোরেন্স-এর দিকে তাকাল। মুখ খুলল, মহাশয়া আপনি তো একজন চিকিৎসক। রোগী আর রোগ নিয়েই তো আপনার কারবার। এসব নিচুতলার মানুষগুলোর অসঙ্গত, অবান্তর ও অশালীন আচরণ ও কথাবার্তার মধ্যে আমাদের নাক গলানোর দরকার কি, ঠিক কিনা?

ফ্লোরেন্স একটা নকল প্যাগোডার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলল, ওই প্যাগোডার কাছ থেকেই আমাদের যাত্রা আরম্ভ করতে হবে। তারপর এক-এক করে সবই দেখব কী মজাই না হবে, তাই না?

ফিরে আসার আটটার বোটে তারা উঠল। সামনের দিকে রেলিং-এ হেলান দিয়ে তারা পাশাপাশি দাঁড়াল। উভয়ের দেহ-মনেই মধুর অবসাদ। ব্লিংকার-এর মন যাবতীয় চিন্তা-ভাবনামুক্ত। নর্থ উডস্ স্থানটা তার কাছে বসবাসের অযোগ্য জনমানবহীন অঞ্চল বলে মনে হল।

নিকট আওয়াজ তুলে স্টিম বোটটা নর্থ রিভার-এর ঘাসের প্রান্তরে ভেড়ার চেষ্টা করলে যাত্রীরা দেখল দুই চোঙ লাগানো বিদেশী-চিহ্ন আঁটা সমুদ্রগামী একটা বিশাল স্টিমার তাদের দিকে ধেয়ে আসছে। ব্যাপারটা নজরে পড়তেই স্টিম বোটটার মুখ ঘুরিয়ে নেওয়া হ'ল। স্টিমারটাও সঙ্গে সঙ্গে গতিপথ পাল্টাতে চেষ্টা করল। ফলে স্টিম বোটের পিছনের গলুইতে প্রচণ্ড এক ধাক্কা মারল। প্রচণ্ড শব্দে বোটটা দুলে উঠল।

ভয়ঙ্কর ধাক্কাটা সামলাতে না পেরে স্টিম বোটটার দু'শ যাত্রীর অধিকাংশই যে যেদিকে পারল হুমড়ি খেয়ে পড়ে প্রাণভয়ে আর্তনাদ জুড়ে দিল। ঠিক যেন এক ধুন্ধুমার কাণ্ড বেঁধে গেল। ক্যাপ্টেন ছুটে এসে স্টীমারটাকে সরিয়ে নেবার জন্য চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিল। ক্যাপ্টেনের কথা কানে না যাওয়ায় স্টীমারের ক্যাপ্টেন নির্মম-নিষ্ঠুরভাবে অতিকায় জাহাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগল।

স্টিম বোটটার গলুইয়ের দিকটা একটু-একটু করে তালিয়ে যাচ্ছে দেখে যাত্রীরা আর্তস্বরে চিৎকার জুড়ে দিল। আতঙ্কে বুকের রক্ত হিম হয়ে যেতে লাগল। কেউবা আকস্মিক ভীতিতে উন্মাদ হয়ে যাবার জোগাড় হ'ল।

স্টিম বোটটা তলিয়ে যাচ্ছে দেখে ব্লিংকার ও ফ্লোরেন্স জমাটবাঁধা আতঙ্কে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল। যতক্ষণ পর্যন্ত না বোটটার গলুই ক্রমে ভেসে ওঠা শুরু করল ততক্ষণ তারা আলিঙ্গনাবদ্ধভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। কারো মুখে রা সরছে না। ফ্লোরেন্সের চোখে-মুখে সুস্পষ্ট ছাপ লক্ষিত হলেও ব্লিংকার কিন্তু নির্বিকার। এক সময় সে ফ্লোরেন্স-এর বজ্রমুষ্ঠি থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে কতগুলি বয়া কাঠের পাটাতনের ওপর থেকে টেনে নামিয়ে আনল। একটা বয়া ঝটপট ফ্লোরেন্স-এর কোমরে জুড়ে দিল।

বার কয়েক প্রবল বেগে দুলে উঠে এক সময় স্টিম বোটটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল। ফ্লোরেন্স-এর মুখে হাসির রেখা দেখা দিল। আবার সে খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠল। ব্লিংকার তার কোমর থেকে বয়াটা খুলে দিল। ব্লিংকার-এর হাত ধরে নিজের পাশে বসাল। তার হাতের ওপর নিজের হাতটা রেখে চোখে-মুখে খুশির ঝিলিক ফুটিয়ে তুলে বলল, বাজি ধরে বলুন তো আমাদের

বোটটা কি ঘাটে পৌঁছতে পাববে?

ক্যাপ্টেন নিজের জায়গা থেকে যাত্রীদের কাছে এলেন। বললেন, আপনারা যদি চিৎকার চেঁচামেচি না থামান, শান্ত না হন তবে সর্বনাশের চূড়ান্ত হয়ে যাবে বলে দিচ্ছি। বোটটাকে কিছুতেই রক্ষা করা যাবে না, ডুবে যাবে। আর মহিলা ও শিশুরা গলুইয়ের দিকে চলে যান। বোট থামলে তারাই আগে নিচে নেমে যেতে পারবেন।

ফ্লোরেন্স তখনও ব্লিংকার-এর বাহুডোরে আবদ্ধ। ব্লিংকার মিষ্টি মধুর স্বরে বলল—ফ্লোরেন্স, আমি তোমাকে অন্তর থেকে ভালবাসি, বিশ্বাস কর।

ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়ে তুলে ফ্লোরেন্স তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, সবাই এমন মধুর স্বরে একথা বলে।

বলুক। অন্য সবার সঙ্গে আমার তুলনা কোরো না। একই দাঁড়িপাল্লায় চালিয়ে আসার বিচার কোরো না লক্ষীটি।

ফ্লোরেন্স অধিকতর দৃঢ়তার সঙ্গে আবারও বলল, আমি তো বললামই, সবাই এমন মধুর স্বরে একথা বলে।

ব্লিংকার বলল, কেন মিছেই বার বার একই কথা বলছ বল তো?

সবাই যে কথা বলে তা কেন বলব না?

'সবাই' বলতে তুমি কাদের কথা বলতে চাইছ?

কাদের কথা আবার, আমি যাদের চিনি, সবাই।

তুমি কি সবাইকে, এখানের সব মানুষকে চেন নাকি?

না চেনার কারণই বা কি থাকতে পারে? আমি কি ঘরের দেওয়ালে একটা ফুল নাকি যে, কাউকে চিনব না?

তাদের তুমি কোথায় দেখেছ, বল তো? তোমার বাড়িতে? মানে সবাই বলতে যাদের কথা বলছ, তাদের কথা জানতে চাইছি।

আমার বাড়িতে? অবশ্যই না। তোমার সঙ্গে যেভাবে আমার দেখা ও পরিচয় হয়েছে, তাদের সঙ্গেও ঠিক একইভাবে পরিচয় হয়েছে। কারো সঙ্গে পথের বাঁকে, কারো সঙ্গে নৌকোয়, আবার কারো সঙ্গে বা পার্কে বেড়াতে গিয়ে পরিচয় হয়েছে। অভিজ্ঞতা বলে আমি মানুষ দেখলেই বলে দিতে পারি, কে, কোন ধান্দায় ঘুর ঘুর করছে। মানে কে 'চাঙ্গা' হয়ে উঠতে চায় সহজেই চিনে নিতে পারি।

চাঙ্গা? চাঙ্গা বলতে কি বোঝাতে চাইছ মাথায় ঢুকছে না তো।

মানে যে আমাকে চুমু খাওয়ার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠবে।

ক্রোধে ফুঁসতে ফুঁসতে ব্লিংকার বলল, কেউ কি সে চেষ্টা করেছে?

হ্যাঁ, অবশ্যই করেছে। যে কোন পুরুষ একাজে উৎহাসিত হবে, হতে যাচ্ছে তুমি বুঝছ না?

তুমি কি প্রশ্রয় দাও?

হ্যাঁ, অবশ্যই প্রশ্রয় দেই। তবে যে এগিয়ে আসে তাকেই নয়, কিছু লোককে দেই। তুমি উৎসাহী হয়ে এগিয়ে না গেলে তারা তোমাকে বের করে নেবেই।

অকস্মাৎ চাবুকের ঘা-খাওয়া পশুর মত তড়াক্ করে সোজা হয়ে ব্লিংকার দাঁড়িয়ে পড়ল। ফ্লোরেন্স ঘাড় ঘুরিয়ে তার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। তার চোখের তারায় অনুসন্ধিৎসার ছাপ। সে যেন ব্লিংকারকে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

ব্লিংকার-এর মুখের দিকে আর এক ঝলক তাকিয়ে নিয়ে ফ্লোরেন্স আবার মুখ খুলল, আমি যদি কারো সঙ্গে দেখা করি-ই তাতে দোষের কি থাকতে পারে বুঝছি না তো?

পুরোপুরিই দোষের। তুমি যেখানে থাক সেখানকার সঙ্গী সাথীদের আপ্যায়ণ করলেই তো পার। পথ থেকে ডিক, হ্যারি আর টমকে ডেকে নেওয়ার কোন দরকার আছে কি?

সহজ, সরল, স্বাভাবিক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ফ্লোরেন্স বলল, আমার বাসস্থল, মানে সে পরিবেশটা সম্বন্ধে যদি তোমার এতটুকুও ধারণা থাকত তবে তুমি অবশ্যই এরকম কথা বলতে পারতে না। যে গলিটায় আমি থাকি সেটা সুরকির গলি নামে সবার কাছে পরিচিত। কারণ, সেখানে প্রায় সব

সময়ই সব কিছুরও সুরকির গুঁড়ো পড়ে। সেখানে আমি চার বছর ধরে আছি। সেখানে কাউকে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো সম্ভব নয়। তোমার ঘরে যদি কাউকে বসতে পর্যন্ত দিতে না পার তবে? একটা মেয়েকে তো কোন না কোন পুরুষের দেখা সাক্ষাৎ করতেই হয়, ঠিক বলিনি?

ঠিকই বলেছ। একটা মেয়েকে তো পুরুষের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ মানে মেলামেশা না করলে চলবে কেন?

শোন, একটা লোক যেদিন আমার সঙ্গে প্রথম রাস্তায় দেখা করতে আসে সেদিন আমি এক দৌড়ে বাড়ি ঢুকে গিয়েছিলাম। সারাটা রাত্রি কেঁদে কাটিয়েছি। তারপর ক্রমে সবই গা-সওয়া হয়ে যায়। গীর্জায় উপাসনা করতে গিয়ে বহু ভাল লোকের সান্নিধ্যে আসি। বৃষ্টি পড়লে পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকি। কখন, কেউ ছাতা-মাথায় আসবে। আমার একটা বৈঠকখানা থাকলে তো তোমাকেই নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যেতে পারতাম। মিঃ ব্লিংকার, তুমি কি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারো এবার যে লোকটা আমার সান্নিধ্যে এসেছে একজন স্মিথ ছাড়া অন্য কিছু?

স্টিম বোট থেকে নেমে ব্লিংকার আর ফ্লোরেন্স পাশাপাশি, গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে হাঁটতে হাঁটতে একটা মোড়ে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। একটা মেয়ের পাশাপাশি হাঁটতে ব্লিংকার খুবই অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

ফ্লোরেন্স করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, সামনের ব্লকটার পরের ব্লকেই আমার মাথা গোঁজার আস্তানা। আজকের বিকেলটা ভাল কাটার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাতেই হয়।

ফ্লোরেন্স বিদায় নিয়ে চলে গেলে ব্লিংকার আপন মনে বিড়বিড় করে কি যেন বলতে বলতে এগিয়ে চলল। কয়েক পা যেতেই একটা খালি গাড়ি পেয়ে লাফিয়ে উঠে পড়ল। ছাই রঙের বড়সড় একটা গীর্জার গা দিয়ে গাড়িটা যাবার সময় সে জানালা দিয়ে সেটার দিকে তাকিয়ে শূন্যে এক ঘুষি চালিয়ে দিল।

গত হপ্তায়ই তাকে নগদ এক হাজার ডলার দিয়েছি। আর সে মেয়েই কিনা বাড়িতে সবার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে! একী ঘোরতর অন্যায় ব্যাপার। ব্লিংকার আপন মনে চীৎকার করে বলতে লাগল।

ব্লিংকার পরদিন সকালে উকিল ওল্ডপোর্ট-এর বাড়ি গেল। সেখানে ত্রিশ বার নিজের নাম স্বাক্ষর করল। ওল্ডপোর্ট-এর দেওয়া কলমটা রাখতে রাখতে ব্লিংকার করজোড়ে বলল, আমি আর পারছি নে, হাঁপিয়ে উঠেছি। দয়া করে এসব ব্যাপার থেকে আমাকে অব্যাহতি দিন।

দেখে মনে হচ্ছে, তোমার শরীরটা ভাল নেই। এবারের সফরে তোমার উপকার হবে বলেই আমি মনে করছি। আমি কাল তো বললামই আগেও বহুবার সে কাজের কথাটা বলেছি। যদি মন চায় তবে ধৈর্য ধরে শোন—পনেরোটার মত পাকা বাড়ি আছে। তার মধ্যে পাঁচটা বাড়ির জন্য পাঁচ বছরের বন্ধকী-কাগজে স্বাক্ষর করতে হবে। এসব বন্ধকী ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তনের ব্যাপারে তোমার বাবা কিছু চিন্তা ভাবনা করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল, বাড়িগুলির বৈঠকখানাগুলি সাব-লেট করা হবে না। তবে ভাড়াটিয়াদের সেগুলোকে বসবাসের ঘর হিসেবে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে। এসব বাড়ি দোকান-বাজার অঞ্চলে।

বাড়িতে বাড়িতে কাজ করে এমন সব মেয়েরাই সেখানে ভাড়া থাকে। তারা সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে বাড়ির বাইরে দেখা সাক্ষাৎ করে। এসব লাল ইটের বাড়ির বাসিন্দারা—

আপনি কি সুরকি-বালির বাড়ির কথা বলছেন। আর সেগুলোর মালিকানা আমার, ঠিক বলেছি?

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। ভাড়াটেরা সুরকির গলি নামই দিয়েছে। ওল্ডপোর্ট মুচকি হেসে কথাটা বললেন।

ব্লিংকার বেশ একটু চড়া গলায়ই বলে উঠল, দেখুন, ওসব বাড়ির চিন্তা-ভাবনা আপনিই করুন। আপনি ইচ্ছে করলে ভেঙে ফেলতে পারেন বা নতুন করে তৈরী করতেও পারেন। আমি একটা কথাই বলব, দেরী হয়ে গেছে, খুবই দেরী হয়ে গেছে মিঃ ওল্টপোর্ট।

দ্য ব্যাজ অব পুলিশম্যান ও'রুন

এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, পুরুষ আর নারীই প্রথমে একে, অন্যকে দেখেছে আর সে মুহূর্তেই মুগ্ধ হয়েছে। সদ্য পরিচয়ের মুহূর্তেই প্রেম ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক, সন্দেহ নেই। কেউ, কাউকে দেখে না, জানে না অথচ প্রেম জমে ওঠার ব্যাপারের কথা বলতে চাইছি। হ্যাঁ, এরকম ঘটনাও যে ঘটে স্বীকার করতেই হয়। আর এরকম একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করেই গল্পটা তৈরী হয়েছে। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারা যাবে না। পানীয়, ঘোড়া, পুলিশ আর রাজা ও তার পারিষদবর্গের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে কাটছাট করে বাদ দেওয়া হয়নি।

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটা যুদ্ধে জেন্টল রাইডার্স নামক এক সেনাদল ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। দু'-একটা যুদ্ধও হয়। পশ্চিম প্রান্তের দুঃসাহসী আর পূর্বাঞ্চলের ধনকুবের দুঃসাহসী মানুষদের নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছিল।

খাকি পোশাক পরলে একজন থেকে অন্যজনকে পৃথক করা সম্ভব হয় না। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তারা অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং সহকর্মীতে পরিণত হয়ে ওঠে।

এলসওয়ার্থ রেমসেন মাত্র দশ মিলিয়নের মালিক হওয়া সত্ত্বেও একজন খুবই সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে। জেন্টল রাইডার্সদের ক্যাম্পফায়ারে বসে সে-ও মৌজ করে মাংস চিবোয়। আসলে যুদ্ধটা খুবই মজার। তাই পোলো খেলার জন্য তার মধ্যে কোন ক্ষোভ নেই।

সেনাবাহিনীতে একটি ভদ্র ও শান্ত স্বভাবের যুবক আছে। সে ভদ্র, সব সময় পোশাক-আশাকে ফিটফাট থাকে। তার নাম ও'রুন। রেমসেন তাকে খুব ভালবাসে। বিখ্যাত অভিযানেই কেবল নয় অন্য সময়েও তারা পাশাপাশি কাছাকাছি থাকে।

যুদ্ধ মিটে গেলে রেমসেন আবার তার প্রিয় পোলো খেলা নিয়ে মেতে গেল। একদিন ও'রুন-এর সঙ্গে ক্লাবে তার দেখা হ'ল। রেমসেন বুঝল বিধাতা পুরুষ তার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়েছেন। তবে বাইরে থেকে দেখে তার মনে হ'ল সে সুখেই দিনাতিপাত করছে। আর এ-ও বোঝা গেল তার সুখী ভাবটা লোক দেখানো, আসল নয়।

কথা প্রসঙ্গে রেমসেনকে বেশ কাতর স্বরেই বলল, রেমসেন, একটা চাকরি আমার খুবই দরকার। তুমি যদি যেমন তেমন কিছু একটা জোগাড় করে দিতে পার খুবই উপকার হয়।

রেম্‌সেন তার পিঠ চাপড়ে আশ্বাস দিল, আরে, এর জন্য ভাববার কিছু নেই। আমার বহু পরিচিত লোক আছে যারা ব্যাঙ্ক, দোকান, প্রভৃতির বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক। তুমি কিরকম কাজ আশা করছ, বল তো?

যেসব পুলিশ ঘোড়ার পিঠে চেপে ঘোরে তাদের মতই একটা চাকরি পেলে ভাল হয়। আর এ কাজটাতেই আমি পটু। ঘোড়ায় চড়ে মুক্ত বাতাস—এরকম একটা জোগাড় করে দিতে পার?

পারব। এটা কোন সমস্যাই নয়।

হ্যাঁ, রেমসেন কথা রেখেছে। ক'দিনের মধ্যেই ও'রুন-এর ভাললাগা একটা চাকরি জোগাড় করে দিল।

অশ্বারোহী পুলিশের দিকে যাদের চোখ পড়ে তারা দেখবেন, ভদ্র, সুসজ্জিত এবং ঠাণ্ডা মেজাজের একটা যুবক ধূসর রঙের একটা ঘোড়ায় চড়ে ডিউটি দিচ্ছে।

তবে আসল প্রসঙ্গটা উত্থাপন করছি। একদিন রেমসেন ফিফথ্ এভিনিউ দিয়ে যাবার সময়ই ঘটনাটা ঘটে। যানবাহনের সংখ্যা বেশী থাকায় একটা মোটর গাড়ি ধীর-মন্থর গতিতে এগিয়ে চলল। গাড়ির আরোহী একজন সোফার আর একজন বৃদ্ধ। তার গা-ঘেঁষে একজন কম বয়সী ভদ্র মহিলা, রূপসী বটে। রূপের আভা তাকে সন্ধ্যার একফালি চাঁদের চেয়েও বেশী সুন্দর করে তুলেছে। ধীর গতিতে গাড়িটা এগিয়ে গেল। বিরাট শহর। লক্ষ লক্ষ লোকের বাস। তাদের মধ্যে এমন বহু নারী আছে যাদের রূপ ডালিম ফুলের চেয়েও বেশী আকর্ষণীয়। রেমসেন আশা করছে, রূপসী মহিলাকে আবার দেখতে পাবে। কারণ প্রত্যেকেরই বিশ্বাস, ঈশ্বর নিজেই তার প্রেমের কাণ্ডারীর ভূমিকা পালন করে।

রেম্‌সেন-এর মানসিক স্বস্তির আর একটা সহায়ক হ'ল যে, ঠিক সে সময়েই শহরের জেন্টল রাইডার্সদের একটা পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কম সংখ্যক সৈন্য, বড়জোর জনাকুড়ি কিন্তু আনন্দ স্ফূর্তি হল খুবই। কতসব পণ্য সামগ্রী, খাদ্যবস্তু আর বক্তৃতা ও হ'ল না। কাক-ডাকা সকালে এক-এক করে বিদায় নিতে লাগল। রণাঙ্গণে কেউ-কেউ রয়ে গেল। তাদেরই একজন ও'রুন। মদে একেবারে বেহেড। পা দুটো থরথরিয়ে কাঁপছে যা পুলিশ বিভাগের নিয়ম-কানুনবহির্ভূত।

ও'রুন তার বন্ধু রেম্‌সেনকে বলল, আমি একেবারে নাজেহাল হয়ে পড়েছি। কেন যে এমন হোটেল-রেস্তোরাঁ তৈরী করে ভেবে পাইনে। আমার সবকিছু কেড়ে নেবে, অস্তিত্ব চুরমার করে দেবে। তিন ঘণ্টার মধ্যে আমাকে ডিউটিতে যেতে হবে। চিন্তাভাবনা করা, কথা বলা সবই ঠিকঠাক পারি কিন্তু পা দুটোই যত বেগড়া বাঁধায়। কিন্তু আমার যে বড্ড নাচতে ইচ্ছে করছে রেম্‌সেন।

শোন, আমার দিকে চোখ মেলে তাকাও তো একবারটি। আমাকে কি তোমার মত, ঠিক ও'রুন-এর মত দেখাচ্ছে না? অশ্বারোহী পুলিশ ও'রুন-এর মত দেখাচ্ছে না? আমার দিকে তাকিয়ে তোমার অবয়বটার কথা ভেবে দেখ ঠিক একই রকম কিনা। পোশাক পরে তোমার ব্যাজ বুকে এঁটে, তোমারই ঘোড়ায় চড়ে আমি আজ পার্কে ডিউটি দেব। ব্যাপারটা জব্বর মজার হবে, তাই না?

নকল অশ্বারোহী পুলিশের ও'রুন ধূসর রঙের ঘোড়ায় চড়ে পার্কে ডিউটিতে লিপ্ত হ'ল। এতে সে এতই আনন্দ পেল যা লাখপতির বরাতেও খুব কমই জোটে। ভোরে দুই ঘোড়ার একটা ভিক্টোরিয়া গাড়ি পার্কে এল। এত ভোরে কেউ তো পার্কে বেড়াতে আসে না। গাড়ির জানালা দিয়ে এক ভদ্রলোকের মুখ দেখা গেল। আর তার পাশেই একফালি চাঁদের মত, ডালিম ফুলের মত সুন্দর, রেম্‌সেন-এর প্রাণেশ্বরী চমৎকার ভঙ্গীতে বসে।

পাশাপাশি রেম্‌সেন আর গাড়িটা পার হবার সময় রেম্‌সেন-এর দিকে রূপসী যুবতীর চোখ পড়ল। মনের ভীরুতার জন্যই সত্যিকারের প্রেমিকার মতই সে রেম্‌সেন-কে দেখেও যেন দেখতে পেল না। তার দু'গালে রক্তিম ছোপ ফুটে উঠল। রেম্‌সেন ঘোড়াটাকে গজ কুড়ি এগিয়ে নিয়ে গেল।

রেম্‌সেন-এর ঘোড়াটা জোর কদমে ভিক্টোরিয়া গাড়িটাকে অনুসরণ করে চলল। ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যেই সেটাকে সে ধরে ফেলল। গাড়ির কোচোয়ান হাতের লাগামটা ফেলে দিয়ে এক লাফে তার সিট থেকে নেমে এল। গাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। রেম্‌সেন-এর কানে এল বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি অহেতুক একনাগাড়ে বকবক করছেন। তার চোখের সামনে একজোড়া নীলাভ চোখ, রূপসীর হাসিমাখা মুখ ও অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টি ভেসে উঠল। তাতে ভয়ের ছাপ। যথার্থ প্রেমিকের ভীরু অন্তরের চাপের জন্যই সে ভয়ের প্রকৃত অর্থটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হ'ল না। তার চোখের মণিদুটো হয়তো নীরব ভাষায় তারই নামটা আর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছিল তার এ সাহসিকতার জন্য। স্কচ টুপি পরা বৃদ্ধ ভদ্রলোক বকবক করেই চলেছেন।

সে মুহূর্তে রেম্‌সেন-এর অন্তরের অন্তঃস্থলে বার বার খুশির শিহরণ জাগতে লাগল। কারণ, তার নামটাও তো মানুষকে বুক ফুলিয়ে বলার মতই বটে। সমাজের সব উঁচু মহলে সেটা সম্মানের বলাবলি হয়। আর এমন কিছু বিষয় আশয়ের সে মালিক যা পৃথিবী ছেড়ে যাবার সময় তার উত্তর পুরুষদের জন্য রেখে যেতে কিছুমাত্রও হীনমন্যতা বোধ করবে না। সে যে ফেলনা নয়।

কথাগুলো বলার জন্য মুখ খুলতে গিয়েও সে নিজেকে সামলে নিল।

এ মুহূর্তে তার পরিচয় কি? অশ্বারোহী পুলিশ ও'রুন-এর ভূমিকায় অভিনয় করছে। সহকর্মীর ব্যাজ ও মর্যাদা এখন তার হাতের মুঠোর মধ্যে। এখন ধনকুবের এলস্‌ওয়ার্থ যদি আকাশের চাঁদের ফালি, ডালিম ফুলের মত রূপসী যুবতী আর স্কচ টুপি পরিহিত ভদ্রলোককে মৃত্যুর সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করে থাকে তবে তাতে অশ্বারোহী পুলিশ ও'রুন-এর ভূমিকা কি? সে তো পরাজিত, অপদস্তের কালি গায়ে মেখেছে। প্রেম দুয়ারে এল, কিন্তু তার আগেই একেবারে অচিন্তনীয় অবিশ্বাস্য এক ঘটনা। রেম্‌সেন তার টুপিতে হাত রেখে আপন মনে বলে উঠল, আমরা যে পুলিশের চাকরিতে নিযুক্ত এরকম কথা উচ্চারণও করা উচিত নয়। এটা যে আমাদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

রেম্‌সেন ঘোড়া হাঁকিয়ে নিজের কাছে চলে গেল। ডিউটি শেষ করে বন্ধুবর ও'রুন-এর আস্তাবলে ঘোড়াটাকে বেঁধে দিল। ও'রুন-এর ঘরের দরজায় পৌঁছে দেখে, শান্ত শিষ্ট যুবকটা মৌজ ক'রে চুরুট টেনে চলেছে। রেম্‌সেন গম্ভীর স্বরে বলে উঠল—তুমি, তোমার ব্যাজ, ঘোড়া, পেতলের তকমা আর তোমার পুলিশবাহিনী আর যেসব পুলিশ এক গ্লাস মদ নিলেই বেহেড হয়ে পড়ে সবাই উচ্ছন্নে যাও। যাও সব—

তার কথা শেষ হবার আগেই খুশিতে ডগমগ ও'রুন সরবে হেসে বলতে লাগল, সবই আমি জানি। তারা দু'ঘণ্টা আগে তোমাকে, মানে আমার খোঁজে এখানে এসে আমাকে ধরে। আমি তাদের একটু উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব ভেবেছিলাম। কারণ কি জান? বাড়িতে একটু গণ্ডগোল বেঁধেছিল। তোমাকে বলার সুযোগ হয়নি। ঘোড়ার গাড়িতে যে বৃদ্ধকে বসে থাকতে দেখেছিলে, আমার বাবা তিনি। আর্ল অব আউস্‌লি। আর আমার বোন লেডি এঞ্জেলা তো তোমার পরিচিতই বটে। আমাকে খুব করে ধরেছে। বলে গেছে আজ সন্ধেতেই তোমাকে সঙ্গে করে যেন হোটেলে যাই। একটা কথা বন্ধু, আমার ব্যাজটাকে তো আবার হারিয়ে ফেলনি। চাকরিটা ছাড়ার সময় ব্যাজটাকে তো কর্তৃপক্ষের হাতে জমা দিতে হবে। আশাকরি সেটা অবশ্যই তোমার সঙ্গেই আছে।

দ্য টেল অব এ টেন্টেড টেনার

কথায় বলে, টাকায় কথা বলে। তবে নিউইয়র্ক শহরের প্রাচীন একটা দশ ডলার নোটের গল্প আপনাদের কাছে উপভোগ্য হতে পারে। ভাল কথা, আপনার মন চাইলে অপরিচিত জনের এ ছোট্ট আত্মকাহিনীর কাহিনীটায় আপনি কান না-ও দিতে পারেন। তবে আপনি যদি তাদেরই একজন হয়ে থাকেন যারা রাস্তায় চলার পথে মেগাফোনের চোঙ দিয়ে বলা জন ডি-র কথাও শুনতে আগ্রহান্বিত হয়, তবে তো কোন চিন্তাই নেই। তবে এ-ও মনে রাখবেন, খুচরো টাকাকড়িও অনেক সময় ঠিকঠাক কথাটা বলতে পারে। যদি কোন দিন মুদি দোকানের কর্মচারীকে বকশিসস্বরূপ একটা রুপোর সিকি দেবেন যাতে সে আপনাকে কিছু অতিরিক্ত মাল দিয়ে দেয়, তবে মহিলার মাথার ওপরের একবার পাঠ করবেন। সে সরস কথা আপনার মনে কোন্ ভাবের সঞ্চার ঘটাবে?

আমি উনিশ শ'এক সালের দশ ডলারের একটি ট্রেজারি নোট। সেরকম একটা নোট আপনার কোন বন্ধুর হাতে দেখতেও পারেন। নোটটার মাঝামাঝি আমার মুখের ওপরে বাইসনের একটা ছবি আঁকা আছে। পঞ্চাশ-ষাট লক্ষের মাল্টি আমেরিকানরা সেটাকে মোষ ভেবে ভুল করে। আর দু'দিকে ক্যাপ্টেন ক্লার্ক আর ক্যাপ্টেন লিউইর্স-এর ছবি রয়েছে। আর আমার বিপরীত দিকে আঁকা আছে স্বাধীনতা বা ক্যাস্কিন বা সেরেস-এর ছবি। আপনি আমায় ভাঙার ইচ্ছা প্রকাশ করলে শ্যাম কাকা আপনার হাতে লাঠি তুলে দেবেন, দশটা লাঠি। শক্ত ডলার, যেটা লোহার না সোনার নাকি সীসার তা বলা মুশকিল, তবে ভুলে যাবেন না যেন, দাগী একটা নোট সামনে বাড়িয়ে দিলে কেউই মনে মনে আনন্দিত হন না।

আমি প্রথম দুটো বছর ভালভাবেই অনেকের হাতে হাতে ঘুরেছি। এমনও হওয়া স্বাভাবিক, অনেক মৃতের ধার শোধে আমাকে ব্যবহার করা হয়েছে। অনেক ভাল মানুষের পকেটে পকেটে যে ঘুরে বেড়াইনি তা-ও নয়। একটা পুরনো, পচা ও ভিজে নোট আমাকে সজোরে ধাক্কা মারল। আমি তখন এক কসাইয়ের দুর্গন্ধময় ঝোলার মধ্যে ছিলাম।

আমি সক্রোধে বলে উঠলাম, ওহে ষাঁড়, আমাকে এভাবে ধাক্কা মারছ যে বড়। খবরদার! আর এমনতর আচরণ কোরো না। নিজের সম্বন্ধে ভুলেও কি ভাবছ না যে, কাস্টম্‌সের অফিসে গিয়ে তোমার নবজন্ম নেওয়ার লগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে? আঠার শ' নিরানব্বই খ্রীষ্টাব্দে জন্মাবার পর আজ তোমার চেহারার যে হাল হয়েছে তা আর বলার নয়।

একটা পাঁচ ডলারের নোট খেঁকিয়ে উঠল, নিজে ষাঁড়মার্কা নোট বলে এত বড়াই কোরো না।

ইয়া মোটা একটা চটের মধ্যে তোমাকে যদি ফেলে রাখত, সে সঙ্গে গুদামের পঁচাশি ডিগ্রি উষ্ণতা, তবে আমার মতই তুমি খঞ্জ হাঁসের দশা প্রাপ্ত হতে।

কই, এরকম কোন পকেটের কথা তো আমার মাথায় আসে নি। শুনিও নি কোনদিন। তুমি এর আগে কার পকেটে আশ্রয় পেয়েছিলে, বল তো?

এক মেয়ে দোকানীর। কেমন ড্যাবা ড্যাবা চোখ করে তাকায় সে। বুঝতে পারলে না? তাদের হাতে না পরলে বোঝার কথা নয়।

আমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে উঁকি মেরে জর্জ ওয়াশিংটনের মাথাওয়ালা দু' ডলারের একটা নোট পাঁচ-ডলার নোটকে লক্ষ্য করে খেঁকিয়ে উঠল—আরে করছটা কী! এভাবে গুঁতো মারছ কেন? তোমার দুঃখটা কিসের, বুঝছি না তো। আমার মত সারাটা দিন যদি পুরু চটের ঝোলার মধ্যে থেকে কারখানার ধুলোবালিতে দম আটকে আসার জোগাড় হ'ত তবে তুমি এরকম নালিশ করলে কিছু বলার ছিল না।

এটা আমার নিউইয়র্কে পৌঁছবার পরের দিনের ব্যাপার। দশ ডলারের একটা পাঁচ শ' ডলারের গোছার মধ্যে বাঁধা অবস্থায় আমি পেন্সিলভানিয়া থেকে ব্রুকলিনের একটা ব্যাঙ্কে পৌঁছাই। তখনও পাঁচ আর দু' ডলারের মালিকের পকেট সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই ছিল না। আমি প্রতিবারই সিল্কের থলিতে থলিতে ঘুরে বেড়িয়েছি।

দেখ, মুদ্রা হিসেবে আমার বরাত ছিল বড়ই ভাল। অনবরত এক হাত থেকে অন্য হাতে, মানে অন্ততঃ বিশবার হাত বদল হয়েছি। কতরকম ব্যাপার স্যাপার যে দেখছি তা বলে শেষ করা যাবে না। মালিকের মুখে আমি নিজেকে সঁপে দিয়েছি। এমন কোন শনিবারের কথা আমার মনে পড়ছে না যে কোন শুঁড়িখানার মালিকের হাতে আমাকে ঠেলে দেওয়া হয়নি। কাউন্টারে জমা পড়ে দশ ডলারের নোটগুলো আর এক ও দুই ডলারের নোটগুলো যায় মদ পরিবেশকদের পকেটে। একবার আমার জায়গা হয় ঠেলাগাড়ির মালিক হকারের পকেটে, নোংরা ও ছেঁড়াকাটা। নোটের গাদার মধ্যে আমার জায়গা হল। আমি ধরেই নিয়েছিলাম, আমার ভাগ্যে হাত-বদলের আর কোন সম্ভাবনাই নেই। একদিন ঠেলাওয়ালা গাড়িটাকে রাস্তার ক্রসিং-এর কাছাকাছি নিয়ে চলে যাওয়ায় ফ্যাসাদে পড়ে যায়। ব্যস, এরই জন্য আমি তার নোংরা দম-আটকানো থলেটা থেকে মুক্তি পেয়ে যাই। যে ট্রাফিক পুলিশের পকেটে আমার স্থান হ'ল, তার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। এক চুরুটের দোকানীর হাতে আমাকে তুলে দিয়ে সে ক'টা চুরুট নিল। দোকানটার পিছনে জুয়াখেলা হয়। সেখানে এক ক্যাপ্টেনের পকেটে আমি স্থান পেলাম। আমার বরাত ফিরে গেল। পরের সন্ধ্যাতেই ব্রডওয়ে রেস্তোরাঁয় সে মদের দাম মেটাতে গিয়ে আমাকে মালিকের হাতে তুলে দিল। তখন থেকেই তা-ই বরাতগুণে আমি তাকে হাতের মুঠোয় পেয়ে গেলাম।

একবার একজনের খরপোষের টাকা মেটাতে আমাকে ব্যবহার করা হ'ল। কুকুরের চামড়ার একটা থলিতে কতগুলো ডাইস আমার সঙ্গী সাথী হ'ল।

জন্মের পর এই প্রথম দাগী নোট কি জিনিস আমি শুনলাম, জানলাম। কিভাবে? ভ্যান নামক এক মাতাল মদের দাম মেটাতে গিয়ে একটা নোটের গোছার সঙ্গে আমাকে মালিকের হাতে তুলে দেয়।

বিশালদেহী একটা লোক মাঝ-রাত্রে হাজির হ'ল। তার মুখের দিকে তাকালে সাধুসন্ত বলেই মনে হয়, কিন্তু চোখ দুটোর দিকে তাকালে পাহারাওয়ালা ছাড়া তার সম্বন্ধে কিছু ভাবা যায় না। সে একগোছা নোটের সঙ্গে আমাকেও বেঁধে বড়সড় একটা গোছা তৈরী করে জাল নোটের ব্যাপারীদের কাছে দিয়ে দিল যা গদি করা বলে পরিচিত।

এবার সে ব্যাঙ্কারকে বলল, পাঁচ ডলারের একটা টিকিট দাও তো। চার্লি, চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে, বুঝলে? চাঁদ ডোবার আগেই আমি বেরিয়ে যাব। সিন্দুকের ওপরের তাকে বাঁ-ঘরে খবরের কাগজে বান্ডিল করা ষাট হাজার ডলার আছে।

এবার আমাকে সযত্নে দুটো স্বর্ণ-সার্টিফিকেটের মাঝখানে রাখা হ'ল। এটা আমার পক্ষে অবশ্যই সৌভাগ্যের ব্যাপার।

একটু বাদেই স্বর্ণ-সার্টিফিকেট দুটোর একটি অন্যটিকে বলল—ওহে, কানে কম শোনো বুড়ো,

আজ তোমার বরাত খুলেছে দেখছি। নতুন কিছু আজ দেখার সৌভাগ্য হবে। আজ বুড়ো জ্যাক স্কেচ দেখাবে।

আমি আমতা আমতা করে বললাম—'ব্যাপারটা কি, একটু খোলসা করে বলুন তো শুনি?'

আমার দিকে ফিরে বিশ ডলার মুখ খুলল—জুয়ার আড্ডাটার মালিক বুড়ো জ্যাক। সে গীর্জার উন্নতিকল্পে পঞ্চাশ হাজার ডলার দেয়। কিন্তু তারা সেটা নিতে অস্বীকার করেন। ডলারগুলো জুয়াখেলার মাধ্যমে উপার্জিত বলেই তাঁরা আপত্তি জানাল।

দশ-ডলার আগ্রহ প্রকাশ করে বলল, গীর্জা? সেটা আবার কি?

হায় কপাল আমার! আমার তো খেয়ালই ছিল না যে, আমি দশ-ডলারের সঙ্গে কথা বলছি। বিশ-ডলার বলল, এসব তো তোমার না জানার কথা। দান খয়রাত করার কাজে তোমার কদর খুবই বেশী, কেনা-বেচার ব্যাপারে কম। এবার বলছি শোন, গীর্জা এমন একটা পাকা ও বড়সড় বাড়ি যেখানে সবকিছুই কেনা-বেচা হয়ে থাকে।

এতে জ্যাক-এর সমস্যার কি থাকতে পারে? শহরের বাইরে একটা রেস্তোরাঁয় বসে খানাপিনা সেরে গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে মালিককে বলল—ভাই জ্যাক, সজ্জনরা আমার ডলারগুলো নিতে রাজি হ'ল না। দেখ, যদি তোমার রেস্তোরাঁর মালপত্র কিনতে এগুলো কাজে লাগে। তাবা বলছে, নোটগুলো নাকি দাগী।

হোক না দাগী। আমার এখানে কিছুই অচল নয়। জ্যাক মুচকি হেসে বলল।

ঘড়িতে এখন রাত্রি একটা বাজে। দোকানের সামনের ঝাপ বন্ধ করে ভেতরের দরজাটা খোলামাত্র এক মেয়েমানুষ বিদ্যুৎ গতিতে ভেতরের দরজাটা দিয়ে ভেতরে ঢুকে বুড়ো জ্যাক-এর মুখোমুখি দাঁড়াল। এরকম মেয়েমানুষ আপনারা আগে বহু দেখেছিলেন—গায়ে কালো কার্ডিগান, লম্বা চুল, ছেঁড়া স্কার্ট আর ফ্যাকাসে মুখ, বিড়ালের মত ঘোলাটে এক জোড়া চোখ। সব সময় মোটর গাড়ি খোঁজে।

মেয়েমানুষটা টেবিলের নোটের গোছাটার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল।

বুড়ো জ্যাক কোন কথা না বলে নোটের গোছা থেকে আমাকে বের করল। এবার আমাকে আগন্তুক মেয়েমানুষটার হাতে গুঁজে দিতে দিতে বলল, মহাশয়া নোটটা দাগী। জুয়া খেলার সময় এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে আজ রাত্রেই পেয়েছি। তিনি যে কোথায় কার কাছ থেকে পেয়েছেন, আমার জানা নেই। এটা আপনি নিলে—

মেয়েমানুষটা কাঁপা কাঁপা হাত বাড়িয়ে আমাকে নিতে নিতে বলল, এসব নোট ছাপাখানা থেকে বেরিয়ে আসার পর হাজার হাজার নোট গুনে গোছা বেঁধেছি। আমি ট্রেজারীর এক করণিক ছিলাম। আপনি যদি শুধু জানতেন—থাক আর কিছু বলার দরকার আছে বলে আমি মনে করি না। তবে আপনাকে ধন্যবাদ জানাতেই হয়।

মেয়েমানুষটা আমাকে নিয়ে সোজা একটা রুটির দোকানে চলে গেল। আমি আবার অন্য হাতে পড়লাম। আমাকে দোকানির হাতে তুলে দিয়ে বিনিময়ে রুটি, জেলি আর কেক নিয়ে দোকান থেকে চলে গেল। আমি দোকানির ক্যাশ-বাক্সে আশ্রয় পেলাম।

এক হপ্তা পরে আমাকে একটা ডলার নোটের মুখোমুখি হতে হ'ল। তার নম্বরটা। ই ৩৫০৩৯৬৬। আমি বলে উঠলাম—এক রুটির কারখানার মালিক গত শনিবার রাত্রে এক মহিলাকে আমার বদলে যে খুচরো নোট দিয়েছিল তুমি তো তার মধ্যে ছিলে, ঠিক কিনা?

অন্য একটা নোট ভাঙিয়ে সে দুধ আর রুটি কিনল। বাড়িওয়ালাকে ভাড়া দেওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আমি তার কাছে ছিলাম, সে আমার কথার জবাবে বলল। ছোট্ট একটা ঘর, রোগা—লিকলিকে একটা সন্তান ছিল। চেহারা ছবি দেখে মনে হ'ল আধ-পেটা খেয়ে কোনরকমে সে টিকে আছে। সে তখন প্রার্থনা করল, গরীবের ক্ষুধার অন্ন যিনি দান করেন—সে এরকমই কি বলেছিল। এরকম দুঃখ-দুর্দশার কথা শুনতে শুনতে আমি ক্লান্ত। আমিও তোমাদের মত দাগী নোট বনে গিয়ে ওপরতলার মানুষের পকেটে পকেটে ঘুরতে পারতাম, বিশ্বাস কর।

আমি রীতিমত ধমকের স্বরেই বললাম, ওসব বাজে কথা। ওপর তলাটলা বলে কিছু নেই। সবই আমার দেখা আছে। এবার গলা নামিয়ে বললাম, একবারটি আমার পিঠের দিকে তাকিয়ে

দেখ তো—পড় কি লেখা আছে।

সরকারী ও ব্যক্তিগত যেকোন রকম ঋণের ব্যাপারে নোটটি উল্লিখিত অর্থের এক আইনসম্মত প্রস্তাবপত্র বিশেষ।

দাগী টাকার প্রসঙ্গে এরকম কথা শুনে শুনে আমার কানে তালা লেগে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। অসহ্য! আমি বললাম।

এ মিড সামার নাইট'স ড্রিম

নাইটরা মরে হেজে গেছে। তাদের তরবারিতে মরচে পড়েছে। যারা জীবনভর পথের ধুলোর সঙ্গে যুদ্ধ করে গেছে কেবলমাত্র সে মানুষ ক'টাই আজও বেঁচে রয়েছে।

আমার প্রিয় পাঠক—এখন গ্রীষ্মকাল চলছে। নির্মম হিংস্র দৃষ্টি মেলে সূর্যটা নিচের শহরটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। একই সঙ্গে হিংস্র হওয়া ও অনুতাপে জর্জরিত হওয়া খুবই কঠিন কাজ, সন্দেহ নেই। তাপমান? ধ্যুৎ, থার্মোমিটারের কথা ছাড়ান দাও দেখি! স্বাভাবিক তাপমানের কথা বলছি না। গরম এত বেশী যে আর বলার মত নয়। আর হবে না-ই বা কেন? সময়টা তো গ্রীষ্মকাল, ঠিক কিনা?

বস্তি অঞ্চলের গাড়ির জন্য একজন ৩৪নং সড়কে দাঁড়িয়ে। চল্লিশের কাছাকাছি তার বয়স। মাথার চুল সাদা, গায়ে সাধারণ পোশাক, চোখে-মুখে অস্বস্তির ছাপ সুস্পষ্ট।

মোটাসোটা গোলগাল চেহারার একজন লোক পথ চলতে চলতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। কিছু বলতেই সে রুমালে কপাল মুছতে মুছতে গলা ছেড়ে হাসতে লাগল। এক সময় হাসি থামিয়ে বলল, তখনকার সেই মশার নিশ্চিন্ত আবাসস্থল জলাভূমি আর এলিভেটর ছাড়া পাহাড়ের চূড়ার মত আকাশছোঁয়া বাড়ি, কোনটাই আমার দরকার নেই। অসহ্য গরমের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে যে নিউইয়র্কে পাড়ি জমাতে হবে তা আমার ভালই জানা আছে।

হ্যাঁ, নিউইয়র্কই হচ্ছে এদেশের সর্বোত্তম গ্রীষ্মাবাস। আপনারা যতই গলা ফাটিয়ে অ্যাডিরন্ জ্যাক ও কাটস্কিল্-এর সুখ্যাতি গান না কেন, একা মানহাটান জেলায় যে আরাম পাওয়া যায় দেশের অন্য সব অঞ্চলের আরাম-আনন্দ একত্র করলেও তার ধারে কাছে ঘেঁষতে পারে না। আমার মোদ্দা কথা, খাড়া পাহাড়ের শীর্ষদেশে ওঠা, লক্ষ-লক্ষ মাছির ভন্‌ভনানি শুনে ভোর চারটের সময় বিছানা ছেড়ে উঠে পড়া, আর কৌটোর খাবারে পেট ভরা, আমার পোষাবে না মশাই।

আর ছোট্ট পুরনো নিউইয়র্ক শহর, অল্প কিছু লোক, আর বাড়ির মতই সুযোগ-সুবিধা—আরাম, আমি প্রতিবছর যে বিজ্ঞাপনের গুরুত্বই দিয়ে থাকি—বুঝলেন?

সামনে অবস্থানরত লোকটার আপাদমস্তক ভাল করে নিরীক্ষণ করে নিয়ে মোটাসোটা নাদুসনুদুস লোকটা আবার মুখ খুলল, মশাই, আপনি যদি বহুদিন শহর ছেড়ে দূরে কোথাও না গিয়ে থাকেন এবং একটা ছুটি কাটাতে আগ্রহী হন তবে যে করেই হোক দু'সপ্তাহের জন্য আমার সঙ্গে চলুন। এখন রিভারকিল-এ ট্রাউট মাছের ঝাঁক এমন লাফালাফি করছে হঠাৎ করে দেখলে মনে হবে মাছিরা ঝাঁক বেঁধে উড়ে বেড়াচ্ছে। সে এক দেখার মত দৃশ্য মশাই! হার্ডি চিঠিতে লিখেছে, গত হপ্তায়ই সে নাকি তিন পাউণ্ড ওজনের একটা মাছ ধরেছে।

গালগপ্প মশাই। স্রেফ বানানো গপ্প! অন্যজন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল। আপনি অত্যুৎসাহী হলে পায়ে রবারের বুট গলিয়ে ছিপ-হাতে মাছের পিছন-পিছন ছুটে বেড়ান গে। মাছ খেতে মন চাইলে আমি একটা বাতানুকুল রেস্তোরাঁয় ঢুকে মাছ খাওয়ার সাধ পূরণ করি। একটা কথা জানেন মশাই, আপনারা গ্রামের পথে পথে ঘুরে বেড়াবার সময় যখন ভাবেন তোফা আছেন তখন আপনাদের ব্যাপার স্যাপারের জন্য আমার ভেতর থেকে ঠেলে হাসি বেরিয়ে আসে। ফাদার নিকারবোকার-এর ছোট্ট গোলাবাড়ি আর ভেতরে ছায়া-ছায়া পথটা থাকলেই আমার আর কিছু চাই না।

বন্ধুর মন্তব্য শুনে মোটাসোটা লোকটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের পথ ধরল। আর নিউইয়র্ক-প্রেমী লোকটা একটা গাড়ি ধরে অফিসের দিকে এগিয়ে চলল। পথ পাড়ি দিতে দিতে এক সময় চোখের সামনে থেকে খবরের কাগজটা ঝট করে সরিয়ে ফেলে মাথার ওপরের এক চিলতে আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

গাড়ি এগিয়ে চলল। সে অন্যমনস্কভাবে অনুচ্চস্বরে বলতে লাগল—সে কী তিন পাউণ্ড ওজনের মাছ! কিন্তু হার্ডি তো মিথ্যে কথা বলার পাত্র নন! হায়! একবারটি যেতে পারলে—কিন্তু কিছুতেই সম্ভব নয়, অন্ততঃ আরও একটা মাস পরে হলে—হ্যাঁ, এক মাস।

শহরের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে আগ্রহী লোকটি অফিসে পৌঁছে কর্তব্যকর্মে ডুবে গেল। করণিক এড্‌কিন্স একগাদা চিঠিপত্র, স্মারকলিপি আর টেলিগ্রাম তার টেবিলে রাখল।

কাজের শেষে, বিকেল পাঁচটায় সে চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে আপনমনে বলতে লাগল, হার্ডি কোন্ টোপ হিসেবে কি ব্যবহার তাই বা কে জানে? কথাটা বলেই সে চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

সেদিন মেয়েটা সাদা পোশাকে সজ্জিত হয়েই এল। তাই কম্পটন গেইন্স-এর কাছে বাজিতে হেরে গেল। মেয়েটা নীল পোশাক ব্যবহার করবে, কম্পটন বাজি ধরেছিল।

কম্পটন এক ধনকুবেরের ছেলে। তাই তার বিরুদ্ধে অবশ্যম্ভাবী একটা ব্যাপারে বাজি ধরার অভিযোগ তো তোলাই যেতে পারে।

শহরের ছোট্ট গ্রীষ্মকালীন হোটেলটায় সেদিন ভিড় জমে যায়। এক চিত্রশিল্পী ও তার স্ত্রী, তিনটে কলেজে পড়ুয়া যুবক রয়েছে একদিকে। আর অন্য দিকে রয়েছে বহু রূপসী তরুণী। কারণ, খবরের কাগজে সংবাদদাতা তাদের কথা বলতে গিয়ে 'মহিলা মহল' কথাটা ব্যবহার করেছে। তবে সে রূপসীদের মেলায় মধ্যমণি হয়ে আসর উজ্জ্বল করে অবস্থান করছে রূপ-সৌন্দর্যের আকর মেরি সেওয়েল। তার খাবারের বিল মেটাতে গিয়ে যুবকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। তবে দু'-এক সপ্তাহের জন্য যারা এসেছে কথাবার্তা আলাপ-পরিচয়ের মধ্য দিয়েই তাদের কেটে যায়। আর কম্পটন? সে পাহাড়টার মত অটল অনড়। আর তার মানিব্যাগও নোটে ঠাসা। আর গেইন্সবাসী যুবকটা রীতিমত সংগ্রামী, আর ধনকুবেরদের ছেলেদের সে তিলমাত্রও পরোয়া করে না। আর গ্রাম্য পরিবেশের প্রতি তার দুর্বলতা আছে, খুবই সত্য।

সে একদিন আলাপ জমাতে গিয়ে বলল, মিস মেরী, আপনার কি মনে হয়?

জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে মিস মেরি তার দিকে তাকাল।

সে বলে চলল, আমার পরিচিত এক হকার গ্রীষ্ম কাটানোর ব্যাপারে শহরই তার কাম্য। তার মতে বনে-জঙ্গলে দিন কাটানোর চেয়ে গ্রীষ্মে শহরের বুকে ঠাণ্ডায় দিন কাটানো যায়। লোকটা আহাম্মক ছাড়া কি, ঠিক কিনা? পয়লা জুনের পর আমি ব্রডওয়েতে স্বস্তিতে শ্বাসক্রিয়া চালাতে পারব, ভাবতেই পারি না।

মা তো বলছেন আগামী সপ্তাহ পরই 'ফিরে যাবেন।' মিস মেরি বলল।

গ্রীষ্মকালে শহরের বুকে আরাম-আয়েশ করে কাটানোর মত বহু জায়গা আছে, ঠিক কিনা? ছাদের ওপর বাগান, জানা আছে নিশ্চয়ই, এ 'ছাদের ওপর বাগান।'

হ্রদটার নীল জলবাহিত বাতাস দেহ-মনে রোমাঞ্চ জাগাতে লাগল। দূর থেকে নিচের উপত্যকাটা ছায়াছবির মত দৃষ্টিনন্দন হয়ে উঠেছে। পাহাড়ের ওপরের কোন জলপ্রপাতের কুয়াশার মত সাদা আস্তরণ গাছগাছালির সবজে আভাকে ঢেকে দিয়েছে। এখানে যৌবন আর প্রথম গ্রীষ্ম বন্ধুর মত পাশাপাশি কাছাকাছি সহাবস্থান করছে। ব্রডওয়েতে তো এসব একেবারেই অনুপস্থিত—আশাই করা যায় না।

শহরবাসীদের পাগলামি আর উচ্ছ্বাস দেখার জন্য কৌতূহলী গ্রামবাসীরা চারদিকে জমা হ'ল। রূপসী আর কদর্য সব রকম যুবক-যুবতী হাসিঠাট্টা আর রঙ্গ রসিকতায় জায়গাটা রীতিমত জমজমাট হয়ে উঠেছে।

গেইন্স-এর হাতে বিস্তর কাজ। একমাত্র সে-ই ত বিজয়ী নাইট হিসেবে রানীর মাথায় মুকুট পরাবার অধিকারী। তার হাতের কব্জিতে সাদা আর কম্পটন-এর কব্জিতে নীল পট্টি বাঁধা।

মিস মেরী নীল রংকে বেশী পছন্দ করলে আজ সে সাদা পোশাকেই নিজেকে সাজিয়ে তুলেছে।

গেইন্স মুকুট পরাবার জন্য রানীর তল্লাশ করতে লাগল। সে খুশির হাসি শুনতে পেল। সে চুপিচুপি সরে পড়তে লাগল। 'চিমনি পাহাড়' নামে পরিচিত একটা গ্রানাইটের ঢিবির ওপর উঠে সে দাঁড়াল। অন্য সবার চেয়ে পঞ্চাশ ফুট ওপরে সে শ্বেতপরীর মত অবস্থান করছে।

ব্যস, আর এক মুহূর্তও দেরি না করে সবাই চিমনি পাহাড়ে ওঠার প্রতিযোগিতায় মেতে গেল। নিছকই একটা খেলা, বাজি ধরাধরি নয়।

গেইন্স মরিয়া হয়ে পঞ্চাশ ফুট অতিক্রম করে সবার আগেই চিমনি পাহাড়ের শীর্ষদেশে উঠে গেল। সে হাতের গোলাপের মালাটা রানীর কপালে পরিয়ে দিল। গ্রীষ্মের অতিথি আর উপস্থিত গ্রামবাসীরা হাততালি দিতে দিতে বারবার উল্লাস প্রকাশ করতে লাগল।

আবেগ-মধুর কণ্ঠে মিস মেরি বলে উঠল, সত্যি তুমি এক সাহসী নাইট! সাবাস!

দেখ, যদি আমি চিরদিনের মত তোমার কাছে সাহসী নাইট হয়ে থাকতে পারতাম, তবে—

মিস মেরি খিলখিল করে হেসে ওঠায় গেইন্স-এর কথার শেষটুকু আর শোনা গেল না।

এদিকে বহু চেষ্টা করে গেইন্স-এর প্রায় এক মিনিট পরে কম্পটন চিমনি পাহাড়টার মাথায় উঠল।

তারা গাড়িতে চেপে হোটেলে ফেরার সময় প্রকৃতির কোলে ধীরে ধীরে অত্যাশ্চর্য, একেবারে অবিশ্বাস্য এক গোধূলি নেমে আসতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সন্ধ্যার অন্ধকার উপত্যকাটাকে ছেয়ে ফেলল। পাহাড়ের মাথায় তারার মেলা, ম্লান আভায় সেটা মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

এডকিন্স মোলায়েম স্বরে বলে উঠল—'মিঃ গেইন্স, ক্ষমা করবেন।'

নিউইয়র্ক শহরকে যে লোকটা পৃথিবীর অন্যতম গ্রীষ্মাবাস জ্ঞান করে সে চোখ মেলে তাকিয়ে চোখের মণি দুটোকে একবারটি বুলিয়ে নিয়ে বলল—আমি কি তবে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম? হ্যাঁ, সেরকমই তো মনে হচ্ছে।

ও কিছু নয়। গরমের জন্য এরকমটা হয়েছে। ক'দিন ধরে শহরে ভয়ানক গরম পড়েছে, গুমোট গরম। এড্‌কিন্স বলল।

অন্য লোকটা বলল, ধুৎ! একেবারে বাজে কথা। গ্রীষ্মে এ শহরটা ১০—১ গোলে গ্রামকে হারিয়ে দেয়, মানে কি? আহাম্মকরাই গ্রামে গিয়ে খাল-বিলের কাদা সেঁটে চুনো পুঁটি ধরায় মেতে ওঠে। আমি তো শহরে থেকে আরাম আয়েশের মধ্যে দিন কাটানোকেই বেশি পছন্দ করি।

এইমাত্র ক'টা চিঠি এসেছে। ভেবেছিলাম, অফিস থেকে বেরোবার আগে সেগুলো একবার পড়ে দেখবেন। এড্‌কিন্স আমতা আমতা করে বলল।

চিঠির গোছার ভেতর থেকে একটা চিঠির কিছু অংশ পড়েই দেখা যাক না—'আমার আদর সোহাগের স্বামী-দেবতা, এইমাত্রই তোমার চিঠি হাতে পড়েছে। তোমার আদেশ, আমরা যেন আরও একটা মাস এখানে কাটিয়ে যাই। রিটা-র সর্দিকাশির উপশম প্রায় হয়েই গেছে। জনি একটা ইন্ডিয়ান শিশুর মত প্রায় জঙ্গলী হয়ে উঠেছে। তোমাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হচ্ছে, জানি, কাজের ঝামেলার জন্য আমাদের আর বেশীদিন এখানে রাখতে পারছ না। তুমি নিতান্তই একজন সজ্জন...সর্বদা এমন ভাব কর যেন গ্রীষ্মে শহরে থাকাই সবচেয়ে বেশী পছন্দ কর। ট্রাউট মাছ ধরা তো তোমার ভাললাগা কাজগুলোর অন্যতম ছিল...আমাদের সবার সুখের তাগিদে... বাচ্চাকাচ্চাদের তুমি পছন্দ না করলেও আমরা তোমার কাছেই যাব—চিমনি পাহাড়ের যে জায়গায় তুমি আমাকে গোলাপের মালাটা পরিয়ে দিয়েছিলে গত সন্ধ্যায় আমি সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম...পনের বছর আগে তুমি বলেছিলে আমার সত্যিকারের নাইট হবে তুমি-ই...প্রিয়তম আমার ভাবতে পার...পনের বছর আগে! হ্যাঁ, তুমি...তুমিই চিরকালের মত আমার নাইট আছ...থাকবেও চিরদিন। তোমার আদরের মেরি।

যার বিশ্বাস, নিউইয়র্ক-ই দেশের শ্রেষ্ঠতম গ্রীষ্মবাসা সে লোকটাই বাড়ি ফেরার সময় একটা

কাফের পাখার তলায় বসে এক পেয়ালা বীয়ার পান করতে করতে স্বগতোক্তি করল, হার্ডি টোপ হিসেবে কি ব্যবহার করে তাই বা কে জানে?'

দ্য গিল্টি পার্টি

জানলার গায়ে দোলনা চেয়ারে বসে একটা লোক দোলা খাচ্ছে। তার মাথার চুলগুলি লালচে. মুখভর্তি খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, পোশাক—আশাক ময়লা তেল চিটচিটে। কোটের পকেট থেকে পাইপটা বের করে তাতে অগ্নি সংযোগ করল। পর-পর কয়েকটা টান দিয়ে এক গাল ধোঁয়া হাল্কা বাতাসে ছেড়ে দিয়ে সান্ধ্য পত্রিকাটা হাতে তুলে নিয়ে অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে হেড লাইনগুলোতে চোখ বুলাতে লাগল। তারপর বিস্তারিত বিবরণগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়বে।

পাশের ঘরে এক মহিলা বাত্রের খাবার বানাতে ব্যস্ত। ফুটন্ত কফি আর শুয়োরের মাংসের তীব্র গন্ধের সঙ্গে পাইপের ধোঁয়ার উৎকট গন্ধের ভীষণ লড়াই চলছে।

বাড়ির বাইরে পূর্বদিকের জনবহুল পথে সন্ধ্যার অন্ধকার নামতে না নামতেই শয়তান সদলবলে হাজির হয়। একদল ছেলেমেয়ে কেউ ছেঁড়া ও ময়লা জামাকাপড়, কেউ সাদা ফিতেওয়ালা সাদা ও পরিষ্কার পোশাক গায়ে দিয়েছে। তাদের কেউ সভ্যভব্য মানুষের মত আবার কেউ বা বাজপাখির ছানার মত অস্থিরচিত্ত আর বখাটে। আর অন্যান্যদের আচরণে তার পিলে চমকে উঠছে—কেউ বাছা-বাছা কাঁচা খিস্তি দিচ্ছে, কেউ বা তা শুনে কানে হাত দুটো চেপে ধরলেও অনায়াসেই খিস্তিগুলো আয়ত্ত করে নিতে পারছে। তাদের দিকে চোখ পড়লেই মনে হয় ছেলেমেয়েগুলো নরকের শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে নরক গুলজার করতে বদ্ধপরিকর। তাদের মাথার ওপর দিয়ে বড়সড় একটা পাখি ডানাদুটো ছড়িয়ে দিয়ে অনবরত চক্কর মেরে চলেছে। ক্রাইস্ট স্ট্রীটের অধিবাসীরা তার নাম দিয়েছে 'শকুন' আর রসজ্ঞরা তাকে 'বড় বক' নামে সম্বোধন করে।

এমন সময় খবরের কাগজ হাতে লোকটার কাছে বারো বছরের এক কিশোরী এসে দাঁড়াল। আবেগের সঙ্গে বলল, বাবা তুমি খুব শান্তি বোধ না করলে আমি তোমার সঙ্গে একদান চেকার খেলতে চাই, খেলবে?

চোখের সামনে থেকে খবরের কাগজটা সরিয়ে খোঁচা-খোঁচা দাড়িওয়ালা লোকটা কপালের চামড়ায় ভাঁজ এঁকে তার দিকে তাকাল। মুচকি হেসে বলল, 'চেকার? না, এখন আর চেকার খেলার মত সময় নেই। সারাটা দিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পর বাড়ি গিয়েও একটু স্বস্তিতে বসতে পারব না? তুমি তো গলিতে অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলতে পার।'

মহিলাটি রান্না ফেলে খুন্তি হাতে ছুটে এসে দরজায় দাঁড়িয়ে বেশ কর্কশ স্বরেই বলল, লিজি রাস্তার বখাটে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলাধূলা করুক এটা আমার ইচ্ছে নয়। তারা অনেক কিছু এরই মধ্যে রপ্ত করে ফেলেছে যা তাদের পক্ষে অবশ্যই ভাল নয়। লিজ তো সারাটা দিন বাড়িতেই কাটায়। তোমার নিজেরই উচিত একে একটু সঙ্গদান করা।

লিজি তো বড়দের সঙ্গে না হোক তার সমবয়সীদের সঙ্গেও খেলাধূলা করতে পারে। এতে সে আনন্দ বেশীই পাবে। যাকগে, এসব ব্যাপার নিয়ে আমাকে উত্তক্ত কোরো না, বলে রাখছি।

কিড মুলালী চোখে-মুখে বিরক্তির ছাপ এঁকে বলে উঠল—তুমি আবার ঝামেলা বাধাচ্ছ দেখছি। আমার সাফ কথা শুনে রাখ, টাকা যতই লাগুক না কেন, আমি অ্যানিকে নিয়ে নাচের আসরে যাব-ই যাব।

বার্ক কিড মুলালীর যাবতীয় পরামর্শদাতা। তার কথা কিড মুলালী বেদবাক্যের মত মেনে চলে। সে আবারও বলল, কিড, আমার কথা শোন, মেয়েটার সংসর্গ থেকে দূরে সরে আস। না হলে

ফ্যাসাদে পড়বে, মনে রেখো। তোমার মেয়ে লিজ-এর সর্বনাশ করতে চাইছ? লিজ তোমাকে নিজের প্রাণের চেয়েও ভালবাসে যা সচরাচর দেখা যায় না। একদল অ্যানি-র চেয়ে যে লিজ-এর অনেক, অনেক বেশী গুরুত্ব বুঝতে পারছ না?

আমি অ্যানির প্রতি আসক্ত যদি ভেবে থাক খুবই ভুল করবে। কিন্তু লিজকে উচিত শিক্ষা আমি দেবই। তার বিশ্বাস, আমি তার কেনা বান্দা। সে চারদিকে চাউর করে দিয়েছে, অন্য কোন মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা তো দূরের ব্যাপার, কথা বলার মত হিম্মতও আমার নেই। এখন সে নেশার মাত্রাটা বড্ড বাড়িয়ে দিয়েছে। তাই এমন সব কথা তার মুখে শোনা যায় যে কোন মেয়ের পক্ষে উচ্চারণ করা উচিত নয়।

তোমরা কি তবে বিয়ে করতে চলেছ?

অবশ্যই। আগামী বছরই বিয়ের পাট চুকিয়ে ফেলব।

বিয়ারের প্রথম পেয়ালাটা তুমিই কিন্তু তার মুখে তুলে দিয়েছিলে, আমি নিজের চোখে দেখেছি। বার্ক বলল। ঘটনাটা দু'বছর আগে ঘটেছিল। তখন সে ডিনার সেরে তোমার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য খালি পায়ে ক্রাইস্টির মোড়ে চলে আসত, ঠিক কিনা? সে তখন শান্ত স্বভাবা এক ভদ্র মেয়ে ছিল। কিছু বলতে গেলে তার দু'গালে রক্তিম ছোপ ফুটে উঠত।

তাকে কথাটা শষ করতে না দিয়েই কিড বলে উঠল, আর এখন? এখন তার মুখেই কথার ফুলঝুরি। ঈর্ষাকে আমি অন্তর থেকে ঘেন্না করি। তাই তো অ্যানিকে নিয়ে নাচের আসরে যাচ্ছি। উচিত শিক্ষা, লিজকে আমি উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব।

বহুত আচ্ছা। তবে একটু সতর্ক থেকো, বলে রাখছি। লিজ যদি আমার অন্তরঙ্গ হ'ত আর আমি অ্যানিকে নিয়ে গোপনে নাচের আসরে যেতাম তবে আমার জামার তলায় অবশ্যই বর্ম ব্যবহার করতাম, বুঝলে?

লিজ বড় বক-শকুনির মধ্যে বেপরোয়াভাবে ঘোরাঘুরি করে। কালো চোখের মণি দুটো মেলে পথচারীদের দিকে এমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায়, গুনগুন করে গানের কলি আওড়ায়, আর এমন খিস্তি খেউর উচ্চারণ করে যা পূর্বাঞ্চলের মানুষ ইংরেজি ভাষায় সম্প্রতি ব্যবহার করতে শুরু করেছে।

লিজ সবুজ সিল্কের একটা চমৎকার স্কার্ট পরেছে। কোমরে বেঁধেছে গোলাপী আর বাদামী রঙের একটা চৌকো চাদর। আঙুলে পরেছে নকল চুনির ক'টা আংটি। গলার হারের লকেটটা কোমর ছাড়িয়ে নেমে গেছে। টুপিটা জীর্ণ। হিলতোলা জুতো জোড়াতে বহুদিন কালির ছোপ পড়েনি।

ব্লু জে কাফের একটা টেবিলে বসতেই পরিচারক টমি এগিয়ে এল। লিজ হুইস্কি চাইল। আর বলে দিল তার সঙ্গে যেন কিছু পরিমাণ সেন্টজার মিশিয়ে দেয়।

টমি পিছন ফেরার চেষ্টা করলে লিজ বলল, টমি, আজ কিড এখানে এসেছিল?

না, আজ তো তাঁকে দেখিনি।

লিজ হাতের পেয়ালাটাকে ঠোঁটের দিকে এগিয়ে নিতে নিতে বলল—আমি তারই খোঁজ করছি। শুনতে পেলাম, সে নাকি 'কার্লসন'কে সঙ্গে করে নাচের আসরে যাচ্ছে। যাক গে। গোলাপি চোখওয়ালা সাদা ইঁদুর! তারই খোঁজে আমি ছুটে বেড়াচ্ছি।

মুহূর্তকাল নীরবে কাটিয়ে চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লিজ আবার বলতে শুরু করল, টমি, তুমি বহুদিন ধরেই আমাকে দেখছ, চেনও ভালভাবেই। দু' বছর আগেই কিড-এর সঙ্গে আমার বিয়ের পাকা কথা হয়ে গেছে। এই যে আংটিটা দেখছ, পাঁচ শ' ডলার দাম। সে-ই দামটা বলেছে।

হতচ্ছাড়িটাকে নাচের আসরে নিয়ে যেতে চায় যাক। আমি তার ফুসফুসটাকে দু' টুকরো করে ছাড়ব। টমি, কিড এখানে এলে তাকে সব কথা বোলো।

মিস লিজ, আমি হলে এসব গুজবকে মোটেই পাত্তা দিতাম না। পরিবেশনকারী টমি বলল। কিড মুলার্নী আপনাকে মানে আপনার মত মেয়েকে কিছুতেই ছেড়ে দেবার পাত্র নন।

মদের ঘোরে লিজ-এর মনটা যেন একটু ভিজে গেল। সে মদের পেয়ালাটাকে ঠোঁটের কাছ থেকে নামিয়ে এনে বলল, দু'দুটো বছর। বাড়িতে কোন কাজ না থাকায় সারাটা সন্ধ্যা গলিতেই

খেলায় মেতে থাকতাম। বহুদিন পর্যন্ত আমি দরজার কাছের সিঁড়িটায় ঠায় বসে কাটাতাম। এক সন্ধ্যায় কিড এসে আমাদের দরজায় দাঁড়াল। অল্পেতেই আমার মনকে জয় করে ফেলল। তার কথা রাখতে গিয়েই আমি মদের গ্লাস হাতে তুলে নিয়েছিলাম। বাড়ি ফিরে রাতভর কেঁদে কাটালাম। সে জন্য আমাকে মারও খেতে হ'ল খুবই। আর আজ? টমি, তুমি অ্যানি কার্লসনকে দেখেছ, বল তো?

আর আমি? আমি কিনা হন্যে হয়ে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। শোন টমি, কিড এখানে এলে খোলসা করে সব কিছু বলবে। তার ফুসফুসটা আমি টুকরো টুকরো করে ছাড়ব। কথাটা বলতে বলতে সে টলতে টলতে এভিনিউ দিয়ে অগ্রসর হতে লাগল।

একটা পাকা ভাড়াবাড়ির সিঁড়িতে বসে কোঁকড়া চুলওয়ালা ছোট্ট একটা মেয়ে একটা দড়ির গিট খোলার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। লিজ মুচকি হেসে তার পাশে বসল।

লিজ তার সবুজ সিল্কের স্কার্টটাকে ধুলোবালি মাখা জুতোর ফাঁকে ঢোকাতে ঢোকাতে বলল, আমার কাছে এসো, বিড়ালের দোলনা বানানোর কায়দা তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি।

তখনই 'স্মল আওয়ার্স সোস্যাল ক্লাব'-এর বিশাল হল ঘরটার আলোগুলো জ্বলে উঠল। এটা পাক্ষিক নাচের আসর বলে সদস্যদের মধ্যে সাজপোশাকের ব্যাপারে রীতিমত তৎপরতা দেখা গেল।

সভাপতি কিড মুলালী ন'টায় এক মহিলাকে সঙ্গে করে হলঘরে প্রবেশ করল।

হলঘরের দর্শকদের মধ্য থেকে সবুজ স্কার্টপরা একটা মেয়ে—লিজ। সে চিৎকার করে উঠল না, কাঁপলও না এতটুকু। সে কিড-এর শপথ বাক্যটা তারই কণ্ঠস্বর নকল করে, তারই ভঙ্গীতে উচ্চারণ করল।

নাচের আসর ভাঙল। সদস্যরা এক এক করে বিদায় নিতে লাগল। মিনিট কয়েকের মধ্যেই এতবড় ঘরটা ফাঁকা হয়ে গেল। আর লিজ? সে পরিচারকের কাছে গর্বের সঙ্গে ছুরি চালাবার বিবরণ বলতে লাগল।

লিজ-এর মাথায় আত্মরক্ষার আদিম প্রেরণা চাঙ্গা হয়ে উঠল। সে একদৌড়ে হলঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রাস্তা দিয়ে সে উল্কার বেগে ছুটে চলল।

ব্যস, এবারই বিশাল শহরটার সবচেয়ে লজ্জার ঘটনা, চরমতম কলঙ্কের কাহিনী—আরম্ভ হয়ে গেল বিরাট হৈ হট্টগোল। বড় বড় শহর ছাড়া এরকম জঘন্যতম ঘটনা অন্য কোথাও লক্ষিত হয় না। আর এ শহরের বুকে ব্যাপারটা সবচেয়ে বেশী করে নজরে পড়ে। যারা সভ্যতা, সংস্কৃতি আর সুনাগরিকতার দম্ভ করে তারাই সবচেয়ে বেশী নোংরামী করে।

সবাই দলবেঁধে তার পিছন পিছন ছুটতে লাগল। মা, বাবা, যুবক-যুবতী, কুমারী, প্রেমিক-প্রেমিকা আর তরুণ-তরুণী কেউ-ই বাদ গেল না। সবাই এমন হম্বিতম্বি জুড়ে দিল যেন রক্তের স্রোত বইয়ে ছাড়বে। এর চেয়ে একটা নেকড়ে সামনে পড়াও অনেক ভাল ছিল।

লিজ-এর বুকের ভেতরে ধুকপুকানি শুরু হয়ে গেল। ক্ষিদে-তেষ্টায় কাতর, তার ওপর ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত হয়ে লিজ একটা ছোট জাহাজঘাটায় এল। সে থামল না। উদ্ভ্রান্তের মত ছুটতে ছুটতে ঈস্ট নদীর জলে আশ্রয় নিল।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ল্যাঠা চুকে গেল। সব শেষ।

মানুষ এক-এক সময় এমন বহু স্বপ্ন দেখে যা রীতিমত মজার ব্যাপার। কবিদের ভাষায় এটা কাল্পনিক দৃশ্য নামে আখ্যাত হয়ে থাকে। এরকম দৃশ্যই কবিদের ছন্দহীন কাব্যের স্বপ্ন। স্বপ্ন-স্বপ্নই বটে। কাহিনীটার অবশিষ্ট অংশটা আমি স্বপ্নে দেখতে পেয়েছি।

আমার বিশ্বাস, আমি যেন অন্যলোকের যাত্রী, আমি যে কিভাবে সেখানে পৌঁছেছি তা আমার জানা নেই। তবে আমি যে সেখানে গিয়েছি এটা অবশ্যই মিথ্যা নয়। আদালতের বাইরে মানুষের মেলা বসে গেছে। কেবল মাথা আর মাথা নজরে পড়ছে।

আদালত-কক্ষে বিচার চলছে। আদালতের এক অপরূপা মহিলা-কর্মী এক সময় গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠল— '৯৯,৯৫২,৭৪৩ নং মামলা।'

মহিলা-কর্মীটি বার-দুই চেঁচিয়ে মামলার নম্বরটা বলতেই সাদা পোশাক পরিহিত একজন বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তার পোশাকটা প্রচারকদের। একে-ওকে কনুইয়ের গুঁতো লাগিয়ে সে সামনের দিকে এগোতে লাগল। একজনকে হাত ধরে টানতে টানতে চলেছে। অবাক হবার মত ব্যাপারই বটে। সে লিজকে টেনে নিয়ে চলেছে।

আদালতের মহিলা-কর্মীটা তাকে ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়েই দড়াম্ করে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

একজন কর্মরত পুলিশ অফিসারকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—'মশাই, ব্যাপারটা কি, বলতে পারেন?'

তিনি আঙুলগুলো জুড়ে চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'বড়ই মর্মান্তিক ব্যাপার। মেয়েটা নামতে নামতে একেবারে নরকের দক্ষিণ দরজায় পৌঁছে গিয়েছে। আমার নাম রেভারেন্ড জোন্স, বিশেষ অফিসার। মামলাটা আসলে আমার আদালতেই এসেছিল। মেয়েটা তার প্রেমিককে হত্যা—খুন করেছে। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কোন উকিল নিযুক্ত করেনি। আদালতে পেশ করা আমার রিপোর্টে ঘটনাটার বিস্তারিত আলোচনা করা আছে। আর নির্ভরযোগ্য সঙ্গীদের দ্বারা সবকিছু সমর্থিত ও প্রমাণিত হয়েছে। পাপের শেষ পরিণতি মৃত্যু। ঈশ্বরের জয় হোক।

একটু বাদেই দরজাটা খুলে গেল। কোর্ট-অফিসার কাঁটামারা বুটে গুরুগম্ভীর আওয়াজ তুলে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন।

পুলিশ-অফিসার রেভারেন্ড জোন্স পকেট থেকে রুমাল বের করে ভিজে ওঠা চোখের পাতাগুলি মুছতে লাগলেন। কান্নাভেজা কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন—অদৃষ্ট বিড়ম্বিতা মেয়েটা। আজ অবধি যতগুলো মর্মান্তিক দুঃখজনক মামলা নিয়ে আমি কাজ করেছি এটা তাদের মধ্যে অন্যতম—এর চেয়ে বেশী কিছু থাকলে এটা ঠিক তা-ই।

আরে ভাই খালাস পেয়ে গিয়েছিল। তোমাকে যে পুট-পাই-এ পাঠানো হবে আশা করি জানই। দক্ষিণ সমুদ্র দ্বীপপুঞ্জে প্রচার-বাহিনীর কাজ করতে পাঠালে, তোমার কেমন লাগবে, বল তো? মুখে কুলুপ এঁটে দিলে যে—কিছু তো বল? যাক গে, যে কথা বলতে চাইছি, মন দিয়ে শোন—ভাল চাও তো এমন অকারণে, মিথ্যা গ্রেফতারের নেশাটা তোমাকে ছাড়তে হবে। তা যদি না-ই পার তবে পাণ্ডববর্জিত এমন জায়গায় তোমাকে বদলি করব, কেঁদে কুল পাবে না।

এবার কি বলছি ধৈর্য ধরে শোন—এ মামলার জন্য যে আসামীকে ধরতে হবে তার মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পোশাক-আশাক ময়লা—তেলচিটে পড়া। আর মোজা পায়ে দিয়ে জানালার ধারে বসে খবরের কাগজ পড়ে, বুঝলে? আর তার ছেলেমেয়েরা গলিতে খেলা করে। ব্যস, আর কিছু বলার নেই। এবার তাকে ধরার চেষ্টায় লেগে পড়।

একটা কথা বলছি, এটাকে কি অর্থহীন স্বপ্ন বলা চলে?

দ্য লস্ট ব্লেন্ড

বারগুলো গীর্জার পুরোহিতদের আশীর্বাদলব্ধ এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের রাতের খাবার রঙিন জল, ককটেল দিয়ে শুরু করা হয় বলে এক্ষেত্রে সেলুনের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে।

এমন বহু রেস্তোরাঁর উল্লেখ দেখা যায় যেখানে একটা গর্তের মধ্যে একটা ডাইস গলিয়ে দিলেই শুকনো একটা মার্টিনি অন্য একটা গর্তের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। সাফ কথা, আমার এসব কথা ইচ্ছা করলে শুনতে পারেন, মন না চাইলে শুনতে না-ও পারেন।

কনল্যাস্ট্রি কেনিলি রেস্তোরাঁর এক কর্মী। আমরা পকেট বোঝাই করে রেস্তোরাঁয় যাই পকেট ফাঁকা করে ব্যাজার মুখে বেরিয়ে আসি। আর কেনিলি? খুশিতে তার বুকের ভেতরে রীতিমত জোয়ার বইতে থাকে। হাসিমাখা মুখে আমাদের ডলার—ডাইসগুলোকে পকেটে চালান দেয়।

বরাত ভাল বা মন্দ যা-ই বলা হোক না কেন, ছোট্ট একটা জায়গায় সেলুনটা অবস্থিত। সমাজের নিচু তলার, খেটে-খাওয়া মানুষই সেখানে যাতায়াত করে। আর জনাকয়েক ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলে প্রকৃতির মানুষও সে পথে দেখা যায়।

রেস্তোরাঁর ওপর তলায় কেনিলি সপরিবারে থাকে। আর তার মেয়ে ক্যাথারিন? হরিণের মত টানাটানা তার চোখ দুটো। না, তার কথা তোমাকে বলব কেন? এলিজা বা জেরাল্ডিন'কে নিয়েই সন্তুষ্ট থাক না কেন বাপু। কেনিলি তাকে নিয়ে বহু স্বপ্ন দেখে। সে যখন রাতের খাবার টেবিলে পরিবেশনের জন্য বিয়ারের কুঁজোটা নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ধীর মন্থর গতিতে নেমে এসে সুরেলা কণ্ঠে ডাক দেয় তখন কেনিলি-র বুকের ভেতরে যেন সমুদ্রের জোয়ার বইতে থাকে—খুশির জোয়ার। আপনি যখন পকেট হাতড়ে শেষ সিলিংটা বের করে কাউন্টারে এগিয়ে দেন তখন তাদের পরিবেশক সেটাকে লুফে নেবে। আর আপনি? মালিকের মেয়েকে বিয়ে করে সুখে দিন কাটাবেন।

কেনিলি-র ব্যাপারটা কিন্তু সে রকম নয়। মেয়েদের মুখোমুখি হলেই তার মুখে যেন কলুপ এঁটে যায়, চোখ-মুখ রাঙা হয়ে আসে। অতএব ক্যাথারিন-এর মুখোমুখি হলে তার হাল কেমন হয় তা তো অনুমান করাই যাচ্ছে! মুখ বন্ধ করে অনবরত থরথরিয়ে কাঁপতে থাকে। প্রেয়সীর সামনে পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল নিথর নির্বাক এক প্রেমিক যেন দাঁড়িয়ে।

ম্যাককার্ক ও রিলে নামে দু'জন লোক কেনিলি-র দোকানে এসে তার সঙ্গে বাক্যালাপ করল। তার ঘরের পিছন দিককার একটা ঘর ভাড়া নিল। সাইফোন, শিশি, বোতল ও ওষুধ মাপার জিনিসে ঘর বোঝাই করে ফেলল। একটা সেলুনে যা কিছু থাকা দরকার সবই তার ঘরে রয়েছে। তারা ভুলেও কোন পানীয় ঠোঁটে ছোঁয়াল না। মদের সঙ্গে কি যেন সব জিনিস মিশিয়ে বিভিন্ন পাঁচন তৈরীর কাজে সর্বক্ষণ মেতে থাকে। দেখে মনে হ'ল তাদের কাজকর্ম সম্বন্ধে রিলে-র অভিজ্ঞতাই বেশী।

রিলে কাগজে মাথা গুঁজে অঙ্ক কষতে থাকে। গ্যালনকে আউন্সে এবং কোয়ার্টকে ড্রামে পরিণত করতে সে সর্বক্ষণ কাগজ কলম নিয়ে মেতে থাকে।

আর ম্যাকমার্ক? সে বিষণ্নমনে মদ আর অন্য সব বস্তু ঢালা-ঢালির কাজ নিয়ে মেতে থাকে। কাজে কোন ভুলচুক হলে সেগুলি নালা দিয়ে বাইরে চালান দিতে দিতে ফ্যাসফেঁসে গলায় বিড়বিড়িয়ে খিস্তি-খেউড় দিতে থাকে। তারা এমন একনিষ্ঠ ভাবে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে একটা রহস্যময় মিশ্রণ তৈরীর কাজে লিপ্ত থাকে যা দেখলে স্পষ্টই মনে হয় যেন দুটো রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণে সোনা তৈরীর কাজে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সত্যি তাদের কাজকর্ম দেখলে এ ছাড়া অন্য কিছু ভাবাই যায় না।

এক সন্ধ্যায় কেনিলি দোকানের কাজের ফাঁকে হাঁটতে হাঁটতে তার পিছনের ঘরটায় হাজির হ'ল। তার কাছে ব্যাপারটা রহস্যময়ই মনে হল। লোক দুটো প্রতিদিন তার রেস্তোরাঁয় যায়, মদ পান করে না। অথচ মদ কিনে নিয়ে যায়। তা থেকে কিছুটা ঘরে বসে পান করে আর অবশিষ্টটুকু গবেষণার কাজে লাগায়।

একটু বাদেই পিছনের দরজা দিয়ে মুখে হাসির ছোপ ফুটিয়ে তুলে ক্যাথারিন ঢুকে কেনিলি'কে লক্ষ্য করে বলল, আজকের খবরটা জানতে এলাম।

কেনিলি দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপা-কাঁপা সলজ্জ স্বরে কোনরকমে উচ্চারণ করল—' আজ বৃষ্টি হবে বলেই তো মনে হচ্ছে।

বৃষ্টি? বৃষ্টি হওয়া খুবই দরকার। কারণ, জলের জন্য মানুষ হাহাকার করছে, তাই না? ক্যাথারিন স্বাভাবিক কণ্ঠেই কথাটা ছুঁড়ে দিল।

আর পিছনের ঘরে ম্যাক্‌কার্ক ও রিলে তাদের অদ্ভুত রাসায়নিক সামগ্রী নিয়ে অত্যাশ্চর্য মিশ্রণ তৈরীর কাজে অমানুষিক পরিশ্রমে লিপ্ত। রিলি তার ফর্মূলা অনুযায়ী পঞ্চাশ বোতল মদ বড়সড় একটা পাত্রে রেখে হরদম ঝাঁকিয়ে চলেছে। সেটাকে অন্য একটা পিপাতে ম্যাক্‌কার্ক ঢেলে রাখছে। রিলি আবার একই কাজে মাতছে।

কাজের ফাঁকে রিলে বলল, তোমাকে সব কথা খোলসা করে বলছি। গত গ্রীষ্মে টিম আর আমি আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিলাম, নিকারাগুয়ার মত কোন দেশে একটা মার্কিন বার চালু করলে দু'হাতে ডলার রোজগার করা যাবে। উপকূলবর্তী শহরগুলোতে পানীয় বলতে কেবলমাত্র রাম আর খাদ্যবস্তু কুইনাইন। ব্যস, আর কিছুই মেলে না। স্থানীয় অধিবাসী ও বহিরাগতরা রাত্রে কাঁপতে কাঁপতে বিছানা নেয় আর সকালে যখন বিছানা ছাড়ে তখন গায়ে থাকে প্রচণ্ড জ্বর। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে এসব উপাদানে তৈরী পানীয়ই সর্বোৎকৃষ্ট দাওয়াই। দু'হাতে ডলার কামানোর একমাত্র উপায়ই হচ্ছে আমাদের আবিষ্কৃত মিশ্রণটা নিয়ে হাজির হওয়া।

এরকম সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা স্টিমার যোগে নিউইয়র্ক শহরে একটা বার চালাবার উপযোগী মালপত্র নিয়ে সান্টাপালাম-এর উদ্দেশে যাত্রা করলাম।

গন্তব্যস্থলে পৌঁছবার আগেই স্টিমারে নায়েব আর কাপ্তেনের সঙ্গে সেভেন-আপ খেলতে খেলতে মদ খাওয়া রপ্ত করে ফেললাম। এক সময় কাপ্তেন আমাদের নিয়ে কম্পাস বাক্সটার আড়ালে গেলেন। একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বললেন, 'শোন, তোমাদের বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, গত মাসে নিকারাগুয়ায় যাবতীয় মদের বোতলের ওপর মূল্যের হিসেবে আটচল্লিশ শতাংশ শুল্ক ধার্য করা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট নিজেই সিনসিনাটি নামক মাথার তেলের পরিবর্তে এক শিশি চাটনি কিনে ফেলেন। তাকেও এ কর না দিয়ে পারেন নি। তবে মদের পিপে বিক্রি করলে এ কর দিতে হয় না।

আমরা সমস্বরে বলে ওঠলাম, ব্যাপারটা খুবই দুঃখজনক, এমন গুরুত্বপূর্ণ কথা আপনি আগে বললেন না!

ব্যস, আর দেরি না করে আমরা কাপ্তেনের কাছ থেকে বিয়াল্লিশ গ্যালনের দুটো মদের পিপে খরিদ করে ফেললাম। আর আমাদের সঙ্গের সবগুলো বোতলের মদ দুটো বড় বড় পিপেতে ঢেলে নিলাম।

আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলাম—কী সর্বনাশটাই না ঘটতে চলেছিল। শতকরা আটচল্লিশের ব্যাপারটা আমাদের সর্বনাশের চূড়ান্ত করে ছাড়ত। ব্যাপারটা হ'ল বোতল বোতল মদ ফেলে না দিয়ে আমরা বারোশ' ডলার মূল্যের ককটেল তৈরীর সুযোগ করে নিলাম।

আমরা পিপেগুলোকে জাহাজ থেকে নামালাম। তাদের মধ্যে একটার মুখ খুলে ফেললাম। একটা হৃদয়বিদারক দৃশ্য চোখে পড়ল। পিপেটার ভেতরের মদের কথা বলতে চাইছি। তার রঙটা বিদঘুটে, ঠিক যেন মটরশুঁটির ঝোল। আর স্বাদ? বুকের ব্যথায় কফির পরিবর্তে যে তরল পান করতে দেওয়া হয় অবিকল সেরকম। পিপেটা থেকে একটু তরল পদার্থ ঢেলে এক নিগ্রোকে খেতে দিলাম। ব্যস, সে একটা নারকেল গাছের তলায় শরীর এলিয়ে দিয়ে তিন-তিনটে দিন অনবরত শক্ত মাটিতে পা আছড়াতে লাগল।

আর অন্য পিপেটা, তাই না? সেটার বিবরণ দেবার আগে আপনাকে একটা প্রশ্ন করছি, খড়ের টুপি মাথায় চাপিয়ে আপনি কি কখনও আটলক্ষ ডলার পকেটে নিয়ে, আর এক রূপসী যুবতীকে কোলে বসিয়ে বেলুনে চেপে আকাশ-ভ্রমণ করেছেন? হ্যাঁ, যে কথা বলতে চাইছি, সে পিপেটার এক ফোঁটা পাকস্থলিতে পড়লে আপনার অবস্থাও অবিকল সেরকমই হবে। আর দু'আঙুল

পরিমাণ যদি উদরস্থ করেন তবে দু'হাতে মুখ ঢেকে আপনি বিলাপ পেড়ে কান্না জুড়ে দেবেন।

ঠিকই বলছি মশাই, দ্বিতীয় পিপেটার তরল পদার্থটা হচ্ছে যুদ্ধ, অর্থ আর সুখী জীবনের এক অভাবনীয় সোমরস। আর রং? সোনার মত ঝকঝকে চকচকে এবং কাচের মত স্বচ্ছ। আমি হলফ করে বলতে পারি হাজার বছরের মধ্যেও এরকম মদ আপনি পাবেন না।

এবার শুনুন আমাদের পরবর্তী কর্মকাণ্ডের কথা বলছি। আমরা সে বস্তু নিয়েই কারবারে মেতে গেলাম। আশ্চর্য ব্যাপার! তা দিয়েই আমরা বাজিমাৎ করে দিলাম। সে দেশের জাদরেল মানুষগুলো সামান্য একটু মালের প্রত্যাশায় কাক-ডাকা ভোর থেকেই আমাদের মদের দোকানের সামনে ভিড় জমাতে লাগলেন। আর কিছুদিন যদি কারবারটা চালিয়ে যেতে পারতাম তবে দেশটা পৃথিবীর মধ্যে শীর্ষ স্থানীয় হয়ে উঠত। আর মূল্য, গোড়ার দিকে এক পাত্র মদের দাম ধরা হয়েছিল পঞ্চাশ সেন্ট রৌপ্য মুদ্রা। প্রথম গ্যালনটা এ দামেই বিক্রি করলাম আর শেষ গ্যালনটা বিক্রি করলাম এক চুমুকের দাম পাঁচ ডলার হিসেবে। সে কী অত্যাশ্চর্য বস্তু। দু'-চার ফোঁটা পাকস্থলিতে পড়লেই মানুষের মন-প্রাণ চাঙা হয়ে ওঠে। আর সে সঙ্গে অবিশ্বাস্য কর্মশক্তি, সাহস আর উচ্চাকাঙ্খা মানুষকে, সামনের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। টাকা যে কোথা থেকে আসছে, কে জোগাচ্ছে সে সব নিয়ে মাথা ঘামানোর অবসর কোথায়?

আরও অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটে গেল, নিকারাগুয়া জাতীয় ঋণ তুলে নিল, শুল্ক তুলে নিল সিগারেটের ওপর থেকে। শুধু কি এ-ই? ইংল্যান্ড আর মার্কিন দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার মতলব ভাজতে লাগল।

সর্বোৎকৃষ্ট পানীয়টা আকস্মিক ভাবেই আমাদের হাতে আসে। আবারও তার দেখা পেলে তাকে পাব ভোগের মাধ্যমেই। আর গত দশটা মাস আমরা সে চেষ্টাতেই নিজেদের লিপ্ত রেখেছি। একাজ করতে গিয়ে মদের কারবারে যেসব ক্ষতিকারক পদার্থ আছে সে সব জিনিস পিপে পিপে মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরী করেছি। টম আর আমি তার সঙ্গে যত ব্র্যান্ডি ও হুইস্কি প্রভৃতি মদ বরবাদ করেছি তা দিয়ে দশটা মদের দোকান গড়ে তোলা সম্ভব হ'ত। কিন্তু এমন একটা অত্যাবশ্যক ও গৌরবময় বস্তুকে তো পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব নয়। উচিতও হবে না। কিন্তু এ-ত হ'ল পরিতাপের দিকটা, আর আর্থিক ক্ষতির ব্যাপারটা?

এ কথা খুবই সত্য যে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আমাদের তৈরী এমন সুন্দর একটা পানীয়কে স্বাগত জানাবেই। প্রাপ্য মর্যাদা যে দেবে এতেও বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

ম্যাককার্ক সর্বক্ষণ মাথাগুঁজে গবেষণায় লিপ্ত থেকে, বিভিন্ন বস্তুর সংমিশ্রণে যে পদার্থটা তৈরী করেছে তার রং চকোলেট, গায়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিটে। তা থেকে তিল পরিমাণ তুলে নিয়ে জিভের ডগায় ঠেকিয়েই কাঁচা খিস্তি খেউর দিয়ে নালায় ঢেলে দিতে লাগল।

একটু নড়েচড়ে বসে কেনিলি সোৎসাহে বলল, তোমার বক্তব্য সত্যি হলে তো ব্যাপারটা খুবই আকর্ষণীয়, অত্যাশ্চর্য! তবে আমাকে নৈশভোজ সেরে এবার বিদায় নিতে হবে।

রিলে বলল, যেতে চাচ্ছ যাও। তবে সবার আগে এক ঢোক খেয়ে যাও। যে বস্তুটা হাতছাড়া হয়েছে সেটা ছাড়া আর যাবতীয় উপাদানই আমাদের জিম্মায় রয়েছে।

কন বলল, একমাত্র জল ছাড়া কোনদিন অন্য কোন পানীয় খাইনি। ওপরে ওঠার সময় ক্যাথারিন চমৎকার একটা কথা বলেছে, জলের চেয়ে ভাল কোন পানীয়ই নেই।

কেনিলি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে ক্যাথারিন ম্যাককার্ক'কে শরীরের সবটুকু শক্তির এক ধাক্কা মারল। ম্যাককার্ক নিজেকে সামলাতে না পেরে মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ার উপক্রম হ'ল। সে গর্জে উঠল, হতচ্ছাড়াটার কথাগুলো শুনলে! আমরা নাকি এক-একটা পয়লা নম্বরের অপদার্থ—মূর্খ। আমরা ছ'ডজন বোতল সঙ্গে নিয়ে জাহাজে উঠেছিলাম, ঠিক কিনা? তুমি সেগুলোর ছিপি খুলে মিশ্রণগুলো কোন পিপেতে ঢেলে ছিলে? সে পিপেটা বল তো?

ম্যাককার্ক আমতা আমতা করে বলল, মনে হচ্ছে দ্বিতীয় পিপেটায় ঢেলেছিলাম। সেটার গায়ে এক চিলতে নীল কাগজ আঠা দিয়ে আটকে দেওয়া ছিল। ছোট্ট একটা টুকরো।

তার মুখের কথা শেষ হবার আগেই রিলে বলে উঠল, পেয়েছি! এবার পেয়ে গেছি। এতক্ষণ এটাই ধরতে পারছিলাম না। জলই তবে আসল খেল দেখিয়েছে। যাক গে, এক মুহূর্তও দেরী

না করে দু'বোতল মদ নিয়ে এসো। তার আগে পেম্পিকে দিয়ে ভাগটা হিসাবপত্র করে নিচ্ছি। যাও, ঝটপট দু'বোতল মদ নিয়ে এস।

কি যেন এক অজানা আকর্ষণে কন কেনিলি-র রেস্তোরাঁর দিকে এগিয়ে চলল।

তিনজন গাট্টাগোট্টা সিপাহী পাশের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটা ভ্যান থেকে নেমে এসে ম্যাককার্ক আর রিলেকে পাকড়াও করে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে লাগল। হাতাহাতি ভালই হয়েছিল বলেই মনে হচ্ছে। উভয়েই পাগলের মত এমন হাত-পা ছোঁড়াছুড়ি শুরু করে দিল যে, পুলিশের গায়েও দু'-চার ঘা যে পড়েনি এমন কথা শোনা যায়নি।

এবার কেনিলি প্রকৃত ঘটনাটা হাত-পা নেড়ে কন'কে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে উভয়ের তুমুল লড়াইটা বুঝিয়ে দিতে লাগল। কেবলমাত্র হাতাহাতি বা গালাগালির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না। নতুন জাতের একটা ককটেল তৈরীর চেষ্টা তারা করেছিল। হয়ত দেখা যাবে তারা নিরাপদেই বাড়ি ফিরবে।

যুদ্ধক্ষেত্রের পরিস্থিতিটা দেখার জন্য কন পিছনের ঘরটায় হাজির হল। হলঘরটা পেরোতেই সে ক্যাথারিন-এর মুখোমুখি হয়ে গেল।

ক্যাথারিন বলল মিঃ ল্যাস্ট্রি, আবহাওয়া দপ্তর থেকে কোন খবর পাওয়া যায়নি, নিশ্চয়ই?'

এখনও কি অনুমান করছ বৃষ্টি হওয়ার কিছুমাত্রও সম্ভাবনা আছে? ঠিকই, রিলে আর ম্যাককার্ক অহেতুক হামলা হুজ্জুতিতে মেতে গেল। ঘরময় ছড়িয়ে বোতল-ভাঙা কাচ, গ্লাসের ছোট-বড় টুকরো। আর অ্যালকোহলের গন্ধে ঘরটা ভুরভুর করছে। আর স্পিরিটও কম যায় না।

দাগ-কাটা বত্রিশ আউন্সের একটা গ্লাস। তার তলদেশে তরল মিশ্রণ ভর্তি একটা চামচ রাখা আছে।

কন গ্লাসটাকে নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শুঁকল। তারপর তরল পদার্থটুকু গলায় ঢেলে দিল।

সে হলঘরটার দিকে এগোবার সময় সিঁড়ির মুখে ক্যাথারিন এর মুখোমুখি হয়ে গেল। ক্যাথারিন কোনরকম ভূমিকা না করেই বলে উঠল, মিঃ ল্যাস্ট্রি কোন খবর পাওয়া যায়নি, তাই না?

কন তার প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গিয়ে ঝট করে তাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে বলল, খবর একটাই আমরা বিয়ে করতে চলেছি।

আমাকে ছেড়ে দাও বলছি! আমি ভেবে পাচ্ছিনে কন্ এমন একটা কথা বলার সাহস তুমি পেলে কোত্থেকে! বলিহারি তোমার দুঃসাহসের!

এলসি ইন নিউইয়র্ক

নিম্ন ব্রডওয়ের পোশাক-পরিচ্ছদের দোকানে 'ফক্স অ্যান্ড ওটার' দোকানে এল্‌সি-র বাবা পোশাক-আশাক কাটার কাজ করে। বুড়ো হয়েছে। ধীর গতিতে সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে চলাফেরা করে। একদিন মদের দোকানে যাবার সময় সদ্য লাইসেন্স-পাওয়া একটা সোফার তাকে গাড়ি চাপা দেয়। পথচারীরা ধরাধরি করে তাকে বাড়ি দিয়ে আসে। ব্যস, ক'দিন বিছানায় পড়ে থাকার পর বুড়ো পরলোকে পাড়ি জমায়। পৃথিবী ছেড়ে যাবার সময় সে মিঃ ওটার-এর লেখা একটা চিঠি আর নগদ আড়াই ডলার বালিশের তলায় রেখে গেল। চিঠিতে মিঃ ওটার লিখেছেন, বুড়ো ও বিশ্বাসী কর্মচারীকে সাধ্যমত সার্বিক সাহায্য তিনি করবেন।

বুড়ো দর্জির মৃত্যু হতে না হতেই বাড়ির মালিক সুযোগটার সদ্ব্যবহার করতে ভুল করল না। তার মেয়ে এল্‌সি'কে ঘর থেকে বের করে দিল।

এল্‌সি অনন্যোপায় হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথে নামল। তার যা কিছু ছিল সবই ফেলে রেখে এল। তার কোটটা কমদামী হলেও তার কাটছাট 'ফক্স অ্যান্ড ওটার' সবচেয়ে ভাল জিনিস।

বরাতগুণে তার দৈহিক গড়নও সত্যি চোখে লাগার মত। চোখের মণি দুটো নোটের মতই নীলাভ। নিষ্পাপ তার চাহনি। আর তার হাতে আছে আড়াই ডলারের মধ্যে অবশিষ্ট এক ডলার। সে সঙ্গে মিস্টার ওটার-এর দেওয়া তার বাবার নামে চিঠিটা তার সঙ্গেই আছে। এটাই তো আসল সূত্র।

অতএব এখন দেখা যাচ্ছে এল্‌সি এভাবে তৈরী হয়ে অদৃষ্টের খোঁজে বৃহত্তর জগতের দিকে এগিয়ে চলল। কিন্তু মিস্টার ওটার-এর চিঠিটার ব্যাপারে একটা সমস্যার উদ্ভব হ'ল। প্রায় এক মাস হ'ল তার দোকানটা উঠে অন্য এক জায়গায় চলে গেছে। চিঠিতে নতুন ঠিকানাটা দেওয়া নেই। তবে এল্‌সি-র বিশ্বাস যে নতুন দোকানটা খুঁজে বের করা খুব কঠিন হবে না।

এল্‌সি শুনেছিল, পুলিশকে ভালভাবে অনুরোধ করলে কোন ব্যক্তি বা ঠিকানা সন্ধান করে দেয়।

এল্‌সি একটা ফাঁকা গাড়ি পেয়ে চেপে বসল। সেটা তাকে একশ সাতাত্তরতম স্ট্রীট থেকে দক্ষিণের বিয়াল্লিশতম স্ট্রীটে পৌঁছে দিল।

গাড়ি থেকে নামার পর এল্‌সি কয়েক মুহূর্ত বিস্ময় বিমূঢ় অবস্থায় ড্যাবা ড্যাবা চোখে চারদিকে তাকাতে লাগল। কারণ শহরের ভিড়ভাট্টা, ব্যস্ততা আর হৈচৈ সম্বন্ধে সে একেবারেই অজ্ঞ—অপরিচিত।

টুপি মাথায় এক যুবক এল্‌সি-র সামনে দিয়ে গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল ডিপোর দিকে হেঁটে চলল। মুখটা দেখলেই মনে হয় তার মধ্যে দয়া-মমতার ছাপ সুস্পষ্ট। হ্যাংক রস তার নাম। ইজাহোর সূর্যমুখী পশু-খামারে থাকে। সম্প্রতি সে পূর্বাঞ্চল থেকে বাড়ি ফিরছে। তার মনটা বিষিয়ে রয়েছে। কারণ, খামারটা খুবই নির্জন-নিরালা পরিবেশে অবস্থিত। আর মেয়ে মানুষের মুখও দেখা যায় না। তার আশা ছিল সেখানে অবস্থানকালে এমন একজনকে কাছে পাবে যে সারা জীবন তার সঙ্গিনী হয়ে পাশাপাশি কাছাকাছি থাকবে। তার সুখ-দুঃখের ভাগীদার হবে। সে অঞ্চলের রূপসীদের দ্বারা তার সাধ-পূর্ণ হয়নি। আজ এখানে পা দিতেই এল্‌সি-র রূপ-সৌন্দর্য ও মিষ্টি-মধুর মুখটা তার নজর কেড়েছে। এতদিন পর সে তার বাঞ্ছিতা, তার জীবন-সঙ্গিনীর হদিস পেয়েছে। সে নিঃসন্দেহ হয়েছে এ মেয়েটার রূপ যৌবনকে সে ভালবাসতে পারবে। আদর-সোহাগে সে তার মন প্রাণ ভরিয়ে দেবে। তাকে সুখী করবে, নিজেও সুখী হবে। যে খামারে এতদিন একটা সূর্যমুখী ফুল ফুটত সেখানে আজ দুটো ফুল ফুটবে। নিরানন্দময় খামার আজ হয়ে উঠবে আনন্দের আগার।

পথ চলতে চলতে হ্যাংক হঠাৎ থমকে গেল। সে পিছন ফিরে তার মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াল। এল্‌সি খামার-মালিক যুবকটার দিকে বুকভরা আশা নিয়ে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাতে না তাকাতেই এক ভুড়িওয়ালা মোটাসোটা পুলিশ যমদূতের মত ছুটে এসে হ্যাংক-এর জামার কলারটা ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে দেওয়ালের গায়ে ঠেসে ধরল। মাত্র দু'ব্লক দূরে রূপোর বাসনকোসন ভর্তি একটা বস্তা নিয়ে একটা চোর একটা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গুটিগুটি কেটে পড়ল। সেদিকে নজরও পড়ল না।

নাদুসনুদুস গোলগাল পুলিশটা তড়পাতে লাগল, আমার সামনেই নষ্টামি জুড়ে দিয়েছো। তোমার কলিজার জোর আছে তো হে ছোকরা! মেয়েদের সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় তা শিখিয়ে দিচ্ছি, চল ; হম্বিতম্বি করতে করতে পুলিশটা তাকে টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল। এল্‌সি হাঁ করে ব্যাপারটা দেখতে লাগল। অবাক হ'ল। লোকটার চেহারাটা তার বড্ড ভাল লেগেছে।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এল্‌সি আবার হাঁটা শুরু করল। তার বিশ্বাস, তার বাবা যেখানে কাজ করত তার কাছাকাছি সে পৌঁছে গেছে। এবার কেউ না কেউ তাকে ফক্স অ্যান্ড ওটার দোকানটা দেখিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক এরকমই? সে কি ওটার-এর দোকানটার খোঁজেই হন্যে হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে? তার মনে ভাবনা জাগল, বুড়ো ওটার-এর সাহায্যের প্রত্যাশা না করে সে নিজের চেষ্টাতে যদি যেমন তেমন একটা চাকরি জোগাড় করে নেয়। তবে? স্বাবলম্বী হতে পারলে তো কথাই নেই।

আরও সামান্য এগোতেই পথের ধারের একটা দেওয়ালের গায়ে লটকনো একটা বিজ্ঞপ্তির দিকে এল্‌সি-র চোখ পড়ল। তাতে বড় বড় হরফে লেখা, 'কর্মসংস্থান সংস্থা'। বিজ্ঞপ্তিটা চোখে

পড়তেই সে ধীর পায়ে ভেতরে ঢুকে গেল। ঘরে পা দিতে তার চোখে পড়ল কয়েকজন মহিলা চেয়ারে বসে। কি সব লেখাজোকা করছে। আর কয়েকজন তাদের তদারকিতে ব্যস্ত। সাদা চুল, দয়ালু মুখের এক বৃদ্ধ এল্‌সি'কে দরজায় দেখেই ছুটে এসে মধুর স্বরে বলল, বাছা, তুমি কি চাকরির প্রত্যাশা নিয়ে এসেছো? তোমাকে দেখেই আমার ভাল লেগে গেছে। আমি এমনই একটা মেয়ের খোঁজ করছি, যে পরিচারিকা হয়ে আমার কাজকর্ম করে দেবে, আবার বান্ধবীর মত আমাকে সঙ্গদান করবে। মনের মত ঘর আর মাসে ত্রিশ ডলার বেতন পাবে, রাজী?

এল্‌সি বৃদ্ধার কথার জবাব দেবার আগেই এক যুবতী খপ্ করে তার হাতটা চেপে ধরে এক পাশে টেনে নিয়ে গেল। তার চোখে সোনার ফ্রেমের মূল্যবান চশমা। একটা হাত কোটের পকেটে ঢোকানো।

যুবতীটা এল্‌সির হাতটা ধরে রেখেই বলল, শোন, আমি মিস টিকল্‌বস্, কর্ম অনুসন্ধানী কাজের মহিলাদের এ সমিতির বিরোধী সমিতি একজন বিশেষ সদস্যা। গত হপ্তাতেই আমি সাতচল্লিশটা মেয়েকে চাকরি নেয়াতে বিরোধিতা করেছি। কাজে যোগদান করতে দেইনি। একটা কথা মনে রেখো, যে তোমাকে চাকবি দিতে আগ্রহী হবে তার সম্বন্ধে সতর্ক থাকবে। তোমার তো জানা সম্ভব নয় যে, তোমাকে কয়লাখনির মজুরের কাজে লাগিয়ে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটাবে না বা মুক্তোর মত ঝকঝকে দাঁতগুলোর লোভে তোমাকে গুম্ করে দেবে না? তাই বলছি কি, আমাদের সংস্থার সবুজ সঙ্কেত না পেয়ে কোন কাজে যোগদান করলে আমাদের সংস্থা তোমাকে গ্রেপ্তার করবে মনে রেখো।

কিন্তু আমার যে মাথাগোঁজার জায়গা বা খাদ্যের সংস্থান বলতে কিছুই নেই। আমি কি বেঁচে থাকার জন্য আপনার সংস্থার অনুমতি কিছুতেই পাব না? আমার গতি কি হবে, আপনিই বলে দিন।

পূর্ব গাম্ভীর্যকে বজায় রেখেই মিস টিক্‌লবস্ বলল, তার আমি কি জানি। আমাদের চাকরি গ্রহণ বিরোধী সংস্থা যা বিবেচনা করবে তা-ই করবে। ব্যক্তিগতভাবে আমার কিছুই করার নেই। আমার কর্তব্য, তুমি যাতে কোন কাজে না লাগতে পার সে ব্যবস্থা করা। তোমার নাম, ঠিকানা ও অন্যান্য বিবরণ বল, লিখে নিচ্ছি। আর প্রতি বৃহস্পতিবার আমাদের সম্পাদকের সঙ্গে কথা বলে যা কিছু জানার জেনে নেওয়ার সুযোগ আছে। আমাদের খাতায় দু'শ কর্মপ্রার্থী মেয়ের নাম আছে। আর আছে উপযুক্ত কর্মনিয়োগকারীর নাম। সেসব প্রতিষ্ঠানে কোন পদ খালি হলে তবেই তালিকাভুক্ত মেয়েদের মধ্য থেকে ক্রমিক সংখ্যা অনুযায়ী চাকরি করার অনুমতি দেওয়া হবে। আবার সাতাশটা নাম নিয়োগকারীদের খাতায় লিপিবদ্ধ করা আছে।

মিস টিক্‌লবস্ তাকে উপযুক্ত পরামর্শ দিয়ে সাবধান করে দেবার জন্য তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে এলসি্ সেখান থেকে মানে মানে কেটে পড়ল। এত হ্যাপা করে কাজ জোগাড় করার সময় বা ইচ্ছা কোনটাই তার নেই।

এল্‌সি-র এখন প্রথম ও প্রধান কাজ মিঃ ওটারকে খুঁজে বের করা। পথ চলতে চলতে একটা রুটির দোকানের সামনে গিয়ে এল্‌সি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দোকানটার জানালায় একটা বিজ্ঞপ্তির দিকে মুহূর্তকাল তাকিয়ে রইল। তাতে বড় বড় হরফে লেখা, হিসাবরক্ষক চাই।

এল্‌সি সোজা রুটির দোকানে ঢুকে মালিকের সঙ্গে দেখা করল। মালিক বুড়োর মাথায় একরাশ পাকা চুল আর চোখে পুরু লেন্সের চশমা। সত্যিকারের একজন রসিকসজ্জন। সামান্য জিজ্ঞাসাবাদ করেই এল্‌সি'কে মালিক বুড়ো তখনই কাজে লাগিয়ে দিল।

এল্‌সি কাজকর্ম বুঝে নেওয়ার জন্য যেই না চেয়ারে বসতে যাবে তখনি এক মহিলা তার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। তার চোখে স্টীলের ফ্রেমের চশমা আর হাত দুটো গ্লাভস-এ মোড়া।

আগন্তুক মহিলা বলল, তোমার কি তিলমাত্রও জানা আছে, এখানে যে চাকরিটা সানন্দে গ্রহণ করলে, আজই তোমাকে একশ'টা প্রাণীর দৈহিক যন্ত্রণা আর সমসংখ্যক হতভাগার মৃত্যুর জন্য তুমিই দায়ী হবে। আরও আছে, তোমারই জন্য বহু আত্মা নরকগামী হবে, জান কি?

কই জানি না তো? কি করেই বা জানব? তা-ই যদি হয় তবে সে কাজ আমি করতে যাবই বা কেন? আৎকে উঠে এল্‌সি বলল।

মহিলাটি বলল, আচ্ছা, একটা নাট্যশালায় হঠাৎ অগ্নিকাণ্ড ঘটলে এত প্রাণহানি ঘটে কেন বল তো? মাদকবল, হ্যাঁ, মাদকবলই এর একমাত্র কারণ। প্রবল শক্তিশালী ভয়ঙ্কর 'আসব' মাদকবলের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকে। আসব কি, বুঝলে না বুঝি? মাদকদ্রব্য ভরা মিছরির টুকরো। নাট্যশালায় প্রথম সারির দর্শক, সমাজের উচ্চস্তরের মহিলারা মুখে আসব গুঁজে নেশায় বুঁদ হয়ে বসে থাকে। সর্বগ্রাসী আগুন যখন আসে তখন পালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত থাকে না। অতএব মানুষ মারার কল বানাচ্ছে লজেন্স আর মিছরির কারখানাগুলো। তুমি যদি সে কাজে কারখানার মালিককে সাহায্য কর তবে তো মানুষের মৃত্যুর দায়ভাগী তুমিও হবে। স্বীকার করছ তো? আর আমাদের কয়েদখানা, হাজত আর কবরখানা আর ভিখারীদের ডেরাগুলো ভরে তোলার দায়িত্বও তোমার ওপর বর্তাবে। তাই তোমাকে এতগুলো কথা বলার অর্থ, মাদকবল তৈরীর কাজে হাত দেওয়ার আগে নিজের মনের সঙ্গে ভালভাবে বোঝাপড়া করে নাও, ভবিষ্যতে যেন পস্তাতে না হয়।

এল্‌সি রীতিমত আর্তনাদ করে উঠল, একী সর্বনেশে কাণ্ডরে বাবা! মাদকবলে যে আসব-এর অস্তিত্ব আছে, তা-ত ঘুণাক্ষরেও জানতাম না। তবে আমার তো বাঁচা দরকার। কিন্তু কিভাবে সেটা সম্ভব, ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছি নে!

আমার সঙ্গে চল, তোমার বাঁচার রাস্তা আমিই তোমাকে বাৎলে দেব। এ কাজটা থেকে সরে এস।

কারখানার মালিকের কাজে ইস্তফা দিয়ে এল্‌সি মহিলাটির সঙ্গে পথে নামল। একটা গলির মোড়ে গিয়ে দেখল, একটা ভিক্টর গাড়ি দাঁড়িয়ে।

মহিলাটি গাড়িতে ওঠার সময় শেষ উপদেশ দিল, শোন আসব তৈরীর কাজ না নিয়ে এমন কোন কাজ নাও যাতে মানুষের মৃত্যুর কারণ না হও। তার কথাটা শেষ হতে না হতেই গাড়ি এগিয়ে যেতে শুরু করল।

এল্‌সি বিষণ্ণ মনে পথ চলতে চলতে স্বগতোক্তি করল, 'হায় ঈশ্বর। আমাকে কি তবে শেষ পর্যন্ত মিঃ ওটার-এর কাছেই আশ্রয় নিতে হবে? আর তা যদি হয় তবে সেটা হবে আমার পক্ষে বড়ই পরিতাপের, বড়ই মর্মান্তিক ব্যাপার। না সাহায্য নয়, নিজের চেষ্টাতেই আমি বাঁচার পথ করে নেব। নিজের বিড়ম্বিত অদৃষ্টের কথা ভাবতে ভাবতে সে চোদ্দতম স্ট্রীটের একটা বাড়ির সদর দরজার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখল, জানালার একটা বিজ্ঞপ্তি ঝুলছে। তাতে স্পষ্টাক্ষরে লেখা, নাটকের পোশাক সেলাইয়ের জন্য অতি সত্বর পঞ্চাশজন মহিলাকর্মী আবশ্যক। বেতন আকর্ষণীয়।

বিজ্ঞপ্তিটা পড়া শেষ করে এল্‌সি দরজার দিকে পা-বাড়াতেই কালো পোশাক পরিহিত একটা গাট্টাগোট্টা লোক পিছন থেকে তার কাঁধে হাত রাখল। গম্ভীর স্বরে উচ্চারণ করল, খবরদার পোশাকের কারখানায় চাকরি নেবার চেষ্টা কোরো না।

একী সর্বনেশে কাণ্ডরে বাবা! এল্‌সি সচকিত হয়ে বলে উঠল, এ যে দেখছি নিউইয়র্কের সব অঞ্চলেই শয়তানরা মাথা গলিয়ে রেখেছে! পোশাকের কারখানাটার আবার দোষ কি?

এটাই তো শয়তানের আসল ঘাঁটি। এখানকার তৈরী পোশাক পরেই তো শয়তানরা নিজেদের ক্ষমতার কথা ফলাও করে প্রচার করে, বুঝেছ? নাট্যশালাগুলোই তো ধ্বংস আর সর্বনাশের পথ। তুমি এমন সুন্দর হাত দুটো দিয়ে পোশাক তৈরী করে ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করতে চাইছ? সে সঙ্গে তোমার পবিত্র আত্মা কলুষিত আর বিপন্ন করতে উৎসাহী হচ্ছ? শেষবারের মত নাট্যশালার পর্দা নেমে আসার পর ভদ্রবেশী দর্শকগুলো কোথায় যায়, জানা আছে কি?

জানি, নিশ্চয়ই জানা আছে। নাট্যাভিনয়ের দিকে সোৎসাহে এগিয়ে যায়। আমি নাট্যশালার পোশাক তৈরী করে যদি পেটের খাবার জোগাড় করি তবে কি সেটা খুবই গর্হিত কাজ হবে? কিন্তু আমাকে যে এখনই কোন না কোন কাজে লেগে পড়া দরকার।

লোকটা পূর্ব স্বর অনুসরণ করেই বলল, আরে, তুমি কি জান না, মিশরের জীবনযাত্রা বিলাসবহুল, ব্যয়বহুল তো অবশ্যই। আমার অনুরোধ, এ অনাচার আর দুষ্কৃতকারীর দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও পালাও। আর কাজ? পেটের জোগাড়? প্রভুই তোমার [illegible]দনের ব্যবস্থা করে

দেবেন। কথাটা বলেই লোকটা হন হন করে এগিয়ে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল।

এল্‌সি চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার ধীর পায়ে এগিয়ে চললো। সে কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা কারখানা এলাকায় হাজির হ'ল। সুবিশাল একটা বাড়ির সামনে গিয়ে সে দেখল, একটা সাইনবোর্ড ঝুলছে পোসি অ্যান্ড ট্রিমার, নকল ফুলের দোকান। তার তলায় অপেক্ষাকৃত ছোট হরফে লেখা, পাঁচশ' মেয়েকে কাজ শেখানো হবে। আগ্রহী মেয়েরা যোগাযোগ করতে পারেন। লোভনীয় বেতন। সিঁড়ি দিয়ে উঠে যোগাযোগ করুন।

এল্‌সি সিঁড়ি দিয়ে উঠে সামনেই একটা বড়সড় ঘরের দরজায় সামনে পৌঁছেই দেখল, জনা ত্রিশেক মেয়ে বসে। তাকে দেখেই অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সী মেয়ে তার দিকে এগিয়ে এল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে সে বলল, কি, চাকরির খোঁজে এসেছ বুঝি?

হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। একটা চাকরি আমার খুবই দরকার।

তাই বলে এ-কাজ? না, একাজটা কোরো না। বেশী বয়সের মেয়েটা বলল, শোন, আমি এখানকার স্ক্যাব কমিটির সভাপতি। আমরা প্রতি হপ্তায় পঞ্চাশ সেন্ট বেতন বাড়ানো এবং বরফ-জল দাবী করেছিলাম বলে আমাদের চারশ' মেয়েকে কাজ থেকে বরখাস্ত করেছে। আর একটা দাবী ছিল ফোরম্যানের গোঁফ কামিয়ে ফেলতে হবে। ভাই, তুমি বরং অন্য কোথাও কাজের ধান্ধা কর। আর তোমার মত রূপসীর পক্ষে এখানকার কাজ করা পোষাবেও না। অন্য ধান্দা করগে।

তাই হবে, অন্য কোথাও চেষ্টা করেই দেখছি। দীর্ঘশ্বাস ফেলে এল্‌সি বলল।

এল্‌সি সেখান থেকে বেরিয়ে ব্রডওয়ে দিয়ে পূর্বদিকে সামান্য এগিয়ে যেতেই বড়সড় একটা বাড়ির গায়ে ফক্স অ্যান্ড ওটার-এর সাইনবোর্ডটা দেখল।

মুহূর্তমাত্র দেরী না করে এল্‌সি লম্বা-লম্বা পায়ে বাড়িটার ভেতরে ঢুকে গেল। সামনেই এক করনিককে পেয়ে একটা চিরকুটে নিজের নাম লিখে এবং তার বাবাকে দেওয়া মিঃ ওটার-এর চিঠিটা তাকে দিয়ে মিঃ ওটারকে পৌঁছে দিতে অনুরোধ করল। একটু বাদেই লোকটা এল্‌সিকে নিয়ে মিঃ ওটার-এর কাছে পৌঁছে দিল।

এল্‌সিকে দেখেই মিঃ ওটার যন্ত্রচালিতের মত চেয়ার ছেড়ে উঠে হাসিমাখা মুখে তাকে স্বাগত জানালেন। লোকটা মাঝ-বয়সী। সামান্য মোটাসোটাই বলা চলে। মাথায় ছোট্ট টাক, সোনার ফ্রেমের চশমা নাকের ডগায় আর সুসজ্জিত একজন সজ্জন।

মুখের হাসিটুকু অব্যাহত রেখেই মিঃ ওটার বললেন, তুমি তবে আমাদের বিয়েট্রির সেই ছোট্ট মেয়েটা? তোমার বাবা আমাদের প্রতিষ্ঠানের একজন অপরিহার্য কর্মী ছিল। সে ছিল সবার চেয়ে বেশী দক্ষ। ভাল কথা, সে কি কিছু রেখে যেতে পারে নি? যাকগে, সে জন্যে ভেবো না। বিশ্বস্ত কর্মচারী ও আমাদের সজ্জন বন্ধুটার কথা আমরা মন থেকে মুছে ফেলি নি। শোন, আমাদের প্রতিষ্ঠানে একটা পদ খালি আছে, মডেলের পদ। কাজটা খুবই সোজা।

মিঃ ওটার ঘণ্টা বাজিয়ে মিস হকিন্স নামক এক মহিলাকে ডেকে পাঠালেন। মিঃ ওটার বললেন, মিস হকিন্স, আমাদের নবাগতা কর্মী মিস বিয়েট্রির একটা টেস্ট নেওয়ার জন্য টেলিফোন কর। ভাল কথা, ভাল করে সাজগোজ করিয়ে নেবে, বুঝলে?

এল্‌সি পূর্ণমাপের একটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দ্রুত নিঃশ্বাস নিতে নিতে সবিস্ময়ে স্বগতোক্তি করল। আমি তবে সত্যি সুন্দরী!

এল্‌সি যখন আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে বিস্ময়ের জোয়ারে ভেসে চলেছে, মিঃ ওটার তখন টেলিফোন বুথে পৌঁছে একটা নম্বর ডায়াল করলেন। নম্বরটা ফাঁস না করাই ভাল।

ফোনের রিসিভারটা মুখের সামনে ধরে রেখে মিঃ ওটার বলে চললেন, অস্কার, সেই টেবিলটা আজ সন্ধ্যায় আমার জন্য খালি রেখো। বাগানের বাঁদিকের বড় কামরার টেবিলটার কথা বলছি। আর একটা কথা, রোস্টের সঙ্গে পাঁচাশি মোহানিস বার্জার, মনে থাকবে তো? আরে না-না, পুরনো মালটা নয়। একেবারে আনকোড়া—ডাঁশা। না-না অস্কার, ঠিক ডাঁশা নয়, পাকা আপেল ভাবতে পার, টসটসে ফল! একেবারে আনকোড়া!

আমার ক্লান্ত পাঠক, আপনি যদি ইচ্ছা করেন তবে তারই লেখা কয়েকটা ছত্র দিয়ে গল্পটা

ইতি টানতে চাই। গ্যাডস্ হিল-এর সেই লোকটার লেখা যার সামনে আপনি যদি টুপি খুলে সম্মান প্রদর্শন না করেন তবে আপনার মাথায় টুপির পরিবর্তে লাউয়ের খোলা চাপিয়ে দেওয়া হবে, বুঝলেন?

সমাজের উচ্চস্তরের কর্তাব্যক্তিরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। সমিতি আর সমাজও উবে গেল। ঠিক-বে-ঠিক যাবতীয় সম্ভ্রান্ত ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিরাও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। মানুষের স্বর্গের অনুকম্পা নিয়ে যেসব আইন ও সমাজ সংস্কারকের দল জন্মগ্রহণ করেছে তারাও উবে গেছে অথচ সে সঙ্গে আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থলের অর্থলিপ্সা নিয়ে, আমাদের চারদিকের পরিবেশ থেকে এভাবে রোজ নিশ্চিহ্ন হয়ে চলেছে। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে আমাদের মাথার মণি, দণ্ডমুণ্ডের কর্তাব্যক্তিটি।

দ্য কাউন্ট অ্যান্ড দ্য ওয়েডিং গেস্ট

এক সন্ধ্যায় দ্বিতীয় এভিনিউ বোর্ডিং হাউসে এন্ডি ডোনোভান্ রাতের খাবার খেতে গেলে মিস কনওয়ে নামের রূপসী যুবতীর সঙ্গে মিসেস স্কট তার আলাপ পরিচয় করিয়ে দেন। মিস কনওয়ে বেটেখাটো চেহারার মানুষ, তবে খুবই বিনয়ী ও নিরীহ নম্র স্বাভাবা। লজ্জাবনত চোখ দুটো তুলে সে তাকাল। ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বিনীতস্বরে নিজের নামটা বলল। ব্যস, আর কোন কথা না বলে মাংসের প্লেটের ওপর কাটা চামচটা নামিয়ে নিল।

চোখে মুখে হাসির ছোপ ফুটিয়ে তুলে মিঃ ডোনোভান বিশেষ ভঙ্গীতে মাথাটা কাৎ করল।

দু'সপ্তাহ পরের ঘটনা। এন্ডি সামনের সিঁড়িতে বসে আপনমনে চুরুটে টান দিয়ে চলেছে। হঠাৎ ওপরে আর পিছন দিকে ক্ষীণ একটা ঠুকঠাক শব্দ শুনে ঘাড় ঘোরাল। ব্যস, তার মাথাটাই গেল ঘুরে। মিস কনওয়ে সবে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। তার গায়ে ফিনফিনে পাতলা কাপড়ের রাতের পোশাক। মাথার টুপিটা পর্যন্ত কালো। আর সেটা থেকে একটা কুচকুচে কালো ফিনফিনে অবগুণ্ঠন বাতাসে মৃদু-মৃদু উড়ছে।

সিঁড়ির সবচেয়ে ওপরের ধাপটায় দাঁড়িয়ে মিস কনওয়ে তার কালো রেশমি দস্তানা জোড়া খুলল। তার গায়ে কোথাও বা অন্য কোন সাদা রঙের লেশমাত্রও নেই। আর সোনালী চুলের গোছাটাকে চমৎকারভাবে গোছগাছ করে গলার কাছে হাল্কা গিঁট দেওয়া। তার মুখটা খুব সুন্দর না হলেও তাতে সরলতার ছাপ সুস্পষ্ট। তবে সে মুখটাই এখন ডাগর ডাগর চোখ দুটো মেলে তাকানোর জন্য সুন্দর হয়ে উঠেছে। দুঃখ-যন্ত্রণার সকরুণ আবেদন নিয়ে তার চাউনি শহরের বাড়িগুলোর মাথার ওপরের সুউচ্চ আকাশের গায়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

ভুললে চলবে না, তার গায়ের সবকিছুই কালো। তার ওপর পছন্দ মাফিক ফিনফিনে ক্রেপ দ্য চায়না—ক্রেপ দ্য ফিবেন। কালো অবগুণ্ঠনের ফাঁক দিয়ে তার মুখের যে অংশটুকু, বিষণ্ণ চাউনি—আর চোখে মুখে এমন করুণ ছাপ যেন জীবন সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিতে না দিতেই বুঝি জীবনের আনন্দটুকু নিঃশেষে উবে গেছে। তা সত্ত্বেও বাগানে একটু-আধটু হাঁটাচলা করলে হয়ত আপনার দেহ-মন কিছুটা অন্তত সুস্থ থাকবে। আরও আছে, মনে রাখবেন সময় মত আপনাকে দরজায় এসে দাঁড়াতে হবে। তবেই তারা গুটিগুটি কাছে এসে দাঁড়াবে। তবে ব্যাপারটা খুবই মারাত্মক যে, আমি এমন মানববিদ্বেষী হতে পেরেছি, ঠিক কিনা? ওই যে শোকযাত্রার কালো পোশাক সেটার প্রসঙ্গে এরকম মন্তব্য করলাম।

মিস কনওয়ে-র কথা মিঃ ডোনোভান-এর অন্তরের অন্তঃস্থলে হঠাৎ আঁকা হয়ে গেল। হাতের জ্বলন্ত চুরুটের শেষ অংশটুকু ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে লো-কাট জুতোর দিকে মন দিতে গিয়ে বলে উঠলেন—মিস কনওয়ে, আজকের সন্ধ্যাটা মেঘমুক্ত, চমৎকার, তাই না?

চাপা দীর্ঘশ্বাস বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে মিস কনওয়ে বলল, হ্যাঁ, অবশ্যই সুন্দর। তা কাদের

কাছে? যাদের উপভো' করার মত মন ও ইচ্ছে দু'-ই আছে।

মনে সাহস সঞ্চার করে ডোনোভান বলল, আশা করি আপনার কোন আত্মীয়কে হারাতে হয় নি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিস কনওয়ে এবার বলল, না, আত্মীয় নয়। তবে এমন একজন পৃথিবী ছেড়ে গেছেন, তবে মিঃ ডোনোভান আমার শোক জ্বালায় আপনাকে দগ্ধ করার ইচ্ছে নেই।

দগ্ধ করা, একথা বলছেন কেন? আপনি নির্দ্বিধায় বলতে পারেন, আমি আনন্দিতই হ'ব। ডোনোভান বলল।

কনওয়ে চোখে-মুখে এমন বিষণ্ণ হাসির ছোপ ফুটিয়ে তুলল যা তার মুখের বিষণ্ণতার ছাপটুকুকে আরও অনেক বেশী প্রকট করে তুলল। আগের মত দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে এবার উচ্চারণ করল, 'আপনি হাসলেও পৃথিবীর সবাই আপনার হাসিতে যোগ দেবে, আর কাঁদলেও কিন্তু তারা হাসবেই। বাস্তব অভিজ্ঞতা এটা আমাকে শিখতে সাহায্য করেছে। মিঃ ডোনোভান, এ শহরে আমার আত্মীয় বান্ধব বলতে কেউ-ই নেই। তাই-তো আপনার এ সহৃদয়তাটুকুর দাম আমার কাছে অনেক, অনেক বেশী।

দেখুন, নিউইয়র্ক শহরে নিঃসঙ্গতা এক বড় বোঝা, অর্থাৎ একা থাকা খুবই কঠিন সমস্যা। তবে এ-ও সত্য যে, পুরনো এ শহরটা যখন বন্ধু হয়ে ওঠে তখন মন-প্রাণ রোমাঞ্চে ভরপুর হয়ে ওঠে। তখন সীমা পরিসীমা বলতে কিছু থাকে না। এবার বলুন তো, পার্কে যে একটু হাঁটাহাঁটি করলেন এতে কি আপনার মনের বিষণ্ণতা কিছুটা অন্তত লাঘব হয়েছে বলে মনে করছেন না? আর যদি আপনার সম্মতি পাই, মিঃ ডোনোভান, যার মন-প্রাণ বিষাদে ভরপুর তাকে সঙ্গদান করতে আপনি উৎসাহী হলে আমি আনন্দ পাব।

তারা হাঁটতে হাঁটতে সামান্য এগিয়ে যেতেই পার্কের নির্জন-নিরালায় একটা খালি বেঞ্চ পেয়ে পাশাপাশি বসল।

যৌবন আর বার্ধক্যের এটুকুই পার্থক্য, অন্য একজন দুঃখের যত বেশী ভাগীদার হয় যৌবনের দুঃখ ততই হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, আর বার্ধক্য দু'হাত উপুড় করে দিলেও দুঃখটা অপরিবর্তিতই থেকে যায়।

কনওয়ে এক ঘণ্টা বাদে অন্তরের অন্তঃস্থলের গোপন কথাটা ব্যক্ত করল। সে ছিল আমার প্রেমিক বাগদত্তা। কথা পাকা হয়ে গিয়েছিল সামনের বসন্তে আমরা বিয়ে করে ঘর বাঁধব। সে যথার্থই একজন কাউন্ট ছিল। ইতালীতে তার জমিদারী ও দুর্গ প্রাসাদ ছিল। কাউন্ট ফার্নাণ্ডো মাজিলি নামে সর্বজন পরিচিত ছিল। আর ছিল অতুলনীয় রুচিশীল। আমার বাবা আমাদের বিয়েতে চরম প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালেন। একবার আমি তার হাত ধরে পালিয়ে যাই। বাবা ধরে ফেললেন। আমাকে বাড়িতে নিয়ে গেলেন। আমি ধরেই নিয়েছিলাম বাবা আর ফার্নাণ্ডো দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন। বাবা ছিলেন পোশাকের কারবারী। পি'ফিপ্‌সিতে তার কারবার ছিল।

বাবা শেষ পর্যন্ত আমাদের বিয়েতে সম্মতি দিলেন। পরের বসন্তে আমাদের বিয়ে করতে বলেন। বিষয় আশয় সংক্রান্ত দলিলপত্র ফার্নাণ্ডো বাবাকে দেখাল। বাবা সন্তুষ্ট হলেন। সে এবার আমাদের বসবাসের যাবতীয় বন্দোবস্ত করার জন্য ইতালির দুর্গ প্রাসাদে চলে গেল। বিয়ের পোশাক আশাক আর গহনাপত্রের জন্য ফার্নাণ্ডো বাবার হাতে কয়েক হাজার ডলার দিতে চাইলে বাবা খুবই রেগে গেলেন। বকাবকিও কম করলেন না। আমাকে তার কাছ থেকে একটা উপহারস্বরূপ কিছু বা একটা আংটিও নিতে দেননি। ফার্নাণ্ডো জাহাজে পাড়ি জমাল। আর আমি? একটা মিছরির দোকানে হিসাবরক্ষকের চাকরি জোগাড় করে নিলাম।

তিনদিন বাদে পি'ফিপ্‌সি থেকে পাঠানো একটা চিঠি আমার হাতে এল। তাতে ফার্নাণ্ডোর মৃত্যু সংবাদ ছিল। দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়েছে।

আমার গায়ে যে শোকের পোশাক দেখছেন এটা তারপর যে পরেছি আজও ছাড়া হয়ে ওঠেনি। চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবার সে বলল, মিঃ ডোনোভান, আমার মন-প্রাণ চিরদিন তার কবরকে ঘিরেই আছে ও চিরকাল থাকবে। আমি যে সঙ্গী হিসেবে বাঞ্ছনীয় নয়, খারাপ তা আমি ঠিকই বুঝতে পারি মিঃ ডোনোভান। কারো প্রতি মন-প্রাণ সঁপে দেওয়া আমার

পক্ষে সম্ভব হয় না। আপনার যেসব বন্ধু হাসি আনন্দে আপনাকে সবসময় মাতিয়ে রাখতে পারে তাদের কাছ থেকে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া মোটেই সঙ্গত নয়। আপনি কি বাড়ি ফিরতে চাচ্ছেন?

দুঃখিত ডোনোভান বললেন, না, এখনই বাড়ি ফিরে যাওয়ায় উৎসাহী নই। মুহূর্তকাল নীরবতার মধ্যে কাটিয়ে সে আবার মুখ খুলল, মিস কনওয়ে আপনি কিন্তু মোটেই বলবেন না এ শহরে আপনার কোন হিতকাঙ্খী, মানে বান্ধব নেই। তা যদি বলেন তবে কিন্তু আমি বড়ই মর্মাহত হ'ব। আপনি আমাকে একজন সত্যিকারের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করুন আর আমি খুবই দুঃখিত, এটা আপনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করুন, এ-ই কামনা করছি।

ভিজে ওঠা চোখের পাতা দুটো মুছতে মুছতে কনওয়ে ভাঙা ভাঙা গলায় উচ্চারণ করল, মিঃ ডোনোভান, আমার এ পকেটটার ভেতরে তার ছবি আছে। কাউকেই কোনদিন দেখাই নি। কিন্তু আপনাকে আমি দেখাব। কেন, তা-ই না? আমার বিশ্বাস, আপনি আমার যথার্থই একজন সুহৃদ।

কথা বলতে বলতে কনওয়ে লকেটটার ভেতর থেকে ছবিটা ডোনোভান-এর চোখের সামনে মেলে ধরল। সে অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে অপলক চোখে তকিয়ে রইল। কাউন্ট সুদর্শনই বলা যেতে পারে, মুখে বুদ্ধিমত্তার ছাপ সুস্পষ্ট। এমন অমিত শক্তিধর পুরুষ অনায়াসেই দশজনের একজন হয়ে ওঠার মতই বটে।

কনওয়ে ক্ষীণকণ্ঠে বলল, আমার ঘরে বড় একটা ছবি আছে। ফ্রেমে বাঁধিয়ে দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখেছি। ফিরে গিয়ে সেটা আপনাকে দেখাব। এ দুটোই আমার সম্বল ফার্নাভোর স্মৃতি বলতে যা বোঝায়। তবে আমার অন্তরে সে যে চিরদিনই বেঁচে থাকবে এ ব্যাপারে কিছুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই।

ডোনোভান-এর সামনে এখন সবচেয়ে বড় ও প্রধান কাজ অদৃষ্টবিড়ম্বিত কাউন্ট ফার্নাভোকে কনওয়ে-র মন থেকে মুছে ফেলে সেখানে নিজের জায়গা করে নেওয়া। মেয়েটার প্রতি তার নিরবচ্ছিন্ন মোহই তাকে এরকম দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে উৎসাহিত করল। কিন্তু কাজটা যে কতখানি কঠিন ও সমস্যা সঙ্কুল সেটা বোঝার মত মানসিকতা তার এ মুহূর্তে অন্তত নেই। সহৃদয় বন্ধুর ভূমিকা পালনেই সে নিজেকে লিপ্ত করল। আর তা সে এত অল্প সময়ের মধ্যেই সেরে ফেলতে সক্ষম হ'ল। এর সত্যতা প্রমাণিত হ'ল যখন দেখা গেল দু'প্লেট আইসক্রীম নিয়ে তারা নিতান্ত আপনজন সুহৃদের মত মন খোলসা করে আলাপ আলোচনায় মেতে উঠেছে। তবে কনওয়ে-এর চোখ মুখের বিষণ্ণতার ছাপটুকু অক্ষুণ্ণই রয়ে গেছে।

সে সন্ধ্যাতেই বিদায় নেবার পূর্ব মুহূর্তে মেয়েটা এক দৌড়ে ওপরে গিয়ে পরম সম্পদ ফ্রেমে বাঁধানো ফটোটা নিয়ে এল।

কনওয়ে বলল, বিদায় নিয়ে ইতালি চলে যাবার সময়ে সে এটা আমাকে দিয়ে যায়। এটা থেকেই আমি ছোট্ট একটা ছবি তৈরি করে নিয়ে লকেটে ব্যবহার করেছি।

খুবই সহৃদয়তার সঙ্গে ডোনোভান বলল, দেখতে খুব সুন্দর মানে ভদ্রলোক খুবই সুশ্রী। ফটোগ্রাফটা থেকে দৃষ্টি তুলে নিয় এসে কনওয়ে-এর মুখের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলল, ভালকথা, মিস কনওয়ে, আগামী রবিবার কোনি যাব মনস্থ করেছি। আপনার পক্ষে কি সঙ্গে যাওয়া সম্ভব হবে?

এক মাস বাদে তারা মিসেস স্কট ও অন্য সব বোর্ডারদের তাদের বিয়ের কথা জানাল। কনওয়ে-এর তখনও কালো পোশাকই রয়েছে।

সবাইকে বিয়ের কথা জানানোর এক সপ্তাহ পরে এক বিকেলে তারা পার্কে গিয়ে সে বেঞ্চটাতে বসল। ডোনোভান-এর মুখে বিষণ্ণতার ছাপ সুস্পষ্ট। তার এরকম ভাবান্তর প্রেমিকাকে ভাবিয়ে তুলেছে। হাজারো প্রশ্ন তার মাথার চারদিকে ভিড় করেছে যা এড়িয়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হ'ল না। সে সবিস্ময়ে বলল, কি ব্যাপার বল তো এন্ডি? আজ রাত্রে তুমি হঠাৎ এমন গম্ভীর হয়ে গেলে যে? হয়েছে কি? এর আগে তো কোনদিন এরকম দেখি নি। কিছু না কিছু অবশ্যই হয়েছে। আমি সেটা জানতে চাই, জানা দরকার। আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, নির্ঘাৎ অন্য

কোন মেয়ের চিন্তা তোমার মাথায় ভর করেছে। তোমার মন তাকেই যদি চায় আপত্তি কোথায়, তাকে নিয়ে এলেই তো পার।

ডোনোভান বলল, ঠিক আছে, বলছি তবে। আমার বিশ্বাস, ব্যাপারটা তোমার মাথায় ঢুকবে না। তুমি তো মাইক খুলিভান-এর নাম শুনেছ, ঠিক কিনা? 'বড় মাইক' খুলিভান বলেই সবাই তাকে চেনে।

কনওয়ে বলল, না আমি কোনদিন শুনিনি। আর তোমার আকস্মিক ভাবান্তরের কারণ যদি সে-ই হয়ে থাকে তবে আমার তিলমাত্রও শোনার আগ্রহ নেই। কে? কে সে বড় মাইক?

নিউইয়র্ক শহরের সবচেয়ে বড় মাপের মানুষ। শ্রদ্ধাবনত কণ্ঠে ডোনোভান বলল, সে রাজনীতির ক্ষেত্রে যা খুশি তা-ই করতে পারে। সবাই বাঘের মত ভয় করে। এই তো ক'দিন আগে পুরনো দেশটা দেখতে এসেছিল, ব্যস, রাজারা হুড়মুড় করে গর্তে ঢুকে গিয়েছিল।

যাক গে, বড় মাইক আমার একজন অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। তবে প্রভাব প্রতিপত্তির বিচারে আমি তার তুলনায় তুচ্ছাতিতুচ্ছ, একটা তাসের দুরি মনে করতে পার। কেবলমাত্র ধনকুবেরদেরই নয়, গরীবদেরও বন্ধু বটে। আজ হঠাৎ তার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যায়। আমাকে দেখেই ব্যস্ত পায়ে কাছে এসে আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে সে আবেগে অভিভূত হয়ে বলে উঠল, কতদিন ধরে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। তুমি তো এখন ভদ্রলোক—সজ্জন হয়ে গেছ! সে জন্যই তোমাকে নিয়ে আমি যারপরনাই গর্ব বোধ করি। সে একটা চুরুট ধরাল, আর আমি একটা হাইবল নিলাম।

দু'চার কথার পর আমি তাকে বললাম, 'শোন। দু'হপ্তার মধ্যেই আমি বিয়ে করছি।

সে সোল্লাসে বলল, 'তুমি নিমন্ত্রণপত্র মারফৎ আমাকে স্মরণ করিয়ে দিও। তবেই আমার মনে পড়বে, তোমার বিয়েতে উপস্থিত থাকাও সম্ভব হবে। মাইক কথায় যা বলে করেও তা-ই। যাক, তাকে আমার বিয়েতে উপস্থিত রাখতে আমি নিজের একটা হাত কেটে ফেলতেও দ্বিধা করব না। আর সেটাকে আমার জীবনের সবচেয়ে গর্বের দিন বলেই মনে করব।

ভাল কথা, তাকে নিমন্ত্রণ করতে আপত্তিই বা কোথায়?

বিশেষ একটা কারণের জন্য আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। বিষণ্ণ মুখে চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডোনোভান বলল, আর সে জন্যই তার পক্ষে সেখানে থাকা সম্ভব নয়। কারণ জানার জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি কোরো না যেন। তোমার কাছে বলা সম্ভব নয়।

আমার জানার জন্য তিলমাত্র উৎসাহও নেই। কনওয়ে মুহূর্তকাল ভেবে বলল, তবে রাজনীতির ব্যাপার স্যাপারই হবে বলে আমার বিশ্বাস। কিন্তু তাই বলে আমার দিকে একটু হাসিমুখে তাকানোর আপত্তিটা কোথায়, বুঝছি না তো?

কনওয়ে, কাউন্ট মাজিলি'কে নিয়ে যতটা ভাবনা চিন্তা করতে আমার জন্যও কি ঠিক ততটাই ভাব, বলত?

কনওয়ে নির্বাক। ডোনোভান দীর্ঘসময় উত্তরের অপেক্ষায় তার মুখের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখল। 'হ্যাঁ' বা 'না' কোন কিছুই সে করল না। এক সময় ডোনোভান-এর হাতটা জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করল।

নিজের সমস্যার ব্যাপারটা ভুলে ডোনোভান তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে, সে কী! এটা আবার কি শুরু করলে!

কাঁদতে কাঁদতেই কনওয়ে বলতে লাগল ডোনোভান, আমি তোমার কাছে মিথ্যে কথা বলেছি। তা ছাড়া তুমি তো কোনদিন আমাকে বিয়ে করে স্ত্রীরূপে বরণ করে নেবে না। ভালও বাসবে না কোনদিনই। তবু সবকিছু তোমাকে খোলসা করে বলতেই হবে। শোন, ফার্নান্ডো বা কাউন্ট বা তার কাছাকাছিও কেউ ছিল না। আর আমার জীবনে কোন প্রেমিকের অস্তিত্বই ছিল না। অন্য সব মেয়েদেরই একজন করে প্রেমিক ছিল। কালো পোশাকের ব্যাপারটা তবে তোমার কাছে খোলসা করে বলি। আসলে কালো পোশাক পরলে আমাকে খুবই সুন্দর দেখায়। আর লকেটের ফটোগ্রাফটা? একটা স্টুডিওতে গিয়ে এক সুদর্শন যুবকের ছবি কিনে আনি। সেটাকে ছোট করে আমার লকেটে ব্যবহার করি, তারপর কাউন্ট আর তার মৃত্যু নিয়ে একটা গল্প তৈরি করে ফেললাম। কেন এমন প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিলাম, শুনতে ইচ্ছে করছে তাই না? কালো

পোশাকটা আমি যাতে সব সময় ব্যবহার করতে পারি, একমাত্র কারণ। চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবার সে বলল, জানি, মিথ্যেবাদীকে কেউ কোনদিনই বিয়ে করে ঘর বাঁধতে উৎসাহী হবে না। ভাল তো বাসবেই না। ডোনোভান, তুমি আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেলে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাবে। তবে যদি পার এটুকু অন্ততঃ বিশ্বাস কোরো তুমি ছাড়া অন্য কোন পুরুষকে ভালবাসিনি—বুকে ঠাঁই দেইনি। ব্যস, আমার আর কিছু বলার নেই।

ডোনোভান প্রেমিকার একটা হাত নিজের কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল, প্রিয়তমে কাউন্ট তার কবরেই থাক। সব কিছু বলে তুমি নিজেকে হাল্কা করেছ আর আমাকেও সহজ করে তুলেছে। আমি আশা করেছিলাম, বিয়ের আগেই তুমি কাজটা সেরে ফেলবে, করলেও তা-ই। কনওয়ে তখন ডোনোভান-এর হাতে আলতো করে একটা চাপ দিয়ে ঠোঁট টিপে টিপে হাসতে হাসতে বলল, তুমি কাউন্টের কাহিনীটা বিশ্বাস করেছিলে, সত্যি করে বল তো?

বাক্স থেকে চুরুট বের করতে করতে ডোনোভান বলল, 'শোন, পুরোপুরি বিশ্বাস করেছিলাম এমন কথা বলব না। কারণ, তোমার লকেটে যে ছবিটা দেখেছিলাম সেটা যে বড় মাইক খুলিভান-এর ছবি চিনতে মোটেই ভুল হয় নি।

দ্য অ্যাসেসর অব সাকসেস

ইউনিয়ন স্কোয়ারে হেস্টিংস বিউচাপ মর্লি একেবারেই অহেতুক ঘোরাঘুরি করছে। আর যারা পার্কের বেঞ্চে অলসভাবে সময় কাটাচ্ছে তাদের দিকে থেকে থেকে সকরুণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। যত্ত সব নিষ্কর্মার ঢেকির দল। জানোয়ারের মত এক মুখ দাড়ি গোঁফ নিয়ে বোকা গর্দভ পুরুষগুলো আর শান-বাঁধানো পথ থেকে ইঞ্চি চারেক ওপরে পা তুলে মেয়েগুলো পা দুটোকে ফাঁক করছে আর জুড়ছে।

মিঃ রকফেলার বা মিঃ কর্নেগি-র মত আমি যদি হতাম তবে পকেটভর্তি ডলার নিয়ে সব কটা পার্ক কমিশনারে সঙ্গে দেখা করে পার্কের বেঞ্চগুলোকে এমন নিচু করতাম যাতে বসার পর পা মাটিতে ঠেকে যায়। আর যেসব শহর প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করতে পারবে তাদের জন্য একটা করে গ্রন্থাগার তৈরি করে দিতাম। আর ছিটেল অধ্যাপকদের জন্য স্বাস্থ্য নিবাস তৈরি করে ফলোজ নামকরণ করতাম।

মহিলা স্বাধিকার রক্ষা সমিতিগুলো বেশ কয়েক বছর যাবৎ সমানাধিকারের দাবীতে পুরুষদের সঙ্গে লড়াই অব্যাহত রেখেছে। ফল কি হল? পার্কের বেঞ্চে বসলেই পায়ের গোড়ালিগুলোকে মাটি থেকে বেশ কিছুটা ওপরে তুলে রেখে নাচাতে হয়। মহিলাগণ একেবারে নিচু, মানে গোড়া থেকে কাজ শুরু করুন। সবার আগে মাটিতে পা ঠেকাবার ব্যবস্থা করুন. তারপর না হয় মানসিক সমানাধিকারের জন্য লড়াইয়ে নামবেন।

হেস্টিংস বিউচাপ মর্লি রীতিমত সাজগোজ করেই বেরিয়েছে। এটাকে তার বংশগত শিক্ষা দীক্ষার ফলই বলতে হবে। তার পোশাক আশাকের বিবরণ দেওয়া আমাদের পক্ষে অনধিকার চর্চা। তবে তার কথাবার্তা আর হাঁটাচলার বিবরণ দিতে বাধা নেই।

হেস্টিংস-এর পকেটে একটা কানাকড়িও নেই। তা সত্ত্বেও সে শতশত কপর্দকহীন অদৃষ্টবিড়ম্বিত যারা তারই মত তাদের দিকে তাকিয়ে করুণার হাসি হাসছে। স্কোয়ারের পশ্চিম দিকের আকাশ ছোঁয়া বাড়িগুলোতে ভোরের প্রথম সূর্য যখন সোনালি আভা ছড়িয়ে দিত তখনও তাদের পকেটের অবস্থা এর চেয়ে খুব ভাল ছিল না।

তবে মর্লি-র পকেটে তখন অর্থ যথেষ্টই ছিল। সূর্যাস্তের আগেও আর পকেট ছিল শূন্য। কিন্তু সূর্যোদয়ের পর তার পকেট রোজই ভর্তি থাকে।

সবার আগেই সে ম্যাডিসন এভিনিউতে ধর্মযাজকের বাড়ি গেল। জাল একটা পরিচয়পত্র

তার হাতে ধরিয়ে দেওয়া হল। হঠাৎ করে দেখলে মনে হয় ইন্ডিয়ানার এক ধর্মযাজকের দপ্তর থেকে সেটা বিতরণ করা হয়েছে। তবে পরিচয়পত্রটার দৌলতেই তার পাঁচটা ডলার আমদানি হয়ে গেল।

ধর্মযাজকের দরজার অদূরে একজন বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়ে। মোটাসোটা তার চেহারা। সে হঠাৎ এগিয়ে এসে ঘুষি তুলে বাজখাই গলায় গর্জে উঠে প্রচলিত দাবী অনুযায়ী তার প্রাপ্য ডলার চাইল।

মর্লি মিষ্টি মধুর স্বরে বলে উঠে, বার্গম্যান যে, তোমাকে এখানে দেখছি, ব্যাপার কি বল তো? হিসাবটা মিটিয়ে দেবার জন্য আমি নিজেই তোমার ওখানে যাব ঠিক করে রেখেছি। ঠিকানা ভুলের জন্য দেরী করে, মানে আজই মাসির পাঠানো ডলার পেয়েছি। ওই মোড়ের কাছে চল, তোমার প্রাপ্য বুঝে নেবে। তোমাকে পেয়ে যাওয়ায় বেশী হাঁটাহাঁটি করতে হল না।

রেস্তোরাঁয় ঢুকে চার ঢোক পাকস্থলিতে পড়তেই বার্গম্যান একেবারে বুঁদ হয়ে গেল, স্বর বদলে গেল। নিজে থেকেই সে বলল, মিঃ মর্লি, আগামীকাল আমার বাড়িতে একবারটি আসুন। আমার প্রাপ্যটা তখনই না হয় মিটিয়ে দেবেন। পথের ওপরে এমন আচরণ করার জন্য মার্জনা ভিক্ষা করছি। কিন্তু গত তিন মাসে যে আপনার মুখও দেখতে পেলাম না, যত্তসব ইয়ে!

মদে বুঁদ হয়ে জার্মানটা কয়েক পেগ গলায় ঢেলে সেখানেই পড়ে রইল। চোখে মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়ে তুলে মর্লি সেখান থেকে চলে গেল। বার্গম্যান যে ইদানিং উনত্রিশ নম্বর পথটা দিয়ে বাড়ি ফেরে এটা তার জানাই ছিল না। অতএব এবার থেকে এ পথটা বর্জন করতেই হবে।

মর্লি আর দুটো স্কোয়ার উত্তরে গিয়ে একটা অন্ধকার বাড়ির দরজায় টোকা দিল। দরজাটা ইঞ্চি ছয়েক ফাঁক হতেই আফ্রিকান এক নিগ্রোর কালো কদর্য মুখটা উঁকি দিল। সে মর্লিকে ভেতরে নিয়ে গেল।

তিনতলার একটা ঘরে ঢুকে জুয়া খেলার চাকার ওপর তাকে প্রায় দশটা মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। পর মুহূর্তেই তারা দু'জনে সিঁড়ি ভেঙে নামতে শুরু করল। মোটাসোটা নিগ্রোটা তাকে টপকে তাড়াতাড়ি নেমে গেল। পাঁচ ডলারের অবশিষ্ট চল্লিশ সেন্টের মুদ্রাগুলো মর্লি-র পকেটে থেকে ঠুনঠুন শব্দে বাজতে লাগল।

মোড়ের কাছে যেতেই সে ঠিক করে উঠতে পারল না কোনদিকে যাবে, কোন দিকে যাওয়া দরকার। বাধ্য হয়ে সেখানে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। পথের বিপরীত দিকের ওষুধের দোকানটার দিকে মর্লি একটা ছেলেকে হেঁটে এগোতে দেখল। লক্ষ্য করল, তার হাতের মুঠোতে কিছু একটা শক্ত করে ধরা।

মর্লি মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলে তার পথ আগলে দাঁড়াল।

ছেলেটা বলল, সরে যান, আমাকে যেতে দিন। ওষুধ কেনার জন্য এটা দিয়ে পাঠিয়েছেন।

ভাল কথা। আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। পথ পেরোতে গিয়ে গাড়ি চাপা পড়তে পার। পথে যাবার সময় লেমন ড্রপ, নাকি চকোলেট, কি খাবে বল তো?

ছেলেটা ওষুধের দোকানের কর্মচারীর হাতে প্রেস্ক্রিপশন দিল। আর ডলারটাও তার দিকে এগিয়ে দিতেই মর্লি চোখে-মুখে শয়তানের হাসি ফুটিয়ে তুলে কর্মচারীটাকে বলল, এক পাঁইট একোয়া পিউরা দেবেন। তার সঙ্গে দশ গ্রেন সোডিয়াম ক্লোরাইড মিশিয়ে দেবেন। দেখবেন মশায়, ঠকাতে চেষ্টা করবেন না যেন, এসব জিনিস আমার ভালই জানা আছে।

দোকানের কর্মচারী মর্লি-র হুকুম মাফিক মিশ্রণটা তৈরি করে তার হাতে দিয়ে বলল, পনেরো সেন্ট দাম। ওষুধপত্রের দাম আপনার নখদর্পণে বুঝতেই পেরেছি তবে এক ডলারের কমে কেউই দেবে না, জানবেন।

মর্লি ওষুধের দোকানের কর্মচারীর হাত থেকে বোতলটা নিয়ে ছেলেটার হাতে তুলে দিয়ে বলল, বোতলটা শক্ত করে ধর। গাড়ি ঘোড়া দেখে রাস্তা পার হবে। মোড় পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে পিছন ফিরল।

ওষুধের দোকানের কর্মচারীটা ওষুধের দাম পনেরো সেন্ট কেটে রেখে যে পঁচাশি সেন্ট ফেরৎ দিয়েছে সেটাকে কোটের পকেটে চালান দিয়ে মর্লি হাঁটা জুড়ল।

মর্লি হাঁটতে হাঁটতে পথের ধারে একটা রেস্তোরাঁ দেখে সেখান ঢুকে পড়ল। গরুর মেরুদণ্ড

আর কম দামী মদ নিয়ে সেগুলোর সদ্ব্যবহারে মেতে গেল। মাংসের হাড় চিবোতে চিবাতে সে রেস্তোরাঁর পরিবেশক যুবকটাকে লক্ষ্য করে হেসে বলল, 'ওহে, তুমি কি জান, তিন ধরনের মানুষকে সহজেই ঠকানো সম্ভব।

একটু বেশী রকম বকশিস পাওয়ার লোভে রেস্তোরাঁর কর্মচারী যুবকটা মর্লির বক্তব্য সমর্থন করে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, অবশ্যই সম্ভব স্যার, আগস্ট মাসে দক্ষিণের দেশ থেকে শুকনো মালপত্র খরিদ করতে যারা আসে, আর স্ট্যাটেন দ্বীপ থেকে যারা হনিমুন সারতে আসে, আর যারা—'

ওহে, তোমার ধারণা ভুল। নিউইয়র্ক ও লং আইল্যান্ড থেকে যতদূর পর্যন্ত সাঁতরে পাড়ি দেওয়া সম্ভব—পুরো অঞ্চলটাই অনভিজ্ঞ কাঁচাবুদ্ধি ছেলেমেয়েতে ভর্তি, মনে রেখো।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে মর্লি পথে নামল। সামান্য এগিয়ে দুটো পথের সংযোগস্থলে গিয়ে পকেটে হাত গলিয়ে দেখল, মাত্র একটা ডাইস পড়ে রয়েছে। এবার পথচারী জনতার দিকে দৃষ্টি ফেরাল। আপন মনে বলে উঠল, এ জনসমুদ্রে আমি জাল ফেলব। আর বেঁচে বর্তে থাকার মত মাছ জালে ধরা পড়বেই পড়বে।

মর্লি যখন আপন ভাবে বিভোর ঠিক তখনই চারজনের একটা দল, দু'জন নারী আর দু'জন পুরুষ আচমকা হুড়মুড় করে তার ওপর পড়ল। সবাই তাকে ঘিরে ধরে সোল্লাসে নাচানাচি শুরু করে দিল। তাকে ধরে বলল, তাদের সঙ্গে তাকেও যোগ দিতে হবে।

কাতর স্বরে মর্লি বলল, আমাকে আপনারা ক্ষমা করবেন। আপনাদের সঙ্গে থেকে আনন্দ স্ফূর্তি করে কাটাতে আমারও খুব ইচ্ছে করছে। আসলে নিউইয়র্ক ইয়টি ক্লাবের ক্যারুথার্স ঠিক আটটায় আমাকে নিয়ে যেতে মোটরগাড়ি নিয়ে আসবে।

ঠিক তখনই সাদা দাড়িওয়ালা বে-মাপের স্যুট-কোট পরা এক বুড়ো ভিড় ঠেলে মর্লি-র সামনে এসে দাঁড়াল। সে বলল, 'আপনি অপরিচিত। তবু আপনাকে বিরক্ত করতে বাধ্য হচ্ছি। মার্জনা করবেন। স্নোদার্স নামে কাউকে আপনি চেনেন কি? সে আমার ছেলে। তার খোঁজে আমি এলেনভিল থেকে ছুটে এসেছি।

মর্লি ভ্রূ দুটো কুঁচকে বলল, কই, এ নামের কাউকে আমি চিনি না। আপনি বরং পুলিশের শরণাপন্ন হোন, কাজ হবে।

আমি এসেছি আমার ছেলে বেন-এর সঙ্গে দেখা করতে ; পুলিশের দরজায় ধর্না দিতে যাব কেন? সে চিঠিতে লিখেছে পাঁচতলা একটা বাড়িতে থাকে। অতএব আপনি যদি তাকে চেনেন, মোটাসোটা, গায়ের রং তামাটে, উনচল্লিশ বছর বয়স। প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা আর সামনের দুটো দাঁত বেশ উঁচু, বেরিয়ে থাকে, চেনেন কি? মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে নিয়ে মর্লি এবার বলে উঠল, 'স্নোদার্স? হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে, সে তো আমার ঠিক পাশের বাড়িটায়ই থাকে।

মর্লি তার ঘড়িটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে স্বগতোক্তি করল, ঘড়ি একটা একান্ত দরকার। এক ডলারের বিনিময়েই ওটা মেলে। উপোষ করে থাকব তাও ভাল, তবু পিতলের তৈরী জিনিসটা বা রেলের লোকজন যেটা দেখে কাজ করে সে জিনিসটা ছাড়া আর চলছে না।

এবার বুড়ো লোকটাকে লক্ষ্য করে বলল, দেখুন, ঠিক আটটায় লং আইল্যান্ডের বিশপের সঙ্গে আমার দেখা করার কথা ছিল। আমরা এক সঙ্গে রাতের খাবার খাব। আবার বন্ধুবর স্নোদার্স-এর বাবাকেও তো ফেলে রেখে যাওয়া উচিত হবে না। ঈশ্বর সাক্ষী, আমাদের মত ওয়াল স্ট্রীটের লোকদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পেটের ভাত জোগাড় করতে হয়। তাই আপনি আমার সঙ্গে চলুন, পৌঁছে দিচ্ছি। তবে গাড়িতে ওঠার আগে আমার সঙ্গে যদি সামান্য কিছু খাওয়া দাওয়া করেন তবে বড়ই খুশি হব।

ম্যাডিসন স্কোয়ার। এক ঘণ্টা বাদে সেখানকার নির্জন অঞ্চলে একটা বেঞ্চের ওপর মর্লিকে বসে থাকতে দেখা গেল। তার দু'ঠোঁটের ফাঁকে পঁচিশ সেন্ট দামের একটা চুরুট আর কোটের ভেতরের পকেট থেকে দোমড়ানো মোচড়ানো একশ' চল্লিশ ডলারের কিছু বিল নিজেদের উপস্থিতি জানান দিচ্ছে। তার চোখে মুখে আত্মতুষ্টির ছাপ। আর প্রায় বিধ্বস্ত চেহারার একটা বুড়ো বেঞ্চটার বিপরীত ধারে বসে। তার পোশাক আশাক আর চেহারায় দারিদ্র্যের ছাপ সুস্পষ্ট।

একটু বাদে বুড়োটা মর্লি-র দিকে তার হাড় সম্বল হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে একটা ডাইস বা কয়েকটা পেনি ভিক্ষা চাইল। মর্লি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে একটা ডলার তার হাতে দিল।

বুড়োটা আশীর্বাদ করল। তারপর ক্ষীণস্বরে বলল, মশাই, একটা চাকরির জন্য কত জায়গায় যে ধর্না দিচ্ছি।

চাকরির কথাটা কানে যেতেই মর্লি সরবে হেসে বুড়োটার উদ্দেশ্যে বলল, চাকরি কোথায় পাবেন, দেবেই বা কে? পৃথিবীটা পর্বতের মত দৃঢ়। আঘাতে আঘাতে সব কিছু ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে হবে। আমি পেরেছি। তাই পৃথিবীর কাছে আমি যা চাই বিমুখ করে না।

আপনার বরাত ভাল। পরম পিতার কৃপালাভে ধন্য। আমি সারাটা জীবন কাজ ছাড়া অন্য কোন কিছুই চিনিনি। কিন্তু এখন কোন কাজই জোটাতে পারছি না।

মর্লি বেঞ্চ ছেড়ে উঠতে উঠতে বলল, কিছু মনে করবেন না, এখন আমাকে উঠতে হবে। চুরুটটার সদ্ব্যবহার করতেই এখানে একটু বসেছিলাম। আশা করি একটা কাজ ঠিকই জোগাড় হয়ে যাবে।

বুড়োটা হাতের ডলারটার দিকে একবারটি চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, এ দয়ার প্রতিদান আজ রাতেই যেন আপনি পেয়ে যান। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে মর্লি বলল, আপনার বাঞ্ছা তো পূর্ণ হয়েছে। আর আমার কথা? আমার বিশ্বাস, সৌভাগ্য পোষা কুকুরের মত সর্বক্ষণ আমার পিছন পিছন ঘোরে। আজ জ্যোৎস্নালোকিত রাতটা আমি ওই ঝলমলে হোটেলটাতেই কাটাব। বিদায়!

মর্লি হোটেলটার উদ্দেশ্যে পা বাড়াল। সামনে একটা পুলিশকে দেখে সে মুচকি হাসল। পুলিশটাও মুখে অনুরূপ হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে নীরবে তার হাসির জবাব দিল। চাঁদটাকে কী সুন্দরই না দেখাচ্ছে!

তখন ঠিক ন'টা বাজে। এক বয়স্কা মহিলা ব্যস্ত পায়ে মোড়ে পৌঁছে গাড়ির অপেক্ষায় উসখুস করতে লাগল। বাড়ি ফেরার দেরী হওয়ার জন্যই হয়ত তার এমন ব্যস্ততা। পরনে অতি সাধারণ পোশাক, নিষ্পাপ চোখের চাহনি।

তাকে চিনতে মর্লি-র অসুবিধা হল না। আট বছর আগে স্কুলে এর সঙ্গে একই বেঞ্চে বসত। তখন তাদের মধ্যে কেবলমাত্র বন্ধুত্বই ছিল, অন্য কোনরকম অনুভূতি, অন্য কোন সম্পর্কের ব্যাপার ছিল না।

সে ঝটপট মোড় ঘুরে পাশের রাস্তাটার এক নির্জন জায়গায় গিয়ে প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, 'হায় ভগবান! আজ যদি আমার মৃত্যু হত? মৃত্যু আমাকে অনেক বেশী শান্তি দিতে পারত!'

দ্য সোস্যাল ট্রাঙ্গেল

আইকে স্নিগলফ্রিজ একটা দর্জির দোকানে শিক্ষানবীশ হিসাবে আছে। ছ'টা বাজতেই সে হাত থেকে ইস্ত্রিটা নামিয়ে যথাস্থানে রেখে দিল। সে সারাটা দিন দুর্গন্ধময় দোকানটায় পরিশ্রম করে। কিন্তু কাজ শেষ হতে না হতেই সে চম্পট দেয়।

মালিক শনিবার রাত্রে তার হাতে বারোটা ডলার দিল। ডলার কটা পকেটে চালান করে দিল। এবার সে ঝটপট হাত-মুখ ধুয়ে নিজের ধান্ধায় বেরিয়ে আদর্শের খোঁজে গেল। কাজকর্মের শেষে প্রত্যেকেরই তো উচিত নিজের আদর্শের খোঁজ করা। সেটা ভালবাসা বা পুরনো বইয়ের গাদার নীরবতা, যা-ই হোক না কেন।

আইকে কাফে ম্যাগিন্সি নামক বিখ্যাত রেস্তোরাঁটায় হাজির হল। বিখ্যাত বলার কারণ এই যে, তার মতে বিলি ম্যাকমাহান বিশ্বের আশ্চর্যতম ব্যক্তির আশ্রয়স্থল এটাই। তিনি জেলার একজন সবচেয়ে বড় নেতা।

আইকে রেস্তোরাঁয় পা দেওয়ামাত্র ম্যাকমাহান উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। সাকরেদরা তাঁকে ঘিরে

বসে। মনে হল শক্তিমান বিজয়ীর ছাপ তার দেহে ও মুখে। আর সাকরেদরা এমনভাবে তাঁকে ঘিরে বসে যেন সদ্য একটা নির্বাচনের পাট চুকেছে। আর তিনি স্মরণীয় জয়লাভে ধন্য। ব্যালট বক্সের দৌলতে শহরের বুকে আবার সুস্থিরতা, স্বাভাবিকতা নেমে এসেছে।

আইকে কয়েক পা এগিয়ে তার আর দেবতার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকল।

বিলি ম্যাকমাহান রীতিমত সুদর্শন—খুবই সুন্দর তাঁর দেহসৌষ্ঠব। হাতে হীরের আংটি জ্বলজ্বল করছে। এমন সুন্দর কণ্ঠস্বরে কথা বলল মনে হয় যেন বিউগল্ বাজছে। চালচলন অবিকল রাজার মত। টাকার কাড়ি, ঠিক যেন নরশ্রেষ্ঠ নরপতি। সহকারী সাকরেদদের প্রতি তাচ্ছিল্যের ভাব প্রদর্শন করলেও আইকে-র চোখের তারায় তার যে গৌরবদীপ্ত মুখমণ্ডলের ছায়া ফুটে উঠেছে তার ব্যাখ্যা ভাষার মাধ্যমে দেওয়া সম্ভব নয়।

সাদা-পোশাক পরিহিত কর্মচারীরা মদ পরিবেশনে ব্যস্ত। অভয় মুদ্রায় বিলি ম্যাকমাহান হাত নাড়তে লাগল। আর এতে হঠাৎই আইকে-র মনে নির্ভিক অনুভূতির সঞ্চার হল।

মান্যবর ম্যাকমাহান-এর কাছে এগিয়ে গিয়ে ভক্ত আইকে তার দিকে হাতটা এগিয়ে দিল।

ম্যাকমাহান হাত বাড়িয়ে আইকে-র হাতটা চেপে ধরে সানন্দে করমর্দন করল। তারপর বলল, তোমার বন্ধুদের নিয়ে আমার সঙ্গে একটু মদ খাও, আপত্তি আছে? আর একটা কথা, আমি কর্তব্য কর্ম শুরু করলে তোমরা যেন কিছু মনে কোরো না।

আইকে-র যুক্তি-বুদ্ধি কেমন মিইয়ে গেল।

পরিবেশক তিনটে বোতল টেবিলে রেখে গেল। তিনটে বোতলেরই ছিপি খোলা হল। বিলি ম্যাকমাহান নিজের পেয়ালাটা হাতে তুলে নিয়ে আইকে-র দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। সাকরেদরাও হাতে পেয়ালা তুলে নিয়ে সশব্দে চুমুক দিতে ব্যস্ত হল।

পুরো সপ্তাহের বেতন হাতে নিয়ে, মুঠো করে বলের মত তৈরি করে আইকে পরিবেশকের দিকে ছুঁড়ে দিল।

পরিবেশক বেচারা এক ডলারের বারোটা নোটের ভাঁজ খুলে গোছগাছ করে ম্যাকমাহানকে লক্ষ্য করে বলল, ঠিক আছে।

ম্যাকমাহানকে ঘিরে আরও বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ চারদিকে দাঁড়িয়ে পড়ল। একটু বাদেই আইকে হলঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

আইকে এবার সোজা বাড়ি গেল। ঘরে ঢুকতেই তার মা আর ভূতের মত কালো বোন তিনটে বেতনের ডলারগুলো হাতড়ে নেওয়ার জন্য তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সব কথা খোলসা করে বলার পর তারা তাকে যা ইচ্ছে তা-ই বলে গালমন্দ করতে লাগল। তাকে মারধোর করতেও তারা ছাড়ল না। আইকে কিন্তু মদের নেশায়ই বুঁদ হয়ে পড়ে রইল। মদ তাকে যা দিয়েছে তার তুলনায় মাইনের ডলারগুলো উড়ে যাওয়া আর মেয়েমানুষের মুখে গাধার কণ্ঠস্বরের মত স্বরে গালাগালি শোনার চেয়ে অনেক অনেক ভাল। তার ওপর ম্যাকমাহান-এর মত লোকের সঙ্গে সে করমর্দন করেছে, এ কী সাধারণ ব্যাপার!

ম্যাকমাহান-এর বৌ ছিল একটা। তার ভিজিটিং কার্ডে 'মিসেস উইলিয়ম ডারাম ম্যাকমাহান' নামটা ছাপানো হত।

আর ম্যাকমাহান? রাজনীতির ক্ষেত্রে সে একজন হোমরা-চোমরা, কর্তাস্থানীয় ব্যক্তি। তার অনুগামীরা তাকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে যথেষ্টই। দিনের পর দিন ধনকুবেরে পরিণত হচ্ছে। ডলারের পাহাড়টা ক্রমেই উঁচু হচ্ছে। কম সে কম ডজনখানেক সাংবাদিক প্রতিনিয়ত তার পিছনে ঘুরঘুর করে। চাবুকের আঘাতে জর্জরিত, কুঁকড়ে যাওয়া বাঘের ছবি ছেপে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। অতএব তার প্রভাব প্রতিপত্তি সম্বন্ধে ধারণা দেওয়ার জন্য আর বিশেষ কিছু বলার দরকার আছে বলে মনে করি না। এহেন ম্যাকমাহান-এর মনের কোণে একটা যন্ত্রণা প্রায়ই চাঙ্গা হয়ে ওঠে। একদল মানুষকে সে সর্বদা সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে চলে। কিন্তু তাদের কাছেই বুঝি তার বহু আকাঙ্খিত স্বপ্ন সাধের রাজ্য গচ্ছিত আছে। তাদের মধ্যেই আছে তার আদর্শ। যেমন আইকে-র মধ্যে যে আদর্শের অভাব লক্ষ্যিত হয়। আর সে আদর্শের অভাব বশতঃ তার মন-প্রাণ মাঝে-মধ্যেই বিষিয়ে ওঠে। মুখে ফুটে ওঠে অসন্তুষ্টির ছাপ।

বিলাস বহুল একটা হোটেলে অভিজাত সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক নামী-দামী মানুষের সমাবেশ ঘটেছে। সে হোটেলেরই সুসজ্জিত হলঘরটার একটা টেবিলে ম্যাকমাহান এবং তার স্ত্রী বসে। তার বৌয়ের গায়ের হীরে জহরতের গহনার অত্যুজ্জ্বল আভার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামার মত কেউ-ই এখানে নেই। পরিবেশক সবচেয়ে দামী মদ তাদের পরিবেশন করল। কেবল তার বৌয়ের কথাই বা বলি কেন? ম্যাকমাহান-এর রাতের পোশাকের সঙ্গে টেক্কা দেয় এমন কেউই হোটেলের হলঘরে উপস্থিত নেই।

বছর ত্রিশেক বয়সের একটা লোক চারটে টেবিলের পরের টেবিলটায় একা, গোমড়ামুখে বসে। ছিপছিপে তার গড়ন, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখের মণি দুটোতে গভীর চিন্তার ছাপ আর হাত দুটো অস্বাভাবিক সরু, লিকলিকে কাঠির মত। সে একাই রাতের খাবার খাচ্ছে। তবে তাকে গরীব বা মধ্যবিত্ত ভাবলে কিন্তু ভুলই করা হবে। আশি লক্ষের মালিক। আবার উত্তরাধিকার সূত্রে সমাজের বিশেষ একটা পদ দখল করে রয়েছে। নাম তার কোর্টল্যান্ড ভ্যান ডুইকিংক।

এবারই ম্যাকমাহান জীবনের সবচেয়ে অবাক কাণ্ড, নির্বোধের মত কাজটা করে ফেলল। হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে কোর্টল্যান্ড-এর টেবিলের কাছে গিয়ে করমর্দনের জন্য হাতটা বাড়িয়ে দিল। তারপর বলল, মিঃ ভ্যান ডুইকিংক, শুনেছি আপনি নাকি প্রচার করে চলেছেন আমার জেলার গরীবদের মধ্যে কিছু সংস্কারমূলক কাজে হাত দিচ্ছেন? শুনুন, আমার নাম ম্যাকমাহান। আপনার অভিলাষ যদি সত্য হয় তবে আমার সার্বিক সহযোগিতা আপনি আশা করতে পারেন।

ম্যাকমাহান-এর হাতটা জড়িয়ে ধরে কোর্টল্যান্ড বলল, মিঃ ম্যাকমাহান, আপনার মহানুভবতার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি ঠিকই শুনেছেন বটে। সত্যি আমি এরকম কিছু কাজ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করছি। আর আপনার সাহায্য পেলে আমি যারপরনাই খুশিই হব।

ম্যাকমাহান নিজের চেয়ারে ফিরে এল। রাজার প্রদত্ত সম্মানের ভারে ঘাড়টায় যেন একটা বোঝা চেপে রয়েছে মনে হল। প্রশংসা ও ঈর্ষাকাতর প্রায় একশ' চোখের দৃষ্টি তার ওপর নিবদ্ধ। আর মিসেস ম্যাকমাহান যেন উৎসাহ উত্তেজনায় তিরতির করে কাঁপছে। হলঘরের প্রতিটা টেবিলের মানুষগুলো গর্ববোধ করছে যে, ম্যাকমাহান-এর সঙ্গে তাদের আলাপ পরিচয় আছে।

আঙুলে ইশারা করে ম্যাকমাহান পরিবেশককে ডেকে নির্দেশ দিল, সবাইকে ভাল মদ পরিবেশন কর। সব দাম আমি দেব। এক নম্বর মদ দেবে, বুঝলে?

পরিবেশক মনে সাহস সঞ্চয় করে গলা নামিয়ে বলল, দেখুন, এ হোটেলের প্রচলিত নিয়ম ও মর্যাদার কথা বিবেচনা করে আপনার হুকুমটা মানা হয়ত বোকামিই হবে। তাই বলছিলাম কি—

ঠিক আছে। তবে এক কাজ কর, আমার বন্ধুবর কোর্টল্যান্ডকে এক বোতল দাও,আশা করি এটা নিয়মকানুন বহির্ভূত নয়? পরিবেশককে নীরব দেখে ম্যাকমাহান এবার বলল, এতেও আপত্তি আছে? তবে আজ এখানে মদের বন্যা বইবে। রাত্রি দুটো পর্যন্ত যারা এখানে থাকবে তাদের জন্য দরজা খোলাই থাকবে, আমার সাফ কথা।

কোর্টল্যান্ড-এর সঙ্গে ম্যাকমাহান করমর্দন করেছে, কম কথা! তার বুকে আজ খুশির জোয়ার বয়ে চলেছে।

ঠেলাগাড়ি আর ময়লা আবর্জনার স্তূপের গা দিয়ে নিম্ন পূর্বাঞ্চলের পথ ধরে এগিয়ে যাওয়া গাড়িটাকে একেবারেই বেমানান মনে হচ্ছে। গাড়ির যাত্রী কোর্টল্যান্ড। তার মুখে আভিজাত্যের ছাপ সুস্পষ্ট। তার পাশেই অবস্থান করছে মিস কনস্টান্স শুইলার। ছেড়া জামাকাপড়ে কোনরকমে লজ্জা নিবারণ করে যুবকের দল পথ পাড়ি দিচ্ছে।

মিস শুইলার চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পথচারী যুবকদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই কথাগুলো ছুঁড়ে দিলেন, কোর্টল্যান্ড, মানুষকে এরকম চরম দারিদ্র্যের মধ্যে দিনাতিপাত করতে হয়, কী মর্মান্তিক ব্যাপার, তাই না? আর তুমি যে তাদের ব্যাপারে ভাবনা-চিন্তা করছ এটাকে তোমার মহত্ব বলতেই হয়। তুমি অকাতরে অর্থ ব্যয় করে তাদের অবস্থার উন্নতি করাকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছ।

অধিকতর দুঃখের সুরে কোর্টল্যান্ড বলল, আমি আর তাদের জন্য কতটুকু করতে পারছি। ধরতে গেলে কিছুই না। কাজটা আসলে বিশাল। তাই সমাজের সবাই কাঁধ না লাগালে এ মহান ব্রত সম্পূর্ণ করা অসম্ভব, তবে ব্যক্তিগত প্রয়াসকেও তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এ সদর রাস্তার মোড়ে মোড়ে কতকগুলো রান্নাঘর তৈরীর পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করছি। সেখান থেকে কোন অভুক্ত মানুষকেই ফিরিয়ে দেওয়া হবে না। আর নিম্নাঞ্চলের জঞ্জাল আর দুর্গন্ধময় পরিবেশের কাঁচা বাড়িগুলো ভেঙে বহু নতুন বাড়ি তৈরী করব।

মোটর গাড়িটা এবার ডিলাস্মিতের পথ বেয়ে এগিয়ে চলল। একদল সহায় সম্বলহীন শিশু যাদের চুল তেলের ছোঁওয়া পায় নি দীর্ঘদিন, হাত মুখে জল ওঠে না, আর নগ্ন পায়ে দিনের পর দিন ঘুরে বেড়ায়, তাদের দেখা গেল।

হেলে পড়া একটা দেওয়ালকে ভালভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য কোর্টল্যান্ড গাড়ি থেকে নামল। জীর্ণদেহী এক যুবক পথের ধারে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। সে যেন ভাঙাবাড়িটার প্রতীক হয়ে সেখানে অবস্থান করছে।

কোর্টল্যান্ড গাড়ি থেকে নেমে হঠাৎ তার একটা হাত ধরে সমবেদনার সুরে বলল, 'বাছা, তোমাদের দুঃখ-দুর্দশা, অভাব অভিযোগের কথা জানার জন্যই এখানে ছুটে এসেছি। তোমাদের জানতে, তোমাদের বুঝতে চাই। সাধ্যমত তোমাদের সাহায্য করার ব্রতই আমি গ্রহণ করেছি। এ মুহূর্ত থেকে আমরা পরস্পরের বন্ধু, কাছের মানুষ, আপনজন'।

এক অনাবিল আনন্দে কোর্টল্যান্ড-এর বুক ভরে উঠল। তার অন্তরের অন্তঃস্থলে বয়ে চলেছে আলোর বন্যা। সে যেন অকস্মাৎ একজন মুখ্য মানুষে পরিণত হয়েছে। কেন? সে যে আইকের সঙ্গে করমর্দন করেছে, হাতে হাত মিলিয়েছে।

দ্য ফরেন পলিসি অব কোম্পানি ৯৯

জন ব্রাইন্স ইঞ্জিন কোম্পানি নম্বর ৯৯-এর জলের গাড়ির চালক। সে এমন এক রোগে আক্রান্ত হয় যার নাম জাপানাইটিস। ব্রাইন্স ইঞ্জিন রুমের দোতলার একটা টেবিলের ওপর একটা মানচিত্র সর্বদা স্থায়ীভাবে খুলে রাখে। আর দিনে বা রাত্রের যে কোন সময় জাপানি এবং রুশ উভয় সৈন্যদলের কে, কোথায় অবস্থান করছে, কে কেমন অবস্থায় আছে আর কার কোন অভিপ্রায় তা-ও ভালভাবে বুঝিয়ে দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব। একটা পিনকে মানচিত্রের গায়ে গেঁথে সে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের অবস্থান নির্দেশ করে। আর প্রতিদিন খবরের কাগজে লড়াইয়ের খবর পড়ে। ঠিক সেমতই রোজ পিনগুলোকে সরিয়ে যথাস্থানে এঁটে দেয়।

জাপানিরা যেখানেই যুদ্ধে জয়ী হয় সেখানেই পিনগুলোকে সরিয়ে দিয়ে জন ব্রাইন্স খুশিতে ডগমগ হয়ে ধেই ধেই করে যুদ্ধের নাচ নাচতে আরম্ভ করে। তার উল্লাস আর হেড়ে গলার হম্বিতম্বি দমকল বাহিনীর অন্য কর্মীরা শুনতে পায়, 'বাঁদরমুখো', 'নাককাটা নচ্ছাড়ের দল', কেমন বুঝছিল, এবার হল। আর তোরা? শক্ত হাত আর বাঁকা পাওয়ালা বুল-টেরিয়াররা, তাদের এক-একটাকে কপ করে গিলে খা গে, পিছুন পিছুন তাড়া করগে। তারপর সেন্ট পিটার্সবুগ গিয়ে গলা অবধি ঠেসে মদ গিল গে—যা।

মিকাডোর সৈন্যদের এমন এক দরদী ও নির্ভেজাল সমর্থক নিপ্পনদের নিজেদের দেশেও মেলা ভার। রুশদের পক্ষের কেউ ভুলেও ইঞ্জিন হাউস নম্বর ৯৯-এর চৌহদ্দিতেও আসে না।

মাঝে-মধ্যে কোথাও অগ্নিকাণ্ড ঘটলে তাতে জন ব্রাইন্সকে গাড়ির চালকের আসনে বসতে হয়। তখন জাপানিদের চিন্তা তার মাথা থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

সহকর্মীদের প্রতি নিজ কার্য-নিয়ন্ত্রণের যতগুলো নিয়ম কানুন মেনে চলে সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, রাজা আর্থার-এর গোল টেবিলের আচার ব্যবহারাদি, নিউইয়র্ক দমকল

বাহিনীর অলিখিত নিয়ম কানুনগুলি আর যুক্তরাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র। আমাদের রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র? সে তো প্রতি মুহূর্তেই গঠনতন্ত্র বিরোধী হয়ে উঠছে। তাই তো সবার আগে আমাদের দমকলবাহিনীর নিয়মগুলোকে বিবেচনা করা প্রয়োজন। গঠনতন্ত্রে আছে, দু'জন মানুষের মধ্যে কিছুমাত্রও পার্থক্য নেই। দমকল বিভাগ কিন্তু নিজেকেই শ্রেষ্ঠ বলে দাবী করে। মন্তব্যটা বড্ড উদার, কিন্তু তো সেগুলোর পরিবর্তন মেনে নেবে না।

একসময় এলিস দ্বীপে আটলান্টিক মহাসাগরের ওপর দিয়ে পাড়ি দেওয়ার সময় একটা জাহাজ প্রোটোজোয়ার একটা মণ্ড ফেলে গিয়েছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল, একদিন না একদিন সেটা থেকেই একজন আমেরিকান নাগরিকের জন্ম হবে। এক ডাক্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখে নিল তার চোখের কোন ব্যামো আছে কিনা, এবার জাহাজের কর্মী সজোরে একটা লাথি মেরে নিচে ফেলে দিল। তাকে মুক্তির নামে দ্বীপে ফেলে দিয়ে জাহাজ এগিয়ে গেল। ইওরোপীয় সভ্যতার সে হাইপোডার্মিক ইক্‌জেকশন যেন খুশিভরা মন নিয়ে সর্বত্র গুটি গুটি ঘুরে বেড়াতে লাগল। আশা আকাঙ্খা, চিন্তা-ভাবনা বা বোচকা বুচকির ঝামেলা তার তিলমাত্রও ছিল না। বহিরাগত শিশুটার পকেটে মাত্র কয়েকটা মুদ্রা ছিল যা বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। জাহাজ থেকে তাকে যে দ্বীপভূমিতে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল তার জনকোলাহল আর সেখানকার অধিবাসীদের চলাফেরা তার মধ্যে খুশি-আনন্দের সঞ্চার করে। একদিন সে মনের সুখে হাঁটাহাঁটি করতে করতে ইঞ্জিন কোম্পানির নম্বর ৯৯-এর এলাকায় ঢুকে গেল। জনসমুদ্রের জোয়ারে হাল্কা শোলার মত ভাসতে ভাসতে শিশুটা এগিয়ে চলল।

পথ চলতে চলতে থার্ড এভিনিউ পার হতে গিয়ে সে মাথার ওপরের দ্রুতগামী ট্রেনের গুরুগম্ভীর আওয়াজ আর নিচের পথের গাড়ির খট্‌খট্‌ শব্দে মোহিত হওয়ায় সে চলার গতি অনেকাংশে মন্থর করে দিল। তারপরই তার নজরে পড়ে ঢং-ঢং শব্দে ঘণ্টা বাজিয়ে বিশালায়তন একটা গাড়ি চলে যাচ্ছে। সেটাকে দেখার জন্য দলে দলে মানুষ উদ্ভ্রান্তের মত ছুটে চলেছে।

নয়নাভিরাম মনোলোভা বস্তুটাকে একবারটি চোখে দেখার জন্য বহিরাগত ছেলেটা তার পিছন পিছন লম্বা লম্বা পায়ে ধেয়ে চলল। তার মুখে ফুটে উঠল হাসির ছোপ।

সে হাজির হয়ে গেল নম্বর ৯৯-এর কাছে। তার চালকের আসনে বসে জন ব্রাইন্স। 'জো' আর 'এরেবুস' নামক ঘোড়া দুটোয় লাগাম শক্ত করে ধরে রেখেছে।

দমকল বাহিনীর কর্মীদের অলিখিত নিয়মকানুনের কোনরকম পরিবর্তন বা সংশোধন সম্ভব নয়। ব্যাপারটা জলের মতই পরিষ্কার। বাধা বিঘ্নহীন পথে তারা চলতে পারে, তাদের অধিকার। দমকলের গাড়ি উল্কার বেগে ধেয়ে চলেছে।

স্টিয়ারিং-এর চাকার বাঁ দিকে জন ব্রাইন্স শরীরের সবটুকু শক্তি নিঙড়ে চাপ প্রয়োগ করল। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা হুড়মুড় করে লোকজনসহ বুকে কাঁপন ধরানো আওয়াজ তুলে পাশের থাম্বাটার ওপর আছাড় খেয়ে পড়ল। লোহার থাম্বাটা বিকট শব্দ করল। গাড়ির যাত্রীরা যে, যেদিকে পারল ছিটকে পড়ল আর জন ব্রাইন্স ফুট কুড়ি দূরে পথের ওপর আছড়ে পড়ল। আর 'এরেবুস' পা খুইয়ে পথে পড়ে ধুঁকে চলেছে।

ইঞ্জিন কোম্পানির নম্বর ৯৯-এর মানসিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে আমরা ঘটনাটার বিবরণটাকে কেটে ছেটে নিচ্ছি। সেদিনটার কথা কোম্পানি মন থেকে মুছে ফেলতেই আগ্রহী। যাক গে, চোখের পলকে সেখানে ভিড় জমে উঠল। খবর পেয়ে এম্বুলেন্স ছুটে এসে রাস্তা পরিষ্কারের কাজে মেতে উঠল। ঠিক তখনই নম্বর ৯৯-এর মানুষগুলো শুনতে পেল এস.পি.সি.এ-র পাণ্ডাদের পিস্তলের গুলি ছোঁড়ার শব্দ। প্রাণভয়ে তারা সেখান থেকে কেটে পড়ল। 'এরেবুস'-এর দিকে কেউ তাকাতেই সাহস করল না।

সে সব হতচ্ছাড়ার জন্য দমকলের মানুষগুলোর এ দুর্গতি তাকে লোকজন পাকড়াও করে টানা হেঁচড়া করে নিয়ে আসতে লাগল। তাকে মেঝেতে শুইয়ে দিয়ে তারা তাকে ঘিরে দাঁড়াল। ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক বস্তুটা হাত-পা নেড়ে নেড়ে কি যেন বোঝাতে চেষ্টা করছে।

মাইক ডাওলিং চোখে-মুখে বিরক্তির ছাপ এঁকে উৎকণ্ঠার সঙ্গে বলল, 'এ কী বিটকেলে শব্দরে বাবা! মাথাটা যে বিগড়ে দেবে! ওটা কি মানুষই, নাকি অন্য কিছু? ওটা তো দ্বীপবাসী

নয়, অবশ্যই বহিরাগত।

কেরানি তার বোটের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলল, তার কোটের গায়ের ডাক্তারি চিহ্নটা লক্ষ্য কর। সে সবে এ দ্বীপে নেমেছে। কোন না কোন বহুন, ফিন বা দাগো টাগো হবে, সে ধরনের হলেই তো জাহাজ থেকে দ্বীপে নামিয়ে দিয়ে চম্পট দেয়।

দমকল বাহিনীর অন্য এক কর্মী বলে উঠল, ভাবা যায়, হতচ্ছাড়াটা পথের মাঝখানে ছুটে আসার জন্যই ব্রাইন্স'কে হাসপাতালের সিটে শুয়ে যমের সঙ্গে পাঞ্জা কষতে হচ্ছে। এ শহরের সবচেয়ে ভাল দমকলের কর্মী-দলটাই ভেঙে তছনছ হয়ে গেল। হতচ্ছাড়াটাকে নিয়ে সমুদ্রের জলে ডুবিয়ে না মারলে আর চলছে না।

ইঞ্জিন চালক বলল, 'স্লোভিস্কিকে ডেকে আনা দরকার। সে এসে সনাক্ত করুক, নচ্ছাড়টা কোন দেশ থেকে রপ্তানী করা হয়েছে।

স্লোভিস্কি থার্ড অভিনিউর মোড়ের গায়ের এক দোকানের মালিক। বহুভাষা তার রপ্ত আছে এরকম প্রচার আছে।

স্লোভিস্কি এসে হতচ্ছাড়াটার কানের কাছে বিড়বিড় করে অবোধ সব স্বরে কি যেন বলল।

হতচ্ছাড়াটা কিছু বলতে অক্ষম। কাগজ কলম নিয়ে এসে সে তার বক্তব্য লিখে দিতে পারে। স্লোভিস্কি বলল।

কাগজ-কলম এনে বহিরাগত বালকটার হাতে দেওয়া হল। সে লিখল—'Demetre Svangvsk'

দোকানদার ঘাম মুছতে মুছতে বলল, 'তার ভাষাটা তুর্কি ভাষা মেশানো অস্ট্রিয়ান ভাষা। আর তার কথায় পোলিশ, ম্যাগিয়ার ও বেসে-রাবিয়ার নামক উপজাতীয় ভাষার শব্দও পাওয়া যায়।

তার কথা শুনে মাইক বলল, তুমি কি তবে তাকে পোলোকার, ডাগো, নাকি অন্য কোন দেশবাসী বলে মনে করছ?

স্লোভিস্কি কি জবাব দেবে ঠিক করে উঠতে না পেরে আমতা আমতা করতে পাগল। সব শেষে বলেই ফেলল, আমি কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না, এর চেয়ে বরং দোকানেই ফিরে যাচ্ছি।

মাইক বহিরাগত হতচ্ছাড়াটাকে টেনে হিঁচড়ে ইঞ্জিন বাড়ির দরজার কাছে নিয়ে গিয়ে কোম্পানি নম্বর ৯৯-এর যাবতীয় জমাটবাঁধা ক্ষোভ ও বিদ্বেষ হাল্কা করতে গিয়ে তার পাছায় দড়াম করে একটা লাথি মারল।

আর Demetre Svangvsk পাশের গলিটা দিয়ে যত শীঘ্র সম্ভব সেখান থেকে চম্পট দিল।

জন বাইন্স তিন সপ্তাহ হাসপাতালের বেডে পড়ে থাকার পর ছুটি পেয়ে বাড়ি ফিরল। কাজে যোগদান করল। এবার সে যুদ্ধের মানচিত্রটাকে যুদ্ধের বর্তমান পরিস্থিতিতে ফিরিয়ে আনতে মনোনিবেশ করল। সে স্বগতোক্তি করল, আমি সর্বদাই জাপদের পক্ষ অবলম্বন করে বাজি ধরি। ধ্যুৎ, রুশদের এক ঝলক দেখলেই তো বুঝে নেওয়া যায় তারা আসলে নেকড়ের পাল অন্য কিছু নয়। আমার পরামর্শ নাও, তাদের মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও, আর এসব বেটেখাটো জু-জিৎসুওয়ালারা জবর কঠিন, সে কথাটা সবসময় মনে রাখবে।

পরদিনও Demetre Svangvsk—নামের যথাযথ উচ্চারণ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সে মুখে মুচকি হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে ইঞ্জিন বাড়িতে উপস্থিত হল। সে কোনরকমে নিজের মনোভাব প্রকাশ করতে গিয়ে বলল, দমকলের গাড়ির চালক সুস্থ হয়ে স্বাভাবিকতা ফিরে পাওয়ায় তাকে সে শুভেচ্ছা জানাতে উৎসাহী আর দুর্ঘটনার জন্য দায়ী বলে ক্ষমাও প্রার্থনা করে। কাজটা সারতে গিয়ে সে এমন অদ্ভুত দৈহিক অঙ্গভঙ্গি করল আর এমন বিদঘুটে শব্দে উচ্চারণ করল যার জন্য আধঘণ্টার বেশী সময় পুরো কোম্পানিটার কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেল।

পরদিন সে আবার ঠোঁট টিপে হাসতে হাসতে এসে হাজির হল। সে কোথায় মাথা গুঁজেছে, আছেই বা কেমন কারোরই জানা নেই।

সেদিনই জন ব্রাইন্স-এর ন'বছরের ছেলে তার অসুস্থ বাবার জন্য পথ্য নিয়ে সেখানে এল। Demetre Svangvsk-এর সঙ্গে সহজেই পরিচয় হয়ে গেল। সে পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হতেও

দেরী হল না। সে তার অনুগত হয়ে পড়ল। তাই তাকে মাঝে মধ্যে ইঞ্জিন বাড়িতে ফটকের সামনে ঘোরাফেরা করার সম্মতি দান করা হল।

ডেপুটি ফায়ার কমিশনারের সুবিশাল গাড়িটা এক বিকেলে নম্বর ৯৯-এর প্রধান ফটকের সামনে এসে দাঁড়াল। ডেপুটি কমিশনার মশাই অনিয়মিত একটা তদন্তের দায়িত্ব পালন করতে ভেতরে ঢুকলেন। নবাগত বালকটাকে সেখানকার কয়েকজন কর্মী লাথি মারতে মারতে তাড়িয়ে দিল। এবার তারা ডেপুটি কমিশনারকে বাড়ির চারদিক ঘুরিয়ে দেখাল। সবকিছুই ঠিকঠাক আছে।

ফায়ার কোম্পানির কর্মীরা এরেবুস-এর মৃত্যুর জন্য যে মর্মাহত হয়েছে ডেপুটি কমিশনার তারও ভাগীদার হলেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি বললেন, 'জো'র আর একটা সঙ্গী জোগাড় করে দেবার জন্যই, অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি দিতেই আমাকে এখানে আসতে হল।

জো-র প্রসঙ্গ নিয়ে তারা যখন কথাবার্তায় ব্যস্ত সে অবসরে বালক ক্রিস ডেপুটি কমিশনারের গাড়ির চালকের সিটে বসে বন্‌বন্‌ করে চাকাটা ঘুরিয়ে দিল। গাড়ির ঘড় ঘড় শব্দ শুনে সবাই হন্তদন্ত হয়ে সদর দরজায় ছুটে আসতে আসতে মোটরটা উল্কার বেগে অনেকটা পথ এগিয়ে গেছে। বরাত ভাল যে, গাড়িটা সোজাই যাচ্ছে। গাড়ির কলকব্জা সম্বন্ধে ছেলেটার সামান্যতম জ্ঞানও নেই। সে কুশনটা সজোরে মুঠো করে ধরে গলা ছেড়ে চেঁচাতে লাগল। চলন্ত গাড়িটার গতি রোধ করতে হলে কোন পাকা বাড়ির সঙ্গে ধাক্কা মারা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আর এভাবে সেটাকে থামালে ক্রিস-এর একটা কানাকড়িও লাভ হবার নয়।

ক্রিস যখন এ বালকসুলভ কাজটা করে ঠিক তখনই সজোরে একটা লাথি খেয়ে গলা ছেড়ে হাসার জন্য Demetre Svangvsk সেখানে হাজির হল। অন্যান্যরা যখন লাফিয়ে সদর দরজার দিকে গেল Demetre তখন জো-কে লক্ষ্য করে সজোরে এক লাফ দেয়। দুম করে লাফিয়ে সে ঘোড়াটার পিঠে চেপে বসল আর ফিসফিস করে তাকে যেন কি সব বলল। দমকলের কোন এক কর্মচারী পরে শপথ করে বলেছে, জো-ও সে ভাষাতেই তার কথার উত্তরও দিয়েছে।

মোটরটা চলতে শুরু করার দশ সেকেন্ড পর দেখা গেল বড় ঘোড়াটা মিষ্টদ্রব্যের মত তার পিছন দিকটা পরম তৃপ্তিতে অনবরত চাটছে।

ব্যাপারটা যারা চাক্ষুষ করেছে তাদের বক্তব্য, বিকট একটা শব্দ ও ভেতরে ক্রিসের একটা কালো বিন্দু ছাড়া মোটরটার ভেতরে আর কিছুই দেখা যায় নি।

কয়েক মুহূর্ত পরই দেখা গেল একটা কালো ঘোড়া টিকটিকির মত কিছু একটাকে পিঠে নিয়ে জো-র পাশাপাশি ছুটছে। তারপরই টিকটিকির মত প্রাণীটা সজোরে এক লাফ দিয়ে ভেতরে ঢুকে কালো বিন্দুটাকে ওপরে উঠিয়ে নিল। ব্যস, এটুকুই তারা দেখেছে।

ইঞ্জিন কোম্পানি নম্বর ৯৯-র লাথি খাবার পনের মিনিট বাদেই Demetre জো-র পিঠে চড়ে সদর দরজাটা পেরিয়ে ভেতরে ঢোকে, ছেলেটাও তার সঙ্গে নির্বিঘ্নে ফিরে আসে।

Demetre মেঝেতে পা দিয়ে জো-র মাথাটা ঠেকিয়ে কর্কশ একটা স্বর করে ডেকে উঠল। জো-ও মহানন্দে নাক দিয়ে শিস দেওয়ার মত শব্দ করে হাঁপাতে লাগল।

জন ব্রাইন্স নবাগত বিদেশীর হাতটা খপ্‌ করে চেপে ধরে এমন জোরে মুঠো করে ধরল যাতে সে নতুনতর কোন শাস্তি মনে করে ঠোঁট টিপে টিপে হাসতে আরম্ভ করল।

দমকল কর্মীদের একজন ওয়াইল্ড ওয়েস্ট সিনেমাটা দেখেছিল। সে ছেলেটার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলল, নবাগত বিধর্মী ছেলেটা ঘোড়া চালায় ঠিক যেন কসাকের মত। আর পৃথিবীর সবচেয়ে দক্ষ ঘোড়সওয়ার তারাই।

কথাটা শোনামাত্র আগন্তুক ছেলেটার চাপা হাসি মুখ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। সে বুকে টোকা দিয়ে সগর্বে বলে উঠল, হ্যাঁ, আমি কসাকই বটে।

জন ব্রাইন্স চোখে মুখে চিন্তার ছাপ এঁকে তার কথাটাই বারবার বলতে লাগল, কসাক। কসাক! কসাকরা কি এক ধরনের রুশ নয়? কসাক।

কেরানি যুবকটা মন্তব্য করল, অবশ্যই। অবশ্যই! তারা রুশ উপজাতিগুলির মধ্যে সেরা। আন্ডারম্যান ফোলি ঘোড়দৌড়ের ব্যাপার স্যাপার কিছুই জানেন না। তিনি ইঞ্জিন বাড়ির সদর দরজায় দাঁড়িয়ে গলা ছেড়ে ডাকাডাকি শুরু করলেন, ব্রাইন্স! ব্রাইন্স!

জন ব্রাইন্সকে দেখে বলতে লাগলেন, এই যে, আরে যুদ্ধটা চলছে কেমন হে? আরে তোমরা কি এখনও ভালুকটার পিছন পিছন ধাওয়া করে বেড়াচ্ছ?

জন ব্রাইন্স বেশ একটু দৃঢ়তার সঙ্গেই বলল, ও সবের আমি কিছুই জানি না। তবে যেটুকু জানি, জাপরা আজ অবধি জয়লাভ করতে পারেনি। ধৈর্য ধরুন মশাই, কুরো পাৎকিন তাদের হাতে ভাল রকম একটা গুঁতো খাক। তখন দেখবেন, তারা একটা হাসের বাচ্চার সমানও হিম্মৎ রাখে না। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন।

দ্য কান্ট্রি অব এলুশন্

যার কোন উপযুক্ত সংজ্ঞা দেওয়া যায় না ঠিক সে রকমই একটা বিষয়বস্তু সুচতুর লেখকরা নির্বাচন করেন। এর সবচেয়ে বড় কারণ এক্ষেত্রে বিষয়বস্তুটা সম্বন্ধে তিনি নিজ মতবাদ ব্যক্ত করতে সক্ষম হন। আর তার পরে সেটা কি নয় সে ব্যাপারেও তার মনোভাবটাকে খোলাখুলিভাবে বলতে পারেন। আরে একী কাণ্ড! এতেই তো তার লেখার কাগজ অনেক ফুরিয়ে গেল। তাই নতুন ও দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে বোহেমিয়া যেতে আমরা সে পথটাকেই অনুসরণ করব।

গ্রেইঞ্জার, ড়ো'র সাময়িক পত্রের সহকারী সম্পাদক টুপিটা তুলে নিয়ে মাথায় চাপালেন। হেঁটে হলঘর পর্যন্ত অগ্রসর হলেন। নিচের তলায় যাবার জন্য বোতাম টিপে এলিভেটরের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলেন।

সাময়িক পত্রের সহকারী সম্পাদক গ্রেইঞ্জার-এর সময় ইদানিং খুবই খারাপ যাচ্ছে। তিনি পত্রিকাটাকে যখন যেভাবে চালাতে চাইছেন তাতেই বড় সাহেব বাদ সাধছেন, পত্রিকাটাকে বন্ধ করে দেওয়াই তার ইচ্ছা বলে মনে হচ্ছে। পিতামহ ম্যাকক্রেনার এমন এক মহিলার সঙ্গে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন যিনি মূর্তিমতী কবিতার রূপ নিয়ে সেখানে উপস্থিত।

গ্রেইঞ্জার ছিলেন সে সাময়িকীর কিউরেটার। মর্গের এক বিখ্যাত পরিচালক, এক মেরু আবিষ্কর্তা আর এক ছোটগল্প লেখকের সঙ্গে বসে তিনি সেদিনই মধ্যাহ্ন ভোজন সেরেছিলেন। তাই ট্রিসিটোনিস রোগ, মোপাসাঁ এবং ভাসমান বরফের টুকরো প্রভৃতি নিয়ে অন্তরের অন্তঃস্থল তোলপাড় হয়ে চলেছে।

তা সত্ত্বেও বোহেমিয়া গেলে আশ্রয় লাভ ও বিশ্রাম নিতে পারেন। সেখানেই তিনি স্বস্তি লাভ করতে পারেন। মেরি এড্রিয়ানা-র সঙ্গে তার দেখা হবে কিনা এটাই লক্ষণীয়। আধ ঘণ্টা পরেই তিনি হাঁটতে হাঁটতে আইডেলিয়া অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের সদর দরজায় পৌঁছে গেলেন। করনিক খুবই অনুচ্চ স্বরে গ্রেইঞ্জার-এর নামটা টেলিফোনে বলল। তবু মিস এড্রিয়ানা নামটা শুনে ফেললেন। মিঃ গ্রেইঞ্জারকে অবশ্যই তিনি পাঠিয়ে দেবেন।

কালো এক চাকরানি অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খুলে দিতে গ্রেইঞ্জার হলের সরু পথ-বেয়ে অগ্রসর হতে লাগলেন। দরজার ফাঁক দিয়ে একগোছা লালচে চুল আর এক জোড়া সবজে চোখের মণিকে উঁকি দিতে দেখা গেল। একটু বাদেই লম্বা খোলা হাত বেরিয়ে তার পথ আগলে বন্ধ করে দিল।

সবজে চোখের মালিক বলল, অন্য কারো পরিবর্তে তুমি আসায় যারপরনাই আনন্দিত হয়েছি। একটা সিগারেট ধরিয়ে আমার হাতে দাও। রাতের খাবার খেতে আমাকে নিয়ে যাবে তো? আমি পোশাক বদলে নিচ্ছি, পাশের ঘরে গিয়ে একটু বোসো। তবে তোমার নিজের চেয়ারটায় যেন বোসো না। সোকি বিশ্রাম করছে। ম্যান্টেলের ওপরে স্কচের বোতল আছে। সোকিকে বোলো নামিয়ে দেবে। শীঘ্রই পোশাক বদলে ফিরে আসছি।

চেয়ারটায় বসে থেকে থেকে গ্রেইঞ্জার অধৈর্য হয়ে উঠল। ঘরের বাতাস যেন বিসুভিয়াস-এর লাভাস্রোতের মত গরম, অসহ্য! একটা থালায় ভুক্তাবশেষ পড়ে রয়েছে যা চোখে পড়ামাত্র

গা-ঝাঁকি দিয়ে ওঠে। সিগারেটের ছাই আর ময়লা জড়ো করা মার্মালেডের ফুলদানিতে এক গোছা গোলাপ অগোছালভাবে এলিয়ে পড়ে রয়েছে। পিয়ানোটার ওপরে একটা প্লেট, চেয়ারের ওপরে স্বরলিপির পাতা খোলা। তার ওপরে কিছু স্যান্ডউইচ ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে।

চমৎকার একটা কালো গাউন পরে, সেজেগুজে মেরি ঘরে ঢুকল। তারা কাফে আঁদ্রে-তে যখন ঢুকল তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। আঁদ্রে শহরের নামকরা বোহেমিয়ান রেস্তোরাঁ।

অতএব তাঁদের কথা কিছু বলা যাক। দশ সেন্ট বেতনে একসময় খাবারের দোকানে আঁদ্রে তার চাকরি জীবন শুরু করেছিল। তখন তার চেহারা ছিল হাড্ডিসার। সেখানে কাজ করতে করতে সে কিছু ডলার জমায়। তা দিয়ে অষ্টম স্ট্রীটে একটা টেবিল পাতা হোটেল খুলে বসল। এক বিকেলে অল্প অল্প করে মাত্রা বাড়িয়ে গলা অবধি মদ গিলে ফেলল। বাড়ি ফিরে বিস্ময় বিমূঢ় স্ত্রীকে সে বলল, সে হচ্ছে তিব্বতের বড় লামা। তাই ভক্ত-শ্রোতাদের বসার জন্য একটু বড়সড় হলঘর তার দরকার হয়ে পড়েছে যেখানে ভক্তরা তার শ্রীমুখ নিঃসৃত অমৃতময় বাণী শুনবে, মাটিতে লুটিয়ে প্রণাম করতে পারবে। অতএব রেস্তোরাঁর হলঘরটার যাবতীয় টেবিল, চেয়ার আর টুল প্রভৃতি উঠোনে নিয়ে পাঁজা করে রাখল। আর ছোট মইটাকে টেবিল ক্লথে ঢেকে সিংহাসন তৈরি করল। তার ওপর নিজে পদ্মাসনে বসল। যথা সময়ে লোকজন মধ্যাহ্ন ভোজ সারতে রেস্তোরাঁর দরজায় ভিড় জমাল। অনন্যোপায় হয়ে সে ব্যস্ত হাতে চেয়ার টেবিল সাজিয়ে সবার বসার ব্যবস্থা করে দিল। আর নিজে উঠোনে দাঁড়িয়ে থরথরিয়ে কাঁপতে লাগল।

টেবিলগুলোর ফাঁকে ফাঁকে কাপড় টাঙিয়ে পরিবারের লোকজনের স্নানের জায়গা করে নেওয়া হল। তার এরকম কায়দা-কানুন দেখে বোহেমিয়ার একদল শিকারী খুশি হয়ে মালিকের বুদ্ধি কৌশলের তারিফ করতে লাগল। দুটো বছর তার তৈরি বাথরুমে কেউ-ই ঢুকল না। নেশার ঘোর কেটে গিয়ে স্বাভাবিকতা ফিরে পেলে মালিক খাবার মেনু কার্ড ছাপাল, ছোট ছোট বাটি করে খাদ্যবস্তু পরিবেশনের ব্যবস্থা করল। এভাবে চলতে চলতে তার মূলধন বেড়ে যখন বিশ হাজারে পৌঁছে গেল তখন সে ব্রডওয়ের অভিজাত অঞ্চলে রেস্তোরাঁটা নিয়ে গেল। তাকে ধনকুবের খদ্দেরদের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হল।

কাফে আঁদ্রের হলঘরের এক কোণে একটা গোল টেবিল রয়েছে, ছ'জন বসতে পারে। সেটার দিকেই গ্রেইঞ্জার মেরিকে মুখোমুখি বসাল। ক্যাপেলমান আর রীভস্ আগে ভাগেই সেখানে বসে। তার মিস টুকারও রয়েছে। তিনি লেডিজ নোটাথেস ম্যাগাজিন-এর সে-সংখ্যার প্রচ্ছদের পরিকল্পনায় আত্মমগ্ন। আর একটা চেয়ার দখল করে রেখেছেন যিনি স্বামীর বিয়োগশোকে শোকবস্ত্র পরিধান করলেও ভুলেও কোনদিন 'ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট' ছাড়া অন্য মদ ছুঁয়েও দেখেন না। এই দেখ! তার স্বামীর কথা তো বলাই হল না। তিনি এখন পরপারের বাসিন্দা। বিখ্যাত চিত্রশিল্পীদের আঁকা বহু মূল্য স্কেচ-চিত্র কাফে আঁদ্রে-র দেওয়ালগুলি ঢেকে রেখেছে। ছবির বিষয়বস্তু রূপসী যুবতীরা।

ক্লান্ত পাঠক-পাঠিকা আমার আন্তরিক ইচ্ছা, আমার বন্ধু এড্রিয়ানা-র পরিচিত হোন। মিসেস পটহান্টার আর মিস টুকার আগে থেকেই আপনাদের বহুল পরিচিত।

মিস এড্রিয়ানা-র বয়স সাতাশ বছর। সিয়াটল থেকে টিয়েরা পর্যন্ত যেকোন স্থানই তার ঠিকানা। আর বোহেমিয়ার রাজকন্যাদের মধ্যে মেরী শ্রেষ্ঠতমা। সবচেয়ে বড় কথা, মেরি নামধারণ করাটাই তো ভয়ানক দুঃসাহসিকতার পরিচায়ক। জুয়াচোর ঠকবাজদের মুল্লুকে বিশজন হেলায়েস আর ফিফাইনেস প্রতি একজন মেরী-র পিছনে রয়েছে।

মিসেস পটহান্টার, মিস টুকার, রীভস আর ক্যাপেলম্যান সেখানে উপস্থিত। ক্যাপেলম্যান সবার অগোচরে একটু পরপরই ঘড়ি দেখছেন। এখন ঘড়িতে ন'টা বাজতে দশ মিনিট বাকি। যথা সময়ে একটা গল্প তার স্মৃতির পাতায় ভেসে উঠবে। গল্পটার বিষয়বস্তু, এক ফরাসী যুবতী তার প্রেমিককে জিজ্ঞাসা করল, আমার বাবার কাছে ন'টায় আমাদের বিয়ের প্রস্তাবটা পাড়বে, পেড়েছ? মুখে হতাশার ছাপ এঁকে প্রেমিক তার প্রশ্নের উত্তর দিল, 'না', প্রস্তাবটা পাড়িনি। যুবতীটা সবিস্ময়ে বলে উঠল সে কী! কারণ কি? প্রেমিক বলল ন'টায় আমি তরবারি নিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে ব্যস্ত ছিলাম। প্রেমিকা যুবতীটা অনুচ্চস্বরে খেঁকিয়ে উঠল, ভীতু কাপুরুষ কাহাকার।

রাতের খাবার দিতে বলা হল। খাবারের পর্ব মিটলে গান-বাজনার সঙ্গে হাতে হাতে কফির পেয়ালা ওঠা নামা করতে লাগল।

গ্রেইঞ্জার-এর টেবিলের দিকে একটু এগিয়ে বসতে গিয়ে মিস টুকার মদের গ্লাসটা উল্টে সবটুকু মদ ফেলে দিলেন। গ্রেইঞ্জারকে লক্ষ্য করে প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল, শুনুন, নতুন একটা প্রচ্ছদের ব্যাপারে আমি একটা প্রস্তাব দিতে চাইছি।

গ্রেইঞ্জার মুচকি হেসে বললেন, এ তো অতি উত্তম প্রস্তাব। আমি পরিচারকের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলব। গ্রেইঞ্জার এরকম ঢঙেই কথাবার্তা বলে থাকেন।

তাদের কথা চলাকালীনই কাফের প্রধান পরিচারক তাঁদের টেবিলের সামনে সেলাম ঠুকল, 'সাহাব, কাফে বন্ধ করার সময় হয়ে গেছে। তার কথা যারা শুনলেন সবাই ব্যস্ত হয়ে কাফে ছেড়ে বাইরে চলে গেল।

গ্রেইঞ্জার এলিভেটারে মেরিকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়ে তালবনের দিকে গাড়ি নিয়ে এগিয়ে গেল।

প্রায় মাঝরাত্রি। মেরি ফোন করে একটা গাড়ি আনিয়ে তাতে চেপে গ্র্যান্ড রেলওয়ে স্টেশনে গেল। বারোটা পঞ্চান্নর ট্রেনে চেপে বসল। কাক-ডাকা ভোরে ক্রোকাসভিল নামক জনমানবহীন স্টেশনে নামল। গাড়ি ঘোড়ার চিহ্নও নেই। অনন্যোপায় হয়ে সে হাঁটা জুড়ল। মাইল খানেক হেঁটে নিঃসঙ্গ একটা বাদামী কটেজে হাজির হল। কালো ও ময়লা তেলচিটে একটা পোশাকে লজ্জা নিবারণ করে এক বুড়োকে টিনের গামলায় সে মুখ ধুতে দেখল।

মেরি ভীত-সন্ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে গিয়ে ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারণ করল, বাবা, কেমন আছ?

কেমন আবার থাকব, পরম পিতা যেমন রেখেছেন। তোর মা রান্নাঘরে আছে। যা, দেখা করে আয়।'

মেরি রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। এক বৃদ্ধা এগিয়ে এসে আবেগ উচ্ছ্বাসহীনভাবে নিছক দায়ে পড়েই যেন তার মাথায় একটা চুমু খেল। তারপর প্রাতরাশের জন্য বাটিতে রাখা খোলাসমেত সেদ্ধ করা কটা আলুর দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। মেরি পুলক ও রোমাঞ্চভরা বুকে আলু কটার খোসা ছাড়াতে বসল।

রুটি সেদ্ধ, আলু আর শুয়োরের মাংস দিয়ে প্রাতরাশ সারা হল। মাংসের টুকরো চিবোতে চিবোতে তার বাবা বলল, তোর মাকে শহরের যে নতুন চাকরিটার কথা লিখেছিলি আশা করি এখনও সেটাতেই লেগে আছিস, কি বলিস?

হ্যাঁ, সেখানেই সেই প্রকাশকেরই বইয়ের সমালোচনা লিখছি।

প্রাতরাশ সেরে তারা তিনজনই চেয়ারে মুখোমুখি বসল।

মেরি-র বুড়ো বাবা বলল, 'শোন, আমাদের বহু দিনের প্রচলিত রীতি সাবাথ দিবসে পরম শ্রদ্ধাস্পদ ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ জেরেমি টেলর-এর ধর্মগ্রন্থের কিছু অংশ পাঠ করা।

তারপর বুড়ো দু'ঘণ্টা ধরে জেরেমি-র ধর্মগ্রন্থ পাঠ করল। মেরি-র মধ্যে অনাগ্রহ ধৈর্যচ্যুতি ও অস্থিরতা প্রকাশ পেল।

সে তিনটার ট্রেনে শহরে ফিরল। কাফে আঁদ্রে-র গোল টেবিলে সে রাতের খাবার খেতে বসল। একই, পরিচিত সব মুখ সেখানে উপস্থিত।

বারোটায় তোমাকে ফোন করেছিলাম। কোথায় ছিলে? মিসেস পটহাস্টার বললেন।

বোহেমিয়ায় গিয়েছিলাম। মেরি জবাব দিল।

ধ্যুৎ! পাঠক-পাঠিকা, মেরি সব ফাঁস করে, কেঁচিয়ে দিল। পরিবেশটাকেই পাল্টে দিল! কারণ, সবে আমি আপনাদের সামনে এ তথ্যই দেওয়ার চিন্তা করেছি। বোহেমিয়া এমন একটা ছোট্ট অখ্যাত অবজ্ঞাত দেশ যেখানে আপনারা কোনদিনই বসবাস করেন নি। যদি আপনি সেখানে নাগরিকত্ব গ্রহণ করে বসবাসের সম্মতি জানান তবে সে দেশের রাজা বসবাসের জন্য পাহাড়ের ওপারে আশ্রয় নেবে। জায়গাটা এমনই একটা পার্বত্যাঞ্চল কেবলমাত্র এক্সপ্রেস ট্রেনের জানালা দিয়ে দেখা যেতে পারে।

তখন ঠিক সাড়ে এগারোটা। ক্যাপলম্যান বহু বার ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত মেরি-কে একটা চুমু

খেতে গেল। মেরি চটে গিয়ে এমন জোরে ও সশব্দে একটা থাপ্পড় মারল যার ফলে সে নিজেও মাথা ঘুরে চেয়ার থেকে আছাড় খেয়ে মেঝেতে পড়ে গেল। তার মুখে মেরি-র পাঁচ আঙুলের দাগ—রক্ত জমে গেল। হৈ হল্লোড় থেমে গেল। হলঘরে নেমে এল অখণ্ড নীরবতা। অলীক বোহেমিয়ার প্রধান আইন লাইভার ফেয়ার একজন লঙ্ঘন করেছে। এর জন্য তাদের কিছুমাত্র পরিতাপ নেই। পরিতাপ যারা আঘাত সহ্য করেছে। জামার হাতা গোটালে মেয়েরা নিজেদের সামলে সুমলে নিল আর পুরুষরা ঘড়ির কাঁটার দিকে চোখ ফেরাল।

আমার আর দরকার নেই। বোহেমিয়ার লোকগুলো তাদের হতাশা নিয়ে থাক গে, আমি চললাম। সুন্দর একটা পরিবেশ থেকে মেরি আমাকে বঞ্চিত, হতাশ করেছে। সে চলে গেলেও আমার আক্ষেপ থাকবে না।

তবে রীতিমত জোর দিয়েই বলতে পারি, আমি কিন্তু হেরে যাইনি। কোথাও না কোথাও সুদীর্ঘ ও সুপ্রশস্ত পাতাল কক্ষে অবশ্যই যেখানে বহু পাল্টা পরিবেশ আছে যা দিয়ে বহু গল্পেরই উপসংহার লেখা হয়েছে। তবে আর কিছু না হোক একটা অন্তত উপসংহারের ব্যাপারে সে পাতাল কক্ষটাকে আমি ঠকাতে আগ্রহী, উৎসাহী, একটা অন্তত আমানতের ব্যাপারে—হ্যাঁ, অন্তত একটা।

মিনি ব্রাউন ক্রোকাসভিল হরেক রকম দৃশ্য দেখার লোভে একদিন শহরে এল। আমি তার পিছু নিলাম তাকে শহরের মধুচক্রের খোঁজ খবর দেওয়ার জন্য। তার পিছু নেওয়ার কারণ, মাছহীন ট্রাউট নদীতে সে একদিন আমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। আমাকে জলপ্রপাতও দেখিয়েছে। তবে আমার ক্যামেরাটা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। তাই তো তাকে সঙ্গদান করলাম।

বোহেমিয়া দেখে সে খুবই মুগ্ধ হল। স্প্যাগেভির ঘাটি তার মনে বিশেষ দাগ কাটল। পৃথিবীতে যে এমন একটা দেনা পাওনার খেলা চলেছে তা একেবারেই তার ধ্যান ধারণা বহির্ভূত। তবে বিনে পয়সার মদ পেটে পড়ায় তার সে ধারণাও মন থেকে মুছে গেল। মদের মাদকতা শক্তি তাকে মুগ্ধ করল, বিভ্রান্তি ঘটাল।

আমি এক সন্ধ্যায় তাকে বহু দূরে নিয়ে চলে গেলাম, ইচ্ছা ছিল গল্পের পাণ্ডুলিপিটা তাকে পড়ে শোনাব। গল্পটা সে উপস্থিত হবার আগেই শেষ হয়ে যায়। গল্পটা সম্বন্ধে তার মতামত জানতে চাইলে সে মন্তব্য করল, গল্পটা আমি ঠিক বুঝতে পারছিনে। ক্রোকাসভিলে মেরি ক'দিন ছিল বল তো শুনি?

আমি বললাম, কতক্ষণ আর? দু'ঘণ্টা পাঁচ মিনিট ছিল।

তবে গল্পটা বাজারে চলতে পারে। মিনি উত্তর দিতে গিয়ে বলল। তবে এটা কিন্তু ধরে নেওয়া যেতে পারে আর একটা হপ্তা সে যদি সেখানে থাকত ক্যাপালম্যান তার বহু প্রত্যাশিত চুমুটা পেয়ে ধন্য হতে পারত, ঠিক কিনা?

দ্য ফোর মিলিয়ন (১৯০৬)

দ্য গিফ্‌ট অব দ্য ম্যাজাই

সবশুদ্ধ মাত্র এক ডলার সাতাশি সেন্ট। ব্যস, এ-ই। তাতে আবার ষাট সেন্ট আছে পেনি। আর মুদি দোকানি ও কসাইয়ের সঙ্গে দরদস্তুরের মাধ্যমে একটা-দুটো করে পেনিগুলো জোগাড় করা সম্ভব হয়েছে। দরকষাকষিতে সে রীতিমত অভ্যস্ত। আর এরই জন্য হাড়-কিপ্টে বলে তার নামে ছিঃ-ছিঃ পড়ে যায়।

একবার বা দু'বার নয়, ডেলা পর-পর তিন-তিন বার মুদ্রাগুলো গুণল। হ্যাঁ, এক ডলার সাতাশি সেন্টই বটে, পরদিনই ক্রিসমাস উৎসব।

ডেলা ছোট ও ময়লা কৌচটায় বসে হায় হায় করতে করতে কপাল চাপড়াতে লাগল। এরকম কৌচে বসে কপাল না চাপড়ে করারই বা কি থাকতে পারে? আর এ থেকেই তার মধ্যে নীতিবোধের উদয় হ'ল—হা পিত্যেশ, সখেদে কপাল চাপড়ানো আর হাসি নিয়েই তো মানুষের বেঁচে থাকা। আর এদের মধ্যে কপাল চাপড়ানোর ভূমিকাটাই প্রাধান্য পায়।

বাড়ির মালকিন যতক্ষণে সিঁড়ি ভেঙে একতলা থেকে দোতলায় পা দিচ্ছেন এটুকু সময়ের মধ্যে একবার বাড়িটার ওপর চোখের মণিদুটো বুলিয়ে নেওয়া যাক। সুসজ্জিত একটা ফ্ল্যাট। ভাড়া সপ্তাহে আট ডলার। গাল ভরে সুখ্যাতি করার মত নয়। তবে ভিখারীরা এরকমটাই বলে থাকে।

নিচের বারান্দায় একটা চিঠির বাক্স আছে কিন্তু চিঠিটিঠি পড়ে না। আর একটা বৈদ্যুতিক বোতামও আছে বটে। তবে সেটাকে টিপে টিপে শব্দ সৃষ্টি করা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। কিন্তু সে চিঠির বাক্সটায় একটা কার্ড রয়েছে। তার গায়ে মিঃ জেমস্ ডিলিংহ্যাম ইয়ং নাম লেখা।

অতীতে যখন চড়া বাজার ছিল, ফ্ল্যাটের দখলদার যখন সপ্তাহে ত্রিশ ডলার বেতন পেত তখন ডিলিংহ্যাম শব্দটা লোকের মুখে-মুখে ঘুরে বেড়াত। এখন তার আয় নামতে নামতে মাসে ত্রিশ ডলারে দাঁড়িয়েছে। সেজন্যই হয়ত 'ডিলিংহ্যাম' কথাটায় ব্যবহৃত অক্ষরগুলো অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

মিঃ জেমস ডিলিংহ্যাম যখনই বাড়িতে পা দেয়, সিঁড়ি বেয়ে দোতলার ফ্ল্যাটে উঠে যায় তখন তাকে 'জিম' বলে সম্বোধন করা হয়। আর ডেলা, যার কথা গোড়াতেই বলা হয়েছে সেই মিসেস জেমস্ ডিলিংহ্যাম ইয়ং তাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে কতই না আদর-সোহাগ করে। এখন অবধি যা কিছু জানা গেছে সবই ভাল।

ডেলা কান্না থামিয়ে স্বাভাবিক হ'ল। গালে পাউডার ঘষে প্রসাধন সারল। এবার জানালার ধারে দাঁড়িয়ে বাইরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতেই তার নজরে পড়ল, ছাই রঙের ছোট্ট জানালাটার ওপরের ছাই রঙের দেওয়ালের ওপর দিয়ে ছাই-ছাই রঙেরই একটা বিড়াল হাঁটিহাঁটি করছে।

আগামীকাল ক্রিস্টমাস উৎসব। তার হাতে মাত্র এক ডলার সাতাশি সেন্ট আছে। জিম-এর জন্য একটা ক্রিস্টমাসের উপহার কেনা দরকার। মাসের পর মাস একটা-একটা করে জমিয়ে এটুকু দাঁড়িয়েছে। সপ্তাহে বিশটা ৩ ডলার। এ থেকে এর চেয়ে বেশী আর কি-ই বা সম্ভব? ব্যয় লাগাম-ছাড়া, হিসেবের মাত্রা রাখা যাচ্ছে না। সর্বদা হয়ও তা-ই। বহু সুখের মুহূর্তে জিম-এর জন্য ভাল কিছু একটা কেনার কথা ভেবেছে। রুচি মাফিক আর দুষ্প্রাপ্য এমন কিছু একটা যা জিম-এর মত কারো নাগালের মধ্যে যোগ্য বলে মনে হতে পারে। না, আকাশের চাঁদের তুল্য কিছু অবশ্যই নয়।

কামরাটার দুটো জানালার ফাঁকে একটা আয়না রাখা আছে। আট ডলারের ফ্ল্যাটের কামরায় এরকম আয়না আপনাদেরও নজরে পড়তে পারে। খুবই রোগাটে কেউ পরপর বার কয়েক নিজের প্রতিবিম্ব আয়নাটায় প্রতিফলিত হতে দেখলে নিজের চেহারাটা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করে নিতে পারবে সন্দেহ নেই। ডেলার চেহারাটাও এরকমই হওয়ায় সে কায়দাটা ভালই রপ্ত করে নিয়েছে।

একটা কথা, জেমস্ ডিলিংহ্যাম ইয়ং দম্পতির এমন দুটো জিনিস রয়েছে যার জন্য তারা খুবই গর্বিত। তাদের একটা হচ্ছে জিম-এর বাপ-ঠাকুরদার কাছ থেকে পাওয়া সোনার ঘড়ি। আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে সুনিবিড় কৃষ্ণমেঘের মত ডেলা-র কেশগুচ্ছ। শেবার রাণী তাদের বিপরীত দিকের ফ্ল্যাটের বাসিন্দা হলে ডেলা হয়ত বা কোনদিন রাণীর মণি-মাণিক্য ও বিভিন্ন উপহার সামগ্রীর ঝকমকানিকে ম্লান করে দেওয়ার জন্য তার জানালায় নিজের কেশগুচ্ছ শুকোবার জন্য ছড়িয়ে দিত। অথবা রাজা সলোমন যদি প্রহরী হয়ে তার ধন-দৌলত নিচের তলার কামরায় সাজিয়ে রাখতেন তবে জিম যতবার তাঁর কাছ দিয়ে যাওয়া-আসা করত ততবারই নিজের ঘড়িটা তাঁর দিকে এগিয়ে দিত যাতে তিনি ঈর্ষাকাতর হয়ে নিজের ঘড়ি কামড়াতেন। হ্যাঁ দুটো জিনিসই গর্ব করার মতই বটে। চোখে লাগার মত ডেলার কেশগুচ্ছ ঝলমলিয়ে পিঠ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। হাঁটু অবধি ঝুলে পড়া কেশরাশি বুঝি তার একটা অসাধারণ প্রসাধনের কাজ করে। ঠিক তখনই লজ্জায় কুঁকড়ে গিয়ে ঝটপট কেশগুচ্ছ বেঁধে ফেলে।

ডেলা একবার পুরনো বাদামী জ্যাকেটটা গায়ে দেয়, পুরনো টুপিটা মাথায় চাপিয়ে নেয়। তারপরই চোখ দুটোতে বিদ্যুতের ঝিলিক ফুটিয়ে তুলে সে তন্বী চঞ্চলা যুবতীর মত লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে সরাসরি রাস্তায় গিয়ে নামল।

ডেলা ব্যস্ত-পায়ে হাঁটতে হাঁটতে যেখানে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সেখানে একটা সাইনবোর্ড দেখতে পেল, যাতে লেখা—'মাদাম সফ্রেনি'। তার তলায় ছোট-ছোট হরফে লেখা কেশচর্চার যাবতীয় জিনিস পাওয়া যায়। ডেলা লম্বা-লম্বা পায়ে দোতলায় উঠে গেল। মাদামটি স্থূলকায়। রীতিমত বিশালদেহী মহিলা। ফর্সা চেহারাটায় ঔদাসিন্যের ছাপ আছে। সব মিলিয়ে মোটেই রূপসীর পর্যায়ে ফেলা যায় না।

ডেলা কোন রকম ভূমিকার অবতারণা না করেই সরাসরি বলল, মাদাম, আপনি আমার চুলের গোছাটা কিনবেন কি?

হ্যাঁ, চুল আমি খরিদ করি। মাথা থেকে টুপিটা খুলুন। চুলের গোছাটা দেখতে দিন।

চুলের গোছাটা থেকে কিছু চুল হাতে নিয়ে নাড়তে নাড়তে মাদাম বললেন—বিশ ডলার দাম দিতে পারি, রাজি?

'রাজি। টাকাটা কিন্তু তাড়াতাড়ি দিতে হবে।' কণ্ঠস্বরে ব্যাগ্রতা প্রকাশ করে ডেলা মাদাম-এর উদ্দেশ্যে কথাটা ছুঁড়ে দিল।

উফ্! পরের দুটো ঘণ্টা যেন ডেলা গোলাপি স্বপ্নে বিভোর হয়ে রইল। জিম-এর জন্য একটা মনের মত উপহার কিনতে সে বহু দোকান চষে ফেলল। হ্যাঁ, মিলেছে বটে। শেষ পর্যন্ত তার বাঞ্ছিত উপহারটা পেল। হলফ করে বলা যায় জিম-এর জন্যই এটা তৈরী করা হয়েছে, অবশ্যই অন্য কারো জন্য নয়। প্লাটিনামের একটা ঘড়ির চেন। সাদামাঠা অথচ রুচিসম্মত নক্সা। জিনিস ভাল। ভাল জিনিসের দামও ভালই হওয়া উচিত। ঘড়িটার সঙ্গে জব্বর মানাবে। যেমন ঘড়ি তার চেনটাও ঠিক সেরকমই না হলে মানায় কখনও!

মনের মত ঘড়ির চেনটা ডেলা একুশ ডলারের বিনিময়ে কিনে নিল। অবশিষ্ট ৮৭ সেন্ট পকেটে নিয়ে সে ব্যস্ত-পায়ে বাড়ি ফিরে এল।

ডেলা ভাবল, জিম ঘড়িতে চেনটা লাগিয়ে অবশ্যই যেকোন লোকের সামনা সামনি হলেই বার-বার সময় দেখার জন্য ব্যস্ত হবে। ঘড়িটা খুবই সুন্দর। তাই চেনের পরিবর্তে চামড়ার পুরনো একটা ব্যান্ড ব্যবহার করে। অধিকাংশ সময়েই ঘড়িটা বের করে সময় দেখতে কেমন লজ্জাবোধ করে।

বাড়ি ফেরার পর ডেলার মধ্যে একটু সুবুদ্ধির উদয় হ'ল। ভালবাসার দৌলতে তার চুলের ধ্বংস যেটুকু হয়েছে তা শোধরাতে লেগে গেল। গ্যাসটা জ্বালল। ড্রয়ার থেকে চুল কোঁকড়ানোর যন্ত্রটা বের করে হাতে নিল। কাজটা খুবই কঠিন ও সমস্যাসঙ্কুল।

কয়েক মুহূর্ত পরে লক্ষ্য করা গেল, ঘন বাদামি রঙের কোঁকড়ানো চুল মাথাটা ছেয়ে ফেলেছে। স্কুল-পালানো ছেলের মাথা ঠিক যেমনটা দেখতে হয়। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে দীর্ঘ সময় ধরে নিজের প্রতিবিম্ব দেখায় মেতে রইল।

এক সময় ডেলা স্বগতোক্তি করল—দ্বিতীয়বার আমার দিকে দৃষ্টিপাত করার আগেই জিম

যদি আমাকে খুন না করে ফেলে তবে সে নির্ঘাৎ বলবে, আমাকে কোনি দ্বীপের নৃত্যরতা মেয়ের মত দেখতে লাগছে। কিন্তু হায় ঈশ্বর! মাত্র এক ডলার সাতাশি সেন্ট দিয়ে আমার পক্ষে কী-ইবা করা সম্ভব হ'ত?

সাতটায়ই কফি তৈরী হয়ে গেল। জ্বলন্ত স্টোভের ওপর কড়াইটা চাপিয়ে রাখল যাতে চপগুলোকে ঝটপট ভেজে দিতে পারে।

কিন্তু একী! জিম তো কোনদিন ফিরতে এত দেরি করে না! সদ্য কিনে আনা চেনটাকে হাতে নিয়ে ডেলা দরজার কাছের টেবিলটার এক কোণে বসল। এ দরজাটা দিয়েই জিম রোজ বাড়ি ঢোকে। ঠিক সে মুহূর্তেই সিঁড়িতে তার জুতোর শব্দ শোনা গেল। ডেলা হঠাৎ কেমন বিমর্ষ হয়ে পড়ল। প্রাত্যহিক জীবনে নীরবে একটু প্রার্থনা করা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। এবারও সে তা-ই শুরু করল—'হে করুণাময়, অনুগ্রহ ক'রে এটুকু কর যাতে তার মনে হয় আমার রূপ-সৌন্দর্য এখনও অব্যাহত রয়েছে।'

সশব্দে দরজাটা খুলে গেল। জিম'কে খুবই গম্ভীর ও শুকনো দেখাচ্ছে। মাত্র বাইশ বছর বয়সে কাঁধে একটা সংসারের বোঝা বইতে হচ্ছে। নতুন একটা ওভারকোট তার না হলেই নয়। দুটো দস্তানাও হাতে নেই। বেচারা জিম।

ঘরে পা দিয়েই শিকারী কুকুরের নাকে ভারুই পাখির গন্ধ গেলে যেমন থমকে যায় ঠিক তেমনি জিমও নিশ্চল-নিথরভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার চোখের মণি দুটো ডেলা-র ওপর স্থির। তার দৃষ্টির অর্থ বোধগম্য না হওয়ায় ডেলা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। ক্রোধ, আতঙ্ক, বিস্ময় বা কোন রকম অনুভূতিই জিম-এর দৃষ্টিতে উপলব্ধি করতে না পারার জন্যই ডেলা ক্রমশ অজ্ঞাত আতঙ্ক জ্বরের শিকার হয়ে পড়েছে। এরকম পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য সে তিলমাত্র তৈরী ছিল না। চোখে-মুখে অত্যদ্ভুত একটা ভাব এঁকে জিম নিষ্পলক চোখে ডেলা-র দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখল।

ডেলা শরীরটাকে কুঁকড়ে টেবিল থেকে নেমে ধীর-পায়ে জিম-এর দিকে অগ্রসর হ'ল। আচমকা চিৎকার করে উঠল—জিম লক্ষ্মীটি, এমন করে আমার দিকে তাকিও না। আমার কথা শোন, নিতান্ত অনন্যোপায় হয়েই মাথার চুলগুলো বিক্রি করে দিতে হয়েছে। কারণ, মনের মত একটা উপহার তোমাকে কিনে না দিলে আমি বড়দিন অবধিতো বেঁচে থাকতে পারতাম না, বিশ্বাস কর। কিচ্ছু ভেবো না, দু'দিনেই চুল গজিয়ে আবার মাথা ভরে যাবে। জিম-এর কাঁধে হাত দুটো রেখে সে এবার বলল, জিম লক্ষ্মীটি আমার, একবার বল, 'শুভ বড়দিন'! আমাদের জীবনে সুখের বন্যা বয়ে যাক, সুখ অব্যাহত থাক। তুমি কি জান জিম, কী চমৎকার একটা উপহার তোমার জন্য কিনে এনেছি!

জিম যেন শত চেষ্টা করেও প্রকৃত, বাস্তব সত্যটাকে উপলব্ধি করতে পারছে না। এরকম একটা ভাবেই জিম গম্ভীর স্বরে উচ্চারণ করল—'তুমি সব চুল বিক্রি—কেটে ফেলেছ ডেলা?'

হ্যাঁ, কেটে ফেলেছি, বিক্রি করে দিয়েছি। তাই বলে তুমি কি আমাকে আগের মত, একইরকম ভালবাস না জিম? চুল না-ই বা রইল, আমি তো আগের সে ডেলা-ই রয়েছি, ঠিক কিনা?

তুমি তবে বলছ তোমার সব চুল—

হ্যাঁ। বললামই তো, সব চুল বিক্রি করে দিয়েছি। জিম, আজ প্রাক ক্রিস্টমাস-সন্ধ্যা। তুমি আমার প্রতি সহানুভূতিশীল হও। তোমারই জন্য আমাকে সব চুল খোয়াতে হয়েছে। মুহূর্তের জন্য নীরব হয়ে এবার সে বলল, জিম, চপগুলো কি গরম করব?

জিম এতক্ষণে মোহাচ্ছন্ন ভাব কাটিয়ে যেন স্বাভাবিকতা ফিরে পেল। হাতদুটো বাড়িয়ে ডেলাকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

পাঠক-পাঠিকা, আসুন, মাত্র সেকেন্ড দশেকের জন্য আমরা অন্য একটা অতিসাধারণ বিষয়ের দিকে ফিরে তাকাই। বছরে দশ লক্ষ ডলার আর সপ্তাহে আটটা ডলারের মধ্যে পার্থক্য কি? একজন গণিতজ্ঞ অঙ্ক কষে আপনাকে ভুল হিসেবই দেবে। প্রাচ্য দেশীয় বধুরা বহুমূল্য উপহার সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। সেটা কি তাদের নিজেদের জন্য? অবশ্যই নয়। অস্পষ্ট এ বক্তব্যটা সম্বন্ধে পরে আলোচনা করব।

ওভারকোটের পকেট থেকে একটা প্যাকেট বের করে টেবিলে রাখতে-রাখতে জিম

বলল—ডেলা, তুমিও আমাকে ভুল বুঝো না। যে মেয়েকে আমি অন্তর থেকে ভালবাসি তার জন্য চুল কেটে ফেলা, দাড়ি কামিয়ে ফেলা বা চুল শ্যাম্পু করার ব্যাপারটা ভালবাসার কোন প্রতিবন্ধকতা করতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি না। প্যাকেটটা খুললেই তুমি বুঝবে, একটু আগে আমার মুষড়ে পড়ার কারণ কি?

প্যাকেট খুলেই ডেলা আনন্দ-উচ্ছ্বাস, আবার পরমুহূর্তেই আর্তনাদ করে উঠল। তার অবস্থার এমন দ্রুত পরিবর্তনে ফ্ল্যাটের মালিককেও ছুটে আসতে হ'ল। ভদ্রলোক বহু চেষ্টায়, বহু সান্ত্বনার মাধ্যমে তাকে স্বাভাবিক করতে পারলেন।

বিশেষ ধরনের কয়েকটা চিরুনি টেবিলের ওপর পড়ে রয়েছে। তাদের মধ্যে কয়েকটাকে ব্রডওয়ের জানালার ধারে সাজানো দেখে ডেলা দীর্ঘদিন যাবৎ মনে মনে পুজো করেছে। খাঁটি কাছিমের খোলা দিয়ে তৈরী চিরুনি, হীরে-মুক্তো খচিত। যে সুন্দর কেশগুচ্ছ খোয়া গেছে তাতে পরার মত চিরুনিই এগুলো। চিরুনিগুলো যে বহুমূল্য ডেলা-র জানা ছিল। কোনদিন ব্যবহার করার বরাত যে তার হবে এটা ভুলেও সে কোনদিন ভাবে নি। সে অমূল্য সম্পদ এখন তার হাতের মুঠোর মধ্যে এসেছে, কিন্তু যে চুলে বহু বাঞ্ছিত অলংকারগুলো শোভা পেত সেগুলোই আজ অনুপস্থিত। চিরুনিগুলোকে বুকে জড়িয়ে ধরে ভাঙা ভাঙা গলায় সে উচ্চারণ করল—'জিম, জানই তো আমার চুল খুবই তাড়াতাড়ি বাড়ে!' পরমুহূর্তেই সে আগুনলাগা বিড়ালের মত আর্তনাদ করে উঠল—উফ্! হায় ঈশ্বর!

জিম এখনও তার উপহারটা চোখে দেখে নি। ডেলা এবার তার হাতের মুঠোটা খুলে তার দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিল। আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠা মুখটা ভুলে জিম-এর দিকে তাকিয়ে ভাবাপ্লুত গলায় বলল—জিম, এটা চমৎকার, তাই না? এটার খোঁজে আমি শহরটাকে তোলপাড় করেছি। এবার থেকে তুমি হয়ত একশ'বার সময় দেখার জন্য ঘড়ির দিকে তাকাবে, তাই না?

কথা বলতে বলতে ডেলা হাতটাকে সরিয়ে এনে বলল, জিম, তোমার ঘড়িটা দাও তো চেনটা পরিয়ে দেখি কেমন মানায়।

জিম নীরবে মুচকি হাসল। তারপর মুখ খুলল, ডেলা, আমাদের ক্রিস্টমাসের দুটো উপহারই আপাতত তুলে রাখা যাক। এগুলো এতই সুন্দর যে, এখনই ব্যবহার করা সঙ্গত হবে না। শোন, তোমার বহু আকাঙ্খিত চিরুনিগুলো কেনার টাকার জন্য ঘড়িটা আমি বিক্রি করে দিয়েছি। প্রসঙ্গান্তরে যাবার জন্য এবার বলল—চপগুলো তো এবার গরম করা যেতে পারে কি বল?

পাঠক-পাঠিকা আপনাদের জানা আছে, প্রাচ্যদেশীয় পণ্ডিতরা গরুর নাদায় শায়িত শিশুটার জন্য যারা উপহার নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা অস্বাভাবিক জ্ঞানীজন। ক্রিস্টমাসের উপহারের প্রচলন কিন্তু তাঁরাই করেছিলেন। আর আমি? নিঃসন্দেহে অপটু। একটা ফ্ল্যাটের দু'জন অবোধ যুবক-যুবতীর অতি সাধারণ ঘটনা তুলে ধরলাম যারা নিতান্তই অবোধের মতই নিজেদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ দুটো পরস্পরের জন্য খুইয়ে ফেলল। তবে সম্প্রতিকালের জ্ঞানীদের উদ্দেশ্যে শেষ কথা হিসাবে আমি বলছি, যে বা যারা, যে উপহার দেন না কেন, উপহার দুটোই ছিল তাদের মধ্যে বহুমূল্য এবং জ্ঞান সমৃদ্ধ। যারা উপহার প্রদান করে বা গ্রহণ করে তাদের মধ্যে এ যুবক-যুবতীর মত মানুষরাই নিঃসন্দেহেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। প্রাচ্য দেশীয় পণ্ডিতজন তো এরা দু'জনই।

ম্যান এবাউট টাউন

রহস্য-টহস্য নিয়ে আমার কোন কৌতূহল নেই। স্রেফ দুটো জিনিস জানার জন্য আমি আগ্রহী। তাই তদন্তের কাজে নেমে পড়লাম। প্রসাধন-স্যুটকেশ নিয়ে যুবতীরা কোথায় যায় তা জানতে আমার দু' সপ্তাহ কেটে গেল। তারপর প্রশ্ন করলাম, তোষকটাকে কেন দু' টুকরো বিশিষ্ট করে তৈরী করা হয়েছে? প্রশ্নটা সন্দেহের সঞ্চার করল। হবেই তো আসলে প্রশ্নটাই তো, হেঁয়ালির মত মনে হয়। আমার জিজ্ঞাসা নিরসন করতে বলা হ'ল। যেসব মেয়ে বিছানা পাতা ও গুঠানোর কাজে নিযুক্ত তাদের কষ্ট লাঘব করার জন্যই তোষকটাকে হাল্কা ক'রে দু'খণ্ডে বিভক্ত করে তৈরী

করা হয়েছে। আমি একেবারেই বোকা বলেই আবারও প্রশ্ন করলাম—তা-ই যদি হয় তবে কেন খণ্ড দুটো সমান করে তৈরী করা হয়নি? ব্যস, তারপর থেকেই তারা আমার কাছ থেকে দূরে দূরে থাকতে লাগল।

জ্ঞান-বুদ্ধি খরচ করে যে তৃতীয় ধারণাটা লাভ করলাম সেটা একটা শহুরে মানুষ বলে পরিচিত চরিত্রটা সম্বন্ধে সামান্য ধারণা। নির্দিষ্ট ও বিশেষ একটি ব্যক্তির চরিত্র সম্বন্ধে যে ধারণা হওয়া উচিত তার তুলনায় সে ব্যক্তি সম্বন্ধে আমার ধারণা ছিল একেবারেই ঝাপসা। কোন ব্যক্তি বা বিষয় সম্বন্ধে জানতে বা বুঝতে হলে সেটা মনগড়া ধারণা হলেও তার সম্বন্ধে মূর্ত ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। জন ডো-র ব্যাপারে মনে মনে যে ধারণা আমি নিতে পেরেছি সেটা ইস্পাতের মূর্তির মতই সুস্পষ্ট। নীলাভ তার চোখের মণি দুটো, বাদামী জামা গায়ে, আর সার্জের ঝকমকে কোট। সর্বদা রোদে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে কিছু একটা নিরীক্ষণে ব্যস্ত। পকেটের আধ-খোলা ছবিটাকে ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে বার-বার খোলে আর বন্ধ করে। কোনদিন যদি ওপরওয়ালার সামনাসামনি হওয়া যায় তবে যে নিঃসন্দেহে তিনি একজন উঁচুদরের বিষণ্ন মানব। তার আস্তিনের তলায় লুকিয়ে থাকবে হাতকড়া। দেখা যাবে সে জুতো পালিশ করাতে ব্যস্ত। আর অদূরবর্তী কোন না কোন স্থানে ফিরোজা মণি। কিন্তু শহুরে মানবটির চিত্র আঁকতে গিয়ে দেখা যাবে ক্যানভাসটা শূন্য—ফাঁকা। আমি ভাবতে পারি তার চোখে-মুখে বিরাজ করছে ঘৃণার ছাপ। আর হাতে? হাত কড়া। এটুকুই। তারপর কোন এক সাংবাদিকের সম্বন্ধে আমি জানার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলাম।

আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, আরে একজন শহুরে মানব তো একজন ক্রিকেটিয়ার আর একজন গদাধারীর মধ্যবর্তী কিছু একটা মনে করা যেতে পারে। তাঁর সম্বন্ধে সঠিক তথ্য কি আমি দেব তা আমার জানা নেই। যখন, যেখানেই কিছু করণীয় আছে সেখানেই তার দেখা মিলবে। আমার মতে তিনি এক প্রতীকী চরিত্রই বটে। প্রতি সন্ধ্যায় কেশ পরিচর্যা করেন, শহরের পুলিশগুলিকে আর পরিচারককে নাম ধরে ডাকেন। কখনও তাকে একা বা অন্য একজনকে তার সঙ্গেও দেখা যেতে পারে।

যে বন্ধুবর আমার কাছে এমন সব তথ্য পরিবেশন করছিল সে বিদায় নিয়ে চলে গেলে আমি ফাঁকা মাঠে গিয়ে হাওয়া খেতে লাগলাম। এরই মধ্যে রিয়ান্টো সেতুটার তিন হাজার একশ' ছাব্বিশটা বৈদ্যুতিক আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। লোকজনের ভিড়ের মধ্য থেকে দেহবিলাসিনীদের চোখের মণি আমার ওপর অনবরত চক্কর মারছে। কিন্তু আমাকে কিছুতেই ছিপে গাঁথতে পারছে না। বিভিন্ন সমাজের ও বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত মানুষ চারদিকে ভিড় জমাচ্ছে, আমার কিন্তু কোনদিকেই খেয়ালমাত্র নেই। তারা সবাই আমার পরিচিত, জানিও তাদের সম্বন্ধে সবকিছু। কিন্তু আমার যে একমাত্র শহুরে মানবটিকেই দরকার। তাকে হারিয়ে ফেললে আমার পক্ষে চরমতম ভুল করা হবে। অন্যদিকে, অন্য কোথাও যাই না কেন।

কোন পরিবার রবিবাসরীয় সংবাদপত্র পাঠ করছে দেখলে আমার বড়ই ভাল লাগে। আমার বাবা অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে যে পাতাটার ওপর চোখ বোলাচ্ছেন সেখানে খোলা-জানালার ধারে যুবতী নারী ব্যায়াম করছে—শরীরটাকে বিভিন্ন দিকে, বিভিন্ন ভঙ্গীতে বার-বার বাঁকাচ্ছে। তিনি সোল্লাসে বলে উঠলেন—ওই......ওই......ওই যে।

আমার মায়ের আগ্রহ অন্য দিকে। তিনি অনুমান করতে ব্যস্ত এন—ডব্লু ওয়াই ও—কে' শব্দটার শূন্যস্থান পূর্ণ করতে কোন্ কোন্ অক্ষর ব্যবহার করতে হবে। অর্থনীতি সম্বন্ধীয় খবরাখবর ও প্রবন্ধগুলোর ওপর বড় মেয়ে অত্যুগ্র আগ্রহে চোখ বুলিয়ে চলেছে। নিউইয়র্ক পাব্লিক স্কুলের ছাত্র আঠারো বছরের ছেলে উইলি সে পুরনো জামাকে কিভাবে আবার নতুন করে নেওয়া যেতে পারে এ বিষয়ক সাপ্তাহিক প্রবন্ধটার ওপর সাগ্রহে চোখ বোলাচ্ছে। তার আশা আগামী পরীক্ষায় সে সেলাই বিষয়ে পুরস্কার লাভ করবে।

একটা রেস্তোঁরায় ঢুকে আমি একজনকে বললাম—'শহুরে মানব' সম্বন্ধে আপনি কতটুকু জানেন, দয়া করে বলবেন কি?

লোকটা তড়বড় করে কি যে বলল তার বিন্দু বিসর্গও আমি উপলব্ধি করতে পারলাম না। আবার পথে নামলাম।

এক গলির মুখে যেতেই স্যালভেশন্ আর্মির এক যুবতী তার হাতের দান পাত্রটা আমার কোর্টের পকেটে গুঁজে মৃদু ঝাঁকুনি দিল। তাকেও 'শহুরে মানব' সম্বন্ধে প্রশ্ন করলাম—তুমি এ অঞ্চলেই অধিকাংশ লোক চেন। দেখেছ তাকে?

ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে সে বলল, আপনার মুখে তার বিবরণ শুনে মনে হচ্ছে, আমার পরিচিত—ভালই চিনি।

—চেনেন! আপনি চেনেন তাকে?

বহুদিন ধরে প্রতিরাত্রে তাকে একই স্থানে দেখি। শয়তানের দেহরক্ষী। যে কোন বাহিনী সৈন্যের মতই বিশ্বস্ত। তাদের দুষ্কর্মের পরিবর্তে প্রভুর সেবার জন্য কয়েকটা পেনি হাতিয়ে আমরা তার এই কাজে এবং তার মত লোকের কাছে যাই। কথাগুলো বলেই মেয়েটা আমার সামনে তার বাক্সটা বার বার দু'-তিন ঝাঁকি দিল। আমি ডালার ছিদ্রটা দিয়ে একটা মুদ্রা বাক্সের মধ্যে চালান করে দিলাম।

আমার এক সমালোচক বন্ধুকে সুদৃশ্য একটা হোটেলের দরজায় গাড়ি থেকে নামতে দেখে আমি দৌড়ে এগিয়ে গিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লাম। কোন রকম ভূমিকা না করেই সরাসরি প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলাম—'শহুরে মানব' বলে কাউকে চেন?

সে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে গিয়ে বলল, 'শহুরে মানব?' কথাটা খুবই পরিচিত মনে হচ্ছে বটে। নিউইয়র্ক শহরে বিশেষ চরিত্রের কিছু সংখ্যক মানুষই শহুরে মানব। কিন্তু কই, আগে তো কেউ-ই এ ব্যাপারে আগ্রহী হয়নি। দেখ, তাদের সঠিক নমুনা দেখানো খুবই কঠিন সমস্যা।

তবে এটুকু বলতে পারি, আমেরিকার কিছু সংখ্যক মানুষ যে বিশেষ রোগের শিকার হয়ে ভোগে এ লোকটা তাদের শিরোমণি মনে করতে পার। সকাল ছ'টা থেকে তার অভিযান শুরু করে। যেকোন ব্যাপারে এমন ভাবে নাক গলায় যাতে করে তাকে দাঁড়কাক বা খটাশের সঙ্গে তুলনা করা চলে। হেস্টার স্ট্রীট থেকে শুরু করে হার্লেম অবধি সম্পূর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছন্নছাড়া বাউন্ডুলের মত চক্কর মেরে বেড়ায়। শহরে এমন কোন জায়গা নেই কোন না কোন কাজের তাগিদে তার উপস্থিতি নজরে পড়ে না। ঠিক এরকমই চরিত্রের তোমার কৌতূহল উদ্রেককারী শহুরে মানবটি। সে প্রতিমুহূর্ত নতুন কোন কিছুকে খুঁজে বের করার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায়। তারা সংখ্যায় খুব কমই। তবে সবার ক্ষেত্রে একই মন্তব্য করা যেতে পারে।

শোন, প্রসঙ্গ তুমি উত্থাপন করেছ বলে আমি খুবই আনন্দিত। শহরের আপদ ওই নৈশরোগটার ব্যাপার আমিও উপলব্ধি করতে পারি।

ইতিপূর্বে ব্যাপারটা আমার নজরে আসেনি। তবে শহুরে মানববটিকে বহু পূর্বেই নথিভুক্ত করা উচিত ছিল, স্বীকার করছি। প্রতি সন্ধ্যায়ই তার আবির্ভাব ঘটলেও তুমি-আমি সপ্তাহে মাত্র একটা দিন তার দর্শন লাভ করি। কোন চুরুটের দোকান লুঠ হওয়ার সময় সে অফিসারের দিকে মিট মিট করে তাকিয়ে থাকে। সবকিছু দেখে-শুনে একটা ধারণা করে নিয়ে অতর্কিতে কেটে পড়ে। প্রেসিডেন্টের দপ্তরে তার নাম তল্লাশ করি, তারকাদের কাছে তার সম্বন্ধে ঠিকানা ও তথ্য চাই পুলিশের হাতে তুলে দেবার জন্য।

সমালোচক বন্ধুবর এ পর্যন্ত বলে অন্য প্রসঙ্গ শুরু করার জন্য উসখুস করতে থাকে।

আমি তাকে সে সুযোগ না দিয়ে চিৎকার করে উঠলাম, তুমি! হ্যাঁ, তাকে তুমিই ধরিয়ে দিয়েছ। শহরের গণ্যমান্য—বিশিষ্ট চরিত্রের পাশাপাশি, গ্যালারিতে তার প্রতিকৃতি টাঙিয়ে দিয়েছ, আর সে প্রতিকৃতিটা নিখুঁত—একেবারে যথাযথ এঁকেছ। আমাকে শহুরে মানবটিকে মুখোমুখি দেখতে হবে। কিন্তু কোথায় তার দেখা পাব? কিভাবেই বা তাকে চিনে নেওয়া সম্ভব হবে? এবার বন্ধুবরের মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, আমার চোখে নতুন, ইতিপূর্বে কোথাও দেখিনি এমন মানুষকে কি আমার সামনে হাজির করতে পারবে, বল? তার ডেরাটা ব্রডওয়ের কোথাও না কোথাও হবে। শহরের প্রতিটা আনাচকানাচ আমাকে খুঁজে দেখতেই হবে। আমার কাছে যে একেবারেই নতুন তাকে ভাল করে দেখতে—বুঝতে হবে।

—শোন, আমি এ রেস্তোরাঁয় রাতের খাবার খেতে এসেছি। চল ভেতরে যাওয়া যাক। শহুরে মানব যদি উপস্থিত থাকে তবে তোমাকে দেখিয়ে দেব। যেসব খদ্দের এখানে নিয়মিত যাতায়াত করে সবাই আমার পরিচিত।

—ধন্যবাদ! রাতের খাবারের সময় এখনও হয় নি। শুনে রাখ, অস্ত্রাগার থেকে শুরু করে কোনি দ্বীপ অবধি সম্পূর্ণ অঞ্চলে চিরুণি তল্লাশি চালাতে চালাতে আমি আজ রাত্রেই তাকে, আমার আকাঙ্খিত 'শহুরে মানব'-টিকে খুঁজে বের করবই করব।

বন্ধুবরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সবে পথটা পার হতে যাব ঠিক সে মুহূর্তেই কেমন যেন একটা চাপা গুঞ্জনধ্বনি শুনতে পেলাম। একটা স্যান্টো-ডুমন্টে চেপে বেশ কিছুটা পথ অতিক্রম করে ফেললাম।

চোখ মেলে তাকানো মাত্রই গ্যাসোলিন-এর উগ্র গন্ধ নাকে এল। আমি গলা ছেড়ে চিৎকার করে উঠলাম—এখনও এটা শেষ হয় নি?

হাসপাতালের নার্স আমার কপালে হাত দিয়ে তাপের পরিমাণ বুঝতে গিয়ে বলল—গা ঠাণ্ডা। এখন জ্বর নেই, নেমে গেছে। এক যুবক ডাক্তার আমার হাতে একটা দৈনিক পত্রিকা দিতে দিতে বললেন—দেখতে চান কি, কি ক'রে এটা ঘটেছে?

নিবন্ধটা আমি পড়লাম। গতরাত্রে যে গুনগুন ধ্বনিটা কানে এসেছিল সেখান থেকেই নিবন্ধটার শিরোনাম আরম্ভ হয়েছে। আর সমাপ্তি ঘটেছে নিচের ছত্র দু'টির মাধ্যমে—বেলভিউ হাসপাতাল, তার চোটটা যে তেমন গুরুতর নয় সেখান থেকেই বলা হয়েছে। তাকে দেখে যথার্থই একজন 'শহুরে মানব' বলেই তো বোধ হচ্ছে।

লস্ট অন ড্রেস প্যারেড

মিঃ টাওয়ার্স চ্যান্ডলার নিজের শোবার ঘরে পোশাক ইস্ত্রি করতে ব্যস্ত। তার পরই দেখা যাবে কেতা দুরস্ত পোশাক পরে, সেজেগুজে সিঁড়ি-বেয়ে নেমে আসছে, শান্ত-সুন্দর এক সুপুরুষ। নিউইয়র্ক শহরের যেসব যুবক সংস্থার সদস্য একঘেয়েমি কাটাবার সান্ধ্য-প্রমোদে বেরোয় তাদেরই একজন অন্যতম কেতাদুরস্ত বাবু সেজেছে। পোশাক পরিচ্ছদের দিকে চিরদিনই তার বিশেষ নজর।

টাওয়ার্স-এর উপার্জন সপ্তাহে আঠারো ডলার। এক স্থপতির অফিসে কর্মরত। বাইশ বছর বয়স। তার দৃষ্টিতে স্থাপত্য যথার্থই একটা শিল্প। তবে এ-ও মনে করে, নিউইয়র্ক শহরে বসে সেটা মুখ ফুটে বলার মত সাহস তার নেই যে, লোহার খাঁচার মত বিশাল বাড়িগুলোর স্থাপত্যকলা মিলানের বিখ্যাত গির্জার তুলনায় খুবই নিম্নমানের।

টাওয়ার্স প্রতি সপ্তাহের উপার্জন থেকে এক ডলার করে জমায়। দশ সপ্তাহের সঞ্চয় ডলার দশটা নিয়ে সোজা চলে যায় হাড়কিপ্টে বুড়ো দর্জিটার দোকানে। তার কাছ থেকে ভদ্রলোকদের পরার উপযোগী সান্ধ্য পোশাক কিনে আনে। টাকার কুমীর আর প্রেসিডেন্টের মত জমকালো পোশাক পরিচ্ছদ পরে সেজেগুজে যেখানে জীবন আনন্দোচ্ছল সেরকম কোন স্থানে যায়।

দশটা ডলার হাতে নিয়ে একদল বিলাসী ধনকুবেরের ভূমিকায় যথাযথ অভিনয় চালিয়ে যেতে সে সক্ষম। আহারাদি, নামী ও দামী মদ, মর্যাদা বজায় রাখার মত বকশিস দান, চুরুট ক্রয় আর গাড়িভাড়া ইত্যাদির জন্য এ পরিমাণ অর্থই যথেষ্ট। এর বেশি আর কি-ই বা চাই।

টাওয়ার্স-এর কাছে এক-একটা আনন্দঘন সন্ধ্যা এক নতুন সুখের উৎস হিসাবেই বিবেচিত হয়। সমাজের রূপসীদের পাশাপাশি কাছাকাছি অবস্থানের শুভক্ষণ তো একমাত্র সন্ধ্যাবেলাটাই। চুল পাকতে শুরু করলেও সে একটামাত্র দিনের ঘটনা মধুর স্মৃতি হয়ে অন্তরের অন্তঃস্থলে জাগরুক থাকে। তবে টাওয়ার্স-এর কাছে প্রতি দশ সপ্তাহই এমন এক অনির্বচনীয় আনন্দময় মুহূর্ত নিয়ে আসে যা প্রথম দিনটার মতই নতুন ও রোমাঞ্চকর। আনন্দমুখর মুহূর্তে ধনকুবেরদের নন্দনদের পাশে নিজের আনন্দ লাভ সম্ভব হয়। সে স্বর্গের সুবেশী পুরুষদের চাক্ষুষ করা সম্ভব হয় আবার তাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করাও যায়—তার সঙ্গে তুলনা করলে এক রূপসীর রূপ-সৌন্দর্য আর হাত-কাটা জরির জামা তো একেবারেই সামান্য, তুচ্ছাতিতুচ্ছ।

একাধারে সেদিনকার দর্শনীয় আর দর্শক সুসজ্জিত টাওয়ার্স ঝলমলে সান্ধ্য-পোশাকে চটক লাগিয়ে ব্রডওয়ে দিয়ে হেঁটে চলল। পরবর্তী উনসত্তরটা সন্ধ্যায় সাদামাঠা পোশাক পরে সাধারণ

টেবিলে রাতের খাবার সারবে। স্যান্ডউইচ আর বিয়ার কিনে নিয়ে দ্রুত বাড়ি ফিরে ঘরে বসেই দুপুরের আহার সারবে। এ স্বাভাবিক কাজ সে নির্দ্বিধায় খুশিমনেই সারবে। কারণ সে তো কোলাহলমুখর শহরটারই বাসিন্দা। আর একটা দিনের আনন্দোচ্ছল মুহূর্ত অনেকগুলোর নিরানন্দ রাতকে পুষিয়ে দেয়, তৃপ্তিতে মন-প্রাণ ভরিয়ে তোলে।

সে ইচ্ছা করেই ধীর-পায়ে হাঁটতে লাগল। এখন রাত্রি বেশি হয়নি। আর সত্তরটা দিনের মধ্যে একটা রাত্রি যার কাছে সবচেয়ে আনন্দঘন, সবচেয়ে সুন্দর সে মুহূর্তগুলো দীর্ঘতর হোক। সপ্রশ্ন ও নিরবচ্ছিন্ন কৌতূহলী বহু চোখের মণি তার ওপর ঘুরপাক খেতে যাচ্ছে, কারণ ঝলমলে পোশাক পরিচ্ছদ, প্রসাধনের প্রলেপ আর ভাবভঙ্গীই জানান দিচ্ছে নিশ্চিত সুখ-শান্তি লাভের জন্য তার ওপর ভরসা করা যায়।

সে একটা বাঁকের কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভাবল, জৌলুসপূর্ণ রেস্তোরাঁটাতেই যাবে যেখানে রুচিমাফিক রাতের খাবার খাওয়া যাবে। ঠিক তখন এক রূপসী যুবতী বাঁক নিতে গিয়ে বরফে পা হড়কে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

টাওয়ার্স সৌজন্য বশত ব্যস্ত হয়ে মেয়েটিকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেল, উঠতে সাহায্য করল। মেয়েটা কোনরকমে দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করল।

টাওয়ার্স সমবেদনা জ্ঞাপন করতে গিয়ে বলল—'খুব লেগেছে কি? যন্ত্রণা হচ্ছে?'

গোড়ালিটা হয়ত মচকে গেছে। আচমকা পা হড়কে যাওয়ায় সেখানে আঘাতটা লেগেছে—যন্ত্রণা হচ্ছে। পায়ে চাপ পড়লেই মনে হচ্ছে প্রাণ বুঝি বেরিয়ে গেল।

কোন সাহায্য—গাড়ি ডেকে দিয়ে আপনাকে সাহায্য করতে পারি কি?

ধন্যবাদ! আপনাকে আর বিব্রত করতে চাইনা। আসলে জুতোর গোড়ালি দুটো বড্ড নাড়ানাড়ি করছে। আর ওদেরই বা কি দোষ—

তাই বুঝি? কথা বলতে বলতে টাওয়ার্স লক্ষ্য করল সুন্দরীই বটে। গায়ের পোশাক পরিচ্ছদ দামী নয়। সাদামাঠা। দোকানের মেয়ে-কর্মীরা যেরকম পোশাক ব্যবহার করে থাকে সেরকমই পোশাক গায়ে দিয়েছে। আর দামী রঙের চুলের ওপর কম দামী কালো খড়ের টুপি মাথায় পরেছে। আর বাড়তি অলঙ্করণ বলতে একটা বো ও এক টুকরো ভেলভেটের ফিতে। আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্না একটা চাকুরে মেয়ে যেমনটা হয়ে থাকে ঠিক সেরকমই তাকে দেখে টাওয়ার্স-এর মনে হ'ল।

যুবক স্থপতির মধ্যে হঠাৎ একটা মতলব মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। ভাবল, মেয়েটাকে তার সঙ্গে রাতের খাবার খেতে বললে কেমন হয়? এক মহিলাকে সঙ্গে পেলে রুচিসম্পন্ন আনন্দময় মুহূর্তটা দ্বিগুণ উপভোগ্য করে তোলা সম্ভব—অবশ্য সে যদি সম্মত হয়। সে নিঃসন্দেহ যুবতীটা বিবাহিতা মহিলা। তার কথাবার্তা ভাবভঙ্গিমা বোঝাচ্ছে। তার পোশাক-আশাক অতি নিম্নমানের হলেও তার বিশ্বাস, তাকে নিয়ে রাতের খাবার খেতে পারলে আনন্দে তার মন-প্রাণ ভরে উঠবে।

টাওয়ার্স যুবতীটার কাছে নিজের ইচ্ছার কথা জানানোমাত্র সে সম্মত হয়ে গেল। ব্যাপারটা সৌজন্যবিরোধী হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চাকুরে মহিলারা একে পাত্তা দেয় না। পুরুষকে সূক্ষ্মভাবে বিচার করার ক্ষমতা ও ইচ্ছা দু-ই তাদের আছে। অর্থহীন আচার আচরণ ও রীতির বদলে নিজের বিবেক-বুদ্ধিকেই বেশী গুরুত্ব দেয়। একটু বুদ্ধি-কৌশল খরচ করতে পারলে দশটা ডলার দিয়ে দু'জনের রাতের খাবার সে অনায়াসেই সম্পন্ন করে নিতে পারবে। আর রাতের খাবারের এ রকম অভিজ্ঞতা মেয়েটাকে একঘেয়েমি দূর করে নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চার করতে অবশ্যই সাহায্য করবে। আর তার লব্ধ অভিজ্ঞতা টাওয়ার্স-এর আনন্দ-উৎসাহকে অনেকাংশে বাড়িয়ে দেবে।

টাওয়ার্স সহানুভূতির স্বরে মেয়েটাকে লক্ষ্য করে বলল—দেখুন, আপনি যাই ভাবুন না কেন, আপনার আঘাত-পাওয়া পা-টাকে দীর্ঘ সময় এক নাগাড়ে বিশ্রাম দেওয়া প্রয়োজন। আর আমি যে অনুরোধটা রেখেছি তা রক্ষা করলে আপনার পা-টাও বিশ্রাম পাবে আর বাঞ্ছা পূরণের মাধ্যমে আমার মধ্যেও খুশির সঞ্চার ঘটবে। ঠিক কিনা? আপনি যখন হোঁচট খেয়ে আঘাত পান তখন আমি একা রেস্তোরাঁতেই যাচ্ছিলাম। আমার সঙ্গে চলুন, গল্প করতে করতে রাতের খাবার সারা যাবে। আর ইতিমধ্যে বিশ্রামের মাধ্যমে আপনার পায়ের যন্ত্রণা অনেকাংশে লাঘব হয়ে যাবে। আর বাড়ি পৌঁছনোও সমস্যা হবে না।

মেয়েটা আমতা আমতা করে, সৌজন্য বজায় রেখে বলল—আপনার সদিচ্ছার জন্য ধন্যবাদ না জানালে নিজেকে অকৃতজ্ঞই মনে হবে। তবু ব্যাপারটা ভাবা দরকার। আমরা পরস্পরের অপরিচিত। অতএব কাজটা সঙ্গত হবে কিনা সেটাই ভাবছি।

আমি তো এতে কিছুমাত্র দোষ দে''হি নে। আমার পরিচয় জানতে চাইলে শুনুন—আমার নাম টাওয়ার্স চ্যান্ডলার। রাতের খাবার খাওয়ার পর আমি গাড়ি করে আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেব অথবা রেস্তোরাঁর দরজা থেকেই শুভ সন্ধ্যা জানিয়ে নিজের পথে চলে যাব—আপনার মর্জিমাফিকই কাজ হবে।

টাওয়ার্স-এর ঝলমলে পোশাকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বলল—আপনার ওই বহুমূল্য পোশাকের পাশে আমার সাদামাটা পুরনো পোশাক, আর জীর্ণ খড়ের টুপিটা যে একেবারেই বে-মানান।

ধ্যুৎ! কি যে বলেন! পুরনো পোশাকেই কিন্তু আপনাকে অধিকতর সুন্দর দেখাচ্ছে। ঝলমলে পোশাক পরিহিতাদের চেয়ে আপনার ওপরই সবার নজর বেশী পড়বে। চলুন, ভেতরে যাওয়া যাক।

রেস্তোরাঁর ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে টাওয়ার্স বলল, একটা কথা কি জানেন? একা-একা রাতের খাবার খেতে আনন্দ পাওয়া যায় না, মোটেই মন চায় না।

তাই বুঝি? মুচকি হেসে মেয়েটা বলল, একটা কথা, আপনি আমাকে মিস মারিয়াম বলেই সম্বোধন করবেন।

ধন্যবাদ!

হলঘরের এক ধারে পছন্দ মাফিক একটা টেবিলে তারা মুখোমুখি বসল। ব্রডওয়ের যে রেস্তোরাঁয় টাওয়ার্স রোজ রাতের খাবার খায় এটা সে রেস্তোরাঁটা নয়। তবে জাঁকজমক সেটার চেয়ে কোন অংশে কমতি নয়। অন্য সব টেবিলগুলো জুড়ে নিয়েছে অভিজাত পরিবারের যুবক-যুবতী ও মাঝবয়সী মানুষগুলো।

বাদকরা হলঘরের এক ধারের মঞ্চ থেকে মধুর সুর তুলে চলেছে। এতে কিন্তু অনুচ্চ কণ্ঠে পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা ও মনের ভাব ব্যক্ত করার কোন অসুবিধাই হবার কথা নয়, হচ্ছেও না তেমন। সাধারণ পোশাক ও টুপি পরিহিতা মেয়েটা নিজেকে অন্য দশজনের সামনে এমনভাবে মেলে ধরতে পেরেছে যাতে তার রূপ-সৌন্দর্যের সঙ্গে অতিরিক্ত সৌন্দর্য যোগ হয়েছে। তবে এ-ও সত্য যে, সে বার-বার আড় চোখে টাওয়ার্স-এর নীলাভ চোখ-জোড়ার দিকে তাকাতে লাগল। আর এরই ফলে তার বিস্ময় ক্রমেই গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে উঠতে লাগল।

ব্যস, তারপরই টাওয়ার্স-এর ঘাড়ে মানহাট্টান-এর পাগলামি চাপল। সে তখন ব্রডওয়েতে বাস করছে। আনন্দ-স্ফূর্তি আর হৈ চৈ চারদিকে সর্বদা লেগেই থাকে। সবার নজর কিন্তু তারই দিকে। কৌতুক-নাটকে সে যেন জীবনের প্রতীক প্রজাপতির ভূমিকায় সফল অভিনয় করে চলেছে। আর সেটা একটামাত্র রাত্রের অভিনয়। জবরদস্ত সাজপোশাকে নিজেকে সে সাজিয়ে নিয়েছে। অতএব তাকে রোখার সাধ্য কারোরই নেই।

মিস মারিয়াম-এর কানের কাছে মুখ নিয়ে টাওয়ার্স ফিস্‌ফিসিয়ে শোনাতে লাগল—'ক্লাব, চায়ের মজলিস, ঘোড়ার রেসের মাঠ, গলফের মাঠ আর কুকুরের খোয়াড়ের কত সব গল্প সরস করে পরিবেশন করতে লাগল। শুধু কি এ-ই? সে আকার ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল ইয়ট-লচিম্যান-এ তার সুবিশাল একটা মাঠ নোঙর করে অবস্থান করছে। আর মিস মারিয়াম-এর চোখ-মুখ দেখে এটুকু অন্তত বোঝা গেল, তার কথাবার্তায় সে বড়ই প্রীত হয়েছে। সুযোগ বুঝে সে কৌশলে এমন কথাও তাকে বুঝিয়ে দিতে ভুলল না, অর্থই যত সর্বনাশের কারণ। এ প্রসঙ্গে তার পরিচিত বিশেষ বিশেষ কয়েক জনের নামও উল্লেখ করল। টাওয়ার্স মাত্র একটা দিনের জন্য সুযোগ পেয়েছে। অতএব এ সুযোগটা পুরোপুরি সদ্ব্যবহারের জন্য মেতে উঠল। এরই ফাঁকে যুবতীটার মধ্যে থেকে থেকে যে সোনা ঝিলিক দিয়ে উঠছে সেদিকেও সে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে।

মিস মারিয়াম ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বলল—দেখুন, এ পর্যন্ত আপনি যে সব জীবনযাত্রার বিবরণ দিয়েছেন তাদের সবই তো নিরর্থক আর পাল তোলা উদ্দেশ্যহীন

জাহাজের মতই। এমন কোন কাজই কি নেই যা করতে আপনি উৎসাহ পাবেন? এমন কোন কাজ মানে—

টাওয়ার্স হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, কাজ! কাজের কথা বলছেন? একবারটি ভেবে দেখুন তো, রোজ রাতে খাবারের পোশাক পরা, ডজনখানেক লোকের সঙ্গে মোলাকাত করা, গাধার গাড়ির চেয়ে দ্রুতগতিতে গাড়ি নিয়ে পথ চলার সময় পুলিশ লাফিয়ে গাড়িতে চেপে থানায় হাজির করবে, ভাবতে পারেন? এ-তো সত্য যে, আমরা অকাজের লোকরাই তো সংখ্যাগরিষ্ঠ আর সবচেয়ে কঠিন কঠোর কাজের কর্মী।

আহারাদি সেরে তারা রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে গাড়ি করে সেখানে হাজির হ'ল যেখানে তারা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। মিস মারিয়াম এখন ভালভাবে হাঁটতে পারছে, পায়ের যন্ত্রণা নেই বললেই হয়।

মারিয়াম এবার টাওয়ার্স-এর কাছ থেকে বিদায় নিতে চাইল। টাওয়ার্স মুখে হাসির ঝিলিক ফুটিয়ে তুলে তার সঙ্গে করমর্দন সারল। ক্লাবে ব্রিজ খেলার প্রসঙ্গে খুবই সংক্ষেপে কি যেন বলল।

টাওয়ার্স সামান্য এগিয়ে একটা খালি গাড়ি পেয়ে তাতে চেপে বসল। গাড়িটা ধীরগতিতে তার বাড়ির দিকে অগ্রসর হতে লাগল।

টাওয়ার্স তার উনসত্তর দিনের রাতের খাবারের পোশাকটাকে ভাঁজ করে তুলে রাখল।

ঘর থেকে বেবিয়ে কপালের চামড়ায় চিন্তার ভাঁজ এঁকে আপনমনে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'সত্যি মেয়েটা খুবই সুন্দর। আর তাকে হয়ত চাকরি করেই পেট চালাতে হয়। তা সত্ত্বেও সব তো ঠিকঠাক আছে। তাকে আমার কথা বাড়িয়ে, ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে না বলে সত্যি কথাটা বলাই উচিত ছিল। তবে আমার পোশাক-পরিচ্ছদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই তো বলা দরকার।

সানহাট্টার আদিবাসী পল্লীর এক চাষী পরিবারে তার জন্ম। সেখানেই সে মানুষ।

এদিকে টাওয়ার্স-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর মেয়েটা লম্বা-লম্বা পায়ে এগিয়ে একটা বিশাল—প্রাসাদোপম বাড়ির সদর দরজায় উপস্থিত হল। এ অঞ্চলে লক্ষ্মীর বরপুত্র এবং তার আত্মীয় স্বজনদের বাস। ব্যস্ত হয়ে সে বাড়িটার ভেতরে ঢুকে গেল। একটা ঘরে রূপসী, একেবারে ডানাকাটা পরীর মত এক মহিলা চোখে-মুখে উৎকণ্ঠার ছাপ এঁকে সেজেগুজে জানালা দিয়ে বাইরের দিবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে।

হন্তদন্ত হয়ে মেয়েটা ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই বড় মেয়েটা রীতিমত গলা ছেড়ে বলতে লাগল, তোমার মাথাটাথা খারাপ হয়েছে নাকি! এ ভাবেই আমাদের মনে ভীতি সঞ্চার করার অভ্যাস মাথা থেকে কবে দূর করবি, বল তো? ছেঁড়া জামা-কাপড় আর মারির পুরনো টুপিটা মাথায় চাপিযে সেই যে বেরিয়েছিস, দু' ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। মা তো ভয়ে কুঁকড়ে গিয়ে লুইসকে গাড়ি দিয়ে তোর খোঁজ করতে পাঠিয়েছে। তোর আর কি—চিন্তা-ভাবনার 'ধার ধারিস না।' কথা বলতে বলতে ঘণ্টা বাজিয়ে পরিচারিকাকে ডাকল। সে এলে বলল—মারি, মাকে খবরটা দাও, মারিয়াম ফিরে এসেছে।

মারিয়াম নিতান্ত অপরাধীর স্বরে বলল, দিদি তিরস্কার কোরো না। মাদাম থিয়োকে বলতে গিয়েছিলাম, গোলাপি রঙের পরিবর্তে অন্য রঙ তিনি যেন সদ্ব্যবহার করেন। এর জন্য এ জামা-কাপড় আর মারির টুপিটা ব্যবহার করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। আমার বিশ্বাস, সবাই ধরেই নিয়েছে আমি একজন দোকানের মেয়ে-কর্মী। পথ চলতে গিয়ে হড়কে গিয়ে আমার গোড়ালি মচকে যায়। অনন্যোপায় হয়েই একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে হাঁটাচলার মত অবস্থা ফিরে না পাওয়া অবধি সেখানেই বসে কাটাই। তাই বাড়ি ফিরতে দেরী হয়।

দু'বোন জানালার ধারে বসল। ছোট বোন মারিয়াম তার দিদির কোলে মাথা রেখে আধ-শোওয়া অবস্থায় বসল। কথা প্রসঙ্গে সে ভাবাপ্লুত কণ্ঠে বলল—দিদি একদিন না একদিন আমাদের বিয়ে হবেই, আমাদের উভয়েরই কথা বলছি। আমাদের অর্থের অভাব নেই যার জন্য কাউকে হতাশ করতে হবে। মুহূর্তকাল নীরবতার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে সে আবার মুখ খুলল, আমি কিরকম পুরুষকে ভালবাসতে আগ্রহী, শুনবে দিদি? যাকে আমি ভালবাসব তার চোখ দুটো হবে নীলাভ। মনটা হবে দয়া-মায়ায় ভরপুর, ধীরস্থির আর শান্ত স্বভাব বিশিষ্ট। আর অন্তরে গরীব মেয়েদের প্রতি শ্রদ্ধা

পোষণ করবে। হ্যাঁ, তাকে অবশ্যই সুদর্শনও হতে হবে। সব শেষে বলছি, আমার ভালবাসার পাত্র হবে উচ্চাকাঙ্খা সম্পন্ন, জীবনের লক্ষ্য থাকতে হবে আর তাকে কোন না কোন কাজে লিপ্ত থাকতে হবে। উন্নতি করতে আমার কাছ থেকে সে সার্বিক সহযোগিতা পাবে। তাই তো সে কতটা আর্থিক অসঙ্গতি সম্পন্ন তা নিয়ে আমার কোন চিন্তা ভাবনা নেই। তবে আমার সাফ কথা শুনে রাখ দিদি, যে কেবলমাত্র ক্লাব নিয়ে ব্যস্ত থাকে আর শুয়ে বসে দিন যাপন করে সেরকম কাউকে ভালবাসা আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হবে না। তার চোখ দুটো নীলাভ হলেও পথ চলতে চলতে কোন গরীব মেয়ের প্রতি দয়া প্রদর্শন করলেও না, কিছুতেই না।

মেমোরিস অব এ ইয়েলো ডগ

আমি কিন্তু খুব বেশী আশাবাদী নই যে, একটা পশুর লেখা পড়ার জন্য আপনারা কেউ অত্যুগ্র আগ্রহী হয়ে পড়বেন। মিঃ কিপ্‌লিং এবং আরও বহুজনই এটা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে পশুদের পক্ষেও উন্নত মানের ইংরেজি ব্যবহার করে নিজেদের কথা ব্যক্ত করা সম্ভব। বর্তমানে লক্ষ্য করা যায় জন্তু জানোয়ারের গল্প কোন সাময়িকপত্রই ছাপতে যায় না। তবে হ্যাঁ, কিছু সাবেকি আমলের পত্রিকার পাতায় সচিত্র ভৌতিক গল্প স্থান পাচ্ছে।

তবে আগেই সাফাই গেয়ে রাখছি, বন বাদাড়ের বইতে সাপ, ভালুক আর বাঘের যেসব রোমাঞ্চকর গল্প স্থান পায় সেরকম কোন গল্প কিন্তু আমার কাছ থেকে প্রত্যাশা করলে হতাশই হতে হবে। নিউইয়র্কের এক কম দামী ফ্ল্যাটে একটা হলুদ কুকুর পুরনো একটা সায়ার কোণে ঘুমিয়ে জীবন কাটিয়েছে। তার কাছ থেকে কোনরকম কথাসাহিত্য প্রত্যাশা করাটা মোটেই সঙ্গত হবে না।

আমি একটা হলদে কুকুরছানা হয়েই জন্মেছিলাম। আমার জাত-বংশ, জন্ম স্থান, জন্ম তারিখ আর জন্মলগ্ন কিছুই আমার জানা নেই। যে কথাটা সবার আগে আমার মনে পড়ে—একটা ঝুড়িতে ভরে এক বুড়ি ব্রডওয়ের পথের বাঁকে দাঁড়িয়ে স্থূলকায় এক মহিলার কাছে আমাকে বেচে দেয়ার চেষ্টা করছিল। হুবার্ড নামের বুড়িটা খুব করে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে আমার গুণগান করতে গিয়ে আমার পূর্বপুরুষের কথা উল্লেখ করল—পোমেরানিয়াম-হ্যাম্বল টোনিয়ান-লালচে-স্থূলকায়া মহিলাটি তার কথা বিশ্বাস করে আমাকে খরিদ করে নিল। এবার বাজারের থলেতে পুরে বাড়ির দিকে হাঁটা জুড়ল। ব্যস, মুহূর্তেই আমি তার বুকের ধনে পরিণত হয়ে গেলাম। আমিও তাঁকে মা বলেই মেনে নিলাম।

আমার অভিন্ন হৃদয় পাঠক-পাঠিকা, একটা কথা সত্যি করে বলুন ত, দু'শ পাউণ্ড ওজনের এক স্থূলকায়া মহিলা আমাকে কোলে নিয়ে আমার সর্বাঙ্গে নিঃশ্বাস ফেলতে-ফেলতে সোনামণি সোনামণি বলতে বলতে আমাকে সোহাগ করছেন—এমন দৃশ্য কখনও দেখেছেন—ভাবতে পারেন?

সর্বজন পরিচিত নাম-ডাকওয়ালা বংশোদ্ভুত কুকুরের বাচ্চা থেকে আমি শেষমেষ মামুলি একটা দো-আঁসলা কুত্তার বাচ্চা হয়ে গায়ে গতরে বাড়তে লাগলাম। আমার মা, স্থূলকায়া মহিলাটির এ ব্যাপারে তেমন নজর ছিল না। তিনি ভাবতেন, যে দুটো কুকুরের বাচ্চাকে নিয়ে নোয়া একদিন নৌকায় চেপেছিলেন এ অধম তাদের বংশোদ্ভুত। আমার প্রতি তাঁর আদরের এতটুকুও ঘাটতি কোনদিন নজরে পড়েনি। ম্যাসিডন স্কোয়ারের বাগানের চত্বরে সাইবেরিয়ান ব্ল্যাক হাউন্ড কুকুরের বাচ্চাদের যে প্রতিযোগিতা হয় তাদের তালিকায় আমার নামটা ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্যও তিনি চেষ্টার ত্রুটি রাখেন নি। দু'জন পুলিশ বেগড়া দেওয়ায় তার প্রয়াস ব্যর্থ হয়।

আমার প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, এবার আপনাদের কাছে ফ্ল্যাটটার বিবরণ দিচ্ছি। নিউইয়র্ক শহরের সাদামাঠা একটা বাড়ি মনে করতে পারেন। প্রথম কামরাটার মেঝে শ্বেত পাথরে মোড়া, দোতলা থেকে পুরো বাড়িটাই সাধারণ পাথরে তৈরী। আমার মা, মানে মনিব, পুরনো আসবাবপত্র ও অন্যান্য জিনিসপত্র দিয়ে তার ঘরটা সাজিয়ে তুলেছিলেন। তাদের মধ্যে তার একটা স্বামী—স্বামী দেবতা ছিল।

ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, এক বিন্দুও বানিয়ে বলছি না। দ্বিপদ এ প্রাণীটার জন্য আমি

বড়ই ব্যথিত, মর্মাহত হতাম। লোকটা বেঁটেখাটো, মাথায় একরাশ ধূসর চুল আর ঠিক আমারই মত ছিল তার গোঁফজোড়া। স্ক্রেন। তার মুখটা জুড়ে ফ্লেমিংগো, পেলিকান ও টুকান ও অন্যান্য বহু পাখির ঠোঁটের ক্ষতচিহ্ন জ্বলজ্বল করত। ঘরদোর পরিষ্কার করা, ঘরমোছা ও গোছানো আর বাসনকোসন ধোয়া থেকে শুরু করে সংসারের যাবতীয় কাজ করা আর সহধর্মিনীর মুখ থেকে অন্য ফ্ল্যাটের মেয়েছেলেদের সম্বন্ধে রসাল গল্প শোনা ছিল তার রোজকার কাজ। রোজ সন্ধ্যায় আমার মনিবানি, স্থূলকায়া মহিলাটি যখন হেঁসেলে রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন তখন তাঁর স্বামীদেবতাটির কাজ ছিল আমার গলায় শিকল পরিয়ে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া। এটা ছিল তার রোজকার কর্তব্য কর্ম।

হতভাগা পুরুষরা যদি জানত তাদের স্ত্রীরা একা থাকলে কিভাবে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তবে হয়ত বা ছাদনাতলায়ই যেত না। গলায় বাদাম তেল মাখা, বাসন কোসন এঁটো অবস্থাতেই পাঁজা করে রাখা, বরফ বিক্রেতার সঙ্গে আধঘণ্টা ধরে ফিসফিস করে গল্পে মজে থাকা, আঙুলে তুলে আচার জিভে ঠেকানো, পুরনো চিঠির গোছা খুলে সঞ্চিত চিঠিগুলো বের করে আগ্রহের সঙ্গে বার-বার পড়া আবার বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে দরজার ছিদ্র দিয়ে এক ঘণ্টা ধরে পাশের ফ্ল্যাটে উঁকি ঝুঁকি মারা—এরকম সব কাজে তারা সময় কাটায় আর পুরুষ মানুষটা কাজ থেকে বাড়ি ফিরে আসার মিনিট দশেক আগে ঘরটার ওপর-ওপর গোছগাছ করে নিয়ে সেলাই ফোঁড়াই নিয়ে ব্যস্ততা দেখিয়ে স্বামী দেবতাটার প্রবঞ্চনায় মাতে।

আমি দিনভর কামরাটার কোণে শুয়ে শুয়ে লক্ষ্য করতাম আমার মনিবানি কিভাবে এত বড় দিনটা কাটায়। আবার ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখতাম, আমি বিড়ালগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি। এক ভদ্রমহিলা কুতকুতে এক বিড়ালছানা কোলে নিয়ে আমার মনিবানির সঙ্গে গল্প করতে আসে। অন্য সব কুকুর হলে যা করত আমিও একই রকমভাবে ঘেউ-ঘেউ করে উঠি। তখন আমার আচরণে মুগ্ধ হয়ে আমাকে পিঠ হাতিয়ে সোহাগ করেন, চুমু খান, আরও কত ভাবে যে আমাকে আদর সোহাগ করতে থাকেন বলে শেষ করা যাবে না।

সত্যি বলছি, বেচারা স্বামীটার জন্য আমার বড়ই দুঃখ হয়। আমরা বাইরে পাশাপাশি বেড়াবার সময় দশজনের চোখে আমাদের উভয়কে একই রকম মনে হ'ত। তাই তো আমরা যেসব রাস্তায় তথাকথিত সভ্য ও ধনীর দুলালরা মোটরগাড়ি নিয়ে যাতায়াত করে সে সব পথ ছেড়ে গরীবদের পল্লীর ধারকাছ দিয়ে বেড়াতেই অভ্যস্ত।

এক সন্ধ্যায় আমরা পাশাপশি বেড়াবার সময় আমি এমন কায়দা করে হাঁটতে লাগলাম যাতে আমাকে সেন্ট বার্নাড-এর কুকুর ব'লে লোকে মনে করে। আর বুড়ো লোকটা? সে প্রয়াসী হলো তাকে যাতে আর বেশী বিষণ্ন, আরও বেশী মনমরা ও আরও বেশী অদৃষ্ট বিড়ম্বিত মনে হয়।

আমার মনটা অস্বাভাবিক রকম বিষিয়ে উঠল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে সহানুভূতির স্বরে বললাম—স্যার, আপনাকে এমন মনমরা দেখাচ্ছে কেন? হয়েছে কি? ধ্যুৎ কার জন্য ভাবতে বসেছেন, বলুন দেখি? আপনার গিন্নি তো ভুলেও কোনদিন আপনাকে একটা চুমুও খায় না। তার কোলে বসে দু'-চারটে মিষ্টিকথা শোনার মত বরাতও আপনার নয়। তবে আপনার বরাত ভাল যে, আমার মত কুকুর হয়ে আপনাকে পৃথিবীতে আসতে হয়নি। আর এরই জন্য আপনার অবশ্যই কৃতজ্ঞ থাকা দরকার। আশা রাখুন, সুদিনের মুখ দেখবেনই।

বিয়ের শেকলে আবদ্ধ বেচারা বুড়ো মানুষটা চোখে-মুখে এমন একটা ছাপ এঁকে আমার দিকে তাকালো যাতে আমার সমগোত্রীয়, কুকুর সুলভ বুদ্ধির ছাপ তাতে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

সে আমার দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে বললো—সে কি তুমি বুঝি আমাদের, মানে মানুষের মত কথা বলতে পার! তুমি বিড়াল দেখেছ নাকি হে?

বিড়াল? বিড়াল কি মানুষের মত কথা বলতে পারে নাকি? আমার বক্তব্য বোঝার ক্ষমতা তার হ'ল না। পশুর কথা তো মানুষের বোঝা সম্ভবও নয়। অবশ্য গল্পে মানুষ ও পশুকে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় সত্য।

আমাদের লাগোয়া কামরাটায় এক ভদ্রমহিলা একটা কুকুর নিয়ে থাকতেন। তাঁর স্বামী রোজ সন্ধ্যায় দরজার শেকল তুলে দিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে যান। আর ফেরেন খুশিতে ডগমগ হয়ে শিস

দিতে দিতে। একদিন হলঘরে কুকুরটার প্রায় নাকের সঙ্গে নাক ঠেকিয়ে ফিস ফিস করে ব্যাপারটা জানতে চাইলাম।

মুহূর্তকাল নীরবে তার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত সে বলতে লাগল—ভাই, তোমার তো জানাই আছে, কোন যথার্থ ভদ্রলোক দশজনের সামনে কোন কুকুরকে আদর করতে উৎসাহী হয় না। গোড়ার দিকে আমরা যখন পাশাপাশি বেড়াতে বেরোতাম তখন আমার মালিক খুবই লজ্জা, মানে বিব্রত বোধ করতেন। একের পর এক ক'রে আট-আটটা মদের দোকানে ঢোকার পর তার মনেই হ'ত না তার পিছন পিছন কুকুর, নাকি অন্য জানোয়ার চলেছে। দোকানের ঝুল বারান্দার ফাঁক দিয়ে বেরোতে গিয়ে আমার লেজের ডগাটা তো কেটেই যায়। উফ্! কী যন্ত্রণা!

তার কথাটা আমার ভালই লাগল।

আমার মনিবানি তার স্বামীটাকে হুকুম করত—বুকে হাঁটু ঠেকিয়ে বসে না থেকে লাভিকে নিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে একটু হাওয়া খাইয়ে আনতে পারছ না?

আমার নামটা এতক্ষণ চেপে রেখেছিলাম। ফাঁস যখন হয়েই গেল তখন বলেই ফেলি, আমার মনিব—মনিবানি উভয়েই আমাকে 'লাভি' নামেই ডাকে। আর তামাটে রঙের কুকুরটার নাম যে 'টুইটনেস' তা-ত আগেই বলা হয়েছে।

সামান্য এগিয়ে এক দৌড়ে আমি অভিজাত একটা মদের দোকানে ঢুকে পড়লাম। আমাকে দেখেই বুড়ো লোকটা প্রায় খেঁকিয়ে উঠল—একী! আমি কি চোখে ঝাপসা দেখছি! ভুল হচ্ছে কি? হতচ্ছাড়া কুত্তার বাচ্চাটা আমাকে এখানে মদ খাওয়ার জন্য টেনে এনেছে নাকি! এতদিন ঢুকব কি ঢুকব না করে করে এখানে ঢোকা হিম্মতে কুলোয়নি।

বুঝতে দেরী হল না বুড়োটার জিভে জল এসেছে, প্রভু প্রলোভনের শিকার হয়ে পড়েছে। সে দুম্ করে একটা টেবিলে বসে পড়ল। পুরো একটা ঘণ্টা ধরে মদ গিলে চলল। আর আমি? লেজ নাড়তে নাড়তে খানা খেয়ে নিলাম। এমন মুখরোচক খানা আমার মনিবও কোনদিন ধরেন নি।

বুড়ো স্কটল্যান্ডের মালের বোতলের তলানিটুকু পর্যন্ত নিঃশেষে গলায় ঢেলে আমাকে নিয়ে বাইরে এল। মাছ শিকারীরা যেমন বড়শিতে মাছ গেঁথে তাকে নিয়ে খেলিয়ে আনন্দ উপভোগ করে তেমনি সে-ও আমার শিকলটাকে নিয়ে খেলায় মেতে গেল। আর আমার গলাবন্ধনীটাকে এক ঝটকায় খুলে পথে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

আর মুখে আক্ষেপসূচক শব্দ উচ্চারণ করে বলল—আয়! হতভাগা কুত্তার বাচ্চা! আমার বৌটা আর কোনদিন তোকে কোলে বসিয়ে চুমু খেতে পারছে না। যা, শিগ্গির এখান থেকে কেটে পড়। তা যদি না-ই পারিস তবে নিদেন পক্ষে গাড়ির তলায় জানটা দে গে যা। দুঃখ-যন্ত্রণা জন্মের মত ঘুচে যাক।

আমিও দো-আঁশলা কুত্তার বাচ্চা। ঠিক করলাম, এঁটুলির মত বুড়োর সঙ্গে লেগে থাকব। কিছুতেই ছাড়ছি না। ন্যাওটা শিশুর মত তার গায়ে সেঁটে থাকতে লাগলাম। ব্যাপারটাতে আমার কাছে রীতিমত মজাই পেতে লাগলাম।

আমি একটু রাগত স্বরেই বললাম। বলি, তোমার মাথায় কি গোবর-টোবর আছে নাকি হে! তোমার সঙ্গ ছেড়ে আমি যে কোথাও যেতে উৎসাহী নই, এতটুকুও বুঝতে পারছ না? আচ্ছা, তুমি কি বুঝেও না বোঝার ভান করছ, নাকি সত্যিই মাথায় ঢুকছে না যে, আমরা দু'জনই ভুল করে একই বুড়ির খপ্পড়ে পড়ে গেছি? হায় রে! আমরা দু'টি প্রাণীই তোমার নচ্ছাড় বৌটার শিকলে আটকা পড়ে গেছি। তার চেয়ে বরং শিকলটা ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে দিয়ে বাঘের রূপ ধারণ কর।

মদের ঝোঁক একটু থিতিয়ে গেলে বুড়ো আবার মুখ খুলল—শোন হে কুত্তার বাচ্চা, কেউ-ই এ পৃথিবীতে বার বার জন্ম নেয় না। তিনশ'-র বেশী কেউ কদাচিৎ পৃথিবীতে টেকে। যদি ওই ফ্ল্যাটে আর কোনদিন ফিরি তবে আমি একটা নিরেট বুদ্ধু। আর তুমি যদি ফের তবে তুমি একই রকম বুদ্ধু—বুদ্ধুর বুদ্ধু।

আমি মনিব-বুড়োটার প্রায় গা-ঘেঁষে হাঁটতে-হাঁটতে বিশ নম্বর পথ ধরে ফেরীঘাটে হাজির হলাম।

আমাদের পালতোলা নৌকাটা জার্সির ঘাটে ভিড়ল। আমরা অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে ঘাটে নেমে পড়লাম।

মনিব-বুড়োটা আমার একটা কান ধরে টানতে-টানতে বলল—হতচ্ছাড়া। নচ্ছাড়! পাজি-ছুঁচো কাহিকার। আজ থেকে আমি তোকে কোন্ নামে সম্বোধন করব, জানিস?

লাভি। মাত্রাতিরিক্তি আনন্দে এ নামটাই আমার মনে জাগল। সে আমার গায়ে-মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল—লক্ষ্মীসোনা। তোকে লক্ষ্মীসোনা বলে ডাকব, বুঝলি?

আমি অনবরত লেজ নেড়ে আবেগ, উচ্ছ্বাস আর আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলাম।

সিস্‌টারস্‌ অব দ্য গোল্ডেন সার্কেল

ভদ্র কন্ডাক্টরটা ওপরতলার যাত্রীদের নিজ নিজ সিটে বসাতে ব্যস্ত। রুবারনেক অটোটা ছাড়তে চলেছে। পাশের পথে দর্শনার্থীদের ভিড়। অন্য দর্শনার্থীদের দেখার জন্যই এরকম গাদাগাদি ভিড়। পৃথিবীর সব প্রাণীই যে অন্য কোন না কোন প্রাণীর শিকার এই সত্যটা প্রমাণ করার জন্যই হয়ত তারা এখানে এসে এমন ভিড় করেছে।

ঘোষক তার মেগাফোন যন্ত্রটা হাতে তুলে নিয়েছে। গাড়িটা অনবরত তিরতির করে কেঁপেই চলেছে। ওপরতলার যাত্রীদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। যে মহিলাটি ইন্ডিয়ানার ভাল্‌পারাইসো থেকে এসেছেন তিনি তাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেওয়ার জন্য চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছেন। কার্ডিয়ানফোন থেকে প্রচারিত বক্তব্য বিভিন্ন জায়গায় প্রদর্শনের সফর-সূচী জানা যাবে।

আফ্রিকার জঙ্গলে খুব সহজেই শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে কৃষ্ণাঙ্গদের পরিচয় হয়ে যায়। মা আর সন্তানের মধ্যে আত্মিক যোগ, মানুষ আর জন্তু-জানোয়ারের মধ্যেকার সামান্য দূরত্বটুকু ঘুচিয়ে প্রভু আর কুকুরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে অভাবনীয় দ্রুত গতিতে সংক্ষিপ্ত ভাব বিনিময় হয়ে যায়। এগুলো ছাড়াও রুবারনেক-এর ভেতরে আরও কয়েকটা ব্যাপার চোখে পড়বে। এখন পর্যন্ত যদি আপনার অজানা থাকে তবে জানার সুযোগ ঘটবে দুটো প্রাণীর, কি ভাবে প্রথম পরিচয়ের মুহূর্তেই, একে অন্যের মনের নাগাল পাওয়া সম্ভব।

ঘণ্টা বাজামাত্র যাত্রী-বোঝাই চার-চাকার যান রুবারনেক অটোটা ধীর গতিতে যাত্রা শুরু করল। মিসৌরী ক্লোভারডেলের বাসিন্দা জেমস্ উইলিয়ামস্ আর তার সদ্য বিবাহিতা সহধর্মিনী সবচেয়ে উঁচু পিছনের সিট দুটোতে বসে।

আমার লেখক-লেখিকা বন্ধু, এ মওকায় জীবন ও প্রেমের শেষ কথা, খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথাটা টুকে রাখুন। ফুলের মিষ্টি গন্ধ, মৌমাছির মৌচাক, ঝর্ণার জলরাশি, চাতকের জলের জন্য আর্তনাদ, কাড়ি কাড়ি কমলালেবুর ছিবড়ে—এসব মিলিয়েই তো সদ্য বিবাহিতা নববধূ। বধূ প্রকৃতই পবিত্র, আর মা, শ্রদ্ধাস্পদা। পুরুষরা যখন এক নারীকে বিয়ে করে জীবন-সঙ্গিনী করে তখন নববধূর মাধ্যমে পরমপিতার উপঢৌকন আসে।

আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, ক্লোডারডেল-এর রূপ-সৌন্দর্যের আকর সহধর্মিনী মিসেস উইলিয়ামসকে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখুন। ফিকে নীল রঙের প্রতি তার ঝোঁক। আর তার চোখ দুটোতে হাল্কা বেগুনি রঙের ছোপ ও গাল দুটোতে গোলাপ-কুঁড়ির আভা সুস্পষ্ট। তিন খণ্ডে সমাপ্ত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিন্তা রাশির ছোট্ট একটা গ্রন্থাগারের ছাপ মিসেস জেমস্ উইলিয়ামসের মুখে প্রকাশমান। প্রথম খণ্ডে এ বিশ্বাসটাই সুস্পষ্ট যে, জেমস্ উইলিয়ামস যথার্থই একজন সজ্জন—মানুষ হিসাবে খুবই ভাল। দ্বিতীয় খণ্ডে উল্লেখ রয়েছে পৃথিবীটা খুবই মনোরম—মনোমুগ্ধকর। আর তৃতীয় খণ্ডে এ বিশ্বাসটাই ব্যক্ত হয়েছে, অটোর সুউচ্চ সিটে পাশাপাশি বসে তারা এমন একটা দেশ সফর করছে যা চিরদিন অজ্ঞাতই থেকে যাবে।

লেখক-লেখিকা, নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন, জেমস্ উইলিয়ামস্ এক চব্বিশ বছরের যুবক। সঠিক ভাবে বললে, তার বয়সে আসলে তেইশ বছর এগারো মাস উনত্রিশ দিন। তার দেহসৌষ্ঠব লক্ষ্যণীয়, কর্মঠ, পরিশ্রমী আর আচার-আচরণ ভাল। সে মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে চলেছে। আর ভূমিকা নয়।

আসল প্রসঙ্গটা এবার পাড়ছি। খয়েরী রঙের ঢিলাঢালা জামা গায়ে এক যুবতী মিসেস উইলিয়ামস্-এর সামনে সিটে বসে। আঙুর ও গোলাপে তার মাথার খড়ের টুপিটাকে সাজিয়ে নিয়েছে। একমাত্র স্বপ্ন রাজ্যের দোকানেই আঙুর ও গোলাপ মিলতে পারে—বাস্তবে হতাশ হতে হবে।

বছর চব্বিশের এক যুবক মেয়েটির ডানদিকের সিটটা দখল করে বসে। তার দেহসৌষ্ঠব উল্লেখযোগ্য, পরিশ্রমী, কর্মঠ যথার্থই সৎ। জেমস্ উইলিয়ামস্-এর দৈহিক ও চারিত্রিক বিবরণের সঙ্গে যদি মিলে যায় তবে কিছু করার নেই।

খয়েরী পোশাকে সজ্জিত যুবতীটা ঘাড় ঘুরিয়ে সবার পিছনের যাত্রীদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। আর বাকিদের ওপর আগেই চোখ বুলিয়ে নিয়েছিল। ঘাড় ঘোরাতেই মিসেস উইলিয়ামসের চোখে তার চোখ পড়ল। মুহূর্তেই উভয়ে সারা জীবনের অভিজ্ঞতা, আশা-আকাঙ্খা আর ভাবনা-চিন্তা আদান-প্রদান করে নিল। আর জানবেন, এসব চোখের ভাষার মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়।

সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে নববধূটি দাঁড়াল। উভয়ে একই সঙ্গে তো তাড়াতাড়ি সম্ভব কথা সেরে ফেলল।

কালো পোশাক পরিহিত একটা লোক রুবারনেক গাড়িটার সামনে পথ আগলে দাঁড়িয়ে পড়ল। পাশের গলি থেকে ঝট্ করে আরেক জন বেরিয়ে এসে তার সঙ্গে যোগ দিল। উভয়েই বিশালদেহী আর অমিত শক্তিধর বলেই মনে হল।

আঙুর আর গোলাপে সাজানো খড়ের টুপি পরা যুবতীটা ঝট্ করে তার সঙ্গীর হাত ধরে ফিসফিসিয়ে কি যেন বলল। যুবকটার কাজের মাধ্যমেই ক্ষিপ্রতার প্রমাণ পাওয়া গেল। মুহূর্তের মধ্যেই সে নিচু হয়ে গাড়িটার একদিকে ঢুকে গেল। চোখের পলকে সে সবার চোখের আড়ালে চলে গেল। ওপর তলার আধডজন যাত্রী চোখের তারায় বিস্ময়ের ছাপ এঁকে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে তার কাণ্ডকারখানা দেখল। কিন্তু সবাই মুখে কুলুপ এঁটেই বসে রইল।

গাড়ি থেকে কেটে পড়ে সে যাত্রীটা একটা ভাড়াটে গাড়ি থামিয়ে ঝট্পট্ তাতে চেপে বসল। ফুল-বোঝাই একটা গাড়ি আর আসবাবপত্রে ঠাসা একটা গাড়ির ফাঁক দিয়ে নদীর স্রোতে ভেসে যাওয়া পাতার মত অনায়াসেই এগিয়ে যেতে লাগল।

সেই যুবতীটা—খয়েরী রঙের পোশাক পরিহিতা ওই যে সেই যুবতীটার কথা বলছি। সে আবার আচমকা ঘাড় ঘুরিয়ে মুহূর্তের জন্য মিসেস উইলিয়ামস্-এর চোখে চোখ রেখেই যন্ত্রচালিতের মতই চোখ ফিরিয়ে নিয়ে চারদিকে তাকাতে লাগল। ঠিক তখন সাদা পোশাক সজ্জিত লোকটার কোটের তলার 'ব্যাজ'টা নজরে পড়ামাত্রই রুবারনেক অটোটা হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সাদা পোশাকের পুলিশটা বলল, গাড়ি দাঁড় করাও। আমরা এ গাড়ির এক যাত্রীর তল্লাশ করছি। ফিলাডেলফিয়া শহরের এক দামী চোর। পিংকি ম্যাক্গুয়োর তার নাম। তার সহকারী ডোলোভান গাড়িটার পিছনের চাকার দিকে এগিয়ে গেল, জেমস্ উইলিয়ামসের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। এবার কর্কশ স্বরে বলল, এতদিনে মহাপ্রভুর দর্শন পেয়েছি। মতলবটা খারাপ করনি। চুপিচুপি রুবারনেকে চেপে কেটে পড়ছিলে বাপধন।

কন্ডাক্টর মেগাফোনে বলল—স্যার, আমাদের পথ আগলাবেন না। পথটা ছেড়ে দিয়ে আপনার যা কিছু বক্তব্য বলুন।

সহজ-সরল প্রকৃতির লোক জেমস্ উইলিয়ামস। কোন রকম টাল বাহানার সাহায্য নিয়ে নিজের সাফাই গাইবার চেষ্টা করল না। ধীরস্থির ভাবেই সামনের দরজা দিয়ে অটো থেকে নেমে গেল। তার পিছন-পিছন তার স্ত্রীও নেমে পড়ল। অটো থেকে নেমে পথে পা দিতেই তার নজরে পড়ল, অটো থেকে নেমে গা-ঢাকা দেওয়া যাত্রীটা আসবাবপত্রের গাড়িটা থেকে নেমেই ছুটে গিয়ে পার্কের গায়ে মোটাসোটা একটা গাছের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে দিল। অটো থেকে নামা মাত্র জেমস্ পুলিশ-অফিসারকে দেখেই হঠাৎ সরবে হেসে উঠল। ভাবল ক্লোভারডেন শহরে তাকে নিয়ে যাওয়ার পর যখন দেখা যাবে তাকে ভুল করে চোর বলে ধরে আনা হয়েছে তখন ব্যাপারটা বড়ই মুখরোচক মনে হবে। অটোটা পুলিশ-অফিসারের প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। আসলে এমন মজার ঘটনা তো সচরাচর চোখে পড়ে না।

পুলিশ-স্টেশনে যাবার পথে জেমস্‌ নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলল—আমি জেমস্‌ উলিয়ামস। মিসৌরীর অন্তর্গত ক্রোভারডেল-এ পড়ি। সে শান্ত-স্বাভাবিক কণ্ঠে নিজের পরিচয় জ্ঞাপন করল। নইলে সবাই হয়ত চমকেই উঠত। মুহূর্তকাল নীরবতার মধ্যে দিয়ে উপস্থিত সবার ওপর একবারটি চোখ বুলিয়ে নিয়ে জেমস্‌ আবার মুখ খুলল—কয়েকটা চিঠিপত্র আমার সঙ্গে আছে যা আপনাদের জিজ্ঞাসা দূর করবে বলেই মনে করি। সাদা পোশাক পরিহিত পুলিশটি বলল—আপনাকে একবারটি আমাদের সঙ্গে যেতে হবেই। কারণ, পিংকি ম্যাকগুয়োর চেহারার সঙ্গে আপনার হুবহু সাদৃশ্য দেখা যাচ্ছে।

তার স্ত্রী, দু' সপ্তাহের বিবাহিতা স্ত্রী চোখে-মুখে অদ্ভুত হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে স্বামীকে বলল—কথা না বাড়িয়ে তারা যেখানে নিয়ে যেতে চাচ্ছে, যাও পিংকি। হয়ত পরিস্থিতিটা অনুকূলেই রয়েছে।

বিশাল পুলিশ-ভ্যানটা চলতে শুরু করল।

সদ্য বিবাহিতা বৌ-টা পথে দাঁড়িয়েই রুবারনেক-এর ওপরতলার সিটে বসে থাকা কোন একজনকে লক্ষ্য করে একটা চুমু ছুঁড়ে দিল। আড় চোখে তার দিকে তাকিয়ে ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলল।

জেমস্‌-এর মধ্যে উদ্ভট একটা পরিকল্পনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। মাথার টুপিটাকে আচমকা পিছনের দিকে অনেকখানি ঠেলে দিল। সে স্বগতোক্তি করল—আমার সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীও কি আমাকে চোর বলেই ধরে নিয়েছে? তার মাথার দোষ আছে, কোনদিন শুনিনি, বুঝিও নি তো। তবে কি—তবে কি আমারই মাথা খারাপ হয়ে গেল! হ্যাঁ, আমারই মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এবার সাদা পোশাক পরা পুলিশ-অফিসারদের লক্ষ্য করি সে গর্জে উঠল, পাগলামি করে এখন যদি আপনাদের দু'জনকে খুন করে তবে কেউ আমার কিছু করতে পারবে না। কারণ, আমি যে পাগল—উন্মাদ! পাগলের সাজা হয় না।

এবার সে পুলিশের গ্রেপ্তারকে অগ্রাহ্য করে রীতিমত হম্বিতম্বি জুড়ে দিল। অনন্যোপায় হয়ে গাড়ি থামাতে হল। বাঁশি বাজিয়ে আরও পুলিশ ডাকতে লাগল। মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি এমন জটিল হয়ে উঠল যে, কয়েক হাজার কৌতূহলী জনতার ভিড় ঠেকাতে রিজার্ভ পুলিশ তলব করতে হল।

পুলিশ-ভ্যানটা সশব্দে থানার দরজার সামনে দাঁড়াল। পুলিশ অফিসারের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে জেমস মুখ খুলল—দেখুন? ম্যাকডুডল্‌, পিংকি, নাকি জানোয়ার পিংকি—এর কোন্‌টা যে আমি ভেবে পাচ্ছি না। তবে আমি যে একটা চোর এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন। আর এ-ও লিখে নিতে পারেন পিংকিকে পাকড়াও করে এখানে হাজির করতে তাদের পাঁচজন পুলিশ হিমসিম খেয়ে গিয়েছিল। এটা নথিভুক্ত করা হোক এটা আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ।

মিসেস উইলিয়াম ম্যাসিডন স্কোয়ারের টমাস কাকাকে সঙ্গে নিয়ে এক ঘণ্টার মধ্যেই পুলিশ স্টেশনে উপস্থিত হল। এমন জমকালো একটা মোটরগাড়িতে তারা এসেছে যা দেখলেই সম্মান প্রদর্শন না করে উপায় থাকবে না।

জেমস্‌-এর নির্দেশিকার যাবতীয় প্রমাণপত্রও সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছে। সে সঙ্গে একটা মোটর কোম্পানির সহযোগিতার প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্রও সঙ্গে এনেছে।

প্রমাণিত হল জেমস্‌ একটা দাগী চোরের অভিনয় করে পুলিশকে হয়রানি করেছে। তার কৃত কর্মের জন্য পুলিশের বড়কর্তা তাকে যারপরনাই বকাবকি করে সসম্মানেই মুক্তি দিল। পুলিশের কাছ থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তার সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী মিসেস উইলিয়ামস্‌ তাকে পাকড়াও করে পাশের ছোট একটা কামরায় নিয়ে গেল। জেমস্‌ একটা চোখ মেলে বিচিত্র ভঙ্গীতে তার সহধর্মিনীর মুখের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। সে তো বহুবার বলেইছে, কেউ তার ডান হাতটা চেপে ধরার সময় ডোনোভানই তার অন্য একটা চোখ চেপে ধরেছিল। আর কোনদিনই সে স্ত্রীকে ভুলেও বকাবকি করেনি।

জেমস এবার বেশ রাগত স্বরেই বলল—ব্যাপারটা কি আমাকে খোলসা করে বলবে কি?

মিসেস উইলিয়ামস আমতা-আমতা করে বলল, লক্ষ্মীটি, কিছু মনে কোরো না। একটা ঘণ্টা

তোমাকে বহু অপমান, বহু কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে—দুঃখিত। অটোতে আমাদের পিছনের সিটে যে মেয়েটা তার স্বামীর সঙ্গে বসেছিল তার আসন্ন দুঃখ-কষ্ট আমাকে বিহ্বল করে তুলেছিল। আসলে তোমাকে পেয়ে আমি যে নিরবচ্ছিন্ন সুখ-শান্তিতে দিন কাটাচ্ছি—মেয়েটার সুখ-শান্তি অব্যাহত রাখার দায়িত্বও আমি স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে না নিয়ে পারলাম না। লোকটা যাতে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে পারে সে মুহূর্তেই এটাই ছিল আমার সবচেয়ে বড় ভাবনা। তারা যখন তোমাকে গ্রেপ্তার করার উদ্যোগ নিচ্ছিল তখন সে লোকটা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে দৌড়ে গিয়ে গা-ঢাকা দেয়। আর পুলিশের লোকরা তোমাকে পাকড়াও করে নিয়ে আসে থানায়। বিশ্বাস কর প্রিয়তম, নিতান্ত অনন্যোপায় হয়েই আমাকে কাজটা করতে হয়েছিল।

সদ্য বিবাহিতা একটা বোন তো এভাবেই মায়াময় আলোর বৃত্তে দাঁড়ানো অন্য একটা বিবাহিতা বোনকে চিনতে পারে। মাত্র একবার, মুহূর্তের জন্য হলেও।

সার্টিনের ঘোমটা দেখেই সবাই বিবাহিতাকে চিনতে পারে। দু'চোখের নীরব চাহনির মাধ্যমেই এক মুহূর্তের এক সদ্য বিবাহিতা অন্য আর এক সদ্য বিবাহিতাকে চিনে ফেলতে পারে। তাদের অন্তরের অন্তঃস্থলের অনাবিল আনন্দ ও সুখের কথা এমন এক অনুচ্চারিত ভাষায় বিনিময় হয় যা কোন পুরুষ বা কোন বিধবার বোধগম্য হয় না—হবার কথাও নয়।

অ্যান আনফিনিশড স্টোরি

আমার টোসেট-এর লেলিহান অগ্নিশিখার কথা শুনে আগের মত মুষড়ে পড়ি না, আর্তনাদ করি না আর মাথায় ছাইয়ের বস্তাও চাপিয়ে রাখি না। কারণ? ধর্মপ্রচারকরাও প্রচারে নেমে গেছেন। তারা প্রচার করতে মেতে গেছেন, পরমপিতা হচ্ছেন রেডিয়াম, ইথার বা এক বৈজ্ঞানিক যৌগিক পদার্থ। আমাদের মত দুর্মতিরা তার কাছ থেকে খুব বেশী হলেও একটা রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া প্রত্যাশা করতে পারি। ব্যস, এর বেশী কি চাওয়ার ও পাওয়ার রয়েছে? তবে প্রাচীনকালে গোড়ামির সামান্য অংশ হলেও আজও অব্যাহত রয়েছে।

এমন দুটো বিষয় অন্ততঃ রয়েছে যাদের সম্বন্ধে মন খোলসা করে কথবার্তা বলা যেতে পারে। আর সে সম্বন্ধে প্রতিবাদের ঝড় ওঠার আশঙ্কা নেই। বিষয় দুটো কি, এই তো? তাদের একটা হচ্ছে স্বপ্ন, আর অন্যটা কাকাতুয়ার মুখে শোনা কথাবার্তা। স্বপ্নের দেবতা মর্ফিউস। দেবতা মর্ফিউস ও পাখি উভয়কেই সাক্ষী হিসাবে দাঁড় করাতে চাওয়া নিরর্থক—একেবারেই নিষ্ফল প্রয়াস। যার কাছে এ দুটো ব্যাপার বলবেন তার পক্ষে মুখবুজে শোনা ছাড়া উপায়ই থাকবে না, প্রতিবাদ করার মত সাহসেই কুলাবে না। তাই একটা স্বপ্নের ব্যাপার নিয়েই দু'-চার কথা বলছি।

ডালসি একটা বিভাগীয় বিপনির কর্মী। পোশাকের লেস, মশলাপাতি, চাকাওয়ালা খেলনা-গাড়ি এবং হরেকরকম ছোটখাটো জিনিস তাকে বিক্রি করতে হয়, বিপনির মালিক তাকে সপ্তাহে ছ' ডলার বেতন হিসাবে দেয়। আর বিক্রির বাকি অর্থ তার নামে খাতায় জমা হয়। আর খরচ লেখা হয় অন্য আর এক জনের নামে। হিসাবপত্র লেখার দায়িত্ব জি-র।

ডালসি যখন প্রথম বিভাগীয় বিপণিটাতে কাজে ঢোকে তখন সপ্তাহে পাঁচ ডলার করে পেত। এত অল্প আয়ে সংসার চালানোর ব্যাপারটা শেখার মতই বটে। এটা নিয়ে আপনার ভাববার দরকার নেই। উত্তম। হতেও পারে। আপনি হয়ত আরও বেশী অর্থের উল্লেখ করতে আগ্রহী। কিন্তু ছ' ডলারও কিন্তু কম নয়। সপ্তাহে ছ' ডলার বিপনি থেকে পেয়ে সে কিভাবে ব্যয় নির্বাহ করত তা-ই আপনার কাছে তুলে ধরছি। একদিন সে কাজ করতে করতে বাঁ দিকের অভিন্ন হৃদয় বান্ধবী সাদিকে বলল—সদি একটা কথা, আজ পিগিকে রাত্রের খাবার খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করেছি।

সাদি তীব্র প্রতিবাদ করে উঠল—অসম্ভব। এমন কাজ কিছুতেই তোমার করা উচিত নয়। শোন, তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। আর পিগি? ধ্যুৎ, তার যা কিছু চটক সবই মেকি, ওপরে-ওপরে রঙ-ঢঙে বাহার। ধরতে গেলে রোজই মেয়ে নিয়ে বড় বড় হোটেল-রেস্তোরাঁয় ঘোরাফেরা করে। এক সন্ধ্যায় ব্ল্যাঞ্চকে সঙ্গে করে হফম্যান হাউসে হাজির হয়েছিল। সেখানে মন-মাতানো গান-বাজনার ব্যবস্থাদি

রয়েছে। সেখানে গেলে এক অনাস্বাদিত আনন্দে সন্ধ্যাটা কাটিয়ে দিতে পারবে।

ডালসি আর কথা না বাড়িয়ে দ্রুত বাড়ির দিকে হাঁটা জুড়ল। চোখে-মুখে হাসির ঝিলিক, বুকে বইছে আনন্দের জোয়ার। জীবনের সত্যিকারের আনন্দকে সে যেন পেতে চলেছে।

সেদিনটা ছিল এক শুক্রবার। গত সপ্তাহের বেতনের মাত্র পঞ্চাশটা সেন্ট ডালসির বটুয়ার তলায় পড়ে রয়েছে।

তখন পথে যেন মানুষের বন্যা বয়ে চলেছে। ডানদিক বাঁদিক—যেদিকেই তাকানো যাক না কেন কেবলই মানুষের মাথা চোখে পড়ছে। ব্রডওয়ের বৈদ্যুতিক আলোগুলো যেন অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে চোখে দেখা দিয়েছে। ভাল-ভাল পোশাকে সজ্জিত সুন্দর পুরুষগুলো নির্মল নির্লজ্জের মত ডালসিকে দেখছে, তার রূপ-সৌন্দর্যসুধা পান করছে। ডালসির কিন্তু সেদিকে খেয়ালমাত্রও নেই। সে হন্তদন্ত হয়ে হেঁটেই চলেছে।

লম্বা-লম্বা পায়ে পথ পাড়ি দিতে দিতে এক সময় ডালসি একটা দোকানে ঢুকে একমাত্র সম্বল পঞ্চাশটা সেন্ট দিয়ে একটা নকল ফিতের কলার কিনে নিল। এটা অন্য কাজে ব্যবহারের জন্য রেখেছিল। কি সে কাজ? পনেরো সেন্ট দিয়ে রাতের খাবার, সকালের জলখাবারের জন্য দশ সেন্ট আর মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য দশ সেন্ট, যষ্ঠিমধুর সিরাপ পাঁচ সেন্ট আর একটা ডাইস পয়সা জমানোর কৌটোয় ফেলার কথা ছিল। তবে যষ্ঠিমধুর সিরাপটাকে বাজে খরচের হিসাবে ফেলা যেতে পারে। যষ্ঠিমধু মদের অভাব অনেকাংশে পূরণ করে। দেহ-মনে অদ্ভুত রোমাঞ্চ জাগায়। ভোগ-বিলাস? আরে জীবনটাই তো ভোগ করার জন্য ঠিক কিনা?

সাজানো গোছানো একটা ঘরে ডালসি থাকে। বোর্ডিং-এর কামরা আর সুসজ্জিত কামরার মধ্যে বিস্তর তফাৎ। সাজানো গোছানো ঘরে উপোস করে কাটালেও কাকপক্ষীও টের পায় না।

সে নিজের ঘরে ঢুকে গ্যাস জ্বালল। তার আলোয় ঘরের পরিস্থিতি দেখা গেল। সোফা-শয্যা, পোশাক-পরিচ্ছদের আলমারি, চেয়ার টেবিল, মুখ ধোবার বেসিন—এটুকুতে যা কিছু ভুলচুক সবই বাড়ির মালকিনেরই। আর অন্য যা কিছু সবের জন্য ডালসিই দায়ী। তার সম্পত্তি বলতে যা কিছু আছে সবই আলমারির ওপর অগোছালভাবে রাখা আছে—সাদির উপহার দেওয়া গিল্টি করা চীনা ফুলদানিটা, স্বপ্ন নিয়ে লেখা বইটা, একটা ক্যালেন্ডার, এক থোকা কৃত্রিম চেরিফল গোলাপি ফিতে দিয়ে বাঁধা, একটা কাঁচের প্লেটে সামান্য চালের গুঁড়ো আরও কত কি। আর উইলিয়াম মুলদুন, জেনারেল কিচেনার, বেনভেনেতো সেলেসি, এবং মার্লবরোর ডাচেস-এর ছবি আয়নার বিপরীত দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে। অন্য আর একটা দেওয়ালে ঝুলছে প্লাস্টার অব প্যারিসের তৈরি রোমক মুকুট মাথায় ও' কালাহান-এর প্রতিকৃতি। একটা তেল-রঙের ছবি যাতে একটা শিশুকে একটা প্রজাপতির পিছনে তাড়া করতে দেখা যাচ্ছে—কাছেই টাঙানো রয়েছে। এগুলো ডালসির শিল্পপ্রীতির পরিচায়ক।

ডালসি হাত চালিয়ে পোশাক-আশাক বদলে নিচ্ছে। সাতটায় পিগি আসবে, কথা দিয়েছে।

পাঠক-পাঠিকা, চলুন, কয়েক সেকেন্ডের জন্য আমরা অন্য দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি। ডালসিকে সপ্তাহে দু'ডলার করে ভাড়া দিতে হয়। সপ্তাহের অন্য দিনগুলোতে সকালের জলখাবারের জন্য দশ সেন্ট খরচ হয়, রবিবারের সকালের জলখাবার একটু মর্জি মাফিকই করে—বিলির রেস্তোরাঁ থেকে বাছুরের মাংসের চপ আর কয়েক খণ্ড আনারস নিয়ে আসে। এর জন্য পঁচিশ সেন্ট লাগে। আর দশ সেন্ট খরচ হয় বকশিস বাবদ। সপ্তাহে কাজের দিনগুলোতে বিভাগীয় বিপনির রেস্তোরাঁয় দুপুরের খাবারের জন্য ষাট সেন্ট লাগে। রাত্রের খাবারের জন্য লাগে ১.৫০ ডলার। দু' সেন্ট সান্ধ্য পত্রিকার জন্য আর দুটো রবিবাসরীয় বাবদ দশ সেন্ট লাগে। সর্বমোট খরচ ৪.৭৬ ডলার। আর পোশাক-আশাকের জন্য খরচ করতে হয়। তার ওপর খরচ করতে হয়—থাক, সে কথা না-ই বা বললাম—ছাড়ান দেওয়া যাক।

পিগির প্রসঙ্গ সংক্ষেপেই সেরে ফেলা যাক। তার নামকরণের সময় মেয়েরা বিশেষ সমাদৃত শূকর-পরিবারের ওপর অহেতুক কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দেয়। সে আমলে তিন অক্ষরের প্রথম পাঠের নীল প্রচ্ছদের বইয়ের প্রথম পাতাতেই থাকত শূকরছানার জীবনী। মোটাসোটা নাদুস-নুদুস দেহ পল্লব, বাদুড়ের মত অভ্যাস আর তার মনটা ইঁদুরের মত আর বিড়ালের মত উদার চরিত্রের।

দামী পোশাক ব্যবহার করে কিন্তু উপোস করার ব্যাপারে তার জুড়ি মেলে না।

পিগি দোকানের যেকোন কর্মী মেয়েকে এক পলক দেখেই বলে দিতে পারে গত ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে চা আর লতাপাতার চেয়ে বেশী ভিটামিনযুক্ত খাবার তার পাকস্থলি পায়নি। সে বাজারের সর্বত্র চক্কর মারে, বিভাগীয় বিপনিগুলোর ধার কাছ দিয়ে ঘুরঘুর করে। একটু সুযোগ পেলেই রাতের খাবারের নিমন্ত্রণ খায়।

বাস্তবিকই পিগি বিচিত্র চরিত্রের যুবক।

ডালসি সাতটা বাজতে দশ মিনিট আগেই সাজগোজে তৈরি হয়ে নিল। গাঢ় নীল পোশাক পরেছে। টুপিতে কাল পালক আঁটা আর ময়লা একজোড়া দস্তানা হাতে পরায় তাকে চমৎকার দেখাচ্ছে।

এখন—এ মুহূর্তে পৃথিবীর অন্য সব কিছুর অস্তিত্ব তার মন থেকে ধুয়ে মুছে গেছে। কেবলমাত্র রূপসী ছাড়া অন্য কোন নামে সম্বোধন করে কেউ কোনদিন তাকে সম্বোধন করে নি। কিছুক্ষণের জন্য হলেও সে রঙচঙে এক জগতে প্রবেশ করবে—একটু বাদেই।

অন্য সব মেয়েদের বক্তব্য পিগি-র হাত খুবই দরাজ। দিলদরিয়া এক যুবক। অতএব রাতের খাবারের প্লেটটা মূল্যবান মুখরোচক খাবার দিয়েই সাজানো হবে, সন্দেহ নেই। ঝলমলে পোশাক পরিহিত নারী-পুরুষদের মাঝে বসে অভাবনীয় সব খাবার খাবে। তাকে সঙ্গে করে পিগি আবারও বাইরে যাবে।

নীল রেশমি একটা পোশাকের অংশবিশেষ দোকানের জানালা দিয়ে সে দেখতে পাচ্ছে, দশ সেন্টের পরিবর্তে সপ্তাহে বিশ সেন্ট জমাতে পারলে কত জমবে হিসাব করা যাক, উফ্! তাতে অনায়াসেই বছর কাটিয়ে দেওয়া যাবে। সেভেনথ্ এভিনিউতে পুরনো মালপত্র বেচা-কেনার একটা দোকান রয়েছে।

সাজগোজ সারতে-সারতে সে যখন রঙিন স্বপ্নে মশগুল ঠিক তখনই বাড়িউলি দরমা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল—মিঃ উইকিন্স নামে এক ভদ্রলোক তোমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। পিগিকে অন্য সবাই এ নামেই সম্বোধন করে। রূপসী ডালসি ব্যস্ত পায়ে ড্রেসিং টেবিলটার কাছে গিয়ে আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে লাগল, যারপরনাই আত্মপ্রসাদ লাভ করল। তার খেয়ালই নেই, বাড়িউলি তাকে লক্ষ্য করছে।

হঠাৎ বাড়িউলির চেহারার প্রতিবিম্বের অংশ বিশেষ আয়নায় দেখেই নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলল—আমি অসুস্থ বা অন্য কোন অজুহাত দেখিয়ে তাকে বলে দাও আমার পক্ষে বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়।

বাড়িউলি চলে যাওয়া মাত্র ডালসি সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে ছিটকিনি এঁটে দিল। তারপর বিছানায় আছাড় খেয়ে পড়ে ডুকরে-ডুকরে কাঁদতে লাগল। আজ তার কাছে একমাত্র কাম্য-পুরুষ জেনারেল কিচেনার। ডালসির চোখে সেই সবচেয়ে সাহসী মানুষ, আদর্শ পুরুষ। কিন্তু, তার মুখের দিকে চোখ পড়লে স্পষ্ট মনে হয় কিসের যেন একটা অব্যক্ত ব্যথা-বেদনা তার ভেতরটাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। তার স্থির চোখের চাহনি ডালসির বুকে আতঙ্ক সৃষ্টি করে, কেমন মিইয়ে যায়। তার দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে, আজ না হোক কাল জেনারেল তার দরজায় এসে দাঁড়াবেই। কোমরে তরবারিটা ঝুলিয়ে হয়ত তার নাম ধরে মধুর স্বরে ডাকবে।

একদিন পাড়ার ছেলেরা লাইট পোস্টের গায়ে লোহার শিকল দিয়ে ঝন্ঝন্ শব্দ করল। ডালসি সচকিত হয়ে জানালার কাছে দৌড়ে গিয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। না, কাউকেই দেখতে পেল না। আসলে জেনারেল তো জাপানে অসভ্য-জঙ্গলী তুর্কীদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত।

ডালসি ভালই জানে, জেনারেল কোনদিন তার জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশ থেকে তার কাছে ছুটে আসবে না। রাত্রেই তার ডাগর ডাগর চোখের চঞ্চল মণি দুটো পিগিকে বশীভূত করে ফেলে। তবে সেই একটামাত্র রাত্রের জন্যই। ব্যস, দ্বিতীয়বার আর তার কাছে যায়নি সে।

একসময় কান্না থামিয়ে ডালসি তার সবচেয়ে পছন্দমাফিক পোশাকটা ঝটপট খুলে একটা পুরনো নীল কিমোনো পরে নিল। রাতের খাবার খেতে মন সরল না। তাস নিয়ে নাড়াচাড়া করতে-করতে চেঁচিয়ে উঠল—লোকটা কী অসভ্য বর্বর। এমন ভাবনা মাথায় আসার মত কোন কথা,

সামান্যতম ইঙ্গিত পর্যন্ত দেইনি।

রাত্রি ন'টায় ডালসি ক্রিমক্রেকার আর র‍্যাম্পবেরি জ্যাম দিয়ে কোনরকমে নৈশভোজ সেরে নিল। তারপর আলোটা নিভিয়ে পাশে সরিয়ে রেখে শুয়ে পড়ল। মিনিট-কয়েকের মধ্যে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

ক'দিন বাদেই পিগি তাকে আবার রাতের খাবার তার সঙ্গে সারার জন্য নিমন্ত্রণ করল। জেনারেল কিচেনার কোন এক কারণে ডালসির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে। ফলে সে বড়ই একাকী বোধ করতে লাগল। তারপর? তারপর হল কি—

আগেই তো উল্লেখ করেছি আমি একদল ধনকুবেরদের মধ্যে অবস্থান করছি। আর এক পুলিশ আমাকে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করতেও ছাড়ল না আমি তাদেরই দলের একজন কিনা। আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে পুলিশ পুঙ্গবের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম—তাদের? তাদের বলতে কাদের কথা বলতে চাইছেন?

বুঝতে পারছেন না কিছুই? যারা কাজের মেয়েদের সামান্য অর্থের বিনিময়ে ভাড়া করে, তাদের কথা। খেয়ে পরে বেঁচে থাকার মত হপ্তায় পাঁচ-ছ'টা ডলার করে তাদের দিকে ছুঁড়ে দেয়, এবার বুঝতে পারলেন তো? এবার সত্যি করে বল, তুমিও কি তাদেরই একজন?

আমার সাফ জবাব—না, অবশ্যই না। আমাকে এমন একজন মনে করতে পারেন, যে একটা অনাথ আশ্রমকে অগ্নিদগ্ধ করে এক অন্ধকে তার পেনিগুলো হাতাবার ধান্দায় হত্যা করেছে।

টবিন্'স পাস্

এক সময় টবিন আর আমি কোনি সফরে গিয়েছিলাম। আমাদের উভয়ের সম্বল একত্র করে দেখা গেল সম্বল মাত্র চার ডলার। কিন্তু টবিন-এর বায়ুপরিবর্তনে যাওয়া খুবই প্রয়োজন ছিল। কারণ, তার অন্তরতমা ক্যাটি মাইনার তিন মাস আগে তাকে ছেড়ে আমেরিকা চলে যায়। ব্যস, তার পর থেকেই বেপাত্তা। তাকে ছেড়ে যাবার সময় তার কাছে ছিল তার নিজেরই উপার্জিত দু'শ ডলার, টবিন-এর পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে জলাভূমিতে অবস্থিত ছোট্ট একটা বাড়ি আর শূকর বিক্রি করে পাওয়া একশ ডলার। ব্যস, এটুকুই। টবিন তার স্ত্রীর কাছ থেকে গত তিন মাসের মধ্যে একটা মাত্র খাম পেয়েছিল—সংক্ষিপ্ত একটা চিঠি। ক্যাটি লিখেছিল, সে তার কাছে ফিরে আসতে, মিলিত হতে আমেরিকা থেকে যাত্রা করেছে। কিন্তু সে ক্যাটির দেখা পাওয়া তো দূরের ব্যাপার, তারপর থেকে একটা চিঠি পত্র পায়নি। পত্রিকার পাতায় সে ক্যাটির নাম করে বিজ্ঞাপন দিয়েছে! নিষ্ফল প্রয়াস, ফয়দা কিছুই হল না।

অনন্যোপায় হয়ে টবিন আর আমি ক্যাটির খোঁজে বাড়ি ছাড়লাম। ভাবলাম, তাকে নিয়ে জলে-জঙ্গলে, বিশেষ করে নদীর বুকে নৌকো চড়ে ঘোরাফেরা করলে বিষিয়ে থাকা মনটা চাঙা হয়ে উঠবে।

টবিন-এর মত বাস্তববাদী মানুষ খুব কমই দেখা যায়। তাই তো প্রাণেশ্বরীর বেপাত্তা হয়ে যাবার ব্যাপারটাতে সে একেবারেই মনমরা, মিইয়ে পড়েছে। শহরের কোলাহলমুখর পরিবেশ আর পথচারীদের ভিড়ভাট্টা সে মোটেই বরদাস্ত করতে পারছেনা। উপায়ান্তর না দেখে আমি তাকে নিয়ে নিরিবিলি একটা গলিতে ঢুকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সেখানে আকর্ষণীয় কোন কিছুই দেখতে পেলাম না। টবিন সামান্য এগিয়ে ছোট্ট একটা স্টলের সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার চাহনিটাই যেন মুহূর্তে পাল্টে গেল। কারণ, কিছুই অনুমান করতে পারলাম না।

মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে সে বলল, শোন, এ জায়গাটা আমার মনের মত হয়েছে। এখানেই আমার শরীর ও মন দুই স্বাভাবিকতা ফিরে পাবে।

আমি সবিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। সে বলে চলল—নীলনদের দেশের অত্যন্ত ক্ষমতা সম্পন্ন গণৎকারকে দিয়ে আমার হস্তরেখা বিচার করিয়ে নেব, ভাবছি। যা হবার তাই হবে

কিনা, জানতে চাচ্ছি।

প্রকৃতির বিভিন্ন লক্ষণ আর অস্বাভাবিক ঘটনার প্রতি টবিনের দুর্বলতা বহুদিনের। পয়া সংখ্যা, কালো বিড়ালের ব্যাপার স্যাপার আর সংবাদপত্রে ছাপা আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রভৃতি বিষয়ের ওপর তার অস্বাভাবিক আস্থার কথা আমার ভালই জানা আছে।

টবিন দ্রুত মন্ত্রপূত মুরগির পোল্ট্রিটার ভেতরে ঢুকে গেল। লাল শালু কাপড়, রেলপথের জংশন স্টেশনের লাগোয়া জালের মত ছড়িয়ে পড়া রেল লাইনের হিজিবিজি রেখার মত অনেকগুলি হাতের ছবি টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। দরজার ওপরে বড়-বড় হরফে সাইনবোর্ডের মত লেখা—মাদাম জোজো, বিখ্যাত মিশরীয় হস্তরেখাবিদ।

মোটাসোটা, রীতিমত নাদুসনুদুস এক মহিলা বিশেষ ভঙ্গীতে ভেতরে বসে। আলখাল্লা জাতীয় লাল জামার গায়ে অনেকগুলি আংটা ঝুলছে আর বিভিন্ন জন্তু-জানোয়ারের ছবি আঁকা।

টবিন গম্ভীর মুখে বসে থাকা মহিলাকে দশটা সেন্ট দিয়ে একটা হাত তার সামনে এগিয়ে দিল। কিন্তু মুখে কিছুই বলল না।

তার হাতের রেখাগুলির ওপর চোখ বুলাতে-বুলাতে মাদাম জোজো বলতে লাগল, শোন তোমার অতীত জীবনে চরম দুর্ভোগ গেছে। ভবিষ্যতের জন্যও দুর্ভোগ অপেক্ষা করছে। শুক্র স্থানে কি পাথরের আঘাতে কেটে যাওয়ার চিহ্ন, বলতো? তোমার হাত বলছে, তুমি প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছ। আর প্রেমিকাটার জন্য জীবনে অনেক দুর্ভোগ তোমাকে ভুগতে হয়েছে, ঠিক কিনা?

টবিন আমার দিকে ফিরে অনুচ্চ কণ্ঠে বলল, মাদাম, অবশ্যই ক্যাটির ব্যাপার স্যাপার জানে।

নাদুসনুদুস গণৎকার আবার মুখ খুলল—তোমার হাতের রেখা বলছে, যাকে তুমি মন থেকে মুছে ফেলতে পারছ না তার জন্যই তোমাকে যত দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে।

টবিন তার চোখের তারায় বিস্ময়ের ছাপ এঁকে তার দিকে নীরব চাহনি মেলে তাকিয়ে রইল।

সে বক্তব্য অব্যাহত রাখল—শোন, নাম-রেখাটা 'কে' এবং 'এম' অক্ষর দুটোই নির্দেশ করছে। হ্যাঁ, 'কে' এবং 'এম'-ই বটে।

টবিন সাধ্যমত আমার কানের কাছে তার মুখটাকে এগিয়ে নিয়ে এসে রীতিমত ফিস ফিসিয়ে বলল, আরে ব্বাস! শুনেছ কি?

গণৎকার মহিলা এবার বলল—একটা কথা শুনে রাখ, পুরুষের গায়ের রং যদি কুচকুচে কালো আর নারী যদি খুব ফর্সা হয় তবে এক্ষেত্রে খিটির মিটির অবশ্যম্ভাবী। আর একটা কথা, শীঘ্রই তোমাকে জলপথের সফরে যেতে হবে, মনে রেখো। তাতে খরচও হবে যথেষ্টই। অধিকতর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে মুহূর্তকাল একটা রেখার দিকে তাকিয়ে নিয়ে আবার বলতে শুরু করল—মানুষের সৌভাগ্য এনে দেয় যে রেখাটা—একটু লক্ষ্য করলে তুমিও চিনতে পারবে। নাকটা একটু বাঁকালো, বুঝলে? এই যে—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই টবিন প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল—তার নামটাও কি হাতের রেখা বলে দিচ্ছে? তা-ই যদি মত হয় তবে সে এলে তাকে সোল্লাসে অভিনন্দন জানাতে পারতাম।

তবে নামের বানানটা হাতের রেখা থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। একটা জিনিস কিন্তু পরিষ্কার, তার নামটা খুবই দীর্ঘ। আর তার অক্ষরগুলোর মধ্যে 'ও' অক্ষরটা অবশ্যই ব্যবহার করতে হয়। আজ এ পর্যন্তই। দরজাটা আর আগলে দাঁড়িয়ে থেকো না।

জাহাজঘাটার দিকে ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে টবিন কপালের চামড়ায় ভাঁজ এঁকে আমাকে লক্ষ্য করে বলল—ব্যাপারটা কিন্তু খুবই অবাক হবার মতই বটে। গণৎকাররা কি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের এতসব কথা জানতে পারে, ব্যাপারটা বড়ই আশ্চর্যজনক!

প্রধান প্রবেশদ্বার দিয়ে বেরোবার মুহূর্তেই প্রমাদটা ঘটে গেল। ভিড় ঠেলেঠুলে বেরোবার সময় এক নিগ্রোর হাতের জ্বলন্ত চুরুটের আগুনে টবিনের কানে ছ্যাঁকা লেগে যায়। ব্যস, ঘটে গেল কেলেঙ্কারী। টবিন তার ঘাড়ে একটা ঘুষি বসিয়ে দিল। নিগ্রোটার সঙ্গের মেয়েরা গলা ছেড়ে চিৎকার চেঁচামেচি জুড়ে দিল। গোলমালের খবরটা পুলিশের কানে যেতে দেরী হল না।

দূর থেকে পুলিশের গাড়ি দেখেই আমিই টবিনকে টেনে হিঁচড়ে সেখান থেকে চম্পট দিলাম।

নৌকোয় বসে কোটের পকেটে ডানহাতটা চালান দিয়েই টবিন অতর্কিতে সোজা হয়ে বসে

পড়ল। সে নিঃসন্দেহ হল, ভিড়ভাট্টা হৈ-হট্টগোলের মধ্যে কে সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে, পকেট মেরেছে। হঠাৎ তার মেজাজটা বিগড়ে গেল। এখান থেকেই বুঝি তার ভাগ্য বিপর্যয়ের সূত্রপাত।

এক রূপসী-যুবতী রেলিংয়ের গায়ের বেঞ্চটায় বসে রয়েছে। তার পরনে দামী পোশাক। তার সামনে দিয়ে যাবার সময় টবিন তার পা মাড়িয়ে দিল। পাকস্থলিতে মাত্রারিক্ত মাল পড়লেই তার আচরণ ভদ্র হয়ে যায়। পায়ে পা ঠেকতেই সে মার্জনা ভিক্ষা করতে গিয়ে মাথা-থেকে টুপিটা সামান্য ঘোরাতে চেষ্টা করামাত্র সেটা বাতাসে উড়ে গিয়ে নদীর জলে গিয়ে পড়ল।

টবিন ব্যাপারটাকে তখনকার মত সামলে নিয়ে আমার কাছে ফিরে এল। ধপ্ করে পাশে বসে পড়ে। আমি ভাবলাম, লোকটার জীবনে পর পর কয়েকটা বিপর্যয় একের পর এক ঘটে গেল। অদৃষ্টের বিড়ম্বনার মধ্যে পড়লেই সে যেন কেমন মরিয়া হয়ে যায়। কখন যে কোন্ অঘটন, কে বলতে পারে?

আচমকা আমার হাত দুটো চেপে ধরে টবিন উত্তেজনার শিকার হয়ে উদ্ভ্রান্তের মত বলতে লাগল—জন, আমরা এখন জলের ওপর দিয়ে ভেসে চলেছি।

আমি কৃত্রিম ক্ষোভ প্রকাশ করে বললাম—টবিন, ওসব বাজে চিন্তা-ভাবনা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলত। মিনিট দশেকের মধ্যেই আমরা তীরে নামব।

ওই যে, মেয়েটা বেঞ্চটা দখল করে বসে, একবারটি তার দিকে দৃষ্টিপাত কর।

আর যে হতচ্ছাড়া নিগ্রোটা আমার কানে আগুনের ছ্যাঁকা লাগিয়ে দিয়েছে তার কথাটাকে মাথা থেকে মুছে ফেলেছ? আর আমার পকেটটা যে ফাঁকা করে দিয়ে গেছে সে ব্যবস্থা কি হবে? পঁয়ষট্টিটা ডলার পকেটে ছিল, খোয়া গেছে।

আমার বুঝতে ভুল হল না, সে বড় রকমের একটা গণ্ডগোল সৃষ্টি করতে চলেছে। আমি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তাকে সংযত করতে চেষ্টা করলাম। তাকে নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে মাথা গরম করা সঙ্গত নয়।

টবিন আমার কথায় কান না দিয়ে বলতে শুরু করল—তুমি কি সে গণৎকার মহিলার দৈববাণীর কিছুই শুনতে পাও নি? আশ্চর্য ব্যাপার তো! ঈশ্বর প্রেরিত বিশেষ গুণ সম্পন্ন অলৌকিক ক্ষমতা বুঝতে পারার মত ক্ষমতা ও ইচ্ছা কোনটাই তোমার নেই। গণৎকার মহিলা আমার হাতের রেখা দেখে যা কিছু বলেছিলেন এক-এক করে সবই যে বাস্তবে পরিণত হয়ে গেল, নিজের চোখেই তো দেখলে। তিনি আমাকে সতর্ক করে দিয়ে আরও বলেছেন, কালো পুরুষ আর ফর্সা নারী থেকে আমার বিপদ আসবে। মনে আছে তো? ঘোর কালো নিগ্রোটার কারবারটা ভুলে গেছ? সজোরে ঘুষি মেরে তার প্রতিশোধ নিয়েছি। ফর্সা আর রূপসী যুবতীটার জন্য আমাকে টুপিটা খোয়াতে হয়েছে, মনে আছে? সর্বশেষে মুরগির পোল্ট্রি থেকে বেরোবার সময় আমার পকেট থেকে পঁয়ষট্টিটা ডলার বেমালুম হাফিস করে দিল। এখন আমি একেবারেই নিঃস্ব-রিক্ত।

টবিন তার বক্তব্যে ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাপার স্যাপারকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করল। আমার কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস কোনি শহরে এরকম দুর্ঘটনা আকছারই ঘটে থাকে, যেকোন লোকেরই যখন-তখন ঘটতেও পারে। এর সঙ্গে ভাগ্য গণনা—হস্তরেখা বিচারের কোন যোগসাজোস নেই।

টবিন আর কথা না বাড়িয়ে সিট ছেড়ে উঠে পায়চারি করতে করতে স্ত্রীদের মুখের ওপর চোখের মণি দুটোকে বুলাতে লাগল।

আমি তার এরকম আচরণের কারণ জানতে চাইলাম। তার মনোভাবকে বাস্তবায়িত করার আগে কেউ ঘুণাক্ষরেও উপলব্ধি করতে পারবে না সে কিভাবে, কি করতে চাইছে।

আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সে গম্ভীরমুখে বলল—তোমার বুঝে নেওয়া উচিত ছিল, আমার হাতের রেখায় যে মুক্তির বাণীর উল্লেখ আছে, তারই খোঁজ করছি। আমার সৌভাগ্যকে যে হাতের মুঠোর এনে দেবে সে বাঁকা নাকওয়ালা লোকটার সন্ধান করছি। সে ছাড়া অন্য কারো পক্ষে আমাকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। আর কারো এমন উঁচু নাক তোমার নজরে পড়েছে, বলত?

ন'টা ত্রিশে আমরা মোটর বোট থেকে নেমে বাইশ নম্বর স্ট্রীট বরাবর শহরের দিকে এগোতে লাগলাম।

পথের বাঁকে ইয়া লম্বা একটা লোককে চাঁদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। পোশাক-আশাক দামী ও কেতা দুরস্ত। দু' ঠোঁটের ফাঁকে জ্বলন্ত চুরুট। তার নাকটা খুবই লম্বা, বাঁক-খাওয়া। সেটা টবিন-এরও নজর এড়াল না। টবিন সঙ্গে সঙ্গে লম্বা-লম্বা পায়ে তার দিকে এগিয়ে গেল। আমি তার পিছু নিলাম।

কোনরকম ভূমিকার অবতারণা না করেই টবিন বলল, স্যার, দয়া করে আপনার নামটা লিখে দেবেন? আসলে আপনার নামটা কত দীর্ঘ সেটাই জানতে চাচ্ছি। এমনও হতে পারে, আপনার পরিচিত হওয়া আমাদের খুবই দরকার।

'ফ্রীডেন হাউসম্যান—ম্যাক্সিমাম জি. ফ্রডেন হাউসম্যান'। লোকটা কোনরকম প্রশ্ন না করেই নিজের নামটা লিখল।

টবিন ভ্রূ কুঁচকে স্বগতোক্তি করল—হ্যাঁ, নামটা লম্বাই বটে, আর একটা কথা, নামটার কোথাও কি 'ও' অক্ষরটা ব্যবহার করেন?

লোকটা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল। 'ও' অক্ষর? কই, না-তো।

তবে কি 'ও' অক্ষরটা ব্যবহার করে নামটা লেখা যেতে পারে?

বিদেশী রীতি অনুযায়ী মর্জিমাফিক নামটার কোথাও 'ও' অক্ষরটাকে বসিয়ে দিতে পারেন, আপত্তির কি থাকতে পারে?

তবে তো ঠিকই আছে। আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আমি ড্যানিয়েল টবিন আর ইনি জন ম্যালোন।

দেখুন, আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ায় বড়ই আনন্দ পেলাম। তবে পথের বাঁকে দাঁড়িয়ে বানান নিয়ে গবেষণা, ভাবা যায় না! অনুগ্রহ করে বলবেন কি, কোন্ জরুরী ব্যাপার নিয়ে আপনাদের এখানে আসা?

দুটো লক্ষণকে কেন্দ্র করে। টবিন জবাব দিল। এক হস্তরেখাবিদ হাতের রেখা বিচার করে দুটো লক্ষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আর তা আপনার মধ্যেই আমি লক্ষ্য করেছি। তা ছাড়া বিপর্যয়রেখার ফলস্বরূপ এক কালো পুরুষ ও ফর্সা ও রূপসী নারীর দেখা ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছি। ফলও হাতেনাতেই পেয়ে গেছি। আর পঁয়ষট্টি ডলার খোয়াবার ব্যাপারটা তো রয়েই গেছে। বিপর্যয় রেখার ক্ষমতা রোধ করতে এখন আপনার দেখা পেলাম।

ঠোঁটের ফাঁক থেকে চুরুটটা নামিয়ে ঢ্যাঙা লোকটা আমার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল—'ওনার কথাগুলি কি আপনি শুধরে নেবেন, নাকি আপনিও এগুলো সমর্থন করছেন?

আমার উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই সে ব্যস্ত চোখের মণি দুটোকে এদিক-ওদিক ঘোরাতে লাগল। তারপর বলল—আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করে বড়ই প্রীত হলাম। এবার—কথাটা শেষ না করেই চুরুটাকে দু'ঠোঁটের সাহায্যে চেপে ধরে ব্যস্ত পায়ে রাস্তাটা পার হয়ে গেল।

টবিন ছিনে জোকের মত তার গায়ে সেঁটে রইল। আর আমি অন্যদিকে অবস্থান করে তাকে অনুসরণ করতে লাগলাম।

রাস্তার বিপরীত পাড়ে গিয়েই লম্বা নাকওয়ালা ঢ্যাঙা লোকটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কণ্ঠস্বরে বিরক্তি প্রকাশ করেই সে বলে উঠল—আপনারা কেন আমার পিছনে এমন এঁটুলির মত লেগে রয়েছেন, বলবেন কি? বললামই তো, আপনাদের সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় আমি খুশিই হয়েছি। এখন বিদায় হোন। আমি বাড়ি ফিরছি।

ভাল কথা, আপনি বাড়িই ফিরে যান, বাধা দেব না। কিন্তু সকালে বাড়ি থেকে বেরনো অবধি আমরা আপনার দরজায় ঠায় বসে কাটাব। সত্যি বলতে কি কুচকুচে কালো পুরুষ, ফর্সা রূপসী নারী আর পঁয়ষট্টি ডলার খোয়াবার ব্যাপার-স্যাপার থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে স্রেফ আপনার ওপরই আমাকে নির্ভর করতে হবে। টবিন দ্বিধাহীন কণ্ঠে কথাগুলো ছুঁড়ে দিল।

আমার মাথায় ছিট আছে অনুমান করে লোকটা বিস্ময়-মাখানো চোখে আমার মুখের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বলল—এযে দেখছি অদ্ভুত এক ভ্রান্ত দর্শনকে আঁকড়ে ধরে রেখেছেন। মশাই, একে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখছেন না কেন, বুঝছি না-তো?

ম্লান হেসে আমি বললাম—'আরে না-না'। ড্যানিয়েল টবিন খুবই চালাক চতুর। অতিরিক্ত মদ পেটে পড়ায় একটু বেমানান হয়ে পড়তে পারে, বুদ্ধিটা একটু ঢিলে হয়ে গেছে। আসল

কথাটা হচ্ছে, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস আর ভবিষ্যদ্বাণীর চক্করে পড়ে একটু-আধটু অস্বাভাবিকতা তার মধ্যে ভর করতেও পারে। এবার হস্তরেখাবিদ নাদুসনুদুস সে মহিলার ভবিষ্যদ্বাণী, ঢ্যাঙা নাক-উঁচু লোকটাকে সৌভাগ্যের প্রতীক জ্ঞান করা প্রভৃতি খুবই খোলসা করে তাকে বললাম। সবশেষে বললাম—মশাই, এরকম পরিস্থিতিতে আমার অবস্থাটা একবারটি ভেবে দেখুন। টবিন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কোন হাঁদা বোকা কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের বন্ধু হওয়ার পরিণাম মন্দভাগ্য নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন। আমি তো মনে করি কোন যন্ত্র ব্যবহার করে যখন আমার হাতের রেখাগুলো টানা হয়নি, হাতে কিছু লেখা হয়নি তখন সে হাতের রেখায় চোখ বুলিয়ে কোন সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে কিছু বলা সম্ভব নয়। আর এ শহরে যদি আপনার নাকটাই সবচেয়ে লম্বা আর বাঁকানো হয়ে থাকে, তবে আমি মনে করি আপনাকে দিয়ে হস্তরেখা-ব্যবসায়ীরা দু'হাতে ডলার রোজগার করতে পারবে, কিছুমাত্রও সন্দেহ থাকতে পারে না। আর আমি বলব, টবিন যদি নেহাৎই আপনাকে নিয়ে একটু-আধটু ভাবনা-চিন্তা করতে আগ্রহীই হয়, আপত্তি কিসের? শেষমেষ সে তার ভুল বুঝে আপনা থেকে সরে দাঁড়াবে।

আমার কথা শোনামাত্র লোকটা আমাদের দু'জনকে জড়িয়ে ধরে গলা ছেড়ে হাসতে লাগল।

সে বলল—আমারই ভুল হয়েছে মশাই। কি করেই বা আশা করব যে, একেবারে অযাচিতভাবে আমার হাতের মুঠোয় এমন একটা সুযোগ, সৌভাগ্য হাজির হবে। সত্যি করে বলতে কি, আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়ই হয়ে পড়েছিলাম।

সে আমাদের নিয়ে অদূরবর্তী একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকল। উদ্দেশ্য, ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের সঙ্গে খোলসা করে কথা বলবে।

টেবিলে বসেই সে তিন কাপ কফির অর্ডার দিল। কোটের পকেট থেকে চুরুটের কৌটোটা বের করে আমাদের দিকে বাড়িয়ে দিল। কফির দামটা টেবিলের ওপর রেখে আমাদের উভয়ের দিকে অনুসন্ধিৎসু নজরে তাকাতে লাগল।

জ্বলন্ত চুরুটে পর-পর কয়েকটা টান দিয়ে একগাল ধোঁয়া বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে সে বলল—শুনুন মশাই, আমি সাহিত্য সাধনায় লিপ্ত, আপনাদের জেনে রাখা উচিত। আমি মানুষের বিভিন্ন বাতিক আর আকাশের সন্ধানে আমি কাক-ডাকা ভোরে ঘর ছেড়ে পথে নামি। আপনাদের সঙ্গে পরিচয়ের মুহূর্তেও আমি রাত্রের প্রধান আলোক-বর্তিকা আর আকাশ পথের সম্পর্ক নিয়ে ভাবনায় আত্মমগ্ন ছিলাম। তা থেকেই উদ্ভব হয় কলাবিদ্যা আর কবিতা ও ছন্দ-লয়ের। আর চাঁদ সেটা তো একটা নিরলস আলোকবর্তিকা। কেবল চক্কর খাচ্ছে। কিন্তু এসবই ব্যক্তিগত ভাবনা-চিন্তার ব্যাপার। কেননা সাহিত্যের পাতায় সবই ওলট পালট হয়ে যায়, বুঝতে পারছেন?

আমি চুরুটে টান দিতে দিতেই নীরবে ঘাড় কাৎ করে তার প্রশ্নের উত্তর দিলাম।

সে বলে চলল—ভাবছি, সারা জীবনে যে সব অত্যাশ্চর্য ব্যাপার স্যাপার আমি আবিষ্কার করেছি সেগুলো ব্যবহার করে একটা বই লিখব। সবই স্মৃতির পাতায় গেঁথে রেখেছি।

আমার কথাও লিখবেন কিন্তু। মনে থাকবে তো আমার কথা? অত্যুগ্র আগ্রহ প্রকাশ করে টবিন বলল।

লোকটার সাফ জবাব—অবশ্যই না। লেখা যাবে না। কারণ, মশাই দুটোর মধ্যে তোমাকে স্থান দেওয়া কিছুতেই সম্ভব হবে না। আপাতত ছাপাখানার সময় নষ্ট করার ইচ্ছা এখনই আদৌ আমার নেই। কেবলমাত্র হাল্কা হাস্যরসই উপভোগ করতে চাচ্ছি। সত্যি করে বলতে কি, ছাপার অক্ষরে তোমাকে বড়ই কিম্ভূত কিমাকার দেখাবে। আনন্দটুকু আমি রসিয়ে-রসিয়ে উপভোগ করতে চাইছি। অকপটে স্বীকার করছি, তোমাদের কাছে পেয়ে আমি কৃতজ্ঞ—ধন্যও বটে।

টবিন বিরক্তিভরে বলে উঠল—দেখুন মশাই, আপনার কথাগুলো আমার গায়ে কাঁটার মত বিঁধছে—অসহ্য। বিশ্বাস করুন, আপনার ইয়া লম্বা আর টিয়া পাখির ঠোঁটের মত বাঁকানো নাকটা দেখে আমার মধ্যে আশার সঞ্চার ঘটেছিল। ইতিমধ্যে আমি হয়ত নিঃসন্দেহ হয়ে পড়তাম, ইয়া ঢ্যাঙা কুচকুচে কালো পুরুষ আর ফর্সা রূপসী মহিলাটি তো আর মিথ্যা হতে পারে না। আর আমি—

ধ্যুৎ! মিথ্যা বকবকানি থামাও ত। মানুষের নাকটাই তোমাকে ভুল পথে পরিচালিত করবে?

শোন, নাকের কাজ নাক ঠিক চালিয়ে যাবেই।

টবিন-এর চারিত্রিক বাতিকগুলোকে ভিজিয়ে অধিকতর রসাল করে নেওয়ার জন্য ঢ্যাঙা ও লম্বা নাকওয়ালা আরও তিন পেয়ালা মদের অর্ডার দিল।

এগারোটা বেজে যাওয়ায় আমরা রেস্তোরাঁ ছেড়ে পথে নামলাম। টবিন আর আমাকে নিয়ে সে তার বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল। একটু বাদে সে একটা ইটের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাড়িটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। সে বলল—এটাই আমার ডেরা—মাথা গোঁজার জায়গা। বাড়িটার ওপর আর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল—আলো নেভানো। নিঃসন্দেহ হওয়া যাচ্ছে, আমার সহধর্মিণী ঘুমিয়ে পড়েছে। বুঝতেই পারছি, অতিথির আপ্যায়ণের ব্যবস্থা যা কিছু সবই আমাকেই করতে হবে। আমি চাইছি, তোমরা এক তলার এ ঘরটায় আশ্রয় নাও। এটা আমাদের খাবার ঘর। যা জোগাড়যন্ত্র রয়েছে তা দিয়ে তোমরাও আহারাদি সেরে নাও। ঠাণ্ডা মুরগির মাংস, পনীর আর দু-এক বোতল স্কচ ঘরে পেয়ে যাবে। উদরপূর্তি করে শুয়ে পড় গে। রান্না ঘরে যে নতুন কাজের মেয়েটা আছে তাকে দিয়ে তোমাদের জন্য দু' পেয়ালা কফি পাঠিয়ে দিচ্ছি। কথাগুলো বলতে বলতে সে সিঁড়ি-বেয়ে ওপর তলায় উঠতে লাগল। যেতে যেতে সে বলল—ক্যাটি কিন্তু খুব ভাল কফি তৈরি করে। মাত্র মাস তিনেক আগে মেয়েটা এ দেশে এসেছে। আমি এখনি কফি দিয়ে তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তোমরা ঘরে গিয়ে বোসো।

দ্য রোমান্স অব এ বিজি ব্রোকার

যুবতী মহিলা স্টেনোগ্রাফারকে সঙ্গে করে দালাল হার্ভে ম্যাক্সওয়েল ঘরে ঢুকে এলেন। করণিক পিচার কাজের ফাঁকে মুহূর্তের জন্য চোখ তুলে তাকিয়ে নিয়ে মুচকি হাসল।

হার্ভে ব্যস্ত পায়ে এগিয়ে গিয়ে নিজের চেয়ারটা টেনে বসে পড়লেন। টেবিলের ওপর অপেক্ষমান চিঠির গাদাটার দিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন। কাজের মধ্যে আত্মমগ্ন হলেন। প্রায় এক বছর ধরে যুবতীটি ম্যাক্সওয়েল-এর কাছে স্টেনোগ্রাফারের কাজে নিযুক্ত, যুবতীটি সুন্দরী বটে। তবে স্টেনোগ্রাফারের রূপ-সৌন্দর্য বলতে যা বোঝায় ঠিক তেমন রূপসী অবশ্যই নয়। ব্রেসলেট, গলার হার বা লকেট কোন কিছুই সে ব্যবহার করে নি আবার মধ্যাহ্ন ভোজনের আসরে যাবে বলে প্রস্তুতি নিয়েছে এবং বাহার বা ভাব তার মধ্যে অনুপস্থিত। ছাই রঙের সাদামাঠা পোশাক তার চেহারা, বিশেষ করে গায়ের রঙের সঙ্গে চমৎকার মানিয়েছে। ম্যাক পাখির দর্শনীয় একটা সোনালি-সবুজ পালক মাথার পাগড়িটার সঙ্গে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। সকালের ঝকঝকে সোনালি আলোয় তার নম্র আর লাজুক-লাজুক আভা যেন তার চোখের তারা আর মুখমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়েছে। চোখ দুটোতে যেন স্বপ্নরাজ্যের মায়াকাজল পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঠোঁটের কোণে আঁকা রয়েছে দীর্ঘস্থায়ী মুচকি-হাসির রেখা।

পিচার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত নীরবে তাকিয়ে থেকে লক্ষ্য করল যুবতীটির ভাবগতিক যেন আজ অন্য রকম। পাশের ঘরে তার টেবিল। কিন্তু সেখানে না গিয়ে বাইরের ঘরে দাঁড়িয়ে রইল। চোখে-মুখে কেমন যেন নিরবচ্ছিন্ন অন্যমনস্কতার ভাব। ম্যাক্সওয়েল-এর টেবিলের দিকে একবার দু-চার পা এগিয়ে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। পর মুহূর্তেই পিছিয়ে গিয়ে আবার আগের জায়গায় এসে দাঁড়াল। তবে উদ্দেশ্যহীন নয়। তিনি যাতে বুঝতে পারেন বঞ্চিত ব্যক্তি উপস্থিতই আছে।

টেবিলের পাশে যে যন্ত্রটা বসে তাকে মানুষের পর্যায়ে ফেলা যায় না, একজন ঘাঘু দালাল। সে নিউইয়র্ক শহরের একজন কর্মব্যস্ত দালাল। যন্ত্র বলার কারণ এই যে, লোকটা স্প্রিং আর চাকায় চেপে হু হু করে শহরটায় ছুটে বেড়ায়।

স্টেনোগ্রাফারের টেবিলটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই সে বলতে লাগল—টেবিলের ওপর পর্বত প্রমাণ উঁচু হয়ে এই যে সব চিঠি আর ফাইলপত্র পড়ে রয়েছে এদের ব্যাপারটা কি? কোন কাজের কাগজপত্র, নাকি অন্য কিছু?

স্টেনোগ্রাফার যুবতীটার বুঝতে দেরী হল না তাকে লক্ষ্য করেই এমন তীক্ষ্ণ তীরটা নিক্ষেপ করা হয়েছে। সে মুচকি হেসে জবাব দিল অবশ্যই না। কথাটা ছুঁড়ে দিয়েই সে সেখান থেকে কেটে পড়ল।

দালাল বলে পরিচিত লোকটা এবার করণিকের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল—মিঃ পিচার, মিঃ ম্যাক্সওয়েল কি অন্য একজন স্টেনোগ্রাফার নিয়োগের ব্যাপারে আপনাকে গতকাল কিছু বলেছিলেন?

হ্যাঁ, তা বলেছেন বটে। আমি এজেন্সিকে জানিয়েও দিয়েছি, নির্বাচনের সুবিধার জন্য কয়েকজন স্টেনোগ্রাফারকে যেন আমাদের অফিসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল— এখন পৌনে দশটা বেজে গেল। আশ্চর্য ব্যাপার, এখন পর্যন্ত কারো টিকিটাও দেখা যাচ্ছে না। স্টেনোগ্রাফার যুবতীটা বিষণ্ণ মুখেই বলল—তবে নতুন স্টেনোগ্রাফার কাজে যোগ না দেওয়া পর্যন্ত আমিই কাজ চালিয়ে যাই, কি বলেন?

সে উত্তরের অপেক্ষা না করেই দ্রুত এগিয়ে গিয়ে নিজের টেবিলে বসে পড়ল। ম্যাক পাখির সোনালী-সবুজ পালক লাগানো পাগড়িটা মাথা থেকে খুলে টেবিলটার এক ধারে রেখে দিল।

কর্মব্যস্ততার সময় সানহাট্টার ব্যস্ত দালালকে দেখার সৌভাগ্য যার হয়নি নৃ-তত্ত্ব নিয়ে তার পড়াশোনা ও অভিজ্ঞতাই মাটি হয়ে গেল।

আজকের দিনটা হার্ভে ম্যাক্সওয়েল-এর ব্যস্ততম দিন বলা যেতে পারে। টেবিলের টেলিফোনটা অনবরত ক্রিং-ক্রিং রবে বেজেই চলেছে। আর অফিস তো জন সমুদ্রে পরিণত হয়েছে। কেবলই মানুষের মাথা আর মাথা। বার্তাবাহক যুবকরা টেলিগ্রাফ আর চিঠিপত্র নিয়ে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। করণিকরা? তারা ঝড়ের কবলে পড়া নাবিকদের মত লাফালাফি জুড়ে দিয়েছে। শুধু কি তারাই? পিচার-এর মুখেও কর্ম-ব্যস্ততার ছাপ ফুটে উঠেছে।

এক্সচেঞ্জে তো ধুন্দুমার কাণ্ড শুরু হয়ে গেছে। দালালের যা কিছু, যেমন যেমনটা ঘটা স্বাভাবিক তার সবকিছুই এখানে উপস্থিত।

ম্যাক্সওয়েল চেয়ারটাকে দালালের চেয়ারটার গায়ে ঠেলে দিয়ে ম্যাক্সওয়েল ছুটোছুটি, লাফালাফি দাপাদাপি করে একের পর এক কাজ সেরে চলেছেন। ঠিক যেন একজন দক্ষ নৃত্যশিল্পী নৃত্যপ্রদর্শনে মগ্ন।

পিচার ঘরে ঢুকে অভিবাদন সেরে জানাল, স্টেনোগ্রাফার এজেন্সি এক মহিলাকে পাঠিয়েছে। পাশের ঘরে বসতে দেওয়া হয়েছে।

ম্যাক্সওয়েল সচকিত হয়ে বলে উঠলো—কি বললে? কোন্ চাকরি? স্টেনোগ্রাফারের চাকরি? তোমার মানসিক অসংলগ্নতা দেখা দিয়েছে নাকি পিচার?

একথা বলছেন কেন স্যার? গতকাল আপনি নিজেই তো আমাকে বলেছিলেন স্টেনোগ্রাফার এজেন্সির কাছে লোক চেয়ে পাঠাতে। আর যেন আজ সকালেই বাঞ্ছিত লোক পাঠিয়ে দেন।

ধ্যুৎ! কি সব প্রলাপ বকছ! আমি তোমাকে স্টেনোগ্রাফার সম্বন্ধে বলতে যাব কেন, কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না। মিস লেস্‌লি তো এক বছর কাজ করে এখানকার সবাইকে খুশিই করেছে। যতদিন খুশি সে এখানে কাজ করতে পারবে। এবার স্টেনোগ্রাফার এক্সচেঞ্জ থেকে আনা যুবতীটাকে ডেকে তিনি বললেন—দুঃখিত মাদাম। এখানে কোন চাকরি খালি নেই। পিচার এজেন্সিতে খবর পাঠিয়ে অর্ডারটা বাতিল করে দাও।

আগন্তুক স্টেনোগ্রাফার যুবতীটা ব্যাজারমুখে অফিস ছেড়ে চলে গেল। পিচার এবার বিরক্তি প্রকাশ করে হিসাব-রক্ষককে লক্ষ্য করে বলল—দেখেছেন মশাই, যত দিন যাচ্ছে বৃদ্ধ ম্যাক্সওয়েল-এর ভ্রম ঘটছে।

ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে জনতার ভিড় ও কাজের চাপ বেড়েই চলল। স্টক, ধার, বন্ধক, বন্ড, সুদ আর জামিন প্রভৃতি হাজারো হাজারো লেনদেনের ব্যাপার আর শেষ হতে চায় না।

মধ্যাহ্নভোজের সময় হলে চিৎকার চেঁচামেচি হৈ-চৈ অনেকাংশে কমে এল।

ম্যাক্সওয়েল চিঠিপত্র, স্মারকলিপি আর টেলিগ্রামের গোছা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন উস্‌কো খুস্‌কো চুলগুলোর কয়েকটা কপালের ওপর ঝুঁকে পড়ে বাতাসে মৃদু-মৃদু দোল খাচ্ছে

একটু পরেই দালালকেও আচমকা দাঁড়িয়ে পড়তে দেখা গেল। কারণ সৌন্দর্যের আধার মিস লেস্‌লি যে তার, তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এ সৌন্দর্য তাকে ম্যাক্সওয়েল-এর কাছে হাজির করল, একেবারে হাতের নাগালের মধ্যে।

ম্যাক্সওয়েল প্রায় অস্ফুটস্বরে বলে উঠলেন—পরমপিতার পিতার দিব্যি, কাজটা সেরে ফেলা দরকার। তাকে এখনই জিজ্ঞেস করব। নিজের কাজে নিজেই অবাক হচ্ছি—আরও অনেক আগেই কেন কাজটা সেরে ফেলি নি। সত্যি, অবাক হবার মত ব্যাপারই বটে। এরকম আক্ষেপ করতে-করতে তিনি ব্যস্ত-পায়ে স্টেনোগ্রাফারের কাছে ছুটে গেলেন।

যুবতী স্টেনোগ্রাফার ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে তাঁর দিকে তাকাল।

ম্যাক্সওয়েল তার টেবিলের ওপর ঝুঁকে মুখ খুললেন—'মিস লেস্‌লি, মাত্র এক মিনিট আমি সময় দিতে পারি। এরই মধ্যে তোমাকে কিছু বলতে চাইছি। তুমি কি আমার সহধর্মিণী হতে আগ্রহী? অন্য দশ জনের মত, স্বাভাবিক উপায়ে ভালবাসার সম্পর্ক যেভাবে তিলে-তিলে গড়ে ওঠে সে পথ অবলম্বন করার মত সময় আমার নেই। তবে খুবই সত্য যে, আমি তোমাকে মনে-প্রাণে ভালবাসি। হ্যাঁ বা না যা বলার তাড়াতাড়ি বলে ফেল। দেখছই তো লোকগুলো দরজায় অনবরত করাঘাত করে চলেছে।

যুবতী স্টেনোগ্রাফারটি ক্রোধোন্মত্তা নাগিনীর মত ফোঁস করে উঠল—এ কী কথা বলছেন আপনি। আপনার মুখে এখন কোন কথা শুনব বলে আমি ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি।

বিশ্বাস কর লেস্‌লি, নষ্টামি-ধান্দাবাজির ব্যাপার নয়, আমি তোমাকে অন্তর থেকে ভালবাসি। তোমাকে বিয়ে করে অর্দ্ধাঙ্গিনীর মর্যাদা দিতে চাই। অনেক আগেই তোমাকে বলতাম—বলা উচিতও ছিল। আজ ভিড় একটু কমতেই মিনিট খানেক সময় তোমার জন্য বের করে নিয়েছি। আরে ধ্যুৎ, ওই যে, কে যেন আমাকে টেলিফোনে ডাকছে। এবার ঘাড় ঘুরিয়ে অধৈর্যভাবে বললেন—'পিচার টেলিফোনটা ধরে এক মিনিট অপেক্ষা করতে বলত।' আবার মিস লেস্‌লির মুখের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন—'মিস লেস্‌লি, দেরী করবার মত সময় নেই। যা বলবার তাড়াতাড়ি বলে ফেল। বল, তুমি আমার গলায় বরমাল্য দিতে রাজি তো ? বল—বল লেসলি।'

তাঁর কথা শেষ হতেই স্টেনোগ্রাফার অত্যাশ্চর্য—একেবারে অভাবনীয় এক কাণ্ড করে বসল। সে যন্ত্রচালিতের মত চেয়ার ছেড়ে উঠে দালাল সাহেবের গলা জড়িয়ে ধরে ভাবাপ্লুত কণ্ঠে বলল—'এবার নিঃসন্দেহ হলাম। চিরদিনের পুরনো ব্যাপারটাই তোমার মগজ থেকে অন্য যাবতীয় ব্যাপার স্যাপারকে ঝেড়ে ফেলেছে। আমি সত্যি খুবই মুষড়ে পড়েছিলাম। হার্ভে, তোমার কি মনে পড়ছে, গতকাল সন্ধে আটটায় পথের বাঁকের লিলি—চার্চ গীর্জায় আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে! চিন্তা করে দেখ ব্যাপারটাকে স্মৃতির পাতা থেকে তুলে আনতে পার কিনা!

দ্য লাভ ফিলট্রে অব আইকে স্কোয়েন্টিন

ফাস্ট এভিনিউ আর লতামণ্ড বড় রাস্তা দুটোর মিলনস্থলের কাছাকাছি, শহরের একেবারে মধ্যস্থলে 'ব্লু লাইট ড্রাগ স্টোর'টি অবস্থান করছে। ব্লু লাইট কিন্তু আমাদের পরিচিত ও প্রচলিত কোন ওষুধের দোকান নয়। এক কথায় একে আধুনিক কোন ফার্মেসী মনে করলে খুবই ভুল করা হবে। এদের পরিশ্রম-লাঘবকারী পদ্ধতিগুলিকে ব্লু লাইট অশ্রদ্ধার চোখেই দেখে। বরং এরা নিজেদের আরক তৈরির আফিম ভিজিয়ে ব্যথা হরণকারী ওষুধ আর আরক নিজেদের পদ্ধতি অনুযায়ী সেঁকে নিজেরাই বানিয়ে নেয়।

'ব্লু লাইট'-এর রাত্রের কেরানি হিসাবে কাজে নিযুক্ত আছে আইকে স্কোয়েন্টিন। সেখানকার বিক্রেতাই পরামর্শদাতা। তার পাণ্ডিত্য ও গুহ্যবিদ্যা শ্রদ্ধালাভের যোগ্য আর সেবাব্রতী হিসাবে সে একজন বিজ্ঞ ও সম্মানিত। কার্যত তার বিদ্যা-কৌশলে তৈরি ওষুধ মুখে তোলা যায় না, নালায় ঢেলে দিয়ে তবেই স্বস্তি পাওয়া যায়। আইকে-এর মোষের শিঙের মত বাঁকা চশমাপরা মুখ আর অসীম জ্ঞানের ভারে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়া তার চেহারাটা ব্লু লাইট-এর কাছাকাছি বসবাসকারী

মানুষগুলোর কাছে খুবই পরিচিত, আর তার সুচিন্তিত মতামত ও বুদ্ধিমত্তা সবার কাছেই অপরিহার্য।

মিসেস বিডল্-এর বাড়িতে তার মাথা গোঁজার ঠাঁই। সকালের খাবার-দাবারও সেখানেই সারে। মিসেস বিডল্-এর রোজি নামে এক যুবতী মেয়ে আছে। ধানাই-পানাই না করে সরাসরিই বলে ফেলছি, আইকের সঙ্গে তার ইয়ে, মানে প্রেম-ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, আইকের যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা রোজিকে ঘিরেই। তার যাবতীয় ওষুধপত্র তৈরির কাজে রোজিই একমাত্র সাহায্যকারী। আর একটা কথা, আইকে বড্ড ভীরু প্রকৃতির। ভয়-ডরের জন্য তার ওষুধগুলোকে সে ভালভাবে মেশাতে পর্যন্ত পারে না। অথচ ওষুধ তৈরির ঘরে সে নিজেকে এত বেশী জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ মনে করে যা ভাষায় বোঝানো সম্ভব নয়। ঘরটা থেকে বেরনোর পর তাকে প্রায় পঙ্গু মানুষ বলেই মনে হয়। ওষুধের ছোপ ভর্তি ঢিলেঢালা জামাটা গায়ে দিয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়ায়। মনে হয় তার মত আত্মভোলা মানুষ পৃথিবীতে দ্বিতীয় আর একজন নেই।

চুংকু ম্যাকগোয়ান নামক যুবকটাকে তার ওষুধের কারখানার এক পুরনো অতিথি বলা চলে। সে সুযোগ পেলেই রোজির ধার-কাছ দিয়ে ছোঁক-ছোঁক করতে থাকে। রোজির সুন্দর মুখের ছুঁড়ে দেওয়া হাসিটুকুকে নীরবে লুফে নেওয়ার জন্য সে সর্বক্ষণ তৈরিই থাকে। এক সময় সে ছিল আইকের ওষুধের একজন বাঁধাধরা ক্রেতা। ক্রমে উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। শরীরের কোথাও ছাল উঠে গেলে ব্যস্ত হয়ে চলে আসত একটু আইওডিন বুলিয়ে দিতে, সামান্য কেটে-ছিঁড়ে গেলে রবার-প্লাস্টিক লাগিয়ে রক্ত বন্ধ করতে। এ সুযোগে, অজুহাতে বলাই ভাল—গল্পগুজবে কিছু সময় কাটিয়ে যাওয়াতেই তার মধ্যে উৎসাহ বেশী লক্ষিত হয়।

এক বিকেলে ম্যাকগোয়ান ধীর-পায়ে ব্লু লাইটে এসে একটা জলচৌকি টেনে নিয়ে বসল। তার বন্ধু আইকে একটা হামানদিস্তা নিয়ে তার মুখোমুখি বসে আঠাশ বেনজোয়িন গুঁড়ো করতে লাগল।

ম্যাকগোয়ানই প্রথম মুখ খুলল—বন্ধু আইকে, আমি যা বলছি, মন দিয়ে শোন। আমার কথা মত যদি কাজ কর তবে আমার খুবই উপকার হবে। আইকের গায়ের জামাটার ওষুধের দাগগুলির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলল—তোমার গায়ের ওই জামাটার কথা বলছি। দাগগুলিকে কি বিশ্রীই না দেখাচ্ছে! হঠাৎ করে দেখলে লোকে ভাববে কেউ বুঝি মেশিনগানের গুলিতে তোমার পাঁজরগুলোকে একেবারে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। তোমাকে বলেছি, ওই ডাগোসই তোমাকে খতম করে ছাড়বে। তার কথায় ম্যাকগোয়ান ঠোঁট টিপে হেসে বলল—দেখ, ডাগোস-এর ব্যাপার নয়। তবে রোগের স্থানটা তুমি ঠিকই অনুমান করেছ। পাঁজরের গায়েই আমার রোগটা ঘাপটি মেরে রয়েছে। ধ্যুৎ! আসল কথাটাই তোমাকে বলা হল না।

আসল কথা? তোমার আসল কথাটা কি, শুনি?

আমি রোজিকে বিয়ে করতে চলেছি, আজ রাতেই।

কথাটা কানে যেতেই আইকের বাঁ হাতের তর্জনিটা হামানদিস্তার কানায় আটকে গেল। আর সে ডান হাতের নোড়াটা দিয়ে তার ওপর ঘা মেরে বসল। আশ্চর্য ব্যাপার। সে যেন বুঝতেই পারল না। ব্যাপারটা দেখে ম্যাকগোয়ান স্তম্ভিত হয়ে গেল। নিজেকে সামলে নিয়ে সে এবার বলল—আরে ভাই, বিয়ে তো করব বলছি, শেষ সময় পর্যন্ত সে রাজি থাকলে তবে তো। দু হপ্তা ধরে আমরা এখান থেকে পালিয়ে অন্য কোথাও চলে যাব ভাবছি। মেয়েটা সকালে যদি বলে যায় সন্ধ্যায়ই মত পাল্টে ফেলে। আজ রাত্রে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করার ব্যাপারে সে পাকা কথা দিয়েছে। অবশ্য এবার সে দু'দিন ধরে সিদ্ধান্তটাকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে। নির্ধারিত সময়টা আরও পাঁচ ঘণ্টা পরে। ভয়ে-ভয়ে আছি সময়মত আবার বেঁকে না বসে।

আইকে বলে উঠল—আরে, তুমি একটা ওষুধের কথা বলছিলে না?

ম্যাকগোয়ান তার কথার জবাব না দিয়ে নিজের বক্তব্যের জের টেনে চলল—হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম। ইতিমধ্যেই হারলেস-এ একটা ঘর ভাড়া করে ফেলেছি। আর একজন ধর্মযাজকের সঙ্গেও পাকা কথা হয়ে গেছে। সাড়ে ন'টায় তৈরি হয়ে তিনি বাড়িতে অপেক্ষা করবেন। পরিকল্পনা মাফিকই কাজ হবে। চিন্তা একটাই, রোজি যদি আবার মত পাল্টে ফেলে।

কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটিয়ে ম্যাকগোয়ান আবার মুখ খুলল—জান আইকে, বুড়ো রিডল

আমাকে মোটেই বরদাস্ত করতে পারে না। এক হপ্তা ধরে হতচ্ছাড়াটা রোজির সঙ্গে আমাকে মুহূর্তের জন্যও বাইরে কোথাও যেতে দেয় না। তাকে সর্বদা চোখে চোখে রাখে। একজন বোর্ডারকে হাতছাড়া করার ভাবনা না থাকলে বহু আগেই আমাকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিত। আমি হপ্তায় বিশ ডলার রোজগার করছি। এবার আইকের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে অনুরোধের স্বরে কথাটা বলল—ভাই আইকে, এমন কোন ওষুধ—কোন চূর্ণের খোঁজ কি নেই যার এক রতি খাইয়ে দিলে রোজি—কথাটা শেষ না করেই সে অস্থিরভাবে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল।

ঘরময় বার কয়েক চক্কর মেরে ম্যাকগোয়ান আইকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আবার বলতে লাগল—টিম লেসি একদিন আমাকে বলেছিল—একদিন সে এক ফেরিওয়ালার কাছ থেকে কি যেন একটা বস্তু এনে সোডার জলের সঙ্গে গুলে খাইয়ে দিয়েছিল। একটা দাগ পাকস্থলিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে রীতিমত নবাব-বাদশা বনে গেল। আর সবাইকে সে ত্রিশ সেন্টের মালিক জ্ঞান করতে লাগল। ব্যস, দুই হপ্তার মধ্যে তারা গীর্জায় গিয়ে বিয়ে করে ঘর বাঁধল।

ম্যাকগোয়ান লোকটা সহজ-সরল মানুষ হলেও গায়ে গতরে শক্তি ধরে যথেষ্টই। মানুষ চেনার ক্ষমতা যাদের আছে, তারা বলতে বাধ্য নিরস খিটমিটে মানুষটার বুদ্ধি-বিবেচনা খুবই সূক্ষ্ম। সুদক্ষ সেনাপতির মতই চূড়ান্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী সন্তর্পণে শত্রুশিবির আক্রমণ করতে বদ্ধপরিকর। যাতে কোনভাবেই তাকে পরাজয়ের গ্লানি গায়ে মাখতে না হয়।

ম্যাকগোয়ান আশায় বুক বেঁধে এবার বলল—আজ রাত্রের খাবারের সময় রোজির সঙ্গে দেখা হলে কোনরকমে একটা চূর্ণ খাইয়ে দিতে পারলে হয়ত তার মতিগতি স্থির থাকবে। পালিয়ে যাবার পরিকল্পনাটাকে ভেস্তে দেবে না। ওষুধের ক্রিয়া কোনক্রমে ঘণ্টা দুই টিকে গেলেই বাজি মাৎ—উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে যাবে।

আইকে সবকিছু শুনে মুখ খুলল—একটা কথা, পালিয়ে যাবার পরিকল্পনাটাকে কখন বাস্তব রূপ দিতে চাইছ, বলবে কি?

রাত্রি ন'টায়। রাত্রি সাতটায় রাত্রের খাবারের পাট চুকিয়ে রাত্রি আটটায় মাথা ধরেছে বলে ঘুমের ভান করে বিছানায় শুয়ে থাকবে। ঠিক ন'টায় বুড়ো পার্ভাটোলো দরজা খুলে আমাকে ভেতরে যাবার সুযোগ করে দেবে। আমি অল্পে দেখিয়ে রোজিকে বাইরে বেরোতে সহায্য করব। বাইরে বেরোবার পর রোজি যদি বিগড়ে না যায় তবে কাজ হাসিল করে নিতে কোনই অসুবিধে হবে না। আইকে, আমাকে একটা ওষুধ—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই আইকে বলে উঠল—একটা কথা বন্ধু, এসব ওষুধ টষুধের ব্যাপারে ওষুধ বিক্রেতাদের খুবই সতর্ক থাকা দরকার। একমাত্র ঘনিষ্ঠ জনদেরই এরকম ওষুধের চূর্ণ দেওয়া যেতে পারে। তবে আমি কথা দিতে পারি এক মাত্রা খাওয়ানোমাত্র রোজি তোমাকে অন্তর থেকে ভালবাসবে। তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে সে মনে স্থান দেবে না।

এবার আইকের প্রেসকিপশনটা মুহূর্তে চোখের আড়ালে চলে গেল। ব্যস, কাজ শুরু হয়ে গেল। সিকি গ্রাম মরফিয়ার দুটো বড়িকে ভাল করে চূর্ণ করে তাতে সুগার অব মিল্ক ভালভাবে মিশিয়ে ওষুধটা বানানো হল। এটা পেটে গেলে একজন পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি ঘণ্টা কয়েক বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকবে। তার ঘুম ভাঙতেই চাইবে না। তবে হ্যাঁ, তার দেহের কোন ক্ষতিই এ ওষুধ থেকে হবে না।

ম্যাকগোয়ান তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ওষুধের মোড়কটা কোটের পকেটে চালান দিল।

এবার আমরা আইকের সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় পাব। সে গোপনে মিঃ রিডল্-এর সঙ্গে দেখা করে তার কাছে ম্যাকগোয়ান ও রোজির পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করার পরিকল্পনাটা ব্যক্ত করল।

মিঃ রিডল্ আইকের মুখে ম্যাকগোয়ানের পরিকল্পনার কথাটা শোনামাত্র উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তৎপর হল। সে আইকেকে বলল—রাত্রের খাবার খেয়ে আমি ওপরে চলে যাচ্ছি। গুলিভর্তি বন্দুকটা হাতে নিয়ে আড়ালে অপেক্ষা করব। বেহাল কিছু দেখলেই দেব গুলি চালিয়ে। বরের গাড়ির পরিবর্তে তাকে এম্বুলেন্সে চেপে ফিরতে হবে, বলে দিচ্ছি।

মরফিয়ার নেশায় রোজিকে ঘণ্টা কয়েকের জন্য বেহুঁশ করার ব্যবস্থা করে, রক্তপিপাসু পিতৃদেবকে বন্দুক-হাতে পাহারায় লিপ্ত করে আইকে নিঃসন্দেহ হল যে, প্রতিদ্বন্দ্বী ম্যাকগোয়ানের

আশাহত হয়ে হাল ছেড়ে দেওয়ার বেশী দেরী নেই।

খবরটা পাওয়ার আশায় অস্থিরচিত্ত আইকে ব্লু লাইট ড্রাগ সেন্টার-এর বারান্দায় সারারাত্রি পায়চারি করে কাটাল।

সকাল আটটায় মিসেস রিডল্-এর মুখে খবরটা শোনার প্রত্যাশায় আইকে ছুটে গেল। দোকানের বারান্দায় উঠতেই ম্যাকগোয়ান একটা গাড়ি থেকে নেমে আনন্দ-উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে তার হাত দুটো জড়িয়ে ধরল। তার চোখে-মুখে যুদ্ধ জয়ের হাসি।

আইকের হাতদুটো ধরে বার কয়েক ঝাঁকুনি দিয়ে বলল—আরে ভাই, কেল্লা ফতে। রোজি ঠিক সময় মতই নিচে নেমে এল। ঠিক ন'টা ত্রিশ মিনিট পনের সেকেন্ডে আমরা রেভারেন্ডের বাড়ি হাজির হই। রোজি আমার সঙ্গে নতুন ভাড়া করা ঘরে এসেছে, নীল কিমানো পরে ডিম সিদ্ধ করে দিয়েছে। ভাই আইকে, আমি সত্যি বড়ই সৌভাগ্যবান! সেতুটার নিচেই আমি একটা কাজ জোগাড় করে নিয়েছি। এখন সেখানেই যাচ্ছি। ভাই, সময়-সুযোগমত একদিন চলে এসো। সবাই মিলে একসঙ্গে বসে খাওয়া দাওয়া করা যাবে, আসবে তো?

আইকে বার-কয়েক ঢোক গিলে আমতা আমতা করে বলল—আমি যে তোমাকে ওষুধ—চূর্ণটা দিয়েছিলাম?

ওই ওষুধ? তুমি আমাকে সে ওষুধটুকু দিয়েছিলে তার কথা শুনতে চাইছ? তার গতি কি হল সবই বলছি। কাল রাত্রে রিডলদের সঙ্গে খেতে খেতে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ফেললাম। কথাবার্তার ফাঁকে টুক করে তোমার দেওয়া ওষুধটুকু বুড়ো রিডল-এর কফির কাপে ঢেলে দিলাম। ওষুধ বিশ্বাসঘাতকতা করল না। বুড়ো রিডল বিছানা আশ্রয় করতে না করতে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। গভীর ঘুমে ডুবে রইল। আমি আর রোজি নির্বিবাদে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

দ্য ফারনিশ্ড রুম

নিম্ন ওয়েস্ট সাইড-এর অন্তর্গত লাল-ইট জেলার বাসিন্দাদের একটা বড় ভগ্নাংশ ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলের মত প্রায়ই বাড়ি বদলায়, এখানে-ওখানে ঘুরে ঘুরে জীবন কাটিয়ে দেয়। নিজেদের বাড়ি না থাকার জন্যই সে জেলার প্রায় সব বাড়িই যেন তাদের। কেবলমাত্র বসতির ক্ষেত্রেই নয়, মনের দিক থেকে তারা যাযাবর। তাদের ঘর-সংসার চলমান, তাদের সঙ্গে সঙ্গেই চলে।

তাই তো এ জেলার বাসিন্দাদের নিয়ে হাজার হাজার গল্পকথা ফাঁদা যায়। তবে এ-ও সত্য যে, গল্পগুলো খুবই একঘেয়ে। আর এতসব ছন্নছাড়া ভবঘুরেদের মধ্যে যদি দু-একটা ভূতের অস্তিত্বের সন্ধান না মেলে তবে তো ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্য হবার মত, অবিশ্বাস্য।

একদিন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসার কিছু সময় বাদে এক যুবক লাল বাড়িগুলোর ফাঁক দিয়ে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে প্রায় বুকে হেঁটে বারো নম্বর বাড়িটার সামনে পৌঁছে থমকে গেল।

অন্ধকারে বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে মুহূর্তের জন্য কি যেন ভেবে সিঁড়িতে ব্যাগটা রাখল। টুপি আর কপালের ধুলো ঝেড়ে নিল। বহুদূরবর্তী সুড়ঙ্গের মধ্যে গিয়ে ঘণ্টার শব্দটা থমকে গেল। ব্যস, শব্দটার অপমৃত্যু ঘটল।

যুবকটা যে বারো নম্বর বাড়ির ঘণ্টা বাজালো তার মালকিন ব্যস্ত-পায়ে এসে দরজা খুলল।

দরজাটা খুলতেই যুবকটা কোন রকম ভূমিকা না করেই বলল, একটা ঘরের খোঁজে এসেছি, পাওয়া যাবে?

ভিতরে আসুন, হপ্তা খানেক আগে তিন তলার পিছনের অংশটা খালি পড়ে রয়েছে। ইচ্ছে করলে সেটা দেখতে পারেন। বাড়ির মালকিন বলল।

আগন্তুক যুবকটা তার পিছন-পিছন সিঁড়ি বেয়ে নিঃশব্দে উঠতে লাগল। সিঁড়ির কার্পেটটা জীর্ণদশা প্রাপ্ত হয়েছে। বহুদিন আগেই তার অবসর গ্রহণের সময় পেরিয়ে গেছে। রোদ-বাতাসহীন ঘুপটি সিঁড়িটার যেখানে-সেখানে পুরু হয়ে শ্যাওলার আস্তরণ জমে রয়েছে। জুতোর তলায় সেগুলো প্যাঁচ-প্যাঁচ করছে। আর দেওয়ালের গায়ের ছোট-ছোট ঘুলঘুলি দিয়ে আলো এসে ওঠা-নামার কিছুটা সুবিধা

করছে। এক সময় সেগুলো হয়ত চারাগাছ লাগানো হয়েছিল। উপযুক্ত আলো-বাতাসের অভাবে মরে হেজে গেছে। নইলে সাধু বা মহাপুরুষদের মূর্তি রাখা হয়েছিল। শয়তান আর পিশাচরা সেগুলোকে তুলে নিয়ে ময়লা আবর্জনার দুর্গন্ধময় আস্তাকুড়ে ফেলে দিয়েছে।

সিঁড়ি-বেয়ে তিন তলায় উঠে বাড়ির মালকিন ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল—এ-ই সেই কামরা। খুবই ভাল। খুব বেশীদিন খালি পড়ে থাকে না। এই তো কিছুদিন আগে, গত গ্রীষ্মে কয়েকজন ভদ্র ও রুচিবান মানুষ এটায় থাকতেন। কোনরকম ঝামেলা হুজ্জতি তো ছিলই না, ভাড়ার পুরো টাকা অগ্রিম দিয়েছিলেন। 'স্প্রালস্ অ্যান্ড মুনি' কোম্পানি ঘরটা তিন মাসের জন্য ভাড়া নিয়েছিল। তুমি ভাল করে দেখ, পছন্দ না হওয়ার কোন কারণই নেই। মিস বে'রেটা স্প্রালস্-এর নামটা অবশ্যই তোমার শোনা আছে, কি বল? ধ্যুৎ! এটা তো তার রঙ্গমঞ্চের নাম—ছদ্মনাম। তারা এখানে পর-পর কয়েকটা নাচ-গানের আসরে বসেছিল। জমজমাট আসর! এবার ডানদিকের দেওয়ালটার দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে বাড়ির মালকিন বলল—ওই ড্রেসিং টেবিলটার ওপরে বাঁধানো বিয়ের সার্টিফিকেটটা রাখতে। আর গায়ে একটা ছোট ঘরও দেখতে পাচ্ছেন—বড় একটা খালি পড়ে থাকে না। এমন সুন্দর ব্যবস্থা, খালি থাকবেই বা কেন, বলুন?

একটা কথা, রঙ্গমঞ্চের লোকজন এখানে আসা-যাওয়া করে নাকি? আগন্তুক যুবকটা বলল।

এলেও আবার চলে যায়। সত্যি বলতে কি, আমার এখানে যারা ভাড়া আসে তাদের প্রায় সবাই রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে কোন না কোনভাবে জড়িত। আরে বাপু, এটা তো নাটকের জেলা নামেই পরিচিত। আর অভিনেতারা কোথাও বেশি দিন থিতু হয় না, শেকড় গজাতে দেয় না। তারা ভাড়া আসে, কিছুদিন থাকে, চলে যায়। আমি কড়ায়-গণ্ডায় প্রাপ্য পেয়ে যাই। ব্যস, আর কি চাই।

বাড়ির মালকিনের হাতে একমাসের অগ্রিম ভাড়া দিয়ে যুবকটা ঘরটা ভাড়া নিয়ে নিল। এবার সে বলল, দেখুন, আমি বড়ই পরিশ্রান্ত। তাই এখন থেকে ঘরটা ব্যবহার করছি।

বেশ তো। ভাড়া যখন দিয়েই দিলে তখন ঘর তো এখন থেকে তোমারই হল। যাক, যে কথা বলতে চাইছি, তোয়ালে থেকে জল পর্যন্ত সবকিছুই হাতের নাগালের মধ্যেই পেয়ে যাবে। তার পরও যদি কোন অসুবিধে হয় আমাকে জানাতে দ্বিধা কোরো না যেন।

বাড়ির মালকিন সিঁড়ির দিকে পা-বাড়াতেই ভাড়াটে-যুবকটা আমতা-আমতা করে বলল—একটা কথা, মিস ভাশলার মানে মিস এলেয়েস ভাশলার নামের এক যুবতীর কথা আপনার মনে আছে? ভাল করে ভেবে দেখুন তো মনে পড়ে কিনা। সম্ভবতঃ সন্ধ্যা গান গাইত। সুন্দরীই বটে, উচ্চতা মাঝারি। চেহারাও মাঝারি—খুব রোগা বা মোটা কোনটাই নয়। চুলগুলো সোনালি, কিছুটা লালচে আভা রয়েছে। বাঁ দিকের ভুরুর গায়ে কালচে একটা আঁচিল—মনে পড়ছে?

কপালের চামড়ায় ভাঁজ ফুটিয়ে তুলে মালকিন মুহূর্তকাল ভেবে বলল—কই না-তো, এরকম চেহারার কেউ-ই তো এখানে কোনদিন ছিল না। তবে একটা কথা, নাটকের অভিনেতারা যেমন প্রায়ই বাড়ি বদলায় তেমনই নাম বদলাতেও অভ্যস্ত। কতজন ঘর ভাড়া নিয়ে এখানে মাথা গোঁজে, আবার পাখির মত ফুড়ুৎ করে উড়েও যায়। কিন্তু ওরকম চেহারার কারো ছবি তো চোখের সামনে ভেসে উঠছে না।

কী আশ্চর্য! যেখানে যাই সেখানেই একই প্রশ্ন করছি। পাঁচ-পাঁচটা মাস অনবরত চক্কর মেরে বেড়াচ্ছি। যেখানে, যাকেই জিজ্ঞেস করি কেবলই একই উত্তর—না-না-না! দিনের বেলায় এজেন্ট, ম্যানেজার, কোরাস গানের দল, স্কুল-কলেজের ছাত্র, শিক্ষকদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে করতে দিন পেরিয়ে রাতের অন্ধকার নেমে আসে। আর রঙ্গমঞ্চের নায়িকাদের মুখের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে-তাকিয়ে রাত্রিগুলো কেটে যায়। যুবকটা স্বগতোক্তি করল।

যুবকটা মেয়েটাকে মনে-প্রাণে নিজের জীবনের মতই ভালবাসে বলেই তাকে খুঁজে বের করার জন্য সাধ্যাতীত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। তার দৃঢ় প্রত্যয়, বাড়ি থেকে কেটে পড়ার পর শহরেরই আনাচে-কানাচে কোথাও আত্মগোপন করে রয়েছে। তবে সমস্যা একটাই। এ শহরটা চোরাবালির মত। স্থায়িত্ব বলে কিছু নেই। চোরাবালির মত ওপরের বালি ধপ্ করে নিচে নেমে যায় আর নিচের কাদা-মাটি চলে যায় নিচে—মাঝে-মধ্যেই ওলট-পালট হয়।

দুশ্চরিত্রা মেয়েদের মনে দোলা লাগানো হাসি যেমন পুরুষদের আপ্যায়ন করে ঠিকই তেমনি

মেকি আতিথেয়তার আলোয় সুসজ্জিত কামরাটা নতুন অতিথিকে আমন্ত্রণ ও আপ্যায়ণ করল।

ঘরটার দেওয়ালে ঝুলছে নিকেল-করা ফ্রেমে বাঁধানো কয়েকটা ছবি, একটা পুরনো ও জীর্ণ খাট, একটা ছেঁড়া ঢাকনায় মোড়ানো সোফা, নড়বড়ে দুটো চেয়ার, কমদামী একটা আয়না প্রভৃতি দিয়ে ঘরটাকে সাধ্যমত সাজিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

যুবকটা চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে দেওয়ালের ছবিগুলোর ওপর চোখের অলস মণিগুলো বুলাতে লাগল। ছবিগুলোর বিষয়বস্তু—দু'দিন বাদে বাদে এক বাড়ি ছেড়ে অন্য বাড়িতে গিয়ে যারা মাথা গোঁজে—'প্রথম কলহ,' 'হুগোনেট প্রেমিক-প্রেমিকা', 'ঝর্নার আত্মা' আর 'বিয়ের প্রাতরাশ' প্রভৃতি।

এবার দেওয়ালের ছবিগুলো থেকে দৃষ্টি তুলে নিয়ে ম্যান্টেলপিসটার ওপর চোখের মনি দুটোকে স্থির করল। সেখানে দু'-একটা ব্যবহারের অনুপোযোগী খারাপ ফুলদানি, ওষুধের শিশি, এক জোড়া খোলা তাস আর কয়েকজন নাট্যাভিনেত্রীর ছবি তার চোখে পড়ল। ছেড়ে যাওয়া ভাড়াটেদের ফেলে যাওয়া জিনিসপত্রগুলোর মধ্যে কিছু কিছু ক্রমে তার কাছে অর্থবহ হয়ে উঠতে লাগল।

ড্রেসিং টেবিলটার সামনে বিছিয়ে রাখা বড় সড় রুমালটার সেলাই ছিঁড়ে-যাওয়া জায়গাটা প্রমাণ দিচ্ছে এর মালকিন নির্ঘাৎ ভিড়ের মধ্য দিয়ে ঠেলাঠেলি করে কোথাও গিয়েছিল। দেওয়ালের ছোট-ছোট আঙুলের ছাপগুলো দেখে সহজেই নিঃসন্দেহ হওয়া যায় ছোট-ছোট বন্দীরা, যারা রোদ-আলো-বাতাসে যাওয়ার জন্য ছটফট করছিল। বোমার আঘাতের দাগগুলো বুঝাচ্ছে, বোতল বা গ্লাস ছুঁড়ে দিয়ে এরকম ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। আর হীরের আঁচড়ে ড্রেসিং টেবিলের বড় আয়নাটার গায়ে আঁকা-বাঁকা হরফে লেখা 'সারি' নামটা লেখা রয়েছে। চিহ্নগুলো দেখে সহজেই অনুমান করা যাচ্ছে, ঘরের বাসিন্দারা রেগে একেবারে টঙ্‌ হয়ে গিয়েছিল যে, ঘরটার ওপর দিয়ে গায়ের জ্বালা নিভিয়েছে। শুধু কি এই ? ঘরের আসবাবপত্রগুলোকে আছড়ে-আছড়ে টুকরো-টুকরো করেছে। ঠিকরে বেরিয়ে আসা স্প্রিংগুলোর আঘাতে বেঁকেচুরে যাওয়া সোফাটাকে দেখে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় অমিত শক্তিধর ও অতিকায় এক দৈত্যকে এটার ওপর হত্যা করার সময় ভয়ানক হাত-পা ছোঁড়া-ছুড়ি করেছিল। প্রচণ্ড আঘাতে ম্যান্টেলপিসের শ্বেতপাথর থেকে একটা টুকরো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে যা দেখে ধরে নেওয়া যায় এখানে রীতিমত ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটেছিল। ভাবলে অবাক হতে হয়, যারা কিছু সময়ের জন্য ঘরটাকে নিজেদের বাড়ি ভেবেছিল—তারাই এমন অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিয়েছে! তবে এখনও মনে করা যেতে পারে সবই বাড়ির মালকিনের আর্থিক অসঙ্গতির নিদর্শন। ক্রমে ভাঙতে ভাঙতে ঘর ও আসবাবপত্রগুলোর এ দশা হয়েছে। অর্থাভাবে মেরামত করা হয়ে ওঠেনি। আবার এ-ও হতে পারে বাড়ির মালকিনের ওপর মিথ্যা আক্রোশ বশতই এরকম তুলকালাম কাণ্ড ঘটানো হয়েছে। নিজের বাড়ি, নিজের ঘর যত খারাপই হোক তা আমাদের কাছে স্বর্গের প্রাসাদতুল্য।

সদ্য ঘর ভাড়া-নেওয়া যুবকটা চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে ঘরটার ব্যাপার স্যাপার নিয়ে আকাশ-পাতাল ভেবে চলেছে। এদিকে অবাঞ্ছিত শব্দ ও গন্ধ সবেগে ঘরের মধ্যে ঢুকছে। একটা ঘর থেকে বুক-কাঁপানো হা-হা হি-হি হাসির শব্দ তার কানে ভেসে আসতে লাগল। আর এক ঘর থেকে ভেসে এল একতরফা ক্রোধ প্রকাশের স্বর, পাশার কড়াৎ-কড়াৎ শব্দ, একটা মাত্র কণ্ঠের আর্তস্বর, ডুকরে ডুকরে কান্নার শব্দ, একটা মাত্র কণ্ঠের ঘুমপাড়ানি গানের কলি আবার মাথার ওপর থেকে ব্যাঞ্জো বাজানোর শব্দও তার কানে এল। মুহূর্তকাল পরে সে শুনতে পেল ভয়ঙ্কর আওয়াজ করে একটা দরজা যেন খুলে গেল। পর মুহূর্তেই তার কানে এল বেড়ার ওপর থেকে একটা বিড়াল অনবরত ম্যাঁও-ম্যাঁও করেই চলেছে। আর মাঝে-মাঝে কানে আসতে লাগল ট্রেন চলার গুরু গম্ভীর আওয়াজ।

চেয়ারে বসেই সে বার-বার আতঙ্কে ছোট হয়ে আসা চোখের মণিদুটো ঘুরিয়ে ঘরটাকে দেখতে লাগল। থেকে থেকে ঠাণ্ডা উৎকট পচা গন্ধ তার নাক দিয়ে ফুসফুসে ঢুকে ভেতরটাকে তোলপাড় করে দিতে লাগল।

ভাড়াটে-যুবক চেয়ারে বসে থাকা অবস্থাতেই এক সময় সচকিত হয়ে সোজা হয়ে বসে পড়ল। সদ্য ফোটা মাইলোনেট ফুলের মিষ্টি-মধুর গন্ধে ফুসফুস দুটো খুশিতে নাচানাচি জুড়ে দিল। যুবকটা হঠাৎ গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠল—প্রেয়সী, প্রেয়সী আমার! কি? কি হল প্রেয়সী?

কেউ তাকে গোপন অন্তরাল থেকে আহ্বান করছে এমন ভাব নিয়ে সে যন্ত্রচালিতের মত তড়াক্ করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে খাড়া হয়ে পড়ল। উদ্ভ্রান্তের মত এদিক-ওদিক ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতে লাগল।

'আমার প্রেয়সী, আমার প্রাণেশ্বরী এ ঘরে এসেছিল'—চেঁচিয়ে বলে উঠল। এবার তার একটা চিহ্নকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য সে সজোরে এক লাফ দিল। তার দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে, প্রেয়সীর কোন না কোন একটা চিহ্ন দেখলেই সে সনাক্ত করতে পারবে। মাইলোনেট-এর সুমিষ্ট গন্ধ কোত্থেকে এল? তার প্রিয়তমা গন্ধ ভালবাসত, কোত্থেকে এল সেটা? এ কী অত্যাশ্চর্য ব্যাপার!

প্রায় উন্মাদের মত এক লাফে সে ড্রেসিং টেবিলটার কাছে এগিয়ে গেল। ব্যস্ত-হাতে ড্রয়ারটা খুলে ফেলল। সামান্য হাতড়ে সেটা থেকে এক টুকরো কাপড়—রুমাল বের করে আনল। সেটাকে নাকের কাছে নিতেই হোলিও-টোপের উগ্র গন্ধ ফুসফুসে গিয়ে আঘাত করল। এবার অন্য একটা ড্রয়ার থেকে বের করল কয়েকটা বড় বড় বোতাম, মহাজনের বন্ধকী কার্ড, নাটকের প্রোগ্রাম, স্বপ্ন বিষয়ক একটা পুস্তিকা আর দুটো শুকনো জলজ গাছের চারা। তার মুখে হতাশার ছাপ নেমে এল। না, ড্রয়ার দুটোর জিনিসগুলো থেকে সে কিছুই উদ্ধার করতে পারল না।

শিকারের গন্ধ-পাওয়া শিকারী কুকুরের মত সে ঘরময় ছুটোছুটি দাপাদাপি করতে লাগল। দেওয়ালগুলো হাতড়ে, প্রায় বুকে হেঁটে ঘরটার কোণগুলি পর্যন্ত খুটিয়ে-খুটিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে লাগল, টেবিল, চেয়ার আর ম্যান্টেলপিসটা পর্যন্ত কাৎ করে, সোজা করে—ওলটপালট করে দেখতেও বাদ দিল না। প্রেয়সী তার কাছাকাছি পাশাপাশিই রয়েছে, তাকে স্পর্শ করছে, সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় দিয়ে তাকে করুণ স্বরে ডাকাডাকি করছে। নিঃসন্দেহ না হতে পেরে দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রেয়সীর কোন চিহ্নের জন্য সে উদ্ভ্রান্তের মত চারদিকে ছুটোছুটি দাপাদাপি করতে লাগল।

এক সময় সে মোহাচ্ছন্ন মানুষের মত চেঁচিয়ে উঠল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, প্রেয়সী আমার! এই যে—এই যে, আমি এখানে। মুহূর্ত কাল নীরবে অপেক্ষা করার পর সে হতাশ হয়ে বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল—হায় ঈশ্বর! চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে এবার বলল—কোত্থেকে এ মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে? আর গন্ধটা থেকেই বা ডাক দেবার মত কণ্ঠস্বর পাচ্ছে! কোত্থেকে! কবে থেকে?

যুবক-ভাড়াটের মনে তখন পরিচারিকার কথা বারবার উঁকি দিতে লাগল।

ভুতুড়ে ঘর থেকে এক দৌড়ে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে একটা ঘরের দরজা দিয়ে আলো দেখতে পেয়ে এক ধাক্কায় দরজাটা খুলে ফেলল। সে বহু চেষ্টায় নিজেকে সামলে নিয়ে বলল—মাদাম আমাকে যে ঘরটা ভাড়া দেওয়া হয়েছে আমার আগে সেখানে কে থাকত, বলুন তো?

আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি বাছা, তোমার আগে সেটায় স্প্রালস্ ও মুনি থাকত। নাট্যজগতে তিনি মিস ব্রেটা স্প্রালস্ নামে পরিচিত। তবে তার প্রকৃত নাম মিসেস মুনি। দেওয়ালে একটা পেরেকের গায়ে বিয়ের সার্টিফিকেটটা ঝোলানো ছিল।

একটা কথা, মিস স্প্রালস কেমন, মানে তিনি দেখতে কেমন ছিলেন বলুন ত?

গায়ের রঙ মাজা, মানে কিছুটা কালো, বেঁটেখাটো, শক্ত-সমর্থ যুবতী। আর মুখে সর্বদা হাসির ঝিলিক লেগেই থাকে। গত মঙ্গলবার তারা ঘর ছেড়ে চলে গেছে।

মুহূর্তের জন্য নীরবে ভেবে যুবকটা এবার বলল—ও, তাই বুঝি? আর একটা কথা, মিস স্প্রালস্-এর আগে কে ভাড়া ছিলেন?

এক ভদ্রলোক। একাই থাকতেন। মাল পরিবহনের কারবারী। কি আর বলব বাছা, আমার এক হপ্তার ভাড়া মেরে দিয়ে চুপিচুপি চম্পট দিয়েছিল। তাঁর আগে দুটো ছেলে-মেয়ে মিসেস ক্রোডার সে ঘরটায় চার মাস কাটিয়ে গেছেন। আর তার আগে থাকতেন মিঃ ডয়েল। বুড়ো মানুষ। ছেলেরাই তাঁর খরচ-খরচা বহন করত। তিনি ঘরটায় দু'মাস কাটিয়ে গেছেন। এ কিন্তু এক বছর আগেকার ব্যাপার। এর আগের কথা আমার ঠিকঠাক মনে পড়ছে না বাছা।

যুবকটা মালকিনকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার নিজের ঘরটায় ফিরে গেল। ঘরে নিরবচ্ছিন্ন নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। যে উগ্র গন্ধটা তার মধ্যে প্রাণ চাঞ্চল্য জাগিয়েছিল সেটা ইতিমধ্যে বিদায় নিয়েছে। মাইলোনেট ফুলের গন্ধটার কথা বলছি। তার জায়গা দখল করেছে শ্যাওলা আর পুরনো

আসবাবপত্রের ভ্যাপসা গন্ধ।

যুবকটার আশা স্তিমিত হয়ে যাওয়ায় বিশ্বাসটুকুতে ক্রমেই ভাঁটা পড়তে লাগল। সে এবার ব্যস্ত-হাতে বিছানার চাদরটাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে দরজা আর জানালার ফাঁকগুলো বন্ধ করে দিল। এবার গ্যাসটাকে জ্বেলে সাধ্যমত আগুনের শিখা বাড়িয়ে দিল। এবার আলোটাকে নিভিয়ে বিছানায় শরীর এলিয়ে দিল। বাস, নিশ্চিন্ত।

মিসেস ম্যাক্‌বুল-এর সে রাত্রে বিয়ার পান করার জন্য একটা পাত্র নিয়ে আসার কথা। সে পাত্রটা হাতে করে এসেছেও। কিন্তু এক তলায় বাড়ির মালকিন মিসেস পার্ডির কামরায় বসে গল্পে মেতে গেছে।

কথা প্রসঙ্গে মিসেস পার্ডি বলল—আজই তিন তলার পিছনের ঘরটা এক যুবককে ভাড়া দিয়েছি। একটু আগে আমার সঙ্গে কথা বলে সে শুতে গেছে।

কথাটা শুনে সামনে ভূত দেখার মত চমকে উঠে মিসেস ম্যাকবুল বলে উঠল—সে কি? বলছেন কি! ওরকম ঘরটা আপনি ভাড়া দিতে পারলেন! অবাক—বাস্তবিকই আপনি কিন্তু অবাক করলেন। আচ্ছা, পুরো ব্যাপারটা তার কাছে খোলসা করে বলেছেন? তার কথার মধ্যে কেমন যেন একটা রহস্যের গন্ধ পাওয়া গেল।

মিসেস পার্ডি নিদ্ধিধায়ই কথাটা ছুঁড়ে দিল—আরে, ঘরটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছি তো ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যেই। তবে না, ওই ব্যাপার স্যাপার সম্বন্ধে তার কাছে কিছুই ফাঁস করিনি।

হ্যাঁ, উচিত কাজই করেছেন। ঘর ভাড়াটুকুই তো আমাদের বেঁচে থাকার সম্বল। আপনি কিন্তু ব্যবসাটা খুব ভালই রপ্ত করে নিয়েছেন। ঘরটার বিছানায় শুয়ে একজন আত্মহত্যা করেছিল ফাঁস হয়ে গেলে অনেকেই ঘর ভাড়া বন্ধ করে দেবে। ঠিক এক হপ্তা আগে, আজকের এ বারটাতেই তো আপনার তিন তলার ওই পিছনের ঘরটার ভাড়াটে আমিই জোগাড় করে দিয়েছিলাম। আমি তো এখনও ভাবতে পারছি না অমন একটা সুন্দরী মেয়ে শেষ পর্যন্ত কিনা গ্যাসের আগুনে আত্মহত্যা করে বসল! মেয়েটা কথাবার্তায় কত সুন্দর, কী মিষ্টি ব্যবহার ছিল তাই না মিসেস পার্ডি?

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন বটে! মিসেস ম্যাক্‌বুল, তবে মেয়েটাকে সত্যি সুন্দরী বলা যেত যদি তার বাঁ দিকের ভুরুর তলায় কালচে আঁচিলটা না থাকত।

দ্য স্কাইলাইট রুম

মিসেস পার্কার গোড়াতেই আপনাকে ঘর দুটো ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখাবেন। তাঁর পরবর্তী পদক্ষেপ হবে সে দুটোর সুযোগ-সুবিধার বর্ণনা দেওয়া। সবশেষে যে লোকটি সে ঘর দুটোতে আট-আটটা বছর কাটিয়ে গেছে পঞ্চমুখে তার প্রশংসায় মেতে উঠবেন। তার অনর্গল কথা বলাতে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা আপনার কিছুতেই হবে না।

তারপর? তারপর হয়ত আপনি আমতা আমতা করে স্বীকার করে নেবেন যে আপনি একজন ডাক্তার, এমন কি দাঁতের ডাক্তারও নন।

আপনার স্বীকারোক্তিতে মিসেস পার্কার এমন এক ভাব দেখাবেন যে, আপনার মা-বাবা আপনাকে মিসেস পার্কার-এর ঘর দুটো ভাড়া পাওয়ার উপযুক্ত করে তৈরি করে তোলেন নি। আর এ কারণেই তাদের প্রতি আপনার মনে আর শ্রদ্ধার ভাব উদয় হবে না।

মিসেস পার্কার এবার সিঁড়ি ভেঙে আপনাকে নিয়ে তিন তলার পিছন দিককার একটা ঘরে নিয়ে যাবেন! সেটা আট ডলারের ঘর। এবার তিনি আপনাকে বোঝাতে লাগবেন, মিঃ টুমেনবেরি বারো ডলার ভাড়াতে এ ঘরটায় থাকতেন। বর্তমানে পাম বীচের কাছে ফ্লোরিডায় তার ভাইয়ের কাছে চলে গেছেন। সেখানে তাঁর একটা কমলালেবুর বাগিচা আছে। সেটা দেখভালের দায়িত্ব তাঁর ওপর বর্তেছে। সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। আর তাতে ঘরদুটোর লাগোয়া স্নানের ঘর থাকার জন্য মিসেস ম্যাক্‌ইনটায়ার সেখানেই শীতকালটা থেকে গিয়েছিলেন। তারপর বহু কষ্টে

হয়ত বা আপনি কোনক্রমে বোঝাতে সক্ষম হবেন, আসলে আপনি আরও সস্তা ভাড়ায় ঘর চাচ্ছেন এতেও অনেক ধৈর্য ধরে তবে আপনার মনের কথা তার কাছে ব্যক্ত করতে পারবেন।

তারপরও যদি আপনি মিসেস পার্কার-এর তাচ্ছিল্য ভাবটাকে বরদাস্ত করতে পারেন তবে চারতলার মিঃ স্কিডার-এর হলঘরটা দেখাতে আপনাকে নিয়ে যাবেন। মিঃ স্কিডারের ঘরটা তখনও তিনি দখল করে রেখেছেন। উদয়াস্ত একের পর এক সিগারেট ধরিয়ে তিনি নাটক লেখায় মেতে থাকেন। তবে সে-ই ঘর ভাড়া নেওয়ার জন্য যে-ই তার কাছে আসে তাকেই তিনি এ ঘরটা দেখাতে নিয়ে আসেন। তার পোশাক-পরিচ্ছদ তারিফ করার মত, স্বীকার করতে হয়।

মিসেস পার্কার সবাইকে হলঘরটা দেখাতে নিয়ে আসার পিছনে কারণও যথেষ্টই রয়েছে যতবার নতুন কোন লোক ঘর ভাড়া নিতে আসে ঘরটা ছেড়ে দিতে হয় এ ভয়ে মিঃ স্কিডার প্রতিবারই তাঁকে ভাড়ার কিছু টাকা দেন।

হ্যাঁ, তারপরও যদি আপনি কোটের পকেটের তিনটামাত্র ডলারকে গরম দিয়ে মুঠো করে ধরে থাকেন, আর রুক্ষ-রুষ্ট কণ্ঠে বলেন যে, আপনি খুবই গরীব তবে সেখানেই খেল্ খতম হয়ে যাবে। মিসেস পার্কার কিছুতেই আর আপনার দিকে চোখ তুলে তাকাবেন না।

ব্যস, আর মুহূর্তমাত্রই দেরী না করে মিসেস পার্কার চিৎকার করে 'ক্লারা-ক্লারা' বলে ডাক দিয়েই ব্যস্ত-পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যাবেন।

একটু বাদেই ক্লারা, নিগ্রো পরিচারিকা আপনাকে সঙ্গে করে মই-বেয়ে সোজা চারতলার চিলেকোঠায় আপনাকে নিয়ে হাজির হবে। সেটা দেখাবে। ঘরটা হলঘরের মাঝখানে অবস্থিত আর তার দৈর্ঘ্য আটফুট ও প্রস্থ সাত ফুট। দু'দিকেই একটা করে অন্ধকার খোপ, মালপত্র রাখার জায়গা রয়েছে। একটা লোহার খাটিয়া, একটা চেয়ার আর হাত ধোয়ার পাত্র ঘরটায় রাখা আছে পোশাক পরিচ্ছদ রাখার জন্য একটা তাক রয়েছে। ঘরটার ওপরের দিকের ছোট ফাঁকা জায়গা যেটাকে জানালা বলতে পারেন সেটা দিয়ে নীল আকাশের চৌকো একটা টুকরো অংশ দেখতে পাবেন। ব্যস, এর বেশী কিছু আশা করলে ভুলই করা হবে। ক্লারা হয়ত বলবে এর ভাড়া দু'ডলার।

একদিন একটা ভারী টাইপরাইটার সঙ্গে করে মিস লীসন ঘর ভাড়ার খোঁজে এল। যন্ত্রটার তুলনায় কোন শক্ত সামর্থ্য মেয়ের পক্ষে সেটা বহন করে নিয়ে আসা সম্ভব হতে পারে। মিস লীসন কিন্তু বেঁটেখাটো চেহারার মহিলা।

মিসেস পার্কার তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে ঘর দুটো দেখালেন। ছোট ঘরটার দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন—শোন বাছা, এ ছোট ঘরটায় তুমি দাঁত তোলার ওষুধপত্র অথবা মড়ার হাড়, নইলে কয়লা রাখতে পারবে—কি পারবে তো?

আমতা-আমতা করে মিস্ লীসন বললেন—কিন্তু-কিন্তু আমার পেশা তো ডাক্তারী নয়। আমি একজন দাঁতের ডাক্তারও নই।

যারা ডাক্তার, নিদেনপক্ষে দাঁতের ডাক্তারও নয় তাদের দিকে মিসেস পার্কার যারপরনাই করুণার দৃষ্টিতে তাকান। আগন্তুক এ মেয়েটার দিকেও একই রকম দৃষ্টিতে তাকালেন। তারপর তাকে নিয়ে তিন তলার পিছনের ঘরটায় হাজির হলেন।

আরিব্বাস! আ-ট ডলার। কিছুতেই সম্ভব নয়। আমাকে দেখলে যা-ই মনে হোক না কেন, মোটেই ধনী মনে করবেন না। আমি গরীব খেটে-খাওয়া অতি সাধারণ একটা মেয়ে। ওপর বা নিচু তলার অন্যান্য ঘরগুলো দয়া করে আমাকে দেখান। যদি আমার সামর্থ্যে কুলায়।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হতেই মিঃ স্কিডার যন্ত্রচালিতের মত তড়াক্ করে লাফিয়ে সিগারের পোড়া শেষাংশগুলো সারা ঘরে ছড়িয়ে ফেললেন। নিতান্ত অপরাধীর দৃষ্টিতে মিসেস পার্কার-এর দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলেন। মুখে দানবীর মত হাসি ফুটিয়ে তুলে মিসেস পার্কার বললেন—কিছু মনে করবেন না মিঃ স্কিডার। আপনি যে ঘরেই রয়েছেন আমার ঠিক জানা ছিল না। আসলে আপনার ঘরের জানালার পর্দাগুলো এ মহিলাকে দেখানোর জন্য ছুটে আসতে হল। অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত।

ঠোঁটের কোণে মিষ্টি হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে মিস লীসন বলে উঠলেন—সত্যি চমৎকার! পর্দাগুলো বাস্তবিকই চমৎকার।

মিসেস পার্কার আগন্তুক মিস লীসনকে নিয়ে ঘর ছেড়ে বাইরে চলে গেলে মিঃ স্কিডার তার বর্তমান নাটকের নায়িকা নির্বাচনের কাজে মন দিলেন।

একটু বাদেই বিপদ-সঙ্কেতের মত গুরুগম্ভীর একটা শব্দ কানে এল—'ক্লারা—ক্লারা!'

ধপাস করে লোহার খাটিয়াটার ওপর বসে পড়ে মিস লীসন বলল—এ ঘরটাই আমি নিতে চাচ্ছি।

মিস লীসন রোজই তার কাজের ধান্ধায় বেরিয়ে যায়। এক গোছা হাতে লেখা কাগজ নিয়ে রাত্রে ঘরে ফেরে। তারপর রাত্রি জেগে সেগুলো টাইপ করার কাজে মেতে থাকে। কোন কোনদিন হাতে কাজ না থাকলে সেদিন অন্য ভাড়াটেদের সঙ্গে চিলেকোঠার সিঁড়িতে বসে অনেক রাত্রি পর্যন্ত গল্পগুজব করে কাটায়। তার মধ্যে হাসিখুশিই কেবল নয়, বিচিত্র সব খেয়াল পরিকল্পনাও ঠাসা। মিঃ স্কিডার নিজেই উৎসাহী হয়ে 'সুড়ঙ্গ-পথের অধিকারী' বা 'এটা ছাগশিশু নয়' ব্যঙ্গ নাট্যের তিনটে অঙ্ক মিস লীসনকে পড়ে শোনাল।

মিস লীসন যতটুকু সময়ের জন্যই হোক না কেন সিঁড়িতে গিয়ে বসলেই ঘরের ভদ্রলোক ভাড়াটেরা রীতিমত আনন্দের জোয়ারে ভাসতে থাকে।

মিস হংসচঞ্চু নামের এক সুন্দরী যুবতী একটা পাবলিক স্কুলের শিক্ষিকা। 'আরে, সত্যি নাকি বলাটা তার মুদ্রাদোষ।

আর মিস ডন নামের যুবতীটা? সে প্রতি রবিবার কোনিতে হাঁস শিকার করতে যায়। একটা বিভাগীয় বিপনীতে চাকরি করে। সে-ও এল। সিঁড়ির একেবারে নিচের ধাপটাতে বসে। তার একটা বদ রোগ আছে। প্রতি মুহূর্তে কেবলই হাঁচে। সিঁড়ির মাঝখানের ধাপটাতে বসে মিস লীসন। সে বসতে না বসতেই পুরুষগুলো তার চারদিকে বসে পড়ে। ব্যস, এবার শুরু হয়ে যায় চুটিয়ে আড্ডা দেওয়া।

যে নাটকের কথা আজ পর্যন্ত কেউ শোনে নি এরকম একটা বাস্তব জীবনকে কেন্দ্র করে লেখা একটা রোমাঞ্চকব নাটকের নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করার জন্য মিঃ স্কিডার মনে-মনে মিস লীসনকে ঠিক করেই রেখেছেন।

আসরে আরও দু'জন আসেন। তাদের একজন মিঃ হুভার। বয়স বছর পঁয়তাল্লিশ। ইয়া মোটা, যাকে বলে একেবারে নাদুস-নুদুস চেহারা। আর দ্বিতীয়জনের নাম মিঃ ইভান্স—যুবক। সে একটার পর একটা সিগারেট টানে আর হরদম কাশে। মিস লীসন প্রতিনিয়ত সিগারেট খেতে বারণ করে। কিন্তু কান দেয় না।

পুরুষদের সবাই একমত পোষণ করে—মিস লীসন-এর মত হাসিখুশি ও রসিক মেয়ে বড় একটা দেখা যায় না।

কিছু সময়ের জন্য অন্যসব প্রসঙ্গ ধামাচাপা দিয়ে রেখে মিঃ হুভার-এর নাদুস-নুদুস শরীরটাকে নিয়ে কিছুটা সময় কাটানো যাক। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামলে প্রমাণিত হয়ে যেত হাড্ডিসার রোমিও প্রেমের অভিনয় দেখিয়ে মাত্র কিছু সংখ্যক লোকের মন জয় করেছেন। কিন্তু সে তুলনায় প্রেমের অভিনয় দেখিয়ে অনেক, অনেক বেশী লোকের মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল ফলস্টাফ।

এক গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় মিসেস পার্কার-এর ভাড়াটেরা যখন সিঁড়িতে বসে আড্ডায় মেতেছে তখন মিস লীসন আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল—সে কি! ওই-ওই মিস ড্যাকসন! এখানে বসেই আমি তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ওই—ওই তো!

আসরে উপস্থিত সবাই যন্ত্রচালিতের মত ঘাড় বাঁকিয়ে আকাশের দিকে তাকাল। ভাবটা এমন যে, জ্যাকসন যেন আকাশের গায়ে বিমান নিয়ে চক্কর মারছে। সবাই সেটাকে দেখার জন্যই যেন উদ্‌গ্রীব।

মিস লীসন এবার আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলল—ওই-ওই যে, ওই তারাটার কথাই বলছি। অত্যুজ্জ্বল—ঝলমলে তারাটা কিন্তু নয়। সেটার কাছাকাছি ওই স্থির তারাটার কথা বলছি। প্রতি রাত্রেই আমি ওটাকে দেখতে পাই। আমি ওর নামকরণ করেছি জ্যাকসন—বিলি জ্যাকসন।

আরে ব্বাস! তুমি যে আবার জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শিনী তা-তো জানা ছিল না। মিস হংসচঞ্চু

ব্যঙ্গের স্বরে বলে উঠল।

হ্যাঁ, ঠিক তা-ই। ওদের প্রত্যেককেই আমি চিনি। শীতকালে মঙ্গল গ্রহের ওরা কিরকম আস্তিনওয়ালা জামা গায়ে দেবে তোমরা জানতে চাইলে তা-ও তোমাদের বলতে পারি। তারা অন্বেষণে লিপ্ত মেয়েটা বলল।

তাই বুঝি? কিন্তু তুমি যে তারাটাকে নির্দেশ করছ ওটার নাম গামা। ওটা ক্যাসিওপিয়া নক্ষত্রপুঞ্জের অন্তর্গত একটা তারা। দ্বিতীয় শ্রেণীর তারাদের দলে পড়ে।

মিঃ ইভান্স নামক যুবকটা বলল—আমার মতে বিলি জ্যাকসন নামটাই সবচেয়ে ভাল।

মিঃ হুভার কপালের চামড়ায় চিন্তার ভাঁজ এঁকে বলল—আমার বিশ্বাস ওটা তারা না হয়ে উল্কাও হতে পারে। রবিবার আমি কোনিতে ছিলাম। সেখানে আমি সকাল দশটার মধ্যে গোটা নয়েক খরগোসকে গুলি করে খতম করেছি।

মিস লীসন মুখ খুললেন—তারাটাকে এখান থেকে চমৎকার দেখাচ্ছে। আশা করি আপনাদের জানা আছে কুয়োর জলে দিনেও তারা দেখা সম্ভব হয়। রাত্রি গভীর হলে জ্যাকসনকে রাতের রানীর পোশাকের গায়ে আঁটা হীরের একটা পিনের মত দেখায়।

ক'দিন বাদেই মিস লীসন টাইপ করার জন্য কাগজপত্র সঙ্গে করে আনা বন্ধ করে দিলেন। কাজের খোঁজে অফিসের দরজায় দরজায় ঢু মেরে যায়। অফিসের উদ্ধত ছোকরা কর্মচারীরা তাকে মোটেই কাজ দিতে চায় না, দেয় না। ফলে মিস লীসনের মনটা ক্রমেই নিরুৎসাহ হয়ে পড়তে লাগল। কোন কোন দিন তাকে উপোস করেই কাটাতে হয়। সত্যি মর্মান্তিক ব্যাপারই বটে।

এক সন্ধ্যায় ক্লান্ত-অবসন্ন দেহে সে মিসেস পার্কার-এর খুপড়িটায় ফিরল। ফাঁকা হলঘরটায় পা দিয়েই মিঃ হুভার-এর মুখোমুখি হয়ে গেল। মিঃ হুভার ক'দিন ধরেই এমনই এক যোগাযোগের অপেক্ষায় ছিল। সে কোনরকম ভূমিকা না করেই সরাসরি মিস লীসনকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসল। মিস লীসন মুখে কোন জবাব না দিয়ে যন্ত্রচালিতের মত তার মুখে দুম্ করে একটা থাপ্পড় কবে দিল। মিঃ হুভার একটা হাত দিয়ে মুখটা হাতাতে-হাতাতে দ্রুত হলঘরটা ছেড়ে বেরিয়ে গেল। কোনরকমে নিজের ঘরের দিকে হাঁটতে লাগল।

মিস লীসন দুর্বল পায়ে নিজের খুপড়িটায় পৌঁছে কোন রকমে আলোটা জ্বালায়। পোশাকটা বদলেই ধপাস্ করে খাটিয়াটার ওপর শুয়ে পড়ল।

মিনিট-কয়েক মড়ার মত পড়ে থাকার পর নিতান্ত অনিচ্ছায় হলেও চোখের পাতাগুলো খুলে জানালা দিয়ে তাকাল। স্কাই লাইটের ভেতর দিয়ে অত্যুজ্জ্বল বিলি জ্যাকসন-এর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। পৃথিবীটাই তার মন থেকে উধাও—ধুয়ে মুছে গেছে। এর বিলি জ্যাকসন নামকরণ তো সেই করেছিল। একটুবাদে সে চাপা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। একটা দুর্বল হাত আকাশের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে প্রায় অস্ফুট স্বরে সে উচ্চারণ করল—জ্যাকসন—বিলি জ্যাকসন! পর মুহূর্তেই হাতটা ধপাস করে বিছানায় পড়ে গেল। আবার প্রায় অস্ফুট স্বরেই বলল—বিদায় জ্যাকসন! বিদায় বিলি জ্যাকসন! বিদায়!

পরদিন বেলা দশটায় নিগ্রো পরিচারিকা ক্লারা গিয়ে দরজায় তালা বন্ধ দেখে দৌড়ে গিয়ে সবাইকে খবরটা দিল। তারা এসে দরজা ভেঙে ভেতরে ডাকাডাকি করল, কব্জিতে জোরে জোরে টোকা মারল, নাকের সামনে ভিনিগার ধরাই শুধু না, পালক পুড়িয়ে নাকে ঠেসে ধরতেও বাদ দিল না। কিন্তু কোন কিছুতেই ফল হ'ল না। একজন ব্যস্ত হয়ে অ্যাম্বুলেন্সে টেলিফোন করতে বেরিয়ে গেল।

অ্যাম্বুলেন্স এল। গাড়ি থেকে সাদা পোশাক পরা এক ডাক্তার নেমে তাঁর নাদুস নুদুস চেহারাটাকে সিঁড়ি দিয়ে কোনরকমে তুলে নিতে লাগলেন। ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে তিনি সংক্ষেপে বললেন উনচল্লিশ-এ অ্যাম্বুলেন্স ডাকা হয়েছিল। ব্যাপার কি? কার কি হয়েছে, বলুন ত?

মিসেস পার্কার ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে বিষণ্নমুখে প্রায় কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলল—মেয়েটার যে হঠাৎ কি হ'ল কিছুই বুঝছি না। আপনি যখন এসেই পড়েছেন দয়া করে পরীক্ষা করে দেখুন।

জ্যোতির্বিদকে দু'হাতে তুলে নিয়ে পাড়ার ডাক্তার সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসতে লাগলেন। ডাক্তার মিসেস পার্কারকে অনুচ্চ কণ্ঠে হলেও বেশ কড়া কড়া ক'টা কথা বললেন। কথাগুলো

কানে যেতেই হঠাৎ মিসেস পার্কার কেমন মিইয়ে গেলেন।

তারপর থেকে কৌতূহলী মানুষগুলো ডাক্তার তাকে কি বলেছেন সে কথা জানার জন্য রীতিমত পীড়াপীড়ি শুরু করে দিল।

মিসেস পার্কার আমতা-আমতা করে বার-বার একই কথা বলে—থাক, ছাড়ান দিন ত। ওসব নিয়ে কেন শুধু শুধু হৈ চৈ বাধাতে চাচ্ছেন? ছাড়ান দিন। আমাকে ক্ষমা করলে খুশি হব। মিছে জল ঘোলা করে লাভ কি? অ্যাম্বুলেন্সের ডাক্তার একটা বড়সড় পোটলা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে গলির মুখে যেতেই সবাই আঁৎকে উঠে, ঘাবড়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে তাঁকে রাস্তা করে দিল। তাদের যেন মনে হ'ল ডাক্তার যেন তাঁর মৃত আপনজনকেই নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সের দিকে এগিয়ে চলেছেন।

কৌতূহলী জনতা দুর থেকে লক্ষ্য করল, ডাক্তার সুবিশাল পোটলাটাকে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে ওঠার পর কিন্তু সেটাকে রোগীদের জন্য বিছানাটায় শুইয়ে দিলেন না। সেটাকে সযত্নে বুকে জড়িয়ে ধরে কণ্ঠস্বরে ব্যস্ততা প্রকাশ করে বললেন, চালাও যত জোরে পার চালিয়ে দাও। উইলসন, তাড়াতাড়ি চালাও।

পরদিন সকালের খবরের কাগজে ছোট একটা খবর ছাপা হল।—আমার প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, খবরটা পড়ার পর তার শেষ ছত্রটা ভাল করে পড়লে আমার মতই আপনারাও সুতোয় গাঁথা মালার মতই ঘটনাগুলো পর পর সাজিয়ে গল্পটা তৈরী করে নিতে সক্ষম হবেন।

খবরটা ছাপা হয়েছিল—উনপঞ্চাশ নম্বর পূর্ব স্ট্রীট থেকে দীর্ঘ অনাহারের শিকার এক দুর্বল যুবতীকে বেলভিউ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।

খবরের সব শেষে বলা হয়েছে—উইলিয়ম জ্যাকসন অ্যাম্বুলেন্সের ডাক্তার, কেসটা যিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন—রোগিণীর রোগ নিরাময় হয়ে যাবে, স্বাভাবিকতা ফিরে পাবেন।

দ্য ক্যামিং-আউট অব ম্যাগি

ইস্ট সাইড-এর 'দান প্রতিদান' ক্রীড়া সংস্থার হলে প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় 'লবঙ্গপাতা সমাজ ক্লাব' নাচের আয়োজন করে। এসব নাচের আসরে অংশগ্রহণ করতে হলে 'দান-প্রতিদান সংস্থার সভ্যপদ নিতেই হবে। নইলে, বাইনগোল্ড কাগজের কারখানার কর্মী হতে হবে। তবে হ্যাঁ, লবঙ্গ পাতা সমাজ ক্লাবের প্রতিটি সভ্যকে সুযোগ দেওয়া হয়, সে বাইরের একজন সঙ্গীকে সঙ্গে নিয়ে একটামাত্র নাচের অনুষ্ঠানে নিয়ে যেতে পারবে। ব্যস, এ পর্যন্তই।

ম্যাগি টুলে নৃত্য পটিয়সী। সে নাট্য-ভঙ্গিতে নাচে এবং নাচের তালের সঙ্গে যথাযথভাবে পা ফেলে। আন্না ম্যাককার্টি এবং তার সঙ্গীর সঙ্গে সে নাচের আসরে যাতায়াত করে। ম্যাগি আর আন্না একই কারখানার কর্মী। তারা পরস্পরের অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। এমন কি কাজও করে কারখানায় পাশাপাশি বসে। বান্ধবী যাতে নাচের আসরে যাওয়ার সময় সঙ্গী হতে পারে সেজন্য প্রতি শনিবার সন্ধ্যাতেই আন্নার বিশেষ অনুরোধে তাকে সঙ্গে নিয়ে ম্যাগির বাড়ি হাজির হয়।

রাইন্ডগোল্ড কাগজের বাক্সের কারখানা প্রতি শনিবার দুপুর তিনটার সময় বন্ধ হয়ে যায়।

এক শনিবার বিকেলে কারখানা থেকে ম্যাগি আর আন্না পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরতে লাগল।

ম্যাগির বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে অভ্যাসমত বলল—ম্যাগি, সাতটায় তৈরী হয়ে অপেক্ষা কোরো। জিমি আর আমি তোমাকে সময় মত ডেকে নেব, মনে থাকবে ত?

ম্যাগি মুচকি হেসে সম্মতি জানাল। তারপর বলল, শোন, আজকের সন্ধ্যেটার জন্য অন্ততঃ আমার জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। আমার এক যুবক-বন্ধু আজ আমাকে সঙ্গে করে নাচের আসরে নিয়ে যাবে। তোমার আন্তরিকতার জন্য ধন্যবাদ।

শান্ত স্বভাবা হলেও আন্না তাকে আক্রমণ করতে ছাড়ল না। নানাভাবে তাকে গালমন্দ করে আক্রোশ প্রকাশ করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল—'হায় ঈশ্বর! ম্যাগিও এক যুবককে

বড়শিতে গেঁথেছে! বন্ধু হিসাবে তুমি ভাল মানুষ, অবশ্যই কাম্য, মিথ্যা নয়। কিছু মনে কোরো না ভাই, বল-নাচের আসরে তাকে সঙ্গিনী হিসাবে নির্বাচিত করা অথবা জ্যোৎস্না রাত্রে পার্কের বেঞ্চে পাশাপাশি বসার ব্যাপারে নির্বাচন করার মত তুমি। অথচ সে কি করে এমন একটা কাণ্ড করে বসল, মাথায় আসছে না। ব্যাপারটা কি করে সম্ভব হ'ল বল ত? কেই বা সে যুবক, বলবে কি?

লজ্জাবনতা ম্যাগী ম্লান হেসে বলল—আরে ভাই, এত অস্থির হচ্ছ কেন? ধৈর্য ধর। কথায় আছে না, সবুরে মেওয়া ফলে। আজ সন্ধ্যাতেই দেখতে পাবে কে সে। তবে এটুকু বলতে পারি, মোটাসোটা চেহারা, উঁচা লম্বায় জিমির চেয়ে দু' ইঞ্চি বেশী! সর্বদা কেতাদুরস্ত থাকে। আন্না, সে হলে আসামাত্রই তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব, কথা দিচ্ছি।

সে সন্ধ্যায় লবঙ্গলতা সমাজ ক্লাবে জিমি আর আন্না সবার আগেই হাজির হল। আন্নার চঞ্চল চোখের মনি দুটো বাঞ্ছিত সে যুবকটার খোঁজে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগল।

মিস টলে তার সঙ্গীকে নিয়ে সাড়ে আটটায় হলঘরে ঢুকল। আন্না তার বান্ধবীকে তার মোটাসোটা যুবক-প্রেমিকটিকে দেখতে পেল।

তাদের ঘরে ঢুকতে দেখেই আন্না গলা ছেড়ে বলে উঠল—'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! ম্যাগ জুতসই মাছটাকে ছিপে গাঁথতে পারে নি। মোটাসোটা যুবক হতে পারে। আর কেতাদুরস্ত? তার ভাব-ভঙ্গিমা একবারটি দেখই না।

জিমি তাকে পাত্তাই দিল না। সে বেশ একটু রাগত স্বরেই বলল—তোমার যা ইচ্ছা বল। মন চাইলে এর হাত ধরে নাচতেও পার। আমার জন্য ভাবতে হবে না। তার একার পক্ষে সবগুলো পথ আগলে দাঁড়ানো তো আর সম্ভব নয়।

জিমি, আশা করি আমি যা বলতে চাচ্ছি তা তোমার অজানা নয়। আমি কিন্তু ম্যাগির কাজে অত্যন্ত খুশি হয়েছি!

ম্যাগি তার মনের মানুষটার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বলল—আমার বন্ধু মিঃ টেরি ও' সুলভিন।' এবার সে বন্ধুকে নিয়ে ঘরময় চক্কর সেরে প্রতিটা লবঙ্গপাতা সমাজ ক্লাবের সভ্যদের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিল। তাকে এখন সুন্দরীই দেখাচ্ছে। তার প্রথম প্রেমিকার উপস্থিতিতে তার চোখ দুটো খুশিতে জ্বলজ্বল করছে।

রাইন্ডগোল্ড কাগজের বাক্সের কারখানার প্রতিটা নারী ও পুরুষ কর্মীর মুখে একই কথা, 'হায় ঈশ্বর! ম্যাগিও একজন সঙ্গী জুটিয়ে নিয়েছে।'

ম্যাগিকে সবাই পীড়াপীড়ি করতে লাগল তার প্রেমিকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য। দু'-দু'টা বছর মুখ ফিরিয়ে থাকার পর লবঙ্গপাতা সমাজ ক্লাবের সভ্যরা এবার তার মধ্যে যেন হঠাৎই আকর্ষণীয় কিছু একটা খুঁজে পেল। এবার থেকে তারা নাচের সঙ্গিনী হবার জন্য তাকে ডাকাডাকি করতে লাগল। সে সত্যি সত্যি তাদের চোখের মণি হয়ে উঠল।

ব্যস, দু'দিনেই ম্যাগি বিশেষ একজনে পরিণত হয়ে গেল। তবে সে সন্ধ্যার রাজ্য জয়ের সুযোগটা সহজেই টেরি ও' সুলভিন-এর হাতের মুঠোয় এসে গেল। একবার নয়, পর পর দু'বার ডেম্পসি ডোনেভান-এর সঙ্গিনীর সঙ্গে নাচল।

ডেম্পসি ডোনেভান ক্রীড়া সংস্থার নেতা। স্যুট-কোটে সজ্জিত। অমিত শক্তিধর। একটা লোহার দণ্ডকে অনায়াসেই সে এক হাতে ঠেকিয়ে ফেলতে পারে। তাকে গ্রেপ্তার করতে সাহসী হওয়া তো দূরের ব্যাপার, গুলি করে হাঁটু জখম করে দিলে বা মাথা ফাটিয়ে দিলে পুলিশ অফিসার এসে তার সঙ্গে রীতিমত নরম সুরেই বলে—বাছা ডেম্পসি, আমার ওপরওয়ালা তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান। তোমার হাতে যখন সময় থাকবে একবারটি তাঁর সঙ্গে দেখা করে এসো।

নাচের আসর জোর জমে উঠেছে। টেরি ও' সুলিভান নাচ থামিয়ে নীল পোশাকে সুসজ্জিত মেয়েটাকে ছেড়ে দিয়ে ম্যাগির খোঁজে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। হলের মাঝামাঝি তাকে দেখতে পেয়ে দু'পা এগিয়ে যেতেই ডেম্পসি তার পথ আগলে দাঁড়াল। সবাই বুঝল, দুই বীর যোদ্ধা পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছে। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে দান-প্রতিদান ক্রীড়া সংস্থার দু'-তিনজন সদস্য হাত গুটিয়ে তাদের দিকে ধেয়ে গেল।

মল্লযোদ্ধা দু'জনই সমান শক্তিধর। উভয়েই পেটা চেহারা। উভয়ের মুখেই পরস্পরের প্রতি

বিদ্বেষের সুস্পষ্ট ছাপ। তাদের মধ্যে কে বেশী শক্তিধর, দক্ষতার বিচারে শ্রেষ্ঠ, বলা মুশকিল। যোদ্ধা দু'জনের মধ্যে জীবিত থাকবে মাত্র একজন।

সুলিভান গর্জে উঠল—আমার বাড়ি গ্র্যান্ডে। আমাকে বাড়িতেই পেয়ে যাবে। তোমার ডেরা কোথায়, জানতে পারি কি?

তার কথায় কান না দিয়ে ডেম্পসিও একই স্বরে বলল—তোমার নাম সুলিভান। শোন, বড় মাইক বলছে, তোমাকে তো আগে কোনদিন দেখেনি। অবাক লাগছে—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ডেম্পসি পূর্বস্বর অনুসরণ করে গর্জে উঠল—দেখ, এ-জেলার সুলিভানরা পরস্পরকে চেনে। আর এটাই স্বাভাবিক। আমাদের একজন মহিলা-সভ্যকে সঙ্গে করে এখানে আসায় তুমি যথেষ্ট স্পর্ধার পরিচয় দিয়েছ। সাফ কথা শোন, আমি তার প্রতিশোধ নিতে চাই।

নিজের কথা ভাব। আত্মরক্ষার চিন্তা কর বন্ধু।

নিতান্তই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাকিয়ে ডেম্পসি ব্যঙ্গের স্বরে বলে উঠল—এবার বুঝতে পারলাম। আসলে সামান্য একটু গড়বড় হয়ে গিয়েছিল। তুমি ও' সুলিভানদের দলভুক্ত নও। আসলে তুমি একটা বাঁকা-লেজওয়ালা বানর।

তার কথায় সেন সুলভিনের মাথায় রক্ত উঠে গেল। সে ডেম্পসির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তৈরী হল। বিপক্ষের এক সাকরেদ এন্ডি জেওঘন খপ করে তার হাতটা চেপে ধরল।

ক্লাবের সম্পাদকও এন্ডি উইলিয়াম জ্যাকমোহনকে ইঙ্গিতে কি যেন বলল। ডেম্পসি বিদ্যুৎগতিতে হলের পিছন দিকের দরজার দিকে চলে গেল। দান-প্রতিদান ক্রীড়া সংস্থার আরও দু'জন সভ্য দ্রুত ছোট দলটার সঙ্গে ভিড়ে গেল। সুলিভান এবার রেফারী ও বোর্ড আইনকানুন প্রণয়নকারী ভদ্রলোকের হাতে গিয়ে পড়ল। তারা ফিসফিসিয়ে কি যেন বলে তাকেও পিছনের দরজা দিয়েই বাইরে নিয়ে গেল।

এবার লবঙ্গপাতা সমাজক্লাবের সভ্যদের এ বিশেষ কাজটা সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে বিবরণ দেওয়া দরকার হয়ে পড়েছে। হলঘরটার পিছনে সংস্থার একটা ভাড়া করা ছোট্ট ঘর রয়েছে। নাচ চলাকালীন যদি কোন সমস্যার, রেষারেষির সৃষ্টি হয় তবে সে দু'জন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেবে। তবে অস্ত্রের সাহায্যে অবশ্যই নয়, মল্লযুদ্ধ বা মুষ্টিযুদ্ধের মাধ্যমে। তবে এ-ও সত্য যে, লবঙ্গপাতা সমাজ ক্লাবের নাচের আসরে কোন মল্লযুদ্ধ দেখেছে এমন মন্তব্য কোন মহিলার পক্ষে জোর গলায় বলা সম্ভব নয়।

বোর্ড আর ডেম্পসির পারস্পরিক সহযোগিতায় প্রাথমিক কাজটা সহজেই সেরে ফেলল। হলঘরের কেউ ব্যাপারটা টেরই পায়নি। ম্যাগিও এসবের বিন্দু বিসর্গও বুঝতে পারেনি, সে ইতস্তত এদিক-ওদিক ঘাড় ঘুরিয়ে তার সঙ্গীর খোঁজ করতে লাগল।

আরে, তুমি কি কিছুই টের পাওনি? ম্যাগিকে লক্ষ্য করে রোজ ক্যাসিডি বলল—তোমার প্রেমিকের সঙ্গে ডোনোভান হুজ্জতি বাধিয়ে বসেছিল। তাই তারা সবাই তাকে নিয়ে লাসকাটা ঘরে নিয়ে গেছে। দেখা যাক, পরিণাম কি হয়।

—সে কী! লাসকাটা ঘরে? ডেম্পসির সঙ্গে লড়াই করতে গেছে? তাদের বাধা দাও, থামাও। তাকে ডেম্পসি কিছুতেই লড়াইয়ে হারাতে পারবে না। কী সর্বনেশে কাণ্ড ঘটতে চলেছে। সে তাকে খুন না করে ছাড়বে না যে!

এতে তোমার কি ক্ষতিবৃদ্ধি হতে পারে, বুঝছি না ত। প্রত্যেকটা নাচের আসরেই তো তারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, অস্বীকার করতে পার?

ম্যাগি অহেতুক আর কথা না বাড়িয়ে উদ্ভ্রান্তের মত ছুটতে ছুটতে হল থেকে বেরিয়ে পিছনের ছোট ঘরটার দরজায় হাজির হল। শরীরের সবটুকু শক্তি নিঙড়ে দরজায় অনবরত ধাক্কা দিতে লাগল। দরজাটা এক সময় হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের সামনে যে অভাবনীয় দৃশ্য ভেসে উঠল তা হচ্ছে—বোর্ড-সদস্যরা ঘড়ি-হাতে দাঁড়িয়ে। ডেম্পসি বীর মল্লযোদ্ধার ভঙ্গীতে শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ক্রোধোন্মত্ত বাঘের মত বার বার মাটিতে পা ঠুকে চলেছে। আর সুলিভান হাত দুটো মুঠো করে খুনীর দৃষ্টিতে প্রতিপক্ষের দিকে তাকিয়ে অনবরত

ফুসে চলেছে।

ম্যাগি ক্ষ্যাপা বাঘিনীর মত চিৎকার করে ডেম্পসির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার উদ্যত হাতটাকে সজোরে চেপে ধরল। এতে তার সর্বাঙ্গে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগায় তার জামার তলায় লুকিয়ে রাখা সুতীক্ষ্ণ ছুরিটা মেঝেতে পড়ে গেল।

ব্যাপার দেখে উপস্থিত সবার তো একেবারে চক্ষুস্থির। দান-প্রতিদান ক্রীড়া সংস্থার ঘরে ঝকঝকে চকচকে ছুরি! এরকম ঘটনা তো আগে কোনদিনই ঘটেনি। এ যে আশ্চর্য—একেবারেই অবিশ্বাস্য কাণ্ড। মিনিটখানেক সবাই হতভম্বের মত তাকিয়ে রইল। এন্ডি জিওঘান জুতোর ডগা দিয়ে ছুরির ফলাটাকে নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল।

পর মুহূর্তেই সুলিভান মুখে হিস্-হিস্ শব্দ করল। বোর্ড-এর সদস্যরা এবং ডেম্পসি দৃষ্টি বিনিময় করা মাত্র ড্যাম্পি রোষপূর্ণ দৃষ্টিতে ডোনোভান-এর মুখের দিকে তাকাল। মনে হল সে যেন একটা পাথরের প্রতিমূর্তির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। পর মুহূর্তে ইশারায় তাকে পিছনের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যাওয়ার জন্য বলল। আর এও বলল অন্য কেউ তার টুপিটাকে নিয়ে যাবে। টুপির জন্য যেন না ভাবে।

ম্যাগি ব্যস্ত পায়ে ডেম্পসির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তার দু'চোখে জল। তবে রীতিমত মানসিকতার দৃষ্টিতেই সে ডেম্পসির দিকে তাকাল। চোখের জল মুছতে মুছতে সে কান্নাভেজা চোখে বলল—ডেম্পসি, এমন পরিস্থিতির উদ্ভব যে ঘটবে আমি কিন্তু আগেই জানতাম। টনি স্পিনেলি তার নাম। তোমরা হাতাহাতি শুরু করতে চলেছ শুনেই আমি উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে এসেছি। সে গিনিয়ার মানুষ। যে দেশের মানুষ সর্বদাই ছুরি পকেটে নিয়ে ঘোরে। এবার চাপা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—আজ পর্যন্ত একটা মনের মত সঙ্গী জোটাতে পারিনি। রোজ রাত্রে জিমি আর আন্নার সঙ্গে আসা-যাওয়া করতে করতে আমি ক্লান্ত—হতাশ হয়ে পড়ি। তাই তাকে সঙ্গে নিয়ে আসি। তার সঙ্গে আমার সর্ত ছিল, নিজেকে সে ও' সুলিভান বলে পরিচয় দেবে। এখন নিঃসন্দেহ হচ্ছি, সে যদি 'ডাগো' নামে নিজের পরিচয় দিত তবে এরকম কোন হাঙ্গামা হুজ্জতিই হত না। বুঝতে পারছি, সংস্থা থেকে পদত্যাগ না করে আমার উপায় নেই।

ডেম্পসি এবার এন্ডি জিওঘান-এর দিকে ফিরে বলল—জানালা দিয়ে পনির কাটা ছুরিটা দিয়ে দাও। আর হলঘরের সবার কাছে ঘোষণা করে দাও, মিঃ ও' সুলিভানকে টেলিফোনে ডেকে পাঠানো হয়েছে। আর বলা হয়েছে সে যেন টাম্যানি হলে চলে যায়। এবার ম্যাগিকে লক্ষ্য করে বলল—ম্যাগি, আমি তোমার সঙ্গে বাড়িতে দেখা করব, ভেবে রেখেছি। আগামী শনিবারের ব্যাপারটা কেমন হবে বলে মনে করছ? আমি ডাকতে গেলে তুমি কি আমার সঙ্গে নাচের আসরে আসতে রাজি হবে?

মুহূর্তে ম্যাগির চোখের তারা দুটোতে হাসির ঝিলিক খেলে গেল। এক সময় আমতা আমতা করে সে বলল—ডেম্পসি, সঙ্গে যাওয়ার কথা বলছ? সে কি, হাঁস কি তবে সাঁতার কাটবে! বলছ কি, মাথায় ঢুকছে না ত?

দ্য গ্রীন ডোর

মনে করুন রাতের আহারাদি সেরে আপনি ব্রডওয়ে দিয়ে একটু হাঁটাহাঁটি করতে শুরু করবেন। সিগারেট পান করার জন্য দশটা মিনিট সময় পেলেন। বুঝেছি, আপনি হয়ত ধরেই নিয়েছেন, কোন বিয়োগান্ত নাটক দেখতে যাবেন। সেখানে যদি কেউ পিছন থেকে আচমকা আপনার কাঁধের ওপর হাত রাখে, ঘাড় ঘুরিয়েই দেখলেন, এক রূপসী যুবতী আপনার মুখের দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসছে। আপনাকে কোন কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই আপনার একটা মাখন মাখানো পাউরুটির টুকরো গুঁজে দিল। পর মুহূর্তেই ছোট্ট একটা কাঁচি দিয়ে আপনার কোটের দ্বিতীয় বোতামটা কেটে দিল। তার পরই প্রায় অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করল—সমান্তরাল ক্ষেত্র। ব্যাস, এবার সে লম্বা-লম্বা পায়ে রাস্তা পার হতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভয়ার্ত দৃষ্টি মেলে তোমার দিকে

মুহূর্তের জন্য তাকিয়েই আবার হাঁটতে শুরু করল।

কি? কি ব্যাপার? তার আহ্বানে কি আপনি সাড়া দেবেন? না, আপনার দ্বারা তা সম্ভব নয়। দুরু-দুরু বুকে আপনি দ্রুত ব্রডওয়ে ধরে হাঁটা জুড়বেন। আতঙ্কে মুষড়ে পড়ে আপনি হাতের রুটিটা ছুঁড়ে ফেলে দেবেন, উদ্ভ্রান্তের মত হাঁটতে হাঁটতেই খোয়া যাওয়া বোতামটার খোঁজে কোটটাকে হাতড়াতে শুরু করবেন। আপনার মনে যদি বিন্দুমাত্রও অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়তা না থাকে তবে আপনি এরকম আচরণ যে করবেন এতে কোন সন্দেহের অবকাশই নেই।

পৃথিবীতে প্রকৃত দুঃসাহসীর সংখ্যা খুবই নগন্য। মানুষ নিজনিজ ধান্দায় ছুটে বেড়ায়। আর উদ্দেশ্যহীনভাবে ছুটোছুটি করে সত্যিকারের দুঃসাহসীরাই। তাদের লক্ষ্য একটাই অজানা অদৃষ্টকে খুঁজে বেড়ানো। বাইবেলে অসম সাহসী ছেলেটার কথা উল্লেখ আছে, সে যখন বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য যাত্রা করেছিল—এর যথার্থ উদাহরণ।

আর তারাই সংখ্যায় বেশী যারা আধা-সাহসী বলে পরিচিত সৎ চরিত্রের ধারক। অনেকে জীবনে উপন্যাস, ইতিকথা সমৃদ্ধ বই আর ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করে ব্যবসার পথ সুগম করে নিয়েছেন। তাদের প্রত্যেকেরই লক্ষ্য স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করা, পুরস্কার জয় করা আর নিজের নামকে অমর করে তোলা। তাই বলতেই হয়, তাঁরা কেউই দুঃসাহসী ছিলেন না। তবে প্রেমিকার খোঁজে, মেকি প্রেমের ফাঁদ পেতে মেয়ে মানুষদের ধরতে যারা ছোঁক-ছোঁক করে তারা সহজেই সাফল্য লাভ করে। পথ চলতে-চলতে আমাদের দিকে লালসা মাখানো দৃষ্টিতে তারা লাজুক চোখে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকে, কতই না ছদ্মবেশ ধারণ করে তারা আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়। জানলা দিয়ে বাইরের রাজপথের দিকে দৃষ্টিপাত করলে অন্তরঙ্গ মুখ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আমাদের পরিচিত ঘরের পরিবর্তে মোটরগাড়ির চালক আমাদের অপরিচিত কোন এক ঘরের দরজায় হাজির করে। অপরিচিত একটা মুখ ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে সমাজের সাদর অভ্যর্থনা জানায়, কিছু অজানা-অচেনা চোখের সঙ্গে আমাদের দৃষ্টি বিনিময় হয়। মনে আতঙ্ক, ঘৃণা, অনুরাগ আর অনুকম্পার অনুভূতির সঞ্চার ঘটে।

আচমকা বৃষ্টি নামলে আমাদের ছাতার তলায় এসে আশ্রয় নেয় কোন স্বর্গের অপ্সরা, কোন বৃহৎ কারবারী প্রতিষ্ঠানে বা কোন শিল্পপতির আদরের দুলালী আর মোড়ে মোড়ে গাড়ির ভেতরে উড়ে এসে পড়ে হরেক রঙের কতসব রুমাল। আবার কতই না আঙুল আমাদের ইঙ্গিতে ডাকাডাকি করে, কত মায়া-কাজল মাখানো চোখ আমাদের বন্দী করে ফেলে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, আমাদের মধ্যে ক'জন ভাগ্যবানই বা সেসব সূত্রকে হাতের মুঠোর মধ্যে ফিরে পেতে সক্ষম হয়? আর ক'জনই বা সে সূত্রকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করে কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে! আমাদের মন মেজাজ মর্জি গতানুগতিকের বোঝা বহন করে করে শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেছে। সহজ-সরল-স্বাভাবিক পথ-বেয়ে এগিয়ে যেতে যেতে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ি, দীর্ঘ একঘেয়ে জীবন কাটানোর পর আমরা হিসাব-নিকাশ কষতে শুরু করি আমাদের প্রেম-ভালবাসা আর রঙীন চিন্তা ভাবনার শেষ পরিণতি তো একটা বা দুটো বিয়ের পিঁড়িতে বসা, আলমারির খোপে রাখা নকল সার্টিনের গোলাপ ফুল ও জীবনভর মন কষাকষি আর কোন্দলের মধ্য দিয়ে চিরদিনের মত ফুরিয়ে যাওয়া।

সত্যি, স্বীকার করতেই হবে, রুডলফ স্টিনার যথার্থ-ই একজন দুঃসাহসী যুবক। প্রতিদিন সন্ধ্যা হলেই সে অভাবনীয় ও উদ্ভট কিছু একটার তল্লাশে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। পথের একটা বাঁক পেরোলেই কোন রহস্য ঘাপ্‌টি মেরে আছে সেটা জানাই ছিল তার একমাত্র লক্ষ্য। ভাগ্যের সন্ধানে পথ চলতে বেরোলে এগিয়ে যাওয়ার এ প্রেরণা তাকে অত্যাশ্চর্য সব জায়গায় হাজির করে। দু'-দু'বার তাকে পুলিশের হাজতে সারারাত্রি মশা তাড়াতে হয়েছে। চোর জুয়াচোরদের পাল্লায়ও পড়তে হয়েছে কয়েকবারই। এ লোভের শিকার হয়ে তাকে বহুবার টাকা পয়সা, ঘড়ি প্রভৃতি খোয়াতে হয়েছে। তা সত্ত্বেও নতুন উৎসাহ ও উদ্যম নিয়ে তাকে এ পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত হন্যে হয়ে ছুটোছুটি করে বেড়াতে হয়েছে।

একদিন সবে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। রুডলফ শহরের জন কোলাহলমুখর পথ ধরে অন্যমনস্কভাবে হেঁটে চলেছে। তবে মনে তার খুশির আমেজ। সে দিনের বেলায় এক পিয়ানো মেরামতের কাজ করে। একবার এক সাময়িক পত্রের সম্পাদকের কাছে সে চিঠি লিখে জানিয়েছিল,

মিস লিবে-র লেখা 'জুনির প্রেমের পরীক্ষা' নামক বইটাই তার জীবনের ওপর সবচেয়ে বেশী করে প্রভাব বিস্তার করে।

পথ পাড়ি দিতে দিতে হঠাৎ একটা রেস্তোরাঁর দিকে তার চোখ পড়ল। তার সামনেই এক দাঁতের ডাক্তারের বিজ্ঞাপন রক্ষিত আছে। বৈদ্যুতিক আলোয় তার অক্ষরগুল্যো লেখা। বিচিত্র পোশাকে সজ্জিত এক বিশালদেহী নিগ্রো আগ্রহী পথিকদের মধ্যে কার্ড বিতরণ করছে। দাঁতের ডাক্তারদের এরকম কার্ড বিলির দৃশ্য রুডলফ এর আগে বহু জায়গায়, বহুবার দেখেছে। অন্যদিন কারো কার্ড নেয় নি। আজ নিল।

পথ চলতে চলতে এক সময় সে অন্যমনস্কভাবে হাতের কার্ডটার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। চোখের তারায় বিস্ময়ের ছাপ এঁকে বার বার উল্টে পাল্টে কার্ডটাকে দেখতে লাগল। এর বিপরীত দিকটা ফাঁকা, কিছুই লেখা নেই। অন্যদিকে লেখা রয়েছে—'এ গ্রীন উইনডো।'

পথের দিকে দৃষ্টিপাত করতেই দেখতে পেল, এক পথচারী হাতের কার্ডটাকে বিতৃষ্ণার সঙ্গে ছুঁড়ে ফেলে দিল। রুডলফ উপুড় হয়ে সেটাকে তুলে হাতে নিল। তার গায়ে দাঁতের ডাক্তারের নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানা লেখা রয়েছে। আর সে সঙ্গে ব্যথাহীন অস্ত্রোপচারের প্রতিশ্রুতি আর দাঁতের চিকিৎসার ব্যাপারে সাধারণ কিছু কথাবার্তাও লিখে দেওয়া হয়েছে।

পিয়ানোবাদক দুঃসাহসী যুবকটা হাঁটতে হাঁটতে আরও কিছুটা অগ্রসর হয়ে এক সময় পথচারীদের ভিড়ে মিশে গেল।

দৈত্যাকৃতি ও বিচিত্র পোশাকধারী নিগ্রোটার পাশ দিয়ে যাবার সময় রুডলফ তার দিকে ফিরেও তাকাল না। আবার এমন অন্যমনস্কতার ভান করে তার হাত থেকে কার্ডটা নিল যাতে সে-ও তাকে দেখতে না পায়।

আড়ালে গিয়ে কার্ডটার দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল, প্রথম কার্ডটার মতই হস্তাক্ষর। এতে আগের কার্ডটার মতই লেখা রয়েছে 'এ গ্রীন উইনডো'।

একটু বাদেই সে লক্ষ্য করল, আরও তিন-চারটে কার্ড পথের ওপর এক-এক করে পড়ল। সবগুলোরই ফাঁকা দিকটা ওপরে পড়ল। রুডলফ হাতে তুলে নিয়ে দেখল, সবগুলোর গায়েই। 'এ গ্রীন উইন্‌ডো' কথাটা লেখা। আর অন্যান্য লেখাগুলোও একই।

অসম সাহসিকতার পরিচয় দিতে হবে এমন কোন কাজ করার কথা রুডলফ'কে একবারের বেশী দু'বার বলতে হয় না। কিন্তু সে কাজটা সে দু'বারই করল। আর তারপরও কাজটা থামাল না।

রুডলফ এক পা-দু'পা করে এগিয়ে দাঁতের ডাক্তারখানার সামনে কার্ড বিলি করতে ব্যস্ত অতিকায় নিগ্রোটার কাছে চলে গেল। এবার আর তার কাছ থেকে কোন কার্ড পেল না। তবে ইথিওপিয়ান অধিবাসীটা বিদঘুটে পোশাক গায়ে চাপিয়ে অসভ্যের মত ভাব নিয়ে পথচারীদের হাতে কার্ড তুলে দিয়ে চলেছে। আর আধ মিনিট পর পর সে নীরস কণ্ঠে দুর্বোধ্য কথা আওড়াতে লাগল। এবার সে রুডলফ'কে কোন কার্ড তো দিলই না উপরন্তু তার চোখ ও অতিকায় মুখে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ পেতে লাগল। তার অসহনীয় দৃষ্টি রুডলফ-এর গায়ে যেন কাঁটার মত ঘা মারতে লাগল। তবে এ-ও সত্য যে, কার্ডের গায়ে লেখা রহস্যময় কথার অর্থ যা-ই হোক দৈত্যাকৃতি নিগ্রোটা তাকে কার্ড দেওয়ার যোগ্য ভেবেছিল বলেই তো দু'-দু'বার তার হাতে কার্ড তুলে দিয়েছিল। তার মুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছে, কার্ডের বক্তব্যের অর্থ বোঝার মত জ্ঞান-বুদ্ধি বা মানসিকতা কোনটাই রুডলফ-এর নেই। সে কথাই হয়ত বা সে বিড় বিড় করে বলছে।

ভিড়ভাট্টা থেকে সামান্য সরে গিয়ে রুডলফ বাড়িটার ওপর মুহূর্তের জন্য চোখ বুলিয়ে নিয়ে সেটা সম্পর্কে মনে মনে কিছু ধারণা নিয়ে নিল। সে বুঝে নিল, এ-বাড়িটার কোথাও না কোথাও লুকিয়ে রয়েছে তার দুঃসাহসিক কাজের প্রকৃত লক্ষ্য বস্তুটা। পাঁচতলা বাড়িটার একতলা সিঁড়ির গায়ে একটা জমজমাট রেস্তোরাঁ রয়েছে।

রেস্তোরাঁ ছাড়া একতলার ঘরগুলো বন্ধ। রুডলফ অনুমান করল, সেখানে মেয়েদের সাজগোজের সরঞ্জাম বা লোম রক্ষিত আছে। বৈদ্যুতিক আলোই বলে দিচ্ছে দোতলাটা দাঁতের ডাক্তারখানা হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। তার ওপরতলায় বিভিন্ন ভাষার এমন সব বিজ্ঞাপন নজরে

পড়ছে যা থেকে সহজেই ধরে নেওয়া যায় সেখানে হস্তরেখাবিদ গনৎকারদের ভিড়। আর রয়েছে কিছু সংখ্যক ডাক্তার, কয়েকটা পোশাক-আশাক তৈরীর দর্জি আর বাদ্যকরের দল। আরও ওপরতলায় জানালার পর্দা, আর জানালার গায়ে রাখা দুধের বোতল ও অন্যান্য দু'-চার রকম খুঁটিনাটি জিনিসপত্র জানান দিচ্ছে সেখানে সংসারী জীবরা মাথা গুঁজে বসবাস করছে।

কোনরকম দ্বিধা না করেই রুডলফ সদর দরজা দিয়ে সোজা বাড়িটার ভেতর ঢুকে গেল। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বাঁকের মুখে কয়েক সেকেন্ডের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। হলঘরটার দিকে তাকিয়ে দেখল, মিটমিট করে দুটো গ্যাসের আলো জ্বলছে। আর দেখল, কাছের আলোটার কাছাকাছি একটা সবুজ দরজা-বন্ধ। পরমুহূর্তেই সামান্য এগিয়ে গিয়ে বন্ধ-দরজার পাল্লায় করাঘাত করল। ভেতর থেকে কারো কণ্ঠস্বর ভেসে আসার আগে যে মুহূর্ত ক'টা সে অপেক্ষা করল তা বাস্তবিকই দুঃসাহসিক অভিযানের ইঙ্গিত দিতে লাগল। তার মাথায় ভাবনার উদয় হ'ল। ঘরটার ভেতরে, সবুজ দরজাটার আড়ালে হয়ত কত অজানা কাজ ঘটে চলেছে—ধূর্ত শয়তানের দল ফাঁদ পাতার পরিকল্পনা করছে, তাসের জুয়ার আড্ডা চলেছে, কোন রূপসী তন্বী যুবতীকে উপভোগের মাধ্যমে প্রেম-প্রেম খেলা চলেছে, নইলে হতাশা, হাহাকার, মৃত্যুলীলা প্রভৃতি বিপজ্জনক কাজ বা হাস্যকর কোন ঘটনাও ঘটা অস্বাভাবিক নয়। দরজার গায়ে আরও দু'-চারবার করাঘাত করতেই ঘরের দরজাটা খুলে গেল। এক যুবতী দরজায় দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল। চকের মত ফ্যাকাসে তার মুখ। বয়স কুড়ির কাছাকাছি। রুডলফ লক্ষ্য করল, যুবতীটা বুঝি কাঁপতে কাঁপতে পড়েই যাবে। সে হাত বাড়িয়ে মেয়েটাকে ধরে ফেলল। ঘরে নিয়ে গিয়ে সোফার ওপর শুইয়ে দিল। গ্যাসের আলোয় ঘরের ভেতরের সর্বত্র চোখের মণি দুটোকে বুলিয়ে নিল। সব কিছু সাজানো গোছানো আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নই বটে। তবে যুবতীটার চোখ মুখ-আর পোশাক-আশাক চরম দ্রারিদ্রের ছাপটুকুর প্রতি তার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হ'ল।

সোফার ওপর শরীর এলিয়ে দিয়ে নির্বাক নিস্পন্দভাবে যুবতীটা পড়ে রইল। হয়ত সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছে। খোঁজাখুঁজি করে একটা পিপে বের করে তাকে সেটার ওপর শুইয়ে দিয়ে, সেটার ওপর চেপে ধরে শরীরের সবটুকু শক্তি নিঙড়ে ঘোরাতে লাগল। পর মুহূর্তেই ভাবল, এ ব্যবস্থা জলে-ডোবা রোগীদের পেট থেকে জল বের করার জন্য। হঠাৎ কর্তব্য স্থির করতে না পেরে সে নিজের টুপিটা খুলে তাকে হাওয়া করতে লাগল। টুপির গায়ে আঁটা পাখার একটা ডগা তার নাকে ঢুকে যাওয়ায় সে বার দু'-তিন হাঁচি দিল। এবার যুবতীটা ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাল। রুডলফ যেন তার মুখে সে মেয়েটিরই প্রতিচ্ছবি প্রত্যক্ষ করল। যাকে এতকাল মনের আয়নায় ধরে রাখা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। সেই চোখ মুখ নাক অবিকল সে মুখটাই যেন তার দেহে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে বড়ই শীর্ণ, ফ্যাকাসে ও করুণ এ মুখ। সে ভাবল এতদিনে তার দুঃসাহসিক অ্যাডভেঞ্চারের নির্ভুল ঠিকানার সন্ধান পেল।

নিষ্পলক আর শান্ত স্বাভাবিক দৃষ্টি মেলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে যুবতীটি ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলল। এক সময় ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারণ করল—'আমি কি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিলাম? এর আর দোষ কি বলুন, তিন তিনটে দিন আমার পেটে দানাপানি পড়েনি। আমার অবস্থায় পড়লে মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করতে পারবেন।

রুডলফ যন্ত্রচালিতের মত তড়াক্ করে লাফিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এখানেই থেকো।

মিনিট কুড়ি বাদে রুডলফ ফিরে এল। হাতে তার বড়সড় একটা খাবারের পোটলা। এক তলার রেস্তোরাঁ থেকে নিয়ে এসেছে।

ব্যস্ত হাতে পোটলাটা খুলে খাবারগুলো সাজাতে সাজাতে রুডলফ বেশ রাগতস্বরেই বলল—। 'হিমেল, উপোষ করে থাকাটা তোমার একটা হাস্যকর অভ্যাস। তোমাকে এটা ছাড়তেই হবে বলে রাখছি। কথা বলতে বলতে তাকে সোফা থেকে তুলে টেবিলের সামনের চেয়ারটায় বসিয়ে দিল। বলল, তোমার সম্মতি পেলে রাতের খাবারটা তোমার সঙ্গেই সেরে নিতে পারি। সে ঘাড় কাৎ করল।

মুহূর্তমাত্র দেরী না করে যুবতীটা সাধ্যমত তাড়াতাড়ি খাবারগুলোর সদ্ব্যবহার করতে লাগল।

রুডলফও নিজের প্লেটে হাত দিল।

রুডলফ এবার জানালার গায়ের তাক থেকে দুটো কাপ নিয়ে এসে চা ঢালল। একটা কাপ হিমেল-এর দিকে বাড়িয়ে দিল আর অন্যটা তুলে নিল নিজের হাতে। পাকস্থলিতে গরম চা পড়ায় হিমেল-এর চোখ মুখ যেন ক্রমে উজ্জ্বল—স্বাভাবিক হয়ে উঠতে লাগল।

কিছুটা স্বাভাবিকতা ফিরে পাওয়ায় যুবতী হিমেল-এর মধ্যে দায়িত্ববোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। সবচেয়ে বড় কথা, রুডলফ-এর কাছ থেকে পাওয়া মমত্ববোধটুকুর প্রতি শ্রদ্ধাবশত সে মানবিক আচরণ করার মানসিকতা পেয়েছে।

খাবার টেবিল থেকে উঠে যুবতী হিমেল দুর্বল পায়ে সোফাটায় ফিরে গেল। এবার ধীরে ধীরে নিজের জীবনের করুণ কাহিনী রুডলফ-এর কাছে তুলে ধরতে গিয়ে যা বলল তাকে মহিলা-কর্মীর সামান্য বেতনের কাহিনীও বলা যেতে পারে। তার ওপর অন্য দশটা মহিলা-কর্মীর মতই 'খেসারত'-এর অজুহাতে বেতন কাটা যাওয়ায় মাসের শেষের প্রাপ্যের পরিমাণও অনেক কমে যায়। শুধু কি এ-ই? রোগ-ব্যাধি, চাকরি থেকে বরখাস্ত, হতাশা তো আছেই। আর? আছে অসম সাহসী যুবকটার দরজায় করাঘাত।

যুবতীটার মুখ থেকে তার জীবনের বেদনাঝরা কাহিনী শোনার পর রুডলফ-এর মনের কোণে উঁকি দিল 'ইলিয়াড'-এর মতই বৃহত্তর বা 'জুনির ভালবাসার পরীক্ষা'-র মতই করুণ, হৃদয় বিদারক।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রুডলফ বলল, তোমাকে এমন মর্মান্তিক পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়েছে, ভাবলেও মনটা বিষিয়ে ওঠে। শহরে তোমার কোন আত্মীয় বন্ধু নেই, তাই না?

যুবতীটা নিঃসঙ্কোচে জবাব দিল, 'না। নেই বলতে কেউ-ই নেই।'

আগের মত দীর্ঘশ্বাস ফেলে রুডলফ বলল 'পৃথিবীতে আমিও নিঃসঙ্গ, একেবারেই একা।'

যুবক রুডলফ-ও তারই মত নিঃসঙ্গ শুনে যুবতীটার মনের গভীরে খুশির ঝিলিক খেলে গেল। বলল, 'আমারই মতই তুমিও অভাগা জানতে পেরে খুশি হলাম।' রুডলফও তার মনোভাব জানতে পেরে কম খুশি হ'ল না।

কথা বলতে বলতে মেয়েটার চোখের পাতা ঘুমে জড়িয়ে আসতে লাগল। বলল 'তোমাকে কাছে পেয়ে কী যে ভাল লাগছে ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না।'

রুডলফ মুচকি হাসল। চেয়ার ছেড়ে উঠে টুপিটা মাথায় পরতে পরতে বলল—'আজ তবে আমি আসি। রাত্রে ভাল ঘুম হলে একটু স্বস্তি পাবে, স্বাভাবিকতা ফিরে পাবে।

যুবতীটা কাঁপা কাঁপা হাত দুটে দিয়ে তার একটা হাত জড়িয়ে ধরে বলল 'শুভরাত্রি।' কয়েক সেকেন্ড নীরব থেকে সে আবার মুখ খুলল, একটা কথা জানতে বড্ড ইচ্ছে করছে। বাড়িটাতে এতগুলো দরজা থাকতে তুমি আমার দরজায় করাঘাত করলে কেন, বলবে কি?'

দৈত্যাকৃতি নিগ্রোর দেওয়া কার্ডটার কথা মনের কোণে উঁকি দিতেই মুহূর্তে তার বুকের মধ্যে একটা অনির্বচনীয় ঈর্ষাকাতর যন্ত্রণা উপলব্ধি করল। কার্ড দুটো যদি তারই মত অন্য কোন অসম সাহসী যুবকের হাতে পড়ে, তবে? তবে কি হতে পারত? সে মুহূর্তেই সে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল, আসল সত্যটাকে সে চিরদিনই বুকের ভেতরে চেপে রাখবে, কোন দিনই প্রকাশ করবে না। যুবতীটা কোনদিন ঘুণাক্ষরেও টের পাবে না, সে নিজেও একই রকম দুরবস্থার সঙ্গে মোকাবিলা করেছিল।

রুডলফ সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি খরচ করে বলল, দেখ, এক পিয়ানো বাদক ও সুরকার এ বাড়িতেই থাকে। তালগোল পাকিয়ে ফেলায় ভুল করে তোমার দরজাতেই করাঘাত করে বসি।'

সবুজ দরজাটা বন্ধ হওয়ার আগেই রুডলফ শেষমেশ এ দৃশ্যটা চাক্ষুষ করেছিল।

রুডলফ এবার বাড়িটার সব ক'টা তলার সব ক'টা ঘর এক-এক করে দেখতে লাগল। যতই দেখছে সে ততই বিস্ময়বোধ করতে লাগল। বাড়িটার সব ক'টা ঘরের দরজাতেই গাঢ় সবুজ রঙের প্রলেপ দেওয়া।

বাড়িটা থেকে বেরিয়ে দৈত্যাকৃতি নিগ্রোটার কাছে গিয়ে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কোনরকম ভূমিকা না করেই সে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'শোন, তুমি যে আমাকে পরপর দুটো কার্ড দিয়েছিলে, এর কারণ কি? এর অর্থই বা কি, বলবে কি?

নিগ্রোটা সরবে হেঁসে তার মালিকের কারবারের একটা বিজ্ঞাপন দেখাল। তারপর পথের দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, ওই দিকে তাকান। তবে দেরী করে ফেলায় প্রথম অংশটা শেষ হয়ে গেছে, আপনি বাদ পড়ে গেছেন।

রুডলফ দেখল, একটা থিয়েটারের সদর-দরজার মাথায় অত্যুজ্জ্বল আলো দিয়ে লেখা রয়েছে 'এ গ্রীন উইন্ডো'। তাদের পরিচালিত নতুন নাটক।

এবার রুডলফ-এর দৃষ্টি নিজের দিকে ফিরিয়ে নিতে গিয়ে নিগ্রোটা বলল, এই যে স্যার, সবার মুখে একই কথা নাটকটা জমজমাট—খুবই ভাল। তাদের এজেন্ট আমার হাতে একটা ডলার গুঁজে দিয়ে দায়িত্ব দিয়েছিল দাঁতের ডাক্তারের কার্ডের সঙ্গে তাদের কিছু কার্ডও যেন বিলি করে দেই। স্যার, ডাক্তারের একটা কার্ড দেব কি?'

রুডলফ নিজের ব্লকের মাথাগোঁজার জায়গার কাছাকাছি গিয়ে একটা দোকান থেকে এক গ্লাস বিয়ার গলায় ঢেলে নিল। অন্য একটা দোকান থেকে একটা চুরুট নিয়ে তাতে অগ্নি সংযোগ করল। কোট ও মাথার টুপিটাকে গোছগাছ করতে করতে সামান্য এগিয়ে গেল। একটা লাইট পোস্টের গায়ে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। পোস্টটাকে উদ্দেশ্য করে বেশ গলা ছেড়েই বলল, আমার বরাতই আমাকে পথ দেখিয়ে যুবতীটার কাছে পৌঁছে দিয়েছিল।'

ব্যাপারটা যেদিকে, যেভাবে শেষ হয়েছে তাতে করে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় যে, রুডলফ প্রেম-ভালবাসা আর অসম সাহসিকতার প্রথম শ্রেণীর একজন ভক্ত। প্রিয় পাঠক-পাঠিকারাও হয়ত আমার মন্তব্যকে অকপটে স্বীকার করে নেবেন।

দ্য কপ অ্যান্ড দ্য অ্যান্থেম্

ম্যাডিসন স্কোয়ারের পার্কের এক বেঞ্চের ওপর শুয়ে সোপি নিদারুণ অস্বস্তিতে পাশ ফিরল। বুনো হাঁস গভীর রাত্রে যখন প্যাক্-প্যাক্ করে ডাকাডাকি জুড়ে দেয়, নারীরা যখন স্বামী দেবতার প্রতি বেশী মাত্রায় সদয় হয়ে পড়ে এবং পার্কের বেঞ্চে শুয়ে থাকা সোপি যখন অস্বস্তিতে পাশ ফিরে শোয়, তখন অবশ্যই মনে করা যেতে পারে যে শীত দরজায় টোকা মারছে।

বাতাসে ভাসতে ভাসতে একটা বোঁটা-খসা পাতা এসে সোপি-র কোলে পড়ল। এটাকে শীত-বুড়োর আগমনবার্তা নির্দেশিত কার্ড মনে করা যেতে পারে।

—ম্যাডিসন স্কোয়ারের স্থায়ী অধিবাসীদের প্রতি শীত বুড়ো বড়ই সদয়, শীতের আগমনবার্তা আগে থাকতেই তাদের কাছে পৌঁছে দেয়। তার বার্তা পেয়েই তো প্রাসাদোপম বাড়িগুলোর বাসিন্দারা শীতের সঙ্গে মোকাবিলার জন্য তৈরী হওয়ার সময় সুযোগ পায়।

সোপিও শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল শীত এসে পড়ল বলে। শীতকে ঠেকাবার জন্য তাকেও তৈরী হতে হবে। সে জন্যই তো সে চোখে মুখে বিরক্তির ছাপ এঁকে বেঞ্চটার ওপর পাশ ফিরে শুলো।

শীত কাটানোর জন্য সোপি-র আশা অবশ্যই আকাশ ছোঁয়া নয়। তার একমাত্র আকাঙ্খা শীতের তিনটে মাস দ্বীপে কাটাবে। ব্যস, এ-ই যথেষ্ট। তিনমাসের জন্য মনের মত একজন সঙ্গী, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হলেই সে খুশি।

ব্ল্যাকওয়েলদের বাড়িতেই সে বছরের পর বছর শীতের ক'মাসের জন্য আশ্রয় পেয়ে আসছে।

নিউ ইয়র্কের ঈশ্বরের বরপুত্ররা শীতকালটা কাটাবার জন্য রেভিয়ার আর পাম বীচে যাবার জন্য তৈরী হয়, সোপিও কিন্তু শীত কাটাতে দ্বীপটাতে যাবার জন্য যা ব্যবস্থাদি করে তা খুবই সাধারণ।

সোপি ভাবল, সে সময় আগত প্রায়। গত রাত্রে সে কোটের তলায় রবিবারের সংবাদপত্রের তিনটে পাতা গুঁজে, গোড়ালি পর্যন্ত ঢেকে নিয়ে আর কোলের ওপর বিছিয়ে নিয়ে ঝর্ণার কাছাকাছি বেঞ্চের ওপর শুয়ে ঘুমে বিভোর হয়ে পড়লেও কনকনে শীতকে ঠেকাবার সাধ্য তার হয়নি। তাই তো দ্বীপটাই তার কাছে বিশেষ গুরুত্ব পেল। শহরের দাতব্য ব্যবস্থাগুলোকে সে বড়ই ঘৃণার চোখে

দেখে। পৌরসভা পরিচালিত বহু দাতব্য ব্যবস্থা করা হয় যাদের ওপর তাদের ভরসা করে সে বেরিয়ে পড়তে পারত। আর সাধারণ জীবন যাপনও করতে পারত। থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাও হয়ে যেত। কিন্তু সোপি-র মত আত্মম্ভরী কারো পক্ষে কারো কাছ থেকে কোন রকম করুণা গ্রহণ কিছুতেই সম্ভব নয়। এতে অসম্মানের বোঝা কাঁধে নেওয়া ছাড়া কিছুই নয়। সিজার যেমন ব্রুটাসকে পেয়েছিল ঠিক তেমনি প্রত্যেক দান শয্যার জন্য দাম দিতে হয়, প্রতিটি রুটির জন্য ব্যক্তিগত গোপন খোঁজ খবরের ব্যবস্থা তো আছেই আছে। এসব কথা বিবেচনা করে সোপি আইনসম্মত অতিথি হওয়ারই পক্ষপাতি। এক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

সোপি দ্বীপে যাওয়ার জন্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ামাত্র বাসনা চরিতার্থ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বহুভাবেই সেটা করা সম্ভব হ'ত বটে। কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যবস্থা হ'ল কোন নামজাদা রেস্তোরাঁয় দামী দামী খাবার খেয়ে নিজেকে কপর্দকহীন ঘোষণা করে নির্বিবাদে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করা। পরবর্তী যা কিছু করণীয় সবই কোন হিতাকাঙ্খী ম্যাজিস্ট্রেটই সম্পন্ন করে দেবেন।

পার্কের বেঞ্চ থেকে উঠে সোপি হাঁটতে হাঁটতে পঞ্চম এভিনিউ আর ব্রডওয়ের মিলনস্থলে হাজির হল। ব্রডওয়ের দিকে কয়েক পা এগিয়ে একটা রেস্তোরাঁর সামনে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। পোশাক আশাকে সে রীতিমত কেতাদুরস্ত। ভাবল, ভেতরে ঢুকে কোনক্রমে টেবিল পর্যন্ত যেতে পারলে আর তার নাগাল কে পায়। সাফল্য হাতের মুঠোয় আসবেই আসবে।

রেস্তোরাঁর সদর দরজা ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকতে না ঢুকতেই সোপি-র সূতো উঠে-যাওয়া ট্রাউজার আর সাবেক আমলের জুতোটার দিকে প্রধান খানসামার দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'ল। হঠাৎ কয়েক জোড়া হাত ঠেলে তাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে একেবারে গলিটা পর্যন্ত গিয়ে ছেড়ে দিয়ে এল।

অনন্যোপায় হয়ে সে আবার ব্রডওয়ের দিকে হাঁটা জুড়ল। ভাবল, তার বাঞ্ছিত দ্বীপের পথটা তেমন সুখকর হবে না। নরকগামী অন্যপথ অবলম্বন করা হবে।

সোপি হাঁটতে হাঁটতে ষষ্ঠ এভিনিউতে পৌঁছাল। সেখানে সুসজ্জিত একটা দোকানের কাঁচের জানালাকে লক্ষ্য করে দড়াম্ করে একটা পাথর ছুঁড়ে মারল। পুলিশ ছুটে এল। সে কোটের পকেটে হাত দুটো ঢুকিয়ে মিটমিট করে হাসতে লাগল। চারদিকে লোক জমতে আরম্ভ করল।

প্রবীণ পুলিশ অফিসার গর্জে উঠল—'এটা কার কাজ?'

সোপি যেন বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছে এরকম ভাব করে রসিকতার স্বরে বলল, 'আপনি কি বুঝতে পারছেন না, এতে আমার কিছুটা ভূমিকা থাকতে পারে?

পুলিশ অফিসারটি তার কথা শুনেও নিঃসন্দেহ হতে পারল ন। কারণ, তার পূর্ব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল, এসব কাজ যারা করে তারা কাজ হাসিল করেই চম্পট দেয়। ঠিক সে মুহূর্তেই একজনকে গাড়ী ধরার জন্য ছুটতে দেখেই পুলিশ অফিসারটি ভিড় ঠেলে তাকে ধাওয়া করল। পর পর দু'বার ব্যর্থ হওয়ায় সোপি-র মনে হতাশা ও বিরক্তির সঞ্চার হ'ল। সে চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার হাঁটা জুড়ল।

আরও সামান্য এগিয়ে সোপি একটা বাঁকের মুখে যেতেই একটা নিম্নমানের, খুবই সাধারণ একটা রেস্তোরাঁর সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। এখানে নিচুতলার মানুষের আনাগোনা। তাই ছেঁড়া ট্রাউজার ও ছেঁড়া জুতো পরে ভেতরে ঢুকতে সে এতটুকুও ইতস্ততঃ করল না। কেউ-ই তার পথ আগলে দাঁড়াল না। একটা নড়বড়ে টেবিলে বসে সাধারণ খাবার দাবারই সে পেট পুরে খেল। হাত মুছতে মুছতে প্রধান খানসামাকে সাফ কথা জানিয়ে দিল, সামান্যতম মুদ্রার সঙ্গেও তার পরিচয় নেই। পকেট একেবারেই ফাঁকা।

প্রধান খানসামা মুখ খোলার আগেই সে আবার বলতে শুরু করল, 'বাপু, তোমরা যেন একজন ভদ্রলোককে বসিয়ে রেখো না। তার চেয়ে বরং একজন পুলিশ অফিসারকে তলব কর। আমাকে তার হাতে তুলে দাও।

খানসামা বিরক্তির স্বরে বলল, 'তোমার জন্য আর পুলিশ অফিসারের দরকার পড়বে না। তার নির্দেশে দু'জন গাট্টাগোট্টা খানসামা সোপি'কে ধাক্কাতে ধাক্কাতে রেস্তোরাঁ থেকে বের করে এমন জোরে এক ধাক্কা দিল যে সে সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পথের মাঝখানে পড়ল।

সোপি রাস্তা থেকে উঠে সে জায়গায়ই দাঁড়িয়ে পাগলের মত সরবে হাসতে লাগল।

সোপি আবার সামনের দিকে এগিয়ে চলল। কিছু দূর যেতে না যেতেই সে নতুন করে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হবার মত মনোবল ফিরে পেল। মিনিট কয়েকের মধ্যে একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে একটা সুযোগ তার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে গেল। খুবই সাধারণ পোশাক পরিহিত যুবতী হাতে একটা দোয়াতদানি আর দাড়ি কামানোর মগের ছবি আঁকা জানালার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রয়েছে। আর জানালার অদূরেই এক গাট্টাগোট্টা পুলিশ দাঁড়িয়ে, পাহারা দিচ্ছে।

সোপি মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল, তাকে এক লোচ্চারের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে। আর এরই মাধ্যমে তার বহু আকাঙ্খিত গ্রেপ্তার হবার সুযোগ এসে যাবে। ব্যস, তবে আর দেখতে হবে না। এতেই দ্বীপটায় যাওয়ার ও বসবাসের পথ সুগম হতে বাধ্য।

সোপি তার দোমড়ানো কোঁচকানো টাইটাকে টেনেটুনে একটু সোজা করে নিল। জামার হাত দুটো কনুই পর্যন্ত গুটিয়ে টুপিটাকে মাথায় একটু বাঁকা করে বসিয়ে নিল। এবার দাঁড়িয়ে-থাকা যুবতীটার দিকে এগিয়ে গিয়ে লোচ্চার বখাটে যুবকের ভঙ্গীতে তার দিকে তাকিয়ে চোখ মারল। অসভ্যের মত মিটমিট করে তাকিয়ে হাসল। আড়চোখে দেখে নিল, পুলিশ পুঙ্গবটা শিকারী বিড়ালের মত তার ওপর কড়া নজর রাখছে। সে একটু স্বস্তি পেল। এবার কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে একেবারে মেয়েটার গা-ঘেঁষে দাঁড়াল। ছোট্ট করে বলল, 'ওহে সুন্দরী, আমার আঙিনায় গিয়ে একটু আপটু খেলা করতে উৎসাহী কি?'

পুলিশটা তার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখছে। সে ভাবছে, লাঞ্ছিতা যুবতীটা একবার ইশারায় ডাকলেই বাঘের মত শিকারটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। ব্যস, সোজা দ্বীপে চালান দিয়ে দেবে। সোপিকে অবাক করে দিয়ে মেয়েটা বলে উঠল 'অবশ্যই। মাইক, আমাকে তুমি যেখানে খুশি নিয়ে যেতে পার, যা খুশি তা-ই করতে পার। হতচ্ছাড়া আমার ওপর কড়া নজর রেখে চলেছে বলেই ইচ্ছা থাকলেও আমি এতক্ষণ তোমার সঙ্গে কথা বলতে সাহস করিনি। কথা বলতে বলতে মেয়েটা তাকে আইভি লতার মত আলিঙ্গনাবদ্ধ করতেই পুলিশ পুঙ্গবটা রাগে গম্‌গম্ করতে করতে সেখান থেকে চলে গেল।

সোপি দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্বগতোক্তি করল, হায় ঈশ্বর, আমার কপালে কি মুক্ত জীবনই লিখে রেখেছ?

হতাশায় জর্জরিত রুডলফ আর এক সেকেন্ডও দেরী না করে সঙ্গিনীটার কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এক দৌড়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেল। সে দৌড়োতে দৌড়োতে নিষিদ্ধ পল্লীতে হাজির হল। যেখানে নারী-পুরুষ লোমের পোশাক আর হাঁটু অবধি নামানো কোট পরে শীতের আমেজভরা হাওয়ায় জোড়ায় জোড়ায় ঘুরে বেড়ায়। আকস্মিক একটা ভয় সোপির মনে দানা বাঁধল। ভাবল, কোন ভয়ানক যাদুমন্ত্র তাকে গ্রেপ্তার প্রতিরোধক করে তুলেছে। নইলে, এত চেষ্টা করেও সে পুলিশের কুনজরে পড়ে দ্বীপে চালান হচ্ছে না কেন? এরকম ভাবতে ভাবতে সে এক রঙ্গমঞ্চের সামনে এক দৈত্যাকৃতি পুলিশকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে গলির মুখে দাঁড়িয়ে পাঁড় মাতালের মত চিৎকার চেঁচামেচি আর গালিগালাজ করতে লাগল।

পুলিশটা কয়েক মুহূর্তের জন্য অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে নিয়ে পাশের কোন একজন নাগরিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে বলল 'বুঝছেন, ইনিও হার্টফোর্ট কলেজ থেকে আসা মহাপুরুষদেরই একজন। চেঁচামেচি করে বটে, কিন্তু ভুলেও কারো অনিষ্ট করে না। ওপরওয়ালার হুকুম আছে ওদের যেন ধরপাকড় না করা হয়।'

সোপি হাল ছাড়ল না। অতি মাত্রায় হাত পা ছোঁড়া ছুঁড়ি করে চিল্লিয়ে পাড়া মাথায় তুলল। শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে স্বগতোক্তি করল, 'হায়! পুলিশ কি তবে কোনদিনই আমাকে পাকড়াও করবে না? দ্বীপটা কি আমার কাছে চিরদিন স্বপ্নরাজ্য হয়েই রয়ে যাবে।

ঠিক সে মুহূর্তেই তার চোখ পড়ল পাশের চুরুটের দোকানে, পোশাক-আশাকে একেবারে কেতাদুরস্ত মাঝ-বয়সী একজন নিজের দামী ছাতাটাকে পাশে রেখে ঝুলন্ত দড়ির আগুন থেকে চুরুট ধরাচ্ছে। সোপি বিড়ালের মত সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে সেখানে গেল। ছাতাটা হাতে তুলে নিয়ে ধীর পায়ে সেখান থেকে কেটে পড়ার সময় ছাতার মালিক ব্যাপারটা লক্ষ্য করে চোর চোর

বলে চিল্লাতে চিল্লাতে তাকে তাড়া করল। কাছে গিয়ে সোপিকে লক্ষ্য করে লোকটা বলল, এটা হচ্ছে কী, শুনি? আমার ছাতাটা নিয়ে কেটে পড়ছ?

আপনার ছাতা? তাই যদি হয় তবে পুলিশ ডাকছেন না কেন স্যার? চোখে কি ন্যাবা হয়েছে নাকি? ওই যে দৈত্যের মত এক পুলিশ দাঁড়িয়ে।

এদিকে পুলিশটা কৌতূহলাপন্ন হয়ে রুডলফ আর ছাতার মালিকের কাণ্ডকারখানা দেখতে লাগল।

ছাতার মালিককে নিশ্চেষ্ট দেখে রুডলফ অনুমান করল এবারও বুঝি তার প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যাবে। নইলে ছাতা চোরকে হাতের মুঠোয় পেয়েও লোকটা পুলিশ ডাকা তো দূরের কথা সামান্য হম্বিতম্বিও করছে না। তবে হয়ত আর পুলিশের হাতে ধরা পড়ে তার আর দ্বীপে চালান হওয়া হল না।

ছাতার মালিক স্বাভাবিক স্বরেই বলল, ছাতাটা কিন্তু আমারই। তবে এর জন্য আপনার লজ্জা বা সঙ্কোচের কিছুই নেই। এ রকম ভুল মানুষমাত্রেই হতে পারে, হয়ও। আর যদি নেহাৎ বলেন যে, ছাতাটা আপনার তবে আমাকে মার্জনা করবেন। কারণ, আজ সকালেই আমি এক রেস্তোরাঁ থেকে ছাতাটা চুরি করেছি। তাই বলছি কি, যদি বলেন, ছাতাটা আপনার তবে আমাকে আপনি—

দৃঢ়তর কণ্ঠে সোপি বলল, হ্যাঁ, এটা আমারই ছাতা। ছাতাওয়ালা চুরুট টানতে টানতে সেখানে থেকে সরে গেল। ঠিক তখনই এক দীর্ঘাঙ্গিনী ও স্থূলকায়া মহিলা মোটরগাড়ির সামনে পড়ে গিয়ে মরতে মরতে বেঁচে গেল। পুলিশটা হন্তদন্ত হয়ে সেদিকে ছুটে গেল।

ক্ষোভে দুঃখে হতাশায় জর্জরিত সোপি সামান্য এগিয়ে অভিধান বহির্ভূত একটা শব্দ উচ্চারণ করে পথের ধারের একটা গর্তে হাতের ছাতাটা ফেলে দিল। আর যারা গায়ে কোর্তা, মাথায় টুপি আর হাতে ছোট্ট একটা লাঠি নিয়ে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায় তাদের উদ্দেশ্যে অভিধান বহির্ভূত বাছা বাছা কিছু শব্দ ব্যবহার করতে করতে পথ পাড়ি দিতে লাগল। আর করবে না-ই বা কেন? এত চেষ্টা করেও সে কিছুতেই তাদের অনুগ্রহ—হাতে ধরা পড়তে পারছে না।

সোপি পূর্বদিকে ম্যাডিসন স্কোয়ার মুখো পথে চলতে লাগল। কারণ পার্কের বেঞ্চটা যার কাছে বাড়ির সমান সেটা তো তার কাছে বাড়িই থেকে যায়।

আরও সামান্য এগিয়ে আবছা অন্ধকার, নির্জন নিরালায় দাঁড়িয়ে-থাকা এক পুরনো গীর্জার সামনে গিয়ে সোপি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার জানালা দিয়ে অর্গ্যানের মিষ্টি মধুর সুর ভেসে আসছে। নিঃসন্দেহে কোন শিল্পী যন্ত্রটার চাবিগুলোর ওপর আঙুল বুলিয়ে যাচ্ছে। তার ধর্মসঙ্গীতের সুর যেন রুডলফকে গীর্জার লোহার রেলিঙের সঙ্গে সেঁটে দিয়েছে। এরকম মিষ্টি সুর সে বহুবার, কিন্তু বহুদিন আগে শুনেছে যখন তার জীবনে মায়ের ভালবাসা ছিল। বাতাস বাহিত গোলাপের মধুর গন্ধ ফুসফুসে ঢুকে মনে প্রাণে রোমাঞ্চ জাগাত, উচ্চাকাঙ্খা সমস্ত বুকটা জুড়েছিল, মনে ছিল পবিত্র চিন্তা আর বন্ধুবান্ধব তার চারদিকে ঘিরে থাকত।

পবিত্র গীর্জার উপস্থিতি, শান্ত সুন্দর পরিবেশ আর মানসিক পরিস্থিতি তার অন্তরাত্মায় আকস্মিক অভাবনীয় পরিবর্তন এনে দিল। যে নরকের কাদায় সে ডুবতে বসেছিল, যে অসহনীয় দুর্দশার মধ্যে দিনাতিপাত করেছে আর যে নীচ মনোবৃত্তি আর অনুচিত বাসনা তার সত্ত্বাকে গ্রাস করে ফেলেছে সেসব অন্ধকার দিনগুলোর কথা এক-এক করে অন্তরের অন্তঃস্থলে উঁকি দিতেই আতঙ্কে সে বারবার শিউরে উঠতে লাগল।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তার অভাবনীয় ভাবান্তর ঘটে গেল। একেবারেই অপ্রত্যাশিত এক শক্তি তার মধ্যে ভর করল যা মনকে মুহূর্তে সুদৃঢ় করে তুলল। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল আর কাদাঘাটা নয়, কাদা থেকে নিজেকে তুলে এনে আবার নতুন জীবন লাভ করবে, আবার মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠবে। সময় পেরিয়ে যায় নি, সময় আছে, এখনও নিজেকে শোধরাবার সময় আছে। যৌবন এখনও ফুরিয়ে যায় নি। মন থেকে মুছে যাওয়া উচ্চাকাঙ্খাগুলোকে নতুন করে জাগিয়ে তুলবে, শঙ্কিত কম্পিত পায়ে আপন লক্ষ্যের দিকে যে এগিয়ে যাবে।

পবিত্র গীর্জা, শান্ত সুন্দর পরিবেশ আর অর্গ্যানের মিষ্টি মধুর ধর্মসঙ্গীতের সুর তার মনে-প্রাণে বিপ্লবের সূত্রপাত করেছে।

না, আর নয়। সোপি কালই শহরের কেন্দ্রস্থলের জাঁকজমকপূর্ণ অঞ্চলে চেষ্টা চরিত্র করে একটা কাজ জোগাড় করে নেবে। এক লোমের ব্যাপারী তো এক সময় তাকে কাজে বহাল করতে রাজী হয়েছিল। কালই তার গদিতে হাজির হবে। শহরের অন্য দশজনের মত সে-ও একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ হয়ে উঠবে। ঠিক তখনই এক বিশালদেহী পুলিশ তার একটা হাত সজোরে চেপে ধরে গর্জে উঠল, 'এখানে কি করছ হে, ছোকরা? চল, আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে।'

পরদিন সকালে পুলিশ-আদালতের ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে সোপি কে দ্বীপে চালান করে দেওয়া। তাকে তিন মাস দ্বীপে কাটাতে হবে।

ম্যাম্মোন অ্যান্ড দ্য আর্চার

বুড়ো এন্টনি রকওয়াল 'রকওয়াল ইউরেকা সোপ' কোম্পানীর নির্মাতা ও স্বত্বাধিকারী। ফিফ্থ অ্যাভিনিউতে নিজের প্রাসাদে বাস করে। তিনি তার প্রাসাদের লাইব্রেরীর জানালা দিয়ে পথের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই মুচকি হাসলেন। প্রাসাদটির বাইরে মোটরগাড়ির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে প্রতিবেশী অভিজাত বংশীয় জি ভ্যান স্কুলাইট সাফোক জোন্স ইতালীর নবজাগরণ শিল্পশৈলী সম্পন্ন বাড়িটার দিকে তাকিয়ে মুহূর্তের জন্য ভুরু কোঁচকালো।

সাবানের রাজা বুড়ো এন্টনি রকওয়াল জানালায় বসেই স্বগতোক্তি করতে লাগলেন সামনের শীতের শুরুতেই আমি সাদা, লাল আর নীল রঙ দিয়ে বাড়িটাকে রঙ করে ফেলব। দেখতে চাই তবুও ওলন্দাজটার নাক সিঁটকানো বন্ধ হয় কিনা। তার পরই তিনি দরজার সামনে গিয়ে গলা ছেড়ে ডাকলেন, 'মাইক। এই যে মাইক এসো। তার ডাক শুনে পরিচারক মাইক সাড়া দিলে গৃহকর্তা রকওয়াল তাকে গলা ছেড়ে বললেন, 'তোমাকে কাজ ফেলে আসতে হবে না মাইক। বরং আমার বাড়ি থেকে বেরোবার আগে যেন একবারটি আমার সঙ্গে দেখা করো।

একটু বাদেই গৃহকর্তার যুবক ছেলে রকওয়াল বাবার সঙ্গে দেখা করতে এল। বুড়ো সরাসরি তাকে প্রশ্ন করল 'রিচার্ড, তুমি যে সাবান ব্যবহার কর তার জন্য মাসে কত খরচ হয়, বল তো?

রিচার্ড মাত্র দু'মাস আগে কলেজের পাঠ শেষ করে বাড়িতে এসে থিতু হয়েছে, এ স্বল্পকালের মধ্যে বাবার সব কিছু সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা এখন অবধি করে ফেলতে পারেনি। তাই তাঁর প্রশ্নটার সদুত্তর খুঁজে পেয়ে সে বলল, আমার বিশ্বাস ডজন প্রতি ছ'ডলার করে আমার খরচ হয়। আরও বলছি। পোশাকের জনা খরচ হয় প্রায় ষাট ডলার। আমি শুনেছি, ভদ্রলোকের ছেলেরা সাবানের জন্য ডজন প্রতি চব্বিশ ডলার আর পোশাকের জন্য একশ' ডলারেরও বেশী খরচ করে। তাদের মত খরচ করার অর্থ তোমার থাকা সত্ত্বেও তুমি কিন্তু কম দামী জিনিস ব্যবহার করতেই আগ্রহী। আগেকার দিনের ইউরেকা সাবান আমি ব্যবহার করি, কেবলমাত্র নির্মল সাবান বলেই। দশ সেন্টের সাবানের গন্ধ ও মোড়ক কোনটাই রুচিসম্মত নয়। তোমার সমান আর্থিক সঙ্গতি এবং পদমর্যাদা সম্পন্ন এক যুবকের পক্ষে তার দাম পঞ্চাশ সেন্ট হওয়াই সঙ্গত। আশা করি মনে আছে, আমি আগেই বলেছি, তুমি একজন যুবক। আর এ-ও মনে রাখবে, কথায় আছে যথার্থ ভদ্রলোক হতে অন্ততঃ তিনটি প্রজন্ম লেগে যায়। কিন্তু আজ আর সে যুগ নেই। বর্তমানে অর্থ হলেই সবই হাতের মুঠোর মধ্যে চলে আসে। নিজেকে দিয়েই প্রমাণ পাচ্ছ, অর্থ, মানে বিত্ত সম্পদ তোমাকে ভদ্রলোকের পদমর্যাদা দান করেছে। আমার দু'দিকে যে দু'জন বুড়ো ভদ্রলোক রয়েছেন যারা আমার জন্যই নির্ঘুম অবস্থায় রাত্রি কাটান, ধরতে গেলে আমি তো প্রায় তাদের মতই অবশিষ্ট, কুরুচিসম্পন্ন এবং অবাঞ্ছিত ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে গেছি।

এমন বহু জিনিস আছে যাদের অর্থের বিনিময়ে সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না।

তার কথায় বুড়ো রকওয়াল বেদনাতুর কণ্ঠে বলল, 'কেন মিছে এমন কথা বলছ! আমি এনসাইক্লোপিডিয়ার গোড়া থেকে ওয়াই অক্ষর পর্যন্ত যাবতীয় জিনিসের খোঁজ করেছি যাদের অর্থের বিনিময়ে সংগ্রহ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। এবার অর্থের বিনিময়ে সংগ্রহ করা সম্ভব নয় এমন একটা জিনিসের কথা বল তো?'

রিচার্ড বলল—'হ্যাঁ, আছে। অর্থের বিনিময়ে কেউ উঁচু সমাজের গণ্ডীর মধ্যে নিজের স্থান করে নিতে পারে না।'

বুঝলাম, নিতে পারে না বা অর্থ সমাজের উঁচু স্তরে কাউকে স্থান করে দিতে পারে না। এবার আমাকে বুঝিয়ে দাও যে, প্রথম পুরুষটি যদি সে সমাজে নিজের স্থান পাবার জন্য অর্থ জোগাতে অক্ষম হ'ত তবে তোমার ওই উঁচু সমাজ গড়ে ওঠা কি সম্ভব হ'ত?'

রিচার্ড চোখের তারায় হতাশার ছাপ এঁকে চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

বুড়ো রকওয়াল এবার নরম স্বরে বলল, একথা আমিও বলতে চাইছি। তাই তো তোমাকে কাছে ডাকিয়েছি। শোন, আমার বিশ্বাস, তুমি যেন কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছ। আমি দু'হপ্তা ধরে তোমার মধ্যে একটা বিশেষ ভাব লক্ষ্য করছি যার জন্য তোমাকে একথা বলতেই হ'ল। ওসব ব্যাপার স্যাপার মাথা থেকে মুছে ফেলে দাও। আমার বিশ্বাস, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই এগার মিলিয়ন আমি পেয়ে যাব। আর সে সঙ্গে সম্পত্তি টম্পত্তি তো রইলই। আর তোমার ওটা যকৃতের ব্যাপার স্যাপার হলে উপসাগরে কয়লা বোঝাই 'ব্যাম্বলার' তো রয়েছেই। প্রয়োজনে দু'দিনের মধ্যেই বাহামার পথে যাত্রা করতে পার। মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে রকওয়াল এবার বলল ভাল কথা, মেয়েটার নাম কিছুতেই মনে করতে পারছি না, কি যেন নাম বলেছিলে?

রিচার্ড-এর কাছ থেকে কোন জবাব না পেয়ে বুড়ো রকওয়াল এবার বলল, আরে সে সহজেই রাজী হয়ে যাবে। তোমার নগদ অর্থ আর বিষয় সম্পত্তি দু'-ই আছে। আর ছেলে হিসেবেও তুমি ফেলনা নও। তার ওপর তোমার হাতে 'ইউরেকা' সাবানের গন্ধও নেই। তবে এটা খুবই সত্য যে, তুমি কলেজে পড়াশুনা করেছ। তার জন্য তাদের মাথা ব্যথার কিছু নেই বলেই আমি অন্তত মনে করি।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, কোন উপযুক্ত সুযোগই আমি হাতে পাচ্ছি না।

বুড়ো রকওয়াল কণ্ঠস্বরে বিরক্তি প্রকাশ করে বলল, আরে ধ্যুৎ! সুযোগ কি এমনি এমনি আসে নাকি হে? নিজের চেষ্টায় সুযোগ করে নিতে হয়। যদি চাও তাকে নিয়ে পার্কে বেড়াতে যেতে পার। আবার গাড়ি চেপে ধারে কাছে কোন ছোটখাটো জায়গায় বেড়িয়েও আসতে পার। আবার এ-ও হতে পারে, গীর্জা থেকে বেরিয়ে তাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসতে পার। ব্যস, এদের যেকোন একটা পথ অবলম্বন করলেই তো কাজ হাসিল করে নিতে পারবে, ঠিক কিনা?'

'বাবা, ওই সামাজিক চক্রের ব্যাপার স্যাপার তোমার জানা নেই বলেই কথাটা এত সহজে তুমি বলতে পারলে। মেয়েটা ওই চক্রের পরিচালক মণ্ডলীরই একজন। তার সময়ের প্রতিটা মিনিট আগে থেকে ঠিক করা থাকে তাকে কোন কাজ সারতে হবে। কিন্তু বাবা, আমার শেষ কথা, ওই মেয়েটাকে আমার চাই-ই চাই। আর তা যদি না পাই তবে এ শহরটা আমার কাছে একটা আস্তাকুড় হয়ে যাবে। আর একটা কথা, যে কথা আমার পক্ষে লিখিতভাবে সম্ভব নয়, সে কাজ আমি কিছুতেই করতে পারব না।

'আরে, তুমি কি বলতে চাইছ যে আমার যাবতীয় অর্থের বিনিময়ে তার অমূল্য সময়ের দু'একটা ঘণ্টা সময় তোমার নিজের জন্য আদায় করতে পার কিনা।

কিন্তু বাবা। আমরা বড্ড বেশী দেরী করে ফেলেছি। আগামী পরশুর জাহাজে সে ইওরোপ চলে যাচ্ছে। দু'বছর সেখানে কাটিয়ে তবেই ফিরবে, আগামীকাল সন্ধ্যায় মাত্র দু'মিনিটের জন্য সে আমার সঙ্গে নিরালায় দেখা করবে, কথা দিয়েছে। কথা আছে, আগামীকাল রাত্রি সাড়ে আটটার ট্রেনের সময় গ্র্যান্ড স্টেশনে ট্যাক্সি নিয়ে আমি সেখানে উপস্থিত থাকব। তার মা-ও তার সঙ্গে থাকবেন। সে পরিবেশে, দু'-আট মিনিটের মধ্যে আমি কোন প্রস্তাব দিলে সেটা তার কান পর্যন্ত পৌঁছবে বলে তুমি মনে কর বাবা? বাবার দিক থেকে কোন জবাব না পেয়ে রিচার্ড আবার মুখ খুলল। বাবা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তোমার বিষয় সম্পত্তি ওই সমস্যার হিল্লে করতে পারবে না। অর্থের বিনিময়ে তার এক মিনিট সময়ও আমরা কিনে নিতে পারব না। আর তা যদি সম্ভব হ'ত তবে বিত্তবানরা দীর্ঘায়ু লাভ করত। তাই বলছি কি, মিস ল্যাস্ট্রির সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনার কোন প্রত্যাশাই করা সম্ভব নয়।

মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে বুড়ো রকওয়াল বলল বাছা রিচার্ড, তবে তুমি বিশ্বাস কর, অর্থের

বিনিময়ে সময়কে কেনা সম্ভব নয়, তাই না? ভাল কথা, যেকোন মূল্য দিয়েও তুমি প্রত্যাশা করতে পার না কোন দোকানি জিনিসপত্র বস্তা বোঝাই করে তোমার বাড়ি পাঠিয়ে দেবে, কিন্তু সোনার খনি দিয়ে হাঁটতে গিয়ে গোড়ালি দুটো পাথরে গুঁতো খেয়ে কেটে গেছে, আমি নিজের চোখে দেখেছি।

এ্যালেন পিসি সে রাত্রেই রিচার্ড-এর কাছে এল। সে সর্বদা হা পিত্যেশ করে, বিষয় আশয়ের বোঝা আর বইতে পারছে না। সে অবস্থাতেই এ্যালেন প্রেমিক-প্রেমিকাদের সমস্যা নিয়ে কথা পাড়ল।

রিচার্ড আড়মোড়া ভেঙে বলল, 'আমাকে সে সবই বলেছে। আমি তাকে জানিয়ে দিয়েছি আমার ব্যাঙ্কের যাবতীয় অর্থকড়ি সে তার নিজের যেকোন কাজে ব্যয় করতে পারে। তখন সে অর্থকড়ির প্রতি বিদ্বেষ ভাব প্রদর্শন করে বলল 'অর্থ কড়ি দিয়ে কিছুই হবার নয়। দশ দশজন লাখপতির প্রচেষ্টাতেও সমাজের বিধানগুলোর এক তিলও পরিবর্তন করতে পারবে না।

'উফ্! রিচার্ড তুমি বিত্ত সম্পদকে এত উর্দ্ধে ঠাঁই দাও এটা আমার ইচ্ছে নয়। এ্যালেন বলে চলল, প্রকৃত প্রেমের ক্ষেত্রে ধন সম্পদের কোন মূল্যই নেই। প্রেমের চেয়ে শক্তিশালী কিছু আছে বলে আমি অবশ্যই বিশ্বাস করি না। বাবা যদি আরও আগে ব্যাপারটা খোলসা করে বলতেন! সে যুবতীর পক্ষে রিচার্ডকে কিছুতেই প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব হত না। তবে আমাব আশঙ্কা হচ্ছে, বড্ড দেরী হয়ে গেছে। মেয়েটার সঙ্গে আলোচনা করার অবকাশই তার পক্ষে পাওয়া সম্ভব হবে না।

পরদিন রাত্রি আটটায় এ্যালেন-এর সঙ্গে রিচার্ড-এর দেখা হলে সে অত্যাশ্চর্য পুরনো একটা আঙটি রিচার্ডকে দিয়ে অনুরোধের স্বরে বলল, তোমার মা এটা আমার হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলেন তোমাকে যেন এটা দেই। আজ রাত্রেই পরে ফেলো আর একটা কথা, তিনি আমাকে বলে দিয়েছিলেন, তুমি যখন তোমার মনের মানুষটাকে পাবে তখন যেন এটা তোমার হাতে তুলে দেই। আজ সে সময় এসেছে—এটা রাত্রেই পরে ফেলো বাছা।

আঙটিটা নিয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে আঙুলে পরতে গিয়ে রিচার্ড দেখল, সেটা দ্বিতীয় গাঁটের ওপর আর উঠছে না। অনন্যোপায় হয়ে সেটা খুলে কোটের পকেটে রেখে দিল। তারপর একটা ট্যাক্সি ধরে স্টেশনে হাজির হল। সেখানে খোঁজাখুঁজি করে মিস ল্যাস্ট্রি'কে যখন বের করল তখন আটটা বত্রিশ মিনিট।

ল্যাস্ট্রি-র মা ও অন্যান্যরা তাদের জন্য ওয়ালাক নাট্যশালায় অপেক্ষা করছে ভেবে তারা ট্যাক্সি নিয়ে এভিনিউ বরাবার ব্রডওয়ের দিকে চলল। ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বলে রিচার্ড থার্টিফোর্থ স্ট্রীটে দাঁড় করাল। কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে সে বলল একটা বিপত্তি ঘটে গেছে। আমার একটা আঙটি কোথায় যেন পড়ে গেছে। আমার মায়ের আঙটি ছিল। কিছুতেই হারানো চলবে না। কোথায় পড়ে গেছে দেখা দরকার। গাড়ী থেকে নামার পর এক মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যেই সে আবার ট্যাক্সিতে ফিরে এল।

এ অল্প একটু সময়ের মধ্যেই একটা মোটরগাড়ী এসে তাদের ট্যাক্সিটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমাদের ট্যাক্সির ড্রাইভার বাঁ দিক দিয়ে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করল। পারল না। ভারি একটা মালগাড়ি এসে তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। ট্যাক্সির ড্রাইভার পড়ল মহাসমস্যায়। সে তৎক্ষণাৎ ডানদিক দিয়ে পথ করে নেওয়ার চেষ্টা করল। এবার অতর্কিতে আসবাবপত্র বোঝাই ভ্যান। সেটা ডানদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়ল। ব্যস ট্যাক্সিটা মুহূর্তের মধ্যে চারদিক থেকে আটকা পড়ে যাওয়ায় আমাদের ড্রাইভার হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিল।

ব্যাপার দেখে মিস ল্যাস্ট্রি-র ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। সে বলে উঠল, কী সর্বনাশ ঘটতে চলেছে, বল তো? আমাদের দেরী হয়ে গেলে কী যে ঘটবে ভেবে পাচ্ছি না!

রিচার্ড দেখল, যেখানে সিক্সথ এভিনিউ, ব্রডওয়ে এবং থার্টি ফোর্থ স্ট্রীটের সঙ্গম ঘটেছে সেখানে রাজ্যের যত ট্যাক্সি, মালগাড়ী, ভ্যান আর সাধারণ গাড়ী মিলে এমন জট পাকিয়ে ফেলেছে যার ফলে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার কোন উপায়ই নেই। এমন যানজট সচরাচর চোখে পড়ে না।

রিচার্ড এবার হতাশার স্বরে মিস ল্যাস্ট্রি'কে বলল, এ যে মহাফ্যাসাদে পড়া গেল! ঘণ্টা খানেকের মধ্যেও এ যানজট ছাড়বে বলে মনে হচ্ছে না! আমার দোষেই এমনটা ঘটে গেল

আঙটিটা না হারালে বোধ হয় আমাদের এ সমস্যায় পড়তে হত না।

ল্যাস্ট্রি বলল, 'বরাত যখন মন্দ তখন আর হা-হুতাশ করে কি হবে। তার চেয়ে বরং তোমার মায়ের দেওয়া আঙটিটাই দেখা যাক।

সেদিন রাত্রি এগারটায় রকওয়াল-এর দরজায় মৃদু করাঘাত হতে লাগল। রাতের খাবার খেয়ে রকওয়াল জলদস্যুদের অভিযান বিষয়ক একটা উপন্যাস গভীর মনোযোগ সহকারে পড়ছে। দরজায় বার দু'-তিন করাঘাত হতেই সে বইয়ের পাতায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই বলল, দরজা খোলাই আছে, ধাক্কা দাও।

দরজা খুলে এ্যালেন ঘরে ঢুকে এল। সে ঘরে ঢুকেই বলল, রকওয়াল, তাদের বিয়ের কথা পাকা করে এলাম। মেয়েটা রিচার্ডকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে। আমাকে কথা দিয়েছে। নাটক দেখতে যাবার সময় পথে যানজটের জন্য দু'ঘণ্টা আটকা পড়ে গিয়েছিল।

রকওয়াল, তোমাকে একটা কথা বলছি। ধনসম্পদের বড়াই আর কোনদিন কোরো না যেন। প্রেমের একটা ছোট্ট চিহ্ন, প্রেম ভালবাসা অনুরাগের প্রতীক একটামাত্র আঙটির জন্যই রিচার্ড বহু আকাঙ্খিত মুখকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েছে, বুঝলে? সেটা কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে তার হাত থেকে পথে পড়ে যায়। ট্যাক্সি থেকে নেমে গিয়ে সেটাকে কুড়িয়ে আনে। ট্যাক্সিটা আবার যাত্রা শুরু করার আগেই যানজট শুরু হয়ে যায়। ব্যস, ট্যাক্সিটা সেখানেই থমকে দাঁড়িয়ে রইল প্রায় দু'ঘণ্টা। রিচার্ড তার কাজ হাসিল করে নিল। তার প্রেমিকার সঙ্গে কথা বলে—বোঝাপড়া করে তার কাছ থেকে বিয়ের সম্মতি পেয়ে যায়। এবার ভেবে দেখ রকওয়াল, নিখাদ প্রেমের কাছে ধনসম্পদ কত তুচ্ছ, নিতান্তই নগণ্য।

বুড়ো রকওয়াল-এর চোখ মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে ভাবাপ্লুত কণ্ঠে বলল, ছেলেটা তার বহু বাঞ্ছিত রত্ন পেয়ে গেছে। তার বাঞ্ছা পূরণ হল। এতে আমি কী যে খুশি হয়েছি তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আমি তাকে কথা দিয়েছিলাম, এর জন্য দু'হাতে টাকা ছড়াতেও আমি দ্বিধা করব না। তুমি এগিয়ে যাও। এবার হাতের বইটা দেখিয়ে রকওয়াল বলল, 'আমি বইটার এমন একটা জায়গায় থেমে গেছি যার জন্য মনটা খুবই চঞ্চল। অধ্যায়টা শেষ না করা অবধি স্বস্তি পাব না।

পরদিন সকালে কেলি নামে নিজের পরিচয় দিয়ে এক ব্যক্তি রকওয়াল-এর বাড়িতে তার সঙ্গে দেখা করতে এল। লাল তার আস্তিন আর গলায় নীল নেকটাই জড়ানো।

রকওয়াল তাকে অভ্যর্থনা করে লাইব্রেরীতে নিয়ে গিয়ে বসতে দিল। এবার চেক বইটার পাতা ঘেঁটে সে বলল, সাবানের হিসাব কী করলে, ভেবে পাচ্ছি নে। তোমাকে তো নগদ পাঁচ হাজার ডলার দেওয়া হয়।

কেলি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, কেন! আমি তো আরও তিন হাজার ডলার নিজের পকেট থেকে দিয়েছিলাম। আসলে হিসাবের অতিরিক্ত দিতে হয়েছিল। ট্যাক্সি আর এক্সপ্রেস মালগাড়ি পাঁচ ডলার দরেই পেয়েছিলাম। তবে দু'ঘোড়ার গাড়ি আর ট্রাকের জন্য দশ ডলার পর্যন্ত না উঠে উপায় ছিল না। তার ওপর কয়েকটা মাল-বোঝাই গাড়ী বিশ ডলার আর গাড়ীর যাত্রীরা দশ ডলার নিয়ে নিল। আর সবচেয়ে বেশী চোট খেলাম পুলিশের কাছে। পঞ্চাশ ডলার করে দু'জন নিয়ে নিল, অন্যান্যদের মধ্যে কেউ পঁচিশ ডলার আর বিশ ডলার করে নিয়ে নিল। জব্বর ব্যবস্থা। ছেলেরা একেবারে সময় মতই হাজির হয়ে যায়। গ্রিপির পাথরের মূর্তির তলা দিয়ে দু'ঘণ্টা আগে পর্যন্ত একটা সাপও গলে যেতে পারেনি, বুঝলেন?

তেরশ' ডলারের একটা চেক কেলি-র দিকে বাড়িয়ে দিয়ে রকওয়াল বলল। এতে তেরশ' আছে। এক হাজার তোমার জন্য আর অন্যান্য অতিরিক্ত খরচের জন্য দিলাম তিন হাজার ডলার, অর্থকড়ির ওপর তোমার মনে বিদ্বেষ নেই আমি কি আশা করতে পারি?

আমার? অর্থকড়ির ওপর বিদ্বেষ? বলেন কি! যে দারিদ্র্যের সৃষ্টিকর্তা তাকে খুঁজে পেলে আমি তার মাথায় লাঠি বসিয়ে দিতেও দ্বিধা করব না।

মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে রকওয়াল আবার মুখ খুলল, কেলি একটা কথার জবাব দাও তো? সে যান-জটের মুহূর্তে তোমার চোখে এমন কি কোন যুবক পড়েছিল যার গায়ে কোন পোশাক

ছিল না কিন্তু হাতে তীর ধনুক ছিল।

মনে পড়ছে?

কপালের চামড়ায় চিন্তার ভাঁজ আর চোখে-মুখে বিস্ময়ের ছাপ এঁকে কেলি বলল, এমন কোন যুবককে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না তো। আর আপনি যেমন বর্ণনা দিচ্ছেন সে রকম অদ্ভুত যুবককে দেখামাত্র পুলিশ অবশ্যই তাড়িয়ে দিয়েছিল। আর সে মুহূর্তে এটাই তো স্বাভাবিক, তাই না?

হতাশার স্বরে রকওয়াল বলে উঠলেন, আমার তো জানাই ছিল, সে বাচ্চা অপদার্থ—হতচ্ছাড়াটা ধারে কাছে থাকার পাত্র নয়। কেলি এখন তবে বিদায়।

দ্য ক্যালিফ, কাপিড অ্যান্ড দ্য ক্লক

পার্কের প্রিয় বেঞ্চটায় বসে ভ্যালেলুনা নির্বাচন কেন্দ্রের প্রিন্স মাইকেল একাই অবসর বিনোদন করে চলেছে। সেপ্টেম্বরের হিমেল বাতাস স্বাস্থ্যোদ্ধারকারী সালসার কাজ করছে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অতি সচেতন মানুষগুলো সন্ধ্যায় অল্প-অল্প ঠাণ্ডা পড়া শুরু হতে না হতেই ব্যস্ত পায়ে বাড়ির দিকে হাঁটা জুড়েছে। ফলে স্বাভাবিক কারণেই পার্কটার অধিকাংশ বেঞ্চই ফাঁকা পড়ে রয়েছে।

প্রিন্স মাইকেলের জুতো জোড়া ছিঁড়তে ছিঁড়তে এমন পর্যায়ে চলে গেছে যে, কোন মুচির পক্ষেই সেটাকে তাপ্পিতুপ্পি দিয়ে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা কিছুতেই সম্ভব নয়। পুরনো পোশাক-পরিচ্ছদ যারা খরিদ করে বেড়ায় তারাও দামদস্তুর তো দূরের কথা, তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। দু'সপ্তাহ ধরে বিনা বাধায় দাড়ি গজাতে গজাতে মুখটাকে রীতিমত বাঁশবন করে তুলেছে। আর মাথার খড়ের টুপিটা ছিঁড়ে ছেঁটে সেটার দশা এমন হয়ে গেছে যে সেটা খরিদ করার মত ধনকুবের পৃথিবীতে অন্তত কেউ নেই।

পার্কের বেঞ্চে শরীর এলিয়ে দিয়ে প্রিন্স মাইকেল হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল। হঠাৎই কেন যেন মনে হল সে ইচ্ছা করলেই তো ওই আলোকোজ্জ্বল বিশালায়তন বাড়িগুলোর যে কোন একটা অনায়াসে খরিদ করে ফেলতে পারে। জমি-জিরাত, সোনা-দানা আর নগদ অর্থকড়ির দিক থেকে শহরের ধনীকে সে অনায়াসে টেক্কা দিতে সক্ষম। যেকোন রাজা-বাদশার সঙ্গে একই টেবিলে বসে নৈশভোজ সারতে পারে। শিল্প-জগৎ জ্ঞানীগুণীমনের পঞ্চমুখে প্রশংসাবাক্য, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের খ্যাতি ও সম্মান, রূপসী যুবতীদের স্তবস্তুতি, সম্মান,খাতির প্রভৃতি সবই ভ্যালেলুনা নির্বাচন কেন্দ্রের প্রিন্স মাইকেল-এর জন্য একত্রে পুঞ্জীভূত রয়েছে। আর যখন সেটাকে সে ভোগ করতে চাইবে, হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে যাবে। এত কিছু সত্ত্বেও সে পার্কের নড়বড়ে বেঞ্চটাকেই নিরাপদ আশ্রয় হিসাবে নির্বাচন করেছে। কাটাবেও এর ওপরে নিজেকে সঁপে দিয়ে। কারণ, জীবনের ফল সে বহুবার বহুভাবে প্রত্যক্ষ করেছে। সবই তিক্ত বিষময় বোধ হয়েছে বলেই তো সাধারণ জীবনের কাছাকাছি চলে এসেছে একটু আধটু বৈচিত্র্যের প্রত্যাশা বুকে নিয়ে।

প্রিন্স মাইকেল-এর মনে এরকম ভাবনার উদয় হয়েছিল বলেই সে নকল গোঁফের আড়াল থেকে ছোট্ট করে হাসল। শহরের দরিদ্রতম ভিখারী সেজে পথে পথে পার্কে-পার্কে ঘুরে মানুষকে মানুষের জীবনকে দেখার লোভ তার বহুদিনের। তার বংশ গৌরব আর পদমর্যাদা, ধনসম্পদ সে যত না ভালবাসে তার চেয়ে অনেক, অনেক বেশী ভালবাসে, অনেক বেশী সুখ লাভ করেছে সর্বজনসুখবাদের মাধ্যমে। বিভিন্নভাবে মানুষকে সাহায্য-সহযোগিতা করা আর মানুষের দুঃখ মোচনের মাধ্যমেই সে লাভ করে সবচেয়ে সন্তুষ্টি ও আত্মতৃপ্তি।

উঁচু মিনারটার ওপর অবস্থিত ঘড়িটার দিকে চোখ পড়তেই মুহূর্তের মধ্যে সর্বজনসুখবাদ প্রিয় প্রিন্স মাইকের হাসির প্রলেপ মাখানো মুখাবয়বে নেমে এল বিষাদের কালো ছায়া। তার চেয়ে বেশী প্রকট হয়ে উঠল ঘৃণার সুস্পষ্ট ছাপ। সমগ্র পৃথিবীটা যে এক মহাকালের অধীন একথাটা মনের কোণে উঁকি দেওয়ামাত্র সে বারবার অদ্ভুতভাবে মাথাটাকে ঝাঁকাতে থাকে। দ্রুত ও আতঙ্কিতভাবে মানুষের আসা-যাওয়ার ব্যাপারটা ঘড়ির দুটোমাত্র ধাতব কাঁটার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, কথাটা মনে

জাগলেই মনটা অকস্মাৎ বিষিয়ে ওঠে।

একটু বাদেই এক যুবক পার্কে ঢুকে প্রিন্স মাইকেল-এর বেঞ্চটার বিপরীত প্রান্তে বসল। তার গায়ে সান্ধ্য পোশাক। স্নায়বিক উত্তেজনা বশত সে আধঘণ্টারও বেশী সময় ধরে চুরুট টেনে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়ল। তারপর চোখ দুটো গিয়ে পড়ল মিনারের ওপর অবস্থিত ঘড়িটার ওপর। ঠিক সে মুহূর্তেই তার নিদারুণ অস্থিরতা দেখা দিল। তার এ আকস্মিক ভাবান্তরটুকু প্রিন্স মাইকেল-এর নজর এড়াল না। সে নিঃসন্দেহ হল, ঘড়িটার ধাতব কাঁটা দুটোর ধীর গতির সঙ্গে সদ্য আগত যুবকটার অস্থিরতার কোন না কোনভাবে যোগসূত্র আছে।

সামনের বেঞ্চ থেকে অন্য আর একটি যুবক উঠে চুরুটওয়ালা যুবকটার কাছে এসে বলল, উপযাচক হয়ে কথা বলার জন্য ক্ষমা করবেন। আমি লক্ষ্য করছি হঠাৎ আপনার মনে অবর্ণনীয় চাঞ্চল্য ভর করেছে—।

তার মুখের কথা শেষ হবার আগেই প্রিন্স মাইক তাকে সমর্থন করতে গিয়ে বলে উঠল, কিছু মনে করবেন না, আমিও আপনার অস্থিরতাটুকু লক্ষ্য করেছি। গোড়াতেই আপনাকে জানিয়ে রাখছি, আমার নাম প্রিন্স মাইকেল। কথা প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখছি এ অভাজন ভ্যালেলুনা নির্বাচন কেন্দ্রের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। আশা করি অনুমান করতে পারছেন আমি ছদ্মবেশ ধারণ করে আপনার সামনে উপস্থিত। আমার দৃষ্টিতে যাকে সাহায্য করার উপযুক্ত জ্ঞান করি তাকে সাহায্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করিনা। অবশ্য একাজটা আমার খেয়াল চরিতার্থ করতে গিয়েই করে থাকি। তবে এটুকু বলতে পারি, যে কারণে আপনি দুঃখ কষ্টের বোঝা বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন আমাদের যৌথ উদ্যোগে আশা করি তা থেকে অব্যাহতি পেয়ে যাবেন।

গোড়াতে যে বিব্রত ভাবটা যুবকটার চোখে মুখে ফুটে উঠেছিল তা ম্লান হয়ে আসতে লাগল। সে মুখ খুলল—আপনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাওয়ায় কী যে খুশি হয়েছি তা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। বিশ্বাস করুন, আপনি যে ছদ্মবেশ ধারণ করে এখানে বসেন, আমি অনুমানই করতে পারিনি। আর আপনি যে আমাকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ না জানালে আমি নিজের কাছেই অপরাধী জ্ঞান করব। যাক, আপনি যে আমাকে সাহায্য করতে আগ্রহী তা কিভাবে করতে চাইছেন, দয়া করে বলবেন কি? তবে আপনাকে বলে রাখছি, ব্যাপারটা কিন্তু খুবই গোপনীয়।

প্রিন্স মাইকেল তার কথার কোন জবাব না দিয়ে বলতে লাগল, একটা কথা জানেন মশাই, কুচক্রী ঘড়িগুলো মানুষের পায়ে বেড়ি পরিয়ে রেখেছে। আপনি যে মিনারের ওপরের ওই ঘড়িটার দিকে দৃষ্টি ফেরাচ্ছিলেন তা কিন্তু আমার নজর এড়ায় নি। সত্যি বলতে কি, ওই ঘড়ির ডায়ালটা যেন এক স্বৈরাচারী রাজার মুখ। আমি বলছি, ওই ঘড়িটার দাসত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করে ফেলুন। ধাতব কাঁটার নির্দেশ মেনে চলার অভ্যাসটা পুরোপুরি বন্ধ করে দিন।

'আমি কিন্তু সাধারণত তা করিও না', ঠোঁট থেকে জ্বলন্ত চুরুটটা নামিয়ে যুবকটা বলল।

প্রিন্স মাইকেল সহানুভূতি ও মর্যাদার সঙ্গে বলল, 'ঘাস লতাপাতা আর গাছগাছালির মতই মানুষের স্বভাবচরিত্রকে আমি জানি। দর্শনশাস্ত্রের ওপর আমার যথেষ্ট দখল আছে। কলাশাস্ত্রেরও উপাধিপ্রাপ্ত ছাত্র ছিলাম আর অর্থকড়ির দিক থেকে একজন ধনকুবেরও মনে করতে পারেন। মানুষের জীবনে যেকোন মন্দভাগ্যকে আমি অনায়াসে দূর অর্থাৎ জয় করতে সক্ষম। সত্যি বলছি, আপনার মুখাবয়বে আমি সততা, মহত্ব, একাগ্রতা—এমন কি দুঃখ দুর্দশার লক্ষণও প্রত্যক্ষ করেছি।

মুহূর্তকাল নীরবতার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে তিনি আবার সরব হলেন, আপনার কাছে আমি অনুরোধ রাখছি, আমার পরামর্শই শুধু নয়, সার্বিক সাহায্য সহযোগিতাও নির্দ্বিধায় গ্রহণ করুন। আমাকে দেখে আমার ক্ষমতা, আপনার দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করতে পারব কিনা বিচার করলে কিন্তু ভুলই করবেন। তা-ই যদি করেন তবে আপনার চোখে-মুখে যে বুদ্ধিমত্তার ছাপ আমি লক্ষ্য করছি তা মিথ্যায় পর্যবসিত হয়ে যাবে। আমার কথাগুলি ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখুন।

চুরুটে পর পর দুটো লম্বা টান দিয়ে যুবকটা আবার মুখ তুলে মিনারের মাথার চলমান ঘড়িটার দিকে তাকাল। তার মুখটা হঠাৎ কেমন কালচে হয়ে এল। পরমুহূর্তেই তার চোখের মণি দুটো ঘুরে তার বিপরীত দিকের সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে-থাকা বাড়িগুলোর মধ্যে চারতলা একটা বাড়ির

ওপর স্থির হল। তার জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে মৃদু আলো নজরে পড়তে লাগল।

দীর্ঘ গভীর হতাশা আর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় যুবকটা আচমকা চিৎকার করে উঠল—হায়! ন'টা বাজতে মাত্র দশ মিনিট বাকি! কথাটা বলেই সে বাড়িটার দিকে পিছন ফিরে লম্বা লম্বা পায়ে হাঁটতে লাগল।

প্রিন্স মাইকেল বজ্রগম্ভীর এবং আদেশ করার স্বরে বিক্ষুব্ধ যুবকটাকে লক্ষ্য করে বলে উঠল, 'থামুন! থামুন মশাই!'

যুবকটা যেন মুখে বিরক্তির ছাপ এঁকে আচমকা ঘুরে দাঁড়াল। মুখে বিরক্তির হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে অনুচ্চ কণ্ঠে বলল, দশটা মিনিট সময় তাকে দিচ্ছি। ব্যস, তার পরই বিদায় নেব। এবার একটু গল্প চড়িয়ে বলল, কথা দিচ্ছি, ঘড়িগুলো ভেঙেচুরে ফেলার কাজে আমি আপনার সঙ্গে হাত লাগাব। আর মেয়েদেরও ছেড়ে দেব না, বলে রাখছি।

—বুঝলাম। কিন্তু আপনার শেষ কথাটায় সায় দিতে আমি কিন্তু মোটেই উৎসাহ পাচ্ছি না। আরে মশাই, পুরো স্ত্রী জাতিটাই যে ঘড়ির চরমতম শত্রু। তাই যারা রাক্ষুসে যন্ত্রের কবল থেকে মনে-প্রাণে অব্যাহতি চায় তারা তো একই গোত্রীয়। আমার ওপর যদি আপনার বিশ্বাস জন্মে থাকে তবে আপনার কাহিনী আমার কাছে খোলসা করে বলুন বন্ধু।

বেঞ্চটার ওপর বসতে বসতে মেকি শ্রদ্ধার সঙ্গে যুবকটা তার বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বলল, শ্রদ্ধেয় রাজামশাই, আপনার কাছে খোলসা করে, কোন কিছু গোপন না করেই আমার সব কথা আপনাকে বলব। শুনুন, ওই যে বাড়িটার জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে, ছ'টার সময় আমি ওই বাড়িটাতেই অবস্থান করছিলাম। এক যুবতী ছিল আমার সঙ্গে। মানে, মানে যার সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল।' মুহূর্তের জন্য নীরবে কি যেন ভেবে সে আবার তার নিজের কথা বলতে লাগল, রাজা মশাই, একটা অসঙ্গত কাজ আমি করতে চলেছিলাম, আমি একটা খারাপ যুবক। কথাটা যুবতীটার কানে গিয়েছিল। সে আমাকে মার্জনা করুক এটাই আমার ইচ্ছা ছিল। আপনি কি বলেন, পুরুষরা তো সর্বদাই আশা করে মেয়েরা আমাদের ক্ষমা ঘেন্যা করুক, আপনার কি মত?

যুবতীটা আমাকে বলল, আমাকে নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়ার সময় দাও, একটা নিশ্চিত জানবে, আমি যদি মার্জনা করে দেই ভাল, তা নইলে জীবনে তোমার মুখ দর্শনও করব না। মধ্যপন্থা অবলম্বনের তিলমাত্র সম্ভবনাও নেই, জেনে রাখ। ঠিক সাড়ে আটটায়, আমার প্রেয়সী বলেছিল, হ্যাঁ, ঠিক সাড়ে আটটায় সবার ওপরের তলার মাঝের জানালাটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে। আমি তোমাকে মার্জনা করলে একটা সাদা রেশমি রুমাল জানালায় বেঁধে রাখব। বুঝে নেবে, সবকিছু পূর্বাবস্থায়ই আছে, আবার আমার কাছে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। আর যদি রুমাল অনুপস্থিত থাকে তবে নিঃসন্দেহ হবে, আমাদের সম্পর্ক চিরদিনের মত ছিন্ন হয়ে গেছে। তাই তো মিনারের ওপরের ঘড়িটার দিকে আমি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলাম। তেইশ মিনিট আগে রুমাল দেখাবার সময় পেরিয়ে গেছে! তারপরই আমার মধ্যে অস্থিরতা প্রকাশ পাওয়ায় আপনি খুবই অবাক হয়েছিলেন রাজা মশাই, ঠিক বলিনি?'

প্রিন্স মাইকেল স্বাভাবিক স্বরে বলল, 'আমি আবারও মন্তব্য করছি, মেয়েরা চিরদিনই ঘড়ির শত্রু। আরও খোলসা করে বললে, ঘড়ি অভিশাপ আর মেয়ে আশীর্বাদস্বরূপ। এখনও জানালার সঙ্কেতটা দেখা যেতে পারে।'

যুবকটা উন্মাদের মত চেঁচিয়ে উঠল, 'ভুল, আপনার ধারণা নিতান্তই ভুল। ভুলের স্বর্গে বাস করছেন আপনি। সঙ্কেতটা আর কোনদিন অবশ্যই দেখা যাবে না। তবে এ-ও সত্য। মারিয়ানকে আপনি চেনেন না রাজা মশাই। সে সর্বদা সময় মেনে সবকিছু করে। গোড়াতে তার এ বিশেষ। গুণটার জন্যই আমি তাকে কাছে টেনে নিয়েছিলাম, ভালবাসা উজাড় করে ঢেলে দিয়েছিলাম। আটটা একত্রিশ মিনিটেই আমার ধরে নেওয়া দরকার ছিল, আমার কপাল ফেটেছে। যাক, রাত্রি এগারটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে আমি জ্যাক মিলবার্ণকে নিয়ে পশ্চিমে যাত্রা করছি। বিদায়।'

প্রিন্স মাইকেল তার কোটটা চেপে ধরে বলল, আর একটু—আমার অনুরোধ ঘড়িটা না বাজা পর্যন্ত ধৈর্য ধরুন। আমি অন্য দশজনের চেয়ে অনেক বেশী জ্ঞান-বুদ্ধি, প্রভাব আর অর্থের

অধিকারী। কিন্তু ঘড়িটা ঢং-ঢং করে বেজে উঠলেই আমি আৎকে উঠি। সে সময়টা পর্যন্ত আপনি আমার কাছে থাকুন। আমি বলছি, ওই যুবতীকে আপনিই লাভ করবেন। আপনার বিয়ের দিন আমার কাছ থেকে পাবেন নগদ এক লক্ষ ডলার, হাডসন উপসাগরের গায়ে একটা রাজপ্রাসাদ। তবে একটা শর্ত, সে প্রাসাদে কোন ঘড়ি রাখতে পার. ন না। ঘড়িগুলোই আমাদের নির্বুদ্ধিতার পরিমাপ করে আমাদের মুখের দৈর্ঘ্য হ্রাস করে দেয়। আপনি আমার শর্ত মানতে উৎসাহী তো?

অবশ্যই, অবশ্যই। ঘড়িগুলো বাস্তবিকই নিষ্কর্মা, একেবারে যাচ্ছেতাই। আমাদের রাতের খাবারের দেরী করে দেওয়াই যেন তাদের সবচেয়ে বড় কাজ। সে আবার মিনারের ওপরের ঘড়িটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। ধাতব কাঁটা দুটো ন'টা বাজতে তিন মিনিটের ঘরে অবস্থান করছে।

প্রিন্স মাইকেল এবার বলল, 'মশাই, দিনভর বড়ই খাটুনি গেছে। পরিশ্রান্ত। একটু ঘুমিয়ে না নিলে আর পারছি না। কথা বলতে বলতে সে বেঞ্চটার ওপর এমনভাবে শুয়ে পড়ল যেন এখানে, এভাবে ঘুমনোর অভ্যাস তার বহুদিনের। ঘুম জড়ানো চোখে এবার বলল, 'প্রতি সন্ধ্যায়, অবশ্য ভাল থাকলে আমাকে এখানে, এ বেঞ্চটাতেই পেয়ে যাবেন। বিয়ের দিন ধার্য হওয়ামাত্র আমার কাছে আসবেন কিন্তু। আপনাকে প্রতিশ্রুত চেকটা দেব, মনে থাকবে তো?

ধন্যবাদ রাজামশাই, হাডসন উপসাগরের তীরবর্তী রাজপ্রাসাদ আমার প্রয়োজন হবে বলে এখন পর্যন্ত আমার মনে হচ্ছে না। তা সত্ত্বেও আপনার প্রস্তাবটা আমার মনে ধরেছে, স্বীকার করছি।

কথা বলতে বলতে প্রিন্স মাইকেল গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। মাথা থেকে টুপিটা মাটিতে পড়ে গেল। যুবকটা সেটা কুড়িয়ে তার মুখের ওপর স্থাপন করল। তার জামাটাকে টানাটানি করে তার কালচিটেপড়া বুকটাকে ঢেকে দিতে দিতে বলল, 'হায়! অদৃষ্ট বিড়ম্বিত বন্ধু আমার!'

মিনারের ওপরের অতিকায় ঘড়িটায় ন'টার ঘণ্টা বাজল। যুবকটা হতাশা জর্জরিত বুকে চারতলা বাড়িটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখল, চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। অশ্লীল অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ দিতে শুরু করল।

চারতলার মাঝখানের জানালা থেকে আনন্দের প্রতীক স্বরূপ একটা সাদা মখমলের রুমাল হাল্কা বাতাসে মৃদু মৃদু দুলতে লাগল। রেশমি রুমালটার ব্যাপারটা সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ আরামপ্রিয় অলস স্বভাবের ভদ্রলোক সেখানে হাজির হল। বাড়ি ফিরছে।

তাকে দেখেই যুবকটা এগিয়ে গিয়ে বলল, 'দয়া করে বলবেন কি, ক'টা বাজে?'

আটটা বেজে সাড়ে উনত্রিশ মিনিট।

বহুদিনের অভ্যাস বশত মিনারের ওপরের বড়সড় ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক রীতিমত আর্তনাদ করে উঠলেন, 'হায়! এ কী কাণ্ডরে বাবা! ও ঘড়িটা যে আর আধঘণ্টা ফার্স্ট যাচ্ছে! দেখছি দশ বছরের মধ্যে ঘড়িটা এমন বিগড়েছে। এবার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা যুবকটাকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, আমার ঘড়িটা কোনদিন একটা সেকেন্ডও হেরফের—'

কথা বলতে বলতে ভদ্রলোক ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেন, যুবকটার হাল্কা কালো ছায়াটা মৃদু আলোকিত তিনটে জানালাওয়ালা বাড়িটার দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

পরদিন সকালে পাহারা দেওয়ার সময় দু'টো পুলিশ পার্কে এসে দেখে জীর্ণ ও বিধ্বস্ত চেহারা ও সাধারণ পোশাকধারী একটা লোক বেঞ্চটার ওপর গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তাকে দেখেই প্রহরারত পুলিশদের একজন বলে উঠল, ডোপি, মাইক। রোজই এখানে আসে, বেঞ্চটায় রাত্রি কাটায়। পার্কটা বিশ বছর ধরে তার বাড়ি-ঘর সর্বস্ব। আজ এ হাল দেখে মনে হচ্ছে এর দিন ফুরিয়ে এসেছে।

তার সঙ্গী পুলিশটার নজরে পড়ল, দলা মোঁচড়া করা একটা কাগজ ঘুমন্ত লোকটার মুঠোর মধ্যে শক্ত করে ধরা। এবার একটু উবু হয়ে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে হাতের কাগজটার দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠল, 'হায়! লোকটা নেশা করেই পঞ্চাশ ডলার ফুঁকে দিয়েছে। কিন্তু সে কোন নেশায় যে মজেছে জানতে পারলে—

পুলিশটার কথাটা শেষ হবার আগেই ভ্যালেলুনা নির্বাচন কেন্দ্রের প্রিন্স মাইকেল উঠে বসল। বেঞ্চ থেকে নেমে বাস্তবের কঠিন মাটিতে পা টেনে টেনে পার্কটার দরজার দিকে এগোতে লাগল।

দ্য ব্রিফ ডিবাট অব টিল্‌ডি

বগল্‌-এর চপ তৈরীর ঘর আর পারিবারিক রেস্তোরাঁটা যদি আপনার অপরিচিতই থেকে যায় তবে লোকসানটা আপনারই। আপনি যদি সে সৌভাগ্যবানদের একজন হয়ে থাকেন যারা দামী খাবারে রাতের আহার সারে তবে বাকী অর্ধেকটা কিভাবে উদর স্ফীত করে তা আপনার জেনে নেওয়া উচিত। আর যাদের কাছে ওয়েটারদের চেকটা কোন সমস্যার ব্যাপারই নয় তবে বগল্‌-এর রেস্তোরাঁর খোঁজ খবব আপনার জেনে নেওয়া চাই-ই। কারণ, সেখানে ভোজন সারতে আপনার অর্থ অবশ্যই উঠে আসবে, আর কিছু না হোক পরিমানের দিক থেকে অবশ্যই প্রদত্ত অর্থ বুঝে পাবেন।

অষ্টম এভিনিউতে বগল্‌-এর দোকানটা অবস্থিত, অঞ্চলটা যথার্থই ধনীদের যে পথে রবিনসন আর ব্রাউন জোন্সরা যাতায়াত করে।

ক্যাশ বাক্সটা সামনে নিয়ে বগল্‌ নিজে গদিতে বসে। আপনার চেক আর নগদ অর্থ সে-ই নেবে। ফুরসৎ পেলে আবহাওয়া সম্বন্ধে দু'-চারটে টুকরো টুকরো প্রশ্নও আপনাকে করবে। ব্যস, এর বেশী কিছু তার কাছ থেকে প্রত্যাশা করলে কিন্তু হতাশ হতে হবে। আপনি তার ইয়ার-দোস্ত নন, একজন সাময়িক খদ্দের মাত্র। ভবিষ্যতে তার সঙ্গে আর দেখা না-ও হতে পারে। তাই এমন ভাব দেখাবে, প্রাপ্য খুচরো পয়সা নিয়ে বিদায় হন। তার ভাবগতিকই এরকম। স্বার্থ ছাড়া এক পা-ও চলে না।

তার খদ্দেরের যা কিছু দরকার সবই দুই পরিচারিকা আর একটা কণ্ঠস্বর সবকিছু জোগায়। পরিচারিকাদের একজনের নাম আইলিন। দীর্ঘাঙ্গিনী, রূপসী চালাক চতুর, হাত চালিয়ে কাজে ওস্তাদ আর রসিক আর পরিহাসপ্রিয় ত বটেই, আর দ্বিতীয় পরিচারিকার নাম টিল্‌ডি। সে বেটে মোটাসোটা, চোখ-মুখ সাধারণ মেয়েদের মত। সবার মন রক্ষা করার ব্যাপারে তার জুড়ি মেলে না।

আর কণ্ঠস্বরের ব্যাপারটা? কণ্ঠস্বরের মালিক রান্নাঘরে। সবার অলক্ষ্যে থেকে কাজ করে যায়। খুবই সাধারণ একটা কণ্ঠস্বর। তার বিশেষত্ব আর নতুনত্ব কিছু নেই। পরিচারিকারা খাদ্যবস্তু সম্বন্ধে যে কথা বলে কণ্ঠস্বরটা তারই পুনরাবৃত্তি করে, ব্যস। আইলিনকে যদি আমি রূপসী বলি তবে কি আপনি অস্বস্তি বোধ করবেন। সে যদি কয়েক শ' ডলার দামের পোশাক গায়ে চাপিয়ে ইস্টার উৎসবের শোভাযাত্রায় সামিল হয় আর তখন যদি আপনি তাকে দেখতে পান তবে আপনিও একথা সমর্থন করবেন।

বগল্‌-এর খদ্দেররা তার হাতের মুঠোয়, হাতের পুতুল, ছ'টা টেবিল ভর্তি খদ্দেরের পরিচর্যা ইচ্ছা করলে সে একাই করতে পারে। যারা ব্যস্ত, সময়ের খুবই অভাব তারা কেবলমাত্র তার দ্রুত দেহসৌষ্ঠব আর দ্রুত চলাফেরার দৃশ্য দেখে আনন্দ পাওয়ার জন্যই তাদের অস্থিরতাকে কব্জায় রেখে দেয়। তার মুখের হাসিটুকু আরও কিছুক্ষণ দেখার লোভে খাওয়ার পাট চুকে গেলেও নতুন করে আর এক থালা খাবার চেয়ে নেয়। রেস্তোরাঁর প্রতিটা খদ্দের, আর তার বেশীরভাগই পুরুষ, তার ওপর কিছু প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালিয়ে যায়।

আইলিন রঙ্গ তামাশার মাধ্যমে একই সঙ্গে দু'জন খদ্দেরকে মাতিয়ে রাখতে পারে। আর এতে পুরোপুরি সফলও হয়। আবার হুকুম মাফিক খাদ্যবস্তু পরিবেশন করার কাজেও তার দক্ষতা কম নয়। পরিচারিকাদের হাসিঠাট্টা আর দক্ষতার সঙ্গে খাদ্য পরিবেশন প্রভৃতির কাঁধে ভর দিয়ে বগল্‌-এর রেস্তোরাঁটা একটা বড়সড় ও নামজাদা হোটেলের মর্যাদা লাভ করল। আর তার মাদাম রেকামিয়ার হল পরিচারিকা আইলিন।

নিয়মিত খদ্দেররা রহস্যময়ী হাস্যময়ী আইলিনকে নিয়ে ক্রমে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মেতে উঠতে লাগল। তবে আইলিনকে প্রতি সন্ধ্যাটাই বিশেষ একজনের জন্য উৎসর্গ করে রাখতে হয়, তাকে সঙ্গদান করতে হয়। কেউ বা তাকে নিয়ে প্রতি সপ্তাহে দুটো দিন বলনাচের আসরে, নইলে রঙ্গ মঞ্চেও যায়। একজন বেটেখাটো ও মোটাসোটা খদ্দেরকে টিল্‌ডি আর সে নিজেদের মধ্যে শূকর সম্বোধন করে। একবার সে নাদুসনুদুস লোকটা আহ্লাদে গদগদ হয়ে একটা পাথর বসানো আঙটি

উপহার দিয়ে বসেছিল আর একজন মোটর মেকানিক্স তাকে কথা দিয়ে রেখেছে নতুন কন্ট্রাক্টটা পেলে তাকে একটা সুন্দর কুকুরের বাচ্চা উপহার দেবে। অন্য আর একজন সজ্জি আর পাঁজরের ছোট ছোট মাংসপ্রিয় লোকটা, সে নিজেকে দালাল বলে পরিচয় দিয়ে আনন্দ পায়, তাকে নিয়ে পার্সিফন-এ বেড়াতে যাবে, পাকা কথা দিয়ে রেখেছে।

আইলিন-এর মুখে পার্সিফন-এর নামটা কানে যেতেই কপালের চামড়ায় চিন্তার ভাঁজ এঁকে টিল্‌ডি বলল, পার্সিফন! সেটা আবার কোথায়?

জায়গাটা যে কোথায় তা আমারও জানা নেই। তবে একটা কথা, বেড়াতে যাওয়ার পোশাক সেলাই করার আগেই আমি বিয়ের পিঁড়িতে বসতে, বিয়ের আঙটি আঙুলে পরতে চাই, অসঙ্গত কথা বলেছি? আমি কিন্তু মনে করি সঙ্গত কথাই বলেছি টিল্‌ডি!

সে সন্ধ্যায় রেস্তোরাঁয় একটা বিয়োগান্ত নাটক অভিনীত হল। টিল্‌ডি-র প্রশংসা করার মত বলতে কেউই নেই। শুধু কি এই? তার দিকে কেউ ভুলেও তাকায় না। তার নাকটা মোটা, যাকে বলে রীতিমত বোঁচা। শরীর বিশেষ করে পেটটা মোটা। সম্পূর্ণ শরীরটাও কম মোটা নয়, মাথার চুলগুলো খড়ের মতই রুক্ষ-রুষ্ট, পায়ের চামড়া খসখসে, কুঁচকে গেছে। সে রেস্তোরাঁর ভেতরে ঘুরে বেড়াবার সময় পেটে আগুন জ্বলছে এরকম লোক ছাড়া মনের আগুন নেভানোর প্রত্যাশায় কেউ তার দিকে ভুলেও চোখ ফেরাল না। তার সঙ্গে একটু-আধটু হাসিঠাট্টা করতেও কেউ উৎসাহী হয় না। কেউ তাকে পাথর বসানো আঙটি, সুন্দর কুকুরের বাচ্চা দেওয়ার বা পার্সিফন-এ বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেয় নি।

তবে পরিচারিকা হিসাবে টিল্‌ডি খুবই অভিজ্ঞা। তাই তার কাজকর্মে, বিশেষ করে হুকুম তামিল করার ব্যাপারে তার জুড়ি মেলে না। খাওয়া দাওয়া সেরে বিল মেটাবার সময়ও আঁড়চোখে আইলিন-এর মুখের দিকে খদ্দেররা তাকিয়ে থাকে। তার রূপের ছোঁয়া লাগলেই মাংস আর চপ-কাটলেটের স্বাদ অধিকতর বৃদ্ধি পেয়ে যায়।

বেঁটেখাটো স্থূলকায়া আর খেঁদা-নাকের মেয়েটা কিন্তু ভেতরে ভেতরে বেঁটেখাটো গ্রীক যুবকটাকে ভালবাসে। সে আইলিন-এর বন্ধু। তা সত্ত্বেও সে যেসব পুরুষকে প্রভাবিত করে তাদের দেখেই সে পুলকিত হয়। কিন্তু খড়ের মত চুল আর খেঁদা নাকের মেয়েটার বুকের গোপন বন্দরে একটা রাজকুমার বা রাজকন্যার স্বপ্ন ফুটন্ত ফুলের মতই বিরাজ করে।

এক সকালে দু'জন মুখোমুখি হতেই আইলিন-এর চোখে একটা আঁচড় লাগা ক্ষতচিহ্ন নজরে পড়ল।

ক্ষতটার দিকে টিল্‌ডি-র চোখের তারার জমাটবাঁধা বিস্ময়টুকু নজরে পড়তেই আইলিন থতমত খেয়ে বলে উঠল, কি আর বলব, গত রাত্রে টুয়েন্টি-থার্ড এবং সিক্সথ-এ ধরে বাড়ি ফেরার সময় এক নচ্ছার আমার পিছু নিল। আমি সঙ্গে সঙ্গে চোখ কটমট করে তাকালাম। সে পালিয়ে যাওয়ার পথ পায় না। কিন্তু এইট্রিন্থ দূরে দূরে থেকে আমাকে অনুসরণ করতে লাগল। আবার ঝামেলা শুরু হয়ে গেল। ব্যস, দিলাম তার গালে সজোরে এক থাপ্পড় কষে। নচ্ছারটা ঠিক তখনই আমার চোখের এ হাল করে দিল। বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে, তাই না? কী যে করি, মিঃ নিকলসন, দশটায় যখন চা ও জলখাবার খেতে আসবেন তখন এটা তাঁর নজরেও পড়বে, ভাবতেও বিচ্ছিরি লাগছে!

তার দুঃসাহসিক কার্যকলাপের কথা টিল্‌ডি রুদ্ধশ্বাসে শুনল। কোন যুবক তো দূরের ব্যাপার কোন পুরুষ মানুষই আজ পর্যন্ত তার পিছু নেয়নি। দিন-রাত্রি যেকোন সময়, যেকোন অঞ্চল দিয়ে সে নিশ্চিন্তে চলাফেরা করতে পারে। একটা পুরুষ মানুষ তোমাকে অনুসরণ করল আর চোখে কালসিটে ফেলে দিল! উফ! ব্যাপারটা যে রোমাঞ্চকর তা ভাবতেও আমার বুকের মধ্যে উথালি পাথালি শুরু করে দিয়েছে।

গতকাল খদ্দেরের মধ্যে সিডার্স নামে এক যুবক ছিল। এক লন্ড্রীর অফিসের কর্মী। শীর্ণকায়। মাথার চুল প্রায় অর্ধেকই পড়ে গেছে। কলপ ঘষে ঘষে রঙও বিচ্ছিরি করে ফেলেছে। সে ইদানিং আইলিন-এর চোখে লাগার জন্য নানাভাবে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। সে টিল্‌ডির টেবিলে বসে সিদ্ধকরা মাছ গিলতে থাকে।

সিডার্স এক সন্ধ্যায় রাতের খাবার খেতে বসে একটু বেশী মাত্রায় বিয়ার খেয়ে ফেলল।

রেস্তোরাঁয় তখন মাত্র দু'-তিনজন খদ্দের উদরপূর্তি করে চলেছে। সিডার্স আচমকা চেয়ার ছেড়ে উঠে নির্লজ্জের মত টিল্‌ডির কোমরটা জড়িয়ে ধরল। একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে তার গালে একটা চুমু খেয়ে বসল। ব্যস, মুহূর্তমাত্র দেরী না করে রেস্তোরাঁ ছেড়ে পথে নামল।

টিল্‌ডি বাজপড়া রোগীর মত সেখানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। একটু বাদেই তার আঙুলে মৃদু চাপ দিয়ে আইলিন বলল, আরে ব্বাস! টিল্‌ডি, তুমি এমন দুষ্টু মেয়ে আগে জানতাম না তো! আজকেই প্রথম টের পেলাম, তুমি আমার খদ্দের হাতিয়ে নিতে শুরু করেছ। ওগো রূপসী, এবার থেকে তো তোমাকে চোখে চোখে রাখতে হবে।

তড়াক করে টিলডি-র মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। মুহূর্তে সে যেন আইলিন-এর সমগোত্রীয় হয়ে উঠল। সে যেন আজ কামদেবের রতি হয়ে উঠেছে। আর হয়ে উঠেছে পুরুষ মনমোহিনী। তার মত উপেক্ষিতা এক মেয়ের কটিদেশ যদি পুরুষের কামনার উপকরণে পরিণত হয়ে ওঠে তবে বিস্ময়ই শুধু নয়, ঈর্ষা উৎপাদনও করবে। হঠাৎ সিডার্স-এর মত এক যুবকের হাতের ছোঁয়া পেয়ে টিল্‌ডি যেন মুহূর্তে দুর্লভ সামগ্রীতে পরিণত হয়ে উঠেছে। সিডার্স তাকে নিয়ে হঠাৎ কী কাণ্ডটাই না করে বসল। সে নিজের হাতে তার গায়ের অসুন্দর আবরণটাকে উন্মোচন করে ফেলে ছাইচাপাপড়া রূপলাবণ্য আবিষ্কার করে ফেলেছে।

অনতিকালের মধ্যেই টিল্‌ডির দেহে একেবারেই অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা দিল। শরীরের শুকনো ভাঁজগুলো থেকে গোলাপের আভা বিচ্ছুরিত হয়েছে।

টিল্‌ডি সত্যি বাজিমাৎ করেছে। আজ পর্যন্ত আইলিন-এর কটিদেশ কোন যুবকই রেস্তোরাঁর ভেতরে জড়িয়ে ধরেনি, সবার সামনে চুম্বন করেনি।

অভাবনীয় আনন্দে আত্মহারা টিল্‌ডি এমন একটা ব্যাপারকে পরিচিত মহলে প্রচার না করে স্বস্তি পাচ্ছে না। রাত্রে খদ্দেরের ভিড়ভাট্টা কমে গেলে সে মালিক বগল্‌-এর টেবিলের পাশে গিয়ে দাড়াল। তার চোখ দুটো আনন্দে জ্বলজ্বল করতে লাগল। বার কয়েক ঢোক গিলে সে চেষ্টা প্রয়াস চালাতে লাগল যাতে তার আচরণে কোনরকম আত্মম্ভরিতা প্রকাশ না পায়, তার কথাগুলো উদ্ধত মনে না হয়।

সে গলা নামিয়ে ধীরে ধীরে বলল, স্যার, গতরাত্রে এক অঘটন ঘটে গেছে। এক ভদ্রলোক আমার কোমর জড়িয়ে ধরে দুম করে চুমু খেয়ে বসে।

বগল্ যন্ত্রচালিতের মত সোজা হয়ে বসে সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'তাই বুঝি? ব্যস, তুমি তো তবে বাজিমাৎ করে ফেলেছে! আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, এ হপ্তার পর থেকে তোমার বেতন এক ডলার করে বাড়িয়ে দেব।

এবার থেকে খদ্দেরদের প্রতিটা টেবিলের সামনে গিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে নিজের কথা বলতে লাগল, 'জানেন, এক ভদ্রলোক আমাকে দেখে এতই মুগ্ধ হয়ে যায় যে, আমার কোমর জড়িয়ে ধরে টুক্ করে একটা চুমু খেয়ে বসেছে।

টিল্‌ডির বক্তব্যকে কেউ মিথ্যা গল্প বলে উড়িয়ে দিল, কেউ কেবল নীরবে ঠোঁট টিপে হাসল, কেউ সোল্লাসে অভিনন্দন জানাল। আবার কেউ কেউ তারদিকে এমন সব মন্তব্য করল যা একমাত্র আইলিনকেই বলা যেতে পারে।

এদিকে টিল্‌ডি-র বুকে উত্তাল উদ্দাম সমুদ্রের ঢেউ বয়ে যেতে লাগল। দু'-দুটো দিন চলে গেল, মিঃ সিডার্স আর বগল্‌-এর রেস্তোরাঁ মুখো হল না। ইতিমধ্যে টিল্‌ডি নিজেকে এমন এক আসনে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে যে নারীকে পুরুষমাত্র কামনা করে থাকে। সে নতুন ফিতে কিনে এনে আইলিন-এর মত আঁটসাঁট করে চুল বেঁধে নিয়েছে। শুধু কি এ-ই? ফিতে জড়িয়ে কোমরটা শক্ত করে বাঁধল যাতে দু'ইঞ্চি সরু হয়ে গেল। বাঁধনহারা আনন্দে তার বুকটা ভরে উঠল। খুশি মিশ্রিত এমন এক অভাবনীয় পরিস্থিতির মুখোমুখি সে হল যে মিঃ সিডার্স আচমকা আবির্ভূত হয়ে তাকে গুলি করে বসবে। হ্যাঁ, সত্যি সে প্রেমের ব্যাপারে একেবারে লাগাম ছাড়া বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।

আবেগপ্রবণ প্রেমিকরা সর্বদাই ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়ে। টিল্‌ডি আশান্বিত হতে পেরেছে। সে নিঃসন্দেহ হল সিডার্স তাকে গুলি করে হত্যা করবে না। কারণ, আইলিনকে তো কেউ গুলি করেনি।

সবচেয়ে বড় কথা, সে দীর্ঘদিন আইলিন-এর ভক্ত। বান্ধবীকে ডিঙিয়ে সে কোনদিনই ওপরে ওঠার চেষ্টা করেনি।

দু'দিন বাদ দিয়ে তৃতীয় দিন বিকেলে সিডার্স বগল্-এর রেস্তোরাঁয় এল। টেবিলগুলো ফাঁকা, একটা খদ্দেরও নেই। রেস্তোরাঁর পিছন দিকে আইলিন মটরশুঁটি বাছছে আর টিল্ডি সরষের পাত্রগুলো ভরতে ব্যস্ত। মিঃ সিডার্স এক পা দু'পা করে তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। টিল্ডি আচমকা তাকে দেখেই থতমত খেয়ে সরষের চামচটাকে বুকের ওপর চেপে ধরল। তার চুলে একটা লাল 'বো' করা গলায় নীল পুতির একটা হার, তাতে একটা রূপোর লকেটও ঝুলছে।

হঠাৎ মিঃ সিডার্স-এর মুখটা রক্তিম হয়ে উঠল। তার মধ্যে অস্থিরতা প্রকাশ পেল। সে অনুরোধের স্বরে বলল, মিস টিল্ডি, একটা কথা বলার জন্য আপনার কাছে ছুটে আসতেই হল। আসলে নেশার ঘোরে আমি এমন জঘন্য কাজটা করে ফেলেছিলাম। আমি দুঃখিত, মর্মাহত লজ্জিত। মাথা ঠিক থাকলে আমি অবশ্যই আপনাকে স্পর্শও করতাম না। আশা করি আমার কৃতকর্মের জন্য আপনি নিজগুণে আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। সুন্দর এ অজুহাতটা দেখিয়েই সিডার্স রেস্তোরাঁ ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

টিল্ডি কফির পেয়ালা আর মাখনের টুকরোগুলোর ফাঁকে আছড়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। চুল থেকে লাল 'বো' টাকে খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল। এ মুহূর্ত থেকে সিডার্স'কে সে মনে প্রাণে ঘৃণা করে। সে চুম্বনকে যে সানন্দে বুকে ঠাঁই দিয়েছিল—হয়েছিল জীবনের প্রথমবার উল্লসিত। তার মধুর চুম্বন তার জীবনকে করে তুলতে পারত মধুময়, পারত রূপকথার দেশের রানী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে চুম্বন মাতালের কাণ্ডজ্ঞানহীন মাতলামিতে পরিণত হল। আজ থেকে তাকে আবার ঘুমন্ত পুরীর সংজ্ঞাহীন রূপসী যুবতী হয়েই সারাটা জীবন কাটাতে হবে, ভাবতে হবে সে নিঃসঙ্গ, এতবড় পৃথিবীতে সে একেবারেই একা।

শেষ। সবই শেষ হয়ে গেছে! টিল্ডি চিরদিনের মত ফুরিয়ে গেছে। না, তবু সবকিছুর পরিসমাপ্তি ঘটেনি। সে-ও তার হাতটাকে জড়িয়ে ধরল। আইলিন নিতান্ত আপন জনের মত, আত্মার আত্মীয়ের মত বুকে জড়িয়ে ধরল। সবদিক চিন্তাভাবনা না করে, কিছুই না বুঝেই সমবেদনার স্বরে বলতে লাগল, টিল্ডি, এভাবে মুষড়ে পোড়ো না। নিজেকে, নিজের মনকে শক্ত করে বাঁধো। ধ্যুৎ! হতচ্ছাড়া সিডার্স-এর জন্য এমন করে মুষড়ে পড়ার কি কারণ থাকতে পারে আমার মাথায় আসছে না বাপু! ভদ্রলোকের চামড়াই তার গায়ে নেই। আমার কথা শোন, কোনদিনই তাকে ক্ষমা কোরো না। তাকে মন থেকে নিঃশেষে ঝেড়েমুছে ফেলে দাও। ওঠ, চোখ মোছ।

এ কস্‌মোপোলাইট ইন এ কাফে

কফির দোকানটায় মাঝরাত্রেও খদ্দেরদের ভিড় প্রায় সমানভাবেই রয়ে গেছে। আমার বরাত ভাল যে, কোণের দিকে আমি যে টেবিলটায় বসি সেদিকে নবাগতদের নজর যায়নি। দুটোমাত্র খালি চেয়ার যেন অর্থের প্রত্যাশায় ভিড় করে থাকা খদ্দেরদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। এসব অতিথি অভ্যাগতরাই তো কাফেটার লাভের পাল্লাকে ভারী করে তোলে।

ঠিক তখনই এক ভবঘুরে এসে খালি চেয়ার দুটোর একটা দখল করায় আমি মনে মনে আনন্দিতই হলাম। কারণ, আমার বিশ্বাস সেই আদ্যিকাল, আদমের আমল থেকে মনে প্রাণে ভবঘুরে জন্ম গ্রহণ করেনি। তাদের সম্বন্ধে বহু কথা শোনা যায় বটে, অনেক বিদেশীকে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় মিথ্যা নয়। কিন্তু যাদের সঙ্গে দেখা হয় তারা পর্যটক বলে চিহ্নিত করা যায় বটে, ভবঘুরে অবশ্যই নয়।

পরিবেশটা বিচার বিশ্লেষণের ভার আপনার ওপরই ছেড়ে দিলাম। মার্বেল পাথরের টেবিলটা, দেওয়ালের গা ঘেঁষে চামড়া দিয়ে মোড়ানো সারিবদ্ধভাবে সাজানো চেয়ার, খুশিতে ডগমগ মানুষ, শরীরের অর্দ্ধাংশ পোশাকাবৃতা সব মক্ষিকা চারু ও কলাশিল্প, অর্থনীতি, অমানুষিক কায়িকশ্রমে রত বকশিসপ্রিয় পরিচারিকর দল, গায়কদের সর্বজন আনন্দদায়ক গানের কলি পরিবেশন, রঙ্গ

রসিকতা, হাসি আর কথার ফুলঝুরি, হ্যাঁ, আপনার মন চাইলে এক পেয়ালা মদিরা পান করে গলা আর মনটাকে একটু ভিজিয়ে নেওয়াতেও কিছুমাত্রও বাধা নেই। মধু আর মক্ষিকা প্রিয় কোন এক ভাস্কর আমার কাছে মনের ভাব ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছিলেন, দৃশ্যটা যথার্থই প্যারিসের সঙ্গে তুলনীয়।

ভবঘুরেটার নাম কি, তাই না? বলছি শুনুন—ই. রাশমোর কগ্‌লান তার নাম। আগামী গ্রীষ্মকাল থেকে কনি দ্বীপ তার কণ্ঠস্বরে মুখরিত হয়ে উঠবে। সেখানে তিনি একটি আকর্ষণীয় নতুন সংস্থা স্থাপন করবেন, আমাকে বললেন, এলাহী ব্যবস্থা সেখানে থাকবে। ব্যস, এবার মুখে খই ফুটতে শুরু করল। তার মুখে নিরবচ্ছিন্ন অবহেলা ও অবজ্ঞার ছাপ ফুটে উঠল। অতি পরিচয়জনিত অবজ্ঞার সঙ্গে সুবিশাল এ পৃথিবীটাকে হাতের মুঠোয় নিয়ে নিল। জমাটবাঁধা অবজ্ঞার সঙ্গে বিষুবরেখার নিকটবর্তী অঞ্চল প্রসঙ্গে কথা বলেই টপ করে এক মহাদেশ ডিঙিয়ে অন্য মহাদেশের আলোচনা শুরু করে দিল। পৃথিবীর সবগুলো মহাদেশ-দেশ আর অঞ্চল প্রসঙ্গে বিদ্রূপ শুরু করল। মহাসাগরগুলোকে তো এক ফুৎকারেই উড়িয়ে দিল। একবার শ্বাস ফেলেই হায়দ্রাবাদের বিশেষ একটা বাজারের রক্ত শেষ করে ফেলল। ব্যস, তারপরই চলে গেল একেবারে ল্যাপল্যান্ডের এক স্কী-র আসরে।

তারপর? তারপর আপনাকে কিয়েলাইকহিকির উত্তাল উদ্দাম ঢেউয়ের পিঠে চাপিয়ে নিয়ে আর্কান্সার-এর জলাভূমির ভেতর দিয়ে আর ইডাহো পশু খামারবাড়িটা আপনাকে এক ঝলক দেখিয়ে নিয়ে পৌঁছে দিল ভিয়েনার নামজাদা সব ডিউকদের মাঝে।

তারপর সে যখন আপনার কাছে গল্প করবে শিকাগোর হ্রদে কিভাবে তার সর্দিকাশি হয়েছিল, বুয়েন্‌স আয়ার্স-এর বৃদ্ধা এক্সামিলা গাছের বীজের রস গরম করে খাইয়ে আপনার রোগ নিরাময় করেছিল।

আমি বলছি, বিশ্বাস করুন, ই. রাশমোর কগ্‌লান—'এস্কোয়ার, বিশ্ব, সৌরজগৎ, মহাবিশ্ব' ব্যস, এ ঠিকানাটা লিখে ডাকবাক্সে চিঠি ফেলে দেওয়ামাত্র আপনি নিঃসন্দেহ হতে পারেন চিঠিটা সময়মত তার হাতে পৌঁছবেই পৌঁছবে।

সত্যি বলছি, আদম-এর আবির্ভাবের পর আজ এই প্রথম একজন যথার্থ ভবঘুরের মুখোমুখি হবার সৌভাগ্য অর্জন করলাম। আর দুরুদুরু বুকে তার পৃথিবী পর্যটনের কাহিনী উৎসাহের সঙ্গে শুনলাম।

তার বৃত্তান্তে কিন্তু এতটুকুও অনাগ্রহ প্রকাশ পেল না। বরং তার কথার প্রতিটা শব্দের মাধ্যমে বোঝা গেল বাতাস বা মাধ্যাকর্ষণের মতই গ্রাম-গঞ্জ, শহর, দেশ আর মহাদেশের প্রতি সমান শ্রদ্ধা অন্তরে পোষণ করে।

ভবঘুরে ই. রাশমোর কগ্‌লান যখন আমাদের এ ছোট্ট গ্রহটা সম্বন্ধে একনাগাড়ে বক্তব্য পেশ করে চলল তখন আমি পুলকিতচিত্তে আর একজন ভবঘুরের মতই মহামানবের কথা যিনি সমগ্রবিশ্বের জন্য কলম ধরলেও বোম্বাইয়ের প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব অন্তরে পোষণ করতেন। এক কবিতার মাধ্যমে মনোভাব ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন—'বিশ্বের নগরে নগরে এক গর্ববোধ আর প্রতিযোগিতা তো রয়েছেই। আর সে নগরগুলোতে যারা ভূমিষ্ঠ হয়, গায়ে গতরে বাড়ে' তারা যেখানে সেখানে চক্কর মেরে বেড়ালেও শিশু যেমন মায়ের কোল ছুঁয়ে থাকে তারাও ঠিক তেমনি আপন আপন নগরকেই আঁকড়ে থাকে।' পথ চলতে গিয়ে তারা যখনই অপরিচিত কোলাহলমুখর পথ পাড়ি দেয় তখনই নিজের একান্ত ভাললাগা, বিশ্বস্ত আর নির্বোধ নগরটার কথা মনের কোণে উঁকি দেয়। মিঃ কিপলিং-কে আমি তার অজ্ঞাতেই ধরতে সক্ষম হয়েছি বলে আমি যারপরনাই আনন্দিতই হলাম। তার অন্তরের গভীরে ডুব দিয়ে আমি এমন একজনকে প্রত্যক্ষ করেছি যার মধ্যে নিজের জন্মভূমি বা দেশের জন্য সংকীর্ণ অহঙ্কারের লেশমাত্র নেই। আর তাকে যদি নেহাৎ প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতেই হয় তবে তা করবেন সমগ্র বিশ্বকে নিয়ে। চাঁদ আর মঙ্গলগ্রহবাসীদের প্রতিপক্ষ হিসাবে। কেবলমাত্র নিজের নগরের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকার পাত্র সে অবশ্যই নয়।

কাফের টেবিলে বসেই ই. রাশমোর কগ্‌লান এসব কথা অনর্গল বলে যেতে লাগলেন।

সোৎসাহে শুনলাম। সে যখন সাইবেরিয়ার রেলপথের ভৌগোলিক অবস্থানের বিবরণ আমার কাছে ব্যক্ত করতে লাগল ইতিমধ্যে অর্কেস্ট্রার বাজনা তুঙ্গে উঠে গেছে। হলের টেবিলগুলো থেকে হাততালি আর উল্লাস সব কিছুকে ম্লান করে দিল। একথা তো সত্য যে, নিউইয়র্ক শহরের প্রতিটা কাফে, রেস্তোরাঁ, পানশালায় প্রতি সন্ধ্যাতেই এরকম দৃশ্য চোখে পড়ে। কেন? এ ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্নতর মত পোষণ করে। কেউ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসতেই শহরের দক্ষিণাঞ্চলের মানুষরা পানশালায় এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তবে? উত্তরাঞ্চলের শহরের পানশালাগুলোতেই বা ভিড় কেন উপচে পড়ে? ব্যাপারটা সমস্যারই বটে। তবে এ সমস্যা থেকে উত্তোরণ অসম্ভব নয়। স্পেনের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ, দীর্ঘদিন যাবৎ টাঁকশালের ঔদার্য, অত্যাধিক ফসল উৎপাদন, নিউ অর্লিয়ান্সের রেসের মাঠে পরপর কয়েকটা বড় মাপের জয় আর উত্তর ক্যারোলিনা সমাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ইন্ডিয়ানা আর কান্সাসের নাগরিকদের আয়োজিত জাঁকজমকপূর্ণ কয়েকটা ভোজসভার আয়োজন—সব মিলে মানহাট্টানে দক্ষিণ অঞ্চলই সম্প্রতি অগ্রগণ্য হয়ে উঠেছে।

অর্কেস্ট্রার বাজনা যখন তুঙ্গে উঠেছে তখন কালো চুলওয়ালা এক যুবক অতর্কিতে লাফিয়ে টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে মাথার টুপিটা খুলে হাতে নিয়ে নাচাতে নাচাতে গেরিলার মত অনবরত গরজাতে লাগল। পর মুহূর্তেই ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে এগিয়ে আমাদের টেবিলের খালি চেয়ারটায় ধপাস করে বসে পড়ল। সিগারেট কেস থেকে একটা সিগারেট বের করে অগ্নি সংযোগ করল। পরপর কয়েকটা লম্বা টান দিয়ে এক গাল ধোঁয়া ঘরময় ছড়িয়ে দিল। তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত্রের অন্ধকার নেমে এসে ভিড় কমে গিয়ে হলঘরটা ক্রমে পাতলা হতে লাগল।

আমাদের টেবিলের একজন তিনটে বোতল চাইল। কালো চুলওয়ালা যুবকটা মুচকি হেসে আমাকে জানিয়ে দিল যে, সে-ও ওই তিনটে বোতলের ভাগীদার। আমি তার কাছে একটা প্রশ্ন রাখলাম, যদি বিশেষ আপত্তি না থাকে তবে আপনি কোন অঞ্চলের অধিবাসী, অনুগ্রহ করে—।

ই. রাশমোর কগ্‌লান টেবিলের ওপর আচমকা একটা ঘুঁষি মারতেই আমার বাক্‌রোধ হয়ে গেল।

আমি আবার মুখ খোলার আগেই ই. রাশমোর কগ্‌লান বেশ বিরক্তিভাবেই বলে উঠল, এরকম প্রশ্ন আমি পছন্দ করি না মশাই। কে, কোন অঞ্চল থেকে এসেছে তা নিয়ে অত ভাববার কি থাকতে পারে, বুঝছি না তো? পোস্ট অফিসের ঠিকানা দিয়ে একজনের বিচার করা কি উচিত? মশাই কেন্টাকির এমন বহুমানুষকে আমি জানি যে বা যারা হুইস্কির নাম শুনলে নাক বাঁকায়, ভার্জিনিয়ার বহু মানুষকে আমি চিনি যারা পোচাহন্তাসের বংশোদ্ভূত নয় আবার এমন ইন্ডিয়ানার অধিবাসী যারা একটাও উপন্যাস রচনা করেনি, হৈ হট্টগোল প্রিয় ইংরেজও বহু দেখেছি, মেক্সিকোর এমন অধিবাসী দেখেছি যারা রূপোর ডলার সাঁটা ভেলভেটের ট্রাউজার ব্যবহার করেন, মাথা ঠাণ্ডা দক্ষিণ অঞ্চলের অধিবাসী, পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তি সম্পন্ন মানুষ দেখেছি আবার এমন নিউইয়র্কবাসীদের এমন ব্যস্তবাগীস মানুষকেও দেখেছি যে বা যারা এক হাতওয়ালা মুদিকে কাগজের ঠোঙায় টক ফল মেপে দেওয়ার জন্য এক মুহূর্তও সময় দিতে নারাজ। আর? আর বেহিসেবী ইয়াঙ্কিও কম দেখিনি। তাই বলছি কি, মানুষকে মানুষের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করুন, মানুষ বলেই মেনে নিন, কোন বিশেষ তকমা পরিয়ে তাকে ছোট ভাববেন না।

ধৈর্য ধরে তার সব কথা শোনার পর আমি মুখ খুললাম, কিছু মনে করবেন না, আমার কৌতূহলটা কিন্তু একেবারেই নিরর্থক নয়। দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষদের আমি জানি, আর বাদকরা যখন এ সুরটা বাজায় তখন আমি মন দিয়ে লক্ষ্যও করে থাকি। আমার মধ্যে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছে যে ব্যক্তি ওই বাদ্যযন্ত্রের সুরের প্রশংসায় দৈহিক হিংস্রতা ও আঞ্চলিকতাকে আঁকড়ে ধরে, সে সেকসাস এন. জে.-ই বটে, নইলে হার্লেম নদী আর সারে পর্বত লাইসিয়ামের মধ্যবর্তী জেলা-শহরের বাসিন্দা। আমার বিশ্বাসটা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবার জন্য ভদ্রলোকের কাছে প্রশ্নটা উত্থাপন করতে না করতেই আমাকে আপনি থামিয়ে দিলেন। আমি তো স্বীকারই করছি, এ প্রসঙ্গে আপনি বিশেষ মত পোষণ করছেন।

ই. রাশমোর কগ্‌লান বলল, দেখুন মশাই। আমি বারোবার ভূ-পর্যটন করেছি। উপারনেভিকের

এক এস্কিমোর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে যে লোক মারফৎ সে সিনসিনাটি থেকে গলাবন্ধ আনিয়ে ব্যবহার করে। আর এক উরুগুয়েবাসী মেষপালকের সঙ্গে মুখোমুখি হতে পেরেছিলাম যে 'ব্যাটল ক্রীক প্রাতরাশ' খাদ্য প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে পুরস্কৃত হয়েছে। আরও বলছি শুনুন, ইয়োকোহামা ও মিশরের কায়রোতে একটা করে ঘর ভাড়া করে রেখে দিয়েছি। সাংহাইয়ের এক চায়ের দোকানে আসার জন্য এক জোড়া চপ্পল সব সময়ই রাখা থাকে। আরও শুনবেন? রিও জেনেইরো সিয়েটলের হোটেলগুলোর পাচকদের বলে দিতে হয় না কিভাবে আমার জন্য ডিমের ঝোল রান্না করতে হবে। আরে মশাই, আমাদের এ পুরনো ভূ-ভাগটা তো আর ছোট্ট একটা বল নয়। তার বাড়িটা দক্ষিণে নাকি উত্তরে অবস্থিত, নাকি উপত্যকার সাবেকী আমলের জমিদারের প্রাসাদ। নইলে ক্লিভল্যান্ড অথবা ইউক্লিভ এভিনিউ অথবা পাইকস পর্বতচূড়া, ফেয়ারফ্যাক্স জেলা, হুলিগানের ফ্ল্যাটবাড়ি অথবা ময়লা আবর্জনাময় পুরনো শহর বা অন্য যেকোন স্থানেই হোক বা দশ একর জুড়ে বিলের জলই হোক না কেন, তা নিয়ে এত মাতামাতি করার কি থাকতে পারে বুঝছি না তো! যেকোন অঞ্চলে, নগরে বা গ্রামগঞ্জে দৈবক্রমে জন্মেছি বলে সেটা নিয়ে যদি আমরা মাতামাতি না করি তবে তো আমাদের পৃথিবীটা আরও অনেক, অনেক বেশী সুন্দর হয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে।

তার কথা শেষ হলে আমি মুখে হাসির ছোপ ফুটিয়ে তুলে বললাম, 'দেখুন, আপনাকে একজন ভবঘুরে, যথার্থ বিশ্ব নাগরিক বলেই আমি মনে করছি। তবে এ-ও মনে হচ্ছে, দেশাত্মবোধের প্রতি আপনার অনীহা—অন্তরে বীতশ্রদ্ধা পোষণ করেন।

ই. রাশমোর কগ্‌লান রীতিমত দৃঢ়তার সঙ্গেই বলল, 'ধরে নিন না, ওটা প্রস্তরযুগের ধ্বংসাবশেষ। আমরা পৃথিবীর সব দেশের সব অঞ্চলের মানুষরা পরস্পরের ভাই। নিজের রাষ্ট্র, নিজের রাজ্য, নিজের দেশ, নিজের অঞ্চল, এসব তুচ্ছাতি তুচ্ছ আত্মম্ভরিতা একদিন ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে। আমরা সবাই মিলেঝুলে একই পৃথিবীর মানুষ হয়ে যাব, এটা হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

তার কথা প্রসঙ্গে আমি তবু বললাম, আপনি যখন দেশ-বিদেশে চক্কর মেরে বেড়ান তখনও কি আপনার চিন্তা ভাবনা কোন একটা বিশেষ অঞ্চল বা নগর—কোন ভাল লাগা আর—।

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ই. রাশমোর কগ্‌লান বলতে শুরু করল, বড্ড ছোট্ট, বড্ড ছোট্ট জায়গা মশাই। গ্রহমণ্ডলে পৃথিবী নামে পরিচিত গ্রহটাই আমার বাসস্থল, আমার ঠিকানা। দেখুন, এ দেশের বহু দেশপ্রেমিক নাগরিকের সঙ্গে বিদেশের মাটিতে আমার দেখা হয়েছে। আমি শিকাগোর বহু ব্যক্তিকে দেখেছি যারা জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে ভেনিসের গন্ডোলায় বসে স্বদেশের জল নিষ্কাশন খালের বর্ণনায় একেবারে আত্মহারা হয়ে পড়েছে। দক্ষিণাঞ্চলের এক ব্যক্তিকে আমি দেখেছি, যে ইংল্যান্ডের রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও পরিচিত হবার পর এক চিলতে কাগজে লিখে জানায় যে তার মায়ের সম্পর্কিত দিদিমা বিবাহসূত্রে চার্লস্টনের পারকিন্স পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। এমন চিন্তা-ভাবনা আমি মোটেই বরদাস্ত করতে পারি না। জেনে রাখুন, আট হাজার মাইল ব্যাস বিশিষ্ট নয়, এমন কোন ভূ-ভাগের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই। ই. রাশমোর কগ্‌লান, মহাবিশ্বের বাসিন্দা, ব্যস, এটাই আমার নাম আর ঠিকানা, লিখে নিন।

কথাটা বলতে বলতে ভবঘুরে ই. রাশমোর কগ্‌লান নমস্কার জানিয়ে আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কাফে ছেড়ে বেরিয়ে গেল। তার বিশ্বাস ছিল, ধূমপান আর আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তিনি একজন পূর্ব পরিচিত ব্যক্তিরই মুখোমুখি হয়েছেন। এবার আমার সঙ্গী হিসাবে রইল শুক্তিমশাই, গলা পর্যন্ত মদ গিলে এমনই বুঁদ হয়ে পড়েছেন যে, উপত্যকার শীর্ষে উঠে গানের ধরার বাঞ্ছাটা প্রকাশ করার শক্তিটুকুও তাঁর মধ্যে অবশিষ্ট নেই।

বিটুইন রাউন্ডস্

মিসেস মার্ফি-র বোর্ডিং বাড়িটার ওপর মে মাসের চাঁদের আলো লুটোপুটি খাচ্ছে। পঞ্জিকার পাতায় লেখা রয়েছে, এমন বিশাল ভূখণ্ড আবিষ্কৃত হবে যার ওপরেও চাঁদের ধবধবে আলো লুটিয়ে পড়বে। চারদিকে বসন্তের ছাপ লক্ষিত হচ্ছে। ব্যস, এবার সর্দি-জ্বরের ধুম পড়ে যাবে। গাছে গাছে নতুন পাতা আর বিচিত্র সব ফুলের ছড়াছড়ি।

বোর্ডিং বাড়ির এক গোলগাল বাসিন্দা লম্বা-চওড়া একটা আসন পেতে বসে রয়েছে। মিসেস ম্যাকক্যাস্কি স্বামীর প্রতীক্ষায় পথের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে জানালায় বসে রয়েছে। টেবিলে রাত্রের খাবার ঠাণ্ডা বরফ হচ্ছে। আর মিসেস ম্যাকক্যাস্কি রাগে ভেতরে ভেতরে ফুঁসছে।

ঘড়িতে ন'টা বাজল। সিঁড়িতে মিঃ ম্যাকক্যাস্কি-র জুতোর শব্দ শোনা গেল। কোটটা ভাঁজ করে বাঁ-হাতে আর জ্বলন্ত চুরুট দাঁতে চেপে ধরে ন'নম্বর ইয়া ভারি জুতো পায়ে সিঁড়ি অতিক্রম করার সময় অন্যসব বাসিন্দার অসুবিধা হওয়ার সম্ভাবনায় সবার কাছে মার্জনা ভিক্ষা করতে করতে একের পর এক ধাপ অতিক্রম করে চলেছে।

ঘরের দরজা খুলেই সে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে পড়ল। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী আলু থ্যাঁতো করার নোড়া বা স্টোভের ঢাকনার পরিবর্তে গুচ্ছেরখানেক ধ্বনি তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল। হ্যাঁ, ব্যাপারটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। সে অনুমান করল, মে-মাসের চাঁদটা তার সহধর্মিনীর অন্তরটাকে নির্ঘাৎ নরম করে দিয়েছে। আশ্চর্য!

নোড়া আর নোড়ার পরিবর্তে কণ্ঠস্বরের চরম আঘাত শুরু হল। মনে করেছ, কিছুই আমার কানে আসেনি, তাই না? পথে বিছিয়ে রাখা যত্তসব বাজেলোকের ফ্রকগুলোকে গোদা জুতো দিয়ে মাড়িয়ে দেবার জন্য তাদের কাছে বার বার মার্জনা ভিক্ষা করতে তোমার এতটুকু বাঁধে না, আর নিজের বিয়ে করা বৌয়ের বুকের ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়েও মুখ ফুটে বলতে পার না, একটা চুমু খাও। আর তোমার পথ চেয়ে বসে থাকতে থাকতে খাবারগুলো ঠাণ্ডা বরফ হয়ে গেল! আচ্ছা পুরুষ মানুষ রে বাবা!

টুপি আর কোটটা চেয়ারের ওপর আছাড় মেলে ফেলে মিঃ ম্যাকক্যাস্কি বলে উঠল 'উফ্! বকবকানি রেখে দুটো খেতে দাও। ক্ষিধেতে নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত—শিষ্টাচারের বদলে পদাঘাত কর তখন আসলে সমাজের ভিঁতের ইঁটের ওপরের মশলাটুকু নিঃশেষে উঠিয়ে ফেলে তবেই রেহাই দাও।

মিসেস ম্যাকক্যাস্কি যেন তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। গলা আরও পঞ্চমে চড়িয়ে স্বামী দেবতার পিণ্ডি চটকাতে লাগল।

মিঃ ম্যাকক্যাস্কিও সম পর্যায়ে গলা চড়িয়ে বলল, বাজে কথা রেখে তোমার শুয়োরের মত সুন্দর মুখটা বের করে খাবারের আয়োজন করবে কিনা, শুনতে চাই।

মিসেস ম্যাক্ক্যাস্কি আচমকা নিজেকে সামলে নিয়ে গম্ভীর মুখে স্টোভটা ধরাতে লাগল। তার মুখের আকস্মিক গাম্ভীর্যকে ঝড়ের পূর্বাভাষ বলা চলে। অর্থাৎ তার মুখের কোণ দুটো যখন ব্যারোমিটারের মতই হঠাৎ থেমে যায় তখন ধরে নিতে হবে জিনিসপত্র বাসনপত্র যা কিছু আছে সব আছড়াআছড়ি ভাঙাভাঙি খেল শুরু হল বলে।

কি বললে, শুয়োরের মত মুখ, তাই না? গমগম করতে করতে মিসেস ম্যাক্ক্যাস্কি শুয়োরের মাংস আর শালগমের স্টু ভর্তি গামলাটা স্বামীর দিকে সজোরে ঠেলে দিল।

এর উচিত জবাব কি তা মিঃ ম্যাকক্যাস্কি-রও অজানা নয়। আর কোনটার পর কোনটা ব্যবহার করতে হবে তা-ও সে ভালই জানে। টেবিলের ওপর থেকে শুয়োরের শিরদাঁড়ার রোস্টের পাত্রটা ছুঁড়ে দিয়ে সে বদলা নিল। ব্যস, মুহূর্তের মধ্যেই জবাব এল, রুটি আর পুডিংয়ের মাটির গামলাটার মাধ্যমে। আর স্বামীর নির্ভুল নিশানায় ছুঁড়ে দেওয়া সুইস ছানার শক্ত একটা পিণ্ড তীরবেগে উড়ে এসে মিসেস ম্যাকক্যাস্কি-র চোখের ঠিক নিচে সজোরে আঘাত হানল। সে-ও কালো গরম কফির পাত্রটাকে অব্যর্থ লক্ষ্যে ছুঁড়ে দিল। প্রচলিত অভ্যাস অনুযায়ী এখানেই লড়াইয়ের যবনিকা পতন হওয়া উচিত ছিল।

তবে মিঃ ম্যাকক্যাস্কি যে এত অল্পে দমবার পাত্র নয়। হাতের কাছের পাথরের ওয়াল-বেসিনটা দু হাতে তুলে দুম করে তার বিবাহসূত্রে লব্ধ প্রতিপক্ষের মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল। বরাত ভাল যে, মিসেস ম্যাকক্যাস্কি সময়মত মাথাটা কাৎ করে আঘাতটাকে ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হল। চোখের পলকে সে এবার ইস্পাতের ইস্ত্রিটাকে শক্ত করে ধরল। ভাবল, এটা দিয়েই ভোজনযুদ্ধ পর্বের যবনিকাপাত ঘটাবে।

কিন্তু মিসেস ম্যাকক্যাস্কি ইস্ত্রিটার হাতলে হাত দেওয়ামাত্র নিচতলার ঘর থেকে বাতাসবাহিত বিকট আর্তস্বর তাদের কানে এল। তখনকার মত যুদ্ধবিরতি না ঘটিয়ে উপায় রইল না।

ক্লিয়ারি নামধারী এক পুলিশ বাড়িটার গলির আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে উৎকর্ণ হয়ে আসবাবপত্র আর বাসনকোসন ছোঁড়াছুঁড়ি ভাঙাভাঙির শব্দ শুনতে লাগল। সে ধরেই নিল জন ম্যাক্ক্যাস্কি আর তার সতীলক্ষ্মী স্ত্রী যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। সে কি ওপরে, তাদের ঘরে গিয়ে যুদ্ধটা থামাবে? পরমুহূর্তেই সিদ্ধান্ত নিল, এটা করবে না। স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার। তাদের সুবিধা অসুবিধার ব্যাপার তো কিছু না কিছু থাকতেই পারে। এর মধ্যে নাক গলাতে যাওয়া মোটেই সঙ্গত নয়। আর এ বিবাদ দীর্ঘস্থায়ীও হবে না। যুদ্ধ অব্যাহত রাখতে হলে তাদের তো অন্য কারো কাছ থেকে কিছু থালা-ঘটি-বাটি অবশ্যই ধার করে আনা দরকার।

এর মধ্যে সিঁড়ির প্রতিটা ধাপে কৌতূহলী লোকজন জড়ো হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে রয়েছে একজন রহস্যভেদী। নাম তার মিঃ টুমে। চিৎকার চেঁচামেচি শুনে সে হন্তদন্ত হয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। খবর পেল মিসেস মার্ফি-র ছোট ছেলে মাইককে পাওয়া যাচ্ছে না, নিরুদ্দেশ। মিসেস মার্ফি বুকফাঁটা আর্তনাদ করতে করতে তার পিছন পিছন দৌড়ে বেরিয়ে এল।

মিঃ টুমে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মিস পার্ডি-র পাশের ফাঁকা জায়গাটায় বসল। আকস্মিক বিপদের সহানুভূতিতে বিচলিত হওয়ায় তাদের হাত পরস্পরের বেষ্টনিতে আবদ্ধ হল।

দুটো পরিচারিকা সহানুভূতির স্বরে বলে উঠল, ঘড়ির পিছনটা ভাল করে দেখা হয়েছে তো?

সিঁড়িটার সবার ওপরের ধাপে নাদুসনুদুস স্ত্রীর গা-ঘেঁষে মেজর গ্রিগ বসে। এক সময় তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বলে উঠল, ব্যাপার কি? বাচ্চাটা হারিয়ে গেছে? আমি তার খোঁজে শহর তোলপাড় করে ছাড়ব। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, অন্ধকার হবার পর তার স্ত্রী কিছুতেই তাকে বাড়ির বাইরে যেতে দেয় না। অনেক ভেবে চিন্তে সে বিষণ্ণমুখে বলল, লড্‌ভিক, তবে না হয় যাও। খুঁজে দেখ যদি কিছু করতে পার। এ মায়ের দুঃখ দেখেও যার চোখ দিয়ে জল আসে না তার বুকটা তো পাষাণ।

মেজর বলল, তবে আমাকে ত্রিশটা—না। ষাটটা সেন্টই দাও। বে-পাত্তা হয়ে যাওয়া ছেলেরা কোন কোন ক্ষেত্রে বহুদূরে চলে যায়। তাই যদি হয় তবে তো গাড়িভাড়া লাগবেই।

চারতলার বুড়ো ডেনি খবরের কাগজের ওপর চোখ বুলাতে বুলাতে মিসেস মার্ফি'কে বলল, বল তো, তাকে সবশেষে কখন দেখেছিলে?

বিকট স্বরে আর্তনাদ করতে করতে মিসেস মার্ফি কোনরকমে বলল, হয়ত গতকাল, নইলে চারঘণ্টা আগেও হতে পারে, আমার জানা নেই। তবে আমার বাছা মাইক যে হারিয়ে গেছে এতে কোন সন্দেহই নেই। কয়েক মুহূর্ত বিলাপ পেড়ে কেঁদে নিয়ে সে আবার বলতে লাগল, আজ সকালেও গলিতে খেলেছে, হায় ঈশ্বর! আজ, নাকি সেটা বুধবার ছিল? সাত রকম কাজে এত ব্যস্ত থাকি যে, সন-তারিখ ঠিক রাখা মুশকিল। কিন্তু সারা বাড়ি খুঁজেছি। না, কোথাও তাকে পেলাম না। ঈশ্বরের দোহাই, হায় ঈশ্বর!

মূক, কঠোর, সুবিশাল শহরটা কারো নিন্দা বা স্তুতি নিয়ে ভাবে না। সবার মুখে একই কথা লোহার মত কঠিন আর রাস্তাগুলো লাভাস্রোতের মতই নির্দয়।

ছোট্ট একটা ছেলে গায়েব হয়ে গেলে পরিচিত মহলে যেমন হৈচৈ পড়ে যায় অন্য কোন বিপদে ততটা হয় না।

বাড়ি থেকে বেরিয়েই মেজর গ্রিগস্ দৌড়োতে দৌড়োতে বিল-এর বাড়ি হাজির হল। তার পরিচারক বলল, আমাকে একটা খবর দিতে পার? বাঁকা বাঁকা পা, বিচ্ছিরি মুখ, দু'বছরের একটা চেড়ে পাকা ছেলেকে কি দেখেছ? হারিয়ে গেছে।

মিঃ টুমে তখনও মিস পার্ডি-র হাত ধরে রেখেই দাঁড়িয়ে আছেন। মিস পার্ডি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, মায়ের বুক থেকে হারিয়ে যাওয়া শিশুটার কথা ভেবে দেখ তো। কে বলতে পারে, চলন্ত ঘোড়ার গাড়ীর তলাতেই পড়েছে কিনা। উফ! কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার, ভাবা যায়!

অবশ্যই। তুমি বললে আমিও বেরিয়ে তার খোঁজ করতে পারি।

মিঃ টুমে আমিও এটাই ভাবছি। কিন্তু তুমি যা ব্যস্তবাগীশ আর বেপরোয়া মানুষ মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহে দুর্ঘটনার শিকার না হয়ে পড়, ভয় হয়।

বুড়ো ডেনি তখনও খবরের কাগজের ওপর চোখ বুলাচ্ছে।

মিঃ ও মিসেস ম্যাকক্যাস্কি ঘর থেকে বেরিয়ে খোলা জানলায় দাঁড়িয়ে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। নিচতলা থেকে হৈ হট্টগোল ভেসে আসায় জানালা দিয়ে ঘাড় বাড়িয়ে উঁকি দিল। বার কয়েক উঁকি ঝুঁকি মেরে মিসেস ম্যাকক্যাস্কি গলা নামিয়ে বলল, মাইক'কে পাওয়া যাচ্ছে না, হারিয়ে গেছে! চিনতে পারছ না? ওই যে নাদুসনুদুস বিচ্ছু ছেলেটা—এবার চিনেছ?

তাই নাকি? বাচ্চাটা কোথায় উবে গেল? ছোট্ট ছেলে বলেই তো ব্যাপারটা খুবই চিন্তার। সে ছেলে না হয়ে মেয়ে হলে খুবই ভাল হত। কারণ, মেয়েদের অনুপস্থিতি মানে বাড়িতে শান্তি-স্বস্তি বিরাজ করা।

মিসেস ম্যাকক্যাস্কি এত বড় একটা গা জ্বালা-করা কথাটাকে মুখবুজে হজম করে বলল। জন, মিসেস মার্ফি-র ছোট্ট ছেলেটা নিখোঁজ, হারিয়ে গেছে। বয়স মাত্র ছ'বছর। ছ'বছর আগে আমার যদি একটা ছেলে জন্মাত তবে তার বয়সও তো তার সমানই হত, তাই না জন? আর আমাদের যদি ছেলে থাকত, আর সে যদি হারিয়ে যেত তবে আমরাও তো শোকে আকুল হয়ে পড়তাম, ঠিক কিনা? মুহূর্তকাল নীরবতার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে মিসেস ম্যাকক্যাস্কি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'জন, তোমার প্রতি, মানে তোমাকে কিছু কটু কথা বলার জন্য আমি যারপরনাই মর্মাহত।'

যা হবার হয়ে গেছে। ওসব কথা ছাড়ান দাও। তাড়াতাড়ি এক কাপ কফি তৈরী কর।

স্বামীর হাতটা জড়িয়ে ধরে মিসেস ম্যাকক্যাস্কি আবেগভরে বলল, 'মিসেস মার্ফি কেমন কেঁদে আকুল হচ্ছে ওই শোন! এত বড় একটা শহরে একটা বাচ্চা হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা সত্যি মারাত্মক। সে যদি আমাদের ছেলে হত তবে আমার বুকটা ফেঁটে চৌচির হয়ে যেত।

মিঃ ম্যাকক্যাস্কি দু'হাতে স্ত্রীর গলাটা জড়িয়ে ধরে বলল। এরকম ভাবা বোকামি ছাড়া কিছু নয়। আমার ছেলে প্যাটকে যদি কেউ চুরি করে নিয়ে যেত, অথবা তার কিছু ঘটলে আমি অবশ্যই দুঃখে ভেঙে পড়তাম। কিন্তু কোনদিনই আমাদের ছেলে ছিল না। জুডি, আমি মাঝে মাঝে তোমার ওপর চটে যাই সত্য। সে সব কথা মন থেকে মুছে ফেল।'

গলি দিয়ে কত লোকই না যাতায়াত করছে। টুকরো টুকরো কত কথাই না ভেসে আসছে, কত সব গুজবই না শোনা যাচ্ছে। বোর্ডিং বাড়িটার সামনে হঠাৎ একটা হৈ হট্টগোল শুরু হল।

মিসেস ম্যাকক্যাস্কি উৎকর্ণ হয়ে ব্যাপারটা সম্বন্ধে সামান্য ধারণা নিয়ে বলল, মিসেস মার্ফি-র কণ্ঠস্বর। সে বলছে, বাচ্চা মাইককে পাওয়া গেছে। তার ঘরের বিছানার তলার লিনোলিয়ামের আড়ালে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ব্যস, এটুকুই।

দেখ তো কাণ্ডটা! আমি হলপ করে বলতে পারি, আমাদের ছেলে হলে কখনই এমন কাজ করত না। যে ছেলে কোনদিন আমাদের বরাতে জোটেনি, সে যদি হারিয়েই যেত বা চুরি যেত তবে তার নাম হত ফেলান। আর হারিয়ে যাওয়া ফেলানকে কুকুরছানার মত বিছানার চাদরের তলায়ই মিলত।

গলিতে আবার পুলিশ ক্লিয়ারি-র মুখ ভেসে উঠল। ইতিমধ্যে ভিড় অনেক কমে গেছে। সে আবার ম্যাকক্যাস্কিদের ঘরের দিকে মুখ তুলে উৎকর্ণ হয়ে লক্ষ্য করতে লাগল। আবার তাদের ঘর থেকে কাঁচ, চিনেমাটি আর লোহার বাসনপত্র আছড়া আছড়ি ভাঙাভাঙির শব্দ ভেসে আসতে লাগল। সে পকেট থেকে ঘড়িটা বের করে সোল্লাসে বলে উঠল, জমেছে। আবার যুদ্ধ জমে উঠেছে! মিঃ অ্যান্ড মিসেস ম্যাক্‌ক্যাস্কি এক ঘণ্টা পনের মিনিট ধরে জব্বর লড়াই করে চলেছে। মিসেস ম্যাক্‌ক্যাস্কি চল্লিশ পাউন্ড ওজনের এক ঘুঁষি বসাচ্ছে। মহিলাটার হাতের বলশক্তি আছে বটে। হাতে দানবীর শক্তি ধরে।

বাই ক্যুরিয়ার

তখন পার্কে লোক যাতায়াতের ঋতু বা সময় কোনটাই নয়। আর যে যুবতীটা পার্কের পথের ধারের বেঞ্চটায় বসে রয়েছে অবশ্যই সে কোন এক আকস্মিক আবেগ-মোহের বশেই এখানে হাজির হয়েছে, আসন্ন বসন্তকে স্বাগত জানাতে, উপভোগ করতে উৎসাহী হয়েছে।

আসলে কিন্তু কিছুটা সময় বিশ্রাম নিতেই বিষণ্ণমুখে যুবতীটা সেখানে বসেছে। তার চোখে মুখে যে বিষণ্ণতার ছায়া লক্ষিত হচ্ছে সেটাও সাময়িকই ঘটনার ফল, চিরস্থায়ী ব্যাপার অবশ্যই নয়। কারণ, সে বিষণ্ণতা তার গালের মনোলোভা রূপ সৌন্দর্য আর যৌবনোচিত ভঙ্গীতে তিলমাত্র পরিবর্তনও ঘটাতে পারে নি।

যুবতীটা যে বেঞ্চে বিষণ্ণমুখে বসে, তার লাগোয়া পথ দিয়ে এক দীর্ঘাকৃতি যুবক পার্কে ঢুকল। এক ছোকরা স্যুটকেস হাতে তার পিছন পিছন চলেছে। যুবতীটাকে দেখামাত্রই আগন্তুক যুবকের মুখটা অকস্মাৎ লাল হয়েই পরমুহূর্তে আবার ম্লান হয়ে এল। আর কয়েক পা এগিয়ে আশা ও উৎকণ্ঠা মিশ্রিত চাহনিতে যুবতীটার দিকে তাকাল। ব্যস, এবার তার সামান্য দূর দিয়েই সে এগিয়ে গেল। তার উপস্থিতি পথ ধরে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা সম্বন্ধে যুবতীটা সচেতন কিনা সেরকম কোন প্রমাণই তার চোখে মুখে প্রকাশ পেল না।

এগিয়ে গজ পঞ্চাশেক দূরে গিয়ে যুবকটা হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনের একটা খালি-বেঞ্চেও বসল। হাতের স্যুটকেসটা মাটিতে নামিয়ে ছোকরাটা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল।

যুবকটা কোটের পকেট থেকে একচিলতে কাগজ বের করে ছোকরাটার হাতে দিয়ে বলল, ওই বেঞ্চে বসা যুবতীটাকে এ চিরকুটটা দিয়ে এস। বলবে, সানফ্রান্সিসকো যাবার পথে আমি স্টেশনে থাকব। সেখানে আলাস্কা হরিণ-শিকার অভিযানে আমিও সঙ্গী হব। আর তার সঙ্গে কথা না বলা বা চিঠি না-দেওয়ার নির্দেশ দেওয়ায় এ পথটাই আমাকে বেছে নিতে হয়েছে। আর এ-ও বলবে, কোন কারণ না দেখিয়ে, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে কাউকে শাস্তি দেওয়া, তাকে নিজের জীবন ঝেড়ে ফেলে দেওয়া—অথচ সে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য নয়, সে যুবতীর স্বভাববিরুদ্ধ কাজ বলেই আমি মনে করি। তাকে বুঝিয়ে বলবে, তার নির্দেশটাকে আমি তিলমাত্র আমান্য করেছি এ প্রত্যাশা নিয়ে যে, হয়ত বা সে আমার প্রতি ন্যায়বিচার করলে করতেও পারে। যাও, চিরকুটটা তাকে দেবে আর যা যা বললাম সব গুছিয়ে ওকে বলবে। কথাটা বলতে বলতে তার হাতে আধা ডলার বকশিস স্বরূপ গুঁজে দিল।

ছোকরাটা ব্যস্ত পায়ে বেঞ্চে বসে থাকা যুবতীটার হাতে চিরকুটটা তুলে দিতে দিতে বলল, ওই ভদ্রলোক এটা আপনাকে দিতে বলেছেন। তিনি যদি আপনার অপরিচিত হন, আপনার সঙ্গে উপযাচক হয়ে আপনার সঙ্গে হাসিঠাট্টা, রঙ্গরসিকতা করে আপনাকে বিরক্ত করার চেষ্টা করে থাকেন তবে আমাকে বলুন, মিনিট কয়েকের মধ্যেই আমি পুলিশ ডেকে এনে আচ্ছা করে জব্দ করে দিচ্ছি। আর যদি তিনি আপনার পরিচিতই হন তবে তিনি পার্কের ভেতরেই রয়েছেন। তবে—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই যুবতীটা ব্যস্ততার সঙ্গে বলে উঠল, না, না। পুলিশ টুলিশ ডাকার দরকার নেই। তাকে আমি এক সময় চিনতাম বটে।

মাদাম, আমি যা বলতে চাইছি তা অবশ্যই আপনি অনুমান করতে পারছেন, ঠিক কিনা? তিনি বলে পাঠিয়েছেন, তিনি ফ্রিস্কো'র পথে যাত্রা করছেন। তারপর তিনি ক্লন্ডাইক-এ যাবেন। সেখানে সামুদ্রিক পাখি শিকার অভিযানে যোগ দেবেন। যাক গে, আপনি নাকি তাঁকে বাতিল, মানে দূরে ঠেলে দিয়েছেন। কিন্তু আত্মপক্ষ সমর্থন, অর্থাৎ তাঁর মনের কথা আপনাকে বুঝিয়ে বলার সময়-সুযোগও তাকে দেন নি। আরও আক্ষেপও তিনি করেছেন, চরম আঘাত হেনেছেন অথচ আপনি কোন রকম কারণ দর্শান নি।

যুবতীটার চোখে মুখে পূর্বের আগ্রহটুকু আক্ষুণ্ণরেখেই এবার বলল, 'তুমি এক কাজ করবে, আমার আদর্শের কথা আমি তাকে নতুন করে শোনাতে আগ্রহী নই। আমার আদর্শ কি কি ছিল আশা করি আজও তার মনে আছে, থাকারই কথা। তাকে বুঝিয়ে বলবে, আমি নিজেকে, নিজের অন্তরের সঙ্গে যথাসাধ্য বোঝাপড়া করে দেখেছি, তাই আমার প্রয়োজনের দিকটা আমি

ভালই জানি—বুঝি। তাই তো তার কোন অজুহাত শোনার সামান্যতম উৎসাহ আমার নেই। কারো মুখ থেকে শুনে বা সন্দেহের বশীভূত হয়ে আমি তাকে শাস্তি দেই নি। আর একমাত্র এ জন্যই আমি তার সামনে কোন অভিযোগ তুলে ধরি নি। আর যে কথাগুলো তার খুব ভালই জানা আছে তা-ই যখন সে আবারও জানতে আগ্রহী তখন তুমিও তাকে নতুন করে খোলসা করেই বলে দিও, বুঝলে?

আর তাকে এ-ও বোলো, যে সন্ধ্যাতে মায়ের জন্য গোলাপ ফুল তুলে আনতে আমি পিছনের দরজা দিয়ে কাঁচ ঘরে গিয়েছিলাম। তখন আমি নিজের চোখে দেখেছি, সে মিস অ্যাশবার্টন-এর সঙ্গে লাল করবী গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে অন্তরঙ্গভাবে কথা বলছে। সে সঙ্গে তাকে এ-ও বলতে পার, তাদের আলিঙ্গনটা এতই স্পষ্ট ও অসঙ্গত ছিল যে, আমি তা খোলসা করে তার কাছে ব্যক্ত করার প্রয়োজন বোধ করিনি। আমি কাঁচ-ঘর ছেড়ে আসার সময় গোলাপফুল আর আমার আদর্শ উভয়ই রেখে এসেছিলাম। চিরকুটটা ছোকরাটার হাতে তুলে দিয়ে সে বলল, এটা যে তোমাকে দিয়েছে তাকেই ফিরিয়ে দিও।

ছোকরাটা আমতা আমতা করে বলল, মাদাম, একটা কথা জানতে ইচ্ছা করলেও মুখ ফুটে বলতে বাঁধছে, মানে ওই আলিঙ্গনের ব্যাপারটা যদি একটু খোলসা করে বলেন তবে—

আলিঙ্গন, জাপ্টাজাপ্টিও বলতে পার। নইলে ওটাকে তুমি একজন আদর্শবাদীর পক্ষে ঘনিষ্ঠতা, দৈহিক নৈকট্যও ভাবতে পার।

তার কথায় ছোকরাটা আর এক মুহূর্তও সেখানে না দাঁড়িয়ে ব্যস্তপায়ে যুবকটার কাছে ফিরে গেল। কোন রকম ভূমিকার অবতারণা না করে সরাসরিই বলল, স্যার, মাদাম স্পষ্টই বললেন, ওসব পুরনো ক্ষত ঘাটাঘাটি করে ফয়দা কিছুই হবার নয়। তিনি আমাকে বললেন, গরম ঘর-এর মধ্যে আপনি নাকি একগোছা কেলিকোর পোশাকের সঙ্গে জড়াজড়ি করেছিলেন। তিনি গোলাপ ফুল তুলতে সেখানে গিয়েছিলেন আর আপনি অন্য এক রূপসীকে বুকে তুলে জাপ্টাজাপ্টিতে মেতেছিলেন। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমাকে বললেন, দৃশ্যটা দেখার মতই ছিল বটে, তবে তার বুক ফেটে যাচ্ছিল। তিনি স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন, আপনি নিজের পথে, নিজেকে নিয়েই মেতে থাকুন আর ট্রেনটা ধরার জন্য যাত্রা করুন। এসব নিয়ে তাঁর কোন মাথা ব্যথাই নেই।

যুবকটার কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। কোটের পকেট থেকে এক গোছা চিঠি বের করে তার ভেতর থেকে একটা চিঠি টেনে নিল। সেটা বার কয়েক উল্টেপাল্টে দেখে ছোকরাটার হাতে তুলে দিল। অন্য একটা পকেট থেকে একটা রূপোর ডলার তার হাতে দিয়ে বলল, চিঠিটা মাদামের হাতে দিয়ে বোলো, যেন মন দিয়ে পড়ে। এটা পড়লেই পরিস্থিতিটা সম্বন্ধে পরিপূর্ণ ধারণা করে নিতে পারবে। আর সে সঙ্গে এ-ও বোলো—সে যদি তার আদর্শের সঙ্গে সামান্যতম বিশ্বাসের সাহায্য নিত তবেই মনের জ্বালা-যন্ত্রণা অনেকাংশে লাঘব হয়ে যেত। আর এ-ও বলবে, যে বিশ্বস্ততাকে সে সবার ওপরে স্থান দেয় তার একচুলও হেরফের হয়নি।

সে চিঠিটা নিয়ে যাবার উদ্যোগ করতেই যুবকটা বলল, 'শোন, তাকে বোলো, আমি তার উত্তরের অপেক্ষায় রয়েছি।

চিঠিটা যুবতীটার হাতে তুলে দিয়ে সে বলল, 'মাদাম, তিনি তো রীতিমত সাফাই গাইলেন। আপনি নাকি একেবারেই অহেতুক তাঁকে দোষারোপ করছেন। তিনি মোটেই দুশ্চরিত্র নন। ভাল কথা, আপনি এ চিঠিটা পড়লেই ব্যাপারটা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা করে নিতে পারবেন যে তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক।

যুবতীটা সন্দিগ্ধ মনে চিঠিটার ভাঁজ খুলে চোখের সামনে ধরল। তাতে লেখা, শ্রদ্ধেয় মিঃ আর্নন্ড গত শনিবার গোধূলি বেলায় মিসেস ওয়ালড্রন-এর বাড়ির সম্বর্দ্ধনা অনুষ্ঠানটা যখন চলছিল তখন আমার পরম আদরের মেয়েটা পুরনো হৃদরোগের শিকার হয়ে পড়ে। তখন আপনি স্বেচ্ছায় এগিয়ে গিয়ে যেভাবে চিকিৎসা ও শুশ্রূষার মাধ্যমে তাকে সুস্থ করে তুলেছিলেন তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ না জানালে নিজেকে বড়ই অকৃতজ্ঞ জ্ঞান করব। তা ছাড়া সে যখন প্রায় বেহুঁশ অবস্থায় ঢলে পড়ে তখন আপনি কাছাকাছি ছিলেন বলেই ধরে ফেলতে, এবং কর্তব্য সম্পাদন করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই আমার আদরের মেয়েকে ফিরে পেয়েছি। অন্যথায় তাকে হারিয়ে

চোখের জলে বুক ভাসানো ছাড়া উপায় থাকত না। আপনি যদি অনুগ্রহ করে আমার বাড়িতে একবারটি পায়ের ধুলো দেন আর তার চিকিৎসার দায়িত্ব নেন তবে যারপরনাই খুশি হব।

ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতান্তে।

ভবদীয়

রবার্ট অ্যাশবার্টন।

যুবতীটা চিঠিটা পড়া শেষ করে চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর সেটাকে ভাঁজ করতে করতে প্রায় কান্নাপ্লুত ভাঙা ভাঙা গলায় পত্রবাহক ছোকরাটাকে বলল—ওই বেঞ্চে বসা ভদ্রলোককে গিয়ে বল, যে, তার প্রেয়সী তাকেই চাইছে।

স্প্রিংটাইম এ'লা কোস্ট

সেটা ছিল মার্চের একটা তারিখ।

দোহাই আপনাদের, এভাবে কোন গল্প শুরু করবেন না। এর চেয়ে খারাপ কোন শুরু আছে বলে আমার অন্তত জানা নেই। ব্যাপারটা একেবারেই রসকষহীন। কিছুটা বাতাস দিয়ে ফোলানো ফাঁপানোও বলতে পারেন। তবে একটা কথা কি, এক্ষেত্রে এ রীতিটাকে ব্যবহার করা যেতে পারে। যুক্তি স্বরূপ বলা যেতে পারে গল্পটা যে অনুচ্ছেদ দিয়ে আরম্ভ করা সঙ্গত ছিল সেটা এমন অনুচিত ও অসঙ্গত যে, একেবারে প্রস্তুতি ছাড়া এটাকে পাঠকের সামনে উত্থাপন করা সম্ভব নয়।

সারা হোটেলের মেনুকার্ডটার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই চোখের জল ঝরিয়ে চলেছে। ভাবা যায়, নিউইয়র্ক শহরের একটা মেয়ে চোখের জল ফেলে ফেলে মেনুকার্ডটা ভেজাচ্ছে।

কিন্তু কেন? এর কারণ হিসাবে আপনি অনুমান করতে পারেন হয়ত গলদা চিংড়ির পাত্র খালি, নইলে লেন্ট উৎসবে আইসক্রীম যা ছিল সবই ফুরিয়ে গেছে। তা-ও যদি না হয় তবে সে পেঁয়াজের অর্ডার দিয়েছে, নইলে সবে ম্যাটিনি শো দেখে এসেছে।

ব্যস, এক-এক করে যখন এসব এবং অন্যান্য সব অনুমানই ভ্রান্ত প্রমাণিত হবে সে মুহূর্তেই আপনি গল্পটা ফাঁদতে উৎসাহী হবেন।

পৃথিবীটাকে একটা ঝিনুক বলে যে লোকটা প্রচার করেছিলেন আর তিনি সেটাকে তরবারির আঘাতে দু'টুকরো করে ফেলবেন, তিনি কিন্তু তখন আশাতীত সুখ্যাতি লাভ করেছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি, তরবারির আঘাতে ঝিনুকের খোলটাকে খোলাটা এমন কোন কঠিন কাজ নয়। সে না হয় হল। আপনি কি একটা টাইপরাইটার যন্ত্র ব্যবহার করে কাউকে স্থলচর একটা ঝিনুকের খোলা খুলে ফেলতে দেখেছেন? এক ডজন জ্যান্ত ঝিনুকের খোলা খুলে ফেলার দৃশ্য দেখার জন্য আপনার পক্ষে কিছু সময় দেওয়া সম্ভব?

সারা তার অসুবিধাজনক অস্ত্রটা ব্যবহার করেই যেকোন উপায়েই হোক না কেন ঝিনুকগুলোর খোলা খুলে তার ভেতরের শীতল ও আঁঠালো অংশটাকে বের করার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। স্টেনোগ্রাফি সম্বন্ধে তার তেমন কোন জ্ঞান নেই। তাই ভাল স্টেনোগ্রাফার না হতে পেরে সে কোন অফিস কাছারিতে এ কাজে অভিজ্ঞদের পাশে নিজের আসন জোগাড় করে নিতে পারেনি। যে একজন ফ্রিলান্স স্টেনোগ্রাফার। এ কাজের ধান্ধাতেই সে এখানে-ওখানে ঘোরাঘুরি করছে।

সারা-র এ জীবনযুদ্ধের সবচেয়ে লক্ষণীয় দৃষ্টান্ত হচ্ছে স্কুলেনবের্গ-এর হোম রেস্তোরাঁ সম্বন্ধে তার কাজকর্ম।

সারা যে পুরনো বাড়িটায় থাকে তার ঠিক লাগোয়া বাড়িটাতেই রেস্তোরাঁটা অবস্থিত। এক সন্ধ্যায় স্কুলেনবের্গ-এ চল্লিশ সেন্টের রাতের ভোজের পর সারা রেস্তোরাঁর হরেকরকম খাদ্যবস্তুর মূল্যতালিকাটা বাড়ি নিয়ে আসে। দাঁত খোঁচানোর কাঠি থেকে আরম্ভ করে সুঁপ পর্যন্ত সব কিছুরই ইংরেজি ও জার্মান ভাষায় প্রায় অপাঠ্য অক্ষরে সে লিখে ফেলল। পরদিন সকালে সারা যাবতীয় খাদ্যবস্তুর নাম আর ছাতা ও ওভারকোটের জন্য দায়ী নই, ইত্যাদি যাবতীয় কথা সুন্দরভাবে টাইপ করে স্কুলেনবের্গকে দেখাল। সেটা রেস্তোরাঁর খাদ্যতালিকার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল।

সারা রেস্তোরাঁ থেকে বিদায় নেবার আগেই স্কুলেনবের্গ তার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হল। রেস্তোরাঁর

একুশটা টেবিলেই খাদ্যবস্তুর নাম ও মূল্যসহ তালিকার যাবতীয় কপি তাকে সরবরাহ করতে হবে। আর প্রাতঃরাশ ও মধ্যাহ্নভোজের জন্য নতুন তালিকা টাইপ করে সরবরাহ করতে হবে—চুক্তির শর্ত। আর এর বিনিময়ে স্কুলেনবের্গে রোজ এক পরিচারককে দিয়ে তিন মনের উপযোগ্য যথা সম্ভব খাদ্যবস্তু সারা-র ঘরে পাঠিয়ে দেবে। আর তখনই পরবর্তীদিন স্কুলেনবের্গ-এর খাদ্যতালিকায় কি কি থাকবে তা পেন্সিলে লিখে তার কাছে পাঠিয়ে দেবে।

এরকম শর্তানুযায়ী চুক্তিবদ্ধ হওয়ায় উভয়পক্ষই মনে মনে সন্তুষ্ট হল। এবার থেকে স্কুলেনবের্গ-এর ক্রেতারা খাদ্যবস্তুর নাম, পরিচয় আর দামের কথা জানার সুযোগ পেল। আর কনকনে ঠাণ্ডার দিনে সারা-ও ঘরে বসে বাঞ্ছিত খাদ্যবস্তু পেতে লাগল। তার কাছে এটাই সবচেয়ে বড় সুবিধা।

ব্যস, এর পরই পঞ্জিকা মিথ্যার অবতারণা করল। বসন্তের আগমনবার্তা ঘোষণা করল। আরে বসন্তের আসার সময় হলে সে-ত এমনিতেই আসবে। মাউথ অর্গানে এখনও ডিসেম্বরের আনন্দোচ্ছ্বল সুর 'চিরসেরা গ্রীষ্মকাল।' ইস্টার উৎসবের পোশাক-আশাক কেনার জন্য মানুষ ডলার জমাতে ব্যস্ত। যখন এসব ব্যাপার স্যাপার ঘটে তখন সবাই বোঝে যে শহরটা এখনও শীতের কাঁথা মুড়ি দিয়েই রয়েছে।

এক বিকেলে সাজানো গোছানো শোবার ঘরটায় সারা শীতে জুবুথুবু হয়ে বসে রয়েছে। ঘরে যাবতীয় ব্যবস্থাদিই রয়েছে। একবার চোখ বুলালেই খুশিতে মন ভরে উঠবে। তার একমাত্র কাজ স্কুলেনবের্গ-এর খাদ্যতালিকা টাইপ করা। ব্যস, আর কিছুই তার করণীয় নেই। সে দোলন চেয়ারটায় বসে জানালা দিয়ে বাইরের প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। দৃষ্টি ফিরিয়ে দেওয়ালে টাঙানো ক্যালেন্ডারটার দিকে চোখ পড়তেই তার মনে হল যেন সেটা বলছে, সারা, বসন্ত যে দরজায় কড়া নাড়ছে। প্রকৃতি নতুন সাজে সেজে উঠতে শুরু করেছে। আর আইভি লতার মত সুন্দর দেহটাতেও বসন্তের ছোঁয়া লেগেছে। তবু তোমার দৃষ্টি কেন এমন বিষণ্ণ, বল তো?

সারা-র বাড়ির পিছন দিককার কারখানার জানালাহীন ইঁটের দেওয়ালটার গায়ে সাদা বরফ জমাট বেঁধে রয়েছে। সে আবার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেবদারু, চেরি, ডুমুর আর চেরোকি গোলাপ গাছগুলোর ওপর দিকে চোখের মণি দুটোকে বারবার বুলাতে লাগল।

অতি বড় বিশ্বনিন্দুকও অবশ্যই স্বীকার করবেন, বসন্তের অগ্রদূতরা চোখ ও কানের আনন্দ দানের ক্ষমতা রাখে বটে।

সারা গত গ্রীষ্মে একটা গ্রামে কাটিয়েছিল। সেখানেই সে এক জোতদারের প্রেমে মজে গিয়েছিল। সানিব্রুক খামার বাড়িতে দুটো সপ্তাহ কাটিয়ে এসেছে। তখনই স্থানীয় জোতদার ফ্র্যাঙ্কলিন-এর যুবক ছেলে ওয়াল্টার-এর সঙ্গে প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এর আগেও অনেকেই জোতদারকে ভালবেসে বিয়ে করে ঘরসংসার পাতে। কিন্তু দু'দিন ঘর করার পরই তাকে দূরে সরিয়েও দেয়। যুবক ওয়াল্টার এক অত্যাধুনিক কৃষিকর্মী। তার গোশালায় একটা টেলিফোন রয়েছে। চাষআবাদের মরশুম সম্বন্ধে সে ভাল ধারণা রাখে।

ছায়ায় ঢাকা এ গলিটাতেই সারা ওয়াল্টার-এর প্রতি অনুরক্তা হয়, তার মন-প্রাণ জয় করে, বুক টেনে নেয়। তারা কাছাকাছি পাশাপাশি বসে সারা-র জন্য হলুদ ফুল দিয়ে একটা মুকুট তৈরী করেছিল। তার বাদামী চুলের গোছায় হলুদ ফুলের মুকুট কী চমৎকারই না দেখাবে, ওয়াল্টার এ ব্যাপারে পঞ্চমুখে প্রশংসা করতেও ভোলেনি।

বসন্তকাল এলেই তারা বিয়ের পাট চুকিয়ে ফেলবে, ওয়াল্টারই প্রস্তাবটা দিয়েছিল। উচ্ছ্বসিত আবেগ আর অন্তহীন নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের মধ্য দিয়ে দিনগুলো কাটিয়ে সারা ফিরে এসে আবার টাইপরাইটার নিয়ে কাজের মধ্যে ডুবে গেল।

সারা যখন ঘরে একা একা বসে ভবিষ্যতের সুখের দিনগুলোর রঙিন স্বপ্নে মশগুল ঠিক তখন হোম রেস্তোরাঁর এক বে-রসিক পরিচারক দরজার কড়া নেড়ে তার সুখস্বপ্নটিকে মাঝপথে ভেঙে দিল। সে রেস্তোরাঁর পরের দিনের খাদ্য তালিকার একটা খসড়া নিয়ে এসেছে।

সারা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে টাইপরাইটারটার সামনের চেয়ারটায় বসল। রোলার দুটোর মধ্যে একটা কার্ড চালান করে দ্রুত আঙুল চালাতে লাগল। দেড় ঘণ্টার মধ্যেই একুশটা খাদ্যতালিকা

টাইপ করে ফেলল। বর্তমান খাদ্য তালিকা থেকে শুয়োরের মাংস বাদ দেওয়া হয়েছে। সুপটাকে অধিকতর পাতলা করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। রুশ শালগম ছাড়া আর কোন সিদ্ধর উল্লেখ নেই। সসেজ স্থান পেলেও দামী পুডিং বাদ দেওয়া হয়েছে।

খাদ্যতালিকার পর মূল্য তালিকাটা টাইপ করার সময়ই তার দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে এল। টাইপরাইটারের স্ট্যান্ডের ওপর টপ্‌টপ্‌ করে চোখের জল পড়তে লাগল।

দু-দুটো সপ্তাহ পেরিয়ে গেল তবু ওয়াল্টার-এর কোন চিঠিই তার হাতে এল না। আর খাদ্যতালিকার পরবর্তী কিস্তিটা হচ্ছে হলুদ ড্যান্ডেলিয়ান ফুল আর ডিমের সমন্বয়ে তৈরী একটা মুখরোচক খাদ্য। ডিমের কথা ছাড়ান দেওয়া যাক। কিন্তু ড্যান্ডেলিয়ান ফুল? এ ফুল দিয়ে মুকুট তৈরী করেই তো ওয়াল্টার তার মন-ময়ূরীকে সাজিয়েছিল। এ-হলুদ ফুলই তো বসন্তের অগ্রদূত। আর এ-ফুলের নামই আনন্দঘন দিনগুলোর স্মৃতি তার অন্তরের অন্তঃস্থলে জাগিয়ে তুলল।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা এরকম কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হলে আপনাদের ঠোঁটের কোণেও হাসির রেখা দেখা দিত না। দৃঢ়তার সঙ্গেই বলতে পারি। এমন কি জুলিয়েটও যদি প্রেমের স্মৃতিচিহ্নের এরকম অবজ্ঞা অবমাননা প্রত্যক্ষ করত তবে সে অবশ্যই কবিরাজের শরণাপন্ন হতে বাধ্য হত।

সারা চোখের জল ঝরিয়ে ঝরিয়ে এক সময় কান্না থামিয়ে অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠল। কর্তব্য বড় দায়। খাদ্যতালিকাগুলো তো তাকে টাইপ করতেই হবে। কিন্তু এর পরও হলুদ ফুলের ভাবাবেগে আচ্ছন্ন থেকেই সে অন্যমনস্কভাবে কিছুটা সময় ধরে টাইপরাইটারের বোতামগুলোর ওপর আঙুল চালাল। তার মনটা চলে গেছে বহুদূরবর্তী গলিপথের জোতদার যুবকটার কাছে। পরমুহূর্তেই সে মনটাকে ফিরিয়ে আনল মানহাট্টার পাথর বিছানো গলিতে। আর নরম আঙুলগুলিকে টাইপরাইটারের বোতামগুলোর ওপর এমন দ্রুত চালাতে লাগল যেন স্পিড ব্রেকারের ওপর দিকে মোটর গাড়ি ছুটে চলেছে।

রেস্তোরাঁর ওয়েটার সন্ধ্যা ছ'টায় রাতের খাবার নিয়ে এল। পাত্রগুলো টেবিলে নামিয়ে রেখে টাইপ করা খাদ্যতালিকাগুলো সহ বিদায় নিল।

সারা রাতের খাবার সারতে বসে ড্যান্ডেলিয়ান ফুলের বাটিটা দূরে সরিয়ে দিল। প্রেমাসিও একগোছা মনোলোভা টকটকে ফুলকে কাদার মত কালো ও নরম বস্তুতে পরিণত করা ঠিক যেমনভাবে তার যাবতীয় স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা শুকিয়ে কুঁকড়ে মরে গেছে। শেক্সপীয়র তো বলেছেনই, প্রেম নিজেকে খেয়েই জীবিত থাকতে সক্ষম। কিন্তু যে হলুদ ড্যান্ডেলিয়ান ফুল এক সময় তার প্রেমকে সাজিয়ে দিয়েছিল তাকে খেতে সারা কিছুতেই উৎসাহ পেল না।

সাড়ে সাতটায় পাশের ফ্ল্যাটের স্বামী-স্ত্রী তুমুল ঝগড়ায় মেতে উঠল। মাথার ওপরের বাসিন্দাটা চড়া সুরে বাঁশী বাজাতে শুরু করল, কয়লার গাড়িগুলো মালপত্র নামাতে লাগল আর পিছন দিককার বেড়ার ওপারে বসে থাকা বিড়ালগুলো মুকডেলের দিকে এক এক করে চলে গেল। এসব ঘটনা চাক্ষুষ করে সারা বুঝল এবার তার বই নিয়ে বসার সময়। দ্য ক্লয়স্টার অ্যান্ড দ্য হার্থ, এ মাসের সেরা অবিক্রিত বইটা বের করে হাতে নিল। সে এবার বাক্সের ওপর পা তুলে জেরার্ড'কে সঙ্গে নিয়ে ঘোরাফেরা শুরু করল।

সামনের দরজাটার কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল। বাড়ির মালকিনই সাড়া দিল। ডেনিস আর জেরার্ড'কে একটা ভালুকের পাল্লায় রেখে সারা উৎকর্ণ হয়ে লক্ষ্য করতে লাগল। পরমুহূর্তেই নিচের তলার হলঘরে জোরে জোরে কথা বলার শব্দ তার কানে এল। ব্যস, আর মুহূর্তমাত্র দেরি না করে সারা হাতের বইটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে এক লাফে দরজায় গিয়ে দাঁড়াল।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, আপনারা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন, সারা সিঁড়ির গায়ে পৌঁছোবার আগেই তার প্রেমাস্পদ জোতদার যুবকটা এক লাফে তিন তিনটে সিঁড়ে অতিক্রম করেই সারাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে একের পর এক চুম্বন দিয়ে তাকে একেবারে ভাবাপ্লুত করে তুলল।

ভাবাবেগে আপ্লুত সারা গলাছেড়ে বলে উঠল, তোমার ব্যাপারটা কি, শুনি! উফ্ কী যে বলি তোমাকে। চিঠি দাওনি কেন? কেন?—চিঠি দাওনি কেন?

ওয়াল্টার আকস্মিক অদ্ভুত পরিস্থিতিটাকে সামলাবার প্রাণান্ত প্রয়াস চালাতে গিয়ে বলল, শোন, শোন, নিউ ইয়র্কটা তো আর এটুকুন জায়গা নয়। রীতিমত বড়সড় একটা শহর। এক হপ্তা

আগে তোমার আগেকার ঠিকানায় যাই। সেখানে শুনি, তুমি বৃহস্পতিবার সে জায়গা ছেড়ে চলে গেছ। তবু কিছুটা সান্ত্বনা পেলাম, শুক্রবারের দুর্ভাগ্যটা ঘটেনি। তারপর থেকেই পুলিশের শরণাপন্ন হলাম। এছাড়া আরও বহুভাবে তোমার খোঁজে বহু জায়গায় ছুটে বেড়িয়েছি।

আমি তো চিঠি লিখেছি! সারা বলল।

সে চিঠি আমার হাতে পৌঁছায়নি।

তবে আমাকে খুঁজে বের করা কিভাবে সম্ভব হল?

চোখে মুখে বসন্তকালীন হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে জোতদার যুবকটা বলল, আজ সন্ধ্যাতেই হোম রেস্তোরাঁয় গিয়েছিলাম। কাঁচা সব্জি আমার বহুদিনের প্রিয় খাদ্য। বিশেষ করে বছরের এ সময়টাতে। যাই হোক, সুন্দর টাইপ করা খাদ্যতালিকায় সে রকম কোন খাবারের খোঁজ করতে গিয়ে বাঁধাকপির তলায় দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। গলা-ছেড়ে মালিককে ডাকলাম। তাঁর কাছ থেকেই তোমার ঠিকানা পেয়ে যাই।

হ্যাঁ, এবার মনে পড়ছে বটে। খাদ্যতালিকায় বাঁধাকপির তলায়ই টাইপ করা ছিল ড্যান্ডেলিয়ান ফুলের খাবারের কথা।

প্রিয়তমা, পৃথিবীর যেকোন প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকেই হোক না কেন, তোমার টাইপরাইটারে টাইপ-করা বিচিত্র 'ডব্লু' অক্ষরটা চিনতে কিছুতেই আমি ভুল করি না। ওয়াল্টার মুচকি হেসে কথাটা ছুঁড়ে দিল।

সারা চোখ দুটো কপালে তুলে বলল, একী কথা! ড্যান্ডেলিয়ান লিখতে তো ডব্লু ব্যবহার করতে হয় না।

সারার দ্বিধা দূর করার জন্য যুবকটা পকেট থেকে হোম রেস্তোরাঁর একটা টাইপ করা খাদ্যতালিকা বের করে একটা ছত্রের দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সেদিন বিকেলে খাদ্যতালিকার প্রথম কার্ডটা সে টাইপ করেছিল, সেটা দেখেই চিনে ফেলল। কার্ডটার ওপরের দিকে, ডানদিকের কোণের কাছে চোখের জল পড়েছিল তার অস্পষ্ট একটা দাগ থেকে গেছে।

মশলা ভরা কাঁচালঙ্কা ও লাল বাঁধাকপির মাঝখানে একটা ছত্র অন্যমনস্কতার বশতঃ টাইপ করে ফেলেছিল, 'সুপ্রিয় ওয়াল্টার, সঙ্গে গোটা সিদ্ধ ডিম।'

এ সার্ভিস অব লাভ

নিজের শিল্পকলার প্রতি যার আন্তরিক ভালবাসা থাকে তখন তার কাছে কোন বোঝাই কঠিন বোধ হয় না। আমাদের বর্তমান গল্পের মূল বিষয়বস্তু এটাই। আর গল্পটা থেকে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে আর তাতে প্রমাণ করে দেওয়া হবে যে, সিদ্ধান্ত সঠিক নয়, ভ্রান্ত।

তখন মিডল ওয়েস্টের চিত্রীশিল্পীদের রমরমা বাজার। সেখানকারই এক ফ্ল্যাটে বাস করে জো লারাবী। শহরের পাম্পটার গা দিয়ে একজন সম্ভ্রান্ত বাসিন্দা লম্বা লম্বা পায়ে পথ পাড়ি দিচ্ছেন, ছ'টায় এ ছবিটা আঁকার কাজ সবে সে শেষ করেছে। সদ্য আঁকা ছবিটা একটা ফ্রেমে বাঁধিয়ে সামনের দোকানটার জানালার গায়ে লটকে দিল।

ঘড়িতে যখন বিশেষ এক সময় নির্দেশ করল তখন জো লারাবী নেকটাই পরে, কোটের পকেটে এক গোছা ডলারের নোট নিয়ে নিউইয়র্কের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

দক্ষিণ অঞ্চলের পাইনগাছে ঘেরা গ্রামে বসে ডেলিয়া কারুথার্স এমন সব অত্যাশ্চর্য ছবি আঁকতে শুরু করে যা, দেখে তার আত্মীয় বান্ধবরা বহু অর্থ চাঁদা তুলে তাকে উত্তর অঞ্চলে পাঠিয়ে দিল। এর একমাত্র কারণ তার শিল্পনৈপুণ্য যাতে উপযুক্ত মর্যাদা লাভ করে। তবে তার নিপুণ তুলির টানকে তারা চোখে দেখার সুযোগ লাভে ধন্য হল না, আরে, এটাই তো বর্তমান গল্পের বিষয়বস্তু।

সঙ্গীত ও কলাশিল্প বিষয়ক আলোচনা করতে বহু ছাত্রছাত্রী একটি স্টুডিওতে জড়ো হয়। তাদের আলোচ্য বিষয় হান্ডতুফে, রেসত্রন্ট-এর সৃষ্ট কর্মাদি, হাগনার, সঙ্গত, লিপিশিল্পকর্ম, চিত্রাবলী, চপিন, দেওয়াল লিপি ও শিল্পকর্ম প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করার উদ্দেশ্যেই তারা এখানে জড়ো হয়েছে। জো আর ডেলিয়ায়ের এখানেই প্রথম সাক্ষাৎ ও আলাপ পরিচয় হয়।

প্রথম সাক্ষাতের মুহূর্তেই জো আর ডেলিয়া পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়, ভালবাসার সূত্রপাত হয়। অচিরেই বিয়ের মাধ্যমে তাদের প্রেম ভালবাসার পরিণতি ঘটে। আগেই বলা হয়েছে, কেউ যদি শিল্পকলাকে অন্তর থেকে ভালবেসে থাকে তবে কোন বোঝাই তার কাছে কঠিন বোধ হয় না।

জো আর ডেলিয়া বিয়ের পর একটি ফ্ল্যাটে ঘর-সংসার করতে শুরু করল। তারা একে, অন্যের সহায়ক ও পরিপূরক হিসাবে শিল্পসাধনায় লিপ্ত থাকায় তাদের সংসার হয়ে উঠল যথার্থই এক আনন্দের আগার। বিত্তবান যুবকটার কাছে আমি একটাই অনুরোধ রাখছি, তোমার যা কিছু বিত্তসম্পদ রয়েছে—সবকিছু বিক্রি করে যাবতীয় অর্থ দীনহীনদের মধ্যে বিলিয়ে দাও। তোমার ভালবাসার পাত্রী ডেলিয়া আর সবচেয়ে ভাল লাগা শিল্প সাধনা নিয়ে এটাই দিন যাপনের যথার্থ পন্থা, তোমার প্রাপ্য। কেবলমাত্র ফ্ল্যাটের অধিবাসীরাই যথার্থ সুখী এরকম কথা আমি যদি গলা ছেড়ে বলি তবে তারা আমার সঙ্গে অবশ্যই গলা মেলাবে। ছোট সংসারই তো যথার্থ সুখের আগার। ঘরের আসবাবপত্র ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম যা কিছু আছে সবগুলিকে রদবদল ও স্থান পরিবর্তন করে তোমার ডেলিয়াকে নিয়ে সুখের দিনগুলো অতিবাহিত কর।

বিখ্যাত শিল্প-শিক্ষক মাজিস্টার-এর কাছে জো চিত্রশিল্পের তালিম নিচ্ছে। চিত্রশিল্পী মাজিস্টার-এর নাম যশের কথা তো কারো আর অজানা নয়। কিন্তু তাঁর এরকম নাম ডাকের কারণ, তার পাঠ্যসূচী সহজ আর বেতন খুবই বেশী। আর ডেলিয়া রোজেনস্টক-এর কাছে শিখছে। তার খ্যাতিকে পিয়ানোর চাবিতে আলোড়ন সৃষ্টি করার সঙ্গেই তুলনা করা যেতে পারে।

যতদিন অর্থ ছিল ততদিন তাদের সংসারে সুখই ছিল। কিন্তু অন্যের সংসারের দোষ ত্রুটি খুঁচিয়ে বের করার উৎসাহ আমার আদৌ নেই। তাদের উদ্দেশ্য খুবই সহজ-সরল। জো তুলির টানে এমন সব ছবি ফুটিয়ে তুলতে আরম্ভ করবে যে, সরু গোঁফ আর মোটা ভুড়িওয়ালা বুড়োগুলো ছবি কেনার জন্য তার পিছন পিছন ঘুরে বেড়াবে। প্রথমে তার নাম ডাক হবে তারপরই গান-বাজনার ওপর তার মনে বিতৃষ্ণা এমন গাঢ়তর হয়ে উঠবে যাতে অর্কেস্ট্রার সিট আর বক্সগুলো খালি দেখলেই তার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসতে থাকবে, আর এরই ফলে সে মোটেই মঞ্চে যেতে উৎসাহী হবে না।

আমি কিন্তু বলব সবচেয়ে ভাল ব্যাপারটা হচ্ছে ছোট পরিবারের সংসারযাত্রা। স্টুডিওতে সারাদিন খাটা খাটুনি করে ঘরে ফিরে গল্পগুজবে মাতা, ইচ্ছা মাফিক রাতের খাবার, হাল্কা প্রাতঃরাশ, পরস্পরের মনোবাঞ্ছা নিয়ে আলোচনা আর ভাবের আদান-প্রদান, একে অন্যকে সাহায্য সহযোগিতা ও উৎসাহ দান, এবং—হ্যাঁ, খোলসা করেই বলছি, বেলা এগারোটার সময় পনীরের স্যান্ডউইচ আর পুরওয়ালা জলপাই।

কিন্তু অচিরেই কলা অনুশীলনের ব্যাপারটা শ্লথ হয়ে আসে। বহুক্ষেত্রেই এমনটা ঘটতে দেখা যায়। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে, খরচ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকে, কিন্তু আর উপার্জন তার সঙ্গে তাল রেখে বাড়ে না। হের রোজেনস্টক আর মিঃ মাজিস্টার-এর বেতন দেবার মত অর্থাভাব। কলা শিল্পকলাকে কেউ যখন অন্তর থেকে ভালবেসে ফেলে তখন তার কাছে কোন বোঝাই কঠিন বোধ হয় না।

উপায়ান্তর না দেখে ডেলিয়া মনস্থির করল গান শিখিয়ে অর্থোপার্জন করবে।

দু'-তিন সপ্তাহ সে গানের ছাত্র-ছাত্রী খুঁজে বেড়াল। এক সন্ধ্যায় খুশি মনে বাড়ি ফিরে এল। হাসতে হাসতে জো'কে বলল, 'শোন জো', আমি ছাত্রী জুটিয়ে ফেলেছি। মানুষ হিসাবেও তারা খুবই ভাল। জেনারেল এ.বি. পিংকনির মেয়ে। একাত্তরতম স্ট্রীটে থাকে। বাড়িটা ভারী সুন্দর, সদর দরজাটা চোখে লাগার মতই বটে! সেটাকে তুমি বাইজানস্টাইন বলবে বলেই আমার বিশ্বাস। আর তার ভেতরটা? আমি হলফ করে বলতে পারি, এরকম একটা বাড়ি এর আগে কোনদিন তোমার চোখে পড়েনি।

আমার ছাত্রী ক্লিমেন্টিনা চমৎকার মেয়ে। ভারী মিষ্টি স্বভাব। সর্বদা সাদা জামা কাপড় ব্যবহার করে। প্রথম দর্শনেই আমি তাকে ভালবেসে ফেলেছি। বয়স মাত্র আঠার। সপ্তাহে তিনটে করে পাঠ আমাকে শেখাতে হবে। আর প্রতিটা পাঠের জন্য আমি পাব পাঁচ ডলার করে। একবারটি

ভেবে দেখ তো জো! ব্যস, আর মাত্র দু-তিনটে ছাত্রী জোগাড় হয়ে গেলে আবার রোজেনস্টক-এর গান শিখতে যেতে পারব।

সেদ্ধ মটরশুঁটির পাত্রটাকে কাঁটা চামচ দিয়ে ঠুকঠুক করতে করতে জো বলল, তুমি চোখবুজে বলে ফেললে। আমার দিকটা একবারটি ভেবে দেখ ত? তুমি ছাত্রী পড়িয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলবে আর আমি তা কলা অনুশীলন করতে খরচ করব? শোন, আমার বিশ্বাস, রাস্তার পাথর বিছিয়ে বা খবরের কাগজ বিক্রি করে দু'এক ডলার আমিও ঘরে আনতে পারব, ঠিক কিনা?

তার গলাটা জড়িয়ে ধরে ডেলিয়া আবেগ ভরে বলল, 'জো, প্রিয়তম আমার, কী বোকা তুমি! শোন, আমি চাই তুমি পড়াশোনায় লেগে থাক। আরে, আমি তো আর গানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে কাজে মাতছি না। আমি তো শিক্ষাদানের সঙ্গে শেখার কাজও চালিয়ে যাব। আমার গান শেখার ব্যাপারটা তো থেকেই যাচ্ছে। সপ্তাহে পনেরো ডলার করে হলেই আমরা রাজার হালে থাকতে পারব। আমার কথা শোন, মিঃ মাজিস্টার'কে ছেড়ে দেবার কথা ভুলেও কোনদিন ভাববে না।

সে না হয় হল। তবে একটা কথা, তোমার ছাত্রী পড়ানোর ব্যাপারটাকে আমি মোটেই সুনজরে দেখতে পারছি না। এটা কলা অনুশীলনের ব্যাপার নয়। তোমার মত ভাল মানুষের পক্ষে একাজ মোটেই মানায় না।

কলাবিদ্যাকে কেউ যখন অন্তর থেকে ভালবাসে তখন কোন কাজই তার কাছে কঠিন বোধ হয় না।

আকাশের যে স্কেচটা আমি পার্কে করেছিলাম মাজিস্টার পঞ্চমুখে তার প্রশংসা করেছিলেন। ছবিগুলোর মধ্য থেকে দুটো ছবি টাঙাবার জন্য আমি টিংকল-এর অনুমতি পেয়েছিলাম। কোন ধনকুবের বন্ধুর চোখে লেগে গেলে সেগুলোর মধ্য থেকে একটা ছবি তো বিক্রিও হতে পারে।

তোমার ছবি যে বিক্রি হবেই এতে কিছুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই।

মিঃ অ্যান্ড মিসেস লারাবী পরবর্তী পুরো সপ্তাহটা সকাল সকাল প্রাতঃরাশের পাট মিটিয়ে নিতে লাগল। সকালের আলোয় সেন্ট্রাল পার্কে বসে স্কেচ করার কাজে জো-এর খুব ঝোঁক দেখা গেল। আর ডেলিয়া? সে সকাল সাতটার মধ্যে তাকে প্রাতঃরাশ গোছগাছ করে দিয়ে, তাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে, চুম্বন খেয়ে বিদায় জানায়। অধিকাংশ দিনই সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলে তবেই বাড়ি ফেরে।

সপ্তাহের শেষে ডেলিয়া সগর্বে ও পরিশ্রান্তভাবে ফ্ল্যাটের সেন্টার টেবিলের ওপর তিনটে পাঁচ ডলারের বিল রাখতে রাখতে ক্লান্ত স্বরে বলল, ক্লিমেন্টিনা ঠিকমত পড়াশোনা করে না বলেই আমার বিশ্বাস। একই পড়া বারবার বোঝাতে গিয়ে আমার মুখ দিয়ে রক্ত উঠে যাওয়ার জোগাড় হয়। আর সে যে সর্বদা সাদা পোশাক আশাক ব্যবহার করে সেটাও আমার চোখ ও মনকে পীড়া দেয়। তবে জেনারেল পিংকনি বুড়ো কিন্তু মানুষ হিসেবে বড্ড ভাল। আমি চাই তার সঙ্গে তুমি আলাপ-পরিচয় কর। ক্লিমেন্টিনা'কে নিয়ে আমি পিয়ানোয় বসলে তিনি প্রায়ই ঘরে ঢোকেন। তিনি যে বিপত্নীক তা তো তোমাকে বলেছিই। ঘরে ঢুকে ছাগলের মত পাকা দাড়ির গোছায় হাত বুলাতে থাকেন। আর প্রায়ই জিজ্ঞেস করেন, রাগ-রাগিনীর অনুশীলনটার উন্নতি হচ্ছে? প্রায়ই সব সময়েই এটা জিজ্ঞেস করে। তবে একটা কথা, মেয়েটা সত্যি আমার মনটা কেড়ে নিয়েছে। আর খুবই উঁচু বংশের মেয়ে। জেনারেল পিংকনি-র এক ভাই বলিভিয়ায় মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত ছিলেন।

জো ঠিক সেই মুহূর্তেই নীরবে মন্টিক্রিস্টোর ভাব নিয়ে একটা দশ, একটা পাঁচ, একটা দুই আর এক ডলারের একটা নোট টেবিলে, ডেলিয়া-র বিলগুলোর পাশে রাখল। তারপর উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে বলল, জান, সেই যে জলরঙের চারকোণা স্তম্ভটা, পিয়োরিয়া থেকে এসেছে এমন এক ভদ্রলোকের কাছে বেচে দিয়েছি।

দেখ আমার সঙ্গে রসিকতা কোরো না, লোকটা পিয়োরিয়ার অধিবাসী অবশ্যই না!

তা হল বা না-ই হল। আমি কিন্তু মনে করি ডেলিয়া, তার সঙ্গে তোমার আলাপ পরিচয় হলে ভাল হয়। খুবই মোটাসোটা, নাদুসনুদুস চেহারার মানুষ, গলায় অধিকাংশ সময়ই উলের মাফলার জড়িয়ে রাখেন। স্কেচটাকে টিংকল-এর জানালায় দেখে প্রথমে হাওয়া বল বলেই ধরে নিয়েছিলেন।

তারপর ছবি বুঝতে পেরেই স্কেচটা কিনে নিলেন। আরও ছবি অর্ডার দিয়েছেন। একটা তৈলচিত্র—ন্যাকাভাম্নার ওজনের আড়তের ছবি। সেটা সঙ্গে নিয়েই তিনি ফিরবেন।

দেখ, তুমি যে নিজের কাজ নিয়ে মেতে আছ তাতেই আমি খুশি। আমার বিশ্বাস, তুমি শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা পাবেই পাবে। তেত্রিশ ডলার। এর আগে কোনদিন এত ডলার খরচ করিনি। আজ রাত্রে গলদা চিংড়ির ব্যবস্থা করতেই হবে। খুশিতে ডগমগ হয়ে জো কথাগুলো বলল।

পরের শনিবার প্রথম জো-ই ফিরল। বৈঠকখানার টেবিলে আঠেরো পাউন্ড রেখে সাবান দিয়ে হাতের কালো রংটা ধুয়ে নিল।

আধঘণ্টা পরে ডেলিয়া ঘরে ফিরল। তার হাত সাধারণ একটা ব্যান্ডেজে জড়ানো। তার মুখ দেখে বিষণ্ণ মনে হল।

জো তার ব্যান্ডেজটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই সবিস্ময়ে বলল, কি ব্যাপার, ওটা কি?

পাঁচটায় ক্লিমেন্টিনা বায়না ধরল, ওয়েল্স্ খরগোস চাই। তার স্বাস্থ্য ভাল নয়, স্নায়ুবিক দুর্বলতা, যাক। জেনারেল তখন কাছেই দাঁড়িয়ে। মেয়েটা পরিবেশন করতে গিয়ে কিছুটা গরম মাংসের ঝোল আমার হাতে ফেলে দিল। এতে মেয়েটা খুবই হকচকিয়ে গেল। জেনারেল বুড়ো ব্যস্ত হয়ে নিচের তলায় গিয়ে কাকে যেন ডাক্তারখানায় পাঠালেন। একটু বাদে সামান্য লোশন আর ব্যান্ডেজ নিয়ে তিনি ঘরে ঢুকলেন। এখন আর কষ্ট, জ্বালা যন্ত্রণা নেই। মুহূর্তের জন্য থেমে আবার মুখ খুলল, আচ্ছা জো, তোমার আরও একটা স্কেচ বিক্রি হয়েছে নাকি? টেবিলের ওপরের ডলারগুলো লক্ষ্য করে প্রশ্নটা তার দিকে ছুঁড়ে দিল।

বিক্রি করেছি নাকি, জানতে চাইছ? পিয়োরিয়া থেকে আসা লোকটা তো অর্ডার দেওয়া ডিপোর স্ক্যাচ আজই হাতে পেয়ে গেছে। আর হাডসনের একটা দৃশ্য চিত্র আর প্যাকের একটা প্রাকৃতিক দৃশ্যের-চিত্র তিনি চাইছেন। কথা বলতে বলতে ডেলিয়া-র হাতের ব্যান্ডেজটার দিকে চোখ পড়তেই সে এবার বলল, ডেলি আজ বিকেলে কখন হাতটা পোড়ালে বল তো?

পাঁচটার সময়। ইস্তিরিটা মানে খরগোসের কড়াইটা সবে উনুন থেকে নামিয়ে রাখা হয়েছিল। বিশ্বাস কর জো, জেনারেল বুড়ো যেমন ব্যস্ত হয়ে নিচে নেমে গেলেন, কী আর বলব তোমাকে।

জো সস্নেহে ডেলিয়াকে পাশে বসিয়ে বলল, ডেলি, গত দু'সপ্তাহ ধরে তুমি কোন্ কাজ করছ, বল তো?

ডেলিয়া মুহূর্তকাল নীরবে মাথা নিচু করে বসে থাকার পর চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, শোন জো, বহু চেষ্টা করেও আমি একটা ছাত্রী জোগাড় করতে পারিনি। উপায়ান্তর না দেখে টোয়েন্টি ফোর্থ স্ট্রীটের এক লন্ড্রীতে জামা ইস্ত্রি করার চাকরি নিয়েছি। ক্লিমেন্টিনা আর জেনারেলের গল্পটা মনে হয় ভালই ফেঁদেছিলাম, চালাচ্ছিলামও ভালই, কি বল? আজ বিকেলে কাজ করার সময় মেয়েটা যখন গরম ইস্ত্রিটা আমার হাতে লাগিয়ে দিল, তার পর বাড়ি ফেরার পথে খরগোসের মাংসের গল্পটা তৈরী করে ফেললাম। জো, তুমি এতে ক্ষুব্ধ হওনি ত? হাতের ওপর নিজের হাতটা রেখে আবার বলতে শুরু করল। জো, আমি লন্ড্রির কাজটা না নিলে তোমার পক্ষে তো আর পিয়োরিয়া থেকে আসা লোকটার কাজে তোমার স্কেচগুলো বেচতে পারতে না, ঠিক কিনা?

জো প্রায় অস্ফুট স্বরে বলল, না, সে তো পিয়োরিয়ার অধিবাসী নয়।

ডেলিয়া তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, শোন, কোথাকার অধিবাসী, কোথায় থাকে সেটা কি কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার? একটা কথা। ক্লিমোন্টিনা'কে আমি পড়াচ্ছিলাম না, সন্দেহটা তোমার মনে কি করে উদয় হল, বল তো?

দেখ, ব্যাপারটা নিয়ে আজ রাতের আগে সন্দেহের উদ্রেক ঘটেনি। রাত্রেও সন্দেহ জাগত না, আজ বিকেলেই ওপর তলার একটা মেয়ের জন্য ইঞ্জিন-ঘর থেকে তেল আর ন্যাকড়া যদি পাঠাতে না হ'ত। গরম ইস্ত্রি লেগে তার হাত পুড়ে যায়। আসলে আমিও ওই লন্ড্রিতেই গত দু' হপ্তা ইঞ্জিনটাকে গরম করার চাকরিতে লেগেছি।

সে কী। তুমি কি তবে ছবি আঁকছিলে না। আমি তো—

শোন, জেনারেল পিংকনি আর পিয়োরিয়া থেকে আসা আমার ছবির ক্রেতা উভয়েই মন-গড়া ব্যক্তি। উভয়েই সরবে হেসে উঠল। হাসি থামিয়ে জো এক সময় আবার বলল, একটা কথা

তো জানই, নিজের শিল্পকে যখন কেউ অন্তর দিয়ে ভালবাসে তখন কোন বোঝাই কঠিন বোধ হয় না।

ডেলিয়া তার মুখটা চেপে ধরে বলল, না, মশাই না, শুধুমাত্র কেউ যখন ভালবাসে, বুঝলে?

অ্যান অ্যাডজাস্টমেন্ট অব নেচার

এই তো সেদিনের কথা, একটা চিত্র প্রদর্শনীতে পাঁচ হাজার টাকায় একটা ছবি বিক্রি হয়ে গেল। ছবিটা এঁকেছে ক্রাফট নামক এক যুবক। সে পশ্চিম অঞ্চল থেকে আসা খুবই সাধারণ এক চিত্রশিল্পী। সে যেমন এক প্রিয় বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করে ঠিক তেমনি তার নিজস্ব একটা মতবাদও রয়েছে। আর ছবিটাকে কেন্দ্র করে একটা কাহিনীও গড়ে উঠেছে। তাই আমি বাড়ি ফিরেই কাগজ কলম নিয়ে লেখার টেবিলে বসে পড়লাম। ক্রাফ্‌ট-এর অনুমান—তবে এটা কিন্তু এ গল্পের শুরুর কথা হিসাবে মনে করা যাবে না।

তিন বছর আগেকার কথা। ক্রাফ্‌ট, বিল জুড়কিন্স নামে কোন এক কবি আর আমি অষ্টম এভিনিউর সাইফার-এর রেস্তোরাঁয় খাচ্ছিলাম। পকেট ফাঁকা। আমরা ভেতরে ঢুকে খাবার চাইলাম। দিল। খেয়ে নিলাম। দাম দিয়েছিলাম বা দেই নি। সাইফার-এর ক্রোধজনিত নীরবতা, জ্বলন্ত হিংস্রতার প্রতি আমাদের বিশ্বাস সুদৃঢ়। মনের দিক থেকে তাকে এক রাজকুমার, নইলে চরম বোকা বা একজন যথার্থ শিল্পী। তার টেবিলে পর্বত প্রমাণ এত পুরনো চেক জমা হয়ে থাকে যে আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম সবচেয়ে নিচের চেকটা হেন্ড্রিক হার্ডসন জমা দিয়েছিল। সে ঝিনুকের ঝোল খেয়ে এটা দিয়ে দাম মিটিয়েছে। তৃতীয় নেপোলিয়ন আর গোল চোখ বিশিষ্ট মাছের মতই তার অসাধারণ একটা ক্ষমতা ছিল যার ফলে সে সবকিছু ঠিকঠাক বুঝেও যেন বুঝত না। একবার অসঙ্গত এক অজুহাত দেখিয়ে আমার খাবারের দাম না মিটিয়েই রেস্তোরাঁ ছেড়ে চলে আসছিলাম, তখন আড়চোখে তাকিয়ে দেখেছিলাম যে, সে ব্যাপারটা বুঝেও বুঝতে না পেরে নীরব হাসিতে থরথরিয়ে কাঁপছে। তাই আমরা মাঝে-মধ্যেই তার বাকি বকেয়া শোধ করে দিতাম। দিতাম, মানে না দিয়ে পারতাম না।

তবে তার দোকানের এক পরিচারিকাই ছিল আসল আকর্ষণ। সে ছিল দোকানটার উন্নতির মূলে। খাদ্যবস্তু পরিবেশন করা ছিল তার কাজ। তার চোখের মণি দুটো ছিল নীলাভ। তার মূর্তি তৈরী করে যদি উঁচু বেদীর ওপর স্থাপন করা হত তবে অবশ্যই সে বীরাঙ্গনা বোনদের সমকক্ষ হতে পারত। সাইফার-এর কর্মী। হাডসন নদীর বুকে যেমন কুয়াশার জালের ভেতর দিয়ে বড় ও মোটা খুঁটিগুলো নজরে পড়ে ঠিক তেমনি রান্নাঘরে চর্বিভাজার সময় যে নীল ধোঁয়ায় ঘরটা ঢেকে ফেলে তার পর্দা ভেদ করে মিলি-র সুবিশাল বপুটা অনায়াসেই নজরে পড়ে যায়। আর খাওয়ার ফাঁকে আহাররত মানুষগুলোর টুকরো-টুকরো কথা, পাখাওয়ালা প্রাণীগুলোর নিরবচ্ছিন্ন গুঞ্জনধ্বনি, বাসনকোসনের ঠকঠকানি, ক্ষুধার্তদের হাকডাক। এসব কিছুর ভেতর দিয়ে মিলি হেলেদুলে বিচিত্র এক ভঙ্গিতে পথ তৈরী করে নিয়ে চলাফেরা করত, অগণিত কেনোর অসভ্য যাত্রী ও মাঝি-মল্লাদের হৈ হট্টগোলের ফাঁক দিয়ে বড় একটা জাহাজ যেমন নিজের পথ তৈরী করে অনায়াসে এগিয়ে যায়।

আবর্জনাময় আমাদের শহরটার এ সর্বজন আকর্ষণীয় রানী মৌমাছিটাকে এমনই বিশাল বপু দিয়ে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছিল যে, সে নজরে পড়ামাত্র বুকের ভেতরে ধড়ফড়ানি শুরু হয়ে যেত। এর কতগুলো কারণও ছিল। কারণগুলো হচ্ছে, জামার হাতা সর্বদা ভাঁজ করে কনুইয়ের ওপর তুলে রাখত। ভাবটা এমন যে, আমাদের মত তিন-তিনটে পালোয়ানকে অনায়াসেই ছুঁড়ে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দেওয়া তার কাছে কোন ব্যাপারই নয়। বয়সে সে ছিল আমাদের চেয়ে অনেক ছোট। কিন্তু আমাদের সঙ্গে তার আচরণ ছিল মাতৃসুলভ। সাইফারের যা কিছু খাদ্যবস্তু সে দরাজ হাতে আমাদের পাতে পরিবেশন করত। এ কাজে দাম আর পরিমাপের কথা গ্রাহ্যই করত না। তার এ কাজ দেখে রূপকথার সে ছাগলের কথা মনে পড়ে যেত যার ভাণ্ড কখনও খালি হয় না। রূপোর ঘণ্টা বাজলে যেমন গুরুগম্ভীর আওয়াজ সৃষ্টি হয় ঠিক তেমনি ছিল তার কণ্ঠস্বর। সে

বত্রিশটা দাঁত বের করে হাসার সময় পাহাড়ের চূড়োয় হলুদ সূর্যরশ্মির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে একটা কথা, খাবার ঘরের বাইরে সে যে কোন্ এক পরিবেশে অবস্থান করছে এরকম কোন দৃশ্য কল্পনায় আনা বাস্তবিকই আমার পক্ষে খুবই কঠিন কাজ ছিল। আর তাকে সর্বদা হাসি খুশিই দেখাত। প্রতি শনিবার খাবার দাবার সেরে আমি যখন সামান্য অর্থ তার হাতে গুঁজে দিতাম তখন তার চোখে মুখে এমন একটা খুশির জোয়ার খেলে যেত যেন ছোট্ট একটা শিশু একেবারে অভাবিতভাবে একটা উপহার হাতে পেয়ে গেছে।

সম্প্রতি সে আমাদের অন্তরের অন্তরতম কোণে একটু একটু করে নিজের স্থান করে নিয়েছে, ব্যাপারটা সে নিজেই আমাদের কাছে বলল। তবে ওটা সত্য যে, আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল শিল্পকলা। আর একে কেন্দ্র করেই ব্যাপারটা ঘটে। আমাদের মধ্য থেকে একজন পোতা আইসক্রীম মিল আর হেড়ন সিম্ফনির সঙ্গে সাইফার আর মিলির অদ্ভুত সাদৃশ্যের কথা ব্যক্ত করে বসে।

ক্রাফট মন্তব্য করল, মিলের শিরে সংক্রান্তি ঘটার উপক্রম, তবেই সাইফার আমাদের সবাইকে তাকে থাকতে হবে।

কি ব্যাপার? সে কি আরও মুটিয়ে যাবে? বার দু'-তিন ঢোক গিলে ভয়ার্ত কণ্ঠে জুডকিন্স জিজ্ঞাসা করল।

তবে কি সে নৈশ বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে রুচি আর মেজাজ মর্জি বদলে ফেলবে? আমি প্রশ্ন করলাম।

আঙুল দিয়ে টেবিলের শুকনো কফি ঘুঁটতে ঘুঁটতে ক্রাফট বলল, আমার বক্তব্যটা মন দিয়ে শোন, ব্যাপারটা হচ্ছে, সিজারের ব্রুটাস ছিল, নাচিয়ে মেয়ের যেমন থাকে পিটিস্ বার্জার, নায়কের যেমন থাকে কর্ণেগি পদক, তুলোর গায়ে যেমন থাকে পোকা, চিত্রশিল্পের যেমন থাকে মর্গ্যান আর গোলাপের যেমন কাঁটা—

আমার ধমক খেয়ে ক্রাফট ধানাই পানাই রেখে এবার খোলসা করে বলতে লাগল, বলছি তবে শোন, এক ধনকুবের উইসকসিন থেকে সাইফার হোটেলে এক বাটি মটরশুঁটির ঝোল খেতে ঢুকবে। আর সে-ই মিলি'কে বিয়ে করে চম্পট দেবে। সে এক বড়সড় কাঠগোলার মালিক।

জুডকিন্স আর আমি সমস্বরে আর্তনাদ করে উঠলাম, ধনকুবের! কাঠগোলার মালিক! উইসকসিন থেকে! হায় ঈশ্বর!

ভাগ্য দেবতা যে মিলি-র এমন ভয়ানক একটা সর্বনাশ সাধন করবে এ ব্যাপারে আমাদের মধ্যে কেউ দ্বিমত পোষণ করেনি। এর চেয়ে অসম্ভব আর কিছু হতে পারে আমার অন্তত জানা ছিল না। কাঠগোলার মালিকের বিচারে মিলি হবে একটা পাইনবন। সুসময়ের মুখ দেখলে এসব লোক যে ফিরতে পারে আর না পারে সে সম্বন্ধে আমাদের ধারণার এতটুকুও ঘাটতি ছিল না। মেয়েটাকে সে নিউইয়র্কে নিয়ে গিয়ে তার চরণে সম্পূর্ণরূপে আত্মোৎসর্গ করে বসবে। 'ডব্লু' অক্ষরটাই যে আমাদের মাথায় নির্মম নিষ্ঠুর আঘাত হেনেছে। এমন একটা সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে রবিবাসরীয় পত্রিকা। বড় বড় হরফে হেডলাইন ছাপবে—'উইনসাম ওয়েট্রেস উইনস ওয়েল্‌থি উইসকসিন্ উডস্ম্যান।'

অল্পক্ষণের জন্য হলেও আমরা ধরেই নিলাম, মিলি আমাদের চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে।

কিন্তু এ-ত হতে দেওয়া যায় না। একজন ধনকুবের কাঠগোলার মালিকের হাতে আমাদের মিলিকে তুলে দেওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। তা ছাড়া লোকটা অগাধ বিত্তসম্পদের অধিকারী আর অন্য অঞ্চলের বাসিন্দাও বটে। মিলি নীরবে চা পরিবেশন করছে। বৃক্ষ সংহারকারীর জন্য এমন এক দৃশ্য মনের কোণে উঁকি দিতেই আমরা আচমকা মিইয়ে গেলাম। আৎকে উঠে আমরা ভাবতে লাগলাম, সাইফার-এর মানুষ সে শুয়োরের মাংস, বাঁধাকপির গন্ধ আর চীনামাটির পাত্রের ঠুংঠাং ধ্বনির মধ্যেই সে আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে।

আমাদের আশঙ্কা বাস্তব রূপ নিল। তবে কাঠের ব্যাপারটা উইসকসিনের পরিবর্তে আশঙ্কা থেকে এসেছে।

আমরা শুকনো আপেলের টুকরো আর গো-মাংস দিয়ে সবে ভোজ শুরু করেছি ঠিক তখনই অবাঞ্ছিত লোকটা ঘোড়া হাঁকিয়ে এসে হল ঘরে ঢুকেই মুহূর্তে আসর মাতিয়ে তুলল। হাত দুটো

বাড়িয়ে আমাদের এমন আন্তরিকতার সঙ্গে জড়িয়ে ধরল যে, আমরা গলে একেবারে জল হয়ে গেলাম। তাকে বন্ধুত্বের আসরে বসাতে আমরা আর দ্বিধা করলাম না।

লোকটাকে হঠাৎ করে দেখলে মনে হয় আঘাতে আঘাতে জর্জরিত। তার মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ, চোয়াল ভাঙা, সব মিলিয়ে খুবই রুক্ষ দেখায়। সে আমাদের কাছে কথায় কথায় লাখ লাখ ডলারের গল্প ঝাড়তে লাগল। আর টেবিলের ওপর রাখতে লাগল বহু সোনার পিণ্ড, বিভিন্ন রকম মনোলোভা পুঁতির হার, সীলমাছের চামড়া আর মশলা দেওয়া বনমোরগের স্তূপাকৃতি মাংস। কেবল লাখ লাখ ডলারের গল্পের ফাঁকে সে জানাল, নর্থ রিভারের ফেরি লঞ্চে সে সবে শিকার সেরে ফিরেছে।

তার গল্প কথার মূল বক্তব্য দু'মিলিয়ন ব্যাঙ্ক ড্রাফট। আর রোজ আদায় হয় এক হাজার ডলার। সে মন খোলসা করে প্রচার করে দিল, উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের খুশি মাফিক খাবার দাবার চেয়ে নিন। ভাববেন না, আমি আছি, আমাদের মনে হল এরকম দিলদরিয়া মানুষ আর দ্বিতীয় একজন নেই।

মিলি সাদা আর গোলাপি পোশাকে অতিকায় বপুটাকে আবৃত করে খাবারের থালা হাতে হলঘরে ঢুকে এল। সে মুহূর্তে আমাদের মনে হল তার অতিকায় বপুটার সঙ্গে একমাত্র সেন্ট ইলিয়াম পাহাড়ের তুলনা করা যেতে পারে। পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে সূর্য উঁকি দেওয়ার মত করে হেসে সে টেবিলের দিকে এগোতে লাগল।

আলাস্কা থেকে সদ্য আগত ধনকুবেরটা খাবার থালার দিকে দৃষ্টিপাত না করে মিলির দশাসই চেহারাটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। এমন একটা ভাব তার চোখ মুখে প্রকাশ পেল, মিলি শীর্ণকায়া হলে হয়ত বা তাকে গিলেই ফেলত, লাভ করত পরম তৃপ্তি। আমরা বুঝে নিলাম, মিলি-র সারা গা সোনা দিয়ে মুড়ে না দিলেও অন্ততঃ হাতে নক্সা করা প্যারিস গাউন আর হীরা মুক্তোর টায়রা তার গায়ে উঠবেই।

ব্যস, তুলোর ভেতর থেকে ইয়া বড় এক শুঁয়োপোকা অতর্কিতে বেরিয়ে এল। আলাস্কার খনির মালিকের ছদ্মবেশধারী শয়তানটা ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত মিলি-র ওপর দুম্ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

চোখের পলকে, সবার আগে শয়তানটার ওপর সক্রোধে ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্রাফট। পরমুহূর্তেই জুডকিন্স আর আমি তাকে মোক্ষম আঘাত হানতে লাগলাম। কিল চড় লাথি মেরে আধমরা করে তাকে টেনে হিঁচড়ে পাশের একটা কাফেতে নিয়ে গেলাম। গলায় ঢেলে দিলাম এক বোতল মদ।

এবার সে রসিকতার স্বরে মৃদু প্রতিবাদের স্বরে বলল, 'আমার নগদ অর্থ আর বিষয়সম্পত্তি যা কিছু সবই এ মেয়েটার হাতে তুলে দেব। আরে ব্বাস! এমন মেয়ে আর দ্বিতীয়টা আমার চোখে পড়েনি। সেখানে ফেরার পর আমার প্রথম কথা হবে, সুন্দরী, আমাকে বিয়ে কর। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার ঘরে সোনাদানা আর মণি-মাণিক্য যা কিছু আছে একবারটি চোখের সামনে দেখলে তার আর অমত করার উপায় থাকবে না।

ক্রাফট চোখে মুখে শয়তানসুলভ হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বলল, হতচ্ছাড়া, বুঝেছি, তোমাকে আরও হুইস্কি আর দুধ গেলাব। আমি ভেবেছিলাম, পশ্চিমের মানুষগুলো সহজেই এলিয়ে পড়ে।

মদ কিনতে গিয়ে ক্রাফট-এর কাছে যে কটা ডলার ছিল খরচ করে ফেলল। তারপর এমন কটমট করে জুডকিন্স আর আমার দিকে সে তাকাল যাতে তার শেষ পেনিটা পর্যন্ত খরচ করে ফেলল।

আমাদের শেষ পেনিটা পর্যন্ত মদের পিছনে খরচ করার পরও হতচ্ছাড়া কাঠগোলার মালিকটাকে নেশায় বুঁদ করে তুলতে না পারায় আমরা মুষড়ে পড়ার জোগাড় হলাম। অনন্যোপায় হয়ে ক্রাফট দুনিয়ার যত প্রথম সারির হাড়কিপ্টেদের সম্বন্ধে খনির মজুরটার কানের কাছে মুখ নিয়ে অভিধান বহির্ভূত বাছা বাছা কয়েকটা শব্দ উচ্চারণ করতে লাগল। হ্যাঁ, ওষুধে ধরেছে বটে। খনির মজুরটা এবার গোঙাতে গোঙাতে বলল, নিয়ে যাও, তোমরা যত খুশি মদ গেল। কথা বলতে বলতে সে গোছা গোছা নোট আর রূপার মুদ্রা ছড়াতে লাগল।

আমরা তার পয়সায় মদ আনিয়ে গলা পর্যন্ত ঢুকিয়ে নিলাম। তারপর বন্দুক দিয়ে ক্রাফট তাকে ঘায়েল করে ফেলল। কাজ হাসিল করে একটা গাড়িতে চাপিয়ে তাকে বহু দুরবর্তী একটা হোটেলে

চালান দিয়ে দিলাম। তার শোবার ব্যবস্থা করা হল তারই সোনার পিণ্ড আর সিল মাছের চামড়ার বিছানায়।

কাজ সেরে আমরা তিনজন আবার সাইফার-এর কাছে ফিরে গেলাম। খদ্দেররা অনেক আগেই যে যার বাড়ি ফিরে গেছে। আমরা তিনজন তখন মিলি-র হাত ধরে ধেই ধেই করে নাচতে লেগে গেলাম।

এ ঘটনা তিন বছর আগেকার। আর ঠিক তখনই পরমপিতা আমাদের ওপর প্রসন্ন হয়েছিলেন। ফলে সাইফার-এর বেশী সুস্বাদু ও মূল্যবান বহু খাদ্যবস্তু কেনার মত ডলার আমাদের হাতে আসে। আমরা যে যার ঠিকানা অনুযায়ী চলে গেলাম। তারপর জুডকিন্স-এর সঙ্গে খুবই কম, মাঝে মধ্যে দেখা হলেও ক্রাফট-এর সঙ্গে আর কোনদিনই দেখা হয়নি। হ্যাঁ, যে কথা বলতে চেয়েছিলাম, পাঁচ হাজার ডলারে বিক্রি হয়ে গেল এমন একটা ছবি আমি দেখেছিলাম। 'রোডেশিয়া' ছিল সেটার নাম। অন্যান্য দর্শকদের মধ্যে একমাত্র আমিই হয়ত চাচ্ছিলাম, রোডেশিয়া ফ্রেম থেকে বেরিয়ে আসুক। আর তার হাতে থাক, গো-মাংসের কিমা আর ডিমের পোচ।

আমি ছুটতে ছুটতে ক্রাফট-এর বাড়ি গিয়ে দেখলাম, তার চোখের তারায় শয়তানির ছাপ সুস্পষ্ট। রুক্ষ-উস্‌কো খুস্‌কো চেহারা। আর তার পোশাক-পরিচ্ছদ দর্জিকে দিয়ে তৈরী করানো। এসবের কিছুই আমার জানা ছিল না।

আমাকে দেখেই সে বলে উঠল, শোন, ধনসম্পদ দিয়ে আমরা ব্রনক্সে একটা চমৎকার বাড়ি খরিদ করেছি। তোমার সুবিধা মত যেকোন দিন সন্ধ্যা সাতটায় চলে এসো, আসবে তো?

আমি বললাম, তবে তুমি যখন আমাদের নিয়ে কাঠগোলার লোকটার সঙ্গে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলে সেটা নিছকই প্রকৃতিদেবীর নির্ভুল শিল্পশৈলীগত সামঞ্জস্য বিধানের ব্যাপার ছিল না, তুমি কি বল ক্রাফ্‌ট?

বিশ্রী ভাবে হেসে ক্রাফ্‌ট তার প্রশ্নের জবাব দিল, তা সম্পূর্ণরূপে অবশ্যই নয়।

আফ্‌টার টোয়েন্টি ইয়ার্স

প্রহরারত পুলিশটা রীতিমত উৎসাহের সঙ্গে চক্কর মেরে বেড়াচ্ছে। পথে কোন মানুষের আনাগোনা নেই। অতএব অবশ্যই মনে করা যেতে পারে কাজটা সে স্বভাব বশতই করছিল, লোক দেখানো ব্যাপার অবশ্যই নয়।

রাত্রি তখন সবে দশটা। তবে দমকা বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টির ফোঁটা থাকায় কনকনে ঠাণ্ডা অনুভব করা যায়। তাই ইতিমধ্যেই যে, যার ঘরের কোণে আশ্রয় নিয়েছে। রাস্তাও ইতিমধ্যে জনমানব শূন্য হয়ে পড়েছে।

বাড়ির দরজার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে, হাতের লাঠিটাকেবিচিত্র কৌশলে ঘোরাতে ঘোরাতে সে পথ পাড়ি দিতে লাগল। তবে শরীরটা তার টলছে আর মাঝে মধ্যে পথের দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। পুলিশটা শান্তি-রক্ষকের ভূমিকা ভালই পালন করছে, বলতে হবে। এ অঞ্চলের বাসিন্দারা সকাল সকালই বিছানায় আশ্রয় নেয়, ঘুমিয়েও পড়ে তাড়াতাড়িই।

বিশেষ একটা ব্লকের মাঝামাঝি পৌঁছে পুলিশটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখল একটা অন্ধকার লোহার দোকানের দরজায় হেলান দিয়ে একটা লোক শুয়ে রয়েছে। তার দু'ঠোঁটের ফাঁকে একটা চুরুট, এখনও অগ্নি সংযোগ করা হয়নি। তার কাছাকাছি গিয়ে পুলিশটা দাঁড়িয়ে পড়তেই সে বলতে লাগল, অফিসার, সবই ঠিকঠাক আছে। আমি এক বন্ধুর অপেক্ষায় এখানে বসে একটু ঝিমিয়ে নিচ্ছি। বিশ বছর আগে আমাদের এখানে দেখা করার পরিকল্পনা করে রাখা হয়েছিল। মুহূর্তের জন্য পুলিশটার মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে সে আবার মুখ খুলল, আমার কথাটা খুবই হেঁয়ালি মনে হচ্ছে, তাই না? ভাল কথা, আপনি যদি ব্যাপারটায় উৎসাহী হন তবে আমি খোলসা করে বলতে পারি।

পুলিশটাকে নীরব দেখে লোকটা ভাবল, [illegible] ব্যাপারটা সম্বন্ধে কৌতূহল বোধ করছে।

সে এবার নড়েচড়ে জুঁত হয়ে বসে বলতে লাগল, এই যে দোকানটা দেখছেন, তখন এখানে বুড়ো জো ব্রাডির রেস্তোরাঁ ছিল।

পুলিশটা তার পাশে বসতে বসতে বলল, 'পাঁচ বছর আগেও সেটা ছিল। তারপরই রেস্তোরাঁ ভেঙে লোহা লক্কড়ের দোকান করা হয়েছে।

লোকটা কোটের পকেট থেকে দেশলাই বের করে তাতে অগ্নি সংযোগ করে এক গাল ধোঁয়া ছাড়ল। দেশলাইয়ের আগুনের মৃদু আলোয় দেখা গেল তার মুখটা ফ্যাকাসে, চোয়াল চৌকো, চোখের তারা দুটো উজ্জ্বল আর ডানদিকের ভ্রূ-র কাছে একটা কাটা দাগ। আর? বেশ বড়সড় একটা হীরে বিচিত্র কৌশলে তার চাদরের পিনে সেঁটে দেওয়া হয়েছে।

ঠোঁটের বন্ধন থেকে চুরুটটাকে নামিয়ে এনে লোকটা আবার সরব হল, আজ থেকে বিশ বছর আগে আমি এখানে বুড়ো জো ব্রাডি-র রেস্তোরাঁয় রাতের খাবার খাচ্ছিলাম। আমার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু জিমি ওয়েলস্ আমার সঙ্গে ছিল। সত্যিকারের ভাল ছেলে বলতে যা বোঝায় সে ছিল সেরকমই একজন। এই নিউইয়র্ক শহরে আমরা দুজনে সহোদরের মত এক সঙ্গে বড় হয়েছিলাম। আমার বয়স তখন আঠারো বছর আর জিমি-র বয়স কুড়ি। পরদিন ভোরেই আমাদের অদৃষ্টের খোঁজে পশ্চিমে যাত্রা করার কথা ছিল। জিমি ছিল সত্যিকারের এক ঘরকুনো। তাকে নিউইয়র্কের বাইরে নিয়ে যাওয়া ছিল মহাসমস্যা বললে ঠিক বলা হবে না, একেবারেই অসম্ভব। তার ধারণা ছিল, একমাত্র এ জায়গাটা নিয়েই পৃথিবী। তারপর আমরা আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম, ঠিক বিশ বছর পরে সেই তারিখ ও সেই সময়টাতেই আমরা আবার এখানে মিলিত হব। তখন যত দূর থেকেই আসতে হোক, যেকোন পরিস্থিতিতেই থাকি না কেন আমরা যথা সময়ে এখানে আসবই আসব। আর আমরা নিঃসন্দেহ হয়েছিলাম বিশটা বছরে আমরা নিজ নিজ বরাত ফেরাতে পারবই।

পুলিশটা এবার একটু নড়েচড়ে বসে অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে বলল, দেখ হে, গল্পটা তো বেশ জমজমাটই মনে হচ্ছে। লাগছেও খুবই ভাল। তবে নতুন করে দেখা হবার ব্যবধানটা আমার কাছে খুবই বেশী মনে হচ্ছে। একটা কথা, তোমরা পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার পর থেকে দীর্ঘ বিশ বছরের মধ্যে বন্ধুটার কাছ থেকে কোন সাড়াই কি পাওনি?

হ্যাঁ, তা পেয়েছি। গোড়ার দিকে আমরা পরস্পরের কাছে চিঠি দিতাম। তবে সেটা মাত্র দু'-এক বছর। তারপর থেকে আমরা বে-পাত্তা হয়ে যাই। সত্যি বলতে কি, সুবিশাল পশ্চিম অঞ্চলটা জুড়ে আমি ঘুরে বেড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। আমি নিঃসন্দেহ যে, সে জীবিত থাকলে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য এখানে অবশ্যই আসবে। কারণ, তার মত অন্তরঙ্গ বন্ধু পৃথিবীতে দ্বিতীয় আর একজনও খুঁজে পাওয়া যাবে না। সে আমাকে অবশ্যই মন থেকে মুছে ফেলেনি, ভবিষ্যতেও কোনদিন মন থেকে সরিয়ে দিতে পারবে না। আমি নিজে এক হাজার মাইল অতিক্রম করে এখানে হাজির হয়েছি। আমার পুরনো ও অভিন্ন হৃদয় বন্ধুটা এসে পড়লেই আমার পরিশ্রম ও প্রয়াস উপযুক্ত মূল্য পাবে।

কথা বলতে বলতে লোকটা পকেট থেকে হীরক খচিত ঢাকনাযুক্ত ঘড়িটা বের করে তাতে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, দশটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। বিশ বছর আগে আমরা যখন রেস্তোরাঁয় পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেই তখন ছিল রাত্রি ঠিক দশটা।

দীর্ঘ নীরবতার পর পুলিশটা বলল, পশ্চিম অঞ্চলে তো বেশ বহাল তবিয়তেই ছিলে, তাই না?

হ্যাঁ, বাজি ধরে বলতে পারি। আমি মনে করি, জিমি বড় জোর এর অর্ধেক করতে পেরেছে। সে মানুষ হিসেবে চমৎকার, পরিশ্রমীও খুবই। বিত্ত-সম্পদের দিক থেকে তার সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে আমাকেও কিছু সংখ্যক করিতকর্মা লোকের সঙ্গে লড়তে হয়েছে। আসলে নিউইয়র্ক শহরটা বড়ই সমস্যা সঙ্কুল স্থান। পশ্চিমের কারবার টারবারই আলাদা মশাই।

শোন, তোমার গল্পটা জমজমাট হলেও আমাকে এখন বিদায় নিতেই হচ্ছে, কাজ আছে। আশা করছি, তোমার বাঞ্ছিত বন্ধুটা শীঘ্রই হাজির হবে। তুমি কি শীঘ্র এ জায়গা ছেড়ে চলে যাবে?

না। এটা সঙ্গত হবে না। কম সে কম আধঘণ্টা সময় তো তাকে দিতেই হবে। জিমি জীবিত

থাকলে সময়মত এখানে হাজির হবেই। অফিসার তবে আপনি কাজেই যান।

পুলিশটি বিদায় নিতে না নিতেই ঝিরঝির করে বৃষ্টি শুরু হল। দু'-চারজন পথচারী যা-ও ছিল সবাই ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে চলে গেল। আর এদিকে সে লোকটা হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে অনিশ্চিত মিলিত হবার আশা নিয়ে লোহার দোকানের বন্ধ দরজায় বসে চুরুট টেনে চলেছে যৌবনের এক সুহৃদয়ের জন্য অধীর প্রতীক্ষায়।

প্রায় আরও বিশ মিনিট বাদে দীর্ঘাকৃতি একজন মানুষ ওভারকোট গায়ে চাপিয়ে লম্বা-লম্বা পায়ে রাস্তাটা অতিক্রম করে সরাসরি লোহার দোকানের সামনের লোকটার মুখোমুখি এসে থেমে গেল। কিছুটা দ্বিধার সঙ্গে বলল, তুমিই তো বব, তাই না?

জ্বলন্ত চুরুট হাতে দরজায় অপেক্ষমাণ লোকটা বলল, হ্যাঁ। তবে তুমিই জিমি, জিমি ওয়েলস্, ঠিক ধরেছি তো?

নবাগত লোকটা বন্ধুর হাত দুটো ধরে গলা ছেড়ে বলে উঠল, কী আশ্চর্য ব্যাপার! তবে তুমি ববই বটে! আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম, তুমি জীবিত থাকলে তোমার দেখা পাবই। আসলে বিশটা বছর তো দীর্ঘ সময়ই বটে। বব, পুরনো রেস্তোরাঁটা থাকলে এখানেই আমরা রাতের খাবার সেরে নিতে পারতাম, ঠিক কিনা? যাকগে, এবার বল তো পশ্চিম অঞ্চল থেকে তুমি কি পেলে?

আমার বাঞ্ছিত সবই পেয়েছি। জিমি, তোমার মধ্যে কিন্তু অনেক, অনেক পরিবর্তন এসেছে। এর মধ্যে তুমি যে দু'-তিন ইঞ্চি লম্বা হয়ে যাবে আমি কিন্তু স্বপ্নেও-ভাবিনি।

ঠিক বলেছ। বিশ বছর পর আমি একটু ধিঙ্গি হয়ে গেছি বটে।

তুমি কিন্তু নিউইয়র্কে ভালই গুছিয়ে নিয়েছ, বুঝতে পারছি।

হ্যাঁ, অস্বীকার করার উপায় নেই। এখানকারই একটা বিভাগীয় অফিসে উঁচু পদেই চাকরি করছি। এবার বন্ধুর হাত দুটো ধরে সে সোল্লাসে বলল, বব, আমার পরিচিত একটা জায়গায় যাই চল, চুটিয়ে গল্প করা যাবে।

পশ্চিম থেকে আসা লোকটা হাঁটতে হাঁটতে নিজের সাফল্যের জন্য গর্ব বোধ করতে লাগল। সে নিজের জীবন কথা বলতে লাগল। সামান্য এগিয়ে বাঁকের মুখে একটা ওষুধের দোকানের উজ্জ্বল আলোয় তারা পরস্পরকে ভালভাবে দেখার সুযোগ পেল। এবার পশ্চিম থেকে আসা লোকটা হঠাৎ এক ঝটকায় নিজের হাতটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলে উঠল, না, তুমি আমার বাঞ্ছিত সে জিমি ওয়েলস নও। বিশ বছর দীর্ঘ সময় হলেও কিন্তু এত দীর্ঘ নয় যে, একটা মানুষের সুতীক্ষ্ণ নাকটা পরিবর্তিত হয়ে বোচা হয়ে যেতে পারে।

দীর্ঘাকৃতি লোকটা বলল, কোন কোন ক্ষেত্রে একটা ভাল লোকও মন্দ হয়ে যেতে পারে, স্বীকার করতো? বব, দশ মিনিট আগেই তুমি গ্রেপ্তার হয়েছ। শিকাগো মনে করে যে, তুমি আমাদের মাঝখানে হাজির হয়ে পড়েছ। তাই সে টেলিগ্রাফ করে আমাকে জানিয়েছে যে, সে তোমার সঙ্গে দু'-চারটে কথা বলতে উৎসাহী। বাধ্য বালকের মত আমার সঙ্গে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে আমি মনে করি। পকেট থেকে এক চিলতে কাগজ বের করে এবার বলল, আমার প্রতি নির্দেশ রয়েছে থানায় পৌঁছবার আগেই যেন আমি এটা তোমার হাতে তুলে দেই। ইচ্ছে করলে একবারটি চোখ বুলিয়ে নিতে পার। পুলিশ ওয়েলস এটা লিখেছে।

কাগজের চিলতেটার গায়ে মুহূর্তের মধ্যে চোখ বুলিয়ে পশ্চিম থেকে আসা লোকটার মুখটা হঠাৎ কেমন যেন মিইয়ে গেল। আর পা দুটো থরথরিয়ে কাঁপতে লাগল।

কাগজের চিলতেটার গায়ে লেখা রয়েছে, বব, আমি নির্ধারিত সময়ে এবং নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে গিয়েছিলাম। তুমি চুরুটটা ধরাতে গিয়ে দেশলাই জ্বাললে, তখনই আমি নিঃসন্দেহ হয়ে পড়েছিলাম, যাকে ধরার জন্য শিকাগো শহর তোলপাড় করা হচ্ছে তুমি-ই সে ব্যক্তি। যে কারণেই হোক আমার পক্ষে কাজটা করা সম্ভব হয়নি। তাই শেষমেশ নিজে না গিয়ে কাজটা সারার জন্য একজন সাদা পোশাকের মানুষকে পাঠাতেই হল।

ফ্রম দ্য ক্যাবী'স সিট

অন্য যে কোন রকম কাজের তুলনায় ছ্যাকড়া গাড়ির গাড়োয়ানদের কাজের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। তাছাড়া তারা অন্য দশজনের চেয়ে সহজ-সরল প্রকৃতির। গাড়ির উঁচু আসনে বসে সে পথচারী ছাড়া অন্য কিছুই ভাবতে পারে না, আসলে ভ্রমণের নেশায় পাগল না হলে তাদের কোন মূল্য আছে বলেই মনে করে না।

গাড়োয়ান একজন ছ্যাকড়া গাড়ির চালক। আর তোমাদের সে মালপত্রের মতই জ্ঞান করে। তুমি স্বয়ং রাষ্ট্রপতিই হও বা ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলেই হও না কেন, একজন গাড়োয়ানের চোখে তুমি একটা চালান দেওয়া মাল ছাড়া কিছুই নও। তুমি তার গাড়িতে চাপার পর কষে সপাং সপাং করে চাবুক হাঁকবে, তোমার হাড্ডি গুঁড়ো গুঁড়ো করে তোমাকে নির্দিষ্ট স্থানে নামিয়ে দেবে। এবার তুমি নিজের পথ দেখে নাও গে।

গাড়ি থেকে নেমে ভাড়া মেটাবার সময় যদি তোমার হাবভাবে এমন কোন ভাব লক্ষিত হয় যে, তুমি নির্ধারিত ভাড়াটা জান তবে জেনে রেখো তোমার বরাতে অনেক দুর্গতি আছে। আর যদি বোকা ভুল করে তোমার নোটবইটা ফেলে গেছ তবে সহজেই অনুমান করতে পারবে 'দান্তে'র কল্পনাও কত নরম ছিল। অতএব তোমাকে ছ্যাকড়া গাড়ির গাড়োয়ানকে সমঝে চলতেই হবে।

কোচয়ানের মধ্যে এরকম মনোভাবের সঞ্চার ঘটার মূলে গাড়িটার বিচিত্র নির্মাণ কৌশল। আর এরই ফলে জীবন সম্পর্কে তার একপেশে দৃষ্টিভঙ্গীর মূলেও একই কারণ কাজ করে চলেছে।

দরজার ওপরে বসে থাকা মোরগটা যেমন জুপিটার-এর মত রাজা-সুলভ ভাবভঙ্গীতে বসে গম্ভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ঠিক তেমনই কোচয়ান তার উঁচু আসনটায় উঠে বসে চামড়ার চাবুকটা হাতে তুলে নেয়। মনে রেখো এর ওপরই তোমার বরাত নির্ভর করছে। গাড়ি চলতে থাকলে তুমি যেন পুতুল সেজে চুপটি করে বসে আছ। জেলখানার কয়েদির মত হাস্যকর পদ্ধতিতে হরদম দুলেই চলেছ। খাঁচায় আটকা-পড়া ইঁদুর যেমন বরাত সম্বল করে বসেই থাকে তোমার অবস্থাও হবে ঠিক সেরকমই।

ছ্যাকড়া গাড়িতে ওঠার পর তুমি একটা সিটের দাবীদার কিন্তু নও, একটা মাল বোঝার সামিল। সমুদ্রের বুকে ভেসে চলা জাহাজের একটা মালের গাট্টি ছাড়া তোমাকে অন্য কিছু ভাবাই যায় না।

এক রাত্রে সামনের ভাড়াটে বাড়িটার যেখানে 'ম্যাক্‌গ্যারির কাফে' রয়েছে তার ঠিক পাশের ঘরটা থেকে পানাহারের তুমুল হৈ হট্টগোল ভেসে আসতে লাগল। ওয়ালশ পরিবার যে ঘরটায় থাকে মনে হল সেটা থেকে অভাবনীয় আওয়াজটা ভেসে আসছে। পাশের গলির পথচারী ও উৎসাহী প্রতিবেশীদের ভিড় ক্রমেই বাড়তে লাগল। সবার মনেই জমাটবাঁধা কৌতূহল। ব্যাপারটা কি? ঘরটা থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসা টুকরো টুকরো কথা থেকে অনুমান করে নেওয়া হল নোরা ওয়ালশ-এর বিয়ে সম্পন্ন হচ্ছে। হিতাকাঙ্ক্ষীরা উল্লসিত হয়ে যেসব কথাবার্তা বলছে সেগুলোই হৈ-চৈ-এর রূপ নিয়ে প্রতিবেশীদের মধ্যে কৌতূহল সঞ্চার করছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কৌতূহলীদের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে গলিটার যাতায়াতের পথ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল।

জেরি ও' ডোনোভান-এর ছ্যাকড়া গাড়িটা গলির মুখেই দাঁড়িয়ে। পল্লীবাসীরা জেরিকে রাত্রের বাজপাখি বলে সম্বোধন করে। তবে এ-ও সত্য যে, ধারে কাছের কয়েকটা পল্লীর মধ্যে জেরির গাড়িটার চেয়ে বেশী ঝক্‌ঝকে চক্‌চকে অন্য আর একটা গাড়ি দেখা যাবে না। আর তার ঘোড়াটা? আমি হলফ করে বলতে পারি, তার ঘোড়াটাকে দেখে খন্দের ধরা বুড়িটা পর্যন্ত না হেসে পারত না। অতএব ঘোড়াটার হাল হকিকত সম্বন্ধে আর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া দরকার আছে বলে মনে করি না।

পথচারী আর প্রতিবেশীরা তামাসা দেখার জন্য অস্থিরতার মধ্যে ডুবে থাকলেও জেরি কিন্তু তার কাজ ঠিক হাসিল করে নিয়েছে। তার ছ্যাকড়া গাড়িটা ইতিমধ্যেই যাত্রীতে বোঝাই হয়ে গেছে। মুহূর্তের মধ্যেই এক যুবতী উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে তার গাড়ির পাশে এসে দাঁড়াল। সে রীতিমত

হাঁপাতে লাগল। ব্যাপারটা জেরির ব্যবসায়িক চোখের নজর এড়াল না।

জেরি এক লাফে তার কোচ-বাক্স থেকে নেমে এসে যাত্রীদের সরিয়ে দিয়ে যুবতীটার জন্য একটা সিটের ব্যবস্থা করে দিল। পরমুহূর্তেই উদ্ভুত উপায়ে লাফ দিয়ে আবার নিজের সিটে গিয়ে বসল। তার চাবুকটা বার দু'-তিন হিস্ হিস্ শব্দ করা মাত্র গাড়ির সামনের ভিড়টা ঝটপট পাতলা হয়ে গেল। ব্যাস, ঝক্‌ঝকে চক্‌চকে গাড়িটা এবার ধীরে মন্থর গতিতে শহরের পথে এগিয়ে যেতে লাগল।

কিছুটা পথ পাড়ি দেবার পর জেরি তার ঢাকনাটা ফাঁক করে বলল, এই যে, শুনছেন? আপনি কোথায় যাবেন?

নিচ থেকে মিষ্টি মধুর কণ্ঠের জবাব তার কানে গেল, তোমার মর্জি, যেখানে নিয়ে যাবে।

জেরি ভাবল যুবতীটা বুঝি একটু হাওয়া খেতে বেরিয়েছে তাই তার নির্দিষ্ট কোন গন্তব্যস্থল নেই। এ রকম ভেবে সে তার অভ্যাসমত একটা পরামর্শ দিল, দিদিমণি, এক চক্কর মেরে পার্কটা দেখে নিন। সন্ধ্যার হিমেল হাওয়ায় মন্দ লাগবে না। তাই করবেন কি?

আমি জানি নে বাপু, তোমার যা মর্জি তাই কর।

কোচয়ান জেরি এবার গাড়িটাকে ফিফ্‌থ্ এভিনিউর দিকে হাঁকাল। গাড়িতে বসে দোল খেতে খেতে জেরির মদের নেশাটা কেটে গিয়ে চমৎকার একটা আমেজে ডুবে যেতে লাগল।

এদিকে অন্ধকার গাড়ির ভেতরে বসে যুবতীটা কৌতূহলী দৃষ্টিতে পথের দু'ধারের আলো আর বাড়িগুলো দেখতে লাগল।

গাড়িটা ফিফ্‌টি নাইনথ্ স্ট্রীট ধরে চলতে থাকলে জেরির মাথাটা কেমন যেন ঝিমঝিম করতে লাগল। হাতের লাগাম ক্রমেই শিথিল হয়ে আসতে লাগল। ঘোড়াটা এক সময় পার্কের দরজা দিয়ে সোজা ভেতরে ঢুকে গেল। পথের ডানদিক ঘেঁষে গাড়িটা চক্কর মারতে লাগল।

জেরির মধ্যে অনেক দিনের একটা স্বভাব ক্রমে চাঙা হয়ে উঠতে লাগল। সে গাড়ির ওপরের ঢাকনাটা সামান্য ফাঁক করে বলল, দিদিমণি গাড়িটা ক্যাসিনোতে দাঁড় করাব কি? এখানে ঠাণ্ডা পানীয় আর গান-বাজনার ঢালাও বন্দোবস্তও আছে। অনেকেই এখানে গাড়ি দাঁড় করায়। যদি বলেন তো—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই যুবতীটা বলে উঠল, তুমি যখন দাঁড় করাতে চাচ্ছ তখন আর আপত্তির কি-ই বা থাকতে পারে, বল ত? ঠিক আছে দাঁড় করাও।

গাড়িটা একটু বাদেই থেমে গেল। জেরি কোচ-বাক্স থেকে লাফিয়ে নিচে নামল। পরমুহূর্তেই গাড়ির দরজা খুলে গেল। গাড়ি থেকে যুবতীটা নেমে এল। হরেক রঙের আলো আর রঙয়ের জৌলুসে তার চোখ দুটো ঝলসে যাবার জোগাড় হল। সে কৌতূহলী চোখে বার কয়েক এদিক ওদিক তাকাতেই তার হাতে কে যেন একটা কার্ড ফেলে দিল। সেটার দিকে চোখ ফেরাতেই ছাপানো চৌত্রিশ সংখ্যা দেখতে পেল। অনুসন্ধিৎসু চোখে চারদিকে তাকাতে সে দেখতে পেল প্রায় কুড়ি গজ দূরে মোটর গাড়ি, পাল্কি আর ছ্যাকড়া গাড়ির ভিড়ে তার গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক তখনই শার্ট পরা একটা লোক হেলেদুলে এগিয়ে এসে তার সামনে দাঁড়াল। পর মুহূর্তেই সে দেখল, লোকটা একটা টেবিলে বসে রয়েছে।

যুবতীটা তার বটুয়ার ভেতর থেকে কিছু খুচরো মুদ্রা বের করে বুঝল, এক গ্লাস বিয়ার কেনা যেতে পারে।

যুবতীটার সামনে পঞ্চাশটা টেবিল জুড়ে বসে রয়েছে যেন অচিন দেশের রাজা আর রানীরা। তাদের পোশাক-আশাক থেকে ঝিল্লা বেরিয়ে তার চোখ দুটোকে যেন ঝলসে দিতে লাগল। পৃথিবীতে যে এত হীরে-মুক্তো-জহরৎ আর রেশমী কাপড় থাকতে পারে, সে সম্বন্ধে তার ধারণাই ছিল না।

ঝলমলে পোশাকে সজ্জিত একজন থেকে থেকে জেরির যুবতী যাত্রিণীর দিকে তাকাতে লাগল। তারা দেখতে পেল গোলাপী শার্ট পরা একটা সাদাসিদে মানুষ আর একটা সাদাসিদে মুখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে জীবনের প্রতি ভালবাসার এমন এক মায়া কাজল পরা দৃষ্টি যা রানীদেরও ঈর্ষা উৎপাদন করছে।

ঘড়ির ঘণ্টার কাঁটা দুটো দু'দু'বার ঘুরে গেল। এবার রাজা আর রানীরা তাদের সিটগুলো ছেড়ে উঠে পড়ল। তাদের কেউ মূল্যবান আর সুদৃশ্য গাড়িতে চেপে বিদায় নিল আবার কেউ বা গল্পগুজব-হাসিঠাট্টায় মেতে গেল।

এক সাদাসিদে মানুষ একটা টেবিলে প্রায় একাই বসেছিল। তার চারদিকের কাপড়গুলো হোটেল-বয়রা তুলে নিয়ে যেতে লাগল।

জেরির সঙ্গিনী যুবতীটা সংখ্যা লেখা কার্ডটা তুলে দেখিয়ে বলল, এ টিকিটটায় কি লেখা আছে বল তো?'

হোটেল বয়টা কাজের ফাঁকে বলল—এতে তার গাড়ির নম্বরটা লেখা আছে। গেটের লোকটাকে এটা দেখাতে হবে। তার হাত থেকে কার্ডটা নিয়ে সে জোরে জোরে সংখ্যা হাঁকতে লাগল। তখন মাত্র তিনটে ছ্যাকড়া গাড়ি সেখানে দাঁড়িয়েছিল। একটা গাড়ির গাড়োয়ান এগিয়ে গিয়ে যুবতী যাত্রিণীকে নিয়ে গাড়িতে তুলে নিল।

গাড়িটা পার্কটার সদর দরজায় পৌঁছনো মাত্র জেরির মনে খটকা জাগল। ক'টা কথা তার মনের কোণে উঁকি দিতে লাগল। ঘোড়াটাকে থামিয়ে সে ঢাকনাটা ফাঁক করে বলল, দেখুন, আর এগোবার আগে আমার জেনে নেওয়া দরকার আপনার কাছে চারটে ডলার আছে কিনা।

মেয়েটা হেসে বলল, চার ডলার অবশ্যই নেই। আমার বটুয়ায় কয়েকটা পেনি বা গোটা দু'-একটা ডাইস পড়ে আছে।

তার কথা শেষ হলে জেরি আবার তার ঘোড়াটার পিঠে চাবুক হাঁকল। ঘোড়ার খুরের খট্ খট্ আওয়াজেও তার কাঁচা খিস্তিটা চাপা পড়ল না। সে অনবরত বাছা-বাছা খিস্তি গাড়িতে বসে-থাকা যুবতীটার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে লাগল। যেসব গাড়ি তার গাড়িকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে তাদের লক্ষ্য করে চাবুক হাঁকতে লাগল। মুখে উচ্চারণ করতে লাগল প্রচলিত যত সব কাঁচা খিস্তি।

বাড়ির সারির মধ্যে যে বাড়িটার সিঁড়ির পাশে সবুজ আলো জ্বলছিল তার সদর দরজার গায়ে জেরি তার গাড়িটা দাঁড় করাল। এক লাফে কোচ-বাক্সটা থেকে নেমে ব্যস্ত হাতে দরজাটা খুলে বেশ গম্ভীর স্বরেই বলল, নেমে আসুন। যুবতী যাত্রিণী গাড়ি থেকে নেমে এল। ক্যাসিনোর হাসির ঝিলিক তখনও তার মুখ থেকে বিদায় নেয় নি। জেরি তাকে টেনে হিঁচড়ে থানার ভেতরে নিয়ে গেল। পুলিশ সার্জেন্ট তার চওড়া গোঁফওয়ালা ইয়া বড় মুখটা তুলে তাকাল। জেরি আর তার চকচকে গাড়ি কোনটাই তার অচেনা নয়।

জেরি গলা ছেড়ে বলতে লাগল—স্যার, এই যুবতী যাত্রিণীটা—সে রাগে এমন কাঁপতে লাগল যে, সে কথাটা শেষ করতে পারল না।

একটু দম নিয়ে কিছুটা স্বাভাবিকতা ফিরে পেয়ে সে আবার মুখ খুলল—স্যার। এ যুবতী যাত্রিণীটাকে আপনার দরবারে পেশ করতে চাই। এ আমার বৌ। আজ সন্ধ্যায়ই বুড়ো ওয়ালেশ-এর বাড়িতে আমাদের বিয়ে হয়েছে। আমি একে বিয়ে করেছি। এবার যুবতী যাত্রিণীটার দিকে ফিরে বলল, নোরা, হুজুরের সঙ্গে করমর্দন কর। তারপরই আমরা বাড়ির দিকে যাত্রা করব।

নোরা পা-দানিতে পা রেখে গাড়িতে ওঠার পূর্ব মুহূর্তে বলল, আমার সময়টা কিন্তু আনন্দেই কাটল।

দ্য ভয়েস অব দ্য সিটি—১৯০৮

বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা পঁচিশ বছর আগে সুর করে করে পাঠ করত, সুরেলা আবৃত্তির কায়দায়, গীর্জার পাদরীর মন্ত্রোচ্চারণ ও করাতকলের পরিশ্রান্ত গুঞ্জনধ্বনির মাঝামাঝি একটা সুর। আমি কারো প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করছি না। চেরাই কাঠ ও করাতের গুঁড়ো কোনটাই তো আর ফেলনা নয়। দু-ই দরকারী।

জীবন গঠনের শ্রেণীতে পাঠ নেওয়া ছোট্ট একটা শিক্ষণীয় কবিতার কথা আমার স্মৃতির পটে ভেসে উঠছে। তার পংক্তিগুলোর মধ্যে দীর্ঘতম জঙ্ঘাস্থি।

তাই বলছি কি, মনুষ্য সংক্রান্ত যাবতীয় জাগতিক আর আধ্যাত্মিক ঘটনাগুলোকে যদি শৈশবেই

এমন সুরেলা পদ্ধতিতে আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে ঢুকিয়ে দেওয়া হ'ত তবে কী অমূল্য উপহারের ভূমিকা পালন করত তা আর স্বীকারের অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু শারীরবৃত্তীয় বিদ্যা, দর্শন আর সঙ্গীতের মাধ্যমে আমরা যা লাভ করি তা খুবই নগণ্য।

সেদিনেরই কথা, আমি খুবই ধন্দে পড়ে গিয়েছিলাম। একটা আলোকরশ্মির প্রয়োজন বড্ড বেশী করে উপলব্ধি করছিলাম। সাহায্য লাভের প্রত্যাশা নিয়ে বিদ্যালয় জীবনের দিনগুলোর দিকে ফিরে তাকিয়েছিলাম। কিন্তু তখন সেসব দাঁতভাঙা শব্দগুলো থেকে যা কিছু লাভ করেছিলাম তার মধ্যে কিছু কথাও স্মৃতিতে আনতে পারলাম না, সম্মিলিত মানুষের মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে।

অন্যরকমভাবে বলতে গেলে সম্মিলিত মানবতার মিশ্র-বাণী সংক্রান্ত। এক মহানগরের সম্মিলিত কণ্ঠস্বরের কথা। তবে একক কণ্ঠস্বরের অভাব কিন্তু নেই। কবির কবিতা, পংক্তি গায়কের গানের কলি, ফুলের ভাষা, নদীর কলধ্বনি, পরবর্তী সোমবারের মধ্যে যে পাঁচ ডলার পেতে আগ্রহী তার বক্তব্যের অর্থ, কন্ডাক্টরের সতর্কতা—সাবধানে এগিয়ে যান, ভোর চারটায় দুধের পাত্রে ধুপ্‌ধাপ্ আওয়াজ সবই অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারি। কিন্তু মহানগরের কণ্ঠস্বরের মানে কে উপলব্ধি করতে পারে।

সেটা দেখার জন্য আমি ঘর ছেড়ে বেরোই। সবার আগে আরেলিয়ার কাছে জানতে চাই। তার গায়ে ছিল সুইচ-এর পোশাক, মাথায় ফুট-আঁটা টুপি, আর পোশাকের বিভিন্ন অংশ থেকে নানা রঙের সুতো আর ফিতে উড়ছিল।

নিজস্ব কোন স্বরের অভাবে আমাকে কেবলমাত্র গোঙানির স্বরেই ভাব ব্যক্ত করতে হ'ল—সুবিশাল এ নগরটা কি কথা বলে? তোমার সঙ্গে কি কোনদিন কথা বলেছে? তার বক্তব্য তুমি কিভাবে অনুধাবন কর, বল তো? ব্যাপারটা খুবই লটঘটে স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু উপায় তো কোন না কোন একটা আছেই।

আরেলিয়া প্রশ্ন করল, সারাটোগা একটা বাক্সের মত কি?

আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম, অনুগ্রহ করে আবার ঢাকনার প্রসঙ্গ উত্থাপন কোরো না যেন। সব নগরেরই নিজস্ব একটি ভাষা আছে বলে আমি মনে করি। তোমাকে মহানগরটা কিছু বলে কি?

দেখ, এ দ্বীপটায় চার লক্ষ মানুষ কোনরকমে মাথা গুঁজে অবস্থান করছে। এমন ছোট্ট একটা জায়গায় এমন অধিকসংখ্যক মানুষ গাদাগাদি করে বাস করলে সেখানে একটা জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হতে হবে। আর তাদের মিলিত স্বরকেই মহানগরের কণ্ঠস্বর আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। আর সেটাই তো তোমার কাছে জানতে চাইছি, বলতে পারবে কি?

আরেলিয়া মুখে একটা অদ্ভুত হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে নীরবে মাথা নীচু করে বসে রইল।

আমি কিন্তু এত সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নই। দৃঢ় কণ্ঠেই বললাম, শোন, আমি নিজেই এখানে ওখানে ঘুরে মহানগরের কণ্ঠস্বরটা খোঁজ করে জেনে নেব। প্রতিটা নগরেরই নিজস্ব একটা ভাষা আছে। কিন্তু কি সে ভাষা? আমাকে সেটা খোঁজ করে বের করতেই হবে। আমার প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে নিউইয়র্ক হয়ত আমতা আমতা করে বলবে, প্রচারের জন্য আমার পক্ষে মুখ খোলা সম্ভব নয়। অন্য কোন নগর এমন কোন কাজ করে না। নিঃসঙ্কোচে শিকাগো বলল, আমি বলব, আবার ফিলাডেলফিয়া উত্তর দিতে বলে উঠল, হ্যাঁ, বলা তো দরকারই বটে। নিউ অর্লিন্স মন্তব্য করল, আমি বলেই থাকি; লুইকভিল দৃঢ়স্বরেই মনোভাব ব্যক্ত করল, কথাটা বলতে আমি কারোরই তোয়াক্কা করি না, পিটার্সবার্গ বলল, ধোঁয়া ছেড়ে দাও, ধোঁয়া ছাড়, সেন্ট লুইস মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলল—আমাকে মার্জনা কর ভাই, ছেড়ে দাও, আমাকে এবার নিউইয়র্ক কি বলে আমার জানা দরকার।

আরেলিয়া মুচকি হাসল।

আমি আবার মুখ খুললাম, থাক-থাক! আমি অন্য কোন জায়গা থেকে এর বক্তব্য জেনে আসব।

বড়সড় একটা বাড়িতে ঢুকে আমি পরিবেশক বিলি ম্যাগনাস'কে জিজ্ঞাসা করলাম, বিলি একটা কথা, তুমি তো দীর্ঘদিন নিউইয়র্ক শহরে আছ। আমি জানতে উৎসাহী, প্রাচীন এ নগরটা তোমাকে কেমন নাচ-গান উপহার দেয়, বলবে কি?

ঠিক সে মুহূর্তেই পাশের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল। বিলি ম্যাগনাস ব্যস্ত পায়ে ঘর ছেড়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত পরেই আবার একটা খালি বালতি নিয়ে ফিরে এল। সেটাকে পাশের বারান্দায় রেখে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, ম্যাম। তিনি দু'বারের বেশী দরজায় কড়া নাড়েন না। মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় এক গ্লাস বীয়ারে গলাটা ভিজিয়ে নিতে অভ্যস্ত।

আমি তার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে এক পেগ আদা বিয়ার চেয়ে নিলাম। বিয়ারটুকু পাকস্থলিতে চালান দিয়ে দিলাম।

এবার খুশিমনে ব্রডওয়ের দিকে সামান্য এগিয়ে এক পুলিশের মুখোমুখি হলাম। কোনরকম ভূমিকার সাহায্য না নিয়েই তাকে বললাম, আপনি তো সবচেয়ে কোলাহল মুখর সময়ে শহরটাকে দেখে থাকেন। শহরের শব্দ সম্বন্ধে আপনার ও আপনার সহকর্মীদের সম্যক ধারণা থাকাই স্বাভাবিক। অতএব এ শহরটার নিজস্ব একটা ভাষা অবশ্যই আছে, যা আপনারা উপলব্ধি করতে পারেন বলেই আমার ধারণা। রাত্রির নির্জনতায় শহরের বুকে টহল দেওয়ার সময় অবশ্যও তা শুনতে পান এবং অনুধাবন করতে পারেন। অনুগ্রহ করে বলুন সুবিশাল এ শহরটা আপনাকে কোন কথা কি বলে?

পুলিশটা আমতা আমতা করে বলল, দেখ হে, আমি কিছু বলি না কেবলমাত্র ওপরওয়ালার হুকুম তামিল করি। আমার কথার মাধ্যমে হয়ত আপনার বাঞ্ছিত জবাবটাই পেয়ে গেছেন। মিনিট কয়েকের মধ্যেই পরবর্তী প্রহরারত পুলিশের দেখা এখানেই পেয়ে যাবেন।

কথাটা বলতে বলতে পুলিশটা নিজের পথেই চলে গেল। দশ মিনিটের মধ্যে আবার ফিরে এসে আমার মুখোমুখি দাঁড়াল। প্রায় রুক্ষ স্বরেই বলল, গত মঙ্গলবার তারা বিয়ে করেছে। তারা তো আপনার চেনা জানাই, কি বলেন?

প্রতি রাত্রি ন'টায় কিছুক্ষণের জন্য এখানে আসে—ওহে একবারটি শুনছ, বলার জন্য। আমি যেকোন উপায়েই হোক এখানে উপস্থিত থাকি। আচ্ছা, একটু আগেই তো আপনি প্রশ্ন করেছিলেন এ নগরটায় কি কি আছে, ঠিক কিনা? বলছি শুনুন, পরপর বারোটা ব্লক অতিক্রম করলেই লক্ষ্য করবেন, দু-একটা বাড়ির ছাদে দিব্যি বাগান গড়ে তোলা হয়েছে।

আমি হাঁটতে হাঁটতে এক সময় ছায়া-ছায়া একটা বাগানের ধারে হাজির হলাম। সে মুহূর্তেই ব্যস্ত পায়ে আমার কবি ভদ্রলোক এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়ালেন। মাথার ঝাঁকড়া চুলগুলোকে টুপি দিয়ে সাধ্যমত ঢেকে রাখা হয়েছে। টুপির ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসা কয়েকটা চুল কপালের ওপর মৃদু মৃদু দোল খাচ্ছে। মুখে অনবরত কবিতার পংক্তি আওড়ে চলেছেন।

আমি তাকে দেখেই বলে উঠলাম, বলি, আমাকে একটু গাড়ি করে পৌঁছে দাও। আমি একটা কর্তব্য সম্পাদন করতে বেরিয়েছি। মহানগরের কণ্ঠস্বর আমাকে অবশ্যই শুনতে হবে। এটাকে একটা বিশেষ নির্দেশ জ্ঞান করতে পার। এ শহরটার আত্মার আর তাৎপর্যপূর্ণ কাব্যিক আর রোমাঞ্চ ও রহস্যময় ভাষা আবিষ্কার করতে এ প্রসঙ্গে তোমার পক্ষেই কিছুটা অন্তত আভাষ দেওয়া সম্ভব। নায়েগ্রা জলপ্রপাতের কাছে বছরকয়েক আগে একজন তার একটা স্বরলিপি আমাদের হাতে তুলে দিয়েছিল। সেটা ছিল পিয়ানোর সবচেয়ে নিচু গ্রাম 'জি' থেকেও ফুট দুই নিচে। কিন্তু এ পদ্ধতিতে তো আর নিউইয়র্ক নগরীর স্বরলিপি তৈরী করে নেওয়া সম্ভব নয়। সে যদি কিছু বলেই থাকে তার একটা ইঙ্গিত আমাকে দাও। আমি এটুকু অন্তত জানি, সেটা তৈরী করতে সারাদিন যেসব যানবাহন নির্গত করে তাদের একত্রে মিলিত করতে হবে। আর সে সঙ্গে সংমিশ্রণ ঘটাতে হবে ছাদের বাগানের গাছে জল দেওয়ার ধ্বনি, রাত্রের গান বাজনা আর অট্টহাসি, গাড়ির চাকার ঘড় ঘড় ধ্বনি, খবরের কাগজের ও অন্যান্য দ্রব্য বিক্রেতাদের চীৎকার চেঁচামেচি আর পার্কের কপোত-কপোতির মন দেওয়া-নেওয়ার গুনগুন ধ্বনিকেও তাদের সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে নিতে হবে। এদের মিশ্রণের ফলে মনোমুগ্ধকর সুরলহরীর উদ্ভব হবে যার সামান্যতম অংশ থেকেই আমাদের বাঞ্ছিত বস্তুটা লাভ করা সম্ভব।

ক্যালিফোর্নিয়ার যে মেয়েটার সঙ্গে আমাদের গত হপ্তায় স্টিভার-এর স্টুডিওতে দেখা হয়েছিল, তার কথা তোমার মনে আছে তো?

অবশ্যই! কিন্তু সে-ত আর গায়ক নয়, কবিতা আবৃত্তিকার।

এখন আমি তার কাছেই চলেছি। আমার 'বসন্তের উপহার' নামক কবিতাটার প্রতিটা অক্ষর, এমন কি দাড়ি-কমাসহ মুখস্ত করে ফেলেছে।

. আরে ভাই, যে ভাষাটার কথা তোমাকে বলেছি, তার কি চিন্তা করেছ? করলে?

হ্যাঁ, সে গান করে না সত্য। তবে তার কণ্ঠে আমার 'সাগর বেলার বায়ু' কবিতাটার আবৃত্তি বাস্তবিক অতুলনীয়।

আমি কয়েক পা এগিয়ে খবরের কাগজের ফেরিওয়ালার কাছে যেতেই সে তার হাতের কাগজটাই আমার হাতে গুঁজে দিল।

আমি পকেটে হাত চালান করে দিয়ে মুদ্রা খোঁজার ভাব দেখিয়ে বললাম—ভাই, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, তোমার কি মুহূর্তের জন্যও মনে হয় না, এ নগরটা হয়ত কথা বলে, মানে কথা বলতে পারে? এই যে নগরটায় উন্নতি-অবনতি আর কতই না হৈ হট্টগোল ঘটে চলেছে। নগরটার যদি কথা বলার ক্ষমতা থাকত তবে এসব ব্যাপার স্যাপার নিয়ে সে কি মন্তব্য করত বলে তুমি মনে করছ?

ধ্যুৎ মশাই, এসব অবান্তর কথা শোনার মত আমার ইচ্ছা বা সময় কোনটাই নেই। কোন্ পত্রিকাটা নেবেন দয়া করে তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন। ম্যাগির জন্মদিন উপলক্ষে একটা উপহার আমাকে কিনে নিয়ে যেতে হবে। ত্রিশটা সেন্ট চাই-ই চাই। কোনটা বলে ফেলুন, কোনটা নেবেন?

একটা খবরের কাগজ কিনতেই হল। যাবতীয় খবরসহ সেটাকে একটা আবর্জনার পাত্রে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। কারণ এতে তো আর কোন মহানগরের ভাষ্যকার নয়। ব্যস, এ অধ্যায়টা এখানেই চাপা পড়ে গেল।

আমি আবার পার্কটায় ফিরে এলাম। চাঁদের আলোয় একটা বেঞ্চ দখল করলাম। কেউ-ই আমার বাঞ্ছা পূরণ, আমার প্রশ্নের উত্তর করো কাছ থেকে না পাওয়ার জন্য মনটা বিষিয়ে রইল।

পর মুহূর্তেই বিদ্যুতের ঝিলিকের মতই দ্রুত আমার প্রশ্নের উত্তর আমার মনের গভীরে উঁকি দিল। যন্ত্রচালিতের মত আমি বেঞ্চ ছেড়ে সোজা হয়ে উঠি দাঁড়িয়ে পড়লাম। উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে আমার নিজের পল্লীতে হাজির হলাম। আমি যে উত্তরটা দীর্ঘ-অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে জানতে পেরে গেছি সেটা যেন আমার কাছ থেকে কোন অবস্থাতে জেনে নিতে না পারে।

তখনও আরেলিয়া সেখানেই অবস্থান করছে। আমি ধীর পায়ে এগিয়ে তার পাশে গিয়ে নীরবে দাঁড়ালাম। আমরা উভয়েই চাঁদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম। দেখতে পেলাম, চলমান একটা মেঘের টুকরো চাঁদের কাছাকাছি যেতেই বিবর্ণ হয়ে পড়ল—পরাজিত সৈন্যদলের মত চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়তে লাগল।

ব্যস, ঠিক সে মুহূর্তেই আমার মনের গভীরে বিস্ময় মিশ্রিত খুশির জোয়ার বয়ে যেতে লাগল। আমাদের হাত দুটো যে ঠিক কখন, কিভাবে পরস্পরকে স্পর্শ করে, তা সে বা আমি কেউই বলতে পারব না। আমাদের আঙুলগুলো পরস্পরের সঙ্গে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ল। সে বন্ধন চিরস্থায়ী হয়ে গেল।

পুরো আধঘণ্টা আমরা উভয়েই মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে রইলাম।

এক সময় আরেলিয়া ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বলল, ফিরে আসার পর থেকে তুমি টু-শব্দটিও করনি, আমি লক্ষ্য করছি।

আরে, এটাই তো মহানগরের কণ্ঠস্বর। আমি গম্ভীর মুখে মাথাটা সামান্য নেড়ে বললাম।

লিটল স্পিক ইন গারনেরেড ফ্রুট

কনে মাটিতে পা ঠেকিয়ে দোলনায় বসে রয়েছে। মধুচন্দ্রিমা রীতিমত জমজমাট। তার চোখে রঙিন স্বপ্ন। আর গোলাপী রঙের কিমোনো গায়ে জড়িয়ে দোলনায় মৃদু-মৃদু দোল খেয়ে চলেছে আর সে আপন মনে ভেবে চলেছে কিড ম্যাক্‌গ্যারির সঙ্গে তার বিয়ের প্রসঙ্গটা নিয়ে টাসমানিয়া বেলুচিস্তান আর গ্রীনল্যান্ডের মানুষগুলো কি জল্পনা কল্পনা করছে। তবে এ-ও খুবই সত্য যে, এর জন্য কিন্তু পরিস্থিতির কোন হেরফের হবার নয়।

দোলনায় শরীর এলিয়ে দিয়ে সুসজ্জিতা কনে জানাল, তার পিচফল খাবার সখ হয়েছে।

কিড ম্যাক্‌গ্যারি কোট আর হ্যাট পরে নববধূর আকাঙ্ক্ষিত পিচফল আনার জন্য তৈরি হতে হতে বলল, দেরী করব না। আমি এক দৌড়ে যাব আর ফিরে আসব। কথাটা ছুঁড়ে দিয়েই সিঁড়ির দিকে দ্রুত হেঁটে গেল।

সে সামান্য গলা ছেড়ে বলল, লক্ষ্মীটি দেরী কোরো না যেন। তুমি কাছে না থাকলে বড্ড ফাঁকা ফাঁকা লাগবে। আর পাকা টসটসে পিচফল এনো কিন্তু।

কিড যেন এখনই বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে এরকমভাবে বার বার বিদায় জানিয়ে তার সদ্যবিবাহিতা স্ত্রীর জন্য পিচফল আনতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল।

স্বাভাবিক কারণেই সেখানে তার দেরি হতে লাগল, কারণ, গ্রীষ্মকাল। এ সময়ে বাঞ্ছিত সোনালী রসাল পিচফল পথের ধারের কোন দোকানে বা কোন ফেরিওয়ালার কাছে সহজে পাওয়া গেল না, পাওয়ার কথাও নয়।

মোড়ের মাথায় ইতালীয় ফলের দোকানটার সামনে সে দাঁড়াল। অনুসন্ধিৎসু চোখে পিচফল খুঁজতে গিয়ে রোদে শুকিয়ে যাওয়া কলা, কমলালেবু আর আপেল দেখে বিতৃষ্ণায় চোখ ফেরাল।

প্রেমিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম প্রেমিক দান্তের মতই আগ্রহ ও ব্যস্ততার সঙ্গে দোকানিকে জিজ্ঞাসা করল, ভাই, পিচফল আছে?

না, স্যার। এখনও তো পিচফলের সময় হয়নি। ভাল কমলালেবু লাগবে? বলুন তো দিতে পারি।

কিড ম্যাক্‌গ্যারি বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরিয়ে আবার হাঁটতে লাগল। এবার সে ঢুকল সারা রাত্রি খোলা থাকে এমন একটা চপের দোকানে। তারপর গেল কাফেতে আর সবশেষে বন্ধুবর জাস্টাস ও' কালাহান-এর ফলের দোকানে বাঞ্ছিত ফলটার খোঁজ করল। কালাহান-এর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, আরে ভাই, আর বোলো না, বুড়ি, মানে সদ্য বিয়ে করা বৌটা পিচফলের আব্দার করেছে, আছে? যদি থাকে তাড়াতাড়ি দাও। আর তোমার কাছে যদি প্রচুর সংখ্যক থেকে থাকে তবে আর একটা নয়, সবার জন্যই দাও।

ভাই, তোমার নতুন বৌটা কী রকম আব্দার করেছে। পীচফল আমার কাছে তো নেই-ই অন্য কারো কাছেও পাবে না। এখনও তার সময় হয়নি। ব্রডওয়েতে গিয়ে দেখতে পার। তবে সেখানেও পাবে বলে আশা কম। ব্যাপারটা সমস্যাই। কোন মহিলার বিশেষ কোন ফলের ওপর আকর্ষণ জন্মালে অন্য যত ভালফলই দাও না কেন মুখে তুলবে না। কিন্তু সমস্যা, এত রাত্রি হয়ে গেছে, বড়সড় কোন ফলের দোকানও খোলা না থাকারই কথা। তোমার বউ কমলালেবু খেলে পুরো একটা বাক্স কমলালেবু দিতে পারি, চলবে?

ধন্যবাদ। অন্য কোথাও গিয়ে চেষ্টা করে দেখি।

কিড যখন ওয়েস্টসাইড এভিনিউতে পা দিল তখন প্রায় মাঝরাত্রি। কয়েকটা দোকানে আলো জ্বলছে, খোলা। কিন্তু তাদের কাছে পিচফলের খোঁজ করতেই রীতিমত খেঁকিয়ে উঠল।

কিন্তু এত সহজে হাল ছেড়ে দিলে কিড ম্যাক্‌গ্যারীর যে চলবে না। তার সদ্যলব্ধ জীবনসঙ্গিনী যে ফ্ল্যাটের খাটের ওপর পারসিক ফলটার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। কিন্তু অবাক করার মত ব্যাপারই বটে। তার মত একজন নামকরা হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন সামান্য একটা পিচফল জোগাড় করতে পারবে না, অবিশ্বাস্য ব্যাপারই বটে।

হঠাৎ কিড ম্যাক্‌গ্যারি দেখল, এক ফল বিক্রেতা দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করছে। সে এক দৌড়ে

তার কাছে হাজির হল। ব্যস্ত কণ্ঠে বলল, ভাই, পিচফল—পিচ ফল আছে কি?

ধ্যুৎ মশাই! দোকান বন্ধ করার সময়—না, নেই। তালা লাগাতে লাগাতে বলল, দেখুন, আরও তিন-চার হপ্তা পরে খোঁজ করবেন। তবে কারো দোকানে দু-একটা পড়ে থাকতেও পারে। তবে কোথায় পাবেন বলতে পারব না। বড় কোন হোটেল-রেস্তোরাঁয় খুঁজে দেখতে পারেন। সে সব জায়গায় টাকার খেলা চলে, প্রচুর টাকা বাজে খরচ হয়। আজকের জাহাজেই ভাল কিছু কমলালেবু এসেছে, লাগে তো বলুন।

কিড দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার কাছ থেকে ফিরে এসে পাশের একটা অন্ধকার গলিতে ঢুকল। সামান্য এগিয়ে যেতেই একটা বাড়ির সিঁড়িতে সবুজ আলো জ্বলতে দেখল।

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে থানার ডেস্ক-সার্জেন্টকে সামনে পেয়ে বলল, ক্যাপ্টেন, ধারে-কাছেই কোথাও গেছিলেন কি?

তার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই ক্যাপ্টেন কাঁটা-মারা বুটে গুরুগম্ভীর আওয়াজ তুলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তার গায়ে সাদা পোশাক, মাথায় টুপি, সব সময়েই যেন দারুণ ব্যস্ত এমন একটা ভাব তার মধ্যে লক্ষিত হল।

হেভীওয়েট চ্যাম্পিয়নকে লক্ষ্য করে বললেন, এই যে কিড, আমি তো ধরেই নিয়েছিলাম তুমি মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে গেছ।

হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। কালই ফিরে এসেছি। এবার পুরো দামে মিউনিসিপ্যালিটিব কাজ করব। একটা কথা, আজ রাত্রে একবারটি ডেন্‌বার ডিক-এর বাড়িতে যাওয়া সম্ভব হবে কি?

সে সব ব্যাপার মিটে গেছে। দু' মাস আগেই তো ডেনবারকে ধরে ফেলা হয়েছে।

হ্যাঁ, সত্যি বটে। তেতাল্লিশ নম্বর রাস্তা থেকে র‍্যাফার্টি তাকে তাড়িয়েছে। সে তো এখন আপনার অঞ্চলেই ঘাঁটি গেড়েছে। জুয়ার কারবার রীতিমত জমিয়ে তুলেছে। আমি নিজেও জুয়ার কারবারে লিপ্ত। আপনাকে তার পিছনে লেলিয়ে দিতে পারি, খারাপ হবে?

ক্যাপ্টেন বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন—কি বললে কিড, আমার অঞ্চলে? শয়তানটা আমাব অঞ্চলে ঘাঁটি গেড়েছে, তুমি ঠিক জান ত? তবে তো এতে তোমার উপকারই হবে। যাক, এবার খোলসা করে বলত, কাজটা কিভাবে হাসিল করা যাবে?

এখনও দরজায় ইস্পাতের পাত লাগায়নি। বড়সড় একটা হাতুড়ি দিযে ঘা মারলেই কাজ হাসিল। দশটা লোকও জোগাড় করার দরকার নেই। ডেনবার আমার ওপর রেগে একেবারে আগুন হয়ে রয়েছে। তার বিশ্বাস, গতবারের হামলা হুজ্জতির খবরাখবর আমি দিয়েছি। আমাব তাড়া রয়েছে। মাত্র তিনটে ব্লক দূরে আমি মাথা গুঁজেছি। দরকার হলে—

তার মুখের কথা শেষ হবার আগেই ক্যাপ্টেন পথপ্রদর্শক আর বারোজন লোক নিয়ে গাড়িতে ওঠার জন্য ব্যস্ত হলেন। গাড়ি ছাড়ল। কিড ম্যাক্‌গ্যারিকে সঙ্গে নিল। প্রায় অন্ধকার একটা গলিতে ঢুকে গাড়িটাকে দাঁড় করিয়ে শিকারী বিড়ালের মত অতি সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে তারা ধীর গতিতে এগোতে লাগলেন। দিনের বেলায় বাড়িটায় হরেক রকম ব্যবসা চলে। দেখলে স্পষ্টই মনে হবে সেটা নিষ্পাপ একটা বাড়ি।

দু'জন গাট্টাগোট্টা লোক কুড়ুল বাগিয়ে দরজায় দু'দিকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ক্যাপ্টেন সাধ্যমত গলা নামিয়ে কিড ম্যাক্‌গ্যারিকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার খবরটা যে সত্যি এ বিষয়ে তুমি নিঃসন্দেহ তো? বাড়িটা যে একেবারে কবরখানার মত নিঃঝুম নিস্তব্ধ হে!

খবরটা ঠিক না হলে আমি দায়ী। দরজাটা ভেঙে ফেলুন। আমার কথার সত্যতা তো যাচাই হয়ে যাবে।

কুড়ুলের ঘায়ে দরজাটা ভেঙে পড়তেই হানাদাররা বন্দুক বাগিয়ে ঝটপট ভেতরে ঢুকে গেল।

ঘরের ভেতের এতক্ষণ জুয়ার আসর জমজমাটই ছিল বলেই মনে হল। আত্মরক্ষা ও পালিয়ে বাঁচার ধান্দায় জনা পঞ্চাশেক জুয়াড়ী হানাদারদের ওপর প্রচণ্ড আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ডেনবার নিজে জুয়ার আড্ডায় উপস্থিত। কিড ম্যাক্‌গ্যারিকে দেখামাত্র সে গুলি খাওয়া বাঘের মত তাকে আক্রমণ করে বসল। কারণ, সে-ই যে আজকের হামলার নায়ক তা-ত আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ফলে ব্যাপারটা ব্যক্তিগত আক্রোশের রূপ নিল। মুষ্টিযোদ্ধা কিড শত্রুর ওপব

দমাদম্ ঘুঁষি হানতে লাগল। শত্রুকে ঘায়েল করে কিড হাত ঝেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ফুঁসতে লাগল। এবার সে এক দৌড়ে পাশের ছোট ঘরটায় ঢুকে গেল। এখানে খাবার টেবিলে কয়েকটা চীনামাটির পাত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে দেখল। সেখানে আলমারীর তলা ঘেঁষে এক জোড়া দশ নম্বর জুতো উঁকি মারতে দেখল।

কিড ম্যাক্‌গ্যারি জুতো জোড়ার মালিক কষ্টিপাথরের মত কাল এক দীর্ঘাকৃতি পুরুষকে টেনে বের করে আনল। গায়ে তার পরিবেশনকারীর কোর্তা।

লোকটা কাটা-পাঁঠার মত থরথরিয়ে কাঁপতে লাগল। কিড ম্যাক্‌গ্যারি তাকে অভয় দিতে গিয়ে বলল, তোমাকে কিচ্ছু বলব না। শান্ত হও, একটা খবর আমাকে দিতে হবে, ধারে-কাছে কোথাও পিচফল পাওয়া যাবে কিনা বলতে পার?

লোকটা বার দু'তিন ঢোক গিলে বলল, বলা মুশকিল কর্তা! সবই হয়ত শহরের ভদ্দর লোকদের উদরে চলে গেছে।

আমি কোন কথা শুনতে চাই না। যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, যেখান থেকে পার আমার জন্য একটা হলেও পিচফল জোগাড় করে নিয়ে এস। আর যদি না পার তবে জান খতম করে ফেলব, মনে রেখো।

পরিবেশক কাঁপা কাঁপা পায়ে এগিয়ে গিয়ে চীনামাটির পাত্র অন্য কয়টা পাত্র, ঘাঁটাঘাঁটি করে একটামাত্র পিচফল জোগাড় করতে পারল। কিড ম্যাক্‌গ্যারি বাজপাখির মত ছোঁ মেরে তার হাত থেকে পিচফলটা নিয়ে সেটাকে কোটের পকেটে চালান দিয়ে দিল। ব্যস, আর মুহূর্তমাত্র দেরী না করে সে উর্দ্ধশ্বাসে বাড়ির দিকে ছুটতে লাগল।

কিড ম্যাক্‌গ্যারি বাড়ির দিকে যত এগোতে লাগল তার মনের বিষণ্ণতা ও হতাশা দূর হয়ে ততই হাল্কা হতে লাগল। তার প্রিয়তমার আকাঙ্ক্ষিত পিচফল সে জোগাড় করতে পেরেছে। সার্থক হয়েছে তার প্রয়াস। প্রচণ্ড শীতে, বরফ-জমা পথ অতিক্রম করে একটা মাত্র হলেও পিচফল জোগাড় করতে পারা নিছকই মামুলি ব্যাপার নয়। সে পকেটে তার বাঞ্ছিত ফলটাকে রেখেছে। সেটাকে মুঠো করে ধরে সে সাধ্যমত ব্যস্ততার সঙ্গে বাড়ির দিকে ছুটতে লাগল। পকেট থেকে অমূল্য সম্পদটা কোনক্রমে পড়ে গেলে সর্বনাশের চূড়ান্ত হয়ে যাবে।

গোলাপী আভা ঘরময় ছড়িয়ে দিয়ে চমৎকার কারুকার্য করা খাটটার ওপরে বসে কনে তার স্বামী-দেবতার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। যাবতীয় অলৌকিক ঘটনা এখনও পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণরূপে মুছে যায়নি। একটা কমলালেবু, একটা ডালিম বা একটা কুল বা পিচফল তুচ্ছ একটা জিনিসের জন্য স্বামীকে সে মাঝরাত্রে বাড়ির বাইরে পাঠিয়েছে। আর সে পত্নী-পূজারী লোকটাই তার বাঞ্ছিত ফলটা আদর করে তার হাতে তুলে দিল।

কনেটা মুখ ব্যাজার করে বলল—কী যে করলে, একটা মাত্র পিচফলের জন্য প্রায় রাত কাবার করে ফিরলে। আরে, আমি কি একটামাত্র পিচফল চেয়েছিলাম নাকি গো? আমি তো মনে করছি, ভাল কমলালেবু হলেই বেশি খুশি হতাম।

দুনিয়ার কনেদের জয় হোক!

দ্য কম্‌প্লিট লাইফ অব জন হপকিন্স

একটা প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে, দারিদ্র্য, যুদ্ধ আর ভালবাসাকে না জানা পর্যন্ত জীবনের পরিপূর্ণ রসাস্বাদন করা কিছুতেই সম্ভব নয়। জীবন সম্বন্ধে যা কিছু জানার আছে তিনটে মাত্র শর্তের মধ্যেই সব নিহিত। যাঁরা ওপর ওপর জ্ঞান লাভ করেই সন্তুষ্ট তাঁরা হয়ত বলবেন, এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টাও এর সঙ্গে যোগ করা দরকার। প্রকৃতপক্ষে তা কিন্তু নয়। একজন দীন-দরিদ্র যখন লক্ষ্য করে একটা ছিদ্রের ভেতর থেকে কোনক্রমে তার জামার গোটানো আস্তিনের ফাঁকে ঢুকে গেছে তখন জীবনের যে গভীর উল্লাস তার মধ্যে দেখা দেয়, আনন্দে আত্মহারা হবার উপক্রম। গলা ছেড়ে চিল্লিয়ে উঠে আনন্দ প্রকাশ করে, এর চেয়ে বেশী আনন্দের অনুভূতি একজন ধনকুবের জীবনে খুব কমই জেগে থাকে।

অনুমান করা যাচ্ছে, যে পরম শক্তির অনুশাসন জীবনকে পরিচালনা করে থাকে সেই পরমপুরুষই যেন মানুষকে শর্ত তিনটি শিখিয়ে দিয়েছেন। তাই তো কারো পক্ষেই সে তিনটে শক্তির গণ্ডির বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়। গ্রাম্যজীবনে শর্ত তিনটে তেমন গুরুত্ব পায় না। সেখানে দারিদ্র্যের কষাঘাত মানুষকে অপেক্ষাকৃত কম পীড়িত করে। আর সেখানে প্রতিবেশী হাঁস-মুরগীর মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ বিবাদ-বিসম্বাদ সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু নগর জীবনে শর্ত তিনটে অধিকতর শক্তিশালী ও সত্য হয়ে ওঠে। কোন একজন হপ্‌কিন্স-এর ছোট্ট জীবনের গণ্ডির মধ্যেই অনেক, অনেক বেশী অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সেটা সত্য প্রমাণিত হয়।

জন হপ্‌কিন্স যে ফ্ল্যাটটায় সপরিবারে বাস করে তা অন্য দশটা ফ্ল্যাটের মত। বাড়িটা খুবই জীর্ণ, জানালার কাছে একটা রবারের চারাগাছ দিব্যি বেড়ে উঠছে। কঙ্কালসার, একটা ঘেয়ো কুকুরের বাচ্চা শুয়ে, অন্তিম ডাকের অপেক্ষায় আছে। তার দগ্‌দগে ঘায়ে মাছিরা ঝাক-বেঁধে ভোজে মেতেছে।

আর কোন জন হপ্‌কিন্স কেন? অন্য দশটা খেটেও খাওয়া মানুষদেরই একজন। সপ্তাহান্তে কুড়ি ডলার বেতন পায়। একটা ন' তলা ইঁটের বাড়িতে কাজে লিপ্ত। কিন্তু কি সে কাজ তা নিয়ে আমরা মাথা না-ই বা ঘামালাম। আর তার সহধর্মিনী মিসেস হপ্‌কিন্স? অন্য দশজন গৃহবধূর মতই জীবন যাপনে অভ্যস্ত। মুখে সোনা বাঁধানো দাঁত, অলসভাবে সময় কাটানো, রবিবার বিকালে ভ্রমণের বিলাসিতা, আরাম-আয়েশ অব্যাহত, বাজারের জন্য মুদির দোকানে ধারের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি, বছরের শেষে সেলের মরশুম শুরু হলে কাপড়ের দোকানে ভিড় বৃদ্ধি করা। জানালায় বসে অবসর বিনোদন করা, চার তলার গিন্নিটার মত উটপাখির টিপ পরা, পাওনাদারের ওপর সাবধানী দৃষ্টি রেখে তাকে দেখলেই চোখে ধুলো দিয়ে অন্য পথে বা গলির মধ্যে ঢুকে যাওয়া প্রভৃতি আভিজাত্য রক্ষা করার যাবতীয় গুণে সে ফ্ল্যাটবাড়ির অধিবাসীদের মতই গুণসম্পন্না।

এরকম সব বিবরণের জন্য আরও একটা মুহূর্ত সময় অতিবাহিত হোক। ব্যস, তারপরই গল্পটা শুরু করে দেওয়া হবে। বেশীক্ষণ ধৈর্যচ্যুতি নয়, মাত্র একটা মুহূর্ত। তারপরই গল্পটা শুরু করা হবে।

শহরে বুকে বড় বড় কতই না আকস্মিক ঘটনা ঘটে থাকে। পথ চলার সময়, বাঁক ঘোরার সময় কুটেনাই জলপ্রপাত থেকে আসা আপনার বন্ধুর চোখে অকস্মাৎ আপনার ছাতার শিকটা গেঁথে দিলেন। পার্কে বেড়াতে গিয়ে সুন্দর একটা ফুল ছিঁড়লেন...সর্বনাশ! একদল ডাকাত আপনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল...অ্যাম্বুলেন্স চাপিয়ে আপনাকে হাস্‌পাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হল...এক নার্সকে আপনি বিয়ে করে বসলেন...আপনার মনময়ূরী আপনাকে ডিভোর্স করল...আপনি কপর্দকশূন্য...আপনি রুটির লাইনে গিয়ে দাঁড়ালেন...দিন কিছুটা ফিরল—এক টাকার কুমীর উত্তরাধিকারিণীকে গীর্জায় নিয়ে গিয়ে বিয়ে করলেন...লন্ড্রী থেকে পোশাক আনিয়ে নিলেন, ক্লাবের চাঁদা পরিশোধ করলেন...চোখের পলকে সব কিছুই ঘটে যায়। সদর রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগলেন...একজন আঙুলে ইঙ্গিত করে আপনাকে কাছে ডাকল, আপনার সামনে ঝট করে একটা রুমাল ফেলে দেওয়া হল। ব্যস, অতর্কিতে একটা ইঁট উড়ে এসে আপনার মাথায় আঘাত হানল। এবার এলিভেটরের তারা বা আপনার ব্যাঙ্ক লালবাতি জ্বালল, বৌয়ের সঙ্গে আপনার মত বিরোধ—বিবাধ হল। শহরটা যেন একটা চঞ্চল শিশু, আর আপনি হলেন তার হাতের খেলনার লাল রঙের ছোপ ; শিশুটা এবার আপনাকে চাটতে চাটতে খেয়ে সাবাড় করে দিল।

গলা পর্যন্ত ঠেসে রাতের খাবার খেয়ে জন হপ্‌কিন্স তার সুসজ্জিত সামনের ফ্ল্যাটটায় গিয়ে আরাম কেদারায় শরীর এলিয়ে দিল। মিসেস হপ্‌কিন্স তার পাশে টুলে বসে হল থেকে ভেসে আসা রাতের খাবারের কথা শুনে প্রায় অস্ফুট স্বরে বকবক করতে লাগল। এখানে আর্থিক অনটন আদৌ ছিল না, প্রেম-ভালবাসা ছিল না, যুদ্ধ-বিগ্রহও ছিল না—তবে এখন একটা নিষ্পত্র ডালেও পরিপূর্ণ জীবনের কলম বাঁধা যেতে পারে।

জন হপ্‌কিন্স-এর সাধ জীবনের বিস্বাদ ময়দার সাথে তালের মিষ্টি মধুর বুলির এক মুঠো কিসমিস ছড়িয়ে, মিশিয়ে দেবে। জন হপ্‌কিন্স কাজের কর্তাকে সম্বোধন না করেই সে বলতে লাগল—আজ অফিসে নতুন একটা এলিভেটার বসানো হয়েছে। ব্যস, এতেই বড় সাহেবের গোঁফ

জোড়া বেঁকে গেল। আর একটু হলেই হয়ত তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেত।

বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে মিসেস হপ্‌কিন্স বলল—সে কী! তুমি বল কি?

আর মিঃ হুইপল্‌স্‌ তার নতুন স্যুটটা পরে আজ অফিসে এসেছিল। আমার খুবই ভাল লেগেছে। কী চমৎকার যে—ছাই রঙের সঙ্গে—কথা বলতে বলতে হঠাৎ চেপে গিয়ে একটা জিনিসের দরকার বোধ করার ফলে প্রসঙ্গটা বদলে নিল। এ মুহূর্তেই আমাকে মোড়ে গিয়ে পাঁচ সেন্ট দামের একটা চুরুট কিনে আনতে হবে। আর সেটা না হলে আমার চলছে না। জন হপ্‌কিন্স টুপিটা মাথায় চাপিয়ে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে গেল।

জন হপ্‌কিন্স মোড়ের যে চুরুটের দোকানটার কথা বলেছে তার মালিক ফ্রেশমেয়ার। তার চোখে পৃথিবীটা একটা রুক্ষ রুষ্ট অন্তরীপ। সে তার বাঞ্ছিত চুরুটটা চাইলে ফ্রেশমেয়ার কাঠের ছোট্ট বাক্স থেকে সেটা বের করে তার হাতে তুলে দিল। গ্যাসের আগুনে সেটা ধরিয়ে দু' ঠোঁটের ফাঁকে চেপে ধরে দোকানিকে দাম দেওয়ার জন্য পকেটে হাত ঢুকিয়েই সে চমকে উঠল। পকেট ফাঁকা, একটা পেনিও নেই।

সে দোকানিকে ব্যাপারটা বোঝাতে গিয়ে বলল, শুনুন মশাই, টেবিল থেকে খুচরো পয়সা না নিয়েই চলে এসেছি। একটু বাদেই নিজে এসে নিকেলের মুদ্রাটা পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছি।

দোকানি ফ্রেশ্‌মেয়ার-এর মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল। তার মতে পৃথিবীটার পচন ধরেছে আর মানুষ ভ্রাম্যমাণ শয়তান ছাড়া কিছু নয়। সে তার বিশ্বাসের হাতেনাতে প্রমাণ পেয়ে মনে মনে উল্লসিতই হল। সে এক লাফে গদি থেকে নেমে খদ্দেরটার জামার কলার চেপে ধরল। মানববিদ্বেষী চুরুটের দোকানির এক ঘুঁষি হজম করার ক্ষমতাও জন হপ্‌কিন্স-এর নেই। দোকানি চোখের পলকে তাঁর মুখে একটা ঘুঁষি চালিয়ে দিল।

চোখের পলকে জন হপ্‌কিন্স-এর পরিচিত ও পক্ষের জনাকয়েক লোক ছুটে সেখানে এল। আবার কয়েকজন কৌতূহলী পথচারীও গোল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে জটলা করতে শুরু করল। একটু বাদেই একটা পুলিশের গাড়ি বিকট আওয়াজ তুলতে তুলতে সেখানে এসে থামল। এতে আক্রমণকারী দোকানি ফ্রেশ্‌মেয়ার এবং আক্রান্ত জন হপ্‌কিন্স উভয় পক্ষই সমস্যার সম্মুখীন হল। জন হপ্‌কিন্স শান্তিপ্রিয় মানুষ হলেও মোটেই লড়াই করতে অক্ষম নয়। সে অতর্কিতে ফ্রেশমেয়ারকে এমন মোক্ষম এক দাওয়াই দিল যাতে সে ভাবতে বাধ্য হল এর চেয়ে বরং হতচ্ছাড়াটাকে চুরুটের পাঁচ সেন্ট দাম ছেড়ে দিলেই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া হত।

দোকানি ফ্রেশ্‌মেয়ার-এর মুখে ঘুঁষিটা মেরেই জন হপ্‌কিন্স পাশের গলিটা দিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে আরম্ভ করল। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ আর ফ্রেশ্‌মেয়ার তাকে অনুসরণ করতে লাগল। সে মুহূর্তেই জন হপ্‌কিন্স-এর পাশ দিয়ে লাল রঙের একটা রেসের মোটর যেতে যেতে সামনের বাঁকের মুখে গতি মন্থর করল। তার চালক হাত ইশারা করে তাকে তাড়াতাড়ি উঠে পড়তে বলল। সে সঙ্গে সঙ্গে এক লাফে মোটরটায় চাপল। ব্যস, মুহূর্তে সেটার গতি বেড়ে গেল। এবার সেটা যেন অ্যালবেট্‌স পাখির মত উড়ে চলতে লাগল।

মিনিট দশেকের মধ্যেই গাড়িটা বার কয়েক বাঁক নিয়ে বাদামী রঙের একটা প্রাসাদতুল্য বাড়ির সদর দরজায় থামল। এক লাফে গাড়ি থেকে নেমে বুড়ো চালক সোফার বলল, মশাই, তাড়াতাড়ি নেমে আসুন। আমি কিছুই বলতে চাই না। ভেতরে চলুন, লেডিই আপনাকে সব কিছু বুঝিয়ে বলবেন। আমরা, বিশেষ করে আমি মনে করি, মঁসিয়ে এ সম্মান আপনার অবশ্যই প্রাপ্য।

হপ্‌কিন্স বাড়ির ভেতরে যেতে ইতস্তত করায় সোফার তার কোন ওজর আপত্তিতে কান না দিয়ে একরকম জোর করেই তাকে ভেতরে নিয়ে গেল। তাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই এক রূপসী যুবতী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। মিষ্টি মধুর স্বরে অভ্যর্থনা করে তাকে বসাল।

সোফার যুবতী মহিলাটিকে লক্ষ্য করে সবিনয়ে নিবেদন করল—মাই লেডি, আমি মঁসিয়ে লং-এর বাড়ি গিয়ে দেখি তিনি নেই। সেখান থেকে ফিরে আসার সময় এক অত্যাশ্চর্য দৃশ্য আমার নজরে পড়ল। দেখলাম, এ ভদ্রলোক শত্রুপক্ষের সঙ্গে তুমুল লড়াই করে চলেছেন। তিনি একাই বীরবিক্রমে পাঁচ-দশ-ত্রিশজনের বিরুদ্ধে লড়ছেন। শুধু কি এ-ই? শত্রুপক্ষের হয়ে আটজন পুলিশও লড়ছিল। আমি তখন ভাবলাম, মঁসিয়ে লংকে যখন বাড়িতে পাওয়াই গেল না, তখন এঁকে নিয়ে

গেলেই মাই লেডির কাজটা মিটতে পারে। ব্যস, গাড়িতে তুলে একে আপনার দরবারে নিয়ে এলাম।

রূপসী যুবতী সোফারকে ধন্যবাদ জানিয়ে তখনকার মত বিদায় করে দিয়ে হপ্‌কিন্সের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন।

জন হপ্‌কিন্স তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাকাল। মাই লেডি এবার বলল, শুনুন, ওয়াটার লং আমার সম্পর্কে এক ভাই হয়। তাকে নিয়ে আসার জন্য সোফারকে পাঠিয়েছিলাম। ব্যাপারটা খোলসা করে বলছি, এ বাড়িরই একজন আমাকে চূড়ান্ত অপমান করেছে, অকথ্য ভাষায় গালমন্দ করতেও ছাড়েনি। সোফার বলে গেল আপনি বীর ও অসম সাহসী। বর্তমানে সাহসী এবং মনে প্রাণে যুদ্ধপ্রিয় মানুষ সচরাচর চোখেই পড়ে না। বলুন তো, আমি কি আপনার সাহসের ওপর নির্ভর করতে পারি কি?

জন হপ্‌কিন্সের ভেতরটা রোমাঞ্চে ভরপুর হয়ে উঠল। রোমাঞ্চের শিহরণ বলতে যা বোঝায় তা সে আজই প্রথম অনুভব করল। ভাবাবেগে আপ্লুত কণ্ঠে সে বলল, ভাল কথা, কাকে জব্দ করতে হবে একবারটি আমাকে দেখিয়ে দিন তো। এতদিন খুচখাচ কাজ নিয়েই মেতেছিলাম। আজই প্রথম একটা কাজের মত কাজ পেলাম। নিজের শক্তিটা একবার যাচাই করে দেখাই যাক না।

মহিলাটি সামনের বন্ধ দরজাটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, এগিয়ে গিয়ে ওই দরজাটার গায়ে ধাক্কা দাও, তার দেখা পেয়ে যাবে। দেখো ভয়ে যেন আবার পিছিয়ে যেয়ো না।

জন হপ্‌কিন্স নিজের চওড়া বুকটার দিকে মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে নিয়ে গম্ভীর স্বরে বলল, আমি পিছিয়ে যাব? কী যে বলেন! কথা বলতে বলতে টেবিলের ওপরে রাখা ফুলের তোড়াটা দেখিয়ে এবার বলল—ওখান থেকে আমাকে একটা গোলাপ দেবেন?

মহিলাটি হাত বাড়িয়ে তোড়া থেকে একটা লাল গোলাপ ছিঁড়ে তার হাতে দিলেন। সে সেটার গায়ে সশব্দে একটা চুমু খেয়ে কোটের বুক-পকেটে গুঁজে রাখল। এবার দু'পা এগিয়ে গিয়ে সজোরে এক ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলে এক লাফে ভেতরে ঢুকে গেল। সেটা একটা সাজানো গোছানো লাইব্রেরী। ঘরের এক কোণে এক যুবক গভীর মনোযোগের সঙ্গে বই পড়ছে। যাকে বলে একেবারে বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকা।

জন হপ্‌কিন্স গম্ভীর স্বরে বলে উঠল—শিষ্টাচার সম্বন্ধে কোন বই-ই আপনার পড়া দরকার। শুনুন, আপনাকে কিছু শিক্ষা দিতেই আমার এখানে আসা। আপনি নাকি এক মহিলার প্রতি অশিষ্ট আচরণ করেন, সত্যি নাকি? কেন?

যুবকটা চোখে-মুখে বিস্ময়ের ছাপ এঁকে হাতের বইটা টেবিলের ওপর রেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে শান্তভাবে হপ্‌কিন্স-এর একটা হাত ধরে বাড়িটার সদর-দরজার দিকে নিয়ে গেলেন। হাতটা ছেড়ে দিয়ে কিছু বলার জন্য মুখ খুলতে যাবেন, ঠিক সে মুহূর্তেই মহিলাটি দরজায় দাঁড়িয়ে গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে বললেন, হুঁশিয়ার র‍্যালফ ব্রান্স্‌কোম্ভ, যে সাহসী-বীর যুবকটা আমাকে রক্ষা করার জন্য এসেছে। তার সঙ্গে একটু সমীহ করে কথা বলার চেষ্টা কর।

যুবকটা এবার যথেষ্ট ভদ্রভাবে দরজার বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে শান্ত গলায় মহিলাকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি চাই ঐতিহাসিক উপন্যাস পড়ার অভ্যাস তুমি ত্যাগ কর। ভাল কথা, ওই লোকটা এখানে কি করে এল, বলবে কি?

সোফার একে নিয়ে এসেছে। আমি এখনও বলব, তুমি সেন্ট বার্নার্ডকে আমার কাছে না পাঠিয়ে খুবই অন্যায় করেছ। ওয়াটারকে ডেকে আনার জন্য আমি সোফারকে পাঠিয়েছিলাম। আসলে তোমার ব্যবহারে আমি খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম।

মহিলাটির হাতটা ধরে যুবক এবার বললেন, ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখ, বোঝার চেষ্টা কর। আমার কথা শোন, ওই কুকুরটা অবশ্যই নির্ভরযোগ্য—বিশ্বস্ত নয়। হতচ্ছাড়াটা তিন-চারজন লোককে কামড়ে ঘায়েল করে দিয়েছে। চল, মাসির কাছে যাই। তাঁকে বলি আমরা বিবাদ মিটিয়ে নিয়েছি।

কথা বলতে বলতে তারা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। জন হপ্‌কিন্স সে বাড়িটা থেকে বেরিয়ে

নিজের ফ্ল্যাটে গেল। সিঁড়িতে দারোয়ানের পাঁচ বছরের মেয়েটাকে খেলতে দেখে আদর করে তার গালে ছোট্ট করে একটা টোকা দিল। কোটের গা থেকে গোলাপ ফুলটা খুলে তার হাতে গুঁজে দিল। এবার লম্বা-লম্বা পায়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল।

মিসেস হপ্‌কিন্স সিঁড়িতে স্বামীর জুতোর আওয়াজ শুনে এগিয়ে গেল। সে দরজার কাছাকাছি আসতেই জিজ্ঞাসা করল—কি হল, চুরুট পেয়েছ?

অবশ্যই পেয়েছি। এ সুযোগে একটু হাঁটাহাঁটি করে এলাম। চাঁদনী রাত। আজকের রাতটা কী সুন্দর—রীতিমত মনোলোভা।

আধপোড়া চুরুটটায় অগ্নিসংযোগ করে দেওয়ালে টাঙানো ছবিটার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থেকে বলল—মিঃ হুইপ্‌ল্‌স-এর স্যুট কোটের কথা বলছিলাম না? খুবই সুন্দর, ধূসর রঙের ওপর, হাল্কা চেক—চমৎকার।

ওয়ান থাউজেন্ড ডলারস্‌

উকিল তার যুবক মক্কেলের দিকে মুখ ঘুরিয়ে ওকালতিসুলভ দৃঢ়কণ্ঠে আবারও বলল—হ্যাঁ, এক হাজার ডলার। এই যে ডলারগুলো, নিন ধরুন।

চকচকে ঝকঝকে পঞ্চাশ ডলার নোটের তাড়াটা গুনতে গুনতে যুবক গিলিয়ান সরবে হেসে উঠল। হাসি থামিয়ে এবার মুখ খুলল—দেখুন, মিঃ টল্‌ম্যান, টাকার পরিমাণটা খুবই জটিল, অদ্ভুত রকমের জটিল। দশ হাজার পরিমাণটা যে কোন লোক হাত চালিয়ে গুণে শেষ করে ফেলত আর যদি পঞ্চাশ হ'ত তবে সমস্যাটা হত অনেক কম, ঠিক কিনা?

উকিল পূর্বস্বর অনুসরণ করেই এবার বললেন, দেখুন, আপনার কাকার উইলটা তো আপনাকে পড়ে শোনালামই, তবে তার বিবরণাদি আপনি মনোযোগসহকারে শুনেছেন কিনা আপনিই জানেন। তবে উইলের বক্তব্যের মধ্য থেকে একটা ব্যাপারের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই এক হাজার ডলার আপনি খরচ করার পরই কিভাবে সেটা খরচ করলেন সে হিসাব আপনাকে আমাদের কাছে দাখিল করতে হবে। এ বক্তব্যটা কিন্তু উইলে স্পষ্ট করেই উল্লেখ করা আছে, পড়ে তো শোনালামই। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, আপনি অবশ্যই স্বর্গীয় মিঃ গিলিয়ান-এর শেষ ইচ্ছাটার মূল্য দেবেন।

দেখুন, এর জন্য যে অতিরিক্ত খরচ-খরচা হবে তা সত্ত্বেও এর জন্য আপনি আমার ওপর নির্ভর করতে, নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, তবে এর জন্য একজন সচিব রেখে তার ওপর হিসাবপত্র রাখা ও যাবতীয় তদ্বির তদারকির দায়িত্বভার অর্পণ করতে হবে। আসলে বৈষয়িক ব্যাপার স্যাপার ঠিকঠাক রাখা কোনদিনই আমার পক্ষে সম্ভব হয় না।

যুবক গিলিয়ান উকিলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ক্লাবে গেল। খোঁজাখুঁজি করে ব্রাইসন নামে একজন লোককে খুঁজে বের করল। তাকে সবাই বুড়ো ব্রাইসন নামে সম্বোধন করে। তার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি।

গিলিয়ান বলল, বুড়ো ব্রাইসন, তোমাকে চমৎকার একটা গল্প শোনাব বলে ছুটে এসেছি।

চোখে-মুখে বিরক্তির ছাপ এঁকে বুড়ো ব্রাইসন কথাটা ছুঁড়ে দিল, ধ্যুৎ, ঝুটমুট বিরক্ত কোরো না। তোমার চমৎকার গল্পটা বিলিয়ার্ড-রুমে খেলোয়াড়দের শুনিও, আনন্দ পাবে। তোমার ওসব গল্প আমি কী বিতৃষ্ণার সঙ্গে শুনি, ভালই জান।

গিলিয়ান তামাকের কুঁচি কাগজে রেখে সিগারেট পাকাতে পাকাতে বলল, আরে, গোড়াতেই হতাশ হয়ে পড়ছ কেন! শোন, আজকের গল্পটা অন্য সব গল্প থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির। গল্পটা এতই রোমাঞ্চকর যে, বিলিয়ার্ড-রুম-এর কিচির মিচিরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে না। আমি সবেমাত্র আমার পরলোকগত কাকার ঘাঘু উকিলের আখড়া থেকে ফিরছি। কাকা পৃথিবী ছেড়ে যাবার সময় আমার জন্য এক হাজার ডলার রেখে গেছেন। তুমিই বলত ব্রাইসন, এক হাজার ডলার দিয়ে একজন মানুষের পক্ষে কত কি আর করা সম্ভব?

মৌমাছি যতখানি আগ্রহ নিয়ে ভিনিগারের বোতলের গা দিয়ে ঘুরপাক খায় ঠিক ততখানি

আগ্রহ নিয়েই বুড়ো ব্রাইসন প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল—আরে, আমার তো বিশ্বাস ছিল, তোমার স্বর্গীয় কাকা সেপ্টিসাম গিলিয়ান কম সে কম আধ-লক্ষ ডলারের মালিক ছিলেন। কিন্তু সেখানে মাত্র এক হাজার—

তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে গিলিয়ান বলে উঠল—আরে ভাই, কাকা আধ-লক্ষ ডলারেরই মালিক ছিলেন বটে। আসল রহস্যটা তো তোমাকে এখনও বলাই হল না। তিনি নগদ অর্থ আর সোনাদানা সবই একটা পোকার জন্য উড়িয়ে দিয়ে গেছেন। তিনি উইলে পরিষ্কার উল্লেখ করে গেছেন, যে ব্যক্তি সে জীবাণুটা আবিষ্কার করতে সক্ষম হবে সে পাবে একটা অংশ। আর অবশিষ্ট ডলার ব্যয় করতে হবে সে জীবাণুটাকে ধ্বংস করার জন্য হাসপাতাল নির্মাণ করতে। তারপর কয়েকজনকে দান সাহায্য করার কথাও উল্লেখ করে গেছেন। আর এও বলে গেছেন, গৃহ শিক্ষিকা আর বাটলার পাবেন নগদ দশ ডলার আর একটা করে সোনার আংটি। সব শেষে উল্লেখ করে গেছেন, তার ভাইপো, অর্থাৎ আমি পাব এক হাজার ডলার।

আরে, তুমি প্রতি মাসে হাতখরচের জন্যই মোটা অর্থ পেতে!

হ্যাঁ। সত্যি কথা বলতে কি, আমার হাত খরচের জন্য আমার খুঁড়ো ছিলেন যথার্থই মুক্ত হস্ত।

অত্যুগ্র আগ্রহান্বিত হয়ে বুড়ো ব্রাইসন এবার বলল, আর একটা কথা, তোমার কাকার অন্য কোন উত্তরাধিকারীর অস্তিত্ব আছে কি?

কপালের চামড়ায় পর পর কয়েকটা চিন্তার ভাঁজ এঁকে গিলিয়ান ভ্রূ কুঁচকে বললেন—কই, তেমন কেউ আছে বলে মনে পড়ছে না। তবে কাকার পালিতা একটা মেয়ে আছে। মিস হেডেন। সে তাঁরই এক বন্ধুর মেয়ে। শান্ত স্বভাবা। গানও মন্দ গায় না। ওই যে নগদ দশ ডলার আর আংটির অধিকারী মিস হেডেন তাদেরই একজন। আমিও যদি তাদেরই দলে পড়তাম। তবে ভালই হত। তা দিয়ে দু-তিন পেগ মদ কিনে ফেললেই ঝামেলার অবসান ঘটে যেত। ধনকুবেরদের মত না বলে সহজ সরল ভাষায় একটা পরামর্শ দাও তো বুড়ো ব্রাইসন, ওই এক হাজার ডলার কিভাবে খরচ করি? পরামর্শটা যেন যুক্তিগ্রাহ্য হয়।

মুহূর্তের জন্য নীরবে ভেবে বুড়ো ব্রাইসন মুখ খুলল—দেখ, একদিক থেকে ধরলে এক হাজার ডলার কিন্তু নিছকই তুচ্ছ, মানে কম নয়, আবার অন্য দিক দিয়ে বিবেচনা করলে এটা খুবই সামান্য অর্থ। এটা দিয়ে ছোট্ট অথচ মনোলোভা একটা বাড়ি কিনে সুখে বসবাস করে রকফেলারকেও তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারে, আবার কেউ তার সহধর্মিনীকে দক্ষিণাঞ্চলে পাঠিয়ে রোগ নিরাময়ের মাধ্যমে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হতে পারে। আবার এক হাজার ডলার দিয়ে এক শ'টা অনাথ শিশুর জন্য দুধ খরিদ করে কম হলেও পঞ্চাশটা বুভুক্ষু শিশুর জীবন রক্ষা করা যেতে পারে। আবার তাদের জুয়ার আড্ডায় এক ঘণ্টার মধ্যে এক হাজার ডলার উড়িয়ে দেওয়া মোটেই অবিশ্বাস্য নয়। আবার যদি মন চায় তবে এক হাজার ডলার দিয়ে কোন উচ্চাকাঙক্ষী ছাত্রের শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করাও সম্ভব। জানতে পেরেছি, গতকালই শিল্পী কারোট-এর একটা মাত্র মৌলিক ছবি এক হাজার ডলারে বিক্রি হয়েছে। আবার কেউ যদি চায় তবে ওই অর্থে উত্তর গোলার্ধের কোন এক নগরে গিয়ে দু'মাস ভদ্র-জীবন যাপন করে আসতে পারে। আর একহাজার ডলারের বিনিময়ে ম্যাডিসন স্কোয়ারের পার্কটা ভাড়া নিয়ে উত্তরাধিকারীদের সমূহ সঙ্কট সম্বন্ধে বক্তব্য রেখে তাদের সতর্ক করে দিতে পারে। সত্যি কথা বলতে এক হাজার টাকা দিয়ে এমন আরও ভাল-মন্দ কাজই করা যেতে পারে।

দেখ বুড়ো ব্রাইসন, তুমি যদি নীতিটীতি নিয়ে এত বেশী কচলা কচলি না করতে তবে তুমি কিন্তু লোকের কাছে প্রিয় পাত্রই হতে। আমার একটাই জিজ্ঞাস্য ছিল, এক হাজার ডলার আমি কিভাবে ব্যবহার করব।

এটা নিয়ে এত ভাববার কি আছে, বুঝছি না এ। যুক্তিগ্রাহ্য একটা খুব ভাল কাজ আছে, যা করা যেতে পারে। তুমি বরং কিছু ভেড়া কিনে একটা খামার খুলে বসতে পার। ভেড়াগুলো আমার দু'-চোখের বিষ। আমার পরামর্শ যদি নাও তবে বলি, মিস লোটা লরিয়েরকে একটা হীরার আংটি কিনে দিয়ে তাকে নিয়ে ইডাহাতে গিয়ে সদ্য তৈরী ওই ভেড়ার খামারে গিয়ে বাস কর।

বুড়ো ব্রাইসনকে ধন্যবাদ জানিয়ে গিলিয়ান চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বলল, আমি নিঃসন্দেহে

তোমার ওপর নিশ্চিন্তে নির্ভর করা চলে। ডলারগুলোকে আমি আজ থেকেই খরচ করতে আগ্রহী। আসলে ডলারগুলো খরচ করার পর আমাকে হিসাব দখিল করা তো হবে।

গিলিয়ান এবার একটা গাড়ি ভাড়া করে সোজা কলাম্বাইন থিয়েটারের মঞ্চে ঢোকার প্রধান ফটকে হাজির হল।

তার উপস্থিতির খবর পেয়ে মিস লরিয়ের তাকে ডেকে ভেতরে নিয়ে গেল। তাকে দেখেই সে ব্যস্ত গলায় বলে উঠল—ববি গিলিয়ান এত দেরী করে এলে! আর মাত্র দু'মিনিট সময় আমার হাতে আছে। তারপরই আমাকে মঞ্চে যেতে হবে।

—বেশী সময় লাগবে না। কেবলমাত্র তোমার ডানকানটা আমার দিকে ঘোরাও, তবেই কাজ সেরে নিতে পারব। আচ্ছা, লকেট সম্বন্ধে তোমার মত কি? আমি একের পর তিনটে শূন্য পর্যন্ত খরচ করতে পারি।

তুমি যা বলবে। একটা কথা ববি গিলিয়ান, ডেপি স্টেচি যে গলার হারগাছা পরেছিল, সেটা দেখেছিলে? বাইশ শ' ডলার দিয়ে টিকানির দোকান থেকে সেটা কিনেছিল। তবে—অ্যাডাম, এক কাজ করত, আমার বাঁ দিকের ফিতেটা সামান্য ওপরে তুলে দাও তো।

এমন সময় কল-বয় তাকে প্রথম কোরাসে অংশগ্রহণের জন্য ডাকল।

ববি গিলিয়ান এবার কলাম্বাইন থিয়েটারের সদর দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির ড্রাইভারকে প্রশ্ন করল, ভাই, একটা কথার জবাব দাও তো—তোমার কাছে এক হাজার ডলার থাকলে তা দিয়ে কি করতে?

ড্রাইভার নির্দ্ধিধায় জবাব দিল এক হাজার ডলারের মালিক হলে সঙ্গে সঙ্গে একটা সেলুন খুলে বসতাম। আমি একটা জায়গাও দেখে রেখেছি যেখানে কাড়িকাড়ি ডলার রোজগার করতে পারব। মোড়ের গায়ে চারতলা বাড়িটা, তার দোতলায় বসার জায়গা আর খদ্দেরদের খানাপিনার ব্যবস্থা। তিন তলায় বিদেশীদের জন্য মিশান আর হাত-পায়ের নখ কাটার জায়গা। আর যদি কিছু অতিরিক্ত মূলধন নিয়োগ করতে আগ্রহী হন তবে সেটাকে অনায়াসে পুল-রুম গড়ে নিতে পারেন।

—ওরে ভাই, ব্যাপারটাকে তুমি সত্যি বলে মনে করলে নাকি? হঠাৎ কথাটা মনের কোণে উঁকি মারল তাই কৌতূহলের শিকার হয়ে তোমার কাছে কথাটা বলে ফেললাম।

কথা বলতে বলতে ববি গিলিয়ান গাড়িতে চেপে বসল। তারপর ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বলল, ঘণ্টা হিসাবে আমি ভাড়া দেব না। যতক্ষণ আমি থামতে না বলব ততক্ষণ গাড়ি চালিয়ে যাবে। পর পর আটটা ব্লক অতিক্রম করে ববি গিলিয়ান গাড়ি থেকে নামল। একটা লোক পাশের ফুটপাতে টেবিলের ওপর পেন্সিল সাজিয়ে বিক্রি করছে। গিলিয়ান পায়ে পায়ে তার কাছে গিয়ে কোনরকম ভূমিকা না করেই বলল—ভাই, তুমি যদি একেবারে অভাবিত উপায়ে এক হাজার ডলার হাতে পেয়ে যাও তবে তা দিয়ে কি করবে, বল তো?

পেন্সিল বিক্রেতা একবার ববি গিলিয়ান এবং পর মুহূর্তেই গাড়িটার ওপর চোখের মণি দুটো বুলিয়ে নিয়ে বলল—আরে ব্বাস! দেখছি, আপনি দিনের আলোতেও গাড়ি চড়ে বেড়ান। তাই বলছি কি, আপনার পক্ষে এমন বহু কথাই বলা সম্ভব। একটা অনুরোধ, যদি মন চায় তবে একবারটি এটা দেখুন। তবে ওই যে বললাম যদি আপত্তি না থাকে। কথা বলতে বলতে সে কোটের পকেট থেকে ব্যাঙ্কের একটা পাশবই বের করে গিলিয়ান-এর চোখের সামনে ধরল। তাতে জমার ঘরে লেখা আছে ১,৭৮৫ ডলার।

বইটা থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আমতা আমতা করে গিলিয়ান গাড়িতে গিয়ে বসল। ড্রাইভারকে বলল, উকিল টল্‌ম্যান, অ্যান্ড শার্প-এর অফিসে নিয়ে চল।

উকিল টলম্যান তার সোনার ফ্রেমের চশমার ফাক দিয়ে গিলিয়ান-এর দিকে তাকালেন। তার দৃষ্টিতে বিদ্রূপের ছাপ।

গিলিয়ান বলল, কিছু মনে করবেন না, একটা কথা বলছি। আশা করি কথাটা অপ্রাসঙ্গিক ও অযৌক্তিক নয়। নগদ দশ ডলার আর একটা আংটি ছাড়া আমার কাকা মিস হেডেনকে আর কিছু দিয়ে গেছেন কি?

না। আর কিছুই দিয়ে যান নি।

ধন্যবাদ।

আর একটা মুহূর্তও সেখানে অপেক্ষা না করে গিলিয়ান আবার গাড়িতে গিয়ে বসল। গাড়িটা গিয়ে তার কাকার বাড়ির দরজায় থামল।

বাড়ির ভেতরে ঢুকে একটা সুসজ্জিত ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে উঁকি দিতেই চোখে পড়ল মিসেস হেডেন চিঠি লেখায় ব্যস্ত। বেঁটেখাটো চেহারা, প্রায় ছিপছিপে গড়ন। গায়ে কালো পোশাক। তার চোখ জোড়া আকর্ষণীয়—হরিণ-নয়না।

কোনরকম ভূমিকা না করেই বলল—মিসেস হেডেন, আমি সবে মাত্র উকিল টল্‌ম্যান-এর অফিস থেকে আসছি। তারা উইলপত্র দেখে সেটাকে সংশোধনের একটা উপায় বের করার চেষ্টা করছেন। আপনি হয়ত জানেন, আমার কাকা উইলে এক হাজার ডলার দিয়ে গেছেন। উকিল মশাই আমার হাত দিয়ে ডলারগুলো পাঠিয়ে দিয়েছেন। এ পথেই যাচ্ছিলাম। ভাবলাম, টাকাটা আপনার হাতে দিয়ে যাই। ডলারের গোছাটা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল—এই নিন, রেখে দিন।

ডলারগুলো হাতে নিয়ে মিসেস হেডেন বলল—আমি দুঃখিত। সত্যি আমি খুবই দুঃখিত।

গিলিয়ান তার কথাটা না শোনার ভান করে বলল, একটা কথা, এর প্রাপ্তি স্বীকার করে দু' ছত্র লিখে দেবেন কি? তাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই এবার বলল—ঠিক আছে, আমিই যা লেখার লিখে দিচ্ছি। কথা বলতে বলতে সে টেবিলে গিয়ে খস্‌খস্ করে লিখল—'বংশের কুলাঙ্গার রবার্ট গিলিয়ান নিজের চিরদিনের সুখের কথা বিবেচনা করে পরমপিতার নামে এক হাজার ডলার পৃথিবীতে তার প্রিয়তমা ও শ্রেষ্ঠতমা নারীর হাতে তুলে দিল।' চিরকুটটাকে একটা খামের মধ্যে ভরে কোর্টের পকেটে ঢুকিয়ে গিলিয়ান নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

গাড়িতে চেপে গিলিয়ান আবার 'টল্‌ম্যান অ্যান্ড শার্প' অফিসে গেল।

সোনার ফ্রেমের চশমাটা নাকের ডগায় ঝুলিয়ে উকিলকে লক্ষ্য করে বলল, আমি এক হাজার ডলার খরচ করে হিসাবটা দাখিল করতে এলাম।

পকেট থেকে খামটা বের করে উকিল টল্‌ম্যান-এর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল—এটা নিন। পড়ুন, আমার বক্তব্য মানে আপনাদের বাঞ্ছিত হিসাব এর মধ্যেই পেয়ে যাবেন।

উকিল টল্‌ম্যান খামটা হাতে নেওয়া তো দূরের ব্যাপার এমন কি সেটার দিকে ভালভাবে না তাকিয়েই তার প্রতিষ্ঠানের মিঃ শার্পকে ডেকে উভয়ে মিলে সুবিশাল সিন্দুকের ডালা খুলে সিল করা একটা খাম বের করল। উভয়েই খামটার মধ্যে কি আছে জানার জন্য অত্যুৎসাহী হয়ে পড়ল।

উকিল টল্‌ম্যান বললেন, মিঃ গিলিয়ান, আপনার কাকা উইলের একটা ক্রোড়পত্রের কথা গোপনে আমাদের জানিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তখন বলে গিয়েছিলেন, উইলের বক্তব্য অনুযায়ী আপনি এক হাজার ডলার ব্যয় করে হিসাব দাখিল না করা পর্যন্ত এ ক্রোড়পত্রটা আপনাকে দেখানোর তো প্রশ্নই ওঠে না, এমন কি খোলা পর্যন্ত যাবে না। যাক, এর বক্তব্যের আইনের কচকচি দিয়ে আপনাকে বিভ্রান্ত করার ইচ্ছা আদৌ আমাদের নেই। তাই এর মূল বক্তব্য আপনার কাছে ব্যক্ত করছি উইলের বক্তব্য অনুযায়ী এক হাজার ডলার ব্যয়ের হিসাব দেখে যদি বোঝা যায় যে আপনি এ পুরস্কারটা পাওয়ার অধিকার অর্জন করেছেন, অর্থাৎ যেকোন গুণ আপনার মধ্যে বর্তমান তবে বহু সুযোগ-সুবিধা আপনার প্রাপ্য হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আপনার গুণের বিচার কে করবে? আপনার কাকা মিঃ শার্প আর আমার ওপর এ বিচারের সার্বিক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে আপনাকে একটা কথা দিতে পারি, আমরা ন্যায়-ধর্মকেই সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়ে কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করব। আর এ আশ্বাসও আপনাকে দিচ্ছি যে, আমাদের মধ্যে এতটুকুও উদারতার অভাব থাকবে না। মিঃ গিলিয়ান, আপনার ওপর আমাদের এতটুকুও বিরূপ মনোভাব, এতটুকুও বিদ্বেষ নেই।

মিঃ গিলিয়ান এখন ক্রোড়পত্রটার মূল বক্তব্য আপনার সামনে তুলে ধরছি—উইলে বর্ণিত এক হাজার ডলার ব্যয়ের যে হিসাব আপনি দাখিল করেছেন তাতে আমরা অর্থাৎ মিঃ শার্প এবং আমি বিচক্ষণতা, বুদ্ধিমত্তা এবং নিঃস্বার্থতার পরিচয় পাই তবে পঞ্চাশ হাজার ডলারের একটা বন্ড আপনাকে দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের ওপর অর্পণ করে গেছেন। আর সেজন্যই ডলারগুলো আমাদের হাতে দিয়ে গেছেন। আর আমাদের মক্কেল পরলোকগত মিঃ গিলিয়ান স্পষ্টই বলে

গেছেন, এ ডলারগুলো আপনি সেভাবেই ব্যয় করবেন যেভাবে অতীতে ব্যয় করেছেন। আমাদের পরলোকগত মক্কেল বলে গেছেন আপনি যদি সমাজের শত্রু, সমাজবিরোধীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দুষ্কর্মে লিপ্ত থাকেন তবে এ পঞ্চাশ হাজার ডলার আমরা পরলোকগত মিঃ গিলিয়ানের পোষ্য, বিশেষ প্রিয়পাত্রী মিসেস হেডেন অর্থাৎ মিরিয়াম হেডেন-এর হাতে তুলে দিতে বাধ্য থাকব।

মিঃ গিলিয়ান চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে নীরবে উকিল টলম্যান-এর বক্তব্য শুনতে লাগল।

ক্ষণিকের বিরতির পর উকিল টল্ম্যান আবার মুখ খুললেন—মিঃ গিলিয়ান, এবার এক হাজার ডলার ব্যয় করে যে হিসাব আপনি দাখিল করেছেন সেটা মিঃ শার্প এবং আমি পরীক্ষা করে দেখব। আর এও বলে রাখছি, আমরা যে সিদ্ধান্ত নেব তার প্রতি আপনার আস্থার অভাব হবে না।

উকিল টল্ম্যান এক হাজার ডলার ব্যয়ের হিসাবসমেত খামটার দিকে হাত বাড়ানোমাত্র গিলিয়ান বাজপাখির মত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে টেবিল থেকে খামটা হাতে তুলে নিল। খামের মুখটা ছিঁড়ে খাম আর হিসাবের কাগজটাকে দুমড়ে মুচড়ে কোটের পকেটে চালান করে দিল। এবার মুচকি হেসে বলল—হিসাবের ব্যাপার স্যাপার নিয়ে আপনাদের ভাবনা চিন্তার কোন দরকার আছে বলে মনে করি না। ধরে নিতে পারেন ওই অর্থ আমি রেসখেলার মাঠে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছি। আপনাদের দিনটা শুভ হোক। কথাটা উকিল টল্ম্যান-এর উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দিয়ে গিলিয়ান দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল।

গিলিয়ান ঘর ছেড়ে গেলে উকিল টল্ম্যান এবং শার্প পরস্পরের মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলেন।

দ্য শক্স্ অব ডুম্

যে সব ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলেগুলো পাবলিক পার্কগুলোকে নিজেদের বাড়ির মত ব্যবহার করে থাকে তাদেরও কিন্তু কিছু না কিছু মান সম্ভ্রম আছেই। এ সত্যটাকে যাচাই করার অত্যুগ্র আগ্রহ নিয়ে ভালান্স নিজের গণ্ডি ছেড়ে ম্যাডিসন স্কোয়ারে হাজির হল।

পার্কে ঢুকে ভালান্স একটা খালি বেঞ্চ পেয়ে বসে পড়ল। পকেট থেকে সিগারেট বের করে দু'ঠোঁটের ফাঁকে আটকে তাতে অগ্নি সংযোগ করল। পার্কের মৃদুমন্দ বাতাসে সিগারেটের ধোঁয়া ছড়িয়ে মিনিট তিনেক ধরে বিষণ্ণ মনে সে ভাবতে লাগল, বাইসাইকেলের মাথাটা নষ্ট হয়ে যাবার পর যখন তার সাইকেলে চড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তখনই তার শেষ এক হাজার ডলারের শেষ এক শ'র নোটটা পর্যন্ত খরচ হয়ে যায়। তারপর সব কটা পকেটে হাত চালিয়ে একটা পেনিও খুঁজে পেল না। ব্যস, সেদিনই সে বাড়িটা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। আসবাবপত্র পাওনাদারদের দাবী মেটাতে চলে গেছে। আর পরিচারকটার বকেয়া বেতন মেটাতে, পরনের জামা-প্যান্ট ছাড়া বাকি সবই খোয়াতে হয়েছে। বর্তমানে সে পার্কের বেঞ্চটাকে সম্বল করে বিষণ্ণ মনে বসে জীবনের হিসাব নিকাশে ব্যস্ত। এত বড় একটা শহরে প্রচণ্ড শীতের রাত্রে আশ্রয় নেবার মত একটা বিছানা বা পেটের জ্বালা নেভানোর মত একটা চিংড়ি পর্যন্ত নেই আর পথ চলার গাড়ি ভাড়ার প্রশ্নই ওঠে না। তার এ দৈন্যদশা কবে, কিভাবে কাটতে পারবে? বন্ধু বান্ধবদের পকেট হাল্কা করে বা মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে অর্থ আদায়ের মাধ্যমে। আর এরকম সিদ্ধান্তই তাকে পার্কের এ বেঞ্চটায় এনে বসিয়েছে।

তার এরকম দৈন্যদশার মূলে সবচেয়ে বড় ভূমিকা তার কাকা তাকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা। আর তার বড় অঙ্কের ভাতাটা একেবারে বন্ধ হয়ে যাওয়া। কেন? তার গুণধর ভাইপো এক বিশেষ মেয়ের পিছনে ছিনেজোঁকের মত লেগে থাকায়, তাকে রীতিমত অমান্য করায়। তবে এ ব্যাপারটা এ কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য নয়, হবেও না। একটা ব্যাপারে পাঠক-পাঠিকাদের সতর্ক করে দিচ্ছি যে, যাঁরা গল্পের প্রধান মূলটাকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়ান তারা যেন গল্পটার বেশিদূর পর্যন্ত অগ্রসর না হন। পরিবারেরই এক শাখা, একটা ভাইপো ছিল। যে তার কাকার উত্তরাধিকারী ও বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিল। কিছুমাত্র আশার আলো দেখতে না পেয়ে সে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে অনেক আগেই দূরে সরে গেছে। এখন তাকেই নির্বাচন করা হয়েছে। ধরে এনে তার বাঞ্ছা পূরণ করা হবে আর সেজন্যই আজ সম্বল হয়েছে পার্কের বেঞ্চটা।

হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটায় শেষ টান দিয়ে শেষাংশটা পাশের ঝোঁপে ছুঁড়ে মারল। সে আচমকা উন্মাদের মত হো হো করে হেসে উঠল। হঠাৎই জীবনের যাবতীয় বাধা বন্ধন কেটে যাওয়ায় সে যেন আজ এক মুক্ত-স্বাধীন চিড়িয়া। একজন পাইলট যখন পারাস্যুটকে কেটে দিয়ে বেলুনটাকে উড়িয়ে দেয় তখন তার মনে রোমাঞ্চ ও শিহরণ জাগে। ঠিক সে রকম অনুভূতিতেই তার বুকটা ভরে উঠল।

গীর্জার ঘড়িতে দশটা বাজতে চলেছে। বেঞ্চটায় এক এক করে আরও কয়েকজন এসে আশ্রয় নিল। তাদের একজন সরতে সরতে একেবারে ভালান্স-এর গা-ঘেঁষে বসল। মজার ব্যাপার, সে যুবক হতে পারে আবার বৃদ্ধ হলেও অবাক হবার কিছু নেই। কম-ভাড়ার বাড়িতে থেকে থেকে যেন ভাজামাছ হয়ে গেছে। তার ওপর চিরুনি আর ক্ষুর যে কতদিন আগে শেষ বারের মত হাতে নিয়েছিল বলা মুশকিল। লোকটা ভালান্স-এর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেশলাই চাইল। আসলে পার্কের জীবরা এভাবে গল্প জমায়, পরস্পরের পরিচিত হয়।

মুখে ম্লান হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে যুবক অথবা বৃদ্ধ লোকটা ভালান্স-এর পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখের মণি দুটোকে বুলিয়ে নিয়ে বলল—আপনার জামা-প্যান্ট দেখে মনে হচ্ছে আপনি পার্কের নিয়মিত খদ্দের নন, ঠিক বলি নি? আসলে পোশাক-আশাক দেখলেই আমি নিঃসন্দেহ হতে পারি। আমার বিশ্বাস, আপনি পার্কের ভেতর দিয়ে যাবার সময় কিছুটা সময় বিশ্রাম নেওয়ার জন্য বেঞ্চটায় আশ্রয় নিয়েছেন। তাই আপনার সঙ্গে বেশী কথা বলতে আমি সঙ্কোচ বোধ করছি। কিন্তু আমার সবচেয়ে বড় সমস্যা, সময় কাটানোর জন্য অবশ্যই একজন সঙ্গী চাই। আমার ভয় হচ্ছে! হ্যাঁ, আমার ভয় হচ্ছে। পার্কের ওদিককার বেঞ্চে-বসা লোকগুলোর মধ্যে দু-তিন জনের কাছেও আমার মনের কথা ব্যক্ত করেছি। হতচ্ছাড়াগুলো আমাকে পাগল ঠাওরে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। আর একটু ভালান্স-এর কাছে সরে গিয়ে কাতর স্বরে বলল—বিশ্বাস করুন, আজ সারাদিনে আমার বরাতে জুটেছে একটা আপেল আর দুটো মাত্র ব্রেটজেল। আগামীকাল আমাকে তীর্থের কাকের মত অপেক্ষা করতে হবে তিন মিলিয়নের উত্তরাধিকারী হবার প্রত্যাশায়। ওই যে, দূরে একটা রেস্তোরাঁর সামনে মোটর গাড়ি সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে, আগামীকাল সেটাই আমার কাছে বিবেচিত হবে সস্তায় পেট ঠাণ্ডা করার জায়গা।

ভালান্স-এর মুখের ওপর চোখের মণি দুটোকে বুলিয়ে নিয়ে লোকটা আবার মুখ খুলল—কি হে ভায়া, আমার কথাটা বিশ্বাস করতে উৎসাহ পাচ্ছ না, মিথ্যে বলেছি?

ভালান্স ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বলল—কেন উৎসাহ পাব না? অবশ্যই বিশ্বাস করছি। চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে এবার বলল, আমি গতকাল ওই রেস্তোরাঁতেই দুপুরের খানাপিনা সেরেছি। আর আজ? আজ এক কাপ কফি পান করার জন্য পাঁচটা সেন্টও জোগাড় করতে পারিনি।

লোকটা বলল—কিন্তু ভায়া, তোমার পোশাক-আশাক দেখে তো আমাদের একজন বলে মনে হচ্ছে না। এক সময় আমিও তো পাখির মত ডানা মেলে আকাশের গায়ে ভেসে বেড়াতাম। যাক গে, তুমি এখানে এসে পড়লে কিভাবে, বলবে কি?

আরে ভাই, আর বলবেন না, বরাতগুণে আমি চাকরিটা খুইয়েছি। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভালান্স বলল।

মশাই, এ নগরটা হচ্ছে নরকের দক্ষিণ দুয়ার। একদিন যে তুমি চিনা-খাবারে উদর পূর্তি করেছ আজ সেই তুমিই চীনের মাটিতে বসে চপসুপ চিবোচ্ছ। বহু দুঃখ-যন্ত্রণা আমাকে সইতে হয়েছে। পাঁচ পাঁচটা বছর আমাকে চরম দুঃখের মধ্য দিয়ে কাটাতে হয়েছে। তবে সুখের মুখ দেখতে পেলাম। রাজসিক কায়দায় প্রতিটা মুহূর্ত কাটাতে লাগলাম। দেখুন, আপনার কাছে বলতে আমার কোন লজ্জা সঙ্কোচ নেই। কারণ, কারো না কারো কাছে আমাকে তো মনের কথা খোলসা করে বলতেই হবে। আমি—হ্যাঁ, আমি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছি। বলতে দ্বিধা নেই—আমি ভয় পেয়েছি।

আমার নামটা আপনার জানতে ইচ্ছা করছে না? শুনুন তবে বলছি, আমার নাম আইড। হয়ত ভাববেন, আমি ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলছি—আমার বাবা ছিলেন বুড়ো পুডিং। রিভার-সাইড পুডিং-এর ধনকুবেরদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন তিনি, ভাবতে [illegible] কথাটা। কিন্তু

সত্য। এক সময় তাঁর বাড়িই ছিল আমার ঠিকানা, হাত পাতলেই প্রয়োজন মাফিক ডলার পেয়ে যেতাম। কি বলতে চাইছেন, দু' পেগ মদের দামও কি আপনার পকেটে নেই? আরে ধ্যুৎ! আপনার নামটাই তো শোনা হল না।

ভালান্স বলল—ডসন আমার নাম।

আইড আবার মুখ খুলল—একটা হপ্তা আমাকে এক কয়লার দোকানে এক চোরের সঙ্গে কাটাতে হয়েছে। তাকে সবাই চোখ পিটপিটে মরিস নামে সম্বোধন করত। আমার থাকার জন্য অন্য জায়গা আর ছিল না। আজ বেরোবার সময় এক ছোকরা আমার পকেটে কিছু কাগজপত্র গুঁজে দিল। আমার অপরিচিত, কোনদিন চোখে দেখেছি বলেও মনে হল না। তবে অনুমান করলাম হতচ্ছাড়াটা পুলিশের সংবাদদাতা। অনেক ভেবেচিন্তে সেদিন রাত্রির অন্ধকার না-নামা পর্যন্ত আর বেরোলাম না। সে আমার নামে লেখা একটা চিঠি রেখে গেল। মিড নামে শহরের এক উকিল চিঠিটার প্রেরক। আন্ স্ট্রীটে একদিন একটা বাড়ির দরজায় এ নামের নেমপ্লেট দেখেছিলাম বটে। চিঠির বক্তব্য পুডিং আমাকে আবার তার গুণধর ভাইপো হিসেবে পেতে আগ্রহী। তাঁর ইচ্ছা, আমি আবার তাঁর ডলারের পাহাড়ের ওপর বসি, উত্তরাধিকারী হই। কাল সকাল দশটায় আমাকে উকিল মশাইয়ের অফিসে হাজির হতে হবে। তিন মিলিয়নের উত্তরাধিকারী হতে হবে আমাকে। আর হাত খরচ হিসেবে দশ হাজার ডলার পাব। আরে ভাই, ভয় পেয়েছি—আমি ভয় পেয়েছি। কথা বলতে বলতে ছন্নছাড়া ভবঘুরে লোকটা যন্ত্রচালিতের মত লাফিয়ে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে হাতদুটো সটান মাথার ওপর তুলে উন্মাদের মত লাফাতে লাগল। পরমুহূর্তেই পার্কের ঘাসের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে বিশ্রী স্বরে গোঙাতে লাগল, মুখ দিয়ে কম বেশী ফেনাও বেরিয়ে এল।

ভালান্স ব্যস্ততার সঙ্গে তাকে জাপ্টে ধরে কোন রকমে বেঞ্চের ওপর শুইয়ে দিল। বহু চেষ্টার পর তাকে কিছুটা সুস্থ করার পর বলল—ভাই, লোকে দেখে ভাববে আপনি উত্তরাধিকারী সূত্রে বিত্তসম্পদ লাভ করার পরিবর্তে আপনি বুঝি প্রাপ্য অর্থ খোয়াতে বসেছেন।

আমি কেন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছি, তাই না? আসলে আমার মধ্যে ভয় জন্মেছে, আজ রাত্রেই বুঝি আমার কিছু একটা ঘটে যাবে। সেটা যে কি, আর কিভাবে ঘটবে তা-ও আমি বলতে পারব না। তবে এটুকু বলতে পারি, এমন কিছু একটা ঘটতে পারে যা আমার ডলারগুলো পাওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। আমার আশঙ্কা, একটা ইয়া মোটা গাছ ভেঙে আমার ওপরে পড়বে নইলে মাথায় বাড়ির ছাদ ভেঙে পড়বে। সত্যি করে বলতে কি, আমি কোনদিন এরকম ভীতু ছিলাম না। কত রাত্রি যে আমি পার্কে কাটিয়েছি তার ঠিক ঠিকানা নেই। আমার প্রাতঃরাশ কোত্থেকে আসবে, কে জোগাবে কিছুই ঠিক ঠিকানা থাকত না। এ কথা বলতে বলতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে আবার মুখ খুলল—কিন্তু ভাই, আজকের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মিঃ ডসন, আমি ধনসম্পদ ভালবাসি। কাল সকালেই বস্তা বস্তা ডলারের অধিকারী হচ্ছি আমি। কত দাস-দাসী প্রতিনিয়ত আমাকে সেলাম ঠুকবে। স্বর্গরাজ্যের সুখ-সমৃদ্ধি আমার পায়ে লুটাবে। যত দিন আমার ধারণা ছিল আমি কোন কম্মের না ততদিন এসব ব্যাপারে আমার কোনই আগ্রহ ছিল না। কিন্তু একদিন যে বিত্তসম্পদের প্রতি আমার অনীহা ছিল কালই সে সব আমার আয়ত্তের মধ্যে চলে আসবে। বিশ্বাস করুন, আমার পক্ষে রীতিমত অসহনীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। হাজারো বিপদ আমাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরতে পারে, আমি অন্ধ হয়েও যেতে পারি, বুকের রোগ ব্যাধি হওয়াও কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। আবার এমনও হতে পারে আমার সম্ভাব্য বিপদ ঘটার আগে পৃথিবীটাই ধ্বংস হয়ে—

আচমকা বিকট আর্তনাদ করে আইড লাফিয়ে উঠল। ভালান্স তার হাত চেপে ধরে শান্ত করার চেষ্টা করতে গিয়ে বলল—মিঃ আইড, কেন এমন করছেন। শান্ত হোন, ধৈর্য ধরুন। কেন মিছে উত্তেজিত হচ্ছেন, ভয়ে এমন মুষড়ে পড়ছেন? তার চেয়ে বরং চলুন, একটু হাঁটাহাঁটি করে আসা যাক।

তার চেয়ে বরং আমি এখানেই থাকি। আপনি দয়া করে আমাকে ছেড়ে যাবেন না, মিঃ ডসন। ইতিপূর্বে আমি বহু কঠিন আঘাত পেয়েছি। কিন্তু কখনও এমন করে মুষড়ে পড়িনি।

একটু বাদে ভালান্স তার সদ্য পরিচিত লোকটাকে নিয়ে নির্জন নিরাশা পঞ্চম এভিনিউ দিয়ে হাঁটতে লাগল, সেটা শেষ করে ত্রিশতম এভিনিউতে পড়ল। সবশেষে তারা ব্রডওয়ের পথ ধরল।

আইডকে পথের ধারে একটা ঝাঁকড়া গাছের তলায় দাঁড় করিয়ে বলল—আপনি এখানে একটু অপেক্ষা করুন। এবার পরিচিত একটা হোটেলে ঢুকে বারের দিকে এগোতে লাগল।

ভালান্স এক পরিচারককে ডেকে বলল—'জিমি বাইরে একজন ক্ষুদ্রার্ত লোক অপেক্ষা করছে।' পকেট ফাঁকা থাকলে এরা কি করে বসে তা তো আর তোমার অজানা নয়। তাকে দু'-একটা স্যান্ডোইচ দাও। তবে সে যাতে খাবারগুলো ছুঁড়ে ফেলে না দেয় সেদিকে আমি নজর রাখব।

পরিচারকটা বলল—মিঃ ভালান্স, কোন লোক আমার চোখের সামনে ক্ষিদের জ্বালায় কষ্ট পেলে আমি সহ্য করতে পারি না। এবার সে একটা তোয়ালেতে কিছু খাবার বেঁধে ভালান্স-এর হাতে দিল।

খাবারের পোটলাটা হাতে করে ভালান্স হোটেল থেকে বেরিয়ে আইড-এর হাতে দিয়ে বলল, মিঃ আইড, এগুলো খেয়ে নিন।

ভালান্স আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। আইড তাকে সে সুযোগ না দিয়েই বাজপাখির মত ছোঁ মেরে খাবারের পোঁটলাটা নিয়ে কাকের মত সেগুলো গিলতে লাগল। খাবার চিবোতে চিবোতে বলল—বিশ্বাস করুন, এক বিন্দুও বানিয়ে বলছি না। বছর খানেকের মধ্যে এত ভাল খাবার আমি খাইনি, মানে খেতে পাই নি। আরে, আমিই যে সব খেয়ে ফেলেছি! আপনি খাবেন না?

ধন্যবাদ! আমার খিদেটিদে পায় না।

আইড এক টুকরো খাবার গিলে নিয়ে বলল—আমরা বরং স্কোয়ারেই ফিরে যাই। সেখানে আর যা-ই হোক অন্তত পুলিশের হুজ্জতির ভয় নেই। অবশিষ্ট খাবারটুকু তোয়ালে দিয়ে জড়াতে জড়াতে বলল—আমি আর খাব না বাবা। বেশি খেয়ে যদি অসুখ বিসুখ হয়। ব্যস, তবে আজ রাতেই অক্কা পেয়ে যাব। ব্যস, সে তিন লক্ষ ডলার তবে তো আর হাতে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। উকিলের সঙ্গে মোলাকাৎ হবার এখনও তো এগার ঘণ্টা বাকি আছে। কথা বলতে বলতে হঠাৎ ভালান্স-এর হাত দুটো চেপে ধরে কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলল—আমার কেবলই ভয় লাগছে—যদি আজ রাত্রেই কিছু একটা ঘটে যায়। আপনার কি রাত্রিবাস করার মত কোন ডেরা আছে?

ভালান্স সঙ্গে সঙ্গে বলল—না। আজ রাত্রি কাটানোর মতও কোন ডেরা নেই। একটা বেঞ্চেই আমরা দু'জনে রাত্রিটা কাটিয়ে দিতে পারব।

শুনুন, আমি বাড়ি গিয়ে আপনাকে একটা চিঠি দেব। বুড়োটাকে দিয়ে সেটা লিখিয়ে নেব। চিঠি দেওয়ার উদ্দেশ্য থাকবে কোন না কোন একটা প্রতিষ্ঠানে আপনার একটা চাকরি হয়। আপনি আজ আমাকে যে সার্বিক সাহায্য করলেন। আপনাকে না পেলে আজ রাত্রিটা কাটানো আমার পক্ষে টিকে থাকা কিছুতেই সম্ভব হত না।

ভালান্স বলল—ধন্যবাদ। একটা কথা, মশাই, আপনি কি ঘুমের ঘোরেও এরকম প্যাচাল পাড়েন?

ভালান্স ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে আকাশের গায়ে ঝুলে থাকা তারাগুলোর দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল। সে কিছুতেই দু'চোখের পাতা এক করতে পারল না। এক সময় দুধের গাড়ির আওয়াজ শুনে বুঝল সকাল হতে আর দেরী নেই। ভোরের ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে বাতাস বইতে থাকায় সে কাঠের শক্ত বেঞ্চটায় শরীর এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

গাছের ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো চোখে এসে পড়ায় ভালান্স-এর ঘুম ভেঙে গেল।

সকাল দশটায় তারা দু'জন আন স্ট্রীটে উকিল মিড-এর বাড়ির সদর দরজায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সময় যতই এগোচ্ছে আইড-এর স্নায়ু ততই চঞ্চল হয়ে পড়তে লাগল, ভেতরে ভেতরে কেমন এক অভাবনীয় অস্থিরতা ভর করল। তাকে কল্পিত ভয়ের মধ্যে ছেড়ে দিতে ভালান্স-এর মন সরল না।

আইডকে সঙ্গে নিয়ে ভালান্স উকিল মিড-এর ঘরে ঢুকতেই তিনি ভালান্সকে স্বাগত জানালেন। ভালান্স উকিলের দীর্ঘদিনের বন্ধু।

উকিল মিড এবার আইড-এর ফ্যাকাসে বিবর্ণ মুখের দিকে তাকালেন। অজানা আতঙ্ক, আসন্ন বিষাদের মুখোমুখি হয়ে সে তো মড়ার মত হয়ে যাবার জোগাড় হল।

উকিল বলল—মিঃ আইড, আপনার ঠিকানায় কাল রাত্রে আরও একটা চিঠি পাঠিয়েছিলাম। আজ সকালে জানলাম গতরাত্রে আপনি বাড়ির বাইরে কোথাও কাটিয়েছেন। তাই স্বাভাবিক কারণেই চিঠিটা আপনার হাতে পড়েনি। তাতে লেখা ছিল মিঃ পুডিং আপনাকে উত্তরাধিকারী করবেন কিনা নতুন করে ভেবে দেখেছেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা করবেন না। আর আপনার কাছে জানাতে চেয়েছেন যে, আপনাদের উভয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক বর্তমান—তার কোন হেরফের করবেন না।

আইড যেন নিজেকে সামলে নিয়ে মুহূর্তে স্বাভাবিকতা ফিরে পেল। তার অস্থিরতা, ভয় জনিত নিরবচ্ছিন্ন কাঁপুনি সবই তার মধ্য থেকে বিদায় নিল। এক অনাস্বাদিত আনন্দে যেন ভেতরটা ভরে উঠল। হঠাৎ উকিল মিড-এর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঠোটের কোণে বিদ্রূপের হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলল। করমর্দন সারতে সারতে বলল—ধ্যুৎ! উচ্ছন্নে যাক সে! কথাটা ছুঁড়ে দিয়েই সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

উকিল মিড ভালান্স-এর দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে বললেন—তোমার কাকা চাইছেন, তুমি আজ, এ মুহূর্তেই বাড়ি ফিরে যাও। ব্যস্ততার জন্য তিনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সেটাকে পরে ঠাণ্ডা মাথায় ভেবেচিন্তে পরিবর্তন করে ফেলেছেন। বর্তমানে তিনি বলতে চাইছেন, আগের মতই সব কিছু অব্যাহত থাকবে। যেমন মনে কর—কথাটা শেষ না করেই তিনি তার করণিককে সম্বোধন করে ব্যস্ত গলায় বলে উঠলেন—জল! শীঘ্র এক গ্লাস জল নিয়ে এস, মিঃ ভালান্স অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন। জল, এক গ্লাস জল চাই—জল!

এ লাইকপেনি লাভার

'গ্রেট স্টোর'! এখানে তিন হাজার মেয়ে-কর্মী সদ্য কর্মব্যস্ত। ম্যাসি তাদের মতই একজন কর্মী। তার বয়স বড়জোর বছর আঠার। সে পুরুষদের দস্তানা বিভাগের মেয়ে-কর্মী। এখানে কাজ করতে করতে দু' রকম মানুষকে সে চিনতে পেরেছে—তাদের মধ্যে কিছু পুরুষ বিভাগীয় বিপণী থেকে নিজেদের ব্যবহারের জন্য দস্তানা কিনে থাকে, আর বাকিরা অন্য সব অদৃষ্ট বিড়ম্বিত পুরুষদের জন্য দস্তানা কেনে। পুরুষের চরিত্র সম্বন্ধে আরও কিছু ধ্যান ধারণা তার জন্মেছে। বাকি দু'শ নিরানব্বই জন মেয়ে-সহকর্মীর কাছ থেকে তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার কথা সে শুনেছে। বিধাতা পুরুষ হয়ত আগেই জানতে পেরে গিয়েছিলেন, তার বরাতে সৎ বুদ্ধি দেওয়ার মত কেউ জুটবে না। তাই দৈহিক রূপ সৌন্দর্যের সঙ্গে সঞ্চয় করার অসীম প্রবণতা তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে তবেই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন।

একদিন আর্ভিং কার্টার গ্রেট স্টোর-এ ঢুকল। সে এক চিত্রশিল্পী। ধনকুবের কবি, ভ্রমণবিলাসী আর মোটর চেপে অনবরত ঘুরে বেড়ায়। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা দরকার যে, সে নিজের ইচ্ছায় এ স্টোরে আসে নি। পুত্রের কর্তব্যের তাগিদেই তাকে এখানে ঢুকতে হয়েছে। আর তার মা ব্রোঞ্জের মূর্তির খোঁজে ছুটে এসেছে।

এক এক করে কটা কাউন্টারে ঢু-মেরে শেষমেষ সে দস্তানার কাউন্টারে এসে থামল। সত্যি একজোড়া দস্তানা তার দরকার। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় নিজের দস্তানা জোড়া নিতে ভুলে গিয়েছিল। সে কথা দোকানির কাছে বলার তো দরকার নেই। কারণ দস্তানার বিভাগে যে প্রেমটেমের ব্যাপার শুরু হতে পারে এরকম ধারণা তার নেই। এর আগে কারো মুখ থেকে শোনেও নি কোনদিন।

কাউন্টারে দাঁড়িয়ে থাকা ম্যাসি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে কার্টার-এর দিকে তাকিয়ে রইল। গ্রীষ্মের সূর্যকিরণের উত্তাপ যেন তার চোখ দুটো থেকে ঠিকরে বেরিয়ে দক্ষিণ সমুদ্রের বুকে ভাসমান বরফের পাহাড়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে।

ম্যাসির দিকে চোখ পড়তেই ধনকুবের কার্টারের মুখে হাসির ছোপ ফুটে উঠল। কিন্তু এটা কোনরকম নীচ মনোবৃত্তির প্রতিফলন অবশ্যই নয়। সেকেন্ড কয়েকের মধ্যেই সে বুঝতে পারল

অন্য সব কাউন্টারের যুবকরা মেয়ে-কর্মীদের সঙ্গে যেমন রঙ্গ রসিকতায় লিপ্ত তাকেও সমগোত্রীয় গণ্য করা হচ্ছে। যুবক ক্রেতাদের সঙ্গে অন্যসব কাউন্টারের মেয়েদের ঠোঁট টিপে হেসে হেসে কথা বলা ও চোখের কায়দা কৌশলই তাকে এমন সিদ্ধান্ত নিতে উৎসাহিত করছে। আর তাই তো সে এখানে মিকি, জ্যাক আর বিলিদের দলেরই একজন হিসাবে গণ্য হয়ে পড়েছে।

দস্তানা পছন্দ করা, কেনা আর দাম মিটিয়ে দেওয়ার পাট চুকিয়ে দেওয়ার পরও কার্টার মুহূর্তকাল স্থবিরের মত সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। ম্যাসির আবির-রঙা ঠোঁট দুটোতে অর্থবহ হাসির রেখা অব্যাহতই রয়ে গেল। অন্যান্য যেসব ক্রেতারা দস্তানা কিনছে তারাও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

না, অতীতে কোনদিন, কোন পরিবেশেই এরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় নি। মিকি, জ্যাক বা বিলির চেয়ে বেশী হতভম্ব হয়ে সে সেখানেই ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। সে যে সমাজের মানুষ সেদিক থেকে বিচার করলে দস্তানা বিভাগের এ মেয়েটার সঙ্গে তার কথা বলার কোন অবকাশই থাকার কথা নয়। দোকানি মেয়েদের সম্বন্ধে সে বহু পড়েছে, বহু লোকের মুখে কত কথাই না শুনেছে। সেসব কথা কাউন্টারটার সামনে দাঁড়িয়ে স্মৃতির পটে আনার চেষ্টা করতে লাগল। মনোলোভা, ভাললাগা যুবতীটার সঙ্গে মাঝে মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ আর গল্পগুজব করার কথা মনে জাগতেই তার বুকের ভেতরে ধুক্‌পুকানি শুরু হয়ে গেল। বুকের এ ধুকপুকানিই বুঝি তার মধ্যে সাহস সঞ্চার করল, প্রেরণা জোগাল।

অতি পরিচিতজন, পরহিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর মত দু'-চারটে অন্তরঙ্গ কথাবার্তার পর কার্টার তার কার্ডটা টেবিলের ওপর রেখে দিল। এবার গলা নামিয়ে বলল—ভবিষ্যতে আবার আপনার দেখা পাবার আশা রাখছি। আর এও আশা রাখছি, পুনরায় মিলিত হয়ে আমাকে আনন্দ দান করতে কার্পণ্য করবেন না। আমার কার্ডটা রইল। এতে আমার নাম-ধাম সবই আছে। আর এটুকু অত্যন্ত বলতে পারি, অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব প্রত্যাশা করছি। এ বাঞ্ছাটুকু কি আমি অন্তরে ধারণ করতে পারি, বলুন?

দিনের পর দিন দোকানের ক্রেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাদের চরিত্র মনোভাব সম্বন্ধে তার মধ্যে একটা সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে গেছে। সে অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে ম্যাসি বলল—অবশ্যই করতে পারেন স্যার। তবে অতীতে কোনদিন অপরিচিত কোন লোকের সঙ্গে আমি বাইরে যাইনি। সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের এটা বিবেকে বাধে। ভাল কথা, আপনি আবার কবে, কোথায় আমার সঙ্গে মিলিত হতে চাচ্ছেন?

যত শীঘ্র সম্ভব। আপনার বাড়িতে যদি যেতে বলেন—।

তাকে থামিয়ে দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠে ম্যাসি মিষ্টি-মধুর স্বরে বলল, না না! আমার বাড়িতে অবশ্যই নয়। আমি যেখানে, যে পরিবেশে আর যে রাজপ্রাসাদে থাকি সেটা আপনার জানা থাকলে অবশ্যই এ রকম কথা ভাবতেও পারতেন না। ছোট্ট একটা কামরায় আমরা পাঁচ-পাঁচজন কোনরকমে দিন কাটাচ্ছি। কোন ভদ্রলোককে সেখানে নিয়ে তোলা সম্ভব নয়।

তবে—তবে অন্য কোন স্থানে।

শুনুন, বৃহস্পতিবার রাত্রে হলে আমার পক্ষে ভাল হয়। রাত্রি সাড়ে সাতটায় আটচল্লিশতম স্ট্রীট আর অষ্টম এভিনিউর মোড়ে আপনার আসা সম্ভব হবে কি? কাছেই আমার ডেরা। রাত্রি এগারটার মধ্যে আমাকে বাড়ি ফিরতেই হবে। মুশকিল হচ্ছে, মা বেশি রাত্রি পর্যন্ত আমাকে বাইরে কাটাতে দেন না।

কার্টার তার প্রস্তাবে সম্মত হয়ে, ধন্যবাদ জানিয়ে তার কাছ থেকে বিদায় নিল।

কার্টার বিদায় নিলে থ্যাবড়া নাক ও দু'চোখ ছোট দোকানি মেয়েটা ম্যাসির কাছে এগিয়ে এল। গলা নামিয়ে ব্যঙ্গের স্বরে বলল—কি ব্যাপার ম্যাসি, মাছটাকে বড়শিতে গেঁথে ফেললে নাকি?

ম্যাসি চোখের পলকে কার্ডটাকে কোমরে চালান দিয়ে আমতা আমতা করে বলল, আরে ব্যাপারটা সম্বন্ধে যা ভাবছ আসলে কিন্তু তা নয়। ভদ্রলোক দেখা করার জন্য অনুমতি চাইলেন। তাই বাধ্য হয়ে—

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ছোট-চোখ মেয়েটা ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়ে তুলে বলল—কি বললে, কেবলমাত্র দেখা করার, মানে দেখা সাক্ষাতের অনুমতি? ব্যস? গাড়ি করে

ঘুরে বেড়ানো ওয়ালড্রপ রেস্তোরাঁয় খাওয়া দাওয়া, পার্কে বা অন্য কোথাও কিছু সময় কাটানোর কথা হয়নি?

কৃত্রিম বিরক্তি প্রকাশ করে ম্যাসি বলল, হচ্ছে কি এসব? তুমি থামবে কিনা, বল? সবকিছু ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখাই তোমার স্বভাব।

গাড়ি করে বেড়ানো বা ওয়ালড্রপ রেস্তোরাঁর কথা আদৌ তিনি বলেন নি। তাঁর কার্ডে দেখা যাচ্ছে, পঞ্চম এভিনিউর ঠিকানা লেখা। নেহাতই যদি রাতের খাবার খাওয়ান তবে হয়ত তামাকের ঝোল বা তরকারী-টরকারী খাওয়াবে। ম্যাসি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কথাটা ছুঁড়ে দিল।

কার্টার তার মাকে নিয়ে গ্রেট স্টোর ছেড়ে বেরোবার সময় বুকের ভেতরটা যেন কেমন একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা আর হাহাকারে ভরে উঠল। পথে নেমে মুহূর্তের জন্য পিছন ফিরে রেস্তোরাঁর দিকে তাকিয়ে চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। সে তো জানেই তার উনত্রিশ বছরের জীবনে প্রথম প্রেম কি, কাকে বলে? প্রেমের ব্যথা কত যন্ত্রণাদায়ক আজই প্রথম অনুভব করছে। প্রথম পরিচয়ের মুহূর্তেই তার ভালবাসার পাত্রীকে নিয়ে মিলনের দিনক্ষণ স্থির করে ফেলেছে, সেটা তার কাছে আনন্দদায়ক হলেও দুশ্চিন্তা তার মন-প্রাণ জুড়ে নিয়েছে।

'গ্রেট স্টোর'-এ কর্মরত মেয়েটা কার্টার-এর কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। তার বাড়ি ঘরের অবস্থাও তার জানা নেই। ছোট্ট সংসার নাকি সেখানে আত্মীয় পরিজনের ভিড় তাও জানে না। রাস্তার মোড়টা হয়ত বা তার বৈঠকখানা, পার্কটা হয়ত ড্রইংরুম, বেড়ানোর শখ মেটাতে হয় এভিনিউতে বেড়িয়ে। তবু হয়ত সে-ই সেখানে সর্বময় কর্তৃত্ব আরোপ করে থাকে।

প্রথম দেখা সাক্ষাতের পর দু'-দুটো সপ্তাহ কেটে গেল। শেষে এক সন্ধ্যায় কার্টার তার প্রেয়সী ম্যাসির হাত ধরে একটা নির্জন পার্কের আলো আঁধারীতে পায়চারি করতে লাগল। গাছের ছায়ায় একটা বেঞ্চে তারা পাশাপাশি গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে বসল।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই কার্টারের হাতটা ধীরে ধীরে এগিয়ে ম্যাসির কোমরটা স্পর্শ করল। পরক্ষণেই ম্যাসির মাথাটা ক্রমে কার্টার-এর দিকে ঝুঁকতে ঝুঁকতে তার কাঁধের ওপর স্থির হল।

ম্যাসি ফুসফুস নিঙড়ে নিঃশ্বাস ফেলে ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারণ করল, আচ্ছা, এরকম একটা আগে তোমার মনে জাগে নি কেন, বল তো?

ভাবাবেগে আপ্লুত কার্টার সাগ্রহে বলে উঠল, প্রিয়তমা ম্যাসি, তোমাকে যে আমি অন্তর থেকে ভালবাসি এটা তুমি বিশ্বাস কর তো? আমি কোন রকম দ্বিধা ছাড়াই বলছি, তুমি আমাকে বিয়ে কর। আমি আন্তরিকভাবে আগ্রহী তোমাকে নিয়ে ঘর বাঁধি, সুখে ঘর সংসার করি। এ অত্যল্পকালের মধ্যে তুমি আমাকে যতটুকু জেনেছ তাতে আমার সম্বন্ধে তোমার মনে কোন বিরূপ ধারণা জাগে নি ত? আমি অন্তর থেকে তোমাকে চাই, আশা করি তোমাকে পাবই পাব।

ম্যাসি তার মুখের দিকে তাকাল। ঠোঁট টিপে হাসল। কিছু একটা বলতে গিয়েও পারল না, নিজেকে সামলে নিল।

কার্টার বলে চলল, হ্যাঁ প্রিয়তম, আমি তোমাকে চিরদিনের জন্য পেতে চাই। আমাদের মধ্যে সামাজিক বৈষম্য যাই থাক না কেন, আমি সবকিছু নস্যাৎ করে দিয়ে তোমাকে পাশে পাবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

ম্যাসি আচমকা ঘাড় ঘুরিয়ে কার্টারের মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে উঠল—বৈষম্য? কিসের বৈষম্য? কোন্ বৈষম্যের ইঙ্গিত দিচ্ছ, বল তো?

কার্টার ম্যাসি-র আকস্মিক মানসিক পরিস্থিতি, ভাবান্তরটুকু সম্বন্ধে আঁচ করতে পেরে আমতা আমতা করে বলল, আরে বৈষম্য টৈষম্য কিছু নেই। বৈষম্য যা কিছু আছে সবই বোকাদের মনে রয়েছে। একটা কথা তো তুমি অবশ্য অনুমান করতে পারছ, তোমাকে আরাম বিলাসের মধ্যে রাখার মত সঙ্গতি আমার আছে। আমার সামাজিক মর্যাদা আকাশ-ছোঁয়া আর ধনসম্পদও পর্বত প্রমাণ।

ম্যাসি সঙ্গে সঙ্গে বলল—সবাই তো এরকম কথাই বলে। আমার কিন্তু বিশ্বাস, তুমি রেসের মাঠে যাও, দু' হাতে ডলার ওড়াও। শোন, আমাকে যতটা তাজা দেখছ, আসলে কিন্তু আমি ঠিক তা নই, জান কি?

দেখ, তুমি যদি প্রমাণ চাও আমি দিতে প্রস্তুত। ম্যাসি, আমার দৃষ্টিতে তুমি সবকিছুর উর্দ্ধে।

মোদ্দা কথা, তোমাকে আমি জীবন সঙ্গিনীরূপে পেতে চাই। আমার অন্তরের কথা আমি তো বলেইছি, প্রথম দর্শনেই আমি তোমাকে মন-প্রাণ সঁপে দিয়েছি, ভালবেসেছি।

খিল খিল করে হেসে ম্যাসি বলল—এমন কথা সবাই বলে। শোন, আমি যদি কখনও এমন কোন পুরুষকে দেখি যে আমার সঙ্গে তৃতীয়বার মেলামেশার পরও আমার পিছনে জোঁকের মত লেগে রয়েছে তার জন্য আমি করতে পারি না, এমন কোন কাজই নেই।

ম্যাসি, আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, দয়া করে এরকম কথা আর বোলো না। বিশ্বাস কর, প্রথম যেদিন তোমার দিকে তাকাই, চোখে চোখ রাখি সেদিন, সে মুহূর্ত থেকেই আমার কাছে তুমিই একমাত্র নারী। অন্য কারো কথা আমি ভাবতেই পারি না।

আমার সঙ্গে তুমি রসিকতা করছ না তো? আমাকে ভুল বুঝো না, আর কতজন মেয়েকে এরকম কথা তুমি বলেছ, বল ত?

এত কিছুর পরও কার্টার হতাশ হয়ে পড়ল না। ম্যাসির কাঁধে হাত রেখে আবেগ-মধুর স্বরে বলল—ম্যাসি, তুমি আমাকে বিয়ে কর, আমার জীবনসঙ্গিনী হও। বিয়ের পরই দম বন্ধ হয়ে আসা এই বিশ্রী শহরটা ছেড়ে সুন্দর, মনোলোভা এক শহরে চলে যাব। কোথায় তোমাকে নিয়ে যাব, ভাবছ? এমন এক স্বপ্নরাজ্যে যেখানে আমি প্রায়ই যাই। চিরবসন্ত বিরাজমান একটা শহরের কথা ভাব মানুষ যেখানে গেলে শিশুর মত সুন্দর আর মুখও পবিত্রতায় ভরপুর হয়ে ওঠে। তোমার মন যতদিন অনাবিল আনন্দে থাকবে, তুমি যতদিন থাকতে চাইবে, ততদিন আমরা সে জায়গা ছেড়ে আসব না। বিরাট এক শহর—ছবি আর মনোলোভা প্রতিমূর্তি দিয়ে স্বর্গরাজ্যের তুল্য সে শহর। জলপথই তার একমাত্র পথ আর সেখানে চলফেরা করে—

গণ্ডোলায় চড়ে সবাই সেখানে পথ চলে, আমি জানি। ম্যাসি তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠল।

ঠিকই বলেছ, হাসতে হাসতে কার্টার বলল। মুহূর্ত কাল পরে সে আবার মুখ খুলল—হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম, আমরা বের হব। পৃথিবীর যত সুন্দর দেশ ও মনোলোভা দ্রষ্টব্য আছে সবই আমরা এক এক করে দেখব। ইওরোপের শহরগুলো ঘুরে আমরা যাব ভারতবর্ষে। সে দেশের নগর-শহর ঘুরে ঘুরে দেখব, হাতিতে চড়ে ঘুরে বেড়াব, হিন্দু আর ব্রাহ্মণদের চমৎকার মন্দিরগুলো দেখব, জাপানীদের সাজানো গোছানো বাগানে ফুরফুরে হাওয়া খাব। তারপর যাব পারস্যে। সেখানে রথদৌড় আর উটের শোভাযাত্রা দেখব।

তারপর?

তারপর বিদেশের বিচিত্র বস্তু আর দৃশ্যাবলী দেখব। ম্যাসি, এসব তোমার যে ভাল লাগবে, তুমি বুঝতে পারছ না?

ম্যাসি বেঞ্চ ছেড়ে উঠতে উঠতে বলল—অনেক দেরী হয়ে যাচ্ছে। এবার বাড়ি যাওয়া দরকার।

কার্টার তবু দমল না। তাকে নানাভাবে তুষ্ট করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তার মেজাজ মর্জি সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই মোটামুটি ধারণা করে ফেলেছে। তার মতের বিরুদ্ধে যাওয়া সঙ্গত হবে না, লাভও কিছু হবার নয়। তা সত্ত্বেও সে নিজের মনকে প্রবোধ দিল সে জয়ী হয়েছে। মুহূর্তের জন্য হলেও তার মনে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে। আর এরই জন্য তার মনে আশার আলো অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মুহূর্তের জন্য হলেও মেয়েটা তার হাতটাকে জড়িয়ে ধরে ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে উঠেছে।

পরদিন সকালে ম্যাসি যথারীতি 'গ্রেট স্টোর'-এর নিজের কাউন্টারে গিয়ে কর্তব্য কর্মে লিপ্ত হল। একটু বাদে তার এক বন্ধু লু লু ধীরে ধীরে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বলল—কি হে, তোমার নাদুসনুদুস বন্ধুটাকে কেমন খেলাচ্ছ, বল তো?

কপালের ওপর ঝুঁকে-পড়া চুলগুলোকে হাত দিয়ে সরাতে সরাতে ম্যাসি বলল—কার কথা বলছ? ওই যে সেই লোকটার কথা? তার আর আমার মধ্যে এখন আর কোনই সম্পর্ক নেই। ক্ষণিকের জন্য ভেবে নিয়ে সে আবার মুখ খুলল—লু লু, একটা প্রশ্নের উত্তর দাও তো, লোকটা আমার কাছ থেকে কি প্রত্যাশা করেছিল, বলতে পার?

সে কি তোমাকে থিয়েটারে যেতে বলেছিল?

আরে ধ্যুৎ! সে মুরোদ তার নেই। তার একান্ত ইচ্ছা ছিল আমি তাকে বিয়ে করে ঘর সংসার—না, তা-ও নয়। বিয়ে করে আমি তার সঙ্গে কোনি দ্বীপে মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে যাই। সেখানে নতুন নতুন দৃশ্যে চোখ-মনকে তৃপ্তি দান করি।

হোয়াইল দ্য অটো ওয়েটস্

সন্ধ্যার অন্ধকার শুরু হতে না হতেই জনহীন পার্কটার নির্জন নিরালা বাঁকের মুখে ছাই রঙের পোশাক পরা মেয়েটা আবার এল। একটা বেঞ্চের এক কোণায় বসে চোখের সামনে একটা বই খুলে নিয়ে বসে রইল। সত্যি করে বলতে কি বই পড়ার ব্যাপারটা বাহানামাত্র। আসলে তার মন ঘোরাঘুরি করছে অন্যত্র, একটা যুবকের দিকে।

মেয়েটার কথা আরও একটু বলে নিচ্ছি—ছাই রঙের সাদামাঠা পোষাক, এমন কি আদব-কায়দা পর্যন্ত নিতান্তই সাদাসিধে। জালের একটা ওড়না জাতীয় কাপড় দিয়ে মাথার উঁচু কাৎকরে পরা টুপিটাকে সে ঢেকে রেখেছে। তারই অংশ বিশেষ নেমে এসেছে মুখের ওপর। তার ফাঁক দিয়ে তার শান্ত মুখটায় সৌন্দর্য যেন উঁকি দিচ্ছে। গতদিন ঠিক এ সময়েই সে এখানে এসে বেঞ্চটায় বসেছিল, তার আগের দিনও এসেছিল। এ ব্যাপারটা আর কেউ না জানলেও একজন অন্তত জানত।

মেয়েটার এখানে আসা আর বেঞ্চটার কোণায় দীর্ঘ সময় নিরবচ্ছিন্ন অস্থিরতার মধ্যে কাটানোর ব্যাপারটাকে জানত, আশপাশ দিয়ে ঘুরঘুর করছে এক যুবক। বরাত ঠুকে সে যে আশায় এখানে চক্কর মেরে চলেছে হঠাৎ-ই সুযোগটা পেয়ে গেল। বইটার পাতা ওল্টাতে গিয়ে মেয়েটার হাত থেকে বইটা মাটিতে পড়ে গেল। আর সেটা আছাড় খেয়ে পড়ার পর দু'পাক খেয়ে হাত দুই দূরে গিয়ে স্থির হল।

বইটা মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যুবকটা প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে বইটা হাতে তুলে নিল। পার্কে বা অন্য কোন স্থানে যেরকম দৃশ্য চোখে পড়ে এক্ষেত্রেও যুবকটা তা-ই করল। ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বইটা মেয়েটাকে দেওয়ার জন্য হাতটা বাড়িয়ে দিল। ছোট্ট করে বলল—এই নিন, ধরুন। তবে এ-ও সত্য যে, টহলধারী পুলিশের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতেও কিছুমাত্রও ত্রুটি রাখল না। আবহাওয়া সম্বন্ধে মামুলি কয়েকটা মন্তব্য করে বরাত ফেরার প্রত্যাশা নিয়ে সে আরও কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল।

নিতান্ত অনিচ্ছায় যেন মেয়েটা তার দিকে তাকাচ্ছে এরকম ভান করে যুবকটার কেতাদুরস্ত ও আকর্ষণীয় চেহারাটার দিকে তাকাল। ছোট্ট করে হেসে অনুচ্চ কণ্ঠে বলল—আপনি চাইলে এখানে বসতে পারেন। আবার মুখে হাসির ছোপ ফুটিয়ে তুলে বলল—আপনি বসলে আমার অস্বস্তির চেয়ে স্বস্তিই, মানে ভালই লাগবে। এখানে আলোটা এতই কম যে বইটা পড়া যাচ্ছে না। তার চেয়ে বরং দুটো কথা বলতে পারলে ভালই হত। বইটা বেঞ্চের ওপর রাখতে রাখতে সে যুবকটার উদ্দেশ্যে কথাটা ছুঁড়ে দিল।

বরাত খুলে যাওয়া যুবকটা জীবন ধন্য হয়ে যাওয়ার মত ভাব নিয়ে বেঞ্চে মেয়েটার পাশে বসল।

যারা পার্কে আসা-যাওয়া করে, যে ফর্মুলার কথা বলে, সে সেইভাবে বাক্যালাপ শুরু করল—যদি কিছু মনে না করেন তবে একটা কথা বলতে চাই।

মেয়েটা ঠোঁট টিপে হেসে বলে উঠল—কি কথা? এত ইতস্ততের কি আছে? যা বলার নির্দ্বিধায় বলতে পারেন।

দেখুন, আপনার মত মনে রোমাঞ্চ জাগানো, মানে মন জয়-করা মেয়ে বহুদিন আমার চোখে পড়ে নি। সত্য গোপন না করলে স্বীকার করতেই হয়, গতকালই আপনার রূপ-সৌন্দর্য আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আপনি কি এতটুকুও উপলব্ধি করেননি যে, আপনার ওই ডাগর ডাগর চোখ একটা যুবকের মনে অবর্ণনীয় আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

মেয়েটা সামান্যতম উষ্মা প্রকাশ না করে, রীতিমত ঠাণ্ডা গলায় বলল—দেখুন, আপনি যে-ই হোন না কেন, আপনার অবশ্যই ভাবা দরকার ছিল যে, আমি এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলা।

আপনি যে কথাটা এখনই বললেন তার জন্য আমি নিজে থেকেই আপনাকে মার্জনা করে দিলাম। এর কারণ কি জানেন? কারণ একটাই, আপনারা, মানে আপনাদের মহলে এ ধরনের কথাবার্তাই স্বাভাবিক। আমি উপযাচক হয়ে আপনাকে বসতে বলায় যদি আমার সম্বন্ধে আপনার মধ্যে এরকম ধারণা জন্মায়, এরকম উক্তি করতে আপনাকে উৎসাহিত করে থাকি তবে আমি না হয় আমন্ত্রণটাকে প্রত্যাহার করে নিচ্ছি।

যুবকটা হঠাৎ চিপসে গিয়ে আমতা আমতা করে বলে উঠল—আমার অশোভন ও শিষ্টতা বহির্ভূত উক্তির জন্য আমি আন্তরিক মর্মাহত, মার্জনা ভিক্ষা করছি। আসলে একটা জায়গাতেই ভুলটা হয়ে গেছে। সত্যি কথা বলতে কি, পার্কে যেসব মেয়ে আসা-যাওয়া করে আপনি তো তাদের রকম সকম জানেন। আমার মনে হয় আপনি তাদের ব্যাপার স্যাপার সম্বন্ধে অজ্ঞ, মানে না-ও জানতে পারেন। তাই বলছি কি—

তাকে থামিয়ে দিতে গিয়ে মেয়েটা অধৈর্য প্রকাশ করে বলল, আপনি দেখছি ব্যাপারটাকে নিয়ে বড্ড কচলাকচলি শুরু করে দিয়েছেন। ও প্রসঙ্গটা ছাড়ান দিন। তবে কিছুই আমার অজানা নেই। এবার একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখুন তো, এসব পথে যারা হাঁটছে তারা কারা? আর যাচ্ছেই বা কোথায়, মানে শেষ পরিণতি কি? তারা উদ্ভ্রান্তের মত এমন দ্রুত ছুটোছুটি করছেই বা কেন? তারা কি সত্যি তৃপ্ত, বলুন তো?

একটু আগে যে যুবকটা গায়ে পড়ে মেয়েটার সঙ্গে উপযাচক হয়ে কথা বলার চেষ্টা করছিল, দু'দিন ধরে তার আশপাশ দিয়ে ঘুর ঘুর করছিল এখন তারই একমাত্র লক্ষ্য নিছক সময় কাটানো। কোন ভূমিকা নিলে সে নিজেকে সামলে সুমলে রাখতে পারবে সেটাই সে ভেবে উঠতে পারছে না।

মেয়েটার মানসিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আঁচ করতে পেরে যুবকটা বলল—ওই যে কপোত-কপোতি জোড়ায় জোড়ায় বসে আছে তাদের দেখতে চমৎকার লাগছে, তাই না? একেই কিন্তু বলে জীবননাট্য—মানে জীবনের অত্যাশ্চর্য নাটক। কেউ বা সঙ্গিনীকে নিয়ে রেস্তোরাঁয় যাচ্ছে নৈশভোজ সারতে, আবার কেউবা অন্যত্র, মানে অন্য কোথাও মজা লুঠতে ছুটছে। তাদের ইতিহাস অন্ধকারে তলিয়ে রয়েছে, কেউ জানে না—খোঁজ রাখে না।

মেয়েটা অদূরবর্তী কপোত-কপোতিদ্বয়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই বলতে লাগল—আমারও অজানা। তবে জানার কৌতূহলও আমার কিন্তু নেই। স্রেফ একটু স্বস্তিতে বসার জন্যই আমি এখানে বসেছিলাম। কারণ, নির্জনতা নয়, জনকোলাহলই আমার প্রয়োজন ছিল। একটা কথা, আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্য আমি ভেতরে ভেতরে আগ্রহান্বিত হয়ে পড়েছিলাম, উপযাচক হয়ে বসতেও বলেছিলাম, কেন? বলতে পারেন কেন আপনাকে পাশে বসিয়েছিলাম, কিছু অনুমান করতে পারছেন কি? বলুন তো মিস্টার— পার্কেন স্টাকার, তার মুখ থেকে কথাটা কেড়ে নিয়ে যুবকটা বলে উঠল। ঠিক এ মুহূর্ত থেকেই তাকে আশান্বিত ও উৎসাহী মনে হল। মেয়েটার মুখ থেকে কিছু শোনার জন্য সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

মেয়েটা মুচকি হেসে বলল—একটু বাদেই আপনি সেটা জানতে ও পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারবেন মিঃ পার্কেন স্টাকার। এটা স্বীকার করেন, ছাপার অক্ষরের বাইরে কারো নামকেই রাখা সম্ভব নয়। এমন কি কারো ছবিটাকেও রাখা যায় না। মাথার উঁচু টুপিটা আর জালের মত ঘোমটাটা আমার নিজের পরিচয়টাকে গোপন রাখতে সাহায্য করছে। আমি কিছুই দেখতে, মানে লক্ষ্য করতে পারছি না ভেবেই তো ওই হতচ্ছাড়াটা আমার দিকে এমন বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে ছিল যেন একটু সুযোগ পেলেই আমাকে গিলে খেয়ে খেলবে। দেখুন, পাঁচ-ছ'টা নামের সম্বন্ধে পবিত্রতম লোকদের তালিকা তৈরী করা হয়, ঘটনাচক্রে আমার নামটাকেও সে তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা যায় আর সেটাকে শীর্ষস্থানেই রাখা যেতে পারে। মুহূর্তকালের জন্য নীরব হয়ে, একটু দম নিয়ে সে আবার মুখ খুলল—মিঃ পার্কেন স্টাকার, আমি মাত্র একটা বারের জন্য কথা বলতে চাওয়ার কারণ কি, বলতে পারেন? কারণ একটাই—সামাজিক শ্রেষ্ঠত্বের অহঙ্কার, চাকচিক্য আর অর্থের গরিমার জন্য সে চরিত্রকে হেলায় নষ্ট করে দেইনি। উফ্! আপনি জানেন না, বললেও ঠিক উপলব্ধি করতে পারবেন না, দুয়ের মাঝখানে পড়ে, অসহনীয় চাপ সহ্য করে করে আমি কেমন হাঁপিয়ে উঠেছি!

কেবল অর্থ-ডলার-পেনির কচকচানি। উফ্! অসহ্য! বিশ্বাস করুন, আমার চারদিকে যাদের দেখেছি, তারা সবাই একই ছাঁচে তৈরী বিভিন্ন মাপের ডল পুতুলের মতই নাচানাচি করে বেড়ায়। যাবতীয় সুখ, ভোগ-বিলাসিতা ভ্রমণের আনন্দ আর সামাজিক মর্যাদা পেয়ে আমি সত্যিই হাঁপিয়ে উঠেছি, দম বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে।

যুবকটা সাহসে ভর করে আমতা আমতা করে বলল—টাকাকড়ি সম্বন্ধে আমি অন্তরে উচ্চ ধারণা পোষণ করতাম। তাই ত—

তার মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে মেয়েটা বলতে শুরু করল—কিন্তু আপনি যখন কোটি কোটি ডলারের অধিকারী হন তখন কিন্তু অর্থই আপনার জীবনকে বিষময় করে তুলবে। সুখাদ্য, ঝলমলে পোষাক-পরিচ্ছদ, বল-নাচ, নাটক আর দুনিয়ার সেরা জিনিসগুলোকে দেখে বেড়ানো, তার ওপর বিত্ত সম্পদ ভোগ করে করে তো শেষমেশ প্রাচুর্যের ওপর মনে বিতৃষ্ণার সঞ্চার হতে বাধ্য মিঃ পার্কেন স্টাকার।

যুবকটা ভেতরে ভেতরে উৎসাহিত হয়েই এবার বলল—দেখুন, ধনকুবের ও কেতাদুরস্ত মানুষের বইয়ের পাতায় পড়তে আর কারো মুখে শুনতে চিরদিনই উৎসাহ পেতাম। একটা কথা কি জানেন? শ্যাম্পেনের গ্লাসে বরফের টুকরো দিয়ে, সেটা ভাসমান অবস্থায় পান করাটাই একটা ফ্যাশান, আপনি মানেন কি? আর আপনার এও জেনে রাখা উচিত যে, আমাদের মত অবাঞ্ছিত মানুষগুলো মজা লুঠতে গিয়ে প্রথা বহির্ভূত পথটাকেই আঁকড়ে ধরে। আবার শ্যাম্পেনের গ্লাসে বরফের টুকরোর প্রসঙ্গে ফিরে যাচ্ছি। তাতার দেশের রাজকুমার এ দেশে পর্যটন করার সময় ওয়ালডর্ফ হোটেলে রাতের ভোজ সারতে গিয়ে শ্যাম্পেনের গ্লাসে বরফের টুকরো ঢালার সূত্রপাত করেন। তারপর থেকেই আমরা একাজে উৎসাহী হই। এ হপ্তার একটা ঘটনার কথা বলছি—ম্যাডিসন এভিনিউর এক নৈশভোজের সময় প্রতিটা অতিরিক্ত প্লেটের গায়ে একটা করে দস্তানা রাখা হয়েছিল, যাতে জলপাইয়ের টক খাবার সময় সবাই সেটা পরে নিয়ে খাওয়ার সুযোগ পান।

বুঝতে পারলাম। যুবকটা বিনয়ের সঙ্গে ব্যক্ত করল—সমাজের ওপর তলার মানুষদের এ রকম সব পরিবর্তন সাধারণ মানুষের কাছে সমাদর পায় না।

মেয়েটা স্বাভাবিক স্বরেই বলল—আমি কোন কোন সময় ভাবি, কোনদিন যদি কোন পুরুষকে আমি ভালবাসি তবে সে হবে সমাজের নিচু তলার কোন মানুষ। সে কাজকর্মের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। তবে অবশ্যই অলস আর পরমুখাপেক্ষী হলে চলবে না। তবে জাতপাত আর বিত্তসম্পদের দাবীই আমার ইচ্ছার চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠবে, সন্দেহের অবকাশ নেই। বর্তমানে দুজন মানুষ আমার পথ আগলে দাঁড়িয়ে। তাদের একজন ইংরেজ মার্কুইস। তিনি বড়ই কৃপণ, অর্থ পিশাচও বলা চলে। আবার নিষ্ঠুরতার দিক থেকেও তার জুড়ি মেলা ভার। আর দ্বিতীয়জন জার্মানির এক নামজাদা ডিউক। আমার বিশ্বাস তিনি কৃতদার এবং তার স্ত্রী বর্তমান। এমনও হতে পারে তার নির্মম নিষ্ঠুর আচরণ এবং উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রই স্ত্রীর মৃত্যুর কারণ। কিন্তু মিঃ পার্কেন স্টাকার, এসব কথা আপনার কাছে কেন বলছি?

যুবকটা বলল—আমার প্রতি আপনার বিশ্বাসের জন্য। আপনার বিশ্বাসের এ দৃঢ়তা আমার কাছে যে কী মূল্যবান তা আপনার ঠিক জানা নেই।

মিঃ পার্কেন স্টাকার, আপনি কিসের ব্যবসা করেন, জানতে পারি।

ব্যবসা? খুবই ছোট ব্যবসা। তবে আমার এ আত্মবিশ্বাসটুকু আছে যে, একদিন না একদিন আমি প্রতিষ্ঠা পাবই। একটু আগে আপনি যে বললেন সমাজের নিচু তলার মানুষকে আপনি ভালবাসতে, আপনজন করে নিতে আগ্রহী, সেটা কি আপনার মনের কথা, নাকি নিছকই বস্তাপচা বুলি?

মনের কথা, নির্ভেজাল সত্যি কথা। সবেমাত্রই তো আপনাকে বললাম মার্কুইস আর গ্র্যান্ড ডিউক আমাকে ভালবেসে সংসার পাততে উৎসাহী হয়েছিলেন। সে লোকটা সম্বন্ধে আমি যে আশা অর্থাৎ যা হবে বলে মনে করি তার কোন কাজই নিচু স্তরের হবে বলে আমি মনে করতে পারি না।

পার্কেন স্টাকার এবার মনে একটু শক্তি সঞ্চয় করে বললেন না, আমি এক রেস্তোরাঁর কর্মী।

ছেলেটার কথায় মেয়েটা আচমকা কেমন যেন মিইয়ে গিয়ে বলল—রেস্তোরাঁর কর্মী নয়, আমার বক্তব্য হল পরিশ্রম করা ভাল। তবে ব্যক্তিগত সেবাটেবা, আশা করি আমার মনের কথা আপনার বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। কিন্তু যদি খানসামা—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই সে বলে উঠল—আপনি ভুল করছেন, আমি রেস্তোরাঁর ওয়েটার নয়, খাজাঞ্চি। এবার একটা বড়সড় বাড়ির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে ছেলেটা বলল—ওই যে বাড়িটা দেখছেন, ওর নিচের তলায় শহরের একটা নামকরা রেস্তোরাঁ আছে, আশা করি জানা আছে। আমি সেখানকারই কর্মী।

মেয়েটা ঘড়িটার ওপর মুহূর্তের জন্য চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল—আপনার কাজ ক'টা থেকে? এখনও কাজে যান নি যে?

আমি আজ দিনের নয়, রাত্রের কর্মচারীদের মধ্যে একজন। আর এক ঘণ্টা বাদে আমার কাজে যোগ দেওয়ার সময় হবে। আপনার সঙ্গে আবারও আমার দেখা হবে এ আশা কি আমি করতে পারি না?

জানি না। আপনার সঙ্গে আর একবার দেখা হওয়ার সুযোগ না-ও হতে পারে। কিছু মনে করবেন না, আমাকে এবার উঠতে হবে। এক ডিনার পার্টিতে যোগ দিতে হবে। আবার থিয়েটারে একটা বক্সও ভাড়া করা আছে। আরে ভাল কথা—এখানে আসার সময় পার্কের কোণে একটা মোটর গাড়ি দেখেছিলেন কি? সাদা মোটর গাড়ি, দেখতে পেয়েছিলেন?

গাড়িটা সাদা আর গিয়ারটা লাল, তাই না?

ঠিকই বলেছেন। আমি সব সময় ওটা নিয়েই বেরোই। পিয়র তো জানেই আমি ওই কোণের বিভাগীয় বিপণী থেকে কেনাকাটা সারি। তাই সে সেখানেই আমার জন্য অপেক্ষা করে। মিঃ পার্কেন স্টাকার, জীবনের বন্ধনের কথাটা একবারটি ভেবে দেখুন তো—এর জন্য নিজের সোফারের চোখেও ধুলো দিতে হয়, ঠিক কিনা?

কথাটা বলেই মেয়েটা ধন্যবাদ জানিয়ে পার্কেন স্টাকার-এর কাছ থেকে বিদায় নিল।

মেয়েটা ব্যস্ত-পায়ে চলে যাবার পর পার্কেন স্টাকার পার্কটার গাছগাছালির আড়াল দিয়ে তার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে এগোতে লাগল। যেখানে গাড়িটা রাখা আছে মেয়েটা সেদিকে হন হন করে হাঁটতে লাগল। এক সময় সে পথটা অতিক্রম করতে গিয়ে গাড়িটাকে ছাড়িয়ে চলে গেল। পার্কের সুবিধামত একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে যুবকটা তার গতিবিধির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতে লাগল। পার্কের বিপরীত দিকের একটা গলির মোড়ের একটা রেস্তোরাঁয় সে ঢুকে পড়ল। হাঁটতে হাঁটতে এমন এক কোণের একটা টেবিল দখল করে বসল যেখানে সস্তায় রাত্রের খাবার সারা চলে। তারপর সে পিছন দিককার ছোট্ট একটা ঘরে ঢুকে গেল। কয়েক মুহূর্ত বাদেই সে টুপি আর জালের ঘোমটাটা খুলে রেখে সেখান থেকে বেরিয়ে এল।

খাজাঞ্চির টেবিলটা সামনেই রাখা আছে। লাল চুলওয়ালা একটা মেয়ে এতক্ষণ একটা টুলে বসে কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করছিল। সে এবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল। তার জায়গায় বসল ছাই রঙের পোশাক-পরা মেয়েটা।

যুবকটা পার্ক থেকে বেরিয়ে ধীরে ধীরে গলিটা দিয়ে হাঁটতে লাগল। মোড়ের কাছে যেতেই মলাট দেওয়া ছোট্ট একটা বইয়ের সঙ্গে হোঁচট খেল। সেটা হাতে তুলে নিতেই সে নিঃসন্দেহ হল, মেয়েটা এ বইটার পাতাতেই চোখ বুলাচ্ছিল। মলাটটা উল্টে বইটার নামটা দেখল—'নব আরব্যরজনী'। স্টিভেন্‌সন-এর লেখা। বইটা আবার পথের ধারে ঘাসের ওপর ফেলে দিয়ে মোটর গাড়িটায় উঠে বসল। ড্রাইভারকে ছোট্ট করে বলল—হেনরি, ক্লাবে চল।

দ্য প্লুটোনিয়ন ফায়ার

কয়েকজন সম্পাদক মশাইয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ও যোগাযোগ রক্ষার সৌভাগ্য হয়েছে। বর্তমানে তারাও আমার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। তবে উভয় দিকের যোগাযোগ রক্ষা করার ব্যাপারটাতে উদ্দেশ্যগত ফারাক কিছু না কিছু তো আছেই।

আমি তাদের মুখেই শুনেছি, তাদের কাছে যেসব পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে সে সবের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লেখক শপথ করে বলেন যে, কাহিনীর ঘটনাগুলো প্রকৃতই সত্য।

সত্য ঘটনা ভিত্তিক গল্প সম্বন্ধে আপনাকে সাবধান করে দেবার জন্যই আমার এ ভূমিকাটার অবতারণা করা। বড়সড় একটা শহরের সাহিত্য-জীবন নিয়েই গল্পটা ফাঁদা হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, গস্‌পোর্ট ইন্ড-এর বিশ মাইল ব্যাসার্দ্ধের মধ্যে যেসব লেখক বাস করেন সবাই এ গল্পটা সম্বন্ধে অত্যুগ্র আগ্রহী। এ পত্রিকার দপ্তরে একটা গল্পের পাণ্ডুলিপি এসেছে যার আরম্ভ এভাবে করা হয়েছে—নির্বাচিত হবার পর আদালত কক্ষটা যখন উল্লাসে রীতিমত তোলপাড় হচ্ছে তার মধ্যেই হার্ডউড ছুটতে ছুটতে বিচারক ক্রেস্‌ওয়েল-এর বাড়িতে ইডার খোঁজে হাজির হল। হার্ডউড আদালতকক্ষ ছেড়ে যাওয়ার পরও বেশ কিছুক্ষণ ধরে করতালধ্বনির মাধ্যমে হার্ডউড-এর প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করতে লাগল।

আলাবাসা থেকে আসা পেটিট একজন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক। তার আট-আটটা গল্প দক্ষিণী পত্রিকাগুলোতে ছাপা হয়েছে। তার সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয়েছে—লেখক আমাদের প্রাক্তন কাউন্টি এটর্নি আর বীরযোদ্ধা মেজর পেটিংগিল-এর সুযোগ্য পুত্র। পেটিংগিল পেটিট ছিলেন লুক-আউট পর্বতবাসী। বীরত্ব আর যোদ্ধা হিসাবে তার খ্যাতি ছিল যথার্থই আকাশছোঁয়া।

আমি আন্তরিকভাবে পেটিট-এর সঙ্গে মেলামেশা করে বুঝেছি, ভদ্রলোক রীতিমত একজন কড়া মেজাজের মানুষ। আর লাজুক লাজুক স্বভাবের লোকটা আমার অভিন্ন হৃদয়ের বন্ধু। হোসিয়া শহরে তার বাবা একটা দোকানের মালিক ছিল। পেটিট সাইন বল আর মাঠে প্রান্তরে ঘোরাঘুরির মধ্য দিয়ে দিনের একটা বড় ভগ্নাংশ কাটিয়ে দিতে লাগল। তার বগলে থাকত দুটো উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি। উপন্যাস দুটোর আলোচ্য বিষয় তেরশ' উনত্রিশ খ্রীস্টাব্দের 'ভাইকোঁত দ্য মঁত্রেপো' গ্যাস্টন লাবুলায়ে নামক কোন এক ভদ্রলোকের পিকার্ডি অভিযানের কাহিনী। এমনটা তো অস্বাভাবিক কিছু নয়। খুবই মামুলি একটা ব্যাপার। কিন্তু একটা মানুষ আর তার ল্যাংড়া কুকুরকে নিয়ে আঁকা একটা স্কেচ বাজারে আলোড়ন সৃষ্টি করে, সম্পাদক তার অন্য একটা পত্রিকায় সেটা ছাপান, একটু ঘুরিয়ে বললে আমাদের পড়তে বাধ্য করেন। আর লেখাটাকে নিয়ে আমরা রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি করে থাকি। ব্যস, আর দেরি না করে আমরা সোওয়া ডলারের বিনিময়ে বইটা কিনে ফেলি।

লাল ইঁটে তৈরী একটা বাড়িতে আমি পেটিটকে হাজির করলাম। একদিন হয়ত 'প্রাচীন নিউইয়র্ক সাহিত্যের দ্রষ্টব্যস্থল' শীর্ষক প্রবন্ধে বাড়িটা স্থান পাবে। বাবার দোকানের আয়ে সে একটা ঘর নিয়ে বাস করতে লাগল। আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে নিউইয়র্ক শহরটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালাম। ব্রডওয়ে হোসিয়ার লী-র চেয়ে কতটা সঙ্কীর্ণ তা সে কিন্তু একবারও মুখ ফুটে বলল না। এটাকে শুভ লক্ষণ ধরে নিয়ে আমি তার ওপর শেষ পরীক্ষা চালাবার মনস্থ করলাম।

একথা সেকথার পর তাকে বললাম—মনে কর, নিউইয়র্ক শহরটাকে ব্রুকলিন সেতু থেকে দেখতে কেমন লাগে এ সম্বন্ধে তোমার ধারণা একটা বিশেষ বিবরণ সম্বলিত প্রতিবেদন তোমাকে লিখতে দিলে তুমি নতুন কোন্ মন্তব্য করবে, বল তো?

পেটিট সঙ্গে সঙ্গে বলল—আহাম্মকের মত কথা বলছ কেন? মোদ্দা কথা, আমার চোখে শহরটা ভালই।

সত্যিকারের এক বোহেমিয়া আবিষ্কার করে আমরা সেটাকে নিয়ে উঠে পড়ে লেগে গেলাম। আমরা প্রতিদিন রাত্রে প্রাসাদোপম বাড়িগুলোতে হাজির হতে লাগলাম যেখানে প্রতিনিয়ত জীবনের এক মহাকাব্য ধ্বনিত হয়ে চলেছে। জীবন আর শব্দ যেন এখানে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। আর দশটা মাত্র সেন্টের বিনিময়ে এখানে এক থালা বীন্‌স মেলে। আমরা বিস্ময় বিমূঢ় দৃষ্টিতে

তাকিয়ে দেখি আর ভাবি আমাদের সহকর্মী শিল্পীরা বোহেমিয়াম রেস্তোরাঁয় আজেবাজে খানা দিয়ে উদরপূর্তি করে। শুধু কি এ-ই? আর আমাদের ডেরাটার ঠিকানা জানতে পেরে যদি এসে সেখানে মজলিশ জমায় সে আশঙ্কাটাও আমাদের মনে কম আতঙ্ক ছড়ায় না।

পেটিট-এর বহু গল্পই সম্পাদকের দপ্তরে জমা পড়ল আবার যথা সময়ে সেগুলো তার হাতে ফেরৎ আসে। সে প্রেমের গল্প ফাঁদত, যেটা কোনদিনই আমার পক্ষে করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু সম্পাদকরা তাকে স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছে, প্রেমের গল্পের প্রতিই তারা আগ্রহী। কারণ স্বরূপ তারা এও জানিয়েছে, প্রেমের গল্পের প্রতিই তাদের বেশী ঝোঁক।

আসলে কিন্তু সম্পাদকদের বিশ্বাসটা নেহাৎই অমূলক, ভ্রান্ত। পত্র-পত্রিকার পাতায় তারা প্রেমের গল্প পড়তে চায় না। প্রেমের গল্পের প্রতি সবচেয়ে বেশী প্রবণতা দেখা যায় ভুড়িওয়ালা নাদুসনুদুস বুড়ো ঘাটের মড়াগুলো। আর ছোট গল্পের প্রতি দশ বছরের মেয়েদের ঝোঁক খুবই বেশী। সম্পাদকদের চিন্তাভাবনা নিয়ে সমালোচনা করার ইচ্ছা আমার নেই, করিও না। তাদের মধ্যেই একটা বড় ভগ্নাংশই সজ্জন। তবে এও তো অস্বীকার করার উপায় নেই প্রত্যেকেরই নিজস্ব মতামত ও রুচি থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। একটা পত্রিকার যুগ্মসম্পাদকদ্বয় আমার পরিচিত ছিল। যাঁরা প্রায় সব বিষয়েই অদ্ভুত রকম একমত পোষণ করতেন। তাঁদের মধ্যে একজন জিন-এর অনুরাগী এবং দ্বিতীয়জন ফ্লব-এর অনুরাগী ছিলেন।

সম্পাদকের টেবিল থেকে ফেরৎ-আসা পাণ্ডুলিপির তোড়াটা পেটিট আমাকে দেখাত, উভয়ে এক সঙ্গে বসে সেগুলি বার বার পড়তাম, ধারণা করার চেষ্টা করতাম সেগুলি কেন নির্বাচিত হয় নি। গল্পগুলো পড়ে আমার তো ভালই লাগত। লেখার কায়দা ভাল আর শেষ পাতার একেবারে শেষে গিয়ে প্রতিটা গল্প শেষ হয়। তবে প্রতিটা গল্পে যেন জীবনের স্পর্শের অভাব লক্ষিত হয়। সবশেষে আমি মন্তব্য করতে গিয়ে লেখককে বললাম—গল্পের বিষয়বস্তুর সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত হয়ে, সম্যক জ্ঞান লাভ করে তবেই গল্প লিখতে আরম্ভ করাই উচিত।

আমার কথা শেষ হলে পেটিট মুখ খুলল, গত সপ্তায় তুমি যে গল্পটা বিক্রি করেছ তাতে একটা বন্দুকের লড়াইয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে তুমি লিখেছ, এরিজোনা নামক খনি-শহরে গল্পের নায়ক তার ৪৫ কোল্ট দিয়ে দরজার গায়েই সাতটা ডাকাতকেই একের পর এক পরপারে পাঠাল। একটা ছয়-ঘড়া পিস্তল যদি থাকে তবে খেল্ দেখিয়ে দেওয়া যায়।

আমি বললাম—তা-ত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার। নিউইয়র্ক আর এরিজোনার মধ্যে বিস্তর ফারাক। সে জায়গাটা সম্বন্ধে আমি খুশিমত বললাম চালাতে পারি। কিন্তু সে ব্যাপারটা সে একেবারেই স্বতন্ত্র। প্রেমের ব্যাপার। সর্বত্রই এ বস্তুটার রূপ একই। এক রাখাল বাঁ-হাতে জিন ধরে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে—এমন একটা গাঁজাখুরি ঘটনার বর্ণনা দিয়ে সম্পাদককে ধাপ্পা দেওয়া যেতে পারে বটে। তাই বলে প্রেমের গল্পের ঘোড়াকে তো আর গাছে চড়িয়ে গল্পের চমক বাড়াতে পারবে না। তাই বলছি কি, প্রেমের গল্প ফাঁদার আগে প্রেমে পড়, চুটিয়ে প্রেম কর। তারপর লব্ধ অভিজ্ঞতাকে নিঙড়ে দিয়ে প্রেমের গল্প লেখায় ব্রতী হও।

আমার পরামর্শকেই পেটিট শিরোধার্যজ্ঞান করে একটা মেয়ের সঙ্গে প্রেমে মজে গেল। এ ব্যাপারটা আমি জানতেই পারিনি। আসলে সে আমারই পরামর্শে, নাকি হঠাৎ একটা মেয়ের শিকার হয়ে প্রেমে মজতে বাধ্য হয়েছে।

স্টুডিওর চত্বরেই একটা মেয়ের সঙ্গে পেটিট-এর মোলাকাৎ হয়ে যায়। তার চেহারা ছবি ভালই, সাদাসিদে এক মেয়ে। কথাবার্তায়ও খুবই পটু। এমন কায়দা কৌশলে তোমাকে অবহেলা করবে যে তোমার প্রকৃত ব্যাপারটা বোধগম্যই হবে না। আসলে মেয়েটা যে নিউইয়র্কের বাসিন্দা।

ব্যস, ক'দিন যেতে না যেতেই পেটিট-এর বুকটা একেবারে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। এতদিন সে তার লেখনির মাধ্যমে প্রেমিকের দ্বিধা-সন্দেহ, ব্যথা-বেদনা, অন্তরের জ্বালা-যন্ত্রণা আর হাহাকারের কথা ইনিয়ে বিনিয়ে ফুটিয়ে তুলেছে। শেষমেশ সবই তার জীবনে সত্য হয়ে দেখা দিল। শাইলকের এক পাউন্ড মাংস তো সামান্য ব্যাপার, কামদেব পেটিট-এর কাছ থেকে পঁচিশ পাউন্ড আদায় করে ছাড়ল। সুদখোর হিসাবে কার কৃতিত্ব বেশী?

এক রাত্রে ছেঁড়াফাটা পোশাক, উসকোখুসকো চুল আর বিষণ্ণ মুখে ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলের মত

হন্তদন্ত হয়ে সে আমার ঘরে ঢুকল। তার মনে কিন্তু বাঁধনহারা উল্লাস।

চোখ-মুখে একেবারেই নতুন একটা হাসির ঝিলিক ফুটিয়ে তুলে সে বলল—আশা করছি আজ রাত্রেই আমি সে গল্পটা লিখে ফেলতে পারব—তোমার জানাই আছে, সেই সর্বজয়ী গল্পটার কথা বলছি। ব্যাপারটাকে আমি অন্তরে অনুভব করছি বটে, তবে সেটাকে যথাযথভাবে ব্যক্ত করতে পারব কিনা নিশ্চিত করে বলতে পারছি না। তবে অনুভব যে করতে পারছি এতে কিছুমাত্র দ্বিধা নেই।

ঠেলে ধাক্কা মেরে তাকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে বললাম—যাও, নিজের ঘরে গিয়ে লেখ তা না হলে আমিই তোমাকে খতম করে ফেলব, বলে রাখছি। রাত্রের মধ্যেই লিখে শেষ করে ফেলতে হবে। লেখা শেষ করেই আমার দরজার ফাঁক দিয়ে ঘরে ঢুকিয়ে দিও। আবার আগামীকালের অপেক্ষায় ফেলে রেখো না যেন।

রাত্রি তখন দুটো, আমার দরজার তলা থেকে খস্‌খস্‌ শব্দ কানে এল। দরজার ফাঁক থেকে কাগজ কটা টেনে নিয়ে এসে রুদ্ধশ্বাসে গল্পটা শেষ পর্যন্ত পড়ে ফেললাম।

গল্পটার পাতায় চোখ বুলাতে বুলাতে ঘুঘুপাখি, হাস, চড়ুইপাখির বিচিত্র ডাক আর গাধার কান ফাটানো কর্কশ গলা আমার কানে বাজতে লাগল। হায় ঈশ্বর! 'এযে হৃদয় বিদারক বেদনাহত সাফো!' আমি গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠলাম—হায় ঈশ্বর! এই কি সে স্বর্গীয় লেলিহান অগ্নিশিখা যা প্রতিভাকে সমুজ্জ্বল করে তোলে? আর মানুষকে কার্যকরী ক্ষমতা দান করে জীবিকার্জনের পথ দেখায়?

গল্পটা আবেগ-উচ্ছ্বাসে ভরপুর অর্থহীন প্রলাপের ছড়াছড়ি, অহঙ্কারের গন্ধ প্রতিটা পাতায় আর নরম মনের প্রকাশও লক্ষিত হয়। কিন্তু গল্প লেখার যে বিশেষ কৌশল পেটিট-এর নিজস্ব সত্ত্বা ছিল তার নামগন্ধও গল্পটার কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

সকাল হলে পেটিট আমার ঘরে ঢুকে একটা চেয়ার টেনে বসল। আমার দিকে নীরবে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাকাল। আমি কোনরকম ভূমিকা ছাড়াই সরাসরি নির্মম-নিষ্ঠুর ভাষাতেই আমার বিচারের রায়টা তার কাছে ব্যক্ত করলাম। সে বোকার মত আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সরবে হেসে উঠল। এক সময় হাসি থামিয়ে প্রফুল্ল মনেই বলে উঠল—বহুৎ আচ্ছা বন্ধু, চুরুটের আগুনে কাগজগুলোকে পুড়িয়ে ফেললেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। তাতে আর হেরফেরই বা কি হতে পারে। মেয়েটাকে নিয়ে আমি আজই 'ক্লারে সঁত'-এ খানা খেতে যাচ্ছি।

প্রায় একটা মাস আর পেটিট-এর সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ হল না। এক বিকেলে পেটিট হন্তদন্ত হয়ে আমার দরজায় এসে দাঁড়াল। ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলের মত তার ভাব, উসকো খুসকো চুল, রুক্ষ-রুষ্ট চেহারা। ঘরে ঢুকেই সে অর্থহীন বকবকানি জুড়ে দিল—কখনও দক্ষিণ আমেরিকা, কখনও প্রুসিড এ্যাসিড আবার পর মুহূর্তেই কবরখানার কথা নিয়ে বকবক করতে লাগল। সারাটা বিকেল ধরে বহু চেষ্টা চরিত্রের পর তার মধ্যে স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হল। পুরোপুরি স্বাভাবিক করে তোলার জন্য তাকে নিয়ে বেড়াতে বেরোলাম, হুইস্কির গ্লাস হাতে তুলে দিলাম। পরিস্থিতিটা একটু সামলে নেওয়ার পর তাকে সাবধান করে দিতে গিয়ে বেশ কড়া স্বরেই বললাম—কি হে, এই কি তোমার সত্য ঘটনাসমৃদ্ধ গল্প নাকি! এভাবে গল্প লিখতে আরম্ভ করলে তোমার বরাতে দুঃখের সীমা পরিসীমা থাকবে না। পুরো দুটো সপ্তাহ ধরে তাকে গলা পর্যন্ত হুইস্কি গিলিয়ে সান্ধ্য পত্রিকার পাতা থেকে নারী-সৌন্দর্যের গোপন কথা সমৃদ্ধ বহু গল্প পড়ে শোনালাম। আর এ-ও জানালাম, চিকিৎসক এ পরামর্শই দিয়েছেন।

চিকিৎসকের অক্লান্ত চেষ্টায় রোগমুক্তির পর সে আবার কলম হাতে নিল। একের পর এক গল্প লিখতে লাগল। তার লেখায় আবার আগের মতই স্বাভাবিকতা ফিরে এল। তার পরই তৃতীয় অঙ্কের পরিসমাপ্তি ঘটল।

বেঁটে খাটো একটা মেয়ে পেটিট-এর প্রেমে মজে গেল। মেয়েটা নিউ হ্যাম্পশায়ার থেকে এসেছে। ব্যবহারিক নক্সা বিষয়ের ছাত্রী। পেটিটও তাকে দেখে মজে গেল। মেয়েটাকে নিয়ে সে এখানে-ওখানে ঘোরাঘুরিতে মেতে উঠল। মেয়েটা তাকে যারপরনাই ভক্তি শ্রদ্ধা করত। আবার মাঝে-মধ্যে তার ওপর বিরক্তিতে একেবারে ফেটেও পড়ত। ব্যাপারটা চরম পর্যায়ে উঠল যখন মেয়েটা জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ার চেষ্টা করল। ব্যাপারটা সম্বন্ধে কিছু না বুঝেই পেটিট আচমকা

াকে জড়িয়ে ধরে তাকে লাফিয়ে পড়া থেকে নিবৃত্ত করল। তার গভীর অনুরাগ আমাকে স্তম্ভিত রল : তার প্রেমের গভীরতা আমার ঘরবাড়ি, বান্ধব-বান্ধবী, পারিবারিক সম্ভ্রম আর যাবতীয় বিশ্বাস মামার ভেতর থেকে নিঃশেষে উঠে গেল।

এক রাত্রে পেটিট আমার ঘরে ঢুকে বার কয়েক হাই তুলে আগের মতই বলল—আমার বিশ্বাস, কটা বড়সড় গল্প লিখতে পারব।

আমি আগের মতই ভাল-মন্দ কিছু না বলে তাকে ঘরে পাঠিয়ে দিলাম। বললাম—ঘরে ফিরেই াগজ-কলম নিয়ে বসে পড়গে।

এক সময় আমার দরজার তলার ফাঁক দিয়ে কয়েকটা কাগজ ভেতরে ঢুকে এল। গল্প পড়া শষ করেই আমি গভীর রাত্রেও যন্ত্রচালিতের মত লাফিয়ে উঠলাম। আপন মনে বললাম—'সেই পটিট এতদিন বাদে বাজিমাৎ করল দেখছি।' লক্ষ্য করলাম, প্রতিটা পংক্তিতে সে যেন রক্তের মক্ষরে একটা নারী-মনের গোপন অন্তরের কথাগুলি যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। গল্পের বাঁধন যমন দৃঢ়বদ্ধ আবার কলাকৌশলও যথেষ্ট প্রশংসনীয়। আমি সঙ্গে সঙ্গে পেটিট-এর ঘরে ছুটে গলাম। তার পিঠ চাপড়ে আবেগভরে বলে উঠলাম—সাব্বাস! সাব্বাস ভাই। এতদিনে তুমি কল্লা ফতে করলে।

সকাল হতেই তার হাত ধরে টানতে টানতে এক সম্পাদকের দপ্তরে নিয়ে গেলাম। সমঝদার লোকটা গল্পটার শেষ পর্যন্ত পড়ে সোল্লাসে পেটিট-এর দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিল। এতেই নিহিত রয়েছে তার বিজয়মাল্য, সোনার পদক আর আয় উপার্জনের ইঙ্গিত।

পেটিট হাত বাড়িয়ে গল্পটা নিয়ে হঠাৎ সেটাকে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলল। এবার বিরক্তিভরে সে বলে উঠল—আসল খেলটা এবার আমার চোখে ধরা পড়ল। কালি দিয়ে নয়, বুকের রক্তের অক্ষরে লিখলেও চলবে না, অন্য কোন জনের রক্তের অক্ষরে লিখতে হবে। আগে অমানুষ হয়ে তবেই আপনাকে শিল্পী হবার জন্য তুলি হাতে নিতে হবে। এবার আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, পুরনো এলবাম আর মেজরের দোকানের বেঞ্চটাই আমার উপযুক্ত জায়গা। পুরনো বন্ধু আমার, কিছু বুঝলে কি?

আমি পেটিট-এর সঙ্গে ডিপো পর্যন্ত গেলাম। আমি এবার মরিয়া হয়ে উঠেছি। শেষ চেষ্টা করতে গিয়ে বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বললাম—শেক্সপীয়র-এর সনেটগুলো সম্বন্ধে তুমি কি বলতে চাইছ?

যাচ্ছেতাই ব্যাপার! তারা তোমাদের দেয় আর তোমরা ক্রেতার হাতে তুলে দাও, ঠিক কিনা? প্রেম? ভালবাসা? ধ্যুৎ! এসব না করে বরং বাবার জন্য লাঙল বেচব।

আমি চোখ দুটো কপালে তুলে বললাম—একী বলছ হে! তুমি দেখছি পৃথিবীর মানুষের মতামতকে একেবারে নস্যাৎ করে দিচ্ছ।

পেটিট আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পা-বাড়াবার উদ্যোগ নিল।

এত কিছু সত্ত্বেও আমি বললাম—শোন, সমালোচকদের মতামতের কথাই আমি বলতে চাইছি। তুমিই বল তো বন্ধু, একজন ফলের দোকানি আর হিসাবরক্ষকের দ্বারা কি মেজরের কাজ চালানো যেতে পারে? আমি এটাই জানতে চাইছি। তুমি জানাবে তো বন্ধু?

দ্য ডিফিট অব দ্য সিটি

শহরের বুকে রবার্ট ওয়ামসলি পা দেওয়ার ফলে একটি কিলকেনি সংগ্রাম ঘটে গেল। তাতে জয়লাভ করে সে প্রকৃত অর্থ আর নাম যশ লাভ করল। কিন্তু অন্যদিকে শহরটা তাকে গ্রাস করে ফেলল। সে যা কিছু প্রত্যাশা করেছে সবই পেয়েছে, কিন্তু শহরটা তার ওপর নিজের ছাপ এঁকে দিল। শহরটা নিজের চাহিদা অনুযায়ী তাকে কেটে ছেঁটে নিজের মনের মত করে গড়ে তুলল। সমাজের দরজার পাল্লা তার সামনে খুলে দিয়ে ঘাসে-ঢাকা একটা গণ্ডীর মধ্যে তাকে বন্দী করে রাখল। পোশাক-পরিচ্ছদ, চালচলন আর সঙ্কীর্ণতা, প্রাদেশিকতার গণ্ডী, বিরক্তিকর ও অসহনীয় ভঙ্গি এক মানহাট্টানবাসী সজ্জন মহত্ত্বের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাকে কতই না ছোট করে রাখে।

এক গ্রাম গঞ্জের মানুষ শহরবাসী সে যুবক-উকিল ভদ্রলোককে নিজের দেশের ছেলে বলে

দাবী করল। আসলে ছ'বছর আগে সে যে সে গ্রামাঞ্চলটার জল-হাওয়াতেই বেড়ে উঠেছি তারপরই বৃদ্ধ ওয়ামসলির ছেলে 'বব' খামারবাড়ি আর ভাল ভাল খাবার দাবারের লোভ সম্বর করে শহরের লাঞ্চ কাউন্টারের দিকে এগিয়ে যায়। হাজির হয় শহরে।

শহরে অবস্থানকালে এমন কোন খুনের মামলার বিচার, মোটর দুর্ঘটনা, কোচিং দল বা নাচে আসর বসেনি যেখানে রবার্ট ওয়ামসলির নাম সবার মুখে মুখে ঘুরে বেড়ায়নি। তার পোশাকে কাটছাঁট জেনে নেওয়ার জন্য দর্জিরা তার খোঁজে পথে দাঁড়িয়ে। সম্ভ্রান্ত ঘরের যুবকরা তার সা দোস্তি ও মেলামেশা করার জন্য উদ্‌গ্রীব।

এলিসিয়া ভ্যান ডারপুলকে বিয়ে করার পরই রবার্ট ওয়ামসলির বাজার যারপরনাই রমর হয়ে উঠল। নবদম্পতি যখন বিদেশ থেকে মধুচন্দ্রিমা যাপন করে স্বদেশে ফিরে এল তখন সমাজে উঁচু তলার মানুষগুলোর মধ্যে রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি হল। লাল ইঁটের তৈরী প্রাসাদোপ বাড়িগুলোতে তাদের ঘন ঘন ভোজের নিমন্ত্রণ হতে লাগল। সহধর্মিণীর জন্য গর্বে রবার্ট-এর বু ফুলে উঠল। অহঙ্কারে তার পা যেন আর মাটিতে পড়ে না।

একদিন রবার্ট-এর মায়ের লেখা একটা চিঠি এলিসিয়ার হাতে পড়ল। চিঠিটায় কিছুমাত্র পাণ্ডিত্যের ছোঁয়া নেই। কেবলই খামার, ফসল, শূকরছানা, বাছুর আর মাতৃস্নেহ তার গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত জুড়ে রয়েছে।

চিঠিটার ওপর একবারটি চোখ বুলিয়ে নিয়ে এলিসিয়া রবার্ট-এর দিকে ফিরে বলল—'কি গো তোমার মায়ের লেখা চিঠিগুলো এতদিন আমাকে দেখাও নি যে বড়? জান, খামার কি জিনিস কেমন দেখতে জানি না। রবার্ট, চল না হপ্তা দু-এর জন্য গ্রামের বাড়ি গিয়ে সবকিছু ঘুরে দেখে আসি, নিয়ে যাবে?

প্রধান বিচারপতির সহকারী রবার্ট সুলভভাবে বলল—ভাল কথাই তো। চল, একবার ঘুরেই আসা যাবে। আমার ধারণা ছিল তুমি গ্রাম্য পরিবেশে যেতে উৎসাহী হবে না, তাই প্রস্তাবটা পাড়ি নি। তুমি নিজে থেকে উৎসাহ প্রকাশ করায় আমি খুবই আনন্দের সঙ্গে প্রস্তাবটা গ্রহণ করছি। চল গ্রামগঞ্জে বেড়াতে ভালই লাগবে।

অত্যুগ্র আগ্রহান্বিতা এলিসিয়া বলল—আমি নিজেই তবে ওনাকে চিঠি দিয়ে আমাদের ইচ্ছার কথা জানিয়ে দিচ্ছি, কি বল? আমাদের উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে তিনি খুব বেশী লোককে নিমন্ত্রণ করবেন বলে মনে হয় না, তোমার কি মনে হয়? ভাল কথা, তিনি মাঝে-মধ্যেই পার্টি টার্টি দিয়ে থাকেন, কি বল তো?

এক সপ্তাহ পরে একটা ছোট্ট-গ্রাম্য স্টেশনে রবার্ট তার সহধর্মিণী এলিসিয়াকে নিয়ে ট্রেন থেকে নামল। শহর থেকে ট্রেনে ঘণ্টা পাঁচেকের পথ।

খচ্চরটানা স্প্রিংয়ের একটা গাড়ি নিয়ে অপেক্ষমাণ এক রসিক যুবক রবার্ট-এর নাম ধরে গলা ছেড়ে ডাকাডাকি করতে লাগল। রবার্ট ঘাড় ঘুরিয়ে তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল।

যুবকটা লাফিয়ে গাড়ি থেকে নেমে বলল—বাড়ির পথটা তবে এখনও মনে আছে, কি বল? তোমার জন্য মোটর গাড়িটা আনতে না পারার জন্য আন্তরিক দুঃখিত। আসলে উপায়ই ছিল না। সেটাকে দিয়ে আজ দশ একর জমি চাষ করা হয়েছে। আর তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য আসার সময় ভাল পোশাক-পরিচ্ছদ পরে আসতে না পারার জন্য আন্তরিক দুঃখিত। এখনও যে ছ-টাই বাজে নি, আশা করি কারণটা বুঝতেই পারছ।

ছোট ভাইয়ের সঙ্গে করমর্দন সারতে সারতে রবার্ট মুচকি হেসে বলল—হ্যাঁ, বাড়ি আসার পথটা আজও মনে আছে। আর এরকম কথা বলার অধিকার তোমার অবশ্যই আছে, স্বীকার করছি। কারণ, দু' বছর আগে শেষবার এখানে এসেছিলাম। কথা দিচ্ছি ভাই, এবার থেকে মাঝে-মধ্যেই চলে আসব।

খচ্চরটানা গাড়িটা তাদের বাড়ির দিকে ছুটে চলল। স্টেশন থেকে বাড়িটা বেশ দূর। সমতলক্ষেত্র আর পার্বত্যাঞ্চলের ওপর দিকে সর্পিল পথ ধরে গাড়িটা ছুটে চলল। এক সময় তারা গ্রামের এলাকায় পৌঁছে গেল। রবার্ট যেন এবার আতঙ্ক-জ্বরের শিকার হল। তার যেন কেবলই মনে হতে লাগল—গ্রামবাসীরা যেন তার দিকে তাকিয়ে চোখের ভাষায় বলছে, রবার্ট, বাড়ির পথটা

তবে এখনও তোমার মনে আছে।

এখানকার গ্রাম্য প্রাকৃতিক পরিবেশ রবার্ট ওয়ামসলির মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করল। অদ্ভুত একটা ব্যাপার সে লক্ষ্য করল, সহধর্মিণী এলিসিয়া তার পাশে, প্রায় গা-ঘেঁষে বসে রয়েছে। অথচ তাকে নিতান্তই অপরিচিতা মনে হতে লাগল, যে যেন তার কেউ-ই নয়। সে ইতিপূর্বে কোনদিন নিজেকে এত উচ্চস্তরের মানুষ ভাবতে পারে নি। সে যেন এক অবাস্তব প্রাণীতে পরিণত হয়ে গেছে। অন্য দশজনের ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে।

তার বাবাকে ভারী বুট পরে, পাইপ ছাড়া মুখে বাড়ি থেকে বেরোতে দেখে সে গলা ছেড়ে চিল্লিয়ে উঠল—না, এ বুটটা পায়ে দিও না, পায়ে দিতে পারবে না। কথা বলতে বলতে সে ব্যস্ত পায়ে ঘরে ঢুকে পাইপটা নিয়ে এসে বাবার মুখে গুঁজে দিয়ে তাতে অগ্নি সংযোগ করল। তার পা থেকে ভারী বুটজোড়া খুলে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। আর তার গা থেকে কোট আর ভেস্টটা খুলে পিলাক বনে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

রাতের খাবারের পাট মিটলে সবাই বারান্দায় পা ছড়িয়ে আরাম আয়েশ করে বসে গল্পগুজবে মেতে উঠল। ফিকে রঙের চমৎকার একটা গাউন পরে এলিসিয়াও তাদের সঙ্গে বসল। তার আচরণে এতটুকু ঔদ্ধত্য প্রকাশ পেল না, নীরবে একধারে জায়গা করে নিয়ে সে বসল। চাটনি ও কটিবাত নিয়ে রবার্ট-এর মা তার সঙ্গে গল্পে মেতে গেল। ভাই টম আর বোন মিলি ও ফসও কাছাকাছিই বসেছে। তাদের বাবা সামান্য দূরে হাতল-ভাঙা একটা আরাম কেদারায় শরীর এলিয়ে দিয়ে স্ত্রী আর পুত্রবধূর কথোপকথন শুনছে। আর রবার্ট? তার মন পল্লীর রূপ সৌন্দর্যে ভরপুর। নীরবে অতীত স্মৃতির পাতা উল্টে চলেছে।

রবার্ট-এর অন্তরের গোপন কন্দরে অতীত-জীবনের স্রোত বয়ে চলেছে। অত্যুৎসাহ তাকে এমন বেপরোয়া এবং উচ্ছৃঙ্খল করে তুলল যে, এক সময় শান্তস্বরে হলেও তার মা পর্যন্ত তাকে বকাবকি না করে পারল না।

এলিসিয়ার হাবভাব দেখে মনে হল, সে হয়ত কিছু বলতে চাইছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে কিছুই বলল না। পুরো সন্ধ্যাটা সে নিশ্চল-নিথর পাথরের মূর্তির মত একাই বসে কাটিয়ে দিল। তাঁর এ নীরবতার কারণ সম্বন্ধে কেউ কিছুই জিজ্ঞাসা করল না।

কিছুক্ষণ পর সে ক্লান্ত বোধ করছে বলে রবার্ট-এর পাশ দিয়ে হেঁটে ওপবের ঘরে চলে গেল। ববার্ট অতি সাধারণ পোশাকে, উসকো খুসকো চুল ও মুখ ভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি—সে যে উঁচু তলার মানুষের প্রতিভূ শ্রদ্ধাস্পদ ক্লাব সদস্য আর বিশুদ্ধ চরিত্রের ধারক রবার্ট ওয়ামসলি সে সবের চিহ্নমাত্রও বর্তমানে তার মধ্যে লক্ষিত হচ্ছে না।

তার পাশ দিয়ে এলিসিয়া ওপর তলায় চলে যেতেই রবার্ট সচকিত হয়ে খাড়াভাবে বসে পড়ল। এলিসিয়া যে এতক্ষণ তার পাশেই বসেছিল খেয়ালই ছিল না। একটু বাদে রবার্টও চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওপর তলায় যাবার জন্য সিঁড়ির দিকে পা বাড়ল।

রবার্ট যখন ঘরে ঢুকল তখন এলিসিয়া জানালার শিক ধরে বাইরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে দাঁড়িয়ে। রবার্ট দরজায় দাঁড়িয়ে চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধীর পায়ে জানালার দিকে এগিয়ে গেল। অদৃষ্টের সঙ্গে মোকাবেলা করার জন্য সে এখন সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত। স্বীকৃত এক ধুরন্ধর, ইতর আর বিত্তশালী লোক হিসাবে সে আগেই অনুমান করে নিয়েছিল শান্ত স্বভাবা ওই মহিলা বিচারে কোন্ রায় দেবে। নিজের কাজের মাধ্যমেই তার মুখোশটা সে খুলে ফেলেছে। মহানগরের কাছ থেকে সে যা কিছু লাভ করেছিল দমকা হাওয়ার বেগে মুহূর্তের মধ্যে সবই নিঃশেষে ঝরে পড়েছে। আকস্মিক ভর্ৎসনারূপ মহাপ্রলয়ের অপেক্ষায় সে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকল।

তার বিচারক ঠাণ্ডা গলায় বলল—শোন রবার্ট, আমার বিশ্বাস ছিল একজন প্রকৃত ভদ্রলোককে আমি স্বামী হিসেবে পেয়েছি। হ্যাঁ, একজন প্রকৃত ভদ্রলোককে আমি স্বামী হিসেবে পেয়েছি বলেই আমার বিশ্বাস ছিল।

মুহূর্তকাল নীরবতার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে সে আবার মুখ খুলল—কিন্তু এখন বুঝছি আমি বিয়ে করেছি এমন একজনকে, প্রিয়তম আমার, আমাকে চুমু খাও, একটাবার আমাকে চুমু খাও।

ইতিমধ্যে মহানগর তার কাছ থেকে দূরে আরও দূরে চলে গেছে।

স্কোয়ারিং দ্য সার্কল

যুবক-যুবতীদের মধ্যে বিরক্তির সঞ্চার ঘটবে নিশ্চিত করে বুঝতে পেরেও অস্বাভাবিক আবেগপূর্ণ এ গল্পটা লেখার আগে আমাকে অবশ্যই জ্যামিতিক আলোচনার একটা ভূমিকার অবতারণা করতে হবেই।

প্রকৃতির গতিপথ বৃত্তাকার। আর কলাকৃতি সরল রেখায় চলে। যেসব প্রাকৃতিক সবই বৃত্তাকার, কলাকৃতি যা কিছু সবই কোণবিশিষ্ট। বরফের দেশে গিয়ে কোন মানুষ পথ হারিয়ে ফেললে তাকে পথের সন্ধানে বৃত্তাকারেই ঘুরপাক খেতে হয়। আর শহরের বাসিন্দাদের পা দুটো চতুষ্কোণ বিশিষ্ট পথে বা ঘর ও বারান্দার মেঝেতে চলতে চলতে নিজ ধর্মচ্যুত হয়ে ক্রমে নিজের কাছ থেকেই দূরে সরে যায়।

শিশুদের গোল গোল চোখ পবিত্রতার নিদর্শন, চঞ্চলা প্রেমিকার চোখে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাঁজগুলো কলাকৃতিরই পরিচায়ক। গোলাকৃতি-সমান্তরাল মুখমণ্ডল সঙ্কল্পবদ্ধ চাতুরীর পরিচায়ক, সন্দেহ নেই। চুম্বনের অধীর প্রত্যাশায় গোল হয়ে ওঠা দুটো ঠোঁটে প্রকৃতির স্বচ্ছন্দ ছন্দময় লীলা-দৃশ্য কার না নজরে পড়েছে?

এখন প্রশ্ন হচ্ছে সৌন্দর্য কাকে বলা যাবে? প্রকৃতির পূর্ণত্বকেই সৌন্দর্য আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। তার প্রধান গুণ হিসাবে গোলাকৃতিকেই ধরে নেওয়া যায়। একবারটি বিবেচনা করে দেখুন, পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র, সুবর্ণ গোলক, বিয়ের স্মারক অঙ্গুরীয়, মন্দিরসমূহের গম্বুজ, সার্কাসের রিং আর মদ পরিবেশনের পাত্র সবই তো গোলাকার।

অন্যদিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে সরলরেখাগুলির মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে প্রকৃতি পথচ্যুত হয়েছে। প্রেমের দেবীর কটিবন্ধ সরলরেখায় পরিবর্তিত হয়েছে—ভেবে নেওয়া সম্ভব কি?

আমরা যেদিন, যে মুহূর্ত থেকে সরলরেখায় চলাচল আর ঘুরতে আরম্ভ করেছি তখন থেকে আমাদের স্বভাবেরও পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে—সাধিত হয়ে চলেছে। প্রকৃতি শিল্পকলার চেয়ে বেশী নমনীয় এবং পরিবর্তনশীল বলে কঠোরতর বিধানের সঙ্গে মিলেমিশে চলার চেষ্টা করে। বহু ক্ষেত্রেই তার অদ্ভুত ফল লক্ষিত হয়। যেমন, একটা ভাল প্রজা মনোলোভা ক্রিসান্থিমাস ফুল, নিউইয়র্কের এক বাসিন্দা, কাঠের রস নিষ্কাশিত হুইস্কি আর প্রজাতন্ত্রী মিশরের বাসিন্দা।

বড় একটা নগরীর প্রকৃতি খুবই অল্প সময়ের মধ্যেই হারিয়ে যায়। তার কারণস্বরূপ জ্যামিতিক বা নৈতিকতাকে মেনে নেওয়া যায় না। বড় একটা নগরীর সদর রাস্তা, ভাস্করের তৈরী মূর্তির সরল রেখাগুলি, সোজা ফুটপাত, পথ চলার কঠিন-কঠোর নিয়ম ও আইন, অবসর বিনোদন থেকে খেলাধুলা পর্যন্ত যাবতীয় ব্যাপার স্যাপার প্রকৃতির বক্ররেখাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করেই চলে থাকে।

এসব ব্যাপার স্যাপার দেখে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া চলে যে, বড় বড় নগর যেন বৃত্তকে চতুষ্কোণ করে গড়ার একটা জটিল ধাঁধার সৃষ্টি করেছে। এ প্রসঙ্গে আরও মন্তব্য করা সম্ভব যে, এ গাণিতিক ভূমিকাটাকে এক কেন্টাকি বিবাদ বিসম্বাদের পরিণতির মুখবন্ধ বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

কাম্বারল্যাণ্ড পর্বতমালায় হার্কনেস পরিবার আর ফল্‌ওয়েল পরিবার দুটোর মধ্যে একটা মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয়েছিল। এর প্রথম শিকার হয়েছিল বিল হার্কনেস-এর একটা পোষা ও প্রিয় কুকুর। হার্কনেস পরিবার এর বদলা নেয় ফল্‌ওয়েল বংশোদ্ভূত এক প্রধান ব্যক্তির জান নিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে। ফল্‌ওয়েল পরিবারও এর বদলা নেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল। তাদের কাঠবিড়ালির মত অদ্ভুত বন্দুক দিয়ে বিল হার্কনেসকে তার কুকুরটা তল্লাশে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

এ বদলা নেওয়া, খুন কা বদলা খুন নেবার ব্যাপারটা চল্লিশটা বছর ধরে চলল। হার্কনেস পরিবারের লোকদের গুলি করা চলতে লাগল। কোন পরিস্থিতিতে? তারা যখন ক্যাম্প-মিটিং-এর পর প্রস্তুত বা অপ্রস্তুত অবস্থায় বাড়ি ফিরে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকত তখনই তাদের ওপর আক্রমণ চালানো হত। আবার একই মারণাস্ত্রের সাহায্যে ফল্‌ওয়েল পরিবারের লোক সংখ্যাও ক্রমে হ্রাস পেতে থাকে।

সর্বনাশ সে হিংসাত্মক কাজের ফলে এক সময় দেখা গেল উভয় পরিবারের মাত্র একজন করে

সদস্য জীবিত রইল। এ পরিস্থিতিতে হার্কনেস হয়ত সিদ্ধান্ত নিল যে, উভয় পরিবারের মধ্যে এ মনোমালিন্যকে আরও কিছুদিন টিকিয়ে রাখলে বিবাদটা ব্যক্তিগত কলহে পরিণত হবে, তাই একদিন সে হঠাৎ ক্যাম্বারল্যান্ড ছেড়ে একেবারে বেপাত্তা হয়ে গেল। আর এরই ফলে প্রতিপক্ষ ফল্‌ওয়েল পরিবারের সর্বশেষ সদস্য স্যামও বদলা নেবার দায়মুক্ত হল, শান্তিও স্বস্তি ফিরে পেল।

এক বছর হার্কনেস-এর কোন খবরই পাওয়া গেল না। তারপর একদিন স্যাম-এর কাছে খবর এল যে, তার উত্তরাধিকার সূত্রের প্রতিপক্ষ হার্কনেস নিউইয়র্ক শহরে মাথা গুঁজেছে। স্যাম কার্পেটের ঝোলায় কিছু পোশাক-পরিচ্ছদ আর সাবেকী আমলের বন্দুকটা কাঁধে তুলে নিল। পরমুহূর্তেই সে বন্দুকটাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে আবার যথাস্থানে ঝুলিয়ে রাখল। ভাবল, নিউইয়র্ক শহরটা হয়ত তার সাবেকী বন্দুকটার শিকার-অভিযানকে বরদাস্ত করবে না। ড্রয়ার থেকে বুড়োর সাবেকী আমলের নির্ভরযোগ্য কোল্ট-এর পিস্তলটা বের করল। সে ভাবল, প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার পক্ষে এ মারণাস্ত্রটাই সব চেয়ে ভাল। সে সেটাকে জামার তলায় গুঁজে নিল। এবার চকচকে ঝকঝকে শিকারী ছুরিটাকে সে চামড়ার খাপে ভরে কার্পেটের ঝোলার ভেতরে ঢুকিয়ে নিল। এবার সর্বশেষ ফল্‌ওয়েল ঘোড়ার পিঠে চেপে নিম্নাঞ্চলের রেলরোড স্টেশনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। যাবার পথে সে ফল্‌ওয়েল পরিবারের সমাধিক্ষেত্রের শ্বেত-পাইপের ফলকগুলোর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

স্যাম ফল্‌ওয়েল নিউইয়র্ক শহরে যখন পা দিল তখন গভীর রাত্রি। উন্মুক্ত প্রকৃতির কোলেই সে এতদিন কাটিয়েছে। তাই তার পক্ষে অনুমান করা সম্ভব হল না যে, এতবড় একটা শহরের অস্থির নিষ্করুণ এবং হিংস্র কোণগুলি অপেক্ষা করে রয়েছে তার অন্তর আর মস্তিষ্কের বৃত্তাকারত্বকে চেপে ধরে তাকেও নবকলেবর প্রাপ্ত লক্ষ লক্ষ শিকারের রূপে পরিণত করার অত্যুগ্র বাসনা নিয়ে। এক ট্যাক্সি-চালক তার এ সঙ্কটাপন্ন পরিস্থিতি থেকে অব্যাহতি দিতে গিয়ে তার পোশাক-পরিচ্ছদের সঙ্গে মানানসই একটা হোটেলে পৌঁছে দিল। স্যাম ফল্‌ওয়েল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

ভোর হতে না হতেই স্যাম ফল্‌ওয়েল শহরটার বুকে অভিযানে বেরিয়ে হার্কনেস বংশের শেষ শত্রুর খোঁজে ছোটাছুটি দাপাদাপি জুড়ে দিল। তার কোল্ট পিস্তলটা সরু একটা চামড়ার ফিতে দিয়ে শক্ত করে কোমরে, কোটের তলায় বাঁধা। আর মসৃণ শিকারী-ছুরিটা ফিতে দিয়ে কাঁধে ঝোলানো। কোটের কলারের এক ইঞ্চি নিচে তার বাটটা অবস্থান করছে। সে এটুকুই মাত্র শুনেছে, কল হার্কনেস একটা এক্সপ্রেস মালগাড়ি করে এসে এ শহরেরই কোন কোন অঞ্চলে মাথা গুঁজেছে। তাকে খুন করে শত্রু নিপাত করার জন্যই স্যাম ফল্‌ওয়েল এখানে ছুটে এসেছে, ছুটোছুটি করছে। তার বুকের ভেতরে প্রতিহিংসার আগুন অনবরত দাউ দাউ করে জ্বলছে।

পথ চলতে চলতে সে ভাবল, রাজপথ দিয়ে চলতে চলতে সে কোথাও না কোথাও তার শত্রু কল-এর দেখা পেয়ে যাবে। কিন্তু এক ঘণ্টা ধরে হাঁটাহাঁটি করে তার দেখা পেল না। এবার সে ভাবল, সে কোথাও না কোথাও ঘাপ্‌টি মেরে রয়েছে। কোন দরজা বা জানালা দিয়ে হয়ত অতর্কিতে গুলি করে বসবে। ফলে স্যাম পথ চলতে-চলতে পথের ধারে বাড়িগুলোর দরজা ও জানালার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলতে লাগল।

দুপুরের দিকে বিশাল শহরটা তার ইঁদুরটাকে নিয়ে খেলায় মেতে থাকায় এক সময় হাঁপিয়ে উঠল, ক্লান্ত হয়ে পড়ল আর অকস্মাৎ তার সরলরেখাগুলি দিয়ে তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল, আঁকড়ে ধরল।

শহরের বুকে দুটো বড় বড় চারকোণা পথ, যেখানে একে অন্যকে ছেদ করেছে, স্যাম ফল্‌ওয়েল সেখানেই দাঁড়িয়ে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে লাগল। হঠাৎ তার নজরে পড়ল পৃথিবীটা তার কক্ষপথ, নিত্যকার চলার পথ থেকে দুম্‌ করে ছিটকে গেল। আর এরই ফলে কোণ সমন্বিত একটা সমতলে পরিণত হয়ে গেল। আর জনজীবন প্রবাহিত হতে লাগল নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে ছক বাঁধা পথ ধরে। জীবনের প্রধান মূল হল ঘনমূল, বর্গমাপ হল অস্তিত্বের মাপকাঠি। নির্দিষ্ট পথ ধরে জনস্রোত সারিবদ্ধভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। তার হৈ চৈ চিৎকার চেঁচামেচিতে সে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। সে কী ভয়ানক হৈ হট্টগোল!

স্যাম কর্তব্য স্থির করে উঠতে না পেরে বড়সড় একটা পাথরের তৈরী বাড়ির গায়ে হেলান

দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। হাজার হাজার লোক তাকে অতিক্রম করে নিজ নিজ গন্তব্যস্থলের দিকে চলে গেল। কিন্তু হায়, কেউ-ই ঘাড় ঘুরিয়ে তার দিকে দৃষ্টিপাত করল না। হয়ত তার অপমৃত্যু ঘটেছে, মরে ভূত হয়ে গেছে। সে কারোরই নজরে পড়ছে না। এরকম একটা অর্থহীন আতঙ্ক তাকে তার মন-প্রাণ জুড়ে বসল। ব্যস, পরমুহূর্তেই শহরটা তার ওপর, একাকিত্বের আঘাত হানল।

স্থূলকায় এক ব্যক্তি জনস্রোত থেকে হঠাৎ ছিটকে বেরিয়ে ফুট কয়েক দূরে দাঁড়িয়ে পড়ল। গাড়ির খোঁজে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। কোনরকমে প্রায় হামাগুড়ি দিতে দিতে স্যাম তার কাছে গেল। গলা চড়িয়ে, চিৎকার চেঁচামেচি থেকে বেশী জোরে গলা চড়িয়ে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল—এই যে মশাই, শুনছেন? র‍্যাংকিন্সদের শূকরগুলোর ওজন পুরো একটা প্যাসেল-এর ওজনের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু তাদের কাছাকাছি যে ফলগুলো অবস্থান করছে সেগুলোকে আগের তুলনায় অনেক ভাল দেখাচ্ছে।

ভুড়িওয়ালা নাদুস-নুদুস লোকটা কোন কথা না বলে লম্বা-লম্বা পায়ে সামান্য এগিয়ে গিয়ে বাঁকের মুখে দাঁড়াল আর আকস্মিক ভয়কে কাটিয়ে স্বাভাবিক হওয়ার জন্য একঠোঙা ভাজা বাদাম কিনে টপাটপ মুখে দিতে লাগল।

স্যাম হতভম্বের মত সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ কর্তব্য স্থির করতে না পারায় একই জায়গায় অবস্থান করতে লাগল। এমন সময় গাট্টাগোট্টা একটা পুলিশ তার দিকে এগিয়ে এসে রীতিমত কর্কশ স্বরে বলল—মশাই, লক্ষ্য করছি, অনেকক্ষণ ধরে আপনি এখানে তাকিতুকি করছেন। ব্যাপার কি? যান, নিজের কাজে যান।

সামনের মোড়ের দিক থেকে একটা কর্কশ শিসের আওয়াজ স্যাম-এর কানে এসে বাজল। আচমকা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকানো মাত্র তার চোখে পড়ল একটা দৈত্যাকৃতি লোক বড় বড় চোখ করে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে। সে ব্যস্ত-পায়ে রাস্তাটা পার হয়ে অন্যদিকে চলে যেতে চাইল। ঠিক সে মুহূর্তে অতিকায় একটা ইঞ্জিন বিকট আওয়াজ করে গোঙাতে গোঙাতে ছুটে এসে তার হাঁটুটা ঘেঁষে চলে গেল। হাঁটুর কিছুটা ছাল উঠে গেল। পর মুহূর্তেই একটা ট্যাক্সি তার গাটা ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল। ট্যাক্সিটার চালক একটা কাঁচা খিস্তি দিয়ে নিজের পথে চলে গেল। পর মুহূর্তেই এক মোটরগাড়ির চালক বারকয়েক হর্ণ বাজিয়ে বিরক্ত হয়ে পাশ কাটিয়ে অনুচ্চকণ্ঠে কি যেন বলতে বলতে চলে গেল। এক ইয়া মোটা, নাদুস নুদুস মহিলা পথ চলতে গিয়ে বাধা পেয়ে কনুই দিয়ে তাকে সজোরে একটা গোত্তা মেরে চলে গেল। ব্যাপারটা সে সামাল দেওয়ার আগেই এক খবরের কাগজের ফেরিওয়ালা পথের ধার থেকে একটা কলার খোসা তুলে নিয়ে তার গায়ে ছুঁড়ে মেরে বিরক্তির সঙ্গে বলতে লাগল—এসব কাজকে আমি খুবই ঘেন্না করি। কিন্তু হতচ্ছাড়াটা এমন করতে লাগল যার ফলে এমন অন্যায় কাজটা না করে পারলাম না।

কল হার্কনেস সেদিনের মত তার কাজে ইস্তফা দিল। এবার সে বিষণ্ণ মনে ক্ষুরাকৃতি বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই তাকে থমকে যেতে হল। পথচারীদের ভিড়ের মধ্যে মাত্র গজ তিনেক দূরে তার বংশের একমাত্র জীবিত শত্রু স্যাম ফল্‌ওয়েল বিপরীত ফুটপাতে দাঁড়িয়ে। সে-ও তার দিকে শিকারী বিড়ালের মত নজর রেখে চলেছে।

কল হার্কনেস অস্ত্রহীন। চরমতম শত্রুকে আচমকা চোখের সামনে দেখে সে যারপরনাই স্তম্ভিত। কিন্তু এখন উপায়? সে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র।

কল হার্কনেসকে কর্তব্য স্থির করার সুযোগ না দিয়েই স্যাম ফল্‌ওয়েল গুলি খাওয়া বাঘের মত গর্জন করে প্রচণ্ড আক্রোশে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাজখাঁই গলায় গর্জে উঠল—কল হার্কনেস, বহু খোঁজাখুঁজির পর তোমার দর্শন পেয়েছি। কেমন আছ?

পঞ্চম এভিনিউ, ব্রডওয়ে আর তেইশতম পথের ত্রিকোণে অবস্থানরত মানুষগুলো বিস্ময়মাখানো দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতে লাগল ক্যাম্বারল্যান্ডের দুই দীর্ঘদিনের শত্রু পরস্পরের হাতদুটো বাড়িয়ে দিল, হাসিমুখে করমর্দন সারল আর সবশেষে আলিঙ্গনের মাধ্যমে পরম আনন্দ উপভোগ করছে।

দ্য ক্যাস্টার অব দ্য সোল

অসম্ভব ! কোন দেবীর মৃত্যু হবে, পরপাড়ে পারি জমাবেন—এমন ঘটনা ঘটা তো দূরের কথা ভাবতেও যে উৎসাহ পাওয়া যায় না। তবে যে সবাই বলে কেবলমাত্র পঞ্চম এভিনিউর ফুটপাতের কিছু সংখ্যক বিশেষ বিশেষ কোণে ইস্টার উৎসব বেঁচে থাকে, অস্তিত্ব অব্যাহতি থাকে, কিন্তু প্রাচীন স্যাক্সন জাতীয় বসন্তের দেবী ইস্টার তাদের অবস্থা দেখে অবশ্যই আস্তিনের আড়ালে মুখ ঢেকে হাসবেন। হ্যাঁ, সত্যি বলছি, না হেসে তিনি পারবেন না।

দেবী ! হ্যাঁ, তিনি বিশেষ কোন অঞ্চলের নয়, সারা পৃথিবী তাঁকে দেবীর আসনে বসিয়ে পূজা করে।

মিঃ ম্যাককুয়ার্ক—টাইগার ম্যাককুয়ার্ক সেদিন সকালে ভয়ানক অস্বস্তি নিয়ে ঘুম থেকে উঠল। কিন্তু কেন যে তার এরকম অস্বস্তি তার বিন্দু বিসর্গও তার জানা নেই। তিনটে ছোট ভাই মেঝেতে অকাতরে ঘুমোচ্ছে। প্রতিদিনের অভ্যাসমত সে তাদের পা দিয়ে ঠেলেধাক্কে রাস্তা করে নিয়ে এগিয়ে গেল। ব্যাপারটা এমন হল সে যেন পা দিয়ে তিনটে কাঠের টুকরোকে অবজ্ঞা ভরে ঠেলে দিয়ে রাস্তা করে নিল। সে এবার ধীর পায়ে জানালার পাশের বড় দেওয়াল-আয়নাটার কাছে গিয়ে সরঞ্জামাদি হাতে তুলে নিয়ে দাড়ি কামাতে লাগল। তারপর সবকিছু ধুয়ে মুছে আবার যথাস্থানে রেখে দিয়ে পিছন ফিরে ঘুমন্ত ভাই তিনটের দিকে তাকাল।

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই বুড়ো ম্যাককুয়ার্ক কাজে বেরিয়ে গেছে। বাড়ির বড় ছেলেটার বেরোবার তাড়া নেই। আসলে ইদানিং তার কাজই নেই। সে পাথর কাটে। পাথর-কাটাদের ক'দিন ধরে ধর্মঘট চলছে। তাই তাকে অনন্যোপায় হয়েই ঠুঁটো জগন্নাথের মত ঘরে অলসভাবে দিন কাটাতে হচ্ছে।

তার থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে তার মা সবিস্ময়ে বলে উঠল—তোর কি হয়েছে, বল তো? সকাল থেকে মুখটা কেমন ব্যাজার দেখাচ্ছে, ব্যাপার কি?

তার দশ বছরের ছোট ভাইটা ঘুমের ভান করে পাশ ফিরে শুয়েছিল। সে যন্ত্রচালিতের মত মায়ের দিকে ঘুরে বলে উঠল—হবে আবার কি। বড়দা তো সারাদিন এনি মারিয়া ডয়েল-এর চিন্তায়ই বিভোর হয়ে থাকে। ছোট ভাইয়ের পাকামোতে বিরক্ত হয়ে টাইগার তার পা ধরে চ্যাম্পিয়নের ভঙ্গিতে এক হ্যাঁচকা টান দিল। সে ছিটকে গিয়ে চেয়ারটার কাছে বিছানার ওপর আছাড় খেয়ে পড়ল। টাইগার তার মায়ের কথার জবাব দিতে গিয়ে বলল—কি যে বলব তোমাকে ভেবেই পাচ্ছি না। শরীরও মন দু'-ই যেন বিশ্বাসঘাতকতা করছে। আসলে কেমন যে লাগছে তা আমি নিজেই জানি না।

আসলে তোমার মন চঞ্চল হয়ে পড়েছে। চায়ের সঙ্গে দু-চার ফোঁটা পাতার বা শেকড় বাকড়ের রস পেটে পড়লেই সব সমস্যা দূর হয়ে যাবে।

মানে শীতটা আরও হপ্তা কয়েক থাকবে।

মিঃ ম্যাককুয়ার্ক প্রাতঃরাশ সেরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পোশাক-আশাক ও চুল গোছগাছ করে নিল।

ধর্মঘট ডাক দেওয়ার পর থেকে ধর্মঘটী ম্যাককুয়ার্ক-এর একটা বদ নেশা পেয়ে বসেছে, রোজ সকালে প্রথমে ছুটবে পরামাণিকের কাছে চুল-দাড়ি ঠিকঠাক করতে। তারপর ছুটে বুটপালিশ ওয়াশার কাছে যাবে। তার বাক্সের ওপর পা রেখে বারোটা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে। মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় হলে তবেই সেখান থেকে সরবে। তার চেহারাটা খেলোয়াড়দের মত সুঠাম। মুখশ্রী সুন্দর, চোখে লাগার মত। আর পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতি খুবই যত্ন নেয়। সব মিলিয়ে, সব সময় সে ফিটফাটই থাকে।

মিঃ ম্যাককুয়ার্ক এক সকালে ব্যস্ত হয়ে তার বিশ্রাম ও পরিদর্শনের স্থলে গেল। তার মনে হল, বাতাসে যেন অসাধারণ কিছু একটা আছে। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও ব্যাপারটা ধরতে পারছে না। সেটা তার চিন্তাকে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে। ইন্দ্রিয়গুলোকে চঞ্চল করে তুলে তাকে নিদারুণ অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে। তারমধ্যে বিরক্তির সঞ্চার ঘটল, করে তুলল কৌতূহলপ্রবণ।

তার মানসিক অস্থিরতার কথা শুনে মিসেস ম্যাককুয়ার্ক বসন্ত আগমনের কথা বলল। অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে টাইগার চোখের মণি দুটো দিয়ে চারদিকের প্রাকৃতিক পরিবেশের দিকে তাকাল। কিন্তু সেরকম কিছুই তো তার নজরে পড়ল না। চড়ুই পাখি আগের মতোই ঠোঁটে করে কুটো নিয়ে ছুটোছুটি করছে। আর ইস্ট রিভার থেকে হিমেল বাতাসও বইছে। আর পুরনো জিনিসপত্রের দোকানি বেসবল খেলার সরঞ্জামাদি সাজিয়ে আর পাশে একটা বরফের বাক্স নিয়ে চিল্লিয়ে খদ্দের জড়ো করে চলেছে।

এত সব লক্ষণ দেখার পরও টাইগার কি করে মেনে নেবে যে, বসন্ত দরজায় কড়া নাড়ছে? লক্ষণগুলোর একটাকেও গুরুত্ব না দিয়ে সে এখন প্রমাণ পেল যে, সত্যি সত্যি বসন্ত আসার সময় হয়ে গেছে।

টাইগার একটা বারে ঢুকে এক পেয়ালা মদ চাইল। মদের গ্লাসে একটাও চুমুক না দিয়েই ব্যস্ত পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। তার কাণ্ড দেখে মদ-পরিবেশক ছুটে এসে তার এরকম অস্বাভাবিক আচরণের কারণ জানতে চাইল। মদের দাম মিটিয়ে দিয়ে সে চিন্তিত মুখে বলল—যাও, নিজের কাজে যাও। ব্যাপার কিছুই না, হঠাৎ মদ খাওয়ার প্রবণতাটা চলে গেছে।

টাইগার এবার একটা খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। এখানে নাপিত লুৎজ্‌কার নামে এক পুরনো বন্ধু থাকে, এক গ্লাসের বন্ধু বললেও কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলা হবে না। এমন কি উভয়ের মধ্যে রীতিমত খিস্তি খেউড়ও চলে।

নাপিত লুৎজ্‌ তাকে দেখেই রসিকতা করতে লাগল—কি হে, টাইগার যে, হঠাৎ এ অসময়ে কি মনে করে। পুলিশ বা কুকুর ধরার কর্মচারীরা বুঝি তাদের কর্তব্য সম্পাদন করেনি?

টাইগার তাকে একটা কাঁচা খিস্তি দিয়ে বলল—আরে, শুয়োরের বাচ্চা ছাড়া তোমার মাথায় অন্য কারো চিন্তাই আসে না?

আরে, ধ্যুৎ! তোমার মগজে যদি কিছু থাকত। আজ তো আমার মনটা অনেক উঁচু দিয়ে চক্কর মারছে। বুঝছ না বাতাসে বসন্তের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে? দেখবে, ক'দিনের মধ্যেই দ্বীপে বনভোজনের ধুম্‌ পড়ে যাবে। আর পিপে পিপে মদ বিক্রি শুরু হয়ে যাবে।

নাপিত লুৎজ্‌ তার কথা শুনে ফিক্‌ফিক্‌ করে হেসে উঠল। তার চোখে-মুখে ফুটিয়ে তুলল বিদ্রূপের ছাপ।

টাইগার এবার রীতিমত খেঁকিয়ে উঠল—তুমি কি আমাকে পাগল পেয়েছ নাকি হে! আমার মুখে বসন্ত-আসার কথা শুনে তোমরা রসিকতা করছ।

তুমি যা-ই বল না কেন, শীত বিদায় নিতে এখনও অনেক দেরী। বসন্তের কোন লক্ষণও কোথাও চোখে পড়ছে না। বসন্তের আগমন সবার আগে উপলব্ধি করতে পারে এরকম তিন শ্রেণীর মানুষ আছে। তারা হচ্ছেন, কবি, প্রেমিক আর বিধবারা।

নাপিত লুৎজ্‌র কথার অর্থ খুঁজে না পেয়ে টাইগার অনন্যোপায় হয়ে রাগে গস্‌ গস্‌ করতে করতে সেলুন থেকে বেরিয়ে আপন মনে হাঁটতে লাগল। ব্যাপারটা এমন দাঁড়াল যে, একটা অভাব বোধ তাকে পেয়ে বসেছে। কিন্তু সেটা যে কি, সে কিছুই বুঝতে না পেরে কথায় কথায় মাথা গরম করে ফেলছে।

টাইগার এবার পরপর দুটো ব্লক পেরিয়ে পুরনো এক শত্রুর মুখোমুখি হল। সে কোন এক কনোভার। টাইগার তার সঙ্গে দ্বৈত-যুদ্ধের পুরনো একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হল।

আকস্মিক ও হিংস্র আক্রমণ ম্যাককুয়ার্ক-এর একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। আর এ গুণের জন্যই তার বরাতে টাইগার খেতাবটা জুটেছিল। তাই তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই সে কনোভারকে হঠাৎ আক্রমণ করে বসল। কনোভারও এত সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। সে-ও অবিশ্বাস্য তৎপরতার সঙ্গে পাল্টা আক্রমণ করতে লাগল। কৌতূহলী পথচারীর ভিড় জমে গেল। তাদের মধ্য থেকেই একজন চিৎকার করে উঠল—বীর যোদ্ধারা, তোমরা শান্ত হও, নিজেরাই দ্বন্দ্ব মিটিয়ে নাও।

পর মুহূর্তেই যোদ্ধা দু'জন লড়াইয়ে ইস্তফা দিয়ে ভিড় ঠেলে দু'দিকে চলে গেল। ছুটতে ছুটতে কিছুটা পথ গিয়ে তারা পথের ধারের বাড়ির খোলা-দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

টাইগার বাড়িটা থেকে বেরিয়ে আবার উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে অন্য আর একটা বড় রাস্তায় গিয়ে পড়ল। এবার সে ছোট একটা পত্রিকার অফিসে ঢুকে গেল। এক যুবতী কাউন্টার থেকে তার দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকাল। টাইগার দু'পা এগিয়ে তার কাউন্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে একটা গানের উল্লেখ করে জানতে চাইল—এই গানটা যে বইতে আছে সেটা পাওয়া যাবে কিনা। আর এও বলল, তার এক বন্ধু পা ভেঙে বিছানায় আশ্রয় করেছে। তারই অনুরোধে সে ছুটে এসেছে।

টাইগার-এর চাহিদা অনুযায়ী যুবতী-বিক্রেতাটি দিতে পারল না।

টাইগার ব্যর্থ মনোরথ হয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এবার সে এনি মারিয়া ডয়েল-এর কড়া নাড়ল।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দরজা খুলে এনি মারিয়া হাসিমুখে তার কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করল।

টাইগার তাকে হলঘরে যেতে বলল, আর এও বলল, সমতলের আবহাওয়া সম্পর্কে তার কাছ থেকে কিছু শুনতে চায়। ব্যাপারটা খোলসা করে বলতে গিয়ে সে বলল—সকাল থেকে দিনভর সবার মুখেই শুনছি, বসন্ত এসে গেছে। বাতাসে নাকি বসন্তের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। তুমিই বল তো, তারা মিথ্যাবাদী, নাকি আমি মিথ্যা কথা বলছি?

এনি মারিয়া চোখ দুটো কপালে তুলে বলল—তোমার মাথা খারাপ হল নাকি! তুমি এটা বলছ কী! আমি তো ভাবছি, বাতাসে ভায়োলেট ফুলে গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। আর রং কেমন সবুজ হয়ে গেছে; দেখতেই তো পারছ। তবে বসন্ত এখনও ঠিক আসে নি, এটা এক বিশেষ ধরনের অনুভূতি ছাড়া কিছু নয়।

আরে আমি তো এ কথাই জানতে চাইছি মারিয়া। আমার মধ্যেও এরকমই একটা অনুভূতির সঞ্চার ঘটেছে। প্রথমে আমার মাথায় আসে নি। সেদিন চতুর্দশ স্ট্রীট দিয়ে হাঁটার সময় আমার মধ্যে অনুভূতিটা জাগে। তখন আমার নিশ্চিত ধারণা হয়েছিল, সেটা আমারই মনের ভুল। কিন্তু কই, আমার নাকে তো ভায়োলেট ফুলের গন্ধ আসে নি। এনি মারিয়া, কেবলমাত্র তোমারই জন্য। বিশ্বাস কর, তোমাকে আমার চাই-ই চাই। শোন, আগামী সোমবারই আমি কাজে যোগ দিচ্ছি। দৈনিক আট ডলার রোজগার করব। ভেবে দেখ, এতে কি আমাদের দু'জনের ভরণপোষণ ভালভাবে চলে যাবে না?

এনি মারিয়া অকস্মাৎ মুখটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে আবেগ ভরে বলে উঠল—তুমি কি বুঝতে পারছ না, পৃথিবী জুড়ে বসন্তের ছোঁয়া লেগেছে?

আর সেদিনটা কিভাবে কেটেছিল আশা করি তুমি ভুলে যাও নি। বসন্তে এ রকম আভাষ সত্ত্বেও বিকালের দিকে বাতাস কেন বরফ-শীতল হয়ে গেল। মার্চেও এক ইঞ্চিও পুরু বরফের আস্তরণ জমে গেল। পঞ্চম এভিনিউতে দেখা গেল মহিলারা লোমের কোট গায়ে জড়িয়ে যাতায়াত করছে।

লুৎজ্ ছ'টার সময় তার সেলুন বন্ধ করতে লাগল। সে দোকান বন্ধ করে পিছন ফিরেই বলে উঠল—আরে টাইগার!

টাইগার বরফ-বৃষ্টির মধ্যে পথে দাঁড়িয়ে। টুপিটাকে মাথার পিছনের দিকে ঠেলে দিয়েছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে একটা চুরুট টানছে।

লুৎজ্ গলা-ছেড়ে বলে উঠল—আরেব্বাস, কী ঝড়-বৃষ্টিরে বাবা! এ যে দেখা যাচ্ছে শীতলকালটা আবার ফিরে এসেছে! ঠাণ্ডায় শরীর অবশ হয়ে আসছে।

মিথ্যাবাদী! তুমি ভয়ানক মিথ্যাবাদী দেখছি! ঘড়ি ঘোষণা করছে, বসন্ত দরজায় কড়া নাড়ছে!

ট্র্যানসিয়েন্টস্ ইন আরকাডিয়া

ব্রডওয়েতে যে এমন সুন্দর একটা হোটেল আছে তার কথা গ্রীষ্ম-আবাসনের উদ্যোগীদের বিন্দু বিসর্গও জানা নেই। সেটা যেমন বড়সড়, ঠিক তেমনই ঠাণ্ডা। সবুজ গাছ-গাছালি সেখানকার বাতাস জোগায়। এলিভেটারের সাহায্যে বা পায়ে হেঁটে যেকোনভাবে ওপরে ওঠা যায়। কোটের গায়ে পিতলের বোতাম লাগানো গাইডরা তো রইলই। আর এমন এক রাঁধুনি রান্নার দায়িত্বে আছে যার রান্নাবান্না বাস্তবিকই অতুলনীয়।

জুলাই মাসে মানহাট্টানের বুকে যে এমন অবিশ্বাস্য এক মরূদ্যান আছে তার খবর শহরের খুব কম লোকেরই জানা আছে। সারা মাস ধরে একটা দৃশ্য দেখা যাবে, হোটেলের জনা কয়েক অতিথি খাবার ঘরে মৃদু গোধূলি আলোর তলায় পা ছড়িয়ে বসে গল্প গুজবে মত্ত। আর খানসামা চারদিকে সজাগ দৃষ্টি মেলে ঘোরাফেরা করছে। মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে না করতেই যার যার চাহিদা অনুযায়ী খাদ্যবস্তু টেবিলে হাজির করছে। সেখানে চিরবসন্ত বিরাজমান। এখানকার শান্তিপ্রিয় সুখী অতিথিরা ব্রডওয়ে থেকে বাতাসবাহিত কোলাহলকে ঝর্ণার কলকল ধ্বনি কল্পনা করে। অপরিচিত কোন পদধ্বনি শোনামাত্র কান সজাগ করে লক্ষ্য করে, তাদের মনে আতঙ্ক জাগে, তাদের নিরালা সুখী জীবন, নিশ্চিন্তে অবসর যাপনের আবাস হোটেলটা বুঝি সে সব সুখ ও শান্তিপ্রিয় মানুষগুলোর নজরে পড়ে যায়, যারা শান্তি ও সুখের খোঁজে পৃথিবীর প্রত্যন্ত কোণে কোণে হন্যে হয়ে চক্কর মারে।

মাত্র জনা কয়েক উদ্যোগী অতিথি এভাবে গ্রীষ্মকালে এ হোটেলটায় আশ্রয় নিয়ে খুবই সতর্কতার সঙ্গে আত্মগোপন করে থাকে আর শৈলশহর ও সমুদ্রের বেলাভূমিতে অবস্থানের যাবতীয় আরাম, আনন্দ ও শান্তি যা বিচিত্র কৌশল আর শিল্পকলার দৌলতে এখানে সব সময়ই ব্যবস্থা রাখা হয়।

যে জুলাই মাসের কথা আলোচনা করা হল এ, সে সময় হোটেলে এমন অতিথির আগমন ঘটল যার নাম শেখা—মাদাম হেলায় ডি' আর্জি বুর্মঁৎ। তার নামটা তালিকাভুক্ত করার জন্য তিনি করণিকের কাছে বেয়ারা মারফৎ সেটা পাঠিয়ে দিলেন।

'হোটেল-লোটাস' মাদাম বুর্মঁৎ-এর মতই অতিথিই সবচেয়ে বেশী পছন্দ করেন।

মাদাম বুর্মঁৎ-এর আচরণে হোটেলের সব কর্মীই যেন তার কেনা গোলাম হয়ে গেল। সে ঘর থেকে ঘণ্টা বাজাতে না বাজাতেই বেল-বয়রা এমনভাবে ছুটতে থাকে যেন তারা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে। স্বত্বের ব্যাপার না থাকলে করণিকরা হয়ত হোটেলটাই তার নামে উইল করে দিতে দ্বিধা করত না। আর অন্য সব অতিথিদের চোখে সে যেন নারীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও রূপ-সৌন্দর্যের অনন্য দৃষ্টান্ত।

এ সম্ভ্রান্ত অতিথিটি সচরাচর হোটেলের বাইরে বেরোয়। তার হাবভাব আর চলাফেরা হোটেলের প্রচলিত নিয়ম কানুনের সঙ্গে হুবহু মিশে গেছে।

মাদাম বুর্মঁৎ হোটেলে যেন একেবারে পাটরানীর মর্যাদা নিয়ে বাস করছে।

তবে রাতের খাবার খাওয়ার সময় মাদাম বুর্মঁৎ-এর উৎকর্ষতা যেন শেষ ধাপে পৌঁছে যায়। সুন্দর একটা গাউন গায়ে দেন, যার নাম পর্যন্ত কেউ শোনেনি। সেটা এক ঝলক দেখলেই যে কারো প্যারিসের কথা মনের কোণে উঁকি দেবে, রহস্যময়ী কোন কাউন্টেসের ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠতে পারে, ভার্সাইকে মনে পড়ে যাওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। আবার মিসেস ফিস্কে বা সরু ও তীক্ষ্ণ ফলা তরবারির কথাও মনের কোণে উঁকি দিতে পারে। ধরতে গেলে এক রকম হঠাৎই গুজবটা হোটেলের অতিথিদের কাছে ছড়িয়ে পড়ল যে, মাদাম বুর্মঁৎ সংস্কারমুক্ত বিশ্বমানবী। আর যেসব জাতি রাশিয়ার ছত্রছায়ায় আছে তাদের সবাইকেই নাকি তিনি পুতুলের মতই নাচিয়ে বেড়ান। পৃথিবী সর্বত্রই তার অবাধ নাগরিকত্ব। অতএব গ্রীষ্মের অসহ্য গরমের হাত থেকে রক্ষা পেতে, অবসর যাপন করতে তিনি যে হোটেল লোটাসকেই নির্বাচন করবেন এতে অবাক হবার কোন কারণই থাকতে পারে না।

মাদাম বুর্মঁৎ 'হোটেল লোটাস'-এ আসার পর তৃতীয় দিন এক যুবক হোটেলটায় এল।

করণিকের কাছে নিজের নাম নথিভুক্ত করল। তার চেহারা ছবি মোটামুটি ভালই বলা চলে। পোশাক পরিচ্ছদেও ভদ্র রুচির ছাপ মেলে। আর চাল চলনেও বিশ্বমানবতার আঁচ পাওয়া যায়। তার তিন-চার দিন হোটেলে থাকার ইচ্ছা। করণিকের কাছে খোঁজ নিল ইউরোপগামী যাত্রী স্টিমার কবে ছাড়বে। করণিকের কাছে সে যে নামটা নথিভুক্ত করাল, তা হচ্ছে হ্যারল্ড ক্যাবিংটন। এতে তার ওপর কোনরকম সন্দেহের উদ্রেক হতেই পারে না। আর হোটেলটার শান্ত-জীবনের সঙ্গে সে এমনভাবে মিশে গেল যে, সেখানকার শান্তিপ্রিয় অতিথিদের মনে কোনরকম আতঙ্ক বা আশঙ্কা জাগল না, জাগার কথাও না।

হেরল্ড হোটেলে আসার পরদিন রাতের খাবার খেয়ে উঠে যাবার সময় মাদাম তার রুমালটা ফেলে গেলেন। হেরল্ড-এর চোখে পড়ায় সে সেটা তুলে দৌড়ে গিয়ে তার হাতে দিয়ে এল। কিন্তু তার মধ্যে মাদাম-এর পরিচয় জানার কোন রকম উৎসাহ বা উচ্ছ্বাস লক্ষিত হল না।

এমনও হতে পারে শান্তির আগার এমন গ্রীষ্ম-আবাসনের সর্বোত্তম হোটেলটায় মাথা গোঁজার সুযোগ পাওয়ার জন্য তারা ভেতরে ভেতরে একে অন্যের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করে থাকবে। এবার থেকে যাতায়াতের পথে উভয়ের মধ্যে ভদ্রতাসূচক কথাবার্তা শুরু হল। আবার আবাসনটার বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশের জন্যই তাদের উভয়ের মনে পরিচয় স্থাপনের ক্ষীণ ইচ্ছা জাগল, আর তা ক্রমে বৃদ্ধি পেতে লাগল। বারান্দাটার শেষ প্রান্তে মাত্র মিনিট কয়েকের জন্য তারা হঠাৎ মুখোমুখি হল। ব্যস, উভয়ের মুখ দিয়ে কথার ফুলঝুরি ফুটতে লাগল।

ঠোঁটের কোণে মিষ্টি হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে মাদাম বুমঁৎ বলল—দেখুন, পুরনো আবাসে দীর্ঘদিন থাকার ফলে মানুষ হাপিয়ে ওঠে। যারা একটু নিরিবিলি, শান্তি আর স্বস্তির প্রত্যাশায় পাহাড় বা সমুদ্র সৈকতে ছুটে যায় ও দুটোর সৃষ্টিকর্তাও যদি আমাদের সঙ্গ নেন তবে ফয়দা কি, বলুন তো ?

হ্যারল্ড চাপা দীর্ঘশ্বাস বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে বলল—সমুদ্রসৈকতেও অমার্জিত রুচিসম্পন্ন ফিলিস্তিনিরা আপনার সঙ্গে সঙ্গে ছুটবে। স্টিমারগুলোর পরিবেশও আজকাল জঘন্য হয়ে যাচ্ছে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি গ্রীষ্মকালের ভ্রমণপিপাসুরা যেন শান্তি ও স্বস্তির নীড় 'হোটেল লোটাস'-এর খোঁজ পেয়ে ধাওয়া না করে।

মুচকি হেসে মাদাম বুমঁৎ বলল, একটা সপ্তাহ হয়ত আমাদের শান্ত নিরিবিলি ডেরাটায় হয়ত হামলা হুজ্জতি ঘটবে না, এটা আমার বিশ্বাস। আর যদি তারা হুড়মুড় করে এখানে এসে হামলা জুড়ে দেয় তবে কোথায় গিয়ে শান্তিতে থাকতে পারব মাথায় আসছে না। গ্রীষ্মকালে মাথা গোঁজার মত এমন আর একটি নিরিবিলি ও আনন্দের আগারের খোঁজ অবশ্য আমার জানা আছে—সেটা হচ্ছে কাউন্ট পোলিন্‌স্কি'র দুর্গ। উরাল পর্বতমালার গায়ে সেটা অবস্থিত।

হ্যারল্ড বলল, হতে পারে। তবে আমি শুনেছি, 'কানেস' আর 'বাডেন বার্গেন' নাকি গ্রীষ্মে মোটামুটি ফাঁকাই থাকে। বছরের পর বছর ধরে পুরনো গ্রীষ্মাবাসগুলো সুনাম হারাচ্ছে। আমাদের মত বহু পর্যটকই হয়ত এরকম শান্ত-সুন্দর নিরিবিলি পরিবেশ খুঁজে আবিষ্কার করছে যেখানে দলে দলে লোক গিয়ে ভিড় জমায় না।

দেখুন, আমি মনস্থির করে ফেলেছি, নিরিবিলি এই চমৎকার হোটেলটায় আর তিনটে দিন কাটিয়ে যাব। প্রতি সোমবার এখান থেকে 'সেড্রিক' জাহাজ ছাড়ে। সেটা ধরব ভাবছি।

সোমবার আমিও চলে যাব। তবে বিদেশে অবশ্যই যাব না।

একটা কথা কি জানেন। হোটেলটার পরিবেশ যত নিরিবিলি ও মনোরম আর মনোলোভাই হোক না কেন চিরকাল তো আর কেউ এখানে পড়ে থাকবে না, কি বলেন? এক হপ্তারও বেশী হল আমার গ্রামের বাড়িটা তৈরী হয়ে খালি পড়ে আছে। তবে একটা কথা কি জানেন, 'হোটেল লোটাস'-এর কথা কোনদিনই মন থেকে মুছে ফেলতে পারব না।

আমার দ্বারাও সম্ভব হবে না। তবে সেড্রিককেও কোনদিন আমার পক্ষে ক্ষমা করা সম্ভব হবে না।

তৃতীয় দিনের পরের রবিবার তারা উভয়ে বারান্দার সে নিরিবিলি কোণাটায় টেবিলে মুখোমুখি বসল। অন্য-দিনের মতই মাদাম সান্ধ্য পোষাক গায়ে জড়িয়ে নিয়েছে। তার চোখে মুখে জমাটবাঁধা

চিন্তার ছাপ। সামনেই শেকল লাগানো একটা বটুয়া পড়ে আছে। তাতে টাকাকড়ি থাকে। বটুয়াটার মুখ খুলে একটা ডলারের বিল বের করতে করতে মুচকি হেসে বলল, মঁসিয়ে, ফ্যারিংটন, আপনাকে কিছু বলার দরকার বোধ করায় মুখ খুলতেই হল। সকালে প্রাতঃরাশের আগেই আমাকে নিজের কাজে চলে যেতে হবে। তাই কাল খুব ভোরে হোটেল ছেড়ে চলে যাচ্ছি। ক্যাসি-র 'ম্যামথ স্টোরে'-এর হোসিয়ারী কাউন্টারের দিকে আমার বসার জায়গা। আগামীকাল আমার ছুটি ফুরিয়ে যাবে। আগামী হপ্তায় বেতন হাতে না পাওয়া অবধি এ ডলারের নোটটাই আমার একমাত্র সম্বল। আপনাকে দেখে, আলাপ করে একজন যথার্থ ভদ্রলোক ভেবেছি বলেই কথাটা বলে যাওয়ার দরকার বোধ করলাম।

পুরো একটা বছর ধরে আমি বেতনের টাকা থেকে কিছু কিছু জমিয়েছি ছুটিতে বেড়াতে বেরনোর জন্য। আর যদি এরকম ছুটি হাতে না আসে তাই একটা হপ্তা সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলার মতই কাটাতে আগ্রহী হয়েছিলাম। চেয়েছিলাম, সাতটায় বিছানা ছাড়ব, বিকেলে বেড়াতে বেরবো, ঘণ্টা বাজিয়ে হোটেল বয়দের ডাকব, চুটিয়ে পরিচারকদের সেবা ভোগ করব। তা আমি ইচ্ছানুযায়ী করেছিও। জীবনের সবচেয়ে যে আরাম-আয়েশ-সুখের বাঞ্ছা করেছিলাম, মনভরে সবই পেয়েছি। আমার স্বপ্ন বাস্তবতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এবার আমি কাজে যোগদান করতে চললাম। পুরো একটা বছর আমার কাজ আর ছোট্ট মাথা গোঁজার জায়গাটা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। মিঃ হ্যারল্ড ফ্যারিংটন, কথাগুলো আপনাকে বলার জন্য মনের দিক থেকে বড্ড তাগিদ অনুভব করছিলাম। কারণ ভেতর থেকে অনুভব করছি, আপনাকে আমার মনে ধরেছে। তা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত আপনার সঙ্গে প্রবঞ্চনা না করে আমার উপায় ছিল না। কারণ, সত্যি করে বলতে কি এসব আমার কাছে রূপকথার গল্পের মতই ব্যাপার। তাই আমি মুখে ইউরোপের কথা আপনার কাছে বলেছি, আর অন্য সব দেশের কথা যা বলেছি সবই বইয়ের পাতা পড়ে, তা-ও স্বীকার করে নিয়েছি। কারণ? আপনি যাতে আমাকে এক বিদূষী ও রুচিশীলা মহিলা জ্ঞান করেন।

আমার গায়ে যে পোশাকটা দেখছেন, আমার একমাত্র সম্বল। অর্থাৎ গায়ে দিয়ে লোকসমাজে বেরনো ও লজ্জা নিবারণের মত এ পোশাকটাই আমার আছে। তা-ও এটা কিস্তিতে দাম মিটিয়ে দেওয়ার শর্তে কিনেছি। এর জন্য পঁচাত্তর ডলার দাম দিতে হয়েছে। দশ ডলার নগদ দিয়েছিলাম আর বাকিটা হপ্তায় এক ডলার করে শোধ দেব, শর্ত ছিল। ব্যস, আপনাকে এটুকুই আমার বলার ছিল। আরে, বড্ড ভুল হয়ে গেছে, আরও একটু বাকি আছে। আমার নামটাই তো আপনাকে বলা হল না।

মেমি সিডিটার আমার নাম। মাদাম বুমঁৎ নামটা আসল নাম নয়, এখানে এটা ব্যবহার করেছি। আমার প্রতি আপনি যে আকৃষ্ট হয়েছেন তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ না জানালে নিজেকে অকৃতজ্ঞ মনে হবে। আগামীকাল সকালে জমার যে কিস্তি দিতে হবে তার জন্য এ ডলারটা অবশিষ্ট আছে। এবার আমি নিজের কামরায় ফিরে যেতে পারি, কি বলেন?

হ্যারল্ড সোৎসাহে হোটেল লোটাস-এর সবচেয়ে মনমোহিনী নারীর মনের কথাগুলো শুনল। সে কথা শেষ করে নিজের ঘরে যাবার উদ্যোগ নেওয়ার আগেই হ্যারল্ড কোটের পকেট থেকে একটা চেক বই বের করে তার একটা পাতায় খসখস করে কি যেন লিখে মেমি সিডিটার-এর হাতে গুঁজে দিয়ে ডলারটা নিতে গিয়ে বলল, দেখুন, আমাকেও আজ সকালেই কাজে যোগদান করতে হবে। তাই ভাবছি কি, আমার কথাটাও বলে নেওয়া দরকার বোধ করছি। ডলার কিস্তির রসিদ এখানে থাকল। আমি তিন বছর যাবৎ আপনার ওই পোশাকের দোকান, মানে ও ডাউড অ্যান্ড লিভনস্কি নামক দোকানটার যাবতীয় কিস্তির অর্থ আদায় করে বেড়াই। একটা ব্যাপারে খুবই অবাক হচ্ছি যে, একই চিন্তা ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ছুটি কাটাতে এখানে, একই জায়গায় এসে হাজির হয়েছি। আমি শহরের সবচেয়ে ভাল হোটেলে ছুটিটা কাটাতে আগ্রহী। তাই তো আমার লব্ধ অর্থ থেকে শতকরা কুড়িটা করে ডলার জমাতে থাকি। এবারও একইভাবে ডলার জমিয়ে রেখেছিলাম। কিছু যদি মনে না করেন একটা কথা বলি, শনিবার রাত্রে কোটে কনিতে আমাদের জলবিহারের যে কথা আছে সে ব্যাপারে আপনার মতটা যদি বলেন খুশি হতাম। মেমি সিডিটার, নকল মাদাম বুমঁৎ যেন খুশিতে রীতিমত ডগমগ হয়ে গিয়ে বলে উঠল, উফ্! মিঃ হ্যারল্ড ফ্যারিংটন, আমি

সে ব্যাপারে অত্যুৎসাহী। যাব, অবশ্যই যাব। সপ্তাহটা কোনিতে ভিড়ভাট্টার মধ্যে কাটাতে হলেও কোনি যে আমাদের মন-প্রাণ অনাবিল আনন্দে ভরপুর করে তুলবে, তাতে কিছুমাত্রও সন্দেহ নেই।

হ্যারল্ড এলিভেটরের দরজা থেকে বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হল। আর মেমি সিড়িটার শেষবারের জন্য এলিভেটরের দিকে এগিয়ে গেল। খাঁচাটায় পা দেবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে হ্যারল্ড বলল, মাদাম হ্যারল্ড ফ্যারিংটন নামটা কিন্তু মন থেকে ঝেড়ে মুছে ফেলবেন। এটা আমার আসল নাম নয়, ছদ্মনাম। আমার আসল নাম জ্যাম্ ম্যাকমেনার্স। কারো কাছে আমি 'জিমি' বলেও পরিচিত বুঝলেন।

এক্সট্রাডিটেড ফ্রম বোহেমিয়া

হার্মোনি গ্রামটা সবুজ বনানীতে ঢাকা পর্বতশ্রেণীর পাদদেশে এক মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত। সে গ্রামের মেয়ে মিস মেডোরা। সে তার গ্রামের বাড়ি থেকে রঙের টিনের বাক্স আর ইজেল নিয়ে নিউইয়র্কে পৌঁছাল।

মিস মেডোরার রূপ সৌন্দর্যের সঙ্গে একমাত্র শিশিরে-ভেজা গোলাপ ফুলের তুলনা করা চলে। সে যখন চিত্র শিল্প শিক্ষা করতে যায় তখন হার্মোনি গ্রামের ছেলে বুড়ো সবাই মন্তব্য করেছিল, মেয়েটার নির্ঘাৎ মাথার দোষ দেখা দিয়েছে। মাথা গরম না হলে কেউ এমন কাজ করে।

নিউইয়র্ক শহরে এসে সে 'ওয়েস্ট সাইড'-এর বোর্ডিং-এর টেবিলে চেয়ার নিয়ে বসে, তখন অন্য বোর্ডাররা বলাবলি করল এ রূপসী কুমারী মেয়েটা কে? কোত্থেকেই বা এখানে এসেছে?

মেডোরা মনে সাহস সঞ্চয় করে অল্প ভাড়ার বিনিময়ে শোবার ঘর নিল। সপ্তাহে দু'দিন কলাবিদ্যা অনুশীলন করার জন্য অবসরপ্রাপ্ত ক্ষৌরকর্মী অধ্যাপিকা এঞ্জেলিনি-র সঙ্গে দেখা করে ব্যবস্থা পাকা করে ফেলল। কথা হল সপ্তাহে দু'দিন তাকে অনুশীলনের জন্য তার কাছে যেতে হবে। অধ্যাপিকা নিজে হারলেম নৃত্য শিক্ষালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

এত বড় একটা শহরে মিস মেডোরা'কে দেখাশোনা করার কেউ ছিল না। এখানে সবাই সবাইকে দেখে, পথ নির্দেশ করে। এখান থেকে কলাবিদ্যা পাঠ নেওয়ার কাজ শেষ করে কেউ কেউ নিজের গ্রামে ফিরে গিয়ে সবার মুখ-ঝামটা চোখ কান বন্ধ করে সহ্য করে। আবার অনেকেই নোনা-ধরা বাড়িতেই থেকে যায় আর তার ছুঁড়ে-দেওয়া রুটির টুকরো দিয়ে পেটটাকে সান্ত্বনা দেয়। আবার কেউ বা দিনের পর দিন ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়ে ক্লান্ত হয়ে ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দেয়। তখন তাদের সামনে দুটোমাত্র পথই খোলা থাকে। মুদির মালগাড়ির চালকের একটা চাকরি জোগাড় হয়েও যেতে পারে, নইলে বোহেমিয়ার ঘূর্ণিপাকের মধ্যে পড়ে অতলে তলিয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়। পরেরটা শ্রুতিমধুর হলেও আসলে কিন্তু প্রথমটাই ভাল, মেনে নেওয়ার মত।

মিস মেডোরা ঘূর্ণিপাককেই বেছে নিল। ব্যস, এতেই ছোট একটা গল্প আমরা পেতে পারলাম।

তার আঁকা স্কেচগুলো অধ্যাপিকা এঞ্জেলিনি কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত হতে লাগল। একদিন পার্কের বাদাম গাছটার ছায়ায় দাঁড়িয়ে সে একটা স্কেচ করলে সেটা দেখে তিনি বললেন, মেয়েটা একদিন দ্বিতীয় রোজা বনহুর হয়ে উঠবে। কিন্তু নামজাদা শিল্পীর মেজাজ দেখাতে গিয়ে কখনও বা নিষ্ঠুর কথা বলতেও ছাড়েন না। যেমন ধরা যাক একদিনের কথা, যেদিন মেডোরা কলম্বাস মার্কল-এর মূর্তি এবং ভাস্কর্যের স্কেচ করতে করতে পুরো একটা বিকাল কাটিয়ে দিল। স্কেচটা নিয়ে অধ্যাপিকার সামনে হাজির হতেই তিনি ঠোঁট বাঁকিয়ে বিতৃষ্ণার সঙ্গে স্কেচটাকে পাশে ঠেলে দিয়ে বলে উঠলেন, গিয়েত্তো একবার একটামাত্র টানেই সম্পূর্ণ একটা সার্কল এঁকে ফেলেছিল। আর তুমি কিনা এটা নিয়ে সারাটা বিকেল কাটিয়ে এলে। একদিন মুষলধারে বৃষ্টি হল। হার্মোনি গ্রাম থেকে মেডোরা তার সাপ্তাহিক টাকা আসার সময় চলে গেল। অধ্যাপিকা আবার তার কাছ থেকে দু'ডলার ধার করার জন্য উসখুস করলেন। এদিকে তার ছবি যিনি বিক্রি করেন তিনি জল-রঙের সবগুলো ছবি ফেরৎ দিয়ে গেলেন। তাছাড়া মিঃ বিংক্‌লি রাতের খাবার জন্য তাকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিল।

মিঃ বিংকলি বোর্ডিং-এর একজন স্ফূর্তিবাজ লোক। ঊনপঞ্চাশ বছর বয়স। শহরের সেন্ট্রাল

মার্কেটে মাছের কারবার করে। ছটার পর ভাল জামা-প্যান্ট, সান্ধ্য পোশাক গায়ে চাপিয়ে সে একেবারে পয়লা নম্বরের বাবু সেজে গেল। যুবকটা বলল, সে একজন ভারতীয়, বোহেমিয়ার ওপর মহলে তার নিয়মিত যাতায়াত আছে। 'পাক'-এ একবার এক যুবকের ছবি ছাপা হয় আর সে যে তাকে দশটা ডলার ধারস্বরূপ দিয়ে ছিল সেটা কারো অজানা ছিল না।

রাত্রি ন'টায় মেডোরা যখন সেজেগুজে মিঃ বিংকলি-র সঙ্গে বোর্ডিং ছেড়ে বেরিয়ে যায় তা দেখে অন্য বোর্ডাররা ভেতরে ভেতরে জ্বলেপুড়ে মরল। তাকে দেখাচ্ছিলও চমৎকার—মনোলোভা। আবার প্রায় পঞ্চাশ বছরের বিংকলিকেও পোশাক-আশাকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। পিছন থেকে তাকে দেখে মনে হচ্ছিল ঠিক যেন একজন উপন্যাস লেখক।

তারা ভাড়া করা একটা গাড়িতে চেপে কাফে টেরেঞ্চ-এ গেল। এটা ব্রডওয়ের সবচেয়ে নামকরা—চটকদার কাফে। সেটা যে শহরের অসামাজিক কাজকর্মের বহু প্রচলিত ও সর্বজনপ্রিয় একমাত্র বোহেমীয় আবাসন ; সবারই তা জানা আছে।

পার্বত্য অঞ্চলের মেয়ে মেডোরা তাব সহযাত্রী মিঃ বিংক্‌লি-র পিছন পিছন কাফের ছোট ছোট টেবিলগুলোর ফাঁক দিয়ে এগোতে লাগল। একটা মেয়ে মেঝের ওপর দিয়ে তিন-তিনবার হাঁটতে পারে—একবার যখন সে পূজার বেদির দিকে অগ্রসর হয়, আর একবার কোন বোহেমীয় হলে ঢোকা'-র সময় আর শেষবার তার প্রতিবেশীর মরা মুরগিটাকে হাতে করে প্রথম বাগানের ভিতর দিয়ে ফিরে যাবার সময়।

টেবিলে অবস্থানরত বোহেমীয় চাকচিক্যে ভরপুর এক যুবকের দিকে মিঃ বিংক্‌লি-র নজর গেল। যুবকটা তাকে দেখেই গলা ছেড়ে বলে উঠল—আরে, ষাট বছরের যুবক বিংক্ যে! অন্য কেউ সঙ্গে না থাকলে আমাদের টেবিলেই চলে এসো।

মাছের কারবারী বিংক্‌লি তার কথা জবাব দিতে গিয়ে বলল, তোমার তো আর অজানা নয় যে, ললিত কলার সঙ্গে লড়াই করার প্রবণতা আমার বড্ড বেশী। মিঃ ম্যাডার, মিঃ ভ্যান্‌ডাইক আর মিস মার্টিন, আর ইনিও একজন নামকরা কলাবিদ। আর মিস টয়নেট ও এলিস, কথাটা শেষ না করেই সে একটা খালি টেবিল খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

মিস টয়নেট ও মিস এলিট উভয়েই মডেল। তারা এ প্রসঙ্গেই আলাপ, আলোচনায় ব্যস্ত।

মেডোরা একটা খালি টেবিলে একাই বসে থাকল। পিছনের ভূ-গর্ভের হলঘর থেকে উন্মাদনায় ভরপুর বাজনার সুর ভেসে আসতে লাগল। মন-মাতানো বাজনার সুর শুনে মেডোরা-র মনে দোলা লাগল। এটা এমন এক জগৎ যেখানে এর আগে কল্পনায়ও সে আসতে পারে নি। তবু একাই চেয়ারটা আঁকড়েই সে বসে রইল। বোহেমিয়া সবগুলো টেবিল দখল করে রেখেছে। চারদিক থেকে ভেসে আসতে লাগল হাসিঠাট্টা, মদের গ্লাসে ঠক্‌ঠকানির, প্রশ্ন ও তর্কের গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

একটু পরেই হাতের গ্লাসটা সশব্দে টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে ভ্যানডাইক ম্যাডার-এর কাঁধে এলিয়ে পড়ল। তার কানের কাছে মুখ নিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে বলতে লাগল, ম্যাডি, মাঝে-মধ্যে আমি কি ভাবি জান? ভাবি, এ ফিলিস্টিনকে তার প্রাপ্য দশ ডলার শোধ করে দিয়ে তার কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেই।

মেডোর বলল, ভ্যান্ডি, এরকম কথা ভুলেও ভেবো না। আমরা মাত্র দু'-চারদিনের অতিথি। আর কলা কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী, দীর্ঘদিন তোমার মধ্যে থেকে যাবে।

মেডোরা অদ্ভুত সব খাবারে উদর পূর্তি করে তারিয়ে তারিয়ে এস্তারবেরি মদ গিলতে থাকল। দু-চার ঢোক মদ পেটে যেতেই তার মনের কোণে জেগে উঠতে লাগল সবুজে ঢাকা পর্বতশ্রেণী আর পশু-পাখিদের ছবি। এক সময় হাসতে হাসতে মিস এলিস'কে লক্ষ্য করে বলল, জান, আমি আমার গ্রামের বাড়িতে থাকলে সুন্দর একটা বাছুর তোমাকে দেখাতে পারতাম। সত্যি খুবই সুন্দর একটা বাছুর।

রাত্রি এগারটায় মিঃ বিংক্‌লি মেডোরাকে সঙ্গে করে বোর্ডিং-এ ফিরল। হলঘরের সিঁড়ির মুখে তাকে শুভরাত্রি জানাল। মেডোরা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে গিয়ে নিজের কামরায় ঢুকল। গ্যাসটা জ্বালতেই সে যেন কেমন আঁৎকে উঠল। জলের তামার কলসির ভেতর থেকে ধোঁয়ার রূপ নিয়ে এক অতিকায় দৈত্য যেমন হঠাৎ বেরিয়ে এসেছিল—ঠিক তেমনই বুঝি হঠাৎ সে কামরাটায়

ইংল্যান্ডের মূর্তিমান আত্মপ্রকাশ করল। মেডোরা যে ভয়ঙ্কর কাজটা করে ফেলেছে তার পূর্ণ স্বরূপ যেন তার সামনে প্রকাশ পেয়ে গেল। সে তো পাপের পাঁকে বসে কাটিয়ে এসেছে আর রক্তের মত টকটকে লাল লাল মদে সে ডুবে গিয়েছিল।

বিছানায় শুয়ে সে অস্থিরভাবে বার বার এপাশ-ওপাশ করে মাঝরাত্রি পর্যন্ত কাটাল। শেষ পর্যন্ত এক লাফে বিছানার ওপর বসে পড়ল। কাগজ-কলম নিয়ে একটা চিঠি লিখে ফেলল। চিঠিটা লিখল, মিঃ বেরিয়া হস্কিন্স, হার্মোনি, ডেরসঁৎ সম্বোধন করে। চিঠির বক্তব্য, এবার থেকে সে যেন তাকে মৃত জ্ঞান করে। আসলে সে তাকে বড্ড বেশী ভালবেসে ফেলেছে। তাই নিজের অপরাধী এবং পাপ কলঙ্কিত জীবনের সঙ্গে তাকে জড়িয়ে ফেলে সে তার জীবনটাকে বরবাদ করে দেওয়ার ইচ্ছা তার তিলমাত্রও নেই। নোংরা এ পৃথিবীর অভদ্রজনোচিত প্রবঞ্চনার পাঁকে সে আকণ্ঠ ডুবে গেছে। বোহেমিয়ার ঘূর্ণিপাকে একেবারে রসাতলে গেছে। এমন কোন অসামাজিক ও অধর্মের কাজ নেই যা সে করেনি। এটা তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আর এর বিরুদ্ধে যাওয়া তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। গলা পর্যন্ত পাঁকে সে তলিয়ে গেছে, সেখান থেকে উঠে আসা তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। অতএব সে যেন তাকে মন থেকে মুছে ফেলতে চেষ্টা করে। ভয়ঙ্কর বোহেমিয়ার সুন্দর অথচ পাশবিক চক্করে পড়ে সে চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেছে। সবশেষে 'বিদায়' দিয়ে চিঠিটা শেষ করল। আর নিজের নাম স্বাক্ষর করতে গিয়ে লিখল—তারই এক সময়ের মেডোরা।

মেডোরা পরদিনই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল। স্বর্গচ্যুত হবার পর বীল্‌জেবাও হয়ত বা এমন হতাশায় জর্জরিত হয় নি।

এক সন্ধ্যায় মিঃ বিংকলি তাকে নিজের ভয়ঙ্কর গুহার ভেতরে নিয়ে হাজির করল।

এখন এ মুহূর্তে তার একমাত্র সম্বল একটা সংশোধনের বাইরে ভুলেভরা জীবন। ভারসঁৎ ফুলের মত সচিত্র। তার কাছে আর কোনদিনই সে ফিরে যেতে পারবে না—একেবারেই অসম্ভব, তবে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কিছুতেই নিজেকে পাঁকে তলিয়ে যেতে দেবে না, কোন পরিস্থিতিতেই নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন বহু মহান ব্যক্তিত্বের উল্লেখ রয়েছে যাদের আদর্শে সে নিজের উদ্ধার মত জীবন তৈরী করবে—যেমন ক্যামিলে জাজা, বয়েল মেরি আর লোলা মন্তেজ। একদিন তাদের নামের তালিকায় মেডোরা মার্টিন-এর নামটাও স্থান পাবে।

মেডোরা দু-দুটো দিন ঘরের কোণেই নিজেকে আবদ্ধ রাখল। এক মিনিটের জন্যও ঘর ছেড়ে বেরোয় নি। একদিন নিউইয়র্ক থেকে যে দামী দামী তৈলচিত্র আঁকার অর্ডার আসত আজ সেরকম কথা সে ভুলেও মনে স্থান দিতে পারে না। ভয়ঙ্কর একটা পদক্ষেপ তার সে জীবন ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলেছে।

তিনদিন পেরিয়ে চতুর্থ দিন পড়লে মেডোরা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চিরুনি, পাউডার আর রুজ প্রভৃতি দিয়ে নিজেকে সুন্দর করে সাজিয়ে তুলল। 'জাজা'-তে সে একবার কার্টারকে দেখেছিল। আয়নার সামনে সে হঠাৎ উন্মাদের মত চিল্লিয়ে উঠল, 'জাট! জাট! তার সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে বলে উঠল 'নাট'। বে-আইনী শব্দটা সে উচ্চারণ করা মাত্র পাহাড়ে ঘেরা, সবুজে ঢাকা হার্মোনি গ্রামটা মন থেকে নিঃশেষে মুছে গেল। ঘূর্ণিপাক তাকে পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলল। চিরদিনই সে বোহেমিয়ার মানুষদের দলভুক্ত। বেরিয়া আর কোনদিনই।—

ব্যস, ঠিক সে মুহূর্তেই দরজাটা দুম্ করে খুলে গেল। বেরিয়া ঘরে ঢুকে গেল। সে বলল, এ কী করেছ ডোরি! তুমি মুখে এত খড়ি আর রং মেখেছ কেন, বল তো?

মেডোরা হাত বাড়িয়ে দিল। গম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারণ করল, কিন্তু অনেক দেরি করে ফেলেছ। অনেক দেরি—এদিকে যে পাশার দান ফেলা হয়ে গেছে। সময় বা সুযোগ কোনটাই আজ আর নেই। আজ আমি সম্পূর্ণ অন্য এক জগতের মানুষ। তোমার মন চাইলে আমাকে অভিসম্পাত দিতে পার। সে অধিকার তোমার অবশ্যই আছে, স্বীকার করছি। আজ আর নয়—চলে যাও। আর আমাকে আমার নিজের পথেই চলতে দাও। বাড়ি গিয়ে সবাইকে বলে দিও তারা যেন কোনদিন ভুলেও আমার নাম মুখে না আনে। একটা কথা শোন বেরিয়া, আমি যখন বোহেমিয়ার আনন্দের জোয়ারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে পড়ব তখন যদি পার, যদি মন চায় তবে আমার জন্য পরম পিতার কাছে প্রার্থনা কোরো, করবে তো?

বেরিয়া তার কথার কোন জবাব না দিয়ে বলল, ডোরি, তোয়ালে দিয়ে মুখের রং কালিঝুলি মুছে ফেল। তোমার চিঠি হাতে পাওয়ামাত্র আমি ব্যস্ত হয়ে চলে এসেছি। তোমার ছবিটবিগুলোর অর্থ বা মূল্য কোনটাই নেই। শোন, আমি ফিরে যাওয়ার টিকিট কেটে নিয়ে এসেছি। ঝটপট জিনিসপত্র বাক্স গোছগাছ করে তৈরী হয়ে নাও।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মেডোরা বলল, বেরিয়া, অদৃষ্ট আমার প্রতিকুল হয়ে পড়েছিল। প্রতিকুল অদৃষ্টের সঙ্গে শক্তিটুকু আমার মধ্যে থাকতে থাকতে তুমি এখান থেকে সরে পড়।

বেরিয়া তার কথায় কান না দিয়ে ব্যস্ত হাতে মেডোরা-র জিনিসপত্র গোছগাছ করতে করতে বলল, তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও। আমি তোমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছি। নতুন পাতায় মেপল গাছগুলো ছেয়ে গেছে, তা যে তোমাকে দেখতেই হবে ডোরা।

উফ্! বেরিয়া, এত শীঘ্র তা সম্ভব নয়।

জান ডোরা, কচি পাতার ওপর সূর্যের আলো পড়লে কী অপূর্ব শোভা যে ধারণ করে তা তোমাকে ভাষায় বুঝিয়ে বলতে পারব না ডোরা!

চলন্ত ট্রেনে বসে মেডোরা ঘাড় ঘুরিয়ে বেরিয়া-র মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, বেরিয়া, আমার ওই চিঠিটা পাবার পরও তুমি আমার কাছে এসেছ দেখে আমি যারপরনাই অবাক।

তাকে থামিয়ে দিয়ে বেরিয়া বলে উঠল, উফ্! সেই থেকে অনবরত অবান্তর কথা বলে চলেছ! তোমার চিঠির বক্তব্য ছিল, তুমি কোন এক বোহেমিয়াদের দেশে যেকোন ভাবেই হোক চলে গিয়েছিলে। কিন্তু সেটা কি করে সম্ভব, কি করেই বা বিশ্বাস করা যাবে। কারণ, তোমার চিঠির ওপরে যে নিউইয়র্কের ডাকঘরের সিলমোহর ছিল।

দ্য ক্যারিয়ন কল

পুলিশ দপ্তরের নথিপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করলেই এ গল্পটার অর্ধেক অংশের সন্ধান পাওয়া যাবে। আর বাকি অর্ধাংশ চাপা পড়ে আছে খবরের কাগজের দপ্তরে।

একটা চোরের হাতে ধনকুবের নরক্রস তার নিজের ফ্ল্যাটে খুন হবার পর খুনী চোরটা ব্রডওয়ে দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে চলার সময় হঠাৎ অভাবিত ভাবে রহস্যভেদী বার্নে উডস্-এর সঙ্গে তার মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল।

গত বছর পাঁচেক ধরে গোয়েন্দা উডস্'কে মাঝে মধ্যেই দিনের আলোয় ঘোরাফেরা করতে দেখা যাচ্ছে। খুনী চোরটাকে দেখেই সে বলে উঠল, 'জনি কার্নান যে, ঠিক ধরিনি?

হ্যাঁ, অনুমান অভ্রান্তই বটে। তুমি তো এক সময় পুরনো সেন্ট জো-তেই বাস করতে তাই না? কিন্তু পূর্বাঞ্চলে যে, কোন জরুরী দরকারে বুঝি তো।

তুমি হয়ত জান না, আমি কয়েক বছর ধরে নিউইয়র্ক শহরের গোয়েন্দা বিভাগের কাজে যোগ দিয়েছি। সেই থেকে আমি এখানেই আছি।

কথা বলতে বলতে গোয়েন্দা বার্নে উডস তাকে নিয়ে পথের ধারের মূলার-এর কাফেতে ঢুকল।

কাফেটা তখন খদ্দেরদের ভিড়ে জমজমাট। কার্নান তখন পোশাক-আশাকে রীতিমত কেতা দুরস্ত। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে হাঁটে, বসেও সামান্য ঝুঁকে। আর আত্মবিশ্বাসে ভরপুর এক যুবক। চোখ দু'টো সামান্য ট্যারা, মুখে ছাই রঙের এক জোড়া চওড়া গোঁফ। নতুন রহস্যভেদীর মুখোমুখি একটা চেয়ারে সে বসল।

চেয়ার টেনে বসতে বসতে উড্স বলল জনি, এখন করছ কি? আমি সেন্ট জো থেকে চলে আসার এক বছর আগেই তো সেখান থেকে তুমি চলে আস। এখানে কাম কাজ কি করছ, বল তো?

তামার খনির শেয়ার বিক্রির কাজ করে রুটির জোগাড় করছি, ব্যস। চেষ্টা করছি এখানে যদি একটা ঘর ভাড়া করে অফিস করা যায়। চমৎকার বার্নে, তুমি তবে এখন নিউইয়র্কের একজন গোয়েন্দা, রহস্য ভেদ করে চলেছ। তবে গোড়া থেকেই তো এরকম কাজকর্মের প্রতি আপনার

ঝোঁক ছিল। দক্ষতাও কম ছিল না। ভাল কথা, আমি সেন্ট জো ছাড়ার পর তো আপনি সেখানকার পুলিশ বিভাগের চাকরি নিয়েছিলেন, তাই না?

হ্যাঁ, ঠিক শুনেছিলে। ছ'মাসের ব্যাপার। আমার মনেও একটা প্রশ্ন জাগছে জনি, মারাটোগাতে তুমি যখন হোটেল খুলেছিলে তখন থেকেই তোমার কাজকর্ম, মানে গতিবিধির ওপর কড়া নজর রেখে চলেছি। তবে তুমি আগে কোনদিন বন্দুক চালাতে পার বলে তো আমার জানা ছিল না। সত্যি করে বল তো, নরক্রম'কে কেন খুন করেছ?

তার কথায় কার্নান যেন আকাশ থেকে পড়ল এমন ভাব দেখিয়ে, চোখ কপালে তুলে বলল, আপনার মধ্যে এমন ভয়ঙ্কর ভাবনার উদয় কি করে হল বলুন তো? আমার যতদূর মনে পড়ে খোসা ছাড়ানো পেঁয়াজের মত পাকা হাতে এবং সতর্কতার সঙ্গে কাজটা করেছিলাম। কোথাও সামান্যতম খুঁতও রাখিনি। খুঁত ছিল কি?

উড্‌স নীরবে ঘড়ির চেনে ব্যবহার করার মত ছোট্ট একটা সোনার পেন্সিল তার সামনে টেবিলের ওপর রাখল। তারপর ক্ষীণকণ্ঠে বলতে লাগল, গত ক্রিস্টমাসে আমরা উভয়ে সেন্ট জো-তে থাকার সময় আমি এটা তোমাকে উপহার দিয়েছিলাম, ঠিক কিনা? আর তুমি যে আমাকে দাড়ি কামাবার মগটা উপহার দিয়েছিলে সেটা আজও আমার তেমনই নতুন রয়ে গেছে। শোন। তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি কথা বলার সময় ভেবে চিন্তে বলার চেষ্টা করবে। আমি কিন্তু তোমাকে ছেড়ে কথা বলব না। একদিন আমরা পরস্পরের বন্ধু ছিলাম ঠিকই। তাই বলে কর্তব্যচ্যুত হতে পারব না।

কার্নান সরবে হেসে উঠে বলল, বিধি আমার সহায়। নইলে কে জানত বন্ধুবর বার্নে আমার পিছু নিয়েছে। সে কোটের পকেটে হাত ঢোকাতে না ঢোকাতেই চোখের পলকে উডস্-এর পিস্তলটা তার বুকে স্থির হল।

ভ্রূ জোড়া ও নাক কুঁচকে কার্নান বলল, আরে, করছ কী! আমি তো তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম। যাক গে, কি বলছি শোন, আমার ভেস্ট পকেটে ছোট্ট একটা ছিদ্র ছিল। যদি হাতাহাতি করতেই হয় তবে পেন্সিলটা পড়ে যেতে পারে অনুমান করে সেটাকে ওই ভেস্ট-এর পকেটে চালান করে দিয়েছিলাম। আমার কথা শোন, পিস্তলটা সরিয়ে নাও। কেন আমি হতচ্ছাড়া নরক্রম'কে কেন গুলি করতে বাধ্য হয়েছিলাম, সব কথা খোলসা করে বলছি। বোকা গর্দভটা আমার কোটের বোতামের ওপর একটা ২২ ঠেকিয়ে হল থেকে তাড়া করে। সে জন্যই তাকে নিরস্ত করা আমার কাছে অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তার স্ত্রী বুড়িটা কিন্তু বড্ড ভাল মানুষ ছিল। সে পাথরের মূর্তির মত বিছানা আঁকড়ে পড়ে থেকে নীরব চাহনি মেলে তাকিয়ে দেখতে লাগল, বারো হাজার ডলারের গলার হারটা খোয়া গেল। কেবলমাত্র ক্ষীণকণ্ঠে মিনতির স্বরে বলল, বাচ্ছা, গার্নেট বসানো তো ডলার দামের সোনার আঙটিটা আমাকে ফেরৎ দিয়ে যাও। মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে নিয়ে এবার মুখে বিতৃষ্ণার ছাপ এঁকে বলল, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে অর্থের লোভেই হাড়গিলে নরক্রমকে বিয়ে করেছিল। নইলে—।

তাকে থামিয়ে দিয়ে উড্‌স্ রীতিমত ধমকের স্বরে বলল, তোমাকে তো আগেই হুঁশিয়ার করে দিয়েছি একটাও অবান্তর কথা বলবে না।

কার্নান থতমত খেয়ে বলল, ঠিক আছে বাবা, ঠিক আছে! কিন্তু আমার এসব কথা বলার কারণ তোমাকে বলব। সব কিছু তোমাকে খোলসা করে বলাটাই নিরাপদ বলে মনে করছি। আর আমি যা কিছু বলছি আমার অতি পরিচিত ও আপনজনকেই বলছি। আর উড্‌স্, আমি তোমার কাছে এক হাজার ডলার পাই, খেয়াল আছে আশা করি? অতএব আমার হাতে হাতকড়া পড়াবার ইচ্ছা থাকলেও তুমি মনের দিক থেকে উৎসাহ পাবে না।

অবশ্যই তা আমার স্মরণ আছে। প্রয়োজনের কথা শোনামাত্র কোন কথা না বলেই তুমি পঞ্চাশ ডলারের কুড়িটা নোট আমার হাতে তুলে দিয়েছিলে। সবই আমি কড়ায় গণ্ডায় তোমাকে শোধ করে দেব। এক হাজার ডলার দিয়ে তখনকার মত আমাকে রক্ষা করেছিলে স্বীকার করছি। সেদিন বাড়ি ফিরে আমি দেখেছিলাম, আমার জিনিসপত্র সব গলিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। দেখে আমার মাথায় বজ্রাঘাত হবার জোগাড়।

কার্নান এবার বলল, আরে বার্নে তুমি আমার জন্যই সত্যবাদী যুধিষ্ঠির হয়ে মর্ত্যধামে আবির্ভূত

হয়েছ। আর একজন পুরোদস্তুর শ্বেতাঙ্গের মত আচরণ না করে তুমি পারবেই না। তাই যার দ্বারা তুমি এত উপকৃত, ঋণী তার দিকে তুমি একটা আঙুলও বাড়াতে পারবে না। শোন, আমার কাম, কাজ করতে হলে আমাকে যেন জানালার কলকব্জা আর ইয়েললকের ব্যাপারটা সবার আগে শিখে নিতে হয়, আবার মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে হয়। এবার কাতর স্বরে বলল, আমি কিছু খাবার দিতে বলছি। গত দু'-একটা দিন আমার পেটে ধরতে গেলে কিছুই পড়েনি। নাড়িভুড়ি পর্যন্ত হজম হয়ে গেছে বোধ হয়। আরে ধ্যুৎ! আমি যদি ধরা পড়ি তবে তো সৌভাগ্যবান গোয়েন্দাটাকে সম্মানটা পুরনো দোস্ত বুজ-এর সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে হবে ; ঠিক বলিনি? আমি কাজ করতে গিয়ে মদ স্পর্শও করি না। কাজ মিটে গেলে পুরনো দোস্তের সঙ্গে আলিঙ্গন করতে পারি।

কপালের চামড়ায় চিন্তার ভাঁজ এঁকে সোনালী পেন্সিলটাকে আঙুল দিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে উড্স আবার মুখ খুলল, দেখ। তোমাকে ছেড়ে না দিয়ে আমার উপায় নেই। অবশ্য তোমার টাকাটা যদি আমি আগেই শোধ করে দিতাম, আমি তা দিতে পারি নি বা দেই নি। চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবার সে বলল, সে কথা ছাড়ান দেওয়া যাক। আমি অবশ্যই ন্যায় কাজ করছি না স্বীকার করতেই হবে। তবে এছাড়া গত্যন্তরও নেই। অতীতে তুমি আমার দিকে অকাতরে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলে, আজ আমার প্রতিদান দেওয়ার সময় এসেছে।

আরে বাবা, মানুষের নাড়ি নক্ষত্রের খোঁজ নিতে আমার ভুল হয় না।

আমাদের মধ্যে ভাগাভাগিটা সমান সমান হলে নিউইয়র্কের সব ক'টা ব্যাঙ্কের ডলার একসঙ্গে জড়ো করলেও কেউ আমার কবল থেকে তোমাকে ছিনিয়ে নিতে পারত না।

তাই তো আমি ধরেই নিয়েছি আমি তোমার কাছেই নিরাপদ। আর এ ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিতই ছিলাম।

বহু লোকই আমার কাজকর্মের দিকে বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করে থাকে। এটা তারা বৃত্তির পর্যায়ে ধরে না। আমার কথা হচ্ছে, আগে আমার মনুষ্যত্ব, তারপর গোয়েন্দাগিরি। তোমাকে ছেড়ে না দিয়ে যেমন আমার উপায় নেই ঠিক তেমনি রহস্যভেদীর কাজ থেকে ইস্তফা দিতেও ঠিক তেমনই বাধ্য। আমি মনে করি চাকরি ছেড়ে দিলে আমাকে এক্সপ্রেস মালগাড়ি চালিয়ে পেটের ভাত জোগাড় করতে হবে। তোমার হাজার ডলার শোধের ব্যাপারটা তখন আমার কাছে নিতান্তই অলীক কল্পনা হয়ে দাঁড়াবে।

লাফিয়ে উঠে কার্নান সঙ্গে সঙ্গে বলল, চমৎকার! তুমি সে কাজেই লেগে পড় উডস্। তবে আমার পাওনা টাকার দাবী ছেড়ে দিতে রাজি। তবে এ-ও জানি যে, তুমি তাতে সম্মত হবে না। তুমি আমার কাছ থেকে টাকাটা ধার নেবার দিনটাকে আমি আমার জীবনের পরম শুভদিন বলে মনে করছি। যাকগে, এখন ওসব ব্যাপার ধামাচাপা থাক। আজ সকালের ট্রেন ধরেই আমি পশ্চিমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছি। সেখানে এমন একটা ঘাঁটি আমার জানা আছে সেখানে নরক্রম-এর সাকরেদদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারব। যাক, মদ খাও। পুলিশ যখন এ ব্যাপারটা নিয়ে ভাবনা-চিন্তায় মত্ত সে সময়টা আমরা মৌজ করে মদের গ্লাস নিয়ে ডুবে থাকব। আর আমি এ মুহূর্তে ছোটবেলার বন্ধু বার্নের জিম্মায়, তার বে-সরকারী জিম্মায়। অতএব কোন পুলিশ ভুলেও আমাকে নিয়ে ভাববে না, কাছেও ঘেঁষবে না।

তার কথাগুলোর মধ্যে তার মনের দুর্বলতা, গর্ব আর উদ্ধত আত্মম্ভরিতা প্রকাশ পেতে লাগল।

মদের গ্লাসটা হাত থেকে টেবিলে রেখে কার্নান বেশ গর্বের সঙ্গেই এক-এক করে তার সকল চুরি, ছিনতাই, ষড়যন্ত্রের কায়দা কৌশল আর আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে কাজ হাসিলের ব্যাপার স্যাপারের ফিরিস্তি দিতে লাগল। সে সব কথা শুনতে শুনতে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ সম্বন্ধে যথেষ্ট ধারণা থাকার পরও এ জঘন্য অপরাধীর ওপর উডস্-এর মন ঘৃণায় ভরে গেল।

তবু নিজেকে সংযত, সামলে সুমলে রেখে, বলল, আমি পরাজয় স্বীকার করে নিচ্ছি কার্নান। এ মুহূর্তে রাস্তা একটাই, আমার যুক্তি মনে করতে পার—কিছুদিন তুমি আত্মগোপন করে থাক। খবরের কাগজওয়ালারা নরক্রম-এর ব্যাপারটা নিয়ে ঝড় তুলতে পারে। এবারের গ্রীষ্মকালটা এ শহরটার সর্বত্র চুরি আর খুন খারাপির ধুম পড়েছে—রোজই একটা না একটা খবর কানে আসছে।

ধ্যুৎ! জাহান্নামে যাক তোমার খবরের কাগজগুলো! বাজার গরম করা ছাড়া তাদের আর কোন মুরোদই নেই। মনে কর, কোন একটা কেসের ব্যাপারে তারা যদি নিতান্তই উৎসাহী হয়, তাতে ফয়দা কি হবে, বলতে পার? একদল সাংবাদিককে অকুস্থলে পাঠাবে। ব্যস, মদের গ্লাস নিয়ে বসে পড়বে। মদ-পরিবেশকের বড় মেয়েটার ফটো তুলবে। কারণ দশতলার বাসিন্দা মেয়েটার ভাবী বর বলেছে ঘটনার রাত্রে নিচের তলার কোন হৈ চৈ শোনে নি। ব্যস, চোরমশাইকে ধরার ব্যাপারে খবরের কাগজগুলো-এর বেশী অগ্রসর হয় না।

তারা যে টেবিলে বসে কথা বলছে তার গায়েই, একেবারে হাতের নাগালের মধ্যেই টেলিফোন বুথ। কার্নান হঠাৎ টেবিল থেকে উঠে বুথে ঢুকে, সেন্ট্রালের কাছে মর্নিং মাস পত্রিকার নম্বরটা চাইল।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই লাইন পেয়ে গেল। সে কোন রকম ভূমিকার অবতারণা না করেই সম্পাদক মশাইকে বলল, শুনুন, আমিই বুড়ো নরক্রমকে খুন করেছি...একটু অপেক্ষা করুন ; আমাকে কিন্তু পাগল ভাববেন না...উফ্! কিছুমাত্রও বিপদের আশঙ্কা নেই। এক্ষুণি আমার এক গোয়েন্দা বন্ধুর সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলছিলাম। আগামীকাল থেকে ঠিক দু'হপ্তা আগে রাত্রি ঠিক আড়াইটার সময় আমি নিজে হাতে বুড়ো নরক্রম'কে খুন করেছি।...আপনার সঙ্গে বসে একটু আধটু মদ পান করব? ধ্যুৎ! এখন এসব কথা ছাড়ান দিন। বরং খোলসা করে বলুন, একটা জরুরী ও বড়সড়, 'স্কুপ' সংবাদ প্রত্যাশা করেন কিনা?...ভাল ; এটা একটু গুরুত্বপূর্ণ 'স্কুপ'—তবে এটা কি করে প্রত্যাশা করেন যে, আমি ফোনেই আমার নাম, ধাম আপনাকে বাৎলে দেব?...কারণ? কারণ একটাই, যে সব রহস্যময় অপরাধের কিনারা করতে গিয়ে পুলিশের লোকেরা নাজেহাল হয়, তার হিল্লে করাই নাকি আপনাদের কাজ। আর এ বিশেষত্বের জন্যই নাকি পুলিশের থেকে আপনারা স্বতন্ত্র।...না, আরও কিছু আমার বলার আছে। আমার মতে একটা সুচতুর ও ঘাঘু ডাকাত বা খুনীকে ধরার ব্যাপারে আপনাদের বস্তা পচা পদ্ধতি, মিথ্যা খবরে ভর্তি এক পেনি মূল্যের কাগজের ক্ষমতা একটা অন্ধ কুত্তার বাচ্চার চেয়ে সামান্যতম বেশী বলে আমি অন্তত মনে করিনা...কি?...আরে, না, এটা কোন প্রতিদ্বন্দ্বী খবরের কাগজের দপ্তর নয় ; খবরটা আপনারা সরাসরি লাভ করে পেয়ে যাচ্ছেন। শুনুন, আমি আবারও বলছি, নরক্রম-এর খুনের ব্যাপারটা আমার দ্বারাই ঘটেছে। আর? হীরে মণি মুক্তোগুলো আমার সুটকেসের ভেতরেই এখনও সযত্নে রক্ষিত, হোটেলের নামটা জানা সম্ভব হয়নি—কথাটা তো আপনাদের মোক্ষম অস্ত্র, বে-কায়দায় পড়ে প্রায়ই ব্যবহার করেন, ঠিক কিনা? আপনাদের অধীনস্থ যেসব যুবক-কর্মী যারা আপনার হয়ে খুনের ঘটনাটার মনোজ্ঞ একটা বিবরণ দাঁড় করিয়ে নিয়েছেন। মিসেস নরক্রম, সদ্য স্বামীহারা মহিলার রাত্রিবাসের দ্বিতীয় বোতামটা আধ-ভাঙা অবস্থায় পাওয়া গেছে। তার আঙুল থেকে আমি যখন গারনেটের আঙটিটা খুলে নিচ্ছিলাম সেটা আমার নজরে পড়েছিল। আমি সেটাকে চুনি মনে করেছিলাম...ওটা বন্ধ করে দিন। ওটার কাজ করার ক্ষমতা ফুরিয়ে গেছে।

মুখে ক্রুর হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে কার্নান এবার উডস্-এর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল।

কার্নান মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়ে বলল, যাক, সে এবার আমার কব্জায় এসে গেছে। আমার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করেছে, আস্থা এসে গেছে। সে অন্য একজনকে বলল, আর একটা ফোন করে সেন্ট্রাল-এর সঙ্গে কথা বলে তাদের বলে দিক, জেনে নিক আমার ফোন নম্বরটা। তাকে আবারও বে-কায়দায় ফেলে, ঘোল খাইয়ে ছাড়ব।

কার্নান আবার মর্নিং মাস-এর সম্পাদককে ফোন করল। বলল, শুনুন, আমি এখন এখানেই আছি। আপনি কিন্তু ভুলেও এরকম কিছু ভাববেন না যে, এরকম একটা ঘুষখোর, মুখোশ পরা ছোট খবরের কাগজের প্রতিষ্ঠানের ভয়ে আমি এখান থেকে কেটে পড়ব, সত্যি কি ভেবেছিলেন? আপনি আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যেই আমাকে আপনার কব্জায় পাবেন। ধ্যুৎ, এসব মস্করা ছাড়ান দিত। বয়স্ক লোকগুলোকে যার যার কাজ করতে দিয়ে নিজের কাজে মন দিন, পথে মোটর দুর্ঘটনা আর বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলাটামলার খোঁজ করুন। আর সে সঙ্গে এর ওর কুৎসা ও নোংরা ব্যাপার স্যাপার খবরের কাগজের পাতায় ছেপে রুটির জোগাড় করুন। তবে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। না, অপরাধ নেবেন না, আপনার সঙ্গে মোলাকাতের সময় আমার নেই।

কার্নান রিসিভারটা যথাস্থানে রাখতে রাখতে বলল, লোকটা একেবারে শিকার হাতছাড়া হয়ে যাওয়া বিড়ালের মত ক্ষেপে গেছে! খেল্ রীতিমত জমে উঠেছে।

কার্নান এবার গোয়েন্দা বন্ধু উডস্‌কে নিয়ে 'শো' দেখার জন্য বেরিয়ে পড়ল। ব্রডওয়েতে একটা রেস্তোরাঁয় খাওয়া দাওয়া করল। দু'হাতে ডলার ওড়াল। দু'জন পাশাপাশি বসে একটা হাসির নাটক দেখল। রাতের খাবারের পর গলা পর্যন্ত শ্যাম্পেন খেল। কার্নান যেন হঠাৎ রাজা-বাদশা বনে গেছে।

রাতভর খোলা থাকে এমন একটা রেস্তোরাঁয় ভোর সাড়ে তিনটার সময় একটা কাফের এক কোণে তাদের বসে থাকতে দেখা গেল। কার্নান বুক ফুলিয়ে বহুভাবে ইনিয়ে বিনিয়ে অনর্গল নিজের বীরত্বের কথা উডস্-এর কাছে বলে চলেছে। আর উডস্ এদিকে ভাবছে, আইনের রক্ষকের পদে নিযুক্ত থেকে নিজের কাজের যোগ্যতার প্রমাণ দেবার সুযোগ শেষমেশ তবে তার হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। পরমুহূর্তেই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, অসম্ভব! একী সম্ভব? এ কী সম্ভব?

ঠিক সে মুহূর্তে গাড়ির ঘরঘর শব্দ আর হর্নের কর্কশ শব্দ মিলে জানান দিচ্ছে যে, ভোর হয়ে এল বলে। আর রাত্রির কালো অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা হাসি-কান্না, আনন্দ-বিষাদকে বয়ে আনছে ভোরের আলো। আসছে আর একটা বিচিত্র দিন। কালো রাত্রির চেয়েও ভয়ঙ্কর এক দিন।

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই উডস্ রেস্তোরাঁর এক ওয়েটারকে দিয়ে এক ডাইসের বিনিময়ে একটা মর্নিং মাস আনাল।

খবরের কাগজটা হাতে পাওয়া মাত্র সে ব্যস্ততার সঙ্গে প্রথম পাতাটার ওপর চোখ বুলিয়েই নোট বই থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে নিল। এবার ছোট্ট সোনার পেন্সিলটা দিয়ে খস খস করে কি যেন সব লিখল। এবার লেখা কাগজের টুকরোটা কার্নান-এর চোখের সামনে ধরল। সে চোখ বুলাতে লাগল, মাননীয় সম্পাদক নিউইয়র্ক মর্নিং মাস।

স্যার, কার্নান-এর গ্রেপ্তার এবং শাস্তিদানের জন্য যে এক হাজার ডলার আমার পাওনা অনুগ্রহ করে সে অর্থ তাকেই আদেশ-নামার সঙ্গে দিয়ে দেবেন।—ইতি বার্নাড উডস্।

কার্নান চিরকুটটা থেকে ফ্যাকাসে মুখটা তুলে উডস্-এর দিকে তাকাল।

উডস্ তাকে লক্ষ্য করে বলল, আমার বিশ্বাস, তাদের তুমি যত নাস্তানাবুদই করে থাক না কেন, আমার অনুরোধ তারা ফেলবে না। যাক, এবার আমার সঙ্গে থানায় চল কার্নান।

দ্য ফুল কিলার

দক্ষিণ অঞ্চলে একটি কথা প্রবাদ বচনের মত লোকের মুখে-মুখে ঘুরে বেড়ায়—'জেসি হোম্‌সকে তলব কর।' সেখানকার কেউ যখন ভয়ঙ্কর রকমের বোকামি করে বসে তখনই এ প্রবাদ বচনটা ব্যবহার করে।

জেসি হোমস একটি কাল্পনিক ব্যক্তি, নির্বোধ নিধনকারী। জ্যাক ফ্রস্ট, সান্টা ক্লজ আর লক্ষ্মীর বরপুত্রদের মতই একটা কাল্পনিক চরিত্র জেসি হোমস্। এ কাল্পনিক ব্যক্তি নির্বোধ-নিধনকারী নামটার উৎপত্তি সম্বন্ধে দক্ষিণের বিজ্ঞতম আর প্রবীণতম অধিবাসীরাও নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারেন না। রোনোকে থেকে রিও গ্র্যান্ডি পর্যন্ত সুবিশাল এলাকা ঘুরে এলে এমন লোক খুব কমই পাওয়া যাবে যে জেসি হোম্‌স-এর নামটা কোনদিনই ব্যবহার করেনি অর্থাৎ তাকে তলব করেনি। হাসিমাখা মুখে বা কান্নাভেজা চোখে তাকে তলব করা হয়। অতএব জেসি হোম্‌স যে একজন কর্মব্যস্ত ব্যক্তি এতে সন্দেহের কিছুমাত্রও অবকাশ নেই।

আমি ছেলেবেলায় যখন তার অস্বাভাবিক মারাত্মক সব কার্যকলাপ থেকে সতর্কতার সঙ্গে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতাম, তখন আমার বুকে তার যে ছবিটা গাঁথা থাকত সেটা আজও আমার ভেতর থেকে মুছে যায় নি। আমার কল্পনায় সে ছিল একটা দুর্ধর্ষ প্রকৃতির বুড়ো। ধবধবে সাদা পোশাক তার গায়ে, মুখে বুক পর্যন্ত নেমে-আসা শন পাটের মত সাদা দাড়ি আর বুক কাঁপানো ইয়া বড় টকটকে লাল দুটো চোখ। যদি দেখা পাই, এরকম আতঙ্কমিশ্রিত ইচ্ছা নিয়ে আমি পথের

দিকে বার-বার তাকাতাম। অধীর প্রতীক্ষায় থাকতাম পথে ধুলোর ঝড় উড়িয়ে, ওক গাছের ডালের ছড়ি হাতে আর চামড়ার ফিতে দিয়ে বাঁধা জুতো পরে কখন সে থপ্‌থপ্ করে পথ পাড়ি দেবে। আমি আজও হয়ত অনুসন্ধিৎসু চোখ মেলে—।

আরে, এটাই তো একটা গল্প, গল্পের উপসংহার ভাবলে ভুল করা হবে।

আমি বিষাদের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি আগ্রহের সঙ্গে পড়ার মত এত ভাল গল্পের সংখ্যা খুবই কম যাতে কোন না কোন সুরাপানের ব্যাপার উল্লেখ করা হয় নি। এতসব ভাল গল্পের মধ্য থেকে এমন একটা গল্পের কথা আমি বলব যা অন্য গল্পগুলো থেকে স্বতন্ত্র প্রকৃতির।

কার্ণার একজন বোকার শিরোমণি। আর সে মনে-প্রাণে একজন শিল্পী। আমার অভিন্ন হৃদয় বন্ধুও বটে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যদি এমন কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব থাকে যে অন্য দশজনের দৃষ্টিতে একান্ত ঘৃণার পাত্র তবে যে মূর্তিমান হচ্ছে লেখকের চোখে সে চিত্রশিল্পী যার তুলির টানে তার গল্পের ছবিগুলো আঁকা হয়েছে। একবারটি পরীক্ষা করে দেখতে দোষ কোথায়? ইডাহো-র খনি-শিবিরকে নিয়ে একটা গল্প তৈরী করে ফেলুন। গল্পটা বাজারে বেচে দিন। প্রাপ্ত অর্থ আনন্দ স্ফূর্তি করে ফুঁকে দিন। ব্যস, এবার দুটো মাস কেটে যাবার পর কারো কাছ থেকে একটা ডাইস কর্জ করে বাজারে যে পত্রিকাতে আপনার গল্পটা ছাপা হয়েছে সেটার একটা খণ্ড খরিদ করে আনুন, তাতে আপনার গল্পের নায়ক রাখাল ছেলে ব্ল্যাক-বিল-এর পুরো একটা পাতার জল রঙের ছবি আপনার চোখে পড়বে। গল্পটা লিখতে বসে যদি কোন প্রসঙ্গের অবতারণা করতে গিয়ে কোনক্রমে ঘোড়া শব্দটার উল্লেখ করে থাকেন তবেই শিল্পীর মাথায় সেটা পাকাপাকিভাবে গেঁথে গেল। ব্যস, ব্ল্যাক বিল-এর গায়ে চাপিয়ে দেওয়া হল একটা এম. এফ. এইচ-র রেগুলেশন ট্রাউজার যা ওয়েস্ট চেস্টার কাউন্টি শিকারী দল ব্যবহার করে থাকে। আর পিঠে ঝুলিয়ে দেবে একটা পার্লার বন্দুক আর চোখে লাগিয়ে দেবে একটা এক চোখ বিশিষ্ট চশমা। আর দূরে দেখা যাবে বিয়াল্লিশতম পথের এক অংশের দৃশ্য এবং ভারতবর্ষের অনন্য স্মৃতিসৌধ, তাজমহলের জ্বলজ্বলে একটা ছবি।

যাক, খুব হয়েছে। কার্ণারকে যেমন আমি অন্তর থেকে অতীতে ঘৃণা করতাম আজও ঠিক তেমনই ঘৃণার চোখে দেখি।

একদিন কার্ণার-এর সঙ্গে আমার হঠাৎ মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। তার বয়স কম, কিন্তু বিষণ্ণতার প্রতিমূর্তি। এরও যথেষ্ট কারণ আছে। আসলে তার মনটা ছিল অনেক উন্নত, আর তার বরাত দিয়েছে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ-যন্ত্রণা। আর বিষণ্ণতাই তার যৌবনের লক্ষণ। কোন এক চরম দুঃখ কষ্টে জর্জরিত ব্যক্তি যদি হঠাৎ হাসি-খুশিতে ভরপুর হয়ে ওঠে তবে নিঃসন্দেহে ধরে নেওয়া যাবে যে, সে ইদানিং চুলে কলপ ঘষতে আরম্ভ করেছে। সিগারেট আর মদে কার্ণার-এর দীর্ঘদিনের আসক্তি। তবে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে সে একটা বোকার শিরোমণি। আর সুচতুর কোন ব্যক্তির মতই আমি দারুণ হিংসা করতাম। সে একবার আমাকে বলল, একটা গল্প সংকলন বইয়ে আমার একটা গল্প পড়েছে, খুবই মনে ধরেছে। গল্পটার কাহিনী সে আমার কাছে গড়গড় করে বলে ফেলল। আমি এই ভেবে মর্মাহত হলাম যে, মিঃ ফিৎজ্ জেম্‌স ও'ব্রায়েন ইহলোক ছেড়ে যাওয়ায় নিজের সৃষ্টির এরকম ভূয়সী প্রশংসা শুনে যাওয়া তার বরাতে জুটল না। বোকা! কার্ণার বোকার হদ্দ। নইলে সে প্রায়ই এমন কাণ্ড করতে পারত?

আমার কথাটাকে আরও একটু খোলসা করে বলছি, এক মেয়ে, মানে যুবতী ছিল। আমি মনে করি, একটা মেয়ে কেবলমাত্র কোন আলোচনা সভায় আর ছবির অ্যালবামে আবদ্ধ-রাখার মত বস্তু। তা সত্ত্বেও আমি কার্ণার-এর সঙ্গে হৃদ্যতার সম্বন্ধ বজায় রাখতেই সে জীবনটার অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিল।

লকেটে রাখার উপযোগী তার একটা ছবি কার্ণার আমাকে দেখিয়েছিল। সে সুশ্রী নাকি—আমার ঠিক মনে নেই। মেয়েটা একটা কারখানায় কাজ করত। বেতন পেত সপ্তাহে আটটা ডলার। আমি আরও জানতে পেরেছি যে মেয়েটা সপ্তাহে দেড় ডলার দিয়ে উপার্জন শুরু করে এমন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

কার্ণার-এর বাবা দু'মিলিয়নের মালিক। ছেলের শিল্প অনুশীলনের জন্য খরচ খরচা করতে এতটুকুও দ্বিধা তার নেই। কিন্তু কার্ণার কারখানার মেয়েটার দিকে আকৃষ্ট হল। তার প্রেমে মজে

গেল। তাই কার্ণার বাবার উত্তরাধিকারকে পাত্তা না দিয়ে স্টুডিওতে গিয়ে আশ্রয় নিল ফেরোনি-র কাছ থেকে কম দামী খাবার দাবার উদরপূর্তি করত। ফেরোনি একজন শিল্পমনস্ক ব্যক্তি কবি আর চিত্রশিল্পীদের ধারে খাবার দাবার দিয়ে সাহায্য-সহযোগিতা করে। কোনক্রমে একট ছবি বিক্রি হয়ে গেলে কার্ণার নিজের দরকারী জিনিসপত্র কেনার পর ফেরোনির হিসাবের খাতায় দুটো ডলার জমা দেয়।

এক রাত্রে কার্ণার আমাকে এবং কারখানার মেয়েটাকে তার সঙ্গে বসে খাবার খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করল। তার ইচ্ছা, জল রঙের ছবি বিক্রি করে কিছু জমানো সম্ভব হলেই সে মেয়েটাকে বিয়ে করে সংসার বাঁধবে। তার প্রাক্তন পিতার দু'মিলিয়ন—ধ্যুৎ! সে আশায় মাটি।

আর কার্ণার-এর প্রেমিকা মেয়েটা? একটা রীতিমত জাঁহাবাজ মেয়ে। বেটেখাটো চেহারা দেখতে রূপসীই বলা চলে। আর সাধারণ কাফেতে এমন সদম্ভে চলাফেরা করে যেন সোনার চামচ সতর্কতার সঙ্গে কোমরে লুকিয়ে রেখে শিকাগো শহরের 'সামার হাউস'-এ বসে আছে। তবে তার আচরণ খুবই সহজ সরল আর স্বাভাবিক। তার দুটো বিশেষত্বের দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, প্রথমত তার বেল্টের বকলস্‌টা পিঠের মাঝখানে থাকে আর লাল চুনি আটকানো টাই-পিন পরা সঙ্গতি সম্পন্ন এক ব্যক্তি চতুর্দশতম পথ থেকেই তাকে অনুসরণ করছে, সে ব্যাপারটা ভুলে আমাদের কাছে মুখ ফুটে বলেনি। তার আচরণে আমি অবাক হয়ে ভাবি, কার্ণার এমন আহাম্মক!

এবার আসল কথাটা পাড়ছি। তার কিছুক্ষণ পরের কথা, ফেরোনি-র টেবিলে বসে কার্ণার আর আমি রাতের খাবার খাচ্ছি। আমি হঠাৎ বললাম, কার্ণার, তুমি একটা বোকা হাঁদা।

কার্ণার মুখের খাবারটুকু গলা দিয়ে চালান করে বলল, 'ঠিকই বলেছ, তাকে আমি এভাবে কাজ করতে দিচ্ছি না। আমার পক্ষে বৌকে কাজ করতে দেওয়া সম্ভব নয়। মিছে আর সময় নষ্ট করে ফায়দাই বা কি? সে-ও তো বিয়ে করার জন্য তৈরী। গতকাল সে আমার জলরঙের ছবিটা বেচেছি। একটা গ্যাস স্টোভে দিব্যি রান্নার কাজ চলে যাবে। মনস্থ করেছি, আগামী হপ্তাতেই আমরা বিয়ের পাট চুকিয়ে ফেলব। মনে হচ্ছে স্নানাগারসহ একটা ফ্ল্যাটও জোগাড় করে নিতে পারব। হপ্তায় আট ডলার ভাড়ায় এরকম ফ্ল্যাট মিলে যায়।

পানীয়ের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে আমি বলে উঠলাম, 'কার্ণার, তুমি একটা পয়লা নম্বরের বোকা।' এবার একটু ভারি গলায়ই বললাম, 'বুঝলে, জেসি হোমস্‌ই তোমার আদৎ দাওয়াই।

কার্ণাব দক্ষিণ অঞ্চলের অধিবাসী নয় বলেই আমার প্রবাদ বচনটার অর্থ বুঝতে পারল না। তারপরও সে তার ফ্ল্যাটের প্রসঙ্গটা চালিয়ে যেতে লাগল। তারপরও আমি আবার বললাম—।

তুমি একটা নিরেট হাঁদারাম! ওই যে বললাম, 'জেসি হোমসই তোমার আদৎ দাওয়াই।'

কথাটা বলেই চারদিকে চোখ ফেরাতেই নির্বোধ নিধনকারী আমার চোখের সামনে দেখা দিল। তার যে ছবি আমার বুকে গাঁথা রয়েছে, কল্পনায় আঁকা, আমাদের মুখোমুখি টেবিলে বসে ইয়া বড় বড় লাল চোখ দুটো মেলে সে আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আপাদমস্তক সে নির্ভেজাল জেসি হোম্‌স্‌। বুক পর্যন্ত ঝুলে-পড়া সাদা দাড়ি, সাবেকি ঢঙের সাদাপোশাক গায়ে, ঘাতকের মত চাহনি, পায়ে ধূলোভরা এক জোড়া জুতো। কার্ণার-এর দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রয়েছে। দক্ষিণ অঞ্চল থেকে আমিই তাকে ডেকে এনেছি কথাটা ভাবতেই আমার বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠল। ভাবলাম, এখান থেকে চম্পট দেই, কিন্তু যাবই বা কোথায়? স্বয়ং যমদূত যে সামনেই বসে। বন্ধু কার্ণারকে আমি বারবার বোকা হাঁদা বলেছি বলেই না নরকের দক্ষিণ দুয়ার আমার সামনে দুম করে খুলে গেল। তা সত্ত্বেও হতচ্ছাড়া জেসি হোমস্‌-এর কবল থেকে বন্ধুকে অবশ্য রক্ষা করা দরকার।

আহাম্মক নিধনকারী মিনিট খানেক পরে তার চেয়ার ছেড়ে আমাদের টেবিলের একটা খালি-চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল। তার ইয়া বড় বড় প্রতিহিংসাপরায়ণ চোখের মণি দুটো মেলে কার্ণার-এর দিকে তাকাল।

আহাম্মক নিধনকারী চিত্রশিল্পীকে লক্ষ্য করে বলল, তুমি তো দেখছি একটা অতিবড় আহাম্মক হে! উপোষ করে আর কতদিন কাটাবে, বল তো? আবারও একটা সুযোগ তোমাকে দিচ্ছি। আমার পরামর্শ মত না চললে তোমার কপালে অশেষ দুর্ভোগ আছে, মনে রেখো।

আহাম্মক নিধনকারীর উপস্থিতিতে কার্নার যে বিমর্ষ হয়ে পড়েনি তা আমার নজর এড়াল না। লোকটা তার ঠিক একফুট দূরে বসে বীভৎস মুখটা তার দিকে ফিরিয়ে বসে অপলক চোখে তাকিয়েই রইল।

কার্ণার অন্যমনস্কতার ভান দেখিয়ে প্রায় অস্ফুটস্বরে বলতে লাগল, আগামী হপ্তায় আমরা বিয়ে করছি। স্টুডিওতে যা কিছু আছে আর পুরনো তৈজসপত্র দিয়ে কোনরকমে আমাদের দিন গুজরান হয়ে যাবে।

আহাম্মক নিধনকারী গম্ভীর স্বরে বলল, নিজের অদৃষ্ট তুমি নিজেই স্থির করে নিয়েছ। তুমি এখন নিষ্প্রাণ, মৃতই মনে করতে পার। শেষবারের মত একটা সুযোগ তোমাকে দিয়ে দেখেছিলাম, ফল কি হয়।

কার্ণার গলা নামিয়ে বলল, জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে দু'জনে গীটার বাজিয়ে অর্থের মিথ্যা অনুভূতি আত্মম্ভরিতাকে মন থেকে মুছে ফেলব।

আহাম্মক নিধনকারী সাপের মত ফোঁস ফোঁস করে বলল, তোমার নিজের মাথায় সর্বস্ব ভেঙে পড়ুক।

তবে আমি যখন নিঃসন্দেহ হলাম, কার্ণার-এর চোখ বা কান কোনটাই আহাম্মক নিধনকারীর উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন নয়, সে মুহূর্তেই এক অজানা আতঙ্কে আমার গায়ের রক্ত হিম হয়ে যাবার জোগাড় হল। কারণ যা-ই হোক না কেন, আহাম্মক নিধনকারীর হাত থেকে বন্ধুবর কার্ণারকে রক্ষা করার সার্বিক দায়িত্ব যেন আমার ওপরই চাপিয়েছে। এ বিস্ময় এবং আতঙ্কের অংশ বিশেষ অবশ্যই আমার মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে।

ফ্যাকাসে বিবর্ণ-মুখে কার্ণার আমার দিকে তাকিয়ে ম্লান হেসে বলল, কিছু মনে কোরোনা, আমি কি নিজের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছিলাম। সে রকমই তো বোধ হচ্ছে। আসলে এটা আমার মুদ্রাদোষে পরিণত হয়ে গেছে।

আহাম্মক নিধনকারী কাফে ছেড়ে চলে গেল।

আমি যন্ত্রচালিতের মত ঝট্ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে বললাম, 'আমি না আসা পর্যন্ত এখানেই থেকো। তার সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার। তুমি বোকা হাঁদা বলেই কীট-পতঙ্গের মত পায়ের তলায় পিষে মরবে? নিজের সম্বন্ধে একটা কথাও তুমি মুখফুটে বলতে পারলে না? আশ্চর্য ব্যাপার তো!'

মদের নেশায় তুমি বুঁদ হয়ে পড়েছ। আমাকে কেউ-ই কিচ্ছু বলেনি।

এই তো, একটু আগেই তোমার ঘাতক এসে তোমার সামনে হাজির হয়েছিল। আর তোমাকেই সে তার এবারের শিকার মনোনয়ন করেছে। তুমি তো বোবা, কালা বা অন্ধও নও যে কিছুই—।

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কার্নার বলল, ধ্যুৎ! এরকম কেউ-ই আমার পরিচিত নেই। কেবলমাত্র তোমাকে ছাড়া এখানে, আমাদের টেবিলে কাউকে দেখিনি, সত্যি বলছি। তুমি মাথা গরম কোরো না, বোসো।

আমি গুলিবিদ্ধ বাঘের মত ক্ষেপে গিয়ে বললাম, চুপ্‌টি করে বোসো। নিজের জীবনের জন্য তোমার চিন্তা না থাকলেও আমার অবশ্যই আছে। তোমাকে আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করা আমার কর্তব্য, আর করবও।

কাফে থেকে এক দৌড়ে বেরিয়ে ব্লকের অর্ধেক পথ গিয়েই আমি তার পথ আগলে দাঁড়ালাম। তাকে আগের মতই নির্মম, পাষণ্ড, ভয়ঙ্কর মনে হল। ওক কাঠের অতি সাধারণ লাঠিটা ভর দিয়ে সে পথ পাড়ি দিচ্ছিল। খপ করে তার হাতটা ধরে টেনে হিঁচড়ে অন্ধকারে নিয়ে গেলাম। সে যে একটা কাল্পনিক ব্যক্তি আমার তো জানাই আছে। আমি যে স্বগতোক্তি করে বলেছি সেটা পুলিশের নজরে পড়ুক এটা আমার অভিপ্রায় নয় বলেই তাকে নিরালায় নিয়ে গেলাম।

বুকে তখনকার মত সাহস সঞ্চয় করে আমি গর্জে উঠলাম, জেসি হোমস্, আমি তোমাকে ভালই চিনি। তোমার কথা জীবনভর বহুবার শুনেছি। তুমি যে তোমার দেশের পক্ষে কী ভয়ঙ্কর কলঙ্ক, অভিশাপ এখন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি।'আকাট মূর্খ আর বোকা হাঁদাদের ঘায়েল না করে তুমি হত্যা করে বেড়াচ্ছ উজ্জ্বল প্রতিভাধর যৌবনাকে। যারা একটা জাতির অস্তিত্ব অব্যাহত

রাখে, তাকে মহান করে তোলার কর্ণধাররূপে কাজ করে, তাদেরই তুমি নিধন করে বেড়াচ্ছ। জেসি হোমস্ তুমি নিজেই একজন আহাম্মক। তুমি নিজের দেশের সেরা যুবকদের তিন যুগ ধরে হত্যা করে চলেছ। আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু কার্ণার একজন যথার্থই প্রতিভাধর ব্যক্তি। তার নামটা তোমার হত্যার তালিকায় জুড়ে দেওয়ার পরই তোমার জঘন্য মনোবৃত্তিটার পরিচয় নতুন করে দিয়েছ।

আহাম্মক নিধনকারী ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রসিকতার ভাব দেখিয়ে বলল, তোমার কথাগুলো তো খুবই ঝাঁঝালো হে! হ্যাঁ, হ্যাঁ, এবার তোমাকে চিনতে পারলাম। তুমি যখন তোমার বন্ধুর পাশে বসেছিলে তখন তাকে বোকা হাঁদা বলে সম্বোধন করেছিলে, ঠিক কিনা?

ঠিকই। বোকা হাঁদাই সম্বোধন করেছিলাম বটে। আসলে তাকে এ কথাটা বলে সম্বোধন করে আমি আনন্দ পাই। হিংসা করে অবশ্যই এরকম বলি না। তোমার বিচারে সে পৃথিবীর সবচেয়ে উদ্ভট এবং নিরেট বোকা। তাই তো তুমি তাকে হত্যা করতে আগ্রহী।

একটা কথা। তোমার পরিচয় দেওয়া আর আমি কে বা কি এ সম্বন্ধে তোমার বিশ্বাসের কথা আমার কাছে ব্যক্ত করতে তোমার কোন আপত্তি আছে—?

আমি গলা-ছেড়ে হেসেই নিজেকে সামলে নিলাম। কারণ একটাই, আমি যে শূন্যের সঙ্গে কথা বলছি তা কারো নজরে পড়াটা সঙ্গত হবে না। গলা নামিয়ে অথচ কর্কশ স্বরেই বললাম—।

আহাম্মক নিধনকারী জেসি হোমস্, তুমি আমার বন্ধুকে খুন করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছ। তাকে যদি খুন কর, কাটার আঁচড়ও তার গায়ে লাগে, তোমার উচিত সাজা যাতে হয়—অর্থাৎ তোমাকে সোজা পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে তবেই আমি ক্ষান্ত হব। আমার ভালই জানা আছে, তাদের দৃষ্টিশক্তি বড়ই নিস্তেজ। কাজেই একটা পুলিশবাহিনী ছাড়া এক উপকথার খুনীকে জালে আটকানো সম্ভব হবে না। এ-ও আমার ভালই জানা আছে।

প্রসঙ্গটাকে কাটছাঁট করে খাটো করতে গিয়ে আহাম্মক-নিধনকারী বলল, 'আমাকে এবার বিদায় নিতে হবে। তুমি বাড়ি ফিরে ঘুমিয়ে দেহ মনকে সুস্থ করে নাও, বিদায়।

কথাটা কানে যেতেই বন্ধুবর কার্ণার-এর জন্য আতঙ্কে আমার শরীরের সব কটা স্নায়ু যেন এক সঙ্গে নিস্তেজ হয়ে আসতে লাগল। মনের দিক থেকেও ভেঙে পড়তে লাগলাম। তাই গলা নামিয়ে অনুরোধের স্বরে বললাম, 'মহানুভব আহাম্মক নিধনকারী মশাই, তোমার কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ রাখছি, আমার সহজ সরল আর নম্র স্বভাবের বন্ধুটাকে খুন কোরো না। আমি ভেবে অবাক হচ্ছি, তুমি দক্ষিণ অঞ্চলে ফিরে গিয়ে কংগ্রেসীদের আর দুষ্কৃতকারীদের হত্যা করে সমাজকে নিষ্কন্টক না করে আমাদের মত সজ্জনের ওপর চড়াও হচ্ছ? পঞ্চম এভিনিউর যেসব ধনকুবের সিন্দুক বোঝাই করে ডলার রেখে বোকা গরীব গরবাদের বিয়ে না করে ঘর পর্যন্ত বাঁধতে দিচ্ছে না তাদের কেন কচুকাটা করছ না। জেসি হোমস চল যাই কোথাও বসে একটু মদটদ—।

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই আহাম্মক নিধনকারী বলতে শুরু করল, যে যুবতীটা তোমার সুহৃদটাকে বোকার শিরোমণি করে তুলেছে তুমি কি তাকে চেন?

হ্যাঁ, সে জন্যই তো আমি তাকে বোকার শিরোমণি বলে ডাকি। বোকা না হলে মেয়েটাকে বিয়ে করে ঘরে না তুলে অহেতুক সময় নষ্ট করছে। হদ্দ বোকা সে। আহাম্মক বাবার দু'মিলিয়ন ডলার লাভ করার ভরসাতেই সে এতদিন হাঁ করে বসে।

অসম্ভব নয়। এটা অসম্ভব নয় যে, ব্যাপারটাকে আমি অন্য দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করছি। একটা কথা, কাফেতে ফিরে গিয়ে তুমি কি তোমার বন্ধু কার্ণারকে এখানে আনতে পারবে না?

তাতে ফয়দা কি বল? সে তো তোমাকে দেখতেই পাবে না জেসি হোমস্। তুমি যে টেবিলে, পাশাপাশি বসে তার সঙ্গে কথা বলেছিলে তা-ই তো সে বুঝতে পারে নি। তুমি যে একটা কাল্পনিক ব্যক্তি তা তো তোমার ভালই জানা আছে।

এবার হয়ত আমাকে ঠিকই চিনতে পারবে। তাকে নিয়ে আসতে পারবে না?

ভাল কথা। কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে জেসি হোমস্, তুমি প্রকৃতিস্থ আছ, নাকি—'

কথাটা শেষ না করেই আমি কাফের উদ্দেশে হাঁটা জুড়লাম। কার্ণারকে বললাম, অদৃশ্য মানব তোমার সঙ্গে বাক্যালাপ করার জন্য বাইরে দাঁড়িয়ে। আমি নিঃসন্দেহ সে তোমাকে হত্যা করতে চাইছে। তাকে যখন চোখে দেখতেই পাবে না তখন ভয় পাবারও কারণ নেই।

কার্ণার যেন বিব্রত হয়েই বলল, 'একী হে! এক ঢোক এব্‌সিন্থের নির্যাস পেটে যেতেই তোমার যে এ হাল হবে আমি ভাবতেই পারিনি। অতএব তুমি উর্জবার্জার-ই খাবে। তোমাকে নিয়ে আমি পায়ে হেঁটেই বাড়ি যাব।

আমি বন্ধুবর কার্ণার'কে নিয়ে আহাম্মক নিধনকারী জেসি হোমস্-এর সামনে হাজির করলাম।

জেসি হোমস্ বলল, রুডলফ আমি পরাজয় স্বীকার করে নিচ্ছি। মেয়েটাকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে এস। কথাটা বলেই বুড়োটা করমর্দনের জন্য তার দিকে হাত বাড়াল।

কার্ণার তার সঙ্গে করমর্দন করতে করতে বলল, 'বাবা, তোমার মঙ্গল হোক। মেয়েটার সঙ্গে তোমার পরিচয় হলে তোমাকে আর কোনদিনই অনুশোচনায় দগ্ধ হতে হবে না।

আমি চোখ দুটো কপালে তুলে সবিস্ময়ে বললাম, 'তবে টেবিলে বসে কথা বলার সময় তুমি তাকে দেখতে পেয়েছিলে, তাই না?

একটা বছর তার সঙ্গে আমার কথা বন্ধ ছিল। এখন সব মিটে গিয়ে পরিস্থিতি আবার আগের মতই—'

আমি তার কথা শেষ হবার আগেই হাঁটা জুড়লাম। কার্ণার মাঝ-পথে কথাটা থামিয়ে বলে উঠল, 'আরে, তুমি চললে কোথায়?

আমি বললাম, আমি জেসি হোমস্-এর খোঁজে যাচ্ছি।

দ্য সিটি অব ড্রেডফুল নাইট

আমার বন্ধু কার্ণি ৮,৬০৬ নম্বর এক্সপ্রেস মালগাড়ির চালক। সে কথা প্রসঙ্গে আমাকে বলল, শোন, সম্প্রতিকালে যে গরম হাওয়া বয়ে গেল তখন বাচ্চা ছেলেমেয়েদের চোখ বেঁধে চোর পুলিশ খেলার মত করেই মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে ধারণা করার ব্যাপারে বহু সুযোগই আমি পেয়েছিলাম।

পুলিশ কমিশনার, বনদপ্তরের কমিশনার আর পার্ক কমিশনার তো দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে এলেন যে, যতদিন আবহাওয়া দপ্তরের তাপমান যন্ত্রটা স্বাভাবিক জীবনযাপনের স্তরে নেমে না আসছে ততদিন জনগণকে পার্কে ঘুমোবার অনুমতি দেওয়া হবে। দক্ষিণ অরেঞ্জ, এন্. জে-র নগর উন্নয়ন মশক নিধন সমিতি এবং কৃষি দপ্তরের সচিব মিঃ কমস্টক-এর দ্বারা সে প্রস্তাবটার অনুমোদন করিয়ে নেন। প্রস্তাবটা অনুমোদন পাওয়ায় তাঁরা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

পার্কগুলোকে যখন বিশেষ অনুমত্যানুসারে জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়ার ব্যাপারটা প্রচার করামাত্র সেন্ট্রাল পার্কের লাগোয়া অঞ্চলের বাসিন্দারা জোয়ারের জলের মত সেখানে ঢুকতে আরম্ভ করল। সূর্য পাটে বসার মিনিট দশেকের মধ্যেই পার্কে ভিড় এমন উপচে পড়তে লাগল যেন আয়ারল্যান্ডের আলুর দুর্ভিক্ষের দৃশ্যের মহড়া চলছে বা সবে ভয়ঙ্কর কোন হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। সেখানে কত পরিবার, কত সঙ্ঘ-সমিতি, বংশগত কত গোষ্ঠী যে ঘাসের ওপর শুয়ে সুখানুভূতি লাভের প্রত্যাশায় জড়ো হয়েছে তা বলে শেষ করা যাবে না। ঠাণ্ডায় অসুবিধা হওয়ার আশঙ্কায় যাদের তেলের স্টোভ নেই তারা বহু কম্বল সম্বল করে হাজির হয়েছে। লতাপাতা ডালপালা দিয়ে আগুন জ্বেলে পার্কের নরম-সবুজ বিছানায় শুয়ে রাত কাটাতে প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ জড়ো হল।

নিউইয়র্ক সেন্ট্রাল রেলরোডের বিপরীতের সুসজ্জিত বীয়ার্শেবা ফ্ল্যাটে যে আমি বাস করি তা-তো আর তোমার অজান্না নয়।

সেখানকার বাসিন্দাদের ওপর যখন কর্তৃপক্ষ নির্দেশ জারি করল যে, তাদের পার্কে গিয়ে ঘুমোতে হবে তখন থেকেই সবার মন অস্বাভাবিক রকম বিষিয়ে উঠল।

পার্কে যাবার ফুটপাতগুলোর দিকে তাকালে স্পষ্ট মনে হচ্ছে রুশ সৈন্যরা বুঝি কুচকাওয়াজ করে চলেছে। ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা রাত্রি যাপনের যাবতীয় আরামদায়ী উপকরণ কাঁধে বগলে নিয়ে পছন্দ মাফিক জায়গা দখলের প্রত্যাশায় উর্দ্ধশ্বাসে পার্কের দিকে ছুটতে লাগল।

লাল মোজা পরা ড্যানি ফ্ল্যাটের দারোয়ানের ওপর তর্জন গর্জন জুড়ে দিল—ফ্ল্যাটের এমন আরাম-আয়েশ ফেলে আমাকে কিনা খরগোসের মত পার্কের ঘাসের ওপর ঘুমোতে হবে?

ফ্ল্যাটের গায়ে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল দেহী পুলিশ অফিসার বাজখাই গলায় খেঁকিয়ে উঠল, চুপ করুন। একটা কথাও শুনতে চাই না। এটা পুলিশ কমিশনারের কড়া আদেশ। ভাল চান তো তাড়াতাড়ি বাড়ি ছেড়ে পার্কে ঘুমোতে যান।

প্রায় মিনতির স্বরে ড্যানি বলল, রাগ করবেন না, ফ্ল্যাটগুলোতে আমরা নানা জাতের লোক একসঙ্গে বাস করলেও আমাদের মধ্যে শান্তি সুখ আছে। আর এ আনন্দ নিকেতন ছেড়ে কিনা—।

পুলিশ অফিসারের ধমক খেয়ে সে আর মুখের কথাটা শেষ করতে পারল না। তার আগেই পুলিশ অফিসার ভেড়ার পালের মত সবাইকে তাড়িয়ে পার্কের ভিতর ঢুকিয়ে দিল। কচি বাচ্চাগুলো বাড়ি ফিরে যাবার জন্য কান্নাকাটি জুড়ে দিল।

পুলিশ অফিসার বিয়েগন গর্জে উঠল, পুলিশ কমিশনারের হুকুম, ছেলে-বুড়ো বা ধনী-দরিদ্র সবাইকে পার্কে ঘুমোতেই হবে। আর যারা আবহাওয়া ব্যুরো এবং পার্ক কমিশনারের হুকুম অমান্য করে তাদের অসম্মান করেন তাদের কেবল অর্থদণ্ডই নয় কারাভোগও করতে হবে। তাই আমার পরামর্শ কোনরকম ব্যাগড়া না বাঁধিয়ে লক্ষ্মী ছেলের মত ঘাসের ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন। রোজ ভোরে বাড়ি ফিরে যাবেন আবার রাত্রির অন্ধকার নেমে আসার আগেই পার্কে হাজির হতে হবে, খেয়াল থাকে যেন।

আমরা, একশ' ঊনআশিজন বীয়ার্শেবা ফ্ল্যাটের অধিবাসী পার্কে মোটামুটি স্বস্তিতে রাত্রি কাটাবার ব্যবস্থা করে শুয়ে পড়লাম। প্রথম রাত্রেই কে একজন গড়িয়ে এসে আমার কম্বলের ওপর পড়ল। মুহূর্তেই তাঁর হাঁটু দুটো দিয়ে আমার গলাটাকে সাড়াশির মত আঁকড়ে ধরল। তার মুখে হাত বুলিয়ে তার চরিত্র সম্বন্ধে ধারণা করে নিতে চাইলাম। প্রতিবারেই কষে লাথি মেরে পার্কের বাইরে বের করে দিয়ে এলাম।

মাঝ রাত্রে আমার ঘুম ভেঙে গেল। শিশিরভেজা ঘাসের ওপর উঠে বসে পড়লাম। ঠিক তখনই একটা গাড়ি আচমকা ছুটে এসে আমার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে পড়ল। সুসজ্জিত এক সুদর্শন ব্যক্তি গাড়ি থেকে আমাকে সামনে পেয়ে বলল, ব্যাপারটা কি, বলুন তো? লোকগুলো পার্কের ঘাসের ওপর শুয়ে রাত্রি কাটাচ্ছে কেন? আমার মনে হয় এটা আইনত অপরাধ।

পুলিশ দপ্তর থেকে এরকমই একটা হুকুম জারি করেছে আর তা কৃষিদপ্তর অনুমোদন করেছে। হুকুমনামায় বলা হয়েছে, যাদের গাড়ির চাকায় একটা লাইসেন্স লাগানো থাকবে না পুনরায় নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তাদের পাবলিক পার্কগুলোতেই রাত্রিবাস করতে হবে। যথা সময়ে, মনোরম আবহাওয়ার সময়ের নির্দেশটা জারি হওয়ায় মোটর চলার পথের ধারে জায়গাগুলো এবং লেকের দু'পাড়ের অঞ্চলগুলো ছাড়া অন্য সব জায়গার মৃত্যুর হার স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী নয়।

লোকটা এবার জিজ্ঞাসা করল, 'আর ওই পাহাড়ের দিকে যাদের দেখা যাচ্ছে তারা কারা, বলুন তো?

বীয়ার্শেবা ফ্ল্যাটের বাসিন্দা। আরাম দায়ক ফ্ল্যাট।

রাত্রির অন্ধকার নেমে এলে সবাই আসে। ইঁট-কাঠ-পাথরের চার দেওয়ালে ঘেরা গরম পরিবেশ ছেড়ে পার্কে এসে রাত্রি কাটাতে বাধ্য হয়। এবার কোটের পকেট থেকে একটা বই বের করে লোকটা বলল, অবিলম্বে সব দিকই বিবেচনা করা হবে, শুনে রাখুন।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার পরিচয়টা—ভাল কথা, আপনি কি পুলিশ কমিশনার?

না, বীয়ার্শেবা ফ্ল্যাটের মালিক আমি। যে সবুজ নরম ঘাস আর গাছগাছালি একটা বাড়িওয়ালার ভাড়াটেদের উপরি সুযোগ সুবিধাগুলো দান করেছে পরম পিতা তাদের সহায় হোন। আগামীকাল থেকেই ফ্ল্যাট ভাড়া শতকরা পনেরো ডলার বাড়িয়ে দেওয়া হবে। বিদায়।

এ ফিলিস্টাইন ইন বোহেমিয়া

ইউনিয়ন স্কোয়ারের এক ধারে জর্জওয়াশিংটন ডান হাতটা ওপরে তুলে লোহার ঘোড়াটার পিঠে এমনভাবে বসে থাকেন যাতে মনে হয় ব্রডওয়ের গাড়িগুলো যখন বাঁক ঘুরে চতুর্দশ স্ট্রীটে ঢোকে তখন তারা যেন সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ে, এ নির্দেশই তিনি যেন যুগযুগান্ত ধরে দিয়ে চলেছেন। কিন্তু সে নির্দেশকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে এমনভাবে চলে যায় যে তারা যেন জনগণের নির্দেশকে পাত্তাই দেয় না। সেনাপতি তখন অবশ্যই উপলব্ধি করেন, তবে তাঁর স্নায়ুগুলো যদি খুবই সবল না হয়ে থাকে যে 'র‍্যাপিড ট্রানজিট গ্লোরিয়া মান্ডি'।

ডান হাতের পরিবর্তে সেনাপতি যদি বাঁ হাত ওপরে তুলে রাখতেন তবে সে অঞ্চলে বিদেশ থেকে আসা অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত মানুষগুলোর ডেরা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাকেই নির্দেশ করত। জাতীয় বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার তাগিদে তারা এখানে এসে মাথা গুঁজেছে। আর যে দেশব্রতী তাদের ঠাঁই দেবার জন্যই এ অঞ্চলটাকে গড়েছেন তিনি ঘোড়ার পিঠে অবস্থান করে তাদের পল্লীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন। আর বাঁ দিকে উৎকর্ণ হয়ে এক রঙ্গনাট্যের সংলাপ শুনছেন। আর অভিনীত হচ্ছে তারই আশ্রিত ব্যক্তিদের উত্তরসূরীদের বিকৃত বিকৃত চরিত্র। পোল্যান্ড, ইতালি, অস্ট্রো—হাঙ্গেরি। প্রাক্তন স্পেনীয় উপনিবেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতিগুলো বংশধরদের বাসস্থান। দেশী মদ আর তাদের দেশের রাজনীতির গোপন তথ্য নিয়ে রেস্তোরাঁ আর বসতবাড়িগুলোতে তারা চক্কর মেরে বেড়ায়। পুরনো লোকগুলো হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে গিয়ে পরিবর্তে দেখা দেয় নতুন নতুন মুখ। উধাও হয়ে কোথায় যায়? এর সঠিক এবং অর্থেক জবাব পেতে হলে যে নবাগত পরিবেশনকারী খাদ্যবস্তু পরিবেশন করছে তার ভদ্রজনোচিত হাবভাবের প্রতি নজর রাখতে হবে।

এটা আসল কাহিনীর মুখবন্ধ মাত্র। আসল কাহিনীটা অসামাজিক অর্থাৎ অভদ্রলোকদের জীবনযাত্রাকে কেন্দ্র করে।

পরদেশী অধ্যুষিত এ অঞ্চলে ক্যাটি ডেম্প্‌সি-র মায়ের সাজানো গোছানো ঘর আছে। কারবারটা অবশ্যই লাভজনক নয়।

ভাড়া শোধ করে দেবার দিন তারা দু'জনে বাড়িওয়ালার দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের প্রাপ্য শোধ করে দিতে পারলে আর রোজকার আইরিশ স্টু রান্নার দ্রব্যসামগ্রী জোগাড় করতে পারলে তবেই সেদিনটাকে তারা সার্থক মনে করে। মাঝে-মধ্যেই দেখা যায় মাংস আর আলু ছাড়াই মাংস রান্না করা হয়েছে। আবার প্রায়ই স্টুর স্বাদ বিশ্রী হয়।

প্রায় ধ্বসে পড়া পুরনো বাড়িটাতেই ক্যাটি গায়ে গতরে বেড়ে উঠতে লাগল। চেহারার গড়ন আর মুখশ্রী খুবই সুন্দর আকর্ষণীয়। এমন টুকটুকে মেয়েটা একদিন একটা অন্যায় করে ফেলল। বাড়িটার বাসিন্দাদের ঘরে জল রাখার ভাঙা কুঁজো আর ময়লা ও ভেজা তোয়ালে রেখে দিল।

বলছি শুনুন, সে ঘরটায় যে ভাড়াটে থাকে তার নাম ব্রুনেলি। সে সবুজ টাই ব্যবহার করে আর প্রতি মাসে সময় মত ভাড়া মিটিয়ে দেয়। একমাত্র এ কারণেই সে অন্য ভাড়াটেদের কাছে বিশেষ অতিথি হিসাবে গণ্য হয়। পোশাক-পরিচ্ছদ, হাবভাব আর চেহারা ছবির দিক থেকে একমাত্র রাজকুমারের সঙ্গেই তার তুলনা চলতে পারে।

রোজ সকালে তার জলখাবার ঘরে দিয়ে আসতে হয়। দুপুরের দিকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে ফিরে আসতে আসতে মাঝরাত্রি হয়ে যায়। দু'টো সময়ই মনে রহস্যের সঞ্চার করে। সবকিছুই কিন্তু রহস্যের আড়ালে নয়। তাছাড়া মিসেস ডেম্পসি-র ভাড়াটেদের কার্যকলাপে রহস্যের নাম গন্ধও নেই।

আর মিঃ ব্রুনেলি চঞ্চলমতির এক লাতিন। ক্যাটি-র সঙ্গে একটু প্রেম-প্রেম খেলতে উৎসাহী হয়ে পড়ল। ক্যাটিও একদিন ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করল।

মায়ের মুখোমুখি বসে ক্যাটি একদিন বলল, আমি মনে-প্রাণে তাকে ভালবাসি। সবচেয়ে বড় কথা সে সত্যিকারের একজন সজ্জন আর বিনয়ীও খুব। সে আমার পাশাপাশি হাঁটার সময় নিজেকে

আমি একজন পাটরানী বলেই মনে করি। কিন্তু সে যে আসলে কে তা আমার জানা নেই। সে ব্যাপারে আমি মনে সন্দেহ পোষণ করি।

মেয়ের কথা সমর্থন করতে গিয়ে মিসেস ডেম্পসি বলল, 'হ্যাঁ, কথাটা ঠিকই বলেছিস মা। তাকে দেখলে একজন অসৎ ব্যক্তি বলেই মনে হয়। আর তার কথাবার্তায়ও ভদ্রতার নাম গন্ধও নেই। তবে এটাও ঠিক মা, আমাদের বিচার তো ভুলও হতে পারে। সে নিয়মিত নগদ ডলার দিয়ে ভাড়া মেটায় আর লন্ড্রীতে পোশাক ধোলাই করায় বলে উঁচু বংশের লোক হবে না কথাটা সত্যি নয়। আশা করি এসব ব্যাপার স্যাপার তুমিও সমর্থন করছ।

ব্রুনেলি তার প্রেম-পর্ব যথারীতি চালাতে লাগল। আবার ক্যাটি-র মনে সন্দেহও জগদ্দল পাথরের মতই চেপে বসে রইল।

এক সন্ধ্যায় বাড়ির বাইরে ব্রুনেলি-র সঙ্গে রাতের খাবার খেতে বসে ক্যাটির মনে সংশয় জাগল, প্রেম ভালবাসার বাহানা বুঝি এখানেই খতম হয়ে যাবে। দামী মসলিনের পোশাক পরিহিতা ক্যাটি যখন পথ চলতে লাগল তখন হঠাৎ করে দেখলে আপনার মনে হবে নিউইয়র্কের বোহেমিয়ার দৃশ্য চাক্ষুষ করছেন।

টোনিও-র রেস্তোরাঁয় ক্যাটিকে নিয়ে ঢুকল। এটা কিন্তু বোহেমিয়াতেই অবস্থিত।

রেস্তোরাঁর ভেতরে বড়সড় একটা ফাঁকা জায়গায় দেড় ডজনের কাছাকাছি ছোট ছোট টেবিল পাতা রয়েছে। বোহেমিয়া সন্ধানীরা জড়ো হয়েছে। সেখানকার একটা কোণায় ছোট টেবিলে ক্যাটিকে বসিয়ে ব্রুনেলি মিনিট কয়েকের জন্য দূরে সরে গেল। ক্যাটি একা একা বসে ঝলমলে পোশাক পরিহিতা নারী-পুরুষ আর তাদের হাসি-ঠাট্টা আনন্দের দৃশ্য অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে দেখতে লাগল।

মিনিট কয়েক বাদে ব্রুনেলি উঠোনে ছোট ছোট টেবিলগুলোর ফাঁক দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় উপস্থিত নারী পুরুষ সবাই হাত তুলে সোল্লাসে বলতে লাগল, টোনিও! টোনিও! সাবাস টোনিও! তার হাত নাড়ার কৌশল দেখার জন্য সম্ভ্রান্ত পুরুষরাও বার বার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতে লাগল।

উল্লাস অভ্যর্থনার পাট মিটে গেলে ব্রুনেলি ব্যস্ত পায়ে রান্নাঘরে ঢুকে গা থেকে কোট আর ওয়েস্ট কোট ঝটপট খুলে ফেলল।

ওয়েটার ফ্লাহাটি-র ওপর দায়িত্ব বর্তেছে ক্যাটিকে খাবার পরিবেশন করার। সে একের পর এক সুখাদ্য তাকে পরিবেশন করতে লাগল। সে সোল্লাসে প্রতিটা প্লেট থেকে একটু করে খাবার তুলে নিয়ে জিভে ঠেকানোমাত্র চমৎকার"! চমৎকার! বলে উঠতে লাগল। খাওয়া শেষ করে ক্যাটি হাতের ছুরি আর কাটা-চামচ টেবিলে নামিয়ে রাখল। তার দু'চোখের কোণে জলবিন্দু দেখা দিল। বিশিষ্ট অতিথি সম্বন্ধে যে সন্দেহ এতদিন জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছিল তা যেন চারগুণ ভারি হয়ে উঠল। যে লোকটাকে সম্ভ্রান্ত নারী পুরুষরা অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে উল্লাসে ফেঁটে পড়েছিল সেই ব্রুনেলি তো আসলে একজন উপাধিধারী প্যাট্রিসিয়ান ছাড়া কিছু নয়। নিজের অভিজ্ঞতা বলে সে তাদের ঠিক চিনে ফেলেছে। আর যা-ই হোক তাকে প্রেমিক হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। এ বিশ্বাসটা তার মধ্যে ক্রমেই দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে উঠতে লাগল। আর যন্ত্রণাদায়ক মানসিকতাও তাকে গ্রাস করল। যতদিন যাচ্ছে সেখানে এ লোকটার ব্যক্তিত্ব, সবচেয়ে বড় কথা পুরুষত্ব তার কাছে সুখদায়ক হয়ে উঠতে লাগল।

একটু বাদেই ব্রুনেলিকে দেখেই ক্যাটি-র বুকের ভেতরে হঠাৎ যেন আনন্দের জোয়ার বইতে লাগল।

উপস্থিত নারী পুরুষদের মধ্য থেকে অনেকেই গলা ছেড়ে ডাকতে লাগল, এই যে টোনিও! টোনিও! অন্যান্যরা চেঁচিয়ে উঠল, 'সেমাই' সেমাই! ব্র্যাভো সেমাই! ব্রাভো!

ব্রুনেলি নিজের প্রাসাদে একের পর এক টেবিলে ঘুরে অতিথি অভ্যাগতদের আপ্যায়নে ব্যস্ত হল। ঘরের প্রতিটি কোণ থেকে গহনা পরিহিত বেলনের মত নিটোল হাত উঁচিয়ে তাকে ডাকাডাকি করতে লাগল।

সত্যি কথা বলতে কি, খুব কম রাজকুমারই এমন বহুজনপ্রিয় গৃহকর্তা হতে পারে। কোন শিল্পীও তার শিল্পকর্মের জন্য এর চেয়ে বেশী প্রশংসা প্রত্যাশা করতে পারে না।

ক্যাটি-র তো জানা নেই যে, সেমাই-এর প্রধান পাচিকার সঙ্গে করমর্দন করার সৌভাগ্য হলে বা ব্রডওয়েয়র প্রধান পরিবেশকের একটা সেলাম পেলে নিউইয়র্কের যেকোন অধিবাসীর মন তৃপ্তিতে কানায় কানায় ভরপুর হয়ে ওঠে।

এক সময় ভিড় পাতলা হতে লাগল। ক্যাটি-র টেবিলের কাছে ব্রুনেলি এসে দাঁড়াল। তার পাশে একেবারে গা-ঘেঁষে দাঁড়াল। মুচকি হেসে ব্রুনেলি বলল, 'কি বুঝছ? নিজের চোখেই তো সবকিছু দেখছ। আমিই এন্টোনিও—এন্টোনিও ব্রুনেলি। হ্যাঁ, আমিই যে টোনিও একথা কি একবারও তোমার মনে জাগেনি ক্যাটি! আমি তোমায় মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসি ক্যাটি। আমাদের বিয়ে হবে, মানে আমি তোমাকে বিয়ে করব। একবার আমাকে এন্টোনিও বলে সম্বোধন কর প্রিয়তমা। আর মুখ ফুটে বল যে, তুমিও আমাকে অন্তর থেকে ভালবাস।

ক্যাটি সোল্লাসে বলে উঠল, 'এন্ডি! এন্ডি তোমার কাছ থেকে ভালবাসা পাওয়া সে কী আনন্দের কথা তা তোমাকে বোঝাতে পারব না! অবশ্যই—হ্যাঁ, অবশ্যই আমি তোমাকে বিয়ে করে ঘর বাঁধব। কিন্তু তুমি যে একজন পাচক এ কথা কেন আমার কাছে গোপন রেখেছিলে, বল তো? তোমাকে কোন একজন বিদেশী কাউন্ট ভেবে আমি তো ধরতে গেলে তোমাকে ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছিলাম।

দ্য র‍্যাথস্‌কেলার অ্যান্ড দ্য রোজ

ক্র্যানবেরি কর্ণার নামক ছোট্ট শহরটায় বোগস্‌ পরিবারের সমস্যাগুলো মাথায় নিয়েই মিস্‌ পোজি ক্যারিংটন জীবনযাত্রা আরম্ভ করেছিল। তবে কথাটা খুবই সত্য যে, সে জীবনকে সব দিক থেকে সার্থক করে তুলেছে।

মিস পোজি ক্যারিংটন আঠারো বছর বয়সকালে 'ক্যারিংটন' নামের সুযোগ সুবিধা পায় আর একটা মেট্রোপলিটন প্রহসন কোম্পানির নাচ-গানের দলের খাতায় নাম লেখায়। সেখানে নিজের অভিনয় দক্ষতার পরিচয় দিয়ে 'ফোল্‌-ডি-রোল'-এর প্রধান নর্তকীর ভূমিকা থেকে আরম্ভ করে 'রাজার স্নানের পোশাক' নাটকে টয়েন্টেট-এর ভূমিকায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। সে অভিনয়ের সুবাদেই সমালোচকদের মন জয় করে নেয়। এভাবেই সে নিজের পথ প্রশস্ত করে।

যে সময়ের কথা আমরা আলোচনা করতে বসেছি তখন মিস ক্যারিংটন-এর নাম যশ আকাশছোঁয়া।

অভিজ্ঞ ও সুচতুর আর বিশ শতকের এক সফল চরিত্রাভিনেতা হাইস্মিথ নামে এক যুবক—আর সে নাটকের হাস্যরসিক সল্‌ হেটোসার-এর ভূমিকায় অভিনয় করার আগ্রহ প্রকাশ করে হের টিমোথি-র কাছে এসে দরখাস্ত করল।

টিমোথি গলা নামিয়ে প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল—শোন, যদি পার তবে যেকোনভাবে ওই ভূমিকায় অভিনয় করার সুযোগ করে নাও। মিস ক্যারিংটন আমার কোন কথাতেই কান দেয় না, দেবেও না। তার সাফ কথা, 'হেটোসার'-এর ভূমিকায় অভিনয় করার মত ভাল কোন অভিনেতা যতদিন না পাওয়া যাবে ততদিন সে মঞ্চে নামছে না। আমি ঠাট্টা করে তাকে বলেছিলাম, ডেল্‌মান টমসনকে দিয়ে ওই চরিত্রটা অভিনয় করালে—'

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সে বলে উঠল—উফ্‌! অবশ্যই না। তাকে, অথবা জন ড্রু, বা জিম করবেট অথবা ওসব খ্যাতনামা অভিনেতাদের কাউকেই আমার পছন্দ নয়। অভিনয় কি জিনিস তারা কিছু জানে না, বোঝেও না কিছু।

তাই বলছি কি। সল হেটোসার-এর ভূমিকায় অভিনয় করতে হলে মিস ক্যারিংটন-এর শরণাপন্ন হও, বুঝিয়ে শুনিয়ে তাকে রাজি করাতে চেষ্টা কর। ঈশ্বর তোমার সহায় হোন।

হাইস্মিথ ক্র্যানবেরি তার পরদিনই কর্ণার-এর ট্রেন ধরল। জনবিরল গ্রাম্য পরিবেশে তিন-তিনটে দিন ধরে 'বোগস' পরিবারকে জোর তল্লাশি চালিয়ে বের করল। কথার মারপ্যাঁচের মাধ্যমে তাদের তৃতীয় আর চতুর্থ প্রজন্ম পর্যন্ত যাবতীয় তথ্য জেনে নিল। মিস ক্যারিংটন যেমন আকাশ-

ছোঁয়া উন্নতি করতে পেরেছে গ্রামটার উন্নতি কিন্তু মোটেই তেমন হয়নি। গ্রামটা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা নিয়ে ক্র্যানবেরি শহরে ফিরে গেল।

হাইস্মিথ-এর শিল্পী জীবন শুরু হয় মাটির তলার এক রেস্তোরাঁ থেকে। রাজার স্নানের পোশাক নাটকে অভিনয় করার পর মিস পোজি ক্যারিংটন'কে একটামাত্র মাটির তলার রেস্তোরাঁয় দেখতে পাওয়া যেতে পারে।

সে রেস্তোরাঁয় একটা প্রাণোচ্ছল দলকে হাসি মস্করায় লিপ্ত থাকতে অনেকেই দেখেছে। তাদের মধ্যে সবার আগেই নাম করতে হয় মদ বুঁদ মিস ক্যারিংটন, তারপর এক এক করে গোল্ডস্টিন ভারিক্কী চেহারা, মাথায় কোঁকড়া চুল আর সব মিলিয়ে দেখতে ভালুকের মত। আর খবরের কাগজের একজন কর্মী। সে একটা টেবিলে একাই বসে পানাহার করে চলেছে। পথ থেকে ন'ফুট নিচে রেস্তোরাঁটা অবস্থান করছে বলে সবার মনেই অফুরন্ত আনন্দ স্ফূর্তি।

একজন লোক দশটা পঁয়তাল্লিশে মাটির তলার রেস্তোরাঁয় ঢুকল। ক্যারিংটন মুচকি হাসল। আর যুবকটা একটা জলপাইয়ের বিচি টুক্ করে গিলে ফেলল।

সদ্য আসা যুবকটা এক গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দা। রোগাটে লম্বা চেহারাধারী। চারদিকের অন্তঃহীন আনন্দ স্ফূর্তির মাঝে তাকে বড়ই মনমরা দেখাতে লাগল। সে বসতে গিয়ে একটা চেয়ার উল্টে দিল। অন্য আর একটা চেয়ার টেনে জড়োসড়ো হয়ে বসল। ওয়েটার এসে সামনে দাঁড়ালে তাকে একেবারে মিইয়ে যেতে দেখা গেল। ওয়েটারকে লক্ষ্য করে সে বার দু'তিন ঢোক গিলে বলল, 'এক গ্লাস ঠাণ্ডা বিয়ার নিয়ে এসো।

রেস্তোরাঁর খদ্দেররা সবাই তার দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপাত্মক স্বরে হো-হো করে হেসে উঠল। সে কিন্তু শিশির ভেজা বাঁধাকপির মত সতেজ আর উকল মুগরের মত সোজা ও সহজ সরল। ঢ্যারা ঢ্যারা চোখে চারদিকে নজর বুলিয়ে নিয়ে মিস ক্যারিংটন-এর ওপর তার দৃষ্টি স্থির হল। মুচকি হেসে সে নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে সে তার টেবিলটার সামনে এসে থামল।

যুবকটা ছোট্ট করে বলল, 'মিস পোজি, কেমন আছ? আমাকে চিনতে পারছ? আরে গ্রামের কামারশালাটার পিছনে আমাদের বাড়ি ছিল, মনে পড়ছে না? বিল সামার্স—বিল সামার্স আমার নাম। মনে পড়ছে কি? তুমি করনার্স ছেড়ে আসার পর গায়ে গতরে বেড়ে উঠেছি, অবশ্য বয়সও কিছুটা বেড়েছে।

সে বলল—'শহরে গেলে তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে একথা লিজ পোরিই আমাকে বলে দিয়েছিল। বেনি স্ট্যানফিল্ডকে যে লিজা বিয়ে করেছে তা-ত তুমি জানই, তাই না? তার কথা হচ্ছে—'

কথাটা শেষ করতে না দিয়ে মিস ক্যারিংটন বলে উঠল 'ধ্যুৎ! কি যা-তা বলছ!

হাইস্মিথ বলল, আরে চটছ কেন, শোনই না, জুন মাসে লিজা আর স্ট্যান্‌ফিল্ড-এর বিয়ে হয়েছে। আর হ্যাম বিলে-র খোঁজ কিছু রাখ? সে ধর্মকর্ম নিয়ে দিব্যি আছে। বুড়ি মিসেস ব্লিদার্স-এর কথা মনে আছে নিশ্চয়ই? সে ক্যাপ্টেন সপুনার'কে বাড়িটা বেচে দিয়েছে। আর ওয়েটারদের সেই যে ছোট মেয়েটা—এক গানের মাস্টারের সঙ্গে বাড়ি থেকে চম্পট দিয়েছে। আর একটা কথা, এ মার্চে আদালত ভবনটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। মাটিভা হস্‌কিন্স পরপারে পাড়ি জমিয়েছে। খুবই সামান্য ব্যাপার হাতে একটা সূঁচ ফুটে গিয়েছিল। ব্যস, এতেই মৃত্যু। আরে, আর একটা কথা, তোমার কাকা কনস্টেবলের পদ লাভ করেছে। আরও আছে, টস বীডল্ স্যালি লাথ্রপ-এর প্রেমে একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছে। সবাই বলাবলি করছে, যে সে বারান্দায় আসে না এমন একটা রাত্রিও যায় না।

তার কথা শেষ হওয়ামাত্র মিস ক্যারিংটন একটু রাগত স্বরেই বলে উঠল, 'এ কী, এমন করে বলছেন কেন! সে তো মোটে একবারই—সমালোচনার তো তেমন কিছু দেখছি না। টম বীডল আমার বহুদিনের বন্ধু। তোমার নামটা আমি গুলিয়ে ফেলছি—মিঃ গোল্ডস্টিন, মিঃ সামার্স, মিঃ বিকেটস্ মিঃ—ধ্যুৎ, তোমার নামটা যেন কি? জনি, ঠিক আছে জনিই বলেই ডাকা যাবে। সেখানকার আরও কিছু খবর আমাকে দাও। কথাটা বলেই সে তার হাত ধরে টেনে কোণের দিকে নিয়ে গিয়ে একটা ফাঁকা টেবিলে মুখোমুখি বসল। ওয়েটারকে ডেকে দু'গ্লাস দামী মদ চাইল।

রেস্তোরাঁর অন্যান্য অতিথিরা আড়চোখে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে টিপে হাসতে লাগল। পোজি ক্যারিংটন-এর হাসির নাটকটা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে লাগল।

গ্রাম্য যুবকটার সহজ সরল মুখের দিকে তাকিয়ে পোজি কপালের চামড়ায় চিন্তার ভাঁজ একে বলল, বিল সামার্স? কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার তার মুখটা আমি কিছুতেই স্মরণে আনতে পারছি না! তবে সামার্স পরিবারের কথা কিন্তু ছবির মত আমার সামনে ভাসছে। ভাল কথা, কিছুদিনের মধ্যে আমার আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যে কারো সঙ্গে তোমার কি দেখা হয়েছে?

ব্যস, হাইস্মিথ ভাবল এবার মোক্ষম অস্ত্রটা ছুঁড়ে দেওয়ার সময় এসেছে। সল হেটোসার-এর ভূমিকায় পাশাপাশি হাস্যরস আর করুণ দৃশ্যের প্রয়োজন উপস্থিত হয়েছে। আর সে যে এরকম অভিনয়ে খুবই দক্ষ, এ সুযোগের সদ্ব্যবহার তাকে করতেই হবে।

বিল সামার্স মুখ খুলল, 'ক্যারিংটন, দিন দু'-তিন আগেই আমি তোমার আত্মীয় পরিজনদের বাড়ি গিয়েছিলাম। ভালই আছে সবাই। উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটেনি, লিলাক ফুলের গাছটা সামান্য বড় হয়েছে আর উঠোনের জঙ্গলি দেবদারু গাছটা শুকিয়ে গিয়েছিল। কেটে ফেলতে হয়েছে। তা সত্ত্বেও স্থানটার তেমন পরিবর্তন হয় নি।

আমার মা কেমন আছেন?

আমি শেষবার যখন তাঁকে দেখি তখন দরজায় বসে ক্রোসেটে বাতিদানের মাদুর বুনছিলেন। আগের চেয়ে খুবই বুড়ি হয়ে গেছেন। তিনি আমাকে বসতে দিয়ে বললেন, 'দেখো, বেতের দোলনাটা যেন ছুঁয়ে ফেলো না।

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকানো মাত্র তিনি আবার বলতে শুরু করলেন—আসলে পোজি বাড়ি ছেড়ে যাবার পর কেউ-ই আর এটাতে বসে নি, বা দোল দেয় নি। সে অ্যাপ্রনটা সেলাই করতে করতে যেভাবে দোলনাটার গায়ে ঝুলিয়ে রেখে গিয়েছিল, আজও ঠিক সেভাবেই রয়ে গেছে। আজও আমার বিশ্বাস আছে, পোজি ফিরে এসে এটার হেম সেলাইয়ের বাকি অংশটা শেষ করে ব্যবহার করবে।

গ্রাম্য যুবকটা বলেই চলল, তোমার মায়ের চোখে রোদ এসে পড়ছে দেখে আমি তাকে একটু সরে বসতে বললাম। তিনি চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'জান উইলিয়াম, আমি যখন এ দরজাটায় বসে থাকি তখন বার বার একই কথা মনে জাগে, এই বুঝি পোজি আসছে। এক রাত্রে সে-ত ওই পথ দিয়েই বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। কারণ রাস্তার ভেজা মাটিতে তার জুতোর ছাপ আমার নজরে পড়েছিল। আমি তার ফিরে আসার আশায়ই পথ চেয়ে বসে থাকি। সে ফিরে আসবে, অ্যাপ্রনটার বাকি অংশটুকু সেলাই করে পড়বে। আমার চোখের সামনে দিয়ে ঘোরাঘুরি করবে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার তিনি বলতে লাগলেন, আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে কে যেন ফিসফিসিয়ে বলে 'শোন, মায়ের কথা ভেবে সে যখন অস্থির হয়ে পড়বে তখন সে ওই পথেই তোমার কাছে ফিরে আসবে। বাছা, তাই তো আমি চোখে মুখে রোদ আসা সত্ত্বেও ঠিক এ জায়গাটা ছাড়ি না।

আধ-শুকনো বিল সামার্স কোটের পকেট থেকে একটা গোলাপ ফুল বের করে মিস ক্যারিংটন-এর সামনে ধরে বলল তোমার মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে পাশের একটা গাছ থেকে এ ফুলটা ছিঁড়ে পকেটে রেখে দিয়েছিলাম। আমি তো জানিই, শহরে তোমার সঙ্গে দেখা হলে, এটা দেখে তুমি খুবই আনন্দ পাবে।

মিস ক্যারিংটন সোল্লাসে বলে উঠল, 'সামার্স, আমি কী খুশি হয়েছি তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। কিন্তু আমি নিঃসন্দেহ যে, ওই করমার্স গ্রামে দু'ঘণ্টা কাটানোও আমার কাজে দুষ্কর, দম বন্ধ হয়ে আসবে। একটু ইতস্তত করে এবার বলল, তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমার মধ্যে যে কী খুশির জোয়ার বয়ে চলেছে তা বলার নয়। কিন্তু আমাকে যে এখন উঠতেই হচ্ছে। হোটেলে ফিরে গিয়ে একটু ঘুমিয়ে না নিয়ে আর পারছি না। সামার্স, শহর ছেড়ে যাবার আগে একবারটি আমার সঙ্গে দেখা কোরো কিন্তু। মিস ক্যারিংটন উপস্থিত সবার চোখে চমক লাগিয়ে রেস্তোরাঁর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

মেক-আপ আর সাজপোশাক গায়ে চাপিয়েই হাইস্মিথ হের গোল্ডস্টিনকে সঙ্গে করে একটা কাফে-র দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। অভিনেতা যুবকটা মুচকি হেসে বলল, শেষ পর্যন্ত দেখা

যাচ্ছে হেটোসার-এর ভূমিকায় অভিনয় করার ব্যাপারটা আমার বরাতেই রয়েছে। ছোটখাটো মহিলাটি সামান্যতম আপত্তিও করেন নি।

দেখ, তোমাদের মধ্যে কি কথাবার্তা হয়েছে কিছুই আমি শুনিনি। গোল্ডস্টিন বলল। তবে আমি তোমাকে এটুকু বলতে পারি যে, তোমার মেক-আপ আর অভিনয় দু'-ই চমৎকার হয়েছে। আমার পরামর্শ শোন, কালই ক্যারিংটন-এর সঙ্গে দেখা কর। সল হেটোসার-এর ভূমিকায় অভিনয় করার প্রস্তাব রাখ। তুমি যে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছ তারপর তার অমতের কিছু থাকতে পারে বলে আমি মনে করি না।

পরদিনই এগারটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে অত্যাধুনিক পোশাক পরে অসীম আত্মবিশ্বাস নিয়ে ক্র্যাকবেরির গ্রাম্য যুবক হোটেলে, মিস ক্যারিংটন-এর হোটেলে হাজির হল।

ফরাসী পরিচারিকা মদ্ময়জেল হতেশ বলল, 'আমি দুঃখিত, ক্ষমা করবেন, প্রতিটা দর্শন প্রার্থীকে একই কথা আমাকে বলতে হচ্ছে। নাটকের ব্যাপার স্যাপার নিয়ে মিস ক্যারিংটন আর কারো সঙ্গেই কথা বলছেন না। আর তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন আধা-গ্রাম আধা-শহর কি যেন অঞ্চলটার নাম? হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, ক্র্যাকবেরি কার্ণেয়ারে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চলে যাবেন?

দ্য হারবিন্‌জার

গ্রাম-গঞ্জের বোকা হাঁদা লোকগুলো বসন্তের আগমনবার্তা টের পাওয়ার আগেই শহরে বাবুরা তৃণ-সবুজ ঋতুর উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পেরেছে। চার দেওয়ালে ঘেরা পাথরের কামরায় চেয়ার পেতে দিয়ে আর টেবিলে ডিম ও টোস্ট সহযোগে সকালের জলখাবার সাজিয়ে ভোরের খবরের কাগজ হাতে ঋতুর রানী বসন্তকে নিয়ে আলোচনায় মগ্ন।

অতীতে বসন্তের উপস্থিতি উপলব্ধি করা ছিল সূক্ষ্ম অনুভূতির ব্যাপার। আর সম্প্রতি তার দায়িত্ব বর্তেছে এসোসিয়েটেড প্রেস-এর ওপর।

বসন্তের রূপ সৌন্দর্যের কথা তারযোগে আগে শহরে আসে জ্ঞানী পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য। কিন্তু চাষী মজুররা? তারা তো ফসলের মাঠে মাঠে শীতের নির্মমতা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না।

এতক্ষণ যা প্যাচাল পাড়া হল সবই বাইরের ব্যাপার স্যাপার ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু প্রকৃত অগ্রদূত তো মানুষের অন্তর। অন্তর দিয়ে উপলব্ধির ব্যাপার।

মিঃ র‍্যাগসিডেল, মিঃ কিড আর মিঃ পিটার্স গাছে প্রথম ভায়োলেট ফুলের কুঁড়িটা ফোটার আগে ইউনিয়ন স্কোয়ারের বেঞ্চে শরীর এলিয়ে দিয়ে বসে জল্পনা কল্পনায় মেতে উঠল। কর্মকুড়ে ছন্নছাড়া বাউন্ডুলেদের মধ্যে মিঃ পিটার্সকে সেরা বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে। কেন? কারণ; সে একটা কুড়ের বাদশা, নোংরা সেখ থাটাশ রাজভিখারী আর দুঃখিত সবার চেয়ে বেশী। তবে অস্বীকার করার উপায় নেই। এ মুহূর্তে সে সবার চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ এক ব্যক্তি।

মিঃ পিটার্স-এর ঘরে বৌ আছে। তবে বউ থাকা সত্ত্বেও কিড আর র‍্যাগসি-র সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে মেলামেশার সমস্যা কিছু নেই। আগেও কোনদিন বাধা ছিল না। আজ বৌয়ের ব্যাপারটাই তার সবচেয়ে বড় আগ্রহের ব্যাপার হয়ে উঠেছে। তার বন্ধু বান্ধবেরা এ বিশেষ বন্ধন, বেড়ি পায়ে পরেনি। তাই তার একাজটাকে নিয়ে তারা এতদিন রসিকতা কম করেনি! কিন্তু আজ? কিন্তু বর্তমানে তারা একবাক্যে মেনে না নিয়ে পারছ না যে, তার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি প্রশংসনীয় নইলে বিধাতা পুরুষের আশীর্বাদধন্য এক ব্যক্তি।

আসল ব্যাপারটা হচ্ছে মিসেস পিটার্স পুরো একটা ডলারের মালিক। সেটাকে তার মুঠো থেকে কিভাবে হাতিয়ে নেওয়া যায় এটাই তিন ফেরেববাজের একমাত্র ধান্ধা। আর বর্তমানে পার্কে বসে তারা সে পরিকল্পনাই করে চলেছে।

অর্থের পরিমাণটা এতই বেশী যে, ব্যাপারটা বিশ্বাস করতেই উৎসাহ পাচ্ছে না। সে ভ্রু কুঁচকে

বলল, একটা কথা, সেটা যে ডলার তুমি কি করে নিঃসন্দেহ হচ্ছ, বল তো?

পিটার্স নির্দ্বিধায় বলল, কয়লাওয়ালার মুখে শুনেছি। সে নাকি নিজের চোখে ডলারটা দেখতে পেয়ে আমাকে বলেছে। মুখ বিকৃত করে এবার বলল, আমাকে সকালের জলখাবার কি দিয়েছে জান? এক কাপ কফি, একটামাত্র রুটির টুকরো, আর তার হাতের মুঠোয় কিনা পুরো একটা ডলার!

রাগে কড়মড় করে তাকিয়ে কিড বলল, চল তো আমরা গিয়ে ঘা-কতক বসিয়ে দিয়ে, মুখে তোয়ালে চাপা দিয়ে ডলারটা ছিনিয়ে নিয়ে আসি। মেয়ে মানুষকে তুমি তো ডরাও না, ঠিক কিনা?

আরে ব্বাস! আমাদের একটা গর্তের মধ্যে ঠেসে চ্যাপ্টা করে দেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব নয়। সবচেয়ে বড় কথা, এক গাদা লোকের মাঝে একটা মেয়ে মানুষ নাস্তানাবুদ করার পক্ষপাতি এ বান্দা অন্তত নয়। র‍্যাগসি বলল।

এবার মিস্টার পিটার্স গর্জে উঠল, খবরদার! ভুলে যেও না, তোমরা আমার বৌয়ের সম্বন্ধে এসব মন্তব্য করছ। একটা মেয়ে মানুষের গায়ে হাত তোলা—তবে ভালবেসে দিলে অবশ্য—'

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই র‍্যাগ্‌সি বলল, আরে একটা ডলার বাগাতে পারলে আমরা তো কতকিছুই করতে পারব।

অধিকতর দৃঢ়তার সঙ্গে পিটার্স বলে উঠল, ধানাই পানাই ছাড়! যে করেই হোক ওই ডলারটা আমাদের হাতাতেই হবে। আরে ব্যাপারটা আমার বৌকে নিয়ে। অতএব আমার ওপরেই দায়িত্বটা দিয়ে তোমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পার। আমি এখনই বাড়ি গিয়ে যে করেই হোক সেটা হাতিয়ে নিয়ে তবেই ফিরব। তোমরা বরং এখানেই অপেক্ষা কর।

বীরের মত ভাব নিয়ে কিড বলল, আরে ধ্যুৎ! একটা মেয়েমানুষকে কব্জা করা আবার একটা সমস্যা নাকি! পাঁজরের ওপর কষে দু' ঘা দিলে বাপ্‌ বাপ্‌ করে বলে দেবে ডলারটা কোথায় রেখেছে।

গীর্জার পুরোহিতের মত ভাব নিয়ে পিটার্স মন্তব্য করল, একটা মেয়ে মানুষের গায়ে হাত দেওয়া কোন পুরুষেরই উচিত নয়। তার চেয়ে বরং কণ্ঠনালিটা দু'হাতে একটু চেপে ধরা, ব্যস, খেল্‌ খতম। কোন নজীরও থাকবে না। আমি চললাম। তোমরা এখানেই অপেক্ষা কর। ডলারটা হাতিয়ে নিয়ে তবেই ফিরব।

পিটার্সরা এমন অন্ধকার স্যাঁতসেতে একটা খুপড়িতে থাকে যে বাড়িওয়ালা ভাড়া নিতেই সঙ্কোচ বোধ করে। বাড়িটা দ্বিতীয় এভিনিউ আর নদীটার মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। মিসেস পিটার্স এটা ওটা করে সামান্য কিছু রোজগারপাতি করে। আর মিঃ পিটার্স বছরে একটা পেনি রোজগার না-করার রেকর্ড গড়ার অধিকারী। তা সত্ত্বেও পরস্পরের ঘৃণা গায়ে না মেখে তারা একই ছাদের তলায় বাস করছে। এতেই তারা অভ্যস্ত হয়ে গেছে। আর এ অভ্যাস শক্তির জন্যই পৃথিবীটা আজও ভেঙে গুঁড়িয়ে যায় নি।

মিসেস পিটার্স ঘরের চেয়ার দুটোর মধ্যে যেটার ওপর ভরসা করা চলে সেটার ওপর নিজের দু'শ পাউন্ড ওজনের দেহটার ভার চাপিয়ে দিয়ে জানালা দিয়ে বিপরীত দিকের দেওয়ালটার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে আছে। ঘরের যাবতীয় সামগ্রী একটা গরুর গাড়িতে চাপিয়ে যেখানে খুশি নিয়ে চলে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু মাগনা দিলেও কোন গাড়োয়ানই তা নিতে রাজি হবে না।

পিটার্স খুপড়িটায় ঢোকামাত্র তার চোখের তারায় একটা বাসনার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তার দৃষ্টির অর্থ বুঝতে বৌয়ের দেরী হ'ল না। কিন্তু তৃষ্ণার বদলে সেটাকে ক্ষুধা বলেই সে-বিশ্বাস করল। সে বলল, শোন, রাতের আগে এখানে খাবার কোন আশাই নেই। শিকারী কুকুরের মত তোমার ওই মুখটাকে ভালোয় ভালোয় বাইরে নিয়ে যাও।

বৌয়ের কথায় কান না দিয়ে মিঃ পিটার্স নীরবে উভয়ের মধ্যে দূরত্বটা সম্বন্ধে ধারণা করে নিল। ভাবল, আচমকা আক্রমণ করে পাহাড়ের মত তার শরীরটাকে ধরাশায়ী করা সম্ভব হলে হতেও পারে। কণ্ঠনালীটাও হয়ত ধরা যেতে পারে। বন্ধু দু'জনের কাছে কথাটা বুক ফুলিয়েই বলেও ছিল। কিন্তু আজ অবধি বৌয়ের গায়ে টোকাটা দেওয়ার হিম্মৎ তার হয় নি। তাই চারদিক বিবেচনা করে কূটবুদ্ধির মাধ্যমে কাজ হাসিল করার ফিকির খুঁজতে লাগল।

মিঃ পিটার্স ভাবে গদগদ হয়ে বৌয়ের কাছে কথা পাড়ল, শোন, তোমার কাছে কি একটা

ডলার আছে? বহু চেষ্টা করে একটা চায়ের দোকানে চাকরি জোগাড় করেছি। কাল থেকেই লেগে পড়তে হবে। এক ডলার আছে কি?

আছে। চাকরি পেয়েছ সে তো ভাল কথা। কিন্তু ডলার—।

আরে বুঝছ না। তার আগে আমাকে যে কিনতে হবে এক জোড়া—

ডলারের নোটটাকে টক করে বুকের ভেতরে চালান করে দিতে দিতে তার বউ বলল, ধাপ্পা দেওয়ার আর জায়গা পাওনি! কোট, ওভারকোট ধোয়াধুয়ি করে আমি কত কষ্টে এ নোটটা জমিয়েছি। হাতে হাঁজা ধরে গেছে। আর সেটাকে কিনা—ধান্ধাটা ছেড়ে কথা বল।

মিঃ পিটার্স এবার উপায়ান্তর না দেখে মোক্ষম অস্ত্র ব্যবহারের চিন্তা করল। তুমি ও বুঝছ, এভাবে লড়াই করে পশুর মত জীবন যাপন করার কোন অর্থই হয় না। চিরটাকাল তুমি আমাকে ভুল বুঝে আসছ। ঈশ্বর সাক্ষী, মাথা তুলে দাঁড়ানোর জন্য আমি মরিয়া চেষ্টা করে চলেছি, তবু—।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিসেস পিটার্স খেঁকিয়ে উঠল, 'থাক, খুব হয়েছে! এরকম কথা শুনে শুনে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। খালি কফির কৌটোটার পিছনে কার্বোলিক অ্যাসিড আছে, সেটা গলায় ঢেলে মনের সাধ মেটাও, বাধা নেই।

আগেকার কায়দা কৌশলগুলো ব্যর্থ হওয়ায় পিটার্স ভাবতে লাগল এবার কোন্ কৌশল অবলম্বন করে কাজ হাসিল করা যাবে। ওদিকে যে পার্কের লোহার পাওয়ালা বেঞ্চে বসে তার দু'বন্ধু অধীর অপেক্ষায় আছে। আর এসবের মাঝখানে ডলারটাকে হাতাবার প্রতিবন্ধকতা করে চলেছে দু'শ' পাউন্ড ওজনের গাছের গুঁড়ির আকৃতি বিশিষ্ট তার নচ্ছাড় বৌটা। একদিন এ-ই তো এত্তটুকু পুঁচকে এক মেয়ে ছিল। তখন ইচ্ছা করলেই—ধ্যাৎ, সেদিন যদি সম্ভব হ'ত তবে আজই বা হবে না কেন? বহুদিন সে এমন কাজ করেনি। নির্মম-নিষ্ঠুর দ্রারিদ্র ও পারস্পরিক ঘৃণা আর অপমান সব কিছুই তো সে খুন করেছে। তার মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। কিন্তু কিভাবে? কিভাবে সে—ধ্যাৎ, কিড আর র‍্যাগসি সেখানে তার অপেক্ষায় বসে হা-পিত্যেশ করছে! সে তো করতে অনাগ্রহী নয়। কিন্তু কিভাবে কাজটা হাসিল করে পথের কাঁটাটাকে চিরদিনের মত সরিয়ে ফেলবে?

পিটার্স তার বৌয়ের মেদবহুল দশাসই চেহারাটার দিকে তাকাল। বুঝল একটু আগে সে কাঁদছিল। সে জানালা দিয়ে পথের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দাঁড়িয়ে। পিটার্স থলথলে মাংসপিণ্ডটার দিকে আঁড় চোখে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবল, না, আর কিছুই হবার নয়।

শেষ চেষ্টা করার জন্য পিটার্স বৌয়ের দিকে দু'পা এগিয়ে তার কাঁধে হাত রাখল। সাধ্য মত ভাব বিমুগ্ধ কণ্ঠে বলল, 'ক্লারা, প্রিয়তমা আমার, লক্ষ্মী সোনা,—এমন কড়া কড়া কথা কেন বলছ, বল তো? তুমি যে আমার প্রাণাধিক, বোঝ না?

হ্যাঁ, ওষুধে কাজ হতে চলেছে। গাছের ডালে ডালে যেন বসন্তের কচিপাতা উঁকি দিচ্ছে, বসন্তের অগ্রদূত। আরে, এরই নাম ইঁদুর ধরার কল। ব্যাপারটা হাসির উদ্রেক করলেও ফাঁদ পাতার উপযুক্ত সময় এটা—ইঁদুর ধরার ফাঁদ পাতাও হয়ে গেছে। তোমরা ম্যাড়া স্যার আর আমরা সবাই ফাঁদে আটকা পড়ে অনবরত কাৎড়ে চলেছি।

পিটার্স-এর বিশালদেহী বৌটা নায়েগ্রার মত গর্জন করে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দু'হাতে সাঁড়াশির মত তার গলাটাকে আঁকড়ে ধরল। একটু সুযোগ পেলেই পিটার্স হয়ত বৌয়ের যথাস্থানে, ভল্টের মধ্যে ঝট করে হাতটা চালান দিয়ে কাজটা হাসিল করে ফেলত। কিন্তু বৌয়ের মাংসল হাত দুটো তার হাত দুটোসহ শরীরটাকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরল ট্যাঁ-ফোঁ করার উপায় রইল না।

ভাবাপ্লুত কণ্ঠে পিটার্স-এর বৌ তাকে বলল, পিটার্স প্রিয়তম আমার, তুমি কি আমাকে অন্তর থেকে ভালবাস?

পিটার্স তার পিঠের মাংসপিণ্ডের ওপর হাত বুলাতে বুলাতে বলল, তুমি বলছ কী ক্লারা! আমি চিরদিন তোমাকে যেমন পাগলের মত ভালবাসতাম আজও ঠিক তেমনই ভালবাসি। তবে, তবে—একী তুমি তো দেখছি অসুস্থ! তোমাকে কেমন ক্লান্ত—চকের মত ফ্যাকাসে তোমার মুখ! একটু অপেক্ষা কর। আমি এখনই আসছি। তোমার রোগটা ধরতে পেরেই। এখনই আসছি।

ভয়ঙ্কর একটা বিদায় আলিঙ্গন দিয়ে পিটার্স-এর বৌ থপ্‌থপ্ করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

পিটার্স-এর মুখে ম্লান হাসির রেখা ফুটে উঠল। আপন মনে বলে উঠল, আর যা-ই হোক, তাকে তো অন্তত ঘর থেকে বের করতে পেরেছি আরে ব্বাস! বুড়িটার বোকা হাঁদা পাঁজরের তলায় যে এখনও ভালবাসা লুকিয়ে আছে আমি ভাবতেই পারি নি। হায় ঈশ্বর, বহু আকাঙ্ক্ষিত ডলারটা যে প্রায় হাতের মুঠোর মধ্যেই চলে এসেছে। তবে সে এত কষ্ট করে বাইরে গেল কেন?

এক বোতল ওষুধ নিয়ে পিটার্স-এর বৌ আগের মতই প্রায় গড়াতে গড়াতে ঘরের ভেতর ঢুকে এল। স্বামীর দিকে বোতলটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, বরাত ভাল যে, ডলারটা বুকে করে আঁকড়ে রেখেছিলাম! আর যা ছিল সবই তো তুমি উড়িয়ে দিয়েছ। দু' চামচ ওষুধ পিটার্সকে খাইয়ে দিয়ে সে তার গা-ঘেঁষে, প্রায় কোলের ওপর বসে গলা জড়িয়ে ধরে ভাবাপ্লুত কণ্ঠে বলল, প্রিয়তম, একবার, মাত্র আর একবার তুমি আমাকে চুম্‌কি চুম্‌কি বলে ডাক।

পিটার্স স্থবিরের মত বসে বৌয়ের হাসিমাখা মুখটার দিকে তাকিয়ে ভাবল—সবই ঋতুরাজ বসন্তেরই কারসাজি। বৌটার বুকে বসন্ত রোমাঞ্চ সৃষ্টি করে চলেছে।

বসন্ত! বসন্ত এসে গেছে। এদিকে ইউনিয়ন স্কোয়ারে মিঃ কিড আর মিঃ র‍্যাগ্‌সি অসহনীয় অস্থিরতার মধ্যে প্রতিটা মুহূর্ত কাটাচ্ছে।

পিটার্স চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আপন মনে বলে উঠল, হায়! প্রথমেই যদি তার কণ্ঠনালীটা টিপে ধরতাম। হায়! সব গেল।

নিমিসিস অ্যান্ড দ্য ক্যান্ডিম্যান

সকাল আটটা। সেল্টিক জাহাজটা ছাড়ার সময় হয়ে গেছে। উভয়ে সে জাহাজেরই যাত্রী কথা প্রসঙ্গে হনোরিয়া বলল।

যুবক ইভস্‌ বলল, আমিও এরকমই শুনেছিলাম। সে জন্যই তোমাদের যাত্রা শুভ হোক, কথাটা জানাতে এলাম।

কথাটা না শুনে উপায় নেই স্বীকার করছি। বিশ্বাস কর। তোমার কাছে গিয়ে যে খবরটা দেব সে সময় সুযোগ ছিল না।

বাইরের রাস্তা দিয়ে ফেরীওয়ালা গলা ছেড়ে হাঁকতে হাঁকতে চলেছে, মোরব্বা! মোরব্বা চাই? ভাল, টাটকা মোরব্বা।

জানালার কাছে এগিয়ে গিয়ে রাস্তার দিকে মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে নিয়ে হনোরিয়া সোল্লাসে বলে উঠল, আরে, আমাদের সেই পুরনো মোরব্বাওয়ালা যাচ্ছে। দু'-একটা খেতে হত। ব্রডওয়েতে যে মোরব্বা পাওয়া যায় এর অর্ধেকও ভাল নয়। মুখে তুলতেই ইচ্ছা করে না। হনোরিয়ার হাঁক শুনে মোরব্বাওয়ালা ম্যাডিসন স্কোয়ারের পুরনো বাড়িটার সদর দরজার সামনে তার ঠেলাগাড়িটা দাঁড় করাল। তার পোশাক-আশাকে একটা উৎসব উৎসব ভাব।

হনোরিয়া সহানুভূতি মিশ্রিত করুণার স্বরে বলল, হয়ত তার বিয়ের সময় ঘনিয়ে এসেছে। আগে তো তাকে রাস্তায় বেরোতে দেখি নি? কয়েক মাসের মধ্যে আজই প্রথম তাকে মোরব্বা নিয়ে পথে ফেরী করতে দেখলাম।

ইভস্‌ জানালা দিয়ে ফুটপাতের ওপর একটা মুদ্রা ছুঁড়ে দিল। মোরব্বাওয়ালা এক ঠোঙা মোরব্বা জানালা দিয়ে গলিয়ে দিল। পরিচিত খদ্দের। কোন্‌ মোরব্বা চাচ্ছে তার ভালই জানা আছে।

মোরব্বার ঠোঙাটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে ইভস ব্যস্ত গলায় বলল, যেও না, দাঁড়াও। লম্বা লম্বা পায়ে সে লেখার ডেস্কের কাছে গেল। ড্রয়ার থেকে একটা পোর্টফোলিও বের করল। সেটার বোতাম খুলে ভেতর থেকে এক চিলতে কাগজ বের করল। কাগজটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই সে এবার বলল, মোড়ক থেকে যেটা প্রথম বের করেছিলাম সেটা এ কাগজের টুকরো দিয়ে মুড়ে রাখা ছিল।

হনোরিয়া-র হাত থেকে কাগজের টুকরোটা নিতে নিতে ইভস্‌ ক্ষমা চাওয়ার স্বরে বলল, সে তো অন্তত এক বছর আগেকার ব্যাপার। সে কাগজের গায়ে লেখা ছত্র দুটো পড়তে লাগল। মাথার ওপরে নীল আকাশ থাকবে যতদিন প্রিয়তম মোর, আমিও থাকব তোমারই ততদিন।

হনোরিয়া বলল, এক হপ্তা আগেই তো আমাদের যাবার কথা ছিল—ঠিক কিনা? এবারের ভ্যাপসা গরমে শহরটা ধরতে গেলে জনমানবশূন্য হয়ে পড়েছে। কোথাও গিয়ে যে মাথা গুঁজব তেমন কোন জায়গাও খালি নেই। তবে দু'-একটা জায়গার খোঁজ আছে, আমোদ-প্রমোদ আর নাচ-গান দেখে আনন্দে কাটিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

এত সহজে রণে ভঙ্গ দেবার পাত্র ইভস্ অন্তত নয়। তাই সে পূর্ব প্রসঙ্গের জের টেনে বলল, সেবার আমি মোরব্বাওয়ালাকে ব্রডওয়ের ধারে পাঁচ ডলার দিয়েছিলাম। কথা বলতে বলতে সদ্য কেনা মোরব্বার ওপরের কাগজের টুকরোটা হনোরিয়া-র দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, পড়। পড়ে দেখ।

হনোরিয়া কাগজের চিলতেটার ওপরে চোখের মণি দুটো বুলাতে লাগল, কেমন করে বাঁচাতে হবে, জীবন শেখায় আমায়/প্রেম আমাদের শেখায়, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর।

ছত্র দুটো পড়তে পড়তে হনোরিয়া-র গালে রক্তিম ছোপ দেখা গেল। ইভস্ সচকিত হয়ে যন্ত্রচালিতের মত তড়াক করে লাফিয়ে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, হনোরিয়া!

হনোরিয়া তার ভুলটা শুধরে দিতে গিয়ে বলল, মিস ক্লিটন! শোন, আমি তোমাকে আবারও সতর্ক করে দিচ্ছি, ভবিষ্যতে ভুলেও যেন ও নামটা মুখে এনো না।

তার কথাটাকে পাত্তা না দিয়ে ইভস্ আবারও বলল, হনোরিয়া, আমার কথাটা তোমাকে রাখতেই হবে। আমি ক্ষমার অযোগ্য, আমার জানা আছে। তবু ক্ষমা আমাকে পেতেই হবে। মানুষের মধ্যে মাঝে মধ্যে এমন সব উন্মাদনা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে যার জন্য স্বভাবের ওপর দোষ চাপানো যায় না। একমাত্র তোমাকে ছাড়া আমি বিশ্বসংসারের সব কিছুর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে পারি। সাইরেন আমাকে তোমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তার সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে এসেছি। ফেরিওয়ালার কাছ থেকে মোরব্বার মাধ্যমে যে কবিতা আমি খরিদ করেছি সেটাই আমার হয়ে ওকালতি করুক। পৃথিবীতে তুমিই আমার ভালবাসার পাত্রী অন্য কাউকে দেওয়া সম্ভব নয়। প্রিয়তমা, তোমার প্রেম-ভালবাসা আমাকে মার্জনা করুক। আমি পরমপিতার নামে কিড়া কেটে বলছি, যতদিন আকাশ নীল থাকবে ততদিন আমার ভালবাসাও সত্য হয়ে থাকবে। শোন হনোরিয়া, তোমাকে ছাড়া আমি কাউকে জানি না, আর জানতে চাইও না।

একটা সঙ্কীর্ণ গলি পথ পশ্চিম অঞ্চলে সপ্তম আর অষ্টম এভিনিউর মধ্যের ব্লকটাকে দ্বিখণ্ডিত করেছে। এ অঞ্চলটায় নাটকের খুবই দহরম মহরম। সবাই একে নাটুকে-পাড়া বলে এক ডাকে চেনে। ছত্রিশ জাত আর বত্রিশ ভাষার একত্রে সমাবেশ ঘটেছে এখানে। তবে বোহেমিয়ায় পরিবেশের গন্ধই বেশী। কিন্তু অঞ্চলটায় পায়ে পায়ে বিপদ জড়িয়ে থাকে, স্বীকার না করে উপায় নেই। গলিটার শেষ প্রান্তে মোরব্বাওয়ালা থাকে। সে যেখানে তার ঠেলাগাড়িটাকে রাখে তার ঠিক ওপরেই একটা খিড়কি আছে। এরিয়ল রক্ গার্ডেন-এর রূপসী তার গায়ে চেয়ার পেতে বসে। শীতল বায়ু সেবন করে। এখানেই সে ভেজা চুল ছড়িয়ে দিয়ে বসে থাকে। ফটোগ্রাফারদের কাছে যা সবচেয়ে বেশী আকর্ষণীয়। সে কাঁধ দুটোর ওপর ঢিলে করে জড়িয়ে রেখেছে একটা ফিনফিনে সূর্যমুখী রঙের চাঁদর। কনুই পর্যন্ত বেলুনের মত নিটোল হাত দুটো অনাবৃত। সে দুটোকে নিয়ে মাতামাতি করার মত কোন ভাস্কর সেখানে নেই তাই বাঁচোয়া। মদময়জেল আদেল এ-বিশেষ ভঙ্গিতে এখানে বসে থাকে আর তার দাসী ফেলিয়া সাধ্যাতীত প্রয়াস চালিয়ে তার পা দুটোকে ঝকঝকে চকচকে করে তোলে।

মদময়জেল কিছুদিন যাবত লক্ষ্য করছে, মোরব্বাওয়ালা যুবকটা রোজই তার জানালাটার নিচে, পথের ধারে দাঁড়ায়। তোয়ালে দিয়ে নিজের সুঠাম দেহটাকে যত্ন করে মুছতে থাকে। কিছু সময় হাওয়ায় জিরিয়ে শরীরটাকে একটু ঠাণ্ডা করে নেয়। দাসীদের তৎপরতায় এসময়ে মদময়জেল-এর হাতে কোন কাজই ধরতে গেলে থাকে না। আসলে তার কাজ বলতে তো একটাই, মনমোহিনী রূপের ডালি মেলে ধরে পথচারী পুরুষদের আকৃষ্ট করা।

মদময়জেল ভালই জানে, মোরব্বাওয়ালা তার বাঞ্ছিত শিকার অবশ্যই নয়। তবে এ-ও তো খুবই সত্য যে, তার জন্মই হয়েছে পুরুষ জাতির সঙ্গে লড়াই করার জন্য। আর সে-ও তো পুরুষ

জাতিরই একজন বলিষ্ঠদেহী যুবক।

এ পুরুষটার দিকে বার বার নিরাসক্ত অনাগ্রহী তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকাবার পর তার ভেতরটা ক্রমেই যেন দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল। সে এমন হৃদয়স্পর্শী ভাবাপ্লুত দৃষ্টিতে তাকায় যার মিষ্টতা তার মোরব্বাগুলো থেকে অনেক, অনেক বেশী মিষ্টি।

এক সময় মোরব্বাওয়ালার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে, ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে আবেগ মধুর স্বরে সে বলল, এই যে শুনছ, আমি যে রূপসী তা কি তোমার চোখে ধরা পড়ে না?

কপালের ঘাম মুছতে মুছতে মোরব্বাওয়ালা কর্কশ স্বরে বলে উঠল, মাদাম, রঙচঙে, বাহারী একটা পত্রিকার প্রচ্ছদ হবার মত রূপই বটে আপনার। আসলে যারা রূপ সৌন্দর্যের পূজা করে থাকে এটা তো তাদেরই বিচার্য। আমি বেচি মোরব্বা, সৌন্দর্যের কি-ই বা বুঝি? মাদাম, ফুলের তোড়ার বাঞ্ছা যদি আপনার থাকে তবে রাত্রি ন'টা থেকে বারোটায় অন্য কোথাও ধান্ধা করুন, পেয়ে যাবেন।

আশ্চর্য ব্যাপার! মোরব্বাওয়ালা তার মনকে দারুণভাবে আকর্ষণ করছে। সে চিরুণির সঙ্গে উঠে আসা কিছু চুল হাতে গুলি পাকিয়ে জানালা দিয়ে নিচে ফেলে দিল। আগের মতই আবেগ, মধুর স্বরে এবার সে বলল, 'সত্যি করে বল তো মোরব্বাওয়ালা, এরকম লম্বা ও নরম চুলের মালিক কোন নারীর সঙ্গে মনের মিল, মানে মনের মানুষ কোথাও কেউ আছে, কি? আর যার হাত দুটো এমন বেলনের মত নিটোল, আছে কেউ? কথা বলতে বলতে সে জানালা দিয়ে একটা হাত ঝুলিয়ে দিল।

ধ্যাৎ! বাজে কথা ছাড়ান দিন মাদাম। সদা মালিশ করা একটা কনুই পর্যন্ত খোলা হাত আর কটা নরম লম্বা চুল দেখিয়ে আমার মন মজাতে পারবেন না। নিশ্চিত জানবেন, সে বান্দা আমি নই। আসলে রঙচঙ মেখে সঙ সেজে বুড়ো আপেল গাছের তলায় নাচন কোদনে আপনি খুবই ওস্তাদ, বুঝতেই পারছি। আপনাকে আগেই হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, মাথায় টুপি চাপিয়ে দিয়ে আমাকে গীর্জায় নিয়ে যাবার ধান্ধা করবেন না। তাই বলছি কি, রঙ্গ রসিকতা রাখুন। বৃষ্টি নামল বলে, বুঝতে পারছেন না মাদাম?

ওহে মোরব্বাওয়ালা তোমার চোখে কি আমি সুন্দরী নই?

ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে মোরব্বাওয়ালা বলল, চমৎকার! নিজেই নিজের প্রেস-এজেন্টের কাজ চালিয়ে নিয়ে বহু টাকা বাঁচাচ্ছেন দেখছি! দেখুন, আমি নিয়মিত চুরুট ফুঁকি। কিন্তু কই, পাঁচ সেন্ট দামের কোন চুরুটের প্যাকেটে তো আপনার ছবি নজরে পড়ে না। যাকগে। আমি কিন্তু নতুন ধরনের মেয়ে মানুষকে আমার জীবন সঙ্গিনী করতে আগ্রহী। যাদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত আমার নখদর্পণে। দিনভর ভাল কেনাবেচা করে। সাতটায় কিছু মাংস আর পিঁয়াজি—।

বাজে বোকো না। যা বলছি শোন, আমি যে সুন্দরী কথাটা তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই-ই। সবাই বলছে আমার দেহ থেকে রূপ সৌন্দর্য উপচে পড়ছে, অতএব তোমার মুখ থেকেও বলিয়ে ছাড়ব, বলে রাখছি।

সবাই বলছে বলেই আমাকেও অন্ধের মত কথাটা সমর্থন করতে হবে? আমি যে সান্ধ্য পত্রিকাটা পড়ছি তাতে চমৎকার একটা গল্প ছাপা হয়েছে। কিছু সংখ্যক মানুষ গুপ্তধনের খোঁজে সমুদ্রে ডুব দিচ্ছে আর কয়েকটা জলদস্যু পাহাড়ের ওপর থেকে তাদের ওপর নজর রেখে চলেছে। সেখানে কিন্তু জলে স্থলে অন্তরীক্ষে মেয়ে মানুষের চিহ্নও নেই। শুভ সন্ধ্যা। কথাটা শেষ করেই সে গাড়িটা ঠেলতে ঠেলতে যে নোংরা বাড়িটায় মাথা গুঁজে রাত্রি কাটায় সেখানে ঢুকে গেল। মদময়জেল বিস্ময় মাখানো দৃষ্টিতে যুবক মোরব্বাওয়ালার ফেলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে রইল।

যে লোকের মেয়ে মানুষ সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই তার কাছে তো ব্যাপারটা অত্যাশ্চর্য অবিশ্বাসই মনে হবে। হবারই কথা। রোজ একই সময়ে মদময়জেল জানালায় এসে দাঁড়ায় আর তার জঘন্য পৈশাচিক মনোবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য তৎপরতা চালাতে লাগল। একদিন সে তার মনের মানুষ নাগরটাকে নিজের সুসজ্জিত ঘরে ডেকে এনে ব্যর্থ প্রয়াস চালাতে লাগল। তাকে

কঠিন কঠোর আঘাত হানতেও এতটুকু দ্বিধা করল না। মদময়জেল রোজ যখন চুল বাঁধাছাদায় ব্যস্ত থাকে ঠিক তখনই মোরব্বাওয়ালা তার ঠেলাটাকে দাঁড় করিয়ে বিশ্রাম করে। আর রোজই মদময়জেল রূপের বাণে তাকে বিদ্ধ করার ব্যর্থ প্রয়াস চালায়। চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে জানালা থেকে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু সে এমন করে তার প্রতি কাম-বাণ চালায় যে, বহু সাধুসন্তও বুঝি আকাশের চাঁদ হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে যেত।

মদময়জেল এক বিকালে নিত্যকার অভ্যাস মত জানালায় দাঁড়াল। যুবক মোরব্বাওয়ালার দিকে দৃষ্টিপাত করল বটে, কিন্তু অন্যদিনের মত উত্ত্যক্ত করল না। সে বলল, ওহে, আমার চোখের দিকে তাকাও।

সে কর্কশ স্বরে হেসে তার দিকে তাকাল। মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে কোটের পকেটে চালান করে দিল।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। এতেই হবে। মদময়জেল বলল।

পরদিন সন্ধ্যায় মোরব্বাওয়ালা আবার জানলাটার কাছে এল। কিন্তু এক অত্যাশ্চর্য দৃশ্য দেখা গেল। সে যেন গতদিন বা তার আগের মোরব্বাওয়ালা নয়। মাথার চুল সযত্নে পাট করা, গায়ে ঝলমলে নতুন পোশাক। মুখের তামাটে রঙটা পাল্টে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

মাথার ওপরের জানালাটা খালি। মোরব্বাওয়ালা মাথার পিছনদিকটাকে পিঠের সঙ্গে ঠেকিয়ে জানালাটার দিকে অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে তাকিয়ে রইল। মাংস জড়ানো এক টুকরো হাড়ের প্রত্যাশায় কুকুরের মত অপলক চোখে সে তাকিয়ে রইল।

একটু বাদেই জানালা পথে মদময়জেল-এর মুখটা দেখা গেল। মোরব্বাওয়ালার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছোট্ট করে হাসল। কিন্তু পরমুহূর্তেই তার সে হাসিটুকু মিলিয়ে গেল। সে নিঃসন্দেহ হল, শিকার ফাঁদে পড়েছে। আর এরই জন্য তার উৎসাহ মুহূর্তে জল হয়ে গেল।

মোরব্বাওয়ালা বলে উঠল, আজকের দিনটা ভারি চমৎকার, তাই না? গত একটা মাসের মধ্যে আমার কাছে আজকের দিনটাই সবচেয়ে সেরা মনে হচ্ছে। আগামীকাল বৃষ্টি হবে মনে হচ্ছে কি?

মদময়জেল তার টোল-খাওয়া চিবুকটাকে জানালার শিকের সঙ্গে আলতোভাবে ঠেকিয়ে ভাবাপ্লুত কণ্ঠে বলল, মোরব্বাওয়ালা বল তো তুমি আমাকে ভালবাস না?

ভাঙা ভাঙা গলায় মোরব্বাওয়ালা বলল। আমি অল্প অল্প করে আজ অবধি আটশ ডলার জমিয়েছি। আমি কি একবারও বলেছি, আপনি সুন্দরী নন, বলুন? ডলারগুলো আপনি নিয়ে আপনার প্রিয় কুকুরটার জন্য একটা বকলাস্ কিনে দেবেন।

তার কথা শেষ হতে না হতেই মদময়জেল গলা ছেড়ে হেসে উঠল। তার হাসির রোল মোরব্বাওয়ালার কানে যেতেও দেরী হল না। মদময়জেল হাসতে হাসতে অশ্বক্ষুরাকৃতি পিনটা নাড়তে নাড়তে বলল, মোরব্বাওয়ালা, তুমি আমার জানালার কাছ থেকে চলে যাও, তোমার দিকে চোখ পড়তেই আমার ভেতব থেকে ঠেলে হাসি বেরিয়ে আসছে। দম বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড় হচ্ছে।

একটু বাদেই পরিচারিকা ফেলিস একটা হাত চিঠি মদময়জেল-এর হাতে দিল।

ঠেলাগাড়িটার হাতল ধরে মোরব্বাওয়ালা গাড়িটাকে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যেতে যেতে চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ন্যায় বিচার কোথাও নেই দেখছি!

গজ তিনেক এগিয়ে গিয়েই সে গাড়িটাকে দুম করে দাঁড় করিয়ে দিল। মাদাম মদময়জেল-এর জানালা দিয়ে বুকফাটা আর্তস্বর ভেসে আসতে লাগল। সে যেন স্পষ্ট শুনতে পেল কে যেন দুম করে আছাড় খেয়ে পড়ে গেল। গাড়িটা ফেলে সে উদভ্রান্তের মত ছুটে জানালাটার কাছে এল। সে মুখ তুলে চিল্লিয়ে উঠল। ব্যাপার কি? হয়েছে কি?

ফেলিস বলল, এই মাত্র একটা দুঃসংবাদ পেয়ে মদময়জেল বড্ড মুষড়ে পড়েছেন। যাঁকে তিনি মন-প্রাণ সঁপে দিয়েছেন, ভালবেসে দেউলিয়া হয়ে গেছেন তিনি চলে গেছেন, মঁসিয়ে ইভস্ তার নাম। হয়ত শুনেও থাকতে পারেন। হায় ঈশ্বর! পুরুষ জাতটাকে তুমি কী ধাতু দিয়েই না তৈরী করেছ! গতকাল জাহাজে চেপে তিনি এখান থেকে কেটে পড়েছেন।

রোজেস, রাসেস অ্যান্ড রোমান্স

ভ্রমণবিলাসী, চিত্রশিল্পী আর কবি রাভেনেল হাতের পত্রিকাটাকে ঘরের মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল।

দালালের করণিক জানালার গোরবাটের ওপর বসে। সে বলে উঠল, রাভি, ব্যাপারটা কি বলত? সমালোচকরা কি তোমার সব লেখাগুলোকেই বাতিল করে দিয়েছেন?

স্বাভাবিক সুরেই রাভেনেল বলল, রোমান্সের অপমৃত্যু ঘটেছে। পত্রিকাটা মেঝে থেকে তুলে নিয়ে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে সে এবার আগের মতই হাল্কাভাবে বলতে লাগল, ম্যাসি, তোর মত সাধারণ মানুষের মাথায় তো এসব ব্যাপার ঢোকার কথা নয়। এ পত্রিকাটায় এক সময় দু মরিয়ের, পো, ব্রেট থার্ট, শ্যানিয়ার, হুইটম্যান লাউয়েল প্রভৃতি প্রখ্যাত সব লেখকের লেখা ছাপা হত। এ থেকেই ব্যাপারটা সম্বন্ধে ধারণা করতে পারছ। এ সংখ্যায় এরকমই একটা সাহিত্যের আসর তোমার জন্য জমিয়ে তোলা হয়েছে। যারা যুদ্ধ জাহাজে কয়লা জোগায়, কয়লা সাজিয়ে গুছিয়ে জমা করে রাখে তাদের কর্মকাণ্ড নিয়েই একটা লেখা হয়েছে। আর একটা ধারাবাহিক প্রবন্ধ, ওষুধ তৈরীর পদ্ধতি সম্বন্ধে একটা লেখা, এক মহিলা গোয়েন্দাকে নিয়ে একটা গল্প, একটা কবিতা আর একটা কাল্পনিক গল্প। সবশেষে বলতে হয় উনিশ পাতা জুড়ে সম্পাদকীয়র নামে কথার ফুলঝুরি তো আছেই। স্যামি, সবগুলোকে পাশাপাশি রেখে বিচার বিশ্লেষণ করলে বলতেই হয় এ যেন রোমাঞ্চকর মৃত্যু সংবাদ। আমি অন্তত এ কথাই বলব।

চামড়ার আরাম কেদারাটার ওপর শরীর এলিয়ে দিয়ে ম্যাসি ব্রাউন বেশ আরাম আয়েশেই বসে। জুতো থেকে শুরু করে সবকিছুর রঙই মনোলোভা ভাবে ম্যাচ করা।

রাভেনেল-এর ঘরের জানালাটা খোলামাত্র হরেকজাত আর হরেক রঙের পাতায় ভরা গাছাগাছালি চোখে পড়ে। বাড়িটার ভিতরের দিকে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বাস করেন। বাড়িটার প্রতি তাঁর অসীম মায়া পড়ে গেছে। তাই এটাকে বেচে দিতে তিনি মোটেই উৎসাহী নন। দুর্গতুল্য বাড়িটার যা কিছু রোমাঞ্চ, এটুকুই ব্যস।

ম্যাসি ব্রাউন সপ্তাহে তিন-চারবার রাভেনেল-এর ফ্ল্যাটে আসে। সে কবি সমিতির সদস্য। আর পূর্বতন ব্রাউনরা কোন না কোনদিক থেকে বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। তবে স্যামি কারবারের খাতিরে বেশ কিছুটা নিচে নেমে যেতে বাধ্য হয়েছে। অতীতের রোমাঞ্চভরা দিনগুলোর জন্য সে কিন্তু অনুতপ্ত নয়। কেবলমাত্র দেনা-পাওনার কথাগুলোই তার মনে আনন্দের জোয়ার বইয়ে দিতে পারে।

পাকা কারবারীর মত চালাকির সাহায্য নিয়ে ম্যাসি বলল, তোমাকে কেন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে, আমি কিন্তু জানি। তোমার লেখা কয়েকটা নতুন কবিতা পত্রিকার অফিস থেকে ফেরৎ আসার জন্যই তোমার মনটা দারুণভাবে বিষিয়ে রয়েছে।

পত্রিকাটার একটা পাতার দিকে ম্যাসি-র দৃষ্টি আকর্ষণ করে রাভেনেল বলল, এখানে একটা কবিতা ছাপা হয়েছে। আমার লেখা, অবশ্য তোমার দৃষ্টিতে এটা যদি কবিতার মর্যাদা পায়।

হ্যাঁ, তাই তো দেখছি। পড়ে শোনাও তো।

রাভেনেল কবিতাটা তাকে পড়ে শোনাল।

কবিতাটা পড়া শেষ হলে ম্যাসি উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে বলে উঠল, আরে ব্বাস! এ যে একেবারে খাস্তা বিস্কুট! আরও আছে কি? যদি থাকে পড়, পড়! ভারী সুন্দর কবিতা। আমি আবার কাব্যটাব্য ভাল বুঝি না, অবশ্য তোমার অজানা নয়।

আছে। আরও পাঁচটা কবিতা আছে। রাভেনেল দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফ্যাকাসে মুখে হাতের পত্রিকাটা টেবিলে রেখে দিল। ম্যাসি কে এবার বেশ খুশিই দেখাল। সে বলল, ঠিক আছে, আজ তবে ছাড়ানই দাও। অন্য একদিন সময় সুযোগ মত না হয় শোনা যাবে। আমাকে আবার এখনই বেরোতে হবে। একজনকে কথা দেওয়া আছে, পাঁচটায় অপেক্ষা করবে।

সে শিস দিতে দিতে ছায়া ছায়া বাগানটার ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে বেরিয়ে গেল।

পরদিন বিকালের দিকে ব্যবসা-বুদ্ধিহীন রাভেনেল জানালার ধারে বসে সদ্য লেখা একটা সনেটের ছত্রগুলোকে কাটাকাটি করে শুধরে সুন্দর করে তুলছে। তার জানালাটা থেকে পুরনো প্রাসাদোপম বাড়িটার একটা জানালা গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে স্পষ্ট দেখা যায়। দেখতে পেল, কাব্য স্বপ্ন আর রোমান্সের নায়িকা তারই জানলাটার দিকে মুখ করে বসে আছে। রাভেনেল আজ, এখনই তাকে প্রথম দেখল। উদ্ভিন্ন যৌবনা। এক বিন্দু শিশিরের মত তাজা। ফুলের পাপড়ির মতই দৃষ্টিনন্দন। যাকে বলে কবির মনোলোভা একটা ফুল যেন জানালাটা দিয়ে উঁকি দিচ্ছে।

যুবতীটা কয়েক মুহূর্ত জানালায় অবস্থান করে এক সময় সেখান থেকে চলে গেল।

এ একটামাত্র দৃশ্য রাভেনেল-এর মনে শিহরণ জাগাল, নতুন শক্তিতে মন-প্রাণ কানায় কানায় ভরিয়ে তুলল। পর মুহূর্তেই তার চোখের সামনে ছোট বড় বাড়ি, পাকা রাস্তা, খবরের কাগজ, ফেরিওয়ালা, দারোয়ানের রাক্ষসের মত তর্জন গর্জন যেন শহরের বুক থেকে প্রেম ভালবাসাকে গ্রাস করে ফেলল।

বিকাল চারটা। রাভেনেল আবার বাগানের গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে বহু আকাঙ্ক্ষিত জানালাটার দিকে তাকাল। অনুসন্ধিৎসু চোখে তাকিয়ে সে লক্ষ্য করল, সেখানে চারটে ছোট-ছোট ফুলদানিতে, দুটো লাল আর দুটো সাদা গোলাপ রাখা আছে। আর সে রূপসী যুবতী তারই জানালাটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পরমুহূর্তেই সে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। কেবলমাত্র সুগন্ধি ফুল চারটে তার স্মৃতিস্বরূপ রেখে গেছে।

স্মৃতি নিদর্শনই বটে। এটা যদি তার মগজে না ঢোকে তবে সে একেবারেই নিরেট অপদার্থ। অযোগ্য তো অবশ্যই। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, রূপসী যুবতীটা তার চারটি 'গোলাপ' কবিতাটা পড়েছে। তার মর্ম স্পর্শ করেছে। আর এর মাধ্যমেই তো সে প্রেমময় জবাব দিয়েছে। আরও আছে, পত্রিকায় যে তার ছবি ছাপা হয়েছে সেটাও সে অবশ্যই পড়েছে। এরকম একটা সপ্রশংস, সহজ সরল অথচ বুদ্ধির স্বাক্ষর বহনকারী বাণীকে অবহেলা করা ঠিক হবে না। তবে তো তাকে জানিয়ে দেওয়া দরকার, তার ধারণা অভ্রান্ত। তার প্রিয় কবি রাভেনেল তার বাগানের বিপরীত দিকেই বাস করে।

রাভেনেল এবার ড্রয়ার থেকে অপেরা গ্লাসটা নিয়ে এল। সেটার মাধ্যমে জানালার ফিনফিনে পাতলা পর্দা ভেদ করে অপেরা গ্লাসটায় ধরা পড়ল টবে জায়ফলের একটা চারাগাছ।

তার কাব্যিক মনস্কতা তাকে দিয়ে তাকের ওপর থেকে একটা বই টেনে বের করাল। অপ্রয়োজনীয় তথ্যের ব্যাঙ্কও একে বলা যেতে পারে। কয়েকটা পাতা ওল্টাতেই এক জায়গায় তার দৃষ্টি স্থির হল। দেখল, লেখা রয়েছে 'ফুলের ভাষা'। দেখল এক জায়গায় লেখা রয়েছে জায়ফলের চারাগাছ—মিলনের ইঙ্গিতবাহী।

রাভেনেল-এর মুখে বিজয়ী বীরের হাসি ফুটে উঠল। জয়লাভ করেছে বুঝলেই প্রেমিকের মুখে হাসির ছোপ দেখা দেয়। আর প্রেমিকার যদি জয় হয় তবে সে হাসি থামিয়ে দেয়। পুরুষের যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। এবার নারী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। প্রেমিকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য দুটো লাল আর দুটো সাদা গোলাপ জানালায় রেখে দেওয়া—বেড়ে মতলব! এরকম যার চিন্তা ভাবনা.সে কাব্যমনস্ক হতে বাধ্য।

রাভেনেল দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল—এবার তবে মিলনের জন্য তৎপর হতেই হয়।

আচমকা ধাক্কা দিয়ে ম্যাসি ব্রাউন ঘরে ঢুকল। রাভেনেল-এর হাসিভরা মুখ ম্যাসি ব্রাউনকে উল্লসিত করল। পর মুহূর্তেই ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই সে আঁৎকে উঠে বলল, সর্বনাশ! আমাকে এখনই বেরোতে হবে। সাড়ে চারটাতে সময় দেওয়া আছে, খেয়ালই ছিল না।

রাভেনেল ব্যঙ্গের স্বরে বলল, বুঝিনে বাপু! কাউকে যদি এসময়ে কথা দিয়েই থাক তবে এখানে আসার দরকারই বা কি ছিল? আমার বিশ্বাস, তোমরা কারবারীরা প্রতিটা মুহূর্তের হিসাব রাখ, ঠিক বলি নি?

সত্যি ভুলেই গিয়েছিলাম, কাউকে কথা দেওয়া আছে। তোমার কাছে পাশের সেই পুরানো বাড়ীটাতে এক রূপসী ললনা বাস করে। আমি তার প্রেমে মজে গিয়ে রীতিমত হাবুডুবু খাচ্ছি। আরও স্পষ্ট করে বলছি আমাদের বাগ্‌দানও হয়ে গেছে। বুড়ো বাপটা অবশ্য ওজর আপত্তি করছে।

কিন্তু তার আপত্তিকে ধোপে টিকতে দেওয়া হচ্ছে না। সে মেয়েটাকে চোখে চোখে রাখছে। ছিনে জোঁকের মত সর্বক্ষণ তার গায়ে সেঁটে থাকে। সেই আমাকে এডিথ-এর জানালাটার কথা বলেছিল স্বীকার করছি, তোমাকে অনেক আগেই ব্যাপারটা জানানো উচিত ছিল। কিছু মনে কর না যেন, আজ তবে আসছি।'

ম্যাসি ব্যস্ত হয়ে পিছন ফিরতেই রাভেনেল বলে উঠল—তুমি কি করে খবরটা পেলে, বল তো?

খুবই সহজ পন্থা, গোলাপ ফুলের মারফতে। আজ জানলায় চারটা গোলাপ ফুল ছিল, মানে চারটার সময়। তেইশতম এবং ব্রডওয়ে পথের সংযোগস্থলে।

প্রায় স্তম্ভিত হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রাভেনেল এবার জিজ্ঞাসা করল, ভাল কথা, জায়ফলের চারা—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ম্যাম এবারও স্বাভাবিক কণ্ঠেই জবাব দিল, তার মানে আধঘণ্টা বাদে। চারটা আর আধঘণ্টা মানে তো সাড়ে চারটাই হয়। যাক, দেরী হয়ে যাচ্ছে, আগামীকাল আবার তোমার সঙ্গে মিলিত হচ্ছি, বিদায়।

ফ্রম ইচ্ অ্যাকোরডিং টু হিস অ্যাবিলিটি

ভাইকিং বিশেষ ক্ষুব্ধ না হয়ে ক্ষীণকণ্ঠে অভিসম্পাত দিতে দিতে তার ক্লাব থেকে বেরিয়ে গেল। সকাল দশটা থেকে এগারটা অবধি ক্লাবটা তার কাছে যারপরনাই অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাকে সে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ব্রুকস্-এর মুখে পোর্টোরিকো চুরুটের কাহিনী, ক্লার্ক-এর মুখে মাছ শিকারের গল্প, হেপ্‌বার্ণ-এর বিলিয়ার্ড-এর অবশ্যম্ভাবী বিজয়ী হবার উপায় বর্ণনা, বুড়ো হাড়গিলে মরিসন-এর বিধবা কেলেঙ্কারী প্রভৃতি বিববণেব কোন হেরফের না ঘটিয়ে এসব ব্যাপার একবার নয়, বহুবারই তাকে শুনতে হয়েছে। মিস এমিল আবার, গত রাত্রেও তাকে আবারও প্রত্যাখ্যান করেছে। তাকে মিসেস ভাইকিং করে দেওয়ার প্রস্তাবটাকে সে পাঁচ পাঁচবারই হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। তার গোপন ইচ্ছা পরের বুধবার সন্ধ্যায়ই আবার তার কাছে প্রস্তাবটা পাড়বে।

চুয়াল্লিশতম স্ট্রীট বরাবর ভাইকিং হেঁটে চলল। তারপর এগিয়ে চলল বড় সুাইচ গেটটার দিকে। আর গায়ে হাল্কা ছাই রংয়ের মর্নিং সুট, মাথায় চমৎকার একটা খড়ের টুপি আর পায়ে কিড-এর জুতো; ধূসর নীল নেকটাইটাকে লর্ডদের মত উদাসীনভাবে গিঁট দেওয়া।

পল জনসনকে নিয়ে উপন্যাস লিখতে যাওয়া আর ভাইকিং-এর পোশাকের বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করা একই ব্যাপার। আবার জ্বরের দাওয়াইয়ের প্রশংসাপত্র দিতে বসার মতই অবান্তর একটা কাজ। হ্যাঁ, এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, গল্পের গতি অব্যাহত রাখার উপযুক্ত পোশাকই সে পড়েছে।

এক সকালে ব্রডওয়েও যেন ভাইকিং-এর কাছে কেমন প্রতিকূল অস্বস্তিকর মনে হল। পথের বেওয়ারিশ এক পাল কুকুর, ফকির—দরবেশ, ভিখারী, ক্রীতদাস আর ঠেলাগাড়ি চালক, ঘোড়াবিহীন গাড়ির বোরখা ঢাকা মেয়েমানুষ ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি করে পথ পাড়ি দিচ্ছে। পথ চলতি এক মহিলা ছাতার খোঁচা দিয়ে তার চোখই কানা করে দিচ্ছিল। বিশেষ করে এ জনাই সে আবার ব্রডওয়েতে ফিরে আসতে বাধ্য হল।

ব্রডওয়ে ধরে পাঁচমিনিট হাঁটতে না হাঁটতেই সে এমন এক জায়গায় হাজির হল যেখানে জনা কয়েক ফ্যাকাসে বিবর্ণমুখ নীরব নিস্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। তারা সর্বক্ষণই কলম কাটা ছুরি নিয়ে ধান্ধায় থাকে আর প্রায় ভ্রূ পর্যন্ত টুপিটা নামিয়ে দেওয়া থাকে। ওয়াল স্ট্রীটের ফাটকা কারবারীরা বাড়ি ফেরার সময় তাদের দিকে বিদেশী বন্ধুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে আগ্রহী থাকে। আর কুখ্যাত সমাজবিরোধীদের মাটির খবরাখবর জানিয়ে দেয়। তবে ওয়াল স্ট্রীটের ফাটকা বাজারে তারা ছুরি চালানো থেকে বিরত থাকে।

এ দলটারই একজন এগিয়ে এসে ভাইকিং-এর সঙ্গে কথা বলল। সে আনন্দিত হল। ভয়ঙ্কর কোন কিছুর জন্য সে যারপরনাই মানসিক চাঞ্চল্য বোধ করল। লোকটার মুখে অপরাধ জগতের কথা শুনে শুনে ভাইকিং-এর অ্যাডভেঞ্চার-এর গন্ধ পেল। মন অস্থির হয়ে পড়ল।

লোকটা বলল, আপনার সঙ্গে নির্জনে দু-চারটে কথা বলার ছিল। যদি কিছু মনে না করেন তবে ওই কাফেটাতে গিয়ে বসি চলুন।

ভাইকিং তার কথায় দারুণ আগ্রহান্বিত হয়ে পড়ল। সদ্য পরিচিত লোকটার পিছন পিছন কাফেতে গিয়ে এক কোণের একটা টেবিলে বসল।

কোন রকম ভূমিকা না করেই সদ্য বন্ধুত্ব গড়ে ওঠা লোকটা বলল, শোন বন্ধু, জেনে রাখ, আমি একজন পয়লা নম্বরের সমাজবিরোধী, সমাজের আতঙ্কও বলতে পার। পশ্চিম অঞ্চলের সবাই আমাকে 'জ্বলন্ত আতঙ্ক' বলে জানে। আমার কাজের পরিধি পকেটমারা, নৈশভোজের টেবিলে হাতসাফাই, কুস্তি আখড়া, বড় বড় চৌর্যকর্ম, তেইশতম পথে ফেরীর পাটাতনে হাতসাফাইয়ের কাজ এরকম আরও কত কি। আরে, আমার নামটাই তো বলা হল না।

ভাইকিং কোটের পকেট হাতড়ে একটা কার্ড বের করে বলল, এটা রেখে দিন। আমার নামের উচ্চারণটা হবে ভাইকিং। শোন, আমাকে যখন প্রথম পরিচয়েই বন্ধু বলে মেনে নিয়েছ তখন মন খোলসা করেই কথা বলছি, আমি বাবার হোটেলে খেয়ে পরে দিন কাটাচ্ছি। আমি তার একজন নিষ্কর্মা অপদার্থ ছেলে। সংক্ষেপে আমার পরিচয় এক ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলে। একটা মুরগীর বাচ্চাকে চাপা দেবার মত মানসিক দৃঢ়তা আমার মধ্যে অনুপস্থিত। এমনই চরিত্রের—।

তার মুখের কথা শেষ হবার আগেই এমার্সন বলে উঠল, যদি কিছু মনে না কর তবে একটা কথা বলি। পুরনো-পোশাক পরিচ্ছদ বহনকারীর কাজ করতে পার। আমি একটা সোনারখনি বাজি ধরে বলতে পারি, আমার গায়ে ভদ্রলোকদের যেসব পোশাক পরিচ্ছদ আছে তার দাম তোমার পোশাকের তুলনায় কম। সে কম পঞ্চাশ ডলার বেশী। আচ্ছা, আমার পোশাক-আশাকে কি ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা যাচ্ছে, বল তো?

ভাইকিং তার আপাদমস্তক চোখের মণি দুটো বুলিয়ে নিয়ে বলল, তোমার সুটটা দামী কাপড়ের কোটটাও হয়ত অনেকগুলো ডলার দিয়ে কিনেছ। কিন্তু দর্জি হতচ্ছাড়া তোমাকে ঠকিয়েছে। কাট ছাঁট মোটেই ভাল নয়।

হ্যাঁ, সুটটার দাম একশ ডলার পড়েছে।

ঠকিয়েছে। ডাঁহা ঠেকিয়েছে। বিশ ডলার হলেও দাম বেশীই হত। আর তোমার টুপিটা বছর খানেকের পুরনো, দেখেই বোঝা যাচ্ছে। আর আস্তিনের বোতামে হীরে বসানো মুক্তোর লিংকের চেয়ে সাদাসিধে লিংক থাকলেই বরং বেশী আকর্ষণীয় হয়ে উঠত। কিন্তু ভাই, তুমি মনে আঘাত পাওনি তো?

এমার্সন সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল, আঘাত পাওয়ার কথা বলছ কী বন্ধু! তার চেয়ে বরং আমি যারপরনাই খুশিই হয়েছি। এবার দয়া করে বল তো, আমার পোশাকে আর কোন্ কোন্ অসঙ্গতি আছে কি? দু একটা কথাতেই বুঝতে পেরেছি, তুমিই এ ব্যাপারে উপযুক্ত লোক।

তোমার টাইটা চমৎকার বাঁধা হয়েছে। পদ্ধতিটা সম্পূর্ণ নির্ভুল। আর ব্রডওয়ের দোকানের জানালায় রাখা নকল মানুষের গলায় পরানো টাইয়ের মতই নিখুঁতভাবেই পরেছ।

তোমার ব্যবহারে আমি তোমার একান্ত অনুগত হয়ে পড়েছি। তোমার কাছ থেকে অনেক, অনেক জ্ঞান লাভ করলাম। আমি বুঝতে পারতাম, কোথায় যেন ত্রুটি, বিচ্যুতি রয়ে গেছে। কিন্তু ধরতে পারি নি। আমার বিশ্বাস, পোশাক পরার কায়দা কৌশল মানুষ ব্যবহারের ফলে নিজে থেকেই রপ্ত করে ফেলে।

সরবে হেসে ভাইকিং বলল, আমার বিশ্বাস, দুশ বছর আগে আমার পূর্বসূরীরা যখন গ্রামে গঞ্জে পোশাক ফেরী করতেন তখনই তারা এ কৌশলটা রপ্ত করে নিয়েছিলেন। পোশাক ফেরী করা ছিল তাদের একমাত্র পেশা, আমি শুনেছি।

অনুরূপ হাসির রেখা মুখে ফুটিয়ে তুলে এমার্সন বলল—আর আমার পূর্বসূরীরা হয়ত রাত্রির অন্ধকারে হানা দিত, তাই কায়দা কৌশলটা ভালভাবে রপ্ত করে উঠতে পারেন নি।

আমার দর্জির দোকানে একদিন তোমাকে নিয়ে যাব। তোমার বাইরের খোলসটা থেকে গুন্ডেব ছাপটুকু কেটে ছেঁটে বাদ দিয়ে দেব। তবে হ্যাঁ, পোশাকের জন্য তুমি যদি আর কিছু ট্যাঁক থেকে খসাতে রাজী থাক।

বাদ দাও তোমার দর্জির দোকান আর দর্জির কথা। তোমাকে আমি বলতে বাধ্য নই দিন কয়েক আগের এক অন্ধকার রাত্রে যখন ফার্মাস ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের লকার থেকে ষোল হাজার ডলার বে-পাত্তা হয়ে গেল তখন আমি কিন্তু বিশ্বের বিপরীত পীঠে পর্যটন সারছিলাম না।

ভাইকিং এবার একটু কঠোর স্বরেই উচ্চারণ করল, বলছ কী তুমি। আমি তোমাকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারি সে ভয় ডরও কি তোমার নেই!

আরে ধ্যৎ! আমি কি সেসব ছিনিয়ে গায়েব করে দিয়েছি নাকি? অবশ্যই না।

এবার সে ভাইকিং-এর পকেট-বই আর ভাইকিং পরিবারের একশ বছরের পুরনো একটা ঘটি টেবিলের ওপর রাখল।

ভাইকিং সবিস্ময়ে বলল, ভাই রে, ছ'হাজার পাউন্ড ওজনের ট্রাউট মাছ ও জেলের গল্প প্রায়ই কার্ক একে ওকে বলে, তুমি শুনেছ কি?

এমার্সন, ভ্রূ কুঁচকে মুহূর্তকাল ভেবে নিয়ে বলল, কই, শুনেছি বলে তো মনে হচ্ছে না। তবে শোনার জন্য মনটা বড্ড উসখুস করছে।

না, অবশ্যই না। আমি বহুবার গল্পটা শুনেছি। একমাত্র এজন্যই তোমাকে বলব না। যাক গে, আমার দর্জির দোকানটায় বসতে চাইছ কি?

পাঁচদিন পরের কথা। ভাইকিং ক্লাবের সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলল, পশ্চিম অঞ্চল থেকে আগত আমার এক বন্ধু আজ এখানে, আমাদের সঙ্গে বসে রাতের খাবার সারবে।

সদস্যদের মধ্য থেকে একজন বলল, ডেনভার-এর সর্বশেষ খবরটা আমাদের কানে এসেছে কিনা সে কি জানতে চাইবে?

অন্য আর এক সদস্য জানতে চাইল, সে আমাদের কাছে কুইন্সির নতুন বড়সড় তিনতলা মন্দিরটার কথা বলবে কি?

কার্ক বেশ একটু রাগত স্বরেই জিজ্ঞাসা করল, পশ্চিম মিসিসিপি নদীর অতিকায় রাক্ষুসে মাছের গল্প কি সে আমাদের কাছে বলব, যা ধরার জন্য একটা গোটা বাছুরকে টোপ হিসেবে বঁড়শিতে গেঁথে সমুদ্রে ফেলে?

উপস্থিত সদস্যদের সবাই অধৈর্যভাবে বলে উঠল, ধ্যৎ! মেরিয়ান, সব ব্যাপার নিয়েই কি তুমি ঠাট্টা তামাশা করবে?

যথা সময়ে অর্থাৎ রাত আটটায় দেখা গেল, ভাইকিং-এর পাশে এসে বসল সহজ সরল, শান্ত অমায়িক ও সদালাপী সুদর্শন যুবক। উপস্থিত সদস্যরা যখন আকাশচুম্বী অট্টালিকার শহরটার গল্পকথা, দূরবর্তী অঞ্চলের ক্ষমতাচ্যুত কোন জারের কাহিনী, ছোট্ট নদীতে চুনো মাছ ধরার রসাল গপ্প, করায় ব্যস্ত তখন লম্বা চওড়া মানুষটা জমকালো পোশাকে সজ্জিত হয়ে সম্রাট বাদশার মত চোখ মেলে তাকিয়ে মুহূর্তের মধ্যেই সেসব রসাল গল্পকে এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিল। ব্যস, সবার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

পশ্চিম অঞ্চলের চমৎকার একটা বর্ণনা রসিয়ে রসিয়ে শ্রোতাদের কাছে তুলে ধরল। তার সহজ সরল ভাষা আর গপ্প বলার অসাধারণ ক্ষমতা বলে তা সবার কাছেই আকর্ষণীয় হয়ে উঠল।

সংক্ষেপে বলতে গেলে এমার্সন উপস্থিত সদস্যদের থোঁতামুখ একে বারে ভোঁতা করে দিল।

পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সে পরদিন সকাল দশটায় বিয়াল্লিশতম স্ট্রীটের একটা রেস্তোরাঁয় ভাইকিং-এর সঙ্গে মিলিত হল।

সেদিনই এমার্সন-এর বিদায় নেবার কথা। পশ্চিম অঞ্চলে চলে যাবে। তার পোশাক-আশাক দেখে মনে হয় হাজার বছর আগেকার কোন দর্জি এগুলো তৈরী করে রেখেছিল। সমাজের একজন দুষ্কৃতকারীর মত কপট হাসির রেখা মুখে ফুটিয়ে তুলে সে কর্কশ স্বরে উচ্চারণ করল—ভাইকিং, সময় হলেই আমি আবার চলে আসব। তুমি মানুষ হিসেবে খুব ভাল। যদি কোনদিন তোমার

সহানুভূতির প্রতিদান দেওয়ার সুযোগ আসে তবে অবশ্যই মুখ ফিরিয়ে থাকব না।

ভাইকিং মুচ্‌কি হেসে বলল, ভাল কথা, পোশাক-আশাক সম্বন্ধে কি যেন কথা হচ্ছিল, মনে করতে পারছি না।

দেখ, আমি এমন একজন লোক খুঁজছি যে বছরের পর পছর আমাদের সঠিক পথে পরিচালনা করতে পারবে। এমার্সন বলল।

বহুৎ আচ্ছা, তুমি যখন বিদায় নিতেই চাচ্ছ তখন তোমাকে বাধা দেব না।

মিস এলিসন-এর বাড়িতে একসঙ্গে বেলা একটায় ভাইকিং-এর মধ্যাহ্ন ভোজ সারার কথা।

ভাইকিং অকারণেই পশুখামার, ঘূর্ণিঝড়, ঘোড়া, পার্বত্য ঝর্ণা, রকি পর্বতমালা, ফাঁদ, শুয়োরের মাংস আর বীনের প্রসঙ্গ নিয়ে অনবরত প্যাচাল পেড়ে চলল। মিস এলিসন বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে সব কথা শুনল।

ভাইকিং সোল্লাসে বলল, আজ আমি বিয়ের প্রস্তাবটা আবারও পাড়ব ভেবেছিলাম, কিন্তু তা আর করছি না। তোমাকে বহু কষ্ট দিয়েছি, বহুভাবে উত্ত্যক্ত করেছি। কলোরাডোতে আমার বাবার একটা পশু খামার আছে তোমার তো জানাই আছে। তাই এখানে পড়ে থাকার ফয়দাই বা কি? তাই আমি মনস্থির করে ফেলেছি, আগামী মঙ্গলবার যাব।

মিস এলিসন বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বলল, না, তোমার যাওয়া চলবে না। তোমাকে কিছুতেই আমি একা যেতে দেব না। তার চোখ দুটো জলে ভরে উঠল। সে বলে চলল— যদি নেহাৎই তুমি চলে যাও তবে আমিও তোমার সঙ্গে যাব। ভাইকিং বোতল থেকে মিস এলিসন-এর প্লেটে সামান্য সস্ ঢেলে দিতে দিতে বলল, আরে, এটা তো হৈ হট্টগোল প্রিয় দুদের নামে।

না। আমি তাকে চিনি না, জানি না, তবে সে যদি তোমার বন্ধু হয় তবে তারই উদ্দেশ্যে! চোখ মুছতে মুছতে মিস এলিসন বলল।

দ্য মেমেন্‌টো

মিস লিনেটি ডি' আরমান্ড বিতৃষ্ণায় ব্রডওয়ের দিক থেকে মুখটা ফিরিয়ে নিল। এটাই স্বাভাবিক। কারণ, লিনেটি ব্রডওয়ের একজন প্রখ্যাত প্রাক্তন নায়িকা। ব্রডওয়ে তার কাছ থেকে একনাগাড়ে দীর্ঘদিন ধরে অনেক, অনেক কিছুই পেয়েছে। আর কিছুর আকাঙক্ষা থাকার কথা নয়। তাই ব্রডওয়ের কাছে তারও অনেক কিছু প্রাপ্য। কিন্তু ব্রডওয়ে তার সঙ্গে করেছে বল্গাহীন বিশ্বাসঘাতকতা। যার ফলে আজ তার মন-প্রাণ হতাশায় জর্জরিত।

মিস লিনেটি ব্রডওয়ের ওপরের জানালার দিকে চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিয়ে বসল। একটা রেশমী মোজা বোনার কাজে নিজেকে লিপ্ত রাখল। নিচের ব্রডওয়ের হৈ হট্টগোল আর ঝলমলে রূপ আজ আর তার মনের ওপর তিলমাত্র প্রভাবও বিস্তার করতে পারছে না।

ব্রডওয়ের জাঁকজমকপূর্ণ অঞ্চলে হোটেল থালিয়া সদম্ভে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক যেমন সমুদ্রের দিকে মুখ করে নিশ্চল নিথর ম্যারাথন দাঁড়িয়ে আছে। সমুদ্রের গায়ে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়ের মতই হোটেলটাও অবস্থান করছে। সমুদ্র এসে বার বার আছড়ে পড়ছে তার গায়ে। হোটেল থালিয়ার ভেতরের লম্বা ও স্বল্পালোকিত বারান্দা দিয়ে হাঁটার সময় মনে হবে কোন বড়সড় জাহাজের ভেতর দিয়ে আপনি হাঁটছেন। কিন্তু হোটেলটার সর্বত্রই দুর্গন্ধ ছড়িয়ে থাকে আর উপযুক্ত আলোর অভাব তো আছেই।

আর এর অবস্থান দেখে মনে হয় জাহাজটা ছাড়ার সময় বুঝি এগিয়ে এসেছে। আর হোটেল বাড়িটার ভেতরে অবস্থানকালে একটু অনুসন্ধিৎসু চোখে চারদিকে দৃষ্টিপাত করলে স্পষ্টই মনে হবে, সর্বত্র যেন নিরবচ্ছিন্ন অস্থিরতা, হতাশা আর প্রত্যাশা, উদ্বেগ আর আতঙ্ক যেন বাড়টাকে ঘিরে রেখেছে। সঙ্গে গাইড না থাকলে আপনার বাঞ্ছিত কামরাটা খুঁজে পাওয়া বাস্তবিকই দুষ্কর। স্যাম লয়েড-এর গোলক ধাঁধায় পথ হারানো আত্মার মত আপনাকে হরদম চক্কর মারতেই হবে। যেকোন মোড় ঘুরলেই নজরে পড়বে রূপসী ললনারা স্নানের পোশাক পরে স্নানঘরের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। আর

শতাধিক ঘর থেকে ভেসে আসবে হাসি-ঠাট্টার স্বর, আলাপরত নারী পুরুষের কণ্ঠস্বর, উল্লাস আর ধ্বনি, আর নতুন ও পুরনো গান বাজনার তাল তো অবশ্যই কানে আসবে।

গ্রীষ্মকাল আসতেই এক এক করে দলগুলো ভেঙে গেল। অভিনেতা অভিনেত্রীদের কেউ আত্মজনের সঙ্গে মিলিত হতে গেছে আর কেউ বা সরাসরি পর্যটন কেন্দ্র হাজির হয়েছে অনিন্দ্য প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে পরমানন্দ লাভের প্রত্যাশা নিয়ে। আবার কেউ বা আগামী মরশুমে কাজ পাওয়ার প্রত্যাশায় ম্যানেজারদের পিছন ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছে।

প্রাক্তন নায়িকা লিনেটি-র কামরাটা ছোট হলেও সুসজ্জিতই বলা চলে। অত্যাবশ্যক সামগ্রীর সঙ্গে বেশ বড়সড় একটা দামী টেবিলের ওপর বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্নজনের দেওয়া মালপত্র, বিভিন্ন সংস্থার দেওয়া সম্বর্ধনাপত্র, আর তার প্রিয় ও বিখ্যাত অভিনেতা অভিনেত্রীরদের ফটোগ্রাফ সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

মিস লিনেটি সাজগোজ করার ফাঁকে টেবিলের ওপর রক্ষিত একটা ফটোগ্রাফের দিকে বারবার আড়চোখে তাকিয়ে ঠোঁট টিপেটিপে হাসতে লাগল। তারপর এক সময় আপন মনে প্রায় অস্ফুটস্বরে বলতে লাগল, লী এখন কোথায়, কিভাবে আছে জানার জন্য মনটা বড়ই চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

বহু প্রশংসিত এ ফটোগ্রাফটা দেখার সুযোগ যদি আপনার বরাতে জুটত তবে আপনার অবশ্যই মনে হত আপনার ঝঞ্ঝাবিধ্বস্ত একটা ধবধবে সাদা ফুলের ছবি সমেত চোখের সামনে অবস্থান করছে। কিন্তু তার এ সাদা রঙের ফুলের জন্য তো আর ফুলের রাজ্যের ওপরে দায়ভার চাপানো যায় না।

আপনার নজরে পড়ল মিস রোজালি খাটো স্কার্টটা যখন নিজের শরীরটাকে ঝট্‌ করে এমনভাবে পাক খাইয়ে দিল যাতে তার গোড়ালি দুটো মাথার ওপরে উঠে নাট্যশালা দর্শকদের মাথার ওপর দিয়ে তীরবেগে বেরিয়ে যায়। ঠিক সে মুহূর্তেই সে ঝট্‌ করে এক ঝাঁকুনি দিয়ে হলুদ গার্টারটাকে অনেক উঁচু দিয়ে দূরে ফেলে দিল। প্রতি সন্ধ্যাতেই তার রূপসী নমনীয় দেহপল্লব চক্কর মারতে মারতে নিচে বসে থাকা দর্শকদের মাঝখানে নেমে আসে।

আপনার আরও নজরে পড়ল এক বিশেষ নাট্যশালায় উপস্থিত কালো সাজ পোশাক পরিহিত পুরুষ পৃষ্ঠপোষকদের মধ্য থেকে একশ'টা হাত ওপরে উত্থিত হল যাতে এ উড়ন্ত নিদর্শনটাকে থামিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়।

এরকম চিত্তাকর্ষক নাচের আসরের প্রতি দু' বছরের শেষে মিস রোজালি-র বরাতে ভ্রমণের জন্য বিয়াল্লিশ সপ্তাহের ছুটি মেলে।

সে বছর দু' বছরের শেষের দিকে মিস রোজালি তার অভিন্ন হৃদয়া বান্ধবী মিস লিনেটকে খবর পাঠিয়ে জানাল লং আইল্যান্ডের উত্তর অঞ্চলে একটা অজ পাড়াগাঁয়ে সে গ্রীষ্মটা কাটাতে যাবে। আর সে সঙ্গে এ-ও জানাল, ভবিষ্যতে সে কোনদিনই রঙ্গমঞ্চে আর নামবে না।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল। রোজালি, হ্যাঁ, রোজালিই কড়া নেড়েছে। হ্যাঁ, বিশ্বাস করুন, সত্যি, রোজালি-ই এসেছে।

রোজালি যখন মাথা থেকে ছড়ানো টুপিটা, আর মুখের ওপর থেকে অবগুণ্ঠনটা খুলে ফেলল তখন আপনার চোখের সামনে এক ফুটফুটে তাজা মুখ ভেসে উঠবে। মাথার একরাশ কোঁকড়ানো চুলকে তড়িঘড়ি অযত্নে বাঁধা হয়েছে বলে কপালের ওপর ঝুলে পড়া কয়েকটা চুল যেন বাতাসে মৃদু মৃদু দোল খাচ্ছে।

লিনেটি বলল, আমি গত এপ্রিল থেকেই এখানে কাটাচ্ছি। আর শোন, আমি স্টোল ইন্‌হেরিট্যান্স কোম্পানীর সঙ্গে পা মিলিয়ে পথ চলছি। আগামী হপ্তায় আমাদের শো এলিজাবেথ-এই আরম্ভ হচ্ছে। আমার কথা তো শুনলে, এবার তোমার কথা কিছু বল, শুনি।

রোজালি সোজা হয়ে লিনেটি-র পোশাকের বাক্সটার ওপর বসল। সে এবার অভাবনীয় বিদ্রূপ ও আত্মসমর্পণের ছাপ চোখে মুখে এঁকে তার কথা পাড়ল—লিন, তোমার কাছে সবই খোলসা করেই বলব। কিছুই গোপন করব না। তারপর কালই আবার ব্রডওয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করব। আরও পুরু ক'রে মুখে রঙচঙ মাখাব। লিন, আমাকে একটা রুমাল ধার দাও না। লং আইল্যান্ডের

ট্রেনগুলোর যে কী দুর্দশা তোমাকে আর বলব কী। গায়ের কালিঝুলি তোলার জন্যই রুমালটা চাইছি। আর একটা কথা, দু এক পাঁইট মদ দিতে পার?

মিস লিনেটি আলমারি খুলে এক বোতল 'সানহাটান' এনে রোজালি-র হাতে তুলে দিল।

মদের গ্লাসটা মুখ থেকে নামিয়ে এনে রোজালি বলল, বিশ্বাস কর লিন, গত মরশুমের শেষ থেকেই আমি রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়ে দিয়েছি। কারণ, ও জীবনের প্রতি আমার বিতৃষ্ণা ধরে গেছে। সত্যি বলছি, মানুষ সম্পর্কে আমার মন-প্রাণ বিরক্তিতে কানায় কানায় ভরে উঠেছে। কাদের বিরুদ্ধে, ভাবছ কি? সেসব মানুষের চেহারাধীরা পশুদের, মানে যাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিনিয়ত লড়াই করে টিকে থাকতে হয়। তোমার তো আর অজানা নয়, এ লাইনে আমাদের প্রতিমুহূর্তে, সব রকম পরিবেশে ও পরিস্থিতিতে লড়াইয়ের মাধ্যমে নিজেদের অস্তিত্ব অব্যাহত রাখতে হয়। কারা তারা? ম্যানেজার থেকে শুরু করে পোস্টারমারা লোকগুলো পর্যন্ত সবাই।

আরও আছে। অভিনয়ের পর যাদের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াতে হয় তারাই তো সবচেয়ে নীচ। নাট্যশালার সদর দরজায় যারা ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত চক্কর মেরে বেড়ায়। আর ম্যানেজারের এক গ্লাসের ইয়ার দোস্ত, যারা আমাদের পাশে বসিয়ে রাতের খাবার খেতে নিয়ে যায়। হীরে মুক্তো চোখের সামনে ধরে। সিনেমায় নিয়ে যেতে আগ্রহী হয়। যত্তসব জানোয়ারের দল। আমি তাদের মন থেকে ঘৃণা করি। তাদের নাম করে হাজারবার থুথু ফেলি।

লিন, নাট্যশালায় আমাদের মত অদৃষ্টবিড়ম্বিতা মেয়েরাই করুণার পাত্রী। আমাদের অনেকেই অভিজাত পরিবার থেকে রঙ্গমঞ্চে নামে অভিনয়ের মাধ্যমে নাম যশের জ্বলন্ত প্রত্যাশা বুকে নিয়ে। দিনের পর দিন অমানুষিক পরিশ্রম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে। কিন্তু বরাত তাদের ওপরে উঠতে দেয় না।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রোজালি আবার বলল, লিন, দীর্ঘশ্বাস যদি ফেলতে হয়, যদি চোখের জল ঝরাতেই হয় তবে তা ঝরাও তাদের জন্য যারা জঘন্য কুৎসিত দৃশ্যে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করে হপ্তায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ ডলার বেতন পায়। তার তো জানাই আছে, এর চেয়ে বেশী রোজগার করা বা সম্মানের কাজ কোনদিনই তার বরাতে জুটবে না। তবু আশা মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না। প্রতীক্ষায় থাকে যদি কোনদিন বরাত গুণে কোন সুযোগ হাতের মুঠোয় আসে। কিন্তু হায়। কোনদিনই তাদের বাঞ্ছিত সুযোগ আসে না।

আমার মনের কথা শোন লিন, আমি সে সব পুরুষকে ঘৃণা করি যারা তোমার চারদিকে ঘুর ঘুর করে। এক বোতল দামী মদ অথবা বাড়তি ডাইয়ের বিনিময়ে তোমাকে কিনে নেওয়ার চেষ্টায় ছিনে জোঁকের মত তোমার গায়ের সঙ্গে সেঁটে থাকে। আর তোমার দিকে এমন লালসা মাখানো দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে যেন হাতের নাগালের মধ্যে পেলে টুক করে গিলে ফেলবে। উফ্! জানোয়ারগুলোকে আমি যে কী ঘৃণা করি তা তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না।

আরে, আমার নিজের কথা তো কিছুই বললাম না!

আমি অল্প অল্প করে দু'শ ডলার জমিয়েছিলাম। ব্যস, তারপরই রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে পুরোপুরি সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলি। লং আইল্যান্ডে পাড়ি জমাই। স্যান্ডপোর্ট নামক সমুদ্রের গায়ে এক অখ্যাত অবজ্ঞাত গ্রামে ছোট্ট একটা বাড়িও পেয়ে গেছি। সেখানে বাগ্মিতা নিয়ে পড়াশোনায় নিজেকে লিপ্ত রাখব। সমুদ্রের লাগোয়া এক বৃদ্ধ মহিলার ছোট্ট একটা বাড়ি আছে। সঙ্গী হিসেবে একজনকে পাওয়ার লোভেই তিনি আমাকে ঘর ভাড়া দিতে আগ্রহী হন। রেভারেন্ড আর্থার লাইলি নামে আরও একজন ভাড়াটে আছে।

লিন, তুমি অবশ্যই তাকে প্রধান সমুদ্রগামী জাহাজ মনে করতে পার। একটু ধৈর্য ধর। এক মিনিটের মধ্যেই আমার সব কথা শেষ হয়ে যাবে।

হ্যাঁ, তিনি প্রথম উদয় হলেন। আমার মনও তাকে সাদর আহ্বান জানাল। তিনি প্রথম আলাপেই আমার মন-প্রাণ সর্বস্ব জয় করে নিলেন। আমি তার কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করলাম। আসলে তিনি আমার শ্রোতাদের থেকে সম্পূর্ণ অন্য চরিত্রের মানুষ। দীর্ঘাকৃতি, ছিপছিপে গড়ন বলতে পার। এতই ধীরস্থির যে, তিনি ঘরে ঢুকলে চোখে না দেখলে টেরই পাওয়া যায় না। কিন্তু তার উপস্থিতি তুমি ঠিকই অনুভব করতে পারবে। কোন নাইটের সঙ্গেই মুখাবয়বের সাদৃশ্য লক্ষিত

হয়। আর কণ্ঠস্বর, চালচলন? অতুলনীয়।

একটা কথা বলছি লিন—তুমি যদি ড্রুকে তার সেরা দৃশ্যের অভিনেতা হিসেবে দেখ তারপর উভয়কে পাশাপাশি রেখে তুলনা কর তবে কিন্তু তুমি শান্তিভঙ্গকারী হিসেবে জন'কে গ্রেপ্তার করার জন্য তৎপর হবে।

দেখ, খুঁটিনাটি ব্যাপার তুলে আমার বক্তব্যকে দীর্ঘ করার সামান্যতম আগ্রহও আমার নেই। যাক, যে কথা বলছিলাম, একমাস পরেই আমি আর জন পরস্পরের বাগদত্তা হলাম। সে এক মেথডিস্ট গীর্জার পুরোহিত। তার থাকার জায়গাটা ছোট্ট। তা হলে কি হবে, বিয়ের ভোজে মুরগি পরিবেশন করা হয় আর নিমন্ত্রিতদের হানিসাকল ফুল বিতরণ করা হয়। আরও আছে, বিকেলে বেড়াতে বেড়াতে আর্থার স্বর্গ সম্বন্ধে কত কথাই যে আমাকে বলে তা বলে শেষ করা সম্ভব নয়। আর একটা কথা, মুরগি আর হানিসাকল ফুলের কথা কোনদিনই আমার মন থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে না।

স্বীকার করছি, আমি যে একসময় রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম ভুলেও তার কাছে প্রকাশ করিনি। সত্যি বলছি, এ কাজটাকে আমি মনে প্রাণে ঘৃণা করতাম। তাই সে কাজ থেকে আমি চিরদিনের মত সরে এসেছি। তাই অতীতের কাদা ঘাঁটার আদৌ আমার ইচ্ছে নেই, যুক্তিও নেই।

তোমাকে আর কি-ই বা বলব লিন? একটা ভাল মেয়ে বলতে যা বোঝায় আমি চিরদিনই ঠিক তা-ই ছিলাম। আমি একজন বাগ্মী। এছাড়া বুক ফুলিয়ে বলার মত কিছুই আমার ছিল না। আমার ঠিক ততটুকুই আমার বিবেকের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল। লিন, আমার মনের কথা তোমাকে বলছি, আমি সত্যি সুখী হয়েছিলাম। অর্থাৎ একটা মেয়ের পক্ষে নিজেকে সুখী মনে করার যে—যে কারণ থাকতে পারে তার কোনটিরই অভাব আমার ছিল না। আমি গীর্জার গায়কদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গাইতাম, আবৃত্তি ভালই করতাম আর সেলাইও খারাপ জানতাম না। আর্থার আর আমি প্রায়ই বিকেলে নৌকা বিহারে বেরোতাম। এক সঙ্গে নৌকো চালাতাম, বনবাদাড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম। আর? আমার মনে হত ছোট্ট সে গ্রামটার মতো সেরা জায়গা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টা নেই।

বিশ্বাস কর লিন, সেখানে সারা জীবন আমার সুখেই কাটত যদি আমার বরাত আমার সঙ্গে—

এক সকালে আমি যখন রোদে পিঠ দিয়ে বিধবা বৃদ্ধা মিসেস গুরলির সঙ্গে পিছনের বারান্দায় বসে তাকে মটরশুঁটি ছাড়িয়ে দিয়ে সাহায্য করেছিলাম, তখন তিনি বিভিন্ন তথ্যসমৃদ্ধ গল্পে নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন।

সত্যি বলতে কি, বৃদ্ধা মিসেস গুরলি-র চোখে মিঃ গুরলি ছিলেন মর্ত্যের এক সর্বত্যাগী সাধু যেমনটি আমার চোখে আর্থার ছিল। একদিন তার সম্বন্ধে অন্তহীন গুণগান শেষ করে উপসংহারস্বরূপ তিনি আমাকে বললেন যে, এই তো সেদিনের কথা, আর্থার এক প্রেমে জড়িয়ে পড়ে। খুবই রোমান্টিক প্রেম। আর সে প্রেমের পরিণতি হয় বিষাদময়। ব্যস, এটুকুই। এর বেশী খোলসা করে তেমন কিছু বললেন, না। তবে এটা তাঁর ভালই জানা ছিল, আর্থারকে ভয়ানক মারধোর করা হয়। আর এ-ও বললেন মর্মাহত আর্থার ক্রমেই মনমরা—হতাশায় জর্জরিত হয়ে ক্রমেই শুকিয়ে যেতে থাকে।

বিষাদের মূর্তপ্রতীক আর্থার সে মেয়েটার কোন একটা স্মৃতিচিহ্ন গোলাপ কাঠের ছোট্ট একটা বাক্সে পুরে, তালাবন্ধ করে তার পড়ার ঘরের টেবিলের ওপর রেখে দিয়েছিল।

কথা প্রসঙ্গে তিনি আরও জানালেন, আমি বহুদিন দেখেছি, সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলেই বাক্সটা কোলে নিয়ে সে চোখে হতাশার ছাপ একে বিষণ্নমুখে বসে থাকে। কেউ এলেই ঝট্ করে লুকিয়ে ফেলে, ড্রয়ারে তালাবন্ধ করে রেখে দেয়।

এবার তুমিই ভেবে বল, আমি আর কতদিন পথ চেয়ে থাকতে পারি?

সেদিন বিকেলেই আমরা নৌকা বিহার করছিলাম। তখন হঠাৎ আমি প্রসঙ্গটা পাড়লাম, আর্থার, তুমি যে আগেও একবার প্রেমে জড়িয়ে পড়েছিলে তা তো আমাকে ভুলেও কোনদিন বল নি।

কিন্তু মিসেস বলেছেন, তার মুখে যেটুকু শুনেছি সেটা আর্থারকে অবগত করালাম। মিথ্যাবাদীকে আমি মনে প্রাণে ঘৃণার চোখে দেখি।

শোন, তোমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার আগে একটা মেয়ের সঙ্গে মন দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপার ঘটেছিল সেটা সত্যি বটে। তুমি যখন জেনেই ফেলেছ তখন কোন কিছু গোপন না করেই তোমার কাছে সবই খোলসা করে বলব।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, সে অপেক্ষাতেই আছি।

আর্থার মুখ খুলল, প্রিয়তমা ইডা, ব্যাপারটা কিন্তু আসলে আধ্যাত্মিক। মেয়েটা আমার ভেতরে যারপরনাই আবেগের সঞ্চার ঘটালেও আমি আন্তরিকতার সঙ্গে স্বীকার করে নিয়েছিলাম সে-ই আমার চোখে আদর্শ নারী। আমি কিন্তু কোনদিন তার মুখোমুখি হই নি, কথাও বলিনি কোনদিন। কী অভাবনীয় আদর্শ প্রেম! তোমার সঙ্গে আমার যে গভীর প্রেমের সম্পর্কে গড়ে উঠেছে সেটা আদর্শ হিসেবে নগণ্য না হলেও এক স্বতন্ত্র প্রকৃতির। আমাদের মধ্যে যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠুক সেটা তোমারও অবশ্য অভিপ্রেত নয়, কি বল?

আমি কৌতূহলের শিকার হয়ে বললাম, সে মহিলা কি রূপসী ছিল? আর প্রায়ই তার দরজায় ধর্না দিতে?

হ্যাঁ, তার রূপের আভা চোখ ঝলসে দেওয়ার মতই ছিল বটে। দেখার ব্যাপারটা যদি জানতে চাও তবে উত্তর একটাই এক ডজন ঘূর্ণিঝড়ের মত। সব সময় দূর থেকেই তাকে দেখতাম।

তুমি কি তাকে মন প্রাণ সঁপে ভালবাসতে?

আমার বিচার বুদ্ধি অনুযায়ী সে ছিল এক আদর্শ রূপ সৌন্দর্যের আকর, আর আত্মা।

আর একটা কথা সত্যি করে বল তো, যে স্মৃতি চিহ্নটা তুমি বুকে করে আগলে রাখছ, যার দিকে চেয়ে চেয়ে তৃপ্তি লাভ কর সেটা কি তারই স্মারক?

হ্যাঁ। যাকে আমি অমূল্য সম্পদ হিসেবে বুকে আগলে রেখেছি সেটাকে স্মারক আখ্যা না দিয়ে পারা যায়? আর সেটা তার কাছ থেকেই পেয়েছিলাম। কিছুটা বাঁকাপথে, কিছুটা সোজা পথেও মনে করা যেতে পারে। সত্যি বলতে কি তার সঙ্গে আমার কোনদিনই মুখোমুখি দেখা হয়নি। আমি দেখা করার জন্য অত্যুৎসাহী হই নি। আসলে সে ছিল আমার চেয়ে অনেক উর্দ্ধে। একটা কথা তোমাকে বলছি ইডা, অতীত—মৃত অতীতকে নিয়ে তুমি যেন নিজেকে ঈর্ষায় জর্জরিত কোরো না। তুমি কি ঈর্ষা—

আমি তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই বলে উঠলাম, ঈর্ষা! এ কী কথা বলছ আর্থার! ব্যাপারটা শোনার আগে তোমাকে নিয়ে আমার যা কিছু ভাবনা চিন্তা ছিল এখন তার দশগুণ ভাবনায় পড়তে হয়েছে।

লিন, তুমি যদি আমার তখনকার পরিস্থিতিটা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি কর, স্বীকার করতে বাধ্য হবে, ব্যাপারটা অবিকল সে রকমই হয়েছিল। সে আদর্শ প্রেম আমার কাছে ছিল সম্পূর্ণ নতুনতর সুন্দর আর গৌরবের বস্তু। ভাবতে পার লিন, কোন এক যুবক এমন একটা মেয়েকে সর্বান্তকরণে ভালবেসেছে যার সঙ্গে সে কোনদিন কথা বলেনি, এমন কি চোখেও দেখে নি। অন্তরের ভালবাসা দিয়ে তার মুখটা সে কল্পনা করেছে! আর তার প্রতি বিশ্বস্ত হয়ে থেকেছে। উফ্! কথাটা আমার কানে যে কী মধু ঢেলে দিল তা বলে বুঝাতে পারব না। যে সব পুরুষের সংস্রবে এসেছি তারা হীরে জহরৎ নিয়ে, নাহলে বেতন বৃদ্ধির লালসা দেখাতো। আর তাদের আদর্শ? ধ্যুৎ! এসব নিয়ে আর কিছু বলতে প্রবৃত্তি হচ্ছে না।

বিশ্বাস কর, আমার মনের কথা বলছি। ব্যাপারটা শোনার পর আর্থার-এর প্রতি আমার ভাবনা চিন্তা অনেকাংশে বেড়ে গেল। যে দেবীর প্রতি সে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হতে আমি উৎসাহ পাই নি। এরও কারণ অবশ্যই আছে। আমি যে তাকে ভালবেসে নিজের করে নিতে চলেছি। আমার দৃষ্টিতে সে হয়ে উঠল ঠিক যেন সাধু-সন্ন্যাসীদেরই একজন, বৃদ্ধা গুরলি যেমনটি দেখেছিলেন।

আজই বিকেলে একজন লোক আর্থার-এর কাছে এল। সে বলল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আর্থারকে একটা মুমূর্ষু রোগীকে দেখার জন্য গীর্জায় যেতে হবে। বৃদ্ধা গুরলি তখন গভীর ঘুমে

আচ্ছন্ন। তাই ধরতে গেলে আমাকে একা রেখেই সে গীর্জার উদ্দেশ্যে পা বাড়াল।

আর্থার ঘর ছেড়ে চলে যেতেই আমি দেখলাম, যে ভুল করে চাবির গোছাটা ফেলে গেছে। ব্যাস, মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম, যে স্মৃতিচিহ্নটা সে এতকাল গোপনে বুকে করে আগলে রেখেছে সেটাকে একবার নিজের চোখে দেখতেই হবে। নিছকই আমার মনের কৌতূহল। বস্তুটা কি সেটা দেখার ইচ্ছেটা বড় কথা নয়।

চাবি ঘুরিয়ে ড্রয়ারটা খুলে ফেললাম। গোলাপ কাঠের ছোট্ট একটা বাক্স আমার নজরে পড়ল। ব্যস্ত হাতে ছোট্ট একটা চাবি দিয়ে তার ডালাটা খুলে ফেললাম। স্মৃতিচিহ্নটার দিকে চোখ পড়তেই আমি লম্বা লম্বা পায়ে নিজের ঘরে ফিরে গেলাম। ব্যস্ত হাতে বাক্সটা গুছিয়ে ফেললাম। অল্প সময়ের মধ্যে সাজগোছ সেরে নিলাম। বৃদ্ধা মহিলার পায়ে ধাক্কা দিয়ে তার ঘুম ভাঙালাম। কেবলমাত্র আর্থারের দিকে তাকিয়ে তার সঙ্গে কথা বললাম, আজেবাজে স্বপ্ন দেখা রেখে উঠে বসুন। সতর্ক হোন, ধার কাছ দিয়ে ভূতরা ঘুরঘুর করছে। আটটা ডলার আমার কাছে পাবেন। আমি এখান থেকে কেটে পড়ছি। ডাক গাড়ির গাড়োয়ান আমার বাক্সটা নিতে আসবে, দিয়ে দেবেন। কথা বলতে বলতে তার প্রাপ্য মিটিয়ে দিলাম।

সে দু'হাতের পিঠ দিয়ে চোখ কচলাতে কচলাতে বলল, মিস রোজালি কোন অসুবিধে, মানে দোষ ত্রুটি, আমি তো ভেবেছিলাম তুমি এখানে খুশিতেই ছিলে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবার সে বলল, যুবতী মেয়েদের মতিগতি বোঝা মুশকিল, তুমি যেমনটা প্রত্যাশা করেছিলে তারা আসলে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির।

আপনার কথা সমর্থন করছি। খুবই সত্য যে, কেউ কেউ সেরকমই। তবে একটা কথা সত্য যে, একটা পুরুষ মানুষকে ভালভাবে জানতে পারলে পৃথিবীর সব পুরুষ মানুষ সম্বন্ধে ধারণা করে নেওয়া যায়। ব্যস, চারটে আটত্রিশের ট্রেন ধরে আমি সোজা এখানে পৌঁছে যাই।

মিস লিনেটি কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বলে উঠল, আশ্চর্য ব্যাপার তো তোমার! বাক্সটার মধ্যে কি দেখেছিলে এখনও বললে না!

রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করার সময় আমি লাথি মেরে যে গার্টার দর্শকদের দিকে ছুঁড়ে দিতাম তারই একটাকে সে গোলাপ কাঠের বাক্সটায় সযত্নে রেখে দিয়েছে। লিন, যেকোন ব্র্যান্ডের একটা মদের বোতল দিতে পার?

অপশনস্—১৯০৯
দ্য থার্ড ইনগ্রেডিয়েন্ট

ভালাসব্রোসা এ্যাপার্টমেন্ট হাউসকে অবশ্যই একটা ফ্ল্যাট বাড়ি বলে আখ্যা দেওয়া চলে না। সেটা বাদামী পাথরের নিছকই একটা পুরনো বাড়ি। একটা বৈঠকখানার মেঝেতে এক পোশাকের কারবারীর টুপি আর চাদর রাখা আছে। আর অন্য বৈঠকখানাটা দখল করে রেখেছে এক দাঁতের ডাক্তার। ডাক্তারের গালভরা প্রতিশ্রুতি আর বীভৎস সব ছবি দেওয়ালে লটকে রেখেছে, যাকে বিষণ্ণতার প্রতিমূর্তি ছাড়া অন্য কিছু ভাবা যায় না। চাইলে সেখানে সপ্তাহে দু'ডলার ভাড়ার বিনিময়ে ছোট্ট একটা কামরা মিলে যেতে পারে।

ভালাসব্রোসা এ্যাপার্টমেন্টের বাসিন্দাদের কেউ সঙ্গীতজ্ঞ, কেউ চিত্রশিল্পী, কেউ স্টেনোগ্রাফার, কেউ বটতলার লেখক, কেউ চারুকলার শিক্ষানবীশ, কেউ বিদ্যুৎ চুরীর পেশাদার, কেউ দোকানের মেয়ে কর্মী, কেউ দালাল আর হরেক পেশায় নিযুক্ত নারী-পুরুষ।

কারো প্রতি কোনরকম অশ্রদ্ধা বা অবহেলা পোষণ না করেই দু'জন ভালাসব্রোস এ্যাপার্টমেন্টের বাসিন্দাকে বর্তমান গল্পে স্থান দেওয়া হবে।

একদিন বিকেল ছ'টায় হেটি পেপন্সার এ্যাপার্টমেন্ট হাউসের চারতলার পিছনদিককার সাড়ে

তিন ডলারের ছোট্ট কামরাটায় নাক ও থুৎনিটাকে স্বাভাবিকের তুলনায় একটু বেশী উঁচু করে কোনরকমে ঢুকে গেল। চারটা বছর এক বিভাগীয় বিপণিতে চাকরি করার পরও যদি মাত্র পনেরটা ডলার নিয়ে ঘরে ফিরতে হয় তবে তো নাক চোখ মুখের হাল এরকম হওয়াই স্বাভাবিক।

মেয়েটা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার অবসরে হেটি-র সংক্ষিপ্ত জীবন কথা বলে নিচ্ছি।

হেটি চার বছর আগে কোমর বিভাগের চাকরির দরখাস্ত নিয়ে অন্য পঁচাত্তরটা মেয়ের সঙ্গে 'গ্রেটেস্ট স্টোর'-এ পা দিয়েছিল। এক পাল মেয়ের মধ্য থেকে দুজনকে বেছে চাকরি দেবার দায়িত্ব বর্তেছিল শান্ত নিরীহ এক টাক মাথা যুবকের ওপর।

তার পরিস্থিতি তখন খুবই সঙ্গীন। তার চোখের সামনে ভেসে বেড়াত বিভিন্ন রঙ আর ঢঙের কতই না ফুল। একটু বাদেই তার সামনে এসে দাঁড়াল ঠিক যেন শিশির ভেজা তাজা ফুল হেটি পেপলার। উদ্ভিন্ন যৌবনা এ মেয়েটার মাথার চুল থেকে শুরু করে পোশাক-আশাক পর্যন্ত সব কিছু যেকোন যুবকের চোখে লাগার মত। সে সঙ্গে সঙ্গে সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল, পেয়েছি, এই তো পেয়ে গেছি!

ব্যস, গ্রেটেস্ট স্টোরে হেটি পেপলার-এর চাকরি হয়ে গেল। গ্রেটেস্ট স্টোরের সামান্য কাউন্টারের চাকরি থেকে তার দ্রুত পদোন্নতি হওয়ার কাহিনীটা জোয়ান অব আর্ক, হারকিউলিস, জব, উনা আর লাল ঘোড়ার সওয়ারে হুডের যোগফলের সমান। গ্রেটেস্ট স্টোর থেকে হেটি-র চাকরি যাওয়ার ব্যাপারটাও তার পদোন্নতির মত অত্যাশ্চর্য। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই রকম বলে তার পুনরাবৃত্তি করতে বসলে এক ঘেয়ে লাগবে সন্দেহ নেই।

এরকম বড় বড় দোকানে একজন করে নির্বোধ সর্বজ্ঞ থাকে, যে বগলে একটা লাল নেকটাই বেঁধে বগলে হিসাবের খাতা নিয়ে কাউন্টারে কাউন্টারে চক্কর মেরে বেড়ায়। তাকে একজন ক্রেতা বলে সম্বোধন করা হয়। যেসব মেয়ে কর্মী সপ্তাহে বেতন পায় তাদের অদৃষ্ট সম্পূর্ণরূপে এ লোকটার মেজাজ মর্জির ওপর নির্ভর করে।

সর্বজ্ঞ এ ক্রেতাটা শান্ত স্বভাব বিশিষ্ট, নিচু গলায় কথা বলে। যুবক আর টাক মাথা। কাজ করতে করতে এক কাউন্টার থেকে অন্য কাউন্টারে যাবার সময় হঠাৎ রূপসী যুবতী হেটির দিকে তার নজর পড়ল। তার মনে হল বিস্তীর্ণ মরুভূমির মাঝে এ যেন এক উর্বর মরূদ্যান।

টাক মাথা যুবকটা তার খাতাটা বগলে নিয়ে গুটিগুটি হেটি-র কাউন্টারে পাশে গিয়ে দাঁড়াল। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত ধরে। এদিক ওদিক চোখের মণি দুটো বুলিয়ে নিয়ে হেটি-র কনুইয়ের কাছে টুক করে একটা চিমটি কাটল। মুহূর্তমাত্র দেরী না করে হেটি তাকে এমন একটা গুঁতো দিল যে, সে পাশের দেওয়ালের গায়ে আছাড় খেয়ে পড়ল। আশা করি হেটিকে কেন গ্রেটেস্ট স্টোর থেকে মাত্র ত্রিশ মিনিটের নোটিশে চাকরিটা খোযাতে হয়েছে তা সহজবোধ্য।

আজ রেস্তোরাঁর খাদ্য তালিকায় গো-মাংসের পাঁজরের দাম লেখা আছে ছ'সেন্ট। আর যেদিন গ্রেটেস্ট স্টোর থেকে হেটি-র চাকরি গিয়েছিল সেদিন প্রতি পাউন্ডের দাম লেখা ছিল সাড়ে সাত সেন্ট। এ পরিস্থিতি থেকেই গল্পটার সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। তা নইলে অতিরিক্ত চার সেন্ট।

হ্যাঁ, এ দুনিয়ায় অধিকাংশ গল্পের কাহিনীই সৃষ্টি হয় অতিরিক্ত সেন্টকে কেন্দ্র করেই। তাই বলছি কি, এ কাহিনীটায় আপনাদের পক্ষে কোন খুঁত বের করাই সম্ভব নয়।

গো-মাংসের পাঁজর নিয়ে হেটি তার সাড়ে তিন টাকা ভাড়ার চারতলার পিছনের ঘরে কামরাটায় উঠে গেল। গো-মাংসের ঝোল দিয়ে উদরপূর্তি করে হেটি লম্বা একটা ঘুমে রাত কাবাড় করে দেবে। ভোরের আলো ফুটলেই জোয়ান অব আর্ক, হারকিউলিস, জব, উনা আর লাল ঘোড়ার সওয়ার হুডের যোগ্য একটা চাকরির খোঁজে বেরিয়ে পড়বে।

তার কামরায় আলু, পিঁয়াজ, রসুন প্রভৃতি কিছুই নেই। কেবলমাত্র জল দিয়ে তো আর গো-মাংসের ঝোল রান্না করা সম্ভব নয়। ঝিনুক ছাড়া ঝিনুকের ঝোল, কচ্ছপ ছাড়া কচ্ছপের ঝোল, কপি ছাড়া কপির কেক রান্না করা গেলেও আলু, পিঁয়াজ আর রসুন ছাড়া গো-মাংসের ঝোল রান্না করা? অসম্ভব—একেবারেই অসম্ভব।

কিন্তু ঠেকায় পড়লে হয় না এমন কোন কাজই নেই। কেবলমাত্র গো-মাংসের পাঁজর দিয়েও

ঝোল রান্না করা যেতে পারে।

সে গামলাটা নিয়ে জল আনার জন্য চারতলার পিছন দিকে যেতেই একটা মেয়েকে দুটো আইরিশ ধুতে দেখল। তার মুখের বিষণ্ণতার ছাপটুকু তাদের নজর এড়াল না। পরনে কিমোনো দেখেই হেটি গ্রেটেস্ট স্টোরের মেয়ে কর্মীদের চিনতে পারে। আর অভিজ্ঞতা দিয়ে এ-ও বুঝতে পারল, আলুর মালিক মেয়েটা এক সাধারণ চিত্রশিল্পী। তারা অবশ্য বসত ঘরটাকে 'স্টুডিও' বলে।

মেয়েটা বেঁটেখাটো। অনভিজ্ঞের মত সে আলুর খোসা ছাড়াচ্ছে।

হেটি দু'পা এগিয়ে আলুর মালিক মেয়েটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মুচকি হেসে বলল, উপযাচক হয়ে আপনার কাজের ব্যাপারে কথা বলছি বলে কিছু মনে করবেন না। এভাবে খোসা ছাড়ালে অনেক আলু নষ্ট হবে। তার চেয়ে বরং আমাকে দিন ভালভাবে খোসা ছাড়িয়ে দিচ্ছি। এমন সুন্দর বারমুডা আলু নষ্ট হলে গায়ে লাগে।

সে একটা আলু আর ছুরিটা নিয়ে খোসা ছাড়াতে আরম্ভ করল।

চিত্রশিল্পী তাকে বহুভাবে ধন্যবাদ জানাল। আসলে কায়দাটা আমার জানা না থাকায় রোজই প্রচুর আলু নষ্ট হয়।

কাজ সেরে হাতের ছুরিটা তাকে ফিরিয়ে দিতে গিয়ে হেটি বলল, একটা কথা, আপনার কি খুব টানাটানি চলছে?

শুকনো হাসি হেসে চিত্রশিল্পী বলল, সে তো অবশ্যই। ইদানিং ছবি এঁকে রোজগারপাতি তেমন হয় না। ভাল দামে ছবি বিকোচ্ছে না। শুধুমাত্র আলু দুটো দিয়েই আজ রাতটা চালাতে হবে। সিদ্ধ করার পর সামান্য নুন আর ছিঁটে ফোঁটা মাখন হলেও গরম গরম খেতে ভাল লাগে।

হেটি ম্লান হেসে বলল, 'ভাই, বরাত গুণেই আজ আমাদের পরিচয় হয়েছে। আমার হালও তোমার মতই। আমি মাংসের একটা বড়সড় টুকরো নিয়ে এসেছি। আলুর অভাব। তাই বলছি কি আমাদের উভয়ের বরাত এক সঙ্গে মিলিয়ে গো-মাংসের ঝোল রান্না করি। এবার চাই শুধুমাত্র একটু পিঁয়াজ আর রসুন। শোন, তোমার চামড়ার বটুয়াটার কোণে কি দু'একটা পেনিও পড়ে নেই? তা হলে নিচে গিয়ে বুড়ো গিসেপ্পি-র দোকান থেকে পিঁয়াজ কিনে আনতাম। আসলে পিঁয়াজ ছাড়া গো-মাংসের ঝোল আর মিছরি ছাড়া ম্যাটিনি শো-তে সিনেমা দেখা সমান বিস্বাদ। দেখ তো যদি—

না ভাই, আমার সর্বশেষ পেনিটা তিনদিন আগেই খরচ করে ফেলেছি। শোন, তুমি আমাকে সেসিলিয়া বলে সম্বোধন করতে পারো।

নেই? তবে আর কিছুই করার নেই। পিঁয়াজ ছাড়াই কাজ চালিয়ে নিতে হবে।

তারা সেসিলিয়া-র ঘরে মাংসের ঝোল রান্না শুরু করল। রান্নার ফাঁকে হেটি দেখল, নতুন রেলপথের যে ফেরিবোটটা চালানো হচ্ছে তারই বিজ্ঞাপনের জন্য তার নিজের হাতের আঁকা একটা ছবির দিকে তাকিয়ে সেসিলিয়া অনবরত চোখের জল ফেলে চলেছে।

উপায়ান্তর না দেখে হেটি আঁচটাকে একটু কমিয়ে দিয়ে সেসিলিয়া-র কাছে গিয়ে তার গায়ে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল, কি ব্যাপার বল তো? তোমার ব্যথা-বেদনার কথা আমাকে খোলসা করে বল তো? আমার বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না, কেন তুমি ফেরিবোটটার দিকে তাকিয়ে চোখের জল ঝরাচ্ছ? এ ফেরিবোটের সঙ্গে তোমার দেখা ও উভয়ের মধ্যে হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, ঠিক কিনা?

সেসিলিয়া চোখের জল মুছতে মুছতে নিজের দুঃখময় জীবনের কাহিনী বলে যেতে লাগল, মাত্র তিনদিন আগের ঘটনা। জার্সি শহর থেকে আমি ওই খেয়া তরীটা চেপে ফিরছিলাম। ছবির কারবারী বৃদ্ধ মিঃ স্ক্রাম একদিন আমাকে বলেছিল, এক ধনকুবের তার মেয়ের একটা ছবি আঁকাতে আগ্রহী। আমার আঁকা কয়েকটা ছবি তাকে দেখিয়ে বললাম, ছবির দাম পঞ্চাশ ডলার। দাম শুনেই বেয়নার খেঁকিয়ে বলল, ধ্যুৎ! এর চেয়ে বিশগুণ বড় ছবির দাম মাত্র আট ডলার। আর আপনি কিনা পঞ্চাশ—

তখন আমার মনের অবস্থা, করুণ, আর একটা দিনও পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করছে না। তখন আমার কাছে কুড়িয়ে কাড়িয়ে মাত্র নিউইয়র্কে ফেরার খেয়ার টিকিট কাটার মত অর্থ

ছিল। আমার ভেতরের অশান্তি ও বিতৃষ্ণাটা বুঝি বা মুখের মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছিল। কারণ, খেয়ায় আমার বিপরীত দিকের বেঞ্চে বসে সে এমনভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছে, যেন আমার মনের খবর সে জানতে পেরে গেছে। তাকে দেখেই আমার মনে হল সে যেমন সুদর্শন ঠিক তেমনই দয়ালুও বটে। কোন মানুষ যখন ক্লান্ত, অসুখী আর নিদারুণ অসহায় অবস্থায় পড়ে তখন দয়াটাই তার কাছে সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দেয়।

আমার অবস্থা এমন অসহনীয় শোচনীয় হয়ে উঠল যে, তার বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতাটুকু আমার মধ্য থেকে নিঃশেষে উবে গেছে। ক্লান্ত পায়ে খেয়া নৌকোর কেবিনের পেছনটায় গিয়ে দাঁড়ালাম। চোখ বন্ধ করে ঝাঁপিয়ে পড়লাম জলে। উফ্! কী ঠাণ্ডা জল! মনে হল বরফও বুঝি এত ঠান্ডা নয়।

এক ঝলক ইচ্ছে আমার মনের কোণে উঁকি দিল, বসত বাড়িটায়ই ফিরে যাই। আশায় বুক বেঁধে পেটের জ্বালা নিয়ে ধড়ে প্রাণটাকে টিকিয়ে রাখি। সে—হ্যাঁ, সে আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে গুটিগুটি পিছু নিয়েছিল। জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে উদ্ধার করল। খেয়া নৌকোটা এগিয়ে গেল। সবাই ধরাধরি করে আমাকে উপরে তুলে নিল।

উঃ! হেটি, আত্মহত্যার চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যর্থ হওয়ায় সে যে কী লজ্জা আমাকে গ্রাস করে ফেলল তা তোমাকে বোঝাবার মত ভাষা আমার নেই।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নীল পোশাকধারী কয়েকটা লোক আমাকে বেষ্টন করে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাদের কার্ড আমার চোখের সামনে ধরল। তখন সে? সে নির্দ্বিধায় তাদের কাছে বলল, আমি কাছাকাছিই ছিলাম। নিজের চোখেই দেখেছি, রেলিং ধরে সে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ তার বটুয়াটা হাত থেকে পড়ে যায়। সেটা তুলতে গিয়ে রেলিঙের ওপর একটু বেশী মাত্রায় ঝুঁকে পড়ে। ব্যস, টাল সামলাতে না পেরে জলে পড়ে যায়। অন্য রকম কিছু সন্দেহ করার কোন অবকাশই নেই।

আমি খবরের কাগজের পাতায় পড়েছিলাম, আত্মহত্যা করতে গিয়ে যারা ব্যর্থ হয় তাদের ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে খুনীদের সাথে রেখে দেওয়া হয়।

দেখলাম, সে নিজেও ভিজে একেবারে জবজবে হয়ে গেছে। সে মনের ভাব গোপন রেখে আমার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে এমন করে হাসতে লাগল যেন ব্যাপারটা তামাশা ছাড়া কিছু নয়। আমার নাম, ধাম ও অন্যান্য বিবরণ জানার জন্য রীতিমত উঠে পড়ে লাগল। কিন্তু কিছুতেই আমার মুখ থেকে শ্রাতব্য কিছুই বের করতে পারল না। আসলে সে মুহূর্তে লজ্জা আমাকে পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলেছিল।

তুমি কিন্তু খুবই বোকার মত কাজ করেছিলে। হেটি সহানুভূতির স্বরে বলল। একটু অপেক্ষা কর, আগুন উস্কে দিয়ে নিচ্ছি। একটু পেঁয়াজ হলে আর কোন সমস্যাই থাকত না।

হেটি আবার তার কাছে ফিরে এলে সেসিলিয়া বলতে আরম্ভ করল, সে তখন কপালের ওপর ঝুঁকে পড়া টুপিটাকে সামান্য তুলে নিয়ে বলল, ঠিক আছে, পরিচয় না-ই বা দিলে। যে করেই হোক আমি তোমাকে ঠিক খুঁজে বের করে ফেলব। তোমাকে জল থেকে উদ্ধার করার দাবী আমি করবই করব। ট্যাক্সি চালককে ন্যায্য ভাড়ার চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ দিয়ে বলল, সে যেখানে যেতে চায় পৌঁছে দিও। সে ট্যাক্সি থেকে নেমে গেল। আমি এগিয়ে চললাম।

মুহূর্তকাল নীরবে কি যেন ভেবে সিসিলিয়া প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, হায় ঈশ্বর! তিন-তিনটে দিন হয়ে গেল তবু সে তো আমাকে খুঁজে বের করতে পারল না।

মুচকি হেসে হেটি বলল, ভাই, সময়টা আরও বাড়িয়ে দাও। নিউইয়র্ক শহরটা তো আর একটা দেশলাইয়ের বাক্স নয় যে, হাত বাড়ালেই বাঞ্ছিত লোকটাকে খুঁজে বের করে ফেলবে। আর জলে ডোবা কত মেয়ের পাত্তাই তো তাকে লাগাতে হচ্ছে। আহা! দু-একটা পেঁয়াজ আর কটা রসুনের কোয়া পেলে মাংসের ঝোলটা জব্বর হত!

সেসিলিয়া আঁৎকে উঠে বলল উফ্! ভয়ঙ্কর ঢেউয়ের কবলে পড়ে আমি প্রায় ডুবেই যাচ্ছিলাম।

হেটি বলল, মাংসে আর একটু জল দিলে হয়ত ভাল হত। যাই, সামান্য জল দিয়ে আসি। একটা পেঁয়াজ হলেও—সে যুবকটাকে দেখে কি ঠাহর করলে, মালকড়ি কিছু আছে তো, নাকি

রাস্তভিখারী।

আমার চোখে তো মনে হল দয়ার অবতার। আর অর্থকড়ি? ভাবে মনে হল, ভালই আছে। তবে তার জন্য কি আছে? শোন, ট্যাক্সির ভাড়া মেটাবার জন্য যখন বিল-বইটা বের করল তখন আড়চোখে তাকিয়ে দেখেছিলাম, তাতে হাজার হাজার ডলার রয়েছে। তারপর দেখলাম, সে খেয়াঘাট থেকে একটা মোটরে উঠে গন্তব্য স্থলে চলে গেল।

কী বোকা মেয়ে রে বাবা! তোমার নাম-ঠিকানা না দিয়ে খুবই বোকামি করেছ!

কণ্ঠস্বরে বেশ উষ্মা প্রকাশ করেই সেসিলিয়া এবার বলল, তুমি এটাকে বোকামি বলতে পার। তবে আমি কিন্তু কোন সোফারকে আমার ঠিকানা দেই না। একে যদি তুমি—

তার মুখের কথা শেষ হবার আগেই সিঁড়ি থেকে কার যেন পায়ের শব্দ ভেসে আসতে লাগল। একটা যুবক ওপরতলা থেকে নিচে নেমে এল। পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে মনে হল সে একেবারেই ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলে প্রকৃতির। আর তার চোখে মুখে বিষণ্ণতার ছাপ সুস্পষ্ট। দৈহিক ও মানসিকভাবে বে-সামাল অবস্থা। তার হাতে ইয়া বড়, এলার্ম ঘড়ির মতই বড় গোলাপি একটা পিঁয়াজ।

হেটি তাকে দেখেই থমকে গেল। আর সেসিলিয়া-র ভাব ভঙ্গিতে ফুটে উঠল—কিছুটা হারকিউলিস, কিছুটা জোয়ান অব আর্ক, কিছুটা জব আর কিছুটা উনা-র মানসিক দৃঢ়তার ছাপ।

যুবকটা সিঁড়ির তলায়ই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার মধ্যে প্রকাশ পেল ভয়, লজ্জা আর অভাবনীয় সঙ্কোচ। হেটি-র চেহারায় অবর্ণনীয় বিস্ময়ের ছাপ। যুবকটার হাতের পিঁয়াজটাই তার মধ্যে এমন আকস্মিক বিস্ময়ের উদ্রেক ঘটিয়েছে! যুবকটা কিন্তু তার হাতের পিঁয়াজটার ভূমিকা সম্বন্ধে কিছুমাত্রও অনুমান করতে পারল না।

হেটি বলল, কিছু মনে করবেন না, আপনার হাতের পিঁয়াজটা কি সিঁড়িতে কুড়িয়ে পেয়েছেন? আমি সবে বাজার করে ফিরেছি। থলের তলাটা কখন যে ফেঁসে গেছে বুঝতেই পারি নি। পিঁয়াজটার খোঁজেই আমাকে এ পর্যন্ত আসতে হয়েছে।

না। আমি সিঁড়িতে পাইনি। এটা অবশ্যই আপনার থলে থেকে পড়ে-যাওয়া পিঁয়াজ নয়। ওপর তলার জ্যাক বেভেন্স আমাকে পিঁয়াজটা দিয়ে এখানে পাঠিয়েছে। বিশ্বাস না হলে দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করে আসতে পারেন।

বেভেন্স? হেটি বলল—বেভেন্সকে আমি চিনি, বই লেখেন তো ইয়া বড় বড় খাম নিয়ে ডাকপিয়ন এসে প্রায়ই হাঁকাহাঁকি করে তাই না? আচ্ছা, আপনি কি ভালাসব্রোসাতে থাকেন? নাকি অন্য—

না। মাঝে মধ্যে এখানে আসি। বেভেন্স-এর সঙ্গে দেখা করতেই আসি। আমার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। পশ্চিম দিকে দুটো ব্লক পরে আমার ডেরা।

তাই বুঝি? তার হাতের পিঁয়াজটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই হেটি বলল, হাতের পিঁয়াজটা কোন কাজে লাগবে?

খাব। কাঁচাই খেয়ে নেব। আসলে আমার ঘরে খাবার কিছুই নেই কিনা। মনে হল জ্যাক-এরও একটু টানাটানিই চলছে। আমি ধরতে গেলে এটা তার কাছ থেকে জোর করেই ছিনিয়ে এনেছি।

হেটি বলল, আপনার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে, অভাব অনটন আপনারও নিত্যসঙ্গী।

মানুষের অভাব অনটনের কি কোন সীমা পরিসীমা আছে, আপনিই বলুন? তবে এ পিঁয়াজটা কিন্তু সম্প্রতি আমার নিজস্ব, একেবারেই নিজস্ব সম্পত্তি। কিছু মনে করবেন না, আমাকে এখন বিদায় নিতে হচ্ছে।

হেটি আমতা আমতা করে বলল, একটা কথা, কচি পিঁয়াজ অবশ্যই খাবার হিসেবে উপযুক্ত নয়। আবার পিঁয়াজ ছাড়া মাংসও চলে না। আপনি যেমন মিঃ বেভেন্স-এর বন্ধু ঠিক তেমনই আমার এক বান্ধবী পাশেই তার ঘরে বসে। আমাদের উভয়ের অবস্থাই একই। উভয়ের চেষ্টায় কিছু আলু আর গো-মাংসের পাঁজর সংগ্রহ করতে পেরেছি। কিন্তু পিঁয়াজের অভাবে সবকিছু ভেস্তে যেতে বসেছে।

যুবকটা হাতের পিঁয়াজটাকে হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে বলল, আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে। আগেই তো বলেছি, আমাকে এখনই—

হেটি ঝট করে তার জীর্ণ কোটের কোণাটা চেপে ধরে বলল, আমার অনুরোধ, দক্ষিণ ইউরোপের অধিবাসীদের মত হবেন না। ভুলেও কাঁচা পিঁয়াজ খেয়ে ব্যামো বাধিয়ে বসবেন না। পিয়াজটা আমাকে দিয়ে দিন আর আমার ঘরে গিয়ে মাংসের ঝোলের জন্য অপেক্ষা করুন। দেখবেন, এমন সুস্বাদু ঝোল জন্মেও কোন দিন মুখে তুলতে পারেন নি। বলে রাখছি, যদি ওজর আপত্তি করেন তবে আমরা দু'জন মহিলা আপনাকে টানতে টানতে ঘরে নিয়ে যেতে বাধ্য হব।

ছন্নছাড়া যুবকটা সোল্লাসে বলে উঠল, আমাকে কেন যে আপনাদের থেকে পৃথক ভাবছেন, ভেবে পাচ্ছি নে। আর আমার পিঁয়াজটাই যদি আপনাদের নিমন্ত্রণ পাওয়ার একমাত্র কারণ হয় তবে এটা আপনারাই নিয়ে নিন। কথাটা বলেই সে পিঁয়াজটা হেটি-র দিকে বাড়িয়ে দিল। এবার বলল, আপনাদের নিমন্ত্রণ আমি হাসিমুখে গ্রহণ করলাম।

যুবকটাকে একটু অপেক্ষা করতে বলে হেটি ব্যস্ত পায়ে সেসিলিয়া-র কাছে গিয়ে বলল, বাইরে একটা পিঁয়াজ তোমার অপেক্ষায় আছে। সঙ্গে এক যুবককেও দেখতে পাবে, যাও। আমি তাকে রাতের খাবার খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেছি। দেখো, তুমি আবার তাকে তাড়িয়ে দিয়ো না যেন।

আবেগ মধুর স্বরে সেসিলিয়া বলে উঠল, প্রিয়তম আমার! আমার স্বপ্নের রাজপুত্র! কোথায়? কোথায়—

আরে ব্বাস! এতেই এমন ভাবমুগ্ধ হয়ে পড়লে। আসলে এ-সে নয়। তুমি তো বলেইছিলে। তোমার বহু আকাঙ্ক্ষিত যুবকটা একজন ধনকুবের ঠিক কিনা? আর তার নিজের গাড়িও আছে। আর আমি যার কথা বলছি সে এক রাজভিখারী—রীতিমত ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলে। এখন বড়ই দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। তবে এমনও হতে পারে এক সময় অন্য দশজন ভদ্রলোকের মতই ছিল, অর্থের অধিকারীও ছিল। তার পিঁয়াজটা না পেলে আমাদের মাংসের ঝোলটাই বরবাদ হয়ে যাবে। তবে কথাবার্তা শুনে আমি নিঃসন্দেহ হয়েছি, তার আচার-আচরণ অবশ্যই ভাল হবে।

রাজপুত্র, নাকি পথের ভিখারী বা সৎ, নাকি অসৎ এসব নিয়ে আমি মোটেই ভাবিত নই। তার কাছে কোন খাদ্যবস্তু থাকলে তুমি নির্দ্বিধায় তাকে ভেতরে নিয়ে আসতে পার।

হেটি ঘর থেকে বেরিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। যাকে পিঁয়াজ হাতে দাঁড় করিয়ে রেখে গিয়েছিল সে সুযোগ বুঝে চম্পট দিয়েছে। ঘাড় ঘুরিয়েই সে আশার আলো সে যুবকটাকে দেখতে পেল। যুবকটা জানালায় ঝুঁকে দাঁড়িয়ে। নিচের তলায় কাকে যেন ইঙ্গিতে ডাকাডাকি করছে। হেটি যুবকটার কাঁধের ওপর দিয়ে বাঞ্ছিত জনকে দেখার চেষ্টা করছে। যুবকটা যাকে ইসারা করে ডাকছিল সে তাকেও দেখতে পেল। এমন কি তার টুকরো টুকরো কথাও শুনতে পেল। যুবকটা আচমকা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে পেল, হেটি তার কাঁধের ওপর দিয়ে নীরবে নিচের দৃশ্য দেখছে।

হেটি-র চোখ দুটো দিয়ে যেন অকস্মাৎ আগুনের হল্কা বেরোচ্ছে। সে যুবকটাকে লক্ষ্য করে কর্কশ স্বরে বলল, মিথ্যে কথা বলার চেষ্টা কোরো না। ওই পিঁয়াজটা নিয়ে তুমি কি করতে চাইছিলে?

তোমাকে তো আগেই বলেছি, আমার ঘরে এক দানা খাবারও নেই। তাই পিঁয়াজটা খেয়ে পেটের জ্বালা নেভানোর চেষ্টা করছিলাম।

তুমি চাকরি, মানে কোন কাজ কর না?

না, এ মুহূর্তে কোন চাকরিই আমার নেই।

কিন্তু আমি যে দেখলাম, জানালা দিয়ে ঝুঁকে নিচে অপেক্ষমাণ সবুজ মোটর গাড়ির সোফারকে ইশারায় কি যেন বলছ?

ম্লান হেসে যুবকটা তার প্রশ্নের উত্তর দিল, আসলে তার বেতন আমিই দিই। আর যে মোটর গাড়িটা দেখেছেন তার মালিকও আমি। আর এ পিঁয়াজটার পিছনে একটা কারণ আছে।

তবে কেন তুমি অন্য কোন খাদ্যবস্তু না খেয়ে শুধুমাত্র পিঁয়াজ খাও, কেন?

একী কথা বলছেন মাদাম! আমার তো মনে পড়ছে না যে, আপনাকে এমন কথা বলেছি, পিঁয়াজ ছাড়া অন্য কোন খাবার খাই না।

স্বীকার করছি। কিন্তু কাঁচা পিঁয়াজ খেতে চাচ্ছিলে কেন?

যুবকটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে বলল, আপনি দেখছি কিচ্ছু জানেন না! সর্দি হলে কাঁচা পিঁয়াজ

খেলে উপশম হয় তা-ও জানেন না? আমার মা খাওয়াতেন। আমার একটা শারীরিক সমস্যার কথা আপনার কাছে ফাঁস করে দিয়েছি বলে কিছু মনে করবেন না। আমি সর্দিতে ভুগছি বলে বাড়ি গিয়ে একটা কাঁচা পিঁয়াজ কামড়ে কামড়ে খেয়ে শুয়ে পড়ব।

কিন্তু ঠাণ্ডা লেগেছে কিভাবে যে সর্দিতে এখন ভুগছেন?

যুবক গলা ছেড়ে হেসে বলল, আপনি তো দেখছি মহা ধড়িবাজ মহিলা! তবে আপনাকে যখন কথা দিয়েছি কোন কিছুই আপনার কাছে গোপন করব না, তখন আপনার এ প্রশ্নটার জবাবও অবশ্যই দেব। আমি নর্থ রিভারে ফেরি করে যাচ্ছিলাম। তখন বরফ ঠাণ্ডা জলে পড়ে গিয়েছিলাম। আসলে একটা মেয়ে জলে ঝাঁপ দিল। তাকে রক্ষা করতে গিয়ে আমাকেও অনন্যোপায় হয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। তাই—

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে হেটি বলে উঠল—যে কথা, বলছিলাম, পিঁয়াজটা আমাকে দাও।

যুবকটা তার হাতের পিঁয়াজটা তুলে দিল।

হেটি এবার তার হাত ধরে একটা দরজা দেখিয়ে বলল—এক কাজ কর, ওই ঘরে যাও, স্বস্তি পাবে। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে সে বলল, তুমি যে মেয়েটাকে জল থেকে তুলে এনে সর্দি বাঁধিয়ে বসেছ ওখানেই তার দেখা মিলবে। আলুর মালিক ভেতরে অপেক্ষা করছে, পিঁয়াজের মালিক সোজা ঘরে ঢুকে যাও। ব্যস, তবে দুটো প্রাণী শান্তিতে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারবে।

এ পুয়োর রুল

প্রায়ই আমি বলি, মাঝে মধ্যে বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বলি যে নারী রহস্যময়ী নয়, পুরুষরা তাদের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে, তাকে বিভিন্নভাবে প্রবোধ দিতে পারে আর তাকে ব্যাখ্যা করতেও পারে সত্য।

বিশ্বাসী মানুষের মধ্যে নারী নিজেই ধারণার সঞ্চার করেছে যে, সে প্রকৃতই রহস্য সঞ্চারকারী নয়, নিজে তো নয়ই। আমার বক্তব্য সত্য, নাকি ভ্রান্ত সে সিদ্ধান্ত আপনারা পরে নিতে পারবেন।

সে আমলের 'হারপার'স ড্রয়ার'-এ বলা হত নিচের ভাল গল্পটা মিস অমুক, মিঃ অমুক আর মিঃ অমুককে নিয়ে তৈরী।

তবে এ থেকে বিশপ অমুক আর মান্যবর অমুক কে দূরে সরিয়ে রাখতেই হচ্ছে। কারণ তাঁরা তো আর এ দলের অন্তর্ভুক্ত নয়।

সে আমলে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী পালোমা ছিল একটা নতুন ও সাজানো গোছানো শহর। একজন প্রতিবেদকের চোখে সেটা 'ব্যাঙের ছাতা' শহর বলেই পরিচিত হত। আসলে কিন্তু এরকমটা মনে করা সঙ্গত নয়। বরং কোলা ব্যাঙের ছাতার মতই পালোমা হচ্ছে প্রথম আর শেষ শহর।

দুপুরের ট্রেনটা জল নেবার জন্য সে স্টেশনে দাঁড়াত। আর মধ্যাহ্ন ভোজ সারার জন্য যাত্রীরা ট্রেন থেকে নামত। সেখানে ডজন তিনেক দেশলাইয়ের বাক্সের মত বাড়িঘর, একটা পশমের কারখানা আর একটা নতুন হোটেল নিয়ে গড়ে উঠেছিল শহরটা। বলা চলে পালোমা ছিল এক উন্নতিশীল শহর। সারদিনে দুটো ট্রেন সেখানে দাঁড়িয়ে যেন দয়া দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করত।

বর্ষায় প্রায় হাঁটু সমান কাদা জমে যায় এরকম একটা জায়গায় প্যারিসিয়ান রেস্তোরাঁটা তৈরী করা হয়েছিল। আর চনমনে রোদ উঠলে সেটাই হয়ে উঠত উষ্ণতম স্থান। হিংকল নামে এক বুড়ো ছিল সেটার মালিক আর কর্মী দু-ই। সে ইন্ডিয়ানা থেকে এখানে বরাত ফেরাবার আশা নিয়ে আসে চীনা ঘাস আর জমানো দুধের মুল্লুকে।

চার কামরার বাক্সের মত একটা বাড়িতে বুড়ো হিংকল সপরিবারে বাস করত। বাঁশ দিয়ে রান্নাঘরটাকে বাড়িয়ে লম্বা একটা ছাউনি তৈরী করা হয়েছিল। একটা লম্বা টেবিল আর কুড়ি ফুট

লম্বা দুটো বেঞ্চ দু' দিকে পেতে খদ্দেরদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হত। সেখানেই আপেলের স্টু, মাংসের রোস্ট, সেদ্ধ মটরশুঁটি, সেদ্ধ বিন, সোডা বিস্কুট আর কফি পরিবেশন করা হত।

মাদাম হিংকল রান্নাবান্না করতেন। তাকে হাতে হাতে সাহায্য করত বেটি নামে একজন মেয়ে। সে সর্বজন সমক্ষে বেরত না। মোদ্দা কথা, তাকে দেখাই যেত না। রেস্তোরাঁয় খুব বেশী খদ্দেরের সমাগম ঘটলে এক মেক্সিকান যুবক পরিবেশনের কাজে হাত লাগাত—সাহায্য সহযোগিতা করত। প্যারিসের ভোজের আসরে যে খাদ্যতালিকার মত আমার হাতে লেখা খাদ্য তালিকার একদম শেষে মিষ্টান্ন দ্রব্যের নামগুলি রাখতাম।

'আইলীন হিংকল' নামটার বানান নির্ভুল। কারণ, আমি নিজের চোখে তাকে এ বানান করে নামটা লিখতে দেখেছি। সে অবশ্যই পরিবারটির একজন সদস্য। তা ছাড়া পুরো উপসাগরীয় অঞ্চলের প্রথম মহিলা কোষাধ্যক্ষ হিসাবেও তার কদর কম ছিল না। রান্নাঘরের দরজার গায়ে, ছাউনিটার তলায় উঁচু একটা টুল জুড়ে সে বসত। একটা কাঁটাতারের জাল দিয়ে তার সামনের দিকটা ঘেরা থাকত। তার মাঝের চৌকোণা একটা গর্তের ভেতর দিয়ে খদ্দেররা পাউন পেন্স গলিয়ে দিত। কাঁটাতারের বেড়াটা কেন যে দেওয়া হয়েছিল বলা মুশকিল। কারণ, সেখানে যেসব খদ্দের ভোজ সারতে আসে তারা তার একটু সেবা করতে গিয়ে মরতেও রাজি। তার কাজটা ছিল একেবারে হাল্কা মামুলি। প্রতিটি প্লেটের দাম এক ডলার। খাওয়া দাওয়া সেরে ডলারটা চৌকোণা ফোঁকড় দিয়ে গলিয়ে দিলে সে সেটা হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়ে কাঠের বাক্সে চালান করে দেয়। হ্যাঁ, এটুকুই তার কাজ।

অনেকেই ঘোড়া ছুটিয়ে দূর-দূরান্ত থেকে রূপসী তন্বী যুবতী আইলীন-এর মুখের এক টুকরো মিষ্টি হাসি দেখার প্রত্যাশা নিয়ে এখানে জড়ো হয়। তবে অস্বীকার করা উপায় নেই যে, তারা সুখাদ্যের সঙ্গে তাদের প্রাপ্য সুন্দর মুখের হাসিটুকু থেকে বঞ্চিত হয় না, আর এ-ও স্বীকার করতেই হবে তিনজন খদ্দেরের প্রতি আইলীন একটু বেশী রকম অনুগ্রহ প্রদর্শন করে। সৌজন্যবশত নিজের নামটা এখন নয়, সবার শেষে প্রকাশ করব।

প্রথমজনের নাম ব্রায়ান জ্যাক্স। কৃত্রিমতায় ভরপুর। বহু উত্থান-পতনের সঙ্গে জড়িত এ নামটা। কঙ্গোর থেকে শুরু করে সানফ্রান্সিস্কো, আরও উত্তরে গেলে পোর্টল্যান্ড আর ফ্লোরিডা পর্যন্ত সে সবারই পরিচিত। পৃথিবীর যাবতীয় কলাবিদ্যা, শিকার, ব্যবসা-বাণিজ্য আর খেলাধুলা প্রভৃতি বিষয়ে তার দক্ষতার অভাব ছিল না।

জ্যাক্সকে আমি যতবারই দেখেছি আমার ততবারই মনের কোণে উঁকি দিয়েছে জি.জি. বায়রন নামের অন্য কবির লেখা কয়েকটা ছত্র—যে, অল্প বয়সেই মদের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছিল, মদেই ডুবে থাকত সর্বক্ষণ—এত মদ গিলত যাতে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের তৃষ্ণা মিটতে পারত: শেষমেশ তৃষ্ণায় শুকনো গলায়ই সে দুনিয়া ছেড়ে গেল, কারণ তার কাছে আর এক ফোঁটাও মদ ছিল না।

কথাটা জ্যাক্স-এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবে সে দুনিয়া ছেড়ে না গিয়ে মৃতপ্রায় অবস্থায় পালোমোতে হাজির হল। সে ছিল পেশায় টেলিগ্রাফ প্রেরক আর স্টেশন আর এক্সপ্রেস এজেন্ট। মাসিক বেতন ছিল পঁচাত্তর ডলার। সে সব কিছু জানত আর সবকিছু বুঝত, এমন এক ভবিষ্যৎ সম্ভবনাময় যুবক কেন যে সামান্য একটা চাকরি নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল তা আমার বোধগম্য হয় নি।

আর সামান্য দু'চার কথার মাধ্যমে তার কথা শেষ করব। সে গাঢ় ও উজ্জ্বল নীল পোশাক, হলুদ জুতো আর জামার কাপড়েতেই একটা বো-টাই সব সময় পরত।

বাড কানিংহাম ছিল আমার দ্বিতীয় প্রতিদ্বন্দ্বী। পালোমার কাছাকাছি একটা পশুখামার ছিল তার আস্তানা। কাজের তাগিদে সে এখানে থাকত। পোষ না-মানা ঘোড়াগুলোকে পোষ মানানো ছিল তার কাজ। চেহারা আর পোশাক-আশাকে বাড ছিল একজন সত্যিকারের পশুপালক। গলার পিছনদিকে সে একটা রুমাল ব্যবহার করত আর চওড়া পটির একটা টুপি সর্বদা মাথায় পরত।

বাড প্রতি সপ্তাহে দু'দিন করে ভাল ভার্দে খামারবাড়ি থেকে প্যারিসিয়ান রেস্তোরাঁয় খানাপিনা সারতে আসত।

তবে জ্যাক্স আর আমি রেস্তোরাঁয় নিয়মিত খানাপিনা সারতে যেতাম।

হিংকল হাউস-এর সামনের দিককার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরটা বৈঠকখানা হিসাবে ব্যবহার করা হত। অন্যান্য সৌখীন দ্রব্য সামগ্রীর সঙ্গে ছোট একটা পিয়ানোও সে ঘরে রাখা ছিল।

সন্ধ্যার দিকে খদ্দেরের ভিড়ে রেস্তোরাঁ উপচে পড়লে জ্যাক্স, বাড আর আমি, আর কোন কোনদিন অন্য দু-একজন বৈঠকখানাটায় আশ্রয় নিতাম। সেখানে অপেক্ষা করার ফাঁকে মিস হিংকল-এর সঙ্গে দেখা করে একটু আধটু কথাও বলতাম।

ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে আইলীন অনেক রঙীন স্বপ্ন দেখত। কাঁটাতারের বেড়ার চৌকোণা ছিদ্রটা দিয়ে দাম নেওয়ার কাজটা যেন অদৃষ্টের ফেরেই তাকে করতে হত। কাজের ফাঁকে সে পড়াশোনার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখত। আর কারো কাছ থেকে শিক্ষণীয় কিছু শুনলে গভীর মনোযোগ সহকারেই শুনত। আর সে ভাবনাতেই অধিকাংশ সময় ডুবে থাকত। প্যারিসিয়ান রেস্তোরাঁর কোষাধ্যক্ষের কাজের চেয়ে বড় কিছু পাওয়াই ছিল তার প্রত্যাশা।

কপালের চামড়ায় ভাঁজ এঁকে সে বলত, শেক্সপীয়র একজন বড় লেখক ছিলেন, একথা কি আপনি স্বীকার করেন না? এ ছাড়াও আইলীন বিশ্বাস করে, শিকাগো শহরের তুলনায় অনেক উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র বোস্টন।

মহিলা চিত্রশিল্পীদের মধ্যে রোজা বনহুর ছিলেন সর্বঅগ্রগণ্যা। লন্ডন শহরকে কুয়াশামোড়া শহর আখ্যা দেওয়া যেতে পারে, প্রাচ্যদেশীয় মানুষের চেয়ে পাশ্চাত্যের অধিবাসীরা অনেক, অনেক মনখোলা ও স্বতস্ফূর্ত আর বসন্তের হাওয়া বইতে শুরু করলে ক্যালিফোর্নিয়া শহরটা বাস্তবিকই মনোরম হয়ে উঠতে থাকে। এরকম আরও বিস্তর মতামত সে অন্তরে পোষণ করে যা থেকে নিঃসন্দেহ হওয়া যেতে পারে যে, পৃথিবীর উন্নত চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে নিজেকে লিপ্ত রেখেছে।

এক সন্ধ্যায় কথা প্রসঙ্গে সে বলল, সত্যি বলছি, আমার চোখের সৌন্দর্য সম্বন্ধে ভূয়সী প্রশংসা শুনে শুনে আমি বাস্তবিকই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমি নিজে ভালই জানি, আমি সুন্দরী নই। অসুন্দরকে সুন্দরী বললে—মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলের ছোট্ট ও সাধারণ এক মেয়ে আমি। সহজ-সরল-পরিচ্ছন্ন থাকাটাই আমার একমাত্র আন্তরিক ইচ্ছা। আর বাবা যাতে সহজ-সরলভাবে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারেন সে চেষ্টাই আমি করে চলেছি।

হিংকল বুড়ো প্রতি মাসে রেস্তোরাঁর আয় এক হাজার রুপোর ডলার সান এন্টোনিওর একটা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখে।

আইলীন-এর কথার পরিপ্রেক্ষিতে বাড বলল—মিস আইলীন, তোমার কথাই ঠিক, মানুষের রূপ-সৌন্দর্যই বড় কথা নয়। আমি যে তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ তা মোটেই তোমার সুন্দর চোখের সুন্দর চাউনির জন্য নয়। তবে? মা-বাবার প্রতি তোমার সদাচরণের জন্যই তোমাকে আমার এত ভাল লাগে। মা-বাবার সঙ্গে যে মধুর আচরণ করে তার তো খুব সুন্দরী হবার প্রয়োজন নেই।

মুখ জুড়ে হাসি ফুটিয়ে তুলে আইলীন বলল—বহুদিন বাদে একটা সত্যিকারের ভাল প্রশংসার কথা শোনানোর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ না দিয়ে আমি পারছি না। আমার চপল চপল চোখ, মাথাভরা ঘন কোঁকড়ানো চুলের প্রসঙ্গ ছেড়ে এসব কথা শুনতে আমি সর্বদাই আগ্রহী। আমি যে বলি তোষামোদ আমি পছন্দ করি না, তা সে আপনি বিশ্বাস করেন—তাতেই আমি সন্তুষ্ট, তৃপ্ত।

খুবই সত্য যে, যাদের চাউনি ভাল তারা যে সর্বদা জয়লাভ করে এরকমটা মনে করা সঙ্গত নয়। সহজ-সরল আর শান্তস্বভাবা বুদ্ধিসত্তা মেয়েদের পক্ষে জয়লাভ—জীবনে উন্নতি করার তো মূলমন্ত্র। এই তো সেদিনই মিঃ হিংকল আমাকে বলছিলেন, তুমি এখানে কাজে লাগার পর থেকে একটা রুপোর ডলারও এদিক ওদিক করনি। আমি তো মনে করি একটা মেয়ের পক্ষে এটাই সবচেয়ে বড় গুণ, সবচেয়ে মূল্যবান মানপত্র। আর তাতেই আমি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছি।

জ্যাক্সের বরাতেও তার বাঞ্ছিত হাসিটা জুটে গেল। দু'গালে টোল ফেলে মুখে মিষ্টি হাসি ফুটিয়ে তুলে আইলীন জ্যাক্সকে লক্ষ্য করে বলল—আমার মনের কথা শুনুন মিঃ জ্যাক্স, কোন মানুষ যদি তোষামুদে না হয়ে মন খোলসা করে কথা বলে তবে আমি যে কী অনাবিল আনন্দ লাভ করি তা আপনাকে বুঝিয়ে বলার সাধ্য আমার নেই। আমার মতে বরাতে না থাকলে যথার্থ সত্যবাদী বন্ধু মেলে না।

জ্যাক্সের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আমার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে তার চোখ-মুখের প্রত্যাশার ছাপটুকু আমার নজর এড়াল না। এমনই অদৃষ্টের মোকাবিলা করার একটা উন্মাদ চেষ্টা যা আমার মধ্যে ভর করল। সে মুহূর্তে আমার মনে হল তাকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দেই যে, সে মহান সৃষ্টিকর্তা যা কিছু সুন্দর বস্তু সৃষ্টি করেছেন সেগুলোর মধ্যে সেই সবচেয়ে বেশী সুন্দর। সে যথার্থই একটা নিষ্কলঙ্ক মুক্তো—যথার্থই অপরূপা। সে যদি তার মা-বাবার প্রতি সাপের মত নিষ্ঠুর হয়, নইলে অর্থকড়ি দু'হাতে ওড়ায়, তা সত্ত্বেও আমি তার অতুলনীয় রূপ-সৌন্দর্যের গুণকীর্তন না করে পারবই না।

তবুও আমার সে ইচ্ছাটা সামলে সুমলে রাখলাম। আসলে চাটুকারের বরাতকে আমি বড্ড ভয় করি। জ্যাক্স আর বাড-এর চাতুর্যভরা উক্তিগুলো শোনার পর যে সে খুশিতে কেমন ডগমগ হয়ে উঠেছিল তা তো সামনে বসেই চাক্ষুষ করলাম। আমি বুঝে নিয়েছি, তোষামোদের প্রলেপ-দেওয়া মিঠা বুলি দিয়ে মিস হিংকল-এর মন ভেজানো যাবে না। তাই আমাকে সৎ আর সত্যবাদীদের খাতায় নাম লেখাতেই হল।

আমি বেশ সংযত ভাবেই বললাম—মিস হিংকল, কাব্য আর রোমান্সের ভাষা যা-ই হোক না কেন, সব দেশে, সব যুগে নারীর রূপ-সৌন্দর্যের তুলনায় নারীর বুদ্ধিমত্তা বেশী আদরণীয় হয়েছে। এমন কি স্বয়ং ক্লিওপেট্রার ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। তার রাণীসুলভ মনোভাবকে তার চোখের মন-মজানো চাউনির তুলনায় বেশী কদর দিয়েছে।

অবশ্যই। আইলীন বলল—আমারও একই বিশ্বাস। তার বহু ছবি বহু পরিবেশে ও বহুবার আমি তার বিভিন্ন ছবি দেখেছি। মনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করার মত রূপ তার ছিল না। তার নাকটা ছিল ইয়া লম্বা—বে-মানান।

আবেগ-মধুর স্বরে আমি বললাম—মিস আইলীন, আপনার কাছ থেকে যদি অভয় মেলে একটা কথা বলি—আপনাকে দেখলেই ক্লিওপেট্রা যেন আমার চোখের সামনে ছায়াছবির মত স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়।

আমাকে দেখলে এরকমটা মনে হওয়ার কারণ কি? মুচকি হেসে আইলীন বলল কই, আমার নাকটা তো তেমন কিছু লম্বা নয় যে, সবার চোখে লাগতে পারে।

আরে, না-না—আমি কি তা-ই বলতে চাইছি নাকি। মানসিক গুণের কথা বলতে গিয়ে যুক্তিটা দাঁড় করাতে হয়েছে।

আইলীন সাধ্যমত নরম স্বরে বলল—দেখুন, আমার প্রতি সহজ-সরল আর মন খোলসা করে মন্তব্য করার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ না জানালে নিজেকে বড্ড অপরাধী মনে হবে। আপনারা খোলাখুলি কথা বললে আমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠতে পারব।

প্যারিসীয় রেস্তোরাঁ থেকে দশটায় বেরিয়ে আমরা তিনজন জ্যাক্স-এর ছোট্ট কাঠের স্টেশনে চলে যেতাম। আর প্লাটফর্মের কিনারায় পাশাপাশি বসে পা নাচাতে নাচাতে একে, অন্যকে গ্যাস দিয়ে দিয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলতাম।

একদিন এক বলিষ্ঠ যুবক ঘোড়ার পিঠে চেপে পালোমাতে হাজির হল। পেশায় উকিল। সি. ভিনসেন্ট ভেসি তার নাম। প্রথম দর্শনেই মনে হবে যে দক্ষিণ-পশ্চিম আইন বিদ্যালয় থেকে সদ্য ওকালতি পাশ করেছে। পোশাকে-আশাকে রীতিমত কেতাদুরস্ত। তাকে নিয়ে পালোমাতে রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি হল।

নিজের বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে তাকে পালোমার অধিবাসীদের সঙ্গে পরিচিত—মেলামেশা করতেই হবে। তাই তো আমরা, বাড, জ্যাক্স আর আমি তার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগটা হাতে পেয়ে গেলাম।

ভেসি যদি আইলীনকে না দেখত, যুদ্ধক্ষেত্রে চতুর্থ প্রতিযোগী না হত তবে সবাই অদৃষ্টবাদের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলত। প্যারিসিয়ান রেস্তোরাঁয় মাথা না গুঁজে হলুদ পাইন হোটেলে আস্তানা গেড়েছে। তবে হিংকল-এর বৈঠকখানার আসরের নিয়মিত সদস্য হয়ে উঠল।

ভেসি ছিল একজন যথার্থই বাগ্মী। খনি থেকে যেমন প্রবল বেগে তেল বেরয় তেমনি তার মুখ থেকে প্রচণ্ড বেগে শব্দ বেরিয়ে আসত। তার বাগ্মিতা আর প্রিন্স এলবার্ট-এর আকর্ষণ যে

আইলীন কাটিয়ে উঠতে পারবে, সে রকম সম্ভাবনা না দেখে আমরা তার সংস্রব থেকে দূরে সরে যেতে বাধ্য হলাম।

শেষমেশ এমন এক সময় এল যখন আমাদের সাহসী না হয়ে উপায় ছিল না।

এক সন্ধ্যায় আমি হিংকলদের বৈঠকখানার সামনের ছোট্ট বাগানটায় আইলীন-এর প্রতীক্ষায় বসেছিলাম। ঠিক তখনই ঘর থেকে কাদের কণ্ঠস্বর ভেসে আসতে লাগল। উৎকর্ণ হয়ে লক্ষ্য করে বুঝলাম, যে তার বাবা কথা বলছে। কখন যে সে বাবার সঙ্গে ঘরে ঢুকেছে বুঝতেই পারি নি।

আইলীন বুড়ো মেয়েকে বলল—আইলীন, ক'দিন যাবৎ আমি লক্ষ্য করছি তিন-চারটে যুবক তোমার বৈঠকখানায় নিয়মিত আনাগোনা করে। তাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যাকে তুমি অন্যদের চেয়ে বেশী মাত্রায় পছন্দ কর?

আইলীন চোখ দুটো কপালে তুলে বলল—একী কথা বলছ বাবা! তারা তো সবাই আমার মনের মত। তবে মিঃ ভেসির সঙ্গে বেশীদিন আমার পরিচয় হয় নি। তবে আমার মতে তিনিও লোক হিসেবে চমৎকার। মন খোলসা করেই কথাবার্তা বলেন আর যা বলেন সৎভাবেই বলেন।

হিংকল বুড়ো বলল—আমিও তো তা-ই বলতে চাচ্ছি। তোমার মুখে সব সময়ই তো শুনি যারা সত্য কথা বলে, স্তোকবাক্যে তোমাকে সন্তুষ্ট করতে উৎসাহী হয় না তাকেই তুমি পছন্দ কর। তুমি না হয় যুবকগুলোর মধ্য থেকে একজনকে বিচার বিবেচনা অনুযায়ী বেছে নাও।

তা কি করে সম্ভব বাবা?

আমিই তোমাকে কৌশলটা শিখিয়ে দেব। তুমি তো একটু-আধটু গানও গাইতে পার। তবে তোমার শিক্ষক মশাই তো বলতেন, তোমার নাকি গানের গলা তেমন নয়। গান নিয়ে মেতে থাকার অর্থই হচ্ছে কাড়ি কাড়ি অর্থ নষ্ট করা। এবার মনে কর, তোমার গান বাজনা সম্বন্ধে যুবকগুলোর কাছে মতামত জানতে চাইবে। এ ব্যাপারে তাদের বক্তব্য কি তা-ও জানতে পারবে। এ সম্বন্ধে যে সত্যি কথাটা বলবে তার স্নায়ুর জোর বেশী বুঝতে পারবে। এভাবেই তুমি তাদের মধ্য থেকে একজনকে অনায়াসে নির্বাচন করে নিতে পারবে।

তোমার পরামর্শ অনুযায়ীই কাজ করব বাবা। আইলীন বলল। হিংকল বুড়ো আর আইলীন ভেতরে চলে গেল। আমি সবার অজান্তে স্টেশনের দিকে হাঁটা জুড়লাম। আর জ্যাক্স আটটার টেলিগ্রাফ-বার্তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। বাড একা শহরে পড়ে রইল। সে ঘোড়ায় চেপে আমার কাছে এল। হিংকল বুড়ো আর আইলীন-এর বক্তব্য তার কাছে ব্যক্ত করলাম। আসলে আমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছে সাচ্চা থাকতেই আগ্রহী। আর আইলীন-এর সব আসক্তদেরই এটা করা উচিত।

আমরা পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা সেরে প্লাটফর্মের ওপরই সোল্লাসে নাচানাচি শুরু করে দিলাম।

সে সন্ধ্যায় মিস হিংকল যে চেয়ারটায় বসেছিল সেটা ছাড়া চার-চারটে চেয়ারই ভর্তি ছিল। আমরা আগে ভাগেই প্রতিযোগিতা থেকে ভেসিকে বাইরে রেখেছিলাম। আর আমরা তিনজন দুরুদুরু বুকে পরীক্ষার জন্য অধীর প্রতীক্ষায় প্রতিটা মুহূর্ত কাটাতে লাগলাম। প্রথম কোপটাই পড়ল বাড-এর ওপর।

আইলীন গাইল—'পাতা যখন ঝরে যায়' গানটা শেষ করে আইলীন এক গাল হেসে বলল—মিঃ বাড, আমার গলা আর সুরজ্ঞান সম্বন্ধে আপনার মনের কথা জানতে পারি কি? আপনি তো ভালই জানেন, তোষামোদ নয়, সত্যি কথাই আমি বেশী পছন্দ করি।

বার্ড নির্দ্বিধায় নিজের মত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলল—মিস আইলীন, সত্যি করেই বলছি, ভোঁদড়ের কণ্ঠস্বরের তুলনায় তোমার গলা উন্নত নয়—তবে অপেক্ষাকৃত কর্কশ। ব্যস, এর বেশী কিছু নয়। আর তুমি যখন আমাকেই পরীক্ষক নির্বাচন করেছ তখন আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, তুমি যা গাইলে সেটাকে আর যা-ই বলা যাক, অন্তত গান বলা যায় না।

সত্যি কথা অকপটে বলতে গিয়ে মাত্রাতিরিক্ত কিছু বলে ফেলল কিনা সে সম্বন্ধে ধারণা নিতে গিয়ে আমি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে আইলীন-এর মুখের দিকে তাকালাম। কিন্তু তার মুচকি হাসিটুকু লক্ষ্য করে নিঃসন্দেহ হলাম ঠিক পথেই গাড়ি চালানো হয়েছে।

আইলীন এবার ঘাড় ঘুরিয়ে জ্যাক্স-এর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলল—মিঃ জ্যাক্স, এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

আমার মতে তুমি প্রথম শ্রেণীর গায়িকা অবশ্যই নও। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটা শহরে আমি যাদের গান শুনেছি তুমি কিন্তু তাদের কাছাকাছিই পৌঁছতে পারনি।

জ্যাক্স-এর মন্তব্য শোনার পর আইলীন ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে আমার দিকে ঘাড় ঘুরাল।

তার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমি বললাম—আমি অকপটে স্বীকার করে নিচ্ছি, প্রথমের দিকে আমি একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলাম, সত্যি। খোলসা করে বলার মধ্যে একেবারে খোলসা করে বলার ব্যাপারটা অবশ্যই থেকে যায়। তাই বলছি কি, আমি মন্তব্য করার সময় একটু লাগাম টেনে রেখেছিলাম, মিথ্যে নয়। তবে এও সত্য যে, আমি অবশ্যই সমালোচকদের দল থেকে সরে যাই নি, ঠিক কিনা?

—মিস আইলীন, বিজ্ঞানসম্মত সঙ্গীতে আমার জ্ঞান তেমন প্রখর নয়। তবে খোলসা করেই আমার মত ব্যক্ত করছি—তোমার প্রকৃতিদত্ত কণ্ঠের ভূয়সী প্রশংসা করতে আমি মনের দিক থেকে মোটেই উৎসাহ পাচ্ছি নে। কথায় আছে, একজন গায়ক গান করেন পাখির মত মিষ্টি কণ্ঠে তবে, পাখির কণ্ঠস্বরেরও তো আবার ভাল-মন্দ আছে। তোমার কণ্ঠস্বরের সঙ্গে আমি কলকণ্ঠ বুলবুলের স্বরকেই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। কণ্ঠস্বর তেমন জোরালো নয়, আবার বৈচিত্র্যেও ভরপুর—

আমাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে আইলীন বলে উঠল—আপনার নিরপেক্ষ মন্তব্যের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি নে। আমার প্রত্যয় আছে যে, আপনার মন খোলসা করা মন্তব্যের ওপর আস্থা রাখা যায়।

ভেসি এবার নিজের মন্তব্য পেশ করতে গিয়ে বলল—মিস হিংকল, কণ্ঠস্বরকে আমি ঈশ্বর প্রদত্ত অমূল্য সম্পদ বলেই মনে করছি। আমার স্মৃতি আর ভাষার দখল তার যথাযথ বর্ণনা দিতে অক্ষম। এবার সে জেনি লিন্ডা থেকে শুরু করে এ্যাবেট অবধি সবগুলো মহাদেশের বড় বড় অপেরাগুলোর গায়ক-গায়িকাদের এক-এক করে নাম করতে লাগল কেবলমাত্র তাদের মূল্যহীনতাকে প্রকট করে তোলার জন্য। তবে শেষ অবধি সে স্বীকার না করে পারল না যে, লিন্ডা গান গাইতে গিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে এমন দক্ষতার পরিচয় দিতে পারে যা হিংকলের পক্ষে এখনও সম্ভব হয় নি। তবে—তবে সেটা তো কেবলমাত্র চর্চার ফলেই সম্ভব হয়েছে, আইলীন-এর পক্ষেও তা সম্ভব নয়।

সবশেষে সে ভবিষ্যদ্বাণী করল, দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় এ গায়িকা অচিরেই সঙ্গীতের এমন একটা স্তরে পৌঁছে যাবে যে তার জন্য প্রাচীন ও মহান নগর টেক্সাসও এমন গর্ববোধ করবে যার নজীর সঙ্গীতের ইতিহাসে নেই।

আমরা তিনজন যখন আইলীন-এর বৈঠকখানা থেকে বিদায় নেবার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম তখন সে কিন্তু আমাদের সঙ্গে করমর্দন সেরে উষ্ণ সম্ভাষণ জানাল। আশ্চর্য ব্যাপার ! সে কিন্তু আমাদের তিনজনের কাউকে কম বা কাউকে বেশী অনুগ্রহ দেখিয়েছে এ রকম দৃশ্য লক্ষিত হল না। তবে আমরা জানতাম—আমাদের তিনজনেরই জানা ছিল। আমরা এটুকু অন্তত জানতে পেরেছি সততা আর খোলসা মনেরই জয় হয়েছে। এবার আমরা, প্রতিদ্বন্দ্বীরা চার থেকে তিনে এসে ঠেকেছি। আইলীন-এর ভাগ্য-লাগা যুবকদের তালিকা থেকে ভেস-এর নামটা সঙ্গত কারণেই বাদ দেওয়া হয়েছে।

তারপর এক-দুই-তিন করে চার-চারটা দিন কেটে গেল। বলার মত কোন ঘটনাই ঘটল না। পঞ্চম দিনে জ্যাক্স ও আমি রাতের খাবার খেতে গিয়ে দেখি ম্যাক্সিকান যুবকটা দেবতায় পরিণত হবার আশা ছেড়ে দিয়ে কাঁটা তারের চৌকোণা গর্তটা দিয়ে ডলার গলিয়ে খাবারের দাম মেটাচ্ছে।

আমরা আর নিজেদের সামলে সুমলে রাখতে না পেরে রান্নাঘরের দিকে ছুটে যাবার সময় হিংকল বুড়োর মুখোমুখি হয়ে গেলাম। আমরা সমস্বরে প্রশ্ন করলাম—আইলীন কোথায়? আইলীন কোথায়, বলতে পারেন?

হিংকল বুড়ো সহানুভূতি স্বরে বলল, শোন হে বাছারা, হঠাৎই সে সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলেছে। আমি এতগুলো ডলার হাতের মুঠোয় পেয়ে তার প্রস্তাবে সম্মতি দিয়ে ফেললাম। সেও চার বছরের জন্য গলা-সাধা চর্চা করতে বোস্টনের খামার বাড়িতে গেছে। কথাটা বলতে-বলতে সে কফির কাপ হাতে খাবার ঘরের দিকে পা-বাড়াল।

সে রাতে আমরা সংখ্যায় তিনজন নয়, চারজন স্টেশনে জড়ো হলাম। প্ল্যাটফর্মের কিনারায় আমরা পাশাপাশি বসে পা দোলাতে দোলাতে এটা-ওটা নিয়ে আলোচনা করতে লাগলাম। আমাদের দলে তখন অন্যতম সদস্য ভেসি। আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল একটা মেয়ের কাছে সত্য, নাকি মিথ্যা কথা বলা উচিত।

আমরা চারজনই যুবক বলে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারলাম না।

দ্য রোজ অব ডিক্সি

এক স্টক কোম্পানি যখন জর্জিয়ার টুম্বস নগর থেকে 'দ্য রোজ অব ডিক্সি' পত্রিকাটা প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন একটামাত্র প্রার্থীর নামই মালিকপক্ষের মাথায় ছিল। তার নাম কর্নেল একুইলা টেলফেয়ার। অগাধ পাণ্ডিত্য, নামযশ আর বংশমর্যাদা আর দক্ষিণ অঞ্চলের ঐতিহ্য—সব মিলিয়ে তিনি ছিলে একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি। এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর জর্জিয়ার যে সব দেশব্রতী নাগরিক পত্রিকাটার প্রকাশনা তহবিলে এক লক্ষ ডলার চাঁদা দিয়েছেন তাদের সমন্বয়ে গঠিত একটা কমিটি একদিন মিঃ টেলফেয়ার-এর বৈঠকখানায় হাজির হলেন। তাঁদের আশঙ্কা ছিল, যদি তিনি কোন কারণে অসম্মত হন তবে তাদের পত্রিকা প্রকাশনার এবং দক্ষিণ অঞ্চলের ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী।

মিঃ টেল্‌ফেয়ার তার সুবিশাল গ্রন্থাগার কক্ষে তাদের মত আপ্যায়ন করে বসালেন। পৈত্রিকসূত্রে তিনি এটা পেয়েছেন। দশ হাজার বই নিয়ে গ্রন্থাগারটা গঠন করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে অধিকাংশেরই প্রকাশকাল আঠার শ' একষট্টি খ্রীষ্টাব্দ। দ্য রোজ অব ডিক্সি পত্রিকার সদস্যরা যখন তার বাড়ি হাজির হলেন তখন তিনি বার্টন-এর লেখা 'এনাটমি অব মেলাংকলি' নামক বইয়ের পাতায় ডুবেছিলেন। আপনাদের যদি দ্য রোজ অব ডিক্সি পত্রিকাটার সঙ্গে পরিচয় থাকে তবেই টেলফেয়ার-এর চেহারাটা সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করে নিতে পারবেন। কারণ, ওই পত্রিকার পাতায় প্রায়ই তার ছবি ছাপা হয়েছে। তাঁর মুখটা এমন যে, সহজে কারো পক্ষেই মন থেকে মুছে ফেলা সম্ভব নয়।

এতগুলো বিশিষ্ট ব্যক্তির সনির্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করা কর্নেল একুইলা টেলফেয়ারের পক্ষে সম্ভব হল না। ফলে তিনি দ্য রোজ অব ডিক্সি পত্রিকার কার্যনির্বাহী সম্পাদকের পদটা গ্রহণ করলেন। আর বেতনের দিকটাও গ্রহণযোগ্যই বটে। তার ওপর তাঁর জমি জিরাতের ফলনক্ষমতা ক্রমে হ্রাস পাচ্ছিল। আর এ সম্মানটাও কম কথা নয়।

মিঃ টেলফয়ার প্রস্তাবটা গ্রহণ করার পূর্ব মুহূর্তে দীর্ঘ চল্লিশ মিনিট ধরে যে বক্তব্য রাখলেন তাতে চসার থেকে মেকলে পর্যন্ত ইংরেজি সাহিত্যের একটা মনোজ্ঞ বিবরণ তাঁদের কাছে ব্যক্ত করলেন। প্রসঙ্গক্রমে একথাও বললেন যে, ঈশ্বর সহায় হলে পত্রিকাটাকে তিনি এমনভাবে সাজিয়ে তুলবেন যে, তার খ্যাতি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে, সমাদর পাবে আকাশ-ছোঁয়া।

সম্পাদকমশাই সহকারী সম্পাদক ও লেখকদের নিয়ে যে দলটি গড়ে তুললেন তা একমাত্র এক থোকা পীচফলের সঙ্গেই তুলনীয়। প্রথম সহকারী সম্পাদক টলিভারলী ফেয়ার ফ্যাক্স। তিনি এমনই এক কৃতী পুরুষ যে সিক্রেট অভিযান চালাতে গিয়ে নিজের বাবাকেই খুন করে বসেন।

আর দ্বিতীয় সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হলেন কীটস উন্‌ থ্যাঙ্ক। তিনি হচ্ছেন মর্গ্যানের আক্রমণকারীদের একজনের ভাইপো।

পুস্তক-সমালোচনার দায়িত্ব যাঁর ওপর বর্তাল তাঁর নাম জ্যাক্সন রফিংহাম। সে যুক্তরাষ্ট্রীয় বাহিনীর কনিষ্ঠতম সৈনিকের পদে নিযুক্ত। এক হাতে দুগ্ধভাণ্ড আর অন্য হাতে অসি ধারণ করে সে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছিল। আর কলা বিভাগের সম্পাদনার দায়িত্ব বর্তেছিল রনসেসভালেস

সাইকেস-এর উপর। সে জেফার্সন ডেভিসের ভাইপোর তৃতীয় সম্পর্কিত ভাই। মিঃ টেলফেয়ারের স্টেনোগ্রাফার এবং টাইপরাইটার মিস লাভিনিয়া টেরহুনের এক মাসিকে একদিন সুযোগ বুঝে স্টোনওয়েল জ্যাকসন চুম্বন করেছিল, এরকম আরও কত কি।

এতকিছু সত্ত্বেও দ্য রোজ অব ডিক্সি পত্রিকাটা প্রতি মাসে নিয়মিত প্রকাশিত হতে লাগল। তবে এও সত্য যে, প্রতিটা সংখ্যাতেই লুক্সেম্বুর্গ বাগিচা বা তাজমহল, নইলে লা কোলেটের মনমাতানো একটা ছবি বা কর্মেনসিটা থাকছেই থাকছে। তবু বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তি পত্রিকাটার গ্রাহক হতে লাগল আর কেনেও অনেকেই।

একদিন এক অস্থিরচিত্ত লোক দ্য রোজ অব ডিক্সি পত্রিকার সম্পাদকের দপ্তরে হাজির হল। চেয়ার টেনে বসতে গিয়ে বলল—আমার নাম টি. টি. থ্যাকার। নিউইয়র্কের অধিবাসী। আমি আসছিও সেখান থেকেই।

সম্পাদকের টেবিলে কয়েকটা কার্ড, এক গোছা ম্যানিলা খাম আর দ্য রোজ অব ডিক্সি পত্রিকার মালিক পক্ষের একটা হাতচিঠি রাখতে রাখতে একনাগাড়ে বলে চলল, আমি বেশ কিছুদিন ধরে পত্রিকার মালিকপক্ষের প্রচার সচিবের সঙ্গে চিঠি লেখালেখি করছি। পত্রিকার উন্নতি এবং সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারে আমি সিদ্ধহস্ত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পত্রিকাটার প্রচার-সংখ্যা দশ হাজার থেকে বাড়িয়ে এক লক্ষে পৌঁছে দিতে পারব। আমি নির্দ্বিধায় এরকম গ্যারান্টি দিচ্ছি। দেখুন, প্রথম সংখ্যাটা প্রকাশের পর থেকে আজ পর্যন্ত পত্রিকাটার ওপর আমি নজর রেখে চলেছি। পত্রিকার সম্পাদক থেকে শুরু করে বিজ্ঞাপন প্রচারের ছোটবড় কাজই আমার নখদর্পণে। বর্তমানে পত্রিকাটার জন্য প্রচুর অর্থের সম্ভাবনা নিয়ে আমি এখানে এসেছি। তবে হ্যাঁ, এ প্রসঙ্গে কথা থাকছে এখানকার সবকিছু যদি আমার পছন্দ মাফিক হয়। আর আমি যে পরিমাণ অর্থ এর পিছনে নিয়োগ করব তা যাতে কড়ায় গণ্ডায় উঠে আসে সেটা তো আমার অভিপ্রেত থাকবেই। সচিব মশাইয়ের মুখে শুনেছি, পত্রিকাটা নাকি বেশ লোকসানে চলেছে। আমার মাথায়ই তো আসছে না, ঠিক ভাবে চালাতে পারলে দক্ষিণের প্রকাশিত একটা পত্রিকা উত্তরের মানুষের কাছে সমাদর পাবে না কেন?

সম্পাদক মিঃ টেলফেয়ার সোনার ফ্রেমের চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে বললেন—মিঃ থ্যাকার, দ্য রোজ অব ডিক্সির লক্ষ্য দক্ষিণী প্রতিভার বিকাশ সাধন, তার প্রচারে নিযুক্ত থাকা। আপনার চোখে পড়তে পারে, এর প্রচ্ছদে বড় বড় হরফে লেখা থাকে 'দক্ষিণের দ্বারা, দক্ষিণের প্রাত আর দক্ষিণের জন্য'—দেখেছেন তো?

হ্যাঁ। তবে উত্তরে পত্রিকাটার বহুল প্রচারে আপনার অবশ্যই আপত্তি থাকার কথা নয়, কি বলেন?

আমার বিশ্বাস, এর প্রচার সব অঞ্চলের মানুষের জন্যই খোলা রাখা দরকার। তবে পত্রিকার ব্যবসাগত দিক সম্বন্ধে আমার মন্তব্য করার কিছু নেই। সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য আমাকে তলব করা হয়েছে। আমার সাহিত্য-প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য প্রয়োগ করেই আমি দায়িত্ব পালন করছি। আমার প্রচেষ্টায় কোন ত্রুটি আছে বলে আমার অন্তত জানা নেই।

অবশ্যই! অবশ্যই! তবে এটাও তো ঠিক যে, ডলার সব ক্ষেত্রেই ডলারই বটে। উত্তর বা দক্ষিণ উভয় স্থানেই আর যাই কিনতে যান না কেন। আপনার টেবিলেই নভেম্বরের সংখ্যাটা রয়েছে দেখছি। আমি নিজে দেখেছিলাম। আপনারও অবশ্যই দেখা আছে। তবু এটার পাতাগুলো খুলছি। মিঃ টেলফেয়ার, আপনার প্রধান সম্পাদকীয় সম্বন্ধে কিছু বলার নেই, ঠিকই আছে। দুটো পৃষ্ঠা উল্টে একটা পৃষ্ঠার দিকে সম্পাদক মশাইয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে তিনি এবার বললেন—এই যে দেখুন, তিন পৃষ্ঠার একটা ইয়া বড় কবিতা ছাপা হয়েছে। কবিতার নাম 'স্বৈরাচারীর পা', লেখিকা লোরিলা লেসেলেস। আমাকেও বহু পাণ্ডুলিপি ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয়। কিন্তু বাতিল করা কবিতার গোছায়ও এরকম নাম আমার নজরে পড়েনি।

দেখুন, মিস লেসেলেস দক্ষিণ অঞ্চলের প্রখ্যাত কবিদের একজন বলে গণ্য হন। আলাবাসার লেসেলেস পরিবারের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সে রাজ্যের উদ্বোধন দিবসের অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রীয় পতাকাটা রাজ্যপালের হাতে তিনিই তুলে দিয়েছিলেন।

হতে পারে। তবে এস অ্যান্ড ও রেলপথের টুস্কালুসা ডিপোর একটা দৃশ্যের অবতারণা করে কবিতা লেখার যৌক্তিকতা কি থাকতে পারে, বুঝছি না তো?

বলছি শুনুন, যে পুরনো বাড়িটায় লেসেলেস জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার বেড়ার একটা কোণকে কবিতায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

ভাল কথা, আগন্তুক মিঃ থ্যাকার বললেন। দেখুন, কবিতাটা আমি পড়েছি। তবে এটা 'স্কুল রান্' নাকি ডিপোটাকে ভিত্তি করা লেখা তা তো আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। আরও বলছি, একটা ছোট গল্প এতে স্থান পেয়েছে, লেখক ফোস্ডাইক পিগট। গল্পটার নাম রোজির প্রলোভন। বস্তাপচা মাল। আচ্ছা, পিগট কে, বলুন তো?

তিনি এ পত্রিকার প্রধান মজুতদারের সহোদর।

হায় ঈশ্বর! এ দুনিয়ায় পিগট-ও অচল নয়। তবে আমার মতে, তুরপুন ব্যবহার করে মৎস্য শিকার আর মেরু আবিষ্কারের প্রসঙ্গে লেখা প্রবন্ধটা চলার মত, স্বীকার করছি। কিন্তু নাশ্ভিল, আটলান্টা, সাবান্না আর নিউ অর্লিয়েন্স-এর চোলাই মদের কারবার সম্বন্ধে লেখাটার ব্যাপারে আপনার মতামত কি, দয়া করে বলবেন কি? লেখাটায় যা পাওয়া যাচ্ছে তা হচ্ছে, কি পরিমাণ চোলাই মদ তৈরি হয় আর গুণাগুণ কি তাই তুলে ধরা হয়েছে। তার বাইরের কোন ব্যাপারেরই উল্লেখ নেই। তার ভয়টা কিসের, মালুম হচ্ছে না তো?

সম্পাদক টেলফেয়ার মুখ খুললেন—আপনার বক্তব্যটা যদি আমার হৃদয়ঙ্গম হয়ে থাকে তবে ব্যাপারটা হচ্ছে—আপনার উল্লিখিত লেখাটা পত্রিকার মালিকপক্ষ আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। আমার প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, লেখাটা যেন ছাপানো হয়। সত্যি কথা বলতে কি, লেখাটার সাহিত্যের দিকটা আমারও মনঃপূত হয়নি। বিভিন্ন দিক থেকে যাঁরা দ্য রোজ অব ডিক্সির অর্থকড়ির দিকটা দেখেন তাঁদের ইচ্ছার মূল্য আমাকে দিতেই হয়।

টেবিলের পত্রিকাটাকে বিতৃষ্ণার সঙ্গে দূরে সরিয়ে দিয়ে মিঃ থ্যাকার বললেন—মিঃ টেলফেয়ার, এসব চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে। দেশের একটা অঞ্চলের চিন্তা মাথায় রেখে পত্রিকাকে কোনদিনই দাঁড় করাতে পারবেন না। সব অঞ্চলের মানুষের কথাই আপনাকে ভাবতেই হবে। দেখুন তো, উত্তর অঞ্চল থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলো দক্ষিণ অঞ্চলের পাঠকদের কাছে কেমন কদর পাচ্ছে, লেখকদেরও প্রেরণা জোগাচ্ছে। আপনার পত্রিকার জন্যও দূর দেশের লেখা সংগ্রহের জন্য তৎপর হতে হবে। আর একটা দিকের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে, লেখকদের বংশ-গৌরব নয়, লেখার উৎকর্ষতাই যেন প্রাধান্য পায়। এবার আপনার সামনে কয়েকটা লেখা রাখছি।

মিঃ থ্যাকার এবার কটা টাইপ করা কাগজ বের করে মিঃ টেলফেয়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে বললেন—এখানে চারটে ছোট গল্প আছে, যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে নাম করা লেখকদের রচনা। এ প্রবন্ধটার লেখক টম ভ্যাম্পসন। ভিয়েনার ওপরতলার সমাজ ব্যবস্থা এর বিষয়বস্তু। একটা পাতা উল্টে এবার বললেন—এটা লিখেছেন দ্বিতীয় ক্রফোর্ড। ইতালীর প্রসঙ্গে ধারাবাহিকভাবে লেখা হয়েছে। আর এ লেখাটার শিরোনাম দেওয়া হয়েছে—নারীর সাজসজ্জার সুটকেসে কি থাকে? লেখিকা—চিকাগোর সংবাদপত্র জগতের এক মহিলা। তিনি পাঁচ বছর ধরে এক মহিলার পরিচারিকার কাজে লিপ্ত থেকে প্রবন্ধটা লেখার বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেছেন। আর এটা জুনে প্রকাশিতব্য হল কেন-এর ধারাবাহিক রচনার প্রথম কিস্তির সংক্ষেপিত কারণ। তারপর—

তাঁকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে সম্পাদক মিঃ টেলফেয়ার বলতে লাগলেন—আপনার কথা আমি সম্পূর্ণরূপে মেনে নিচ্ছি যে, একটা পত্রিকার বিভিন্ন রকম লেখাই ছাপা দরকার। তাই আমি মনস্থ করেই রেখেছি, দ্য রোজ অব ডিক্সিতে প্রকাশের জন্য ইতালীর বিখ্যাত কবি টাসোর মূল রচনা থেকে অংশ বিশেষ অনুবাদ করব। মিঃ থ্যাকার, এ অমর কবির অমৃতধারার স্বাদ গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে?

মিঃ টেলফেয়ার, ওসব প্রসঙ্গ এখন ছাড়ান দিন। আসল প্রসঙ্গ শুরু করা যাক। দেখুন, এসব রচনা সংগ্রহ করতে ইতিমধ্যেই আমাকে কিছু অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। তার পরিমাণ চার হাজার ডলার। আমি চাই, এগুলো থেকে কিছু কিছু লেখা আগামী সংখ্যায় ছেপে দিয়ে দেখব, পত্রিকাটার

প্রচার সংখ্যার হেরফের কি হয়। আমি কিন্তু মনে করি, এসব উৎকৃষ্ট মানের লেখা পত্রিকাটায় স্থান পেলে দেশের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব আর পশ্চিম সব অঞ্চলেই এর বিক্রি বেড়ে যাবে। মালিকপক্ষ থেকে একটা চিঠি দিয়ে আপনাকে বলা হয়েছে, আপনি যেন এ প্রসঙ্গে আমাকে সার্বিক সাহায্য সহযোগিতা করেন। চিঠিটা এর মধ্যেই রাখা আছে। আসুন আপনি যেসব লেখা বেছে রেখেছেন তা থেকে কিছু লেখা বাদছাদ দিয়ে ফেলি।

কণ্ঠস্বরে রীতিমত গাম্ভীর্য এনে মিঃ টেলফেয়ার বললেন—দেখুন মিঃ থ্যাকার, আমি যতদিন দ্য রোজ অব ডিক্সির সম্পাদকের কাজে বহাল আছি ততদিন সম্পাদকের মর্যাদা নিয়েই থাকব। তবে আমার বিবেকের দিক থেকে উৎসাহ পেলে মালিকপক্ষের ইচ্ছার মর্যাদা দিতে আমি আগ্রহী।

চমৎকার! চমৎকার কথা! তবে কাজ শুরু করে দেওয়া যাক। এবার বলুন তো, আমার কাছে যেসব লেখা আছে তাদের মধ্য থেকে কতখানি জানুয়ারি সংখ্যায় ব্যবহার করা সম্ভব?

মোটামুটি আট হাজার শব্দ ব্যবহার করার মত জায়গা এখনও খালি আছে।

খুব ভাল। যদিও অল্প জায়গা, তা সত্ত্বেও পাঠকরা কিছু না কিছু নতুনত্বের স্বাদ তো পাবেই। আমি যেসব লেখা সঙ্গে এনেছি, তা থেকে প্রয়োজন অনুসারে লেখা নির্বাচনের দায়িত্ব আমি আপনার ওপরেই দিচ্ছি। আমাকে এখনই নিউইয়র্কের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে হবে। হপ্তা দু'-এর মধ্যেই আমি আবার আপনার সঙ্গে মিলিত হচ্ছি।

মিঃ টেলফেয়ার এবার বললেন—দেখুন মিঃ থ্যাকার, জানুয়ারী সংখ্যার যে খালি জায়গাটার কথা আপনাকে বলেছি, সেটা কিন্তু ইচ্ছে করেই খালি রাখা হয়েছে। আজ, একটু আগেই দপ্তরে এমন একটা লেখা জমা পড়েছে যার মত সাহিত্য-প্রচেষ্টা আজ অবধি আমার নজরে অন্তত পড়েনি। একমাত্র মহৎ প্রতিভা ছাড়া এরকম রচনা সম্ভব নয়। সে লেখাটাকে ছাপার জন্য যেটুকু জায়গা দরকার ঠিক সেটুক জায়গাই খালি রাখা হয়েছে।

কপালের চামড়ায় পরপর কয়েকটা ভাঁজ এঁকে মিঃ থ্যাকার বললেন, রচনাটা কোন্ ধরনের, বলবেন কি? দেখুন, আট হাজার শব্দের ব্যাপারটাই সন্দেহের উদ্রেক করছে।

একজন বিখ্যাত লেখক প্রবন্ধটা রচনা করেছেন। অন্য দিক থেকেও তাকে বিশিষ্টের আসনে বসানো যেতে পারে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, রচনাটা ছাপা হবে কিনা, সে ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তাঁর নামটা প্রকাশ করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

মিঃ থ্যাকার একটু যেন থতমত খেয়ে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলেন—একটা কথা বলুন তো, গল্পটা কি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করার ব্যাপার? অথবা দক্ষিণ ক্যারোলিনার হুইটসায়ার নগরে একটা নতুন জলের পাম্পের উদ্বোধন-অনুষ্ঠানের বিবরণ, না কি জেনারেল লীর চাকরবাকরদের পরিবর্তিত তালিকা, নাকি অন্য কোন প্রসঙ্গ?

আপনি রসিকতা করছেন তা বোঝার মত ক্ষমতা আমার আছে মিঃ থ্যাকার। যাই হোক, শুনুন—প্রবন্ধটা লিখেছেন একজন মানবদরদী, দার্শনিক, চিন্তাশীল ছাত্র আর একজন বিখ্যাত অলংকারশাস্ত্রজ্ঞ।

তবে ধরে নেওয়া যেতে পারে, প্রবন্ধটা অবশ্যই এক লেখক-গোষ্ঠির রচিত, মিঃ থ্যাকার বললেন। মিঃ টেলফেয়ার, আমার কিন্তু স্পষ্টই মনে হচ্ছে, আমার প্রশ্নের উত্তরটা নিয়ে আপনি ধানাই-পানাই করছেন। ইদানিং কেউ আট হাজার শব্দের কোন প্রবন্ধ পড়ে বলে আমার অন্ততঃ জানা নেই। তবে খুনের মামলা বা সুপ্রিম কোর্টের বিবরণ হলে স্বতন্ত্র ব্যাপার। ড্যানিয়েল ওয়েবস্টারের ভাষণের একটা কপি কোনক্রমে আপনার হস্তগত হয়ে পড়েছে কিনা ভাবছি।

সম্পাদক মিঃ টেলফেয়ার কণ্ঠস্বরের গাম্ভীর্যটুকু বজায় রেখেই বললেন, আপনি দক্ষিণ অঞ্চল আর এখানকার অধিবাসীদের প্রতি যে অবজ্ঞা প্রকাশ করে চলেছেন তা এবার ক্ষান্ত দিন। পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে আমি লেখার গুণাগুণ বিচারের যোগ্য ব্যক্তি নই, আপনি যে আমার চেয়ে বড় সমঝদার তা আপনাকে তথ্য দিয়ে প্রমাণ করতে হবে।

থ্যাকার রীতিমত ঘাবড়ে গিয়ে বলে উঠল, একী কথা বলছেন মিঃ টেলফেয়ার! কই, আমি তো এরকম কোন কথা বলিনি। যাক গে, এবার কাজের কথা আলোচনা করা যাক। আট হাজার শব্দের প্রবন্ধটার বিষয়বস্তু কি, বলুন তো শুনি।

শুনুন, প্রবন্ধটাতে জ্ঞানের এক বিরাট পরিধি ব্যক্ত করা হয়েছে। জ্ঞানের ভাণ্ডারের পক্ষে এটা এক মহৎ অবদান। তা সত্ত্বেও প্রবন্ধটা পত্রিকাতে ছাপার ব্যাপারে আমার মধ্যে একটিমাত্র সন্দেহ এখনও বর্তমান। ব্যাপারটা হচ্ছে, প্রবন্ধটার লেখকের ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য এখন পর্যন্ত আমরা সংগ্রহ করতে সক্ষম হইনি যাতে লেখকের কথা আমাদের 'দ্য রোজ অব ডিক্সি' পত্রিকায় এমন ফলাও করে প্রচারকার্য চালানো উচিত হবে কিনা বুঝতে পারছি না।

আপনার বক্তব্যে আমি তো বুঝতে পেরেছি তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এক পুরুষ।

হ্যাঁ, আসলে ঠিক তাই। সাহিত্য আর অন্য বহু ব্যাপারে। তবে এটুকু জানবেন, আমি যে সব লেখা পত্রিকায় ছাপার জন্য নির্বাচন করে থাকি—সে সম্পর্কে আমি খুবই সতর্ক থাকি ও গুরুত্ব দেই। আর লেখকরা সবাই নিঃসন্দেহে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি। বর্তমান প্রবন্ধটার লেখকের ব্যাপারে যতদিন পর্যন্ত পর্যাপ্ত তথ্য জেনে নিয়ে সন্তুষ্ট হতে না পারছি ততদিন সেটাকে চেপে রাখব। শেষমেশ আপনাকে কথা দিতে পারি, প্রবন্ধটা সম্বন্ধে যদি আমার মধ্যে বিরূপ ধারণার সঞ্চার হয় তবে আপনার লেখাগুলো থেকে একটা লেখাও যদি ছাপতে পারি তবে আমি আনন্দিতই হব।

মিঃ থ্যাকার যেন অথৈ জলে পড়লেন। তিনি বললেন, কী সমস্যায়ই না পড়া গেল। আপনার ওই মহৎ সাহিত্যের মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারলাম না। সত্যি বলতে কি, পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে অলীক বলে মনে হচ্ছে।

দেখুন মিঃ থ্যাকার, প্রবন্ধটা এমন একজন সংস্কৃতিবান ব্যক্তিত্বের লেখা যিনি আমার বিচারে বর্তমান কালের যেকোন জীবিত মানুষের চেয়ে বর্তমান জগৎ এবং তার ভাল-মন্দ ব্যাপারে অনেক বেশী অবগত আছেন।

উত্তেজিতভাবে থ্যাকার বললেন, সে কী! জন ডি. রকফেলারের স্মৃতিকথাকে আপনি হেয় জ্ঞান করবেন তা তো হতে পারে না।

সম্পাদকমশাই বললেন, না, ব্যবসা-বাণিজ্যের নগণ্য কথা নয়, আমি বলতে চাইছি সাহিত্যকীর্তি আর মানসিকতার কথা।

ঠিক আছে, ভদ্রলোক যদি এতই জ্ঞানবান হন তবে প্রবন্ধটা ছাপতে আপত্তি কিসের, বুঝছি না তো।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সম্পাদকমশাই বললেন, আমার লোভ একটাই। আজ পর্যন্ত 'দ্য রোজ অব ডিক্সি' পত্রিকাটাতে এমন কোন লেখা ছাপা হয়নি যা তার ছেলেমেয়েদের লেখা নয়। দেখুন, বর্তমান প্রবন্ধটা সম্বন্ধে একটামাত্র দিক ছাড়া আমার আর কিছুই জানা নেই। আর লেখক দেশের এমন অঞ্চলে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন যাকে আমি আজীবন ঘৃণা করি, মনে-প্রাণে শত্রু জ্ঞান করি। তাই বলে তার প্রতিভাকে তো আর অস্বীকার করতে পারি না। একটু আগেই তো আমি বলেছি, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনধারার ব্যাপারে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য আমি প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি। আর যতদিন তা সম্ভব না হবে ততদিন আমি জানুয়ারী সংখ্যার ফাঁকা জায়গাটাকে সেভাবেই রেখে দেব স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছি।

বহুৎ আচ্ছা। আপনি যদি উৎকৃষ্ট মানের কোন লেখা পান তবে আমার দেওয়া লেখার পরিবর্তে সেটাকেই পত্রিকায় স্থান দেবেন, চেয়ার ছেড়ে উঠতে মিঃ থ্যাকার বললেন। হপ্তা দু'-এর মধ্যেই আমি আবার আপনার সঙ্গে দেখা করছি। সম্পাদক টেলফেয়ার-এর সঙ্গে করমর্দন সেরে তিনি সম্পাদকের দপ্তর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

দু'সপ্তাহ পরে মিঃ থ্যাকার দ্য রোজ অব ডিক্সির সম্পাদকের দপ্তরে এসে দেখলেন, পত্রিকাটার জানুয়ারীর সংখ্যাটাকে পৃষ্ঠা অনুযায়ী সাজানোর কাজ মিটে গেছে আর ফর্মা ছাপার কাজ বন্ধ। আর যে ফাঁকা জায়গাটা রাখা ছিল সেটাকে পূরণ করা হয়েছে জর্জিয়ার বুলোচ পরিবারের সুপরিচিত বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব টি. রুজভেল্ট-এর একটা প্রবন্ধ দিয়ে। আর শিরোনামটা হচ্ছে—'কংগ্রেসের জন্য দ্বিতীয় বাণী ডিক্সির গোলাপের উদ্দেশ্যে লিখিত।'

স্কুলস্ অ্যান্ড স্কুলস্

এক লক্ষ ডলার দামের একটা বাড়িতে জেরোস ওয়্যারেন বুড়ো বাস করে। পঁয়ত্রিশ নম্বর 'ইষ্ট ফিফটি-সেভেন্থ' স্ট্রীটের বাড়ি। সে শহরের মধ্যবর্তী অঞ্চলের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ দালাল। অগাধ ধনসম্পদের মালিক। স্বাস্থ্যের তাগিদে সে রোজ সকালে কয়েক ব্লক হেঁটে পাড়ি দিয়ে শেষ পর্যন্ত ট্যাক্সি করে অফিসে যায়। পুরনো এক বন্ধুর ছেলেকে সে পোষ্যপুত্র নিয়েছে। সিরিল স্কট তার নাম। টিউব টিপে সে যখন রঙ বের করতে শিখেছে তখন থেকেই সে একজন কৃতী চিত্রশিল্পী হয়ে উঠেছে। জেরোস ওয়ারেন বুড়োর সংসারে বারবারা রস নামে আর একজন আছে, তার দত্তক ভাইঝি। মানুষ তো দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করার জন্যই পৃথিবীতে আসে। বুড়োর কোন আত্মজন না থাকার জন্যই তো অন্যের ঝামেলা কাঁধে নিয়ে সংসারের জোয়াল টেনে চলেছে।

বারবারা আর গিলবার্ট বেশ সুখ-স্বাচ্ছন্দের মধ্যেই জীবন কাটাতে লাগল। কিন্তু আসলে যে চিরদিন কারোরই সমান যায় না, তাই এক সময় তাদের মাথার ওপরেও দুর্দিনের কালো মেঘ দেখা দিল। ত্রিশ বছর আগে যখন জেরোস যুবক ছিল তখন তার এক ভাই ছিল—নাম তার ডিক। নিজের বা অন্য কোন আপনজনের বরাত ফেরাবার তাগিদে সে দূরদেশে পাড়ি জমিয়েছিল। বহুদিন তার কোন পাত্তাই ছিল না।

জেরোস বুড়োদের খাতায় নাম লেখানোর পর একদিন ভাইয়ের এক চিঠি হাতে পেল। চিঠির কাগজটার গায়ে লবণ, শুয়োরের মাংস আর কপির গন্ধ জড়িয়ে ছিল। চিঠিটা পড়ে সে বুঝতে পারল বরাত ফেরানো তো দূরের ব্যাপার, ভাই ডিক বন্দী হয়ে শত্রুর দেশে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। আর সে বর্তমানে দুর্গতির চরম সীমায় পৌঁছেছে। দীর্ঘ ত্রিশ বছরে তার যা লাভ হয়েছে তা হচ্ছে উনিশ বছরের এক কন্যারত্ন। আর তাকেই সে বড় ভাই জেরোস-এর কাছে জাহাজে করে পাঠিয়ে দিয়েছে। আর তার খাওয়া পরা থেকে শুরু করে বিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত সার্বিক দায়িত্বভার বুড়ো জেরোসের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে নিজেকে হাল্কা করছে।

সত্যি কথা বলতে কি জেরোস বুড়ো একজন সর্ববাহী এবং নির্ভরযোগ্য বাহন। সবাই তো জানে, এটলাস সুবিশাল পৃথিবীটাকে কাঁধে বহন করছে। একটা রেলের বেড়ার ওপর এটলাস অবস্থান করছে। আর অতিকায় একটা কচ্ছপের পিঠের ওপর ওই রেল চাপানো আছে। আরে বাবা কচ্ছপটারও তো দাঁড়াবার মত নির্ভরযোগ্য শক্ত কোন ভূমি দরকার। আর সে নির্ভরযোগ্য ভূমিটা তৈরি করা হয়েছে জেরোস বুড়োদের মত বাহনদের ব্যবহারের মধ্যে।

মানুষ কোনদিন অমরত্ব লাভ করতে পারবে কিনা জানা নেই। যদি না-ও করে তবে জানার জন্য মানসিক অস্থিরতা অনুভব করি জেরোস বুড়ো করে তার প্রাপ্য বুঝে পাবে? কবে আর কতদিন বাকি?

স্টেশনে গিয়ে তারা নেভাডা ওয়ারেন-এর সঙ্গে দেখা করল। সাদাসিধে ছোট্ট একটা মেয়ে। রূপসী না হলেও দেখতে ভালই বলা চলে। সে ভারি পোটলাটা মাথায় তুলতে কুলীরা পর্যন্ত থমকে যায়। সেটাকে সে এক ঝটকায় ঘাড়ে তুলে নিয়ে দিব্যি চলতে লাগল।

তার রোদে পোড়া তামাটে ও শক্ত গালে বার দুই চুমু খেয়ে বারবারা বলল—শোন, আমি তোমাকে দেখেই ধরে নিয়েছি আমাদের মধ্যে সহজেই ভাব জমে যাবে।

জেরোস বুড়ো তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, আমার আদর-সোহাগের ভাইঝি, এখানে কোনরকম দ্বিধা বা সঙ্কোচ বোধ করবে না। মনে করবে এটা তোমার নিজেরই বাড়ি।

গিলবার্ট মুখে মিষ্টি হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বলল—আমি কিন্তু তোমাকে আমার আদরের বোন মনে করব, বোন বলেই সম্বোধন করব।

নেভাডা বলল—এক কাজ করত, আমার মাথার বোঝাটা ধর, নামাব। দশ লক্ষ পাউণ্ড। ছ'টা পুরনো খনি থেকে এ নমুনাগুলো বাবা সংগ্রহ করেছিলেন।

দুই

ত্রিভুজ। ত্রিভুজ কাকে বলে? যখন কোন একটা পুরুষ আর দুটো নারী, নতুবা একটা নারী আর দুটো পুরুষ, নইলে একটা নারী, একটা পুরুষ আর একজন অভিজাত ব্যক্তি—তাদের মধ্যে কোনরকম স্বাভাবিক জটিলতার আবির্ভাব ঘটলে এরকম যেকোন সমস্যাকে ত্রিভুজ আখ্যা দেওয়াই প্রচলিত রীতি। আর সেগুলো সর্বদাই সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ হয়, সমবাহু ত্রিভুজ অবশ্যই নয়। তাই জেরোস বুড়োর বাড়িতে নেভাডা আসায় সে, বারবার আর গিলবার্ট মিলে এমনই একটা ত্রিভুজের সৃষ্টি হয়েছে। আর বারবারা হচ্ছে সদ্য গঠিত ত্রিভুজটার অতিভুজ।

এক সকালে জেরোস বুড়ো জলখাবার খাওয়ার পাট চুকিয়ে খবরের কাগজটার ওপর চোখ বুলাতে লাগল। মেয়েটা তার মনের মতই হয়েছে। তার মধ্যে সে যেন তার মৃত ছোট ভাইয়ের স্বাধীনচেতা সহজ-সরল মন খুঁজে পেয়েছে।

এক সকালে পরিচারিকা একটা চিরকুট নেভাডার হাতে দিল। পরিচারিকা বলল, পত্রবাহক এক যুবক, দরজায় অপেক্ষা করছে। উত্তর নিয়ে নাকি যাবে।

নেভাডা হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিয়েই এক কোণের সোনালী চিহ্নটা দেখেই বুঝতে পারল, চিঠিটা গিলবার্টের লেখা। পরপর দু'-তিনবার চিঠিটা পড়ে সেটা ভাঁজ করতে করতে জেরোসের ঘরের দিকে পা বাড়াল। ঘরে ঢুকেই ভাবাপ্লুতকণ্ঠে বলল—জেঠু, গিলবার্ট তো ছেলে হিসেবে খুবই ভাল, তাই না?

জেরোস বুড়ো মুচকি হেসে বলল—গিলবার্ট অবশ্যই ভাল ছেলে। আরে, আমি যে তাকে নিজের হাতে লালন পালন, মানুষ করেছি।

চিঠিটা জেরোসের দিকে এগিয়ে ধরে নেভাডা বলল—জোর করে এ চিঠিটা পড়। তারপর তুমিই বলবে, এটাকে কি তুমি সঙ্গত কাজ মনে কর? আসলে শহরের মানুষের চাল চলন কাজকর্ম সম্বন্ধে আমার মোটেই ভাল ধারণা নেই কিনা তাই তোমাকে জিজ্ঞেস করছি।

জোরোস বুড়ো প্রথমবার মনোযোগসহকারে চিঠিটা পড়ল। তারপর দ্বিতীয়বার, সবশেষে তৃতীয়বার পড়ল। তারপর কাগজটাকে চোখের সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে মুখ খুলল—বাছা, তোমার কথা শুনে আমি তো রীতিমত ঘাবড়েই গিয়েছিলাম। গিলবার্টকে আমি খুব ভাল করেই চিনি। মনে করতে পার, ছেলে তো নয় একটা রত্ন। তার বাবার কার্বনকপি মনে করা যেতে পারে। সে শুধুমাত্র এটুকুই জানতে চেয়েছে, তুমি আজ বারবারা আর বিকেল চারটার সময় তার সঙ্গে লঙ আইল্যান্ডে বেড়াতে যেতে পারবে কিনা। আমি কিন্তু এর মধ্যে কোনই অপরাধের গন্ধ পাচ্ছি না বাছা। তবে চিঠির কাগজটা—হ্যাঁ, নীলরঙের কাগজ আমি কোনদিনই বরদাস্ত করতে পারি না।

তার সঙ্গে সেখানে যাওয়া কি সঙ্গত হবে?

কেন হবে না। যাবে, অবশ্যই যাবে। শোন, তুমি যে এমন সাবধানতা অবলম্বন করেছ তার জন্য আমি আন্তরিক খুশি হয়েছি।

তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে জেঠু! চল, তুমিও চল।

আমি? না, অবশ্যই যাচ্ছি না। আসলে সারা জীবনে মাত্র একবারই মোটর গাড়িতে চেপেছি। আর গাড়িটা গিলবার্টই চালিয়েছিল। তবে তুমি ও বারবারা অবশ্যই যেতে পার, আপত্তি নেই। না, আমি যাচ্ছি না, কিছুতেই যাচ্ছি না।

লম্বা-লম্বা পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে নেভাডা পরিচারিকাকে বলল—আমরা যাব, অবশ্যই যাব। আর পত্রবাহককে বলে দাও, আমরা সময় মত তৈরিই থাকব। মিস বারবারাকে আমিই বলে দেব। আর সে যেন আমাদের সম্মতির কথা গিলবার্টকে বলে দেয়।

জেরোস বুড়ো পাশের ঘর থেকে গলা ছেড়ে বলল—নেভাডা, কিছু মনে কোরো না, বড্ড ভুল হয়ে যাচ্ছে। মুখে নয়, একটা ছত্র লিখে তোমাদের সম্মতির কথা জানিয়ে দেওয়াই ভাল হয়। বেশী না হয় একটামাত্র ছত্র লিখে দাও।

নেভাডা সোল্লাসে বলল—চমৎকার। পরমুহূর্তে বলল, না জেঠু, চিঠির আর দরকার হবে না। গিলবার্ট অবশ্যই বুঝতে পারবে। সে চালাক চতুর ছেলে। আমি জীবনে কোনদিন মোটর গাড়িতে

চাপিনি। মোটরে চাপা শালতি চাপার চেয়ে মজাদার কিনা আমার জানা দরকার। আমি শালতি চালিয়ে লস্ট হর্স গিরিখাদের ভেতর দিয়ে লিটল ডেভিল নদীতে গিয়ে পড়েছি। কী যে মজা তোমাকে কি করে বোঝাই জেঠু!

তিন

পাঠক-পাঠিকা, মনে করুন ইতিমধ্যে দু'মাস পেরিয়ে গেছে। এক লক্ষ ডলারের বাড়ির অঞ্চলের একটা বাড়িতে বাববারা বসে আছে। ঘরটা তার খুবই পছন্দ হয়েছে। বিশ্ব সংসারে সময় কাটাবার মত বহু জায়গা ও উপকরণ আছে। তার পড়ার ঘরটা অনন্য, একেবারেই অদ্বিতীয়।

তবে একটা ত্রিভুজের দীর্ঘতম রেখাকে অতিভুজ এটা বুঝতে অতিভুজের বহুদিন সময় লেগে গেল। তবে দীর্ঘতম রেখাটার কিন্তু কোন বাঁক থাকে না। তীরের ফলার মত সোজা।

সেখানে বারবারা একাই আছে। জেরোস বুড়ো নেভাডাকে নিয়ে থিয়েটার গেছে। বারবারাকেও যেতে বলা হয়েছিল। যায় নি। তার ইচ্ছা, বাড়িতে নিরিবিলিতে বসে পড়াশোনা করবে।

বারবারা লাইব্রেরীতে ওক কাঠের টেবিলে বসে একটা খাম নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। নেভাডাকে লেখা চিঠির খামটার বাঁদিকের ওপরে কোণে সোনালী চিহ্ন দেওয়া। অতএব তার বুঝতে অসুবিধা হল না, চিঠিটার লেখক গিলবার্ট। নেভাডা বাড়ি ছেড়ে যাবার পর ডাক পিওন চিঠিটা দিয়ে গেছে। চিঠির বক্তব্য জানার জন্য বারবারা গলার মুক্তোর হারটা দিয়ে দিতেও কুণ্ঠিত হবে না। সমস্যা হল, কোন উপায়ে, ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে খামের ভেতর থেকে চিঠিটা বের করে পড়াও তার পক্ষে সম্ভব নয়। আর সবচেয়ে বড় কথা, সমাজে তার খ্যাতি এরকম কাজের পক্ষে বড় অন্তরায়। অত্যুজ্জ্বল আলোর সামনে ধরে সাধ্যমত চেষ্টা করল, যদি চিঠিটার দু'-একটা ছত্রও পড়া সম্ভব হয়। কিন্তু হায় গিলবার্ট চিঠির কাগজ আর খাম ব্যবহার করেছে তার ফলে দু'-একটা শব্দও পড়তে পারল না। বারবারা দারুণভাবে হতাশ হল।

থিয়েটার দেখে সবাই এগারোটায় বাড়ি ফিরল। চমৎকার শীতের রাত্রি। জেরোস বুড়ো সম্প্রতিকালের সখের যানজট আর ট্যাক্সি পরিষেবার ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে কিছুক্ষণ ধরে স্যানর স্যানর করল। নেভাডা তার নীলাভ চোখের মণি দুটো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তার বাবার বাড়ির মনোলোভা প্রাকৃতিক পরিবেশ আর পাহাড়ের ঝড়ের রাত্রের গল্প বলতে লাগল। আর এমন একটা কনকনে শীতের রাত্রে বারবারা কাঠ কাটতে বসল। এর চেয়ে ভাল কোন কাজের কথা সে ভেবেই পেল না।

জেরাস বুড়ো কুইনিন আর গরম জলের জন্য ওপর তলায় উঠে গেল। নেভাডা ওপরে না গিয়ে সোজা পড়ার ঘরে চলে গেল। দস্তানার বোতাম আলগা করতে করতে সদ্য দেখে-আসা নাটকটার গলদগুলো এক এক করে বলে যেতে লাগল।

বারবারা বলল—তুমি নাটক দেখতে যাওয়ার একটু পরেই ডাক পিওন এসে এ চিঠিটা দিয়ে গেছে, নাও।

চিঠি? কে লিখেছে?

সত্যি বলছ, কার চিঠি বুঝতে পারছ না? আমি কিন্তু নিঃসন্দেহ যে, গিলবার্ট লিখেছে।

গিলবার্ট আবার আমাকে কি লিখল, বুঝতে পারছি না তো!

আমরা অর্থাৎ সব মেয়েই এক। আমরা কিন্তু ডাক ঘরের সিলমোহর দেখেই খামের ভেতরে কি লেখা থাকতে পারে অনুমান করে নিতে পারি।

দস্তানার বোতামগুলো খুলতে খুলতে বিরক্ত হয়ে বলল—বারবারা, খামের, মুখটা ছিঁড়ে পড় শুনি সে কি বলতে চাইছে।

একী অবাক কাণ্ড! তোমার চিঠি পড়ব আমি! গিলবার্টের লেখা চিঠিটা আমি পড়ব, এটা অবশ্যই তোমার মনের কথা নয়। তা ছাড়া চিঠিটা তোমাকে লেখা, অন্য কেউ পড়তে যাবেই বা কেন?

নেভাডা তার নীলাভ চোখের মণি দুটো দস্তানার ওপর থেকে তুলে বারবারার দিকে নিবদ্ধ রেখে মুচকি হেসে বলল—শোন, আমাকে কেউ এমন কিছু লেখে না, যা অন্য কেউ পড়লে

সমস্যায় পড়তে হবে। গিলবার্ট হয়ত লিখেছে আমরা যদি কাল তার গাড়িতে করে বেড়াতে যাই তবে সে খুশি হবে।

বারবারা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও খামের মুখটা ছিঁড়ে দ্রুত চিঠিটা পড়ল। আবারও পড়ল। তারপর চিঠি থেকে চোখ তুলে নেভাডার দকে আড়চোখে তাকাল।

নেভাডার কিন্তু চিঠিটা সম্বন্ধে সামান্যতম আগ্রহও আছে বলে মনে হল না। চিঠিটার চেয়ে যেন দস্তানা দুটো খোলার কাজটা তার কাছে বেশী জরুরী। একজন শিক্ষানবীশ চিত্রশিল্পীর চিঠির গুরুত্ব মঙ্গলগ্রহ থেকে পাঠানো খবরের চেয়ে বেশী নয় অবশ্যই।

বারবারা সেকেন্ড পনের অপলক চোখে নেভাডার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে এক সময় মুচকি হেসে মুখটা খুবই সামান্য ফাঁক করল। সে অনুপাতে ভ্রূ'দুটোও কোঁচকালো।

সৃষ্টির মুহূর্ত থেকে কোন এক নারীর পক্ষে অন্য আর এক নারীর কাছে রহস্যময়ী হয়ে থাকা সম্ভব হয় নি। বিদ্যুতের মত ক্ষিপ্রগতিতে এক নারী অন্য এক নারীর অন্তরের অন্তঃস্থলে ডুব দেয়, প্রতিটা সূক্ষ্মতম ইঙ্গিতকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। আবার তীক্ষ্নতম ছলনাকেও অতি সহজেই বিচার বিশ্লেষণ করে ফেলতে পারে।

কয়েক মুহূর্ত নীরবে ভেবে, ক্ষণিক ইতস্ততের পর বারবারা আবার মুখ খুলল—নেভাডা, সত্যি বলছি চিঠিটা আমাকে দিয়ে খোলানো ও পড়ানো অবশ্যই উচিত হয়নি। আমি জোর দিয়েই বলতে পারি, অন্য কেউ এটা পড়ুক এটা তার অভিপ্রায় ছিল না।

নেভাডা দস্তানার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই বলল—তার চেয়ে বরং বাইরে বেরিয়ে জোরে জোরে পড়ে চিঠিটার বক্তব্য সবাইকে শুনিয়ে দাও। তুমি যখন জেনে ফেলেছ তখন আর আপত্তির কিই বা থাকতে পারে? গিলবার্ট যদি এমন কিছুই আমাকে লিখে থাকে যা অন্যের কিছুতেই জানা উচিত নয় তবে তো একমাত্র এজন্যই সেটা অন্যের অবশ্যই জানা দরকার।

ভাল কথা, বারবাবা বলল, গিলবার্ট চিঠিতে লিখেছে রাত্রি বারোটায় তোমাকে তার স্টুডিওতে যেতে। যাওয়ার জন্য তোমাকে বারবার অনুরোধ জানিয়েছে। চিঠিটা নেভাডার সামনে ফেলে দিয়ে বারবারা এবার বলল—তোমাদের সব গোপন কথা জেনে ফেলেছি বলে আমি আন্তরিক দুঃখিত। তবে আমি বলব, গিলবার্ট-এর মত একজন সজ্জনের পক্ষে এমন কথা বলা অবশ্যই উচিত হয় নি। কোথাও, কিছু একটা ভুল অবশ্যই হয়েছে।

সুপ্রিয়া নেভাডা, তুমি কি মনে করতে পার না, তোমার আর গিলবার্ট এর গোপন ব্যাপার স্যাপারের কথা আমি কিছুই জানতে পারি নি? এর পরেরটুকু আমি আর পড়তে পারছি না। গিলবার্ট-এর সঙ্গে যখন দেখা হবে তার কাছ থেকেই বাকীটুকু শুনে নিও। বারবারা আর মুহূর্তমাত্র সেখানে না দাঁড়িয়ে ব্যস্ত পায়ে ওপরে যাওয়ার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

চার

বারবারা ঘর ছেড়ে গেলে নেভাডা বিড়ালের মত পা টিপে টিপে হল ঘরের দিকে হাঁটতে লাগল। সে স্পষ্ট শুনতে পেল বাববারা দোতলার দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিল। পড়ার ঘরের দেওয়াল ঘড়িতে তখন বারোটা বাজতে পনের মিনিট বাকি। সে আগের মতই সন্তর্পণে পা টিপে টিপে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে ফের বৃষ্টির মধ্যেই পথে নামল। ছ' স্কোয়ার দূরে গিলবার্ট-এর স্টুডিওটা অবস্থিত।

ঘুটঘুটে অন্ধকার ইস্ট রিভার থেকে কনকনে হিমেল হাওয়া শহরটার ওপর প্রচণ্ড আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। ইতিমধ্যেই পথের ওপর এক ফুট পুরু হয়ে বরফ জমেছে। রাজপথগুলো যেন পম্পেইর পথের মত স্তব্ধ কবরখানার মতই। শুভ্র সমুজ্জ্বল বরফের সমুদ্রের ওপর দিয়ে গাড়িগুলো সমুদ্র-ঈগলের ঝাঁকের মত চলছে। আবার থেকে থেকে দু'-একটা মোটরগাড়ি সফেন ঢেউয়ের বুক চিরে সাবমেরিনের মত অনবরত ফুঁসতে ফুঁসতে এগিয়ে চলেছে।

বরফের ঝড়-বৃষ্টি অগ্রাহ্য করে নেভাডা সামুদ্রিক পাখির মত ছুটতে লাগল গিলবার্টের স্টুডিওর দিকে।

পথের বাঁকে যেতেই নেভাডা টহলদারী পুলিশের মুখোমুখি হ'ল। বাজখাঁই গলায় পুলিশটা

গর্জে উঠল, 'দাঁড়াও'!

পুলিশ পুঙ্গব সামান্য এগিয়ে নেভাডাকে চিনতে পেরে বলে উঠল—আরে নেভাডা যে! এত রাত্রে এমন দুর্যোগে উর্দ্ধশ্বাসে কোথায় চলেছেন?

আমি, মানে ওষুধ—ওষুধের দোকানে যাচ্ছি।

ওষুধের দোকানের কথা শুনে প্রহরারত পুলিশটার মন গলে গেল। পুলিশ পুঙ্গবটার হাত থেকে রেহাই পেয়ে নেভাডা আবার উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগল। আরও কিছুটা পথ পাড়ি দিয়ে সে বাঁক ঘুরতেই বহু আকাঙ্ক্ষিত স্টুডিওর দরজাটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল।

এলিভেটরটা দশ তলায় গিয়ে স্থির হল। এবার ব্যস্ত-পায়ে সিঁড়ির আটটা ধাপ অতিক্রম করে নেভাডা উননব্বই নম্বর দরজা নরকের দক্ষিণ দরজায় হাজির হল। মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করে সে শরীরের সবটুকু শক্তি নিঙড়ে দরজার পাল্লায় ধাক্কা দিল। এর আগে জেরোস জেঠু আর বারবারার সঙ্গে বহুবারই এখানে এসেছে।

নেভাডা দরজায় ধাক্কা দিতে দরজাটা খুলে গেল। গিলবার্ট দরজা খুলে এক গাল হেসে তাকে স্বাগত জানাল।

নেভাডা হাতের পিঠ দিয়ে কপালে নেমে আসা চুলগুলোকে সরাতে সরাতে বলল—আমি কি খুব দেরী করে ফেলেছি? আমি সাধ্যমত পা চালিয়ে ছুটতে ছুটতে এসেছি। জেরোস জেঠুর সঙ্গে থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলাম। গিলবার্ট এই তো—গিলবার্ট আমি তো এসেই গেছি!—এই যে আমি!

গিলবার্ট একটা বুরুশ দিয়ে নেভাডার গায়ের মাথার বরফের কুচিগুলো ঝেড়ে ফেলে দিতে লাগল।

নেভাডা বলল—তুমি আমাকে ডেকেছ, আসতে বলেছ, আমি ছুটে এসেছি। কিন্তু কেন আমাকে ডেকেছ, চিঠিতে তা-তো লেখনি।

তুমি নিজে আমার চিঠিটা পড়েছ, নেভাডা?

না, আমি পড়িনি। বারবারা আমাকে চিঠিটা পড়ে শুনিয়েছে। পরে অবশ্য আমি পড়েছিলাম। তুমি লিখেছ—রাত্রি বারোটায় আমার স্টুডিওতে চলে এসো। অবশ্যই আসা চাই।

হ্যাঁ, এ কথাই আমি লিখেছিলাম।

আমি কিন্তু ধরেই নিয়েছিলাম, তোমার অসুখ-বিসুখ করেছে। কিন্তু এখন দেখছি, তুমি সুস্থ স্বাভাবিক, মানে বহাল তবিয়তেই আছ, ঠিক কিনা?

নেভাডা, ব্যস্ত হচ্ছ কেন! কেন তোমাকে ডেকেছি তা এখনই তোমাকে খোলসা করে বলছি। আমি—তোমাকে আমি বিয়ে করতে চাই নেভাডা—আর তা আজ রাত্রেই মিটিয়ে ফেলতে চাইছি। কী সুন্দর বরফ-ঝরা রাত্রি! তুমি রাজী তো নেভাডা?

হয়ত বা তুমি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছ যে, আমি অনেক দিন ধরেই তোমার কথা ভাবছি, তোমাকে ঘিরে কতই না স্বপ্ন দেখছি। আর আমিও এরকমই একটা ঝড়-বৃষ্টির রাত্রের অপেক্ষায় ছিলাম। শোন গিলবার্ট, দুপুরে দিনের আলোয় গীর্জায় গিয়ে বিয়ে—চিরকালই আমার অপছন্দ। তুমি যে এরকম একটা প্রস্তাব দেবে আমি কিন্তু স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। আর এও ভাবিনি, বিয়ের প্রস্তাবটা করার মত মনের জোর যে তোমার আছে। এটা ভেবেও আমি কম খুশি হই নি। জান গিলবার্ট, তাদের একেবারে অবাক করে দেব, এটা আমাদের শোক-যাত্রায় পরিণত হবে, ঠিক বলি নি?

অবাক কাণ্ড তো। কথাটা যেন কোথায় শুনেছি, বলে মনে হচ্ছে। একটু অপেক্ষা কর নেভাডা, একটা জরুরী ফোন করে এখনই ফিরে আসছি।

মুহূর্ত কাল পরেই পাশের ঘর থেকে গিলবার্ট এর কণ্ঠস্বর ভেসে আসতে লাগল—তুমি কে? জ্যাক নাকি? আমি গিলবার্ট বলছি। শোন, এখনই আমি বিয়ে করতে চলেছি। তোমার বোনকে ঘুম থেকে তুলে যত শীঘ্র সম্ভব চলে এস। আসা চাই কিন্তু, আর নেভাডা এখানে, আমার স্টুডিওতেই আছে। এগ্নিসকে সঙ্গে করে আনা চাই, মনে থাকে যেন। আরে, অনেক আগেই আমাদের বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেছে। দেরী কোরো না, ঝটপট চলে এস।

ফোন করার পর গিলবার্ট আবার নেভাডার কাছে ফিরে এল। আবেগের সঙ্গে বলল—নেভাডা, আজ কী খুশির দিন, বল তো! তোমার পুরনো বন্ধু জ্যাক, প্যাটন আর তার ছোটবোন কিছুক্ষণের মধ্যেই এখানে পৌঁছে যাচ্ছে। বিশ্বাস কর নেভাডা, আজ নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী লোক বলে ভাবতে পারছি। ভাল কথা, তোমাকে যে চিঠিটা লিখেছিলাম সেটা কোথায়? আমাকে দাও তো।

নেভাডা জামার ভেতর থেকে চিঠি সমেত খামটা গিলবার্ট-এর হাতে তুলে দিল।

চিঠিটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে গিলবার্ট বলল—প্রিয়তমা, মাঝরাত্রে তোমাকে এখানে আসতে বলায় তুমি খুবই অবাক হয়েছিলে, তাই না?

নেভাডা কণ্ঠস্বরে সামান্য উষ্মা প্রকাশ করে বলল—অবাক? কই, না-তো। যত রাত্রি বা যত ঝড়-বৃষ্টিই হোক না কেন, অবাক আমি হই নি।

গিলবার্ট এক দৌড়ে পাশের ঘর থেকে একটা ওভারকোট নিয়ে এসে নেভাডার হাতে দিয়ে বলল—এটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নাও। সিকি মাইল পথ আমাদের পাড়ি দিতে হবে। নিজেও একটা ওভারকোট গায়ে দিতে দিতে বলল—জ্যাক আর তার বোন এক্ষুণি এসে পড়বে। ভাল কথা নেভাডা, টেবিলে আজকের সান্ধ্য পত্রিকাটা আছে, তাতে পশ্চিম অঞ্চলের খবর ছাপা হয়েছে। ঝট করে একটু চোখ বুলিয়ে নাও। আমার বিশ্বাস, একটু-আধটু পড়লে তোমার ভাল লাগবে। ওই যে, ওখানে আছে।

নেভাডা চোখে-মুখে বিস্ময়ের ছাপ এঁকে ঠায় বসে রইল। বিষণ্ণ মুখে, অপলক চোখে গিলবার্ট-এর দিকে তাকিয়েই আছে। এক সময় প্রায় অস্ফুট স্বরে বলল—আগেই আমি বলতে চেষ্টা করেছিলাম। মানে আমরা আগে, মানে সবার, সব কিছুর আগে। আমি একেবারে নিরক্ষর, একটা অক্ষরও চিনি না। বাবা আমাকে একটা দিনের জন্য স্কুলের চৌকাঠ মাড়াতে দেন নি। এখন—এখন যদি—

ঠিক সে মুহূর্তেই সিঁড়ি থেকে কাদের যেন পায়ের শব্দ ভেসে আসতে শোনা গেল। হ্যাঁ, জ্যাক আর এগ্নিসই আসছে।

পাঁচ

গিলবার্ট আর নেভাডার অনুষ্ঠান মিটে গেলে গাড়িতে করে বাড়ি ফিরতে লাগল। ঢাকা গাড়ি। উভয়ের মুখেই হাসির ঝিলিক। গিলবার্ট এক সময় মুখ খুলল—প্রিয়তমা নেভাডা, তুমি কি সত্যি জানতে চাইছ, সে রাত্রে আমি তোমাকে যে চিঠিটা পাঠিয়েছিলাম তাতে কি লিখেছিলাম বল নেভাডা, সত্যি করে বল তো সে কথা জানতে চাইছ কি?

নেভাডা বলল—ছাড়ান দাও তো এসব কথা।

আমি ঠিক একথাই তোমাকে লিখেছিলাম। ভাল কথা সুপ্রিয়া নেভাডা, যে কথা বলতে চাইছিলাম, ফুলের ব্যাপারে তুমিই কিন্তু ঠিক বলেছিলে। সত্যি ফুলটা লিলাক ছিল না, হাইড্রেঞ্জিল ফুল।

নেভাডা ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বলল—তাই বুঝি? সে যাই হোক, ও ব্যাপার মন থেকে মুছে ফেলাই ভাল।

সত্যি বলতে কি, বারবারাকে নিয়েই রসিকতাটা করা হয়েছিল। যাক গে, এ প্রসঙ্গটা ছাড়ান দাও।

সাপ্লাই অ্যান্ড ডিমান্ড

থার্ড এভিনিউতে ন' ফুট বারো ফুট—মাপ বিশিষ্ট একটা কামরায় ফিঞ্চ-এর টুপি সাফাইয়ের দোকান আছে—জরুরীভিত্তিক টুপি সাফাইয়ের দোকান। একবার কোনক্রমে তার দোকানে টুপি পরিষ্কার করালে আর দেখতে হবে না, সারা জীবনের জন্য আপনি তার দোকানের বাঁধা খদ্দের হয়ে যেতে বাধ্য।

সবচেয়ে বড় কথা, তার ইস্তিরি করার গোপন কৌশলটা আমাব কিছুই জানা নেই। তবে প্রতি চারদিন বাদে বাদেই আপনাকে টুপিটা সাফাই করতেই হবে। অতএব গুটি গুটি তার দ্বারস্থ না হয়ে উপায়ই বা কি?

ফিঞ্চ-এর বয়স কুড়ি থেকে চল্লিশের মধ্যে কিছু একটা হবে। ধীর স্থির। কাজের চাপ কম থাকলে চুটিয়ে গল্পগুজব করায় তার খুব আগ্রহ। তাই তো আমার টুপিটাকে স্বাভাবিকের চেয়ে একটু ঘন ঘনই সাফাই করাতেই হয়।

এক বিকেলে হাঁটতে হাঁটতে ফিঞ্চ-এর দোকানে হাজির হলাম। দোকানে তখন সে ছাড়া দ্বিতীয় কোন প্রাণী ছিল না, একদম সে একা। আমি মাথা থেকে পানামা টুপিটা খুলে তার হাতে দিতেই এক বিশেষ ধরনের তরল পদার্থ দিয়ে এমনভাবে ঘষতে লেগে গেল যাতে যাবতীয় ধুলোবালি কিছু আর আটকে থাকা ময়লা চুম্বকের মত টেনে নিতে আরম্ভ করল।

কাজের ফাঁকে ফিঞ্চ কথা শুরু করার চেষ্টা করতেই আমি মুখ খুললাম—শুনেছি, আদিবাসীরা নাকি জলের তলায় কাপড় বোনে, আপনার কি মত? জলের তলায়—

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠ—ধ্যুৎ! যত্তসব বুজরুকি! এসব কথা বিশ্বাস করবেন না মশাই। আদিবাসী বা সভ্যমানুষ যেই হোক না কেন, এমন দীর্ঘ সময় জলের তলায় থাকা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। যাক গে, একবার বলুন তো শুনি, রাজনীতি নিয়ে আপনি কি একটু আধটু চর্চাটর্চা করে থাকেন? খবরের কাগজের পাতায় দেখছিলাম, তারা নাকি জোগান ও চাহিদা নামক একটা আইন পাশ করেছে, পড়েছেন?

হ্যাঁ। তবে ওটা কিন্তু আসলে কোন ধরাবাঁধা আইন নয়।

আইন নয়? তবে? কি বলতে চাইছে?

ওটা মূলত আর্থ-রাজনৈতিক নীতি। আমি ব্যাপারটা তাকে সাধ্যমত বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করলাম।

ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমার সঠিক কিছু জানা ছিল না। বছরখানেক আগে ব্যাপারটা নিয়ে বহু কথা, বহু আলোচনাই তো শোনা গেছে। তবে আমি যা বুঝেছি, সবই এক তরফা কথাবার্তা।

দেখুন, রাজনীতিবিদরা কথাটাকে আঁকছার ব্যবহার করেন। আমার তো ধারণা, ওই কথাটা তাদের কাছে একটা বিশেষ অস্ত্র। ওটা ছাড়া তারা এক পা-ও চলতে পারে না।

আসলে কথাটা আমি এক রাজাকে বলতে শুনেছিলাম। তিনি দক্ষিণ আমেরিকার এক রাজা। উপজাতিদের এক শ্বেতাঙ্গ রাজা।

ফিঞ্চ-এর মুখে কথাটা শুনে আমি খুবই কৌতূহলাপন্ন ও আগ্রহান্বিত হলাম, তবে এতটুকুও অবাক হই নি। এই যে এত বড় একটা শহর, এটাকে তো একমাত্র মায়ের কোলের সঙ্গেই তুলনা করা চলে। যারা জোয়ারের জলের মত এখানে ওখানে চক্কর মেরে মেরে কিনারার নাগাল পায় না তারাই ভাসতে ভাসতে এখানে হাজির হয়, মাথা গোঁজার জায়গা করে নেয়। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলেই তারা গুটিগুটি পায়ে ঘরে ফিরে আসে। দরজার সিঁড়িতে বসে সন্ধ্যাটা কাটিয়ে দেয়। আমার পরিচিত এমন একজন লোক আছে যে সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত অবধি অতি সাধারণ মানের একটা রেস্তোরাঁয় পিয়ানো বাজিয়ে খদ্দেরদের আনন্দদান করে। শুনেছি, সে নাকি আফ্রিকার জঙ্গলে একটা সিংহ শিকার করে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। আর হোটেলে কাজ করে এমন এক যুবকের সঙ্গেও আমার পরিচয় আছে। সে ব্রিটিশদের হয়ে জুলুমের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। এরকম ভূরিভূরি গল্প আমি শুনেছি। অতএব টুপি সাফাইওয়ালা লোকটা কোন এক রাজার বন্ধু

ছিল, এ গল্প কিন্তু আমি কোথাও, কারো মুখেই কোনদিন শুনিনি।

কাজের ফাঁকে আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে টুপিসাফাইওয়ালা আমার কাছে জানতে চাইল বর্তমান টুপিটা আমি নতুন কিনেছি কিনা? আমি জানালাম, দিন-পাঁচেক আগেই কিনেছি।

টুপি-সাফাইওয়ালা একটু নড়চড়ে বসে তার গল্পের ঝোলার মুখ খুলে বসল—এক রাতে পকেট ভর্তি ডলার নিয়ে একটা লোক হাজির হল। তার গায়ের রঙ গাঢ় বাদামী। ঘটনাটা ঘটেছিল দু'বছর আগে। আমি তখন গাড়ির চালক। জলের গাড়ি চালাতাম। একথা-সে কথার পর লোকটা সোনার প্রসঙ্গ উত্থাপন করল। বলল, দক্ষিণে গুয়াডিমালা নামে এমন একটা দেশ আছে যাকে বলা হয় সোনার দেশ। সেখানে একটা পাহাড়ে নাকি সোনার ছড়াছড়ি। আরও বলল, সেখানকার আদিবাসী নারী-পুরুষরা প্রায় সারাদিন নদীতে পড়ে থাকে। খুব মিহি এক বিশেষ ধরনের জাল দিয়ে চুনোমাছ ধরার মত জল ছেঁকে ছেঁকে সোনা তোলে। সত্যি অদ্ভুত দেশ তাই না? এমন একটা দেশের কথা—

আমি তার কথার মাঝখানে বলে উঠলাম—আর ব্বাস! সে সোনা দিয়ে তারা কি করে?

করবে আবার কি, কিচ্ছু করে না। সে দেশের মানুষরা দিনের পর দিন কেবল সোনা জমায়, মোটেই কিছু করে না।

গুয়াডিমালার প্রসঙ্গ শেষ করে সে আরও অনেক, অনেক কথাই বলল। এক সময় সে আমার সঙ্গে করমর্দন করে বিদায় নিল। কিন্তু আমি তার কথার একটা বর্ণও বিশ্বাস করতে পারলাম না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত পোঁটলা পুটলি বেঁধে আমি একদিন গুয়াডিমালার উদ্দেশ্যে পা-বাড়ালাম। আমার পাঁচ-পাঁচটা বছর ধরে জমানো তেরশ' ডলার সঙ্গে নিয়ে নিলাম। আর সেখানকার আদিবাসী ইন্ডিয়ানারা কোন্ কোন্ জিনিস ভালবাসে তা আমার ভালই জানা ছিল। তাদের পছন্দ অনুযায়ী পাঁচটা খচ্চরের পিঠে পাঁচটা ইয়া বড় লাল কম্বলের গাট্রি, পাথর-লাগানো চিরুনি, লোহার বালতি, কাঁচের গলার মালা, আর বেশ কিছু সংখ্যক দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম নিয়ে নিলাম। ইয়া তাগড়াই একটা কালো মোজা ভাড়া করে নিলাম। সে খচ্চর চালাবে আর দো-ভাষীর কাজও চালাতে পারবে। সেখানে যেতে হলে দো-ভাষী সঙ্গে না থাকলে বোবা হয়েই থাকতে হবে। সেখানে পৌঁছে দেখা গেল মোজোকে দিয়ে খচ্চর চালাবার কাজটা ভালই করানো গেছে। কিন্তু ইংরেজিটা তার খুব ভাল রপ্ত নেই। কেমন যেন অগোছাল কাটা-কাটা ইংরেজি বলে। তার নামটা অদ্ভুত। উচ্চারণ করতে দম বেরিয়ে যেত। শেষমেশ আমি কাটছাঁট দিয়ে তাকে ম্যাকক্লিন্টক বলে ডাকতাম। নামটা তার আসল নামের সঙ্গে খুব বেশী ফারাক ছিল। সে তাতেই খুশি।

যাই হোক, আমি সোনা ছড়ানো মুল্লুকে তো যাবতীয় লটবহর নিয়ে হাজির হলাম। গাঁ-টা ছিল পাহাড়ের চল্লিশ মাইল ওপরে। সমতল ভূমি থেকে এতটা ওপরে আমার পিতৃপুরুষরা কেউ কোনদিন উঠেছিল বলে আমার জানা নেই। কখনও পায়ে হেঁটে আবার কখনও বা খচ্চরের পিঠে চেপে সেখানে পৌঁছতে আমাদের পুরো ন'টা দিন সময় লেগে গেল। এক বিকেলের কথা বলছি। আমাকে আর খচ্চরের পালকে নিয়ে ম্যাকক্লিন্টক পাঁচ হাজার ফুট উঁচু দুটো পাহাড়ের চূড়ার ওপরের কাঁচা চামড়ার একটা সেতু অতিক্রম করল। বাহাদুর বটে কালো মোজাটা! কাঁচা চামড়ার সেতুটায় পা দেওয়ামাত্র আমার বুকেব ভেতরে ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগল। ভাবলাম, পিতৃদত্ত প্রাণটা নির্ঘাৎ সোনার দেশেই খোয়াতে হবে। আর ম্যাকক্লিন্টক দিব্যি আমাকে নানাভাবে উৎসাহ দিয়ে সেতুটা পার করিয়ে সামনের পাহাড়টায় চূড়ায় নিয়ে চলে গেল।

শেষ পর্যন্ত বহু আকাঙ্ক্ষিত গ্রামটায় পৌঁছতে পারলাম। বাড়িঘর যা কিছু সবই কাদা আর পাথরের চাঁই দিয়ে তৈরী। বাঁধাধরা রাস্তাঘাট বলতে কিছুই নেই। গ্রামবাসীরা দরকার অনুযায়ী যেখানে সেখানে দিয়ে যাতায়াত চলাফেরা করে। রাস্তা দিয়ে চলার সময় লক্ষ্য করলাম, প্রতিটা বাড়ির দরজা-জানালা সামান্য ফাঁক। ব্যাপারটা মুহূর্তেই আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। গাঢ় বাদামী চামড়ার কৌতূহলী মানুষগুলো দরজা-জানালার ফাঁক দিয়ে আমাদের দেখছে। গ্রামের বাড়িগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় বাড়িটার বারান্দায় এসে দাঁড়াল দশাসই চেহারার এক শ্বেতাঙ্গ পুরুষ। গায়ে হরিণের চামড়ার চমৎকার পোশাক-পরিচ্ছদ। গলার সোনার চেনটায় সূর্যের কিরণ

পড়ে রীতিমত ঝকঝক করছে। আর দু' ঠোঁটের ফাঁকের জ্বলন্ত চুরুটটা থেকে ধোঁয়া পাক খেয়ে খেয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে।

লোকটা বারান্দা থেকে নেমে গম্ভীর মুখে আমাদের দিকে এগিয়ে এল। তার চোখের তারায় জিজ্ঞাসার ছাপ। সে মুখ খোলার আগেই ম্যাকক্লিন্টক খচ্চরের পিঠ থেকে এক লাফে নেমে তার দিকে এগিয়ে গেল। অবোধ্য ভাষায় কি যেন সব বলল। লোকটা কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমার দিকে বারকয়েক তাকাল।

বিশাল চেহারাধারী শ্বেতাঙ্গ লোকটা আমার দিকে তাকিয়ে খুবই পরিচিতজনের মত বলতে লাগল--এ কী আশ্চর্য কথা বুটিনস্কি! তুমি আবার কবে থেকে, কেমন করেই বা এ কারবারে নামলে, বল তো?

আমি তার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে না পেরে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে নীরবে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

লোকটা বলেই চলল---কই, এর আগে তো তোমাকে একটা কণাও খরিদ করতে দেখি নি। এ শহরের কথা জানলেই বা কার কাছ থেকে, শুনি?

আমি ঘাবড়ে গিয়ে হাত কচলাতে কচলাতে বললাম---দেখুন, আমি একজন গরীব মানুষ। খচ্চরের পিঠে চেপে দেশ-বিদেশে সফর করে বেড়াই। একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, আপনি কি সত্যি সত্যি এ লাইনেরই লোক, নাকি সবই বুজরুকি? আপনাব ব্যাপারটা দয়া করে খোলসা করে বলুন তো।

সে সব কথা পরে হবে। তুমি আগে আধাঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে, ঘরে এসে জিরিয়ে নাও। তারপর সব কথা হবে। কথা বলতে বলতে লোকটা একটা আঙুল উঁচিয়ে ধরতেই গাট্টাগোট্টা এক গ্রামবাসী ছুটে এল।

শ্বেতাঙ্গ লোকটা এবার আমাকে লক্ষ্য করে বলল---এ লোকটা তোমার কাজকর্ম যা কিছু সবই করে দেবে। আর বাকি যা কিছু সবই আমি করব। আমার হাত ধরে সে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেল। নিজেই চেয়ার টানাটানি করে আমাকে বসতে দিল। মিনিট দু'-তিনের মধ্যেই দুধের মত সাদা এক গ্লাস পানীয় দিয়ে আপ্যায়ন করল।

এমন ঝকঝকে চকচকে সাজানো গোছানো ঘর আমি আগে কোনদিন দেখিনি। বহুমূল্য রেশমি চাদর দিয়ে পাথরের দেওয়ালগুলো মোড়া। লাল আর হলুদ রঙের কার্পেট মেঝেতে পাতা। টকটকে লাল মাটি আর আর ছাগলের চামড়ার বিচিত্র ঢঙের বহু পাত্র তাকের ওপর সাজানো। বাঁশের আসবাবপত্রে ঘরগুলো ভর্তি। সেগুলো ব্যবহার করে সমুদ্রের পাড়ে কম করেও আধা ডজন কুটির তৈরী করা যেতে পারে। আর আসবাবপত্রগুলোর নির্মাণ-কৌশলও তাকিয়ে দেখার মত।

প্রাথমিক আপ্যায়ন সেরে গৃহকর্তা শ্বেতাঙ্গ লোকটা আমার মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে কথাবার্তা শুরু করতে গিয়ে বলল---আমার মনে হচ্ছে, প্রথমত তুমি জানতে চাইছ, আমি কে? আমার প্রকৃত পরিচয় কি, ঠিক কিনা? বলছি, ধৈর্য ধরে শোন---এ অঞ্চলের উপজাতি ইন্ডিয়ানাদের আমিই একমাত্র ইজারাদার ---মালিকও বলতে পার। আমাকে সবাই "বড় ইয়াকুমা" বলে সম্বোধন করে। 'বড় ইয়াকুমা' কথাটার অর্থটা বুঝতে পারলে না, তাই না? এর মানে দলের "বুড়ো আঙুল", মানে তোমরা যাকে রাজা বল---এরা তাকেই বলে 'বুড়ো আঙুল'। আমি তোমাদের একজন রাষ্ট্রদূত বা ডিনামাইটের একজন ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের চেয়ে অনেক, অনেক বেশি ক্ষমতা ধরি আর একটা কথা বলে রাখছি, সময় সুযোগ মত আমি খবরের কাগজও পড়ি। আমার কথা তো মোটামুটি শুনলে। এবার তোমার কথা, মানে তোমার পরিচয় দাও। পরিচয় আদান-প্রদানের পর্ব সেরে আমরা না হয় অন্য সব প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করব, কি বল?

তার কথা শেষ হলে আমি মুখ খুললাম---সবার আগে আমার নামটা বলছি, ডব্লু, ডি, ফিঞ্চ বলে আমি পরিচিত। পেশায় একজন পুঁজিবাদী। আর বাড়ি পাঁচশ' একচল্লিশ ইস্ট থার্টি সেকেন্ড---

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বড় ইয়াকুমা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, নিউ ইয়র্ক, ঠিক কিনা? এবার ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বলল, আমি জানি। নিউ ইয়র্ক সম্বন্ধে কিছু কিছু খোঁজ খবর আমি রাখি।

আমি এবার এখানে কোন উদ্দেশ্যে এসেছি, কিভাবে দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে এখানে পৌঁছেছি প্রভৃতি এক-এক করে তাকে বললাম।

আমার উদ্দেশ্যের কথা শুনে শ্বেতাঙ্গ লোকটা শিশুর মত সহজ সবল ভাব নিয়ে বলল, কি বললে, সোনা? সোনার গুঁড়ো? চমৎকার কথা তো শোনালে পরদেশী। তোমার কথা শুনে খুবই মজা পেলাম। এটা সোনার মুল্লুক এমন কথা কার মুখে শুনেছ বল তো? আসলে কিন্তু এটা আদৌ তা নয়। আর তুমি কিনা কোন একজন লোকের মুখে এমন একটা কথা শুনে প্রলুব্ধ হয়ে এখানে তোমার যাবতীয় অর্থকড়ি বিনিয়োগ করতে ছুটে এসেছ? চমৎকার! শোন, আমার দেশবাসী ইন্ডিয়ানরা শিশুর মত সাদাসিদে—মাটির মানুষ। সোনা কেনার ক্ষমতার ব্যাপার স্যাপার সম্বন্ধে কোন ধারণাই তাদের নেই। আমার বিশ্বাস, নির্ঘাৎ কেউ তোমাকে ধাপ্পা, মানে ভুল বুঝিয়েছে। সবশেষে বলছি, আমার কথায় সম্পূর্ণ আস্থা তুমি রাখতে পার।

হতে পারে, কেউ আমাকে ভুল তথ্য দিয়েছে, মানে ভুল বুঝিয়েছে। সব কিছু শোনার পর আমার কাছে ব্যাপারটা কিন্তু খুব সহজ এবং স্বাভাবিক মনে হয়েছে।

শ্বেতাঙ্গ মাতব্বর আবার মুখ খুলল, শোন হে পরদেশী মেহমান, আমি তোমাকে যা বলব তার প্রতিটা বর্ণই সত্য। কোন শ্বেতাঙ্গ মানুষের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ আমার মোটেই হয় না। অতএব তোমার যাতে ভাল হয় সে রকম পরামর্শই তোমাকে আমি দেব। তোমার অর্থকড়ি বিনিয়োগের একটা উপায় তোমাকে বাৎলে দিচ্ছি। আমরা প্রজারা হয়ত বা সামান্য কিছু সোনার গুঁড়ো তাদের পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে। অতএব সেগুলো তাদের কাছ থেকে নিতে হলে তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। তুমি সঙ্গে করে যেসব জিনিসপত্র নিয়ে এসেছ সেগুলো আগামীকাল তাদের সামনে রেখে চেষ্টা চরিত্র করে দেখ যদি বিক্রি করতে পার।

আমি কি বলব হঠাৎ করে গুছিয়ে উঠতে না পেরে নীরবই রইলাম।

শ্বেতাঙ্গ পুরুষটা এবার বলল, শোন, আমার বে-সরকারী পরিচয়টা এবার তোমার কাছে খোলসা করে বলছি—আমার নাম পেট্রিক শ্যেইন। আমি অসীম সাহস, অটুট মনোবল আর অনন্য আত্মবিশ্বাস সম্বল করে একা যুদ্ধ করে 'পেচে ইন্ডিয়ান' উপজাতির ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করি। এখন আমিই সুবিশাল এ অঞ্চলের একচ্ছত্র অধিপতি।

চার বছর আগে আমি ঘুরতে ঘুরতে এখানে হাজির হয়েছিলাম। আমার অতিকায় চেহারা, গায়ের সাদা চামড়া আর অসীম স্নায়ুবিক শক্তির সাহায্যে এদের জয় করেছি। ছ'সপ্তাহ নিরলস চর্চার মাধ্যমে আমি এদের ভাষা রপ্ত করে নিয়েছি। আসলে এদের ভাষাটা খুব সহজ। অল্পেই আয়ত্ত করে নেওয়া সম্ভব।

হ্যাঁ, আমি তাদের জয় করলাম, প্রভুত্ব স্থাপন করলাম। তারপর আমি ধৈর্য ধরে তাদের মধ্যে আর্থ-রাজনীতি, আইন-কানুন, কিছু কিছু নীতিকথা, মিতব্যয়িতা আর ভেল্কি দেখানোর ব্যাপার স্যাপার শেখালাম। প্রতি রবিবার বা তার আগে পরের কাছাকাছি কোন দিন তাদের শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরী করে নেই যোগান ও চাহিদার নীতি কি জিনিস। আমি তাদের কাছে যোগানের ভূরিভূরি প্রশংসা করি আর চাহিদা সম্বন্ধে এমন সব কথা বলি যাতে চাহিদার ওপর তাদের মন বিতৃষ্ণায় ভরপুর হয়ে ওঠে। প্রতিবারই আমি তাদের কানে একই কথা ঢুকিয়ে দিতে থাকি। আচ্ছা বল তো পরদেশী মেহমান ডব্লু. ডি, আমার মধ্যে কি কাব্যিক গুণটুন কিছু আছে?

দেখুন, সেটাকে কাব্য আখ্যা দেওয়া যায় কিনা তা-তো আমার জানা নেই।

সে যা-ই হোক, কাব্য যদি হয়েই থাকে তবে তা টেনিসন-এর কাছ থেকে ধার করা। আমি চিরদিনই তাকে শ্রেষ্ঠ কবি বলে মনে করি। আর একটু সময় সুযোগ পেলেই তাঁর এ কথাগুলো মনে মনে আবৃত্তি করি কারণ আমি একবিন্দুও বাড়িয়ে, ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলছি না, কেউ যদি এটা আয়ত্ত করে নিতে পারে তবে সেটাই হবে সে আমলের একজন সুলতানের পক্ষে মশলা-বাগিচায় বেড়ানোর চেয়ে মহত্তর একটা কাজ।

আশা করি আমার কথা শুনে তুমি অবশ্যই বুঝতে পারছ। আমি তাদের শিক্ষা দেই—চাহিদাকে কাটছাঁট কর, যোগানটাই তো আসল কথা। আমি তাদের শিক্ষা দেই—খুবই সাধারণ দরকার টরকার ছাড়া কিছুই চাইবে না। সামান্য পরিমাণে মাংস, সামান্য কোকো আর উপকূল থেকে সংগ্রহ

করা একটু আধটু ফল—ব্যস, এতে তারা সন্তুষ্ট। সবকিছুই তারা শিখে নিয়েছে। খড় আর গাছের ছাল বাকলের আঁশ দিয়ে তারা নিজেদের পোশাক-পরিচ্ছদ আর টুপি নিজেরাই বানিয়ে নেয়। আর এতেই তারা সন্তুষ্ট। দেখ, এক সাধারণ একটা জাতির মধ্যে আত্মতুষ্টির ভাব সঞ্চার করতে সক্ষম হওয়াটাই বড় কাজ বলে আমি মনে করি।

শ্বেতাঙ্গ রাজার সম্মতি পেয়ে আমি ম্যাকক্লিন্টককে লাগিয়ে দিলাম জোর কদমে কাজ শুরু করার জন্য। সে আমার যাবতীয় মালপত্র গ্রামের একটা খোলা জায়গায় সাজিয়ে ফেলল। ব্যস, আর যাবে কোথায়! খবরটা ছড়িয়ে পড়তেই চারদিক থেকে গ্রামবাসী ইন্ডিয়ানরা সেখানে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কৌতূহল ও আগ্রহের সঙ্গে সবকিছু নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগল। লাল কম্বল, কানের দুল, আংটি প্রভৃতি এক এক করে তাদের দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিলাম। আর পাথর বসানো চিরুনি, মুক্তোর গলার হার প্রভৃতি দেখিয়ে মেয়েদের মন জয় করার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেলাম। আর সব বয়সী ছেলেদের হরেক রকম গেঞ্জি দেখিয়ে তাদের মন কাড়তে সাধ্যমত প্রয়াস চালাতে লাগলাম। কিন্তু হায়! এত প্রয়াস ও পরিশ্রম সবই ব্যর্থ হওয়ার জোগাড় হল। ফয়দা কিছুই হল না। খোদাই করা বুভুক্ষু মূর্তির মত তারা গভীর উৎসাহে সবই দেখল এক এক করে। কিন্তু ফলাফল শূন্য। একটা জিনিসও তারা কিনল না।

আমি চোখে মুখে গভীর হতাশার ছাপ এঁকে ম্যাকক্লিন্টককে জিজ্ঞাসা করলাম—এ কেমন ব্যাপার হল! কারণ কিছু বুঝতে পারছ? সে বার কয়েক হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙল। একটা সিগারেট ধরিয়ে একগাল ধোঁয়া বাতাসে ছড়িয়ে দিল। পাশে দাঁড়িয়ে ছটফট করতে থাকা খচ্চরটাকে আচ্ছা করে ধমকাল। তারপর আমার কাছে এগিয়ে এসে অনুচ্চকণ্ঠে আমাকে বলল—কত্তা, এখানকার মানুষের পয়সার খুব টানাটানি যাচ্ছে। হাতে মালকড়ি না থাকলে সৌখিন জিনিস কিনবে কেমন করে?

আমাদের মধ্যে যখন কথাবার্তা চলছে তখন গলায় সোনার হার ঝুলিয়ে, চুরুট টানতে টানতে শ্বেতাঙ্গ রাজা প্যাট্রিক সেখানে এল। চুরুটে লম্বা একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, কি হে পরদেশী মেহমান ডব্লু. ডি, কারবার কেমন হচ্ছে?

খুব ভাল। খদ্দেরদের কী ভিড়! আর কিছু মাল বেচেই দোকান গুটিয়ে নেব। আগামীকাল দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম দিয়ে একবারটি চেষ্টা করে দেখব ভাবছি। নিলামে দু'গ্রোস মাল খরিদ করে নিয়ে এসেছি।

আমার কথা শুনে শ্বেতাঙ্গ রাজা তো হেসেই খুন। হাসি থামিয়ে এক সময় সে বলতে লাগল, হে আমার পরলোকগতা জেরুশা মাসি! ডব্লু. ডি, কারবারের ব্যাপারে তুমি যে একেবারে নির্বোধ শিশুর মত কথা বলছ দেখছি! তোমার কি এটাও জানা নেই যে, ইন্ডিয়ানদের দাড়ি কামানোর হ্যাপা পোহাতে হয় না? এরা দাড়ি না কামিয়ে পটাপট দাড়ি টেনে টেনে আগাছার মত গোড়া থেকে তুলে ফেলে। সত্যি, একটা কচি খোকার জ্ঞানগম্যিও তোমার নেই দেখছি!

কথাটা বলেই শ্বেতাঙ্গ রাজা শোন গলা ছেড়ে হাসতে হাসতে চলে গেল।

আমি এবার ম্যাকক্লিন্টককে কাছে ডেকে গলা নামিয়ে বললাম, এক কাজ কর, গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রচার করে দাও আমার টাকার দরকার নেই। আমি চাই সোনা, সোনার গুঁড়ো। আর এ-ও প্রচার করে দাও, প্রতি আউন্সের দাম ষোল ডলার হিসেবে সোনার দাম দেব, বুঝলে? ডলার, পেনির বদলে আমার দরকার গুঁড়ো। যাও গ্রামে ঘুরে ঘুরে কথাটা প্রচার করে দাও।

ম্যাকক্লিন্টক আমার হুকুম তামিল করল। পাঠক পাঠিকা কি মনে করছেন, ডব্লু.ডিকে তখন সৈন্য তলব করে ভিড় ঠেকাতে হয়েছে। ধ্যুৎ! কোন ফয়দাই হল না। মিনিট দুয়ের মধ্যে যত মাসির বোন-ঝি আর কাকার ভাইপো দোকানের সামনে ছিল গুটিগুটি সেখান থেকে কেটে পড়ল।

এক রাত্রে আমি শ্বেতাঙ্গ রাজা শোন-এর বাড়ির বৈঠকখানায় বসে এ ব্যাপার নিয়ে কথাবার্তা বলছিলাম।

প্রসঙ্গক্রমে আমি বললাম, সোনার গুঁড়ো যা কিছু আছে তারা নির্ঘাৎ সেগুলো কোথাও না কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। তা নইলে সোনার প্রসঙ্গ শুনেই তারা অবশ্যই এভাবে ভয়ে পালিয়ে যেত না।

শ্বেতাঙ্গ রাজা বলল, পরদেশী, তোমার ধারণা ভুল। এদের সোনা বলতে কিছু নেই। আচ্ছা, এ সোনার উদ্ভট চিন্তাটা তোমার মাথায় কে চাপিয়ে দিয়েছে, বলতে পার? তুমি এ্যালান পো পড়েছ নাকি হে? এদের কাছে এক কণা সোনাও নেই, আমার কথা বিশ্বাস কর।

আমি জানতে পেরেছি, গ্রামবাসীরা গুঁড়ো সোনা পাখির পালকের ফাঁপা অংশগুলোতে পুরে রেখে দেয়। পরবর্তীকাল সেগুলোকে ঢেলে পঁচিশ পাউন্ডের বস্তায় বোঝাই করে।

শ্বেতাঙ্গ রাজা শ্যেন প্রফুল্ল মুখে বলল, পরদেশী ব্যাপারী ডব্লু. ডি সাদা চামড়ার মানুষের সঙ্গে আমার খুব কমই দেখা হয়। তাই ভাবছি, তোমাকে এখানে আমার কাছেই রেখে দেব। আমার মনে হয় না, তুমি এখানে জ্যান্ত—

কথাটা শেষ না করেই সে মখমলের সুবিশাল একটা মখমলের পর্দা সরিয়ে দিল। হরিণের চামড়ার একটা পর্বত প্রমাণ স্তূপ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল।

শ্বেতাঙ্গ রাজা শ্যেন মুচকি হেসে বলল, শোন, এখানে হরিণের চামড়া বোঝাই চল্লিশটা বস্তা আছে। আর গুঁড়ো সোনা যে পরিমাণ আছে তার দাম দু লক্ষ কুড়ি হাজার ডলার। সবই আমার সম্পত্তি। আর সবকিছুর স্বত্বাধিকারী বড় ইয়াকুমাই। গ্রামবাসীরাই এসে যোগান দেয়। শোন, কাঁচের মালার কারবারী, সবকিছু কিন্তু আমার মালিকানাধীন।

আমি প্রচণ্ড বিতৃষ্ণার সঙ্গে বলে উঠলাম, কিন্তু আমি তো দেখছি, এতে আপনার কোন লাভই তো নেই। আপনি মূলত একজন রক্ষক ছাড়া আর কিছুই নয়। ভাল কথা, এসব সঞ্চিত অর্থের সুদ আপনি নিয়মিত দিয়ে থাকেন তো?

দেখ, আসল কথা, এগুলো আমি মনে প্রাণে ভালবাসি। সর্বক্ষণ এদের স্পর্শ পাওয়ার জন্য আমি যারপরনাই আগ্রহী। আমার সুখ শান্তি বলতে এটুকুই। ব্যস, তবেই আমি তৃপ্ত। এ ঘরটায় পা দিলেই আমি নিজেকে ধনকুবের জ্ঞান করি। আমি নিজেকে রাজারও রাজা জ্ঞান করি। ভাবি, বছর খানেকের মধ্যেই আমি কোটিপতি বনে যাব। যতদিন যাচ্ছে সোনার গুঁড়োর বস্তাটা ততই উঁচু হচ্ছে। উপজাতিদের সবাই খাড়িতে নেমে গেছে। অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে জল ছেঁকে ছেঁকে সোনার গুঁড়ো সংগ্রহ করছে। সে সব পোটলা বেঁধে নিয়ে আসছে আমার কাছে। আশা করি এবার ব্যাপারটা তোমার কাছে খোলসা হয়ে গেছে, কেন তারা তোমার ওইসব কাঁচের গহনাপত্র কিছুতে উৎসাহী নয়? কি করেই বা কিনবে? তারা সে সোনার গুঁড়ো যা পায় সবই আমার কাছে জমা দিয়ে যায়। তার ওপর আমি দিনের পরদিন তাদের কানে বীজমন্ত্র দিয়েছি, কোন কিছুর প্রতি প্রলুব্ধ না হতে, কোন কিছুর আকর্ষণে মনকে না বাঁধতে। এক কাজ কর পরদেশী মেহমান, তোমার দোকানটাই না হয় গুটিয়ে নাও। ফয়দা যখন কিছুই হবার নায়, তখন ঝুটমুট—'

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে আমি বলে উঠলাম, দেখুন, আপনার প্রকৃত পরিচয়টা আমিই বলছি। মশাই, আপনি একটা পয়লা নম্বরের হাড়কিপ্টে। মোদ্দা কথা, একজন জঘন্য ঘৃণিত চরিত্রের মানুষ আপনি। সবাইকে বলেন যোগানের কথা, কিন্তু ভুলেও চাহিদার কথা বলেন না। আসলে যোগান তো যোগানই বটে। এর বেশী কিছু নয়। কিন্তু চাহিদার পরিধি বিস্তীর্ণ। নারী আর শিশুর অধিকার তো চাহিদার মধ্যেই অন্তর্নিহিত থাকে। এমন কি শিষ্টাচার, মানবিকতা, বন্ধুত্ব আর গলির মোড়ের ভিখারীটার ভিক্ষাবৃত্তি পর্যন্ত চাহিদার মধ্যেই পড়ে। অতএব যোগান আর চাহিদা উভয়েরই সমন্বয় সাধন করতে হবে। দেখুন, আমার ঝোলার মধ্যে এমন কিছু জিনিস রক্ষিত আছে যা আপনার অর্থনীতি আর রাজনীতির গৃহীত সিদ্ধান্তকে তছনছ করে দিতে পারে, বিশ্বাস করুন।

পরদিন সকালে আমার নির্দেশ পালন করতে গিয়ে ম্যাকক্লিন্টক একটা খচ্চরের পিঠে মালপত্র নিয়ে সে জায়গাটায় গেল। আগের মত গ্রামবাসীরা কৌতূহলের শিকার হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

সেগুলো থেকে বেছে বেছে আমি গলার হার, কানের দুল, ব্রেসলেট, চিরুণি গ্রামবাসী মেয়েদের পরতে দিলাম। ব্যস, তারপরই মোক্ষম চালটা আমি চাললাম।

এবার আমার মালপত্রের পাঁজা থেকে খুঁজে খুঁজে আধা গ্রোস ছোট আয়না বের করলাম। উপস্থিত গ্রামবাসী মেয়েদের মধ্যে সেগুলো বিলিয়ে দিলাম। সত্যি কথা বলতে কি, পেচে ইন্ডিয়ানদের এটাই প্রথম আয়নার ব্যবহার।

শ্বেতাঙ্গ রাজা শ্যেইন গলা ছেড়ে হাসতে হাসতে এক ঝলক আমার দিকে তাকিয়ে নিজের

পথে চলে যেতে যেতে বলল, কি হে পরদেশী ব্যাপারী, কারবার জমেছে মনে হচ্ছে?

আমি মুচকি হেসে বললাম, জমেছে কিনা, সে-তো নিজের চোখেই দেখতে পারছেন।

ইতিমধ্যে অদ্ভুত একটা কাণ্ড ঘটতে চলেছে। মেয়েরা আয়নায় নিজের নিজের মুখ দেখে বুঝতে পারল তারা সত্যি সুন্দরী। তারা তাদের রূপের ব্যাপারটা পুরুষদের কানে তুলতেও দেরী করল না। ব্যাপারটা যে পুরুষদের অনুকূলে যায় নি এরকম মনে করাই সঙ্গত। তারা বার বার নিজেদের আর্থিক অসঙ্গতির কথা জানাতে লাগল। অজুহাতও কম দাঁড় করাল না। কিন্তু কোন অজুহাতই শেষ পর্যন্ত ধোপে টিকল না।

এবার আমি তাদের কথার মধ্যে নাক গলাবার সময় এসেছে নিঃসন্দেহ হয়ে ম্যাকক্লিন্টনকে দোভাষী হিসাবে ব্যবহার করলাম। আমার বক্তব্যের তর্জমা করে সে মেয়েদের লক্ষ্য করে বোঝাতে লাগল, একমাত্র সোনার গুঁড়োর বিনিময়ে তারা এসব গহনাপত্র খরিদ করতে পারে যা কেবলমাত্র সম্রাট, রাজা বাদশাদের রমণীদের গায়েই দেখা যায়। আর সাজ পোশাক কেমন হয়েছে নিজের চোখে দেখার জন্য তারা এসব আয়না ব্যবহার করেন সোনার গুঁড়ো দিয়ে কেনা গহনাপত্র পরে তারাও নিজেদের বেগম রাণীর মত সুন্দর করে সাজিয়ে তুলতে সক্ষম। নগদ অর্থকড়ি দিতে হবে না, কেবলমাত্র সোনার গুঁড়োর বিনিময়ে তারা এসব খরিদ করতে পারবে।

সবশেষে আমি ম্যাকক্লিন্টনকে বললাম, তুমি এদের বলে দাও, পিটসবার্গ-এর ব্যাঙ্কগুলো এসব জিনিস গচ্ছিত রেখে শতকরা চার ভাগ সুদও দিয়ে থাকে।

ম্যাকক্লিন্টন, তোমাকে যা বলতে বললাম তা একনাগাড়ে বলে যাও আব সোনার গুঁড়োর কর্মীরা তাদের কাজের মধ্যে লেগে থাকুক। আর টম ওয়াটসনরা যে জর্জিয়ায় ফিরে গেছে তা মাঝে মাঝেই তাদের স্মরণ করিয়ে দিও, কেমন?

মাছের আঁশের তৈরী চমৎকার অলঙ্কার আর পাথরের মালা গলায় পরে এক আদিবাসী গ্রামের পুরুষ এক ইন্ডিয়ান পুরুষের কাঁধে ভর দিয়ে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে। আর ইন্ডিয়ান পুরুষটা অনবরত এমন দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলে যাচ্ছে যার একটা বর্ণও আমার বোধগম্য হল না।

ম্যাকক্লিন্টন আমাকে তর্জমা করে বুঝিয়ে দিল। পুরুষটা বলছে যে, সোনার গুঁড়োর বিনিময়ে যে এমন মনোলোভা জিনিস পাওয়া যায় তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। আর মেয়েরা? ধরতে গেলে তারা উন্মাদদশা প্রাপ্ত হয়েছে।

ইয়াকুমা তাদের বোঝাতে সাধ্যমত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে, এসব ঝকমকে অলঙ্কার ভূত-প্রেত ছাড়ানোর কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজেই ব্যবহার করা যাবে না।

তার কথার পরিপ্রেক্ষিতে আমি মন্তব্য করলাম, যেখানে অর্থ কড়ির ব্যাপার স্যাপার সেখানেই তো ভূত প্রেতের তাণ্ডব চলে।

ম্যাকক্লিন্টন বলল, তারা রাগে ফুঁসছে যে, ইয়াকুমা তাদের বোকা বানাতে গিয়ে এমন সব কথা বলছে। তাই তারা--

আমি তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে সোল্লাসে বলে উঠলাম, ম্যাকক্লিন্টন, ওষুধে ধরেছে। খেল শুরু হয়ে গেছে। তোমার কাজ চালিয়ে যাও। আরে সোনার গুঁড়ো বা নগদ মালকড়ির বিনিময়ে আমাদের মালপত্র ফাঁকা হয়ে গেল।

এ কী হল! এ যে রীতিমত তাজ্জব কাণ্ড ঘটে গেল! চোখের পলকে ভিড়টা পাতলা হয়ে গেল। ব্যাপারটা আমার মাথায়ই এল না। তাদের ফেরৎ দিয়ে যাওয়া ছোট্ট আয়না ও অলঙ্কারগুলো পোটলা বেঁধে খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে আমাদের ডেরায় ফিরলাম।

আমরা ডেরায় ফিরতে না ফিরতেই প্রচণ্ড চিৎকার চেঁচামেচিতে ম্যাকক্লিন্টন আর আমি দারুণ আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম। মুহূর্তের মধ্যে আর্তনাদ করতে করতে শ্বেতাঙ্গ রাজা শ্যেইন আমাদের কাছে হাজির হল। তার পোশাক ছেঁড়া ফাঁটা, মাথার চুল উস্‌কো খুস্‌কো, চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল। আর মুখে অসংখ্য আঁচড়, রক্ত ঝরছে। ক্ষিপ্ত বিড়াল যেন আঁচড়ে আঁচড়ে এমন হাল করে দিয়েছে।

তিনি বললেন, পরদেশী, তারা রাজকোষ লুঠ করতে শুরু করেছে। আমাকে খুন করে ফেলবে বলে শাসাচ্ছে, তোমাকেও নাকি ছাড়বে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দুটো খচ্চরের বাঁধন খুলে তৈরী

হয়ে নাও, পালাতে হবে।

আমি মুচকি হেসে বললাম, আসলে যোগান আর চাহিদার তাৎপর্যটা তাদের মাথায় ঢুকেছে। এর জন্য মেয়েরাই সবচেয়ে বেশী দায়ী। তারাই কিন্তু আমাকে দেবতার মত ভক্তি শ্রদ্ধা করত।

হ্যাঁ, তা করত বটে। কিন্তু তখন তো আর তারা আয়নায় নিজেদের মুখ দেখে নি।

দেরী হয়ে যাচ্ছে পরদেশী মেহমান। তারা কুড়ুল আর ছুরি হাতে এদিকেই ধাওয়া করছে। শীঘ্র কর, খচ্চর তৈরী করে নাও।

ছাইরঙ আর সাদা খচ্চরটা তাকে দিলাম। আর মেটে রঙেরটা নিলাম আমি নিজে। ওটা ঘণ্টায় দু'নট দ্রুত ছোটে। একটা হাঁটুতে শিরায় টান ধরেছে। তবে সাধ্যমত চেষ্টা করে পুষিয়ে দেবে।

আমি এবার শ্বেতাঙ্গ রাজা শ্যেনকে বললাম, শুনুন, আপনার রাজনীতির ক্ষেত্রে আপনি যদি পারস্পরিক অধিকারের সমন্বয়কে স্বীকার করে নিতে উৎসাহী হতেন তবে আমি নিজে ছাইরঙ আর সাদা খচ্চরটা নিয়ে মেটে রঙেরটা আপনাকে দিয়ে দিতাম। কিন্তু এ পরিস্থিতিতে তা হবার নয়।

শ্যেইন, ম্যাকক্লিন্টন আর আমি কাঁচা চামড়ার সেতুটা পার হতে না হতেই পেচে-রা দলবেঁধে এ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আমাদের লক্ষ্য করে চরম আক্রোশে ইয়া বড় বড় পাথর ছুঁড়ে মারতে লাগল। কয়েকটা লম্বা লম্বা ছুরির ফলাও বিদ্যুৎগতিতে আমাদের গা ঘেঁষে উঁড়ে যেতে লাগল। সেতুর আমাদের দিকটা যে মোটা মোটা চামড়ার ফিতে দিয়ে বেঁধে দেওয়া ছিল সেগুলোকে ঝটপট কেটে দিলাম। আমরা এবার উপকূল দিয়ে চলতে লাগলাম।

সে মুহূর্তেই ইয়া লম্বা আর গাট্টাগোট্টা এক পুলিশ ফিঞ্চ-এর দোকানে ঢুকল। বজ্রগম্ভীর স্বরে সে বলতে লাগল, ক্যাসি-র দোকানে আলোচনা হচ্ছে শুনে এলাম, আগামী রবিবার ইস্ত্রিকারক ইউনিয়নের সদস্যরা বার্গেন বীচ-এ ঘটা করে বনভোজন করছে, কথাটা সত্যি কি?

ফিঞ্চ উল্লসিত হয়ে বলল, আরে ভাই, অবশ্যই সত্যি। এলাহী কাণ্ডের আয়োজন হচ্ছে। কী যে মজা হবে তা আর বলার নয়!

পুলিশটা পাঁচ ডলারের নোট এগিয়ে দিয়ে বলল, পাঁচটা টিকিট আমার দরকার, দিন।

ফিঞ্চ বলল, সে কি! বড্ড বেশী হয়ে যাচ্ছে নাকি?

রাখুন তো মশাই। কিছু কেনা-বেচাও তো চলবে নিশ্চয়? তবে তো কিছু ক্রেতাও চাই। যাবার জন্য আমি খুব আগ্রহী।

একটু বাদেই ময়লা পোশাক পরিহিতা বছর সাতেকের একটা মেয়ে ফিঞ্চ-এর কাছে এল। সে বলল, মা বলেছেন, মুদির জন্য আশি সেন্ট দেবার জন্য। আর বলেছেন, গোয়ালার জন্য উনিশ সেন্ট আর খুঁটিনাটি কিছু জিনিস কেনার জন্য পাঁচ সেন্টও দিতে।

ফিঞ্চ কোনরকম ফোঁ-ফাঁ না করে কাঠের বাক্স থেকে এক ডলার চার সেন্ট বের করে মেয়ের হাতে দিয়ে দিল।

আমার টুপির ফিতেটা খুলতে খুলতে ফিঞ্চ বলল, এটাই হচ্ছে যোগান আর চাহিদার সঠিক নিয়ম। দুটোকে একসঙ্গে, পাশাপাশি কার্যকর করতে হবে। আমি দিব্যি কেটে বলতে পারি ওই নিকেলের মুদ্রাটা দিয়ে সে জেলি-মটর খরিদ করবে। এ খাবারটা সে খুব ভালবাসে। আসলে চাহিদাই যদি না থাকে তবে যোগানের মূল্য কি থাকতে পারে?

আমি একটু নড়েচড়ে বসে আগ্রহান্বিত হয়ে বললাম, আর সে শ্বেতাঙ্গ রাজার কি হল, শোনা গেল না তো?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, কথাটা আগেই আমার বলা দরকার ছিল। আরে, যে লোকটা দোকানে ঢুকে নগদ অর্থ দিয়ে টিকিট কটা খরিদ করে নিয়ে গিয়েছিল তিনিই শ্বেতাঙ্গ রাজা শ্যেইন। আমার সঙ্গেই খচ্চরের পিঠে চেপে তিনি ফিরে এসেছিলেন। ইদানিং তিনি পুলিশ বাহিনীতে চাকরি করছেন। ভালই আছেন।

টু হিম হু ওয়েটস

হাডসনের সাধু বাবাজী অসহনীয় উত্তেজনার শিকার হয়ে নিজের গুহাটার ভেতরে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল। ক্যাট্স্কিল পর্বতমালার একটা ছোট্ট টিলার ওপর গুহাটা অবস্থিত। সবুজ অরণ্য বেষ্টিত পাহাড়টার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বাস্তবিকই মনোলোভা। পাহাড় আর পাহাড় থেকে নেমে আসা নদীর মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে একফালি পাকা রাস্তা। এটা থেকে একটা আঁকাবাঁকা ছায়া ছায়া রাস্তা সাধু বাবাজীর গুহার মুখে গিয়ে থমকে গেছে। নদীর মাইল খানেক ওপরের দিকে মনোলোভা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত একটা গ্রীষ্মকালীন পর্যটনকেন্দ্র আছে। গ্রীষ্মের অসহ্য গরমের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য শহরের পর্যটকরা সেখানেই আশ্রয় নেয়। পর্যটন কেন্দ্রটা 'ভিউ-পয়েন্ট ইন' নামে পরিচিত।

সাধু বাবাজীর দিকে আপনার অপেরা গ্লাসটাকে ঘুরিয়ে দেখুন, মুহূর্তের মধ্যেই আপনার চোখ দুটো যেভাবে স্পর্শকাতর হয়ে উঠবে তাতেই তিনি আপনার এক প্রিয়পাত্রে পরিণত হয়ে উঠবেন।

সাধু বাবাজীর বয়স বছর চল্লিশেক। মাথার লম্বা চুলের গোছার অগ্রভাগ কোঁকড়ানো আর বুক পর্যন্ত নেমে আসা বাদামী দাড়িগুলো দু'ভাগে বিভক্ত। হাতের আঙুলগুলো লম্বা ও বেশ হৃষ্টপুষ্ট আর নাকটা ছুঁচলো। তার হাবভাবে তাকে ঝাড়ফুঁক সম্বল অন্য দশটা সাধু থেকে সহজেই পৃথক মনে করা যেতে পারে আর নিঃসন্দেহে তাকে উচ্চমার্গের সাধুর আসন দেওয়া যেতে পারে।

আসলে গুহাটাই কিন্তু সাধু বাবাজীর আসল আস্তানা নয়। বরং গুহাটাকে আসল আস্তানার একটা অংশ মনে করা যেতে পারে। কাঠের খুঁটি আর কাদা দিয়ে তৈরি বেড়ার ওপর উন্নত মানের মরচে নিরোধক দস্তার পাতের ছাউনির চাল।

আসল কুঁড়ে ঘরটায় আছে একটা বড়সড় পাথরের বেদী, পুঁথিপত্র রাখার কাঠের তক্তার তাক আর দুটো পাথরের ওপর চওড়া তক্তা বিছানো একটা টেবিল। মাটির দেওয়ালের গায়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে বন্য পশুর লম্বা চওড়া একটা চামড়া। নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্লেস আর অষ্টম হেনরি স্ট্রীটের নিকটবর্তী কোন একটা স্থান থেকে এটাকে খরিদ করা হয়েছিল।

আদ্যিকালের একটা পাথরের উনুন পাতা আছে ঘরের পিছন দিককার গুহাটাতে। সাধু সেখানেই পাকসাক সারে। সাবেকি আমলের একটা কুড়ুল দিয়ে কঠোর পরিশ্রম আর অসীম ধৈর্যের সঙ্গে পাথরের দেওয়ালে কয়েকটা তাক কেটে তাতে রান্নার জিনিসপত্র রাখে।

সাধু বাবাজী দশ বছর যাবৎ সে আস্তানায় আছে। সে ভিউ-পয়েন্ট ইন-এর এক বিশেষ সম্পদ বলে বিবেচিত হয়। সেখানকার পর্যটকদের কাছে ভুতুড়ে উপত্যকার রহস্যময় প্রতিধ্বনির পরই সে সেখানকার আকর্ষণ। মাত্র ইঞ্চি-কয়েক দূরে প্রেমিক লম্ফ নামক স্থানটা অবস্থিত। সেখানকার সবার চোখে সে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। ব্যর্থ প্রেমের কারণে ঘর-সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তিনি বিবাগী হয়েছে। প্রতি শনিবার রাত্রে তাকে গোপনে ভিউ-পয়েন্ট ইন-এ এক ঝুড়ি ভর্তি করে খাদ্যদ্রব্য পাঠানো হয়। আস্তানার সীমানার বাইরে সে কোনদিন ভুলেও যায় না। পর্যটনকেন্দ্রে যেসব পর্যটক আসে তারা সবাই তার সঙ্গে দেখা করে। সবার মুখে একই কথা, তার দর্শন আর জ্ঞানবুদ্ধি এক অত্যাশ্চর্য সম্পদ।

সে বছর গ্রীষ্মে ভিউ-পয়েন্ট ইন-এ দারুণ ভিড় জমে। পর্যটকদের আগমনে একেবারে ভর্তি। তাই সে শনিবার রাত্রে খাবারের ঝুড়িতে অন্যান্য খাদ্যবস্তুর সঙ্গে কয়েকটা অতিরিক্ত খাবার ভর্তি টিনও সাধুর আশ্রমে এসেছিল।

কিছু বাস্তব অভিযোগ এবার উত্থাপন করছি শুনুন। অতএব প্রেম কথাটার আবির্ভাব ঘটুক।

সত্যি কথা বলতে কি, সাধু বাবাজী একজন দর্শনার্থী আসবে এরকম নিশ্চিত আশা করেছিল। আর তারই জন্য তার বুক অবধি নেমে আসা প্রচারসুলভ দাড়িগুলোকে দীর্ঘ সময় ধরে চিরুনি চালিয়ে আঁচড়ে ফিটফাট করে তুলল। আটানব্বই সেন্ট দামের এলার্ম ঘড়িটায় পাঁচটা বাজা মাত্র সে চটের স্কার্টটাকে নামিয়ে হাতে নিল। বহু যত্নে ঝেড়ে ঝেড়ে পরিষ্কার করল। তারপর গায়ে চাপিয়ে বোতামগুলো আটকালো। দরজার ফাঁক থেকে ওক কাঠের লাঠিটা হাতে নিয়ে আস্তানার

চারিদিকের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বিশেষ কৌশলে এগোতে লাগল। সাধু বাবাজীকে বেশী দূর যেতে হল না। সামান্য এগোতেই শুকনো পাইনপাতার ওপর দিয়ে মচ্‌মচ্‌ শব্দ তুলে হেঁটে এগিয়ে এল সর্বজনপরিচিত ট্রেনহোম বোনদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ও রূপ সৌন্দর্যের আকর বিয়েট্রিক্স। তার পায়ের মোজা থেকে শুরু করে মাথার টুপিটার পালকগুলো পর্যন্ত সব নীল রঙের। তবে বঙ কোথাও হাল্কা আবার কোথাও বা খুবই গাঢ় নীল।

উভয়ের দৃষ্টি বিনিময় হল। ঠোঁটের কোণে দেখা দিল মুচকি হাসির রেখা। মুখের হাসিটুকু অব্যাহত রেখেই বিয়েট্রিক্স বলল, সাধু-সন্ত হবার সুবিধে অনেক। তোমার সঙ্গে দেখা করতে, সান্নিধ্য লাভ করতে মহিলাদের পাহাড় বেয়ে তোমার আশ্রমে আসতে হয়।

বিয়েট্রিক্স পাইন পাতার বিছানার ওপর ধপাস করে বসে পড়ল। আর সাধু বাবাজী তারই মুখোমুখি একটা পাইন গাছে হেলান দিয়ে অদ্ভুত কায়দায় দাঁড়াল। কয়েক মূহূর্ত পরে সে-ও পা দুটোকে ভাঁজ করে চটের স্কার্টটা দিয়ে ঢেকে বিয়েট্রিক্স-এর মুখোমুখি বসল।

মুখে হাল্কা হাসির ছোপ ফুটিয়ে তুলে সাধু বাবাজী প্রথম মুখ খুলল, দেখ। একটা পাহাড় হবার সুবিধাও কিন্তু অনেক ; নীল পরীরা পাখা মেলে উড়ে না এসে পাহাড় বেয়ে তোমার কাছে হাজির হবে।

বিয়েট্রিক্স বিষণ্ণ মুখে বলল, মা স্নায়ুর ব্যথায় শয্যাশায়ী বলেই তো তোমার কাছে আসা সম্ভব হয়েছে। আগেকার সে অতিথিশালায় দম আটকানো ভ্যাঁপসা গরম। এবার গ্রীষ্মে অন্য কোথাও থাকার মত অর্থ আমাদের ছিল না।

জান, কাল রাত্রে আমি ওই উঁচু পাহাড়টার শীর্ষদেশে উঠে গিয়েছিলাম। সেখানে দাঁড়িয়ে অতিথিশালার আলোগুলো দেখতে পেলাম। বাতাসে দু-একটা গানের কলিও কানে এল। আমি কল্পনার সাহায্যে দেখতে পেলাম, তুমি যেন অন্য কোন এক পুরুষের কণ্ঠলগ্না হয়ে নাচে মেতেছ। তখনকার আমার মনের অবস্থাটা ভাবতে পার, নিজেকে কেমন নিঃসঙ্গ ভাবছিলাম।

বিয়েট্রিক্স ফুসফুস নিঙড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, দেখ, তুমি ব্যাপারটা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করতে পারনি। আমি কণ্ঠলগ্না নয়, একজনের বাহুলগ্না হয়েছিলাম বটে। মায়ের কনুই দুটোতে আর কাঁধে বাত রোগের আক্রমণ হয়েছিল। তাই আমাকে প্রায় ঘণ্টা খানেক ধরে পুরনো মালিশের ওষুধটা ঘষতে হয়েছিল। একটা কথা, গত সন্ধ্যার সাপ্তাহিক নাচের আসরে ওয়েস্ট পয়েন্ট থেকে আসা কয়েকটা যুবক আর ইয়াট বোঝাই করে শহর থেকে আসা কিছু যুবক যোগ দিয়েছিল। আমি ইতিপূর্বেও লক্ষ্য করেছি বাত ব্যথায় আক্রান্ত হলে মা ব্যথা-বেদনায় একেবারে মুষড়ে পড়ে। তখন তাকে ধরে ওষুধ মালিশ করার দায়িত্ব আমাকেই পালন করতে হয়। একটা কথা, সাধুমা কেন হওয়া সম্ভব নয়!

মুহূর্তকাল নীরবতার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে বিয়েট্রিক্স আবার বলতে লাগল, তোমার জীবনের প্রেম-ভালবাসার কাহিনী আমাব জানা আছে। অতিথিশালার খাদ্য-তালিকার বিপরীত দিকে সেটা ছাপিয়ে দেওয়া আছে। সত্যি করে বল তো, ভদ্রমহিলা কি খুবই রূপসী ছিল?

সাধু ভ্রূ কুঁচকে বলল, কি বললে, খাদ্য তালিকার বিপরীত পিঠেও ছাপিয়ে দেওয়া হয়েছে! দেখ, পৃথিবীর মানুষের এসব কাণ্ডকারখানার তোয়াক্কা আমি মোটেই করি না। তবে খুবই সত্যি যে, রূপের বিচারে সে ছিল সুন্দরতমা। তারপরই আমি ভাবলাম, পৃথিবী ঘুরে বেড়ালেও তার মত সুন্দরী দ্বিতীয় আর একজনও মিলবে না। সে জন্যই তো আমি সবকিছু ছেড়েছুঁড়ে এ পাহাড়টার গায়ে এসে মাথা গুঁজেছি। জীবনের বাকি দিনগুলো তার স্মৃতি বুকে নিয়ে এখানেই কাটিয়ে দেব সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি।

বিয়েট্রিক্স সোল্লাসে বলে উঠল—চমৎকার! সত্যি চমৎকার সিদ্ধান্ত নিয়েছ! আমার মতে একজন সাধু-সন্তের জীবন আদর্শ স্বরূপ। বিলের পাওনা আদায়ের তাগাদা দিতে কেউ আসবে না, রাতের খাবার খেতে যাওয়ার জন্য পোশাকের চিন্তায় অস্থির হতে হবে না। হায় ঈশ্বর! আমি যদি এমন জীবন যাপন করতে পারতাম! কিন্তু সে রকম বরাত তো আমার হবার নয়। এ মরশুমে আমি বিয়ের পিঁড়িতে না বসলে মা আমাকে জোর করে টুপি সেলাই বা জরিপের কাছে লাগিয়ে দেবে। আমার যে বয়স বেড়ে যাচ্ছে সেটা কোন ব্যাপারই নয়, ভাল জায়গায় যাবার মত অর্থকড়ি

আমাদের নেই, এটাই বড় কারণ। আবার আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, আমার মনের মত কোন পুরুষ না হলে কারো গলায় বরমাল্যও দেব না। তাই তো আমি সাধু-সন্তের খাতায় নাম লেখাতে এত আগ্রহী। তারা কোনদিন বিয়ে থা করে না, বিয়ে করে সংসার পাতে কি?

মনের মত মানুষ জুটে গেলে কত শত সাধু-সন্ত বিয়ে করে দিব্যি সংসার করে।

রূপসী যুবতী বিয়েট্রিক্স বলল, কিন্তু তারা তো সাধু-সন্ত। কারণ তারা সঠিক মানুষটাকে হারিয়েছে ঠিক কিনা?

বিবাগী লোকটা বোকার মত বলে উঠল, হ্যাঁ, কারণ তারা ভাবে যে, তারা সবকিছু হারিয়েছে। পাহাড়ে গুহায় বা ধনীদের সমাজে বাস করে তাদের সবাই জ্ঞানলাভের সমান অধিকারী, কোন বাধাই নেই।

বিয়েট্রিক্স বলল, আমার পরিচিতজনরা সবাই তো নামজাদা লোক। যত গোলমাল এতেই। গ্রীষ্মে সমুদ্রের ধারে এত নামজাদা লোকের সমাবেশ ঘটে যে, তাদের পাশে আমরা চুনোপুঁটির সমান। একটা কথা, আমরা সবাই ছিলাম মেয়ে। সংখ্যায় ছিলাম চারজন। একমাত্র আমিই এখনও পড়ে আছি। বাকি সবার বিয়ে থা হয়ে গেছে। ঘর সংসার করছে। আমার বোনদের জন্য মা যারপরনাই গর্বিত। সবাই খ্রীস্টমাসে দামী দামী উপহার দেয়। টাকার কুমীর ছাড়া অন্য কারো দিকে আমার চোখ ফেরানোও বারণ।

তবে, সাধু কিছু একটা বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল।

রূপসী যুবতী আবার মুখ খুলল, তবে সাধু-সন্তদের তো মাটির তলায় সোনার তাল আর 'ডাবলুন'-এর বিশাল পাত্র পোঁতা থাকে। সব সাধু-সন্ন্যাসীরই থাকে।

তা থাকতে পারে। তবে আমার কিন্তু নেই।

আমার কিন্তু জানা ছিল সবারই আছে। আমি দুঃখিত! তবে আমাকে এবার বিদায় নিতেই হচ্ছে।

সাধু বলল, ওগো রূপসী—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই বিয়েট্রিক্স ক্ষুব্ধ কণ্ঠেই বলল, আমার একটা নাম আছে—বিয়েট্রিক্স। তবে কেউ কেউ আমাকে ট্রিক্স বলেও সম্বোধন করে। তাই বলে আপনি ও রকম নাম ধরে—,কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে পূর্বস্বরেই এবার বলল, আমি বলে রাখছি, আমাকে একটাবার মাত্র চোখে দেখার জন্য হলেও তোমাকে অতিথিশালায় যেতেই হবে।

শোন, গত দশ বছরের মধ্যে কোনদিন সেটার ধারে কাছেও যাই নি।

আমি তো বলছি, আমাকে দেখতে সেখানে তোমাকে যেতেই হবে, মুহূর্তের জন্য থেমে এবার বলল, বৃহস্পতিবার ছাড়া অন্য যেকোন সন্ধ্যায় তোমাকে যেতেই হবে।

সাধু নিতান্ত দুর্বলের মত নীরবে হাসল।

বিয়েট্রিক্স বলল, তবে এবার বিদায় নিচ্ছি, কেমন? আমি তোমার পথ চেয়ে থাকব। তবে মনে রেখো, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কিন্তু অবশ্যই নয়।

'ভিউ পয়েন্ট ইন'-এর পরবর্তী খাদ্যতালিকায় যদি এ ছত্রগুলো যোগ করা হয় তবে তা আরও কতই না আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে---সাধু দশ বছরের বেশী নির্জন নিরালায় দিন যাপনের পর মাত্র একটাবার তার বিখ্যাত গুহার আশ্রয় ছেড়ে বাইরে গিয়েছিল। আর সে গিয়েছিল ট্রেনহোম বোনদের সবচেয়ে ছোট আর সবচেয়ে সুন্দরী মিস বিয়েট্রিক্স-এর আকর্ষণে যে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়—

বিয়ে? কার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে?

বিয়েট্রিক্স বিদায় নিলে সাধু তার গুহায় ফিরে এল। সংসার জীবন ছেড়ে আসা বন্ধু বান্ধবরা গুহার দরজার দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের একজনের নাম বব। মোটাসোটা চেহারা, মুখে বুদ্ধিমত্তার ছাপ আর চকচকে পোশাক-পরিচ্ছদ গায়ে। ধনকুবের সে। সাধু বাবাজীর চেয়ে দু বছরের বড়। কিন্তু দেখলে মনে হয় তার বয়স সাধুবাবাজীর চেয়ে পাঁচ বছর কম।

বব বলল, তোমার ওই মোটা গোঁফ জোড়া আর পোশাক-পরিচ্ছদ সত্ত্বেও তুমি কিন্তু সেই হ্যাম্প এলিসনই রয়ে গেছ দেখছি। অতিথিশালার খাদ্য-তালিকায় তোমার সব কথা দেখেছি। তোমার জীবনীর কথা বলছি। দশ দশটা বছর ধরে তুমি কেন এমন একটা—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই সাধু বাবাজী বলতে লাগল। তুমিও কিন্তু আজও ঠিক

সেরকমই রয়ে গেছ। চল, ভেতরে গিয়ে বসবে চল।

বব বলল, তুমি যে কেন দশ বছর ধরে একটা নারীকে ছেড়ে আছ তা আর কেউ না জানলেও আমি অন্তত জানি। এডিথ কার কেবলমাত্র তোমাকেই নয়, আরও চার পাঁচজনের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেছে। একমাত্র তুমি তার সংস্রব ত্যাগ করে গা-ঢাকা দিয়েছিলে। বাকিরা কেউ মালের বোতল সম্বল করেছে, কেউ রাজনীতি নিয়ে মেতে গেছে অর্থাৎ সবাই নিজের নিজের পথ খুঁজে নিয়েছে।

কিন্তু বব, এডিথ কার তো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রূপসীদের মধ্যে অন্যতমা। সংসার ত্যাগ করে দূরে, বহুদূরে এ গুহায় আশ্রয় নেবার পর কোনদিন তার সম্বন্ধে কোন কথাই আমি শুনিনি।

বব বলল, সে আমাকে বিয়ে করে ঘর বেঁধেছিল। এ খবরটা পাওয়ার পর তোমার মানসিক অবস্থা কি হয়েছিল তা আমি অনুমান করতে পারছি। কিন্তু এ ছাড়া তার আর কিছু করারও তো ছিল না। তার আরও চারটে বোন, মা আর বুড়ো বাবা, মিঃ কার ছিল। ফানুশের পিছনে ছুটতে গিয়ে তার বাবা সব অর্থ উড়িয়ে দিয়েছিল। ক্রমে অবনতি ছাড়া উন্নতির কোন লক্ষণই ছিল না। একটা কথা মনে রেখো, আমি এডিথকে বিয়ে করলেও তুমি তাকে যতটা জান আমি তার চেয়ে এক চুলও তাকে বেশী জানি না। তখন আমার ব্যাঙ্কে ছিল দশ লক্ষ ডলার এখন পঞ্চাশ ষাটের মাঝামাঝি দাঁড়িয়েছে। সে যে মনে-প্রাণে আমাকেই কামনা করত এরকম মনে করা ঠিক হবে না। মনে কর, আসলে অনেকগুলো মানুষের দায়িত্ব সে কাঁধে নিয়ে নিয়েছিল। তাদের দেখভালের দায়ও ছিল তারই মাথায়। তুমি এমন কাজটা, মানে গোপনে গুহাটায় এসে মাথা গোঁজার পর সে আমার গলায় বরমাল্য দিল। তখন আমার বদ্ধমূল ধারণা ছিল, আমাকে অন্তর থেকে ভালবাসে বলেই সে এই কাজটা করেছে।

সাধু বাবাজী ছোট্ট করে প্রশ্ন করল, আর এখন? এমন তোমাদের মধ্যে—

সাধু বাবাজী কথাটা শেষ করার আগেই বব বলে উঠল, আমরা উভয় উভয়ের আর অনেক কাছাকাছি, অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হয়েছি। দু'বছর আগে সে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করেছিল। আমাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েও গেছে। ব্যাপারটা ছিল পুরোপুরি বিপরীত চরিত্রের। নিজের সাফাই গাইবার কোন চেষ্টাই করি নি। এখানে তুমি তো বহাল তবিয়তেই আছ। একটা কথা বলছি, তুমি তো চিরদিন উপন্যাসের নায়কই ছিলে। তোমাকে তো এডিথ-এর ভাললাগা, মানে মনে ধরার কথা। তুমি ছিলে তার একমাত্র নাগর। আসলে তারা ব্যাঙ্ক-নোটেই ভোলে। তোমার মাথাভর্তি লম্বা চুল, বুক অবধি নেমে আসা দাড়ি আর গুহা প্রাসাদে তাদের মন মজে না। এবার সত্য গোপন না করে বল তো, তুমি নিরেট মূর্খের মত কাজ করেছিলে স্বীকার করছ তো?

দাড়ির জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে সাধুর মুখে হাসির ঝিলিক ফুটে উঠল। কাঠখোট্টা ও অর্থ-পিশাচ বব-এর চেয়ে সে চিরদিনই একটু উঁচু স্তরের মানুষ। তাই বব-এর এত সব অবান্তর কথাতেও সে মনঃক্ষুণ্ণ হল না। আর সবচেয়ে বড় কথা, নির্জন নিরালা গুহায় বসে পুঁথিপত্র পাঠ ও ধ্যান-ধারণার মাধ্যমে সে এসব তুচ্ছ জাগতিক ব্যাপার স্যাপারের অনেক উচ্চস্তরে পৌঁছে গেছে। তার দশ বছরের কৃচ্ছ্র সাধনা আদর্শ, ন্যায় নীতি, স্বার্থগৃধ্নু পৃথিবীর প্রতি বিদ্বেষ—সবই কি বিফলে যাবে? তাই তো দাড়ির জঙ্গল ভেদ করে মুখের হাসির রেখাটুকু ফুটে উঠেছে।

দরজার কাছ থেকে কেমন অদ্ভুত একটা শব্দ তাদের কানে এল। মুহূর্তের মধ্যে এডিথ কার-এর মুখ তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল। চোখে মুখে জমাট বাধা চিন্তার ছাপ এঁকে সে সাধু বাবাজীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল। গলা নামিয়ে স্পষ্ট উচ্চারণ করেই সে বলল, আমি অতিথিশালায় উঠেছি। সেখানে তোমার সম্বন্ধে জানতে পারলাম। তখনই মনস্থির করে ফেললাম, তোমার সঙ্গে দেখা করে ক্ষমা চেয়ে নেব। আমার সুখ-শান্তি আমি অর্থকড়ির বিনিময়ে বেচে দিয়েছিলাম। জানই তো, আমার কাঁধে অনেকের হিসেবে দাঁড় করানো সম্ভব নয়। বিশ্বাস কর, আমি মনে-প্রাণে কেবলমাত্র তোমাকেই কামনা করেছিলাম। হ্যাঁ তোমাকে, একমাত্র তোমাকে পেতে চেয়েছিলাম। তারপর মানে বর্তমানে আমার সবচেয়ে বড় কামনা হয়ে দাঁড়িয়েছে একবারটি তোমাকে দেখা। দশ-দশটা বছর তুমি আমার স্মৃতিকে বুকে আঁকড়ে রেখেছ। বিশ্বাস কর, আমি তখন ভুলেও ভাবিনি, পৃথিবীর যাবতীয় ধন দৌলত এক সঙ্গে জড়ো করলেও একটা বিশ্বস্ত হৃদয়ের মূল্যের সমান হতে পারে না। প্রিয়তম হ্যাম্পটন, আমি যদি এখন, না, তা হয় না, হতে পারে না,

বড্ড দেরী হয়ে গেছে। কথা শেষ করে সে চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

সাধু বাবাজী পরিষ্কার বুঝতে পারল, এডিথ আজ সবকিছু ভুলে, সব কিছুর মায়া কাটিয়ে আজ মনে-প্রাণে তাকেই বুকে পাওয়ার জন্য অত্যুৎসাহী। কেবলমাত্র সে সম্মত হলেই হয়। একটা বহুমূল্য সোনার মুকুট সে জয় করেছে, এখন শুধুমাত্র বুকে টেনে নেবার অপেক্ষা। দশ-দশটা বছরের বিশ্বস্ততার পুরস্কার তার হাতের মুঠোয়। এখন কেবলমাত্র হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নিলেই হয়ে যায়।

মুহূর্তের জন্য তার মনের গভীরে আনন্দের ঝিলিক খেলে গেলেও পর মুহূর্তেই অতীতের উপেক্ষার অপমান ও ব্যথা-বেদনা, আবার তাকে বুকে পাবার আকুল আর্তির প্রতি জমাটবাঁধা বিতৃষ্ণা অস্থির করে তুলল।

হ্যাঁ, সে নিজের মনকে শক্ত করে বাঁধল। ক্ষীণ অথচ দৃঢ়তার সঙ্গেই বলল, না, তা হবার নয়। দেরী হয়ে গেছে, বড় দেরী হয়ে গেছে।

সাধুর কথা শেষ হতে না হতেই রূপসী যুবতী পিছন ফিরে হাঁটা জুড়ল। সাধু নীরব চাহনি মেলে তার ফেলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে রইল।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসতে না আসতেই সাধুর মধ্যে অদম্য অস্থিরতা চেপে বসল। যাকে বলে সংসার মত্ততা তার মধ্যে ভর করল।

অতিথিশালা থেকে বাতাস বাহিত নাচ গান আর উল্লাসধ্বনি তার কানে আসতে লাগল। রাত্রের অন্ধকার হাডসন নদীটা যেন বাধা আর বিশাল দূরত্ব সৃষ্টি করেছে। অতিথিশালার সামনের জলে জোনাকির আলো অনবরত জ্বলেই চলেছে। না, সেগুলো জোনাকির আলো নয়, গ্যাসোলিন ও মোটর বোটের আলো এরকম বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। গত দশ-দশটা বছর ধরে গান-বাজনা বা হৈ হট্টগোলের কোন শব্দই তার কানে আসে নি। কিন্তু আজ? আজ সন্ধ্যায় যেন সব কিছু যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, সবকিছু কেমন ওলট পালট হয়ে যেতে চলেছে।

নাচমহল থেকে ওলন্দাজের মিষ্টি মধুর সুরে তার মন-প্রাণ রোমাঞ্চে ভরপুর হয়ে উঠেছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে ভাবতে লাগল, দশ-দশটা বছর অকাট মুর্খের মত সে কিনা জীবন থেকে কেটেছেঁটে বাদ দিয়ে দিয়েছিল। হায় ঈশ্বর! দশটা বছর কী কম কথা! কাজটা সে স্বেচ্ছায়, সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছাতেই করেছিল। কেন? এমন একজনের জন্য সে অনন্যোপায় হয়ে কাজটা করেছিল, সে মিথ্যা সুখ আর ভোগ লালসায় প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাকে হাসিমুখে ত্যাগ করেছিল। কিন্তু বছরগুলো কিন্তু তার বৃথা যায় নি। সে রূপসীই কি তাকে ত্রিভুবনে সেরা মুক্তো, সেরা রূপসী, সবচেয়ে ছোট আর সান্নিধ্য লাভের সুযোগ করে দেয়নি?

কিন্তু আজ বৃহস্পতিবার। সে-তো বিদায়কালে বারবার বলে গেছে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় যেন না যাই। অস্থিরচিত্ত সাধু এবার স্বগতোক্তি করল, ধ্যুৎ! জাহান্নামে যাক ওসব। পরিণামে যা-ই ঘটুক না কেন, এ কাজটা আমি করবই করব।

সাধু বাবাজী এবার উন্মাদের মত গায়ের সাধুর পোশাক-পরিচ্ছদ খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল। প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে গুহাটার একেবারে শেষ প্রান্তে চলে গেল। ব্যস্ত হাতে একটা বাক্স টানাটানি করে বের করে আনল। বহু চেষ্টা চরিত্র করে তার ডালাটা খুলতে পারল।

বাক্সটার ভেতর থেকে এক এক করে বের করল, দশ বছর আগেকার কাটছাট পোশাক-আশাক আর ক্ষুর, কাঁচি, জুতো, টুপি আর বাতিল করে দেওয়া খুঁটিনাটি জিনিসপত্র। অস্থিরভাবে ও চরম বিতৃষ্ণার সঙ্গে সবকিছু টেনে টেনে বের করে গুহার ভেতরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলতে লাগল।

আয়নাটা মুখের সামনে ধরে কাঁচি দিয়ে সে দাড়িগুলোকে কেঁটেছেটে ছোট করে ফেলল। আয়নাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে স্বগতোক্তি করল, বাঃ! চমৎকার হয়েছে। জাহাজের কাপ্তেনের ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি অবশ্যই এর থেকে সুন্দর হয় না। কিন্তু চুলে কাঁচি চালাতে গিয়ে থমকে গেল। নিজের হাতে চুল কাটা অন্তত তার কম্ম নয়। তাই বাধ্য হয়ে চিরুনি দিয়ে সাধ্যমত সুন্দর করে লম্বা চুলগুলোকে পাট করে নিল। যে লোকটা দশটা বছর সমাজ সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে পাহাড়ের গুহায় স্বেচ্ছা নির্বাসন জীবন যাপন করছিল তার প্রতি করুণা বশত তার মনের অন্তহীন জ্বালা যন্ত্রণার কথা ব্যক্ত করার সমবেদনা প্রকাশ করার দায় থেকে আমরা অব্যাহতি পেয়ে গেলাম।

এবার সে একটা লোহার পাত দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেঝের একটা পাথরের টুকরো তুলে সেখান থেকে ছোট্ট একটা বাক্স বের করে আনল। তার ভেতর থেকে তিন হাজার ডলারের একটা বিল বের করল। পাইপের মত গোল করে পাকিয়ে তেল কাপড়ের একটা টুকরো দিয়ে যথা সম্ভব যত্ন সহকারে মুড়িয়ে রেখেছিল। তার এসব কাণ্ডকারখানা থেকেই অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে সে একজন সত্যিকারের সর্বত্যাগী সাধু-সন্ত ছিল।

ব্যস্ত পায়ে পাহাড় বেয়ে নিচের দিকে তার নামার দৃশ্য বাস্তবিকই বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে দেখার মত। লম্বা একটা ফ্রক কোট প্রায় পায়ের পাতা পর্যন্ত নেমে গেছে। ধবধবে সাদা ট্রাউজার, গোলাপী জামা আর উঁচু কলার কালো ফ্রক কোটটার সঙ্গে এমন সুন্দর মানিয়েছে যে, চাক্ষুষ না করলে কাউকে ভাষার মাধ্যমে বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়। পাঠক পাঠিকারা ভুলে যাবেন না—দশটা বছর! খড়ের ছড়ানো টুপির ফাঁক দিয়ে কপালের ওপরে ঝুলে পড়া ছোট ছোট চুলগুলো আলতোভাবে বাতাসের তালে তালে দোল খাচ্ছে। জোর দিয়েই বলতে পারি, আপনার দৃষ্টি শক্তি যত প্রখরই হোক না কেন, হঠাৎ করে তাকে দেখলে অবশ্যই চিনতে পারবেন না। আপনাকে স্বীকার করতেই হবে সাধু বাবাজী হ্যামলেট-এর ভূমিকায় অভিনয়ে নামছে।

মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আপনি অবশ্যই জোর গলায় বলতে পারবেন না যে, এমন এক সর্বত্যাগী সাধু বাবাজী দশ-দশটা বছর পাণ্ডব বর্জিত পাহাড়ের গায়ের নিরালা গুহায় অতিবাহিত করেছে এক রূপসী যুবতীর একটু ভালবাসা পাবার প্রত্যাশায়, অন্য একজনের মন জয় করে কাছে টানার জন্য।

নদীর জল নাচের আসরটা পর্যন্ত প্রসারিত করে তৈরি করা হয়েছে। বৈদ্যুতিক আলোর রোশনাই নদীর স্থির জলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে এক অপরূপ শোভার সঞ্চার করেছে। চমৎকার! এ দৃশ্যটা বাস্তবিকই মনোলোভা হয়ে উঠেছে। অতিথিশালায় গ্রীষ্মাবাসগুলো থেকে বেরিয়ে কম সে কম একশ সম্ভ্রান্ত নারী পুরুষ উল্লাস প্রকাশ করতে করতে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। দুর্গম পার্বত্য পথ বেয়ে সাধু ক্রমে নিচে নামছে। অতিথিশালাটা তার বাঁ দিকে অবস্থিত। জানালাগুলো থেকে অত্যুজ্জ্বল আলোকচ্ছটা ঠিকড়ে বেরিয়ে আসছে, ভেসে আসছে মিষ্টি মধুর বাজনা। ওয়ালজের সুর থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের।

সদর দরজায় এক নিগ্রো দারোয়ান লাঠি হাতে পাহারা দিচ্ছে। সাধু তাকে জিজ্ঞাসা করল, ব্যাপার কি হে। আজ রাত্রে এখানে কি হচ্ছে, কোন উৎসব—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই দারোয়ানটা গোঁফে তা দিতে দিতে বলল, হুজুর, প্রতি বৃহস্পতিবারের মত আজও নাচমহলে নাচের আসর বসেছে।

ওপরের একটা ঘরের জানালার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সাধু বলল, ওই যে ওপরে মেন্ডেলসন বেজে উঠল, সেখানে কি হচ্ছে, বল তো?

আরে কত্তা, ওটাই তো অতিথিশালার হলঘর। ওখানে একটা বিয়ের আসর সাজানো হয়েছে, বিয়ে হচ্ছে। একজন টাকার কুমীর বব ব্লিংকলে আর মিস বিয়েট্রিক্স-এর বিয়ে, কত্তা মেয়েটো বাস্তবিকই অনন্যা, রূপের আভায় চোখ ঝলসে দেয়!

দ্য মোমেন্ট অব ভিক্টরী

ব্রেন গ্র্যাণ্ডার উনত্রিশ বছর বয়সের এক যুবক। যুদ্ধবিশারদ হিসাবে তার যথেষ্ট খ্যাতি আছে। এ থেকেই তার যুদ্ধের নমুনা সম্বন্ধে ধারণা করা যেতে পারে। তার আরও একটা পরিচয় আছে, মেক্সিকো উপসাগরের তীরবর্তী কাডিজ শহরের একজন বড় কারবারী আর পোস্টমাস্টারও বটে।

এক জ্যোৎস্নালোকিত সন্ধ্যায় আমরা দু'জন তার বাক্স আর পিপের মধ্যে বসে মনোরম সন্ধ্যাটা উপভোগ করে চলেছি। এক সময় কথা প্রসঙ্গে সে বলে উঠল, একটা কথা বল তো, হাজারো বিপদ, গোলমাল, ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড, অনাহার অর্ধাহার আর দুর্ভিক্ষ ও এরকম সব কাজকর্মের মধ্যে মানুষ কেন মাথা গলাতে যায়? আর কেনই বা একজন অন্য একজনকে টপকে যেতে উৎসাহী

হয়? এমন কি মানুষ তার সুহৃদদের চেয়েও বেশী শক্তিধর, সাহসী, বীর আর বেশী শাসালো হয়ে উঠতে অত্যুগ্র আগ্রহী হয়ে ওঠে? তার আসল ইচ্ছাটা কি? এ থেকে সে মনে-প্রাণে কিসের প্রত্যাশা করে? কেবলমাত্র মুক্ত হাওয়া আর নিছক অনুশাসনের জন্যই তো আর এসব কাজে নিজেকে লিপ্ত করে না। একটা কথা মন খোলসা করে বল তো বলি, কোন একজন মানুষ যখন হাটে-মাঠে-ঘাটে, শিকার করতে গিয়ে, মঞ্চে ভাষণ দেওয়ার সময়, যুদ্ধক্ষেত্রে, শিক্ষালয়ে,'বনপথে চলার সময় পৃথিবী সভ্য আর অসভ্য দেশের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে সাফল্য লাভ আর অসাধারণ প্রতিযোগিতার চেষ্টায় লিপ্ত হয়, তখন তার মনের কোণে কোন্ আশা সক্রিয় হয়ে ওঠে?

আমি বার কয়েক মাথা চুলকে ভেবেচিন্তে মুখ খুললাম, শোন বেন, যেসব মানুষ যশ খ্যাতির জন্য হন্যে হয়ে ছোটে তাদের লক্ষ্যকে সহজেই তিনটে পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে—প্রথমত, উচ্চাভিলাষ, যেটা জনগণের সমর্থন লাভের বাঞ্ছা, লালসা, যার নজর সাফল্যের বাস্তবের দিকে, আর কোন মেয়ের প্রতি প্রেম ভালবাসা, যা তার বরাতে জুটেছে বা পেতে আগ্রহী।

কিছুক্ষণ নীরবে ভেবে নিয়ে বেন মুখ খুলল। শোন, আমার বিশ্বাস, তোমার বক্তব্য পুঁথিগতভাবে যথার্থই হয়েছে। আমি কিন্তু এক বিশেষ মানুষ উইলি রবিন্স-এর কথা বলতে চাইছি। এক সময় তার সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় হয়েছিল। তোমার আপত্তি না থাকলে তার সম্পর্কে দু'চার কথা বলতে আগ্রহী, শুনবে?

আমাদের বন্ধুদের মধ্যে স্যান অগাস্টিন-এ উইলি ছিল বিশেষ অন্তরঙ্গজন। আমি তখন 'ব্রাডি অ্যান্ড মার্চিসন কোম্পানির, কেরানির কাজ করি। তার ছিল শুকনো খাবার-দাবার আর রাখি মালের পাইকার কারবারী। আমরা উভয়েই একই ক্রীড়াসঙ্ঘ, সমিতি আর সামরিক সঙ্ঘের সদস্য ছিলাম। আমাদের যেকোন আনন্দ স্ফূর্তি, হৈ হট্টগোলের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী উদ্যোগ ছিল উইলিরই।

শোন, গল্পটা আরম্ভ করার আগে একটা মনোজ্ঞ বিবরণ তোমার সামনে রাখছি। তার হাবভাব চলাফেরা থেকে শুরু করে গায়ের রঙটা পর্যন্ত ছিল ককেসিয়ানদের মত। কাটা কাটা কথা বলত। চোখের মণি দুটো ছিল নীলাভ। আর যেকোন পরিস্থিতি, যেকোন ব্যাপারের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নেওয়ার অদ্ভুত ক্ষমতা তার ছিল। কোনদিন, কোন ব্যাপারেই তার সঙ্গে আমার মতবিরোধ হয় নি।

এমন এক যুবক উইলি একদিন মিরা এলিসনকে দেখামাত্র রীতিমত উতলা হয়ে পড়ল, মজে গেল। গোটা অগাস্টিন-এর যুবতীদের মধ্যে মীরা ছিল সবচেয়ে রূপসী, অনন্যা। তার মত উজ্জ্বল আর প্রাণোচ্ছল মেয়ে দ্বিতীয় আর একজনও ছিল না। সত্যি কথা বলতে কি, তার চোখ দুটো ছিল মায়া কাজল মাখানো, মায়াবনবিহারিণী হরিণীও বলা চলে।

আরে ধ্যুৎ! আমি মিরা-র প্রেমে মজিনি। হয়ত বা তার প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খেতাম। কিন্তু জাতে মাতাল হলে কি হবে আমি তালে ঠিক ছিলাম। বেগতিক দেখে মানে মানে সট্‌কে পড়েছিলাম। নইলে কি হত, হতে পারত জোর দিয়ে বলতে পারছি না।

এক রাত্রে মিসেস কর্নেল স্প্র্যাগিস-এর বাড়িতে আমাদের এক আইসক্রিম পার্টি ছিল। আমাদের পুরো দলটাই নিমন্ত্রিত ছিল। ওপরতলার বড় ঘরে আমাদের আর নিচের হলঘরটায় মেয়েদের সাজগোছের ব্যবস্থা ছিল। আর একেবারে নিচতলার হলঘরে নাচের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

এক সময় উইলি আর আমি সাজসজ্জার ঘরে ছিলাম। তখন হঠাৎ সেখানে মিরা-র আবির্ভাব ঘটল।

উইলি তখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চিরুণি হাতে চুল পাট করতে ব্যস্ত। মিরা সব সময় প্রাণবন্ত আর খেয়ালি প্রকৃতির। সে হাসতে হাসতে বলল, এই যে উইলি! আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে এমন তন্ময় হয়ে করছ কি?

আরে, দেখতেই তো পাচ্ছ, প্রজাপতি হওয়ার চেষ্টায় মেতে গেছি। প্রাণোচ্ছ্বাসে ভরপুর মিরা হাসতে হাসতে জবাব দিল, আরে ধ্যুৎ। যত চেষ্টাই কর না কেন, কোনদিনই তোমার পক্ষে প্রজাপতি হওয়া সম্ভব হবে না, শুনে রাখ। কথাটা বলতে বলতে মিরা ঘর ছেড়ে চলে গেল।

মিরা বিদায় নিলে আমি উইলি-র দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম। লক্ষ্য করলাম, তার মুখটা যেন অকস্মাৎ কেমন চকের মত সাদা হয়ে গেল। বুঝতে অসুবিধা হল না। মিরা-র বাক্যবাণ তার

বুকে আঘাত হেনেছে। তবে আমি কিন্তু তার কথায় কোন শেষ দেখতে পাই নি। কিন্তু আকস্মিক আঘাতে উইলি যে কতখানি ভেঙে পড়েছিল তা ভাবতেও পারবে না।

একটু বাদে আমরা যখন সেজেগুজে নিচে নামলাম তখন, এমন কি সে রাত্রে উইলি ভুলেও একবারও মিরা-র কাছে ঘেঁষে নি।

তারপরই যুদ্ধ জাহাজ 'মেইন' শক্তিশালী বোমার আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। ব্যস, তারপরই কেউ একজন, সে বেন টিলম্যান বা সরকার অথবা জো বেই লিও হতে পারে, দামামা বাজিয়ে স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিল।

একটা কথা কি জান, হ্যামলিন আর ম্যাসন রেখার দক্ষিণ অঞ্চলের প্রত্যেকেই জানে যে, উত্তর অঞ্চল একদম একা এমন একটা বড় দেশ যে স্পেনের বিরুদ্ধে লড়ে কিছুতেই জুঁত করতে পারবে না। তাই ইয়াংকিরা সাহায্য চাইলে জনি বেব্স সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল। তারা বলল, ফাদার উইলিয়ম, আমরা লক্ষ লক্ষ সৈন্য নিয়ে আসছি। কিউবা শহরে আমাদের সৈন্যরাই প্রথম নামল, আতঙ্কে প্রতিপক্ষ কাঁপাকাঁপি শুরু করে দিল। যুদ্ধের পূর্ণ বিবরণ দেওয়ার আদৌ আমার ইচ্ছা নেই। একটা উদ্দেশ্যেই যুদ্ধের প্রসঙ্গ আমি উত্থাপন করেছি, একমাত্র উইলি-র কাহিনীটাকে জমজমাট করে তোলার জন্য।

বীরত্বের পাগলামি যদি কারো মধ্যে ভর করে থাকে তবে সে হচ্ছে উইলি। ক্যাস্টিনের অত্যাচারীদের দেশে পৌঁছতে না পৌঁছতেই বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তার মধ্যে যেন উন্মাদনা ভর করল। আমাদের ক্যাপ্টেন থেকে শুরু করে আমাদের সৈন্যদলের সব ওপরওয়ালারাই তার কারবারে খুশি হলেন। তোমরা হয়ত ধরেই নিয়েছ তার পদোন্নতি হবেই হবে। তার কিন্তু সে রকম কোন লালসাই ছিল না। সে কোঁকড়া চুল বালক বীরের ভূমিকা পালন করে এবং সে জীবন্ত অবস্থায় ঘরে ফিরে আসে। ইয়া বড় একটা লাঠি হাতে নিয়ে সে সেনাপতির পায়ে মাথা রেখে সে মৃত্যুকে মাথা পেতে নেয় না।

তার মধ্যে তখন রক্তপাত, বিজয়মাল্য, উচ্চাভিলাষ, তকমা, মানপত্র আর যাবতীয় সামরিক গৌরব লাভের নেশা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। যুদ্ধের কোনরকম আতঙ্কই তার মধ্যে বাসা বাঁধে নি। যুদ্ধের দামামা তার রক্তে উন্মাদনা জাগাতে পারে না। একমাত্র রাশিয়ার রাণী এবং জ্যাক অব ডায়মন্ড ছাড়া তার সঙ্গে তুলনা করার মত চরিত্রের নজীর ইতিহাসের পাতায় খুঁজে পাওয়া ভার।

আমি তাকে সাধ্যমত দীর্ঘসময় ধরে পাখি পড়ানোর মত করে বিভিন্নভাবে বোঝালাম। অন্তত হাজার বার বললাম, এপথ থেকে সরে এস। পার তো নিজের ভবিষ্যৎ তৈরি করে নাও। তোমার খোঁজ করার জন্য কারো মাথা ব্যথা নেই। মওকা বুঝে নিজের পদোন্নতির ধান্ধায় থাক। তুমি কেন যে এমন বীরত্বের জন্য পাগল হয়ে নরঘাতকের ভূমিকা নেবার জন্য হন্যে হয়ে উঠে পড়ে লেগেছ, কিছুতেই আমার মাথায় আসছে না। কি করে যে তোমার স্বভাবের এমন অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটল কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি নে!

উইলি ধরতে গেলে রাগত স্বরেই বলল, এ তোমার মাথায় যাবার নয়।

তার খাকি কোটের প্রান্ত ধরে একটা হেঁচকা টান দিয়ে আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বললাম, আমি বারবার বলছি, তুমি যেয়ো না। তোমাকে যতই এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি না কেন তোমার ভালবাসা আমাকে উন্মাদ করে দিয়েছে। বীরত্বের ভূত তোমার কাঁধে চেপেছে বলেই তো তুমি এমন পাখা ঝটপট করছ। বীর সাজবার অত্যুগ্র আগ্রহ তোমাকে যে পেয়ে বসেছে, তা আমার ভালই জানা আছে। আমি মনে করি, তোমার মাথার দোষ দেখা দিয়েছে নতুবা কোন মেয়েকে পাকড়াও করার ধান্ধায় আছে। যদি মেয়ে সংক্রান্ত ব্যাপার স্যাপার-এর মধ্যে থাক তবে একটা জিনিস তোমাকে দেখাতে পারি, দেখবে?

আমি তার সম্মতি-অসম্মতির জন্য অপেক্ষায় না থেকে প্যান্টের পিছনের পকেট থেকে স্যান অগাস্টিন সংবাদপত্র বের করে তার সামনে মেলে ধরলাম। তার আধ কলম জুড়ে মিরা এলিসন ও জো গ্র্যানবেরি-র বিয়ের খবর ফলাও করে ছেপেছে।

খবরটার শিরোনামের ওপর একবার চোখ বুলিয়েই সে হো-হো করে হেসে উঠল। এতে যে তাকে ঘায়েল করতে পারিনি, বুঝতে অসুবিধা হল না।

মুখে হাসির রেখা অব্যাহত রেখেই সে বলে উঠল, আরে ভাই, এমনটা যে ঘটবে তা-ত সবারই জানা ছিল। আমি এক হপ্তা আগেই ব্যাপারটা জেনেছি।

বহুৎ আচ্ছা, আমি বললাম, তবে তুমি কেন এমন হন্যে হয়ে খ্যাতির জন্য ছুটোছুটি দাপাদাপি করছ, জানতে পারি? দেশের রাষ্ট্রপতি নাকি কোন সুইসাইড স্কোয়ার্ডের সদস্য হতে চাচ্ছ, বল তো?

ক্যাপ্টেন ফ্লয়েড এসে আমাদের আলোচনায় বাধা দিলেন। তিনি বললেন, অবান্তর কথা রেখে নিজের নিজের কোয়ার্টারে যাও, নইলে রক্ষী ডেকে তোমাদের পাহারা ঘরে চালান করে দেব, বলে দিচ্ছি। বিদায় নেবার আগে বল তো, তোমাদের কারো পকেটে তামাক আছে?

ক্যাপ্টেন আমি বিদায় নিচ্ছি, আমি বললাম। কিন্তু একটা কথা আপনার কাছে জানতে চাইছি, যে ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের মতবিরোধ সে সম্পর্কে আপনার অভিমত কি, দয়া করে বলবেন কি? বলুন তো, এতে উচ্চাভিলাষ কিসের জন্য? দিনের পর দিন মানুষ কেন জীবনের ঝুঁকি নেয়? পরিণামে তার বরাতে কি সত্যি কিছু জোটে? আমি কিন্তু ঘরে ফিরতেই আগ্রহী। কিউবা রইল কি ধ্বংস হয়ে গেল তা নিয়ে আমার কোনই মাথা ব্যথা নেই। চার্লি কালবার্সন আর রাণী সোফিয়া ক্রিস্টিনা-র মধ্যে কে দ্বীপটা শাসন করবে তাতে আমার কি আসে যায়? জীবিতদের তালিকা ব্যতীত অন্য কোন তালিকায় নিজের নাম তোলার কিছুমাত্র আগ্রহও আমার নেই। দেখতে পাচ্ছি, আপনিও ওই তালিকার ব্যাপারে আগ্রহী। দয়া করে বলবেন কি, কেন আপনি এমন হন্যে হয়ে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন? কোন পরম প্রাপ্তির আশা আপনাকে এমন করে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে?

ক্যাপ্টেন ফ্লয়েড ঝট করে কোষবদ্ধ তরবারিটা বের করে বল উঠলেন, শোন বেন,তোমার এ কাপুরুষসুলভ মনোভাব আর পালিয়ে বাঁচার ইচ্ছার জন্য আমি উর্দ্ধতন অফিসারের কর্তব্য পালন করে তোমাকে কোর্ট মার্শাল করতে পারি। তবে আমি সে পথ নেব না। আমার কথা যখন জানতেই চাচ্ছ, শোন তবে, পদোন্নতি, যুদ্ধবিগ্রহ জয়লাভের জন্য প্রাপ্য সম্মান পাবার প্রত্যাশায় আমি নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। জানই তো একজন ক্যাপ্টেনের তুলনায় একজন মেজরের বেতন অনেক, অনেক বেশী। আর অর্থ-কড়ি আমার খুবই দরকার, জান?

আপনার কথা আমি অকপটে মেনে নিচ্ছি স্যার। কিন্তু উইলি-র অভিভাবকরা এক একজন টাকার কুমীর। আর যে লোকটার স্বভাব ধীর স্থির, উচ্চাভিলাষের ধার ধারে না, সে কেন এমন এক দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হয়ে উঠল! এর পিছনে স্বাভাবিক উচ্চাভিলাষ কাজ করছে বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। হয়ত তার আকাঙ্ক্ষা, ইতিহাসের পাতায় তার নামটা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হোক। আর এটাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

শেষ পর্যন্ত হলও তা-ই। ক্যাপ্টেন ফ্লয়েড-এর পদোন্নতি হল। তিনি মেজর জেনারেলের পদ লাভ করলেন, নাইট কমান্ডারের পদ লাভে ধন্য হলেন। আর আমাদের কোম্পানির ক্যাপ্টেনের পদে উন্নীত হল উইলি রবিন্স।

সে হয়ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার পিছনে আর বেশী ছুটোছুটি করে নি। আমার যতদূর জানা আছে, এ যুদ্ধের পরিসমাপ্তিটা তার দ্বারাই ঘটানো সম্ভব হয়। নিজের বাঁধানো যুদ্ধে সে আমাদের আঠারটা নওজোয়ানকে যুদ্ধের নামে খুন করল। কিন্তু এ যুদ্ধের কোন দরকারই ছিল না।

এক গভীর রাত্রে সে আমাদের দশজনকে সঙ্গে করে একশ' নব্বই গজ বিস্তৃত একটা খাড়ি পার হল, দুটো পাহাড় অতিক্রম করে জঙ্গল আর ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে হাজির হল ছোট্ট একটা গ্রামে। ঘুমন্ত গ্রামের ভেতর দিয়ে বিড়ালের মত সন্তর্পণে এগিয়ে এক স্পেনীয় কমান্ডার বেনি ভীডাসকে বন্দী করল। আমার মতে বেনি ভীডাস-এর জন্য এত কষ্ট স্বীকারের কোন যুক্তিই নেই। কারণ, লোকটা কালো চামড়ার দলভুক্ত, নগ্ন পা আর হতোদ্যম। সবচেয়ে বড় কথা আত্মসমর্পণের জন্য সে অধীর প্রতীক্ষারই ছিল। তারই জন্য এত কষ্ট স্বীকার নিষ্প্রয়োজন বলেই আমার মনে হয়েছিল। তবে এ কাজটাই উইলি-র পদোন্নতির একমাত্র সহায়ক হল।

খবরের কাগজগুলোতে উইলি-র দুঃসাহসিক অভিযানের কথা বড় বড় হরফে ফলাও করে ছাপা হল। কেবলমাত্র নাম ও অভিযানের বিবরণ দিয়েই তারা সন্তুষ্ট থাকতে পারল না, তার ইয়া বড় ছবিও ছেপে দিল। তার ওপর 'সংবাদ' নামক পত্রিকার পাতায় চোখের জল দিয়ে সরকারের

কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বসল, সেনাদল আর রক্ষীবাহিনীকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যেন ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়। আর এ-ও জোর দিয়েই বলা হল, এককভাবে লড়াই চালাবার জন্য উইলি-র ওপর দায়িত্ব অর্পিত হোক।

লড়াইটা যদি মাত্র ক'দিনের মধ্যেই থেমে না যেত তবে উইলি যে আরও কত মূল্যবান পুরস্কার আর খ্যাতির মুকুট লাভ করত তা আমি অনুমানও করতে পারছি না। তবে লড়াইটা সত্যি সত্যি থেমে গেল।

উইলি কর্নেলের পদ লাভ করার তিন দিন পর, ডাক মারফৎ আরও তিনটে সোনার পদক পাওয়ার পর, শত্রুর আগমন প্রতীক্ষায় থাকার সময় তার বন্দুকের গুলিতে দুটো স্পেনীয় সৈনিক প্রাণ হারাবার পরই যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হল। সৈন্যরা অস্ত্রপাতি রেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

লড়াই থামল। সুস্থ পরিবেশে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা শুরু হল। আমাদের সেনাবাহিনী স্যান অগাস্টিনে ফিরে গেল। খবরের কাগজ, তার মারফৎ আর বিশেষ সংবাদদাতা পাঠিয়ে আমাদের জানানো হল, আমাদের সম্বর্ধনা জানাবার জন্য এক বিরাট সভার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কী সৌভাগ্যের ব্যাপার, তাই না?

আমাদের শব্দটা ব্যবহার করে আমি আত্মপ্রসাদ লাভ করছি বটে। আসলে কিন্তু এই যে এত কিছুর আয়োজন সবই প্রাক্তন সেনানী, কার্যত ক্যাপ্টেন আর সম্ভাব্য কর্নেল উইলি রবিন্সকে লক্ষ্য করেই করা হয়েছে। তাকে নিয়ে গোটা শহরটা যেন এক অভাবনীয় উন্মাদনায় মেতে উঠল।

সবার আকাঙক্ষা ছিল বরেণ্য কর্নেল উইলি সাজানো গোছানো সুন্দর একটা গাড়িতে বসে থাকবে। শহরের গণ্যমান্য নাগরিক আর অস্ত্রাগারের কয়েকজন কর্মী গাড়িটা টানবে। কিন্তু সে তা না করে নিজের সেনাদলের সঙ্গে সবার আগে আগে স্যান হার্ডসন এভিনিউ দিয়ে কুচকাওয়াজ করে অগ্রসর হতে লাগল। পথের দু'ধারের বাড়িগুলো পতাকা আর উল্লসিত মানুষের ভিড় জমে উঠল। আবার মুখে উইলি-র জয়ধ্বনি। উইলি-র চেয়ে বেশী খ্যাতি লাভ করেছে এমন কোন মানুষকে আমার অন্তত নিজের চোখে দেখার সৌভাগ্য হয়নি।

শোভাযাত্রা অস্ত্রাগারে গিয়ে শেষ হল। তখন উইলি আমাকে নিয়ে একটু হাঁটাহাঁটি করার জন্য একটা গলি দিয়ে এগিয়ে একটা সাদা রঙের বাড়ির সামনে হাজির হল।

আমি বাধা দিয়ে বললাম, দাঁড়াও। আগে সংকেতটা জানাবে তো। এ গোপন আস্তানাটা কি তোমার চেনাজানা নয়, মিরা এলিসনকে বিয়ে করার আগে এ ছোট্ট আস্তানাটা তো জো গ্র্যানবেরিই তৈরী করেছিল। এখানে তুমি কেন যেতে উৎসাহী হচ্ছ, বুঝছি না তো?

আমার কথা শেষ হবার আগেই উইলি গেটটার ছিটকিনি খুলে ফেলেছে। আমাকে নিয়ে ইটের রাস্তা বরাবার হাঁটতে লাগল। মিরাকে বারান্দায় একটা দোলনা চেয়ারে বসে নিবিষ্ট মনে সেলাই করতে দেখালাম। মাথার চুল কোনরকমে জড়িয়ে রেখেছে। আগে কোনদিন তার মুখে বিন্দু বিন্দু দাগ চোখে পড়েনি। আর জো বারান্দার এক কোণে গম্ভীরমুখে বসে। গায়ে একটা সাদামাটা জামা, কলার নেই। মুখভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি। আমাদের দিকে সে মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে আবার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। টু-শব্দটিও করল না। মিরাও মুখে কলুপ এঁটেই বসে রইল।

উইলি-র গায়ে ইউনিফর্ম, বুকে তকমা আর পদক, হাতে শোভা পাচ্ছে সোনালি হাতলযুক্ত সুদৃশ্য নতুন তরবারি। তাকে রীতিমত কেতাদুরস্তই দেখা যেতে লাগল। সেই প্রথম নীরবতা ভঙ্গ করল, তা-ই তো! আমার জানা ছিল না। চেষ্টা করলে হয়ত বা আমার দ্বারাও সম্ভব হতে পারত!

ব্যস, আর কিছুই সে বলল না। তারপরই সে টুপিটা মাথায় চাপাল। আমিও তাকে অনুসরণ করে পথে নেমে এলাম। এগিয়ে চললাম সম্বর্ধনা প্রাঙ্গণের উদ্দেশ্যে।

উইলি যখন বিমর্ষমুখে কথাগুলো উচ্চারণ করল তখন হঠাৎই আমার অন্তরের অন্তরতম কোণে সে রাতের নাচের আসরটার দৃশ্যটা ভেসে উঠল। আয়নার সামনে দীর্ঘসময় ধরে চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ানো আর দরজা দিয়ে মাথাটা গলিয়ে মিরার-র রসিকতা করার দৃশ্যটার কথা বলতে চাইছি।

আমরা স্যান হার্ডস্টন এভিনিউতে ফিরে যাবার পর উইলি মুখের গাম্ভীর্যটুকু অব্যাহত রেখেই বলল, বেন, তবে বিদায় নিচ্ছি। বাড়ি গিয়ে জামা জুতো ছেড়ে একটু বিশ্রাম করা দরকার।

আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে বলে উঠলাম, উইলি—তুমি, তুমি হঠাৎ এমন বিমর্ষ হয়ে পড়লে কেন, বলতো? কি হয়েছে তোমার? আরে ভাই, আজকের দিনে নায়ককে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য গোটা শহরটাকে এমন ঝলমলে করে সাজানো হয়েছে, শহরবাসী আনন্দে ডগমগ হয়ে আদালত ভবনে অধীর প্রতীক্ষায় রয়েছে!

উইলি ফুসফুস নিঙড়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, বেন, ঠিক আছে। সে সব যদি এর পরও আমার মন থেকে মুছে না গিয়ে থাকে তবে ধিক—শতধিক।

মুহূর্তকাল নীরবে কাটানোর পরই বেন শেষ কথাটা বলল, তাই তো আমি বলি, উচ্চাভিলাষ যে কোথা থেকে শুরু হয় তা তুমি জান না, বলতে পার না। আর তেমনই কোথায় যে এর শেষ হবে তা-ও তোমার জানা নেই উইলি।

নো স্টোরি

আমি বেয়েকন-এর এক কর্মী। কাজের শর্ত, জায়গা অনুপাতে আর মজুরি হিসাবে। তবে আমি আশা করছি, আজ না হোক কাল মাহিনা হিসাবে চাকরিটা ঠিকই পেয়ে যাব। এক কর্মী হয়ত বড়, গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম সেরে টেবিলটার এক ধারে আমার জন্য একটু জায়গা খালি করে রেখে গেছে। আমি সেখানেই গুটিসুটি মেরে বসে কাজ সারি। আমি কি লিখি তাই না? দিনভর বাউন্ডুলের মত পথেঘাটে ঘুরে ঘুরে শহরটা ফিসফিসিয়ে যা কিছু বলে, তর্জন গর্জন হম্বিতম্বি করে, মুচকি মুচকি হাসে সেসব কথাই কাগজের গায়ে খস্‌খস্‌ করে লিখি। আমার আর উপার্জন বাঁধা ধরা কিছু নয়, হেরফের হয়।

একদিন ট্রিপ ব্যস্ত পায়ে আমার ঘরে ঢুকল। আমার লেখার টেবিলটার ওপর ঝুঁকে দাঁড়াল। সে কারিগরি বিভাগে কোন একটা কাজ করে, ঠিক জানি না। তবে ছবি ছাপাটাপার কাজ বোধ হয় করে। কারণ তার পোশাক-আশাক আর গা থেকে ফটোগ্রাফারের ব্যবহৃত জিনিসের উগ্র গন্ধ পাওয়া যায়। আর তার হাত দুটোতে প্রায়ই ছোটখাটো আঁচড় আর এ্যাসিডের দাগ আমার চোখে পড়ে।

ট্রিপ বেটেখাটো রোগাটে চেহারার এক যুবতী। তার বয়স বছর পঁচিশেক হলেও দেখলে মনে হয় চল্লিশ-টল্লিশের কম হবে না। আর তার চোখ মুখ সবসময়ই কেমন যেন ফ্যাকাশে বিবর্ণ দেখায় আর অসুখীর ছাপ সুস্পষ্ট। তোয়াচ টোয়াচ করে লোকের সঙ্গে কথা বলাই তার চরিত্রের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য বলেই আমার মনে হয়। ধার করতে তার এতটুকুও বাধে না। পঁচিশ সেন্ট থেকে আরম্ভ করে এক ডলার পর্যন্ত যা পায় তা-ই সে ধার করে। কিন্তু এক ডলারের বেশী ভুলেও কোনদিন ধার করে না। আমার টেবিলের ধারের টুলটায় যখনই সে বসে তখনই একটা হাত দিয়ে নিজের আর একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরে যাতে কোনটাই কাঁপতে না পারে। আমি আড়চোখে তার এ ব্যাপারটা লক্ষ্য করি।

আজই ক্যাশিয়ারকে গ্যাস দিয়ে ফুলিয়ে ফুলিয়ে পাঁচটা রূপোর ডলার আদায় করেছি। সম্পাদক নিতান্ত অনিচ্ছায় হলেও রবিবাসরীয়তে আমার একটা লেখা ছাপার জন্য নির্বাচন করায় ওই ডলারগুলো আমার পাওনা হয়েছে। এতে শান্তি স্বস্তি না পেলেও যুদ্ধ বিরতির একটা মানসিকতা গড়ে ওঠে। আর এ জন্যই আমি চন্দ্রালোকিত ব্রুকলিন সেতুটার একটা নিবন্ধ লিখে ফেলার জন্য জোরসে কলম চালাতে লাগলাম।

ট্রিপ আমার টেবিলের সামনে দাঁড়াতেই তার মুখে যেন আরও অকথিত দুঃখ যন্ত্রণার ছাপ, শোচনীয়তার চিহ্ন, আরও বেশী অদৃষ্ট বিড়ম্বিতা উপদ্রুত দেখাতে লাগল। তাকে অনেকবারই বিমর্ষ দেখেছি বটে। কিন্তু এমনটা আমার চোখে অন্তত পড়েনি। তার দুঃখ কষ্ট এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে যাতে তার প্রতি করুণার মাত্রা হঠাৎ এমন বেড়ে গেল যে, বেশ করে উত্তম মধ্যম দিয়ে ঘাড় ধরে ঘর থেকে বের করে দেওয়ার চিন্তাটাই সবার আগে মাথায় এল।

কুত্তার বাচ্চার মত চোখ দুটো পিটপিট করে তাকিয়ে সে বলল, একটা ডলার দেবে?

দেব। একটা নয় আরও চারটে দিতে পারি। তবে এগুলো বুড়ো এটাকশন-এর কাছ থেকে হাতাতে আমাকে অনেক হ্যাপা পোহাতে হয়েছে। কিন্তু এগুলো আমি নিয়েছি পাঁচ ডলারের বড় একটা সমস্যা মেটাবার জন্য। পাঁচটা ডলার থেকে একটা এ মুহূর্তেই খোয়াবার আশঙ্কায় কথাটা আমি না বলে পারলাম না।

ট্রিপ আগের মত শুকনো গলায় বলল, ধার চাইবার জন্য আমি এখানে হামলা করতে আসিনি।

তার কথায় আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

ট্রিপ এবার বলল, আমি ভাবলাম খুব সুন্দর একটা গল্পের প্লট পেলে তুমি আগ্রহের সঙ্গে নেবে। বিশ্বাস কর। সত্যি বলছি, দারুণ জমাটে গল্পের প্লট তোমাকে উপহার দিতে পারি। তবে এ-ও সত্য, গল্পটার কাহিনী জোগাড় করতে তোমাকে হয়তো দু-একটা ডলার খসাতে হবে। আমার নিজের জন্য একটা কানা কড়িও চাচ্ছি না, আশাও করছি না।

আমার বুকের মধ্যে আচমকা খুশির জোয়ার বয়ে যেতে লাগল। ঝট করে পেন্সিলটা নিয়ে সোজা হয়ে বসতে বসতে আগ্রহের সঙ্গে বললাম, গল্পের প্লটটা কি, বল তো?

গল্পটা একটা মেয়েকে নিয়ে। খুবই সুন্দরী মেয়ে, বলতে পার এক রূপসী তন্বী যুবতী। সে কুড়িটা বছর লং দ্বীপে কাটিয়েছে। আগে কোনদিনই সে নিউইয়র্ক শহর চোখে দেখে নি।

হঠাৎ এক বিকেলে চৌত্রিশতম স্ট্রীটে তার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। সবে পূবালি নদীর ফেরি থেকে নেমে পথে উঠেছে। আমি অন্য সব পথচারীদের মত নিজের কাজে চলেছি। সে হাত ইশারা করে আমাকে থামাল। দু'পা এগিয়ে আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কাতর মিনতির স্বরে বলল, দয়া করে বলবেন কি, কোথায় গেলে জর্জ ব্রাউন-এর দেখা পেতে পারি?

সহজ সরল বুদ্ধিতে মেয়েটা আমার কাছে জানতে চাইল, নিউইয়র্ক শহরে জর্জ ব্রাউন নামের লোকটাকে কোথায় খুঁজে পাবে! ব্যাপারটা তোমার কাছে কেমন মনে হচ্ছে, বল তো?

আমি তাকে নিয়ে এক ফাঁকা জায়গায় গিয়ে কৌতূহলবশত কটা কথা বলে জানতে পারলাম পরের সপ্তাহে ডড হিরাম নামধারী এক চাষী যুবকের সঙ্গে তার বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেছে।

আমার কিন্তু মনে হল রূপসী যুবতীটা এখনও জর্জ ব্রাউনকে নায়কের আসনে বসিয়ে ভবিষ্যৎ দাম্পত্য জীবনের রঙীন স্বপ্ন দেখে চলেছে। বছর কয়েক আগেও জর্জ গরুর চামড়ার জুতো পায়ে দিয়ে গ্রামের পথে হেঁটে বেড়াত। ব্যস, তারপরই নিউইয়র্ক শহরে পাড়ি জমায়। বরাত ফেরানোই ছিল তখন তার একমাত্র লক্ষ্য।

যুবতী আডা লোয়ারিও একটা টাট্টুর পিঠে চেপে আট মাইল পথ অতিক্রম করে রেলওয়ে স্টেশনে চলে আসে। টিকিট কেটে সকাল ছ'টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে শহরগামী ট্রেনটায় চেপে বসে। নিউইয়র্ক শহরের পথে পথে হন্যে হয়ে জর্জ-এর খোঁজে ঘুরে ঘুরে বেড়াল। কোথাও তার বাঞ্ছিত যুবক, প্রাণের মানুষটার দেখা পেল না। সে নিদারুণ হতাশ হল। ইতিমধ্যে জর্জ আবার গ্রামে ফিরে গেছে। হায় ঈশ্বর! একী খেল তোমার!

এখন আমার পরিস্থিতিটা একবার ভেবে দেখ। হাডসন-এর লাগোয়া ওই বাজে শহরটায় এমন রূপসী এক যুবতী মেয়েকে একা ফেলে আসা কি করে সম্ভব? শহরটা যে খুব খারাপ এটা অন্তত স্বীকার কর? আর বল, তার ভালটা দেখাও আমার কর্তব্য, কি বল?

আমার পক্ষেই বা কি করা সম্ভব। পকেটে একটা কানা কড়িও নেই। আর সে ভাগ্যবিড়ম্বিতা মেয়েটাও তো রেলের টিকিট কাটতে শেষ সেন্টটা পর্যন্ত কাউন্টারে দিয়ে দিয়েছে। যাক গে, আমি তাকে বত্রিশতম স্ট্রীটে রেখেছি। এক সময় আমি সেখানেই থাকতাম। একটা ডলার হলেই একটা দিন কাটিয়ে দেওয়া যায়। বাড়িটার মালকিন বুড়ি ম্যাগ্‌গিনিস। তোমাকে সে বাড়িটা চিনিয়ে দেব।

আমি হাতের কলমটা টেবিলে রেখে বললাম, ট্রিপ, এসব কী অবান্তর কথা বলে যাচ্ছ! তুমি যে বললে, একটা ভাল গল্পের প্লট দেবে, তার কি হল? আচ্ছা, পূবালী নদীর খেয়া নৌকোগুলো তো কত মেয়েকেই লং দ্বীপে নিয়ে যায়, পারাপার করে, এ আবার নতুন কথা কি?

আমার কথায় ধৈর্য বিচ্যুতি ঘটতে দেখে ট্রিপ-এর মুখটা হঠাৎ কেমন কঠিন হয়ে উঠল। গম্ভীরমুখে, ভুরু কুঁচকে তার বক্তব্যকে গুরুত্ব দেবার চেষ্টা করে বলল, এর চেয়ে আর কি যে রগরগে গল্প হতে পারে আমার মাথায় আসছে না। তুমি আসলে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টাই

করছ না। আমি বলছি, তোমার কলমের খোঁচায় গল্পটা দারুণ হয়ে উঠবে। এর বিনিময়ে কম করেও পনের ডলার তো আসবেই। আর গল্পের প্লট জোগাড় করতে মাত্র গোটা চারেক ডলার তোমার খসবে। বুঝতেই পারছ, এগার ডলার তোমার নীট লাভ।

আমার চার ডলার খরচ হবে কিভাবে, বলবে কি?

মিসেস ম্যাক্‌গিনিসকে দিতে হবে এক ডলার আর মেয়েটার বাড়ি ফেরার জন্য খসাতে হবে দুটো ডলার।

ভাল কথা, চতুর্থ ডলারটা—

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ট্রিপ বলে উঠল, বারে, আমাকে হুইস্কি খাবার জন্য অন্তত একটা ডলার তো দেবে! যাক, এবার চার ডলারের হিসেব তো পেলে, নাকি?

আমি মুখে রহস্যময় হাসি ফুটিয়ে তুলে আবার কলমটা হাতে নিলাম যেন আবার লেখা আরম্ভ করব। কিন্তু এ লোকটাও যেন এঁটুলির মত গায়ের সঙ্গে লেগে রয়েছে, ছাড়বার পাত্র নয়। হঠাৎ নজরে পড়ল, তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে আরম্ভ করেছে।

ট্রিপ এবার রীতিমত জোর দিয়েই বলল—তোমার কি মাথায় আসছে না, মেয়েটাকে আজ বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া দরকার। কালরাত্রে নয়, কাল কিছুতেই নয়, আজই দিনের আলো থাকতে থাকতেই পাঠিয়ে দেওয়া দরকার। তার জন্য আমার আর কি-ই বা করার আছে। হঠাৎ মাথায় এল, ঘটনাটাকে কেন্দ্র করে খবরের কাগজের জন্য তুমি একটা গল্প ফেঁদে কিছু কামিয়ে নিতে পারবে। তুমি বুঝতে পারছ না, রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে আসার আগেই তাকে অবশ্যই বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া চাই।

ঠিক সে মুহূর্তেই শিসের মত ভারি কর্তব্যবোধ আমার মধ্যে নাড়াচাড়া দিয়ে উঠল। আর এও ভাবলাম, সে বোধ কেনই বা ভারি বোঝার মত একজনের ঘাড়ে চাপবে? সেদিন আমি ধরেই নিয়েছিলাম, আমার মাথার ঘাম পায়ে ফেলা অর্থ-কড়ির একটা বড় ভগ্নাংশই এ যুবতী আডা লোয়ারির সাহায্যের জন্য ব্যয় করতে হবে। আর তাকেই বরাতের ফের বলে ধরে নিলাম। রাগে দুঃখে গম্‌গম্ করতে করতে কোটটা গায়ে চাপিয়ে নিলাম। টুপিটা মাথায় পরতে পরতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম।

ট্রিপ আমাকে সন্তুষ্ট করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করতে গিয়ে অনুগতজনের মত পথ দেখিয়ে বুড়ি ম্যাক্‌গিনিস-এর বন্ধকের দোকানে নিয়ে গেল। বলা নিষ্প্রয়োজন, ভাড়াটা আমার ট্যাক থেকেই খসাতে হল।

কলিং বেলের বোতামটা টেপা মাত্রই ট্রিপ-এর মুখটা কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। বাড়ির মালকিনের জুতোর শব্দ কানে যেতেই সে আরও মিইয়ে গেল যাতে আমার বুঝতে দেরী হল না। কী কঠিন জীবনই না সে যাপন করে চলেছে।

কণ্ঠস্বরে ব্যস্ততা প্রকাশ ক'রে ট্রিপ বলল—তাড়াতাড়ি একটা ডলার আমাকে দাও তো।

দরজাটা সামান্য ফাঁক হতেই সেখান দিয়ে সে ডলারটা ভেতরে গলিয়ে দিল। আর তাতেই আমাদের ভেতরে যাবার অনুমতি লাভ করা হল, বুঝতে পারলাম।

দরজাটা খুলে ম্যাক্‌গিনিস ছোট্ট করে বলল—বাইরের ঘরেই তাকে পাবে।

বৈঠকখানার দরজা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিতেই দেখলাম, একটা মেয়ে কোণায় হাঁটু ভাঁজ করে আরাম আয়েশ করে কাঁদছে আর ফাঁকে ফাঁকে পরম তৃপ্তিতে লজেন্স চুষছে। মেয়েটাকে কেবল সুন্দরী বললে রেখে ঢেকেই বলা হবে। বলতেই হবে, সে এক নিখুঁত সুন্দরী। কেঁদে কেঁদে তার চোখ দুটো আরও বেশী উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। 'ইভ'-এর বয়স যখন পাঁচ বছর ছিল তখন সে অবশ্যই উনিশ-কুড়ি বছরের মিস আডা লোয়ারির মিনি সংস্করণ ছিল।

আমাকে নিজের বন্ধু বলে পরিচয় দিয়ে ট্রিপ বলতে লাগল—মিস লোয়ারি, আমার বন্ধু মিঃ চামার্স তোমাকে যা বলবে তা অবশ্য আমি আগেই তোমাকে সবই বলে রেখেছি। সে একজন লেখক। আমার চেয়ে অনেক গুছিয়ে কথাগুলো পরিবেশন করতে পারবে বলেই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। জ্ঞান-বুদ্ধিও খুবই পাকা। তোমার কর্তব্য সম্বন্ধে সঠিক পরামর্শ দিতে পারবে।

ট্রিপ-এর কথায় আমি ভেতরে ভেতরে ফুঁসতে লাগলাম। আমি নিজেকে সামলাবার চেষ্টা না

করে কণ্ঠস্বরে রীতিমত উষ্মা প্রকাশ করেই বললাম—মিস লোয়ারি, আমি তোমাকে সাহায্য করতে রাজি। তবে সমস্যা হচ্ছে, ব্যাপারটা তো আমাকে খোলসা করে বলা হয় নি। তাই আমি. মানে আমি কর্তব্য স্থির করতে—

মিস লোয়ারি ক্ষণিকের জন্য হলেও মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বলল—দেখুন, তেমন কোন ব্যাপার নয়। আমার বয়স যখন বছর পাঁচেক তখন একবার নিউইয়র্ক শহরে এসেছিলাম বটে। তারপর এবারই প্রথম এখানে পা দিয়েছি। তাই বলছিলাম কি, এ শহরটা যে এমন বিশাল অঞ্চল জুড়ে আর জাঁকজমকপূর্ণ এরকম তিলমাত্র ধারণাও আমার ছিল না। পথে মিঃ ট্রিপ-এর সঙ্গে দেখা হলে আমার এক বন্ধুর খোঁজ জানতে চাই। আমার উদ্দেশ্যের কথা জানতে পেরে তিনি আমাকে এখানে নিয়ে আসেন। আমাকে রেখে তিনি কোথায় যেন চলে যান। ব্যস, তারপরই তাঁর সঙ্গে আপনি এলেন।

ট্রিপ কোনরকম ভনিতা না করেই বলল—মিস লোয়ারি, আমি যা বলছি, শোন, তোমার যা কিছু সমস্যা মিঃ চামার্সকে সব খোলসা করে বল। কিছুই যেন লুকোবার চেষ্টা করবে না।

অবশ্যই, সে তো অবশ্যই। কিন্তু কি বলব? আসলে বলার মত কিছুই তো দেখছি না। তবে এটুকুই মাত্র বলতে পারি যে, আগামী বৃহস্পতিবার হিরাম ডড-এর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা পাকা হয়ে আছে। সমুদ্রের লাগোয়া তার দু'শ একর জমি আছে। আর তার একটা খামারও আছে। আজ সকালেই আমি ড্যাপার নামক ঘোড়ার পিঠে চেপে স্টেশন পর্যন্ত এসেছিলাম। যাত্রা করে বেরোবার সময় বলে এসেছিলাম, সারাটা দিন সুসি অ্যাডামস্-এর সঙ্গে থার্কব। আসলে কথাটা ছিল মনগড়া। তবে এ-ও সত্য যে, আমি ওসবের ধার ধারি না। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী টিকিট কেটে, ট্রেনে চেপে বসলাম। নামলাম নিউইয়র্ক স্টেশনে। পথে বেরিয়েই মিঃ ট্রিপ-এর সঙ্গে দেখা। তার কাছেই জানতে চাইলাম, কোথায় গেলে তাকে—

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ট্রিপ একটু চড়া গলায়ই বলল—মিস লোয়ারি, একটা কথা মন খোলসা করে বল তো, হিরাম ডড নামক যুবকটাকে তুমি অন্তর থেকে পছন্দ কর, তাই কি? মানুষ হিসেবেও সে খুবই ভাল, ঠিক বলেছি?

অবশ্যই! আমি অবশ্যই তাকে অন্তর থেকে পছন্দ করি। হিরাম মানুষ হিসেবেও অতুলনীয়। সে আমাকেও মন প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। তবে ভাল তো সবাই বাসে তাই না?

আমি হলফ করেই বলতে পারতাম, মিস আডা লোয়ারিকে সবাই ভালবাসবে, ভাল না বেসে পারে না। তাকে পাবার জন্য সবকিছুই করতে রাজিও থাকবে।

সে আর কিছু না বলে টেবিলের ওপর মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। আমি তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য মানসিক চাঞ্চল্যবোধ করতে লাগলাম। কিন্তু আমি যে জর্জ নই। আর হিরাম ডডও নই, কথাটা ভেবে আমার ভালই লাগল। তা সত্ত্বেও মর্মাহতও কম হলাম না।

একটু বাদে সে কান্না থামিয়ে চোখ মুছতে মুছতে তার গল্প আরম্ভ করল—আমি মনের দিক থেকে খুবই ভেঙে পড়েছি। কিন্তু এ ছাড়া আমার তো কোন উপায়ও ছিল না। জর্জ-এর বয়স যখন ছিল আট আর আমার ছিল পাঁচ তখন আমাদের মধ্যে হৃদ্যতার সম্পর্ক, মানে বন্ধু-বান্ধবী হয়ে পড়েছিলাম। তারপর সে যখন উনিশে পা দিল—চার বছর আগের কথা বলছি—সে তখন গ্রীনবার্গ ছেড়ে শহরে পাড়ি জমাল। যাবার সময় আমাকে বলে গেল, পুলিশের খাতায় নাম লেখাবে, নইলে রেলপথের প্রেসিডেন্ট বনে যাবে, না হলে সেরকমই কিছু একটা বনে যাবে। তারপর আবার আমার কাছে ফিরবে। ব্যস, তারপর থেকে আমি তার কোন পাত্তাই পাই নি। হ্যাঁ, আমি তাকে মনে-প্রাণে ভালবাসতাম। কিন্তু সে—

ট্রিপ ফিসফিসিয়ে বলতে লাগল—মিঃ চামার্স থেমো না, বলে যাও। মেয়েটাকে বাৎলে দাও সে কোন্ পথ ধরবে। আমিও তাকে সে কথাই বলেছি, তুমিও বলে দাও, ও কি করবে।

আমি একটু দম নিয়ে নিলাম। ট্রিপ-এর ওপর থেকে ক্ষোভটা কমাতে চেষ্টা করলাম। আমার কর্তব্য সম্বন্ধেও ধারণা করে নেওয়া সম্ভব হল। ট্রিপ প্রথমেই আমাকে যা বলে দিয়েছিল সেটাই উপযুক্ত পন্থা। মেয়েটাকে সেদিন গ্রীনবার্গে পাঠিয়ে দিতে হবে। টিকিট কেটে দিয়ে তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে ফেরৎ পাঠানো ছাড়া অন্য কোন চিন্তাই করা যায় না। আমি হিরামকে অন্তর থেকে ঘৃণা

করি, জর্জকে মানুষই জ্ঞান করি না। কিন্তু যা করণীয় তা-তো করতেই হবে। ফলে আমি এমন একটা ভাব ফুটিয়ে তুললাম যার মধ্যে মলোমন-এর ভাবভঙ্গি আর লং দ্বীপের যাত্রী-প্রতিনিধির মনোভাব পরিস্ফুট হয়।

আমি সাধ্যমত সহানুভূতির সঙ্গে এবার বললাম—দেখুন মিস লোয়ারি, যাই বলুন না কেন, জীবন সত্যি বড় অদ্ভুত। আমরা যাকে প্রথম ভালবাসার ডোরে বাঁধতে উৎসাহী হই, খুব কমই তাদের বিয়ে করে ঘর বাঁধি। প্রথম যৌবনের প্রথম প্রেম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাস্তব রূপ পায় না। এও তো স্বীকার না করে পারা যায় না, বাস্তব আর উভয়ের সমন্বয়েই জীবন গড়ে ওঠে। স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে কারো পক্ষেই বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। মিস লোয়ারি, একটা কথা জিজ্ঞেস করছি—আপনার কি বিশ্বাস, মিঃ ডড-এর সঙ্গে একটা সুখী, পরিপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারতেন, মানে যাকে বলে মিলিত-পরিপূর্ণ আর সুখী জীবন?

মিস লোয়ারি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—উফ্! হিরাম বড্ড ভাল, চমৎকার এক যুবক। আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি, তার সঙ্গে আমি সুখেই জীবন যাপন করতে পারতাম। আমাকে একটা মোটরবোট আর একটা মোটর গাড়ি দেবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু যে করেই হোক বিয়ের দিন এগিয়ে আসতে থাকায় তাকে একটা ইচ্ছার কথা না জানিয়ে পারলাম না। মনে করেন জর্জ-এর কথা ভেবেই। নির্ঘাৎ তার কিছু না কিছু হয়েছিল, নইলে সে অবশ্যই আমাকে চিঠি দিত।

সে চলে যাওয়ার দিনই আমরা একটা হাতুড়ি-বাটালি দিয়ে একটা ডাইসকে ঠিক মাঝ বরাবর কেটে দু' টুকরো করে একটা টুকরো সে নিল আর দ্বিতীয়টা নিলাম আমি। ডাইস দুটো হাতে নিয়ে আমরা শপথ করলাম, উভয়ে একে অন্যের প্রতি বিশ্বস্ত থাকব। আর উভয়ে আবার মিলিত না হওয়া অবধি ডাইসের টুকরো দুটোকে নিজেদের কাছে রেখে দেব। আলমারিতে পোষাকের ভাঁজে ছোট্ট একটা বাক্সের মধ্যে আমার টুকরোটা এখনও সযত্নে রক্ষিত আছে। চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবার সে বলল—এখন বুঝতে পারছি, এখানে তাকে খোঁজ করতে আসাটা আমি চরম আহাম্মকের মত কাজ করেছি। বিশ্বাস করুন, আসলে এ শহরটা যে এত বড় আমার ধারণাই ছিল না।

মুখে শুষ্ক হাসি ফুটিয়ে তুলে ট্রিপ আমাদের কথায় যোগ দিল বাঞ্ছিত ডলারটা যাতে পেতে পারে—হায়! গ্রামগঞ্জের ছেলেরা যখন শহরে আসার পর অনেক কিছু জানতে, বুঝতে আর শিখে নিতে পারে ঠিক তেমনই অনেক কিছু তাদের মন থেকে মুছেও যায়। আমার তো বিশ্বাস, জর্জ শহরে এসে হয় জাহান্নামে গেছে, নতুবা অন্য কোন মেয়ের জালে জড়িয়ে পড়েছে। তা যদি নাও হয় তবে মদ আর রেসের মাঠে গিয়ে সবকিছু খুইয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। শোন লোয়ারি, মিঃ চার্মাস-এর পরামর্শ অনুযায়ী তুমি গ্রামের বাড়িতে ফিরে যাও। আর এটাই তোমার পক্ষে উচিত কাজ করা হবে।

এদিকে ঘড়ির কাটা এগোতে এগোতে দুপুরের কাছাকাছি চলে গেছে। অতএব ঝটপট কিছু একটা করে ফেলতেই হবে। আমি দার্শনিকের মত নানা যুক্তির অবতারণা করে তাকে বহুভাবে বোঝাতে লাগলাম, তার পক্ষে বাড়ি ফিরে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের মত কাজ অর্থাৎ একমাত্র সঙ্গত কাজ।

আমার কথা শুনে মিস লোয়ারি মুখ তুলে তাকাল। বিমর্ষমুখে বলল—রেলওয়ে স্টেশনের কাছে একটা গাছের সঙ্গে আমার ঘোড়াটা বেঁধে রেখে এসেছি।

ট্রিপ আর আমি উৎসাহিত হয়ে বললাম—ভালই হল, ঘোড়াটা আসামাত্র তুমি তার পিঠে চেপে যত শীঘ্র সম্ভব বাড়ির দিকে রওনা হয়ে যাও। আমাদের কথা শুনলে তোমার ভালই হবে।

আর? তারপর তার অতুলনীয় রূপে বানে জর্জরিত হয়ে আমিও তার অভিযানে সঙ্গী না হয়ে পারলাম না। যথা সম্ভব ব্যস্ত-পায়ে আমরা ঘাটে হাজির হলাম। স্টেশনের টিকিট ঘরে গিয়ে শুনালাম গ্রীনবার্গের ভাড়া এক ডলার আশি সেন্ট। একটা টিকিট কেটে মিস লোয়ারির হাতে দিলাম। আর কুড়ি সেন্ট দিয়ে একটা আধফোটা গোলাপ কিনে তার হাতে গুঁজে দিলাম।

মেয়েটা খেয়া-নৌকোর পাটাতনে দাঁড়িয়ে হাতের রুমালটাকে আমাদের দিকে অনবরত দোলাতে লাগল। এক সময় সেটা ক্রমে একটা ছোট্ট বিন্দুতে পরিণত হয়ে একেবারে আমাদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

ট্রিপ আর আমি নৌকোটার ফেলে-যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েই রইলাম। এক সময় দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাটির পৃথিবীতে ফিরে এলাম, বাস্তব জীবনের কঠিন, কঠোর আর নীরস নিঃসঙ্গ অবস্থায়।

আমি ক্রমে রূপের মোহ আর রোমাঞ্চের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে লাগলাম। ট্রিপ-এর দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে ঠোঁট বাঁকাতে আর নাক সিঁটকাতে লাগলাম। আগের চেয়ে অনেক বেশী ঘৃণাকাতর মনে হতে লাগল। আমার পকেটের ডলার দুটো নাচাতে নাচাতে চরম বিতৃষ্ণায় তার মুখে ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম। সেও আত্মরক্ষার মেকি পথের আশ্রয় নিয়ে নিজেকে সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে ট্রিপ শুকনো গলায় বলল—আচ্ছা, এ ঘটনাটা থেকে মাল-মশলা নিয়ে একটা গল্প সাজাতে পারবে না? যেমন তেমন একটা গল্প কি লেখা সম্ভব হবে না?

আমি ততোধিক শুকনো গলায় জবাব দিলাম—গল্প তো দূরের কথা একটা ছত্রও লেখার মত নয়। তবে রূপসী তন্বী যুবতীকে তার চরম দুর্গতি থেকে রক্ষা করেছি এ পুরস্কারটাই হবে আমাদের পরম পাওয়া।

ট্রিপ বিবর্ণমুখে বলল—তোমার ডলার দুটো খরচ হয়ে যাওয়ার জন্য আমি খুবই মর্মাহত। আমি কিন্তু এটাকে একটা বড়সড় আর জব্বর গল্পের প্লট ভেবেছিলাম।

এক কাজ করা যাক, এসব কথা মন থেকে মুছে ফেলে চল আমরা শহরের পরের গাড়িটা ধরি।

ট্রিপ কোটের পকেট হাতড়ে একটা পুরনো রুমাল বের করে আনল। সে রুমালটা বের করে আনার সময় তার ভেস্ট-এর সঙ্গে ঝোলানো সস্তা রূপোর পাতে মোড়া একটা ঘড়ির চেন আমার নজরে পড়ে গেল। আর সেটার গায়ে লাগানো একটা বস্তু দেখে আমি আচমকা সেটাকে মুঠো করে না ধরে পারলাম না। বস্তুটা কি? বাটালি দিয়ে দু টুকরো করা একটা রূপোর ডাইস-এর অর্ধাংশ।

আমি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে সেটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই সচকিত হয়ে উচ্চারণ করলাম, একী!

সে ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারণ করল—হ্যাঁ, তোমার অনুমান অভ্রান্তই বটে। আমিই জর্জ ব্রাউন। ট্রিপ নাম ধারণ করে এখানে শহরে বাস করছি। এটার আর দরকার কি, কেনই বা আর সঙ্গে রাখতে যাব।

এরপর আমি যদি মদ খাওয়ার জন্য একটা ডলার নিঃসঙ্কোচে ট্রিপ-এর হাতে গুঁজেই দিয়ে থাকি তবে আমার কাজটাকে সমর্থন না করার মত লোক জগৎ সংসারে কেউ আছে কিনা জানার জন্য আমি খুব আগ্রহী।

হি অলসো সার্ভস

আমি যদি পুরো এক হাজার বছরের জীবন পেয়ে যেতাম তবে সে সময়টাতে সত্যিকারের একটা প্রেমের কাহিনীর এত কাছে পৌঁছে যেতে সক্ষম হতাম যাতে রাণীর সাজ পোশাকের একটা প্রান্ত স্পর্শ করা সম্ভব হয়।

জাহাজের যাত্রী হয়ে কতশত মানুষই না আমার কাছে আসে। তারা জনমানবশূন্য প্রান্তর, অরণ্যভূমি, দূরদূরান্ত, ভূগর্ভ বাসস্থল আর খুপড়ির মত চিলেকোঠা থেকে এসে তাদের দেখা ও শোনা কত সব বিচিত্র ঘটনার সংলাপ আমাকে শোনার যাদের প্রলাপ বললেও ভুল হবে না। কিন্তু আমার অদৃষ্ট প্রেরিত অভিন্ন হৃদয় শিবির-বন্ধ হাংগি ম্যাগি, চিন্তা ভাবনা দিয়ে যেভাবে গুছিয়ে গাছিয়ে আমার কাছে কাহিনীটা কাছে ব্যক্ত করেছিল সেটাকে যদি যথাযথভাবে উপস্থাপন না করতে পারি তবে তার জন্য আমার কান দুটোকেই দায়ী করতে হবে।

হাংকি যখন থার্ড এভিনিউ ওপরতলার চবব-এর ছোট রেস্তোরাঁ ও কাফের মুখ্য পরিচারিকার ভূমিকা পালন করছিল তখনই তার সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা জন্মায়।

তারপর যখনই সে আলাস্কা ভ্রমণ সেরে শহরে ফিরে এসেছে তখনই সুবিশাল শহরটার ছোট্ট গলিপথে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে। সে একটা গুপ্তধনের খোঁজে হন্যে হয়ে চক্কর মেরে যাওয়া জাহাজের পাচকের কাজ নিয়ে সে তাদের অভিযানের সঙ্গী হত। আবার জাহাজটা কখনও বা আর্কানমাস নদীতে মুক্তো আহরণের ধান্ধায় ঘুরে ঘুরে ব্যর্থ হয়ে বন্দরে ফিরে আসত। হাংকিও জাহাজ ছেড়ে নেমে আসত। তারপর অসময়ের ডেরা চব্ব-এর রেস্তোরাঁ ও কাফেতে সে আবার কিছুদিনের জন্য কাজে মেতে উঠত।

দীর্ঘ কয়েক মাসের অদর্শনের পর থার্ড এভিনিউ আর টুয়েন্টি থার্ড এভিনিউর সংযোগস্থলে হঠাৎ এক সন্ধ্যায় হাংকির সঙ্গে আমার মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। একটা নির্জন কোণে আমরা পরস্পরের মুখোমুখি বসে কথা বলার সময় সে এমন বকবক করতে লাগল যে, আমার কানদুটো বুঝি আর একটু হলেই বধিরতা প্রাপ্ত হয়ে যেত। তবু তার অনর্গল বকবকানি থেকে সারবস্তু যেটুকু পেলাম সেটা মোটামুটি এরকম—হাংকি আমার কথার জবাবে বলল—তুমি পরবর্তী নির্বাচনের কথাই তো বলতে চাইছ? কিন্তু ইন্ডিয়ানদের ব্যাপার স্যাপার সম্পর্কে তোমার তেমন কোন ধারণাই নেই। বিডল, কুপার বা চুরুট প্রসঙ্গে আমি বলছি না। কলেজে পড়ুয়াদের মধ্যে যারা গ্রীমক-পুরস্কারে ভূষিত হয়, ফুটবলের মাঠে যারা প্রতিপক্ষের হাফ ব্যাকের মাথার খুলি উড়িয়ে দেয় তাদের কথাই আমি বলতে চাইছি। আর তাদের কথাই তোমাকে বোঝাতে চাইছি, যারা বিকেলে বাদাম-বিস্কুট সহযোগে চা-পর্ব সারে জীব-বিজ্ঞানের অধ্যাপকের মেয়ের মুখোমুখি বসে, আর পূর্বপুরুষের রেখে যাওয়া বাঁশের কুঁড়ে ঘরে ফিরে সাপ আর গাঙ্ ফড়িং ভাজা দিয়ে উদর পূর্তি করে।

একটা কথা তোমাকে বলছি, তারা কিন্তু মানুষ হিসেবে তেমন খারাপ নয়। গত বছর কয়েক ধরে যে সব পরদেশী সেখানে গিয়ে ঘাঁটি গেড়েছে তাদের অনেকের চেয়ে অবশ্যই ভাল। ইন্ডিয়ানদের কথা বলতে গিয়ে একটা কথা বলতেই হবে, তারা যখন শ্বেতাঙ্গদের সংস্রবে আসে, মেলামেশা করে তখন তাদের যাবতীয় দোষ ত্রুটি ফ্যাকাশে মুখোশের দোষের সঙ্গে বিনিময় করে। আর গুণগুলোকে নিজেদের জিম্মায় রেখে দেয়। আর বহিরাগতরা আমাদের গুণগুলোকে নিজেদের আচরণের সঙ্গে মিশিয়ে নেয় আর দোষগুলোকে নিজেদের কুক্ষিগত করে রাখে। আর এজন্যই তাদের ঠেকাবার জন্য পুরো সৈন্যদলকে না নামিয়ে উপায় থাকে না।

হাইজ্যাক স্নেকফিডার-এর সঙ্গে আমার মেক্সিকো অভিযানের কথা ব্যক্ত করছি—সে পেনসিল্‌ভেনিয়া মহাবিদ্যালয়ের স্নাতক। তার পায়ে ছাগলছানার চামড়ার মোকাসিন জুতো আর আস্তিন গোটানো মাদ্রাজী-শিকারী জামার আধুনিকতম সংস্করণ। সত্যি বলছি, সে ছিল আমার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। লোকোয়াতে তার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ পরিচয় হয়েছিল। তারপরই আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, ক্রমে সে বন্ধন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে থাকে। সত্যি কথা বলতে কি, সে একজন সমাজের প্রথম শ্রেণীর মানুষ ছিল। বোস্টন আর এরকমই বড় বড় শহরের সম্ভ্রান্ত সব ব্যক্তিদের বাড়ি থেকে তাকে নিমন্ত্রণ করা হত। আর প্রবন্ধ লেখার জন্যও তার খাতির কম ছিল না।

ফ্লোরেন্স ব্লুফেদার নামে একটা মেয়ে মস্কোজিতে বাস করত। তাকে দেখামাত্রই হাইজ্যাক-এর বুদ্ধি কেমন যেন জল হয়ে গেল। সে আমাকে কয়েকবারই তার কাছে নিয়ে গিয়েছিল। যে কথা বলতে চাইছি, সে যুবতীটার গায়ের রঙ তোমার চেয়ে সাদা আর আমার চেয়ে অনেক, অনেক বেশী শিক্ষিত ছিল। থার্ড এভিনিউর বড় আর ঝকমকে দোকানগুলিতে যেসব মেয়ে আর সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলারা কেনাকাটা সারতে আসে তাদের থেকে তাকে আলাদা করে বেছে নেওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। তাকে আমার মনে ধরার আরও একটা উল্লেখযোগ্য কারণ ছিল, জ্যাক-এর সঙ্গে না গিয়ে কখন সখন আমি একাই তার কাছে হাজির হতাম। সে মস্কোজী শহরের মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিল। পড়াশোনা করেছে মানবজাতিতত্ত্ব নিয়ে। এর বিষয়বস্তু এমন, যার পাতায় বিভিন্ন জাতির মানুষের বংশ-সূত্রের কথা ব্যক্ত হয়েছে। হাইজ্যাকও সে পথটাকেই আঁকড়ে ধরল। ছোট, বড় বহু জনসভায় বিষয়টা সম্বন্ধে বহু জ্ঞানগর্ভ ভাষণও পাঠ করল।

এই রে! হাইজ্যাককে নিয়ে প্রসঙ্গ শুরু করে পুরো অন্য পথে চলে যাচ্ছি যে! অতএব আবার তার কথাতেই ফিরে যাওয়া যাক। প্রায় দু' মাস আগে তার একটা চিঠি পেয়েছিলাম। তাতে সে

লিখেছে যে, ওয়াশিংটনে অবস্থিত মানবতত্ত্ববিষয়ক সংখ্যালঘু প্রতিবেদন ব্যুরো তাকে চাকরিতে বহাল করে নির্দেশ দিয়েছে সে কিসকোতে গিয়ে খনন কার্যের মাধ্যমে পাওয়া কিছু লিপির অনুবাদ করার কাছে হাত দেওয়ার জন্য। অথবা সে যেন ভগ্নস্তূপ থেকে উদ্ধার করা কিছু সাংকেতিক লেখা উদ্ধার করতে নিজেকে লিপ্ত করে। নইলে ওরকমই কোন কাজে মনোনিবেশ করে। আর এও লিখেছে আমি তার সঙ্গদান করলে আমার জন্য যে অর্থ ব্যয় হবে তা প্রকল্পের খরচের মধ্যেই জুড়ে দিতে পারবে।

আমি তাকে টেলিগ্রাফ মারফৎ সম্মতি জানিয়ে দিলাম। সে এবার একটা টিকিট পাঠিয়ে দিল। ব্যস, আমি ওয়াশিংটনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। সেখানে পৌঁছে তার সঙ্গে দেখা করলাম। প্রাথমিক শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর আমি তাকে কতকগুলো টুকরো খবর দিলাম। সেও আমাকে জানাল, ফ্লোরেন্স ব্লু ফেদার হঠাৎ তার বাড়ি থেকে কোথায় যেন চম্পট দিয়েছে, একেবারে বে-পাত্তা।

আমি তার কাছে সবিস্ময়ে ব্যাপারটা জানতে চাইলে সে বলল—আর বোলো না ভাই, ব্যাপারটা খুবই অবিশ্বাস্য, সন্দেহ নেই। ফুটপাত ধরে তাকে চলতে দেখা গিয়েছিল। তারপর একটা বাঁক ঘুরেই সে যেন একেবারে কর্পূরের মত উবে গেল। সবাই তাকে খুঁজে বের করার জন্য হন্যে হয়ে চারদিকে ছুটোছুটি করেছে বটে। কিন্তু কোনই সূত্রের সন্ধান না পেয়ে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে।

আমি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললাম—মেয়েটা বড় ভাল ছিল। জ্যাক-এর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, সে খুবই মর্মাহত হয়েছে। আমার বিশ্বাস, মিস ব্লু ফেদারকে সে খুবই উঁচু নজরে দেখে, তার জন্য অন্তরে উচ্চাসন পেতে রেখেছে। তার হাত থেকে মদের গ্লাস নামছে না দেখে আমার অনুমান আরও দৃঢ় হল। আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে এটুকুই বুঝেছি, কোন পুরুষ যখন তার মনময়ূরীকে হারায় তখন মদের বোতলের ওপর নিজের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—সবকিছু সঁপে দেয়।

আমরা ট্রেনযোগে ওয়াশিংটন থেকে নিউ অর্লিয়েন্সে হাজির হলাম। সেখান থেকে বেলিজগামী স্টিমারে উঠলাম। ভয়ঙ্কর এক ঝড়ের কবলে পড়ে আমরা উভয়েই ক্যারিবিয়ান সাগরের তীরে গিয়ে আছাড় খেয়ে পাশেই ছোট শহর বোকা ডি-কোকোউলা উঠলাম। একে মৃত শহর বলাই ভাল। বাইবেলে তো বহু প্রাচীন শহরের কথা পাওয়া যায় যাদের খোঁজ করতে গেলে এখন হতাশ হয়েই ফিরে আসতে হবে। পনেরো শ' সাতানব্বই সালের আদিম সুমারী পাথরে বিচারালয়ের গায়ে খোদাই করে লেখা আছে তখন নগরের জনসংখ্যা ছিল তেরো শ'। প্রায় সব নাগরিকই ইন্ডিয়ান, আর অন্যান্যরা ইন্ডিয়ানদের সংকর বংশধর। আমি অবাক হয়ে ভাবলাম, এখানকার অধিকাংশের গায়ের চামড়া হাল্কা রং বিশিষ্ট। তবে কেন নগরটা ককেসাসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে না যাওয়ার পিছনে যুক্তি কিই বা থাকতে পারে? কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতে দেরী হল এর জন্য প্রধানতম দায়ী মেজর বিং।

হ্যাঁ, মেজর রিং। স্থানীয় অধিবাসীরা গভীর জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করে নিয়ে আসত। তারা মজুরি হিসাবে এক পঞ্চমাংশ পেত। মজুররা কাজ বন্ধ করে আরও এক ভাগ দাবী করলে মেজর হাসিমুখেই তাদের দাবী মেনে নিত।

সমুদ্রের একেবারে লাগোয়া এক উন্মুক্ত পরিবেশে মেজর বিং-এর বাংলোটা অবস্থিত ছিল। হাইজ্যাক আর আমি লম্বা বারান্দায় বসে দুপুর থেকে মাঝরাত পর্যন্ত দিব্যি কাটিয়ে দিতাম। সে বলত তিন লক্ষ পাউন্ড নিউ অর্লিয়েন্সের ব্যাঙ্কে জমিয়েছে। আমরা যদি চাই তবে হাইজ্যাক আর আমি অনায়াসে সারাটা জীবন তার অতিথি হয়ে থেকে যেতে পারি। কিন্তু ভবি সে ভুলবার নয়। হাইজ্যাক-এর মাথা থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ভূত কিছুতেই নামল না। সে মানবজাতিতত্ত্বর ব্যাপারে তাকে খোঁচাতে লাগল।

সব কিছু শুনে মেজর বিং চমকে উঠে বলল—কি বললেন, ধ্বংসস্তূপ? আরে মশাই, ধ্বংসস্তূপ, মানে ঢিবি—এখানকার জঙ্গলে কম করেও এক শ' তো আছেই। সেগুলোর সৃষ্টিকাল সম্বন্ধে আমার কিছুই জানা নেই। তবে আপনাকে এটুকু অন্তত বলতে পারি, আমি এখানে পা দেবার অনেক আগে থেকেই এখানে যেমন ছিল, আজও তেমনই আছে।

হাইজ্যাক আচমকা একটা প্রশ্ন করে বসল—এখানকার আদিবাসীরা কি ধরনের পূজা-অর্চনায় অভ্যস্ত, বলুন তো মিঃ বিং?

পূজা-অর্চনা? না, এটা আমার পক্ষে সঠিক করে কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে আপনাকে এটুকু বলে সাহায্য করতে পারি, এখানে একটা পুরনো গীর্জা আছে। ফিডার নামে একটা লোক সেখানে স্থায়ী ভাবে বসবাস করে। সে স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে ভগবান যীশু খ্রীষ্টের বাণী প্রচার করে এবং তাদের খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করে। আমার বিশ্বাস, তারা এখনও বহু দেব-দেবী, মূর্তি আর গাছ পূজা করে।

ক'দিন বাদে জ্যাক আর আমি বনের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা পথের হদিস পেয়ে গেলাম। পথটা ধরে আমরা মাইল চারেক এগিয়ে গেলাম। এবার বাঁ দিকের পথ দিয়ে আরও মাইল খানেক যেতেই আমরা বিশাল একটা ধ্বংসস্তূপের সামনে হাজির হলাম। লতাপাতা ঝোপঝাড়ে নিরেট একটা পাথর। তার গায়ে বহু জন্তু জানোয়ারের ছবি খোদাই করা ছিল। আমরা হাঁটতে হাঁটতে পাথরটার পিছনদিকে চলে গেলাম।

হাইজ্যাক বলল—প্রাচীন মন্দির! এটাকে আমরা ঘুরে ঘুরে ভালভাবে দেখব। একটা কথা, ঝড়টা আমাদের এখানে টেনে এনে অশেষ উপকারই করেছে, তোমার কি মত?

আমি নীরবে মুচকি হাসলাম। ভাঙা মন্দিরটার পিছনে প্রথমেই একটা ছোট্ট ঘর পেলাম। তার ভেতরে পাথরের একটা লেখার টেবিল আর পাথরের হাত-মুখ ধোবার পাত্র চোখে পড়ল। আর দেখলাম দেওয়ালের ছিদ্রে গাঁথা কতকগুলো কাঠের গোঁজ, গজালের মত দেখতে। না, আর কিছু দেখা গেল না।

হাইজ্যাক যখন গভীর মনোযোগ দিয়ে দেওয়ালের লিপি পরীক্ষায় ব্যস্ত আমি তখন গুটিগুটি সামনের ঘরটায় ঢুকলাম। ঘরটার দৈর্ঘ্য চল্লিশ ফুট আর প্রস্থ ত্রিশ ফুট। মেঝেও পাথরের। ছোট ছোট দুটো জানালা দিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী আলো ঢোকে।

আমি পিছন ফিরতেই জ্যাককে দেখতে পেলাম। লক্ষ্য করলাম তাকে যেন কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে। সে কোমর পর্যন্ত পোশাক খুলে দাঁড়িয়ে আছে। আমার উপস্থিতি সম্বন্ধে তার খেয়ালই নেই। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে ছোট্ট করে একটা ধাক্কা দিলাম। না। কোন সাড়াই পেলাম না। হায় ঈশ্বর! জ্যাক কি পাথর বনে গেছে? আসলে আমি নিজেও তো গলা পর্যন্ত মদ গিলেছিলাম। গলা চড়িয়ে বললাম—ওহে জ্যাক, তুমি যে একেবারে কঙ্কালসার হয়ে গেছ! আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম, সে একাজে লেগে থাকলে এ হাল না হয়ে যাবে কোথায়।

আমরা দু'নম্বর মিঃ স্নেক ফিডারকে দেখতে পেলাম। একটা প্রস্তরমূর্তি, না হয় দেবতা আর তা যদি নাও হয় তবে একটা ওল্টানো মূর্তি অথবা অন্য কিছু হবে, আর ঠিক হাইজ্যাক-এর মতই দেখতে অবিকল তার মুখ, আকৃতি আর রঙ—কিন্তু একটা বেদীর ওপর নিশ্চল-নিথর ভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

আরে, এ যে আমার এক ভাই। কথাটা বলেই জ্যাক মুখে কলুপ এঁটে দিল। পর মুহূর্তেই সে আমার কাঁধে একটা হাত আর অন্য হাতটা মূর্তিটার কাঁধে তুলে দিয়ে বলল—হাংকি, আমি এখন আমার পূর্বসূরীদের মন্দিরে অবস্থান করছি।

তোমার চোখকে যদি বিশ্বাস করা যায় তবে বলতেই হয়, তুমি নিশ্চয় তোমার যমজ ভাইয়ের দেখা পেয়েছ। এক কাজ কর। মূর্তিটার পাশাপাশি দাঁড়াও জ্যাক, তোমাদের মধ্যে কোন তফাৎ চোখে পড়ে কিনা দেখি।

না, কোন তফাৎই আমার চোখে পড়ল না। একটা ইন্ডিয়ান চাইলে নিজের মুখটাকে লোহার মত কঠিন আর নিশ্চল-নিথর করে রাখতে পারে। অতএব হাইজ্যাক যদি নিজের মুখটাকে পাথরের মত কঠিন করে তোলে তবে মূর্তিটা থেকে নিজেকে আলাদা করতে সক্ষম হবে না।

আচ্ছা, বেদীটাতে কিছু অক্ষর খোদাই করা দেখছি, তবে পাঠোদ্ধার করতে পারছি না। এদেশের বর্ণমালাটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের—আমি মন্তব্য করলাম।

মিনিটখানেকের জন্য হাইজ্যাকের মানবজাতিত্বের কাছে তার মদের শক্তি পরাজয় স্বীকার করল। ব্যস, সে শিলালিপি পাঠ করতে মেতে গেল।

মূর্তিটা থেকে চোখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে সে বলল —হাংকি, এটা টোলটোপাস্কল-এর মূর্তি। তিনি প্রাচীন এজটেজদের দেবতাদের মধ্যে সর্বাধিক শক্তিধর।

আমি মূর্তিটার ওপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই বললাম, হাইজ্যাক, দেবতা টোলটোপাস্কল'কে চিনতে পেরে কেবল খুশিই নয়, ধন্য হয়ে গেছি। কিন্তু এটা চাক্ষুষ করে জুলিয়াস সিজার নিয়ে মহাকবি শেক্সপিয়ার-এর একটা রসিকতার কথা মনের কোণে উঁকি দিচ্ছে। যদি শুনতে চাও—

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে হাইজ্যাক বলে উঠল—হাংকি, একটা কথা বলত, অবতারবাদে তোমার আস্থা আছে কি?

অবতারবাদ! এ শব্দটার বিন্দু বিসর্গও আমার মাথায় ঢোকে না।

আমার বিশ্বাস যে, আমিই দেবতা টোলটোপাস্কল-এর নতুন অবতার। গবেষণার মাধ্যমে আমি নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন উপজাতিদের মধ্যে কেবলমাত্র চিরোকিয়াই জোর গলায় বলতে পারে তারাই এজটেক জাতির প্রত্যক্ষ উত্তরসূরী। য়োরেল ফেদার আর আমি এ মতবাদের ওপর আস্থাশীল। আর সে মেয়ে যদি—তবে?

হাইজ্যাক আচমকা আমার হাতটা ধরে আমার মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকল। তার বিশিষ্ট সহকারী খুনী ক্রেজি হর্স-এর মতই তাকে মনে হল।

আমি আমতা আমতা করে বললাম—ঠিক আছে, সে মেয়েটা যদি তাই হয় তবে তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে, নাকি মদের নেশা এখনও কাটেনি? মূর্তির মধ্যে মানুষকে কল্পনা করা, ব্যাপারটা কেমন না? অবতারবাদ? ধ্যুৎ, এসব ছাড়ান দাও তো। তার চেয়ে বরং মদের বোতল খুলে বসা যাক।

মদের বোতলের জন্য হাত বাড়ানো মাত্র হঠাৎ শুনতে পেলাম, কার যেন পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। আমি হাইজ্যাক-এর হাত ধরে টানতে টানতে একটা শোবার ঘরে নিয়ে গেলাম। শোবার ঘর হলেও বিছানাপত্র সেখানে অনুপস্থিত। চারদিকের দেওয়ালের গায়ে অসংখ্য ছিদ্র চোখে পড়ল। তাদের গায়ে চোখ লাগিয়ে আমরা মন্দিরের সামনের দিকটা দেখতে পেলাম। পরে মেজর বিং-এর মুখে আমি শুনেছিলাম, প্রাচীনকালে ওসব ছিদ্রের মাধ্যমে পুরোহিতরা উপাসকদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। আর এজন্যই ছিদ্রগুলোর সৃষ্টি।

একটু বাদেই এক অতি বৃদ্ধা ইন্ডিয়ান একটা মাটির থালায় করে খাবার নিয়ে মন্দিরের ভেতরে ঢুকল। সেটাকে খোদাই করা মূর্তিটার সামনে রেখে মেঝেতে উপুড় হয়ে সটান শুয়ে পড়ে পরপর কয়েকবার মাথা ঠুকল। তারপর খাবারের থালাটা রেখে মন্দির ছেড়ে চলে গেল।

বৃদ্ধা চলে গেলে হাইজ্যাক আর আমি থালার ছাগমাংস, কাঁকড়া সেদ্ধ, পিঠে, আম আর কলা দিয়ে উদর পূর্তি করলাম। তারপর মদের বোতল খুলে নিয়ে বসলাম।

আমি এক ঢোক মদ গলায় ঢেলে বললাম—আজ নির্ঘাৎ বুড়ো টুকুসসের জন্মোৎসব। আবার এমনও হতে পারে, এরা রোজই এমন থালা ভর্তি খাবার সাজিয়ে দেবতার সামনে দিয়ে যায়, কে জানে? এতদিন আমার জানা ছিল, দেবতারা কেটাওয়াম্পাস পাহাড়ের চূড়ায় বসে ভ্যানিলা পান করে তৃপ্তি লাভ করেন। এখন দেখছি, আসলে তা নয়।

একটু বাদেই আরও অনেক আদিবাসী মন্দিরে আসতে লাগল, তারা মূর্তিটার সামনে বিভিন্ন রকম পূজার উপকরণ রেখে দিয়ে মেঝেতে উন্মাদের মত গড়াগড়ি দিতে লাগল। কিছুক্ষণ শ্রদ্ধা নিবেদন করার পর তারা মন্দির থেকে বেরিয়ে বনের দিকে চলে যেতে লাগল।

জ্যাক খাবারের থালাগুলোর ওপর চোখ বুলাতে বুলাতে বলল—দেবতার উচ্ছিষ্ট এসব ভোগ করে উদর পূর্তির কাজে ব্যবহৃত হয় আমার জানা নেই।

আমি তার প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বললাম—আরে, বনের গভীরে অবশ্যই কোথাও না কোথাও পুরোহিত, ছোটখাটো দেবমূর্তি বা পাওয়ারা ঝাপ্টি মেরে অবস্থান করছে। একটা কথা মনে রেখো, যেখানেই দেবতার বিগ্রহ দেখতে পাবে, সেখানেই দেখা যাবে ভোগের জন্য কোন না কোন লোক অদূরবর্তী গোপন কোন স্থানে আত্মগোপন করে রয়েছে।

তারপর আবার আমরা এক পেগ করে মদ গলায় ঢাললাম। শরীরটাকে একটু ঠাণ্ডা করার জন্য আমরা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ানোমাত্র এক যুবতীকে ধ্বংসস্তূপটার দিকে এগিয়ে আসতে দেখতে

পেলাম। তার পা দুটো খালি, সাদা ঢিলেঢালা একটা জামা গায়ে আর সাদা ফুলের একটা মালা হাতে। আর কালো চুলের খোঁপায় একটা নীল পালক গোঁজা। সে আরও একটু কাছে আসতেই আমরা, জ্যাক আর আমি আতঙ্কে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলাম। কারণ, মেয়েটার মুখে ব্লু ফেদার আর বৃদ্ধ রাজা টক্লিকোলজির মুখের ছাপ স্পষ্ট দেখতে পেলাম। ঠিক তখনই আবার হাইজ্যাক-এর কাঁধে মানবজাতিতত্ত্বের ভূত চেপে বসল। আমাকে টেনে হিঁচড়ে দেববিগ্রহটার পিছনে নিয়ে হাজির করল। তারপর সে বলল—হাংকি এটাকে উঁচু করে ধরত। এটাকে অন্য ঘরে নিয়ে গিয়ে স্থাপন করব। আমি প্রতি মুহূর্তে অনুভব করছি, পবনদেব-এর নতুন অবতার আমি। আর হাজার হাজার বছর আগে আমার বিয়ের কনে ছিল এই ফ্লোরেন্স ব্লু ফেদার। এক সময় সে মন্দিরে আমি রাজা ছিলাম. আজ সেখানেই সে আমার খোঁজে হাজির হয়েছে।

আমি বললাম, ঠিক আছে, তুমি ওর পা দুটো ধর, আর আমি মাথার দিকটা ধরছি।

আমরা দু'জনে ধরাধরি করে তিন শ' পাউন্ড ওজনের পাথুরে দেবতার মূর্তিটাকে পিছন দিককার ঘরে নিয়ে গিয়ে দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখলাম।

ব্যস. মুহূর্তমাত্র দেরী না করে হাইজ্যাক এক দৌড়ে গিয়ে আদিবাসীদের বোনা এক জোড়া রেশমি শাল নিয়ে এল। নিজে পোশাক পরিচ্ছদ যা কিছু আছে সবই খুলে যতটা সম্ভব বিবস্ত্র অবস্থা হল। লালসাদা শাল দুটো শরীরে জড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এবার একটা বেদীর ওপর প্লাটিনামের মূর্তির মত নিশ্চল-নিথরভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল। আবেব্বাস! সে যে কী সব কাণ্ড জুড়ে দিল সেটা দেখার জন্য আমি দেওয়ালের ছিদ্র দিয়ে চোখ রেখে তাকিয়ে থাকলাম।

মিনিট কয়েকের মধ্যে সেই মেয়েটা একটা মালা নিয়ে ঘরে ঢুকল। তাকে দেখে মনে হল অবিকল ফ্লোরেন্স ব্লু ফেদার-এর মত দেখতে।

তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই আমি স্বগতোক্তি করলাম—একী! এ-ও কি অবতার হয়ে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়েছে? তবে তো ভাল করে দেখতেই হয় তার বাঁ গালে একটা তিল আছে কিনা। ভাল করে লক্ষ্য করার পর দেখলাম, তার গায়ের রং ফ্লোরেন্স-এর চেয়ে সামান্য ঘোরতর। তবে সব মিলিয়ে মেয়েটা দেখতে ভাল।

কিন্তু হাইজ্যাক যতটা মাল গিলেছে তাতে তার ততটা নেশা কিন্তু হয় নি।

মেয়েটা ধীর-পায়ে এগিয়ে গিয়ে হাতের মালাটা হাইজ্যাক-এর পায়ের তলার পাথরের বেদীটার ওপর রাখল।

পরমুহূর্তেই হাইজ্যাক বেদী থেকে নীরবে নেমে এল। প্রায় অস্ফুট স্বরে অথচ গম্ভীর গলায় এমন কয়েকটা শব্দ উচ্চারণ করল যা প্রায় ধ্বংসস্তূপের দেওয়ালে খোদাই করা শিলালিপির মতই। মেয়েটা সঙ্গে সঙ্গে ঝট করে পিছনে সরে গেল। তার চোখ দুটো ইয়া বড় হয়ে গেল।

হাইজ্যাক তার হাত ধরে এক সঙ্গে মন্দির ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল। মেয়েটা যে পথ দিয়ে বন থেকে বেরিয়ে এসেছিল তারা সে পথেই হাঁটতে লাগল। হাইজ্যাক বা মেয়েটা কেউ-ই পিছন ফিরে আমার দিকে আর তাকাল না।

আমি গলা ছেড়ে বললাম, আরে হাইজ্যাক। চললে কোথায়? শহরের রেস্তোরাঁয় যে আমাদের খাবার বিল বাকি আছে। আর তুমি কিনা আমাকে সহায় সম্বলহীন অবস্থায় ফেলে চলে যাচ্ছ! আমার পকেটে একটা সেন্টও যে নেই। করছ কি! এ জেলের মেয়েটার ফাঁদ থেকে বেরিয়ে এস। আমরা শহরে ফিরে যাই, চলে এস।

আমার কথায় কান না দিয়েই তারা তেমনই হাত ধরাধরি করে সামনের দিকে এগিয়ে চলল। ভুলেও পিছন ফিরে তাকাল না। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে গভীর বনে ঢুকতে ঢুকতে হারিয়ে গেল। ব্যস, তারপর আমি কোনদিনই হাইজ্যাককে দেখি নি, কারো মুখে তার কথা শুনিও নি।

হাংকি ম্যাগী তার নিজের গল্পটা সম্বন্ধে কোন্ ধারণা করেছে, জানি না। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা, অবতার বা নতুন রূপ ধারণের ব্যাপার-স্যাপার সম্বন্ধে তোমার মত কি?

সে বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই ব্যক্ত করল—আসলে ব্যাপারটা মোটেই তেমন কিছু না। অতিরিক্ত মদই তার সর্বনাশ করেছে। আর সে সঙ্গে অতিরিক্ত পড়াশোনা সাহায্য করেছে। ইন্ডিয়ানদের সর্বজনসমক্ষে তুলে ধরাই হল তাদের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য।

ভাল কথা, মিস ব্লু ফেদার সম্বন্ধে—

আমাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই সে ঠোটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বলতে লাগল—ও এ কথা! যে মেয়েটা হাইজ্যাক-এর হাত ধরে তাকে পটিয়ে নিয়ে চলে গেল, তার কথা বলছ? তাকে দেখামাত্র আমি ভেতরে ভেতরে একটা ঝাঁকুনি অনুভব করেছিলাম সত্য। তবে মাত্র মিনিট খানেকের জন্য। আচ্ছা, আপনার মনে পড়ছে, আপনাকে আমি বলেছিলাম, প্রায় এক বছর আগে মিস ফ্লোরেন্স ব্লু ফেদার বাড়ি থেকে বে-পাত্তা হয়ে গিয়েছিল? তার ঠিক চারদিন বাদেই ইস্ট টুয়েন্টি থার্ড স্ট্রীটের পাঁচ কামরার একটা সুসজ্জিত ফ্ল্যাটে হাজির হয়। ব্যস, সেদিন থেকে তার পরিচয় হয় মিস ম্যাগি, বুঝতে পারলেন?

বেস্ট সেলার

গত গ্রীষ্মে একদিন একটা জরুরী কাজে আমি পিটস্‌বার্গে গিয়েছিলাম। আমার চেয়ার কারটার একটা বড় ভগ্নাংশ দখল করেছিল অত্যাধুনিক পোশাক পরিহিতা আর জালের অবগুণ্ঠন পরা বিভিন্ন বয়সের মহিলারা, যারা জানালা তুলতে গেলেই আপত্তি জানায়, হেই-হেই করে ওঠে।

সাত নম্বর চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে একটু-আধটু কৌতূহলের শিকার হয়ে নয় নম্বর চেয়ারের যাত্রীর ছোট, কালো, টাকওয়ালা দৃশ্যমান মাথার অংশ বিশেষের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম।

চেয়ার ও জানালার মাঝামাঝি মেঝের ওপর নয় নম্বর আচমকা একটা বই ছুঁড়ে দিল। লক্ষ্য করে দেখলাম, বইটা এখানকার সম্প্রতিকালের সর্বাধিক বিক্রিত বই। 'দ্য রোজ লেডি অ্যান্ড ট্রাভেলিয়ানে'-এর একটা খণ্ড।

লোকটা জানালার দিকে তার মুখটা ঘোরাতেই চিনতে পারলাম, পিটসবার্গ-এর জন এ. পেস্কুড। একটা কাঁচ কারখানার ভ্রাম্যমাণ সেলস্‌ম্যান। আমার পরিচিত সত্য, কিন্তু বিগত দু'বছর আমাদের দেখা নেই।

মিনিট দু'-এর মধ্যে আমরা পরস্পরের সঙ্গে করমর্দন সেরে বৃষ্টি, স্বাস্থ্য, ঠিকানা, গন্তব্যস্থল আর উন্নতির ব্যাপার-স্যাপার সংক্রান্ত জিজ্ঞাসাবাদ সেরে নিলাম, তবে আমার বরাত নেহাৎ ভাল না হলে হয়ত তার পরই রাজনীতির প্রসঙ্গ উঠত।

পাঠক-পাঠিকা, জন এ. পেস্কুড হয়ত বা আপনাদেরও পরিচিত। বেঁটেখাটো চেহারার মানুষ সে। সর্বদা একই রঙের নেকটাই ব্যবহার করে না। 'কম্রিয়া স্ট্রীল ওয়ার্কস'-এর তৈরী ইস্পাতের সামগ্রীর মত সে কঠিন। আর মানুষ হিসাবে খাঁটিও ঠিক তেমনই। আমাদের প্লেট গ্লাস পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী বলেই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। কোন একজন যখন নিজের শহরে অবস্থান করে তখন তার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য ভদ্র জীবন যাপন করা আর প্রচলিত আইন কানুন অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলা।

তাঁর সঙ্গে আমার যখন চির রাত্রির শহরে প্রথম পরিচয় হয়, তখন তার জীবনবোধ, সাহিত্য, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে তার মতামতের কথা আমার বিন্দুবিসর্গও জানা ছিল না। তাঁর সঙ্গে আমার যখন, যেখানেই মুখোমুখি দেখা হয়েছে অন্য প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনা হয়েছে। এবার দেখা হতেই সে বলল—আমাকে কিছুদিনের মধ্যেই কোকটাউনে চলে যেতে হচ্ছে। ব্যবসা বাণিজ্য খুবই ভাল চলছে।

পেস্কুড জুতোর ডগা দিয়ে ফেলে-দেওয়া বইটাকে দূরে সরিয়ে দিতে দিতে চরম বিতৃষ্ণার সঙ্গে সে বলল—আচ্ছা, বেস্ট সেলার আখ্যা দিয়ে যেসব বই বাজারে বিক্রি হচ্ছে তার দু'-একটা পড়ার দুর্ভাগ্য তোমার হয়েছে কি? আমার কাছে শোন, এসব বইয়ের নায়ক আমেরিকার কোন না কোন এক টাকার কুমীর। শিকাগো শহর থেকে আসাও অসম্ভব নয়। আবার এমনও হতে পারে, ইউরোপ থেকে আগতা কোন মেয়ের প্রেমে মজে বাবার রাজ্যে ফিরে চলেছে। তারা সবাই যেন একে, অন্যের কার্বন কপি। অধিকাংশ সময়েই শিকাগো বা নিউইয়র্কের একান্ত বাধ্য নগরটা কোন

কোটিপতি গমের দালাল, নতুবা ওয়াশিংটনের কোন এক কাগজের সংবাদদাতা। তবে যারা রাজকন্যাদের রাজপুত্রের সন্ধান আর বন্দী করে আপন করে ধরে নিয়ে আসার জন্য পাঠিয়ে দেয়, তাদের, উদ্দেশ্য রাজারাজরা ও অভিজাত সম্প্রদায়ের দলে যাতে মাথা গলাতে পারে।

আর যদি সে রকম কোন বেস্ট সেলার সংগ্রহ করে পড়ে নিতে পার, তবে দেখতে পাবে কোন এক ভয়ঙ্কর কাণ্ড কারখানার মধ্য দিয়ে কাহিনীটা দ্রুত পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

ইতিমধ্যেই পেস্কুড মেঝে থেকে বেস্ট সেলারটা হাতে তুলে নিয়েছে। এবার বইটার একটা পাতার বিশেষ একটা জায়গার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল—এখান থেকে কিছুটা অংশ পড়ছি, শোন, বাগানের একান্ত নির্জন প্রান্তে টিউলিপ আর ট্রাভেলিয়ান রাজকুমারী আইডার সঙ্গে প্রেমালাপে মগ্ন।

টিউলিপ রাজকুমারী আইডাকে লক্ষ্য করে বলছে—শোন প্রিয়তমা, পৃথিবীর সুন্দরতম আর মধুরতম ফুলের মধ্যে তুমি, হ্যাঁ তুমিই শীর্ষ স্থানীয়া। তাই বলছি কি, এমন কথা আর মুখেও এনো না। তুমি আকাশের ফুল, আমি তো নেহাৎই আমি। তা সত্বেও আমি তো একটা মানুষ বটে। সাহসের ওপর নির্ভর করে কিছু করার মত মনোবল আমার অবশ্যই আছে। আমি এক মুকুটহীন রাজা। তবে আজও আমার কাছে এমন সব অস্ত্রশস্ত্র আছে যার সাহায্যে বিশ্বাসঘাতক ষড়যন্ত্রীদের কবল থেকে আনায়াসেই গুটজেন ফস্টেটিনকে মুক্ত করতে পারি।

মুহূর্তের জন্য নীরবতা অবলম্বন করে সে আবার মুখর হল—কী আশ্চর্য ব্যাপার, বল তো! শিকাগো শহরের একজন মানুষ তরবারী নাচিয়ে মুক্তির বাণী প্রচার করে চলেছে! একী আর তার মত একজনের দ্বারা সম্ভব, বল তো?

আমি তার কথার পৃষ্ঠে বললাম—জন, আমার বিশ্বাস, তোমাকে আমি বুঝতে পেরেছি। তোমার বক্তব্য, উপন্যাস লেখকরা তাদের লেখায় দৃশ্যপট ও চরিত্রের মধ্যে সঙ্গতি রক্ষা করুক, ঠিক বলি নি? অর্থাৎ ইতালির কাউন্টদের সঙ্গে মন্টানোর রাখাল, তুরস্কের পাশাদের সঙ্গে ভেরমন্টের চাষাভুষা, সিনমিনাটির চোলাই মদের কারবারীদের সঙ্গে ভারতবর্ষের রাজারাজরাদের অথবা ইংরেজ ডিউকদের সঙ্গে দ্বীপপুঞ্জবাসী খননকারীদের মিলিয়ে মিশিয়ে গুলিয়ে না ফেলে—ব্যস, এটুকুই বলতে চাইছি।

আবার সমাজের সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মানুষদের সঙ্গে সাধারণ কারবারীদের কথা বলতে চাইছি—নতুন করে কথাটা পেস্কুড যোগ করল। শোন ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতে চাইছি না, মানুষে মানুষে পার্থক্য মানে সমাজের শ্রেণীভেদ আছে আর থাকবেও। মানুষের প্রবৃত্তিই হচ্ছে নিজের নিজের শ্রেণীর সঙ্গে মিশে থাকা। আর তারা তো করেও। একটা কথা কিছুতেই আমার মাথায় আসে না। মানুষ কাজ করতে নেমে কেন হাজার হাজার ওরকম বই কিনতে উৎসাহী হয়। বাস্তবে তো এমন কোন ছিটেল আমাদের চোখে পড়ে না, আবার শুনিওনি কোনদিন।

আমি নির্দ্বিধায় বললাম—আমার একটা কথা শোন জন, বহুদিন যাবৎ কোন বেস্ট সেলার বই পড়তে পাই নি। হতে পারে, এ ব্যাপারে আমার ধারণাটাও তোমারই মত। যাক, এবার তোমার নিজের কথা কিছু বল। আগেকার সে কোম্পানিটাতেই কাজ টাজ করছ, নাকি?

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই সে বলতে লাগল—হ্যাঁ। আরে তোমার সঙ্গে সেই যে দেখা হয়েছিল তারপরই আমার বেতন হঠাৎ লাফিয়ে দ্বিগুণ হয়ে যায়। আর সে সঙ্গে একটা কমিশনও পাই। ইস্ট-এন্ড অঞ্চলে এক চিলতে জমি কিনে ছোট্ট একটা বাড়িও করেছি। শুনছি, আগামী বছর কোম্পানি আমার কাছে কিছু শেয়ার বিক্রি করবে। কে নির্বাচিত হতে পারল তা নিয়ে আমার কোনই মাথা-ব্যথা নেই। লাফিয়ে লাফিয়ে আমি উন্নতির চরম শিখরের দিকে এগিয়ে চলেছি। ব্যস এটুকই যথেষ্ট।

আমি কোনরকম ভূমিকা না করে, সরাসরি প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলাম—একটা কথা জন, জীবন-সঙ্গিনী, মানে প্রেমিকা জুটিয়ে নিয়েছ কি?

সরবে হেসে পেস্কুড বলে উঠল—আরে ধ্যুৎ। কথাটা তোমাকে বলাই হল না। তবে প্রেম-ভালবাসার ব্যাপার স্যাপার নয়। ভাল, ব্যাপারটা তবে তোমাকে খোলসা করেই বলছি—

কথা বলতে বলতে একটু নড়েচড়ে আয়েশ করে বসে পেস্কুড বলতে শুরু করল—ধৈর্য ধরে

শোন, প্রায় আঠার মাস আগেকার কথা, আমি সিন্‌সিনাটি হয়ে দক্ষিণ দিকে এগোচ্ছিলাম। তখন গীর্জার ধারে এক রূপসী তন্বী যুবতীর দিকে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হল। তার রূপের আভায় চোখ যেন ঝলসে দিচ্ছিল। সে কিন্তু কোনদিনই আমার নজরে পড়েনি। কারো কারো মতে হয়ত সে উচ্ছ্বসিত হবার মত সুন্দরী না-ও হতে পারে। কিন্তু আমি হলফ করেই বলতে পারি, জীবন-সঙ্গিনী করার মত রূপের অধিকারী সে। ডাকটিকিট, গাড়ি আর রুমাল প্রভৃতির ছেলেমানুষী করার মত মানসিকতা আমার কোনদিনই ছিল না। আর সেও এসব নিয়ে মাথা ঘামাত না। সে একটা বইয়ের মধ্যে মুখ গুঁজে বসেছিল। আমি আড় চোখে বারবার তার রূপ-সৌন্দর্য উপভোগ করছিলাম। শেষ অবধি ব্যাপারটা জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠল। তার সঙ্গে বাক্যালাপে আমি তেমন উৎসাহী ছিলাম না। তবে অস্বীকার করতে পারব না, আমার প্লেট-গ্লাসের কারবার কিছুদিনের জন্য শিকেয় উঠল। ব্যস, একই চিন্তা মাথায় অনবরত চক্কর মারতে লাগল।

সে রূপসী সিনসিনাটিতে গাড়ি বদল করল, লুইস্‌ভিলের গাড়িতে চাপল। তারপর সেখান থেকে নতুন করে টিকিট কেটে সেলবিভিল, ফ্র্যাংকনোর্ড আর লেক্সিনটন হয়ে ক্রমে এগোতে লাগল। যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করে আমি তার সঙ্গে এঁটুলির মত সেঁটে এগোতে লাগলাম, যাকে বলে ছায়ার মত অনুসরণ করা। তবে তার নজরের বাইরে থাকতেই আমি সাধ্যমত প্রয়াস চালাতে লাগলাম। তবে এ-ও খুবই সত্য যে, তাকে মুহূর্তের জন্যও চোখের আড়াল হতে দেই নি।

ভার্জিনিয়ার প্রায় শেষ প্রান্তের ছোট্ট একটা স্টেশনে বিকাল প্রায় ছ'টায় সে ট্রেন থেকে নামল। শ' চারেক কালো মানুষ আর পঞ্চাশটার মত বাড়ি ছাড়া সেখানে কিছুই চোখে পড়ল না। আর যা কিছু পড়ল তা হচ্ছে লাল মাটির ছড়া ছড়ি, বিন্দু বিন্দু দাগওয়ালা কুকুর আর গোটা কয়েক খচ্চর।

দীর্ঘাকৃতি এক বৃদ্ধ তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল। তার মাথায় ধবধবে সাদা এক রাশ চুল আর মুখ পরিষ্কার ও উজ্জ্বল। বৃদ্ধ লেখক মেয়েটার ছোট থলেটা হাতে নিয়ে নিল। তারপর কাঠের সেতু পেরিয়ে আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথ-বেয়ে উঠে যেতে লাগল। আমি আড়াল-আবডাল দিয়ে তাদের অনুসরণ করতে লাগলাম।

ঝোঁপ ঝাড়ের ফাঁক দিয়ে পাহাড়ের প্রায় শীর্ষদেশে একটা বিশালায়তন বাড়ি আমার নজরে পড়ল। প্রায় এক হাজার ফুট ওপরে। বাড়িটার সামনের ফটক দিয়ে তারা ভেতরে ঢুকে গেল। ওয়াশিংটনের ক্যাপিটাল-এর মত সুবিশাল না হলে বাড়িটা হয়ত আমার চোখেই পড়ত না।

আমি স্বগতোক্তি করলাম—আমাকে তো ওখানেই যেতে হবে। কিন্তু মেয়েটার বেশভূষা দেখে তো মনে হয় সাধারণ ঘরের। কিন্তু ওটা হয় লাট সাহেবের বাংলো, নতুবা বিশ্ব মেলার কৃষি ভবন জাতীয় কিছু। তার চেয়ে বরং গ্রামের মানুষের কাছ থেকে বা পোস্ট মাস্টারের কাছ থেকে ওটার সম্বন্ধে জেনে আসি।

আমি কাঁধ থেকে নমুনার বাক্সটা নামিয়ে মালিকের কাছে বক্তব্য পেশ করলাম—আমি প্লেট-গ্লাসের ব্যাপারী। অর্ডার নিতে এসেছি। যদি দরকার—

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই সে বলে উঠল---না হে, প্লেট-গ্লাস আমার দরকার নেই। কাঁচের গুড়ের পাত্র একটা যদি থাকে দিতে পার।

এরকম কথাবার্তার মাধ্যমে তার সঙ্গে ভাব জমাতে চেষ্টা করলাম।

লোকটা আমার কথার জবাব দিতে গিয়ে বলল--- সে কি হে, আমার তো ধারণা ছিল পাহাড়ের ওপরের ওই বাড়িটায় কে থাকে তা সবারই জানা আছে। আরে মশাই কর্নেল এলিনের নাম শোনেন নি? ভার্জিনিয়ার---না, কেবলমাত্র ভার্জিনিয়ারই নয়, সব জায়গার মধ্যে তিনি রুচিবান ও রীতিমত একজন ধনকুবের বলে পরিচিত। শুধু কি এই? যুক্তরাষ্ট্রের প্রাচীনতম পরিবার হিসেবেও তাদের খ্যাতি কম নয়। তার মেয়েই ইলিনয় থেকে ফিরল। সেখানে তার অসুস্থ মাসিকে দেখতে গিয়েছিল।

হোটেলে নাম লিখিয়ে আমি তৃতীয় দিনে সেই যুবতীকে ধরতে পারলাম। সে উঠোনে পায়চারি করছিল। কিভাবে আলাপ শুরু করব বুঝতে না পেরে মাথা থেকে টুপিটা নামিয়ে বললাম—মাফ করবেন, মিঃ হিংকলের বাড়িটা—

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই সে বলে উঠল—মিঃ হিংকল? বাচটনে ও নামে কেউ থাকে না বলেই আমি জানি। আচ্ছা, তার গায়ের রঙ কি খুব ফর্সা?

না। পিটস্‌বার্গ থেকে অহেতুক এখানে ছুটে আসি নি।

পিটস্‌বার্গ? বাড়ি থেকে অনেক দূরে চলে এসেছেন দেখছি।

এ তো সামান্য, আরও হাজার মাইল হলেও আমি পিছ পাও হতাম না।

মেয়েটা ঠোঁটের কোণে দুষ্টুমিভরা হাসি ফুটিয়ে তুলে বলল—তাই বুঝি? কিন্তু সেল্‌বিভিল থেকে ট্রেনটা ছাড়ার সময় হঠাৎ আপনার ঘুম ভেঙে না গেলে তো আসাই হত না।

সে মুহূর্তেই যুবতীর মুখে উঠোনের ফুটন্ত গোলাপের মত রক্তিম ছোপ ছড়িয়ে পড়ল। তার কথা শোনার পর ব্যাপারটা আমার মনে পড়ে গেল, যুবতীটা কোন্ ট্রেনে উঠে দেখার জন্য সেল্‌বিভিল স্টেশনের বেঞ্চে বসে অপেক্ষা করার সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সত্যি ঘুমটা হঠাৎই ভেঙে গিয়েছিল, বাঁচোয়া।

সাধ্যমত সম্ভ্রম এবং আগ্রহের সঙ্গে আমি তার কাছে সব ব্যক্ত করলাম। খোলাখুলিই সব তাকে বললাম। আর এ-ও খোলসা করেই বললাম, তার সঙ্গে পরিচিত হবার লোভেই এতটা পথ পাড়ি দিয়েছি। আর এও গোপন করলাম না যে, আমাকে যাতে তার ভাল লাগে সে প্রয়াস চালাতেও আমি চেষ্টার কোন ত্রুটি করিনি।

সে মুচকি হেসে বলল—দেখুন মিঃ পেস্কুড, এর আগে কেউ-ই এমন সহজভাবে ও মন খুলে আমার সঙ্গে কথা বলে নি। ভাল কথা, আপনার নামটা যেন কি বললেন?

জন এ. পেস্কুড।

আমার কথাটা শেষ হতে না হতেই সে গলা ছেড়ে হাসতে লাগল। এক সময় হাসি থামিয়ে সে বলল—মিঃ পেস্কুড, আর একটু দেরী করলেই আপনি পৌহাটান স্টেশনে ট্রেনটা ধরতে পারতেন না।

এটা আপনি জানলেন কি করে, বলুন তো?

সে হঠাৎ 'আপনি' থেকে 'তুমি'-তে পৌঁছে গিয়ে বলল—বুঝলে মানুষের মন খুব নোংরা। তুমি যে প্রতিটা ট্রেনেই ছিলে আমার অজানা ছিল, ভেবেছ? ভেবেছিলাম ট্রেনেই আমার সঙ্গে তুমি কথা বলবে। সে চেষ্টা করনি বলে আমি খুবই খুশি হয়েছি।

এবার সে বিশালায়তন ওই বাড়িটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলল—ওই দেবদারু-আবাসনের এলিন পরিবার একশ' বছর ধরে বাস করে। এটায় পঞ্চাশটা কামরা আছে। আমাদের প্রাসাদটার মতই আমাদের বংশ-গৌরবও কোন অংশে কম নয়। আর আমার বাবা এক নাইটের উত্তরসূরী। আরও বলছি শোন, আমার বাবা একজন ঢাকীকে কিছুতেই দেবদারু-আবাসনে প্রবেশাধিকার দেবেন না। যদি কোনক্রমে জানতে পারেন আমি বেড়ার ওপর দিয়ে কারো সঙ্গে বাক্যালাপ করেছি তবে আমাকে ঘরে তালা দিয়ে দেবেন।

তুমি কি আমাকে বাড়িতে ঢুকতে দেবে?

না, তোমার সঙ্গে আমার কোন কথাই নেই। কারণ, তোমার সঙ্গে তো কেউই আমার পরিচয় করিয়ে দেয় নি। এটা প্রথা বিরুদ্ধ। বিদায়।

আমি বললাম—আগামীকাল আমি কিন্তু নাইট মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করার জন্য আসব।

আসবে? এস, বাবা শিকারী কুকুর তোমার দিকে লেলিয়ে দেবেন। হো-হো রবে হেসে সে বলল।

তবে কুকুরের দৌড়ের ক্ষমতা কিন্তু বেড়েই যাবে। কারণ, আমি একজন জবরদস্ত শিকারী।

না, আর নয়। এবার আমাকে যেতেই হবে। আসলে তোমার সঙ্গে কথা বলতে যাওয়াটাই আমার উচিত হয়নি। আমি চললাম।

যাবেই যখন তখন তোমাকে ধরে রাখার ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু তোমার নামটাই তো জানা হল না। বিদায় নেবার আগে তোমার নামটা বলে যাবে না?

দু'ঠোঁটের ফাঁকে হাসি ফুটিয়ে তুলে বলল—আমার নাম জেসি। সে বিদায় নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে

বে-পাত্তা হয়ে গেল।

পরদিন সকাল এগারোটা বাজতে না বাজতেই আমি সুবিশাল বাড়িটার দরজায় ঘণ্টাটা বাজালাম। প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা তীর্থের কাকের মত দাঁড়িয়ে থাকার পর ইয়া লম্বা এক নিগ্রো এসে দরজা খুলে সামনে দাঁড়াল। আমার ব্যবসা সংক্রান্ত কার্ডটা তার হাতে দিলাম। সে বাড়ির ভেতরে চলে গেল। একটু বাদেই সে আবার দেখা দিল। আমাকে অভ্যর্থনা করে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেল।

কর্নেল এলিন দরজা ঠেলে ঘরের ভেতরে, আমার সামনে এলেন। তিনি ঢুকতেই ঘরটা যেন উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেল। তবে তার গায়ে আগের দেখা সেই পোশাক যেটা গায়ে দিয়ে স্টেশন থেকে মেয়েকে আনতে গিয়েছিলেন। ঘরে ঢুকে তিনি মুচকি হেসে আমাকে বসতে বললেন। আমি একটা অক্ষরও গোপন না করে তাঁর কাছে সব কিছু খুলে বলতে গিয়ে বললাম, কেমন করে আমি সিন্‌সিনাটি থেকে তার মেয়ে জেসির পিছু নিয়েছিলাম। আমার জীবনযাত্রা প্রণালী, চাকরি, বেতন আর ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনার কথা বলতেও বাদ দিলাম না। গোড়ার দিকে আমার আশঙ্কা ছিল তিনি হয়ত রেগেমেগে আমাকে জানালা দিয়েই ছুঁড়ে দেবেন। কথা বলার ফাঁকে সুযোগমত তাকে পশ্চিমী কংগ্রেসী ভদ্রলোকটার পকেট-বুক আর সদ্য বিধবাকে হারাবার গল্পটা শুনিয়ে দিতেও ভুললাম না। গল্পটা শুনে তাঁর মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল। আমি নিঃসন্দেহ যে, দেওয়ালে টাঙানো তাঁর পূর্বপুরুষদের ফটোগুলো আর ঘোড়ার লোমে তৈরী সোফাগুলো যেন বহুদিন পর হাসির রোল শুনতে পেল।

দু'ঘণ্টা ধরে আমরা মুখোমুখি বসে মন-খোলা আলোচনা করলাম। তার কাছে একটামাত্র সুযোগ আমি প্রার্থনা করলাম। ফলে যদি ওই বেঁটেখাটো যুবতীটার মন জয় করতে না পারি তবে অহেতুক কালক্ষয় না করে আমি সোজা হাঁটা জুড়ব। ভবিষ্যতে আমি মুহূর্তের জন্যও আর কর্নেলকে বিরক্ত করব না।

আমার সব কথা ধৈর্য ধরে শোনার পর তিনি এবার মুখ খুললেন—রাজা প্রথম চার্লসের আমলে স্যার কোর্টেনে পেস্কুড নামে কোন এক ভদ্রলোক ছিলেন।

হতে পারে। তবে আমার বংশের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল বলে আমার অন্তত জানা নেই. দাবীও করছে। আমরা বংশ পরম্পরায় পিটস্‌বার্গের ধারে কাছেই বাস করছি। প্রাচীন 'স্লোকি' শহরে যেকোন লোককে জিজ্ঞেস করলেই আমাদের বিষয়ে সব জানতে পারবেন। একটা কথা, আপনি কি কোনদিন, কারো মুখে তিমি শিকারের জাহাজের কাপ্তেনের গল্পটা শুনেছেন? ওই যে নাবিককে দিয়ে যিনি প্রার্থনার বাণী বলাবার জন্য প্রাণান্ত প্রয়াস চালিয়েছিলেন।

কপালের চামড়ায় চিন্তার ভাঁজ এঁকে তিনি বললেন—কই, এমন সৌভাগ্য আমার কোনদিন হয়েছে বলে তো মনে পড়ছে না।

আমি তাঁকে গল্পটা শোনালাম। সেটা শোনার পর তিনি হাসতে হাসতে মেঝেতে গড়াগড়ি যাবার জোগাড় হলেন। আমিও তাঁকে একজন খদ্দের ভেবে বসলাম। অতএব কাঁচের বাসনপত্র বেশ কিছুই তাঁকে গছানো যাবে!

তিনি হঠাৎ বলে বসলেন—মিঃ পেস্কুড, একটা কথা তো খুবই সত্য যে হাসির গল্প কথাই তো একজনের সঙ্গে অন্যের বন্ধুত্ব গড়ে তোলে। আপনি যদি আগ্রহী হন তবে একটা শেয়াল শিকারের গল্প আপনাকে শোনাতে চাই। আর ঘটনার সঙ্গে আমি নিজেও জড়িয়ে আছি। গল্পটা অবশ্যই আপনাকে আনন্দ দান করবে।

আমার আগ্রহের কথা শুনে তিনি বেশ রসাল করে দিয়ে গল্পটা বললেন। ঘড়ি ধরে দেখলাম, চল্লিশটা মিনিট ধরে তিনি একনাগাড়ে গল্পটা বললেন। সেটা শুনে আমার হাসি যেন আর থামতেই চাচ্ছিল না। তিনি আমাকে কাছে পেয়ে যে খুবই খুশি হয়েছেন বুঝতে পারলাম—যখন দেখলাম তিনি নিগ্রো পরিচারককে পাঠিয়ে হোটেল থেকে আমার চামড়ার ব্যাগটা আনালেন। এবার থেকে আমি দেবদারু আবাসনেই বাস করতে লাগলাম।

পর পর দুটো সন্ধ্যা সুযোগের সন্ধানে থাকার পর এক সময় জেসিকে একা পেলাম। তার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়ে বললাম—...কের সন্ধ্যাটা চমৎকার, তাই না?

আমার কথার জবাব না দিয়ে সে বলল—বাবাও আসছেন। আজ তিনি তোমাকে 'বুড়ো নিগ্রো আর কাচা' তরমুজের গল্পটা শোনাবেন। তার গল্প ফুরোবার নয়। একবার তো তুমি পুলস্কি শহরে প্রায় পড়েই যাচ্ছিলে।

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। আমার খুব মনে আছে। সিঁড়ি থেকে পা হড়কে গিয়েছিল। আর একটু হলেই পড়ে গিয়ে হাড়গোড় ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যেত।

আমি জানি। আমি—আমি তো ভয়ে একেবারে কুঁকড়েই গিয়েছিলাম। সত্যি জন, আমি খুবই ভয় পেয়েছিলাম।

ব্যস, তার পরই সে সজোরে এক লাফ দিয়ে জানালা পথে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল।

* * *

কোকটাউন। গাড়ির গতি কমতে কমতে থেমে যেতে লাগল। পেস্কুড ধীরে হাতে নিজের মালপত্র আর টুপিটা তুলে নিল।

জন বলল—এক বছর পেরোতে না পেরোতেই আমি তাকে বিয়ে করে ঘর বাঁধলাম। তোমাকে একটু আগে বললাম, ইস্ট এন্ড-এ জমি কিনে ছোট একটা বাড়ি করেছি। বৃদ্ধ নাইট মশাই, মানে ওই কর্নেলও সে বাড়িতেই বাস করছেন। বাইরে বাইরে কিছুদিন ঘুরে আমি যখন বাড়ি ফিরি, তখন তিনি দরজায় দাঁড়িয়ে থাকেন। দেশ-বিদেশ থেকে যদি কোন নতুন গল্পের সূত্র পেয়ে থাকি সেটা শোনার জন্যই আমার প্রতি তাঁর এত আগ্রহ।

গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরের প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি ফেরালাম। উঁচু একটা পার্বত্য এলাকা জুড়ে কোকটাউনটা গড়ে উঠেছে। মুষলধারে বৃষ্টি নামলে পাথর আর কালো মাটির গা-বেয়ে জলধারা রেলপথে নেমে আসে।

আমি বললাম—জন তুমি তো এখানে কারবার জমাতে পারবে না। পৃথিবীর এ শেষ প্রান্তে তোমার প্লেট-গ্লাস খরিদ করার মত লোকই নেই।

এ কী বলছ! এই তো দিন কয়েক আগেই জেসি' কে নিয়ে ফিলাডেলফিয়া থেকে বেরিয়ে এলাম। সে ফিরে এসে বলল, সেখানে নাকি সে জানালায় রাখা পেটুনিয়া ফুলের চারা দেখতে পেয়েছে। ভার্জিনিয়ার পুরনো বাড়িতে ঠিক যেমন চারা সে লাগাত। তার জন্য কয়েকটা কাটিং নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা আছে। তাই রাত্রিটা এখানেই থেকে যাব ভাবছি। আমরা এখানেই থাকছি। বিদায় হে বুড়ো। ঠিকানা তো তোমাকে দেওয়াই আছে। সময় সুযোগ পেলে এখানে এসে আমাদের দেখে যেও, কেমন?

ট্রেনটা আবার চলতে লাগল। বৃষ্টি শুরু হল। আমি বেস্ট সেলারটাকে যত্ন করে ট্রেনের মেঝেতেই যত্ন করে সরিয়ে রাখলাম নইলে ভিজে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল. আমি ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়ে তুললাম, মনে পড়ে গেল যে, জীবনের তো কোন ভৌগোলিক পরিমাণ বা পরিমাপ কোনটাই নেই। আমি বললাম—ট্রাভেলিয়ান, তোমার ভবিষ্যৎ জীবন সুখের হোক। আর তুমি যেন তোমার প্রেয়সীর জন্য পিটুনিয়া ফুলের চারার সন্ধান পাও।

থিম্বল, থিম্বল

চামড়ার বেল্ট আর কারখানার মালপত্রের সংস্থা 'কার্টেরেট অ্যান্ড কার্টেরেট' কোম্পানির অফিসটার পথ-নির্দেশ হচ্ছে—ব্রডওয়ে থেকে নাক বরাবর এগিয়ে গেলে পার হবেন ক্রসটাউন নামক লেন, ডেড লেন আর ব্রেডলেন। সেখান থেকে বাঁ দিকে বাঁক নিতে হবে, তারপর ডানদিকে, ঠেলাগাড়ি পেরিয়ে যাবেন, চারটে ঘোড়ায়টানা দু'টনের ঠেলাগাড়িটা পার হয়েই লাফাতে লাফাতে একটা শৈলশিরার ওপর উঠেই তার গায়ে পাথর আর লোহার তৈরি একশ তলার একটা বাড়ি। সেটারই বারো তলায় পাওয়া যাবে 'কার্টেরেট অ্যান্ড কার্টেরেট' কোম্পানির অফিস।

আর তারা যে কারখানায় চামড়ার বেল্ট আর কারখানার দ্রব্য সামগ্রী তৈরী করে তার অবস্থান

ব্রুকলীন-এ। ব্রুকলীনের কথা যদি বাদও দেওয়া যায় তবে এসব সামগ্রীর ব্যাপারে আপনাদের তিলমাত্র আগ্রহও থাকবে না। তাই পুরো ব্যাপারটাকে একটা এক অঙ্কের নাটকের একটামাত্র দৃশ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখব। এর ফলে পাঠকের পরিশ্রম অনেকাংশে কম লাগবে আর প্রকাশকের খরচও কমে যাবে। তাই বলছি কি, চারটে টাইপ করা পৃষ্ঠা 'কার্টেরেট' অ্যান্ড কার্টেরেট' কোম্পানির পিওন পার্সিভালের সামনে গিয়ে দাঁড়াবার মত বুকের পাটা যদি আপনার থেকে থাকে তবে অফিসের ভেতরে একটা চেয়ারে বসে পড়ুন। আর বুড়ো কালো মানুষ, শিকারী কলের প্রহরী আর খোলাখুলি ব্যাপার স্যাপার নিয়ে লেখা নাটকটা চোখের সামনে মেলে ধরুন।

নাটকটা শেষ হলেই আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন, এর বেশীর ভাগ লেখাই পরলোকগত মিঃ ফ্রাংক স্টকটনের গল্প থেকে ধার করে নেওয়া হয়েছে।

গোড়াতেই একটা জীবনী আপনাকে পড়তে হবে। আমি চিনির প্রলেপ দেওয়া কুইনাইন বড়ির বিপরীত নিয়মে বিশ্বাস রাখি। আমি তেতো প্রলেপটাকেই বাইরে রাখতে আগ্রহী। এতে আপনি অবাক হলেও আমার কিছু বলার নেই।

এক প্রাচীন ভার্জিনিয়া পরিবারের উত্তরসূরী এ কার্টেরেটরা। বহু, বহুদিন আগে কার্টেরেটরা গিলে-করা ফিতের শার্ট ব্যবহার করতেন। কেউ বাগিচার মালিক ছিলেন, কেউ ধাতুর সাত বাহন করতেন আর ক্রীতদাসদের আগুনে পুড়িয়ে মারতেন। কিন্তু যুদ্ধ তাদের সর্বনাশ করে দিয়ে গেছে। তাদের প্রচুর বিষয় সম্পত্তি রয়ে গেছে।

কথা দিচ্ছি, কার্টেরেটদের অতীত কাহিনী ঘাটাঘাটি করতে গিয়ে আমি অবশ্যই আপনাদের যোলশ'কুড়ি খ্রীষ্টাব্দের আগের কথা শোনাব না। সে বছরই দু'জন আসল আমেরিকান সেফ্লাওয়ার জাহাজে কার্টেরেট এদেশে পদার্পন করেছিলেন। তবে তারা দুটো আলাদা আলাদা জাহাজে চেপে এসেছিলেন। সেফ্লাওয়ার জাহাজে যে ভাই এসেছিলেন তিনি তীর্থযাত্রী যাজক ছিলেন। বহু পত্র-পত্রিকার প্রচ্ছদে আপনারা নিশ্চয়ই তার ছবি দেখে থাকবেন। আর অন্য ভাইয়ের নাম ব্ল্যান্ডফোর্ড কার্টেরেট। তিনি নিজেরই দুই মাস্তুলের জাহাজে চেপে সাগর পাড়ি দেন। নেমেছিলেন ভার্জিনিয়ার উপকূলে। আর এফ. এফ. ডি. হয়েছিলেন। আর তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল আত্ম-অহঙ্কার, শিকার, মিষ্টি পানীয় আর ক্রীতদাসদের সাহায্যে চাষবাসের মালিক হিসাবে। তাঁর চাষ-আবাদ ছিল এলাহী ব্যাপার।

ব্যস তারপরই গৃহযুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। এ ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোর বিবরণ সংক্ষেপে মোটামুটি এরকম—স্টোনওয়াশ জ্যাকসন গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারালেন, লী আত্মসমর্পণ করলেন, বিশ্বভ্রমণে বেরোলেন গ্রান্ট, জিম-ক্রো গাড়ি আবিষ্কৃত হল, তুলোর দাম আকাশছোঁয়া হল আর ওল্ড-ক্রো হুইস্কির দাম অস্বাভাবিকভাবে চড়ে গেল। আর এখান থেকেই আপনাদের গল্পটা শুরু হয়েছে।

গৃহযুদ্ধ শুরু হবার বহু আগেই ইয়াংকি কার্টেরেটরা ব্যবসা শুরু করেছিলেন। কারখানার মালপত্র সরবরাহ এবং চামড়ার বেল্ট সরবরাহের ব্যাপারে এটুক বলাই যথেষ্ট যে, তাদের পরিবারটা ছিল বদরাগী ও রীতিমত উদ্ধত প্রকৃতির।

ডিকেন্স-এর বইয়ে আপনারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যে চা-আমেরিকানদের কাহিনী পেয়েছেন, ঠিক তাদেরই যুদ্ধ চলার সময় আর তারপরে ব্ল্যাকফোর্ড কার্টেরেট তার চাষের জমি, শিকার, মিষ্টি পানীয় খোয়ালেন। শেষমেশ তাকে জীবনটাও হারাতে হয়েছে। তিনি তার উত্তরসূরীদের জন্য কি রেখে গেলেন? সামান্য কিছু জমিজিরাত আর তার বংশের মান সম্ভ্রম—অহংকার।

তারপরের ঘটনা মোটামুটি এরকম যে, পনের বছরের পঞ্চম ব্যান্ডফোর্ড কার্টেরেট উক্ত নামের চামড়ার কারখানার মালপত্র সরবরাহ আর চামড়ার বেল্ট কোম্পানির একটা শাখার তরফ থেকে উত্তর অঞ্চলে গিয়ে কারবার শেখার আমন্ত্রণ পেল। শেয়াল-শিকার করা, দরিদ্র পরিবারের খুবই সামান্য পরিমাণ জমি জিরাত আর পূর্বসূরীদের জন্য অহংকার করা প্রভৃতি তাকে ছেড়ে দিতে হবে। সুযোগ হাতের মুঠোয় পেয়ে ছেলেটা তাকে কাজে লাগাল। পঁচিশ বছর বয়সেই সে পঞ্চম জনের সমান অংশীদার হিসাবে উক্ত সংস্থার দপ্তরে বসতে পারল। এখান থেকেই আমাদের গল্প আবার নতুন করে আরম্ভ হল।

দুই যুবক। তারা একই বয়স্ক। উভয়ের কথাবার্তা আর চালচলন সবই সাদামাঠা। আবার সব ব্যাপারেই দৈহিক আর মানসিক শক্তি ধারণ করে। আর পোশাক-আশাকে নিউইয়র্কের অন্য দশটা যুবকের মতই ফিটফাট—তা করণিক বা কোটিপতি যেই হোক না কেন।

ব্ল্যান্ডফোর্ড কার্টেরেট এক বিকেলে চারটের সময় প্রতিষ্ঠানের নিজের ঘরে বসে একটা চিঠি খুলল। একটু আগেই কোন এক করণিক চিঠিটা তার ডেস্কে রেখে গেছে। চিঠিটা পড়া শেষ করে সে পুরো একটা মিনিট ধরে সরবে হাসতে লাগল। তার হাসি শুনে জন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল।

এক সময় হাসি থামিয়ে ব্ল্যান্ডফোর্ড জনকে লক্ষ্য করে বলল—আমার মায়ের চিঠি। এর মজার ছত্র ক'টা তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি। পাড়ার সবার খবরাখবর দেওয়ার পর আমাকে সতর্ক করে দিয়েছেন ভুলেও যেন পা ভিজে না রাখি আর সুযোগ পেলেই যেন সঙ্গীতবহুল হাসির নাটক দেখতে যাই। এবার দিয়েছেন, শূকরছানা, গরু আর মোষের খবরাখবর। তারপরই আছে ফসলের হিসাব।

তারপর যা লিখেছেন তা মোটামুটি এরকম—আমরা কি ভাবছি! যে, ছিয়াত্তর বছরের বুড়ো জ্যাক কাকাও ভ্রমণে যাবেনই। না গিয়ে কিছুতেই নাকি ছাড়বেন না। নিউইয়র্কে গিয়ে তিনি মাস্টার ব্ল্যান্ডফোর্ট-এর সঙ্গে মোলাকাত করবেনই। এ বয়সেও তার জ্ঞানবুদ্ধি নষ্ট হয় নি। তাই মা আপত্তি করেন নি। কাকার কথাবার্তা ও হাবভাব দেখে মায়ের মনে হয়েছে, তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা যা কিছু সবই এ বিশ্ব-পর্যটনে কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে। আমার তো জানাই আছে যে, সে বাড়িতেই তাঁর জন্ম। আর সেখানকার পরিবেশ ছেড়ে কোনদিন দশ মাইল দূরবর্তী কোন স্থানে যান নি। আর যুদ্ধ চলাকালে তিনিই আমার বাবার দেহরক্ষী হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। আর তাঁর সেবক বলতে তিনিই ছিলেন। তা ছাড়া তিনি আমাদের পরিবারের একজন একনিষ্ঠ সেবক ও প্রজা ছিলেন। আমার বাবার আর তাঁর বাবারও সে সোনার ঘড়িটা ছিল সেটা প্রায়ই নেড়েচেড়ে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেন। মা তাকে বলেছিলেন, ঘড়িটা আমার। একথা শোনার পর তিনি মায়ের কাছে বহু অনুনয় বিনয় করেছেন, তিনি নিজে এসে হাত ঘড়িটা আমার কাছে পৌঁছে দেওয়ার অনুমতি দেন।

তাঁর অনুরোধে মা হাত-ঘড়িটা তার হাতে দিয়েছেন। সেটা আমাকে দেওয়ার জন্য নিয়ে আসছেন। মায়ের ইচ্ছা, আমি যেন এখানে তার থাকার সুবন্দোবস্ত করি। তার বেশী যত্নের কথা আমাকে ভাবতে হবে না। তিনি নিজের কাজকর্ম নিজেই করে নিতে পারেন। মা খবরের কাগজ পড়ে জানতে পেরেছেন আফ্রিকান বিশপ আর কালো রাজা-রাজরাদের নাকি এ ইয়াংকি শহরে থাকা-খাওয়া খুব কষ্ট হয়। তাঁর মাথায় আসছে না, ভাল-ভাল হোটেলগুলোতে জ্যাক কাকাকে কেন থাকতে দেওয়া হবে না। আর এটাকে এখানকার নিয়ম বলেই মনে করছেন।

জ্যাক কাকা যাতে আমাকে খোঁজ করে বের করতে পারেন তার বিস্তারিত পথ-নির্দেশ মা তাকে দিয়ে দিয়েছেন। আর নিজের হাতে তার থলেটা গুছিয়ে দিয়েছেন যাতে তাঁকে নিয়ে আমাকে কোন সমস্যায়ই পড়তে না হয়। আর তাঁর যাবতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা আমি অবশ্যই করে দেব, এ বিশ্বাসটুকু আমার মায়ের আছে আর যে ঘড়িটা তিনি আমাকে দেবেন সেটা যেন আমি তাঁর হাত থেকেই নেই—ওটা একটা সম্মানের প্রতীক। ছোট্ট কার্টেরেটরাই ঘড়িটা পড়ত, অথচ এত হাত বদলেও সেটায় একটা আঁচড় পর্যন্ত পড়েনি, একটা চাকাও ভুল চলে নি। আমি যেন মনে করি, সেটাকে আমার কাছে নিয়ে আসার ব্যাপারটা তাঁর কাছে খুবই বড় একটা খুশির। মাও অন্তর থেকে ভেবেছেন, আরও দেরী হবার আগেই ছোট্ট এ সফরের আনন্দটা ভোগ করুন।

মা আর যা লিখেছেন, আমি তো বহুবারই তাঁর মুখ থেকে শুনেছি, কিভাবে মারাত্মক রকম আহত হয়েও জ্যাক কাকা রক্তেভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে প্রায় বুকে-হেঁটে চান্সেলার্সভিলে পৌঁছে গিয়েছিলেন, যেখানে আমার বাবা বুকে বুলেট বিদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন, আর সে-ঘড়িটাকে ইয়াংকিদের কবল থেকে রক্ষা করতে তার পকেট থেকে তুলে এনেছিলেন।

তাই মা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, বুড়ো জ্যাক কাকা যখন আমার কাছে পৌঁছবেন তখন যেন তাঁকে সে আমলের জীবন ও বাড়ির একজন ভঙ্গুর অথচ যোগ্য সংবাদ-বাহক হিসেবেই দেখি।

তারপর মা আর যা লিখেছেন তা হল—আমি এখন দীর্ঘকাল বাড়িঘর ছেড়ে দূরে চলে এসেছি,

আর এত বেশীদিন এখানকার মানুষের মধ্যে কাটাচ্ছি যাদের তাঁরা সবাই বিদেশী বলে মনে করছেন। জ্যাক কাকা আমাকে দেখলে চিনতে পারবেন কিনা এ বিষয়ে মা যথেষ্ট সন্দেহ পোষণ করছেন। তবে আমার কাকার দৃষ্টিশক্তি খুবই প্রখর, তাই মা বিশ্বাস করছেন যে, একজন ভার্জিনিয়া কার্টেরেটকে সে দেখামাত্র তিনি চিনে ফেলবেন। মা তো ভাবতেই পারছেন না, ইয়াংকি দেশে দশ বছর কাটালেও তাঁর ছেলের এত পরিবর্তন হতে পারে। তবে তিনি নিঃসন্দেহ যে, তাঁর দেশে আমি অবশ্যই জ্যাক কাকাকে দেখেই চিনতে পারব। জ্যাক কাকার থলেতে মা আঠেরোটা ডলার দিয়ে দিয়েছেন। তিনি যাতে ঠিক ঠিক জিনিস কেনাকাটা করতে পারেন সেদিকে আমি যেন নজর দেই। আর এও লিখেছেন, তাঁকে নিয়ে আমার কোন অসুবিধাই হবে না।

আমি যদি তেমন ব্যস্ত না থাকি তবে জ্যাক কাকাকে একটা পছন্দ মাফিক থাকার জায়গা জোগাড় করে দেই যেখানে তিনি যবের রুটি আর সাধারণ খাবার দাবার পান। আর বিশেষ করে লিখেছেন, তাকে যাতে আমার অফিসে এবং রাস্তা ঘাটে জুতো খুলতে না হয়, সেদিকে আমি যেন সতর্ক থাকি।

আমার হাতে যদি সময় থাকে, অর্থাৎ খুব বেশী ব্যস্ত না থাকি তবে তার রুমালগুলো যখন ধোপার বাড়ি থেকে ধোয়ার পর ফেরৎ আসবে তখন যেন সেগুলো ভালভাবে গুণে দেই। তিনি যাত্রা করার আগে মা একডজন রুমাল কিনে দিয়েছেন। আর এ চিঠি যখন আমার হাতে আসবে ততদিনে তিনি হয়ত আমার এখানে পৌঁছে যাবেন। মা তাকে বারবার বলে দিয়েছেন, এখানে পৌঁছোবার পর তিনি যেন সরাসরি আমার অফিসে চলে আসেন।

ব্র্যান্ডফোর্ড চিঠিটা পড়া শেষ করামাত্র এমন একটা ঘটনা ঘটল যা গল্পে এরকমটা ঘটা উচিত আর মঞ্চে তো ঘটা চাই-ই চাই।

অফিসের পিওন পার্সিভাল ঘরে ঢুকল। যথোচিত অভিবাদন সেরে বলল, স্যার, বাইরে একজন কালো ভদ্রলোক অপেক্ষা করছেন। তিনি মিঃ ব্র্যান্ডফোর্ড কার্টেরেট-এর দর্শনপ্রার্থী।

ব্র্যান্ডফোর্ড এক ঝটকায় চেয়ার ছেড়ে উঠে কণ্ঠস্বরে ব্যস্ততা প্রকাশ করে বলল, যাও, তাড়াতাড়ি তাঁকে ভেতরে নিয়ে এসো।

জন কার্টেরেট পার্সিভালকে বলল, তুমি বরং এক কাজ কর, তাকে মিনিট কয়েক বাইরে অপেক্ষা করতে বল। কখন তাঁকে ভেতরে নিয়ে আসবে আমি তা বলে দেব। কথাটা বলে সে ভাইয়ের দিকে ফিরে বলল, ব্র্যান্ড, তোমাদের দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষদের দৃঢ় বিশ্বাস। উত্তরের মানুষদের আর তোমাদের মধ্যে একটা পার্থক্য বর্তমান। আর সেটা সম্বন্ধে ধারণা নেওয়ার একটা অত্যুগ্র কৌতূহল আমার ভেতরে সদা জাগ্রত থাকে। তোমরা সে আদমকে তোমাদের পূর্বপুরুষদের একটা প্রতিদ্বন্দ্বী শাখা জ্ঞান কর তা আমি বুঝি। কিন্তু এর কারণটা কিছুতেই আমার মাথায় আসে না। কেন যে আমাদের মধ্যে এ পার্থক্য তা কিছুতেই বুঝতে পারি না।

শোন জন, শুধুমাত্র পার্থক্যটাই তোমার মাথায় ঢোকে না। আমার বিশ্বাস, যে সামন্ততান্ত্রিক জীবন আমরা কাটাই সেটাই আমাদের মনে জমিদার-সুলভ মানসিকতা আর অপরকে অবজ্ঞা করার প্রেরণা জাগিয়ে তুলেছে।

সে যা-ই হোক, কিন্তু এখন তো আর তুমি সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব অন্তরে পোষণ কর না। আমরা তোমাদের চেটে খেয়েছি আর খচ্চরগুলোকে গায়েব করে দিয়েছি আর তুলোগুলো আত্মসাৎ করেছি বলে তোমাদের গায়ে গতরে খেটে রুটির জোগাড় করতে হচ্ছে। ঠিক যেভাবে আমরা গৃহযুদ্ধের আগে করেছি। তোমরা যুদ্ধের আগে যেমন আত্মম্ভরী ছিলে আজও ঠিক তেমনিই রয়ে গেছ। অতএব আর্থিক সঙ্গতিকে এর কারণ হিসেবে দাঁড় করানো যায় না।

এমনও হতে পারে নিগ্রোরাই আমাদের আবহাওয়াকে বিষাক্ত করে দিয়েছে।

আবহাওয়াই এর জন্য দায়ী হতে পারে। আর তা যদি না-ই হয়, তবে হয়তো নিগ্রোরাই আমাদের নষ্ট করে দিয়েছে। জ্যাক বুড়োকে ভেতরে আসতে বলছি। তাকে দেখলে আমি হয়তো একটু আনন্দ পাব।

জন তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, এত উতলা হোয়ো না, একটু অপেক্ষা কর। আমার মতবাদটাকে একটু যাচাই করে দেখতে চাচ্ছি। আমরা দু'জনে অবিকল একই রকম দেখতে না হলেও, প্রায় একই

রকম। জ্যাক বুড়ো তোমাকে পনের বছর বয়সে শেষবার দেখেছেন, তারপর আর দেখেন নি। তাই আমি পরীক্ষা করতে চাই, তিনি ঘড়িটা কার হাতে দেন। কালো মানুষ বুড়োটা নিশ্চয়ই তার ছোট মাস্টারকে সনাক্ত করতে পারবেন। এক ইয়াংকির হাতে অবশ্যই ভুল করে ঘড়িটা দেবেন না। আর একটা শর্ত থাকবে, যে এ পরীক্ষায় হারবে সে জরিমানাস্বরূপ আজকের রাতের খাবারের দাম দেবে। আর সাড়ে পনের ডলার দমের দু'ডজন রুমালের দাম দিতে হবে জ্যাক বুড়োকে, রাজি?

জন-এর প্রস্তাবে ব্ল্যান্ডফোর্ড সানন্দে সম্মত হয়ে গেল।

এবার পার্সিভাল আগন্তুক কালো বুড়োটাকে ভেতরে নিয়ে এল। বুড়ো খুবই সন্তর্পণে অফিস ঘরে ঢুকল। একজন বেঁটেখাঁটো মানুষ। আলকাতরার মত কালো তার গায়ের রঙ। কোঁচকানো চামড়া। মাথায় ইয়া বড় টাক, কেবলমাত্র দু'কানের কাছে এক গোছা পাকা চুল। ডান হাতটা মুঠো করা। মনে হল কিছু একটা জিনিস লুকিয়ে রেখেছেন।

ঘরের ভেতরে ঢুকেই বুড়ো জ্যাক থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। দশ ফুট ব্যবধানে বসে থাকা যুবক দুটোর দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকালেন। উভয়ের দৃষ্টিই জ্যাক-এর দিকে।

বুড়ো জেফ নিঃসন্দেহ যে, যুবক দুটোর মধ্যে এমন একজন আছে যে সে সম্ভ্রান্ত পরিবারের মানুষ যাদের সৌভাগ্য দিয়ে তাঁর নিজের জীবন গড়া আরম্ভ হয়েছিল। আর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের সান্নিধ্যেই কাটবে।

যুবকদ্বয়ের মধ্যে একজন উদ্ধত কার্টেরেট চরিত্রের ধারক ও বাহক। আর দ্বিতীয় জন দীর্ঘ ও খাড়া পারিবারিক নাকের অধিকারী।

বাড়ি থেকে বেরোবার মুহূর্তে বুড়ো জ্যাক-এর নিশ্চিত ধারণা ছিল উত্তরের হাজার যুবকের মধ্য থেকে তিনি তাঁর যুবক মনিবকে অনায়াসেই সনাক্ত করতে পারবেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখছেন, এ-তো বড় কঠিন সমস্যা। এরকম পরিস্থিতিতে একটা কৌশল অবলম্বন করাকেই শ্রেয় বাঁচার উপায় মনে করলেন।

তিনি উভয় যুবককে মাঝামাঝি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে মুচকি হেসে বলে উঠলেন, মার্স ব্ল্যান্ডফোর্ড। কেমন আছ, ভাল তো?

দু'জনই সমস্বরে জবাব দিল, আরে, জ্যাক কাকা যে! কেমন আছেন। বসুন, বসুন। ঘড়িটা এনেছেন কি?

বুড়ো জ্যাক মুচকি হেসে একটা চেয়ার টেনে বসলেন, আর মাথা থেকে টুপিটা খুলে মেঝেতে রেখে দিলেন। হাতের ঘড়িটাকে হাতের মুঠোয় আরও শক্ত করে ধরলেন। এ ঘড়িটাকেই রক্ষা করার জন্যই তো তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে লড়াই করেছিলেন সেটাকে তো আর বিনা যুদ্ধে, হাসিমুখে শত্রুপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব নয়—কিছুতেই নয়।

হ্যাঁ, মার্স ব্ল্যান্ডফোর্ড, ঘড়িটা আমার হাতের মুঠোর মধ্যেই আছে। এক মিনিটের মধ্যেই আমি সেটা তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি। মনিবানি আমাকে বার বার বলে দিয়েছেন, পারিবারিক গৌরব ও মর্যাদার কথা বিবেচনা করে তুমি যেন ঘড়িটা হাতে পড় বাছা। জান, এক বুড়ো নিগ্রোর পক্ষে দশ হাজার পথ পাড়ি দেওয়া আবার পুরনো ভার্জিনিয়াতে ফিরে যাওয়া খুবই কষ্টসাধ্য। ছোট-মনিব, তুমি এখন অনেক বড় হয়েছ। একটা কথা কি জান বাছা, বুড়ো মনিবের সঙ্গে তোমার চেহারার সঙ্গে অবিকল সাদৃশ্য না থাকলে আমার পক্ষে তোমাকে চেনা সম্ভবই হত না।

বুড়ো কালো মানুষটার চোখ দুটো অত্যাশ্চর্যভাবে যুবকদ্বয়ের মাঝখানে চক্কর মারতে লাগল। আর এমনভাবে কথাগুলো বলতে লাগল যা উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে। তার একমাত্র লক্ষ্য একটা স্মারকচিহ্নের খোঁজ করা।

জন আর ব্ল্যান্ডফোর্ড একে, অন্যের দিকে তাকিয়ে নীরবে চোখ টিপল।

বুড়ো জ্যাক আবার মুখ খুলল, আমার বিশ্বাস, মায়ের দেওয়া চিঠিটা ইতিমধ্যেই তোমার হাতে এসেছে।

হ্যাঁ, পেয়েছি। জন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল। তোমার আসার খবরটা আমি আর ভাই উভয়েই জানতে পেরেছি। আমরা যে উভয়েই কার্টেরেট তা তো আর তোমার অজানা নয়।

ব্ল্যান্ডফোর্ড বলল, আর আমরা একজন উত্তর অঞ্চলে জন্মেছি আর বড়ও হয়েছি সেখানেই।

জন বলল, তাই তুমি ঘড়িটা দাও।

ব্ল্যান্ডফোর্ড জনকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই বলে উঠল, আমি আর আমার ভাই।

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জন বলল, তবেই ভেবে দেখ জ্যাক কাকা।

ব্ল্যান্ডফোর্ড বলল, জ্যাক কাকা, তোমার থাকার জন্য একটা ভাল ঘরের ব্যবস্থা করে রেখেছি।

জ্যাক কাকা অত্যাশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে অকস্মাৎ হো-হো শব্দে হেসে উঠে বললেন, আমি দেখছি, এবার মাথার টুপিটাকে সামান্য তুলে অদ্ভুতভাবে একদিকে সামান্য কাৎ করে দিল। তারপর যন্ত্রচালিতের মত চোখের মণি দুটোকে উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে চক্কর মারতে মারতে বলল, আমি কি দেখছি, বল তো? লক্ষ্য করছি, তোমরা দু'জনে এক বুড়ো নিগ্রোর সঙ্গে রসিকতায় মেতেছ। কিন্তু জ্যাক বুড়োকে ধোকা দেওয়া তোমাদের কাজ নয়।

ব্ল্যান্ডফোর্ড, তোমাকে এক ঝলক দেখেই আমি চিনতে পেরে গেছি। তোমার বয়স যখন বড় জোর বছর চৌদ্দ তখন তুমি বাড়ি ছেড়ে এসেছিলে। তবু প্রথম দর্শনেই তোমাকে আমি সনাক্ত করে ফেলেছি। আরে বাবাজীবন, তুমি যে বুড়ো কত্তার এক জীবন্ত প্রতিমূর্তি বুঝতে পেরেছ অন্য জনের সঙ্গেও তোমার চেহারার অনেকটাই সাদৃশ্য রয়েছে। তবে খুবই সত্য যে জ্যাক বুড়োকে ধাপ্পা দিতে পার নি, জেনে রাখ।

তখন উভয়ে কার্টেরেটই ঘড়িটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। জ্যাক বুড়োর মুখের হাসিটুকু মিলিয়ে গিয়ে হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে গেল। সে ধরেই নিল, তারা তাকে বোকা বানাবার চেষ্টায় মেতেছে। সে ভেবে দেখল, হাত দুটোর মধ্যে যেটাতেই পারিবরিক সম্পদটাকে দিক তাতে কোনই হেরফের হবে না। সে সঙ্গে এ-ও ভাবল যে, শুধুমাত্র তার আত্মম্ভরিতা আর বিশ্বস্ততাই নয়, ভার্জিনিয়ার কার্টেরেট বংশের বহুরকম ঝুঁকিই এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। যুদ্ধ চলাকালীন অস্ত্র হাতেই অন্য আর একটা দল সম্পর্কে বহু কথাই সে শুনেছিল। আর শুনেছিল তারা উত্তর অঞ্চলের বাসিন্দা আর অন্য পক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। কথাটা শোনার পর দীর্ঘ সময় তার মন প্রাণ অস্বাভাবিক বিষিয়েছিল। তার পুরনো মনিব রাজকীয় বিলাস ব্যসন আর যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে চরম আর্থিক দুরবস্থায় পড়ে গেছে। সবই ঘটেছে তার চোখের সামনেই। আর বৃদ্ধ মনিবানি সরল বিশ্বাসে তার হাতে তুলে দিয়েছেন শেষ স্মারকটা। আর তার ওপর দায়িত্ব বর্তেছে, সেটাকে এমন একজনের হাতে তুলে দিতে হবে—যে প্রকৃত দাবীদার। আর সে ঘড়িটাকে নিয়মিত দম দেবে যার ফলে এটা টিক্-টিক্ শব্দের মাধ্যমে ভার্জিনিয়ার কার্টেরেট পরিবারের সুসময়ের কথা অনবরত ঘোষণা করে চলবে।

বুড়ো জ্যাক এমুহূর্তে দু'দুটো যুবককে ঘড়িটার দিকে হাত বাড়াতে দেখতে পাচ্ছে। উভয়েরই চেহারা ছবি আর পোশাক পরিচ্ছদ ভদ্রজনোচিত। আর উভয়ের আচরণই মার্জিত। তাদের মধ্যে যে কোন একজন তার বাঞ্ছিত সে যুবক। নিজের দুর্বল বিচক্ষণতার জন্য সে যারপরনাই ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হল। অনন্যোপায় হয়ে সে তার এ কৌশলটা ছেড়ে অন্য পথ ধরার চিন্তা করল। ঘামে ভিজে যাওয়া ঘড়িসমেত হাতটাকে টেনে নিল। এবার গভীর অনুসন্ধিৎসু নজরে যুবকদ্বয়ের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করল, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কিছু না কিছু আছেই। দেখল, একজনের কালো নেকটাইয়ে একটা সাদা মুক্তোর স্টিকপিন আটকানো আছে। আর দ্বিতীয় জনের নেকটাইটার রঙ নীল। তার গায়ে আটকে দেওয়া হয়েছে একটা কালো মুক্তোর স্টিকপিন। অতএব রুচির হেরফের তো কিছু না কিছু আছেই।

ঠিক সে মুহূর্তেই আরও সুযোগ জ্যাক বুড়োর হাতে এসে গেল। পার্সিভাল ছোকরাটা ঘরে ঢুকে নীল টাই আর কালো স্টিকপিনওয়ালা যুবকটার টেবিলে রাখল। তার গায়ে ছাপার অক্ষরে লেখা অলিভিয়া ডি-আরমন্ড।

এবার কালো নেকটাই আর সাদা স্টিকপিনওয়ালা যুবকটা বেশ একটু কড়া স্বরেই বলল, তোমার সঙ্গে আর পারার উপায় নেই ভাই! তাকে কাছে ডেকে এনে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করে ফেললেই তো ল্যাটা চুকে যায়।

যুবকদের মধ্যে একজন বলল, জ্যাক কাকা, আপনার চেয়ারটা ওদিকে সামান্য একটু টেনে নিলে অসুবিধে হবে? জরুরী একটা ব্যাপারে এক মহিলা আমার দর্শনপ্রার্থী। আমাদের ব্যাপারটার

নিষ্পত্তি একটু পরেই না হয় করব।

মিনিট খানেকের মধ্যেই পরমা সুন্দরী এক মেয়ে ঘরে ঢুকল। গায়ে দামী পোশাক পরিচ্ছদ মাথার টুপিটার গায়ে একটা উটপাখির পালক গুঁজে দেওয়ায় তার রূপ যেন বহুলাংশে খোলতাই হয়েছে।

মিস ডি. আরমন্ড ঘরে ঢুকে কালোহীরের স্টকপিন আঁটা নীল নেকটাই পরিহিত যুবকটার টেবিলের সামনের চেয়ারটা দখল করে বসল। আবহাওয়ার কথা দিয়ে আলোচনা শুরু করল তারপর বলল, বেশী দেরী করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সংক্ষেপে কথা সেরে আমি বিদায় নেব

মিস আরমন্ড, আমার ভাই উপস্থিত থাকলে আমাদের আলোচনা চলতে পারবে কি।

অবশ্যই! অবশ্যই! বরং আমার ইচ্ছা ; তিনি আমাদের পাশে উপস্থিত থেকে সব কথ খোলাখুলি শুনলে আমাদের বরং ভালই হবে। তিনি ঘটনার একমাত্র সাক্ষী। ঘটনাস্থলে তিনি তে উপস্থিত ছিলেন।

কালো নেকটাই-এ সাদা স্টিকপিন আঁটা যুবকটা বলল, আচ্ছা, আপনি কি কোন প্রস্তাব উত্থাপন করতে আগ্রহী?

অবশ্যই। কারণ, প্রস্তাবটা যে আমার কাছেই এসেছে। সবার আগে সেটাই মীমাংসা করা হোক মিস আরমন্ড দৃঢ়তার সঙ্গেই কথাটা ছুঁড়ে দিল।

নীল নেকটাইওয়ালা যুবকটা বলল, আমি যতদূর শুনেছি, তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কালো নেকটাইওয়ালা যুবকটা বলে উঠল—

কিছু মনে কোরো না ভাই, প্রসঙ্গটা আমাকেই শুরু করতে দাও। প্রায় দু'মাস আগের কথা, আমরা ছ'-সাতজন মোটরগাড়ি চেপে গ্রামের দিকে বেড়াতে গিয়েছিলাম। পথের ধারের একটা বাড়িতে রাতের খাবার খেতে বসে আমার ভাই আপনার কাছে বিয়ের প্রস্তাব রেখেছিল। অস্বীকার করার উপায় নেই, আপনার রূপের মোহে মুগ্ধ হয়েই সে এ কাজ করতে বাধ্য হয়েছিল। আপনার রূপের বাহার যে অনন্য তা তো আর কেউ অস্বীকার করতে পারবে না, আপনিই বলুন?

মিস আরমন্ড মুচকি হেসে বলল, আপনি খবরের কাগজের সংবাদদাতা হলে আমার অশেষ সুবিধা মিঃ কর্টেরেট।

কালো নেকটাইওয়ালা এবার বলল, 'মিস আরমন্ড, আপনি তো রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেন, ঠিক কিনা? আর একটা কথা, আপনার অনুরাগীর সংখ্যাও কম নয়। আর তাদের কেউ কেউ আপনার কাছে প্রস্তাবও হয়তো রাখে। আমার ভাই যে আপনাকেও বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল তা আমাদের অস্বীকার করার উপায় নেই, ঠিক কিনা? এবার একটা কথা সত্যি করে বলুন তো পরদিন সকালে সে প্রস্তাব কি খেলো হয়ে যায় এমন অভিজ্ঞতা কি আপনার কোনদিন হয়নি? সন্ধ্যার যত বোকামি সবই পরদিন মাথা থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

হ্যাঁ, এরকম অভিজ্ঞতা আমার আছে, মিস আরমন্ড বলল, সত্যি কথা বলতে কি এরকম খেলায় কিন্তু আমি কম অভ্যস্ত নয়। তবে যখন আমি মামলাটার দায়িত্ব নিয়েছি তখন আমার কিছু বক্তব্য অবশ্যই আছে। ওই একই প্রস্তাবের পুনরাবৃত্তি করা এবং পুনরাবৃত্তি করা চিঠি আমার হাতে এসেছে।

কালো নেকটাই পরিহিত যুবকটা একটু কড়া স্বরেই বলল, সবই বুঝতে পেরেছি। এবার খোলসা করে বলুন তো চিঠিগুলোর জন্য আপনি কি পরিমাণ ডলার আশা করছেন?

মিস আরমন্ড বলল, দেখুন মশাই, আমি বাজারের সস্তা মেয়ে নই। আপনাদের পরিবারেরও যথেষ্ট সামাজিক মর্যাদা আছে। তাই বলছি কি, অর্থকড়ির ব্যাপারটা এক্ষেত্রে আসল ব্যাপার নয়। বিশ্বাস করুন, আমি তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করেছি। তাছাড়া তাকে আমার ভালও লেগেছে।

এসব বাজে কথা রেখে সাফ কথা বলুন, কত ডলার আপনি চাচ্ছেন?

অন্তত দশ হাজার ডলার।

যদি মেনে না নেওয়া হয়, তবে?

তবে বিয়ের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নেওয়া হোক।

নীল নেকটাই পরিহিত যুবকটা এবার মুখ খুলল, অনেক কথাই তো শুনলাম। এবার আমি কিছু বলতে চাই, আমি এমন এক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত যারা চিরকাল সমাজের বুকে মাথা উঁচু করেই

চলে আসছে। তুমি গ্রামে মানুষ হলেও আমরা উভয়েই কার্টেরেট, কথাটা তো আর মিথ্যে নয়? তবে এ সত্য যে, আমাদের চালচলন আর পারিবারিক জীবনে কিছু না কিছু পার্থক্য তো আছেই আছে। তবে আমাদের ঐতিহ্য হচ্ছে মহিলার ব্যাপার স্যাপারে কোন কার্টেরেটই বীরের ধর্ম থেকে সরে দাঁড়ায় না। তারা যদি কাউকে মুখ ফুটে কোন প্রতিশ্রুতি দেয়, তবে পরিস্থিতি যা-ই থাক তা রক্ষা করতে পিছিয়ে যায় না।

নীল নেকটাই পরিহিত যুবক এবার সরাসরি মিস আরমন্ডকে লক্ষ্য করে বলল—অলিভিয়া, মন খোলসা করে বল তো, কবে, কত তারিখে তুমি আমাকে বিয়ে করতে উৎসাহী?

যুবতীটা মুখ খোলার আগেই কালো নেকটাইওয়ালা যুবকটা বলে উঠল, নরযোক উপসাগর আর প্লিসাথ পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে গত তিন শতকে কত পরিবর্তনই না হয়ে গেছে। আজ আমাদের সমাজে ক্রীতদাসকে পাত্তা দেই না, ডাইনিদের জ্যান্ত পুড়িয়ে মারি না। মহিলাদের যেমন সিংহাসনে বসাই না, আবার কাদায় ফেলে চটকাইও না। আজকের যুগ বুদ্ধি আর সমন্বয়ের যুগ। সবকিছু আজ জানতে শিখেছি, বুঝতে শিখেছি। 'বীরধর্ম' শব্দটার অর্থ আজ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যা রোজই কিছু না কিছু পরিবর্তিত হচ্ছে।

কালো নেকটাই পরিহিত যুবকটা একটা চেকবই টেনে নিয়ে খস্ খস্ করে একটা চেক লিখে ফেলল। চোখের পলকে বই থেকে চেকের পাতাটা ছিঁড়ে ফেলল। এবার সেটাকে মিস আরমন্ড-এর হাতের কাছে রেখে দিয়ে বলল, আমি ব্যবসাকে ব্যবসা বলেই মনে করি। আর বাসও করি ব্যবসার জগতেই। চেকটায় ডলারের পরিমাণ লেখা আছে দশ হাজার। এবার মিস আরমন্ড-এর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, মিস আরমন্ড, এবার খোলসা করে বলুন তো, আপনি কমলা লেবুর ফুল, নাকি নগদ আশা করছেন?

মিস আরমন্ড মুখে কিছু না বলে, চেকটা তুলে নিয়ে নিজের বটুয়াটার ভেতরে চালান দিয়ে দিল। তারপর শান্ত স্বরে বলল, ঠিক আছে, এতেই হবে। আরে মেয়েদেরও তো মন বলে একটা পদার্থ আছে মশাই। আপনাদের দু'জনের মধ্যে একজন চিত্রশিল্পী। আমি ভাবছি আপনাদের মধ্যে কে, সে শিল্পী? কথাটা বলেই উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে সে সোজা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। আকস্মিক এ ব্যাপারটায় বুড়ো জ্যাক-এর ব্যাপারটা তাদের কারো মাথায়ই ছিল না।

যুবতী আরমন্ড ঘর ছেড়ে গেলে বুড়ো জ্যাক ঘরে ঢুকেই বলল, ছোট মনিব, তোমার প্রাপ্য ঘড়িটা নাও। সে পরিবারের প্রকৃত মালিকের হাতে ঘড়িটা দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

দ্য হাইডিং অব ব্ল্যাক বিল

এক কৃষকায় অতচ শক্তিমান লোক লস পিনোস স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে অনবরত পা দুলিয়ে চলেছে। তার মুখটা লাল আর ঠোঁট দুটো উঁচু। আর রক্তজবার মত লাল চোখ দুটোর ওপর ধবধবে সাদা ভুরু দুটোকে আরও সাদা দেখাচ্ছে। তার প্রায় গা ঘেঁষে মোটাসোটা একটা লোক বিষণ্ণমুখে ধীরস্থিরভাবে বসে। তাদের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে তাদের উভয়ের মধ্যে হৃদ্যতার সম্পর্ক বর্তমান—বন্ধু।

মোটাসোটা বিষণ্ণ লোকটা কথা প্রসঙ্গে বলল, 'হ্যাম, তোমার ব্যাপার কি বল তো? চার চারটে বছর তোমার দেখাই নেই, বে-পাত্তা হয়ে কোথায় কাটিয়ে এলে, জানতে পারি কি?

টেক্সাসে। সেখানে কোন্ পরিস্থিতিতে ছিলাম সবই তোমাকে বলব, কিছুই গোপন করব না। থাক, আমার নিরুদ্দেশের কথা তোমাকে খোলসা করেই বলছি—ইন্টারন্যাশনাল থেকে এক ভোরে একটা জলাশয়ের পাশে নেমে পড়লাম। জায়গাটায় পশু খামারের ছড়াছড়ি। আর নিউ ইয়র্ক শহরের তুলনায় বস্তিবাড়ির সংখ্যাও অনেক অনেক বেশী। তবে শহর থেকে কুড়ি মাইল দূরে বস্তিগুলোর অবস্থান। ফলে খাদ্য দিয়ে উদর পূর্তি করে তার গন্ধ তোমার নাকে এসে যন্ত্রণার কারণ হবে না।

স্টেশন ঘর থেকে বেরিয়ে কোন রাস্তা চোখে না পরায় আমি মাঠের ভেতর দিয়েই চলতে

লাগলাম। মাঠঘাট বন বাদাড় পেরিয়ে কুড়ি মাইল রাস্তা পেরিয়ে একটা পশু-খামারে হাজির হলাম। ছোট্ট খামার বাড়ি।

দু'পা এগিয়ে যেতেই একটা বেঁটেখাটো মানুষকে দরজায় পা ঝুলিয়ে বসে এক মনে সিগারেট তৈরী করে চলেছে। পরনে সাদা শার্ট এবং বাদামী রঙের ঢিলে পাজামা। গোলাপী রংয়ের একটা রুমাল গলায় জড়িয়ে রেখেছে।

আমি যথোচিত অভিবাদন সেরে বললাম, মশাই, এক নবাগত লোককে কিছু জলখাবার আর বেতনাদি দিয়ে একটা কাজ দেওয়া সম্ভব কি?

লোকটা ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, আসুন, আগে ভেতরে আসুন। আশ্চর্য ব্যাপার, আপনার ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ তো শুনতে পাই নি!

আপনি যাঁর কথা বলছেন, তিনি এখনও এসে পৌঁছায়নি। আমি মঠের ভেতর দিয়ে পায়ে হেঁটে চলে এসেছি। আসলে কারো বোঝা হয়ে ওঠা আমার চরিত্র বিরুদ্ধ। একটু জল হবে কি?

জল? আপনার গায়ে তো দেখছি, আধ ইঞ্চি পুরু হয়ে ধূলো বালি জমেছে।

মশাই আমি চাচ্ছি খাবার জল, স্নানের জন্য নয়।

লাল রঙের একটা ঝোলানো জলের পাত্র নামিয়ে আমার হাতে দিতে দিতে লোকটা বলল, আপনি কাজ, মানে চাকরি খুঁজছেন?

হ্যাঁ। দেশের এদিকটা খুবই নির্জন নিরালা, তাই না?

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। লোকের মুখে শোনা যায়, কোন কোন সময় সপ্তাহের পর সপ্তাহে কোন মানুষকে এ পথে যাতায়াত করতে দেখা যায় না। আমি সবে, মাত্র এক মাস আগে এখানে এসে মাথা গুঁজেছি। পুরনো এক অধিবাসীর কাছ থেকে খামারটা কিনে নিয়েছি। সে লোকটা আরও ভেতরে চলে যেতে আগ্রহী।

দেখুন আমি বিভিন্ন রকম কাজ জানি। আমার একটা চাকরি দরকার, এটাই আপাতত আমার একমাত্র সমস্যা।

ভেড়া চরাতে পারবেন, মানে রাজি আছেন?

হয়তো পেরে যাব। আসলে একমাত্র ভেড়া চরানোর কাজটাই আমি কোনদিন করিনি। তবে আসার সময় ট্রেনের জানালা দিয়ে অনেককেই ভেড়া চরাতে দেখেছি বটে। তবে কাজটাকে তেমন ভয়ঙ্কর কিছু মনে হয় নি।

খামারের মালিক বলল—দেখুন মশাই, ভেড়া চবাবার একটা লোক আমি খুঁজছি। মেক্সিকোর মানুষের ওপর নির্ভর করা যায় না। মাত্র দু'পাল ভেড়ার মালিক আমি। সকালের জন্য মাত্র আটশ' ভেড়া আমার পাশে আছে। যদি রাজি থাক সেগুলোর দায়িত্ব তোমাকে দিতে পারি, মানে তুমি নিতে পার। বিনা পয়সায় আহাবদি পাবে আর মাসে নগদ পাবে বারো ডলার। তৃণভূমিতে একটা তাঁবুর মধ্যে তোমাকে রাত্রি বাস করতে হবে। কাঠ জল প্রভৃতি তোমার তাঁবুতে পৌঁছে দেওয়া হবে। রান্নাবান্না তোমাকে নিজের হাতে করে নিতে হবে, বুঝলে?

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম—ঠিক আছে, আমি রাজি।

ব্যস, পরদিন ভোরে এক পাল ভেড়া তাড়িয়ে নিয়ে মাইল দুয়েক এক পাহাড়ের লাগোয়া তৃণভূমিতে নিয়ে গিয়ে চরাতে লাগলাম।

আমি ভেড়ার পাল নিয়ে যাত্রা করার পূর্বমুহূর্তে ভেড়ার মালিক আমাকে কয়েকটা নির্দেশ দিতে গিয়ে বলল, 'রাত্রি অন্ধকার নেমে আসার আগেই আমি নিজে গিয়ে তোমার থাকার তাঁবু আর খাবারদাবার পৌঁছে দিয়ে আসব, তোমার ভাববার কিছুই নেই।

ভাল কথা। রেশনের কথাটা যেন ভুলে যাবেন না। আপনার নাম তো জলি কফার, ঠিক কিনা?

না, হেনরি ওগ্‌ডেন আমার নাম।

আর আমার নাম পার্সিভাল সেন্ট ক্রেয়ার।

আমি চিকুইটো পশু খামারে পাঁচদিন ভেড়া চরাবার চাকরি করলাম। ব্যস, তখনই অরণ্যের প্রতি আমার মনে আকর্ষণ ভেড়াগুলোর চেয়ে অনেক বেশী পছন্দ মাফিক সঙ্গী দেখেছি। রোজ ভোর হতেই ভেড়ার পাল নিয়ে চরাতে যাই আর সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলে তাদের খোয়াড়ে

ফিরিয়ে নিয়ে আসি। তারপর নিজে হাতে ছাগ-মাংস, গমের রুটি আর কফি রান্না করে আহারাদি সারি। টেবিল ক্লথের মত ছোট একটা তাঁবুতে শুয়ে শুয়ে ভেড়ার ডাক শুনি।

পঞ্চাশ দিনের কথা বলছি। সেদিন সন্ধ্যায় ভাল, অর্থাৎ দামী ভেড়াগুলোকে খোঁয়াড়ে ঢুকিয়ে তালাবন্ধ করে আমি পশু খামারের দিকে হাঁটতে লাগলাম। সেখানে পৌঁছে পশুপালকের ঘরে ঢুকে গেলাম। কোন রকম ভূমিকা না করেই তাঁকে বললাম—মশাই, আপনার আর আমার মধ্যে একটা হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে ওঠা দরকার বলে আমি মনে করছি। প্রকৃতির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা আর মানুষের জন্য আট ডলার মূল্যের পোশাক পরিচ্ছদ সরবরাহ করার জন্য ভেড়ার পালের দরকার আছে বলে আমি অন্তত মনে করছি। তবে এক টেবিলে বসে গল্পগুজব করা বা আগুনের পাশে বসে মজলিস করার ব্যাপারে তাদের সঙ্গদান বড়ই বে-মানান। আপনার কাছে তাস, অন্য কোন খেলার সরঞ্জাম বা ধাঁধার কোন বইপত্র থাকলে বের করুন, কিছুটা মনের খোরাক হবে।

বাস্তবিকই হেনরি ওগ্‌ডেন নামক পশুপালক একজন বিচিত্র প্রকৃতির লোক। তার আঙুলে অনেকগুলো আংটি ঝকমক করছে, হাতে ইয়া বড় একটা সোনার ঘড়ি, আর সুন্দর একটা নেকটাই গলায় বাঁধা। আর চশমাটাও সব সময় কম ঝকমক করে না। সত্যি বলতে কি তখন এক পবিত্র সাধুসন্ত, পুরনো পাপীর সঙ্গ আমার কাম্য। ভেড়া ছাড়া কোন মানুষকে পেলে যেন আমি আকাশের চাঁদ হাতে পেয়ে যাই, এমনই আমার মনের অবস্থা।

হেনরি ওগ্‌ডেন হাতের বইটা নামিয়ে রেখে বললেন, শোন সেন্ট ক্লেয়ার, তোমার প্রথম প্রথম খুবই নিঃসঙ্গ লাগছে, আমি বুঝছি। আর এ কাজটা যে আমার কাছেও একঘেয়েমি মনে হচ্ছে না তা-ও আমি স্বীকার করছি। আচ্ছা, তুমি কি নিঃসন্দেহ যে, ভেড়াগুলোকে তুমি যেভাবে খোঁয়াড়ে আটকে রেখে এসেছ তারা কিছুতেই বাইরে বেরিয়ে বে-পাত্তা হয়ে যাবে না?

দেখুন, একজন কোটিপতি খুনীকে যেভাবে শক্ত করে বেঁধে রাখা দরকার ঠিক সেভাবেই আমি ভেড়াগুলোকে আটকে রেখে এসেছি। আপনি চাইলে অনায়াসেই তাদের আপনার সামনে হাজির করতে পারব বলেই আমি মনে করি।

পশুপালক ওগ্‌ডেন এক জোড়া তাস বের করল। আমরা উভয়ে তাস খেলায় মেতে গেলাম। পাঁচ-পাঁচটা দিন ভেড়ার খোঁয়াড়ে কাটাবার পর আমি যেন ব্রডওয়ের এক নিষ্কর্মার ঢেকি বনে গেছি। একটা খেলায় জেতার পর আমার মধ্যে এমন উল্লাস আর উত্তেজনা ভর করল যে, আমি যেন ট্রিনিটি-তে দশ লক্ষ ডলার জিতে গেছি। আর হেনরি ওগ্‌ডেন যখন সাদা মনে পুলম্যান গাড়ির মহিলাটার কথা আমাকে বলল তখন আমি একনাগাড়ে পাঁচ মিনিট ধরে কেবল হেসেই কাটালাম।

জীবনটা যে কতই আপেক্ষিক এতেই প্রমাণ হয়ে গেল। একজন হয়তো জীবনে এত কিছু দেখেছে যে, লক্ষ লক্ষ ডলার চোখের সামনে আগুনে পুড়ে ছাই হতে দেখলেও সেদিকে আর দ্বিতীয়বার তাকাবে না। কিন্তু কোন একজনকে একনাগাড়ে ভেড়া চরাতে দিলে দেখা যাবে আজ সন্ধ্যায় আর ঘণ্টা বাজবে না' ধরনের গান শুনেই হেসে খুন হবে, নইলে একদল মেয়ে মানুষের সঙ্গে তাস খেলতে বসে যথার্থ আনন্দ লাভ করবে।

হেনরি ওগ্‌ডেন এক বোতল মদ বের করে আনল। ব্যস, ভেড়ার খোঁয়াড়ের কথা তার মন থেকে নিঃশেষে উবে গেল। সে হাতের গ্লাসটাকে ঠোঁট থেকে নামিয়ে এনে বলল, প্রায় এক মাস আগে খবরের কাগজে ছাপা হয়েছিল—এম. কে. অ্যান্ড টি ট্রেনটাকে পথে নামিয়ে বে-পরোয়া লুটপাট করা হয়েছিল। পড়েছিলে? এক্সপ্রেস এজেন্টকে গুলি করে পনের হাজার ডলার কারেন্সি নোট হাফিস করে দিয়েছিল। সবার মুখে একই কথা, একটামাত্র লোকের দ্বারা কাজটা হয়েছিল, পড়েছিলে কি?

হ্যাঁ, মনে হচ্ছে খবরটা পড়েছিলাম। এমন ঘটনা তো প্রায়ই ঘটছে। তাই টেক্সাসের মানুষের এসব কথা তো মনে থাকার কথা নয়। বলুন তো, যে লোকটা এত বড় ঘটনা ঘটিয়েছিল সে ধরা পড়েছিল কি?

অবশ্য তখনকার মত গা-ঢাকা দিয়েছিল সত্য। আজই খবরের কাগজে দেখলাম, পুলিশ অফিসার এ অঞ্চল থেকে তাকে ধরেছেন। মনে হচ্ছে, যে বিলটা ডাকাতরা ছিনিয়ে নিয়েছিল সবই ছিল এসপিনোসা শহরের সেকেন্ড ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক-এর প্রথম কিস্তির নোট। সেগুলো কোথায় খরচ

করেছে সে সূত্র ধরেই পুলিস এখানে চড়াও হয়েছিল।

গ্লাসের মদটুকু নিঃশেষে আমার গলায় ঢেলে দিয়ে আমি বললাম—আমি যা বুঝছি, এ অঞ্চলে একজন ট্রেন ডাকাত এসে আত্মগোপন করে থাকলে কিছুমাত্র বোকামির পরিচয় দেওয়া হবে না। আর এ কাজের জন্য একটা পশু-খামার সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা বলেই আমার মনে হয়। কারো পক্ষে কিভাবে সম্ভব যে এরকম দুর্ধর্ষ চরিত্রের একজন মানুষ ভেড়ার পালের মধ্যে মিশে গিয়ে আত্মগোপন করে থাকতে পারে। হেনরি ওগ্‌ডেন-এর মুখের দিকে অনুসন্ধিৎসু চোখে এক ঝলক তাকিয়ে নিয়ে আমি বললাম—আচ্ছা, বলুন তো, দুর্ধর্ষ প্রকৃতির লোকটার চেহারার কোন বিবরণ কি খবরের কাগজের পাতায় ছাপা হয়েছে? তার মুখের গড়ন, উচ্চতা, দৈহিক পরিমাপ, দাঁত, পোশাক আশাকের কোন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে চাইছি, লিখেছে কি?

মোটেই না। কারণ, মুখোশহীন অবস্থায় তাকে কেউ দেখতেই পায়নি। সর্বক্ষণ একটা মুখোশের আড়ালে সে নিজেকে লুকিয়ে রাখত। সে ট্রেন ডাকাতটার নাম। 'কালো বিল' এটা তারা কোনক্রমে জেনেছিল। সে সর্বদা একই রকম কাজকর্মে লিপ্ত থাকে। আর এক্সপ্রেস ট্রেনের কামরায় যে-রুমালটা তার পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল তার গায়ে 'কালো বিল' নামটা লেখা ছিল। ব্যস, এ সূত্রটা ধরেই।

তাঁকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই আমি বলে উঠলাম, ভাল কথা। আমি না হয় মেনেই নিচ্ছি, 'কালো বিল' পশু-খামারে এসে আত্মগোপন করেছে। তবে আমার বিশ্বাস, তাকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে না।

তাকে যে বা যারা ধরিয়ে দেবে তাকে এক হাজার ডলার পুরস্কারস্বরূপ দেওয়া হবে।

এরকম অর্থের আমার দরকার নেই। প্রতি মাসে আপনি যে বারো ডলার বেতন আপনি দিচ্ছেন তা-ই আমার যথেষ্ট। আমার কিছুদিন বিশ্রাম নেওয়া দরকার। টেক্সারকানা যাবার ভাড়াটা কোনরকমে জমাতে পারলেই আমি এখান থেকে চম্পট দেব। সেখানে আমার বিধবা মা থাকেন। হেনরি ওগ্‌ডেন-এর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে এবার বললাম, 'কালো বিল' যদি প্রায় একমাস আগে এ অঞ্চলে আস্তানা গেড়ে থাকে আর একটা পশু-খামার খরিদ করেই থাকে—

হেনরি ওগ্‌ডেন যন্ত্রচালিতের মত লাফিয়ে উঠে প্রায় গর্জে উঠল, চুপ কর! তুমি বলতে চাইছ যে—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই আমি বলে উঠলাম, আরে মশাই, আমি তো আর আপনার সম্বন্ধে কোন কথা বলছি না। এটা একটা উদাহরণ ছাড়া কিছু নয়। মনে করুন কালো যদি এখানে এসে ঘাপ্‌টি মেরেই থাকে। যদি একটা ভেড়ার খোঁয়াড় কিনেই থাকে, আর সেটাকে দেখভাল করার জন্য যদি পশুপালক হিসেবে আমাকে চাকরিতে বহাল করেই থাকে, আমাকে খাওয়া-পরা দিয়েই থাকে আর আমার সঙ্গে অভিন্ন হৃদয় বন্ধুর মত ব্যবহার করে থাকে। যেমন ধরুন এক সঙ্গে বসে গপ্প করা, খেলাধুলা করা প্রভৃতির কথা বলছি, আপনি যেমন আমার সঙ্গে করছেন অবিকল সেরকম ব্যবহারের কথা বলছি—তবু আমি অভয় দিচ্ছি, অন্তত আমার দিক থেকে কোনরকম ভয়ের সম্ভাবনা নেই। দেখুন, কোন একটা লোক যদি ভেড়াটেড়া কাজ বা ট্রেনের ব্যাপার স্যাপারের সঙ্গে জড়িতই থাকে তবু আমার কাছে একটা মানুষ, কেবলই একটা মানুষ। এছাড়া আর কোন পরিচয় আছে বলে আমি অন্তত মনে করি না। আমার কথাগুলি অবশ্যই আপনি বুঝতে পারছেন, কি বলেন?

হেনরি ওগ্‌ডেন জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলে বলল—সেন্ট ক্লেয়ার, আমি ভেবে দেখলাম, তোমাকে দিয়েই আমার কাজ মিটবে। শোন, আমি কালো বিল হলেও তোমাকে বিশ্বাস করতে, তোমার ওপর এরকম আস্থা রাখতে কুণ্ঠিত হতাম না, ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে যেতাম না। ওসব প্রসঙ্গ ধামাচাপা দিয়ে বরং দু'-এক দান তাস খেলা যাক। তবে এ-ও বলে রাখছি, একজন ট্রেন ডাকাতের মুখোমুখি বসে তার সঙ্গে খেলতে যদি তোমার কিছুমাত্রও আপত্তি না থাকে তবেই তোমাকে আমি খেলতে বলছি।

আমার চিন্তাধারার কথা তো আপনাকে খোলসা করেই বলেছি। আমার বক্তব্যের মধ্যে তো কোনরকম জটিলতা আছে বলে মনে করি না।

তাস খেলতে বসে প্রথম দান খেলার তাসগুলো বাটতে বাটতে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে কোন অঞ্চল থেকে এসে এখানে মাথা গুঁজেছে।

সে সঙ্গে সঙ্গে বলল, মিসিসিপি উপত্যকা থেকে।

চমৎকার! ভারি সুন্দর জায়গা বটে মিসিসিপি উপত্যকা। আমি নিজে বহুবারই সেখানে গিয়েছি, কিছুদিন করে আনন্দে কাটিয়ে এসেছি। তবে একটা কথা আপনার কি মনে জাগেনি, সেখানকার আবহাওয়া তেমন ভাল নয়, খাবার দাবারেরও সমস্যা? যাক গে, আমি প্যাসিফিক স্লোপ-এর মানুষ। আপনি কি কোনদিন সেখানে গেছেন?

ঝড়, ঝোড়ো হাওয়ার উৎপাত খুবই বেশী। কিন্তু কোনদিন পাশ্চাত্য দেশে গেলে কেবল আমার নামটা বলবে, দেখবে কেমন আদর যত্ন—তোয়াজ টোয়াজ করতে আরম্ভ করবে।

আমি তাস বাটা শেষ করে বললাম দেখুন, একটা কথা মন খোলসা করেই বলছি, আপনার টেলিফোন নম্বর। আপনার বংশ পঞ্জী জানার জন্য আমার বিন্দুমাত্রও আগ্রহ নেই। একটা কথাই শুধুমাত্র আপনাকে বোঝাতে চাইছি, আপনার ভেড়ার রাখালের কাছ থেকে আপনার কোনরকম বিপদের আশঙ্কা নেই। সম্পূর্ণ নিরাপদ। দুশ্চিন্তার কোনই কারণ নেই।

সরবে হেসে ও হেনরি ওগ্‌ডেন এবার বলল, আরে ধ্যুৎ! ঘুরে ফিরে সেই একই প্রসঙ্গ। আরে কিছুতেই কে তোমার মাথায় আসছে না যে, আমি যদি কালো বিলই হতাম। তোমাকে খোলা মনে না দেখে যদি সন্দেহই করতাম তবে তোমার ওই চওড়া বুকে একটা উইল চেস্টার বুলেট গেঁথে দিতাম। আর যদি তোমার মধ্যে এতটুকুও স্নায়ুবিক দুর্বলতা লক্ষ্য করতাম তবে সেটাকে বন্ধ করে দিতেও দেরী করতাম না জেনে রাখ।

স্নায়ুবিক দুর্বলতা কেনই বা থাকতে যাবে, যে লোক একটা ট্রেনকে এক হাতে নিজের কব্জার মধ্যে রাখতে সক্ষম অতএব তার তো সেটা থাকার কথা নয়। আর সে কোনদিনই আজেবাজে কাজে হাত দেবে না। আমি বহুজায়গায় বহু ধাক্কা খেয়ে শিখেছি, পৃথিবীতে এমন বহু মানুষের অস্তিত্ব লক্ষিত হয় যারা বন্ধুত্বকে সবার ওপরে স্থান দেয়। আমি আপনার অধীনস্থ এক ভেড়ার রাখালমাত্র। অতএব আপনার বন্ধুত্ব লাভের প্রত্যাশা বা দাবী কোনটাই করতে পারি না। কিন্তু অন্য কোথাও, অন্য কোন পরিবেশে আমাদের পরিচয় ও মেলামেশার সুযোগ ঘটলে আমরা পরস্পরের বন্ধু হয়ে উঠতে পারতাম, ঠিক কিনা?

ধ্যুৎ। এখন ভেড়ার ব্যাপার ট্যাপার মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও তো। কি বলতে চাইছ, খোলসা করে বলে ফেল।

শুনুন তবে, দিন চারেক আগেকার কথা বলছি। আমার ভেড়াগুলো জলাশয়ের ধারে রোদে চিৎপাত দিয়ে শুয়ে, আর আমি কফি তৈরী করতে ব্যস্ত। এমন সময় এক ছদ্মবেশধারী মানুষ ঘোড়ার পিঠে চেপে সেখানে এল। কল্পাস শহরের মহিসাসুর বিল আর শহরের কুকুর ধরার 'ব্যাটন রুজ'-এর মাঝামাঝি কোন একটা পোশাকে সে সজ্জিত ছিল। তার মুখে যোদ্ধার এতটুকুও ছাপ ছিল না। তাই আমাকে ধরেই নিতে হল সে সামান্য এক স্কাউট ছাড়া কিছু নয়। আমার দিকে তাকিয়ে স্বাভাবিক স্বরেই সে বলল—কি হে, ভেড়া চরাচ্ছ বুঝি?

আমি মুচকি হেসে বললাম—তা ছাড়া অন্য কোন মহৎ কাজ সম্পাদন করছি বলে মনে হচ্ছে না।

কিন্তু তোমার চেহারা ছবি বা কথাবার্তা কোনটাই তো ভেড়ার রাখালের মত নয় হে।

তবে আমি কিন্তু বলব, তুমি যেমন দেখতে কথাবার্তাও ঠিক তেমনই বলছ।

সে ঘোড়া থেকে নেমে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আমি কার ভেড়া, মানে কার হয়ে ভেড়া চরাচ্ছি। আমি ইঙ্গিতে দু'মাইল দূরে পাহাড়ের ঢালে বসে থাকা পশুপালক চিকুইতো'কে দেখিয়ে দিলাম। তারপর একথা সে কথার পর সে নিজেকে একজন ডেপুটি শেরিফ বলে পরিচয় দিল।

ডেপুটি শেরিফ মশাই তারপর বলল, শোন, 'কালো বিল' নামে এক ট্রেন-ডাকাতও এ অঞ্চলের কোথাও না কোথাও আত্মগোপন করে আছে। মাল এন্টোনিও থেকে শুরু করে বহুদূর অবধি তার খোঁজে চিরুনি তল্লাশি চালানো হচ্ছে। একটা কথা, গত এক মাসের মধ্যে এখানে কোন নতুন মুখ দেখতে পেয়েছ বা তার সম্বন্ধে কোন কথা শুনেছ কি, ভেবে বল তো?

আমি কপালের চামড়ায় চিন্তার ভাঁজ একে, বার কয়েক মাথা চুলকে বললাম—হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে। ফ্রায়োতে লুমিস পশুখামারের কোন এক মেক্সিকোবাসীর বাড়িতে আপনার বর্ণনা মাফিক, একজন কাজ নিয়েছে বলে শুনেছি। ব্যস, এর বেশী কিছু জানতে চাইলে আমি কোন তথ্য দিতে বাস্তবিকই অক্ষম। তবে শুনেছি। গত তিনদিন যাবৎ ও সেখানে আছে।

একটা কথা সত্যি করে বল তো, তুমি যার অধীনে ভেড়া চরাবার কাজ করছ সে লোকটা কেমন, মানে চেহারা ছবি কেমন? বুড়ো জর্জ রামে এখানে দশ বছর ভেড়া চরিয়েও নাকি ফয়দা লুটতে পারে নি।

যে বুড়োটা ভেড়া আর খোয়ার সব কিছু বিক্রি করে এখান থেকে সটকে পড়েছে। অন্য একজন তার সর্বস্ব খরিদ করে নিয়েছে।

আগ্রহান্বিত হয়ে ডেপুটি মশাই সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—আরে ব্বাস! ইয়া মোটা—যাকে বলে একেবারে নাদুস নুদুস চেহারা। ভুড়িওয়ালা এক ওলন্দাজ। মুখে বুক পর্যন্ত ঝুলে পড়া দাড়ি আর চোখে সর্বদা নীল চশমা ব্যবহার করে। কাঠবিড়ালি আর একটা ভেড়ার মধ্যে কি যে ফারাক সে জ্ঞান বুদ্ধিটুকু তার নেই। আমার বিশ্বাস, ভেড়া আর খোঁয়াড়টা বিক্রি করে বুড়ো জর্জ তাকে মোটা অর্থকড়ি ঠকিয়েছে।

তারপর আমার খাদ্যবস্তুর একটা বড় ভগ্নাংশের সর্বনাশ করে ডেপুটি ঘোড়া হাঁকিয়ে বিদায় নিল।

বার দু'-তিন ঢোক গিলে হেনরি ওগ্‌ডেন বলল, এ প্রসঙ্গটা ছাড়ান দাও তো। তাকে নিয়ে আমাদের সময় নষ্ট করার মত কোন কারণই দেখছি না। মদের গ্লাসটা ঠোটের কাছে তুলতে গিয়ে বলল, তবে তোমার কাছে ট্রেন ডাকাতের ব্যাপার স্যাপার যদি গুরুত্ব না পায়।

ধ্যুৎ! এটা আবার কোন ব্যাপার নাকি? আমার বিশ্বাস, কালো বিল-এর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব প্রগাঢ়ই হয়ে উঠবে।

সপ্তাহ দুই পরের কথা। তখন ফসল কাটার সময় চলেছে। ভেড়ার পালকে খামারে নিয়ে যাওয়া দরকার। ভেড়াগুলোর গায়ের লোম ছেঁটে দিতে হবে। নাপিতের দল আসার আগের দিন ভেড়াগুলোকে নিয়ে পশু খামারে পৌঁছে গেলাম। সবগুলোকে খোঁয়াড়ে ঢুকিয়ে ভালভাবে দরজা বন্ধ করে তবেই রাতের মত বিদায় নিতে পারলাম।

সেখান থেকে খামার বাড়িতে গিয়ে দেখি হেনরি ওগ্‌ডেন দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে সাইকেলের পুরনো পাম্পের মত ফোঁস্-ফোঁস্ করে নাক ডাকিয়ে গভীর ঘুমে মত্ত। ঘুমন্ত একটা মানুষকে দেখলে দেবদূতেরও চোখ দুটো ভিজে ওঠার কথা। মনে হয় তার এত শক্তি সামর্থ, প্রভাব আর পারিবারিক মর্যাদা সবই বুঝি মূল্যহীন। এ মুহূর্তে সে তো শত্রুর হাতের নিছক একটা পুতুলের চেয়েও অসহায়।

আমার নিজের জন্য এক গ্লাস আর ওগ্‌ডেন-এর জন্য এক গ্লাস মদ নিয়ে তার মাথার কাছে খাটিয়ার কোণায় বসলাম। সে ঘুমে বিভোর হয়েই রইল আর আমি মৌজ করে গ্লাসের মদটুকু তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে লাগলাম।

চুরুট ধরিয়ে পর পর কয়েকটা টান দিয়ে পরম তৃপ্তিতে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলাম। হেনরি ওগ্‌ডেন ঘুমে তেমনই অচৈতন্যই হয়ে থাকল।

একটু বাদে জানালা দিয়ে বাইরের রাস্তার দিকে চোখ ফেরাতেই দেখি, পাঁচটা লোক তেজী ঘোড়ার পিঠে চেপে বাড়িটার কাছে এল। তাদের মধ্যে একজনের সঙ্গে তাঁবুতে আমার সঙ্গে কথা হয়েছিল, যে আমার খাদ্যবস্তুর একটা বড় ভগ্নাংশ উদরস্থ করে চম্পট দিয়েছিল—সেই ডেপুটি। তাদের সবাই হাতেই গুলি ভরা বন্দুক আছে, দেখলাম।

বন্দুক বাগিয়ে ধরে যে পাঁচজন আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারীর আগমন ঘটল তাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় একজনের দিকে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হল।

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে আগন্তুকদের সামনে গিয়ে হাসি হাসি মুখে শুভ সন্ধ্যা জানালাম।

নেতৃস্থানীয় লোকটা আমার দিকে সামান্য এগিয়ে আমার বুক বরাবর বন্দুকটা ধরে গর্জে উঠল, খবরদার! তোমার সঙ্গে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তা না মেটা পর্যন্ত হাত নামাবার চেষ্টা কোরো না।

কী যে বলেন! কেনই বা হাত নামাতে যাব, আপনিই বলুন? আমি কি কালা, নাকি কানে খাটো য আপনার হুকুমটাই শুনতে পাই নি।

লোকটা তেমনই বাজখাঁই গলায় এবার বলল, শোন, আমরা কালো বিল-এর তল্লাশে এ পর্যন্ত ধাওয়া করেছি। গত মে মাসে হতচ্ছাড়াটা পঁচিশ হাজার পাউন্ড হাপিস করে বে-পাত্তা হয়ে গেছে। আমরা এ অঞ্চলের সবগুলো পশু-খামারে চিরুণি তল্লাশি চালিয়েছি। এ পশু-খামারে তোমাকে কোন কাজ করতে হয়? আর ঝটপট তোমার নামটা বলে ফেল।

ক্যাপ্টেন, পার্সিভাল সেন্ট ক্লেয়ার আমার নাম। ভেড়া চরানো আমার জীবিকা। আজই ভেড়ার পালকে নিয়ে এসে খোঁয়াড়ে ঢুকিয়ে দিয়েছি। তারপরই ক্লান্তি কাটাবার জন্য মদ আর চুরুট নিয়ে সবে একটু আরাম আয়েশ করতে বসেছি অমনি আপনাদের ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনে ছুটে আসতেই হল।

এ পশু-খামারটার মালিক কে, কোথায় তাকে পাওয়া যাবে?

মালিক? ঠিক আছে, মিনিট খানেক অপেক্ষা করুন ক্যাপ্টেন। ভাল কথা, আপনি যে দুর্ধর্ষ লোকটার খোঁজ করছেন তার জন্য কোন পুরস্কার টুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে নাকি?

হ্যাঁ, তা তো হয়েছেই। এক হাজার ডলার পুরস্কার। কিন্তু পুরস্কারটা তো তাকে গ্রেপ্তার করা ও উপযুক্ত শাস্তিদানের জন্যই দেওয়া হবে। খোঁজ দেওয়ার ব্যাপার স্যাপারের কথা তো সে-ঘোষণাতে কিছু উল্লেখ ছিল না।

আমি মুখ তুলে নীল আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই বললাম, 'দু'-একদিনের মধ্যেই বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে, কি বলেন?

ক্যাপ্টেন বাজখাঁই গলায় বলে উঠলেন, এসব হচ্ছে কি শুনি! আগে বল, কালো বিল কোথায়? তার আচার-আচরণ, মানে স্বভাব-চরিত্র কেমন খোলসা করে বল? তার সম্বন্ধে কোন খবরাখবর তোমার জানা থাকলে সব কিছু আমাদের কাছে বলতে তুমি আইনত বাধ্য। ঝটপট বলে—

তাঁর মুখের কথা শেষ হবার আগেই আমি বলতে আরম্ভ করলাম, আমি কি বলছি, ধৈর্য ধরে শুনুন ক্যাপ্টেন। আমি ঘোড়সওয়ারকে বলতে শুনেছিলাম, কোন এক মেক্সিকোর অধিবাসী জেফ নামক এক গরুর রাখালকে বলছিল, দু'হপ্তা আগে কালো কালো বিল'কে কোন এক ভেড়ার রাখালের এক দূর সম্পর্কের ভাই মাটামারাস নামক স্থানে দেখতে পেয়েছিল।

পুরস্কারের অর্থের ব্যাপারে বোঝাপড়া করার ধান্ধায় ক্যাপ্টেন আমার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে এবার বললেন, আমার কথা মন দিয়ে শোন মিতভাষী মানুষ, কালো বিল-এর পাত্তা যদি আমাকে তুমি দিতে পার তবে আমার নিজের পকেট থেকে তোমাকে একশ' ডলার নগদ পুরস্কাব দেব। অর্থের পরিমাণটা কিন্তু কম আকর্ষণীয় নয়। আসলে পুরস্কার প্রচারের শর্ত অনুযায়ী তোমার তো একটা কানাকড়িও পাবার কথা নয়। এখন কি বলতে চাইছ, খোলসা করে বলে ফেল তো?

ক্যাপ্টেন, যে একশ' ডলারের কথা বললেন তা এখনই, মানে নগদ দেবেন তো?

আমার কথা শুনে ক্যাপ্টেন তার সহযোগীদের সঙ্গে ফিসফিসিয়ে কি যেন বলাবলি করলেন। ব্যস, সবাই নিজের নিজের পকেট হাতড়ে যার সঙ্গে যা কিছু আছে বের করে এক সঙ্গে জড়ো করতে লাগল। হিসাব করে দেখা গেল মোট অর্থের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে নগদ ১০২.৩০ পাউন্ড আর তামাক বেরিয়েছে ৩১ পাউন্ড মূল্যের।

আমি গলা নামিয়ে বললাম, ক্যাপ্টেন, আমার কাছে এগিয়ে আসুন। যা বলি মন দিয়ে শুনুন।

ক্যাপ্টেন আমার কথামত কাজ করতে গিয়ে আমার একেবারে গা-ঘেঁষে এসে দাঁড়াল। আমি প্রায় ফিসফিসিয়ে বলতে লাগলাম—'ক্যাপ্টেন, আমি খুবই গরীব। রাজভিখারীও বলতে পারেন। মাসে মাত্র বারোটা ডলার বেতনে ওই জানোয়ারগুলোকে চরিয়ে নিয়ে বেড়াই সেসব হতভাগাদের চারিত্রিক দোষই হচ্ছে দলছুট হয়ে যাওয়া। আমি একজন সত্যিকারের হা-ভাতে। আমার বিধবা মা টেক্সারখানাতে আছেন। আমি জ্ঞানত কোন বন্ধুর সর্বনাশ করিনি। সুদিনে বা দুর্দিনে উভয় ক্ষেত্রেই তাদের পাশাপাশি কাটিয়েছি। ক্যাপ্টেন এতে তো আর বন্ধুত্বের নাম গন্ধও নেই। মাসে বারোটা ডলার তো মামুলি পরিচয়ের মাধ্যমেই পাওয়া যেতে পারে।

মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে নিয়ে সে আবার মুখ খুলল, ক্যাপ্টেন, আপনার বাঞ্ছিত লোকটাকে,

মানে কালো বিলকে এ বাড়িতেই পেয়ে যাবেন। আপনার ডানদিকের ঘরটায় ঢুকে যান দেখবেন একজন নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। তার সঙ্গে আজ পর্যন্ত আমার যা কিছু কথাবার্তা হয়েছে তাতে মালুম হচ্ছে আপনারা তাকেই তল্লাশ করছেন। তার সঙ্গে আমার বন্ধুর মতই হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আজ যদি আমার সুসময় হত তবে গন্ডোলা অঞ্চলের যাবতীয় সোনার খনির বদলেও তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতায় লিপ্ত হতাম না। একটা কথা আপনাকে না বলে পারছি না—প্রতি হপ্তায় যে খাদ্য আমাকে দেওয়া হয়েছে তার অর্ধেকই থাকতো পোকায় খাওয়া, আর কাঠের অভাবও খুবই ছিল।

তারপর একথাও বলতে ভুললাম না, আপনারা খুব সাবধানে ঘরে ঢুকবেন কিন্তু। অধিকাংশ সময়ই সে ধৈর্য ধরতে পারে না। বলা তো যায় না, কি করতে কি করে ফেলবে।

দলের মাতব্বর গোছের লোকটার পিছু পিছু অন্যান্যরা শিকারী বিড়ালের মত সন্তর্পণে পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকে গেল। মাতব্বরটা ঘুমন্ত হেনরি ওগ্‌ডেন'কে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিল। সে যন্ত্রচালিতের মত তড়াক্ করে লাফিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ানো মাত্র পুরস্কার লোভীদের দু'জন তাকে জাপ্টে ধরে ফেলল। আরে ব্বাস! হেনরি ওগ্‌ডেন যে গায়ে এত শক্তি ধরে আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। এতগুলো লোকের বিরুদ্ধে একজনের এমন ধস্তাধস্তি ইতিপূর্বে আমার দেখার সৌভাগ্য হয় নি।

সবাই জাপ্টে ধরে তাকে কলাগাছের মত ভূমিতে ফেলে দেওয়ায় সে গুলি খাওয়া বাঘের মত গর্জে উঠল, এসব হচ্ছে কি!

ক্যাপ্টেন মুখে বিদ্রুপের হাসি ফুটিয়ে তুলে বলল, মিঃ কালো বিল, আপনি ফাঁদে আটকা পড়ে গেছেন। আপাতত এটুকু জেনেই সন্তুষ্ট থাকতে পারেন।

অন্যায়! এটা রীতিমত জুলুম!

রক্ষক মাতব্বরটা বললেন, জুলুম? হয়তো তা-ই করা হত। বল তো, ক্যাটি তোমার কোন্ ভরা ক্ষেতে মই দিয়েছিল? আর সবচেয়ে বড় কথা, ট্রেনের মালপত্র লুঠপাট করার ব্যাপারে দেশে আইন আছে। কথা বলতে বলতে তিনি হেনরি ওগ্‌ডেন-এর পকেটগুলো হাতড়াতে শুরু করলেন।

হেনরি ওগ্‌ডেন পূর্ব স্বর অনুসরণ করেই গর্জে উঠল, তোমাদের এরকম অন্যায় জুলুমের জন্য আমিও তোমাদের মজা টের পাইয়ে দিতে পারি।

মাতব্বর গোছের লোকটা হেনরি ওগ্‌ডেন-এর পকেট থেকে সেকেন্ড ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব এস্পিনোসা সিটি'-র এক গোছা নতুন বিল বের করে আনলেন। সেগুলো তার মুখের সামনে ধরে তিনি বেশ কড়া স্বরেই বললেন, মজা আমিও টের পাইয়ে দিতে পারি। ওঠ। আমাদের সঙ্গে যাবার জন্য তৈরী হোন। গারদে গিয়ে কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করবেন চলুন।

হেনরি ওগ্‌ডেন উঠে পোশাক ঝেড়ে নেকটাইটাকে ঠিক করে নিল। তার সব বিল হাতিয়ে নেবার জন্যে সে কোনরকম ফোঁ-ফাঁ করল না।

ক্যাপ্টেন প্রশংসার স্বরে বলল, ধান্ধাটা ভালই আঁকড়ে ধরেছেন এবার মশাই। এমন একটা পরিবেশে পশু-খামার কিনে ঘাপ্‌টি মেরে রয়েছেন। লুকিয়ে থাকার মত জায়গাই বটে এটা। চমৎকার মতলব!

ক্যাপ্টেন যখন হেনরি ওগ্‌ডেন-এর সঙ্গে বোঝাপড়ায় ব্যস্ত তখন শান্তিরক্ষকদের একজন খোঁয়াড়ের কাছে ঘোরাঘুরি করে এক ভেড়ার রাখালকে ধরে ফেলল। সে মেক্সিকোবাসী। জন স্যালিস তার নাম।

স্যালিস হেনরি ওগ্‌ডেন-এর ঘোড়ার জিন লাগিয়ে তৈরী করে দিল। শেরিফ ক্যাপ্টেন আর তার দলবল বন্দুক বাগিয়ে ধরে বন্দী হেনরি ওগ্‌ডেন'কে নিয়ে শহরে উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

খামার ছেড়ে যাবার মুখে হেনরি ওগ্‌ডেন সালিস-এর ওপর খামার দেখভালের দায়িত্ব দিয়ে গেল। ভেড়াগুলোর লোম ছাটাই করা ব্যবস্থা করতে বলল। কোথায় কোথায় ভেড়াগুলোকে চরাতে হবে তা বলে যেতেও ভুলল না। তার কথাবার্তা শুনে মনে হল ক'দিনের মধ্যেই সে আবার খামারে ফিরে আসবে।

ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যেই পশু-খামারে মালিক রাঞ্চো চিকু তার কোন এক প্রাক্তন মেষ রাখাল

পার্সিভাল সেন্ট ক্লেয়ার বেতন আর কালো টাকা মিলে একশ' নয় ডলার নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চেপে দক্ষিণের পথে অগ্রসর হতে লাগল।

লাল-মুখো লোকটা এক সময় থেমে গেল। উৎকর্ণ হয়ে শোনার চেষ্টা করল। পাহাড়গুলোকে ফাঁক দিয়ে একটা মালগাড়ীর কি নীল কোর্তাদের—

না, তেমন কিছু পাওয়া যায় নি। তোমার কথাবার্তা কিন্তু আমার ভাল মনে হচ্ছে না। তোমার আমার বন্ধুত্ব দীর্ঘ পনের বছরের। তুমি কাউকে আইনের হাতে তুলে দিয়েছ এরকম কথা কারো মুখে আমি শুনিনি, দেখার তো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু এ লোকটার নিমক তুমি খেয়েছ। মুখোমুখি বসে তাস পিটেছ। আর সে লোকটাকেই তুমি আজ ধরিয়ে দিলে! তার বিনিময়ে তুমি নিঃসঙ্কোচে টাকাও নিয়েছ। তোমার মানসিকতা এরকম তো কোনদিন ছিল না।

লাল মুখো লোকটা এবার বলল, তিনি হচ্ছেন হেনরি ওগ্‌ডেন যিনি এলিবাই আর অন্য বিভিন্ন রকম আইনের মারফতে নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এ কথাটা আমি জানতে পেরেছিলাম। তার দ্বারা আমার অনিষ্ট তো হয়নি বরং আমি উপকৃতই হয়েছি। তাকে আইনের দিকে ঠেলে দিতে আমার মন ঘৃণায় ভরে যায়।

আচ্ছা, হেনরি ওগ্‌ডেন-এর পকেট থেকে যে বিলগুলো পাওয়া গেছে সেটা কি হল?

লাল মুখো লোকটা মুখ খুলল, আর কাজটা আসলে আমার দ্বারাই হয়েছে। তিনি যখন ঘুমে বিভোর ছিলেন তখন আমিই গোপনে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম। আসলে কালো বিল আমি নিজেই।

দ্য হেড হান্টার

জর্জ ডিউই এবং স্পেনের মধ্যে যে তুমুল যুদ্ধ বেঁধেছিল সেটা মিটে যাওয়ার পরই আমি ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জে পাড়ি জমাই। আমার খবরের কাগজের সংবাদদাতার কর্তব্য পালন করতে আমি সেখানেই থেকে গেলাম। পরিচালক সম্পাদক আমাকে এক সময় জানিয়ে দেওয়া হল, গরু ছাগল ছানার শোক নিয়ে লেখা টেলিগ্রাফ মারফৎ পাঠানো আটশ' শব্দের খবরটাকে অফিস একটা যুদ্ধে খবর স্বীকার করছে না। অনন্যোপায় হয়ে আমি চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে আমি বাড়ি চলে আসি।

দেশে ফিরে আসার সময় আমি যখন বাণিজ্য জাহাজে ছিলাম তখন বাদামী মানুষের সে রহস্যময় দ্বীপপুঞ্জে যেসব অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম সে কথাই বার বার আমার মনের কোণে উঁকি দিত। সৈন্য যাতায়াতের আর ছোট সব যুদ্ধটুদ্ধের ব্যাপার আমার কিছুমাত্রও আগ্রহও ছিল না। সে জাতিটার চাষার মত অস্পষ্ট মুখগুলো যেন সুদূর অতীত থেকে আমার দিকে নিষ্পলক চোখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত। আর তা-ই আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখত। আজব ব্যাপার।

মিণ্ডানাওতে যখন আমি অবস্থান করতাম তখন সেখানকার নরমুণ্ড শিকারী বলে কুখ্যাত আদিম হিংস্র উপজাতীয় লোকগুলোকে দেখে আমার মন যারপরনাই আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। আর মুগ্ধও কম হইনি। ভয়ঙ্কর প্রকৃতির ছোটখাটো মানুষগুলোকে কোনদিন চোখে দেখা যায় না। কিন্তু তাদের গোপন উপস্থিতির একটা অকথিত সন্ত্রাস উষ্ণ মধ্যাহ্নেও রীতিমত শীতের কম্পনের সৃষ্টি করে। তারা শিকারের খোঁজে গভীর দুর্গম জঙ্গলে, গভীর খাদে, বিপদসঙ্কুল পাহাড়ের চূড়ায়, জনমানবহীন গভীর বনে বনে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। প্রতিটা মাইল, প্রতিটা মুহূর্তে মৃত্যুর হাতছানি এসব আমার মনকে বড্ড বেশী করে আকর্ষণ করত।

আমার মনে এসব কথা উঁকি দিলেই আমার মনে হয় তাদের কর্মধারা কত সুন্দর, কতই না সহজ সরল, অথচ তবু ফলপ্রসূ। অবাক হয়ে প্রতিনিয়ত এসব কথাই ভাবি।

তুমি নিজের কুঁড়ে ঘরেই বসবাস কর। নিয়তির আদেশ অনুসারে চল। কখনও সখনও ভালবাসা, হিংসা বা উচ্চাকাঙক্ষা বশত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠ। নীরবে লকলকে ছুরির ফলাটা নিয়ে নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়। লড়াইয়ে জয়ী হয়ে শিকারের কাটা মুণ্ডটা নিয়ে তুমি ঘরে ফিরে আস। সীমাহীন গর্বের সঙ্গে সেটাকে দরজায় ঝুলন্ত চুপড়ির ভেতরে রেখে দিলে। সেটা কোন শত্রু বা

বন্ধুর, নতুবা নবাগত কোন মানুষের মুণ্ডও হতে পারে। কাজটা ঈর্ষা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা মামুলি কোন খেলাও সেটা হতে পারে।

কাজটার পিছনে যে কারণই থাক না কেন পুরস্কারটা কিন্তু অবশ্যই জুটবে। গ্রামবাসীরা যাতায়াতের পথে তোমাকে শুভেচ্ছা জানাতে পারে। তোমার সাদা বা বাদমী পরিচারিকাটা তার ওপর তোমার স্নেহ ভালবাসার যে নিদর্শনটার দিকে খুশিভরা মনে নরম ব্যাঘ্রনয়নে চেয়ে থাকবে। তৃপ্তির সঙ্গে কাটা গলাটা থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঝরে পড়া রক্তের শব্দ উৎকর্ণ হয়ে শুনবে।

সত্যি, একটা অক্ষরও বানিয়ে বলছি না, উৎফুল্ল মুণ্ড শিকারীর কার্যকলাপ আমাকে মুগ্ধ করেছে। সে কলা আর দর্শনকে একটা সরল সূত্রে গেঁথেছে। তোমার শত্রুপক্ষের মুণ্ডটা ছেদন করে সেটাকে তোমার দুর্গের সদর দরজার ঝুড়িতে রেখে দেওয়া, মৃত বস্তুর মত ফেলে রাখা—তার যাবতীয় ষড়যন্ত্রকে বানচাল করে দেবার, যাবতীয় যুক্তিকে খণ্ডন করার আর তার ওপর তোমার প্রভুত্বকে করার পক্ষে এর চেয়ে ভাল কাজ আর কি হতে পারে?

যে জাহাজে চেপে আমি দেশের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম তার কাপ্তেন ছিল সুইডেনের অধিবাসী। এক খেয়ালি মানুষ। সে তার যাত্রাপথ হঠাৎ বদলে নিয়ে, আমার ওপর সহৃদয়তা বশত প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে ছোট্ট একটা নগরে আমাকে নামিয়ে দিয়ে নতুন সিদ্ধান্ত যে বন্দরে নামানোর কথা ছিল সেখান থেকে কয়েকশ' মাইল দক্ষিণে এ শহরটা অবস্থিত। কিন্তু দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আমি বড়ই ক্লান্তি হয়ে পড়েছি। তাই ক্লান্ত মনকে প্রবোধ দিলাম এখানে, মোজাডা গ্রামেই আমার বাঞ্ছিত বিশ্রাম লাভ করে আবার স্বাভাবিকতা ফিরে পাব।

বাবার টালি-ছাওয়া দরজাটায় আমি ক্লো গ্রীণকে প্রথম দেখি। একটা কাপড়ের চিল্‌তে দিয়ে সে রূপের একটা কাপ পরিষ্কার করছিল। কালো মখমলের কাপড়ের ওপর একটা মুক্তো যেমন দেখা যায় তাকেও ঠিক তেমনই মনোলোভা দেখাচ্ছিল। কিছুটা অভ্যর্থনা আর কিছুটা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে সে মুহূর্তের জন্য আমার মুখের দিকে তাকিয়েই সে ঝট করে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল। যাবার সময় মৃদু একটা গানের কলি আমাকে শুনিয়ে গেল বটে।

এর জন্য অবাক হবার কোন কারণ ছিল না। কারণ, সে অঞ্চলের সবচেয়ে কুখ্যাত ব্যক্তি ডাঃ স্ট্যামফোর্ড আর আমি বেসুরো গানের সুর ভাজতে ভাজতে গ্রামের পথ ধরে হাঁটছিলাম। আমরা তখন কুখ্যাত মোজাডোর মজলিশখানা বরফের কারখানা থেকে ফিরছিলাম। আমরা সেখানে ঠাণ্ডা কালো মদ গলায় ঢালতে ও বিলিয়ার্ড খেলায় মেতে ছিলাম।

আমি হঠাৎ উত্তেজনার শিকার হয়ে গীর্জার পাদরির মত ধীর স্থির ডাঃ স্ট্যামফোর্ড-এর দিকে চোখ ফেরালাম। আমরা যে একটা মুক্তো সম্মুখে শুয়োর বনে গিয়েছি সেটা চোখের পলকেই ঠাহর করে নিলাম।

রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে আমি হঠাৎ বলে উঠলাম, তুমি একটা পশু। তুমি এর অর্ধেকটা সম্পাদন করেছ। আর অবশিষ্ট দোষ বর্তাচ্ছে অভিশপ্ত দেশটার ওপর। এরচেয়ে কেন একটা ঘুমন্ত দেশে গিয়ে গলা অবধি মদ আর রুটি গিলে জানটা দেওয়াই ঢের ভাল ছিল।

পথের নির্জনতাকে কাটিয়ে ডাঃ স্ট্যামফোর্ড গলা ছেড়ে হেসে উঠল। সে চেঁচিয়ে বলল, সে কী তুমিও! তাও আবার একটা ছিপি খুলতে না খুলতেই। আরে এটা তো মানছ, মেয়েটার চেহারা ছবি বেশ ভালই। তবে বলে রাখছি, ওখানে আঙুল পোড়াতে চেষ্টা কোরো না। মোজাডা গ্রামের ছেলে বুড়ো সবাই এক সুরে বলবে তার মনের মানুষটার নাম লুই ডিভো।

ঠিক আছে, সময়মত দেখা যাবে। আমি বললাম, দেখা যাবে সে একাধারে নিছক একটা মানুষ আবার পুরুষও কিনা। সবুর কর, লক্ষ্য রাখ।

মুহূর্তমাত্রও সময় নষ্ট না করে লুই ডিভোর সঙ্গে আমি মোলাকাত করলাম। তেমন বেগ পেতে হল না। কারণ, মোজাডা গ্রামে বিদেশীদের ডেরা খুব বেশী হলেও ডজন খানেক। এক তুর্কীর সাধারণ একটা হোটেলে তারা রোজ মিলিত হয়। সদর দরজার মুক্তোটার সঙ্গে মোলাকাত হবার আগেই আমি ডিভোর সঙ্গে দেখা করলাম। কারণ, যুদ্ধের পদ্ধতি আমি যে এরই মধ্যে রপ্ত করে ফেলেছি। আর এ-ও আমার ভালই জানা আছে যে, পুরস্কারের দিকে অগ্রসর হবার আগে প্রতিপক্ষের শক্তিটা যাচাই করে নেওয়াই উচিত।

তার সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা নিতে গিয়ে কেমন একটা অভাবনীয় ভীতি আমার মধ্যে ভর করল। লক্ষ্য করলাম, লোকটা সম্পূর্ণরূপে ভারসাম্যসম্পন্ন, কর্মকুশল, আতিথেয়তাও অতুলনীয়, নিস্পৃহ আর সহজ সরল প্রকৃতি সম্পন্নও বটে। তার দুর্বলতার খোঁজ করতে গিয়ে আমি দুম্ করে একটা মাত্রাতিরিক্ত ভুল, মানে বাড়াবাড়ি করে ফেললাম। তা সত্ত্বেও নিজের তেমন ভুল ভ্রান্তি বুঝতে পারলাম না। অসন্তুষ্টির সঙ্গে আমাকে মেনে নিতেই হল, লুই ডিভো আমার যোগ্যতম এক প্রতিপক্ষ। দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম, চরম আঘাতই তাকে হানা দরকার। সে বড়সড় কারবারী, বিত্তবান আমদানি রপ্তানিকারী। বিভিন্ন শিল্পকর্ম আর উচ্চ সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শন অফিসে তার চারিদিকে ছড়ানো থাকে।

লোকটার চেহারা একহারা, তবে লম্বা বললেও ঠিক বলা হবে না। ছোটও সুগঠিত মাথায় একরাশ বাদামী চুল। ছোট-ছোট করে ছাঁটা। আর আচার ব্যবহার? আদর্শ।

অল্প সময়ের মধ্যেই আমি গ্রীণ হাউস-এর সম্মানীত ও নিয়মিত অতিথিতে পরিণত হয়ে গেলাম। জীর্ণ পোশাকের মতই আমার উচ্ছৃঙ্খল আচরণগুলোকে ত্যাগ করলাম। আত্মপ্রত্যয় সম্পন্ন এক পুরস্কার বিজয়ীবীর যোদ্ধার মতই আমি সুঅভ্যাসগুলোর পাঠ নেওয়ার জন্য আত্মনিয়োগ করলাম।

আর ক্লোগ্রীণ। তার দৃষ্টিনন্দন ভুরুকে কেন্দ্র করে একটা সনেট লিখে তোমাকে ক্লান্ত ক'রে তোলার ইচ্ছা আদৌ আমার নেই। তবে এটুকু স্বীকার না করে উপায় নেই সে তো তার আবার আচরণ আর সৌন্দর্য সবই অত্যাশ্চর্য। নভেম্বরের আপেলের মত টস্‌টসে। আর জানালার কাঁচের মত রহস্যের আধার। তার বাবার নাম হোমার গ্রীণ। সর্বজনশ্রদ্ধেয়। তার মা সংসারের হাজার কাজের মধ্যে নিজেকে লিপ্ত রাখে। মিঃ হোমার অনবরত বকবক করেন আর ধর্মগ্রন্থের একটা অধ্যায় লেখা নিয়ে মেতে থাকেন। অন্য কোন দিকে তার হুঁসও থাকে না।

লুই ডিভো আর আমি উভয়েই গ্রীণ পরিবারের বন্ধু, হিতাকাঙ্খীতে পরিণত হয়ে গেলাম। তার সঙ্গে আমার সেখানেই নিয়মিত দেখা সাক্ষাৎ হয়। তার মত অন্য কোন সজ্জনকে আমি ইতিপূর্বে ঘৃণার চোখে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

এটাকে আমার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য যা-ই বলা যাক না কেন আমি কিন্তু সেখানে দেশের মত আদরণীয় হয়ে উঠলাম। সত্যিকারের এক যুবকের মতই আমার চেহারা,—মুখ মণ্ডল। আর মুখে এমন একটা সকরুণ ঘর ছাড়ার ছাপ লক্ষিত হ'ত যা সব সময় মায়ের মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, দারুণভাবে আকর্ষণ করে।

ক্লো আমাকে 'টমি' সম্মোধন করে। আর আমি তার প্রতি অল্প বিস্তর অনুরাগ প্রকাশ করলেই সে আমার সঙ্গে রঙ্গ তামাসা জুড়ে দেয়। কিন্তু ডিভো-র সম্বন্ধে সে তেমন মুখই খোলে না—খুবই চাপা। সে যে প্রেমিক। ক্লো-র কল্পনাকে সে জাগিয়ে তোলে, গভীরতম অনুভূতিকে উদ্দীপ্ত করেন। তার মন-প্রাণ, তার কল্পনা ডিভোকে ঘিরেই বেড়ে উঠতে থাকে। আমি অন্য দিকে অভাবনীয়ভাবে ঝুঁকে তার মনকে নাড়া দিতে পারিনি।

তবে এ-ও সত্য যে, ক্লো আমাদের মধ্যে কারও প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করে নি। তবে সে একদিন কথার ছলে আমার কাছে প্রকাশ করে ফেলল, মানুষের কোন্ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রতি তার প্রগাঢ় আকর্ষণ বেশী।

আমাকে সে বলল, বুঝলে টমি, আমি অবশ্যই চাই না কেউ আমার প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করতে সসৈন্যে অন্য আর একটা দেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ুক।

মুচকি হেসে আমি বললাম, যদি তার বিপরীত মন্তব্যই তুমি করতে উৎসাহী হও তবে আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি, কতটা কি করা যায়। সংবাদপত্রগুলো তো রাশিয়ার কূটনৈতিক দপ্তরের কর্মখালির বিজ্ঞাপনে ভরা থাকে। ওয়াশিংটনের বহু মাতব্বরের সঙ্গে আমার নিজের বহু লোকের খাতিরটাতির আছে। গোলন্দাজ বাহিনীর একজন কমিশনারের সাহায্য সহযোগিতা আমি হয়তো অনায়াসেই পেয়ে যাব। তা ছাড়া—

আমাকে থামিয়ে দিয়ে ক্লো বলে উঠল, আরে, সেটাই তো আমি চাচ্ছি না। আমার মনের কথা তোমাকে বলছি, শোন—পৃথিবীতে এমন বহু বড় বড় কাজ হয়, মেয়েদের কাছে যেগুলো

নিতান্তই মূল্যহীন। ড্রাগনদের নিধন করার জন্য সে আমলের নাইটরা যখন বর্ম বুকে এঁটে ঘোড়া হাকিয়ে যেত তখনও নিঃসঙ্গ মনিবানির পাশে অবস্থান করে চাকরবাকররাই তার হাতে দস্তানাটা তুলে দিয়ে, বা দমকা বাতাস বইলে ব্যস্ত হাতে তার ওভারকোটটা এগিয়ে দিয়ে তার অন্তরের অন্তঃস্থলে নিজের জায়গা করে নিত। ছোটখাটো কাজের মাধ্যমে যে যুবক নিজের মনের নিখাদ ভালবাসা প্রকাশ করতে পারে সে-ই আমার সবচেয়ে কাছের মানুষ, মনের মানুষে পরিণত হতে পারবে। তার কথাগুলো একবার কানে গেলেই অন্তরের অন্তঃস্থলে দাগ কাটে। আমার বাঁ-দিক দিয়ে কেউ হাঁটলে আমি অসন্তুষ্ট হই, কেউ আলোর দিকে পিঠ দিয়ে বসলে আমার রাগ হয়, চড়া রঙের নৌকো আমার বড়ই অপছন্দ, ভায়োলেট পুল আমার খুবই পছন্দ, জলের ওপর চাঁদের আলো পড়ে ঝলমল করার সময় আমি যদি সে দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে থাকি তখন যেন আমার সঙ্গে কথা না বলে আর বিলাতি বাদামের ভেতরে খেজুরের পুর দেওয়া থাকলে সেটা আমি খুবই তৃপ্তির সঙ্গে খাই।

আমি ভুরু কুঁচকে বললাম— শিক্ষাপ্রাপ্ত যেকোন পরিচারিকারই এ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার।

পরিচারিকাকে সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে আমার কি দরকার সেটা আমি নিজেই ভুলে যাই। এরকম পরিস্থিতিতে আমার চাহিদার কথা তাকেই মনে করিয়ে দিতে হবে।

আমি হেসে বললাম, তোমার দাবী দেখছি ক্রমেই উর্ধ্বগতি হয়ে চলেছে। আর আমি যদি বলি যে, বিঠোভেন-এর মোনাটা শোনার জন্য আমার প্রাণান্ত হয়ে উঠছে আর রাগে ফুঁসতে থাকি। তবে তাকে বুঝতে হবে আমার দরকার নুন-বাদাম, আর সে বস্তুটা পরিচারিকার কাছেই থাকতে হবে।

আমার মাথায়ই ঢুকছে না, তোমার প্রিয় কোন্ নাচ-গানের পরিচালক, নাকি কোন রুচিশীল মুদি।

ক্লো হাসতে হাসতে বলল, শোন, এতক্ষণ যা কিছু বললাম তার একটা বড় ভগ্নাংশকেই নিছক রসিকতা বলে মনে কোরো। আর টুকিটাকি জিনিসগুলোকে হাল্কাভাবে নিও না যেন। তুমি আগ্রহী হলে একজন বীরপুরুষ হতে পার, তবে আচার আচরণে যেন তা প্রকাশ না পায়। অধিকাংশ মহিলাই একজন বড়সড় খুকি ছাড়া কিছু নয়, আর অধিকাংশ পুরুষ খোকা ছাড়া কিছু নয়। আমাদের খুশি উৎপাদন করার চেষ্টা করবে, কিন্তু পরাজিত করে নিজে খুশি হতে চেষ্টা কোরো না যেন। আমরা বীরপুরুষের অভাব মেটাতে গিয়ে আমরা সাধারণ একটা মুদিকে সেরকম করে গড়ে তুলতে পারি যখন আমাদের রুমালটা তৃতীয়বারের মত পড়ে যাওয়ার আগে সে সেটাকে ধরে ফেলতে সক্ষম হয়, বুঝলে?

সে রাত্রে আমার খুব জ্বর আসে। তাপমাত্র তিন-চারে উঠে থমকে থাকে, নামতে চায় না। সিঙ্কোনা আর আলকাতরা মিশ্রিত ওষুধ সে জ্বর তোয়াক্কা করে না। তখন চিকিৎসক এসে জ্বরের সাধারণ সূত্রটার ব্যাখ্যা দেন—জীবনীশক্তি + বাঁচার আকাঙক্ষা-জ্বরের স্থায়িত্বকাল = ফলাফল।

দু'কামরার কুঁড়েঘরে আমি আরাম আয়েশ করে দীনযাপন করছিলাম, সেখানেই আমি বিছানা নিলাম আর এক গ্যালন মদের জন্য লোক পাঠিয়ে দিলাম। তবে মদটা কিন্তু আমার জন্য নয়। মদের নেশা চেপে গেলে, স্ট্যামফোর্ড প্রশান্ত মহাসাগর আর আন্দিজ পর্বতমালার মধ্যবর্তী সবচেয়ে বড় ডাক্তারে পরিণত হয়ে যায়। সে এসে আমার শিয়রে বসল। মদ গিলে সুস্থ হয়ে নিল।

মদের গ্লাসটা হাত থেকে নামিয়ে সে বলে উঠল, দেখ হে, তুমি আমার নব রোমিও। ওষুধে তোমার ব্যামো সারবে না। আমি তোমাকে কুইনাইন দিচ্ছি যার তেতো গুণ তোমার মধ্যে ক্রোধ আর ঘৃণার সঞ্চার ঘটাবে। আর দেব দুটো উত্তেজক দাওয়াই যা তোমার ব্যামো সারার সম্ভাবনাটাকে দশ শতাংশ বাড়িয়ে দেবে।

দুটো সপ্তাহ আমি শ্মশানে হিন্দুবিধবাদের মতই বিছানা আঁকড়ে পড়ে রইলাম।

অশিক্ষিত ইন্ডিয়ান নার্স বৃদ্ধা আটাস্কা নিষ্কর্মার মত দরজায় বসেই হর্তব্য সম্পাদন করে যেতে থাকল। ধ্যুৎ! এক বিকেলে তাকে বিদায় করে দিলাম। বিছানা ছেড়ে সেজেগুজে নিলাম। থার্মোমিটারে একশ' চার ডিগ্রি তাপমাত্রা দেখে খুশিই হলাম। পোশাক আশাক সম্বন্ধে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করলাম। চোখের সামনে আয়না ধরতেই বুঝে নিলাম জ্বর আমার চোখ দুটোকে

উজ্জ্বলতা দান করেছে আর মুখে ফুটে উঠেছে রঙের আভা। তখন ক্লো গ্রীণ আর লুই ডিভো-র কথা মনের কোণে উঁকি দিল।

আমি ক্লো গ্রীণ-এর বাড়ি হাজির হলাম। মনে হল আমি বুঝি পথটুকু সাঁতরে পাড়ি দিয়েছি।

তাদের দরজার সামনেই ক্লো গ্রীণ আর লুই ডিভো-র মুখোমুখি হলাম। ক্লো গ্রীণ উল্লসিত হয়ে পর পর দু'বার করমর্দন করতে করতে গলা ছেড়ে বলে উঠল— ইস্! তোমাকে দেখে যে কী খুশি হয়েছি তা আর বলার নয়! আরে টমি, তোমাকে যে আগের চেয়ে বেশী উজ্জ্বলই দেখাচ্ছে।

তোমাকে দেখতে যাওয়ার জন্য আমি তৈরীও হয়েছিলাম। কিন্তু তারা আমাকে বাধা দিয়েছে, কিছুতেই যেতে দেয় নি।

আমি উদাসীনভাবে বললাম, তাই বুঝি? কিন্তু তেমন কিছু তো হয়নি। একটু আধটু জ্বর ব্যস। দেখ না, আবার কেমন হাঁটাহাঁটি করে বেড়াচ্ছি।

আধ ঘণ্টা ধরে আমরা কথাবার্তা বললাম। হঠাৎ ক্লো গ্রীণ-এর নীল চোখের তারায় আমি কামনার ছাপ লক্ষ্য করলাম। গভীর ছাপ। সেটা বেচারা ডিভো-রও নজর এড়াল না।

আমরা প্রায় সমস্বরেই বলে উঠলাম, ক্লো, তোমাকে কেমন বিমর্ষ দেখাচ্ছে। কি চাচ্ছ, বল তো?

ক্লো নির্বিকারভাবে বলল, দু'দিন নারকেলের পুডিং খেতে বড্ড ইচ্ছা করছে। কেবল ইচ্ছাই নয়। তীব্র আকাঙক্ষাও বলতে পার।

ডিভো মোলায়েম অথচ আক্ষেপসূচক শব্দ উচ্চারণ করে বলে উঠল, ইস্! এখন তো মোজাডায় নারকেল মিলবে না। এখানে সে অনেক আগেই নারকেলের সিজন শেষ হয়ে গেছে ক্লো। আমি একেবারে আহাম্মকের মতই বলে ফেললাম, একটা ওয়েলস্ খরগোস বা ভাঁপা চিংড়ি হলে চলবে কি?

মান্যবর হোমার দরজার আড়াল থেকে আমাদের কথার মধ্যে নাক গলালেন—আরে, বুড়ো ক্যাম্পোসরা অনেক সময় গুদামে শুকনো নারকেল জমিয়ে রাখে। কিন্তু বাছা আমার, এরকম ইচ্ছাকে সামলে রেখে প্রভু যে নিত্যকার খাবারের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন সকৃতজ্ঞ অন্তরে সে সব খাদ্যবস্তুতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

তখন লুই ডিভো বিদায় নিল। সান্ধ্য ভোজের জোগাড় করার জন্য মিনিট কয়েকের জন্য বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

সবাই এক এক করে বিদায় নেবার পর সবুজ কঞ্চির একটা ঝুড়িকে দরজার গড়ালের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেলাম। রাগে আমার রক্ত ওঠার উপক্রম হল। মুণ্ডু শিকারীদের কথা আমার মনে জেগে উঠল। নির্মম নিষ্ঠুর ছোট—বেঁটেখাটো পাষণ্ডগুলোকে কখনও চোখে দেখা যায় না বটে কিন্তু তাদের গোপন উপস্থিতির ত্রাস দুপুরের প্রচণ্ড গরমেও তীব্র শীতে শরীরে কম্পন সৃষ্টি করে। মাঝে মধ্যেই আত্মম্ভরিতা, ভালবাসা, তীব্র হিংসা মানসিক অবসন্নতা অথবা উচ্চাভিলাষের শিকার হওয়ায় একজন মানুষের মধ্যে ভয়ঙ্কর উত্তেজনার সঞ্চার ঘটে। লকলকে ঝকঝকে ছুরিটা নিয়ে ঘর থেকে সে বেরিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে আরম্ভ করে। বিজয়ী হয়ে সে রক্তাক্ত মুণ্ডুটা হাতে ঝোলাতে ঝোলাতে ফিরে আসে।

আমি চুপিচুপি সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিজের ডেরায় ফিরে এলাম। দেওয়ালে ঝুলন্ত বাঁকা ও ধারালো ছুরি হাতে নিয়ে নিলাম। কসাইয়ের ছোরার চেয়েও, ক্ষুরের ছেয়ে ধারালো তার ফলাটা চকমক করতে লাগল। ঘর থেকে বেরিয়ে আপন মনে ঠোঁট নাড়তে নাড়তে লুই ডিভোর অফিসের দিকে হাঁটা জুড়লাম।

আমাকে দেখে ব্যাপারটা বুঝতে তার ভুল হল না। আমার হাতের চকচকে ছুরির ফলাটার দিকে সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল। পর মুহূর্তেই সে যন্ত্রচালিতের মত আমার চোখের আড়ালে চলে গেল। দৌড়ে পিছনের দরজাটার কাছে গিয়ে দুম করে এক লাথি মেরে সেটা খুলে ফেললাম। অনুসন্ধিৎসু নজরে চারদিকে নজর ফেরাতেই দেখতে পেলাম দুরন্ত হরিণের বেগে সে দৌড়োচ্ছে সামনের দু'শ গজ দূরবর্তী বনের দিকে। আমি চিল্লাতে চিল্লাতে তাকে অনুসরণ করতে লাগলাম।

আমি শক্তিমান হলেও সে দ্রুতগতি সম্পন্ন। মাইল খানেক ছোটাছুটির পর আমি তাকে প্রায়

ধরে ফেলার উপক্রম করলাম। ঠিক সে মুহূর্তেই সে ঝট করে বাঁক নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে সিঁধিয়ে গেল। সামনেই একটা পার্বত্য নালার ধারে পৌঁছেই সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হল। তারপরই সে এক লাফে সেটা ডিঙিয়ে গেল। আমিও সবেগে সেটা পেরিয়ে গিয়ে মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই পাহাড়ের গায়ে তাকে কোণঠাঁসা করে ফেললাম। আত্মরক্ষার তাগিদেই সে ঝট করে পিছন ফিরে আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ল? বীভৎস একটা হাসি তার চোখে মুখে ফুটে উঠল। লুই ডিভোর প্রায় আর্তনাদ করে উঠল— উফ্! রেবার্ণ—রেবার্ণ থাম। আমার কথা শোন, এস আমরা অর্থহীন ব্যাপারটার ফয়সালা করে ফেলি! আমি বিশ্বাস করি, এর জন্য তোমার সাম্প্রতিক জ্বরটাই বেশী করে দায়ী, তোমার কোনই দোষ নেই। যাক, নিজেকে সংযত কর। ওই হাস্যকর অস্ত্রটাকে হয় খাপে ঢুকিয়ে নাও, নতুবা আমাকে দিয়ে দাও। তারপর চল ফিরে গিয়ে আলোচনার মাধ্যমেইআমাদের অদ্ভুত ব্যাপারটার ফয়সালা করে ফেলি।

ফিরে যাব? হ্যাঁ, তোমার রক্তাক্ত কাটা মুণ্ডুটা হাতে নিয়েই আমি ফিরব।

বুঝিয়ে শুনিয়ে আমাকে সংযত করতে গিয়ে সে বলল, আরে ধৈর্য ধর, আমার কথা শোন, আমি তোমাকে জানি। এমন একটা হাস্যকর কাজ করা তোমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। আচ্ছা, একটা কথা ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখ তো, মিস ক্লো গ্রীণ একথা জানতে পারলে তোমার প্রতি তার কি ধারণা হবে?

আমি ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়ে তুলে বললাম, চমৎকার! শেষ পর্যন্ত মোক্ষম কথাটাই তুমি বলে ফেললে দেখছি। মিস ক্লো গ্রীণ কি ভাববে, তাই না? তুমি হয়তো জান না, তারা সবাই হেরোডিয়াস-এর সন্তান। তাদের মনে নিজের জায়গা করে নিতে হলে তাদের চোখের সামনেই নিজের হাতে শত্রুর ধড় থেকে মুণ্ডুটা নামিয়ে দিতে হবে। তাই বলছি কি লুই ডিভো তোমার মুণ্ডুটা পাবার সুযোগটা করে দাও। আমার সাফ কথা শোন, নারীদের সঙ্গে একই টেবিলে বসে গণ্ডার আর হাতি শিকার করবে, আবার ভীরুর মত কাঁপবে, তা তো হতে পারে না।

আমি কথার ফাঁকে হাতের ছোরাটাকে দু'একবার নাড়ানাড়ি করতেই সে ভয়ে কেন্নোর মত গুটিয়ে যাবার উপক্রম হল। কাঁপা কাঁপা গলায় কোনরকমে উচ্চারণ করল—

আরে ধ্যুৎ! কি যে করছ! রেবার্ণ, তুমি তো আমাকে ভালই চেন, তাই না?

আরে ব্বাস! তোমাকে আবার চিনি না! খুব ভালই চিনি। কিন্তু আমার দরজার মাথার ঝুলন্ত ঝুড়িটা এখনও খালি পড়ে আছে। ছেলে বুড়ো সবাই রাস্তা দিয়ে যাবার সময় দেখছে দরজার ওপরে খালি ঝুড়িটা দুলছে। আরে সেটা যে তোমার মুণ্ডুটার জন্য হা পিত্যেশ করছে।

লুই ডিভো প্রাণভয়ে কুঁকড়ে গেল। ভীত সন্ত্রস্ত খরগোসের মত সে আমাকে পাশ কাটিয়ে পালাবার চেষ্টা করতেই আমি খপ্ করে তার হাতটা চেপে ধরলাম। ফাঁদে পড়া প্রাণীর মত সে মোচড়া-মুচড়ি শুরু করে দিল। আমি হাতের মুঠোয় সুযোগটা পাওয়ামাত্র শরীরের সবটুকু শক্তি নিঙড়ে, তার গলাটা লক্ষ্য করে দিলাম এক কোপ বসিয়ে। ব্যস, কাজ হাসিল। ছ'-সাতটা কোপ দিতেই আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়ে গেল। মুরগীর বাচ্চার মত বার কয়েক কাৎরেই তার ধড়টা নিশ্চল নিথর হয়ে গেল।

তার রক্তাক্ত মুণ্ডুটা রুমালে বেঁধে নিলাম। আমি একশ' গজ না হাঁটা পর্যন্ত সে তিনবার চোখ দুটো খুলল আবার বন্ধ করল। চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ে আমার পা দুটো ভিজে জবজবে হয়ে গেল। কিন্তু তাতে আমি ভ্রূক্ষেপও করলাম না। বরং তার ছোট করে ছাঁটা চুল আর ছুঁচলো করে ছাঁটা দাঁড়ির খোঁচা লাগায় আমার মন সুখ—যারপরনাই রোমাঞ্চ জাগতে লাগল।

আমি গ্রীণ পরিবারের বাড়ি পৌঁছেই সদর দরজায় ঝুলন্ত খালি ঝুড়িটায় লুই ডিভো-র রক্তাক্ত মুণ্ডুটা ধপাস করে ফেলে দিলাম। ক্লো গ্রীণ ঘর থেকে বেরিয়ে আমাকে দেখে অবাক হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কপালের চামড়ায় ভাঁজ এঁকে সে বলল, টমি, তোমরা কোথায় গিয়েছিলে, বল তো? আমি বেরিয়ে দেখি তোমরা নেই, চলে গেছ।

আমি গম্ভীর স্বরে বললাম, ঝুড়িটার ভেতরে উঁকি মেরে দেখ।

সে পায়ের আঙুলগুলোর ওপর ভর দিয়ে সামান্য উঁচু হয়ে ঝুড়িটার ভেতরে উঁকি দিয়েই বিকট স্বরে চিৎকার করে উঠল। সে যে আনন্দে চিল্লিয়ে উঠেছে শুনে আমি আনন্দিত হলাম।

সে সোল্লাসে বলে উঠল—উফ্! টমি, আমি যা চেয়েছিলাম তুমি অবিকল তা-ই করেছ। আমি যে কী খুশি হয়েছি তা তোমাকে কী করে বোঝাই! আমি যে বলেছিলাম, ছোটখাট কাজই হচ্ছে আসল, সেটা তুমি অন্তরে গেঁথে রেখেছ দেখছি।

লুই ডিভো-র রক্তাক্ত মুণ্ডুটাকে ঝুড়ি থেকে নামিয়ে এনে নিজের এ্যাপ্রণটা দিয়ে জড়িয়ে ধরল। তার মুখটা চকচক করতে লাগল।

আমি স্বগতোক্তি করলাম—ছোটখাট কাজ! সত্যি, ছোটখাট কাজ! নরমুণ্ড শিকারীরাই তবে সঠিক পথে চলে। মহিলারা ভালবাসে যে, তোমরা তাদের জন্য এরকম কাজই সম্পাদন কর। ক্লো গ্রীণ আমার কাছে সরে এসে একেবারে গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ভাবাপ্লুত কণ্ঠে উচ্চারণ করল, তুমি আমার কথা ভাব। সত্যি তুমি আমার কথা ভাব। আমি তো বলেই ছিলাম, ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে ভাব, আর সে সবই তো পৃথিবীটাকে টিকিয়ে রাখে, গড়ে। যে আমার মনের মানুষ হবে ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে তাকে ভাবতেই হবে। ছোট ছোট কাজের মাধ্যমেই তো সে আমার সুখ উৎপাদন করবে। আমি লাল পিচ ফল খেতে চাইলে সে ডিসেম্বর মাসেই পিচফল এনে আমার হাতে তুলে দেবে। ব্যস, আমিও জুন পর্যন্ত তাকে সমানভাবে ভালবেসে যাব। কোন বর্মধারী নাইট আমার জন্য তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করুক এটা আমার কাম্য নয়। টমি, তুমি সত্যি আমাকে খুশি করেছ।

আমি মুখটাকে তার মুখের কাছে নামিয়ে আনলাম। সশব্দে চুমু খেলাম। আমার মাথাটা ঝিমঝিম করতে লাগল। মুহূর্তে লুই ডিভো--র মাথাটা একটা নারকেলে পরিণত হয়ে গেল।

ক্লো গ্রীন খুশিতে ডগমগ হয়ে বলতে লাগল 'আজ কী আনন্দ টমি! আজ রাতের খাবারে নারকেলের পুডিং থাকছে। তোমাকেও কিন্তু আসতেই হবে মনে থাকে যেন।

কথা বলতে খুশিতে ডগমগ হয়ে সে পাশের ঘরের দিকে গেল। চোখের পলকে কর্পূরের মত উবে গেল।

একটু বাদেই ডাঃ স্ট্যামফোর্ড উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটতে ছুটতে সেখানে এল। সে খপ করে আমার নাড়িটা চেপে ধরল, তার ভাবটা এমন যে, আমি যেন চুপিচুপি কেটে পড়ার ধান্ধা করছিলাম।

সে ক্রোধে গর্জে উঠল, তুমি যে কোন পাগলা গারদের বাইরে সবচেয়ে বড় আহাম্মক! তুমি কেন বিছানা থেকে উঠে এসে ঘুর ঘুর করছ! খপ করে তার হাতটা চেপে ধরে সে রীতিমত আৎকে উঠল, তোমার নাড়ি এমনভাবে চলছে যেন কেউ অনবরত হাতুড়ি চালাচ্ছে।

আমি বললাম, ডাক্তার, দু'একটা কাজের নাম বল তো।

আরে ডিভো-ই আমাকে তলব করেছে। সে ঘরের জানালা দিয়েই দেখেছিল, তুমি বৃদ্ধ ক্যাম্পোস-এর দোকানে ঢুকছ। তার নিজের মাপকাঠিটা বাগিয়ে ধরে তাকে পাহাড় পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে গেছ। যাবার সময় তার সবচেয়ে বড় নারকেলটাকে সঙ্গে নিয়ে গেছ।

শুনুন ডাক্তার, ছোটখাট জিনিসগুলোই তো আসল। আর—।

আরে ধ্যুৎ! এ মুহূর্তে তোমার পক্ষে বিছানাটাই আসল, বুঝলে? চল আমার সঙ্গে। তুমি এক্কেবারে যাচ্ছেতাই দেখছি!

ব্যস, আমার বরাতে আর নারকেল পুডিং জুটল না। কেবলমাত্র নরমুণ্ড শিকারীদের প্রতি আমার মধ্যে একটা অবিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে উঠল। আরও বহু শতক ধরে হয়তো গ্রাম্য যুবতী নারীরা দরজার ওপরে ঝুলন্ত ঝুড়িটার নরমুণ্ডুটার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে অধীর প্রতীক্ষায় থাকবে অন্য কোন ছোটখাট বিজয়ের পুরস্কার লাভের প্রত্যাশা বুকে নিয়ে।

দ্য হায়ার প্র্যাগমেশন

আমার কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে উঠেছে, জ্ঞান লাভের জন্য কার শরণাপন্ন হব? প্রাচীনদের মন থেকে মুছে ফেলা হয়েছে, এরিস্টটল, প্লেটো, মার্কস অরেলিয়াস, এপিটেটাস আর সলোমান কারো কাছে যাওয়ার জন্যই মন থেকে উৎসাহ পাচ্ছি না। আর ঈশপ তো এখন ভারতবর্ষীয়দের সর্বস্বত্বাধীন।

বহু বছরে ধরে সে পিপীলিকাকে স্কুলপাঠ্য বইয়ের পাতায় বুদ্ধি আর শ্রমের আদর্শের নজীর হিসাবে ব্যপ্ত করা হচ্ছে। সম্প্রতি প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে তারা একেবারেই আহাম্মক নির্বোধের শিরোমণি। অহেতুকই পরিশ্রম আর সময় দু-ই বরবাদ করে। আর পেঁচাকেও অবজ্ঞাভরে বাদের দলে ফেলা হয়েছে। পাকা দাড়িওয়ালাগণ চুল গজানোর দাওয়াইয়ের ফলাও করে প্রশংসাপত্র বিতরণ করছে। প্রাত্যহিক খবরের কাগজের পাতায় ছাপা দিনপঞ্জীতে ছাপার ভুল দেখা যাচ্ছে। কলেজের অধ্যাপকরা আজ—

না, ব্যক্তি বিশেষের প্রসঙ্গ ছাড়ান দেওয়া যাক। চারদেওয়ালে ঘেরা শ্রেণীকক্ষে বসে শব্দকোষের পাতা ঘেঁটে আর অতীত কাহিনীতে মন প্রাণ সঁপে দিয়ে আমাদের পক্ষে জ্ঞানার্জন একেবারেই অসম্ভব। কবির বক্তব্য—জ্ঞান লাভ হয়, তবে বিজ্ঞতা থেকেই যায়। বিজ্ঞতাকে শিশিরের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। তা আমাদের অজান্তেই আমাদের ভিজিয়ে রাখে, সতেজতা দান করে আর আমাদের বুদ্ধির ক্ষেত্রে একমাত্র সহায়ক হিসাবে কাজ করে। আর জ্ঞানকে বেগবান জলধারা মনে করা যেতে পারে যা আমাদের শিকড়কে নাড়া দেয় আন্দোলিত করে থাকে।

তবে? আমরা তবে বিজ্ঞতা সঞ্চয়ের দিকেই ঝুঁকি? কিন্তু জ্ঞান-অজ্ঞান ছাড়া তো আর বিজ্ঞতা লাভ সম্ভব নয়। কোন একটা ব্যাপার জানা হলে তবেই তো আমরা যথার্থভাবে জানি। কিন্তু আমরা বিজ্ঞ হয়ে গেছি জানলেই তো বিজ্ঞ হয়ে উঠি না।

যাক গে, আগে গল্পটা বলি। পরেই না হয় জ্ঞান আর বিজ্ঞতার কচকচানি নিয়ে মাতামাতি করা যাবে।

একদিন ছোট্ট একটা পার্কের বেঞ্চে একটা দশ সেন্ট দামের খবরের কাগজ পড়ে থাকতে দেখি। অন্তত আমি তার পাশেই বেঞ্চের ওপর বসার সময় আমার কাছে সে দামটাই দাবী করেছিল। খবরের কাগজটা ছিল ছেঁড়া আর খুবই ময়লা। তবে তাতে যে কয়েকটা গল্প একত্রিত করে বাঁধা ছিল এ ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ছিলাম। কার্যত দেখা গেল সেটা খবরের কাগজ থেকে কেটে আঁঠা দিয়ে সেঁটে দেওয়া খবর আর ছবির সংকলন।

আমি সেটাকে পরীক্ষায় লিপ্ত হতে গিয়ে বললাম—আমি একজন সংবাদপত্রের প্রতিবেদক। যে সব অদৃষ্টবিড়ম্বিতরা প্রতিটা সন্ধ্যায় পার্কের বেঞ্চে বসে কাটায় তাদের নিয়ে একটা প্রবন্ধ লেখার দায়িত্ব আমার ওপর বর্তেছে। তোমার এ পতন কিভাবে ঘটল জানতে পারি কি?

আমার হাতের ক্রীত বস্তুটা এমন সরবে হেসে উঠল যাতে আমি নিঃসন্দেহ হতে পারলাম, বহুকালের মধ্যে এই প্রথমবার এরকম প্রশ্ন করা হয়েছে।

সে আমাকে লক্ষ্য করে বলে উঠল—না, কিছুতেই তুমি কোন প্রতিবেদক বা প্রবন্ধকার নও। তারা কখনই এরকম কথা বলে না। প্রতিবেদক দেখলেই আমি চিনে নিতে পারি। আমাদের মত পার্কের লালুরা মানুষের স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। আমরা এখানে, বেঞ্চে বসে দিনভর কতসব মানুষ যাওয়া-আসা করতে দেখি। আমার বেঞ্চটার পাশ দিয়ে যারা অদ্ভুতভাবে হেঁটে যায় তারা কোন্ ধরনের চিজ তাও আমার নখদর্পণে।

ভাল কথা, তবে বল তো, আমি কোন্ ধরনের চিজ বলে তুমি মনে করছ? আমি প্রশ্ন করলাম।

বেশ ইতস্ততের পর মানব প্রকৃতির ছাত্রটা মুখ খুলল—আমি তো মনে করি তুমি একজন দিন-মজুরির কাজে নিযুক্ত, চুক্তিতে কাজ কর, নইলে কোন দোকানের কর্মচারী, তা নইলে সাইনবোর্ড লেখার কাজে নিযুক্ত। হাতের জ্বলন্ত চুরুটটাকে মৌজ করে টানার জন্যই পার্কটায় ঢুকেছিলে। যাক গে, অন্ধকার যে ঘনিয়ে আসছে তা-তো নিজের চোখেই দেখছ। তোমার গিন্নি কিন্তু তোমাকে বাড়িতে ধূমপান করতে দেবে না। না-হে, ভাল করে ভেবে চিন্তে আমি বলছি, তোমার কোন গিন্নি

নেই।

আমি নিজেকে আর স্থির রাখতে না পেরে বলে উঠলাম—না, না! এ কী কথা বলছ! গিন্নি নেই বটে, কিন্তু কামদেবের চুম্বকের আকর্ষণে গিন্নি ঠিক এসে যাবে। তবে যদি—

আমাকে থামিয়ে দিয়ে ছন্নছাড়া ভবঘুরেটা বলে উঠল—আরেব্বাস! এটা যে তোমার নিজেরই একটা গল্প আছে। তোমার দেওয়া ডাইসটা ফিরিয়ে নাও। তার বদলে তোমার গল্পটাই আমাকে শোনাও। যে সব ভাগ্যহীন সন্ধ্যাগুলো পার্কের বেঞ্চে কাটায় তাদের উন্নতি-অবনতির কথা জানার জন্য আমি খুবই উৎসাহী। বল তোমার গল্পটা শুরু কর।

এর পিছনে কারণ যাই থাক না কেন, বক্তব্যটা আমার মনে ধরল। সংসার কর্তৃক পরিত্যাক্ত ময়লা-জীর্ণ দ্রব্যটার দিকে অত্যুগ্র আগ্রহান্বিত হয়ে তাকালাম। ভাবলাম আমারও তো একটা গল্প আছে, তার কাছে সেটা বলার আপত্তি কিছু থাকতে পারে না। জনা কয়েক বন্ধুর কাছে তো বলেছি আমি চিরকালই লাজুক প্রকৃতির। ছন্নছাড়া বাউন্ডুলেটার কাছে গোপন কথাগুলো, গল্পটা বলার উৎসাহ দেখে আমি নিজেই কম অবাক হলাম না।

আরে, আমার নামটাই তো বলা হ'ল না। বলছিলাম, আমার নাম ম্যাক।

আমি তাকে লক্ষ্য করে বললাম—ম্যাক, আমি তবে গল্পটা বলছি, কি বল?

ডাইসটা কি তুমি আগেই ফেরৎ নিতে চাচ্ছ? আমি তাকে একটা ডলার দিয়ে বললাম—তোমার গল্পটার দাম ডাইসটা।

সে বলল—চমৎকার! এবার তোমার গল্প শুরু কর।

আমি গল্পটা শুরু করতে গিয়ে মুখবন্ধস্বরূপ বললাম—যেসব প্রেমিকরা তাদের মর্মভেদী আর্তনাদের কথা কেবলমাত্র আকাশের গায়ে ঝুলন্ত বাঁকা চাঁদ আর রাতের বাতাসের কাছেই ব্যক্ত করে তারা বিশ্বাস করতেই উৎসাহ পাবে না যে, আমার অন্তরের গোপন কথা এক ধ্বংসস্তূপের কাছে ব্যক্ত করলাম।

আমি মিসড্রেড টেলফেয়ারকে অন্তরের ভালবাসা নিঙড়ে দিয়ে যেসব দিন, মাস আর বছর কাটিয়েছিলাম তার সব কাহিনী তার কাছে ব্যক্ত করলাম। আমার অন্তরের সীমাহীন হতাশা আর হাহাকার, অসহনীয় মানসিক যন্ত্রণা আমার বিনিদ্র রাত্রি যাপন আর ব্যর্থ আশা আকাঙ্ক্ষার কথা তার কাছে ব্যক্ত করতে কিছুই গোপন করলাম না। আর আমার সে রাতের বন্ধুটার কাছে আমার প্রেমিকার নাম, তার চেহারার বিবরণ, তার রূপ সৌন্দর্য, সামাজিক মর্যাদা আর প্রাচীন সে বংশের গৌরব ছিল কোটিপতিদের চেয়ে অনেক, অনেক বেশী। বংশের বড় মেয়ে হওয়ার জন্য সে জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আর প্রাচুর্যের মধ্য দিয়ে জীবনের দিনগুলো কাটিয়েছে সবই খোলসা করে তার কাছে ব্যক্ত করলাম।

সে রূঢ় বাস্তব জগতে আমাকে টেনে নামিয়ে সবিস্ময়ে আমাকে বলল—এ কী তাজ্জব ব্যাপার! সে যুবতীটাকে তুমি কেন তুলে দিচ্ছ না। বুঝছি না তো!

তাকে বহুভাবে বুঝিয়ে বললাম—দেখ হে, আমার আর্থিক সঙ্গতি—মানে উপার্জনের কথা বলছি, আর আমি এতই ভীতু যে, আমার প্রেম ভালবাসার ব্যাপারটা তার কাছে খুলে বলার মত বুকের পাটা আমার ছিলই না। তার কাছে এও বলতে ভুললাম না, সে সামনে এলে, মুখোমুখি দাঁড়ালেই লজ্জায় আমার শরীরের সব রক্ত যেন মুখে গিয়ে আশ্রয় নিত। কেবল তোৎলানো ছাড়া কিছুই পরিষ্কারভাবে বলতে পারতাম না। আর সে আমার কাণ্ডকারখানা দেখে মন উতলা করে তোলা সরব হাসিতে মুখর হয়ে উঠল।

ম্যাক বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বলল—একটা কথা, সে কি পেশাদার মেয়ে, মানে—

আরে না, না। সে টেল্‌ফেয়ার পরিবারের মেয়ে। সবাই পঞ্চমুখে পরিবারটার প্রশংসা করে।

তার কোন বোন আছে কি?

আছে। একটামাত্র বোন আছে।

সে ছাড়া অন্য কোন মেয়ের সঙ্গে তোমার আলাপ পরিচয় আছে কি?

আছে। তাদের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়।

বুঝেছি। তা এতক্ষণ বল নি কেন? আরে তোমার কথা শুনে আমার নিজের কথাই মনের কোণে

উঁকি মারছে। আমার কথাও তোমাকে অবশ্যই শোনাব।

তার কথায় আমি ভেতরে ভেতরে রাগে ফুঁসতে লাগলাম। কারণ, একজন হা-ঘরে আর হা-ভাতের সঙ্গে আমার তুলনা করা হচ্ছে বলে আমার রাগ হবার তো কথাই বটে। সবচেয়ে বড় কথা, আমি তো আগেভাগেই তাকে এক ডলার দশ সেন্ট দিয়ে রেখেছি, ফলে তাকে, চেপে ধরলাম।

আমার সঙ্গীটা তার হাতের গুলি ফুলিয়ে বলল—আমার সম্প্রসারিত মাংসপেশীটা একবার ধরে দেখ তো। তার হাতটা ঢালাই লোহার মত শক্ত।

ম্যাক গর্বেক সঙ্গে সঙ্গে বলল—দেখ, বছর চারেক আগেও পেশাদারী রিং-এর বাইরে নিউইয়র্ক শহরের যেকোন পেশাদারী মুষ্টিযোদ্ধাকে আমি ধরাশায়ী করে দিতে পারতাম। তবেই বল, তোমার আর আমার, উভয়ের ব্যাপার সমপর্যায়ের কি না? আমি পশ্চিম অঞ্চলের বাসিন্দা। তবে বাড়ির নম্বরটা তোমাকে দিচ্ছি না। মুষ্টিযুদ্ধের খাতায় আমি নাম লিখিয়েছিলাম দশ বছর বয়সে। আর যখন আমার বয়স ছিল কুড়ি তখন শহরের কোন অ-পেশাদারী যোদ্ধা আমার সঙ্গে লড়াই করে চতুর্থ রাউন্ড পর্যন্তও টিকে থাকতে পারত না।

তবে প্রথম যেদিন এক পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধার সঙ্গে লড়াই রিং-এর ভেতরে পা দিলাম সেদিনই আমি একটা গলদা চিংড়িতে পরিণত হয়ে গেলাম। কি করে যে এমনটা হয়ে গেল আমি ঠিক বলতে পারব না। আমার বিশ্বাস, আমি বড়ই ভাবপ্রবণ। হয়ত বা প্রস্তুতিপর্ব ও উপস্থিত দর্শক সমাগম দেখেই আমি স্নায়বিক দুর্বলতা অনুভব করতে লাগলাম। রিং-এর ভেতরে মুষ্টিযুদ্ধ করে আমি কোনদিন জয়ী হতে পারিনি। আমার ম্যানেজারের সঙ্গে লাইট ওয়েট এবং অন্যান্য মুষ্টিযোদ্ধারা চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে। লড়াই শুরু হতেই আমি ধরাশায়ী হয়ে যাই। আসলে মুষ্টিযুদ্ধের রিং, মুষ্টিযোদ্ধা আর দর্শকের ভিড় দেখা মাত্র আমার ভেতরে কেমন যেন মোচড় মারতে থাকে।

লড়াই শুরু হতে না হতেই দর্শকরা দেখে আমি রিং-এর বাইরে ছিটকে পড়ে চিৎ হয়ে রয়েছি। আসলে কিন্তু রিং-এর বাইরে বা ভেতরে আমি অনেকেরই সমকক্ষ যোদ্ধা ছিলাম, সন্দেহ নেই। কিন্তু পেশাদার কোন মুষ্টিযোদ্ধার মুখোমুখি হলে কেমন একটা অভাবনীয় অনুভূতি আমার অন্তরাত্মাকে শুকিয়ে দিত।

অনন্যোপায় হয়েই আমাকে মুষ্টিযুদ্ধের রিং-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে দিতেই হল। এবার একটা অদ্ভুত অভ্যাস আমার মধ্যে ভর করল। হাটে মাঠে শহরে যেকোন স্থানে অপেশাদার কোন মুষ্টিযোদ্ধাকে দেখামাত্র দুম্ করে তার মুখে ঘুষি বসিয়ে দিতে লাগলাম। আর কারণে-অকারণে, যেকোন পরিস্থিতিতে বাসের বা ট্রেনের কন্ডাক্টার, মালগাড়ি চালক, ট্রেনের চালক বা মোটরের চালককে হাতের নাগালের মধ্যে পেলেই দমাদম ঘা-কতক বসিয়ে দিতে লাগলাম। রিং-এর বাইরে কে কতবড় বীর আর যুদ্ধের কলাকৌশল তার রপ্ত করা আছে এসবের পরোয়া না করেই তাদের কুপোকাৎ করে দিতে লাগলাম। রিং-এর বাইরে যাদের অনায়াসে হারিয়ে দেবার আত্মবিশ্বাস ছিল সেই আত্মবিশ্বাসটুকু যদি আমার থাকত তবে আজ আমার গলায় মুক্তোর মালা আর পায়ে রেশমি মোজা শোভা পেত, সন্দেহ নেই।

বাওয়ারির ধার দিয়ে হেঁটে যাবার সময় হঠাৎ একজন বস্তিবাসী আমাকে ঘিরে ফেলল। তারা সংখ্যায় ছ'-সাতজন। তাদেরই একজন আচমকা একটা ধাক্কা দিয়ে আমাকে রাস্তার ধারে সরিয়ে দিল। পর পর তিনদিন আমার নিরম্বু উপবাস চলছিল। আমি ক্রোধোন্মত্ত বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে গর্জে উঠলাম—খুব মজা পেয়েছ, তাই না? কথাটা বলতে বলতে তার মুখে দুম্ করে এক ঘা বসিয়ে দিলাম। সে-ও সহজে রণে ভঙ্গ দিয়ে লেজ তুলে পালাবার পাত্র নয়। লড়াইয়ের কায়দা কৌশল তার ভালই রপ্ত ছিল। তবু তাকে ধরাশায়ী করতে আমার ছ' মিনিটও সময় লাগল না।

এবার গ্রামবাসীদের একজন আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল—হে বীর, তুমি কে আমার জানা নেই। কিন্তু ওই যে, যাকে তুমি কুপোকাৎ করলে তার পরিচয় কিছু জান? সে বিশ্বের মিড্‌ল ওয়েট চ্যাম্পিয়ন। রেড্‌ডি বার্নস্ তার নাম। গতকালই তিনি নিউইয়র্কে পা দিয়েছেন। জিম জেফ্রিস-এর সঙ্গে একটা ম্যাচ খেলবেন। অবশ্য তুমিও যদি তাঁর সঙ্গে—

কিন্তু আমি সংজ্ঞা ফিরে পাওয়ার পর দেখলাম, এমোনিয়ার গন্ধে কুঁকড়ে দুমড়ে ওষুধের দোকানের সামনের রোয়াকটার ওপর পড়ে আছি। আগে যদি ঘুণাক্ষরেও জানতাম যে, সেই

বিশ্বশ্রেষ্ঠ রেড্‌ডি বার্নস তবে ভুলেও তাঁর গায়ে একটা আঁচড় পর্যন্ত দিতে উৎসাহী তো হতামই না বরং টুক্ করে নালায় নেমে হামাগুড়ি দিয়ে গুটিগুটি কেটে পড়তাম।

ম্যাক উপসংহার টানতে গিয়ে বলল—দেখ হে, এ সবই কল্পনার ব্যাপার স্যাপার। সে জন্যই তো বলছিলাম, তোমার আর আমার ব্যাপার একই। তোমার পক্ষে জয়লাভ কখনই সম্ভব নয়? পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধাদের সঙ্গে লড়াইয়ে টিকে থাকা তোমার কম্ম নয়। তাই বলছি কি, তোমার উপযুক্ত স্থান পার্কের ওই বেঞ্চটা।

ম্যাক ফিক্ ফিক্ করে হাসতে হাসতে বলল—তুমি যা-ই বল না কেন, আমি কিন্তু কোন সাদৃশ্যই দেখতে পাচ্ছি না। বড়সড় রিং-এর সঙ্গে আমার পরিচয় খুবই কম।

ধ্যুৎ! যতই হম্বিতম্বি কর না কেন তোমাকে হারতেই হবে। কারণ, তুমি রিং-এ যেতেই ভয়ে কুঁকড়ে যাও। লড়াইয়ে আসা তো পরের কথা, কোন পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধার সামনে তুমি মাথা তুলে দাঁড়াতেই ভয়ে কুঁকড়ে যাও। তাই তুমি আর আমি সমান।

ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই আমি কণ্ঠস্বরে ব্যস্ততা প্রকাশ করে বলে উঠলাম—আরে-ব্বাস! এত দেরী হয়ে গেল। আমাকে যে এখন বিদায় নিতেই হচ্ছে।

আমি ফুট দশেক এগিয়ে যেতেই বেঞ্চের লোকটা গলা ছেড়ে বলে উঠল—ডলারটার জন্য খুবই আপশোষ হচ্ছে। আর ডাইসটার জন্যও কম ব্যথা পাইনি! তোমার পক্ষে জয়লাভ করা কোন দিনই সম্ভব হবে না। কারণ, তুমি যে একজন সখের মুষ্টিযোদ্ধা।

আমি স্বগতোক্তি করলাম—একজন ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করতে গিয়ে উচিত ফলই পেয়েছ।

আমি হাঁটতে হাঁটতে লোকটার ওপর রাগে ফুঁসতে লাগলাম। সামান্য এগিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ঘাড় ঘুরিয়ে গলা ছেড়ে বললাম—তুমি দেখে নিও, রেড্‌ডি বার্নস-এর সঙ্গে লড়াই করার হিম্মত আমার আছে। এমন কি তার পরিচয় জানার পরও আমি তার সঙ্গে লড়াইয়ে নামার সাহস রাখি।

লম্বা লম্বা পায়ে আমি টেল্‌ফেয়ার ভবনে গিয়ে ফোন করলাম। বিপরীত দিক থেকে মিষ্টি মধুর গলা ভেসে এল, কি ব্যাপার, গলাটা কি আমার পরিচিত নয়?

স্বাভাবিক কণ্ঠে বললাম—আরে তুমি যে!

টেল্‌ফেয়ার পরিবার সুলভ মিষ্টি গলায় জবাব এল—কিন্তু আপনি কে বলুন তো?

আমি? আমি সরাসরি ক'টা কথা তোমাকে বলতে চাইছি।

বিপরীত দিকে কণ্ঠস্বর শোনা গেল—কী অদ্ভুত ব্যাপার! তুমি মিঃ আর্ডেন!

ঠিকই, অনুমান অভ্রান্তই বটে। এবার আসল কথা বলছি শোন। তোমাকে আমি কত ভালবাসি তা তো তোমার অজানা নয়। আর দীর্ঘদিন যাবৎ আমি একটা অর্থহীন আহাম্মকির চর্চা করে চলেছি। কিন্তু এ ব্যাপারে আমি আর আহাম্মকের মত কাজ করতে রাজি নই। অর্থাৎ এ মুহূর্তেই তোমার কাছ থেকে একটা জবাব আমি আশা করছি। সাফ কথা বল, তুমি আমাকে বিয়ে করতে সম্মত কিনা?

বিয়ে? তোমাকে? তোমাকে বিয়ে করতে আমি সম্মত, অবশ্যই সম্মত। আমি তোমার মনের কথা জানতাম না। তুমি—তুমি যে আমাকে ভালবাস একথা কোনদিনই মুখ ফুটে বলনি। উফ্! কী চমৎকার কথা! কী শান্তি। তুমি দয়া করে এখনই আমাদের বাড়ি চলে এস। আমার আন্তরিক ইচ্ছার কথা ফোনে বলা সম্ভব নয়। শীঘ্র বাড়িতে এস। কি, আসবে তো?

আমি হন্তদন্ত হয়ে টেল্‌ফেয়ার ভবনে হাজির হলাম। সাধ্যমত জোরে জোরেই ঘণ্টাটা বাজালাম। একজন দরজা খুলে দিল। আমাকে বৈঠকখানায় নিয়ে গেল। ঘরের সিলিং-এর দিকে চোখ রেখে আমি স্বগতোক্তি করলাম—প্রত্যেক মানুষের কাছ থেকেই প্রত্যেকের কিছু না কিছু শেখার আছে। ম্যাক চমৎকার এই দার্শনিক তত্ত্বটা শুনিয়েছে। নিজের অভিজ্ঞতার সুফলটা সে পেল না, পেলাম আমি। পেশাদারী দলে যদি নাম লেখাতে চাও, তবে তোমাকে করতে হবে—

না, আমার চিন্তা ভাবনা আর অগ্রসর হতে পারল না। সিঁড়িতে কার যেন পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। অনুমান করতে অসুবিধা হল না, একজন পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধা যখন রিং-এর দড়িটা

ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকত তখন ম্যাক কোন অবস্থার সম্মুখীন হত। সেখান থেকে চম্পট দেওয়ার উপযুক্ত দরজা বা জানালার খোঁজে আমি আহাম্মকের মতো এদিক ওদিক তাকাতে লাগলাম। অন্য কোন মেয়ের আসার কথা থাকলে আমি হয়ত বা—

আমার চিন্তায় বাধা পড়ল। ঠিক সে মুহূর্তেই দরজাটা দুম্ করে খুলে গেল। বেস, সিলড্রেড-এর ছোট বোন ঘরে ঢুকল। এর আগে তার এমন রূপ-সৌন্দর্য আমার চোখে পড়েনি। সে ধীর পায়ে আমার দিকে এগোতে লাগল।

সে এবারও টেল্‌ফেয়ার সুলভ মিষ্টি মধুর স্বরে বলল—আগে কেন এ কথাটা আমাকে বল নি ফিল? তুমি একটু আগে টেলিফোন করার আগে পর্যন্ত আমার তো দৃঢ় বিশ্বাস ছিল দিদির প্রতিই তোমার আকর্ষণ, মানে তাকেই ভালবাস।

আমার বিশ্বাস, ম্যাক আর আমি চিরদিন হতাশ সৌখীনদের দলভুক্তই থেকে যাব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখছি, আমার ব্যাপারটা ঘুরে অন্য রকম হয়ে গেল। এর জন্য আমি খুব, খুবই খুশি।

রাস ইন আরব

মানুষের বিচার যদি অর্থকড়ি দিয়েই করা হয় তবে আমি তিন শ্রেণীর মানুষকে অন্তর থেকে মেনে নিতে পারি না। তারা যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে পারে তার চেয়ে বেশী পরিমাণ অর্থ যাদের আছে। তাদের যে অর্থ আছে তার চেয়ে বেশী যারা ব্যয় করে সে সব মানুষের কথা বলতে চাইছি।

উপরোক্ত তিন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর মানুষগুলোকে আমি তিলমাত্রও বরদাস্ত করতে পারি না। তবে ব্যক্তি হিসাবে আমি সবচেয়ে বেশী পছন্দ করি স্পেন্সার গ্রেন্‌ভিল নর্থকে। তিনি লক্ষ লক্ষ ডলারের মালিক হলেও সেটা যে ঠিক কত লক্ষ আমি স্মরণ করতে পারছি না।

সে বছর গ্রীষ্মে আমি শহরের বাইরে এক পা-ও বাড়াই নি। আমি অধিকাংশ সময় লাক্ষা দ্বীপের দক্ষিণের একটা গ্রামেই গিয়ে থাকি। সচরাচর এর বাইরে অন্য কোথাও যাই না। তবে সে গ্রীষ্মে তাও যাই নি।

এক বন্ধু আমাকে প্রশ্ন করেছিল, সে গ্রীষ্মে আমি কেন যাই নি? জবাবে আমি বলেছিলাম, পৃথিবীর মধ্যে উৎকৃষ্টতম গ্রীষ্মাবাস হচ্ছে, নিউইয়র্ক। আপনারা কথাটা এর আগেও শুনেছেন। আমি কিন্তু একথাই তাকে বলেছিলাম।

সে বছর আমি থিয়েটারের ব্যবস্থাপক ও প্রযোজক—বিংক্‌লে অ্যান্ড কিং-এর প্রেস-এজেন্ট ছিলাম।

প্রেস-এজেন্ট-এর অর্থ এবং তার কাজ সম্বন্ধে আপনাদের অবশ্যই ধারণা আছে। আসলে কিন্তু সেটা নয়। প্রেস এজেন্ট হবার রহস্য তো সেটাই।

সি. অ্যান্ড এন উইলিয়মসন গাড়িটা নিয়ে বিংক্‌লে ফ্রান্স সফরে বেরিয়েছে। আর কিং কেশ বিন্যাসের যন্ত্রচালানো শিখতে স্কটল্যান্ডে গেছে। তারা যাত্রা করার আগেই স্বাভাবিক উদারতাবশত ছুটি কাটাবার জন্য আমাকে জুন-জুলাইয়ের বেতন অগ্রিম দিয়ে গেছে। আমি কিন্তু ছুটিতে নিউইয়র্কে থেকে গেছি। কারণ, আমার মতে এর চেয়ে ভাল গ্রীষ্মাবাস অন্য কোথাও নেই।

দশই জুলাই নর্থ তার এডিরনড্যাক্স শিবির থেকে এ শহরে এল। মনে মনে এমন এমন একটা শিবিরের ছবি আঁক যেখানে ষোলটা ঘর আছে। আর সেখানে ঘরগুলোতে আছে আসবাবপত্র, পালকের মোটা লেপ, একটা গ্যারেজ, টেলিফোন, রূপোর প্লেট আর একজন খানসামা। তবে শিবিরটা একটা জঙ্গলের মধ্যে অবস্থান করছে।

আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যই নর্থ নিউইয়র্কে ছুটে এসেছে। সে রীতিমত সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। পোশাক আশাক অতিরিক্ত ঝকমকে আর গায়ের রং বাদামী। খুবই আমুদে—যাকে বলে রীতিমত হৈ হট্টগোল প্রিয়।

কথা প্রসঙ্গে সে আমাকে বলল—কয়েকটা জরুরী কাগজপত্রে সই করা আর সে রকমই কিছু

কাজ সারবার জন্য দিন কয়েকের জন্য চলেই এলাম। আমার উকিলের টেলিগ্রাম পেয়েই ছুটে এসেছি।

শহরে পথ দিয়ে একটু ফুরসত পেয়েই তোমাকে টেলিফোন করে জানতে পারলাম তুমি এখানেই আছ। শহরের কুড়ের বাদশাদের মত এখানে পড়ে থেকে করছটা কি বলত? তোমার স্বপ্ন-সাধের মুল্লুক লংদ্বীপের কি হ'ল বলত? প্রতি বছর গরম পড়তেই তো খিটখিটে মেজাজ আর টাইপরাইটারটা নিয়ে সেখানে পাড়ি জমাও। আর রাত্রির অন্ধকার নামলেই আমার সেসব রাজহাঁস নাচ-গানে মেতে থাকে—ব্যাপারটা কি, অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছে কি?

আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম—রাজহাঁস? তার চেয়ে বরং বল পাতিহাঁস। রাজহাঁসের সুর তো ভাগ্যবানদের শ্রবণেন্দ্রিয়কে আনন্দ দানের জন্য হে। ভাগ্যদেবীর বরপুত্রদের আনন্দদানের জন্য তারা ঐশ্বর্যশালীদের কৃত্রিম হ্রদে পরমানন্দে সাঁতার কেটে বেড়ায়।

আরে ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলে আর বহিরাগত অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্য তারা তো সেন্ট্রাল পার্কেও সাঁতার কাটে। সেখানেও বহুবার তাদের দেখেছি। সে যাই হোক, গ্রীষ্ম যে ফুরিয়ে আসতে চলেছে। আর তুমি কুনো ব্যাঙের মত এখনও শহরেই পড়ে আছ দেখছি।

আমি আবার বলতে শুরু করলাম—গ্রীষ্মাবাসগুলোর মধ্যে নিউইয়র্ক শহরটাকে আমি সবার সেরা মনে করি।

রীতিমত দৃঢ়তার সঙ্গেই নর্থ আমার কথার প্রতিবাদ করল—আরে, একথা বোলো না। পুরনো একথাটা আর কতবার শুনব, বল তো? তোমাকে তো আর আমার চিনতে বাকি নেই। যত যাই বল না কেন, এবারের গরমকালটা তোমার উচিত ছিল আমাদের সঙ্গে যাওয়া, আনন্দ করে কাটিয়ে আসা। আমাদের সঙ্গে গেলে সেখানে টম ভন্‌লি, মনরো পরিবার, লু লু ট্যানফোর্ড, প্রেস্টন পরিবার, মিস কেনেডি আর তার মাসির সঙ্গে দেখা হত। ভাল কথা, মাসিকে তোমার কিন্তু খুবই ভাল লাগত। চমৎকার মহিলা, কি বল?

ধ্যুৎ! মিস কেনেডির মাসিকে আমি কোনদিনই দেখতে পারতাম না। আমার দু'চোখের বিষ।

আরে আমি কি সেরকম কিছু বলছি নাকি? আসলে তোমাকে বোঝাতে চাচ্ছি, সেখানে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ স্ফূর্তির মধ্যেই আমাদের দিনগুলো কেটেছে। বিদ্যুৎ চালিত লঞ্চে মাছ, বিশেষ করে ট্রাউট মাছ ধরা। অন্য সময় লঞ্চে চড়ে সান্ধ্যভ্রমণ সারা, সঙ্গে ফটোগ্রাফ তো ছিলই। আবার বনের ভেতর দিয়েও আঁকাবাঁকা পথ আছে। সেখানে মোটর চালানো কী আনন্দদায়ক ব্যাপার তা আর তোমাকে বুঝিয়ে বলার দরকার আছে বলে মনে করি না। আবার সেখান থেকে মাত্র মাইল তিনেক দূরে 'পাইনক্লিপ ইন'টা অবস্থিত। বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের নারী-পুরুষ সেখানে এবছর জড়ো হয়েছিল। আমরা প্রতি হপ্তায় দু'দিন সেখানকার নাচের আসরে অংশগ্রহণ করতে চাই। তুমি কি দুটোমাত্র দিন আমাদের সঙ্গদান করতে পারবে না?

তোমার আমন্ত্রণ, সহানুভূতির জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তবে গ্রীষ্মকালটা আমার কাছে এ শহরটাই আকর্ষণীয় আমি বললাম, বুর্জোয়ারা শহর ছেড়ে চম্পট দিয়েছে, তাই আমি সম্রাট নিরো হয়ে থাকতে পারব। এখানে বৈদ্যুতিক পাখা আমার জন্য মেরু প্রদেশের হাওয়া জোগান দেবে।

নর্থ নাছোড়বান্দা। সে তবু বলল—আমার অনুরোধটা রাখ। ওখানে অফুরন্ত সুযোগ-সুবিধা। জানি। তোমরা, মানে ধনকুবেররা কেমন শিবিরে বাস কর তা তো আমার অজানা নয়। তোমরা বুনো ফুল সরিয়ে রেখে শ্যাম্পেনের বালতি কাছে টেনে নেও। ম্যাডাম টেট্রাজিনি আহারাদির পর নৌকার মঞ্চে বসে গান-বাজনা নিয়ে মেতে ওঠ, তা-ও জানি।

আরে, কি যে ভাব। যতটা ভাবছ আমরা কিন্তু ততটা বখাটে হয়ে যাই নি। বিচিত্রানুষ্ঠানের একটা দল তিন-চার রাতের জন্য সেখানে গিয়েছিল, মিথ্যে নয়। তবে এও সত্য যে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গায়ক কেউই ছিল না। আর গ্রীষ্মটা তুমি শহরে কাটাতেই অত্যুৎসাহী একথা অন্য কাউকে বিশ্বাস করাতে পারলেও আমাকে পারবে না। তুমি যা বলছ তা যদি তোমার মনের কথা হয়ে থাকে তবে গত চার বছর ধরে কেন গ্রীষ্মকালটা সেখানে কাটিয়েছ? একবার তো বন্ধুবান্ধবদের না বলে শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিলে। এমন কি বন্ধুদের পর্যন্ত সরল গ্রামটার খোঁজ দাও নি।

হ্যাঁ, তা দেই নি বটে। এর কারণ একটাই, তারা হয়ত পিছন পিছন গিয়ে ব্যাপারটা জেনে ফেলত। তারপরই আমি জানতে পারি, শহরেই বহু রূপসী মেলে। আজ সন্ধ্যায় তুমি যদি ফাঁক থাক তবে তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে দেখিয়ে আনতে পারি, যাবে?

যেতে পারি। আজ সন্ধ্যায় আমার হাতে তেমন জরুরী কোন কাজ নেই।

নর্থ-এর ছোট গাড়িটা নিয়ে আমরা প্রথমেই সেন্ট্রাল পার্কের ধার কাছ দিয়ে কয়েকটা চক্কর মারলাম। সবশেষে জংলার দিকে গিয়ে বললাম—এর চেয়ে মোক্ষম জায়গা আর মিলবে না। এমন ফুরফুরে বিশুদ্ধ বাতাস অন্য আর কোথায়—।

আমাকে থামিয়ে দিয়ে সে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে উঠল—ধ্যুৎ! ময়লা আবর্জনা আর গ্যাসোলিনের ভ্যাপ্‌সা গন্ধে ভরপুর বাতাসকে যদি বিশুদ্ধ বাতাস বল তবে আমার আর কিছু বলার নেই। আমার কথা শোন, দিনের বেলায় পাইনবনের কিছুক্ষণ শ্বাস প্রশ্বাস চালাতে পারলে প্রকৃত তাজা ও বিশুদ্ধ বাতাসের স্বাদগ্রহণ করে, জীবন সার্থক করতে পারতে।

সে কথা আমি আগেও শুনেছি, আমি বললাম। আজ বিশুদ্ধ বাতাসের স্বাদের কথাই যদি বল তবে শুনে রাখ লাক্ষা দ্বীপের বাতাসই আমার কাছে সবচেয়ে বেশী কাম্য।

রসিকতার স্বরে নর্থ বলল—বন্ধু, তাই যদি হয় তবে সুবিশাল এ রুটির কারখানায় সিদ্ধ না হয়ে সেখানে ছুটে যাচ্ছ না কেন, বলতে পার?

কারণ একটাই। আমি জানতে পেরে গেছি যে নিউইয়র্ক শহরটাই গ্রীষ্মকালের পক্ষে সেরা শহর।

বাজে কথা। এ কথা তুমি নিজেও অন্তর থেকে মান না।

বন্ধুবর নর্থ-এর কাছে আমার মতটাকে ব্যক্ত করতে গিয়ে আমি সত্যি মহাফাঁপরে পড়ে গেলাম। তার ওপর আবহাওয়া দপ্তর আর মরশুমটা কেন আমার বিরুদ্ধে জোর ষড়যন্ত্রে মেতে উঠল।

অস্বীকার করার উপায় নেই, নিউইয়র্ক শহরটা যেন জ্বলন্ত একটা উনুনের ওপর বসে আছে। এমন কি বড় বড় রাস্তাগুলোতেও লোক চলাচল অস্বাভাবিক রকম কমে গেছে। হোটেলওয়ালারা যেন বসে মাছি মারছে।

একটা হোটেলের ছাদে বসে নর্থ আর আমি রাতের খাবার সারলাম। কয়েক মিনিটের জন্য হলেও আমি ভাবলাম, অন্তত এবারের মত আমি জিতেই গেছি। প্রায় ঠাণ্ডা পূবের হাওয়া ছাদটার ওপর দিয়ে ঝিরঝির আমাদের গা-বেয়ে চলে গেল। ফুলের হাল্কা মধুর সুবাসও নাকে পাওয়া গেল।

রুচিসম্মত গরমের পোশাকে সজ্জিতা কয়েকজন মহিলার আগমন ঘটায় স্থানটা আরও মনোরম হয়ে উঠল। আর খাবারগুলোও কম উপাদেয় ছিল না। শহরটা যে গ্রীষ্মাবাস হিসাবে মনোরম, এ ব্যাপারে আমার বক্তব্যটা আরও জোরদার হয়ে উঠল। তবে নর্থ-এর গজগজানি কিন্তু থামল না।

রাতের খাবার সেরে আমরা একটা রঙ্গ নাটিকা দেখার জন্য ছাদের বাগানের চেয়ার দখল করলাম। কৃত্রিম ঠাণ্ডা বাতাস, পর্যাপ্ত পরিসেবা, বাহারে পোশাক পরিহিত দর্শক সমাগম আর সবার মধ্যে খুশি খুশি ভাব পরিবেশটাকে সত্যি মনোরম করে তুলেছে।

হায়! নর্থ-এর মন থেকে অসন্তুষ্টিটুকু তবু কাটল না। সে নাটক দেখার ফাঁকে আমাকে বলল—শোন, মে-র এক তারিখেই আমি অবাধ বরফের তহবিলে নগদ পাঁচ শ'ডলার জমা দিয়েছি। আর এখানকার যা কিছু সবই তো কৃত্রিমতায় ভরপুর, অন্তঃসারশূন্য আর অস্বস্তিকর। অন্তত একটাবার যদি জঙ্গলে গিয়ে পাইন আর ফার-এর নাচন দেখতে পেতে তবে সারা জীবনে আর অন্য কথা মুখ দিয়ে বেরুত না। দিনভর হরিণ শিকারের পর পাহাড়ী ঝর্ণার গায়ে বোতলে মুখ ঠেকিয়ে পড়ে থাক, কেউ ভুলেও বিরক্ত করতে আসবে না। আরে ভাই, গরমের দিনগুলো তো এভাবেই কাটাতে হয়। চোখ-কান বুজে ঝোলা-কাঁধে বেরিয়ে পড় আর মৌজ করে প্রকৃতিকে নিঙড়ে নিঙড়ে উপভোগ কর। ব্যস, আর কি চাও।

আমি এবার জোর দিয়েই বললাম—আমিও তোমার সঙ্গে গলা মেলাচ্ছি।

আসলে কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার সতর্কতায় একটু বিলেসি ভাব এসেছিল, স্বীকার না করে উপায় নেই। ফলে মুখ ফস্‌কে সত্যি কথাগুলোই বেরিয়ে পড়ল। ফলে নর্থ দীর্ঘ সময় কৌতূহল

মিশ্রিত অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

নর্থ যেন এবার মনোবল পুরোপুরি পেয়ে গেল। সে বেশ জোর গলায়ই আমাকে চেপে ধরল—এবার তবে দেবতা এ্যাপোলো আর প্যান-এর নামে দিব্যি কেটে বলতো, এতক্ষণ তবে শহরের গ্রীষ্ম মনোরম বলে লড়ে যাচ্ছিলে কেন?

মনে হল, আমার চোখ-মুখে কেমন একটা অপরাধীর ছাপ ফুটে উঠেছে।

নর্থ এবার যেন মনোবল পুরোপুরি পেয়ে গেল। সে আমাকে চেপে ধরল—ভাই, আর সবকিছু না হয় ছেড়েই দিলাম। এবার সত্যি করে বলতো, সে মহিলার নামটা কি?

আমি আর ধানাই পানাই করে পাশ কাটিয়ে যেতে পারলাম না। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই বলে ফেললাম, অ্যানি এ্যাস্টন। বিংক্লে অ্যান্ড কিং প্রযোজিত 'রূপোর রজ্জু' নাটকে নাতেত-এর ভূমিকায় সে অভিনয় করেছিল। পরবর্তী নাটকে এর চেয়ে ভাল একটা চরিত্রে তার অভিনয়ের সুযোগ পাওয়ার কথা।

আমাকে একবারটি তার কাছে নিয়ে চল না বন্ধু।

অ্যানি তার মাকে নিয়ে তখন ছোট্ট একটা হোটেলে থাকে। পশ্চিমের বাসিন্দা তারা। নগদ মালকড়িও কিছু ছিল। তা দিয়েই কোনরকমে তাদের থাকা-খাওয়া মিটে যায়। আমি বিংক্লে অ্যান্ড কিং-এর প্রচার সম্পাদকের পদে বহাল আছি। ফলে তাকে জনগণের কাছে তুলে ধরার জন্য প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি।

সত্যি কথা বলতে কি, মেয়েটা রীতিমত এক রূপ-সৌন্দর্যের আকর। শান্ত স্বভাবা আর মনে হয় শতকরা একশ' ভাগই খাঁটি। নাট্যশালার প্রতি আন্তরিকতা আর প্রতিভাও নাটকের উপযোগী। আর বিংক্লে অ্যান্ড কিং-এর প্রচার সম্পাদক আমাকে সে সত্যিকারের একজন হিতকারী বন্ধু জ্ঞান করে। এক সময় নাটক বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সে আমাকে একটা বে-দরকারী কাজে তলব করেছিল। বন্ধুবর নর্থ-এর কথা আমি তার কাছে বহুবার বলেছি। তাই নাটকের প্রথম অংশটা শেষ হবার আগেই একটা টেলিফোন পেয়ে পা-বাড়ালাম।

মিঃ নর্থ আর আমাকে দেখলে মিস এ্যাস্টন যারপরনাই আনন্দিতই হবে।

তার ঘরের দরজায় পৌঁছে আমরা দেখলাম তার মায়ের মাথায় যত্ন করে একটা নতুন টুপি পরাতে ব্যস্ত। এর আগে কোনদিন তার রূপ-সৌন্দর্য এত আকর্ষণীয় হয়ে ওঠেনি।

দরজায় দাঁড়িয়েই নর্থ অসঙ্গত ও অশিষ্ট উপায়ে নিজেকে তার সামনে তুলে ধরতে মেতে গেল। সে তো কথাবার্তায় এমনিতেই চোস্ত। সবচেয়ে বড় কথা অনেক লক্ষের মালিক। তবে অর্থের সঠিক পরিমাণটা আমার ঠিক স্মরণ নেই। আমার মুখ ফসকে তার টুপিটার কিছু সুখ্যাতির কথা বেরিয়ে গেল। ব্যস, সে আলমারি খুলে ডজন ডজন টুপি এনে আমার সামনে ফেলল। অভিনয়ের অবসরে সে যে টুপি সেলাই করে তা-তো আমার অজানা নয়।

পরমুহূর্তেই আমার কানে এল, বন্ধুবর নর্থ আবেগ-উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে অ্যানিকে তার শিবিরের সৌন্দর্য আর অভিনবত্বের কথা ফলাও করে গল্পাকারে পরিবেশনে ব্যস্ত।

এ ঘটনার দু'দিন পরই আমি এক অবিশ্বাস্য দৃশ্যের সম্মুখীন হলাম। দেখলাম, নর্থ তার মোটর গাড়িতে মিস অ্যাস্টনকে পাশাপাশি বসিয়ে সঙ্গে তার মাকেও নিয়ে আমার কাছে এল।

নর্থ-এর কথা শুনে আমি আরও বেশি অবাক হলাম। সে বলল—আরে বব, পুরনো-এ শহরটা দেখছি গ্রীষ্মের পক্ষে বড়ই মনোরম। এখানে যতই বেড়াচ্ছি ততই যেন জায়গাটাকে আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে। এখানকার কয়েকটা হোটেলের ছাদে আর বাইরে হাসির নাটক অভিনীত হয়। ভাবল একটা জায়গা বেছে নিয়ে হাল্কা কোন পানীয়ের বোতল নিয়ে বসতে পারলে গ্রাম্য পরিবেশের চেয়ে অনেক, অনেক মনোরম বোধ হয়। আর ফুরফুরে হাওয়ায় দেহ-মনে রোমাঞ্চ জাগে। এসব ছেড়ে দিলেও বলা যায়, গ্রাম গঞ্জের পরিবেশ এমন কিছু লোভনীয় নয়। সেখানে কি মিলতে পারে? রোদে পুড়ে, ঘামে ভিজে একসার হওয়া, সঙ্গীহীনভাবে মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়ানো আর পাচক বাসি পচা যা পরিবেশন করবে তা দিয়ে উদরটাকে সান্ত্বনা দেওয়া—ব্যস, এই তো গ্রামের সুখ।

আমি মুচকি হেসে বললাম—তবে যা-ই বল না কেন পার্থক্য কিছু না কিছু থাকেই, কি বল?

সে বলল—তোমাকে কিন্তু এ কথাটাই বলতে যাচ্ছিলাম বব। বিশ্বাস কর, আমার অন্য কোন

উপায়ই ছিল না। তোমার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে জয়মাল্য কিন্তু আমারই গলায়—মেয়েটা একান্তভাবে আমারই, বুঝতে পারছ?

আমি হেসেই বললাম—ভাল তো, মাঠটা উভয়ের কাছেই খোলা রইল। অনধিকার প্রবেশ বলে কোন কথাই তো থাকতে পারে না, ঠিক কিনা?

মিস অ্যাস্টন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নর্থ আর আমাকে তার বাসায় চায়ের নিমন্ত্রণ করল। নর্থ তো আবেগ-উচ্ছ্বাসে রীতিমত অভিভূত। আর অ্যাস্টন? তার রূপ যেন আরও খোলতাই হয়ে উঠেছে। মিস অ্যাস্টন তার আগামী মরশুমের নাটকের প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু করল।

আমি তার কথার পৃষ্ঠে বললাম—আরে, তুমি জান না বুঝি? আগামী মরশুমে আমি আর বিংকলে অ্যান্ড কিং সংস্থার কাজ করছি না।

সে কপালের চামড়ায় পরপর কয়েকটা ভাঁজ এঁকে বলল—এ কী অদ্ভুত কথা শোনাচ্ছ! আমি তো আরও শুনেছি আগামী মরশুমে তারা একটা সেরা দল গড়ে তুলবে। আর তোমার ওপরই সার্বিক দায়িত্বভার তুলে দেবে, তুমিই তো এ কথা বলেছিলে। আর এখন তুমিই কিনা সুর পাল্টে—

হ্যাঁ, কথা সে রকমই ছিল বটে। তবে শেষ পর্যন্ত তা আর হচ্ছে না। আগামী মরশুমে আমার পরিকল্পনার কথা তোমাকে বলছি, আমি লাক্ষা দ্বীপে পাড়ি জমাব মনস্থ করেছি। সেখানে উপসাগরের তীর ঘেঁষে একটা কুঁড়েঘর তৈরী করে বাস করব। আর দুটো নৌকো কিনে নেব। হাতে নেব একটা দোনলা বন্দুক আর সঙ্গে থাকবে একটা হলুদ শিকারী কুকুর। সমুদ্রবাহিত নোনা বাতাসে আমি দিনভর শ্বাসক্রিয়া চালাব। বাতাস ঘুরে যখন বনের দিক থেকে প্রবাহিত হবে তখন পাইনের গন্ধে মনপ্রাণ ভরে নেব। আর রোমাঞ্চ জাগানো দেহ-মনে কাগজ-কলম নিয়ে নাটক লেখার কাজে মেতে থাকব। একের পর এক নাটক লিখে বাক্স বোঝাই করে ফেলব।

আর আমার সবচেয়ে বড় কাজ হবে আমার পাশের হাঁসের খামার বাড়িটাকে খরিদ করে নেওয়া। হাঁসের প্যাঁক-প্যাঁকানি তেমন শ্রুতিমধুর না হলেও আমার শুনতে ভালই লাগে। হাঁসের ডাকে রাত্রে এক ডজনবার ঘুম চটে গেলেও আমার কানে কিন্তু মধুই বর্ষণ করবে।

উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে আমি বলতে লাগলাম—আরে, রূপ-সৌন্দর্য, বুদ্ধি-বিবেচনা, শৃঙ্খলা আর মধুর কণ্ঠস্বর ছাড়া পাতিহাঁস আর কোন্‌দিক থেকে আকর্ষণীয়, জান কি? তাদের পালক স্তূপাকার করে দু' পয়সা কামিয়ে নেওয়া সম্ভব। আমার পরিচিত এক খামারের মালিক বছরে চারশ স্টার্লিং পাউন্ড মূল্যের পালক বিক্রি করে। আর জাহাজে চালান দিতে পারলে আয়ের পরিমাণ বেড়ে আকাশ ছোঁয়া হয়ে যেতে পারে। তাই বলছি কি, সমুদ্রের নোনা হাওয়া আর পাতিহাঁসের পালকই আমার মনপছন্দ। আর শিকারী কুকুরটাকে সঙ্গে নিয়ে সূর্যাস্ত দেখতে দেখতেই আমার দিন কেটে যাবে, কি বল। রোদে ঝলসানো, নিরর্থক আর হৈ হট্টগোল মুখর শহরে থেকে মনটাকে বিষিয়ে তোলার কিছুমাত্রও আগ্রহ আমার নেই।

আমার কথায় মিস অ্যাস্টনের মুখে বিস্ময়ের ছাপ ফুটে উঠল। আর নর্থ ঠোঁট টিপে হাসতে লাগল।

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বললাম—আমাকে এখন বিদায় নিতেই হচ্ছে। আজ রাত্রি থেকেই আমি নাটক লেখার কাজে হাত দেব। কথাগুলো বলতে বলতে আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম।

ক'দিন বাদে মিস অ্যাস্টন-এর টেলিফোন পেলাম। সে বলল, বিকেল চারটায় তার সঙ্গে দেখা করার জন্য। আমি দেখা করতে গেলাম।

আমাকে দেখেই ক্ষণিক ইতস্ততের পর সে বলল—আমার অনেক উপকার তুমি করেছ। তাই কথাটা তোমাকে জানানোর প্রয়োজন বোধ করলাম। আমি নাট্যজগত থেকে বিদায় নিচ্ছি।

কাজটা ঠিকই করেছ। আমিও তাই ভেবেছি। হাতে বেশী অর্থকড়ি হলে তারা এমনটাই করে।

আমি কিন্তু প্রায় নিঃস্ব অর্থাৎ থাকলেও সেটা খুবই সামান্য।

কিন্তু আমি তো জানি, দুই-দশ বা ত্রিশ—বহু লক্ষের সে মালিক, তবে পরিমাণটা ঠিক কত বলতে পারছি না—ভুলে গেছি।

তুমি কি বলতে চাইছ, আমি বুঝতে পেরেছি। বুঝেও না বোঝার বাহানা আমি করব না। তবে

মিঃ নর্থকে আমি বিয়ে করছি না, এও জেনে রাখ।

আমি যেন একটু রুক্ষ স্বরেই এবার বললাম—তাই যদি হয় তবে তুমি নাট্য-জগৎ থেকে সরে যাচ্ছ কেন? জীবিকা অর্জনের জন্য তোমার পক্ষে আর কি করা সম্ভব?

সে আমার দিকে আরও সামান্য এগিয়ে এসে অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল—আমি পাতিহাঁসের পালক কুড়োতে পারি, ভবিষ্যতেও পারব।

প্রথম বছরেই পাতিহাঁসের পালক বিক্রি করে আমাদের উপার্জন হল সাড়ে তিন শ' স্টার্লিং পাউন্ড। কম কথা!

দ্য ব্যুরিয়েড ট্রেজার

পাগল যে কত রকম আছে তা বলে শেষ করা যাবে না। এবার আমি উঠতে না বলা পর্যন্ত আপনারা সবাই চুপটি করে বসে থাকতে রাজি তো?

পৃথিবীতে যত রকম বোকামি আছে সবগুলো দোষই আমার আছে, শুধুমাত্র এক রকম ছাড়া। আমার পৈত্রিক সম্পত্তি আমি সবই উড়িয়ে দিয়েছি। বিয়ের যৌতুকের ব্যাপারটা আমি মিথ্যে বলেছি। লন-টেনিস আর পোকার—আরও বহুভাবে আমি ডলার উড়িয়ে আজ নিঃস্ব রিক্ত। তবে টুপি মাথায় দিয়ে ঘণ্টা বাজাবার যে চরিত্রটা বাকি ছিল তাতে আমার অভিনয় করা হয়ে ওঠেনি। সেটা হচ্ছে, গুপ্তধন খোঁজার অভিনয় করা।

আমরা কিন্তু মূল বিষয়বস্তু থেকে বহুদূর সরে অক্ষম লেখকদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরকমটা না করে উপায় থাকে না—মেনে নিচ্ছি যে, আমি একজন আবেগপ্রবণ আহাম্মক। আমি যে মার্থা স্যাংগামকে দেখলাম, ব্যস, যেন তার ক্রীতদাস বনে গেলাম। সে আঠারো বছরের উদ্ভিন্ন যৌবনা। পিয়ানোর হাতির দাঁতের রীডের মত তার রং। অপরূপা। সহজ-সরল মনের একটা পরী যেন আকাশ থেকে টেক্সাসের ছোট্ট শহরটায় নেমে এসেছে। বেলজিয়াম বা অন্য যেকোন রাজ্যের রাজমুকুটের হীরা-জহরৎ জোগাড় করে আনার মত মন্মোহিনী ক্ষমতা আর মনোবল তার মধ্যে যে আছে তাতে কিছুমাত্রও দ্বিধা আমার নেই। এটা কিন্তু সে বোঝে না, আমিও তাকে বুঝতে দেই নি। এতে যে আমাকে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হচ্ছে, খুলে বলার দরকার আছে বলে মনে করি না।

সত্যি কথা বলেই ফেলছি, মে মার্থা'কে আমি নিজের করে পেতে চেয়েছি, চেয়েছি নিজের কাছে রেখে দিতে। আর চেয়েছি আমার কাছাকাছি পাশাপাশি থেকে রোজই আমার চপ্পল জোড়া আর পাইপটাকে এমন জায়গায় রেখে দেব যাতে কিছুতেই খুঁজে না পাই।

মে মার্থার পিতৃদেব সর্বদা চশমা-নির্ভর একজন শব্দশাস্ত্রজ্ঞ বা এরকমই কোন উপাধির যোগ্য ব্যক্তি। বন বাদাড় থেকে কীটপতঙ্গ পাকড়াও করে এনে পিন দিয়ে পিচবোর্ডের গায়ে আটকে দিয়ে কোন একটা নামকরণ করে ফেলেন। ব্যস, এভাবেই জীবনটা দিব্যি কাটিয়ে দিচ্ছেন।

দুটো মাত্র প্রাণী নিয়ে পরিবার—তিনি আর মে মার্থা তার সদস্য। তিনি মেয়েটাকে নারী-সমাজের আদর্শস্থানীয়া মনে করেন। কারণ, তার সব রকম সুবিধা-অসুবিধার দিকে তার দৃষ্টি সর্বদা সজাগ। বিজ্ঞানীরা সবসময় আনমনা—সব ব্যাপারেই উদাসীনই থাকেন।

আমি ছাড়া অন্য আর একজন মে মার্থাকে মনে মনে কামনা করে। সে এক যুবক, কলেজের পড়া শেষ করে দিয়েছে। গুড়লো ব্যাংক্স তার নাম। গ্রীক, ল্যাটিন, গণিত, দর্শন আর তর্কশাস্ত্র—যতরকম পুঁথিগত বিদ্যার যতরকম শাখা আছে সব বিষয়েই সে বিশেষ পারদর্শী।

তবে এও সত্য যে, সে আর আমি উভয়েই তার অন্তরঙ্গ বন্ধু। তবে আমাদের দু'জনের মধ্যে কে যে সবচেয়ে বেশী স্থান করে নিয়েছি, কাকে তার বেশী পছন্দ আমরা কেউ-ই বুঝতে পারি না। আসলে মে মার্থা চিরদিনই এমন এক মেয়ে যে জলে নামবে কিন্তু পা ভিজবে না। আর একটা ব্যাপার লোককে কিভাবে লেজে খেলানো, নিজের পিছনে ঘুরে মরতে বাধ্য করতে হয় এটা সে ছেলেবেলা থেকেই বেশ রপ্ত করে ফেলেছিল।

আরে, সে কথা বলতে বলতে বাঁক ঘুরে অন্য দিকে চলে গিয়েছিলাম। বুড়ো ম্যাংগ্রাম ছিলেন একজন সত্যিকারের আপন ভোলা মানুষ। দীর্ঘদিন পরে হয়ত তিনি বুঝতে পারলেন, দুটো যুবক তার মেয়ের পিছনে ঘুরঘুর করছে, তাকে বে-কায়দায় ফেলার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

আমার ধ্যান ধারণাতেই ছিল না যে বিজ্ঞানীদের দ্বারা এসব ব্যাপার স্যাপারেরও নিষ্পত্তি করতে পারে। তিনি তো গুড্‌লো আর আমাকে নিম্নশ্রেণীর ও নিকৃষ্টতম প্রাণীর পর্যায়ভুক্ত বলে অবজ্ঞার চোখে দেখে থাকেন। একদিন আমাদের দু'জনকে ডেকে রীতিমত কড়া স্বরেই শাসিয়ে দিলেন, ভবিষ্যতে আর কোনদিন যদি তার বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে আমাদের দেখতে পান তবে উভয়কেই পতঙ্গের তালিকাভুক্ত করবেন। তাঁর তখনকার চোখ-মুখের দৃশ্য আমার আজও যেন চোখের সামনে ভাসছে।

হ্যাঁ, বিজ্ঞানী বুড়ো ম্যাংগ্রাম-এর দাওয়াইয়ে যে কাজ হয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তার রক্তচক্ষু দেখার পর থেকে পাঁচদিনের জন্য আমরা বে-পাত্তা হয়ে গেলাম। বিশ্বাস ছিল, এর মধ্যে ঝড় থেমে গিয়ে পরিস্থিতি আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। তারপর আমরা যখন সাহসে ভর করে, দুরুদুরু বুকে তাদের বাড়িতে ঢুকতে গেলাম তখন আমাদের উভয়েরই মাথায় বজ্রাঘাত হবার জোগাড়। মিস মার্থা আর তার বাবা দু'জনই বে-পাত্তা। দেখি, বাড়ির সদর-দরজায় ইয়া পেল্লাই একটা তালা ঝুলছে। তাদের যৎসামান্য মালপত্র যা ছিল সে সবও নিয়ে গেছে।

সত্যি আমাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ারই জোগাড় হল বটে। আমার ফুসফুস নিঙড়ে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল—হায়! গুড্‌লো বা আমাকে—দু'জনের একজনকেও মার্থা বিদায় মুহূর্তে বিদায়বাণী শুনিয়ে গেল না। এমন কি পাশের ঝোপের কাঁটার গায়ে এক চিলতে কাগজও গেঁথে রেখে গেল না। পোস্ট অফিসের একটা কার্ড বা সদর-দরজার গায়ে একটা চকের দাগও তো রেখে যেতে পারত। কিন্তু এমন কোন সূত্রই সে রেখে যায় নি যা দিয়ে তাকে না পাই, খোঁজাখুঁজি করে অন্তত মনকে প্রবোধ দিতে পারতাম।

দু'-দুটো মাস ধরে গুড্‌লো আর আমি উভয়েই তার খোঁজ করার আলাদা আলাদাভাবে কত পরিকল্পনাই নিয়েছি। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। ছুটোছুটি দাপাদাপিই সার হল।

তারপরই গুড্‌লো আর আমি অভিন্ন হৃদয় বন্ধুতে পরিণত হয়ে গেলাম, আর চরমতম শত্রুও বটে।

এক বিকেলে আমরা অন্য দিনের মত সিন্ডার-এর সেলুনের পিছনে বসে তাস পিটতে পিটতে কথার মার প্যাঁচের মাধ্যমে একে, অন্যের কাছ থেকে মার্থার পাত্তা লাগাবার ব্যাপারটায় কে, কতদূর অগ্রসর হতে পেরেছি জেনে নিতে চেষ্টা করতে লাগলাম। প্রতিদ্বন্দ্বীরা সাধারণত পরস্পরের সঙ্গে এমন আচরণেই লিপ্ত হয়ে থাকে।

এরকম কথাবার্তা বলার সময় সে এক ফাঁকে আমাকে বলল—একটা কথা বল তো এড, তার হদিস যদি তুমি পাওই তাতে তোমার কোন ফয়দা হবে বলে তুমি মনে করছ? এমনও তো হতে পারে, মিস স্যাংগামের মধ্যে এমন বড় রকমের কোন আকাঙ্খা থাকতে পারে যা পূর্ণ করার সাধ তোমার থাকলেও সাধ্যে কুলোবে না। তাই যদি হয় তবে তো তাকে খোঁজার জন্য এই যে পরিশ্রম করলে তুমি সবই বিফলে যাবে নাকি?

আমি বললাম, আমার কথা যদি শুনতে চাও তবে বলছি, একটা সত্যিকারের সুখের সংসার বলতে আমি যা বুঝি তা হচ্ছে টেক্সাসের কোন ওক আর পাইন বনে আট কামরার একটা বাড়ি। সেখানে একটা ঘোড়দৌড়ের মাঠে থাকবে তিন হাজার ঘোড়া আর থাকবে স্বয়ংক্রিয় একটা টেলিফোন। ঘোড় দৌড়ের মাঠ থেকে যা উপার্জন করবে তা দিয়ে মার্থা খুশি মাফিক খরচ করবে, আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। আমার চপ্পল আর পাপিটাকে এমন জায়গায় রাখবে সন্ধ্যে হলে যাদের আর হদিসই মিলবে না। একদিন সেটাই বাস্তব রূপ নেবে। তোমার বিদ্যা শিক্ষা, তোমার দর্শন ও তোমার সংস্কৃতির পরোয়া আমি করি না।

গুড্‌লো বল 'শোনি, সে কিন্তু এসব থেকে অনেক উচ্চস্তরের মানুষ, ভুলে যেয়ো না।'

সে যে পর্যায়ের মানুষই হোক না কেন, এ মুহূর্তে তো সে আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে, আমি বলছি, কলেজের বিদ্যা ছাড়াই আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে খুঁজে বের করবই, করব।

তারা তাস গুটিয়ে বীয়ারের বোতল খুলে বসল।

একটু বাদেই এক চাষী-যুবক ঘরের দরজায় দাঁড়িয়েই একটা ভাঁজ-করা নীল একটা কাগজ আমার হাতে তুলে দিল। আর মুখে বলল, তার ঠাকুরমা অক্কা পেয়েছেন। তিনি নাকি এ কাগজটা দীর্ঘ কুড়ি বছর খুবই যত্ন করে, বলতে গেলে সর্বক্ষণ বুকে আগলে রাখতেন। কিছু চাষের অনুপযোগী জমি, দুটো খচ্চর আর এ নীল কাগজটা তার পারিবারিক সম্পত্তি হিসাবে রেখে তিনি চোখ বুজেছেন।

ক্রীতদাস প্রথা বিরোধীরা যুদ্ধে এরকম নীল কাগজ ব্যবহার করত। চিঠিটা লেখা হয়েছে আঠারশ' তেষট্টির চৌদ্দই জুন। চিঠিটায় এমন এক গুপ্তস্থানের বিবরণের উল্লেখ রয়েছে যেখানে দশ-দশটা গাধার পিঠে বোঝাই করা স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা লুকিয়ে রাখা হয়েছে। আর যার অর্থ মূল্য তিন লক্ষ ডলার। এমন স্পেনিস পাদরি নাতি স্যাম-এর ঠাকুরমা একথাটা রুন্ডলকে বলেছিলেন যাঁর গুপ্তধনের সন্ধান জানা ছিল। সে ঘটনার বহু বছর পর দীর্ঘ রোগভোগের পর নিজের বাড়িতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। পাদরি তাকে যা কিছু বলেছিলেন বৃদ্ধ রুন্ডল হুবহু তাই লিখেছিল।

আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আগন্তুক চাষী-যুবকের দিকে তাকিয়ে বললাম—একটা কথা বলতে পার, তোমার বাবা এ চিঠিটা পড়েন নি কেন?

যখন পড়ার সুযোগ পেলেন তার আগেই তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন।

ভাল কথা, তুমি নিজে গুপ্তধনের খোঁজ করনি কেন, বল তো?

সত্যি কথা বলতে কি, মাত্র দশ বছর আগে আমি এ চিঠিটার ব্যাপার জানতে পারি। এমন চাষ বাসের মরশুম চলছিল। আমি তা নিয়েই মেতে ছিলাম। চাষের হ্যাপা পোহাতে না পোহাতেই শীতকাল। বরফ-ঝরা শীতের উপদ্রব এসে পড়ে। বছরের পর বছর ধরে তো এরকম রুটিন মাফিক কাম কাজ চলতে থাকে। গুপ্তধনের ব্যাপার স্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর ফুরসৎ কোথায়, বলুন তো?

তার কথাগুলো আমার কাছে খুবই সঙ্গত মনে হ'ল। তাই মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করে আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে গুপ্তধনের তল্লাশে মেতে গেলাম।

নীল কাগজের চিঠিটাতে যে নির্দেশ দেওয়া আছে তা খুবই সহজ সরল। ডোলোরেসের এক প্রাচীন স্প্যানিশ মিশন থেকে গুপ্তধনের বোঝা পিঠে নিয়ে গর্দভ-বাহিনী মিছিল করে যাত্রা করল। দক্ষিণে পথ পাড়ি দিয়ে দিয়ে তারা আলামিটো নদীর তীরে হাজির হল। নদীটা অতিক্রম করে দুটো উঁচু পাহাড়ের মধ্যবর্তী একটা ছোট্ট পাহাড়ের শীর্ষদেশে তারা যাবতীয় গুপ্তধন পুঁতে রাখল। একটা পাথরের স্তূপকে চিহ্ন হিসাবে রেখে দেওয়া হল। কিছুদিন কাটতে না কাটতেই একমাত্র স্প্যানিস ধর্মযাজক ছাড়া দলের সবাই হিংস্র উপজাতি ইন্ডিয়ানদের হাতে নির্মমভাবে প্রাণ খোয়াল। কেবলমাত্র একজনেরই এ গোপন তথ্যটা জানা ছিল। কথাটা আমার মনের মতই হল বটে।

রুন্ডল একটা সুদীর্ঘ ও ব্যয়বহুল অভিযানের পরিকল্পনা নিয়ে নিল? আমার বিদ্যা-শিক্ষা নেই বলে ব্যয় ও সময় লাঘব করার একটা মতলব বের করে ফেললাম।

সরকারী জমিজমা-সংক্রান্ত দপ্তরে গিয়ে পুরনো মিশন থেকে আমরা আলমিটো নদী পর্যন্ত যাবতীয় জমির জরিপের নক্সা সংগ্রহ করে ফেললাম। এতে খরচাপাতি তেমন হল না আর সময়েরও সাশ্রয় হল। জমির জরিপের নক্সাটার ওপর আমি দক্ষিণে নদীটা পর্যন্ত একটা সরলরেখা টেনে দিলাম। এরজন্য আমিনের শরণাপন্ন হতে হল না এতেও সময় এবং অর্থ দু'য়েরই সাশ্রয় হল।

আমাদের মালপত্র দুটো ঘোড়ায় টানা গাড়িতে চাপিয়ে রুন্ডল আর আমি একশ' উনপঞ্চাশ মাইল পথ অতিক্রম করে গন্তব্যস্থলের সবচেয়ে নিকটবর্তী চিকো শহরে হাজির হলাম।

চিকো শহরে পৌঁছে আমরা খোঁজাখুঁজি করে এক সরকারী আমিনকে বের করলাম। আমাদের অঙ্কিত রেখাচিত্রটা অনুসরণ করে তিনি আমাদের পশ্চিমে নিয়ে গেলেন। আমরা পশ্চিমদিকে পাঁচ হাজার সাত শ' বিশ 'ভারাস' দূরে গিয়ে আমিন একটা পাথরের মণ্ড পুঁতে দিলেন। ব্যস, এবার ডাক-গাড়ি ধরে তিনি চিকো শহরে ফিরে গেলেন।

আমার মধ্যে বদ্ধমূল ধারণা জন্মাল, ওই তিন লক্ষ ডলার আমাদের হাতে আসছেই। রুন্ডল খুব বেশী হলেও এক তৃতীয়াংশ পেতে পারে। কারণ, এ ব্যাপারে যাবতীয় খরচাপাতি তো আমিই

করেছি। মার্থা যদি আজও জীবিত থাকে তবে তাকে আমি যে করেই হোক খুঁজে বের করবই। আর প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে বুড়ো ম্যাংগামের কাণ্ডকরখানার ওপরও আঘাত হানব। তবে সবকিছুই নির্ভর করছে গুপ্তধন হাতে পাওয়ার ওপর।

রুন্ডল আর আমি একটা তাবু খাটিয়ে নিলাম। নদীর গায়েই ডজন খানেক ছোট ছোট পাহাড় আমাদের নজরে পড়ল। উভয়ে ব্যস্ত পায়ে পাহাড়গুলো খুঁজে দেখতে লাগলাম। খোঁজাখুঁজির মধ্যে দিয়েই চার-চারটা দিন কেটে গেল। তারপর আহারাদি সেরে আমরা আবার একশ' চল্লিশ মাইল দূরবর্তী কাঞ্চো শহরে ফিরে গেলাম।

আমরা, গুড্‌লো ও আমি ফিরে এসে সিভারের সেলুনের পিছনে আবার মিলিত হলাম। এবার আমাদের কাজ হল তাস পেটার ফাঁকে নতুন খবরের খোঁজে ঘুরে বেড়ানো। এক সময় কথা প্রসঙ্গে আমরা গুড্‌লোকে গুপ্তধনের ব্যাপারটা বললাম। সংক্ষেপে বিবরণ দিয়ে দূরত্বের হিসাবসহ জরিপের নক্সাটাও তার চোখের সামনে মেলে ধরলাম।

গুড্‌লো বিজ্ঞের মত বার-কয়েক নক্সাটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে চুপচাপ বসে থাকল। কয়েক মুহূর্ত বাদেই আচমকা হো-হো রবে হেসে উঠল। হাসি থামিয়ে এক সময় সে বলে উঠল—জিম, তুমি একটা আহাম্মক!

কেন? আহাম্মকের মত কি করেছি। এর আগে বহু স্থান থেকেই গুপ্তধন উদ্ধার করা হয়েছে।

আহাম্মক বলার কারণ এই যে, নদী যে বিন্দুতে গিয়ে তোমার আঁকা সরল রেখাটায় পড়বে তার হিসাব করতে গিয়েই তুমি ভুল করে বসেছ। কারণ, নয় ডিগ্রী পশ্চিম দিকে সে রেখাটার একটা পরিবর্তন হবে। এই বলে সে পেন্সিলটা হাতে তুলে নিল। একটা ঘাসের গায়ে ঝট করে একটা নক্সা এঁকে ফেলল।

নক্সাটা আঁকা শেষ করে সে তার গায়ে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলতে লাগল—স্প্যানিশ মিশন থেকে উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে নদীর তীরবর্তী বিন্দুটার দূরত্ব হবে ঠিক বাইশ মাইল। তোমার বক্তব্য অনুযায়ী একটা পকেট কম্পাসের সাহায্যে দূরত্বটা মাপা হয়। নিয়ম অনুযায়ী ছাড় দিলে আলমিটো নদীর ওপর যে বিন্দুতে গুপ্তধনের খোঁজ করা দরকার ছিল তার চেয়ে আর পশ্চিম দিকে ঠিক ছয় মাইল আর নয় শ' পঁয়তাল্লিশ ভারাস দূরে সে স্থানটার অবস্থান হবে। উফ্। তুমি যে কী আহাম্মক তা আর বলার নয়।

সবই তো বুঝলাম, কিন্তু তোমার ওই ছাড়ের ব্যাপারটা তো মাথায় ঢুকল না।

বিজ্ঞের মত আমার দিকে তাকিয়ে গুড্‌লো বলে উঠল—আরে এ সাধারণ ব্যাপারটা বুঝলে না। আকাশের মধ্যরেখা থেকে চুম্বক চালিত কম্পাসের জন্য ছাড় দিতে হবে না? কথাটা বলেই সে পিটপিট করে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসতে লাগল। তবে গুপ্তধনের অত্যুগ্র লিপ্সা যে তার চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে তা আমার নজর এড়াল না।

সে এবার বলল—শোন, গুপ্তধন সম্বন্ধে এরকম প্রাচীন কাহিনী সব সময় অমূলক হয় না। যে কাগজটায় গুপ্তধনের কথা বলা হয়েছে সেটা আমাকে একবারটি দেখাবে? আমাদের দু'জনের চেষ্টায় হয়ত বা—

সে কথাটা আর শেষ করল না। গুড্‌লো আর আমি প্রেমের চরম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলাম। এবার আমরা গুপ্তধনের সন্ধান-কার্যের সঙ্গীতে পরিণত হলাম।

আমরা দু'জনে চিকো শহরে হাজির হলাম। সেখান থেকে সে আমিনকে সঙ্গে করে গুড্‌লোর ছাড় দেওয়া হিসাব মাফিক স্থানে হাজির হলাম।

জায়গাতে পৌঁছতে পৌঁছতে আমাদের রাত্রি হয়ে গেল, কাঠকুটো জোগাড় করে রান্না সারলাম।

গুড্‌লো কথা প্রসঙ্গে বলল—গণিত বিষয়ক সাধারণ জ্ঞানের অভাবে কত পরিশ্রম ও অর্থ জমে গেল বল তো? তোমার ভুলটাকে যদি আমি চোখে আঙুল দিয়ে না দেখিয়ে দিতাম তবে গুপ্তধনের সন্ধান পেতে তোমার যে আরও কত দিন লেগে যেত ভাবতেই পারবে না।

আমি বললাম—নদীর গায়ের পাহাড়গুলো তো আগে খুঁজে দেখা যাক কিছু পাওয়া যায় কিনা। সত্যি বলতে কি, ওই ছাড়ের ব্যাপারটা কিন্তু এমনও আমার কাছে খোলসা হল না। আমি তো

বিশ্বাসই করি, কম্পাসের কাঁটাটা ঠিক মেরুর দিকে মুখ করেই অবস্থান করে।

পরদিন সকালের খাবার খেতে বসে গুড্‌লো কীটস্‌-এর একটা কবিতা আবৃত্তি করতে করতে এক ফাঁকে আমাকে বলল—গুপ্তধনের দলিলটা একবার আমাকে দাও। আমার তো মনে হচ্ছে ঘোড়ার জিনের আকৃতি বিশিষ্ট পাহাড়টার কথাই তাতে উল্লেখ করা হয়েছে। তবু আর একবার ভাল করে দেখে নেওয়া যাক।

গুড্‌লো আমার হাত থেকে কাগজটা নিয়ে রুন্ডলোর রেখাচিত্রটাকে সূর্যের আলোয় ধরে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে চোখ বুলাতে বুলাতে আচমকা একটা বিশ্রী গালাগালি দিয়ে আমাকে কাছে ডাকল।

আমি এগিয়ে তার গা-ঘেঁষে দাঁড়ালে সে রেখাচিত্রটার ওপর একটা আঙুল রেখে বলল—আগে তো আমাদের কারো নজরে পড়েনি। এমন নীল কাগজটার দিকে ভাল করে নজর দিতেই দেখলাম, লেখা রয়েছে 'স্যালভার্ন ১৮৯৮।"

আমি তার অর্থ জানতে চাইলে কাগজটার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই বলল—জলছাপ। কাগজটা ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কারখানায় তৈরী হয়েছিল। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে কাগজের লেখার তারিখ দেখা যাচ্ছে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে। ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা রীতিমত ধাপ্পাবাজি।

আমি বললাম—রুন্ডলরা অশিক্ষিত। সহজ-সরল গ্রাম্য মানুষ। তবে খুবই বিশ্বাসী। কাগজের কারখানার মালিকদের ধাপ্পাবাজি হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

পরমুহূর্তেই গুড্‌লো রেগে একেবারে কাঁই হয়ে উঠল। আমার দিকে রোষপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে উঠল—আমি কম করেও হাজারবার বলেছি তুমি একটা আহাম্মক। একটা নিরক্ষর গ্রাম চাষী তোমাকে ধাপ্পা দিয়ছে, আর তুমি ধাপ্পা দিয়েছ আমাকে।

এ কী অবান্তর কথা বলছ! আমি আবার তোমাকে ধাপ্পা দিলাম কিভাবে?

তোমার বিদ্যাহীনতা আর অজ্ঞানতা দিয়ে আমাকে ঠকিয়েছ। তোমার পরিকল্পনার এমন সব ভুল ভ্রান্তি আমি দু-দুবার চোখে আঙুল দিয়ে ধরিয়ে দিয়েছি যা তোমার নিজেরই ধরা উচিত ছিল। ফলে এক ধাপ্পাবাজের চক্করে পড়ে আমি যে খরচ খরচা করে ফেলেছি যা সামাল দিতে আমার মাথার ঘাম পায়ে পড়বে। ধনে-প্রাণে মারা যাবার উপক্রম হয়েছি।

আমি বললাম—শোন গুড্‌লো, তোমার বিদ্যা শিক্ষার দাম আমার কাছে একটা কানাকড়িও নয়। তোমার বিদ্যার বড়াইকে আমি ঘৃণার চোখে দেখি। বিদ্যা তোমার নিজের কাছে অভিশাপ স্বরূপ আর তা তোমার বন্ধুদের কাছে অস্বস্তিকর ছাড়া কিছু নয়। তোমার জলছাপওয়ালা চিরকুটটা নিয়ে আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যাও। ওসবের জন্য আমি পরিকল্পনাটা থেকে পিছিয়ে যাব না, কিছুতেই নয়।

ঘোড়ার জিনের আকৃতি বিশিষ্ট পাহাড়টার দিকে আমার চোখ পড়ল। আমি বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বললাম—আমি গুপ্তধনের তল্লাশি চালাতে ওই পাহাড়টায় যাবই যাব। এখনও সময় আছে, ভেবে দেখ, তুমি যাবে কিনা। একটা মাপ-জোক আর জলছাপের ব্যাপার স্যাপার নিয়ে তোমার বুকের ভেতরে যদি ধুক্‌পুকুনি শুরু হয়ে যায় তবে তোমাকে উপযুক্ত অভিযাত্রী মনে করব না। ভেবে দেখ, কি করবে?

নদীর তীরে যেতেই হেস্‌পেরাস থেকে চিকো শহরে যাবার ডাকগাড়িটা পেয়ে গেলাম।

গুড্‌লো কণ্ঠস্বরে উষ্মা ও অস্বস্তি প্রকাশ করে বলে উঠল—এসব ধাপ্পাবাজির ব্যাপারে আমি নেই। কেবলমাত্র আহাম্মক ছাড়া কেউ-ই ওই কাগজটা নিয়ে সময় ও অর্থ নষ্ট করবে না। অন্তত আমি তো নই-ই। ঠিক আছে জিম, তুমি তো একটা পয়লা নম্বরের আহাম্মক। তোমাকে অদৃষ্টের হাতেই তুলে দিচ্ছি। আমি এখুন থেকেই বিদায় নিচ্ছি।

গুড্‌লো তার তল্পিতল্পা নিয়ে ডাক-গাড়িটায় উঠে পড়ল। জুন মাসের আকাশ—পরিষ্কার নীল আকাশ। এত পাখিপাখলা আর কীট-পতঙ্গ এর আগে কোথাও, কোনদিন আমি দেখি নি।

ঘোড়ার জিনের আকৃতি বিশিষ্ট পাহাড়টার সর্বত্র পাতিপাতি করে খুঁজলাম। কিন্তু হায়। গুপ্তধনের চিহ্নমাত্রও চোখে পড়ল না। পাথরের স্তূপ, গাছের ডালপালা লতাপাতায় কোন আগুনের চিহ্ন বা তিন লক্ষ ডলারের চিহ্নও পেলাম না। বুড়ো রুন্ডল-এর নীল চিরকুটে বর্ণিত কোন কিছুরই

হদিস মিলল না।

পাহাড় থেকে নেমে এসে একটা সবুজ উপত্যকা নজরে পড়ল। সেটা থেকে ফিতার মত সরু একটা নদী এঁকেবেঁকে বয়ে এসে আলামিটো নদীতে এসে মিলিত হয়েছে।

নদীর পাড় বরাবর হাঁটতে হাঁটতে একটা বুনো মানুষকে ছুটোছুটি করতে দেখে আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। মাথার ইয়া লম্বা চুলগুলো রুক্ষ-এলোমেলো। বুক পর্যন্ত নেমে আসা দাড়িগুলো যেন রীতিমত জঙ্গল সৃষ্টি করেছে। আমি ধরেই নিলাম, কোন পলাতক পাগল। ভাবলাম, লোকটা সভ্য জগৎ থেকে এমন প্রত্যন্ত পাণ্ডববর্জিত অঞ্চলে হাজির হল কি ভাবে।

পাগলের মত লোকটাকে দেখলাম, চমৎকার রঙচঙে মাথাওয়ালা একটা প্রজাপতির পিছনে অনবরত ছুটোছুটি করছে।

আরও সামান্য এগিয়ে আঙুরলতায় ছাওয়া একটা কুঁড়েঘর দেখে আমার কৌতূহল আরও অনেকাংশে বেড়ে গেল। কৌতূহলের শিকার হয়ে আর কয়েক পা এগিয়ে দেখলাম, মার্থা ম্যাংগাম আপনমনে বনফুল কুড়োচ্ছে।

সে ফুলতোলার ফাঁকে মুখ তুলতেই আমাকে দেখতে পেল। নতুন পিয়ানোর সাদা চর্বির মত ধবধবে মুখটা আবিররঙা হয়ে উঠেছে। তার দিকে নীরবে এগিয়ে গেলাম। তার হাতের কুড়নো ফুলগুলো একটা একটা করে ঘাসের ওপর পড়তে লাগল।

দ্বিধাহীন গলায় সে বলল—জিম, আমি জানতাম, তুমি আসবে। বাবা আমাকে চিঠি লিখতে বাধা দিয়েছেন। তবে তুমি যে আসবে আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম।

তারপর ঘটনার পরিসমাপ্তি কিভাবে ঘটল তার ভাবনা পাঠক-পাঠিকাদের ওপর দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলাম।

আমি মাঝে-মধ্যেই ভাবি, শিক্ষাকে যদি বাস্তব জগতে প্রয়োগ না করা যায় তবে পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন করে মানুষের ফয়দাই বা কি? কারো শিক্ষার সুফল যদি অন্যের ভাগেই লাগে তবে সেটা কোন্ শিক্ষা?

ওকবনের মাঝের একটা আট-কামরার বাড়িতে মার্থা এখন আমার কাছেই থাকে। স্বয়ংক্রিয় একটা পিয়ানোও সেখানে আছে। আর তৈরী করা হচ্ছে তিন হাজার গবাদি পশুর একটা খোঁয়াড়।

রোজ রাত্রে আমি ঘোড়া হাঁকিয়ে বাড়ি ফিরে এলে আমার চপ্পল আর পাইপটাকে খুঁজে পাওয়াই সমস্যার ব্যাপার।

কিন্তু তার জন্য কার কি বয়েই গেল? কার—কার কি হয়েই গেল।

রোডস্ অব ডেস্‌টিনি

১৯০৯

রেস্তোরাঁর এক কোণে ইয়ার দোস্তদের নিয়ে মদ খেতে খেতে কবিবর ডেভিড মিগনট তার অপ্রকাশিত কবিতাগুচ্ছ থেকে একটা কবিতাকে গানের সুর দিয়ে বন্ধুদের কাছে পরিবেশন করল। পরিবেশটা গ্রামাঞ্চলের। গান শেষ হলে সবাই উল্লসিত হয়ে তাকে পঞ্চমুখে প্রশংসা করতে লাগল। কারণ মদের বোতল তো কবির পয়সাতেই এসেছে।

রেস্তোরাঁর সবাই উল্লসিত হলেও নোটারি এম. পপিনু কিন্তু কথাগুলো সম্পর্কে বার বার মাথা নাড়তে লাগল। তিনি একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। অন্য সবার মত মদ গিলে বেহেড মাতাল হয়ে যান নি।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে কবি ডেভিড সিগনট গ্রামে মেঠো পথ দিয়ে হাঁটতে লাগল। ফাঁকা মাঠের ঝিরঝিরে বাতাস তার মদের নেশাকে ক্রমে কাটিয়ে দিতে লাগল। তখন হঠাৎ তার মনের কোণে ভেসে উঠল সেদিন সে আর ইউভোনি ঝগড়া করেছে আর সেও দিব্যি কেটে বলেছে বাইরের বৃহত্তর জগতের যশ ও সম্মান অর্জনের প্রত্যাশা বুকে নিয়ে সেই রাত্রেই সে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে।

উল্লসিত হয়ে সে নিজের মনকে প্রবোধ দিয়েছে, আমার কবিতা যখন সবাই পাঠ করবে তখন হয়ত আজকের রূঢ় বক্তব্যটা সে মহিলাটার মনের কোণে উঁকি দেবে, হয়ত নয়, দেবেই দেবে।

ভাটিখানায় যারা চোলাই মদ খেয়ে মাতলামিতে মেতে থাকে তারা ছাড়া সে অঞ্চলের সবাই ঘুমে বিভোর হয়েছিল। ডেভিড চুপি চুপি নিজের ঘরে ঢুকে তার গুটি কয়েক পোশাক আশাক যা ছিল সেগুলোকে ছোট্ট একটু পুঁটুলি বাঁধল। এবার সেটাকে একটা লাঠির ডগায় বেঁধে নিয়ে ভেরনায় হয়ে বহু দূরবর্তী দেশের দিকে এগিয়ে যাওয়া পথ ধরে হাঁটতে শুরু করল।

ডেভিড তার বাবার যে ভেড়ার পালকে রোজ মাঠে চরাতে নিয়ে যেত সেগুলো খোঁয়াড়ে কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে আছে। সে তাদের মাঠে চরতে দিয়ে নিজে গাছতলায় বসে ছেঁড়া কাগজে একের পর এক কবিতা লিখে যেত। সে পুঁটুলি বাঁধা লাঠিটা কাঁধে নিয়ে সে খোঁয়াড়টার পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল। সে দেখল, ইউভোনির জানালায় তখনও মিট মিট করে আলো জ্বলছে। সেটা চোখে পড়তেই একটা আকস্মিক দুর্বলতা তার প্রত্যয়কে একটু নাড়িয়ে দিল। আলোটা হয়ত তাকে এটাই বলছে সে, ইউভোনি তার নির্ঘুম চোখে নিজের ক্রোধের জন্য অনুতাপ জ্বালায় জর্জরিত হচ্ছে আর ভোরের আলো ফুটে উঠলেই হয়ত বা—কিন্তু না! সে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে। না, ভেরনায় তার উপযুক্ত জায়গা নয়। সেখানে এমন কাউকেই পাওয়া সম্ভব নয় যে তার ভাবনা-চিন্তার ভাগীদার হতে পারে। তার অদৃষ্ট, তার ভবিষ্যৎ এপথেরই কোন এক দূরবর্তী অংশে অপেক্ষা করছে।

চাঁদের হাল্কা আলোয় তিন লীগ দীর্ঘ উন্মুক্ত প্রান্তরের বুক চিরে পথটা সরীসৃপের মত এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে। গাঁয়ের প্রতিটা মানুষের বিশ্বাস, পথটা প্যারিস পর্যন্ত তো গেছেই। আর আমাদের কবিবর ডেভিডও পারিস কথাটাই বারবার মনে মনে আওড়াতে লাগল। ডেভিড-এর আগে কোনদিনই ভেরনায় থেকে এতদূরে আসে নি। তার গতি খোঁয়াড় থেকে ভেড়া চরাবার মাঠের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

বাঁ দিকের পথ ধরে

তিন লীগ অতিক্রম করার পর পথটা এক মহা সমস্যার সৃষ্টি করল। ঠিক যেন এক চক্করের মধ্যে ডেভিডকে ফেলে দিল। পথটা এবার এক সমকোণ সৃষ্টি করে অন্য আর একটা সদর রাস্তার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। কর্তব্য স্থির করতে না পেরে ডেভিড গোলক ধাঁধায় পড়ার মত অবস্থায় কয়েক মুহূর্ত নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। কর্তব্য নির্ধারণ করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত সে বাঁ দিকের পথটা ধরেই অগ্রসর হতে লাগল।

বড় সড়কটার গায়ে চাকার দাগ দেখে অনুমান করা যাচ্ছে সবেই কোন না কোন চক্রযান তার ওপর দিয়ে চলে গেছে। আধ ঘণ্টা বাদে একটা পাহাড়ের পাদদেশের ছোট খাদের মধ্যে মাল-বোঝাই একটা গাড়িকে মালবোঝাই অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে ওই চাকার দাগের ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। গাড়িটার চালক আর তার সহকারী চেঁচামেচি করতে করতে ঘোড়ার লাগাম ধরে টানাহেঁচড়া করছে। কালো এক গাট্টাগোট্টা পুরুষ আর পায়ের পাতা পর্যন্ত নেমে-আসা আলখাল্লা পরা এক মহিলা পথের ধারে দাঁড়িয়ে। উভয়ের চোখেই উৎকণ্ঠার ছাপ।

গাড়ির চালক আর তার সহকারীর প্রয়াসের মধ্যে সামান্যমাত্র বুদ্ধিমত্তার পরিচয় না পেয়ে ডেভিড উপযাচক হয়ে সে কাজে হয়ত লাগল। তাদের দু'জনকে বলল—ঘোড়া দুটোকে ছেড়ে চাকায় হাত লাগাও।

নওজোয়ান ডেভিড তার পেশীবহুল সুদৃঢ় কাঁধটাকে গাড়ির পিছনে লাগাল। এবার শরীরের সর্বশক্তি নিয়োগ করে ঠেলতে লাগল। সবার সমবেত প্রয়াসে গাড়িটাকে কোনক্রমে খাদ থেকে তুলে আনা সম্ভব হল।

এবার সবাই ব্যস্ত হয়ে গাড়িতে উঠে বসল। ডেভিড পথের ধারে দাঁড়িয়েই রইল। বিশালদেহী শক্ত সামর্থ্য লোকটা ডেভিডকে গাড়িতে উঠতে বলল। ডেভিড তখনও দাঁড়িয়ে কর্তব্য সম্বন্ধে

ভাবতে লাগল। ভদ্রলোক এবার রীতিমত হুকুম করার স্বরেই বলল—কি হল, গাড়িতে ওঠ। দেরী হয়ে যাচ্ছে।

ডেভিড দেখল, ভদ্রলোকটির হুকুম তামিল না করে আর উপায় নেই। তাই সে দ্বিধা-সঙ্কোচ কাটিয়ে গাড়িতে উঠে গেল। গাড়ির ভেতরে উঁকি দিয়ে সে দেখল, মহিলাটি পিছনের আসনে বসে আছেন। তাই সে সামনের সিটে বসার জন্য এগোবার চেষ্টা করতেই ইয়া দশাসই চেহারার লোকটা আগের মতই বাজখাই গলায় বলে উঠল—যাচ্ছ কোথায়? ওখানে, মহিলাটির পাশেই তোমাকে বসতে হবে—বস।

ভদ্রলোকটি সুবিশাল দেহ নিয়ে সামনে সিটে গিয়ে বসল।

পাহাড়ের গা-বেয়ে ধীর-মন্থর গতিতে গাড়িটা উঠতে লাগল। মহিলাটি এক কোণে রীতিমত জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকল। আবছা অন্ধকারে ডেভিড নিঃসন্দেহ হতে পারল না, মহিলাটি যুবতী, নাকি বয়স্কা। তার পোশাক পরিচ্ছদ থেকে বেরিয়ে আসা একটা মধুর গন্ধ ডেভিডকে কল্পনার জাল বুনতে বাধ্য করল। তার কাছে ব্যাপারটা রহস্যের আড়ালেই রয়ে গেল। আর এও ভাবল যে, এ রহস্যের আড়ালে এক অপার সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে আর সে ভাবল, এতদিন যা তার কল্পনার গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তার মধ্যে চমৎকার এক অভিযানের আহ্বান লুকিয়ে আছে। কিন্তু সে রহস্যভেদের চাবিকাঠি তো তার কাছে নেই। কারণ, সে একটা টু-শব্দও করেনি।

ঘণ্টা খানেক বাদে ডেভিড জানালা দিয়ে বাইরে দৃষ্টি ফিরিয়ে বুঝল, পার্বত্য অঞ্চল ছাড়িয়ে গাড়িটা কোন শহরের পথ পাড়ি দিচ্ছে।

আরও কিছু পথ পাড়ি দিয়ে অন্ধকার একটা বাড়ির বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়াল।

ওপরওলার পর্দা দেওয়া একটা জানালা খুলে গেল। জানালা দিয়ে রাত্রের টুপি মাথায় একজনকে দেখা গেল। পর মুহূর্তেই তাকে বলতে শোনা গেল—তোমার পরিচয় কি? এত রাত্রে কেনই বা ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে এসেছ। পয়সাওয়ালা ভ্রমণার্থীরা তো এত রাত্রে ঘরের বাইরে থাকে না। অতএব ঝামেলা না করে এখান থেকে কেটে পড়ত বাপধনরা।

মোটামোটা ও গাট্টাগোট্টা লোকটার সঙ্গের চাকরটা বলল—পাগলের মত কী সব যা তা বকছ! মঁসিয়ে দ্য বিউপার্তুসকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখাটা কি তোমার পক্ষে ভাল মনে করছ?

মঁসিয়ে দ্য বিউপার্তুসের নামটা শোনামাত্র হন্তদন্ত হয়ে নিচে নেমে এল।

বাড়ির ভেতর থেকে শেকল টানার গুড় গুড় শব্দ ভেসে আসতে শোনা গেল। পর মুহূর্তে বিশাল দরজাটা খুলে গেল। কনকনে শীতে আর ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে 'সিলভার ফ্ল্যাগন'-এর মালিক রাতের পোশাক পরেই মোমবাতি হাতে দরজায় এসে দাঁড়াল। আগন্তুকদের সাদর অভ্যর্থনা জানাতে লাগল।

জমিদারের পিছন পিছন ডেভিড গাড়ি থেকে নেমে এল। তার প্রতি আগের মতই বজ্রকণ্ঠের হুকুম ভেসে এল—মহিলাটিকে গাড়ি থেকে নামতে সাহায্য কর। কবি ডেভিড বিনা বাক্যব্যয়ে সে হুকুম তালিম করল।

ডেভিড মহিলাটিকে গাড়ি থেকে নামাবার সময় লক্ষ্য করল তার ছোট হাতটা তিরতির করে কাঁপছে।

ডেভিডের পরবর্তী হুকুম হল—মহিলাটিকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে যাও। সে এবারও নীরবেই হুকুম তামিল করল।

হলঘরের মত বিশাল একটা ঘর। শুঁড়িখানার লম্বা খাবার জায়গা। অতিকায় বপুধারী ভদ্রলোক টেবিলের কাছাকাছি কোণের একটা চেয়ারে দুপ্ করে বসে পড়ল। আর দেয়ালের লাগোয়া একটা চেয়ারে বসল মহিলাটি। তার চোখেমুখে ক্লান্তির সুস্পষ্ট ছাপ।

ডেভিড এক কোণে দাঁড়িয়ে নীরবে ভাবতে লাগল এ অবস্থায় তাদের কাছ থেকে কিভাবে ভালয় ভালয় কেটে পড়া যায়।

গৃহকর্তা করজোড়ে ভাবাপ্লুত কণ্ঠে বলল—স্যার, আমার যদি জানা থাকত আপনার সেবা করার মত এতবড় সম্মান আমি পাব তবে আপনার আহারাদির যাবতীয় সুব্যবস্থা করে রাখতে পারতাম। এখন মুরগির ঝোল, মদ আর—আর—

মোমবাতি, জমিদার তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল।

মোমবাতি? ঠিক আছে স্যার। মিনিট খানেকের মধ্যেই আধা ডজন মোমবাতি এনে ধরিয়ে দেওয়া হল। গৃহকর্তা বলল—স্যার আর বিশেষ কোন নির্দেশ?

মোমবাতি।

অবশ্যই। অবশ্যই প্রভু। আমি এক্ষণি ব্যবস্থা করছি। মিনিট দু' তিনের মধ্যেই আর এক ডজন মোমবাতি এনে হলঘরটাকে সাজিয়ে তোলা হল।

বহুমূল্য কালো কাপড়ে জমিদারের আপাদমস্তক ঢাকা। কেবলমাত্র গলা আর আস্তিনে ধবধবে সাদা টুকরো লাগানো আছে। এমন কি তার তরবারির হাতল আর কোষও কালো। তার মুখে দেখা যাচ্ছে গর্বোদ্ধত ঘৃণার ছাপ।

ডেভিড বার-বার আড়চোখে মহিলাটির দিকে তাকিয়ে নিঃসন্দেহ হতে পারল, সে অষ্টাদশী না হলেও যুবতী। আর নিঃসন্দেহে যুবতী।

জমিদার গম্ভীর স্বরে ডেভিডকে জিজ্ঞাসা করল—আরে তোমার নামটাই শোনা হল না! কি নাম তোমার? কাজকর্মই বা কি কর?

ডেভিড—ডেভিড মিগনট। আমি একজন কবি।

জমিদার গোঁফ জোড়া সাধ্যমত বাঁকিয়ে বলল—তুমি বেঁচে আছ কেমন করে হে?

আমি মেষ পালনও করি। আমার বাবার ভেড়ার পালের দেখাশোনা করার দায়িত্ব আমার ওপর।

তাই বুঝি? যাক গে, আমি যা বলছি মন দিয়ে শোন, আজ রাত্রে তুমি ভুল করে সৌভাগ্যের দুয়ারে হাজির হয়ে গেছ। ওই যে মহিলাটাকে দেখছ, সে আমার ভাইঝি। মাদময়জেল লুসি দ্য ভারসেন তার নাম। সম্ভ্রান্ত বংশীয়া। নিজস্ব বার্ষিক আর দশ হাজার ফ্রাঁ। আর তার রূপ-সৌন্দর্যের কথা মুখে নাই বা বললাম, নিজের চোখেই তো দেখতে পাচ্ছ। এসব যদি তোমায় মেষপালক মনে ধরে থাকে তবে অনায়াসেই তাকে স্ত্রী হিসেবে পেতে পার।

দেখ, আমার কথায় বাধা দেবার চেষ্টা না করে যা বলছি ধৈর্য ধরে শোন। কোত্ দ্য ভিলেমোরের গ্রামের বাড়ি থেকেই আজ রাত্রে ফিরছি। এ মেয়ের বিয়ে হবার কথা ছিল, পুরোহিত, অতিথি-অভ্যাগতরা উপস্থিত হয়ে গিয়েছিলেন। বংশমর্যাদা ও পদমর্যাদা অনুযায়ী বিয়ের ব্যবস্থাদিও সারা হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ শান্তস্বভাবা বাগদত্তা মহিলাটি হঠাৎ গুলি খাওয়া বাঘিনীর মত আমার ওপর চড়াও হল। সে বজ্রগম্ভীর স্বরে আমার ওপর নিষ্ঠুর ও জঘন্যতম অপরাধের অভিযোগ আনতে লাগল আর বিয়ের প্রস্তাবটাকেও নাকচ করে দিল। তখনই আমি প্রতিজ্ঞা করলাম যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যে পুরুষের সঙ্গে প্রথম দেখা হবে তারই সঙ্গে এ মহিলার বিয়ে দেব, সে চোর, পাচক বা রাজকুমার যেই হোক না কেন। শোন, মেষপালক যুবক, আমার বাঞ্ছিত সে প্রথম পুরুষ তুমিই। আজ রাত্রেই আমি তার বিয়ে দেব। তুমি গররাজি থাকলে অন্য কারো সঙ্গে হলেও আজ রাত্রেই আমি তার বিয়ে দেবই দেব। তোমার সিদ্ধান্ত জানাবার দশ মিনিট সময় তোমাকে দিচ্ছি। কোন প্রশ্ন করে আমাকে মিছে বিরক্ত কোরো না।

বিশাল দেহধারী লোকটার দিকে চোখ পড়তেই তার ভাবভঙ্গী দেখে তার ঠোঁট দুটো তির্‌তির্ করে কাঁপতে লাগল। কিছুই বলতে পারল না। দু' পা এগিয়ে মহিলাটির সামনে দাঁড়িয়ে নীরবে অভিবাদন করল। এমন রাশভারি রূপসী যুবতীর মেয়ের সামনে দাঁড়িয়ে তার মুখ দিয়ে রা সরার কথা নয়। কিন্তু তার মুখে কোন্ অদৃশ্য শক্তি যেন অনর্গল কথা শোনাতে লাগল—মাদময়জেল, আমি যে একজন মেষপালক তা তো শুনলেনই। তবে আমি মাঝে মধ্যে নিজেকে একজন কবি বলে মনে করি। আপনি মন খোলসা করে বলুন তো মাদময়জেল। আমি কি আপনার সেবা করার উপযুক্ত?

মুখ নিচু করে বসে থাকা যুবতীটি ধীরে ধীরে মুখ তুলে ডেভিডের দিকে তাকাল। তারপর এক সময় ভাবাপ্লুত কণ্ঠে বলল—মঁসিয়ে, আপনাকে একজন সহৃদয় ব্যক্তি বলেই আমার মনে হচ্ছে। ইনি আমার কাকা, আমার একমাত্র আত্মীয়। আমাকে ভালবাসতেন বটে, কিন্তু দেখতে আমার মায়ের মত বলে অন্তর থেকে ঘৃণা করেন। আমার জীবনকে তিনি ত্রাসে ভরে তুলেছেন। তার চোখ দুটোর দিকে নজর যেতেই আমার অন্তরাত্মা পর্যন্ত শুকিয়ে যায়। আগে কোনদিন তাঁর

কথায় প্রতিবাদ করতে, তাঁর অবাধ্য হতে সাহস করি নি। কিন্তু আজ রাত্রে আমার চেয়ে তিনগুণ বয়স্ক এক লোকের সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। আপনার জীবনে এমন একটা সমস্যার সৃষ্টি করার জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত, মার্জনা করবেন। তিনি যে বোঝা আপনার চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করে পাগলামি শুরু করেছেন আপনি তাতে অবশ্যই সম্মত হবেন না। আপনার উদার আচরণও কথাবার্তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না। বহুদিন এরকম মমত্ববোধ কারো মধ্যেই আমি পাইনি।

কবির চোখে এবার উদারতার চেয়ে বেশী কিছু ফুটে উঠল। সে নিঃসন্দেহে একজন কবি, কারণ ইউডোনিকে সে মন থেকে মুছে ফেলেছে। আর নতুন প্রেমের কমনীয়তায় সে মুগ্ধ—অভিভূত। নিদারুণ তৃষিত হৃদয়ে সে সেদিকে হাত দুটো প্রসারিত করল।

ডেভিড আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলল—যে কাজটা সম্পন্ন করতে আমার বহু বছর লাগার কথা তা দশ মিনিটের মধ্যেই মিটিয়ে নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মাদময়জেল, আমি ভুলেও বলব না, আপনার প্রতি আমি করুনা দেখাচ্ছি। তা যদি বলি তবে অবশ্যই সত্য কথা বলা হবে না। আপনাকে আমি ভালবাসলেও এ মুহূর্তে তা আপনাকে প্রদর্শন করার সুযোগ থাকলেও অবশ্যই সঙ্গত হবে না। তাই বলছি কি, আগে ওই জঘন্য চরিত্রের লোকটার হাত থেকে আপনাকে উদ্ধার করার অনুমতি আমাকে দিন। তারপর যথা সময়ে ভালবাসা প্রদর্শন করা যাবে। আর আমার বিশ্বাস, আমি চিরদিন মেষপালক থাকব না। আমার একটা ভবিষ্যৎ আছে। আমি চাই, আপনার জীবনের দুঃখ-যন্ত্রণার ভার লাঘব করতে। আপনার অদৃষ্টকে কি আমার ওপর ছেড়ে দেওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব, বলুন?

—আমার প্রতি করুণা প্রদর্শন করতে গিয়ে আপনি—

করুণা বলবেন না। তার চেয়ে বরং বলুন ভালবাসা, আপনার প্রতি প্রেমের তাগিদে। আর বেশী সময় নেই—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই মাদময়জেল বলল—এ কাজের জন্য ভবিষ্যতে আপনাকে অনুতাপজ্বালা ভোগ করতে হবে। আমার প্রতি আপনার মনে ঘৃণা জাগবে। কথা বলতে বলতে সে আলখাল্লার ভেতর থেকে হাত বের করে ডেভিডের হাতের ওপর রাখল। চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—নিজের জীবন দিয়ে হলেও তোমাকে আমি বিশ্বাস করব, ভালবাসব। তাকে জানিয়ে দাও। তার চোখের আড়ালে যেতে পারলেও তাকে ভুলে যেতেও আমার পক্ষে দেরী হবে না।

ডেভিড এবার ঘর থেকে বেরিয়ে এগিয়ে গিয়ে জমিদারের মুখোমুখি হল। মাত্র আর দু'মিনিট সময় আছে। রাজকুমারী আর অর্ধেক রাজত্ব গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিতে মেষপালকের আটটা মিনিট সময় লাগার কথা।

ডেভিড কোমরে হাত দিয়ে গর্বিত কণ্ঠে বলে উঠল—দেখুন মশাই, মাদময়জেলের কাছে আমি প্রস্তাব, না প্রস্তাব ঠিক নয়, অনুরোধ রেখে আমাকে বিয়ে করবে আমার ধর্মপত্নী হবার জন্য। অনুরোধ রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় আমি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করছি।

চমৎকার! চমৎকার কথা বলেছ। মাদময়জেলের বরাতে তো আরও নিকৃষ্টমানের পুরস্কার জুটতে পারত। এবার গীর্জা আর শয়তানের কৃপা পেলেই যত শীঘ্র সম্ভব শুভ কাজটা চুকিয়ে ফেলা যেতে পারত।

জমিদার তরবারিটা দিয়ে টেবিলে ঘা দিতেই একগোছা মোমবাতি নিয়ে বাড়িওয়ালা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল। জমিদার বললেন—মোমবাতির আর দরকার নেই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গীর্জায় গিয়ে পুরোহিতকে ডেকে নিয়ে এস।

বাড়িওয়ালা বিদায় নিলে এবার তিনি বললেন—মঁসিয়ে মিগ্নট, আজ একটু বাদেই যাকে তুমি পত্নীরূপে পাচ্ছ সে তোমার জীবনকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাঁক করে দেবে। তার ধমনীতে সর্বনাশা রক্তের স্রোত বইছে। সে তোমার জীবনে লজ্জা নিরবচ্ছিন্ন আর উৎকণ্ঠা নিয়ে আসবে। যে শয়তান তার ওপরে ভর করেছে সে তার চোখ দুটোতে আশ্রয় নিয়েছে কেবলমাত্র চোখেই নয়, তার চামড়া আর মুখ-সর্বাঙ্গে। আমার দিক থেকে তোমার সুখী-জীবনের প্রতিশ্রুতি রইল কবিবর। দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবার বলল—মাদময়জেল, তবে আমি তোমার হাত থেকে আমি অব্যাহতি পেতে চলেছি।

জমিদার উল্লসিত হয়ে মদের বোতলটা কাছে টেনে নিলেন। আমচকা আঘাত পেয়ে মানুষ

যেমন চিল্লিয়ে ওঠে মেয়েটা ঠিক তেমনি চেঁচিয়ে উঠল। ডেভিড মদের গ্লাসটা হাতে নিয়েই এক লাফে জমিদারের মুখোমুখি দাঁড়াল। তখন চোখে-মুখে মেষপালকের চিহ্নমাত্রও নেই। শুনুন। আপনি আমাকে একটু আগে মঁসিয়ে সম্মোধন করে যে সম্মান প্রদর্শন করেছেন। আর এতেই মাদময়জেলের সঙ্গে আমার বিয়ের প্রস্তাবটাও আপনার কাছাকাছি একটা মর্যাদার আসন দান করেছে।

বিদ্রূপের স্বরে জমিদার বললেন—মেষ পালক এরকম ভাবনা তোমার মধ্যে উদয় হওয়া অসম্ভব নয়।

জমিদারের বিদ্রূপের চিহ্ন আঁকা মুখের ওপর আচমকা গ্লাসের মদটুকু ছুঁড়ে দিয়ে ডেভিড গর্জে উঠল—জমিদার মশাই, দয়া করে আমার সঙ্গে যুদ্ধে নামুন। শক্তি পরীক্ষা—

জমিদার গুলি খাওয়া বাঘের মত গর্জে উঠে গৃহকর্তা বৃদ্ধকে ডেকে বললেন, এ মেষপালকটার জন্য শীঘ্র একটা তরবারি এনে দাও। এবার মহিলাটির দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে এমন রোষপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন যে, তার গায়ের রক্ত হিম হয়ে যাবার জোগাড় হল। তারপর বাজখাই গলায় উচ্চারণ করলেন—শোন, একই রাত্রে আমি তোমার স্বামী জুটিয়েছি আর এ রাত্রেই তোমাকে আমি বিধবাও করব, দেখে নিও।

মহিলাটির সামনে কথাটা বলতে তার জিভে বাঁধলেও ডেভিড বলল—আমি তরবারি নিয়ে যুদ্ধ করতে জানি না।

মুখ বিকৃত করে জমিদার বলে উঠলেন তবে কি আমিও কাঠের গদা নিয়ে লড়াই করব নাকি? আরে, আমার পিস্তলটা কোথায়? নিজস্ব পরিচারককে চিৎকার করে বললেন।

ফাঁসোয়া এক দৌড়ে গিয়ে গড়ি থেকে রুপোর নক্সা করা দুটো পিস্তল নিয়ে এসে জমিদারের হাতে দিল। জমিদার একটা পিস্তল মেষপালকের দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন—একজন মেষপালকের পক্ষে ঘোড়া টিপতে জানা খুবই স্বাভাবিক। তাদের অনেকেই তো দ্য বিউ পের্তুস-এর অস্ত্রাঘাতে নিহত হয়ে সম্মান লাভের অধিকারী হয়েছে, নজীর আছে।

জমিদার আর মেষপালক লম্বা একটা টেবিলের দু'প্রান্তে মুখোমুখি দাঁড়াল। উভয়ের হাতেই গুলিভরা পিস্তল।

গৃহকর্তা বৃদ্ধ প্রায় আর্তনাদ করে উঠল—একী করছেন মঁসিয়ে। ভগবান যীশুর দোহাই! আমার বাড়িতে রক্তপাত ঘটিয়ে আমাকে অপরাধী করবেন না। এতে আমার খরিদ্দাররা ভয়ে—

গৃহকর্তার পক্ষে কথাটা আর শেষ করা সম্ভব হল না। আসলে জমিদারের রোষপূর্ণ চোখের দিকে চোখ পড়তেই তার বুকের ভেতরে ধুকপুকানি শুরু হয়ে গেল। সে ধপ্ করে মেঝেতে বসে পড়ল। কথা বলার মত সামান্যতম শক্তিও যেন তার নেই।

এবার মহিলাটি মুখ খুলল—আপনারা তৈরী হয়ে দাঁড়ান। আমি যুদ্ধ শুরু হবার সংকেত দেব। এবার কয়েক পা এগিয়ে ডেভিডকে চুম্বন করল। তারপর সামান্য পিছিয়ে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল।

প্রতিদ্বন্দ্বী দু'জন পিস্তলের ঘোড়ায় আঙুল ঠেকিয়ে মহিলাটির সঙ্কেত ঘোষণা অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল।

মহিলাটি এবার কেটে-কেটে উচ্চারণ করল—এক-দুই-তিন।

প্রায় একই সময়ে দুটো পিস্তল গর্জে উঠতে শোনা গেল। জমিদার পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগলেন আর ডেভিড সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মাথাটাকে মৃদু মৃদু দোলাতে লাগল। তার চোখের মণি দুটো বুঝি সহধর্মিণীকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। পরমুহূর্তে দুম করে মেঝেতে আছাড় খেয়ে পড়ল। বার কয়েক আছাড়ি পিছাড়ি করে কুণ্ডলি পাকিয়ে গেল।

বিধবা মহিলাটি বিকট আর্তনাদ করে তার ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে বিলাপ পেড়ে কাঁদতে লাগল। কান্নাপ্লুত কণ্ঠে সে বলে উঠল—হায় ঈশ্বর! পিস্তলের গুলি এর হৃদপিণ্ডটাকে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে! হায়! হৃদপিণ্ডটা একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

জমিদার গর্জে উঠলেন—ন্যাকামি ছেড়ে চলে এস। এ গাড়িতে করেই তোমাকে নিয়ে যাব। ভোরের আলো ফোটার আগেই তোমাকে কোন না কোন জীবন্ত মানুষের সঙ্গে বিয়ে দেবই দেব।

আর যার সঙ্গে প্রথম দেখা হবে তারই সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব, আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। যার সঙ্গে প্রথম দেখা হবে সে চাষী বা চোর—ডাকাত যেই হোক। আর কারো পথে যদি দেখা নাই হয় তবে যে মুটে-মজুর আমার গাড়ির দরজা খুলে দেবে তার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব। এখন নীরবে গাড়িতে ওঠ।

এক-এক করে সবাই গাড়িতে উঠে বসল। ঘুমন্ত গ্রাম্য পথ দিয়ে গাড়িটা এগিয়ে চলল। আর এদিকে গিলভার ফ্ল্যাগন-এর সুবিশাল হলঘরে কিংকর্তব্যবিমূঢ় বৃদ্ধ গৃহকর্তা কবির রক্তাপ্লুত মৃতপ্রায় দেহের ওপর ঝুঁকে অস্থিরভাবে নিজের হাত দুটো কচলাতে লাগল। আর দু' ডজন মোমবাতির শিখা অনবরত কেঁপে চলল।

ডান দিকের পথ ধরে

ডেভিড থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তিন লীগ পথ পাড়ি দিয়ে পথটা বড় একটা পথে মিলিত হয়েছে। কয়েক মুহূর্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকার পর ডানদিকের পথটা ধরে সে এগিয়ে চলল।

পথটা কত দূরে, কোথায় গিয়ে মিলিত হয়েছে কিছুই তার জানা নেই। কিন্তু সে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে রাতের অন্ধকার থাকতে থাকতেই সে যে করেই হোক ভেরনায় থেকে বহু দূরে চলে যাবে। আরও এক লীগ পথ পাড়ি দিয়ে একটা বড়সড় পল্লীনিকেতনের গা দিয়ে যাবার সময় দেখল সেখানে অত্যাধুনিক আমোদপ্রমোদ চলছে।

ডেভিড ব্যস্ত পায়ে আরও লীগ পথ পাড়ি দিয়ে পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। পথের ধারের একটা পাইন গাছের শুকনো পাতার ওপর শুয়ে বিশ্রাম নিতে গিয়ে কখন যে ঘুমে অচৈতন্য হয়ে পড়েছে টেরই পায়নি। শুকনো পাতার খোঁচায় হঠাৎ ঘুম চটে গেলে হুড়মুড় করে উঠে আবার ত্রস্ত পায়ে হাঁটতে লাগল।

ডেভিড পাঁচ-পাঁচটা দিন এক নাগাড়ে বড় রাস্তাটা দিয়ে হাঁটল। সে কখন চাষীর ঘরের গাদায়, কখন পাতার বিছানায় পড়ে ঘুমোলো। চাষীরা কালো রুটি দিয়ে তার খিদে মেটাল। নদীর জলে সে তৃষ্ণা মেটাল। আবার মেষপালরা দুধ দিয়ে তার উপকার করল।

শেষ পর্যন্ত বড়সড় একটা সেতু পেরিয়ে ডেভিড শহরে ঢুকল। সেটা এমন এক শহর যেটা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক কবিকে যশের মুকুট দানে সম্মানীত করেছে অথবা পিষে মেরেছে।

প্যারিস, প্যারিস শহর তাকে অভ্যর্থনা জানাল।

ডেভিড হাঁটতে হাঁটতে শহরের আরও কিছুটা ভেতরে ঢুকে রু কঁতি-র একটা পুরনো বাড়ির ছাদে মাথা গোঁজার জায়গা ভাড়া করল। একটা কাঠের আরাম কেদারায় শরীর এলিয়ে দিয়ে কবিতা আবৃত্তিতে মন দিল।

পথের দু'ধারে আকাশচুম্বী বাড়ির বিচিত্র সমারোহ দেখে ডেভিড যারপরনাই অবাক হল। রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে এলেই সরাইখানা থেকে মাতালদের হৈ হট্টগোলের আওয়াজ ভেসে আসে। আর সে ভবঘুরেদের চিৎকার চেঁচামেচি তো সর্বক্ষণই কানঝালাপালা করে দেয়। এক সময় যে সব বাড়িতে ভদ্রলোকদের বাস ছিল সম্প্রতি সেগুলোতে অভদ্র ও ব্যভিচারীদের বাসভূমি হয়ে উঠেছে। ফলে ভাড়াও বেশী। কেবলমাত্র এখানেই ডেভিড-এর মনের মত পরিবেশ পাওয়া গেল। আর তার আর্থিক সঙ্গতির মধ্যেও পড়ে এ জায়গাটা। সে এখানে সারা দিন রাত কাগজ-কলম নিয়ে কবিতা রচনার কাজে মেতে রইল।

একদিন সে নিচুতলার পরিবেশ থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে ফেরার সময় প্রায়ান্ধকার সিঁড়ির বাঁকে এক যুবতীর সঙ্গে তার মুখোমুখি ধাক্কা লেগে গেল। সে সিঁড়িতে দাঁড়িয়েছিল। হ্যাঁ যুবতীই বটে, উদ্ভিন্ন যৌবনা। তার রূপের আভা চোখ যেন ঝলসে দেয়। ঢিলেঢালা আলখাল্লার ফাঁক দিয়ে নিচের দামী গাউনটা দেখা যেতে লাগল। তার মুখে

চিন্তার ছাপ ফুঠে উঠল। সে ডেভিড-এর দিকে তাকাল। মুহূর্তের মধ্যেই তার চোখ দুটো গোল হয়ে উঠল। এক হাতে সে গাউনটা তুলল। সাধারণ একজোড়া হাই-হিল জুতো সে দেখতে পেল।

মেয়েটা হয়ত ডেভিডকে আসতে দেখেছিল। তাকে সাহায্য করার অভিপ্রায় নিয়েই এখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে।

ডেভিড মদের বোতলটা বগলে নিয়ে সিঁড়িটার ধার ঘেঁষে ওপরে উঠে যেতে লাগল।

মঁসিয়ে একা এ বাড়িতেই থাকেন? রূপসী যুবতী ডেভিডকে লক্ষ্য করে কথাটা বলল।

ডেভিড তার কথা শুনেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘাড় ঘুরিয়ে তার প্রশ্নের উত্তর দিল, হ্যাঁ, ম্যাডাম এ বাড়িতে থাকি।

তবে কি তিনতলায়?

না, আরও উঁচুতে আমার মাথা গোঁজার জায়গা।

প্রশ্নটা করেই মেয়েটা যেন কেমন অপ্রতিভ হয়ে পড়ল। সে আমতা আমতা করে বলল, মঁসিয়ে ক্ষমা করবেন। একজন লোককে এ ধরনের, মানে কোথায় থাকেন প্রশ্ন করা মোটেই ভদ্রতার পরিচায়ক নয়।

না, এমন কথা বলবেন না ম্যাডাম! আমি আশা করছি, তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই মেয়েটা বলে উঠল, হ্যাঁ, আমারই ভুল হয়েছে। আসলে এ বাড়িটার সব কিছুর প্রতি আমার আগ্রহটা মাত্রাতিরিক্ত অস্বীকার করতে পারব না। একদিন যে এটাই আমার বাড়ি ছিল। তাই আজও কেবল সে সুখের দিনগুলোর স্বপ্ন দেখার জন্য ছুটে ছুটে আসি। তাই বলে আবার এটাকে অজুহাত মনে করবেন না।

কবিবর আমতা আমতা করে বলল তবে আমার কথাও শুনে রাখুন, আপনাকে সাফ কথাই বলছি, কোনরকম অজুহাতেরই প্রয়োজন নেই। একেবারে ওপর তলায়, যেখানে সিঁড়িটা বাঁক নিয়েছে সেখানকার ছোট্ট একটা কামরায় আমি থাকি।

মেয়েটা এমন করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল যেন কিছুটা স্বস্তি বোধ করল। এবার সে গোল গোল চোখ দুটো মেলে বলল, তবে আর মঁসিয়ের সময় নষ্ট করব না। একটা অনুরোধ রইল, আমার বাড়িটার দেখভাল করবেন। হায়! এখনও বুড়িটার স্মৃতি আমার বুকে জ্বল জ্বল করছে! আপনার সৌজন্যের জন্য আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন মঁসিয়ে।

মেয়েটার একগাল হাসি আর কিছু মিষ্টি সুবাস পিছনে ফেলে ধীর পায়ে এগিয়ে গেল। ডেভিড যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় একের পর এক সিঁড়ি ডিঙিয়ে ওপর তলায় উঠে যেতে লাগল। পরবর্তীকালে মেয়েটা সে মধুর হাসি কোনদিনই তার চোখ আর স্মৃতি থেকে মিলিয়ে যাবে বলে মনে হয় না। যাকে, যে মেয়েকে সে চেনে না, যাকে মুহূর্তের জন্য চোখে দেখে নি সে-ই তো তার জন্য কাব্যের ডালি সাজিয়ে নিয়ে এল। আর দিয়ে গেল হঠাৎ শোনা দুটো গানের কলি। কোঁকড়ানো চুলের উদ্দেশ্যে কবিতা আর নিটোল সুদর্শন পায়ের জন্য লেখা একটা সনেট।

ডেভিড-এর মধ্যে যে কবিত্ব শক্তি রয়েছে সে বিষয়ে এতটুকুও সন্দেহের অবকাশ নেই। কারণ, ইউভোনি তার মন থেকে মুছে গেছে। নতুন—একেবারে তরতাজা এক ভালবাসা তার সতেজ সুরভি দিয়ে তাকে ঘিরে ধরেছে। তার মন-মাতানো সুগন্ধ অদ্ভুত এক আবেগে তার মন-প্রাণ ভরে দিয়েছে।

এক রাত্রে তিনজন মানুষ সে বাড়িটার চারতলার একটা ঘরের টেবিলটাকে ঘিরে বসে রয়েছে। তাদের মধ্যে একজন রীতিমত স্থূলকায় বিশালদেহী। তার পরনে কুচকুচে কালো পোশাক। তার চোখমুখে গর্বিত ভাব স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। আর তার ইয়া মোটা গোঁফ জোড়া তার বিদ্রূপের ছাপ ফুটে ওঠা চোখ দুটোর কাছাকাছি উঠে গেছে। অন্য একজন যুবতী ডাগর ডাগর চোখের মালিক, শিশুর মত অকপট হতে পারে, আবার বেদিনীদের মত আয়ত আর মন মজানোও হতে পারে। এ মুহূর্তে চোখ দুটো যেন কোন ষড়যন্ত্রকারীর মতই উজ্জ্বল আর উচ্চাকাঙ্খী। আর তৃতীয় ব্যক্তি বাস্তবিকই একজন কর্মঠ। একজন অসম সাহসী যোদ্ধা, কর্তাব্যক্তি। অন্য দু'জন তাকে 'ক্যাপ্টেন', দেরোলেস সম্বোধন করছে। অবশ্য তার কর্তৃত্ব মেনে চলার মতই বটে।

এ লোকটা টেবিলের ওপর সশব্দে একটা ঘুষি মেরে বলল, আজ রাত্রে। আজ রাত্রে সে যখন

খ্রীস্টের ভোজন উৎসবে যোগদান করতে যাবে তখন। এসব অনিশ্চিত ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পেতে পেতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কেবলমাত্র সঙ্কেত, সংখ্যা আর গুপ্ত সভার আলোচনা নিয়ে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমাদের সৎ বিশ্বাসঘাতক হতে হবে। ফ্রান্সকে তার কবল থেকে রক্ষা করতে হলে তাকে হত্যা করা হোক। এভাবে ফাঁদ পেতে পেতে তার পিছনে ধাওয়া করা সম্ভব নয়। হ্যাঁ, আমার মত, আজরাত্রেই। আজ রাত্রে যখন উৎসবে যোগদান করতে যাবে তখনই কাজটা সারতে হবে।

মহিলাটি সহৃদয় দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। মেয়েরা যতই ষড়যন্ত্র ষড়যন্ত্র করে চেঁচামেচি করুক, আসলে মেয়ে চিরদিন দুঃসাহসিক কাজে থমকে যায়। বিশালদেহী পুরুষটা তার লম্বাগোঁফে আঙুল বোলাতে লাগল।

বজ্র কঠিন স্বরে সে বলল, 'ক্যাপ্টেন, এ ব্যাপারে আমি তোমার মতকেই সমর্থন করছি। অপেক্ষা করে কোন লাভই হবার নয়। প্রাসাদের প্রহরীরা আমাদের দলের লোক। তারাই কাজ হাসিল করে দেবে।

ক্যাপ্টেন দেরোলেস কর্কশ স্বরে উচ্চারণ করল হ্যাঁ, আজ রাত্রেই। শুনুন জমিদার মশাই, আমার এ হাত দুটোই আজ রাত্রে কাজটা চুকিয়ে ফেলবে।

বিশালদেহী লোকটা বলল, তবু একটা প্রশ্ন তো থেকেই যাচ্ছে। প্রাসাদে আমাদের দলের সবাইকে জানাতে হবে। একটা সংকেত সম্বন্ধে সবাই এক মত হতে হবে। আমাদের মধ্যে সর্বাধিক বিশ্বস্ত যে তার জন্য রাজকীয় গাড়ীতে স্থান করে দিতে হবে। দক্ষিণ দরজায় রিরো প্রহরায় আছে। তার কাছে কোনক্রমে খবরটা পৌঁছে দিতে পারলেই কেল্লা ফতে।

মহিলাটি বলল, ঠিক আছে, আমিই খবরটা পৌঁছে দেব। জমিদার ভ্রূ জোড়া কুঁচকে বলল, 'আপনি! কাইন্ডলি, আপনি খবরটা পৌঁছে দেবেন? আপনার নিষ্ঠার প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে। তবু—'

বেশ একটু গলা চড়িয়ে মহিলাটি এবার বলল। আমার কথা ধৈর্য ধরে শুনুন, এবাড়ির চারতলার ছোট্ট একটা কামরায় এক গ্রাম্য যুবক বাস করে। সে খুবই সহজ সরল। গ্রামের বাড়িতে ভেড়া চরাত। স্বভাবও ভেড়ার মতই নরম। আমার দিক থেকে সবুজ সঙ্কেত পেলেই সে আমার নিজের লোকে পরিণত হয়ে যাবে। সে একজন কবি। আমার বিশ্বাস, সে আমাকে নিয়ে কবিতাও রচনা করে, স্বপ্নটপ্নও দেখে। আমার কথা সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। আমি বললে সে আগ্রহের সঙ্গে খবরটা রাজপ্রাসাদে পৌঁছে দেবে বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

ষড়যন্ত্রকারীরা যখন কর্তব্যকর্ম সম্বন্ধে আলোচনায় ব্যস্ত তখন কবিবর প্রেমিকাকে লেখা একটা কবিতার পংক্তি আওড়াতে লাগল। ঠিক তখন এক রূপসী মহিলা আচমকা দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল। সে এমন হাঁপাতে লাগল যেন বড়ই বিপন্ন। শিশুর আয়ত ও অকপট চোখ দুটো মেলে সে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে মহিলাটি কবি ডেভিডকে লক্ষ্য করে বলল, মঁসিয়ে, বড়ই বিপদে পড়ে শরণাপন্ন হতেই হল। আমার ধারণা, আপনি একজন যথার্থই সজ্জন। এমন কোন মানুষের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় নেই যার সাহায্য পেতে পারি। আমার মা মরণাপন্না। আমার কাকা রাজপ্রাসাদের রক্ষীদলের অধিনায়কের পদে নিযুক্ত। তাকে ডেকে আনা খুবই দরকার। আমি কি আপনার কাছ থেকে এ উপকারটুকু আশা করতে পারি মঁসিয়ে?

মাদময়জেল, আপনার বাঞ্ছাই হয়ে উঠবে আমার দুটো ডানা। এবার অনুগ্রহ করে বলুন তো, কিভাবে তার কাছে খবরটা পৌঁছে দিয়ে আপনার অনুরোধ রক্ষা করতে পারব?

মহিলাটি একটা মুখ আঁটা খাম ডেভিড-এর হাতে দিয়ে বলল, প্রাসাদের একেবারে দক্ষিণ দরজায় চলে যাবেন। খেয়াল থাকে যেন, একেবারে দক্ষিণ দিকের দরজা। সেখানকার কর্তব্যরত প্রহরীকে বলবেন, "রাজপাখি তার বাসা ছেড়ে উড়ে গেছে।" ব্যস, সে আপনাকে প্রাসাদের ভেতরে ঢুকতে দেবে। এবার সর্ব দক্ষিণের দরজায় গিয়ে এ কথাটা আর একবার উচ্চারণ করবেন। সে লোকটা আপনার কথা শুনে বলবেন, 'তিনি যখন খুশি আঘাত করতে পারেন। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে তার হাতে চিঠিটা দিয়ে তুলে দেবেন। মঁসিয়ে ব্যাপারটা হচ্ছে, আমার কানে আমাকে বিশ্বাস করে এ সংকেত বাণীটা আমাকে দিয়েছেন। সম্প্রতি তো দেশজুড়ে বিক্ষোভের আগুন জ্বলছে আর

রাজাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র চলছে। তাই তো রাত্রির অন্ধকার নেমে আসার পর সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয় যাতে কেউ-ই রাজপ্রাসাদে ঢুকতে না পারে। আপনি যদি অনুগ্রহ করে এ চিঠিটা যথাস্থানে পৌঁছে দিতে পারেন তবেই আমার মায়ের পক্ষে পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার আগে একবারটি তাকে শেষ দেখা দেখে শান্তি লাভ করতে পারবেন।

ডেভিড তার হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে বলল, কিন্তু এত রাত্রে আপনাকে বাড়ি ফিরতে দেওয়াটা সঙ্গত হবে না। আমি না হয়—'

আমার জন্য ভাববেন না। এমন একটা মুহূর্তও নষ্ট করা সম্ভব নয়। আপনি যত শীঘ্র সম্ভব চলে যান। আপনার সহানুভূতির জন্য আমি ভবিষ্যতেও কৃতজ্ঞ থাকব।

কবিবর ডেভিড ব্যস্ত পায়ে বিদায় নেওয়া মাত্র মহিলাটি নিচের ঘরে ঢুকে গেল।

জমিদার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মহিলাটির দিকে তাকালে সে বলল, আর ভাবতে হবে না। সে তার ভেড়াগুলোর মত যেমন দ্রুত গতি সম্পন্ন ঠিক তেমনই বোকা হাঁদাও বটে।

ক্যাপ্টেন দেরোলস উন্মাদের মত চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'হায়! আমার পিস্তলটা ফেলে এসেছি। অন্য কোন পিস্তলের ওপরও আমার পক্ষে ভরসা করা সম্ভব নয়।

জমিদার আলখাল্লার ভেতর থেকে রূপোর নকসা করা একটা চকচকে অস্ত্র বের করে তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এটা ধর। এর চেয়ে ভাল অস্ত্র হয় না। তবে খবরদার এটাকে হাতছাড়া কোরো না যেন। এর গায়ে আমার প্রতীক চিহ্ন আঁকা আছে। তাছাড়া আমি তো সম্প্রতি অন্যান্য সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের মতই হয়ে গেছি। আজ রাত্রি থাকতেই আমাকে প্যারিস থেকে যত দূরে সম্ভব চলে যেতে হবে। কালই আমার পল্লী নিকেতনে পৌঁছে যাব। কাউন্টেস, চল তোমাকে এগিয়ে দিচ্ছি।

জমিদার মোমবাতিটাকে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল। এবার তিনজন একই সঙ্গে রু কোঁতি-র পথে নেমে পথচারীদের ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল।

ডেভিড উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে রাজপ্রাসাদের দক্ষিণ দিকের দরজায় পা দিতেই একটা বর্শার ফলা তার বুকে ঠেকামাত্র সে বলে উঠল—

বাজপাখি তার বাসা ছেড়ে উড়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে বর্শার ফলাটা সরে গিয়ে তাকে পথ ছেড়ে দিল।

প্রহরী ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারণ করল—যত শীঘ্র পার চলে যাও। রাজপ্রাসাদের দক্ষিণ সিঁড়িতে পা দেওয়ামাত্র সে আবার বাধার সম্মুখীন হল। সে আবারও একই গুপ্তসংকেত উচ্চারণ করল। বাধা অপসারিত হয়ে গেল। রক্ষীদের মধ্যে একজন প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল—

যখন খুশি তিনি আক্রমণ করতে, কথা শেষ হবার আগেই প্রহরীদের মধ্যে পড়ে গেল। একজন সবাইকে ঠেলে ধাক্কে সরিয়ে দিয়ে চিঠিটা ডেভিড-এর হাত থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে নিল। সে ডেভিডকে নিয়ে হলঘরে ঢুকে গেল। এবার খামের মুখটা ছিঁড়ে চিঠিটা পড়ল। ইউনিফর্ম পরিহিত এক বন্দুকধারীকে ইঙ্গিতে কাছে ডাকল। বজ্রগম্ভীর স্বরে বলল, 'যত শীঘ্র সম্ভব দক্ষিণ দরজার প্রহরীদের গ্রেপ্তার করার ব্যবস্থা কর। আর তাদের জায়গায় রাজভক্ত প্রহরীদের নিযুক্ত কর। এবার সে ডেভিডকে নিয়ে এগিয়ে গেল।

সে এবার ডেভিডকে নিয়ে লম্বা একটা বারান্দা ও বাইরের ঘর ডিঙিয়ে একটা হলঘরে ঢুকল। সেখানে কালো পোষাক পরিহিত এক ব্যক্তি বিষণ্নমুখে বসে গভীর চিন্তায় মগ্ন। সে তাকে লক্ষ্য করে বলল, 'স্যার, নর্দমার ইঁদুরের মত এ রাজপ্রাসাদটা গুপ্তচর আর বিশ্বাসঘাতক ছেয়ে গেছে। আপনি তখন আমার কথাগুলোকে উদ্ভট কল্পনা বলেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন, ঠিক কিনা? এ লোকটা কিন্তু তাদের সাহায্য সহযোগিতা পেয়েই আপনার দরজা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। আর তার কোটের পকেটে একটা চিঠি পাওয়া গেছে। আমি সেটা কেড়ে নিয়েছি। আমার কাজকে আপনি যাতে বিশ্বাস করতে পারেন সে জন্য লোকটাকে আমি আপনার দরবারে হাজির করলাম।

রাজা সামান্য নড়েচড়ে চেয়ারে সোজা হয়ে বসে বললেন, আমি নিজে একে জেরা করব। ডেভিড-এর দিকে তাকিয়ে এবার বললেন—তুমি কোথা থেকে এসেছ, বল?

স্যার, ভেরনয় গ্রাম থেকে। সেটা উইরে এৎ নার নামক প্রদেশের অন্তর্গত।

ভেরনয় গ্রাম? প্যারিসে তোমার কাজ কি?

স্যার, আমি একজন নামকরা কবি হতে উৎসাহী। গ্রামের বাড়িতে বাবার খোঁয়াড়ের ভেড়া চরাতাম।

মাঠে কাজ করতে? মাঠেই কি তুমি থাকতে? ভোরের আলো ফোটার আগে বেরিয়ে বেড়ার ধারে ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘাসের ওপর শুয়ে থাকতে? পাহাড়ের গায়ে ভেড়ার পাল চরে বেড়াত; গাছের ছায়ায় বসে মিষ্টি রুটি আর ঝর্ণার জল দিয়ে পেটের আগুন নেভাতে, আর ঝোপের আড়াল থেকে কালো পাখিরা মিষ্টি মধুর গান গাইত আর তুমি তন্ময় হয়ে শুনতে, তাই নয় কি ভেড়ার রাখাল?

আপনার অনুমান অভ্রান্ত স্যার। আর শুনতাম ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়ানো উল্লসিত মৌমাছিদের গুঞ্জনধ্বনি। আবার কখন সখন পাহাড়ের ওপর থেকে আঙুর সংগ্রহকারীদের বাতাসবাহিত গানের কলিও কানে আসত।

শুনতে, অবশ্যই শুনতে। কিন্তু কালো পাখিদের গান তো শুনতেই। ঝোপের আড়াল থেকে তারা মধুর শিস দিয়ে বাতাসকে মুখরিত করে তুলত, ঠিক কিনা?

স্যার, ইউরে এৎ নায় পাখির মত মিষ্টি মধুর গান তো অন্য কোন পাখিই গাইতে পারে না। আমি কবিতার মাধ্যমে তাদের গানের ভাষাকে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছি।

ভাল কথা, তোমার সে কবিতাগুলো আমাকে এখন শোনাতে পার? বহুদিন আগে, সেই কবে কালো পাখির গান শুনেছি। তাদের গান হৃদয়াঙ্গম করতে পারা তো আমার রাজত্ব পাওয়ার চেয়ে বড় পাওয়া। আর রাত্রির অন্ধকার নেমে এলে ভেড়ার পালকে খোয়াড়ে ঢুকিয়ে দিয়ে তুমি যে মিষ্টি রুটি খেতে খেতে কবিতা আওড়াতে সেগুলোর দু-একটা আমাকে শোনাতে পার মেষপালক?

ডেভিড সাগ্রহে একটা কবিতা আবৃত্তি করে রাজা মশাইকে শোনাল।

কবিতা আবৃত্তি চলাকালীন আচমকা একটা কর্কশ অওয়াজ হওয়ায় কবিতাটা মাঝ পথেই থেমে গেল। স্যার অভয় দিলে দু-একটা কথা বলতে চাইছি। আমাদের সময়ের বড়ই অভাব। আপনার নিরাপত্তার ব্যাপারে কোন গাফিলতি হলে মার্জনা করবেন।

রাজা ম্লান হেসে বললেন, গাফিলতি? ডিউক দ'অমেল কোনরকম গাফিলতি বা দোষ ত্রুটি থাকতে পারে না তার আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

ডিউক দ'অমেল বলল, 'লোকটার পকেট থেকে যে চিঠিটা উদ্ধার করা হয়েছে তা আপনাকে পড়ে শোনাচ্ছি, আজ রাত্রেই সুবয়াজের মৃত্যু বার্ষিকী। তিনি যদি অভ্যাস মত মাঝ রাত্রের প্রার্থনা সভায় উপস্থিত হন তবে রু এসপ্লানেডের মোড়ে তাকে আক্রমণ করবে। তিনি যদি এ বাঞ্ছা করেন তবে রাজপ্রাসাদের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বাজপাখির ব্যাপারটা বুঝতে পারার জন্য মোমবাতি জ্বেলে রেখো।

চিঠিটা পড়ে ডিউক ভাঁজ করতে আরম্ভ করলে ডিউক কর্কশ স্বরে উচ্চারণ করল, এই যে মেষপালক। চিঠির বক্তব্য নিজের কানেই শুনলে। এবার বল তো, চিঠিটা দিয়ে কে তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে, সত্যি করে বল?

ডেভিড বলল, 'ব্যস, আপনার কাছে কিছুই গোপন করব না। এক মহিলা আমার হাতে চিঠিটা দিয়ে আমাকে বলেছে তার মা নাকি দারুণ অসুস্থ, মৃত্যুশয্যায়। আর এ চিঠিটা কোন ক্রমে তার কাকার হাতে পৌঁছে দিলেই তিনি যত শীঘ্র সম্ভব তাকে দেখতে যাবেন। চিঠির অর্থ আমার কিছুই জানা নেই। তবে একথা আপনাকে জোর দিয়েই বলতে পারি মেয়েটা বাস্তবিকই সুন্দরী। তার রূপের আভা চোখ যে ঝলসে দেয়।

শোন, তার বিস্তারিত এবং সঠিক বিবরণ দাও। আর সে সঙ্গে বল, কি করেই বা তুমি তার হাতের মুঠোয় চলে গেলে?

ডেভিড ম্লান হেসে বলল, তার বিস্তারিত এবং সঠিক বিবরণ জানতে চাইছেন? শুনুন তবে মহামান্য ডিউক, রোদ আর ঘন ছায়ার সমন্বয়ে তাকে গড়া হয়েছে। সে তন্বী যুবতী। অল্ডার গাছের মতই তন্বী। তার চাল চলন মনোরম বললেও কমই বলা হবে। তার চোখ দুটোর দিকে চোখ পড়ামাত্র কেমন যেন বদলে গিয়ে গোল গোল হয়ে যায়। সে যখন কাছে এগিয়ে আসতে থাকে তখন মনে হয় সূর্য বুঝি তাকে ঘিরে রেখেছে। আর ফিরে যাবার সময় মনে হয় সব কিছু বুঝি

কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। তখন হর্ণফুলের গন্ধে বাতাস ভরপুর হয়ে যায়। তার সঙ্গে রু কোঁতি-র ঊনত্রিশ নম্বর বাড়িতে আমার পরিচয় ঘটে।

ডিউক দ'মেল বলল, মহারাজ, আমরা ওই বাড়িটার ওপরই কড়া নজর রেখেছি। কবিকে ধন্যবাদ জানাতেই হয়, কুখ্যাত কাউন্টেস কুয়েবেদ-র একটা সে আমাদের দান করেছে।

মহারাজ ও মহামান্য ডিউক, আশা করি আমি তুচ্ছ কথাগুলো বলে কোন অন্যায় করিনি। সে রূপসী যুবতীর চোখের চাউনি আমি নিজের চোখে দেখেছি। আমি আমার জীবন পণ করেও বাজি ধরতে পারি, চিঠির বক্তব্য যা-ই হোক না কেন, তাকে স্বর্গীয় দেবদূত না ভেবে উপায় নেই।

কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে ডিউক বলল, শোন, তোমাকে আমি কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি ফেলব। তোমার রাজপোশাক পরে, রাজা সেজে আর রাজার গাড়িতে চেপে তোমাকে মাঝ রাতের প্রার্থনা সভায় যোগদান করতে হবে। বল, রাজী তো?

মহাশয়, তার চোখের দিকে যখন আমি তাকিয়েছি তখনই আমার পরীক্ষা হয়ে গেছে। এবার আপনি আমার যেভাবে খুশি যেকোন পরীক্ষা নিতে পারেন।

ঘড়িতে তখন বারোটা বাজতে আধঘণ্টা বাকি? রাজপ্রাসাদের দক্ষিণ পশ্চিম দিকের জানালায় ডিউক নিজে হাতে একটা লাল বাতি জ্বেলে দিল। তারপর রাজ পোশাকে সজ্জিত হয়ে সে গাড়িতে উঠে বসল। গাড়িটা এবার গীর্জার দিকে উল্কার বেগে ধেয়ে চলল। ক্যাপ্টেন তে ক্রু রু এসপ্লানেডের মোড়ের এক বিপজ্জনক মানুষকে নিয়ে অপেক্ষা করে চলেছে। লক্ষ্য একটাই ষড়যন্ত্রকারীদের আবির্ভাব হলেও তারা অতর্কিতে তাদের আক্রমণ করে বসবে।

বাস্তব ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেল, কারণ যা-ই থাক না কেন ষড়যন্ত্রকারীরা তাদের পরিকল্পনা পাল্টে ফেলেছে। রু এসপ্লানেড থেকে সামান্য দূরবর্তী রু খ্রীস্টোফার-এ রাজকীয় গাড়ীটা হাজির হওয়া মাত্রই ক্যাপ্টেন দেরোলস তার রাজহত্যাকারী দলটাকে নিয়ে আচমকা বেরিয়ে এসে গাড়িটার যাত্রীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু হয়ে গেল তুমুল লড়াই। লড়াইয়ের শব্দে ক্যাপ্টেন তে ক্রুর সৈন্যদের নজর কাড়ল। গাড়ির যাত্রীদের রক্ষা করতে তারাও ছুটোছুটি করে এল। ইতিমধ্যেই অসম সাহসী ও নির্ভীক দেরোলেস গাড়িতে উপাবিষ্ট ব্যক্তির গায়ে পিস্তলের গুলি গেঁথে দিল। অদৃষ্ট বিড়ম্বিত নকল রাজা কবিবর ডেভিড-এর রক্তাপ্লুত দেহটা গাড়ির ভেতরে লুটিয়ে পড়ল। মঁসিয়ে মার্কুইস দ্য বুকার্তুস-এর পিস্তলের গুলি তাকে পরপারে পাঠিয়েছে। হায়। একেই বুঝি বলে অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস।

প্রধান সড়ক ধরে

আরও তিন লীগ অতিক্রম করে পথটা অন্য আর একটা সড়কের সঙ্গে সমকোণ সৃষ্টি করে মিলিত হল। হঠাৎ কর্তব্য স্থির করতে না পেরে ডেভিড চোখে মুখে হতাশার ছাপ এঁকে সড়কের পাশের একটা গাছের তলায় বসে বিশ্রাম করতে লাগল।

সড়কগুলো কোনদিকে এগিয়ে কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে কিছুই তার জানা নেই। যে সড়কটা ধরেই সে অগ্রসর হোক না কেন, যেখানেই গিয়ে পৌঁছাক সেখানেই আকস্মিকতা আর বিপদে ভরপুর একটা বিশাল জগৎ তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। অত্যুজ্জ্বল একটা তারার দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হল। সে আর ইউভোনে তারাটাকে একই নামে সম্বোধন করত। সে মুহূর্তেই ইউভোনির কথা তার মনের কোণে উঁকি দিল। তখনই সে ভাবল। বড্ডবেশী তাড়াহুড়ো করে সে কাজটা করে ফেলেছে। উভয়ের মধ্যে মনের অমিল আর কথা কাটাকাটি হওয়াতেই সে কেন নিজের বৌ আর বাড়িঘর ছেড়ে চলে এসেছে? তাদের প্রেম ভালবাসা কি এতই ভঙ্গুর সে সামান্য ঈর্ষার আঘাত সইতে পারবে না, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে? সন্ধ্যার বিষণ্ণতা, মনের বেদনাভার তো ভোর হলেই লাঘব হয়ে যেত। এখন সময় সুযোগ আছে—ভেরনায়-এর মানুষ ঘুম থেকে ওঠার আগেই তো অনায়াসে বাড়ি ফিরে যাওয়া সম্ভব। তার স্মৃতিতে ইউভোনে-র কথা ভেসে উঠল। দীর্ঘদিন ওখানেই কাটিয়েছে, সেখানে গেলে আবার মনের আনন্দে কলম চালাতে পারবে, জীবনে যথার্থ

সুখের সন্ধান মিলবে।

অস্থিরতা আর বেপরোয়া মনোভাব মুহূর্তে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ডেভিড সোজা হয়ে দাঁড়াল। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ডেভিড যেদিক থেকে এসেছে সে দিকেই ফিরে দাঁড়াল। ভেরনয়-এর দিকে হাঁটতে হাঁটতে অহেতুক ঘোরাঘুরির বাসনাটা তার মন থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে সে ভেড়ার খোঁয়াড়টা অতিক্রম করে গুটিগুটি নিজের কুঠরিটার ভেতর ঢুকে গেল। নতুন অপরিচিত পথে চলার দায় থেকে তার পা দুটো রেহাই পেয়ে গেল।

মেয়েদের মনের খবর ডেভিড-এর ভালই জানা আছে। পরদিন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলে ইউভোনে পথের ধারের কুয়ো-তলায় হাজির হল। সেখানে গিয়ে সে মহিলাদের গল্পের আসরে যোগ দিল। তার চোখেমুখে কাঠিন্যের ছাপ লক্ষ্যিত হলেও তার চঞ্চল চোখের মণি দুটো কিন্তু ডেভিড-এর খোঁজেই চারদিকে ঘুরপাক খেতে লাগল। ডেভিড সামান্য এগিয়ে তার চোখের অস্থির দৃষ্টি লক্ষ্য করল। সাহসে ভর করে তার সামনে গেল। কিছুক্ষণ পরে একে, অন্যকে চুম্বন করল। তারপর তারা পরস্পরের হাত ধরাধরি করে বাড়ি ফিরে গেল।

তিন মাস পরে তারা গীর্জায় গিয়ে বিয়ের গাঁট ছড়া বাঁধল। ডেভিড-এর বাবার বুদ্ধি যেমন খুবই প্রখর আর অগাধ ধন সম্পদের মালিকও বটে। মহা ধূমধাম করে বিয়ের আয়োজন করা হল। আর বাজল বাদ্যির আওয়াজ তো তিন লীগ দূর থেকে শোনা গেল। পাত্র-পাত্রী উভয়েই গ্রামবাসীদের অতীব প্রিয়ভাজন। পথে ঘটা করে শোভাযাত্রা বেরলো আর মাঠে মাঠে চলতে লাগল নাচ-গানের আসর। অতিথি অভ্যাগতদের মনোরঞ্জনের জন্য পুতুল নাচের ব্যবস্থা করা হল আর দ্রু থেকে নিয়ে আসা বাজিকর তো রীতিমত আনন্দের ফোয়ারা ছুটিয়ে দিল।

ডেভিড-এর বিয়ের পর এক বছর পেরোতেই ডেভিড-এর বাবা পরলোক গমন করলেন। বাবার অনুপস্থিতিতে সে-ই হল ভেড়ার পাল, বাড়িঘর আর অন্যান্য যাবতীয় সম্পত্তির মালিক। আর গ্রামের সবচেয়ে সুন্দরী যুবতীকে তো সে আগেই পত্নীরূপে পেয়ে গেছে।

ইউভোনে পথ দিয়ে যাবার সময় তার দেহের আলোর ঝিলিক সবার চোখে ধাঁধা লেগে যাবার জোগাড় হয়। আর তার কিন্নর কণ্ঠে গাওয়া গানের সুর পথচারীদের মুগ্ধ করে সন্দেহ নেই।

ক্রমে দিন যায় রাত্রি আসে, আবার ফিরে আসে দিন। এমন সময় একদিন ডেভিড দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা একটা বাক্সের ভেতর থেকে একটা পুরনো কাগজের চিলতে বের করল। আবার বসন্ত এসে তার বুকে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। কারণ, সে যে একজন স্বভাব কবি। এরই ফলে স্ত্রী ইউভোল তার মন থেকে ক্রমে সরে যেতে একেবারে মুছে গেছে। পৃথিবীর বর্তমান অনন্য রূপ কবি মনকে মোহগ্রস্ত করে তুলেছে। আর অরণ্য আর উন্মুক্ত প্রান্তরবাহিত বাতাস তাকে আনমনা করে তুলেছে। এতদিন সে রোজ ভোরে ভেড়ার পালকে নিয়ে মাঠে গেছে আবার সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলে তাদের ফিরিয়ে এনেছে খোঁয়াড়ে। আর বসন্ত আসার পর? সে জঙ্গলের ধারে, ঘাসের বিছানায় শুয়ে কাগজের গায়ে পেন্সিল দিয়ে কথার পর কথা সাজাতে মেতে থাকে। আর ক্ষুধার্ত নেকড়ের দল জঙ্গল থেকে গুটিগুটি বেরিয়ে তার অন্যমনস্কতার সদ্ব্যবহার করে, ঘাড়ে কামড়ে ধরে ভেড়া নিয়ে চম্পট দেয়।

এবার থেকে ডেভিড-এর কবিতার সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল আর ভেড়ার সংখ্যা হ্রাস পেতে লাগল। আর ইউভেন-এর মেজাজও ক্রমেই তিড়িক্কি হয়ে উঠতে লাগল। তার কথাগুলোও যে কেমন খোঁচা খোঁচা হয়ে পড়ল। সে কবি স্বামীকে সাফ কথা বলে দিল, তারই অন্যমনস্কতা ও অবহেলার জন্য দিন দিন ভেড়ার সংখ্যা কমছে। আর এরই জন্য তাদের সংসারে নেমে আসছে বল্গাহীন দুঃখ দুর্দশা। স্ত্রীর গঞ্জনায় অস্থির হয়ে ডেভিড অনন্যোপায় হয়ে ভেড়ার পালের দেখভাল করার জন্য এক ছোকরাকে নিযুক্ত করল। এবার থেকে বাড়ির ওপরতলায় ছোট্ট কামরাটায় দরজা বন্ধ করে কবিতা রচনার কাজে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সঁপে দিল।

ভেড়ার তদারকিতে নিযুক্ত ছোকরাটাও এক স্বভাব কবি। কিন্তু কবিতা রচনার কাজে হাত পাকা না হওয়ায় দিবানিদ্রাকেই পরম কর্তব্য বলে মনে করল। নেকড়ের দল ক'দিনের মধ্যেই বুঝে নিল, কবিতা রচনা আর দিবানিদ্রা সহোদর ভাইয়ের মতই বটে। অতএব ভেড়া কমাবার জন্য তারা উঠে পড়ে লেগে গেল। আর ইউভেনের মেজাজও তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ক্রমেই ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বতর

হয়ে পড়তে লাগল। ওপরের দিকে জানালাটা, ডেভিড-এর কামরার জানালাটা লক্ষ্য করে বাছা বাছা শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে তার চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করাকেই প্রাত্যাহিক কাজ হিসাবে বেছে নিল।

এম, পাপিনু নোটারি। বুড়ো নোটারি বলেই সবাই তাকে সম্বোধন করে। সহৃদয় এবং জ্ঞানী হিসাবে সমাজে তার বিশেষ খ্যাতি আছে।

ডেভিড-এর ব্যাপারটা এক সময় তার নজরে পড়ল। সবার সব কিছুতেই এগিয়ে যাওয়া তার মজ্জাগত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদিন ডেভিড-এর দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। বার কয়েক ঢোক গিলে আমতা আমতা করে সে বলল, বন্ধু ডেভিড, একটা কথা বলছি, আবার অন্য রকম ভেবো না যেন। যাকগে যে কথা বলতে চাচ্ছি—তোমার বাবার বিয়ের সার্টিফিকেটে আমাকেই সিলমোহর করতে হয়েছিল। আবার তারই ছেলের সর্বস্ব খুইয়ে দেউলে হবার সার্টিফিকেটে যদি আমাকে স্বাক্ষর করতে হয় তবে ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই মর্মান্তিক হয়ে দাড়াবে। তুমি দেখছি, আমার মধ্যে হাহাকার জাগিয়ে তোলার জন্যই তৎপর হয়ে পড়েছ। এবার ধৈর্য ধরে আমার পরামর্শটা শোন। দ্রু-তে মঁসিয়ে ব্রিল নামে আমার এক অভিন্ন হৃদয় বন্ধু আছে। তার সম্পূর্ণ নাম জর্জেস বিল। স্তুপাকৃতি বইয়ের একটা ঘরে সে দিন রাত্রি চব্বিশ ঘণ্টা পড়ে থাকে। নিজেও বহু বইপত্র রচনা করেছে। আকাশের নক্ষত্রগুলোর আবিষ্কারের কাহিনী, মাটির তলার সমাধিগুলোর নির্মাণ পদ্ধতি, তিতির পাখির ঠোঁট কেন লম্বা—সবই অনায়াসেই তোমাকে বলে দিতে পারবে। ভেড়ার ডাক যেমন তুমি সহজেই বুঝতে পার, ঠিক সেরকমই কাব্যের তাৎপর্য ও গঠন বৈচিত্র্যও তার কাছে সহজবোধ্য। তুমি বরং এক কাজ কর, তোমার কবিতার গোছা নিয়ে তার কাছে যাও। সেগুলো একবারটি তাকে দিয়ে পড়িয়ে নাও। তবেই ব্যাপারটা খোলসা হয়ে যাবে, কবিতা নিয়েই তুমি মেতে থাকবে, নাকি বৌ আর সংসারের দিকে মন দিয়ে অন্য দশজনের মত দিন কাটাবে।

ডেভিড আগ্রহান্বিত হয়ে বলল, তবে এক কাজ করুন, একটা চিঠি লিখে দিন। আপনি কেন যে এতদিন এ পরামর্শটা দেন নি তা নিয়ে আমার আক্ষেপ হচ্ছে।

পরদিন কাক ডাকা ভোরে ডেভিড তার পুঁথিপত্রের পাণ্ডুলিপির গোছা নিয়ে দ্রু-র পথে হাঁটা জুড়ল। দুপুরে মঁসিয়ে ব্রিল-এর দরজায় হাজির হয়ে যথোচিত অভিবাদন জানিয়ে তার পায়ের কাছে পাণ্ডুলিপির গোছাটা রাখল। সূর্য যেভাবে জলকে শুঁষে নেয় ঠিক তেমনি বুড়ো পাপিনুর কাগজের বক্তব্য শুঁষে নিতে লাগল। একটা বর্ণও যেন অবহেলা করার মত নয় এমন মনোযোগ সহকারে পুরু চশমার ভেতর দিয়ে পড়তে লাগল।

পাণ্ডুলিপির শেষ কবিতাটা পড়া শেষ করে মঁসিয়ে ব্রিল নাকের ডগা থেকে চশমাটা নামিয়ে রুমাল দিয়ে কাঁচ দুটো মুছতে মুছতে বলল, আমার বন্ধুবর পাপনু-র সার্বিক কুশল তো?

ডেভিড বলল, 'হ্যাঁ, তার শরীর ও মন দু'-ই সুস্থ।

মঁসিয়ে ডেভিড আপনার ভেড়ার সংখ্যা কত?

গতকাল শুনেছি তিন শ ন'টা। আটশ পঞ্চাশ থেকে কমতে কমতে সম্প্রতি এ সংখ্যায় দাঁড়িয়েছে। আসলে ভেড়াগুলোর বরাতই খারাপ।

শোন, তোমার স্ত্রী, ঘর-সংসার সবই আছে। আরামে ও সুখে সংসার করছিলে। ভেড়াগুলো থেকে প্রচুর অর্থাগমই তোমার হত। তাদের মাঠে চরাতে নিয়ে যেতে, মুক্ত বাতাসে শ্বাস প্রশ্বাস নিতে, পরিতৃপ্তির রুটিতে পেট ভরাতে আর কালো পাখির শিস শুনতে, ভেড়া চরাবার সময় তোমাকে কেবল একটু সজাগ থাকতে হত। কি ঠিক বলছি?

হ্যাঁ, শতকরা এক'শ ভাগই ঠিক।

দূর সমুদ্রের বুকে একটা পাসের খোঁজে যেন চোখের মণি দুটো চঞ্চল হয়ে পড়েছে এমনই ভাবে পাণ্ডুলিপির ওপর চোখ বুলিয়ে মঁসিয়ে ব্রিল মুখ খুলল, তোমার লেখা কবিতাগুলো পড়লাম। মঁসিয়ে ডেভিড, জানালা দিয়ে দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বল তো, ওই গাছগুলো তোমার নজরে পড়ছে কি? অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে ডেভিড বলল, 'একটা কাক'।

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ, কাকই বটে। কর্তব্য থেকে সরে যেতে ইচ্ছে হলে ওই পাখিটা আমাকে সাহায্য করে। ওটাকে তুমি চেন? একজন কৃতী দার্শনিক। নিজের অদৃষ্টকে হাসিমুখে স্বীকার করে নিয়ে দিব্যি সুখে দিন কাটিয়ে দিচ্ছে। খাদ্যবস্তু ক্ষেত খামারেই পেয়ে যায়। গায়ে গায়ক পাখির

মত দৃষ্টিনন্দন পালক না থাকার জন্য তার কোনই আক্ষেপ নেই। মঁসিয়ে ডেভিড, প্রকৃতি ও তার কণ্ঠস্বর আপনিও অবশ্যই শুনে থাকবেন। আপনার বিশ্বাস শুনে থাকবেন। আপনার বিশ্বাস যে সে নাইটিঙ্গেল পাখি থেকে বেশী সুখে দিন কাটাচ্ছে?

ডেভিড উঠে দাঁড়ানো মাত্র গাছের ডালে বসে থাকা কাকটা কর্কশ স্বরে ডাকাডাকি শুরু করল। সে বলল মঁসিয়ে ব্রিল, আপনি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। একটা কথা, আপনি কি বলতে চাইছেন যে, কর্কশকণ্ঠী পাখিদের কোনদিনই কি নাইটিঙ্গেল পাখির কণ্ঠস্বর ছিল না?

যদি থাকতই তবে আমার কানে অবশ্যই ধরা পড়ত। প্রতিটা শব্দ আমি গভীর মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করি। আমার কথা শুনুন। কবিতা চর্চা ছেড়ে দিয়ে আপনার জীবনকে কাব্যময় করে তুলুন মঁসিয়ে ডেভিড।

দার্শনিক ব্রিলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ডেভিড বলল, আপনার পরামর্শ শিরোধার্য করে আমি আবার ভেড়ার পালের মধ্যে ফিরে যাব মনস্থ করেছি।

আমার সঙ্গে রাতের খাবার খেতে বসলে সম্পূর্ণ ব্যাপারটা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারি, রাজি?

মাফ করবেন। আমি ভেড়ার পালকে চরাতে যাচ্ছি।

কবিতার পাণ্ডুলিপির গাদা বগলে নিয়ে ডেভিড ভেরনয়-এর পথেই ফিরে চলল। গ্রামে ফিরে গিয়ে সে এক আর্গেনিয়া ইহুদী দোকানি জিগলার-এর দোকানে হাজির হল। সে যখন যা পায় তাই বেচে।

ডেভিড তার দোকানে ঢুকে বলল, দেখুন, জঙ্গলের নেকড়েগুলো আমার ভেড়ার পালের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কখনও তাড়া করে নিয়ে বেড়ায়। আমার আগ্নেয়াস্ত্র দরকার, আছে কি?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে দোকানি জিগলার বলল, 'বন্ধু ডেভিড, বুঝতেই পারছি, আজকের দিনটা আমার খারাপ যাবে। কারণ, তোমাকে এমন একটা অস্ত্র দিতে হবে যার আসল দামের এক-দশমাংশ আমার পাওয়ার আশা নেই। এই তো গত হপ্তাতেই আমি এক গাড়ি সেল-এর মালা খরিদ করেছি। আবার জমিদার মশাইয়ের পল্লীনিকেতনটা সেল-এ বিক্রি হয়ে গেল। তার দাম আমার জানা নেই। রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। তাকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হয়েছে। সে সব মালের সঙ্গে কয়েকটা ভাল আগ্নেয়াস্ত্রও ছিল। এই যে পিস্তলটা দেখছ, চল্লিশ ফ্রাঁ দাম। অবশ্য এ দামে বেচলে আমার দশ ফ্রাঁ লোকসান হবে। যাক গে চল্লিশ ফ্রাঁ ছাড়া অতিরিক্ত দশটা ফ্রাঁ দিলে আমি কার্তুজ ভরে দিতে পারি।

ডেভিড জিগলার-এর কাছ থেকে পিস্তলটা খরিদ করে কোটের তলায় লুকিয়ে রেখে বাড়ি ফিরে এল। ইউভোনে বাড়ি নেই। সম্প্রতি সে অহেতুক পাড়ার বাড়িগুলোতে ঘুরে বেড়ানো তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

ডেভিড রান্না ঘরে উঁকি দিয়ে দেখল, স্টোভটা জ্বলছে। সে বগল থেকে কবিতার পাণ্ডুলিপিগুলো নিয়ে জ্বলন্ত স্টোভটার ওপর ছুঁড়ে দিল। কাগজগুলো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠতে একটা কর্কশ স্বর শোনা গেল।

কবি ডেভিড আপন মনে বলে উঠল, 'কাকের' হ্যাঁ কাকের গানের স্বর।

ডেভিড লম্বা লম্বা পায়ে চিলে কোঠায় উঠে গেল। প্রায় নিঃশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিল। গ্রামটার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে একটা পিস্তলের গর্জন বিশজনের কানে পৌঁছল। সবাই ছুটোছুটি করে এসে তার বাড়ির সামনে জড়ো হল। বাড়ির ওপর থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখে সবাই হন্তদন্ত হয়ে ওপরে উঠে গেল।

হতভাগা কালো পাখিটার ছিন্নবিচ্ছিন্ন পাখির পালকগুলোকে সযত্নে ঢেকে দিয়ে সে কবির দেহটাকে তুলে নিয়ে নিজের বিছানায় শুইয়ে দিল। মেয়েরা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কেউ ইউভোনেকে খবর দেবার জন্য উর্দ্ধশ্বাসে ছুটল।

দুর্ঘটনার গন্ধ পেয়ে পাপিনু সবার আগে সেখানে উপস্থিত হল। মেঝেতে পড়ে থাকা অস্ত্রটা তুলে নিয়ে তার সূক্ষ্ম ও মনোলোভা কারুকার্যের ওপর বারবার চোখের মণি দুটো বুলাতে লাগল। তার চোখের তারায় তৃপ্তি ও বিষাদের ছাপ ফুটে উঠল।

গ্রাম্য ধর্মযাজককে এক পাশে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অস্ত্রটার গায়ের কারুকার্যের দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, এতো মঁসিয়ে মার্কুই দ্য বুপার্তুস-এর অস্ত্র আর শিরস্ত্রাণ খোদাই করা আছে। কথাটা বলেই সে ফুসফুস নিঙড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

দ্য ডিস্‌কাউন্টার অব মানি

বর্তমানে ধনসম্পদের খলিফারা মানুষের অভাব অভিযোগ ঘুচাবার জন্য যেভাবে বাগদাদ-অন-দ্য সাবওয়ে-র ধার কাছ দিয়ে ঘুরঘুর করে তা চাক্ষুষ করলে হারুণ আল রসিদও নির্ঘাৎ পিছন ফিরে শুতেন।

দরিদ্রের দুঃখ দুর্দশা কিভাবে যথোচিত উপায়ে দূর করা যেতে পারে আজ বিত্তবানদের এটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটা ব্যাপারে কিন্তু পৃথিবীর সব মানবদরদীরাই একমত পোষণ করেন যে, তোমার ঘাতকের কখনই অর্থ দেওয়া যাবে না। সব দরিদ্ররা অতিমেজাজী বলে সমাজে একটা কুখ্যাতি আছে। অর্থকড়ি হাতে পেলেই তাদের মধ্যে একটা প্রবল প্রবণতা লক্ষিত হয় যাতে পাওনাদারের কিস্তিটা পরিশোধ না করে সবই ব্যস্ত হয়ে পড়ে নিজের প্রতিকৃতি আঁকাবার জন্য।

তবে সে আমলে দাতা হিসাবে হারুণ আল রসিদ-এর কিছু কিছু সুবিধা অবশ্যই ছিল, স্বীকার করতে হয়। হারা উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করার সময় তিনি উজির গজরকে সঙ্গে সঙ্গে রাখতেন। আর তার জল্লাদ বুড়ো মসরুর চাচাও তার পাশে পাশেই থাকত। এরকম সদলবলে ভ্রমণ করতে বেরোলে তা সার্থক তো হতে বাধ্য।

অধুনা খবরের কাগজের পাতায় এরকম একটা প্রবন্ধ আপনার চোখে পড়েছে কি যার শিরোনামাটা ছিল 'আমাদের প্রাক্তন প্রেসিডেন্টকে নিয়ে আমাদের করণীয় কি?' ধরা যাক, কার্ণেগি অবৈতনিক গ্রন্থাগারে পুস্তক বিতরণের কাজে তাকে সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য জো আর তাকে নিযুক্ত করলেন। কোন শহর এরকম একটা গ্রন্থাগার নিতে কোন শহর আপত্তি করবে বলে কি আপনার বিশ্বাস? আগে যেখানে একটা গ্রন্থাগার ছিল সেখানে দুটো করে গ্রন্থাগার মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠবে।

আমি তো আগেই বলে রেখেছি, অর্থকড়ির খলিফাদের হাজারো বাধা। ময়দার তাল দিয়ে ঘোচানো সম্ভব নয় এরকম কোন দুঃখের অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই। আর তারা তার ওপরেই সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল।

হারুণ আল রসিদ ন্যায় বিচারের পূজারী ছিলেন। তিনি যোগ্য ব্যক্তিদের পুরস্কার দিয়ে সম্মানীত করতেন আর অপরাধীকে শাস্তি দান করতে দ্বিধা করতেন না। তাঁর দ্বারাই ছোটগল্পের প্রতিযোগিতার সূত্রপাত হয়েছিল। কোন দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করলে তাকে তার দুঃখ দুর্দশার কাহিনী শোনাতেই হত। তার বর্ণিত কাহিনীতে যদি বাচনভঙ্গী, শৈলী আর ভাবের অভাব লক্ষিত হত তবে তিনি তৎক্ষণাৎ সঙ্গী উজিরকে হুকুম করতেন, বসফরাসেব প্রথম জাতীয় তহবিলের দু'হাজার দশ ডলারের নোট তাকে দান করার জন্য। অন্যথায় তাকে চাকরিতে বহাল করা হোক। আর গল্পটা যদি আকর্ষণীয় হত তবে জল্লাদ মোসরুরকে হুকুম দিতেন তার মুণ্ডুটা উড়িয়ে দেবার জন্য। হারুণ আল রসিদ যে আজও জীবিত আছেন আর এক পত্রিকার সম্পাদনার কাছে নিযুক্ত —যার গ্রাহক হতেন আপনার ঠাকুরমা সে সংবাদের কোন সমর্থন মেলে নি।

কোটিপতি গল্পটা এবার শুরু করা যাক।

বিহঙ্গবিদ্যার মাধ্যমে কোটিপতি হাওয়ার্ড পিল অর্থ উপার্জন ও সঞ্চয় করেছিল। সে ছিল একজন সারস বিশারদ। আর তার তীক্ষ্ণবুদ্ধিও ছিল অসাধারণ।

পূর্বসূরীদের বাড়ির একতলার পিলকিন্স চোলাই মদ কোম্পানিতে সে কাজে লেগে গিয়েছিল। কারণ তার মা সে কোম্পানির অংশীদার ছিল। যকৃতের ব্যামোতে বুড়ো পিলকিন্স পৃথিবী ছেড়ে যায়। আর মাল বিক্রির অচল গাড়ির দুশ্চিন্তায় জর্জরিত হয়ে তার মা মারা যায়। আর চল্লিশ লক্ষ

ডলার নিয়ে সেখানে হাজির হল যুবক হাওয়ার্ড পিলকিন্স। সে ছিল রীতিমত উদ্ধত চরিত্রের এক যুবক। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, অর্থের বিনিময়ে সবকিছুই সংগ্রহ করা সম্ভব। ব্যস, এবার সে বাগদাদ অন দ্য সাবওয়ে-তে বসে নিজের সে বিশ্বাসের ওপর ভর দিয়ে সে সবকিছুই করতে আরম্ভ করল।

শেষ পর্যন্ত ইঁদুর ধরার ফাঁদে সে ধরা পড়ল। স্প্রিংয়ের শব্দ সে শুনতে পেল। আর তার মন আটকা পড়ল তারের খাঁচায়। আর তা আটকা পড়ল এমন এক টুকরো পনিরের আকর্ষণে সে এলিস ভন্ ডার রুইস্লি।

আমি এলিস ভি, ডি-র আর কোন বিবরণ দেব না। আপনার নিজের ডেরা, ম্যাগি বা বিয়েট্রিস-এর কথা মনে মনে ভাবুন, তার নাকটাকে আর একটু উন্নত করে নিন, কণ্ঠস্বরটাকে আর একটু মোলায়েম করে নিন, তার সুরটাকে ওঠা নামা করান, তাকে রূপ সৌন্দর্যের আর অপ্রাপ্যনীয় করে তুলুন—ব্যস, তবেই এলিস-এর চেহারা সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা পেয়ে যাবেন। তার পরিবার বলতে একটা জীর্ণ ছোট্ট দালান, বিভিন্ন রঙের সমন্বয়ে তৈরি কোট পরিহিত যোসেফ, এক কোচোয়ান আর কোনরকমে প্রাণে বেঁচে থাকা বুড়ো একটা ঘোড়া।

আদ্যিকালের এ ঘোড়াটার জন্য তারা আঠারশ' আটানব্বইয়ে এক প্রস্থ নতুন সাজ পোশাক কিনে দিল। আবার ষোল'শ উনপঞ্চাশে ভল ডার রুইসলিং পরিবারই কোন এক ইন্ডিয়ান সর্দারের কাছ থেকে দুটো পর্দা আর এক কোয়ার্ট বুটিদার ফিতের বিনিময়ে ইস্টরিভারও বনাঞ্চল এবং রিডিংটন স্ট্রীট ও স্বাধীনতার প্রতিমূর্তির মধ্যবর্তী সম্পূর্ণ অঞ্চলটি কিনে নিয়েছিল। সে ইন্ডিয়ান সর্দারের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, ভ্রমর দূরদৃষ্টি এবং রুচিশীলতার সুখ্যাতি আমি সর্বদাই করি। কেবলমাত্র আপনার মধ্যে ভন ভার রুইসলিংরা সম্বন্ধে বোঝাতে যে সে এমনই এক সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের মানুষ ছিল যারা টাকার কুমীরদের দেখামাত্র নাক সিঁটকায়।

কোন এক সন্ধ্যায় পিলকিন্স গ্রামার্সি স্কোয়ারে হাজির হয়ে এলিস ভি. ডি আর-এর কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাড়ল। এলিস নাক সিঁটকে তার ধন সম্পদের কথা মুহূর্তের জন্য ভাবল। ব্যস, মুহূর্তের মধ্যে প্রস্তাব আর প্রস্তাবক উভয়কেই সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে দিল।

পিলকিন্স কিন্তু একজন কৃতী খেলোয়াড়। সময় নিন, ভেবে দেখুন, যদি কোনদিন আপনার জবাবটা নিয়ে আবার ভাবনাচিন্তা করতে উৎসাহী হন তবে ওরকম আমার কাছে একটা গোলাপ পাঠিয়ে দেবেন। কথা বলতে বলতে পিলকিন্স এলিস-এর চুলের গোলাপটায় আলতোভাবে হাত ছোঁয়াল।

বহুৎ আচ্ছা! তা যদি কোনদিন করি তবে মনে করবেন যে, টাকার জোরে হয় আপনি, না হয় আমি নতুন কোন একটা ব্যাপার শিখেছি। আপনি উচ্ছন্নে গেছেন মশাই। আমার দ্বারা আপনাকে বিয়ে করা সম্ভব হবে বলে আমি মনে করছি না। আপনার দেওয়া উপহার সামগ্রী যথা সময়ে ফেরৎ পাবেন।

উপহার! কপালের চামড়ায় বিস্ময়ের ছাপ এঁকে পিলকিন্স বলল, 'কন, আমি তো জীবনের কোনদিন আপনাকে কোন উপহার দেই নি। আপনি যার কাছ থেকে উপহার নিয়েছেন তার সম্পূর্ণ একটা তালিকা আমি দেখতে চাচ্ছি। কোন রকম মিষ্টদ্রব্য, আর্ট ক্যালেন্ডার বা কোন ফুল তো আপনাকে উপহার হিসাবে আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভবই হয় নি।

আপনার মনে নেই। বহুদিন আগে আমাদের পরিবার দুটো প্রতিবেশী, মানে পাশাপাশি বাড়িতে বাস করতাম। আমি তখন সাত বছরের বালক, আমি একটা গলির ভেতরে চাকার ওপর আমার পুতুলটাকে বন্‌বন্ করে ঘোরাচ্ছিলাম। আপনি আমাকে লোমশ কুঁতকুঁতে বিড়ালছানা উপহার দিয়েছিলেন। তার মাথাটা খুলতেই মিছরির টুকরো ভর্তি দেখা গেল। পাঁচ সেন্টের বিনিময়ে আপনি সেটা খরিদ করেছিলেন। দেখুন, ওই মিছরির টুকরোগুলো ফেরৎ পাঠাবার কোন সুযোগটাই আমি পাই নি। আসলে তিন বছর আগে আমি অবিবেচক হয়ে পড়েছিলাম। মিছরির টুকরোগুলো আমি একটু একটু করে খেতে খেতে শেষই করে ফেলেছি। তবে হ্যা, বিড়ালছানাটা কিন্তু আজ অবধি আমার কাছে রয়ে গেছে। কাল সকালেই সেটা আপনার কাছে ফেরৎ পাঠিয়ে দেব। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি।

এলিস ভি.ডি. আর-এর হাল্কা ধরনের কথাগুলোর মাধ্যমে তার প্রত্যাখ্যানের দৃঢ় মনোভাবটাই

স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল। অতএব জীর্ণ বাড়িটা থেকে তা উপেক্ষিত কোটি ডলার নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া ছাড়া তার সামনে অন্য কোন পথই খোলা নেই।

পিলকিন্স এলিস ভি.ডি. আর-এর বাড়ি থেকে বেরিয়ে ম্যাডিসন স্কোয়ারের ভেতর দিয়ে ধীর পায়ে হাঁটতে লাগল। ঘড়িতে তখন আটটা বাজে। তেমন ঠাণ্ডা পড়ে নি। মাত্র জনা কয়েক ভ্রমণার্থী বিভিন্ন প্রান্তের বেঞ্চে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে।

একটু বাদেই পিলকিন্স এক সাহসী যুবকের মুখোমুখি হল। তার গায়ে একটা কোটও নেই। একটা মেয়ে তার পাশাপাশি হাঁটছে। মুখে তার মধুর হাসির রেখা লেগেই আছে। তার গলায় একটা কোট জড়ানো। অগ্রাহ্যকারী ওই যুবকটার কোটটাই যে তার গলায় জড়িয়ে নিয়েছে এটা না বললেও বুঝতে অসুবিধা হয় না।

যুবকটার থেকে একটা সিট দূরের একটা বেঞ্চে পিলকিন্স বসে পড়ল। চোখ তুলে তাকিয়ে সে বুঝে নিল তারা একই পর্যায়ভুক্ত। অর্থাৎ কিনা পুরুষরাই কেবল দেখতে পায়, আর মেয়েরা হায়! তারা দেখেও যেন দেখে না।

মিনিট কয়েক বাদেই পিলকিন্স যুবকটার দিকে সামান্য ঝুঁকে যুবকটার সঙ্গে কথা বলল। আর সে-ও হেসে হেসে ভদ্রভাবে তার কথার উত্তর দিল। তাদের আলোচনা সাধারণ বিষয় ছেড়ে ভয়ঙ্কর ব্যক্তিদের প্রসঙ্গে চলে গেল।

কথার ফাঁকে মুখের হাসিটুকু অব্যাহত রেখেই যুবকটা বলল—আপনি প্রবীণ, ভাববেন না যে, আমি আপনার মতের বিরুদ্ধে কিছু বলছি বা ভাবছি। তাই বলে একজন অপরিচিতর কথা মানা যায় না। আপনার বক্তব্য শতকরা এক'শ ভাগই সত্য, সে জন্য আমি বাধিত, স্বীকার করছি। কিন্তু কারো কাছ থেকে কিছু ধার করার কথা আমি মনেও আনতে পারি না। আমি ভার্জিনিয়ার রোনোক অঞ্চলের ক্লেটন বংশোদ্ভূত। সার্কাস ক্লেটন আমার নাম। মিস ইভা বেডফোর্ড ওই যুবতীর নাম। সতের বছর বয়স্কা। বেডফোর্ড অঞ্চলের বেডফোর্ড পরিবারের মেয়ে। বিয়ে করার জন্য আমরা দু'জন ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসেছি। আমাদের উভয়েরই বড় শখ ছিল নিউ ইয়র্ক শহরটা দেখব। আজ বিকেলেই এখানে পা দিয়েছি। ফেরী পার হবার সময় আমার পকেট বইটা খোয়া গেছে, আমার পকেটের কোণায় মাত্র তিনটে সেন্ট পড়েছিল। যেকোন উপায়ে কাল একটা কাজ জোগাড় করে ফেলব। তারপর বিয়ের পাট চুকিয়ে ফেলব।

পিলকিন্স আমতা আমতা করে বলল। কিন্তু ওই মহিলাটিকে কি সারারাত বাইরে, কনকনে ঠাণ্ডায় রাখা ঠিক হবে। একটা হোটেল টোটেলে—'

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই যুবকটা বলে উঠল—মশাই, আমি তো আগেই বলেছি, আমার সম্বল মাত্র তিনটে সেন্ট। অবশ্য হাজার খানেক থাকলেও সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ব্যাপারটা হয়ত আপনার মাথায়ও আসছে। মাফ করবেন, আপনার টাকা নেওয়া আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। সামান্য ঠাণ্ডায় মিস বেডফোর্ড বা আমার, কারো কিছু হবে না। কাল ঠিকই একটা কাজ জোগাড় করে নিতে পারব। সঙ্গে কিছু চকোলেট আর কেক আছে তা দিয়ে চলে যাবে।

এবার কোটিপতি বেশ একটু দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করল, শুনুন, আমি কয়েক কোটি ডলারের অধিকারী। পিলকিন্স আমার নাম। এ মুহূর্তেই আমার সঙ্গে আট ন'শ' ডলার আছে। আচ্ছা বলুন তো, আপনি কি বুঝতে পারছেন না যে, আপনি আর ওই যুবতী যাতে আজকের রাত্রিটা আরাম আয়েশে কাটাবার জন্য আমার অর্থের সামান্য কিছু নিতে আপত্তি করে ধরতে গেলে তা প্রায় নিয়েই ফেলেছেন, ঠিক কিনা?

আমিও তা-ই ভাবছি বটে। তবে এটা মুখফুটে কিন্তু প্রকাশ করতে পারছি না' মশাই। আসলে এসব ব্যাপার স্যাপারকে আমি অন্যরকম চোখে দেখতেই অভ্যস্ত। তবু আপনার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

কোটিপতি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তবে আপনি আমাকে বিদায় নিতে বাধ্য করছেন, কি বলেন?

দু'দুজন সাধারণ মানুষ একটা দিনেই তার ধন-সম্পদকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করছে। সে মুদ্রার পূজারী নয়। তবে সর্বদা এ-ও বিশ্বাস করে যে, ধন সম্পদের ক্ষমতা অসীম।

পিলকিন্স ব্যস্ত পায়ে সেখান থেকে সামান্য এগিয়ে গিয়ে আবার আচমকা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। আর বেঞ্চটার কাছে যুবক যুবতীটা যেখানে বসে আছে সেখানে ফিরে এল। মাথা থেকে টুপিটা নামিয়ে হাতে নিয়ে সে বলতে লাগল। মেয়েটা খুশির প্রলেপ মাখানো অত্যুজ্জ্বল চোখ দুটো তুলে তাকাল, এতক্ষণ আকাশচুম্বী বাড়ি, পাথরের মূর্তিগুলো যে-দৃষ্টিতে দেখছিল ঠিক সে রকম দৃষ্টিতেই তাকে দেখতে লাগল। আর ভাবল বেডফোর্ড অঞ্চল থেকে পুরনো স্কোয়ারটা কতদূরে অবস্থিত।

পিলকিন্স মুখ খুলল, মিঃ রেনোক, আমি আপনার স্বাধীন মানসিকতা আর বোকামি উভয়েরই প্রশংসা না করে পারছি না। তাই তো আপনার শৌর্যবীর্যের কাছে একটা আবেদন না রাখতে ফিরে এসেছি। আমি বিশ্বাস করি, আপনারা, মানে দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষরা যখন কনকনে শীতের রাতেও একটা মহিলাকে বাইরে একটা বেঞ্চে বসিয়ে রাখেন কেবলমাত্র আপনাদের সেকেলে আত্মম্ভরিতাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য, তখন সেটাকে আপনারা তাকে শৌর্যই আখ্যা দিয়ে থাকেন। আমার এক বন্ধু আছে, এক মহিলা, সারাজীবন তাকে চিনি। এখান থেকে কয়েকটা বাড়ি পরেই একটা বাড়িতে মা, বাবা, পিসিরা, দিদিরা এবং বাড়ির অন্যান্যদের সঙ্গে সে থাকে। আমার এটুকু বিশ্বাস আছে, মিস বেডফোর্ড যদি আজকের রাতটা তাদের আতিথ্য গ্রহণ করে সেখানে থাকেন তবে তিনি আনন্দের সঙ্গেই তাঁকে গ্রহণ করবেন। মিঃ রোনেক আপনার আভিজাত্যকে কি একটু নিচে নামিয়ে আনা সম্ভব নয়, বলুন?

রোনেক-এক ক্রেটন পিলকিন্স-এর সঙ্গে করমর্দন করতে করতে বলল, যে মহিলার কথা আপনি বললেন, যার আতিথেয়তার উল্লেখ করলেন মিস বেডফোর্ড পুলকিতচিত্তেই তাকে গ্রহণ করবেন।

এবার সে মিস বেডফোর্ড-এর সঙ্গে মিঃ পিলকিন্স-এর প্রথা অনুযায়ী পরিচয় করিয়ে দিল।

মিস বেডফোর্ড ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বলল, মিঃ পিলকিন্স, আজকের রাত্রিটা কী চমৎকার, তাই না? আপনার কি একই মত নয়?

ভন ডার রুইসলিংদের জীর্ণ পাকা বাড়িটায় পিলকিন্স তাদের নিয়ে গেল। এলিস খবর পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে দরমায় হাজির হল। মিস বেডফোর্ডকে সাদর আমন্ত্রণ জানাল। তারপর এলিস পিলকিন্সকে বলল, মিঃ ক্রোটেন-এর থাকার ব্যবস্থা তোমাকে করতে হবে।

পিলকিন্স সোল্লাসে বলল, অবশ্যই। আমি নিউ ইয়র্কের একজন নাগরিক হিসেবে পার্কগুলোরও অংশীদার। আজকের রাতটা তাকে আমি ম্যাডিসন স্কোয়ারের অতিথি করে রেখে দেব। বেঞ্চে বসে অনায়াসেই আমরা সকাল পর্যন্ত কাটিয়ে দেব। তুমি যে মেয়েটার দায়িত্ব নিয়েছ তার জন্য ধন্যবাদ।

মিস এলিস এবার মিস বেডফোর্ডকে নিয়ে ওপর তলায় চলে গেল। একটু বাদেই আবার দরজায় এসে পিলকিন্স-এর হাতে একটা আয়তাকার পিসবোর্ডের বাক্স তুলে দিয়ে বলল, তোমার দেওয়া উপহারটা আবার তোমার হাতেই তুলে দিলাম।

আরে, এবার মনে পড়েছে, একটা লোমশ বিড়ালছানা, তাই না?

পার্কের একটা বেঞ্চে ক্রেটনকে বসিয়ে রেখে পিলকিন্স বিদায় নেবার জন্য তৈরি হলে ক্রেটন তার সঙ্গে করমর্দন সারতে সারতে বলল, 'একটা চাকরি জোগাড় করতে পারলেই আমি আপনাকে ঠিক খুঁজে নেব। আপনার কার্ডে তো ঠিকানা দেওয়াই আছে। আপনার আন্তরিক সহানুভূতির জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। শুভরাত্রি।

পিলকিন্স ঘরে ঢুকেই পিসবোর্ডের বাক্সটার ডালাটা খুলল। তার ভেতর থেকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকা একটা বিড়ালছানা বের করল। তার মিছরির টুকরোগুলো বহুদিন আগেই লুঠ হয়ে গেছে। পিলকিন্স বিষণ্ণ দৃষ্টিতে সেটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে চেয়ে থাকল। এক সময় স্বগতোক্তি করল, আর যাই হোক ধন সম্পদ থাকলেই যে সব পাওয়া যায় আজ আর আমিও বিশ্বাস করি না। পর মুহূর্তেই সে বিকট আর্তনাদ করে বাক্সটার তলায় কি যেন একটা উন্মাদের মত খুঁজতে লাগল। থেঁতলানো সুন্দর একটা গোলাপ ফুল যার ওপর বিড়ালছানাটা শুয়ে থাকত।

নেক্সট টু রিডিং ম্যাটার

ডেসব্রোসেস স্ট্রীটের খেয়া নৌকা থেকে নামার সময়ই তিনি আমার চোখে পড়ে গেলেন। তাকে দেখামাত্রই আমার মধ্যে ধারণা জন্মে গেল যে, দুই গোলার্ধ এবং সমগ্র পৃথিবীটাই তাঁর পরিচিত—নখদর্পণে। এক জমিদারের মত তিনি দীর্ঘ কয়েক বছর বিদেশ সফর সেরে দেশে, নিউ ইয়র্ক শহরে প্রত্যাবর্তন করেছেন। কিন্তু এমন সব ভাবভঙ্গী সত্ত্বেও মনে হল যে, অনেক খলিফার এ শহরের পথে আগে কোনদিন তিনি হাঁটেন নি। সে বিচিত্র এক ঢিলেঢালা নীল পোশাক পরিহিত, আর মাথায় চাপিয়েছেন সাবেকি আমলের গোলাকার একটা পানামা টুপি। আরও আছে, এরকম সহজ সরল মানুষ ইতিপূর্বে, কোনদিন আমার চোখে পড়েনি। তার চেহারা ছবিতে লিংকনসুলভ এমন এক রুক্ষতা আর নিয়মের ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় যা যে কোন মানুষের মধ্যে বিস্ময় সঞ্চার করবে আর বিষণ্ণতায় মুগ্ধ করবে।

পরে তাঁর মুখেই শুনেছিলাম, যুডসন টেট তার নাম। পোখরাজের একটা আংটির মধ্য দিয়ে তিনি সবুজ রঙের রেশমি নেকটাইটা বেঁধেছেন। আর তাঁর দড়িটা হাঙরের মেরুদণ্ড দিয়ে তৈরি। সব মিলিয়ে তার মধ্যে সহজ সরলভাব তার মধ্যে লক্ষিত হয়।

আমার সঙ্গে প্রথম আলাপ পরিচয়ের মুহূর্তেই মিঃ যুডসন টেট শহরের রাস্তাঘাট এবং হোটেল রেস্তোরাঁ প্রভৃতি সম্বন্ধে বহুভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। আর এমন ভাব নিয়ে তিনি প্রশ্নগুলো করলেন যেন এসব সামান্য ব্যাপারগুলো ঠিক এ মুহূর্তটার জন্যই ভুলে গেছেন। শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত আমার শান্ত পরিবেশে নির্জন হোটেলটা সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মন্তব্য করার মত কোন সঙ্গত কারণই আমার মনে এল না। অতএব নৈশভোজ সেরে আমরা মুখোমুখি চেয়ারে বসে ধূমপানের প্রস্তুতি নিতে লাগলাম। অবশ্য আহারাদির খরচ খরচা আমিই করলাম।

সে মুহূর্তে যুডসন টেট আমাকে একজন সত্যিকারের বন্ধু হিসাবে মনে করেছিলেন বলেই তিনি মনের কথা আমার কাছে ব্যক্ত করার চেষ্টা করলেন। তিনি বক্তব্য শুরু করলে আমি নিঃসন্দেহ হলাম, তার মধ্যে বিশেষ একটা শক্তি আছে। তার কদর্য চেহারা যাতে আপনার মন থেকে মুছে যেতে পারে সে রকম কোন প্রয়াসের ধার কাছ দিয়েও তিনি গেলেন না। বরং সেটাকে এমনভাবে ব্যক্ত করলেন যা তার বক্তব্যের মন্ত্রমুগ্ধতার একটা অঙ্গ বিশেষ। চোখ বুজে থাকলে হয়ত বা আপনি ইঁদুর ধরা বাঁশীওয়ালার সুরের আকর্ষণে অন্তত হ্যামিল্টন-এর দেয়াল পর্যন্ত চলে যেতেন। তারপরও যদি তাকে অনুসরণ করতেন তবে সেটা শিশুসুলভ কাজ হয়ে যেত। যাক গে, এখন তার বক্তব্য তার নিজের মুখ থেকেই শোনা যাক ফলে বক্তব্য যদি খুবই এক ঘেয়ে বোধ হয় তবে তার দায় তার ওপর চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে।

যুডসন টেট বললেন, নারীরা বড়ই রহস্যময়ী। আর কথা শুনে আমি রীতিমত চটে গেলাম। আদ্যিকাল থেকে চলে আসা একটা বহুল প্রচলিত, বহুকাল আগেই মিথ্যা প্রমাণিত, যুক্তিহীন অবান্তর কথা শোনার জন্য তো আমি সেখানে হাজির হইনি।

আমি বললাম, 'শুনুন, আমার সেটা জানা নেই।

একটা কথা বলুন তো, ওরাটামা-র নাম কোনদিন শুনেছেন কি?

হয়ত শুনেও থাকতে পারি। মনে হচ্ছে যেন কোন নৃত্য শিল্পীর নাম অথবা এ নামে কোন গন্ধদ্রব্য আছে—নিশ্চিত করে বলতে পারছি না।

ওরাটামা অন্য একটা দেশের এমন এক শহর যার কথা কিছু জানে না, বোঝেনও না কিছু। দেশটা একজন ডিরেক্টরের শাসনাধীন। কিন্তু বিপ্লব আর বিদ্রোহের পথে সেখানকার যাবতীয় কাজ নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। আর সেখানেই বেশ বড় একটা জীবন নাটক অভিনীত হয়েছিল, আমেরিকার সবচেয়ে সহজ-সরল অধিবাসী যুডসন টেট যার মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন, ইতিহাস অথবা উপন্যাসের সবচেয়ে দুঃসাহসীও সুদর্শন ব্যক্তি ফার্গুসন ম্যাকমাহান ও ওরাটামার জজ-এর রূপসী মেয়ে সেবিস্তারিটা আলবেলা জামোরা। আর একটা কথা বলে রাখছি, পৃথিবীর মধ্যে কেবলমাত্র উরুগুয়েতেই 'চুচুলা' গাছ জন্মে। যে দেশের কথা আমি বলছি সেখানে যা কিছু মেলে

তাদের মধ্যে মূল্যবান কাঠ, রবার, কোকো, হাতির দাঁত, সোনা আর রং প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

আমি সবিস্ময়ে বললাম, 'দক্ষিণ আমেরিকায় হাতির দাঁত পাওয়া যায়। সত্যি বলছি, একথা আমি জানতামই না।

বেশ এক গল্প তুলেই যুডসন টেট বললেন, এখানেই আপনার সামান্য ভুল হয়ে গেছে। আমার কথিত দেশটা যে দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত একথা তো বলি নি। একটা কথা মনে রাখবেন, আমাকে খুবই সমঝে চলতে হয়, মানে প্রতিটা পা সমঝে ফেলতে হয়। তবুও আমি যে দেশের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তারিপের নাকের হাড়ের তৈরি ঘুটি দিয়ে দাবা খেলেছি। তারিপের নাকের হাড় একেবারে হাতির দাঁতের মত দেখতে।

মশাই, আমি কিন্তু প্রাণী জগতের কথা নয়, বলছিলাম নারী জাতির প্রেম ভালবাসা, দুঃসাহসিক কাম কাজ আর তাদের চালচলন সম্বন্ধে। আমিই ছিলাম দীর্ঘ পনের বছর ধরে সে প্রজাতন্ত্রের শাসক স্বরূপ। অর্থাৎ প্রধান ও প্রকৃত শাসক মাংকো বেনাভিডেস-এর হয়ে আমি দেশটার সার্বিক শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলাম। খবরের কাগজের পাতায় তার ছবি দেখে থাকবেন। কুচকুচে কালো, বুক পর্যন্ত নেমে আসা দাড়ি আর হাতে গুটানো একটা কাগজ—এমন ছবি তো দেখেছেনই। পঙ্গু এ-রাজাই দেশের সর্বত্র, সব কাজের মধ্যে বিশিষ্টতম এক ব্যক্তি হিসেবে থাকতেন। তখন গ্রোভার ক্লিভল্যান্ড রাষ্ট্রপ্রধান না থাকলে তাকেই দক্ষিণ আমেরিকার রুজভেল্টই সম্বোধন করা হত। রাষ্ট্রপ্রধানের কার্যকাল দু'বছর। তারপর একজন উত্তরাধিকারীকে নিয়োগ করে তিনি ওই পদ থেকে ইস্তফা দিতেন।

তবে নিজের এসব সুখ্যাতি মুক্তিদাতা বেনাভিডেস নিজে সম্পন্ন করতেন না। অবশ্যই না। কাজটা সম্পন্ন করত স্বয়ং যুডসন টেট। বেনভিডেস পুতুলের ভূমিকা পালন করতেন। আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি, যুদ্ধ ঘোষণা আর তাকে কখন তাকে রাজপোশাকে সজ্জিত হতে হবে—যাবতীয় ব্যাপারে তাকে পরামর্শ দিতাম আমি নিজে। এসব কথা আপনাকে শোনানো আমার অভিপ্রায় নয়। আমি বলতে চাইছি, আমি এমন অসীম ক্ষমতার অধিকারী কিভাবে হলাম? সে কথাই আপনার কাছে ব্যক্ত করব। কারণ, যে মুহূর্তে আদম প্রথম চোখ মেলে তাকিয়েছিল আর স্মেলিং সল্টের শিশিটাকে হাত দিয়ে এক ধারে ঠেলে দিয়ে প্রশ্ন করেছিল, 'আমি এখন কোথায় অবস্থান করছি? ব্যস, তারপর থেকেই আমি তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ভাষ্যকার বনে গেলাম।

নিউ ইংল্যান্ড-এর গোড়ার দিককার খ্রীস্টান, বৈজ্ঞানিকদের যেসব ছবি চিত্রশালায় সংরক্ষণ করা হচ্ছে তাদের ছবি ছাড়া বাইরের আর যত মানুষকে আপনি দেখেছেন তাদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে কুশ্রী, আপনি নিজের চোখেই দেখছেন। তাই অল্প বয়সেই আমি ভেবে রেখেছিলাম, চেহারার ঘাটতিটুকু আমাকে বাচনশক্তি দিয়ে পুষিয়ে নিতে হবে। চর্চার মাধ্যমে আমি তাতে সাফল্য লাভও করেছি।

বৃদ্ধ বেনভিডেস-এর অজান্তেই তাঁর সিংহাসনের পিছনে যেসব শক্তিমান পাণ্ডা, যেমন মিসেস ডি পাম্পাদুর, ট্যালেরান্ড আর লোয়ের প্রভৃতি ছিল তাদের সবাইকে ক্রমে নিজের বিচক্ষণতা আর বাচনশক্তি দিয়ে ঘায়েল করে ফেললাম। আমি কেবলমাত্র কথার চক্করে ফেলে কোন জাতিকে ঋণগ্রস্ত বা ঋণমুক্ত করে ফেলতে পারতাম, মিথ্যে নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে গলা ছেড়ে ভাষণ দিয়ে শত্রুসৈন্যদের ঘুম পাড়িয়ে রাখার ক্ষমতাও আমার ছিল। দু'চারটে কথার মারপ্যাচের মাধ্যমেই দুঃখ-দুর্দশা, জ্বালা-যন্ত্রণা, বিক্ষোভ-বিদ্রোহ অর্থ আত্মসাৎ করা বা উদ্বৃত্ত দেখানো প্রভৃতি কাজ আমি অনায়াসেই সম্পন্ন করতে পারতাম। আবার লড়াকু কুত্তা বা শান্তির দূত পায়রাগুলোকে বার কয়েক পাখির মত শিস দিয়ে জাগিয়ে তোলার ক্ষমতাও আমার ছিল। কারো রূপ বা পোশাকের জৌলুস আমার কাজের প্রতিবন্ধকতা করতে পারত না, করেও নি কোনদিন।

আমাকে প্রথম দর্শন করামাত্র সবাই রীতিমত শিউরে ওঠে। চরম অবস্থার হৃদরোগগ্রস্ত ব্যক্তি না বলে আমি মুখ খোলার দশ মিনিটের মধ্যেই তারা আমার আপনজন বনে যায়। নারী বা পুরুষ, যে-ই আমার সংস্পর্শে আসে আমি তাদেরই প্রভাবান্বিত করে নেই। আচ্ছা একটা কথা বলুন তো, আমার মত মুখের অধিকারী একটা পুরুষকে কোন নারী ভালবাসতে পারে এটা বিশ্বাস করতে আপনি অবশ্যই উৎসাহী হবেন না, ঠিক কি না?

মিঃ টেট, আমি বিশ্বাস করি, আপনার বক্তব্য শতকরা একশ' ভাগই সত্য। কোন সহজ সরল প্রকৃতির মানুষ মেয়েমানুষের মনে ধরেছে, প্রেমে পড়েছে এটা ইতিহাসে পাওয়া গেলেও উপন্যাসের পাতায় একঘেয়ে, বিরক্তিকর মনে হয়, আমি তো মনে করি—'

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই যুডসন টেট বলে উঠলেন, 'আমি মার্জনা ভিক্ষা করছি, ব্যাপারটা কিন্তু আপনার মাথায় ঢোকেনি। আমার গল্পটাই তো এখন আপনার শোনা হয় নি।

রাজধানী শহরে ফার্গুসন ম্যাকমাহান আমার বন্ধু ছিল। সুপুরুষ। সুঠামদেহী, সদাহাস্যময়, নীল চোখ দুটোতে সর্বক্ষণ হাসির ঝিলিক লেগেই থাকত। আমার মাথার সোনালী চুলগুলো ছিল কোঁকড়ানো।

তবে সে কিন্তু মোটেই বাকপটু ছিল না। সুন্দর হওয়াটাই সবচেয়ে বড়গুণ এ ধারণাটা নিয়েই বড় হয়ে উঠেছিল। তার কথা শুনলেই আমার কান ঝালাপালা করত। তা সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। হয়ত বা আপনি ভাবতেও পারেন, চরিত্রের দিক থেকে আমরা সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর ছিলাম বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল, তাই না?

উপকূলবর্তী শহর ওরাটামার-এর চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা দমন করতে এবং শুল্ক ও সামরিক বিভাগের কয়েকজনের শিরশ্ছেদ করার জন্য এক সময় আমাকে সেখানে যেতে হয়েছিল। ফার্গুসন তখন প্রজাতন্ত্রের এক দেশলাই ও বরফ কারখানার সরকারী সুবিধাভোগী মালিক ছিল। সে স্বেচ্ছায়ই আমার সঙ্গে সেখানে যেতে আগ্রহান্বিত হল।

একটা খচ্চরের গাড়ি চেপে আমরা ওরাটামা শহরে পৌঁছলাম। আমরা শব্দটা ব্যবহার করেছি বটে, আসলে কিন্তু আমি বলাটাই উচিত ছিল। যুডসন—টেট-এর নামটা চারটে জাতি, পাঁচটা দ্বীপপুঞ্জ, দুটো মহাসাগর, একটা উপকূল ও একটা যোজকের মানুষের শুনল, জানতে পারল। তাদের কাছে আমি দুঃসাহসিক ভদ্রলোক বলে পরিচিত হলাম।

আমার সম্বন্ধে সেখানকার খবরের কাগজগুলোতে প্রচুর লেখালেখি হল। 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' পত্রিকা তো আমাকে নিয়ে বারো নম্বর পাতার পুরো একটা 'স্টিক'-ই লিখে ফেলল। সত্যি বলতে কি, আমার এ সাগর অভিযানে ফার্গুসন-এর অবদান নামমাত্রও ছিল না। কারো প্রতি তিলমাত্রও হিংসা আমার মধ্যে নেই। যা-যা ঘটেছিল হুবহু তা-ই বলছি।

সেখানকার সাধারণ মানুষ ছিল 'নেবুচাডনেজার'-এর দলভুক্ত। তারা যুডসন টেট-এর কাছে মাথা নত করে থাকত। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, মাংকো বেনাভিডেস-এর পিছনে মূল শক্তি আমিই জোগাচ্ছি। পূর্ব অরোরা থেকে আমদানি করা যত বই-ই যে বা যারা পড়ুক না কেন, তাদের কাছে আমার মুখের দামই সবচেয়ে বেশী। কিন্তু এমন মানুষও বহু আছে যারা মুখের জেল্লা বাড়াতেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত করে দেয়। কোল্ড ক্রীম থেকে শুরু করে কত কিছুই না তারা মুখে মাখে যাতে এক নজরেই সুপুরুষ বলে মনে হয়।

ফার্গুসন আর আমাকে স্থানীয় এস্টররা নিয়ে সেন্টিপিড ক্লাবে নিয়ে তুলল। একেবারে সমুদ্র তীরবর্তী একটা বাড়িতে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করল। শহরের সব শ্রেণীর ও সর্বস্তরের মানুষ সেখানে ভিড় জমাতে আরম্ভ করল।

এক বিকালে 'সেন্টিপিড'-এর সমুদ্রের মুখোমুখি বারান্দায় বসে ফার্গুসন আর আমি রাম-এর বোতলে চুমুক দিচ্ছিলাম। ঠোঁটের কাছে মদের বোতলটা নিয়ে গিয়েও ফার্গুসন থমকে গেল। বলল, যুডসন, ওরাটামাতে এক রূপসী, ডানাকাটা পরী থাকে, তার নাম সোনিওরিটা আনাবেলা জামোরা। সত্যিকারের রূপসী বলতে যা বোঝায় সে ঠিক তা-ই। তার রূপের আভা চোখ ঝলসে দেয়। দেখলে মনে হয় যেন সবে নরক থেকে উঠে এসেছে!

আমি তার কথায় না হেসে পারলাম না। হাসতে হাসতেই এক সময় বললাম—'চমৎকার! প্রেমিকের রূপ সৌন্দর্য বর্ণনায় তুমি আবেগ উচ্ছ্বাসে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছ! তোমার কথা, আমার মনে যে ফাউস্ট ও মার্গারিটা-র প্রেম-সম্ভাষণের কথাই উঁকি দিচ্ছে।

আরে যুডসন, তুমি কি ভালই জান না যে নিজে একটা গণ্ডারের মত বিশ্রী দেখতে, জান না? তাই মেয়েমানুষ সম্বন্ধে তোমার মনে আগ্রহ বা কৌতূহল কোনটাই তো থাকার কথা নয়। আমার কথা যদি বল, আমি নির্দ্বিধায় বলছি, আমি পুরোপুরি মিস আনাবেলা-র প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি। তাই

তো তোমাকে কথাটা বলেছি। আর তোমার সাহায্য সহযোগিতাও আমার কাম্য।

সাহায্য সহযোগিতা? কিন্তু আমি সেটা কিভাবে করতে পারি, বল?

বলছি শোন, তার প্রধানা পরিচারিকা ফ্রান্সেসস্কাকে আমি টাকা কড়ি দিয়ে ইতিমধ্যেই হাত করে রেখেছি। আর যুডসন, উদার, মহৎ ও সুপুরুষ হিসেবে এ-দেশে তোমার যথেষ্ট খ্যাতি আছে।

খুবই সত্য। আর সেটা আমার প্রাপ্য, মান তো?

উত্তর আর দক্ষিণ মেরু উভয় অঞ্চলেই সবচেয়ে সুদর্শন যুবক হিসেবে আমারও তো খ্যাতি আছে।

শোন, কেবলমাত্র মুখাবয়ব আর ভূগোলটাকে বাদ দিয়ে তোমার কথা আমি পুরোপুরি সমর্থন করতে পারি। আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বললাম ফার্গুসন আমতা আমতা করে বলল, শোন, আমাদের দু'জনের মধ্যে তোমার পক্ষেই সেনিওরিটা আনাবেলা জামোরাকে কুপোকাত করা সম্ভব। যুবতীটা যে এক প্রাচীন স্পেনীয় পরিবারের মেয়ে তা-তো আর তোমার অজানা নয়। তাই বিকেলে সে যখন নিজেদের গাড়ি নিয়ে পার্কে বেড়াতে বেরোয় অথবা সন্ধ্যায় জানালার ফাঁক দিয়ে মুখ বের করে বসে থাকে তখন ছাড়া আর অন্য সময় সে সুদূর আকাশের তারার মতই আয়ত্তের বাইরে থাকে।

খোলসা করে বল তো, আমাদের দু'জনের মধ্যে কার জন্য তাকে পটাতে, মানে কুপোকাৎ করতে হবে?

ফার্গুসন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, আমার, আমার জন্য। আরে তুমি তো তার ছায়া পর্যন্ত দেখ নি। ফ্রান্সেস্কো কিন্তু বেশ কয়েকবার তোমার নাম উল্লেখ করেই আমাকে দেখিয়ে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। আমাকে দেখেই যুবতীটা মনে করে যে, দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ রোমান্টিক চরিত্রবান পুরুষ, সর্বশ্রেষ্ঠ নায়ক আর শ্রেষ্ঠতম কূটনীতিবিদ জন যুডসন টেট-কেই দেখছে। তবেই বুঝতে পারছ যার মধ্যে আমার দৈহিক সৌন্দর্য আর তোমার খ্যাতি-প্রতিষ্ঠার মিলন ঘটেছে তাকে কি করে ফিরিয়ে দেবে, বল তো? তোমার বহু রোমহর্ষক কার্যাদির বিবরণ সে অবশ্যই শুনেছে। আর আমাকে তো একাধিকবারই চাক্ষুষ করেছে। কোন মেয়ের পক্ষে এর চেয়ে আর কি-ই বা চাওয়ার থাকতে পারে?

বল তো, এর চেয়ে কিছু কম হলে কি তার চলবে বলে মনে কর? একটা কথা কি, আমাদের পারস্পরিক আকর্ষণকে আমাদের পক্ষে আলাদা করা কি সম্ভব? আর লাভটাকেই বা আমরা কিভাবে ভাগাভাগি করে নেব, বল।

ফার্গুসন এবার তার পরিকল্পনার কথাটা আমাকে খোলসা করে বলল মন দিয়ে শোন, জর্জ ডন লুইস জামোয়া-র একটা উঠোন তো অবশ্যই আছে আর সেটা রাস্তা থেকে অন্দর মহল পর্যন্ত চলে গেছে। তার এক কোণে তার মেয়ের ঘরের একটা জানালা আছে আর দেখতে পাবে, জায়গাটা আধো আলো, আধো অন্ধকারে ঢাকা। আর আমাকে দিয়ে সে কোন কাজ হাসিল করবে বলে তুমি মনে কর? আমি কেন, কতটা স্বাধীন, কতটা আকর্ষণীয় আর আমার মুখের কৃতিত্বই বা কতখানি তা তার ভালই জানা আছে। আর তা জানা আছে বলেই তো সে প্রস্তাব করেছে, মাঝরাত্রে আমি যেন সে উঠোনে হাজির হই যাতে আমার এ ভূতের মত কিম্ভূতকিমাকার মুখমণ্ডলটা তার চোখে না পড়ে, আর তার হয়ে মেয়েটার কাছে প্রেম নিবেদন করি, যাকে সে একটু আগেই পার্কের কাছে দেখেছে সে সুপুরুষটার আর ডন যুডসন টেট বলে নিঃসন্দেহ হয়েছে।

কিন্তু বন্ধুবর ফার্গুসন-এর জন্য এটুকু কাজ না করার তো কোন যুক্তিই আমি খুঁজে পাচ্ছি না। আমার ওপর কাজটার দায়িত্বভার অর্পণ করে যে সে আমার সুখ্যাতিই করেছে, আমাকে অনেক বড় করে দেখেছে, এতে তো নিজের ত্রুটিকেই তুলে ধরেছে।

আমি কোনরকম দ্বিধা না করেই বলে উঠলাম, 'ওহে সুদর্শন যুবক, কথা দিচ্ছি, আমার সার্বিক সাহায্য তুমি পাবেই। তার জানালার বাইরের সে আধো আলো আধো অন্ধকার জায়গাটায় আমাকে নিয়ে চল। আমার বাক্‌চাতুর্যের মাধ্যমে সে রূপসী তন্বী যুবতী তোমারই হয়ে যাক।

ফার্গুসন এবার আমার দিকে সামান্য হেলে অপেক্ষাকৃত অনুচ্চ কণ্ঠে বলল, 'যুডসন, তোমার কাছে আমার একটাই অনুরোধ, তোমার মুখটাকে যেন অন্ধকার লুকিয়ে রেখো। পরমপিতার দোহাই দিয়ে বলছি, তোমার মুখটাকে যেন আমার আকাঙ্ক্ষিতা কিছুতেই দেখতে না যায়। আমার বাক্‌শক্তি

প্রখর হলে অবশ্যই তোমাকে এ অনুরোধ করে বিব্রত করতাম না। আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ যে, আমাকে দেখে আর তোমার মুখে অমৃতময় বাণী শুনে কেন সে ঘায়েল হবে না, বল?

ফার্গুসন আর সে রূপসীর পরিচারিকা যাবতীয় ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করে ফেলল। এক রাতে উঁচুকলার আর লম্বা ঝুলের একটা আলখাল্লা গোছের জামা তারা আমাকে এনে দিল। আমি সেটা গায়ে দিয়ে ঝটপট তৈরি হয়ে নিলাম। আমি উঠোনে গিয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই জানালার কাছ থেকে প্রায় ফিসফিসানি গোছের একটা শব্দ আমার কানে এল। ফার্গুসন-এর পরামর্শ মাফিক আমি জামার কলারটা তুলে খাড়া করে দিলাম, কারণ তখন বর্ষাকাল চলছে আর কনকনে ঠাণ্ডাও পড়েছিল।

তারপর? আপনারা বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, আমি এক ঘণ্টা ধরে সেনিওরিটা আনাবেলা-র উদ্দেশ্যে বকবক করে গেলাম।

উদ্দেশ্যে বলার অর্থ কথাগুলো তাকে লক্ষ্য করে বলেছি। মানে তার সঙ্গে বলিনি। সে হয়ত মাঝে মধ্যে আবেগমথিত কণ্ঠে বলে বলল, 'আঃ, সেনিওর' বা 'আরে মশাই, রসিকতা করছেন না-তো? আবার একটু বাদেই হয়ত বলে উঠল, 'আমি ভালই জানি, এসব নিছকই আপনার মুখের কথা, অবশ্যই মনের কথা নয়। এরকম বহু টুকরো টুকরো কথা সে বলল, অভিসারের সময় মেয়েরা আবেগে উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে যা বলে থাকে। আমাদের উভয়েরই ইংরেজি ও স্পেনীয় ভাষা রপ্ত ছিল। তাই প্রয়োজন মাফিক উভয় ভাষাতেই আমি ফার্গুসন-এর যুবতীটার মন জয় করতে সাধ্যাতীত প্রয়াস চালাতে লাগলাম। আসলে জানালার গরাদগুলো না থাকলে দুটো ভাষা ব্যবহারের দরকার পড়ত না। একটা ভাষাতেই অনায়াসে কাজ হাসিল করে ফেলা যেত। এক ঘণ্টা ধরে আমি অভিনয় চালাবার পর সে আমাকে বিদায় জানাল। বিদায় মুহূর্তে সে আমাকে একটা গোলাপফুল উপহার দিল। বেশ বড়সড় টকটকে লাল গোলাপ। ফিরে এসে সতেজ রক্তিম গোলাপটা ফার্গুসন-এর হাতে গুঁজে দিলাম। সে আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ল।

বন্ধুবর ফার্গুসন-এর হয়ে অভিনয় করার জন্য আমি ক্রমান্বয়ে তিন তিনটা সপ্তাহ প্রত্যেক তৃতীয় বা চতুর্থ রাতে রূপসী যুবতী সেনিওরিটা আনাবেলা-র জানালার ধারে হাজির হই। শেষমেশ যুবতীটা স্বীকার না করে পারল না যে, সে তার মন প্রাণ আমাকেই সমর্পণ করেছে, আর এ-ও নির্দ্বিধায় স্বীকার না করে পারল না যে, সে আমাকে পার্কের ভেতর দিয়ে গাড়ি চড়ে যাবার সময় বহুবার আমাকে দেখেছে, মুগ্ধ হয়েছে। আসলে সে-তো আমাকে নয়, ফার্গুসনকেই দেখেছে। আর এ-ও সত্য সে, আমারই মুখের কথা তার মন জয় করেছে। ব্যাপারটা একবার গভীরভাবে ভেবে দেখুন তো, ফার্গুসন নিজে সেখানে গিয়ে একেবারে আড়ালে থেকে অন্ধকারেই একটা ঢিল ছুঁড়ে দিল, আর একটাও নিজের কথা ব্যক্ত করল না, তবে ব্যাপারটা কেমন হত!

একেবারে সর্বশেষ রাতে আমাকে কথা দিল, সে আমাকে ছাড়া আর কাউকে চেনে না, চিরদিনের জন্য আমারই হবে। আমার বলতে ফার্গুসন-এর তার হাতে যাতে আমি চুমু খেতে পারি সে উদ্দেশ্যে হাতটা জানালার গরাদের ফাঁক দিয়ে বাড়িয়ে দিল। চুম্বনের মাধ্যমে তার অভিলাষ পূর্ণ করে আমি কথাটা ফার্গুসন-এর কাছে বললাম।

সে বিষণ্ণমুখে বলল, এটা কী করলে! এ কাজটা আমার জন্য রেখে দিলে না কেন?

এবার থেকে কাজটা তো তোমাকেই করতে হবে বন্ধু। কাজটা চালিয়ে যাবে, কিন্তু মুখে একটা শব্দও উচ্চারণ কোরো না যেন। ভবিষ্যতে সে যখন ভাববে যে, সে তোমার প্রেমে মজে গেছে তখন হয়ত বা আসল বাক্যালাপ আর তোমার মুখের কথার পার্থক্যটুকু ধরতেই পারবে না।

সত্যি বলছি, আর কোনদিন সেনিওরিটা আনাবেলা-র সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাতই হয় নি। কিন্তু পরের দিন ফার্গুসন-এর কাছ থেকে অনুরোধ এল তার সঙ্গে পার্কের ভেতর দিয়ে যেন আমি হাঁটাচলা করি। আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও গেলাম। আমাকে শিশু আর কুকুরগুলো দেখামাত্র আতঙ্কে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে জলাশয়ের ঝোপঝাড় আর কলাবাগানের ভেতরে গিয়ে গা-ঢাকা দিল।

কালো ঘোড়ায় টানা একটা গাড়ির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে ফার্গুসন সোল্লাসে বলে উঠল, ওই, ওই যে, সে আসছে। সে এসে গেছে!

তার কথাটা কানে যেতেই আমি চোখ তুলে তাকালাম। ব্যস, সে মুহূর্তেই আমার পায়ের তলার মাটি যেন তিরতির করে কাঁপতে লাগল। সেনিওরিটা আনাবেলা পৃথিবীর সুন্দরতমা যুবতী। অন্তত সে মুহূর্তে অন্তত যুডসন টেটে-র চোখে সে-ই হচ্ছে একমাত্র রূপসী রূপের বন্যা যাকে বলে। আর সে মুহূর্তে তার মনের কোণে একটা কথাই বার বার উঁকি দিতে লাগল, চিরদিনের জন্য সে আমার হবে আর আমি তার হয়ে থাকবো। কিন্তু আমার মুখটার কথা মনে পড়তেই আমার সংজ্ঞা লোপ পাওয়ার জোগাড় হল। পরমুহূর্তেই আমার অন্য সব গুণের কথা এক এক করে মনে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে লাগল। ব্যস, আমি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বিষিয়ে ওঠা মনে স্বগতোক্তি করলাম, 'এ কী কাণ্ড! আমি কিনা অন্য একজনের হয়ে এ অনন্যার সঙ্গে অভিনয়ে মেতেছিলাম তার হয়ে প্রেম নিবেদন করেছিলাম!'

রূপসী সেনিওরিটা আনাবেলা-র গাড়িটা আমাদের প্রায় গা-ঘেঁষে চলে যাবার সময় সে তার আয়ত চোখ দুটো মেলে ফার্গুসন-এর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। আর তার দৃষ্টির প্রসাদ লাভ করলে যুডসন টেট হয়ত বা পুষ্পক রথে চড়ে আকাশ পথে উড়ে যেত। কিন্তু হায়! ভুলেও তার চপল চাপল চোখ দুটো মেলে আমার দিকে তাকাল না।

আর আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সুদর্শন যুবকটা? সে সোল্লাসে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গীর মাধ্যমে তার মন জয় করার চেষ্টায় ব্রতী হল। আর মাথায় কোঁকড়ানো চুলগুলো বাতাসে উড়িয়ে তার মন জয় করার চেষ্টা করতেও ভুলল না।

রীতিমত ভারিক্কী মেজাজেই ফার্গুসন বলল, তাকে তো খুব কাছ থেকেই দেখলে, তোমার চোখে কেমন লাগল, সত্যি করে বল তো?

আমি দ্বিধাহীন কণ্ঠেই তার কথার জবাব দিলাম, 'শুনে রাখ, ও-ই হবে মিসেস যুডসন টেট। ব্যস, এটুকু শুনেই খুশি থাক। আর এ-ও জেনে রাখ, বন্ধুর সঙ্গে প্রবঞ্চনা করার ব্যক্তি আমি নই। অতএব আগেভাগে সতর্ক হও।

আমার বিশ্বাস ছিল, আমার কথা শুনে ফার্গুসন হেসেই খুন হবে। কিন্তু তা না করে সে খেঁকিয়ে উঠল, আরে ধ্যুৎ! তোমার শখ তো কম নয় ময়দার তালের মত কদর্য মুখো বুড়ো! তুমিও দেখছি প্রেমে মজে গেছ! বলেছ মন্দ না। তবে বড্ড দেরী করে ফেলেছ। ফ্রান্সেসকো-র মুখে শুনেছি, রূপসী আনাবেলা দিন রাত চব্বিশ ঘণ্টা কেবল আমার কথাই বলে। তবে এ-ও সত্য যে, সন্ধ্যেবেলায় তুমি তবে বহু মিষ্টি মধুর কথা বলে তার মনোরঞ্জন করেছ, সে জন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। বল তো, তুমি কি বিশ্বাস কর না, একাজটা আমি নিজেই করতে সক্ষম হতাম, কি বল?

আমি বললাম, মিসেস যুডসন টেটা, নামটা যেন ভুলে যেয়ো না। শোন, তোমার সুন্দর চেহারার সঙ্গে আমার জিভটাও তুমি পেয়েছ বলেই তো কাজ হাসিল করা সম্ভব হয়েছে। আচ্ছা, একটা কাজ করা যায় না? তোমার দেহসৌষ্ঠব আমাকে ধার দিতে পার না? এমুহূর্ত থেকে আমার জিভটা কেবলমাত্র আমার হয়েই কাজ করবে। ভিজিটিং কার্ডের গায়ে যে নামটা লেখা থাকবে সেটা, মিসেস যুডসন টেট, মনে রেখো। ব্যস, এটুকুই।

ফার্গুসন আবার মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বলল—'বহুৎ আচ্ছা! ওর বাবা, জজ সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তার সম্মতিও আমি পেয়ে গেছি। আগামী সন্ধ্যায় তিনি এক অনুষ্ঠানে করছেন। বন্ধু যুডসন, তুমি যদি ভাল নাচতে পারতে কবে আমার ভাবী স্ত্রী, মিস ম্যাকমাহানকে মুখোমুখি দেখতে পারতে।

কিন্তু পরের সন্ধ্যায় জজ সাহেবের হলঘরে যখন বাজনা বেজে উঠল তখন ধীর পায়ে যুডসন টেট ঢুকল। নতুন সাদা পোশাক তার গায়ে। দেখে মনে হল সমগ্র জাতির মধ্যে সে-ই সবচেয়ে উঁচু দরের মানুষ। প্রকৃতপক্ষে সে-তো তা-ই।

আমার মুখের দিকে চোখ পড়তেই জনা কয়েক বাদ্যকর তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পড়ল। আর কয়েকজনের মুখে ফুটে উঠল জমাটবাঁধা আতঙ্কের ছাপ। আর রূপসী তন্বী যুবতী সেনিওরিটা তো আকস্মিক আতঙ্কে আর্তনাদ করেই উঠল। আর জজ সাহেব? তিনি লম্ফঝম্ফদিয়ে সোল্লাসে বার বার আমার পায়ে মাথা ঠুকতে লেগে গেলেন। কোন সুন্দরী, সুন্দর চেহারার মানুষই আমার

প্রবেশকে এমন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হত না।

আমি রীতিমত মোলায়েম স্বরে বললাম মিঃ সেনিওর জামেরা, আপনার আদরের কন্যার বহু সুখ্যাতি আমি শুনেছি। অনুগ্রহ করে তার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলে বড়ই বাধিত হব।

গোলাপি রঙের অনেকগুলি কাপড়ের দোলনা সাজানো রয়েছে, তারই একটায় বসে মিস সেনিওরিটা আনাবেলা মৃদু মৃদু দোল খাচ্ছে। তার পরনে সুইজারল্যান্ডের চকমকে সাদা পোশাক আর পায়ে ভেলভেটের লাল চটি। আর মাথার মণি মুক্তোগুলো রীতিমত ঝলমল করছে।

এদিকে ফার্গুসনকে ঘরের এক কোণে দেখা যাচ্ছে। সে দুটি ক্রীতদাস ও একজন শ্বেতকায়া পরিচারিকার কবল থেকে নিজেকে মুক্তো করার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

মহামান্য জজ সাহেব আমাকে সঙ্গে করে তাঁর আদরের মেয়ে মিস আনাবেলা-র কাছে গেলেন। তার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমার মুখের দিকে চোখ পড়ামাত্র তার মুখটা অকস্মাৎ চকের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল আর হাত থেকে পাখাটা খসে মেঝেতে পড়ে গেল। আর আচমকা ধাক্কা খাওয়ার জন্য নিজেরই দোলনা চেয়ারটা থেকে উল্টে পড়ার জোগাড় হল। কিন্তু এরকম দৃশ্যের মোকাবেলা করার অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা আমার আছে।

আমি রূপসী যুবতীর পাশে বসে দিব্যি আলাপ জমিয়ে তুললাম। আমার কথা শোনামাত্র তার মধ্যে কেমন আকস্মিক উল্লাস লক্ষ্য করলাম। মুহূর্তে তার চোখ দুটো ইয়া বড় বড় হয়ে গেল। সে কেমন দ্বিধায় পড়ে গেল। আমার মুখ, মানে চেহারাটার সঙ্গে কণ্ঠস্বরের মিলন ঘটানো তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না, লক্ষ্য করলাম। সে জড়োসড়ো হয়ে দোলনা চেয়ারটায় বসে রইল। ক্রমে তার ডাগর ডাগর চোখ দুটোতে স্বপ্নালু দৃষ্টি ফুটে উঠল। সে যে ক্রমেই আমার দিকে ঝুঁকে পড়ছে আমার বুঝতে অসুবিধা হল না।

আনাবেলা যুডসন টেট সম্বন্ধে বহু কথা শুনেছে। সে যে একজন উঁচুদরের মানুষ, কত বড় বড় কাজ সে সম্পন্ন করেছে, সে সব কাজই তো আমার স্বপক্ষের কথা। তবে সে যখন নিঃসন্দেহ হল, এতদিন সে যুডসন টেট বলে যাকে জেনে এসেছে, কথা বলেছে সে সুপুরুষটি আমি নই অন্য একজন, তখন সে মনে বড় রকম এক ধাক্কা খেল। ঠিক সে মুহূর্তেই আমি তার সঙ্গে স্পেনীয় ভাষায় বাক্যালাপ শুরু করলাম। কারণ, কিছু বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে স্পেনীয় ভাষা ইংরেজি ভাষার চেয়ে বেশী উপযোগী। আর হাজার তারের একটা বীণার ঝংকারের মত আমি সে ভাষাটা বলতে লাগলাম। প্রথম সুর থেকে অষ্টম সুরের মধ্যে আমার কণ্ঠস্বর ওঠা নামা করাতে লাগলাম।

কথাবার্তার মধ্যে অনবরত কাব্য, প্রেম, ফুল আর চাঁদের আলো প্রকাশ পেতে লাগল। আমি দীর্ঘদিন ধরে তার জানালার বাইরে আধো আলো আধো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে যা কিছু কথা তাকে শুনিয়েছি তা থেকেও কিছু কিছু তাকে শোনালাম। তার চোখ দুটোর ঝলমলানি আমার নজর এড়াল না। নিঃসন্দেহ হলাম যে, সে তার পূর্বপরিচিত, আমার কণ্ঠস্বর চিনতে পেরেছে, চিনতে পেরেছে তার রহস্যের আড়ালে থাকা অভিসারককে। আমার মনে আনন্দের জোয়ার বয়ে চলল।

হ্যাঁ, ফার্গুসন ম্যাকমাহানকে হারিয়ে দিতে আমাকে মোটেই বেগ পেতে হল না। আর কণ্ঠস্বরই যে সত্যিকারের শিল্পকলার মধ্যে অন্যতম তাতে আর তিলমাত্র সন্দেহও রইল না। যার কণ্ঠ দিয়ে সুন্দর সুন্দর কথা উচ্চারিত হয় সে-ই তো প্রকৃত সুন্দর। এ প্রবাদ বাক্যই বিখ্যাত।

এদিকে সম্পূর্ণ বিপরীত, একেবারেই অপ্রত্যাশিত এক দৃশ্য লক্ষিত হল। বীতশ্রদ্ধ ফার্গুসন মুখ বিকৃত করে শ্বেতকায়া মেয়েটার সঙ্গে ওয়ালজ নাচতে লাগল। নিতান্ত নিরুপায় হয়েই তাকে যে নাচানাচি করতে হচ্ছে তা তার চোখ মুখ দেখেই স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যা-ই হোক না কেন, ফার্গুসন যখন নাচে ব্যস্ত সে অবসরে সেনিওরিটা আনাবেলার হাত ধরে আমি লেবু বাগিচায় বেড়াতে গেলাম।

লেবু বাগিচা থেকে ফেরার আগেই আমি তার অনুমতি পেয়ে যাই, আমি যেন পরদিন মাঝ রাতেই তার জানালার ধারের আবছা অন্ধকার জায়গাটায় হাজির হই. তার সঙ্গে মিলিত হয়ে মধুরালাপ করি।

আরে, এর মত সহজ কাজ আর কি-ই বা থাকতে পারে? ব্যস, দু সপ্তাহের মধ্যেই আমি আনাবেলা-র কাছ থেকে সবুজ সঙ্কেত পেয়ে গেলাম। সে নিজেই আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব

পাড়ল। ব্যস, ফার্গুসন একেবারেই অন্ধকারের অতল গহ্বরে চাপা পড়ে গেল। সে কিন্তু ব্যাপারটাকে ঠাণ্ডা মাথায়ই গ্রহণ করল। তবে সে একথাও বলতে ছাড়ল না, সে কিছুতেই এ পরাজয়কে স্বীকার করে নেবে না।

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমাকে বলল, যুডসন, ব্যাপারটা যদি কথার কথা হয় তবে সেখানে সুখের, মুখের কথাতেই কাজ হাসিল হয় বটে, তবে সে বিদ্যাটা চর্চা করার ব্যাপারে আমি কোনদিনই মাথা ঘামাই নি।

আরে ধ্যুৎ! যে গল্পটা আপনাকে বলব মনে করেছিলাম সেটা তো শুরু করাই হল না!

আমি একদিন গা জ্বালা করা রোদে ঘোড়ার পিঠে চেপে বহু দূরে চলে গিয়েছিলাম। তারপর শহরের একেবারে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এক গাছের ছায়ায় ঘোড়াটাকে বেঁধে এক ল্যাদনের হিমশীতল জলে নেমে খুব করে ডুবিয়ে স্নান করায় শরীরের জ্বালা কমে কিছুটা ঠাণ্ডা হল।

সেদিন সন্ধ্যা পেরিয়ে রাতের অন্ধকার নেমে এলে আনাবেলাকে দেখতে তাদের বাড়ি গেলাম। সে সময়ে প্রতি সন্ধ্যায়ই আমি তার সঙ্গে মিলিত হতাম। আমাদের বিয়ের পাকা কথা হয়ে গেছে, এক মাসের মধ্যেই আমাদের বিয়ের পাট চুকিয়ে ফেলা হবে। সত্যি বলছি, তখন তাকে দেখলে আমার মনে হত সে যেন অবিকল একটা বুলবুল পাখি, চপল চাপল একটা হরিণী বা একটা আধ ফোটা গোলাপ। আর তার আয়ত চোখ দুটো যেন সামনের মত নরম আর চকচকে।

আর সে? সে যখন আমার দিকে ভাবাপ্লুত চোখে আমার বাঁকাটেরা চেহারা আর মুখের দিকে তাকায় তখন তার চোখের তারায় বিতৃষ্ণা ও অবজ্ঞার ছাপ নজরে পড়ে না। বরং গভীরে প্রশংসা আর অনুরাগের ছাপই তার চোখে মুখে প্রকাশ পায়—যে দৃষ্টিতে সে প্রথম প্রথম ফার্গুসন-এর দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকত।

যেসব কথা শোনার জন্য সে অত্যুগ্র আগ্রহী, যেমন তার ওপর নির্ভর করা যেতে পারে, পৃথিবীতে যা কিছু শ্রেষ্ঠতম ও সুন্দরতম তাদের ওপর একমাত্র তারই দাবী, এরকম কিছু গালভরা কথা তাকে বলার জন্য যেই না মুখটা খুলতে যাব অমনি মনের কথাগুলোর পরিবর্তে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল একেবারেই অভাবনীয় একটা খ্যাঁক-খ্যাঁক শব্দ শিশুদের বুকে দীর্ঘদিনের কাশি বসে গেলে যে শব্দ বেরিয়ে আসে অবিকল সে শব্দ। বহু চেষ্টা করেও মনের কথা তার কাছে প্রকাশ করা সম্ভব হল না। একে বোকার মত বরফ শীতল জলে স্নান করারই পরিণাম বলা যেতে পারে।

আনাবেলা-র পাশাপাশি বসে তাকে খুশি করার জন্য দীর্ঘসময় ধরে নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস চালিয়ে যেতে লাগলাম। সে হাল্কা ধরনের, ভাসা ভাসা বহু কথাই বলল। আমার বুঝতে অসুবিধা হল না। আনাবেলা-র চোখের মণি দুটো আগের মত উজ্জ্বল নয়, আর দৃষ্টি আমার দিকে নিশ্চল স্থির হয়ে থাকছে না। তার কানকে আনন্দ দান করার মত এমন কিছুই আমার তখন ছিল না।

আমি আনাবেলা-র কাছ থেকে বিদায় নেবার মুহূর্তে তার মুখের দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকালাম। তাকে যেন বড়ই নিস্পৃহ মনে হল, চোখে মুখে গভীর চিন্তার ছাপটুকুও আমার নজর এড়াল না।

পরপর আরও পাঁচটা সন্ধ্যায় আমি তার সঙ্গে মিলিত হলাম। রোজই একই ঘটনা ঘটতে লাগল।

ষষ্ঠ দিনে তাদের বাড়িতে পা দিয়েই আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। জানতে পারলাম, ফার্গুসন ম্যাকমাহান-এর হাত ধরে সে চম্পট দিয়েছে, পাখি খাঁচা ছেড়ে পালিয়েছে।

উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে ফেরীঘাটে গেলাম। জানতে পারলাম, পালতোলা একটা লেলিজগামী প্রমোদ তরীতে চেপে তারা পালিয়েছে। রাজস্ব বিভাগের একটা স্টিমলঞ্চের ব্যবস্থা করে আমি মাত্র আট ঘণ্টা পরে তাদের পিছনে ধাওয়া করলাম।

আমি স্টিম লঞ্চে ওঠার পূর্ব মুহূর্তে বৃদ্ধ ম্যানুয়েল ইকুইতো-র ওষুধের দোকানে গেলাম। মুখে কিছু বলতে না পারার জন্য আমার গলা দিয়ে বার কয়েক কেবলমাত্র ফ্যাঁস-ফ্যাঁস শব্দ বেরল। বৃদ্ধ বার বার হাই তুলতে লাগল। সে দেশের প্রচলিত প্রথা মাফিক এক ঘন্টার মধ্যেই আমাকে তার পরিষেবা করা উচিত। ফলে আমি ধৈর্য হারিয়ে এক লাফে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার গলাটা চেপে ধরে আমার গলাটা আবার দেখতে তাকে বাধ্য করলাম। সে আরও একবার হাত

তুলে তরল পদার্থের একটা বোতল আলমারি থেকে বেক করে আমাকে দিয়ে বলল প্রতি দু'ঘণ্টা অন্তর এক চামচ করে খেতে হবে।

কোটের পকেট থেকে একটা ডলার বের করে তার সামনে ফেলে দিয়ে আমি স্টিমারলঞ্চটা ধরার জন্য উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগলাম।

ফার্গুসন আর আনাবেলা যে প্রমোদ তরী চেপে চম্পট দিয়েছিল সেটা বন্দরে ভিড়বার তের সেকেন্ড বাদে আমাদের স্টিমলঞ্চটা সেখানে পৌঁছাল। আমাদের ছোট লঞ্চটা পাড়ে দাঁড়াবার আগেই তারা উভয়ে একটা ডোরি ভাড়া করে পাড়ের দিকে যেতে লাগল।

আমি নাবিককে আরও, আরও জোরে চালাবার জন্য সাধ্য মত চেষ্টা করলাম। কিন্তু হায়! শব্দটা বাইরে বেরিয়ে আসার মুহূর্তে আমার কণ্ঠনালীতে বাধা পেয়ে থমকে গেল। আমার মনে পড়ে গেল বুড়ো ইকুইতো-র ওষুধের শিশুটার কথা। সেটা থেকে কিছুটা কালো তরল পদার্থ গলায় ঢেলে দিলাম।

তরী দুটো একই সঙ্গে তীরে পৌঁছল। আমি সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত পায়ে হেঁটে ফার্গুসন আর আনাবেলা-র মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ালাম। আনাবেলা-র চোখের উজ্জ্বল মণি দুটো মুহূর্তের জন্য আমার মুখের ওপর স্থির হল। পর মুহূর্তেই পূর্ণ আবেগ উচ্ছ্বাস আর দৃঢ়বিশ্বাসের সঙ্গে ফার্গুসন-এর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

আমার ভালই জানা আছে, কথা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আমি তখন একেবারেই লাগাম ছাড়া, বেপরোয়া। আমার আশা ভরসা যা কিছু সবই কথা। ফার্গুসন-এর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রূপ সৌন্দর্যের ব্যাপার তাকে চ্যালেঞ্জ জানানো আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। যে কথাগুলো তাকে বলার জন্য আমার ভেতরে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে, রীতিমত তোলপাড় হচ্ছে ঠিক সেসব শব্দই আমাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে আমার কণ্ঠনালী দিয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল।

আমি স্পষ্ট উচ্চারণ করলাম, 'সেনিওরিটা আনাবেলা, একমাত্র মুহূর্তের জন্যও কি আমি তোমার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাব না? আমার প্রত্যাশিত সুযোগ তুমি দেবে কি?'

আপনি কি এ প্রসঙ্গের বিস্তারিত বিবরণ শুনতে আগ্রহী? শুনতে ইচ্ছুক? ধন্যবাদ। আমার আগেকার সে বাক্‌শক্তি আবার যথাযথভাবেই ফিরে এসেছিল।

আনাবেলাকে সঙ্গে করে আমি একটা তালগাছের তলায় হাজির হলাম। আমার অতীতে কথার জালে তাকে আবার মোহিত করে তুললাম। সে মন্ত্রমুগ্ধের মত আমার কথাগুলো শুনল।

আমার কথা শেষ হলে আনাবেলা ভাবাপ্লুত কণ্ঠে বলতে লাগল, 'যুডসন, তুমি যখন আমার সঙ্গে, আমাকে কিছু বল তখন আমার কানে অন্য কোন কথাই প্রবেশ করে না। অন্য কিছুই দেখতে পাই না, পৃথিবীর কোন কিছুর অস্তিত্ব আছে বলে আমার মনে হয় না, কেউ না, কিচ্ছু না।

গল্পটা এখানেই শেষ। সেনিওরিটা আনাবেলা আমার সঙ্গেই স্টিমলঞ্চে চেপে ওয়াটারমাতে ফিরল। আর ফার্গুসন? তার যে কি হল সে সম্বন্ধে আর কিছুই জানতে পারি নি। তার সঙ্গে আর কোনদিন দেখাও হয় নি। আনাবেলা এখন মিসেস যুডসন টেট নামে পরিচিত। এই যে গল্পটা বললাম, এটা কি আপনার কাছে খুবই অস্বস্তিকর বোধ হয়েছে?

আমি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলাম, 'কই, না-তো। দেখুন, মনস্তাত্বিক ব্যাপার স্যাপারে আমি সবসময়ই আগ্রহী। একটা মানুষের, বিশেষ করে একটা মহিলার মন এতই রহস্যজনক যে কল্পনা করা যায় না। তারা—।

আমার কথা শেষ হবার আগেই যুডসন টেট বলে উঠল—অবশ্যই। আর একটা কথা, মানুষের শ্বাসনালী আর শাখা শ্বাসনালীও সমানই বিস্ময়কর। আবার কণ্ঠনালীর ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, কণ্ঠনালী নিয়ে আপনি কখনও চর্চাটর্চা করেছিলেন?

অবশ্যই না। কোনদিনই না। তবে আপনার গল্পটা কিন্তু আমাকে খুবই আনন্দ দিয়েছে। মিসেস যুডসন টেট সম্বন্ধে কটা কথা জিজ্ঞেস করব? সম্প্রতি তার শরীর স্বাস্থ্য আর চালচলন সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করবেন?

অবশ্যই, অবশ্যই। সম্প্রতি আমরা জার্সি শহরের অন্তর্গত বার্জেন এভিনিউতে বসবাস করছি। আসলে ওরাটামার জলবায়ু মিসেস টেট-এর শরীর ঠিক বরদাস্ত করতে পারছিল না। একটা কথা,

আপনি কি কোনদিন আলজিভের এরিটেনয়েড উপাস্থির অপারেশন করেছেন?

আলজিভে এরিটেনয়েড উপাস্থি? কই, না-তো! আমি তো শল্যচিকিৎসকই। আমি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলাম।

যুডসন টেট বলল, 'তা বটে, কিন্তু একটা কথা কি জানেন, নিজের স্বাস্থ্যের সুরক্ষার খাতিরেই প্রত্যেকের চিকিৎসা বিজ্ঞান ও ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান থাকা চাই-ই চাই। হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগলেই তো ফুসফুসের ব্যামো বা ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস হতে পারে। আর তার জন্য কণ্ঠস্বরের ভয়ানক ব্যামো হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নয়।

আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। বেশ একটু কড়া মেজাজের সঙ্গেই বললাম, 'তা হতে পারে, স্বীকার করছি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তো এদের কোনটাই ঘটেনি। মেয়েদের বহু বিচিত্র রোগ—'

হ্যাঁ, ঠিকই। মেয়েরা বহু অদ্ভুত রোগ-ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয়। যে কথা আপনাকে বলতে চাচ্ছিলাম, আমি ওরাটামায় ফিরে ওষুধ বিক্রেতা ম্যানুয়েল ইকুইতোকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারি, আমার হৃত কণ্ঠস্বরের জন্য তিনি যে কালো তরল ওষুধ দিয়েছিলেন তাতে খুবই তাড়াতাড়ি আমার গলার ব্যামোটা নিরাময় হয়ে গেল। চুচুলা গাছের নির্যাস থেকে সে ওষুধটা তিনি বানিয়েছিলেন।

কথা বলতে বলতে যুডসন টেট কোটের পকেট থেকে সাদা পিসবোর্ডের আয়তাকার একটা ছোট বাক্স বের করে বললেন, শ্বাসনালীর যেকোন ব্যামো আর কণ্ঠস্বরের বিকৃতি বা যেকোন রকম সর্দি, কাশি সারাতে এটাই পৃথিবীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ওষুধ। ওষুধটার তৈরি ফর্মুলাটা বাক্সটার গায়েই ছাপিয়ে দেওয়া আছে, এই দেখুন। এতে আছে ২টি দানা যষ্ঠীমধু, ১/১০ দানা সুগন্ধি ভেষজ টুলু, ১/১০ ফোঁটা চুচুলার নির্যাস, ১/২০ ফোঁটা মৌরীর তেল, ১/৬০ ফোঁটা কাবাব চিনির রস, ১/৬০ ফোঁটা আলকাতরার তেল প্রভৃতি।

মুহূর্তের জন্য থেমে যুডসন টেট আবার বলতে লাগল, 'আমার নিউ ইয়র্ক-এ আসার প্রধানতম উদ্দেশ্য কি, জানেন? আজ পর্যন্ত গলার ব্যামো সারাবার জন্য যত রকম ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের মধ্যে সর্বোত্তম ওষুধের বাজার তৈরি করাই আমার প্রধান লক্ষ্য। আমার সঙ্গে যে পেটিটা আছে তার মধ্যে চারডজন ওষুধ আছে। মাত্র পঞ্চাশ সেন্ট দরে আমি সেগুলোকে বিক্রি করছি। এ ব্যামো যদি আপনার থাকে তবে।

সে কথাটা শেষ করার আগেই আমি সেখান থেকে কেটে পড়লাম। যুডসন টেট আর তার বিবেক চৈতন্যকে একা রেখে আমার হোটেলের লাগোয়া পার্কটার উদ্দেশ্যে ধীর পায়ে হাঁটতে লাগলাম। আমার মনটা কেমন যেন এলোমেলো হয়ে পড়েছে। সে আমার মধ্যে এমন একটা গল্প চাপিয়ে দিয়েছে যাতে আমি তার বাস্তব প্রয়োগ করতে পারি। তাতে এমন প্রাণের স্পন্দন বর্তমান যা যথাযথ প্রয়োগ করা গেলে বাজারে কাটতি হতেও পারে। গল্পটা যা দাঁড়িয়েছে তাকে বলা যেতে পারে সুকৌশল সম্বলিত চিনির প্রলেপ দেওয়া একটা বিজনেস ট্যাবলেট। তবে পরিণামে যা খারাপ লাগল তা হচ্ছে সেটাকে বিক্রির জন্য বাজারে ছাড়া আমার পক্ষে সম্ভবই হল না। বিক্রির দোকান আর বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠান আমাকে বিন্দুমাত্রও আমল দিল না। বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানগুলোও মুখ ঘুরিয়ে থাকল। আর সাহিত্য সমাজের কাছ থেকে সমাদার তো আশাই করা যায় না। হতাশা আর হাহাকারে জর্জরিত মানুষের সারিতে বসে থাকতে থাকতে এক সময় আমার দু'চোখের পাতা বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল।

উপায়ান্তর না দেখে নিজের ঘরে গিয়ে আমার ভাল-লাগা খবরের কাগজগুলো থেকে চারটে গল্প এক ঘণ্টার মধ্যে পড়ে ফেললাম। এর উদ্দেশ্য একটাই, আমার মনটাকে আবার আর্টের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলার চেষ্টা করা।

এক-একটা গল্প পড়ে শেষ করা মাত্র হতাশ হয়ে হাতের খবরের কাগজটা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। কোন লেখকই আমার অস্বস্তিতে ভরপুর মনে স্বস্তি ও শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিতে পারল না। বিশেষ ধরনের একটা মোটর গাড়ির পঞ্চমুখে প্রশংসা করে একটা হাল্কা গল্প ফেঁদেছে।

সর্বশেষ পত্রিকাটা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দেবার পরই আমি যেন নিজের হারানো মনকে ফিরে পেলাম।

স্বগতোক্তি করলাম পাঠক-পাঠিকারা যদি এতগুলো মোটরগাড়ি খেয়ে হজম করতে পারে তবে কণ্ঠনালীর দাওয়াই চুচুলা লজেন্স নিয়ে লেখা টেট-এর একটা মাত্র গল্পকে নিয়ে তাদের এমন ধৈর্যচ্যুতি ঘটা সঙ্গত হবে না।

তাই বলছি কি, এ গল্পটা যদি আপনাদের কাছে ছাপার অক্ষরে হাজির হয় তবে ধরে নেবেন ব্যবসাটা সত্যিকারের ব্যবসাই বটে। আর কলা-দেবী যদি বাণিজ্য-দেবীকে ডিঙিয়ে বহু দূরে চলে যায় তবে তাকেও সজোরে দৌড়োতে হবে।

কোন রকম ছলচাতুরি না করে আমি মোদ্দা কথা বলে দিচ্ছি যে কোন ওষুধ বিক্রেতার কাছ থেকে আপনার পক্ষে 'চুচুলা' গাছ সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না—কোন ওষুধের দোকান থেকেই না।

দ্য লোনসাম্ রোড

ডেপুটি মার্শাল ব্যাংক কেপারটন আমার পুরনো জিগরী দোস্ত। কফি-বীজের মত গাঢ় বাদামী তার গায়ের রঙ। সে উঁচা-লম্বা এক শক্তসামর্থ্য যুবক। তার কথাবার্তা—আচরণ রূঢ়। আর পিস্তল ছোঁড়া ও ঘোড়ায় চড়াতে খুবই পটু—সতর্ক আর অব্যর্থ তার নিশানা। এমন এক যুবককেই একদিন তার বাইরের অফিস-ঘরের ভেতরে একটা কুরসিতে রেকাবের ঝুনঝুনি সমেত আচমকা দুম্ করে বসে পড়তে দেখতে পেলাম।

বেলা পড়ে যাওয়ায় আদালত-ভবনটা প্রায় জনমানবশূন্য হয়ে পড়েছিল, আর মার্শাল বাকও প্রায়ই আমার কাছে অপ্রকাশিত কিছু কথা আমাকে বলে। তাই তার সঙ্গে ঘরে গিয়ে এমন একটা কাজ আমি করে বসলাম যার ফলে তার মধ্যে গল্প বলার প্রেরণা জন্মায়।

মার্শাল বাক যদিও ৪৫-এর ঘোড়া টেপার কাজে খুবই দক্ষ, তা সত্ত্বেও কিন্তু আজ পর্যন্ত কাগজে সিগারেট পাকানোর কায়দাটা রপ্ত করে উঠতে পারে নি। কিন্তু কাগজে পাকানো সিগারেটের স্বাদ যেন তার মুখে বড়ই মধুর।

আমাকে দোষ দেওয়া যাবে না। কারণ, আমি খুবই যত্নসহকারে শক্ত ও মসৃণ করেই সিগারেটটা পাকিয়েছিলাম। হয়ত বা নিজের কোন আকস্মিক খেয়াল বশতই আমাকে বৈবাহিক আলোচনাটা শুনতে হল। আর তাও কিনা শুনতে হল মার্শাল বাক-এর মুখ থেকে! অবাক হবার মত ব্যাপারই বটে।

যাক গে, বাক তার বক্তব্য শুরু করল—বাড গ্র্যাম্বেরি আর জিমকে তো কোনরকমে হাজির করতে পারলাম।

আমি আগ্রহান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—একটা কথা, তাদের উভয়কে এক খোঁয়াড়ে আটকাতে গিয়ে কি কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল? কথাটা জিজ্ঞাসা করার উদ্দেশ্য, একটা মহাকাব্য শোনার যে আমার মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তারই একটা সুস্পষ্ট গন্ধ যেন আমি তার কথার মধ্যে পেয়েছিলাম।

মার্শাল বাক বলল—সমস্যা তো কিছুটা হয়েছিলই। মুহূর্তকাল নীরবতার মধ্যে কাটিয়ে সে তার চিন্তাটাকে অন্য পথে নিয়ে যেতে গিয়ে বলল—জান, মেয়েমানুষদের ব্যাপার স্যাপারই অদ্ভুত। আর উদ্ভিদ বিজ্ঞানে তাদের অবস্থান নির্দেশ করা হয় তবে সেটাও হয়ত একই রকম। তাদের শ্রেণী বিভাগের দায়িত্ব যদি আমার ওপর অর্পণ করা হয় তবে আমি বলব, তারা মানব-সমাজের এক প্রকার চলমান আগাছা বিশেষ। ঘোড়া ঘাস খাচ্ছে এ দৃশ্য কোনদিন চাক্ষুষ করেছ? তাকে একটা খানা ডোবার পাড়ে নিয়ে যাওয়ামাত্র চি-হি রব তুলে ঝট করে পিছন ফিরবে। আবার যদি তাকেই দু'হাজার ফুট গভীর গিরিখাতের কাছে হাজির করলে সেটাকে খানা ডোবা মনে করে দিব্যি নেমে যাবে। একজন বিবাহিত পুরুষের ক্ষেত্রে একই ঘটনা লক্ষিত হবে—অবিকল একই ব্যাপার।

আমি পেরি রাউস্ট্রির প্রসঙ্গে বলতে চাইছিলাম। বিয়ের পিঁড়িতে বসার আগে পর্যন্ত সে আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু, মানে যাকে বলে একেবারে জিগরীদোস্ত ছিল। একসময় পেরি আর আমি হৈ

হট্টগোল এড়িয়ে চলতাম, একদম বরদাস্ত করতে পারতাম না। এক সময় আমরা দু'জনে কত জায়গায় যে এক সঙ্গে বেড়িয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। এমন পিকনিক করতে, আনন্দ-ফুর্তি করতেও দুজনে একই শহরে চলে যেতাম। তারপরই পরিস্থিতি অন্য রকম হয়ে গেল। মারিয়ানা নামে একটা মেয়ে কোত্থেকে উড়ে বসল বুঝতেই পারলাম না। পেরি তার আয়ত চোখের কপট চাউনি দেখে একেবারে মজে গেল।

আমাদের বন্ধুত্বের বাঁধন ঢিলে হতে হতে এক সময় আমরা পরস্পরের কাছ থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। সবচেয়ে বেশী আশ্চর্য হলাম যখন দেখলাম পেরি তার বিয়েতে নিমন্ত্রণ করা তো দূরের ব্যাপার আমাকে জানাল না পর্যন্ত! নতুন বউ হয়ত নিঃসন্দেহ হয়েছিল, মার্শাল বাককে জোয়ালে জুড়ে না দিয়ে একটা বলদ দিয়ে লাঙল টানাচ্ছে জমি-চাষ বেশী ভাল হবে। তাই দীর্ঘ দু'মাস আমার আর পেরির একবারও মুখোমুখি দেখা হয়নি।

তার পরের ঘটনা। একদিন আমি শহরতলীর পথ পাড়ি দেবার সময় দেখলাম, একজন পথের ধারের একটা বাড়ির উঠোনে গোলাপ গাছে জল দিচ্ছে। দেখেই লোকটা পরিচিত বলেই মনে হল। কিন্তু কোথায়, কোন্ পরিস্থিতিতে পরিচয় হয়েছিল। থমকে দাঁড়িয়ে অনুসন্ধিৎসু নজরে লক্ষ্য করতে লাগলাম। আপন মনেই বলে উঠলাম—না, এ পেরি রাউস্ট্রি হতেই পারে না। যেন বিয়ের জালে আটকা-পড়া জেলি মাছে রূপান্তরিত জীব ছাড়া একে অন্য কিছুই ভাবতে পারলাম না।

মনে হল, মারিয়ানা হয়ত বা লোকটাকে খুন করে ফেলেছে। দেখতে তো ভালই লাগছে। তবে পায়ে জুতো আর গলায় একটা সাদা কলার উঠেছে। ভাবে মনে হল, হয়ত এখনই ভাল-ভাল কথা বলতে শুরু করবে, ট্যাক্স দেবে, কিছু পান করার সময় কেড়ে আঙুলটা এগিয়ে দেবে—হায়! মানুষটা এমন আস্ত একটা ভেড়া বনে গেছে! কারবারী মহলে হয়ত একজন কেউকেটাই বনে গেছে। তবুও পেরিকে এ অবস্থায় দেখে আমি মোটেই স্বস্তি পেলাম না।

সদর-দরজা পর্যন্ত এসে সে করমর্দনের মাধ্যমে স্বাগত জানাল। আমি অন্তরের ঘৃণা চেপে রেখে বললাম—কিছু মনে করবেন না, আপনিই কি মিঃ রাউস্ট্রি? মনে এক সময় সৌভাগ্যবশত আপনার সঙ্গলাভ—তবে যদি নিতান্তই আমার ভুল না হয়ে থাকে।

আরে ধ্যুৎ! এসব বাতেলা ছেড়ে সাফ-সাফ কথা বল। পেরি রাউস্ট্রি নম্র স্বরেই কথাটা বলল—আমি তো এটাই আশংকা করেছিলাম।

এবার আমি নিজের মনকে শক্ত করেই বললাম—ভাল কথা, শোন তবে অদৃষ্ট বিড়ম্বিত, ঘৃণিত পোষা কুত্তা। কার জন্য, কেন এসব করছ, বলতে পার? তোমাকে দেখে তো মালুম হচ্ছে, গৃহপালিত জীব হয়ে গেছ। কাঠের বাড়ি পাহারা দেওয়া আর জুড়ির আসনে বসাই তোমার কাজ। তুমি কিন্তু এক সময় একজন মানুষ ছিলে পেরি। তোমার এসব কাজকে চিরদিনই কু নজরে, খারাপ চোখে দেখেছি। বাইরে, উন্মুক্ত আকাশের নিচে না থেকে বাড়ির ভেতরে গিয়ে ঘরদোর সাজানো গোছানো আর ঘড়িতে দম্ দেওয়া প্রভৃতি কাজে গিয়ে যোগ দিচ্ছ না কেন? কে বলতে পারে, একটা খরগোশ এসে তোমার পায়ে কুটুস করে কামড়ে দিলে।

সে কিন্তু স্বাভাবিক গলায়ই বলল—শোন মার্শাল বাক, তোমার ঠিক মাথায় ঢুকছে না। বিয়ে থার পর একটু-আধটু বদলে যেতেই হয়। বিবাহিত পুরুষের পক্ষে তোমার মত হৈ চৈ নিয়ে মেতে থাকা সম্ভব হয় না। শহরের পথে আর গলিতে-গলিতে চক্কর খেতে সময়ের অপব্যবহার করা কোন কাজের কথাই নয়।

দীর্ঘশ্বাস ফেলেই হয়ত আমি বলে উঠলাম—আমি কিন্তু আজকের এ নিরীহ মেষ শাবকটাকেই অহেতুক হৈ হট্টগোলকারী জীবই জানতাম। আমি কিন্তু ভুলেও ভাবিনি পেরি, তোমার মত উঁচু দরের একজন মানুষ এরকম নগণ্য মানুষের ভগ্নাংশে পরিণত হবে। আর ব্বাস! এতক্ষণ তো চোখে পড়েনি, তোমার গলায় একটা নেকটাইও যে ঝুলছে! আর এমন সব কথা বলছ যা কেবল কোন দোকানদার বা মেয়েমানুষের মুখেই মানায়। তোমাকে দেখে আমার কি সত্যি মনে হচ্ছে, একটা ছাতা ঝুলিয়ে আর গেলিস পরে রাত্রে বাড়ি ফিরে চলেছ।

ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে পেরি বলল—সত্যি বলছি মার্শাল বাক, আমার মনে হয় ছোটখাটো মেয়ে মানুষটা আমার কিছু পরিবর্তন, মানে উন্নতি বিধানই করেছে। তুমি বুঝছ না,

বিয়ের একটা রাত্রেও বাইরে কাটানো তো দূরের ব্যাপার, চার দেওয়ালের বাইরেই আমি যাই নি।

আমি পেরির সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে কথাবার্তা বললাম। সত্যি কথা বলতে কি, অন্য কথার ফাঁকে সে আমাকে তার টমেটোর উৎপাদন আর কৃষি ফার্মের কাণ্ডকারখানার কথা জোর করেই কম করে দু'বার আমার কাছে বলে ফেলল।

ক্রমে পেরির মধ্যে বুদ্ধির ঝিলিক উঁকি মারতে লাগল। সে মনের কথা আর চেপে রাখতে না পেরে বলেই ফেলল—মার্শাল বাক, তোমার কাছে বলতে লজ্জা নেই, মাঝে-মধ্যে কেমন একঘেয়ে বিরক্তিকর তো অবশ্যই লাগে। তবে ছোটখাটো মেয়ে মানুষটাকে নিয়ে ঘর বেঁধে আমি সুখী নই এমন কথাও জোর দিয়ে বলতে পারব না। আর এ-তো সত্য, একজন পুরুষের পক্ষে একটু-আধটু উত্তেজনারও তো দরকার আছে। তবে খোলসা করেই বলি—আজ বিকেলে মারিয়ানা যেন কার সঙ্গে দেখা করার জন্য বাড়ির বাইরে গেছে। রাত্রি সাতটার পর আর ঘরমুখো হচ্ছে না। আমাদের কাছে সময়সীমা 'সাতটা'। আমরা উভয়ে না থাকলে কোনদিনই নির্দিষ্ট ওই সময়সীমা, মানে সাতটার বেশী বাইরে থাকি না। আঃ তোমাকে পেয়ে আমার ভেতরটায় খুশির জোয়ার বইছে। আমরা দু'জনে একটু আনন্দ ফুর্তি করলে কেমন হয়, বল তো? আমি কিন্তু খুব মজাই পাব।

বুড়ো শালিকটার কথায় আমি সোল্লাসে হাততালি দিতে লাগলাম। আমি হাসতে হাসতেই বললাম—ওহে, শুকিয়ে কাঠ হওয়া বুড়ো কুমীর কাহাকার, টুপিটা অন্তত মাথায় চাপাও। বুঝতে পারছি, এখনও তোমার অপমৃত্যু ঘটেনি। পচা পাঁকে তলিয়ে গেলেও মনুষ্যত্ব এখনও তোমার মধ্যে কিছুটা আছে। এ শহরটাকে চিরে টুকরো টুকরো করে আমরা কোন শক্তির জোরে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া অব্যাহত রাখা। আরে হতচ্ছাড়া বুড়ো দামড়া, তোমার সুহৃদ মার্শাল বাককে সঙ্গে করে যদি আগের মতই আর একবার পাপের কাদায় গড়াগড়ি দাও, তবে এ বয়সেও তোমার মাথায় আবার কচি কচি শিং বেরোবে, শুনে রাখ।

বহুৎ আচ্ছা! কিন্তু সাতটার মধ্যে আমাকে বাড়ি ফিরে আসতে হবে, খেয়াল থাকে যেন।

আরে তাই ফিরো। স্বগতোক্তি করলাম—মদের ভাটির মালিকের পাল্লায় পড়লে বৌয়ের আঁচল ধরা পেরি যে কোন্ সাতটা বাজাবে তা তো আমিই জানি।

ডিপোর কাছে পুরনো সে বাড়িটার 'গ্রে মিউল' ম্যালুনে যাওয়াই স্থির হল।

আমি বললাম যে বাড়ির কোন্ ভাটিখানায় যাবে, স্থির কর। পেরি বলল—এক কাজ করা যাক, 'সার্সাপারিলা'য় যাওয়া যাক।

ব্যস, আর এক মুহূর্তও দেরী না করে আমরা ঘোড়া হাঁকিয়ে পাশাপাশি গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে ছুটতে লাগলাম।

ভাটিখানার দরজায় পৌঁছে পেরিকে বললাম—বন্ধু, যা প্রাণে চায় কর, কিন্তু বেশী হৈ হট্টগোল করে ভাটিখানার পরিবেশকের মাথাটা ঘোলাপ্রান্ত করে দিও না যেন। তার হয়ত বুকের ব্যামো আছে। নড়বড়ে চেয়ারে বসে আমরা মালের বোতলের ছিপি খুলে বসলাম। পেরি একের পর এক গ্লাস গলায় ঢালতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার জিভ জড়িয়ে আসতে লাগল।

তার ভাবভঙ্গী দেখে আমি বুঝতে পারলাম, সে বহুদিনের একটা সাধ আজ মেটাতে আগ্রহী হয়ে পড়েছে।

অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে পেরি বলল—বাক, আমার সাধটার কথা তোমাকে খোলসা করেই বলছি, আমার একান্ত ইচ্ছা, আজকের রাত্রিটা স্মরণীয় হয়ে থাক। বহুদিন ধরে পায়ে বেড়ি পরে ঘরে বন্দী জীবন যাপন করেছি। আজ সে বেড়ি খুলে মুক্ত হতে চাই। চাই পুরনো সে দিনে ফিরে যেতে। পিছনের কামরাটায় গিয়ে সাড়ে ছটা পর্যন্ত চেকভ খেলে কাটিয়ে দেব।

পুরনো পরিচারক মাইকই আমাদের দেখভালের দায়িত্ব আছে। আমি তাকে ডেকে বললাম ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে বলছি, এসব ব্যাপার যেন কারো কাছে ফাঁস কোরো না।

মাইক নীরব চাহনি মেলে তাকিয়ে রইল।

আমি বলে চললাম—শোন, পেরির আগেকার সেসব কাণ্ডকারখানার কথা তো আর তোমার অজানা নয়। তার আগেকার সে জ্বরটাই এখন লেগেই আছে, সারে নি। ডাক্তার তাকে একটু আনন্দ

ফুর্তিতে রাখার পরামর্শ দিয়েছে।

পেরি উত্তেজনার শিকার হয়ে মাইক-এর কাছ থেকে চেকার-বোর্ড আর ঘুঁটিগুলো চেয়ে নিল।

আমি পেরির উত্তেজনা প্রশমিত করার জন্য তাকে নিয়ে পিছনের ঘরটায় চলে গেলাম। দরজায় খিল আটকাবার পূর্ব মুহূর্তে বেশ কড়া সুরেই মাইককে বললাম—খবরদার! কারো কাছেই যদি বল যে, তুমি বাককে দেখেছ 'মার্সপারিলা'য় বা তার দলের কোন লোকের চেকার বোর্ড নিয়ে মেতেছে, তবে কিন্তু ওই কানটার মত এ কানটাও টেনে ইয়া লম্বা করে দেব, মনে থাকে যেন।

মাইক ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে আমি ব্যস্ত হাতে দরজার খিলটা আটকে দিলাম তারপর পেরি আর আমি চেকার-বোর্ড নিয়ে বসে পড়লাম।

ঘুটি চালতে চালতে আমি ভাবতে লাগলাম—মানুষের কেন এমনটা হয়? দুনিয়ার সব বিবাহিত পুরুষরাই কি বোকার মত আনন্দ ফুর্তির ইচ্ছাটাকে গলা টিপে হত্যা করে ফেলে? তারা মদের গ্লাস ছোঁয় না, বাঘকে পোষ মানাতে উৎসাহী হয় না, এখন লড়াইয়েও প্রবৃত্ত হয় না। তা-ই যদি হয় তবে কেন সাধ করে বিয়ের পিঁড়িতে বসে?

আমি প্রতি মুহূর্তে পেরির ওপর নজর রেখে বুঝতে পারলাম, সে খুশিতে একেবারে ডগমগ হয়ে পড়েছে।

সে সোল্লাসে বলে উঠল—আমার পুরনো বন্ধু মার্শালবাক, আজকের রাতটাই কি আমাদের কাছে সবচেয়ে আনন্দ মুখর রাত নয়। বিয়ের পর প্রায় সর্বক্ষণ বাড়িতে, চার দেওয়ালে ঘেরা জেলখানার মধ্যেই আটকা পড়ে রয়েছি। অনেকদিন প্রাণ খুলে মাতলামি পর্যন্ত করতে পারিনি। উফ্! কী দুঃসহ জীবন!

হ্যাঁ, সে 'মাতলামি' শব্দটাই ব্যবহার করেছে। ভাটিখানার পিছনের ঘরে বসে চেকার খেলাটাকে সে হয়ত ন্যায়-নীতি বহির্ভূত কাজ বলেই মনে করেছে।

বার কয়েক ঘুঁটি চালার পরই পেরি একবার করে ঘড়ির দিকে তাকায় আর বলে—বাক, তুমি তো জানই সাতটার মধ্যে আমাকে বাড়ি ফিরে যেতেই হবে।

আরে সে না হয় যেয়ো, এখন তো ঘুঁটি চাল। এখানকার হৈ হট্টগোল, মানে উত্তেজনায় আমার তো প্রাণ ওষ্ঠাগত হতে চলেছে।

তখন হয ঘড়িতে সাড়ে ছটা বাজে। বাইরে, রাস্তা থেকে হঠাৎ হৈ হট্টগোলের আওয়াজ কানে এল। জোর চিৎকার আর পিস্তলের গুলির আওয়াজ। আর সে সঙ্গে কয়েকটা ঘোড়ার খুরের গম্ভীর আওয়াজও কানে এল।

আমি উৎকর্ণ হয়ে কয়েক মুহূর্ত লক্ষ্য করার পর বলে উঠলাম—কি হয়েছে? ওটা কিসের চিৎকার চেঁচামেচি?

পেরি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল—ওটা কিছু না, বাইরে একটা বাজে হৈ চৈ—এবার তোমার চাল। ঠিক আর একটা হাত খেলার মত সময়ই আমরা পাব।

আমি চোখে-মুখে বিস্ময় ও আতঙ্কের ছাপ এঁকে বললাম—একবারটি জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখে আসি, ব্যাপারটা কি? একদিকে রাজার ওপর চড়াও হওয়া, আর অন্য দিকে বাইরে আকস্মিক গোলাগুলি, দু'-দুটো দিক কোন মানুষের পক্ষে কি একা সামলানো সম্ভব!

আমি এগিয়ে গিয়ে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টিপাত করতে পুরো ব্যাপারটা আমার সামনে ছবির মত স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল।

ট্রিম্বল সদলবলে চড়াও হয়ে আচমকা এলোমেলো ভাবে গুলি চালাতে শুরু করেছে। ট্রিম্বল টেক্সাসের সবচেয়ে বড় ঘোড়া চোরদের সর্দার। তাদের লক্ষ্য গ্রেমিউল। চোখের পলকে তারা নজরের বাইরে চলে গেল। ভাবগতিক দেখে মনে হল তারা সদর দরজার দিকেই ধেয়ে গেছে। ব্যস, দমাদম্ গুলির আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল। ভাটিখানার পিছন দিককার বড় আয়নাটা আর অনেকগুলো বোতল ভাঙার শব্দ শুনতে পেলাম। উঁকি দিয়ে দেখলাম, মাইক এ্যাপ্রন গায়েই নেকড়ের মত ছুটোছুটি দাপাদাপি করছে। আর চারদিক থেকে অনবরত গুলির আওয়াজ ভেসে আসছে। ব্যস, পুরো দলটা এবার ভেতরে ঢুকে এল। মদ-মাংস যা পেল হালুম হালুম করে খেতে লেগে গেল।

পেরি আর আমার দলটাকে চিনি, আর তারাও আমাকে আগে থাকতেই চেনে। পেরির বিয়ের বছরখানেক আগে আমরা দু'জনই একই বন-রক্ষকের দলে কাজ করতাম। সান-মিগুয়েলের কাছাকাছি এক স্থানে এ দলটার সঙ্গে আমাদের জোর লড়াই বাঁধে। তাদের ঘায়েল করে দলের সর্দার কেন ট্রিম্বল আর অন্য দু'জনকে খুনের দায়ে পিঠমোড়া করে বেঁধে নিয়ে এসেছিলাম।

পেরি বেরোবার জন্য উসখুস করতে থাকলে আমি বললাম আরে বলছ কি! এখন কিছুতেই আমাদের বাইরে যাওয়া ঠিক হবে না। তারা চলে না যাওয়া পর্যন্ত এখানেই আমাদের গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে।

পেরি ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বলল—সাতটা বাজতে আর মাত্র পঁচিশ মিনিট বাকি। আর একটা চাল তবে হয়েই যাক। ভুলে যেয়ো না, সাতটায় কিন্তু আমাকে বাড়ি পৌঁছতেই হবে।

এদিকে ট্রিম্বল আর তার দলের গুণ্ডারা উৎপাত করেই চলেছে। আমরা উপায়ান্তর না দেখে আবার খেলায় মন দিলাম। তারা আমাদের দরজা খোলার জন্য দু'-তিনবার চেষ্টাও চালাল। খবর পেয়ে শহর মার্শাল হ্যাম গোমেট সদলবলে ছুটে এলেন। তারা ট্রিম্বলের দলের দু'-একজন গুণ্ডাকে ধরার চেষ্টা চালাতে লাগল।

পেরির কাছে আমি খেলায় এবারও হেরে গেলাম। সত্যি কথা স্বীকার করছি, সে আমাকে তিনটে খেলাতেই হারিয়ে দিয়েছে। তবে মন স্থির রেখে খেলতে পারলে হয়ত তিনটে খেলায় পরাজয় ঠেকাতে পারতাম। কিন্তু বিবাহিত বুড়ো দামড়াটা ঠাণ্ডা মাথাতেই প্রতিটা চাল দিয়ে জিতে গেল।

খেলা শেষ হতেই পেরি দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘড়ির ওপর চোখের মণি দুটো বুলিয়ে নিয়ে সে বলল—বাক, সময়টা খুব ভালই কাটল, কি বল? কিন্তু আমাকে যে এবার যেতেই হবে। সাতটা বাজতে আর মাত্র পনের মিনিট বাকি। সাতটার মধ্যে আমাকে বাড়ি ফিরতেই হবে, জানই তো।

তার হাবভাব দেখে মনে হল, সে বুঝি রসিকতা করছে। আমি গম্ভীর স্বরেই বললাম—আরে, ব্যস্ত হবার ব্যাপার নয়। শোন আধ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টার মধ্যেই তারা এখান থেকে কেটে পড়বে। আর তা যদি না-ও করে তবে নির্ঘাৎ মদের নেশায় বুঁদ হয়ে মেঝের ওপর গড়াগড়ি খাবে। বিয়ে করেছ বলে তো এমন কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে বসনি যে, জেনে শুনে বন্দুকের গুলির মুখে গিয়ে পড়বে, আত্মহত্যা করতে চাইবে। কথাটা বলেই আমি সরবে হাসতে লাগলাম।

মুখ কাচুমাচু করে পেরি এবার বলল—আরে বন্ধু, একবার বাড়ি ফিরতে আধ ঘণ্টা দেরি করে ফেলেছিলাম। ব্যস, মারিয়ানার পথেই মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। আমার অপেক্ষাতেই সে দাঁড়িয়েছিল। বাক, তার তখনকার মূর্তি যদি দেখতে—কিন্তু কিছুই তুমি বুঝতে পারবে না। ব্যস, সেই শেষবার। তারপর আর কোনদিনই বাড়ি ফিরতে দেরি করিনি। যাক, এবার কিন্তু তোমার কাছ থেকে বিদায় নিতেই হচ্ছে।

আমি যন্ত্রচালিতের মত লাফিয়ে দরজা আগলে দাঁড়ালাম। বললাম—ওহে বিবাহিত বুড়ো দামড়া, ধর্মযাজক যে মুহূর্তে তোমাকে বড়শিতে গেঁথে দিয়েছিলেন তখনই তোমার নামকরণ করেছিলেন আহাম্মক, জান কি? আচ্ছা, তোমার মাথায় কি বুদ্ধিমান মানুষের মত একটু-আধটু চিন্তা ভাবনা করতে পার না? সদর-দরজার কাছে দশটারও বেশি ষণ্ডামার্কা লোক দাঁড়িয়ে। মদ গিলে গিয়ে সবাই খুনী বনে গেছে। দু' পা যেতে না যেতেই তারা তোমাকে মদের মতই গিলে ফেলবে, বুঝতে পারছ বিবাহিত বুড়ো দামড়া। অন্তত এ মুহূর্তের মত একটু বুদ্ধি খেলাও, জান বাঁচাবার মত সুযোগের অপেক্ষায় থাক।

কিন্তু পালের গোদা ওই আহাম্মকটা দ্বারের পোষা ময়নার মত একই গানা গেয়ে চলেছে—সাতটার আগেই আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে। নইলে আমার গিন্নি মারিয়ানা আমাকে খুঁজতে বেরোবে। ঝট করে চাকারের টেবিল থেকে উঠে পড়ে সে এবার বলতে লাগল—গুণ্ডা ট্রিম্বলের দলের ভেতর দিয়েই আমি চলে যাব। যে করেই হোক সাতটার আগেই আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে। পাঁচটার মধ্যে তিনটে খেলায়ই আমার জিত হয়েছে, মনে রেখো। আরও কিছু সময় হয়ত খেলা যেত, কিন্তু মারিয়ানা আবার ওই দিকে—

আমি বাধা দিয়ে গর্জে উঠলাম—চুপ্ কর বুড়ো দামড়া! আমি বিয়ে না করলে বোকামিতে

কমতি নই। চারটে থেকে একটা নিয়ে বাকি থাকে তিনটে—এ পর্যন্ত বলে আমি টেবিলের দুটো পায়া দুম্ করে ভেঙে হাতে নিয়ে নিলাম। খেঁকিয়ে ওঠলাম—শোন, সাতটার মধ্যেই আমরা বাড়ি ফিরে যাব—সে বাড়ির ঠিকানা স্বর্গ, নরক বা মর্ত্য যেখানেই হোক না কেন। চল বিবাহিত বুড়ো দামড়া, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসছি।

এক হেঁচকা টানে দরজাটা খুলে ফটকের অর্ধেক পথ যেতে না যেতেই আমরা গুণ্ডাগুলোর নজরে পড়ে গেলাম। কোন্ আড়াল থেকে যেন বেরি ট্রিম্বল গুলি খাওয়া বাঘের মত গর্জে উঠল—ওই বাক ক্যাপারটন হতচ্ছাড়া এখানে কি করে উদয় হল।

কথাটা বলেই সে পিস্তলের ঘোড়া টিপল। কিন্তু গুলিটা আমাদের কানের কাছে বাতাস বুলিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল। গুলিটা ব্যর্থ হওয়ায় সে আক্ষেপে ফেটে পড়ল। কারণ দক্ষিণ অঞ্চলের পিস্তল আর বন্দুকবাজদের মধ্যে সেই যে সবার সেরা। কিন্তু ঘরটা এত ঘন ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন যে, পিস্তলের নিশানা করা বাস্তবিকই কঠিন সমস্যা। পেরি আর আমি টেবিলের পায়া দুটো দেয়ালের গায়ে বার বার জোরসে পেটাতে লাগলাম। পর মুহূর্তেই ঝড়ের বেগে ছুটে গিয়ে বেরি ট্রিম্বলের দলের একজনের হাত থেকে আচমকা উইনচেষ্টার বন্দুকটা ছিনিয়ে নিলাম। ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে গুলি খাওয়া বাঘের মত তর্জন গর্জন শুরু করে দিলাম। চোখের পলকে শয়তান বেরি ট্রিম্বলের হিসাব চুকিয়ে দিলাম।

মুহূর্তমাত্র দেরি না করে পেরি আমি উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে মোড়ের মাথায় হাজির হলাম। আম ভুলেও ভাবতে পারি নি ওই ফাঁদটা থেকে বেরিয়ে যেতে পারব। তবে ওই বিবাহিত আহাম্মক দামড়াটার কাছে হার মানতে আমি রাজি নই। পেরির ধারণা, চেকার খেলাটাই শ্রেষ্ঠতম ঘটনা। আর আমার মতে? টেবিলে পায়া দুটো ভেঙে অভিযান চালানোর চেয়ে বড় ব্যাপার আর কিছুই হতে পারে না।

পেরি ব্যস্ত কণ্ঠে আওড়াতে লাগল—জোরে, আরও জোরে পা চালাও! সাতটা বাজতে আর মাত্র দু' মিনিট বাকি। যে করেই হোক সাতটাতে আমাকে বাড়ি পৌঁছতে হবেই!

আমি রীতিমত ধমকে উঠলাম—ধ্যুৎ ছাই! বকবকানি থামাও তো! সাতটার মধ্যেই আমাকে কারোনারের আদালতে পৌঁছতে হবেই—প্রধান সাক্ষী আমি। কাজটা না করে আমি কোথাও যাব না।

আমরা পেরির ছোট বাড়িটার গা দিয়ে যাবার সময় সাতটা বেজে পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে। বাড়ির দরজায় বিষণ্নমুখে মারিয়ানাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। সে প্রথমে আমাদের দেখতে পায় নি। কারণ, তার দৃষ্টি ছিল অন্য দিকে। কিন্তু যখন দেখতে পেল তখন কালনাগিনীর মত ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল যা আমার গা-বেয়ে এগিয়ে গেল, তার এখনকার অবস্থা একমাত্র বাছুর হারানো গরুর সঙ্গেই তুলনা করা যেতে পারে। সে ফোঁস করেই উঠল—একী পেরি! এত দেরি করলে যে!

নিতান্ত অপরাধীর মত পেরি জবাব দিল—হ্যাঁ, পাঁচটা মিনিট। আসলে বাক আর আমি চেকার খেলায় মেতে গিয়েছিলাম।

তারপর পেরি মারিয়ানার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। মারিয়ানা আমাকে অভ্যর্থনা করে ঘরে নিয়ে গেল।

সত্যি বলছি, সেদিন সে স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে আমি অনেকটা সময় কাটিয়েছিলাম। কথা প্রসঙ্গে তাদের বললাম—খেলার সময় টেবিলের পায়া দুটো যখন ভেঙে গেল তখনকার সে পরিস্থিতিটার তো তুলনাই হয় না! আরেব্বাস! পেরিকে তো কথা দিয়েছি ওই ব্যাপারটা সম্বন্ধে মারিয়ানাকে একটা কথাও বলব না।

মার্শাল বাক মুখ খুলল—ঘটনাটা ঘটার পর ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভাবনা চিন্তা করেছি। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমার খুবই খটকা লেগেছে। সেটা আমার মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না।

আমি শেষ সিগারেটটা পাকিয়ে মার্শাল বাকের হাতে দিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকালাম। ছোট্ট করে বললাম—কোন্ ব্যাপারটার কথা বলতে চাইছ?

মার্শাল বাক ঠোঁট থেকে সিগারেটটা নামিয়ে বলে উঠল— সেটাই তো বলতে চাইছি। পেরি

নিরাপদে বাড়ি ফেরার পর ছোটখাটো মহিলা মারিয়ানা এমন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায় যা দেখে আমাকে ভাবতেই হল—তার চাউনিটা আমাদের সার্সাপরিলা, চেকার—আর সবকিছুকে ছাপিয়ে গেছে, বেশী দামী। আর সে খেলায় বিবাহিত বুড়ো দামড়াটাকে কেনই বা পেরি বাউস্ট্রি বলে সম্বোধন করা হল না।

দ্য গার্ডিয়ান অব দ্য অ্যাকোল্যাড

ওয়েমাথ ব্যাংক-এর পরিবারে কাকা বুশরড একজন রীতিমত গুরুত্বপূর্ণ লোক। সে স্থাবর অস্থাবর, বিশ্বস্ত সেবক আর সুহৃদ হিসাবে দীর্ঘ ষাট-ষাটটা বছর ওয়েমাথ সংস্থার একনিষ্ঠভাবে সেবা করে আসছে। তার গায়ের রং, অর্থাৎ তার বাইরেটা কালো বটে কিন্তু তার মনটা লেজার খাতার খালি পাতার মতই সাদা। তার চোখে ওয়েমাথ ব্যাংকই একমাত্র উল্লেখযোগ্য সংস্থা। ব্যাংকে তার পরিচয় একজন দারোয়ান আর ভারপ্রাপ্ত প্রধান রক্ষী—উভয়ই।

দক্ষিণ উপত্যকায় পার্বত্য অঞ্চলে ওয়েমাশ অবস্থিত, এখানে তিনটে ব্যাংক আছে। তাদের মধ্যে দুটোর অবস্থা খুবই সঙ্গীন। দক্ষতার অভাবে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। আর তৃতীয় ব্যাংকটার পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে সুদক্ষ ওয়েমাথ পরিবার আর বুশরড কাকা তো আছেই।

ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট রবার্ট ওয়েমাথ। ওয়েমাথ পরিবারের পুরনো লালটালির বাড়িতে তিনি থাকেন। আর থাকে তার বিধবা মেয়ে মিসেস ভেসি। সবাই তাকে 'মিস লেটি' সম্বোধন করে। আর গাই ও নান নামে তার দুটো সন্তানও তার সঙ্গেই থাকে।

আর উঠানে, অদূরে একটা ভাঙাচোরা বাড়িতে কাকা বুশরড তার বৌ কাকি, সলিন্ডিকে নিয়ে থাকে।

পথের ধারের অত্যাধুনিক ও সুসজ্জিত একটা বাড়িতে ব্যাংকের ক্যাশিয়ার মিঃ উইলিয়ম ওয়েমাথ থাকে।

মিঃ রবার্ট-এর বয়স ষাট বছর। স্থূলকায়, লম্বা চুল আর একজোড়া নীল চোখওয়ালা লোক। তার আর পরিচয় হচ্ছে একজন উদার হৃদয়, দয়ার অবতার, মেজাজী আর মুখে যুবকের হাসির ঝিলিক সর্বদা লেগেই আছে। তর্জন গর্জন করলেও কারো ওপর চড়াও হন না।

আর মিঃ উইলিয়ম একজন নরম স্বভাবের মানুষ। আচার ব্যবহার বা কোন কাজে সচরাচর ভুল করে না। সবসময়ই কাজের মধ্যে ডুবে থাকে।

ওয়েমাথদের নিয়েই ওয়েমাথভিল পরিবার গড়ে উঠেছে। সবার শ্রদ্ধা লাভ করা তাদের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া এক বিশেষ সম্পদ।

কাকা বুশরড ব্যাংকের একজন বিশ্বস্ত রক্ষী, সংবাদবাহক। আবার প্রজা ও অভিভাবকও বটে, মিঃ উইলিয়ম আর মিঃ রবার্টের মত তার পকেটেও ভল্টের একটা চাবি থাকে। অধিকাংশ সময়ই ভল্টে জড়ো করে রাখা হয় বস্তা বোঝাই রৌপ্যমুদ্রা দশ, পনের অথবা পনের হাজার ডলার। সত্যি কথা বলতে কি, কাকা বুশরড-এর জিম্মায় সবকিছুই নিরাপদ। আর তাকেও একজন সত্যিকারের ওয়েমাথ ধরে নেওয়া যেতে পারে।

সম্প্রতি কাকা বুশরড-এর জীবনে একটু-আধটু হাঙ্গামা দেখা দিয়েছে। আর সেটা ঘটেছে মার্স রবার্টকে কেন্দ্র করে। খবর নিয়ে জানা গেছে প্রায় এক বছর যাবৎ মাত্রাতিরিক্ত মদ খাচ্ছে। গোড়ার দিকে এমন পরিমাণে মদ খেত যাতে মাতলামি করার মত পরিস্থিতি হত না। তারপর ক্রমেই তার পরিমাণ উর্দ্ধমুখী হতে লাগল। সম্প্রতি দিনে দু'বার করে সে মার্চেন্টস অ্যান্ড প্ল্যান্টার্স হোটেলে গিয়ে গলা অবধি মদ গিলে আসে। হয়ত এরই ফলে তাঁর স্বাভাবিক জ্ঞান-বুদ্ধি এবং ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতাও কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। মিঃ উইলিয়াম ওয়েমাথ পরিবারের একজন হলেও তার অভিজ্ঞতা ও ব্যবসায়িক বুদ্ধিও তেমন পাকা নয়। বহু চেষ্টা করেই কারবারের লোকসানের গতিকে রোধ করতে পারল না। আর এরই ফলে সে ব্যাংকের সঞ্চয়ের পরিমাণ ছ' থেকে নামতে নামতে

পাঁচের অঙ্কে এসে ঠেকেছে। আর অবিবেচকের মত ঋণ দিতে দিতে ফেরৎযোগ্য অর্থের পরিমাণ ক্রমেই উর্দ্ধমুখী হতে লাগল। রবার্ট যে প্রায় সর্বক্ষণ মদ গিলতে থাকে তা দিয়ে প্রতিষ্ঠানের কেউই কিছু বলে না। কারো কারো মতে তার মদের নেশার জন্যই তার স্ত্রীকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। তার উগ্র মেজাজের জন্য তাকে কেউ কিছু বলতে দ্বিধা করে। এ পরিবর্তনটুকু মিস লেটি আর তার শিশুদুটোর নজর এড়াল না। আর এর জন্য কষ্টও কম পেল না। কাকা বুশরড মিঃ রবার্ট-এর আচরণে ভেতরে ভেতরে ক্ষুব্ধ ও উদ্বিগ্ন হল। কিন্তু তাকে বাধা দেবার মত মানসিক দৃঢ়তা তার নেই, অবশ্য মার্স আর সে এক সময় দু'জন বন্ধুর মত বড় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বুশরড-এর জীবনে বড় একটা সঙ্কটের সম্ভাবনা দেখা দিল।

মিঃ বরার্ট-এর আবার মাছ ধরার বাতিক আছে। মরশুমের সময় একটু-আধটু ফুসরত পেলে ছিপ-হাতে বেরিয়ে পড়ে। তাই মাছ ধরার সুযোগ এসেছে খবর পাওয়ামাত্র সে জানিয়ে দিল হ্রদ অঞ্চলে মাছ ধরতে যাচ্ছে।

কাকা বুশরড এমন 'সন্তানদল'-এর কোষাধ্যক্ষের কাজে নিযুক্ত। সে যখন, যে সংস্থার সদস্যপত্র গ্রহণ করে তারাই তাকে কোষাধ্যক্ষের পদে বহাল করে দেয়। কিন্তু সবার কাছে তার পরিচয় ওয়েমাথ ব্যাংক-এর মিঃ বুশরড বলে। অতএব কোষাধ্যক্ষের পদও অন্য কাউকে দেওয়া সম্ভব নয়।

মাছ ধরতে যাওয়ার পরিকল্পনার কথা মিঃ রবার্ট যেদিন ঘোষণা করল সে রাত্রেই বারোটায় কাকা বুশরড-এর ঘুম ভেঙে গেল। এক লাফে বিছানা ছেড়ে নেমে বলল যে, তাকে এখনই ব্যাংকে যেতে হবে। কারণ 'সন্তানদল'-এর পাশবই আনতে ভুলে গেছে, ব্যাংকেই পড়ে আছে হিসাব রক্ষক সেদিন হিসাব মেলাবার পর বাতিল চেকগুলোকে দুটো ইলাস্টিক জড়িয়ে রেখেছে। আর যত পাশবই থাকে সে একটা ইলাস্টিক দিয়েই জড়িয়ে রাখে।

কাকী মালিন্ডী এত রাতে তাকে ব্যাংকে না যেতে বলে বাধা দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু কর্তব্যকর্মে অবহেলা করে হাত-পা গুটিয়ে ঘরে বসে থাকতে পারল না। সে বলল—আমি সিস্টার আডালিন হস্‌কিন্সকে বলেছিলাম, কাল মর্শালি সাতটায় এসে পাশ বইটা নিয়ে গিয়ে পরিচালন সভায় পৌঁছে দেবার জন্য। আবার ফেরার সময় সেটা এখানে নিয়ে আসে যেন।

কাকা বুশরড তার পুরনো বাদামী রঙের সুটটা পরে বেরোবার জন্য তৈরী হল। এবার বাদাম কাঠের লাঠিটা হাতে নিয়ে নির্জন নিরালা পথ ধরে হাঁটতে লাগল। সে একের পাশের বড় দরজাটা খুলে ব্যাংকে ঢুকে গোপনীয় আলোচনার ছোট্ট ঘরটায় পা দিতেই পাশবইটা পেয়ে গেল।

পাশবইটা নিয়ে বাড়িতে ফেরার প্রস্তুতি নেওয়া মাত্র সদর দরজার তালার মৃদু আওয়াজ তার কানে এল। সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার মনে হল, কে যেন লম্বালম্বা পায়ে ঘরে ঢুকল। খুব সাবধানে দরজাটা বন্ধ করে দিল। লোহার রেলিং-এর দরজা ডিঙিয়ে গণনার ঘরে চলে গেল।

ব্যাংকের এ স্থানটা সরু। এ ফালি পথের সাহায্যে পিছনের ঘরটার সঙ্গে সংযোগ সাধন করেছে। এখন সেটা গাঢ় অন্ধকার। কাকা বুশরড খুবই সন্তর্পণে লাঠিটা ভর দিয়ে সামান্য পথ যেতেই অবাঞ্ছিত সে লোকটাকে দেখতে পেল। অন্ধকারেও তাকে সনাক্ত করতে পারল। সে নিঃসন্দেহ হল যে, অবাঞ্ছিত আগন্তুক ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ছাড়া আর কেউ নয়।

বুড়ো বুশরড অন্ধকারে দাঁড়িয়ে প্রতিটা মুহূর্তের ওপর কড়া নজর রাখতে লাগল।

ভল্টের সুবিশাল দরজাটার বিপরীত দিকে সে দাঁড়িয়ে। মূল্যবান দলিল দস্তাবেজ, সোনাদানা আর কারেন্সী নোট প্রভৃতি যা কিছু সবই ভল্টের সিন্দুকের ভেতরে রক্ষিত আছে। আর আঠারো হাজার ডলারের রৌপ্যমুদ্রা হয়ত ভল্টের মেঝেতে আছে।

শিকারী বিড়ালের মত পা টিপে টিপে প্রেসিডেন্ট এগিয়ে গিয়ে চাবি ঘুরিয়ে ভল্টের দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকে গেলেন। তারপর আগের মতই সন্তর্পণে আবার দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন। মিনিট দুয়ের মধ্যে বড় একটা থলে হাতে নিয়ে তিনি ভল্টের বাইরে এলেন। ভল্টের তালাটা লাগিয়ে দিলেন।

কাকা বুশরড গোপন অন্তরাল থেকে পুরো ব্যাপারটা দেখতে লাগল। আতঙ্কে তার সর্বাঙ্গ থরথরিয়ে কাঁপতে লাগল।

প্রেসিডেন্ট মিঃ রবার্ট ভারী থলেটাকে নিয়ে যে পথে এসেছিলেন আবার সে পথেই চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে রাখতে ব্যাংক ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। সামনের দরজাটার আবার আগের মতই সন্তর্পণে চাবি ঘুরিয়ে তালাটা বন্ধ করলেন।

বুড়ো কাকা বুশরড-এর পা দুটো যেন পাথরের মত নিশ্চল-নিথর হয়ে গেল। ভল্ট আর সিন্দুক চোর যদি প্রেসিডেন্ট নিজে না হয়ে অন্য যেকোন লোক, যত শক্তিশালীই হোক না কেন সে নিজের বয়সের কথা ভুলে গিয়ে অবশ্যই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত ব্যাংকের সম্পত্তি রক্ষার তাগিদে, কর্তব্য রক্ষা করতে। কিন্তু পর মুহূর্তেই রক্ষী বুশরড-এর মন-প্রাণ যেন ডাকাতির চেয়ে ভয়ঙ্কর কোন অজানা আতঙ্কে যারপরনাই নির্যাতীত হচ্ছে। ওয়েমাথ-এর যশ-খ্যাতি পথের ধুলায় মিশে যেতে চলেছে—অপবাদের আতঙ্কই তাকে যেন গ্রাস করছে। প্রেসিডেন্ট মার্স রবার্ট ব্যাংক ডাকাতি করে গেলেন। একে ডাকাতি ছাড়া আর কোন্ আখ্যাই বা দেওয়া যেতে পারে।

কাকা বুশরড-এর ভাবনা-চিন্তা যেন ক্রমেই জট পাকিয়ে উঠতে লাগল। এবার এক এক করে বহু টুকরো টুকরো ঘটনা তার মনে পড়ে যেতে লাগল। মিঃ রবার্ট দিন দিনই অমিতাচারে মেতে উঠছিলেন। আর এ জন্যই তার মেজাজ সর্বদা খিটখিটে হয়ে থাকত। বর্তমানে তিনি একজন লুঠেরা। ঝট্ করে আত্মগোপন করে বসবেন। ব্যাংকের বাকি তহবিলের সঙ্গে তিনিও চম্পট দেবেন। আর এদিকে মিঃ উইলিয়াম, মিস লেটি, গাই ছোট্ট নান আর বুড়ো কাকা বুশরডকে যাবতীয় অপমান ও বদনাম গায়ে মাখতে হবে। এ কাজের আর কোন্ অর্থই বা হতে পারে? এতদিনে প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি সবই পথের ধুলোয় মিশে গেল।

মিনিট খানের নিশ্চল-নিথর পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে বুড়ো কাকা বুশরড এসব কথা ভাবল, পর মুহূর্তেই সে দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে নিজের মনকে বাঁধল।

সামনের দরজার দিকে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে সে গলা ছেড়ে আর্তনাদ করতে লাগল—হায় ঈশ্বর! এখানে এতসব মহৎ কাজের এমন পরিণতি! পৃথিবীর বুকে এমন কুৎসিৎ, এমন ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে গেল, ওয়েমাথ পরিবারটা শেষ পর্যন্ত ডাকাতের আখড়া হয়ে উঠল। মার্স রবার্ট দোহাই তোমার, এমন জঘন্য একটা কাজ কোরো না। আমি প্রাণপণে চেষ্টা করব তোমার পথ আগলাবার। তোমাকে আটকাবই। তুমি আমার মাথাটা গুলির আঘাতে উড়িতে দিতে পার সত্য, কিন্তু আমার যদি হিম্মতে কুলোয় তবে আমি তোমার পথ রোধ করবই।

বাত রোগে আক্রান্ত পা দুটোকে জোর করে টানতে টানতে, হাতের বাদাম কাঠের লাঠিটায় ভর দিয়ে বুড়ো কাকা বুশরড উর্দ্ধশ্বাসে স্টেশনের দিকে ছুটতে লাগল। স্টেশনে পৌঁছে সে দেখল, ব্যাংক প্রেসিডেন্ট মিঃ রবার্ট দালানের আড়ালে দাঁড়িয়ে ট্রেনের অপেক্ষায় আছেন। ব্যাংক থেকে নিয়ে আসা থলেটা হাতে ধরেই রেখেছেন।

ব্যাংক প্রেসিডেন্ট মিঃ মার্স রবার্ট যেখানে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে কুড়ি গজ দূরে অবস্থানরত কাকা বুশরড হঠাৎ মানসিক অস্থিরতা অনুভব করতে লাগল। যে কাজের জন্য সে ছুটে এসেছে তার প্রচণ্ড সাহসিকতা আর হঠকারিতা তাকে পুরোপুরি আচ্ছন্ন করে ফেলল। এখনও যদি সে পালিয়ে যেতে পারে তবে ওয়েমাথ বংশের ক্রোধের হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে যেত তবে সে যে সুখী হত এতে কোন সন্দেহই নেই। আবার এও মনে হল, সে যদি তার কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়, তার সেবাব্রতের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করে, তবে কি হবে?

কাকা বুশরড সামান্য এগিয়ে গিয়ে হাতের লাঠিটা বার কয়েক প্লাটফর্মের শক্ত পাথরের গায়ে ঠুকল। উদ্দেশ্য, সে কিছু বলার আগেই যাতে লুঠেরা মিঃ রবার্ট তাকে চিনতে পারে। হ্যাঁ, কাজ হয়েছে। হঠাৎ তার কানে এল—বুশরড যে! তুমি এখানে!

হ্যাঁ, আমি।

এত রাত্রে তুমি হঠাৎ এখানে কি মনে করে?

কাকা বুশরড জীবনে এই প্রথম প্রেসিডেন্ট মার্স রবার্টকে একটা মিথ্যা কথা বলল—স্যার, নরিয়া পেটার্সন কাজিকে দেখার জন্য এসেছি। তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

ভয়ানক ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। কাল আবার নিজেই বাতের ব্যথায় কাৎরাবে। আচ্ছা, আকাশটা কি পরিষ্কার হবে, বল তো বুশরড?

আমার তো সেরকমই মনে হচ্ছে স্যার।

মার্স রবার্ট সেখানে, বাড়িটার ছায়ায় দাঁড়িয়েই একটা চুরুট ধরালেন। এক গাল ধোঁয়া ছাড়লেন।

কাকা বুশরড-এর মুখ দিয়ে টু-শব্দটিও বেরল না। লাঠিটায় ভর দিয়ে সেখানেই ভূতের মত দাঁড়িয়ে রইল। ঠিক তখনই ট্রেনে অস্পষ্ট একটা হুইসেল তার কানে এল। সে ভাবল, ওই ট্রেনটাই ওয়েমাথ-এর নাম, যশ আর খ্যাতিকে লজ্জার মুল্লুকে নিয়ে যাবে। মুহূর্তে তার মন থেকে সব ভয়, সব দ্বিধা কেটে গেল। হেঁচকা টানে মাথার টুপিটা নামিয়ে আনল, ওয়েমাথ বংশের কর্তব্যরত ব্যক্তি ব্যাংক প্রেসিডেন্ট মার্স রবার্ট-এর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ল। আসন্ন বিপদের একেবারে শেষ ধাপে তার পথ রোধ করে দাঁড়াল।

বজ্র গম্ভীর স্বরে বুড়ো কাকা বুশরড বলতে লাগল—কি হে মার্স রবার্ট, সেদিনের কথা কিছু মনে আছে যেদিন সবাই এক সঙ্গে 'ওক লন'-এ নকল যুদ্ধ দেখতে গিয়েছিলে? তুমি সেদিন ঘোড়দৌড়ে জয়লাভ করে মিস লুসির মাথায় রানীর মুকুট পরিয়ে দিয়ে উল্লাস প্রকাশ করেছিলে, মনে পড়ে কি?

হ্যাঁ, নকল-যুদ্ধের কথা অবশ্যই ভুলিনি, মিঃ রবার্ট বললেন—কিন্তু এখানে, মাঝরাতে হঠাৎ যুদ্ধের প্রসঙ্গ উত্থাপন করার কারণ কি? তুমি বরং ঘরে ফিরে যাও বুশরড আমার মনে হচ্ছে, তুমি ঘুমের ঘোরে আবোল তাবোল বকে চলেছ।

বুড়ো কাকা বুশরড তার কথায় ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে বলে চলল তোমার কাঁধে মিস লুসি একটা তরবারি ঝুলিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে বলেছিল, মিঃ রবার্ট, আমি তোমাকে রাজা সাজিয়ে দিলাম, ওঠ, সোজা হয়ে দাঁড়াও বুকে সাহস সঞ্চার কর। কথাটা বহুদিন আগেকার হলেও তুমি বা আমি কেউই আজও ভুলি নি। তার পরের আরও একটা দিনের কথা আমাদের উভয়ের আজও মনে আছে। মিস লুসি সেদিন অন্তিম শয্যায় শায়িত ছিল। আমাকে ডেকে আনিয়ে সে বিষণ্ণ মুখে বলেছিল—কাকা বুশরড, আমার ইচ্ছা, আমার মৃত্যুর পর রবার্টকে তুমিই দেখভাল করবে। আমার বিশ্বাস, অন্য কাউকে সে পাত্তা না দিলেও সে তোমার কথা অগ্রাহ্য করবে না। মাঝে মধ্যে সে রেগে একেবারে অগ্নিমূর্তি ধারণ করে, তোমার কথা তখন না-ও শুনতে পারে। তা সত্ত্বেও তার কাছাকাছি পাশাপাশি এমন একজনের থাকা দরকার যে তার স্বভাব বুঝে ব্যবস্থা নিতে পারে। আবার কখনও কখনও সে একেবারে অবুঝ শিশু হয়ে ওঠে। অত্যুজ্জ্বল চোখের মণি দুটো আমার দিকে তুলে সে আরও বলেছিল কাকা বুশরড, সে আর যাই হোক আসলে তো সে চিরদিনই আমার চোখে রাজা, নির্ভীক, নিষ্কলঙ্ক আর নিন্দা-কুৎসার ঊর্ধ্বে, বুঝতেই পারছ।

আচমকা রেগে একেবারে কাঁই হয়ে যাওয়াই রবার্ট-এর চরিত্রের একটা বিশেষ দোষ। চুরুটের ধোঁয়াটুকু মুখ থেকে বের করতে করতে হঠাৎ গর্জে উঠলেন—কথার জাহাজ বুড়ো কাহাকার! তোকে যে আমি বাড়ি যেতে বলছি, কানে ঢুকছে না? তোর কি মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেছে। মিস লুসি ওই কথাগুলো বলেছিল, না? বংশগৌরবের স্মারক সে তরবারিটাকে পরিচ্ছন্ন রাখা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। গত সপ্তাহেই তার মৃত্যুর দু' বছর পূর্ণ হয়ে গেছে, না? আরে বুদ্ধ কাহাকার, সারা রাত ফ্যাচর ফ্যাচর করেই কাটিয়ে দিতে চাইছ নাকি হে?

প্রায় এগার মাইল দূরবর্তী জলের ট্যাংকের কাছাকাছি থেকে আবার ট্রেনের হুইসল ভেসে এল।

ব্যাংক-প্রেসিডেন্ট মার্স রবার্ট-এর হাতের ভারি থলেটার গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বুড়ো বুশরড বলতে লাগল—মার্স রবার্ট পরম পিতার দোহাই, এটার মধ্যে কি আছে কিছুই জানা না থাকলেও বলছি, ওটাকে তুমি সঙ্গে নিয়ে যেও না। ব্যাংকের কোন্ জায়গা থেকে তুমি এটাকে পেয়েছ তা-ও আমার জানা আছে। ভুলে যেয়ো না। এ থলেটার মধ্যে আছে লুসি আর তার সন্তানদের চরমতম বিপদ। আর এটার মাধ্যমেই ওয়েমাথ বংশের যশ খ্যাতি পথের ধুলোয় লুটিয়ে যাবে। আমি জানি, তুমি চাইলেই এ ভৃত্যটাকে খুন করে ফেলতে পার। তবু তোমাকে বার বার অনুরোধ করছি এ থলেটা তুমি নিয়ে যেও না। যদিও আমি কোনদিনই জর্ডন নদীর ওপারে যাইনি তবু যদি মিস লুসি কোনদিন জিজ্ঞেস করে—কাকা বুশরড, তুমি কেন মার্স রবার্ট-এর দেখভাল করনি, কর্তব্যকর্মে গাফিলতি করেছ? আমার তো তখন জবাব দেবার কিছুই থাকবে না।

ঠোঁট থেকে চুরুটটা নামিয়ে এনে ব্যাংক প্রেসিডেন্ট উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে বললেন—

বুশরড তুমি কিন্তু অনধিকার চর্চা, অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ। এতদিন যাবৎ তোমার পাওনার অতিরিক্ত যে অনুগ্রহ তোমাকে দেখানো হয়েছে সুযোগের অপব্যবহার করে তুমি ক্ষমার অযোগ্য কাজে মেতেছ। তবে তো তুমি জানই এ থলেটার মধ্যে কি আছে। তোমার বিশ্বস্ততা, তোমার সেবাধর্ম—সবকিছু নিছকই অজুহাত মাত্র। আর একটা কথাও না বলে, মুখে কুলুপ এঁটে তুমি সোজা বাড়ি ফিরে যাও।

ইতিমধ্যে ট্রেনটার হেডলাইটের আলো স্টেশনের অনেকটা জায়গা ছায়া দূর করে আলোকিত করতে শুরু করেছে। বুড়ো বুশরড থলেটাকে শক্তভাবে মুঠো করে ধরল। রীতিমত দৃঢ়তার সঙ্গেই সে বলল—মার্স রবার্ট, থলেটাকে নিয়ে তুমি যেও না, এটা আমাকে দাও। শোন, তোমার সঙ্গে কড়া স্বরে কথা বলার অধিকার আমার অবশ্যই আছে। ক্রীতদাসের মত আজীবন তোমার সেবায় নিজেকে লিপ্ত রেখেছি, ছেলেবেলা থেকে তোমার পাশাপাশি কাছাকাছি প্রতিটা মুহূর্ত কাটিয়েছি। আমি যুদ্ধেও গিয়েছি, চাবুকের আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করে ইয়ংকিদের উত্তরে তাড়িয়ে দিয়েছি। তোমার বিয়েতে, এমনকি মিস লেটির জন্মকালেও আমি তোমার পাশে ছিলাম। আর মিস লেটির কুচোকাচারা তো সন্ধ্যে হতে না হতেই অপেক্ষা করতে থাকে, কাকা বুশরড কখন ফিরবে। গায়ের রং আর উপাধির কথা ছাড়ান দিলে আমি তো ওয়েমাথ পরিবারেরই একজন।

আবার শোন মার্স রবার্ট, আমরা উভয়েই এখন বুড়ো হয়েছি। লুসির সঙ্গে আবার মিলিত হবার দিন আর বেশী দূরে নয়। আমাদের কৃতকর্মের হিসাব নিকাশ তার কাছে আমাদের দিতেই হবে। এ বুড়োটাকে যে পরিবার আপন করে নিয়েছিল, তার কাছ থেকে যে সেবাটুকু পেয়েছে তার চেয়ে বেশী কিছু তার কাছ থেকে কেউই প্রত্যাশা করবে না। কিন্তু ওয়েমাথ পরিবারের বংশ গৌরবের কথা তো স্বীকার করতেই হবে। তাই বলছি কি মার্স রবার্ট থলেটা আমাকে দাও। তুমি যাই বল না কেন, এটা আমার চাই-ই চাই। এটাকে ভল্টে ঢুকিয়ে দিয়ে তালা লাগিয়ে দেব। ব্যস, কাজ হাসিল। আমাকে যে মিস লুসির হুকুম তামিল না করে উপায় নেই।

ট্রেনটা হুইসল দিচ্ছে। যাত্রীরা উঠে পড়েছে। ছাড়ার সময় হয়ে গেছে।

মিঃ মার্স রবার্ট নীরবে থলেটা থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিলেন। বুড়ো বুশরড সেটাকে নিতান্ত আকাঙ্ক্ষিত সম্পদের মত দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরল। ব্যাংক প্রেসিডেন্ট মার্স রবার্ট লাফিয়ে চলন্ত ট্রেনের পা-দানিতে উঠে বলতে লাগলেন—বুশরড, থলেটা নিয়ে তুমি ফিরে যাও। মনে রেখো, এখানেই ব্যাপারটা চুকে গেছে। আমি চলে যাচ্ছি। মিঃ উইলিয়ামকে আমার হয়ে বোলো—আমি শনিবার ফিরব। বিদায়। কথা বলতে বলতে তিনি দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

বুড়ো বুশরড থলেটাকে দু' হাতে বুকে চেপে ট্রেনটার ফেলে-যাওয়া পথের দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইল। চোখ দুটো ক্রমে বুজে আসতে লাগল, ঠোঁট দুটো কাঁপছে। এক সময় আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে পরম পিতাকে ধন্যবাদ জানাতে লাগল—ওয়েমাথ পরিবারের যশ খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য।

বুড়ো কাকা বুশরড নিঃসন্দেহ যে, মিঃ মার্স রবার্ট ফিরে আসবেনই। কারণ, সে ভালই জানে, ওয়েমাথরা মিথ্যা কথা বলে না। পরম পিতাকে ধন্যবাদ দিতে হয়, ওয়েমাথরা ব্যাংকের টাকা আত্মসাৎ করেছে একথা কেউ-ই বলতে পারবে না।

ওয়েমাথ বংশের গচ্ছিত সম্পদের অভিভাবকত্ব করার তাগিদে বুড়ো বুশরড সদ্য উদ্ধার করা থলেটা বুকে জড়িয়ে ধরে ব্যাংকের দিকে সাধ্য মত দ্রুত হাঁটতে লাগল।

তিন ঘণ্টা ট্রেনযাত্রার পর মার্স রবার্ট ভোর হবার মুখে একটা নির্জন নিরালা ফ্ল্যাগ-স্টেশনে নামলেন। প্লাটফর্মে পা দিয়েই তিনি দেখলেন, একজন প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে। আর পাশেই স্টেশনের দরজার গায়ে স্প্রিংওয়ালা একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে। আর একটা ঘোড়া ও একজন কোচোয়ানও দেখতে পেল। প্লাটফর্মে অপেক্ষমাণ লোকটা বিচারক আর্চিনাড। মার্স রবার্ট-এর পুরনো বন্ধু। তাকে দেখেই বিচারক আর্চিনার্ড সোল্লাসে বলে উঠলেন—বব, তবে সত্যি সত্যি এলে। আজকের দিনটা মাছ ধরার পক্ষে খুবই উপযুক্ত।

ওয়েমাথ ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট মার্স রবার্ট বলে উঠলেন—সব ভেসে গেছে। আমার পরিবারের

এক জঘন্য আত্মবিশ্বাসী বুড়ো নিগ্রো আছে, সে হতচ্ছাড়াটাই পরিকল্পনাটাকে বানচাল করে দিয়েছে। অবশ্য কাজটা সে আমাদের পরিবারের মঙ্গলের জন্যই করেছে। এখন বুঝছি, কাজটা সে ঠিকই করেছে। আমি যে সবকিছু নিয়ে চম্পট দিয়েছিলাম সেটা সে দেখে ফেলেছিল। ব্যাংকের ভল্টে সেগুলো লুকিয়ে রেখেছিলাম। সেখান থেকে সেগুলো নিয়ে আসছিলাম। আসলে আমার মদ খাওয়ার ব্যাপার যে সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল সেটা সে সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করেছে। তাই সে আমার প্রতিটা পদক্ষেপের ওপর কড়া নজর রেখে চলছিল।

শোন, আমি মনস্থির করে ফেলেছি—শীঘ্রই আমি মদ খাওয়া ছেড়ে দেব। আমার মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, মদের নেশাটা অব্যাহত রাখলে কোন ভদ্রলোকের পক্ষে শিষ্টাচার ও উন্নত মানসিকতা রক্ষা করা সম্ভব নয়। আর অপবাদ, নির্ভীক হয়ে পবিত্রতা বজায় রাখা সম্ভব নয়—বুড়ো বুশরড একথাটাই আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে।

বিচারক অর্চিনার্ড বললেন—কথাটা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গতই বটে।

মার্স রবার্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবার বললেন—তবু বলছি, ওই থলেটার মধ্যে দু' কোটি পুরনো এমন 'বুরবন' ছিল জীবনে যা চোখে দেখার সৌভাগ্য তোমার হয়নি।

দ্য এন্‌চান্‌টেড প্রোফাইল

সত্যিকারের খলিফা বলতে যা বুঝায় তাদের সংখ্যা খুবই কম। জন্মসূত্রে, পূর্বসংস্কার বশত, বা মানসিক প্রবৃত্তি ও কণ্ঠস্বরের বিচারে নারীদের সবাই শাহেবজাদী। হাজার হাজার উজিরকন্যা রোজই নিজ নিজ সুলতানকে সহস্র এক গল্প শোনায়।

এ কাহিনীটা আমিও শুনেছি, তবে যদিও এটা একটা নারী খলিফার গল্পকথা। এটাকে কিন্তু কোনক্রমে আরব্য রজনীর কাহিনী মনে করা যাবে না। কারণ, এতে সিন্ডেরেলার কথা আছে। আর অন্য এক আমলে সে তার আবির্ভাব ঘটেছিল। তাই বলছি কি, ক্ষিপ্র সন-তারিখে আপনাদের আপত্তি না থাকলে আমি গল্পটা আরম্ভ করতে পারি। মিশ্র সন-তারিখের উল্লেখ থাকায় অবশ্য এতে এক অভাবনীয় প্রাচ্য রসের সঞ্চার ঘটেছে, সন্দেহ নেই।

যাক, গল্পটা শুরু করাই যাক—নিউইয়র্ক শহরে একটা খুবই প্রাচীন হোটেল আছে। এটা যখন তৈরী হয় তখন চতুর্দশতম সরণির ওপারে। বোস্টন আর হ্যামারস্টিক-এর অফিসে যাবার প্রাচীন ইন্ডিয়ান সরণিটা ছাড়া যাতায়াতের আর কোন উপায়ই ছিল না।

অতিশীঘ্রই আগেকার, পুরনো হোটেল বাড়িটা ভেঙে ফেলা হবে। তখন তার শক্ত দেয়ালগুলোকে যখন ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হবে তখন তার ইটগুলো গম্ভীর আওয়াজ তুলে গড়াতে গড়াতে নালার ভেতরে গিয়ে পড়বে। শহরের মানুষগুলো তখন নিকটবর্তী মোড়গুলোতে ভিড় করবে আর সাবেকি আমলের একটা স্মৃতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে দেখে চোখের জল ঝরাবে।

আধুনিক বাগদাদ শহরের মানুষের নিষ্ঠাবোধ বড়ই টনটনে। নিষ্ঠার এ ধ্বংস-কার্য সম্পাদনের বিরুদ্ধে যারা সবচেয়ে বেশী চোখের জল ঝরাবে আর গলাছেড়ে হৈ হৈ করবে তাদের কিন্তু সে সব মানুষের পর্যায়ভুক্ত যারা আঠার শ' তিয়াত্তরের কোন একদিন যাদের এ হোটেলটারই বিনামূল্যে খাবার বিতরণের দরজা থেকে লাথি মেরে মেরে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

মিসেস ম্যাগি, ম্যাগি ব্রাউন সর্বদা এ হোটেলেই আশ্রয় নিতেন। ষাট বছর বয়সেও তাকে একজন শক্ত সমর্থ মহিলা বলেই মনে হত। সর্বদা জমকালো পোশাক পরিধান করতেন। আর তার হাতের বটুয়াটা যাকে আদম কুমীর সম্বোধন করা হত সে আদিম জানোয়ারটা চামড়া দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল।

মিসেস ম্যাগি যতবারই এ হোটেলে এসেছেন ততবারই এ হোটেলের ওপর তলার ছোট্ট একটা বৈঠকখানা এবং শোবার ঘর ভাড়া করতেন। ভাড়া দিতেন প্রতিদিন দু' ডলার হিসাবে। তিনি যতদিন হোটেলটায় থাকতেন ততদিন কতজন যে তাঁর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করঁতে আসত তা গোণাগঁ নেই।

মিস ম্যাগিকে বিশ্বের তৃতীয় নারী বিত্তবতী নারী বলা হত। আর সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সবাই ছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে বিত্তবান কারবারী ও দালাল। আদ্যিকালের বটুয়াটার মালকিন কঞ্জুস প্রকৃতির বুড়িটার কাছে তাদের আনাগোনা করত, ধর্নাও বলা চলে—ষাট লক্ষ ডলারের মত কিঞ্চিৎ ঋণ পাবার প্রত্যাশা নিয়ে।

এক্রোপোলিস হোটেলটার স্টেনোগ্রাফার ও টাইপরাইটার মিস ইডা বেটস হোটেলটার নামটাও ফাঁস করে দিলাম। মিস ইডা বেটসকে মনে করা যেতে পারে ঠিক যেন গ্রীক পুরানের অন্তর্গত কোন নারী-চরিত্র। তার দৃষ্টি ছিল যাকে বলে রীতিমত ছলাকলা। আগেকার দিনের মানুষ কোন মহিলার স্তুতি করতে গিয়ে বলত তাকে ভালবাসার যোগ্যতা অর্জন করাটাই তো এক উদার শিক্ষা। আর ধবধবে সাদা শার্ট-জড়ানো কটিদেশের দিকে তাকানোর সৌভাগ্যের হওয়ার অর্থই হচ্ছে কোন পত্রবিনিময় বিদ্যালয়ের পুরো পাঠ্যসূচীর পাঠ নেওয়া।

সে মাঝে-মধ্যে আমার কিছু কিছু কাগজপত্র টাইপ করে দিত। তার পারিশ্রমিক অগ্রিম না নেওয়ার জন্য সে আমাকে তার সুহৃদ ও কৃপাধন্য ব্যক্তি জ্ঞান করত। সে ছিল সৎ এবং সহৃদয়। একজন ঢাক-বাদ্যকার আর লোম আমদানিকারকও তার সামনে সদাচরণের ব্যাপারে তার আচরণের অতিরিক্ত কিছু করতে সাহস পেত না। কেবলমাত্র এক্রোপলিস-এর মালিক থেকে শুরু করে কঠিন রোগাক্রান্ত কুলিটা পর্যন্ত এক্রোপলিস-এর পুরো দলটাই তার সম্মান রক্ষা করতে চোখের পলকে ঝাঁপিয়ে পড়ত। কম কথা!

এক দুপুরে মিস বেট্স-এর দোকানের গা দিয়ে হেঁটে যাবার সময় তার জায়গায় একজন কালো চুলওয়ালা পুরুষ আঙুলগুলো দিয়ে চাবিগুলোর গায়ে অনবরত ঠুকে চলেছে। আমি ভাবলাম, এটা একটা সাময়িক পরিবর্তন ছাড়া কিছু নয়। এরকম ভাবতে ভাবতে আমি নিজের মনেই এগিয়ে গেলাম।

পরের সপ্তাহেই আমি দু' সপ্তাহের ছুটি কাটাবার উদ্দেশ্যে শহরের বাইরে চলে গেলাম। ফিরে এসে আবার এক্রোপলিসের পথে হেঁটে যাবার সময় দেখলাম, মিস বেট্স তার টাইপরাইটারটার ওপরে একটা কাপড় চাপিয়ে ঢেকে দিচ্ছে। একটা চেয়ার এগিয়ে আসতে আমাকে বসতে বলল। সে সংক্ষেপে কিছু সংলাপের মাধ্যমে নিজের অনুপস্থিতি এবং ফিরে আসার ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল।

মিস বেট্স বলল—মশাই বলুন তো, গল্পসল্প কেমন চলেছে?

আমি বললাম—চলছে ঠিকঠাকই। আগের মতই বলতে পারেন।

বড়ই পরিতাপের ব্যাপার দেখছি! ভাল টাইপ করাটাকে একটা গল্পের মূল কথা মনে করে নেওয়া যেতে পারে। তখন আমার অভাবটা বড্ড বেশী করে বোধ করেছিলে, ঠিক কিনা?

মোটেই না। আমার পরিচিতজনরা সবারই তো তোমার মত জানা আছে কতখানি ফাঁক রেখে টাইপ করা দরকার। আর এও জানে, কোথায় সেমিকোলন টিপতে হবে, হোটেলের অতিথি কারা আর মাথার কাঁটা কি এও ভালই জানে। আরে, তুমিও তো শহরের বাইরে কাটিয়ে এসেছ। এই তো সেদিন তোমার সিটে অন্য আর একজনকে বসে কাজ করতে দেখেছিলাম।

আরে, তার কথাই তো বলতে চাচ্ছি, মিস বেটস বলল। কিন্তু তুমিই তো হঠাৎ অন্য কথা পেড়ে বসলে। ম্যাগি ব্রাউনের কথা তো তোমার শোনাই আছে। সে এখানে প্রায়ই আসা-যাওয়া করে। সে চার কোটি ডলারের মালিক। জামি শহরে দশ ডলারের ফ্ল্যাটে বাস করে। উপ-রাষ্ট্রপ্রধানের পদের প্রার্থী আধা ডজন ব্যবসায়ীর কাছে যে পরিমাণ নগদ অর্থ থাকে তার কাছে সর্বদা তার চেয়ে বেশী অর্থ থাকে। তবে সে অর্থ তিনি অন্য কোথায় রাখে আমি না জানলেও শহরের সে অঞ্চলের অধিবীসারা স্বর্ণমুদ্রার পূজায় মেতে থাকে এবং সেখানকার মানুষের কাছে তার কদর সবচেয়ে বেশী।

হপ্তা দু' আগের কথা, মিসেস ব্রাউন হঠাৎ আমার কাছে এলেন। দশ মিনিট ধরে কতসব গল্প করলেন। টলেপ থেকে আসা এক বৃদ্ধ সজ্জনের জন্য তামার খনির প্রস্তাব সংক্রান্ত একগাদা কাগজ টাইপ করানোর জন্য তিনি আমার কাছে দীর্ঘসময় কাটিয়ে গেলেন। আমি টাইপ করার কাজ চালু রেখেই চারদিকে নজর রাখি। এক মুহূর্তও নষ্ট করার মত সময় আমার নেই। কারণ, এ কাজের মাধ্যমে আমাকে প্রতি হপ্তায় বিশটা ডলার আমার রোজগার করা চাই-ই চাই।

সেদিন সন্ধ্যায়ই দোকান বন্ধ করার মুখে সে লোক মারফৎ তার ফ্ল্যাটে আমাকে তলব করল। সেদিন কাজের চাপ খুব বেশী, শরীরের ওপর দিয়ে ধকলও কম যায় নি। তবু তার ফ্ল্যাটে হাজির হলাম। ব্যাপার দেখে আমি থ। একেবারে তাজ্জব বনে গেলাম। আরেব্বাস, বুড়ি ম্যাগি একেবারে সাচ্চা মানুষ হয়ে গেছে।

আমার ঘুমের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই সে বলল—শোন মেয়ে, তোমার রূপের পসার আমি কারো মধ্যেই দেখি নি। আমার ইচ্ছা, তোমার ওই টাইপের কাজকর্ম ছেড়ে তুমি আমার কাছে থাক। একটামাত্র স্বামী আর দু-একটা ছেলেপুলে ছাড়া তো নিজের জন নেই বলতে কেউ-ই আমার নেই। তার ওপর তাদের কারো সঙ্গে আমার যোগাযোগ বা সম্পর্ক কিছুই নেই। তোমাকে এমন কষ্টের বোঝা বয়ে নিয়ে বেড়াতে হচ্ছে দেখে আমার খুবই মায়া হচ্ছে। তুমি বরং আমার মেয়ে হয়ে এখানে থেকে যাও বাছা। সবার বিশ্বাস, আমি বড়ই কঞ্জুস, আত্মাটাও নাকি খুব ছোট। আর খবরের কাগজগুলোও মিথ্যে প্রচারে মাতে, আমি নাকি নিজের রান্নাবান্না আর কাচা-ধোয়া নিজে হাতেই করে থাকি। মিথ্যে—কাগজগুলো মিথ্যে প্রচার করে করে কি যে আনন্দ পায়, বুঝি না বাছা। তবে রুমাল, পেটিকোট প্রভৃতি ছোটখাটো জিনিসগুলো ধোয়াধুয়ি তো করে নিতেই হয় —কি বল? শোন বাছা, আমি এক বুড়ো মেয়ে মানুষ। একজন সর্বক্ষণের সঙ্গী না হলে কি করে চলে, বল তো? একমাত্র তোমাকেই আমার মনে ধরেছে। তুমি কি পারবে না এখানে থেকে আমাকে সঙ্গদান করতে। আমিও সে টাকা খরচ করতে পারি এটা সবাইকে দেখিয়ে দিতে চাই।

এবার আপনার কাছেই আমি প্রশ্ন রাখছি, এ পরিস্থিতিতে আপনি হলে কি করতেন? তবে মিসেস ব্রাউন-এর কথায় আমি পুরোপুরি মোহিত হয়ে গেলাম। সত্যি বলতে কি, তাকে আমার মনে ধরে গেল। সে লাখ লাখ ডলারের মালিক। ইচ্ছে করলে সে আমার জন্য অনেক কিছুই করে দিতে পারে। তবে এটাই কিন্তু ভাল লাগার বড় কারণ নয়। এ দুনিয়ায় আমিও একেবারে নিঃসঙ্গ। প্রতিটা মানুষেরই এমন একজন সঙ্গী থাকা চাই-ই চাই যার কাছে বাঁ-কাঁধের ব্যথা বেদনার কথা বলা সম্ভব আর বলা যায় পেটেন্ট লেদারের চামড়ায় ফাটল ধরলে কত তাড়াতাড়ি ফেঁসে গিয়ে সেটা অকেজো হয়ে পড়ে। এমন আলোচনা তো আর হোটেলের আবাসিকদের সঙ্গে করা সম্ভব নয়।

ব্যস, আমি হোটেলের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বুড়ি ম্যাগির ফ্ল্যাটে গিয়ে উঠলাম। কিন্তু আমি যেন তার কাছে একটা জড় বস্তু বনে গেলাম। আমি বসে বই বা ম্যাগাজিন পড়ার সময় সে আধ ঘণ্টা ধরে অপলক চোখ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। আমার মুখে কি যে সে দেখে সেই জানে।

ক'দিন ধরে তার একই অবস্থা দেখে আমি তাকে প্রশ্ন না করে পারলাম না—মিসেস ব্রাউন, আমার মুখ দেখে কি আপনার কোন মৃত নিকট আত্মীয় বা বাল্যের কোন বান্ধবীর কথা মনে পড়ে?

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—শোন বাছা, তোমার মুখটা যেন আমার এক অভিন্ন হৃদয় বান্ধবীর কার্বনকপি। তবে সত্যি বলতে কি, তোমার জন্যই তোমাকে আমার এত মনে ধরেছে।

মশাই, এবার বলুন তো, কি আশ্চর্য ব্যাপার! মিসেস ব্রাউন তারপর আমাকে নিয়ে বড় দর্জির দোকানে গিয়ে তার মনের মত করে সাজিয়ে দিতে বলল। এবং বলল টাকার জন্য যেন সে দ্বিধা না করে।

তারপর সে আমাকে নিয়ে কোথায় গেল, বলতে পারবেন? ধ্যুৎ! হল না। আরও ভাবুন—হ্যাঁ, এবার ঠিকই বলেছেন। আমাকে বিখ্যাত হোটেল বস্টন-এ হাজির করানো হল। ছ' কামরার একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করল। প্রতিদিনের জন্য মোটা অর্থ ভাড়া। আমি নিজের চোখেই বিলটা দেখলাম।

ব্যস, বুড়ি মিসেস ব্রাউনকে আমি অন্তর থেকে ভালবাসতে শুরু করলাম।

আরেব্বাস! পোশাকের পাহাড় দেখে আমার মন গলে একেবারে জল হয়ে গেল। তখন থেকে 'মিস ব্রাউন'-এর পরিবর্তে আমি তাকে 'ম্যাগি মাসি' সম্বোধন করতে লাগলাম। আচ্ছা একটা কথা, সিন্ডেরেলার কথা আপনি অবশ্যই পড়ে থাকবেন। রাজকুমার সাড়ে তিন নম্বর জুতোটা পরিয়ে দিল তখন সিন্ডেরেলা যা কিছু বলেছিল তা তখন আমি তাকে যা-যা বলেছিলাম সে তুলনায় খুবই

তুচ্ছ প্রশংসা।

ম্যাগি মাসি আহ্লাদে গদগদ হয়ে আমাকে বললেন, আমার খাতিরে তিনি হোটেল বস্‌টন-এ এক ভোজ সভার ব্যবস্থা করবেন আর সেখানে পঞ্চম এভিনিউর প্রাচীন ওলন্দাজ পরিবারের বিখ্যাত সব মানুষগুলোকে জড়ো করবেন। আর এও বলল, সে নাকি কাউকে নিমন্ত্রণ করে না, ডেকে পাঠায়।

আমি বিস্ময় মাখানো দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সে বলে চলল—ভোজ সভায় এমন পঞ্চাশজন অতিথিকে জড়ো করব, যাদের রাজা এডোয়ার্ড আর উইলিয়াম ট্রেভার্স জেরোস ছাড়া অন্য কেউই তাঁদের কোন ভোজ সভায় জড়ো করতে পারেন না। তবে তারা সবাই পুরুষ। তারা সবাই হয় আমার কাছ থেকে ধন-সম্পদ ধার করেছে না হয় ভবিষ্যতে ধার পাবার আশা রাখে। তাদের কারো কারো স্ত্রী আসবেনা, তবে অধিকাংশই স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়েই আসবে।

শুনুন, সে ভোজ সভায় আপনি উপস্থিত থাকলে কী যে ভাল হত তা আর কথার নয়। থাক, এবার যা বলছি ধৈর্য ধরে শুনুন, নিমন্ত্রিত অতিথি অভ্যাগতরা যে সব ঝলমলে পোশাক পরে এসেছিল তা দেখে আমার তো চোখে ধাঁধা লাগার জোগাড় হয়েছিল। আর খাবার-দাবারের আয়োজন? সে তো ছিল রীতিমত রাজসিক ব্যাপার। পুরুষরা প্রায় সবাই ছিল টাকমাথা আর পাকা জুল্‌ফিওয়ালা। আর আমার পরনে যে পোশাক পরা ছিল তার দামই তিন হাজার ডলার। দোকানিকে দাম দেবার সময় বিলটা আমি নিজের চোখেই দেখেছিলাম।

আমার বাঁ দিকে যে বসেছিল তার কথাবার্তা একজন ব্যাংক মালিকের মত। আর এক যুবক বসেছিল আমার ডানদিকে। সে পরিচয় দিয়েছিল খবরের কাগজের একজন শিল্পী বলে। নিজের পরিচয় দিয়েছিল। তার কথাই আপনার কাছে বলতে চাচ্ছি।

আচ্ছা, লাফ্রপ নামধারী কোন এক সাংবাদিক-শিল্পীর সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে, মানে চেনেন কি? উঁচুলম্বা চেহারা, চোখ দুটো নজরে পড়ার মত, সুন্দর। সহজ-সরল কথাবার্তা। কোন্ খবরের কাগজের অফিসে সে কাজ করে আমার জানা নেই।

হোটেলের মালিক ছ'শ' ডলারের বিল পাঠিয়ে দিল। আমি যে নিজের চোখেই দেখেছি। ম্যাগি মাসি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল। আমি কোনরকমে তাকে খাটে শুইয়ে দিলাম। একটু বাদেই চোখ মেলে তাকিয়ে সে অনুচ্চকণ্ঠে বলল—ব্যাপারটা কি, বলত? ভাড়া বা আয়কর হঠাৎ এক লাফে এতটা বাড়ে, তোমার কি ধারণা?

এ নিয়ে এত ভাববার কি আছে। বিলটার অর্থমূল্য তো বালতির দোকানে এক ফোটা জলের সামিল। উঠুন, উঠে বসুন।

তার পরের ব্যাপার শুনলে আপনি অবাক হবেন মশাই। সঙ্গে তার পা দুটো বরফ-শীতল হয়ে গেল। ব্যস, ভোর হতে না হতেই সে হোটেল বস্‌টন ছেড়ে আমাকে নিয়ে ওয়েস্ট সাইড-এর একটা ভাড়া বাড়িতে গিয়ে উঠল। ঘরটায় পা দিতেই দেড় হাজার ডলার দামের এক প্রস্ত ঝলমলে পোশাক আর এক বার্নারের একটা গ্যাস স্টোভ। ম্যাগি মাসি এবার কৃপণ-রোগের কবলে পড়ল।

আমার বিশ্বাস, প্রত্যেককেই অন্তত একবার হলেও পানোৎসবে যোগদান করতে হয়। পুরুষরা জুয়ার আসরে আর মেয়েরা পোশাক পরিচ্ছদে অর্থকড়ি ঢালে। কিন্তু আমি যদি চল্লিশ লক্ষ ডলারের মালিক হতাম তবে একটা ছবি কেনার জন্য উৎসাহী হতাম। ছবির কথা বলতেই আমার মনের কোণে ব্যাপারটা ভেসে উঠল—আচ্ছা, লাথ্রপ নামধারী কোন সাংবাদিক-শিল্পীর কখনও মুখোমুখী হয়েছেন কি, মানে তাকে চেনেন কি? উঁচুলম্বা—ধ্যুৎ। তার কথা তো আগেই আপনাকে বলেছি ভোজসভায় খাবার খেতে বসে তাকে আমার খুবই মনে ধরেছিল। সে নিঃসন্দেহ ছিল যে, ম্যাগি মাসির ধন-সম্পদের একটা ভগ্নাংশ উত্তরাধিকার সূত্রে আমার বরাতে জুটে যাবেই যাবে।

ম্যাগি মাসি আমাকে আগের মতই সমানভাবে ভালবাসতে লাগল। মুহূর্তের জন্যও আমাকে চোখের আড়াল করে না। তবু আমি না বলে পারছি না, সে ছিল এক কঞ্জুসের সম্রাট। প্রাত্যহিক খরচের জন্য পচাত্তর সেন্ট বেঁধে দিল। আমরা খাবার দাবার নিজেদের ঘরেই রান্না করে নিতে লাগলাম। আমি হাজার ডলারের পোশাক পরে এক-বার্ণারের স্টোভে আমি হাত-পা পুড়িয়ে

রান্নাবান্না সারতে লাগলাম।

হ্যাঁ, যে কথা বলতে চাইছিলাম। তৃতীয় দিনেই বে-কায়দা দেখে চম্পট দিলাম। দেড় শ' ডলারের পোশাক গায়ে চাপিয়ে পনের সেন্ট দামের মেটের ঝোল রান্না করা আমার আর সহ্য হল না। এখন যে পোশাকটা আমার গায়ে দেখছেন, পঁচাত্তর ডলার দাম। মিসেস ব্রাউন-এর অর্থে খরিদ করা। আমার আগেকার পোশাক পরিচ্ছদ আমার বোনের ফ্ল্যাটে—ব্রুকলিন-এ রেখে গিয়েছিলাম।

আমি তাকে বললাম, মিসেস ব্রাউন, আমি ধন-সম্পদের পূজারী নই। তবে এমন কিছু ব্যাপার স্যাপার আছে যা আমি অন্তর থেকে বরদাস্ত করতে পারি না। রূপকথার গল্পের রাক্ষসের কথা আমি পড়েছি। সে নাকি একই নিঃশ্বাসে ঠাণ্ডা জলের বোতল আর গরম পানি বের করতে সক্ষম। একেও আমি বরদাস্ত করতে পারি বটে একমাত্র ক্ষুরভর্তি ঘেয়ো ঘোড়াকে বরদাস্ত করতে পারি না। সবার মুখেই শুনি, আপনি চল্লিশ লক্ষ ডলারের মালিক, আর এর চেয়ে কম ডলার কোন অবস্থাতেই আপনার হাতে থাকে না। তাই তো আপনি আমার মন জুড়ে বসতেও আরম্ভ করেছিলেন।

আমার কথা শুনে বুড়ি ম্যাগি হাত-পা ছড়িয়ে বিলাপ পেড়ে কাঁদতে আরম্ভ করল। সে আমাকে প্রতিশ্রুতি দিল—সর্বদা জলের ব্যবস্থা দু' বার্ণারের স্টোভ আছে এমন ভাল বাড়ি ভাড়া করবে।

তারপর সে বলল—শোন, অনেকগুলো ডলার আমি খরচ করে ফেলেছি। এখনকার মত খরচপাতি কিছু কমানো দরকার। আর একটা কথা, আজ পর্যন্ত তোমার মত ভাল মেয়ে আমার চোখে পড়েনি। তাই তো তোমাকে ছাড়তে কিছুতেই আমার মন সরছে না বাছা।

আমি তার কথায় না মজে এক্রোপলিস-এ চলে গেলাম। আগে টাকাও পেয়ে গেলাম।

আমার কথা তো শুনলেন। এবার আপনার কথা বলুন—লেখালেখির কাজ কেমন চলছে? আমি জানি, আমার কাছে টাইপ করাতে না পারায় আপনার কিছু লেখা খোয়া গেছে। ভাল কথা, একজন সংবাদপত্রের শিল্পীর সঙ্গে কি আপনার কোনদিন পরিচয় হয়েছিল? প্রশ্নটা আগেও আপনাকে করেছি, মনে আছে। সম্প্রতি সে কোন্ সংবাদপত্রে কাজ করে, আমার জানা নেই। ব্যাপারটা হাসির উদ্রেক করার মতই বটে, আমি কিন্তু কথাটা না ভেবে পারতাম না যে, বুড়ি ম্যাগির কাছ থেকে আমার পক্ষে কত ডলার পাওয়া সম্ভব বলে সে মনে করে যে ব্যাপারটা সে ভাবছেই না। আমার যদি কোন সংবাদপত্রের সম্পাদকের সঙ্গে পরিচয়-খাতির থাকত তবে আমি কিন্তু—

ঠিক সে মুহূর্তেই দরজা থেকে পায়ের শব্দ ভেসে এল। ইডা বেট্‌স পিছনের চুলে চিরুনি-গাঁথা আগন্তুককে দেখতে পেল।

আমি লক্ষ্য করলাম মুহূর্তেই সে যেন পাথরের মূর্তি বনে গেল। কেবলমাত্র পিগমেলিয়ন আর আমিই অলৌকিক ঘটনাটার সাক্ষী থাকলাম।

সে কাঁপা কাঁপা গলায় উচ্চারণ করল—হ্যাঁ, এ লোকটাই লাথ্রপ। আমি অবাক হচ্ছি, তবে কি অর্থের জন্যই—এ কী অদ্ভুত কাণ্ড! সে-ও শেষ পর্যন্ত—

নিমন্ত্রিত হিসাবে আমিও বিয়ের আসরে উপস্থিত ছিলাম। বিয়ের অনুষ্ঠানের পাট চুকে গেলে লাথ্রপকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে আমি বললাম—আরে, তুমি তো একজন শিল্পী। তবু তুমি কেন বুঝতে পারলে না যে বুড়ি ম্যাগি ব্রাউন বেট্‌সকে খুবই পছন্দ করত। চল, তোমাকে দেখিয়ে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করে দিচ্ছি।

কনের গায়ে প্রাচীন যুগের গ্রীকদের পোশাকের মত পরিপাটি করে সাজানো পোশাক। মালা থেকে কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে তা দিয়ে একটা মাথার মালা তৈরী করে বেট্‌স-এর মাথায় পরিয়ে দিলাম। এবার তার সদ্য বিবাহিত স্বামী লাথ্রপ-এর পাশে দাঁড় করালাম।

বর লাথ্রপ মুচকি হেসে বলে উঠল—জিঙ্গোর দোহাই দিয়ে বলছি, ইডার মাথাটাকে কি রূপোর ডলারের গায়ে আঁকা হিলার মাথার একটা নীরব ঘণ্টা বলে মনে হচ্ছে না?

আর্ট অ্যান্ড দ্য ব্রন্‌কো

নির্জন-নিরালা অঞ্চল থেকে এক চিত্রশিল্পী বেরিয়ে এল। গণতন্ত্রের মাধ্যমে একমাত্র প্রতিভার অভিষেকই হতে পারে। সে প্রতিভাই লেনি বিস্কোর কপালে পরাবার জন্য বনফুলের মালা গেঁথে দিয়েছিল? শিল্পের দেবীর আশীর্বাদ পক্ষপাতহীনভাবেই কোন শিল্পানুরাগী সম্রাট বা রাখাল বালকের আঙুলের ডগা থেকে পরিস্ফুট হয়ে থাকে। সে শিল্পের দেবীই তার মাধ্যম হিসাবে 'সান সাবা'র এক বালক-শিল্পীকে নির্বাচন করে নিয়েছিলেন। আর এরই ফলস্বরূপ যুক্তরাষ্ট্রের পরিচ্ছদ-ভবনের লাগোয়া ঘরে সাত ফুট বাই বারো ফুট মাপের একটা রঙের প্রলেপ দেওয়া, সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো ক্যান্‌ভাস প্রতিষ্ঠা করা হয়।

সে সময়ে চলছিল আইন-পরিষদের অধিবেশন। তখন পশ্চিম-রাষ্ট্রের রাজধানী শহরের মানুষ অধিবেশনের সঙ্গে যুক্ত অত্যাশ্চর্য কর্মযজ্ঞ আর আর্থিক লাভকে মহানন্দে উপভোগ করল। আর বোর্ডিং হাউসগুলো আনন্দপ্রিয় আইন প্রণয়নকারীদের সহজলব্ধ ডলার সমানে পকেটে পুরতে লাগল। পাশ্চাত্যের মহত্তম রাষ্ট্রটার বিস্তার এবং সম্পদের বিচারে রীতিমত একটা সাম্রাজ্য। জঘন্য মানসিকতা, পাশবিকতা, আইনভঙ্গ আর রক্তঝরা অতীত-ইতিহাসকে দু' হাতে ঠেলে দিয়েছে। প্রাচ্যের অন্যান্য যেকোন জরাজীর্ণ নষ্টচরিত্র শহরের মতই এ শহরেও জীবন ধারণ আর সম্পত্তি উভয়ই নিরাপদ। এখন এর সীমান্তে শৃঙ্খলা বিরাজ করছে। আর জোচ্চরি, গীর্জা, 'হেবিয়াস কর্পাস' বিচার-ব্যবস্থা আর স্ট্রবেরি ভোজের আসর রীতিমত জমে উঠেছে। ইঁচড়ে-পাকা মানুষগুলোও আজ বাধাহীনভাবে তার সাংস্কৃতিক মতামত ব্যক্ত করতে সক্ষম। বিভিন্ন শিল্প ও বিজ্ঞান কেবলমাত্র মদতই নয় আর্থিক সাহায্যও লাভ করছে। তাই বলছি কি, এ মহান রাষ্ট্রটির আইন-পরিষদ যদি লেনি বিস্কোর একটা অমর চিত্র ক্রয় করতে গিয়ে অর্থ এদিক-ওদিক করেই থাকে তবে সেটা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।

সত্যি কথা বলতে কি, সান সাবা দেশে ললিত কলা তেমন উন্নতির স্বাক্ষর রাখতে পারে নি। সেখানকার যুবকরা সৈনিক বৃত্তিতে বিশেষ দক্ষ, ঘোড়া চুরির ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত, এক তাসের খেলায় বিশেষ পারদর্শী, রাত্রির অন্ধকারে শহরগুলো উত্তেজনা সৃষ্টি করতে তাদের জুড়ি মেলা ভার। কিন্তু আজ অবধি শিল্পকলা শিল্পের ঘাঁটি হিসাবে তার খ্যাতির কথা শোনা যায় নি। সম্প্রতি লেনি বিস্কোর তুলির টান সে অপবাদকে ঘুচিয়ে দিয়েছে। এখানকার চুনা পাথরের পাহাড়, কাঁটা ঝোপঝাড় আর শুকনো উপত্যকার খরায় পোড়া ঘাসের বনেই একদিন এক শিশু-শিল্পী ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। সে যে শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল তার কারণও জানা সম্ভব হয় নি। মনে করা যেতে পারে সৃষ্টির এক শিল্প-মনস্কতা তাকে অনুপ্রেরণা দান করেছিল, আত্মপ্রকাশে ইন্ধন জুগিয়েছিল, আর তারপরই সে মানসিকতা ক্ষতিকারক কাজকর্ম দেখতে দেখতে সে উপত্যকার বালুকারাশির মধ্যে আনন্দে আর আবেগে-উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে ওঠে। কারণ, একটা কলা সৃষ্টির দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে লেনির ছবিটা সমালোচকদের ভেতর থেকে যাবতীয় সযত্ন প্রয়াসকে দূরে ঠেলে দিয়েছিল।

পরিকল্পনা করা হয়েছিল পাশ্চাত্য দেশের নিসর্গচিত্র অনুযায়ী ছবিটা, একটা সম্পূর্ণ দৃশ্যও বলা যেতে পারে—আঁকা হবে। এটাকে প্যানোরমাও বলা যেতে পারে। একটা জানোয়ারের মূর্তি হবে ছবিটার মূল কেন্দ্র। একটা পূর্ণাবয়ব, বন্যপ্রাণীর চোখ, গরু পা গানোর কর্মীর হাত থেকে একটা বলদ যেমন লাফ ঝাঁপ দিয়ে কোনরকমে নিজেকে মুক্ত করে উন্মাদের মত ছুটতে থাকে। কিন্তু ছবির পশ্চাৎপটের ডানদিকের কোন ফাঁকা জায়গায় সেটাকে আঁকতে হবে। প্রাকৃতিক পরিবেশটাকে সুন্দরভাবেই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। লতাপাতা ঝোপঝাড়, নাসপাতিগাছ, মেসকিট গাছ প্রভৃতিকে যথাযথ স্থানে বসানো হয়েছে। আর ছবির উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করা হয়েছে জলের গামলার মত সুবিশাল ফুলওয়ালা স্পেনের ছুরিকা-গাছ ঠিক ঠিক জায়গায় আঁকার মাধ্যমে। আর অদূরবর্তী অঞ্চলে দেখানো হয়েছে তৃণহীন সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর আর তারই মাঝ দিয়ে এঁকেবেঁকে বয়ে চলেছে ফিতের মত সরু নদী-নালা। ছবিটার একেবারে সামনে অত্যাশ্চর্য রঙের একটা ঝুমঝুমি সাপ হাল্কা সবুজ রঙের গাছটার তলায় বিড়ে পাকিয়ে শুয়ে আছে। ছবিটার এক-তৃতীয়াংশ জায়গা

জুড়ে আছে সাগরের মত নীল আর ধবধবে সাদা রঙের ছোপ। পশ্চিমাঞ্চলের নীল আকাশের গায়ে সাদা মেঘের টুকরোকে ভেসে বেড়াতে দেখা যায়।

সদ্য আঁকা ছবিটাকে প্রতিনিধি কক্ষের প্রধান ফটকের কাছাকাছি চওড়া-দালানের দুটো স্তম্ভের মধ্যবর্তী স্থানে স্থাপন করা হয়েছে। নাগরিক, আইন প্রণেতাগণ ভিড় করে সে স্থানটা অতিক্রম করে যাবার সময় সৃষ্টির দিকে অপলক চোখে তাকান। তাদের মধ্যে অনেকেই, অধিকাংশও হতে পারে, জনবিরল তৃণভূমি অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। অতএব পরিচিত দৃশ্যটা সঙ্গত কারণেই তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার কথা। আবার যারা এক সময় গবাদি পশু চরাত তারা পরিচিত দৃশ্যের স্মৃতি মনের কোণে ভেসে ওঠায় পুলকিত চিত্তে সেখানে দাঁড়িয়ে পড়তে লাগল। সমগোত্রীয় পরিচিতজনের সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়তে লাগল। আসলে শহরে তো শিল্পসমালোচক নেই বলতে কেউ-ই নেই। রঙ, তুলি, পরিবেশ আর অনুভূতির কথা কোনদিন তারা কানেও শোনে নি। তাদের বেশীরভাগ লোকই ছবিটায় ভূয়সী প্রশংসা করল বিশেষ করে সোনালী ফ্রেমটার প্রশংসা তো একেবারেই পঞ্চমুখ করতে লাগল। আসলে এত বড় ফ্রেম তো তারা এর আগে কোনদিন দেখেই নি।

উচ্চ প্রশংসা ছবিটার উদ্যোক্তা আর জামিনদার সেনেটর কিনে। তিনি সামান্য এগিয়ে, ছবিটার পাশে দাঁড়িয়ে চিনচিনে গলায় বলেন, শুনুন মশাই, আমাদের রাষ্ট্রের সম্পদ, সমৃদ্ধি আর জামিন—মানে গৃহপালিত পশুদের কথা বলতে চাইছি, সবকিছু সম্বলিত একটা দৃশ্যপট যে একটা অক্ষর-অমর ক্যানভাসের গায়ে মনোলোভা করে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। আমরা যদি তাকে উপযুক্ত স্বীকৃতি না দেই তবে আমাদের মহান দেশের নামটাই সে কলঙ্কের কালিমায় লিপ্ত হবে, ঠিক কিনা?

কে এ সেনেটর কিনে? তিনি আসলে 'সান সাবা' অঞ্চল চারশ' মাইল দূরবর্তী পশ্চিমাঞ্চলের একেবারে শেষ প্রান্তের একটা বিশেষ অংশের প্রতিনিধি মাত্র। কিন্তু তাই বলে তো আর শিল্পের প্রকৃতি অনুরাগীকে সে স্থান-কালের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব নয়। তা ছাড়া সান সাবা অঞ্চলের প্রতিনিধি সেনেটর সুলেন্স নিশ্চয়ই জানেন যে, তাঁর অন্যতম নির্বাচকের ছবিটা খরিদ করা রাষ্ট্রের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য।

আর সেনেটর সুলেন্স পুনর্নির্বাচনের প্রত্যাশা রাখেন। তাই সান সাবা-র ভোটের গুরুত্ব তিনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন। আর এ-ও জানেন যে, আইন পরিষদে সেনেটর কিনের যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি আছে। অতএব তাঁর সহযোগিতা পেলে প্রস্তাবটা অনায়াসে অনুমোদিত হবে, সন্দেহ নেই।

আবার সেনেটর কিনেরও সেঁচ সংক্রান্ত একটা ঝোঁক আছে যাকে নিজের কেন্দ্রের সুবিধার্থে আইন-পরিষদ কর্তৃক অনুমোদন করিয়ে নেওয়া দরকার। আর এতে সেনেটর সুসেন্স তাকে যথেষ্ট সাহায্য সহযোগিতা করতে পারেন। অতএব দুটো স্বার্থের যখন সমন্বয় ঘটে গেল। অতএব রাষ্ট্রের রাজধানীর মানুষ যে মাত্রাতিরিক্ত শিল্পকলার প্রতি ঝুঁকবে, নাগরিকদের শিল্পের প্রতি প্রবণতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে তাতে তো অবাক হবার কোনই কারণ নেই। ব্রিস্কোর প্রথম ছবিটা যে বর্ণাঢ্য উৎসব অনুষ্ঠান এবং মনোরম পৃষ্ঠপোশকতায় লেনি বেস্কোর প্রথম ছবিটার আবরণ উন্মোচনের মাধ্যমে উদ্বোধন করা হল এরকম সৌভাগ্য খুব কম শিল্পীর বরাতেই জোটে। অতএব চারদিকে শিল্পী লেনি ব্রিস্কোর জয় জয়কার পড়ে গেল।

সেনেটর সুলেন্স আর কিনে উভয়ে এম্পায়ার হোটেলের কাফেতে বসে পানাহার সারতে সারতে ললিতকলা আর সেচের ব্যাপারে বোঝাপড়া করে ফেললেন।

তবে আলোচনার শুরুতেই সেনেটর কিনে বললেন আমার মাথায় ঠিক আসছে না। আমি শিল্পকলা-সমালোচক নই। তবে আমার বিশ্বাস, ব্যাপারটা সম্বন্ধে মন্তব্য করা সম্ভব হবে না। শোন সুলেন্স ধর আমি তোমাকে সাহায্য করতে রাজি হলেও অন্য সবাই আমাদের এ প্রয়াসকে এক তুড়িতে উড়িয়ে দেবে, উপহাস করবে, সেনেট-কক্ষ থেকে আমাদের বের করে দেওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নয় আর বের করে দেবেও।

কিনের পানপাত্রের গায়ে নিজের পাত্রটাকে মৃদু টোকা লাগিয়ে সেনেটর সুলেন্স বললেন—

আসল ব্যাপারটাই তো আমার মাথায় যাচ্ছে না হে। শিল্পকর্মটার, মানে ছবিটার গুণাগুণের বিচার করার দরকার নেই। যে মূল বক্তব্যটা নিয়ে আমাদের কাজ শুরু করতে হবে সেটা আগে জানা দরকার। কে এই শিল্পী লেনি ব্রিস্কো? সে হচ্ছে লুসিয়েন ব্রিস্কোর নাতি।

আচ্ছা, বুড়ো লুসিয়েন ব্রিস্কো সম্বন্ধে তুমি কি জান, কতটুকু জান? সেনেটর কিনে চোখে-মুখে চিন্তার ছাপ ফুটিয়ে তুলে বললেন, সে-তো তোমারও পরিচিত। লুসিয়েন ব্রিস্কোই তো জনমানবহীন এক বিস্তীর্ণ এ রাষ্ট্রের পত্তন করেছিলেন। আর তিনিই এখানে ইন্ডিয়ানদের বসতি গড়ে তুলেছিলেন। আর ঘোড়াচোরদের এখান থেকে তিনি বিতাড়ন করেছিলেন। আর তিনিই শিরে রাজমুকুট ধারণ করতে ঘোরতর আপত্তি জানিয়েছিলেন। অতএব বুঝতেই পারছ লোনি ব্রিস্কো এ রাষ্ট্রের একজন প্রিয় পাত্র। আশা করি এবার মূল বক্তব্যটা তোমার মাথায় গেছে? সেনেটর কিনে বললেন—ছবিটা গুটিয়ে বেঁধে ফেল। মনে কর, এটা বিক্রি হয়ে গেছে। শিল্পকলা সম্বন্ধে এতকিছু না বলে গোড়াতেই এ কথাটা বলে ফেললেই তো ল্যাটা চুকে যেত। এ রাষ্ট্রকে দিয়ে যদি লুসিয়েন ব্রিস্কোর নাতির একটা শিল্পকর্ম কেনাতে না পারি তবে সেদিনই সেনেটের পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে জেলার আমিনের কাজে ফিরে কাঁধে করে শিকল বয়ে বেড়াব। এক চোখওয়ালা স্নাদার্স-এর মেয়র থাকার জন্য একটা টাকার বিশেষ ব্যবহার করা হয়েছিল, কথাটা শুনেছ? মুলতুবি একটা প্রস্তাব মারফৎই সেটা অনুমোদন লাভ করেছিল। আর ব্রিস্কো যত ইন্ডিয়ানদের হত্যা করেছিল, এক চোখওয়ালা সে বুড়োটা তার অর্ধেক লোককেও খুন করতে পারেনি। এবার সত্যি করে বল তো, তুমি আর সে চিত্রশিল্পী রাজকোষ থেকে কত টাকা বরাদ্দ করবে মনস্থ করেছ?

আমি তো শ' পাঁচেকের কথা ভেবেছি। সেনেটের মুলেন্স বললেন।

পাঁচশ'! লুসিয়েন ব্রিস্কোর নাতি আঁকা সুর তুলে দাঁড়ালো একটা লাল বলদের ছবির জন্য মাত্র পাঁচ শ'! শোন, এতে তোমার রাষ্ট্রের মান সম্মান বজায় থাকবে কি? পাঁচশ' না বলে তার চেয়ে দু' হাজার বল।

সেনেটর সুলেন্স নীরব চাহনি মেলে সেনেটর কিনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

সেনেটর কিনে বলে চললেন—বিলটা তুমি তুলবে। আর আমি সেনেটে দাঁড়িয়ে বুড়ো লুসিয়েন ব্রিস্কো যত ইন্ডিয়ানদের হত্যা করেছিল তাদের প্রত্যেকের খুলির চামড়া দেখাতে থাকব, ঠিক আছে।

আর? আর কিছু?

হ্যাঁ, তিনি আরও কোন্ কোন্ বড়াই করার মতও বোকামির কাজ করেছিলেন সবই দেখাতে হবে। তিনি সে রকম কোন কাজে ব্রতী হয়েছিলেন কি? হ্যাঁ—হ্যাঁ, তিনি যত বেতন আর প্রাপ্য যত সুযোগ সুবিধা কিছুই নেননি, সসম্মানে প্রত্যাখ্যান করেছেন। রাজি হলে তিনি গভর্নরও হতে পারতেন। কিন্তু তাতেও রাজি হন নি। এমন কি পেন্সন নিতেও ঘোরতর আপত্তি করেছেন। তাঁর যাবতীয় পাওনা মিটিয়ে দেবার সুযোগ একার রাষ্ট্র পেয়েছে। লোনি ব্রিস্কোর ছবিটা তাকে কিনতে হবেই হবে। আর তার জন্য ব্রেস্কো পরিবারকে সে এতদিন অপেক্ষা করানো হয়েছে তারজন্য দণ্ডও কিছু না কিছু তাদের প্রাপ্য। শুল্ক বিলটার ব্যাপার মিটে গেলে এ মাসের মাঝামাঝি আমরা এ প্রসঙ্গটা উত্থাপন করব।

ভাল কথা। তবে একথাই থাকল।

সেনেটর কিনে বললেন—সুলেন্স, একটা কথা, ওই সেচের খালগুলো কাটবার জন্য কত ডলার খরচ হতে পারে বলে তুমি মনে করছ? আর এর ফলে প্রতি একরে কি পরিমাণ ফসলের উৎপাদন বাড়বে তারও একটা হিসাব করে আমাকে দেখাবে। আর একটা কথা, আমার বিলটা যখন উত্থাপন করব তখন কিন্তু তোমার সাহায্য আমার পক্ষে অপরিহার্য হয়ে উঠবে, মনে থাকবে তো?

অবশ্যই। কথা দিচ্ছি, তাতে আমার সমর্থন অবশ্যই থাকবে।

আর যে কথা বলছিলাম, আমার বিশ্বাস, আমরা উভয়ে মিলে এ অধিবেশনটা এবং পরবর্তী অধিবেশনগুলোতে ভালভাবে কাটিয়ে দিতে পারব। তোমার কি মত সেনেটর?

সান-সাবার বালক চিত্রশিল্পী লোনি বিস্কোর প্রতি ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন হয়ে উঠলেন। আসলে তাকে লুসিয়েন বিস্কোর পরিবারে পঠিয়ে ভাগ্যদেবী বহু আগেই কাজটা সম্পন্ন করে রেখেছিলেন অস্বীকার করার উপায় নেই।

লুসিয়েন ব্রিস্কো রাষ্ট্রের পত্তন, রাজ্য দখল করা আর মহৎ ও উদারচেতা মনের প্রেরণায় আরও কিছু ভাল কাজ সম্পন্ন করার ব্যাপারে কর্ণধার—পথপ্রদর্শক ছিলেন। স্থানীয় আদিম অধিবাসীদের মধ্যে তাঁকে অবশ্যই অন্যতম বলে মনে করতে হবে। অনভিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞ আর অসভ্য আদিবাসীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী অভিযাত্রীদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তি।

বুন, ক্লার্ক, গ্রীন, ক্রোকেট আর থার্ডসন প্রমুখের তালিকায় অন্যান্য যাদের নাম স্থান পেয়েছে, তাদের তালিকার লুসিয়েন ব্রিস্কোর নামও অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। আর অন্য সবার সমান শ্রদ্ধাও তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদন করা যায়।

লুসিয়েন ব্রিস্কোর জীবন নিতান্তই সহজ-সরল, স্বাধীনচেতা আর উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ। এমনকি সেনেটর কিনের স্বল্প চতুর যে কোন ব্যক্তিই আগে থেকে বলে দিতে পারতেন সে তার নাতির প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করতে পুরস্কৃত করার ব্যাপারে তার রাষ্ট্র এতটুকুও কার্পণ্যও বিলম্ব করবে না।

এবার থেকে বহুদিন পর্যন্ত প্রায়ই একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা গেছে যে, প্রতিনিধি-কক্ষের সদর-দরজার গায়ে স্থাপিত মহান ছবিটার দিকে সেনেটর অপলক চোখে তাকিয়ে আছেন। আর মাঝে-মধ্যেই উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করতেন নাতির শিল্পকর্মের। প্রশংসার সঙ্গে লুসিয়েন ব্রিস্কোর কীর্তির স্মৃতিচারণ করছেন। আর এ কাজকে তিনি মনে-প্রাণে কর্তব্যজ্ঞান করেন। তবে সেনেটর সুলেন্সও লুসিয়েন ব্রস্কোর প্রতি কর্তব্য পালন করেন, কিন্তু নিঃশব্দে নীরবে।

এবার নির্দিষ্ট সে বিলটা উত্থাপনের দিন ক্রমেই এগিয়ে আসতে লাগল। এ উপলক্ষ্যে 'সান সাবা' অঞ্চল থেকে ঘোড়া হাঁকিয়ে সেখানে উপস্থিত হল লোনি ব্রিস্কো। আর শিল্পকলার সুখ্যাতি গাইবার জন্য একদল ঘোড়াচোরও পাগলা ঘোড়ার পিঠে সেখানে গেল। কেন? কারণ, লোনি ব্রিস্কো যে তাদেরই দলভুক্ত। সে এবং তার সাকরেদরা ঘোড়ার রেকাব, রঙ-তুলি আর প্যালেট চালাতে যেমন দক্ষ লাসো আর '৪৫ বন্দুক চালাতেও ঠিক তেমনই দক্ষ।

সেটা ছিল মার্চ মাসের এক বিকাল। একদল লোক রীতিমত হৈ-হৈ রৈ-রৈ করতে শহরে ঢুকে আলোড়ন সৃষ্টি করল। আসলে তারা ঘোড়াচোরের দল। তারা পোশাক আশাক কিছুটা বদলে শহরের বুকে ধুন্ধুমার কাণ্ড জুড়ে দিল। মাথার টুপিই কেবল তারা ফেলে নি, দু'-ঘোড়া পিস্তল আর বেল্ট কোমর থেকে খুলে ঘোড়ার পিঠের জিনের নিচে লুকিয়ে রেখেছে।

ঘোড়াচোরদের সঙ্গেই লোনি ব্রিস্কোও শহরে ঢুকেছে। লোনি ব্রেস্কো ত্রিশ বছরের লম্বা চওড়া, সুঠামদেহী যুবক। বাদামী তার গায়ের রঙ। গম্ভীর স্বভাব, কথা কম বলা তার স্বভাবের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

সেনেটর সুলেন্স পত্র পাঠিয়ে পুরো ব্যাপারটা লোনি ব্রিস্কোকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। এমন কি সরকারের কাছ থেকে পুরস্কার বাবদ কি পরিমাণ অর্থ পেতে পারেন সে কথাও তাকে খোলাখুলি জানিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে লোনি নিঃসন্দেহ হয়েই এখানে এসেছে সে, যশ আর অর্থ ধরতে গেলে তার পকেটেই ঢুকে গেছে। ব্যাপারটা নিঃসন্দেহ যে, বাদামী রঙের ঘোড়া সওয়ারটার বুকে যেন স্বর্গীয় অগ্নিশিখার একটু স্ফুলিঙ্গ অনবরত জ্বলেই চলেছে। ইতিমধ্যেই সে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে সে দু' হাজার ডলার তার প্রতিভার ভবিষ্যৎ বিকাশের কাজেই সে ব্যবহার করবে। আর ভবিষ্যতে স্বীয় প্রতিভা আর নিষ্ঠার ওপর নির্ভর করে এর চেয়েও বড় একটা ছবি আঁকার পরিকল্পনা সে ইতিমধ্যেই নিয়ে নিয়েছে। এর চেয়ে বড় বলতে মনে করা যেতে পারে বারোফুট বাই বিশফুট মাপের ছবি যাতে পুরোপুরি একটা নিসর্গ ফুটিয়ে তোলা হবে আর তাতে দেখানো হবে পরিবেশ আর কর্মকাণ্ড।

ঘোড়াচোরের দলটা বিলটা উত্থাপনের তিনদিন আগে থেকেই তাদের দুঃসাহসিক কার্যকলাপ শুরু করে দিল। গায়ে কোট ব্যবহার না করলে কি হবে ঘোড়ার পেটে মারার লোহার কাঁটা পায়ে পরে নিয়েছে। মুখে জঘন্য কথাবার্তা। উৎসাহ-উদ্দীপনায় সবার মন ভরপুর। অভাবনীয় উল্লাসে তারা ছবিটাকে ঘিরে নাচানাচি, লাফাতে লাগল। আর একটু-আধটু মওকা পেলেই তাঁর চিত্রশিল্পী লোনি ব্রিস্কো-র শিল্পনৈপুণ্যের প্রশংসায় মেতে ওঠে। এ স্তাবকদের দলের সর্দার পেরি তো অনর্গল একই ছকবাঁধা গৎ আওড়ে যেতে লাগল। সুবিশাল ছবিটার দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে বলতে

লাগল—ওই যে, দু' বছরের এঁড়ে বাছুরটা দেখছেন, সেটার দিকে নজর দিন। ওটাকে কি জীবন্ত প্রাণী বলে মনে হচ্ছে না? তার আয়ত চোখ দুটোর দিকে ভালভাবে লক্ষ্য করলে মুগ্ধ হতেই হবে। দোলায়মান লেজটা? সব মিলিয়ে প্রাণীটাকে একেবারে জীবন্ত প্রাণী না ভেবে পারা যায় না। সত্যি কথা বলতে কি, অন্য কোন উপায়ে একটা এঁড়ে বাছুর লেজ নাড়ছে এ রকম দৃশ্য আমার চোখে অন্তত পড়েনি। আর যদি দেখে থাকি তবে আমার গা থেকে চামড়া খুলে নেবেন, আমি প্রতিবাদই করব না।

জুড শেল্‌বি, ছবিটার নিসর্গ অংশে প্রশংসাই সবচেয়ে বেশী করে করল। তবে বাছুরটার চমৎকারিত্বের কথাও কম বলল না।

একদিকে লোনির দলের ঘোড়াচোররা অন্যদিকে সেনেটর কিনে নানা ছবিটার গুণকীর্তনে মেতে উঠল।

এভাবে নানাজন বিভিন্নভাবে প্রচার কার্যে মগ্ন হল। কার্যত দেখা গেল চিত্রকরের রঙ-তুলির কৃতিত্বের চেয়ে ছবিটার গুণকীর্তনই মাত্রাতিরিক্ত চলতে লাগল। আর এরই ফলে সাধারণ দর্শকরাও ছবিটার মধ্যে চমৎকারিত্বের সন্ধান পেতে লাগল। তারাও সবাই পঞ্চমুখে প্রশংসা করতে লাগল।

এবার সে বিশেষ দিনটা এল। লোনির ব্রিস্কোর আঁকা ছবিটা কেনার দু' হাজার ডলার ব্যয় বরাদ্দ পাশ করিয়ে নেবার জন্য প্রসঙ্গটা অধিবেশনে তোলার দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেনেটর সুলেন্স।

নির্দিষ্ট দিনে সেনেট-কক্ষের সামনের সারির চেয়ারগুলো দখল করে লোনি এবং 'সান সাবা'র দল।

যথা সময়ে সেনেটর সুলেন্স বিলটা উত্থাপন করলেন। এক সময় দ্বিতীয় দফার শুনানিও হয়ে গেল। এবার সেনেটর সুলেন্স লোনি ব্রিস্কো এবং তার তুলির ভূয়সী প্রশংসার উল্লেখ করে দীর্ঘ ভাষন দিলেন। এবার চেয়ার ছেড়ে উঠে এলেন সেনেটর কিনে। সে আমলে জ্ঞান-বুদ্ধির চেয়ে বাগ্মিতার কদরই ছিল সবচেয়ে বেশী। তখন লোকের মনোরঞ্জনের দিকে লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন অঙ্গ ভঙ্গীর মাধ্যমে উপসংহারই ছিল আসল। তার ভাষণের সারকথা কতটুকু আছে সেটা বড় কথা নয়, আসলে শ্রোতাদের কতখানি আনন্দ দান করতে পারল তা দিয়েই বক্তার বাগ্মিতা ও পারদর্শিতার প্রমাণ হত।

সেনেটর কিনে ভাষণ দান করলেন। দর্শক-আসনে উপবিষ্ট সান-সাবা-র দলের অবিন্যস্ত চুল কপাল আর চোখের ওপর নেমে এল। আর এরা ষোল আউন্স ওজনের টুপিগুলোকে অস্থিরভাবে এক হাঁটু থেকে অন্য হাঁটুর ওপর ফেলে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

সেনেটর কিনে এক ঘণ্টা ধরে ইতিহাস প্রসঙ্গে বক্তৃতা দিলেন। ভাবাবেগ আর দেশাত্মবোধ মিশ্রিত ইতিহাস। কথা প্রসঙ্গে সদর-দরজায় রক্ষিত ছবিটার কথা বলতে গিয়ে বললেন—ছবিটার প্রশংসা করার দরকার আছে বলে আমি মনে করি না। কারণ, সেনেটর নিজের চোখে ছবিটা দেখেছেন। লুসিয়েন ব্রিস্কোর নাতি লোনি ব্রিস্কো ছবিটা এঁকেছেন। তারপর লুসিয়েন ব্রিস্কোর জীবন-কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করলেন। তিনি যে কঠোর ও দুঃসাহসিক কার্যকলাপের মাধ্যমে সে এক স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন সে কথা বলতেও তিনি বাদ দিলেন না। প্রসঙ্গক্রমে এ-ও উল্লেখ করলেন, দেশের মাটি ও মানুষের প্রতি অফুরন্ত ভালবাসা আর উপঢৌকন আর কারো প্রশংসার প্রতি তাঁর অন্তরে ছিল জ্বলন্ত ঘৃণা। আর তিনি ছিলেন আত্মবিশ্বাসের এক মূর্ত প্রতীক। রাষ্ট্রের প্রতি আন্তরিক সেবা তাকে মহতের আসন দান করেছে। এ-ই হচ্ছে লুসিয়েন ব্রিস্কোর পরিচয়। সেনেটর কিনে-র ভাষণে যে ভাবাবেগ উচ্ছ্বাস অতিমাত্রায় ছিল তার প্রমাণ হাতেনাতে পাওয়া গেল শ্রোতাদের ঘন ঘন করতালির মাধ্যমে।

না, বিপক্ষে একটা ভোটও পড়ল্‌ না। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বিলটা পাশ হয়ে গেল। আগামী দিন সেটা পরিষদে গৃহীত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

লেনি ব্রিস্কো এবং তার 'সান সাবা' দলের সদস্যরা টলতে টলতে পরিষদ-ভবনের প্রাঙ্গণে হাজির হল। মৃগপদ সামার্স নামক এক গাট্টাগোট্টা যুবক সোল্লাসে মন্তব্য করল—ছবিটার গতি তবে হয়েই গেল। তাদের মতিগতি আমি বুঝে নিয়েছি—এতগুলো ডলারের বিনিময়ে তাঁরা লোনি ব্রিস্কো-র এঁড়ে বাছুরটাকেই খরিদ করেছেন। দেখ, ওসব পরিষদীয় ব্যাপার আমার মাথায় ঢোকে না, তবে

তাঁদের কথাবার্তা আর গতিক আমাকে একথা ভাবতেই উৎসাহ দিচ্ছে। একটা কথা লক্ষ্য করেছ লোনি, তাঁরা ছবি কিনলেন তোমার, আর গুণকীর্তন গাইলেন তোমার ঠাকুরদা লুসিয়েন ব্রিস্কো-র অদ্ভুত কাণ্ড বটে। তাই ব্যাপারটা অনুমান করতে পারছ, তোমার নামের সঙ্গে ওই ব্রিস্কো পদবীটা ছিল বলেই তোমার কপাল ফেটেছে, ছবিটা অগ্নিমূল্যে বিকিয়েছে।

কথাগুলো লোনি ব্রিস্কো-র মনে কাঁটার মত বিঁধল ও একটা সন্দেহ দানা বাঁধল। পুরো ব্যাপারটাই তার কাছে অপ্রীতিকর বোধ হতে লাগল। তার মাথাটা যেন প্রবল মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বলে ক্রমেই ভূমির দিকে নামতে লাগল। সে মাথা নিচু করে বসে ঘাসের গোড়া ছিঁড়ে অন্যমনস্কভাবে চিবোতে লাগল। ছবিটার উৎকীর্ণতার কথা সেনেটর তার দীর্ঘ ভাষণে ভুলেও উল্লেখ করলেন না, একথাটাই তার মনে বার-বার কাঁটার মত বিঁধতে লাগল। একজন শিল্পীর কাছে ব্যাপারটা কম অপমানজনক নয়। চিত্রশিল্পীর কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে কেবল ঠাকুরদার নাতি হিসাবে। এটাই তার সবচেয়ে বড় ও একমাত্র পরিচয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদিক থেকে ব্যাপারটা সন্তোষজনক, অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু শিল্পকলা পুরস্কার দিতে গিয়ে শিল্পকার্য বা শিল্পীর প্রকৃত কৃতিত্বের মূল্য না পেলে শিল্পশৈলীকে তো ছোট করেই দেখানো হয়েছে। ব্যাপারটা বালক চিত্রশিল্পীকে বড়ই ভাবিয়ে তুলল, মন-প্রাণ যারপরনাই বিষিয়ে উঠল।

লোনি ব্রিস্কো যে হোটেলটায় আশ্রয় নিয়েছে সেটা পরিষদ ভবনের অদূরে অবস্থিত। সেনেটে তখন অর্থের বিলটা পাশ হতে হতে মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় হয়ে গেল। খাবার ঘরে যাবার সময় হোটেলের করণিকের সঙ্গে তার মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। কোনরকম ভূমিকা না করেই করণিক ভদ্রলোক বললেন—শুনেছেন, নিউইয়র্ক থেকে একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী আজই এ শহরে পৌঁছেছেন, আর তিনি এ হোটেলেই উঠেছেন। এখান থেকে তিনি পশ্চিমে, মেক্সিকো শহরে যাবেন। জুনিস-এর পুরনো প্রাচীরে সূর্যের কিরণ পড়লো তার ফল কি দাঁড়ায় সেটা পর্যবেক্ষণ করাই লক্ষ্য। সম্প্রতিকালের পাথরে আলো প্রতিফলিত হয়। আর প্রাচীনকালে নির্মিত প্রসাদ বা ছোট-বড় বাড়িগুলোতে ব্যবহৃত মশলা ও সরঞ্জাম দিতে আলোর প্রতিফলন ঘটে না, আলো শুষে নেয়। শিল্পী আশা রাখছেন, তার একটা নতুন ছবিতে ব্যাপারটা ফুটিয়ে তুলবেন। আর তা দেখে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ব্যাপারটা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবার জন্য দু'হাজার মাইল পথ তিনি ঘুরবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে লোনি সদ্য আগত কৃতী চিত্রশিল্পীকে খুঁজে বের করলেন। সামান্য আলাপ-পরিচয়ের পর নিজের কাহিনীটা খোলসা করে তাকে বললেন। শিল্পী অসুস্থ স্বীয় শিল্প-প্রতিভা আর জীবনের প্রতি ঔদাসিন্য বশতই তিনি প্রাণে বেঁচে আছেন।

লোনি ব্রিস্কো-র মুখে তার দৃষ্টির বিস্তারিত বিবরণ শুনে তিনি সোৎসাহে তার সঙ্গে ছবিটার কাছে গেলেন। কপালের চামড়ায় চিন্তার ভাঁজ এঁকে তিনি দাঁড়িয়ে হাত বুলোতে লাগলেন। স্পষ্টই মনে হল তিনি মোটেই খুশি নন।

আমার সঠিক মনোভাব আমার কাছে ব্যক্ত করুন এটাই আমার একান্ত ইচ্ছা। আপনার মতামত যে ভাবে কলমের ডগা দিয়ে প্রকাশ করেন সে কথাই বলতে চাইছি, লোনি ব্রিস্কো কাতর মিনতি জানাল।

চিত্রশিল্পী বললেন—হ্যাঁ, ঠিক সেভাবেই আমি মতামত ব্যক্ত করব। সত্য কথা খোলাখুলি বলার মত বয়স আমার হয়েছে। তোমার তো এটাই জ্ঞাতব্য যে, ছবিটা নিখুঁত, কিনা—এই তো?

হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন। এটা আসলে পশম, নাকি নিছকই সুতো? আপনি খোলসা করে বলুন, আমার কি ভবিষ্যতে এরকম ছবি আরও আঁকা উচিত, নাকি এখানেই যবনিকা টানব?

শোন, খেতে বসে পিঠে খেতে খেতে একটা গুজব আমি শুনতে পেলাম—রাজ্য সরকার অতিশীঘ্রই এ ছবিটার জন্য দশ হাজার ডলার দেবেন।

হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। সেনেটে সেটা অনুমোদিত হয়েও গেছে। পরিষদে আগামীকালই ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করে ফেলবে, এ-ও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সৌভাগ্যের ব্যাপার, সন্দেহ নেই। একটা কথা, কি খরগোসের মত পায়ের অধিকারী?

না, অবশ্যই না। কিন্তু ব্যাপারটা থেকে আমার মনে হচ্ছে, আমার এক ঠাকুরদা ছিলেন। আমার

আঁকা ছবিটার ব্যাপারে তাকেও দেখছি রীতিমত জড়িয়ে ফেলা হয়েছে। এটা আঁকতে আমি পাঁচ-পাঁচটা বছর ব্যয় করেছি। আপনি খোলসা করে বলুন তো, ছবিটা কি একেবারেই বাজে হয়েছে, নাকি? এখানে কেউ কেউ সমালোচনা করছে, এঁড়ে বাছুরের লেজটা খারাপ আঁকা হয় নি। আর তারা এ-ও বলছে, ছবিটার বিভিন্ন অংশের সামঞ্জস্য ভালই রক্ষিত হয়েছে। আপনার মতামত জানার জন্য আমি খুব আগ্রহী।

বিখ্যাত শিল্পী কণ্ঠস্বরে বিরক্তি প্রকাশ করে বলে উঠলেন—বাছা, কলা-দেবীর দোহাই, ছবিটবি আঁকার ব্যাপারে আর মিছে অর্থ ব্যয় কোরো না। দুঃখ পোয়ো না, আসলে এটা একটা ছবিই হয় নি। যা হয়েছে তাকে নিছকই একটা বন্দুক বলা চলে। আমার পরামর্শ শোন, যদি পার সরকারের পিছনে জোকের মত লেগে থাক। মওকা বুঝে তোমার প্রাপ্য দু' হাজার ডলার বাগিয়ে নাও। তবে মনে রেখো, ভবিষ্যতে কোনদিন ক্যানভাসের সামনে দাঁড়াবে না। তার নিচের সারিতেই থাকার চেষ্টা কোরো। সে অর্থ দিয়ে শ' দুই টাট্টু ঘোড়া খরিদ করে ফেল। শুনেছি এরকম দামেই নাকি ঘোড়া বিকোন হয়। যাক গে, যে কথা বলছিলাম, ঘোড়া খরিদ করে জীবনভর তাদের পিঠেই কাটাও। ব্যস, ফুসফুস ভরে মুক্তো বাতাস নাও, ভাল-মন্দ খাওয়া দাওয়া কর, নিশ্চিন্তে নাক ডাকিয়ে ঘুমোও—সুখে জীবন কাটিয়ে দাও।

লোনি ব্রিস্কো বিষণ্নমুখে তাঁর কথাগুলো শুনতে লাগল। চিত্রকর বলে চলল—হ্যাঁ, যে কথা বলছি, ছবি আঁকার কাজে আর কোনদিন হাত দিও না যেন। তার আপাদমস্তক একবারটি চোখ বুলিয়ে এবার তিনি বললেন—বাছা, তোমাকে দেখে তো মনে হচ্ছে, শরীর-স্বাস্থ্য ভালই। এটাও কিন্তু একটা প্রতিভা। তুমি বরং ওটার চর্চায় লেগে থাক। আচ্ছা, আমার মুখ থেকে একথাই তুমি শুনতে চেয়েছিলে, ঠিক কিনা?

গরু-দাগানেরা তিনটায় এল। জিন পরানো 'আগুনে তামালেস'-কে সঙ্গে করে নিয়ে এল। প্রচলিত প্রথাটাকে অগ্রাহ্য করার তো উপায় নেই। সেনেট কর্তৃক বিলটা পাশ হয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে পুরো দলটাকেই শহরের পথে পথে দাপিয়ে আনন্দ প্রকাশ করতে হবে। মদের বন্যা চুটিয়ে দিয়ে শহরটাকে উত্তেজনায় চাঙা করে তুলতে হবে। আবেগে-উচ্ছ্বাসের সঙ্গে ঘোষণা করতে হবে সান সাবা-র গৌরব কাহিনী। রাতভর কেবল আনন্দ-উচ্ছ্বাস-উল্লাস চালাতে হবে।

লোনি বিস্কো এক লাফে আগুনে তামালেস-এর পিঠে চেপে বসল। তার বাঁকা ধনুকের মত পা দুটোর গুঁতো খেয়ে জন্তুটা খুশি হল। লোনি তার বহুদিনের বন্ধু। বন্ধুর জন্য কিছু তো করাই দরকার। দুই পায়ের গুঁতোয় সে আগুনে তামালেসকে জোর কদমে ছুটিয়ে নিয়ে চলতে চলতে লোনি ব্রিস্কো গলা-ছেড়ে বলে উঠল—চল, সবাই চল।

উত্তেজিত-উল্লসিত দলটা ধুলো উড়িয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে দিল। লোনি সদলবলে পরিষদ ভবনের দিকে ছুটে চলল। তার সাকরেদরা বার বার সান সাবা-র নামে বার বার জয়ধ্বনি দিতে লাগল।

কাঁটা-মারা খুরে খটখট আওয়াজ তুলে গরু-দাগানেদের টাট্টুঘোড়াগুলো ছ'-ছটা চুনা পাথরের সিঁড়ি-বেয়ে ওপরে উঠে গেল। পথচারীদের চোখ ছানাবড়া করে তারা দালানের চত্বরে ঢুকে গেল।

লোনি ব্রিস্কো সবার আগে সোজা ক্যানভাসটায় কাছে পৌঁছে গেল। জানালা দিয়ে মৃদু এক টুকরো আলো এসে ছবিটার গায়ে ছড়িয়ে পড়ার তার শিল্পগত ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও সেটাকে একটা সত্যিকারের নিসর্গ বলেই মনে হতে লাগল। সবুজ ঘাসের প্রান্তরের বুকের ওপর দিয়ে ছুটন্ত টাট্টুটার পূর্ণাবয়ব মূর্তিটার দিকে চোখ পড়লে আপনিও হয়ত পিছিয়ে না গিয়ে পারতেন না। আগুনে তামালেস-এরও বুঝি সেরকম অবস্থাই হয়েছিল। সে তার পিঠে আরোহণকারীর নির্দেশই পালন করছে।

লোনি জিনের ওপর ঝুঁকে তার কনুই দুটো ডানার মত করে তুলে উঁচু করল। একজন গরু-দাগানে তার টাট্টুটাকে পূর্ণ গতিতে ছোটার ইঙ্গিত দেয়। এবার টাট্টু আগুনে তামালেস একটা লাল রঙের টাট্টুঘোড়ার দিকে তাকিয়ে বুঝে নিল তাকে পিছনে ফেলে তাকে এগিয়ে যেতেই হবে। উল্কার বেগে ছুটে যাওয়া টাট্টুটার লাগাম টান পড়ল, আর আগুনে তামালেস লোনি ব্রোস্কিকে পিঠে নিয়েই ছবিটার ওপরে ওঠার জন্য কামানের গোলার মত বেগে ধেয়ে সুবিশাল ক্যানভাসটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে বেরিয়ে টুকরো-টুকরো হয়ে যাওয়া ক্যানভাসের টুকরোগুলো পাশের অতিকায় একটা

গর্তের চারদিকে ঝুলে পড়ল।

এবার লোনি ব্রিস্কো হাতের লাগামে আচমকা হেঁচকা টান দিয়ে টাট্টুঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে দিল। সে স্তম্ভগুলোর চারদিকে অনবরত চক্কর মারতে লাগল।

দর্শকরা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল। ব্যাপার দেখে তারা স্তম্ভিত হয়ে গেল। কিন্তু কেউ এগিয়ে যেতে সাহস পেল না।

খবর পেয়ে পরিষদ-ভবনের সশস্ত্র সার্জেন্ট ব্যস্ত-পায়ে ছুটে এল। ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করে ভুরু কোঁচকাল। চোয়াল কঠিন হয়ে উঠল।

আইনসভার সদস্যদের কাছেও অভাবনীয় ব্যাপারটার খবর পৌঁছতে দেরী হল না। তাদের অনেকেই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। চোখে মুখে বিস্ময়ের ছাপ এঁকে ভিড় করে দাঁড়ালেন।

এদিকে লোনি ব্রিস্কো-র গরু-দাগানের দলও তার উন্মাদের মত কাণ্ড দেখে রীতিমত স্তম্ভিত হয়ে আতংকে নীরব চাহনি মেলে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল।

সবার আগে যারা ছুটে এসেছিলেন তাদের দলে সেনেটর কিনেও আছেন। তিনি আতঙ্কিত মুখে কিছু বলার চেষ্টা করলে লোনি ব্রিস্কো জিনের ওপরে বসে-থাকা অবস্থাতেই মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে, হাতের চাবুকটার দিকে সেনেটরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে শান্ত স্বরেই বলতে লাগল—মিস্টার, আজ আপনি চমৎকার এক ভাষণ দিয়েছেন। কিন্তু ওই টাকার প্রসঙ্গটা উত্থাপন না করলেই ভাল করতেন। তবে এ কথাও আমি বলতে চাইছি না, সরকার আমাকে কোন রকম অর্থই দেবেন না। আমি মনস্থ করে রেখেছিলাম, সরকারের কাছে বিক্রি করার মত একটা ছবি আমার কাছে ছিল। তবে, এটা কিন্তু সে ছবিটা নয়।

আর একটা কথা, আপনি আপনার ভাষণে আমার ঠাকুরদা লুসিয়েন ব্রিস্কো সম্বন্ধে বহুভাবে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ফলে তার নাতি হিসেবে আমি কম গর্ব অনুভব করিনি। আমার মনের কথাটা বোঝার চেষ্টা করুন—ব্রিস্কো পরিবার আজ অবধি সরকারের কাছ থেকে কোনরকম উপহার গ্রহণ করেনি, প্রত্যাশাও করেনি। আপনাদের মধ্যে যদি কারো ইচ্ছে হয় তবে ওই ফ্রেমটা নিয়ে যেতে পারেন। এবার সান সাবার প্রতিনিধিদের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে সে বলে উঠল—টাট্টুর পিঠে চাবুক মার।

লোনি ব্রিস্কো নির্দেশ পাওয়ামাত্র তার সাকরেদ হাতের চাবুক হিস্‌হিস্‌ শব্দে টাট্টুগুলোর পিঠে পড়তে লাগল। ব্যস, চাবুকের ঘা খাওয়ামাত্র ঘোড়াগুলো পথের ধুলো উড়িয়ে উল্কার বেগে ছুটতে লাগল।

তারা সান সাবা-র অর্ধেক পথ পাড়ি দিয়ে রাত্রি কাটাবার জন্য তাঁবু ফেলল। শোবার ঠিক আগে লোনি ব্রিস্কো তাঁবু থেকে বেরিয়ে তার প্রিয় টাট্টু আগুনে তামালেস-এর কাছে এল। তার গায়ে-মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—আমার প্রিয় তামালেস, ছবিটার মধ্যে একমাত্র তুই-ই কিছু দেখতে পেয়েছিলি। সত্যি, আমার প্রিয় ছবিটা অবিকল একটা টাট্টু ঘোড়ার মতই দেখতে হয়েছিল তাই না?

লোনি ব্রিস্কো তার প্রিয় ঘোড়াটার ওপর ঝুঁকে পড়ে তার গায়ে অনুশোচনার নিঃশ্বাস ফেলে তার চিত্রশিল্পী হবার সাধকে চিরদিনের মত মন থেকে মুছে ফেলল।

দ্য প্যাসিং অব ব্ল্যাক ঈগল

কোন এক বছরের কথা। সে বছর এক নাগাড়ে কয়েক মাস ধরে রিয়ো গ্র্যান্ডির তীরবর্তী টেক্সাসের সীমান্ত অঞ্চল জুড়ে ভয়ঙ্কর এক ডাকাত দল বল্গাহীন উৎপাতে মেতে ওঠে। কুখ্যাত এ লুঠেরাটা সবার মধ্যে ভয়ানক আতঙ্ক সঞ্চার করে। তার অভাবনীয় ব্যক্তিত্বের জন্যই সবাই তাকে কালো ঈগল সম্বোধন করে। কালো ঈগল সত্যি সীমান্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের সর্বদা আতঙ্কে জড়সড় করে রাখত।

কালো ঈগল আর তার সাকরেদদের নিয়ে বহু ভয়ঙ্কর কাহিনী লোকের মুখে মুখে ঘুরে বেড়ায়। হঠাৎ চোখের পলকের মধ্যেই যেন কালো ঈগল পৃথিবী থেকে একেবারে বে-পাত্তা হয়ে গেল। ব্যস, তারপর কোনদিন তার সম্বন্ধে একটা কথাও শোনা যায় নি। কেবলমাত্র সীমান্ত অঞ্চলের অধিবাসীরাই নয়, এমনকি তার নিজের সাকরেদরাও তার নিখোঁজ হবার রহস্য সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারল না।

টেক্সাসের সীমান্ত অঞ্চলের খামার আর জনবসতির মানুষের মন থেকে তবু আতঙ্ক দূর হল না। কালো ঈগল সম্বন্ধে ভীতি তাদের মধ্যে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসল। সবাই ভাবল, সে হয়ত হঠাৎ একদিন সদলবলে জনবসতির ওপর চড়াও হয়ে বল্গাহীন লুটপাট শুরু করে দেবে। কিন্তু না। সে আর কোন দিনই আসবে না।

কালো ঈগলের অদৃষ্টের রহস্য ভেদ করতেই এ কাহিনী লিখতে বসা।

সেন্ট লুই-এর মদ্য পরিবেশনকারীদের পদাঘাতকে কেন্দ্র করেই কাহিনীটার সূত্রপাত। তার অনুসন্ধিৎসু নজর পড়ল মুরগি-প্রভু বাগ্‌লস্-এর মূর্তির ওপর। সে তখন ঠুকরে ঠুকরে বিনা পয়সার ভোজ সারতে ব্যস্ত। আসলে মুরগি-প্রভু একজন রসরাজ বহুরূপী। মুরগির ঠোঁটের মতই লম্বা ও বাঁকানো তার নাকটা। আর পেটে? মুরগির মত অনবরত ক্ষিধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। আর সে আগুন বিনা পয়সায় মেটানোই তার স্বভাব। আর এ স্বভাবটা তার মজ্জায় মজ্জায় ছড়িয়ে পড়েছে। তাই তো তার ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলে বন্ধুরা অনেক ভেবে চিন্তে তার নামকরণ করেছে 'মুরগি-প্রভু বাগ্‌লস্'।

পানীয় না কিনে কেবলমাত্র খাদ্য সামগ্রী নিয়েই সে খেতে বসে পড়ল। মদ পরিবেশক কাউন্টার থেকে নেমে আহাম্মক খাদ্যরসিকটার কানটা আচ্ছা করে মলে দিয়ে হিড় হিড় করে দরজা পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেল। তারপর সজোরে এক লাথি মারল। সঙ্গে সঙ্গে সে রাস্তায় গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

ঠিক তখনই মুরগি-প্রভু বুঝতে পারল শীত এসে গেছে। পথচারীরা ভিড় করে পথ পাড়ি দিচ্ছে। আকাশের গায়ে তারাগুলো আলতোভাবে ঝুলছে।

পথচারীদের সবার গায়েই ওভারকোট। তাদের বোতাম-আঁটা পকেট থেকে একটা ডাইস বের করা যে কী কঠিন সমস্যা তা মুরগি-প্রভুর অজানা নয়। অন্য বছরের মত দক্ষিণ অঞ্চলে যাবার সময় হয়ে গেছে। আর দেরি করার উপায় নেই।

রুটি ওয়ালার জানালার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে মাত্র পাঁচ বছরের একটা ছেলে লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার এক হাতে একটা ছোট্ট গোলাকার চ্যাপ্টা ঝকঝকে চকচকে বস্তু আর অন্য হাতে দু' আউন্সের একটা খালি শিশি শক্ত করে ধরে রেখেছে। মুরগি-প্রভু ভাবল, তার দুঃসাহসের প্রমাণ দেবার এটাই তো উপযুক্ত পরিবেশ ও সময়।

মুরগি-প্রভু এবার অনুসন্ধিৎসু নজরে চারদিকে ভাল করে তাকিয়ে নিয়ে বিড়ালের মত সতর্কতার সঙ্গে শিকারের দিকে এগোতে লাগল।

ছোট্ট ছেলেটার অভিভাবক হয়ত আগে থেকেই তাকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল। তাই সে মুরগি-প্রভুর ইঙ্গিতকে পাত্তাই দিল না।

মুরগি-প্রভুর তো ভালই জানা আছে, লক্ষ্মীদেবীর কৃপা পেতে হলে তাকে নির্ভীক, একেবারেই বেপরোয়া হতেই হবে।

ছোট্ট ছেলেটা তার মূলধন চকচকে বস্তুটাকে হাতের মুঠোয় শক্ত করে চেপে ধরে রেখেছে সেটাকে বাগাতে হলে মুরগি-প্রভুকে পাঁচ সেন্টের ঝুঁকিটা না নিলে চলবে না।

ভাগ্য ফেরাবার পরীক্ষাটা যে খুবই বিপজ্জনক ঝুঁকির ব্যাপার তা মুরগি-প্রভুর ভালই জান আছে। অতএব কাজে জোর জুলুম না করে কায়দা কৌশলে কাজটা হাসিল করতে হবে। তা ছাড় বল প্রয়োগ করে কোন শিশুর সম্পত্তি ছিনিয়ে নিতে সে ভয়ও পায়।

এই তো ক'দিন আগে সে অসহ্য ক্ষুধায় কাতর হয়ে একবার পার্কের ভেতরে গাড়িতে বস একটা বাচ্চার হাত থেকে একটা খাদ্য বস্তুর বোতল ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু শিশুট তৎক্ষণাৎ এমন ক্ষীপ্রতার সঙ্গে গাড়ির বোতামটা টিপে দিল যে, বিকট আওয়াজ করে হর্নটা বেজে উঠল। চোখের পলকে তার সঙ্গীরা ছুটে এসে মুরগি-প্রভুকে পাকড়াও করে ফেলে। ব্যস, তাবে আরামদায়ক খোঁয়াড়ে চালান করে দেওয়া হল। ত্রিশ-ত্রিশটা দিন সেখানে কয়েদবাস করতে হল

সে ইনিয়ে বিনিয়ে ছেলেটার মুখ থেকে শুনে নিল, কোন্ মিষ্টি খেতে সে খুব বেশী পছন্দ করে। তার মা ছোট্ট শিশিটা দিয়ে দশ সেন্ট দামের বেদনানাশক ওষুধ কেনার জন্য তাবে পাঠিয়েছে। ওষুধটার নাম ক্যারেগোরিক।

বাড়ি থেকে বেরোবার সময় ছেলেটার মা পাখি পড়াবার মত করে তাকে বলে দিয়েছে— ডলারটা শক্ত করে হাতের মুঠোয় ধরে রাখবি। পথে দাঁড়িয়ে কারো সঙ্গে কথা বলবি না, কেউ কিছু বললে দাঁড়িয়ে শুনবি না, ওষুধ কেনার পর দোকানিকে বলবি ফেরৎ খুচরোগুলো একট কাগজে মুড়িয়ে ট্রাউজারের পকেটে ঢুকিয়ে দিতে ইত্যাদি আরও কিছু সতর্কতা।

ছোট্ট ছেলেটার ট্রাউজারের পকেটটা আসলে দেড়া। আর চকোলেট ক্রিমের ওপর তার খুবই লোভ।

মুরগি-প্রভুর পকেটে মাত্র পাঁচটা সেন্ট ঠুংঠাং আওয়াজ করছে। এটুকুই তার মূলধন। সে দোকানে ঢুকেই তার পুরো মূলধন, পাঁচটা সেন্টই নানা রকম চকোলেট খরিদ করতে খরচ করে ফেলল। সমূহ বৃহত্তর ঝুঁকিটাকে নিতে কার্যসিদ্ধির পথটাকে পরিষ্কার করতে হলে এটুকু না করলে তো চলবে না।

মুরগি-প্রভু এগিয়ে গিয়ে সদ্য খরিদ করা সবগুলো চকোলেটই ছোট্ট ছেলেটার হাতে গুঁজে দিল। এতে সে তার মনে বিশ্বাস স্থাপন করতে পেরে সে খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠল।

এবারই পরবর্তী অভিযানের দিকে সে সহজেই অগ্রসর হতে পারল। ছোট্ট ছেলেটার হাত ধরে সে অদূরবর্তী পরিচিত একটা বড় ওষুধের দোকানে গেল। সে মুরগি-প্রভু অভিভাবকের মত ডলারটা দোকানির হাতে তুলে দিয়ে বেদনানাশক ওষুধটা দিতে বলল। ছেলেটা এদিকে মনের আনন্দে চকোলেট চুষতে মেতে গেছে। মুরগি-প্রভু তার ট্রাউজারের পকেটে হাত চালান করে তাতে একটা ওভারকোটের বোতাম পেয়ে গেল। সেটাকেই কাগজে মুড়িয়ে ফেরৎ খুচরো হিসাবে ছেলেটার পকেটে ঢুকিয়ে দিল। এবার ছেলেটাকে তার বাড়ির পথে রওনা করিয়ে দিল।

ধাপ্পাবাজ মুরগি-প্রভু নিজের লগ্নি-করা মূলধনের বিনিময়ে সতেরশ' সেন্ট লভ্যাংশ নিয়ে দোকানের এলাকা ছেড়ে চম্পট দিল।

দু'ঘন্টা বাদে রেলের কারশেড থেকে টেক্সাসগামী একটা মালগাড়ি বেরিয়ে এল। ওয়াগানগুলো সবই খালি। চলন্ত ট্রেনটারই একটা ওয়াগানে মুরগি-প্রভু প্যাকিং বাক্সের কাঠের আড়ালে গিয়ে ঘাপ্‌টি মেরে শুয়ে পড়ল। ব্যস, মুহূর্তের মধ্যে সে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার পাশেই সস্তা দামের এক বোতল হুইস্কি আর একটা ঠোঙা ভর্তি রুটি আর পনীর সে পড়ে থাকতে দেখল। মিঃ রাগ্‌লস্ ওরফে মুরগি-প্রভু তার নিজের গাড়িতে চেপে শীতকালটা কাটাবার জন্য দক্ষিণ অঞ্চল সফরে বেরিয়ে পড়ল। মালগাড়িটা ধীর-মন্থর গতিতে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চলল।

মালগাড়িটা পথে বিভিন্ন কর্তব্য সম্পাদন করতে করতে ক্রমেই দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হতে লাগল। আর মুরগি-প্রভু? সে তার নিজের জায়গাতেই অবস্থান করতে লাগল। কিন্তু মাঝে-মধ্যে পেটের জ্বালা নেভানোর জন্য সবার অলক্ষে গাড়ি থেকে নামা-ওঠা করতে লাগল।

মালগাড়িটা গবাদি পশুর চারণক্ষেত্রের ওপর দিয়ে যাবে আর সেখানকার গুরুত্বপূর্ণ স্থান স্যান এন্টোনিও মুরগি-প্রভুর গন্তব্যস্থল। সেখানকার জলবায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ হলেও মানুষগুলো বড়ই আর্থিক

অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করে। তবে তারা অতিথি বৎসল ও পরোপকারী, সেখানকার মদ পরিবেশকরা তাকে লাথি মেরে রাস্তায় বের করে দেবে না। সে যদি এক নাগাড়ে দীর্ঘ সময় ধরে ভোজন করে, আর যদি পর পর একই হোটেলে গিয়ে ওঠে তবু সেখানকার মানুষেরা নরম গলায়ই তার সঙ্গে কথা বলবে যা শুনলে মনে হবে তারা মুখস্ত করা গদ আওড়াচ্ছে। তারা তাকে ধরে চেয়ার থেকে তুলে দেবার আগেই মুরগি-প্রভু তার খাওয়া প্রায় সেরেই ফেলবে। সেখানে সারা বছর ধরেই বসন্তের আবহাওয়া প্রবাহিত হয়। রাতের অন্ধকার নেমে এলেই প্লাজাগুলোতে গান-বাজনায় মুখরিত হয়ে ওঠে আর শুরু হয় হৈ-হুল্লোড় আনন্দ স্ফূর্তি। বাড়ির ভেতরে অতিথিদের জায়গা না হলেও সদর-দরজার বাইরে মৌজ করে ঘুমিয়ে রাত কাটিয়ে দেওয়া সম্ভব।

মালগাড়িটা টেক্সাকাণাতে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আবার দক্ষিণ দিকে ধেয়ে চলল। এক সময় অস্টিন কলোরাডোর সেতুটা অতিক্রম করে সান এন্টোনিওর দিকে উল্কার বেগে ছুটে চলল।

মালগাড়িটা যখন এন্টোনিও স্টেশনে থামল তখন মোরগ-প্রভু গভীর নিদ্রায় মগ্ন। আর মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে এটা সর্বশেষ স্টেশন লারেডো-তে পৌঁছে গেল। সে পথে বিভিন্ন স্থানে খালি গাড়িগুলো ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কারণ সে সব কেন্দ্রের পশু-পশুখামারগুলোর মালপত্র জাহাজে তোলা হয়।

সাদা একটা খুঁটিকে রেলপথের গায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মোরগ-প্রভু এগিয়ে গেল। দেখতে পেল সেটার গায়ে লেখা আছে—এস. এ. ৯০। লারেডোও দক্ষিণ দিকে এতটা দূরত্ব। সে এখন যেকোন শহর থেকে প্রায় একশ মাইল দূরে অবস্থান করছে। চারদিকের রহস্যময় তৃণভূমির বুক থেকে ক্ষুধার্ত নেকড়ের গর্জন শোনা যাচ্ছে।

রাতের ঘুটঘুটে অন্ধকারে সেখানে দাঁড়িয়ে মোরগ-প্রভু একা বোধ করতে লাগল।

মোরগ-প্রভু সম্পূর্ণ অপরিচিত শিকাগো, বোস্টন, ফিলাডেলফিয়া পিটস্‌বার্গ আর নিউ ইয়র্কে বহু কষ্টে দিন কাটিয়েছে। কিন্তু কোথাও, একটা দিনের জন্যও নিজেকে এমন একা মনে হয় নি।

দীর্ঘ গভীর নিস্তব্ধতা ভেদ করে হঠাৎ সে ঘোড়ার খুরের শব্দ আর ডাক শুনতে পেল। লক্ষ্য করল রেপনের পূবদিক থেকে শব্দটা ভেসে আসতে লাগল। হঠাৎ তার মনে পড়ল তৃণভূমিতে তো ডাকাত, ঘোড়ার রাখাল, সাপ, ইঁদুর, মাকড়সা ও বিছে প্রভৃতি কত কিছুই থাকা সম্ভব। এসবের কথা সে বইয়ের পাতায় পড়েছে। একটা কাঁটাঝোপ ঘুরে যেতে না যেতেই ঘোড়ার ডাক তার কানে এল। অজানা ভয়ে সে কাঁদতে আরম্ভ করল।

মোরগ-প্রভু হঠাৎ এমন একটা পেয়ে গেল যাকে সে মোটেই ভয় করে না। খামার বাড়িতে তার ছেলেবেলা কেটেছে। তাদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। অতএব তাদের ভয় করার প্রশ্নই ওঠে না। সে তাদের পিঠে চড়তে পারে, স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধেও ভাল ধারণা আছে।

ঘোড়াটা এগিয়ে এলে সে তার গলার লম্বা দড়িটা ধরে ফেলল। চোখের পলকে সে দড়িটাকে দিয়ে একটা লাগাম তৈরি করে ঘোড়াটার মুখে বেঁধে ফেলল। এবার এক লাফে তার পিঠে চেপে শক্ত হাতে লাগামটা চেপে ধরল। ব্যস, ঘোড়াটা তীরবেগে ছুটতে আরম্ভ করল। পাহাড় বা অন্য কোন রকম বাধা সামনে পড়লে মোরগ-প্রভু লাগাম টেনে তার গতিপথ বদলে দিতে আরম্ভ করল। এক সময় গাছপালার ঝোপের ফাঁক দিয়ে মেক্সিকোর অধিবাসীদের ঢঙে তৈরি একটা মাটির বাড়ি তার নজরে পড়ল। লম্বা লম্বা ঘাস আর নলখাগড়া দিয়ে ছাউনি দেওয়া। অভিজ্ঞ লোকমাত্রই অনুমান করে নিতে পারবে বাড়িটা একটা ভেড়ার খোঁয়াড়। বাড়ির চারদিকে অযত্ন অবহেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে উলের পাঁজা, ভেড়ার খাবারের বস্তা, ঘোড়ার জিন, লাগাম, দড়ি আর তাঁবু টাঙাবার বিভিন্ন খুঁটিনাটি জিনিস। আর সদর দরজায় গায়েই দুই ঘোড়ায় টানা মালগাড়িটার পিছনে, পথের ওপরে পড়ে রয়েছে খাবার জলের অতিকায় একটা পিপে, আরও কত কি খুঁটিনাটি জিনিস।

মোরগ-প্রভু এক লাফে ঘোড়াটার পিঠ থেকে নেমে পাশের একটা গাছের সঙ্গে সেটাকে বেঁধে ফেলল। দু'পা এগিয়ে গিয়ে, ভেতরে কে আছেন, ভেতরে কে আছেন বলে হাঁকডাক দিল। না,

বাড়িটার ভেতর থেকে কোন সাড়াই ভেসে এল না। পায়ে পায়ে আরও সামান্য এগিয়ে গিয়ে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে ভেতরে উঁকি দিল। ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল। দেশলাই জ্বেলে তাকের ওপরে একটা বাতি দেখতে পেল। সেটাকে জ্বালল। বাইরে বা ঘরের ভেতরে কোথাও কোন লোকই তার চোখে পড়ল না। ঘরের ভেতরের জিনিসগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে এমন একটা জিনিস পেল যা সে একেবারেই প্রত্যাশা করতে পারে নি। কি সেটা? কোয়ার্ট খানেক পানীয়। নেহাৎ বরাতে না থাকলে এমনটা হবার নয়।

আধঘণ্টা বাড়িটার ভেতরে কাটাবার পর মোরগ-প্রভু বাড়িটার বেড়া ধরে ধরে এদিক ওদিক ধাক্কা খেতে খেতে কোনরকমে বাইরে বেরিয়ে এল, নিজের ছেঁড়া ফাঁটা তেলচিটে পড়া পোশাকের পরিবর্তে সে নিজে মেষপালকের পোশাকে সজ্জিত করেছে। কোমরে বেঁধে নিয়েছে ছয় ঘোড়া একটা পিস্তল আর কার্তুজ ভর্তি একটা বেল্ট। আর এক জোড়া বুট পায়ে পরে নিয়েছে।

মোরগ-প্রভু আবার ব্যস্ত পায়ে ঘরে ঢুকে খোঁজাখুঁজি করে কয়েকটা মোটা কম্বল, একটা লাগাম আর একটা জিন বের করে ঘোড়াটাকে সাজিয়ে নিল। এবার ঘোড়ার পিঠে কম্বল কটা বেঁধে নিয়ে একলাফে সেটার ওপর চেপে বসল। লাগামে টান লাগতেই তেজী ঘোড়াটা উল্কার বেগে ছুটতে লাগল।

ফ্রি নদীর তীরবর্তী কোন এক নির্জন নিরাময় স্থান বেছে নিয়ে বার্ড কিং-এর দুঃসাহসী, ঘোড়া গরু চোরের দল আর আইনের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত একটা দল আস্তানা গেড়েছে। রিও গ্র্যান্ডি অঞ্চলে তাদের দাঙ্গাহাঙ্গামা আর লুঠতরাজ মারাত্মক রকম না হলেও খবরের কাগজগুলো তাদের অত্যাচারের কথা খুব ফলাও করে প্রচার করায় ঘোড়া গোরু চোরদের ওপর কড়া নজর রাখার জন্য ক্যাপ্টেন কিন-এর রক্ষী দলটার ওপর হুকুম হল। ফলে বার্ড-কিং-এর দল রক্ষী দলটার পিছনে তাড়া না করে ফ্রি উপত্যকার তৃণভূমিতেই গা-ঢাকা দিয়ে আছে।

আত্মগোপন করে থাকার ব্যাপারটায় বার্ড কিং-এর সাকরেদরা অগৌরবের কাজ বলে মনে করল। ফলে তার সঙ্গে দলের অন্য সবার মত বিরোধ দেখা দিল। তার নেতৃত্ব থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য দলের সবাই গোপন আলোচনায় লিপ্ত হল। তবে তার যোগ্যতা নিয়ে কারো এতটুকুও সন্দেহ নেই। কিন্তু দলের মধ্যে নতুন কয়েকজন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠায় বার্ড কিং-এর নেতৃত্ব সম্বন্ধে ভাঁটা পড়তে লাগল। তবে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হল কালো ঈগলই দলকে মর্যাদার সঙ্গে পরিচালনা করতে সক্ষম।

কালো ঈগল কেউ কেউ সীমান্তের আতঙ্ক বলে সবার কাছে পরিচিত। সে মাত্র তিন মাস আগে দলে এসেছে, সভ্যপদ লাভ করেছে।

এক রাতে তারা মান মিগুয়েল-এর জলাভূমির গায়ে তাঁবু গেড়ে অবস্থান করছে। এমন সময় এক অশ্বারোহী ঘোড়া ছুটিয়ে এসে তাঁবুর পাশে নামল। সে দেখতে যেমন কদাকার ভয়ঙ্কর তেমনই অমঙ্গলের প্রতীকও বটে। নীলচে পুরু গোঁফের ফাঁক দিয়ে পাখির ঠোঁটের মত লম্বাও বাঁকা নাকটা ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে। গর্তে বসা চোখের মণি দুটো হিংস্রতার সুস্পষ্ট ছাপ। পায়ে কাঁটা মারা জুতো, কোমরে গুলি ভরা পিস্তল। গলা পর্যন্ত মদ গিলে একেবারে বুঁদ। তবে হাবভাব কিন্তু একেবারেই নির্ভীক।

সত্যি কথা বলতে কি রিও ব্রাভো নদীর উভয় তীরের কেউ-ই একদম একা দুর্ধর্ষ বাড কিং-এর তাঁবুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে কিছুতেই সাহস পেত না। কিন্তু অকুতোভয় ঈগল ঘোড়া থেকে নেমেই তাদের কাছে খাবারের জন্য হুঙ্কার দিল।

একটা কথা সবাই জানে, তৃণভূমির মানুষ বড়ই অতিথি বৎসল। অতি বড় শত্রুকে গুলিবিদ্ধ করার আগেও তাকে পেট ভরে খাইয়ে নেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। তাই নবাগতের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন রকম চিন্তা ভাবনা না করেই তাকে ভোজের পংক্তিতে বসিয়ে দেওয়া হল।

আগন্তুক বড্ড বেশী বুলি কপচায়। খেতে বসে সে দাঙ্গা হাঙ্গামা আর লুঠতরাজে বড় বড় গপ্প ফেঁদে বসল। তাকে কেন্দ্র করে বার্ড কিং-এর সাকরেদদের মধ্যে হৈ চৈ পড়ে গেল। আসলে দলের বাইরের কারো কারো সঙ্গে খুব কমই তাদের দেখা সাক্ষাৎ হয়। তার ওপর আগন্তুকের আড়ম্বর সৃষ্টিকারী রসাল ঘটনা দলের সবার মধ্যে খুবই প্রভাব বিস্তার করল।

আগন্তুককে কিছুতেই ছাড়া হল না। তাকে খুব করে খাইয়ে দাইয়ে খুশি করে তাঁবুতে রেখে দেওয়া হল। তারপর সবাই একমত হয়ে তাঁকে দলের সভ্যপদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হল। কালো ঈগল বলে নিজের নাম লেখাল। ক্যাপ্টেন মন্ট্রেসর। দলের সবাই সে মুহূর্তে তার নামকরণ করল 'বরাহনন্দন'। হয়ত বা তার ভয়ানক ক্ষুধার কথা বিবেচনা করেই তাকে এমন সুন্দর একটা নামে ভূষিত করা হল। 'বার্ড কিং' পরবর্তী তিন মাস ধরে আইন রক্ষকদের নজরও সংঘর্ষ এড়িয়ে এক নাগাড়ে দাঙ্গা হাঙ্গামা আর লুটতরাজ চালাল। দস্যুরা বহু ঘোড়া ও গরু লুঠপাট করে আনল। রিও গ্র্যান্ডি পার করে সেগুলো চড়া দামে বেচে প্রচুর অর্থ কামিয়ে নিল। আবার মাঝে মধ্যেই মেক্সিকোবাসীদের উপনিবেশ চড়াও হয়ে তাদের মনে আতঙ্ক ছড়িয়ে বস্তা বস্তা খাদ্যবস্তু লুঠ করে তাঁবুতে এনে হাজির করতে লাগল। তাদের অস্ত্রপাতিও কম লুঠ করল না।

এরকম সব রক্তপাতহীন হামলা হুজ্জতির মধ্য দিয়ে 'বরাহনন্দন'-এর কদর্য হিংস্র রূপ আর ভয়ানক কর্কশ কণ্ঠস্বরের আতঙ্ক বহু দূরবর্তী মানুষের মনেও ত্রাসের সঞ্চার করল। যে নাম যশ লাভ করতে অন্য সব দস্যুদের সারাটা জীবন কেটে যায় তা সে তিনমাসেই অর্জন করে ফেলল।

লোকে বলে মেক্সিকোর বাসিন্দারা মানুষের অদ্ভুত অদ্ভুত নামকরণে বিশেষ পারদর্শী। তারাই প্রথমে 'বরাহনন্দন-এর নতুন নামকরণ করল 'কালো ঈগল'। আর ছোট ছোট শিশুদের ভয় দেখাবার জন্য তাকে নিয়ে তারা কত সব গল্প তৈরি করল। আর সেগুলো বলে শিশুদের খাওয়াতে ঘুম পাড়াতে লাগল। গল্পের মূল বিষয়বস্তু সে ঠোঁটে করে শিশুদের তুলে নিয়ে গিয়ে দূরদেশে ছেড়ে দেয়। ফলে তার কথা বাতাসে ভর দিয়ে দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। মেষ পালকরাও তার গল্প কবে সময় দিব্যি সময় কাটিয়ে দিতে লাগল। খবরের কাগজের পাতারও একটা বিরাট ভগ্নাংশ সে দখল করে নিল।

উর্বর জনবসতিহীন রিও গ্র্যান্ডি থেকে নুয়ে শেষ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে গবাদি পশুর একাধিপত্য। সেখানে আইন কানুনের নামগন্ধও নেই। ফলে জলদস্যুরা সেখানে নির্বিবাদে লুঠতরাজ চালায়। তবে বরাহ নন্দনের নাম দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় সেখানে কিনের রক্ষীবাহিনী মাঝে মধ্যেই হানা দিতে লাগল।

রক্ষীবাহিনীর হানা দেওয়ার ব্যাপারটায় বাড কিং আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। সে নিঃসন্দেহ হয়ে পড়ল, অচিরেই তাদের সঙ্গে দলের ঘোরতর সংঘর্ষ অথবা অনন্যোপায় হয়ে তাকে দল থেকে অবসর গ্রহণ করতে হবে।

অচিরেই ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় বার্ড কিং সদলবলে ফ্রিও নদীর তীরবর্তী এক দুর্গম অঞ্চলে গিয়ে গা-ঢাকা দিল। ফলে তার দলের মধ্যে অসন্তোষ ক্রমে বেড়েই চলল। আর কালো ঈগল-এর নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। বার্ডকিং কিন্তু তার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানে না।

বার্ড কিং তার বিশ্বস্ত সহযোগী ক্যাক্টাস টেলরকে নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে গোপনে আলোচনা করল।

আলোচনা চলার সময় কথা প্রসঙ্গে বার্ড কিং বলল, 'শোন, দলের সবাই যদি চায় তবে আমি মরে যেতে রাজি আছি। আমি জানি আমার নেতৃত্ব সম্বন্ধে তাদের মনে সন্দেহ জেগেছে। এর বড় কারণ হচ্ছে, স্যাম কিনে এসে পড়ায় আমরা গোপনে অন্তরালে গা-ঢাকা দিয়েছি। আমার আন্তরিক ইচ্ছা, তারা যাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ না দেয় বা বন্দী হয়ে অন্যত্র চালান হয়ে যাওয়া থেকে অব্যাহতি পাক। আর তারা কিনা গলা ছেড়ে বলছে আমি নাকি এক নিষ্কর্মার ধাড়ি।

ক্যাকটাস তাকে বোঝাতে গিয়ে বলল, 'তোমার ধারণা ঠিক নয়। আসল কথা হচ্ছে, দলের সবাই বরাহনন্দন-এর দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

তাদের মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে এমন আলোচনা চলার পর এক প্রতিনিধিদল বাড কিং-এর সঙ্গে আলোচনায় বসল। আলোচনার মাধ্যমে তাদের মনোভাব বুঝতে পেরে বার্ড কিং তাদের কাজকর্ম অনেকটা সহজ করে দিল। তাদের ইচ্ছা বড় একটা ঝুঁকি নিয়ে বড় রকমের লাভ করতে আগ্রহী করল।

তারা একটা ট্রেক আটক করার সিদ্ধান্ত নিল। বরাহনন্দন-এর এ প্রস্তাবে তারা উৎসাহিত হল।

নবাগত লোকটার উৎসাহ ও সাহসের পরিচয় পেয়ে তার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে গেছে। ঘোড়া-গরু চুরি করে চম্পট দেওয়া আর তাতে কেউ বাধা দিলে তাকে গুলি করে খতম করে দেওয়া—ব্যস, এর বাইরে বড় রকম সাহসিকতার কথা তাদের মাথায়ও কোনদিন আসে নি।

বার্ড কিং মধ্যস্থতা করে সিদ্ধান্ত নিল, কালো ঈগলকে যতদিন নেতৃত্ব প্রমাণের মত সুযোগ না দেওয়া হবে ততদিন তাকে দলের অধীনে থেকেই কাজ করে যেতে হবে।

দীর্ঘ সুচিন্তিত আলোচনার মাধ্যমে ট্রেন আটক করা ও লুঠপাট করার সময় ও স্থান নির্দিষ্ট করা হল। তখন মেক্সিকোতে ভীষণ খাদ্যাভাব এবং যুক্তরাষ্ট্রে পশু-খাদ্যের দুর্ভিক্ষ চলছে। ফলে, দুটো প্রজাতন্ত্রের মধ্যে সংযোগকারী রেলপথের মাধ্যমে জোর কদমে বাণিজ্য চলছে। তারা স্থির করল, ছোট রেল-স্টেশন এস্পিনাই পরিকল্পিত ডাকাতির পক্ষে একমাত্র উপযুক্ত স্থান। সে স্টেশনে ট্রেনটা মাত্র এক মিনিট দাঁড়ায়। স্টেশনের চারদিকে গাছ গাছালিতে ঢাকা, জনবসতিহীন। আর স্টেশনে? একজন এজেন্ট একটামাত্র ঘরে রাত দিন চব্বিশ ঘণ্টা কাটায়।

রাত্রি সাড়ে দশটায় এস্পিনা স্টেশনে ট্রেন আসার কথা। ট্রেন লুঠের পর দস্যুদের পরদিন সকালে মেক্সিকোর সীমান্তে পৌঁছে যেতে অসুবিধা হবে না।

সত্যি কথা বলতে কি, কালো ঈগলের ওপর যে দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছে তা পালন করতে অস্বীকার করা বা সরে দাঁড়ানোর কোন ভাবই তার মধ্যে লক্ষিত হয় নি।

সে দলের প্রত্যেককে যথাস্থানে দাঁড় করিয়ে কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করে দিল। চারজন করে কর্মীকে পথের দু'ধারের ঝোপের আড়ালে নিযুক্ত করা হল। স্টেশন এজেন্টকে পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব জন রোজার্স-এর ওপর বর্তাল। ঘোড়াগুলোকে তৈরি করে অপেক্ষা করবে ব্রংকো চার্লি। যেখানে ট্রেনের ইঞ্জিনটা দাঁড়াবার কথা তার একদিকে আত্মগোপন করে না থাকবে কালো ঈগল আর অন্য দিকে থাকবে বার্ড কিং। ট্রেনটা থামামাত্র তারা ফায়ারম্যান ও ইঞ্জিনীয়ার ট্রেন থেকে জোর করে নামিয়ে পিছনের দিকে নিয়ে চলে যাবে। ব্যস, এবার এক্সপ্রেস ট্রেনটা লুঠ করে সবাই চম্পট দেবে। আর এ-ও স্থির হল কালো ঈগল পিস্তল থেকে ফাঁকা আওয়াজ না করা অবধি কেউ জায়গা ছাড়তে থাকবে না। ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল।

স্টেশনে ট্রেনটা পৌঁছবার দশ মিনিট আগে থেকেই সবাই কর্তব্য পালনের জন্য নিজ নিজ জায়গায় গিয়ে কর্তব্য পালনের জন্য তৈরি হয়ে পড়ল। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কালো ঈগল রেল লাইন থেকে পাঁচ গজের মধ্যে ঝোপের আড়ালে ঘাপ্‌টি মেরে নির্দিষ্ট সময়ে অধীর অপেক্ষায় বসে। তার কোমরের দু'দিকে দুটো দু'ঘোড়ার পিস্তল বাঁধা। একটু পর পর কোটের পকেট থেকে কালো একটা বোতল বের করে একটু একটু করে ঢেলে গলাটা ভিজিয়ে নিচ্ছে।

এক সময় বিকট স্বরে গর্জন করতে করতে ইঞ্জিনটা এগিয়ে এসে কালো ঈগল আর বাড কিং-কে অতিক্রম করে চল্লিশ গজ এগিয়ে গেল।

ডাকাত সর্দার ঝট করে দাঁড়িয়ে পড়ে ঝোপের চারদিকে চোখের মণি দুটোকে বুলিয়ে নিল। দলের সবাই সঙ্কেত ধ্বনির অপেক্ষায় উৎকর্ণ হয়ে রইল।

কালো ঈগলের ঠিক বিপরীত দিকের একটা বস্তুর ওপর তার নজর পড়ল। আসলে অন্যদিনের মত যাত্রীবাহী ট্রেন না এসে সে দিন একটা মিশ্র ট্রেন মাল ও যাত্রী বগীর মিশ্রণ। কালো ঈগলের সামনে যে বগীটা দাঁড়িয়ে তার দরজাটা আধা খোলা। সে ব্যস্ত পায়ে এগিয়ে গিয়ে পাল্লাটা ঠেলে পুরোপুরি খুলে দিতেই উগ্র একটা গন্ধ, মদের গন্ধ নাকে এল। মনটা হঠাৎ আনন্দে নেচে উঠল। একটা সুখের দিন, আগেকার একটা স্মৃতি তার মনের কোণে জেগে উঠল। সে আচমকা একটা হাত ভেতরে চালান করে দিল—শুকনো, থলথলে, নরম-নরম, মনে পুলক সঞ্চার করানো আর মেঝেতে প্যাকিং কাঠ বিছানো।

ট্রেন ছাড়ার ঘণ্টা বাজল। ডাকাত সর্দার পিস্তল সমেত কোমরের বেল্টটা খুলে দূরে ফেলে দিল। এমনকি মাথার চওড়া টুপি আর কাঁটা মারা জুতো জোড়া খুলে ছুড়ে ঝোপের ভেতরে ফেলে দিল।

ভোঁস্-ভোঁস আওয়াজ তুলে ট্রেনটা এগোতে লাগল। প্রাক্তন সীমান্ত এসে বাড কিং বক্স করে

ঢুকে অন্ধকারে ঘাপ্‌টি মেরে বসে থাকল। দরজাটা আগেই বন্ধ করে দিয়েছিল। কালো বোতলটাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। মোরগ-প্রভু সবার অজান্তে তার নিজের জায়গায় ফিরে চলেছে।

ট্রেনটা নির্বিঘ্নে এস্পিনা স্টেশন ছেড়ে পরবর্তী স্টেশনের উদ্দেশ্যে এগিয়ে চলল। এদিকে ডাকাত দলের সবাই আক্রমণের সঙ্কেত না পাওয়ায় চোখের সামনে দিয়ে ট্রেনটাকে বেরিয়ে যেতে দেখেও নিজ নিজ স্থানে 'আত্মগোপন' করেই রইল।

এক্সপ্রেস ট্রেনটার সংবাদবাহ জানালা পথে বাইরের প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই স্বগতোক্তি করল, 'জায়গাটা লুঠপাঠের পক্ষে খুবই উপযুক্ত।

ফোবি

আমি ক্যাপ্টেন প্যাট্রিসিও মালোন'কে বললাম, আপনি তো বহু অভিযান আর অদ্ভুত অদ্ভুত কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। আপনার কি ভাগ্য—সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব মানেন? অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি, সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য কি আপনার জীবনের চলার পথকে প্রভাবিত, প্ররোচিত বা বিরোধিতা করেছে?

আমি নিউ অর্লিয়েন্স-এর কঙ্গো স্কোয়ারের লাগোয়া রুসেলিনের ছোট্ট লাল টালির কাফের টেবিলে বসে তাকে প্রশ্নটা করলাম। ফরাসী ব্রান্ডির আকর্ষণে অভিযানের ক্যাপ্টেনরা প্রায়ই আসা যাওয়া করে। তাদের মুখাবয়ব বাদামী, মাথার টুপি সাদা আর আঙুলে আংটি ব্যবহার করে।

তারা দুর সমুদ্র পেরিয়ে দূরবর্তী দেশ থেকে আসে। তারা আসা যাওয়ার পথে যা কিছু দেখেছে সে সব কথা বলতে চায় না। তার কারণ এই নয় যে, সে সব কথা বইয়ের পাতায় ছাপানো কাল্পনিক ও অবাস্তব ঘটনার চেয়েও বেশি আশ্চর্যজনক। তবে এর প্রকৃত কারণ কি? কারণ, ঘটনাগুলো' খুব বেশী অন্যরকম। আর আমি? আমি একজন যেকোন বিয়ের ভোজের একজন স্থায়ী অতিথি, অবশ্যই অনিয়ন্ত্রিত। আর সামান্য সময় সুযোগ পেলেই এসব সৌভাগ্যবান নাবিকদের সঙ্গে গল্প জমানোর চেষ্টা করি।

হিবার্নো আইবেরিয়ান বাবা-মার সন্তান ছিলেন ক্যাপ্টেন মালোন। পৃথিবীর সব দেশে তিনি পা রেখেছেন। দেখলে মনে হয় পঁয়ত্রিশ বছরের একজন মানুষ। একটা সোনার তাবিজ আর হাতির দাঁতের লকেট চেনের সঙ্গে ব্যবহার করেন। তবে এ কাহিনীর সঙ্গে কিন্তু এসবের কোনই সম্পর্ক নেই।

আমার অনুরোধের জবাব দিতে গিয়ে এক গাল হেসে ক্যাপ্টেন বলল, 'আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে হলে আমাকে দুর্ভাগ্যের কিয়ানির গল্পটা বলতে হয়। অবশ্য আপনি যদি শুনতে আগ্রহী হন।

আমার আগ্রহের কথা জানতে পেরে ক্যাপ্টেন মালোন বলতে লাগলেন, 'একবার সুপিটুলাস স্ট্রীট দিয়ে হেঁটে যাবার সময় একজন বেটেখাট মানুষকে আমার দিকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। এক ভূগর্ভ কক্ষের কাঠের দরজার পাল্লাটা খুলেই সে বে-পাত্তা হয়ে গেল। নিচের নরম কয়লার স্তূপ থেকে আমি তাকে উদ্ধার করে নিয়ে এলাম। গায়ের ধূলো ময়লা ঝাড়তে ঝাড়তে সে অনর্গল কিছু শপথবাক্য পাঠ করে চলল। মনে হল যে কিছু তরল পদার্থের অভাব বোধ করছে। তাকে নিয়ে পথের ধারের একটা কাফেতে ঢুকলাম। সেখানে কিছু তেতো জিনিস খেলাম আর মদ গিলে উভয়ে সতেজ হয়ে নিলাম।

টেবিলে মুখোমুখি বসে আমি এবারই প্রথম ফ্রান্সিস কিয়ার্নি'কে ভালভাবে দেখার সুযোগ পেলাম। পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি লম্বা। শক্তপোক্ত চেহারার মানুষ। অনর্গল কথা বলতে পটু। আর তার চোখ-মুখের ভাব দেখে মনে হল যেন খুবই সঙ্কটাপন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে, দিন কাটাচ্ছেন তিনি। ভাবলাম, তাকে না ঘাটানোই উচিত।

আমি কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করলেও সে নিজে থেকেই বলতে শুরু করল—আমি কোস্টারিকা উপকূল থেকে স্বর্ণ শিকার অভিযান সেরে সবে ফিরে এসেছি। এক কলাবাহী স্টিমারের দ্বিতীয় মেট-এর মুখে জানতে পারলাম, আদিবাসীরা সমুদ্রতীরের বালি ঘেঁটে প্রচুর সোনা কুড়িয়ে পাচ্ছে

যার বিনিময়ে পৃথিবীর সব মদ, বৈঠকখানার যাবতীয় বাদ্য যন্ত্র আর লাল কেলিকো কাপড় কিনে নেওয়া যায়। আমি যেদিন সেখানে পা দিলাম সেদিনই 'ইনকর্পোরেটেড জোন্স' নামক এক সিন্ডিকেট এক বিশেষ জায়গা থেকে পাওয়া যাবতীয় খনিজ পদার্থের জন্য সরকারী আদেশনামা পেয়েছে। পরবর্তী সুযোগের প্রত্যাশায় আমি উপকূলেই খড়ের কুঁড়েঘরে শুয়ে ছ'টা সপ্তাহ কাটালাম। অবশ্য উপকূল জ্বরের জন্য যেখানে না থেকে উপায়ও কিছু ছিল না। সুস্থ হয়ে একটা নরওয়েগামী জাহাজের তিন নম্বর রাঁধুনির চাকরি নিয়ে সেখান থেকে বিদায় নিলাম। কোয়ারেন্টিন সীমার দু'মাইল দূরে জাহাজের বয়লার ফেটে গেল। এবার এক ডাক নৌকার খালাসির চাকরি নিয়ে এখানে হাজির হয়েছি। ঠিক করেছি, এ ভূগর্ব ঘরেই আজ রাতটা কাটাব। তারপর বরাত যেদিকে নিয়ে যায় পা-বাড়াব।

কিয়ার্নি-র ব্যক্তিত্ব গোড়া থেকে আমার মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করল, মুগ্ধও কম করল না। তার মধ্যে আমি অস্থিরতা আর অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসের বিরুদ্ধে অটুট মনোবল নিয়ে রুখে দাঁড়াবার প্রবল ইচ্ছা লক্ষ্য করলাম। আর এরকম দৃঢ় মনোবলই তার দেশবাসীকে ঝুঁকি গ্রহণ আর অভিযানের ক্ষেত্রে একজন দামী সঙ্গী করে তোলে। সে মুহূর্তে আমি ঠিক এমন একজনের খোঁজই করছিলাম।

তখন ফল কোম্পানির এক জাহাজ ঘাটে আমার পাঁচশ টনের একটা স্টিমার নোঙর করে রেখেছি। পরদিনই মালবোঝাই জাহাজটা যে বন্দরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার কথা, ধরা যাক তার নাম এস্পেরান্ডো। ঘটনাটা বেশিদিন আগের নয়, সে দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার কথা উঠলেই স্বাভাবিকভাবেই প্যাট্রিসিও মালোন-এর নামটাও চলে আসে। জাহাজের লোহালক্কর আর চিনির বস্তার এক হাজার উইন্‌চেস্টার রাইফেল রাখা আছে। ডন রাফায়েল ভালদেভিয়া—এসপারেন্ডোর সহৃদয় দেশব্রতী ও যুদ্ধের অধিনায়ক, রাজধানী শহর আগুয়াস ফ্রায়াস-এ আমার জন্য অধীর অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি মনে উচ্চাকাঙ্খা পোষণ করেন যে, তাঁর স্বপ্ন সাধের এস্‌পারেন্ডোকে তিনি সমৃদ্ধি, খ্যাতি, শানি আর শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করবেন। আর একারণেই তিনি আমার রাইফেলের প্রত্যাশায় আগুয়াস ফ্রায়াস নামক স্থানে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছেন। অতএব আমি ফ্রান্সিস কিয়ার্নি-র মতই একজন লোকেরই খোঁজ করছি। মদের গ্লাস হাতে নিয়ে একথার পর তাকে স্বৈরাচারী রাষ্ট্রপ্রধান ক্রুজ আর জনগণের মাথার ওপর তার লালসা আর উদ্ধত নিষ্ঠুরতার বোঝার কথা বলতেও বাদ দিলাম না। তা শুনে ক্যাপ্টেন কিয়ার্নি-র চোখে জল দেখা দিল। পর মুহূর্তেই তার চোখের জল শুকিয়ে দিলাম অদূর ভবিষ্যতের সম্ভাবনার কথা বলে, যেদিন দাম্ভিক প্রজাপীড়ককে গদিচ্যুত করে তার আসনে জ্ঞানী ও উদার হৃদয় ভালদেভিয়াকে বসাতে পারব।

তিনি চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বললেন, 'শুনুন, কার্ডিলেরাস পর্বতের উচ্চতম চূড়া থেকে যতদিন সে দাম্ভিক অত্যাচারীকে তার সাকরেদদের সহ সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে না পারবেন ততদিন তিনি আমার পক্ষেই থাকবেন।

দাম মিটিয়ে দিয়ে আমরা কাফে ছেড়ে পথে নামলাম। কিয়ার্নি'কে আজ রাতটা আমার হোটেলে কাটানোর প্রস্তাব দিলাম। সর্বশেষে বললাম, কাল দুপুরেই আমরা বন্দর ত্যাগ করব।

আমার প্রস্তাবে তিনি সম্মত হলেন। তারপর বললেন 'শুনুন ক্যাপ্টেন, অগ্রসর হবার আগে আপনাকে আমার জানিয়ে রাখা দরকার, বাফিন উপসাগর থেকে শুরু করে টিয়েরা ডেল ফুয়েগো পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষ আমাকে অদৃষ্ট বিড়ম্বিত কিয়ার্নি, নামে জানে। আসলেও আমি কিন্তু তা-ই। কোন কাজে আমি হাত দিলেই তা যেন কর্পূরের মত হাওয়ায় মিলিয়ে যায়, কেবলমাত্র একটা বেলুন ছাড়া। কোন বাজী ধরামাত্র হেরে যাই, কেবলমাত্র তামার মুদ্রা ছাড়া। কোন নৌকায় ওঠামাত্র তা তলিয়ে যায়, কেবলমাত্র ডুবোজাহাজ ছাড়া। যা-ই পেতে চাই তা-ই গুড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়, কেবলমাত্র কামানের গোলা ছাড়া। যা কিছু হাতে নিয়ে দৌড়াতে চেষ্টা করি তা-ই ভূমিতে পতিত হয়, কেবলমাত্র হাতের লাঙ্গলটা ছাড়া। তা-ই তো সবাই আমাকে অদৃষ্টবিড়ম্বিত কিয়ার্নি বলে সম্বোধন করে। এ কথাটা আপনাকে জানানো উচিত মনে করায় না বলে পারলাম না।

—অদৃষ্টবিড়ম্বিত—অদৃষ্ট কোন কোন সময় একটা মানুষের জীবনকে জট পাকিয়ে দিতে পারে আবার এলোমেলোও করে দিতে পারে। তবে তা মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে তার পিছনে কোন

না কোন কারণ থাকেই থাকে।

অবশ্যই। কারণ তো থাকেই। আর একটা স্কোয়ার পর্যন্ত গেলেই আপনাকে আমি তা দেখিয়ে দিতে পারব, কথা দিচ্ছি।

অবাক হলাম। বিস্ময়ের ঘোরটুকু কাটানোর জন্য তার পাশে পাশে হেঁটে চললাম। ক্যানাল স্ট্রীটে পা দিতেই কিয়ার্নি থমকে দাঁড়িয়ে আমাব একটা হাত চেপে ধরলেন। অত্যুজ্জ্বল একটা তারার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে আমাব দৃষ্টি আকর্ষণ করল। দিগন্ত রেখা থেকে ত্রিশ ডিগ্রী ওপরে তারাটা স্থিরভাবে অবস্থান করছে।

আমি মুখ খোলার আগেই সে বলে উঠল, ক্যাপ্টেন, ওটা হচ্ছে, শনি গ্রহ। ওই গ্রহটাই অশুভ, ভাগ্যহীনতা, হতাশা, ব্যর্থতা আর যাবতীয় গণ্ডগোলের মূলে কাজ করে।

জানেন ক্যাপ্টেন, আমার জন্ম হয় ওই নক্ষত্রেই। আমি কোন কাজে হাত দেওয়ামাত্র শনিগ্রহ এসে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সবাই তাকে স্বর্গের অশুভ গ্রহ বলেই জানে। শোনা যায় তার ব্যাস তিয়াত্তর হাজার মাইল। আর তার দেহে অবস্থান করছে শিকাগোর মতই লজ্জাকর ও ক্ষতিকারক বহু অঞ্চল বা কৃত্ত বর্তমান। এবার ভেবে দেখুন, এরকম একটা গ্রহে জন্মলাভ কী সঙ্কটের ব্যাপার!

আচ্ছা, বলুন তো, এমন বিস্ময়কর জ্ঞান আপনি কিভাবে লাভ করেছেন? আমি কপালের চামড়ায় চিন্তার ভাঁজ এঁকে বললাম।

ও এই কথা, ক্লীভল্যান্ড, মানে ওহিওর ক্লীভল্যান্ডের এক মহাজ্ঞানী জ্যোতির্বিজ্ঞানী আজ্‌রাথ-এর কাছ থেকে। একবার একটা কাচের গোলকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই তিনি আমার নামটা বলে দিয়েছিলেন। আমি মুখ খোলার আগেই আমার জন্ম আর মৃত্যুর তারিখও বলে দিলেন। তারপরই মিনিট কয়েকের মধ্যে আমার কোষ্ঠির ছকটা তৈরি করে ফেললেন। তা থেকেই জানা গেল, ফান্সিস কিয়ার্নি-র বংশের যেকোন ব্যক্তি, যেখানে আছে তাদের পক্ষে এবং তার সুহৃদয়ের পক্ষে সেটা বড়ই মন্দভাগ্যের ব্যাপার। কোষ্ঠিটা তৈরি করে আজরাথ মর্মাহত হয়েছিলেন খুবই সত্য বটে। কিন্তু তিনি নিজের পেশার ব্যাপারে সম্পূর্ণ সচেতন ও আস্থাভাজন ছিলেন। এ কাজে তার ভুল হয় না, হতে পারে না, খুবই নিঃসন্দেহ ছিলেন। তখন বেশ রাত্রি। তিনি আমাকে নিয়ে মুক্ত আকাশের তলায় গেলেন। অঙ্গুলি নির্দেশ করে আমাকে শনি গ্রহটা দেখিয়ে দিলেন। আর এ-ও বুঝিয়ে দিলেন, কিভাবে তাকে সনাক্ত করা সম্ভব।

কিন্তু শনিগ্রহ তো কেবলমাত্র ওপরওয়ালা ছাড়া কিছু নয়। অতএব তিনিই সব নন। তিনি এতই মন্দভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেন যার ফলে তাঁকে একদা সহযোগী না রেখে উপায় নেই। তারা অনবরত চক্কর খাচ্ছে আর তাদের নিজ নিজ অঞ্চলে দুর্ভাগ্যকে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

দূর আকাশের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে কিয়ার্নি বললেন, শনিগ্রহের আট ইঞ্চি ওপরের দিকে বিচ্ছিরি একটা নক্ষত্র নজরে পড়ছে তো? আরে, উনিই তিনি, মানে চন্দ্রমা-র কথা বলছি। আমি তাঁরই অধীনস্থ একটা প্রাণী মাত্র। এবার কি বলছি শোন, জন্মমুহূর্ত থেকেই তুমি শনিগ্রহ কর্তৃক প্রভাবিত। আর ভূমিষ্ঠ হবার ঘণ্টা আর মিনিটের জন্য তোমাকে দিনযাপন করতে হবে নবম উপগ্রহ চন্দ্রমা-র শাসন কর্তৃত্বাধীন অবস্থায়, তাকে অভিশাপ দেবার ইচ্ছা যদি তোমার হয় তবে দিতে পার। তিনি কিন্তু নিজের কাজ ঠিক করে চলেছেন।

জ্যোতিষীর সঙ্গে দেখা ও কথাবার্তা হবার পর দুর্ভাগ্য যেন ছায়ার মত আমাকে অনুসরণ করে চলেছে। আর তা ঘটে চলেছিল বহু বছর আগে থেকেই। ক্যাপ্টেন, মানুষ হিসেবে আমার দুর্ভাগ্য আর বাধা বিঘ্নের কথা তো আপনাকে বললামই, আমাকে নিয়ে যদি আপনি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন, অর্থাৎ আমি সঙ্গে থাকলে আপনিও বিপদের সম্মুখীন হবেন, আপনার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আশঙ্কা থাকে তবে আর আমাকে সঙ্গে নিয়ে দরকার নেই।

আমি ফ্রান্সিস কিয়ার্নিকে সাধ্যমত আশ্বাস দিয়ে বললাম, এখনকার মত আমরা ফলিত আর গণিত জ্যোতিষশাস্ত্রকে শিকেয় তুলে রাখি, কি বলেন? চেষ্টা করে দেখাই যাক না অদৃষ্টের বিরুদ্ধে সাহস আর প্রবল ইচ্ছাশক্তি দিয়ে লড়াই করে ফয়দা কিছু হয় কি না। তবে পাকা কথা হয়ে গেল, কালই আমাদের স্টিমার এস্পোরাডোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করছে।

মিসিসিপি নদী থেকে পঞ্চাশ মাইল ভাঁটিতে অতিক্রম করতে না করতেই আমাদের স্টিমারের

হালটা আশ্চর্য্যজনকভাবে ভেঙে গেল।

একজনকে পাঠানো হল একটা নৌকা নিয়ে এসে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। ব্যস, এতে তিন-তিনটে দিন বরবাদ হয়ে গেল। তারপর উপসাগরে পৌঁছানোমাত্র মনে হল আতলান্তিক মহাসাগরের সব ঝড় বুঝি সেখানে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। আমরা ভেবেই রেখেছিলাম, আমাদের সঙ্গের ভারী জিনিসপত্র আর অস্ত্রপাতিগুলোকে বুঝি মেক্সিকো উপসাগরের তলায় মজুদ না রেখে উপায় থাকবে না।

ফ্রান্সিস কিয়ার্নি কিন্তু তার মারাত্মক কোষ্ঠির ওপর থেকে আমাদের বিপদের বোঝার অনুমাত্রও নামাতে চেষ্টা করল না। ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে চুরুট টানতে টানতে অবলীলাক্রমে প্রতিটা ঝড় সে কাটিয়ে দিল। বৃষ্টি আর সমুদ্রের জলকেও তিলমাত্রও আমল দিল না। বিঘ্ন সৃষ্টিকারী নক্ষত্রটা মেঘের ফাঁক দিয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগল। একদিন আকাশটা নির্মেঘ হয়ে গেছে তার অনিষ্টকারী অভিভাবককে লক্ষ্য করে তর্জন গর্জন শুরু করে দিল। বাচ্চা শয়তান কাহাকার! তুমি যতই মিটমিট ঝিকমিক কর না কেন, আসলে তুমি একটা মেয়েমানুষ ছাড়া কিছু না, ঠিক বলি নি? একটা পুরুষের পিছনে এঁটুলির মত লেগে থাকাই তোমার কাজ। তুমি চন্দ্রমা? ধ্যুৎ! হুটোপাটা করে জাহাজ ডুবিয়ে দাও। চন্দ্রমা, তুমি একটা গোয়ালিনির মতই তোমার নামটা শোনায়, মিথ্যে বলেছি? আমার দুঃখ একটাই, একটা পুরুষ নক্ষত্র পেলাম না। পুরুষকে যা কিছু বলা যায়, তা-তো চন্দ্রমাকে বলা সম্ভব নয়। ধ্যুৎ! চন্দ্রমা, তুমি জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাও! জাহান্নামে যাও।

একনাগাড়ে আটদিন ধরে ঝড়, জলোচ্ছ্বাস আর জলের ঘূর্ণিপাক আমাদের স্টিমারটাকে বিপথে, বহুদূরে নিয়ে ফেলল এস্পোরাভোতে পাঁচদিন লাগার কথা ছিল।

শেষমেশ এক বিকালে আমাদের স্টিমারটা ছোট্ট রিও এস্কন্ডিডোর শান্ত মোহনায় হাজির হল। এবার আমাদের নদীর তীর বরাবার গাছপালা ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে আমাদের পাঁচ মাইল পথ প্রায় বুকে হেঁটে পাড়ি দিতে হল। আমরা বার বার শিস দেওয়ার পর সাড়া পেলাম, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বাতাসবাহিত একটা চিৎকার কানে এল। কার্লোস কুইন্টানা ঝোপঝাড় ভেঙে হাঁপাতে হাঁপাতে হাজির হল। সে আনন্দে রীতিমত ডগমগ। মাথার টুপিটাকে বার বার নাচাতে আরম্ভ করল।

সেখান থেকে একশ গজ দূরে তীর ছাউনি। তিন শ' দেশসেবক সেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। তাদের বিপ্লব আর মুক্তিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে এক মাস ধরে তাদের যুদ্ধ-কৌশল শেখানো হচ্ছে।

আমাদের নৌকোটা তারে লাগবার আগেই কার্লোস গলা ছেড়ে বলতে লাগল, ক্যাপ্টেন! আমার ক্যাপ্টেন! দলবেঁধে কুচকাওয়াজ করার সময় দেখতে পাবেন, তারা কখন চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছে, চারজন করে, দেখার মত দৃশ্যই বটে। অস্ত্রও চমৎকার চালাতে পারে। এবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, হায়! একমাত্র বাঁশের লাঠি সম্বল করে তাদের কায়দা কৌশল দেখাতে হয়। বন্দুক? ক্যাপ্টেন বন্দুক এনেছেন তো?

আমি তাকে আশ্বস্ত করতে গিয়ে বললাম, এনেছি কার্লোস। এক হাজার উইনচেস্টার বন্দুক। সে সঙ্গে প্রতি মিনিট বারো শ' শর্টের দুটো গ্যাটলিং বন্দুক সঙ্গে আছে।

সে সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল, ভালগমে ডিয়স। দুনিয়া জয় করব।

আমাদের কথাবার্তা চলাকালীনই ফ্রান্সিস কিয়ার্নি স্টিমারের রেলিং টপকে সমুদ্রে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। সাঁতার জানে না। নাবিকদের ছুঁড়ে দেওয়া দড়ির প্রান্ত ধরে কোনরকমে স্টিমারে উঠে এল, নিজের দুর্ভাগ্যের ব্যাপারে আতঙ্কিত হলেও মনোবল কিন্তু অটুট ও নির্ভিকই লক্ষ্য করলাম। স্বগতোক্তি করলাম, লোকটার প্রশংসা না করে পারা যায় না।

স্টিমারের প্রধান চালককে নির্দেশ দিলাম, অস্ত্রশস্ত্র গোলা বারুদ যা কিছু আছে সবই নামিয়ে দেবার জন্য। গ্যাটলিং বন্দুক দুটো নামানো একটু সঠিক হলেও কাজটা সোজাই বটে।

কার্লোস-এর সঙ্গে হেঁটে ছাউনিতে গেলাম। সৈন্যদের উদ্দেশে স্পেনীয় ভাষায় সংক্ষেপে ভাষণ দিলাম। তা আগ্রহের সঙ্গে শুনল। কার্লোস মদ ও সিগারেট খেতে দিল। অস্ত্রপাতি নামানোর

কাজ দেখার জন্য একটু বাদে স্টিমারে ফিরে এলাম।

বন্দুক ও গোলাবারুদগুলো নামানো হয়। একটা গ্যাটলিং বন্দুক নামিয়ে দ্বিতীয়টা নামানোর জন্য কসরৎ চলছে।

হঠাৎ আমরা দেখতে পেলাম, ফ্রান্সিস কিয়ার্নি অনবরত ছুটাছুটি করে চলেছে। তাকে দেখলে মনে হয় সে একাই দশটা লোকের ক্ষমতা ধরে, পাঁচটা লোকের কাজ করার হিম্মৎ রাখে। আর আমাকে কাছে পাওয়ামাত্র সে যেন খুবই উৎসাহিত হয়ে পড়ল, অস্ত্রপাতি নামানোর কাজ করতে গিয়ে একটা দড়ির প্রান্তকে স্টিমার থেকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। অসতর্কতাবশত ফ্রান্সিস কিয়ার্নি সেটার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল। খট্‌খট্ শব্দ হল। গলগল করে ধোঁয়া বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ল। গ্যাটলিং বন্দুকটা দুম করে নিচে পড়ে কুড়ি ফুট জল আর পাঁচ ফুট কাদার ভেতরে ঢুকে গেল।

দৃশ্যটা দেখামাত্র আমি ঝট্ করে মুখটা ঘুরিয়ে নিলাম। কার্লোস-এর তীব্র আর্তস্বর কানে এল। নাবিকরা ফোঁস করে উঠল। চারদিক থেকে নালিশ জানাতে লাগল। টোরেস তর্জন গর্জনসহ শাপ মণ্যি করতে লাগল। কোন রকমে সে সব সহ্য করলাম।

আমার তাঁবুটা প্রধান সেনাপতির তাঁবুর পাশেই খাটানো হয়েছে। একসময় ফ্রান্সিস কিয়ার্নি আমার তাঁবুতে হাজির হল। মুখে হাসির ছোপ। অশুভ নক্ষত্রের কষাঘাতের লেশমাত্র তার মুখে দেখা গেল না। বরং একজন বীর শহিদ বলেই তাকে মনে হল। তার দুঃখ যন্ত্রণা যেন এমনই গৌরবের যা তাকে নতুনতর খ্যাতি এনে দিয়েছে, করেছে যারপরনাই মহিমান্বিত।

সে শান্তস্বরেই বলল, ক্যাপ্টেন, দেখতেই তো পারছেন, দুর্ভাগা ফ্রান্সিস কিয়ার্নি এখনও আপনার সামনে দাঁড়িয়ে। ওই বন্দরের ব্যাপারটা বড়ই লজ্জাকর। মাত্র ইঞ্চি দুই এগোতে পারলেই পথটা মিলে যেত। দড়ির প্রান্তটা আমি শক্ত করে ধরেও রেখেছিলাম। জাহাজের একজন দক্ষ নাবিক যে দড়ির প্রান্তটা দিয়ে গলুইয়ের সঙ্গে ফস্কা গেরো দিয়ে রাখতে পারে, ভাবা যায়? আমি দায়িত্বটা ঝেড়ে ফেলে দিতে চাইছি, ভুলেও ভাববেন না। এটা নিছকই আমার বরাত।

মিঃ কিয়ার্নি, এমন মানুষও আছে, যে বা যারা নিজের ভুলটা বরাত বা আকস্মিক ঘটনা বলে দায়িত্ব এড়িয়ে যায়। আপনি ও তাদের দলের একথা কিন্তু বলছি না। তবে যাবতীয় দুর্ঘটনার মূলে যদি ওই ছোট্ট গ্রহটার কারসাজিই থাকে তবে তো দেশের সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন করে জ্যোতিষের অধ্যাপক নিয়োগ করতেই হয়।

দেখুন ক্যাপ্টেন, নক্ষত্রের আকার বড় বা ছোট এটা আসল কথা নয়। তার গুণ, মানে কার্যকরী ক্ষমতাটাই আসল কথা। মেয়েদের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। তাই তো তারা বড় বড় গ্রহগুলোর পুরুষোচিত আর ছোট ছোট গ্রহগুলোকে নারীসুলভ নামকরণ করেছে। ভাবুন তো, আমার নক্ষত্রটাকে 'চন্দ্রমা'-র পরিবর্তে আগামেম্‌নন্ বা বিল ম্যাককার্টি না হয় ওরকমই কোন নামকরণ করত, তবে? বিপদসংকেতটাকে যতবারই টিপে দেওয়া হত আর ততবারই আমার জন্য বেতার মারফৎ একটা দুর্ভাগ্যকে পাঠিয়ে দেওয়া হত। আর আমিও ততবারই তাদের সম্বন্ধে আমার ভাবনা চিন্তার কথাগুলো জানিয়ে দিতে পারতাম, তাই নয় কি? সে ভাষাতে তো আর একটা চন্দ্রমার সঙ্গে কথা বলা সম্ভব নয়।

হাসি চেপে রেখেই আমি বললাম, আপনি ব্যাপারটা নিয়ে যত খুশি মস্করা করতে পারেন। কিন্তু নদীর জল কাদার মধ্যে আমার গ্যাটলিংটা যে তলিয়ে গেল এটা তো আর মস্করা করার ব্যাপার ভাবা যায় না।

হতভাগ্য ফ্রান্সিস কিয়ার্নিকে দূরে সরিয়ে দিয়ে কারো পক্ষে বেশীদিন থাকা সম্ভব নয়। তাকে একদিন বলতেই হল, 'দেখুন, ভাগ্যটাগ্যের কথা আপাতত ছাড়ান দিয়ে কাজের কথা ভাবুন। আনাড়ি সৈন্যদের কুচকাওয়াজ শেখানোর অভিজ্ঞতা আপনার আছে কি?

—চিলির সৈন্যদলে আমি এক বছর ছিলাম। গোড়ার দিকে সার্জেন্টের পদে, তারপর ড্রিল মাস্টারের পদে বহাল ছিলাম। তারপর গোলন্দাজ বাহিনীর ক্যাপ্টেনের পদে এক বছর কাজ করেছি।

—আচ্ছা, আপনার সে সৈন্যদলের হাল কি হয়েছিল, বলুন তো?

—বালমাচেডার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে সবাই খতম হয়ে যায়।

--অস্ত্র চালানো শেখাবার জন্য কাল আপনার হাতে একশ' আনকোরা সৈন্যকে তুলে দেব। আপনার পদ হবে লেফ্‌টেন্যান্ট। পরম পিতার দোহাই, দুর্ভাগ্যের কুসংস্কারকে মন থেকে নিঃশেষে ঝেড়ে ফেলে দিন। গ্রহ নক্ষত্রদের কথা ভুল যান। আপনার সৌভাগ্যের গ্রহ হিসেবে এস্পেরান্ডোকে আঁকড়ে ধরুন।

ধন্যবাদ। আপনার কথা মনে রাখতে চেষ্টা করব।

পরদিন দুপুরের দিকে বহু চেষ্টার পর ফ্রান্সিস কিয়ার্নি জল-কাদা থেকে গ্যাটলিংটাকে তুলে আনা সম্ভব হল। এবার আমার তিন সহকারী ম্যাকুয়েল, কার্লোস আর ফ্রান্সিস কিয়ার্নি সৈন্যদের মধ্যে উইনচেস্টারগুলো বিতরণ করল। তারপর দিন রাত তাদরে যাবতীয় কুচকাওয়াজ শেখাতে লাগল। এস্পেরান্ডোর উপকুলটা নীরব নিস্তব্ধ হওয়ার জন্য আমরা গুলি ছুঁড়ে আওয়াজ সৃষ্টি থেকে বিরত থাকতাম। আমাদের সৈন্যরা যতদিন পর্যন্ত স্বাধীনতার বার্তা অর্থাৎ অত্যাচারী সরকারের পতনের খবর আনতে না পারে ততদিন সে পরপীড়ক সরকারকে কোনরকম সাবধানতা অবলম্বনের সুয়োগ দেওয়ার ইচ্ছা আমাদের ছিল না।

রাজধানী এগুয়াস ফ্রায়াস থেকে এক বার্তাবাহক খচ্চরের পিঠে চেপে ডন রাফায়েল ভালদেভিয়া একটা পত্র নিয়ে আমার কাছে এল।

এ সদাশয় মহান লোকটার নাম উচ্চারণ করা মাত্র তখনই তার উদারতা, বুদ্ধিমত্তা ও মহত্বের কথা আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

তিনি মনে প্রাণে একজন বিজ্ঞান সাধক, বাগ্মী, কবি। দক্ষসৈনিক, পৃথিবীর সব অভিযানের দক্ষ সমালোচক আর এস্পেরান্ডোর মানুষের কাছে দেবতুল্য ব্যক্তি দীর্ঘদিন তার বন্ধুত্ব পেয়ে আমি নিজেকে সম্মানিত বোধ করেছি।

আমি তার ভাবনা চিন্তার মোড় ঘুরিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম যে, এক নতুনতর এস্পোরান্ডোকে তাকে স্মৃতিসৌধরূপে রেখে যেতে হবে। রেখে যেতে হবে দুর্নীতিপরায়ণ স্বৈরাচারীদের শাসনমুক্ত একটা ভূমিখণ্ড। আর বিচক্ষণতার মাধ্যমে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সুখী ও সমৃদ্ধ একটা জাতি তৈরি করে রেখে যেতে হবে।

আমার কথায় তিনি হাসিমুখে সম্মত হলেন। একান্ত আগ্রহে সুমহান ব্রত পালনে উদ্যোগী হলেন। আমাদের মত বিশ্বস্ত মানুষগুলোর জন্য রাজকোষের দরজা উন্মুক্ত করে দিলেন। শুধু কি এই? তার যাবতীয় গোপন কর্মধারার কথাও আমাদের কাছে খোলাখুলি ব্যক্ত করতে দ্বিধা করতেন না। তার খ্যাতি এমন ছড়িয়ে পড়েছিল যে, সমর মন্ত্রীর পদে তাঁকে বহাল করতে প্রেসিডেন্ট বাধ্য হয়েছিলেন, তিনিই তাকে একাজে বাধ্য করেছিলেন।

পত্র মারফৎ ডন রাফায়েল জানিয়েছেন, এবার সময় ঘনিয়ে এসেছে। সাফল্যলাভ অবশ্যম্ভাবী। অত্যাচারী ক্রুজের শাসনের বিরুদ্ধে দেশবাশী সোচ্চার হয়ে উঠেছে। জনগণ রাতের অন্ধকার নেমে এলেই তার প্রাসাদকে লক্ষ্য করে দমাদম ইট পাটকেল ছুঁড়তে আরম্ভ করে বিদ্রোহ জানায়।

বাগানে প্রেসিডেন্ট ক্রুজ-এর যে ব্রোঞ্জের মূর্তিটা আছে তার গলায় লাসো লাগিয়ে ভূমিস্যাৎ করে দিয়েছে।

আমার ভূমিকা ছিল কেবলমাত্র সৈন্যদল আর এক হাজার বন্দুক নিয়ে সেখানে উপস্থিত থাকা। আর নিজেকে মুক্তিদাতা বলে ঘোষণা করা, আর একদিনের মধ্যেই ক্রুজকে গদিচ্যুত করার দায়িত্ব তার নিজের ওপর ছিল। রাজধানীতে প্রহরারত ছ'শ' সৈন্য লোক দেখানো বাধা দিতে পারে। আসলে দেশটা তো আমাদের হাতের মুঠোর মধ্যে।

তাঁরও প্রস্তাব আঠারোই জুলাই আক্রমণ শুরু করা হবে। তবেই আমরা ছাউনি উঠিয়ে আগুয়াস ফ্রায়াসের দিকে অগ্রসর হবার ছ'দিন সময় পাব।

আমরা চৌদ্দ তারিখ ভোরে সমুদ্রের দিকে যাত্রা করলাম।

একের পর এক পাহাড় ডিঙিয়ে ষাট মাইল পথ পাড়ি দিয়ে আমরা রাজধানীতে পৌঁছলাম।

আমি টাকার থলি থেকে কিছু বিল বের করে ফ্রান্সিস কিয়ার্নিকে বললাম এতে কিছু টাকা আছে। তার কার্যসিদ্ধি করার জন্যই আমি এ অর্থব্যয় করছি। এর চেয়ে ভাল কাজের জন্য তার

অর্থ ব্যয় করার অন্য কোন উপায় আমার জানা নেই। একশ' ডলার এতে আছে। বরাত ভাল বা মন্দ যা-ই হোক না কেন, এবার থেকে আমরা ভিন্ন পথে যাত্রা করব। নক্ষত্র থাক আর না-ই থাক, বিপদ বুঝলে আপনার পাশে পাশেই অবস্থান করব।

মুহূর্তকাল ভেবে আমি বললাম, মিঃ কিয়ার্নি, আপনি স্টিমারে ফিরে যান। কিছু মালপত্র আমোটাপাতে নামিয়ে দিয়ে সেটা নিউ অর্লিয়েন্সে ফিরে যাবে। আর এ কাগজটা প্রধান নাবিকের হাতে দেবেন। তবেই সে আপনাকে পথ খরচ বাবদ অর্থ দিয়ে দেবে। নোট বইয়ের পাতায় প্রয়োজনীয় বক্তব্য লিখে সেটা ছিঁড়ে তাঁর হাতে দিলাম, আর ডলারগুলোও দিয়ে দিলাম।

তাঁর সঙ্গে করমর্দন সারতে সারতে বললাম, মিঃ কিয়ার্নি, আপনার প্রতি আমি কিন্তু অসন্তুষ্ট নই। তবে এ অভিযানে কি আর বলব? সিনিওরিটা চন্দ্রমা-র কোন ভূমিকা নেই।

পরিস্থিতিটা তার কাছে যাতে সহজ হয়ে উঠতে পারে সে জন্যই হেসে হেসে কথাটা তাকে না বলে পারলাম না।

কাগজ আর ডলারগুলো হাতে নিয়ে ফ্রান্সিস কিয়ার্নি বললেন, ক্যাপ্টেন, আগুয়াস ফ্রায়াস-এর যুদ্ধে আপনার সহকারী হতে পারলে আমি আনন্দিতই হতাম। আপনাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হোক। বিদায় নিচ্ছি, কি বলেন?

ফ্রান্সিস কিয়ার্নি বিদায় নিলেন। তাঁর টাট্টু ঘোড়াটা নিয়ে আমরা আবার পথে নামলাম। ছোট-বড় পাহাড়, পার্বত্য উপত্যকা, হিমশীতল ঝর্ণা অতিক্রম করে আমরা এগিয়ে চললাম। তারপর এবড়ো খেবড়ো চূড়ার চারদিকে চক্কর খেতে খেতে আর সুগভীর খাদের ওপরের নড়বড়ে সেতুগুলোকে রুদ্ধশ্বাসে হামাগুড়ি দিয়ে আর প্রায় বুকে হেঁটে পেরিয়ে গেলাম।

আগুয়াস ফ্রায়াস থেকে পাঁচ মাইল আগে ন্যাড়া পাহাড়টার গায়ে আমরা সতেরতম দিনে সন্ধ্যার দিকে তাঁবু ফেললাম। ইচ্ছা সকালে আবার নতুন করে যাত্রা শুরু করব।

আমি মাঝরাতে তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে মুক্ত বাতাসের স্বাদ নিচ্ছি। নীল আকাশের গায়ে জ্বলন্ত তারাগুলো মিটমিট করছে। শনিগ্রহটা মাথার ওপরে অবস্থান করছে। তার গায়েই দেখলাম, ফ্রান্সিস কিয়ার্নি-র দুর্ভাগ্যের কারণ হতচ্ছাড়া নক্ষত্রটা জ্বলজ্বল্ করছে। সে মুহূর্তেই আমার মনে পড়ে গেল যেখানে বীর ডন রাফাফেল আমাদের জন্য উজ্জ্বল একটা নক্ষত্রকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য অধীর প্রতীক্ষায় রয়েছেন।

আমাদের ডানদিকের ঘন ঘাসবন থেকে একটা অবাঞ্চিত শব্দ ভেসে আসতে লাগল। ঘাড় ঘোরাতেই দেখলাম, ফ্রান্সিস কিয়ার্নি ঘাস বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছেন। খোড়াচ্ছেন। জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফেঁসে ফালা ফালা হয়ে গেছে। একটা বুট আর টুপি বে-পাত্তা।

আমি নিরাসক্ত দৃষ্টি মেলে তার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'ধ্যুৎ, আপনি যদি আমাদের পিছন ছাড়তেই এতই নারাজ তবে এতদিন কেন আমাদের নিপাত করে দিতে পারেন নি, ভেবে অবাক হচ্ছি।

ফ্রান্সিস কিয়ার্নি খোড়া পা'টাকে উঁচু করে ধরে তার বাঁধা পট্টিটা থেকে একটা পাথর বের করে নিয়ে বললেন, দুর্ভাগ্য যাতে আপনাদের ছুঁতে না পারে সেজন্যই আমি আধা দিনের পথ পিছনে থেকেই চলছিলাম। ক্যাপ্টেন, বাধ্য হয়েই আমাকে আসতে হল। এ যুদ্ধের ভাগীদার হবার খুবই শখ আমার। আপনার দেওয়া এক শ' ডলার নিন। আগামীকালের লড়াইয়ে যোগ দেওয়ার অনুমতি আমাকে দিন।

শুনুন একশ'র একশ' গুণ ডলারের বিনিময়েও আমি আমার পরিকল্পনার এতটুকুও হেরফের হতে দিচ্ছি না। তার পিছনে অশুভ গ্রহের কারসাজি আর আমার ভুল, যে কারণই থাক না কেন। শনিগ্রহ আর তার উপগ্রহ জোট বেঁধেও যদি আমাদের জয়লাভকে ব্যর্থ করে দিতে চায় তবে তাদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার মানসিক দৃঢ়তা আমার অবশ্যই আছে। তবে এ-ও সত্য, আপনি ক্লান্ত, আর একজন দক্ষ সৈনিক। এত রাত্রে আপনাকে অবশ্যই ফিরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা নেই। কাছেই ম্যানুয়েল ওর্টিজ-এর ছাউনি। তার খোঁজ করে পোশাকপরিচ্ছদ, খাদ্য আর কম্বল চেয়ে নিন। ভোরের আলো ফুটলেই আমরা পা বাড়াব।

আমাদের ধন্যবাদ জানিয়ে ফ্রান্সিস কিয়ার্নি বিদায় নিল। বারো কদমও তিনি অগ্রসর হন নি।

অকস্মাৎ একটা অত্যুজ্জ্বল আলোক বিচ্ছুরিত হয়ে চারদিকের পাহাড়কে যেন ঝলসে দিল। আর অশুভ শি-শি-শি শব্দ আমরা শুনতে পেলাম। পরমুহূর্তেই তার গর্জন শোনা গেল। আর তা ক্রমেই বাড়তে লাগল। তার পরই ভয়ঙ্কর আওয়াজ করে বিস্ফোরণ ঘটল। তার ফলে যে আলো এবং গর্জন এতই তীব্রতর হল যে কান আর চোখ দুয়েরই পীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়াল। মনে হল পৃথিবীটাই ভেঙেচুরে একসার হয়ে যাবে। আশ্চর্য ব্যাপার, প্রাকৃতিক ঘটনা বলে যে তাকে উড়িয়ে দেব সে রকম নিশ্চিত সিদ্ধান্তও নিতে পারলাম না। সঙ্গে সঙ্গে আমার সৈন্যদের আর্তস্বর কানে এল। আর ফ্রান্সিস কিয়ার্নির কাতর আর্তনাদ আমাকে রীতিমত স্তম্ভিত করে দিল।

ভাবলাম, তারা আমাকেই দোষারোপ করবে। কিন্তু এমন ভয়ঙ্কর কাজের নায়ক যে কোন্ শয়তান তা ফ্রান্সিস কিয়ার্নি-র পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়।

আমি অনুসন্ধিৎসু চোখে চারদিকে তাকালাম। পাহাড়গুলো দিব্যি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। তবে তো আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে বা ভূমিকম্পের কাজ নয়। হঠাৎ দেখতে পেলাম, ধূমকেতুর মত একটা অত্যুজ্জ্বল লেজ পশ্চিম আকাশের দিকে ধেয়ে চলেছে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে চিল্লিয়ে উঠলাম, 'ধূমকেতু! ধূমকেতু! ধূমকেতুর পতন—বিপদের আশঙ্কা নেই।

পর মুহূর্তেই আবার ফ্রান্সিস কিয়ার্নি তীব্র স্বরে বলতে লাগল, 'চন্দ্রমা! চন্দ্রমা পালিয়েছে। ভয়ঙ্কর শব্দে ফেটে নরকে চলে গেছে। ক্যাপ্টেন এই দেখুন, লাল মাথা ছোট্ট ভূতটা ফেটে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে। ফ্রান্সিস কিয়ার্নি বড্ড কঠিন ঠাঁই বাবা! কিয়ার্নি-র সঙ্গে লড়াইয়ে টিকে থাকতে পারে নি। আজ থেকে অদৃষ্ট বিড়ম্বিত বিদায় নিল। উফ্! আজ যে কী খুশীর দিন আর বলার নয়।

আমি চোখের তারায় বিস্ময়ের ছাপ এঁকে আকাশের দিকে তাকালাম। দেখলাম, শনিগ্রহটা তার নিজের জায়গাতেই অবস্থান করছে। কিন্তু তারই প্রায় গায়ের ছোট্ট লাল জ্যোতিষ্কটার দিকে অঙ্গকে নির্দেশ করে ফ্রান্সিস কিয়ার্নি বলল, ওইটায় আমার অশুভ নক্ষত্র। ওইটা বে-পাত্তা হয়ে গেছে। আমি নিঃসন্দেহ, আধ ঘণ্টা আগেও ওটাকে ওখানে আমি দেখেছিলাম। তবে এ-ও খুবই সত্য যে, প্রকৃতির কোন ভয়ঙ্কর আক্ষেপের জন্য ওটাকে আকাশ থেকে ছুঁড়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, প্রকৃতির জ্বলন্ত আক্ষেপ।

আমি হাত বাড়িয়ে ফ্রান্সিস কিয়ার্নি-র কাঁধে ছোট্ট একটা ধাক্কা মেরে বললাম, এ ব্যাপারটার মাধ্যমেই আপনার মন পরিষ্কার হয়ে যাক, দূর হয়ে যাক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। জ্যোতিষ শাস্ত্র আপনাকে হারাতে পারেনি। নতুন ছক তৈরি করে আপনার কোষ্ঠী তৈরি করা দরকার। আপনার জয়লাভ আমার মন-প্রাণ ভরে দিয়েছে।

তাঁর মনোবল ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করার পর আমি এবার বললাম, মিঃ কিয়ার্নি, তাঁবুতে ফিরে গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নিন। কাল ভোরেই গোপন সঙ্কেত পাবেন।

আঠারোই জুলাই। সেদিন সকাল ন'টায় আমি ফ্রান্সিস কিয়ার্নি'কে সঙ্গে করে ঘোড়ায় চেপে আগুয়াস ফ্রায়াসে ঢুকলাম।

সৈন্যদল আর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কার্লোস এগিয়ে চলল। এবার আমি কিয়ার্নি'কে সঙ্গে নিয়ে জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে ডন রাফায়েল-এর প্রাসাদের দিকে এগোতে লাগলাম। এস্পেরান্ডো বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিশাল বাড়িটার গা দিয়ে যাবার সময় খোলা জানালা দিয়ে প্রকৃতি বিজ্ঞানের অধ্যাপক হের বের্গোউইজ-এর চকচকে টাকমাথা আর পুরুকাঁচের চশমাটা আমার নজরে পড়ল। তিনি ডন রাফায়েল আর আসার, অর্থাৎ আমাদের উভয়ের আদর্শ সত্যিকারের একজন বন্ধু। মুচকি হেসে তিনি আমার দিকে হাতটা নাড়ালেন।

আগুয়াস ফ্রায়াস-এ কোনরকম চাঞ্চল্য দেখতে পেলাম না। অন্যদিনের মতই অধিবাসীরা বাজার হাট করছে। বুঝতে দেরী হল না সে, ডন রাফায়েল ইচ্ছে করেই এমন খেলায় মেতে মজা লুঠছেন।

এক বৃদ্ধা সদর দরজায় এসে জানাল, ডন রাফায়েল এখনও ঘুমোচ্ছেন।

তা হোক, তাকে খবর দাও ক্যাপ্টেন মালোন ও তাঁর এক বন্ধু তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আগ্রহী,

দরজায় অপেক্ষা করছেন।

ভীত সন্ত্রস্ত মুখে বৃদ্ধা ফিরে এসে বলল, কত্তারা, আমি বহু ডাকাডাকি করলাম। জোরে জোরে ঘণ্টা বাজালাম। কিন্তু ঘুম থেকে ওঠা তো দূরের ব্যাপার কোন সাড়াই দিলেন না। আর কি করতে পারি, বলুন তো?

তাকে আচমকা এক ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ফ্রান্সিস কিয়ার্নি'কে নিয়ে আমি দ্রুত ভেতরে ঢুকে গেলাম।

ঘরটার দরজায় পা দিয়ে দেখলাম, বইপত্রে আর মানচিত্রে ভরা একটা টেবিলের লাগোয়া একটা চেয়ারে শরীর এলিয়ে ডন রাফায়েল চোখবুজে বসে। ঘরে নীরব নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। আমি এগিয়ে গিয়ে তার হাতটা ধরলাম। বরফ-শীতল। কয়েক ঘণ্টা আগেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন। তার মাথায়, কানের ঠিক ওপরে একটা ক্ষত। রক্ত শুকিয়ে রয়েছে। অনেক আগেই রক্ত বন্ধ হয়ে গেছে।

বৃদ্ধাকে দিয়ে মোজোকে ডাকিয়ে আনালাম। হের বার্গোউইজ'কে খবর দিয়ে আনার জন্য তাকে পাঠিয়ে দিলাম।

আমরা সবিস্ময়ে পাথরের মূর্তির মত নির্বাক নিস্তব্ধ ডন রাফায়েল-এর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

হের বার্গোউইজ এসে টেবিলের তলা থেকে কমলালেবুর মত কালচে একটা পাথর বের করে এনে চশমার পুরু কাঁচের ভেতর দিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে লাগলেন। তারপর মুখ খুললেন, এটা বিস্ফোরণে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়া ধূমকেতুর একটা টুকরো। গত মাঝ রাতের কিছুক্ষণ পরই এ শহরের মাথার ওপরেই বিশ বছরের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য একটা বিস্ফোরণ ঘটেছে।

মৃত ডন রাফায়েল-এর চেয়ারটার ওপরে কমলালেবুর পরিধির সমান একটা গর্তের ভেতর দিয়ে নীল আকাশের একটা টুকরো আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল।

পরিচিত একটা কণ্ঠস্বর আমার কানে যেতেই আমি যন্ত্রচালিতের মত ঘাড় ঘুরিয়েই দেখি, ফ্রান্সিস কিয়ার্নি মেঝেতে অনবরত গড়াগড়ি খাচ্ছে আর তার দুর্ভাগ্যের কারণ নক্ষত্রটাকে লক্ষ্য করে তাঁর জানা সব কটা অভিশাপ দিয়ে চলেছে।

চন্দ্রমা সে নারীজাতিরই একজন এ বিষয়ে তিলমাত্রও সন্দেহ নেই। আগুনে পড়ে ভস্মীভূত হয়ে যাওয়ার সময়, চূড়ান্ত সর্বনাশ ঘটার সময়ও সে-ই শেষ কথাটা উচ্চারণ করে গেছে।

ক্যাপ্টেন মালোন ভালই জানেন, কোন পরিস্থিতিতে কোন্ কথা বলতে হচ্ছে আর কোথায়ই বা প্রসঙ্গটা শেষ করতে হবে। তিনি আবার বলতে আরম্ভ করলেন, 'আমাদের পরিকল্পনা অবশ্য বাস্তবায়িত হয়েছে। ডন রাফায়েল-এর জায়গায় কাউকে বসাবার মত পাওয়া গেল না। আর আমাদের সেনাদলও কমতে কমতে একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেল।

আমি নিউ অর্লিয়েন্স থেকে ফিরে টুলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক বন্ধুর কাছে গল্পটা বলেছিলাম। আমি গল্পটা শেষ করা মাত্রই তিনি গলা ছেড়ে হাসতে লাগলেন। হাসি থামিয়ে এক সময় জিজ্ঞেস করলেন, ফ্রান্সিস কিয়ার্নি-র অদৃষ্টের কথা কিছু আমার জানা আছে কিনা।

তার কথার জবাবে আমি বললাম, না। তারপর আর তাঁর দেখা পাই নি। আমার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় বলেছিলেন, তার অশুভ নক্ষত্রের ক্ষমতা নিঃশেষ হয়েছে অতএব এবার তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবেই।

একটা ঘটনা তার জানা নেই বলেই তিনি এমন আনন্দিত আছেন। তাঁর দুর্ভাগ্যের জন্য যদি শনিগ্রহের নবম উপগ্রহ 'চন্দ্রমা'কেই দায়ী করে থাকেন তবে সে ঈর্ষাপরায়ণা মহিলা আজও জীবনযাত্রার ওপর নজর রাখছে। শনিগ্রহের প্রায় গায়ের যে নক্ষত্রটাকে তিনি অশুভ নক্ষত্র ভেবেছেন সেটা তার আকস্মিক ঘটনার ফলে গ্রহের কাছাকাছি চলে গিয়েছিল। শনিগ্রহের কাছাকাছি থাকার তিনি অন্য বহু নক্ষত্রকেই অশুভ নক্ষত্র বলে ভেবে নিয়েছেন। একমাত্র শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেই আসল চন্দ্রমা'কে দেখা সম্ভব।

ক্যাপ্টেন মালোন একটু দম নিয়ে এবার বললেন, প্রায় এক বছর বাদে একদিন আমি পথ চলার সময় এক মোটাসোটা মহিলা পাশের একটা সরু গলি থেকে বেরিয়ে এলেন। তার পিছনে ছিলেন বেঁটেখাটো এক পুরুষ। তাঁর হাতে ছিল শাকসব্জিতে বোঝাই একটা থলে। সে-ই ফ্রান্সিস

কিয়ার্নি। অনেক পাল্টে গেছেন। আমি দাঁড়িয়ে পড়ে তাঁর সঙ্গে করমর্দন করতে করতে জিজ্ঞেস করলাম, পুরনো দোস্ত, আপনার ভাগ্য কেমন চলছে, বলুন?

মুচকি হেসে তিনি বললেন, বুঝতেই তো পারছেন, আমি বিয়ে থা করে সংসার পেতেছি।

মোটাসোটা মহিলাটি নিচু গলায় বললেন, কি ব্যাপার বল তো ফ্রান্সিস? পথের মাঝে দাঁড়িয়ে তুমি যে গল্পই করে চলেছ!

এই যে প্রিয়তমা চন্দ্রমা। এক্ষুণি আসছি। কিয়ার্নি কথাটা বলতে তার পিছন পিছন হাঁটতে লাগল।

আমি প্রশ্ন করলাম, ক্যাপ্টেন, সত্যি করে বলুন তো, আপনি অদৃষ্টে বিশ্বাসী?

ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে ক্যাপ্টেন আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, আপনি কি বিশ্বাস করেন?

এ রিটিভড্ রিফরমেশন

জেলখানার জুতোর কারখানায় জিমি ভ্যালেন্টিন আপন মনে জুতোর ওপরের অংশগুলো সেলাই করে চলেছে। তখন কারারক্ষী সেখানে এল। তাকে অফিসে নিয়ে গেল। গভর্নরের সদ্য স্বাক্ষর করা ক্ষমার ছাড়পত্রটা ওয়ার্ডেন তার হাতে তুলে দিল। চার বছর কারাবাসের নির্দেশের দশমাস সে কাটিয়েছে। তার ধারণা ছিল, এখানে বড় জোর তিনমাস তাকে কাটাতে হবে।

আদেশনামাটা তার হাতে তুলে দিয়ে ওয়ার্ডেন বলল, সকালেই তুমি এখান থেকে খালাস পেয়ে যাচ্ছ। তুমি তো আসলে লোক হিসেবে খারাপ নও। এবার থেকে সিন্দুকটিন্দুক ভাঙা বন্ধ করে সৎপথে বেঁচে থাকার চেষ্টা কর। অন্য দশজনের মত করে নিজেকে তৈরি কর।

আমি সবিস্ময়ে বললাম, 'একী বলছেন! আমি তো কোনদিনই সিন্দুক ভাঙ্গি নি।

আরে তুমি তো ভাঙো নি বটে। কিন্তু সে স্প্রিং ফিল্ড-এর কেলেঙ্কারীর দায়ে তোমাকে এখানে চালান দেওয়া কেন। সমাজের কোন নামকরা মানুষকে এর সঙ্গে জড়িয়ে ফেলার আশঙ্কাতেই কি 'এলবি' প্রমাণ করতে অনাগ্রহী হয়েছিলে? অথবা এটা কি সে অসৎ বুড়ো জুরিটার কম্ম? তোমাদের মত নির্দোষ নিষ্কলঙ্ক কয়েদীদের বেলায় সর্বদা এ দুটোর মধ্যে একটা ব্যাপারই তো ঘটে হে।

আমি? স্প্রিংফিল্ড-এ আমি বাস করেছি! কই এরকম ঘটনা তো আমার জীবনে কোনদিনই ঘটে নি। জিমি নিতান্ত ভালমানুষের মতই কথাটা ছুঁড়ে দিল।

ক্রোনিন, একে বাইরে যাবার পোশাক পরিয়ে তৈরি করে দাও। ওয়ার্ডেন বলল।

ক্রোনি এগিয়ে এলে ওয়ার্ডেন এবার বলল, আর শোন, সকাল সাতটায় এর হাত কড়া খুলে দেবে। আর এ যেন ষাঁড়ের খোঁয়াড়েই আসে। ভ্যালেন্টিন, আমার পরামর্শটা ভেবে দেখার চেষ্টা কোরো, কেমন?

পরদিন সকাল সোয়া সাতটায় সরকারের দেওয়া ছাড়া পাওয়া বাধ্যতামূলক অতিথিদের পোশাক পরে জিমি ভ্যালেন্টাইন ওয়ার্ডেনের অফিসে এল।

জেলখানার করণিক একটা রেলের টিকিট আর পাঁচ ডলারের একটা বিল তুলে দিল। আইনের আশা যে, এ মূলধন দিয়েই সে আবার নিজেকে সুনাগরিক তৈরি করতে পারবে।

ওয়ার্ডেন তার খাতায় লিখে রাখল, 'ভ্যালেন্টিন, ৯৭৬২-কে গভর্নর মার্জনা করেছেন।

জেমস ভ্যালেন্টিন ওয়ার্ডেনের ঘর থেকে বেরিয়ে পথে নামল। হাঁটতে হাঁটতে পথের বাঁকে পৌঁছে সে একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকল। সেখানে মুক্তির আনন্দ উপভোগ করল ঝলসানো মুরগির মাংস আর মদ দিয়ে। তারপর একটা ভাল চুরুট কিনে টানতে টানতে ডিপোর দিকে এগিয়ে চলল। স্টেশনের দরজায় একটা অন্ধকে বসে থাকতে দেখে তার টুপির ভেতরে একটা সিকি ছুঁড়ে দিয়ে সে ট্রেনে চেপে বসল।

তিন ঘণ্টা পরে ভ্যালেন্টিন ছোট্ট একটা স্টেশনে নামল। স্টেশন থেকে বেরিয়েই কোল এক

মাইক ডোলান-এর কাফেতে গিয়ে ঢুকল।

বারের ওদিকে মাইককে সে একাই পেয়ে গেল। ভ্যালেন্টিনকে দেখে মাইক দুঃখ প্রকাশ করে বলল, ব্যবস্থাটা আরও আগে করা দরকার ছিল, মানছি। কিন্তু পারিনি। স্প্রিংফিল্ড থেকে আগেই প্রতিবাদটা পেয়েছিলাম। কিন্তু গভর্নর ধরতে গেলে বেঁকেই বসেছিলেন। যাক, ভাল আছ?

ভ্যালেন্টিন বলল, 'ভাল, খুব ভাল আছি। আমার চাবিটা কোথায় দাও।

মাইক-এর কাছ থেকে চাবিটা নিয়ে সে ওপরে উঠে পিছন দিককার একটা ঘর খুলল। ঘরে জিনিসপত্র ঠিক ঠাকই আছে। ডাক সাইটে গোয়েন্দা তার বেন প্রাইস-এর কলারটা চেপে ধরার সময় যে বোতামটা ছিঁড়ে মেঝেতে পড়ে গিয়েছিল সেটা এখনও সেখানেই পড়ে আছে।

সে দেয়ালের ভেতর থেকে ভাঁজ করা একটা বিছানা বের করে কাঠটাকে দেয়ালের ভেতরে ঠেলে দিয়ে একটা ধূলো জড়ানো স্যুটকেস টেনে বের করল। তার ডালা খুলে প্রাচ্যের সবচেয়ে সেরা চুরির সরঞ্জামগুলোর দিকে সে অপলক ও সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। সেরা ইস্পাতের তৈরি সম্পূর্ণ সেটটাই আছে, যেমন—ছেনি, বাটালি, তুরপুণ, আগর আর নিজের হাতে তৈরি কটা অস্ত্রপাতি যা তার গর্বের সামগ্রী। তারা জীবিকা নির্বাহের জন্য এমন সব যন্ত্রপাতি কামারকে দিয়ে তৈরি করিয়ে নিয়েছে যার দাম স্বরূপ সে ভ্যালেন্টাইনের কাছ থেকে ন'শ' ডলারের কিছু বেশি নিয়েছিল।

স্যুটকেসটা ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করে সেটাকে হাতে নিয়ে ভ্যালেন্টাইন আধ ঘণ্টার মধ্যেই আবার পথে নামল।

মাইক ডোলান দৌড়ে গিয়ে সহানুভূতির সুরে বলল সঙ্গে কিছু আছে কি?

মাইক-এর কথাটা ঠিক ধরতে না পেরে ভ্যালেন্টিন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলল, সঙ্গে? কি বলতে চাইছ, বুঝছি না। আমি এখন নিউইয়র্কের দুটো নামকরা কোম্পানির প্রতিনিধি।

মাইক তার কথা শুনে খুবই আনন্দিত হল। তাকে ধরে নিয়ে এসে সে আনন্দে এক বোতল শক্তি পানীয় সেল্টজার খাইয়ে দিল।

জেল থেকে ভ্যালেন্টিন, ৯৭৬২-এর মুক্তির এক সপ্তাহ বাদেই ইন্ডিয়ানার রিচমন্ডে সিন্দুক ভেঙে একটা চুরি হয়ে গেল। বহু চেষ্টা চালিয়েও চুরির নায়কের কোন হদিসই মিলল না। কোনরকমে খুবই সামান্য, আটশ' ডলার উদ্ধার করা সম্ভব হল। সপ্তাহ দুই বাদেই আবার বিশেষ ধরনের পেটেন্ট--করা চোর প্রতিরোধক সিন্দুক খুলে পাঁচশ' ডলারের কাছাকাছি কারেন্সি নোট হাফিস হয়ে গেল। কিন্তু ভেতরের রূপো আর সিকিউরিটি বন্ড স্পর্শও করল না। ব্যস, চোরের খোঁজে তোলপাড় শুরু হয়ে গেল।

এবার জেফার্সন শহরের একটা সাবেকি আমলের ব্যাঙ্কের সিন্দুক থেকে পাঁচশ ডলারের ব্যাঙ্ক নোট হাফিস হয়ে গেল। জোর কদমে তদন্ত চালিয়ে সবগুলো সিন্দুক চুরির পদ্ধতির মধ্যে লক্ষ্যণীয় একটা সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া গেল।

রহস্যভেদী বেন প্রাইস চুরির ঘটনাস্থলগুলোতে ঘুরে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মন্তব্য করল, এসবেরই নায়ক একজন, জিম ভ্যালেন্টিন। এ কম্বিনেশন নব-টার দিকে দৃষ্টিপাত করলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। ব্যাপারটা দেখলে মনে হয়, যেন বর্ষাকালে মুলো তোলার মতই কোন কাজ। এমন সূক্ষ্ম কাজ করার যন্ত্রপাতি একমাত্র ভ্যালেন্টিন-এর কাছেই আছে। সে কিছুতেই তুরপুণটাকে একবারের বেশী ঘোরায় না। ভ্যালেন্টিনকেই পাকড়াও করতে হবে। নইলে সে আবারও এ কাজই করে বসবে। স্প্রিংফিল্ড-এর চুরির ব্যাপারে তদন্ত করতে গিয়ে জিমি-র অভ্যাস, কাজের পদ্ধতি বেন পাইস জেনে নিয়েছিল। সে লম্বা লম্বা পায়ে দ্রুত পলায়ন করতে পারে। তার সহকারী নেই, একাই কাজ সারে। আর অভিজাত সমাজের মানুষের সঙ্গে চলতেই সে বেশী পছন্দ করে।

বেন প্রাইস এ সিন্দুক চোরটাকে ধরার জন্য ঘোরাঘুরি করতে লাগল। ফলে অন্য সিন্দুক চোররা নির্বিবাদে তাদের কাজ হাসিল করতে লাগল।

জিমি ভ্যালেন্টিন একদিন তার সুটকেসটা নিয়ে জলদস্যুদের এলাকার রেলপথ থেকে পাঁচ মাইল দূরবর্তী এলমোর স্টেশনে মেলট্রেনের কামরা থেকে নেমে পড়ল। সরু গলিপথ দিয়ে সে

দ্রুত হোটেলের দিকে হাঁটতে লাগল।

'এলমোর ব্যাংক' সাইনবোর্ড ঝোলানো একটা বাড়িতে এক রূপসী তন্বী যুবতী তাকে পাশ কাটিয়ে ঢুকে গল।

ভ্যালেন্টিন যুবতীটার চোখের দিকে মুহূর্তের দিকে তাকিয়েই সে তার নিজের সত্তাকে ভুলে একেবারে বদলে গেল, একেবারে অন্য মানুষে পরিণত হল। যুবতীটা চোখ নামিয়ে নিল। তার চোখ দুটো মুহূর্তে রক্তিম হয়ে উঠল। ভ্যালেন্টিন-এর মত চেহারা, পোশাক পরিচ্ছদ ও আদব কায়দা জানা যুবক এলমোরে কালে ভদ্রে চোখে পড়ে।

একটা ছেলে ব্যাংকের সিঁড়িতে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরঘুর করছে। তাকে দেখেই জিমি কলার ধরে টেনে নামিয়ে এনে এলমোর শহরটা সম্বন্ধে তার প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করতে লাগল। আর মাঝে মাঝে তাকে ঘুষস্বরূপ কিছু ডাইস দিল। সে রূপসী যুবতীটা এক সময় ব্যাংক থেকে বেরিয়ে ভ্যালেন্টিনকে কোন রকম আমল না দিয়ে হিল তোলা জুতোয় গম্ভীর আওয়াজ তুলে নিজের পথে চলে গেল।

ভ্যালেন্টিন সিঁড়ি থেকে নামিয়ে আনা যুবকটাকে জিজ্ঞাসা করল, এ-ই কি মিস পলি সিম্পসন?

না-ত, আন্নাবেল অ্যাডম ওনার নাম। ওর বাবা এ ব্যাংকের মালিক।

ভ্যালেন্টিন যুবতীটার ফেলে যাওয়া পথের দিকে মুহূর্তের জন্য তাকাল।

যুবকটা এবার বলল, আপনি এলমোর শহরে এসেছেন, কোন দরকার আছে বুঝি? আপনার ঘড়ির চেনটা কি সোনার? আমি একটা বুলডগ আনতে চলেছি। আপনার কাছে কি আরও ডাইস আছে?

জিমি হাঁটতে হাঁটতে প্ল্যান্টার্স হোটেলে হাজির হল। সেখানে ম্যানেজারের খাতায় নিজের নাম লেখাল র‍্যাল্‌ফ ডি স্পেন্সার। একটা ঘরভাড়া করে সেখানে আশ্রয় নিল।

ভ্যালেন্টিন করণিককে বলল, দেখুন, এখানে ব্যবসা শুরু করার জন্য একটা ভাল জায়গার খোঁজে এসেছি। এখানে জুতোর কারবার ভাল চলবে ত?

করণিক যুবকটা ভ্যালেন্টিন-এর পোশাক পরিচ্ছদের ওপর বারবার চোখ বুলাতে লাগল। এখানকার যুব সম্প্রদায়ের কাছে সে নিজে ফ্যাসানের প্রতীক বিবেচিত হয়। কিন্তু ভ্যালেন্টিন-এর পোশাক দেখে সে নিজের পোশাকের ত্রুটিগুলো ধরতে পারছে। ভ্যালেন্টিন-এর কাছ থেকে টাই বাধার বিশেষ পদ্ধতিটা শিখে নিতে নিতে সে তাকে মহানন্দে বাঞ্ছিত তথ্যগুলো জানিয়ে দিতে বলল, 'দেখুন, কেবলমাত্র জুতো বিক্রি করে এমন দোকান এখানে একটাও নেই। শুকনো মালপত্রের দোকানেই জুতো বিক্রি হয়। আসলে সব ব্যবসাই এখানে রমরমা। আর এখানকার মানুষগুলো খুবই মিশুকে। আশা করছি, মিঃ স্পেন্সার এখানেই ব্যবসা ফেঁদে থেকে যাবেন।

করণিকের কথায় স্পেন্সার আশান্বিত হল। সে মনস্থির করল, দিন কয়েক এ শহরেই থেকে যাবে।

ভ্যালেন্টিন স্পেন্সার সেজেই এলমোর শহরে থেকে গেল। সত্যি সত্যি সে এখানে একটা জুতোর দোকান খুলে বসল। ক'দিনের মধ্যে ব্যবসা জমে উঠল।

স্পেন্সার ক'দিনের মধ্যেই সেখানকার সমাজে মিশে গেল। সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিতও করে নিল। বন্ধু বান্ধব জুটতেও দেরী হল না। আর অন্তরের বাসনা পূর্ণ করার জন্য প্রয়াসী হল। মিস আন্নাবেল অ্যাডাম্‌স-এর সঙ্গে তার মোলাকাৎ হল। ক্রমেই রূপসী তন্বী যুবতী আন্নাবেল-এর রূপে মুগ্ধ হয়ে গেল।

এক বছর পর দেখা গেল স্পেন্সার সমাজের শ্রদ্ধা অর্জন করেছে, জুতোর কারবারে রীতিমত একজন ধনকুবের বনে গেছে। আন্নাবেল-এর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে স্থির করল দু'সপ্তাহের মধ্যেই তারা বিয়ের পাট মিটিয়ে ফেলবে।

মিঃ অ্যাডাম্‌স মফস্বলের একজন উদ্যোগী ও পরিশ্রমী ব্যাংকার। স্পেন্সারকে সবদিক থেকে তাঁর পছন্দ হল। আন্নাবেল তাকে নিয়ে যেমন গর্বিত ভালও বাসে ঠিক তেমনই।

স্পেন্সার ক্রমে মিঃ অ্যাডামস-এর পরিবারে এবং আন্নাবেল-এর বিবাহিত দিদির বাড়িতে তার

অবাধ গতি। সে যেন উভয় পরিবারেরই আপনজন।

ভ্যালেন্টিন তার পুরনো বন্ধু পলকে একটা চিঠি লিখল। তারপর সেটাকে তার বন্ধুর ঠিকানা লিখে ডাক বাক্সে ফেলে দিয়ে এল। চিঠির বক্তব্য—পরবর্তী বুধবার রাত ন'টায় বন্ধুবর পল যেন লিটল রক-এ সুলিভান-এর বাড়িতে উপস্থিত থাকে। তার ইচ্ছা, ক'টা ছোটখাট ব্যাপারে সে যেন তার সঙ্গে একটা মীমাংসা করে ফেলে। আর তার যন্ত্রপাতির সুটকেসটা বন্ধু পলকে সে উপহারস্বরূপ দান করতে চাচ্ছে। সেগুলো ফেলে পল যে খুবই খুশি হবে তা সে ভালই জানে। এক হাজার ডলার খরচ করলেও তার পক্ষে সেগুলোর ডুপ্লিকেট করে নেওয়া সম্ভব হবে না।

ভ্যালেন্টিন বন্ধুকে এ-ও লিখল, এক বছর আগেই সে পুরনো কাজ কারবার ছেড়ে দিয়েছে। ছোট্ট একটা দোকান খুলে বসেছে। আজ সে সৎপথে জীবন ধারনের উপায় খুঁজে পেয়েছে। আর দু'সপ্তাহের মধ্যেই সে পৃথিবীর সেরা রূপসী যুবতীকে বিয়ে করবে। সে মনে করে এটাই তার একমাত্র কাম্য জীবন, সাদাসিদে জীবন।

সে আরও লিখেছে, লক্ষ্য ডলারের বিনিময়েও সে এবার অন্যের একটা ডলারও ছোঁবে না। বিয়ে পাট মিটে গেলে সে সব কিছু বিক্রি করে পশ্চিমে পাড়ি জমাবে। সেখানে কেউ তার অতীত জীবনের কাদা ঘাটতে যাবে না।

ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে ভ্যালেন্টিন সবশেষে লিখেছে তার ভাবী পত্নী যেন এক ডানা কাটা পরী। সে ভ্যালেন্টিনকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে। অতএব সম্পূর্ণ পৃথিবীর বিনিময়েও সে আর কোন গর্হিত কাজে উৎসাহী হবে না।

চিঠি শেষ করার আগে সে লিখেছে, বন্ধুবর পল যেন অবশ্যই নির্দিষ্ট দিনে খুলি-র বাড়ি উপস্থিত থাকে। কারণ, তার সাথে সে দেখা করতে অত্যুগ্র আগ্রহী। আর যন্ত্রপাতিগুলো সে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। চিঠির শেষে জিমি ভ্যালেন্টিন নিজের নাম স্বাক্ষর করেছে।

ভ্যালেন্টিন-এর চিঠিটা পেয়ে বেন প্রাইস নির্দিষ্ট দিনে একটা বগী গাড়িতে চেপে এলমোর শহরে প্রবেশ করল। শহরের বুকে নীরবে চক্কর মারতে মারতে এক সময় তার বাঞ্ছিত র‍্যালফ ডি স্পেন্সার-এর দেখা পেয়ে গেল।

ভ্যালেন্টিন, তুমি ব্যাংকারের মেয়েকে বিয়ে করতে চলেছ! ভালই তো, আমি কিছুই জানি না! বেন প্রাইস স্বগতোক্তি করল।

ভ্যালেন্টিন পরদিন সকালে মিঃ অ্যাডমস-এর বাড়ি প্রাতরাশ সারল। সে বিয়ে উপলক্ষ্যে আন্নাবেল-এর জন্য কিছু জিনিস কিনতে 'লিটল রক'-এর উদ্দেশ্যে রওনা হল। এলমোর-এ পা দেবার পর সে এবারই প্রথম শহরে চলেছে। নিজের পুরনো বৃত্তি সংক্রান্ত কাজকর্মের সঙ্গে দীর্ঘদিন তার সম্পর্ক নেই। অতএব এখন নির্বিবাদে চলাফেরা করতে পারবে বলেই সে বিশ্বাস করে।

প্রাতরাশ সেরে ভ্যালেন্টিন-এর সঙ্গে পরিবারের সবাই, মিঃ অ্যাডামস আন্নাবেল, ন' আর পাঁচ বছরের দুটো মেয়ে আর আন্নাবেল-এর বিবাহিতা দিদি শহরের উর্ধ্বে রওনা হয়ে গেল। ভ্যালেন্টিন যে হোটেলে আছে তার ধার দিয়ে যাবার সময় গাড়ি দাঁড় করিয়ে তার ঘর থেকে সুটকেসটা নিয়ে এল। সেখান থেকে তারা ব্যাংকে গেল।

ভ্যালেন্টিনও অন্যান্যদের সঙ্গে ব্যাংকে গেল। কারণ, সে মিঃ অ্যাডাম্স-এর ভাবী জামাতা। অতএব সর্বত্র তাঁর অবাধগতি। সে হাতের সুটকেসটা নামিয়ে রাখল। বিয়ের আনন্দে মশগুল আন্নাবেল ভ্যালেন্টিন-এর টুপিটা মাথায় চাপিয়ে সুটকেসটা হাতে নিল। সেটা সামান্য উঁচু করে তুলেই সে বলে উঠল, আরে ভ্যালেন্টিন, সুটকেসটা এত ভারী কেন, বল ত? মনে হচ্ছে, সোনার ইট বোঝাই করে রেখেছ!

স্বাভাবিকের চেয়ে শান্ত স্বরে ভ্যালেন্টিন বলল, তুমি জান না, বেশ কিছু সংখ্যক নিকেল করা সু-হর্ণ আছে। ফেরৎ দিতে নিয়ে যাচ্ছি। ভাবলাম, এগুলো নিয়ে গেলে ভাড়া অনেক বেঁচে যাবে। আমি বড়ই কৃপণ হয়ে পড়েছি, তাই না?

সবেমাত্র একটা সিন্দুক আর ভল্ট এরমোর ব্যাংকে আনা হয়েছে। জায়গা মত বসানোও হয়ে গেছে। এর জন্য মিঃ অ্যাডামস-এর অহঙ্কারে যেন মাটিতে পা পড়ে না। সবাইকে ডেকে ডেকে

দেখান। ভল্টটা ছোট হলেও এর বিশেষত্ব হচ্ছে, এতে নতুন পেটেন্ট নেওয়া দরজা ব্যবহার করা হয়েছে। আর তিনটে ইস্পাতের খিল এমনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যার ফলে একটা হাতল ব্যবহার করে তিনটে খিলই খোলা সম্ভব। আর একটা টাইম লকও তাতে লাগানো হয়েছে।

অ্যাডামস গর্বিতভাবেই ভ্যালেন্টিনকে সঙ্গে নিয়ে ভল্টটার কাছে গেল। আর সেটার খোলা আর বন্ধ করার কৌশলটা তাকে ভালভাবে বুঝিয়ে দিল।

ভ্যালেন্টিন ব্যাপারটা সম্বন্ধে তেমন আগ্রহ দেখাল না। তবে দুটো শিশু মে ও আগাথা অবশ্য চকচকে ধাতু আর মজার ও গুল দেখে খুবই উল্লসিত হল।

সবাই যখন এসব নিয়ে ব্যস্ত তখন বেন প্রাইস ভেতরে ঢুকে অনুসন্ধিৎসু নজরে কি যেন দেখতে লাগল। সে টেলার ক্লার্ককে বলল, কোন দরকারে সে ব্যাংকে আসেনি। পরিচিত একজনের জন্য অপেক্ষা করছে।

অকস্মাৎ মেয়েরা আর্তনাদ করে উঠল। ব্যাপারটা হল বড়দের অজান্তেই ন' বছরের মেয়ে মজা করতে গিয়ে আগাথাকে ভল্টটার ভেতরে ঢুকিয়ে আটকে দিয়েছে। তারপর খিলগুলো লাগিয়ে কম্বিনেশনের বোতামগুলো ঘুরিয়ে দিয়েছে। ঠিক যেমনটা সে মিঃ অ্যাডাম্‌সকে করতে দেখেছিল।

বৃদ্ধ ব্যাংকার অ্যাডাম্‌স ব্যস্ত পায়ে এগিয়ে গিয়ে হাতল ধরে টানাটানি করে প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, হায় ঈশ্বর! দরজাটা যে খোলা যাচ্ছে না! ঘড়িতে চাবি না দিয়েই, কম্বিনেশনও যথাযথ করা হয় নি!

ঘোরতর বিপদ বুঝে আগাথা-র মা বিলাপ পেড়ে কাঁদতে লাগল। ভল্টের ভেতর থেকে অস্পষ্ট ও মৃদু একটা কান্নার স্বর ভেসে আসতে শুনে সব মেয়েরাই হাউ মাউ করে কাঁদতে লাগল।

অ্যাডাম্‌স ধমক দিয়ে সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'লিটল রক তো বহু দূরের ব্যাপার। ধারে কাছে এমন কাউকে পাওয়া যাবে না যে কোনক্রমে দরজাটা খুলে দিতে পারবে? এবার ভ্যালেন্টিন ওরফে স্পেন্সার-এর দিকে তাকিয়ে বলল-এ ব্যাপারে তোমার পরামর্শ কি? আমাদের কী করণীয়? এতটুকু একটা শিশু, বেশীক্ষণ ভল্টের মধ্যে আটকা পড়ে থাকলে দম বন্ধ হয়েই যে মারা যাবে! সবচেয়ে বড় কথা ভয়েই যে তার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে।

আগাথা-র মা উন্মাদিনীর মত বিলাপ পেড়ে কেঁদে অনবরত ভল্টটার গায়ে লাথি মারতে ভিড়ের মধ্য থেকে কে একজন ডিনামাইট ব্যবহার করতে বলল।

আন্নাবেল চোখের তারায় হতাশা ও উৎকণ্ঠার ছাপ এঁকে ভ্যালেন্টিন-এর দিকে তাকাল। সত্যি বলতে কি একটা মেয়ের কাছে তার ভালবাসার পাত্রের অসাধ্য কিছুই থাকতে পার না।

আন্নাবেল তার কাছে কাতর মিনতি রাখল, এ ব্যাপারে তোমার কি কিছুই করার নেই প্রিয়তম। চেষ্টা করে দেখ না যদি কোন সুরাহা করতে পারে।

ভ্যালেন্টিন মুচকি হেসে বলল, 'তোমার কোটের ওই গোলাপটা আমাকে দেবে কি প্রিয়তমা?

আন্নাবেল-এর হাত থেকে গোলাপটা নিয়ে ভেস্টপকেটে রেখে ভ্যালেন্টিন গা থেকে কোটটা খুলে ফেলল। এবার ব্যস্ত হাতে জামার আস্তিন দুটো গুটিয়ে নিল। ব্যস, চোখের পলকে সে বে-পাত্তা হয়ে গেল।

মিনিট খানেকের মধ্যেই সেখানে হাজির হল সিন্দুক চোর ভ্যালেন্টিন।

সে তীব্র স্বরে বলে উঠল, 'ধারে কাছে কেউ-ই থাকবে না। দরজার কাছ থেকে সবাই দূরে সরে যান।

এবার হাতের সুটকেসটা দুম করে টেবিলের ওপরে রেখে সে এক ঝটকায় তার ডালাটা খুলে ফেলল।

সেখানে যে আরও লোকজন আছে এটা তার খেয়ালই নেই। ব্যস্ততার সঙ্গে সুটকেসটার ভেতর থেকে ঝকঝকে চকচকে বিচিত্র সব যন্ত্রপাতি বের করে টেবিলে সাজিয়ে রাখতে লাগল। আর গভীর মনোযোগ সহকারে কাজটা করার জন্য আগেকার অভ্যাস মত সে জোরে জোরে শিস দিতে লাগল।

উপস্থিত সবাই নিশ্চল নিথর পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখতে লাগল। সবার চোখেই বিস্ময়ের ছাপ।

ভ্যালেন্টিন এক মিনিটের মধ্যেই তার সর্বাধিক প্রিয় তূরপুণের ফলাটা ইস্পাতের দরজার মধ্যে অল্প অল্প করে ঢুকিয়ে দিতে লাগল। মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে, নিজের আগেকার চুরির রেকর্ড ভেঙে, খিলগুলো ঠেলে ধাক্কে সরিয়ে দিতে দিতে দরজাটা সপাটে খুলে দিল।

আগাথা সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেও নিরাপদেই আছে। তার মা দৌড়ে গিয়ে এক ঝটকায় তাকে কোলে তুলে নিল।

ভ্যালেন্টিন ঝট করে কোটটা পরে নিয়ে হেঁটে সদর দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যেতে গিয়ে পরিচিত কণ্ঠস্বরের ডাক শুনতে পেল, 'এই যে, বন্ধু ভ্যালেন্টিন।

ভ্যালেন্টিন কণ্ঠস্বরটা শুনতে পেয়েছে ঠিকই। কিন্তু সে দাঁড়াল না। এমন কি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল না পর্যন্ত।

মুহূর্তের মধ্যেই দীর্ঘাকৃতি একজন পুরুষ মূর্তি তার সামনে এসে পথ আগলে দাঁড়াল।

মুখে অদ্ভুত এক হাসির ঝিলিক ফুটিয়ে তুলে ভ্যালেন্টাইন তার দিকে তাকিয়ে বলল। আরে বেন যে! শেষ পর্যন্ত আমাকে ধরে ফেললে! ভাল, চল। কিন্তু এর জন্য তেমন হেরফের হবে বলে তো মনে করছি না।

বেন প্রাইস-এর হঠাৎ মনে পড়ে গেল, ভ্যালেন্টিন তো এখানে স্পেন্সর নামে পরিচিত। তাই সে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, মিঃ স্পেন্সার, আপনি হয়ত আমাকে ভুল বুঝছেন। আমি তো আপনাকে ঠিক চিনে উঠতে পারছি না। বাইরে, পথের ধারে আপনার বগী গাড়িটা দাঁড়িয়ে, ঠিক কিনা?

বেন প্রাইস ঘাড় ঘুরিয়ে পথে নেমে হাঁটতে শুরু করল।

দ্য ফোর্থ ইন সাল্‌ভাডর

শহরটা যখন দেশপ্রেমের হৈ চৈ আর তর্জন গর্জনে উত্তাল হয়ে উঠেছিল তখনই এক গ্রীষ্মের বিকালে বিলি কাসপারিস-এর মুখে গল্পটা শুনেছিলাম।

বিলি আসলে একটা ইউলিসিস, পুচকে শয়তান। সে সব সময় শহরের সর্বত্র চক্কর মেরে বেড়ায়। আগামীকাল সকালে আপনারা যখন ডিম ভেঙে প্রাতরাশের আয়োজন করতে ব্যস্ত থাকবেন তখন সে হয় ওকি চোবি হ্রদের মধ্যবর্তী শহরের বাজারে হৈ হট্টগোল বাঁধাতে নয় তো ঘোড়া কেনা বেচার কাজে মেতে থাকবে।

ছোট্ট একটা গোলাকার টেবিলে আমরা মুখোমুখি বসে গল্প করছিলাম। আর আমাদের উভয়ের মাঝখানে ছিল বড় বড় বরফের টুকরো ডোবানো দুটো গ্লাস। আর একটা নকল তালগাছ মাথার ওপরে শোভা পাচ্ছিল। এ দৃশ্যটা দেখে ঠিক একই রকম অন্য আর একটা দৃশ্যের কথা তার মনে পড়ে গেল।

বিলি তার সে কাহিনীটা বলতে আরম্ভ করল, আমার সহায়তায় সালভাডর-এ একটা চতুর্থী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তার কথাই বলছি।

তখন সেখানে আমি একটা বরফের কলের মালিক ছিলাম। তার আগেই আমার কলোরাডোর খনি থেকে যাবতীয় রূপো তুলে আনি। সর্তসাপেক্ষ একটা ছাড় আমাকে দেওয়া হয়। আমি এক নাগাড়ে ছ'মাস বরফ তৈরি করব এরকম শর্তে আমাকে নগদ এক হাজার ডলার জমা রাখতে হবে, এ-ই শর্ত। শর্ত পালন করলে গচ্ছিত অর্থ আমি ফেরৎ পেয়ে যাব। আর শর্ত অমান্য করলে সে অর্থ সরকারের তহবিলে জমা পড়বে।

আমি বরফ তৈরির কাজ শুরু করলে সরকারী পরিদর্শক সকাল বিকাল যেকোন সময় কারখানায় হানা দিতে লাগল যদি বরফ তৈরির কাজ বন্ধ রেখেছি এরকম পরিস্থিতিতে আমাকে ধরতে পারে।

এর মধ্যে এক দুপুরে দেখা গেল। তাপমান যন্ত্রে হিমাঙ্ক ১১°-তে নেমে গেছে। তখন দেড়টা

বাজে। তারিখটা ছিল তেসরা জুলাই।

হঠাৎ দু'জন পরিদর্শক লাল ট্রাউজার গায়ে চরিয়ে আমার বরফের কারখানায় হাজির হল। বেঁটেখাট দু'জন পুরুষ।

বিশেষ কারণ বশত এক নাগাড়ে তিন-তিনটা সপ্তাহ কারখানায় এক পাউন্ড-বরফও তৈরী করা সম্ভব হয়নি। এর পিছনে দুটো কারণ ছিল, সালভাডরের পৌত্তলিকরা যে মাল কিনতে অনাগ্রহী। তাদের বক্তব্য যাতে বরফ রাখে সেটাই নাকি ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ফলে আমার পক্ষে বরফ তৈরি করা সম্ভব হয়নি। কারণ, এতদিনে আমি মনের দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছি।

তখন আমি একটাই ফিকির খুঁজছিলাম, কোনক্রমে গচ্ছিত এক হাজার ডলার বাগিয়ে নিতে পারলে এ দেশ থেকে চম্পট দেব।

শর্তের ছ'মাসের মেয়াদ ফুরোবার কথা, ছ'-ই জুলাই। উপায়ান্তর না দেখে আমার কাছে যতখানি বরফ ছিল তা-ই তাদের দেখিয়ে দিলাম। চৌবাচ্চার কালো ঢাকনাটা ওঠাতেই একশ' পাউন্ডের একটা বরফের টুকরো দেখা গেল। চমৎকার দেখতে।

কাজ সেরে আমি যেই না চৌবাচ্চার ঢাকনাটা নামাতে যাব অমনি সেই কাল শিকারী কুত্তা দুটোর একটা হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে বসে সজোরে আমার শুভ বিশ্বাসের জামিনদার যন্ত্রটায় হাত লাগিয়ে শরীরের সর্বশক্তি নিয়োগ করে এক হেঁচকা টান দিল।

ব্যস, মিনিট দু'-এর মধ্যেই চৌবাচ্চাটা থেকে ঢালাই কাঁচের দৃষ্টিনন্দন সে টুকরোটা টানাটানি করে বের করে মেঝেতে ফেলল। জাহাজ থেকে সেটাকে নামিয়ে আনতে আমাকে ট্যাক থেকে পুরো পঞ্চাশ পাউন্ড খসাতে হয়েছিল।

যে লোকটা এ কাজের নায়ক সে বিদ্রূপাত্মক স্বরে বলতে লাগল, বরফটা ঠাণ্ডা? খুবই গরম দেখছি! সেনিওর, আসলে আজকের দিনটা যে আসলে খুবই গরম। বাইরে বের করলে হয়ত ঠাণ্ডা হয়ে যেতে পারে।

আমি বেশ একটু রুক্ষ স্বরেই তার অপমান চাতুরির জবাব দিতে গিয়ে বলে উঠলাম, হ্যাঁ, ঠাণ্ডা হতে পারে। হয়ত কেউ বলবে, আপনাদের ট্রাউজারের বসার জায়গাটা নীলচে, কিন্তু আমার মতে তা লাল। বাপ্‌ধন, যেখানে সেখানে হাত-পা ছোঁড়ার মজাটা টের পাইয়ে দিচ্ছি। ব্যস, সে মুহূর্তেই বুটের দু' গুঁতোয় দু'জনকেই দরজা দিয়ে বাইরে বের করে দিলাম।

এবার আমার অসম্মানের কারণ ওই কাঁচের টুকরোটাকে ঠাণ্ডা করার জন্য প্রয়াস চালাতে লাগলাম।

তখনই ভর দুপুরের রোদের মধ্যেই গোলাপ কাঠ ও রবারে আগ্রহী ম্যাক্সিমিলিয়ন জোন্স সেখানে এল। আমেরিকান। ধবধবে সাদা পোশাক পরিহিত।

সে ঘরে ঢুকতেই আমি বললাম, 'এই যে মহান কলম্বাস!

আমার মেজাজ তখন পঞ্চমে চড়েছিল। এবার বললাম, তোমার আগ্রহটা আমার জানাই আছে ট্রেনের যাত্রী জনি আম্নিগার ও বিধবার যে গল্পটা তুমি আরও একবার শোনাতে চাইছ, ঠিক কি না? আরে, সে গল্পটা তো এক মাসের মধ্যে ন'বার আমাকে শুনিয়েছ হে।

কপালের চামড়ায় ভাঁজ একে সবিস্ময়ে জোন্স বলে উঠল, বুঝেছি, গরমে তোমার মাথাটা বিগড়েছে। বিলি বেচারিকে ছারপোকায় ধরেছে দেখছি।

আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে জোন্স আমার পরিচারককে ডাকল, সুচাচো! সুচাচো!

সে আসামাত্র জোন্স তাকে বলল, তুমি ট্রাউজারটা গায়ে চাপিয়ে এক দৌড়ে ডাক্তারের কাছে যাও।

আমি বললাম, ম্যাক্সিমিলিয়ন, চেয়ারটা টেনে বসে পড়। তুমি যেটা দেখতে পাচ্ছ এটা আসলে আদৌ বরফ নয়। আর এটার ওপারে যে বসে সে-ও কিন্তু মোটেই বিকৃত মস্তিষ্ক নয়। সবেমাত্র এক হাজার ডলার খোয়া যাওয়ার শোকে এমন এক নির্বাসিত ব্যক্তি যার প্রাণটা দেশের জন্য হাহাকার করছে। এবার বিধবাটাকে জনি গোড়াতেই কি বলল? আরও একটাবার আমি সেটা শুনতে আগ্রহী। ম্যাক্সিমিলিয়ন, আমার কথায় যেন ক্ষুব্ধ হোয়ো না।

ম্যাক্সিমিলিয়ন জোন্স আর আমি মুখোমুখি বসে গল্প জুড়ে দিলাম। দেশের জন্য আমাদের

উভয়েরই মন দেশের জন্য কেঁদে উঠেছিল। তাই অন্তরের অন্তঃস্থলে দেশভক্তি আর আকর্ষণ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল।

আমি সেখানে অবস্থানকালে মদের বোতলের প্রতি অস্বাভাবিক আকর্ষণের জন্য ধনকুবের আমি পথের ভিখারী বনে গেলাম। এখন অবশ্য আমার মাথার ওপর থেকে দুঃসময়ে মেঘ কেটে গেছে। আমি পৃথিবীর বৃহত্তম দেশের মুকুটহীন সম্রাট হতে চাইছি।

আর ম্যাক্সিমিলিয়ন তার মনের যত রাগ ঢালতে লাগল বিশেষ একটা সম্প্রদায় পরিচালিত রাজ্য শাসনব্যবস্থা আর লাল ট্রাউজার ও ক্যালিকোর জুতা ব্যবহারকারী সর্ব শক্তির আধার রাজাদের উদ্দেশ্যে।

আর আমরা প্রচার করে দিলাম, সালভাডোর-এ চৌঠা জুলাই আড়ম্বরের সঙ্গে উদযাপন করা হবে। ম্যাক্সিমিলিয়ন বা আমি কেউ-ই এতখানি ঝিমিয়ে পড়িনি যে, দেশের সম্মানার্থে এটুকু করতে কুণ্ঠিত হব।

সে মুহূর্তেই একজন স্থানীয় বাসিন্দা কারখানায় ঢুকল। জেনারেল মেরি এস্পেরাঞ্জা তার নাম। সে আমার ও জোন্স-এর বন্ধু। রাজনীতি আর বর্ণের ব্যাপার স্যাপারের সঙ্গে জড়িত। শিষ্টতা আর বিশেষ ধরনের বুদ্ধির আধারও বটে। চিকিৎসা বিদ্যা পড়ার তাগিদে দু'বছর ফিলাডেলফিয়াতে কাটিয়েছিল। তখনই সে দ্বিতীয় গুণটা রপ্ত করে নেয় আর প্রথমটাও আঁকড়ে রেখেছে। সবসময় তাস নিয়ে পড়ে থাকলেও সালভাডরের অধিবাসীদের কাছে সে মোটেই আতঙ্কের কারণ ছিল না।

মেরি এস্পেরাঞ্জা আমাদের সঙ্গে যোগ দিল। তাকেও একটা মদের বোতল দিলাম। সে বলল, বন্ধু সেনিওরদ্বয়, আগামীকাল সুপ্তি ও স্বাধীনতার পবিত্র দিন। সে দিন সালভাডরবাসী ও আমেরিকাবাসী উভয়ের মনেই সমানভাবে গ্রহণযোগ্য। তোমাদের দেশের ইতিকথা আর তোমাদের মহান ওয়াশিংটনের কথা আমি জ্ঞাত আছি।

আমি আর জোন্স ভাবলাম, কবে 'চতুর্থ' আসবে সেটা মেরি ঠিক মনে করে রেখেছে। জেনে আমাদেরও খুব আনন্দ হল। এক সময় ইংল্যান্ডের সঙ্গে আমাদেরকে যে বেঁধেছিল সে কথা ফিলাডেলফিয়াতেই অবস্থানকালেই হয়ত সে জানতে পেরেছিল।

ম্যাক্সিমিলিয়ন আর আমি প্রায় সমস্বরেই বললাম, এটা আগে থেকেই আমাদের জানা ছিল। তুমি আসার আগে আমরা ওই ব্যাপারটা নিয়েই আলোচনা করছিলাম। তুমি নিঃসন্দেহে বলতে পার যে, আগামীকাল হৈ চৈ শুরু হয়ে যাবে। আমরা সংখ্যায় খুবই কম, কিন্তু আকাশটাই হয়ত বা—'

আমাদের কথাটা শেষ করতে না দিয়েই মেরি এস্পেরাঞ্জা বলতে লাগল, আমিও সাহায্যে নেমে পড়ব। আমিও মুক্তির সমর্থক। আমরা ওই দিনটাকে স্মরণীয় করে রাখতে আগ্রহী।

ম্যাক্সিমিলিয়ন বলল, আগামীকাল আমরা আমেরিকানরা হুইস্কি চাই আর তোমাদের দরকার স্কচ স্মোক। জোলো কোন মদ মোটেই চলবে না। রাষ্ট্রদূতের পতাকাটা ধার হিসেবে আমরা চেয়ে নেব। বিলফিঙ্গার ভাষণ দেবে। আর আমরা শহরের বুকে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করব।

আতস বাজি কিছু পুড়লেও আমরা দোকানের সব কার্তুজ বন্দুকের জন্য কিনে নেব। আমি ডেনভার থেকে একটা দু'-ঘরা কিনেছিলাম। আমি বললাম।

মেরি এস্পেরাঞ্জো বলল, এখানে একটা কামান আছে। বড়সড় কামান। সেটা থেকে দমাদম্ গোলা ছোড়া হবে। আর তিনশ' রাইফেলধারী গুলি ছুড়বে।

ম্যাক্সিমিলিয়ন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, জেনারেল, এটাকে আমরা একটা সম্মিলিত আন্তর্জাতিক উৎসবে পরিণত করে তুলব। তুমি একজন বড়মাপের রাজপুরুষকে জোগাড় করার ব্যবস্থা কর।

আমি তরবারি সাক্ষী রেখে বলছি, মুক্তির স্বার্থে যেসব বীর জমায়েত হবে তাদের সবার আগে ঘোড়ার পিঠে চড়ে আমি যাব।

ম্যাক্সিমিলিয়ন আর আমি এক সঙ্গে বলে উঠলাম, 'তুমি তো একটা কাজ করতে পার, সেনাপতির সঙ্গে দেখা করে বল যে, আমরা জাঁকজমকের সঙ্গেই উৎসবটা পালন করতে চাচ্ছি। তিনি যেন ওই বিশেষ দিনের জন্য অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইনটাকে একটু শিথিল করে দেন। সৈন্যরা

আমাদের আনন্দ স্ফূর্তিতে বাধা দিলে তাদের মারধোর করে জেলে যাওয়ার ইচ্ছা আমাদের আদৌ নেই, বুঝতে পেরেছ?

আরে তিনি তো আমাদের দলেরই। তার সাহায্য সহযোগিতা থেকে আমরা বঞ্চিত হব না। মেরি এস্পেরাঞ্জা বলল।

ব্যস, সেদিন বিকেলেই যাবতীয় ব্যবস্থাদি সেরে ফেললাম। দীর্ঘদিন যাবৎ প্রচলিত চতুর্থ দিবসের উৎসব জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হবে, আর ভোজের ব্যবস্থা থাকবে শুনে শহরবাসী তো আনন্দে রীতিমত নাচানাচি শুরু করে দিল।

সেখানে আমরা ছ'জন ছিলাম, মার্টিন ডিলার্ড কফি চাষী বিল ফিঙ্গার বৃদ্ধ ; হেনরি বার্নেস রেলওয়ে কর্মী, জেরি ভোজসভার দায়িত্বশীল কর্মী, জন্সি আর আমি। তখন স্টেরেট নামধারী একজন ইংরেজও শহরে উপস্থিত ছিলেন। পতঙ্গদের গৃহনির্মাণ শিল্প সম্বন্ধে একটা বই লেখার তাগিদে তিনি শহরে এসেছিলেন। তারই নিজের দেশ সম্বন্ধে অনুষ্ঠিতব্য সভায় একজন ইংরেজকে আমন্ত্রণ জানাতে আমরা সঙ্কোচ বোধ করতে লাগলাম। তবে তাঁর প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা-বশত আমাদের ঝুঁকিটা নিতেই হল।

আমরা স্টেরেট-এর বাসায় হাজির হলাম। জোন্স তাঁর কাছে সবিনয় নিবেদন রাখল, মাননীয় ইংলিশম্যান, ছারপোকার বাস নির্মাণ কৌশল নিয়ে আপনার লেখালেখির কাজে একটু বিঘ্ন ঘটাতে আমাদের আসতেই হল। আমরা আগামীকাল 'চতুর্থ দিবস'-এর উৎসব পালন করতে চলেছি। আমাদের সঙ্গে মিলেমিশে আনন্দ স্ফূর্তি আর পানাহারের উদার মানসিকতা যদি আপনার থাকে তবে সে অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি আমাদের আনন্দ বর্ধন করবে।

চশমাটাকে নাকের ডগা থেকে সামান্য তুলে নিয়ে স্টেরেট বললেন আমি উৎসবে যোগ দিতে উৎসাহী কিনা এ কথাটা জানতে আপনারা যে উৎসাহী হয়েছেন তাতে আমি খুবই খুশি হয়েছি। আপনাদের ভাবা উচিত ছিল যে, না ডাকলেও আমি উপস্থিত হতাম। স্বদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে নয়, সমৃদ্ধশালী একটা দেশের আনন্দ উৎসবের অংশীদার হবার জন্যই আবার অংশগ্রহণ করা দরকার মনে করছি।

চতুর্থ দিবস-এর অর্থাৎ উৎসবের দিন ভোরে আমার বরপ কলের ঘরে চোখ মেলে তাকাতেই আমার বুকের ভেতরে ছ্যাৎ করে উঠল। ঘরটার চারদিকে চোখ ফেরাতেই আমার সর্বস্ব সম্পত্তির ধ্বংসাবশেষ এক এক করে চোখে পড়তে লাগল। মেজাজটা বিগড়ে গেল। জানালা দিয়ে তাকাতেই রাষ্ট্রদূতের বাড়ির মাথার উড়ন্ত ছেঁড়াফাঁটা তারকা ও ডোরাকাটা পতাকাটা চোখে পড়ল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমি স্বগতোক্তি করলাম, বিলি কাস্‌পারিস, তোমরা সবাই আহাম্মকের শিরোমণি। এভাবে 'চতুর্থ দিবস উৎসব' পালন নিতান্তই অর্থহীন। তোমার ব্যবসা শিকেয় উঠেছে। তোমার হাজার হাজার ডলার দুর্নীতি পরায়ণ সরকারের তহবিলে জমা পড়েছে। মাত্র পঞ্চাশটা চিলি ডলার তোমার সম্বল। কাল রাত্রে শোবার সময় তার দাম ছিল ছেচল্লিশ সেন্ট, আর তার দাম ক্রমেই নিম্নগামী হচ্ছে। আজ ওই পতাকা নিয়ে দাপাদাপি করে শেষ সেন্টটাও তুমি উড়িয়ে দেবে। কাল থেকে তোমার কেবল কলা খেয়ে দিন কাটাতে হবে আর বন্ধুদের ঘাড় ভেঙে মদ খাবে।

আবার চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলতে লাগল, ওই তারকা আর ডোরাকাটা পতাকা তোমার কোন স্বার্থ সিদ্ধি করেছে। কি পেয়েছ ওটার কাছ থেকে? ওই পতাকার ছায়ায় যতদিন ছিলে ততদিন হাড় ভাঙা পারিশ্রমের মাধ্যমেই তোমায় প্রাপ্য আদায় করেছ।

ঠিক সে মুহূর্তে নিজেকে আমার একটা নীলের গাছ বলেই মনে হতে লাগল। তারপর গায়ে পোশাক আর কোমরে অস্ত্রশস্ত্র ঝুলিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়লে একটু যেন স্বস্তি পেলাম। তারপর জনতার মিছিলে সামিল হয়ে গেলে যেন আত্মপ্রত্যয় তখন আবার আমি স্বগতোক্তি করতে লাগলাম, বিলি কাস্‌পারিস, আজ সকালে তো তুমি পনেরটা ডলার আর একটা দেশের সর্বেসর্বা। ডলারগুলো খরচ করে ফেল। আর সে সঙ্গে এক আমেরিকানের মতই স্বাধীনতা দিবসে শহরটাকে একেবারে চাঙা করে তোল।

আমার আজ মনে আছে, প্রথা অনুযায়ীই আমরা দিনটাকে শুরু করেছিলাম। আমরা ছ'জন পথ চলতে লাগলাম। কারণ, স্টেরেট আমাদের আগে আগে হেঁটে চলেছেন। আমরা যুক্তরাষ্ট্রের গৌরব কথা, প্রধানের বাণী আর পৃথিবীর অন্য সব দেশকে দাবিয়ে রাখার ও মুছে দেবার দুর্ধর্ষ ক্ষমতার কথা ধ্বনির মাধ্যমে আকাশ বাতাস মুখরিত করতে লাগলাম। ম্যাক্সিমিলিয়ন-এর আশা, আমাদের এক সময়ের শত্রু মিঃ স্টেরেট আমাদের এ উৎসাহ উদ্দীপনা অপরাধ নেবেন না!

হাতের বোতলটা নামিয়ে রেখে ম্যাক্সিমিলিয়ন স্টেরেট-এর সঙ্গে করমর্দন সারতে সারতে বলল, ব্যাপারটা যখন দুই শ্বেতাঙ্গের তখন ব্যক্তিগত ক্ষোভ থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। প্যাট্রিক হেনরি, ব্যাংকার ও ওয়ালডর্ফ এস্টর এবং ওরকম যে কোন অন্যায় আচরণ আমাদের দু'জাতির মধ্যে থেকে থাকুক, তা মার্জনা করে দেবেন মিঃ স্টেরেট।

স্টেরেট একটু গলা ছেড়ে বললেন, আনন্দ উল্লাসকারী বন্ধুগণ, মহারাণীর পক্ষ থেকে আপনাদের বলছি, সব কিছুর সঙ্গে একটু নুনের ছিঁটা দিয়ে নিন, আমেরিকার পতাকা তলে শান্তি লঙঘনকারীদের অতিথি হওয়াটাকে আমি বিশেষ সম্মানজনক মনে করি।

বৃদ্ধ বিলফিঙ্গার ভাষার কেরামতি দেখিয়ে মাঝে মাঝেই ভাষণ দিতে লাগলেন।

হৈচৈ মাতামাতির পরিমাণ ক্রমে বাড়তেই লাগল। এমন সময় ভিড়ের মাঝখান দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে সেখানে হাজির হলেন মেরি এস্পেরাঞ্জা ডিঙ্গো, আর পিছন পিছন এল কালো জামা পরিহিত, খালি পায়ে দশফুট লম্বা বন্দুক হাতে শ' দুই কালো যুবক। জেনারেল মেরি আর তাঁর অনুষ্ঠানে যোগদানের ব্যাপারটা ম্যাক্সমিলিয়ন আর আমি উভয়েই ভুলেই গিয়েছিলাম। জেনারেলকে দেখামাত্র আমরা ধ্বনি দিতে লাগলাম।

আমাদের সঙ্গে করমর্দন সেরে জেনারেল মেরি এস্পেরাঞ্জা হাতের তরবারিটাকে বিশেষ ভঙ্গিতে নাচাতে লাগলেন।

ম্যাক্সিমিলিয়ন তখন সোল্লাসে জেনারেলকে পানাহারের জন্য আমন্ত্রণ জানাল।

জেনারেল মেরি সসম্মানে তার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন। তারপর তিনি মুক্ত মানুষদের দীর্ঘজীবন কামনা করে ধ্বনি দিলেন।

স্টেরেট অতিথিদের পানাহারের ব্যবস্থা করলেন, আমন্ত্রণ জানালেন। আমরা কিন্তু স্টেরেট-এর আতিথেয়তা থেকে বাদ পড়লাম। কারণ, ঠিক সে মুহূর্তেই মাত্র কয়েক স্কোয়ার দূরে গুলি ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু হয়ে গেল। ব্যাপারটা সম্বন্ধে ধারণা নেবার জন্য জেনারেল মেরি এস্পেরাঞ্জা গণ্ডগোলের জায়গাটার উদ্দেশ্যে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন, তার সৈন্যরাও তাঁর পিছন পিছন ছুটল।

একটু বাদেই শব্দের প্রকৃতি লক্ষ্য করে বুঝলাম, জেনারেল এস্পেরাঞ্জার সৈন্যরা পাল্টা জবাব দিতে শুরু করেছে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই শহরের বিভিন্ন জায়গায় গুলি চালাচালি শুরু হয়ে গেছে। তারপরই শোনা গেল কামানের গুরুগম্ভীর শব্দ। মনে হল মরা সালভাডরকেই আমরা জাগিয়ে তুলতে পেরেছি। গর্বে আমাদের বুক এত উঁচু হয়ে গেল। মনে মনে হলেও স্বীকার করতেই হল, জেনারেল মেরি এস্পেরাঞ্জা-র কাছে আমরা কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ।

স্টেরেট শহরের বুকে বসে মাংসের হাড় চুষতে ব্যস্ত হলে আচমকা একটা গুলি উড়ে এসে তার সে হাড়টাকে উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল।

আমি তাঁকে প্রবোধ দিতে গিয়ে বললাম, ব্যাপারটার জন্য কিছু মনে করবেন না। ধরুন, এটা নিছকই একটা আকস্মিক ঘটনা। চতুর্থ দিবস-এর অনুষ্ঠানে এরকমটা প্রায়ই ঘটে থাকে। আমার ভালই মনে আছে, নিউ ইয়র্কে স্বাধীনতার ঘোষণা-পত্রের প্রথম ঘোষণার দিন শহরের সব কটা হাসপাতালে আর থানায় এস. আর. ও-র বিজ্ঞপ্তি লটকে দিতে হয়।

ঠিক সে মুহূর্তেই জেরি বিকট আর্তনাদ করে এক হাতে তার পায়ের পিছন দিকটা সজোরে চেপে ধরল। মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহে সেখানে একটা বন্দুকের গুলি ঢুকে গেছে। ঠিক তখনই জোর হৈ হল্লোড়ের শব্দ কানে এল। জেনারেল মেরি এস্পেরাঞ্জা শহরের কোণের দিক থেকে তার সাদা ঘোড়াটাকে উল্কার বেগে ছুটিয়ে নিয়ে এলেন। আর বন্দুকের গুলি ছুঁড়তে তার সৈন্যরা তার পিছন পিছন ছুটে এল। তারপর তাদের তাড়া করে এল গায়ে নীল ট্রাউজার আর মাথায় টুপি

পরা উত্তেজিত যোদ্ধারা।

জেনারেল ঘোড়ার পিঠে চেপেই আর্তস্বরে বলতে লাগলেন 'বাঁচাও! বাঁচাও। মুক্তির দোহাই, কে, কোথায় আছ, বাঁচাও, বাঁচাও!,

প্রেসিডেন্টের দেহরক্ষী কোম্পানিরা আজুল উৎসবের কাজে উদ্যোক্তাদের স্যাহায্য করেছিল বলে তারা তার ওপর নির্যাতন চালিয়েছে।

মার্টিন ডিলার্ড বলে উঠল 'চতুর্থ দিবস' উৎসবে যেকোন আমেরিকানের মর্জি মাফিক কাজ করার অধিকার আছে। বৃদ্ধ বিলফিঙ্গার নাগরিকদের উদ্দেশ্যে বলল, মুক্তি লাভের মুহূর্তে আমাদের পূর্বসূরীরা যখন মৃত্যুহীন স্বাধীনতার মুলমন্ত্র রচনা করেছিলেন তখন তাঁরা স্বপ্নেও ভাবেন নি যে, এরকম এক ঝাঁক কাক উৎসবের আনন্দ, উল্লাসকে এমন করে মাটি করে দেবে। আমাদের প্রতিজ্ঞা করতে হবে, প্রতিষ্ঠিত শাসনতন্ত্রকে আমরা যে করেই হোক রক্ষা করব।

তার কথা আমরা সবাই সমর্থন করলাম, একমত হলাম। সে মুহূর্তেই সবাই বন্দুক হাতে নীল সৈন্যদের ওপর আক্রমণ চালাতে শুরু করলাম। আমাদের প্রবল আক্রমণের সামনে দাঁড়াতে না পেরে তারা লেজ গুটিয়ে চম্পট দিল। আমাদের ভোজ সভাটা বানচাল করার রাগে দুঃখে আমরা তাদের সিকি মাইল পর্যন্ত তাড়িয়ে দিয়ে এলাম।

জেনারেল মেরি এস্পেরাঞ্জাও আমাদের সঙ্গে সসৈন্যে লড়াইয়ে যোগদান করলেন। তাদের তাড়িয়ে দিয়ে আমরা ক্লান্তি অপনোদনের জন্য সেখানেই বসে পড়লাম।

মনে আছে ফিরে আসার সময় পথে দেখলাম, কিছু লোক জটলা করছে। সেখানে ইয়া লম্বা একটা লোক, বিলফিঙ্গার নয়, বারান্দায় দাঁড়িয়ে চতুর্থ দিবস-এর উৎসব সম্বন্ধে জোর গলায় ভাষণ দিচ্ছে।

ব্যস, আমার গল্পটা এ পর্যন্তই।

আমার পুরনো বরফের কলটাকে আমি যেখানে ছিলাম ঠিক সে জায়গাটাতেই বসিয়ে দিয়েছিল। কারণ, পরদিন ভোরে চোখ খুলে দেখি, আমি যেখানে ছিলাম ঠিক সে জায়গাটাতেই আছি।

আমার নাম ও ঠিকানাটা মনে পড়তেই আমি ঝট্ করে উঠে সোজাভাবে দাঁড়িয়ে পড়লাম। সবকিছুর অনুসন্ধানে মেতে গেলাম। ব্যস, আমার সর্বশেষ সেন্টটাও খরচ হয়ে গেল। আমি একবারেই কপর্দকশূন্য হয়ে গেলাম।

একটু বাদেই একজন লোককে সঙ্গে করে জেনারেল মেরি এস্পেরাঞ্জা কালো গাড়ি চেপে সেখানে হাজির হলেন।

আমি স্বগতোক্তি করলাম, এবার ব্যাপারটা মাথায় ঢুকল। আপনারা পুলিশের বড় সাহেব আর পুলিশ হাজতের লর্ড চেম্বারলেন। অতিরিক্ত আঘতের দায়ে আপনারা কি বিলি কাসপারস-এর খোঁজে ছুটে এসেছেন? সে হয়ত জেলেই দিন কাটাচ্ছে।

মনে হল, জেনারেল মেরি এস্পেরাঞ্জা মিটিমিটি হাসছেন। আর তার সঙ্গের লোকটা আমার সঙ্গে করমর্দন সেরে আমেরিকান ভাষায় বলতে লাগলেন, 'সেনিওর ক্যাসপারিস, জেনারেলের মুখে আমাদের আদর্শের স্বার্থে আপনার সাহসী সেবার কথা আমি শুনেছি। আমার তরফ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনার এবং অন্য সব সেনিওর আমেরিকানদের সাহসের কাঁধে ভর করেই আমাদের জয়লাভ সম্ভব হয়েছে। ভয়ঙ্কর এ যুদ্ধের কাহিনী ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে এবং অমরত্ব লাভ করবে।

যুদ্ধ? কোন্ যুদ্ধের কথা বলছেন? আমি প্রশ্ন করলাম।

জেনারেল মেরি এস্পেরাঞ্জা বললেন, বিনয়ী সেনিওর কাসপারিসও তো ভয়ঙ্কর সে যুদ্ধে তার বীর বন্ধুদের পরিচালনা করেছিলেন। স্বীকার করতেই হয়, তাদের সাহায্য ছাড়া বিদ্রোহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হত।

তাই বুঝি? কাল একটা বিদ্রোহ সেটা বলতে বাদ দিলেন যে? সেটা তো চতুর্থ—

এ পর্যন্ত বলেই আমি থেমে গেলাম। ভাবলাম, এটাই সঙ্গত হয়েছে।

সঙ্গের লোকটা মুখ খুললেন, 'ভয়ঙ্কর সে সংঘর্ষটা ঘটার পর, প্রেসিডেন্ট বোলানো সরে

পড়তে বাধ্য হলেন। প্রেসিডেন্ট পদে কাসলোকেই বসানো হয়েছে। নতুন ব্যবস্থাপনায় বাণিজ্যিক বিভাগের প্রধান আমাকে নিযুক্ত করা হয়েছে। আমার ফাইলে একটা কাগজ পেয়েছি যাতে উল্লেখ আছে, সেনিওর কাস্‌পারিস আপনার চুক্তি লঙ্ঘন করেছে, বরফ তৈরি করেনি। কথাটা বলেই তিন ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকালেন।

আমি বললাম, আমার বিরুদ্ধে যা লেখা হয়েছে তা সম্পূর্ণ সত্য। তারা আমাকে যে ঠিকই ধরেছিল তা আমার জানাও আছে। তবে এখানেই ব্যাপারটার নিষ্পত্তি ঘটে গেছে।

হাতের একটা দস্তানা খুলে সে কাঁচের মণ্ডটার ওপর হাতটা রেখে তিনি বললেন, এরকম কথা বলবেন না। এবার নীরবে মাথাটা নেড়ে উচ্চারণ করলেন, বরফ।

জেনারেল মেরি এস্পেরাঞ্জা-ও কাঁচে মণ্ডটার ওপর হাত রেখে বললেন বরফ! হ্যাঁ, বরফই বটে। আমি শপথ করে বলছি, বরফ।

সঙ্গের লোকটা বললেন, এ মাসের ছ' তারিখে সেনিওর কাস্‌পারিস ট্রেজারিতে উপস্থিত হল তবে গচ্ছিত এক হাজার ডলার ফেরৎ পেয়ে যাবেন।

জেনারেল মেরি এস্পেরাঞ্জা আর তার সঙ্গী বিদায় নিলেন।

গাড়িটাকে যতক্ষণ বালির ওপর দিয়ে গড়িয়ে যেতে দেখলাম ততক্ষণ আমি বারবার মাথা নোয়াতে লাগলাম। তবে এ অভিবাদন কিন্তু তাদের উদ্দেশ্যে জানালাম না। কারণ, তাদের মাথাব ওপর দিয়ে, রাষ্ট্রদূতের ছাদের ওপর দিয়ে পতাকাটাকে বাতাসে উড়তে দেখতে পাচ্ছিলাম। আমার আন্তরিক অভিবাদন তো তাকেই জানালাম।

ফ্রেন্ডস ইন সান রোজারিও

ঠিক সময়ে, সকাল আটটা বিশ মিনিটে পশ্চিমযাত্রী স্টেশনে দাঁড়াল। একটা লোক কালো চামড়ার মোটা একটা থলে বগলের নিচে ঝুলিয়ে ট্রেনটা থেকে নামল। তারপর লম্বা-লম্বা পায়ে হাঁটতে হাঁটতে শহরের সদর রাস্তায় পড়ল।

সান রোজারিও স্টেশনে আরও বহু যাত্রী নামল। তাদের কেউ ধীর পায়ে খাবার ঘরে গেল, কেউ ঢুকল সিলভার ডলার সেলুনে আবার কেউ বা স্টেশনেই অন্য সব বিশ্রামরত ব্যক্তিদের সঙ্গে গিয়ে বসল।

থলেওয়ালা লোকটা লম্বা লম্বা পায় হাঁটলেও তার মধ্যে কোন অস্থিরতার লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে না। লোকটা বেঁটেখাটো। গাট্টাগোট্টা চেহারা। মাথায় ছোট ছোট চুল। মুখে স্থিরপ্রতিজ্ঞার ছাপ আর চোখে সোনালি ফ্রেমের চেহারা।

আর লোকটার পোশাক পরিচ্ছদ? পাশ্চাত্য ঢঙে তৈরি পোশাক তার গায়ে। শান্ত তার মুখচ্ছবি।

লোকটা তিনি স্কোয়ার পথ পায়ে হেঁটে পাড়ি দিয়ে শহরের ব্যবসায়িক এলাকার কেন্দ্রস্থলে পৌঁছে গেল। সেখান থেকে প্রধান রাস্তাটার বুক চিরে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা এগিয়ে গেছে। এরই জন্য সেখান থেকে সান রোজারিওর ব্যবসা বাণিজ্যের আর জীবিকার একটা প্রাণ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। এককোণে ডাকঘর আর অন্য কোণে রুবেন্‌স্কির কাপড়ের দোকানটা অবস্থান করছে। আর অন্য কোন দুটো আগলে রয়েছে শহরের দুটে ব্যাংক, 'স্টকমেনস ন্যাশনাল' আর 'ফার্স্ট ন্যাশনাল'।

সদ্য আগত লোকটা আরও কয়েক পা এগিয়ে ফার্স্ট ন্যাশনাল ব্যাংক অব সান রোজারিও-র সদর দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন। আর লম্বা লম্বা পায়ে সরাসরি ক্যাশিয়ারের জানলায় গিয়ে দাঁড়ালেন।

ব্যাংকের যাবতীয় বিভাগ খোলা হয় সকাল ন'টায়। কর্মীরা এরই মধ্যে এসে গেছে।

ক্যাশিয়ার নিজের টেবিলে বসে ডাকে আসা চিঠিপত্রগুলো ঘাটাঘাটি করছেন।

কাজের ফাঁকে জানালায় দাঁড়ালে লোকটার দিকে চোখ পড়ল। মুখ তুলে তাঁর দিকে তাকিয়ে

তিনি বললেন, ন'টার আগে ব্যাংকের কাজকর্ম চালু হয় না।

আগন্তুক লোকটা বললেন, 'তা আমার ভালই জানা আছে। কথা বলতে বলতে নিজের একটা কার্ড জানালা দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে বললেন, অনুগ্রহ করে এটা নেবেন কি?

ক্যাশিয়ার হাত বাড়িয়ে কার্ডটা নিয়ে চোখের সামনে ধরলেন—

'জে. এফ. সি. নেটল উইক। ন্যাশনাল ব্যাংক পরীক্ষক।'

ক্যাশিয়ার এবার থতমত খেয়ে বার কয়েক ঢোক গিলে তাকে সাদর অভ্যর্থনাসহ ভেতরে নিয়ে গিয়ে চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বসতে অনুরোধ করল।

ক্যাশিয়ারের নাম এড্‌লিঙ্গার। মাঝ-বয়সী। কাজের ব্যাপারে যথেষ্ট অভিজ্ঞ।

এবার একের পর এক কর্মচারী সঙ্গে রীতিমত গুরুত্ব সহকারে আগন্তুক ব্যাংক পরীক্ষকের পরিচয় করিয়ে দিতে লাগল।

এবার আগন্তুকের দিকে ফিরে বলল, 'স্যার, আমি ভেবেছিলাম স্যাম টার্নারই এখানে আসবেন। গত চার বছর ধরে তো তিনিই এখানকার হিসাবপত্র পরীক্ষা করছেন। তবে আপনাকে আগেই বলে রাখছি, আমাদের কাজকর্ম, মানে হিসাবপত্র ঠিকঠাকই আছে। নগদ টাকা তেমন নেই। তবে বিপদ আপদের জন্য কিছু রাখতেই হয়, তাই না?

হিসাব পরীক্ষক বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বললেন, মিঃ টার্নার, কম্পট্রোলারের নির্দেশেই আমাকে জেলা পরিবর্তন করে এখানে আসতে হল। আমার আগেকার এলাকা ইন্ডিয়ানা আর দক্ষিণ ইউনিয়ন। সেখানকার কাজকর্ম তিনিই দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি এবার বললেন, 'মিঃ এড্‌লিঙ্গার, আমি সবার আগে ক্যাশটা দেখতে চাচ্ছি।

ব্যাংকের গণক পেরিডর্সি ইতিমধ্যেই নগদ অর্থ ঠিক করে রাখার কাজ শুরু করে দিয়েছে। তার ভালই জানা একটা সেন্ট পর্যন্ত হিসাব মিলানোই আছে। অতএব আতঙ্কের কোন কারণই থাকতে পারে না। তবু কেবলমাত্র গণকই নয়, ব্যাংকের প্রতিটা কর্মচারীর হৃতকম্প শুরু হয়ে গেছে।

আসলে আগন্তুকের চোখ মুখে এমন একটা কর্কশ ও রফাহীনতার ভাব লক্ষ্যিত হচ্ছে যে, তার মুখের দিকে চোখ পড়লেই যেন বুকের ভেতরে ধুকপুকানি শুরু হয়ে যায়। এক নজরে দেখলেই মনে হয় লোকটার ভুল হয় না, ভুল এড়িয়ে যাওয়াও তার স্বভাব বিরুদ্ধ।

আগন্তুক মিঃ নেটল্‌উইক প্রথমে নগদ অর্থের হিসাব করতে বসে প্রায় যাদুকরের গতিতে নোটের বাণ্ডিলগুলো গুনে ফেললেন। তারপর বিলগুলো টেনে নিয়ে গুনতে লাগলেন। তার সরু সাদা আঙুলগুলো দক্ষ পিয়ানোবাদকের মত দ্রুত চলতে লাগল।

বিলগুলো পাশে সরিয়ে রেখে তিনি এবার সশব্দে সোনাগুলোকে কাউন্টারের ওপর রাখলেন। সর্বশেষ নিকেল আর ডাইসটা পর্যন্ত তিনি গুনে ফেললেন।

এবার এক কর্মচারী তুলাদণ্ড এনে আগন্তুক নেটলউইক-এর সামনে রাখল। তিনি এবার ভল্টের প্রতিটা রূপোর বস্তা এক এক করে ওজন করলেন।

মাত্রাতিরিক্ত শিষ্টতার সঙ্গে গণক পেরি ডর্সিকে প্রতিটা ক্যাশ মেমোরান্ডা সম্পর্কে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করলেন। তার কাজকর্মের দৃঢ়তার পলে গণক পেরি ডর্সি-র গলা বার বার শুকিয়ে আসতে লাগল।

ব্যাংকের সবাই লক্ষ্য করল আগন্তুক নেটল্‌উইক সেন স্যাম টার্নার-এর চেয়ে একটু বেশিরকমই স্বতন্ত্র প্রকৃতির। তিনি সব কিছু এমন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা, গণনা করা আর নিজে হাতে ওজন করার ধার ধারতেন না। আর মিঃ টার্নার ছিলেন টেক্সাসের অধিবাসী, ব্যাংকের প্রেসিডেন্টের পুরনো ও জিগরি দোস্ত। আর দীর্ঘদিন যাবৎ মিঃ ডর্সি-র সঙ্গে পরিচয়।

আগন্তুক পরীক্ষক নেটল্‌উইক যখন নোটের বাণ্ডিল গুনতে ব্যস্ত তখনই ফার্স্ট ন্যাশনাল-এর প্রেসিডেন্ট মেজর টমাস বি: কিংম্যান পাশের দরজায় উপস্থিত হলেন। তাকে সবাই 'মেজরটম' বলে জানে।

পরীক্ষক নোটগুলোর ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে গণনা করতে ব্যস্ত দেখে মেজরটম তার ছোট্ট কামরাটায় ঢুকে চিঠিপত্রগুলোর ওপর চোখ বুলাতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে ছোট্ট একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। ব্যাপারটা পরীক্ষক নেটল্ডউইক-এর চোখে পড়েনি। তিনি যখন ক্যাশকাউন্টারের কাজে ডুবেছিলেন ঠিক তখনই মিঃ এড্‌লিঙ্গার অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ব্যাংকের বার্তাবাহক রয় উইলসন-এর দিকে তাকিয়ে ঘাড়টাকে দরজার দিকে কাৎ করেছিলেন। বার্তাবাহক তৎক্ষণাৎ ব্যাংকের আদায়ের বইটা বগলে নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা স্টকমেনস ন্যাশনাল ব্যাংকে হাজির হল। সেখানে কর্মীদের উদ্দেশ্যে গলা ছেড়ে বলল, 'ফার্স্ট ব্যাংকে' তো এক নতুন পরীক্ষক ঢুকে সবাইকে নাস্তানাবুদ করতে শুরু করেছে। তোমরাও কি স্বেচ্ছায় হাঁড়িকাঠে গলা দিতে চাচ্ছ নাকি হে? যাক গে, মিঃ এড্‌লিঙ্গার তোমাদের কাছে খবরটা পৌঁছে দেবার জন্য আমাকে গোপনে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

স্টকমেনস ন্যাশনাল ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট নিজের ঘরে বসেই বার্তাবাহক রয়-এর কথাগুলো শুনলেন। নাম তার মিঃ বাকলে। বয়স্ক। তবে শক্ত সামর্থ লোক। রবিবারের পোশাক পরিহিত, চাষীর মত দেখতে সাজপোশাকও।

প্রেসিডেন্ট মিঃ বাকলে বার্তাবাহককে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—

মিঃ কিংম্যান কি ব্যাংকে এসেছেন?

হ্যাঁ স্যার, আমি বেরোবার সময় তিনি গাড়ি করে ব্যাংকে ঢুকলেন।

মিঃ বাকলে এক চিলতে কাগজে খসখস করে কি যেন সব লিখে সেটা বার্তাবাহকের হাতে দিয়ে বললেন, এটা মিঃ কিংম্যান-এর হাতে দেবে। শীঘ্র যাও, পথে যেন দেরী কোরো না।

বার্তাবাহক রয় ব্যস্ত পায়ে ফিরে এসে খামটা মেজর কিংম্যান-এর হাতে দিল।

মেজর কিংম্যান সেটা পড়ে ভেস্টের পকেটে চালান করে দিলেন। কয়েক মুহূর্ত নীরবে ভেবে তিনি ভল্টের দিকে হাঁটতে লাগলেন। সেখান থেকে 'সোনালী হরফে অগ্রিম বাটা কেটে নেওয়া বিল' কথাগুলো লেখা মোটা খাতাটা নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এলেন।

আগন্তুক নেটল্ডউইক ক্যাশ গণনার কাজ সেরে একটা বড় কাগজে সংখ্যাগুলো লিখে ফেলতে লাগলেন। কয়েকটা সংখ্যা লিখেই চশমার ফাঁক দিয়ে মিঃ ডর্সি-র দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। তার দৃষ্টির অর্থ যেন এরকম—আপনি এবারের মত নিরাপদ। তবে—'

বাজখাই গলায় পরীক্ষক নেটল্ডউইক বলে উঠলেন, ক্যাশ মিলেছে, ঠিক আছে।

এবার হিসাব রক্ষকের কাছে গিয়ে লেজার খাতাটা নিয়ে ব্যস্ত হাতে একের পর এক পাতা ওল্টাতে লাগলেন। এক সময় হঠাৎ থমকে গিয়ে তিনি বললেন, কতদিন পর পর আপনি হিসাব মেলান, বলুন ত?

এ-ক-মা-স। থতমত খেয়ে হিসাবরক্ষক জবাব দিল।

হিসাব পরীক্ষক নেটল্ডউইক পাতা ঘাঁটাঘাঁটি করে দেখলেন হিসাব ঠিকই আছে।

হিসাব পরীক্ষক এবার স্থায়ী আমানতের সার্টিফিকেটের হিসাবের বইয়ে পাতা ওল্টাতে লাগলেন। হ্যাঁ, এটাও ঠিকই আছে।

এবার তিনি অতিরিক্ত টাকা তোলার তালিকাটা দেখলেন। তারপর ব্যাংকের অস্বাক্ষরিত বিল দেখলেন। হ্যাঁ, এতেও আপত্তিজনক কিছু পেলেন না।

হিসাব পরীক্ষক নেটল্ডউইক এবার ক্যাশিয়ারকে নিয়ে পড়লেন। তাকে একের পর এক প্রশ্ন করে একেবারে লেজেগোবরে করতে চলেছেন। এবার তিনি লক্ষ্য করলেন, বেশ লম্বা-চওড়া একজন তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। বয়স ষাটবছর বা তার কাছাকাছি। সুস্থ সবল দেহ, মাথাভর্তি পাকা চুল। চোখ দুটো বড়ই তীক্ষ্ণ। ইনি ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট স্বয়ং মেজর কিংম্যান। ক্যাশিয়ার হিসাব পরীক্ষকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিল।

সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির দুটো হার্ত করমর্দন করল। মিঃ কিংম্যান খচ্চর চালনা, গরু চরানো, ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলে জীবন যাপন, সৈনিক বৃত্তি, খনি সন্ধানী, শেরিফের কাজ আর পশুপালন, এরকম আরও বহু কাজের মাধ্যমে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। বর্তমানে তিনি ব্যাংকের প্রেসিডেন্টের পদে বহাল আছেন। তার সহকর্মীরা তাঁর মধ্যে কোন রকম পরিবর্তন দেখতে পায় না।

এক সময় টেকসাসে গরু-মোষের দাম আকাশ ছোঁয়া হয়ে যাওয়ায় তিনি নিজের বরাত

ফিরিয়ে নিতে পেরেছিলেন। তারপর সান রোজারিওতে এসে 'ফার্স্ট ন্যাশনাল ব্যাংক' নামব প্রতিষ্ঠানটা খুলে বসলেন। অচিরেই তার ব্যাংকের উত্তরোত্তর উন্নতি হওয়ায় বর্তমানে এটা খুব সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছে।

মেজর কিংম্যান-এর যেমন গরু মোষ সম্বন্ধে ভাল অভিজ্ঞতা ছিল ঠিক তেমনই বর্তমানে মানুষ খুব ভালই চেনেন। পকেট থেকে ঘড়িটা বের করে একবারটি চোখ বুলিয়ে নিয়ে পরীক্ষব নেটল্‌উইক বললেন, সব মিটে গেছে। এবার আমার শেষ কাজ ধার নেওয়ার খাতাটা পরীক্ষ করে দেখা। আপনার সম্মতি পেলে আমরা এবার সে কাজটা শুরু করব।

হিসাব পরীক্ষক নেটল্‌উইক পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ ব্যস্ত হাতে করলেও খুঁটিয়ে খুঁটিয়েই সবকিছু পরীক্ষা করেছেন। এ ব্যাংকের সবকিছুই ছিমছাম, পরিষ্কার।

এ শহরে আর একটা ব্যাংক আছে। প্রতিটা ব্যাংকের হিসাব পরীক্ষা করার জন্য তিনি দক্ষিণাস্বরূপ পঁচিশ ডলার করে পান।

সে ব্যাংকের হিসাব পরীক্ষার কাজ এমন দ্রুততার সঙ্গে মেটাতে পারলে তিনি এগারোটা পঁয়তাল্লিশের ট্রেনটা ধরতে পারবেন আশা রাখেন।

তার পরবর্তী কাজকর্ম সে অঞ্চলে যেদিকে যাবার ট্রেন সেদিন আর একটামাত্র আছে। নইলে তাঁকে আজকের রাত আর রবিবারটা পশ্চিমের এ ছোট্ট শহরটাতেই কাটানো ছাড়া গতি থাকবে না। সে জন্যই তো তিনি এমন ব্যস্ত হাতে কাজ করে চলেছেন।

মেজর কিংম্যান গম্ভীর স্বরে বললেন, 'স্যার, আমার সঙ্গে আসুন। আমরা উভয়ে একই সঙ্গে যাই। আসলে ঐসব কাগজপত্র সম্বন্ধে আমার চেয়ে ভাল ধারণা অন্য কারোরই নেই।

তারা উভয়ে প্রেসিডেন্টের ঘরে গেলেন। হিসাব পরীক্ষক চেয়ার টেনে বসলেন। পরীক্ষক ব্যস্ত হাতে পাতা উল্টে খুঁটিনাটি নোটগুলো দেখে নিলেন। এবার খুললেন, বড় অঙ্কের ধার কর্জের খাতাটা। যারপরনাই ক্ষীপ্রতার সঙ্গে পাতার পর পাতা উল্টে তিনি চোখ বুলাতে লাগলেন। কেবলমাত্র গুটিকয়েক কাগজ হাতে রেখে বাকী কাগজপত্র একদিকে ঠেলে দিলেন। হাতের কাগজগুলোকে গোছগাছ করে তিনি ছোট্ট একটা ভাষণ দিতে লাগলেন।

স্যার, সত্যি কথা বলতে কি এ বছরের ফসল উৎপাদনের হার খুবই কম। আর গবাদি পশুর ব্যবসার মন্দার ব্যাপারটা বিবেচনা করলে স্বীকার করতেই হয়, আপনার ব্যাংকের অবস্থা খুবই ভাল।

আর করণিকরাও কাজকর্ম যথা সময়ে এবং নিষ্ঠার সঙ্গেই সম্পন্ন করেন বলেই মনে হয়। তবে একটা কাজ সারতে পারলে আপনার ব্যাংকের কাজ মিটে যায়।

দেখা যাচ্ছে, এখানে ছ'টা ঋণপত্র আছে! তার মোট অর্থের পরিমাণ চল্লিশ হাজার পাউন্ড। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে, এর সবই সত্তর হাজার পাউন্ড মূল্যের স্টক, বন্ড ও শেয়ার ইত্যাদির দ্বারা দায়মুক্ত।

কিন্তু দায়পত্রগুলোকে তো ঋণ স্বীকার পত্রের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু সেগুলো তো ঋণ স্বীকার পত্রের সঙ্গেই থাকা উচিত ছিল। আমার মনে হচ্ছে, সেগুলো আপনার ভল্টে বা সিন্দুকে রাখা হয়েছে। আপনি আমাকে সেগুলো পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ করে দিলে কাজটা মিটিয়ে ফেলতে পারি।

মেজর কিংম্যান চোখের তারা দুটো পরীক্ষক নেটলউইক-এর মুখের দিকে নিবদ্ধ রেখেই দৃঢ়কণ্ঠে বললেন 'না, সেগুলো ভল্ট বা সিন্দুক এদের কোনটিতেই নেই। সেগুলো আমার কাছেই আছে। আর সেগুলো এখানে না রাখার জন্য আপনি আমাকেই দায়ী করতে পারেন। সব দায় আমি নিজের ঘাড়ে নিচ্ছি।

মেজরের কথায় পরীক্ষক হঠাৎ একটু থমকে গেলেন। আসলে পরীক্ষক আশাই করতে পারেন নি, শিকারের কাজ আরম্ভ করার অগেই এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ পথ তার সামনে পড়ে যাবে।

সে মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে এক সময় মুখ খুললেন, তাই বুঝি? দেখুন, ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। তাই বলছি কি–

তাঁকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই মেজর বললেন—

আমি তো সব দায়দায়িত্ব নিজের ঘাড়েই নিয়েছি।

তবু যদি একটু খোলসা করে বলেন তবে আমার কাজের সুবিধা হয়।

ব্যাপারটা হচ্ছে, দায়পত্রগুলো আমিই নিয়েছি।

মানে, আপনি নিয়েছেন বলতে—কেন?

আমার এক পুরনো অভিন্ন হৃদয় বন্ধুকে বাঁচাবার জন্য ওগুলো আমাকে নিতে হয়েছে। আমার নিজের প্রয়োজনে নয়। বিপদগ্রস্ত বন্ধুকে বাঁচাবার জন্য ওগুলো না নিয়ে আমার উপায় ছিল না।

পরীক্ষক নীরব চাহনি মেলে মেজরের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলেন, এবার কি বলবেন।

মেজর এবার পরীক্ষককে নিয়ে ব্যাংকের পিছন দিককার একটা ছোট্ট ব্যক্তিগত ঘরে ঢুকলেন। রজাটা বন্ধ করে দিলেন।

ঘরটার ভেতরে আছে একটা বেঞ্চ, একটা টেবিল, ছ'টা চেয়ার, আর দেওয়ালে টাঙানো আছে কটা টেকসাস হরিণের লম্বা-লম্বা শিংওয়ালা মাথা। আর বিপরীত দেওয়ালে মেজরের পুরনো শ্বারোহী সৈনিকের তরবারি ঝুলছে। এটা কোমরে ঝুলিয়ে তিনি এক সময় পিলো দুর্গে শিলোতে য়েছিলেন। তরবারিটা আজও আগের মতই চকচক করছে।

মেজর পরীক্ষক নেটল্‌উইক-এর দিকে একাট চেয়ার ঠেলে দিয়ে তাকে বসতে বললেন। রপর নিজে একটা চেয়ার টেনে জানালার ধারে বসলেন।

জানালা দিয়ে 'স্টকমেনস ন্যাশনাল'-এর সামনের দিকটা আর ডাকঘর দেখা যায়।

চেয়ারে বসার পর মেজর কোন কথা না বলে পরীক্ষক নেটলউইক-এর মুখের দিকে দৃষ্টি বদ্ধ রেখে বসে রইলেন।

পরীক্ষক নেটল্‌উইক-ই প্রথম মুখ খুললেন।

তিনি বলতে আরম্ভ করলেন, আপনার বক্তব্যটা যে খুবই গুরুতর আশা করি আপনি নিজেও া বুঝতে পারছেন?

মেজর একটু নড়েচড়ে বসলেন।

পরীক্ষক বলে চললেন, আমার কর্তব্য আমাকে কোনদিকে ঠেলে দেবে, কোন কাজ করতে াধ্য করবে আশা করি তা আপনি অনুমান করতে পারছেন।

যেমন?

যুক্তরাষ্ট্রের কমিশনারের কাছে আমাকে যেতে হবে। আর—মেজর কিংম্যান একটু ত্তেজিতভাবেই বলে উঠলেন, আরে আমি জানি। আমি জানি বলেই ত—

তাকে মাঝ পথে থামিয়ে দিয়ে পরীক্ষক নেটলউইক কপালেব চামড়ায় ভাঁজ করে বলে ঠলেন, জানেন? মানে, কি জানেন?

আরে মশাই আপনি নিশ্চয়ই আমার সম্বন্ধে এমন কিছু ভাবেন নি যে, আমি জাতীয় ব্যাংকের াইন কানুন আর পরিবর্তিত বিধিবদ্ধ আইনগুলো না জেনেই এত বড় একটা ব্যাংক চালাচ্ছি।

পরীক্ষক জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে মেজর কিংম্যান-এর মুখের দিকে তাকালেন।

মেজর বলে চললেন, কি, আমি আইন কানুন সম্বন্ধে অজ্ঞ এরকম কিছু ভেবেছেন কি? আশা রি অবশ্যই তা ভাবেন নি।

পরীক্ষক আমতা আমতা করে বলে উঠলেন, সে-ত নিশ্চয়! সে-ত নিশ্চয়!

দেখুন, আপনার যা করণীয় তা-ই করুন। আমি আপনার কাছ থেকে কোনরকম অনুগ্রহ ত্যাশা করছি না।

তা আমি ভাবতে যাবই বা কেন, বলুন?

আমি কিন্তু আমার বন্ধুর কথা বলছি। আমি আশা করব, আমার বন্ধুবর বব সম্পর্কে আমার ক্তব্য ধৈর্য ধরে শুনুন। তারপর না হয় আপনার যা কিছু বক্তব্য বলবেন।

পরীক্ষক নেটল্‌উইক একটু নড়েচড়ে চেয়ারে ভাল হয়ে বসলেন। তিনিই ধরেই নিয়েছেন, জ আর ফেরার ট্রেন ধরা যাবে না। অতএব আজ আর সান রোজারিও ছাড়া সম্ভব নয়। পায়ান্তর না দেখে এখানেই কোন হোটেল আশ্রয় নিয়ে রাত্রি বাস করতে হবে।

পরীক্ষক ভাবলেন, কন্ট্রোলোর অব রেভিনিউ-র কাছে একটা জরুরী টেলিগ্রাম করতে হবে।

আর? আর মেজর কিংম্যানকে গ্রেপ্তার করার জন্য গ্রেপ্তারী পরোয়ানা চেয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কমিশনারের কাছে শপথ গ্রহণ করতে হবে। আবার এ-ও হতে পারে, দায়পত্রগুলো হারিয়ে ফেলা বা আত্মসাৎ করার জন্য মেজরের ওপর ব্যাংক বন্ধ করে দেওয়ার হুকুম জারি করতে হবে।

মেজরকে নীরব দেখে পরীক্ষক নেটল্‌উইক তার ভাবনাটাকে আরও সম্প্রসারণ করে চললেন, এবার তিনি ভাবলেন, তিনি এই প্রথমবারই কোন অপরাধমূলক কাজ খুঁজে বের করেন নি।

ইতিপূর্বে তিনি দেখেছেন, মাত্র ছোট্ট একটা ভুলচুকের জন্য ব্যাংকের কর্মীরা নতজানু হয়ে মেয়ে মানুষের মত হাউমাউ করে কেঁদেকেটে একটা সুযোগ প্রার্থনা করেছে। একবার এক ব্যাংকের ক্যাশিয়ার তো নিজেকে সামাল দিতে না পেরে গুলি করে আত্মহত্যা করেছিলেন।

পরীক্ষক নেটল্‌উইক এত কিছুর পরও ভাবলেন, মেজর কিংম্যান যদি তাঁর সঙ্গে এ ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন তবে তাঁর উচিত তাকে সে সুযোগ দেওয়া।

ব্যাংক পরীক্ষক এবার টেবিলের ওপর কনুইটা রেখে আর হাতের তালুর ওপর থুৎনিটা দুইয়ে মেজরের দিক থেকে কোন প্রস্তাব আসে কি না সেজন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন.

ফার্স্ট ন্যাশনাল ব্যাংক-এর প্রেসিডেন্ট মেজর কিংম্যান আড়চোখে ব্যাংক পরীক্ষকের মুখের দিকে মুহূর্তের জন্য তাকালেন।

ব্যাংক পরীক্ষক আগের ভঙ্গিতেই নীরবে বসে রইলেন। মেজর এবার মুখ না খুলে আর পারলেন না। তিনি কিছুটা উপদেশ দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, দেখুন, কোন মানুষ যদি আপনার চল্লিশ বছরের পুরনো বন্ধু হয়ে থাকে আর জলে, আগুনে মাটিতে আর বহু ঝড় ঝাপটায় আপনাদের একই সঙ্গে দিন কেটে থাকে, যখন তার কোন উপকার করার সামর্থ আপনার থেকে থাকে, তখন আপনার মন সেটা করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে, ঠিক কিনা?

দেখুন, যখন আমার দুঃসময় ছিল তখন আমরা বব আর আমি একই সঙ্গে মাঠে মাঠে গরু ভেড়া চরিয়েছি।

ব্যাংক পরীক্ষক অপলক চোখে মেজর কিংম্যান-এর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

মেজর কিংম্যান বলে চললেন, 'তারপরের কথা শুনুন, আমরা দু'জনে একসঙ্গে কালিফোর্নিয়া এবং মেক্সিকোর এরিজোনার বহু জায়গায়, সোনা আর রূপোর খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি।

আর আমরা উভয়েই একষট্টির যুদ্ধে যোগদান করেছিলাম। তবে পৃথক পৃথক সৈন্য বিভাগে। আর দু'জন পাশাপাশি অবস্থান করে আমরা দু'জন ঘোড়া চোরদের সঙ্গে তুমুল লড়াই করেছিলাম।

আর এরিজোনা পর্বতমালার একটা কামরার মধ্যে। কুড়িফুট বরফের নিচে আমরা উভয়ে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিয়ে দিয়েছি।

বিদ্যুৎ ঝলসে উঠতে পারছে না এমন প্রবল বেগে বাতাস বইছে, আমরা একসঙ্গে পাশাপাশি ঘোড়া ছুটিয়ে মাইলের পর মাইল পাড়ি দিয়েছি।

মিঃ নেটল্‌উইক, একটা কথা কি জানেন, আমাদের দু'জনের যখন পুরনো এংকর বার পশু খামারের ঘোড়া দাগানোর ছাউনিতে প্রথম মোলাকাৎ হয়েছিল তারপর থেকে বব আর আমাকে বহু দুঃখ কষ্টের ভেতর দিয়ে পথ চলতে হয়েছে। বহু ঝড় ঝাপটা অগ্রাহ্য করে আমাদের পাহাড় পর্বতে, মাঠে আর খামারে দিন কাটাতে হয়েছে। আর তখনই আমি একাধিকবার উপলব্ধি করেছিলাম যে, দুঃসময়ে পড়লে, পরস্পরকে সাহায্য সহযোগিতা করা একান্ত দরকার।

মিঃ নেটলউইক, আসল ব্যাপারটা কি জানেন? লেনদেন, মানে দেওয়া নেওয়ার খেলা। কথাটা সত্যি কি না আপনিই ভেবে দেখুন, বন্ধুর বিপদে যদি আপনি তার প্রতি সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে না দেন তবে আপনার বিপদে সে এগিয়ে আসবে এটা তো প্রত্যাশাই করতে পারেন না। আর সত্যি কথা বলতে কি, বব এমনই এক মানুষ যে প্রয়োজনের তাগিদে গণ্ডী ছাড়িয়ে আরও অনেক দূর পর্যন্ত যেতে দ্বিধা করে না।

তারপর কি বলছি শুনুন—কুড়ি বছর আগে আমি এ শহরের শেরিফ-এর পদলাভ করি। তখন

আমি বব'কে আমার সহকারীর পদে নিযুক্ত করেছিলাম। তখন গবাদি পশুর বাজার ছিল আকাশ ছোঁয়া আমরা দু'জনে তার ফয়দা তুলতে ভুল করি নি। ব্যাপারটা তারও বছর কয়েক আগেকার। আমার ওপর শেরিফ আর কালেক্টর উভয় কাজের দায়িত্ব বর্তাল। তখন আমার ওপর সেটা খুবই খারাপ ব্যাপার ছিল। আমি বিয়ে করেছি। দুটো ছেলেমেয়েও হয়ে গেছে। তাদের একজনের বয়স ছ' আর দ্বিতীয় জনের চার বছর।

আদালতের গায়েই ভাল একটা বাড়ি পেয়ে গেলাম। কাউন্টিই খরচা খরচা করে সাজিয়ে গুছিয়ে দিয়েছে। আর আমার ভাড়া দেওয়ারও ব্যাপার নেই। ফলে বেশ কিছু অর্থ জমিয়ে ফেলতে আমার অসুবিধে হল না। অফিসের অধিকাংশ কাজ ববকেই করতে হয়।

আমরা উভয়েই বহু দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করে এসেছি। অনেক বিপদ আপদ আমাদের মাথার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। আমরা কেউ-ই কিন্তু এত বিপদের মধ্যেও মনোবল হারিয়ে ফেলিনি।

তারপর আমরা উভয়েই বিয়ে করলাম। রূপসী তন্বী যুবতীকে বউ হিসেবে পেলাম। সুখের সংসার হল। ছেলে মেয়ে পেলাম।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, পুরনো বন্ধুকে সঙ্গী হিসেবে রেখে আমি যাবতীয় সংসার সুখ লাভ করে আমি দিন কাটাতে লাগলাম। বিশ্বাস করুন, দিনগুলো রীতিমত সুখেই কাটতে লাগল।

এক নাগাড়ে দীর্ঘ সময় কথা বলে মেজর থামলেন। তারপর খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন।

ব্যাংক পরীক্ষক নেটল্‌উইক ইতিমধ্যে অবস্থা পাল্টে বসেছেন। ডানহাতের চেটো থেকে চিবুকটা তুলে অন্য হাতের ওপর রেখেছেন। তাঁর চোখের মণি দুটো আগের মতই মেজরের মুখের ওপর স্থির নিবদ্ধ।

মেজর জানালা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে এসে আবার ব্যাংক-পরীক্ষকের দিকে তাকালেন।

আরও কয়েক সেকেন্ড নীরবতার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে তিনি আবার মুখ খুললেন, 'মিঃ নেটলউইক, এক শীতকালের কথা। সে বছর করের টাকা এত দ্রুত ও অধিক পরিমাণে জমতে লাগল যে, এক সপ্তাহের মধ্যে তা ব্যাংকে জমা দেবার জন্য সময়ই করে উঠতে পারলাম না। অনন্যোপায় হয়ে খালি একটা চুরুটের বাক্সে চেকগুলোকে রাখলাম। এতগুলো চেক ছোট্ট একটা বাক্সে রাখাই সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। ফলে চেকগুলোকে বাক্সটার মধ্যে ঠেসেঠেসে রাখতে লাগলাম।

আর ডলারের নোটগুলো? সেগুলোকে একটা বস্তা বোঝাই করে রেখে দিতে লাগলাম। আর নোটের বস্তা আর চুরুটের বাক্সটাকে একটা সিন্দুকে তালাবন্ধ করে শেরিফের অফিসেই একটা ঘরের মধ্যে রেখে দিলাম।

বিশ্বাস করুন, সে সপ্তাহ যে কী ভীষণ খাটুনি গিয়েছিল তা আর বলার নয়। আমি তো প্রায় অসুস্থই হয়ে পড়েছিলাম। আমার স্নায়ুবিক রোগ দেখা দিল। রাতের ঘুম ঘুচে গেল। অধিকাংশ রাত্রেই মাঝ রাত্রির পর বিছানায় শুয়ে নির্ঘুম অবস্থায় কাটাতে হয়েছে। তার ওপর সারাদিনে এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্রাম পেতাম না। ডাক্তার আমার অসুখটার একটা বৈজ্ঞানিক নামকরণও করেছিলেন। তাঁর ব্যবস্থা অনুযায়ী ওষুধ খেতে লাগলাম।

কিন্তু ওষুধে ধরবে কেন, বলুন? চেক আর নগদ অর্থের চিন্তা মাথায় নিয়ে রাত্রে শুতে যেতে হয়। তারপরও সে চিন্তা মাথা থেকে নামত না। এ পরিস্থিতিতে কখনও ঘুম আসতে পারে?

সত্যি কথা বলতে কি, ব্যাপারটা নিয়ে আমার ভাবনার কিছুই ছিল না। সিন্দুকটা ছিল রীতিমত মজবুত! আর সবেচেয়ে বড় কথা, বব ছাড়া অন্য কেউ-ই সেটাকে খোলার কৌশল জানত না। আসলে তালা খোলার কম্বিনেশন না জানলে যত কসরৎ করা যাক না কেন, কারো পক্ষেই সিন্দুকটা খোলা সম্ভব ছিল না।

সেদিনটা ছিল এক শুক্রবার রাত্রি। থলের ভেতরে ছিল নগদ ছ'হাজার পাঁচশ' পাউন্ড।

শনিবার সকালে আমি অন্যদিনের সময়েই অফিসে গেলাম। অফিসে পা দিয়েই সিন্দুকের তালাটা টানাটানি করে পরীক্ষা করে নিলাম। হ্যাঁ, তালাটা বন্ধই আছে বটে। দেখলাম, বব তার

টেবিলে বসে লেখালেখি করছে।

কৌতূহলবশত সিন্দুকটা খুলেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। আরে সর্বনাশ। আমার যাবতীয় টাকা উধাও হয়ে গেছে। গলা ছেড়ে বব'কে ডাকলাম। আর আদালতে প্রতিটা লোককে ডেকে ডাকাতির খবরটা বললাম। বব কিন্তু খবরটা শোনার পরও শান্তই থাকল। খুব বেশী হাহাকার হা-হুতাশ করল না। ব্যাপারটা আমাকে স্তম্ভিত করল।

ডাকাতির পর দু'-দুটো দিন পেরিয়ে গেল। বহুচেষ্টা করেও কোন সূত্রের সন্ধান পেলাম না।

মনে খুবই খটকা লাগল। ধরেই নিলাম। কোন সিন্দুক চোরের দ্বারা কাজটা অবশ্যই হয়নি। কারণ, কম্বিনেশনের সাহায্যে সিন্দুকটাকে অনায়াসেই খোলা সম্ভব হয়েছিল।

চুরির ব্যাপারটা নিয়ে নানাজন নানা কথা বলতে লাগল। এখানে-ওখানে জটলা করে কানাঘুষোও কম হল না। কারণ, এক বিকেলে আমার স্ত্রী এলিস ছেলেমেয়েরা এল। এলিস দীর্ঘসময় মাটির দিকে তাকিয়ে গোমড়া মুখে বসে রইল। তারপর এক সময় প্রচণ্ড আক্রোশে বার বার মাটিতে পা ঠুকতে লাগল। তার চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল।

এক সময় এলিস বিকট আর্তনাদ করে উঠল। 'হতচ্ছাড়া মিথ্যেবাদীর দল! চোখে মুখে মিথ্যে কথা বলে! কিংম্যান, কিংম্যান! তুমি কথাটা শেষ করার আগেই তিনি সম্বিৎ হারিয়ে চেয়ারে এলিয়ে পড়ল। আমি তাকে ধরে না ফেললে হয়ত চেয়ার নিম্নে পড়েই যেত।

চোখে মুখে জলের ঝাপ্‌টা দিয়ে তাকে কিছুক্ষণের মধ্যেই সুস্থ করে তুলতে পারলাম বটে।

সে মাথা তুলে আমার দিকে তাকাল। তারপর সম্পত্তির কথা বলে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল।

আর জ্যাক ও জিল্লা, আমার ছেলে আর মেয়ে আতঙ্কে জড়োসড়ো হয়ে ঘরের একধারে দাঁড়িয়ে কোন রকম চিৎকার চেঁচামেচি না করে মেঝেতে ক্রমাগত জুতো ঠুকতে লাগল। মুহূর্তের মধ্যেই ভীত সন্ত্রস্ত তিতির পাখির মত একে, অন্যকে জড়িয়ে ধরল। সত্যি কথা বলতে কি জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে এ-ই তাদের পদক্ষেপ।

বব তখনও নির্বিকার চিত্তে টেবিলে বসে মাথা গুঁজে কাজ করে চলেছে। তারপর এক সময় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তেমনি নীরবে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

তখন পুরোদমে জুরির বিচার চলছে।

পরদিন সকালে আমার সঙ্গে কোন কথা না বলেই বব তাঁদের সামনে হাজির হল? নিজের দোষ স্বীকার করে বলল, 'হুজুর, চেক আর ডলারগুলো আমিই চুরি করেছি।

ডলারগুলো কোথায় জিজ্ঞেস করলে সে জবাব দিল, পোকার খেলতে গিয়ে সব ডলার খুইয়েছে।

বব-এর স্বীকারোক্তির পনের মিনিটে মধ্যে জুরি আমাকে একটা পরোয়ানা পাঠিয়ে দিল। যে লোকটার সঙ্গে আমি অন্তরঙ্গভাবে মিশেছি, যাকে আমি সবচেয়ে বেশী বিশ্বাস করে সর্বদা পাশাপাশি কাছাকাছি রেখেছি সে লোকটাকে আমাকে গ্রেপ্তার করতে হবে।

হ্যাঁ, অনন্যোপায় হয়েই আমি সে কাজটা করেছিলাম। কিন্তু গ্রেপ্তার নয়, আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলাম। তাকে ডেকে বলেছিলাম, 'শোন বব, আমার বাড়ি আছে, এখানে আছে আমার অফিস, মেইন আছে আর দূরে আছে কালিফোর্নিয়া। আরও দূরে যেতে মন চাইলে আছে ফ্লোরিডা, সবকিছু তোমার সামনে খোলা আছে। পুনরায় আদালত বসার আগে তুমি এখান থেকে যেখানে মন চায় চলে যেতে পার। তোমার যাবতীয় দায়িত্ব আমি নিজের ঘাড়ে নিচ্ছি।

মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে আবার মুখ খোললাম, মনে রেখো, আমি যখনই তোমাকে ডাকব যত শীঘ্র সম্ভব আমার সামনে হাজির হতে হবে, মনে থাকবে?

সাধ্যমত গলা নামিয়ে প্রায় স্বগতোক্তি করার মত স্বরে সে ছোট্ট করে উচ্চারণ করল, অসংখ্য ধন্যবাদ।

তারপর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সে আবার মুখ খুলল, হ্যাঁ, আমিও আশঙ্কা করেছিলাম, তুমি অবশ্যই আমাকে হাজতে ঢোকাবে। আগামী সোমবার আদালত বসবে। মাঝের একটা দিন আমি অফিসের চারদিকে, কাছাকাছিই ঘোরাঘুরি করে কাটিয়ে দিতে চাইছি অবশ্য তোমার যদি

এতে আপত্তি না থাকে। কেবলমাত্র এটুকু অনুগ্রহই তোমার কাছ থেকে আমি প্রত্যাশা করছি। তবে ব্যাপারটাকে তুমি যদি খুব বেশী বলে মনে না কর।

আর একটা অনুরোধ, বাচ্চা দুটোকে যদি আমার কাছ থেকে সরিয়ে না ফেলে দু'-চারবার উঠোনে আসতে আর ঘুরে বেড়াতে দাও তবে আমি একটু স্বস্তি পাব, কথা রাখবে কি?

কেন রাখব না? তারা সর্বদাই স্বাগত, আর তুমিও ঠিক তেমনই। তুমি আগের মতই আমার বাড়িতে আসা-যাওয়া কোরো।

একটু দম নিয়ে মেজর কিংম্যান এবার ব্যাংক পরীক্ষক নেটল্‌উইক-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, মিঃ নেটল্‌উইক, আপনার পক্ষে একই সময়ে চোরের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা সম্ভব নয়, আবার বন্ধুকেও চোর বানাতে পারেন না, ঠিক কিনা?

ব্যাংক পরীক্ষক একই ভঙ্গীতে মুখে কুলুপ এঁটে বসে রইলেন। টু-শব্দটিও করলেন না।

ঠিক সে মুহূর্তে একটা কান ঝালাপালা করা হুইসল কানে এল। একটা ট্রেন ডিপোতে ঢুকছে। বার বার হুইসল দিতে দিতে এগোচ্ছে।

ন্যারো গেজের ছোট ট্রেনটা দক্ষিণ থেকে হেলেদুলে এগোতে এগোতে সান রোজারিওতে থামল।

মেজর কিংম্যান উৎকর্ণ হয়ে এক মুহূর্ত কি যেন শুনলেন। তার ঘড়ির ওপর চোখ বুলালেন। দশটা পঁয়ত্রিশ মিনিট, ট্রেনটা সময় মতই এসেছে।

মেজর আবার মুখ খুললেন, তারপর থেকে বব খবরের কাগজ পড়ে আর সিগারেট ফুকেফুকে অফিসের চারদিকে চক্কর মারতে লাগল। আমার দপ্তরে প্রচুর কাজ জমে যেতে লাগল। উপায়ান্তর না দেখে একজন সহকারী নিয়োগ না করে পারলাম না। এভাবে অচিরেই প্রাথমিক উত্তেজনাটা ক্রমে থিতিয়ে পড়ল।

একদিন বব আমার অফিসে হাজির হল। ঘরে আমি তখন একাই ছিলাম। জরুরী কিছু কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছিলাম। তার মুখের দিকে চোখ পড়তেই তাকে কেমন বড্ড বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল।

সে বার-কয়েক ঢোক গিলে বলল, কিংম্যান, এ কী কঠিন শাস্তি! এ যে দেখছি, উত্তর আমেরিকাতে বাস করার চেয়েও কঠিন সমস্যা। জলাশয় থেকে চল্লিশ মাইল দূরবর্তী আগ্নেয়গিরির মরুভূমির চেয়েও যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার। তবে কথা দিচ্ছি, আমি শেষ অবধি লেগে থাকব।

আর তোমার তো আমার এ স্বভাবটার কথা অজানাও নয়। কিন্তু সামান্যতম আভাষও আমাকে দিতে, ইঙ্গিতেও যদি আমাকে বুঝিয়ে দিতে, বব, আমি বুঝতে পেরে গেছি, ব্যস, তবেই তো পুরো ব্যাপারটা সহজ, জলের মত হয়ে যেত, তাই নয় কি?

আমি যারপরনাই স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললাম, আরে বব, তুমি যে কি বলতে চাইছ তার মাথামুণ্ড কিছুই আমার মাথায় ঢুকছে না। তবে এটুকু অন্তত তুমি জেনে রাখ। তোমার সাহায্যার্থে আমি সবকিছু করার জন্য তৈরি আছি। কিন্তু বব, তুমি যে আমাকে রীতিমত ভাবিয়ে তুললে হে!

আমার কথা শেষ হতে না হতেই সে বলল, 'ঠিক আছে কিংম্যান।'

কথাটা আমার উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দিয়ে সে হাত বাড়িয়ে খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে চোখের সামনে ধরল, চুরুটটায় অগ্নিসংযোগ করল। মুক্ত বাতাসে একগাল ধোঁয়া ছড়িয়ে দিয়ে কপালের চামড়ায় চিন্তার ভাঁজ এঁকে আমার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

সে যে কি বলতে চেয়েছিল তা আমি আদালত খোলার আগের দিন অনুভব করতে পারলাম।

সে রাত্রে শুতে যাওয়ার সময় আমার মধ্যে অসহনীয় একটা অস্থিরতা ভর করল। মাঝ-রাত্রি পর্যন্ত নির্ঘুম অবস্থায় কাটালাম। বিছানায় শুয়ে বার বার এপাশ-ওপাশ করলাম। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম টেরই পাই নি। ঘুম ভাঙলে দেখলাম, সামান্যমাত্র পোশাক পরিহিত অবস্থায় আমি আদালত বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে।

বব আমার একটা হাত সজোরে ধরে রেখেছে আর অন্য হাতটা রয়েছে আমাদের পারিবারিক ডাক্তার দু'হাতে মুঠো করে ধরে। আর এলিস ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে আমাকে অনবরত ধাক্কা দিচ্ছে। সে আমার অজ্ঞাতেই ডাক্তারকে খবর দিয়ে আনিয়েছে। তিনি যখন আমার ঘরে পা দিলেন তখন দেখা গেল, আমি বিছানায় অনুপস্থিত। আমি অনেক আগেই ঘর ছেড়ে পালিয়েছি।

তারপর সবাই ব্যস্ত হয়ে আমাকে খুঁজতে আরম্ভ করল।

সব কিছু শুনে ডাক্তার মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে বললেন, একে বলে স্বপ্নাটন। এ রোগ হলে রোগী ঘুমের মধ্যে হাঁটে।

আমরা সবাই বাড়ি ফিরলাম। ডাক্তার আমার কাছেই রয়ে গেলেন। তখনই তিনি অদ্ভুত সব গল্প আমাদের শোনালেন, এরকম পরিস্থিতি মানুষ কতরকম অত্যাশ্চর্য, একেবারে অবিশ্বাস্য সব কাণ্ড করে।

দীর্ঘ সময় বাইরে থাকায় আমি অস্বাভাবিক শীত অনুভব করতে লাগলাম। তখন আমার স্ত্রীও ঘর ছেড়ে বাইরে চলে গেল।

আমি ঠাণ্ডায় কুঁকড়ে যাবার যোগাড় হলাম। উপায়ান্তর না দেখে আমি ব্যস্ত হাতে আলমারিটা খুলে ফেললাম। হাত বাড়িয়ে ভেতর থেকে পুরনো পোশাকের তাক থেকে বেশ বড়সড় একটা লেপ বের করলাম। সেখানে যে লেপটা রাখা আছে সেটা আমি আগেই জানতাম।

লেপটা ধরে টান দিতেই আমি রীতিমত ভড়কে গেলাম। লেপের ভাঁজ থেকে একটা ডলারের থলি দুম্ করে মেঝেতে পড়ে গেল। হায়। কী আশ্চর্য কাণ্ড! এ থলিটা চুরির দায়েই তো সকালেই বব-এর বিচার হবার, দণ্ড হবার কথা! আমি নিষ্পলক চোখে ডলারের থলিটার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

এক সময় আমি চেঁচিয়ে বলতে লাগলাম, এই লাফানো ঝুমঝুমি সাপটা এখানে কিভাবে এল?

আমি সে ব্যাপারটাতে কতখানি অবাক হয়েছিলাম সেটা উপস্থিত সবারই নজরে পড়েছিল। বব কিন্তু তখনই ব্যাপারটা অনুধাবন করে নিল।

আগেকার সে আভাষ তার চোখে মুখে লক্ষিত হল। সে সোল্লাসে বলে উঠল, তুমি কী যে কাণ্ড করলে তা আর বলার নয়। আরে বুড্ডা, আমি তো নিজের চোখে দেখেছি, থলেটাকে তুমিই সেখানে রেখেছিলে। আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখলাম, সিন্দুক খুলে তুমি ওটাকে বের করে নিলে। ব্যস, আমি তোমার পিছু নিলাম। জানালার আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখলাম, সেটাকে পোশাকের আলমারিতে, লেপের ভাঁজে সেটাকে গুঁজে রাখছ।

তবে নচ্ছার নেকড়ে কাহাকার! ব্যাপারটাকে তুমি ভেবেছিলে, বল ত?

আরে, আমি কি ছাই জানতাম যে, ঘুমের ঘোরে একাজ করছি?

আমি দেখতে পেলাম, সে দরজার দিকে মুখ করে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। জ্যাক আর জিল্লা দরজায় দাঁড়িয়ে। ব্যাপারটা তখনই আমার হৃদয়ঙ্গম হল, বব-এর পক্ষে একজন মানুষের বন্ধু হবার অর্থটা কি।

কয়েক মুহূর্তের জন্য মেজর কিংম্যান নীরব হলেন। খোলা জানালা দিয়ে বাইরের প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। তখনই তাঁর নজরে পড়ল কোন এক অচেনা লোক স্টকমেনস ন্যাশনাল ব্যাংকের ভেতরে ঢুকে হলুদ একটা পর্দা টেনে দিয়ে জানালাটা ধীরে ধীরে ঢেকে দিচ্ছে।

ব্যাংক পরীক্ষক নেটল্‌উইক চেয়ারটায় নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলেন। মেজরের মুখের গল্পটা তিনি ধৈর্য ধরে শুনলেও তাঁর মধ্যে তেমন আগ্রহ লক্ষ্যিত হল না। এ রকম পরিস্থিতিতে মেজর কিংম্যান কথিত গল্পটা তার কাছে নিছকই মামুলি বলে মনে হল। পরবর্তী ঘটনারও তার কিছু মাত্রও প্রভাব আছে বলে তার মনে হল না।

ব্যাপারটা ব্যাংক পরীক্ষককে এটাই ভাবতে উৎসাহিত করল যে, এসব পশ্চিম অঞ্চলের মানুষগুলো একটু বেশি রকমই ভাবুক প্রকৃতির। আর তাদের ভাবনা চিন্তা, মানসিকতা আদৌ ব্যবসায়ী সুলভ অবশ্যই নয়। আর বন্ধুদের কবল থেকে তাদের রক্ষা করা দরকার আছে। মেজর এতক্ষণ ধরে যা বলতে চেয়েছেন তাতে ইতি টেনেছেন। কিন্তু যা কিছু বলেছেন তা নিতান্তই অর্থহীন। অতএব ব্যাপারটা নিয়ে আবার কথা বলা যেতে পারে।

ব্যাংক পরীক্ষক মুখ খুললেন, আপনার আর কিছু বলার আছে?

মেজর নির্বাক।

ব্যাংক পরীক্ষক এবার বললেন, আপনার যদি আর কিছু বলার না-ই থকে তবে কি আমি এবার আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারি যে, ওই সরিয়ে-ফেলা দায়পত্রগুলো সম্বন্ধে আপনি আর কোনভাবে যুক্তির অবতারণা করতে উৎসাহী?

মেজরকে তবু নীরব দেখে ব্যাংক পরীক্ষক ব্যাপারটা আরও খোলসা করে বোঝাতে গিয়ে বললেন, মিঃ কিংম্যান, আমি কি বলতে চাইছি তা আপনার মত একজন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তির পক্ষে না বোঝার কথা নয়। তবু আবারও বলছি, সরিয়ে-ফেলা যেসব দায়পত্রগুলো নিয়ে এত কথা বলা হল সে সম্বন্ধে আপনার দিক থেকে কিছু বলার থাকলে নির্দ্বিধায় বলতে পারেন।

কি বললেন? সরিয়ে ফেলা দায়পত্র! সরিয়ে ফেলা!

হ্যাঁ, ব্যাপারটা তো তা-ই দাঁড়াচ্ছে।

মেজর কিংম্যান চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন। ঘাড় ঘোরালেন। চোখের নীল তারা দুটো ব্যাংক পরীক্ষকের দিকে তুলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন। তাতে ক্ষোভের চিহ্নও কম লক্ষিত হল না। তারপর বেশ একটা কড়া স্বরেই উচ্চারণ করলেন, মিঃ নেটল্‌উইক, আপনি কি বলতে চাইছেন, বলুন ত?

মেজর এবার যন্ত্রচালিতের মত এক লাফে সোজা ভাবে দাঁড়িয়ে পড়লেন। কোটের পকেটে হাতটা চালান করে দিয়ে একগোছা কাগজ বের করে ব্যাংক পরীক্ষকের চোখের সামনে ধরে বললেন মিঃ নেটল্‌উইক আপনার বাঞ্ছিত প্রতিটা শেয়ার, বন্ড আর স্টক এ গোছাটার মধ্যেই পেয়ে যাবেন।

ব্যাংক পরীক্ষক আচমকা ভূত দেখার মত দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলেন। টু-শব্দটাও করলেন না।

মেজর বলে চললেন, স্যার, ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি ডলারগুলো গুণতে ব্যস্ত ছিলেন তখনই আমি আপনার চোখে ধূলো দিয়ে এগুলো সরিয়ে ফেলেছিলাম। এই নিন, নিজেই মিলিয়ে পরীক্ষা করে দেখুন ঠিকঠাক আছে কিনা।

মেজর কিংম্যান চেয়ার ছেড়ে উঠে আবার ব্যাংকের কর্মচারীদের ঘরের দিকে লম্বা লম্বা পায়ে হাঁটতে লাগলেন।

বিস্ময়ে অভিভূত, সাগর জলে চোবানি খাওয়া ব্যাংক পরীক্ষক নেটল্‌ম্যান ঝট করে চেয়ারটা পিছন দিকে ঠেলে দিয়ে মেজর কিংম্যানকে অনুসরণ করলেন।

ব্যাংক পরীক্ষক এবার নিঃসন্দেহ হতে পেরেছেন, তিনি এমন একটা কিছুর শিকার করেছেন যাকে ধাপ্পা বলে কিছু মনে করা যেতে পারে না। অথচ সে চাল চালতে গিয়ে তিনি পরাজিত, ব্যবহৃত হয়েছেন আর একেবারে বাতিলও হয়ে গেছেন। সবচেয়ে বড় কথা সেটা যে কোন খেলা তার তিলমাত্রও তিনি জানেন না, অনুমানও কিছুই করতে পারেন নি। আবার এমনও হতে পারে, তার পদস্থ অবস্থানটাও একেবারেই অহেতুক এ খেলার শিকার হয়ে পড়েছে।

তবে উপায়? না, পরিস্থিতি চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এখন আর তাঁর কিছুই করার নেই। আবার এ প্রসঙ্গে লিখিত কোনরকম মন্তব্য করাটাও অবাস্তব।

আর যেভাবেই হোক ব্যাংক পরীক্ষক আরও ধারণা করে নিতে পেরেছেন যে, ব্যাপারটা সম্বন্ধে তিনি যতটুকু বুঝতে ও জানতে পেরেছেন তার চেয়ে এক তিলও বেশী জানা কোনদিনই তার পক্ষে সম্ভব হবে না।

নিতান্ত নিরুৎসাহে এবং যন্ত্রচালিতের মতই ব্যাংক পরীক্ষক দায়পত্রগুলো একটা একটা করে পরীক্ষা করতে লাগলেন। মন্তব্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেন। থলেটাকে হাতে তুলে নিলেন। এবার তিনি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন।

এবার মেজর কিংম্যানের দিকে তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন। তারপর প্রতিবাদের স্বরে বললেন, আমি একটা কথাই আপনাকে বলতে চাচ্ছি মিঃ কিংম্যান, আপনার এরকম বক্তব্য, মানে আপনার ভুল বক্তব্য, যার ব্যাখ্যা করার দরকারটুকুও আপনি মনে করেন নি, আমি সঠিকভাবে

যা উপলব্ধি করতে পারি নি, ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে বা কৌতূহলের দিক থেকে, কোনটাই নয়। এরকম সব কাজকর্মের সঠিক অর্থ আমার মোটেই বুঝতে পারি নি। এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কিছু থাকলে বলতে পারেন মেজর।

তার কথা শেষ হলে মেজর কিংম্যান মুখ খুললেন। নির্মম ও গম্ভীর স্বরে তিনি বলতে লাগলেন, 'মশাই, পাহাড়-পর্বতে, বনে জঙ্গলে তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরে আর পার্বত্য উপত্যকার এমন বহু ব্যাপার স্যাপার আছে যা আপনার বোধগম্য হবার নয়। তবে একজন এক বৃদ্ধের গল্পটা যে আপনি ধৈর্যের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত শুনেছেন তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না।

আমি একজন টেকসাসের লোক আমরা সেখানকার বৃদ্ধরা আমাদের অভিযান আর বুড়ো পুরনো বন্ধু বান্ধবদের কথা বলতে বড়ই উৎসাহী।

আর আমরা যখনই 'কোন কালে' বলে গল্প বলতে আরম্ভ করি তখনই এখানকার মানুষরা উঠে পড়ি কি মরি করে পালাতে আরম্ভ করে। আর একারণেই কোন নতুন অপরিচিত কেউ আমাদের বাড়ি এলেই আমরা তাদের কাছে গল্পের ঝোলার মুখ খুলে দেই।

কথা শেষ করেই মেজর মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুললেন। আর ব্যাংক পরীক্ষক টু শব্দটিও না করে কোনরকমে অন্যমনস্কতার ভান করে হঠাৎ ব্যাংক থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ব্যাংকের সবাই জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল, ব্যাংক-পরীক্ষক নেটলউইক ব্যস্ত পায়ে বড় রাস্তাটা পার হয়ে স্টকমেনস্ ন্যাশনাল ব্যাংক-এর দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন।

মেজর কিংম্যান নিজের ঘরে ফিরে চেয়ার টেনে বসলেন। কোটের ভেতরের পকেটে হাতটা চালান করে দিয়ে বব-এর লেখা চিঠিটা বের করে আনলেন।

তিনি ব্যস্ত হাতে চিঠিটার ভাঁজ খুলে চোখের সামনে ধরলেন, গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত পড়লেন। আগে অবশ্য একবার ব্যস্ততার সঙ্গে এটা পড়েছিলেন। এখন ধীরে সুস্থে আবারও পড়লেন।

বব বন্ধুবর মেজর কিংম্যানকে সম্বোধন করে চিঠিটা লিখেছে। আর তার বক্তব্য মোটামুটি এরকম, কাকা শ্যাম-এর কোন শিকারী কুকুর মেজর কিংম্যান-এর কাছে যাচ্ছে। এর মানে ঘণ্টা দুয়েকের জন্য তারা লোকটাকে কব্জার মধ্যে পাচ্ছে। এ মুহূর্তে বব আশা করছে, মেজর তার জন্য কিছু করুক। ব্যাংকে তাদের মাত্র দু'হাজার দু'শ পাউন্ড আছে, আইনত তাদের থাকা দরকার বিশ হাজার পাউন্ড। ঘোড়া ও মোষ কেনার জন্য গত রাত্রেই ফিসার আর বস'কে আঠারো হাজার পাউন্ড পাঠিয়ে দিয়েছে। সেগুলো কেনা-বেচার মাধ্যমে চল্লিশ হাজার পাউন্ড তাদের অর্থাগম হবে। কিন্তু তাতে ব্যাংক পরীক্ষক সন্তুষ্ট হবেন না।

আবার দায়পত্রগুলোও তাঁকে দেখানো সম্ভব নয়, কারণ সেগুলো দায়পত্র হিসেবে গণ্য হবার নয়, নিতান্তই হাত চিঠি বলে গণ্য হবে।

সে আরও লিখেছে, মেজর তো পরিষ্কারই জানেন, জিম ফিশার আর পিংক রস সৃষ্টিকর্তার সৃষ্ট সবচেয়ে ভাল শ্বেতাঙ্গ পুরুষ। আর তারা সঙ্গত কাজই করবে। জিম ফিশারকে অবশ্যই মেজরের স্মরণ থাকার কথা। এ হচ্ছে সেই লোক যে পাসো-তে একজন ফাঁরো তাসারুকে গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করেছিল।

বব এবার লিখেছে, সে সাম ব্রাডশ'কে টেলিগ্রাম করেছে, সে যেন তাকে বিশ হাজার পাউন্ড যত শীঘ্র সম্ভব পাঠিয়ে দেয়। আর তা ন্যারো গেজ রেল পথের দশটা পঁয়ত্রিশের ট্রেনেই পৌঁছে যায়।

আর একটা কথা, লিখেছে ব্যাংক পরীক্ষক এসে দু'হাজার দু'শ' পাউন্ড গুণে শেষ করামাত্র মেজর দরজা বন্ধ করে দেবেন, এটা তিনি করতে পারেন না।

এবার বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই সে লিখেছে, মেজর যেন ব্যাংক পরীক্ষককে অবশ্যই আটকে রাখে। যেকোন উপায়ে, যদি দড়ি দিয়ে পিঠমোড়া করে বাঁধতে হয়। যদি তার মাথায় চেপে তাকে আটকে রাখতে হয় তবু যেন তাকে কিছুতেই বেরিয়ে যেতে না দেওয়া হয়। আর ন্যারো গেজ রেলপথের ট্রেনটা স্টেশনে ঢোকার পর মেজর যেন তাদের সামনের জানালার দিকে তাকাল। নগদ অর্থগুলো ব্যাংকের ভেতরে ঢোকামাত্র সংকেত হিসেবে বব জানালার পর্দাটা টেনে দেবে

তার আগে তাকে যেন কিছুতেই ছেড়ে দেওয়া না হয়।

সবশেষে সে কাতর মিনতি জানিয়েছে যে, সে তার ওপরেই সম্পূর্ণ ভরসা করে আছে।

চিঠির শেষে স্বাক্ষরের জায়গায় লেখা আছে 'তোমার পুরনো সাকরেদ'। এবার বব বাক্‌লে-র স্বাক্ষর। তার তলায় লেখা, প্রেসিডেন্ট, স্টকমেনস ন্যাশনাল।

মেজর কিংম্যান এবার হাত চিঠিগুলো ব্যস্ত হাতে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে বাতিল কাগজের ঝুড়িতে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

হতভম্ব, বুড়ো, গরু-দাগানে নির্ভীক পুরুষ! আকস্মিক খুশিতে মেজর কিংম্যান-এর বুকের ভেতরে ফুসফুসে লাফালাফি শুরু হয়ে গেল। ভাবল লোকটা বিশ বছর আগে শেরিফের অফিসে আমার জন্য যা কিছু করেছিল আজ অন্তত কিছুটা তো শোধ করা সম্ভব হ'ল।

দ্য এমানসিপেশন অব বিলি

সাবেকি আমলের, খুবই পুরনো চারকোণা থামওয়ালা একটা প্রাসাদ। তার দেওয়ালের পলেস্তরা আর রং চটে গিয়ে এখানে ওখানে ক্ষত চিহ্নের মত হয়ে গেছে। তার ওপর জানালার পাল্লাগুলোও বাঁকা।

এক সময় এ প্রাসাদটায় শেষ সামরিক রাজ্যপালদের অন্যতম এক বুড়ো বাস করতেন। আজ একেবারেই বে-ওয়ারিশ মালের মত প্রাসাদটা অবহেলিত অবস্থায় কোনরকমে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষরা সে আমলের মহাযুদ্ধের বৈরি মনোভাবের কথা মন থেকে মুছে ফেলতে পারলেও সে আমলের প্রতিনিধিদের আর অতীত ঐতিহ্যের কথা আজও তাদের মনের গভীরে জ্বলজ্বল করছে।

এলম নগরের অধিবাসীরা রাজ্যপাল পেম্বাটন-এর মধ্যেই আজও তাদের প্রাচীন গৌরবময় অধ্যায় আর শ্রেষ্ঠত্বের ছাপ দেখতে পায়।

একজন রাজ্যপালের পক্ষে যতরকম সম্মান ও খ্যাতি পাওয়া সম্ভব তার রাজ্য যাবতীয় সম্মানেই তাঁকে ভূষিত করেছে। তিনি আজ অতিবৃদ্ধ। তিনি পরম শান্তি আর স্বস্তিতে দিন অতিবাহিত করে চলেছেন। নগরবাসীরা আজও অতীতের সে মানুষটাকে সমানভাবে সমীহ করে, ভালবাসে।

রাজ্যপালের ধ্বংস প্রায় প্রাসাদটা এলম নগরের প্রধান সড়কের ধারে ধ্বসে পড়া প্রাচীরের ফুট কয়েক পরেই মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে।

রোজ সকাল হলেই বাতব্যাধিগ্রস্ত বৃদ্ধ রাজ্যপাল খুবই সাবধানে পা ফেলে ফেলে সিঁড়ির একের পর এক ধাপ অতিক্রম করে নিচে নেমে আসেন। তারপর হাতের সোনার হাতল লাগানো লাঠিটাতে ঠুক্‌ঠুক্ আওয়াজ করে গলির উঁচু নিচু পথ বেয়ে ধীর পায়ে হাঁটতে শুরু করেন।

সম্প্রতি তাঁর বয়স প্রায় আটাত্তর বছর। তিনি এতগুলো বছর পিছিয়ে ফেলে এসেছেন। তবুও তার দেহ সৌষ্ঠব আজও অক্ষতই রয়ে গেছে। আর একসময় যে তিনি খুবই সুন্দর ছিলেন তা আজও তাঁর চোখ মুখ সর্বাঙ্গে সে ছাপ বর্তমান। বরফের মত ধবধবে তাঁর ঝুলে পড়া গোঁফ জোড়া, মাথার চুল যত্ন করে আঁচড়ানো।

আর পোশাক পরিচ্ছদ? পায়ের পাতা পর্যন্ত নেমে আসা ফ্রক কোটের বোতামগুলো পর্যন্ত ভুকরে সুন্দরভাবে আটকে দেওয়া হয়েছে। মাথায় বসানো উঁচু রেশমি টুপিটাকেও সুন্দরভাবেই বসিয়ে দেওয়া আছে। এলম নগরবাসীরা এটাকে 'ছিপি' নামকরণ করেছে। হাতে দুটো দস্তানা সর্বদাই ব্যবহার করেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে তার পোশাক আশাক চালচলন কেতাদুরস্ত আর শিষ্টাচার অধিকাংশ সময়েই কিছু না কিছু মাত্রা ছাড়িয়েই যায়। বর্তমানে বৃদ্ধ রাজ্যপালের চলার সীমানা প্রধান সড়কের লী এভিনিউ পর্যন্ত। এ পথটুকু ক্রমে স্মরণীয় আর বিজয় গৌরবে গৌরবান্বিত মিছিলের রূপ নিয়েছে।

পথ চলতে গিয়ে রাজ্যপাল যারই সম্মুখীন হন সে-ই নতজানু হয়ে তাঁকে অভিবাদনের মাধ্যমে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। অনেকেই তখন মাথা থেকে টুপিটাকে নামিয়ে নেয়। আর যাঁরা তার ব্যক্তিগত সুহৃদের সম্মানলাভে ধন্য হয়েছেন তারা কয়েক মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে হেসে করমর্দন করে। তারপরই দক্ষিণী সৌজন্য বিনিময়ের রীতি অনুযায়ী শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের পালা।

রাজ্যপাল প্রাসাদ থেকে রওনা হয়ে হেঁটে দ্বিতীয় স্কোয়ার পর্যন্ত গিয়ে কিছু সময়ের জন্য দাঁড়ায়। সেখানে অন্য আর একটা পথ এভিনিউকে আড়াআড়িভাবে অতিক্রম করে দু'দিকে এগিয়ে গেছে। সে চৌমাথায় চাষীদের দু'একটা মালগাড়ি আর ফেরিওয়ালার দু-একটা গরুর গাড়ি ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকে। তখনই সে পরিস্থিতিটার দিকে জেনারেল ডেফেনবাউ-এর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পড়ে যায়, তখন তিনি তার 'ফার্স্ট ন্যাশনাল ব্যাংক'-এর বাড়ির অফিস থেকে বেরিয়ে পুরনো বন্ধুকে সাহায্য করার শুভ ইচ্ছা নিয়ে লম্বা লম্বা পায়ে এগিয়ে আসেন।

তারপর? পরস্পরের কুশলবার্তা বিনিময় পর্ব শুরু হলেই বর্তমানকালের চাল-চলনের দোষ ত্রুটিগুলোর বৈসাদৃশ্য চোখে লাগে।

জেনারেলের চেহারাটা খুবই নাদুসনুদুস ফলে শরীরটা সামনের দিকে এতই নুয়ে পড়ে যা চোখে না দেখলে কাউকে বিশ্বাস করানো বা কারো মুখে শুনে নিজে বিশ্বাস করতে উৎসাহই পাওয়া যায় না। আর তখনই যেন রাজ্যপালের বাতের ব্যথাটা একটু ঝিমিয়ে পড়ে। তখন তিনি জেনারেলের হাতটা ধরে নির্বিঘ্নে খড় বোঝাই মালগাড়ি আর গরুর গাড়ির ফাঁক দিয়ে পথটা পেরিয়ে যান। বন্ধুর সাহায্য-সহযোগিতায় এভাবে ডাকঘর পর্যন্ত পৌঁছে মান্যবর কূটনীতিজ্ঞ সকালের ডাক নিতে আসা ইয়ার দোস্ত নাগরিকদের সঙ্গে কিছু সময়ের জন্য মজলিসে মেতে যান।

তারপর এক সময় রাজনীতিজ্ঞ, আইনজ্ঞ আর বংশ গৌরবে গৌরবান্বিত জনা দু'-তিন বিশিষ্ট নাগরিককে নিয়ে রাজকীয় মর্য্যাদার সঙ্গে এভিনিউর ধার ঘেঁষে হেঁটে প্যালেস হোটেলের সদর দরজার কাছে এসে কিছু সময়ের জন্য দাঁড়ান। হোটেলের যাত্রীদের তালিকায় যদি রাজ্যের বিখ্যাত ও সম্মানীত ব্যক্তির পরিচিত হবার যোগ্য কোন নবাগতের নাম খুঁজে পান তবে সেখানেই হয়ত রাজ্যপালের দীর্ঘ শাসনকালের গৌরবের আলোচনায় মেতে গিয়ে আর দু'-এক ঘণ্টা কাটিয়ে দেবেন।

হোটেল থেকে ফেরার সময় রাজ্যপাল ক্লান্ত হয়ে পড়ায় জেনারেল অবশ্যই যারপর নাই ভদ্র মালিক মিঃ এপল্‌বি আর ফ্রেন্ডস-এর দোকানে মিনিট কয়েক বিশ্রাম করে নেবার প্রস্তাব করবেন।

মিঃ এপল্‌বি আর ফ্রেন্ডস ফেল্ট্রেস একজন ক্লান্তি অপনোদন বিশেষজ্ঞ। দাওয়াইয়েব ফর্মুলাটা তার অবশ্যই জানা আছে। দক্ষ হাতে সদ্য তৈরি করা দাওয়াইয়ের গ্লাসটা প্রথম রাজ্যপালের হাতেই গ্লাসটা তুলে দেন।

সত্যি বলছি, ক্লান্তি অপনোদন দাওয়াই পরিবেশনে কোনদিন সামান্যতম ব্যতিক্রম হয় না।

মিঃ এলবি প্রথম দু'গ্লাস দাওয়াই তৈরি করে প্রথমটা রাজ্যপালকে হাতে আর দ্বিতীয় গ্লাসটা দেন জেনারেলকে।

গ্লাসে একটাও চুমুক না দিয়ে রাজ্যপাল কাঁপা কাঁপা গলায় ভাষণটা দেন।

মিঃ ফেল্ট্রেস, না, এটা হচ্ছে না। আপনার নিজের জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত এক গ্লাস দাওয়াই তৈরি না করছেন ততক্ষণ আমরা এর একটা ফোঁটা মুখে তুলছি না। আরে মশায়, আমার শাসনকালে আপনার বাবা আমার একজন সমর্থক আর হিতাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে একজন। তাই তার ছেলেকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন কেবলমাত্র আমার আনন্দের ব্যাপারই নয়, অবশ্য কর্তব্যের মধ্যেও পড়ে।

রাজ্যপালের এরকম ঔদার্যে আনন্দে ডগমগ হয়ে ওষুধের দোকানি ফেল্ট্রেসও কথায় সম্মত হন আর দাওয়াইয়ের গ্লাসটা ঠোঁটে লাগাবার আগে বলে উঠলেন : উপস্থিত সুধীজন, আমাদের মহান প্রাচীন রাজ্যের সমৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রাজ্যের অতীত গৌরবের স্মৃতিতে আর তার প্রিয় সন্তানের স্বাস্থ্যের খাতিরে।

পুরনো আমলের কোন না কোন প্রহরীদের কাছে পাওয়া যায়ই। আর সে-ই রাজ্যপালকে

সঙ্গে করে তার প্রাসাদে পৌঁছে দেয়।

তিনি কোনদিন নিজের কাজের ঝামেলায় জড়িয়ে থাকলে সেদিন কর্ণেল টাইটাস বা বিচারক ব্রুমফিল্ড অথবা অন্য কেউ এগিয়ে এসে তার কাজটা সম্পাদন করে দেয়।

রাজ্যপালের সকালের ডাকঘর ভ্রমণের এটাই হচ্ছে নিত্যকারের ঘটনা। যখন তিনি কোন প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে যোগদান করতে যান আর জেনারেল পথপ্রদর্শকরূপে আগে আগে অতীতের পাকাচুল অতিথিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যান তখনকার দৃশ্যটা যে আর কতই না লক্ষ্যণীয়, বিস্ময়কর আর চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে তা আর বলার নয়।

অনেকে বলে থাকেন, জেনারেল ডেফেনবার্ড সাক্ষাৎ এলম্‌নগর। সংক্ষেপে বলতে গেলে, নগরের মুখপাত্র হিসাবে তার প্রতিদ্বন্দ্বীই নেই।

'ডেইলি ব্যানার' সংবাদপত্রটার এত স্টক তিনি কিনে রেখেছেন যার ফলে সংবাদপত্রটা তার ইচ্ছানুযায়ী পরিচালিত হয়।

আর 'ফার্স্ট ন্যাশনাল ব্যাংক-এ তার শেয়ার এত বেশী যে, সেখান অর্থ ধার দেওয়ার ব্যাপারটা তার মর্জির ওপরই নির্ভর করে।

আবার যদি খোলা ভোজের আসরে বিদ্যালয়ের উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে আর কৃতিত্ব ও সাফল্য তাকে এনে দেয় প্রতিদ্বন্দ্বীহীন প্রথম আসনটা। এসব ছাড়াও তার বহু দানধ্যান আছে যা তাঁকে অবর্ণনীয় সম্মানের অধিকারী করেছে। তাঁর কর্তৃত্ব তাঁকে রোম সম্রাটের সমান মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিতে পরিণত করে দিয়েছে। আর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে, তার মনটা বিরাট আর একনিষ্ঠও বটে। তাই তো নগরবাসী যথার্থই বলে, জেনারেল ডেফেনবাউ সাক্ষাৎ এলম্ নগর।

কথায় কথায় রাজ্যপালের প্রাতঃভ্রমণের ছোট্ট একটা ঘটনার কথা বাদ পড়ে গেছে। তিনি রোজ দলবল নিয়ে ভ্রমণ সারার সময় এভেনিউর ধারে অবস্থিত ছোট্ট একটা দালানের অফিস ঘরের সামনে তিনি রোজই একবার করে থেমে যান।

বাড়িটার সামনের দিকে একটা কয়েক ধাপের কাঠের সিঁড়ি আছে। ঘরের দরজায় একটা ছোট্ট টিনের পাতে লেখা আছে 'উইলিয়ম বি পেম্বার্টন। এটর্নি অ্যাট ল।'

দরজাটা দিয়ে ভেতরের দিকে মুখ বাড়িয়ে জেনারেল গলা ছেড়ে বলেন ওহে বিলি, বাপধন। পরমুহূর্তেই রাজ্যপাল সুরেলা কণ্ঠে বলে ওঠেন, গুডমর্নিং বিলি।

উভয়ের কণ্ঠস্বর কানে যেতেই সিঁড়ি থেকে একজন সহনশীল বেঁটেখাঁটো মানুষের পায়ের শব্দ ভেসে আসতে থাকে। তারপর কাছে এসে দলের সবার সঙ্গে হেসে হেসে করমর্দন করে।

কেবলমাত্র এ প্রাতঃভ্রমণকারীরাই নন, পথে ঘাটে দেখা হলেই এলম নগরের প্রতিটা মানুষ তার সঙ্গে করমর্দন করে।

নিত্যকার অভ্যাস মত সৌজন্যমূলক দু'-চারটে কথাবার্তার পর বেঁটেখাঁটে মানুষটা ফিরে গিয়ে নিজের টেবিলে বসে। আইনের বই আর হরেক রকম কাগজপত্রে টেবিলটা ভর্তি। আর ইতিমধ্যে ভ্রমণ বিলাসীদের মিছিলটাও এগিয়ে যেতে থাকে।

দরজায় আঁটা নামের ফলকটা দেখেই ধরে নেওয়া যায়, বিলি পেম্বার্টন একজন আইনজ্ঞ, আইন ব্যবসায়ী। ছোট্ট এ বাড়িটাতেই সে বেড়ে উঠেছে। এ খুপড়িটা থেকেই সে বহু বছর ধরে উন্নতির ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু তার সে উচ্চাশা মাঠে মারা গেছে। আজ তার মধ্যে এ বিশ্বাসই বদ্ধমূল হয়েছে যে, এ বাড়িটা থেকেই তার উচ্চাকাঙক্ষার সমাধি হবে।

বিলি পেম্বার্টন পিতৃদেবের প্রতি শ্রদ্ধা আর কর্তব্য অন্য ছেলেদের তুলনায় ভালভাবেই পালন করেছে। আর এ আশাও করেছে যে, নিজের কাজ আর যোগ্যতর মাধ্যমে সে সমাজে পরিচিতি লাভ করবে আর সে সঙ্গে প্রশংসাও কুড়োবে।

দীর্ঘ দিনের কঠিন কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে একজন আইন ব্যবসায়ী হিসেবে তার পরিচিতি ও খ্যাতি এলম্ নগরকে ছাড়িয়ে বহু দূরবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে।

বিলি পেম্বার্টন একবারই নয়, দু'-দু'বার সর্বোচ্চ আদালতে লড়তে ওয়াশিংটন গিয়েছেন। অসামান্য বাক্‌চাতুর্য তীক্ষ্ণ যুক্তি আর আইনের জ্ঞানের মাধ্যমে সবাইকে বিস্ময়ে অভিভূত করে দিয়েছে।

আর আইন ব্যবসার মাধ্যমে তার আর উপার্জন লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে।

বিলি পেম্বার্টন বাবাকে নিয়ে তাদের সাবেকি আমলের পারিবারিক বাড়িটাতেই আগেকার আমলের বহুল ব্যয়সাপেক্ষ ভোগ বিলাসে বসবাস করছে। বাড়িটা আজ যতই জীর্ণদশা প্রাপ্ত হোক না কেন বাপবেটার মধ্যে কেউ-ই সেটা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবার কথা কোনদিন ভাবতেই পারে নি।

আমাদের সম্মানিত নাগরিক প্রাক্তন রাজ্যপাল পেম্বার্টন-এর ছেলে বিলি পেম্বার্টন আজও এলম নগরে থেকে গেছেন।

বিলি পেম্বার্টন যখন জনসভায় ভাষণ দেয় তখনও কেটে কেটে তার এ পরিচয়টার মাধ্যমেই নাম ঘোষণা করা হয়।

আবার কেউ এলে, এমন কি আদালতের কাজে আসা আইন ব্যবসায়ীর কাছেও তার পরিচয়ও একইভাবে দেওয়া হয়।

তার পরিচয় ডেইলি ব্যানার সংবাদপত্রেও একইভাবে ছাপা হয়। আসলে পিতৃ-পরিচয়ে পরিচিত হওয়াটাই তার কপালে লেখা আছে। সে জীবনের যত খ্যাতিও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে সবই পিতার চমকপ্রদ ও ভয়ঙ্কর পিতৃ-পরিচয়ের মাধ্যমে চাপা পড়ে গেছে। অতএব সে 'পেম্বার্টন'-এর পুত্র এটাই তার বড় পরিচয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিলি পেম্বার্টন-এর উচ্চাশার বৈশিষ্ট্য আর সবচেয়ে মর্মান্তিক ব্যাপারটা হচ্ছে, এলম্ নগরটাকে জয় করাই তার জীবনের একমাত্র কাম্য। কিন্তু তার মধ্যে আত্মপ্রত্যয়ের অভাব আর নিজের গুণগান করার ক্ষমতা তার কোনদিনই ছিল না, আজও নেই। এটা তার স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য।

জাতীয় ও রাজ্যস্তরের সম্মান তার কাছে যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার। তার ইচ্ছা যশ-খ্যাতিকে দু'হাতে দূরে ঠেলে দিয়ে যাদের মধ্যে সে জন্মগ্রহণ করেছিল, যাদের সঙ্গে সে বড় হয়েছে সে সব বন্ধু-বান্ধবদের প্রশংসা পেতেই সে বেশী উৎসাহী।

তার বাবা পেম্বার্টন-এর গলায় যত ফুলের মালা দেওয়া হয়েছিল তা থেকে একটা পাঁপড়িও নিজের জন্য ছিঁড়ে নিতে সে মুহূর্তের জন্যও আগ্রহী হয়নি। সে সব গাছের শুকনো ফুল আর পাতা দিয়েই তার প্রাপ্য যে সব মালা গাঁথা হয়েছে কেবলমাত্র তার বিরুদ্ধেই সে বিদ্রোহে সোচ্চার হয়েছে। কিন্তু সেটা তার চাপা-বিদ্রোহ। তা এ চাপা ক্ষোভ সত্ত্বেও এলম নগরটা তাকে চিরটাদিন তাকে 'বিলি' আর 'পুত্র' বলেই সম্বোধন করে এসেছে।

নিজের অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসের কথা বিবেচনা করেই বিলি পেম্বার্টন সতর্কতার সঙ্গে নিজেকে গুটিয়ে রেখেছে, জনসাধারণের কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। আর নিজের বইপত্র নিয়েই মেতে থেকেছে।

একদিন কোন এক ওপর মহল থেকে পাঠানো একটা চিঠি ডাক মারফৎ বিলি পেম্বার্টন-এর হাতে এল।

চিঠিটার বক্তব্য, আমাদের দেশের এক দ্বীপ উপনিবেশের এক গুরুত্বপূর্ণ বিচার বিভাগীয় পদে তাকে নিয়োগ করা হয়েছে। আর এটা তারই নিয়োগ-পত্র।

ব্যাপারটা নিঃসন্দেহ বিশেষ সম্মানীয়। কারণ, এ গুরুত্বপূর্ণ শূন্য পদটা পূরণ করার জন্য একজন যোগ্যতম প্রার্থীকে বাছাই করার তাগিদে সমগ্র জাতিই একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে, একমাত্র আমাকেই এ পদে নিয়োগ করা যেতে পারে যে চারিত্রিক, শিক্ষাগত যোগ্যতা আর মানসিক ভারসাম্যের দিক থেকে সবার সেরা বিবেচিত হয়।

চিঠিটার কথা জানাজানি হওয়ার ফলে সমগ্র এলম নগর সর্বত্র বিলি পেম্বার্টন-এর নামে উত্তাল হয়ে উঠল। তার নাম আর সদ্যলব্ধ বিশেষ সম্মানটার কথা ছেলে বুড়ো সবার মুখে মুখে ঘুরে বেড়াতে লাগলেও অধিকাংশ মানুষ বলাবলি করতে লাগল, পুত্রের এ আকস্মিক সম্মান লাভের জন্য আমরা রাজ্যপাল পেম্বার্টনকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। পুত্রের এ সাফল্য লাভের মাধ্যমে রাজ্যপাল পেম্বার্টন-এর সঙ্গে সমগ্র এলম্ শহরই আজ আনন্দের জোয়ারে ভাসছে, বিচারপতি বিলি পেম্বার্টন আমাদের রাজ্যের বহুযুদ্ধের নায়ক আর জনসাধারণের গর্ব রাজ্যপাল পেম্বার্টন-এর পুত্র। নগরের ছেলে বুড়ো সবার মুখে মুখে আর খবরের কাগজের পাতায় পাতায়

ছাপা এ খবরটা যেন বাতাসের কাঁধে ভর দিয়ে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও পৌঁছে যেতে লাগল। এলম নগরের সৎ ছেলে আর রাজ্যের পৌত্র, রাজনীতির ক্ষেত্রেও এটাই তার ছক বাঁধা অদৃষ্ট।

হ্যাঁ, বিলি পেম্বার্টন তার বাবাকে নিয়ে তাদের পুরনো প্রাসাদোপম বাড়িটাতেই বাস করে। তাদের পরিবার বলতে তারা বাপ-বেটা দু'জন আর একজন বয়স্কা মহিলা মোট এ তিনজন। রাজ্যপালের পুরনো কৃষ্ণকায় খানসামা বুড়ো জেফকেও হয়ত তাদের পরিবারের মধ্যেই গণ্য করা উচিত। জেফ ছাড়াও আরও পরিচারক তাদর বাড়িতে আছে, কিন্তু টমাস জেফার্সন পেম্বার্টন তো এ পরিবারের একজন সদস্য।

এলম নগরের অধিবাসীদের মধ্যে একমাত্র জেফ-ই বিলি পেম্বার্টনকে পিতৃপরিচয়হীন স্বীকৃতি জানাল। তার মতে টালবট জেলার শ্রেষ্ঠতম সন্তান 'মার্স উইলিয়ম', বিলি পেম্বার্টন প্রাক্তন রাজ্যপাল পেম্বার্টন-এর পুত্র রকম পরিচয় বা সম্বোধন তো তার মুখ থেকে বেরোবার কথা নয়।

আর জেফ এক নায়কের নিজস্ব পরিচারক, সে পরিবারটাতেই একজন সদস্যের মত। তাই তো এক্ষেত্রে যথাযথ বিচারের সবচেয়ে বেশী সুযোগ সে-ই পেতে পারে।

বিলি প্রথমেই খবরটা জেফকে জানাল। জেফ সান্ধ্য আহারের জন্য বাড়িতে পা দিয়েই মাথা থেকে 'ছিপি' টুপিটা খুলে ভাল করে ঝেড়ে মুছে দেওয়ালের পেরেকের গায়ে ঝুলিয়ে রাখল।

বৃদ্ধ বলল, আমি যা বলেছিলাম অক্ষরে অক্ষরে ফলল তো! আরে আমার তো আগেই জানা ছিল, এরকম ডাক আসবেই। ইয়াংকিরা তোমাকে প্রধান বিচার পদে নির্বাচন করেছে, তাই তো? মার্স উইলিয়াম, একটা কথা বল তো, তুমি কি ওই ফিলিপিনদের দেশে পাড়ি জমাবে, নাকি এখানে অবস্থান করেই তাদের বিচারের কাজ চালাবে, কি চিন্তা করেছ?

বিলি পেম্বার্টন জবাব দিতে গিয়ে বলল, 'অধিকাংশ সময় যে সেখানেই কাটাতে হবে এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ, এটাই তো স্বাভাবিক।

মুহূর্তের জন্য ভেবে নিয়ে জেফ এবার বলল, এ ব্যাপারে গভর্নরের মত কি, জানা নেই।

জেফ-এর কথাটা বিলি পেম্বার্টনকেও ভাবনায় ফেলে দিল। আসলে গভর্নরের ব্যাপারটা এর আগে তার মাথায়ই আসে নি। দীর্ঘদিনের অভ্যাস মতই সান্ধ্য আহারের সময় তারা দু'জন লাইব্রেরীতে গিয়ে চেয়ার টেনে মুখোমুখি বসল। রাজ্যপাল চেয়ারটাকে আর একটু টেনে আয়েশ করে বসে তাঁর বিশেষ ধরনের মাটির পাইপটা টানতে লাগলেন। আর বিলি জ্বলন্ত চুরুটটাকে দু'ঠোঁটের ফাঁকে আটকে টানতে লাগল। একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বিলি তার নতুন চাকরি পাওয়ার কথাটা বাবার কাছে পাড়ল।

রাজ্যপাল নিবিষ্ট মনে তার মাটির পাইপটা টানতে লাগলেন। ছেলের নতুন চাকরির খবরটা শোনার পর দীর্ঘসময় নীরবতার মধ্যেই কাটালেন, টু-শব্দও করলেন না।

বিলি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আগ্রহের সঙ্গে বাবার মতামত জানার জন্য অধীর প্রতীক্ষায় রইল। আবেদন ছাড়াই এমন গুরুত্বপূর্ণ একটা চাকরি পাওয়ায় তার মন-প্রাণ খুশিতে ভরপুর।

দীর্ঘ নীরবতার পর এক সময় রাজ্যপাল সরব হলেন। আপাতত তার কথাগুলো তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে না হলেও তিনি যা বললেন সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। কাঁপা কাঁপা স্বরে তিনি বললেন, শোন উইলিয়ম, গত মাস কয়েক যাবৎ আমার বাতের ব্যথাটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

বাবা, আমি এর জন্য যারপরনাই দুঃখিত।

দেখ বিলি, আমার এখন প্রায় আটাত্তর বছর বয়স চলছে। বুড়োদের খাতায় নাম লিখিয়েছি। আমার শাসনকালে যাদের নাম লোকের মুখে মুখে ঘুরে বেড়াত তাদের মধ্যে মাত্র দু'তিনজনের নাম আজ আমি স্মরণে আনতে পারছি।

বিলি নীরব চাহনি মেলে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। রাজ্যপাল এবার বললেন, আচ্ছা উইলিয়ম, একটা কথা তো শোনা হল না।

কি? কোন কথা বাবা? রাজ্যপালের মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিলি প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল।

তোমার নতুন চাকরিটার কথা বলছি।

কোন্ দিকটা—'

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই রাজ্যপাল আবার বলতে শুরু করলেন, আমি জানতে চাইছি, যে নতুন চাকরিটা তুমি পেয়েছ সেটা কি রকমের?

যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রধান বিচারপতির পদ।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ, বাবা।

রাজ্যপাল আবার নীরব হলেন।

বিলি বলে চলল, বাবা, আমার তো মনে হচ্ছে, চাকরিটা খুবই লোভনীয়।

হুম! রাজ্যপাল অস্ফুট উচ্চারণ করলেন।

বিলি পূর্ব প্রসঙ্গের জের টেনে বলতে লাগল, বাবা, তোমার তো ভালই জানা আছে, চাকরিটা রাজনীতির ঊর্ধ্বে।

হ্যাঁ, তা বটে।

আর এর মধ্যে কোনরকম দলাদলির ব্যাপার স্যাপারও নেই।

অবশ্যই। তোমার এ বক্তব্যে কিছুমাত্রও সন্দেহ থাকার কথা নয়।

কিন্তু আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাইছি উইলিয়ম।

বাবার দিকে সামান্য ঝুঁকে অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে বিলি বলল—

কি? কি কথা?

শোন উইলিয়ম, ইতিপূর্বে পেম্বার্টন বংশের কেউ-ই কোনদিন যুক্তরাষ্ট্রীয় কোন চাকরিতে বহাল হয় নি। তাদের মধ্যে যেমন জমিদার আছে, ঠিক তেমনই ক্রীতদাসও আছে, আর কেউ কেউ বাগিচার মালিকও আছে।

হয়ত তোমার জানা থাকতে পারে, তোমার মাতৃকুলের দু'-একজন আইন বিভাগেও বহাল হয়েছিলেন।

হ্যাঁ, আমার জানা আছে বটে।

এ ব্যাপারে তুমি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছ, বল তো?

বিলি উত্তরটা দিতে ইতস্তত করতে লাগল।

রাজ্যপাল আবার বললেন, কি উইলিয়ম, তুমি কি সাব্যস্ত করেছ? তুমি কি চাকরিটা নেবে সিদ্ধান্ত নিয়েছ, বল উইলিয়ম?

বিলি চিন্তাক্লিষ্ট মুখে চুরুটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে ক্ষীণকণ্ঠে জবাব দিল, বাবা, ব্যাপারটা নিয়ে আমি এখনও কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারি নি। কি করব, এখনও ভাবছি।

পাইপটাকে কলমের ডগা দিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে রাজ্যপাল এবার বললেন, উইলিয়ম, এত কাল তুমি তো আমার কাছে লক্ষ্মী ছেলেটার মত হয়ে ছিলে। আজ তবে কেন হঠা—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই বিলি বলে উঠল, বাবা, আমি তো সারাটা জীবন ধরে তোমার ছেলে হয়ে রয়ে গেলাম। রাজ্যপাল কিছুটা প্রশংসার স্বরে এবার উচ্চারণ করলেন, উইলিয়ম, তোমার মত একজন জ্ঞান আর গুণের আধার ছেলের জন্য আমি আনন্দিত হই বলে আমি প্রায়ই কিছু না কিছু সন্তুষ্টি বোধ করে থাকি, মিথ্যে নয়। বিশেষ করে আমাদের এলম নগরের অধিবাসীরা কথাবার্তার মাধ্যমে তোমার কথা বলতে গিয়ে তোমার নামের সঙ্গে জড়িয়ে আমার নামটাও উচ্চারণ করে।

বাবা, নাম জড়িয়ে ফেলার ব্যাপারটা কেউ কোনদিন ভুলে গেছে বলে আমি জানি না।

শোন উইলিয়ম, আমার নাম আর রাজ্যের সেবার জন্য আমি যতখানি সম্মান ও খ্যাতির অধিকারী হয়েছি তার ফলটা তো'তোমার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে ভোগ করা সম্ভব।

আর যখনই কোন বিশেষ সুযোগ পেয়েছি তখনই সেটাকে তোমার মঙ্গলার্থে কাজে লাগাতে আমি তো কোনদিন একটা মুহূর্তের জন্য দ্বিধা করি নি। কেনই বা করতে যাব, বল ত? আমি তো জানিই সেটা তোমার হকের পাওনা। কারণ, তুমি যে আমার সেরা সন্তান। শোন উইলিয়ম, তোমার সদ্য পাওয়া চাকরিটা আমার কাছ থেকে তোমাকে দূরে সরিয়ে নেবার মতলবে এসেছে।

বিলি নীরব চাহনি মেলে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

রাজ্যপাল চাপা দীর্ঘশ্বাস পেলে এবার বললেন, শোন, উইলিয়ম, আমার এই তো বয়স। বাঁচবই বা কতদিন? বার্ধক্যে আমাকে অন্যের ওপরে নির্ভরশীল করে ফেলেছে। এমন কি কথা বলা আর চলাফেরার ব্যাপারেও। উইলিয়ম, তোমাকে ছেড়ে আমি কেমন করে বাঁচব, বল তো?

রাজ্যপালের মুখে বিষণ্ণতার ছাপ ফুটে উঠল। হঠাৎ তাঁর মুখ থেকে পাইপটা মেঝেতে পড়ে গেল। দু'চোখের কোল বেয়ে জলের ধারা নেমে এল। কণ্ঠস্বর কিছু চড়েই ক্রমে ভাঙতে ভাঙতে একেবারে ভেঙে পড়ল। এমনটা হওয়াই তো স্বাভাবিক। তিনি এখন বুড়ো হয়ে পড়েছেন। এতদিন যে ছেলে তাঁর কাছাকাছি পাশাপাশি থেকে তাঁর দেখাশোনা করত আজ সে-ই তাকে ফেলে দূরে চলে যাবার মনস্থ করেছে।

বিলি পেম্বার্টন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বাবার কাঁধের ওপর আলতো করে একটা হাত রাখল। মুচকি হাসল।

এবার কণ্ঠস্বরে খুশির ছোঁয়া লাগিয়ে বলতে লাগল, বাবা, তুমি ভেবো না। আমি কথা দিচ্ছি, এ চাকরিটা আমি নেব না।

রাজ্যপাল চোখের তারায় খুশির ছাপ এঁকে ছেলের দিকে তাকালেন।

বিলি বলে চলল, হ্যাঁ, বাবা, আমি এ চাকরিটা নেব না। এলম নগরই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আজ রাত্রেই আমি তাদের চিঠি লিখে আমার সিদ্ধান্তের কথা তাদের জানিয়ে দেব।

লী এভিনিউতে রাজ্যপাল আর জেনারেল ডেফেনবাউ-র দেখা হল। তাঁরা প্রাথমিক সৌজন্য বিনিময় সারার পরই হিজ একেসলেন্সি যারপরনাই উল্লসিত হয়ে বিলি-র নতুন চাকরি পাওয়ার খবরটা তাঁকে বললেন।

খবরটা শোনামাত্র জেনারেল খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠলেন, তিনি আবেগে অভিভূত হয়ে গলা ছেড়ে বলতে লাগলেন—

আরে, বিলি-র কাছে এর চেয়ে সুসংবাদ আর কি হতে পারে। বড়ই আনন্দের কথা!

রাজ্যপাল তার খুশিভরা মুখের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলেন। জেনারেল পূর্বস্বরেই বলে চললেন, সত্যি এর চেয়ে বড় সুখবর আর হয় না। কে জানত বলুন যে বিলি, আরে, মশাই এসব কথা ছাড়ান দিন তো, সত্যি কথা বলতে কি, বিলির জন্য এ চাকরি তো বাঁধাই ছিল।

রাজ্যপাল এ পরিস্থিতিতে কি বলবেন স্থির করতে না পেরে মুখে কলুপ এঁটে আগের মতই ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন।

আবেগে উচ্ছ্বাসে অভিভূত জেনারেলের মুখে যেন খই ফুটতে লাগল। তিনি একনাগাড়ে বলে চললেন, আরে মশাই, এটা তো কেবলমাত্র আপনার কাছেই নয়, এলম্ নগরবাসীর পক্ষেও পরম গৌরবের ব্যাপার। তার ওপর আমাদের রাজ্যের পক্ষেও কম সম্মানের ব্যাপার নয়, কি বলেন? দক্ষিণ অঞ্চলের পক্ষে এক সম্পূর্ণ নতুনতর এক মর্যাদা।

স্বীকার করতে লজ্জা নেই, বিলি-র ব্যাপারে আমরা এতদিন উদাসীন ছিলাম।

এবার রাজ্যপালের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তিনি বললেন, সে কবে রওনা হচ্ছে, দিনক্ষণ ঠিক করেছে? আমাদের পক্ষ থেকেও তো কিছু করণীয় আছে। তাকে একটা সম্বর্ধনা তো অন্তত দিতেই হবে, এ চাকরিতে বছরে আট হাজার পাউন্ড একেবারে বাঁধা। মশাই একটাবার ভেবে দেখুন তো, আমাদের সে ছোট্ট মুখচোরা বিলি কী কাণ্ডটাই করেছে!

রাজ্যপাল গর্বের সঙ্গেই বললেন, উইলিয়ম অন্যরকম সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

অন্য রকম সিদ্ধান্ত? আপনার কথার মানেটা বুঝলাম না-তো।

সে চাকরির প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করেছে।

প্রত্যাখ্যান করেছে! উইলিয়ম চাকরির প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করেছে? কেন?

আরে বাবা, বুড়ো বয়সে আমাকে ফেলে রেখে সে কোথাও যাবে না বলে। সে আমার বড় ভাল ছেলে, তাই না?

সে স্বেচ্ছায় প্রত্যাখ্যান করেছে, নাকি আপনি তাকে এ কাজে বাধ্য করেছেন? কোন্‌টা সত্যি বলুন তো?

এবার বন্ধুর বুকের ওপর তর্জনীটা ঠেকিয়ে জেনারেল বললেন—আপনি অবশ্যই তার কাছে আপনার বাতের ব্যথা সম্বন্ধে ইনিয়ে বিনিয়ে বলেছেন।

রাজ্যপাল এবার বেশ একটু কঠিন স্বরেই বললেন, বন্ধুবর জেনারেল, আমার ছেলের বয়স কত, জানেন? তার বয়স এখন বিয়াল্লিশ চলছে। এসব ব্যাপারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার বয়স ও বুদ্ধি দু'-ই তার আছে। আর তার বাবা হিসেবে একটা কথা বলা আমি অবশ্য কর্তব্য বলে আমি মনে করছি। আমার বাতের ব্যথা সম্বন্ধে আপনি যে মন্তব্য করেছেন সেটা নিছকই একটা ছোট নলের বন্দুকের চেয়ে ছোট বুলেট ছাড়া কিছু নয়।

জেনারেল বার-কয়েক ঢোক গিলে, আমতা আমতা করে বললেন, মিঃ পেম্বার্টন, যদি কিছু মনে না করেন তবে একটা কথা বলি।

কি? কি কথা?

মশাই এ বাতের ব্যথার দোহাই দিয়ে মানে বাতের ব্যথার কথা বলে আপনি বেশ কিছুদিন যাবৎ এখানকার মানুষগুলোর কান একেবারে ঝালাপালা করে দিয়েছেন।

রাজ্যপাল বড় বড় চোখ করে তাঁর দিকে তাকালেন

জেনারেল বলে চললেন, আপনার বাতের ব্যথা এখানকার মানুষগুলোকে রীতিমত বিব্রত করে তুলেছে। আর তখন কিন্তু বন্দুকের নলটার মাপ ছোট ছিল না।

দু' বন্ধুর মধ্যে এরকম কথা কাটাকাটি শেষ পর্যন্ত হয়ত ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করতে পারত, হাতাহাতি হওয়াও কিছুমাত্রও বিচিত্র ছিল না, কিন্তু বরাত যে, ঠিক সে মুহূর্তেই কর্নেল টাইটাস আর তাদের অন্য একজন বন্ধু সেখানে হাজির হয়।

রাজ্যপাল আর জেনারেলের মধ্যে কথাকাটির ব্যাপারটা তাদের মধ্যস্থতায় সেখানেই ধামাচাপা পড়ে গেল।

বিলি পেম্বার্টন এভাবে নিজের যাবতীয় উচ্চাভিলাষকে কার্যত হত্যা করে একসময় হঠাৎই বুঝতে পারল যে, তার বুক থেকে বেশ ভারী একটা বোঝা নেমে যাওয়ায় সে যেন রীতিমত হাল্কা বোধ করছে। আর এরই ফলে তার মন সুখে ভরে উঠেছে। এলম নগরের উত্তাপ তার ভেতরে পুলকের সঞ্চার ঘটাচ্ছে।

বিলি এমন ভাবছে, মহামান্য হয়ে অপরিচিত মানুষদের মধ্যে বসে অভিজ্ঞ কৌশলীদের সওয়াল জবাব শোনার চেয়ে 'বিলি' হয়ে থেকেই বুড়ো বাবার সঙ্গী হয়ে, কাছাকাছি পাশাপাশি অবস্থান করা অনেক, অনেক শান্তির, অনেক স্বস্তির।

আর বাবার সে করুণ আর্তস্বর, বাছা, আমি তোমাকে ছেড়ে কেমন করে থাকব, কেমন করে বাঁচব, শোনা আর প্রতিবেশী আর পরিচিত বন্ধুজনদের অভিনন্দন পাওয়াটা অনেক ভাল, অনেক বেশী আনন্দের।

বাবার সঙ্গে কথাবার্তা হওয়ার পর, সদ্য লব্ধ চাকরিটাতে ইস্তফা পাওয়ার পর থেকে বিলি পেম্বার্টন-এর বুকে রীতিমত খুশির জোয়ার বয়ে যেতে লাগল। সে রাস্তা দিয়ে যাতায়াতের সময় এমনভাবে শিস্ দেয়, গুনগুন করে আপন মনে গান করে সে, তার বন্ধু-বান্ধব এবং পরিচিত ছেলে বুড়ো সবাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তার কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে।

আবার এমন ঘটনাও ঘটতে দেখা গেছে যে। মাত্রাতিরিক্ত আনন্দ উচ্ছ্বাসের শিকার হয়ে বিলি সবার পিঠে অশ্রদ্ধার সঙ্গে মৃদু চড় মেরে সবাইকে অবাক করে দিতে লাগল। আবার বহুদিনের পুরনো এমন সব গল্প সল্প ফেঁদে বসে যা তাদের অবাক না করে পারে না।

মামলা মোকদ্দমার চাপ থাকলে ব্যস্ত থাকলেও এখন বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগুজব করার এবং বিশ্রামের জন্য বিলি সময় করে নিতে লাগল। ক'দিনের মধ্যে পরিস্থিতি এমন হয়ে দাঁড়াল যে, তার চেয়ে অনেক কম বয়সের যুবকরা তাকে গল্‌ফ ক্লাবে ভর্তি করে নেওয়ার জন্য তার পিছনে

ঘুরঘুর করতে লাগল। কিন্তু তাতে সম্মত হল না।

বিলি পেম্বার্টন যে বিস্মরণের মধ্যেই ডুবে যেতে আর ডুবে থাকতে আগ্রহী। এর একটা উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া গেল যখন দেখা গেল সে তার মাথার 'ছিপি টুপি'-টাকে তুলে রেখে ছড়ানো ও ছোট সাধারণ ও নরম একটা টুপি ব্যবহার করতে লাগল।

এলম্ নগর তাকে মার্টল লতা আর ফুলের মালা দিয়ে সাজিয়ে তাকে সম্বর্দ্ধনা জানাল না, বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখতে শুরু করল না তবু এখানেই সে পরম শান্তি আর আরামে দিন কাটাতে লাগল। তার মনে এমন একটা ভাবের উদয় হল যে, দুনিয়ার যত শান্তি, যত সুখ যেন এখানেই পুঞ্জীভূত করে রাখা হয়েছে।

নির্বিঘ্ন শান্তি আর স্বস্তির মধ্য দিয়ে এলম্ নগরের দিনগুলো একের পর এক এগিয়ে যেতে লাগল।

আর এদিকে রাজ্যপাল তাঁর অভিন্ন হৃদয় বন্ধু জেনারেলকে নির্ভরযোগ্য সঙ্গীও পথপ্রদর্শক করে প্রতিদিন সকালে তার ডাকঘর পর্যন্ত বিজয়যাত্রী নির্বিঘ্নে চালিয়ে যেতে লাগলেন। যাতায়াতের পথে যেসব জায়গায় বিশ্রাম ও গল্পসল্প করতে অভ্যস্ত তা-ও বাদ যায় না।

কিন্তু কোন মানুষের, কোন রাজ্যের বা কোন শহরের চিরদিন সমান যায় না। এলম্ নগরের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হল না। একদিন এলম্ নগরের বুকে এক আকস্মিক উত্তেজনার জোয়ার বইতে আরম্ভ হল। উত্তেজনার কারণ, হঠাৎ খবর এল প্রেসিডেন্টের একটা ভ্রাম্যমাণ দল বিশ মিনিটের জন্য এলম্ নগরের পদার্পণ করবে।

প্রেসিডেন্টের ভ্রাম্যমাণ দলটার কর্মকর্তা এ-ও জানিয়েছেন, প্যালেসে হোটেলের লম্বা চওড়া বারান্দা থেকে পাঁচ মিনিটের একটা ভাষণ দান করা হবে। মোটামুটি এরকমই কার্যসূচী প্রচারিত হয়েছে।

খবরটা প্রচারিত হতে না হতেই দলমত নির্বিশেষে এলম্ নগরের সব মানুষ মিলে যেন একটামাত্র মানুষে পরিণত হয়ে গেছে। সবাই একই চিন্তা ভাবনা আর এক কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন করার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেছে।

আর সবচেয়ে ব্যস্ত দেখা গেল একজনকে, সে মানুষটা হচ্ছেন জেনারেল ডেফেনবাউ। এর কারণও রয়েছে যথেষ্টই। রাজ্যের প্রধানতম ব্যক্তিকে সম্মানের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানাতে হবে, কম দায়িত্বের ব্যাপার?

ট্রেনটার ইঞ্জিনের মাথায় ছোট ছোট অসংখ্য তারকা আর ডোরাকাটা পতাকা উড়িয়ে ধীর মন্থর গতিতে এগিয়ে এসে স্টেশনে দাঁড়াল।

এলম্ নগর সাধ্যমত যাবতীয় ব্যবস্থা করল। ফুল ছিটিয়ে রাষ্ট্রপ্রধানকে সাদর অভ্যর্থনা করা হল। রাজকীয় সম্মান প্রদর্শনও করল। আর সে সঙ্গে গাড়ী ঘোড়া, সাজোয়া বাহিনী, চকচকে পোশাক পত্র, পতাকা ও কমিটির আর অন্ত রইল না।

হ্যাঁ, বিলি পেম্বার্টন এসেছে, সে এখানেই আছে। কিন্তু এখানে তো তার ভূমিকা পুত্রের, বৃদ্ধ রাজ্যপাল পেম্বার্টন-এর পুত্রের পরিচয়েই সে পরিচিত। তাই সে হোটেলের বাইরে, পথের ওপর অপেক্ষমাণ সাধারণ মানুষগুলোর ভিড়ে অপেক্ষা করছে।

হ্যাঁ, সত্যি তো বিলি পেম্বার্টন একজন সাধারণ ব্যক্তিত্ব ছাড়া কি? তাই তো তার স্থান-হয়েছে সমাজের অখ্যাত অবহেলিত মানুষগুলোর ভিড়ে। এর জন্য তার এতটুকুও আক্ষেপ নেই। সে সময় থেকে ছিপি টুপিটা খুলে হাতে নিয়ে নিয়েছে। তার চোখে মুখে গভীর প্রশান্তির সুস্পষ্ট ছাপ।

বিলি পেম্বার্টন তার বাবার লক্ষ্যণীয় বিশেষ ভাবভঙ্গীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে দাঁড়িয়ে আছে। সপ্রশংস তার দৃষ্টি। সে ভাবছে, আর যা-ই হোক না কেন, যে ব্যক্তি এমন সাহসিকতার সঙ্গে তিন পুরুষের চোখের মণিস্বরূপ হয়ে অবস্থান করতে সক্ষম তার ছেলে হতে পারাটা তো কম আনন্দের, কম গৌরবের ব্যাপার নয়।

এক ফাঁকে জেনারেল দু'-একবার কাশির মাধ্যমে গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিলেন। পুরো এলম্ নগরটা যেন খুশিতে নড়েচড়ে উঠল। জেনারেল সময় ঝট করে নিজের হাতটাকে সরিয়ে

নিলেন।

প্রাক্তন সামরিক রাজ্যপাল বৃদ্ধ পেম্বার্টন যথাসময়ে নিজের হাতটা প্রেসিডেন্টের দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

কিন্তু একী! জেনারেল একী অদ্ভুত কথা বলছেন!

জেনারেল স্বাভাবিক কণ্ঠেই বলতে লাগলেন, মিঃ প্রেসিডেন্ট, আপনার সম্মতি নিয়ে এমন এক ব্যক্তিত্বকে আপনার সামনে হাজির করছি যিনি এলম্ নগরের বিশিষ্ট নাগরিকদের মধ্যে অগ্রগণ্য, শিক্ষিত, মার্জিত আর সম্মানিত বিচারক, সমগ্র নগরবাসীর প্রিয়পাত্র আর একজন আদর্শ দক্ষিণ অঞ্চলের এক অনন্য ব্যক্তিত্ব, মহামান্য উইলিয়ম বি. পেম্বার্টন-এর পিতা।

চার্সেজ লা ফেমি

দুমার্স আর রবিন্স পরস্পরের অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। দুমার্স প্রায় একশ' বছরের পুরনো সংবাদপত্র 'লা আবিল'-এর প্রতিবেদক আর রবিন্স 'পিকায়ুল' সংবাদপত্রের প্রতিবেদকের ভূমিকা পালন করছে। দীর্ঘ বহু বছরের ঘাত-প্রতিঘাত আর উন্নতি-অবনতির মধ্যেও পাশাপাশি অবস্থান করে তারা পরস্পরের প্রতি অটুট বন্ধুত্বের পরিচয় দিয়েছে।

দুমার্স আর রবিন্স মাদাম তিবোলত্-এর দুর্মাই স্ট্রীটে অবস্থিত সে ছোট্ট রেস্তোরাঁতে বসে। এখানে তাদের পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হওয়াটা ধরতে গেলে অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে।

জায়গাটা আপনার পরিচিত হলেও তার স্মৃতি চারণ করলে আপনার অন্তরের অন্তঃস্থলে আনন্দ ও সুখানুভূতি মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে।

রেস্তোরাঁটা নিঃসন্দেহে ছোট। প্রায়ান্ধকার। মাত্র গোটাছয়েক বার্নিশ-করা টেবিল কোন রকমে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। আর আছে সস্তা দামের কয়েকটা চেয়ার, ব্যস। তবে অস্বীকার করা যাবে না, সেখানে বসে আপনি নিউ অর্লিয়েন্সের সবচেয়ে ভাল কফির স্বাদ উপলব্ধি করতে পারবেন।

সর্বদা কাউন্টারে দেখা যাবে ইয়া মোটাসোটা আর প্রশ্রয়শীলা মাদাম, তিবোলত্'কে। সে টেবিলের গায়ে গাঁট হয়ে বসে খদ্দেরদের কাছ থেকে দাম বুঝে নেয়।

মাদাম তিবোলত্-এর দুটো বোনঝি মিমি আর নিকোলেৎ চোখে লাগা বিব এপ্রন গায়ে চাপিয়ে খদ্দেরদের পছন্দ মাফিক পানীয় পরিবেশনের মাধ্যমে মনোরঞ্জন করে থাকে।

প্রায় ধোঁয়াচ্ছন্ন ঘরটায় বসে দুমার্স আধ বোজা চোখে বার বার মদের গ্লাসে চুমুক দিয়ে চলেছে। তার মুখোমুখি চেয়ারটায় বসে রবিন্স সকালের 'পিক' পত্রিকার ওপর চোখ বুলিয়ে চলেছে।

রবিন্স পত্রিকাটার পাতাগুলো উল্টেপাল্টে চোখ বুলাতে বুলাতে এক জায়গায় এসে থমকে গেল। বিজ্ঞাপনের কলমের এ খবরটায় তার দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। আকস্মিক আগ্রহে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই সে বন্ধু দুমার্সকে লক্ষ্য করে গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠল। তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে জোরে জোরে পড়ে খবরটা তাকে শোনাতে লাগল।

দুমার্স-এর কাছে আকর্ষণীয় খবরটার শিরোনাম হিসেবে ছাপা হয়েছে, 'প্রকাশ্য নিলাম'। আর তার বক্তব্য মোটামুটি এরকম, আজ বিকেল তিনটায় বন্‌হোম স্ট্রীটের ভগিনী সম্প্রদায়ের বাড়িতে লিটল সিস্টার্স অব সামরিয়া'-র যাবতীয় সর্বোচ্চ করদাতার কাছে বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সে নিলামে জমি, বাড়ি ও বসতবাটী আর গীর্জার আসবাবপত্র, সবই বিক্রি হবে। অতএব করদাতারা উপস্থিত থেকে যেন নিজ নিজ যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে এমন সব বহুমূল্য সম্পদ লাভের সুযোগ গ্রহণ করেন।

দুই বন্ধু গভীর মনোযোগ দিয়ে খবরের কাগজের পাতার বিজ্ঞাপনটা পড়ল। এর ফলে তাদের উভয়েরই মনের কোণে ভেসে উঠল বছর দুই আগেকার, তাদের সাংবাদিক জীবনের ঘটনা সম্পর্কিত কিছু আলোচনার ব্যাপার।

সেদিনের সে ঘটনাগুলো স্মৃতিতে আনতে গিয়ে ইতিমধ্যে যেসব পরিবর্তন হয়েছে তারই

পৃথক পৃথক পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনাটাকে কেন্দ্র করে তারা কথাবার্তা বলতে লাগল।

এখন তারা দু'জন ছাড়া রেস্তোরাঁতে আর কোন খদ্দের নেই।

তারা অনুচ্চ কণ্ঠে কথাবার্তা বললেও মাদাম তিবোলত্-এর কানে তাদের আলোচনা পৌঁছে গেল। সে কৌতূহলাপন্ন হয়ে তাদের কাছে এগিয়ে এল। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে সে বসে পড়ল। এর কারণও আছে যথেষ্টই। কারণ, তার খোয়া যাওয়া অর্থ, বে-পাত্তা হয়ে যাওয়া কুড়ি হাজার ডলার থেকেই কি পুরো ব্যাপারটার সূত্রপাত হয় নি?

বেশ কিছুদিনের পুরনো, অ-দরকারী কথাবার্তা আর ব্যাপার স্যাপার ছাঁটাই করে দূরে সরিয়ে দিয়ে বহুদিন পরিত্যক্ত রহস্যটার আলোচনা করতে তিনজনই অত্যুৎসাহী হয়ে পড়ল। ব্যস, শুরু হয়ে গেল আলোচনা।

একদিন তো লিটল সিস্টার্স অব সামরিয়া-র এ-বাড়ির এ গির্জার ভেতরেই দুমার্স আর রবিন্স দাঁড়িয়ে ছিল।

গির্জার ভেতরে তারা দু' বন্ধু মিলে সংবাদ সংগ্রহের জন্য অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে ব্যর্থ প্রয়াস চালাচ্ছিল। তখন কুমারী মেরী-র সোনালী মূর্তিটার ওপর বার বার তাদের চোখ পড়ছিল।

আলোচনার শেষের দিকে মাদাম তিবোলত্ বলল, শোন, মঁসিয়ে মোরাঁ এরকমই একজন দুশ্চরিত্র অসৎ প্রকৃতির এক নচ্ছার ছিল। আমি যে অর্থকড়ি নিরাপদে রাখার জন্য তার কাছে গচ্ছিত রেখেছিলাম সেটা যে সে আত্মসাৎ করেছে সে বিষয়ে তিলমাত্রও সন্দেহ নেই। কথাটা অন্যভাবে বললে, যেভাবেই হোক হতচ্ছাড়া আমার গচ্ছিত অর্থকড়ি খরচ করে ফেলেছিল। বাধ্য হয়েই খরচ করেছিল।

মাদাম এবার ঘাড় ফুরিয়ে দুমার্স-এর দিকে তাকিয়ে সরবে হেসে বলল, মঁসিয়ে দুমার্স, আমার ভালই জানা আছে, তখন আপনি আমার কাছে এসেছিলেন। আর কথা প্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন, মঁসিয়ে মোরাঁ সম্বন্ধে আপনার যা কিছু জানা আছে আমাকে বিস্তারিত বলুন।

হ্যাঁ, আমি সত্যি সত্যি জানি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় ওই সব লোক যখন টাকাকড়ি হারায় তখনই আপনারা তাকে বলেন, 'চার্সেস লা ফেমি'-র মধ্যে কোথাও না কোথাও মানুষের অস্তিত্ব আছেই আছে। তবে মঁসিয়ে মোরাঁর ব্যাপারে সেটাকে সত্যি মনে করা যায় না। না, অবশ্যই সত্যি নয়।

আমি হলফ করে বলতে পারি, পরপারে পাড়ি জমানোর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি একজন যথার্থ সাধু ছিলেন।

এ মুহূর্তের জন্য থেকে একটু দম নিয়ে মাদাম তিবোলত্ আবার বলতে শুরু করলেন, মঁসিয়ে দুমার্স, আপনারা তো কুমারী মেরী-র ওই মূর্তিটার ভেতরেই খোয়া-যাওয়া টাকাকড়িগুলো ফিরে পাবার চেষ্টা করতে পারেন। কারণ, যে সব ব্যাপারেও মঁসিয়ে মোরাঁ উপস্থিত ছিলেন।

একটু থেমে আগের মতই নির্দ্বিধায়ই এবারও বললেন, 'দেখ, ইচ্ছে করলে আরও একটু আধটু চেষ্টা চালাতে পার, দেখতে পার সেখানেও কোন মেয়েমানুষের কারসাজি আছে কি না।'

রবিন্স চেয়ারে সোজা হয়ে বসে পড়ল। মাদাম তিবোলত্-এর শেষের কথাগুলো শোনামাত্র সে রীতিমত চমকে উঠল। সে সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুবর দুমার্স-এর দিকে আঁড় চোখে তাকাল।

আর তার দোআঁশলা বন্ধুটা নিশ্চল নিথরভাবে চেয়ারে বসে সিগারেটের অবশিষ্টাংশের সদ্ব্যবহার করতে লাগল। আর চোখের তারা দু'টোকে পাক খেয়ে খেয়ে ওপরে উঠে যাওয়া ধোঁয়ার দিকে নিষ্পলক চোখে তকিয়ে রইল। মুখে টু-শব্দটাও করল না

ঘড়িতে তখন সকাল ন'টা। মিনিট কয়েক বাদেই দুই বন্ধু রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে নিজ নিজ কাজের তাগিদে দুই দিকে চলে গেল। সদর রাস্তা ধরে তারা সোজা এগিয়ে যেতে লাগল।

এবার শুরু হবে বিশ হাজার ডলার গায়েব হওয়ার সংক্ষিপ্ত কাহিনী। কাহিনীটা মোটামুটি এরকম—

নিউ অর্লিয়েন্স শহরের মানুষের মনে আজও নির্ঘাৎ দানা বেঁধে আছে, এ শহরেরই মিঃ

গ্যাসপার্ড মরিন-এর মৃত্যুকালে যা কিছু ঘটেছিল সে সব কথা।

মিঃ মরিন ছিলেন পুরনো ফরাসী অঞ্চলের একজন অধিবাসী। তিনি ছিলেন একজন স্বর্ণশিল্পী আর হীরে মুক্তো বিক্রেতা। সে অঞ্চলের সবাই তাঁকে যথেষ্ট খাতির করত, শ্রদ্ধাও কম করত না।

মিঃ মরিন ছিলেন একজন এক প্রাচীন ফরাসী বংশের সন্তান। একজন ঐতিহাসিক হিসাবেও যশ খ্যাতি কম ছিল না।

আর মিঃ মরিন ছিলেন একজন অকৃতদার। বয়স ছিল পঞ্চাশের কাছাকাছি।

তিনি রয়্যাল স্ট্রীটের সাবেকী আমলের বিরল বাড়িগুলোর একটায় নির্জনে ও সুখে শান্তিতে বসবাস করতেন। এক সকালে দেখা গেল নিজের বাড়ির মেঝেতেই তিনি মরে পড়ে রয়েছেন। তার শরীর বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

মিঃ মরিন-এর মৃত্যুর পর তার বিষয় সম্পত্তির অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেল, তিনি একেবারে নিঃস্ব, দেউলে হবার শেষ সিঁড়িতে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

হিসাব নিকাশ করে দেখা গেল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে তার যেটুক তা দিয়ে কোনরকমে তার বাজারের ধার দেনা শোধ করা যাবে।

মৃত মিঃ মরিন সম্বন্ধে আরও পাত্তা চালিয়ে জানা গেল যে, মরিন পরিবারের প্রাক্তন প্রধানা পরিচারিকা কোন এক মাদাম টিবোল্ট-এর বেশ কিছু পরিমাণ অর্থ তার কাছে গচ্ছিত রাখা ছিল। তার পরিমাণ বিশ হাজার। এ বিপুল অর্থ মাদাম তার ফ্রান্সের এক আত্মীয়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল।

কেবলমাত্র তার বন্ধু বান্ধবই নয়, আইন বিভাগের কর্তৃপক্ষও হন্যে হয়ে সে টাকাকড়ির খোঁজ করল। কিন্তু কিছুতেই তার কোন হদিসই পেল না।

এতগুলো টাকা বে-পাত্তা হয়ে গেল, কিন্তু তার তিলমাত্র চিহ্নও রেখে যায় নি।

মাদাম তিবোলত্-এর কথা মত টাকাগুলোর নিরাপদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সেটা যে ব্যাংকে তিনি রেখেছিলেন সেখান থেকে মিঃ মরিন পুরো টাকাটাই স্বর্ণমুদ্রায় তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। অতএব দেখা যাচ্ছে, মিঃ মরিন-এর মনে অসৎ উদ্দেশ্য ভর করেছিল। অবশ্য সেজন্য মাদাম তিবোলত্-এর কিছুমাত্র সান্ত্বনা ছিল না।

মিঃ মরিন-এর বন্ধুবান্ধব আর আইন বিভাগের কর্তৃপক্ষ নিরাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিল। এবার দুমার্স আর রবিন্স নিজ নিজ পত্রিকার প্রতিনিধি হিসাবে তদন্তের কাজে নামল। শুরু করল জোর কদমে তদন্ত।

দুমার্স বলল, 'চার্সেস লা মে ফেমি।'

তার বন্ধুবর রবিন্স তার কথায় সায় দিল।

তারপর রবিন্স দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, শোন, চিরন্তন নারীতে পৌঁছবার পর সব পথই শেষ হয়ে যায়। যত কষ্টই হোক না কেন, সে নারীর হদিস আমাদের পেতেই হবে।

দুমার্স আর রবিন্স মিঃ মরিন-এর হোটেলের বেল বয় থেকে শুরু করে মালিক পর্যন্ত সবার কাছে হাজির হয়ে টাকাটার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করল। তাদের যার কাছ থেকে যেটুকু খবর সংগ্রহ করা সম্ভব হল জেনে নিল।

তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে এসে শিষ্টতা এবং সাধ্যমত দৃঢ়তার সঙ্গে মৃত মরিণ-এর পরিবারবর্গ এবং নিকট আত্মীয়দের একের পর এক জেরা করতে লাগল। কিন্তু এবারও তাদের প্রয়াস ব্যর্থ হল।

এবার তারা মৃত স্বর্ণকার মরিন-এর দোকানের কর্মচারীদের নিয়ে পড়ল। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অথচ সাধ্যমত কৌশলে তাদের সঙ্গে কথা বলে টাকাগুলোর হদিস পাওয়ার জন্য চেষ্টা চালাল। খবর জোগাড় করার জন্য তারা দোকানের ক্রেতাদের পাকড়াও করতেও ছাড়ল না।

সত্যি কথা বলতে কি, দুমার্স আর রবিন্স শিকারী কুকুরের মত গন্ধ শুকে শুকে অপরাধীর সম্ভাব্য প্রতিটা পথ, প্রতিটা পদক্ষেপ বছরের পর বছর ধরে মরিয়া হয়ে অনুসরণ করে চলল। তবু আশাপ্রদ কোন সূত্র খুঁজে পেল না।

সম্ভাব্য সবরকম কৌশল অবলম্বন করে হন্যে হয়ে চেষ্টা চালাবার পরও মিঃ মরিন সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্কই রয়ে গেল। তার গয়ে সামান্যতম কালির ছিটাও দেওয়া সম্ভব হল না।

মৃত মরিন'-এর কাঁধে শেষ চাপানোর মত সামান্যতম একটা দুর্বলতা, সততার পথ থেকে মুহূর্তের জন্য পদস্খলন বা কোন নারীর প্রতি তার আসক্তির সামান্যতম আসক্তির ইঙ্গিতও দুমার্স বা রবিন্স খুঁজে পেল না।

উপরন্তু দীর্ঘদিন ধরে বহু জায়গায় তদন্ত চালিয়ে তারা যে তত্ত্ব আবিষ্কার করল তা হল, মৃত মরিন-এর জীবনযাত্রা ছিল একজন সত্যিকারের সন্ন্যাসীর মত, নিয়মের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তার কাজকর্মের প্রতিটা মুহূর্ত এবং পবিত্রতায় ভরপুর। আর স্বভাব ছিল নিতান্তই সহজ সরল, কথাবার্তা ছিল যারপরনাই দিল খোলা।

মৃত মরিন'কে যারা জানত, যারা খুব কাছে থেকে দেখেছে তারা সবাই একবাক্যে মন্তব্য করল, লোকটা ছিল যথার্থই উদারচেতা, দায়পরায়ণ, দানশীল এবং শিষ্টাচারের প্রতীক।

নোট বইটার একটা ফাঁকা পাতায় আঙুল বুলাতে বুলাতে চোখে মুখে হতাশার ছাপ এঁকে, বন্ধু দুমার্স বলল, সবই তো হল, এবার কি করণীয় বল তো?

দুমার্স সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে বলল, চার্সেজ লা ফেমি। একবারটি লেডি বেলেয়ার্স'কে পাকড়াও করা যাক।

লেডি বেলেয়ার্স'কে?

হ্যাঁ, তাকে জোর জেরা করে দেখব ভাবছি।

এ মহিলাটা খুবই চালাক চতুর। আর ক্ষীপ্রতা আর ধূর্ততার বিচারেও তার জুড়ি মেলা ভার। ঘোড়দৌড়ের মাঠে সবার চোখের মণি।

সবচেয়ে বড় কথা লেডি বেলেয়ার্স-এর গতিবিধির কোন বাঁধাধরা ছক নেই। শহরের এমন কয়েকজন আছে যারা কাজ ধরে হেরে গিয়ে হতাশার সুরে বলতে বাধ্য হয়েছে, এ মেয়েমানুষটা কিছুতেই নিখাঁদ সাচ্চা হতে পারে না।

দুই প্রতিবেদক দীর্ঘ শলাপরামর্শ করে শেষ পর্যন্ত কোমর বেঁধে লেগে পড়ল লেডি বেলেয়ার্স'কে বাজিয়ে দেখার জন্য।

প্রতিবেদকদের মুখে মিঃ মরিন-এর কথা শুনেই লেডি বেলেয়ার্স কপালের চামড়ায় বিরক্তির ভাঁজ এঁকে বলে উঠল, কি বললেন, মিঃ মরিন? অবশ্যই না।

দুমার্স জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল লেডি বেলেয়ার্স পূর্ব স্বরেই এবার বলল, 'মিঃ মরিন? না, মশাই, সে ঘোড়দৌড় কেমন তা মিঃ মরিন কোনদিন চোখেও দেখে নি।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ, শতকরা একশ' ভাগই সত্যি বলছি মশাই। আসলে সে এরকম চরিত্রের লোকই ছিল না। এ ব্যাপারে কাউকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, ভাবাই যায় না।

তার মুখে দুই বন্ধু 'লিটল সিস্টার' নামক একটা সংস্থার নাম শুনল।

তদন্ত চালিয়ে জানতে পারা গেল, মিঃ মরিন, এ পরোপকারী এ সংস্থাটাকে খুবই সুনজরে দেখত। হাতে দু'পয়সা এলেই তাকে উদারহাতে দান করত। তারপরও আছে সে ব্যক্তিগত উপাসনা পর্বটা সে সংস্থাতেই নিয়মিত সারত। আর পবিত্র বেদীতে অন্তরের ভক্তি নিঙড়ে দিতে দিলে একবার সেখানে যাওয়া চাই-ই চাই।

সত্যি কথা বলতে কি, জীবনের শেষ সিঁড়িতে পা দেবার পর তার মন সম্পূর্ণরূপে ধর্মানুষ্ঠানের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। জাগতিক ব্যাপার স্যাপারের প্রতি তার তিলমাত্র আকর্ষণও ছিল না।

দুমার্স আর রবিন্স খুঁজতে খুঁজতে 'লিটল সিস্টার' নামক প্রতিষ্ঠানটায় উপস্থিত হল।

গির্জার সদর দরজায় পা দিয়েই তারা দেখতে পেল, এক অতি বৃদ্ধা গির্জা ঝাড়ামোছায় ব্যস্ত।

বৃদ্ধার সঙ্গে কথা বলে তারা জানতে পারল, প্রতিষ্ঠানটার প্রধান সিস্টার ফেলিসিটে। তিন প্রার্থনা কক্ষে ধ্যান মগ্না। একটু বাদেই তিনি সেখান থেকে বেরোবেন।

অনন্যোপায় হয়ে তারা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগল। একটু বাদেই সুদৃশ্য পর্দাটা ধীরে

ধীরে সরে গেল।

পর্দা ঠেলে সিস্টার ফেলিসিটে প্রার্থনা কক্ষ থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। হাড্ডিসার চেহারা। দীর্ঘদেহী। চোখ মুখে অবর্ণনীয় বিষণ্ণতার ছাপ। কালো একটা গাউনে পায়ের পাতা থেকে গলা অবধি ঢাকা। আর মাথায় ভগিনী সম্প্রদায়ের শক্তপোক্ত একটা টুপি। তিনি নিস্তেজ চোখের মণি দুটো মেলে আগন্তুক দু'জনের দিকে তাকাল।

দুমার্স অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে রবিন্স-এর দিকে তাকাল।

রবিন্সই প্রথম মুখ খুলল। সে বলল,

সু-প্রভাত! আমরা সংবাদপত্রের পক্ষ থেকে এসেছি। লেডি, মরিন-এর ব্যাপারটা আশা করি অনেক আগেই আপনি শুনে থাকবেন

সিস্টার ফেলিসিটে-র মুখে বিষণ্ণতার ছাপটুক অধিকতর প্রকট হয়ে দেখা দিল। তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আগন্তুক সাংবাদিকদের দিকে তাকালেন। রবিন্স সাধ্যমত শিষ্টতা ও নম্রতা বজায় রেখেই এবার বলল—দেখুন লেডি, মৃত মরিন-এর প্রতি সুবিচার করতে খোয়া-যাওয়া টাকাগুলোর রহস্যভেদ করা খুবই দরকার বলে আমরা মনে করছি। তাই আপনাকে বিরক্ত করতেই হচ্ছে। আশা করি এ-কাজে আপনার সার্বিক সাহায্য সহযোগিতা থেকে আমরা বঞ্চিত হব না।

মুহূর্তের জন্য নীরব হয়ে, সিস্টার ফেলিসিটের মনোভাব বোঝার চেষ্টা করে আবার বলতে লাগল, দেখুন সিস্টার, মৃত মরিন যে প্রায়ই এখানে, এ গির্জায় আসতেন, সবাই জানে।

এবার যা বলছি, অনুগ্রহ করে ধৈর্য ধরে শুনুন, মৃত মরিন-এর নিত্যকার অভ্যাস, রুচি, প্রিয়জন অর্থাৎ বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি ব্যাপারে যে কোন সত্য বিবরণই তার প্রতি ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সিস্টার ফেলিসিটে-র দিক থেকে কোন কিছু বলার চেষ্টা না দেখে রবিন্স এবার বলল, সিস্টার, আশা করি আমাদের সদিচ্ছার কথা আমি আপনাকে বোঝাতে পেরেছি? আর এ-ও আশা করছি, আপনার সার্বিক সহৃদয় সহানুভূতি থেকে আমরা অবশ্যই বঞ্চিত হব না।

সিস্টার ফেলিসিটে সব কিছু শোনার পর মুখ খুললেন, 'দেখুন, আমি মৃত মরিন সম্বন্ধে যেটুকু জানি স্বেচ্ছায়ই বলব। আর যা কিছু বলব, আমার জ্ঞানত শতকরা একশ' ভাগই সত্য, আশা করি আপনাদের এ বিশ্বাসটুকু থেকে আমি বঞ্চিত হব না।

হ্যাঁ, আমরা আপনার ওপর এটুকু আশা রাখি বলেই এতখানি পথ পাড়ি দিয়ে এখানে ছুটে আসতে উৎসাহী হয়েছি।

তবে আমি আপনাদের বাঞ্ছা পুরোপুরি পূরণ করে আসার পক্ষে সম্ভব হবে কিনা জানি না। কারণ, আমি মৃত মঁসিয়ে মরিন-এর সম্বন্ধে খুব সামান্যই জানি। বলছি শুনুন, মঁসিয়ে মরিন ছিলেন আমাদের এ -প্রতিষ্ঠানের এক সৎ বন্ধু, মনে প্রাণে একজন হিতাকাঙ্ক্ষী। বহুবার তিনি একশ' ডলার পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠানে দান করেছেন।

আশা করি আপনাদের অবশ্যই জানা আছে, ভগিনী সম্প্রদায় একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। বে-সরকারী দানের ওপর একে কাজকর্ম পরিচালনার জন্য নির্ভর করতেই হয়। মোদ্দা কথা, সৎ ও ধর্মপ্রাণ মানুষের সহৃদয় সাহায্য সহযোগিতার ওপর নির্ভর করেই প্রতিষ্ঠানটা আজও নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখে চলেছে।

আর মিঃ মরিন? তিনি গির্জাকে একটা রূপোর মোমবাতিদানি আর বেদীর বহুমূল্য আবরণ বস্ত্র দান করেন অতএব বুঝতেই পারছেন, তিনি ছিলেন যথার্থই একজন ধর্ম অন্তঃপ্রাণ। প্রার্থনা করতে প্রতিদিন তিনি গির্জায় আসতেন। কোন কোন দিন এক ঘণ্টারও বেশী সময় তিনি এখানে কাটিয়ে যেতেন।

রবিন্স প্রায় অস্ফুট উচ্চারণ করল, হুম!'

সিস্টার ফেলিসিটে বলে চললেন, মৃত মরিন ছিলেন একনিষ্ঠ ক্যাথলিক। সত্যি কথা বলতে কি, তাঁর প্রাণ ছিল পবিত্রতায় উৎসর্গীকৃত। গির্জার প্রার্থনা কক্ষে কুমারী মাতার যে মূর্তিটা আছে সেটা তিনিই আমাদের উপহার দিয়েছেন। বললে বিশ্বাস করবেন কিনা, জানিনা ; ওই মূর্তিটার মডেল তৈরি থেকে ঢালাইয়ের কাজ পর্যন্ত সবই তিনি নিজের হাতে সম্পন্ন করেছেন। উফ্!

এরকম একজন সজ্জনকে সন্দেহ করাটা খুবই নিষ্ঠুর কাজ নয় কি?

মৃত মরিন-এর ওপর সন্দেহ, দোষারোপ করায় রবিন্স যারপরনাই মর্মাহত হল।

তবে এ-ও তো সত্য যে, মৃত মরিন মাদাম তিবোলত্-এর টাকাগুলো কোন্ কাজে বা অ-কাজে খরচ করেছে সে রহস্য ভেদ না করা অবধি কুৎসার জিভকে বন্ধ করার চিন্তাই করা যায় না।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, প্রবাদও বলা যেতে পারে, এ রকম কাজের সঙ্গে কোন না কোন মহিলা জড়িত থাকে। পুরোপুরি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই বলছি, যদি এমনটা হয়, তবে—' সিস্টার ফেলিসিটে চোখ দুটোকে ইয়া বড় করে, গম্ভীর মুখে রবিন্স-এর দিকে তাকাল। আরও কয়েক মুহূর্ত নীরবতার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে সিস্টার ফেলিসিটে আবার মুখ খুললেন, 'দেখুন, এমন একটামাত্র নারী ছিলেন মৃত মরিন যার কাছে মাথা নত করেছিলেন, মানে যাকে তিনি নিজের হৃদয় দিয়েছিলেন, আত্মসমর্পণ করেছিলেন।

রবিন্স-এর চোখ দুটো হঠাৎ জ্বলজ্বল করতে লাগল। অবর্ণনীয় উল্লাসে মেতে সে হাতের পেন্সিলটাকে বার বার নাড়াতে লাগল।

সিস্টার ফেলিসিটে হঠাৎ দৃঢ়স্বরে বলে উঠলেন, 'সে নারীকে চাক্ষুষ করতে চান?

উল্লসিত হয়ে রবিন্স বলে উঠল, অবশ্যই, অবশ্যই!

সিস্টার ফেলিসিটে এবার হাত বাড়িয়ে পাশের প্রার্থনা কক্ষের পর্দাটা ধীরে ধীরে সরিয়ে দিলেন।

রবিন্স পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখল, ভেতরে সুদৃশ্য পবিত্র বেদী, জানালার কাঁচ ভেদ করে আসা মৃদু আলোয় সেটা উদ্ভাসিত।

আর? পাথরের দেওয়ালের সুবিশাল কুলুঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে কুমারী মাতা মেরি-র মূর্তি। সোনালি তার রঙ। চমৎকার দেখতে।

ক্যাথলিক দুমার্স এ কাজটার নাটকীয়তায় অভিভূত হয়ে পড়ল। চোখে-মুখে ফুটে উঠল ভাবাবেগের ছাপ। মুহূর্তেই মাথাটা সাধ্যমত নুইয়ে বুকে ক্রুশ চিহ্ন আঁকল।

রবিন্স কিছুটা বিমূঢ় হয়ে পড়ল। সে প্রায় অস্ফুট স্বরে ক্ষমা চেয়ে ধীর পায়ে সেখান থেকে বেরিয়ে বাইরে চলে গেল।

কয়েক মুহূর্ত পর্দাটা ধরে রেখে সিস্টার ফেলিসিটে ধীরে ধীরে পর্দাটা ছেড়ে দিলেন।

চাপা দীর্ঘশ্বাস পেলে সাংবাদিক দু'জন সিস্টার ফেলিসিটে-র কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গীর্জা ছেড়ে বেরিয়ে এল।

গির্জা থেকে বেরিয়ে তারা বোন্‌হোম স্ট্রীটের সরু পথটায় হাজির হল। পথের পাশে দাঁড়িয়ে রবিন্স একটা বাজে কথার মাধ্যমে রসিকতা করল। তারপর দুমার্সকে বলল, 'সবই হল, এবার? এবার কি গির্জার মেয়ে?

ধ্যুৎ! কিছু সময়ের জন্য গির্জা আর মেয়েটেয়ের ব্যাপার মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও তো।

তবে?

তবে আর কিছু নয়। এখন চল কোথাও গিয়ে একটু কড়া কোন পানীয়ের বোতল নিয়ে বসে মেজাজটা চাঙা করে নেওয়া যাক।

খোয়া যাওয়া টাকাকড়ির অতীত কাহিনী তো কিছুটা আলোচনা করাই হল। এবার মাদাম তিবোলত্-এর কথাগুলো শুনে রবিন্স-এর মাথায় হঠাৎ যে মতলবটা খেলে গিয়েছিল সে কথায় আসা যাক।

আচ্ছা, এটা কি খুবই উদ্ভট অনুমান যে, সে ধর্মোন্মাদ নিজের সব অর্থ, যথা সর্বস্ব, নাকি মাদাম তিবোলত্-এর অর্থ তার অত্যুগ্র ভক্তির ধারাটাকে অব্যাহত রাখতেই ব্যয় করে দিয়েছিল? ঈশ্বর, পূজা-অর্চনার জন্য এর চেয়ে অত্যাশ্চর্য কাজের নিদর্শন আছে।

চিন্তা করে দেখাই যাক না, এ কাজ কি সম্ভব নয় সে খোয়া-যাওয়া কয়েক হাজার ডলার গালিয়েই চকচকে মূর্তিটাকে গড়ে তোলা হয়েছিল?

সেদিন বিকেল রবিন্স ঝটপট তৈরি হয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তার গন্তব্য স্থল, সিস্টার্স অব সামরিয়া-র গির্জা। সে গির্জার দরজা দিয়ে যখন ভেতরে ঢুকছে তখন ঘড়িতে বিকেল তিনটে বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি।

গির্জার ভেতরে তখন আধো আলো আধো অন্ধকার। আবছা আলোয় রবিন্স দেখল, নিলাম ডাকার জন্য শ'খানেক লোক হাজির হয়েছে। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে অধিকাংশই বিভিন্ন ধর্ম প্রতিষ্ঠান। পাদরি আর গির্জার লোকজন যারা গির্জার বিভিন্ন জিনিস নিলামে কিনে নিয়ে যাওয়ার জন্য জড়ো হয়েছে। তাদের এরকম ইচ্ছার পিছনে কারণ হচ্ছে, যদি গির্জার জিনিসগুলো সাধারণ মানুষের হাতে পড়ে অপবিত্র হয়ে যায় এটাই তাদের আশঙ্কা।

আর অন্যান্য যারা গির্জায় জড়ো হয়েছে তারা হচ্ছে ব্যবসায়ী ও এজেন্ট। সাধারণ মানুষ নেই বললেই চলে।

নিলাম ডাকার কাজ শুরু হল। দেখতে দেখতে কয়েকটা ছোটখাট জিনিস বিক্রি হয়ে গেল।

এবার দু'জন সহকারী ধরাধরি করে কুমারী মার্তার সবার সামনে এনে রাখল।

নিলাম ডাকা শুরু হতেই প্রথম ডাক দিল—দশ ডলার।

পরমুহূর্তেই ধর্মযাজকের পোশাক পরিহিত একজন সুঠামদেহী গাট্টাগোট্টা মানুষ ডাক দিল, পনের।

ভিড়ের ভেতর থেকে কেউ একজন হেঁকে বলল—বিশ।

এভাবে একের পর এক ডাকের মাধ্যমে পঞ্চাশ ডলার উঠে গেল।

রবিন্স চারদিকে চোখে মণি দুটো একবার বুলিয়ে নিয়ে হেঁকে উঠল—এক শ'—এক শ' ডলার।

অন্য আর একজন গলা ছেড়ে বলল—এক শ' পঞ্চাশ ডলার।

রবিন্স সাধ্য মত গলা ছেড়ে হাঁকল—দু' শ—দু' শ' ডলার।

অন্য এক প্রতিযোগী মুহূর্তমাত্র দেরী না করে ডাক দিল দু' শ' পঞ্চাশ।

আবার রবিন্স-এর গলা শোনা গেল 'তিন শ'।

অন্য কণ্ঠটা গলা চড়িয়ে হাঁকল তিন শ' পঞ্চাশ।

এভাবে মূর্তিটার দাম ক্রমেই উর্ধ্বমুখী হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত রবিন্সের দেওয়া শেষ ডাকের সাধ্য সেই মূর্তিটার নিলাম শেষ হল।

রবিন্স মূর্তিটার জন্য দেয় অর্থ আনার জন্য ছুটে বেরিয়ে গেল। ইতিমধ্যে দুমার্স ভিড় ঠেলে মূর্তিটার কাছাকাছি চলে এসেছে। সে মূর্তিটার কাছে দাঁড়িয়ে রইল।

একটু বাদেই বহুমূল্য বস্তুটাকে গাড়িতে উঠিয়ে দুমার্স আর রবিন্স সোজা চলে গেল, পুরনো চার্টেস স্ট্রীটে দুমার্স-এর বাড়ি।

গাড়ি থেকে নেমে মূর্তিটাকে পরিষ্কার কাপড়ে জড়িয়ে বহু কষ্টে দুমার্স আর রবিন্স ধরাধরি করে ওপরে তুলে নিল। শক্ত পোক্ত একটা টেবিলের ওপর সেটাকে তুলে রাখল।

মূর্তিটার ওজন একশ' পাউন্ড। দুমার্স আর রবিন্স হিসাব নিকাশ করে দেখল, মূর্তিটার দাম বিশ হাজার সোনার ডলার তো হবেই।

রবিন্স খুবই সতর্কতার সঙ্গে মূর্তির ঢাকনাটা খুলে ফেলল। তারপর কোটের পকেট থেকে ছুরি বের করল। রবিন্স-এর কাণ্ড দেখে দুমার্স রীতিমত হায় হায় করে উঠল—আরে করছ কি! করছ কি! এটা যে ভগবান খ্রিষ্টের জীবনী তুমি এটা করছ কি, নিজেই জান না।

রবিন্স ধমকের সুরে হলেও ঠাণ্ডা গলায়ই বলল ধ্যুৎ! ঘেনর ঘেনর না করে চুপ করে দেখ, কি করছি। অনেক দেরী হয়ে গেছে। এখন আর তোমার উদ্ধারের কোন পথই খোলা নেই।

রবিন্স শক্ত হাতে ছুরির ফলা চাপিয়ে মূর্তিটার কাছ থেকে ছোট্ট একটা টুকরো খসিয়ে নিল। এবার দেখা গেল সোনার পাত দিয়ে মোড়া বিবর্ণ, ছাই রঙের একটা ধাতব পদার্থ।

দুমার্স কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে নীরবে রবিন্স-এর কাণ্ড কারখানা দেখতে লাগল।

রবিন্স এবার হাতের ছুরিটা মেঝেতে ফেলে দিল। ঘাড় ঘুরিয়ে দুমার্স-এর দিকে তাকিয়ে বলল—সীসা। সোনার পাত দিয়ে মোড়া সীসা।

ধ্যুৎ! ছাড়ান দাও তো। ওটা জাহান্নামে যাক। দুমার্স বলল— শোন, আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাবার জোগাড় হয়েছে।

কেন? তবে কি করতে চাচ্ছ?

শোন, এ পরিস্থিতিতে আমার এক বোতল কড়া মদ না হলে আর চলছে না।

মুচকি হেসে রবিন্স বলল—একটু বাদে হলে চলবে না?

না, এখনই, এ মুহূর্তেই যা হোক একটা পানীয় আমার চাই।

বহুৎ আচ্ছা। চল বন্ধু, আগে তোমাকে ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা করি।

দুই জনে হাঁটতে হাঁটতে মাদাম তিবোলত্-এর রেস্তোরাঁয় হাজির হল। আগেই বলা হয়েছে রেস্তোরাঁটা দুটো স্কোয়ারের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত।

রবিন্স আর দুমার্স রেস্তোরাঁর সদর-দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। দীর্ঘদিনের অভ্যাসমত তারা ঘরে কোণের দিককার টেবিলটায় বসার জন্য এগোতে লাগল।

তাদের দেখেই মাদাম তিবোলত্ নিজের চেয়ার ছেড়ে ব্যস্ত পায়ে এগিয়ে গেল। হাসতে হাসতে সে বলল—আজ আর আপনাদের এসব টেবিলে বসার দরকার নেই। আপনারা বরং—।

রবিন্স কপালের চামড়ায় পর পর কটা ভাঁজ এঁকে সবিস্ময়ে বলে উঠল—বসব না। সে কী, আমরা তো অধিকাংশ দিন ওই টেবিলটায়ই বসি।

হ্যাঁ, তা সে বটে। কিন্তু আজ আর বসবেন না।

তবে? আমরা তবে কোথায় বসব?

আপনাদের জন্য আজ ভেতরের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চেয়ার-টেবিল সবই আছে।

আজ আমাদের এত সমাদর করার উদ্দেশ্য কি জানতে পারি কি?

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মাদার বলল আরে, কারণ আবার কি, কিছুই না। আমার ইচ্ছে হয়েছে আজ আপনাদের আমি নিজের হাতে খাবার পরিবেশন করে খাওয়াব।

মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে তারা প্রায় সমস্বরেই বলে উঠল—আজ আপনাদের জন্য আমি নিজে হাতে খাবার তৈরি করেছি, পানীয় সাজিয়ে রেখেছি। আপনাদের তো আর অজানা নয়, বন্ধুদের মানে মনের মানুষদের আমি নিজে পরিবেশন করে খাওয়াতে ভালবাসি। এ পথে—এ দিকে। দয়া করে আমার পিছন পিছন চলে আসুন।

মাদাম তিবোলত্ রবিন্স আর দুমার্সকে তোয়াজ করে পিছন দিককার ছোট একটা সাজানো গোছানো ঘরে নিয়ে গেল। তারা বুঝতে পারল, বিশেষ বিশেষ খদ্দেরদের সে এখানে পানাহারের জন্য নিয়ে আসে। ঘরের মধ্যে গোধূলির হাল্কা আলো জানালা দিয়ে ঢুকে এসেছে। ভাল কাঠের চেয়ার-টেবিলগুলো বার্নিশ করা। বিদায়ী সূর্যের শেষ রক্তিম আভার ছোঁয়া পেয়ে আসবাবপত্রগুলো চকচক ঝকঝক করছে। পাশের ছোট উঠোন থেকে ঝর্ণার ঝিরঝির শব্দ আর বিকেলের মৃদুমন্দ বাতাস ঘরে ঢুকে আসছে।

রবিন্স, স্বভাবে গোয়েন্দা—ঘরটার ভেতরে পা দিয়েই এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। অনুসন্ধিৎসু তার দৃষ্টি। সভ্যতা ভব্যতা বর্জিত পূর্বসূরীদের কাছ থেকে মাদাম তিবোলত্ পেয়েছে মোটা দাগের সাজসজ্জার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ।

ঘরটার দেওয়ালে সস্তাদামের কয়েকটা ছবি টাঙিয়ে রাখা হয়েছে। দেওয়ালের গায়ে আর যা কিছু দেখা গেল জন্মদিন-উৎসবের নিমন্ত্রণপত্র, বিজ্ঞাপনের জমকালো নমুনা আর খবরের কাগজের চোখে লাগার মত কয়েকটা বিভিন্ন মাপের ছবি। মনোলোভা জমকালো ছবিগুলোর মধ্যে কয়েকটাতে দুর্বোধ্য তাপ্পিমারা হয়েছে যা রবিন্স-এর কৌতূহল মিশ্রিত অনুসন্ধিৎসু নজরে ধরা পড়ে গেল।

রবিন্স সবে চেয়ারে বসেছে। আবার ঝট্ করে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। আসলে তার অত্যুগ্র কৌতূহলই তাকে স্থির হয়ে বসে থাকতে দিল না। দেওয়ালে আঁটা ছবিগুলো ভালভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার আগ্রহের শিকার হয়ে সে গুটিগুটি এগিয়ে গেল।

সে দেওয়ালের দিকে এগিয়ে, ছবিগুলোব মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটা-একটা করে ছবি খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে এক সময় সবিস্ময়ে বলে উঠল—আরেব্বাস!

দুমার্স সচকিত হয়ে রবিন্স-এর দিকে মুখ তুলে তাকাল। তার চোখে-মুখে ফুটে উঠল গভীর উৎকণ্ঠা আর জিজ্ঞাসার ছাপ।

রবিন্স বলতে লাগল—আরেব্বাস, মাদাম! কবে থেকে যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা চারভাগ সুদের পাঁচ হাজার ডলারের স্বর্ণবস্তু ব্যবহার করে দেওয়াল সাজানোর কৌশল ও অভ্যাস শিখেছেন!

সত্যি করে বলুন তো মাদাম, এটা কি গ্রিমের রূপকথা থেকে নেওয়া কিছু দৃশ্য, নাকি আমার চোখের দোষ দেখা দিয়েছে, চোখের ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে?

রবিন্স-এর কথা শুনে দুমার্স আর মাদাম তিবোলত্ এগিয়ে এসে তার পাশে দাঁড়াল।

মাদাম হেসে বলল মঁসিয়ে রবিন্স কি বলছেন। উফ্! ওই রঙচঙে কাগজের টুকরোগুলোর কথা বলছেন? আসল ব্যাপার কি জানেন? দেওয়ালের জায়গাগুলোর পলেস্তারা খসে গেছে। আর সেগুলো চাপা দেওয়ার জন্যই এখান-ওখান থেকে ছবি আর রঙচঙে কাগজ কেটে আঁঠা দিয়ে সেঁটে দিয়েছি। কথাটা বলেই সে হাসতে লাগল।

ভাল কথা, কিন্তু এগুলো কোথায় পেলেন, বলবেন কি?

ও, এই কথা? এগুলো কোথায় পেলাম? হ্যাঁ, ঠিকই, আমার মনে পড়েছে। মঁসিয়ে মোরা একদিন আমার এখানে বেড়াতে এসেছিলেন।

মুহূর্তের জন্য নীরবে ভেবে নিয়ে আবার বলতে শুরু করল—হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে। মঁসিয়ে মোরা একদিন আমার বাড়ি এসেছিলেন। তা ধরুন, মারা যাবার প্রায় এক মাস আগের কথা।

তখন কি ওই টাকা সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে কোন কথা হয়েছিল কি?

হ্যাঁ, হয়েছিল বটে।

কি কথা, মনে আছে কিছু?

তা থাকবে কেন? তিনি তখন আমাকে বলেছিলেন, মানে কথা দিয়েছিলেন যে, ওই টাকাগুলো তিনি আমার নামে বিনিয়োগ করে দেবেন। আর মঁসিয়ে মেরিন দেওয়ালের ওই টুকরো কাগজগুলো টেবিলে রেখে ওই টাকাগুলো সম্বন্ধে কি যেন বললেন।

কি বললেন, মনে আছে?

না, আসলে তাঁর বক্তব্য আমি বুঝতেই পারিনি। তবে ওই টাকাগুলো আমি চোখেই দেখি নি। মঁসিয়ে মোরা লোকটা খুবই খারাপ, একেবারে হতচ্ছাড়া। আচ্ছা, ওই কাগজগুলোকে আপনারা বন্ড, নাকি কি যেন বলে থাকেন? হ্যাঁ, মনে পড়েছে, বন্ড! বন্ডই বলেন, তাই না?

মঁসিয়ে রবিন্স তাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে গিয়ে দেওয়ালের গায়ে সাঁটা চারটে বন্ডের চারদিকে বুড়ো আঙুলটা বুলোতে লাগল। তারপর মুখ খুলল

আরে, তুমি তো জান না, তোমার দশ হাজার ডলার, কুসনগুলো এখানে ছবিগুলোর সঙ্গেই আটকানো।

তাই নাকি! চোখ দুটো কপালে তুলে মাদাম তিবোলত্ বলল।

রবিন্স এবার দেওয়ালের কাগজগুলোর দিয়ে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলল—শোন, তোমাকে এক কাজ করতে হবে। এক বিশেষজ্ঞকে তলব করে আনতে হবে।

বিশেষজ্ঞ? কোন্ বিশেষজ্ঞ? কি দরকার, বলুন তো?

বিশেষজ্ঞের দরকার এ জন্যই যে, খুবই সতর্কতার সঙ্গে ওই কাগজগুলো তোলার ব্যবস্থা করতে হবে। আর একটা কথা, মিঃ মরিন কিন্তু ঠিক কাজই করেছিলেন।

মাদাম তিবোলত্ ব্যাপারটা নিয়ে গভীর মনোযোগ সহকারে ভাবতে লাগলেন।

রবিন্স এবার বলল—মাদাম, আপনার সঙ্গে বক বক করতে করতে আমার মাথা গরম হয়ে গেছে। কান দুটো দিয়ে আগুনের হল্কা বেরোচ্ছে। বাইরে গিয়ে গায়ে একটু মুক্ত বাতাস লাগিয়ে আসছি।

কথাটা শেষ করতে না করতেই সে ডুমার্স-এর হাত ধরে প্রায় টানতে টানতে ঘরের বাইরে নিয়ে চলে গেল।

মাদাম গলা ছেড়ে সিমি আর নিকোলেটকে ডাকল। তারপর দেওয়ালের গায়ে সাঁটা কাগজগুলোর গায়ে হাত বুলিয়ে দেখতে দেখতে স্বগতোক্তি করল—আমার একমাত্র সম্বল, আমার সম্পত্তি সবার সেরা মানুষ, মনে-প্রাণে সাধু-সজ্জন, গৌরবময় মানুষ মঁসিয়ে মেরি আমাকে, আমার অজান্তে ফিরিয়ে দিয়ে গেছেন। একটা কানা কড়িও আত্মসাৎ কল্লেন নি। ঈশ্বর তোমার সহায় হোন!

রবিন্স ঘরে গিয়ে ডুমার্সকে বলল—শোন, কাজ হাসিল। আমি এবার দিন তিনেকের জন্য

আনন্দ-ফুর্তি করতে চললাম। আমার অনুরোধ যদি শোন তুমিও আমার সঙ্গে চল। মনটাকে একটু চাঙ্গা করে ফিরবে।

সে না হয় হল। আমার কথা না হয় ছাড়ানই দিচ্ছি। কিন্তু তোমার পত্রিকা 'পিক'-এর কাজকর্ম।

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সে বলে উঠল—আরে, মাত্র তো তিনটে দিনের মামলা। আমার সেবা ছাড়াই পিক ঠিক গড়গড় করে চলে যাবে। দুমার্স সরবে হেসে উঠল।

রবিন্স এবার বলল—শোন বন্ধু, তোমার ওই সবুজ জোলো মাল যেটা তুমি গলা অবধি গেল সেটা মোটেই এক নম্বর মাল নয়। সেটা চিন্তাকে জোরদার করে দেয়।

হ্যাঁ, তা বটে।

এখন আমার দরকার এমন এক কড়া কোন মাল যা মানুষকে সবকিছু ভুলিয়ে বুঁদ করে রাখে। এবার কি বলছি শোন, সেই একমাত্র মহিলার সঙ্গে আমি তোমার পরিচয় করিয়ে দিতে চাচ্ছি যার পক্ষে সে আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটা এনে দেওয়া সম্ভব।

তার কি নাম, বলত?

তার নাম বেলে অব কেন্টাকি। আরে বন্ধু বারো বছরের পুরনো 'বুর্বন'। দুমার্স জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

রবিন্স তার কাঁধে মৃদু চাপ দিয়ে এবার বলল আরে বন্ধু, খাসা মাল। যাকে বলে একেবারে জব্বর। তিন পোয়া বোতলে ভর্তি. এবার বলত তোমার কাছে ব্যাপারটা কেমন মনে হচ্ছে? কি বন্ধু, চলবে তো?

চলবে বলছ কি! চল, এখনই যাওয়া যাক। দুমার্স চার্সেজ লা ফেমি।

এ ডাবল ডাইড ডিসিভার

লানো কিড-এর জন্যই ল্যারেডোতে গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেল। হ্যাঁ, দোষটা তো অবশ্যই তার। কারণ, তার মানুষ হত্যা করার নেশা, মানে অভ্যাসটাকে মেক্সিকোর মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা দরকার ছিল। কিন্তু সে অবশ্যই নিজেকে সংযত রাখার, অভ্যাসটার লাগাম টেনে রাখার চেষ্টা করল না।

কিড-এর বয়স কুড়ি বছর পেরিয়ে গেছে। আর কুড়ি বছরেও তার তালিকায় যদি কেবলমাত্র মেক্সিকোবাসীদের নামই থাকে তবে তো রিও গ্রান্ডের সীমানায় সবার চোখের আড়ালে ফুটে ওঠার মত ব্যাপারই বটে। কিড অবশ্যই নিজেকে নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখল না।

ডাস্টো ভালডোর জুয়ার আড্ডায় ঘটনাটা ঘটল। একটা তাসের আড্ডায়, মানে 'পোকার' খেলার আড্ডায় শুধু যে কেবলমাত্র ইয়ার দোস্তরাই উপস্থিত থাকে তাই নয়, এ খেলায় অংশ গ্রহণ করতে বা খেলা দেখার অত্যুগ্র আগ্রহ নিয়ে বহু দূরবর্তী অঞ্চল থেকে উৎসাহীরা ঘোড়া হাকিয়ে হাজির হয়।

হ্যাঁ, ভেবে দেখলে ব্যাপারটা সত্যি খুবই মামুলি। এক জোড়া বিবির ব্যাপার। আর তাদের নিয়েই যত গণ্ডগোল, কথা কাটাকাটি মন কষাকষি, হাতাহাতি এমন কি খুনোখুনি পর্যন্ত গড়ায়।

ব্যাপারটা মিটে গেলে বিচার বিবেচনা করে দেখা গেল, কিড একটা অবিবেচকের কাজ করে ফেলেছিল আর তার প্রতিদ্বন্দ্বীপক্ষ ভীষণ রকমের একটা ভুল করেছিল।

হতভাগা প্রতিদ্বন্দ্বীটা ছিল এক পশুপালন খামারের মালিকের ছেলে। তার বয়স প্রায় কিড-এরই সমান। তবে তার সাকরেদদের সংখ্যাও ছিল অনেক।

গণ্ডগোল চরমে উঠে গেলে সে অগ্নিমূর্তি ধারণ করে যখন বন্দুকের ঘোড়ায় টিপ দিয়েছিল তখন তার গুলিটা বিকট আওয়াজ তুলে আচমকা কিড-এর ডান কানের একেবারে গা-ঘেঁষে, এক ইঞ্চির মাত্র ষোল ভাগের এক ভাগ দূরত্বে আঘাত করেছে।

ব্যস, চোখের পলকে প্রতিহিংসাকামীরা জড়ো হয়ে গেল। তারা হৈ হৈ করে তার খোঁজে

বেরিয়ে পড়ল। প্রতিপক্ষের তিনজন গাট্টাগোট্টা যুবক স্টেশন থেকে সাড়ে পাঁচ গজের ব্যবধানের মধ্যেই তাকে পাকড়াও করে ফেলল।

শত্রুপক্ষের তিন যুবকের বেষ্টনীর মধ্যে দাঁড়িয়ে কিড দাঁত বের করে হাসতে লাগল সেটা সে কোন উদ্ধত আচরণ বা হিংস্র আক্রমণ শুরু কারার আগে করে থাকে। এটা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। হাতটাকে সে অস্ত্রটার কাছাকাছি আনার আগেই প্রতিপক্ষ অনুসরণকারীরা লেজ গুটিয়ে চম্পট দিল।

তাই সে মতলব আটল অকারণে সময় নষ্ট না করে দূরবর্তী কোন স্থানে চলে যাবে। নিরাপদ আশ্রয়ে গিয়ে নরম ঘাসের বিছানায় টানটান হয়ে শুয়ে রৌদ্রতাপের সঙ্গে মোকাবেলা করবে সুখের ওপর একটা রুমাল চাপা দিয়ে। ব্যস, তারপরই একটা লম্বা ঘুম দিয়ে কাটিয়ে দেবে কয়েকটা ঘণ্টা।

মতলবটাকে বাস্তবায়িত করতে কিড লম্বা-লম্বা পায়ে স্টেশনে ঢুকে গেল। প্লাটফর্মে উত্তরগামী একটা যাত্রীবাহী ট্রেনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। মুহূর্তমাত্র দেরী না করে সে একটা কামরায় উঠে পড়ল। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বিকট স্বরে সিটি দিয়ে হিস্ হিস্ আওয়াজ করতে-করতে ট্রেনটা প্লাটফর্ম ছেড়ে এগিয়ে যেতে লাগল।

গলগলে কালো ধোঁয়া উড়িয়ে মাইল কয়েক দূরবর্তী ফ্ল্যাগ-স্টেশনে ট্রেনটা থামতে না থামতেই এভাবে পালিয়ে গিয়ে গা-ঢাকা দেওয়ার ধাক্কাটা সে মাথা থেকে মুছে ফেলল।

সামনেই বহু টেলিগ্রাফ স্টেশন আছে। কিন্তু বিদ্যুৎ ও বাষ্পের প্রতি তার সামান্যতম আকর্ষণও নেই। মোটেই আনন্দ পায় না। জিন আর রেকাবই তার নিরাপত্তার সবচেয়ে বড় অবলম্বন সহায়ক। তেজি ঘোড়া ছাড়া অন্য কিছুর ওপর নির্ভর করতে সে তিলমাত্র উৎসাহও পায় না।

সে যে লোকটাকে খুন করে এখানে পাড়ি জমিয়েছে সে তার ইয়ারদোস্ত তো নয়ই, এমন কি পরিচিতও নয়। এর আগে কোনদিন দেখেছে বলেও মনে পড়ছে না।

তবে এটা কিন্তু মিথ্যা নয়, সে যে হিডলগোর কোরালিটস বংশের ছেলে এটা তার জানা ছিল। আর এ-ও জানত যে, সে অঞ্চলের পশুপালন খামার থেকে আসা ঘোড়া-দাগানেরা খুবই দুর্ধর্ষ প্রকৃতির। স্বীকার করতেই হবে, কেন্টাকির যুদ্ধবাজদের চেয়ে তারা অনেক, অনেক বেশী হিংস্র, নিষ্ঠুর আর যে কোন উপায়ে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে দ্বিধা করে না।

তাই তো সে ঝট্ করে মনস্থ করে ফেলল, কোরালিটিস প্রতিহিংসা চবিতার্থ করার তীব্র ইচ্ছা আর তার নিজের মধ্যে ব্যবধান যত শীঘ্র যত বেশী বৃদ্ধি করা যায় ততই তার পক্ষে নিরাপদ।

স্টেশন চত্বর থেকে বেরিয়েই একটা দোকান কিড-এর নজরে পড়ল। দোকানের কাছেই দেখতে পেল একটা ঝোপ। লতা পাতার ঝোপটার দিকে কয়েক পা এগোতেই সে দেখতে পেল খদ্দেররা জিন-আঁটা ঘোড়াগুলোকে বেঁধে রেখে দোকানে বসে হাসি মস্করায় মেতে রয়েছে। ঘোড়াগুলির দিকে তাদের নজর নেই। আর থাকবেই বা কেন? এটা যে তাদের বহুদিনের অভ্যাস।

ঘোড়াগুলোর মধ্যে অধিকাংশই মাথা নামিয়ে ঝিমোচ্ছে। আর লম্বা ঠ্যাংওয়ালা, গলায় ফুটিফুটি দাগযুক্ত নাদুসনুদুস একটা ঘোড়া ঘাড়টা এক পাশে বাঁকিয়ে নাক দিয়ে ভুস্ ভুস্ করে শ্বাস ফেলতে ফেলতে মাটিতে অনবরত পা ঠুকে চলেছে।

কিড ঘোড়াটার ওপর মুহূর্তের জন্য চোখ বুলিয়েই বুঝে নিল, এর ওপর নির্ভর করা যেতে পারে বটে। ব্যস, একবারটি দোকানের খদ্দেরদের দিকে অনুসন্ধিৎসু নজরে তাকিয়ে নিয়েই সে এক লাফে তার পিঠে চেপে বসল।

কিড হাঁটু দিয়ে পেটের দু' পাশে গোত্তা মেরে, মালিকের চাবুকটা দিয়েই বার-বার তার পিঠে আঘাত হানতে লাগল।

একটা কথা খুবই সত্য যে, সৎ এবং সুনাগরিক হিসাবে তার যথেষ্ট খ্যাতি আছে। একজন বে-আদব দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীর ফাসুরেকে হত্যা করায় তার গায়ে কাদার ছিটা লেগেছে, ব্যস। এ কাজটার মাধ্যমে তার চরিত্রে একটা গাঢ় কালো দাগ পড়ল।

তবে এও সত্য যে, রিও গ্র্যান্ডের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে একটা মানুষকে খতম করে দিলেও তেমন কোন ব্যাপারই নয়। খুবই মামুলি একটা ব্যাপার মাত্র।

কিন্তু লোকটার ঘোড়াটা নেওয়ার ফলে এমনও হতে পারে যে, এ ক্ষতিটার জন্যই লোকটাকে হয়ত দরিদ্র করে দেবে। এ ক্ষতিটা সামাল দেওয়া তার পক্ষে বড়ই সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু যে চুরি করল সে-তো আর এটা নিয়ে ধনী হয়ে যাবে না। তবে কথা থেকে যায় যে যদি ধরা পড়ে যায়—

কিন্তু কিড ইতিমধ্যে এতটা পথ পাড়ি দিয়ে ফেলেছে যে, তার পক্ষে আর ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়—এ চিন্তাই আর সে করতে পারছে না।

কালো ঘোড়াটা অপরিচিত সওয়ারকে পিঠে নিয়ে বার বার যেভাবে লাফালাফি করতে লাগল তাতে কিডকে তেমন অসুবিধায় পড়তে হল না। অভিজ্ঞ হাতে লাগাম টেনে ধরে তার বে-আদপিকে সামাল দিয়ে দিল।

উল্কার বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে সে পাঁচ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে এবার উত্তর-পূর্ব দিকে, নুয়েসেস নদীর পথে অগ্রসর হতে লাগল।

সে দেশটা তার খুবই পরিচিত। সেখানকার রাস্তাঘাট তার নখদর্পণে। সে যতবারই গেছে কেবলমাত্র পূর্বদিকেই গেছে। ফলে কোনদিন সমুদ্রের মুখোমুখি হয়নি। আজ পর্যন্ত সমুদ্র দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিতই রয়ে গেছে। তাই বিখ্যাত উপসাগরটাকে চাক্ষুষ করার ইচ্ছা বহুদিন ধরে সে বুকের গোপন অন্তরে চেপে রেখে দিয়েছে।

এক নাগাড়ে তিনদন ঘোড়া ছুটিয়ে সে এক সময় কার্পাস ক্রিস্টির পাড়ে পৌঁছে ঘোড়া দাঁড় করাল। সামনে শান্ত-সুন্দর সমুদ্র। সমুদ্রের ছোট ছোট ঢেউগুলো পাড়ে এসে আছড়ে পড়ছে। কৌতূহলী চোখ মেলে সে সমুদ্রের ঢেউগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকল।

দ্রুতগামী জাহাজ 'পলাতক'-এর কাপ্তেন বুন ছোট নৌকাটার কাছে দাঁড়িয়ে। তার অধীনস্থ এক নাবিক নৌকাটার পাহারায় নিযুক্ত। সে কাছাকাছিই রয়েছে।

জাহাজ ছাড়ার পূর্ব মুহূর্তে কাপ্তেনের হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে, তার অতি প্রয়োজনীয় জিনিস তামাকের চৌকোণা ডিবেটা নৌকায় রেখে চলে এসেছেন। সেটাকে নিয়ে আসার জন্য তিনি তাড়াতাড়ি একজন নাবিককে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর নিজে নৌকোটার কাছাকাছি সমুদ্রেব পাড়ের বালির ওপর হাঁটাহাঁটি করতে লাগলেন। পকেট হাতড়ে সামান্য তামাক বের করে সেটুকু মুখে ছুঁড়ে দিয়ে চিবোতে লাগলেন। নাবিকটা ফিরে না আসা পর্যন্ত তাঁকে এখানেই অপেক্ষা করতে হবে।

উঁচু হিলওয়ালা বুটপরা একটা যুবক ক্রমে এগোতে এগোতে একেবারে জলের কিনারায় চলে এল। তার চেহারাটা একহারা। পেশীবহুল সুঠামদেহী যুবকটার মুখের দিকে হঠাৎ করে তাকালে মনে হয় একটা ছোট্ট ছেলের মুখ বুঝি তার দেহে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে তার অকাল কঠোরতা তার মুখে বিশেষ অভিজ্ঞতার ছাপ ফুটিয়ে তুলেছে।

এক সময় তার গায়ের রঙ বোধ করি কালোই ছিল। কিন্তু ক্রমাগত রোদে পুড়ে পুড়ে সেটা কফির মত বাদামী রঙে পরিণত হয়ে গেছে। ইন্ডিয়ানদের মত মাথার চুলগুলো খাড়া খাড়া আর কালো। আর মুখ? আজ অবধি তার মুখটা ক্ষুরের ছোঁয়া পায়নি। নীলাভ চোখ দুটো শান্ত স্নিগ্ধ।

সে বাঁ-হাতটাকে শরীর থেকে সামান্য দূরে রেখেই হাঁটছে। এর কারণ, মুক্তোখচিত হাতলযুক্ত .৪৫টা সবসময় তার সঙ্গেই থাকে। আর সেটাকে কোটের বাম-বগলে রাখার পক্ষে আকারটাও বড়, একটু বেশিই বড়।

যুবকটার দৃষ্টি বালির ওপর পায়চারিরত কাপ্তেন বুন-এর দিকে নেই। কাপ্তেনকে ছাড়িয়ে তার দৃষ্টি দূরে সমুদ্রের ওপর চক্কর মারছে। তার কৌতূহলী চোখের মণি দুটো সমুদ্রের ছোট-ছোট ঢেউগুলোর সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ। তন্ময় হয়ে সমুদ্রের সৌন্দর্যই উপভোগ করতেই সে ব্যস্ত।

কাপ্তেন পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে যুবকটার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। কৌতূহলাপন্ন হয়ে ছোট্ট করে বললেন—কি হে বাছা, এ উপসাগরটা কেনার আগ্রহ আছে নাকি?

কিড ঘাড় ফিরিয়ে কাপ্তেনের দিকে তাকিয়ে বলল—কেনার আগ্রহ? কই, না-তো? আসলে এর আগে কোনদিন সাগর-উপসাগর দেখি নি—তাই দেখছি।

তাই বুঝি? কথাটা বলেই কাপ্তেন মুচকি হাসলেন।

কিড বলল, আপনি কি এটা বেচে দেবার কথা ভাবছেন? ঠোঁটের কোণে হাসির রেখাটুকু অক্ষুণ্ণ রেখেই কাপ্তেন এবার বললেন—এ বার বেচার ইচ্ছে নেই। তবে কথা দিচ্ছি, বুয়েন্‌স টিয়েরাস-এ পৌঁছে এটাকে সি.ও.ডি করে তোমাকে পাঠিয়ে দেব। এবার নৌকাটার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলে উঠলেন—হতচ্ছাড়া অপদার্থটা এতক্ষণে তামাকের ডিবেটা নিয়ে আসছে। এক্‌ ঘণ্টা আগেই জাহাজ ছাড়া উচিত ছিল। তামাকের ডিবেটা ফেলে আসায় একটা ঘণ্টা চোট খেয়ে গেলাম।

—কিড এবার প্রশ্ন করল—ওই জাহাজটার মালিক কি আপনি?

—হ্যাঁ, আমারই বটে।

—আরেব্বাস! কী সুন্দর! তবে স্টিমারের মত ছোট।

—স্টিমার? আমার ওই ছোট্ট জাহাজটাকে তুমি যদি অবজ্ঞার চোখে দেখ আমি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হব না, আপত্তিও করব না।

—একটা কথা জিজ্ঞেস করব? আমতা-আমতা করে কিড জিজ্ঞাসা করল।

—কি? কি কথা? এত সঙ্কোচের কি আছে, বলেই ফেল।

—এ জাহাজ, মানে আপনারা এখান থেকে ছেড়ে কোথায় যাবেন?

—বুয়েন্‌স টিয়ারে।

কিড জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কাপ্তেনের মুখের দিকে তাকাল।

কাপ্তেন বললেন—বুয়েন্‌স টিয়ার হচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলবর্তী একটা ছোট্ট দেশ। আগে, মানে সেখানে শেষবার যখন ছিলাম তখন সে দেশটাকে কোন্‌ নামে সম্বোধন করা হত ঠিক মনে করতে পারছি না।

—দেখে তো মনে হচ্ছে একটা মালবাহী জাহাজ, ঠিক কিনা?

—হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ। মালবাহী জাহাজই বটে।

—এখান থেকে কি নিয়ে যাচ্ছেন?

—করোগেটেড টিন, চেরা কাঠ, দেশলাই আরও কত কি টুকিটাকি জিনিসে জাহাজ বোঝাই করা হয়েছে।

—আর একটা কথা—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই কাপ্তেন বলে উঠলেন—কি কথা? তোমার যা কিছু জিজ্ঞাস্য নির্দ্বিধায় আমাকে প্রশ্ন করতে পার।

—যে দেশে আপনারা যাচ্ছেন, দেশটা কেমন?

—কেমন? কি বলতে চাইছ ঠিক বুঝতে পারছি না।

—আমি জানতে চাইছি, দেশটা গরম, নাকি ঠাণ্ডা?

—হ্যাঁ, একটু-আধটু গরম তো আছেই। তবু সেখানকার ভৌগলিক আর প্রাকৃতিক দৃশ্য খুবই দৃষ্টিনন্দন। মনে করতে পার দেশটা একটা 'হারানো স্বর্গ'।

কিড চোখের তারায় কৌতূহলের ছাপ এঁকে কাপ্তেনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

কাপ্তেন বলে চললেন—হ্যাঁ বাছা, দেশটা সত্যি একটা হারানো স্বর্গ বিশেষ। পাখির গানে সেখানে রোজ ভোরে ঘুম ভাঙে। তারপরই মৃদুমন্দ বাতাস গোলাপের গন্ধ বয়ে এনে তোমার মন-প্রাণ এক অনাস্বাদিত আনন্দে ভরে তুলবে।

তাই বুঝি? কপালের চামড়ায় বিস্ময়ের ছাপ এঁকে কিড প্রশ্নটা.কাপ্তেনের দিকে ছুঁড়ে দিল।

কাপ্তেন বললেন, হ্যাঁ, শতকরা একশ' ভাগ সত্যি। আরও আছে, সেখানকার মানুষকে আমাদের মত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, মানে পরিশ্রম করে মুখের গ্রাস জোগাড় করতে হয় না।

পরিশ্রম করে মুখের গ্রাস জোগাড় করতে হয় না? কথাটা কেমন মনে হচ্ছে না? একটু খোলসা করে বলবেন কি?

শোন তবে বলছি, ভোরে ঘুম থেকে উঠেই তারা পেয়ে যায় ঝুড়ি ঝুড়ি সুস্বাদু ফল। আর সে দেশে রবিবার নেই, বরফের উৎপাত নেই, ভাড়া লাগে না। কাজকর্মের হ্যাপা নেই, গণ্ডগোল হৈ-হট্টগোল কাকে বলে সেখানকার মানুষ জানে না, কেমন বুঝছ?

তবে সেখানকার মানুষ এত বড় দিন-রাত্রি, মানে চব্বিশটা ঘণ্টা কাটায় কিভাবে! চোখ দুটো

কপালে তুলে কিড কথাটা বলল।

মুচকি হেসে কাপ্তেন বললে—আরে ছোকরা, কেবলই ঘুমিয়ে কাটায়। ঘুমিয়ে কাটানো আর বিনা আয়েশে সবকিছু পাওয়ার মত এরকম দেশ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টা চোখে পড়বে না। আরও শোন, কলা, আনারস আর কমলালেবু প্রভৃতি যা কিছু খাও সবই সে দেশ সরবরাহ করে।

কিড সোল্লাসে বলল—চমৎকার তো! শুনেই তো আমার মন সে দেশে চলে গেছে। সেখানে যেতে ভাড়া কত লাগে বলুন তো?

ভাড়া? মাত্র চল্লিশ ডলার। এটা কিন্তু সবকিছু সমেত। তবে যেতে হবে দ্বিতীয় শ্রেণীর কেবিনে। আমার জাহাজে প্রথম শ্রেণীর কেবিন নেই। ওই চব্বিশ ডলারের মধ্যেই আহারাদির দামও ধরা আছে।

কিড আমতা আমতা করে বলল—আমি যদি যেতে চাই নিয়ে যাবেন? হরিণের চামড়ার একটা থলে বের করতে করতে সে বলল—আপনার চব্বিশ ডলার ভাড়া মিটিয়ে দেবার মত ডলার আমার কাছে আছে, নেবেন?

হরিণের চামড়ার থলেটায় দু' ডলার তার সম্বল।

ঠিক আছে। ভাড়া যখন মিটিয়ে দিতে পারবে তখন আমার আর আপত্তি কি থাকতে পারে, বল তো? তবে একটা কথা আমার কিন্তু আগেই জেনে নেওয়া দরকার।

কি? কি কথা কাপ্তেন?

কথাটা হচ্ছে, তোমার এভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার ব্যাপারে তোমার মা আবার আমাকে দোষারোপ করবেন না তো?

সে চিন্তা আপনাকে করতে হবে না। সেটা আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে আপনি নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন কাপ্তেন।

বহুৎ আচ্ছা! বহুৎ আচ্ছা!

কাপ্তেন এবার সঞ্জেস নামে এক নাবিকের ইশারায় কাছে ডাকলেন।

নাবিক সঞ্জেস এলে তিনি তার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে কিডকে বললেন—শোন, সঞ্জেস তোমাকে কাঁধে করে জাহাজে তুলে দেবে। এক ফোঁটা জলও তোমার পায়ে লাগবে না।

তখনও বুয়েন্‌স টিয়ারাস-এর রাষ্ট্রদূত মদ গিলে বে-হেড মাতাল হয়ে যান নি। ঘড়িতে সবে এগারোটা বাজে। বিকাল আর সন্ধ্যার মাঝামাঝি সময়ের আগে তার কপালে বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গসুখে ফুসরৎ-ই মেলে না।

রাষ্ট্রদূত মশাই তখন সুদৃশ্য ও আরামদায়ক দোলনায় বসে একটু-আধটু ঝিমিয়ে আয়েশ করে নিচ্ছেন। এমন সময় বার দুই বার দুই আওয়াজ হতেই তাঁর তন্দ্রাভাবটা টুটে গেল।

তিনি চোখ মেলে তাকিয়েই দেখলেন, দূতাবাসের দরজায় কিড দাঁড়িয়ে আছে। চোখ দুটোতে কৌতূহল মিশ্রিত জিজ্ঞাসার ছাপ এঁকে সে রাষ্ট্রদূতের দিকে তাকিয়ে।

কিড-এর প্রতি আতিথেয়তা আর সৌজন্য প্রকাশের অবস্থা রাজদূতের মধ্যে নেই। তিনি কিড-এর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে। তবে তার আচরণে কিছু না কিছু ব্যস্ততা অবশ্যই প্রকাশ পাচ্ছে।

স্বাভাবিক কণ্ঠেই কিড এবার বলল—আমার জন্য আপনি ব্যস্ত হবেন না স্যার। আমি তো সবেই এখানে এসেছি। শহরের সবাই বলল, শহরটা ঘুরে দেখার আগেই আপনার সঙ্গে মোলাকাৎ, মানে দেখা করে যাওয়াই এখনকার প্রচলিত বিধান।

মুচকি হেসে রাষ্ট্রদূত বললেন তাই বুঝি?

হ্যাঁ। জাহাজে টেক্সাস থেকে এসে একটু আগেই এখানে নেমেছি।

তোমাকে দেখে, তোমার সহজ-সরল কথাবার্তা আমাকে মুগ্ধ করেছে বাছা।

তোমার নামটাই তো শোনা হল না। কি নাম তোমার?

রিও গ্রান্ডের সবাই আমাকে লানো কিড বলে সম্বোধন করে।

আর আমার নাম থ্যাকার। রাষ্ট্রদূত বললেন—এক কাজ কর, ওই চেয়ারটা টেনে বস। এবার

কি বলছি, মন দিয়ে শোন, তোমার এখানে আসার উদ্দেশ্য যদি অর্থ বিনিয়োগ করা হয়ে থাকে তবে এখানকার কারো পরামর্শ নাও। অন্যথায় সবাই তোমাকে ঠকাবার জন্য উঠে পড়ে লাগবে। তোমাকে একেবারে নিঃস্ব করে ছাড়বে, বুঝলে? চুরুটের অভ্যাস আছে? চলবে একটা?

বড়ই বাধিত হলাম। কিড বিনয়ের সঙ্গে বলল—দেখুন, আমার কোটের পকেটে যে বস্তুটা আছে তা না হলে আমার একটা ঘণ্টাও চলবে না। কথা বলতে-বলতে কিড পকেট থেকে তামাক কাগজ বের করে একটা সিগারেট পাকিয়ে ফেলল।

চুরুটে একটা লম্বা টান দিয়ে, এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে রাষ্ট্রদূত এবার বললেন, এখানে স্পেনীয় ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষার প্রচলন নেই। তাই বলছি কি, তোমার দো-ভাষী রাখা দরকার। তা নইলে মনের ভাব ব্যক্ত করা তোমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। আমার সাহায্য যদি তুমি চাও তবে অবশ্যই বঞ্চিত হবে না, মনে রেখো।

কিড মুচকি হেসে বলল স্যার, ইংরেজি ভাষার চেয়ে আমি স্পেনীয় ভাষাটা অন্তত নয় গুণ ভাল বুঝি এবং কথা বলতে পারি। আমি যে দেশের মানুষ সেখানকার মানুষ সে ভাষাতেই কথা বলে।

তুমি স্পেনীয় ভাষা জান, মানে কথা বল? রাষ্ট্রদূত থ্যাকার বললেন তোমার চেহারা আমাদের মত দেখতে। আর তুমি এখন এসেছ টেক্সাস থেকে, তা-ই তো বললে? আর তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তোমার বয়স কুড়ি বা একুশের বেশী নয়। তোমার মনের জোর কতটা কঠিন আমার জানা নেই।

রাষ্ট্রদূত থ্যাকার চেয়ার ছেড়ে উঠে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

এবার কিড-এর কাছে গিয়ে বললেন—বাছা, হাতটা দেখি।

থ্যাকার তার বা-হাতটা টেনে নিজের হাতের মধ্যে রেখেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে শেষ পর্যন্ত তার হাতের উল্টো পিঠটা গভীর অনুসন্ধিৎসু নজরে দেখতে লাগলেন।

এক সময় কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা প্রকাশ করে তিনি বলে উঠলেন—আরে এটা তো আমিই করতে পারি। আমি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বুঝতে পেরেছি, কাঠের মত কঠিন তোমার মাংসপেশী আর শিশুর মতই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী।

কিড নীরবে তাঁর কথা শুনতে লাগল। তাঁর চোখের তারায় অত্যুগ্র আগ্রহ প্রকাশ পেল।

থ্যাকার বলে চললেন—তুমি ঘাবড়ে যেয়ো না বাছা। এক সপ্তাহের মধ্যেই আমি সারিয়ে তুলব, কথা দিচ্ছি।

কিড এবার বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বলল—স্যার, একটা কথা, আপনি যদি মুষ্টিযুদ্ধের ইঙ্গিত দিয়ে থাকেন তবে আমার অনুরোধ আর এগোতে চেষ্টা করবেন না। আর আমার ওপর বাজিও ধরবেন না।

—তবে?

তবে যদি বন্ধুদের কারবারে উৎসাহী হয় তবে আমি আপনার পক্ষেই আছি।

তাই বুঝি? থ্যাকার বললেন।

অবশ্যই চায়ের টেবিলে বসে মেয়েদের মত প্যাঁক প্যাঁক করতে আমি মোটেই উৎসাহী নই।

থ্যাকার বললেন—দেখ, কাজটা কিন্তু তার চেয়ে অনক সহজ। একটু এগিয়ে যাবে কি?

—চলুন—

জানালা দিয়ে পলেস্তারা খসা দোতলা একটা সাদা বাড়ির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে থ্যাকার বললেন—ওই যে বাড়িটা দেখলে, তার ভেতরে এক ক্যাস্টীলীয় ভদ্রলোক আর তাঁর স্ত্রী বাস করেন। তারা তোমাকে আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরে ডলার দিয়ে তোমার পকেটগুলো ভর্তি করে দেবার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করছে। সেখানে বুড়ো সান্টোস ইউবিক থাকেন। তিনি এদেশের অর্ধেক সোনার খনির মালিক। অতএব বুঝতেই পারছ, তাঁকে টাকার কুমির বললেও ছোট করেই বলা হবে।

কিড আচমকা প্রশ্ন করল—স্যার, একটা কথা বলছি, কিছু মনে করবেন না, আপনার গাঁজার কল্কেতে টান দেবার অভ্যেস টভ্যেস আছে নাকি?

থ্যাকার হঠাৎ একটু থমকে গেলেন। পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন—আরে বস—বস। তোমাকে সব কথা বলা দরকার, বলবও।

কিড চেয়ারটা টান দিয়ে আবার বসে পড়ল।

থ্যাকার এবার বলতে আরম্ভ করলেন—শোন, আজ থেকে বারো বছর আগে তাদের একটা ছেলে হারিয়ে যায়। না, আমি নিঃসন্দেহ, সে মারা যায়নি।

ছেলেটা যখন হারিয়ে যায় তখন তার বয়স আট বছরও হয়নি। অথচ সে একটা জ্যান্ত আতঙ্ক, শয়তানের শিরোমণি। ব্যাপারটা সবাই জানে কয়েকজন আমেরিকান স্বর্ণ শিকার করতে যাওয়ার সময়, এখানে এসেছিল।ছোট্ট ছেলেটা তাদের মন জয় করে নিয়েছিল। তারা খুবই ভাল বাসত।

এখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার পরও তারা সেনিওর উইরিক আর ছেলেটাকে কিছুদিন মাঝে মধ্যেই চিঠিও দিত।

মুহূর্তের জন্য নীরব থেকে থ্যাকার আবার মুখ খুললেন—আসল ব্যাপার কি জান? ছেলেটার কাছে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে আমেরিকার গল্প করে করে তারা তার কথাটাই বিগড়ে দিয়েছিল।

পরদেশী স্বর্ণ শিকারীরা বিদায় নেবার পর ছেলেটার মধ্যে কেমন যেন এক অবর্ণনীয় অস্থিরতা দেখা দিল। ব্যস, ক' দিনের মধ্যেই সে হঠাৎ একদিন উধাও হয়ে গেল।

বহু খোঁজাখুজির পর অনুমান করা হল, ছেলেটা স্টীমারের মত ছোট্ট একটা ফলবাহী জাহাজে কথা আর আনারসের স্তূপের আড়ালে লুকিয়ে নিউ অর্লিয়েন্সে চম্পট দিয়েছে। শোনা যায় এর পরও নাকি কেউ-কেউ তাকে টেক্সাসে পেয়েছিল। ব্যস, এ পর্যন্তই। এর বেশী কিছু তাদের কাছ থেকে পাওয়া যায় নি।

এক চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাষ্ট্রদূত থ্যাকার এবার বললেন—আমি জানতে পেরেছি, হতভাগা বুড়ো ইউরিক তার খোঁজ পাওয়ার জন্য হাজার-হাজার ডলার খরচ করেছিল। আর ম্যাডামের শারীরিক অবস্থা খুবই সঙ্গীন। আর হবে না-ই বা কেন, বল তো? ছেলেটাই তো বুড়ো-বুড়ির চোখের মণি, একমাত্র সম্বল ছিল।

জান বাছা, ছেলেটা নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার পর বুড়িটা যে শোকের পোশাক গায়ে চাপিয়েছিল আজও সে সেই বেশই পারে। লোকের মুখে শোনা যায়, একদিন না একদিন তাদের হারানো মানিক ফিরে আসবে বলেই তারা বিশ্বাস করে।

রাষ্ট্রদূত থ্যাকার মুহূর্তের জন্য থেমে দম নিয়ে এবার বললেন—সত্যি, তারা আজও ছেলেকে ফিরে পাবার আশা মন থেকে মুছে ফেলতে পারে। আর একটা কথা—তাদের হারিয়ে যাওয়া আদরের দুলালের বাঁ-হাতের পিঠে উল্কি করা ছিল উড়ন্ত একটা ঈগল। আর তার নখ দিয়ে আঁকড়ে ধরা আছে একটা বর্শা।

থ্যাকার-এর কথাটা কানে যেতেই থ্যাকার নিজের বা-হাতের পিঠটা ঘুরিয়ে অপলক চোখে সেটাব দিকে তাকিয়ে থাকল। দেখতে লাগল, থ্যাকার-এর বর্ণনার সঙ্গে তার হাতে আঁকা উল্কিটাব কতটুকু মিল বা অমিল আছে।

থ্যাকার এবার ধীর-হাতে সরকারী টেবিলের আড়াল থেকে চোরাই মদের বোতলটা এনে বললেন—হ্যাঁ, যা বলেছি, ঠিক তা-ই। বাছা, তোমার তো বুঝতে না পারার মত ব্যাপার নয়। আমিও কিন্তু ওটা করে নিতে পারি।

এবার বলছি শোন, কেন আমি রাষ্ট্রদূত হলে সান্দাকানে গিয়েছিলাম। এতদিন আমি সেটা ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। এক সপ্তাহের মধ্যেই আমি তোমার হাতের উল্কিটার সাথে ওই নখে করে ধরে-রাখা বর্শাটা সমেত উড়ন্ত ঈগলের ছবিটাকে এমন সাদৃশ্য প্রমাণ করে দেব যে, তুমি নিজেই মেনে নিতে বাধ্য হবে, তুমি নিজেই ওটা নিয়ে জন্মেছিলে।

কিড রীতিমত স্তম্ভিত হয়ে নিষ্পলক চোখে থ্যাকারের মুখেব দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

থ্যাকার এবার রীতিমত দৃঢ়তার সঙ্গেই বললেন—শোন, আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম যে, তুমি আজ না হোক কাল তুমি আমার অফিসে আসবেই। তাই তো আমি এক প্রস্ত সুঁচ আর কালি আগে থেকেই সংগ্রহ করে রেখেছি। কী আশ্চর্য ব্যাপার তোমার নামটা আমি কিছুতেই মনে রাখতে পারছি

না—ডাল্টন, না-কি—

কিড বলে উঠল, একটু আগেই তো আপনাকে বলেছি, আমার নাম কিড।

আরে ঠিক আছে—ঠিক আছে। কিড তো তোমার নাম? কিন্তু বাছা, তোমার এ নামটা বেশী দিন চালানো যাবে না। তার পরিবর্তে সেনিওরিটো ইউকি নামটা কেমন হবে, বল তো?

আশ্চর্য ব্যাপার তো! অতীতে কোনদিন কারো ছেলের ভূমিকায় আমি অভিনয় করেছি বলে তো মনে পড়ছে না। দেখুন লোকের কাছে বলার মত মা-বাবার অস্তিত্ব যদি কোনদিন আমার থেকেও থাকে তবে আজ তারা নির্ঘাৎ পর পারের বাসিন্দা।

এবার একটু দ্বিধা—আমতা আমতা করে কিড বলল—আপনার খেলার ছকটা কি রকম, অনুগ্রহ করে বলবেন কি স্যার? রাষ্ট্রদূত থ্যাকার চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে মদের গ্লাসটা ঠোঁটের দিকে তুলতে তুলতে বললেন—আমিই তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, ব্যাপারটাকে তুমি কতদূর পর্যন্ত গড়াতে দিতে ইচ্ছুক, বল তো?

কিড সহজ-সরল ভাবেই বলল—স্যার, আমার এখানে আমার উদ্দেশ্য গোড়াতেই বলে রেখেছি, বলি নি?

হ্যাঁ। ভালই জবাব দিয়েছ বটে, মদের গ্লাসটাকে ঠোঁট থেকে নামিয়ে থ্যাকার বললেন—তবে তোমাকে কিন্তু ততটা দূর পর্যন্ত যেতে হবে না, বুঝলে? আমার পরিকল্পনাটা তোমার সামনে তুলে ধরছি—তোমার হাতে বাণিজ্য-চিহ্নটা উল্কি করার পর বৃদ্ধ ইউরিককে জানাব। আর এর আগে তোমাকে বলব ওই পরিবারটার অতীত-কাহিনী। যতখানি সম্ভব তোমার কাছে ব্যক্ত করব। আর তুমিও প্রসঙ্গটা নিয়ে আলোচনা করার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নেবে।

কিড অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে থ্যাকার-এর কথাগুলো নীরবে শুনতে লাগল। মাঝখান থেকে কোন কথা বলে থ্যাকার-এর বক্তব্যকে এলোমেলো করে দিতে আগ্রহী নয় বলেই সে মুখে কুলুপ এঁটেই রইল।

থ্যাকার একই স্বরে বলতে লাগলেন—বাছা, তোমার চোখে সঠিক চাউনি আমি লক্ষ্য করছি তুমি স্পেনীয় ভাষা বোঝ, কথাও বলতে পার, যাবতীয় তথ্য তুমি অবগত আছ, টেক্সাস সম্বন্ধে সম্যক ধারণা তোমার আছে আর উল্কি চিহ্ন যে আছে তা তো আমি চোখের সামনেই দেখতে পারছি।

কিড এবারও নীরবই রইল।

থ্যাকাব এবার বেশ একটু কড়া সুরেই বললেন—শোন, এখন আমি যদি তাদের জানিয়ে দিই যে, আসল উত্তরাধিকারী আমার জিম্মায় আছে। আর তাকে স্বাগত জানানো হবে কিনা, ক্ষমা করে ঘরে ফিরিয়ে নেওয়া হবে কিনা, তবে? তবে, ব্যাপারটা কেমন দাঁড়াবে ভেবে দেখ তো?

আমার কাছ থেকে খবর পাওয়ামাত্র তারা সোজা আমার কাছে ছুটে আসবেন। তোমার গলা জড়িয়ে ধরে আদর সোহাগ করবেন। তারপর জলখাবারের রেকাবি আর বৈঠকখানার দিকে পা-বাড়াবার মাধ্যমে ঘটনাটার যবনিকা পতন ঘটবে, বুঝলে?

কিড উল্লসিত হয়ে বলল—চমৎকার! তবে চমৎকার হবে? আমি তো অপেক্ষা করেই আছি। আমি তো একটু আগেই ঘোড়া থেকে নেমে আপনার দপ্তরে এসেছি। আর এর আগে কোনদিন আপনাকে অবশ্যই দেখি নি। একটা কথা কি জানেন স্যার—

কি? কি কথা?

বলছি কি, আপনি যদি ব্যাপারটাকে মা-বাবার আশীর্বাদ পর্যন্ত গড়িয়ে দিতে আগ্রহী হয়েই থাকেন, তবে আমার নামটাকে বদলে ফেলতে তো আমার আপত্তি থাকার কথা নয়। এখন এটুকুই বলতে পারি।

তোমাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না। তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে বহুদিন দেখি নি বাছা, যে তোমার মত যুক্তিগ্রাহ্য বক্তব্যকে হাসিমুখে মেনে নিতে উৎসাহী হয়। তারপরের ব্যাপারটা কিন্তু খুবই সহজ-সরল। কথাটা হচ্ছে, তারা যদি তোমাকে অল্প কিছু সময়ের জন্যও স্বীকার করে নেয়, আমি বলব সেটাই তো যথেষ্ট। আর একটা কথা তোমাকে বলতে চাচ্ছি বাছা।

কি? কি কথা? কিড আগ্রহান্বিত হয়ে বলল।

কথাটা যেন মনে রেখো, তোমার বাঁ কাঁধে যে তিলটা আছে সেটাকে দেখার সময়-সুযোগ যেন তাদের দিও না।

এবার অপেক্ষাকৃত গলা নামিয়ে থ্যাকার বললেন—মন দিয়ে শোন বাছা, বুড়ো ইউরিক সব সময় পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লক্ষ ডলার বাড়িতে মজুত রাখে।

কিড যন্ত্রচালিতের মত দ্রুত গতিতে মুখ তুলে থ্যাকার-এর দিকে তাকাল।

থ্যাকার বলে চললেন—তিনি ডলারগুলো ছোট্ট একটা সিন্দুকের মধ্যে রাখেন। আর তার তালাটাকে কোন জুতোর বোতামের মত অনায়াসেই খুলে ফেলা সম্ভব। মনে রেখো, উল্কি বসানোর কারসাজি করার জন্য আমার প্রাপ্য মজুদ অর্থের আধাআধি অর্থ কি অর্ধেক।

কিড অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে থ্যাকার-এর মুখের দিকে তাকিয়েই রইল।

থ্যাকার এবার বলল—আর একটু কাছে এসো। দেওয়ালেরও কান আছে। শোন বাছা মোট অর্থ আমরা দু'জনে আধাআধি ভাগ করে নিয়ে সোজা জাহাজ ঘাটায় হাজির হব। সেখান থেকে জাহাজ ধরে রিও জেনেইরোতে পাড়ি জমাব, আমার মতলবটা মাথায় ঢুকল?

কিড-এর চোখ দুটো জ্বল্‌জ্বল্ করতে লাগল। সে সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় কাৎ করে সম্মতি জানাতে গিয়ে বলল—পরিকল্পনাটা তো চমৎকারই মনে হচ্ছে স্যার! আমি রাজি—অবশ্যই রাজি।

তবে এ কথাই রইল, কি বল? আর একটা কথা, পাখিটাকে তোমার হাতের পিঠে বসিয়ে না দেওয়া অবধি তুমি বরং এখনো, আমার কাছাকাছি থাক। এর পিছনের দিকে আমার একটা ঘর আছে, থাকতে পারবে। আমি নিজে হাতেই আমার পাকসাক করে নেই। কথা দিচ্ছি, এ হাড়কিপ্টে সরকার আমাকে তোমার জন্য যতটুকু করার সুযোগ দেবে, ঠিক ততখানিই করব। আশা করছি, তোমাকে আরাম আয়েশেই রাখতে পারব।

থ্যাকার বলছিলেন উল্কি আঁকার ব্যাপারে এক সপ্তাহ লাগবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে পুরো দু' সপ্তাহ লেগে গেল। কাজ মোটামুটি সেরে এক 'সুচাচো' কে তলব করলেন।

সুচাচো এসে নতজানু হয়ে রাষ্ট্রদূতকে অভিবাদন করে আদেলের অপেক্ষায় দাঁড়াল।

থ্যাকার হাত চালিয়ে তার বহু বাঞ্ছিত শিকার বুড়ো ইউরিককে একটা চিঠি লিখে ফেললেন। চিঠিটার শিরোনামে লিখলেন—এল্ সেনিওর ডন সান্টোস

ইউরিক,—লা ক্লাসা ব্লাংকা।

চিঠির বক্তব্য মোটামুটি এরকম—তাঁর অনুগত্যানুসারে লিখছেন যে, সপ্তাহ দুই আগে তার বাড়িতে কোন এক অস্থায়ী অতিথির আগমন ঘটেছে। এক যুবক। বয়স বছর কুড়ি। সে যুক্তরাষ্ট্র থেকে জাহাজে বুয়েনস টিয়েরাস-এ এসে নেমেছে। সে আশা ফলপ্রসূ না-ও হতে পারে সেটাকে উস্কে দিতে উৎসাহী না হলেও রাষ্ট্রদূত আশা করছেন যে, আগন্তুক যুবকটা তাঁর বহুদিন আগে বে-পাত্তা হয়ে যাওয়া ছেলে হওয়াও অসম্ভব নয়।

যুবকটাকে কাছে নিয়ে যদি নিউরিক দেখেন তবে হয়ত তার পক্ষে মঙ্গলই হবে। তিনি আরও লিখেছেন—এ ছেলেটা যদি সে বাঞ্ছিত যুবকটাই হয়ে থাকে তবে হয়ত সে নিজের বাড়িতে ফিরে যাবার বাসনা নিয়েই তাঁর দরকারে হাজির হয়েছে। এখানে পৌঁছবার পর কিন্তু তার মধ্যে সন্দেহ দানা বেঁধেছে, তাকে কেমনভাবে গ্রহণ করা হবে। আর মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার ফলেই তার মন দুর্বল হয়ে পড়েছে, সাহস হারিয়ে ফেলেছে। চিঠিটা শেষ করে রাষ্ট্রদূত নিজের নাম স্বাক্ষর করলেন—টমসন থ্যাকার।

সুচাচো চিঠিটা নিয়ে যাত্রা করার আধ ঘণ্টা পরেই সেকেলে ল্যান্ডো গাড়ি-চেপে সেনিওর ইউরিক রাষ্ট্রদূতের বাড়িতে এলেন। গাড়িটা রাষ্ট্রদূতের বাড়ির দরজায় দাঁড়ানোর মুহূর্তকাল পরেই ইয়া লম্বা একজন কেতাদুরস্ত ভদ্রলোক নেমে এলেন। তারপর তিনিই একজন মোটাসোটা মহিলাকে হাত ধরে গাড়ি থেকে নামালেন। তাঁর পরনে কালো, শোক পালনের পোশাক।

গাড়ি থেকে নেমেই তাঁরা ব্যস্ত-পায়ে রাষ্ট্রদূতের বাড়িতে ঢুকে গেলেন।

থ্যাকার এগিয়ে এসে তাঁদের অভ্যর্থনা করে বসতে দিলেন। তার টেবিলের কাছেই এক সুদর্শন যুবক দাঁড়িয়ে। কেবলমাত্র চেহারাই নয়, তার মুখবয়বটাও খুবই সুন্দর। প্রথম দর্শনেই তার ওপর কেমন যেন একটা মায়া পড়ে যায়।

রাষ্ট্রদূত চেয়ার এগিয়ে সেনিওর ইউরিককে বসতে অনুরোধ করলেন। চেয়ারে বসেই তিনি ব্যস্ত হাতে মাথার আবরণটা খুলে ফেললেন। তিনি মাঝ-বয়স পার করে দিয়েছেন। চুলে পাক ধরেছে। তবে চেহারা, বিশেষ করে চামড়া থেকে রূপের জেল্লা ঠিকরে বেরোচ্ছে। কিন্তু তার চোখের তারা দুটোতে বিষণ্ণতার ছাপ সুস্পষ্ট। আর মহিলার চোখেও গভীর শোক আর হতাশার ছাপ লক্ষিত হয়। তার চোখ দুটো বলে দিচ্ছে, কেবলমাত্র একটা স্মৃতি আর ক্ষীণ আশা অন্তরে আঁকড়ে ধরে পৃথিবীতে আজও বেঁচে আছেন।

মহিলাটি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে যুবকের মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর চোখের তারা দুটো বার বার তার মুখে—সর্বাঙ্গে চক্কর মারতে লাগল।

পরমুহূর্তেই তার চোখের তারা দুটো নেমে এসে যুবকের বাঁ-হাতের পিঠটায় থমকে গেল। একটু বাদেই তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। এক সময় তিনি গলা ছেড়ে চিৎকার করে উঠলেন—হিজো সিও। হিজো সিও! কথাটার বার দুই উচ্চারণ করেই তিনি আবেগে উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে কিডকে বুকে জড়িয়ে ধরে চোখের জল ফেলতে লাগলেন।

কিড একমাস পর রাষ্ট্রদূত থ্যাকারের কাছ থেকে একটা চিঠি পেল। চিঠিটা পাওয়ামাত্র সে তার বাড়িতে ছুটে এল।

এখন সে একজন স্পেনীয় যুবকের মত দেখতে হয়েছে। গায়ে বিদেশ থেকে আনানো দামী পোশাক। আর বিভিন্ন অলঙ্করণের মাধ্যমে তাকে এমন সুন্দর করে সাজানো হয়েছে যাতে স্বীকার করতেই হচ্ছে সেগুলোর সৃষ্টি যেন সার্থকতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

দামী তামাক আর কাগজে একটা সিগারেট পাকানো শুরু করামাত্র তার আঙটির হীরের টুকরোটা রীতিমত ঝলমলিয়ে উঠল।

দু'-এক কথায় প্রাথমিক শুভেচ্ছা সারার পরই রাষ্ট্রদূত থ্যাকার বললেন কি হে, কেমন আছ? কাজকর্ম কেমন চলছে?

তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়, কিড স্বাভাবিক কণ্ঠেই জবাব দিল।

তাই বুঝি?

আজই প্রথম গো-সাপের মাংসের স্বাদ পেলাম। গো-সাপ ইয়া বড় বড় টিকটিকির মত দেখতে, চেনেন নিশ্চয়ই? আপনি কি এ মাংস পছন্দ করেন স্যার?

না?

অন্য কোনরকম সরীসৃপের মাংস?

না, কেবলমাত্র গো-সাপই নয়, কোন সরীসৃপের মাংসই আমি পছন্দ করি না।

আমার আবার এসব ব্যাপারে খুব একটা বাছবিচার নেই। ঘড়িতে তখন বিকেল তিনটে বাজে। আর এক ঘণ্টা বাদেই থ্যাকার মদের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে একেবারে পাঁড় মাতাল হয়ে যাবেন।

থ্যাকার নিজের লালমুখটাকে রীতিমত বিকৃত করে কেটেকেটে বলতে লাগলেন—মিস্টার, মওকা বুঝে নিজের আখের গুছিয়ে নাও। নাইলে ভবিষ্যতে কিন্তু অসহায়ভাবে নিজের বৃদ্ধাঙ্গুলি চোষা ছাড়া গতি থাকবে না। একটা ব্যাপার আমি লক্ষ্য করছি বাছা—

তাঁকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই কিড বলে উঠল—কি? কোন্ ব্যাপার? কিসের কথা বলতে চাইছেন?

বলতে চাইছি, তুমি কিন্তু আমার সঙ্গে ঠিক তাল রেখে বাঁশি বাজাতে পারছ না।

ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে কিড জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে থ্যাকার-এর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

থ্যাকার ঠোঁটের কোণে হাল্কা হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বললেন—আরে, এ সাধারণ কথাটা তোমার মাথায় ঢুকছে না! দেখ, চার-চারটে সপ্তাহ পেরিয়ে গেল তুমি কিন্তু অমিতব্যয়ীই রয়ে গেছ। অথচ তুমি চাইলেই রোজ দু'বেলা সোনার থালায় বাছুরের মাংসের ঝোল পেতে পার—পার কিনা?

মুহূর্তের জন্য ভেবে নিয়ে এবার তিনি বললেন—একটা কথা বলছি শোন, আমাকে যে এতদিন কেবলমাত্র ছিবড়ে খাইয়ে রাখছ, কাজটা উচিত হচ্ছে? অসুবিধেটা কোথায়, আমার কিন্তু মাথায়

ঢুকছে না বাপু। এবার গলাটা নামিয়ে, প্রায় ফিসফিসিয়ে বললেন, কাসা ব্লাংকায় কি তোমার মত একটা চালাক চতুর যুবকের চোখে এমন কিছু পড়ছে না যা নগদ টাকার মতই দেখতে?

কিড অসহায় দৃষ্টি মেলে থ্যাকার-এর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

থ্যাকার এবার বলল—শোন, 'না' বলে আমাকে প্রবোধ দেবার বৃথা চেষ্টা কোরো না। বুড়ো ইউরিক কোথায় তার ধন-দৌলত রাখেন তা কারোরই অজানা নেই, তোমার তো থাকার কথাই নয়। আর এ-ও জেনে রাখ, তার অর্থ কড়ি যা কিছু সবই যুক্তরাষ্ট্রের। আর তিনি কিছুই হাত পেতে নেনই না। তবে? তুমি কি করছ বল তো? বল, এবার বলে ফেল কিছুই করছি না। আমি তো দেখছি, কিছুই তোমার বলার নেই।

কিড নিজের আঙুলের অত্যুজ্জ্বল হীরেটার দিকে তাকিয়ে এবার বলল—সেখানে অবশ্যইপ্রচুর ধন-সম্পদ আছে।একের পর এক বান্ডিল সাজানো দেখে আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না তার পরিমাণ কত হতে পারে। তবে এটা আমি জোর দিয়েই বলতে পারি যে, আমার পালিত পিতা তাঁর সে বড় বাক্সটাকে সিন্দুক বলেন ডলার, বিশ আর কাগজপত্রে ঠাসা সে বাক্সটায় আমি একসঙ্গে পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড পর্যন্ত দেখেছি।

তাই নাকি? থ্যাকার-এর চোখ দুটো শিকারী বিড়ালের মত জ্বল জ্বল্ করতে লাগল।

কিড তাঁর দিকে না তাকিয়েই পূর্ব প্রসঙ্গের জের টেনে বলতে লাগল—হ্যাঁ, পঞ্চাশ হাজার ডলার পর্যন্ত আমি সিন্দুকটায় রাখতে দেখেছি। খুবই সত্যি, সিন্দুকটার চাবি অধিকাংশ সময়েই আমার কাছেই রেখে দেন। কোথাও গেলে তো অবশ্যই আমার জিম্মায় চাবিটা রেখে যান। কেন এমনটা করেন, বলতে পারেন?

কেন? এ ব্যাপারে তোমার কি মত?

আসলে তিনি দেখাতে চান, আমিই যে বহুদিন আগে তাঁর দল থেকে নিখোঁজ হয়ে-যাওয়া ছোট্ট ফ্রান্সিসকো। আর এ সত্যটা যে তিনি জানেন, অন্তর থেকে বিশ্বাস করেন, বোঝাতে চান। এবার যেন থ্যাকার-এর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। তিনি রীতিমত বিরক্তির সঙ্গেই বললেন—একটা কথা আমার মাথায় ঢুকছে না, তুমি তবে এখনও কিসের অপেক্ষায় আছ?

ক্রোধোন্মত্ত থ্যাকার এবার বললেন—আমার সাফ কথা মন দিয়ে শোন, তুমি কি ভুলে গেছ যে, আমি চাইলেই মুহূর্তে এ আপেলের গাড়িটা উল্টে দিতে পারি। ওই বুড়া ইউরিক যদি ঘুণাক্ষরেও তোমার পরিকল্পনার কথা টের পেয়ে যান তবে?

কিড কিছু না বুঝে বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। থ্যাকার পূর্বস্বর অনুসরণ ক.ঃ এবার বললেন—হ্যাঁ, ঠিকই বলছি, বুড়োটা যদি টের পায় তুমি তার সে হারিয়ে-যাওয়া ছেলে নয়, তামার আসল পরিচয় একজন পয়লা নম্বরের প্রবঞ্চক, তবে তোমার বরাতে কি জুটবে, আশা ...নুমান করতে পারবে। আরে কিড, এ দেশটা সম্বন্ধে তোমার তো কোন ধারণাই নেই। পায়ের তলায় চাপা-পড়া ব্যাঙের মতই তোমাকে পিষে একেবারে খতম করে দেবে। নতুবা খোলা মাঠে, সবার চোখের সামনে তোমার পিঠে গুণে গুণে পঞ্চাশটা লাঠি দিয়ে ঘা মারবে। আর যতক্ষণ লাঠিগুলো ভেঙে টুকরো টুকরো না হয় ততক্ষণ তোমাকে কিছুতেই রেহাই দেবে না। আর তোমার যেটুকু অবশিষ্ট থাকবে সেটুকু কুমীরকে দেবে জলখাবার খাবার জন্য।

কিড এবার দরজার দিকে মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে দেখে নিয়ে গলা নামিয়ে বলল—আমিও আপনাকে কথা বলছি যে সব কিছুই যেমন আছে ঠিক তেমনই থেকে যাবে। এ মুহূর্তে তো সবই ঠিকঠাক আছে।

বোতলের তলাটাকে টেবিলের ওপর ঠেকিয়ে থ্যাকার জিজ্ঞাসা করল—কি বলতে চাইছ, খোলসা করে বল তো?

কিড পূর্ব স্বরেই বলল—আমাদের পরিকল্পনাটা ভেস্তে গেছে।

ভেস্তে গেছে, বলছ কী?

হ্যাঁ, যা বলছি সম্পূর্ণ সত্যি। আর একথা আপনাকে বলতে চাইছি—

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে থ্যাকার বলে উঠলেন কি? কথাটা কি?

কথাটা হচ্ছে, আমার সঙ্গে যখনই আপনার কথা বলার সুযোগ হবে, মানে যখনই আমার সঙ্গে

কথা বলবেন তখনই আমাকে ডন ফ্রান্সিসকো ইউরিক বলে সম্বোধন করবেন।

কারণটা জানতে পারি কি?

আপনি নিঃসন্দেহ থাকতে পারেন, এসব কিছুরই জবাব আপনাকে আমি দেব।

ঠিক আছে, তোমার আর যা বলার আছে, বল।

হ্যাঁ, ধৈর্য ধরে শুনুন, কর্নেল ইউরিক-এর ধন-সম্পদ তার কাছেই থেকে যাবে।

থ্যাকার চেয়ার থেকে প্রায় লাফিয়ে উঠে বলে উঠলেন—হ্যাঁ, ঠিক বলছি। এবার যা বলছি শুনলে আপনার উৎকণ্ঠা দূর হবে, আশা করছি।

ব্যাপারটা কি? তুমি কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছ?

ব্যাপারটা হচ্ছে, ইউরিক-এর টাকা তারই জিম্মায় থাকবে। আপনার আর আমার প্রথম দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে তার ছোট সিন্দুকটা লারেডো-র প্রথম জাতীয় ব্যাঙ্কের মতই নিরাপদ, বুঝলেন?

তোমার কথায় তো মনে হচ্ছে, তুমি আমাকে দূরে, বহু দূরে ঠেলে ফেলে দিতে চাইছ, ঠিক কিনা?

কিড হেসে বলল—অবশ্যই। আপনাকে দূরে ঠেলেই দিলাম মনে করতে পারেন, ব্যাপারটা ঠিক সেরকমই।

কেন? কেন এরকম চিন্তা তোমার মাথায় এল তা-ও তো মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি নে।

এবার পুরো ব্যাপারটা আপনাকে খোলসা করে বলছি। ফ্র্যান্সিসকো ইউরিক-এর বাড়িতে হাজির হলে প্রথম রাত্রে তারা আমাকে একটা শোবার ঘর দেখিয়ে দিল। ঠিক যেমন শোবার ঘর বোঝায়। অর্থাৎ কম্বল পেতে দিয়েছে, ভাববেন না। রীতিমত সুসজ্জিত শোবার ঘর বলতে যা বোঝায় ঠিক সে রকমই একটা ঘর মনে করতে পারেন।

তারপর? তারপর কি হল?

তারপর আমি ঘুমিয়ে পড়ার আগেই আমার নকল মা গুটিগুটি ঘরে ঢুকলেন। বিছানাপত্র ঝাড়াঝাড়ি করে মশারী পর্যন্ত গুঁজে দিলেন। তারপর ঘর ছাড়ার আগে কি বললেন, অনুমান করতে পারছেন?

কি বললেন?

আমার গায়ে-মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে আবেগ-মধুর কণ্ঠে বললেন—পাঞ্চিটো, আমার আদরের দুলাল, ঈশ্বর করুণা করে তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাঁকে আমি আমৃত্যু বুকে করে রাখব। ঠিক একথা না বললেও, এরকমই কিছু কথা বলেছিলেন। আর তখন আমার নাকের ওপর তার চোখের দু'-চার ফোঁটা জল পড়েছিল।

মিঃ থ্যাকার সে মুহূর্তে সেসব কিছু আমাকে লতার মত আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল। ব্যস, সেদিন থেকে এরকম ভাবে চলে আসছে, বুঝলেন কিছু? আর চলতেও থাকবে সেরকমভাবেই।

মুহূর্তের জন্য নীরবতার মধ্য দিয়ে ভেবে কিড আবার মুখ খুলল—মিঃ থ্যাকার, আপনি যদি ভেবে থাকেন যে, আমি কেবলমাত্র আমার স্বার্থের কথা ভেবেই এ কথা বলছি, তবে কিন্তু আমার প্রতি অবিচারই করা হবে। এরকম কোন মুহূর্ত যদি আপনার জীবনেও কোনদিন মুহূর্তের জন্য এসে থাকে তবে তাকে নিজের কাছেই রেখে দিন, ফাঁস না-ই বা করলেন।

মিঃ থ্যাকার, আমি জীবনে বেশী মহিলার সংস্পর্শে আসিনি। তাই মনের কথা ব্যক্ত করার মত কোন মা-ও আমার ববাতে জোটে নি। কিন্তু একটামাত্র মহিলাকেও যা পেলাম, তাকে আমাদের নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি... জন্য নিরেট বোকা বানিয়ে রাখা দরকার। কিন্তু তিনি সেটা একবার বরদাস্ত করেছেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার? অবশ্যই তা করবেন না।

তুমি কি মনের দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছ কি? তোমার কথাবার্তা, তোমার কণ্ঠস্বর তো সে রকম ইঙ্গিতই দিচ্ছে।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কিড এবার বলল—না, মন দুর্বল হবে কেন মিঃ থ্যাকার। আমি যে একটা জঘন্য প্রবৃত্তির নেকড়ে। আর আমাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে হয়ত বা ঈশ্বরের পরিবর্তে শয়তান। আর শয়তানই আমাকে পথ প্রদর্শকের কাজ করছে। তবে এ-ও সত্য যে, আমি এ পথের শেষ

কোথায় দেখে ছাড়ব। আগেও বলেছি, আবারও বলছি, ভবিষ্যতে আপনি যখনই আমার সঙ্গে কথা বলবেন, তখন যেন খেয়াল থাকে, আমি কিড নই, ডন ফ্রান্সিসকো ইউরিক—এ নামেই আমাকে সম্বোধন করবেন।

থ্যাকার এবার ক্রোধ সামলাতে না পেরে গর্জে উঠলেন—তোমার মুখোশটা আমি আজই খুলে দিচ্ছি, অপেক্ষা কর। তুমি একটা শয়তান, মুখোশধারী বিশ্বাসঘাতক।

যন্ত্রচালিতের মত এক লাফে চেয়ার ছেড়ে উঠে কিড আচমকা থ্যাকার-এর গলাটা চেপে ধরে ঠেলতে ঠেলতে ঘরের এক কোণে নিয়ে গেল। তারপর ঝট্ করে বাঁ-বগলের কাছ থেকে .৪৫টা বের করে তার নলটা থ্যাকার-এর গলায় ঠেকাল।

ব্যাপার দেখে থ্যাকার-এর চোখ তো একেবারে ছানাবড়া হয়ে গেল। তিনি ক্রোধ মিশ্রিত আতঙ্কে তোৎলাতে লাগলেন।

কিড শান্তভাবেই মুচকি হেসে বলল—মিঃ থ্যাকার, আমার এখানে আসার কারণ তো আমি আগেই আপনাকে বলেছি। আর এখান থেকে আমাকে চলে যেতে হলে তা আপনার জন্যই। অংশীদার কথাটা কিন্তু ভুলে যাবেন না। এবার বলুন তো, আমার নাম কি? আমার নামটা কি, মনে আছে তো?

থ্যাকার প্রায় গোঙাতে-গোঙাতে বললেন—কি না, তোমার নাম ডন ফ্রান্সিসকো ইউরিক-ইউরিক।

বাড়ির বাইরে থেকে চাকা চলার ঘড় ঘড় শব্দ ভেসে এল। পর মুহূর্তেই কার যেন আর্তস্বর ভেসে এল।

পিস্তলটা বাগিয়ে ধরেই কিড দরজার দিকে এগিয়ে গেল। পরমুহূর্তেই আচমকা ঘুরে দাঁড়াল। কাঁপা-কাঁপা পায়ে থ্যাকার-এর দিকে এগিয়ে গেল। তাঁর মুখোমুখি দাঁড়াল। তার দিকে নিজের বাঁ-হাতের পিঠটা এগিয়ে দিল।

এবার অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা গলায় বলল—সবকিছু যেন আগের মতই, মানে যেমনটি আছে ঠিক তেমনটিই থাকবে তারও একটা কারণ অবশ্যই আছে মিঃ থ্যাকার।

থ্যাকার তার মুখের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

কিড এবার বলল—মিঃ থ্যাকার, কারণটা হচ্ছে, যে লোকটাকে আমি নিজের হাতে লারেডোতে খুন করেছিলাম তার বাঁ-হাতেও উল্কি-আঁকা এমনই একটা ছবি ছিল।

ডন সান্টোস ইউরিক-এর সাবেকি আমলের ল্যাণ্ডোগাড়িটা ইতিমধ্যেই সদর-দরজায় পৌঁছে গেছে।

মাদাম ইউরিক ঢিলেঢালা একটা গাউন পরে চোখের তারায় খুশির ঝিলিক ফুটিয়ে তুলে সামনের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আবেগ মধুর স্বরে বললেন—সোনামণি আমার, তুমি গাড়ির ভেতরে।

যুবক ডন ফ্রান্সিসকো ইউরিক গাড়ির ভেতর থেকে জবাব দিল—হ্যাঁ মা। আমি এখনই নামছি।

দ্য রেঁনেসাস অ্যাট চার্ল রয়

গ্রাঁদেমঁত চার্লস একজন বেঁটেখাটো ক্রিয়োল লোক। চৌত্রিশ বছর বয়স। মাথায় ছোট্ট একটা টাক—মাথার ঠিক মাঝখানে। হাবভাব ঠিক এক রাজপুত্রের মত। নিউ অর্লিয়াংসের রোজ দরবারের কাছাকাছি যে নোংরা পাহাড়টা আছে তারই গায়ে অবস্থিত তুলোর দালালের অফিসের এক করণিকের কাজ সে করে। এ কাজ সে দিনের বেলায় সেরে নেয়।

আর রাত্রে? রাত্রির অন্ধকার নেমে এলেই সে চলে যায় তার ফরাসী আলয়ের তিনতলার ঘরে। তখন সে আর তুলোর কলের কর্মী নয়, একেবারে চার্লস পরিবারের শেষ বংশধর বনে যান। পরিবারটা অতীতে ফরাসী দেশের জমিদার ছিল।

বর্তমানে চার্লসরা প্রজাতন্ত্রী মতবাদকে বুকে আঁকড়ে ধরলেও মিসিসিপি নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার রাজকীয় হৈ-হল্লোড়ময় উদ্বেগহীন জীবনযাত্রায় এতটুকুও ঘাটতি

দেখা যায় না।

এমনটাও অস্বাভাবিক নয় যে একদিন গ্রাঁদেমঁত একজন মার্কুইস দ্য ব্রাসেও ছিলেন। কারণ, এ উপাধিটা তাদের বংশ পরম্পরায় চলে আসছে। তার জমিদারীটা কিন্তু মাসিক পঁচাত্তর ডলারের। হায়! কেবলমাত্র উপাধির কচকচানিই সম্বল।

প্রতিমাসে কিছু কিছু তুলে রেখে গ্রাঁদেমঁত ছ' শ' ডলার জমিয়েছে। আমার পাঠক-পাঠিকা হয়ত শুনেই বলবেন ছ' শ' ডলার বিয়ে করার পক্ষে তো যথেষ্ট অর্থই বটে।

দুটো বছর এ প্রসঙ্গটা নিয়ে মুখে কলুপ এঁটে থাকার পর তিনি একদিন ঘোড়ার পিঠে চেপে মহিলার বাবার সীড ডি আর-এর খামারে গেলেন। সেখানে পৌঁছে মাদময়জেল আদেল ফুকু-এর কাছে ভয়ঙ্কর সে প্রশ্নটা উত্থাপন করল। এর আগেও সে এ প্রসঙ্গটা পেড়েছে।

মহিলাটি গত দশ বছর ধরে যে উত্তর দিয়ে আসছে আজও সে একই উত্তর দিল। শোন গ্রাঁদেমঁত, আমি আজও মনে করি, আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আপনি মিছেই ঘ্যানর ঘ্যানর করছেন। আমার সাফ কথা, আগে আমার ভাইকে খুঁজে বের করে আমার কাছে পৌঁছে দিন।

দশ-দশটা বছর ধরে এমন একটা অযৌক্তিক শর্তের বাঁধনে আটকা পড়ে আজ চার্লস সরাসরি জানতে চাইল, আদেল তাকে সত্যি সত্যি ভালবাসে কিনা।

আদেল নিজেকে সংযত রেখে অপেক্ষাকৃত নরম গলায়ই বলল—গ্রাঁদেমঁত, আমার কথাটা বোঝার চেষ্টা কর। আমি আবারও তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর না দিয়ে আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করার অধিকার তোমার নেই। দুটোর একটা কাজ তোমাকে করতে হবে, আমার ভাই ভিক্টরকে খুঁজে এনে আমার কাছে পৌঁছে দিতে হবে, অথবা সে মারা গেছে প্রমাণ করতে হবে, বুঝেছ?

এর পিছনে কারণ যা-ই থাক না কেন, চার্লস পর পর পাঁচবার প্রত্যাখ্যাত হলেও ফিরে যাবার সময় তাকে কিন্তু তেমন বিষণ্ণ দেখা গেল না। প্রেমের কথাটা সে অস্বীকার করেনি। আবেগ-উচ্ছ্বাসের তরী তো গভীর জলেই না অনায়াসেই ভেসে বেড়াতে পারে। আমরা কি তবে সে কথাই বলার চেষ্টা করব যে, চব্বিশ বছরের তুলনায় জীবনের জোয়ার চৌত্রিশ বছর বয়সে অনেক, অনেক বেশী শান্ত-সুন্দর আর বিবেচক হয়, ঠিক যেন নিস্তরঙ্গ এক সমুদ্র।

যতই তন্ন তন্ন করে খোঁজাখুঁজি করা হোক না কেন ভিক্টরকে আর কোনদিনই খুঁজে পাওয়ার কিছুমাত্রও সম্ভাবনা নেই।

ভিক্টর ফুকুয়ের নিখোঁজ হয়ে যাবার গোড়ার দিকে চার্লস-এর নামে প্রচুর ডলার ছিল। বে-পাত্তা হয়ে যাওয়া যুবকটাকে খুঁজে বের করার জন্য সে পিকার্ডন-এর মত খইয়ের মত ডলার উড়িয়েছে।

হ্যাঁ, গোড়ার দিকে তার ক্ষীণ আশা ছিল, কারণ মিসিসিপি চাইলেই তার স্রোতধারার ভেতর থেকে যেকোন শিকারকে অনায়াসেই ফিরিয়ে দিতে পারে।

তারপর থেকে ভিক্টর-এর বে-পাত্তা হয়ে যাওয়ার দৃশ্যটার কথা গ্রাঁদেমঁত কম করেও হাজারবার ভেবেছে। আর প্রতিবারই যখন আদল তার আবেদন নিবেদনের একই চোখা চোখা বে-পরোয়া জবাব দিয়েছে, বিকল্পের কথাটা ব্যক্ত করেছে তখন দৃশ্যটা তার বুকে নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

সত্যি কথা বলতে কি, ছেলেটা ছিল সবার আদরের, চোখের মণি। তা ছাড়া সে ছিল অদম সাহসী, সদাবিজয়ী আর একরোখা। তার বালক সুলভ কল্পনা খামারেই এক কিশোরীর কাছে বাঁধা পড়েছিল। সে কোন এক ওভারসিয়ারের মেয়ে।

কথাটা শতকরা এক শ' ভাগই সত্যি যে, ব্যাপারটা সম্বন্ধে ভিক্টরের পরিবারের কেউ ঘুণাক্ষরেও কিছু জানত না। এটা সে এমন জটিল রূপ ধারণ করেছে তা-ত অবশ্যই তাদের পরিবারের কেউ জানত না।

সে যে পথে হাঁটতে শুরু করেছে তার পরিণতি যে অবর্ণনীয় এবং অবশ্যম্ভাবী দুঃখ-একথা যেন দিব্য চোখে দেখতে পেয়েছিল। তাই সে পরিবারটাকে অবশ্যম্ভাবী দুঃখের হাত থেকে পরিবারের মানুষগুলো বাঁচাবার অত্যুগ্র আগ্রহ নিয়ে গ্রাঁদেমঁত ব্যাপারটাকে বাধা দিতে সাধ্যাতীত

চেষ্টা করেছে। সর্বকাজের সহায়ক ও সর্বশক্তিমান অর্থ তার মনে অনন্ত উৎসাহ জোগাল, চলার পথকে সুগম করে দিল।

ব্যস, মওকা বুঝে ওভারসিয়ার কিশোরীকে নিয়ে অজানা-পথে পাড়ি জমাল। একটা সূর্যাস্ত আর সূর্যোদয়ের মধ্যেই নির্বিবাদে কাজটা ঘটে গেল।

গ্রাঁদেমঁত নিঃসন্দেহ ছিল, সে যে চাল চেলেছে তাতেই ছেলেটার দুর্বুদ্ধি মাথা থেকে নেমে গিয়ে শুভবুদ্ধির উদয় হবে। সে একটা মিনিট সময়ও নষ্ট না করে ঘোড়ার পিটে চেপে বসল। চাবুকের ঘা খেয়ে তেজী ঘোড়াটা উল্কার বেগে ধেয়ে চলল। তার উদ্দেশ্য সীড ডি ওর-এ গিয়ে তাকে পাকড়াও করে তার সঙ্গে কথা বলবে।

তারা দু'জনে উঠোন ছাড়িয়ে পথ দিয়ে ধীরমন্থর গতিতে হাঁটতে হাঁটতে প্রয়োজনীয় কথা সেরে নিতে লাগল।

আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে। বৃষ্টি এল বলে। কিন্তু তখন পর্যন্ত ছিটেফোঁটা বৃষ্টিও হয় নি।

পথ চলতে চলতে গ্রাঁদেমঁত তাদের সবে দানাবাঁধা গোপন প্রেমের কথা উত্থাপন করতেই ভিক্টর হঠাৎ রেগে একেবারে গুলি-খাওয়া বাঘের মত হয়ে গেল। সে এতই ক্রুদ্ধ হয়ে গেল যে, উন্মাদের মত তার ওপর চড়াও হল। সে বেঁটেখাটো মানুষ সত্য। কিন্তু পেশীবহুল চেহারা। লোহার মত শক্তপোক্ত তার পেশীগুলো।

ছেলেটা তাকে একের পর এক ঘুঁষি মেরে চলল। এত ঘুঁষি খেয়েও সে নিজেকে সামলে সুমলে রাখল। শেষ পর্যন্ত নিতান্ত নিরুপায় হয়েই শেষমেশ সে তার কব্জিদুটো সাঁড়াশির মত সজোরে চেপে ধরল। এক হেঁচকা টানে ছেলেটাকে পথের ওপর চিৎ করে ফেলে দিল।

পরমুহূর্তেই তার রাগ জল হয়ে গেল। ভিক্টরকে ছেড়ে দিল। সে কোন রকমে উঠে দাঁড়িয়ে পোশাকের ধূলো ঝাড়তে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

ভিক্টর এবার সক্রোধে সীড ডি ওর-এর বাড়ির দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে গলা-ছেড়ে বলতে লাগল—'তুমি আর তারা সবাই মিলে আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা আর আমার জীবনের সব সুখ বরবাদ করার জন্য নোংরা-গোপন ষড়যন্ত্রে মেতেছ। ঠিক আছে, ভবিষ্যতে আর কোনদিন আমার মুখ তোমরা দেখতে পাবে না। আমি আমার পথ বেছে নিয়ে তোমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি।'

ব্যস, সে অতর্কিতে দৌড়ে অন্ধকারে একেবারে বে-পাত্তা হয়ে গেল।

তার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে গ্রাঁদেমঁত অন্ধকারেই তাকে অনুসরণ করল। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। ঘুটঘুটে অন্ধকারে সে যে কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল কোন হদিসও পেল না।

গ্রাঁদেমঁত তবু হাল ছাড়ল না। সে ঝোপঝাড় আর উইলো গাছের ফাঁক দিয়ে বার-বার ভিক্টর-এর নাম ধরে অনবরত ডাকতে ডাকতে নদীর তীর পর্যন্ত চলে গেল। না, তার ডাকে কোন সাড়াই এল না। তার যেন মনে হল নিচের স্রোতস্বিনী নদীর বুক থেকে ডুবন্ত একটা ক্ষীণ আর্তনাদ তার কানে এল। ব্যস, পর মুহূর্তেই ভয়ঙ্কর ঝড় উঠে গেল। তারপর নামল মুষলধারে বৃষ্টি। বৃষ্টিতে কাক-ভেজা হয়ে সে বিষণ্ন মনে বাড়ি ফিরে গেল।

গ্রাঁদেমঁত বাড়ি ফিরে সবার কাছে ছেলেটার নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা খোলসা করেই বলল। তবে আসল ব্যাপারটা গোপনই রেখে দিল।

গ্রাঁদেমঁত নিঃসন্দেহ ছিল, রাগ কমে মাথা ঠাণ্ডা হলে ভিক্টর অবশ্যই বাড়িতে ফিরে আসবে।

কিন্তু পরে তার ওই প্রদর্শনটাই বাস্তবে পরিণত হল। সত্যি তার মুখটা কেউ-ই আর কোনদিন দেখতে পেল না।

এদিকে গ্রাঁদেমঁত বাড়ি ফিরে ভিক্টর সম্বন্ধে যা কিছু বলেছিল তার কোন পরিবর্তন করাই তার পক্ষে আর সম্ভব হল না। আর এরই ফলে তার বে-পাত্তা হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা রহস্যের আড়ালেই রয়ে গেল। সে রহস্য ভেদ করা কিছুতেই সম্ভব হল না।

সে বিশেষ রাত্রের পর থেকে আদেল তার দিকে যতবারই তাকিয়েছে ততবারই গ্রাঁদেমঁত তার চোখের তারা দুটোতে একটা নতুন ভাবের প্রকাশ লক্ষ্য করেছে।

তারপর থেকে এক-দুই-তিন করে বছরের পর বছর কেটে গেছে কিন্তু সে ভাবের এক তিলও পরিবর্তন হয় নি। আর তার অর্থও সে বুঝে উঠতে পারে নি। কারণ, আদেলও সে ভাবের উদ্দেশ্যটা

ভুলেও কোনদিন খোলসা করে বলে নি। এমন হাবভাবেও কিছু প্রকাশ করে নি।

সে যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারত যে, সে অভিশপ্ত রাত্রে আদেল তার ভাই তার প্রেমিকের ফিরে আসার জন্য অধীব অপেক্ষায় সদর-দরজাতেই দাঁড়িয়েছিল, আর সবিস্ময়ে ভাবছিল কোন গোপন কথাবার্তা যদি থেকেও থাকে তার জন্য এমন একটা দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্ত আর বিপদসংকুল স্থানে দাঁড়িয়ে তারা কাজ সারতে চেয়েছিল কেন? আর তা যদি তার জানা থাকত সে, হঠাৎ বিদ্যুতের ঝিলিকের মত আদেল দেখতে পেয়েছিল উভয়ের সংক্ষিপ্ত হলেও কঠিন সংগ্রাম যখন গ্রাঁদেমঁত-এর বজ্রমুষ্টির চাপে ভিক্টর এলিয়ে পথে পড়ে গিয়েছিল তবে তার পক্ষে পুরো ব্যাপারটাই খোলসা করে বলা সম্ভব ছিল। আর এর ফলে আদেল-এর পক্ষেও —

আদেল কোন্ পথ নিত আমার জানাই আছে। তবে একটা কথা খুবই সত্য যে, গ্রাঁদেমঁত কর্তৃক আদেল-এর পাণি প্রার্থনা এবং আদেল-এর সম্মতি জানানোর মধ্যে তার ভাই ভিক্টর-এর নিখোঁজ হয়ে যাওয়া ছাড়া আরও কিছুর অস্তিত্ব ছিল।

ইতিমধ্যে দশ-দশটা বছর পার হয়ে গেছে, নদী দিয়ে বয়ে গেছে কতই না জল। তবু সেদিন মুহূর্তের বিদ্যুতের ঝলকানিতে সে যা চাক্ষুষ করেছিল সে ছবিটা তার চোখে স্মরণীয় হয়েই রইল।

আদেল ভাই ভিক্টরকে নিজের জীবনের চেয়েও বেশী ভালবাসত। কিন্তু রহস্য ভেদ করার জন্য, প্রকৃত সত্যকে জানার জন্য সে কি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছিল! সবাই তো জানে, মেয়েরা সত্যের পূজারিণী।

এমন বহু মেয়ে মানুষের কথা শোনা যায় যারা কামনা-বাসনার ব্যাপারে মিথ্যার তুলনায় জীবনকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ জ্ঞান করে। সে সব কথা আমার জানা নেই।

তবে এ-ও সত্য যে, আমি অবাক হয়ে ভেবে একসার হই, গ্রাঁদেমঁত যদি তার প্রেয়সীর পা দুটো ধরে চোখের জল ফেলতে ফেলতে কেঁদেকেটে বলত যে, স্রোতস্বিনী নদীর অতল গহ্বরে ভিক্টর তার হাতটাই ডুবিয়ে দিয়ে গেছে আর মিথ্যা কথা বলে সে আর নিজের ভালবাসাকে কলঙ্কিত করতে পারছে না, তবে আদেল যে কোন্ পথ বেছে নিত তা আমি ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছি না।

গ্রাঁদেমঁত চার্লস কিন্তু আদেল-এর চোখের ভাষা কোনদিন উপলব্ধি করতে পারে নি। আর শেষবার ব্যর্থ হয়ে সে যখন ঘোড়ায় চড়ে বাড়ির দিকে যাচ্ছিল তখন তার মন নিজের খ্যাতি ও ভালবাসার কানায় কানায় পরিপূর্ণ থাকলেও ভবিষ্যতের আশা তিলমাত্রও তার মনে বইল না।

সেটা ছিল এক সেপ্টেম্বর মাস। শীতের প্রথম মাসেই আঁদেমঁত-এর পুনর্জন্মের চিন্তা জাগল। মনে মনে ভাবল, আদেলকে যখন কোনদিনই সে আপন করে বুকে পাচ্ছে না, তাকে ছাড়া বিত্ত-সম্পদ যখন অর্থহীন হয়ে পড়ছে তবে কিসের আকর্ষণে, কোন্ প্রয়োজনে সে কাড়ি কাড়ি ডলার সঞ্চয় করবে। আর যা কিছু অর্থ সঞ্চিত আছে কেন বা সে বুকে করে আগলে রাখবে?

সে এবার থেকে রয়্যাল স্ট্রীটের কাফের টেবিলে মদের বোতল আর গ্লাস নিয়ে নিজের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার উপায় উদ্ভাবন করতে ব্যস্ত থাকে। দীর্ঘ ভাবনা-চিন্তার পর তার পরিকল্পনাটা পূর্ণ রূপ লাভ করে।

পরিকল্পনাটাকে বাস্তব রূপ দিতে তার বিত্ত সম্পদ যা কিছু আছে সবই খরচ হয়ে যাবে সত্য। কিন্তু ঘণ্টা কয়েকের জন্য হলেও সে-ত চার্লস-পরিবারের চার্লস বনে যাবে। চার্লস বংশের সবচেয়ে গৌরবময় দিন উনিশে জানুয়ারি। সে মহান দিনটা আবার গৌরবের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হবে।

সে বিশেষ দিনটাতে ফ্রান্সের রাজা কোন এক চার্লস-এর মুখোমুখি বসে পানাহার সেরেছিলেন। আর সে স্মরণীয় দিনেই সার্কুইস দ্য ব্রাসে আঁসাদ চার্লস হঠাৎ জাহাজ থেকে বন্দরে পা দিয়েছিলেন। সে বিশেষ দিনেই তার মা বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। আর সে দিনটাতেই গ্রাঁদেমঁত প্রথম পৃথিবীর আলো দেখে। গ্রাঁদেমঁত স্মৃতির পাতা ঘেঁটে যতটুকু উদ্ধার করতে পারছে তা হচ্ছে, বংশটার পতনের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত। বছরের এ দিনটাই ছিল পানাহার, আতিথেয়তা আর স্মৃতিচারণের দিন।

নদীর দশ মাইল ভাঁটিতে চার্ল রয়-এর পরিবারিক একটা খামার ছিল। বহু বছর আগেই বংশের কর্তাদের দানধ্যানের দৌলতে এবং ঋণ মেটাতে যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি অন্যের হস্তগত হয়ে যায়।

তারপর থেকে একের পর এক মালিকানা পরিবর্তন হতে হতে এখন তা অব্যবহৃত অবস্থায়

পড়ে আছে।

আদালতে এখনও উত্তরাধিকারের মামলা মোকদ্দমা চলছে। আর সুখে সস্তা দামের পাউডার মেখে আর লেস লাগানো জামা পরে চার্লস বংশের মহাপুরুষরা এখন প্রায়ান্ধকার নিস্তব্ধ বাড়িটায় রাতের আসর জমায়। এসব কাহিনীর মধ্যে যদি সত্যতা না থাকে তবে বলতেই হয় চার্ল রয়-এর ভুতুড়ে বাড়িটায় এমন কেউ-ই বাস করে না। জনমানবশূন্য একটা বাড়ি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থেকে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে ব্যস।

একদিন সলিসিটর বললেন, আপনি যতদিন খুশি বাড়িটাকে ব্যবহার করতে পারেন। এক হপ্তা, এক মাস বা এক বছর যতদিন মন চায় ব্যবহার করুন, আপত্তি নেই।

জানেন, এক সময় এ ছাদের তলায় বসে মধ্যাহ্নে আর নৈশ ভোজ সেরেছি। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সলিসিটার কথাটা বললেন।

সার্তেস, কানাল, সাঁৎ চার্লস আর রয়্যাল স্ট্রীটের যে সব বড় বড় পুরনো জিনিস কেনা-বেচার দোকান আছে সেখানে একজন শান্ত শিষ্ট দোকান যুবককে আসা-যাওয়া করতে দেখা যেতে লাগল। সেখানে পুরনো আসবাবপত্র, ধাতব তৈজসপত্র—বিশেষ করে রুপোর সামগ্রী, চায়না, ঘরকন্নার ছোটখাট জিনিসপত্র আর ঘর সাজাবার সামগ্রী বিক্রি হয়। যুবকটার মাথায় ছোট্ট একটা টাক। কথাবার্তা চালচলন উল্লেখযোগ্য। আর একটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে তার শিল্পরসিকসুলাভমনোভাব।

যুবকটা পুরো দোকানটা ঘুরেফিরে দেখতে লাগল। কিসের খোঁজে সে দোকানটায় ঘুরঘুর করছে তা সে দোকানিকে খোলসা করেই বলল। সে বলল—দেখুন, খাবার ঘর, বৈঠকখানা, পোশাকপত্র রাখার ঘর প্রভৃতি সাজাবার জন্য কিছু সৌখিন জিনিস আমি ভাড়া করতে ইচ্ছুক। শর্ত হচ্ছে, যাবতীয় জিনিসপত্র বাক্সে প্যাক করে পাঠিয়ে দিতে হবে। তারপর চারদিন বাদে আবার একইভাবে প্যাক করে আপনার দোকানে ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

আর এ-ও বলছি, আপনার জিনিসপত্রের যদি কোনরকম ক্ষয়ক্ষতি হয় অর্থাৎ যদি হারিয়ে যায় বা ভেঙে যায় উভয় ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের কথা বলছি।

দোকানিদের অনেকেই গ্রাঁদেমঁতকে অনেকেই আগেই দেখেছে, আর সে আসলে চার্লসদের সঙ্গে বিভিন্ন কাজকর্মের সুবাদে প্রত্যক্ষ পরিচয়ও ছিল অনেকেরই সঙ্গে। তাদের মধ্যে অনেকেই ক্রিফেল-এর অধিবাসী।

দারিদ্রের জ্বালায় জর্জরিত এ যুবক করণিক ক্রেতা নিজের যাবতীয় সঞ্চিত অর্থকে দিন দুয়েকের জন্য হলেও প্রাচীন গৌরবের আলোকশিখাকে জ্বালিয়ে তোলার এক জাঁকজমকপূর্ণ অবিবেচকের মত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তার আন্তরিক ইচ্ছার কথা জানাতে পেরে তাদের মধ্যে অভাবনীয় সহানুভূতির সঞ্চার হল।

দোকানিরা বলল—আপনার পছন্দমাফিক জিনিসপত্র বেছে নিন। যদিও ক্ষতিপূরণের শর্ত থাকবে তবু বলছি, একটু যত্ন নিয়ে ব্যবহার করলে আর ক্ষতিপূরণের হ্যাপা পোহাতে হবে না। এতে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ কমই থাকবে। তবে কথা দিচ্ছি, ভাড়ার হার আপনার পীড়ার কারণ হবে না।

এবার মদের কারবারীদের ব্যাপার, তারা দু'শ' ডলারের একটা মোটা অংশই ছেঁটে নিয়ে নিল, তবে সবচেয়ে ভাল ও দামী মদ বেছে নেওয়ার সুযোগ পেয়ে গ্রাঁদেমঁত খুবই আনন্দিত হল।

শ্যাম্পেনের বোতলের সারিটা যেন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকাডাকি করতে লাগল। সে তাদের আহ্বানকে সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে গেল।

পুরো দু'শ' ডলার পকেটে নিয়ে সে বোতলগুলোর সামনে আগের মতই ঠায় দাঁড়িয়ে রইল ঠিক যেভাবে একটা শিশু একটা পেনি মুঠো করে ধরে একটা মনোলোভা পুতুলের সামনে লুব্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে।

এবার রান্নাঘরের ব্যাপারটার পালা। এ ব্যাপারটা নিয়ে তাকে দীর্ঘসময় ধরে ভাবতে লাগল। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বাছাবাছি করার ফাঁকে আঁদ্রেমঁত-এর কথা তার মনের কোণে উঁকি দিল। পুরো মিসিসিপি উপত্যকা অঞ্চল জুড়ে ফরাসী ক্রেয়ল রান্নার সামগ্রীর জন্য সে একজন যোদ্ধা।

সে হয়ত এমন এ অঞ্চলেরই কোথাও আছে।

সলিসিটার তো তাকে বলেছেনই, মামলায় বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে অঞ্চলটাতে আজও চাষবাস চলছে।

পরের রবিবার এল। সেদিন সকালেই আঁদ্রেমঁত ঘোড়ার পিঠে চেপে চার্লরয় চলে গেল। দরজা-জানালা আর খড়খড়ি বন্ধ থাকায় সুবিশাল বাড়িটাকে কেমন যেন ফাঁকা আর নিরানন্দময় মনে হতে লাগল।

দীর্ঘ অব্যবহারে বাড়িটার উঠোনে লম্বা-লম্বা ঘাস আর লতাপাতার ঝোপঝাড় গজিয়েছে। প্রধান ফটক আর পথে শুকনো পাতা স্তূপাকৃতি হয়ে রয়েছে।

গ্রাঁদেমঁত বাড়িটার পাশের সরু গলি-পথটা ধরে খামারের কর্মীদের বাসার দিকে এগোতে লাগল। রঙ-বেরঙের পোশাক গায়ে চাপিয়ে মজুররা খুশিভরা মন নিয়ে দলবেঁধে গীর্জা থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল।

আঁদ্রে এখনও এখানেই থাকে। তার মুখের হাসিটুকু আজও আগের মতই চোখে পড়ছে। পোশাকেও খুশির চিহ্ন।

গ্রাঁদেমঁত এবার আঁদ্রেকে নিজের ইচ্ছার কথা তাকে বলল। আর গর্বে পুরনো সে পাচিকাটা যেন ফুলেফেঁপে উঠল। খাবার দাবার পরিবেশনের আগে তাকে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে হবে না জেনে সে যারপরনাই খুশি ও নিশ্চিন্ত হল। তাই তো ভাবাপ্লুত হয়ে মোটা ডলার তার হাতে দিয়ে খাদ্যবস্তুর ব্যাপারে তাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে দিল।

কালো চামড়ার মানুষগুলোর মধ্যে বাড়ির পুরনো চাকরবাকরদের মধ্যে অনেকেই আছে। রান্নাবান্না, পরিবেশন, ভাড়ার ঘর রক্ষণাবেক্ষণ, সংসারের অন্য যাবতীয় খুঁটিনাটি কাজের চাকরবাকর আর নায়েব এবসালম প্রমুখ মিলে আধাডজন যুবক মসি গাঁদে-র সঙ্গে দেখা করার জন্য দরজায় ভিড় করল।

এবসালম কথা দিল—স্যার, এদের ভেতর থেকেই এমন একদল সহকারীকে বেছে কাজে নিয়োগ করা হবে যারা খাবার দাবার পরিবেশনেও দক্ষ।

একদল বিশ্বস্ত চাকরবাকরদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন কাজের দায়িত্ব দিয়ে গ্রাঁদেমঁত শহরে ফিরে গেল। এতেই সব মিটে গেল না। আর বহু টুকটাক কাজকর্ম নিয়ে তাকে ভাবনা চিন্তা করতে হবে। ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে হবে। পরিকল্পনামাফিক কাজটা যাতে সম্পন্ন হয় তার জন্য সে যাবতীয় ব্যবস্থাদি পাকা করে ফেলল। যাবতীয় প্রয়োজনীয় কাজকর্ম মিটিয়ে সে ভাবল, এবার বাকী রয়ে গেল কেবলমাত্র আমন্ত্রণপত্র পাঠাবার ব্যাপারটা।

নদীর তীরবর্তী প্রায় মাইল বিশেক অঞ্চল জুড়ে এমন আধা ডজন পরিবারের বাস যাদের চার্লস-পরিবারেরই সমসাময়িক কালের রাজকীয় আপ্যায়ন ছিল রীতিমত বড়াই করার মতই জাঁকজমকপূর্ণ। এক সময় তারাই ছিল সমাজের মাথা, গর্বিত আর শ্রদ্ধাভাজন পরিবার। ছোট্ট গণ্ডীটার মানুষের সামাজিক হৃদ্যতার বন্ধন ছিল খুবই আন্তরিক ও সহানুভূতিপূর্ণ।

গ্রাঁদেমঁত সবিনয়ে নিবেদন রাখলেন, আর মাত্র একটাবারের জন্য হলেও বন্ধুবান্ধব হিতাকাঙ্ক্ষী অন্তত আর একটা বারের জন্য হলেও সবাই এ বাড়িতে উপস্থিত হয়ে বাড়িটা তিথি-উৎসব উপলক্ষে জানুয়ারির উনিশ তারিখে চার্লরয়-তে উপস্থিত হয়ে যেন আনন্দ বর্ধন করেন।

আমন্ত্রণ-পত্র তো আর সুখের কথাতেই তৈরী হয়ে যাবে না। তার আঁকা-লেখা করতে হবে। গ্রাঁদেমঁত নিজেই বসে গেল সেগুলোর আঁকার কাজটা আগে মিটিয়ে ফেলার জন্য। তার নিপুণ তুলির টানে কার্ডের গায়ে নিখুঁত ছবি ফুটে উঠতে লাগল। শেষ পর্যন্ত আঁকা ও লেখার কাজ মিটে গেলে দেখা গেল, কার্ডগুলো দেখতে রীতিমত দৃষ্টিনন্দন হয়ে উঠেছে।

জানুয়ারির প্রথম দিকেই সে কার্ডগুলোকে নাম-ঠিকানা অনুযায়ী এক-এক করে পাঠিয়ে দিতে লাগল যাতে আমন্ত্রিতরা নির্দিষ্ট দিনের আগেই হাতে পেয়ে যান।

নির্দিষ্ট দিনে, জানুয়ারির উনিশ তারিখে সকাল আটটায় নিম্ন উপকূলের বাষ্পচালিত নৌকো 'রিভার বেলে' পুলকিত চিত্তে চার্লরয়-এর দীর্ঘদিন অব্যবহৃত ঘাটের দিকে ক্রমে এগোতে লাগল।

নৌকোটা পাড়ে ভেড়ামাত্র তার সঙ্গে কাঠের পাটাতন জুড়ে দেওয়া হল। খামারের মজুরেরা

সারিবদ্ধভাবে বিভিন্ন জিনিসের চুবড়ি মাথায় নিয়ে দুর্বল পাটাতনের ওপর দিয়ে সতর্কতার সঙ্গে নামতে লাগল।

উপস্থিত সভার মধ্যে সবচেয়ে ব্যস্ত দেখা গেল গ্রাঁদেমঁত'কে। বেশী নাড়ানাড়ি না-করার সতর্কবানী সাঁটা চুবড়িগুলোর দিকেই তার সবচেয়ে বেশী লক্ষ্য। কারণ, সেগুলোর মধ্যে রক্ষিত আছে কাঁচ আর চায়নার ভঙ্গুর দ্রব্য বাসনপত্র। এদের যেকোন একটা কোনক্রমে মাথা থেকে পড়ে গেলে তাকে যে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে তা তার এক বছরের সঞ্চিত অর্থ দিয়েও কুলিয়ে উঠতে পারবে না।

নৌকোটা থেকে সবশেষ বাক্সটা নামানো হয়ে গেলে সেটা পাড় থেকে এগিয়ে ভাঁটার টানে দুর্বার গতিতে চলতে লাগল।

নৌকো থেকে নামানো যাবতীয় জিনিস এক ঘণ্টার মধ্যেই বাড়িতে ঢুকে গেল।

এবার শুরু হল এবসালম-এর কাজ, অর্থাৎ সদ্য ভাড়া করে নিয়ে আসা জিনিসগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে রাখার কাজ তদ্বির করা।

বাড়ি গোছানোর কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করার লোকেরও অভাব হল না। কারণ, সেদিনটা চার্লরয়-এর ছুটির দিন। চিরদিনই এ নিয়ম চলে আসছে। আবাসিক নিগ্রোরা সবাই স্বেচ্ছায় কাজকর্ম করতে মেতে গেল।

প্রায় কুড়িজন নিগ্রো যুবক-যুবতী উঠোনের স্তূপাকৃতি পাতা ঝাঁটা দেওয়ার কাজে কোমর বেঁধে লেগে গেল।

আঁদ্রে তার সাবেকি আমলের সে দাপটের সঙ্গে বিশাল রান্নাঘরে ছোট পাচক আর সাহায্যকারীদের ওপর জোর দাপট চালিয়ে তাদের দিয়ে কাজকর্ম করিয়ে নিতে লাগল।

বিভিন্ন রকম কণ্ঠস্বর আর ব্যস্ত-পায়ের শব্দে বাড়িটা রীতিমত জমজমাট হয়ে উঠল।

কম কথা! প্রিন্স বাড়ি ফিরে এসেছে। আর তার চার্লরয় দীর্ঘ একটানা ঘুম থেকে জেগে উঠেছে।

নদীর ওপর থেকে সে রাত্রে চাঁদ ওঠার দীর্ঘদিন না দেখা দৃশ্যটা আবার চোখের সামনে ফুটে উঠেছে। চাঁদের অত্যুজ্জ্বল ভাল-লাগা কিরণ পুরনো বাড়িটার প্রত্যেক জানালা থেকে ছড়িয়ে পড়েছে। বাড়িটার দু' কুড়ি ঘরের মধ্যে মাত্র চারটা ঘরকে সাফসুতরা করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হয়েছে। আমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনা করে বসাবার জন্য সুবিশাল অভ্যর্থনা-কক্ষ, খাবার ঘর আর তাদের আরাম আয়েশ করার জন্য দুটো ছোট ঘরকে সাধ্যমত সাজিয়ে তোলা হয়েছে। প্রত্যেক ঘরের জানালায় জ্বলন্ত মোমবাতি রাখা হয়েছে যাদের মিষ্টি আলোয় বাড়ির এ অংশটা ঝলমল করছে।

সবচেয়ে সুন্দর লাগছে খাবার ঘরটাকে। ঘরের মাঝখানে লম্বা টেবিল পেতে দেওয়া হয়েছে। পঁচিশজন একসঙ্গে বসে পানাহার করতে পারে।

তুষার-শুভ্র সাদা চাদর পেতে দেওয়া হয়েছে পুরো টেবিলটা জুড়ে। তার ওপর রেখে-দেওয়া চায়না ও কাঁচের পাত্রগুলো শীতকালের প্রকৃতির মত ঝক্‌ঝক্ করছে। আসলে সুবিশাল এ ঘরটাই এমন সুন্দর করে তৈরী সে না সাজালেও সুন্দর দেখায়। মূল্যবান কাঠ দিয়ে দেওয়ালগুলোকে শিলিংয়ের অর্ধেকটা পর্যন্ত ঢেকে দেওয়া হয়েছে। তার ওপর দক্ষ হাতের বার্নিশের প্রলেপ। এগুলোও মোমবাতির আলোয় ঝলমল করছে। আর তার ওপর কয়েকটা জল রঙের স্কেচ টাঙিয়ে দেওয়ার ফলে সেগুলোর সৌন্দর্য আরও বেশী খোলতাই হয়েছে।

সাধারণ রুচি সম্মত পদ্ধতিতে অভ্যর্থনা-কক্ষটাকে সাজানো গোছানো হয়েছে। চারদিকে দৃষ্টিপাত করলে যা কিছু চোখের সামনে ফুটে উঠছে সেগুলো দেখলে বিশ্বাস করতেই উৎসাহ পাওয়া যায় না যে, এগুলোকে আবার ধুলোবালি, মাকড়সা আর আরশোলার জিম্মায় রাখা হবে।

বাড়িটায় পা দিয়েই যে হলঘরটায় উঠতে হয় সেটাকেও এমন সুচারু হাতে রুচিসম্মত উপায়ে সাজানো হয়েছে যে সেটায় পা দিয়েই মুহূর্তের জন্য হলেও থমকে যেতে হয়। তার ওপর তাল, ফার্ন আর আলোর ঝক্‌মকি দিয়ে ঘরটাকে আরও অনেক অনেক বেশী আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে।

তখন সাতটা বাজে। হঠাৎ কোত্থেকে যেন গ্রাঁদেমর্ঁত বেরিয়ে এল। তার গায়ে বহুমূল্য সান্ধ্য-পোশাক। পোশাকের গায়ে ছোট-ছোট মুক্ত বসানো।

আমন্ত্রণ-পত্রে সান্ধ্য-ভোজনের সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে রাত্রি আটটা।

বারান্দায় একটা আরাম কেদারায় বসে গ্রাঁদেমঁত চোখ বন্ধ করে স্বপ্নাচ্ছন্ন অবস্থায় সিগারেটে ছোট-ছোট টান দিয়ে চলল।

ধীর মন্থর গতিতে রুপোর থালার মত চাঁদটা আকাশের গা-বেয়ে বেয়ে অনেক ওপরে উঠে গেছে।

প্রধান ফটক থেকে পঞ্চাশগজ দূরে গাছগাছালিতে ঢাকা বাড়িটা অবস্থান করছে। ফটকের গা-ঘেষে পথটা এঁকেবেঁকে ঘাসের উঁচু জমিটা অতিক্রম করে খরস্রোতা নদীটার পাড় পর্যন্ত।

এক সময় দু'মুখো দুটো স্টিমার পরস্পরকে অভিনন্দন জানাল। স্টিমারের কর্কশ সাইরেন নীরব-নিস্তব্ধ নিম্নভূমির বিষণ্ণতা ভেঙে দিতে দিতে স্টিমার দুটো ক্রমে তীরে ভিড়তে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার নদী আর নিম্নভূমির বুকে নেমে এল নিরবচ্ছিন্ন নিস্তব্ধতা। তবে রাত্রের চিরাচরিত কিছু কিছু ক্ষীণ শব্দ জেগেই রইল। তাদের মধ্যে বিশেষ পেঁচার ডাক, ঝিঁঝি পোকার গুঞ্জনধ্বনি, ঘাসের ফাঁক দিয়ে ব্যাঙের উচ্ছ্বাসধ্বনি আর রাতজাগা জানা-অজানা কতসব পাখির ডাক থেকে থেকে সে নিস্তব্ধতাকে ভেঙে দিতে লাগল।

নিগ্রো বস্তি থেকে যেসব ছেলেমেয়ে কাজের তাগিদে এসে জড়ো হয়েছিল তারা দলবেঁধে তাদের ডেরায় ফিরে চলল। আর ছন্নছাড়া ভবঘুরেরাও এক-এক করে বিদায় নিল।

সারাদিনে কর্মকোলাহল এখন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সুশৃঙ্খল নীরবতায় পরিণত হয়েছে।

কুচকুচে কালো ছ'টা পরিচারক সাদা কোর্তা গায়ে চাপিয়ে, কোমরে বেল্ট আর মাথায় টুপি পরে পায়ে সাধ্যমত কম আওয়াজ তুলে টেবিলের চারদিকে হাঁটাচলা করছে। এরই ফাঁকে তারা সাজানো জিনিসপত্রকে এদিক-ওদিক সামান্য সারিয়ে নতুন করে সাজাবার ভান করছে।

যে সব জায়গায় এখনও আলোর রোশনাই রয়েছে সে সব জায়গায় কালো পোশাক গায়ে চাপিয়ে এব্‌সালম ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর গ্রাঁদেমঁত চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে আমন্ত্রিতদের প্রতীক্ষায় রয়েছে।

গ্রাঁদেমঁত কোন না কোন স্বপ্নের জাল বুনে চলেছে—অবাস্তব, একেবারেই যুক্তিহীন স্বপ্ন। এর কারণও অবশ্যই আছে। কারণটা হচ্ছে, সাজ পোশাক ও মেজাজ মর্জিতে সে এখন চার্লরয়-এর মালিক বনে রয়েছে, আর আদেল সেজেছে তার সহধর্মিণী।

আদেল এমন গ্রাঁদেমঁত-এর দিকে পায়ে পায়ে এগোচ্ছে। সে তার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। পর মুহূর্তেই তার হাতটা তার কাঁধের ওপর আলতোভাবে রাখল।

এবসালম-এর কণ্ঠস্বর অনুকরণ করে, কালো মানুষদের ভাষায় সে বলল—মঁসিয়ে গ্রাঁদেমঁত, ক্ষমা করবেন। এদিকে আটটা বেজে গেল।

গ্রাঁদেমঁত যেন আচমকা লাফিয়ে উঠল—আরেব্বাস, আটটা! আটটা বাজে!

ব্যস্ত পায়ে সে জানালার কাছে গেল। খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টিপাত করতেই ঘোড়া বাঁধার কাঠের খুঁটির দিকে তার নজর পড়ল। সবগুলো খুঁটিই এখন ফাঁকা পড়ে রয়েছে। এক সময় সবগুলো খুঁটিতে অতিথিদের হরেক রঙের তেজী ঘোড়া বাঁধা থাকত।

আঁদ্রের রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল সুরেলা কণ্ঠের আক্ষেপ সূচক শব্দ। হায় ঈশ্বর! আহা! এমন একটা সুন্দর নৈশভোজ এমন সেরা একটা নৈশভোজ, ছোট হলেও এটাকে নৈশ ভোজের রত্ন আখ্যা দেওয়া যেতে পারে! আর একটা—হ্যাঁ, আর একটা মুহূর্তে পেরিয়ে গেলেই সর্বনাশের চূড়ান্ত হয়ে যাবে। তখন আর বস্তিগুলোর কালো মানুষগুলো এতসব খাবার দাবারের একটা কণাও স্পর্শ করবে না।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গ্রাঁদেমঁত বলল—তারা একটু বেশীই দেরী করে ফেলেছে। আশা করা যাচ্ছে এখনই এসে পড়বে, আর দেরী করবে না। আঁদ্রে'কে নির্দেশ পাঠাও এখনই যেন টেবিলে খাদ্যবস্তু পরিবেশন না করে। আর একটা কথা তাকে বলে পাঠাও, যদি কোন গোঁয়ার ষাঁড় শিং বাগিয়ে খাবার ঘরে ঢুকে পড়ে তবে যেন খবরটা যতশীঘ্র সম্ভব তার কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়।

কথাটা বলেই গ্রাঁদেমঁত আবার চেয়ারে বসে পড়ল। পকেট থেকে সিগারেট বের করে তাতে অগ্নিসংযোগ করল। তারপর ঘন ঘন টান দিয়ে এক গাল ধোঁয়া ঘরময় ছড়িয়ে দিল।

গ্রাঁদেমঁত ভাবল, এত কথা বলল বটে, কিন্তু সে রাত্রে চার্লরয়-এ কাউকে আপ্যায়ণ করতে

পারবে বলে তার মনে হয় না। এরকম ঘটনা চার্লস-পরিবারের আমন্ত্রণে কেউ সাড়া দিল না. এরকমই ঘটনা ইতিহাসে এই প্রথম ঘটল। ইতিপূর্বে তাদের পরিবারে এরকম কোন ঘটনার নজীরই নেই।

সত্যিকথা বলতে কি, গ্রাঁদেমঁত-এর আত্মসম্মানবোধ এতই প্রবল যে, আর নিজের নামটার মর্যাদা সম্বন্ধে তিনি এতই নিশ্চিত ও নিঃসন্দেহ যে, আজকের রাত্রে তার নৈশভোজের টেবিলটা খালি পড়ে থাকবে, এত কিছু আয়োজন বৃথা যাবে এমন কোন ঘটনার কথা সে ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি।

খামারের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের যেসব মানুষের কাছে আমন্ত্রণলিপি পাঠানো হয়েছে তারা প্রায় সবাই প্রতিদিন চার্লরয়-এর পার্শ্ববর্তী সদর রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে।

নিঃসন্দেহে বলা চলে, আজকে যে পুরনো বাড়িটা নতুন রূপ নিয়ে জেগে উঠেছে, হয়ত আজকের এ বিশেষ দিনটাতেও তারা গাড়ি চালিয়ে বাড়িটার পাশের বড় রাস্তাটা দিয়ে গেছে, জীর্ণদশাপ্রাপ্ত বাড়িটা অবশ্যই তাদের চোখে পড়ার কথা।

পথচারিরা চার্লরয়-এর ধ্বংসস্তূপের দিকে আগ্রহের সঙ্গে তাকিয়ে হয়ত আমন্ত্রণলিপিটার ওপর চোখের মণি দুটো বুলিয়ে নিয়েছে। পুরো ব্যাপারটাকে রুচিহীন ভাওতা মনে করে কোন আমন্ত্রিতই পরিত্যক্ত বাড়িটাতে নিমন্ত্রণ করতে এসে বোকামির পরিচয় দিতে কেউ উৎসাহী হয় নি।

রুপালী থালার মত অত্যুজ্জ্বল চাদটা এখন হামাগুড়ি দিতে দিতে গাছপালার ওপরে উঠে গেছে। আর এরই ফলে উঠোনটায় ছায়া, আধো আলো আধো অন্ধকার নেমে এল। নদীর জল বাহিত ঠাণ্ডা বাতাস ঝিরঝির করে বয়ে চলেছে। এটা এ ইঙ্গিতই দিচ্ছে যে, রাত্রি গভীর হলে তুষারপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

তুলোর দালাল করণিক-যুবকটা চেয়ারে বসে সিগারেট টেনে টেনে ধোঁয়ার কুণ্ডলি বাতাসে ছড়িয়ে দিতে লাগল।

হ্যাঁ, আমি সন্দেহের জ্বালায় ভুগছি, নিজের সামান্য কিছু অর্থ যা ছিল সবই এভাবে আহাম্মকের মত ব্যয় করার কথা মুহূর্তের জন্য হলেও তার মনের কোণে উকি দিয়েছে। এখানে, চার্লরয়-এ অবস্থান করে ঘণ্টা কয়েকের জন্য তার হৃত গৌরবকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন সেটাই তার কাছে যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ মনে হচ্ছে।

অলস মনে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে সে একের পর এক স্মৃতির পাতা উল্টে চলেছে:

হঠাৎ একটা বইয়ের কথা তার স্মৃতির পটে ভেসে ওঠামাত্র সে সরবে হেসে উঠল। সে বিশেষ বইটার নাম—একদিন এক গরীব এক ভোজসভার আয়োজন করেছিল।

হঠাৎ এব্‌সালম কেশে উঠল। কাশির শব্দটা কানে যেতেই গ্রাঁদেমঁত আচমকা চেয়ারে নড়েচড়ে বসল। এতক্ষণ সে ঘুমোয়নি। একটু তন্দ্রাভাব, মানে ঝিমুনি এসেছিল, ব্যস।

এব্‌সালম সহজ-সরলভাবেই বলল—মঁসিয়ে গ্রাঁদেমঁত ন'টা বাজল।

গ্রাঁদেমঁত আচমকা চোখ মেলে তাকিয়েই ঝট করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সে আমলের চার্লসরা এক একজন ছিলেন একটা দারুণ মেজাজী মানুষ। ভাঙবে তবু এতটুকুও মচকাবে না। কি করে মাথা কিভাবে নত করতে হয় তারা জানে না।

শান্ত গলায় সে বলল—টেবিলে খাবার পরিবেশন কর।

এব্‌সালম আদেশ পালন করামাত্র গ্রাঁদেমঁত তাকে দাঁড়াতে বলল। কারণ, তার হঠাৎ মনে হ'ল কে যেন প্রধান ফটকের ছিটকিনিটা খুলে বাড়ির দিকেই এগোচ্ছে। আর নেশাখোরের মত আঁকাবাঁকা পা ফেলে, নিজের মনে বকবক করতে করতে ভেতরের দিকে এগিয়ে আসছে।

লোকটা ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলের মত সিঁড়ির তলায় প্রায়ান্ধকারে দাঁড়িয়ে সে অনবরত বক বক করেই চলেছে। সে বলছে—

দয়ার সাগর, দয়ার অবতার একটা গরীব বুভুক্ষুর জন্য একটু-আধটু খাবার দেওয়া যাবে কি? আর কোণায় খুপছি একটু রাত্রি বাসের মত জায়গা কি এখানে হবে না? কারণ ভবঘুরে বাউণ্ডুলেটা এবার একটু অবান্তর কথা বলে ফেলল। এখন আমার ঘুমনো দরকার। আমি ঘুমোতে চাই। রাত্রির অন্ধকার নেমে এলেই এখন আর আমার মাথায় পাহাড়-পর্বত নাচানাচি করে না। আর আমার

কেটলিগুলোতে মাজার সময় যে খস্‌খস্‌ আওয়াজ হয় তা-ও আমার কানে ঢোকে না। আমার পায়ে লোহার বেড়িটা এখনও আটকানো আছে। আর একটা কড়াও আছে। যদি মন চায় তবে আমাকে একটা শেকলে বেঁধেও রাখতে পারেন, বাঁধবেন?

লোকটা এলোমেলো পায়ে সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে ঝুলে-পড়া ছেঁড়া কম্বলটাকে গোছগাছ করে নিতে লাগল।

দীর্ঘপথ ধুলো কাদার মধ্যে পথ পাড়ি দিয়ে আসায় পায়ের সস্তা দামের জুতো জোড়া তুবড়ে গেছে। জুতোর সঙ্গে তার পায়ে লোহার বেড়ি আর কড়াও সবার চোখে পড়ল। ছেঁড়াফাটা পোশাকগুলো দীর্ঘদিন রোদ জল আর ধুলো-বালিতে বিচিত্র বর্ণ ধারণ করেছে। সেগুলোর আসল বর্ণ যে কি ছিল তা আজ আর বোঝার উপায় নেই।

আর মাথার বাদামী চুলের রাশি জট পাকিয়ে গেছে। দীর্ঘদিন তাদের গায়ে তেলের ছোঁয়া আর চিরুণির আঁচড় না পড়ার জন্যই আজ এ হাল হয়েছে। আর সে সঙ্গে ধুলো-বালির সহযোগিতা তো আছেই। বুক পর্যন্ত নেমে-আসা দাড়িগুলো তার মুখটাকে পর্যন্ত ঢেকে ফেলেছে। চুল আর দাড়ির মাঝখান দিয়ে চোখের মণিদুটো জ্বল জ্বল করছে।

গ্রাঁদেমঁত সামনের দিকে ঝুঁকে অনুসন্ধিৎসু নজরে তার দিকে তাকাতেই দেখতে পেল ছন্নছাড়া আগন্তুকটার হাতে একটা কার্ড ধরা আছে।

গ্রাঁদেমঁত কার্ডটার দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে বলল—তোমার চৌকো একটা কার্ডের মত বস্তু দেখা যাচ্ছে, ওটা কি জানতে পারি?

স্যার, পথের ধারে কুড়িয়ে পেয়েছি।

এলোমেলো পায়ে আর দুটো ধাপ উঠে লোকটা গ্রাঁদেমঁত-এর দিকে কার্ডটা বাড়িয়ে দিল।

গ্রাঁদেমঁত হাত বাড়িয়ে কার্ডটা নিলে লোকটা প্রায় গোঙাতে গোঙাতে বলল—স্যার, ক্ষিধেতে পেটের নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত জ্বলেপুড়ে খাঁক হয়ে যাচ্ছে। দয়া করে আগে কিছু খেতে দিন। কিছু টারটিল, এক টুকরো পোড়া রুটি, কিছু না হোক এক মুঠো শিম দিন—আত্মাটাকে শান্ত করি।

একটা কথা কি জানেন স্যার? ছাগলের মাংস আমি গলা দিয়ে নামাতে পারি না। ও মাংস দেখলেই আমার সর্বাঙ্গে কেমন যেন অবাঞ্ছিত ঝাঁকুনি অনুভব করি।

গ্রাঁদেমঁত তার কথার অর্থ বুঝতে পেরেছে কিনা নিঃসন্দেহ হতে না পেরে এবার সে বলল—আসলে ছাগলের গলায় ঝক্‌ঝকে ছুরির ফলা বসিয়ে টান দেওয়ামাত্র সে অসহায় শিশুর মত বিকট আর্তনাদ করে কেঁদে ওঠে। সে নারকীয় দৃশ্যের কথা মনে পড়তেই আমার ফুসফুস কেমন যেন চিপ্‌সে যায়।

গ্রাঁদেমঁত হাত বাড়িয়ে কার্ডটা নিয়ে দেখল, নৈশ ভোজের জন্য যে কার্ডের মাধ্যমে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল এটা তাদেরই একটা। সে নিঃসন্দেহ হল, জনমানবহীন চার্লরয় বাড়িটার সঙ্গে নিমন্ত্রণপত্রটাকে মিলিয়ে দেখে কেউ না কেউ গাড়িতে বসেই বীতশ্রদ্ধ হয়ে গাড়ি থেকেই নির্ঘাৎ কার্ডটাকে পথে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চম্পট দিয়েছে।

ঠোঁটের কোণে ম্লান হাসিররেখা ফুটিয়ে তুলে সে নিজেকে উদ্দেশ্য করেই বলল—নদীর পাড়, ঝোপ-ঝাড় আর সদর রাস্তা থেকে যাকে পাও তাকেই এখানে ডেকে নিয়ে এস।

মুহূর্তকাল পরে সে এব্‌সালম'কে ডেকে বলল—এক কাজ কর, লুইকে একবারটি আমার কাছে পাঠিয়ে দাও তো।

লুই এক সময় অল্প বয়সে তার কাছে পরিচারকের চাকরি নিয়ে এসেছিল। কাজও করেছিল দীর্ঘদিন।

জরুরী তলব পেয়ে একটু বাদেই সাদা কোর্তা গায়ে চাপিয়ে লুই ঘরে ঢুকে গ্রাঁদেমঁত'কে অভিবাদন করে আদেশের অপেক্ষায় তার সামনে দাঁড়াল।

গ্রাঁদেমঁত লুইকে লক্ষ্য করে বলল, শোন এ ভদ্রলোক আমার সঙ্গে বসে রাতের খাবার খাবেন। ওকে সঙ্গে নিয়ে স্নানের ঘরটা দেখিয়ে দাও। স্নান করিয়ে ভাল পোশাক পরিয়ে আমার কাছে নিয়ে আসবে। মনে রেখো, বিশ মিনিটের মধ্যে ওকে সাফসুতরা করে, সাজ পোশাক পরিয়ে নিয়ে এসে খাবার পরিবেশন করতে হবে।

এব্‌লাসম ঘোষণা করল, বিশ মিনিটের মধ্যেই ডিনার পরিবেশন করা হবে।

এদিকে লুই বিশ মিনিটের মধ্যেই আগন্তুক অতিথিকে ভাল সাজপোশাক পরিয়ে খাবার ঘরে গ্রাঁদেমঁত-এর সামনে, হাজির করল। গ্রাঁদেমত টেবিলের এক ধারে দাঁড়িয়ে তারই জন্য অপেক্ষা করছে।

লুই-এর অভিজ্ঞ হাতের স্পর্শে নবাগত অতিথিটা এক ভদ্র-জীবে পরিণত হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে আকর্ষণীয় হয়েছে তার মাথার টুপিটা। এটা কোন এক পরিচারকের জন্য শহর থেকে আনানো হয়েছিল। এটা পরাতেই যেন তার চেহারাটার আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে।

কেবলমাত্র পোশাক পরিচ্ছদের কথাই বা বলি কেন, কাকের বাসার এলোমেলো ও জটাওয়ালা চুল আর দাড়ির ঝোপটাকে অনেকটা আয়ত্তে নিয়ে এসেছে।

তবে নবাগত অতিথি যখন খাবার টেবিলটার দিকে এগোতে লাগল তখন কিন্তু তার চোখে মুখে এমন কোন ছাপ লক্ষিত হল না যার ফলে তাকে এক আনাড়ি বলে মনে করা যেতে পারে আর কোন রকম হতভম্বের ভাবও চোখে পড়ল না যা আরব্যরজনীর এরকম আকস্মিক খোলস বদলের পর তার কাছ থেকে স্বাভাবিক ভাবেই প্রত্যাশা করা হয়েছিল।

এব্‌সালম তাকে নিয়ে গিয়ে গ্রাঁদেমঁত-এর ডানদিকে বসিয়ে দিলে সে এমন হাবভাব করল যেন ব্যাপারটা তার কাছে বিশেষ কিছু নয়, বরং খুবই স্বাভাবিক। আর এ পরিস্থিতিতে সে অভ্যস্ত, খুবই মামুলি ব্যাপার।

গ্রাঁদেমঁত ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বলল—মশাই, একজন অতিথির সঙ্গে নিজের পরিচয় দিয়ে পরিচিত হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত। আমার নাম যে চার্লস, আশা করি আপনার জানা আছে?

ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলে আগন্তুক নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে মুখ খুলল—আমার নামটাও আপনার হয়ত জানতে ইচ্ছে করছে? পাহাড়ে সবাই আমাকে গ্রিংগো বলে সম্বোধন করে। আর পথচারীরা আমাকে জ্যাক বলে জানে।

আপনার শেষের নামটাই আমার কাছে শুনতে ভাল লাগছে। মিঃ জ্যাক আপনার সম্মানে এক গ্লাস করে মদ হয়ে যাক। গ্রাঁদেমঁত-এর নির্দেশে অগুনতি পরিচারক একের পর এক গ্লাস মদ পরিবেশন করতে লাগল।

আঁদ্রে-র চমৎকার রান্নার কায়দা-কৌশল আর নিজের মদ বাছাইয়ে উদ্দীপিত হয়ে গ্রাঁদেমঁত রীতিমত একজন আদর্শ গৃহকর্তায় পরিণত হয়ে গেল। তারওপর সৌজন্য আর রসিকতার ব্যাপারটা তো আছেই।

মদের গ্লাস হাতে নিয়ে আগন্তুক যে সব কথাবার্তা বলতে লাগল তাতে তাকে যেন কেমন অস্থির মনে হতে লাগল। আর কথাবার্তাও যেন কেমন এলোমেলো আর অসঙ্গত। আর তার অন্তরের অন্তঃস্থলে যেন একের পর এক আত্মবিস্মৃতি, সাবলীন ও সহজ-স্বাভাবিক চিন্তা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল। আর চোখের তারায় সাম্প্রতিক জ্বর-বিকারের লক্ষণ ফুটে উঠেছে। দীর্ঘ জ্বর-বিকারের ফলেই হয়ত তার শরীর এমন কৃশ, দুর্বল, মানসিক অস্থিরতা আর বিষণ্ণতার কারণ।

ফ্যাকাশে মুখটার হাল্কা প্রসন্নতার ছাপ ফুটিয়ে তুলে জ্যাক গ্রাঁদেমঁত-এর নামটাকে বদলে নিয়ে সম্বোধন করল—চার্লস একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

—কি? কি কথা? নির্দ্বিধায় বলতে পারেন।

—আচ্ছা, আপনি পাহাড়কে কখনও নাচতে দেখেন নি, তাই?

—পাহাড়ের নাচন? না, সে সৌভাগ্য আমার হয়নি। মুচকি হেসে গ্রাঁদেমঁত জবাব দিল।

—তাই বুঝি?

—হ্যাঁ, ঠিক তা-ই, মিঃ জ্যাক, আপনাকে নিশ্চিত করে আমি বলতে পারি যে, দৃশ্যটা অবশ্যই দেখার মতই, মানে আকর্ষণীয় হবে। আপনারও অবশ্যই জানা আছে, ধবধবে সাদা বরফের মুকুট মাথায় নিয়ে সুবিশাল পাহাড়গুলো ওয়াল্‌টজ্ নাচে, দাকোলেতো-ও মনে করতে পারেন।

কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা প্রকাশ করে জ্যাক বলল—সকালে শিমগুলো রান্না করার জন্য কেটলিগুলো ঝক্‌ঝকে চক্‌চকে করে মাজা দরকার। তারপর কম্বলের ওপর টানটান হয়ে শুয়ে নিশ্চল-নিথরভাবে

পড়ে থাকবেন।

—তারপর? তারপর কি হবে?

ব্যস, তারপরই তারা সবাই বেরিয়ে এসে আপনার সামনের বাজনার তালে তালে নাচতে শুরু করবে। নাচ দেখে আপনি এমন উদ্বুদ্ধ হয়ে পড়বেন যে, তাদের সঙ্গে নাচার জন্য আপনার মধ্যেও উৎসাহ জাগবে। কিন্তু তা আর হবার নয়। কারণ, আপনাকে তো প্রতি রাত্রেই শেকল দিয়ে খুঁটিয়ে সঙ্গে বেঁধে রাখবে। পাহাড়গুলো যে নাচে, মানে নাচতে পারে একথা আপনি বিশ্বাস করেন মিঃ চার্লস?

দেখুন, ভ্রমণকারীদের কথার প্রতিবাদ না করাটাকে আমি সৌজন্যের পরিচায়ক বলেই মনে করি মিঃ জ্যাক। গ্রাঁদেমঁত হেসে কথাটা জ্যাক-এর উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দিল।

তার কথায় মিঃ জ্যাক সরবে হেসে উঠল। গ্রাঁদেমঁত-এর দিকে ঝুঁকে প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল—আপনি একটা নিরেট আহাম্মকের মতই এসব ব্যাপার স্যাপার বিশ্বাস করেন। আসলে পাহাড়গুলো তো সত্যি সত্যি নাচে না। তবে? নাচটা জ্বরের ঘোরে, বিকারের জন্য আমার মাথার মধ্যে নাচটা হয়। হাড়ভাঙা পরিশ্রম আর খারাপ জলেই এরকম জ্বর হয়। হপ্তার পর হপ্তা ধরে আপনি অসুস্থ হয়ে বিছানা আঁচড়ে পড়ে থাকবেন। এ ব্যামোর কোন দাওয়াই-ই নেই। রোজ সন্ধ্যায় কুঁতকুঁত করে জ্বর আসবে। তখন আপনার শরীরে অসুরের মত, মানে দু'জন মানুষের শক্তি হবে।

এক রাত্রে সাকরেদরা সব মদে বে-হুঁস হয়ে এলিয়ে পড়ে থাকে। তারা রূপোর ডলার ভর্তি ঝোলা নিয়ে হাজির হয়। খুশিতে ডগমগ হয়ে গলা পর্যন্ত মদ গিলে তারা বুঁদ হয়ে যায়। রাত্রির অন্ধকার নেমে এলে ফাইল দিয়ে ঘষে ঘষে শিকলটা কেটে পাহাড়ে চম্পট দিন।

মাইলের পর মাইল অনবরত হাঁটা—তাদের দলে তখন শ'য়ে শ'য়ে মানুষ। একের পর এক পাহাড় ক্রমে পিছনে পড়ে রইল। তারা সবাই পাহাড়ে পৌঁছে লম্বা লম্বা ঘাসের বনে। রাত্রে কিন্তু পাহাড়গুলো নাচানাচি করে না। তাদেরও তো দয়া মায়া আছে। আপনারা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ুন। তারপর আর দেরী না করে আপনারা নদীর তীরে পৌঁছে যান। নদী আপনার কানে কানে কত কথাই না বলে। নদীর তীর ধরে অনবরত চলেছেন তো চলেছেনই। কিন্তু হন্যে হয়ে যা খুঁজছেন তা কিন্তু পাচ্ছেন না।

মিঃ জ্যাক চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম করে বসল। ক্রমে তার চোখের পাতা দুটো বুজে আসতে লাগল। উপাদেয় খাদ্যবস্তু আর দামী ভাল মদ তার অন্তরে গভীর প্রশান্তির সঞ্চার করল। তার মুখের রেখাগুলো ক্রমে মিলিয়ে গিয়ে মসৃণ হয়ে আসতে লাগল। এক অবর্ণনীয় অবসন্ন ভাব তাকে আচ্ছন্ন করে তুলল।

ঘুমে প্রায় বুজে ওঠা চোখে সে এবার বলতে লাগল—মিঃ চার্লস, আমি ভালই জানি, খারাপ—এটা খুবই খারাপ। এভাবে ঘুমে চোখ বুজে আসা—খাবার টেবিলে বসেই, কিন্তু কিন্তু বুঝতেই পারছেন, দারুণ খাবার খেয়েছি মশাই! আর আপনি তো পুরনো মানুষ গ্রাঁদেমঁত।

গ্রাঁদেমঁত! গ্রাঁদেমঁত! নামের মালিক সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসে পড়ল। সচকিত হয়ে হাতের গ্লাসটাকে সশব্দে টেবিলে নামিয়ে রাখল। বৃষ্টি-ভেজা কাকের মত দেখতে যে লোকটাকে সে খলিফার মত সম্মান খাতির করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে, দামী পোশাক পরিয়ে সুখাদ্য ও দামী মদ খাইয়েছে সে তার নামটা কি করে জেনে ফেলল। চাকর বাকরদের মধ্যেও কেউ তো তার নাম উচ্চারণ করেনি, তবে?

গ্রাঁদেমঁত-এর মধ্যে অল্প অল্প করে হলেও উদ্ভট একটা সন্দেহ তার মনে দানা বাঁধতে লাগল। একেবারেই অকল্পনীয় ও অযৌক্তিক সে সন্দেহ।

সে কাঁপা-কাঁপা হাতে পকেট থেকে ঘড়িটা বের করে তাড়াতাড়ি তার পিছনের ঢাকনাটা খুলে ফেলল। ঢাকনাটার ভেতরের দিকে একটা ছবি একটা ফটোগ্রাফ আটকানো রয়েছে।

গ্রাঁদেমঁত যন্ত্রচালিতের মত নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে আগন্তুক অতিথি জ্যাক-এর ঘাড়ে হাত রেখে বার-কয়েক ঝাঁকুনি দিতে লাগল।

পরিশ্রান্ত—প্রায় ঘুমের শিকার হয়ে-পড়া লোকটা গ্রাঁদেমঁত-এর দিকে চোখ মেলে তাকাল। চোখ দুটো পিট পিট করতে লাগল।

গ্রাঁদেমঁত ঢাকনা-খোলা ঘড়িটা তার চোখের সামনে ধরল। এবার বেশ গম্ভীর স্বরেই বলল—মিঃ জ্যাক, ঘড়ির ভেতরের ফটোগ্রাফটার দিকে তাকান। একটা কথা খোলসা করে বলুন তো, আদেল আমার বোন।

আদেল আপনার বোন! সত্যি করে বলুন তো—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই জ্যাক অধিকতর দৃঢ়তার সঙ্গে এবার উচ্চারণ করল—হ্যাঁ, যা বলেছি শতকরা একশ' ভাগই সত্যি। ছন্নছাড়া ভবঘুরে লোকটার কণ্ঠস্বর ঘরটায় বার-বার প্রতিধ্বনি হতে লাগল। আচমকা সে পা দুটো সামনের দিকে বাড়িয়ে দিতে না দিতেই গ্রাঁদেমঁত ঝট্ করে এগিয়ে দু' হাতে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। ভাবাবেগে আপ্লুতকণ্ঠে বলে উঠল, ভিক্টর! ভিক্টর! ভিক্টর ফকুয়ের! তুমি আমার দেবতুল্য! আমার প্রতি সদয় হও। আমার দিকে মুখ তুলে তাকাও!

উধাও হয়ে যাওয়া মানুষটা ক্লান্তিতে এতই এলিয়ে পড়েছে, ক্রমে এমন ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে লাগল সে, রাত্রে তার কাছ থেকে আর কোন কথাই বের করা সম্ভব হল না।

পরবর্তীকালে তার টুকরো-টুকরো অগোছাল কথাগুলো একটা পরিপূর্ণ অর্থের রূপ পেল।

সে তার সম্পূর্ণ কাহিনী ধীরে ধীরে বলল—উত্তেজনা বশত একদিন সে বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল। জলে আর স্থলে সে কী মর্মান্তিক দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে দিন কাটিয়েছে, কত বিঘ্ন-বিপদের মুখোমুখি হয়েছে, দক্ষিণ মুল্লুকে কতই না ভাগ্য বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে, ঘটেছে হাজারো উত্থান-পতন।

অতি সম্প্রতিকালে সে মেক্সিকোর সোনেরা পর্বতমালায় ডাকাতদলের হাতে ধরা পড়ে যায়। তারা তাকে তাদের ডেরায় বন্দী করে দেয়। পায়ে বেড়ি পরিয়ে আর শেকলে আটকে রেখে চাকরের কাজ করাতেও এতটুকুও দ্বিধা সে করেনি।

তারপর সে জ্বরে পড়ল। মাত্রাতিরিক্ত জ্বরে তার মধ্যে বিকার দেখা দিল। সুযোগ বুঝে তাদের চোখে ধুলো দিয়ে সে সেখান থেকে চম্পট দিয়েছে। এবার শুরু হল তার আবার নতুন করে পথে পথে চলা। এভাবে পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে কোন এক অত্যাশ্চর্য প্রকৃতির আকর্ষণে সে একদিন এ নদীটার কাছে হাজির হল। এরই তীরে একদিন সে জন্মগ্রহণ করেছিল।

সে আরও বলল, তার রক্তে প্রবাহিত সে গর্বিত, লৌহ-কঠিন বস্তুটার কথা যা এতদিন তার মুখে কুলুপ এঁটে রেখেছিল তারই অজ্ঞাতে একজনের মান সম্ভ্রমকে চাপা দিয়ে রেখেছিল। শুধু কি এ-ই? দুটো প্রেমিক-হৃদয়কে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল।

হয়ত তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগছে—প্রেম কি? প্রেম কি বস্তু!

আমি যদি সেটা স্বীকার করে নেই তোমরা তবে আমার কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলবে—অহঙ্কার কি! অহঙ্কার কি বস্তু!—বুঝলে?

ভিক্টর খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে গ্রাঁদেমঁত-এর সঙ্গে অভ্যর্থনা কক্ষে গেল। সেখানে একটা শোফায় শরীর এলিয়ে দিল। তার চোখ দুটোতে ফুটে উঠেছে বুদ্ধির ভোরের অত্যুজ্জ্বল আলো। আর মুখে বিরাজ করছে অবর্ণনীয় প্রশান্তির ছোপ।

চার্লরয়-এর এক রাত্রির অতিথির জন্য এবসালম বিছানা গোছগাছ করতে লাগল। কালই হয়ত তিনি আবার তুলোর দালালের কাজকর্মে যোগ দেবার জন্য এখান থেকে যাত্রা করবেন তবু ত—

অতিথি যুবকটার পশে দাঁড়িয়ে গ্রাঁদেমঁত বলল—'আগামীকাল'—

সে কথাটা শেষ করতে পারল না। কারণ কথাটা বলতে বলতে তার মুখটা হঠাৎ অত্যুজ্জ্বল হয়ে উঠল, এলিজার রথের সারথির মুখ ঠিক যেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তার স্বর্গ-ভ্রমণের গৌরব কথা শোনার সময় আগামীকাল আমি তোমাকে সে মহিলার কাছেই নিয়ে যাব ভিক্টর। কাল, আগামীকালই নিয়ে যাব।

এ ডিপার্টমেন্টাল কেস*

টেক্সাসে হাঁটতে গিয়ে একই সরলরেখার মত সোজা পথে হাজার মাইল পথ পাড়ি দিতে পার। আর যদি পথটা বক্ররেখার মত আঁকাবাঁকা হয়? তবে দূরত্ব আর তোমার গতিবেগ অনেকাংশে বৃদ্ধি পেতে পারে।

সেখানে আকাশের ঝুলে-থাকা মেঘগুলো বাতাসের বিপরীত দিকে হাল্কাভাবে ঘুরে বেড়ায়। অতীতে এক সময় টম গ্রীণ কাউন্টি একটা বেশ বড়সড় জেলা ছিল।

তারপরই আইক নির্মম কুঠারের আঘাতে টম গ্রীন কাউন্টিটাকে কেটে টুকরো-টুকরো করে অনেকগুলো জেলাতে পরিণত করেছেন। তাদের কোনটাই ইওরোপীয় রাজ্যগুলোর চেয়ে বড় তো নয়ই, অধিকাংশ আয়তনে ছোটই বটে।

এরকম একটা কাউন্টি টেক্সাসের এক সময়ের সংখ্যাতত্ত্ব বীমা আর ইতিহাস বিষয়ক কমিশনারের তেমন গুরুত্বপূর্ণ লোক নয়, আবার খুব কমও বলা চলে না।

এক সময়ের কথাটা ব্যবহার করার অর্থ এই যে, সে এখন কেবলমাত্র বীমা বিভাগেরই কমিশনারের দায়িত্বে আছে।

রাজ্যপাল ১৮৮ খ্রীষ্টাব্দে এ বিভাগের প্রধানের পদে লিউক কুন্‌রড স্ট্যান্ডিফার নামক এক প্রৌঢ়কে বহাল করলেন। তখন তার বয়স পঞ্চান্ন বছর। তিনি তখন একজন পুরোমাত্রায় একজন টেক্সান। তার বাবা ছিলেন রাজ্যের একজন খুবই পুরনো বাসিন্দা, অগ্রদূতও বলা চলে। স্ট্যান্ডিফার নিজে একজন সৈনিক হিসাবে কমনলওয়েল্‌থের সেবা করেছেন। আবার আইনপ্রণেতা আর বনরক্ষক হিসাবেও তিনি দেশের কম স্বার্থরক্ষা করেন নি। তাঁর পুঁথিগত বিদ্যা তেমন ছিল না। কিন্তু অবর্ণনীয় অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর কার্যসিদ্ধির নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার।

আর সেজন্যই তো প্রাক্তন বনরক্ষক এজরা স্ট্যান্ডিলার-এর ছেলে লিউক কুনরড স্ট্যান্ডিফারকে ইতিহাস, বীমা আর সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগের কমিশনারের পদে বহাল করা হয়।

লিউক এ সম্মানকে মাথা পেতে নিয়েছিলেন সত্য। কিন্তু সে পদ লাভ করে তাঁকে কোন্ কোন্ দায়িত্ব পালন করতে হবে, আর সে সব দায়িত্ব পালন করার যোগ্যতা তার আছে কিনা এবিষয়ে তার মনে সন্দেহের মেঘ জমাট বেঁধে ছিল। তা সত্ত্বেও পদটার দায়িত্বভার তিনি কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। নিজের সম্মতির ব্যাপারটা তিনি টেলিগ্রাম মারফৎ ওপরওয়ালাকে জানিয়েও দেন।

নতুন পদটা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে তার ছোট শহর থেকে যাত্রা করেন। সেখানে তাঁকে ছোট্ট একটা অফিসে জমি জরিপ আর মানচিত্র আঁকার কাজে হাত দিতে হয়।

তবে এ-ও সত্য যে, নতুন কাজটায় যোগদানের জন্য যাত্রা করার আগে তিনি এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা-র পাতা ঘেঁটে ঘেঁটে সংশ্লিষ্ট কাজের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি যতদূর সম্ভব আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন।

নতুন কমিশনার হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণের পর সপ্তাহ কয়েকের মধ্যেই কাজ সম্বন্ধে তার মনের ভীতি অনেকাংশে লাঘব হয়ে যায়। কাজকর্মের ব্যাপারে তিনি যতই মন-প্রাণ সঁপে দিতে লাগলেন ততই তাঁর মধ্যে স্বাভাবিকতা ফিরে আসতে লাগল।

কমিশনার লিউক-এর অফিসে একজন বুড়ো করণিক কাজ করে। মোটা কাঁচের চশমাধারী। কর্ম-পাগল লোক। সার্থককর্মা। তবে তার মধ্যে যে সবজান্তা ভাব আছে সেটাকে যথার্থই বলা যেতে পারে। ইতিমধ্যে সে তার ওপরওয়ালা বদলেছে সে বিষয়ে তার কিছুমাত্র ভাবান্তর লক্ষিত হল না। আসলে সে এসব কোন কিছুকেই পরোয়া করে না। আর করবেনই বা কেন? নিজের টেবিলটা যার সামলাবার হিম্মত আছে সে অন্যকে তোয়াক্কা করতে যাবেই বা কেন?

বুড়ো করণিকের নাম কৌফ্‌ম্যান। সে-ই বরং তার সদ্য-আসা ওপরওয়ালাকে হাতে ধরে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অল্প অল্প করে কাজকর্ম শিখিয়ে পড়িয়ে দিতে লাগল। ফলে অফিসের যাবতীয় কাজ নির্বিবাদেই সম্পন্ন হতে লাগল।

প্রকৃতপক্ষে সংখ্যাতত্ত্ব, ইতিহাস আর বীমা বিভাগের কাজকর্ম তেমন বেশী কিছু নয়। ফলে

সদ্য যোগদান-করা কমিশনার লিউককে এ ব্যাপারে তেমন চিন্তা করতে হয় না।

সেটা ছিল আগস্টের এক ভ্যাঁপসা গরমের বিকাল। কমিশনার সাহেব ঘর্মাক্ত কলেবরটাকে অফিসের আরাম কেদারায় এলিয়ে দিয়ে, সবুজ কাপড়ে মোড়া টেবিলটার ওপর পা দুটো তুলে দিয়ে আয়েশ করে বসে সময় কাটাতে লাগলেন। দু'ঠোঁটের ফাঁকে জ্বলন্ত চুরুট চেপে ধরে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় জানালা দিয়ে বাইরের বৃক্ষহীন পরিষদ-ভবনের দৃশ্যের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলেন।

কমিশনার লিউক-এর বিভাগের কাজকর্ম তেমন কিছু নয়। বীমা বিভাগের কাজ খুবই সহজ-সরল। আর সংখ্যাতত্ত্ব? এর কোন চাহিদাই নেই। আর ইতিহাস তো মতই। ফলে কাজকর্মে অভিজ্ঞ ও চিরস্থায়ী বুড়ো করণিক কৌফ্‌ম্যান অনবরত ছুটির আর্জি দাখিল করে। আর তা কমিশনার সাহেব মঞ্জুরও করে দেন।

সেদিন অফিসে তেমন কর্মব্যস্ততা আর কোলাহল কিছুই নেই। থেকে থেকে এদিক-ওদিক থেকে টুংটাং, ঠুক্‌ঠাক্‌, খট্‌খট্‌ আওয়াজ এদিক-ওদিক থেকে ভেসে আসতে লাগল। প্রায় নীরব সে পরিবেশ থেকে একসময় শান্ত একটা কণ্ঠস্বর বাতাস-বাহিত হয়ে ঘরে অবস্থানরত লোকগুলোর কানে ভেসে এল।

অপ্রত্যাশিত কথাগুলো কমিশনার লিউক-এর কাছে দুর্বোধ মনে হলেও হঠাৎ কেমন অস্থিরতা তার মধ্যে ভর করল।

কার কণ্ঠস্বর এটা? কোন এক নারীর কণ্ঠস্বর। কমিশনার এমনই এক প্রকৃতির মানুষ যিনি গাউন দেখলেই নতজানু হয়ে কপালে হাত ঠেকান। গাউনের কাপড়টার গুণাগুণ বিচার না করেই তিনি সম্মানে মাথা নত করেন।

কমিশনার মুখ ঘুরে দরজার দিকে তাকাতেই দেখেন, এক যুবতী ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে—দেশের অগণিত দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত মেয়েদেরই একজন। আপাদমস্তক কালো কাপড়ে আচ্ছাদিত। দারিদ্রের চির-প্রতীক। মুখটার দিকে দৃষ্টিপাত করলে মনে হয় তার বয়স চল্লিশ তো হবেই। মুখের রেখাগুলো সে আভাষই দেয়। আসলে বয়স কুড়ি বছরের বেশী নয়।

কমিশনার সাহেব থতমত খেয়ে যন্ত্রচালিতের মত দ্রুত চেয়ারটাকে পিছন দিকে ঠেলে দিয়ে ঝট্‌ করে পা দুটোকে টেবিল থেকে নামিয়ে নিলেন। তারপর প্রায় তোৎলাতে তোৎলাতে বললেন—আমাকে ক্ষমা করবেন মাদাম।

বিষণ্নতার প্রতীক যুবতীটা প্রশ্ন করল—স্যার, আপনি কি রাজ্যপালের পদে বহাল আছেন?

আজ্ঞে না। আমি রাজ্যপাল নই। ইতিহাস, সংখ্যাতত্ত্ব আর বীমা বিভাগের কমিশনারের পদে বহাল আছি।

ও, তাই বুঝি।

হ্যাঁ। বলুন মাদাম, আপনার জন্য আমি কি করতে পারি? দয়া করে ওই চেয়ারটায় বসে বলুন আমার কাছে আপনি কোন্‌ প্রত্যাশা নিয়ে এসেছেন?

যুবতীটা চেয়ার টেনে বসল। হয়ত বা দৈহিক প্রয়োজনের তাগিদেই তাকে বসতে হয়েছে। সস্তা দামের একটা পাখা তার হাতে। সৌজন্যের এ শেষ চিহ্নটা সে এখন আঁকড়ে ধরে রেখেছে, ত্যাগ করে নি। তার পোশাক-আশাক প্রকট দারিদ্র্যের স্বাক্ষর বহন করছে।

মেয়েটা চেয়ারে বসে যে লোকটা রাজ্যপালের পদাধিকারী নন তার দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করেই, স সুস্থির হয়ে বসে রইল। তাঁর মুখে সারল্য ও করুণার স্বাক্ষর লক্ষ্য করল। বয়স চল্লিশ তো হবেই। বছরের পর বছর খোলা আকাশের নিচে রোদ-বৃষ্টির মধ্যে কাজ করার জন্য মুখটা আর বেশী পাকা পাকা আর কঠিন হয়ে পড়েছে। তবে তার মুখের অকৃত্রিম সৌজন্যের ছাপটুকু তার নজর এড়াল না।

মেয়েটা অনুসন্ধিৎসু নজরে দীর্ঘসময় কমিশনার লিউক-এর মুখের দিকে তকিয়ে থাকার ফলে তার চোখ-মুখের স্বচ্ছ ও তীব্রতার ছাপটুকু নজরে পড়ল।

আর তার পোশাক পরিচ্ছদেও তার বর্তমান পেশাগত কর্মসম্পাদনের ছাপ সুস্পষ্ট। তার মাথার চওড়া কালো টুপি আর লম্বা ফ্রক কোটটা পদস্থ অফিসারের লক্ষণ বহন করছে।

কমিশনার লিউক মেয়েদের প্রাপ্য সম্মান প্রদর্শন করতে কখনই ত্রুটি রাখেন না। এখনও সে

সম্মান প্রদর্শন করেই বললেন—মাদাম, আপনি তো রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক, তাই না?

আগন্তুক মহিলা ক্ষণিক ইতস্ততের পর বলল—আমি ঠিক বলতে পারব না। তা হলে হতেও পারে।

পরমুহূর্তেই সামনের চেয়ারে উপবিষ্ট ভদ্রলোকটার সহানুভূতি ও মমত্ব-ভরা চোখের তারার আকর্ষণে সে নির্দ্বিধায় নিজের অভাব অনটন আর দুঃখ-দুর্দশার কথা বলতে আরম্ভ করল। তার বিবাহিত জীবনে দুঃখ-কষ্ট আর অখুশীতে ভরা যে অতীত-কাহিনী বলল তা এক পাশবিক মনোবৃত্তি-সম্পন্ন, অবিবেচক, অমানবিক স্বামীর কাহিনী। লোকটা ছিল এক যথার্থ দুরাচার, ডাকাত, ভীরু আর অমিতব্যয়ী। স্ত্রীর বেঁচে থাকার, খাওয়া-পরার সামান্য ব্যবস্থা করার যোগ্যতাও তার নেই। আর সে দুর্বৃত্ত নামতে নামতে এত নীচে নেমে গেছে যে, বৌয়ের গায়ে হাত তুলতেও সে বাদ দেয় নি। এই তো মাত্র একটা মাত্র দিন আগের কথা, মহিলাটির কপালে একটা ক্ষতচিহ্ন দগ্‌দগ্ করছে। তার অপরাধ একটাই—স্বামীদেবতার কাছে জীবন ধারণের জন্য কিছু অর্থ সে দাবী করেছিল। তাতেই মহাপুরুষটার মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল।

মহিলাটি চোখের জল মুছতে মুছতে এবার বলল—স্যার, আমি ভেবেছি, আমার দুরবস্থায় সরকার তো আমাকে কিছু সাহায্য করলে করতেও পারে। এরকম চিন্তা করে মনস্থ করলাম—রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে আমার দুঃখের কাহিনী বললে হয়ত আমার যা হোক একটা গতি হলে হতেও পারে। তাই আমি অনেক আশা বুকে নিয়ে ছুটে এসেছি।

লোকমুখে শুনেছিলাম, মেক্সিকোর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যারা অস্ত্রধারণ করেছিল। তারপর এদেশে বসতি গড়ে তুলে ইন্ডিয়ানদের তাড়াবার জন্য স্বেচ্ছায় সাহায্য করেছিল, রাজ্য সরকার নাকি তাদের জমি জিরাত দিয়ে সাহায্য করে থাকেন। আমার বাবাও দীর্ঘদিন সে কাজে নিজেকে লিপ্ত রেখেছিলেন। কিন্তু তিনি সরকারের কাছ থেকে কোন রকম সাহায্য পান নি। অবশ্য পেলেও তিনি হাত পেতে কিছুই নিতেন না। আজ অনন্যোপায় হয়েই আমাকে ছুটে আসতেই হয়েছে।

দেখুন স্যার, আমার বাবার সত্যি যদি কিছু প্রাপ্য থাকে তবে তো সরকার আমাকে তা দেবেন, আমি দাবীও করতে পারি।

কমিশনার লিউক বললেন—মাদাম, সেটা সম্ভব হলে হতেও পারে। তবে কথা হচ্ছে, পুরনো অধিবাসীরা তো সরকারের কাছ থেকে নিজ নিজ প্রাপ্য বহুদিন আগেই পেয়ে গেছেন। তবু প্রয়োজনে আমি জমি জিরাত বিলি বন্টনের দপ্তরে গিয়ে আপনার হয়ে খোঁজখবর নিতে পারি। ভাল কথা, আপনার বাবার নামটা কি ছিল, জানতে পারি কি?

—আমোস কল্‌ভিন।

—হায় ঈশ্বর! কমিশনার লিউক আচমকা চেয়ার ছেড়ে উঠে কোটের বোতাম খুলতে খুলতে রীতিমত চড়া গলায় বলে উঠলেন—আমোস কলভিন-এর মেয়ে! মাদাম, আমোস কল্‌ভিন আর আমি দীর্ঘ দশ বছর ধরে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম। আরে, আমরা পাশাপাশি 'কিওয়া'-দের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি, একসঙ্গে গরু-মোষ চরিয়েছি আর এক সঙ্গে সারা টেক্সাস ঘুরে বেড়িয়েছি। এবার মনে পড়ছে, তোমাকে আগেও আমি দেখেছি। তুমি তখন এক ছোট্ট মেয়ে ছিলে। হলুদ রঙের টাট্টু ঘোড়ার পিঠে চেপে তুমি ঘুরে বেড়াতে। আমি তো একবার তোমাদের বাড়িতেও কিছুদিন থেকেছিলাম। আরে, তুমি আমোস কল্‌ভিন-এর সে ছোট্ট মেয়েটা! মনে করে দেখত বাছা, তোমার বাবার মুখে কোনদিন লিউক স্ট্যান্ডিফার-এর নাম কোনদিন তুমি শুনেছিলে? কি, এরকম নাম কোনদিন শুনেছিলে বলে মনে পড়ছে কি?

মহিলাটির ফ্যাকাসে বিবর্ণ মুখে ছোট্ট একটু হাসির ঝিলিক ফুটে উঠল—হ্যাঁ, আপনার নাম বাবার মুখে বহুবার শুনেছি। সত্যি বলতে কি, আপনার মত অন্য কারো নাম বাবার মুখে অনেকবার শুনেছি বলে মনে পড়ছে। বাবা আপনাকে নিয়ে কবে, কোথায় কি করেছেন রোজই গল্প করতেন।

তাই বুঝি? মুচকি হেসে কমিশনার লিউক বললেন।

অবশ্যই। বাবার মুখে আপনাকে কেন্দ্র করে যে শেষ গল্প শুনেছি সেটা আমার আজও স্পষ্ট মনে আছে। আদিবাসীদের সঙ্গে লড়াই করতে বাবা গুরুতর আহত হয়েছিলেন, আর আপনি একটা

জলের পাত্র হাতে নিয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে ঘাসের ওপর দিয়ে এগোচ্ছিলেন ঠিক তখনই তারা আপনার দিকে—

হ্যাঁ, ঠিক—ঠিক বলেছ। আরে ওটা তেমন উল্লেখযোগ্য কোন—' কোটের বোতাম আটকাতে আটকাতে লিউক বললেন। মুহূর্তকাল পরে তিনি আবার মুখ খুললেন—মাদাম, এবার বলত, কোন অপদার্থটা—ধ্যুৎ! মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে, মাপ কর। বল তো লোকটা তোমাকে বিয়ে করেছিল, বল তো?

—বেন্টন শার্প।

বেন্টন শার্প-এর নামটা কানে যাওয়ামাত্র বিকট আর্তনাদ করে কমিশনার লিউক ধপাস্ করে চেয়ারে বসে পড়লেন। তার পুরনো বন্ধু আমোস কল্ভিন-এর শান্তস্বভাবা যে মেয়েটার স্বামী বেন্টন শার্প! অপদার্থ বেন্টন শার্প-এর স্বামী।

বেন্টন শার্প এ রাজ্যের এ তল্লাটের সবচেয়ে বড় দুরাচার—কুখ্যাত গুণ্ডা এক সময় সবচেয়ে বড় ঘোড়া-চোর বলে তার বদনাম ছিল। তার আর যেসব সুনাম ছিল সেগুলো হচ্ছে, সমাজের সবচেয়ে বড় জুয়াড়ি, বেপরোয়া ভাড়াটে গুণ্ডা আর বন্দুকের জোরে সীমান্তবর্তী অঞ্চলের বড় বড় শহরে যত সব দু'নম্বরী ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। বেন্টন শার্পকে ঘাঁটাতে যাবে এত বড় বুকের পাটা কার আছে?

সমাজের ছাপোষা সাধারণ মানুষই কেবল নয়, আইনের কর্তা ব্যক্তিরাও আগ বাড়িয়ে বেন্টন শার্পকে ঘাঁটাতে উৎসাহী হয় না, বরং তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে কোনরকমে চাকরি বজায় রাখে।

ব্যাপারটা কমিশনার লিউক-এর মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না কিভাবে ওই লুঠেরা বাজপাখিটা আমোস কল্ভিন-এর সে শান্ত, সহজ-সরল ছোট্ট পায়রাটাকে বিয়ে করে ঘর বাঁধতে পারল। একী অসম্ভব, একেবারে অবাস্তব ব্যাপার!

মিসেস শার্প নিজের অজান্তেই যেন চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে মিসেস শার্প বলল—মিঃ লিউক, একটা ব্যাপার কি জানেন? আসলে তার সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানা ছিল না। আব একটা কথা আপনাকে বলছি, এতটুকুও বাড়িয়ে বলছি না। সে ইচ্ছে করলে এত শান্ত আর দয়ালু হয়ে উঠতে পারে তা আর কি বলব আপনাকে। তখন আমরা গোলিয়াড নামক ছোট্ট শহরে বাস করতাম। আমাদের বাড়ির পাশের পথ দিয়ে বেন্টন প্রায়ই কেতাদুরস্ত হয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে যেত। মাঝে-মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য আমাদের বাড়ির বৈঠকখানায় বিশ্রাম নিত।

তখন হয়ত বা আমি এখনকার মেয়ে অনেক বেশী ভালই ছিলাম। প্রথম একটা বছর সে আমার প্রতি খুবই অমায়িক—ভাল ব্যবহার করল। ব্যস, আমরা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লাম, আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। সে আমার জন্য পাঁচ হাজার ডলারের একটা জীবন-বীমাও করে ফেলল। তারপর? তারপর গত ছ'মাস ধরে সে আমার ওপর এমন বল্গাহীন অকথ্য অত্যাচার শুরু করল যে, মনে করতে পারেন, খুন করা ছাড়া যে আমার ওপর আর যত রকম অত্যাচার করা সম্ভব, কোন কিছুই করতে সে বাকি রাখল না। হায় ঈশ্বর! সে যদি আমাকে একেবারে মেরে ফেলত তা-ও অনেক ভাল ছিল।

এখন কিছুদিন যাবৎ তার অর্থাগমে ভাটা পড়েছে। দৈন্যদশা চলছে। তাই আমার ওপর সব সময় তিড়িক্কি মেজাজ দেখায়। কথায় কথায় যা ইচ্ছা তা-ই বলে গালমন্দ করে।

তারপরই আমার বাবা ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর একমাত্র সম্বল গোলিয়াডের ছোট বাড়িটা আমার জন্য রেখে গেলেন।

বিশ্বাস করুন মিঃ লিউক, স্বামীর পীড়াপীড়িতে আমি বাবার সে বাড়িটাও বিক্রি করতে বাধ্য হই।

বাড়ি বিক্রির ডলারগুলো হাতিয়ে নিয়ে সে আমাকে ঘাড় ধরে পথে বের করে দিল।

আমি পথের ভিখারী বনে গেলাম এখনে-ওখানে ঘুরে কোন রকমে আমার দিন কাটতে লাগল।

ক'দিন আগে এর-ওর মুখে শুনতে পেয়েছি, এখন নাকি সান এন্টোনিওতে সে দু'হাতে ডলার কামাচ্ছে। উপায়ান্তর না দেখে আমি তার কাছে ছুটে গেলাম। কোন রকমে বেঁচে থাকার জন্য তার কাছে হাত পাতলাম। তখন সে আমাকে—

কথাটা শেষ না করে কপালের ক্ষতটার দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে সে বলল—হ্যাঁ, আমি বেঁচে

থাকার জন্য আমি তার কাছে কিছু অর্থ চাইলে সে আমাকে শুধু 'এটা' দিয়েই বিদায় করল।

অসহায় অবস্থায় পড়ে, নিতান্ত নিরুপায় হয়েই আমি অস্টিনে চলে আসতে বাধ্য হয়েছি। আমার ইচ্ছে ছিল, রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে আমার দুরবস্থার কথা জানাব।

কমিশনার লিউক নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

মিসেস শার্প বলে চলল—শুনুন, এক সময় বাবার মুখে শুনেছিলাম। রাজ্যসরকারের কাছ থেকে তিনি নাকি কিছু জমি বা পেন্সন পেতে পারেন। কিন্তু তিনি তা সরকারের কাছ থেকে কোনদিন চেয়ে নেন নি, নিতেনও না।

কমিশনার লিউক বিষণ্ণমুখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। টেবিলের মূল্যবান আসবাবপত্রগুলোর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে কেটে কেটে বলতে লাগলেন—মিসেস শার্প, তোমার জানা আছে কিনা জানি না। সরকারের কাছ থেকে বকেয়া পাওনা আদায় করা যে কী হ্যাপা, কত হাঁটাহাঁটির ব্যাপার তা আর বলার নয়। সেখানে লাল ফিতের শক্ত গেরো আছে, উকিল-মোক্তারের আদালতের সমস্যা—হাজারো হ্যাপা। এসবের জন্য দীর্ঘদিন কেবলমাত্র অপেক্ষাই নয়, হাঁটাহাঁটি করতে করতে ক'জোড়া জুতো যে বাতিল করতে হবে তার ইয়ত্তা নেই।

কিছু সময় নীরবে ভেবে তিনি আবার বললেন—মিসেস শার্প, সরকারের জমিবন্টন ও আর্থিক সাহায্য দপ্তরে আমার এ দপ্তরের কোনরকম হাত আছে কিনা সঠিক জানা নেই। আমার এ দপ্তরটা কেবলমাত্র ইতিহাস, বীমা আর সংখ্যাতত্ত্ব সম্বন্ধীয়। আমার বিশ্বাস, এসব তোমার স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কোন কাজেই লাগবে না।

একটু থেমে তারপর বললেন—তবে একটা কথা কি জান, কোন কোন সময় তো ঘোড়ার জিনকে টেনেটুনে লম্বা করা সম্ভব। যাক গে, তুমি একটু বস, আমি আসছি। কথা বলতে বলতে তিনি পাশের ঘরের দিকে চলে গেলেন। উদ্দেশ্য, পাশের ঘরে গিয়ে যদি খোঁজ খবর পাওয়া যায়।

সরকারী কোষাধ্যক্ষ ভদ্রলোক মোটা তারের জাল দিয়ে ঘেরা ঘরের মধ্যে বসে খবরের কাগজের ওপর আলসভাবে চোখ বোলাচ্ছেন। দিনের কাজকর্ম প্রায় শেষ। করণিকরা নিজনিজ চেয়ারে বসে ছুটির ঘণ্টার জন্য অপেক্ষায় আছে। এমন সময় ইতিহাস, সংখ্যাতত্ত্ব আর বীমা বিভাগের কমিশনার লিউক ঘরে ঢুকে জানালায় হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি বার বার এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন।

সরকারী কোষাধ্যক্ষ ভদ্রলোক বেঁটেখাটো মানুষ। বৃদ্ধ হলেও দ্রুত কাজ সম্পন্ন করে থাকেন। মুখের বরফের মত সাদা দাড়ির গোছা বুক পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে।

কমিশনার লিউককে দেখেই সরকারী কোষাধ্যক্ষ যন্ত্রচালিতের মত এক লাফে চেয়ার ছেড়ে উঠে স্বাগত জানালেন। চেয়ার টেনে আপ্যায়ন করে বসতে দিলেন। উভয়ের বন্ধুত্ব দীর্ঘদিনের।

কমিশনার লিউক সরকারী কোষাধ্যক্ষ ভদ্রলোককে 'খুড়ো ফ্রাংক' বলে ডাকতেন। পরবর্তীকালে তার এ নামটা প্রচার হতে হতে পুরো টেক্সাস শহরে ছড়িয়ে পড়ে, পরিচিত সবাই তাকে এ নামেই সম্বোধন করে।

কমিশনার লিউক বললেন—খুড়ো ফ্রাংক, আপনার হাতে এখন কি পরিমাণ অর্থ আছে, বলুন তো?

দশ লক্ষ ডলারের কিছু বেশী।

কোষাধ্যক্ষের কথা শোনার পর তাঁর চোখ দুটো আনন্দে চকচক করতে লাগল।

এবার কোষাধ্যক্ষের মুখের দিকে তাকিয়ে কমিশনার এবার বললেন 'খুড়ো ফ্রাংক' আমোস কলভিনকে আপনি চেনেন কি? যদি না-ও চেনেন তবে তার নাম কোনদিন, কারো মুখে শুনেছেন কি?

বিলক্ষণ চিনি। বড় ভাল মানুষ। নাগরিক হিসেবেও তার কদর কম নয়। দক্ষিণ-পশ্চিমের প্রথম স্থায়ী ও সম্মানীত বাসিন্দাদের মধ্যে তিনিও অবশ্যই পড়েন।

তাঁর মেয়ে আমার অফিসে অপেক্ষা করছে, মানে আমি বসিয়ে রেখে এসেছি।

তাই বুঝি? কেন? কোন জরুরী দরকার—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই কমিশনার বলে উঠলেন—সে আজ একেবারেই নিঃস্ব,

কপর্দকহীন। বেনটন শার্প-এর সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল। জানেনই, সে একটা খুনী, পয়লা নম্বরের গুণ্ডা। নেকড়ের চেয়ে হিংস্র।

শুনুন, সে মেয়েটাকে আজ খুবই অভাবের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। তার অমানবিক আচরণ মেয়েটার বুকটাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে।

একটা কথা, আপনি হয়ত জেনে থাকবেন। মেয়েটার বাবা এ রাজ্যটাকে গড়ে তোলার জন্য অভাবনীয় সাহায্য করেছিল। এবার মেয়েটার সাহায্য-সহযোগিতায় রাজ্যের কিছু করণীয় আছে। অর্থাৎ মেয়েটার এ দৈন্য দশায় রাজ্যের উচিত তাকে সাহায্য করা।

শুনুন, হাজার দুই ডলার সাহায্য পেলে সে তার বে-হাত হয়ে যাওয়া বাড়িটাকে আবার কিনে নিতে পারে। আর জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো একটু শান্তিতে কাটাতে পারবে। আমি আশা করছি, টেক্সাস রাজ্য অবশ্যই তাকে হতাশ করবে না। খুড়ো ফ্রাংক আপনি বরং টাকাটা আমাকে দিয়ে দিন। আমি এখনই গিয়ে তাকে পৌঁছে দেব।

কিন্তু—

কিন্তু টিন্তুর কথা নয়, লাল-ফিতের সমস্যাটা আমরা না হয় পরে সুবিধা মত মিটিয়ে নেব।

কমিশনারের কথায় কোষাধ্যক্ষ কেমন একটু বিব্রত বোধ করতে লাগলেন।

বার-কয়েক আমতা আমতা করে কোষাধ্যক্ষ বললেন—দেখুন মিঃ লিউক নিয়ামকের নির্দেশ ছাড়া আমার পক্ষে একটা সেন্টও কাউকে দেওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া ভাউচার ছাড়া একটা ডলার খরচ করার ক্ষমতাও আমার নেই। কী সমস্যায় ফেললেন বলুন ত!

কোষাধ্যক্ষের কথায় কমিশনার লিউক-এর কিছুটা ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বললেন—আমি যদি ভাউচার লিখে দেই, তবে?

কোষাধ্যক্ষ নীরব রইলেন।

কমিশনার লিউক বলে চললেন—আমার যদি এটুকু করার ক্ষমতা না-ই থাকল তবে সরকার আমাকে এ পদে কেনই বা নিয়োগ করেছে? আমি কি দপ্তরে গাছের গুঁড়ির একটা গাঁট হয়ে পড়ে থাকব?

আপনি বৃথাই ক্ষুব্ধ হচ্ছেন মিঃ লিউক।

আপনি কি মনে করছেন, এর জন্য জামিন হতে পারে না? এক কাজ করুন না কেন, সংখ্যাতত্ত্ব আর সংশ্লিষ্ট অন্য দুটো দপ্তরের নামে অর্থগুলো খরচ দেখিয়ে দিলেই ল্যাটা চুকে যায়।

একটা কথার জবাব দিন তো, সংখ্যাতত্ত্ব এ প্রমাণ দেয় না যে, এক সময় আমোস কল্‌ভিন যখন এ রাজ্যের প্রথম পদার্পণ করেন তখন বিস্তীর্ণ অঞ্চলটা ছিল অসভ্য জঙ্গলী আদিবাসী আর বিষধর সাপের আড্ডা। আর এখানে সাদা চামড়ার মানুষের প্রভুত্ব বিস্তার করতে গিয়ে তিনি দিনরাত্রি দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করেছেন।

আর সংখ্যাতত্ত্ব থেকে এ প্রমাণও কি পাওয়া সম্ভব হবে না যে, আমোস কল্‌ভিন-এর মেয়েটার জীবনে এমন চরম দুর্গতিতে ফেলে দিয়েছে এখন এক শয়তান, পয়লা নম্বরের এক দুরাচার যে টেক্সাসবাসীর বুকের রক্ত দিয়ে গড়া ঐতিহ্যকে ধূলিসাৎ করে দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। আপনি, আমি পুরনো আমলের টেক্সাসবাসীরা এর ঐতিহ্যকে গড়ে তোলার জন্য কি অকাতরে বুকের রক্ত ঢেলে দেই নি?

আর ইতিহাসের পাতায় কি প্রমাণ নেই যে, এ রাজ্যটাকে গড়ে তুলতে যারা একদিন অকাতরে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিল, এক তারকা-লাঞ্ছিত পতাকার এ মহান রাজ্য তাদের ছেলে-মেয়েদের দুর্দশা লাঘবে কোনদিন মুখ ফিরিয়ে থাকে নি।

শুনল, ইতিহাস আর সংখ্যাতত্ত্ব দপ্তর যদি আমোস কল্‌ভিন-এর মেয়ের চরমতম দুর্দশার সময় তার ন্যায্য দাবীকে সমর্থন না করে তবে আইন পরিষদের আগামী অধিবেশনেই আমি প্রস্তাব দেব, যাতে আমার পদটার বিলোপ সাধন করা হয়।

কোষাধ্যক্ষ আগের মতই নীরবে মাথা নীচু করে বসে রইলেন।

কমিশনার লিউক এবার বললেন—তাই বলছি কি খুড়ো ফ্রাংক, আপনি না হয় এবারের মত আমাকে তার প্রাপ্য অর্থ নিয়ে দিন। আমি তো কথা দিচ্ছি, আপনি যদি বলেন তো তার হয়ে আমিই

যাবতীয় কাগজপত্রে সই সাবুদ করে দেব।

কিন্তু ব্যাপারটা তো ঠিক একা আমার নয়।

—ঠিক আছে, তারপরও যদি রাজ্যপাল, অর্থ-নিয়ামক বা অন্য যেকোন পদস্থ অফিসার এ ব্যাপারে কোন রকম আপত্তিকর কথা বলেন তবে ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, পুরো ব্যাপারটাকে দেশবাসীর সামনে পেশ করব। আমি দেখতে চাই, তারা এ ব্যাপারটাকে সমর্থন করে, কিনা। আপনাকে ফ্যাসাদে ফেলার কোন কাজই করব না, কথা দিচ্ছি।

কমিশনার লিউক-এর কথাগুলো ধৈর্য ধরে শোনার পর পর কোষাধ্যক্ষকে কেমন যেন বিভ্রান্ত আর সহানুভূতিমান মনে হতে লাগল।

অফিসের করণিকরাও সহানুভূতির সঙ্গে কমিশনার লিউক-এর বক্তব্য শুনতে লাগল।

এবার কোষাধ্যক্ষ আর মুখ বুজে থাকতে পারল না। তিনি যারপরনাই নরম সুরে বলতে লাগলেন—শুনুন মিঃ লিউক, এসব ব্যাপারে সবাইকে সাহায্য-সহযোগিতা করাই আমার কাজ, আর সাহায্য করতেও আমি ব্যক্তিগতভাবে কম উৎসাহী নই। কিন্তু আপনার কাছে আমার একটাই অনুরোধ, আমার জায়গায় দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা সম্বন্ধে একটু ভাবুন।

কমিশনার লিউক জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে কোষাধ্যক্ষের মুখের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলেন।

কোষাধ্যক্ষ আগের মতই নরম সুরে বলতে লাগলেন—আপনার তো আর অজানা নয় যে, রাজকোষের প্রতিটা সেন্ট খরচ করার নিয়ম ব্যবস্থা-পরিষদের বিলি-বন্টনের নিয়ম মেনে অর্থ তোলা হয় অর্থ-নিয়ামকের চেক মারফৎ। এ পথ অবলম্বন করা ছাড়া একটা সেন্টও খরচ করার অধিকার আমার নেই।

আমি তো নিজেই—

না, কেবলমাত্র আমারই নয়, আপনার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য, অর্থাৎ আপনিও অর্থ-নিয়ামককে ডিঙিয়ে একটা সেন্টেও হাত দিতে পারেন না।

আর একটা কথা, আপনার দপ্তর তো অর্থ দপ্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। সেটা সম্পূর্ণরূপে করণিক ভিত্তিক বিভাগ।

সে তো বুঝলাম। তবে কি মহিলাটির অর্থলাভের কোন—

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কোষাধ্যক্ষ বলে উঠলেন—না, তার সামনে কোন পথই খোলা নেই এমন কথা আমি বলছি না।

তবে? তাকে কোন্ পথ অবলম্বন করার পরামর্শ আপনি দিচ্ছেন?

তাকে ব্যবস্থা-পরিষদের শরণাপন্ন হতে হবে।

ব্যবস্থা-পরিষদের কাছে যেতে হবে?

হ্যাঁ। ব্যবস্থা-পরিষদের কাছে লিখিত আবেদন করতে হবে।

ধ্যুৎ মশাই! জাহান্নামে যাক আপনার ব্যবস্থা-পরিষদ! অস্থিরচিত্ত কমিশনারের পক্ষে আর শিষ্টতা বজায় রাখা সম্ভব হল না।

কোষাধ্যক্ষ তাকে শান্ত করতে গিয়ে বললেন—মিঃ লিউক, আপনি বৃথাই ধৈর্য হারাচ্ছেন।

আমার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার ব্যাপারটা যদি আপনি—

হ্যাঁ, আমি আপনার পরিস্থিতিটা ঠিকই উপলব্ধি করতে পারছি। তাই বলছি কি, মাথা ঠাণ্ডা করুন। আমার কথা শুনুন, এখনকার মত মিঃ কাল্‌ভিন-এর মেয়ের খরচ-খরচার জন্য আমি খুশি মনে, নিজের পকেট থেকে এক শ' ডলার দিচ্ছি। কথা বলতে বলতে তিনি কোটের পকেটে হাতটা চালান করে দিলেন।

কমিশনার লিউক এবার গলা নামিয়ে বললেন—খুড়ো ফ্রাংক, আপনার পকেট থেকে কিছু না দিলেও চলবে। কারণ, এরকম কোন অর্থ সাহায্য যে এখনও প্রত্যাশা করেনি।

ও, তাই বুঝি?

হ্যাঁ, ঠিক তা-ই। আর ব্যাপারটা তো এখন আমার ওপর রয়েছে। এখন একটা ব্যাপারই আমি বুঝতে পারলাম, সরকারের মুখে চুণ-কালি দেওয়ার দায়িত্ব এখন আমার ওপর বর্তেছে। এখন বুঝছি, এ দপ্তরের ক্ষমতা একটা দিনপঞ্জী বা হোটেলের রেজেস্ট্রি খাতার তুলনায় কোন অংশে

বেশী কিছু নয়।

কোষাধ্যক্ষ চশমাটাকে আঙুলের ডগা দিয়ে সামান্য ঠেলে যথাস্থানে বসিয়ে দিয়ে তাঁর মুখের দিকে নীরব চাহনি মেলে তাকিয়ে রইলেন।

কমিশনার লিউক পূর্ব প্রসঙ্গের জের টেনে বলে চললেন—শুনে রাখুন, এ-দপ্তরটা যতদিন আমার অধীনে থাকবে ততদিন আমি আমোস কল্ভিন-এর মেয়ের মত অন্য মেয়েদেরও আমি নিরাশ করে ফিরিয়ে দেব না, কিছুতেই নয়। প্রয়োজনে এ দপ্তরের ক্ষমতার সীমা অতদূর পর্যন্তই সম্প্রসারিত করে নেব। প্রয়োজনে ইতিহাস, বীমা আর সংখ্যাতত্ত্ব দপ্তরের কাজকর্মের দিকে চোখ-কান খোলা রাখবেন।

কমিশনার লিউক এবার চোখে-মুখে চিন্তার ছাপ এঁকে নিজের দপ্তরের দিকে পা-বাড়ালেন।

নিজের টেবিলে বসে তিনি অন্যমনস্কভাবে কালির দোয়াতের ছিপিটাকে বার-বার খুললেন আর বন্ধ করলেন।

এক সময় তিনি মুখ তুলে মহিলাটির দিকে তাকিয়ে বললেন—মিসেস শার্প, তুমি বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা দাখিল করছ না কেন?

দেখুন, বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা রুজু করতে যে অর্থ লাগবে তা আমি কোথায় পাব?

কমিশনার লিউক এবার খোলসা করেই বললেন—দেখ, বলতে লজ্জা নেই, ঠিক এ সময়টাতেই আমার দপ্তরে অর্থকড়ির টানাটানি চলছে। আর সংখ্যাতত্ত্ব দপ্তরের জন্য ব্যাঙ্ক থেকে নিয়ম লঙ্ঘন করে অতিরিক্ত অর্থ তোলা হয়ে গেছে। ইতিহাস দপ্তরের কথা যদি বল, তার তো নিজের খরচ চলার মত অর্থই নেই।

মুহূর্তের জন্য ভেবে নিয়ে তিনি এবার বললেন—তবে একটা কথা কি মিসেস শার্প, তুমি জায়গা মতই হাজির হয়েছে। ভেবো না, ব্যবস্থা যা হোক একটা কিছু হয়েই যাবে। ভাল কথা, তোমার স্বামী দেবতাটি কোথায় যেন থাকে বলছিলে?

দেখুন, কাল সে সান এন্টোনিও ছিল। আজও নিশ্চয়ই সেখানেই আছে।

কমিশনার যেন হঠাৎ তার সরকারী চাকরির উর্দিটা এক ঝটকায় খুলে ফেললেন। ছোট মেয়েটার হাতটা চেপে ধরে আগেকার সে ভাবাপ্লুত কণ্ঠে বলে উঠলেন—আচ্ছা, তোমার নাম তো আমান্ডা, ঠিক বলি নি?

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন।

অনেকক্ষণ যাবৎ আমারও তা-ই মনে হচ্ছে। তোমার বাবা প্রায়ই তোমাকে এ নামে ডাকতেন, তাই না?

হ্যাঁ, ঠিকই।

শোন আমান্ডা, তুমি এখন তোমার বাবার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুর সামনে দাঁড়িয়ে। আর সে রাজ্য সরকারের একটা অফিসের প্রধানত কর্মী। তোমার এ চরমতম দুর্দিনে তোমার দিক থেকে যথেষ্ট সাহায্য-সহযোগিতা পাবে। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, আরও দু'-তিন দিন চালিয়ে নেবার মত টাকাকড়ি কি তোমার কাছে আছে?

কয়েকটা দিন চালিয়ে নেবার মত যথেষ্ট অর্থই আমার কাছে আছে।

তবে আর কোন চিন্তা নেই। এক কাজ কর, তুমি যেখানে আশ্রয় নিয়েছ, সেখানেই গিয়ে থাক।

তারপর?

তারপর আগামী পরশু বিকেল চারটায় আবার আমার অফিসে চলে এসো। আশা করি তখন হয়ত তোমাকে নির্দিষ্ট কিছু জানানো আমার পক্ষে সম্ভব হবে। কি আসবে তো?

আসব। অবশ্যই আসব। আমাকে নিজের তাগিদেই আসতে হবে।

ভাল কথা, একটু আগে তুমি বলেছিলে, তোমার স্বামী তোমার নামে পাঁচ হাজার পাউন্ডের একটা জীবন-বীমা করেছিল, তাই না?

হ্যাঁ, বলেছিলাম। আর ঘটনাটা সত্যিও বটে।

আর একটা কথা বল তো, ওই জীবন-বীমার প্রিমিয়ামটা যথা সময়ে অর্থাৎ ঠিক মত দেওয়া হয়েছে কিনা, বলতে পারবে?

হ্যাঁ। পাঁচ মাস আগে সে এক বছরের প্রিমিয়ামের পুরো টাকাই অগ্রিম দিয়েছিল।

রসিদগুলো আছে কি?

সব রসিদই আমার বাক্সে আছে।

ব্যস। তবে তো কোন কথাই নেই।

মিসেস শার্প কমিশনার লিউক-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

কমিশনার লিউক এবার নিজের হোটেলে ফিরে ব্যস্ত-হাতে ট্রেনের সময় সরণির পাতা উল্টে চোখ বুলিয়ে নিলেন। গা থেকে কোট ও ভেস্ট কোট খুলে ফেললেন। তারপর পিস্তলের খাপটাকে এমনভাবে কাঁধের ওপর থেকে বেঁধে নিলেন যাতে খাপটা বাঁ দিকের বগলের ঠিক নিচে থাকে।

চামড়ার খাপটার ভেতরে .৪৪ পিস্তলটাকে ভরে নিলেন। এবার ভেস্ট কোট ও কোটটাকে গায়ে চাপিয়ে পায়ে হেঁটেই স্টেশনের দিকে রওনা হলেন।

বিকেল পাঁচটার ট্রেনটা এসে স্টেশনে ভিড়ল। সান এন্টোনিওগামী ট্রেন।

পরদিন সকালের খবরের কাগজ সান এন্টোনিও এক্সপ্রেস-এর পাতায় বড় বড় হরফে ছাপা হ'ল—

"বেনটন শার্প সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি"

আর শিরোনামটার তলায় ছাপা হল—দক্ষিণ-পশ্চিম টেক্সাস অঞ্চলের সবচেয়ে কুখ্যাত মস্তান গোল্ড ফ্রন্ট রেস্তোরাঁর মধ্যে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেল। কুখ্যাত এ মস্তানের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের এক দায়িত্বশীল কর্মী আত্মরক্ষার সক্ষম –দ্রুততম পিস্তল চালানোর অত্যাশ্চর্য প্রদর্শনী।

ঘটনাটা মোটামুটি এ রকম

বেনটন শার্প গতকাল রাত্রি এগারোটায় দু'জন সঙ্গীকে নিয়ে গোল্ড ফ্রন্ট রেস্তোরাঁয় ঢোকে। তাদের নিয়ে সে কোণের দিকের একটা টেবিলে বসে গলা পর্যন্ত মদ গিলে শার্প তুমুল হৈ হট্টগোল বাঁধিয়ে দেয়। নেশার ঝোঁকে সে প্রায়ই এরকম করে।

পাঁচ মিনিট বাদেই এক ভদ্রলোক সে রেস্তোরাঁয় ঢোকেন। তিনি একজন সুদর্শন ও সুবেশ আর দীর্ঘদেহী পুরুষ।

সেখানে উপস্থিত অন্যান্য খরিদ্দাররা ইতিহাস, বীমা ও সংখ্যাতত্ত্ব দপ্তরে সম্প্রতি নিযুক্ত কমিশনার মান্যবর লিউক স্ট্যান্ডিফারকে চিনতে পারে।

বেনটন শার্প যে দিকের টেবিলে বসে মদ খেয়ে চলেছে মিঃ লিউক পায়ে পায়ে সেদিকে এগিয়ে গিয়ে হয়ত ভাবলেন যে, তার পরের টেবিলে একটা চেয়ারে বসলেই ভাল হয়।

মিঃ লিউক মাথা থেকে টুপিটা খুলে দেওয়ালের একটা হুকে টাঙিয়ে রাখতে গেলেন। আচমকা সেটা খুলে মিঃ শার্প-এর মাথায় পড়ে যায়।

টুপিটা আচমকা মাথার ওপরে পড়তেই মিঃ শার্প সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ঘুরিয়েই তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে, যাকে বলে একেবারে অশ্লীল, অশ্রাব্য খিস্তি।

মিঃ লিউক এ ঘটনার জন্য করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। শার্প কিন্তু কিছুতেই দমল না। সে অনর্গল অশ্লীল খিস্তি খেউর করতেই থাকল।

ঠিক সে মুহূর্তেই মিঃ লিউক দু'পা এগিয়ে গিয়ে একেবারে গলা নামিয়ে, প্রায় সগতোক্তি করার মত ফিসফিসিয়ে মস্তানটাকে কি যেন বললেন। এতই ক্ষীণস্বরে কথাটা বললেন যেন তৃতীয় কোন ব্যক্তি শুনতে না পায়।

তাঁর কথাটা শোনামাত্র মিঃ শার্প রেগে একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে গেল। সে বিদ্যুৎগতিতে লাফিয়ে সোজাভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল।

মিঃ লিউকও ঝট করে কয়েক পা পিছিয়ে চলে যান। তারপরই নিজের ঢিলেঢালা কোটটা দু'হাতে ভাঁজ করে বুকের ওপর তুলে চুপচাপ নিশ্চল-নিথরভাবে দাঁড়িয়ে প্রতিপক্ষের গতিবিধির ওপর নজর রাখতে লাগলেন।

শার্প তখন যন্ত্রচালিতের মত দ্রুততার সঙ্গে একটা হাত হিপ পকেটে চালান করে দিলেন। উদ্দেশ্য যত শীর্ঘ সম্ভব পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে নেওয়া। এ পিস্তলের গুলিতে সে এর আগে কম সে কম ডজনখানেক লোককে পরপারে পাঠিয়েছে।

সেখানে যারা কাছাকাছি উপস্থিত ছিল, অর্থাৎ প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছে, শার্প যে দ্রুততার সঙ্গে পকেট থেকে পিস্তলটা বের করেছে তার চেয়েও দ্রুত গতিতে সেটার মোকাবেলা করা হয় এমন অবিশ্বাস্য যান্ত্রিক গতির মত পাল্টা পিস্তল চালান দিয়ে যা দক্ষিণ-পশ্চিমের কোন মানুষই আজ পর্যন্ত চাক্ষুষ করে নি।

সদ্য পকেট থেকে বের করা পিস্তলটা শার্প উঁচিয়ে ধরেছে, আর তা এতই দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করা হয় যে চোখের দৃষ্টি এত দ্রুত চলতে পারে না।

চোখের পলকে একটা চকচকে .৪৪ পিস্তল যেন ভোজবাজির খেপের মতই এসে পড়ে মিঃ লিউক-এর ডান হাতে। পিস্তলের ঘোড়ায় চাপ পড়ল কি না সেটা বোঝার আগেই শিসার একটা তপ্ত গুলি ছুটে গিয়ে শার্প-এর পাঁজর ভেদ করে বুকের ভেতরে গেঁথে গেল।

ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করে প্রত্যক্ষদর্শীরা অনুমান করেছেন, ইতিহাস, বীমা ও সংখ্যাতত্ত্ব দপ্তরের এ নব নিযুক্ত কমিশনারটি দীর্ঘ কয়েক বছর যাবৎ যে আদলের একজন যোদ্ধা আর বনরক্ষকের কাজে লিপ্ত থাকার ফলেই .৪৪ পিস্তল এত দ্রুত ব্যবহার করার ক্ষমতা রপ্ত করে নিয়েছিলেন।

সবাই মনে করছেন, আজই একটা প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী একটা শুনানী হওয়া ছাড়া মিঃ লিউককে এ ব্যাপারে অন্য কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে না। এর সবচেয়ে বড় কারণ, প্রত্যক্ষদর্শী সবার একই বক্তব্য যে, একমাত্র আত্মরক্ষার তাগিদেই মিঃ লিউক কাজটা করতে বাধ্য হয়েছেন।

পূর্ব নির্দিষ্ট দিনে মিসেস শার্প কমিশনারের দপ্তরে উপস্থিত হল। ঘরে ঢুকে সে দেখল, কমিশনার লিউক আপনমনে কামড়ে কামড়ে একটা সোনালী আপেলের সদ্ব্যবহার করে চলেছেন।

সদ্য আগত মিসেস শার্পকে দেখে তিনি স্বাভাবিক ভাবেই তাকে অভ্যর্থনা করে বসতে বললেন। তারপরই সেদিনের আলোচ্য বিষয়টা সম্বন্ধে নিঃসঙ্কোচে কথা বলতে লাগলেন।

চেয়ারে একটু সোজা হয়ে বসতে বসতে মিঃ লিউক স্বাভাবিক কণ্ঠেই বললেন—মাদাম, এ কাজটা করা ছাড়া আমার অন্য কিছুই করার ছিল না। আর যদি আমি এটা না-ই করতাম তবে নির্ঘাৎ আমারই এ-পরিণতি ঘটে যেত।

এবার বৃদ্ধ করণিক ভদ্রলোকের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তিনি বললেন, মিঃ কৌফ্ম্যান, অনুগ্রহ করে একবার আলমারিটা খুলুন তো।

করণিক আলমারিটার দিকে এগিয়ে গেলে কমিশনার মিঃ লিউক বললেন—আলমারিটা খুলে নিরাপত্তা জীবনবীমা কোম্পানির ফাইলটা বের করুন।

মিঃ কৌফ্ম্যান ফাইলপত্র ঘাঁটা-ঘাঁটি করে সেখান থেকে একটা ফাইল টেনে বের করলেন।

কমিশনার লিউক এবার বললেন—খুলে দেখুন তো, সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা?

মিঃ কৌফ্ম্যান বললেন—খুলে দেখার আর দরকার নেই। সবকিছু ঠিকই আছে। তারা দশদিনের মধ্যেই ক্ষতিপূরণ দিয়ে থাকে। তবু আপনি যখন বলছেন তখন একবার না হয় দেখেই নিচ্ছি।

মিসেস শার্প তখনই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। কমিশনার লিউকও তার সময় নষ্ট করলেন না। কারণ, এ মুহূর্তে তার সেখানে কিছুই করণীয় নেই। এখন তার সবচেয়ে বেশী করে দরকার দীর্ঘ বিশ্রাম।

মিসেস শার্প বিদায় নিয়ে পা-বাড়াবার মুহূর্তে কমিশনার নিজের থেকেই সৌজন্যের তাগিদে বললেন—মিসেস শার্প, সংখ্যাতত্ত্ব, ইতিহাস আর বীমা দপ্তর তোমার স্বার্থে যা কিছু করণীয় সবই সাধ্যমত করেছে। লাল ফিতের ওপর ভরসা রেখে চললে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করা খুবই কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়াত। ইতিহাস দপ্তর কিছুই করতে পারল না, সংখ্যাতত্ত্ব দপ্তর হতাশ হল—তবে যদি অনুমতি করতো বলতে পারি, বীমার পথ অবলম্বন করার ফলেই কাজটা দ্রুত সম্পন্ন করা হল।

দ্য হাল্‌বেরডিয়ার অব দ্য লিটল রাইনশ্লস

যদি হাতে কখন সময় থাকে এবং সুযোগ পান তবে 'পুরনো মিউনিক' রেস্তোরাঁয় এবং 'বিয়ার হলে' একবারটি পদার্পণ করবেন।

কিছুদিন আগেও সে জায়গা দুটো ছিল বোহেমিয়াদের ঘাঁটি। তবে সাম্প্রতিককালে সেখানে কেবলমাত্র গায়ক, চিত্রশিল্পী আর সাহিত্য-সাধকরাই যাতায়াত করে।

কিন্তু সেখানকার পাচকটা এখন ভাল। আর আঠারো নম্বর পরিচারকটার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে আমার খুবই ভাল লাগে।

'পুরনো মিউনিক'-এর খদ্দেররা বহু বছর আগে থেকেই পুরনো জার্মান শহরের একটা কার্বনকপি হিসাবেই সেটাকে স্বীকার করে নিয়েছে।

ঢালু বরগাওয়ালা ছাই রঙের সুবিশাল হল ঘর, বাইরে থেকে আমদানি করা স্তূপাকৃতি মদের বোতল, মন-মতানো ছবি আর দেওয়ালের গায়ে আঁকা কবিতার চিত্রলিপি প্রভৃতি দেখে আয়নার দিক থেকে নিচের দিককার অঞ্চলটাকে অবিকল একই রকম দেখায়। কোথাও এতটুকুও হেরফের আছে বলে মনে হয় না।

ক'দিন আগে মালিক একটা নতুন ঘর তৈরী করে এর আয়তন বাড়িয়েছে। নতুন অংশটার নামকরণ করা হয়েছে—'ছোট রাইনশ্লস'। খদ্দেরদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে নতুন একটা সিড়িও তৈরী করেছে। ওপরে নকল পাথর ব্যবহার করে নিচু একটা প্রাচীরও তুলে নিয়েছে। আইভিলতা দিয়ে সেটাকে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। আর চিত্রশিল্পীর তুলির টানে দেওয়ালের গায়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে আঁকাবাঁকা রাইন নদী। আর তার তীরের পরিবেশটাকেও চমৎকার ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আর তারই এক জায়গায় আঁকা হয়েছে 'এরেস্‌ব্রিটসিন' দুর্গ-প্রাসাদের মনোলোভা একটা ছবি।

তবে সেখানে মূল্যবান কাঠের তৈরী চেয়ার-টেবিল পেতে দেওয়া হয়েছে। খদ্দেররা চাইলে খাবার দাবার ও বিয়ার সেখানেই পরিবেশন করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই রাইন নদীর তীরবর্তী পরিবেশে চমৎকার একটা দু'-প্রাসাদের শীর্ষে বসে পানাহারের ইচ্ছা আপনার মনে অবশ্যই জাগার কথা।

আমি এক বিকালে 'পুরনো মিউনিক'-এ গিয়েছিলাম। তখন সেখানে খদ্দের খুব কমই ছিল। সিঁড়ির গায়ের একটা পছন্দ মাফিক টেবিল বেছে নিয়ে আমি বসেছিলাম।

অর্কেস্ট্রা-স্ট্যান্ডের মাথায় রাখা কাঁচের চুরুটদানিটা ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে যখন দেখতে পেলাম তখন খুবই মর্মাহত হলাম। দুঃখে মনটা অস্বাভাবিক রকম বিষিয়ে উঠল। এরকম একটা ঘটনা পুরনো মিউনিক-এ ঘটুক তাকে আমি মোটেই সুনজরে দেখি না। কই এর আগে তো সেখানে কোনদিন এরকম কোন ঘটনা ঘটতে দেখা যায় নি।

আঠারো নম্বর পরিচারক এগিয়ে এসে আমার কাঁধেব ওপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল।

হ্যাঁ, এ আঠারো নম্বর পরিচারকটাই আমাকে একদিন আবিষ্কার করেছিল। গরুর খোয়াড়ের মতই ছিল তার ইয়া পেল্লাই মাথাটা। আর নানা রকম চিন্তা-ভাবনায় সেটা সব সময় বোঝাই থাকত। সে দরজাটা খুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো ভেড়ার পালের মত হুড়োহুড়ি করতে করতে সেখান থেকে বেরিয়ে আসত। পরে আবার সেগুলো একত্রও হতে পারে, আবার না-ও হতে পারে।

মেষপালক হিসাবে আমার কোন সুখ্যাতি ছিল না। তাকে নমুনা হিসাবে কোন পর্যায়েই ফেলা সম্ভব নয়। আর তার জাতি, পরিবার, বাড়ি, ভোট, আত্মা, অভিযোগ, শখ, পছন্দ হওয়া আর বিশ্বাস বলতে কিছু আছে কিনা তা-ও আমার অজানাই রয়ে গিয়েছিল।

আঠারো নম্বর পরিচারকটা প্রায় সব সময়ই এসে আমার টেবিলের ধারে দাঁড়াত। আর যতক্ষণ তার কাজের তাড়া থাকত না ততক্ষণ সে এক নাগাড়ে বকে যেত। বক্‌বকানিতে তার মুখ দিয়ে ফেনা বেরিয়ে আসার উপক্রম হয়ে পড়ত। তার বকবকানি শুনে মনে হত ভোরের আলো ফুটলে চাতক পাখিরা যেন গোলাবাড়ি যাবার আগে অনবরত কিচিরমিচির করেই চলেছে।

আমি কণ্ঠস্বরে ক্ষোভ প্রকাশ করেই তাকে প্রশ্ন করলাম—আঠারো নম্বর, চুরুটদানিটা কি করে ভাঙল, বল তো?

সে পাশের চেয়ারটার ওপর একটা পা রেখে বলল—স্যার, আপনাকে আমি সে ঘটনাটা বলতে পারি। একটা কথা আগে বলুন তো, দুর্ভাগ্যে যখন আপনার হাত দুটো কানায় কানায় ভরে উঠেছে তখন হঠাৎ কেউ এসে সৌভাগ্যে আপনার হাতদুটোকে ভরে দিয়েছে, এরকম ঘটনা কি আপনার জীবনে কোনদিন ঘটেছে? আর আপনি কি তখন লক্ষ্য করে দেখেছেন, আঙুলগুলো তখন কেমন আচরণ করে? বলুন, আপনি দেখেছেন কি?

ধ্যুৎ! আঠারো নম্বর ওসব হেয়ালি ছাড়ান দাও দেখি। হাত দেখা আর হাতের চিকিৎসার ব্যাপার ছাড়ান দাও তো।

আঠারো নম্বর এবার বলল—স্যার, প্রিন্স এলবার্ট-এর কথা আপনার মনে আছে কি? সেই যে লোকটা শরীরটাকে পেটানো পিতলের পোশাকে ঢেকে নিয়ে, নকল সোনার তৈরী প্যান্ট পরে আর মিশ্র তামার টুপি মাথায় ব্যবহার করত। আর এ পোশাকে নিজেকে ঢেকেঢুকে মাংস-কাটার কুড়ুল হাতে মুঠো করে ধরে, বরফ-কাটা শাবল আর পতাকা-দণ্ডের সাহায্যে নির্মিত একটা অস্ত্র হাতে নিয়ে সিঁড়ির প্রথম ধাপটায় সর্বদা দাঁড়িয়ে থাকত। আর তার পাশে ফেলে আপনি ছোট রাইনশ্লস-এ উঠে যেতেন—তার কথা বলছি। তাকে আপনার মনে আছে কি?

আরে, তাকে মনে থাকবে না, বলছ কি আঠারো নম্বর। সেই এক কুঠারধারীর কথা বলছ তো? তবে তার দিকে কোনদিন ভাল করে তাকায়নি, মানে লক্ষ্য করি নি।

হ্যাঁ স্যার, তার কথাই বলতে চাইছি।

ভাল করে লক্ষ্য না করলেও বলা যেতে পারে লোকটা বর্মের এক সমাহার ছাড়া কিছুই নয়। আর তার হাবভাবও সেরকমই ছিল।

না স্যার, কেবল এটুকু বললেই তার সম্বন্ধে সবই বলা হয়ে গেছে মনে করা যাবে না। সে আরও বেশী কিছু ছিল। সত্যি কথা বলতে কি, সে ছিল আমার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। তার সম্বন্ধে খোলসা করে বলতে গেলে বলা দরকার—সে ছিল একটা যথাযথ বিজ্ঞাপন। সিঁড়ির ধাপে সর্বক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার জন্যই মালিক তাকে ভাড়া করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, সে এমন একটি দর্শনীয় ব্যাপার হয়ে উঠবে যা দেখে খদ্দেররা নিঃসন্দেহ হয়ে পড়বে, দোতলায় কোন না কোন একটা কাণ্ড হয়ে চলেছে।

আমি বললাম, 'এক কুঠারধারী। এক কুঠারধারী ছিল কয়েক শ' বছর আগেকার এক মহাযোদ্ধা। একটামাত্র কুঠার সম্বল করে সে মহাপরাক্রমশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে প্রবল বিক্রমে লড়াই করত।

স্যার, বেশ কয়েকশ' বছর আগে বলতে আপনি যা বুঝাতে চাইছেন, লোকটা কিন্তু মোটেই এত বুড়ো ছিল না। তার বয়স ছিল বড় জোর তেইশ-চব্বিশ বছর।

সত্যি কথা বলতে কি, মতলবটা মালিকের মাথা দিয়েই বেরিয়েছিল। প্রথমে তিনি মতলব করেছিলেন, লোকটার আপাদমস্তক তামা পিতলের আগেকার দিনের পোশাকে আবৃত করে তাকে দোতলায় ওঠার সিঁড়ির প্রথম ধাপের কাছে দাঁড় করিয়ে রাখবেন। ফোর্থ এভিনিউর পুরা দ্রব্য সামগ্রীর দোকান থেকে মালপত্র সবই তিনি নিজে খরিদ করে নিয়ে এসেছিলেন।

এবার রেস্তোরাঁর গায়ে, পথের ধারে একটা বিজ্ঞপ্তি লটকে দিয়েছিলেন, 'একজন কর্মক্ষম বহুরূপী চাই।' তার তলায় লিখে দেওয়া হয়েছিল, পোশাকপত্র সবই কর্তৃপক্ষ দেবে।

সেদিন সকালেই ছেড়া ফাঁটা অথচ দামী পোশাক পরিহিত একটা যুবক এসে হাজির হল। আমার মুখোমুখি হতেই কাতর মিনতি জানাল কাজটা যা-ই হোক না কেন, আমিই কাজটা আশা করছি। তবে এ-ও বলে রাখা ভাল যে, ইতিপূর্বে আমি কোনদিন, কোন হোটেল রেস্তোরাঁয় বহুরূপীর কাজ করিনি, অর্থাৎ এ-কাজে আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই বলতে কিছুই নেই। ঠিক আছে আগে কাজটা তো পেয়ে যাই, পরে এসব দেখা যাবে। আমাকে অনুগ্রহ করে মালিকের সামনে হাজির করার ব্যবস্থা কর।

আমি তাকে সঙ্গে করে মালিকের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিলাম।

মালিক প্রথমে অনুসন্ধিৎসু নজর মেলে তার আপাদমস্তক ভাল করে নিরীক্ষণ করে নিলেন। তারপর তাকে বিচিত্র একটা পাজামা পরিয়ে আবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাল করে দেখে নিলেন। দেখা গেল পোশাকটা তার গায়ে মতলব মাফিকই হয়েছে। ব্যস, চাকরটি তার বরাতেই জুটল।

স্যার, তারপরের ব্যাপারটা তো আপনি নিজের চোখেই বহুদিন ধরে দেখেছেন। কাঁধের ওপর পর্বতটা রেখে রীতিমত এক কুঠারধারী পরশুরাম বনে গিয়ে সিঁড়িটার প্রথম ধাপের গায়ের চাতালের ওপর দাঁড়িয়ে পাহারায় নিযুক্ত থাকে।

স্যার, সত্যি কথা বলতে কি, মালিক তাকে রীতিমত একটা সে আমলের চরিত্র গড়ে দিয়েছিলেন। একেবারে সেই আদ্যিকালের কথা বলতে চাইছি।

প্রতিদিন রাত্রি আটটা থেকে আরম্ভ করে রাত্রি দুটো পর্যন্ত তাকে 'এক কুঠারধারী' সেজে সিঁড়ির গায়ের চাতালটার ওপর ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হত। সে আমাদের সঙ্গে কাজকর্মের বিনিময়ে দু'বেলা খাবার দাবার পায়। আর প্রতি রাত্রের জন্য পায় একটা করে ডলার।

আমি তার সঙ্গে একই টেবিলে খাওয়া দাওয়া সারি। সে আমাকে খুব ভালবাসে। কিন্তু ভুলেও কখনও নিজের নামটা সে বলে না। তার হাবভাব দেখে আমার মনে হয় রাজা-বাদশাদের মতই সে ছদ্মবেশ ধারণ করে দিন কাটাচ্ছে।

প্রথম দিনই রাত্রে খেতে বসে তাকে আমি বললাম, 'ফেলিং-ঘাইসেন, আরও গোটা কয়েক খুন্‌চি হাতে নিয়ে নাও, ভাল হবে।

সে তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই বলল, এতটা কেতাদুরস্ত হবার দরকারই বা কি ভাই আঠারো? ভাল কথা, তুমি আমাকে 'এক কুঠারধারী' বলেই ডেকো।

শোন, নামের ব্যাপারে কিছুমাত্র কৌতূহলও আমার নেই। কোন এক সময়ের ধনকুবেররা কি করে মুখ থুবড়ে পড়ে তা আমার ভালই জানা আছে।

সে নিজে থেকেই আমাকে তার হাতের তালুটা দেখাল। আমি অনুসন্ধিৎসু নজরে সেটার দিকে তাকালাম। আমার বিশ্বাস কেউ যেন সুতীক্ষ্ণ একটা ছুরির ফলা দিয়ে তার হাতের তালুটাকে কোনাকুনিভাবে কেটে দিয়েছে। আমি অবাক না হয়ে পারলাম না।

আমি কৌতূহল মিশ্রিত জিজ্ঞাসার ছাপ এঁকে তার মুখের দিকে তাকালাম।

আমার কৌতূহল নিবৃত্ত করতে গিয়ে সে বলল, 'আরে ভাই, এত অবাক হবার মত কোন ব্যাপার নয়। আমার হাতের শোচনীয় অবস্থা হয়েছে ইট সাজিয়ে ও টেনে, কয়লা তুলে আর ঠেলাগাড়ি টেনে টেনে। ইদানিং কাজ করতে খুবই কষ্ট হতে লাগল। পারলাম না। অনন্যোপায় হয়ে সে সব কাজ ছেড়েই দিলাম।

মুহূর্তকাল থেমে, চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে এবার বলল, আরে ভাই, আসলে যে আমি জন্মাবধি বহুরূপী। চব্বিশটা বছর ধরে তো ওসব কাজেই হাত দুটোকে ব্যবহার করেছি। হাতের আর দোষ কি দেব, বল? তাছাড়া ওসব কাজে এখন আর পয়সা নেই, পেটও চলে না। এখন এক নাগাড়ে আটচল্লিশ ঘণ্টা অনশন করার অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছি।

এক রাত্রে, প্রায় সাড়ে এগারোট বাজে। একদল কেতাদুরস্ত ভদ্রলোক হোটেলে হাজির হল। এরা সবাই পর্যটক। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায় আর সাধ মিটিয়ে আনন্দ ফুর্তি করে। তাদের একটা মোটাসোটা নাদুস নুদুস মেয়ে রয়েছে, পাকা গোঁফওয়ালা একটা মোটাসোটা বুড়ো আর ছোট্ট একটা ছেলে। ছেলেটা সর্বক্ষণই মেয়েটার কোটের কোণা ধরে থাকে, চলাফেরার সময় কোটটা ছাড়ে না। আর তাদের সঙ্গে রয়েছে বয়স্কা এক মহিলা। তার হাবভাব দেখে মনে হয় জীবনটাই যেন তার কাছে মূল্যহীন।

পুরো দশটা সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল। হোটেলের টেবিলে বসে রাতের খাবার খেতে কী আনন্দই না লাগে।'

জুতোর আওয়াজ তুলে তারা সবাই সিঁড়ি বেয়ে ওপর তলায় উঠে গেল।

আধ মিনিট যেতে না যেতেই মেয়েটা ওভার কোট দোলাতে দোল্লাতে আবার নিচে নেমে এল। সে চাতালে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী নজর মেলে এক কুঠারধারীকে দেখতে লাগল। তারপর তার চোখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

তারপর তার চোখের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই, লেবুর সরবতের মত মিষ্টি হাসি হেসে বলল, তুমি!'

তখন আমি দরজার কাজে দাঁড়িয়ে তাদের রকম সকম দেখতে লাগলাম। কোনকিছুই আমার নজর এড়াল না।

নিশ্চল নিথর পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থেকে স্যার পার্সিভাল বলল, 'আরে, এটা আমার নতুন সাজ। বর্ম, চর্ম আর কুঠার, ঠিক আছে তো?

মেয়েটা বিরক্তিভরে বলল, 'ধ্যুৎ! কী যে কর! এ সবের কোন মানে হয়? ঠাট্টা-ইয়ার্কি আর রঙ্গ-তামাশা তো বখাটে লোকদের ক্লাবটাকে বলে। আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না। লোকের মুখে শুধুমাত্র এটুকুই শুনেছিলাম যে, তুমি কোথায় যেন চলে গেছ। ব্যস, চেষ্টা করেও তোমার ব্যাপারে আর কিছুই জানতে পারি নি। তিন-তিনটে মাস হয়ে গেল, আমি, মানে আমরা বহু চেষ্টা করেও এর বেশী জানতে পারি নি।

নিশ্চল নিথর পাথরের মত মূর্তিটা এবার বলল, শোন, পেটের দায়ে, মানে বেঁচে থাকার তাগিদেই আমাকে বহুরূপী সাজতে হয়েছে। আমি কাজ—চাকরি করছি। আরে, কাজ বা চাকরিটাকরি কাকে বলে সে সব তো আবার তোমাদের জানাই নেই।

আচ্ছা, তুমি কি সব টাকাকড়ি খরচ করে ফেলেছ?

মুহূর্তের জন্য নীরব থেকে স্যার পার্সিভাল কি যেন ভাবল। তারপর মুখ খুলল, শোন, এখন আমার যা দশা তাতে বলতে হয় পথের দরিদ্রতম ভিখারিটার চেয়েও আমার আর্থিক অবস্থা খারাপ, অবশ্য যদি নিজের পেটের ভাত যদি নিজে রোজগার করে নিতে না পারি। আশা করি আমার অবস্থাটা তোমাকে বোঝাতে পেরেছি, কি বল?'

মেয়েটা ঠোঁট বাঁকিয়ে বলে উঠল, 'এটাকে তুমি কাজ বলছ! আশ্চর্য! আমি তো এতদিন জেনেছি মানুষ হাত, না হয় মাথা দিয়ে কাজ করে। কিন্তু এমন সঙ্‌ সেজে পেটের ভাত যোগাড় করাকে তুমি কাজ বলতে চাইছ!

আরে সঙ সাজা বা আর যা-ই বল না কেন বহুরূপী সাজার ব্যাপারটা বহুদিন ধরে চলে আসছে। আর এটা রীতিমত সম্মানজনক পেশা, বুঝলে?

মেয়েটা এবার মুখ ঝাম্‌টা দিয়ে বলে উঠল, তোমার মনোভাব আমার আর বুঝতে বাকি নেই, এরকম একটা কুরুচিপূর্ণ কাজের জন্য তুমি কিছুমাত্রও ভাবিত, লজ্জিত নও। তোমার মতিগতি দেখে আমি যারপরনাই অবাক হচ্ছি। আমার ধারণা ছিল, তোমার মধ্যে কিছু হলেও পৌরুষ আছে। সে পৌরুষের প্রেরণায় তুমি কাঠ কেটে বা জল তুলে জীবিকা নির্বাহ করতে। কিন্তু তুমি তা না করে প্রকাশ্যে এরকম জবর ঝং একটা পোশাক গায়ে চাপিয়ে সঙ সেজে সর্বক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে তোমার এতটুকু আত্মসম্মানে বাঁধছে না, লজ্জা করছে না। স্যার পার্সিভাল একটু নড়েচড়ে গালের বর্ম- চর্মটাকে খটখটিয়ে বলল, হেলেন, আমার একটা অনুরোধ রাখবে?

কি? কি বলতে চাইছ, বল?

দয়া করে তোমার এ বকবকানি কিছুটা সময়ের জন্য বন্ধ করবে?

কেন বন্ধ করব? কেনই বা তোমার এরকম মতিগতি দেখেও মুখে কলুপ এঁটে রাখব, বল?

তুমি বুঝতে পারছ না হেলেন যে এ কাজে আমাকে অন্তত আরও কিছুটা দিন লেগে থাকতে হবেই।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ, ঠিত তা-ই। আর এ কাজ চট করে ছাড়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

সম্ভব নয়? তুমি সঙ্‌ সেজে, অথবা তোমার ভাষায় এক কুঠারধারী সেজে থাকতে তুমি এতই আনন্দ পাও! সত্যি তুমি অবাক করলে পার্সিভাল। বলিহারি তোমার রুচির!

তুমি যে ভাষাতেই আমাকে নিয়ে ঠাট্টা-ইয়ারকি কর না কেন, সেন্ট জেমস-এর রাজসভায় মন্ত্রী হবার জন্যও এখনই আমার পক্ষে এ চাকরিটা কিছুতেই ছাড়া সম্ভব নয়।

ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টিতে হেলেন তার নিষ্পলক চোখ দুটোর দিকে তাকাল।

স্যার পার্সিভাল এবার গলা নামিয়ে রীতিমত অনুরোধের স্বরে বলল, তুমি আমার জায়গায়

দাঁড়িয়ে যদি পরিস্থিতিটা সম্বন্ধে একটু ভাবনা চিন্তা কর তবে ব্যাপারটা তোমার কাছে খোলসা হয়ে যাবে।

হেলেন আগের মতই মুখ ঝামটা দিয়ে বলে উঠল, 'আমার আর বুঝে দরকার নেই। আমার কথা তুমি মিলিয়ে নিও, আজ রাত্রেই তোমার এ সঙ্ সাজার, চাকর হবার সাধ একেবারে মিটিয়ে তবে ছাড়ব।

কথাটা স্যার পার্সিভাল-এর উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দিয়েই হেলেন সমুদ্রের ঢেউয়ের মত নাচতে নাচতে একেবারে মালিকের টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে এক এমন মন মজানো হাসি হাসল যাতে মালিক একেবারে আহ্লাদে গদগদ হয়ে উঠল। তার নাকের ডগা থেকে চশমাটা প্রায় খুলেই পড়ে যাচ্ছিল।

হেলেন বলল, মশাই, আমার বিশ্বাস, আপনার কর্মরত এ বহুরূপীটা স্বপ্নের মতই সুন্দর।

মালিক ভদ্রলোক চশমার ফাঁক দিয়ে তার মুখের দিকে আগের মতই তাকিয়ে রইল।

হেলেন এবার বলল, দেখুন, ব্যাপারটা দেখে মনে হচ্ছে, পুরনো জগৎ থেকে আলতোভাবে কেটে আনা একটা টুকরো নিউ ইয়র্ক-এ এনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। আজ আমরা প্রাণভরে এখানে রাত্রের খাবার সারব। কিন্তু কথা হচ্ছে, আপনি যদি আমাদের একটা অনুরোধ রাখেন তবে এ স্বপ্নের জগৎটা পূর্ণ হয়ে উঠবে, আপনার এক কুঠারধারীকে আজ আমাদের টেবিলের পরিচারক করে দিন।

মালিক টুলটুল করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সে কি বলবে ভেবে না পেয়েই চুপ করে রইল।

হেলেন তাকে নীরব দেখে আবার বলল, আপনার এক কুঠারধারীকে আজ আমাদের খাবার টেবিলের পরিচারক করে দিন, দেবেন কি?

বোঝা গেল মালিকের একেবারে অন্তরে গিয়ে তার কথাটা আঘাত হানল। সে আহ্লাদে গদগদ হয়ে হেসে উঠল। তারপর নেমে আসা চশমাটাকে আঙুলের ডগা দিয়ে যথাস্থানে বসিয়ে দিতে দিতে সে বলে উঠল, অবশ্যই—অবশ্যই। এটা তো খুবই ভাল প্রস্তাব। আপনারা খেতে বসলে সর্বক্ষণ অর্কেস্ট্রায় 'ডি ওয়াকট্ অ্যামরীন' বাজানো হবে—চমৎকার হবে, তাই না?

হেলেন ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলল।

মালিক এবার তার চেয়ারটাকে পিছনের দিকে সামান্য ঠেলে দিয়ে উঠে সোজা এক কুঠারধারীর কাছে চলে গেল। তাকে বলল, শোন হে, তুমি এখনই ওপরে গিয়ে অতিথিদের খাবার টেবিলের কাছে চলে যাও।

মালিকের কথায় স্যার পার্সিভাল বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে মালিকের মুখের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইল। আসলে মালিকের এমন অভাবনীয় আদেশের অর্থ বুঝতে না পেরে সে রীতিমত স্তম্ভিত হয়ে গেল।

মালিক আবার বলল, যাও, দেরী না করে যত শীঘ্র পার অতিথিদের খাবার টেবিলের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাক।

মালিকের দ্বিতীয় বারের নির্দেশটা শোনার পরই স্যার পার্সিভাল ব্যস্ত হাতে মাথা থেকে হেল্‌মেটটা খুলে দেওয়ালে ঝুলিয়ে রেখে দিল।

মেয়েটা ইতিমধ্যেই ওপরে গিয়ে নিজের আসনে বসেছে। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম, মেয়েটার চাপা হাসির ফলে তার চোয়ালটা অস্বাভাবিক শক্ত হয়ে গেছে।

খাবার টেবিলে বসে সে অন্যান্যদের উদ্দেশ্যে বলল, আজ একজন সত্যিকারের এক কুঠারধারী আমাদের খাদ্য আর পানীয় পরিবেশন করবে। কারণ, সে লোকটা তার নিজের কাজের জন্য যারপরনাই গর্বিত। তাই বলছি কি, ব্যবস্থাটা বাস্তবিকই সুন্দর হবে, তাই না?

মেয়েটার কথা শুনে মোটাসোটা নাদুস নুদুস ছেলেটা বলল, চমৎকার! বাস্তবিকই চমৎকার ব্যবস্থা!

মোটাসোটা ও ভুড়িওয়ালা লোকটা বলল, 'কিন্তু একজন সত্যিকারের পরিচারক হলেই বরং ভাল হত।

এবার বয়স্কা মহিলা মুখ খুলল, কাজটা আমার কাছে মোটেই ভাল ঠেকছে না। আসল পরিচারক হলেই তো ভাল হত।

মেয়েটা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল কেন? একথা বলছেন কেন?

আরে তাকে যে কোন সস্তা দামের যাদুঘর থেকে উঠিয়ে আনা হয়নি তা-ই বা কে বলতে পারে।

মেয়েটা সরবে হেসে বলল, আর তা যদি হয়-ই তবে ক্ষতি কি?

ব্যাপারটাকে এমন হাল্কা করে দেখো না বাপু। আর পোশাক আশাক কতরকম রোগ বীজাণু থাকতে পারে।

অতিথিদের খাবার টেবিলে যাবার পূর্বমুহূর্তে পার্সিভাল আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বলল, 'শোন আঠারো নম্বর, আমাকে এ কাজটা খুবই সতর্কতার সঙ্গে, নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করতে হবে। তুমি আমাকে একটু আধটু শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরি করে দাও ভাই। তা না হলে আমি তালগোল পাকিয়ে একেবারে লেজেগোবরে হয়ে যাব।

স্যার পার্সিভাল বর্ম-চর্মের ওপরই কাঁধে একটা ধবধবে তোয়ালে চাপিয়ে অতিথিদের হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল।

কেতাদুরস্ত ভদ্রলোকটা বলল, আরে, এ যে দেখছি ডিয়ারিং। ওহে বুড়ো, তোমার ব্যাপারটা কি, বলত?

এক কুঠারধারী বলল, স্যার, আমি এ টেবিলেই খাবার পরিবেশন করি।

সে কী হে, তুমি এখনও কাজ করছ!

হ্যাঁ স্যার, প্রায় তিন মাস হয়ে গেল, আমি এখানে কাজ করছি।

সে কী হে, এখনও কাজ করেই চলেছ! আজও তোমাকে ছাঁটাই করা হয়নি?

না, একবারও না, এমন কি একদিনের জন্যও না। তবে হ্যাঁ, কয়েকবার আমাকে কাজ বদল করে দেওয়া হয়েছে।

মেয়েটা একটু চড়া গলাতেই বলল, ওয়েটার, আর একটা তোয়ালে চাই, নিয়ে এসো।

এক কুঠারধারী সঙ্গে সঙ্গে একটা ধবধবে একটা তোয়ালে এনে মেয়েটার হাতে দিল।

সত্যি বলছি, আমি বহু মহিলা দেখেছি। কিন্তু কোন মহিলার মধ্যে এমন শয়তান যে বাস করে তা আগে আমার চোখে পড়ে নি। তার গাল দুটোতে লালের ছোপ পড়েছে। চিড়িয়াখানার বন বিড়ালের মত চোখ দুটো অনবরত পিটপিট করে। আরও আছে, সর্বক্ষণ মেঝেতে পা দুটো ঠুকেই চলেছে। কী বে-আদপ মেয়ে মানুষ রে বাবা!

তোয়ালেটা হাতে নিয়েই সে আগের মতই চড়া গলায় আবার হুকুম করল, এই যে ওয়েটার, বরফবিহীন পরিশ্রুত জল দিয়ে যাও। আর একটা পা-দানিও নিয়ে এসো। শোন, খালি এ ফুলদানিটা এখান থেকে নিয়ে যাও।

আশ্চর্য ব্যাপার, নচ্ছাড় মেয়েটা প্রতিটা মুহূর্ত তাকে ঘোড়ার মত ছুটিয়ে মারতে লাগল।

আমি দরজার কাছেই সর্বক্ষণ দাঁড়িয়ে পার্সিভালকে বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করতে লাগলাম।

গোড়ার দিকে এক কুঠারধারী পরিবেশনের কাজটা খুব ভালভাবেই চালিয়ে নিতে লাগল। কিন্তু শেষের দিকে সব কিছু কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে ফেলতে লাগল। একের পর এক এটা-ওটা করতে গিয়ে ঘাবড়ে গিয়ে ঝোলের ঢাকনাওয়ালা বড় থালাটাই হঠাৎ মেঝেতে ফেলে দিল। ব্যস, মেয়েটার দামী পোশাকের তলার দিকটা ঝোলে একেবারে মাখামাখি হয়ে গেল। যাকে বলে একেবারে কেলেঙ্কারী ব্যাপার ঘটিয়ে ছাড়ল।

পোশাকটার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিয়েই মেয়েটা চোখ দুটো ইয়া বড় বড় করে এক কুঠারধারীর দিকে তাকাল। তারপর শুরু করল তর্জন গর্জন, আহাম্মক! অপদার্থ কাহাকার। একটা কুড়ুল কাঁধে করে সঙ সেজে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কোন কাজই পার না। সেটাই, হ্যাঁ, সেটাই তোমার একমাত্র উপযুক্ত কাজ। অকর্মার গোঁসাই!

স্যার পার্সিভাল গরু চোরের মত অপরাধীর মুখ করে করজোড়ে নিবেদন করল, মাদাম, বড্ড

ভুল হয়ে গেছে। এবারের মত মাফ করে দিন। আসলে থালাটা আগুনের চেয়েও বেশী গরম ছিল, সামাল দিতে পারি নি।

বুড়ো লোকটা একেবারে ষাঁড়ের মত গর্জে উঠলেন, এমন অপদার্থ তো জীবনে দেখি নি! ওয়েটার, যত তাড়াতাড়ি পার ম্যানেজারকে এখানে হাজির কর। এমন একটা নিরেট আহাম্মককে পরিবেশনের কাজে লাগিয়েছে! যাও, যত তাড়াতাড়ি পার ম্যানেজারকে এখানে হাজির কর। আমি হন্তদন্ত হয়ে মালিকের খোঁজে চলে গেলাম।

আর অভদ্রের ধাড়ি বুড়োটা যন্ত্রচালিতের মত একলাফে উঠে এলেন।

বুড়ো লোকটা সাধ্যমত গলা চড়িয়ে হম্বিতম্বি জুড়ে দিল, 'এমন একটা আহাম্মককে দিয়ে পরিবেশন করাচ্ছে! আমি চাই, এ হতচ্ছাড়াটাকে আজ, এ মুহূর্তের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হোক।

মালিক ভদ্রলোক পড়ি কি মরি করে খাবার টেবিলের সামনে আসতেই বুড়ো লোকটা টেবিলে সজোরে একটা ঘুষি মেরে বলে উঠল মঁসিয়ে, এসব কি হচ্ছে, শুনি? আপনার নিষ্কর্মার ধাড়ি পরিবেশকের কাজটা একবারটি নিজের চোখেই দেখুন। আমি জানতে চাই হতচ্ছাড়াটাকে এখনই চাকরি থেকে বরখাস্ত করবেন কিনা? মেয়ের পোশাকটা একেবারে বরবাদ করে দিয়েছে। অন্তত ছ'শ' ডলার দাম। অপদার্থটাকে এখনই বরখাস্ত না করলে আমি পোশাকের দামের জন্য আপনার বিরুদ্ধে মামলা করব, বলে রাখছি।

মালিক ভদ্রলোক হাত কচলে অনুনয় বিনয় শুরু করল, 'সত্যি কাজটা খুবই খারাপ করে ফলেছে। তবে স্যার, ছ'শ' ডলার বড্ড বেশীই হয়ে যাচ্ছে। আমার মতে—'

স্যার পার্সিভাল সহজভাবে হাসিমুখে বলল, হের ব্রকম্যান, মাত্র একটা মিনিট অপেক্ষা করুন।

ব্যাপারটা আমি কিন্তু ধরতে পেরেছি, ধাতব বর্ম-চর্ম গায়ে চাপিয়ে সে একেবারে নাস্তানাবুদ হয়ে পড়েছে।

তারপরই সে এমন সুন্দর একটা ভাষণ দিল যা আমি আগে কোনদিন, কারো মুখে শুনিনি। তবে তার কথাগুলো আপনাদের কাছে পরিবেশন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। টাকার কুমীরগুলোকে সে খুব কায়দা করে ঘা কতক মেরে দিল। প্রথমে ঝাঁঝালো গলায় শুনিয়ে দিল তাদের বাড়ি, গাড়ি, হীরে মুক্তো আর অপেরা বক্স প্রভৃতির কথা শুনিয়ে দিল। তারপর পাড়ল, খেটে-খাওয়া মানুষ, শ্রমিক শ্রেণীর কথা। তারা যেসব অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে অমানুষিক পরিশ্রম করে, যদিও তার কথাগুলো অন্তঃসারশূন্য কথার ফুলঝুড়ি ছাড়া কিছু নয়।

সে বলেই চলল, অস্থিরচিত্ত এসব ধনকুবেররা নিজেদের বিলাস ব্যসন নিয়ে সন্তুষ্ট না থেকে গরীব আর দুর্দশাগ্রস্তদের আস্তানায় গিয়ে চড়াও হয়। আর তাদেরই ভাইবোনের মত এসব অদৃষ্ট বিড়ম্বিত নারী পুরুষদের দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে মস্করায় লিপ্ত হয়, তামাশা করে।

হের ব্রকম্যান, একটা কথা জানেন কি? এখানে, এরকম একটা সুন্দর একটা পরিবেশে তারা মাঝে মধ্যে দিয়ে এ মহৎ প্রতিষ্ঠানটাতে সুরুচি আর সামঞ্জস্যকে বিঘ্নিত করে। কিভাবে, জানতে চান? বৃথা গর্বের হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করে তারা দাবী করে যে, দুর্গ প্রাসাদেরএক কুঠারধারীকে তাদের টেবিলে খাবার পরিবেশন করতে হবে। আমি কিন্তু সতর্কতার সঙ্গেই এক কুঠারধারীর ভূমিকাটা পালন করেছিলাম। আসলে আমি কোনদিনই পরিবেশনকারীর কাজ করিনি। আর এ কাজের অ-আ, ক-খ-ও আমার জানা নেই। অথচ এসব একদিনের নবাব, প্রশ্রয়লোভী ও স্বার্থগৃধ্নু টাকার কুমিরগুলোকে খাবার পরিবেশন করার দায়িত্ব আমার ওপর বর্তাল।

অতএব আপনারা ভেবে দেখুন, অবিবেচক লোকগুলোর ঔদ্ধত্যের জন্য যদি ছোটখাটো একটা দুর্ঘটনা যদি ঘটেই থাকে তবে সে দোষ কি আমার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে, নাকি আমি নিজের ঘাড়ে নিয়ে নেব? আর এরই জন্য কি আমাকে জীবিকা নির্বাহের পথ থেকে বঞ্চিত হতে হবে?

মুহূর্তের জন্য নীরব থেকে স্যার পার্সিভাল আবার মুখ খুলল, 'আমি এতক্ষণ যা কিছু বললাম, তার মধ্যে আমাকে সবচেয়ে বেশী করে আঘাত করেছে তাদের এ আত্মম্ভরিতা আর অবিবেচকের মত বায়না যা এমন সুন্দর একটা পরিবেশকে বিষিয়ে তুলেছে, পবিত্রতা নষ্ট করেছে। আর? এক কুঠারধারী আমাকে খাবার টেবিলের পরিবেশনকারীর ভূমিকায় নামিয়েছে।

আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সব কিছু শুনে ধরেই নিয়েছিলাম, স্যার পার্সিভাল-এর কথাগুলো কেবলমাত্র কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, ফয়দা কিছুই হবে না।

তার বক্তব্য কিন্তু মালিকের মনে দাগ কাটল। সে বিমর্ষ মুখে মুহূর্তকাল নীরবে দাঁড়িয়ে থাকার পর মুখ খুলল।

সেইনগট, আপনি শতকরা একশ ভাগই উচিত কথা বলেছেন। আমার এ এক কুঠারধারীর তো ঝোল পরিবেশন করার কথা নয়। তাই তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়।

তবে হ্যাঁ, আপনারা যদি চান তবে আমি অন্য আর একজন পরিবেশনকারীকে আপনাদের জন্য নিয়োগ করতে পারি। আপনারা বরং এই কুঠারধারীকে ছেড়ে দিন। কুঠার কাঁধে নিয়ে সে তার নিজের জায়গায় চলে যাক।

কিন্তু মহাশয়রা, বৃদ্ধলোকটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলল, আপনারা এ জায়গা ছেড়ে অন্যত্র চলে যান। আর ওই নষ্ট হয়ে যাওয়া পোশাকটার জন্য আপনি ছ'শ' কেন, ছ'হাজার ডলার দাবী করলেও মামলা ঠুকলেও আমার দিক থেকে কিছুমাত্রও আপত্তি নেই। আমি মামলা লড়ার জন্য পিছপাও নই।

কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলেই মালিক লম্বা লম্বা পায়ে নিচে নেমে গেল।

বুড়ো ব্রোকম্যান একজন খাঁটি ওলন্দাজ। মালিক সিঁড়ি দিয়ে নামার সময়ই ঘড়িতে বারোটার ঘণ্টা বাজল। আর বুড়ো লোকটা গলা ছেড়ে হেসে উঠল।

হাসতে হাসতেই সে বলল, ওহে ডিয়ারিং, তুমিই জিতে গেলে দেখছি। আসল ব্যাপারটা আমি তবে খোলসা করে বলছি। ক'দিন আগেকার কথা। সেদিন ডিয়ারিং আমার কাছে এমন একটা জিনিস চেয়ে বসল যা আমি তাকে দিতে রাজি হই নি।

আমি মেয়েটার মুখের দিকে চোখ ফেরালাম। দেখলাম, লজ্জায় তার মুখটা রক্তিম হয়ে উঠেছে।

বুড়ো লোকটা বলে চলল, 'হ্যাঁ, আমি তার প্রার্থনা মঞ্জুর করতে রাজি হই নি। তাকে বললাম, তুমি যদি অযোগ্যতার অপরাধে একবারও চাকরি থেকে বরখাস্ত না হয়ে তিন মাসের জন্য নিজের জীবিকার্জন করতে সক্ষম হও তবে তুমি যা চাইছ তা হাসিমুখে আমি তোমার হাতে তুলে দেব। আমার কথিত সে তিন মাস আজ রাত্রি বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ হয়ে গেছে।

শোন ডিয়ারিং, তোমাকে খাদ্য পরিবেশনে নিয়োগ করার ব্যাপারে আমারও কিছুটা ভূমিকা আছে, স্বীকার করে নিচ্ছি।

কথা বলতে বলতে বুড়ো চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। হাত বাড়িয়ে পার্সিভাল-এর হাত দুটো চেপে ধরল।

বুড়োর কাণ্ড দেখে এক কুঠারধারী আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবার যোগাড় হয়ে পড়ল। আবেগ উচ্ছ্বাস সামলাতে না পেরে সে প্রায় তিন ফুট উঁচু একটা লাফ দিল।

নিজের হাত দুটো ওপরের দিতে তুলে, সবার সামনে মেলে ধরে সে বলল, 'আপনারা হাত দুটোর দিকে তাকান। চুণাপাথরের খনির শ্রমিক ছাড়া এমন হাত কি আপনারা আর কারও পাবেন? আমি বলব, অবশ্যই না।

লম্বা চুলওয়ালা বুড়োটা বলল, 'পরম পিতার দোহাই ডিয়ারিং, তুমি সত্যি করে বল তো, গত তিন মাস তুমি কোন্ কাজে লিপ্ত ছিলে?

স্যার পার্সিভেল মুচকি হেসে বলল, সে কথা জানতে চাইছেন? শুনুন তবে বলছি, পাথর ভাঙা আর কয়লা তোলার মত ছোট কাজ করেছি। এক সময় সেখানকার কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে আসতে হয়েছে। তখন আমার এমন পরিস্থিতি যে, চাবুক চালাতেও অক্ষম আবার কোদাল চালানোও সম্ভব নয়। হাত দুটোকে কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। তাই বাধ্য হয়ে বহুরূপীর কাজে যোগদান করতেই হল। একটা কথা তো আর অস্বীকার করা যাবে না যে, গরম ঝোল ভর্তি থালা তো আর কাটা ঘায়ে মলমের কাজ করে না। তাই তো সেটা হাত থেকে দুম্ করে মেঝেতে পড়ে গেল।

দেখুন, এ ধরনের মেয়েদের সম্বন্ধে আমি বাজী ধরতে পারি। এমন মেয়ে আমার অনেকই দেখা আছে। তারা একদিকে যেমন একরোখা ও রাগী আবার সময় মত উল্টোটাও লক্ষ্যিত হয়। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি।

ঠিক সে মুহূর্তে মেয়েটা উল্কার বেগে ধেয়ে এসে স্যার পার্সিভাল-এর হাত দুটো জড়িয়ে ধরল।

হায় ঈশ্বর! দুটো দুঃখী হাত, দুটো আদর সোহাগের হাত! কথাটা বলতে বলতে তার চোখের কোল বেয়ে জলের ধারা নেমে এল। তারপর পার্সিভাল-এর হাত দুটো ধরে আবেগভরে নিজের বুকে চেপে ধরল।

কত আর বলব, এত কিছু ঘটার পর যেন রীতিমত এক নাটকের দৃশ্য শুরু হয়ে গেল।

এক কুঠারধারী একই টেবিলে, মেয়েটার পাশের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসল।

তারপর! তারপর রাতের খাবারের বাকি খাদ্যবস্তু আমি নিজে হাতে পরিবেশন করলাম। ব্যস, সেখানেই ঘটনাটার পরিসমাপ্তি ঘটল। না, ভুল হয়ে গেছে, আরও একটু রয়ে গেছে।

বিদায় মুহূর্তে স্যার পার্সিভাল ধাতব জিনিসপত্র, মানে হেলমেট থেকে শুরু করে যাবতীয় সাজ সরঞ্জাম ফেলে রেখে দিয়ে অতিথিদের সঙ্গে চলে গেল।

আমি তো নাছোড়বান্দা, ছাড়বার পাত্র নই। তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ওহে আঠারো নম্বর, সবই তো হল। তুমি কিন্তু এখনও বললে না চুরুট দাঁনিটা ভাঙার রহস্যটা কি? কি করে সেটা ভাঙল?

আঠারো নম্বর এবার আর ব্যাপারটা সম্বন্ধে মুখ বুজে থাকতে পারল না। সে বলল, আরে, তাই তো! মশাই সে গত রাত্রের ব্যাপার।

হ্যাঁ, গতরাত্রে হঠাৎ রাইনগ্লস-এর সদর দরজার সামনে একটা মোটর গাড়ি এসে দাঁড়াল, স্যার পার্সিভাল আর সে রূপসী যুবতী গাড়ি থেকে নেমে এল। উদ্দেশ্য, রাতে খাবার খাওয়া।

আমি শুনতে পেলাম, সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে তারা বলাবলি করছে, সেই টেবিলটায় বসবে। তারা টেবিলে বসলে আমি নিজে হাতে তাদের খাবার পরিবেশন করলাম। আমাদের হোটেলে তখন একজন নতুন এক কুঠারধারী এসেছে। ধনুকের মত অস্বাভাবিক বাঁকানো তার পা দুটো। আর মুখটার ঠিক যেন একটা ভেড়ার মুখ তার কাঁধের ওপর বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

খাবার খেয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় পার্সিভাল চাতালের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা এক কুঠারধারীর সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কোটের পকেট থেকে একটা দশের নোট বের করে তার হাতে গুঁজে দিল।

আচমকা নতুন এক কুঠারধারীর হাত থেকে কুঠারটা দুম্ করে চুরুট ফার্নিচারের ওপর পড়ে গেল। ব্যাপারটা এবার বুঝলেন তো?

অন বিহাফ অব দ্য ম্যানেজমেন্ট

কোন এক ম্যানেজার—পুরুষ ম্যানেজার আর শেষ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত তার কাণ্ডকারখানার কথা নিয়ে এ গল্পটা গড়ে তোলা হয়েছে।

সালি মাগুন-এর মুখে এ গল্পটা আমি শুনেছিলাম। বিশ্বাস করুন, কথাগুলো তার মুখ থেকেই শোনা। আমি সেটাই নতুন করে পরিবেশন করছি। ব্যস, এটুকুই আমার। তবে এ-ও মেনে নিচ্ছি, আমি যা বলব তা যদি একটা সত্যিকারের গল্প গড়ে না ওঠে তার জন্য সে দায়ী নয়, দোষ ত্রুটির পুরোপুরি দায়ভার আমার স্মৃতিশক্তির ওপরই বর্তাবে।

গল্পের গোড়ার দিকটা অবশ্য সালি-র বক্তব্যই উদ্ধৃত করেছি, এ পুরুষ ম্যানেজার একজন ব্রুটাসবিহীন সিজার। তার পরিচয় একজন স্বৈরাচারী, একজন খেলোয়াড় হিসাবে। তবে কোন রকম ঝুঁকি নিতে তিনি নারাজ।

আমরা দুপুরের খাবার খেতে বসেছি। খেতে খেতে সালি মাগুন আমাকে গল্পটা শোনাতে লাগল। গোড়াতেই তার কাছে অনুরোধ রাখি গল্পের ছোটখাটো ব্যাপার-স্যাপারগুলোও যেন

খোলসা করে ব্যক্ত করে।

খেতে খেতে চেয়ারে একটু নড়েচড়ে বসে সালি মাগুন গল্পটা শুরু করল :

শোন, ডেনভার গ্যালওয়ে আমার বহুদিনের বন্ধু। তাকে আমি জন্ম ম্যানেজার বলেই জানি।

তিন বছর বয়সেই ডেনভার নিউইয়র্ক শহরে চলে আসে। এটাই তার প্রথমবার নিউ ইয়র্কে পদার্পণ। পিটস্‌বার্গে তার জন্ম হয়েছিল।

তার জন্মের পরবর্তী তৃতীয় গ্রীষ্মে তার মা-বাবা পূর্বাঞ্চলে পাড়ি জমিয়েছিল। তারপর সেখানেই স্থায়ী বসতি গড়ে তুলেছিল।

বয়স বাড়ার পর ডেনভার পরিচালনার কাজে যোগ দেয়। আট বছর বয়সকালে মালিক ভাগ্যের একটা খবরের কাগজের দোকান পরিচালনার দায়িত্ব তার ওপর বর্তায়। তারপর থেকে বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করেছে। সে কখনও শুকনো খাবার দাবারের দোকানে, স্কেটিং রিংক-এ, হাঁটা প্রতিযোগিতায়, নাচের স্কুলে রেস্তোরাঁয়, গ্রীষ্মাবকাশের শিবিরে, এক জেলান্তরের নেতার প্রচার কার্যালয়ে, বীমা কোম্পানির কাজে, হাসির নাটকের দলে অবার কখনও বা একের পর এক করে এক ডজন হোটেলে ম্যানেজারের পদে বহাল হয়েছে।

ডেনভার যখন জেলান্তরের নেতার প্রচার অভিযানে ম্যানেজারের পদে বহাল তখন তার ফলে কফ্‌লিন যখন পূর্বাঞ্চলে থেকে নির্বাচনে জয়লাভ করলেন তখন ডেনভার-এর একটা উল্লেখযোগ্য পদোন্নতি হয়। ব্রডওয়ের একটা হোটেলের ম্যানেজারের চাকরি তার বরাতে জুটে গেল।

একবার সে সেনেটর ও'গ্রাডির নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বও লাভ করেছিল।

ডেনভার গোড়া থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিউ ইয়র্কের অধিবাসী ছিল।

যে সময়ের কথা বলছি তার আগে সে দু'বার মাত্রই নিউ ইয়র্ক ছেড়ে বাইরে গিয়েছিল। একবার খরগোস শিকারের জন্য ইয়ংকার্সে গিয়েছিল। আর একবার সে নর্থ রিভারে একটা ফেরি থেকে নামার সময় তার সঙ্গে আমার মুখোমুখি দেখা হয়েছিল।

সে আমাকে দেখেই সোল্লাসে বলে উঠেছিল, 'আরে সালি যে!'

আমি মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা করলাম। কেমন আছ? তারপর গিয়েছিলে কোথায়?

পশ্চিমে গিয়েছিলাম। এখন সেখান থেকেই ফিরছি।

পশ্চিমে? হঠাৎ পশ্চিমে ধাওয়া করেছিলে কেন?

আর বোলো না, বড় সড় ও জমকালো একটা প্রমোদ ভ্রমণ সেরে ফিরছি।

তবে কটা দিন আনন্দ ফূর্তির মধ্য দিয়েই কাটিয়ে এলে, কি বল?

তা আর বলতে। হায় ঈশ্বর! আমাদের দেশটা যে এত বড় আমার ধারণাই ছিল না। বিশাল!

যাক তবে পশ্চিমের শহরটা—

সত্যি বলছি, পশ্চিমের এমন জৌলুস, জাঁকজমক সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গও আমার জানা ছিল না। দেশটা যে কেবলমাত্র জাঁকজমকপূর্ণ তা-ই নয়, গৌরবান্বিতও বটে।

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ।

আরে ভাই, পশ্চিমের তুলনায় পূর্বাঞ্চল তো একেবারেই ছোট্ট। সত্যি কথা বলতে কি, দেশ পর্যটন করা আর আমাদের দেশটা যে কী বিশাল, তার ধনদৌলত কী অগাধ সে সম্বন্ধে একটা ধারণা লাভ করা খুবই আনন্দের, সন্দেহ নেই।

আমি নিজে কয়েকবারই কালিফোর্নিয়া ঘুরে বেড়িয়েছি। আর একদিকে মেক্সিকো আর অন্যদিকে আলাস্কা পর্যন্ত গিয়েছি। তাই ডেনভার-এর কথাগুলো আমার মনকে নাড়া দিল। ব্যস, তার মুখোমুখি বসে গেলাম গল্প শোনার অত্যুগ্র বাসনা নিয়ে।

তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়োসমাইটে অবশ্যই গিয়েছিলে, তাই না?

না, মনে পড়ছে না। ডেনভার বলল, 'মাত্র তিনটে দিন আমি সেখানে ছিলাম। ওহিও-র ইয়ংসটাউন-এর পশ্চিমে কোথাও যাওয়া হয়ে ওঠে নি।

তখন মাত্র দু'বছর আগে আমি নিউ ইয়র্কে বসবাস করছি। উদ্দেশ্য ছিল, টেনিসের একটা অগ্রখনির হয়ে একটা চিত্র পত্রিকার প্রসঙ্গ নিয়ে কাজ করব।

এক বিকালে ছাপাখানা থেকে বেরিয়ে সদর রাস্তায় পা দিতেই হঠাৎ ডেনভার-এর সঙ্গে

মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। ফুটন্ত পদ্মের মত তখন তার চেহারা। সত্যি বলছি, তার এমন সুন্দর চেহারা আমার চোখে আগে কোনদিন চোখে পড়ে নি।

আমরা সোল্লাসে করমর্দন সারলাম। পরস্পরের করমর্দনের পর সে বলল, 'এখন কি করছ? কোথায় আছ?'

আমার মনের কথা সংক্ষেপে তার কাছে ব্যক্ত করলাম।

আমার কথা শুনেই ডেনভার ছ্যাঃ ছ্যাঃ করে উঠল বলল, অভ্র। শেষমেশ অভ্র! এর চেয়ে ভাল কিছু তোমার জানা নেই। তারচেয়ে বরং আমার সঙ্গে হোটেল ব্রান্স উইক-এ চল না কেন। আরে, তোমার মত একটা লোকের খোঁজেই তো আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি।

আসলে কোঁকড়ানো চুল আর গায়ের রং সিপিয়া এমন একটা ছবি হাতে পেয়েছি। সেটা তোমাকে দেখানোর একান্ত ইচ্ছা।

তুমি কি ব্রান্স উইক-এ আস্তানা গেড়েছ?

বিনা ভাড়ায়। একটা সেন্ট দেই না। খুশি খুশি ভাবে বলল আবার কামরাটা কিন্তু একেবারে ছোটও নয়। সিন্ডিকেট, মানে হোটেলের মালিক সিন্ডিকেটই আমাকে সেখানকার ম্যানেজার করে রেখেছে।

তবে ব্রান্স উইক কিন্তু মোটেই ব্রডওয়ের মত বড়সড় হোটেল নয়। কেন তাই বলে একেবারে ছোটও বলতে পারবে না। বহু তাবড় তাবড় লোক সেখানে এসে মাথা গোঁজেন।

হোটেল বাড়িটা আটতলা। ডোরাকাটা নতুন চাঁদোয়া টাঙানো। বিজলি বাতির আলোয় এমন ঝলমল করে দিন, নাকি রাত্রি বুঝতেই পারবে না।

পথ চলতে চলতে ডেনভার বলে চলল, এক বছর যাবৎ আমি এখানকার ম্যানেজারের পদে বহাল আছি। আমি যখন প্রথম ম্যানেজারের চাকরি নিয়ে এখানে আসি তখন খুব বিপদে না পড়লে। ব্রান্স উইক-এর চৌকাঠ ও মাড়াত না।

কেরানি বাবুর টেবিলে রাখা ঘড়িটা বিনা দামেই দিব্যি একের পর এক হপ্তা চলত।

হোটেলের দৈন্য দশা সম্বন্ধে ভাবতে ভাবতে একটা ফন্দি ফিকিরের কথা আমার মাথায় এল। হোটেলের মালিকের সঙ্গে আলোচনা করতে বসে বললাম আরও হাজার কয়েক ডলার খরচ করতে।

তারা আমার মতলবটাকে সানন্দেই গ্রহণ করল। সে অর্থের প্রতিটা সেন্ট ব্যয় করলাম বিজলিবাতি, সোনারপাত, রসুন আর লঙ্কার গুঁড়ো খরিদ করতে।

একদল স্পেন ভাষাভাষী লোককে হোটেলে নিয়োগ করলাম।

তারপর? তারবাদ্যের একটা ব্যান্ড জোগাড় করে হোটেলে নিয়ে এলাম। প্রতি রবিবার হোটেলের নিচের তলায় পুরোদমে মুরগির লড়াইয়ে ব্যবস্থা করলাম। জোরদার লড়াই চলতে লাগল। এতে হয়ত ওপর তলার খদ্দেরদের মজাতে পারলাম না। তবে খুবই সত্য যে, হাভানা থেকে পাটাগোনিয়া অবধি ডন সেনিয়রদের মধ্যে ব্রান্স উইক-এর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। মেক্সিকো আর কিউবার বড় বড় মাথাগুলো এসে ব্রান্স উইক-এ এসে আশ্রয় নিতে লাগল। এছাড়া আরও দক্ষিণে উভয় আমেরিকার অধিবাসীরা এসে সেখানে উঠতে লাগল। ব্রান্স উইক-এর ব্যবসা একেবারে রমরমা হয়ে উঠল।

হোটেলের দরজার কাছে পৌঁছেই ডেনভার আমার গতিরোধ করে দিল।

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকাতেই সে বলল, ভেতরে বড়সড় একটা চামড়ায় কুরশিতে বেঁটেখাঁটো খয়েরি রঙের একজন বসে রয়েছে। এক কাজ কর মিনিট কয়েক এখানে থেকে তার ওপর নজর রাখ। তারপর তোমার কি ধারণা হয় আমাকে জানাবে, কেমন? আমি চেয়ারে বসলাম। ডেনভার গোল টেবিলটার চারদিকে বার বার চক্কর মারতে লাগল। হীরার আংটির চকমকানি, রসুনের গন্ধ আর সিগারেটের ধোঁয়া মিলে ঘরে আন্তর্জাতিক আসরের আমেজ এনে দিয়েছে।

ডেনভার সদ্য শেখা স্পেন ভাষায় টুকারা টুকরো কথার মাধ্যমে টেবিলটার চারদিকে ঘুরে ঘুরে অতিথিদের সঙ্গে কথা বলতে লাগল আর করমর্দন সারতে লাগল।

ডেনভার যে লোকটার দিকে আমাকে চোখ রাখতে বলেছিল আমি তার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম। বিদেশীদের মত চেহারার লোকটির গায়ে ডবল কলারের ফ্রককোট। পায়ের আঙুল বার বার বাঁকিয়ে মেঝেটার স্পর্শ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ছাগলের বাচ্চার মত তার গায়ের রং আর গোঁফ দুটো দুদিকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলাম, লোকটা মুহূর্তের জন্যও ডেনভার-এর ওপর থেকে দৃষ্টি ফেরাচ্ছে না, চোখের তারায় লক্ষিত হচ্ছে বিস্ময় মাখানো শ্রদ্ধার ভাব।

গোল টেবিলটার চারদিকে বার কয়েক চক্কর সারার পর ডেনভার আমাকে সঙ্গে করে তার নিজের ঘরে নিয়ে গেল। চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলল। আমি একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লাম।

সে একটা চেয়ারে বসতে বসতে আমার উদ্দেশ্য বলল, যে কালো লোকটার ওপর তোমাকে চোখ রাখতে বলেছিলাম তার সম্বন্ধে তোমার মতামত কি?

আমি নড়েচড়ে চেয়ারে ভালভাবে বসে বললাম, শোন, আমি যে ধারণা নিলাম তা যদি সত্যি হয় তবে বলতেই হয়, সে তোমাকে যত বড় মানুষ ভাবে তা অভ্রান্ত হলে তার কাছ থেকে তুমি অনেক কিছুই পেতে পার বলেই আমার বিশ্বাস।

তোমার অনুমান অভ্রান্ত। সালি ওই লোকটা সম্বন্ধে তুমি কোন ধারণা করতে পেরেছ?

নির্দ্বিধায় আমি জবাব দিলাম, পথের ধারের কোন ক্ষৌরকার, আর একটি বড়সড় কিছু হলে জুতো পালিশওয়ালাদের শিরোমণিটনি হবে।

শোন হে, তার চোখের চাউনি দেখে বিচার করা ঠিক হবে না। জেনে রাখ, ভদ্রলোকটি দক্ষিণ আমেরিকার প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট পদের জন্য নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন।

আর যা-ই বল, ভদ্রলোকটাকে কিন্তু আমার চোখে খুব একটা খারাপ লাগে নি।

ডেনবার এবার তার পরিকল্পনাটা বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে বলার জন্য চেয়ারে সোজা হয়ে বসল।

সে বলল, শোন সালি, আমি কোন না কোন জায়গায় ম্যানেজারের পদে কাজ করে চলেছি। হয়ত বা আমার ভাগ্যের জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে। ব্যাপারটা হচ্ছে, অন্য কোন একজন অর্থ বিনিয়োগ করবে, আর পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা, করার ব্যাপার স্যাপার দেখাশুনা আর মেরামতি কাজ কারবার চালাবে, আর ব্যবসা পরিচালনার দায়িত্ব আমার।

সত্যি কথা বলতে কি, আমি নিজের পকেট থেকে একটা ডলারও কোনদিন বিনিয়োগ করি নি। আমার পক্ষে অন্যের জিনিসপত্র নিয়ে কাজকর্ম সম্পাদন, আর অন্যের উদ্যোগে সাহায্য সহযোগিতার করা সম্ভব।

আমার অকাঙ্ক্ষার কথা বলছি, বড় কিছু করার বাসনা আমার দীর্ঘদিনের। মনে কর কাঠের বড়সড় গুদাম, হোটেল ব্যবসা বা রাজনৈতিক কার্যকলাপের চেয়ে বড় রকমের কিছুর কথা বলতে চাইছি।

কোন একটা মোটরগাড়ির কারখানা, হীরে জহরতের প্রতিষ্ঠান বা রেলপথের কাজকর্ম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজারের পদে বহাল হওয়া আমার আন্তরিক ইচ্ছা। আর আমি যা আকাঙ্খা করছি সে রকমই একটা চাকরি দেওয়ার প্রস্তাব নিয়ে গ্রীষ্মমণ্ডল থেকে বেটেখাটো লোকটা এসে এখানে হাজির হয়েছে।

সে আমাকে চাকরিটা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করলে আমি বললাম, চাকরিটা কি, বলুন তো? সে কি চুরুটের দোকান নাকি জর্জিয়া সঙ্গীতের প্রতিষ্ঠান খোলার ধান্ধায় আছে?

সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে ডেনভার বলল, লোকটা কিন্তু আজেবাজে কোন লোক নয়। তার পরিচয়, জেনারেল রোম্পিরো, জেনারেল জোসি আলফন্সো সাপোলিও ইহুদী আন রোম্পিরো। সালি সে-ই তো উপযুক্ত লোক। সে আমাকে দিয়ে তার প্রচার কার্য চালিয়ে নিতে চাইছে। অর্থাৎ ডেনভার সি গ্যালোওয়েকে সে একজন প্রেসিডেন্ট তৈরির বাগিচা হিসেবে কাজে লাগাবার ইচ্ছায় আছে।

সালি ব্যাপারটা একটাবার ভেবে দেখত! পুরো গ্রীষ্মমণ্ডল বুড়ো ডেনভার দাবড়ে বেড়াচ্ছে এক হাতে আনারস ও পদ্মফুল আর অন্য হাতে একের পর এক প্রেসিডেন্ট তৈরী করে চলেছে। তা-ই যদি হয়, তবে কি খুড়ো মার্ক হান্না-র মাথার দোষ দেখা দেবে না?

শোন সালি, তুমিও আমার সঙ্গে চল এটা আমার আন্তরিক ইচ্ছা। আমাকে একাজে সাহায্য করার মত উপযুক্ত লোক আমার জানাশোনার মধ্যে কেউ-ই নেই।

ওই বাদামী চামড়ার লোকটাকে একমাস ধরে তোয়াজ করে করে হোটেলে রেখে দিয়েছি। কারণ? কারণ হচ্ছে সে ফোরটিন্থ স্ট্রীটে যাতায়াত করে সেখানকার শরণার্থীদের মধ্য থেকে যেন কাউকে বেছে নেওয়ার সুযোগ না পায়।

লোকটা কিন্তু হাড়িকাঠে মাথা গলিয়েও দিয়েছে, জেনারেল জে. এ. এস. জে. রোম্পিরোর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী ক্রিয়া কাণ্ডের ম্যানেজার হচ্ছে ডি. সি. জি। আরে ধ্যুৎ ছাই! কোল প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট আর তার নামটা যেন কি, মনে পড়ছে না-তো?

ডেনভার সেলফ থেকে একটা পৃথিবীর মানচিত্র টেনে নিল। আমরা লাঞ্ছিত, নিপীড়িত আর পদদলিত দেশকে আমার মানচিত্রটা থেকে খুঁজে বের করলাম। সেটা পশ্চিম উপকূলের একটা নীলাভ দেশ। বিশেষ ধরনের একটা ডাক টিকিটের মত তার আয়তন।

জেনারেলের বক্তব্য এবং সে দেশের এস্টর গ্রন্থাগারের দারোয়ানের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমি যেটুকু জানতে পেরেছি, তাতে বুঝতে পারলাম, সে দেশের নির্বাচন পরিচালনা কাজকর্ম খুবই সহজ।

আচ্ছা, জেনারেল তবে নিজের দেশে থেকে কেন নির্বাচনের কাজকর্ম চালাচ্ছেন না? আমি বললাম।

পকেট থেকে চুরুট বের করতে করতে ডেনভার আমার প্রশ্নের জবাব দিল, দক্ষিণ আমেরিকার রাজনীতি সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণা নেই। ব্যাপারটা হচ্ছে, জেনারেল রোম্পিরো-র বরাত মন্দ যে, তিনি জনসাধারণের খুবই প্রিয়ভাজন। দেশের মানুষ তাঁকে নায়কের আসনে বসিয়েছে। আর এরই ফলে দেশের সরকার একেবারে ক্ষেপে লাল হয়ে গেছে।

প্রেসিডেন্ট স্বয়ং পূর্ত দপ্তরের প্রধানকে বললেন, একটা পরিচ্ছন্ন দেওয়াল খুঁজে বের করে সেখানে সেনিওর রোম্পিরোকে দাও দাঁড় করিয়ে। তারপর তাঁর বিরুদ্ধে সৈন্যদের ক্ষেপিয়ে দাও। অতএব জেনারেল সেখান থেকে লেজ তুলে পালিয়ে বাঁচবেন, বুঝলে।

কিন্তু তিনি খুবই অভিজ্ঞ ও চালাক চতুর। ডলারের থলিটাকে সঙ্গে আনতে ভুল করেন নি। একটা যুদ্ধ জাহাজ খরিদ করে ফেলার হিম্মৎ তাঁর অবশ্যই ওই থলেতেই আছে।

আমি কপালের চামড়ায় চিন্তার ভাঁজ ফুটিয়ে তুলে বললাম, তার প্রেসিডেন্টের পদ লাভের সম্ভাবনা কতখানি বলতে পার?

আরে সে কথা তো তোমাকে বলেছিই। দক্ষিণ আমেরিকার যে কটা রাজ্যে জনগণের ভোটের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করা হয় তার দেশটা তাদের মধ্যে সেরা মনে করতে পার। এ মুহূর্তে সেখানে যাওয়া প্রেসিডেন্টের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। কেন না, আমি মনে করি, দেওয়ালে পিঠ দিয়ে গুলি খেয়ে জান দেওয়াটা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাই এমন একজন নির্বাচনে পরিচালকের খোঁজ করছেন যে তার হয়ে নির্বাচনের যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালনা করতে পারবে।

সালি তোমার তো আর অজানা নয় যে, মিথ্যা বুলি আমি আওড়াই না। কিন্তু আশা করি তুমি অবশ্যই ভুলে যাওনি যে, কাফ্লিনকে আমি কিভাবে উনিশতম জেলার একজন পুরোদস্তুর নায়ক বানিয়ে দিয়েছিলাম। আমাদের জেলাটা তো বেশ বড়সড়ই ছিল। তুমি কি বোঝ না, কেমন করে বাঁদরের খাঁচার একটা দেশকে বাগে আনতে হয় তা আমার ভালই জানা আছে। আমার কথা তুমি মিলিয়ে নিও, জেনারেল যে পরিমাণ অর্থ খরচ করতে সম্মত তার চেয়ে দু'প্রলেপ বেশী জাপানী বার্নিশ তার গায়ে লাগিয়ে আমি তাকে ভোটে জেতাতে সক্ষম হবই হব।

ব্যাপারটা নিয়ে আমি ডেনভার-এর সঙ্গে একটু আধটু তর্কও করেছিলাম। তাকে খোলসা করেই বলেছিলাম, উনিশতম জেলার তুলনায় গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া অবশ্যই স্বতন্ত্র ধরনের।

ডেনভার কিন্তু আমার যুক্তি মেনে নেবার পাত্র নয়। সে সাফ কথা বলে দিল, তুমি সেখানে যাবে কিনা সিদ্ধান্ত নেবার জন্য তোমাকে তিন মাস সময় দিচ্ছি। আগামীকালই জেনারেল রোম্পিরো-র সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেব। তিনিই তোমাকে বিস্তারিত বলে দেবেন।

পরদিন ভাল পোশাকে সেজেগুজে বিশিষ্ট রবার ব্যবসায়ীর সঙ্গে দেখা করে সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিলাম।

জেনার রোম্পিরো-র বাইরেটা যতই কাঠখোট্টা মনে হোক না কেন আসলে কিন্তু খুবই ভদ্র ও বিনয়ী। তিনি যেসব শব্দ উচ্চারণ করলেন তা থেকে একটা ভাষার রূপদান খুবই কঠিন সমস্যা। যদি একজন কলেজের অধ্যাপকের লেখা প্রবন্ধ আর এক চীনা লন্ড্রীওয়ালার একটা শার্ট হারিয়ে ফেলার ব্যাখ্যাকে মিশিয়ে ঘেঁটে দেওয়া যায় তবে জেনারেলের কথাবার্তার একটা ধারণা করে নেওয়া যাবে।

তিনি তাঁর রক্তাক্ত দেশের বিবরণ আমার সামনে তুলে ধরলেন। আর চিকিৎসক এসে হাজির হবার আগেই তারা সে ব্যাপারটা নিয়ে কি করতে ইচ্ছুক সে বিবরণ আমাকে দিলেন। তবে তার বক্তব্যের অধিকাংশটাই জুড়ে ছিল ডেনভার ডি, গ্যালওয়ে-র প্রসঙ্গ।

তিনি আমাকে বললেন, 'আহা! তার মত মানুষ চোখেই পড়ে না। এমন আশ্চর্য আর মহৎ ব্যক্তিত্ব, অন্যকে দিয়ে কাজ হাসিল করিয়ে নেবার মত ক্ষমতা অন্য কারো মধ্যেই আমার চোখে পড়েনি। অন্য কোন লোককে দিয়ে তিনি কাজকর্ম করিয়ে নেবেন, নিজে পায়ের ওপর পা তুলে কেবল আদেশ দিয়ে যাবেন, নিয়ন্ত্রণ করবেন, ব্যস, তবেই সব কাজ ঠিকঠাক ভাবে হয়ে যাবে। এত বড়মাপের বক্তা অথচ সাধারণ বুদ্ধির মানুষ আমার দেশে একজনও মিলবে না। সেনিওর গ্যালওয়ে ঠিক এমনই একজন মানুষ।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম, 'হ্যাঁ, ডেনভার-এর মত একটা যুবকই আপনার দরকার. কেবলমাত্র মস্তানী ছাড়া আর যাবতীয় কাজেই সে পারদর্শী।

আমি তিন দিন অতিক্রান্ত হবার আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম, ডেনভার-এর প্রচার অভিযানে সামিল হব।

ডেনভার হোটেলের মালিকের কাছ থেকে তিন মাসের ছুটি মঞ্জুর করিয়ে নিল।

জেনারেলের সঙ্গে একই কামরায় আমরা পুরো একটা সপ্তাহ বাস করলাম। এরই মধ্যে তাঁর দেশটা সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জেনে নিলাম।

এবার আমাদের রওনা হবার পালা। জেনারেলের বন্ধুবান্ধবে ও হিতাকাঙ্খীদের কাছে লেখা এক গোছা চিঠিতে ডেনভার-এর কোটের পকেট ভর্তি হয়ে গেল। আর সে সঙ্গে চরম মুহূর্তে নির্বাসিত জনপ্রিয় নায়ককে যে সব বিশ্বস্ত রাজনীতিবিদ্ সাহায্য করতে উৎসাহিত হবার সম্ভাবনা আছে তাদের একটা তালিকাও তার পকেটে স্থান পেল।

চিঠি আর তালিকা ছাড়া আমাদের সঙ্গে আর যা কিছু রইল তা হচ্ছে, বিশ হাজার ডলার মূল্যের বিভিন্ন পরিমাণের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক নোট।

তখন জেনারল রোম্পিরোকে একটা অগ্নিদগ্ধ কুশপুত্তলিকা ছাড়া অন্য কিছুই ভাবা যাচ্ছিল না। কিন্তু প্রয়োজনের মুহূর্তে ইনিই একজন ঘাঘু রাজনীতিজ্ঞ বনে যাবেন।

এখানে সামান্য কিছু অর্থ রইল, জেনারেল বললেন। আমার কাছে আরও অনেক, অনেক ডলার আছে। সেনিওর গ্যালওয়ে, আপনাকে কাড়ি কাড়ি ডলার পাঠানো হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থও ঠিক পাঠিয়ে দেব।

শুনুন সেনিওর গ্যালওয়ে, নির্বাচিত হবার জন্য পঞ্চাশ হাজার, একশ' হাজার 'পেসো' খরচ করতেও কার্পণ্য করবেন না।

আমি যদি প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হই আর যদি এক বছরের দশ লক্ষ ডলার কামিয়ে নিতে না পারি তবে আমাকে মাথায় চাটি মেরে ওপারে পাঠিয়ে দিও!

ভালগামে ডিয়স—বুঝলে?

তখনই পকেট থেকে কিউবা-চুরুট তৈরির এক চিলতে কাগজ বের করে স্পেনীয় আর ইংরেজি শব্দ মিলিয়ে একটা গোপন সংকেত লিখে তার একটা প্রতিলিপি জেনারেলকে দিল। এর উদ্দেশ্য, আমরা যাতে তাকে নির্বাচনের কাজকর্মের কথা সময়ে সময়ে জানিয়ে দিতে পারি। আর প্রয়োজনে যাতে অর্থের পরিমাণও তাকে জানিয়ে দিতে পারি।

জেনারেল রোম্পিরো আমাদের সঙ্গে করে স্টিমার পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন।

জাহাজ ছাড়ার পূর্ব মুহূর্তে ডেনভার-এর কোমর জড়িয়ে ধরে জেনারেল চোখের জল মুছতে মুছতে বললেন, শোন, জেনারেল রোম্পিরো, তার সব আশা ভরসা, বিশ্বাস আর নির্ভরতা আপনার ওপর অর্পণ করেছে। বন্ধুর হয়ে, তারই স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কর্মভার মাথায় নিয়ে আপনি যাত্রা করছেন। আপনার যাত্রা শুভ ও সবদিক থেকে সার্থকতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক।

ডেনভার তাকে আশ্বস্ত করতে গিয়ে দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলল, অবশ্যই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন জেনারেল। নিচের দিকে মাথা রেখে যেমন কলার কাঁদি তিলে তিলে বাড়ে ঠিক তেমনি আমরা আপনাকে নির্বাচনে জেতাবই জেতাব।

ডেনভার-এর হাত দুটো জড়িয়ে ধরে কাতর মিনতির স্বরে জেনারেল এবার বললেন, শুনুন, আমার ওপর ছবি তৈরি করবেন, ছবি। অর্থ যা-ই লাগুক না কেন, আমার ওপর কিন্তু অবশ্যই ছবি তৈরি করতে হবে, মনে রাখবেন।

ডেনভার চোখের ভাষায় আমার কাছে জানতে চাইল। জেনারেল কি নিজের শরীরে উল্কি আঁকতে উৎসাহী হয়েছেন?

আমি ধমক দিয়ে উঠলাম, ধ্যুৎ! তুমি একটা আস্ত আহাম্মক। ইনি বোঝাতে চাইছেন, নির্বাচনের ব্যয়ভার বহনের জন্য তুমি চেক কেটে যত খুশি অর্থ তুলতে পারবে। কাজটা যে উল্কি আঁকার চেয়েও কঠিন। লাস কাটার সমগোত্রীয়ই বটে।

স্টিমার ছাড়ল। ডেনভার আর আমি পায়ে হেঁটে যোজকটা পাড়ি দিলাম।

সেখান থেকে আবার স্টিমার চেপে একেবারে জেনারেল রোম্পিরো-র দেশের উপকূলে পৌঁছে গেলাম।

আমাদের একটা সপ্তাহ লেগে গেল সেখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেদের বোঝাপড়া করে নিতে।

ডেনভার জেনারেল রোম্পিরো-র দেওয়া চিঠিগুলো ঠিকানা অনুযায়ী নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছে দিল।

এক ছোট রাস্তার গায়ে, কোমর অবধি ঘাসে ঢাকা একটা প্রান্তরে আমরা প্রধান ঘাঁটি গড়ে তুললাম।

নির্বাচনের আর মাত্র চারটে সপ্তাহ বাকি। তবু কোথাও কোন উত্তেজনা নজরে পড়ল না।

প্রেসিডেন্ট পদের জন্য স্থানীয় প্রার্থী রোডরিকিস। এস্পিরিটু নগরটা রাজধানী শহর নয় বটে, তবে রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু বলা যেতে পারে। এ শহরের বুকেই যাবতীয় বিপ্লবের সূত্রপাত হয়।

এক সপ্তাহ অতিক্রান্ত হলে ডেনভার আমাকে বলল, যন্ত্রটার কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। ব্যাপারটা কেমন হল জান সালি, আমরা ওয়াক ওভার পেয়ে গেছি। জেনারেল রোম্পিরো এখানে সশরীরে উপস্থিত না থাকার জন্য কেউ কোন কাজেই নামছে না। স্থানীয় প্রার্থী তাদের দু'চোখের বিষ। ব্যস, কিছু মালকড়ি ছিটিয়ে দিতে পারলেই আমরা তড়াক করে ডাঙায় উঠে যেতে পারব, বুঝলে?

তোমার কি ইচ্ছা, খোলসা করে বল তো? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

কি আবার ইচ্ছা, সে একই ব্যবস্থা। ডেনভার বলল, আদিবাসীদের ভাষায় ভাষণ দানের জন্য প্রতি রাত্রে আমাদের দলের বক্তাদের পাঠাব। আর তালগাছের ছায়ায় মশাল মিছিল করা হবে। সে সঙ্গে মদের ফোয়ারা ছুটবে। আর শহরের সব বাদ্যকরদের দলকে বায়না করা হবে। আরও আছে—

তাই বুঝি? আরও আছে?

আছে। তোমার তো জানাই আছে, প্রথমেই উপকূল অঞ্চলে যাওয়া হবে, সেখানে বটগাছের ছায়ায় দুটো চড়ুইভাতির ব্যবস্থা করা হবে। আর নাচের আসর বসানো হবে বিখ্যাত 'ফায়ার মেনস্' হলে। আমি আগেই হিসাব করে রেখেছি। পুরো শহরের অধিবাসী আর কয়েক মাইল ব্যাপী জঙ্গলী মানুষগুলোকে আমরা চিংড়িমাছ দিয়ে ঢেকে রাখার পরিকল্পনা নিয়েছি। এটাই আমাদের কর্মসূচীর প্রথম দফা। তুমিই বরং এ ব্যবস্থাটা সেরে ফেল। আর আমি দেখি। জেনারেল উপকূলবাসীদের জন্য কত টাকা বরাদ্দ করে রেখেছেন।

মেক্সিকোতে বসবাসকালে আমি স্পেনীয় ভাষাটা একটু আধটু রপ্ত করে নিয়েছিলাম। তাই

ডেনভার-এর পরামর্শ মাফিক যাত্রা করলাম। প্রধান ঘাঁটিতে পৌঁছে গেলাম পনের মিনিটের মধ্যেই।

আমি ফিরে এসেই বললাম, দেখ হে, এদেশে চিংড়ি যদি থেকেই থাকে তবে সেটা কেউ কোনদিন চোখেও দেখতে পায় নি।

আমার কথায় ডেনভার-এর চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে গেল। সে প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, সে কী হে, চিংড়ি নেই? এমন দেশ কোথাও আছে নাকি যেখানে চিংড়ির নামগন্ধও নেই। নির্বাচনী জালকে চিংড়ি ভাজা ছাড়া কিভাবে গুটিয়ে তোলা সম্ভব, মাথায় আসছে না ত!

তুমি ঠিক বলছ সালি, চিংড়ি মোটেই নেই?

হ্যাঁ, মোটেই নেই। একটা কুঁচো চিংড়িও মিলবে না।

তবে, ঈশ্বরের দোহাই সালি, তুমি আবার গিয়ে দেখে এসো, তারা কি খায়? যা হোক কিছু দিয়ে তো তাদের উদরপূর্তি করতে হবে। যাও—

তার মুখের কথা শেষ হবার আগেই আমি আবার পা-বাড়ালাম। আরে, আমি তো আর ম্যানেজার হিসেবে কমতি নেই। এক ঘণ্টা বাদেই ফিরে এসে বললাম, তারা জাপাটোস, টাপিওকা, কাছিম ফ্রিটোস আর উক্কা দিয়ে পেট ভরায়।

আরে ব্বাস! যারা এসব জিনিস খায় তার তো ভোট চ্যালেঞ্জ করা উচিত হে!' আমার কথা শুনেই ডেনভার উন্মাদের মত চিল্লিয়ে উঠল।

দিন কয়েকের ভেতরেই অন্য শহরের প্রচারক দল এস্পিরিটুতে এসে জড়ো হল। ফলে আমাদের প্রধান ঘাঁটি রমরমা হয়ে উঠল।

আমাদের একজন দো-ভাষী জোগাড় করতে হল। মদ, চুরুট, বরফ জল আনাতে হল। আর ডেনবার দু'হাতে খইয়ের মত ডলার ছড়াতে লাগল। এভাবে খরচ করায় নোটের গোছাটা পাতলা হতে হতে এমন হয়ে গেল যা দিয়ে ওহিও-তে একটা প্রজাতন্ত্রী দলের ভোটও কেনা সম্ভব নয়।

ডেন্‌ভার-এর পকেট শূন্য হতে চলেছে। বাধ্য হয়ে সে জেনারেল রোম্পিরো-কে টেলিগ্রাম করল আরও দশ হাজার ডলার যত শীঘ্র সম্ভব পাঠিয়ে দেবার জন্য। বাঞ্ছিত সময়ের মধ্যে ডলারগুলো তার হাতে এসেও গেল।

তারা দীর্ঘদিন আমেরিকান এস্পিরিটুতে বাস করত। তারা সবাই হয় দালালীর কাজে বা ব্যবসায় নিযুক্ত। রাজনীতির কচকচানি নিয়ে তারা কেউ-ই মাথা ঘামায় না। হ্যাঁ, যা সঙ্গত তা-ই করে বটে। তবে এটা ঠিক। ডেনভার আর আমাকে তারা খুবই আদর-যত্ন করে।

এক আমেরিকান, নাম তার হিকস্। সে প্রায়ই প্রধান ঘাঁটিতে আসা যাওয়া করে। চুটিয়ে আড্ডা দেয়। এস্পিরিটুতে চৌদ্দ বছর যাবৎ সে বাস করছে। তার উচ্চতা ছ'ফুট চার ইঞ্চি আর ওজন একশ' পঁয়ত্রিশ পাউন্ড। কোকোর কারবারী। উপকূলীয় জ্বর আর আবহাওয়া তাকে একেবারে ঘায়েল করে দিয়েছে। সবাই বলে, গত আট বছরে তাকে কেউ হাসতে দেখে নি।

তিন ফুট লম্বা তার মুখটা। কুইনাইন খাওয়ার সময় ছাড়া সে অন্য কোন সময় মুখটা খোলে না। আমাদের প্রধান ঘাঁটিতে প্রায়ই এসে সে মাছি মারে আর রঙ্গতামাশা করে। হিকস্ একদিন স্পষ্টই বলল, রাজনীতি সম্বন্ধে আমার কোন আগ্রহ বা আস্থা কোনটাই নেই। একটা কথা গ্যালওয়ে, এখানে তোমাদের কি করার ইচ্ছা, মানে কি করতে চাইছ?

জেনারেল রোম্পিরো-র হয়ে প্রচার কার্য চালানোই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, ডেনভার বলল, আমি তাঁর ম্যানেজার। আমাদ্দের উদ্দেশ্য তাকে প্রেসিডেন্টের পদে বসানো।

শোন, যদি আমি তুমি হতাম তবে আরও অনেক, অনেক ধীরে কাজ করতাম। আরে, তোমাদের হাতে তো এখনও প্রচুর সময় আছে।

প্রচুর সময় বলছেন কেন, যতটা সময় দরকার তার চেয়ে বেশী সময় তো নেই।

ডেনভার পুরোদমে কাজকর্ম করতে লাগল। সঙ্গ সাথীদের সে মুঠো মুঠো ডলার দিতে লাগল। আর তারাও সময় মত অর্থের জন্য হাজির হয় শহরের প্রত্যেককে দিনে তিনবার করে মদ গেলানো হয়। প্রতি রাত্রে আতসবাজির ধূম পড়ে যায়, ব্যান্ডের বাজনায় শহর কাঁপতে থাকে।

চৌঠা নভেম্বর নির্বাচনের তারিখ ধার্য হল। আমি আর ডেনভার ভোগের আগের রাত্রে প্রধান ঘাঁটিতে বসে পাইপ টেনে চলেছি। ঠিক তখনই হিকস্ দরজায় এসে দাঁড়াল। বিষণ্নমুখে ঘরে ঢুকে

চেয়ারে বসল।

ডেনভার সর্বদাই আত্মপ্রত্যয় রাখে আর আনন্দপ্রিয়। সে টেবিলে একাট ঘুষি মেরে বলে উঠল, জেনারেল রোম্পিরো নির্বিবাদে জয়লাভ করবেন। দশ হাজার ভোটে আমরা জিতব। এখন কেবলমাত্র 'জিন্দাবাদ' ধ্বনির মাধ্যমে বিজয় মিছিল বের করা। কালই বিজয় মিছিল করে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলব।

কাল কি ঘটতে চলেছে, বলুন তো? হিকস্ বলল।

ডেনভার সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, 'সে কী কথা! আপনি কি কোন খবরই রাখেন না! কাল প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হবে।

আরে আপনারা কি মশাই ইহলোকে, নাকি অন্য কোথাও বাস করছেন?

সে কী! এ কথা বলছেন কেন মিঃ হিকস্!'

কাল প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হবে যে বললেন তা শুনেই এ কথা না বলে পারছি না মশাই।

তবে?

আরে মশাই, আপনাদের কি কেউ-ই এটা বলে নি?

কি? কিসের কথা বলছেন মিঃ হিকস্?

আরে আপনারা এখানে পা দেবার এক হপ্তা আগেই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পাট চুকে গেছে?

আরে, চৌঠা নভেম্বরের পরিবর্তে কংগ্রেস সাতাশে জুলাই নির্দ্ধারণ করেছিল। সতের হাজার ভোটে রোড্রিকিস্ নির্বাচিত হয়েছেন। আমার ধারণা ছিল, তোমরা আগামী দু'বছর বাদের নির্বাচনের জন্য বৃদ্ধ রোম্পিরো-র হয়ে প্রচার কার্যে মেতেছ।

হিকস্-এর কথাটা কানে যেতেই আমার আঙুল থেকে খসে পাইপটা মেঝেতে পড়ে গেল। আমার বা ডেন্ভার কারো মুখে আর রা সরল না।

পরমুহূর্তেই আমি কানের কাছে ফিক্‌ফিক্ শব্দে শুনতে পেলাম। হিকস্ আট বছরের মধ্যে এই প্রথমবার হাসছে। গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিল।

ওয়েটার আমাদের সামনে মদের বোতল আর গ্লাস রেখে গেল। আমি বললাম, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ, তোমার বন্ধুটি একজন উপযুক্ত ম্যানেজার, সন্দেহ নেই। এমন ম্যানেজার না হলে—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে আমি বললাম, এক মিনিট, একটা মিনিট অপেক্ষা কর। সে যে এ পরিস্থিতিতে কি করতে পারে তার কোন আভাষই এমনও আমি তোমাদের দেই নি। ধৈর্য ধর।

নিউ ইয়র্কে যখন আমাদের জাহাজ ভিড়ল তখন জেনারেল রোম্পিরো আমাদের অপেক্ষায় জেটিতে দাঁড়িয়ে। তিনি তখন ভালুকের মত অনবরত নেবেই চলেছেন। খবর শোনার জন্য তিনি ধৈর্য ধরতে পারছেন না। ডেনভার তাকে টেলিগ্রাম মারফৎ আমাদের ফেরার খবরটা জানিয়ে দিয়েছিল। ব্যস, এর বেশী একটা কথাও বলেনি।

জেনারেল রোম্পিরো চিল্লাতে লাগলেন, কি ব্যাপার, চুপ করে আছ কেন! আমি—আমি প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হয়েছি তো? আমার দেশের মানুষ কি জেনারেল রোম্পিরো'কে তাদের প্রেসিডেন্টরূপে বরণ করে নিয়েছে। আমার শেষ ডলারটা শেষ করেই তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। অতএব আমার প্রেসিডেন্টের পদটা লাভ করা যে একান্ত দরকার। বল, বল সেনিওর গ্যালওয়ে, আমি প্রেসিডেন্ট হয়েছি তো? আমার হাতে যে একটা কানাকড়িও নেই। আমি একেবারে কপর্দকশূন্য। এ পরিস্থিতিতে আমার প্রেসিডেন্ট না হলেই যে নয়।

আমার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে ডেনভার তাকাল। সে শুকনো গলায় বলল, সালি, আমাকে বৃদ্ধ জেনারেল রোম্পির কাছে রেখে তোমরা বিদায় হও। খবরটা তাকে ধীরে ধীরে দিতে হবে। তার সে পরিস্থিতিটা অন্য কেউ দেখলে বড়ই মর্মান্তিক হয়ে দাঁড়াবে।

তার সে মর্মান্তিক পরিস্থিতিতে ডেনভারকে আরও খোশমেজাজী, প্রিয় ভাষী এক যাদুকরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। নইলে আজ অবধি যত যশ খ্যাতি সে লাভ করেছে সবই মুহূর্তে তাকে খোয়াতে হবে।

আমি দু'দিন বাদে আবার হোটেলে হাজির হলাম। দেখলাম, ডেনভার তার নিজের আসনে বসেই কাজকর্ম করে চলেছে। সে মুহূর্তে তাকে দুটো ঐতিহাসিক উপন্যাসের নায়কের ভূমিকায়

অভিনয়রত দেখলাম। ইতিমধ্যে সে সবাইকে বলে বেড়িয়েছে, ফ্লোরিডায় তার যে কমলা লেবুর বাগান আছে সেখানে দিন কয়েক আনন্দ ফুর্তির মধ্যেই কাটিয়ে ফিরে এসেছে।

দু'-চার কথায় কুশল বিনিময় সেরেই আমি বললাম, কি হে, জেনারেল রোম্পিরো-র সঙ্গে ব্যাপারটার ফয়সালা করে নিয়েছ কি?

সে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে বলল, মিটিয়ে নিয়েছি কিনা জানতে চাইছ?

হ্যাঁ, তার কি হল, কিভাবে—

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই সে বলে উঠল, মিটিয়ে ফেলেছি কিনা, জানতে চাইছ তো? চল, আমার সঙ্গে চল, নিজের চোখেই দেখে নিঃসন্দেহ হবে।

সে কথা বলতে বলতে আমার হাত ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে খাবার ঘরের দরজায় হাজির করল।

দেখলাম, শার্ট-প্যান্টপরিহিত একজন বেঁটেখাঁটো বাদামী রঙের পুরুষ ঘরময় পায়চারি করছেন।

তার মুখে হাসির ঝিলিক। ব্যাপার দেখে আমি রীতিমত স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

সত্যি ব্যাপার দেখে একেবারে থ বনে গেলাম। ডেনভার জেনারেল রোম্পিরো'কে হোটেল ব্রান্সউইক-এর হেড ওয়েটারের চাকরিতে বহাল করে দিয়েছে! ব্যাপার দেখে আমি যেন একেবারে আকাশ থেকে পড়লাম।

কথা বন্ধ করে মিঃ মাগুন আমার দিকে চোখ তুলে তাকাতেই আমি জিজ্ঞাসা করলাম, একটা কথা, ব্যবসাটা কি মিঃ গ্যালওয়ে এখন পরিচালনা করছেন?

সালি মুখে কিছু না বলে নীরবে মাথা নাড়ল।

ডেনভার এক বিধবাকে বিয়ে করে ঘর বেঁধেছে। সে হার্লেম-এর একটা বড়সড় হোটেলের মালিক। ডেনভার নিজেই তার যাবতীয় কাজকর্মে তদারক করে। সুখেই দিন কাটাচ্ছে।

হুইসলিং ডিক্‌'স খ্রীস্টমাস স্টকিং

চারদিক ঘেরা গাড়িটা থেকে হুইসলিং ডিক্ পিছনের দরজা দিয়ে খুবই সতর্কতার সঙ্গে লুকিয়ে নেমে পড়ল। এর কারণ নগর আইনের ৫৭১৬ ধারায় সন্দেহ হলেই পুলিশকে গ্রেপ্তারের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। আর এ বিশেষ আইনটার সঙ্গে হুইস্‌লিং ডিক-এর আগে থেকেই পরিচয় আছে।

তাই গাড়ি থেকে লুকিয়ে নামার পূর্ব মুহূর্তে একজন দক্ষ সেনাপতির মত অনুসন্ধিৎসু নজর দেখে নিয়ে তবেই নেমেছে।

দক্ষিণের এ সুবিশাল ভিখারিদের শহর, দুঃখ দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের শহর, জলবায়ুর দিক থেকে ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলেদের পক্ষে স্বর্গরাজ্যে সে যখন শেষবার এসেছিল তারপর এতদিন পেরিয়ে গেলেও শহরটার এক তিলও পরিবর্তন হয় নি।

নদীর পাড়ের বাঁধের গায়ে তার মালগাড়িটা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সে জায়গাটা এখন বিভিন্ন রকম মাল বোঝাই গাড়ির মেলা বসে গেছে।

পিপে ঢাকার পুরনো ত্রিপল আর বস্তার পরিচিত দুর্গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে রয়েছে। জাহাজের ফাঁক দিয়ে মেটে রঙের নদী ঢেউ তুলে এগিয়ে চলেছে। বিজলি আলোয় ঝলমলে নদীর একটা বাঁককে বহু দূর থেকে দেখা যায়। আল্‌জিয়ার্স নদীর তীরের সোজা একটা কালো রেখা ভোরের রক্তিম আলোয় অধিকতর কালো হয়ে উঠেছে।

দূরে নোঙর করা জাহাজে যাত্রী পৌঁছে দেবার জন্য দু'-একটা ছোট্ট স্টিমার ভোঁ দিতে দিতে এগোচ্ছে।

যাত্রীবোঝাই মোটর গাড়ি আর মালবাহী ঠেলাগাড়ির আওয়াজ কানে আসছে। খেয়া নৌকোগুলোর মধ্যেও চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

গাড়ির পিছন দিক থেকে হুইসলিং ডিক-এর লাল মাথাটা দেখা যাচ্ছে। সেটা থেকে কুড়ি গজ

দূরে নাদুস নুদুস ভুড়িওয়ালা একটা পুলিশ পর্বত প্রমাণ চালের বস্তার দেখাশুনা করতে ব্যস্ত।

পৌরসভার কর্মচারীদের চোখের সামনেই আলজিয়ার্স নদীর ওপরের নিত্যকার এ অলৌকিক ঘটনাটা ঘটে চলেছে। কর্মচারীরা কিন্তু নির্বিকার ভাবেই না দেখার ভান করে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

তাদের একজন অফিসারের সঙ্গে একজন ভিক্ষাজীবি ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলে হুইসলিং ডিক-এর গলায় গলায় ভাব। রাত্রির অন্ধকারে এ বাঁধটার ওপরে তাদের বহুবার মুখোমুখি দেখা হয়েছে। কারণ, অফিসারটা একজন সঙ্গিত রসিক। তাই তো চালচুলোহীন ভবঘুরে এ লোকটার মন-মাতানো শিসের শব্দ তার মন কেড়ে নেয়।

তবু সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে পরিচয়কে সে আমল দিতে রাজী নয়। নির্জন নিরালা জাহাজঘাটে শিস দিতে দিতে একজন পুলিশের মুখোমুখি হওয়া আর একটা মালগাড়ি থেকে নেমে প্রায় বুকে হেঁটে পালিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পার্থক্যটা যে অনেক অনেক বেশী। তাই ডিক নীরবে অপেক্ষা করতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই মাল বোঝাই গাড়িটা গাড়ির ভিড়ে হারিয়ে গেল।

হুইসলিং ডিক-এর পক্ষে যতক্ষণ অপেক্ষা করা দরকার সে মাথাটা বের করে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে ততক্ষণই সেখানে অপেক্ষা করল। তারপরই এক সময় সুযোগ বুঝে সাধ্যমত কম আওয়াজ করে, এক লাফে পথে নামল।

মালবাহী গাড়িটা থেকে নেমে বিড়ালের মত পা টিপে টিপে একজন নিরীহ শ্রমিকের ভাব দেখিয়ে রেল লাইনের ওপর দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল। তার ইচ্ছা, নির্জন নিস্তব্ধ গিরোড চরে হেঁটে লাফায়েত স্কোয়ারের একটা বিশেষ বেঞ্চের কাছে চলে যাবে। আগেই বাঁচাল বলে পরিচিত এক বন্ধুর সঙ্গে সেখানেই দেখা হওয়ার কথা আগেভাগেই পাকা হয়ে আছে।

নির্বাসিত ভবঘুরে লোকটা নদীর তীর বরাবর হাঁটতে হাঁটতে এক সময় বাঁধের ওপর উঠে গেল। এবার তার বহুদিনের পরিচিত পথ বরাবর এগোতে লাগল।

হাঁটতে হাঁটতে দু'মাইল পথ পাড়ি দেবার পর সে নির্মীয়মান একটা বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান দেখতে পেল। নতুন একটা বন্দর গড়ে উঠছে। জোর কদমে জাহাজঘাট তৈরির কাজ হচ্ছে। চারদিকে যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম দেখে তার মনে হল একদল সাপ বুঝি তার দিকে এগিয়ে আসছে। বাদামী আর কালো মানুষের দল চারদিকে দিনরাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে। ভীত সন্ত্রস্ত মনে সে সেখান থেকে গুটিগুটি চম্পট দিল।

দুপুরের কাছাকাছি সে আখের দেশে হাজির হল। আখের ক্ষেতগুলো দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। আম কাটা চলেছে। চাষী মজুররা ব্যস্ত হাতে আম কেটে চলেছে। মালগাড়ির চাকায় ক্যাঁচ-ক্যাঁচ আওয়াজ তুলে গাড়ি যাওয়া আসা করছে। সমুদ্রের লাইট হাউসের মত চিনিকলের চিমনিগুলো আকাশের দিকে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে।

পথ চলতে চলতে এক সময় হুইস্‌লিং ডিক্‌-এর নাকে মাছ ভাজার গন্ধ এল।

ক্রমে রাত্রির অন্ধকার নেমে এল। সে সঙ্গে পড়ল তীব্র শীত। যাত্রীটাও আশ্রয় লাভের প্রত্যাশা নিয়ে লম্বা লম্বা পায়ে এগিয়ে চলল। আঁকাবাঁকা বাঁধটার গা-গেঁষে যে পথটা এগিয়ে গেছে সে পথ ধরেই এগোতে লাগল। কোথায় যাবে, কোথায় গিয়ে থামবে কিছুই সে জানে না।

রাত্রি বাড়ার সঙ্গে শীতের তীব্রতাও ক্রমেই বেড়ে চলল। একসময় সে পিছনে একটা খটখট শব্দ হতে শুনতে পেল। তার বুঝতে দেরী হল না যে, সেটা ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ। ডিক সঙ্গে সঙ্গে রাস্তাটা ছেড়ে পাশের লম্বা লম্বা ভেঁজা ঘাসের মধ্যে নেমে পড়ল। ঘাড় ঘোরাতেই তার নজরে পড়ল দুই ঘোড়ায় টানা একটা চার-চাকার গাড়ি ধীর গতিতে তার দিকেই এগোচ্ছে।

গাড়ির সামনে সিটে একজন গাট্টাগোট্টা লোক বসে। মুখে ঝাঁকড়া দাড়ি আর হাতে চাবুক। তার পিছনে সিটে এক মাঝবয়সী মহিলা বসে। আর? দেহে যৌবন আগত প্রায় একটা মেয়ে। সুদর্শনা ও সুবেশী এক কিশোরী।

গাড়ির চালকের কোটি দেশ থেকে বোটটা সামান্য সরে যাওয়ায় হুইসলিং ডিক তার দু'হাঁটুর ফাঁকে রাখা দুটো ক্যানভাসের থলে দেখতে পেল।

হুইসলিং ডিক শহরে বসবাসকালে দেখেছে, এরকম হলে এক্সপ্রেস মালগাড়ি আর ব্যাংকের সদর দরজা পর্যন্ত যাতায়াত করে থাকে।

হুইসলিং ডিক আরও দেখল, গাড়ির অবশিষ্ট ফাঁকা জায়গা বিভিন্ন আকৃতি ও আয়তন বিশিষ্ট মোড়কে ঠাসা।

ধীর গতিতে এগিয়ে যাওয়া মালগাড়িটা যখন হুইসলিং ডিক-এর পাশ দিয়ে এগোচ্ছে ঠিক তখনই রূপসী কিশোরীটার মাথায় অদ্ভুত একটা খেয়াল চেপে বসল। সে সুরেলা কণ্ঠে ছন্নছাড়া ভবঘুরে লোকটার দিকে তাকিয়ে চিল্লিয়ে উঠল—এই যে, শুনছ, শুভ খ্রীস্টমাস!

ব্যাপার দেখে হুইস্লিং একেবারে থ' বনে গেল। তার জীবনে তো এমন ঘটনা সচরাচর ঘটে না। সে ভেবেই পেল এমন অপ্রত্যাশিত কথাটার প্রত্যুত্তর কিভাবে দেবে। চিন্তা করার মত অবকাশ নেই। নিজের সহজাত প্রবৃত্তিই তাকে কর্তব্য বাতলে দিল। সে ঝট করে মাথা থেকে পুরনো ছেঁড়া টুপিটাকে নামিয়ে নিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলে উঠল ওই যে, ওখানেই।

সে মুহূর্তে মেয়েটা একটু নড়েচড়ে বসার চেষ্টা করলে মোড়কের স্তূপ থেকে একটা কালো ও হাল্কা বস্তু হঠাৎ পথে পড়ে গেল। ভবঘুরে হুইস্লিং হাত বাড়িয়ে সেটা তুলে নিল। চোখের সামনে ধরে বুঝল, একটা রেশমি কালো মোজা আঙুলে চাপ দিয়ে অনুভব করল, খুবই নরম। কী উপভোগ্য নরম এ মোজাটা।

হুইসলিং ডিক্ বলে উঠল ফুটন্ত ফুলের মত ছোট্ট মোজাটা। এখন তুমি এ বিষয়ে ভাবছ কি? শুভ খ্রীস্টমাস!

সে মোজাটা সযত্নে ভাঁজ করে পকেটে চালান করে দিল।

আরও প্রায় দু'ঘণ্টা এক নাগাড়ে পথ পাড়ি দেওয়ার পর জনবসতি চোখে পড়ল। পথের বাঁক ঘুরতেই একটা আখের বাগান বাড়ি নজরে পড়ল। একটা নয় পাশাপাশি বেশ কয়েক ছোট-বড় বাড়িই তার নজরে পড়ল। আরও সামান্য এগিয়ে আখ ক্ষেতের মালিকের বাড়িটাও সে চিনতে পারল। চারকোণা দু'মহলার বাড়ি। প্রাচীর দিয়ে চারদিক ঘেরা। সবুজ ঘাসের প্রাঙ্গন আর ফুল-ফলের বাগিচাও রয়েছে।

বাড়িটার কাছে পৌঁছেই হুইসলিং ডিক থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। পরিবেশের বাতাসটা শুঁকে কি যেন উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে লাগল।

আপন মনেই সে বলে উঠল হ্যাঁ, কোথায় যেন সুগন্ধি স্টু রান্না হচ্ছে। আমার নাক ভুল করতেই পারে না। হ্যাঁ, স্টু-র গন্ধই বটে।

হুইসলিং ডিক্ সেখানে দাঁড়িয়ে সামান্য ইতস্তত করে নিচু প্রাচীরটা ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকছে। ভেতরে পা দিয়েই সে বুঝে নিল, সে দিকটা সচরাচর ব্যবহার করা হয় না। ভাঙাচোরা বাতিল ইট আর ছোট-বড় কাঠের টুকরো ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে। আর একধারে একটা কয়লার উনুন জ্বলছে। অনুসন্ধিৎসু নজরে ভালভাবে দেখে বুঝল, ধারে-কাছে কিছু মানুষ যেন শুয়ে বসে রয়েছে।

সে গুটিগুটি আরও সামান্য এগোতেই দেখতে পেল আগুনটা হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে উঠল। আর তার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে ইয়া মোটা আর পেল্লাই ভুঁড়িওয়ালা একটা লোক। তার মাথায় টুপি আর বাদামী সোয়েটার গায়ে।

হুইসলিং ডিক স্বগতোক্তি করল, লোকটাকে দেখে তো মনে হচ্ছে জুয়াড়ি বোস্টন হ্যারি। ঠিক আছে, একটু পরখ করেই দেখতে আপত্তি কিসের।

সে বেশ উঁচু লয়ে শিস দিতে আরম্ভ করল। এবার রীতিমত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে একপা দু'পা করে জ্বলন্ত উনুনটার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

মোটাসোটা নাদুসনুদুস লোকটা মোটামুটি চড়া গলাতেই বলল, বন্ধুগণ, একজন অপ্রত্যাশিত কিন্তু বাঞ্ছিত মানুষ আমাদের দলে ভিড়েছে। হুইসলিং ডিক তার নাম। সে আমাদের বহুদিনের বন্ধু। আর আমিই তার জামিন থাকছি।

আর মিঃ ডব্লু. ডি. আমাদের সঙ্গে রাতের খাবার খেতে বসবে। তখনই সে আমাদের বলবে, কি পরিস্থিতিতে সে আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

হুইসলিং ডিক্ বলল, সেই পুরনো ব্যাপার। তা সত্ত্বেও আমন্ত্রণ জানানোর জন্য তোমাদের

ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার তো বিশ্বাস, তোমরা সবাই যেভাবে এখানে মিলিত হয়েছো ঠিক সেভাবেই আমিও এখানে পৌঁছেছি।

আর একটা কথা, আজ সকালেই এক পুলিশের মুখে শুনেছি, তোমরা সবাই নাকি চিনির কলের কর্মী।

এবার একটু ক্ষুব্ধ স্বরেই বোস্টন হ্যারি বলে উঠল, আরে ধ্যুৎ। আমাদের সঙ্গে ভালভাবে আলাপ পরিচয়, মেলামেশার আগেই একজন অতিথির কিছুতেই আপ্যায়নকারীদের অপমান করা উচিত। চিনির কলের শ্রমিক! আমরা পাঁচজন, মানে আমি ব্লিংকি, বেটে টম আর গগল্‌স্ মিলে সাব্যস্ত করেছি, একটা দল তৈরি করে নোংরা পথে নতুন কারো সঙ্গে পরিচয় হলে তাকে নিউ অর্লিয়েন্সে একটা কাজ জুটিয়ে দিয়ে রুটির যোগাড় করে দেব।

একটু থেমে সে আবার বলল, ব্লিংকি, তোমার বাঁদিকের চিংড়ির বাটিটা তোমার ডানদিকের লোকটার খালি বাটিটার দিকে বাড়িয়ে দাও তো।

বহু আগে থেকেই হুইস্‌লিং ডিক্-এর সঙ্গে বোস্টন হ্যারি-র পরিচয়। সে ভালই জানে, তার দলের সাকরেদদের চেয়ে সে অনেক বেশী চালাক চতুর আর ছটফটেও খুবই। কোন গ্রামের ধনকুবের ব্যবসায়ী বা অভিজ্ঞ ও বিত্তবান স্পেয়ার দালালের মতই তার চেহারা ছবি আর চালচলন।

গাট্টাগোট্টা শক্ত পোক্ত চেহারা আর রক্তাভ মুখটা ভালভাবে কামানো। পোশাক আশাক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এমন কি জুতোর ব্যাপারেও সে সর্বদা সজাগ।

আর গত দশ বছরে সে বহু জায়গায় বহুবার জুয়াখেলায় সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু সে কারখানায় কাজ করেছে এমন হিসাব কোন খাতাপত্রে মিলবে না। একটা দিনের জন্যও সে কোন কারখানায় কসরৎ করেনি। তার দলের সাকরেদদের মধ্যে একটা গুজবের প্রচার আছে, সে বহু ডলার জমিয়েছে।

আর বাকি চারজন? যারা চোরের মত অন্ধকার ঘুপ্‌টির মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে দিন কাটায়। সাধারণের কাছে যারা সন্দেহজনক লোক হিসাবে চিহ্নিত।

খাওয়া শেষ করে তারা উঠে পড়ল। তাদের মধ্যে থেকে একজন হাতে ইশারা করে বোস্টনকে একধারে, একটু আবডালে নিয়ে গেল। অনুচ্চ কণ্ঠে, প্রায় ফিসফিসিয়ে কি যেন বলল। সে-ও ঘাড় কাৎ করে তার কথায় সম্মতি জানাল।

একটু বাদেই বোস্টন হুইস্‌লিং ডিক'কে বলল, ভাই, আমি কি বলছি। মন দিয়ে শোন, তোমাকে খোলসা করেই কিছু বলছি, আমরা পাঁচজন একই দলভুক্ত। আমাদের ইচ্ছা, তোমাকেও আমাদের দলে নিয়ে নেব। আমাদের সমান অংশীদার তুমিও হবে। কাজ করতে গিয়ে আমাদের যে মুনাফা হবে তার বখ্‌রা তুমিও অন্য সাকরেদদের মত সমানই পাবে।

আর মুনাফার ভাগ যেমন সমান পাবে তখন আমাদের কাজে সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতাও পাবে। এ বাগিচায় দু'শ' কর্মীকে কাল সকালে এক সপ্তাহের বেতন দেওয়া হবে।

কাল খ্রীস্টমাস দিবসের উৎসব। শ্রমিকদের ইচ্ছা, কাল কাজ বন্ধ রাখবে। মালিকের হুকুম কাল ভোর পাঁচটা থেকে ন'টা পর্যন্ত কাজ করে এক গাড়ি মাল তুলে দিতে হবে। শ্রমিক রাজি হয়েছে।

এবার অনুচ্চ কণ্ঠে, প্রায় ফিসফিসিয়ে সে বলল, কাল গাড়ি নিয়ে মালিক নিউ অর্লিয়েন্সে যাবে। ফেরার সময় তার সঙ্গে এক বস্তা ডলারের নোট সঙ্গে নিয়ে আসবে। মোট ডলারের পরিমাণ দু'হাজার আর চুয়াত্তর পঞ্চাশ। বড্ড বেশী কথা বলে এমন এক লোকের মুখ থেকে আমি অর্থের পরিমাণটা জানতে পেরেছি। আবার সে জানতে পেরেছে জমানবিশের মুখ থেকে।

বাগিচার মালিক স্থির করেছে, ডলারগুলো শ্রমিকদের হাতে হাতে রাখবে। হ্যাঁ, লোকটা ভুল করেছে, তাকে ডলারগুলো দিতে হবে আমাদের হাতে। আরাম-ভোগীদের হাতেই অর্থ থাকবে। কারণ অর্থের মালিক যে তারাই।

এবার মন দিয়ে শোন, মোট অর্থের অর্ধেক আমার পকেটে যাবে, আর বাকি অর্ধেক তোমরা সমান ভাগ করে নেবে। এবার স্বাভাবিকভাবেই তোমার মনে প্রশ্ন জাগবে, এরকম হারে ভাগ হবে কেন? এর ও কারণ অবশ্যই আছে। এ মতলবটা আমার মাথা দিয়েই বেরিয়েছে। আর আমার এখানে অন্য একটা দল রাতের খাবার খাবে। রাত ন'টায় তারা বিদায় নেবে। তারা যেতে দেরী

করলেও আমাদের বুদ্ধি খরচ করে আমাদের কাজটা হাসিল করতে হবে।

সবগুলো ডলার ছিনতাই করতে আমাদের প্রায় পুরো রাতটাই লেগে যাবে, খেয়াল থাকে যেন।

রাত্রি ন'টার কাছাকাছি সময়ে ব্লিংকি আর ডিয়ার। পেট পথটা ধরে ধীর পায়ে এগোতে থাকবে। মিনিট পনের এগিয়ে গিয়ে সেখানকার বড় আখ ক্ষেতটায় আগুন ধরিয়ে দেবে।

দমকা বাতাসে আগুন দ্রুত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। দশ মিনিটের মধ্যেই সবাই বাল্তি ভরে জল নিয়ে আগুন নেভানোর জন্য ছুটে যাবে। তখন কেবলমাত্র মেয়েরা আর ডলারের বস্তাগুলি বাড়িতে থাকবে। ব্যস, মওকা বুঝে আমরা যাবতীয় ধনদৌলত নিয়ে চম্পট দেব। দেখেছ?

একটা কথা, আখ ক্ষেতে আগুন লাগার দৃশ্য দেখেছ? আর তখন যে শব্দের উদ্ভব হয় শুনেছ কোনদিন? এত জোরে জোরে শব্দ হয় যে, তখন কোন মেয়ের আর্তনাদই কানে আসবে না। ফলে নিরাপদেই আমরা কাজটা সারতে পারব।

একটা মাত্রই বিপদের সম্ভাবনা থাকবে ডলারের বস্তাটা নিয়ে পাড়ি জমাবার আগেই আমরা যদি ধরা পড়ে যাই। তুমি একটা কাজ যদি কর তবে—

ধন্যবাদ বোস্টন হুইস্লিং ডিক্ বলল তোমরা যে আমাকে একটা কাজ দিতে চাইছ তার জন্য আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এখন বলি, বিদায়।

একলাফে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে বোস্টন একটু রাগত স্বরেই বলল, তোমার বক্তব্য কি, খোলসা করে বলত?

বক্তব্য আবার কি, এ কাজটা থেকে আমাকে রেহাই দাও। আমার সাফ কথা শোন এসব চুরি রাহাজানির মধ্যে আমি নেই। তাই মানে মানে বিদায় নিয়ে সরে পড়ছি, ব্যস।

হুইস্লিং ডিক কথা বলতে বলতে সামনের দিকে দু'-তিন পা এগিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘাড় বাঁকিয়ে দেখল, ছোট একটা পিস্তল বাগিয়ে ধরে বোস্টন তাকে থামতে বলছে।

দলের পাণ্ডা সঙ্গে সঙ্গে হেড়ে গলায় গর্জে উঠল, এক পা-ও এগোবে না। ফিরে এসে চেয়ারে বোসো। আমরা কাজটা চুকিয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমাকে এখানেই থাকতে হবে। আর দু' ইঞ্চি এগিয়ে গেলেই আমি গুলি করতে বাধ্য হব। যদি পিতৃদত্ত প্রাণটাকে টিকিয়ে রাখতে চাও তবে আমার হুকুম তামিল কর।

বহুৎ আচ্ছা, তা-ই করছি। কিন্তু ভাই, তোমার ওই বারো ইঞ্চি পিস্তলের নলটা নামিয়ে রাখ তো।

এই তো লক্ষ্মী ছেলের মত কথা। এখান থেকে পালাবার চেষ্টা কোরো না। ব্যস, তোমার কাছ থেকে আর কিছু আশা করছি না। শুনে রাখ, পুরনো বন্ধুকে গুলি করার সুযোগ পেলেও আমি সুযোগের সদ্ব্যবহার করি, মানে করে থাকি। সহজে আমি সহজে আঘাত করি না। কিন্তু যে ডলারগুলো আমি হাতের মুঠোয় পেতে চলেছি সেটাকে বাগাতে পারলেই আমিও এসব কাজ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেব।

ডলারগুলো নিয়ে ধারে কাছের কোন একটা জানাশোনা শহরে গিয়ে জমকালো একটা সেলুন খুলে বসব। সত্যি বলছি ডিক্, এভাবে পুলিশের তাড়া খেতে খেতে আজ আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, হাঁপিয়ে উঠেছি। সত্যি বলছি, এসব নক্কারজনক কাজে আমার ঘেন্না ধরে গেছে।

কথা বলতে বলতে পকেট থেকে একটা ঘড়ি বের করে আগুনের আলোয় এক ঝলক দেখে নিয়ে বোস্টন এবার বলল, ন'টা বাজতে পনের মিনিট বাকি। ব্লিংকি আর পেট আর দেরি নয়, বেরিয়ে পড়। আখের ক্ষেতটার অন্তত বারো জায়গায় আগুন ধরাবে। মনে থাকে যেন।

কাজ সেরে রাস্তা ছেড়ে বাঁধের পথটা ধরবে, কারো সঙ্গে দেখা হবে না। তোমরা ফিরে আসতে আসতে সবাই আগুন নেভানোর জন্য দাপাদাপি শুরু করে দেবে। ব্যস। ঠিক তখনই আমরা নেকড়ের মত দ্রুত আর শিকারী বিড়ালের মত পা টিপে টিপে বাড়িটার ভেতরে সিঁধিয়ে যাব। ডলারের বস্তাটা নিয়ে চম্পট দেব।

ভাল কথা, তোমরা যত বেশী দেশলাই সঙ্গে করে নিয়ে যাও। মনে থাকে যেন, আখ ক্ষেতের অন্তত বারো জায়গায় আগুন ধরাতে হবে।

দুই ছন্নছাড়া ভবঘুরে সবার কাছ থেকে দেশলাই কুড়িয়ে পকেট বোঝাই করে নিল। হুইসলিং

ডিক্‌ও কোটের পকেট থেকে দুটো দেশলাই বের করে তাদের হাতে তুলে দিল। তারা এবার আধো আলো-আধো অন্ধকার পথ ধরে আখ ক্ষেতের দিকে এগোতে লাগল।

ভবঘুরে তিনজনের মধ্যে দু'জন, টম, গগলস সুবিধামত কাঠের পেটিতে হেলান দিয়ে আঁড় চোখে এ-মুহূর্তের চরমতম শত্রু হুইসলিং ডিক-এর ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে লাগল। হুইস্‌লিং নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যেই বিষণ্ণমুখে হাঁটাহাঁটি করতে লাগল।

পায়চারি করতে করতে সে অন্যমনস্কভাবে কোটের পকেটে হাত ঢোকাতেই পথ থেকে কুড়িয়ে পাওয়া রেশমি মোজা জোড়া আঙুলে ঠেকল। মুচকি হেসে সে স্বগতোক্তি করল, আহাঃ। ফুটন্ত ফুলের মত সুন্দর মোজা জোড়া।

দু'ঘণ্টা সময় পেরিয়ে গেছে। তখন বেলেসিড বাগিচার খাবার ঘরে খাওয়া দাওয়া আর জোর গল্পগুজব চলছে। বাগিচার মালিক, তার পরিবারের লোকজন আর ক'জন অতিথি মিলে খাবার ঘরটাকে যেন রীতিমত মাছের বাজার বানিয়ে তুলেছে। গৃহকর্তার আবেগ-উচ্ছ্বাসই সবচেয়ে বেশী। আর গৃহকর্ত্রী তো আসরের মধ্যমণি সেজে বসেছিল। এক-একজন এক-একটা কথা বলছেন আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি খিল্‌খিল করে হেসে উঠতে লাগলেন।

এক সময় কথার মোড় ঘুরে ভবঘুরেদের প্রসঙ্গ উঠল। কাদের অন্যায় অত্যাচার চরমে উঠেছে এটাই আলোচনা বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়াল।

ভবঘুরেরা কয়েক মাইল পরিধি জুড়ে যে বল্গাহীন তাণ্ডব শুরু করেছে তাতে শহরের মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে পড়ার যোগাড় হয়েছে।

একজন বলল প্রতি বছর শীতের শুরুতেই তারা নদীপথে দলে দলে এসে শহরের আনাচে কানাচে আশ্রয় নেয়।

অন্য আর একজন তাকে সমর্থন করে বলল, 'হ্যাঁ, কথাটা ঠিকই। তারা শহরটাকে একেবারে ছেয়ে ফেলে।

প্রথমজন বলল, আরে এই মাত্র ক'দিন আগে মাদাম পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছেন। ভবঘুরেদের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি না করে এখন বাজারই করা যায় না। অতএব শহরময় চিরুণি তল্লাশি চালিয়ে হতচ্ছাড়াগুলোকে শ্রীঘরে আটক করা হোক।

'হ্যাঁ, দু'চার ডজনকে নচ্ছাড় ভবঘুরেকে তো জেলে ঢোকানোও হল। কিন্তু এ-ত সমুদ্র থেকে এক ঘটি জল তুলে নেওয়ার সামিল। বাকি তিন চার হাজার নচ্ছাড় বাঁধ অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আরে কী জ্বালাতন বলুন দেখি মশাই নচ্ছাড়গুলো কোন কাজকর্ম ত করবেই না এমন কি ওভারসিয়ারদের পাত্তা পর্যন্ত দিচ্ছে না। আর আমাদের বাড়ির পোষা কুকুরগুলোর সঙ্গে ভাব জমাবে। তারা যে কোন কু-মতলবে আছে তা-ই বা কে জানে!

এবার গৃহকর্তা তার সহধর্মিনীকে লক্ষ্য করে বলল, একটা কথা সত্যি করে বল তো? আজকের দিনে তুমি ক'জন ভবঘুরেকে বাড়িতে ডেকে এনে খেতে দিয়েছ?

মুচকি হেসে মাদাম বলল, ছ'জন। আর তাদের মধ্যে দু'জন আমাদের বাড়িতে কাজের খোঁজ করছিল।

তার কথা শুনে বাগিচার কর্তা সরবে হেসে উঠে বলল, হ্যাঁ, তা করছিল বটে। তবে তাদের নিজেদের পেশার কাজ। তাদের একজন কাচের জিনিসপত্র আর অন্যজন কাগজের ফুল তৈরী করে। কিন্তু গায়ে গতরে খাটার কাজ করতে কেউ-ই রাজি নয়।

আর একজনের কথা বললে না-তো।

কার? কোন্ কথা?

সে লোকটা দিব্যি ভাল ভাষায় কথা বলতে পারে। যা তাদের মত তাদের সমাজের কারো কাছ থেকেই প্রত্যাশা করা যায় না। আবার তার কাছে একটা ঘড়িও ছিল, লক্ষ্য করেছিলে?

হ্যাঁ। সেটা আবার একটু পর পর বের করে দেখছিলও। এক সময় সে নাকি বোস্টন শহরে থাকত।

শোন, আমি কিন্তু বিশ্বাস করতে উৎসাহ পাচ্ছি না যে, তারা সবাই লোক হিসেবে খারাপ। আমার মনে হয় তারা উন্নতির পথের হদিস পায়নি, সুযোগ তো অবশ্যই না।

আর আমি এ-ও লক্ষ্য করেছি, তাদের জ্ঞানের পথ আজও এক জায়গাতেই থমকে রয়েছে। কিন্তু মুখের গোঁফ জোড়া অন্য দশজনের মত বেড়েই চলেছে।

তুমি হয়ত লক্ষ্য করনি, আজ সন্ধ্যায় আমরা যখন গাড়ি করে ফিরছিলাম তখন তাদের একজন আমাদের গাড়িটার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে পথের ধারে দাঁড়িয়েছিল। কী সুন্দর ভদ্রসন্তানের মত মুখটা! কিন্তু সে মুখে গভীরভাবে অযোগ্যতার ছাপ ফুটে উঠেছে। 'ক্যাডালেরিয়া' থেকে নেওয়া অত্যাশ্চর্য এক সুরে সে শিস দিচ্ছিল। কী চমৎকারই না লাগছিল!

তাদের সুদর্শন যুবতী মেয়ে দুটোর মধ্য থেকে একজন যুবতী মেয়ে আবেগ মধুর স্বরে বলল 'মাম্মি, আমি ভেবে পাচ্ছিনে ভবঘুরে সে সুন্দর লোকটা কি আমার রেশমি মোজাটা পথে কুড়িয়ে পেয়েছে?'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে মাদাম মেয়ের দিকে তাকাল। মেয়েটা বলে চলল, আর তোমার কি বিশ্বাস, সে আজ রাত্রে আমার মোজাটাকে জায়গা মত রেখে দেবে? আমি কি একটা মোজা টাঙিয়ে রাখতে পারি?

মেয়েটা মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে আবার বলতে লাগল, আচ্ছা মাম্মি, আমার এত মোজা থাকতে কেন আমি এক জোড়া রেশমি মোজা চেয়েছিলাম, জান কি?

তার মাকে নীরব দেখে মেয়েটা এবার বলল, তুমি দেখছি কিচ্ছু জান না। জুডি আন্টি একদিন বলেছিলেন, এমন দুটো মোজা তুমি ঝুলিয়ে রাখতে পারলে সান্টাক্রস এসে নাকি সেটাকে ভাল ভাল জিনিসে ভর্তি করে রাখবে। আর খ্রীস্টমাস উৎসবের আগের দিন আমি যত ভাল ভাল কথা বলব তার দামটা মঁসিয়ে সাম্বে অন্য মোজাটায় রেখে যাবে। মঁসিয়ে সাম্বেলে একজন নামকরা যাদুকর তা তো তোমার অজানা নয়।

যুবতী মেয়েটার কথা শেষ হতে না হতেই আচম্বিতে উল্কার প্রেতচ্ছায়ার মত একটা কালো ছায়ার মত একটা ঘন কালো ছায়া এসে জানালার কাঁচটাকে গুঁড়োগুঁড়ো করে দিল। ভোজনরত অতিথিদের মাথায়ও দু-চারটে টুকরো ছিটকে গিয়ে পড়ল। আর দেওয়ালের গায়ে একটা গভীর খাঁজ কেটে দিল। বেলেমিড-এ আজও যেসব নবাগতের আগমন ঘটে তারা সে খাঁজটার দিকে বিস্ময়-মাখানো দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। আর গভীর মনোযোগের সঙ্গে সে ঘটনাটা শোনে।

উপস্থিত মেয়ে পুরুষ সবাই বিকট স্বরে আর্তনাদ জুড়ে দিল। বাগিচার মালিক নিজেকে একটু সামলে নিয়ে প্রথম সক্রিয় হয়ে উঠল। অধিকার প্রবেশকারীর ক্ষেপণাস্ত্রটা মেঝে থেকে তুলে সবার সামনে তুলে ধরল।

সে প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, আরে এ যে দেখছি মোজার ধূমকেতু বর্ষণ! তবে কি মঙ্গল গ্রহের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব হল! এবার কালো মোজাটাকে উঁচু করে ধরে সে বলল, এটা তো দেখছি, বেশ ভর্তিই আছে! কথাটা বলেই মোজাটাকে উল্টো করে ধরতেই তার ভেতর থেকে হলুদ রঙের কাগজে মোড়া একটা পাথর টুপ করে মেঝেতে পড়ল।

বাগিচার মালিক গলা ছেড়ে বলতে লাগল গ্রহান্তর থেকে আসত এ শতকের প্রথম বাণী। কথাটা বলেই চশমাটাকে আঙুলের ডগা দিয়ে তুলে যথাস্থানে রেখে পাথরটাকে বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল।

এবার বিদ্যুৎ গতিতে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে বাগিচার মালিক জোরে জোরে বার দু'-তিন ঘণ্টা বাজাল।

নিঃশব্দে একটা পুরুষ এসে তার সামনে দাঁড়াল। বাগিচার মালিক ব্যস্ত কণ্ঠে বলল, শীঘ্র যাও, মিঃ ওয়েস্‌লিকে গিয়ে বলবে, তিনি যেন মরিস আর রীড্‌সকে সঙ্গে নিয়ে আর শক্ত পোক্ত দশজন সশস্ত্র লোককে নিয়ে যেন যত শীঘ্র সম্ভব হয় ঘরের দরজায় চলে আসেন। আর সঙ্গে যেন প্রচুর পরিমাণে দড়ি আর লাঙ্গলের ফলা যেন সঙ্গে নিয়ে আসে।

এবার বাড়ির মালিককে লেখা একটা চিঠি জোরে জোরে পড়তে লাগল। যার বক্তব্য মোটামুটি এরকম—

পথের ধারে যেখানে পুরনো ইঁট জমা করে রাখা আছে তার গায়ের খালি মাঠটায় আমি ছাড়া আরও পাঁচ পাঁচটা ছন্নছাড়া বে-পরোয়া ভবঘুরে রয়েছে। একটা পিস্তল হাতে দিয়ে তারা এখানে

আমাকে পাহারায় রেখে গেছে। আমি এরই মধ্য থেকে আপনাকে খবরটা পাঠালাম। দুটো সাকরেদ আখ ক্ষেতে আগুন দিতে গেছে। আপনি এবং আপনার লোকজন যখন ছুটোছুটি করে বাড়ি খালি রেখে ওই আগুন নেভাতে যাবেন তখন পুরো দলটা অতর্কিতে আপনার বাড়িতে হানা দেবে। শ্রমিকদের বেতনের ডলারগুলো ও গহনাপত্র লুঠ করে চম্পট দেবে।

আর যে মেয়েটা পথে মোজা ফেলে গিয়েছিল তাকে আমার খ্রীস্টমাসের আনন্দ জানাবেন। সে ঠিক যেমন করে আমাকে জানিয়েছে।

সবার আগে সেখানে পুলিশ পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। তারপর আমাকে উদ্ধার করার জন্য কিছু সাহায্যকারী পাঠান।

চিঠির শেষে হুইস্‌লিং ডিক-এর স্বাক্ষর রয়েছে। বাগিচার মালিক চিঠিটা পড়া শেষ করলে ঘরের মধ্যে অভাবনীয় অখণ্ড নীরবতা নেমে এল। কারো মুখে টু শব্দটিও নেই।

পরবর্তী অধঘণ্টার মধ্যেই দেখা গেল 'বেলেমিড'-এর প্রয়াসের ফলে পাঁচজন ভবঘুরেই ধরা পড়ে বৈঠকখানায় তালাবন্দী অবস্থায় বসে আছে। সকাল হলেই তাদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।

আর একটা অবিশ্বাস্য কাণ্ড দেখা গেল, হুইস্‌লিং ডিক্ বাগিচা মালিকের পাশে বসে মহানন্দে বিভিন্ন উপাদেয় খাদ্যসহযোগে ভোজ সারছে। শুধু কি এ-ই? কত সব রূপসী যুবতী তার একটুখানি খুশি উৎপাদন করতে তার মুখের এক ঝলক হাসি দেখতে কতভাবেই না চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

খাবার টেবিলে বসেই হুইস্‌লিং ডিক'কে শোনাতে হল কিভাবে বোস্টন হ্যারি-র লুঠেরা দলের সঙ্গে তার মোলাকাৎ হয়। আর কি করেই বা সে মোজার মধ্যে পাথরের টুকরো আর চিঠিটা ভরে ধূমকেতুর বেগে ছুঁড়ে খাবার ঘরের কাঁচের জানালা দিয়ে ভেতরে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

সব কিছু শুনে বাগিচার মালিক হুইস্‌লিং ডিককে প্রতিশ্রুতি দিল, তাকে আর ভবঘুরে সেজে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হবে না। এতবড় একটা অবশ্যম্ভাবী ক্ষতির হাত থেকে যে তাকে রক্ষা করল তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো আর পুরস্কৃত করা তো তার কর্তব্যও বটে।

বাগিচার মালিক হুইস্‌লিং ডিক্‌কে প্রতিশ্রুতি দিল, 'বেলেমিড'-এর মর্যাদা রক্ষা করতে তার যোগ্য কোন একটা পদে তাকে বহাল করা হবে। আরও কথা দিল আখ ক্ষেতের কাজ চালাতে পারে এমন একটা উঁচু পদে সে যাতে বহাল হতে পারে সে পথটা আগে থেকেই সুগম করে দেওয়া হবে। এক কথায় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে তাকে সার্বিক সাহায্য সহযোগিতা করা হবে।

খ্রীস্টমাস দিবসে ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই হুইস্‌লিং ডিক্-এর ঘুম ভেঙে গেল। বিছানা ছেড়ে উঠে জানালার কাছে গিয়ে পর্দাটা সরিয়ে দিল। সকালের তাজা বাতাস তার দেহ মনে রোমাঞ্চ জাগিয়ে তুলল।

ঠিক সে মুহূর্তেই সে অশুভ একটা শব্দ শুনতে পেল। বাগিচার শ্রমিকরা অল্প সময়ের মধ্যে দিনের কাজ শেষ করার জন্য হাত চালিয়ে কাজ করতে লেগে গেছে।

আর ভাগ্যের সন্ধানে বেরিয়ে ছিন্নবাস ছদ্মবেশী রাজকুমার বাগিচার মালিকের জানালায় দাঁড়িয়ে কেঁপে চলেছে।

বাগিচার ছোট্ট রেলগাড়িটা হিস্ হিস্ শব্দ তুলে ধোঁয়া ছড়াচ্ছে। আর শ্রমিকরা ব্যস্ত হাতে তাতে সাপ্তাহিক হিসাব অনুযায়ী চিনির পিপেগুলো তুলে দিতে লাগল।

হুইস্‌লিং জানালা দিয়েই নিচে পথের দিকে দৃষ্টি ফেরাল। পনের ফুট নিচে বাড়িটার প্রাচীরের গায়ে ফুলগাছের সারি দেখতে পেল এ থেকেই অনুমান করে নিল, সেখানকার মাটি বেশ নরম।

বাড়িটার ওদিকটায় সে কোন লোকজন দেখতে পেল না। ঘর থেকে সন্তর্পণে বেরিয়ে সে পা টিপে টিপে হেঁটে প্রাচীরটার কাছে চলে গেল।

সে বুঝে নিল, এক লাফে প্রাচীরটা ডিঙিয়ে ওপারে চলে যাওয়া তেমন কঠিন ব্যাপার নয়। সে করলও তা-ই। প্রাচীরটা ডিঙিয়ে ওপারে নেমে শিশির ভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে আরম্ভ করল। সে এবারে স্বাধীন. ভোরের পাখির মতই মুক্ত।

ইতিমধ্যে ভোরের রক্তিম সূর্যটা অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে আকাশের গা-বেয়ে অনেকটা ওপরে উঠে গেছে। সে ভাবছে, এবার নিজের ইচ্ছেমত যেদিকে খুশি চলে যেতে

পারে। নদীর ঢেউ বয়ে চলেছে। কিন্তু কোথায়, কোন ঠিকানায় যাচ্ছে তা কারো জানা নেই।

একটু বাদেই বাঁধের ওপর থেকে বাতাসবাহিত মনোলোভা রোমাঞ্চকর ভারী গলার একটা শিস-ধ্বনি ভেসে আসতে লাগল। কে? কে শিস্ দিচ্ছে? কই, বুনো পাখিরা তো এমন স্বরে শিস্ দেয় না। এক সময় সে শিস্ধ্বনিটা ক্রমে মিলিয়ে যেতে লাগল। তারপর আর শোনা গেল না।

ছোট্ট পাখিটা তো জানে না, ওই শিসের যে অংশটুকু তার বোধগম্য হচ্ছে না, তা-ই এ গায়ককে প্রাতরাশের কথা ভুলিয়ে দেয়। ছোট্ট একটা পাখি গাছের ডালে বসে একটু বাদে বাদে ডানা ঝাপটে চলেছে।

দ্বিতীয় খণ্ড

দ্য জেন্টল গ্র্যাফ্‌টার

মডার্ণ রুর‍্যাল স্পোর্টস্

দক্ষিণ ইন্ডিয়ানার এক হলুদ পাইন কাঠের হোটেলে এক সকালে অ্যান্ডি আর আমার ঘুম ভাঙল। তখন আমাদের দু'জনের পকেটে সব মিলিয়ে মাত্র আটষট্টি সেন্ট পড়ে রয়েছে।

গত রাত্রে আমরা যে কিভাবে ট্রেন থেকে নেমেছিলাম তার বিবরণ আপনাদের কাছে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, ট্রেনটা গ্রামের বুক চিরে এমনই দ্রুতগতিতে চলছিল যার ফলে গাড়ির জানালা দিয়ে আমরা সেটাকে একটা সেলুন মনে করেছিলাম। আসলে তো সেটা ছিল একটা জলের ট্যাঙ্ক আর ওষুধের দোকান।

সেদিন পথ চলতে গিয়ে আমরা প্রথম যে স্টেশনটা পেয়েছিলাম সেটাতেই কেন নেমে পড়েছিলাম তার কারণ যদি আপনারা জানতে আগ্রহী হন তো বলি, কারণ তার আগের দিনই আমরা দু'জনে একটা আলাস্কান হীরে আর ঘড়ির খেলায় হেরেছিলাম।

ঘুম ভাঙতেই নাকে নাইট্রো মিউরিয়াটিক অ্যাসিডের উৎকট গন্ধ লাগল আর শুনতে পেলাম মোরগের কর্কশ ডাক আর? ভারী কোন একটা বস্তু পড়ে যাওয়ার গম্ভীর শব্দ আর একটা মানুষের প্রার্থনার সুর শুনতে পেলাম।

আমি উল্লাস প্রকাশ করে বললাম, আরে অ্যান্ডি, আমরা যে গ্রামীণ সমাজে পৌঁছে গেছি। চল, বাইরে গিয়ে দেখি কোন খামারের মালিক আমাদের জন্য কি হাজির করেছে। সবার আগে সেটাকে চক্ষুদান করতে হবে। ব্যস, তারপরই শেয়াল ধরার রব করতে করতে এক দৌড়ে সেখান থেকে চম্পট দেব।

ব্যস্ত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতেই একদল খামারের লোক চোখে পড়ল। আর মাইল দুই দূরে পাহাড়ের ওপরে একটা দৃষ্টিনন্দন সাদা বাড়ি চোখে পড়ল।

খামারের মালিককে আমরা আগ্রহান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ওইটা কার বাড়ি, বলুন তো?

লোকটা বেশ গর্বের সঙ্গেই আমাদের প্রশ্নের জবাব দিল 'এজরা প্লাংকেট-এর বসতবাড়ি। তিনি আমাদের দেশের একজন সবচেয়ে প্রগতিশীল নাগরিক। সম্মানীয় ব্যক্তি।

আমরা প্রাতরাশ সারলাম। রেস্তোরাঁর মালিকের প্রাপ্য মিটিয়ে দেওার পর আমাদের পকেটে আর মাত্র আটটা সেন্ট ঠুংঠাং আওয়াজ করতে লাগল। তা নিয়েই আমরা দু'জনে সবচেয়ে প্রগতিশীল পল্লী প্রধানের পাত্তা নিয়ে নিলাম।

অ্যান্ডিকে বললাম, আমি বরং একাই যাই, কি বল? একজন খামারের মালিকের দু'জনের লড়তে যাওয়াটা বড়ই বে-মানান হবে।

অ্যান্ডি বলল, তবে তা-ই হোক। আমিও মুখোমুখি লড়াইয়েরই পক্ষপাতি। ভাল কথা, খামারের মালিক অ্যান্ডি তুমি কিভাবে ঘায়েল করবে মনস্থ করেছ?

সুটকেসের ভেতরে হাত চালিয়ে যেটা প্রথম হাতে ঠেকবে, সেটাই। ভাবছি, নতুন আয়করের কিছু রসিদ সঙ্গে করে নিয়ে যাব। আপেলের খোসার রস আর মাটি দিয়ে মধু তৈরীর ব্যবস্থাপত্র, এরকমই কিছু।

আর পকেটের মাপের সোনার ইট, ট্রেনের ভেতরে পাওয়া মুক্তোর মালা, আর নেব একটা—'

ব্যস, এ-ই যথেষ্ট। এজরা প্লাংকেট-এর জন্য এদের যে কোন একটা নিয়ে গেলেই যথেষ্ট হবে বলে আমি মনে করি।

আর দেরী না করে আমি একটা বগি-গাড়ি ভাড়া করে ফেললাম। তাতে চেপে এজরা প্লাংকেট-এর খামার বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। একজনকে সিঁড়িতে বসে থাকতে দেখলাম। সে সাদা ফ্ল্যানেলের সুট পরেছে। মাথায় চাপিয়েছে গল্ফ টুপি, গলায় বেঁধেছে লালটাই আর আঙুলে হীরের আংটি পরেছে।

তাকেই সামনে পেয়ে বললাম, একবারটি মিঃ প্লাংকেট-এর সঙ্গে দেখা করতে চাইছি।

সে মুচকি হেসে বলল, আপনি তো তাকেই সামনে দেখছেন। এবার বলুন তো, আপনার জন্য কি করতে পারি?

আমি নীরব চাহনি মেলে অপলক চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। টু-শব্দটাও মুখ দিয়ে বেরল না।

আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার চোখ বুলিয়ে সে এবার বলল, বহুৎ আচ্ছা। আপনি কি বলতে চাইছেন নির্দ্বিধায় বলুন। আপনার কোটের বাঁ-দিকের পকেটটা যে ফুলে রয়েছে, দেখতে পাচ্ছি।

আমি মুহূর্তের জন্য কোটের পকেটটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিলাম। এজরা প্লাংকেট এবার বলল, আগে সোনার ইটটা পকেট থেকে বের করে ফেলুন। ওটার প্রতি আমি খুবই আগ্রহী।

আমি কর্তব্য স্থির করতে না পেরে পকেট থেকে সোনার ইটটা বের করলাম। তার ওপর থেকে রুমালটা সরিয়ে ইটটা দেখালাম।

এক ডলার আশি সেন্ট। হ্যাঁ, ঠিকই আছে তো?

গম্ভীর স্বরে তার প্রশ্নের উত্তর দিলাম, দেখুন স্যার, ওটার মধ্যে যে শিসেটুকু আছে তার দামই এর চেয়ে বেশী।

বস্তুটাকে আমি আবার পকেটে চালান দিয়ে দিলাম।

দেখুন, আমি একটা সংগ্রহশালা খুলতে চলেছি। সে জন্যই ওটা আমার চাই। গত হপ্তায় পাঁচ হাজার ডলারের সামগ্রী ২.১০ ডলারের বিনিময়ে খরিদ করেছি।

তার কথাটা শেষ হতে না হতেই ঘরের ভেতর থেকে টেলিফোনের আওয়াজ ভেসে এল।

খামারের মালিক উঠতে উঠতে বলল, মিঃ বাংক, চলুন, ভেতরে যাওয়া যাক। আমার বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখে যান। জায়গাটা খুবই নির্জন নিরালা, তাই না? মনে হচ্ছে, নিউইয়র্ক থেকে টেলিফোনটা এসেছে।

আমি তার পিছন পিছন ঘরের ভেতরে গেলাম। ঘরটা অনেকটা শেয়ার দালালের ঘরের মতই দেখতে। ওক কাঠের টেবিল, দু'দুটো টেলিফোন, স্প্যানিশ চামড়ার আচ্ছাদন দেওয়া চেয়ার ও সোফা, গিল্টি করা ফ্রেমে বাঁধানো তৈলচিত্র আর পাশের একটা টিকার থেকে খবর হচ্ছে।

খামারের মালিক টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে বলল, হ্যালো, রিজেন্ট থিয়েটার? হ্যাঁ, আমি উডবাইন সেন্টারের এজরা প্লাংকেট বলছি।

হ্যালো, শুক্রবার সন্ধ্যার জন্য চারটে অর্কেস্ট্রার সিট বুক করুন। আর মনে রাখবেন, আমি সাধারণত সেসব সিট বুক করি, সেগুলো—হ্যাঁ, নমস্কার।

টেলিফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রাখতে রাখতে সে এবার বলল প্রতি দু'হপ্তা বাদ বাদ আমি একটা শো দেখার জন্য আমেরিকা চলে যাই। আঠারোটার প্লেনটা ইন্ডিয়ান পোলিস বিমান বন্দর থেকে ধরি। রাত্রের দশটা ঘণ্টা ইয়াপ্লিয়াম ওয়ে-তে কাটিয়ে দেই। আটচল্লিশ ঘণ্টা বাদে আবার বাড়ি ফিরি।

উভয়ের মধ্যে এরকম কথাবার্তা চলাকালীনই আবার টেলিফোনটা বাজতে লাগল।

হ্যালো! খামারের মালিক সাড়া দিল। ওঃ, এ যে মিলডেল থেকে পার্কিন্স বলছে। আমি তো আগেই বলেছি, ওই মরকুটে ঘোড়াটার বিনিময়ে আটশ' ডলার কিন্তু বড্ড বেশী। সেটাকে এখানে নিয়ে এসেছ? চমৎকার! আমাকে একবার দেখাবে কিন্তু। রিসিভারটা রেখে একটু দূরে সরে গিয়ে ওটাকে বৃত্তাকারে জোর কদমে চালিয়ে দাও তো।

জোরে, আরো জোরে, আরো জোরে। হ্যাঁ, এবার তার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি বটে। এক কাজ কর, ওটাকে এবার ফোনের কাছাকাছি নিয়ে চলে এস। কাছে, আরও কাছে ওর নাকটাকে রিসিভারটার কাছে, আরও কাছে নিয়ে এস। না হে, ও ঘোড়াটা আমার দরকার নেই। কোন দামের বিনিময়েই আমি ওটাকে কিনতে চাই না। শুভরাত্রি।

খামারের মালিক আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, এবার মালুম হচ্ছে তো, চাষবাসের কাজেও চুল কাটার একটা ব্যাপার রয়েছে। সম্প্রতি সবাই ব্যাপারটা জানে।

তবে বলছি শুনুন, আজকাল সারাটা দিন আমরা কিভাবে কাটিয়ে থাকি। আপনি যেটা শুনেছেন ওটা শিকাগো, সানফ্রান্সিসকো, লুইস আর নিউ ইয়র্কের যাবতীয় খবরের কাগজের সংক্ষিপ্তসার, মানে মূল বক্তব্য।

ওটা আমাদের গ্রামীণ সংস্থায় টেলিগ্রাম করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তারপর সেখান থেকে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গ্রাহকদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ওই টেবিলটার দিকে তাকিয়ে দেখুন, দেশের যাবতীয় নামকরা দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা জড়ো করে রাখা হয়েছে। আর মাসিক পত্রিকাগুলোর কিছু কিছু অগ্রিম পৃষ্ঠার বিশেষ সংস্করণ রয়েছে।

হাত বাড়িয়ে একটা পৃষ্ঠা তুলে তার শিরোনামটা দেখলাম, লেখা রয়েছে বিশেষ অগ্রিম প্রুফ। উনিশ শ' নয়-এর জুলাই সংখ্যা 'সেঞ্চুরি'তে স্থান পাবে। এরকম আরও কিছু দেখতে পেলাম।

এরকম সময়ে খামারের মালিক টেলিফোন করে কাকে যেন আসতে বলল। ম্যানেজারকেও হতে পারে।

আমি কিছু বলতে চাইছি অনুমান করে সে নিজেই বলল, মিঃ বাংক, আমি দুঃখিত, আমার পক্ষে আপনাকে আর সময় দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। একটা খবরের কাগজের দরকারে আমাকে এখনই কম্যুনিজমের অবাস্তবতা শিরোনাম দিয়ে একটা প্রবন্ধ খাড়া করতে হবে।

আর বিকেলে আমাদের কাগজেরই জন্য 'ঘোড়দৌড় সংস্থা'-র একটা আলোচনাচক্রে যোগদান করতে হবে। তাই বলছি কি—

ধন্যবাদ। আমি এখনই আমার বগি গাড়িতে গিয়ে চাপছি। আমি হোটেলে ফিরে এলাম। তাকে সেখানে রেখে অ্যান্ডি-র সঙ্গে দেখা করার জন্য আমি ভেতরে চলে গেলাম। তাকে সবকিছু খোলসা করে বললাম। একটা শব্দও বলতে বাদ দিলাম না।

অ্যান্ডির একটা বিশেষ স্বভাব, কিছু ভাববার সময় সে সমানে বাঁ-দিকের গোঁফটা কামড়াতে আরম্ভ করে। এভাবে গোঁফ কামড়াতে কামড়াতে সে অনেকটা সময় ধরে ঘরময় পায়চারি করল।

এক সময় আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, জেফ ময়ূরের পালকধারী যে কাকের কথা তুমি এইমাত্র শোনালে সেটা আমি বিশ্বাস করলেও প্রত্যয় কিন্তু করি না, বুঝলে?

একটা কথা বল তো জ্যাফ, ধর্ম সম্বন্ধে আমার তেমন দুর্বলতা আছে বলে তোমার মনে হয় কি, হয়?

না, তোমার সম্বন্ধে আমি এরকম কোন ধারণা অন্তরে পোষণ করি না। সত্যি কথা বলতে কি, গির্জার বহু মানুষ আছে যাদের ধর্মের প্রতি বিশেষ আসক্তির ব্যাপারটা বাইরে থেকে বোঝা যায় না।

আমি কিন্তু সৃষ্টির আদিকাল থেকেই চিরদিন শিক্ষা নিয়েছি, অ্যান্ডি বলল। আসলে সৃষ্টিকর্তার চরম পরিকল্পনার প্রতিই আমি আস্থাভাজন। তিনি তো বিশেষ একটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই কৃষকদের সৃষ্টি করেছিলেন। সে উদ্দেশ্যটা হচ্ছে, তোমার আর আমার মত মানুষদের খাদ্যের ব্যবস্থা করা। তা যদি নাই হয় তবে তিনি আমাদের মগজে বুদ্ধি ঢুকিয়ে দিয়েছে কেন। আমি কিন্তু বলব, বাইরের জৌলুস যা-ই থাক না কেন, চাষী চিরদিন চাষী থেকে যাবে।

তাই বুঝি?

ঠিক তা-ই। যদি চাও আমার মতবাদটাকে হাতে নাতে প্রমাণ করে দিতে পারি।

আমার মতই তুমিও সে প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হবে, আমি মুচকি হেকে কথাটা ছুঁড়ে দিলাম।

একটা কথা কি জান? এ লোকটা নিজের শরীর থেকে ভেড়ার খোয়াড়ের শিকল ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। শিক্ষা, সাহিত্যকর্ম, বিদ্যুৎ-শক্তি আর বুদ্ধির বিভিন্ন সুবিধার গণ্ডির মধ্যে আজ সে নিজেকে বন্দী করে ফেলেছে।

তোমার কথা শোনা থাকল। তা সত্ত্বেও আমি প্রয়াস চালাব। এমন কিছু প্রকৃতিসৃষ্ট বিধান আছে যা গ্রাম্য সুযোগ সুবিধাকে ডিঙিয়ে যেতে পারে না।

কথাটা বলেই অ্যান্ডি পাশের কামরাটায় ঢুকে কয়েক মুহূর্ত বাদে একেবারে কেতাদুরস্ত হয়ে বেরিয়ে এল। কেবলমাত্র ছিমছাম পোশাকেই নয়, এমন কি নীল রং দিয়ে সে যে গোঁফ জোড়াকে ভিজিয়ে নিয়েছে তা-ও আমার চোখে পড়ে গেল।

আমি কপালের চামড়ায় ভাঁজ একে সবিস্ময়ে বললাম, আরে ব্বাস! করেছ কি হে! একেবারে সার্কাস দলের রিং মাস্টার বনে গেছ যে!'

অ্যান্ডি মুচকি হেসে বলল, বগি গাড়িটা তো বাইরেই আছে, তাই না? আমি ফিরে না আসা অবধি তুমি এ জায়গা ছেড়ে যেয়ো না যেন।

অ্যান্ডি দু'ঘণ্টা বাদে ফিরে এল। কোটের পকেট থেকে এক গোছা নোট বের করে টেবিলে রেখে বলল, এখানে আট শ' ষাট ডলার আছে। সবই বলব ধৈর্য ধর। সে বাড়িতেই উপস্থিত ছিল। আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে চোখ বুলিয়ে নিয়ে রসিকতা শুরু করে দিল। আমি কোন কথা না বলে আখরোটের খোলা আর ছোট বলটাকে তার সামনে, টেবিলে রাখলাম।

তারপর আমার পুরনো ফর্মূলাটাকে প্রয়োগ করতে গিয়ে বললাম, মঁসিয়ে, উঠে বসে ছোট বলটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন। এই যে ছোট জিনিসটা দেখতে পাচ্ছেন, পাচ্ছেন নাকি? ভেবে দেখার চেষ্টা করুন তো, ছোট জোকারটা কোথায় হাফিস হয়ে গেল? দেখলেন আমার যাদুমন্ত্র কেমন আপনার চোখকে ধোঁকা দিয়ে দিল।

আমি আঁড়চোখে খামারের মালিকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম। সে ধীরে ধীরে উঠে সামনের দরজাটা বন্ধ করে দিল। তারপর আরও সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে নিরীক্ষণ করতে লাগল।

তারপর রীতিমত আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গেই বলল, আমি কুড়ি বাজি ধরে বলছি, কোন খোলার তলায় বলটা আছে আমি বের করে দিতে পারি।

অ্যান্ডি তারপর আরও বলল, দেখুন, এরপর আর নতুন করে কি-ই বা বলার থাকতে পারে, বলুন? তখন তার বাড়িতে জমা ছিল আট শ' ষাট ডলার।

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। গৃহকর্তা দরজা পর্যন্ত এসে আমাকে এগিয়ে দিয়ে গেল। আমার সঙ্গে করমর্দন সারার সময় আমি লক্ষ্য করলাম, তার চোখ দুটো জলে ভরে গেছে।

চোখ মুছতে মুছতে সে বলল, 'বহু বছর পর আজ একটা নির্ভেজাল আনন্দের স্বাদ পেলাম বলে আপনাকে ধন্যবাদ জানাতেই হচ্ছে মিঃ বাংক। পুরনো দিনের সুখের দিনগুলো আজ আমার স্মৃতির পটে ভেসে উঠছে যখন আমি সামান্য এক চাষী ছিলাম, বৃষ্টি বিশেষজ্ঞ অবশ্যই নই। শুভ রাত্রি! ঈশ্বর তোমার সহায় হোন।

কথাগুলো এক নাগাড়ে বলে জেফ পিটার্স থামল।

আমার বুঝতে অসুবিধা হল না যে তার কাহিনী ফুরিয়ে গেছে।

তারপর আমি বলতে লাগলাম, 'তবে আপনি বলতে চাইছেন, অবশ্যই। প্রায় সেরকমই বটে। চাষীদের উন্নতির শিখরে উঠতে দাও, রাজনীতির খেলায় গা ভাসিয়ে দিতে দাও। চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবার সে বলল, চাষ-আবাদের খেলা বড়ই নির্জন, নীরস। তারা আগে এ খোলার খেলার মোটেই পক্ষপাতি ছিল না। বরং বিরোধিতায় মাতত।

দ্য এ্যাথিক্স অব পিগ

আমি তখন পূর্বগামী ট্রেনের যাত্রী। ধূমপানের ঘরে ঢোকামাত্র জেফারসন পিটার্স-এর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। ওয়াবাশ নদীর পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চলে একমাত্র তারই মিস্তিষ্কের সেলেবেলাম, সেরেব্রাম আর মেডুলা অব্‌লংগাটা ঠিকঠাক কাজ করে।

জেফ জুয়াচ্চুরি ধাপ্পাবাজি কাজে নিজেকে লিপ্ত রেখেছে। পিতৃমাতৃহীন আর বিধবার দিক থেকে তাকে ভয় করার দরকার হয় না। তার পেশা ভারী পকেটকে হাল্কা করে দেওয়া।

চুরুট ঠোঁটে উঠলেই তার মন মেজাজ শরীফ হয়ে ওঠে। আর আমি একটা চুরুটের বিনিময়েই তার কাছ থেকে গল্পটা উপহার পেয়ে গেলাম।

জেফ চুরুটে একটা লম্বা টান দিয়ে, ঘরের হাল্কা বাতাসে এক গাল ধোঁয়া ছড়িয়ে দিয়ে গল্পটা ফেঁদে বসল। সে বলতে লাগল, শোন আমার এ-কারবারের সবচেয়ে কঠিন কাজ হচ্ছে, এক বিশ্বাসী, সৎ, সমাজে খ্যাতিমান ও সম্মানীত একজন অংশীদার খুঁজে বের করা যার সঙ্গে ধাপ্পাবাজির কাজকর্ম করা যেতে পারে।

ধাপ্পাবাজির কাজ চালাতে গিয়ে যেসব সবচেয়ে ভাল লোকদের আমি সঙ্গী হিসেবে পেয়েছি যারা কম বেশী প্রবঞ্চনার আশ্রয়ও নিত। নিজের পুরোপুরি পছন্দ মাফিক লোকের হদিস পাওয়া বাস্তবিকই কঠিন সমস্যা।

তাই গত গ্রীষ্মে যখন সাব্যস্ত করে ফেললাম, এমন একটা অঞ্চলে এবার হাজির হব যেখানে এ বিষহরির সাকরেদটা এখনও ঘাঁটি গাড়েনি বলেই খবর পেয়েছি। এমন এক অংশীদারের হদিস পাওয়ার জন্য চেষ্টা চালাতে লেগে গেলাম যার মধ্যে দুষ্কর্মটা করার মত সহজাত প্রতিভা আছে। আর এ-ও চাই যার মাথায় সাফল্যের পোকা ঢোকেনি। যাকে বলে এখনও ধোয়া তুলসিপাতা সে রয়ে গেছে।

আমি খোঁজাখুঁজি করতে করতে মনের মত পরিবেশ সমৃদ্ধ একটা গ্রামের হদিস পেয়ে গেলাম। সবাই এ-শহরটাকে 'নেবো' পাহাড় নামকরণ করেছে।

পশ্চিম ভার্জিনিয়া, কেন্টাকি এবং উত্তর কেরোলিনা যেখানে কোণাকুণিভাবে এক সঙ্গে মিলিত হয়েছে সেখানেই গ্রামটা অবস্থিত।

নেবো পাহাড় গ্রামে একটা সপ্তাহ কাটানোর পর আমি একদিন একটা দোকানে হাজির হলাম। উদ্দেশ্য যদি আমার পছন্দ মাফিক একটা লোক পেয়ে যাই। গ্রামের নামকরা চার তাসের খেলোয়াড়রা রাত্রি বাস করে।

প্রাথমিক পরিচয় পর্ব মিটে যাওয়ার পর আমি মুখ খুললাম, 'পাপ আর জাল জুয়াচ্চুরি এ শহরটার মত অন্য কোথাও ঢোকেনি। সারা পৃথিবীটা ঘুরে এলেও এমন আর একটা শহর পাওয়া যাবে না। এখানকার সব মেয়ে মানুষই অসম সাহসী আর পুরুষরা সবাই সৎ এবং পরোপকারী। তাই স্বীকার করতেই হয়, এ শহরটার জীবনধারা অনুকরণযোগ্য।

দোকানি আগ বাড়িয়ে বলল, শতকরা একশ' ভাগই সত্যি কথা বলেছেন কত্তা। এখানকার মানুষ যে আর ন্যায়-নীতির পূজারী একথা সবারই জানা আছে।

জেফ নীরব চাহনি মেলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

দোকানি বলে চলল, মিঃ পিটার্স, আমার বিশ্বাস রিউপ টাটুম-এর সঙ্গে আপনার এখনো মুখোমুখি দেখা হয়নি, ঠিক কিনা?

শহর কনস্টেবল বলল, বিউফ টাটুম-এর সঙ্গে দেখা কি করেই বা হবে। বেঁটেখাটো হতচ্ছাড়াটা তো একটা বজ্জাতের হাড়। কপাল ভাল, তাই কোনরকমে ফাঁসির দড়ি এড়াতে পেরেছে। আরে ভাই তার প্রসঙ্গ উঠতেই আমার মনে পড়ে গেল, গত পরশুদিনই তাকে জেল থেকে বের করে আনার দায়িত্ব আমার ওপর বর্তেছিল।

হতচ্ছাড়াটার ত্রিশ দিন কারাবাসের শাস্তি হয়েছিল। ইয়াঙ্ক গুডলো'কে খুন করার অপরাধে

তাকে কারাবাসের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেদিনই তার শাস্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। আরে, দু'দিন বেশী কারাবাস করাটা তার কাছে কোন ব্যাপারই নয়।

আমি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললাম, একেবারে বজ্জাতের হাড়! নেবো পাহাড়ে তার মত দুষ্কৃতকারী দ্বিতীয় আর একজনও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আরে মশাই কেবলমাত্র দুষ্কৃতকারী বললে তাকে বরং সম্মানই দেখানো হবে, নচ্ছাড়টা একটা পয়লা নম্বরের শুয়োর-চোর।

আমি তখন মনে মনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম, যে করেই হোক রিউফ টাটুমকে খুঁজে বের করতে হবেই, খুঁজে বের করবই।

কনস্টেবলটা তাকে খালাস করে আনার পর দু'-একদিনের মধ্যেই আমি তার সঙ্গে দেখা করলাম। আলাপ পরিচয় করলাম।

তারপর একদিন তাকে সঙ্গে করে শহরের একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলে চলে গেলাম। সেখানে একটা কাঠের গুঁড়ির ওপরে দু'জনে পাশাপাশি বসলাম।

আমার তখন এমন একজন অংশীদার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে যার চেহারায় গ্রাম্য মানুষের ছাপ থাকলেও সে দাঙ্গাহাঙ্গামার একাঙ্ক নাটকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারবে।

আমি ইতিমধ্যেই পিটফল অ্যান্ড জিন-এর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধও হয়েছি, যে একাঙ্ক নাটকটা পশ্চিমের গোটা কয়েক শহরে অভিনয় করব। সে এ ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য রিউফ টাটুম-এর সঙ্গে চুক্তি করে ফেলল। আর এ চরিত্রে অভিনয় করার জন্যই সে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছে। আর প্রকৃতি দেবী তো এমন একটা ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য ফেয়ারব্যাংসকে পৃথিবীর বুকে নিয়ে এসেছিলেন। যে এলিজাকে জলে ডুবে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিল সে-ই তো ফেয়ারব্যাংস।

আমি তার কাছ থেকে কি প্রত্যাশা করি সবই খোলাখুলিভাবে রিউফ টাটুমকে বললাম।

আমি লক্ষ্য করলাম, সে আমার প্রস্তাবটাকে সানন্দে গ্রহণ করল।

আমার পুরোপুরি আস্থালাভের জন্য সে নিজের কার্যকলাপের সাফল্যের হাজার নজির আমার সামনে রাখল।

তার মুখ থেকে কৃতিত্বের বিবরণাদি শোনার পর আমি তাকে উৎসাহ দিতে গিয়ে বললাম, শোন, মানুষের জীবনে উচ্চাকাঙ্খা অবশ্যই থাকা দরকার। আর নেবো পাহাড়ে শুয়োর চুরির ব্যাপারও চলে যাবে। একটা কথা মনে রেখো রিউফ টাটুম। বাইরের অঞ্চল এ কারবারটাকে বড় পুরনো মনে করে হেয় জ্ঞান করবে।

যাক গে, তবে আমরা দু'জনে একটা অংশীদারী কারবারে হাত দিচ্ছি। আমার পকেটে মূলধন স্বরূপ নগদ এক হাজার ডলার আছে। সেটাকে সম্বল করেই আমরা শেয়ার বাজারে কাজে লেগে পড়ব, কেমন?

এমন পরামর্শ করে আমি রিউফ টাটুমকে সঙ্গে নিয়ে নেবো পাহাড় ত্যাগ করলাম। আমরা হাজির হলাম ভাঁটি অঞ্চলে।

পথ চলতে চলতে আমার ধাপ্পাবাজির মতলবটা তাকে বুঝিয়ে বলতে লাগলাম। পরিকল্পনা কি এবং তাকে কোন্ ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে সেটা যদি তার কাছে খোলসা না হয় তবে কাজ হাসিলের চিন্তাই তো করা যায় না।

আমরা মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় লেক্সিংটন শহরে পা দিয়েই দেখি—বিংকল ব্রাদার্সের সার্কাস চলছে। নীল ঘাসবনের চাষীরা সার্কাস দেখার জন্য সেখানে জড়ো হয়েছে। পথে সার্কাস দল দেখতে পেলে আমি কিছু না কিছু মালকড়ি না কামিয়ে সে জায়গা ছাড়ি না।

সার্কাসের তাঁবুর কাছাকাছি থাকার জন্য আমার আর রিউফ টাটুম-এর থাকার জন্য ঘর ভাড়া করে ফেললাম।

পি.ভি. নামে এক বিধবা মেয়েমানুষ সার্কাসটা পরিচালনা করছে। আমি সেদিন রিউফ টাটুমকে নিয়ে একটা পোশাকের দোকানে গিয়ে তাকে একেবারে রাজকুমার সাজিয়ে নিলাম।

মানিয়েছেও চমৎকার।

আমি সে রাত্রেই সার্কাসের তাঁবুতে চলে গেলাম। সেখানে বন্দুকের লক্ষ্যভেদ খেলার ছোট একটা দোকান খুলে ফেললাম। তাতে রিউফ টাটুম ক্যাপার-এর কাজ চালাবে। আর বাজি ধরার জন্য তার হাতে এক গোছা নোট গুঁজে দিলাম। ঘুণাক্ষরেও আমি তাকে এতটুকু অবিশ্বাস করিনি, সত্যি বলছি। ছোট একটা টেবিল সাজিয়ে উৎসাহীদের দেখাতে লাগলাম লক্ষ্যভেদ করাটা কত সহজ।

অশিক্ষিত একদল ছেলে এসে আমার চারদিকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ব্যস, তারা বাজি ধরার জন্য রীতিমত ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি জুড়ে দিল।

আমাদের পরিকল্পনা ছিল, ঠিক সে মুহূর্তেই রিউফ টাটুম এক পায়ে ভর দিয়ে সেখানে হাজির হয়ে ছেলেগুলোর হাতে কিছু দশ আর পাঁচের নোট গুঁজে দেবে।

রিউফ টাটুম'কে না দেখে আমি ব্যস্তভাবে চারদিকে তাকাতে লাগলাম। কিন্তু হায় ঈশ্বর। কোথায় রিউফ টাটুম। সে যে একেবারে উধাও হয়ে গেছে। তাকে বার দুই দেখেছিলাম, চিনি জড়ানো মটরশুঁটি চিবোতে চিবোতে সে ধারে কাছেই ঘোরাঘুরি করে ছবিটবি দেখে বেড়াচ্ছে।

চারদিকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলের দল কিছু সময় ধরে খেলাটার কায়দা কৌশল দেখল। কিন্তু সুবিধা হল না।

আরে, ক্যাপার না থাকলে বন্দুকের লক্ষ্যভেদের খেলা জমানো দুষ্কর। ফলে ছেলেরা দু-চারজন করে সেখান থেকে কেটে পড়তে লাগল।

আমার আশা ছিল লাভ কম সে কম দু'শ তো হবেই। কিন্তু মাত্র বিয়াল্লিশ ডলার রোজগার করেই খেলা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলাম।

উপায়ান্তর না দেখে রাত্রি এগারোটায় ঘরে ফিরে বিছানা আশ্রয় নিলাম। ভাবলাম, সার্কাসের আকর্ষণেই রিউফ টাটুম সবকিছু ভুলে গিয়ে সেখানে মেতে গেছে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই তাকে ব্যবসার আসল ব্যাপারটা তাকে বুঝিয়ে বলব।

আমি ঘুমের ঘোরেই শুনতে পেলাম, ধারে কাছে কোথাও একটা শিশু বিকট সুরে কান্নাকাটি করছে।

আমি অস্থিরভাব হল ঘরে গিয়ে বিধবা মহিলার উদ্দেশ্যে গলা ছেড়ে বললাম, মিসেস পিভি দয়া করে আপনার শিশুটার কাঁদুনিটা একটু থামাবার ব্যবস্থা করলে ভাল মানুষগুলো একটু ঘুমিয়ে ক্লান্তি অপনোদন করতে পারে।

আমার কথাটা শেষ হতে না হতেই মিসেস পিভি হেড়ে গলায় রীতিমত খেঁকিয়ে উঠল, কী যা-তা বলছেন মঁসিয়ে। ওটা আমার শিশু নয়। আমার বন্ধু মঁসিয়ে রিউফ টাটুম সে বাচ্চা-শুয়োরটাকে ঘণ্টা দুই আগে ঘরে ঢুকিয়ে রেখেছে সেটাই অনবরত কোঁকাচ্ছে, তারই শব্দ। মঁসিয়ে আপনি তার কাকা, সৎভাই বা নিজের ভাই যা-ই হোন না কেন, অনুগ্রহ করে বাচ্চা-শুয়োরটার মুখটা বন্ধ করার ব্যবস্থা করুন।

গুটি কয়েক মধুর বচনে বিধবা মহিলাকে কোন রকমে শান্ত করে রিউফ টাটুম-এর কামরায় ঢুকলাম। ভেতরে পা দিয়েই দেখলাম, একটা কুচকুচে কালো বাচ্চা-শুয়োর অনবরত কোঁৎ-কোঁৎ করে ঘরময় দাবড়ে বেড়াচ্ছে। আর বেচারা রিউফ টাটুম একটা কড়াইয়ে দুধ ঢালছে।

আমি গম্ভীর স্বরে বললাম, তোমার ব্যাপারটা কি রিউফ? কাজে ফাঁকি দিয়ে জুয়ার আড্ডা থেকে কিছু মালকড়ি কামানের ধান্ধায় বেগড়া দিলে। আর বাচ্চা-শুয়োরটার ব্যাপারটাই বা কি, বল তো? তুমি দেখছি, সব কিছু ভণ্ডুল না করে ছাড়বে না।

জেফ, আমার প্রতি নিষ্ঠুর হয়ো না। শুয়োরের বাচ্চা চুরি করার ব্যাপারটা আমার রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে জানই ত। আজ রাত্রে একটা সুযোগ হাতে আসায় লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। ব্যস, এটাকে হাফিস করে চম্পট দিলাম।

দেখ, চুরি রোগটা তোমার মজ্জাগত, হতে পারে বটে, আর এ-ও হতে পারে যে, আমরা

যখন শুয়োরের অঞ্চলটা ছেড়ে দূরে বহুদূরে চলে যাব তখন কোন উন্নত আর বহুল পরিমাণ আয়ের কাজের দিকে তোমার মনপ্রাণ আকৃষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু এমন একটা নোংরা ও গর্জনকারী পশুর সংস্রবে থেকে কেন নিজেকে নিচে নামাতে উৎসাহী হচ্ছ, আমার মাথায় আসছে না।'

'এ কী কথা বলছ জেফ! শুয়োরের বাচ্চাদের প্রতি তোমার মধ্যে এতটুকুও মমত্ববোধ নেই? আমার প্রতি মন যে তোমার নেই তাই তুমি বুঝতে পারছ না। এটাকে দেখে আমার কিন্তু বিশ্বাস, যুক্তি আর বুদ্ধির দিক থেকে এটা অনেক উচ্চস্তরের প্রাণী।

জেফ, বিশ্বাস কর, একটু আগেই সে দু'পায়ের ওপর ভর দিয়ে ঘরের অর্ধেকটা পার হয়ে গিয়েছিল।

চমৎকার! আমি শুতে চললাম। তোমার সুহৃদটাকে একটু বুঝিয়ে দাও, সে যেন কোঁৎ-কোঁৎ করে বুদ্ধির পরিচয় দেবার চেষ্টা না করে, বুঝলে?

বুঝছ না কেন? ওর বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে। দুধ খাইয়ে দিচ্ছি, ঘুমিয়ে পড়বে।

আমি রোজই সকালের জলখাবারের আগে বিছানা ছাড়ি আর সকালের খবরের কাগজটা পড়ি।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি, সকালের লেকিসংটন দৈনিক পত্রিকাটা বারান্দায় পড়ে রয়েছে।

খবরের কাগজটা খুলতেই একটা বিজ্ঞাপন আমার চোখে পড়ল। বিজ্ঞাপনটা দু'কলম জুড়ে ছাপা হয়েছে। তাতে নিচের কথাগুলো লেখা রয়েছে।

পুরস্কার—পাঁচ হাজার ডলার

ইওরোপে শিক্ষণপ্রাপ্ত বিখ্যাত শূকরছানা বেপ্পো গতকাল রাত্রে 'বিংকলে ব্রাদার্স'-এর তাঁবু থেকে বে-পাত্তা হয়ে গেছে বা চুরি হয়েছে। অক্ষত ও জীবিত অবস্থায় তাকে খুঁজে এনে দিতে পারলে উপরোক্ত পরিমাণ অর্থ পুরস্কারস্বরূপ দান করা হবে।

বিজ্ঞাপনটার তলায় ছাপা হয়েছে—জিয়ো বি. ট্যাপলি, ব্যবসা-পরিচালক, সর্কাস ময়দান।

বিজ্ঞাপনটা বার দু'তিন পড়ার পর খবরের কাগজটা ভাঁজ করে কোটের ভেতরের পকেটে রেখে দিলাম।

তারপর গুটি গুটি রিউফ টাটুম-এর কামরায় ঢুকলাম। সে বাচ্চা-শুয়োরটাকে আপেলের খোসা আর দুধ খাওয়াতে মেতে রয়েছে।

আমি দরজায় দাঁড়িয়েই মুচকি হেসে বললাম, সবাইকে নমস্কার জানাচ্ছি। তোমরা তবে ঘুম থেকে উঠে পড়েছ, দেখছি। তোমার আদরের বাচ্চা-শুয়োরটা প্রাতরাশ খাচ্ছে বুঝি? আচ্ছা, এটাকে নিয়ে এখন কি করবে, ভেবেছ কিছু?

একে আমি ঝোলায় পুরে নিয়ে যাব মনস্থ করেছি। আর নেবো পাহাড়ে এর মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেব।

বাচ্চা শুয়োরটা কিন্তু বেশ নাদুসনুদুস, তাই না?

কাল রাত্রে তুমি কিন্তু একে যা নয় তাই বলে গালমন্দ করেছিলে।

আরে সে-ত মুখের কথামাত্র। এখন কিন্তু দেখতে খুবই ভাল লাগছে। আরে ভাই আমি নিজে তো একটা খামারবাড়িতে মানুষ হয়েছি। তাই শুয়োরের বাচ্চাদের আমার এত ভাল লাগে।

একটু ভেবে নিয়ে তারপর বললাম, আসল ব্যাপার কি জান? সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলেই আমি শুয়ে পড়তাম। রাত্রের আলোয় তো তাদের কোনদিনই দেখা হয়ে ওঠে নি। তাই তো গতরাত্রে এটাকে দেখেই আমার গা-পিত্তি জ্বলে গিয়েছিল। এখন যে ওটাকে দেখে আমি লোভ সম্বরন করতে পারছি নে। ঠিক আছে, আমি তোমাকে নগদ দশটা ডলার দিচ্ছি, শুয়োরের বাচ্চাটা আমাকে দিয়ে দাও।

না, এটাকে আমি বেচব না। অন্য কোন বাচ্চা হলে হয়ত দশ কেন, আরও কমেই হয়ত মাল খালাস করে দিতাম।

কিন্তু ওটাকে কেন দিতে চাইছ না? সে যদি ব্যাপারটা কোনক্রমে জানতে পেরে যায় তাই ব্যস্ততার সঙ্গে কথাটা রিউফ টাটুম'কে লক্ষ্য করে কথাটা ছুঁড়ে দিলাম।

সে বেশ জোর দিয়েই বলল কারণ এটাই একটা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় কাজ। অন্য কারো পক্ষে এমন দুঃসাহসিক কাজটা করা অবশ্যই সম্ভব হত না।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে এবার বলল। শোন, যদি কোনদিন আমার বরাতে ছেলেমেয়ে আর অগ্নিকুণ্ড জোটে তবে তার আগুন পোহাতে পোহাতে গল্প করব, কেমন করে সার্কাসের একদল লোকের মাঝখান থেকে একটা বাচ্চা শুয়োরকে খপ্ করে তুলে নিয়ে চম্পট দিয়েছিলাম। আমার নাতি নাতনিদেরও রসিয়ে রসিয়ে গল্পটা শোনাব। আমার এ দুঃসাহসিক কাজের জন্য আমার উত্তরসূরীরা নিশ্চয়ই গর্ব বোধ করবে।

কিন্তু।

না জেফ, এতে আর কোন কিন্তুটিন্তু নেই। আমি এ বাচ্চাটাকে কাউকে উপহার তো দেবই না, এমন কোন দামের বিনিময়েই বেচতে রাজি নই। বাড়ি গিয়ে এটাকে মার জিম্মায় রেখে বলব, যত্ন আত্মি করে টিকিয়ে রাখতে। আমার হাতের কাজের, আমার দক্ষতার একটা প্রমাণ অন্তত থাক, বুঝেছ?

আমি জোর করে মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বললাম, আরে, তোমার কর্মদক্ষতার প্রমাণ দেবার জন্য এ বাচ্চা শুয়োরটা কিন্তু এতদিন পৃথিবীতে টিকে থাকবেই না। তা ছাড়া তোমার বাচ্চাকাচ্চা আর নাতি-নাতনিরা তোমার মুখের কথাই বিশ্বাস করবে।

মুহূর্তকাল ভেবে আমি আবার বললাম, আরে ব্যাপারটাকে তুমি যখন এতই গুরুত্ব দিচ্ছ তখন আমাকে দেখছি পুরো একশ'টা ডলারই খসাতে হবে। যাক গে, একশ'-ই দিচ্ছি, আমাকে দিয়ে দাও।

রিউফ টাটুম চোখে মুখে বিস্ময়ের ছাপ ফুটিয়ে, কপালের চামড়ায় পর পর ক'টা ভাঁজ এঁকে বলল, একটা কথা জানতে চাইছি জেফ।

আমি মুখের হাসির রেখাটুকু অক্ষুণ্ণ রেখেই বললাম, 'কি? কি কথা?

কথাটা হচ্ছে, সামান্য একটা শুয়োরের বাচ্চার জন্য তুমি স্বেচ্ছায় পুরো একশ'টা ডলার খসাতে চাইছ, কারণ কি? এটা দিয়ে তুমি কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চাইছ, খোলসা করে বলবে কি?

ওপর ওপর বিচার করলে তুমি অনুমানই করতে পারবে না যে, আমার মধ্যে একটা শিল্পী মন বিরাজ করছে। সত্যি কথা বলতে কি, বাচা শুয়োর সংগ্রহ করা আমার একটা নেশা।

তারপর মুহূর্তের জন্য ভেবে এবার বললাম, মনের মত বাচ্চা শুয়োরের খোঁজে আমি সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়েছি। মেরিনো থেকে পোল্যান্ড অবধি বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বাচ্চা শুয়োর আমার খোয়াড়ে সযত্নে লালন পালন করছি। আসলে এ বাচ্চা-শুয়োরটা রক্তমুখী জাতের শুয়োর। এটাকে আমি নির্ভেজাল বার্কশায়ার বলেই মনে করছি। ঠিক আছে, পুরো একশ'টা ডলার বুঝে নিয়ে ওটাকে আমার হাতে তুলে দাও।

বিবর্ণমুখে রিউফ টাটুম বলল, দেখ বন্ধু, তোমার বাঞ্ছাটা পূর্ণ করতে পারলে আমি খুশিই হতাম। আসলে তোমার মত আমার ভেতরে শিল্পী সত্ত্বা বিরাজ করছে। একটা কথা, বাচ্চা শু য়ার চুবির ব্যাপারে তুমি যদি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিতে পার তবে এটাকে কেনইবা শিল্পকর্মের মর্যাদা দেওয়া হবে না? আমি তো এটাকে প্রতিভার ব্যাপার বলেই মনে করি। মোদ্দা কথা শোন, আড়াইস ডলারের বিনিময়েও আমি এ বাচ্চা শুয়োরটাকে বে-হাত করব না।

আমি নিজের অত্যুগ্র ইচ্ছাটাকে সাধ্যমত চেপে রেখেই বললাম—শোন, আমি ব্যাপারটাকে যতটা শিল্পের দিক থেকে গুরুত্ব দিচ্ছি তার একতিলও ব্যবসার কথা ভাবছি না। আসলে বাচ্চা-শুয়োরের প্রচারক হিসেবে ওটাকে যদি আমার সংগ্রহে না রাখি তবে কিছুতেই নিজেকে

প্রবোধ দিতে পারব না যে, পৃথিবীর প্রতি আমি কর্তব্য সম্পাদন করতে পেরেছি। আর এটাই হবে আমার জীবনের চরম ব্যর্থতা।

শোন জেফ, এ ব্যাপারে অর্থকড়ির ব্যাপারটা কোনক্রমেই প্রাধান্য পাচ্ছে না। এখানে অনুভূতিটাই সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব পাচ্ছে।

বহুৎ আচ্ছা! সাতশ' দিচ্ছি।

কি যে করছ! রিউফ টাটুম তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে বলল, যাক গে, তুমি যখন এতই আগ্রহী তখন সাতশ' নয়, আটশ' করে দাও।

আটশ'?

হ্যাঁ। আটশ' ডলার ছাড় আমি অনুভূতিটাকে গলা টিপে ধরি।

ব্যস, মুহূর্ত মাত্র দেরী না করে ডলারের গোছাটা বের করার জন্য কোটের ভেতরের পকেটে হাতটা চালান করে দিলাম। কুড়ি ডলারের চল্লিশটা ডলার সতর্কতার সঙ্গে গুণে রিউফ টাটুম-এর হাতে তুলে দিতে দিতে বললাম, ওটাকে আমি নিজের কামরায় নিয়ে গিয়ে তালাবন্ধ করে রেখে দিচ্ছি। সকালের জলখাবার না সারা পর্যন্ত ওটা সেখানেই থাকবে।

কথাটা বলতে বলতে আমি যেই না বাচ্চা-শুয়োরটার পিছনের একটা ঠ্যাং খপ করে চেপে ধরেছি, সে সার্কাসের কর্কশ বাদ্যযন্ত্রের মত বিকট স্বরে চিল্লিয়ে উঠল।

রিউফ টাটুম বলল, 'আমি কোলে করে এটাকে তোমার কামরায় দিয়ে আসছি। সে করলও তাই।

সকালের জলখাবার কোন রকমে নাকে মুখে গুঁজে আমি ব্যস্ত পায়ে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে পথে নামলাম। সামনেই একটা ভাড়াটে মাল গাড়ি পেয়ে গেলাম। চালক এক অতি বৃদ্ধ নিগ্রো। উভয়ে দীর্ঘ প্রচেষ্টায় বাচ্চা শুয়োরটাকে একটা বস্তার মধ্যে ঢুকিয়ে সোজা সার্কাস ময়দানের দিকে যাত্রা করলাম।

একটা তাঁবুতে জর্জ বি. ট্যাপ্‌লি-র দেখা পেলাম। লোকটা মোটাসোটা ইয়া পেল্লাই চেহারাধারী। একটা চোখ কানা। গায়ে লাল একটা সোয়েটার, মাথায় ছড়ানো টুপি আর আঙুলের হীরের আঙটিটা রীতিমত জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে।

আমি তাঁবুটার ভেতরে সবকিছুর ওপর একবারটি চোখের মণি দুটো বুলিয়ে নিয়ে বললাম, 'আমি কি জর্জ বি. ট্যাপলি-র সঙ্গে কথা বলছি?'

হ্যাঁ, আপনার অনুমান অভ্রান্ত।

ব্যস, আপনার বাঞ্ছিত জানোয়ারটা আমার জিম্মায়ই আছে। লোকটা যন্ত্রচালিতের মত সোজা হয়ে বসে বলল, তাই নাকি? ঠিক আছে, দেখান তো।

আপনার প্রিয় বেপ্পোকে গাড়িতে করে নিয়ে এসেছি। আজ ভোরেই আমার উঠোনে ঘাস খাচ্ছিল। আমি বড় বিলেই পাঁচ হাজার ডলার নেব। আমার পক্ষে এটাই সুবিধাজনক। এক হাতে আপনার জানোয়ারটাকে দেব আর অন্য হাতে—

আমার কথা শেষ হবার আগেই জর্জ বি. ছুটতে ছুটতে পাশের কামরায় গেল। দেখলাম, কামরার এক কোণে খড়ের বিছানায় ওপর লাল ফিতে গলায় জড়ানো এক বাচ্চা-শুয়োর শুঁয়ে কুঁতকুঁত করছে।

কামরার দরজায় দাঁড়িয়েই জর্জ বি. ট্যাপলি গলা ছেড়ে বলল, ম্যাক, আজ সকালে দুষ্টুটাকে নিয়ে কোন হুজ্জতি হয় নি তো?

কই, কোন সমস্যাই তো হয় নি। তবে রাত্রি একটার সময় নাচিয়ে মেয়েদের মত ক্ষিধের জ্বালায় কুঁৎ-কুঁৎ করছিল।

সে এবার আমার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, কি ব্যাপার বলুন তো মশাই! চমৎকার ধাপ্পা মারতে শিখেছেন দেখছি! গতরাত্রে শুয়োরের মাংসের চপ কি গলা অবধি গিলেছেন নাকি!

আমি বিষণ্নমুখে কোটের ভেতরের পকেট থেকে খবরের কাগজের টুকরোটা বের করে বিজ্ঞাপনটার দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম।

সে বলল, ধ্যুৎ মশাই। ধাপ্পা, স্রেফ ধাপ্পা! এ ব্যাপারে আমি আদৌ কিছু জানি না। নিজের

চোখেই তো দেখলেন আমার প্রিয় দুষ্টুটা খড়ের গদিতে শুয়ে কেমন কুঁৎ কুঁৎ করছে।

সেখানে আর মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করে মালগাড়িতে চেপে কাছাকাছি একটা সুবিধা মত জায়গায় হাজির হলাম। সেখানে হতচ্ছাড়া বাচ্চা-শুয়োরটাকে বস্তা থেকে বের করে পথে দাঁড় করালাম। এবার তার পাছায় গায়ের জোরে একটা লাথি মেরে সোজা গাড়িতে উঠলাম, কোচোয়ান নেড খুড়োকে বললাম, সোজা খবরের কাগজের অফিসে নিয়ে চল।

গাড়ি থেকে নেমে নেড খুড়োকে তার প্রাপ্য পঞ্চাশ সেন্ট গাড়িভাড়া মিটিয়ে দিয়ে পায়ে হেঁটে খবরের কাগজের অফিসে হাজির হলাম।

ব্যাপারটা আমি সামনাসামনি জানতে চাই। তাই তো কষ্ট করে এতটা পথ পাড়ি দিয়ে নিজেই ছুটে এসেছি।

বিজ্ঞাপন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কর্মী ভদ্রলোককে তাঁর টেবিলেই পেয়ে গেলাম। ফাইলে মাথাগুঁজে কাজ করে চলেছেন।

তাঁর কাছে গিয়ে নমস্কার জানিয়ে বললাম, একটা বাজির ব্যাপারে সঠিক তথ্য জানার জন্য আপনাকে বিরক্ত করতে বাধ্য হচ্ছি।

ফাইল থেকে মুখ তুলে প্রবীণ ভদ্রলোকটি চাঁদির চশমার ফাঁক দিয়ে আমার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, আপনার জন্য কি করতে পারি বলুন?

বললামই তো, একটা বাজির ব্যাপারে আমি আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।

হ্যাঁ, সে-তো বুঝলাম। কিন্তু কিসের বাজি? কার সঙ্গে বাজি?

আমি কোটের ভেতরের পকেট থেকে খবরের কাগজের টুকরোটা বের করে ভদ্রলোকের চোখের সামনে মেলে বললাম, এ বিজ্ঞাপনটার কথা বলতে চাইছি।

কি? বিজ্ঞাপনটা নিয়েই কি আপনার, মানে আপনাদের বাজি?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কি ব্যাপার খোলসা করে বলুন মঁসিয়ে?

বিজ্ঞাপনটার ব্যাপার জানতে চাইছি, যে ভদ্রলোক এ বিজ্ঞাপনটা আপনার দপ্তরে জমা দিয়ে গিয়েছিলেন, তার চেহারাটা আপনার মনে আছে, মানে লোকটা কেমন দেখতে মনে আছে কিছু?

মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে নিয়ে বিজ্ঞাপন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত প্রবীণ ব্যক্তিটি মুখ খুললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই মনে আছে। আরে মশাই ভদ্রলোক তো গতকালই বিজ্ঞাপনটা আমার হাতে জমা দিয়ে গেছেন।

আচ্ছা, ভাল করে ভেবে বলুন তো, লোকটা কি বেঁটেখাটো ও মোটাসোটা?

বেঁটেখাটো? অবশ্যই না। বরং তিনি ছিলেন অন্তত ছ'ফুট লম্বা আর চারফুট আধা ইঞ্চি চওড়া।

তাঁর কথায় আমি যেন হঠাৎ চিপসে গেলাম। তবু নিজেকে কিছুটা সামলে সুমলে নিয়ে এবার বললাম, আর একটা কথা, তার পা দুটো কি অনেকটা সাঁড়াশির মত বাঁকা, আর কানের কাছে ইয়া লম্বা জুল্ফি ছিল কি?

আরে না, না। আমার এবারের বক্তব্যও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

আমি যেন সদ্য আকাশ থেকে পড়ার ভান করে বললাম, আমার এবারের বক্তব্যও ভ্রান্ত!

অবশ্যই। ভদ্রলোকের কানের কাছে জুল্ফি অবশ্যই ছিল না।

আর পা দুটো?

স্বাভাবিক। আপনার আমার পায়ের মতই একেবারে স্বাভাবিক। আর পোশাক পরিচ্ছদও ছিল যথেষ্ট ভদ্রজনোচিতই বটে।

দুপুরের খাবারের সময় আমি মিসেস পীভি-র কাছে গেলাম। তিনি রান্নাঘরে কাজে ব্যস্ত। আমার উপস্থিতির কথা জানতে পেরেই রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমার সামনে এলেন। মুচকি হেসে শুভেচ্ছা জানালেন।

তারপর তিনি বললেন, আচ্ছা, মিঃ টাটুম কখন ফিরবেন তা তো কিছুই জানা নেই। তিনি

না ফেরা পর্যন্ত ঝোলটোল কিছু রেখে দেব কি?

আমি মুখে কৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে বললাম, মাদাম, এমন কাজটা যদি করেন তবে পৃথিবী উদরে যত কয়লা আর পৃথিবীর ওপরে যত বন-জঙ্গল আছে সবই আপনাকে জ্বালানি হিসে পোড়াতে হবে।

গল্পটা শেষ করে মুহূর্তকাল নীরবতার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে উপসংহার বলতে গিয়ে মি জেফারসন পিটার্স বললেন, আশা করি এবার ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ যে, ব্যবসার ক্ষে একজন বুদ্ধিমান, সৎ এবং নিষ্ঠাবান অংশীদার যোগাড় করা কী কঠিন সমস্যা?

বহুদিনের পরিচয় এবং অভিজ্ঞতা সম্বল করে আমিও বললাম—তবে ব্যাপারটা তে দু'জনের বেলাতেই প্রযোজ্য হতে পারে, তাই না?

মানে? কি বলতে চাইছ?

একথাই বলতে চাইছি, পুরস্কারের ডলারগুলো যদি উভয়ের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেওয়া প্রস্তাব দিতে তবে তো আমি ডলারগুলো থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত হয়ে এমন করে—

জেফ আমার দিকে এমন অভিযোগের দৃষ্টিতে, কটমট করে আমার মুখের দিকে তাকা যার ফলে আমার পক্ষে বক্তব্যটা শেষ করাই সম্ভব হল না।

সে এবার বলল, দেখ হে, এ ব্যাপারটা একটু স্বতন্ত্র ধরনের। এখানে একই নীতি প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। আমার পরিকল্পনাটা তো ছিল আইন আর নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধীয় প্রয়াস।

সেটা আবার কি?

খুবই সহজ ও সাধারণ ব্যাপার। কম দামে কেনা আর বেচা বেশী দামে।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ, ঠিক তাই। আচ্ছা এ নীতিটা কি ওয়াল স্ট্রীটও সমর্থন করে না? বলতে পারেন ভালুক ষাঁড় আর শুয়োরের বাচ্চার মধ্যে পার্থক্য কি? কুচো লোম ও শিং আর লোমের দোষই বা কি?

হোস্টাজেস টু মোমাস

কেবলমাত্র একবার!

হ্যাঁ, কেবলমাত্র একটাবার ছাড়া আমি কোনদিন ধাপ্পাবাজির ন্যায়সঙ্গত গণ্ডির বাইরে পা দেই নি।

তবে ওই একবারই আমি সংশোধিত নির্দ্ধারিত আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে এমন এক কাজ করে বসেছিলাম যার ফলে নিউ জার্সি ট্রাস্ট আইন মোতাবেকও মার্জনা ভিক্ষা করতে হয়েছিল। হ্যাঁ, সত্যি, একেবারে শতকরা একশ' ভাগই সত্যি বলছি।

আমি আর মাস্কোজির ক্যালিগুলো পোক্ষ টামোলিপাসের মেক্সিকান রাজ্যে কয়েকটা তিন তাসের খেলা দেখাতে আর একটা ভ্রাম্যমান লটারি করতে গিয়েছিলাম। রাজ্যটা টামোপিলাসের অন্তর্গত।

সত্যি কথা বলতে কি, মেক্সিকোতে লটারির টিকিট বিক্রির ব্যাপারটাও ধরতে গেলে একটা সরকারী ধাপ্পাবাজি ছাড়া কিছু নয়।

ব্যাপারটা এরকম, এখানে যেমন উনপঞ্চাশ সেন্টে আটচল্লিশ সেন্ট মূল্যের টিকিট বিক্রি করা হয়।

তাই তো 'রুবালেম'-দের পর ফিরিও কাকা হুকুম দিলেন তারা যেন আমাদের খেলা পরিচালনার সময় সেখানে হাজির থাকে।

রুবালেম কি বা কারা? এক বিশেষ ধরনের গ্রাম্য পুলিশ। তারা যখন আমাদের দিকে

এগোতে শুরু করল তখন আমরাও মেক্সিকান রাজ্যের দিকে রওনা হলাম।

তারা মাটামোরাস অবধি আমাদের পিছন ধাওয়া করল। অনন্যোপায় হয়ে আমরা একটা ইটভাঁটায় গা ঢাকা দিলাম। তারপর সে রাত্রেই রিও গ্রান্ডি নদী সাঁতরে পাড়ি দিয়ে দিলাম।

দু'হাতে দুটো আস্ত ইঁট দু'হাতে তুলে নিয়ে ক্যালিগুলা টেক্সাসের ভূমিতে ছুঁড়ে দিল।

আমরা সেখান থেকে সোজা সান এন্টোলে হাজির হলাম। তারপর একইভাবে গা-ঢাকা দিতে দিতে আমরা নিউ অর্লিয়েন্সের মাটিতে পা দিলাম। সেখানে কিছু সময় বিশ্রামের মাধ্যমে আমরা পথশ্রম অপনোদন করে একটু সতেজ হয়ে নিলাম।

তুলোর রাজ্যের যে শহরে আমরা এক নতুন ধরনের মদ খেয়ে শরীর ও মন চাঙ্গা করে নিলাম। যে শহরটা সম্বন্ধে আজ আমার মনের কোণে একটা কথাই উঁকি দিচ্ছে যে, ক্যালিগুলা, ম্যাক্‌কার্টি আর আমি স্টেশনের প্লাটফর্মে দাঁড়িয়েছিলাম। আর অস্পষ্ট হলেও মনে পড়ছে, টিকিট ঘরের জানালা দিয়ে হাত গলিয়ে দুটো হলুদ টিকিটও আমরা কেটেছিলাম।

আমি জানালা থেকে টিকিটসহ হাতটা বের করতে না করতেই কাকে যেন বলতে শুনলাম—'ট্রেন আসছে।' মনে হল একজন হাতের লণ্ঠনটা নাচাতে নাচাতে বলল, সবাই উঠে পড়েছে! ব্যস, এটুকুই, আর কিছু মনে পড়ছে না।

যখন সংজ্ঞা ফিরে পেলাম তখন বুঝতে পারলাম, স্টেট অব ভার্জিনিয়ার সঙ্গে এমন একটা পাণ্ডববর্জিত অঞ্চলে আমাদের লড়াই হয়েছে যেখানে সারা দিন রাত্রে দুটো মাত্র ট্রেন দাঁড়ায়।

ক্যালিগুলা আর আমি পোশাক আশাক পাল্টে নিচে নেমে এলাম।

আমরা যখন হোটেলের দরজায় হাজির হলাম তখন হোটেলের মালিক বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসে একমনে মটরশুঁটির খোসা ছাড়িয়ে চলেছে। তার উচ্চতা ছ'ফুট তো হবেই। চেহারার ছবি দেখে তো মানুষ হিসাবে ভালই মনে হল।

ক্যালিগুলা চিরদিনই বাক্যবাগীশ। কোনরকম কষ্টই যে বরদাস্ত করতে পারে না। তা সত্ত্বেও সেই প্রথম মুখ খুলল, 'রিফুকর্মী, সুপ্রভাত। দয়া করে বলবেন কি আমাদের কেন আসতে হয়েছে?

হোটেলের প্রবীণ মালিক ভদ্রলোক তার কথা শুনে একেবারে থ বনে গেল। কি জবাব দেবে ভেবে না পেয়ে নীরব চাহনি মেলে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে তাকিয়ে রইল।

ক্যালিগুলা বলে চলল, আমরা কোন্‌ উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি তা আমাদের জানা আছে বটে। কিন্তু এসেছি কোথায় তা-ই জানি না।

আমার বিশ্বাস ছিল ভোরে ঘুম থেকে উঠেই আপনারা খোঁজ নেবেন। আপনারা সবাই গত রাত্রের ন'টা ত্রিশের ট্রেন ধরে এখানে এসেছেন। আর তখন আপনারা আর নিজেদের মধ্যে ছিলেন না, বেহেড মাতাল ছিলেন।

সে না হয় মেনেই নিলাম। কিন্তু এ জায়গাটা—তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই হোটেলের মালিক বলে উঠল।

এটা পর্বত উপত্যকা শহর। এ ছোট্ট শহরটা জর্জিয়া রাজ্যের অন্তর্গত।

যাক গে, সে পাত্তা পরেই না হয় লাগানো যাবে। পেটের ভেতরে আগুন, কিছু খাবার দাবার পাওয়া যাবে কি?

ওই চেয়ার দুটোতে বসুন। কুড়ি মিনিটের মধ্যেই এ শহরের সেরা প্রাতরাশ আপনাদের সামনে পৌঁছে যাবে।

আমাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়ে যে প্লেট দুটো এল তাতে কিছু কিছু করে শুয়োরের মাংস আর নরম পাথরের মত নাম না জানা এক বিশেষ ধরনের হলুদ বস্তু।

আমি আপন মনে বলে উঠলাম, 'হায় ঈশ্বর! এ-ই কি এ শহরের সেরা প্রাতরাশের নমুনা!'

দুই

প্রাতরাশের প্লেট দুটো খালি করে আমরা সামনের বারান্দাটায় গিয়ে বসলাম। চোখের সামনে ভেসে উঠল জর্জিয়ার একটা অংশ।

যে প্রাকৃতিক দৃশ্যটার মুখোমুখি আমরা বসলাম তা বড়ই অ-সুন্দর। যতদূর দৃষ্টি চলে কেবল লাল পাহাড়ের মিছিল। আর তাতে যেন জানা-অজানা কাটাগাছের মেলা হয়েছে। আর উত্তর দিকটা আগলে রেখেছে গাছগাছালিতে ছাওয়া নাতিদীর্ঘ একটা পর্বতমালা।

না, পর্বত উপত্যকা শহরটা এখনও ঘুমে আচ্ছন্ন। গলিপথ দিয়ে ডজন খানেক পথচারি পায়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে। কোথাও বা ছেলেরা লাঠি হাতে ঘোরাঘুরি করছে।

তখনই রাজপথে অন্য প্রান্ত ঘেঁষে পায়ের পাতা অবধি কোট গায়ে দিয়ে, মাথায় জেলে টুপি চাপিয়ে একটা লম্বাটে লোক হেঁটে চলেছে। পথচারীদের প্রায় সবাই তাকে নতজানু হয়ে অভিবাদন করছে আর তার সঙ্গে করমর্দনের জন্য অনেকে ব্যস্ত পায়ে রাজপথটা পেরিয়ে কাছে এল। আর? তাকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য সব বাড়ি আর দোকান থেকে বেরিয়ে এল।

আমাদের হোটেলের প্রবীণ মালিক? হন্তদন্ত হয়ে বারান্দায় এসে আভূমি লুণ্ঠিত হয়ে ভাবাপ্লুত কণ্ঠে বলে উঠল—'সুপ্রভাত কর্ণেল।'

ইতিমধ্যে লম্বাটে লোকটা এক যোজন পথ পাড়ি দিয়ে ফেলেছে। আচ্ছা, ইনিই কি সেই আলেকজান্ডার? ক্যালিগুলা তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই বলে উঠল। আর তাকে 'মহান' বলার পিছনেই বা কোন যুক্তি রয়েছে?

আরে মশাই, এ ভদ্রলোক তিনি নন। ইনি জ্যাকসন টি—কর্ণেল জ্যাকসন টি. রকিংহাম। আর ইনি সানরাইজ অ্যান্ড ইডেনভিল ট্যাপ রেলরোড'-এর অধিকাংশ স্টক ব্যতীত পার্বত্য এলাকার এক হাজার একর জমির মালিকও বটে। তিনি আমাদের পয়লা নম্বর নাগরিক। এত বড় একজন জনদরদী ও ধনকুবের নাগরিককে সম্মান জানাতে পারলে পর্বত উপত্যকার নাগরিকরা খুবই খুশি হয়।

সে বিকেলে ক্যালিগুলা বারান্দায় খবরের কাগজ পড়ে একঘণ্টা কাটিয়ে দিল।

যে লোকটা ছাপাছাপির ব্যাপারকে ঘৃণার চোখে দেখে তার পক্ষে খবরের কাগজ নিয়ে এক ঘণ্টা কাটানোর কাজটা অবশ্যই অস্বাভাবিক।

কাগজ পড়া শেষ করে ক্যালিগুলা আমাদের বারান্দায় এল। এবার রোদে পিঠ দিয়ে শুয়ে পড়ল। আমার বুঝতে অসুবিধা হল না, সে নির্ঘাৎ কোন একটা ধাপ্পাবাজির মতলব মাথা দিয়ে বের করতে পেরেছে।

আমি মুখটা সাধ্যমত তার কানের কাছাকাছি নিয়ে ছোট্ট করে বললাম, ব্যাপারটা কি বল তো ক্যালিগুলা? খনির শেয়ার বাজার ছাড়া বা পেনসিলভানিয়ার গোলাপি ফুলের দাম বাড়ানোর চিন্তা করছ বলে তো ভাবতে পারছি না।

ক্যালিগুলা অদূরবর্তী পাহাড়ের সারির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সে বলে উঠল, ওই পাহাড়গুলো দেখতে পাচ্ছ তো? আর রেলরোডের মালিক ওই কর্ণেলকেও দেখতে পাচ্ছ তো? তিনি বিভিন্ন প্রয়োজনের তাগিদে ডাকঘরে যাতায়াত করেন।

হ্যাঁ, তা তো অনেক আগেই দেখেছি।

আমি ফন্দি আঁটছি ওই লোকটাকে বে-কায়দায় ফেলে দশ হাজার মুক্তিপণ আদায় করে নেব কি? মতলবটা খারাপ?

দেখ, তুমি যা-ই বল না কেন, কাজটা কিন্তু নিতান্তই বে-আইনী।

তুমি যে এরকম মন্তব্য করবে তা আমি আগেই জানতাম। তবে খুবই সত্য বটে যে, প্রথম দৃষ্টিতে মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে, এ কাজের মাধ্যমে শান্তি আর মর্যাদা দু'-ই ক্ষুণ্ণ হবে। আসলে কিন্তু তা হবে না।

কথা বলতে বলতে কোটের ভেতরের পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করে সেদিকে

আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবার বলল, এ কাগজটা পড়েই মতলবটা আমার মাথায় দানা বেঁধেছে। যুক্তরাষ্ট্র যে ন্যায়সঙ্গত জুয়াচুরিকে ক্ষমার চোখে দেখেছে, সমর্থন করেছে আর অনুমোদনও করেছে তুমি কি তারও কুৎসা গাইতে উৎসাহী হবে?

শোন, আমার মতে মানুষকে অপরহরণ করা অবশ্যই একটা নীতিহীন দুষ্কর্ম ছাড়া কিছু নয়। এটাকে যদি যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন করে তবে আমি বলব সেটা নীতিশাস্ত্রের বর্তমান সংশোধন, নববিধান। আর এটাকে একটা জাতির পক্ষে আত্মহত্যাই মনে করা যেতে পারে।

ক্যালিগুলা বলল, বলছি তবে শোন, খবরের কাগজের পাতায় যে ঘটনাটা ছাপা হয়েছে তা তোমার কাছে ব্যক্ত করছি। এক গ্রীক নাগরিক, বার্ডিক হ্যারিস তার নাম। জুয়া চুরির অভিযোগে আফ্রিকায় যে বন্দী হয়েছিল। দুটো কামানবাহী ছোট সৈন্যসহ জাহাজ তাঞ্জিয়ার্স রাজ্যে পাঠানো হয়েছিল। এর ফলে রেসুলিকে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে মরক্কোর রাজাকে সত্তর হাজার ডলার সেলামী দিতে বাধ্য হয়েছিল।

আমি তাকে সতর্ক করে দিতে গিয়ে বললাম। 'সবাই বুঝলাম কিন্তু আমার একটা কথা রাখবে?'

ক্যালিগুলা আমার দিকে সামান্য ঝুঁকে, অত্যুগ্র আগ্রহ প্রকাশ করে বলে উঠল, কি, কি কথা?

বলছি কি, ধৈর্য ধর। এত তাড়াহুড়ো না করে মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ কর। ব্যাপারটা আসলে আন্তর্জাতিক, স্বীকার করছ তো? এক্ষেত্রে অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে কাজে হাত দেওয়াটা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আর—

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই সে বলে উঠল, আর কি? এ প্রসঙ্গে তোমার আর কোন বক্তব্য আছে কি?

আছে। অবশ্যই আছে। বলছি শোন। দেশীয়করণের নথিপত্র যার জিম্মায় আছে তার কাছে ব্যাপারটা খুবই নগণ্য—তুচ্ছ।

—আর একটা কথা, কনস্তান্তিনোপল থেকে কিছু প্রেসের খবর আছে।

—কি বলতে চাইছে?

—সে কথা অবশ্যই তোমার কাছে বলব, ছ'মাস বাদে খবরের কাগজের পাতায় সেসব কথা অবশ্যই দেখতে পাবে। আর তা মাসিক পত্রিকাগুলোর সমর্থনও অবশ্যই পেয়ে যাবে। আর সঙ্গে কিছু সংখ্যক ছবিও ছাপিয়ে দেওয়া হবে। ব্যস, তারপরই কাজ হাসিল, সবই ঠিকঠাক হয়ে যাবে।

এ ব্যাপারে আর কিছু ঘটতে পারে বলে তুমি অনুমান করছ কি?

অবশ্যই। অনুমান নয়, অবশ্যই ঘটবে বলেই আমি অন্তত মনে করি?

কি কি ঘটতে পারে বলে তুমি মনে করছ?

তবে ধৈর্য ধরে শোন, খোলসা করেই বলছি—পাহাড়ের কোন এক গোপন কন্দরে বার্ডিক হ্যারিসকে লুকিয়ে রেখে আফ্রিকার এ রৈসুল দেশের প্রতিটা খবরের কাগজের পাতায় বিজ্ঞাপন দেবে, বক্তব্য থাকবে বিভিন্ন দেশের সরকারের কাছে তার মুক্তির জন্য টাকা দাবী করা। এর ফলে জন হে যদি এগিয়ে আসে, নিজেকে এর মধ্যে লিপ্ত করে, জুয়াচুরির ব্যাপারটার প্রতি সমর্থন জানায় তবে তো কিছুতেই তোমার মাথায় আসবে না যে এটা একটা ন্যায়সঙ্গত কাজ, আসবে কি?

না, অবশ্যই না। কারণ, আমি সর্বদাই ন্যায়ের পূজারী। এখন আমার পক্ষে রিপাবলিকান দলের বিরুদ্ধে আমার পক্ষে সজ্ঞানে একটা শব্দও বলা সম্ভব নয়। কেউ আমাকে মেরে ফেললেও আমি তা পারব না।

ক্যালিগুলা আমার মুখের দিকে নীরবে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

আমি পূর্ব প্রসঙ্গের জের টেনে এবার বললাম, তবে হ্যারিস যদি মনে প্রাণে একজন গ্রীক হয়ে থাকে তবে কোন আন্তর্জাতিক ক্ষমতাবলে সে এ ব্যাপারটায় মাথা গলাবে, না। তুমি কি মনে করছ সে এতে উৎসাহী হবে?

—এসব খবরের কাগজগুলোতে প্রসঙ্গটা উত্থাপন করা হয়নি। তবে আমি কিন্তু বিশ্বাস করি। এটা নিছকই আবেগ উচ্ছ্বাসেরই ব্যাপার। আর একটা কথা, জন হে যে একজন কবি তোমার তো জানাই আছে। কবিতা লেখার জন্য তিনি সারাদিনে দীর্ঘ সময় ব্যয় করেন তা-ও তোমার অজানা নয় কি বল?

—হ্যাঁ, তাঁর কবিতার ব্যাপার স্যাপার আমি জানি বটে।

লিখুন, তিনি কবিতা নিয়েই পড়ে থাকলেও কিন্তু অন্যসব কর্তব্যকর্মে মোটেই উদাসীন নন। আসল কথা হচ্ছে, প্রচুর সৈন্যসহ 'অলিম্পিয়া' আর 'ব্রুকলিন' নামক দুটো যুদ্ধজাহাজ জন হে পাঠিয়ে দিলেন।

আর সৈন্যরা ত্রিশ ইঞ্চি কামান হাতে আফ্রিকার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত তোলপাড় করতে লাগল।

নির্দিষ্ট লোকটার শারীরীক পরিস্থিতির কথা জানার জন্য হে টেলিগ্রাম করলেন। তিনি জানতে চাইলেন, তারা আজ সকালে কেমন আছে? বার্ডিক হ্যারি কি এখনও বহাল তবিয়তে জীবিত আছে? বা রৈসুলি পরপারে পাড়ি জমিয়েছে!

মরক্কোর রাজা তখন সত্তর হাজার ডলার লোক মারফৎ পাঠিয়ে দিলেন। ব্যস, তারাও সেদিনই বার্ডিস হ্যারিসকে মুক্ত করে দিল।

এরকম ছোট একটা অপহরণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে অন্য কোন দেশেও তেমন আলোড়ন সৃষ্টি হয় নি।

আর বার্ডিক হ্যারিস নিজেও রিপোর্টারদের কাছে গ্রীক ভাষাতেই বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রের খবরাখবর সে-ও অনেক কিছু শুনেছে। সে তার বক্তব্যে রুজভেল্ট সম্বন্ধে পঞ্চমুখে প্রশংসা করেছে। তবে তার চেয়ে বেশী রৈসুলির সুখ্যাতি করেছে।

বার্ডিক হ্যারিস যা কিছু বলেছে তার মূল বক্তব্য হচ্ছে, আজ অবধি যত অপহরণকারীর সঙ্গে সাকরেদ হিসাবে কাজ করেছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে সহজ সরল—সাদা মনের মানুষ রৈসুলি।

সে যে কেবলমাত্র একজন দিলখোলা মানুষ তা-ই নয়, শিষ্টতার বিচারেও পয়লা নম্বরের মানুষ বলেই সে মনে করে।

পিক আশা করি এবার বুঝতে পারছ, সব দেশের আইনের সমর্থন আমরা পাচ্ছি, পাবও বটে।

শোন, এ কর্ণেলকে আমরা মওকা বুঝে দল থেকে বের করে নিয়ে সোজা পাহাড়ের দিকে চম্পট দেব। তারপর পাহাড়ের ওপর তুলে এমন একটা গুহায় তাকে রেখে পাথর দিয়ে গুহার মুখটা চাপা দিয়ে দেব যেখানে যেতে ভুলেও কেউ উৎসাহী হয় না।

ব্যস, এবার তার উত্তরাধিকারী বা আইনসম্মতভাবে প্রাপ্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে দশ হাজার ডলার মুক্তিপণ আদায় করে রাখব।

তুমি কি মনে করছ এত সহজেই কাজ হাসিল, মানে দশ হাজার ডলার বাগিয়ে নিতে পারবে?

আরে, এত হ্যাপার কথা শুনেও বলছ, সহজে? তবে আমি নিঃসন্দেহ যে, ঝামেলা যতই হোক না কেন, দশ হাজার ডলার আমার পকেটে আসছেই।

বহুৎ আচ্ছা! আমার কথাটাও শুনে রেখো, তুমি কিন্তু ঘুড়ো টেকোমাস-এর চেয়ে এ ব্যাপারে চমক সৃষ্টি, মানে বড় রকমের খেল দেখাতে পারবে না।

মুহূর্তের জন্য থেকে সে আবার মুখ খুলল—কথা দিচ্ছি বরাতে যা আছে পরে দেখা যাবে, একাজে আমি তোমার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ে যাব। জুয়াচুরির কাজটায় আমরা কতটা সাফল্য লাভ করতে পারি দেখাই যাক না।

ক্যালিগুলা আমার সঙ্গে সোল্লাসে করমর্দন সেরে বলল—'সাবাস! এই তো চাই বন্ধু।'

তিন

এবার আমাদের প্রথম ও প্রধান কাজ কর্নেল জ্যাকসন টি, রকিংহোমকে ছিনতাই করে নিয়ে আসার পর তাকে লুকিয়ে রাখার মত উপযুক্ত একটা স্থানের খোঁজ করা।

ক্যালিগুলা আর আমি পুরো তিন-তিনটা দিন বাঞ্ছিত সে নিরাপদ স্থানের খোঁজে পাহাড়টাকে চষে বেড়াতে লাগলাম।

নিরবচ্ছিন্ন ও নিরলস তল্লাসি চালিয়ে পাহাড়ের প্রায় শীর্ষদেশের একটা গুহা বেছে নিলাম। সত্যি নির্বিঘ্নে কাজ হাসিল করার মত জায়গাই বটে। গলাছেড়ে চিৎকার করলেও কেউ শুনতে

পাবে না, নিজের প্রয়োজনের তাগিদে সেমুখো হবার তো প্রশ্নই ওঠে না।

পাহাড়ের ওপরের সে গুহাটা লতাপাতা-ঝোপঝাড়ে ঢাকা আর একটা মাত্র পথ—না, পথ বলা যাবে না, সেখানে যাওয়ার মত তো সরু একটা জায়গা আছে। কোনরকমে সেখানে পৌঁছানো যায় বটে, তবে বহু কষ্ট স্বীকার করে।

জুয়াচুরি কাজটা হাসিল করার জন্য যে কয়টা কাজ ছিল সেগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজের দায়িত্ব আমি নিজের হাতে রেখে দিলাম। ট্রেন ধরে আমি সোজা আটলান্টা চলে গেলাম।

আটলান্টার বাজারে ঘুরে আমি দু'শ পঞ্চাশ ডলার দামের স্বাস্থ্যপ্রদ আর মুখোরোচক কিছু খাবার দাবার খরিদ করে পাঠিয়ে দিলাম।

আসলে কর্নেল জ্যাকসন, টি. রকিংহাম-এর মত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির রুচিপূর্ণ ব্যয়বহুল। আহারাদির কথা মাথায় রেখে সাধ্যমত সেরা খাদ্য সামগ্রীই যোগাড় করলাম।

শুধু স্বাস্থ্যসম্মত আর সুস্বাদু খাবার দাবারই নয়, সোনালী ব্যান্ডযুক্ত দু'শ' হাভানা চুরুট, ফোল্ডিং খাট, দামী টুল আর একটা ক্যাম্প স্টোভের ব্যবস্থাও করতে ভুললাম না। মোদ্দা কথা, সাধ্যমত কর্নেল রকিংহাম-এর আরামের উপযোগী যাবতীয় ব্যবস্থাই করে ফেললাম।

আমরা, বিশেষ করে আমি আশায় আশায় থাকলাম। তাঁর কাছ থেকে দশ হাজার ডলার আদায় করার পর তিনি অবশ্যই এরকম সৌজন্য আর সুব্যবস্থাদির জন্য ক্যালিগুলা আর আমাকে কেবলমাত্র প্রশংসাই নয় সাধুবাদও জানাবেন। মুক্তি-পনের বিনিময়ে মুক্তিপাবার পর গ্রীক পুরুষটা যেমন পঞ্চমুখে প্রশংসা করেছিল।

আটলান্টা থেকে বাছাই করা মালপত্র সংগ্রহ করার পর সবগুলোকে একটা গাড়িতে চাপিয়ে আমরা পাহাড়ের ওপরের নির্দিষ্ট গুহাটায় নিয়ে গেলাম।

বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সৌখিন দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে আমরা গুহাটাকে একটা রীতিমত শিবিরে পরিণত করে ফেললাম। ব্যস, এবার কিছুটা অন্তত নিশ্চিন্ত।

গুহাটাকে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বসবাসের উপযোগী ক'রে সাজিয়ে তোলার পর আমাদের কাজ হ'ল কর্নেলকে স্বাগত জানাবার জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষায় থাকা।

এক সকালে কর্নেল রকিংহাম পার্বত্য উপত্যকা থেকে জরুরী কিছু কাজকর্ম মিটিয়ে বাড়ির পথে ফিরে যাওয়ার সময় আমরা গোপন স্থান থেকে অতর্কিতে বেরিয়ে তাঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়লাম।

কর্নেল এক বৃদ্ধ—লম্বা-চওড়া এক সুদর্শন পুরুষ। কেবলমাত্র চেহারা ছবিই নয় পোশাক আশাকেও রীতিমত কেতাদুরস্ত। মোদ্দা কথা, তিনি একজন ছিমছাম বৃদ্ধ।

তাঁকে পাকড়াও করে আমরা সাধ্যমত সহজ-সরল ভাষায় এবং যথা সম্ভব সংক্ষেপে আমাদের উদ্দেশ্যটা তার কাছে ব্যক্ত করলাম।

কেবলমাত্র মুখের কড়া অথচ মিষ্টি কথাতেই নয়, ক্যালিগুলাও উদ্দেশ্যহীন হাবভাব দেখিয়ে কোটের কোণাটাকে সামান্য উঁচু করে কোমরের .৪৫-এর নলটার তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতেও ভুলালম না।

কর্নেল রকিংহাম আঁৎকে উঠে বললেন—এ কী সর্বনেশে ভয়ঙ্কর কাণ্ড! দিনের আলোয় জর্জিয়ার পেরিকাউন্টিতে ডাকাতির চেষ্টা!

তবে আমার কথাও শুনে রাখ, গণ-উন্নয়ন বোর্ড-এর কাছে যাতে খবরটা পৌঁছায় শীঘ্রই তার উপযুক্ত ব্যবস্থা আমি করছি। তোমাদের এরকম জঘন্য নক্কাড়জনক কাজের উপযুক্ত শাস্তি কিভাবে দেওয়া যায় তা আমার জানা আছে।

ক্যালিগুলা কিছুটা ধমকের স্বরেই বলল—খুব হয়েছে। ন্যাকামি না করে যা বলছি, করুন। লক্ষ্মীছেলের মত এখন গাড়িতে উঠে পড়ুন। এটা তো একটা ব্যবসায়িক সভা তাই না? সেটা যাতে অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি থাকে, সে ব্যবস্থাই আমরা করতে চলেছি। উঠুন, গাড়িতে উঠে বসুন।

কর্নেল রকিংহামকে নিয়ে আমরা পার্বত্য পথে অগ্রসর হতে লাগলাম। গাড়িটার পক্ষে যতটা ওপরে ওঠা সম্ভব আমরা ততটা পথ উঠে গাড়ি দাঁড় করালাম।

তারপর কর্নেল রকিংহামকে গাড়ি থেকে নামালাম। ঘোড়াটাকে একটা গাছের সঙ্গে শক্ত করে

বেঁধে রাখলাম। এবার কর্নেল রকিংহামকে মাঝখানে নিয়ে আমরা পায়ে হেঁটে পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠে যেতে লাগলাম। অনেক কষ্টে বন্দীকে নিয়ে আমরা গুহাটার দরজায় হাজির হলাম।

গুহার দরজায় দাঁড়িয়ে আমি বললাম—শুনুন কর্নেল, আমাদের উদ্দেশ্যটা আশা করি আপনি হয়ত কিছুটা অনুমান করলেও করতে পারেন।

কর্নেল রকিংহাম জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে আমার মুখের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলেন।

আমি পূর্ব প্রসঙ্গের জের টেনে বললাম—আমাদের উদ্দেশ্যের কথা আমি আপনাকে সাফ সাফ জানিয়ে দিচ্ছি—আমরা কিছু মুক্তি-পণের প্রত্যাশায় আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছি।

মুক্তিপণ! মানে আমাকে এখানে আটকে রেখে—'

তাঁকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই আমি এবার বললাম, হ্যাঁ, আপনার অনুমান অভ্রান্ত। মরক্কোর রাজা—আপনার হিতকাঙ্খীরা যদি আমাদের দিকে বাঞ্ছিত সামান্য অর্থ ছুঁড়ে দেন তবে আপনার কোন রকম অনিষ্ট তো দূরের কথা সামান্য একটা কাঁটার আঁচড়ও লাগবে না, কথা দিচ্ছি। আপনার মতই আমরাও ভদ্র ও সম্মানীত পরিবারের সন্তান। আপনার দিক থেকে যদি প্রতিশ্রুতি পাই যে, আপনি এখান থেকে পালিয়ে যাবার ধান্দা করবেন না তবে শিবিরে বসবাসের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা আপনাকে দেওয়া হবে।

ঠিক আছে, কথা দিলাম।

বহুৎ আচ্ছা! আপনি তবে এখানেই থাকুন। আর আমি আর মিঃ পাক্ক আপনার খাবার দাবারের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি। মনে রাখবেন, পালিয়ে যাবার ইচ্ছা করবেন না। ভদ্রলোকরা চুক্তি ভঙ্গ করে না, ভুলে যাবেন না যেন। আর দেরী করা ঠিক হবে না, এগারোটা বাজে।

'আমার খাবার দাবারের জন্য আপনাদের বেশী কষ্ট করার দরকার নেই। এক টুকরো নোনা শুয়োরের মাংস আর কিছুটা ভুট্টাচূর্ণ হলেই আমি খাওয়ার পাট চুকিয়ে নিতে পারব।'

আমি প্রবল আপত্তি জানাতে গিয়ে বললাম—সে কী কথা! এমন জঘন্য খাবার আপনাকে, আমাদের অতিথিকে কিছুতেই দেওয়া চলবে না। আমাদের সম্বন্ধে আপনার যে ধারণাই দানা বাঁধুক না কেন, আসলে আমরা কিন্তু অনেক ওপর তলায় ঘোরাফেরা করি।

কর্নেল একটা চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে খবরের কাগজটা চোখের সামনে মেলে নিয়ে বসলেন।

ক্যালিগুলা আর আমি গা থেকে কোট খুলে ফেলে পরম উপাদেয় খাদ্যবস্তু তৈরী করতে মেতে গেলাম।

পশ্চিমী রান্না বান্নায় ক্যালিগুলো খুবই ওস্তাদ। আমরা বারোটার মধ্যে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য যে সব খাদ্যবস্তু রান্না করলাম তা মিসিসিপি নদীর বুকে ভেসে বেড়ানো স্টীমারের পরম উপাদেয় খাদ্যবস্তুর মতই দেখতে। আর গন্ধের কথা না-ই বা বললাম।

টেবিলে সদ্য রান্না-করা খাদ্যবস্তু সাজানো হ'ল। কর্নেল রকিংহাম টুলটা টেনে টেবিলটার কাছে এনে গুছিয়ে বসলেন। কোটের পকেট থেকে চশমাটা খুলে নাকের ডগায় লাগালেন। তারপর টেবিলের খাদ্যবস্তুগুলোর দিকে চশমার ফাঁক দিয়ে বার বার তাকাতে লাগলেন।

এক সময় লক্ষ্য করলাম, তাঁর ঠোঁট দুটো নড়তে শুরু করেছে। মনে হ'ল অনুচ্চ কণ্ঠে, একেবারেই বিড়বিড় করে আমাদের চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে চলেছেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার অবশ্যই তা নয়। ঠিক সে মুহূর্তেই তাঁর দু'চোখের কোল-বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল।

কর্নেল এবার খাদ্যবস্তুগুলোর এত দ্রুত এবং অত্যুগ্র আগ্রহে সদ্ব্যবহার করতে শুরু করলেন যা ইতিপূর্বে কাউকেই খেতে দেখি নি। ঠিক যেন একটা যন্ত্র কাজ করে চলেছে।

দেড় ঘণ্টার মধ্যেই কর্নেল রকিংহাম একটা আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে বসলেন।

আমি এক বাক্স গোল্ডেন হাভানা চুরুট এনে তার দিকে এগিয়ে দিলাম। তিনি নির্দ্বিধায় হাত বাড়িয়ে বাক্সটা নিলেন। জ্বলন্ত চুরুটে একটা লম্বা টান দিয়ে একগাল ধোঁয়া ছড়িয়ে দিলেন। তারপর স্বাভাবিক স্বরেই বললেন—মশাইরা, এ অনন্ত পর্বত আর পার্বত্য বনানীর দিকে যখন দৃষ্টি নিক্ষেপ করি আর সৃষ্টিকর্তার এমন সব অতুলনীয় অনিন্দ্যসৃষ্টির কথা যখন ভাবি তখন আমি যেন জেমস অন্য মানুষ।

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই আমি বলে উঠলাম—কর্নেল, কিছু মনে করবেন না, অন্য একটা জরুরী কাজে আমাদের এখনই বেরোতে হবে।

আমি কাগজ-কলম এনে তাঁর সামনে রাখতে রাখতে বললাম, আপনাকে আমাদের বাঞ্ছিত দশ হাজার ডলার কে পাঠাবে বলুন তো?

মুহূর্তের জন্য ভেবে নিয়ে তিনি বললেন—আমার তো বিশ্বাস, আমাদের রেলবোর্ডের ভাইস-প্রেসিডেন্টকে লিখলেই কাজ হবে। ইডেনভিল-এ কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়ে বসেন।

ইডেনভিল এখান থেকে কত দূরে, আপনার কি জানা আছে?

দশ মাইলের কাছাকাছি।

কর্নেল রকিংহাম-এর দিকে কাগজ-কলম ঠেলে দিয়ে আমি বললাম—আমি, যা বলছি আপনি হুবহু তা-ই লিখে যান।

কর্নেল রকিংহাম কলমটা হাতে নিয়ে আমার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

আমি বলতে লাগলাম—লিখুন যে, দু'জন দুষ্কৃতকারী আমাকে একা পেয়ে এমন এক জনমানবহীন প্রত্যন্ত অঞ্চলে বন্দী করে রেখেছে সেখান থেকে আমাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা বৃথা। আমার মুক্তিপণস্বরূপ দশ হাজার ডলার তারা দাবী করছে। অন্যথায় আমার প্রাণহানি সুনিশ্চিত।

অতএব আমার প্রাণরক্ষার জন্য অবিলম্বে তাদের বাঞ্ছিত দশ হাজার ডলার সংগ্রহ করতে হবে আর সে সঙ্গে এসব নির্দেশও পালন করতে হবে। তাই উল্লিখিত ডলারগুলো নিয়ে 'কৃষ্ণচূড়া পর্বতমালা'-য় অবিলম্বে একাকী চলে আসুন। উক্ত পর্বতমালার পাহাড়ি খাড়িতে এলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। পথ নির্দেশ—খাড়ি বরাবর অগ্রসর হয়ে বাঁ-দিকের চওড়া একটা পাথর পর্যন্ত যাবেন। তার গায়ে লাল চক্র দিয়ে একটা ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে রাখা হয়েছে।

আপনার এরপরের কাজ হবে পাথরটার ওপর দাঁড়িয়ে সাদা একটা পতাকা বার বার নাড়ানো। একটু বাদেই আপনার সামনে হাজির হবেন একজন পথ-প্রদর্শক। আমাকে যেখানে বন্দী করে রাখা হয়েছে সেখানে তিনি আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। অহেতুক বিলম্ব করবেন না। মনে রাখবেন, বিলম্বে আমার প্রাণহানির যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

লেখা শেষ করে কর্নেল রকিংহাম আবারও কিছু বলার জন্য অনুমতি চাইলেন।

আমাদের অনুমতি নিয়ে তিনি জানতে চাইলেন, তার সঙ্গে আমরা কি রকম ভাল ব্যবহার করা হচ্ছে তা যদি ও চিঠিতে ভাইস-প্রেসিডেন্ট জানিয়ে দেওয়া হয় তবে রেলরোড-এর লোকজন কিছুটা নিশ্চিন্ত হতে পারবেন, উৎকণ্ঠা দৃঢ় হবে।

তাঁর প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ার কোনই কারণ না থাকায় আমরা মত দিলাম।

কর্নেল রকিংহাম এবার লিখলেন—দুর্বৃত্ত দু'জনের সঙ্গে পাশাপাশি সবেমাত্র বিভিন্ন রকম সুখাদ্যে মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে উঠলেন। তারপর ককটেল থেকে শুরু করে কফি পর্যন্ত বিভিন্ন রকম সুখাদ্যে পূর্ণ তালিকার উল্লেখ করলেন।

তারপর উপসংহারে লিখলেন—ছ'টার কাছাকাশি নৈশ ভোজের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আর আশা করা যাচ্ছে সেটা মধ্যাহ্ন ভোজনের চেয়ে বাড়াবাড়ি হবে। তাঁর পক্ষে পীড়াদায়ক হবে বলেই তিনি আশঙ্কা করছেন।

লেখা শেষ হলে আমি আর ক্যালিগুলা তাঁর হাত থেকে কাগজটা নিয়ে চিঠিটার গোড়া থেকে শেষ অবধি মনোযোগের সঙ্গে পড়লাম। বাতিল করার মত একটা শব্দও আমাদের চোখে পড়ল না। তবে একটা জায়গায় এটু আধটু খটকা লাগল, অস্বীকার করতে পারলাম না। কারণ পাচক হিসাবে আমরা সুখ্যাতির দাবী যে করতে পারি এতে দ্বিমত থাকার কথা নয়। তবে ব্যাপারটাকে গায়ে না মেখে এড়িয়েই গেলাম। তবে দশ হাজার ডলারের হুন্ডির প্রসঙ্গে এসব কথা নিতান্তই খেলো, স্বীকার করতেই হয়।

আমি চিঠিটা হাতে নিয়ে পার্বত্য উপত্যকায় হাজির হলাম। এবার একজন পত্র-বাহক দরকার। আমি অনুসন্ধিৎসু নজরে চারদিকে দৃষ্টি ফেরাতে লাগলাম। অচিরেই আমার উদ্দেশ্য সফল হবার সম্ভাবনা দেখা দিল।

গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে এক আদিবাসী যুবককে ঘোড়ায় চড়ে আমার দিকেই আসতে

দেখলাম।

জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারলাম, অশ্বারোহী যুবকটা ইডেনভিল-এই চলেছে।

যুবকটার ঘোড়াটাকে থামিয়ে একটা ডলার হাতে গুঁজে দিয়ে বললাম—একটা জরুরী চিঠি রয়েছে, রেলরোড-এর অফিসে পৌঁছে দিতে হবে। বিশেষ একটা জরুরী কাজের তাগিদে আমার পক্ষে এ জায়গা ছেড়ে যাওয়া হচ্ছে না। তুমি যদি একটু কষ্ট করে সেখানে চিঠিটা পৌঁছে দাও তবে বড়ই উপকার হয়।

অশ্বারোহী যুবকটা হাতের ডলারটার দিকে আড় চোখে তাকিয়ে নিয়ে বলল—এ আর বেশী কিছু কি? আমি তো ওদিকেই যাচ্ছি। পথে ঘোড়া থেকে নেমে চিঠিটা দিয়ে যাব।

যুবকটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আর একটা মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে গুহা-শিবিরে ফিরে গেলাম। কারণ, এ পরিস্থিতিতে কর্নেল রকিংহাম-এর খুশি উৎপাদন করাই আমার আর ক্যালিগুলা-র প্রথম ও প্রধান কাজ।

চার

আমরা নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নিলাম। গুহা শিবিরের যাবতীয় দায়িত্ব ক্যালিগুলার ওপর দেওয়া হয়েছে। সে চারদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে লাগল।

বিকেল চারটায় ক্যালিগুলার কাছ থেকে আমি খবর পেলাম, একটা জামার মাধ্যমে কে নাকি সংকেত পাঠাচ্ছে। ব্যাপারটা সম্পর্কে আমি যেন সতর্ক দৃষ্টি রাখি।

ক্যালিগুলার কাছ থেকে বার্তা পেয়ে আমি পাহাড়ের এবড়ো খেবড়ো পথ ধরে সাধ্যাতীত দ্রুতগতিতে নিচে নেমে যেতে লাগলাম। পার্বত্য উপত্যকায়, কর্নেল বাকিংহাম-এর চিঠিতে উল্লিখিত স্থানে গিয়ে মোটাসোটা একজন লাল মানুষের মুখোমুখি হলাম।

আমি বাঞ্ছিত মোটা নাদুস নুদুস লোকটাকে নিয়ে পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠে গেলাম। এমন মোটা লোকের পক্ষে পাহাড়ে পথ ডিঙিয়ে আসায় তার গায়ে আলখাল্লা জাতীয় জামাটার ভিজে একেবারে জবজবে হয়ে গেছে। তার জামাটা সত্যি বিচিত্র ধরনের। একে আলখাল্লা জাতীয় তার ওপর আবার কলারবিহীন—একেবারেই বেঢপ।

আগন্তুককে সামনে দেখে কর্নেল রকিংহাম তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বললেন—সানরাইজ অ্যান্ড ইডেনভিল ট্যাপ রেলরোড-এর ভাইস-প্রেসিডেন্ট ক্যাপ্টেন ডুভাল সি. রকিংহাম। ইনি আমার সহোদর, তার ওপর মানুষ হিসেবে খুবই ভাল—যাকে বলে যথার্থই এক ভদ্রজন।

—অন্যদিক থেকে ওনার পরিচয়, মরক্কোর রাজা, তাই না?

—হ্যাঁ, সত্য বটে।

তারপর আগন্তুকের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে, মুচকি হেসে বললাম—কেবলমাত্র ব্যবসার তাগিদেই যদি আমি মুক্তিপণের ডলারগুলো গুণে নেই তবে আশা করি আপনার দিক থেকে আপত্তির কোন কারণ নেই?

না, না, এতে আর আপত্তি করার কি-ই বা থাকতে পারে। অবশ্য ডলারগুলো যখন হাতে পাবেন, মানে নিয়ে আসার পর।

আমি চোখে-মুখে বিস্ময়ের ছাপ এঁকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকালাম।

আমার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠাটুকু দূর করার জন্য ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে এবার বললেন—দেখুন, মুক্তি-পণের ডলারগুলোর দায়িত্ব আমাদের দ্বিতীয় ভাই ভাইস-প্রেসিডেন্টের ওপর আমি দিয়ে এসেছি।

আমি চোখে-মুখে বিরক্তির ছাপ এঁকে বললাম—এটা কেমন হল? আসলে তাই জ্যাকসন-এর জন্য আমি এত আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি যে, এক মুহূর্তও নষ্ট করতে উৎসাহ পাচ্ছিলাম না। তবে এ নিয়ে আতঙ্কিত হবার তিলমাত্রও কারণ নেই।

তাঁর দিক থেকে অভয় পেয়েও আমি উৎকণ্ঠামুক্ত হতে পারলাম না।

আগন্তুক এবার বললেন—ভাববেন না, আশা করি কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি এখানে পৌঁছতে বেশী দেরি করবেন না।

এবার কর্নেল রকিংহাম-এর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তিনি বললেন—ভাই জ্যাকসন, তোমার চিঠিতে যে চিংড়ির স্যালাডের কথা লিখেছ, তার স্বাদটা কেমন, বল তো শুনি?

আমাদের প্রসঙ্গটা চাপা পড়ে অন্যদিকে মোড় নিচ্ছে দেখে আমি বলতে বাধ্য হলাম—মাননীয় ভাইস-প্রেসিডেন্ট আপনাকে একটা কথা না বলে পারছি না।

বলুন।

আপনার কথিত দ্বিতীয় ভি. পি. না-আসা পর্যন্ত আপনি নিজে এখানে আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করে বরং এখানেই থেকে যান।

মোটাসোটা ভদ্রলোকটি রীতিমত চমকে উঠে বললেন—এখানেই থেকে যাব? আপনাদের দুরভিসন্ধিটা জানতে পারি কি?

দুরভিসন্ধি বা যা-ই বলুন না কেন, আসলে এটা একটা গোপন ঘাঁটি। বাইরের কেউ এখানকার টিকিটি বিক্রি করুক এটা আমরা চাইছি না, মনে করতে পারেন কিছুতেই বরদাস্ত করব না।

ক্যালিগুলা আধ ঘণ্টার মধ্যেই আবার বলতে শুরু করল—দেখ, ওই দেখ। রোগা ও লম্বাটে কে একজন আমাদের দিকেই আসছে!

আমি অনুসন্ধিৎসু চোখে তার অঙ্গুলি-নির্দেশিত পথে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম। দেখলাম, তার কথা সত্য। কে একজন আসছে বটে।

আমি আবার লম্বা-লম্বা পায়ে পাহাড় বেয়ে নেমে যেতে লাগলাম।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই আমি গুহা-শিবিরের কাছাকাছি ফিরে এলাম। এবার আমি যাকে নিয়ে ফিরে এলাম তাঁর উচ্চতা ছ'ফুট তিন ইঞ্চি, এ ছাড়া বলার মত তার চেহারার আর কোন বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ল না।

আমি তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে মনে মনে বললাম—এ ভদ্রলোকের পকেটে যদি দশ হাজার ডলার থেকেই থাকে তবে তা অবশ্যই কোটের ভেতরের পকেটে সযত্নে রক্ষিত আছে, আর তা আছে একটা মাত্র বিলে এবং লম্বালম্বি ভাঁজ করা। দেখাই যাক, আমার অনুমান কতটা সত্য।

কর্নেল রকিংহাম সরব হলেন। ইনি হচ্ছেন আমাদের দ্বিতীয় ভাইস-প্রেসিডেন্ট। এঁর নাম মঁসিয়ে প্যাটারসন জি. কোবল।

কোবল মুসকি হেসে বললেন—আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাওয়ার জন্য আমি যারপরনাই খুশি হয়েছি।

আমার এখানে ছুটে আসার উদ্দেশ্য, একটা জরুরী খবর জানানো। তার কথায় আমি আর ক্যালিগুলা উভয়েই ভ্রূ কুঁচকে তার দিকে তাকালাম।

কোবল বলে চললেন—খবরটা হচ্ছে, আমাদের সাধারণ যাত্রী এজেন্ট মেজর টালাহাসি টাকার সম্প্রতি কিছু অর্থকড়ি ধারের ব্যাপারে এক গোছা আমাদেরই রেলরোড বন্ড নিয়ে 'পেরি কাউন্টি ব্যাংক'-এর সঙ্গে জরুরী আলোচনা নিয়ে খুবই ব্যস্ত আছেন। বলতে পারেন তিনি এখন দম ফেলারই সময় পাচ্ছেন না।

একনাগাড়ে অনেকক্ষণ কথা বলার পর কোবল মুহূর্তের জন্য থেমে একটু দম নিয়ে এবার বললেন—একটা কথা জানতে পারি কি?

আমি বলে উঠলাম—কি? কি কথা, নির্দ্বিধায় বলতে পারেন।

সত্যি করে বলুন তো, আমাদের প্রিয়পাত্র কর্নেল রকিংহাম আপনাদের প্রেরিত চিঠিতে উল্লিখিত ব্যক্তি কি?

আমি আর ক্যালিগুলা আবার নীরব জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকালাম।

আমার দিক থেকে বাঞ্ছিত উত্তর না পেয়ে কোবল এবার বললেন—আসল ব্যাপারটা কি জানেন? ব্যাপারটা নিয়ে আমার আর ছাপ্পান্ন পরিচালকের মধ্যে একটা তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

তারই মীমাংসা—

তাঁর কথাটা শেষ হবার আগেই আবার ক্যালিগুলার কণ্ঠস্বর কানে এল। আমি অবাক না হয়ে পারলাম না। কয়েক মুহূর্ত আগেই ক্যালিগুলা আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিল। ইতিমধ্যে কখন যে সে আমাদের গুহা-শিবির থেকে বেশ কিছুটা নিচে নেমে গেছে টেরই পাইনি।

আমি উৎকর্ণ হয়ে ক্যালিগুলার কথাটা ভালভাবে শোনার চেষ্টা করলাম।

হ্যাঁ, ক্যালিগুলার কণ্ঠস্বরই বটে। সে এবারও একই কথা বলছে—ওই-ওই যে, পাহাড়ের ওপর আরও একটা সাদা পতাকা উড়ছে।

আমিও গলা ছেড়েই বললাম—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। সাদা পতাকাই বটে।

শোন, আমি সাফ কথা বলে দিচ্ছি, এর পরও যদি এরকম কিছু আমার নজরে পড়ে তবে আমি অবশ্যই গুলি চলিয়ে দেব।

আরে ধৈর্য হারিও না। ব্যাপারটা কি ভাল করে লক্ষ্য কর আগে নিঃসন্দেহ হয়ে তবেই কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।

ভাল করে দেখার আর দরকার পড়বে না। আমি নিঃসন্দেহ যে, ওগুলো টর্পেডো-বোট না হয়েই পারে না।

আমার নির্দেশে পথ-প্রদর্শক যুবকটা পাহাড়-বেয়ে তরতর করে নিচে নেমে গেল।

মিনিট-কয়েকের মধ্যেই একটা অচেনা মুখকে নিয়ে আমাদের গুহা-শিবিরে ফিরে এল।

আগন্তুকের পরনে ঢিলেঢালা পা-জামা, হাতে একটা লণ্ঠন আর বাঁ-কাঁধে কিছু নেশার সামগ্রী।

আমি মুহূর্তের জন্য তার আপাদমস্তক সতর্ক দৃষ্টি মেলে নিরীক্ষণ করে নিঃসন্দেহ হলাম, ইনিই মেজর টাকার। আমি এতই নিঃসন্দেহ ছিলাম যে, ওপরে, আমাদের গুহা—শিবিরের কাছাকাছি না আসা পর্যন্ত তাঁর পরিচয় তো দূরের কথা তার নামটা পর্যন্ত জানার আগ্রহ প্রকাশ করলাম না।

পথ-প্রদর্শক আগন্তুককে নিয়ে আমাদের সামনে আসার পর জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে জানতে পারলাম, টিমোথি কাকা। ইডেনভিলে সুইচম্যানের পদে চাকরি করে।

জানতে পারলাম, টিমোথি কাকাকে আগেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে খবরটা পৌঁছে দেওয়ার জন্য। খবরটা হচ্ছে, রেলরোডের এটর্নি জর্জ প্রেন্ডারগাস্ট মুক্তিপনের দশ হাজার ডলার সংগ্রহ করার জন্য কর্নেল রকিংহাম-এর খামারের জমি মর্টগেজ রাখার কাজে লেগে পড়েছেন।

টিমেথি কাকা যখন মুক্তি-পণের অর্থ সংগ্রহের কথা বলল তখন দুটো গাট্টাগোট্টা লোক শিকারী বিড়ালের মত সন্তর্পণে পা টিপে টিপে অদূরবর্তী ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল। তারা তেমনি নিঃশব্দে গুহা-শিবিরের সামনে এসে দাঁড়াল।

লোক দুটোর দিকে চোখ পড়তেই ক্যালিগুলা ঝট্ করে কোটের তলা থেকে পিস্তলটা বের করে তাদের দিকে বাগিয়ে ধরল।

কর্নেল রকিংহাম এবারও ক্যালিগুলাকে বাধা দিলেন। তিনি প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন—আরে করছেন কি মঁসিয়ে! পিস্তলটা নামান

ক্যালিগুলা ঘাড়ঘুরিয়ে তার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল। কর্নেল রকিংহাম পূর্ব স্বরেই বললেন—আরে, এদের একজন মিঃ বাটস্—বিয়াল্লিশ নম্বর ট্রেনের ফোরম্যান, আর দ্বিতীয়জন মিঃ জোন্স—বিয়াল্লিশ নম্বর ট্রেনেরই ইঞ্জিনীয়ার।

মুখ কাচুমাচু করে বাটস্ বলল—মাফ করবেন মঁসিয়ে জিম আর আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাহাড়ে উঠতে বাধ্য হয়েছি।

ক্যালিগুলা হাতের পিস্তলটা নামিয়ে নিয়ে নীরবে বাটস্-এর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

বাটস্ এবার বলল—হ্যাঁ, বিশ্বাস করুন, আমরা দু'জনে কাঠবিড়ালির খোঁজে পাহাড়ে ঘোরাফেরা করতে করতে কখন যে পাহাড়টার ওপরে উঠে পড়েছি, টেরই পাই নি। সেজন্যই তো আমরা সাদা পতাকার কথা ভাবিই নি।

আমি এবার একটু বেশ গম্ভীর কণ্ঠেই বললাম—আমি নিচে নামছি। তবে মনে রাখবেন, এটাই আমার শেষ বার নিচে নামা। আর এস. অ্যান্ড ই. টি. যদি মনে করে থাকে যে, আমরা তাদের প্রেসিডেন্টকে এখানে বন্দী করে রেখেছি বলে এখানে একদল লোককে চড়ুইভাতি করার জন্য

পাঠিয়ে দেবে তবে কিছুমাত্রও আপত্তি করব না।

এবার ক্যালিগুলা-র দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল—শোন, প্রয়োজনে আমরাও এখানে একটা বিজ্ঞপ্তি টাঙিয়ে দেব 'অপহরণকারীর কাফে ও ট্রেনের কর্মীদের নিকেতন'।

আমি এবার মেজর টালাহাসির কথাবার্তা থেকে সে সার বক্তব্যটুকু ধরতে পেরে গেছি। আর এতে আমার অস্বস্তিটুকু সামান্য পরিমাণে হলেও লাঘব হল।

আমি তাকে নানা কথায় ভুলিয়ে ভালিয়ে হাঁটতে হাঁঠতে ঘড়ির কাছাকাছি নিয়ে গেলাম, সে যদি সত্যি জাহাজের রান্নাঘরের কর্মী হয়ে থাকে বা পাহাড়ের পথচারীর মজুরের কাছে লিপ্ত থাকে তবে তাকে খুড়ির জলে ঠেসে ধরে পরলোকে পাঠিয়ে ছাড়ব।

আশ্চর্য ব্যাপার, সে যতক্ষণ আমার কাছাকাছি-পাশাপাশি পথ পাড়ি দিল ততক্ষণ কেবলই টোস্টের কথা আর শতমূলী গাছের প্রসঙ্গেই কপচাতে লাগল।

হাঁটতে হাঁটতে পাহাড়টার শীর্ষদেশে উঠেই আমি—মঁসিয়ে, একটা কথা খোলসা করে বলুন তো শুনি।

কি? কোন্ প্রসঙ্গের ইঙ্গিত দিতে চাইছে মঁসিয়ে?

কোন্ প্রসঙ্গ? কিচ্ছু বুঝতে পারছেন না?

মেজর টালাহাসি নিতান্ত গো-বেচারির মত মুখ করে বলল—দেখুন, যদি বুঝতেই পারব তবে আর শুধু শুধু আপনাকে বিরক্ত করতে উৎসাহী হব কেন বলুন তো?

ঠিক আছে, বলছি তবে শুনুন—একটা কথার ঠিকঠাক জবাব দিন তো মুক্তিপণের দশ হাজার ডলার তোলা হয়েছে বলে জানেন কি?

আমাদের রেলরোড-এর ত্রিশ হাজার ডলার মূল্যের একটা বন্ডের ওপর কাজ আছে। আমার প্রশ্নের উত্তরের পরিবর্তে তিনি অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করায় আমি সবিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে তাকালাম।

তিনি আমার মুখের বিস্ময়ের ছাপটুকু লক্ষ্য করে বললেন—কি বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? বিশ্বাস করুন ঘটনাটা শতকরা একশ' ভাগ সত্যি। শুধু তা-ই নয়, কাজটার ব্যবস্থা আমি পাকা করেও ফেলেছি। আর সে সঙ্গে—

আমি তার বক্তব্য মাঝ-পথে থামিয়ে দিয়ে বললাম—মেজর, আমি যা বলছি শুনুন—এমন প্রসঙ্গটা ভাবনাচিন্তা ছাড়ান দিন। তবে ওটা ঠিকঠাকই আছে। নৈশভোজ পর্যন্ত অপেক্ষা করুন তারপরই দেনাপাওনার ব্যাপারটা নিষ্পত্তি হয়ে যাবে।

তারপরই আমি উপস্থিত সবার ওপর একবারটি চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললাম—আপনারা সবাই সম্ভ্রান্ত ও ভদ্রলোক। আপনাদের সবাই আমাদের এখানে নৈশভোজ সারার জন্য অনুরোধ করছি।

ক্যালিগুলা ছাড়া উপস্থিত সবাই পরস্পরের দিকে চোখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল।

আমি এবার বললাম—আমার তো মনে হয়, আমার প্রস্তাবটা সবার ক্ষেত্রেই আনন্দদায়ক হওয়ার কথা। কারণ, এখানে আমরা যতজন উপস্থিত আছি সবাইতো পরস্পরকে বিশ্বাস করেছি, ঠিক কি না? সবাই প্রায় সমস্বরেই বলে উঠলেন—অবশ্যই! অবশ্যই!

আমি এবার বললাম—যেহেতু আমরা ধরেই নিচ্ছি যে, আলোচনায় সময়ই সাদা পতাকাটাকে আরও একবার দোলানো হবে, ঠিক আছে?

ক্যালিগুলা বলল—হ্যাঁ, ঠিক প্রস্তাবই দেওয়া হয়েছে।

আমি তো চিন্তা ভাবনা করে সবার পক্ষে গ্রহণযোগ্য প্রস্তাবটা দিলাম।

ক্যালিগুলা এবাল বলল—একটু আগেই যখন তুমি পাহাড় বেয়ে নিচে নেমে গিয়েছিলে ঠিক তখনই একজন এজেন্ট আর দু'জন ব্যাগেজমাস্টার গাছ থেকে নেমে আসে। ভাল কথা, মেজর কি আমাদের বাঞ্ছিত ডলারগুলো সঙ্গে করে এনেছিলেন?

না, সঙ্গে করে নিয়ে আসেন নি।

তবে? কি বলেছেন?

তিনি বলেছেন যে, টাকা কর্জের বন্দোবস্ত তিনি পাকা করে এসেছেন।

কোন পাচকের পক্ষে যদি কোনদিন কারো ঘণ্টার মধ্যে দশ হাজার ডলার রোজগার করা সম্ভব

হয় তবে আমি আর ক্যালিগুলাই সেদিন সে কাজটা সারতে পেরেছিলাম।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসার আগেই, অর্থাৎ ছ'টার মধ্যেই আমরা বিভিন্ন উপাদেয় খাদ্যবস্তুর সমন্বয়ে উল্লেখযোগ্য একটা নৈশভোজের আয়োজন করেছিলাম। ভোজের ব্যবস্থা করা হয়েছিল পাহাড়ের শীর্ষদেশে।

যথা সময়ে রেলরোডের নিমন্ত্রিত অতিথিদের ভোজের আমন্ত্রণ জানানো হল। তাঁরা এসে গোল হয়ে বসলেন।

আহারাদির পর মদের বন্যা বইয়ে দেওয়া হল। মদের ঝোঁকে সবাই চুটিয়ে আড্ডাও দিল।

ভোজের আসর থেকে সবাই উঠে গেলে আমি আর ক্যালিগুলা মেজর টাকারকে একটু ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গেলাম।

কোনরকম ভূমিকা না করেই আমি একেবারে সরাসরি মুক্তি-পণের কথাটা তাঁর কাছে পেড়ে বসলাম।

মেজর মুখে কিছু না বলে কারেন্সিনোটের বেশ বড়সড় একটা নোটের গোছা বের করলেন। আমার মনে হল এর বিনিময়ে আরিজোনার অন্তর্গত ব্যাবিটভিল-এর উপকূলীয় অঞ্চলের পুরো একটা শহরও কিনে ফেলা সম্ভব হতে পারে।

আমি ও ক্যালিগুলা সবিস্ময়ে নোটের গোছাটার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

মেজর মুখ খুললেন—মঁসিয়েগণ, সানরাইজ অ্যান্ড ইডেনভিল রোড-এর স্টকের মূল্য সম্প্রতি কিছু নেমে গেছে। ত্রিশ হাজার ডলার দামের বন্ডের বিনিময়ে সাতাশি ডলার পঞ্চাশ সেন্টের বেশী ধার পাওয়ার ব্যবস্থা আমার পক্ষে কিছুতেই করা সম্ভব হয় নি। আর কর্নেল রকিংহাম-এর খামারের জমির বিনিময়েও পঞ্চাশ হাজারের বেশী জর্জ প্রেন্ডারগাস্ট সংগ্রহ করতে পারেন নি।

আমি আর ক্যালিগুলা কপালের চামড়ায় ভাঁজ এঁকে সবিস্ময়ে তার কথাগুলো শুনতে লাগলাম।

মেজর এবার থলেটার দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে বললেন—দেখুন, এর মধ্যে একশ' সাঁইত্রিশ পঞ্চাশই আছে।

মেজর টাকার-এর দিকে তাকিয়ে আমি বললাম—তবে দেখা যাচ্ছে, তিনি রেলরোড-এর একজন সম্মানীয় প্রেসিডেন্ট। আবার এক হাজার একর জমির মালিকও বটে। তা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে---

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মেজর টাকার বললেন—রেলরোড সম্বন্ধে আপনাদের কি ধারণা আছে আমার জানা নেই। তবু বলছি, রেলরোডটা লম্বায় দশ মাইল। সে লাইনে সব সময় ট্রেন চলাচল করে না। পাইন বন থেকে কাঠ সংগ্রহের জন্য যখন বহু মানুষ সেখানে ভিড় করে, তখনই কেবল সে লাইনে ট্রেন চলে। তাছাড়া অন্য সময়ে ট্রেন চলাচল করে না।

আমি বললাম, তাই বুঝি? এমন ব্যবস্থা?

হ্যাঁ, ঠিক তাই। যে কথা বলছিলাম, বহুদিন আগে, যখন সুসময় ছিল তখন বন্ড থেকে হপ্তায় আঠারো ডলার পর্যন্ত নিট আয় হত। সময় মত খাজনা দিতে না পারায় কর্নেল রকিংহাম-এর জমি জিরাত তেরো বার বিক্রি হয়ে গিয়েছিল।

আমি সবিস্ময়ে বললাম—তে-রো-বার!

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছি। কেনই বা হবে না। দু'-দুটো বছর ধরে জর্জিয়ার এ বিশাল অঞ্চলে একটা পিছফলও হয়নি। আর তরমুজ? বসন্তকালে উপযুক্ত বৃষ্টির অভাবে তরমুজও ফলে নি।

তার ওপর এসব অঞ্চলের মানুষগুলো এতই গরীব যে, চাষের জমিতে যে একটু-আধটু সার দেবে সে ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত নেই।

আর জমির উর্বরতাশক্তির কথা যদি বলেন তবে বলতেই হয় ফসল জন্মাবার মত ক্ষমতাই তাদের নেই। একে অনুর্বর জমি, তার ওপর সার দেওয়া সম্ভব হয় না, ফলে ফসল ভাল তো হয়ই না, বরং বলা চলে খুবই নামমাত্র আয়ই জমিজিরাত থেকে হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে খরগোসের উদরপূর্তির মত ঘাসও জন্মায় না।

তবে প্রশ্ন করতে পারেন, এ অঞ্চলের মানুষগুলোর জীবিকা কি? যা দিয়ে কোনরকমে খেয়ে-পরে পিতৃদত্ত জীবন টিকিয়ে রেখেছে, ঠিক কিনা? বলছি তবে শুনুন—কেবলমাত্র ভুট্টা আর

শুয়োরের মাংসের ওপর নির্ভর করে এখানকার মানুষগুলো বেঁচেবর্তে আছে।

ক্যালিগুলা এতক্ষণ অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত রেখেছিল। শেষমেষ আর ধৈর্য ধরতে না পেরে সে একটু গলা চড়িয়েই বলে উঠল—তুমি কি করে যে এমন সব অবান্তর কথা হজম করছ ভেবে পাচ্ছি না।

আমি নীরবে ম্লান হাসলাম।

সে আগের মতই গলা চড়িয়ে বলল—আমি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না, এ নচ্ছাড়টাকে নিয়ে তুমি কি করতে চাইছ?

আমি ডলারের গোছাটা মেজর টালাহাসির হাতে ফিরিয়ে দিলাম। তারপর চোখে-মুখে বিতৃষ্ণার ছাপ ফুটিয়ে তুলে দু'পা এগিয়ে কর্নেল রকিংহাম-এর পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তারপর যন্ত্রচালিতের মত তাঁর পিঠে এমন জোরে একটা থাপ্পড় মারলাম যে তিনি হাত কয়েক দূরে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন।

কর্নেল রকিংহামকে লক্ষ্য করে বিদ্রূপাত্মক সুরে বললাম—কি কর্নেল, আমার এ ছোট্ট রসিকতাটা আপনি, কেবল আপনিই নন, আপনারা ভালই উপভোগ করলেন, কি বলেন? আমার সাফ কথা শুনুন, ব্যাপারটাকে নিয়ে আমরা আর কচলাকচলি করতে রাজি নই।

শুনুন, আমার নম রাইনগোল্ডার। আমার আর এক পরিচয় চৌকি ডেপিউর ভাইপো আমি। আর আমার সঙ্গের এ বন্ধুটা 'পার্ক' নামক খবরের কাগজের সম্পাদকের দ্বিতীয় সম্পর্কের ভাই। আশা করি এবার বুঝতে পারছেন।

আসলে দিন-কয়েক আনন্দ ফুর্তি করে কাটাবার উদ্দেশ্যে আমরা দক্ষিণে এসে হাজির হয়েছি। এখন পর্যন্ত দুই কোয়ার্ট কোবলার-এর মুখটা তো খুলিই নি। সেটা হয়ে গেলেই ব্যাপারটা মিটে যায়।

ব্যাপারটা নিয়ে আর মিছে কচলাকচলি করে ফয়দা কিছুই নেই। দু'-একটা কথার মাধ্যমেই ইতি টেনে দেওয়া যাক।

আজ আমার যতদূর মনে পড়ছে মেজর টাকার-এর বেহালার হাত খুবই ভাল ছিল। দক্ষ শিল্পী যাকে বলে।

আর ক্যালিগুলা? সে একজনের মাথার ওপর মাথা রেখে দিব্যি ওয়ালজ নেচে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিত। আর আমি, জি. কেব্‌ল এবং মিঃ প্যাটারসন কর্নেল জ্যাকসন টি রকিংহামকে ঘিরে 'ফেক-হন্টন' দেখাতাম—খুবই সঙ্কোচের সঙ্গেই কথাটা বললাম।

বেশী দূরের কথা না-ই বা বললাম, কাল সকালেই তো, ব্যাপারটাকে যখন তোমরা খুব সম্ভবপর বলে মেলে নিতে পারবে না, তখনও ক্যালিগুলা আর আমার সান্ত্বনা একটা থাকবেই।

আমাদের তো জানাই ছিল আমরা 'সানরাইজ অ্যান্ড ইডেনভিল ট্যাপ' বেলরোড'কে আমরা যত কঠিন আঘাত হেনেছিলাম, 'রেসুলি কার্ডিক হ্যারিস'কে সঙ্গী হিসাবে নিয়েও তাঁর পক্ষে অর্ধেক কঠিন আঘাতও হানা সম্ভব হয় নি।

হার্টস অ্যান্ড ক্রুসেস

বল্‌ডি উডস্‌ হাত বাড়িয়েই তার বাঞ্ছিত বোতলটা পেয়ে গেল। সে যখনই কোন কিছু তল্লাস করে সেটা সে—আরে ধ্যুৎ! এটা তো আর বল্‌ডির গপ্প নয় যে, তার সুখ্যাতির কথা বলতে হবে।

এবার সে বোতল থেকে তৃতীয় বার পানীয়টা ঢালল, প্রথম আর দ্বিতীয় বারের তুলনায় এবার গ্লাসটায় এক আঙুল বেশী পানীয়ই ঢালল।

বল্‌ডি একটা পরামর্শ করল, আর যোগ্য লোকের সঙ্গেই সে পরামর্শ করল।

রীতিমত দৃঢ়তার সঙ্গেই বল্‌ডি বলল—মোদ্দা কথা শোন, তোমার জায়গায় আমি হলে তো একটা রাজা-বাদশা বনে যেতাম।

ওয়েব ইয়েগার চওড়া স্টেটসন টুপিটাকে আঙুলের ডগা দিয়ে ঠেলে সামান্য পিছনের দিকে দিয়ে দিল। তখন তার খড়ের মত চুলের গোছাটা আরও ছড়িয়ে পড়ল। না, এতেও তেমন সুবিধা হল না। নিদারুণ অস্বস্তি বশত সে বল্‌ডির পানীয়টাকেই আঁকড়ে ধরল।

গ্লাসে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে ওয়েব তার অভিযোগগুলোকে সংক্ষেপে ব্যক্ত করল—কোন পুরুষ মানুষ যদি একটা মাত্র রানীর গলায় মালা দিয়ে তাকে সহধর্মিনীরূপে বরণ করে নেয় তবে তার দুমুখো হওয়া মোটেই সঙ্গত নয়।

বল্‌ডি তার কথা সমর্থন করতে গিয়ে বলল—অবশ্যই নয়। আরে, তুমি তো নিজের অধিকারবলেই রাজা হয়েছ। আসলে একটা কথা কি জান?

কি? কি কথা?

কথাটা হচ্ছে, যদি আমি তোমার জায়গায়, মানে তুমি হতাম, তবে তাসগুলোকে আমি নতুন করে বেটে দিতাম, বুঝলে?

নতুন করে বেটে দিতে?

অবশ্যই তা নয় তো কি? আসলে তাসটা যে এখন তোমার দখলে। আচ্ছা ওয়েব ইয়েগার, তুমি এখন কি বল ত?

তার মানে? বিষণ্ণ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বল্‌ডির দিকে তাকিয়ে ওয়েব ইয়েগার কথাটা ছুঁড়ে দিল।

আরে রোসো রোসো। ধৈর্য ধর। আমি তো তোমাকে কোন দিন মন্দ কথা, মানে গালাগালি করি নি।

শোন, এটা একটা উপাধিমাত্র। ছবির কার্ডে প্রায়ই চোখে পড়ে। এদের কিন্তু কোন পিঠ হয় না। শোন ওয়েব, তোমাকে খোলসা করে বলছি। ইওরোপ মহাদেশে এমন সব প্রাণী দেখতে পাবে। মনে কর, আমি বা তুমি নয়ত কোন রাজ-পরিবারের মেয়ের সঙ্গে কোন ওলন্দাজ পরিবারের পুরুষের বিয়ে হল। তারপর কোন এক সময়ে আমাদের সহধর্মিনীটি রানী বনে গেল। তবে? আমরা কি রাজা বনে যাব? অবশ্যই না। দশ লক্ষ বছরে রাজা হতে পারব না। কার্যত যা ঘটে তা হচ্ছে, আমরা কেবলমাত্র রাজ্যাভিষেক-উৎসবে হাজির থাকি, ব্যস।

মদের গ্লাসে আর একটা চুমুক দিয়ে বল্‌ডি পূর্ব প্রসঙ্গের জের টেনে আবার বলতে শুরু করল—আমাদের একমাত্র লক্ষ্য ফটোগ্রাফে ছবি হয়ে ফুটে ওঠা।

ওয়েব ইয়েগার বলে উঠল—আর? আর কিছুই কি আমাদের করণীয় নেই?

হ্যাঁ, সিংহাসনের দাবীদার, মানে উত্তরাধিকারীকে পৃথিবীর মাটিতে নিয়ে আসার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা। তবে এটাকে কিন্তু সমবণ্টন ব্যবস্থা আখ্যা দিতে পারবে না, বুঝলে?

হাতের গ্লাসটাকে সশব্দে টেবিলে রেখে সে এবার বলল—শোন ওয়েব, মনে কর তুমি একজন রানীর স্বামী, তবে রাজা নেই কিন্তু। আর আমি যদি তোমার জায়গায় হতাম তবে আমি কিন্তু কিছু না কিছু করতাম। যেভাবেই হোক না কেন, আমি একজন রাজা বনে যেতাম।

বল্‌ডি খালি গ্লাসটাকে কাছে টেনে নিয়ে মদের বোতলটার দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিল।

ওয়েব দীর্ঘ নীরবতার পর মুখ খুলল—তুমি আমার সঙ্গে বছরের পর বছর ধরে গরু-ছাগলের কাজ করেছিলে। আমরা দু'জনে বাল্যকাল থেকেই এক সঙ্গে কাজ করেছি। পাশাপাশি ঘোড়ায়

চেপে কত জায়গায় গিয়েছি।

হ্যাঁ, আমরা দুজনে ছিলাম সত্যিকারের মানিক জোড়।

তারপর শোন, আমার ঘর সংসারের কথা তো তোমার কাছে ছাড়া অন্য কারো কাছে এমন মন খোলসা করে বলি না, আমার কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে, তুমি নোপালিটো পশু-খামারে কাজে নিযুক্ত থাকার সময় আমি সান্টা ম্যাক্‌এলিস্টারকে বিয়ে করে ঘর বাঁধি।

আমারও কিন্তু সবকিছু ছবির মত মনে আছে।

একবারটি ভেবে দেখ ত, আমি তখন ফোরম্যানের পদে বহাল ছিলাম। আর এখন? এখন আমার হাল কি হয়েছে, বল ত? দড়ির একটা গিঁট, একটা কানা কড়ি দামও আমার নেই।

ম্যাক্ এলিস্টার বুড়োটা যখন পশ্চিম টেক্সাসের বিরাট পশু-খামারের মালিক ছিল তখন তোমার কতই না সম্মান খাতির ছিল, বলতো? চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ওয়েব ইয়েগার বলল—হ্যাঁ, তা ছিল বটে। সেদিন কি আর কোনদিন ফিরে আসবে ভাই?

কেবলমাত্র মান মর্যাদার ব্যাপারই বা বলি কেন? খামারে যেকোন ব্যাপারে তার মতই কেবল নয়, তোমার মতামতের দামও দেওয়া হত।

হ্যাঁ, তা দেওয়া হত ঠিকই। কিন্তু কতদিন? বুড়ো যতদিন জানত সে, আমাকে বড়শিতে গেঁথে ডাঙায় তোলার চেষ্টা করছে। যখন নিশ্চিন্ত তখন আমাকে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিল। ব্যস তার কাছে আমার কদর ঝট্ করে কমে গেল।

বল্‌ডি বলল—বুড়োর মৃত্যুর পর—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ওয়েব ইয়েগার বলে উঠল—সে কথা আর বোলো না ভাই, বুড়োর মৃত্যুর পর সান্টা গরু আর ঘোড়ার মালিক বনে গেল। আর আমি? আমি শুধুই গরু ঘোড়ার মালিক। এটুকুই—আমার একটা এঁড়ে বাছুর বিক্রি করার ক্ষমতা নেই।

এখন ব্যবসাপত্র যা কিছু সান্টা দেখাশোনা, মানে খামারের সর্বময় কর্তৃত্ব তারই। যাবতীয় অর্থকড়ি লেনদেন সান্টা নিজের হাতে করে। সে রানী বনে গিয়ে ছড়ি ঘোরায়। আর আমি? আমার কোন ভূমিকাই নেই—একটা কানাকড়িও দাম নেই।

আমি যদি তোমার জায়গায় থাকতাম তবে আমি রাজা বনে যেতাম। বল্‌ডি কথাটা আবারও উচ্চারণ করল। আমার মত বলছি, একটা রানীকে বিয়ে করে কোন পুরুষ যদি ঘর বাঁধে তবে তার জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত তো রানীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা দরকার।

বোতল থেকে গ্লাসে মদ ঢালতে ঢালতে বল্‌ডি এবার বলল—ওয়েব, নেপোলিট-এর ব্যাপারে, তোমার কোন মতামতই খাটে না কথাটা শুনে সবাই ঠাট্টা করে, হেসেই খুন হবার যোগাড় হয়।

ওয়েব ইয়েগার বিষণ্নমুখে বল্‌ডির মুখের দিকে নীরব চাহনি মেলে তাকিয়ে রইল।

ওয়েব ইয়েগার মুখ খুলছে না দেখে বল্‌ডি নিজেই আবার বলতে লাগল—শোন, মিস ইয়েগার-এর বিরুদ্ধে আমার কোন বক্তব্যই নেই। এ তল্লাটের সবচেয়ে ভাল মেয়ে তাকেই বলতে হয়। তবে খুবই সত্য যে, একটা পুরুষের তো তার নিজের বাড়ির ওপর কর্তৃত্ব থাকতেই হবে।

ওয়েব ইয়েগার একটু নড়েচড়ে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তার পর বিষণ্ন গলায় বলল—আমি আজই ঘোড়ায় চেপে পশু-খামারে যাব। কাল ভোরেই সান আন্টোন-এর জন্য একটা মৌচাক তৈরীর কাজ শুরু করতে হবে।

বল্‌ডি বলল—আমিও তোমার সঙ্গে রওনা হচ্ছি।

ওয়েব ইয়েগার সচকিত হয়ে বলল—তুমি? আমার সঙ্গে তুমি কোথায় যেতে চাইছ?

আরে ভাই ঘাবড়াচ্ছ কেন? আমি শুকনো—হ্রদটা পর্যন্ত যাব। তারপর সেখান থেকে তুমি চলে যাও খামারের দিকে, আমি নিজের পথে ঘোড়া ছুটিয়ে দেব।

ঠিক আছে। তবে তা-ই হোক।

দুই বন্ধু এক সকালে রেলপথের ছোট্ট একটা ডেরায় মিলিত হল। তারপর সেখান থেকে টাট্টু ছুটিয়ে চেপে যাত্রা করল।

ঘোড়া ছুটিয়ে 'শুকনো হ্রদ'-এ পৌঁছল। তারপর সেখান থেকে তারা নিজ নিজ পথে যাত্রা করার পূর্ব মুহূর্তে এক সঙ্গে ধূমপান করার জন্য তারা ঘোড়া থেকে নামল।

এতক্ষণ পথ চলার সময় তারা পরস্পরের সঙ্গে খুব বেশী কথা বলে নি, ধরতে গেলে নীরবেই পথ পাড়ি দিচ্ছিল।

এবার ধূম পান সারতে সারতে ওয়েব ইয়েগার পূর্ব প্রসঙ্গের জের টেনে নতুন করে কথা শুরু করল।

ওয়েব ইয়েগার বলল—বল্‌ডি, একটা কথা তোমাকে বলতে চাইছি, অবশ্য তোমার যদি শুনতে আপত্তি না থাকে। বল্‌ডি একগাল ধোঁয়া বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে বলল—আরে ধ্যুৎ! কি যে বল, আপত্তি কিসের, নির্দ্বিধায় বলতে পার।

আশা করি তোমার অবশ্যই মনে আছে, এমন একদিন ছিল যখন সান্টা এতটা স্বাধীন হয়ে ওঠে নি। তোমার স্মৃতিশক্তিকে যদি আরও একটু পিছিয়ে নিয়ে যাও তবে আরও মনে পড়বে, বুড়ো ম্যাক এলিস্টার যখন সান্টা আর আমাকে পরস্পরের কাছ থেকে যখন দূরে দূরে রাখত। কি, মনে পড়ছে?

বল্‌ডি নীরবে মুচকি হাসল।

ওয়েব ইয়েগার বলে উঠলো—আরও আছে, বুড়ো ম্যাকএলিস্টার যখন আমাদের পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখত সান্টা তখন সংকেতের মাধ্যমে আমাকে জানাত, সে আমার সঙ্গে মিলিত হতে আগ্রহী।

একদিন বুড়ো ম্যাক্‌এলিস্টার রেগেমেগে দিব্যি কেটে আমাকে শাসিয়েছিলেন, আমি যদি কোনদিন ভুলেও পশু খামারের গুলির আওতার মধ্যে চলে যাই তবে আমাকে একেবারে ঝাঁঝরা করে ছাড়বেন।

এবার বল্‌ডির দিকে সামান্য ঝুঁকে বলল—বল্‌ডি আমাকে দেখা করার নির্দেশ দিতে গিয়ে সান্টা যে সঙ্কেতচিহ্নটা ব্যবহার করত তা তোমার মনে পড়ছে? একটা হৃদ্‌পিণ্ড যার মাঝখানে একটা ক্রুশ-চিহ্ন আঁকা থাকত?

কালনাগিনীর মত বল্‌ডি ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। সে রীতিমত গর্জে উঠল—ধুত বুড়ো শেয়াল কাহাকার! আমি ভুলে গেছি? না, একটা বর্ণও ভুলি নি। সে চিহ্ন কয়লার সাহায্যে ময়দার বস্তার গায়ে আঁকা হত। খবরের কাগজে আঁকার পেন্সিল ব্যবহার করা হ'ত।

তারপর কি হল বলছি, সান্টার বাবা, হাড়গিলে বুড়োটা মেয়েকে দিয়ে দিব্যি কাটিয়ে নিয়েছিলেন, আমাকে কোনদিনই সে চিঠি লিখবে না অথবা কাউকে দিয়ে আমাকে কোন খবর দেবে না। তাই তো অনেক ভেবে চিন্তে সে সঙ্কেত চিহ্নটা—হৃদ্‌পিণ্ড আর ক্রুশচিহ্নে মতলবটা মাথা খাটিয়ে বের করেছিল।

বাবার এত সতর্কতা সত্ত্বেও তার আমার সঙ্গে মিলিত হবার খুব ইচ্ছে হলে খামারের এমন কোন একটা কিছুর গায়ে সঙ্কেত চিহ্নটা এঁকে রাখত যা আমার চোখে পড়বেই পড়বে। আর আমার চোখে পড়তও।

হ্যাঁ, তোমাদের ব্যাপার স্যাপার আমরা অবশ্যই জানতাম। তবে আমরা কিন্তু ভুলেও তোমাদের পরিকল্পনায় বেগড়া দিতাম না।

এ কথা আমিও নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নিচ্ছি। তারপর কি বলছি শোন—সান্টা যখন রোগের কবলে পড়ে তখনই আমাকে শেষবারের মত সঙ্কেত পাঠায়।

সঙ্কেত চিহ্নটা চোখে পড়ামাত্র আমি সে রাত্রেই পিন্টোর পিঠে চড়ে বসি। তেজী ঘোড়াটা উল্কার বেগে ছুটে আমাকে পিঠে নিয়ে চুয়াল্লিশ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে দিল।

ঘোড়া থেকে নেমে তাদের বাড়ির দরজায় পা দিতেই হাড়গিলে বুড়ো ম্যাক্‌এলিস্টার-এর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে যায়।

আমাকে দেখেই তিনি লেজে পা-পড়া কেউটের মত ফোঁস করে উঠল—হতচ্ছাড়া নচ্ছাড় কোথাকার! তোমার কি মরার শখ নাকি! শোন, এবারের মত আমি তোমাকে ছেড়ে দিলাম। তোমাকে খবর দিয়ে এখানে নিয়ে আসার জন্য এক ম্যাক্সিকানকে তোমার ডেরায় পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলাম। যাক, তুমি নিজে থেকেই যখন এসে পড়েছ, বাড়ির ভেতরে গিয়ে সান্টার সঙ্গে দেখা কর, তাকে দেখে সোজা আমার কাছে চলে আসবে, দেরী করবে না।

সান্টা খুবই অসুস্থ। শয্যাশায়ী।

আমি তার কাছে যেতেই সে আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরল, মুখে ফুটিয়ে তুলল বিশেষ এক ধরনের হাসি।

আমি ধুলো-কাদা-জড়ানো পা দিয়েই তার বিছানায় উঠে বসলাম।

সে ম্লান হেসে বলল—ওয়েব, তুমি যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছ সে শব্দ আমার কানে এসেছে। বিশ্বাস কর, তুমি যে আসবে এ ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম। একটা কথা বল তো, আমার সংকেত চিহ্নটা তোমার নজরে পড়েছিল কি?

হ্যাঁ, চোখে পড়েছিল শিবিরে ঢুকেই আমি সেটা দেখতে পেয়েছিলাম। পিঁয়াজ আর আলুর বস্তার গায়ে সঙ্কেতচিহ্নটা আঁকা ছিল না?

আরে, তারাও তো এক সঙ্গে মিলেমিশে থাকে। তারা সারাটা জীবন ধরে একে অন্যের সঙ্গী।

দেখ, তারা কিন্তু ঝোপের সঙ্গে একেবারে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

আরে, আমি যে হৃদপিণ্ড আর ক্রুশচিহ্নের কথা বলছি, আমাদের সঙ্কেত চিহ্ন কি নির্দেশ করে, আর অর্থই বা কি? অর্থ হচ্ছে ভালবাসা আর দুঃখ-যন্ত্রণা লাভ কর, বুঝলে?

সান্টা এক সময় ঘুমে বিভোর হয়ে পড়ল।

ডাক্তার এলেন। তার কপালে হাত রেখে তিনি বললেন—বিয়ের দাওয়াই হিসেবে তুমি কিন্তু খারাপ নও। এক কাজ কর, তুমি বরং ঘর ছেড়ে বাইরেই চলে যাও।

কেন? এ কথা বলছ কেন?

এ কথা বলার অর্থ রোগের যে লক্ষণ আমি দেখতে পাচ্ছি তাতে তোমার নিয়মিত এখানে আসা এবং অবস্থানের কোন দরকার আছে মনে করছি না। আমি নিঃসন্দেহ যে, ঘুম থেকে জাগলেই সে সুস্থ হয়ে যাবে—স্বাভাবিকতা ফিরে পাবে।

ডাক্তারের পরামর্শে আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। তারপর হাঁটতে হাঁটতে ম্যাকএলিস্টার বুড়োর সঙ্গে দেখা করলাম। তাকে বললাম—সে এখন ঘুমোচ্ছে। আপনি এখন আপনার ছাকনি করার কাজটা আরম্ভ করতে পারেন। একটু দাঁড়ান, ঘোড়ার পিঠের জিনের মধ্যে আমার পিস্তলটা রেখে চলে এসেছি।

ঠোঁটের কেণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে ম্যাকএলিস্টার বুড়ো বলল—পশ্চিম টেক্সাসের পশু-খামারের কাজের জন্য তোমার মত একজন কর্মঠ ও দায়িত্বশীল ছেলে আমার দরকার। কিন্তু কোথায় বা যাব। একাজের জন্য উপযুক্ত লোক হচ্ছে একটা জামাই।

আমি আগ্রহান্বিত হয়ে বললাম—তাই বুঝি?

হ্যাঁ, তবে তোমাকে আমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার ইচ্ছা আমার আদৌ নেই।

মুহূর্তের জন্য ভেবে সে আবার বলল—তোমাকে অবশ্য নেপোলিটোর কাজটা দিতে পারি, তবে একটা শর্তে।

শর্ত? কি সে শর্ত, দয়া করে বলবেন কি?

শর্তটা হচ্ছে, তোমাকে পশু-খামারের সঙ্গে বেশ কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে থাকতে হবে, রাজি?

আমি মুখ খোলার আগেই সে আবার বলতে আরম্ভ করল—শোন, এখনকার মত দোতলায় গিয়ে একটা খাটিয়ায় শুয়ে পড় গে। ঘুম থেকে ওঠার পর বিয়ের কথা আলোচনা করা যাবে, বুঝলে?

বল্‌ডি উড আর ওয়েব ঘোড়া হাঁকিয়ে চলেছে। পশ্চিমী কায়দায় তারা করমর্দন সারল।

ওয়েব এবার বল্‌ডির কাছ থেকে খুশি মনে বিদায় নিল। যাবার সময় জানিয়ে গেল, তার সঙ্গে দেখা ও কথাবার্তা হওয়ায় সে খুবই খুশি হয়েছে।

এবার তারা পরস্পরের বিপরীত দিকে ঘোড়া হাঁকিয়ে দিল। দূর থেকে বাতাস-বাহিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল শোন আমি যদি তুমি হতাম তবে আমি রাজা বনে যেতাম।

বাড টার্নার পরদিন সকাল আটটায় নেপালিটোর খামার বাড়ির সামনে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল।

সেদিন সকালেই যে গরুর পালটাকে সান্ এন্টোনিওতে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল সে গরুর পালটার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিল বাড। মিসেস ইয়েগার তখন এক ঝাড় হায়াসিন্ত ফুলে জল দিচ্ছিল। আর কাজের ফাঁকে খামার থেকে-আসা দু'-তিন জন উপ-মালিককে বিভিন্ন নির্দেশ দিচ্ছিল।

বার্ড নমস্কার জানিয়ে বলল—এ গরুর পালকে শহরে কার কাছে পাঠাতে চাইছ, বল তো? ওই সেই বারবার-এর কাছেই কি?

এ পরিস্থিতিতে এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, কাজের নির্দেশাদি দান করার ক্ষমতা কেবলমাত্র রানীর হাতেই রয়েছে। ব্যাঙ্কের যাবতীয় কাজকর্ম, কেনাকাটা আর বিক্রির যাবতীয় দায়িত্ব রানী নিজের হাতের মুঠোয় রেখে দিয়েছে। রাজা ম্যাকএলিস্টার-এর রাজত্বকালে তার সচিবের পদে বহাল ছিল। সে কর্তব্যনিষ্ঠা এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে খুবই লাভজনকভাবেই কাজটা সম্পন্ন করেছে। কিন্তু সে মুখে কিছু বলার আগেই জামাই-রাজা স্বাভাবিক কণ্ঠেই বলল—'নেস্‌বিট ও জিমারম্যান-এর খোয়াড়ে এগুলোকে নিয়ে যাও। জিমারম্যান-এর সঙ্গে আমি এ ব্যাপারে আগেই কথা বলে রেখেছি।

সান্টা সঙ্গে সঙ্গে তাকে ডেকে বলল—শোন, তুমি কি বলতে চাইছ ওয়েব? নেস্‌বিট আর জিমারম্যান-এর সঙ্গে কোনদিন আমার লেন-দেন হয় নি। এ খামারের মাল তো পাঁচ বছর ধরেই তো তারা কেনা-বেচা করছে। তার সঙ্গে ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়ার ইচ্ছা আমার আদৌ নেই। এবার সে বার্ড টার্নার-এর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল—গরুর পালকে নিয়ে গিয়ে সরাসরি তার হাতে তুলে দিও।

ওয়েব বলল—আমার ইচ্ছা, এ গরুর পালকে নেসবিট আর জিমারম্যান-এর কাছেই পাঠিয়ে দেওয়া হোক। বেশী দেরী করা ঠিক হবে না।

সান্টা এবার বেশ একটু রাগত স্বরেই বলল—ধ্যুৎ! যত্তসব অবান্তর কথা। বাড, তুমি আর দেরী না করে, এখনই যাত্রা কর। দেরী করলে সময়মত পৌঁছতে পারবে না। আর এক মাসের মধ্যেই আমরা আর এক পাল গরু তৈরী করে ফেলব, বারবার'কে মনে করে বোলো।

এ গরুর পালটাকে তুমি বারবার-এর হাতে জমা দেবে।

এবার সান্টা বলল—হ্যাঁ, তাই করবে। এর ওপরে আর কথা নেই। তবে আর তুমি মিছে দেরী কোরো না। এখনই রওনা হয়ে যাও।

সান্টা এবার ধমকের সুরেই বলল—আজ তুমি কেমন যেন বোকার মত ব্যবহার করছ।

বোকা? নিরেট বোকা। এ ছাড়া আর কি-ই বা তুমি প্রত্যাশা। করতে পার? আরে, পশু-রানী বিয়ে করার আগে পর্যন্ত আমি একটা সত্যিকারের মানুষ ছিলাম। আর আজ? আজ আমি একজন রসিকতার পাত্রে পরিণত হয়েছি। আমি চাই, আবার আগেকার মত সত্যিকারের মানুষ হতে।

'ওয়েব, অবুঝের মত কথা বোলো না'—সান্টা এবার শান্ত গলায়ই বলল—একটা কথা সত্যি করে বল তো, গরু-মোষের বিলি-বণ্টনের ব্যাপারে আমি কোন দিন তোমার কাজে নাক গলাই? এ শিক্ষাটা আমার বাবার কাছ থেকেই আমি পেয়েছিলাম। আমাকে, আমার মনোভাবকে একটু নিরপেক্ষভাবে বিচার করে দেখ।

আমার সাফ কথা শোন, আমার নিজের যদি কোন স্বাধীনতা না-ই থাকে তবে এরকম রাজা-রানী খেলার আদৌ আমার ইচ্ছা নেই। তুমি মাথায় মুকুট পরে রানী সেজে বসে থাক, আর আমি গরু-ছাগলের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকি। ঠিক আছে। খামারের মালিক যখন তুমি তখন তোমার ইচ্ছানুযায়ী বারবারই গরুগুলো পাক, আমার আপত্তি নেই।

ওয়েব বাড়ির ভেতর থেকে আগেভাগে বেঁধে-রাখা বিছানার গাট্টিটা বের করে আনল। এর আগে দূরে কোথাও গেলে এটাকে সে সঙ্গে নেয় না। ঘোড়ার পিঠের জিনের সঙ্গে সে জিনিসপত্রগুলো বেঁধে নিল।

ঘোড়ার পিঠে দরকারী জিনিসপত্র বেঁধে ছেঁদে ওয়েব এক লাফে ঘোড়ার পিঠে চেপে বসল।

ঘোড়ার পিঠে বসেই ওয়েব গম্ভীর মুখে বলল—দূরের জলাশয়ের ধারে এক পাল গরু-বাছুর আছে। তাদের অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে রাখতে হবে। আর একটা কথা, লোবোস তিনটে বাছুরকে

খতম করে দিয়েছে। সেগুলোকে যেন সরিয়ে ফেলা হয় কথাটা বলতে আমি ভুলে গেছি। বলে দিও। এক কাজ কোরো, গরু-বাছুরগুলোর পরিচর্যার ভার বরং সিমস্-এর ওপর দিও, ভাল হবে।

সান্টা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—ওয়েব, তুমি আমাকে চিরদিনের মত ছেড়ে চলে যাচ্ছ?

আগেকার মত সত্যিকারের একজন মানুষ হবার জন্য যাচ্ছি।

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তোমার প্রয়াস সার্থকতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক। কথাটা কোনরকমে ছুঁড়ে দিয়েই সে গম্ভীর মুখে ঘরে ঢুকে গেল।

ওয়েব ঘোড়া ছুটিয়ে পশ্চিম টেক্সাসের শেষ প্রান্তে হাজির হল। রাস্তাঘাট পরিচিত হলে সে হয়ত নীল আকাশটা যেখানে নেমে এসে পৃথিবীর সঙ্গে মিশেছে সে পর্যন্তই চলে যেত।

ওয়েব থামল না। অনবরত ঘোড়া ছুটিয়েই চলল।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে গেল। ওয়েব আর রানীর কাছে ফিরে এল না।

একদিন নেপোলিটোর পশু-খামারে বার্থালোসিও নামক এক মেষ পালক ঘোড়ায় চড়ে হাজির হল।

দীর্ঘপথ পাড়ি দেওয়ায় সে ক্লান্ত। খিদেও পেয়েছে। সে রানীর পশু-খামারে আতিথ্য গ্রহণ করল। আহারদি সারল। খাবার টেবিলে বসে বলল—মিসেস ইয়েগার, হিডালগো জেলার অন্তর্গত সেকো পশু-খামারের একটা লোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। ওয়েব ইয়েগার তার নাম। বর্তমানে সে খামারটার ম্যানেজারের দায়িত্ব পেয়েছে। লম্বা ছিপছিপে গড়ন। মাথার চুল পাতলা। কথা কম বলে। আপনার নামটা শুনে মনে হচ্ছে, আপনার সঙ্গে তার আত্মীয়তা আছে। এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি?

সান্টা ইয়েগার নির্দ্ধিধায় বলল—তিনি আমার স্বামী। তিনি পশ্চিমের একজন নামকরা পশুপালক। সেকো পশুখামারের কাজকর্ম তবে ভালই চলছে, কি বলেন?

এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে আলোচনা আর বেশীদূরে অগ্রসর হল না।

নেপোলিটোর খামারে বছর কয়েক যাবৎ পশু-প্রজননের এক নতুন পদ্ধতির ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হচ্ছে।

নতুন প্রজাতির প্রাণীগুলো টেকসাসের লম্বা লেজযুক্ত গরুগুলোর তুলনায় একটু উচ্চস্তরের বলেই বিবেচিত হয়। তাদের জন্য পৃথক চারণভূমির ব্যবস্থাও করা হল। তাদের খ্যাতির কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

এক কর্মঠ ও বেপরোয়া যুবক একদিন তিনটে মেক্সিকান গো-পালককে সঙ্গে করে, কোমরে পিস্তল ঝুলিয়ে এক যুবক নেপোলিটোর পশু-খামারের সামনে ঘোড়া থেকে নামল।

ঘোড়া থেকে নেমে যুবকটা সোজা খামার-বাড়িতে ঢুকে সেখানকার রানীর সঙ্গে দেখা করল। তার হাতে একটা ব্যবসায়িক চিঠি তুলে দিল। চিঠিটার শিরোনামা—মিসেস ইয়েগার, নেপোলিটো পশু-খামার।

ওয়েবস্টাব ইয়েগার-এর লেখা চিঠি। চিঠিটার বক্তব্য মোটামুটি এরকম—সে সেকো পশু-খামারের মালিকের নির্দেশ অনুসারে তার খামারের সাসেক্স প্রজাতির দু'-তিন বছর বয়স্ক একশ'টা গরু কিনতে আগ্রহী। সে যদি তার চাহিদা পূরণ করতে পারে তবে যেন পত্রবাহকের হাতে পশুগুলোকে তুলে দেয়। সে গুলোকে মূল্য বাবদ তার নামে সঙ্গে একটা চেক দেওয়া হবে।

চিঠিটার শেষে সেকো পশু-খামারের ম্যানেজার ওয়েবস্টার ইয়েগার-এর নাম স্বাক্ষর করা রয়েছে।

সব রাজ্যেই, সবার ক্ষেত্রেই ব্যবসা সর্বদাই ব্যবসা। পরদিন সকালে তাকে দেওয়ার জন্য সে রাত্রেই একশ'টা গবাদি পশুকে খামার-বাড়ির লাগোয়া একটা খোয়াড়ে আটকে রাখা হল।

ক্রমে রাত্রি গভীর হল। সান্টা ইয়েগার্‌কি তখন বিছানায় শুয়ে সে চিঠিটা বুকে নিয়ে তার নামটা উচ্চারণ করে করে কেঁদে চলল? আত্মম্ভরিতাবশত বহুদিন তার নামটাই সে মুখে উচ্চারণ করে নি। তারপর চোখের জল মুছতে মুছতে সে চিঠিটাকে ফাইলে রেখে দিল।

প্রায় মাঝ-রাত্রি পর্যন্ত নির্ঘুম অবস্থায় কাটিয়ে সান্টা বিছানা ছেড়ে নেমে এল। নিঃশব্দে খামার-বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। মিনিট খানেক জন্য সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মুখ

করে দাঁড়াল। সে দিকে তাকিয়ে বার-বার চুম্বন দিল। তার মনের ব্যথা, অসহায় অবস্থাটা দেখার মত সেখানেই কেউ-ই তখন ছিল না।

এবার সে আগের মতই নিঃশব্দে পা টিপে টিপে কামারশালায় ঢুকল। সেখানে সে কি করল তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে।

হাপরটা বারকয়েক ফোঁস ফোঁস করল। তারপরই শোনা গেল হাতুড়ির গম্ভীর শব্দ।

মিনিট-কয়েক বাদেই সে বিচিত্র আকৃতি বিশিষ্ট হাতলযুক্ত একটা বস্তু হাতে সে কামারশালা থেকে বেরিয়ে গেল। আর অন্য হাতে একটা ছোট জ্বলন্ত আগুনের মালসাকে শক্ত করে ধরে নিল।

যেখানে সাসেক্স প্রজাতির বাছুরগুলোকে রাখা আছে সে খোয়াড়ে সে গুটিগুটি ঢুকে গেল।

খোয়াড়ে ঢুকে গাঢ় লাল রঙের বাছুরগুলোর মধ্যে সে ধবধবে সাদা একটা বাছুর দেখতে পেল। সাসেক্স বাছুরগুলোর রঙ গাঢ় লাল হয়ে থাকে। কিন্তু একটা মাত্র বাছুর সাদা রঙের হওয়ায় সেটা সহজেই নজরে পড়ে গেল।

আমরা ইতিপূর্বে দেখিনি এমন একটা বস্তু সান্টা কাঁধ থেকে নামাল। ফাঁসওয়ালা একটা লাসো দড়ি। সে ব্যস্ত হাতে ফাঁসটাকে খুলে ফেলল। তারপর দড়িটাকে গুটিয়ে বঁ-হাতে নিয়ে নিল। তারপর বাছুরগুলোর ভিড়ে ঢুকে গেল।

সান্টা সাদা বাছুরটাকে লক্ষ্য করে হাতের লাসোটাকে ছুঁড়ে দিল। সেটা একটা শিং-এ জড়িয়েই ফস্কে গেল। দড়িটাকে গুটিয়ে আবার নতুন করে ছোঁড়ামাত্র লাসোটা তার সামনের পায়ে জড়িয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাছুরটা মাটিতে পড়ে গেল। সান্টা বাঘিনীর মত তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু তেজী বাছুরটা কোন রকমে উঠেই সজোরে এক ধাক্কা দিয়ে তাকে মাটিতে ফেলে দিল।

সান্টা কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়েই আবার লাসোটাকে ছুঁড়ে দিল। সাদা বাছুরটা তখন অস্থিরভাবে লাফালাফি ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছে। লাসোটা এবার বাছুরটার পায়ে কায়দা মত আটকে গেছে। বাছুরটা আবার ধপাস্ করে মাটিতে পড়ে গেল। সান্টা এবার ঝট্ করে দড়িটাকে খোঁয়াড়ের একটা খুঁটির সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে ফেলল। সে আবার খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগিয়ে গিয়ে বাছুরটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কোন রকমে তাকে বাগে আনতে পারল।

মুহূর্তের মধ্যেই বাছুরটার পা চারটে বেঁধে ফেলতে পারল। কাজ সেরে সামান্য পিছিয়ে খোয়াড়ের বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে ঘন ঘন শ্বাস ফেলতে লাগল।

পর মুহূর্তেই সদর-দরজার কাছে বঞ্চিত জ্বলন্ত আগুনের মালসাটার কাছে সেখান থেকে গরম, টকটকে লাল গরু-দাগানো ইস্ত্রিটা নিয়ে এল।

গরম ইস্ত্রিটা দিয়ে যখন সাদা বাছুরটার দাগানোর কাজ চলছে তখন সেটা গলা ছেড়ে এমন তীব্র আর্তনাদ করতে লাগল যে, তাতে নেপোলিটোর ঘুমন্ত মানুষগুলোর ঘুম চটে গিয়ে শিউরে ওঠার কথা। আসলে কিন্তু তা ঘটল না।

কাজ সেরে সান্টা আগের মতই নিঃশব্দে খামার-বাড়িতে গিয়ে ঢুকল। একটা খাটিয়ার ওপর সে ধপাস্ করে পড়ে গেল। তারপর উপুড় হয়ে শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। তার কান্না দেখে মনে হল, খামারের অন্য সব বধূর মতই রাণীর মনটাও বুঝি একই বস্তু দিয়ে ঘেরা।

আর পাহাড়-পর্বত অতিক্রম করে যদি জামাইরাজা আবার ফিরে আসে তবে সে রাজার মতই তাকে সাদরে বরণ করে নেবে। সে শুয়ে শুয়ে কেঁদেই চলল।

ভোরের আলো ফুটে উঠতেই কর্মঠ পিস্তলধারী যুবক তার অনুগত সঙ্গী সাথীদের নিয়ে সাসেক্স প্রজাতির বাছুরগুলোকের নিয়ে সাকো-খামারের দিকে এগোতে লাগল।

এক সন্ধ্যায় বাছুরগুলোকে নিয়ে যুবক ও তার সহকর্মীরা বাছুরগুলোকে নিয়ে খামার-বড়িতে উপস্থিত হল।

খামারের ফোরম্যান তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে সদ্য নিয়ে-আসা বাছুরগুলোকে গুণে মিলিয়ে নিল।

সকাল হলে অদ্ভুত একটা কাণ্ড ঘটে গেল। সকাল আটটা নাগাদ অদূরবর্তী ঝোপঝাড় ঠেলে এক অশ্বাসেই ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দেহে নোপালিটো খামার-বাড়িতে ঢুকল। সে ঘরে পা দেওয়ামাত্র দুটো হাত তার গলাটা জড়িয়ে ধরল। আবেগ-মধুর স্বরে উচ্চারিত হল—ওয়েব। ওয়েব।

ওয়েব ইয়েগার বলল—আমি একটা নীচ ভোঁদড় ছাড়া কিছু নয়।

সান্টা তার হাত দিয়ে ঝট করে চেপে ধরে বলে উঠল—না, এমন করে বোলো না গো! চুপ কর। চুপ্‌টি করে বোসো। আগে একটু জিরিয়ে নাও। তারপর সব কথা হবে।

মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে সান্টা বলল—একটা কথা, ওটা কি তোমার নজরে পড়েছিল?

হ্যাঁ। দেখতে পেয়েছিলাম। ওয়েব জবাব দিল।

তুমি পশুরানীর আসনেই অধিষ্টান করে থাক। আর যদি পার তবে সে ব্যাপারটাকে মন থেকে মুছে ফেলো।

কেন যে বার বার রানী সম্বোধনটা করে আমাকে শুধু শুধু লজ্জা দাও, বুঝতে পারি না। আমি চিরকাল তোমার স্ত্রী—তোমার প্রিয়তমা সান্টার ইয়েগার হয়েই থাকতে চাই, থাকবও তা-ই।

কথা বলতে বলতে সান্টা তার স্বামীর হাত ধরে ঘরের ভেতরে নিয়ে গেল। সেখানে দোলনার ওপর একটা শিশু হাত-পা নেড়েচেড়ে খেলা করছে। সুদর্শন উলঙ্গ একটা শিশু।

সান্টা আবেগ-মধুর স্বরে বলল—শোন, এ খামার-বাড়িতে কোন রানী থাকে না। তবে এই হচ্ছে রাজা। ভাল করে তাকিয়ে দেখ ওয়েব, তোমার চোখ দুটো যেন এর কোটরে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বাড টার্নার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলল—গরুগুলোকে খামার থেকে বের করেছি। তাদের কি বারবার-এর কাছে নিয়ে যাব?

ওয়েব, এক বছর আগেকার মতই মুচকি হেসে বলল—বাড, তুমি বরং তোমার মালকিনকেই জিজ্ঞেস কর।

এদিকে সেকো খামারের মালিক বুড়ো কুইন নেপোলিটা খামার থেকে সদ্য কিনে আনা সাসেক্স বাছুরগুলোকে দেখতে পেল।

সাসেক্স বাছুরগুলোকে দেখতে দেখতে সে নতুন ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করল—উইলসন, নেপোলিটো খামারের ট্রেড মার্কটা কি, বলতে পার?

'–X/Y'

হ্যাঁ, আমারও তা-ই জানা ছিল। কিন্তু এই সাদা বাছুরটার পিঠে অন্য আর একটা ট্রেড মার্ক আঁকা আছে। লক্ষ্য কর, ট্রেড মার্কটা একটা হৃদপিণ্ডের মধ্যে একটা ক্রুশ-চিহ্ন। এটা তবে কোন্ ব্র্যান্ড বলতে পার?

উইলসন ক্রুশ-চিহ্নটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে আমতা আমতা করতে লাগল।

দ্য হ্যান্ডবুক অব হাইসেন

স্যান্ডারসন প্রাট, আমার মত যদি জানতে চাও তবে আমি বলব, আবহাওয়া দপ্তরে নিয়ন্ত্রণাধীনই যুক্তরাষ্ট্রে শাসন ব্যবস্থা থাকা দরকার। এর সমর্থনে আমি তোমাকে যুক্তিও দেখাতে পারি। আর আমাদের কলেজের সব অধ্যাপককে কেন আবহাওয়া দপ্তরে বদলি করা হবে না তা-ও তোমার জানা নেই।

অধ্যাপকরা সব পড়াশুনা জানা লোক। তাঁরা অনায়াসেই সকালের খবরের কাগজ পড়েই টেলিগ্রাম করে প্রধান কার্যালয়ে জানিয়ে দিতে পারে—সেদিনের আবহাওয়া কেমন যাবে বলে তারা মনে করেন।

আবহাওয়া ইডাহো গ্রীণ আর আমাকে কিভাবে মনোজ্ঞ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেছিল তা তোমাকে আমি এখনই বলে দিতে পারব।

আমরা সে বার সোনার খনির তল্লাস করতে করতে মন্টানার সোজা বিটার রুট পর্বতমালায় উঠে গিয়েছিলাম। চাপ দাড়িওয়ালা একজন আমাদের আগেই সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল। আর তারা খনির অন্ধিসন্ধি বের করার জন্য জোর তৎপরতাও চালাতে আরম্ভ করেছিল।

কল্লোল থেকে এক ডাক-হরকরা একদিন সে পাহাড়ে এল। সে একটা জায়গায় বসে তিন-তিনটে টিনভর্তি কাঁচা সব্জি খেল, খাবার সময় তখনকারই এক তারিখেরই একটা খবরের কাগজ আমাদের দিয়ে গেল। তাতে আবহাওয়ার পূর্বাভাষ ছাপা হয়। তাতে বিটার রুট পর্বতমালার আবহাওয়া সম্বন্ধে ছাপা ছিল—আবহাওয়া গরম আর মোটামুটি ভাল থাকবে। আর সামান্য পশ্চিমী হাওয়া প্রবাহিত হবে।

কিন্তু সেদিন সন্ধ্যা হতে না হতেই বরফ পড়তে শুরু হয়ে যায়। ফলে কনকনে ঠাণ্ডা পড়ে। আর প্রবল বেগে পূবালী হওয়া প্রবাহিত হতে থাকে।

ব্যাপার দেখে ইডানো আর আমি ভাবলাম, এটা নিছকই একটা দমকা বাতাস। তাই পাহাড়ের ওপরের একটা খালি কামরায় আমাদের শিবিরটাকে স্থানান্তরিত করলাম।

কিন্তু মাটির ওপরে তিন ফুট উঁচু হয়ে বরফ জমার পরও সে প্রবল হাওয়াটা সমান তালেই বয়ে চলল।

আমাদের বুঝতে অসুবিধে হল না, বরফ আমাদের ঘিরে ফেলেছে, বরফের কারাগারে বন্দী হয়ে পড়েছি।

বরফ আরও উঁচু হয়ে জমার আগেই আমরা ব্যস্ত হয়ে কিছু জ্বালানি কাঠ যোগাড় করে ফেললাম। আর আমাদের সঙ্গে দু'মাসের মত খাবার দাবারও ছিল। অতএব প্রকৃতি আমাদের যতই রক্তচক্ষু দেখাক না কেন আমাদের দুশ্চিন্তার কিছুই ছিল না। বিরুদ্ধ প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করার মানসিকতা নিয়ে আমরা তৈরী হতে লাগলাম।

আপনাদের যদি মানুষ খুন করার মত মতলব থাকে তবে কুড়ি ফুট লম্বা একটা আঠারো ফুট চওড়া একটু কামরায় দুটো মানুষকে এক মাস আটকে রাখুন। মানুষের প্রকৃতির পক্ষে সেটা বরদাস্ত করতে সম্ভব হবে না।

বরফের ইয়া বড় বড় টুকরো যখন পড়তে শুরু করল তখন সেগুলোকে নিয়ে আমি আর ইডাহো নানাভাবে রসিকতা করতে শুরু করলাম। আর রান্নার পাত্র থেকে যে বস্তাটা বের করলাম তাকে রুটি মনে করে কিছু স্তুতি করতেও ভুললাম না।

কিন্তু তিন সপ্তাহ হতে না হতেই ব্যাপারটা নিয়ে ইডাহো আর আমার মধ্যে তুমুল তর্কাতর্কি শুরু হয়ে গেল। কেবলমাত্র হাতাহাতি হতে বাকি রইল।

ইডাহো রেগে মেগে বলে উঠল—তুমি যা-ই বল না কেন, আমি বাপের জন্মেও শুনিনি কি দুধ একটা বেলুন থেকে এভাবে পড়ে পড়ে একটা টিনের পাত্রে জমতে পারে।

আমিও রীতিমত দৃঢ়তার সঙ্গেই বললাম—মিঃ গ্রীন, আপনি আমার বন্ধু ছিলেন কথাটা সত্যি বটে। কিন্তু এখন আমি খুবই সঙ্কোচের সঙ্গে আপনাকে বলছি, মানে স্বীকার করছি যে, আপনার যদি সুযোগ থাকে আমাকে এবং তিন-পেয়ে একটা লোমশ জন্তুর মধ্যে একজনকে বেছে নেবার মত সুযোগ দেওয়া হয় তবে এ মুহূর্তে এ কামরাটার মধ্যে অন্য বাসিন্দাটা বসে পরমানন্দে লেজ নাড়তে আরম্ভ করত।

এরকম কথাকাটাকাটির মধ্যে দু'-দিন পেরিয়ে গেল। ব্যস, তারপরই উভয়ের মধ্যে বাক্যালাপ, এমন কি মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল।

আমরা রান্নাবান্নার ব্যাপার স্যাপারও আলাদা করে নিলাম।

উনুনের এক পাশে বসে ইডাহো রান্না সারে, আর অন্যধারে।

তখন কামরার বাইরে বরফ জমতে জমতে জানালা পর্যন্ত উঠে গেছে। তাই নিতান্ত নিরুপায় হয়েই দিনভর আগুন জ্বালিয়ে রাখতে হয়।

সত্যি কথা বলতে কি কোনরকমে কাজ চালিয়ে নেবার মত শিক্ষাদীক্ষা আমার ইডাহোর ছিল না। জীবনে বেঁচেবর্তে থাকার মত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীরও যে তেমন দরকার আছে তা আমরা কেউ-ই অনুভব করি নি। আর তার জন্য আমরা কোনদিন ঠেকিওনি। কিন্তু পাহাড়ের

ওপরে বরফ-ঘেরা একটা কামরায় আটকা পড়ে থাকার সময়ই আমরা প্রথমে উপলব্ধি করলাম, হোমার বা গ্রীক সাহিত্যের মত অন্য কিছু যদি রপ্ত করা থাকত অথবা জ্ঞান-বিজ্ঞানের উচ্চতর শাখা সম্বন্ধে কিছু জ্ঞানগম্যি থাকত তবে নিজেদের মধ্যে চিন্তা ভাবনা করার মত বিষয়-বস্তুর অভাব হত না।

এক সকালে ইডাহো লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ওপরের তাক থেকে কিছু একটা পাড়তে লাগল। ব্যস, লাঠিটার খোঁচায় উপর থেকে দুটো বই তাক থেকে দুম্ করে মেঝেতে পড়ে গেল। সে বই দুটো তোলার জন্য নিচু হতেই আমাদের পরস্পরের চোখে চোখ পড়ে গেল।

পুরো একটা সপ্তাহের মধ্যে সে এই প্রথমবার আমাকে লক্ষ্য করে মুখ খুলল—দেখো, তোমার হাতটা যেন আবার পুড়িও না।

আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকালাম।

সে বলে চলল—যদিও তুমি কেবলমাত্র কাছিমের হবারই যোগ্যপাত্র। তা সত্ত্বেও আমি তোমার সঙ্গে সোজা হাতেই খেলতে আগ্রহী। তোমার বাবা-মা তোমাকে ঝুমঝুমি সাপের সামাজিকতা আর শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়ে, এক বরফ চাপা পড়া ফুলের মত শয্যাসঙ্গিনী করে এ বিশাল পৃথিবীতে ছেড়ে দিয়েছিলেন তার চেয়ে কিছু অন্তত সুব্যবহার আমি তোমার সঙ্গে করব। সাত ঘরের একটা খেলা আমি তোমার সঙ্গে খেলব মনস্থ করেছি। খেলায় যে জয়ী হবে সে তার পছন্দ মাফিক একটা বই আর যে হারবে সে পাবে অন্য বইটা।

আমরা খেলতে বসলাম। দীর্ঘসময় ধরে খেলার পর ইডাহো জয়ী হল। সে তার পছন্দ মাফিক বইটা তুলে নিল। আমার বরাতে জুটল অন্য বইটা—হাতে তুলে নিলাম। ব্যস, কামরার যার যার অংশে বসে পরস্পরের দিকে পিছন ফিরে পড়তে আরম্ভ করে দিলাম।

স্বীকার না করে উপায় নেই, বইটা পড়ে আমি যতটা আনন্দিত হলাম তার বিনিময়ে দশ ভরি সোনা কেউ আমার হাতে গুঁজে দিলেও ততটা খুশি হতাম না।

আমার বইটা ছিল ছোট্ট একটা বই—দু' ইঞ্চি লম্বা আর চওড়া পাঁচ ইঞ্চি। হারকিসার-এর লেখা, অপরিহার্য তথ্যের সংক্ষিপ্ত—সারকথা।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার ভুলও হতে পারে—এমন ভাল বই এর আগে আর একটাও লেখা হয় নি।

বহুমূল্য বইটা আজই আমি পেয়েছি। তবে এতে যেসব তথ্যের উল্লেখ আছে তার মাধ্যমে আমি আপনাকে বা অন্য যে কোন ব্যক্তিকে অন্তত পঞ্চাশবার পরাজিত করতে পারব। সলোমন বা নিউইয়র্ক 'ট্রিবিউন'—যার কথাই বলুন। এদের উভয়ের কথাই হারকিসার বইতে বহুবার বহুভাবে উল্লেখ আছে। ভদ্রলোককে সে সব ঘটনা সংগ্রহ করতে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে লক্ষ লক্ষ মাইল ঘুরে বেড়াতে হয়েছে।

বইটাতে যা-যা পাওয়া যাবে সেগুলোর মধ্যে সব নগরের লোকসংখ্যা, একটা মেয়ের বয়স বাৎলে দেবার উপায়, জল বসন্ত উঠতে কতদিন লাগে, আকাশের তারার সংখ্যা, একটা উটের দাঁতের সংখ্যা কত, লাট সাহেবের ভোটের অধিকার কত, পৃথিবীর দীর্ঘতম সেতু কোন্‌টা রোম সাম্রাজ্যের সয়োনালি কত পুরনো, এক সুদর্শন মহিলার মাথার চুলের সংখ্যা কত, বিষের প্রতিষেধক হিসাবে কোন্ বস্তু ব্যবহার করা হয়, পৃথিবীর বড় বড় পাহাড়গুলোর উচ্চতা কত, ডিম সংরক্ষণের উপায় কি, সর্দিগর্মির প্রাথমিক চিকিৎসা কি, জলে ডুবে যাওয়া মানুষের নিরাময়ের উপায় কি, ফুল ও ফলের চারা তৈরীর উপায় কি, ডিনামাইট তৈরীর পদ্ধতি কি, রোগীর কাছে ডাক্তার আসার আগে কি কি করা বিধেয়—এরকম হাজারো প্রশ্নের মীমাংসা হারকিসা-র বইতে আছে। উপরোক্ত মীমাংসাগুলো ছাড়া আর কিছু যদি থেকেও থাকে তাদের অভাব আমার মাথায়ই আসে নি।

আমি চার-চারটে ঘণ্টা বইটার ওপর মুখ গুঁজে বসে রইলাম। পড়তে পড়তে বুঝতে পারলাম, বইটা শিক্ষণীয় বিষয়ে ভরপুর।

বরফের কারাগারে যে আমি বন্দী আর ইডাহোর সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদের কথা আমার মাথা থেকে উবে গেছে।

ইডাহোও আমার দশাই প্রাপ্ত হয়েছে। দেখলাম, একটা টুলে বসে সে-ও তন্ময় হয়ে বইটার মধ্যে ডুবে রয়েছে। শুধু কি এই? তার চোখে মুখেও রীতিমত খুশির ঝিলিক খেলে চলেছে।

আমি ঘাড় ঘুরিয়ে বললাম—তোমার বইটা কেমন, বল তো ইডাহো?

ইডাহো সহজ সুরেই আমার কথার জবাব দিল। আমার সঙ্গে যে ঝগড়া চলছিল সেটা নির্ঘাৎ সে ভুলে গেছে। সে বলল—বইটা কেমন তা-তো আর বলার দরকার নেই। আরে, এটা যে হোমার কে. এস-এর লেখা।

আমি চোখের তারায় জিজ্ঞাসার ছাপ এঁকে বললাম—হোমার কে. এস? তিনি আবার কে, বল তো?

আমার প্রশ্নের জবাবে সে বলল—হোমার কে. এস ; ব্যস, এ-ই তো।

ইডাহো চাতুরি করছে ভেবে আমি ধমকের স্বরেই বললাম—তুমি তো একটা মহা ধাপ্পাবাজ হে! কোন লেখক কি কোনদিন তাঁর বইতে কেবলমাত্র নামের আদ্যক্ষর ব্যবহার করেন নাকি? যদি হোমার কে. এস. সপুপেন্‌ডাইক, হোমার কে. এস. জেনিস বা হোমার কে এস. জ্যাকসুইনি হ'ত তবে কোন মানুষের মত পুরো নামটা ব্যবহার না করে একটা বাছুর যেমন জামার কেবলমাত্র লেজটা চিবিয়ে খায় সেরকম তুমিই বা কেবলমাত্র নামের আধখানা ধরে কামড়া কামড়ি করছ কেন?

ঠাণ্ডা গলায়ই ইডাহো বলল—দেখ, আমি যা বুঝেছি তোমার কাছে ঠিক তেমনই বললাম। আমি আবারও বলছি এটা হোমার কে. এস-এর লেখা একটা কবিতার বই। তবে স্বীকার করতে হয় গোড়ার দিকটায় আমি বইটা পড়ে তেমন রসকষ পাইনি বটে। কিন্তু কয়েক পাতা পড়েই রসাস্বাদন সম্ভব হল। তারপর তো আমি এমন মজে গেছি যে একটা লাল কম্বলের বিনিময়েই আমি বইটা বে-হাত করতে পারব না।

ধ্যুৎ। তুমি ওটা নিয়েই পড়ে থাক গে। আমি নিরপেক্ষ ঘটনার বিবরণ জানতে আগ্রহী। আর চাই তথ্য, যা আমার মনের খোরাক জোগাবে। সেটা আমার বাছাই-করা বইটা থেকে পুরোপুরি পেয়ে গেছি।

আরে, তোমার বইটা থেকে যা পেয়েছি সেটা তো সংখ্যাতত্ত্ব ছাড়া কিছু নয়। আর তথ্য যত রকম আছে তার মধ্যে এটা নিকৃষ্টতম। এটা পড়লে তোমার মনটাই বিষিয়ে উঠবে। কবিতা। হ্যাঁ, আমার দরকার কবিতা, সরস কবিতা। আরে ধ্যুৎ! গজ-ফুট-ইঞ্চি—না বাপ, তোমার ওই পরিমাপের ব্যাপার স্যাপার নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার তিলমাত্র ইচ্ছাও আমার নেই। অতএব তুমি যা-ই কর না কেন সংখ্যাতত্ত্বের ব্যাপার স্যাপারের প্রতি আগ্রহ আমার নেই।

এরকম একটা পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে ইডাহো আর আমার দিন কাটতে লাগল। আনন্দের মধ্যে যা কিছু কথাবার্তা আর উত্তেজনার ঝড় বয়ে যেতে লাগল সবই ওই বই দুটোই বিষয়বস্তু নিয়ে। তুষারপাতের কল্যাণে আমরা দু'জনই যেন জীবনের একটা নতুন দিকের স্বাদে নিজেদের ভরে তুলতে লাগলাম।

আমরা কোন রকমে সে বসন্তকালটার শেষের দিক পর্যন্ত সেখানে কাটিয়ে সেখান থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে নিলাম। আমরা নিজেদের তৈরী সেভাবেই করেছিলাম, কিভাবে ঝটপট কাজ মিটিয়ে নেওয়া যায় তারপর তেমনই দ্রুততার সঙ্গে পথে নেমে পড়া যায়।

আমাদের যাবতীয় মালপত্র নগদ আট হাজার ডলারের বিনিময়ে বিক্রি করে দিলাম।

আমাদের যাবতীয় জিনিসপত্র বিক্রি করে দেবার পর আমরা পথে নামলাম। পথ চলতে চলতে শেষ পর্যন্ত সলমন নদীর তীরবর্তী ছোট্ট শহর রোসায় হাজির হলাম। সেখানে অবস্থান করে বিশ্রামের মাধ্যমে পথশ্রমের ক্লান্তি অপমোচন করাই ছিল আমাদের তখনকার ইচ্ছা।

একটা উপত্যকার ওপর ছোট এ রোসা শহরটা গড়ে উঠেছে। এটা কোন খনি-শহর নয়। এখানে শহরের কোলাহল ও উত্তেজনা আদৌ নেই। রোগ ব্যাধির উপদ্রব নেই। তিন মাইল দীর্ঘ একটা ট্রলি লাইন যেটা এখানকার আশেপাশে সর্বত্র চষে বেড়ায়। আমরা,

মানে ইডাহো আর আমি 'সান-সেট-ভিউ' নামক একটা হোটেলে মাথা গুঁজলাম।

তখন আমাদের রোজকার কাজ ট্রলি লাইনের ট্রেনে চেপে সারাটা দিন ঘুরে ঘুরে কাটানো আর সূর্য পাটে বসলে ক্লান্তদেহে হোটেল সান-সেট-ভিউ'তে ফিরে এসে আহারাদির পর সারাটা রাত্রি ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেওয়া। এভাবেই আমরা একটা সপ্তাহ কাটালাম।

কিছুটা পড়াশোনার মাধ্যমে আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি লাভ করে এবং দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতার সম্বল করে আমরা রোসা শহরের অভিজাত সমাজে নিজেদের স্থান করে নিতে পারলাম।

ক্রমে রোসা শহরের সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলোর কাছ থেকে উৎসব অনুষ্ঠানে আমাদের আমন্ত্রণ আসতে লাগল, আবার বড় ধরনের উৎসবেও আমাদের জন্য আসনের ব্যবস্থা হতে লাগল।

রোসা শহরেই ভারুই পাখির মাংস আহার এবং পিয়ানো বাজানো প্রতিযোগিতায় ইডাহো আর আমার সঙ্গে রোসা শহরের রানী মিসেস ডি. অরমন্ড সিম্পসন-এর সঙ্গে প্রথম দেখা ও আলাপ পরিচয় হয়। দীর্ঘ সময় ধরেই আমাদের আলাপ চলেছিল।

রানী ডি. আরমন্ড সিম্পসন একজন বিধবা। শহরে যে একটামাত্র দোতলা পাকাবাড়ি আছে তারই মালিক তিনি। তার বাইরের দিকটা ডিমের মত মসৃণ ও চকচকে ঝকঝকে।

কেবলমাত্র ইডাহো আর আমিই নই, জানতে পাবলাম, আর কুড়িজন শহরের একমাত্র দোতলা ও সুদৃশ্য বাড়িটার জন্য লালসা জড়ানো আগ্রহ নিয়ে ঘুরঘুর করছে। সে রাত্রে আহারাদির পর গান বাজনা ও নাচের ব্যবস্থা ছিল। নাচের পালা শুরু হবার মুখে। উপস্থিত ভদ্রলোকদের মধ্য থেকে তেইশজন মিসেস সিম্পসন-এর সঙ্গে নাচার জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে এগিয়ে গেল—ইচ্ছাও প্রকাশ করল।

আমার কেবল তাঁর সঙ্গে নাচার ইচ্ছা নয়। অনুষ্ঠানের পর তাঁকে সঙ্গে করে বাড়িতে পৌঁছে দেবার জন্য অনুমতি চাইলাম। ব্যস, এতেই আমি জিতে গেলাম। সত্যি কথা বলতে কি আমার উপস্থিত বুদ্ধিই আমাকে জয়লাভের পথ দেখাল।

অনুষ্ঠান সেরে বাড়ি ফেরার পথে মিসেস সিম্পসন নির্মেঘ নীল আকাশের দিকে একবার চোখের মণি দুটো বুলিয়ে নিয়ে বললেন, মিঃ, প্রাট, আজকের রাতটা কী মনোরাম, তাই না।

আমি তার দৃষ্টি অনুসরণ করে এক ঝলক আকাশটাকে দেখে নিয়ে বললাম, 'আজ্ঞে মাদাম।'

একবারটি দেখুন, আকাশে তারাগুলো কেমন ঝিকমিক করছে। আর সম্পূর্ণ আকাশটাই কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। চমৎকার!

আমি কথা প্রসঙ্গে বললাম, 'মিসেস সিম্পসন, নাচের আসরে কেমন একটা অদ্ভুত কাণ্ড শুরু হয়ে গিয়েছিল?

হ্যাঁ, সবাই মিলে আমাকে একেবারে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল!

আসল ব্যাপারটা কি জানেন? নিজেকে জাহির করার এমন একটা অপূর্ব সুযোগ পেয়ে তারা লাগাম ছাড়া মাতামাতি জুড়ে দিয়েছিল। নিজেদের সংযত রাখা তাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হচ্ছিল না।

মিসেস সিম্পসন গম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, 'হুম!'

আমি এবার বললাম, ওই যে সবচেয়ে বড় নক্ষত্রটা দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে তার দূরত্ব ছেষট্টি বিলিয়ন। এখানে আলো পৌঁছতে তার ছত্রিশ আলোক বর্ষ সময় লাগে। চোখের সামনে একটা আঠারো ফুট দীর্ঘ দূরবীন যন্ত্র ধরলে আকাশের শোভাবর্দ্ধক তেতাল্লিশ মিলিয়ন নক্ষত্র চোখের সামনে ফুটে উঠবে।

আর এ মুহূর্তে কেউ যদি এখান থেকে আকাশের দিকে রওনা হয় তবে একনাগাড়ে সাতাশ শ' বছর ধরে সেটা চোখের সামনে অনবরত ভেসেই থাকবে।

মিসেস সিম্পসন কপালের চামড়ায় ভাঁজ এঁকে বলে উঠলেন, অবাক করলেন তো মঁসিয়ে! এতসব তথ্য তো এর আগে কারো মুখে শুনি নি। সে জন্যই তো বেশ গরম বোধ করছি। অনেকক্ষণ ধরে নেচে আসায় শরীরটা যেন কেমন যেন ক্লান্তিতে এলিয়ে পড়তে চাইছিল।

আমি মুচকি হেসে বললাম, 'এর কারণটাও আমি সহজেই আপনাকে বুঝিয়ে দিতে পারি। যেমন—'

তাঁকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই আমি বলে উঠলাম, আপনার শরীরে ঘর্মগ্রন্থীর সংখ্যা দুই মিলিয়ন। আর তারা একই সঙ্গে কাজ করে চলেছে তখনই এরকমটা ঘটে। আর আপনি যখন জানতে পারবেন আপনার ঘর্মপরিবাহী প্রতিটা নালিকার দৈর্ঘ্য সিকি ইঞ্চি। আর তাদের একটার পর একটাকে জুড়ে দিলে সাত মাইল দৈর্ঘ্য দাঁড়াবে।

আর ব্বাস! একী অদ্ভুত কথা শোনালেন মঁসিয়ে! আপনার কথাগুলোর যে রীতিমত একটা জলসেঁচ প্রকল্পের মতই অত্যাশ্চর্য বলে মনে হচ্ছে। আমি অবাক হচ্ছি মিঃ প্রাট, এমন সব অদ্ভুত তথ্য পেলেন কোথায়, জানতে পারি কি?

সবই বলব। এখন যা কিছু বলছি, ধৈর্য ধরে শুনুন। সত্যিকথা বলতে কি মিসেস সিম্পসন। সবই আমার বাস্তব অভিজ্ঞতার ফসল, অর্থাৎ আমার এ চোখ দুটোই আমাকে এমন সব গূঢ়তথ্য জানতে ও বুঝতে সাহায্য করেছে।

মোদ্দা কথা হচ্ছে, আমি যখন ভূ-পর্যটনে বেরোই তখন আমার চোখ আর কান দু'ই খোলা রাখি।

মিঃ প্রাট, শিক্ষিত মানুষদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা চিরদিনের। এ শহরে যত্তসব অপগণ্ডের বাস। তারা শিক্ষা দীক্ষা পড়াশুনার পাট বহু আগেই চুকিয়ে দিয়েছে। এত বড় শহরটা চষে ফেললেও একজনও যথার্থ শিক্ষিত লোকের দেখা পাওয়া কঠিন সমস্যা। একজন শিক্ষিত, মার্জিত রুচি সম্পন্ন এবং সংস্কৃতিবান মানুষের কথা বলেও তৃপ্তি পাওয়া যায়। আমার অনুরোধ রইল। সময় সুযোগ পেলেই আপনি আমার বাড়িতে চলে এলে আমি যারপরনাই খুশি হব। আসবেন তো?

আমি নীরবে মুচকি হাসলাম।

এভাবে আলাপ পরিচয়ের মাধ্যমে আমি বিধবা মহিলাটার অন্তরের অন্তঃস্থলে নিজের স্থান করে নিলাম। তার আমন্ত্রণে সাড়া দিতে গিয়ে প্রতি মঙ্গল ও শুক্রবার দোতলা বাড়িটায় হাজিরা দিতে লাগলাম।

এবার আমার প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়াল সপ্তাহের ওই দুটো দিন তাকে হারকিসার-এর বইয়ের তথ্যগুলো অল্প অল্প করে তার কাছে বলতে লাগলাম।

আর ইডাহো? সে শহরের হৈ হুল্লোড়প্রিয় লোকগুলোর দলে ভিড়ে রঙ্গ রসিকতা আর আনন্দ স্ফূর্তি নিয়ে মেতে রইল।

সত্যি বলছি, আমি ঘুণাক্ষরেও বিশ্বাস করতে পারি নি যে, ইডাহো ডুবে ডুবে জল খাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সে বুড়ো হোমার কে. এস-এর পদ্ধতি অনুযায়ী বিধবা বুড়িটার মনে প্রভাব বিস্তার করতে সাধ্যাতীত প্রয়াস চালাচ্ছে।

এক বিকেলে ইডাহো অত্যাশ্চর্য, একেবারেই অবিশ্বাস্য এক কাণ্ড করে বসল। কিন্তু সে যে কি অত্যাশ্চর্য কাণ্ডটা করেছে তা অবশ্য আমি অনেক পরে জানতে পারি।

এক বিকালে আমি এক ঝুড়ি আমড়া নিয়ে বুড়ি মিসেস সিম্পসন-এর সঙ্গে দেখা করতে চলেছি। হঠাৎ একেবারেই অপ্রত্যাশিতভাবে তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি তাঁর বাড়ির দিক থেকেই সোজা পথটা ধরে এগোচ্ছেন।

মিসেস সিম্পসন-এর দিকে আমার চোখ পড়তেই একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। দেখলাম, তাঁর মাথার টুপিটা অবিশ্বাস্য রকমভাবে এক দিকে নামানো। টুপির ফাঁক দিয়ে অবিন্যস্ত, রীতিমত উস্‌কো-খুস্‌কো চুল উঁকি দিচ্ছে। আরে চোখের তারা দুটোতে উদ্ভ্রান্তির ছাপ সুস্পষ্ট। আর মুখটা অল্প বিস্তর রক্তিম।

আমাকে দেখেই ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বরে কেমন যেন উদ্বেগ উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেল,—মিঃ গ্রান্ট, আমি যে কথাটা বিশ্বাস করতে তিলমাত্র উৎসাহও পাচ্ছি নে।

আমি মুখ কাচুমাচু করে বললাম, কি? ব্যাপার কি বলুন তো মাদাম? হয়েছে কি! কি-ই বা বিশ্বাস করতে পারছেন না, দয়া করে বলবেন কি?

—মিঃ গ্রীণ-এর কথা বলছি।

—কেন? সে করেছে কি?

—তিনি কি আপনার বন্ধু?

হ্যাঁ, আমাদের বন্ধুত্বকে অস্বীকার কবি কি করে বলুন তো?

সত্যি বলছি, আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি নে, অমন একটা লোকের সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব খাতির তো দূরের কথা আপনার সঙ্গে পরিচয় আছে!

আমি ম্লান হেসে বললাম। শুধু বন্ধুই নয়, আমাদের মধ্যে কম সে কম ন' বছরের বন্ধুত্ব।

আরে মশাই, যদি নিজের ভাল চান, যদি নিজের মান ইজ্জৎ অক্ষুণ্ণ রাখতে চান তবে মিঃ গ্রীণই নয়। আরও দু'একজন যদি আপনার এরকম বন্ধু থেকে থাকে তবে কাটছাঁট করে আপনার বন্ধুদের তালিকাটাকে ছোট করে ফেলুন।

মাদাম, আপনার কথার মাথামুণ্ড কিছুই আমি বুঝতে পারলাম না।

বিধবা মহিলা বলল, কথাটা তো এমন কিছু কঠিন নয় যে আপনার মত একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়।

মাদাম, আমি এইমাত্রই বললাম, মিঃ গ্রীণ আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে সে একজন সহজ সরল পর্বতবাসী। সে একটু অমিতব্যয়ী খুবই সত্য আর কথাবার্তাও একটু আধটু রুক্ষ। আবার মিথ্যাবাদী হওয়াটাও একেবারে অসম্ভব নয়। মোদ্দা কথা, এমন কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি তার চরিত্রকে কলঙ্কিত করতে পারে বটে। ব্যস, এর বেশী কোন দোষে দুষ্ট বলে তো তাকে মনে করতে পারিনে মিসেস সিম্পসন।

মিসেস সিম্পসন আমতা আমতা করে বলল, 'কিন্তু---কিন্তু—'

এর মধ্যে আর কোন কিন্তুটিন্তু থাকতে পাবে না। আমার ওই বন্ধুটাকে আপনি মাত্র দু'-চারদিনের পরিচয়ের মাধ্যমে তো আর আমার চেয়ে ভাল চিনে ফেলতে পারেন না।

মুহূর্তের জন্য থেমে আমি আবার মুখ খুললাম, দেখুন সে পোশাকপত্র একটু ঝলমলে ব্যবহার করতে পারে, তার লোক দেখানো ঔদ্ধত্য কারো কারে চোখকে পীড়া দিতে পারে, সত্য বটে। তবে একটা ব্যাপারে আপনি নিঃসন্দেহে হতে পারেন। তার ভেতরটা এতই দুর্ভেদ্য যে কোন নীচাশয় ব্যক্তির মত অপরাধ প্রবণতা এবং আশাহীন আচরণকে প্রশ্রয় দেয় না।

মিসেস সিম্পসন কি বলবেন ভেবে না পেয়ে নীরব চাহনি মেলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আমি পূর্ব প্রসঙ্গের জের টেনে এবার বললাম, মাদাম, আমি দীর্ঘ ন'-ন'টা বছর তার সঙ্গে কাটানোর পর আমি নিজে তার চরিত্রের কুৎসা গাওয়া বা অন্য কেউ তার কুৎসা রটাক—উভয়কেই আমি সমান ঘৃণার চোখে দেখি।

মিসেস সিম্পসন নিজেকে একটু সামলে সুমলে নিয়ে বলল, মিঃ প্রাট, পুরনো বন্ধুর কৃপণ স্বভাবের কথা ব্যক্ত করে, মানে সাফাই গেয়ে আপনার যা স্বাভাবিক ঠিক তা-ই করেছেন। তবে—

মিসেস সিম্পসন কথাটা শেষ না করে আমতা আমতা করতে লাগল।

আমি না বলে পারলাম না—কি হল? থেমে গেলেন কেন মিসেস সিম্পসন? কি বলতে চাইছিলেন নির্দ্বিধায় বলতে পারেন।

আমার দিক থেকে অভয় পেয়ে মিসেস সিম্পসন বললেন, দেখুন, তিনি আমার কাছে যে জঘন্য প্রস্তাব করেছেন সেটাকে একজন ভদ্রমহিলার সুনামের পক্ষে যথেষ্ট অশালীন, ক্ষতিকরও কম নয়। এরকম একটা জ্বলন্ত সত্যকে তো আর মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়।

মিসেস সিম্পসন-এর কথায় আমি যেন একেবারে আকাশ থেকে পড়লাম। বার কয়েক ঢোক গিলে আমি বলতে লাগলাম, মানে তার মানে! এ কী কথা বলছেন!

যা সত্যি, একেবারে একশ' ভাগ সত্যি তা-ই বলেছি মিঃ প্রাট।

সে কী! বুড়ো ইডাহোটা এমন জঘন্য একটা কাজ করেছে! তার যাবতীয় কাজের মধ্যে একটামাত্র কাজকেই আমি নিন্দনীয় বলে জানি। আর তার জন্য ইডাহো'কে নয়, একটা বরফ ঝড়ই সম্পূর্ণরূপে দায়ী।

বরফ-ঝড়ে! কি ব্যাপার, একটু খোলসা করে বলবেন কি মিঃ প্রাট?'

অবশ্যই একটা শব্দও গোপন না করে যা সত্য সবই আপনার কাছে তুলে ধরছি। কিছু দিন আগে আমরা উভয়েই একটা বরফ-ঝড়ের মধ্যে এ পাহাড়টার ওপরেই বন্দী হয়ে পড়েছিলাম।

তারপর? তারপর কি ঘটেছিল?

তারপর বুড়ো ইডাহো যত্তসব বস্তা পচা কিছু কবিতা, মানে একটা কবিতার বইয়ের শিকার হয়ে পড়েছিল। তারপর থেকেই তার আচার-আচরণ কেমন অশোভন, অশিষ্ট হয় পড়তে থাকে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক তা-ই। আপনি ঠিকই বলেছেন। জানেন মঁসিয়ে তার সঙ্গে আমার পরিচয় হবার পর থেকে যখন, যেখানেই কার সঙ্গে দেখা হয় সেখানেই তিনি আমার কানের কাছাকাছি মুখটা নিয়ে গিয়ে ফিসফিসিয়ে অনর্গল অনৈতিক ছড়া আওড়াতে লাগে।

কার কবিতা, মানে সে সব ছড়া কার লেখা, সে বলেছে?

হ্যাঁ। ছড়াগুলোর রচয়িতা নাকি এক মহিলা কবি। নাম তাঁর রুবি ওট।

মহিলা কবি? কবির নাম রুবি ওট?

হ্যাঁ, তা-ই তো বলেছেন। মিঃ প্রাট, তিনি যে কোন্ প্রকৃতির মানুষ তা তার কাব্যের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

তবে কি ইডাহো-র হাতে একটা নতুন বই এসেছে? আগে যে বইটা সে আমাকে দেখিয়েছে তার লেখক তো মহিলা নন, কে. এস ছদ্মনাম লেখা একটা কবিতার বই।

দেখুন, তার কিন্তু সে বইটা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত ছিল। এখন তো তিনি একটা ঘূর্ণি ঝড়ের চক্করে পড়ে গেছেন। তিনি একটা ফুলের তোড়া আমাকে পাঠিয়েছেন। তার গায়ে একটা ছড়ার কবিতা পিন দিয়ে আটকে দিয়েছেন।

তাই নাকি!

তবে আর বলছি কি! একটা মহিলাকে দেখেই আপনি অবশ্যই তাকে চিনতে পারবেন, বুঝতে পারবেন।

আর একটু বলুন তো মিঃ প্রাট, রোসার সম্ভ্রান্ত সমাজে আমার আসন কোন্টা সেটাও আপনার জানা আছে।

মুহূর্তের জন্য থেকে মিসেস সিম্পসন এবার বলল, 'মিঃ প্রাট, একটা মুহূর্তের জন্যও কি আপনি চিন্তা করতে পারেন যে আমি সে রকম প্রকৃতির একটা মেয়ে যাকে লক্ষ্য করে বলা যেতে পারে।—'

মিসেস সিম্পসন এবার ফুলের তোড়ার সঙ্গে ইডাহো-র সেঁটে দেওয়া কবিতাটির বিষয়বস্তু সংক্ষেপে ব্যক্ত করতে গিয়ে বলল, প্রিয়তম, সুদূর কোন বনানীর তুমি আর আমি কৌতূহলে জীবনে যে ক'টা দিন কাটিয়ে দেব—পানীয়ের পাত্র আর সামান্য কিছু আহার্য আর সুর ছন্দে লেখা একটা কাব্য হাতে নিয়ে তুমি আমার কাছাকাছি থাকবে। সই তুমি প্রেমোচ্ছ্বাসে গাইবে—

কবিতাটার বক্তব্য বর্ণনা করেই মিসেস সিম্পসন নাক সিঁটকে বলতে লাগল—'ছিঃ ছিঃ! একেবারে অভাবনীয় ব্যাপার মঁসিয়ে। কাব্যটাকে সবসময় সঙ্গে করেই নাকি ঘুরে বেড়ান।

আমি কপালের চামড়ায় পরপর কয়েকটা ভাজ এঁকে আমি তাঁর মুখের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলাম।

সে বলে চলল, সেজন্যই তো তিনি লিখেছেন। না, কিছুতেই নয়, জঘন্য সে চড়ুইভাতিতে তাঁকে একাই যেতে বলুন। তা নইলে তিনি যেন ওই রুবি ওট'কে সঙ্গী করে সেখানে যান। মিঃ প্রাট, সবইতো শুনলেন। এবার আপনার ওই ভদ্র, শান্ত সৌম্য বন্ধুর সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য কি?

এ পরিস্থিতিতে আমি কি জবাব দেব ভেবে না পেয়ে মুখে কলুপ এঁটে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম।

মিসেস সিম্পসন বলল, মিঃ প্রাট, চুপ করে থাকবেন না। আপনার গুণধর বন্ধুর কথা কিছু তো বলুন।

আমি তোৎলাতে তোৎলাতে বললাম। মা-দা-ম, ব্যাপারটা তো এমনও হতে পারে আমার বন্ধু ইডাহো যে কবিতাটা আপনাকে উপহারস্বরূপ পাঠিয়েছে সেটা নিছকই একটা কবিতামাত্র। এতে কারো, কোনরকম ক্ষতি বৃদ্ধি হওয়ার কথা নয়। দেখুন মাদাম, নিয়ম শৃঙ্খলা বিরোধী হলেও ছড়াগুলো তো সমাজে দিব্যি চলে যায়।

কারণ? কারণ কি?

কারণ? ব্যাপারটা তো খুবই সহজ সরল মাদাম। কারণ, কবিতা ও ছড়ার মাধ্যমে যে বক্তব্য

তুলে ধরা হয় তার আসল অর্থটা তো ঠিক তা নয়। তাই বলছি কি, এসব ব্যাপার স্যাপারকে যদি আপনি গুরুত্ব না দিয়ে সহজ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখেন তবেই সত্যিকারে খুশি হব। আমরা বরং এক কাজ করি মিঃ সিম্পসন—'

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই মিসেস সিম্পসন বলে উঠল, কি কাজ? কি বলতে চাইছেন?

বলছি কি, চেষ্টা করে দেখাই যাক না, কবিতার নিচুস্তর থেকে আমরা কল্পনা ও বাস্তবের মহত্তর স্তরে চলে যাই। আজকের এমন সুন্দর, এমন পবিত্র বিকেলটাকে আমরা উপভোগ করি, আমাদের চিন্তা ভাবনাটা একটু অন্য অর্থেই চলুক ক্ষতি কি?

উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে মিসেস সিম্পসন বলে উঠল উফ্ ; মিঃ প্রাট, রুবি ওট-এর কবিতার ওই ন্যাকামির পর আপনার মনোলোভা বাস্তবধর্মী কথাগুলো আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে খুশির জোয়ার বয়ে চলেছে!

মিসেস সিম্পসন, আমার একটা অনুরোধ রাখা কি আপনার সম্ভব হবে?

কি? অনুরোধটা না শুনেই কি করে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেই বলুন তো মিঃ প্রাট?

আমি মুচকি হেসে বললাম, রাস্তার ধারের ওই কাঠের গুঁড়িটার ওপর কিছুক্ষণের জন্য বসতে আপনার আপত্তি আছে? কবিদের অমানবিক, অবান্তর ও কুৎসিৎ বক্তব্যগুলোকে আমরা যাতে মন থেকে মুছে ফেলতে পারি তার জন্য এরকম প্রস্তাব দিচ্ছি, একটু বসবেন ওখানে?

কয়েক পা এগিয়ে তারা কাঠের গুঁড়িটার ওপর পাশাপাশি বসল।

আমি বললাম মিসেস সিম্পসন, আমরা দু'জনে এই যে, কাঠের গুঁড়িটার ওপর বসেছি, এর সংখ্যাতত্ত্ব যেকোন কবিতার চেয়ে অনেক বেশী বিস্ময়কর। এর বয়স ষাট বছর।

মিসেস সিম্পসন চোখের তারায় বিস্ময়ের ছাপ এঁকে বলল, সে কী! কাঠের গুঁড়িটার বয়স ষাট, কি করে বুঝলেন?

আমি মুচকি হেসে বললাম, কেন? এ-তো খুবই সহজ ব্যাপার। এর গায়ে যেসব আঁকাবাঁকা দাগ দেখতে পাচ্ছেন এগুলোই প্রমাণ করছে এর বয়স ষাট বা তার কাছাকাছি।

হুম! সত্যি আশ্চর্য ব্যাপার।

তারপর কি বলছি শুনুন—এ গুঁড়িটাকে যদি ভূপৃষ্ঠ থেকে দু'হাজার ফুট গভীরে রেখে দেওয়া যায় তবে তিন হাজার বছরে এরা কাঠ কয়লায় পরিণত হয়ে যাবে। নিউ ক্যাসল-এর কাছাকাছি শিলিংওয়ার্থ পৃথিবীর গভীরতম কয়লা খনি।

মিসেস সিম্পসন অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে আমার কথাগুলো শুনতে লাগল।

আমি বলেই চললাম, এবার কি বলছি শুনুন, চারফুট লম্বা আর তিন ফুট চওড়া এবং দু'ফুট আট ইঞ্চি গভীর একাট বাক্সের ভেতরে একটন কয়লা রাখা সম্ভব।

দেখুন। আমাদের শরীরের কোন একটা ধমনী যদি আচমকা কেটে যায় তবে সেঁক দেব কোথায়? ক্ষতস্থানটায়? না ক্ষতস্থানটার কিছুটা ওপরে সেঁক দিতে হবে।

একটা মানুষের পায়ে ক'টা অস্থি থাকে? ত্রিশটা। আঠার শ' একচল্লিশ খ্রীস্টাব্দে 'টাওয়ার অব লণ্ডন' ভষ্মীভূত হয়ে গিয়েছিল।

মিসেস সিম্পসন এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মত আমার কথাগুলো শুনছিল। আমি থামতেই সে অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে বলে উঠল, আরও—আরও কিছু মিঃ প্রাট আরও কিছু বলুন। কথাগুলো কী আনন্দদায়ক, মৌলিক তো বটেই।

আমি মুচকি হাসলাম।

মিসেস সিম্পসন এবার বলল, আমার তো বিশ্বাস, সংখ্যাতত্ত্ব বিষয়টা বাস্তবিকই খুবই চিত্তাকর্ষক।

তবে আসল ঘটনাটা তখনই নয়, ঘটল দু'সপ্তাহ পরে।

ঘটনাটা ঘটেছিল এক রাত্রে। আমি তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। হঠাৎ আগুন! আগুন! আর্তচিৎকার কানে যেতেই আমার ঘুম চটে গেল। তড়াক করে লাফিয়ে বিছানায় বসে পড়লাম। সাধ্যমত ব্যস্ততার সঙ্গে পোশাক বদলে নিয়ে হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে গেলাম। ব্যাপারটা কি দেখার

আগ্রহটাই আমাকে তখন পেয়ে বসেছিল।

ব্যস্ত পায়ে কিছুটা পথ পাড়ি দিতেই দেখলাম, আগুন লেগেছে মিসেস সিম্পসন-এর বাড়িতে। আমার মাথায় বাজ পড়ার যোগাড় হল। লম্বা লম্বা পায়ে মিনিট দুইয়ের মধ্যেই আমি সেখানে হাজির হয়ে গেলাম।

দেখলাম, দোতলা হলুদ বাড়িটার পুরো একতলাটাকে আগুন গ্রাস করে ফেলেছে। আমি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

আসলে সে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে কর্তব্য স্থির করতে না পারায় আমার পক্ষে স্থবিরের মত দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া সে মুহূর্তে গত্যান্তরও তো কিছু ছিল না। রোসা-র নারী পুরুষ আর কুকুর—যে, যেখানে ছিল সব এসে সেখানে জড়ো হয়েছে। সবার চোখে মুখেই গভীর আতঙ্কের ছাপ। আর চারদিকে দারুণ উত্তেজনা, হৈ চৈ।

আমি আরও সামান্য এগিয়ে গেলাম। ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ চোখে পড়ল, ছ'জন দমকল-কর্মী ইডাহোকে জাপ্টে ধরেছে। আর ইডাহো তাদের কবল থেকে মুক্তি পাবার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আর তারা বার বার তাকে বলে চলেছে আরে মঁসিয়ে, দেখছেন না পুরো একতলাটাই আগুনে পুড়ছে প্রাণ নিয়ে ঢোকা সম্ভব নয়! আর কোনক্রমে ঢুকে গেলেও বাইরে বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়।

আমি চোখে মুখে গভীর উৎকণ্ঠার ছাপ এঁকে বললাম মিসেস সিম্পসন—মিসেস সিম্পসন কোথায়?

দমকল কর্মীদের একজন বলল, কই, তাঁকে তো দেখতে পাইনি। শুনেছি, তিনি ওপরতলার ঘরে ঘুমান। আমরা বহুবার ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করেছি, সম্ভব হয় নি।

মই? আপনাদের কোম্পানির মই—

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে দমকল কর্মীটা বলল, আমাদের কোম্পানির কোন মই নেই। এটাই তো এখন বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যে জায়গাটা জুড়ে খুব বেশী আগুন জ্বলছে সে জায়গাটা রীতিমত আলোকিত হয়ে আছে। আমি উদ্ভ্রান্তের মত ছুটে সেখানে চলে গেলাম।

অত্যুজ্জ্বল আলোকে পরিপূর্ণ স্থানটায় দাঁড়িয়ে আমি কোটের পকেট থেকে 'সহজপাঠ'-এর বইটা বের করে পাতা ওল্টাতে লেগে গেলাম।

বইটার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে আমি কণ্ঠস্বরের উত্তেজনা প্রকাশ করে বলে উঠলাম, বুড়ো থার্নি, আজ অবধি একটা মিথ্যে কথাও তুমি কোনদিন আমাকে বল নি। এবার তুমি আমাকে পরামর্শ দাও, এ মুহূর্তে আমার কর্তব্য কি? কি করব মাথায় আসছে না।

সহজপাঠের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে একশ' সতের পাতায় পৌঁছে আমি থমকে গেলাম। সেখানে স্পষ্টাক্ষরে একটা অধ্যায় লেখা রয়েছে—দুর্ঘটনার মুহূর্তে কি করণীয়।

আমি প্রতিটা ছত্রের ওপর আঙুল চালিয়ে অগ্রসর হতে হতে আসল জায়গাটা পেয়ে গেলাম। সত্যি বলছি, বুড়ো হারকিসার বড্ড ভাল মানুষ। এমন কোন ব্যাপার নেই যে, তার নজর এড়িয়ে গেছে। তার কাজকর্ম দেখে আমি অবাক না হয়ে পারলাম না।

একশ' সতের পাতার সে বিশেষ জায়গাটায় লেখা আছে—শ্বাসের সঙ্গে ধোঁয়া আর গ্যাস টেনে দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম হলে তিষির ফলের চেয়ে ভাল প্রতিষেধক আর দ্বিতীয় কিছু নেই। চোখের কোণে কয়েকটা ফেলে রেখে দিলেই আর তিলমাত্র সমস্যাও থাকবে না।

তখনকার মত সহজপাঠের কাজ মিটে গেলে আমি বইটাকে আবার কোটের পকেটে চালান করে দিলাম।

ঠিক সে মুহূর্তেই আমার পাশ দিয়ে একটা ছেলে উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে যেতে দেখলাম। খপ্ করে তার হাতটা চেপে ধরলাম। কোটের ভেতরের পকেট থেকে ক'টা নোট বের করে তার হাতে গুঁজে দিয়ে বললাম, এক কাজ কর, দৌড়ে একটা ওষুধের দোকানে যাও।

কেন? কার কি হয়েছে? ছেলেটা বলল।

আমি প্রায় ধমকের সুরেই বললাম—ধ্যাৎ! সে সব পরে শুনলেও চলবে। এখন যা বলছি কর।

ওষুধের দোকান থেকে এক ডলার দামের তিষির ফল কিনে যত শীঘ্র পার ফিরে আসবে। আর শোন, তুমি বকশিসস্বরূপ এক ডলার পাবে। তবে খেয়াল থাকে যেন শীঘ্র আনা চাই কিন্তু।

ভিড় করা উদ্বিগ্ন জনতার দিকে ফিরে আমি গলা ছেড়ে বললাম—

আশা করছি, এবার আমরা মিসেস সিম্পসনকে উদ্ধার করতে পারব।

কথা বলতে বলতে আমি গা থেকে ঝটপট কোট আর মাথার চওড়া টুপিটা খুলে ফেললাম।

চার চারজন দমকল কর্মী আর ভিড় করা কৌতূহলী জনসাধারণের মধ্য থেকে জনা কয়েক আমাকে চেপে ধরল।

আমি তাদের বাধা দিতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না। সবাই প্রায় সমস্বরেই বলতে লাগল, করছেন কী মঁসিয়ে! এ পরিস্থিতিতে বাড়িটার ভেতরে ঢোকার মানেই হচ্ছে, নিজেকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাতে ঠেলে দেওয়া।

সে যা হয় দেখা যাবে।

ক্ষেপেছেন মঁসিয়ে! যেভাবে আগুন জ্বলছে তাতে যে কোন মুহূর্তে বাড়িটার সব কটা ঘরের মেঝে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে পারে।

আমি না হেসে পারলাম না। হাসতে হাসতেই বললাম, বাড়ির ভেতরে ঢুকে চোখই যদি না পাই তবে আর চোখের কোণে তিষির ফল কিভাবে রাখব?

কথাটা বলেই আমি দমকল কর্মীদের প্রত্যেকের মুখে ঝটপট একটা করে কনুইয়ে গুঁতো মেরে ফেলে দিলাম। পর মুহূর্তেই আমাকে ধরে রাখা লোকগুলোর জানুদেশে দমাদম এমন লাথি হাঁকলাম যে, তারা হুমড়ি খেয়ে পড়ল, হাঁটুর ছাল উঠে গেল। এবার বা-দিকে পা ছুঁড়ে দিয়ে আর একজনকে ধরাশায়ী করে দিলাম। ব্যস, চোখের পলকে নিজেকে মুক্ত করে ফেললাম।

ঝড়ের বেগে আমি জ্বলন্ত বাড়িটার ভেতরে ঢুকে গেলাম।

মুহূর্তকালের মধ্যেই আমার পরিস্থিতি এমন হয়ে উঠল যার ফলে আমাকে বেস্তোবাঁর একটা ঝলসানো মুরগির সঙ্গে একমাত্র তুলনা করা চলে।

আগুন, ধোঁয়া আর বিষাক্ত গ্যাসের একইসঙ্গে আক্রমণের ফলে আমি দু'-দু'বার মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম।

না, হারকিসার'কে বুঝি লজ্জা আর দুর্নামেব হাত থেকে রক্ষা করতে পারলাম না।

তবে দমকল কর্মীদের কাছে যেটুকু জল ছিল তা-ই আমাকে রক্ষা করল। টলতে টলতে কোনরকমে মিসেস সিম্পসন-এর কামরায় ঢুকে যেতে পারলাম। ধোঁয়া আর বিষাক্ত গ্যাসের আক্রমণে তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে বিছানায় পড়ে রয়েছেন।

আমি উল্কার বেগে কামরাটার ভেতরে ঢুকে গেলাম। যন্ত্রচালিতের মত বিছানার চাদর দিয়ে মিসেস সিম্পসন-এর সংজ্ঞাহীন দেহটাকে মুড়িয়ে ফেললাম।

মেঝের অবস্থাটাই আমার সাফল্য এনে দিল, স্বীকার করতে পারব না। মেঝের অবস্থা খারাপ থাকলে তা কিছুতেই আমার পক্ষে কাজটা করা সম্ভ হত না। সত্যি বলছি, কিছুতেই করতে পারতাম না।

মিসেস সিম্পসন-এর সংজ্ঞাহীন দেহটাকে কাঁধে নিয়ে আমি বাড়ির বাইরে পঞ্চাশ গজ দূরবর্তী উন্মুক্ত এক প্রান্তরের ঘাসের বিছানায় শুইয়ে দিলাম।

কয়েকজন আমার পিছন পিছন জলের বালতি নিয়ে ছুটে এল। আর তখনই সে ছেলেটা ওষুধের দোকান থেকে তিষির ফল নিয়ে ছুটতে ছুটতে আমার কাছে হাজির হল।

হাত বাড়িয়ে মিসেস সিম্পসন-এর মুখের ওপর থেকে চাদরটা সরিয়ে নিতেই সে চোখ মেলে তাকাল।

আমাকে সামনে দেখেই সে সবিস্ময়ে বলে উঠল, আপনি! মিঃ প্রাট? আমি বললাম, চুপ করুন। চোখে ওষুধটা না দেওয়া পর্যন্ত একটা কথাও বলবেন না মিসেস সিম্পসন।

এবার তিষির ফলের মোড়কটা খুলে তা থেকে তিন-চারটে তিষির ফল হাতে নিলাম। তারপর তার ঘাড়ের তলায় বাঁ হাতটা চালিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে মাথাটাকে সামান্য উঁচু করলাম। এবার তিষির ফলগুলো তার চোখের বাইরের কোণে গুঁজে দিলাম।

ঠিক তখনই গ্রামের এক ডাক্তার ঘোড়া ছুটিয়ে সেখানে হাজির হল।

ডাক্তার ঘোড়া থেকে নেমে তাড়াতাড়ি মিসেস সিম্পসন-এর কাছে এল। তার হাতটা তুলে নিয়ে নাড়িটিপে ধরে জিজ্ঞাসা করল এঁর চোখের কোণে এসব কি?

আমি বললাম জেরুজালেমের ওকগাছের ফল আর পুরনো জলেপ।

ওকগাছের ফল? কি ব্যাপার বলুন তো মঁসিয়ে? আপনি কি ডাক্তার বদ্যি?

আজ্ঞে না।

তবে যে এসব এঁর চোখের কোণে গুঁজে দিয়েছেন?

আমি নিজে ডাক্তার বদ্যি বা হেকিম নই সত্য বটে। তবে যার পরামর্শে এ ব্যবস্থা করতে পেরেছি সেটা আপনাকে দেখাতে পারি।

আমার অনুরোধে একজন আমার কোটটা এনে দিল। আমি সেটার পকেট থেকে 'সহজপাঠ' বইটা বের করে ডাক্তারের হাতে তুলে দিলাম।

ডাক্তার বইটা হাতে নিয়ে আমার মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন।

আমি বললাম অনুগ্রহ করে এর একশ সতের পৃষ্ঠা খুলুন। দেখবেন সেখানে ধোঁয়া আর গ্যাস বন্ধ হবার প্রতিকার সম্বন্ধে বিস্তারিত পরামর্শ দেওয়া আছে।

ডাক্তার আমার কথামত ব্যস্ত হাতে বইটার পাতা ওল্টাতে লাগলেন।

আমি বলে চললাম, সেখানে লেখা আছে, চোখের বাইরের কোণে তিষির ফল। এর কার্যকারিতা সম্বন্ধে আমার কিছুই জানা নেই। হারকিসার কিন্তু একথাই বলেন। আর ইনিই আমার প্রথম রোগী। যদি ইচ্ছে হয় তবে আপনিও একবারটি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। এতে কিন্তু কোন বাধাই নেই 'ডাক্তারবাবু'।

কোন এক দমকল কর্মীর লণ্ঠনের আলোয় বুড়ো ডাক্তার বইটার সে বিশেষ পাতাটায় নিস্তেজ চোখের মণি দুটো বুলোতে লাগলেন।

বইয়ের পাতা থেকে চোখ তুলে ডাক্তার বললেন, মিঃ প্রাট, রোগ নির্ণয় করতে গিয়ে আপনি ভুল পথে চলে গেছেন।

হারকিসার দম বন্ধ হবার প্রতিকার হিসেবে বলেছেন, রোগীকে যত শীঘ্র সম্ভব খোলা হাওয়ায় নিয়ে যেতে হবে। তারপর তাকে হেলান দিয়ে বসিয়ে দিতে হবে। চোখে ধুলো আর অঙ্গার পড়লে তিষির ফল ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যাবে। যাক গে, এখন।

তাঁকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই মিসেস সিম্পসন বলল, দেখুন, আমি মনে করছি, আপনাদের আলোচনায় আমার কিছু বলা দরকার।

ডাক্তার তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, বলুন আপনার কি বক্তব্য বলুন শুনি?

তিষির ফল ব্যবহারে আমি এমন উপকার পেয়েছি যা অন্য কোন কিছু থেকে পাইনি, আর পাব বলেও মনে করি না।

মিসেস সিম্পসন এবার মাথাটা সামান্য তুলে বলল, প্রিয় প্রাট, আমার অন্য চোখটায়ও কয়েকটা তিষির ফল গুঁজে দাও।

তাই বলছি কি, আগামীকাল বা অন্য যে কোন দিন আপনি যদি রোসায় পদার্পণ করেন তবে একটা মনোলোভা দোতলা হলুদ বাড়ি নজরে পড়বে। আর? সেখানে দেখতে পাবেন, সেখানে প্রিন্সেস প্রাটকে আগে যিনি মিসেস সিম্পসন নামে সবার পরিচিত ছিলেন। বাড়িটার বাইরের দিকটাও দক্ষ হাতে সাজানো।

বাড়িটার ভেতরে যদি ঢোকেন তবে বৈঠকখানার শ্বেতপাথরের টেবিলের ঢাকনার ওপরে যত্নসহকারে রক্ষিত আছে, অপরিহার্য তথ্যের সহজপাঠ বইটা। লেখক হারকিসার। মানব জীবনের জ্ঞান ও সুখ সম্বন্ধে যেকোন বিষয় জানবার জন্য অবশ্য পাঠ্য ও অপরিহার্য বই।

দ্য টেম্পার্ড উইন্ড

কানসাস নগরে বাকিংহাম স্কিনার আর আমার প্রথম সাক্ষাৎ ও আলাপ পরিচয় হয়।

আমি তখন একটা পথের বাঁকে দাঁড়িয়েছিলাম। ঠিক তখনই আমার নজরে পড়ল, তিনতলার একটা জানালা দিয়ে খড়ের রঙের মাথা গলিয়ে এমন স্বরে চিল্লাচিল্লি করছে—হোয়া! এই যে হোয়া! হঠাৎ করে শুনলে মনে হবে, কেউ বুঝি দল থেকে বেরিয়ে যাওয়া কোন খচ্চরকে দলে ভিড়বার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

আমি কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে চারদিকে তাকালাম। কিন্তু দেখতে পেলাম, একটা পুলিশ বুট পালিশ করাচ্ছে, আর অদূরে একটা মাল বোঝাই গাড়ি পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। না, এছাড়া অন্য কিছুই আমার চোখে পড়ল না।

তারপর মিনিট খানেকের মধ্যেই বাকিংহাম স্কিনার সশব্দে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল। চিংড়ি মাছের মত লম্বা লম্বা পায়ে লাফাতে এগিয়ে এসে কি যেন খুঁজতে লাগল। কি খুঁজল জানি না, তবে কিছুই সে খুঁজে পায় নি এ ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ। একটু বাদেই সে আগের মতই লাফাতে লাফাতে দরজাটা দিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল।

বাকিংহাম স্কিনার-এর কাণ্ডটা আমার মধ্যে কৌতূহলের সঞ্চার করল।

আমি ঘাড় তুলে আবার বাড়িটার তিনতলার ওই জানালাটার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম। বেশ বড়সড় একটা ফলক আমার চোখে পড়ল। তাতে বড়বড় হরফে লেখা রয়েছে, 'কৃষকবন্ধু ঋণদান প্রতিষ্ঠান'।

ইতিমধ্যে লম্বাটে চেহারা আর বড় মাথা আকৃতির লোকটা আবার নিচে নেমে এসেছে।

কি যেন ভেবে আমি ব্যস্ত পায়ে রাস্তাটা পেরিয়ে গেলাম। তারপর তার সঙ্গে দেখা করার জন্য এগিয়ে গিয়ে তার মুখোমুখি দাঁড়ালাম।

হ্যাঁ, তার আরও কাছাকাছি এগিয়ে যেতেই আমি নিঃসন্দেহ হলাম, কোন একটা ব্যাপারে লোকটা এমন বাড়াবাড়ি করছে।

পরনের নীল জিন্স আর পায়ের গরুর চামড়ার জুতো জোড়া দেখে রেউব'কে চিনতে অসুবিধা হয় না। তবে ম্যাটিনি নায়কের মত তার হাত দুটো। আর সে সঙ্গে খড়ের রঙ বিশিষ্ট ঝাঁকড়া চুলে ঢাকা কান দুটোর দিকে চোখ পড়লে মনে হয় সে নিঃসন্দেহে কোন না কোন পুরনো বস্তি প্রতিষ্ঠানের মালিক।

আমার বড্ড জানতে ইচ্ছা করল, কোন্ ধাপ্পাবাজি তাকে আমার চেয়ে ওপরে তুলে দিয়েছে।

তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এইমাত্র যে খচ্চরটা দল থেকে বেরিয়ে গেল সেটা কি তোমার পালের নাকি হে? আরে আমি সেটাকে থামাতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু কিছুতেই পারলাম না। ইতিমধ্যে সেটা হয়ত গোলাবাড়ির অর্ধেক পথ পাড়ি দিয়ে দিয়েছে।

খড়ের টুপিওয়ালা বলে উঠল। হতচ্ছাড়া খচ্চরটা জাহান্নামে যাক!

এবার আমার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে ভাল করে দেখে নিয়ে মাথার চওড়া টুপিটা খুলে ফেলল। তারপর গলা নামিয়ে বলল শোন হে, একমাত্র মন্টেগু সিলভারকে বাদ দিলে পশ্চিমে সবচেয়ে বড় দালাল পার্শে ভু পিকেন্স-এর সঙ্গে করমর্দনের জন্য বড়ই আকাঙ্খিত।

আমি মুচকি হেসে করমর্দনের জন্য তার দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিলাম।

তারপর ঠোটের কোণের হাসিটুকু অক্ষুণ্ণ রেখেই আমি বললাম, 'আমার হাতেখড়ি হয়েছিল সিলভার-এর কাছেই। তিনি আমরা চেয়ে সব দিক থেকেই বড়। তার জন্য আমার মনে কোন আক্ষেপ নেই। এবার খোলসা করে বলে ফেল তো ভায়া। তুমি কি করে সব দানেই জিতে যাও? তোমার জেতার আসল রহস্যটা কি?'

আমার কথায় বাকিংহাম স্কিনার-এর মুখটা যে কিছুটা রক্তিম হয়ে উঠল তা আমার নজর এড়াল না।

বাকিংহাম স্কিনার বলল, হাত খরচের জন্য কিছু অর্থকড়ি। ব্যস, এর বেশী কিছু নয়।

সম্প্রতি আমি মূলধনের অভাব বড্ড বেশী করে অনুভব করছি। খুবই হাত টানাটানি চলছে এরকম ছোট শহরে চল্লিশ ডলার খসালেই এমন একটা টুপি কিনে নেওয়া যায়। কিন্তু কাজটা কিভাবে করব? কেন বাপু, বাবুদের গ্রাম্য সাজপোশাক গায়ে দিয়েছি। এ পোশাক গায়ে দিয়ে আমি জোনাস স্টাবল ফিল্ড বনে যাই। আর এ নামটা এমনই যে, একে শ্রুতিমধুর করে নেওয়া সম্ভব নয়। তিন তলার কৃষকবন্ধু প্রতিষ্ঠানে গিয়ে হাজির হই।

সেখানে কর্তার মুখোমুখি গিয়ে টুপি আর দস্তানা খুলে মেঝেতে রাখি। দু'হাজার ডলারের বিনিময়ে আমার গোলাবাড়িটা বন্ধক রাখার জন্য আবেদনপত্র দাখিল করলাম। গোলাবাড়িটা বন্ধক রাখার কারণস্বরূপ উল্লেখ করলাম, ইউরোপে গিয়ে গান-বাজনা শেখার জন্য আমার বোনকে ওই পরিমাণ অর্থ দিতে হবে। এরকম ধার দেওয়ার ব্যাপার হলে ঋনদান প্রতিষ্ঠানগুলো খুব সহজেই রাজি হয়ে যায়।

ঠিক সে সময়েই আমার দলিলের খসড়াটা বের করার জন্য যেই না কোটের পকেটে হাতটা চালান করেছি অমনি শুনতে পেলাম, আমার খচ্চরের পাল ভিন্ন পথে দৌড়াতে আরম্ভ করেছে। আর পরে দেখলাম, একটা তো দলছুটই হয়ে গেছে।

উপায়ান্তর না দেখে, হোয়া! এই যে হোয়া! বলে চিল্লাচিল্লি জুড়ে দিলাম।

ফয়দা কিছুই হল না। বাধ্য হয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলাম। দরজা খুলে পথে নামলাম। তারপর মিনিট কয়েকের মধ্যেই আবার ওপরে তাদের দপ্তরে ফিরে গেলাম।

দেখুন মঁসিয়ে জাহান্নামে যাক খচ্চরের দল। আমার এখনই বাড়ি ফিরতে হবে। কারণ অর্থকড়ি কিছুই তো সঙ্গে আনিনি। তাই বলছি কি মঁসিয়েরা, আলাপ-আলোচনা যা কিছু অন্য দিনই না হয় সেরে নেয়া যাবে, কি বলেন?

এরপর আমিও ইসরাইলীদের মত সতরঞ্চিটা পেতে আশমান থেকে যদি কিছু খাবার দাবার পড়ে সে আশায় বুক বেঁধে বসে রইলাম।

একটু বাদেই ফুটফুটে ভেস্ট-গায়ে, চশমাওয়ালা এক ভদ্রলোক বলল, মিঃ স্টাবলফিল্ড, দশ ডলারের এ বিলটা নিয়ে আগামাকাল অবধি অপেক্ষা করে আমাদের ধন্য করুন। এ ঋণের ব্যাপারে আপনার কাজটা করে দিতে পারলে আমরা যারপরনাই আনন্দিত হব। এই নিন, বলে বিলটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল।

আমার কথা শুনে বাকিংহাম স্কিনার নরম সুরেই বলল, আরে মঁসিয়ে, এটা তো খুবই নগণ্য একটা ব্যাপার। তবে আমি তো অনেক আগেই বলেছি, বর্তমানে কিছু কিছু খুচরো বড়ই দরকার হয়ে পড়েছে।

আমি তার করুণ অবস্থার কথা জানতে পেরে হেসে বললাম, এতে এত দ্বিধা-সঙ্কোচের কি আছে, বুঝছি না তো। সব মানুষের এরকম আকস্মিক প্রয়োজন হতে পারে। তবে একটা ব্রিজ খেলার আড্ডা বা ট্রাস্ট গড়ে তোলার চেয়ে তো খুবই ছোট কাজ সন্দেহ নেই। কিন্তু শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় তো খুবই ছোট মাপেই আরম্ভ করা হয়, ঠিক কিনা?

বাকিংহাম স্কিনার আমার দিকে সামান্য ঝুঁকে অনুচ্চ কণ্ঠেই জিজ্ঞাসা করল, সত্যি করে বল তো, তোমার ধাপ্পাবাজির কারবার এখন কেমন চলছে?

'কেন, খুবই ভাল আর আইন কানুন অনুযায়ীই চলছে।'

—তবু যদি একটু খোলসা করে বল।

—এখন রাইনস্টোনের কারবার জোর কদমে চালাচ্ছি।

—রাইনস্টোন? সেটা আবার কি?

—রাইনস্টোন হচ্ছে, এক ধরনের নকল রত্ন।

—বুঝলাম। আরও কিছু আছে?

—রাইনস্টোন ছাড়া সুইস ওয়ার্বলার-এর। বার্ড কল, ড ওলিয়াস সিনাপি-র বৈদ্যুতিক মাথা ধরার ব্যাটারি, ছ'টা মিশরীয় বালব।

—আর কিছু?

—হ্যাঁ, আরও কিছু আছে বটে। এরপর বিশেষ করে নাম করতে হয় নখ কাটা ও একত্রে কাঁটা, বোনাজো বাজেট যার মধ্যে রোল্ডগোল্ডের বাক্মানের বিয়ের আংটি রাখা থাকে এবং নাম খোদাই করা খাম—এ পর্যন্ত যা কিছু বললাম, সব কিছু দাম এক সঙ্গে আটত্রিশ সেন্ট।

এবার বাকিংহাম নিজের কারবারের কথা বলতে আরম্ভ করল, দেখ, মাস দুই আগে বেঞ্জিন আর কাঠের ছাইয়ের সমন্বয়ে তৈরী পেটেন্ট করা মুহূর্তের মধ্যে অগ্নিনির্বাপক বস্তুর কারবার করে আমার আর টেকসাস-এর ভালই রোজগারপাতি হচ্ছিল। বহু শহরে বস্তা বস্তা বিক্রি হচ্ছিল।

কিন্তু সমস্যাটা কোথায়?

সমস্যাটা দেখা দিল তখনই যখন তারা পেট্রোলিয়ামের দিকে ঝুকল। পেট্রোলিয়াম আমদানি করতে থাকলে আমার কারবার তো লাটে ওঠারই কথা। কার্যত হলও তা-ই

তবে এখন করছ কি? আমি আগ্রহ প্রকাশ করে বললাম।

পেট্রোলিয়াম আমদানি শুরু হলে আমি অনন্যোপায় হয়ে অগ্নি নির্বাপক বস্তুর কারবার ছেড়ে এখানে চলে এলাম। কে.সি-র সঙ্গে কারবারে মেতে গেলাম। মন-গড়া একটা খচ্চরের পাশ আর গোলাবাড়ি খাড়া করে কোন রকমে দিন গুজরান করছি, ব্যস। মিঃ পিকেন্স তুমি নিজের চোখে আমার ব্যাপার স্যাপার দেখে ফেলায় লজ্জায় যেন আমার মাথা কাটা যাবাব যোগাড় হয়েছে।

আমি সহানুভূতির সুরে বললাম দেখ হে, মাত্র দশ ডলার সামান্য মূলধন নিয়ে একাট লোন কর্পোরেশনের সঙ্গে একটু আধটু ধাপ্পাবাজিতে মাতলে লজ্জার কি-ই বা থাকতে পারে?

আমার কথাটা তার মনে খুবই ধরেছে বুঝলাম। তারপরই বললাম তা সত্ত্বেও আমি বলব, তোমার এ কাজটাকে কিন্তু সমর্থন করা চলে না। কাজটা তো অর্থকড়ি কর্জ করে আর ডান হাত উপুড় না করা, মানে ফেরৎ না দেওয়ারই মত।

স্বীকার করছি, গোড়া থেকেই বাকিংহাম স্কিনারকে আমার মনে ধরে গিয়েছিল।

দিন কয়েকের মধ্যেই আমাদের মধ্য হৃদ্যতার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল।

তার সঙ্গে কয়েকদিন মেলামেশার পরই আমার মাথায় যে মতলবটা চক্কর মারছিল সেটা সুযোগ বুঝে একদিন তার কাছে তুলে ধরলাম।

আমার মতলবটা তার খুবই মনে ধরে গেল। তাকে আমার কারবারের অংশীদার করে নেওয়ার প্রস্তাব দিলাম।

আমার কথা শুনে বাকিংহাম সোল্লাসে বলল, তোমার পরিকল্পনাটা চমৎকার! যদি সত্যি সত্যি অসৎ না হয় তবে যেকোন কাজের অংশীদার হতে আমি এক পায়ে খাড়া।

চমৎকার! এই তো চাই।

তবে একটা কথা, তোমার পরিকল্পনাটাকে আমি একবার যাচাই করে দেখে নিতে চাই।

ভাল কথা, সেটা কিভাবে করতে চাই, দেখ।

মোদ্দা কথা হচ্ছে, শুধুমাত্র দশটা ডলারের জন্য এরকম জঘন্য ধান্ধাবাজি, মানে জুয়াচুরি কারবার করতে নিজেকে খুবই ছোট মনে হয়।

আমার পরিকল্পনাটা আমার বেশ মনের মতই ছিল। আমি সহজেই ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ি। কোমল স্বভাবের মানুষের ওপর আমার মন এমনিতেই দুর্বল। সে জন্যই তো পরিকল্পনাটা আমার খুবই মনে ধরেছিল।

এ ধাপ্পাবজি কারবারটা চালাতে আমাদের একজন যুবতী সহায়িকা একান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। আমার খোঁজে মনের মত কোন সহায়িকা না থাকায় একদিন বাকিংহাম-এর কাছে প্রস্তাব রাখলাম। আমাদের প্রয়োজন মাফিক কোন যুবতীর খোঁজ তোমার জানা আছে?

খোলসা করে বল তো ঠিক কেমন মেয়ে আমাদের কাজের জন্য দরকার?

এমন একটা মেয়ে যোগাড় করতে হবে যার বুদ্ধি বিবেচনা পাকা, মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করতে পারে আর শৈশব থেকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যাভাস করার সময় পর্যন্ত ব্যবসা সংক্রান্ত ধ্যান ধারণা যার পাকা।

আর কিছু?

আর খেয়াল রাখবে, চিউংগাম চিবোতে ওস্তাদ, ছবির ফেরিওয়ালি বা নামকরা নৃত্যশিল্পী হলে কিন্তু আমাদের বাঞ্ছা পূরণ হবে না।

মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে নিয়ে বাকিংহাম এবার বলল, হ্যাঁ, তোমার ফরমাস মাফিক এক যুবতী আমার খোঁজে আছে বটে।

তবে তো আমার একটু যাচাই করে দেখা দরকার। নিয়ে যাবে?

অবশ্যই। কাজে লাগাবার আগে ভালভাবে বাজিয়ে দেখে তবেই তো সিদ্ধান্ত নিতে হবে। চল তার সঙ্গে কথা বলে দেখবে।

ভাল কথা, তার নামটা কি বল তো?

সারা,—সারা মেলয়।

আমি কৌতূহলবশতঃ বাকিংহাম-এর সঙ্গে মেয়েটার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে গেলাম। একটা বর্ণও বানিয়ে বলছি না। মেয়েটাকে দেখামাত্রই আমার চোখে লেগে গেল। প্রয়োজন অনুযায়ী আমি ঠিক যেমনটি চেয়েছিলাম মেয়েটা ঠিক তেমনটিই বটে। বাইশ বছর। পূর্ণ-যৌবনা। মাথায় এক রাশ ঝাঁকড়া বাদামি চুল। মিষ্টি স্বভাবা আর ঠোঁটের কোণে যেন সর্বক্ষণই হাসি লেগেই থাকে। হ্যাঁ আমাদের কাজের জন্য ঠিক এরকমই একটা মেয়ে দরকার।

প্রাথমিক শুভেচ্ছা বিনিময়ের পরই মেয়েটা ঠোঁটের কোণে হসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বলল, মঁসিয়ে, আসল ব্যাপারটা যদি খুলে বলেন তবে আমার পক্ষে কর্তব্য স্থির করা সহজ হবে।

আমি তার মতামত নির্দ্ধারণ করার সুবিধার কথা বিবেচনা করে বললাম, মাদাম, সত্যি করে বলতে কি, আমাদের মতলবটা, মানে ধাপ্পাবাজির কারবারটা বাস্তবিকই চমৎকার, রুচিসম্মত আর রোমাঞ্চকরও বটে। মনে করুন 'রোমিও জুলেয়েট'-এর বারান্দার সে মনোরম দৃশ্যটাও আমাদের মতলবটার কাছে জোলো বলে মনে হবে।

তারপর আমি আমাদের কারবারের কথা সবিস্তারে মিস মেলয়-এর কাছে ব্যক্ত করলাম। তার কাছে কিছুই গোপন করলাম না।

আমার মুখ থেকে সবকিছু খোলাখুলিভাবে শুনে মিস মেলয় আনন্দে আমাদের কারবারের অংশীদার হতে সম্মত হল। সে উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে আমাকে বলল, মঁসিয়ে, শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত একটি প্রতিষ্ঠানে আমি সচিব ও স্টেনোগ্রাফারের চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে এরকম সম্মানজনক কাজে যোগদানের সুযোগ পেয়ে আমি কেবলমাত্র খুশিই নই, নিজেকে ধন্য জ্ঞান করছি।

আমরা পূর্ব নিদ্ধারিত প্রকল্পটায় ঝুলে পড়লাম। কাজের পদ্ধতিটা ব্যক্ত করতে গিয়ে একটা বহুল প্রচলিত প্রবাদবাক্যের সাহায্য নিচ্ছি,—বিশ্বের সবসেরা ধাপ্পাবাজিগুলো আরম্ভ হয় হাতের লেখার নীতিবাক্য, স্তব-স্তোত্র, প্রবাদ উক্তি আর এসার্ড-এর উপকথাকে নির্ভর করে।

আর আমাদের ধাপ্পাবাজি কারবার? আমাদের শান্তিপূর্ণ ছোটখাট বাটপাড়িটা গড়ে তুলেছিলাম প্রাচীন এ-উক্তিটাকে ভিত্তি করে, 'যাবতীয় উদ্যোগই একজন প্রেমিকদের প্রতি আকৃষ্ট হয়।'

এক সন্ধ্যার কথা বলছি। বকিংহাম আর মিস মেলয় তখন তেজী ঘোড়ায় টানা একটা বগি গাড়িতে চেপে একটা গোলাবাড়ির দরজায় আচমকা গাড়িটা দাঁড় করাল।

গাড়ির ভেতরে বসে থাকা মেয়েটার মুখে বিষণ্ণতার ছাপ কিন্তু স্নেহের প্রলেপ দেওয়া। সে বাকিংহাম-এর হাত ধরে গাড়ি থেকে নেমে তার হাত ধরেই চলতে লাগল। তারা সবসময় এভাবেই চলে। তারা বলল, বাবা-মার নির্মম নিষ্ঠুর আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে বিয়ে করার বাসনা নিয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এসেছে। এর-ওর কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে তারা জানতে চাইল বিয়ের কাজ চালাবার জন্য একজন ধর্মযাজককে কোথায় পাওয়া যাবে।

গোলাবাড়ির মালিক তাদের যত্ন করে বসতে দিয়ে তাদের আগমণের উদ্দেশ্য বিস্তারিতভাবে শুনল। সব কিছু শুনে সে বলল, 'শোন বাপু, এ তল্লাটের সবচেয়ে বড় ধর্মযাজক রেভারেন্ড

আবেলস। ক্যানি ক্রিক-এ তাঁর নিবাস। এখান থেকে মাইল চারেক দূর।

গোলাবাড়ির মালিকের সহধর্মিণী হাত দুটো এপ্রণে মুছে চশমার ফাঁক দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। সে যে কি ভাবছে আর কি দেখছে তা সে সে-ই জানে।

ঠিক সে মুহূর্তেই দেখা গেল একটা এক্কা গাড়িতে চেপে পার্লে-ভূ পিকেন্স গোলাবাড়িটার দিকেই অগ্রসর হচ্ছে।

তার পরনে আগা গোড়া কালো পোশাক। ধবধবে সাদা নেকটাই। আর মুখটা ফজলি আমের মতই লম্বাটে। বিচিত্র শব্দ করে সে অনবরত নাক টেনে চলেছে।

এক্কা গাড়িটা আরও কিছুটা এগিয়ে এলে গোলাবাড়ির মালিক গাড়ির ভেতরে বসে থাকা পার্লে-ভূ পিকেন্স'কে মুহূর্তকাল অনুসন্ধিৎসু নজরে দেখেই আচমকা বলে উঠল, আরে মঁসিয়ে, ওই, ওই তো একজন ধর্মযাজক!

সে অঞ্চলের ছেলে বুড়ো সবার মুখে মুখে ঘুরে বেড়াতে লাগল, আমিই রেভ অবিজা গ্রীণ। আমি পরবর্তী রবিবার স্থানীয় 'লিটল বেথেল' বিদ্যালয় ভবনে প্রচার কার্যে বের হয়েছি। খুবই ব্যস্ত।

বাকিংহাম আর মিস মেলয় খুবই আগ্রহ প্রকাশ করল, আমি তাদের বিয়ের পাটটা চুকিয়ে দিলে তাদের বড়ই উপকার হয়। কারণ, মেলয়-এর বাবা সদলবলে মেয়ের তল্লাসে তাদের অনুসরণ করে চলেছে।

তাদের বিশেষ করে মেয়েটার কাতর মিনতি আগ্রহ করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত রেভারেন্ড গ্রীণ গোলাবাড়িরই বাইরের বড়সড় ঘরটায় তাদের বিয়ের পাট মিটিয়ে দিল।

গোলাবাড়ির মালিক হেসেহেসে তাদের বকাঝকা করল, আশীর্বাদও করল অন্তরের সবটুক শুভেচ্ছা নিঙড়ে। আর তাঁর সহধর্মিনী সদ্যবিবাহিতা মেলয়-এর পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে কম আদর—সোহাগ করল না।

এদিকে বিয়ের পাট মিটিয়ে নকল ধর্মযাজক রেভারেন্ড পার্লে-ভূ পিকেন্স একটা জব্বর বিয়ের সার্টিফিকেট লিখে ফেললো। গোলাবাড়ির মালিক আর সহধর্মিনী উৎসাহের সঙ্গে বিয়ের সাক্ষী হিসাবে সার্টিফিকেটে স্বাক্ষর করল।

তারপর থেকে এক এক করে আরও দুটো বিবাহার্থী নারী-পুরুষ নিজ নিজ গাড়ি চেপে নকল ধর্মযাজকের কাছে এল। বিয়ের পাট মিটে গেলে তারা আবার গাড়ি চেপে চলেও গেল।

হায় ঈশ্বর! কী আদর্শ ধাপ্পাবাজিই না সম্পন্ন হয়ে চলেছে! একদিকে প্রেমের সাগরে হাবুডুবু খাওয়া দুটো তাজা প্রাণের ভালবাসার সার্থকতা আর অন্য দিকে গোলাবাড়িতে সম্পন্ন ঘটনাগুলো, আমার জানা বাটপাড়দের মুখে আচ্ছা করে ঝামা ঘষে দেওয়া হল।

দিনের পর দিন আমি একই পদ্ধতি অনুসরণ করে কুড়ি জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকার হাতে হাত এক করে, কুড়ি জোড়া বাকিংহাম আর মিস মেলয়-এর বিয়ের পাট মিটিয়ে দিয়ে আমি সবার শ্রদ্ধা কুড়োলাম।

আমি কিন্তু ভুলেও ভাবলাম না, বিভিন্ন গোলাবাড়ির মালিকের কাছ থেকে পাওয়া হাত চিঠিগুলোতে তারা যে স্বাক্ষর করেছিল তার জন্য আমাদের প্রাপ্য অর্থ যখন ব্যাঙ্ক থেকে উঠিয়ে নিলাম আর তাদেরই হিসাব থেকে ব্যাঙ্ক সেগুলো কেটে নিল। আর প্রতিটা চিঠির জন্য তিনশ' থেকে পাঁচ শ' ডলার পর্যন্ত তখন নব-বিবাহিতা নারী-পুরুষদের দশা কি হয়েছিল, ভাবা যায়!

আমরা ধাপ্পা দিয়ে রোজগার করা ছ'হাজার ডলার আমরা তিনজনে সমানভাবে ভাগ করে নিলাম।

এতগুলো ডলার একসঙ্গে হাতে পেয়ে মিস মেলয় খুশিতে এমন ডগমগ হয়ে উঠল যে তার দু' চোখের কোল বেয়ে জল পড়তে লাগল। আনন্দাশ্রু।

কিছুক্ষণ ধরে চোখের জল ঝরিয়ে এক সময় সে বলল, ধাপ্পাবাজির এ খেলাটা তো খুবই মজার! সত্যি কথা বলতে কি, আমি যদি আপনাদের এ কাজে যোগদান না করতাম।

আপনারা যদি কারবারটার অংশীদার করে না নিতেন তবে আমার পরিস্থিতি খুবই সঙ্গীন হয়ে পড়ত। এ ডলারগুলো পেয়ে আমি একটা নতুন পরিকল্পনার কাজে হাত দিতে পারব ভাবছি, এবার সিলসিলাটিতে পাড়ি জমাব। সেখানে গিয়ে হস্তরেখা বিচার আর ভোজবাজির খেলায় নিজেকে লিপ্ত করব। মিশরীয় বিখ্যাত যাদুকরী মাদাম মারমালাই-এর মত একটা ডলারের বিনিময়ে ভাল ভাল ভবিষ্যদ্বানী করে হতাশা আর হাহাকারে জর্জরিত নারী পুরুষের মনে শান্তি ফিরিয়ে আনাই হবে তখন আমার প্রথম ও সবচেয়ে বড় কাজ।

বিদায় বন্ধুরা, ব্যবসাটায় লেগে থাকুন। কুচ পরোয়া নেই। কেবলমাত্র পুলিশ আর খবরের কাগজের দপ্তরের সঙ্গে একটু সদ্ভাব বজায় রাখতে হবে, ব্যস নিশ্চিন্ত।

আমরা তিনজনই পরস্পরের সঙ্গে করমর্দনের পালা মিটিয়ে ফেললাম।

করমর্দন সেরে মিস মেলয় খুশিতে নাচতে নাচতে বিদায় নিল। সে চলে যাওয়ায় আমরাও হাল্কা হয়ে গেলাম। কয়েক শ' মাইল দূরে পাড়ি জমালাম।

আসলে নকল ধর্মগুরু সেজে এতগুলো বিয়ে দেওয়া জাল সার্টিফিকেট বিক্রি করে অর্থোপার্জনের ব্যাপারটা চাউর হয়ে যাওয়ার আগেই মানে মানে কেটে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

আমাদের দু'জনের দু'হাজার করে মোট চার হাজার ডলার পকেটে নিয়ে আমরা সোজা নিউ জার্সির সে নামকরা শহরে চলে গেলাম।

আপনাদের হয়ত বদ্ধমূল ধারণা রয়েছে যে, নিউইয়র্কের মানুষগুলো খুবই বুদ্ধিমান আর জ্ঞানী গুণী। আমি কিন্তু বলব, আসলে কিন্তু অবশ্যই তা নয়। সত্যি কথা বলতে কি, ভাল কিছু শেখার সুযোগের খুবই অভাব তাদের। কারো যদি কোন ব্যাপারে জ্ঞানলাভের আগ্রহ থাকেও তবু সুযোগের অভাবে তাকে হা পিত্যেশ করতেই হবে।

আসল সমস্যাটা হচ্ছে, নিউইয়র্ক শহরের সব কিছুতেই ঢাক ঢাক গুড় গুড়। সবই আড়ালে আবডালে সম্পন্ন হয়।

তবে এ-ও সত্যি যে, এ শহরটার একদিক মহাসাগর দিয়ে এবং অন্যদিক নিউ জার্সির মাধ্যমে বৃহত্তর দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। এরকম যার ভৌগোলিক অবস্থান তার কাছ থেকে এর চেয়ে বেশী কিছু আপনাদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করা কি উচিত, নাকি প্রত্যাশা করে কোন ফল পাওয়া যাবে?

মোদ্দা কথা, অল্প মূলধনে সৎ ধাপ্পাবাজদের দু'পয়সা কামিয়ে নেবার উপযুক্ত জায়গা নিউইয়র্ক নয়। সেখানে জুয়া খেলার ওপর করের হার এত বেশী যে কারবার চালানোই সমস্যা। আবার যদি অতিমাত্রায় জুয়া খেলার কর দিয়ে কারবার চালাতে পারলে বাউভিল তো জুয়াড়ীদের কাছে স্বর্গরাজ্য বিবেচিত হয়।

কেবলমাত্র জুয়াখেলার কথাই বা বলি কেন—কাস্টমস দপ্তরের কর্তা ব্যক্তিদের পকেটে মোটা অর্থ গুঁজে দিতে পারলে লোককে ধাপ্পা দিয়ে সৌখীন জিনিসপত্র সেখানে প্রচুর মেলে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, তখন তো আর আমার পকেট ভর্তি ডলার ছিল না।

ডলারের গোছা নিয়ে আমি আর বাকিংহাম ভাগ্য পরীক্ষা করতে নিউইয়র্ক শহরে হাজির হলাম।

রোমুলাস জি. এটার বুরি-র সঙ্গে আমাদের ইস্ট সাইড়-এর এক হোটেলে আলাপ পরিচয় হল। তার মাথায় ইয়া বড় চকচকে টাক আর গাল পর্যন্ত নেমে আসা জুলফি তার মুখটাকে সুন্দর করে তুলেছে।

অর্থকড়ি লেনদেনের ব্যাপারে রোমুলাস জি. এটারবুরি-র মত মাথাওয়ালা লোক দ্বিতীয় আর একজন আমার চোখে পড়েনি। কোন অফিসের রেলিং-এর ভেতর তার মত একজন মাথার খোঁজ পেলে যেকোন লোক বিনা রসিদে চোখ-কান বুজে লাখ ডলারও জমা দিতে পারে।

রোমুলাস-এর আয় উপার্জন খুব সামান্য হলেও জামা-কাপড়ে কিন্তু রীতিমত ফিটফাট। কথা প্রসঙ্গে সে জানাল, একসময় স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্য ছিল। কিন্তু কিছু সংখ্যক ধনকুবের তার প্রতি ঈর্ষাবশত এমন একটা জটলা পাকাল যে, অনন্যোপায় হয়ে নিজের আসলটা তাকে

বিক্রি করে দিতে হয়।

আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বাকিংহাম আর আমাকে এটার বুরি-র খুব পছন্দ হয়ে যায়। সে আমাদের কাছে এমন কয়েকটা উদ্যোগের কথা ব্যক্ত করল যাদের ব্যাপারে দীর্ঘসময় ধরে চিন্তা-ভাবনা করতে গিয়ে আমার মাথার চুলগুলো পড়তে পড়তে একেবারে ফাঁকা হয়ে যাবার যোগাড় হয়! সে যতগুলো উদ্যোগের কথা জানাল তাদের মধ্যে একটা হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ ডলার খরচ করে একটা জাতীয় ব্যাঙ্ক খোলা।

সে তার পরিকল্পনাটাকে আমাদের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝিয়ে দিল। আমরা এবার তার কাছে আমাদের আর্থিক সঙ্গতির কথা খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করলাম।

তারপর আমাদের কাছ থেকে তার এক চতুর্থাংশ কর্জ নিয়ে বেরিয়ে গেল। একটু বাদেই এক বাক্স গলার চিকিৎসার লজেন্স নিয়ে ফিরে এল। উদ্দেশ্য, নিজের গলাটাকে একটু ভাল ক'রে পরিষ্কার করে নেওয়া। অল্প সময়ের মধ্যেই তার গলাটা একেবারে ঝরঝরে কনকনে হয়ে গেল।

রোমুলাস এবার নতুন ক'রে বকতে শুরু করে দিল। এবার সে আমাদের কাছে অপেক্ষাকৃত বড় বড় পরিকল্পনার কথা একেবারে আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়ে দিতে লাগল।

হ্যাঁ, রোমুলাস-এর ইচ্ছা পূরণ হতে দেরী হল না। আমাদের মনটা ঘুরে গিয়ে তার দিকে ভিড়তে লাগল।

রোমুলাস মন্তব্য করল তোমাদের মূলধন নিয়োগের ব্যাপারটা তার বিশাল টাকওয়ালা মাথাটার ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

আমরা নিজেদের মধ্যে সাধারণ জুয়াখেলা হিসাবে তার পরিকল্পনাটাকে ভালই মনে হল।

এরকম সাধারণ জুয়ার ব্যাপার-ট্যাপার পুলিশের ধরা-ছোঁয়ার মোটামুটি বাইরে থাকে আর মূলধন বাড়াবার ব্যাপারে এর জুড়ি হয় না।

সত্যি কথা বলতে কি বাকিংহাম আর আমি তো ঠিক এরকম কোন পরিকল্পনার আশা করেছিলাম, স্থায়ী কোন কারবারে আইননানুগ মূলধন খাটিয়ে অর্থোপাজন—পথের বাঁকে বা জমজমাট গলির মোড়ে ঘুঁটি সাজিয়ে বসে বাজিমাৎ—দু'হাতে ডলার কুড়নো।

তাই পরিকল্পনাটাকে বাস্তবায়িত করতে দু'সপ্তাহের মধ্যেই ওয়াক স্ট্রিটের লাগোয়া একটা সুসজ্জিত অফিস গড়ে উঠল। বড় বড় সোনালি হরফের একটা সাইনবোর্ড লটকে দেওয়া হল। তাতে লেখা—'দ্য গোলকুন্ডা গোল্ড বন্ড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী'।

অফিসটা বেশ কয়েকটা ঘর নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে। একটা বেশ বড় সড় ঘরে প্রতিষ্ঠানের সচিবও কোষাধ্যক্ষ মিঃ বাকিংহাম স্কিনার বহুমূল্য চকচকে চেয়ারে বসে। চকমকে তার পোশাক পরিচ্ছদ। লম্বাটে রেশমি টুপিটা টেবিলের এক ধারে রাখা থাকে। অধিকাংশ সময়ই তার খালি চেয়ারটা আর সুদৃশ্য টুপিটাই দেখা যায়, বাকিংহামকে ধারে কাছে কোথাও দেখা যায় না।

আর? সচিবের একজন সহকারী ও হিসাবরক্ষককে অফিসে দেখা যায়।

অন্য আর একটা টেবিলে বসে অতি সাধারণ একজন মানুষ। তাকে দেখলেই মনটা আনন্দে ভরে ওঠে। পোশাকের আড়ম্বর তো নেই-ই বরং সবসময় খুবই সাধারণ পোশাক তার গায়ে থাকে। পা দুটো তুলে প্রায় সর্বক্ষণই সে আপেল চিবোয়। মাথার বাজে টুপিটাকে পিছন দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। লোকটা কে, তাই না? তার বর্তমান নাম কর্নেল টেকুম্‌সে। এক সময় পার্লে-ভূ পিকেন্স বলেই সবাই তাকে চিনত। সে প্রতিষ্ঠানের ভাইস প্রেসিডেন্ট।

আমরা যখন ডাকাতির পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে নিয়ে কেবলমাত্র কাজ শুরু করার অপেক্ষায় আছি তখন আমি তাকে বললাম, দেখ হে, আমার জন্য ঝকমকে পোশাক পরিচ্ছদ দরকার নেই। আর আমি তো একজন খুবই সাধারণ লোক। সাদামাটা জামা পরি না। ফরাসী পোশাকও নয় বা সাময়িক চুলের ব্যবহার করতেও অভ্যস্ত নই।

বাকিংহাম আমার মুখের দিতে জিজ্ঞাসু নজর মেলে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

আমি মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বললাম, 'আরে ভাই, আমাকে নকল পাথর

'রাইনস্টোন' বিক্রেতার ভূমিকায় রেখে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।

নকল পাথর রাইনস্টোন বিক্রেতা?

কেন, অসুবিধে কোথায় বুঝছি নে তো। আর তাতে যদি আপত্তি থাকে তবে আমি না হয় সবার চোখের আড়ালেই থেকে যাব, কি বল?

আমি কি বলব ভেবে না পেয়ে তার মুখের দিকে আগের মতই ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম।

আমি এবার বললাম শোন বাকিংহাম, তোমরা যদি আমাকে স্বাভাবিক অথচ কদর্য চেহারায় রেখে কাজে লাগাতে পার তবে বরং তা-ই কর।

এটেরবুরি বলে উঠল, তোমাকে—তোমাকে সাজিয়ে গুছিয়ে কেতাদুরস্ত করব? আমার মত যদি নাও তবে একাজে, মানে তোমাকে সাজিয়ে গুজিয়ে রাখতে আমি মোটেই রাজি নই।

বাকিংহাম বলল, কেন? কোন্ যুক্তিতে আপনি এ কথা বলছেন, দয়া করে একটু খুলে বলবেন কি?

—কথাটা কিন্তু খুবই সোজা, একেবারে জলের মত পরিষ্কার। আমার যুক্তি হচ্ছে, ক্রিসেন্তিমাস ফুলে সুসজ্জিত, ঝকমকে আসবাবপত্র বোঝাই এক ঘরভর্তি লোকের চেয়ে আমাদের এ কারবারটার পক্ষে তুমি যা আর তার দাম অনেক বেশী বলেই আমার অন্তত বিশ্বাস।

হ্যাঁ, আপনার কথাটা সমর্থনযোগ্য বলেই মনে করছি। আমি বললাম।

এটেরবুরি তার প্রস্তাবটাকে জোরদার করার জন্য এবার বলল তোমাকে পাকা অভিনেতার ভূমিকা পালন করতে হবে, সুদূর পশ্চিম দেশীয় এলোমেলে চরিত্রের একজন মানুষের ভূমিকায় তোমাকে অভিনয় করতে হবে। পোশাক পরিচ্ছদের দিকে কোন নজর নেই, একেবারেই নিজের প্রতি উদাসীন প্রকৃতির একজন ধনকুবের মত—বুঝলে?

সে না হয় বুঝলাম। তারপর আমার কর্তব্য সম্বন্ধে তোমার—

হ্যাঁ, তারপর তোমার কর্তব্য হবে এমন হাবভাব দেখানো যে, প্রচলিত রীতিনীতিকে তুমি অন্তর থেকে ঘৃণা কর। আর কৌশলে সবাইকে বুঝিয়ে দিতে হবে, তুমি অগণিত স্টকের মালিক। সাদামাটা চেহারা আর পোশাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করলেও তোমার ব্যবসায়িক বুদ্ধি খুবই তীক্ষ্ণ সঞ্চয়শীলও বটে। বুঝলে, তোমাকে কিভাবে, কোন্ ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে?

আর কিছু?

হ্যাঁ, টেবিলের ওপর পা দুটোকে লম্বা করে ছড়িয়ে দিয়ে অধিকাংশ সময়েই আপেল চিবোতে থাকবে। খবরদার, খেয়াল রেখো, খেলাটা হচ্ছে, নিউইয়র্ক শহরে, আর খেলায় তোমাকে ছলে বলে কৌশলে জিততেই হবে।

অবশ্যই! অবশ্যই!

আর একটা কথা, টেবিলের ওপরে পা দুটোকে টানটান করে যখন তুমি আপেল চিবোতে থাকবে তখন খোসাগুলোকে টেবিলের ড্রয়ারে রেখে দেবে। এতে তোমাকে মিতব্যয়ী। সঞ্চয়শীল আর কর্কশ বলেই মনে হবে, বুঝলে?

আমি নীরবে ঘাড় কাৎ করে তার বক্তব্যকে সমর্থন করলাম। বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে এটেরবুরি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে নিজের কাজে চলে গেল।

আমি তার বুদ্ধি পরামর্শ হুবহু মেনে চলতে লাগলাম। আমি সাদামাটা পোশাক আশাকে রকি পর্বতের পাদদেশের অঞ্চলের মহাজনের ভূমিকায় জোর অভিযান চালাতে লাগলাম।

শিকার ঘরে পা দিলেই এটেরবুরি সশ্রদ্ধ আর ক্ষমাশীল কণ্ঠে আমার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই তাকে বলে উনি আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট কর্নেল পিঁকেন্স। মনে করতে পারেন পশ্চিমের লগ্নিকারকদের পক্ষে তিনি যথার্থই একজন ধনকুবের স্বরূপ। পোশাক আশাক হিসেবে যেমন একেবারে সাদামাটা আর কথাবার্তা ও কাজকর্মের দিক থেকেও সহজ সরল প্রকৃতির।

ছোট্ট একটা শিশুর মতই সরল তার মন। পাঁচ লক্ষের চেকে স্বাক্ষর করতে পারেন—খুবই সরল প্রকৃতির। অভাবনীয়, একেবারেই অত্যাশ্চর্য ব্যাপার মশাই। তবে এ-ও সত্য যে, উনি অস্বাভাবিক রক্ষণশীল আর সাবধানতা অবলম্বন করে চলেন।

যৌথ কারবারটা এটেরবুরিই পরিচালনা করে। বাকিংহাম আর আমি সব কিছু ঠিকঠাক বুঝতে পারি না। তবে এ-ও মিথ্যা নয়, তার কাজে কোন ফাঁক ফোকড় নেই। সময় সুযোগ পেলেই সে আমাদের সবকিছু খোলসা করে বুঝিয়ে বলে।

আমাদের প্রতিষ্ঠানে যারা স্টক কিনতে আসে এটেরবুরি তাদের গ্যারান্টি দেয়, প্রতি মাসে শতকরা দশ ভাগ হিসেবে তাদের সুদ দেওয়া হবে। আর সুদটা তাদের দেওয়া হবে প্রতিমাসের শেষ তারিখে। মনলোভা শর্তই বটে!

কোন একজন স্টক প্রাপক কোম্পানিতে যদি একশ' ডলার জমা দেয় তবে কোম্পানি তার নামে একটা সোনালি বন্ড বাজারে ছাড়ে আর সে একজন বন্ড প্রাপকে পরিণত হয়ে যায়।

একদিন আমি কাজের ফাঁকে, এটেরবুরি'কে একা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। বলুন তো, একজন লগ্নীকারীকে এমন কি সুযোগ সুবিধা দিতে পারবে, বলুন তো শুনি? সুযোগ সুবিধে বলতে বুঝাতে চাইছি বাড়তি সুযোগ-সুবিধার কথা বুঝাচ্ছি, যা একজন স্টক প্রাপক পায় না এমন কোন সুযোগ-সুবিধে।

আমার কথা শেষ হতে না হতেই এটেরবুরি টেবিল থেকে একটা 'সোনালি বন্ড' হাত তুলে নিল। সম্পূর্ণ বন্ডটাই গিল্টি করা। আর তার গায়ে বাছাই করা কিছু শব্দ ব্যবহার করে কিছু কথা লেখা আছে। তার ঠিক কেন্দ্রস্থলে একটা লাল শিলমোহর লাল ফিতে দিয়ে সুন্দর করে বন্ডটা বেঁধে রাখা হয়েছে।

বন্ডটা হাতে নিয়ে এটেরবুরি এমন বিশেষ এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল যেন আমার কথা তার অন্তরে আঘাত হেনেছে।

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই বলল, প্রিয় বন্ধু কর্নেল পিকেন্স, আমি লক্ষ্য করছি, কলাকৃতির প্রতি তোমার মধ্যে তেমন কোন আকর্ষণই নেই।

আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললাম, তাই বুঝি? কি করে বুঝলে?

তোমার আচরণই আমার মন্তব্যের সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

আমি তার কথার কি জবাব দেব ভেবে না পেয়ে মুখে কলুপ এঁটে তার বক্তব্য শোনাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করলাম।

সে বলে চলল, দেখ, এরকম সুন্দরভাবে লিথোগ্রাফ-করা মনোলোভা এ রত্নটা হাতে পেলে হাজার হাজার পরিবারের মানুষ আনন্দের জোয়ারে ভাসতে আরম্ভ করে। তাদের পরিস্থিতিটার কথা একবারটি ভেবে দেখ তো?

আমি নীরবে চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

এটেরবুরি তার মুখে দিকে তাকিয়ে এবার বলল, হায়? তোমার চোখ দুটো জলে ছলছল করছে কর্নেল! আমার কথাগুলো তোমার মনে জোর ধাক্কা দিয়েছে, ঠিক কিনা?

আমি চোখ মুছতে মুছতে বললাম, না, আমার চোখে তো কিছুই নেই, স্বচ্ছ। আরে আমি তোমার দিকে অপলক চোখে দীর্ঘ সময় ধরে তাকিয়ে কথাগুলো শুনছিলাম কিনা তাই হয়তো এরকমটা হলেও হতে পারে। তবে আমার কিন্তু মনে হচ্ছে যে আদ্রতা তোমার চোখে ধরা পড়েছে সেটা আপেলের রস হাওয়াটাই স্বাভাবিক।

আপেলের রস! চোখের তারায় বিস্ময়ের ছাপ এঁকে আমি বললাম।

এতে এমন অবাক হবার কি আছে, বুঝছি না-তো।

কোন একজন মানুষ দিনভর আপেল চিবোবে আবার সে সঙ্গে কলাকৃতির প্রতি অনুরক্তও হবে, এটা তো তোমার পক্ষে প্রত্যাশা করা সম্ভব নয়।

আগেও বলা হয়েছে, কোম্পানির প্রায় সবই এটেরবুরিই দেখভাল করে। আমার বিচার বিবেচনা অনুযায়ী তার কাজটা খুবই সাধারণ। বিনিয়োগকারীরা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী অর্থকড়ি

স্টক-এ জমা দিয়েই নিজেদের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করে ফেলেছেন।

—লাভের অর্থকড়ির ব্যাপারটা—

আমাকে থামিয়ে দিয়ে এটেরবুরি বলে উঠল,—হ্যাঁ, গোলকুণ্ড গোল্ড বন্ড ইন্‌ভেস্টমেন্ট প্রতিষ্ঠান কিভাবে লাভের অর্থ পকেটে পুরতে পারে তা-ও আমরা বুঝি। তবে একটু খুলেই বলি কেমন? মনে কর তুমি অর্থ নিলে। ফেরৎ দিলে শতকরা দশভাগ হারে। ব্যাপারটা কি এরার খোলসা হল না? তুমি সঙ্গতভাবেই শতকরা নব্বই ভাগ লাভ করলে, বুঝলে?

হ্যাঁ, এ পর্যন্ত বুঝলাম।

তারপর শোন তবে, ওই শতকরা নব্বই ভাগের কথা বললাম, তা থেকে কিন্তু খরচ-খরচা বাবদ অর্থ বাদ যাবে, মনে রেখো। আসলে এ পর্যন্ত যা কিছু বললাম সবই চলবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার মক্কেল তোমার পরামর্শ অনুযায়ী প্রতিটা পদক্ষেপ ফেলবে, বুঝলে?

আমি নীরবে ঘাড় কাৎ করলাম।

প্রতিষ্ঠানটা গড়ে তোলার সময় এটেরবুরি প্রেসিডেন্ট আর কোষাধ্যক্ষ উভয় পদই আঁকড়ে ধরতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল।

বাকিংহাম তখন এটেরবুরি-র দিকে চোখ দুটো বড় বড় করে তাকিয়ে বলে ওঠে, মন দিয়ে শোন, আমি নিজেকেই কোষাধ্যক্ষ হিসেবে ঘোষণা করলাম এবং দায়িত্বভার নিজের কাঁধে তুলে নিলাম। এটা তো মিথ্যা নয়, বাকিংহাম পিকেন্স আর আমি মূলধন যুগিয়েছি। অনুপার্জিত মূলধন যা কিছু বৃদ্ধি হবে তার ব্যবস্থা যা করার তা আমরাই করব। এতে অন্তত অন্যের মাতব্বরি বরদাস্ত করব না।

প্রতিষ্ঠানের ঘরগুলোর ভাড়া আর আসবাবপত্র দিয়ে সেগুলোকে সাজিয়ে গুছিয়ে নেওয়ার জন্য খরচ খরচার প্রথম কিস্তির জন্য আমার পাঁচশ' ডলার শোধ করতে হল। পনেরশ' ডলার খরচ করতে হয়েছে বিজ্ঞাপন ও ছাপার কাজকর্ম বাবদ।

অস্বীকার করা যাবে না, এটেরবুরি ব্যবসা খুব ভাল বোঝে। পাকা বুদ্ধি। সে আমার মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বলল, মনে রেখো, আমরা, মানে আমাদের কারবারের আয়ু ঠিক তিন মাস।

তিন মাস? যদি তারপরও—

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সে বলল, তারপরও, মানে তিন মাসের পর একটা দিনও যদি বেশী হয় তবে আমাদের গর্তে ঢুকে পড়তে হবে, নইলে ছদ্মনাম ধারণ করে চলাফেরা করতে হবে, বুঝলে?

তবে কি যা কিছু করার সবই তিন মাসের মধ্যেই সেরে ফেলতে হবে?

অবশ্যই জাল গুটিয়ে আমাদের ষাট হাজার ডলার পকেটস্থ করে নিতে হবে, মনে থাকে যেন।

কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের পরিকল্পনা বাস্তবরূপ নিতে লাগল। চারদিক থেকে টাকা এসে আমাদের প্রতিষ্ঠানে জমা পড়তে আরম্ভ করল।

বাকিংহাম-এর এক মিনিটও ফুসরত নেই। সারাটা দিন চেক, কাগজের নোট, মানি-অর্ডার প্রভৃতি নিয়ে মেতে থাকে। একে টেবিলের ওপর ফাইলের পাহাড় তার ওপর রোজই ধরতে গেলে কাতারে কাতারে মানুষ স্টক কেনার জন্য তার ঘরে ভিড় জমায়।

তবে শেয়ারগুলো খুব বেশী ডলারের নয়। অধিকাংশই সামান্য অর্থের মানে দশ, পঁচিশ আর পঞ্চাশ ডলারের। আবার বেশ কিছু দু'-তিন ডলারের শেয়ারও আছে।

অল্প দামের শেয়ার হলে কি হবে, এতেই প্রেসিডেন্ট এটেরবুরির মুখে হাসির ঝিলিক সর্বদা লেগেই থাকে। মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহ উদ্দীপনা অসৎ মনোবৃত্তি ও আচরণে তার মসৃণ টাকটা আরও বেশী চকচক করতে থাকে।

এটেরবুরি-র পরামর্শ অনুযায়ী আমরা তিন মাস ধরে চুটিয়ে কারবার চালালাম। নির্বিঘ্নেই আমাদের কারবারটা চলল। আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা একের পর এক ডলারের গোছা দিয়ে ড্রয়ার বোঝাই করতে লাগলাম।

আবার স্টক বিক্রির টাকাও নিয়মিত গ্রাহকদের হাতে তুলে দিলাম। ফলে সে ব্যাপারে

কোনরকম হৈ হট্টগোল হল না, হবার কথাও তো নয়।

যখন আমরা পঞ্চাশ হাজার ডলারের গোছা ড্রয়ারে ঢুকিয়ে ফেলেছি। পঞ্চাশ হাজার ডলার, কম কথা! ফলে আমরা তিনজনই তখন লটারিতে বরাত খোলা ভাগ্যবানদের মত বিলাস ব্যসনের মধ্য দিয়ে দিন কাটাতে লাগলাম। আমাদের র‍্যালা তখন আর দেখে কে!

এক সকালে বাকিংহাম আর আমি প্রাতরাশ খেয়ে অফিসের দিকে চললাম। সদর দরজার কাছে যেতেই দেখলাম সাধারণ চেহারা আর ততোধিক সাধারণ পোশাক আশাকে সজ্জিত একজন আমাদের অফিস থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। তার দু'ঠোঁটের ফাঁকে আটকানো পাইপটা থেকে অনবরত ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সে গটমট করে এগিয়ে যেতে লাগল।

ঠিক তখনই এটেরবুরিও অফিসের সদর দরজায় হাজির হল। তাকে দেখে মনে হল সে যেন বৃষ্টিতে কাকভেজা হয়ে এসেছে।

আমাকে সামনে পেয়ে সে অ-চেনা লোকটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই বলল কে? ঐ লোকটা কে, চেন?

না, আমদের দু'জনের মধ্যে কেউ-ই তাকে চিনি না।

আমিও তো চিনতে পারছি না। তবে আমি বাজি ধরে বলতে পারি, লোকটা খবরের কাগজের কর্মী।

বাকিংহাম ঘাড় ঘুরিয়ে চলে-যাওয়া লোকটাকে আর একবার দেখে নিয়ে বলল, এখানে তার কি দরকার? কি চায়?

খবর। শুদ্ধ ভাষায় যাকে বলে সংবাদ। সে কিছু শেয়ার কিনতে আগ্রহী। একের পর এক প্রায় ন'শ' প্রশ্ন সে আমাকে করেছে। আর প্রায় প্রত্যেক প্রশ্নের মাধ্যমে সে আমাদের দুর্বল জায়গাগুলোতে ঘা মেরেছে। আমি তো জানিই সে খবরের কাগজের কর্মী। আরে বাবা, আমাকে ঘায়েল করা এত সোজা।

তবে আর অসুবিধে কি?

দেখ হে, যা-ই বলি না কেন, আসলে আমি খবরের কাগজের ঘাঘু লোকগুলোকে খুবই ভয় করি।

আমরা তার মুখের দিকে নীরব চাহনি মেলে তাকিয়ে রইলাম। এটেরবুরি বলে চলল, দেখ, ডাকঘরের পরিদর্শক আর গোয়েন্দাদের নিয়ে আমার মোটেই মাথাব্যথা নেই। তাদের সঙ্গে আট মিনিট কথাবার্তা চালিয়েই শেয়ার বিক্রি করে দেই। আব খবরের কাগজের লোকগুলো আমার ঘাম ছুটিয়ে দেয়।

তবে? আমাদের কিছু করণীয় আছে কি?

আমার পরামর্শ যদি তোমরা শোন তবে বলি, একটা লভ্যাংশ ঘোষণা করে দিয়ে আমরা বরং পাততাড়ি গুটিয়ে এখান থেকে সরে পড়ি।

সরে পড়ব? মানে কারবার গুটিয়ে?

অবশ্যই। কারণ, তোমরা কিছু অনুমান করতে না পারলেও পরিস্থিতি কিন্তু সে দিকেই বাঁক নিচ্ছে।

বাকিংহাম আর আমি প্রায় সমস্বরেই এটেরবুরিকে বলে উঠলাম-ধ্যুৎ! তুমি চুপ করত। তোমার বক্তৃতা থামাও তো দেখি হে! তুমি যা-ই ভাব না কেন, আমাদের কাছে কিন্তু মোটেই সাংবাদিক বলে মনে হচ্ছে না।

আমরা বেশ জোর দিয়ে তার কথার বিরোধিতা করলেও এটেরবুরি কিন্তু মোটেই নিজের বক্তব্য থেকে এতটুকুও সরে যেতে পারল না। ফলে সারাটা দিন বিষণ্ন মনে নিজের ঘরে বসেই কাটিয়ে দিল।

পরদিন বাকিংহাম আর আমি সকাল সাড়ে দশটার কাছাকাছি হোটেল থেকে বেরিয়ে পথে নামলাম। এক ফেরিওয়ালার কাছ থেকে কয়েকটা খবরের কাগজ কিনে বগলে নিয়ে নিলাম। একটা খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠাটার ওপর চোখ বুলাতে গেলে প্রথমেই চোখে পড়ল আমাদের ছোট কোম্পানির কিছু ভুল-ভ্রান্তির বিবরণ।

হ্যাঁ, এটেরবুরি একেবারে ঠিক কথাই বলেছিল। এ দুনিয়ায় পিতৃদত্ত জীবনটাতে অস্তিত্ব রাখতে হলে গোলকুন্ডা গোল্ড বন্ড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট, কোষাধ্যক্ষ, ভাইস-প্রেসিডেন্টের এখান থেকে যত শীঘ্র সম্ভব সরে পড়তে হবে।

বাকিংহাম আর আমি ব্যস্ত-পায়ে অফিসের দিকে হাঁটা দিলাম।

সদর-দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই তো আমাদের চোখ ছানাবড়া হওয়ার যোগাড়। দেখি, সিঁড়ি, বারান্দা আর হলঘরে লোক ভিড় করে নানা রকম কথা বলাবলি করছে।

সবাই অফিসের ভেতরে ঢোকার জন্য হুড়োহুড়ি করছে। কিন্তু না পারায় হুড়োহুড়ি আরও বেড়েই চলেছে। আসলে রেলিং-এর ভেতরটা মানুষে ঠাসা হওয়ার জন্যই এ সমস্যাটা আরও জটিল হয়ে উঠেছে।

উপস্থিত মানুষগুলোর সবার হাতেই সোনালি বন্ড আর গোলকুন্ডা স্টক-এর কাগজ।

বাকিংহাম আর আমি নিঃসন্দেহ হয়ে পড়লাম যে, খবরের কাগজের বক্তব্য পড়েই সবাই এমন উতলা হয়ে ছুটে এসেছে।

লক্ষ্য করলাম, ভিড়ের মধ্যে কল-কারখানায় কাজ করে এমন বহু বুড়ো-বুড়িই আছে। আবার যুদ্ধফেরৎ বহু বুড়ো মানুষও চোখে-মুখ উৎকণ্ঠার ছাপ এঁকে ভিড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি করে চলেছে। যুদ্ধফেরৎ বুড়োদের মধ্যে জনা কয়েক আবার বিকলাঙ্গ—যুদ্ধে হাত বা পা খুইয়েছে। সবার হাতেই কিন্তু একটা করে সোনালি বন্ড আর গোল্ডকুন্ডা স্টক-এর কাগজ।

আমি লক্ষ্য করলাম, ভিড়ের মধ্যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠিত মানুষগুলোর দিকে বাকিংহাম হতাশ ও বিবর্ণমুখে তাকিয়ে। কয়েক মুহূর্ত ম্লানমুখে লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে সে দু'পা এগিয়ে গিয়ে এক রোগাটে অতি বৃদ্ধার মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াল। কণ্ঠস্বরে কৃত্রিম সহানুভুতির সুর টেনে সে বলল—মাদাম, আপনিও কি এ অফিস থেকে বন্ড কিনেছিলেন?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বৃদ্ধাটি বলল—আর বলবেন না মঁসিয়ে, কি কুক্ষণে যে এমুখো হয়েছিলাম।

কেন? সোনালি বন্ড বা স্টক কেনার কথা বলছেন?

তবে আর বলছি কি, আমি অনেক কষ্টে জমানো পুরো একশ' টা ডলার এখানে বিনিয়োগ করেছি।

একশ' ডলার?

হ্যাঁ। মঁসিয়ে, বললে বিশ্বাস করবেন কিনা, জানি না, ওই ডলারগুলো ছিল আমার সারাটা বছরের সঞ্চয়। আমার একটা ছেলে ঘরে মৃত্যু-শয্যায়। হাতে একটা সেন্টও নেই যে, দু' ফোঁটা ওষুধ বা পথ্যি এনে তার মুখে দেই।

বাকিংহাম নিজের অজান্তেই দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

অসহায় বুড়িটা বলেই চলল—শয্যাশায়ী ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে এলাম। ভাবলাম ক'টা ডলার তুলে নিয়ে গিয়ে তাকে কিছু পথ্য আর ওষুধ কিনে দেব। এখানকার নিয়মকানুনে বলা ছিল, যেকোন সময় সঞ্চিত অর্থ থেকে কিছু পরিমাণ তুলে নেওয়া যাবে।

তারপর? তারপর কি হল?

কি আর হবে, সবাই যা বলাবলি করছে তাতে তো এখন বুঝছি আমি ধনে-প্রাণে মারা যেতে বসেছি। আমার সবকটা ডলারই খোয়া যাবে।

আমার ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে লক্ষ্য করলাম, কিছু বুড়ো-বুড়ি অঝোরে চোখের জল ফেলে চলেছে। দু'-চারজন প্রায় বিলাপ পেড়ে কাঁদছে।

আর সবচেয়ে করুণ অবস্থা দেখলাম, কারখানার মেয়েগুলোর। তারা বুড়ো-বুড়িদের চেয়েও বেশী ভেঙে পড়েছে। দিনের পর দিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে, শখ আহ্লাদকে জলাঞ্জলি দিয়ে যা কিছু জমিয়েছিল সবই খোয়া যেতে বসেছে।

আমি দু'পা এগিয়ে যেতেই দেখলাম, লাল শাল গায়ে একটা যুবতী এমন আকুল হয়ে কান্নাকাটি করছে যেন হতাশা আর হাহাকারে তার বুকটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। তার অবস্থা দেখে আমার মনটা এমনই বিষিয়ে উঠল যে, তার কাছে গিয়ে কিছু বলার মত সাহস বা উৎসাহ কিছুই পেলাম না।

বাকিংহাম কিন্তু স্থির থাকতে পারল না। সে হাপুস নয়নে ক্রন্দনরত যুবতীটার দিকে এগিয়ে গিয়ে সহানুভূতি প্রকাশ করে খোঁজ নিল।

শোকে বিহ্বল মেয়েটা কাঁপতে কাঁপতে বলল—মঁসিয়ে, আমার বিপদের কথা কারো কাছে মুখফুটে বলার নয়। আমার দম বন্ধ হয়ে আসার যোগাড় হয়েছে।

তারপর চোখ ডলতে ডলতে পাশের এক মাঝবয়সী মহিলার দিকে ফিরে সে বলতে লাগল—দিদি আমার কি উপায় হবে! জ্যাকি তো এখন আর আমাকে বিয়ে করতে রাজি হবে না—কিছুতেই না। সে ওই রোগা, হাড় জিরজিরে স্টেইনফেল্ডকেই বিয়ে করে ঘর বাঁধবে। ওই নচ্ছাড় মেয়েটার চারশ' ডলার সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা আছে। আমি তো জ্যাকিকে হাড়ে হাড়ে চিনি। সে অবশ্যই আমাকে ছেড়ে স্টেইনফেল্ডকেই বিয়ে করবে। আমি সে দৃশ্য কেমন করে সহ্য করব দিদি! ভেবেই যে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে গো!

বাকিংহাম হঠাৎ আমার চোখে চোখ রাখল। লক্ষ্য করলাম, তার চোখে কিসের যেন ইঙ্গিত। সে অকস্মাৎ দৃষ্টি ফেরাল। আমিও তার দৃষ্টিপথ অনুসরণ করে দেওয়ালের দিকে দৃষ্টি ফেরাতেই আমি চমকে গেলাম। বুকের মধ্যে ধড়াস্ করে উঠল। দেখলাম, খবরের কাগজের সেই রিপোর্টার দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে চুরুট টানছে আর অনবরত ধোঁয়া ছেড়ে চলেছে, তার চোখের তারায় উপচে-পড়া কৃতিত্বের ছাপ।

মুহূর্তের মধ্যেই আমি নিজেকে সামলে নিলাম। বাকিংহাম-এর চোখের ইশারায় আমি তার সঙ্গে রিপোর্টার ভদ্রলোকের দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম।

বাকিংহাম ঠোঁটের কোণে কৃত্রিম হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বলল—মঁসিয়ে, স্বীকার করতেই হয়, আপনার কলমের জোর আছে বটে। সত্যি বলছি, আপনি লেখেন খুবই ভাল।

চুরুট টানতে টানতে ভদ্রলোক বাকিংহাম-এর মুখের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। নীরবে মুচকি হাসল।

বাকিংহাম এবার বলল—লেখাটাকে আপনি কতটা টেনে নিয়ে যাবেন বলে মনস্থ করেছেন, জানতে পারি কি? আপনার হাতে কি আরও খবরটবর কিছু আছে?

চুরুটে লম্বা একটা টান দিয়ে রিপোর্টার এক গাল ধোঁয়া বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে মুচকি হেসে বলল—মঁসিয়ে, খবর সংগ্রহ করাই আমার কাজ। আর খবর সংগ্রহের জন্যই তো আমাকে উদয়াস্ত হন্যে হয়ে ছুটোছুটি দাপাদাপি করতে হয়, আমার যা করণীয় তা-ত সেরেই ফেলেছি।

—ঠিক বুঝলাম না।

ম্লান হেসে রিপোর্টার এবার বসল—না বোঝার মত কথা তো আমি বলি নি মঁসিয়ে। সত্যি আমার কাজ মিটে গেছ। এবার যা করার সবই সোনালি বন্ড আর স্টক প্রাপকরাই করবে আশা করি বুঝতেই পারছেন, তাদের মধ্যে এমন জনা কয়েক তো থাকতেও পারে যারা আদালতের শরণাপন্ন হতে উৎসাহী হবে। দেখা যাক, কোথাকার জল গড়িয়ে কোথায় গিয়ে থামে।

রিপোর্টারের কথা শেষ হবার আগেই বাইরে তুমুল হৈ হট্টগোল শুরু হয়ে গেল। সে উৎকর্ণ হয়ে ব্যাপারটা সম্বন্ধে ধারণা করে নেবার চেষ্টা করল। কিন্তু নিঃসন্দেহ হতে পারল না। ফলে উপায়ান্তর না দেখে সে দৌড়ে বাইরে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

বাকিংহাম তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল—মঁসিয়ে ব্যস্ত হবে না, একটু অপেক্ষা করুন। আপনাকে কিছু খবর দিতে চাইছি, অবশ্য যদি আপনি উৎসাহী হন।

কি খবর জানতে চাওয়ার আগেই বাকিংহাম কোটের পকেট থেকে যন্ত্রচালিতের মত হাতটা চালিয়ে দিয়ে আমার হাতে একটা চাবি গুঁজে দিল।

সে যে কি বলতে চাইছে, কি তার ইচ্ছা তা বুঝতে আমার মোটেই দেরী হল না।

সে আমার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে অনুচ্চকণ্ঠে, ধরতে গেলে প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল—বকিংহাম, এ ধাপ্পাবাজিটা আমাদের কাজের বাইরে পড়ছে নাকি?

আমি গম্ভীরকণ্ঠে উচ্চারণ করলাম—হুম্!

—আমাদের কি এটাই ইচ্ছা সে, জ্যাকি রোগা সেইনফেল্ডকে বিয়ে করে সুখে ঘর-সংসার করুক?

আমি মুচকি হেসে বললাম—বাকিংহাম, আমার ভোটটা তোমার দিকেই পড়বে?

'সে আর কথা না বাড়িয়ে নীরবে, চোখের ভাষায় আমাকে কর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশ দিল।

আমি কণ্ঠস্বরে ব্যস্ততা প্রকাশ করে বললাম—আরে যাচ্ছি—যাচ্ছি, ঝড়ের বেগে ছুটে গিয়ে তোমার বাঞ্ছিত বস্তুটা এনে তোমার হাতে তুলে দেব। মাত্র মিনিট দশেক সময় আমি চেয়ে নিচ্ছি।

আমি কথা বলতে বলতে লম্বা লম্বা পায়ে ভল্টের দিকে এগিয়ে গেলাম। সেটা হচ্ছে, সেফ ডিপোজিট ভল্ট।

বেশ বড়সড় একটা রুমালে নোটের গোছাটা বেঁধে আমার চেয়ে-নেওয়া সময়ের আগেই জায়গামত ফিরে এলাম।

বাকিংহাম আর আমি এবার রিপোর্টারকে আমাদের সঙ্গে বাইরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলাম।

তাকে নিয়ে আমরা বাঁকা-পথে, অফিসের পিছন দিক দিয়ে অফিসেরই একটা ফাঁকা ঘরে ঢুকলাম।

রিপোর্টার চোখের তারায় বিস্ময় মিশ্রিত জিজ্ঞাসার ছাপ এঁকে প্রথমে আমার দিকে, পরমুহূর্তেই বাকিংহাম-এর দিকে তাকাল। আমি নিষ্ক্রিয়ই রইলাম। আসলে পুরো ব্যাপারটা যে বাকিংহাম অঘোষিতভবে হলেও নিজের কাঁধে নিয়ে নিয়েছে। আমি দর্শকের ভূমিকা পালন করছি বলা যেতে পারে।

বাকিংহামই সমস্যার সমাধান করে দিল। সে রিপোর্টারকে লক্ষ্য করে বলল—মঁসিয়ে, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? ওই চেয়ারটা টেনে দয়া করে বসে পড়ুন। একদম শান্তভাবে বসবেন।

রিপোর্টার তার নির্দেশ অনুযায়ী চেয়ারটা টেনে বসতে বসতে বলল—এ সবের কারণ কি কিছুই বুঝতে পারছি নে! আমাকে এখানে আনা হলই বা কেন?

ব্যাপার তেমন কিছুই নয়। আমরা, বিশেষ করে আমি আপনার একটা সাক্ষাৎকার নেব।

ইতিমধ্যে এটেরবুরি আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে। তার চোখে গভীর জিজ্ঞাসার ছাপ। ব্যাপারটার বিন্দু-বিসর্গও বুঝতে না পেরে সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

বাকিংহাম এবার আমার আর এটেরবুরির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলল—আমার রিপোর্টার বন্ধু, এ ধাপ্পা বাজ দু'জনের দিকে তাকিয়ে দেখুন। এরা দু'জনই আরাকানের ধাপ্পাবাজ কাউন্টির ধাপ্পাবাজ ভিল থেকে এসেছে।

আমি আর বাকিংহাম এক সময় ওল্ট পয়েন্ট কমফর্ট থেকে শুরু করে গোল্ডেন গেট পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে প্রসাধন সামগ্রী থেকে শুরু করে নিত্য ব্যবহার্য নানা খুঁটিনাটি জিনিস ঘুরে ঘুরে বিক্রি করতাম।

ফেরি করতে বেরিয়ে কারো পকেটে অতিরিক্ত ডলার আছে জানতে পারলেই তার পিছু নিতাম। সেগুলো আত্মসাৎ না করা পর্যন্ত তাকে ছাড়ান দিতাম না। তবে অতি বড় বিশ্বনিন্দুকও বলতে পারবে না যে, কোন দীন দরিদ্রের পকেট হাতড়ে কোনদিন আমরা একটা কানাকড়িও বাটপাড়ি করে নিয়েছি।

এতদিনে বুঝতে পারলাম, আমরা ভুল করে আজ আমাদের নীতি বহির্ভূত পথেই পা বড়িয়েছি। হা-ঘরে গরীবদের পকেটই আমরা বেশী সংখ্যক কেটেছি। অস্বীকার করতে পারব না, ব্যাপারটা আমাদের আগেই বোঝা উচিত ছিল।

আসল সমস্যাটা আমি এতদিনে বুঝতে পেরেছি। আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি সত্যি নিউ ইয়র্কবাসীর মতই ছিল। মানুষ পোশাক আশাক আর বাহ্যিক আড়ম্বর দিয়েই তাদের আর্থিক সঙ্গতি-অসঙ্গতির বিচার করেই আসল কেলেঙ্কারীটা করে ফেলেছি।

শুনুন রিপোর্টার বন্ধু আপনার হাতে যদি অল্প সময়ও থাকে তবে কাগজ-কলম নিয়ে লেখায় মেতে যান। আর যদি চান তবে আপনার খবরের কাগজের জন্য আরও কিছু মালমশলা সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে পারেন, কি দরকার আছে, লিখে নিন তবে।

আমার দিকে ফিরে বাকিংহাম বলল এটেরবুরি যা খুশি ভাবতে পারে তা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই। আমি তাকে মোটেই আমল দিতে রাজি নই।

অবশ্যই।

তা ছাড়া আমাদের কারবারে তার কতটুকুই বা অবদান আছে? সে কেবলমাত্র পরিকল্পনা, মানে মাথা খাটিয়ে কারবারটাকে দাঁড় করিয়েছে। ব্যস, এর বেশী আর কি করেছে, বলতে পার? ঠিকই তো। আমি বললাম বাকিংহাম এবার বলল, তার ব্যবসায়িক বুদ্ধিটুকুর বিনিময়ে সে যদি তার ভাগের অর্থটুকু তুলে নিতে পারে তবে সে বর্তে যায়, তাই নয় কি? ভাল কথা, এটেরবুরি সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি অন্য রকম?

আমি আমতা আমতা করে বললাম—আমার সম্বন্ধে তো তোমার ভাল ধারণাই থাকা উচিত। সত্যি বলছি, স্টকগুলো কে যে বিক্রি করছে তা-ই তো আমার জানা ছিল না।

ঠিক আছে, ঠিক আছে।

আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে সে ভেতরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। তারপর অফিসের হলঘরে হাজির হল। তারপর জানালা দিয়ে রেলিং-এর বাইরে অপেক্ষমান মানুষের জঙ্গলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

ইতিমধ্যে এটেরবুরি আর তার বিশেষ ধরনের টুপিটা উধাও হয়ে গেছে।

অপেক্ষমান মানুষগুলোর উদ্দেশ্যে বাকিংহাম নাতিদীর্ঘ এক ভাষণ দিল।

সে বলল—উপস্থিত নিরীহ ভেড়ার পাল শুনুন আমি কি বলছি। আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, আপনাদের খোয়া-যাওয়া লোম আপনারা ফিরে পাবেন। একটাও বে-হাত হবে না। তবে একটা কথা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, কোনরকম হাঙ্গামা হুজ্জতি বাঁধাবার চেষ্টা করবেন না। সবাই শান্ত হয়ে দাঁড়ান।

আর সারিবদ্ধভাবে, অর্থাৎ একটামাত্র সারিতে সবাই দাঁড়িয়ে পড়ুন। জটলা পাকাবার চেষ্টা করবেন না যেন।

এই যে মাদাম, দোহাই আপনার। দয়া করে ভেড়ার মত হাঁকাহাঁকি বন্ধ করবেন, নাকি আমাকে অন্য রকম চিন্তা করতে হবে? আপনার গচ্ছিত-রাখা ডলারগুলো কিন্তু আপনার কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য আমাদের পকেটে অপেক্ষা করছে?

আরে—আরে, করছো কী! আরে, এই যে ছেলেটা, রেলিং টপকাবার চেষ্টা কোরো না। নেমে যাও। শান্ত হও। শোন, আমার কথা শোন, তোমার ডাইনগুলো তো নিরাপদেই আছে।

এই যে দিদিভাই, কেঁদো না। কান্না থামাও। শোন, আমি কি বলতে চাইছি। তোমার গাচ্ছিত-রাখা একটা সেন্টও খোয়া যাবে না। কান্না থামাও, চোখ মোছ।

আপনারা সবাই দয়া করে আমার কথা শুনুন, সবাই শৃঙ্খলা রক্ষা করুন, সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ান।

এবার বাকিংহাম-এর দিকে ফিরে বললাম—এক কাজ কর, সারিবদ্ধভাবে এদের সবাইকে ভেতরে ঢুকতে সাহায্য কর। কাজ মিটে গেলে আবার অন্য দরজা দিয়ে যেন সুশৃঙ্খলভাবে বেরিয়ে যেতে পারে সে ব্যবস্থা কর।

বাকিংহাম গা থেকে কোটটা খুলে ফেলল। আঙুল দিয়ে ঠেলে টুপিটাকে মাথার পিছনদিকে চালান দিয়েছিল।

এবার সে দু'পা এগিয়ে গিয়ে আলোটা জ্বেলে দিল। ঠাণ্ডা মাথায় টেবিলে গিয়ে বসল। ডলার আর সেন্টের গোছা তার টেবিলে সাজিয়ে রাখা আছে। সব অর্থকড়িই গোছা করে বাঁধা।

আমি দরজায় দাঁড়িয়ে একজন-একজন করে লোককে ভেতরে ঢোকাতে লাগলাম।

আর রিপোর্টার নিজ নিজ প্রাপ্য বুঝে পাওয়ার পর তাদের নিয়ে ভেতরের দরজা দিয়ে বের করে আবার হলঘরটায় পৌঁছে দিতে লাগল।

তারা এক এক করে ভেতরে ঢুকছে আর বাকিংহাম তাদের নিজ নিজ সোনালি বন্ড আর স্টক-এর হিসাব অনুযায়ী। একটা কানাকড়িও কাউকে কম দিচ্ছে না।

অর্থ-প্রাপকরা ভুলেও ভাবে নি যে, গোলকুণ্ডা গোল্ড বন্ড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট প্রতিষ্ঠানের শেয়ারচক্রের অর্থ পুরোপুরি ফেরৎ পেয়ে যাবে।

তারা বাকিংহাম-এর হাত থেকে নোটের গোছা যেন বাজপাখির মত ছোঁ মেরে নিতে লাগল। আশ্চর্য ব্যাপার তো! কিছু মেয়ে মানুষ নোটের গোছা হাতে পেয়ে অনবরত কেঁদেই চলল!

না, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নয়। মেয়ে মানুষদের কাণ্ডকারখানাই আলাদা। তাদের ধর্ম এটাই যে, মনে আঘাত পেলে তারা গলাছেড়ে চেঁচিয়ে কান্নাকাটি করে। আর সুখের সময়? অতিসুখে তারা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। আর যখন শোকতাপ বা সুখ কোনটাই পায় না তখন গোপনে চোখের জল ফেলেই চলে।

লাল শাল গায়ে রূপসী যুবতী মেয়েটা ঘরে ঢুকল তার প্রাপ্য অর্থ বুঝে নেওয়ার জন্য। বাকিংহাম তাকে তার প্রাপ্য অর্থ ছাড়াও অতিরিক্ত কুড়ি ডলার তার হাতে তুলে দিল। মেয়েটা ব্যাপারটা না বুঝেই সেগুলো হাতে নিল।

আমাদের কোষাধ্যক্ষ মুচকি হেসে বলল—ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়। গোলকুন্ডা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আপনাকে বিয়ের উপহারস্বরূপ আপনাকে দেওয়া হল।

নিজের নিজের প্রাপ্য অর্থ বুজে পেয়ে সবাই বাড়ি ফিরে গেল। বাকিংহাম এবার অবশিষ্ট অর্থ খবরের কাগজের রিপোর্টারের হাতে তুলে দিল।

ব্যাপার দেখে বেচারা রিপোর্টারের তো ভিমরি খাওয়ার যোগাড় হল। কৌতূহল মিশ্রিত বিস্ময়ের দৃষ্টিতে সে বাকিংহাম-এর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

তার বিস্ময় দূর করতে গিয়ে বাকিংহাম বলল—রিপোর্টার ভায়া, ব্যাপারটা আপনিই তো শুরু করেছিলেন, কথাটা তো আর মিথ্যে নয়। তাই আপনাকে দিয়েই ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হোক, আমার ইচ্ছা।

এবার টেবিলের ফাইলগুলোর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলল—এই যে, সব ফাইলপত্র এখানে আছে। এগুলোতে প্রতিটা বন্ড আর শেয়ার-এর বিবরণ কানাকড়ি পর্যন্ত লেখা আছে। হিসাব অনুযায়ী বাকী অর্থ সবই এখানে আছে। তবে আমাদের খরচ খরচা বাদ দিয়ে হিসেব করা আছে।

কথাটা শুনে রিপোর্টার বলল—কিন্তু এসব কথা আমাকে বলে ফায়দা কি, বলবেন কি?

শুনুন, এবার থেকে আপনাকে এ প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানের কাজ করতে হবে।

আমি? মানে আমি হব তত্ত্বাবধায়ক?

হ্যাঁ। আপনার খবরের কাগজের সুনামের কথা বিবেচনা করেই আপনাকে কাজটার দায়িত্ব নিতে হবে। আমার জ্ঞান বুদ্ধি মাফিক সমস্যা থেকে উত্তোরণের এটাই প্রকৃষ্টতম উপায়।

আপনারা? আপনাদের কাজ কি হবে জানতে পারি কি?

আমাদের আর কোন কাজই রইল না। আমি আর আমাদের আপেলখেকো ভাইস-প্রেসিডেন্ট এবার আমাদের প্রেসিডেন্ট এটেরবুরির পথ অনুসরণ করব, মনস্থ করেছি। অর্থাৎ আমরাও এখান থেকে কেটে পড়ব।

একী বলছেন আপনারা! আপনাদের কথা কিছুই আমার মাথায় ঢুকছে না মঁসিয়ে!

আমাদের পরিকল্পনা কথা তো আপনাকে খোলসা করেই বলেছি। এবার বলুন তো রিপোর্টার ভায়া, আপনি তো কাগজের জন্য আজকের মত যথেষ্ট খবরই পেয়ে গেছেন, ঠিক বলি নি?

ভুরু কুঁচকে, কপালের চামড়ায় পরপর ক'টা ভাঁজ এঁকে রিপোর্টার বলল—খবর! আপনার কি বিশ্বাস, এটা আমার পক্ষে ব্যবহার করা সম্ভব হত?

কেন? সম্ভব হত না কেন?

কেন আবার, মনে করুন খবরের কাগজে দপ্তরে গিয়ে কর্তৃপক্ষকে জানালাম। তখন তারা আর সম্পাদক ও পরিচালক কি বলবেন, বলতে পারেন?

এতে তাঁদের তো খুশি হবারই কথা।

হ্যাঁ, খুশি হয়ে তারা আমার হাতে বেলেভিউ-র একটা পাশ ধরিয়ে দিয়ে বলবেন, যত শীঘ্র পারি আমি যেন সেখানে ভর্তি হয়ে যাই। তারপর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে তবেই যেন অফিসে যাই, বুঝলেন?

একটা সাপ ব্রডওয়ের রাস্তা দিয়ে এঁকেবেঁকে হেলে দুলে এগিয়ে চলেছে এরকম একটা গল্প ফেঁদে আপনাদের আমি শোনাতে পারি, কিন্তু তাদের কাছে এরকম একটা কথা আমার পক্ষে শোনানো সম্ভব নয়। অর্থগৃধ্ন একটা মানুষ পকেট খালি করে যাবতীয় অর্থ বিলিয়ে দিচ্ছে! না, অসম্ভব। আমাকে মার্জনা করবেন এরকম একটা কথা সত্যি হলেও আমার পক্ষে লেখা সম্ভব নয়,

কিছুতেই নয়। তা ছাড়া আমি যে খবরের কাগজে হাসির গল্পকথা লেখার দায়িত্বে নেই।

বাকিংহাম বলল—আমাদের বক্তব্যও আপনার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। তা ছাড়া আমরা তো আর আপনাদের ওয়াল স্ট্রীটের দালাল নই। এখন রক্তচোষাদের মত মনোবৃত্তি আমাদের নয়। আমরা সুযোগ সুবিধা মত এমন সব ধাপ্পাবাজির খেল দেখাই যাতে মানুষ মজাই পায় আর সর্বস্ব খোয়াতেও হয় না।

অসম্ভব? আমাদের পক্ষে আর এ কাজে লেগে থাকা সম্ভব নয়। তা ছাড়া আমরা আমাদের কাজ আর নিজেদের প্রতিশ্রদ্ধাও অন্তরে পোষণ করে থাকি। বিদায় রিপোর্টার, বিদায় তত্ত্বাবধায়ক। আপনার কাজ আপনি বুঝে নিয়ে যেভাবে খুশি পরিচালনা করুন।

বাকিংহাম ও আমি আর এক মুহূর্তও সেখানে অপেক্ষা না করে লম্বা-লম্বা পায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। একইভাবেই গোলকুন্ডা গোলন্ড বন্ড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি শিকেয় উঠল। তার পরদিন আমাকে আর বাকিংহামকে আপনারা যদি দেখে থাকেন তবে সেটা গোলকুন্ডা কোম্পানিতে নয়, অবশ্যই ওয়েস্ট সাইড ফেরিঘাটের কাছাকাছি ছোট্র একটা হোটেলে।

বাকিংহাম কর্কের বস্তাটা মালগাড়িতে করে এনে সেটাকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে সে আমাকে বলল—একটা ভাল খবর আছে। ব্রাডি এক হপ্তার জন্য তার মালগাড়িটা আমাদের ভাড়া দিয়েছে। এবার আমরা আর একটা নতুন মতলব খাটাব। জার্সি শহরের সর্বত্র এ চুলের তেলটা হু হু করে বিক্রি হবে। সেখানকার মানুষ টাক-মাথা মোটেই পছন্দ করে না। সেখানে মশার উপদ্রবের জন্যই টাক-মাথার প্রতি তাদের এমন বিতৃষ্ণা।

কথা বলতে বলতে সে মুহূর্তের জন্য থামলে আমি কাঁধের থলিটা থেকে লেবেলগুলো বের করার জন্য হাত চালান করে দিলাম।

আমি হতাশার সুরে বললাম—বন্ধু বাকিংহাম, আমার তেলের লেবেলগুলো শেষ হয়ে গেছে। আর মাত্র ডজন খানেক আছে।

বাকিংহাম বলল—ফুরিয়ে যাওয়াটা কি অসম্ভব কোন ব্যাপার? ফুরিয়ে গেলে আরও কিছু কিনে ফেললেই তো ল্যাটা চুকে যায়।

আমি পকেট হাতড়ে যা বের করলাম তা হিসাব করে দেখলাম, তা দিয়ে সকালে হোটেল জলখাবার আর ফেরির ভাড়া কোনরকমে মিটতে পারে।

আমি থলে হাতড়ে যা বের করলাম দেখলাম—এক ঝাঁকাতেই শীত উধাও হবে—লেবেল প্রচুরই আছে।

ব্যস, তাতেই তো কাজ চলে যাবে।

আমরা ব্যস্ত হাতে 'শীত বিতাড়ন' লেবেলগুলোই যথা স্থানে লাগিয়ে ফেললাম।

বাকিংহাম বলল—যে যা-ই বলুক না কেন, আমি বলব সৎপথে পেটের ভাত যোগানো ওয়াল স্ট্রীটের চেয়ে ঢের, ঢের ভাল, বুঝলে?

আমি বললাম-এ প্রসঙ্গটা সম্বন্ধে আমার সঙ্গে সহজেই বাজি ধরতে পার।

ইন্‌নোসেন্ট অব ব্রডওয়ে

জেফ পিটাস একটু নড়েচড়ে বসে বলল—আমি তো একদিন কাজকর্ম থেকে অবসর নেব আর তা যখন নেব তখন কেউ যেন বলতে না পারে যে উপযুক্ত দাম মিটিয়ে না দিয়ে কারো কাছ থেকে কোনদিন একটা ডলার নিয়েছি।

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এক সময় এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলাম যখন আমি এ নীতি থেকে প্রায় সরেই যাচ্ছিলাম। কেন? কিভাবে? একটা নিন্দনীয় অসাধু কাজে প্রায় ব্রতী হয়ে পড়েছিলাম। তবে আমাদের এ মহান দেশের গঠনতন্ত্র আর আইন কানুনের বলেই আমি সে যাত্রায় অব্যাহতি পেয়ে গিয়েছিলাম। আমাকে আর নীতিভ্রষ্ট হতে হয় নি।

আমার এক অংশীদারের নাম অ্যান্ডি টাকার। সে যে কেবলমাত্র আমার অংশীদার তা-ই নয়, একজন হিতাকাঙ্ক্ষী—অভিন্ন হৃদয় বন্ধুও বটে। যাকগে, যে কথা বলছিলাম, এক গ্রীষ্মে অ্যান্ডি আর আমি সম্ভ্রান্ত পরিবারের নারী-পুরুষদের ব্যবহার্য পোশাক আশাকের বার্ষিক জোগানের যাবতীয় ব্যবস্থাদি করার জন্য নিউইয়র্ক শহরে গিয়েছিলাম।

আমরা কোথাও, বিশেষ করে নিউ ইয়র্কে থাকার সময় রীতিমত আড়ম্বরের সঙ্গে চলাফেরা করতাম, কাম কাজের ওপর তেমন নজরটজর রাখতাম না।

পশ্চিম আর উত্তর নদীর মধ্যবর্তী যেকোন স্থানে মুখ-খোলা একটা থলে হাতে দাঁড়ালেই কাজ হাসিল। তবে থলেটার গায়ে লিখে রাখতে হবে—নোটের গোছাগুলো এর ভেতরে ফেলুন। আলগা বিল বা চেক নেওয়া হয় না। মানি অর্ডারের রসিদ অথবা কানাডার নোট ফেলার চেষ্টা করলে তাকে শায়েস্তা করার জন্য হাতের নাগালের মধ্যেই পুলিশ পাওয়া যাবে। তাই তো আমি আর অ্যান্ডি প্রায়ই কাঠঠোকরা পাখির মেলা আর খেলা দেখতে শহর ছাড়িয়ে ব্রডওয়ের জলাভূমিতে হাজির হতাম, আর খালি-হাতে—একটা পাখিও শিকার না করে নিজেদের ডেরায় ফিরে আসতাম। অতএব নিউ ইয়র্কে আমরা নিশ্চিন্তেই দিন গুজরান করতাম।

ব্রডওয়ের খুব অনতিদূরের এক গলিতে একদিন এক নিউইয়র্কবাসীর সঙ্গে আমাদের দু'জনেরই আলাপ পরিচয় হয়।

আমরা তিনজনে এক টেবিলে বসে বীয়ারের গ্লাস হাতে আলোচনার মাধ্যমে আবিষ্কার করলাম, আমরা দু'জনেরই কোন এক সময় হেলস্মিথ নামক কোন একজনের সঙ্গে পরিচয় ছিল। তখনই আমরা উপলব্ধি করলাম যে, পৃথিবীটা খুবই ছোট।

নিউ ইয়র্কবাসী এবার তার জীবন-কথা শোনাতে আরম্ভ করল। একেবারে গোড়া থেকে, মানে যখন সে টামানি হলটার কাছে বসে আদিবাসী ইন্ডিয়ানদের কাছে জুতোর ফিতে বেচত তখন থেকে সে তার কাহিনী বলতে লাগল।

বীকসান রোডের একটা চুরুটের দোকানের কল্যাণে এ নিউ ইয়র্কবাসীটা ক্রমে অনেক ডলার কামিয়ে নিয়েছে। আর দশ বছরে ফোর্টিন্‌থ স্ট্রীটের ওপরে উঠতে পারে নি। আমি দিব্যিকেটে বলতে পারি যে, দশ বছরের মধ্যেই সে আকাশচুম্বী বাড়িতে বসবাস করতে শুরু করবে।

তারপরই গেঁয়ো শহরবাসীটা একগোছা বিলভর্তি একটা থলের মুখ খুলে আমাদের সামনে উঁচিয়ে ধরল।

আমার দিকে থলেটাকে এগিয়ে দিয়ে সে বলতে লাগল—মিঃ পিটার্স, থলেটায় পাঁচ হাজার ডলার রয়েছে। আমার পনের বছরের ব্যবসার মাধ্যমে জমানো অর্থ। এগুলো আপনার কাছে রাখুন, আমার জন্যই আপনার কাছে গচ্ছিত রাখুন।

মিঃ পিটার্স, বিশ্বাস করুন, পশ্চিমবাসী আপনাদের কাছে পেয়ে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি। সুযোগ পেলে মাঝে-মধ্যেই আপনাদের সঙ্গে মিলিত হব। আমার ইচ্ছা আমার অর্থকড়ির পুরো দায়িত্ব আপনি নিয়ে আমাকে সাহায্য করুন।

আমি আপত্তি জানাতে গিয়ে বললাম—না, এটা ঠিক নয়। আপনার অর্থকড়ি আপনার কাছেই থাকা ভাল। তাই আমার অনুরোধ, মিঃ পিটার্স আমার নোটের গোছাটা আপনার কাছেই গচ্ছিত

রাখুন। কে ভদ্র ও সৎ তা মানুষ দেখলেই আমি চিনে নিতে পারি। এবার আর একটু বীয়ার ঢালা যাক, কী বলেন?

লোকটা দশ মিনিটের মধ্যেই লোভনীয় বস্তুটাকে টেবিলের ওপর ফেলে রেখে চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে রীতিমত নাক ডাকতে লাগল।

তার ব্যাপার দেখে অ্যান্ডি বলল—আরও মিনিট পাঁচেক এখানে থাকা দরকার। এর মধ্যে কোন ওয়েটার আসে কি না, দেখা যাক।

না অ্যান্ডি, আমার পক্ষে এ কাজটা করা ঠিক হবে না। এর জন্য কিছু না করে নোটের গোছাটা নিয়ে কেটে পড়া আমার পক্ষে সঙ্গত হবে না।

আমরা দু'জনে ঠেলেধাক্কে শহরবাসী গেঁয়ো গোঁফওয়ালা লোকটার ঘুম ভাঙালাম। সে সসম্ভ্রমে বলল, ঘুমোয় নি, মিনিট কয়েকের জন্য চোখ একটু আমেজ করছিল মাত্র। এখন ভদ্রলোকদের মত কয়েক দান পোকার খেললে খারাপ হয় না। ব্রুকলিনে থাকার সময় ছাত্রাবস্থায় এ খেলাটা চুটিয়ে খেলত।

তার কথায় অ্যান্ডির মুখে হাল্কা একটা খুশির প্রলেপ দেখা দিল। সে ধরেই নিল, এতে তাদের অর্থ সংক্রান্ত সমস্যার একটা সমাধান হয়ে যেতে পারে।

সেখান থেকে বেরিয়ে আমরা তিনজন দূরবর্তী আমাদের হোটেলে চলে গেলাম। আমি কাগজ-কলম নিয়ে অ্যান্ডির কামরায় ঢুকলাম। সহজ-সরল শিশুটাকে তার পাঁচ হাজার ডলার ফিরিয়ে দেবার প্রস্তাবটা আবার উত্থাপন করলাম। না, ফয়দা কিছুই হল না।

উপরন্তু আগের মতই গোঁফওয়ালা লোকটা বলল—মিঃ পিটার্স, অনুগ্রহ করে আমার ওই ছোট্ট কোটের গোছাটা আপনার জিম্মায়ই রেখে দিন। আমার যখন দু' দশ ডলার দরকার পড়বে তখন আমিই না হয়ে আপনার কাছ থেকে চেয়ে নেব। আমার হিতাকাঙ্ক্ষী কারা তা বোঝার মত জ্ঞান বুদ্ধি আমার আছে। বীকম্যান রোডের মত জমজমাট জায়গায় যে লোকটা তিন-তিনটা বছর ধরে কারবার চালাতে পারে তার অবশ্যই এ জ্ঞানগম্যি আছে যে কোন্ পরিস্থিতিতে তার কি করা দরকার।

কোটের পকেটে হাতটা চালান করে দিয়ে সে খইয়ের মত কুড়ি ডলারের সার্টিফিকেট ছড়াতে লাগল।

তার কাণ্ডকারখানা দেখা টার্নার-এর আঁকা লেবু বাগিচায় হেমন্তের একটা দিন ছবিটার কথা আমার মনের কোণে উঁকি দিল। আর অ্যান্ডি? সে-তো প্রায় হো-হো করে হেসেই উঠল।

শহরবাসী গোঁফওয়ালা সে লোকটা প্রথম দানটা খেলেই টেবিলের ওপর সশব্দে একটা ঘুষি চালিয়ে দিল। তারপর হাত নেড়ে নাচের ভঙ্গিমা করতে লাগল।

অ্যান্ডি পোকার খেলায় চিরদিনই পারদর্শী। সে ঝট করে টেবিল থেকে উঠে জানালার কাছে গিয়ে পথের চলমান গাড়িগুলোর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

গোঁফওয়ালা লোকটা বলল—আপনারা যে খেলায় মন বসাতে পারছেন না তারজন্য আপনাদের দোষারোপ করতে পারছি নে। একটা কথা বলবেন কি, আপনারা এ শহরে আর কতদিন থাকবেন মনস্থ করেছেন?

আর হপ্তাখানেক, আমি বললাম।

আমার দিক থেকেও সেটাই মঙ্গলের। ব্রুকলিন থেকে আমার এক ভাই আজ সন্ধ্যাতেই-এখানে পৌঁছচ্ছে। আমি তাকে নিয়েই নিউইয়র্ক দেখাতে বের হ'ব ভাবছি। সে কৃত্রিম পা নিয়ে হাঁটাচলা করে। ছোট-ছোট বাক্সের কারবারী, গত আট বছরের মধ্যে সেতুটা পার হয়ে এ তল্লাটে একদিনের জন্যও আসে নি। এখানে আমাদের দিনগুলো ভালই কাটবে বলেই তো আমি আশা করছি।

আমি নীরবে তার কথাগুলো শুনতে লাগলাম। সবশেষে সে বলল—দেখুন, অন্তত আগামীকাল পর্যন্ত আমার ডলারের গোছাটা আপনার জিম্মায়ই রাখুন। তা সত্ত্বেও আমি নোটের গোছাটা তাকে ফিরিয়ে দিতে চাইলে সে বলল, এতে সে খুবই অপমান বোধ করছে। মোদ্দা কথা, নোটের গোছাটা আমার পকেটে গুঁজে দিতে পারলেই তার স্বস্তি।

তারপর সে বলল—দেখুন মঁসিয়ে, আমার পকেটে খুচরো যা কিছু আছে তাতেই আমার দিন কয়েক দিব্যি চলে যাবে। আপনি দয়া করে এ নোটের গোছাটা আপনার পকেটেই রেখে দিন।

আগামীকাল সন্ধ্যা ছ'টা থেকে সাতটার মধ্যে এসে মিঃ টাকার আর আপনার সঙ্গে দেখা করব। ভুলে যাবেন না, এক সঙ্গে রাত্রের খাবার খাব।

গোঁফওয়ালা গেঁয়ো শহরবাসী বিদায় নেবার পর অ্যান্ডি কৌতূহলমিশ্রিত সন্দেহের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল।

আমি বললাম—কি ব্যাপার বল তো অ্যান্ডি, তোমার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, কিছু বলতে চাইছ।

দেখ, আমার কিন্তু ব্যাপাবটা খুব একটা সুবিধের মনে হচ্ছে না। আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকালাম।

সে এবার বলল—আমার কিন্তু বিশ্বাস কিছু লোক আমাদের পিছনে লেগেছে। টিকটিকির দল ছায়ার মত আমাদের পিছনে এঁটুলির মত সেঁটে রয়েছে। যে করেই হোক হতচ্ছাড়াটা আমাদের গাড্ডায় ফেলবেই। আবার এতগুলো ডলারও তো হাতছাড়া করা সম্ভব নয়।

আমিও তো এ রকমই কিছু ভাবছি।

তুমি কি মনে করছ না যে, এমন একটা অপূর্ব একটা সুযোগ বারবার আমাদের দরজায় এসে বার বার কড়া নাড়ছে?

আমি টেবিলের ওপর পা দুটো তুলে দিয়ে ব্যাপারটা নিয়ে গভীর ভাবনায় ডুবে গেলাম।

একটু বাদে আমি মুখ খুললাম—অ্যান্ডি, এ-তো মহা ফ্যাসাদে পড়া গেল। গোঁফওয়ালা শহরবাসী আমাদের কী সমস্যায়ই না ফেলে দিয়েছে। ওর ডলারের গোছাটায় আমরা যেন হাত-পা নাড়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি। অদৃষ্টদেবীর সঙ্গে আমরা চুক্তিতে আবদ্ধ তা সে খেলাপ করা সম্ভব নয়। আমাদের ব্যবস্থা ছিমছাম, সহজ সরল।

হ্যাঁ, কথাটা খুবই সত্য বটে। একে অন্যের রক্ত চুষে খাওয়ার ধান্দায় সব সময় ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায়। ওই যে চুরুটখোর লোকটাকে দেখছ সে-ও একই দলের। সে যে নিউইয়র্কবাসী কথাটা কিন্তু ভুলে যেয়ো না।

সে তবে কোন্ ধান্দায় ছোঁক ছোঁক করে বেড়াচ্ছে বলে তুমি মনে করছ?

ধান্দাটা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ না হতে পারলেও এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, আমাদের কাছ থেকে কোন একটা সুযোগ সুবিধা আদায় না করা পর্যন্ত সে কিছুতেই আমাদের পিছন ছাড়বে না।

তারপর? তারপর পরিণামে—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই আমি বলে উঠলাম—তারপর সে যখন নিজমূর্তি ধারণ করবে তখন সে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে। তুমি যদি নিজেকে রক্ষা করতে না পার তবে তোমাকে ধন-প্রাণে মরতে হবে।

মুহূর্ত নীরবে ভেবে নিয়ে আমিই আবার বলতে লাগলাম—শোন অ্যান্ডি, চুরুটখোর ওই লোকটা তার শিশুসুলভ বিশ্বাস আর সরলতা দিয়ে আমাদের মন জয় করে নিয়েছে যেটাকে আমাদের বরাতের ব্যাপার বলতেই হবে। কারণ, তার ডলারগুলো তো আমাদের শুচিতার পক্ষে, কেবল শুচিতার কথাই বা বলি কেন নীতিবোধের পক্ষেও চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ডলারগুলোর ওপর আমাদের সামান্যতম অধিকার না থাকায় দাবীও করতে পারি না, ঠিক কিনা?

হ্যাঁ, তা-তো বটেই।

যদি ওই ডলারগুলোর ওপর আমাদের দাবী আছে বলে মনে করতে পারতাম তবে তো আমি সানন্দে ওই নোটের গোছাটা পকেটে চালান দিয়ে তাকে এমন একটা অর্থোপার্জনের পথ বাৎলে দিতাম যাতে সে আগামী কুড়ি বছরের মধ্যে আরও পঞ্চাশ হাজার ডলার কামিয়ে নিতে পারে। কিন্তু আমরা তো তার সঙ্গে কোন রকম কারবার, মানে তার কাছে কিছু বেচিনি যে ওই ডলারগুলো দাবী করতে পারি। সে পরম হিতাকাঙক্ষীর মত আমাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, অন্ধের মত বিশ্বাস করেছে। তার প্রয়োজন মাফিক ডলারগুলো সে চেয়ে বসবে।

অ্যান্ডি বলল—তবে পরিস্থিতিটা যা দাঁড়িয়েছে তা হচ্ছে, ডলারগুলো নিয়ে এখান থেকে চম্পট দিতে পারি না। জেফ, তোমার সততা, কারবারের ক্ষেত্রে তোমার নীতিবোধের প্রশংসা আমি হাজারবার করতে পারি। তা ছাড়া বিকল্প কোন মতলবও আমার মাথায় ঢুকছে না।

অ্যান্ডি মুহূর্তকাল ভেবে তারপর আবার বলতে লাগল—আজকের রাত্রি এবং কাল প্রায় সারাটা দিন আমাকে বাইরে কাটাতেই হবে। জরুরী একটা কাজ আছে। কাল সন্ধ্যায় সে এলে আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তাকে যেকোনভাবে আটকে রেখো। কাল সে আমাদের সঙ্গে রাত্রের খাবার খাবে।

হ্যাঁ, ব্যাপারটা তা-ই ঘটল। বিকেল পাঁচটার কাছাকাছি সময়ে মোটা গোঁফওয়ালা চুরুটখোর লোকটা আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

কোন রকম ভূমিকা না করেই সে বলল—মিঃ পিটার্স, সময়টা খুব আনন্দেই কাটল। নিউইয়র্ক শহরটা প্রাণভরে দেখলাম। একেবারে মনের কথা আপনাকে বলছি, নিউইয়র্ক শহরের সঙ্গে টেক্কা দেওয়ার মত দ্বিতীয় আর একটা শহর আছে বলে আমার অন্তত জানা নেই। যদি কিছু মনে না করেন তবে মিঃ টাকার ফিরে না আসা পর্যন্ত ওই সোফাটায় শুয়ে একটু ঘুমিয়ে নিতে চাই। রাত্রি জাগা আমার ধাতে সয় না। আর আপনি যদি কিছু মনে না করেন তবে ওই পাঁচ হাজার ডলার আমি নিয়ে নেব।

আমি চকিতে তার দিকে তাকালাম।

সে এবার বলল—মিঃ পিটার্স, কাল এমন একজনের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল সে আগামীকালের রেসের মাঠে একটা দান মারবেই। একটু ঘুমিয়ে নেবার এ অশিষ্ট আচরণের জন্য আপনি আমাকে মার্জনা করবেন।

পৃথিবীর দ্বিতীয় শহরটার মোটা গোঁফওয়ালা লোকটা সোফার ওপরে টানটান হয়ে শুয়ে চোখ দুটো বন্ধ করে দিল।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই আমার অতিথির নাকের ভোঁস ভোঁস আওয়াজ আমার কান ঝালাপালা হয়ে যাবার জোগাড় হল। আমি কর্তব্য সম্বন্ধে গভীর ভাবনায় ডুবে গেলাম।

অ্যান্ডি ফিরল বিকাল সাড়ে পাঁচটায়।

অ্যান্ডি কোটের পকেট থেকে একটা দলিল বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল—জেফ, ব্যাপারটার ফয়সালা ঠিকঠিক ভাবেই মিটে গেছে। এটা পড়লেই সবকিছু বুঝতে পারবে।

নিউইয়র্ক জার্সি সরকার কর্তৃক প্রচারিত একটা কর্পোরেশনের সনদ। দ্য পিটার্স অ্যান্ড টাকার কন্‌সলিডেটেড অ্যান্ড অ্যামালগেমেটেড এরিয়েল ফ্র্যাঙ্চাইজ ডেভেলপ্‌মেন্ট কোম্পানী লিমিটেড-এর পক্ষে সনদ পত্রটা প্রচারিত হয়েছে।

সনদ-পত্রটা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অ্যান্ডি বলল—এটা বিমান-পথের স্বত্বকেনার সনদ-পত্র। তখন আইন-সভার অধিবেশন মুলতুবি থাকলেও একজনের কাছে বেশ কয়েকটা সনদ-পত্র ছিল। তখনও এমন কিছু শেয়ার অবিকৃত ছিল যাদের সংখ্যা এক লক্ষ আর এক ডলার সমমূল্যে কেনা যাবে। সে লোকটার কাছ থেকে অপূর্ণ একটা সনদ-পত্র আমি খরিদ করেছি, এটা সেই সনদ-পত্র।

অ্যান্ডি পকেট থেকে কলম টেনে নিয়ে অপূর্ণ সনদ-পত্রটা পূর্ণ করতে লেগে গেল।

আমি এগিয়ে গিয়ে সনদ-পত্রটার ওপর ঝুঁকে বললাম—প্রাপকের নামের জায়গায় কি লিখছ?

সে ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকাল।

আমি বললাম—ওই ঘরটায় লেখা বেয়ারার।

লেখা শেষ হলে মোটা গোঁফওয়ালা চুরুটখোর লোকটার হাতে সার্টিফিকেটটা ধরিয়ে দিল।

লোকটা সেটার দিকে হতভম্বের মত তাকিয়ে রইল। আমরা তাকে মুখে কিছু না বলে জামাকাপড় গোছগাছ করতে লেগে গেলাম।

আমরা ফেরিঘাটে অপেক্ষা করার সময় অ্যান্ডি আমাকে বলল—একটা কথা জিজ্ঞেস করব জেফ?

—কি? কি কথা?

—ডলারগুলো নেবার ব্যাপারে তোমার বিবেক পরিষ্কার তো?

—তা না হবার কি আর থাকতে পারে?

—সে কথাই জানতে চাইছি।

আমি তার মুখের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বললাম—যেকোন হোল্ডিং কর্পোরেশনের চেয়ে আমরা আর কিভাবে সাচ্চা হলাম?

এ কল লোন

সে, আসলে পশু-খামারের মালিকরা বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ ছিল।

পশু-খামারের মালিকরা একাধারে ছিল গবাদি পশুর মালিক, জমির মালিকানা স্বত্ব ছিল তাদেরই হাতে। আর তারা ছিল তৃণভূমির জমিদার ও হাড়-মাংসের ব্যারণ ছিল তারাই।

পশু-খামারের মালিকরা ইচ্ছা করলে সোনার রথে চড়ে হাওয়া খেতে পারত। রাত্রি কাটাতে পারত ডলারের গদিতে শুয়ে।

ধনকুবের এসব মালিকদের একটাই ভাবনা ছিল, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাড়ি কাড়ি ডলার তাদের ঘরে সঞ্চিত রয়েছে। এমন অগাধ অর্থ তারা খরচ করবেন কিভাবে?

তাই লংবিল লংলি লতা-পাতার ঝোপ-ঝাড় ঠেলে বেরিয়ে শহর-জীবনের আনন্দ-স্ফূর্তি উপভোগ করার জন্য সে গুটিগুটি হাজির হল ফ্রায়োর 'বার-সার্কল' শাখায়।

লোকটা স্বভাবে স্ক্রেন বটে। কিন্তু পাঁচ লাখ ডলারের মালিক। শুধু কি এ-ই? তাঁর আয় উপার্জন ক্রমেই উর্ধ্বমুখী।

অগাধ অর্থের মালিক হলে কি হবে লংবিল পথে পথে আর তাঁবুর তলায় দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কাটিয়ে দিতে অভ্যস্ত।

অদৃষ্টের সক্রিয় সহায়তা, মিতব্যয়িতা, ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করার মানসিকতা আর অসৎ পথে অর্থোপার্জনের প্রখর বুদ্ধিমত্তা—সব কিছু মিলে তাঁকে গো-রাখাল থেকে একেবারে পশু-খামারের মালিক বানিয়ে দিয়েছে।

কিছু দিনের মধ্যেই পশু-খামারে ডলারের বন্যা বইতে শুরু করল। ব্যস, লংবিল-এর ভাগ্যদেবী কাটাবনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে তার খামারের দরজায় উপুড় করে ঢেলে দিয়ে গেলেন।

লংবিল চাপারোসার সীমান্তবর্তী ছোট্ট শহরের বুকে বহু অর্থ ব্যয় করে একটা সুদৃশ্য বসতবাড়ি তৈরী করলেন, আসলে একজন বিশিষ্ট নাগরিক মর্যাদা লাভ করা তাঁর বরাতে ছিল।

চাপারোসায় বসবাস শুরু করার পর কিছুদিনের মধ্যেই লংবিল প্রথম জাতীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করে সে তার প্রেসিডেন্টের পদে বহাল হলেন।

একদিন প্রথম জাতীয় ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ারের জনালা দিয়ে একটা সরকারী কার্ড দাখিল করলেন। পেট-রোগা এ লোকটার নাকের ডগায় প্রয়োজনের তুলনায় দ্বিগুণ শক্তিশালী একটা ঝুলছে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ব্যাঙ্কের কর্মীদের সবাই আগন্তুক এ জাতীয় ব্যাঙ্ক-পরীক্ষকের হুকুম তালিম করার জন্য তার চারদিকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

দু'-চার কথার মাধ্যমেই দেখা গেল, ব্যাঙ্ক-পরীক্ষক মিঃ ডে. এডগার টড একজন ধড়িবাজ—রীতিমত ঘাঘু লোক। কাজকর্ম মিটিয়ে তিনি টেবিল থেকে তুলে টুপিটা মাথায় গলিয়ে নিলেন।

এবার ব্যাঙ্কের একটা গোপন কক্ষে আলোচনার শুরুতেই ব্যাঙ্ক পরীক্ষকের দিকে তাকিয়ে লংবিল বললেন—মিঃ টড সবকিছু দেখে কি বুঝলেন? এমন কোন লোককে চোখে পড়ল যার দৃষ্টিটা আপনার ঠিক পছন্দ মাফিক নয়?

টড একটু নড়েচড়ে বসে মন্তব্য করলেন—দেখুন, ব্যাঙ্কের চেকের কাজকর্ম নিখুঁতই আছে। ঋন দানের ব্যাপার স্যাপারও তো ভালই দেখা গেল—তবে একটাকে বাদ দিয়ে।

লংবিল যন্ত্রচালিতের মত মুখটা তুলে ব্যাঙ্ক-পরীক্ষকের দিকে তাকাল। ভুরু দুটো কুঁচকে বলল—একটা বাদে, মানে?

বলতে চাচ্ছি যে একটা খুবই বাজে কাগজ আপনারা রেখে চলেছেন, আর তা এতটা খারাপ যার ফলে আমাকে ভাবতে হয়েছে সেটার গুরুত্ব সম্বন্ধে। আপনাদের সম্যক ধারণা নেই।

আপনি কোন্ কেসটার ইঙ্গিত দিচ্ছেন, দয়া করে বলবেন কি?

টমাস মেরউইনকে চাওয়া মাত্র প্রদেয় তলবী ঋণ দেওয়া দশ হাজার ডলারের ব্যাপারটা।

লংবিল নীরবে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ব্যাঙ্ক-পরীক্ষক বলে চললেন—একটা কথা কি জানেন, ঋণের পরিমাণটা একজন

ব্যক্তিবিশেষকে দেয় সর্বোচ্চ সীমার চেয়ে অনেক বেশী। আর ঋণ দানের পদ্ধতিটাও লক্ষ্যনীয়।

কেন? ঋণদানের পদ্ধতিতে আবার কি গলদ দেখালেন?

কোন রকম জামিন ছাড়াই কিন্তু ঋণটা দেওয়া হয়েছে। এতে আপনার দু'দিক থেকে ব্যাঙ্কের আইনকে লঙ্ঘন করেছেন।

চোখ দুটো কপাল তুলে লংবিল বলে উঠলেন—সে কী! ব্যাঙ্কের আইন লঙ্ঘন করা হয়েছে?

অবশ্যই! ম্লান হেসে ব্যাঙ্ক-পরীক্ষক বললেন—আর এরই ফলে আপনারা নিজেদের সরকারীভাবে ফৌজদারী দণ্ডবিধির আওতায় নিয়ে এসেছেন।

আপনি বলছেন কী মিঃ টড!

বললাম আর কোথায়? সবে তো বলা শুরু করেছি মিঃ লংলি। যাক গে, যে কথা বলছিলাম—এ ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ যে, আমি যদি কারেন্সী কনট্রোলারের কাছে একটা নোট পাঠাই—মানে আমি পাঠাতে বাধ্য, তবে পরিণাম এটাই দাঁড়াবে যে, পুরো ব্যাপারটাই উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিচার বিভাগের হাতে চলে যাবে। অতএব ব্যাপারটা যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আশা করি অনুমান করতে অসুবিধে হচ্ছে না।

ব্যাঙ্ক-প্রেসিডেন্ট আরাম কেদারায় শরীর এলিয়ে দিয়ে হাত দুটো মাথার পিছনে রেখে ঘাড়টা ঘুরিয়ে ব্যাঙ্ক-পরীক্ষকের মুখের দিকে তাকালেন।

ব্যাঙ্ক প্রেসিডেন্টের চোখে-মুখে হাল্কা হাসির প্রলেপটুকু দেখে ব্যাঙ্ক-পরীক্ষক বিস্ময়ে হতবাক হবার জোগাড় হলেন। তিনি ভাবলেন, ব্যাপারটার গুরুত্ব যদি তিনি বুঝেও থাকেন তবে তার কোন প্রতিফলন তো লক্ষ্যিত হচ্ছে না।

ব্যাঙ্ক প্রেসিডেন্ট স্বাভাবিক কণ্ঠেই বললেন—তবে আপনি তো মেরউইনকে চেনেন না। দেখুন, এ ঋণের ব্যাপারটা আমার জানা আছে। আর এ-ও জানি, টম মেরউইন-এর মুখের কথা ছাড়া আর কোন জামিনই নেই।

কোন জামিন যে নেই এটা আপনি আগেই জানতেন?

অবশ্যই। দেখুন আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে আমি লক্ষ্য করেছি যে, একজন মানুষের মুখের কথার চেয়ে বড় জামিন আর কিছু হতে পারে না।

আপনার এ-বিশ্বাসের ব্যাপারটা কি সরকারের স্বীকৃতি পাবে বলে আপনি বিশ্বাস করছেন?

—না। আমি জানি যে, আমার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সরকার ব্যাপারটাকে দেখবেন না।

ব্যাঙ্ক-পরীক্ষক তাঁর দ্বিগুণ শক্তিশালী চশমার ফাঁক দিয়ে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে গ্রাম ব্যাঙ্ক মালিক মিঃ লংলির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ব্যাঙ্ক পরীক্ষককে সহজে ব্যাপারটা বোঝাবার জন্য লংলি এবার বললেন—মিঃ টড, আসল ব্যাপারটা কি ঘটেছিল, বলছি শুনুন—টম মেরউইন বিশ্বস্তসূত্রে খবর পেয়েছিল, রিও গ্রান্ডির রকি গিরিখাতের নিকটবর্তী অঞ্চলে দু'বছর বয়স্ক দু' হাজার ভেড়ার বাচ্চা বিক্রি হবে। তাদের প্রতিটার দাম আট ডলার। তখন কানসাস শহরে তাদের প্রতিটা পনের ডলারে বিক্রি হচ্ছে। টম আর আমি উভয়েই এটা জানতাম।

—কিন্তু ভেড়ার বাচ্চার দামের তারতম্যের সঙ্গে এ ব্যাপারটার সম্পর্ক কি?

সে কথাই তো আপনাকে বোঝাতে চাচ্ছি মিঃ টড। হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম, তখন টম মেরউইন-এর সম্বল ছিল ছ' হাজার ডলার। আর আমি দশ হাজার ডলার ঋণ দিলাম।

তিন সপ্তাহ আগে টম-এর ভাই এড্ ভেড়াগুলোকে বাজারে বিক্রি করার জন্য নিয়ে গেছে। ডলারগুলো নিয়ে তার যেকোন সময় চলে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। সে ফিরে এলেই টম যে ঋণ পরিশোধ করে দেবে এতে কোন সন্দেহই নেই।

তাঁর কথা শোনামাত্র ব্যাঙ্ক-পরীক্ষকের বুকের ভেতরে ধুকপুকানি শুরু হয়ে গেল। সুযোগ থাকলে হয়ত তিনি কপালই চাপড়ে বসতেন। ব্যাপারটা ধরা পড়া মাত্রই তার হয়ত উচিত ছিল নিকটবর্তী টেলিগ্রাফ অফিসে গিয়ে কম্পট্রোলারের কাছে টেলিগ্রাম করে সবিস্তারে ব্যাপারটা জানিয়ে দেওয়া।

ব্যাঙ্ক-পরীক্ষক দীর্ঘ তিন-তিনটা মিনিট ধরে বহুভাবে কথার মারপ্যাঁচের মাধ্যমে ব্যাঙ্ক-

মালিককে ঘায়েল করার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালালেন। শেষ পর্যন্ত তাঁকে বোঝাতে সম্মত হলেন যে, তিনি সমূহ বিপদের একেবারে চরম সীমায় পৌঁছে গেছেন।

ব্যাঙ্ক-মালিকের চোখের মণি দুটো স্থির হয়ে গেছে লক্ষ্য করে তিনি বুঝলেন যে, ওষুধে কাজ হয়েছে। এবার তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে আসন্ন চরম বিপদ থেকে উত্তোরণের ছোট্ট একটা পন্থার প্রস্তাব রাখলেন।

আঙুলের ডগা দিয়ে চশমাটাকে ওপরের দিকে সামান্য ঠেলে দিয়ে ব্যাঙ্ক-পরীক্ষক বললেন—মিঃ লংলি, একটা ব্যাঙ্ক পরীক্ষার তাগিদে আজ রাত্রেই আমি হিলডেন-এ যাচ্ছি। কাজ সেরে আমি চাপারোসা হয়ে ফিরব। আগামীকাল দুপুর বারোটায় আমি আবার আপনার ব্যাঙ্কে আসব। ইতিমধ্যে যদি টম মেরউইন-এর ঋণটা শোধ হয়ে যায় তবে তো মঙ্গলই। আমি তবে আমার প্রতিবেদনে এ ব্যাপারটার উল্লেখই করব না। অন্যথায় আমাকে কর্তব্য সম্পাদন করতেই হবে।

পন্থাটা বাৎলে দিয়ে ব্যাঙ্ক-পরীক্ষক ব্যাঙ্ক-মালিকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পথে নামলেন।

ব্যাঙ্ক-পরীক্ষক বিদায় নিলে ব্যাঙ্ক-মালিক লংবিল একটা চুরুট ধরিয়ে টম মেরউইন-এর বাড়ির দিকে যাত্রা করলেন।

টম-এর বাড়ি পৌঁছেই লংবিল সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন—টম, এড-এর কোন খবর এসেছে?

না। এখনও তো তার কোন খবর পাইনি। তবে আমার বিশ্বাস, দু'-একদিনের মধ্যেই সে ফিরে আসবে। কিন্তু তোমাকে কেমন চিন্তিত দেখাচ্ছে ব্যাপার কি বলত?

আরে, আর বোলো না ভাই, আজ হঠাৎ এক ব্যাঙ্ক-পরীক্ষক এসে হানা দিয়েছিল। কাজের ফাঁকে তোমার সে-হাতচিঠিটা তার চোখে পড়ে যায়। তুমি আর আমি উভয়েই জানি বটে, সবই ঠিক আছে। কিন্তু আসলে সে কাজটা ব্যাঙ্ক-আইনের সম্পূর্ণ বিরোধী। আমি তো একেবারেই নিঃসন্দেহ ছিলাম না, ব্যাঙ্কের কোনরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা হওয়ার আগেই তুমি ডলারগুলো ফেরৎ দিয়ে দেবে।

তাই ত, এসে মহা—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই লংবিল বলে উঠল—সত্যি মহাসমস্যাই বটে। আর আমার হাতেও এতগুলো ডলার নেই যে, আমি তোমাকে দিয়ে দেব আর তুমি যতশীঘ্র সম্ভব ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে ঋণটা শোধ করে দেবে।

টম মেরউইন-এর মুখে বিষাদের কালো ছায়া নেমে এল। কি বলবে ভেবে না পেয়ে নীরব চাহনি মেলে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

লংবিল চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবার বলল—আগামীকাল দুপুর বারোটা পর্যন্ত সময় আমি পেয়েছি। এরই মধ্যে ওই হাত-চিঠিটার জন্য দেওয়া-ডলারগুলো আমাকে যে করেই হোক জমা দিতেই হবে। তা নইলে—

আরে ভাই, এমন করে ভেঙে পড়ছ কেন?

ভেঙে পড়ব না! তুমি ব্যাপারটার গুরুত্ব মোটেই বুঝতে পারছ না!

বুঝছি। অবশ্যই বুঝতে পারছি।

এত কিছু শোনার পরও তুমি ব্যাপারটাকে আমলই দিচ্ছ না?

আমল দেব না কেন, বলতে পার? যাক গে, যে-কথা বলছি শোন, আগামীকাল দুপুর বারোটা পর্যন্ত সময় আছে, তাই তো বললে?

হ্যাঁ, ব্যাঙ্ক-পরীক্ষক অনুগ্রহ করে এটুকু সুযোগ দিয়ে গেছেন।

ঠিক আছে, সময় মত তোমার টাকার ব্যবস্থাটা হয়েই যাবে। তুমি আমার কথার ওপর আস্থা রেখে নিশ্চিন্ত হতে পার।

বহুৎ আচ্ছা। কথাটা বলেই লংবিল চেয়ার ছেড়ে উঠে দরজার দিকে পা-বাড়ালেন। দরজার চৌকাঠ ডিঙোতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ঘাড় ঘুরিয়ে বিষণ্ণ মুখে বললেন—টম, আমি জানতাম, সামর্থ্য থাকলে তুমি আগেই ঋণটা শোধ করে দিতে।

ব্যাঙ্ক-মালিক লংবিল বিদায় নিলে টম মেরউইন ঝট্ করে চেয়ারটাকে পিছনে ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। হাত বাড়িয়ে কোটটা নিয়ে ব্যস্ততার সঙ্গে সেটাকে গায়ে চাপিয়ে পথে নামল।

লম্বা লম্বা পায়ে হেঁটে সে শহরের একমাত্র বে-সরকারী ব্যাঙ্ক কুপার অ্যান্ড ক্রেগ-এ হাজির হল।

ব্যাঙ্কের অংশীদারের সঙ্গে দেখা করে সরাসরি বলল—মিঃ কুপার, আজ না হলেও আগামীকাল আমাকে দশ হাজার ডলার দিতেই হবে।

অংশীদার কুপার বলল—দশ হাজার ডলার? কিন্তু—

এর মধ্যে আর কোন কিন্তু-র ব্যাপার নেই। সাফ কথা, ডলারগুলো আমার দরকার আর তা তোমাকে ব্যবস্থা করে দিতেই হবে। যে কথা বলতে চাচ্ছি, এখানে আমার একটা আর কিছু বিষয় আশয় আছে। এদের সাকুল্যে ছ' হাজার ডলার, আর এগুলোই আমার একমাত্র জামিন। তবে তোমার জ্ঞাতার্থে বলছি যে, কিছু পশু কেনাবেচার কারবার মারফৎ ক'দিনের মধ্যেই আমি ওই পরিমাণ অর্থের চেয়েও কিছু বেশী লাভ হিসেবে পেয়ে যাব।

তার কথাটা শুনে কুপার বার কয়েক কাশল। কিছু বলার ইচ্ছা থাকলেও বলতে পারল না।

টম মেরউইন চেয়ারটাকে তার দিকে সামান্য টেনে নিয়ে এবার কাতর মিনতির স্বরে বলল—মিঃ কুপার, ঈশ্বরের দোহাই, তুমি অমত কোরো না। ওই পরিমাণ অর্থের চাওয়ামাত্র প্রদেয় তলবী ঋণ আমার রয়েছে। যে আমাকে ঋণটা দিয়েছে আমি তাব সঙ্গে রেঞ্জারশিবির আর পশু-শিবিরে দীর্ঘ দশ-দশ'টা বছর একই কম্বলের বিছানায় শুয়ে কাটিয়েছি।

আমার দীর্ঘদিনের সে সঙ্গীটা আমার যথা সর্বস্ব, এমন কি আমার শিরার রক্তও জামিন হিসেবে চাইতে পারে, আর তা প্রাপ্যও বটে। ঋণের অর্থ সে এখনই চাচ্ছে। আসলে সে নেকড়ের কবলে পড়েছে। যে করেই হোক ডলারগুলো জমা দিয়ে তাকে রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্তব্য।

অংশীদার মিঃ কুপার গম্ভীরকণ্ঠে উচ্চারণ করল—হুম্!

টম মেরউইন' পূর্বস্বর অনুসরণ করেই বলল—কুপার, তুমি তো আমাকে ভালই চেন, মানে আমার কথার যে দাম আছে তা-তো আর তোমার অজানা নেই।

যথেষ্ট ভদ্রভাবেই কুপার বলল—তোমার কথার দাম সম্বন্ধে আমার এতটুকুও সন্দেহ নেই। এবার একটু আমতা-আমতা করে সে বলল—কিন্তু টম, তুমি তো জানই, আমার একজন অংশীদার রয়েছে।

হ্যাঁ, তা-তো জানি।

তাই বলছি কি, আমার হাত-পা বাঁধা। ইচ্ছা থাকলেও আমার পক্ষে কাউকে ধার দেওয়া সম্ভব নয়।

আমি তো জামিন—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই কুপার আবার বলতে আরম্ভ করল—জামিন? তোমার হাতে অনেক মূল্যবান জামিন থাকলেও এক হপ্তার আগে তোমার ঋণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হত না।

টম মেরউইন হতাশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল—এ-ক স-প্তা-হ!

এখনই আমাদের তুলো কেনার জন্য পনের হাজার ডলার রকডেল-এর মাইয়ের ব্রাদার্স-এর কাছে পাঠাতে হচ্ছে আর তা আজ রাতের নেরো-গেজ লাইনের ট্রেনেই ডলারগুলো যাচ্ছে। অতএব বুঝতেই পারছ, সম্প্রতি আমাদের নগদ অর্থের খুবই টানাটানি যাচ্ছে।

কিন্তু—কিন্তু—

দেখ, তোমার সমস্যা দূর করতে পারছি না বলে আমরা আন্তরিক দুঃখিত।

টম মেরউইন বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিষণ্নমনে নিজের বাড়ি ফিরে গেল। বিকেল প্রায় চারটার কাছাকাছি সে জাতীয় ব্যাঙ্কে হাজির হল। মালিক লংলির টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

লংবিল চশমার ফাঁক দিয়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে টম-এর মুখের দিকে তাকালেন।

টম বলল—শোন, তোমার ডলারগুলোর জোগাড় আজ রাত্রে, মানে আগামী কালই করার চেষ্টা করব, বুঝলে।

লংবিল স্বাভাবিক কণ্ঠেই বলল—ভাল কথা, তা-ই কোরো।

ঘড়িতে তখন রাত্রি ন'টা বাজে। টম সেজেগুজে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথে নামার জন্য তৈরী

হতে লাগল।

টম-এর বাড়িটা ছোট্ট শহরটার প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত। ধারে-কাছে কোন লোকজনই নেই।

টম তবু মুহূর্তের জন্য চারদিকে একবারটি চোখ বুলিয়ে নিয়ে ছ'-ঘড়া পিস্তল, দুটো কোমরের দু' দিকে, কোটের তলায় গুঁজে নিল। চওড়া একটা টুপি মাথায় চাপিয়ে নিল। তৈরী হয়ে নিয়ে সে এবার পথে নামল।

সে নির্জন-নিরালা পথে লম্বা-লম্বা পায়ে হেঁটে নেরো-গেজ লাইনে উঠল। এবার একই রকম ব্যস্ততার সঙ্গে পা চালিয়ে হেঁটে শহরের দু'মাইল দূরবর্তী জলের ট্যাংকটার হাজির হল। এবার সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

অনুসন্ধিৎসু নজরে চারদিক ভালভাবে দেখে নিয়ে সে এবার কোটের পকেট থেকে বড়সড় কালো রুমালটা বের করল। সেটাকে মুখের নিচের দিকে বেঁধে নিল। এবার হাত বাড়িয়ে টুপিটাকে টেনে মুখের দিকে নামিয়ে মুখটাকে প্রায় ঢেকে নিল।

চাপারোসা থেকে ছেড়ে রকভেল-এর রাতের ট্রেনটা দশ মিনিটের মধ্যেই জলের ট্যাঙ্কে পৌঁছে গেল।

টম কোমর থেকে পিস্তল দুটোকে হেঁচকা টানে বের করে এনে দু'হাতে বাগিয়ে ধরল। তারপর ধীরে ধীরে একটা ঝোপের ভেতর থেকে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। সতর্ক দৃষ্টি মেলে আবার চারদিকে তাকিয়ে নিল।

এবার সে ইঞ্জিনটার দিকে এগিয়ে চলল। না, বেশী দূর যেতে পারল না। তৃতীয়বার পা ফেলামাত্র অতর্কিতে দু'টো লম্বা ও ইস্পাতের মত শক্ত হাত পিছন দিক থেকে তাকে জাপ্টে ধরল। মুহূর্তের মধ্যেই তাকে শূন্যে তুলে পাশের ঘাসের জমিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে দুটো শক্ত হাঁটু তার পিঠের ওপর চেপে বসল। আর দুটো শক্ত হাত সাঁড়াশির মত তার কব্জি দুটোকে আঁকড়ে ধরল।

অসহায় শিশুর মত সে সেখানে, ওই ঘাসের জমির ওপরই পড়ে রইল।

ইঞ্জিনটা জল নেবার জন্য দীর্ঘসময় সেখানে দাঁড়াল। কাজ সেরে সেটা কর্কশ স্বরে সিটি দিয়ে ধীর গতিতে যাত্রা শুরু করল। মুহূর্তের মধ্যে গতি ক্রমে বাড়তে শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেন ক্রমে দৃষ্টির বাইরে, অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

টম এবার ছাড়া পেল। ঘাসের জমি ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই সে লংবিল-এর মুখোমুখি হল।

লংবিল গম্ভীর কণ্ঠে বলল—দেখ টম, কাজটা এভাবে করার কোন দরকার ছিল কি?

টম নিতান্ত অপরাধীর দৃষ্টিতে ফ্যাল ফ্যাল করে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

লংবিল আগের মতই গম্ভীর স্বরে বলে চললেন—শোন টম, কুপারের সঙ্গে আজ সন্ধ্যায়ই আমার দেখা হয়েছিল। কথা বার্তার মাধ্যমে তার মুখ থেকে শুনলাম, তোমাদের দু'জনের মধ্যে কি কথাবার্তা হয়েছিল।

টম-এর হাত ধরে ঘাসের জমি থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে লংবিল বললেন—মিঃ কুপার-এর বাড়ি থেকে বেরিয়েই আমি তোমার বাড়ির দিকে দ্রুত চলতে আরম্ভ করলাম।

তোমার বাড়ি ঢুকে আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকলাম। তারপর সতর্ক দৃষ্টি মেলে তোমার কাণ্ডকারখানা দেখতে লাগলাম। তুমি যে কোটের তলায় পিস্তল দুটো গুঁজে রেখেছিলে তা-ও আমার নজর এড়ায় নি।

তুমি তৈরী হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লে। আমি গোপনে তোমাকে অনুসরণ করতে লাগলাম। যাক, এসব কথা পরে হবে। অনেক রাত্রি হয়ে গেছে। চল, বাড়ি ফেরা যাক।

লংবিল এবার টম মেরউইনকে নিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলেন।

টম মেরউইন এবার প্রথম মুখ খুলল—দেখ, আমি ভেবে দেখলাম, এটাই একমাত্র এবং অপূর্ব সুযোগ।

তাই বলে এভাবে?

তুমি ঋণটা শোধ করতে বললে। আমিও ডলারগুলো ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলাম। একটা কথা তো খুবই সত্য যে, তারা ডলারগুলোর জন্য তোমার ওপর চাপ সৃষ্টি করলে তোমার তো

কিছুই করার থাকবে না।

আচ্ছা, তারা যদি তোমাকে চাপ দিত তবে তুমিই বা কি করতে।

ট্রেন-ডাকাতির চিন্তাটা আমার মাথায় কিছুতেই আসত না। কিন্তু একটা 'কল লোন'-এর ব্যাপারটা তো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। দেখ, আমার কাছে ঋণটা কিন্তু ঋণই বটে। সেটা যে করেই হোক শোধ করতেই হবে। ওই নচ্ছাড় ব্যাঙ্ক-পরীক্ষকটা আসার আগে বারো ঘণ্টা সময় তো আমাদের হাতে আছে, ঠিক কিনা? যেভাবেই হোক তোমাকে পাকড়াও করার আগে ডলারগুলোর ব্যবস্থা করতেই হবে। আর আমাদের সে চেষ্টা সফলও হতে পারে। মুহূর্তকাল উৎকর্ণ হয়ে থেকে সে আবার মুখ খুলল—গ্রেট স্যাম হাউসস্টোন! ওই-ওই যে, শুনতে পাচ্ছ কি?

রাতের অন্ধকারে বাতাস-বাহিত একটা শিষ কানে আসতে টম মেরউইন ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োতে আরম্ভ করল। আর লংবিল তাকে অনুসরণ করতে লাগলেন।

টম মেরউইন দৌড়োতে দৌড়োতে একটা বাড়ির সদর-দরজার সামনে পৌঁছে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সে মুহূর্তমাত্র দেরী না করে বন্ধ দরজাটার গায়ে সজোরে দুম্ করে একটা লাথি মারল। দরজাটা সশব্দে খুলে গেল।

ঘরে ঢুকতে গিয়ে টম মেরউইন মেঝেতে রাখা চামড়ার একটা থলেতে হোঁচট খেল। আচমকা বাধা পেয়ে সে উল্টে পড়ে গেল। পথশ্রমে ক্লান্ত একটা যুবক বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে নীরবে সিগারেট টেনে চলেছে।

টম মেরউইন নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল—এড্, কি খবর?

টম মেরউইন-এর ছোট ভাই এড মেরউইন একটু আগেই ফিরে এসেছে। সে ঠোঁট থেকে সিগারেটটা নামিয়ে এনে দাদার প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বলল—খুবই ভাল খবর। সাড়ে ন'টায় ট্রেনটা ধরলাম। পনেরো দরে পুরো ভেড়ার পালটাই বেচে দিয়েছি।

পনেরো দরে! চমৎকার।

দাদা, ঊনত্রিশ হাজার ডলারের চামড়ার ব্যাগটায় তুমি লাথি মারলে! ডলারগুলো বের করে আলমারিতে রেখে দাও। আমি আর পারছি নে। পথশ্রমে বড়ই ক্লান্ত।

দ্য হায়ার অ্যাবডিক্শন্

ছন্নছাড়া বাউন্ডুলে—সবাই যাকে পয়লা নম্বরের ভবঘুরে বলে জানে সেই কার্লি ফ্রি ধীর-পায়ে লাঞ্চ-কাউন্টারের দিকে এগোতে লাগল। দু'-চার পা যেতেই আচমকা খাবার পরিবেশনকারীর চোখে চোখ পড়তেই সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সে হলঘরের মেঝেতে দাঁড়িয়ে মুখের এমন ভাব করল যে, যেন সে কোন বন্ধুর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে যার তাকে নিজের গাড়িতে করে নিয়ে যাবার কথা।

নাটক করার, মানে অভিনয় দক্ষতা তীক্ষ্ণ হলেও মেক-আপ-এর দক্ষতা খুবই কম।

পরিবেশনকারী যুবকটাও তার কাছে কম অভিজ্ঞ নয়। সে চোখে-মুখে এমন ভাব ফুটিয়ে তুলে, সিলিং-এর দিকে চোখ রেখে হলঘরটায় ঘুরে বেড়াতে লাগল সে, দেখে মনে হচ্ছে জটিল কোন সমস্যার সমাধানে সে ডুবে রয়েছে।

এক সময় পরিবেশনকারী যুবকটা চলতে চলতে আচমকা ভবঘুরে লোকটার সঙ্গে ধাক্কা মারল। ভাবটা এমন করল যেন অন্যমনস্কতার জন্যই সে লোকটাকে ধাক্কা মেরেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে ভবঘুরে লোকটা হুমড়ি খেয়ে মেঝেতে পড়ে গেল।

ভবঘুরে লোকটা নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই পানীয় পরিবেশনকারীকে খপ্ করে তার হাতটা ধরে ফেলল। টানতে টানতে তাকে দরজার কাছে নিয়ে গেল। পাছায় সজোরে একটা লাথি মেরে একেবারে দরজার বাইরে বের করে দিল।

দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে এরকম ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে। ভবঘুরেদের মোকাবেলা করার জন্য হোটেলের কর্মীদের সর্বদা খদ্দেরদের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়।

লাথি খেয়ে ভবঘুরে কার্লি একেবারে পথের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে সে নিজেকে সামলে নিয়ে পোশাকের ময়লা ঝাড়তে ঝাড়তে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল।

বিহিষ্কারক খাদ্য বা পানীয় পরিবেশনকারী কারো ওপরেই তার মনে ক্ষোভ বা বিদ্বেষ জাগল না। এ-তো তার প্রায় প্রতি দিনের ব্যাপার। তার বাইশ বছরের জীবনের এক নাগাড়ে পনেরোটা বছরই তো ভবঘুরের মত কেটেছে। ফলে তার মনটা খুবই শক্ত হয়ে গেছে। অবহেলা অবজ্ঞা আর তিরস্কারের সঙ্গে সমঝোতা করে নিয়ে এক-একটা দিন পার করে চলেছে। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, তারা তার শত্রু সন্দেহ নেই। আবার যদি অস্বাভাবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিবেচনা করা যায় তবে বলতেই হবে, অনেক ক্ষেত্রে তারা পরম হিতকাঙ্খীও বটে। পিতৃদত্ত জীবনটাকে টিকিয়ে রাখতে গিয়ে তাদের কাছ থেকে সহানুভূতি, হরেক রকম সুযোগ সুবিধা না নিলে তার চলেই না।

ভবঘুরে কার্লি সঙ্কীর্ণ পথটার ওপর দাঁড়িয়ে ভবিষ্যৎ কর্তব্য সম্বন্ধে ভাবতে লাগল।

সান এন্টেনিও তাকে যারপরনাই বিরক্ত করেছে, বিচলিতও কম করে নি। তাকে জোর করে আই, অ্যান্ড জি. এন-এর একটা মালগাড়ির বগি থেকে টেনে হিঁচড়ে শহরে নামিয়ে দিয়েছিল। ব্যস, সেই থেকে আজ তিনদিন হল সে এ শহরে বিনা পয়সার অতিথি হয়ে দিন কাটাচ্ছে।

এ শহরটায় পা দেওয়ামাত্র কার্লির মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে উঠেছিল। তার একদম পছন্দ হয় নি। রাস্তায়, গলির মোড়ে, দোকানে, বাজারে, হাটে যখন যে দিকে তাকানো যাক না কেন কেবল মানুষ আর মানুষ। যেন সব সময় মেলা জমে থাকে।

আর শহরের রাস্তাগুলোও মোটেই পরিকল্পনামাফিক তৈরী নয়। যেখান-সেখান দিয়ে পথ চলে গেছে। আর সেগুলো আঁকাবাঁকা গোলক ধাঁধার মত রাস্তাগুলো পথচারীদের কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেয় না। নবাগতরা এখানে পথ চলতে গিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে। গন্তব্যস্থলে পৌঁছোতে হলে অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শ নেওয়া ছাড়া গত্যান্তর থাকে না।

শুধু কি এ-ই? ছোট্ট একটা নদী শহরটার বুক চিরে এমনভাবে হেলে দুলে এঁকেবেঁকে বয়ে গেছে যা দেখে কার্লি একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছে। আর যে শেষ পানীয় পরিবেশনকারী তার পাছায় লাথি মেরে হোটেল থেকে বের করে দিয়েছে তারপায়ে ন' নম্বরী জুতো ছিল।

সুসজ্জিত ঘরটা রাস্তার মোড়ের আর একেবারে রাস্তা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। রাত্রি আটটা বাজে।

পাথরের সরু গলি দিয়ে যারা ভেতরে ঢুকছে আর যারা বাইরে যাচ্ছে সবাই কার্লিকে সমানে ধাক্কা মেরে চলে যাচ্ছে।

বাঁ দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই বাড়িগুলোর মাঝখান দিয়ে একটা ফাঁকা জায়গা দেখে কার্লি ভাবল, সেটাও নির্ঘাৎ একটা গলি, যাতায়াতের পথ। একটুখানি আলোর ঝিলিক ছাড়া গলিটা অন্ধকার।

কার্লি গলিটার মুখে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ভাবল, আলো যেখানে আছে সেখানে মানুষ থাকতেই হবে।

আলো থাকার অর্থই হচ্ছে, মানুষ আছে। আর মানুষ যেখানে আছে সেখানে খাবার না থেকে যাবে না। অন্তত ছোট্ট শহর সান এন্টোনিওতে যেখানে রাতের বেলাতেও মানুষের উপস্থিত লক্ষ্যিত হয় সেখানে খাবার থাকবেই থাকবে। আর পানীয়ের ব্যবস্থা তো অবশ্যই থাকবে।

কার্লি কয়েক মুহূর্ত নীরবে ভেবে নিয়ে আলোটার দিকে গুটিগুটি হাঁটতে লাগল।

আলোটার উৎসস্থল সোয়েগেল-এর রেস্তোরাঁ। রেস্তোরাঁটার খোলা-দরজা আর কাঁচের জানালা দিয়ে আলো বেরিয়ে এসে রাস্তায় পড়েছে।

রেস্তোরাঁটার সদর-দরজার কাছাকাছি যেতেই কার্লি পথের ওপর একটা পুরনো খাম পড়ে থাকতে দেখল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিয়ে সে ঝট করে খামটা কুড়িয়ে নিল। তার মুখটা ফাঁক করে ভেতরে নজর চালিয়ে দেখল, খালি। খামটার ভেতরে একটা দশ লাখ ডলারের চেকও থাকতে পারত। বরাতগুণে সেটা একেবারেই খালি। এক টুকরো কাগজ পর্যন্ত নেই।

ভবঘুরে কার্লি রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে-আসা আলোর দিকে খামটা কাৎ করে তার গায়ে লেখা ঠিকানাটা পড়ল। লেখা রয়েছে—মিঃ অটো সোয়ে-গেল। তারপর রাস্তা, শহর আর রাষ্ট্রের নাম লেখা। আর খামের ওপরে ডাকঘরের ছাপ মারা রয়েছে ডেট্রয়েট।

কার্লি গুটিগুটি রেস্তোরাটার দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। অত্যুজ্জ্বল আলোয় সে মুহূর্তের জন্য নিজের চেহারার দিকে তাকিয়ে সে বুঝতে পারল, তার গায়ে বহু বছরের ভবঘুরে পেশার ছাপ সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

প্রখর বুদ্ধিমত্তা আর সুবিবেচক ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলে ভবঘুরে বস্তিভোগীদের মত পরিচ্ছন্নতার ছাপ চেহারায় অনুপস্থিত। তার দিকে কয়েক মুহূর্ত নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকলে আপনার চোখের সামনে যেন অস্পষ্ট ছবির মত ভেসে উঠবে মিশরের মমি, একটা অতিকায় মোমের মূর্তি, কোন এক নির্বাসিত রুশ পুরুষ আর মরুভূমির বুকের পথভ্রষ্ট মানুষের চেহারা।

কার্লি দরজা দিয়ে সামান্য এগিয়ে ভেতরে উঁকি দিল। ঘরটা ছোট। তার বাতাস—মাংস আর পানীয়ের গন্ধে ভরপুর। আর বাঁধাকপি ও শূকর ছানার গন্ধ যেন পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মেতেছে। এ যেন অক্সিজেন আর হাইড্রোজেনের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম।

কার্লি এক পা-দু'পা করে রেস্তোরাঁর শেষ পর্যন্ত এগিয়ে গেল। বার-কয়েক কেশো রোগীর মত বিশ্রী স্বরে কাশল।

কয়েক গজ দূরে সোয়েগেল-এর বিটেবিল। একটা কাঠের হাত-বাক্স সামনে নিয়ে বসে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে।

কার্লি রীতিমত মেজাজে এগিয়ে সোয়েগেল-এর টেবিলের সামনে দাঁড়াল। নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলল যে, সে ডেট্রয়েট-এর একজন কাঠমিস্ত্রি।

দিন গেলে রাত হয়, আবার রাত পোহালে যেমন পৃথিবীর বুকে নেমে আসে দিনের আলো ঠিক তেমনই নিয়মে কার্লির ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল। সোয়েগেল-এর সঙ্গে বাক্যালাপ ক্রমে এগোতে বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ার মতই কার্লের ভাগ্যে কেবলমাত্র আহারই নয়, মাথা গোঁজার জায়গার ব্যবস্থাও হয়ে গেল।

সোয়েগেল কথা প্রসঙ্গে বলল—আচ্ছা, বল তো, ডেট্রয়েট-এর বাসিন্দা হেইনরিক স্ট্রসকে তুমি চেন?

কার্লি কৃত্রিম উল্লাস প্রকাশ করে তার প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করল—হেইন্‌রিক স্ট্রসকে আমি চিনি কিনা? আরে মঁসিয়ে, কী যে বলেন, তিনি কেবলমাত্র আমার পরিচিতই নন, রবিবার এলেই আমি আর হেইনরিক একসঙ্গে খেলায় মেতে যেতাম। আমরা একসঙ্গে কত যে খেলেছি তা আর আপনাকে কি বলব মঁসিয়ে!

সুচতুর বাক্যবাগীশ লোকটার সামনে আরও এক প্লেট গরম মাংস আর এক পেগ দামী মদ এল।

রেস্তোরাঁর মালিক কার্লির সম্বন্ধে যে ধারণাই করুক না কেন, সে-তো অন্তত নিজেকে চেনে। তাই সে পানাহার সেরেই সেখান থেকে কেটে পড়ার ধান্দা করতে লাগল।

সোয়েগেল অন্যদিকে ফিরে এক খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলা শুরু করলে মওকা বুঝে কার্লি চেয়ার ছেড়ে সোজা পথে নেমে গেল। ব্যস, পথচারীদের ভিড়ে মিশে যেতে তার দেরী হল না।

আর এবার থেকেই সে দক্ষিণী শহরের সমস্যাগুলো সম্বন্ধে একের পর এক ধারণা করে নিতে আরম্ভ করল।

এক দিনের অভিজ্ঞতা দিয়ে সে যেটুকু বুঝতে পেরেছে তা হচ্ছে উত্তরের শহরগুলোর হা-ঘরে মানুষদের জন্যও যেসব আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা আছে এখানের কোন পল্লীতেই তার এক কণা ব্যবস্থাও নেই। এমন কি সামান্য বাজনার ব্যবস্থা পর্যন্ত কোথাও দেখা যায় না। আশ্চর্য ব্যপার! একেবারে নীরস—যাকে বলে শুখা শহর।

জনারণ্যে মিশে হাঁটতে হাঁটতে কার্লি শুনতে পেল অন্ধকার খোলা জানালা দিয়ে ঘরের ভেতর থেকে ভেসে আসছে হাসি ঠাট্টা হৈ-হুল্লোড় আর টাকার মিষ্টি-মধুর ঝলকানি। আর বাতাস-বাহিত সুললিত কণ্ঠের গানের কলিও তার মনের ওপর কম প্রভাব বিস্তার করেনি।

এতসব আয়োজন থাকা সত্ত্বেও কার্লি কেন বিপরীত ধারণা অন্তরে পোষণ করছে? হ্যাঁ, এর যুক্তি কিছু না কিছু তো আছেই। গান-বাজনা যা কিছুর আয়োজন এ অঞ্চলে হয় সবই ব্যক্তিগত বন্দোবস্তের ব্যাপার। এখানকার আমুদে মানুষেরা নিজের নিজের গান-বাজনার মজলিস বসায়। কিন্তু সবই ব্যক্তিগত উদ্যোগ ছাড়া সর্বসাধারণের অবসর বিনোদনের জন্য গান-বাজনা, আনন্দ-ফুর্তির ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত সান-এন্টোনিওতে অনুপস্থিত।

কার্লি হারা উদ্দেশ্যে এগিয়েই চলল। আরও কিছুটা পথ গিয়ে সে পশু-খামার থেকে ফেরা একদল ফুর্তিবাজ পথচারীদের মুখোমুখি হল। তারা ধারে কাছেই কোন পশু-খামারের কর্মী। ছুটির পর গলা-ছেড়ে গাইতে গাইতে তারা নিজের নিজের ডেরায় ফিরছে। কেউ বা চলেছে ভাটিখানার দিকে। দু'-এক পেগ চোলাই মদ খেয়ে শরীরটাকে একটু চাঙা করে নেবে।

ফুর্তিবাজ লোকগুলো কার্লিকে সামনে পেয়ে দলছুট ভেড়ার মত ঠেলে ধাক্কে তাদের দলে ভিড়িয়ে দিল। গরু, ভেড়া আর ছাগল আর পশমের রক্ষাকর্তারা কার্লেকে তাদের দলে ভিড়িয়ে নিল।

ঘণ্টা খানেক পরেই কার্লি দুর্বল পায়ে আঁকাবাঁকা পদক্ষেপে রেস্তোরাঁর পানশালা থেকে বেরিয়ে এল।

কার্লির ক্ষণিকের বন্ধুরা যেমন অল্প সময়ের মধ্যেই তাকে আপন করে কাছে টেনে নিয়েছিল তেমনি খুব সহজেই তাকে বাতিল করে দিল।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে পথ চলতে চলতে কার্লি ভাবল, পেটের আগুন তো নেভানো গেল, এবার মাথা গোঁজার মত একটা জায়গা আর যেমন তেমন একটা বিছানা পেলেই এখনকার মত সমস্যা মিটতে পারে। কিন্তু কি করে তার বাঞ্ছা পূরণ হতে পারে? তবে হাল ছেড়ে দিলেও তো চলবে না। পরিস্থিতির সঙ্গে দৃঢ় মন নিয়ে মোকাবেলা করে সমস্যাটার সমাধান তাকে যে করেই হোক করতেই হবে।

একটু বাদেই ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে—বরফের মত ঠাণ্ডা বৃষ্টি জল। এক ফোঁটা গায়ে লাগলে সর্বাঙ্গে কাঁপুনি ধরিয়ে দেয়।

অনবরত ঝিরঝির করে পড়তেই থাকা অলস বৃষ্টিপাত মানুষের শরীরেরই কেবল নয়, মনের তাপমাত্রাও হ্রাস করে দিয়েছে। আর সারাদিনের রোদে-পোড়া পাথরের বাড়িঘর আর রাস্তায় বৃষ্টির জল পড়ায় ভ্যাপ্‌সা গরম আর সোঁদা গন্ধ উঠছে। আর এভাবেই উত্তরে বাতাস বয়ে আনে বসন্ত আর হেমন্তকাল। সে সঙ্গে পৌঁছে দেয় আগামী শীতের আগামবার্তা।

দায়িত্ব পালনে অক্ষম-প্রায় প্রথমে যে সঙ্কীর্ণ গলিটায় নিয়ে গেল সে সেদিকেই সোজা হেঁটে চলল। হাঁটতে হাঁটতে সে গলিটার একেবারে শেষ প্রান্তে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। অনুসন্ধিৎসু চোখে চারদিকে তাকিয়ে পরিবেশটা সম্বন্ধে আঁচ নিয়ে নেবার চেষ্টা করল।

কার্লি আর দু'পা এগিয়ে পাথুরে দেওয়ালটাকে আরও ভালো করে লক্ষ্য করলে একটা খোলা-দরজা তার নজরে পড়ল।

দরজাটায় পৌঁছে শরীরটাকে সামনের দিকে বাঁকিয়ে এদিক-ওদিক তাকাতেই সে দেখতে পেল, দেওয়াল-ঘেরা জায়গাটার তিনদিক জুড়ে সারিবদ্ধভাবে ছোট ছোট কাঠের চালাঘর দাঁড়িয়ে আছে। আর ঘরগুলোর সামনে অস্থায়ী আগুন জ্বলছে।

কার্লি দরজাটা ডিঙিয়ে গুটিগুটি ঘেরা জায়গটায় ঢুকে গেল।

দু'-চার পা হাঁটাহাঁটি করে সে দেখতে পেল, চালাগুলোর তলায় অনেকগুলো ঘোড়া বাঁধা, আপনমনে দানাপানি খেয়ে চলেছে। তারপরই তার নজরে পড়ল অনেকগুলো ঠেলাগাড়ি আর মালগাড়ি এখানে-ওখানে অলসভাবে পড়ে আছে।

এবার কার্লির বুঝতে অসুবিধা হল না, এটা একটা গুদামবাড়ি। মালগাড়ি আর ঠেলাগাড়ি রাখার জায়গা। বহু খোঁজাখুঁজি করেও কার্লি কোন লোকজনের হদিস পেল না। সে আপনমনে বলল—আশ্চর্য ব্যাপার তো! এতগুলো ঘোড়া, ঠেলাগাড়ি আর মালগাড়ি রাখা আছে, কিন্তু চালকদের কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। লোকগুলো গেল কোথায়?

পরমুহূর্তেই কার্লি ভাবল, গাড়ির চালকরা হয়ত বা শহরের চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। তা যদি

না-ও হয় তবে নির্ঘাৎ হাতি দেখতে গেছে নতুবা প্যাঁচার ডাক শোনার জন্য জঙ্গলের ধারে কাছে ঘোরাফেরা করছে। আর যাবার সময় ব্যস্ততার জন্য দরজাটা খোলা রেখেই একে একে এখান থেকে চলে গেছে।

কার্লি মদের নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে। বেশী হাঁটাচলা বা গভীরভাবে কোন কিছু ভাববার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। দক্ষিণ আমেরিকার অতিকায় বোয়া সাপের গলা পর্যন্ত খাবার গিলে, উটের মত তেষ্টা মিটিয়ে সে প্রায় অচল হয়ে পড়েছে। কোন কিছু দেখে বেড়াবার মত তার শরীর বা মন কোনটাই সুস্থ নয়।

কার্লি দুর্বল ও কাঁপাকাঁপা পায়ে কোনরকমে আরও কিছুটা এগিয়ে প্রথম মালগাড়িটার কাছে গেল, দুই ঘোড়ায় টানা একটা মালগাড়ি, সাদা ত্রিপল দিয়ে ছাউনি দেওয়া আছে। গাড়ির ভেতরে গাদা করে রাখা হয়েছে পশমের বস্তা, ধূসর কম্বলের দু'-তিনটে গাট্টি আর কয়েকটা গাট্টি আর বাক্স।

গাড়িটার অবস্থা দেখে যেকোন চালাক-চতুর মানুষ সহজেই বুঝে নিত এগুলো কোন না কোন পশু-খামারে পাঠাবার জন্য গাড়ি বোঝাই করা হয়েছে। কালই হয়ত জায়গামত পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

কিন্তু কার্লি-র নেশাগ্রস্ত ও তন্দ্রাতুর স্থূল বুদ্ধিতে গাড়ির মালগুলোকে এ কনকনে ঠাণ্ডার রাত্রে উষ্ণ-আশ্রয়ের প্রতীক ছাড়া আর কিছুই মনে হ'ল না।

বহু চেষ্টা চরিত্র করে, বার-কয়েক আছড়ে পড়ে কার্লি গাড়িটার চাকা-বেয়ে কোনরকমে সেটার ওপরে উঠে যেতে পারল।

আঃ কী উষ্ণ আর আরামদায়ক ব্যবস্থা। বহুদিন বাদে সে যেন একটা মনের মত উষ্ণ ও নরম বিছানায় শুতে পারল। আর মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করে সে শুধু শুয়েই পড়ল। পা দিয়ে চেপে বস্তা-কম্বল সরিয়ে সরিয়ে একটা চমৎকার গর্ত তৈরী করে ফেলল। তারপর সেটার ভেতরে নিজেকে সিঁধিয়ে দিল। ব্যস আর কথা নেই, গর্তটার ভেতরে সে তালুকের মত নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমিয়ে পড়ল। মিনিট কয়েকের মধ্যে সে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে লাগল।

চিবোলো খামারবাড়ির ছ'জন গো-দাগানো কর্মী খামারের দরজায় অপেক্ষা করছে। সেটা একটা কাঠের বাড়ি। সাদা রং করা। খামার বাড়ি থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে জায়গাটা অবস্থিত। তার কিছুটা দূরে রয়েছে একটা ঘোড়ার খোঁয়াড়। আরও কিছুটা পথ এগিয়ে গেলে দেখা যাবে, লোম-ছাঁটার খোঁয়াড় আর পশমের গুদাম।

আর খামারবাড়িটায় চারটে বড় বড় কামরা। কাঁচা ইটের দেওয়াল পলেস্তারা করা।

বাড়িটা লম্বা ও গভীর হ্রদের তীরে অবস্থিত। দেবদারু ও ওক গাছ সেটাকে ঘিরে রেখেছে।

রাতের অন্ধকার নেমে এলেই ইয়া বড় বড় গাবগাছ হ্রদের জলে মনের আনন্দে লাফাতে থাকে। রাত একটু গভীর হলেই জলহস্তীদের দেখা যায়। তারা স্নান করতে নামে। জল তোলপাড় করে। কেউ বা ডুব-সাঁতার দিয়ে বহুদূর চলে যায়।

সত্যি কথা বলতে কি, চিবোলো খামার বাড়িটার দক্ষিণ-অঞ্চলের খামারবাড়ির সঙ্গে যতখানি সাদৃশ্য আছে তার চেয়ে অনেক, অনেক বেশী বৈসাদৃশ্য আছে পশ্চিম-অঞ্চলের খামারবাড়ির সঙ্গে।

খামারবাড়িটার দিকে তাকিয়ে একটু ভাবলেই বোঝা যায় পঞ্চাশ সালে বুড়ো কিওয়া ট্রায়েস্‌ডেল যখন মিসিসিপি নদীর পার্শ্ববর্তী নিম্নভূমি থেকে টেক্সাসে এসেছিল কাঁধে করে একটা বন্দুক নিয়ে তখন হয়ত সে এ বাড়িটাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। আর এ কারণেই হয়ত বা বাড়িটায় দক্ষিণ-অঞ্চলের বাড়িগুলোর ছাপ বেশী করে লক্ষিত হয়।

আসলে সে তার আগেকার বাড়িটা সঙ্গে করে না আনলেও ট্রুয়েস্‌ডলে উত্তরাধিকারী হিসাবে এমন একটা জিনিস সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল যা পাথর বা ইটের চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী, অনেক বেশী মজবুত। কিন্তু সে বহুমূল্য সম্পদটা কি? কার্টিস আর ট্রুয়েস্‌ডেল পরিবারের দীর্ঘদিনের বিবাদ।

চিবোলো থেকে ষোলো মাইল দূরবর্তী অন্‌মোস খামারটা যখন কার্টিস পরিবারেরই কোন একজন কিনে ফেলে তখন ট্রুয়েস্‌ডেলদের অবস্থা সবদিক থেকে ভাল।

সে আসলে ট্রুয়েস্‌ডেল-জঙ্গলের বহু মেক্সিকান সিংহ, নেকড়ে, বনবিড়াল মেরে মেরে প্রায় নির্বংশ করে দিয়েছে। শুধুই কি বন্যপ্রাণী? না, কার্টিস-পরিবারের দু'-একজনকেও তার বন্দুকের গুলিতে নির্মমভাবে প্রাণ দিতে হয়েছে। আবার তার নিজের এক ভাই কার্টিস্‌দের গুলিতে প্রাণ দিল। সে নিজের হাতে চিবোলো নদীর পাড়ে ভাইয়ের মৃতদেহটা মাটি চাপা দিয়েছিল।

ব্যস, এবার থেকেই জমিজিরাতের পরিমাণ আর গরুর সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের অবস্থা লাফিয়ে লাফিয়ে রমরমা হয়ে উঠতে শুরু করে। তাদের খ্যাতি ও সমৃদ্ধি আকাশ-ছোঁয়া হয়ে উঠতে থাকে।

সেদিনের সে ট্রুয়েস্‌ডেল আজ বুড়ো হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে হাজারো ঘটনা দুর্ঘটনার মধ্যে নিজেকে লিপ্ত রেখে রেখে চিত্ততার ভাণ্ডটাকেও সে পূর্ণ করে তুলেছে। তার মাথার পাকা চুলের গোছা সিংহের কেশরের মত নামতে নামতে একেবারে বুক পর্যন্ত নেমে গেছে।

গাছগাছালির ছায়ায় ঢাকা চিবোলোর হ্রদের নির্জন-নিরালা পাড়ে বসলে তার হিংস্র নীলাভ চোখ দুটো আজও জীবনের গভীর তিক্ততায় কেমন যেন অনবরত জ্বালা করতে থাকে। কিন্তু সত্যি করে বলতে কি জীবনের এ তিক্ততার কোন বাহ্যিক কারণ তার জানা ছিল না, সে নিজেও বহুভেবে কোন কারণ খুঁজে পায় নি।

তবে তার এ তিক্ততার কারণ যে একেবারেই নেই এমন কথা বলা যায় না। কি সে কারণ? কারণটা হচ্ছে, তার একমাত্র ছেলে রান্‌সম শত্রুপক্ষের একমাত্র জীবিত বংশধর একটা যুবতী কার্টিস মেয়েকে বিয়ে করার জন্য জেদ ধরেছে। তাদের গোপন প্রেম যে এতদূর গড়িয়েছে তা ট্রুয়েস্‌ডেল ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে নি। এটাই তার অশান্তির একমাত্র কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ট্রুয়েস্‌ডেল-এর অশান্তির কথা এখন বাদ দেওয়া যাক। এখন খামারে একমাত্র যে শব্দটা আসছে সেটা সম্বন্ধে একটু-আধটু খোঁজ খবর নেওয়া যাক। জানা গেল, সেটা ফলের রস গিলবার গম্ভীর আওয়াজ আর গরু দাগানোর টিনের পাতের কর্কশ আওয়াজ। আর সে সঙ্গে যোগ দিয়েছে, ঘাস খেতে খেতে টাট্টুঘোড়া বার বার পিছনের দিকে লাথি হাঁকার শব্দ। আর খোয়াড়-রক্ষক সাম্‌রেডেল-এর গুন গুন স্বরে করুণ সুরে গানের সুর তো আছেই।

দিনের শেষে বিদায়ী সূর্যটা পশ্চিম আকাশের গায়ে ঘণ্টা কয়েকের জন্য ডুব দিল। প্রকৃতির কোলে দেখা দিল আলো-আঁধারীর খেল। তারপরই একটু একটু করে রাতের অন্ধকার নেমে এল খামারবাড়ি, খামার, নদীর তীরবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে।

গরু-দাগানেরা অনেক আগেই কাজ সেরে যে, যার ঘরে ফিরে গেছে।

কয়েকজন খামার-কর্মী মালগাড়ির ওপরে উঠে একটা বেশ বড়সড় ত্রিপলের ঢাকনাটা খুলে গাড়ির মালপত্র আচ্ছা করে ঢেকে দিল। তারপর কম্বলগুলো আর ছ'জোড়া হাত-বস্তা টেনে হিঁচড়ে গাড়ির ওপর তুলতে আরম্ভ করল।

খামারের মালিক 'রানসম'কে সবাই 'রান্‌সের' সম্বোধন করে। খামার-কর্মীদের কথাবার্তার মাধ্যমে কার্লে এটা আবিষ্কার করতে পারল।

হঠাৎ রান্‌সের-এর হাতে শক্ত কিছু আটকে যাওয়া সে ভয়ঙ্কর এক বস্তু টেনে তুলে নিল।সেটা একটা বড়সড় চামড়ার গোছা, কাদা-মাখানো। টন সুতো আর মোটা তার দিয়ে আচ্ছা করে জড়িয়ে বাঁধা। তার ভেতর থেকে বার বার উঁকি দিচ্ছে বিরক্ত একটা কচ্ছপের মাথার মত একটা মানুষের পায়ের আঙুল—বুড়ো আঙুলের ডগা।

অনুসন্ধিৎ নজরে সেটা সম্বন্ধে আঁচ করে নেবার জন্য সে কয়েক মুহূর্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করল। পরমুহূর্তেই সে বিকট আর্তনাদ করে উঠল—আরে ব্বাস! এ আবার কী! হ্যাঁ, মানুষের পায়ের আঙুলই তো বটে।

রান্‌সের এবার ঘাড় ঘুরিয়ে খামার-কর্মীদের দিকে তাকিয়ে ভয়ার্ত কণ্ঠে চিল্লিয়ে বলল—তোমরা এটা করেছ কী হে?

এক যুবতী-কর্মী বলল—কেন হুজুর? হয়েছে কি?

তোমরা কি গাড়িতে মানুষের লাশ চাপিয়েছ নাকি?

মানুষ? মানুষের লাশ। ভুরু কুঁচকে যুবক-কর্মীটা বলল।

তবে আর বলছি কি? এই যে এটা কি?—মানুষের পায়ের আঙুল ছাড়া এটাকে কি বলবে?

ইতিমধ্যে সে রহস্যজনক বস্তুটা অস্বাভাবিক রকম নড়াচড়া শুরু করে দিল।

রান্‌সের আকস্মিক ভীতিটুকু সামলাতে না পেরে বিকটস্বরে আর্তনাদ করে উঠল। খামার-কর্মী ছুটোছুটি করে এগিয়ে এল।

ইতিমধ্যে আঙুলটার বিপরীত দিকের গর্তের মুখ থেকে সরীসৃপের মত লম্বা ঘুম ভেঙে কার্লি মাথাটা তুলল। শরীরের সর্বশক্তি নিয়োগ করে গর্তটা থেকে বেরিয়ে এল। কোনরকমে উঠে বসল। তারপর পাড় মাতালের মত চোখ পিটপিট করে চারদিকে তাকাতে লাগল। মানুষটা জ্যান্ত বুঝতে পেরে রান্‌সের-এর আত্মায় যেন একটু জল এল। সে সাহস সঞ্চার করে রহস্যজনক লোকটার দিকে তাকিয়ে বেশ একটু কর্কশ স্বরেই বলে উঠল—ওহে সেভারিক বাবুমশাই, আমাদের মালগাড়িতে, মালপত্রের ভেতরে তুমি কোন্ কর্ম করছিলে, জানতে পারি কি?

কার্লি কি জবাব দেবে ভেবে না পেয়ে স্থাবরের মত বসে নীরব চাহনি মেলে তার দিকে তাকিয়ে আগের মত চোখ পিটপিট করতে লাগল।

রান্‌সের এবার কর্কশ গলায় গর্জে উঠল—হতচ্ছাড়া! আমাদের খামারে, মালের বস্তার মধ্যে তোমার দরকার কি, খোলসা করে বল?

ইতিমধ্যে গরু দাগানেদের মধ্যে যারা তখনও খামার ছেড়ে যায়নি আর অন্য কয়েকজন খামার-কর্মী ছুটোছুটি করে ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেছে। তারা সবে তামাকের ডিবার মুখ খুলে নিয়ে বসেছিল। সে সব ফেলেই চলে এসেছে।

কার্লি আবার ঘাড় ঘুরিয়ে চারদিকে ঘোলাটে দৃষ্টি ফিরিয়ে পরিস্থিতিটা সম্বন্ধে আঁচ করে নেবার চেষ্টা করল। তার ফ্যাকাসে-বিবর্ণ মুখটা একেবারে চকের মত ফ্যাকাসে হয়ে এল। সে ভুরু দুটো কুঁচকে বলে উঠল—ব্যাপার কি? এটা কোন্ জায়গা? আমি কোথায় এলাম?

হতচ্ছাড়া নচ্ছাড়া কোথাকার! ন্যাকামি করার আর জায়গা পাও নি? আবার বলে কিনা, আমি কোথায় এলাম? রানসের বিশ্রী স্বরে খেঁকিয়ে উঠল।

রান্‌সের-এর কথাগুলো যতই কর্কশ আর তীব্র হোক না কেন, সে সবের একটা বর্ণও তার কানে গেল না।

কার্লি আগের মত চোখের তারায় বিস্ময়ের ছাপ এঁকে বলল—দেখে শুনে তো মনে হচ্ছে, এটা একটা পুরনো খামারবাড়ি। তোমরা কারা? কেনই বা আমাকে এখানে নিয়ে এসেছ?

রান্‌সের নীরবে দাঁত কিড়মিড় করতে লাগল।

কার্লি পূর্ব স্বরেই বলতে লাগল—তোমরা মুখবুজে থেকো না। বল, তোমরা আমাকে এখানে নিয়ে এসেছ কেন? আমাকে এখানে নিয়ে আসার জন্য আমি কি তোমাদের অনুরোধ করেছিলাম? চুপ করে থেকো না। শীঘ্র বল, আমি তোমাদের বলেছিলাম? দেখ, দেরী করলে আমি কিন্তু তোমাদের মুখই জাগিয়ে দেব। বল—আমি বলেছিলাম?

বাজে কথা রাখ? ধানাইপানাই ছেড়ে সত্যি করে বল, আমাদের গাড়িতে, মালপত্রের মাঝখানে তুমি এলে কেমন করে?

কর্কশ গলায় ধমক মেরে কার্লি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চুপ্‌টি করে বসে রইল। মুখই খুলল না।

রান্‌সে এবার বলল—শোন অনিমন্ত্রিত অতিথি আমাদের সঙ্গে যখন জুটেই গেছ তখন এক কাজ কর—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই কার্লি ক্ষীণকণ্ঠে বলে উঠল—কাজ? আমাকে দিয়ে কি কাজ করাতে চাচ্ছ?

সে না হয় পরেই ভাবা যাবে। এখন বলতে চাইছি, আমাদের এখানে, মানে আমাদের দলে যখন ভিড়েই গেছ তখন আমার সঙ্গে চল।

কার্লি আগের মতই চোখ পিট পিট করে তাকাতে লাগল। রান্‌সের এবার বলল—আরে অতিথি বাবাজী, তোমাকে তো আর রাতের অন্ধকারে বনবাদাড়ে ছেড়ে দিতে পারি না। তা ছাড়া মদের নেশায় তুমি এখনও ঝিমোচ্ছ। তোমাকে খামারের বাইরে বের করে দিলে খরগোসই হয়ত ছিঁড়েফেঁড়ে দেবে। চল আমার সঙ্গে।

চার্লিকে সঙ্গে নিয়ে সামান্য এগিয়ে সে একটা সুবিশাল চালাঘরে ঢুকল। সেখানে খামারের গাড়িগুলো জড়ো করে রাখা হয়েছে।

রান্‌সে খামারের এক কর্মীকে দিয়ে ক্যানভাসের একটা খাটিয়া আর একটা মোটা কম্বল আনাল।

সে এবার কার্লিকে লক্ষ্য করে বলল—শোন হে, এখানে তোমার ঘুম আসবে কিনা জানা নেই। তবে ঘুমোতে না পারলেও ভোর না হওয়া পর্যন্ত কোনরকমে এখানে কাটিয়ে দিতে পারবে কি বল?

কার্লি বলল—কোনরকমে বলছেন কী স্যার। এ সুযোগ যে আমার একেবারেই অপ্রত্যাশিত। বলতে পারেন, আমার কাছে এটা রীতিমত সুখশয্যা বিশেষ।

দেখ, তুমি আরামে ঘুমোতে পারলেই যথেষ্ট। আমন্ত্রিত না হলেও তুমি আমাদের কাছে অতিথি তো বটেই।

আপনাদের, মানে আপনার আতিথেয়তায় আমি মুগ্ধ, স্বীকার না করে পারছি না স্যার।

ঠিক আছে। আমি গিয়ে তোমার জন্য খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি। আহারাদি সেরে কম্বল মুড়ি দিয়ে আরামসে একটা ঘুম দাও।

ঘুম! ঘুম আমাকে কবেই ছেড়ে চলে গেছে।

সেকি!

হ্যাঁ, ঠিক তাই। পুরো একটা হপ্তা আমি দু' চোখের পাতা এক করতে পারিনি।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কার্লি এবার বলল—স্যার, একটা কথা বলতে পারি?

কি কথা? তোমার যা কিছু বক্তব্য নির্দ্বিধায় বলতে পার।

স্যার, আপনার কাছে শবাধারে ব্যবহার করার মত পেরেক আছে কি?

রান্‌সে সেদিনই গাড়ি করে এক নাগাড়ে পঞ্চাশ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে খামারে পৌঁছেছে। তারপর এত রাত্রে আবার এমন একটা মাতালের পাল্লায় পড়ে বকবকানি শুনতে হচ্ছে।

বুড়ো কিওয়া ট্রুয়েস্‌ডেল তার প্রিয় বেতের আরাম কেদারায় শরীর এলিয়ে দিয়ে তেলের বাতির আলোয় কিছু জরুরী কাগজ বাছাবাছি করতে ব্যস্ত।

রান্‌সে ঘরে ঢুকে মুচকি হেসে অল্প কথার মাধ্যমে বাবার কুশল সংবাদ জেনে নিল। এবার শহর থেকে নিয়ে-আসা খবরের কাগজের বান্ডিলটা বাবার সামনে টেবিলে রেখে দিল।

এবার বুড়ো কিওয়া-র প্যাঁচাল শুরু হল। সে হাতের কাগজটা টেবিলে নামিয়ে রেখে বলল—বুঝলি রান্‌সে, আজ সারাটা দিন ধরে একটা কথাই বার বার আমার মনে হয়েছে। কথাটা আমি আগেও কয়েকবারই তোকে বলেছি, আজও আর একবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাচ্ছি।

কি কথা? কোন্ কথাটা বাবা?

শোন রানসে, আমি সারাটা জীবন ধরে যা কিছু করেছি, সবই তোর জন্য।

তা কি আমি অস্বীকার করেছি বাবা? কেন তুমি—

ছেলেকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই বুড়ো কিওয়া আবার বলতে শুরু করল। তোর মঙ্গলের কথা বিবেচনা করেই আমি দুঃসাহসের ওপর ভর করে বাঘ-সিংহের সঙ্গে লড়াই করেছি। হিংস্র আদিবাসীদের বিষ-মাখা তীরকে অগ্রাহ্য করে লড়াই করেছি দিনের পর দিন। আর? সাদা চামড়ার মানুষের সঙ্গেও লড়াই করতে এতটুকুও দ্বিধা করিনি।

রান্‌সে ভেতরে ভেতরে একটু বিরক্ত হয়েই বলল—বাবা, এত রাত্রে কেন মিছামিছি এসব কথা ভেবে নিজের মনকে বিষিয়ে তুলছেন। এখন ঘুমোতে যাও।

না, রান্‌সে। আমাকে সবকিছু বলতে দাও। বাধা দিও না। হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম—স্মৃতির পটে এঁকে রাখার মত একটা মা তোর। তোকে আমিই বন্দুক চালাতে শিখিয়েছি, শিখিয়েছি উল্কার বেগে ঘোড়া ছোটাতে আর আমিই শিখিয়েছি কিভাবে সৎপথে ভদ্র জীবন যাপন করা যায়, শেখালাম।

কিন্তু বাবা এখন হঠাৎ এসব কথা—

ছেলের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বুড়ো কিওয়া আবার সরব হল—আরও আছে। ধৈর্য ধর,

পরবর্তীকালে কঠিন—কঠোর পরিশ্রম করে আমি ডলারের পর ডলার জমিয়ে রীতিমত একটা পাহাড় সৃষ্টি করেছি। কার জন্য? সবই তোরই জন্য। আমি চোখ বুজলে তুই একজন ধনুকবের-এ পরিণতি হয়ে যাবি। আমি নিজে হাতে তোকে তিল তিল করে মানুষ করেছি, রান্‌সে। চিতাবাঘ যেমন খুবই যত্ন করে তার বাচ্চাকে বড় করে তোলে, আমিও তেমনই তোকে কোলে-পিঠে করে লালন পালন করেছি। সমাজের বুকে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার মত দৈহিক বল, বিদ্যা-বুদ্ধি আর বিত্তসম্পদ সবই আমি নিজেকে উজাড় করে তোকে দিয়েছি, দেইনি?

—কিন্তু বাবা!

এবার আসল কথা শোন বাছা, বুড়ো বাবার কথাটা মনে রাখবি, তুই কিন্তু তোর একার নয়। কেবলমাত্র নিজেকে নিয়ে, নিজের সুখ-শান্তি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলে তো তোর চলবে না বাছা। তোকে সবার আগে একজন নির্ভেজাল—একদম খাঁটি একজন ট্রুয়েস্‌ডেল হতে হবে। এ পরিবারের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাভাজন, সম্মান রক্ষার একজন নির্ভীক ও নিষ্ঠাবান ব্রতী হতে হবে তোকে।

রান্‌সে এতক্ষণে নিঃসন্দেহ হল তার বাবা এত রাত্রে এসব কথা কেন বলছে।

বুড়ো কিওয়া এবার মোক্ষম অস্ত্রটা হানল—একটা কথা আমাকে সাফ সাফ শুনতে হবে। সত্যি করে বলবে, তুই কি এখনও সেই কার্টিস মেয়েটার পিছনে এখনও ঘুর ঘুর করছিস?

রান্‌সে নীরবে ভাবতে লাগল, এত রাত্রে বাবার এমন একটা প্রশ্নের কি জবাব দেবে।

বুড়ো কিওনা এবার কণ্ঠস্বরে বেশ একটু উষ্মা প্রকাশ করেই বলল—কি হল? মুখে একেবারে কুলুপ এঁটে দিলি যে! আমার কথার জবাব দে রান্‌সে।

রান্‌সে শান্ত গলায়ই বলল—বাবা আমি তোমাকে আবারও বলছি, যেহেতু আমি মনে-প্রাণে একজন ট্রুয়েস্‌ডেল, আর যেহেতু তুমি আমার জন্মদাতা, তাই আমি মোটেই কার্টিসকে বিয়ে করছি না।

বাছা, তুই আমার বংশের উপযুক্ত ছেলেই বটে। অনেক রাত হয়ে গেছে, খেয়েদেয়ে শুয়ে পড় গে।

পরিচারক পেড্রো খাবার দিয়ে গেল। রান্‌সে তাকে বলল—শোন, গাড়ির চালাঘরে খাটিয়ার ওপর এক ছন্নছাড়া ভবঘুরে শুয়ে আছে তাকে বেশী করে, অন্তত দু'জনের মত খাবার দিয়ে আয়।

পেড্রো চলে গেলে রান্‌সে ঘোড়াশালে গিয়ে বেছে বেছে একটা তেজী ঘোড়া নিল। সেটাকে বাইরে নিয়ে এসে পিঠে চেপে বসল। সে এবার খোঁয়াড়ে হাজির হল।

খোঁয়াড়ে দরজায় বসে স্যাম আপন মনে গিটার বাজিয়ে চলেছে। সেখানে মুহূর্তের জন্য ঘোড়াটা দাঁড় করিয়ে তারপর জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। পূবদিকে আট মাইল পথ পাড়ি দিয়ে রান্‌সে বড় ও ঝাঁকড়া একটা গাছের তলায় ঘোড়া দাঁড় করাল। আকাশের গায়ে রূপালী চাঁদটা আলতোভাবে দুলছে। কাছেই একটা ঝোপের পাশে গোটা পাঁচেক খরগোস বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে পরম আনন্দে খেলায় মেতেছে।

রান্‌সে আরও মাইল আটেক দূরের ওমমোস খামারের আলো দেখতে পেল।

মিনিট দশেকের মধ্যেই ইয়েনা কার্টিসও ঘোড়ার পিঠে চেপে সে গাছতলায়, রান্‌সের কাছে এল।

তারা উভয়ে পরস্পরের দিকে সামান্য ঝুঁকে একে অন্যের হাত চেপে ধরে পরম আদরে মৃদু মৃদু চাপ দিতে লাগল।

রান্‌সে বলল—আমি কিন্তু তোমাদের খামার বাড়ির আরও কাছে যাব ভেবেছিলাম। কিন্তু তুমি তো কিছুতেই এতে মত দাও না।

ইয়েনা খিল খিল করে হেসে উঠল। সে বাড়ি থেকে আট মাইল রাস্তা ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছে তার প্রাণ পুরুষ রান্‌সেকে একটাবারের জন্য শুধু চোখের দেখা দেখতে।

ইয়েনা তার প্রেমিকের হাতটা ধরে আবেগ-মধুর স্বরে বলল—রান্‌সে, তোমাকে তো বহুবারই বলেছি, আমি তোমার অর্ধপথের মেয়ে, বলি নি? আর সর্বদা অর্ধপথেই আমি থাকব।

তবে?

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ইয়েনা এবার বলল—আমি তো তা-ই করেছি প্রিয়তম? তোমার সঙ্গে

অর্ধপথেই আমি দেখা করেছি, ঠিক কিনা? নৈশভোজের পরই তার কাছে কথাটা পাড়লাম। কারণ, এ সময়েই তার মেজাজ খুবই চাঙা থাকে।

মুহূর্তের জন্য থেমে সে আবার মুখ খুলল—রান্‌সে, তুমি কি কোনদিন ভুল করে বিড়ালছানা ভেবে কোন সিংহের ঘুম ভাঙিয়েছ? সে যেন গোটা খামার বাড়িটাকে ভেঙেচুড়ে একেবারে একসাড় করে দিয়েছে। আর কি, এখানেই যবনিকা পতন।

তার কথার তাৎপর্য বুঝতে না পেরে রান্‌সে ফ্যালফ্যাল করে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

ইয়েনা কিন্তু থামল না। সে বলেই চলল—রান্‌সে, আমি বাবাকে বড্ড ভালবাসি। সে সঙ্গে ভয়ও কম করি না। সত্যি খুব ভয় করি।

খুবই স্বাভাবিক কথা। বাবাকে ভালবাসাটাই তো স্বাভাবিক। তিনি আমাকে দিয়ে শপথ করিয়ে নিয়েছেন—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই রেন্‌সে বলে উঠল—কি বললে, শপথ? কি শপথ করিয়ে নিয়েছেন?

আমাকে দিয়ে তিনি শপথ করিয়ে নিয়েছেন, আমি যেন কখনও ট্রুয়েস্‌ডেল-পরিবারের কাউকে বিয়ে না করি। তোমার বরাতটা কেমন, বল তো?

আমার কথাও একই, মানে একই রকম। শুকনো গলায় রান্‌সে বলল—আমিও বাবাকে কথা দিয়েছি তাঁর ছেলে কোনদিন একজন কার্টিস-পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে আনবে না।

ইয়েনা প্রেমিকের রান্‌সে-র হাতটা নিজের হাতের মুঠোয় রেখে বলল—প্রিয়তম, আমি ভুলেও কোনদিন ভাবেনি যে, আমাকে তুমি ছেড়ে গেছ বলেই তোমাকে আমি আরও বেশী করে কাছে পাব। কিন্তু এবার যে আমাকে বিদায় নিতে হচ্ছে। বাড়ি থেকে লুকিয়ে তোমার কাছে এসেছি। বিদায়—বিদায় রান্‌সে!

দু'জন দু'দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

ইয়েনে ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে বসেই মুখটা ঘুরিয়ে বলল—রান্‌সে, ভুলে যেয়ো না যেন, আমি তোমার অর্ধপথের সঙ্গিনী।

ধ্যুৎ! জাহান্নামে যাক ওসব পারিবারিক বিবাদ বিসম্বাদ আর উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যত্তসব চিন্তা-ভাবনা।

রান্‌সে নিজে ঘরে গিয়ে ঢুকল। ব্যস্ত-পায়ে এগিয়ে গিয়ে আলমারি খুলে একটা চিঠির গোছা বের করে আনল। মিসিসিপিতে বেড়াতে গিয়ে ইয়েনা তাকে এগুলো শিখিয়েছিল। তার ভেতর থেকে একটা চিঠি বের করে আলোর কাছে নিয়ে বার দুই চিঠিটা পড়ল। তারপর সেটাকে কোটের পকেটে চালান দিয়ে ছিল।

আলনার হুক থেকে টুপিটা টেনে নিয়ে রান্‌সে মাথায় চাপিয়ে সন্তর্পণে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

এবার হাঁটতে হাঁটতে একটা মেক্সিকান বস্তিবাড়িতে হাজির হল।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রান্‌সে বলল—টিয়া জুয়ানা, একটা জরুরী কথা বলার জন্য এত রাত্রে তোমাকে বিরক্ত করতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত।

পাকা চুল আর তোবড়ানো মুখ নাড়িয়ে এক অতিবৃদ্ধ বলল—তুমি কে গো বাছা? আলো উস্কে দিয়ে এবার রান্‌সের মুখের দিকে ঝুঁকে বৃদ্ধা বলল—এবার চিনতে পেরেছি। ডন রান্‌সে। আমাদের পুরনো বন্ধু আর মালিক।

হাতের আলোটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বৃদ্ধা টিয়া জুয়েনা এবার বলল—চিবোলো খামারে আমি বত্রিশটা বছর কাটিয়েছি। আমি ভেবেই নিলাম, সব কথা জানাজানি হবার আগেই আমি বাগানের মায়া কাটিয়ে কবরে চলে যাব।

বৃদ্ধা এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিয়ে এবার বলল—এক কাজ করত বাছা, দরজাটা বন্ধ করে দাও। তোমাকে সব কথা আজ খোলাখুলিই বলব। তোমার মুখই বলে দিচ্ছে, তুমি সবই জেনে ফেলেছ।

রান্‌সে টিয়া জুয়ানা-র বন্ধ ঘরে পুরো একটা ঘণ্টা কাটাল।

রান্‌সে যখন টিয়া জুয়ানার বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাড়ির দিকে চলেছে তখন পথের মাঝের

চালা-ঘর থেকে কার্লি তাকে ডাকল।

রান্‌সে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে চালা-ঘরের দরজায় হাজির হল।

ছন্নছাড়া ভবঘুরে কার্লি খাটিয়ার ওপর কম্বল জড়িয়ে বসে পরম আনন্দে চুরুট টানছে।

রান্‌সে এগিয়ে গিয়ে তার খাটিয়াটার কাছে দাঁড়াল। কার্লি রীতিমত খেঁকিয়ে উঠল—তোমার ব্যাপারটা কি বল তো ভায়া।

রান্‌সে নবাগত অতিথির মুখে আচমকা এরকম প্রশ্ন শুনে রীতিমত হকচকিয়ে গেল। তার মুখের দিকে নীরব চাহনি মেলে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। টু-শব্দটিও করতে পারল না।

কার্লি আগের মতই খেঁকিয়ে উঠল—তুমি খোলসা করে বল তো, একটা ভদ্রলোককে আদর করে তুলে এনে এরকম ব্যবহার করা কি তোমার পক্ষে উচিত হয়েছে?

রান্‌সে নিতান্ত অপরাধীর মত আমতা আমতা করে বলল—কি? হয়েছে কি, তা-তো বলবে?

আমি খোয়াড়ে গিয়ে একটা ক্ষুর জোগাড়, মানে ধার করে এনে দাড়িটা কাটিয়ে নিয়েছি। তোমার কি এ খেয়ালটুকুও ছিল না?

ম্লান হেসে রান্‌সে বলল—এ তো ভালই করেছ।

সে না হয় হল। কিন্তু একটা মানুষের কি আর কিছুই দরকার হয় না? ওই যে তোমার হাতের আঙুলগুলো আছে তাদের মধ্য থেকে তিন আঙুল কি আরও বেশী করে ফাঁক করতে পার না?

মানে? ঠিক বুঝতে পারলাম না তো।

একটু চেষ্টা কর, মাথা খাটাও, দেখবে সবই খোলসা হয়ে যাবে। দেখ, কথাটা তো খুবই সত্যি যে, আমি নিজের ইচ্ছায়, মানে সাধ করে তোমার অতিথি হয়ে এ চালাঘরটায় এসে মাথা গুঁজি নি।

মানে—মানে—। রান্‌সে আমতা আমতা করতে লাগল।

কার্লি আরও জোরে খেঁকিয়ে উঠল—রাখ তোমার মানেটানে! ওই গুদাম-ঘর থেকে রীতিমত আপ্যায়ন করে তুমি এ চালাঘরটায় আমাকে এনে তুলেছ, মিথ্যে বলেছি?

রান্‌সে নীরবে ভবঘুরে অতিথির দিকে সামান্য ঝুঁকে আরও ভাল করে লক্ষ্য করল। তারপর বলল—এক কাজ কর তো, এখানে—এই আলোয় একটু দাঁড়াও তো ভায়া।

কার্লি অনুচ্চ কণ্ঠে বিড়বিড় করতে করতে কম্বলটা গা থেকে ফেলে খাটিয়া থেকে উঠে আলোটার দিকে দু'পা এগিয়ে গেল।

রান্‌সে লক্ষ্য করল, তার সদ্য কামানো মুখটা যেন একেবারেই বদলে গেছে। এ যেন কয়েকঘণ্টা আগেকার সে ভবঘুরেটা নয়। যত্ন করে চুল আঁচড়ে একটা চমৎকার ঢেউ তুলে কপালের ডানদিকে উল্টে দিয়েছে। চমৎকার!

কার্লি নীরবে রান্‌সের ব্যাপার-স্যাপার দেখতে লাগল।

এদিকে রান্‌সের চোখের মণি দুটো কার্লির দেহের ওপর অনবরত ঘুরপাক খেতে লাগল। সে লক্ষ্য করল, তার মুখের নেশাখোরের অস্বাভাবিক, বিকৃতভাবটা এখন একেবারেই অনুপস্থিত। সুঠাম দেহ, নাকটা খাড়া, চোখদুটো বড় ও টানা টানা, ছোট চৌকোণা থুৎনিটা তার চেহারায় রীতিমত একটা ভদ্র ভদ্র ভাব এনে দিয়েছে। এ যেন সমাজের ভদ্রলোকদেরই একজন।

রান্‌সে তাকে নিয়ে আবার খাটিয়ায় ফিরে গেল। পাশাপাশি বসাল। কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সে তাকে যত দেখছে ততই যেন অবাক হচ্ছে।

রান্‌সে এবার বলল—যদি কিছু মনে না কর তবে তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, করব?

কার্লি একটু কড়া মেজাজেই জবাব দিল—কি জানতে চাও ঝটপট বলে ফেল।

সত্যি করে বলতো, তুমি কোত্থেকে এসেছ? তোমার কি বাড়িঘর কিছু আছে? আত্মীয়-পরিজন কেউ—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই কার্লি সরবে হেসে বলল—। আমি কোত্থেকে এসেছি, যাবই বা কোথায়? ধ্যুৎ! এতক্ষণ পরে এ কথা জিজ্ঞেস করছ! আরে ভায়া, আমি তো পেরেক দিয়ে গাঁথা দেওয়ালে আটকানো এক টুকরো কাঠ ছাড়া কিছু নয়। সত্যি কথা বলতে কি, আমি তো রোজিল্যান্ড—না, ওসব কথা ছাড়ান দেওয়া যাক।

তোমার পূর্বপুরুষ—

তাকে থামিয়ে দিয়ে কার্লি এবার বলে উঠল—পূর্বপুরুষ হল, আমার পূর্বপুরুষদের কথা কিছুই আমার জানা নেই। তারা কে, কোথায়, কি অবস্থায় ছিল কিছু জানি না।

তার মানে?

মানে একটাই, জ্ঞান হওয়ার পর থেকে আমি ঘরছাড়া। পথহারা এক পথিক। ভবঘুরের জীবন বেছে নিয়ে আজ এখানে, কাল ওখানে হরদম চক্কর মেরে বেড়াচ্ছি।

রান্‌সে প্রায় অস্ফুট উচ্চারণ করল—হুম।

কার্লি পূর্বসরেই বলল—ও সব কথা ছাড়ান দিয়ে মোদ্দা কথাটা বলে ফেল তো বাপু, আজ রাত্রের মতই এখানে সব ব্যবস্থা হবে, নাকি হবে না?

তোমার সব কথার জবাব আমি দেব। আগে আমার কথার জবাব দাও তো বাপু।

কি? কি কথা? ধানাই পানাই না করে ঝটপট বলে ফেল।

তুমি ঘর-বাড়ি ছেড়ে পথে নামলে কেন? সত্যি করে বল তো, কেন ভবঘুরের জীবন বেছে নিয়েছ?

কেন? কেন আমি চিরপথিক হলাম। একটু আগেই বললাম, জ্ঞান হবার পর থেকেই, মানে একদম শিশুকাল থেকেই আমি পথে নেমেছি, বেছে নিয়েছি ভবঘুরের বৃত্তি।

সে তো বুঝলাম, কিন্তু কেন?

মনে করতে পার বাধ্য হয়েই আমি পথকে সম্বল করে দিন গুজরান করছি। ভেবেচিন্তে যেটুকু অস্পষ্ট ছবির মত আমার মনের কোণে ভেসে ওঠে তা হচ্ছে, আমি এক ভাঁড়ের সম্পত্তি।সে ছিল এক কুঁড়ের বাদশা। নিজে সর্বক্ষণ দাওয়ায় বসে পা নাচাত আর আমার কাঁধে ঝুলি তুলে দিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ভিক্ষে করার জন্য পাঠিয়ে দিত।

তখন তোমার বয়স আনুমানিক কত ছিল, মনে পড়ে?

বয়স কত ছিল, বলতে পারব না। তবে এটুকু বলতে পারি, তখনও আমি ছিটকিনি খোলার মত লম্বা হই নি।

বুঝলাম। সে তোমাকে কি বলেছিল, কোথায় আর কিভাবে তোমাকে পেয়েছিল?

হ্যাঁ, একদিন কিছু কিছু বলেছিল বটে।

রান্‌সে অত্যুগ্র আগ্রহ প্রকাশ করে, কার্লির দিকে সামান্য ঝুঁকে বলল—কি? কি বলেছিল? কোথায় কিভাবে পেয়েছিল?

সবই খোলসা করে বলছি—একদিন সে যখন একটু প্রকৃতিস্থ, মানে স্বাভাবিক ছিল তখন সে আমাকে সত্যি কথাটা বলে ফেলেছিল, একটা পুরনো গাদা বন্দুক আর কয়েকটা প্রাচীন মুদ্রার বিনিময়ে এক মেক্সিকান ভেড়ার লোম ছাটাইকারীর কাছ থেকে কিনে নিয়েছিল। ব্যস, এ পর্যন্তই আমি জানি।

মোদ্দা কথা, তুমি নির্ঘাৎ একটা বে-ওয়ারিশ মানব সন্তান।

হ্যাঁ, একদম খাঁটি কথা।

চিবোলো খামারের উল্কি তোমার গায়ে আমি এঁকে দিতে চাচ্ছি।

তাতে ফয়দা কি হবে?

কাল থেকেই তোমাকে কোন একটা গরু-দাগানো শিবিরের কাজে লাগিয়ে দেব ভাবছি।

কাজ! আমাকে কাজে লাগিয়ে দেবে? ধ্যুৎ! তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কথাটা বলেই সে মুখটা অস্বাভাবিক রকম বিকৃত করে আবার বলতে শুরু করল—আমাকে তুমি ভেবেছ কি? জানতে পারি কি? তুমি কি মনে করছ, আমি গরুর পাল নিয়ে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াব আর পাগলা ভেড়াগুলোকে নিয়ে দাপাদাপি করব? এসব কথা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও বাছাধন। আমার সঙ্গে ফেরেকবাজি করার চেষ্টা কোরো না।

তুমি মিছেই ভয় পাচ্ছ ভায়া। বরাত ঠুকে একবার কাজটায় লেগে গেলে দেখবে ব্যাপারটা কোন সমস্যারই নয়। দু-চারদিনেই কাজে মন বসে যাবে, আমার কথা মিলিয়ে নিও।

আমি তোমার কাজ নিলে তো মন বসবে। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কার্লি বলল—ধ্যুৎ! যত্তসব

ধান্দাবাজি মতলব।

শোন, ভোরেই আমি পেড্রোকে বলে দেব, তোমাকে যেন কাজকর্ম বুঝিয়ে দেয়। তোমার সঙ্গে আমার আবার দেখা হবার আগেই গরু-দাগানোর কাজটা যে তুমি ভালভাবে রপ্ত করে নিতে পারবে এতে কোন সন্দেহ আমার নেই।

আমি? গরু-দাগানোর কাজ—ধ্যুৎ! যে গরুগুলোকে দেখাশোনা করার জন্য তুমি চালাকি করে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছ তাদের ওপর আমার অসীম করুণা। আরে, আমার রাতের টুপিটার কথা কিন্তু ভুলে যেও না গুরু।

পরদিন সকালে রান্‌সে ঘোড়ায় চড়ে সান গেব্রিয়েল শিবিরের দিকে যাত্রা করল।

উল্কার বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে সে শিবিরের প্রধান ফটকের সামনে ঘোড়া থেকে নামল। কার্লি তখন কম্বল পেতে বসে আপন মনে খিস্তি খেউড় করে চলেছে। গরু-দাগানো কর্মীরা তাকে আমলও দিচ্ছে না। ধুলোয় তার পোশাক পরিচ্ছদের রঙ পাল্টে গেছে। গায়েও কম ধূলোবালি লেগে নেই।

রান্‌সে সেখান থেকে বেরিয়ে রান্‌সে বাক-এর কাছে গেল। বাক শিবিরের কর্তা তত্ত্বাবধায়ক।

বাক ক্ষুব্ধ স্বরেই বলল—আরে ওটা একটা পুরো দস্তুর বাজপাখি হে। কোন কাজই করতে রাজি নয়, কুড়ের বাদশা।

রান্‌সে ম্লান হেসে বলল—তোমার কথা আমি মেনে নিচ্ছি। তবু—

এ রকম একটা অমানুষ আমি বাপের জন্মেও দেখি নি। না খেয়ে কষ্ট করবে তবু গতর খাটিয়ে রোজগারপাতি করবে না।

গরু-দাগানোর কাজে যদি ওর আপত্তি থাকে—

হ্যাঁ, তা-ও আমি করেছি। গরু-দাগানোর কাজ থেকে সরিয়ে নিয়ে আমি তাকে বাঁধাছাদার কাজ দিয়েছি। আমার বিশ্বাস, ওটাই ওর উপযুক্ত কাজ। আরে, বোলো না, ছেলে ছোকরারা তো তাকে অন্তত ডজনখানেক বার মৃত্যুদণ্ড দিয়েই দিচ্ছিল।

তারপর?

আমি তাদের ধমকে দিয়েছি। বলে দিয়েছি যে, তুমি হয়ত ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলেটাকে যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই দিয়ে সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নির্বাহ করানোর চেষ্টা করছ।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে রান্‌সে বলল—বাক, আমি বুঝছি, তোমার ওপর একটা কঠিন কাজ চাপিয়েছি। তবে এটুকু ভুলে যেয়ো না যেন, বাউণ্ডুলেটাকে আমি যে করেই হোক পথে আনব। তার ভবঘুরে-স্বভাবটাকে মন থেকে মুছে ফেলে এক জায়গায় যাতে থিতু হয় সে ব্যবস্থাও করবই করব। আর এরকম চিন্তা করেই শিবিরে এনে তুলেছি। আর নিজে শিবিবে এসেছি তাকে বুঝিয়ে শুনিযে কাজে লাগিয়ে দেবার জন্য।

বাক-এর সঙ্গে কথা বলে রান্‌সে এবার কার্লির কাছে গেল। কার্লি তখনও খাটিয়াটার ওপর বসে বিড়বিড় করে অনর্গল খিস্তি করে চলেছে।

রান্‌সে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল—ভায়া, এখানে চুপ্‌টি করে বসে না থেকে স্নানটান সেরে নিলে পারতে না।

কার্লি সবিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে বলল—স্নান? কেন মিছিমিছি জলটল গায়ে ঢালতে যাব?

আরে ভায়া, তুমি কি বুঝছ না, একবার ভাল করে স্নান করে নিলেই তুমি সভ্য-সমাজে পাতা পাতবার যোগ্য হয়ে উঠবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলে তো নিজের মনটাও প্রফুল্ল থাকে।

কার্লি রসিকতার স্বরে বলল—বাপধন, মানে মানে কেটে পড়তো। আমার সাফ কথা শুনে নাও, এখানে ডাল গলবে না।

রান্‌সে-ও অনুরূপ হেসে বলল—আরে ভায়া, ডাল গলে কিনা সেটা চেষ্টা করে তো দেখতে হবে।

চালিয়ে যাও, জোরসে চেষ্টা চালিয়ে যাও। তবে কার্লি যখন একবার জলের টবের কথা ভেবেছে তখন একজন নার্সকে অবশ্যই সে তলব করবে, জেনে রাখ।

চালঘর থেকে মাত্র বারো গজ দূরে জলের ডোবাটা রয়েছে। ধরতে গেলে রান্‌সে তার অতিথি কার্লেকে নিয়ে গেল। গজ তিনেক দূর থেকে রান্‌সে তার একটা ঠ্যাং ধরে তাকে টেনে হিঁচড়ে

আলুর বস্তার মত জলের ডোবাটার কাছে একেবারে ধারে নিয়ে গেল। তারপর শরীরের সবটুকু নিঙড়ে দাঁতে দাঁত চেপে সজোরে এক ধাক্কা মেরে তাকে জলের ডোবাটায় ফেলে দিল।

ডোবাটায় পড়ে কার্লি সমুদ্রের বুকের একটা শুশুকের মত বার বার ডুবতে আর ভাসতে লাগল। সে সঙ্গে থেকে থেকে বার বার আর্ত চিৎকার চালিয়ে যাচ্ছে।

কার্লি কোন রকমে ডোবাটার পাড়ের কাছাকাছি এনে রান্‌সে একটা সাবান আর খোসা তার হাতে দিয়ে বলল—ওই দিকে গিয়ে এগুলোর সদ্ব্যবহার করে এসো। এখানকার কাজ সেরে মালগাড়ির চালায় ফিরে গেলে বাক তোমাকে নতুন পোষাক-আষাক দেবে। একেবারে ফুলবাবু বনে যাবে।

ভবঘুরে কার্লি আর প্রতিবাদ না করে তার আদেশ মতই কাজ করল। নীল শার্ট আর বাদামী পোষাকে সে রীতিমত এক কেতাদুরস্ত যুবকে পরিণত হয়ে গেল।

রান্‌সে কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে কার্লিকে একজন ফুলবাবুর মত দেখে আনন্দিতই হল।

সে উল্লসিত হয়ে বলল—হে প্রভু, আশা করি সে একজন ভীরু প্রকৃতির হবে না। আমি অনেক আশা নিয়ে কাজে নেমেছি। তাকে যেন তুমি ভীরু কাপুরুষ বানিয়ে দিও না।

কার্লি কয়েক পা এগিয়ে এসে রান্‌সের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজের পোষাক পরিচ্ছদের ওপর একবারটি চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল—কি হে ভায়া একেবারে সাফসুতরা হয়ে পড়েছি, কি বল? আশা করি, এবার থেকে তুমি আমার সঙ্গে বন্ধুর মত কথাবার্তা বলবে, কি বল?

আমি এটাই চেয়েছিলাম, তুমি অন্য দশজন মানুষের মত স্বাভাবিক জীবন যাপন কর।

তারপর রান্‌সে একটা মাস সান গেব্রিয়েল শিবিরে থেকে গেল কার্লি নামক ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলে যুবকটার মধ্য থেকে ভবঘুরে প্রকৃতিটাকে মুছে দিয়ে তাকে স্বাভাবিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত করে তোলার জন্য।

রান্‌সে যে পদ্ধতি অনুসরণ করে এমন একটা অসাধ্য কাজকে বাস্তব রূপ দিয়েছিল তার বিস্তারিত বিবরণ দিতে পারলে বহু শিক্ষাবিদ উপকৃত হতেন, সন্দেহ নেই।

সত্যি কথা বলতে কি কার্লের মনোভাবের পরিবর্তন সাধন করতে রান্‌সেকে সূক্ষ্ম মতবাদকে কার্যে রূপায়িত করতে হয়নি। সে হয়ত বা তার পৈত্রিক ধর্মের প্রতি আস্থা এবং বেয়াড়া ঘোড়াকে বাগ মানাবার কৌশল আর অতুলনীয় ধৈর্য সম্বল করেই সে অসাধ্য সাধন করতে সক্ষম হয়।

গরু-দাগানোর লোকগুলো দেখল, তাদের মনিব একটা অপরিচিত জন্তুকে বশে আনার জন্য সাধ্যাতীত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। ক'দিনের মধ্যেই তারাও তার সহকারীতে পরিণত হয়ে গেল।

রান্‌সে লক্ষ্য করল কার্লিকে শিক্ষাদানের প্রথমার্ধ নির্বিঘ্নেই সে সম্পন্ন করতে পেরেছে।

সাবান আর জলের সঙ্গে কার্লির বন্ধুত্ব ক্রমে ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠেছে।

কার্লি একদিন একটা হুইস্কির বোতল পুরোটা গলায় ঢেলে ষোল ঘণ্টা ঘাসের বিছানার ওপর বে-হুঁশ হয়ে কাটিয়ে দিল। হুইস্কির বোতলটা ঝুমঝুমি সাপের কামড়ের প্রতিষেধক হিসাবে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল।

কাজটাকে গরু-দাগানোর লোকগুলো খুব অসন্তুষ্ট হল। তারা তার হাল্কা শাস্তি বিধানও করল। কার্লির প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ছাড়া তারা তার সঙ্গে স্বেচ্ছায় একটা কথাও বলল না।

ক'দিনের মধ্যেই সে কালরাত্রি এল। আর এল উত্তরে হিমেল বাতাস আর তুষারপাত সঙ্গে করে নিয়ে এল, সে সঙ্গে বৃষ্টিপাত তো রইলই।

গরু-দাগানোদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়স্ক উইলসন। সে জ্বরে পড়ে দু'দিন-দু'রাত্রি শুয়ে কাটিয়ে দিল।

সকালে জো যখন প্রাতরাশের জন্য বিছানা ছেড়ে উঠে এল তখন দেখল কার্লি একটা ময়লাটানা মালগাড়ির চাকায় হেলান দিয়ে নাক-ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। তার গায়ে একটামাত্র জিনের কম্বল। আর সবগুলো কম্বল উলিসন-এর গায়ে চাপিয়ে দিয়েছে হিমেল হাওয়া আর বৃষ্টি থেকে তাকে রক্ষা করার জন্য। তারপর তিন-তিনটে রাত্রি কাটানোর পর কার্লি শীতের সঙ্গে মোকাবেলা করার জন্য নিজের কম্বল গায়ে দিয়ে ঘুমলো।

এবার থেকে কার্লি নিজের থেকে গরু-দাগানোর ছেলেগুলোর সঙ্গে আন্তরিকভাবে মেলামেশা

শুরু করে দিল। আর ক'দিনের মধ্যেই সে নিজেকে শিবিরের কর্মীদের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে দিল।

তিন সপ্তাহ পরে রান্‌সে খান গেব্রিয়েল শিবির থেকে বার-এর খামারবাড়িতে হাজির হ'ল।

ঘোড়া থেকে নেমেই রান্‌সে জিজ্ঞাসা করল—ওই ঘোড়সওয়ারটা কোথায়?

ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে একজন বলল—বেশী দূরে নয়। হাত বাড়ালেই তাকে পেয়ে যাবেন। আর তার চেয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কর্মী আজকাল অন্য কোন শিবিরে নেই, বিশ্বাস করুন।

রান্‌সে এবার ঘাড়-ঘুরিয়ে একজন ছিমছাম পোশাকধারী গরু-দাগানো কর্মীকে দেখতে পেল। স্বগতোক্তি করল—আরে, এ কী আগেকার সেই কার্লি।

রান্‌সে কার্লির দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিল। ঘোড়া পোষা মানানো কাঠের মত শক্ত হাত দিয়ে কার্লি রান্‌সের হাতটা মুঠো করে ধরল।

রান্‌সে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলে বলল—কার্লি, তোমাকে আমি খামার-বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইছি, আপত্তি আছে?

এ-তো আমার কাছে দারুণ খুশীর ব্যাপার। তবে একটা শর্ত—

শর্ত? কি সেই শর্ত?

আমি আবার এখানে আসব, মানে ফেরৎ পাঠাতে হবে। আসলে এখানকার মানুষগুলোর সঙ্গে আমি নিজেকে মিশিয়ে নিতেও পেরেছি, এখানকার গরু-দাগানোর কর্মীরাও আমাকে ভালবেসে কাছে টেনে নিয়েছে।

রান্‌সে কার্লিকে নিয়ে চিবোলো খামার-বাড়িতে পৌঁছল। উভয়ে ঘোড়া থেকে নামল।

কার্লিকে দরজার কাছে দাঁড় করিয়ে রেখে রান্‌সে ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল। বুড়ো কিওয়া ট্রুয়েস্‌ডেল আপন মনে খবরের কাগজের ওপর চোখ বুলিয়ে চলেছে।

রান্‌সেকে দেখে বুড়ো কিওয়া বল্‌ল—তোমার খবর কি? তার হাতের কাগজটা থরথর করে কাঁপতে লাগল।

কিওয়া বলল—বাছা, তুমি সবকিছু কিভাবে জানলে, বলতো?

দেখ বাবা, টিয়া জুয়ানার মুখে আমি সব শুনেছি। ও ব্যাপারটা নিয়ে ভাববার কিছুই নেই। মনে করতে পার, ওটা নিছকই একটা দুর্ঘটনামাত্র।

আমি বাছা, তুমি তো আমার কাছে নিজের ছেলের মতই ছিলে।

সবই জানতে পেরেছি বাবা। তুমি আমাকে কিভাবে পোষ্যপুত্র নিয়েছিলে সবই বলেছে। আর তা নিয়েছিলে পশ্চিমযাত্রী একদল শিকারীর কাছ থেকে, তাও তার মুখ থেকেই শুনেছি।

বুড়ো কিওয়া কি বলবে ভেবে না পেয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

রান্‌সে বলে চলল—টিয়া জুয়ানা আমাকে এ-ও বলেছে, ছোট্ট ছেলেটা কিভাবে—তোমার তো আর অজানা নয়। তোমারই ছোট্ট ছেলে পালিয়ে গিয়েছিল বা হারিয়ে গিয়েছিল, তাই না?

বুড়ো কিওনা নীরবে ঘাড় কাৎ করল।

রান্‌সে বলে চলল—ছোট্ট ছেলেটা যেদিন নিখোঁজ হয়ে যায় সেদিনই ভেড়ার লোম-ছাঁটাইয়ের গাড়ি করে খামার-বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিল।

দু' বছর বয়সকালে আমার সে ছেলেটা বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল। ঠিক তখনই একদল বিদেশী মালগাড়ি চেপে এখানে এসে হাজির হয়েছিল।

তারপর? তারপর?

তাদের দলে ছিল অবাঞ্ছিত একটা শিশু। তাদের কাছ থেকে সে শিশুটাকে, মানে তোমাকে পেলাম। রান্‌সে এসব কথা তুমি জানতে পার এটা কোনদিনই আমার ইচ্ছা ছিল না। তারপর থেকে আমার সে হারিয়ে-যাওয়া শিশুটার আর কোনই হদিস পাই নি।

রান্‌সে পিছন ফিরে দরজার বাইরে অপেক্ষমান কার্লেকে ইশারা করে ঘরে যেতে বলল।

তারপর বুড়ো কিওয়ার দিকে ফিরে রান্‌সে বলল—দেখুন, আমার যদি মারাত্মক ভুল না

হয়ে থাকে তবে সে এক্ষণি ঘরে ঢুকছে।

কার্লি ঘরে ঢুকল। বুড়ো কার্লি তার মুখের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

না, সন্দেহ করার মত তিলমাত্র অবকাশও রইল না।

বুড়ো কিওয়া তাকিয়ে দেখতে লাগল, আগন্তুক যুবকটার মাথার চুলগুলোর সঙ্গে তার নিজের চুলের হুবহু সাদৃশ্য রয়েছে। থুৎনি, নাক, চোখ আর মুখের আদলও যেন অবিকল একই রকম। এমন কি উভয়ের চোখের মণি দুটোও নীলাভ।

বুড়ো কিওয়া যেন হঠাৎ শরীরে হাতির বল পেয়ে গেল। সে যন্ত্র চেয়ার ছেড়ে যন্ত্রচালিতের মত এক লাফে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কার্লি চোখের তারায় বিস্ময়ের ছাপ এঁকে মুহূর্তকাল বুড়ো কিওয়ার মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে ঘরের সর্বত্র চোখ বুলাতে লাগল।

বুড়ো কিওয়া চেয়ার ছেড়ে ওঠামাত্র কার্লি খালি-দেওয়ালটার ওপর চোখ বুলাতে বুলাতে বলল—আমাদের সে টক্-টক্ ঘড়িটা গেল কোথায়?

বুড়ো কিওয়া প্রায় চিৎকার করে উঠল—ঘড়ি? ঘড়িটা? হ্যাঁ, দীর্ঘদিন একটা অষ্টম-দিবাসিক ঘড়ি ওই দেওয়ালটায় টাঙানো থাকত বটে! কিন্তু—কিন্তু তুমি সেটা জানলে কী করে। অস্থিরচিত্ত বুড়ো কিওয়া ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে রানসে সেখানে নেই।

কার্লি ঘবে ঢোকামাত্র বান্‌সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। এতক্ষণে কার্লি তার তেজী ঘোড়াটার পিঠে চেপে পূব দিকে অলমোস খামার-বাড়ির পথে অনেকটা পথ পাড়ি দিয়ে দিয়েছে।

এ মিডসামার মাসক্যুয়েরাড

পিটার্স কথার ফাঁকে বিতৃষ্ণার সঙ্গে বলে উঠল—শয়তান—শয়তান বড় শক্ত মনিব, তার সঙ্গে কাজ করা বড়ই কঠিন সমস্যা।

অন্য সবাই যখন ছুটি উপভোগ করবে সে তখন তোমাকে সবচেয়ে বেশী খাটিয়ে হাড়-মাস আল্‌গা করে ছাড়বে।

সেন্ট পল, বৃদ্ধ ডাঃ ওয়াটস অথবা অন্য যেকোন রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ক বললেন—তার বরাতটাও ভাল বলতেই হবে, সে কোন না কোন একজন বেকার লোককে হাতের কাছে পেয়েও যায়।

এবার আমার মনে পড়েছে, গরমের সময়ে একদিন আমার কারবারের অংশীদার অ্যান্ডি টাকার আর আমি নিজেদের কাজকর্ম ছেড়েছুড়ে দিয়ে অবসর নেবার চেষ্টা করছিলাম।

বরাত! একেই বলে বরাত। নইলে যখন, যেখানেই যাই না কেন কাজ আমাদের পিছন ছাড়ে না বরং এঁটুলির মত আমাদের সঙ্গে সেঁটে থাকে।

তবে এ-ও সত্যি যে, একজন প্রচারকের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্যরকম। প্রচারক ঘাড় থেকে যাবতীয় ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মজা লুটতে পারেন, শতকরা একশ' ভাগ সত্যি কথা।

প্রচারক সে মাসের একত্রিশ তারিখে গীর্জার চারদিকটা পাতলা পাত আর মশারীর জাল দিয়ে ঘিরে রেখে নিজের মাছ ধরার ছিপ বা গল্‌ফ্ খেলার ছড়ি নিয়ে আটলান্টিক শহরের রাস্তায় বা কোন এক হ্রদের ধারে চলে যেতে পারেন।

মাছ ধরে বা গল্‌ফের মাঠে তিনটে মাস তিনি অনায়াসে কাটিয়ে দিতে পারবেন। নিজের কাজকর্মের কথা মনে না থাকলেও বিন্দুমাত্রও আপত্তি নেই।

আমি যে-কথা বলতে বলতে বাঁক ঘুরে গিয়ে অন্যের কথা পেড়ে বসলাম—অ্যান্ডি বা আমার বরাতে গ্রীষ্মের ছুটি মোটেই জোটে না।

সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের পকেট ছিল ফুটো, অর্থকড়ি মোটেই ছিল না। আমার চেয়ে অ্যান্ডি-র আর্থিক অবস্থা ছিল আরও বেশী সঙ্গীন। অনন্যোপায় হয়ে সে একেবারে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে মনমরা হয়ে পড়ল।

তাকে প্রবোধ দিতে গিয়ে আমি অ্যান্ডিকে বললাম—তারা, এত সহজে হতাশ হয়ে পড়লে চলবে কেন, বল দেখি? তোমাকে ব্যবসায় উন্নতি করে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীদের পাশে নিজের স্থান করে নিতে হবে।

অ্যান্ডিকে নীরব দেখে আমি আবার বলতে লাগলাম—অ্যান্ডি, মন কি চায় জান? এখান থেকে দূরে, বহু দূরে নাগরিক সভ্যতার বাইরে কোন এক নির্জন-নিরালা গ্রাম্য পরিবেশে গ্রীষ্মটা কাটাতে চাই।

তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললাম—জান অ্যান্ডি, আমিও বড়ই ক্লান্ত, একটা মাস স্বস্তিতে কাটিয়ে এলে আবার সতেজ মন নিয়ে, নতুন উদ্যমে ব্যবসায় লাগতে পারতাম।

এ লোভনীয় বিশ্রামের ব্যাপারটা অ্যান্ডির মনেও রোমাঞ্চ জাগাল।

ব্যস, আর দেবী না করে আমরা মনের মত গ্রীষ্মাবাসের খোঁজ করার জন্য যাবতীয় রেলপথের প্রচার-পত্রিকা নিয়ে সোৎসাহে ঘাটাঘাটি শুরু করে দিলাম। কোথায় যাওয়া যেতে পারে এরকম সিদ্ধান্ত নিতে নিতেই পুরো একটা সপ্তাহ লেগে গেল।

প্রচার-পত্রিকাগুলো ঘাটাঘাটি শেষ করে আমরা মোটামুটি ধারণা করতে পারলাম যে, পাসাডুস্‌কেগ, মেইল থেকে এলপসো অবধি, আর স্ক্যাগওয়ে থেকে কি ওয়েস্ট অবধি পুরো যুক্তরাষ্ট্রটাই পাহাড়-পর্বতে ঘেরা আর সবুজ বনানীতে ঢাকা, কাকের চোখের মত স্বচ্ছ জলের হ্রদ, গল্‌ফ্ খেলার মাঠ, গ্যারেজ, টেনিসের মাঠ, মেয়েমানুষ আর ফুরফুরে হাওয়া—রীতিমত স্বর্গরাজ্য। আর সবগুলির দূরত্বই দু'ঘণ্টার মধ্যে। কোন অসুবিধাই নেই।

অ্যান্ডি আর আমি সঙ্গে সঙ্গে বাক্স-প্যাঁটরা গোছাতে লেগে গেলাম। তারপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা বিমানবন্দরে গিয়ে ছ'টার কচ্ছপ-বিমানে চাপলাম। লক্ষ্যস্থল 'কাকপুচ্ছ'। টেনিসি আর উত্তর কেরোলিনার পর্বতশ্রেণীতে সামান্য পরিচিত সে স্থানটা।

কাঠঠোকরা সরাইখানায় আমাদের নিয়ে যাওয়া হল।

ইয়া মোটাসোটা গুঁড়ি আর পাথরের ওপর দিয়ে সরাইখানাটার দরজায় পৌঁছতে আমাদের প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার যোগাড় হল।

সরাইখানাটা সদর-রাস্তা থেকে দূরে, ঝাঁকড়া গাছের ছায়ায় অবস্থিত। লম্বা লম্বা বারান্দা থাকায় সরাইখানাটা আমাদের মনে ধরে গেল। সাদা পোষাক পরিহিতা একদল মেয়েকে ঘোরাঘুরি ছুটোছুটি করতে দেখলাম।

সরাইখানাটার বাকি অংশে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণে সাজানো কিছু মনোরম দৃশ্য আর একটা ডাকঘর আর উন্মুক্ত আকাশ আমাদের চোখে পড়ল।

আপনারা ব্যাপারটা একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখুন দেখি, এরকম একটা পরিবেশে আমরা সোৎসাহে সরাইখানাটার প্রধান দরজায় পৌঁছতেই একজন হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এসে আমাদের সাদর অভ্যর্থনা করে ভেতরে নিয়ে গেল। বুড়ো দাঁতের ডাক্তার। দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের একজন বিখ্যাত ব্যথা-বেদনাবিহীন দাঁতের ডাক্তার। নাম তার স্নিদার্স। স্নিদার্স-এর চেহারা গ্রাম্য করণিকের মত। হাবভাব চালচলন কিন্তু জমিদারের মত।

স্নিদার্স প্রথমেই আমাদের বলে দিলেন—শুনুন, আমিই কাঠঠোকরা সরাইখানার একাধারে অভ্যর্থনাকারী ও স্বত্বাধিকারী।

আমিও সুযোগ বুঝে অ্যান্ডির পরিচয়টা দিলাম। স্নিদার্স আমাদের নিয়ে গেলেন প্রধান দরজার গায়েরই উঠোনের ভেতরের গ্রীষ্মাবাস ধরনের বাড়িতে নিয়ে গেল।

ব্যস, স্নিদার্স এবার তার কাহিনীর ঝোলাটার মুখ খুলে দিল। সে বলল—মঁসিয়ে, এখানে আপনাদের পায়ের ধুলো পড়ায় আমি যারপরনাই খুশিও আনন্দিত হলাম। আপনার সাহায্য সহযোগিতা আমার দরকার হবে। বুড়ো হয়েছি, রাস্তার কাজকর্ম ঠিকমত করার সামর্থ্য হারিয়ে ফেলেছি। অথচ লেফটেন্যান্ট পিয়ারির মালবরোর একটা চিঠি মরশুম শুরু হবার দু' হপ্তা

আগেই শুরু হয়ে গেল। তাঁরা উভয়েই গ্রীষ্মের দিনগুলো এখানে কাটাতে চাইছেন।

একটু থেমে বুড়ো স্নিদার্স আবার বলতে শুরু করল—মঁসিয়ে আপনারা লেখাপড়া জানা ভদ্রলোক। আপনাদের পক্ষে নিশ্চয়ই ব্যাপারটা সহজেই বোধগম্য হওয়া উচিত যে—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই আমি অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে বলে উঠলাম—কি কথা। কিসের ইঙ্গিত দিতে চাইছেন মিঃ স্নিদার্স?

বুঝতেই পারছেন, এরকম ছোটখাটো একটা ভিড়ভাট্টার হোটেলে তাঁদের মত দু'জন বিখ্যাত লোককে অতিথি হিসেবে পাওয়াটা কী কঠিন এবং সৌভাগ্যের ব্যাপার।

অবশ্যই, অবশ্যই।

তাই আমি ব্যাপারটা জনসাধারণের প্রচার করার জন্য একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি।

কি সে ব্যবস্থা দয়া করে বলবেন কি? আপনার গৃহীত ব্যবস্থাটা জানার জন্য বড়ই ঔৎসুক্য বোধ করছি।

মিঃ স্নিদার্স একটু নড়েচড়ে বসে রীতিমত গর্বের সঙ্গেই বলল—আমি প্রচুর হ্যান্ডবিল ছাপিয়ে এ অঞ্চল এবং দূরবর্তী অঞ্চলগুলো ব্যাপারটা চাউর করে দিয়েছি যে, এ বছর গরমের দিনগুলো দু-দু'জন বিখ্যাত ব্যক্তি কাঠঠোকরা সরাইখানায় এসে কাটাবেন।

আমি ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে আমি বললাম—তাই বুঝি? তবে তো চমৎকার ব্যবস্থাই নিয়েছেন।

সে আর বলতে মঁসিয়ে, ওই লম্বা বারান্দাটার দিকে একবারটি তাকিয়ে দেখুন, ডিউক আর লেফটেন্যান্টকে একবারটি চোখের দেখা দেখার জন্য সববয়সী মেয়েরা কেমন ভিড় করেছে আর পুরুষদের মেলা বসে গেছে।

প্রচুর লোকজন দেখছি বটে। আমি আরও ভাবলাম, এরা সবাই আপনার সরাইখানারই অতিথি। তার কাছ থেকে আরও কথা আদায় করার জন্য কথাটা বলে ফেললাম।

কী যে বলেন মঁসিয়ে? একটা সরাইখানায়, বিশেষ করে আমার এ কাঠঠোকরা সরাইখানার মত ছোট একটা বাড়িতে এত লোকের মাথা গোঁজার জায়গা কোথায়? যাক গে, যে কথা বলছিলাম উপস্থিত জনতার মধ্যে আছেন চারজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্তা স্কুল-শিক্ষিকা, আর দু'জন অস্বাভাবিক, সাঁইত্রিশ থেকে বিয়াল্লিশ বছর বয়স্ক তিনজন উচ্চ বিদ্যালয়ের স্নাতক আর আছেন দু'জন সাহিত্য-সাধক যাদের একজন লিখতেই জানেন না। এক ভদ্রমহিলা আর দু'জন মহিলাও আছেন।

এ-তো রীতিমত সাড়া ফেলে দিয়েছেন! করেছেন কী মঁসিয়ে? এলাহী কাণ্ড!

আরও আছে, ধৈর্য ধরে শুনুনই না। আরও দু'জন আস্তাবলে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। আর চাট্টানুগার 'অপেরা গ্লাস' পত্রিকার সম্পাদিকা এবং বাঁধুনির জন্য খড়ের গাদায় দড়ির খাটিয়া পেতে দিয়েছি। মঁসিয়ে একবারটি নিজের চোখেই দেখে নিন, বিখ্যাত লোকদের মানুষকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা কী অপরিসীম!

আমি চোখ দুটো কপালে তুলে বললাম—অদ্ভুত এ যে একেবারেই অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটিয়েছেন মিঃ স্নিদার্স! এরকম একটা সৌভাগ্যজনক আনন্দের ব্যাপারে আপনার তো আনন্দের জোয়ারে আসার কথা। শুধু তা-ই নয়, খুশিতে আপনার তো আনন্দে আঙুল কামড়াবার কথা!

হ্যাঁ ব্যাপারটা অবশ্যই সৌভাগ্যের অস্বীকার করার উপায় নেই।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, আপনার মধ্যে সেরকম খুশীর জোয়ার বইছে বলে মনে হচ্ছে না তো!

মনে হবেও না মঁসিয়ে।

আমি ভ্রূজোড়া কুঁচকে বললাম—হবে না? তার মানে?

আসলে মূল চিঠিগুলোর স্বাক্ষরের সঙ্গে এ সংখ্যাগুলো মিলিয়ে দেখি—ব্যাপারটা কি জানেন মঁসিয়ে, ভুলটা হয়েছিল আমারই ক্ষীণ দৃষ্টির জন্যই।

আপনারই ক্ষীণদৃষ্টি—

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মিঃ স্নিদার্স বলে উঠলেন—একজন লেফ্‌টেন্যান্ট হবার

বদলে সে আসলে এসেভিল গ্রামের সোডাওয়াটারের দোকানের এক করণিক।

আমি কপালের চামড়ায় ভাঁজ এঁকে বললাম—সে কী!

তবে আর আপনাকে বলছি কি। তার নাম লেভি টি. পীভি। আর মার্লবরোর ডিউক বলে যাকে চালানো হচ্ছে, সে মারফীজ লাশের এক মুদির দোকানে খাতা লেখে, নাম তার থিয়ো-ড্রেক।

তারপর? তাদের শেষ পর্যন্ত কোন্ গতি করলেন?

যা করা উচিত ছিল তাই করেছি। পাছায় আচ্ছা করে কটা লাথি মেরে দু'জনকেই ট্রেনে তুলে দিয়েছি। আর তাকিয়ে দেখেছি, তারা নীচু অঞ্চলের দিকে হেঁটে চলে গেছে। আসলে তো তারা নিজেরই লোক।

মিঃ স্নিদার্স বলে চলল—আমার অবস্থা কেমন সঙ্গীন, আপনিই বলুন মঁসিয়ে। অনন্যোপায় হয়ে উপস্থিত মহিলাদের কাছে গিয়ে করজোড়ে বোঝালাম, আমাদের সেই দু'জন বিশিষ্ট অতিথি বিশেষ জরুরী কাজে পথে আটকা পড়েছেন। আশা করছি, দু'-একদিনের মধ্যেই এখানে পৌঁছে যাবেন।

কিন্তু এতেই কি আপনি রেহাই পাবেন ভাবছেন মিঃ স্নিদার্স?

মনে তো হচ্ছে, এতেই কাজ হবে। তারা যখন বুঝতে পারবে তাদের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করা হচ্ছে? তখন তারা অবশ্যই সুড় সুড় করে সরে পড়বে। তবে পরিস্থিতিটা যে খুবই কঠিন, বুঝতেই পারছেন।

অ্যান্ডি এতক্ষণ ঘুরে ঘুরে সরাইখানাটার পরিস্থিতি দেখছিল। হাঁটতে হাঁটতে কখন যে সে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে লক্ষ্যই করে নি। আমাদের কথার মাঝখানে সে বলে উঠল, মঁসিয়ে স্নিদার্স, এখন আর হা-পিত্যেশ করে কি হবে? মরু অঞ্চলের নামে তো আপনার আয় উপার্জন খুব কম হয়নি, কি বলেন? আর আমরা দু'জন তো আপনার সরাইখানায় আতিথ্য গ্রহণ করছিই।

আপনারা কি একাজটা করবেন, মানে করতে পারবেন তো? উপস্থিত ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলাদের সামনে আপনারা দু'জন যদি মেরু অঞ্চলের লোকের, আর ডিউকের ভূমিকায় অভিনয় করতে পারেন তবে আমার ইজ্জৎ আর সরাইখানার কারবার দু'-ই রক্ষা হয়। দয়া করে করবেন কি?

মুহূর্তের জন্য ভেবে নিয়ে অ্যান্ডি মুখ খুলল—মঁসিয়ে শুনুন তবে, আমাদের পক্ষে কাজটা করা সম্ভব কি না? কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দু'জন ছদ্মবেশী পুরুষকে দেখতে পাবেন।

ছদ্মবেশী পুরুষ? দু'জন—

মিঃ স্নিদার্স-এর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে অ্যান্ডি বলে উঠল—ধৈর্য ধরুন, সবই ছবির মত পরিষ্কার হয়ে যাবে। তারপর যে কথা বলছিলাম, ডিউকরা আসে, কিছুদিন বাদে আবার চলেও যায়। মেরু অভিযাত্রীরাও একই ভাবে আসে, আবার তারাও থাকে না। কিন্তু জেফ পিটার্স আর আমি, মানে চিরদিন যারা আসে তাদের হয়ে থেকে যাই।

বুড়ো স্নিদার্স চোখ পিট পিট করে সবিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

অ্যান্ডি বলে চলল, আপনি মত দিলে আমরা দু'জনই সাজব আপনার, বিশেষ করে উপস্থিত উৎসাহীদের বাঞ্ছিত অতিথি।

বুড়ো স্নিদার্স অ্যান্ডির হাতদুটো জড়িয়ে ধরে সোল্লাসে বলে উঠল—আপনি—আপনারা আমার মান ইজ্জত রক্ষা করুন!

ধৈর্য ধরুন মিঃ স্নিদার্স। অচিরেই আপনি চোখের সামনে দেখতে পাবেন সেই দুই বিখ্যাত কীর্তিমান পুরুষকে হাজির করব যারা জমিদারের দুর্গ, আর বোরিয়ালিস দুর্গ থেকে সবে এখানে হাজির হয়েছে। তাদের সার্থক অভিনয় যে আপনাকে মুগ্ধ করবে এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ। আর আপনার সরাইখানায় যেসব কৌতূহলী পুরুষ ও মহিলা জড়ো হয়েছেন তারাও কম আনন্দিত হবে না।

অ্যান্ডির কথায় বুড়ো স্নিদার্স যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেল। তার তোবড়ানো মুখটায়

হাসির ঝিলিক দেখা গেল।

মাত্রাতিরিক্ত আকস্মিক উল্লাসে বুড়ো আমাদের দু'জনকে দু'হাতে ধরে জামাই-আদরে সরাইখানায় ওপর তলায় নিয়ে গেল। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে আমাদের জানিয়ে দিল। আমরা যতদিন থাকব ততদিন বিনামূল্যে বিভিন্ন উপাদেয় খাদ্য ও পানীয় পেয়ে যাব।

মিনিট কয়েক বাদে মিঃ স্নিদার্স আমাদের দু'জনকে নিয়ে সে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

আমাদের দেখেই উপস্থিত দর্শনার্থীদের মধ্যে অভাবনীয় চাঞ্চল্য দেখা দিল। চোখের তারার কৌতূহলের ছাপ এঁকে সবাই আমাদের দেখতে লাগল। হবেই তো, এরই জন্য যে তারা এত কষ্ট স্বীকার করছে।

মিঃ স্নিদার্স উপস্থিত সবাইকে লক্ষ্য করে বলল—সুধীজন, উত্তর মেরুর বিশ্ববিখ্যাত আবিষ্কারক লেফটেন্যান্ট পিয়ারী এবং সানবরোর মহামান্য ডিউককে আপনাদের সামনে উপস্থিত রাখতে পেরে আমি আন্তরিকভাবে খুশি এবং নিজেকে ধন্য জ্ঞান করছি।

বুড়ো স্নিদার্স-এর কথা শেষ হতে না হতে আমরা, মানে আমি আর অ্যান্ডি যখন বিশেষ ভঙ্গিমায় মাথা নত করলাম তখন মহিলাদের ঘাঘরাগুলো মৃদু মৃদু দুলতে লাগল। আর পুরুষরা দু' হাত উঁচিয়ে অভিবাদন জানাল।

ব্যস, কাজ হাসিল। বুড়ো স্নিদার্স-এর আনন্দ যেন আর ধরে না। এবার সরাইখানার খাতায় নিজ নিজ নাম তালিকাভুক্ত করার জন্য নারী-পুরুষ সবাই যেন রীতিমত হুড়োহুড়ি শুরু করে দিল।

এবার থেকে আমাদের মেজাজ দেখে কে। সরাইখানার মালিক একটা সুসজ্জিত ঘরে আমাদের নিয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যেই একজন পরিচালক সবচয়ে দামী মদের বোতল আর নক্সা-কাটা দুটো গ্লাস আমাদের সামনে রেখে গেল।

আমরা গ্লাস দুটোতে ক্যারোলিনার খাঁটি মদ গলায় ঢেলে তৃপ্তির ঢেকুর তুলতে লাগলাম।

অ্যান্ডি যখন একের পর এক গ্লাস গলায় ঢালতে লাগল দেখে আমার চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে যাবার যোগাড় হল। এর যথেষ্ট কারণও রয়েছে। তাকে তো আমি ভালই চিনি। তার একটা শিল্পীসুলভ মনোভাব, মানে লক্ষণ মাঝে-মধ্যে প্রকাশ পায়। ব্যাপারটা হচ্ছে, সে যখন আধ-মাতাল থাকে তখন স্বাভাবিক অবস্থায়ই থাকে। আর যখন পুরো মাতাল হয়ে যায় তখন তার আর হুঁশ থাকে না। তার কাছে তখন ধরা আর সরার মধ্যে কোন পার্থক্যই থাকে না।

দু'-এক গ্লাস মদ গলায় ঢেলে আমি বারান্দায় গিয়ে একটা সুদৃশ্য আরাম কেদারায় শরীব এলিয়ে দিলাম। ব্যস, সে বারান্দায় আমার উপস্থিতির খবরটা বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। মিনিট দু'-তিনের মধ্যেই স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা, সাহিত্য-সাধক আর অন্যান্য উৎসাহী নারী-পুরুষরা ছুটো-ছুটি করে এসে আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়ল।

মহিলাদের মধ্য থেকে একজন মুখ খুলল—আপনার প্রথম অভিযানটার কথা কিছু শুনতে চাচ্ছি। মঁসিয়ে, যদি অনুগ্রহ করে সে বিষয়ে আলোকপাত করেন তবে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করব।

আমার বুকের ভেতরে ধড়াস্ করে উঠল। ভদ্রমহিলার প্রশ্নটার জন্য নয়, অ্যান্ডিকে একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম বলে। তার সঙ্গে একটা ব্যাপারে বোঝাপড়া না করায় বড় রকমের একটা কেলেঙ্কারী ঘটে যেতে পারে।

বোঝাপড়াটা কি?

অ্যান্ডি ডিউকের ভূমিকায়, নাকি লেফটেন্যান্ট-এর ভূমিকায় অভিনয় করতে আগ্রহী?

আরও আছে, আমি ভদ্রমহিলার কথায় বুঝতেই পারলাম না, উত্তর মেরু অভিযান, নাকি আমার বিবাহ অভিযানের কথা জানতে চাইছেন।

ভেবেচিন্তে আমিও এমন একটা জবাব দিলাম যাতে দুটো প্রশ্নের উত্তরই হয়। আমি মুচকি হেসে বললাম—সান্দাম, ঠাণ্ডা! ভীষণ ঠাণ্ডা!

ইতিমধ্যে অ্যান্ডি সেখানে চলে এসেছে। সে বক্তৃতার জোয়ার বইয়ে দিতে লাগল।

অ্যান্ডির কথার মাধ্যমে আমিও জেনে গেলাম, কোন চরিত্রে ডিউক, নাকি মেরু অভিযাত্রী,

কোন ভূমিকায় অভিনয় করতে সে আগ্রহী। না, আমি আসলে কেউ-ই নই। অ্যান্ডি দু'জনই।

অ্যান্ডির কথায় আমি স্পষ্টই বুঝতে পারলাম, সে স্যার জন ফ্রাংকলিন থেকে শুরু করে সমস্ত বৃটিশ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আর মেরু আবিষ্কারকদের প্রতিনিধি হবার জন্য প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে অ্যান্ডি মুখ খুলল—উপস্থিত সুধীজন, আমেরিকার মাটিতে পদার্পণ করতে পারায় আমি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করছি। আমি কিছুতেই মেনে নেব না যে, ম্যাগনা কার্টা বা গ্যাস বেলুন অথবা বরফ-জুতো আপনাদের, মানে নারীজাতীর সৌন্দর্য ও আকর্ষণ, সুউচ্চ প্রাসাদসমূহ বা আপনাদের ভাসমান তুষারখণ্ডের স্থাপত্যকে ম্লান করে দিতে সক্ষম। এটাকে নিছক আমার মুখের কথা মনে করলে কিন্তু আমার প্রতি অবিচারই করা হবে।

প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মহিলাদের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠল—মাননীয় লেফটেন্যান্ট অনুগ্রহ করে আপনার অভিযানের কথা কিছু বলুন।

অ্যান্ডি বার দু'-তিন ঢোক গিলে বলল—অবশ্যই। আপনাদের কৌতূহল অবশ্যই নিবৃত্ত করব।

উপস্থিত মহিলাদের মধ্যে এক অবর্ণনীয় খুশীর জোয়ার বয়ে চলল। সবাই একটু নড়েচড়ে দাঁড়াল।

অ্যান্ডি মুখ খুলল—বলব, সবই খোলসা করেই বলব। আরে, বেশীদিনের কথা নয়, গত বছর বসন্তে ব্লেনবিন দুর্গে আমি ৮৭ ফারেনহাইট পর্যন্ত গিয়ে সব রেকর্ড ম্লান করে দিয়েছি। যখন চারটে ঘণ্টা বাজল তখন আমার নজরে পড়ল ওয়েস্ট মিনিস্টর এবে। কিন্তু এক তিল খাবারও সেখানে মিলল না।

দুপুর হল। অনন্যোপায় হয়ে এক-এক করে চারটে বালির বস্তা দমাদম জাহাজ থেকে ফেলে দিলাম। ব্যস জাহাজটা ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে উঠতে চার লট উঠে গেল।

এভাবে মাঝরাত্রি হয়ে গেল। এদিকে দেখা গেল নতুন সমস্যা, রেস্তোরাঁটাও বন্ধ হয়ে গেল। একটা বরফের চাঁইয়ের ওপরে বসে আমরা চার-চারটে হট ডগ মেয়ে দেখলাম।

আরে ব্বাস! যেদিকে দৃষ্টি যায় কেবল বরফ আর বরফ।

প্রতি রাত্রে দু'বার করে ওপবে উঠে সারেঙ ক্যালেন্ডারের একটা করে পাতা ছিঁড়ে ফেলতে লাগল। আর তা থেকেই আমরা ব্যারোমিটারের সঙ্গে সময় মিলিয়ে নিতে লাগলাম। ঘড়িতে তখন বারোটা। দরজা দিয়ে একটা মেরু ভালুক দুম্ করে ঘরে ঢুকে গেল। ইয়া দশাসই তার চেহারা, একমাত্র যমদূতের সঙ্গেই যার তুলনা চলতে পারে।

মেরু ভালুক, তারপর কি হল প্রিয় লেফটেন্যান্ট? এক রূপসী স্কুল শিক্ষিকা চোখ দুটো কপালে তুলে বলে উঠল।

কথাটা বলেই অ্যান্ডির দু'চোখের জল মুছতে লাগল। পর মুহূর্তেই নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সে বলল—ডাচেস তখন পিলে কাঁপানো চিৎকার করে বলল—আমাকে যমদূতটা ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে।

ব্যস কথাটা বলেই সে একলাফে বারান্দায় গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তারপরই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লেগে গেল।

মুহূর্তের জন্য থেমে একটু দম নিয়ে অ্যান্ডি আবার উপস্থিত মহিলাদের দিকে করুন দৃষ্টিতে তাকাল।

ইতিমধ্যে কৌতূহলী পুরুষও মহিলারা এক-এক করে সেখান থেকে সরে পড়তে লাগল।

অ্যান্ডি তখনকার মত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। পরদিন ভোরেই মহিলারা সরাইখানা ছেড়ে চলে গেল।

সরাইখানার মালিক মিঃ স্নিদার্স আমাদের খোঁজ খবর নেওয়া বা কথা বলা তো দূরের কথা আমার ঘর মুখোও হল না।

দু'-দুটো দিন সে খুবই সতর্কতার সঙ্গে আমাদের বিশেষ করে আমার সংস্রব এড়িয়ে চলতে লাগল।

তবে সে যখন বুঝল যে, আমাদের কাছে আর কিছু না হোক রাহা খরচের মত টাকাকড়ি আছে তখন ধীরে ধীরে নরম হতে লাগল।

আমি আর অ্যান্ডি এভাবে হরষে-বিষাদে গ্রীষ্মকাল কালটা মিঃ স্নিদার্স-এর কাকপুচ্ছ সরাইখানায় কাটিয়ে আমাদের ডেরায় ফিরে এলাম। আসার সময় নগদ দু' হাজার একশ' পাউণ্ড সঙ্গে নিয়ে এলাম।

এতগুলো পাউণ্ড কিভাবে সংগ্রহ করেছিলাম, তাই না। আরে, আমরা একটু ফুসরত পেলেই বুড়ো স্নিদার্স-এর সঙ্গে সেভেন-আপ খেলায় মাততাম। আর এরই ফলে পাউন্ডগুলো তার ট্যাক থেকে আমাদের পকেটে এসে গিয়েছিল।

দ্য অক্টোপাস ম্যারুন্‌ড

কথা প্রসঙ্গে জেফ পিটার্স বলল—কি বলছি শোন, ন্যাস-ব্যবস্থার সবচেয়ে দুর্বল দিকটা তার নিজের মধ্যেই জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছিল।

আমি মুচকি হেসে বললাম—কেবলমাত্র একজন পুলিশম্যানের কথাই বলি কেন, এরকম যে সব দুর্বোধ্য কথা বলা হয়, তোমার কথাটাও হুবহু একই রকম শোনাচ্ছে হে।

না, অবশ্যই তা নয়। একটা ন্যাস আর পুলিশের মধ্যে কিছুমাত্রও যোগসূত্র আছে বলে আমি অন্তত বিশ্বাস করি না। আমার বক্তব্যকে একটা এপিটোগ্রাম বলেই মনে করা যেতে পারে।

আমি এবার রসিকতার ছলে জেফকে বললাম—শোন হে, একটা প্রশ্নের উত্তর তোমার কাছ থেকে আমি আশা করছি, পাব কি?

সে ম্লান হেসে বলল—প্রশ্নটা কি, আগে বলবে তো, তারপর উত্তর দেওয়ার মত হলে অবশ্যই দেব।

প্রশ্নটা হচ্ছে, তোমার জীবনে, মানে পতন-অভ্যুদয় জীবনে চলার পথে ন্যাস-শ্রেণীর কোন্ কোন্ উদ্যোগের পরিচালক হিসাবে কাজ করেছিলে কি, বল তো?

জেফ আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে অকপটে ব্যাপারটাকে স্বীকার করে নিল। ব্যাপারটা অবাক হবার মতই বটে।

সে নির্দ্বিধায় বলল—বলছি তবে শোন, এক বছর আমি আর অ্যান্ডি, মানে কারবারের দুই অংশীদার আকাশ-পথে মেক্সিকোতে গিয়েছিলাম। তখন ফিলাডেলফিয়ার একজন পুঁজিপতি চিহুয়াহুয়ার যাঁর নাম, তিনি একটা রূপোর খনিতে অর্ধেক অংশের দরুন আমাদের দু'জনকে আড়াই হাজার ডলার দিয়েছিলেন। অবশিষ্ট অর্ধেক অংশের মূল্য দু'-তিন হাজার ডলার তো হবেই। হ্যাঁ, অস্বীকার করা যাবে না, খনির কাজ কারবার খুবই ভালই চলছিল। আমি এখনও অবাক হয়ে ভাবি, যে রূপোর খনিটার মালিকানা স্বত্ব কার ছিল?

আমরা যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসার পর টেক্সাসের রিও গ্রান্ডির উপকূলবর্তী ছোট্ট একটা শহরে নামলাম। 'পাখি-নগর' নামে শহরটা পরিচিত ছিল। আসলে যে সেখানে কেবলমাত্র পাখিদেরই আস্তানা ছিল তা বলা যাবে না। আসলে সেখানকার অধিবাসীদের সংখ্যা ছিল দু'হাজার। তারা অধিকাংশই মানুষ।

পাখি-নগরের মানুষগুলোর মধ্যে কেউ ঘোড়ার দালালী, কেউ জুয়া খেলা, কেউ শেয়ার বাজারের দালালী আর অধিকাংশই চোরাচালান-টালানের মাধ্যমে পেটের ভাত যোগাড় করে।

ছোট একটা হোটেলে আমি আর অ্যান্ডি মাথা গুঁজেছিলাম। আমরা যেদিন পাখি নগরে পা দিলাম সেদিন থেকেই মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।

সে পাখি-নগরে তিনটে সেলুন ছিল। তবে আমি বা অ্যান্ডি কেউ-ই মদ খেতাম না। কিন্তু আমরা দেখতাম, সকাল থেকে মাঝ রাত্রি পর্যন্ত শহরের মানুষ দলে দলে কাতারে কাতারে একটা সেলুন

থেকে অন্য একটা সেলুনের দিকে চলেছে। হাতে মালকড়ি থাকলে কিভাবে তা খরচ করার উপায় তাদের জানা ছিল।

দু'-দিন দু' রাত্রি এক নাগাড়ে মুষল ধারে বৃষ্টি পড়ার পর তৃতীয় দিন বিকেলের দিকে বৃষ্টি কমল। তখন কর্দম-চিত্র দেখার জন্য আমি ও অ্যান্ডি হাঁটতে হাঁটতে শহরের এক প্রান্ত থেকে বিপরীত প্রান্তে চলে গেলাম।

রিও গ্র্যান্ড নদী আর একটা মজে যাওয়া নদীর বিস্তীর্ণ খাদের মধ্যবর্তী স্থানে পাখি-নগরটা গড়ে উঠেছিল।

অ্যান্ডি কৌতূহলের শিকার হয়ে দীর্ঘ সময় ধরে জলস্রোতের নদীখাতের মধ্যবর্তী তীরটা ভেঙে পড়ার দৃশ্য দেখতে লাগল।

সত্যি অ্যান্ডির বুদ্ধিবৃত্তি কখনই নিষ্ক্রিয় থাকত না। নদীর ধ্বংসলীলা দেখতে দেখতে সে তার তাৎক্ষণিক ধারণাটা মনে কিছুমাত্র গোপন না করে আমার কাছে ব্যক্ত করল। আর সেখানে তখনই একটা ন্যাস গঠন করে ফেলা হল।

আমরা শহরে ফিরেই ন্যাসটাকে বাজারে ছেড়ে দিলাম। আমরা সবার আগে পাখি-শহরের বড় সেলুন ব্লু-স্নেক'টা কিনে ফেললাম। দাম লাগল বারোশ' ডলার।

তারপর এক সময় ঘুরতে ঘুরতে মেক্সিকান জের সেলুনে গেলাম। দেখেশুনে সেটা পছন্দ হয়ে গেল। পাঁচশ' ডলারের বিনিময়ে আমরা সেটাকেও কিনে ফেললাম। আর অন্যটা কিনলাম চারশ' ডলার দিয়ে।

পাখি-শহরের মানুষ পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখল শহরটাই একটা দ্বীপে পরিণত হয়ে গেছে। পুরনো খাত ধরেই নদীটা প্রবাহিত হচ্ছে। আর তার উত্তাল-উদ্দাম স্রোত শহরটাকে বেস্টন করে ফেলেছে।

তখনও অনবরত বৃষ্টি পড়েই চলেছে। উত্তর-পশ্চিমের মেঘ দেখে ধরে নেওয়া যাচ্ছে পরের দু' সপ্তাহও প্রবল বর্ষণ হবে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা শোচনীয় পরিস্থিতিটা সম্বন্ধে তখনও আঁচ পাওয়া যায় নি।

পাখি-শহরটা যেন ডানা-ভাঙা পাখির মত কাৎরে কাৎরে চলেছে।

একী জো-র সেলুনটা যে বন্ধই হয়ে গেছে। অন্য সেলুনটার অবস্থাও সঙ্গীন। আর ব্লু স্নেক-এর পরিস্থিতিই বা কি?

অক্টোপাস জেফার্সনিয়ান পিটার্স বারের এক ধারে বসে। তার দু' ধারে দুটো দু'-ঘড়া বন্দুক। মাত্র তিনজন মদ পরিবেশনকারী অলসভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেওয়ালে তিন ফুটের একটা বিজ্ঞপ্তি টাঙানো। তার গায়ে বড় বড় হরফে লেখা—সব রকম পানীয়ের দাম এক ডলার।

অ্যান্ডি সোনালি লেবেল যুক্ত চুরুট দু'ঠোঁটের চাপে রেখে সিন্দুকের ওপরে বসে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে।

শহরের দু'জন মার্শাল তাদের দু'জন সহকারীকে নিয়ে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার তাগিদে 'ব্লু স্নেক' সেলুনের অবস্থান করছে। ন্যাসের পক্ষ থেকে তাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, বিনা পয়সায় পানীয় দেওয়া হবে।

তারপরের কথা আর বলব কি, পাখি শহরের অধিবাসীরা দশ মিনিটের মধ্যেই বুঝতে পারল যে, তারা খাঁচায় আটক হয়েছে। আমরাও বিপদের অশঙ্কায় কাতর হয়ে পড়লাম। না, কোন বিপদই ঘটল না।

পাখি শহরের বাসিন্দারা বুঝতে পারল, তারা আমাদের হাতের মুঠোয় চলে এসেছে।

আমি শহরের নিকটতম রেলপথের দূরত্ব ত্রিশ মাইল আর কম করেও সপ্তাহ দুই এ নদীতে নৌকা চালানোর প্রশ্নই ওঠে না। তাই তো তারাও সেলুনে হাজির হয়ে দরাজ-হাতে ডলার ছুঁড়ে দিতে শুরু করল। সে দৃশ্য ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।

পাখি-শহরের প্রায় দেড় হাজার ছেলে-মেয়ে তখন বয়ঃসন্ধিক্ষণ। ভাল-মন্দ বিচার করে কোন কাজে পা ফেলার বয়স তাদের হয় নি।

শহরের ছেলে-মেয়েদের টিকে থাকতে হলেও রোজ অন্তত বার কুড়ি মদের গ্লাসে চুমুক দেওয়া

চাই-ই চাই।

বন্যার জল নেমে যাওয়া পর্যন্ত কেবলমাত্র ব্লু-স্নেক সেলুনই তাদের প্রয়োজন মেটাতে পারে। সব মহান ঠগ-বাটপাড়দের মতই ব্লু-স্নেক-এর ব্যাপারে কৃতিত্ব কম নয়। বলা চলে ব্লু-স্নেক একটা চিনির প্রলেপ দেওয়া তেতো বড়ির ভূমিকা পালন করে চলেছে।

দুপুরবেলায়ই সবাই খাওয়া দাওয়া সারতে বাড়ির দিকে পা বাড়াল। পরিবেশনকারীদের আমরা নির্দেশ দিলাম, এ সুযোগে তারা আহারাদি সেরে নিক। তারাও বার ছেড়ে গেল।

অ্যান্ডি আর আমি রোজগারের টাকাকড়ি গুণতে লেগে গেলাম। তেরো শ' পাউন্ড রোজগার হয়েছে।

আমরা হিসাব নিকাশ মিটিয়ে ফেললাম, পাখি-শহরটা যদি দুটো সপ্তাহ এমন দ্বীপ হয়ে থাকে তবে আমাদের ন্যাস শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়কে একটা নতুন সুসজ্জিত ডর্মিটরি দান করতে সক্ষম করবে, আর টেক্সাসের প্রত্যেক দুস্থ পরিবারকে একটা করে খামার উপহার দিতে পারবে তবে তারা যদি খামারের প্রয়োজনীয় জমিটা যোগাড় করতে পারে।

আমাদের এরকম আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত সাফল্যে অ্যান্ডি তো অহংকারে ফুলে একেবারে কলাগাছ হয়ে গেল। হবার মত ব্যাপারও বটে। কারণ, পরিকল্পনাটা তার মাথায়ই প্রথম খেলেছিল।

অ্যান্ডি সিন্দুকটার ওপর থেকে নেমে সবচেয়ে বড় চুরুটটা ধরিয়ে মৌজ করে টানতে লাগল।

চুরুটের শেষাংশটুকু ফেলে দিয়ে অ্যান্ডি পিছনের ঘরে গিয়ে সবচেয়ে সৌখীন পোষাকটা পরে ফুলবাবু সেজে একটু বাদে বাইরে এল। তার চোখের তারায় তখন ভয়ঙ্কর অথচ শান্ত দৈবভাবের ছাপ বিরাজ করছে দেখে আমার খুব ভাল মনে হল না।

আমার বুঝতে অসুবিধা হল না, হুইস্কি পেটে পড়ার জন্যই তার এ ভাবান্তর ঘটেছে। আমি অনুসন্ধিৎসু নজরে তার দিকে তাকালাম।

কোন কোন সময় এমন দুটো সময় এসে উপস্থিত হয় যখন তার পরিণতির কথা তোমার পক্ষে কিছু বলা সম্ভব হয় না। প্রথমত, কোন পুরুষ যখন মদের গ্লাসে প্রথম চুমুক দেয়, আর দ্বিতীয়ত, কোন মহিলা যখন মদের গ্লাসে শেষ চুমুকটা দেয়।

অ্যান্ডি আধ ঘণ্টারও কম সময়ে তার স্কেটজোড়া বদলে বরফে চলার ইয়াটটা পরে নিল।

তাকে দেখে বাইরে থেকে ফিটফাটই লাগল কিন্তু তার বুকের ভেতরে বিক্ষুব্ধ ও অভাবনীয় কিছু আশা জমাট বেঁধে রয়েছে।

আমার দিকে তাকিয়ে সে বলল—জেফ, তুমি কি জান যে, আমি একটা আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ—জীবন্ত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ, জান কি?

তোমার ভাবগতিক তো সেটাই বুঝিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু তুমি তো আইরিশ নও ভায়া, আমি ম্লান হেসে বললাম।

অ্যান্ডি এবার বলল—হ্যাঁ, আমি একটা জীবন্ত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ। আমার বুকের ভেতরে আগুনের শিখা লক লক করে অনবরত জ্বলেই চলেছে। বিভিন্ন শব্দ ও কথাবার্তা বলার জন্য আমার বুকের ভেতরটা তোলপাড় করছে। অতএব যেকোন একটা ভীষণ কিছু না দেওয়া অবধি আমি স্বাভাবিকতা ফিরে পাব না। আসলে মদ পেটে পড়লেই কিছু বলার জন্য আমার ভেতরটা তোলপাড় হতে থাকে।

আমি বললাম—তার চেয়ে খারাপ কোন কিছু করার জন্য মন যে উতলা হয় না তবু বাঁচোয়া।

অ্যান্ডি বকবক করেই চলল—বাল্যকালের কথা যতদূর মনে পড়ে, মদে চিরদিনই বাগ্মিতার শিকার হয়ে পড়ি।

এক কাজ কর, তোমার মনকে শান্ত করতে নদীর পাড়ে গিয়ে ছোট্ট একটা ভাষণ দিয়ে ফেল গে।

আরে ধ্যুৎ। নদীর পাড়ে ফাঁকা জায়গায় ভাষণ, আরে শ্রোতা না থাকলে ভাষণ দিয়ে জুত আছে!

তোমার ভাষণের ইচ্ছাটা কোন্ বিষয়কে কেন্দ্র করে তোমার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, বল তো?

আরে, কোন বিশেষ বিষয়ের ব্যাপারই নয়। যেকোন একটা প্রসঙ্গ নিয়ে কিছুক্ষণ ধরে অনর্গল বক বক করা মনে করতে পার। মনে কর, জন ডব্লু.কিট্‌স্-এর প্রসঙ্গ রাশিয়ার অভিবাসন, কাবাইল-এর সাহিত্যকীর্তি বা বাণিজ্য নীতি বা জল নিকাশী ব্যবস্থা এদের যেকোন একটা প্রসঙ্গে যদি ভাষণ দেই তবেই আমার শ্রোতাদের দু'চোখ দিয়ে অনবরত জলের ধারা নামতে থাকবে, কেউ গলাছেড়ে কাঁদবে, কেউ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবে আবার কেউ বা ডুকরে ডুকরে কেঁদে আকুল হবে।

আমি বললাম, অ্যান্ডি তোমাকে একটা পরামর্শ আমি দিতে চাইছি, বলব কি?

কি? তোমার পরামর্শটা কি শুনি?

আমি বলতে চাইছি, তোমার বক্তৃতার ব্যামো থেকে তুমি যদি অব্যাহতি পেতেই আগ্রহী হও তবে তুমি না হয় শহরেই পাড়ি জমাও। তোমার কথামালাকে ভাষণপ্রিয় নাগরিকদের কথা প্রকাশ করে তৃপ্ত হও গে। তারপর বললাম, আর আমি? আমি না হয় দলের ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে যাবতীয় ব্যবস্থাদি মিটিয়ে ফেলি। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা সবাই এখানে রাতের খাবার খেতে এখানে হাজির হবে। শূকরের মাংস তারা খুবই তৃপ্তির সঙ্গে খায়। আজ মাঝরাত্রি পেরোবার আগেই দেড় হাজার পাউন্ডের বেশী আমাদের পকেটে আসবে যে এতে কোন সন্দেহই নেই।

অ্যান্ডি আর কথা না বাড়িয়ে ব্লু স্নেক ছেড়ে বেরিয়ে পথে নামল।

আমি দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম।

দরজায় দাঁড়িয়েই আমি অ্যান্ডি-র ফেলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম। দেখলাম, কয়েক পা এগিয়েই সে পথচারীদের থামিয়ে কি সব বলছে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তার ভাষণ শোনার জন্য পথচারীরা তার চারদিকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে পড়েছে। আর সে ভিড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাত দু'টো নেড়ে নেড়ে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে।

মিনিট কয়েক ভাষণ দেওয়ার পর সে ভিড় ঠেলে হাঁটতে আরম্ভ করল। হ্যাঁ, তার প্রয়াস সার্থক। সে হাঁটা শুরু করলে কৌতূহলী জনতা তার পিছু নিল। তার মুখ থেকে আরও কিছু শোনার অত্যুগ্র আগ্রহ বশতই তারা তাকে ছাড়তে নারাজ।

অ্যান্ডি যখন ছোট রাস্তাটা পেরিয়ে পাখি শহরের সদর রাস্তাটায় পা দিল তখন দেখা গেল, আরও বেশী সংখ্যক পথচারী তাকে অনুসরণ করে চলেছে। এ যেন রীতিমত জনতার এক মিছিল।

অ্যান্ডি-র ব্যাপার-স্যাপার দেখে আমার মনের কোণে ভেসে উঠল হেইডসিক-এর বাঁশিওয়ালার অত্যাশ্চর্য সে কাণ্ডটা। সেই যে সেই কাণ্ড, বাঁশিওয়ালা যে সম্মোহিনী বাঁশির সুরে মুগ্ধ করে শহরের ছেলে মেয়েদের নিয়ে শহর থেকে কেটে পড়ছে। সত্যি খুবই আশ্চর্য তো অ্যান্ডি-র বাগ্মিতা!

ঘড়ির কাঁটা ঘুরতে ঘুরতে একটার ঘরে গেল, তারপর দু'টোর ঘরে, তারপর ধীরে ধীরে তিনটের ঘরেও চলে গেল। কিন্তু পাখি শহরের একটা কাকপক্ষীও ব্লু স্নেক-এর চৌকাঠ মাড়াল না। পথঘাট একেবারে খাঁ খাঁ করছে। আবার ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিও পড়তে শুরু করেছে। যেদিকেই চোখ ফেরানোই যাক না কেন কোথাও মানুষের নাম গন্ধও নেই।

বৃষ্টি-ভেজা পথ পেরিয়ে এক সময় একজন ব্লু স্নেক-এর সদর দরজায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সে ব্যস্ত হয়ে বুট জোড়া থেকে কাদা ঝেড়ে ফেলতে লাগল।

আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, মঁসিয়ে, অপরাধ নেবেন না। আসল ব্যাপারটা কি, দয়া করে বলবেন কি? আজ সকালেই এখানে মানুষ গিজ গিজ করছিল। কিন্তু এখন? এখন শহরটাকে সাইফোন আর টাইরের মত একটা শহরের ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে গেছে যেখানে সঙ্গী সাথীহীন এক সরীসৃপ যেন দেওয়াল থেকে দেওয়ালে হামাগুড়ি দিয়ে, বুকে হেঁটে এগিয়ে চলেছে।

বুটের কাদা ঝাড়তে ঝাড়তে আগন্তুক বলল, আর বলবেন না মঁসিয়ে। শহরের অধিকাংশ মানুষ বিস্তীর্ণ এক প্রান্তরে জমায়েত হয়ে একটা লোকের বক্তৃতা শুনছে। তারা একেবারে মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে তার বক্তৃতা শুনছে, যাকে বলে একেবারে মজে যাওয়া।

আমি সবিস্ময়ে বলে উঠলাম, তাই বুঝি?

সে মুচকি হেসে বলল, তবে আর বলছি কি, মঁসিয়ে। তবে বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, লোকটা এক পয়লা নম্বরের বাগ্মী, চমৎকার বলে!

আশা করছি, এক সময় না এক সময় তার ভাষণটা শেষ হবেই হবে।

হায়! সেদিন বিকালটা সুখাই গেল, একটা খরিদ্দারও আমাদের ব্লু স্নেক-এর চৌকাঠ মাড়াল না। পরিস্থিতি যে হঠাৎ এমন হয়ে উঠবে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলে দেখলাম, দুটো মেক্সিকান অ্যান্ডিকে ঠেলাগাড়িতে চাপিয়ে ব্লু স্নেক-এর সদর দরজায় হাজির করল।

মেক্সিকান ঠেলাওয়ালাদের সাহায্য নিয়ে আমি অ্যান্ডিকে ধরাধরি করে ঘরের ভেতরে নিয়ে গেলাম। একটা বিছানার ওপর শুইয়ে দিলাম।

অ্যান্ডি-র ব্যাপার স্যাপার দেখে আমি তো একেবারে আকাশ থেকে পড়লাম। বিছানায় শুয়ে, গভীর ঘুমের মধ্যেও সে হাত দুটো থেকে-থেকে অনবরত ছুঁড়ে চলেছে।

আমি বিস্ময় কৌতূহল নিবৃত্ত করতে ব্লু-স্নেক-এর দরজায় তালা দিয়ে পথে নামলাম। লম্বা-লম্বা পায়ে এগিয়ে চললাম।

গলির মোড়ে যেতেই একজন পথচারীর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। তার মুখে শুনলাম, পুরো দুটো ঘণ্টা ধরে অ্যান্ডি নাকি এমন জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিয়েছে যা টেক্সাস শহরের মানুষ ইতিপূর্বে আর কোথাও শোনে নি। কেবলমাত্র টেক্সাস শহরবাসীর কথাই বা বলি কেন, পৃথিবীর কেউ-ই আজ অবধি শোনে নি।

আমি কৌতূহলের শিকার হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, মঁসিয়ে তার ভাষণের প্রসঙ্গ কি ছিল, বলুন তো?

মিতাচার।

তার জুতো ঝাড়া মোছা শেষ করে আগন্তুক এবার বলল, মঁসিয়ে, তার বক্তৃতা শেষ হলে দলে দলে শহরবাসী একটা পত্রে স্বাক্ষর করতে লাগাবে এক বছরের জন্য তারা মদ্যপান রদ করবে, নিজেরাও মদ স্পর্শও করবে না।

দ্য হ্যান্ড দ্যাট রুল্স্ দ্য ওয়ার্লড।

অন্য একটা প্রসঙ্গে চলে গিয়ে আমি বললাম, আমাদের দেশের বহু মহামানবই তো বলে গেছেন যে, তাদের সাফল্যের মূলে রয়েছে কিছু সংখ্যক মহীয়সী নারীর উৎসাহ উদ্দীপনা, সাহায্য ও সহযোগিতা। আর এরই জন্য তারা তাদের কাছে অবশ্যই ঋণী। অতএব নারীজাতির কাছে—

জেফ পিটার্স তার মুখের কথা শেষ না করতে দিয়েই আমি বলে উঠলাম, আমার অবশ্যই জানা আছে।

তবে?

ইতিহাসের পাতায় আমরা বহু বিখ্যাত নারীর কথা পাই, যাদের মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে মাদাম ইয়েল, যোয়ান অব আর্ক, মিসেস কডল্ ওইভ প্রভৃতি আরও অনেকেরই নাম, ঠিক কিনা?

অবশ্যই। ঠিকই বলেছ।

আমি কিন্তু বলব বর্তমানকালের নারীরা ব্যবসা-বাণিজ্য বা রাজনীতি কোন ব্যাপারেই কাজে লাগে না। তুমিই তারা কোন্ ব্যাপারে সবার অগ্রগণ্য?

বর্তমানে পুরুষরা।

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জেফ পিটার্স বলে উঠল, হ্যাঁ, পুরুষরাই বর্তমানকালে সংসার পরিচালক, স্টেনোগ্রাফার, রান্নাবান্না, পাগড়ী ও টুপি তৈরীর কর্মী, নার্স, করণিক, কেশ ও বেশভূষা প্রস্তুতকারী আর রজক প্রভৃতির পেশায় এমন দক্ষ যার কাছাকাছি বহু মেয়েই পৌঁছতে পারে না। এবার বল তো, কোন্ কাজে একজন নারী পুরুষকে পরাজিত করে দিতে পারে?

আমি তার প্রশ্নের জবাব দিতে না পেরে, তার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে অসহায়ভাবে তাকিয়ে রইলাম।

জেফ পিটার্সই আমার অসহায় অবস্থার কথা বিবেচনা করে বলল, আরে ভায়া, সাধারণ কথাটা তোমার মাথায় ঢুকছেনা! হাসির নাটকে কোন নারী যখন পুরুষের ভূমিকায় অভিনয় করতে মঞ্চে নামে একমাত্র এ কাজটাতেই নারী পুরুষকে হারিয়ে দিতে পারে, বুঝলে?

আমি তার কথায় সরবে হেসে উঠলাম।

সে এবার বলল, অতএব বুঝতেই পারছ, নারীরা অধিকাংশ ব্যাপারেই পুরুষদের চেয়ে আজও অনেক, অনেক পিছিয়ে আছে।

আমি একেবারে হাল ছেড়ে না দিয়ে এবার বললাম, আমিও মাঝে মধ্যে এরকমটা ভাবি বটে। তা সত্ত্বেও আমি বলব, তুমিও অবশ্যই লক্ষ্য করেছ যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে নারীর বুদ্ধিমত্তা আর বোধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

জেফ পিটার্স আমার কথায় বারবার মাথা নেড়ে বলল, সত্যি করে বল তো তুমিও কি একই ধারণা পোষণ কর না? তবে একথাটাকে তো আর অস্বীকার করতে পারবে না সে, যেকোনরকম ফাঁকিবাজি বাটপাড়ির কাজে নারীর ওপর আস্থা রেখে তাকে অংশীদার করে নেওয়া সম্ভব 'কি? আমি জোর গলায়ই বলব, একাজে নারীর ওপর কিছুতেই নির্ভর করা যায় না।

আর কিছু, আর কিছু বলবে কি?

বলার তো অনেক কিছুই আছে, সাধ্যমত সংক্ষেপে বলছি লক্ষ্য করে দেখবে, তুমি যখনই কোন নারীর ওপর খুব বেশী রকম নির্ভর করে ফেলবে তখনই সে একজন পাকা সাধু বনে যাবে।

তুমি এত সব জানলে কি করে জেফ!

আরে ভায়া, এ হচ্ছে বাস্তব অভিজ্ঞতার ফসল। আমি একবার নারীদের বহুভাবে পরীক্ষা করে দেখেছি। আর তারই ফলে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

তারপর কি বলছি শোন, বিল হাম্বল নামে আমার এক দীর্ঘদিনের পুরনো বন্ধু ছিল। সে ছিল খুবই উচ্চাভিলাষী। সে মাঝে মধ্যেই রঙীন স্বপ্ন দেখে আত্মপ্রসাদ লাভ করত। একদিন সে দিবা-স্বপ্ন দেখল, যুক্তরাষ্ট্রে মার্শাল বনে গেছে। এরকম উদ্ভট কথাটা সে মনে মনে ভাবতও বটে।

অ্যান্ডি আর আমি তখন যুক্তরাষ্ট্রে বেতের লাঠির একটা ন্যায়সঙ্গত কারবারে লিপ্ত ছিলাম। সে আমাদের কাছে তার সে খোয়াব দেখা, মানে উচ্চাকাঙক্ষার কথা আমার কাছে প্রকাশ করল। ভাবনাটা আমার মাথায় চেপে বসল। আমি তার উচ্চাকাঙ্খাটাকে অলীক কল্পনা বলে উড়িয়ে না দিয়ে ভাবতে বসলাম, পিটার্স অ্যান্ডি টাকার কোম্পানির ব্যাপারে মার্শাল নিয়োগ সংক্রান্ত কাজে তাকে কিভাবে সাহায্য সহযোগিতা করা যেতে পারে।

একদিন বিল হাম্বল আমার কাছে এল। দু-চার কথায় কুশল সংবাদ আদান প্রদানের পর আমাকে বলল, জেফ, তুমি তো লেখাপড়া শিখেছ। বহু পুঁথিপত্র পড়ে বহু খবরাখবরই জান।

হ্যাঁ, একটু আধটু লেখাপড়া যখন শিখেছি তখন কোন কোন বিষয়ের খবরাখবর কিছু তো রাখিই, আর এ জন্যই আমাকে কোনদিন অনুশোচনায় জর্জরিত হতে হয়নি, স্বীকার করছি। তবে একথা তোমার জানা দরকার—'

কি? তোমার কথাটা কি?

মন দিয়ে শোন, শিক্ষাকে যারা নিঃশুল্ক জ্ঞান করে সস্তা করে তোলে আমি কিন্তু অবশ্যই তাদের দলভুক্ত নই। তোমাকেই একটা প্রশ্ন করতে চাই ভায়া,

প্রশ্ন? আমাকে? কি সে প্রশ্ন বল তো শুনি?

বল তো সাহিত্য আর ঘোড়দৌড়ের মধ্যে মানুষের কাছে কোন্‌টা সবচেয়ে বেশী মূল্যবান?

আরে ঘোড়দৌড়ের ব্যাপারটা তো—মানে আমার মতে কবি আর বড় বড় সাহিত্য সাধকদের সমতুল্য কেউ-ই হতে পারে না। অর্থাৎ সাহিত্যিকদেরই আমি সবার ওপরে স্থান দেবার পক্ষপাতি।

আমারও মত ঠিক তা-ই। তবে ধন-সম্পদের জগতে আর বিশ্ব-মানব প্রেমের আসরে পাকা মাথাওয়ালা লোকগুলো কেন ঘোড়দৌড়ের মাঠে ঢোকার সময় আমাদের কাছ থেকে দুটো করে ডলার কেন আদায় করে? আর একটা লাইব্রেরীতে ঢোকার সময় বিনা পয়সায়, মানে কোনরকম দর্শনী ছাড়াই ঢুকতে দেয়, কারণ কি?

দেখ, আমার জ্ঞান বুদ্ধি বহির্ভূত ব্যাপার নিয়ে তুমি কথা বলছ হে। আমার একান্ত ইচ্ছা তুমি ওয়াশিংটনে গিয়ে আমার জন্য একটা চাকুরি যোগাড় করে নিয়ে এসো। আমার সাফ কথা শোন, আমি খুবই সাধারণ একজন মানুষ। চাকরিটা আমার খুবই দরকার, চাই-ই চাই।

আমি গুম্ হয়ে বসে তার কথাগুলো শুনতে লাগলাম। বিল হাম্বল বলে চলল, তুমি হয়ত জেনেও থাকতে পার, আমার ছেলেমেয়ের সংখ্যা কম নয়। মে-র এক তারিখ আমি বিপাবলিকান

দলের খাতায় নাম লিখিয়েছি। আর বিদ্যাশিক্ষা সে-ও তো তোমাকে বলেইছি, পেটে সাতকিল মারলেও মুখ দিয়ে একটা অক্ষর বেরোবে না।

আমাকে নীরব দেখে সে চোখে মুখে বিরক্তিভাব প্রকাশ করে এবার বলল, তুমি যে একেবারে মুখে কলুপ এঁটে রইলে হে, কারণ কি? যাক যে কথা বলছিলাম, আমার চাকরি না পাওয়ার কোন কারণই আমি দেখতে পাচ্ছি না। আর আমি এ-ও বিশ্বাস রাখি, তোমার কারবারের অংশীদার মিঃ টাকারও তো ভালই বিদ্যাবুদ্ধির অধিকারী।

হ্যাঁ, তা বটে। মিঃ টাকার একজন বিদ্বান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি।

বলছি কি, তিনিও তো আমাকে সাহায্য করতে পারেন। প্রাথমিক খরচাপাতি আমিই বহন করব। ওয়াশিংটনে, গাড়িভাড়া আর মদের খরচখরচা বাবদ ব্যয় এক হাজার ডলার। আমি কথা দিচ্ছি, চাকরিটার ব্যবস্থা করতে পারলে আরও নগদ এক হাজার ডলার দেব।

আমার মধ্যে তেমন উৎসাহের লক্ষণ দেখতে না পেয়ে বিল হাম্বল বলল, কি হে, আমার কথাটা কি তোমার মনে ধরছে না?

আমি শুনছি, তোমার যা কিছু বলার নির্দ্বিধায় বলে যাও।

যাক গে, নগদ অর্থকড়ি যা দেব তা-তো তোমার কাছে বললামই। এরপর কি বলছি, ধৈর্য ধরে শোন, বাড়তি সুযোগের মধ্যে বারো মাসের জন্য হুইস্কি আমদানির রমরমা ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে।

বিল হাম্বল-এর কথা সবই শুনলাম। তারপর আমি চলে গেলাম অ্যান্ডির কাছে। বিল হাম্বল-এর ব্যাপারটা নিয়ে তার সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে শলা পরামর্শ করলাম। কথাটা সে-ও আগ্রহের সঙ্গেই নিল। আমরা একমত হয়ে সেটাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য ওয়াশিংটনের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

ওয়াশিংটনে পৌঁছে আমরা একটা হোটেলে উঠলাম। দক্ষিণ ডাকোটা এভিনিউতে সেটা অবস্থিত।

হোটেলে পৌঁছে চুরুট টানতে টানতে আমি অ্যান্ডিকে বললাম, অ্যান্ডি বিবেচনা করে দেন। আমাদের জীবনে সত্যিকারের সৎ কাজ করার সুযোগ এটাই প্রথম। তবে এ-ও সত্যি যে, আমরা কোনদিনই কাউকে ধরাধরি করতে অভ্যস্ত নই।

অ্যান্ডি চুরুটে একটা লম্বা টান দিয়ে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বলল, হ্যাঁ, এ ধরনের কাজে কিছুটা বদনাম তো ঘাড়ে নিলে চাপবেই।

তবে বিল হাম্বল-এর ব্যাপার আমরা জেনেশুনে হলেও কিছুটা বদনামের ভাগীদার হতে বাধ্য হচ্ছি। সত্যি কথা বলতে কি একটা ন্যায়সঙ্গত কাজের জন্য একটু আধটু বাঁকা পথ, মিথ্যার আশ্রয় নেওয়াটা তেমন কোন অপরাধ নয়। তবে আমি মনে করি, এমন একটা নিয়ম বহির্ভূত বিশ্রী কাজে পা-বাড়াতে হলে আমি মনে করি সহজ সরল এবং খোলাখুলি পথ ধরাই উচিত।

তবে তুমি কিভাবে কাজটা সারবে বলে মনস্থ করেছ?

আমি যা ভেবে রেখেছি তোমাকে খোলসা করেই বলছি, মোট অর্থ থেকে পাঁচশ' ডলার জাতীয় অভিযান কমিটির তহবিলে চাঁদা স্বরূপ জমা দিয়ে আমরা যদি রসিদ নিয়ে নি, তবে?

তাতে ফয়দা কি হবে বলে তুমি মনে করছ?

ওই রসিদটা প্রেসিডেন্টের টেবিলের ওপরে রেখে তারপর যদি বিল হাম্বল-এর প্রসঙ্গটা তার কাছে পাড়ি, তবে?

তারপর?

এতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে বলেই আমার বিশ্বাস। প্রেসিডেন্ট তো মানুষ হিসেবে খুবই ভাল।

এটা অবশ্য ঠিকই বলেছ। সবারই এক কথা। তিনি সুবিবেচক, আর ব্যবহারও নাকি খুবই অমায়িক।

তারপর কি বলছি শোন, আমরা আঁকাবাঁকা পথে ; পিছন দরজা দিয়ে না গিয়ে সহজ সরল ও ন্যায়সঙ্গত পথে অগ্রসর হচ্ছি জানতে পারলে তিনি যে সন্তুষ্ট হবেন এতে কিন্তু কিছুমাত্র সন্দেহের

অবকাশ নেই।

অ্যান্ডি আমার প্রস্তাবটাকে সানন্দেই গ্রহণ করল। তার পূর্ণ সমর্থন পাবার পর পরই আমরা হোটেলের করণিকের সঙ্গে আমাদের পরিকল্পনার প্রসঙ্গে আলোচনা করলাম।

আমাদের মুখে সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটা শোনার পর প্রৌঢ় করণিক কয়েক মুহূর্ত কপালের চামড়ায় গভীর চিন্তার ভাঁজ এঁকে গম্ভীর মুখে বসে রইল।

আমি তার মতামত জানতে চাইলে সে যা বলল তাতে আমরা বিমর্ষ মনে হলেও তার বক্তব্যকে মাথা পেতে নিলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে পরিকল্পনাটা খারিজ করে দিতে বাধ্য হলাম।

হোটেলের করণিক আমাদের পরামর্শ দিলেন, দেখুন আপনারা ঘোড়া ডিঙিয়ে খাস খাবার চেষ্টা করছেন।

আমি বললাম মঁসিয়ে আপনার পরামর্শ মাফিক আমরা তো আমাদের পরিকল্পনাটা থেকে সরেই এসেছি। এবার কাজটা হাসিল যাতে হয় তার পরামর্শ কিছু তো দেবেন।

আমার পরামর্শ যদি শোনেন তবে আমি বলব, ওয়াশিংটন শহরে কাজ যোগাড় করার পথ একটাই, আর তা হচ্ছে বিধান সভার কোন একজন মহিলা সদস্যের সাহায্য নেওয়া।

তাঁর নামটা দয়া করে বলবেন কি?

মিসেস আভেরি। ওপর তলার বহু ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর মেলামেশা ও হৃদ্যতার সম্পর্ক আছে।

কিন্তু তাঁর কাছে পৌঁছোবার উপায় কি?

হোটেলের করণিক আমাদের মিসেস আভেরি-র কাছে পৌঁছোবার রাস্তা বাৎলে দিলেন।

আমি আর অ্যান্ডি পরদিন সকাল দশটায় গাড়ি ভাড়া করে তার হোটেলে পৌঁছে গেলাম। তাঁর অনুমতি পেতেও দেরী হল না।

আমরা তাঁর বৈঠকখানায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর মিসেস আভেরি আমাদের কাছে এলেন। সত্যিকারের রূপের আকর বলতে যা বোঝায় তিনি ঠিক তা-ই। তার রূপের আভা চোখ ঝলসে দেয়। মনে হল, সারা বিশ্বের সৌন্দর্য রাশি বুঝি তার সর্বাঙ্গে জড়ো করা হয়েছে। তার চুলে যেন সোনার খনির আভা লেগে রয়েছে। চোখের মণি দুটো নীলাভ। সব মিলিয়ে তার মুখটা যেন যেকোন জুলাই ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদপট হবার মতই বটে।

আমাদের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে নিয়ে মিসেস আভেরি মুচকি হেসে বললেন, আপনারা কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছেন, জানতে পারি কি?

সাধ্যমত সংক্ষেপে অমরা বিল হাম্বল-এর প্রয়োজনের কথা তাঁর কাছে পাড়লাম। আর কাজটা হাসিল করার জন্য আমরা কত ডলার ব্যয় করতে পারি তা-ও বলতে বাদ দিলাম না।

আমাদের প্রস্তাবটা ধৈর্য ধরে শোনার পর মিসেস আভেরি আবার মুখ খুললেন, দেখুন, পশ্চিমের ওসব নিয়োগ খুবই সোজা বলেই আমি মনে করছি।

আমরা কিছুটা আশ্বস্ত হলাম। অত্যুগ্র আগ্রহান্বিত হয়ে তাঁর পরবর্তী বক্তব্য শোনার জন্য অধীর প্রতীক্ষায় রইলাম।

মুহূর্তের জন্য নীরবতার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে মিসেস আভেরি এবার বললেন, ব্যাপারটা সোজা হলেও আমাকে একটু ভাবার সুযোগ দিন। একটু ভেবে দেখি, কাকে দিয়ে কাজটা হাসিল করা যেতে পারে।

মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে নিয়ে মিসেস আভেরি আবার মুখ খুললেন, হাতের সামনে একাজের পক্ষে উপযুক্ত একজনকেই পাচ্ছি। তিনি হচ্ছেন, সেন্টের স্পাইরাই।

চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে তিনি বললেন, একটু অপেক্ষা করুন, আমার মেনু কার্ডে তার স্থানটা কোথায় দেখে নিচ্ছি।

টেবিলের কাছে গিয়ে 'এস', চিহ্নিত ড্রয়ারটা টেনে বের করলেন। সেটার ভেতরে হাতটা চালান করে দিয়ে কয়েকটা কাগজ বের করে নিলেন।

তারপর বললেন, হ্যাঁ, ঠিকই আছে। তাঁর নামের পাশে তারকা চিহ্ন আঁকাই আছে।

তারকা চিহ্নের অর্থ কাজের জন্য প্রস্তুত।

কাগজটার ওপর আবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স। দু'বার বিয়ে।

প্রেসবিটেরিয়ান, পছন্দ তলস্তয়, নীল অক্ষি, পোকার খেলা আর তৃতীয় বোতল মদেই আবেগ উচ্ছ্বাসে অভিভূত।

হাতের কাগজটা টেবিলে রেখে মিসেস আভেরি এবার আমাকে লক্ষ্য করে বললেন এবার আমি নিশ্চিত।

আমি তাঁর দিকে সামান্য ঝুঁকে অত্যুগ্র আগ্রহ প্রকাশ করে বলে উঠলাম, নিশ্চিত? কোন্ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত, দয়া করে বলবেন কি?

আমি নিশ্চিত যে, আপনার, মানে আপনাদের বন্ধু মিঃ বামার'কে আমি ব্রাজিলের মন্ত্রীর পদে বহাল করে দিতে পারব।

আমি তার কথাটা শুধরে দিতে গিয়ে বললাম, বামার নয়, হাম্বল—বিল হাম্বল। ব্রাজিলের মন্ত্রীত্ব নয়?

তবে আপনাদের প্রার্থনা যেন কি?

যুক্তরাষ্ট্রে মার্শালের পদটা পাইয়ে দেবার প্রার্থনা জানাতেই আমরা এতটা পথ ছুটে এসেছি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে বটে। যুক্তরাষ্ট্রের মার্শালের পদটার কথাই বলেছিলেন বটে। আসল ব্যাপার কি, জানেন? হাজারো কাজের ঝামেলায় সব সময় মাথা ঠিক রাখা সম্ভব হয় না মাঝে মধ্যে কোন কোন ব্যাপার মাথায় রাখা সম্ভব হয় না। আপনারা বরং একটা কাজ করুন।

বলুন, কি করতে হবে আমাদের?

আপাতত আপনাদের তেমন কিছু করার নেই। কেবলমাত্র আপনাদের সঙ্গে যে সব কাগজপত্র এনেছেন তা আমার কাছে জমা রেখে যান।

তারপর আমরা আবার কবে আপনার সঙ্গে দেখা করব?

চারদিনের মধ্যে আবার এখানে চলে আসা চাই, মনে থাকবে তো?

সে কী, দরকারটা তো আমাদের, আর অমরা ভুলে যাব! না কেবলমাত্র চারদিনের মধ্যেই এ-অফিসে এসে আমার সঙ্গে দেখা করা ছাড়া আপনাদের আর কিছুই করণীয় নেই।

আপনি তবে আশা দিচ্ছেন, যে করেই হোক আমাদের বাঞ্ছা পূরণ হবেই, এই তো?

দেখুন, আমি মনে করছি, ইতিমধ্যেই হিল্লে হয়ে যাবে।

মিসেস আভেরি-র কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে আমি আর অ্যান্ডি হোটেলে ফিরে এলাম। এবার থেকে শুরু হল মিসেস আভেরির তলব পাওয়ার অপেক্ষায় আমরা প্রহর গুণতে লাগলাম। অস্থিরচিত্ত অ্যান্ডি ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। আর সে সঙ্গে বাঁ-দিককার গোঁফের কোণাটাকে এমনভাবে কামড়াতে লাগল যে, তা আর বলার নয়।

অ্যান্ডি এক সময় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে বলল, জান, প্রখর বুদ্ধি আর অনন্যা রূপসী নারী বাস্তবিকই বিরল। বুদ্ধি আর রূপের এমন সমন্বয় সচরাচর নজরে পড়ে না। তুমি কি বলবে জানি না, আমার অন্তত এমন বিরল ব্যাপার দেখার সৌভাগ্য হয়নি।

আমি মুচকি হেসে বললাম-এর সঙ্গে কিসের তুলনা চলতে পার, জান?

চোখের তারায় কৌতূহল মিশ্রিত জিজ্ঞাসার ছাপ এঁকে সে বলে উঠল, কার? কিসের?

উপকথায় পাওয়া যায়, পাখির ডিম দিয়ে তৈরী ওমলেটের কথা। এটা তেমনই বিরল।

অ্যান্ডি এবার বলল, আমি তো মনে করি, এরকম একটা নারীর তো উচিত কোন একটা পুরুষকে উন্নতির চরম শিখরে উন্নত করে দেওয়া।

আমি চোখ দুটো কপালে তুলে বলে উঠলাম, আমার অভিজ্ঞতায় এমন কিছু দেখি নি বা শুনিনি যে, কোন নারী কোন একটা পুরুষকে চাকরি পেতে সাহায্য করেছে।

তবে কি তুমি মিসেস আভেরি-র কথার ওপর আস্থা রাখতে পারছ না?

আমার তো এখন পর্যন্ত বিশ্বাস হচ্ছে না।

তবে তুমি কি নিঃসন্দেহ যে, মিসেস আভেরি বিল হাম্বল'কে মার্শালের পদে নিযুক্ত করা সম্ভব হবে না?

আমি একথা বলছি নে। আমি সন্দেহবাদী হতে চাইছি না। তবে আমার সন্দেহ হচ্ছে যে, তুমি আর আমি কাজটাকে যত ভালভাবে করতে পারতাম তা এ মহিলার পক্ষে করা সম্ভব হবে কিনা।

না, তোমার মতকে আমি সমর্থন করতে পারছি নে, অ্যান্ডি বলল। আমি তোমার সঙ্গে বাজি ধরতে পারি, সে পারবে, অবশ্যই পারবে। দেখ, মহিলাদের ক্ষমতা সম্বন্ধে উচ্চধারণা পোষণ করি বলে আমি গর্বিত।

আমি আর অ্যান্ডি পূর্ব নির্দ্ধারিত সময়েই আভেরি-র হোটেল হাজির হলাম। সে অপরূপাকে আরও অনেক, অনেক বেশী সুন্দরী বলে মনে হল। তবে প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার থেকে শুরু করে পোষাক পরিচ্ছদ পর্যন্ত প্রতি ক্ষেত্রে তার রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

আমি তাঁর আপাদমস্তক কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখে নিলাম। সত্যি তাঁর রুচিবোধের জন্য বাহবা না দিয়ে পারা যায় না। তা সত্ত্বেও আমি যেন আমাদের বাঞ্ছা পূরণের ব্যাপারে তাঁর ওপর পুরোপুরি আস্থা রাখতে পারলাম। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, কেমন যেন একটা সন্দেহরোগ আমাকে পেয়ে বসল।

কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মিসেস আভেরি যখন যুক্তরাষ্ট্রের বড়সড় সিলমোহর করা একটা দলিল বের করে আমাদের সামনে রাখল তখন তাব বিপরীত দিকে বড় বড় সুন্দর হরফে লেখা নজরে পড়ল। দেখলাম তার গায়ে স্পষ্টাক্ষরে লেখা, 'উইলিয়ম হেনরি হাম্বল'। এবার আমার মনে কিছুমাত্র সন্দেহ তো রইলই না উপরন্তু যারপরনাই বিস্মিত না হয়ে পারলাম না।

মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে মিসেস আভেরী বললেন, দেখুন, আপনারা এটা পরের দিনই পেতে পারতেন। সত্যি বলছি, এটা যোগাড় করতে আমাকে এতটুকুও বেগ পেতে হয় নি। একবার মুখফুটে বলতেই, কাজ হাসিল হয়ে গেল। হোটেলে বসেই এটা আমি হাতে পেয়ে যাই।

আমরা দু'জনই বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

মিসেস আভেরি বলে বললেন, হ্যাঁ, কাজটা অনায়াসেই মিটে গেছে। এবার আমতা আমতা করে তিনি বললেন, কিন্তু একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমি এখন খুবই ব্যস্ত। বলতে সঙ্কোচ বোধ করছি, আপনাদের সঙ্গে এখন বেশী সময় দিতে পারছি না। আশা করি আমার এরকম আচরণের জন্য আমাকে—

আমরা প্রায় সমস্বরেই বললাম, না না, আমরা কিছু মনে করছি না। তা ছাড়া আপনি হাজারো কাজের ঝামেলায় সর্বদা ব্যস্ত থাকেন আমাদের তো আর অজানা নয়।

সে ভরসাতেই তো আশা রাখছি, আপনারা আমার এরকম অসৌজন্যতার জন্য আমাকে অবশ্যই মার্জনা করবেন।

মহিলাটি চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বললেন, 'একটা রাষ্ট্রদূতের পদ সম্প্রতি আমার হাতে বিবেচনাধীন আছে। আর আছে দু'-দু'টো কন্সালের পদ এবং ছোট ছোট পদের বহু আবেদনপত্র। আমার চোখের পাতা বন্ধ করার অবকাশটুকু পর্যন্ত নেই। আপনারা কিন্তু দেশে ফিরে গিয়ে মিঃ হাম্বলকে আমার পক্ষ থেকে অবশ্যই অভিনন্দন জনাবেন। এ পর্যন্ত বলে তিনি বেরোবার উদ্যেগ নিলেন।

আমি মিসেস আভেরি-র হাতে পাঁচশ' পাউন্ডের পুঁটুলিটা তুলে দিলাম। আর তিনি সেটা গুণলেন না । টেবিলের ড্রয়ার খুলে রেখে দিলেন।

মিসেস আভেরি-র হাত থেকে পাওয়া বিল হাম্বল-এর নিয়োগপত্রটা আমি কোটের বুক পকেটে ভরে নিলাম।

মিসেস আভেরি-র কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি আর অ্যান্ডি পথে নামলাম।

আর একটা বেলাও নষ্ট না করে আমরা দেশের উদ্দেশ্যে পা-বাড়ালাম। যাত্রা করার পূর্ব মুহূর্তে বিল হাম্বল'কে একটা টেলিগ্রাম করে দিতে ভুললাম না। তাকে জানালাম 'চাকরির নিয়োগপত্র পকেটে। বড় গ্লাসগুলো তৈরি রেখো।'

আমার আর অ্যান্ডির-র বুকেও তখন খুশির জোয়ার বয়ে চলেছে আরে ব্বাস, পথে আসতে আসতে অ্যান্ডি আমাকে সর্বক্ষণ জ্বালিয়ে মারল, মেয়েদের ব্যাপারে আমার জ্ঞান কত ক্ষীণ।

আমি উপায়ান্তর না দেখে স্বীকার করতে বাধ্য হলাম যে, মহিলাটি, মানে মিসেস আভেরী আমার ধ্যান ধারণাই কেবল বদলে দেন নি, একেবারে বিস্ময়ে হতবাক্ করে দিয়েছেন।

আমরা আরকানসাস-এর সীমান্তে পৌঁছলাম। আমার হঠাৎ কি খেয়াল হ'ল বিল হাম্বল-এর

নিয়োগপত্র কোটের পকেট থেকে বের করলাম। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়লাম। তারপর সেটাকে অ্যান্ডি-র দিকে বাড়িয়ে দিলাম।

অ্যান্ডি হাত বাড়িয়ে আমার কাছ থেকে সেটাকে নিল। সে-ও শেষ পর্যন্ত সেটা পড়ল। তার দিক থেকে কোন না কোন মন্তব্য আমি আশা করেছিলাম। কিন্তু সে ভাল মন্দ কিছুই বলল না।

বিল হাম্বল-এর জন্যই কাগজটা লিখিত। আর দলিলটা যে খাঁটি এ বিষয়ে সন্দেহ করার মত কিছুই নজরে পড়ল না।

তবে চাকরিটা? চাকরিটা বিল হাম্বল-এর আশানুরূপ তো হল না। তার একান্ত ইচ্ছা ছিল, যুক্তরাষ্ট্রের মার্শাল-এর পদটা। কিন্তু নিয়োগপত্র অনুযায়ী বুঝতে পারলাম, ফ্লা-র অন্তর্গত ডাড শহরের পোস্ট মাস্টারের পদে নিয়োগ করা হয়েছে। লিটল রকস্টেশন ট্রেন থেকে নেমে আমি আর অ্যান্ডি সোজা পোস্ট অফিসে চলে গেলাম। বিল হাম্বল-এর নিয়োগপত্রটা ডাক মারফৎ ঠিকানা অনুযায়ী পাঠিয়ে দিলাম।

আমরা আবার স্টেশনে ফিরে এলাম। এবার আমাদের গন্তব্যস্থল হচ্ছে উত্তর-পূর্বে, সুপিরিয়র হ্রদের নিকটবর্তী অঞ্চল।

ভবিষ্যতে আর এক মুহূর্তের জন্য বিল হাম্বল-এর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। আমি তার সঙ্গে দেখা করার জন্য ভেতর থেকে তাগিদ অনুভব করিনি।

জেফ পিটারস অ্যাজ এ পারসোন্যাল ম্যাগনেট

চার্লস্টন এফ. সি তার বইয়ের পাতায় পাতায় ভাত রান্নার যতরকম পদ্ধতির নাম উল্লেখ আছে, জেফ পিটার্সও অর্থোপজনের ঠিক তত রকম ধান্ধাই জীবনে করেছে।

জেফ পিটার্স-এর অর্থোপার্জনেব পরিকল্পনাগুলোর কথা শুনতে আমি বাস্তবিকই খুব আনন্দ পেতাম। তবে তার জীবনের প্রথম দিককার প্রয়াসগুলোর কথা শুনতে আমি সবচেয়ে বেশী আনন্দ পেতাম। প্রথম দিককার কথা বলতে তার জীবনের সেসব কাহিনী যখন সে পথের বাঁকে বাঁকে দাঁড়িয়ে কাশির পাচন আর ব্যথা-বেদনার মালিশ বিক্রি করে কোনরকমে দিন গুজরান, পেটের খোরাক যোগাড় করত। আর সে শেষ কানাকড়িটা নিয়েও নিশ্চিন্তে খেলায় মেতে যেত।

জেফ পিটার্সকে একটু খোঁচা মারলেই সে গড়গড় করে বলতে লাগত, আর্কান্‌সের ফিসার হলে আমি যখন থাকতাম তখন পায়ে দিতাম হরিণের চামড়ার চমৎকার সুট। পায়ে একজোড়া মোকাশিয়ান এক জোড়া বুট আর মাথায় পরতাম চওড়া একটা টুপি। মাথার লম্বা চুলগুলোর ডগাটুপিব ফাঁক দিয়ে উঁকি মারত। আরও ত্রিশ ক্যারাট হীরের একটা আংটি হাতে পরতাম যেটা আমি টেকসার্কানাব এক অভিনেতার কাছ থেকে স্মৃতির নিদর্শন হিসেবে পেয়েছিলাম।

আমি কৌতূহলাপন্ন হয়ে জেফ পিটার্স-এর মুখের দিকে তাকিয়ে ক্ষীণকণ্ঠে বললাম, আংটি? অভিনেতার কাছ থেকে হীরের আংটি উপহার?

আরে তবে আর বলছি কি? আমার কাছে কিন্তু এটা নিছকই একটা মামুলি ব্যাপার। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে আমাকে লক্ষ্য করে কথাটা ছুঁড়ে দিল। যাক গে, যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম, একসময় আমি একজন ভারতীয় বিখ্যাত চিকিৎসক বনে গিয়ে বেশ দু'পয়সা কামিয়ে নিয়েছিলাম। তখন আমি ডাঃ ওয়াঘ্-হু নাম ধারণ করে চুটিয়ে চিকিৎসা চালিয়ে গিয়েছিলাম।

চিকিৎসা পদ্ধতি?

মঁসিয়ে, আমার সাফ কথা, চিকিৎসা-পদ্ধতি বা বিদ্যাটিদ্যার ধার ধারতাম না। সবেধন নীলমণি একটামাত্র তেতো বড়ি সম্বল করেই আমি নবজীবনদায়ী চিকিৎসা চালিয়ে যেতাম। রোগব্যাধির জ্বালায় জর্জরিত হয়ে লোকে আমার কাছে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ত। আমি তেতো বড়ি বরাদ্দ করতাম। আশ্বস্ত হয়ে বাড়ি ফিরে যেত। কোন কোন ক্ষেত্রে রোগ নিরাময়ও হয়ে যেত।

তেতো বড়ির ব্যাপারটা কি, জানতে পারি কি?

সেটার আবিষ্কর্ত্রী ছিল চোক্‌ট জাতির এক সর্দারের রূপসী স্ত্রী। সে আকস্মিকভাবে একটা গাছ আবিষ্কার করেছিল। জীবনদায়ী গাছ গাছড়া আর জড়িবুটির সমন্বয়ে সে বিশেষ বড়িটা তৈরী করা হত। সেটাকে মোক্ষম দাওয়াইও বলতে পার।

কিন্তু বেশীদিন সে ওষুধটা বিক্রি করে অর্থোপার্জন করা সম্ভব হল না। আসলে ধানাই পানাইয়ে তো বেশীদিন মানুষকে সন্তুষ্ট রাখা যায় না।

ওষুধের কারবারটা ঢিমে হয়ে আসায় আমাকে অন্য কোন ব্যবসার কথা ভাবতেই হল।

তখন আমার পকেটে সম্বলমাত্র পাঁচটা ডলার।

একদিন যার উদ্দেশ্যে হাঁটতে হাঁটতে ফিসার হিল-এর ওষুধের দোকানে হাজির হলাম। আমার উদ্দেশ্য এবং মূলধনের কথা খোলাখুলি তাদের বললাম। আমার ব্যবহার এবং কথাবার্তায় মুগ্ধ হয়ে তারা আমার দিকে সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিল।

ফিসার হিল-এর ওষুধের দোকান থেকে আধা গ্রোস আট আউন্সের খালি বোতল ও কর্ক ধার পেয়ে গেলাম।

ওষুধের উপকরণাদি আর লেবেল আমার ঝোলাতেই মজুদ ছিল। আমি আবার রঙিন স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। সত্যি কথা বলতে কি, আমার জীবনের মোড় আবার কিছুটা ঘুরতে আরম্ভ করল।

আমি ওষুধ বানিযে বোতলে ছিপি ও লেবেল সাঁটার কাজে লেগে গেলাম। হোটেলে, আমার ঘরেই প্রচুর পরিমাণে কলের জল ছিল। ব্যস, ছিপি আর লেবেল সেঁটে টেবিলের ওপর সারি সারি বোতল সাজিয়ে ফেললাম। 'নবজীবনদায়ী তেতো সালসা।'

নকল ওষুধ? ধ্যুৎ! বাজে কথা। নিন্দুকেরা যা খুশি ভাবুক আমি কোনই তোয়াক্কা করি না। আমি তো অন্তত জানি আমার ওষুধে এতটুকুও বাটপাড়ি নেই।

দু'ডলার দামের সিঙ্কোনার আরক আমার ব্যাগে মজুত ছিল। আর ছিল এক ডাইম দামের এনিলিন। অতএব ওষুধের মান তো খারাপ হওয়ার কথা নয়। আর নকল মাল বলারও কোন সুযোগ নেই।

বিশ্বাস করুন, এক বিন্দুও বানিয়ে বলছি না। পরবর্তীকালে আমি যখনই সে সব শহরে গিয়েছি তখনই সেখানকার মানুষ হযে আমার কাছে ছুটে এসেছে। ওষুধের জন্য আমার কাছে ধর্ণা দিয়েছে। আপনিই বলুন তো, নকল মাল হলে ওষুধ না চেয়ে তো আমার পিঠের চামড়া গুটিয়ে ফেলার জন্যই তৎপর হ'ত নাকি?

যাক, যে কথা বলছিলাম, ওষুধ তৈরীর কাজ মিটিয়ে সে রাত্রেই আমি একটা মালগাড়ি ভাড়া করে ফেললাম। গাড়িতে ওষুধের বোতলগুলো সাজিয়ে নিয়ে পথের মোড়ে মোড়ে গাড়ি দাঁড় করিয়ে আমার মোক্ষম দাওয়াই জীবনদায়ী তেতো সালসা বিক্রি করতে মেতে গেলাম।

সত্যি কথা বলতে কি, পথের মোড়ে মোড়ে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ওষুধের গুণাগুণের বিবরণ দিতে আরম্ভ করামাত্র পথচারীরা গাড়ির চারদিকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত আমার কথাগুলো শুনতে লাগল।

ফিসার হিল শহরে তখন ম্যালেরিয়ার প্রকোপ চলছিল। পথে-ঘাটে কেবল হাত পা লিকলিকে আর ইয়া বড় পেটওয়ালা মানুষের মিছিল। এরকম একটা পরিস্থিতিতে ম্যালেরিয়া নিরাময়ের তেতো সালসা হাতে পাওয়ার অর্থই হচ্ছে স্বর্গটাকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে যাওয়া, ঠিক কিনা?

আমার দীর্ঘভাষণের মধ্যে সবচেয়ে বেশী করে বললাম, দুরারোগ্য ব্যাধি ম্যালেরিয়ার হাত থেকে অব্যাহতি পেতে হলে সবচেয়ে বেশী করে দরকার নিউমো-কার্ডিয়াক অ্যান্টি স্কোরসালসা। আমার বোতলে তো তা-ই আছে। অতএব কয়েক দাগ খেলেই ম্যালেরিয়া বাপ বাপ বলে পালাবার পথ পাবে না। ব্যস, তাতেই ভোজবাজির মত কাজ হল। প্রতিটা বোতলের জন্য পঞ্চাশটা সেন্ট করে নিয়ে চোখের পলকে সব কটা বোতল বেচে দিলাম।

সবে শেষ বোতলটা এক অত্যুৎসাহী ক্রেতার হাতে তুলে দিয়ে দাম বুঝে নিচ্ছি ঠিক তখনই অনুভব করলাম, কে যেন আমার কোটের পিছন দিকটা ধরে ছোট্ট একটা হেঁচকা টান দিল।

ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে দৃষ্টি ফেরাতেই বুঝতে পারলাম, কে সে এবং কি চায়? তার বুক পকেটের ওপরের জার্মান সিলভারের তারকা চিহ্নিত তকমাটাই আমাকে তার পরিচয় এবং আমার কর্তব্য

বাৎলে দিল। কোনরকম জিজ্ঞাসাবাদ না করেই আমি মুচকি হেসে পাঁচ ডলারের একটা বিল তার হাতে গুঁজে দিলাম। ব্যস, আমি আইনকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাতে পারলাম।

আর সে-ও আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে এটাই বুঝিয়ে দিল, এবার যা খুশি করতে পার, আইন তোমার পক্ষে আছে।

আমি আকাশের গায়ে চোখের মণি দুটোকে বুলিয়ে নিয়ে বললাম, একবারটি চেয়ে দেখ কনস্টেবল, আজকের রাতটা কী সুন্দর! একেই বলে, তারা ভরা আকাশ, তাই না?

আমার কথায় কান না দিয়ে সে তার ধান্ধার কথা শুরু করল, তুমি এসব কি শুরু করেছ?

আমি কিছু না বোঝার ভান করে তার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম। টু-শব্দটিও করলাম না।

সে আগের মতই গম্ভীর স্বরেই বলতে লাগল, ওষুধের নাম করে তুমি যে বে-আইনি মাল চালাচ্ছ তার পরিণাম কি জান?

বে-আইনি মাল? হ্যাঁ, এতে আইন তো একটু আধটু লঙ্ঘিত হচ্ছে, মিথ্যে নয়।

একটু আধটু! সিটি লাইসেন্স আছে কি? নাকি তুমি সব কিছু জেনে শুনে, আইনের তোয়াক্কা না করেই—

না, সিটি লাইসেন্স আমার নেই বটে। আসলে তোমাদের যে একটা শহর আছে তা-ই তো আমার জানা নেই।

চালাকি করার জায়গা পাও নি?

এতে তো চালাকির কিছু নেই। সেটা যদি নিতান্তই দরকার হয় তবে কালই একটা করিয়ে নেব।

কাল সিটি লাইসেন্স যোগাড় করলে কাজও কালই করবে।

তার মানে?

মানেটা তো খুবই পরিষ্কার। লাইসেন্স ছাড়া মাল বিক্রি করতে দেব না। সেটা যোগাড় না করা পর্যন্ত বিক্রি বন্ধ করে দেব।

শেষ পর্যন্ত হতচ্ছাড়াটা করলও তা-ই। আমাকে আর একটা মালও বিক্রি করতে দিল না। উপায়ান্তর না দেখে আমি গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে হোটেলে ফিরে গেলাম।

রাত্রে খাবার টেবিলে বসার আগে হোটেলের মালিকের সঙ্গে সিটি-লাইসেন্সের ব্যাপারে কথা বললাম।

আমার মুখে সবকিছু শুনে সে বলল, মঁসিয়ে ফিসার হিল-এ আপনার পক্ষে এ ওষুধ চালানো সম্ভব নয়।

আমি ভ্রূ কুঁচকে বললাম, চালাতে পারব না? কারণটা কি দয়া করে বলবেন কি?

কারণ একটাই, এখানকার একমাত্র চিকিৎসক ডাঃ হস্‌কিল মেয়রের নিকট আত্মীয়, শ্যালক।

কিন্তু তার সঙ্গে আমার ওষুধের কোন প্রতিযোগিতা নেই।

সে যা-ই হোক, কোন হাতুড়ে ডাক্তারকেই তাঁরা এখানে ব্যবসা করতে দেবেন না। আশা করি এবার বুঝতে পেরেছেন?

আমি কপালের চামড়ায় ভাঁজ একে বললাম, আপনার কথা যে একেবারে বুঝি নি তা নয়, কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে, ডাক্তারী বলতে যা বোঝায় আমি তো তা করি না। তাছাড়া আমার একটা ফেরি করার লাইসেন্স আছে। কেউ চাইলে তবেই শহরের লাইসেন্স করিয়ে নেই।

হোটেলের মালিক প্রসঙ্গটা চাপা দেবার চেষ্টা করে বলল, দেখুন চেষ্টা করে যদি সিটি লাইসেন্স করিয়ে নিতে পারেন।

প্রসঙ্গটা সেদিনের মত চাপা পড়ে গেল। আমিও আর কথা না বাড়িয়ে আহারাদি সেরে শুয়ে পড়লাম।

সকাল হল পোষাক পরে মেয়রের অফিসের দিকে হাঁটা জুড়লাম। এর-ওর কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারলাম, তিনি তখনও ওপর তলা থেকে নামেন নি। কখন যে নামবেন তা-ও কেউ বলতে পারল না।

মেয়রের দেখা না পেয়ে আমি হতাশ হয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে একটা চুরুট ধরিয়ে ভবিষ্যৎ কর্তব্য সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলাম।

একটু বাদেই হোটেলের বারান্দায় একটা অপরিচিত যুবক এল। একটা চেয়ার টেনে আমার কাছাকাছি বসল।

যুবকটার পরনে নীল সুট আর মাথায় বাদামী রঙের চওড়া একটা টুপি। চেয়ারে বসেই সে আমার কাছে সময় জানতে চাইল।

আমি ঘড়িটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললাম, সাড়ে দশটা। তার মুখের দিকে চোখ পড়তেই আমি বলে উঠলাম, আরে, আপনি তো অ্যান্ডি টাকার, তাই না।

হ্যাঁ। কিন্তু আপনি—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই আমি বললাম, আপনার সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় না থাকলেও আপনাকে আমি কাজের সময় দেখেছি।

লোকটা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল।

আমি বলে চললাম, আপনি তো দক্ষিণী রাজ্যগুলোতে কাজ করেন, ঠিক বলি নি?

হ্যাঁ। তা করি বটে।

আর আপনি বিরাট 'মদন সমারোহ'-র প্রদর্শনী করে বাজিমাৎ করেন।

হ্যাঁ, তা-ও সত্যি বটে।

আমি আপনাকে যখন দেখেছি তখন আপনার সঙ্গে ছিল, হীরের বিয়ের আংটি, বাগদান-আংটি, ডরোথি ভারবন, আলু পেষাই যন্ত্র আর এক বোতল ঠাণ্ডা সিরাপ।

ঠিক। ঠিকই বলেছেন।

আর আপনার এতগুলো জিনিসের দাম ছিল সাকুল্যে মাত্র পঞ্চাশটা সেন্ট, ঠিক বলি নি?

হ্যাঁ, আপনার প্রতিটা কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে।

অ্যান্ডি টাকারকে আমি মনে রেখেছি দেখে সে খুবই আনন্দিত হল। সোল্লাসে আমার সঙ্গে করমর্দন করল।

অ্যান্ডি টাকার মানুষ হিসাবে খুবই ভাল, অতুলনীয়। সে একজন সত্যিকারের ভ্রাম্যমান মানুষ, বরং বলা চলে তার চেয়েও বেশী কিছু।

সবচেয়ে বড় কথা অ্যান্ডি টাকার নিজের বৃত্তির ওপর শ্রদ্ধাশীল। আর শতকরা তিন শ' লাভ হলেই সে সন্তুষ্ট।

কথাবার্তার মাধ্যমে জানতে পারলাম, বাগানের বীজ আর বে-আইনি ওষুধপত্রের কারবারের বহু দিক থেকে বহু প্রস্তাবই তার কাছে এসেছে।

অ্যান্ডি কিন্তু প্রলোভনের শিকার হয় নি। বহু প্রলোভন দেখিয়েও বে-আইনি ব্যবসায় কেউ-ই তাকে ভেড়াতে পারে নি। তার মত ও পথ সর্বদাই সোজা। সহজ-সরল পথ থেকে সরে গিয়ে অর্থোপার্জনে কোনদিনই সে উৎসাহী হয় নি।

অ্যান্ডিকে পেয়ে আমার মনে একটু আনন্দই হল। তার সততা আমার আগ্রহকে অনেকাংশে বাড়িয়ে দিল। সত্যি কথা বলতে কি, আমি একজন অংশীদারের খোঁজে ছিলাম।

কথায় কথায় অ্যান্ডি-র কাছে প্রস্তাব পাড়লাম, দেখুন, আমার কারবারটা খুবই লাভজনক। কিন্তু আমার একার পক্ষে ঠিকঠাক ভাবে কারবার চালানো সম্ভব হচ্ছে না।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ, তাই তো আমাকে একজন অংশীদারের কথা ভাবতেই হচ্ছে। আপনি যদি আমার সঙ্গে অংশীদার হিসেবে কারবারে যোগ দেন তবে কারবারটাকে বাড়ানো যেতে পারে।

অ্যান্ডি আমার সঙ্গে কারবারে ভিড়ে যেতে রাজি হয়ে গেল।

আমি কোন কিছুই গোপন না করেই ফিসার হিল-এর সব বৃত্তান্ত তার কাছে তুলে ধরলাম।

সে মন্ত্রমুগ্ধের মত আমার মুখের কথা শুনতে লাগল। আমি তাব নীরবতার সুযোগ নিয়ে অনর্গল বলেই চললাম। এবার আমি জোলাপের মিশ্রণ আর স্থানীয় রাজনীতির ব্যাপার স্যাপার খোলসা করে তাকে বললাম।

অ্যান্ডি-র মুখে শুনলাম, সেদিন ভোরের ট্রেনেই সে এখানে এসেছে। আর তার পকেটের অবস্থাও বর্তমানে তেমন ভাল নয়।

আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলার পর কারবারের অংশীদার পাকা সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অ্যান্ডি কিছুক্ষণের জন্য বাইরে বেড়াতে চলে গেল।

কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে অ্যান্ডি আবার হোটেলে ফিরে এল।

আমি ঠায় বারান্দায় বসেই এতক্ষণ একের পর এক চুরুট টানছিলাম। অ্যান্ডি হোটেলে ফিরে আরাম আমার পাশের চেয়ারটাতেই বসল।

আমি পূর্বপ্রসঙ্গের জের টেনে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার প্রস্তাবটা সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছেন কি?

অ্যান্ডি বলল, হ্যাঁ, আপনার কারবারের অংশীদার হতে আমি রাজি।

আমাদের কথাবার্তা পাকা হয়ে গেল। আমরা পরস্পরের সঙ্গে করমর্দন সারলাম। উভয়েই খুশি।

পরদিন সকাল এগারোটায় হোটেলের বারান্দার ওই চেয়ারটায় বসে আমি আপন মনে চুরুট টেনে চলেছি। এমন সময় টম খুড়ো নামে-পরিচিত একজন হন্তদন্ত হয়ে হোটেলে ঢুকেই একজন ডাক্তারের খোঁজ করল। আর তাকে তার সঙ্গেই যেতে হবে গুরুতব অসুস্থ মেয়র জজ ব্যাংকস'কে দেখতে হবে।

আমি তার কথা শুনে কি জবাব দেব ভেবে না পেয়ে নীরবে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

লোকটা ঝটপট তৈরি হয়ে নেবার জন্য আমাকে তাড়া দিতে লাগল।

আমি অসহায় দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, আরে, আমি গিয়ে কি করব, বুঝতে পারছি না-তো!

কেন? রোগীকে দেখবেন, ওষুধপত্র যা লাগে ব্যবস্থা করবেন।

কিন্তু আমি তো আর ডাক্তার নই। আপনি বরং একজন ডাক্তারের কাছে যান।

সে চেষ্টা কি আর করি নি ভেবেছেন?

তারপর?

খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, ডাঃ ডক হস্‌কিন্স রোগী দেখতে বিশ মাইল দূরবর্তী এক গ্রামে গেছেন।

অন্য কেউ?

এ শহরে তিনিই সবে ধন নীলমণি—তিনিই একমাত্র ডাক্তার। আর এদিকে মেয়র জজ মাসা ব্যাংকস্-এর অবস্থাও খুবই সঙ্গীন।

তাই তো, একজন ভাল ডাক্তার—'

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আগন্তুক মাঝ বয়সী লোকটা বলে উঠল মেয়র জজ ব্যাংকস্-ই আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। বার বার বলে দিয়েছেন, যে করেই হোক আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে।

আমি আমতা আমতা করে বললাম, দেখুন, পরিচিত অপরিচিত যে-ই হোন না কেন, এক ভদ্রলোক গুরুতর অসুস্থ, অনায়াসেই দেখতে যাওয়া যেতে পারে।

যে চিন্তা করেই হোক আপনাকে নিয়ে যেতেই হবে।

ওই যে বললাম, একজন মানুষ হিসেবেই আমি আপনার সঙ্গে গিয়ে ওনাকে দেখে আসতে পারি।

দয়া করে তা-ই করুন।

আমি এক বোতল 'নবজীবন সালসা' কোটের পকেটে ঢুকিয়ে আগন্তুক মাঝ বয়সী লোকটির সঙ্গে পথে নামলাম।

পাহাড়ের ওপর মেয়রের বাড়ি। ছিমছাম দেখার মত বাড়িই বটে। শহরের মধ্যে সবচেয়ে দর্শনীয়—সেরা বাড়ি। বাড়ির ছাদটা ম্যানসার্ড।

বাড়ির সামনে দৃষ্টিনন্দন একটা বাগান। হরেক জাত আর রঙ্ ও আকৃতির কতই না ফুল ফুটে

রয়েছে। বাগানের দরজার কাছে, দু'দিকে দুটো ঢালাই লোহার কুকুর। তাকিয়ে দেখার মতই বটে।

পথ প্রদর্শকের পিছন পিছন আমি মেয়রের ঘরে ঢুকলাম। ঘরটা রীতিমত সুসজ্জিত।

মেয়র জজ ব্যাংক্স বিছানায় শুয়ে। কেবলমাত্র গোঁফ জোড়া আর পা দুটো ঢেকে তিনি স্থবিরের মত শুয়ে।

একটু আগেও মেয়র ভেতরে ভেতরে এত বেশী গোঙাচ্ছিলেন যে, গোটা সানফ্রান্সিস্কোই যেন সেখানে জড়ো হয়ে পড়েছে। তাঁর বিছানাব পাশেই এক যুবক জল হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখলাম।

মেয়র চাদরের ফাঁক দিয়ে কোন রকমে ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, ডক, আমি সত্যি মৃত্যু শয্যায়। মনে হচ্ছে, কঠিন কোন পীড়া আমার দেহে ভর করেছে। তোমার পক্ষে কি আমার রোগ নিরাময়ের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব নয়?

আমি বললাম, মেয়র, আমি কিন্তু এস.কিউ.লেপিয়ার-এর প্রত্যক্ষ ছাত্র নই।

মেয়র আগের মতই নীরব চাহনি মেলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আমি পূর্ব প্রসঙ্গের জের টেনে বলে চললাম, 'তাছাড়া আমি মেডিক্যাল কলেজে নিয়মিত পড়াশুনা করি নি। নিছকই একজন মানুষ হিসেবে যদি আপনার কোন কাজে লাগতে পারি সে ভরসাতেই আমি এখানে এসেছি। যে কেউ একজন রোগশয্যায়—'

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই মেয়র আগের মতই কাঁপা কাঁপা ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, 'ধন্যবাদ!'

এবার পাশে জলের কাপ হাতে দাঁড়িয়ে থাকা যুবকটার দিকে চোখের মণি দুটো ঘুরিয়ে মেয়র বললেন ডক ওয়াঘ-হু, ও আমার ভাই-পো মিঃ বিডল্। আমার যন্ত্রণা লাঘব কবার জন্য সে সাধ্যাতীত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার প্রয়াস সফল হয়নি।

কথা ক'টা একনাগাড়ে বলে মেয়র রীতিমত হাঁপাতে লাগলেন। কয়েক মুহূর্ত চোখ দুটো বন্ধ করে জোরে জোরে শ্বাস ক্রিয়া চালাতে আরম্ভ করলেন।

এক সময় তিনি প্রায় অস্ফুট উচ্চারণ করলেন 'উফ্!' তারপরই কোঁকাতে লাগলেন।

আমি দু'পা এগিয়ে মেয়রের বিছানার একেবারে গা-ঘেঁষে দাঁড়ালাম। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাঁর মুখাবয়বটাকে দেখলাম। তারপর তাঁর শিয়রে বসলাম। হাত বাড়িয়ে তার হাতটাকে টেনে নিয়ে আমার ওপর রাখলাম। নাড়িটা পরীক্ষা করলাম।

আমার হাতের স্পর্শে মেয়র আবার চোখ মেলে তাকালেন আমি বললাম, এবার আপনার জিভটা দেখান।

মেয়র সাধ্যমত জিভটাকে বের করে দেখালেন। তাবপর আমাব কথায় তিনি জিভটাকে ভেতরে নিয়ে পরবর্তী নির্দেশের জন্য আমার দিকে তাকালেন।

আমি তাঁর পেটের ডান দিকটা বার বার টিপে লিভারটা পবীক্ষা করলাম। তিনি দু'-একবার মুখটাকে একটু বিকৃত করলেন। বুঝলাম, লিভারে চাপ পড়ায় ব্যথা অনুভব করছেন। এবার চোখ দুটোর পাতা উল্টে চোখের মণি দুটোকে ভালভাবে দেখলাম। সবশেষে আবার তার মুখায়বের ওপর আমার মণি দুটোকে বুলিয়ে নিলাম।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, মহামান্য মেয়র, আপনি কতদিন যাবৎ অসুখে ভুগছেন?

মেয়র কোঁকাতে কোঁকাতে বললেন, 'ক'দিন ধরেই শরীরটা বিশ্বাসঘাতকতা করছিল। আসলে বিছানা নিয়েছি গতকাল রাত্রে। উফ্! কী যন্ত্রণা! ডক, যা হোক কোন একটা ওষুধ আমাকে দিন। আমি আর সহ্য করতে পারছি না! কি, দেবেন তো?

আমি এবার ঘাড় ঘুরিয়ে মেয়রের ভাইপো মিঃ বিডল্-এর দিকে তাকিয়ে বললাম, জানালায় খড়খড়িটা একটু তুলে ধরলে সুবিধে হয়।

সে বলল, জেমস খুড়ো, তোমার কি ব্যাপার বল তো? তোমার কি ডিম আর শূকরের মাংস খাওয়ার জন্য মন ছটফট করছে?

আমি মেয়রের মুখের দিকে আমার মুখটা নামিয়ে নিলাম। এবার তাঁর ডান দিকের কাঁধের ওপর কান রেখে পরীক্ষা করলাম। তারপর আমতা আমতা করে বললাম, মেয়র লক্ষণ খুব ভাল

মনে হচ্ছে না।

মেয়র ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, আপনার দ্বিধার কোন কারণ নেই ডক। আমার রোগটা কি, নির্দ্বিধায় বলতে পারেন।

দেখুন, আপনার কণ্ঠাস্থিত প্রদাহজনিত রোগের আক্রমণ হয়েছে। আর রোগটা খারাপ ধরনের

হায় ঈশ্বর! মেয়র রীতিমত আর্তনাদ করে উঠলেন। তারপব নিজেকে একটু সামলে নিে আবার বলতে শুরু করলেন, 'ডক, আপনি কি সেখানে মালিশ করার জন্য কোন ওষুধ বা অন্য কোন কিছু ব্যবস্থা করা কি আপনার পক্ষে সম্ভব নয়?

আমি টেবিল থেকে টুপিটা তুলে হাতে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম।

আমি দরজার চৌকাঠের কাছাকাছি যেতেই মেয়র কাঁপা কাঁপা গলায় উচ্চারণ করলেন, ডব আপনি আমাকে ফেলে রেখে চলে যাচ্ছেন না তো?

আমি চৌকাঠের কাছে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

মেয়র এবার বললেন, 'ডক, আপনি চলে যাবেন না। আমাকে মৃত্যুর জিম্মায় রেখে আপনি চলে যেতে পারেন না।'

যুবক বিডল্ বললেন ডাঃ হোয়া হো, সাধারণ মমতাবোধই কিন্তু একটা মৃত্যুপথযাত্রী মানুষকে এভাবে মৃত্যুর হাতে রেখে চলে যাবার পথে আপনাকে বাধা দেবে।

আমি ঘাড় ঘুরিয়ে তার দিকে তাকালাম।

মিঃ বিডল্ বলে চললেন, হ্যাঁ, ডাঃ হোয়া-হো, আপনার বিবেকই আপনার পথ আগলে দাঁড়াবে।

আমার ভুল নামটা শুধরে দিতে গিয়ে আমি ম্লান হেসে বললাম। ডাঃ হোয়া হো নয়, ডা ওয়াঘ-হু।

কথাটা বলেই আমি পিছন ফিরলাম। তারপর এক পা দু'পা করে এগিয়ে গিয়ে মেয়রের বিছানার পাশে দাঁড়ালাম। হাত তুলে ঝট করে আমার লম্বা চুলগুলোকে পিছন দিকে চালান দিয়ে দিলাম

এবার বললাম, মহামান্য মেয়র, একটা মাত্রই আশা আপনি করতে পারেন। হ্যাঁ, একটা মাত্র আশা। আমার জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে যা বোঝলাম তা হচ্ছে, ওষুধে আপনার কিছুই হবার নয়।

তার মানে? ব্যাপারটা একটু খোলসা করে বলবেন কি ডাঃ ওয়াঘ-হো? মিঃ বিডল্ বললেন

আমি বললাম, দেখুন, ওষুধপত্র যথেষ্ট উচ্চমানের হলেও তার চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী ব্যবস্থাও আছে।

ওষুধের চেয়েও শক্তিশালী ব্যবস্থা? মেয়র বললেন।

সেটা হচ্ছে, বৈজ্ঞানিক প্রদর্শন। আমি বলতে চাইছি, মারপারিনার ওপর মনের জয়লাভের কথা বলতে চাইছি।

মেয়র জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে আমার দিকে তাকালেন।

আমি বলে চললাম—হ্যাঁ, মারপারিনার ওপর মনের জয়লাভ। অসুস্থ বোধ করার সময় সে সময়কার ব্যথা-যন্ত্রণা ছাড়া অন্য কোন প্রকার ব্যথা-বেদনা, রোগ ব্যাধি বলে কিছু নেই। স্যার, এ বিশ্বাসে আপনাকে স্থির থাকতে হবে। সেটাই আপনাকে করে দেখাতে হবে।

দেখুন ডক, আপনার কথাটা ঠিক হৃদয়াঙ্গম করতে পারলাম না। মেয়র ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করলেন।

ব্যক্তিগত আকর্ষণশক্তির কথা অর্থাৎ যে অত্যাশ্চর্য খেলার কথা বলছি যাকে ব্যক্তিগত আকর্ষণশক্তি আখ্যা দেওয়া চলে। আমি মুচকি হেসে বললাম।

ব্যক্তিগত আকর্ষণশক্তি বলতে আপনি যা বোঝাতে চাইছেন তা কি আপনি দেখাতে পারবেন?

আপনার চোখে আমি একজন ফেরিওয়ালা, পথে পথে গরীব মানুষদের কাছে ওষুধ বিক্রি করে থাকি। এ কাজ করতে আপনি আমাকে দেখেছেনও বটে।

হ্যাঁ, কথাটা ঠিকই।

আমি যাদের কাছে ওষুধ বিক্রি করি তাদের ওপর আমি ব্যক্তিগত আকর্ষণশক্তি প্রয়োগ করি না।

কারণ? কেন করেন না।

কারণ একটাই, সে শক্তিকে তো ধূলায় টেনে নামানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিছুতেই পারি না?

মিঃ ডট, আপনি কি আমার ব্যামোর চিকিৎসা করতে সক্ষম?

ব্যামোর চিকিৎসা, মানে নিরাময়ের কথা বলতে চাইছেন তো?

হ্যাঁ।

মহামান্য মেয়র আমার কথাটা ধৈর্য ধরে শুনুন। চিকিৎসক বলতে যা বোঝায় আমি কিন্তু মোটেই তা নই।

চোখের তারায় অবিশ্বাসের ছাপ এঁকে মেয়র আমার দিকে তাকালেন। কিছু বলতে চেয়েও যেন বলতে পারলেন না।

আমি তার জিজ্ঞাসা নিবারণের জন্য এবার ব্যাপারটা আরও খোলসা করে বললাম হ্যাঁ, আমি ঠিকই বলেছি। চিকিৎসক আমি নই। ডাক্তারী আমি করিনা। তবে হ্যাঁ, আপনার জীবন রক্ষা করতে আমি আপনার চিকিৎসা করব।

কথাটা কেমন হল নাকি? চিকিৎসক নন, অথচ চিকিৎসা করবেন!

আমি চিকিৎসা করব আপনার দেহের নয়, আপনার মানসিক চিকিৎসার মাধ্যমে আপনাকে সুস্থ করে তুলব। তবে একটা কথা।

কথা? কি কথা?

কথাটা হচ্ছে, মেয়র হিসাবে লাইসেন্সের প্রশ্নটা যদি আপনি উত্থাপন না করেন।

আমি অবশ্যই তা করব না।মেয়র বললেন।

বহুৎ আচ্ছা।

তবে আপনি এক মুহূর্তও দেরী না করে আমাকে ব্যাধিমুক্ত করার জন্য যা করণীয় শুরু করে দিন। কারণ, আমার সেসব ব্যথা যন্ত্রণা আবার চাঙা হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে। যা করার শীঘ্র করুন ডট।

উভয় চিকিৎসা, মানে দুটো চিকিৎসার মাধ্যমেই আপনার রোগ নিরাময়ের গ্যারান্টি আমি দিচ্ছি। আর রোগ নিরাময় হলে আমার দাবী থাকবে আড়াইশ' ডলার, রাজী তো?

রাজী। আড়াইশ' ডলারই আপনাকে দেব, কথা দিচ্ছি।

বহুৎ আচ্ছা।

আড়াইশ' ডলার—আমার জীবনের অন্তত ততটা মূল্য আছে বলেই আমি মনে করছি। আপনি শীঘ্র চিকিৎসা শুরু করুন।

আমি এবার মেয়রের বিছানায়, তাঁর মাথার কাছে বসে পড়লাম। মেয়রও তাঁর চোখের মণি দুটোকে আমার মুখের ওপর স্থির করলেন।

আমি এবার বললাম, মাননীয় মেয়র, আপনার মনটাকে এবার রোগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলুন। মনে করুন, আপনার কোন ব্যামোই নেই, অসুস্থ নন। আপনার কোন মস্তিষ্ক, হৃদযন্ত্র বা কণ্ঠাস্থি—কিচ্ছু নেই। আপনার কোন ব্যামো, মানে ব্যথা যন্ত্রণা কখনও ছিল না। এখনও নেই। নিজের মনের ভুল স্বীকার করুন। শুধরে নিন।

মেয়র মুহূর্তকাল নীরব চাহনি মেলে আমার মুখের দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইলেন।

আমি এবার বললাম, মহামান্য মেয়র, এবার আপনি নিশ্চয়ই অনুভব করছেন, যে ব্যামো, মানে যে ব্যথা-যন্ত্রণা আপনার কোনদিন ছিল না তা ধীরে ধীরে আপনার মধ্য থেকে সরে যাচ্ছে, ঠিক কিনা?

মেয়র ঠোটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুললেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, মিঃ ডক, মনে হচ্ছে এখন আমি কিছুটা সুস্থ বোধ করছি। আমার বাঁ-দিকের ফোলা ভাবটাও যে সত্যিকারের ফোলা নয়—সম্পূর্ণ মিথ্যা এ বিষয়ে কিছু তো অন্তত বলুন।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ, এ ফোলাটাকে কিভাবে আমি ভুলতে পারব, নিশ্চিত মিথ্যে বলে মনে করতে পারব এ

ব্যাপারে কিছু বলুন। আমার বিশ্বাস, এবার আমি সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারব। আর কিছু শূকরের মাংস আর গমের কেক দিয়ে পরম তৃপ্তিতে আহার সারতে পারব।

মেয়র এবার তাঁর বাঁ-দিকের ফোলা জায়গাটা আমার দিকে ঘুরিয়ে শুয়ে পড়লেন।

আমি হাত বাড়িয়ে তাঁর ফোলা জায়গাটার ওপর ধীরে ধীরে তর্জনিটা বুলিয়ে দিতে লাগলাম। বার কয়েক মালিশ করার পর দৃঢ়তার সঙ্গেই বললাম, ভুল—এটাও তো আপনার মনের ভুল মেয়র। কই, ফোলা তো দেখা যাচ্ছে না। আর একটু আধটু ফোলা থেকে থাকলেও এখন আরে মোটেই নেই। দেখুন, নিজেই হাত বুলিয়ে দেখুন, ফোলা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মেয়র নির্দিষ্ট জায়গাটা বার কয়েক আঙুল বোলালেন। তারপর মুচকি হেসে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

আমি বললাম, কি ? কিছু পাচ্ছেন ? মনে হচ্ছে, ঘুমে আপনার চোখের পাতা দুটো বুজে আসছে, ঘুম পাচ্ছে। চোখের পাতা কিছুতেই খোলা রাখতে পারছেন না, তাই না ? এখন আপনার ব্যামোটাকে আটকানো গেছে, ব্যথা বেদনা উবে গেছে। এবার আপনি ঘুমিয়ে পড়ছেন, হ্যাঁ, এবার ঘুমে বিভোর হয়ে পড়েছেন।

মেয়র সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়লেন। এবার তাঁর নাক ডাকতে শুরু করেছে। তিনি গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলেন।

মেয়র নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে লাগলেন। আমি এবার ঘাড় ঘুরিয়ে মেয়রের ভাই-পো মিঃ বিডল-এর দিকে তাকিয়ে বললাম, আপনি নিশ্চয়ই আধুনিক বিজ্ঞানের সুফলটা প্রত্যক্ষ করলেন। এ ব্যাপারে আপনার মতামত—

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মিঃ বিডল্ বললেন, ভাল কথা, কিন্তু কাকাবাবুর চিকিৎসাটা আপনি কখন শুরু করছেন ?

আগামীকাল এগারোটার সময় আমি আবার মহামান্য মেয়রের সঙ্গে দেখা করব।

ইতি মধ্যে যদি—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই আমি বলে উঠলাম।

না, ইতিমধ্যে তাঁর আর ভাবান্তর ঘটার সম্ভাবনা নেই। তাঁর ঘুম ভাঙলে তাকে তিন পাউন্ড গো মাংস আর কয়েক ফোঁটা তার্পিন তেল দেবেন।

আমি মিঃ বিডল্-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পথে নামলাম।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর আমি ছোটখাটো কয়েকটা কাজ সেরে পূর্ব নির্দিষ্ট সময়ে মেয়রের বাড়ি হাজির হলাম।

সিঁড়ির কাছেই মিঃ বিডল্‌কে পেয়ে গেলাম, অতুগ্র আগ্রহান্বিত হয়ে বললাম, মিঃ বিডল, আপনার কাকার অবস্থা এখন কেমন? গতরাত্রে গভীর ঘুম হয়েছিল কি ?

হ্যাঁ, গভীর নিদ্রায় ডুবেছিলেন। মনে হচ্ছে এখন ভালই আছেন।

আমি মেয়রের বিছানায়, শিয়রে বসলাম। হাত বাড়িয়ে তাঁর নাড়ি পরীক্ষা করলাম। তারপর কণ্ঠাস্থি পরীক্ষা করলাম। তাঁকে সুস্থই মনে হল।

আমি তাঁর ওপর আর একটা চিকিৎসা চালালাম। ফল ভালই পাওয়া গেল। এবার মনে হল, তার শেষ ব্যথা বেদনাটাও উবে গেছে। আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

মেয়র আমার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

আমি মুখে হাসির প্রলেপ ফুটিয়ে তুলে বললাম, মহামান্য মেয়র, আপনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। আপনি নিজে কি মনে করছেন ?

মেয়র নীরবে মুচকি হাসলেন।

আমি বললাম, আরও দু-তিন দিন বিশ্রাম করুন, তবেই আপনি স্বাভাবিকতা ফিরে পাবেন। মেয়র, আমি যে সময় মত ফিসার হিল-এ হাজির হয়েছিলাম সেটা বড়ই উপকারে লাগল।

অবশ্যই। আপনি না এলে আমি হয়ত—

মেয়রকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই আমি বলে উঠলাম, একটা কথা কি জানেন মেয়র ? প্রথাগত চিকিৎসা, মানে ট্যাবলেট ক্যাপসুলে আপনার সে অবস্থার পরিবর্তন করা কিছুতেই সম্ভব

হ'ত না। আশা করি, আপনার অনুমান যে মিথ্যা তা প্রমাণিত হয়ে গেল। আর আপনার ব্যামো, মানে ব্যথা-বেদনা যে অলীক তা-ও হাতেনাতে প্রমাণ পেয়ে গেলেন, কি বলেন?

অবশ্যই! অবশ্যই! মেয়র হেসে বললেন,

আমি এবার অনুরূপ হেসে বললাম, মাননীয় মেয়র , এবার আমার পক্ষে যা আনন্দদায়ক সে ব্যাপারটা উত্থাপন করি, কি বলেন?

মেয়র হাসি থামিয়ে আমার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, আপনার পক্ষে আনন্দদায়ক, ব্যাপারটা কি খোলসা করে বলুন তো, শুনি?

মানে আমার ফি-টার কথা বলতে চাইছি—আড়াইশ' পাউন্ডের ব্যাপারটা। আর একটা অনুরোধ, দয়া করে চেক দেবেন না যেন।

চেকের প্রতি আপনার অনীহার কারণটা জানতে পারি কি?

কারণ, চেকের সামনে বা পিছনে, যে কোন দিকে আমার নামটা লিখতেই আমার অনীহা—ঘৃণা করি, বুঝলেন?

মেয়র আর কথা না বাড়িয়ে শিয়রের বালিশের তলায় হাত চালান করে দিলেন। সেখান থেকে একটা পকেট বই বের করে এনে বললেন, ডট, এর মধ্যেই আপনার বাঞ্ছিত নগদ টাকাগুলো আছে।

মেয়র এবার পকেট বইটার ভেতর থেকে পঞ্চাশ ডলারের পাঁচটা নোট বের করে গুণে হাতের মুঠোতে রাখলেন। মেয়রের ভাইপো বিড্‌ল মেয়রের বিছানার কাছেই দাঁড়িয়ে। মেয়র তাকে বললেন—রসিদটা নিয়ে এসো তো।

আমি রসিদে স্বাক্ষর করে সেটা মেয়রের হাতে ফিরিয়ে দিলাম। মেয়র পঞ্চাশ ডলারের নোট পাঁচটা আমার হাতে তুলে দিলেন।

এবার একটা রুগ্ন লোকের পক্ষে যা একেবারেই বে-মানান সে রকম হাসির রেখা মুখে ফুটিয়ে তুলে মেয়র বললেন, অফিসার, এবার আপনার কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করুন।

মেয়রের মুখের কথা শেষ হতে না হতেই মিঃ বিডল্‌ আমার হাতটা খপ্‌ করে চেপে ধরল।

আমি কিছু বলার আগে মিঃ বিড্‌ল বলে উঠল, ডাঃ ওয়াঘ হু ওরফে পিটার্স, আপনাকে গ্রেপ্তার করা হল।

আমি চোখ দুটো কপালে তুলে সবিস্ময়ে বলে উঠলাম, এসবের অর্থ কি, জানতে পারি কি মিঃ বিড্‌ল?

অবশ্যই। আপনি দেশের প্রচলিত আইন বিরুদ্ধ কাজ করেছেন। অর্থাৎ বিধান অনুযায়ী অনুমতি ছাড়াই চিকিৎসা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন মিঃ ওয়াঘ-হু।

আপনি, মানে আপনার পরিচয়টা জানতে পারি কি?

অবশ্যই, বিছানায় উঠে বসতে বসতে মেয়র বললেন, আমিই ওনার পরিচয় দিচ্ছি। ইনি রাজ্য চিকিৎসা সমিতির পক্ষ থেকে নিযুক্ত একজন গোয়েন্দা। আপনার অবশ্যই জানা নেই যে, পাঁচ পাঁচটা জেলায় ইনি আপনার পিছনে এঁটুলির মত লেগেছিলেন।

হুম্‌!

গতকাল ইনি আমার কাছে এসেছিলেন। আপনার ব্যাপারে কথা বললেন। আর তখনই আমরা আপনাকে খাঁচায় ভরার পরিকল্পনা করেছিলাম। মিঃ ফকির, সবশেষে এ-ও বলে রাখছি, ভবিষ্যতে আপনি কিন্তু ভুলেও আর ডাক্তারী করার চেষ্টা করবেন না, মনে থাকবে তো।

আমি মিঃ বিড্‌ল, আপনি কি সত্যি একজন গোয়েন্দা?

'হ্যাঁ। আপনাকে বেশী করে এবার শেরিফের কাছে হাজির করব।

হুম্‌! একবার সে চেষ্টা করেই দেখুন না মিঃ বিড্‌ল।

কথাটা বলেই আমি আচমকা তার গলাটা চেপে ধরে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলার চেষ্টা করামাত্র সে পকেট থেকে যন্ত্রচালিতের মত পিস্তলটা বের করে আমার থুৎনির নিচে চেপে ধরল।

মুহূর্তের মধ্যে আমি নিজেকে সামলে নিলাম।

বিড্‌ল আমার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল। তারপর আমার পকেট থেকে পাউন্ডের গোছাটা

ছিনিয়ে নিল। তারপর বেশ গম্ভীর স্বরেই বলল, জজ ব্যাংক্‌স, আপনি আর আমি যে নোটগুলিতে স্বাক্ষর করেছিলাম এগুলো সেই নোট আমিই তার সাক্ষী। আমি নিজে হাতে এগুলোতে শরিফের হাত তুলে দেব। আর রসিদটা তিনিই আপনার কাছে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবেন। এ সবই মামলার সময় কাজে লাগবে।

মিঃ বিড্‌ল-এর কথার জবাব দিতে গিয়ে মেয়র বললেন, তা-ই করবেন।

তারপর আমার দিকে ফিরে মেয়র বললেন মিঃ ওয়াঘ-হু, আপনার অবস্থা দেখে আমি কিন্তু সত্যি অবাক হচ্ছি। আরও কিছু ভোজ বাজির খেল দেখাচ্ছেন না কেন? আচ্ছা, আপনার চৌম্বক আকর্ষণের কর্কটাকে দাঁত দিয়ে কামড়ে খুলে ফেলে তুচ্ছ ওই হাত কড়াটাকে ফুস্‌ করে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারছেন না দেখে আমি কিন্তু অবাক হচ্ছি।

তাঁর কথার কোন জবাব না দিয়ে মিঃ বিড্‌লকে লক্ষ্য করে বললাম, অফিসার, কেন আর মিছে দেরি করছেন? তারপর মেয়রের দিকে তাকিয়ে বললাম, আমার ভোজবাজির খেল যা দেখাবার সময় মতই করব। তারপর হাত কড়াটাকে বার কয়েক নাচিয়ে ঠোঁট দুটো বাঁকিয়ে বললাম, মহামান্য মেয়র, অনতিবিলম্বেই সে দিনটা আসবে যখন আপনি না মেনে পারবে না যে, ব্যক্তিগত চৌম্বক আকর্ষণ একটা সফল পদ্ধতি।

তাই বুঝি? বিদ্রূপের সুরে মেয়র বললেন।

আমি রীতিমত দৃঢ়তার সঙ্গে বললাম, অবশ্যই, আর আপনিও নিঃসন্দেহ হবেন, এ-ক্ষেত্রে সেটা অবশ্যই সফল হয়েছে।

আমি তা-ই ভাবছি।

সদর দরজার কাছাকাছি গিয়ে আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ঘাড় ঘুরিয়ে বললাম, অ্যান্ডি, এবার একজন কারও সঙ্গে আমাদের দেখা হবে। তুমি না হয়, তাই? হ্যাঁ, এ তো সতি সত্যি অ্যান্ডি টাকার। ওটাও তারও পরিকল্পনা ছিল। আর এভাবেই আমরা দু'জনে যৌথ কারবার শুরু করার মত মূলধন যোগাড় করে ফেললাম।

দ্য চেয়ার অফ ফিল্যান্থ্রো ম্যালমেটিক্স

আমি কথা প্রসঙ্গে বললাম, আমি তো পরিষ্কার বুঝতে পারছি, শিক্ষা খাতেই পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলারের রাজকীয় অনুদান বরাদ্দ করা হয়েছে।

সান্ধ্য পত্রিকাগুলোর পাতা ঘেঁটে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা খবরগুলো যোগাড় করে টুকে রাখতে ব্যস্ত ছিলাম। তখন জেফ পিটার্স তার পাইপে তামাক ভরে আঙুল দিয়ে চেপে বসিয়ে দেবার কাজে ব্যস্ত ছিল। সে পাইপটা থেকে মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বলল। আর এর জন্য একটা বক্তৃতা মঞ্চ দরকার। আর তার জন্য বিশ্বপ্রেমঘটিত গণিতশাস্ত্র সম্বন্ধে ভাষণ দেবার মত উপযুক্ত একটা ছাত্রদল অবশ্যই প্রয়োজন।

তুমি কি এ কথার মাধ্যমে বিশেষ কোন প্রসঙ্গের ইঙ্গিত দিতে চাইছ?

অবশ্যই। আমি আর অ্যান্ডি টাকার যখন বিশ্বপ্রেমিক দলের সদস্য ছিলাম তখনকার ব্যাপার-স্যাপার সম্বন্ধে তোমাকে কিছুই বলা হয়নি, তাই না?

আমি একটু নড়েচড়ে বসে এবার বললাম। আট বছর আগে আরিজোনায় ঘটনাটা ঘটেছিল। দুই ঘোড়ায় টানা একটা মালগাড়ি নিয়ে আমি আর অ্যান্ডি রুপোর খোঁজে শিলা পর্বতে গিয়েছিলাম। অস্বীকার করব না, কিছু পরিমাণ রুপো আমরা পেয়েও ছিলাম। আর তা পঁচিশ হাজার ডলারের বিনিময়ে টাকসন-এর জনা কয়েক খদ্দেরের কাছে বিক্রিও করে দিয়েছিলাম। রুপোর পরিমাপে তারা আমাদের হাতে একটা ব্যাংক-চেক তুলেও দিয়েছিল। এক হাজার ডলার একটা বস্তা বোঝাই করে আমাদের দিয়েছিল।

' ডলারের বস্তাটাকে একটা মালগাড়িতে চাপিয়ে পূবদিকে প্রায় একশ' মাইল যাবার পর আমাদের বুদ্ধিটা চাঙা হয়ে গেল। কোন মঞ্চ অভিনেতার বেতনের পরিমাণ শুনবার সময় বা পেন্সিলভেনিয়া রেলওয়ের 'বার্ষিক' প্রতিবেদন পাঠ করার সময় পঁচিশ হাজার ডলারের পরিমাণটা খুব বেশী মনে হয় না। তবে কোন মালগাড়ির দরজা খুলে তুমি যখন বুট দিয়ে ইতস্ততঃ ঘা মারতে থাক তখন প্রতিটা আঘাতেই একটা ঝনঝন শব্দ উত্থিত হবে যাতে তোমার মধ্যে একটা ধারণা বদ্ধমূল হবে যে, তুমি একটা দিন-রাত্রির ব্যাঙ্কের জানালার কাছে অবস্থান করছ এবং সেখানকার দেওয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজল।

আমরা তৃতীয় দিন সকালে ছোট্ট একটা ছিমছাম সুদৃশ্য শহরে পৌঁছলাম। একটা পাহাড়ের সানুদেশে, মনোরম পরিবেশে শহরটা গড়ে উঠেছে। গাছগাছালি আর হরেক রঙ আর ঢঙের পাহাড়ে ফুল শহরটাকে ঘিরে রেখে তার সৌন্দর্যকে অনেকাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে।

যত দূর মনে পড়ছে শহরটার নাম ছিল ফ্লোরেসভিল। শহরটার জনসংখ্যা দু'হাজারের কাছাকাছি। আর তখনও তার গায়ে জালের মত রেলপথ ছড়িয়েছিল।

আর তখনও মশামাছি বা পূর্বে দেশের পর্যটকরা ভিড় জমাতে শুরু করে নি।

আমি আর অ্যান্ডি অর্থকড়ি যা ছিল সবই এসপেরাঞ্জা সেভিংস ব্যাঙ্ক-এ পিটার্স ও টাকার-এর নামে জমা দিয়ে দিলাম। তারপর স্কাইভিউ হোটেলে ঘর ভাড়া নিলাম।

নৈশভোজ সেরে আমরা হোটেলের গ্যালারিতে বসে চুরুট ধরিয়ে পরম তৃপ্তিতে টানতে আরম্ভ করলাম।

ফুরফুরে বাতাসে চুরুট টানার সময়ই আমাদের মনে বিশ্বপ্রেমের পরিকল্পনাটা দানা বাঁধল। আমার মনে হয়, যারাই টাকা লগ্নির কারবার করে তারাই মাঝে মধ্যে এ-নেশার শিকার হয়ে পড়ে।

জনগণের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করে কেউ যখন কিছু অর্থকড়ি বাগিয়ে নিতে পারে তখনই একটা আতঙ্ক তার মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। আর তখনই সে অর্থের কিছু পরিমাণ ফিরিয়ে নেবার জন্য মানসিক চাঞ্চল্য অনুভব করে।

একটু অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে তুমি যদি ব্যাপারটা লক্ষ্য কর কিভাবে তার জ্ঞাতব্য কর্মটা বলছে তবেই তোমার চোখের সামনে ভেসে উঠবে যাদের কাছ থেকে সে অর্থগুলো পেয়েছিল তা তাদের মধ্যেই বিলিয়ে দেবার জন্য সে উৎসাহী। উদাহরণ হিসাবে মনে করা যাক, একজন যে সব গরীব ছাত্রদের কাছে তেল বিক্রি করে লক্ষাধিক ডলার রোজগার করল যারা রাত্রি জাগরণের মাধ্যমে রাজনীতিভিত্তিক অর্থনীতি নিয়ে বিদ্যাচর্চা করে। এরকম ক্ষেত্রে লক্ষিত যে, তার বিবেক চৈতন্যরূপ অর্থকড়ি কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দিকেই ছুটে যায়।

আর মনে কর খেটে খাওয়া গরীব মানুষদের কাছ থেকে কেউ অর্থকড়ি যোগাড় করল। সে ক্ষেত্রে তার অনুশোচনার হাত বাক্সের অর্থকড়ি সে লোকগুলোর কোটের পকেট ছাড়া অন্য কোথায় গিয়ে আশ্রয় নিতে পারে?

তাই তো সে আশি মিলিয়ন ডলার খরচ খরচা করে কয়েকটা গ্রন্থাগার তৈরী করে দেয় আর তার সুবিধাটা লাভ করে সেসব দিন মজুর যারা নিজেদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সেসব বাড়ি তৈরী করে।

এখন বরং এ সব কথা থাক। আবার সে পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক। অগাধ অর্থের মালিক হওয়ার পর আমার মধ্যেও বিশ্বপ্রেমের রোগ সংক্রামিত হল।

আমি আর অ্যান্ডি সেবারই প্রথম এমন অগাধ অর্থের মালিক হয়ে গেলাম যে সে কাজ বন্ধ করে আমাদের উভয়ের মধ্যে ভাবনার উদয় হল যে, কিভাবে অর্থগুলো আমরা উপার্জন করেছি।

আমাদের মধ্যে তখন যে কথোপকথন হয়েছিল তা হল—

আমি অ্যান্ডি-র দিকে সামান্য ঝুঁকে বললাম, আরে ভায়া, আমরা তো এখন রীতিমত ধনকুবের বনে গেছি। তবে এ-ও সত্য যে, সাধারণ মানুষের ধ্যান ধারণাকে অতিক্রম করে যেতে পারি নি।

অ্যান্ডি মুচকি হেসে আমাকে সমর্থন করল।

আমি এবার বললাম, আমরা প্রচুর অর্থের অধিকারী তো হয়েছি। তাই আমাদের ভবিষ্যৎ কর্তব্য সম্বন্ধে নানা চিন্তা ভাবনা মাথার মধ্যে ভিড় করছে।

অ্যান্ডি অত্যুগ্র আগ্রহ প্রকাশ করে বলে উঠল, ভাবনা চিন্তা করে কোন পথ বের করতে পেরেছ?

হ্যাঁ, আমি ভেবে স্থির করেছি, মানবতার জন্য কিছু না কিছু করা দরকার।

জেফ, আমিও এরকমই কিছু একটা করা দরকার চিন্তা করেছি। বিভিন্ন কায়দা কৌশল করে আমরা অগাধ অর্থের মালিক হয়েছি। অতএব সে অর্থের কিছু পরিমাণ তো খরচ করাও উচিত।

অ্যান্ডি-র কথা আমার মনঃপুত হল কিনা ভেবে সে আমাকে বলল, আমার কথা তো শুনলে, তুমি কিছু ভাবনা চিন্তা করেছ কি? যদি তোমার মাথায় কোন মতলব এসে থাকে তবে বল?

আমাকে নীরব দেখে অ্যান্ডি নিজেই আবার মুখ খুলল, 'তুমি কি খেটে-খাওয়া গরীব মানুষদের বিনা পয়সায় খাওয়ানোর চিন্তা করেছ, নাকি জর্জ কোর্টেলু'কে হাজার দুই ডলার পাঠিয়ে দেওয়া মনস্থ করেছ? যদি এরকম কিছু ভেবে থাক তবে—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে আমি বললাম, আরে ধ্যুৎ, এ সবের কোনটাই আমার মাথায় আসে নি।

তবে?

আমাদের হাতে এমন অগাধ অর্থ এসেছে যে, গরীব মানুষদের দান করার কথা আমরা ভাবতে পারি না।

তবে কোন চিন্তা তুমি করেছ?

সবই বলছি শোন, তারপর যা ভেবেছি সেটা হচ্ছে, অর্থকড়ি সে পথে আমাদের পকেটে এসেছে সেগুলোকে সে পথে ফিরিয়ে দেবার মত যথেষ্ট পরিমাণ অর্থও তা নয়। তবে সেটা কোন পথ, তাই না?

আরে ভায়া, সেটাই তো আমি জানতে চাইছি।

অতএব সে দুটো পথের মাঝামাঝি একটা পথ অবলম্বনের কথা আমাদের ভাবতে হবে।

আমরা দু'জনে পরদিন ফ্লোরেসভিল-এর পথে হাঁটতে হাঁটতে অগ্রসর হচ্ছিলাম। তখন এক সময় হঠাৎ আমাদের নজরে পড়ল পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত লাল ইটের তৈরী একটা চমৎকার বাড়ি। অনুসন্ধিৎসু নজরে তাকিয়ে অনুমান করলাম, বাড়িটায় কেউ থাকে না।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে মনোলোভা বাড়িটার দিকে আরও কিছুটা অগ্রসর হয়ে পথচারীদের একজনকে বাড়িটার প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ করলাম। তার মুখে জানতে পারলাম, বছর কয়েক আগে কোন এক খনি মালিক বহু অর্থ ব্যয় করে পাহাড়ের ওপরে ওই বাড়িটা তৈরী করিয়েছিলেন। বসবাসের জন্যই সে বাড়িটা তৈরী করিয়েছিল। কিন্তু বাড়িটা তৈরীর কাজ যখন শেষ হল তখন সে হিসাব নিকাশ করে দেখল, বাড়িটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে মনের মত করে তোলার জন্য তার হাতে আর মাত্র ২.৮০ ডলার অবশিষ্ট আছে। তাই সে ডলার ক'টা দিয়ে হুইস্কি খেয়ে বাড়িটার ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ল। ব্যস, খতম। তারপর এখন সে টুকরো টুকরো হয়ে সেখানেই চিরনিদ্রায় কাল যাপন করছে।

আমরা দু'জনই, মানে আমি আর অ্যান্ডি একই ধারণার শিকার হয়ে পড়লাম।

আলোচনার মাধ্যমে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, বাড়িটা কিনে আমরা এটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে মনের মত করে তুলব। কিভাবে? কলম দানি আর অধ্যাপকদের দিয়ে।

আমরা এ-ও স্থির করে ফেললাম, সামনের ছোট্ট জমিটাতে একটা লোহার কুকুরের মূর্তি বসিয়ে দেব। আর? আর ফাদার জন ও হারকিউলিস-এর দুটো মূর্তিও স্থাপন করব। আর সেখানেই গড়ে তুলব পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ একটি বিনাবেতনে অধ্যয়ন করার জন্য বিদ্যালয়।

আমরা এগিয়ে গিয়ে ফ্লোরেসভিল-এর স্থানীয় অধিবাসী বিশেষ করে গণ্যমান্য লোকদের সঙ্গে বাড়িটার প্রসঙ্গে কথা বলে খোঁজ খবর নিলাম। আমাদের মতলবটার তারিফ করল তারা।

স্থানীয় গণ্যমান্য লোকরা আমাদের সম্মানে ভোজসভার আয়োজন করল। আমরাও তাদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে বাড়িটা কেনার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিলাম।

ভোজ-সভায়ই অ্যান্ডি নিম্ন মিশরের জলসেচ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে দেড় ঘণ্টা ধরে ভাষণ দিয়ে দিল।

ব্যস, আমরা বাড়িটা কিনে নিয়ে মানবপ্রেমমূলক কাজে নিজেদের লিপ্ত করতে একটা দিনও দেরী করলাম না।

শহরের মানুষদের মধ্যে যারা একটা মই আর হাতুড়ির পার্থক্য সম্বন্ধে জ্ঞান আছে এমন সব

লোককে আমরা বাড়িটার সংস্কার করে সাজিয়ে গুছিয়ে তোলার জন্য কাজে লাগিয়ে দিলাম। তাদের ওপর প্রথম দায়িত্ব দিলাম, সভা-কক্ষ আর শ্রেণী-কক্ষে বাড়িটাকে দুটো ভাগে বিভক্ত করে ফেলা। এক মালগাড়ি বোঝাই টেবিল, গণিতের বই, অভিধান, স্লেট, তারপর অধ্যাপকদের জন্য চেয়ার, কঙ্কাল, ফুটবল, উঁচুশ্রেণীগুলোর জন্য গাউন, আর টুপি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষা-সহায়ক সামগ্রী সত্বর পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা ফ্রিস্কোতে টেলিগ্রাম করে দিলাম।

কিন্তু হতচ্ছাড়া টেলিগ্রাফ অপারেটরটা এমনই আনাড়ি ছিল যে, সে যে কি শুনল আর কি-ই বা লিখল তা সে-ই জানে। কিন্তু কার্যত যা ঘটল তা অবাক হওয়ার মত ব্যাপারই বটে। মালগাড়ি থেকে নামানো হল ঘোড়ার গা আঁচড়াবার একটা ব্রাশ আর এক টিন মটরশুঁটি—ব্যস।

এটিকে সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলোর পাতায় পাতায় আমার আর অ্যান্ডির ছবি আর মনোজ্ঞ প্রতিবেদন ছাপা হতে লাগল।

এবার ছ'জন অধ্যাপককে যতশীঘ্র সম্ভব পাঠিয়ে দেবার জন্য আমরা শিকাগোর কর্মসংস্থান অফিসে টেলিগ্রাম পাঠালাম। আরও জানালাম, একজন মৃতভাষাসমূহের বিশেষজ্ঞ, একজন ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক, একজন ন্যায়শাস্ত্রবিদ, একজন রাজনীতিভিত্তিক অর্থনীতিবিদ্, একজন ডেমোক্রাট, একজন সঙ্গীতজ্ঞ ও চিত্রশিল্পী আর একজন রসায়নের অধ্যাপককে যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বেতন দেওয়া হবে আটশ' থেকে সাড়ে আটশ'র মাঝামাঝি। আর টেলিগ্রাম মারফৎ এ-ও জানিয়ে দিলাম, এস্‌পেরেঞ্জা ব্যাঙ্ক বেতনের জন্য জামিন থাকবে।

বহু চেষ্টার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়টাকে মোটামুটি গড়ে তোলা হল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সদর-দরজার গায়ে একটা ফলকে বড় বড় হরফে লিখে দেওয়া হল—'বিশ্বের বিশ্ব বিদ্যালয়'।

তারপর সেপ্টেম্বরের এক তারিখে যখন একটা বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ভর্তির কথা প্রচার করা হল তখন থেকেই দু'-চারজন করে শিক্ষার্থী আসতে লাগল।

প্রথম শিক্ষার্থীর দলটা টাকসন থেকে আগত ত্রি-সাপ্তাহিক এক্সপ্রেসে ট্রেনে এসে নামল। তাদের প্রায় সবাই যুবক। সবার চোখে-মুখেই উচ্চাকাঙ্খা আর খাদ্যের আকাঙ্খার ছাপ সুস্পষ্ট। আমরা রাজ্যের সবগুলো খবরের কাগজে সদ্য গড়ে-তোলা বিশ্ববিদ্যালয়টার বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। ফলে চারদিক থেকে দলে দলে কাতারে কাতারে শিক্ষার্থীরা এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে ভিড় করতে লাগল।

দেশবাসী খবরের কাগজের পাতার বিজ্ঞাপন পড়েই দেশের মানুষ যে এমনভাবে সাড়া দেবে তা সত্যি আমাদের কল্পনাতীত ব্যাপারই ঘটল বটে।

আঠার বছর বয়সের থেকে শুরু করে মুখে গোঁফের রেখা দেখা দেওয়া বয়সের পর্যন্ত দু'শ' উনিশটা ছাত্র বিনা বেতনে শিক্ষাদানের বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় এসে ভিড় করল।

শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদ্র-রঙ আর নীল রঙের পতাকা নিয়ে পায়ে পা মিলিয়ে পথে পথে মিছিল করে বেড়াল। ফ্লোরেসভিল শহরের প্রতিটা অঞ্চল যেন নতুন প্রেরণা নিয়ে জেগে উঠল। সম্পূর্ণ শহরটা যেন উৎসবে উজ্জীবিত হয়ে গেল। অ্যান্ডি এক মনোজ্ঞ ও সারগর্ভ ভাষণ দিল।

অধ্যাপকরা সপ্তাহ দুই-এর মধ্যে ছাত্রদের ঝাড়াই বাছাই করে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী পৃথক পৃথক শ্রেণীকক্ষে পাঠিয়ে দিল।

আমি অন্তত মানতে রাজি নই যে একজন বিশ্বপ্রেমিক হওয়ার চেয়ে অন্য কিছুতে এমন অনাবিল আনন্দ লাভ করা যেতে পারে। ফ্লোরেস্‌ভিল গেজেটের দু'জন প্রতিবেদককে আমি আর অ্যান্ডি বাজীকরের পুতুলের মত নাচিয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগলাম।

প্রতি সপ্তাহে দু'দিন করে অ্যান্ডি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দান করতে লাগল। তখন চারদিকে আমাদের সে কী কদর তা ভাষায় বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়। এবার গেজেট-পাতায় আমার আর অ্যান্ডির কাট-আউট ছবি ছাপা হল। তার একপাশে ছাপা হল, মার্শাল পি. ওয়াইল্ডার আর আবে লিংকন-এর ছবি।

অ্যান্ডি আমার বিশ্ব প্রেমের প্রতি উৎসাহ-উদ্দীপনা সমান। উভয়ে রাত্রি জেগে বিশ্ববিদ্যালয়ের

উন্নতির জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা করতে লাগলাম।

আমি একদিন অ্যান্ডিকে বললাম—শোন, আমরা কিন্তু একটা ব্যাপার লক্ষ্য করিনি। আসলে সেদিকটা আমাদের কারো মাথায়ই আসে নি।

অ্যান্ডি অত্যুগ্র আগ্রহ প্রকাশ করে বলল—কি? কোন্ ব্যাপারটা বল দেখি?,

শিক্ষার্থীদের জন্য একটা 'ডর্মিটরি'-র ব্যবস্থা রাখা দরকার ছিল, তাই না?

আরে, ব্যাপারটা একেবারেই কারো মাথায়ই ঢোকে নি। এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তো আমাদের অবশ্যই ভুল হওয়া উচিত হয়নি। ডর্মিটরি না থাকলে ছাত্ররা শোবে কোথায়?

যে, যা-ই বলুক না কেন, আমাদের হাতে-গড়া বিশ্ববিদ্যালয়টা কিন্তু সব দিক থেকে দ্রুত সাফল্যের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। পাঁচ-পাঁচটা রাজ্য আর অঞ্চল থেকে শিক্ষার্থীরা এল। ফ্লোরেসভিল শহরে রীতিমত সাড়া পড়ে গেল। যাকে বলে একেবারে হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার।

বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরেই গড়ে উঠল নতুন ও বড়সড় একটা শুটিং গ্যালারী, নতুন দুটো সেলুন আর একটা বন্ধকী দোকান।

সত্যি শিক্ষার্থীদের আচার আচরণ ও কথাবার্তা সবদিক থেকে চমৎকার। সবচেয়ে বড় কথা, অ্যান্ডি আর আমাকে নিয়ে তাদের গর্ব অন্তহীন। তারা প্রতি মুহূর্তে পঞ্চমুখে আমাদের সুখ্যাতি করতে লাগল। সত্যি কথা বলতে কি, তারা যেন আমাদের পরিবারেরই সদস্য।

সেটা ছিল অক্টোবরের শেষের দিককার একটা দিন। সেদিন অ্যান্ডি আমার কাছে এল। সংক্ষেপে শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল—তোমার কাছ থেকে একটা কথা জানার জন্য ছুটে এলাম।

আমি ভ্রূ দুটো কুঁচকে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম—কি? কি কথা জানার জন্য তুমি এমন ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসেছ, বল তো অ্যান্ডি?

আরে ধ্যুৎ! ব্যস্ততা আবার কিসের। ব্যাপারটা জানা দরকার মনে করেছি তাই চলে এলাম। যাকগে, আমি জানতে চাইছি ব্যাঙ্কে আমরা কি পরিমাণ টাকাকড়ি রেখেছিলাম তোমার মনে আছে কি?

আমি অনুমানের ওপর নির্ভর করেই তার প্রশ্নের জবাব দিলাম—ষোল হাজার পাউন্ড বা তার সামান্য কম-বেশী হবে।

আমাদের এখন উদ্বৃত্ত আছে ৮২১ ৫২ পাউন্ড।

কথাটা শোনামাত্র আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার যোগাড় হল। আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রায় আর্তনাদ করে উঠলাম—তুমি এটা বলছ কী অ্যান্ডি! তবে তুমি বলতে চাইছ, ওই নচ্ছাড় ঘোড়া-চোরের বাচ্চারা আমাদের এমন করে রক্তচোষার মত চুষে নিয়েছে। কী সর্বনেশে কথা!"

অ্যান্ডি বলল—তা-তো নিয়েছেই।

তবে তো আজই বিশ্বপ্রেমের গঙ্গাযাত্রা করিয়ে দিতে হয় হে।

তুমি যে কী হতাশা-জ্বরে ভোগ আমার মাথায়ই আসে না বাপু।

এমন সর্বনাশা কথায় হতাশ হব না, বলছ কী অ্যান্ডি।

যা বলছি মাথা ঠাণ্ডা করে শোন। আমাদের পরিকল্পনাটাকে একটু ঘুরিয়ে নিতে হবে এই যা।

হেঁয়ালি রেখে যা বলতে চাইছ খোলসা করে বল।

বলছি, আমরা যদি বিশ্বপ্রেমের ব্যাপার-স্যাপারকে একটা ভাল ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে নিই তবে এটা অচিরেই সেরা লগ্নি হয়ে দাঁড়াতে পারবে।

ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান।

আরে বাবা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। ঠিক আছে, তোমাকে এটা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। আমার ওপর সার্বিক দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিণতির কথা আমিই ভাবছি পরের সপ্তাহে একদিন আগ্রহের সঙ্গে ফ্যাকাল্টির বেতন তালিকার ওপর চোখ বুলাতে গিয়ে নতুন একটা নাম হঠাৎ আমার চোখে পড়ে গেল। নামটা হচ্ছে, জেমস ডার্নলে মার্ককর্কল। গণিত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। সাপ্তাহিক বেতনের পরিমাণ একশ' পাউন্ড। আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম। আমি বিকট আর্তনাদ করে ডাকাডাকি শুরু করে দিলাম—অ্যান্ডি! অ্যান্ডি।

আমার ডাক শুনে অ্যান্ডি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল। তাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই আমি পূর্বস্বর অনুসরণ করেই বলে উঠলাম—এটা কি অ্যান্ডির এটার অর্থ কী বলতো?

অ্যান্ডি ব্যাপার কিছু বুঝতে না পেরে অথর্বের মত ফ্যালফ্যাল করে আমার মুখের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইল।

আমি হাতের তালিকাটার দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম—এটা কি ব্যাপার বল তো? একজন গণিতের বিভাগীয় প্রধানের বেতন সপ্তাহে একশ' মানে বছরে পাঁচ হাজারের বেশী? এটা কি করে সম্ভব হল আমার তো মাথায়ই ঢুকছে না! তিনি জানালার কাঁচ ভেঙে নিজেই এখানে চাকরি করতে লেগে গেছেন, নাকি?

আরে ভাব, ধৈর্য ধর, মাথা ঠাণ্ডা করে শোন—ফ্যাকাল্টির পদগুলো পূরণ করার চিন্তা ভাবনার সময় তোমার বা আমার কারো মাথায়ই গণিতের অধ্যাপকের পদটির কথা মনে আসে নি।

আমি কি বলব হঠাৎ করে স্থির করতে না পেরে নীরবে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সে বলে চলল—দেখ, ভুল যারই হোক না কেন, তাই বলে এমন গুরুত্বপূর্ণ পদ তো আর খালি রাখা যায় না। তাই আমি এক সপ্তাহ আগে ফ্রিস্কোতে টেলিগ্রাম করেছিলাম একজন অভিজ্ঞ গণিতের অধ্যাপক পাঠিয়ে দেবার জন্য।

আমি বললাম—গণিতের অধ্যাপকের কথা ভুলে গিয়ে এখন দেখছি, ভালই করেছিলাম। তাঁর দু' সপ্তাহের বেতন দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের আছে। ব্যস, তারপরই আমাদের বিশ্বপ্রেম স্কিরো গল্‌ফের মাঠের নরম গর্তে পরিণত হয়ে যাবে।

আরে ধৈর্য ধর, অপেক্ষা কর। দেখই না আমাদের কি হাল হয় শোন, মোদ্দা কথা হচ্ছে, আমরা যে মহৎ কাজে মাথা গলিয়ে দিয়েছি এখন আর সেখান থেকে ফিরে আসা কিছুতেই সম্ভব নয়। আরও আছে—আমাদের এ খুচরো কারবারটাকে আমি যতই দেখছি ততই যেন বেশী ভাল বলে মনে হচ্ছে।

আমি তো তার কথা শুনে রীতিমত বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলার যোগাড় হলাম। হাঁ করে তার কথা শুনতে লাগলাম।

অ্যান্ডি গড় গড় করে বলে চলল—হ্যাঁ, বিশ্বপ্রেমের খুচরো কারবারটা আমার কাছে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেয়ে চলেছে। এটাকে নিয়ে যে গবেষণা চালানো যেতে পারে এটা আগে কোনদিনই আমার মাথায় আসে নি। আমি চোখ দুটো কপালে তুলে বলে উঠলাম—গবেষণা! গবেষণা চালাবার কথা ভাবছ অ্যান্ডি।

অবশ্যই। এস, এখানে বস। ব্যাপারটা নিয়ে একটু চিন্তা-ভাবনা করা যাক। শোন, আমি যত বিশ্বপ্রেমিককে জানি তাঁরা সবাই অগাধ অর্থের মালিক, মনে করতে পার, প্রত্যেকেই এক-একজন ধনকুবের। আর অনেক আগেই আমাদের ভেবে দেখা দরকার ছিল, কোন্‌টা কারণ আর কোন্‌টা কোট। একটু গভীর ভাবে ভাবলেই ব্যাপারটা তোমার কাছে খোলসা হয়ে যাবে।

অ্যান্ডির আর্থিক ব্যাপারে বাক্‌পটুতার ওপর আমার আস্থা যথেষ্টই আছে। তাই পুরো ব্যাপারটা তার ওপর ছেড়ে দিতে আমি এতটুকুও দ্বিধা করলাম না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রমেই উন্নতি ঘটতে লাগল।

বর্তমানে অ্যান্ডি আর আমি মাথায় ঝক্‌মকে রেশমি টুপি ব্যবহার করতে লাগলাম। ব্যাপারটা এমন হল যে, ফ্লোরেসভিল আমাদের আমায় একের পর এক সম্মান চাপিয়ে দিতে লাগল যা লক্ষ লক্ষ পাউন্ডের অধিকারী। কিন্তু আমরা তখন অন্তঃসারশূন্য বিশ্বপ্রেমিকে পরিণত হয়েছি।

শিক্ষার্থীরা শহরটাকে প্রাণবন্ত ও সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

শহরে কিছু নতুন লোক আমদানি হয়েছে যারা তাদের খেলা দেখাবার একটা অফিস খুলেছে আর তারই মাধ্যমে দু'হাতে পাউন্ড কামাচ্ছে।

আমি আর অ্যান্ডি একরাত্রে তাসের খেলার অফিসে গেলাম। ভদ্রতার তাগিদে দু'-এক দান তাসের জুয়াও আমাদের খেলতে হল। দেখলাম, আমাদের পঞ্চাশ জনের কাছাকাছি শিক্ষার্থী গলা পর্যন্ত মদ গিলে তাসের জুয়া খেলায় মেতেছে।

আমি অ্যান্ডির দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম। অ্যান্ডি বলল—কি? কিছু বলবে?

আমি বললাম—অ্যান্ডি, এখানে আমাদের আর থাকার দরকার আছে বলে মনে করি না।

কেন? একথা বলছ যে বড়?

আরে, দেখছ না উঠতি ফুল বাবুদের পকেটে আমাদের চেয়েও অনেক বেশী মালকড়ি আছে। ওই দেখ, পকেট থেকে কেমন নোটের গোছা বেরোচ্ছে।

হ্যাঁ, কথাটা ঠিকই বলেছ বটে। তাদের মধ্যে অনেকেই টাকার কুমির, খনির মালিক আর শেয়ার-দালালের আদরের দুলাল। আমার খুবই দুঃখ হচ্ছে এই ভেবে যে, মানুষ হবার, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার এমন অভাবনীয় সুযোগ হাতের মুঠোয় পেয়েও মদ আর জুয়ার আড্ডায় ভিড়ে জীবনটাকে বরবাদ করে দিচ্ছে।

শিক্ষার্থীরা খ্রীষ্টমাসের ছুটি পড়তেই ছুটি কাটাবার জন্য নিজের নিজের বাড়ি চলে গেল। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বেশ বর্ণাঢ্য একটা বিদায়-উৎসব-এর ব্যবস্থা করলাম। ফ্যাকাল্টির অনেকেই উৎসবে ভাষণ দিতে গিয়ে অ্যান্ডি আর আমাকে সম্রাট মার্কাস অটোলাইকাস আর রকফেলার-এর সঙ্গে তুলনা করল।

আমি গলাছেড়ে ম্যাক্কর্কল'কে ডাকাডাকি করলাম। কিন্তু তিনি ধারে কাছে কোথাও নেই। আসলে অ্যান্ডির মতে সে লোকটা বিশ্বপ্রেমের জন্য প্রতি সপ্তাহে এক শ' পাউন্ড রোজগার করার যোগ্যতা তাকে একবারটি চাক্ষুষ করার বড়ই ইচ্ছা ছিল।

শিক্ষার্থীরা রাত্রের ট্রেন ধরে যে যার বাড়ি চলে গেল। শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতিতে শহরটা মধ্যরাত্রির মত নীরব-নিস্তব্ধ হয়ে পড়ল।

অ্যান্ডির কামরায় ঢুকে দেখি, সে তাসের জুয়ার একটা টেবিলে বসে দু' ফুট উঁচু হাজার ডলারের একটা কারেন্সি নোটের গোছাকে দু'টো ভাগ করতে ব্যস্ত।

আমি গিয়ে তার মুখোমুখি চেয়ারে বসলে সে বলল—এক-এক ভাগে একত্রিশ হাজার ডলার আছে। বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ পাঠবর্ষের প্রথম দু'মাসে যে লাভ হয়েছে এ ডলারগুলো আমাদের প্রাপ্য লভ্যাংশ।

আমি নীরবে তার বক্তব্য শুনতে লাগলাম।

আমাকে নীরব দেখে অ্যান্ডিই আবার বলতে লাগল—জেফ, আশা করি বুঝতে পারছ যে, আমরা যদি বিশ্বপ্রেমকে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পরিচালনা করি তবে সেটাই হয়ে উঠবে একটা আর্ট।

আর্ট?

হ্যাঁ, আর্ট তো বটেই। আর সে আর্ট যে দেয় ও যে নেয় উভয়কেই ধন্য করে থাকে।

তার কথাটা আমার খুবই মনে ধরে গেল। আমি উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে বলে উঠলাম—আরে ব্বাস! তুমি যে একজন মহান ব্যক্তি অ্যান্ডি! তোমাকেই আমি ডক্টর বলে স্বীকার করে নিচ্ছি।

শোন, আমরা সকালের ট্রেনেই এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি।

হে মহান, সকালের ট্রেন না বলে যদি এখনই রওনা হতে বল তবু আমি এক পায়ে খাড়া। কিন্তু যাওয়ার আগে আমার একটা বাসনা পূর্ণ করতে চাইছি।

বাসনা? কি সে বাসনা, বল তো?

অধ্যাপক জেমস ডার্নলে ম্যাককর্কলও অবশ্যই এ শহর ছেড়ে চলে যাবেন, তাই না?

হ্যাঁ। সবাই চলে গেলে তাকেও তো অবশ্যই—

অ্যান্ডিকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই আমি বলে উঠলাম—তাঁকে একবারটি চাক্ষুষ করার খুবই ইচ্ছা করছে।

অ্যান্ডি তাসের জুয়াড়ির দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল—আরে ভায়া, এটা আর এমন কি কঠিন কাজ। জিম, একটু উঠে এসে আমার বন্ধুবর মিঃ পিটার্স-এর সঙ্গে করমর্দন কর। উঠে এসো।

দ্য একসাট সায়েন্স অব ম্যাট্রিমোনি

জেফ পিটার্স কথা প্রসঙ্গে বলল—দেখ, আমার কোনদিনই মেয়েদের বিশ্বাসঘাতকতায় বিশ্বাস ছিল না, আজও নেই। সত্যি কথা বলতে কি, ধাপ্পাবাজির মত নির্দোষ কাজের ব্যাপারে অংশীদার বা পরিচালক রূপে তারা অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য নয়। তুমি ভেবে দেখ—

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আমি বলে উঠলাম—শোন, আমি কিন্তু বলব, এ প্রশংসাটা মেয়েদের অবশ্যই প্রাপ্য। নারী মাত্রেই যে সৎ এ ব্যাপারে আমার কিছুমাত্রও দ্বিধা নেই।

তারা কেনই বা সৎ হবে না, বলতে পার? তাদের হয়ে ধাপ্পা দেওয়া বা অতিরিক্ত সময় কাজ করার জন্য তো পুরুষরাই এক পায়ে খাড়া।

আমি নীরবে মুচকি হাসলাম।

জেফ বলে চলল—মোদ্দা কথা শোন, যতক্ষণ তাদের আবেগে বা চুলে হাত না পড়ে ততক্ষণ তারা কিন্তু ভাল মানে সৎই থাকে।

আমি প্রায় অস্ফুট উচ্চারণ করলাম—হুম্!

জেফ বলে চলল—এবার সেই বিধবা মহিলার কথা একবারটি ভেবে দেখ তো?

বিধবা মহিলা? কার কথা বলছ?

আরে, সেই যে সেই বিধবা মহিলা, মানে আমি আর অ্যান্ডি কায়রোতে আমাদের নবগঠিত বিবাহ-বন্ধনী অফিসের কাজে সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য যাকে কাজে বহাল করেছিলাম, তার কথা বলছি।

তোমার বিজ্ঞাপন দেবার মত আর্থিক সামর্থ্য থাকলে বিবাহ-বন্ধনী ব্যবসাকে কামধেনুর মত ব্যবহার করতে পারবে, মানে অনবরতই হতে থাকবে। কারবার শুরু করার সময় আমাদের মূলধন ছিল ছ'হাজার ডলার। তখন আমাদের আশা ছিল, দু'মাসের মধ্যেই সেটাকে দ্বিগুণ করে তোলা সম্ভব হবে।

আমরা যে বিজ্ঞাপনটা টাঙিয়ে দিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে—সুদর্শনা, সদাহাস্যময়ী মহিলা, যথার্থই গৃহপ্রিয়া ও গৃহকর্মে নিপুণা আর বত্রিশ বছর বয়স্কা। নগদ ছ' হাজার ডলারের মালিক, সে সঙ্গে গ্রামে মূলধন সম্পত্তি—পুনর্বিবাহে আগ্রহী। আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন পুরুষের পরিবর্তে সহৃদয় দরিদ্র মানুষ বাঞ্ছনীয়। কারণ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, নিরেট সদ্‌গুণাবলী জীবনে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মধ্যেই সচরাচর লক্ষিত হয়। কোন স্নেহশীল, বিশ্বস্ত, সুবিবেচক, নিষ্কলঙ্ক এবং সম্পত্তি পরিচালনা ও অর্থকড়ি লগ্নি করার মত যোগ্যতা সম্পন্ন পুরুষই বাঞ্ছনীয়। অতএব তার বয়স, চেহারা ও চালচলনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে না। সম্পূর্ণ ঠিকানা ও বিষদ বিবরণসহ পত্রমারফৎ যোগাযোগ করুন।

বিনয়াব্রতা
সঙ্গীহীনা
প্রযত্নে পিটার্স অ্যান্ড টাকার, বিবাহ-বন্ধনী,
কায়রো, ইল্।

এরকম একটা রসাল ও মনোজ্ঞ কাল্পনিক বিজ্ঞাপন লেখার কাজ সেরে আমি মুখ তুলে জেফ-এর দিকে তাকালাম।

জেফ তখনও বিজ্ঞাপনটার ওপর চোখ বুলাতে ব্যস্ত।

আমি মুচকি হেসে বললাম—ভায়া, বিজ্ঞাপন তো লেখা হল, কিন্তু আমাদের বাঞ্ছিত সে মহিলাকে কোথায় মিলবে? আমি তো বাঞ্ছা পূরণের কোন সম্ভাবনা আছে বলেই মনে করছি না।

জেফ কাগজের টুকরোটা থেকে মুখ তুলে চোখে-মুখে বিরক্তির ছাপ ফুটিয়ে তুলে আমার দিকে তাকাল।

আমি তার অবস্থা দেখে কি বলব ভেবে না পেয়ে নিজেকে সামলে রাখলাম।

কণ্ঠস্বরে বিরক্তি প্রকাশ করে জেফ বলল—তোমার যত্তসব উদ্ভট চিন্তা ভাবনা।

আমি জোর করে মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বললাম—কেন? এটাকে উদ্ভট চিন্তা বলছ কেন, বুঝছি না তো?

আমি ভেবে অবাক হচ্ছি যে, তোমার মধ্য থেকে বাস্তবতা বোধটুকুও লোপ পেয়ে গেছে দেখছি! একটা মহিলাকে ঝুটমুট কেন যে টেনে আনলো কিছুতেই আমার মাথায় আসছে না। আমার একটা কথার জবাব দিতে পার?

কি? কোন্ কথা?

বল তো, ওয়াস স্ট্রীটে তরল পদার্থ কেনা-বেচার সময় সেখানে কোন জলকন্যা উপস্থিত থাকে কি? আমাদের কারবার বিয়ে সংক্রান্ত—এতে কোন মহিলার উপস্থিতি অপরিহার্য এরকম উদ্ভট চিন্তা তোমার মাথায় কেন যে এল তা-ই তো আমার মাথায় ঢুকছে না।

তাই বুঝি?

তা ছাড়া কি? বিয়ের কোন ব্যাপারই যেখানে নেই সেখানে একটা বিয়ের মিথ্যে ফাঁদ পেতে মিছে সময়ের অপব্যবহার করবে এমন কোন মহিলা তোমার ডাকে সাড়া দেবে তুমি ভেবেছ? এ আমি অলীক কল্পনা ছাড়া অন্য কোন আখ্যা দিতে পারছি না।

আমি তাকে বললাম—আরে এত সহজে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলে চলবে কেন, বল তো?

তবে কি একটা অলীক কল্পনা নিয়ে মেতে থাকব?

বলছি তবে শোন, এরকমই এক মহিলাকে আমি জানি।

জেফ ট্রটার নামে আমার এক পুরনো বন্ধু আছে। জেফ ট্রটার তার নাম। এক বছর আগে এক বুড়ো চিকিৎসকের দেওয়া ভুল ওষুধ খায়। ব্যস, স্ত্রীকে বিধবা ক'রে সে দুনিয়া ছেড়ে চলে গেল। আমি মাঝে-মধ্যেই তাদের বাড়ি যেতাম। তাই মনস্থ করেছিলাম যে বিধবা মহিলাকে আমাদের কারবারে লাগিয়ে দেব। বিধবা মহিলাটি যে ছোট্ট শহরে বাস করে তার দূরত্ব এখান থেকে ষাট মাইল।

আমি আমার তেজী ঘোড়াটার পিঠে চেপে উল্কার বেগে ছুটিয়ে দিলাম। ষাট মাইল রাস্তা পেরিয়ে হাজির হলাম সে মহিলার বাড়ির দরজায়। তাকে বাড়িতে পেয়ে গেলাম।

আমি তার কাছে আমাদের উদ্দেশ্য খোলাখুলিভাবে আলোচনা করলাম। আমার প্রস্তাবে সে সম্মত হল। মিসেস ট্রটার আমাদের বিজ্ঞাপনের সঙ্গে পাকাপাকিভাবে জড়িয়ে পড়ল। তবে হয়ত দৈহিক রূপ-সৌন্দর্য, বয়স আর সম্পত্তির ব্যাপারস্যাপার বাদ দিয়ে।

স্বীকার করতে বাধা নেই, মিসেস ট্রটারকে দেখে চলনসই আর প্রশংসা করার যোগ্য বলেই মনে হল। আর সে সঙ্গে আমাদের কারবারে তাকে চাকরিটা দেওয়া সম্ভব হওয়ায় মৃত বন্ধু জেফ-এর প্রতি করুণা প্রদর্শনও করা গেল।

আমি মিসেস ট্রটার-এর বৈঠকখানায় কফির কাপ হাতে নিয়ে আমাদের ইচ্ছাটা তার কাছে পাড়লে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল—এটাকে কি আপনাদের সৎ ও মহৎ প্রচেষ্টার একটা নমুনা বলে মনে করা যেতে পারে?

আমি কফির কাপটাকে ঠোঁটের কাছাকাছি নিতে গিয়েও থেমে গিয়ে বললাম—মিসেস ট্রটার, সত্যি কথা বলতে কি, আমি আর আমার বন্ধুবর অ্যান্ডি টাকার মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি, আর হিসেব করেও দেখেছি, আমার দেওয়া বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এ সুবিশাল দেশের ত্রিশ হাজার দেশবাসী হন্যে হয়ে লেগে পড়বে আপনার পাণিগ্রহণ করে অগাধ ধনসম্পদ আর সম্পত্তি লাভ করতে। আর তাদের মধ্যে ত্রিশ শ'-রও বেশি পাণিপ্রার্থীর প্রত্যাশা থাকবে যে, বিনিময়ে তারা আপনাকে দেবে ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলে, অলস, অর্থগৃধ্ন, বাটপাড়, ব্যর্থ জীবন আর নীচ ও জঘন্য মনোবৃত্তি সম্পন্ন দেহের সান্নিধ্য।

মিসেস ট্রটার ভ্রূদুটো কুঁচকে নীরব চাহনি মেলে নীরবে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তার চোখের তারায় বিস্ময়মিশ্রিত জিজ্ঞাসার ছাপ।

আমি বলে চললাম—মিসেস ট্রটার, অ্যান্ডি আর আমার একান্ত ইচ্ছা, সমাজের বুকে বিচরণরত এরকম সব জঘন্য চরিত্রের মানুষ নামধারী পশুগুলিকে উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব। আর তা যদি করতে পারি তবেই তো আপনি খুশি?

হ্যাঁ, ঠিক তাই। মিঃ পিটার্স, আমি এটুকু অন্তত বিশ্বাস করতাম, আপনারা অবশ্যই এরকম কোন অসৎ কাজে উৎসাহী হবেন না।

আমি ঠোঁটের কোণে হাল্কা হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বললাম—তাই বুঝি?

হ্যাঁ, ঠিক তাই। কিন্তু একটা কথা তো ভালভাবে জানাই হল না। আপনাদের প্রতিষ্ঠানে আমার কাজটা কি হবে? একটু আগে যে তিন হাজার বাটপাড়ের কথা বললেন, তাদের প্রত্যেককে কি আমাকে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যাগমন করতে হবে, নাকি আমি তাদের ঝেঁটিয়ে বিদেয় করাই আমার কাজ হয়ে দাঁড়াবে?

মিসেস ট্রটার, ধ্রুবতারার মতই হবে আপনার কাজ।

ধ্রুবতারা? ঠিক বুঝলাম না তো।

মানে আপনি হয়ে উঠবেন আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। সাজানো গোছানো নামকরা একটা হোটেলে আপনি অবস্থান করবেন। কাম কাজ কিছুই আপনাকে করতে হবে না। ব্যবসা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজকর্ম, মানে চিঠিপত্র লেখালেখি ও অন্যান্য যা কিছু অ্যান্ডি আর আমিই করব। তবে তাদের মধ্যে যেসব লোক অত্যুগ্র আগ্রহী আর আবেগ-উচ্ছ্বাসে ভরপুর পাণিপ্রার্থী কোনরকমে ট্রেন ভাড়াটা যোগাড় করতে সক্ষম তারা হয়ত নিজেদের ঝকমকে পোশাক পরিচ্ছদ দেখাবার জন্য হলেও হয়ত কায়রোতে এসে হাজির হতে পারে। এরকম লোকদের দরজা থেকেই বিদেয় করে দেওয়ার কাজের হ্যাপা আপনাকেই পোহাতে হবে। আমাদের তরফ থেকে আপনার হোটেল খরচ এবং সপ্তাহে নগদ পঁচিশ পাউন্ড আপনি পাবেন, বুঝেছেন?

ঠিক আছে, আমাকে মাত্র পাঁচটা মিনিট সময় দিন।

আপনার সিদ্ধান্ত নিতে আরও পাঁচ মিনিট—

আমাকে থামিয়ে দিয়ে মিসেস ট্রটার বলে উঠলেন—আরে না, না, সিদ্ধান্ত আমি অনেক আগেই নিয়ে নিয়েছি।

তবে?

আমার অত্যাবশ্যক কিছু জিনিসপত্র গোছগাছ করে নিতে আর ঘরের দরজার চাবিটা একজন প্রতিবেশীর হাতে তুলে দিতে পাঁচটা মিনিট সময় দরকার। ব্যস, তারপর থেকেই আমার প্রাপ্য বেতনটা শুরু হয়ে যাবে।

আমি মিসেস ট্রটারকে নিয়ে কায়রোতে ফিরে এলাম। সেখানে একটা সুসজ্জিত হোটেলে তাকে তুললাম। এবার আমার সাফল্যের খবরটা অ্যান্ডির কাছে পৌঁছে দিলাম।

আমার সাফল্যের কথা শুনে অ্যান্ডি যারপরনাই খুশি হয়ে বলল—চমৎকার! যাক, এবার আমরা নিশ্চিন্তে কাজে হাত দিতে পারব, কি বল?

এবার আমরা জোর কদমে কাজ শুরু করে দিলাম। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে প্রকাশিত খবরের কাগজগুলোতেও বিজ্ঞাপনটা ছাপাবার ব্যবস্থা করলাম। সব কাগজে ওই একই বিজ্ঞাপন ছাপানো হল।

আমরা পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী মিসেস ট্রটার এর নামে ব্যাঙ্কে দু' হাজার ডলার জমা করে দিলাম। আমরা তার নামে এতগুলো ডলার জমা দিতে এতটুকুও দ্বিধা করলাম না। কারণ, মিসেস ট্রটার খুবই চালাক চতুর, চটপটে, নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য। অতএব তার নামে ডলারগুলো ব্যাঙ্কে রাখলে কোন সমস্যা হওয়ার আশঙ্কা নেই।

ওই বিজ্ঞাপনটা দেওয়ার পর থেকে অ্যান্ডি আর আমি চিঠিপত্র পড়া ও উত্তর দেওয়ার কাজে প্রতিদিন বারো ঘণ্টা করে খাটতে লাগলাম। প্রতিদিন শ'খানেক করে চিঠি আসতে লাগল।

সত্যি আমার জানাই ছিল না যে এদেশের এত উদার হৃদয় অথচ গরীব মানুষ আছে যারা একটা সবদিক থেকে লোভনীয়া বিধবা মহিলাকে লাভ করার জন্য এবং তার টাকাকড়ি লগ্নি করার হ্যাপা পোহাতে উৎসাহী।

পিটার্স অ্যান্ড টাকার-এর কাছ থেকে প্রত্যেক আবেদনকারী একটা করে বাঞ্ছিত জবাব পেতে লাগল। জবাবে তাদের প্রত্যেককে জানিয়ে দেওয়া হল যে, তার সুন্দর ও মন খোলসা-করা চিঠি পেয়ে তার বাঞ্ছিত বিধবা মহিলাটি যারপরনাই পুলকিত ও প্রভাবান্বিত হয়েছেন। আর এ-ও উল্লেখ

করা হল তারা যেন আরও বিস্তারিত বিবরণ সহ চিঠি লেখেন। আর সম্ভব হলে যেন এক কপি ফটোগ্রাফও চিঠির সঙ্গে পাঠিয়ে দেন।

প্রত্যেক চিঠিতে এ-ও লিখে দেওয়া হল, 'পিটার্স অ্যান্ড টাকার' আপনাকে এ-ও জানাচ্ছে, দ্বিতীয় চিঠির সঙ্গে পত্রালাপের ফি বাবদ দু'ডলার চিঠির সঙ্গে যেন পাঠিয়ে দেন।

এ পরিকল্পনার প্রকৃত মজাটা হচ্ছে, এদেশে বসবাসকারী বিদেশী অধিবাসীদের শতকরা নব্বইজনই কোনরকমে অর্থ সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দিতে দেরী করল না।

শুধু পত্র মারফৎই নয়, কিছু কিছু অত্যুৎসাহী মক্কেল সশরীরে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন।

তারা আসামাত্র আমরা তাদের মিসেস ট্রটার-এর কাছে পাঠিয়ে দিতে লাগলাম। তারপর আমাদের নির্দেশ অনুযায়ী তিনি কাজ শুরু করছেন।

মিসেস ট্রটার-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দর্শনার্থী পুরুষদের অধিকাংশই সরাসরি নিজ নিজ জায়গায় ফিরে গেল। আবার জনা কয়েক আমাদের কাছে, পিটার্স অ্যান্ড টাকার প্রতিষ্ঠানে চলে এসে গাড়ি ভাড়ার টাকা দাবী করে বসল।

এদিকে আমাদের কাছে যে সব চিঠি আসতে লাগল তার ফলে আমরা প্রতিদিন দু'শ' পাউন্ড মত হাতে পেতে লাগলাম।

এক বিকালের কথা বলছি, আমরা তখন খুবই কাজে ডুবেছিলাম। আমি দুই ও এক-এর বিলগুলোকে চুরুটের বাক্সের মধ্যে ঠেসে ঠেসে ভরতে ব্যস্ত ছিলাম আর অ্যান্ডি খোলা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে অনবরত শিস দিচ্ছিল। ঠিক তখনই এক বেঁটেখাটো ও রোগাটে লোক আচমকা ঘরে ঢুকে চারদিকের দেওয়ালে এমন অনুসন্ধিৎসু নজরে চোখ বুলাতে লাগল যেন সে দামী ও উন্নত শিল্পকর্ম সমৃদ্ধ দু'-একটা তৈলচিত্র খোঁজ করছে।

দেওয়াল থেকে মুখ ঘুরিয়ে লোকটা টেবিলের দিকে তাকাল। তারপর মুখ খুলল—আজকের ডাকে আপনারা বহু চিঠি পেয়েছেন দেখছি।

চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে আমি টুপিটা খুলে হাতে নিলাম। মুচকি হেসে বললাম—আমরা আপনার আগমন প্রতীক্ষায়ই ছিলাম। আপনার উপস্থিতিতে আমরা বড়ই স্বস্তি ও আনন্দ পেলাম। সবই আপনাকে দেখাব।

আগন্তুক অনুরূপ হাসি ঠোঁটের কোণে ফুটিয়ে তুলল—তাই তো আমি সশরীরে এসে হাজির হয়েছি।

আপনি ওয়াশিংটন ছেড়ে আসার সময় টেডি কোথায় ছিল বলুন তো?

তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আমি রিভারভিউ হোটেলে মিসেস ট্রটার-এর পরিচয় করিয়ে দিয়ে এসেছি।

তারপর?

তার নামে ব্যাঙ্কে দু'হাজার ডলার জমার পাশ-বইটা তাকে দেখিয়ে দিয়েছি। তারপরই সরাসরি এখানে চলে আসি।

গোয়েন্দা দপ্তরের লোকটা বলল—এখন সব কিছুই ঠিকঠাক আছে বলেই তো বোধ হচ্ছে।

আমি বললাম—হ্যাঁ, তা আছে বটে। একটা কথা আপনাকে বলব বলব বলেও বলতে বাঁধছে।

কি? কি বলতে চাইছেন নির্দ্বিধায় বলতে পারেন।

আপনি বিবাহিত লোক না হলে মহিলাটির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার জন্য আপনাকে এখানে রেখে যাব মনস্থ করেছি। দু'ডলারের ব্যাপারটা আমরা উত্থাপনই করব না এও ভেবে রেখেছি।

অসংখ্য ধন্যবাদ। দেখুন, আমি যদি বিবাহিত না হতাম তবে হয়ত এ কাজটা মিটিয়েই ফেলতাম মিঃ পিটার্স। সে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

তিন মাসের শেষে দিকে হিসাব করে দেখা গেল আমাদের আমানত পাঁচ হাজার ডলারেরও কিছু বেশী দাঁড়িয়ে গেছে। তখনই ভাবলাম, এবার আমাদের সেখান থেকে কেটে পড়া দরকার।

ইতিমধ্যে বহু নালিশই আমাদের কাছে জমা পড়ে গেছে। আর এদিকে দিনের পর দিন দীর্ঘসময়

করে একই কাজে লিপ্ত থেকে মিসেস ট্রটারেরও এক ঘেয়ে লাগছে, ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

তার অস্বস্তির সবচেয়ে বড় কারণ, বহু পাণিপ্রার্থী তার সঙ্গে মোলাকাৎ করতে এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বকবক করে তার প্রাণ ওষ্ঠাগত করে তুলেছে। আর এটাই তার কাজের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাই এখানকার পাট চুকিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি রিভারভিউ হোটেলে মিসেস ট্রটার-এর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। উদ্দেশ্য, তার গত সপ্তাহের প্রাপ্য বেতন মিটিয়ে দিয়ে তার কাছ থেকে বিদায় নেওয়া। আর সে সঙ্গে দু'হাজার ডলারের চেকটাও তার কাছ থেকে ফেরৎ নেওয়া দরকার।

হোটেলে মিসেস ট্রটার-এর ঘরের দরজায় পা দিয়েই আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ঘরের ভেতর থেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার স্বর ভেসে আসতে শুনলাম। মিসেস ট্রটার কেঁদে আকুল হচ্ছে।

আমি ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললাম—আরে একী করছেন মিসেস ট্রটার। শুনেছি স্কুলে যেতে অনাগ্রহী মেয়েরা এমন করে কাঁদে। ব্যাপার কি? হয়েছে কি, বলুন তো? কেউ বকাবকি করেছে, নাকি বাড়ির জন্য মন খারাপ হয়েছে?

না-না, মিঃ পিটার্স, বসুন, সবই আপনাকে খোলসা করে বলব।

আমি এগিয়ে গিয়ে একটা চেয়ার টেনে বসলাম।

মিসেস ট্রটার চোখ মুছতে মুছতে বলল—মিঃ পিটার্স, আপনি তো জেফ-এর বন্ধু ছিলেন। তাই আপনার কাছে বলতে কোন দ্বিধা নেই।

বলুন, নির্দ্ধিধায়ই আপনি বলতে পারেন।

মিঃ পিটার্স, আমি প্রেমে মজেছি। একজনকে আমি মনে প্রাণে এমনই ভালবেসে ফেলেছি—

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আমি বিস্ময় মিশ্রিত কৌতূহলাপন্ন হয়ে বলে উঠলাম—ভালবাসা! মানে আপনি প্রেমে পড়েছেন!

হ্যাঁ, বিশ্বাস করুন, যা বলছি প্রতিটা বর্ণই সত্য। আর ভালবাসায় এতই মজে গেছি যে, তাকে না পেলে আমার পক্ষে প্রাণে বেঁচে থাকাই সম্ভব নয়। আমি সারাটা জীবন ধরে হন্যে হয়ে যে মনের মানুষটাকে খুঁজেছি সে অবিকল সেই মানুষ।

আমি মুচকি হেসে বললাম—কিন্তু সমস্যাটা কোথায় বলুন তো? যাকে অন্তরে ঠাঁই দিয়েছেন তাকে গ্রহণ করে জীবন সঙ্গিনী করে নিলেই তো হয়।

মিসেস ট্রটারকে নীরব দেখে আমি এবার বললাম—অবশ্য যাকে ভালবেসেছেন, মানে যার প্রেমে পড়ে আপনি হাবুডুবু খাচ্ছেন যদি সে-ও আপনার প্রেমে মজে গিয়ে থাকে তবেই তো আপনার বাঞ্ছা পূরণ হতে পারবে।

আমি চেয়ারে একটু নড়েচড়ে বসে বললাম—মিসেস ট্রটার, এবার বলুন তো, আপনার প্রেমিক প্রবরের দিক থেকে কি আপনি যথেষ্ট সাড়া পেয়েছেন?

হ্যাঁ, তা পেয়েছি।

কে সে সৌভাগ্যবান, জানতে পারি কি?

বিজ্ঞাপন পড়ে যেসব ভদ্রলোক আমার চারদিকে ঘুরঘুর করছিল সে তাঁদেরই একজন।

বহুৎ আচ্ছা! তারপর?

ওই দু'হাজার ডলার যদি তাঁর হাতে তুলে না দেই তবে সে আমাকে বিয়ে করতে সম্মত নয়।

তার নামটা কি বলুন তো?

'উইলিয়ম উইলকিন্সন।' ব্যাস, এ পর্যন্ত বলেই মিসেস ট্রটার আমার কাছে তার প্রেমের পাঁচালি শুরু করে দিল।

আমি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললাম—মিসেস ট্রটার, একটা নারীর হৃদয়াবেগের প্রতি সত্যিকারের সমবেদনশীল কোন পুরুষকে আপনি খুঁজে পাবেন না। আর এক সময় তো আপনি আমার অভিন্ন হৃদয় বন্ধুদের মধ্যে একজনের জীবন সঙ্গিনী ছিলেন।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মিসেস ট্রটার বললেন—হ্যাঁ, তা ছিলাম বটে।

দেখুন এ ব্যাপারটা যদি আমার নাগালের মধ্যে থাকত তবে আমার দিক থেকে তৎপরতার এতটুকুও অভাব দেখতে পেতেন না, মানে এ মুহূর্তেই আমি আপনাকে বলে দিতাম, ওই দু'হাজার ডলারের বিনিময়ে আপনি আপনার মনের মানুষটাকে জীবনসঙ্গীরূপে লাভ করে সুখে ঘর-সংসার করুন।

মিসেস ট্রটার আমার মুখের দিকে অসহায় দৃষ্টি মেলে নীরবে তাকিয়ে রইল।

আমি আগের মতই সমবেদনার স্বরে এবার বলতে লাগলাম—মিসেস ট্রটার, ওই দু'হাজার ডলার আমরা আপনাকে দিয়ে দিতেও পারতাম, কারণ, যেসব বুড়ো খোকারা আপনাকে বিয়ে করার লোভে ছুটোছুটি করছিল আমরা তাদের কাছ থেকে রক্তচোষার মত পাঁচ হাজার পাউন্ডেরও বেশী চুষে নিয়েছি। আসলে ব্যাপারটা যে আমার একার নয় তা-তো আপনি ভালই জানেন। তাই বলছি কি, এর জন্য কারবারের অংশীদার অ্যান্ডির সঙ্গে আমাকে কথা বলতে হবে।

কিন্তু তিনি কি—

আমি তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললাম—অ্যান্ডি কিন্তু মানুষ হিসেবে খুবই ভাল, একজন যথার্থ অমায়িক বলা যেতে পারে। তবে ব্যবসার ব্যাপারে সে খুবই এক রোখা।

মিসেস ট্রটার আমার কথা শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

আমি এবার বললাম—আশাকরি আপনাকে আর নতুন করে কিছু বলতে হবে না, অর্থকড়ির ব্যাপারে অ্যান্ডি আর আমি সমান-সমান অংশীদার। তাই বলছি কি, আপনি একেবারে নিরাশ হবেন না। তার সঙ্গে কথা বলে দেখিই না কতদূর কি করা যায়।

তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি হোটেলে ফিরে এলাম। মিসেস ট্রটার-এর প্রসঙ্গে তার সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করলাম।

সবকিছু শুনে অ্যান্ডি বলল—দেখ, ইদানিং আমি এরকম কোন কিছুই আশঙ্কা করেছিলাম। একটা কথা কি জান? প্রেমের ব্যাপারে কোন মেয়ে তোমার নির্দেশ মেনে চলবে এরকম আশা তোমার পক্ষে করা সম্ভব নয়।

সবই তো বুঝলাম অ্যান্ডি। আমরা একটা নারীর হৃদয়কে ভেঙে দেবার প্রত্যক্ষ কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছি। সত্যি কথা বলতে কি, এরকম একটা ব্যাপারের জন্য আমরা দায়ী হচ্ছি ভেবে আমার মনটা যারপরনাই বিষিয়ে উঠছে।

হ্যাঁ, ব্যাপারটা ভাবতে আমারও খুব খারাপ লাগছে। জেফ, আমার মত শোন, আমি কি করব মনস্থ করেছি, খোলসা করেই তোমাকে বলছি।

বল শুনি, এ ব্যাপারে তোমার মত কি?

তুমি চিরদিনই উদার ও সহজ-সরল স্বভাবের মানুষ। আর আমি তোমার চরিত্রের একেবারে বিপরীত মেরুর। অর্থাৎ আমার মনটা একটু কঠিনই বটে। তাছাড়া, একজন সন্দেহপরায়ণ ও বৈষয়িক বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষও বলতে পার। তবে এই প্রথম আর এই শেষবারের মত আমি তোমার সঙ্গে পা মিলিয়ে হাঁটতে রাজি আছি। তুমি মিসেস ট্রটার-এর হোটেলে যাও।

তারপর?

তাকে বলবে ব্যাঙ্ক থেকে তার বাঞ্ছিত দু'হাজার ডলার তুলে তার মনের মানুষটার হাতে তুলে দিয়ে স্বপ্নকে বাস্তবায়িক করুক।

আমি যন্ত্রচালিতের মত এক লাফে চেয়ার ছেড়ে উঠে প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে তার সঙ্গে করমর্দন করলাম। সোল্লাসে বারবার তাকে ধন্যবাদ জানালাম।

তারপর ঘোড়ার পিঠে চেপে মিসেস ট্রটার-এর হোটেলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলাম। ব্যস্ত-পায়ে তার ঘরে ঢুকে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লাম। হাঁপাতে হাঁপাতে তাকে আমাদের সিদ্ধান্তের কথা তাকে খোলাখুলি বললাম। সে এতক্ষণ যত জোরে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছিল এবার তার চেয়ে অনেক, অনেক বেশী জোরে হাসতে লাগলেন।

দু'দিন পরেই আমি আর অ্যান্ডি সে শহর থেকে বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগলাম। বাক্স-পেটরা গোছগাছ করে নিলাম।

আমি কাজের ফাঁকে অ্যান্ডিকে বললাম—এখান থেকে চলে যাবার আগে মিসেস ট্রটার-এর

সঙ্গে কি একবারটি দেখা করে যাবে না? আশা করি সে এবার তোমার মনের সত্যিকারের পরিচয় পেয়েছে। আর অন্তরের সবটুকু কৃতজ্ঞতা নিঙড়ে তোমাকে জ্ঞাপন করবে।

অ্যান্ডি বিষণ্ণ মুখে বলল—আমি কিন্তু তোমার কথা বিশ্বাস করি না। তাই আমি চাইছি, তাড়াতাড়ি রওনা হয়ে আমরা বরং এ ট্রেনটাই ধরি।

আমরা টাকাকড়ি কোমরবন্ধের সঙ্গে বেঁধে নেবার জন্য তোড়জোড় করতে লাগলাম।

আচমকা লক্ষ্য করলাম, অ্যান্ডি একগোছা বিল কোটের ব্রেস্ট-পকেট থেকে বের করে সেটাও কোমরবন্ধের সঙ্গে বেঁধে নিচ্ছে।

আমি সবিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে বললাম—এগুলো কি অ্যান্ডি?

অ্যান্ডি স্বাভাবিক কণ্ঠেই আমার প্রশ্নের উত্তর দিল—মিসেস ট্রটার-এর দু'হাজার ডলার।

সে কী! এগুলো তোমার কাছে কি করে এল?

সে-ই আমার হাতে তুলে নিয়েছে।

তার মানে?

মানেটা খুবই পরিষ্কার। কারণ, এক মাসেরও বেশীদিন ধরে আমি, প্রতি সপ্তাহে তিনটে করে সন্ধ্যা তার ঘরে কাটিয়েছি.

তুমি? অ্যান্ডি, তুমিই তবে উইলিয়ম উইলকিন্সন?

হ্যাঁ, এক সময় তা-ই ছিলাম বটে।

শেয়ারিং দ্য উফ্

নিজের পেশার আলোচনার ন্যায়-নীতি নিয়ে আলোচনা শুরু হলেই জেফ পিটার্স-এর মুখ দিয়ে যেন খই ফুটতে থাকে।

কথা প্রসঙ্গে সে বলে, অ্যান্ডি টাকার আর আমার মধ্যে যখনই ধাপ্পাবাজি কারবারের নৈতিকতা নিয়ে যত পার্থক্যের সৃষ্টি হয় কেবলমাত্র তখনই অ্যান্ডি আর আমার হৃদ্যতার সম্পর্কে সৃষ্টি হয় কেবলমাত্র তখনই অ্যান্ডি আর আমার হৃদ্যতার সম্পর্কে সূক্ষ্ম একটা ফাটল দেখা দেয়। এর জন্য তার আর আমার উভয়েরই একটা করে মাপকাঠি আছে।

আমাদের মত পার্থক্যের ব্যাপারগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, জনগণের কাছ থেকে অর্থকড়ি বাগিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে অ্যান্ডির মাথায় যেসব মতলব চাঙা হয়ে ওঠে তাদের সবগুলোকে আমি মেনে নিতে রাজি হই না।

অ্যান্ডি মনে মনে ভাবে আমাদের কারবারের আর্থিক লাভের ব্যাপারে আমি মাঝে-মধ্যে বাধার কারণ হয়ে দাঁড়াই। আমাদের মন কষাকষি আর কথা কাটাকাটি মাঝে মাঝে রীতিমত তুঙ্গে উঠে যায়।

একবার আমাদের মধ্যে এমন জোর কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে গেল যে, আমি তাকে রকফেলার-এর নামটা শুনিয়ে দিতেও ছাড়লাম না।

বেশ রাগত স্বরেই আমি বলে উঠলাম—আরে অ্যান্ডি তুমি কি বলতে চাইছ আমার তা ভালই জানা আছে। নেহাৎ আমাদের বন্ধুত্ব দীর্ঘদিনের তাই তোমার কথা আমি গায়ে মাখি না, এতটুকুও দুঃখ পাই না। কারণ, আমি তো নিশ্চিত জানি, মাথা ঠাণ্ডা হলেই আমার মনে আঘাত দেওয়ার জন্য তুমি অনুতপ্ত হবে। সত্যি কথা বলতে কি, আজ অবধি আদালতের কোন সমনদারের সঙ্গে আমাকে হাত মেলাতে হয় নি। আসলে তুমি হঠাৎই মাথা গরম করে ফেল।

এক গ্রীষ্মে আমি আর অ্যান্ডি কয়েকটা দিনের জন্য বিশ্রাম নেওয়ার জন্য কোন শৈলাবাসে যাব। ব্যস, উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের জন্য আমরা আলোচনায় বসলাম।

দীর্ঘ সময় ধরে বাছাবাছি করে কেন্টাকি পর্বতমালার ছোট্ট এক শহর গ্রাসভেলকেই আমরা

নির্বাচন করলাম।

আমরা নির্বাচিত গ্রাসভেল শহরে হাজির হলে স্থানীয় অধিবাসীরা ভাবল, আমরা ঘোড়া কেনা-বেচার কারবার করি। অতএব আমরা উভয়েই সম্ভ্রান্ত নাগরিক। তাই তারা আমাদের সহৃদয়তার সঙ্গেই গ্রহণ করল।

আমি আর অ্যান্ডি আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম, কোন পরিস্থিতিতেই আমরা কথা কাটাকাটিতে লিপ্ত হব না।

এক সকালে গ্রাসভেল শহরে এক লোহার কারবারী আমাদের হোটেলে এল। আমাদের সঙ্গে সে আগ বাড়িয়ে আলাপ পরিচয় করল। বারান্দায় পাশাপাশি বসে সিগারেট টানল।

আদালতের ময়দানে বেশ কয়েকটা বিকালে এক সঙ্গে চাক্তি-খেলার মাধ্যমে লোহার কারবারী লোকটার সঙ্গে আমাদের হৃদ্যতা আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। সে কথা একটু বেশীই বলে। তার পদবি মার্কিসন। মোটাসোটা চেহারা আর গায়ের রঙ লালচে।

সেদিন মিঃ মার্কিসন-এর সঙ্গে আমাদের যা কিছু কথাবার্তা হ'ল, যা কিছু ঘটল তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে, সে কোটের ব্রেস্ট-পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে আমাদের পড়তে দিল।

আমরা কোনরকমে চিঠি-পড়া শেষ করে সেটা ভাঁজ করতে লাগলাম। হাসতে হাসতে মার্কিসন বলল—চিঠিটা পড়ে আপনাদের কি মনে হচ্ছে, বলুন তো শুনি?

আমরা দু'জনই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকালাম। মার্কিসন এবার বলল—আমি বুঝতে পারছি না, আমাকে এরকম একটা চিঠি কেন লেখা হল? এর অর্থ কি?

অ্যান্ডি আর আমি তো চিঠিটা পড়ার আগেই বুঝে নিয়েছি। ওটা কিসের চিঠি। তা সত্ত্বেও চোখে-মুখে এমন ভাব ফুটিয়ে তুললাম যেন চিঠিটা গভীর মনোযোগ সহকারে চিঠিটার আদ্যোপান্ত পড়েছি।

অতীতে সে সব টাইপ করা চিঠিতে সবিস্তারে বর্ণনা করা হত কিভাবে এক হাজার ডলার দিয়ে পাঁচ হাজার ডলারের এমন বিল পাওয়া যেত যাদের কোন বিল বিশেষজ্ঞও নকল বলে ধরতে পারতেন না। মার্কিসন ঠিক এমনই একটা চিঠি আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন।

আমাদের নীরব দেখে মার্কিসন নিজেই আবার মুখ খুলল—দেখুন, ওয়াশিংটনের টাকশাল-এর এক কর্মীর কাছ থেকে পাওয়া চোরাই প্লেট থেকেই এরকম বেশ কিছু সংখ্যক বিল তৈরী করে নেওয়া হয়।

অ্যান্ডি প্রায় অস্ফুট উচ্চারণ করল—হুম্।

মার্কিসন এবার বলল—ভেবে পাচ্ছিনে আমাকেই কিনা এরকম একটা চিঠি পাঠানো হয়েছে! তাজ্জব ব্যাপার!

অ্যান্ডি আর মুখে কুলুপ এঁটে থাকতে পারল না। সে বলল—দেখুন মিঃ মার্কসন, এটা এখন কোন অত্যাশ্চর্য, একেবারে অবিশ্বাস্য ব্যাপার বলে আমি মনে করছি না।

তার মানে?

মানে অনেক ভাল মানুষের হাতেই এমন চিঠি এসে থাকে। এর জবাব যদি আপনি না দিয়ে থাকেন তবে তারা তালিকা থেকে আপনার নামটা কেটে দেবে। মানে আপনাকে আর কোন চিঠি পাঠাবে না।

যদি জবাব দেই, তবে?

এ-তো খুবই সাধারণ ব্যাপার, তারা আপনাকে পেয়ে বসবে। একের পর এক চিঠি পাঠাতেই থাকবে। তারা আপনাকে বলবে, টাকাকড়িগুলো নিয়ে আপনি তাদের সঙ্গে দেখা করুন আর কোন ব্যবসায় লেগে পড়ুন, এবার ব্যাপারটা পরিষ্কার হল তো?

কিন্তু ব্যাপারটা একটু গভীরভাবে ভেবে দেখুন তো, শেষ পর্যন্ত তারা আমাকে এ চিঠিটা পাঠিয়ে দিল, আর লোক পেল না!

দিন কয়েক পরে মার্কিসন আবার হন্তদন্ত হয়ে আমাদের হোটেলে এসে হাজির হল।

ঘরে ঢুকেই সে বলল—দেখুন মশাইরা, আমি নিশ্চিত জানি, আপনারা মানুষ হিসাবে খুব ভাল।

তা যদি না জানতাম তবে অবশ্যই এরকম একটা গোপন ব্যাপারে আপনাদের কাছে অবশ্যই মুখ খুলতাম না।

সে যা-ই হোক, আপনি কি তাদের চিঠির জবাব দিয়েছেন? আমি মার্কিসনকে জিজ্ঞাসা করলাম।

সে রীতিমত বিরক্তির সঙ্গেই জবাব দিল—দিয়েছি। নিতান্ত কৌতূহলাপন্ন হয়েই হতচ্ছাড়াদের চিঠির জবাব দিয়েছিলাম।

চিঠি পেয়ে তারা কি করল?

কি আবার করবে, আমাকে শিকাগো যেতে বলে চিঠি পাঠিয়েছে।

আর কিছু?

হ্যাঁ, আরও লিখেছে, কবে, কখন আমি যাত্রা করব তা যেন টেলিগ্রাম মারফৎ জে. স্মিথকে জানিয়ে দেই। শিকাগো পৌঁছে আমি যেন একটা বিশেষ রাস্তার মোড়ে অপেক্ষা করি। আর সেখানে ছাই রঙের পোষাক পরিহিত একজন এসে আমার সামনে একটা খবরের কাগজ মেলে না ধরা পর্যন্ত আমাকে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতেই হবে।

তারপর? তারপর কি করতে হবে? অ্যান্ডি জিজ্ঞাসা করল।

তারপর লিখেছে। খবরের কাগজওয়ালা লোকটাকে আমি যেন জিজ্ঞাসা করি জলের রঙ কেমন?

জলের রঙ কেমন? তার মানে?

মানে একটাই, এর মাধ্যমে সে বুঝতে পারবে, আমি কে, অর্থাৎ তার বাঞ্ছিত লোক কিনা। আর আমার পক্ষেও তার পরিচয় জানা সম্ভব হবে।

অ্যান্ডি ভুরু কুঁচকে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল—আরে, এ যে সেই পুরনো খেল্। এরকম ঘটনার কথা তো খবরের কাগজের পাতায় প্রায়ই চোখে পড়ে। এবার মার্কিসনের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে সে আবার বলল—তারপর? তারপর যা ঘটল মোটামুটি এরকম—জান-পরিচয় হয়ে গেলে সে লোকটা আপনাকে নিয়ে হাজির করল একটা হোটেলের গোপন কামরায়। মিঃ জোন্সও সেখানে আগে থাকতে অপেক্ষা করছিলেন। তারা আপনার সামনে কিছু আসল চকচকে নোট মেলে ধরল, ঠিক কিনা?

মার্কিসন বলল—হ্যাঁ, ঠিক এরকম ঘটনাই ঘটেছিল। অ্যান্ডি আবার বলতে শুরু করল—তারপর আপনি তাদের কাছ থেকে এক একটার পরিবর্তে পাঁচটা করে নোট আপনার চাহিদা অনুযায়ী খরিদ করে নিলেন, ঠিক বলি নি?

হ্যাঁ, যা হুবহু ঘটেছিল তা-ই আপনি বলছেন।

এবার তারা আপনার সামনেই সব নোটগুলো একটা থলেতে ভরে আপনার হাতে তুলে দিল, সত্যি কিনা?

সত্যি। শতকরা একশ' ভাগই সত্যি।

এবার যা বলছি, মিলিয়ে নিন। নোটগুলো থলেতে ভরে তারা আপনার হাতে তুলে দেওয়ায় আপনি নিঃসন্দেহ হলেন যে সত্যিকারের নোটগুলো থলেটার মধ্যেই রয়ে গেছে। অবশ্য পরে থলের মুখ খোলার পর আপনার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার যোগাড় হল। দেখলেন, পুরো নোটের গোছাটাই জাল, ঠিক কিনা?

মার্কিসন এবার বললেন—একটু আগে পর্যন্ত যা কিছু বলেছেন সবই হুবহু ঠিক। কিন্তু শেষেরটুকু একটু অন্যরকম, মানে হতচ্ছাড়ারা আমাকে নোটের থলেটা গছাতেই পারে নি। দেখুন মঁসিয়েরা, আমার মাথায় যদি একটু-আধটু ঘিলু না-ই থাকত তবে গ্রাসভিল-এর মত শহরে সবচেয়ে বড় একটা ব্যবসা চালানো কি আমার পক্ষে সম্ভব হত? এবার বলুন তো মিঃ টাকার, আপনার কি বিশ্বাস যে, তারা আপনাকে সত্যিকারের, মানে আসল টাকা দেখায়? আমি বলব, অবশ্যই না।

অ্যান্ডি বলল—আমি কিন্তু আসল নোটই দেখেছিলাম। আর কাগজপত্র দেখে তো আমার সে ধারণাই হয় মিঃ মার্কিসন।

দেখুন, আমি নিজে অন্তত নিঃসন্দেহ যে, হতচ্ছাড়ারা আমাকে ধোঁকা দিতে পারবে না, কিছুতে

না।

তাই বুঝি?

অবশ্যই। আমি তো মনস্থ করে রেখেছি যে, হাজার দুই ডলার পকেটে নিয়ে সোজা সেখানে চলে যাব। আর সবগুলো নোটই হতচ্ছাড়াদের হাতে দিয়ে দেব।

পরিণামে কি হবে একবারটি—

অ্যান্ডিকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই মিঃ মার্কিসন বলে উঠল—পরিণাম? শুনুন তবে বলছি—তারা যে নোটগুলো আমার সামনে মেলে ধরবে তখন মিঃ মার্কিসন-এর চোখে সেগুলো পড়লে এ অভিজ্ঞ চোখ দুটোকে তারা কিছুতেই ধাপ্পা দিতে পারবে না। তারা তো লিখিতভাবেই জানিয়েছে, প্রতিটা এক ডলারের বিনিময়ে পাঁচটা করে ডলার ফেরৎ দেবে। এ শর্ত থেকে তাদের পক্ষে কিছুতেই সরে যাওয়া সম্ভব হবে না। কিছুতেই আমি তাদের শর্তভঙ্গ করতে দেব না।

অ্যান্ডি বিস্ময়মাখানো দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। মিঃ মার্কিসন বলে চলল—আপনারা নিঃসন্দেহ হতে পারেন, বিল মার্কিসন-এর চোখকে হতচ্ছাড়া কিছুতেই ফাঁকি দিতে পারবে না। আমি বড়ই কড়া ধাতের মানুষ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শিকাগোতে গিয়ে একের বিনিময়ে পাঁচ হিসেবই নচ্ছাড় জে. স্মিথকে অবশ্যই কুপোকাৎ করতে পারব।

তবে আপনি নিঃসন্দেহ যে, আপনি একাজে বাজিমাৎ করতে পারবেনই, কি বলেন?

অবশ্যই। নিজের ওপর এ আস্থাটুকু আমার আছে।

সত্যি বলছি বিল মার্কিসন-এর মাথা থেকে একে পাঁচ-এর ভূতটাকে নামানোর জন্য অ্যান্ডি আর আমি সাধ্যাতীত প্রয়াস চালালাম। কিন্তু আমাদের সব প্রয়াসই ব্যর্থ হয়ে গেল। আসলে ব্যাপারটা সম্বন্ধে সে একেবারেই মরিয়া হয়ে উঠেছে।

বিল মার্কিসন-এর ওই এক কথা, ধাপ্পাবাজি কারবারটার পাণ্ডাদের হাতেনাতে ধরে কড়া সাজার ব্যবস্থা করাকে সে সামাজিক কর্তব্য বলে মনে করে। আর সে কর্তব্য সম্পাদন করতে সে রীতিমত বদ্ধপরিকর। এ কাজে সে যে সাফল্য লাভ করবে তাতে সে তিলমাত্র সন্দেহও পোষণ করে না।

বিল মার্কিসন বিদায় নিয়ে পথে নামার পর আমি আর অ্যান্ডি চুরুট ধরিয়ে মুখোমুখি চেয়ারে বসলাম। ডলার পাঁচগুণ করার মতলবটা নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে ভাবনা-চিন্তা করলাম।

চুরুটটাকে ঠোঁট থেকে নামিয়ে নিয়ে অ্যান্ডি বলল—জেফ, একটা কথা তো আর অস্বীকার করার উপায় নেই যে, কারবারের ব্যাপারে তোমার আর আমার মধ্যে প্রায়ই মতবিরোধ—কথা কাটাকাটি পর্যন্ত হয়ে থাকে। আর এমনও দেখা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমিই ভুলটা করি। তবে ঐ একটা ব্যাপারে আমরা প্রায় সবসময়ই একমত হয়ে থাকি।

হ্যাঁ, এ ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের মধ্যে মত পার্থক্য হয় না বললেই চলে।

শোন, আমার বিশ্বাস, শিকাগোতে গিয়ে মিঃ মার্কিসনকে ওই ধাপ্পাবাজগুলোর কাছে একা যেতে দেওয়া ঠিক হবে না।

আমি বলব, চরম ভুলই করা হবে।

ওই বাটপাড় কারবারটাকে বন্ধ করার মত একটা মাত্র উপায়ই আছে। আচ্ছা ভায়া, তুমি কি মনে কর না ওই ধাপ্পাবাজদের উচিত শিক্ষা দিয়ে মিঃ মার্কিসনকে রক্ষা করতে পারলে আমরা খুবই খুশিই হব? নাকি তুমি অন্য কোন মত পোষণ—

সে কী হে! তুমি এটা বলছ কি। মিঃ মার্কিসনকে রক্ষা করতে পারলে আমি খুশি হব না, ভাবলে কি করে? কথাটা বলেই আমি অ্যান্ডির হাতদুটো চেপে ধরে বার-কয়েক ঝাঁকুনি দিয়ে সোল্লাসে বলে উঠলাম—চমৎকার! চমৎকার মতলব এঁটেছ ভায়া।

অ্যান্ডিও মুখে হাসির ছোপ ফুটিয়ে তুলল।

আমি বলে চললাম—আমার মনের কথা শোন অ্যান্ডি, অন্য সময়ে আমি যা-ই বলি, যা-ই করে থাকি না কেন, এ ব্যাপারে কিন্তু আমি মনে মনে তোমার কথাগুলোই ভাবছিলাম। মিঃ মার্কিসন যে-কাজটা করার জন্য বদ্ধপরিকর তা তাকে করতে দেওয়াটা আমাদের পক্ষে খুবই অসম্মানজনক বলেই আমি মনে করছি। তাকে ওটা করতে দেওয়া আমাদের পক্ষে কিছুতেই উচিত হবে না। সে যখন শিকাগো যেতে বদ্ধপরিকর তখন চল আমরাও সেখানে যাই।

তারপর?

সেখানে গিয়ে হতচ্ছাড়াগুলোর ধাপ্পাবাজি কারবারটা বন্ধ করে দেব।

অ্যান্ডি সোল্লাসে আমার প্রস্তাবটা সমর্থন করল। ওই ধাপ্পাবাজি কারবারটা বন্ধ করার ব্যাপারে তার উৎসাহের প্রাবল্য আমাকে খুবই মুগ্ধ করল।

খুশিতে ডগমগ হয়ে আমি বললাম—শোন অ্যান্ডি, আমি নিজে একজন মহাধার্মিক এরকম ধারণা আমি অবশ্যই অন্তরে পোষণ করি না। আবার নৈতিকতার ব্যাপারেও আমার কিছুমাত্রও খুঁতখুতানি নেই।

এসব কথা এ সময়ে কেন—

কারণ একটাই ভায়া, যে লোকটা নিজে বুদ্ধি কৌশল, ইচ্ছা শক্তি এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এতবড় একটা কারবার গড়ে তুলেছে সে লোকটা জনা কয়েক ধাপ্পাবাজের হাতে পড়ে নিঃস্ব। একেবারে পথের ভিখারী হয়ে যাবে এটা স্থাবরের মত দাঁড়িয়ে দেখা আমাদের পক্ষে অবশ্যই সঙ্গত হবে না।

অ্যান্ডি সোল্লাসে বলে উঠল—চমৎকার মতলব, মিঃ মার্কিসন যখন শিকাগোতে হাজির হবে ঠিক তার পিছন পিছনই আমরাও সেখানে হাজির হব। যেকোন উপায়ে ওই হতচ্ছাড়াদের ধাপ্পাবাজি কারবারটা বন্ধ করে দেব।

আমি অ্যান্ডিকে সঙ্গে নিয়ে বিল মার্কিসন -এর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

আমাদের পরিকল্পনার কথা শুনে মিঃ মার্কিসন মুহূর্তকাল গুম্ হয়ে বসে ভাবল। তারপর মুখ তুলে আমাদের মুখের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিয়ে বলে উঠল—মঁসিয়েরা, তা হয় না। আমার পক্ষে তোমাদের পরিকল্পনাটাকে সমর্থন করা কিছুতেই সম্ভব নয়। আমার সাফ কথা শুনুন, এ ব্যাপারটা থেকেও আমি কিছু না কিছু মালকড়ি কামিয়ে নিতে চাই।

মালকড়ি কামাবার ধান্দা না করে চলুন, আমাদের সঙ্গে। আমি বললাম।

অসম্ভব! একেবারেই অসম্ভব। হাতের কাছের শিকার ফেলে রেখে—

মিঃ মার্কসন-এর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে অ্যান্ডি বলল—কার্যত দেখা যাবে শিকারের বদলে শিকারীই ঘায়েল হয়ে গেছে। তার চেয়ে বরং ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে চলুন।

ব্যাপারটার একটা হিল্লে আমাকে করতেই হবে। কিন্তু এখন বড় সমস্যা তো দেখছি আপনাদের নিয়ে।

আমি বললাম—আমাদের নিয়ে? এ আবার কি রকম কথা?

আপনারা যদি আমার পিছন না ছেড়ে এঁটুলির মত আমার গায়ের সঙ্গে সেঁটে থাকেন তবে আমার আত্মহত্যা না করে উপায় থাকবে না।

অ্যান্ডি গম্ভীরমুখে প্রায় অস্ফুট উচ্চারণ করল—হুম্।

তবে একটা কথা, একের বদলে পাঁচ-এর নোটগুলো ভাঙাবার ব্যাপার যখন চলতে থাকবে তখন হয়ত আপনাদের সহযোগিতা অপরিহার্য হয়ে উঠবে।

মুহূর্তের জন্য নীরব থেকে মিঃ মার্কিসন আমাদের মনের অবস্থা সম্বন্ধে আঁচ করে নেওয়ার চেষ্টা করল। তারপর একসময় আবার মুখ খুলল—শুনুন, আমার আপত্তি থাকা সত্ত্বেও আপনারা যদি সেখানে যেতে উৎসাহী হন তবু কিন্তু ডলার বদলের পুরো ব্যাপারটাকে একটা তামাশা আর মজার ব্যাপার হিসেবেই গণ্য করব।

ব্যস, সেদিন আমাদের আলোচনা এ পর্যন্তই হল। আমরা জরুরী কিছু কাজ সেরে নেবার জন্য বেরিয়ে পড়লাম।

এদিকে মিঃ মার্কিসন গ্রাসভেল শহরের সর্বত্র প্রচার করে দিলেন যে, দিন কয়েকের জন্য তিনি মিঃ টাকার ও মিঃ পিটার্সকে সঙ্গে নিয়ে কয়েকটা লোহার খনির সম্পত্তি ঘুরে ঘুরে দেখার জন্য পশ্চিম ভার্জিনিয়াতে পাড়ি জমাচ্ছে।

আর জে. স্মিথকে সে টেলিগ্রাম মারফৎ জানিয়ে দিল, অচিরেই কোন একটা নির্দিষ্ট দিনে তাদের বিছানো জালে মাথা গলাবে।

মিঃ মার্কিসন-এর পরিকল্পনা মাফিক আমি আর অ্যান্ডি শিকাগোর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলাম।

মিনিট খানেক নীরবে ভেবে নিয়ে মিঃ মার্কিসন হঠাৎ সরবে হাসতে আরম্ভ করল।

আমরা তো তার ব্যপারস্যাপার দেখে একেবারে থ'বনে গেলাম। একসময় হাসি থামিয়ে মিঃ মার্কিসন বলল—অয়াবাস এভিনিউ আর লেক সরণির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ছাই রঙের পোষাক পরিহিত একটা লোক। সে চোখের সামনে একটা কাগজ মেলে ধরবে। তারপরই আমি তাকে জিজ্ঞেস করব, জলের রঙ কি? চমৎকার! চমৎকার! চমৎকার পরিকল্পনা! কথাটা বলতে বলতেই সে আবার গলা-ছেড়ে হাসতে লাগল।

সকাল সাতটার কাছাকাছি আমরা শিকাগো হাজির হলাম।

এখনও প্রায় দু'ঘণ্টা সময় হাতে আছে। কারণ, ছাই রঙের পোষাক পরিহিত লোকটার সঙ্গে সকাল ন'টায় মিঃ মার্কিসন-এর মোলাকাৎ হওয়ার কথা।

আমরা মিঃ মার্কিসন-এর পিছন পিছন ছোট্ট একটা রেস্তোরাঁয় হাজির হলাম। সেখানে সামান্য কিছু পানাহার সেরে নিলাম।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে আমরা তিনজন হোটেলে ফিরে গেলাম। সেখানে মিঃ মার্কিসন-এর কামরায় গিয়ে তার বাঞ্ছিত ছাই রঙের পোশাক পরিহিত লোকটার জন্য প্রতীক্ষায় প্রতিটা মিনিট কাটাতে লাগলাম।

হোটেলের কামরায় বসে মার্কিসন আমাদের দু'জনকে লক্ষ্য করে বলল—দেখুন মঁসিয়েরা, আমরা তিনজন মিলে এমন একটা মতলব বের করি যাতে সহজেই শত্রুতে ধরাশায়ী করে দিতে পারি।

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকালাম।

মিঃ মার্কিসন বলে চলল—এমন একটা মতলব করলে কেমন হয় আপনারা দু'জনে ভেবে দেখুন তো।

মতলব? আপনার মতলবটা আগে শুনি তো?

মনে করুন, ছাই রঙের পোশাক পরিহিত লোকটার সঙ্গে আমি যখন কথা বলতে থাকব তখন আপনারা এমন ভাব দেখিয়ে সেখানে যাবেন যেন হঠাৎই সেখানে হাজির হয়েছেন। এমনভাবে আমার নাম ধরে সম্বোধন করবেন যেন আমার খুবই পরিচিত জন। তারপর হাসিমুখে করমর্দন করবেন।

আমি তাকে একপাশে ডেকে নিয়ে বলব যে, আপনারা গ্রাসভেল-এর অধিবাসী, কারবারী। কারবারই আপনাদের একমাত্র অবলম্বন। আর উভয়েই মানুষ হিসেবে খুবই সদাশয়।

আমার মুখে আপনাদের সুখ্যাতি শুনে তারা হয়ত আমাকে বলবে—ভালই তো, তারাও যদি লগ্নি করতে আগ্রহী থাকে তবে তাদেরও দলে ভিড়িয়ে নিন। ভাল কথা, আমাদের পরিকল্পনাটা কেমন মনে করছেন, বলুন তো?

অ্যান্ডি আমার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে বলল—তোমার কি মত? এ ব্যাপারে তুমি কি মনে করছ?

আমার মতামত আর নতুন করে কি বলব? আমার যা কিছু বক্তব্য তা-তো তোমাকে বলবই।

তবে বলেই ফেল।

আমার একমাত্র বক্তব্য হচ্ছে, আজই ব্যাপারটার যা হোক কিছু একটা ফয়সালা করে ফেলা যাক। অহেতুক সময় নষ্ট করার দরকারই বা কি, বল?

আমি মুচকি হেসে তাকে সমর্থন করলাম।

সে এবার বলল—এবার যা বলছি, মন দিয়ে শোন—আমি কোটের বুক পকেট থেকে একটা গিল্টিকরা '৩৮ বের করে তার নলটাকে বার-কয়েক এদিক-ওদিকে ঘোরাব।

আমি অত্যুগ্র আগ্রহ প্রকাশ করে বলে উঠলাম—তারপর? তারপর কি করবে?

তারপর মিঃ মার্কিসনকে লক্ষ্য করে বজ্র-গম্ভীর স্বরে আমি বলব—ওরে নরাধম, নরকের কীট, পাপাত্মা, চোরাকারবারি বাচ্চা শুয়োর—দু' হাজার বের করে শিগগীর টেবিলে রাখ। এক মুহূর্তও দেরী করবি না। ধান্দাবাজী করলে জান খতম করে দেব, বলে দিচ্ছি। আমি ভাল মানুষ বটে। তবে ক্ষেপে গেলে মাথায় খুন চেপে যায়। চটপট দু' হাজার টেবিলে রেখে দে।

মিঃ মার্কিসন তখন বলি প্রদত্ত পশুর মত আতঙ্কে, মানে কৃত্রিম আতঙ্ক চোখে-মুখে ফুটিয়ে তুলে কোটের পকেট থেকে নোটের গোছাটা বের করে টেবিলে রেখে দিলে আমি গর্জে উঠব—ওরে নরাধম, তোর মত ধাপ্পাবাজদের জন্যই দেশের জেলখানাগুলো গড়ে তোলা হয়েছে। আর দেশের আদালতগুলোও তো একই উদ্দেশ্যে তৈরী হয়েছে।

অ্যান্ডি সোল্লাসে বলে উঠল—চমৎকার! এ পর্যন্ত যা শোনালাম তাতে তো তোমার পরিকল্পনাটা ভালই মনে হচ্ছে। তারপর?

তারপরের কথাগুলোও কৃত্রিম ক্ষোভ প্রকাশ করেই মিঃ মার্কিসনকে লক্ষ্য করে আবার বলল—তুমি বাটপাড়ি করার আর জায়গা পাওনি? এ নিরীহ সহজ-সরল প্রকৃতির সদাশয় মানুষগুলোর ডলারগুলো হাতিয়ে নেবার জন্য এখানে হাজির হয়েছে।

আমার কথা শেষ হলে মিঃ মার্কিসন হয়ত বলবেন—আরে না, আমি নয়, এ লোকগুলোই ধাপ্পা দিয়ে আমার দু'হাজার ডলার বাগিয়ে নেওয়ার জন্য এখানে হাজির হয়েছে। বাটপাড়ির ধান্দা আমার নয়, এদের।

আমি তখন বলব—বাজে কথা! এটা নিছকই তোমার একটা ধাপ্পা। আমি তোমার চরিত্র জানি, সব দোষ, সব পাপ তোমারই। তুমি ভেবেছ, মুখ কাঁচুমাচু করে এদের ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারবে। আমি যদি তোমাকে না চিনতাম, তোমার চরিত্র, মানে নাড়ি-নক্ষত্র না জানতাম তবে হয়ত তোমার এসব কথায় গলে যেতাম। কিন্তু তা কিছুতেই হচ্ছে না। তোমার ধান্দাই হচ্ছে, একজনের মাথায় হাত বুলিয়ে নিজের, না হয় কোন আপনজনের পকেট ভারি করা। ওই সব চোরা কারবারীদের চেয়ে তুমি হাজারগুণ অপরাধী, জেনে রাখ।

তারপর আমি একই স্বরে বলব—বাইরে, দশজনের সামনে তুমি একজন সদাশয় ধর্মাচারী বলে প্রচার কর। সজ্জনের ভেক ধারণ করে সমাজের বুকে চলাফেরা কর। নিয়মিত গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা সভায় যোগদান করতেও ভুল কর না। আর ঠিক সময়ে শিকাগো শহরে হাজির হয়ে খোলস বদলে আসল রূপ ধারণ করা। এখানে বড়বড় কারবারীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজের কূটবুদ্ধিসম্বল করে রক্তচোষার মত তাদের শোষণ করতে মেতে যাও। ব্যস, নিজের কাজ হাসিল করে কেটে পড়। তোমার মাথায় তো ঢুকবে না যে, পরিবারের ভাষণের জন্য কী কঠোর পরিশ্রম করে তাদের অর্থোপার্জন করতে হয়। তোমার মত সদাশয় ভদ্রলোকের ভেকধারী, যারা বিনা মূলধনে কারবারে টাকার কুমীর বনে—তারাই তো স্টক-এক্সচেঞ্জ, শেয়ার-বাজার লটারি প্রভৃতি বাটপাড়ির প্রধান সমর্থক। তবে এগুলোর পিছনে তোমাদের সমর্থন না থাকলে ওই সব লাভজনক ধাপ্পাবাজি কারবারে কবে লালবাতি জ্বলত।

মুহূর্তের জন্য থেমে আমি আবার বলতে শুরু করলাম—আমি তারপর যা বলব, বলছি শোন—ওই যে লোকদুটোর পকেট হাল্কা করার ধান্দায় তুমি এখানে হাজির হয়েছ তারা অবশ্যই বহু বছরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে একটু একটু করে চোরা কারবারটা চিনতে পেরেছে। বহুবার নিজের অর্থ খুইয়েছে, জীবনের ঝুঁকি নিতেও দ্বিধা করেনি।

তোমরা ধোয়া তুলসি পাতা, মানে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর ভাব নিয়ে এখানে হাজির হও। পছন্দ মাফিক একটা ডাকঘর খুঁজে নিতে পারলেই তোমাদের কাছে প্রায় হাজির হয়ে যায়। তারপর ঠিকানা অনুযায়ী একের পর এক নিরীহ-নম্র সহজ-সরল মানুষগুলোকে ডেকে নিয়ে এসে পকেট খালি করে তবে ছাড়ান দাও, নিজেরাও গা-ঢাকা দাও।

আর যদি বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে, অর্থাৎ তোমাদের মক্কেলদের মধ্যে কেউ যদি টাকাটা পেয়ে যায় তবে তোমরা হাজার রকম মিথ্যা ঘটনা সাজিয়ে পুলিশের কাছে নালিশ কর। আর যদি তোমার বরাতেই টাকাটা জুটে যায় তবে ছাইরঙের পোষাক পরিহিত-লোকটার কাছ থেকে রাত্রের খাবারের দাম দেবার জন্য চেয়েচিন্তে কিছু অর্থ নিয়ে নাও। আমি অ্যান্ডি তোমাকে চিনতে ভুল করিনি। তাই তো তোমাকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য তোমার পিছনে ধাওয়া করেছিলাম। বাছাধন, মানে মানে ডলারগুলো দিয়ে দাও।

আমি কুড়ি ডলার বিলের মোট দু'হাজার ডলার কোটের ভেতরের বুক-পকেটে রেখে তৈরী হয়ে নিলাম।

আমি এবার মিঃ মার্কিসনকে লক্ষ্য করে বললাম—আপনার ঘড়িটা বের করে টেবিলের ওপরে রাখুন। আর যতক্ষণ এক ঘণ্টা সময় পেরিয়ে না যায় ততক্ষণ চেয়ারে চুপটি করে বসে থাকুন।

এক ঘণ্টা পরেও কি আমি এখানেই বসে থাকব? মিঃ মার্কিসন আমাকে বললেন।

আরে না-না, এক ঘণ্টা বাদে আপনি যেখানে খুশি চলে যেতে পারবেন৭ একটা কথা, যদি আপনি আমাদের মতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করেন তবে কিন্তু আপনার কাণ্ডকারখানার কথা উল্লেখ করে হ্যান্ডবিল সারা গ্রাসভেল শহরে ছড়িয়ে দেব, মনে থাকে যেন।

তার মানে?

মানে একটাই, আপনার মান সম্মান, অর্থাৎ প্রভাব প্রতিপত্তি ধূলোয় মিশিয়ে দেব।

আতঙ্কিত চোখে মিঃ মার্কিসন প্রথমে আমার এবং পর মুহূর্তেই অ্যান্ডির মুখের দিকে তাকাল।

আমি বলে চললাম—মিঃ মার্কিসন, আমি মনে করি এ-শহরে দু' হাজার ডলারের চেয়ে আপনার প্রভাব পতিপত্তির দাম অনেক, অনেক বেশী।

মার্কিসনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে অ্যান্ডি আর আমি যেখান থেকে রওনা হয়ে পড়লাম।

ট্রেনটা দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। অ্যান্ডি আর আমি মুখোমুখি আসনে নীরবে বসে। কারো মুখে টুঁ-শব্দটাও করলাম না।

বেশ কিছুটা পথ পাড়ি দেবার পর অ্যান্ডিই প্রথম মুখ খুলল—তোমাকে একটা প্রশ্ন করলে কিছু মনে করবে না তো?

আরে ভায়া, একটা কেন, চল্লিশটা প্রশ্ন করলেও কিছু মনে করব না। বল তো, কি তোমার জিজ্ঞাস্য?

মার্কিসনকে নিয়ে আমরা যাত্রা করার সময়ই মতলবটা তোমার মাথায় ছিল?

অবশ্যই।

তাই নাকি?

বললামই তো, ছিল। এরকমটা ছাড়া আর কি-ই বা করা যেত, বলতে পার?

অ্যান্ডি নীরব রইল।

আমি এবার বললাম—অ্যান্ডি, সত্যি করে বল তো, তোমার মাথায়ও কি এরকমই একটা পরিকল্পনা খেলছিল না?

অ্যান্ডি গুম্ হয়ে বসে রইল। আধঘণ্টা সে মুখে কুলুপ এঁটেই বসে রইল।

আমিও কিছুক্ষণ তাকে আর বিরক্ত করলাম না।

এক সময় আমার পক্ষে আর চুপ করে থাকা সম্ভব হল না। আমি এবার বললাম—তুমি মাঝে-মধ্যে আমার নৈতিক চরিত্রটাকে, মানে আমার নীতিবাদ যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পার না।

তুমি ঠিকই বলেছ।

তা ছাড়া কি-ই বা আর বলতে পারি?

জেফ, একটা কাজ করতে পার?

কি? কি কাজ?

কাজটা হচ্ছে, তোমার বিবেকের একটা রেখাচিত্র এঁকে আমাকে উপহার দেবে।

সে সরবে হেসে বলল—বিবেকের রেখাচিত্র? চমৎকার কথা শোনালে অ্যান্ডি।

ঠিকই তো, সেটা কাছে থাকলে আমি মাঝে-মধ্যে, সেটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিতে পারব।

কন্‌সিয়েন্স ইন আর্ট

একদিন জেফ পিটার্স আমাকে বলল—আমি কোনদিনই আমার বন্ধুবর অ্যান্ডির টাকারকে খাঁটি বাটপাড়ির বৈধ নৈতিকতার দায়ে বাঁধতে সক্ষম হইনি।

সত্যি কথা বলতে কি, অ্যান্ডির কল্পনাশক্তি এতই তীক্ষ্ণ যে, তার পক্ষে সততা অক্ষুণ্ণ রাখা আর সম্ভব নয়।

আসলে অর্থোপার্জনের এমন উন্নত মানের ধাপ্পাবাজি আর বাটপাড়ির পরিকল্পনা তার মাথায় আসে যাকে কোন পর্যায়েই ফেলা যায় না। আমার নিজের কথা যদি বলতে হয় তবে আমি বলব, কোন কিছুর বিনিময় ছাড়া, অর্থ কোন কিছু না দিয়ে কারো কাছ থেকে একটা কানাকড়িও আমি নিতে উৎসাহী হই না। তবে 'কোন কিছু' বলতে এখানে রোল্ডগোল্ডের গহনা, বাতের মলম, বাগানে বপন করার বীজ, স্টোভের পালিশ আর স্টক সার্টিফিকেট নয়তো মাথায় কোন আঘাতের ক্ষতচিহ্ন।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার পূর্বসূরীদের কেউ কেউ অবশ্যই ইংল্যান্ডের অধিবাসী ছিলেন। আর আমি উত্তরাধিকারসূত্রে পুলিশ সম্বন্ধে অস্বাভাবিক একটা ভীতি আমি লাভ করেছি।

বন্ধুবর অ্যান্ডির বংশ-তালিকাটা একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির। একটা পৌরসভা থেকে পুরনো কোন পূর্বসূরীদের কথা তার জানা আছে বলে আমার মনে হয় না।

এক সময় মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলে ওহিও উপত্যকায় আমরা যখন কাজে নিযুক্ত ছিলাম তখনই অ্যান্ডি মতলব এঁটেছিল বড়সড় একটা লগ্নি-কারবার ফাঁদবে। সে উচ্চাকাঙ্খাটা সে অন্তরের অন্তঃস্থলে দীর্ঘদিন পুষে রেখেছিল।

অর্থোপার্জনের প্রসঙ্গ উঠলেই অ্যান্ডি আমাকে বলত—জেফ, এসব আজেবাজে কাজে বৃথা সময় নষ্ট না করে বড়সড় কোন একটা কারবারে ঝুলে পড়ব।

তারপর একই প্রসঙ্গে জের টেনে অন্য আর একদিন। অ্যান্ডি আমাকে বলেছিল—শোন জেফ, এ শহরে যেসব কারবারী আছে তাদের অধিকাংশই তো আমি টিকটিকি আর আরশোলা ছাড়া কিচ্ছু ভাবতেই পারি না। তাই বলছি কি, তাদের পিছনে ঘুরঘুর না করে আমরা বরং আকাশচুম্বী প্রাসাদ-নগরীর কোন মক্কেলের খোঁজ করে তাকে পাকড়াও করার ধান্দা করলে কেমন হয়, বল তো?

ভায়া, আমার চরিত্র তো আর তোমার অজানা নয়। কোনরকম বে-আইনীর নামগন্ধ নেই, সাদাসিধে কোন কারবারের দিকেই আমার ঝোঁক। মনে করতে পার, ঠিক যেমন কারবারে আমি এখন নিজেকে লিপ্ত রেখেছি।

সে তো জানিই।

কারো কাছ থেকে আমি যেকোন রকম অর্থকড়ি নেবার সময়ই মনে মনে স্থির করে ফেলি, কিভাবে তার বিনিময়ে তাকে কিছু দেব।

এ-ও আমি ভালই জানি। তোমার সঙ্গে তোর আসার সম্পর্ক তো আর আজকের নয় জেফ।

এবার কি বলছি শোন, তোমার মাথায় যদি কোন নতুন পরিকল্পনা এসে থাকে তবে সেটার কথাও আমরা ভেবে দেখতে পারি। আমরা ছোটখাটো সেসব কারবারের ধান্দা করে থাকি সে সবের ব্যাপারে তো আর মাথার দিব্যি দেওয়া নেই যে নতুন কোন কারবারে আমরা মাথা গলাতে পারব না, কি বল?

আমার কথা শুনে অ্যান্ডি, এবার বলল—শোন জেফ, আমি তো মতলব এঁটেছি, কুকুর, ক্যামেরা ও শিঙা ছাড়াই যে সব মার্কিন টাকার কুমীরদের বেছে বেছে আমরা ঘায়েল করব যাদের—'পিটস্‌বার্গ কোটিপতি' বলে চিহ্নিত করা হয়।

আমি সোৎসাহে একটু নড়েচড়ে বসলাম। অ্যান্ডি বলল—আমার মতলবটা তোমার মনে ধরেছে মনে হচ্ছে।

সে না হয় স্বীকার করছি। কিন্তু কোথায়? নিউইয়র্কে?

না, নিউইয়র্কে অবশ্যই নয়।

তবে কোথায়, বলবে কি?

পিটস্‌বার্গে।

পিটস্‌বার্গে কেন? কেনই বা নিউইয়র্কে নয়, জানতে পারি কি?

আরে ভায়া, যে সব টাকার কুমীরের কথা আমি বলেছি তারা যে পিটস্‌বার্গেই বাস করে, নিউইয়র্কে নয়।

নিউইয়র্কে কেন নয়?

নিউইয়র্কের প্রতি তাদের অনীহা। তবে তারা যে মাঝে-মধ্যে নিউইয়র্কে হানা দেয় না এমন কথাও জোর দিয়ে বলা যায় না। গরম কফিতে একটা মাছি পড়লে যেমন সহজেই চোখে পড়ে ঠিক তেমনই পিটস্‌বার্গের ধনকুবের সহজেই চোখে পড়ে যায়। ফলে সহজেই আলোচনার বিষয়ও হয়ে পড়ে।

এতে ধনকুবেরের কোন রকম ওজর আপত্তি থাকে না?

অবশ্যই। সে নিজে ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ করে না। তাকে নিয়ে নিউইয়র্ক প্রতিনিয়তই রঙ্গ -রসিকতা করে। আসল কথাটা কি জান জেফ?

আমি কৌতূহল মিশ্রিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নীরবে অ্যান্ডির মুখের দিকে তাকালাম।

তাকে নীরব দেখে আমিই বললাম—আসল কথাটা হচ্ছে, এখানে বসবাসকালে ধনকুবের লোকটা মোটেই কিছু খরচ করতে উৎসাহী হয় না। যাকে বলে, পয়লা নম্বরের কঞ্জুস।

জেফ, এবার কি বলছি, ধৈর্য ধরে শোন—একদিন পিটস্‌বার্গ-এর একটা লোক বাংকাম শহরে দশদিন কাটিয়েছিল। সে ছিল পনের কোটি ডলারের মালিক।

আরেব্বাস! প-নে-র কোটি?

হ্যাঁ, পনের কোটি। তারপর যে কথা বলতে যাচ্ছি, শোন—লোকটা শহরে দশদিন থেকে যে পরিমাণ ডলার খরচ করেছিল তার হিসাবের পাতাটা আমি দেখেছিলাম। খরচের পাতায় লেখা ছিল—যাতায়াত বাবদ ব্যয়—দু'হাজার একশ' ডলার, হোটেলে যাতায়াত বাবদ ট্যাক্সি-ভাড়া দু'শ' ডলার, প্রতিদিন পাঁচ ডলার হিসাবে হোটেলের ব্যয় পঞ্চাশ ডলার আর বকশিস বাবদ ব্যয় হয়েছে পাঁচ লক্ষ সাত হাজার পাঁচ শ'। ওই দশদিনে তার মোট খরচ হয়েছে পাঁচ লক্ষ বিরাশি হাজার তিনশ' ডলার।

হিসাবের তালিকাটা উল্লেখ করার পর অ্যান্ডি মুহূর্তকাল নীরবে আমার মুখের দিকে নীরবে তাকিয়ে থাকে। এ ব্যাপারে আমি কোন মন্তব্য করি কিনা দেখে নিয়ে সে-ই আবার বলতে লাগল—শোন, পিটস্‌বার্গের মানুষ কি করে খরচ করতে হয় ভালই জানে। আর তার সময় যখন ভাল যায় সে তখন বাড়িতে কাটায়।

এতে আমাদের কোন্ স্বার্থ সিদ্ধি হবে বলে তুমি মনে করছ? আমি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কথাটা বললাম।

অ্যান্ডি বলল—আমাকে সেখানে গিয়েই তার সঙ্গে মোলাকাৎ করব।

সে যা-ই হোক না কেন, একটা জমাটে গল্পকে আরও বেশী জমিয়ে তুলতে হলে এটুকু বললেই চলে যাবে সে, এখানকার কাজকর্ম, বিলি ব্যবস্থা মিটিয়ে অ্যান্ডি আর আমি সরাসরি পিটস্‌বার্গের উদ্দেশ্যে পা-বাড়ালাম।

আমরা সেখানকার স্মিথফিল্ড স্ট্রীট ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমি বললাম—কি ব্যাপার অ্যান্ডি, মুখে কুলুপ এঁটে দিলে যে! এখানকার পরিবেশ, মানে রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, মাঠ ময়দান তোমার কাছে কেমন লাগছে, কিছু বলছ না যে?

কেমন লাগছে? খারাপ আর বলি কি করে, বলতো? তবে এখানে হাঁটাচলা করতে আমাদের মার্জিত সহজাত প্রবৃত্তি ও রুচিতে সে একটু-আধটু বাঁধছে, তা তো অস্বীকার করা যাবে না। তবে পিটস্‌বার্গের ধনকুবেররা সহজ-সরল প্রকৃতির। আর আন্তরিক ও গণতান্ত্রিকও বটে। তাদের বাইরেটা রুক্ষ আর অশিষ্ট। আচার আচরণেও তাদের অমার্জিত বলেই মনে হয়। নিতান্ত অভদ্রের মত হৈ-হুল্লোড়ও করে। আসলে কিন্তু তাদের ভেতরটা অসৌজন্য আচরণের ঘাঁটি।

আমি কৌতূহলাপন্ন হয়ে বলে উঠলাম—ব্যাপারটা তো খুব গোলমেলে হে! তাদের চরিত্র

বাস্তবিকই—

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে অ্যান্ডি, বলল—পিটস্‌বার্গের ধনকুবেরদের চরিত্র এমনটা কেন, বলতে পার? আসলে তাদের মধ্যে অধিকাংশ খুবই নিচুতলার সমাজ থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে ওপরে উঠে এসেছে।

এর পরিণতি কি হতে পারে বলে তুমি মনে করছ?

শহরটা যতদিন ধূমপানকারীদের কব্জায় চলে না যায় ততদিন এভাবেই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে থাকবে।

অ্যান্ডি আর আমি কৌতূহলের শিকার হয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করার জন্য তিন-চারদিন শহরের পথে পথে—প্রতিটা অঞ্চলে চক্কর মেরে বেড়াতে লাগলাম। পথচারীদের মধ্য থেকে কেবলমাত্র চোখে দেখেই জনা কয়েক ধনকুবেরকে আমরা সনাক্ত করতে পারলাম।

ধনকুবেরদের একজন নিজের মোটরগাড়ি চেপে এল। আমাদের হোটেলের সদর-দরজার সামনে গাড়ি দাঁড় করাল। এক কোয়ার্ট শ্যাম্পেন আনাল।

মদ পরিবেশনকারী বোতলের ছিপিটা খুলে দিতেই সে বোতলটা উপুড় করে মুখে ঢেলে দিল। চোখের পলকে বোতলটা সাবাড় করে দিল।

লোকটার হাবভাব দেখেই আমি ধরে নিলাম, অগাধ অর্থের মালিক হবার আগে সে ফু দিয়ে কাচের গ্লাস তৈরী করার কাজে লিপ্ত ছিল। নইলে এমন করে মদের বোতলটা কিছুতেই গলায় ঢেলে দিতে পারত না।

এক সন্ধ্যায় আমি অ্যান্ডির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। রাতের খাবারের সময় সে হোটেলে ফিরল না। এগারটা নাগাদ সে আমার ঘরে এল।

আমি কোন কিছু বলার আগেই সে বলল—শোন, একজনকে কব্জায় এনে ফেলেছি। বারো মিলিয়ন। রোলিং মিল, ভূ-সম্পত্তি, তেল আর প্রাকৃতিক গ্যাস। সত্যিকারের ভাল মানুষ বলতে যা বুঝায় লোকটা ঠিক তাই। কোন রকম ঝুটঝামেলায় থাকে না। গত পাঁচ বছরে যাবতীয় অর্থ উপার্জন করেছে। অধ্যাপকের সার্বিক সাহায্য সহযোগিতায় মোটামুটি ভালই লেখাপড়া করেছে। আর সাহিত্য, শিল্পকলা এবং পোযাক পরিচ্ছদের কারবার—এমন আরও অনেক রকম ব্যবসায় লিপ্ত।

আমি যখন তার সঙ্গে দেখা করলাম তখনই ইস্পাত কর্পোরেশনের একজনের কাছে দশ হাজার ডলারে একটা বাজি জিতে নিল।

আমি প্রথম মুখ খুললাম দ-শ হা-জা-র ডলার! অ্যান্ডি বলল—হ্যাঁ, দশ হাজার ডলার বাজি জিতল। আর এরই জন্য আজই এলিখেনি রোলিং মিলে চারটে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে যাবে। তাই হাতের কাছে যাদের পেল তাদের নিয়েই রাত্রের খাবার খেতে বসে গেল, ভাবা যায়?

আমরা সবাই ডায়মন্ড গলির একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে মৌজ করে বসে নানা উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী গলা পর্যন্ত ঢুকিয়ে নিলাম।

খাওয়া দাওয়ার পাট মিটে গেলে লোকটা লিবার্টি স্ট্রীটের একটা অ্যাপার্টমেন্টে আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে গেল। দশটা ঘর নিয়ে সে বাস করে। ঘরগুলো একটা মাছের বাজারের ওপরে অবস্থিত। ঘরগুলোর গায়েই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্নানাগারও আছে।

ঘরগুলো আমাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবার সময় সে বলল—দেখ হে, অ্যাপার্টমেন্টটা সাজিয়ে গুছিয়ে দৃষ্টিনন্দন করে তুলতে তাকে ব্যয় করতে হয়েছে আঠারো হাজার ডলার। সবকিছু নিজের চোখে দেখে আমি নিঃসন্দেহ হয়েছি যে, তার পূর্বকথিত অর্থ অবশ্যই সে খরচ করেছে।

তার ঘরে এমন একটা বহুমূল্য ছবি আছে। সেটার দাম আশি হাজার ডলার। অন্য আর একটা ঘরে কুড়ি হাজার ডলার দামের পুরা বস্তুর সংগ্রহ আছে।

লোকটার নাম কি, বল তো? আমি কৌতূহলের শিকার হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

অ্যান্ডি বলল—স্কুডার। এ নামেই তাকে সবাই ডাকে।

বয়স?

কম-বেশী পঁয়তাল্লিশ বছর। বর্তমানে পিয়ানো বাজানো শিখছেন। প্রতিদিন পনের হাজার পিপে

তার কূপগুলো থেকে তেল ওঠে, ভাবতে পার?

ভাল কথা, প্রাথমিক পরিচয়টা তবে খুশি হওয়ার মতই বটে, তাই না? তবে একটা কথা, আসল মাল, মানে টাকাকড়ির খবর কিছু বল। বহুমূল্য চিত্রশিল্প আর পুরা বস্তুর খবরে আমাদের কোন্ ফয়দা হবে? আর তার কূপের তেল দিয়েই বা আমরা কি করব? টাকাকড়ির খবর কিছু যোগাড় করতে পেরেছ অ্যান্ডি?

একটা কথা কি জান ভায়া? সবাই যাকে অর্থপিশাচ-ধনকুবের বলে এ লোকটার চরিত্র কিন্তু অবিকল সেরকম নয়। আমাকে সঙ্গে করে সে যখন তার পুরাকীর্তির সংগ্রহশালাটা দেখছিল তখন তার চোখের মণি দুটো আবেগে-উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে উঠছিল?

আরে ধ্যুৎ! আসল কথা, মানে মালকড়ির খবর কিছু জানা থাকলে বল।

আরে, অধৈর্য হচ্ছ কেন? কি বলছি শোনই না ধৈর্য ধরে।

হ্যাঁ, পুরাকীর্তির সংগ্রহের কথা বলছিলাম। এক সময় তিনি আমাকে নিয়ে পাশের একটা ঘরে নিয়ে যে ছোট ভাস্কর্যটার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করালেন সেটা রীতিমত একটা বিস্ময়কর নিদর্শন। কম করেও সেটা দু'শ' বছর পুরনো তো হবেই।

অ্যান্ডির উৎসাহকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সমর্থন করতে গিয়ে আমি বললাম—তোমার পরমাশ্চর্য নিদর্শনটা কি, বল তো?

অ্যান্ডি ঠোঁটের কোণে যুদ্ধ জয়ের হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বলে উঠল, বুঝলে জেফ, নেহাৎ বরাতে না থাকলে এমন অনন্য একটা ভাস্কর্য-নিদর্শন দেখা সম্ভবই নয়।

আমি কণ্ঠস্বরে একটু বিরক্তির প্রকাশ করে বললাম—আরে ধ্যুৎ! তুমি কেবলই ধানাই পানাই করে আমার আসল প্রশ্নটা এড়িয়ে যাচ্ছ।

অ্যান্ডি তুমি দেখছি সত্যি সত্যি রেগে যাচ্ছ। কোনটা তোমার আসল প্রশ্ন—হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি, পুরা কীর্তিটা, মানে সেটা কিসের মূর্তি, এই তো? ঠিক আছে, বলছি শোন—নিরেট হাতির দাঁতের একটা টুকরোর ওপর খোদাই করে পদ্মফুলের মত এক নারীর মুখ। বাস্তবিকই মনলোভা একটা মূর্তি মনে করতে পার।

মূর্তিটা তবে তো সত্যি সত্যি মনোলোভা হতেই হবে।

হ্যাঁ, যা বললাম ঠিক তা-ই। তারপর কি হ'ল বলছি শোন, স্কুডার ক্যাটালগটা হাতে নিয়ে মূর্তিটার বিবরণ বিস্তারিতভাবে আমাকে বলতে লাগলেন। তিনি বললেন—খ্রীষ্টপূর্ব কোন এক সালে এক মিশরীয় ভাস্কর রাজা দ্বিতীয় রামেসিস-এর জন্য এরকম দুটো মূর্তি নির্মাণ করেছিল।

আমি তার কথার মাঝখানে বলে উঠলাম—সেই কৃতী ভাস্করের নামটা বলেছিলেন কি?

হ্যাঁ। খাক্‌রা নামক এক ভাস্কর মূর্তি দুটো নির্মাণ করেছিল।

স্কুডার তারপর কি বলেছিলেন শোন—মনোলোভা মূর্তি দুটোর মধ্যে একটা বে-পাত্তা হয়ে গেছে। বহু তল্লাশি চালিয়েও কেউ সেটার হদিস পায় নি।

পুরা বস্তুর সংগ্রহকারী আর তার বিক্রয়কারীরাও তার কোন হদিস করতে পারল না?

তারা সারা ইওরোপ মহাদেশে চিরুনি তল্লাসী চালিয়েও কোনই হদিস পেল না।

যেটা বর্তমানে স্কুডার-এর সংগ্রহশালায় আছে, তার দাম কত, তিনি বলেছেন কিছু?

হ্যাঁ, তা বলেছেন বটে।

কত?

দু' হাজার ডলার মিটিয়ে দিয়ে স্কুডার মূর্তিটা সংগ্রহ করেছেন।

আমি এবার বললাম—অ্যান্ডি কথাগুলো শুনতে তো ভালই লাগছে, কৌতূহলোদ্দীপকও বটে। কিন্তু একটা কথা—

অ্যান্ডি আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠল—তোমার আবার কোন্ কথা জানার আছে?

না, শিল্পকলা সম্বন্ধে আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই।

তবে?

আমি বলতে চাইছি, ভাস্কর্য নিদর্শন সম্বন্ধে আলোচনাই দেখছি, বর্তমানে আমাদের মুখ্য আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আসলে কিন্তু আমরা এখানে এসেছি ধনকুবেরদের ব্যবসা শেখাতে

ঠিক কিনা?

অ্যান্ডি সসঙ্কোচে বলল—তা বটে—তা বটে। তবু আমি বলব ভায়া ধৈর্য ধর। কথা বলে না, সবুরে মেওয়া ফলে।

হয়তো বা শীঘ্রই আমরা গোলকধাঁধা অতিক্রম প্রকৃত পথের হদিস পেয়ে যাব।

পরদিন ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই অ্যান্ডি বেরিয়ে গেল। সারা সকাল গেল সে ফিরল না। দুপুরের আগে তার দেখাই মিলল না।

অ্যান্ডি হোটেলে ফিরে তার নিজের ঘরে ঢুকল। সেখান থেকেই আমাকে ডেকে পাঠাল।

আমি হন্তদন্ত হয়ে তার ঘরে ঢুকলাম। আমাকে দেখেই সে কোটের পকেট থেকে হাঁসের ডিমের মত একটা মোড়ক বের করল। ব্যস্ত-হাতে নিজের মোড়কটা খুলে ফেলল। হাতির দাঁতের মত একটা শিল্পকর্ম তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল।

আমি বিস্ময়-মাখানো দৃষ্টিতে মূর্তিটার দিকে তাকালাম। সত্যি অনন্য তার কারুকার্য। কোটিপতির মূর্তিটার যে বিবরণ সে দিয়েছিল অবিকল সে রকমই তার শিল্প নৈপুণ্য।

আমি তার পুরো একটা বেলা বে-পাত্তা হয়ে যাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করার আগেই সে বলতে আরম্ভ করল—সক্কালে হোটেল থেকে বেরিয়ে একটা পুরনো বন্ধকী-দোকানে গিয়েছিলাম। সেখানকার জিনিসপত্র ঘাটাঘাটি শুরু করলাম। পুরনো ছুরি, কাঁটা-চামচ আর বাক্স পেটরার স্তূপের মধ্যে হঠাৎ মনোলোভা শিল্পকর্মটা চোখে পড়ে গেল। আমি বস্তুটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলাম। বস্তুটার প্রতি আমার অত্যুগ্র আগ্রহ লক্ষ্য করে দোকানি মুচকি হেসে বলল, 'স্যার, বছর কয়েক আগে এ জিনিসটা আমার হাতে এসেছিল।

এ ক'বছরের মধ্যে কেউ এটাকে ছুঁয়েও দেখল না।

কে এটাকে আপনার কাছে বিক্রি করেছিল, মনে আছে কি?

নিশ্চিত করে এখন আর বলতে পারব না।

তবু কিছু মনে পড়ছে কি?

মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে নিয়ে দোকানি এবার বলল, 'স্যার যতদূর মনে পড়ছে, কোন আরবী বা তুর্কী অথবা অন্য কোন পরদেশী চোরাই মাল পাচারকারী যারা নদীর ভাটিতে এসে হাজির হয়, ঘর বাঁধে তাদেরই কেউ এটা আমার কাছে বেচে দিয়ে গিয়েছিল।

আশ্চর্য ব্যাপার তো! তারা এটা কোথায় পেল!

টানা-মাল বুঝতেই তো পারছেন স্যার। বস্তুটা পাচার করে নিয়ে এসেছে।

মূর্তিটার জন্য আমি দু'ডলার দাম দিতে চাইলাম। আর হয়তো এমন ভাব দেখিয়েছিলাম, মূর্তিটা আমার চাই-ই চাই।

দোকানি আমার আগ্রহের সুযোগটার সদ্ব্যবহার করল। সে দুম্ করে তিনশ' পঞ্চান্ন ডলার দাম হেঁকে বসল।

আমি ভুরু কুঁচকে দোকানির মুখের দিকে তাকালাম। দোকানি এবার অধিকতর দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, স্যার, এ দাম না পেলে মূর্তিটা ছাড়ার প্রশ্নই ওঠে না।

আমি সবিস্ময়ে অ্যান্ডির মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, তিনশ' পঁয়ত্রিশ ডলার দিয়ে তুমি—

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে অ্যান্ডি বলল, আরে ধ্যুৎ! তিনশ' পঁয়ত্রিশ ডলার দিয়ে কেনার বান্দা আমি নই।

তবে?

দর কষাকষি করতে করতে শেষ পর্যন্ত পঁচিশ ডলারের বিনিময়ে এটা কিনে নিয়েছি।

অ্যান্ডি এবার মূর্তিটাকে বার কয়েক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বলল, দেখ জেফ, স্কুডার মূর্তিটার যে বিবরণ দিয়েছে এটা অবিকল সেই বস্তু। বলা চলে একেবারে কার্বন-কপি। দু'হাজার ডলার পেলে তিনি আনন্দে ডগমগ হয়ে দু'হাজার ডলারের বিনিময়ে নিয়ে নেবে। আর এটা যে তার মূর্তিটার মতই খাঁটি নয় তাই বা কে জানে?

আমি বললাম, ঠিকই বলেছ।

হ্যাঁ, আমারও তা-ই মত।

আবার এ-ও ভাবা যেতে পারে, তিনি যে এটা কিনবেনই তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়?

আমি বুঝতেই পারি নি। অ্যান্ডি সে ব্যাপারটা সম্বন্ধেও চিন্তা-ভাবনা করে রেখেছে। তারপর আমরা সে পরিকল্পনাটা বাস্তবায়িত করেছিলাম তা-ই এখন বলছি।

আমি অধ্যাপক পিকল্‌ম্যান সেজে নিলাম। চোখে পড়লাম একজোড়া চশমা। কালো ফ্রক-কোটটা গায়ে চাপিয়ে নিলাম। হাত দিয়ে মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে নিলাম। ব্যস, এভাবে একেবারে অধ্যাপক বনে গেলাম।

অধ্যাপকের পোশাকে সজ্জিত হয়ে আমি একটা হোটেলে গিয়ে ঘরভাড়া করে নিলাম। তাদের রেজিস্টারে নাম লেখালাম।

হোটেলের ঘরটায় তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। স্কুডারকে একটা টেলিগ্রাম করে দিলাম।

টেলিগ্রামে তাকে জানালাম, ভাস্কর্যশিল্প সংক্রান্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনে সে যেন যত শীঘ্র সম্ভব হোটেলে আমার সঙ্গে দেখা করে।

এক ঘণ্টার মধ্যেই এলিভেটরটা তাকে এনে হোটেলে পৌঁছে দিল।

স্কুডার একজন সাবেকি আমলের মানুষ। সাদাসিধে পোযাক আষাক। পোষাক থেকে মেটে তেল আর কানেক্টিকাট কাপড়ের গন্ধ নাকে এসে লাগল।

আমাকে দেখেই স্কুডার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলে উঠল, আরে, এই যে প্রফেস! সমাচার ভাল তো?

আমি একটু আগেই হাত দিয়ে মাথার চুল আর একটু বেশী করে এলোমেলো করে নিয়েছিলাম।

স্কুডার-এর কথার জবাবে চশমার ফাঁক দিয়ে তার মুখের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিয়ে বললাম, আমি কি কর্নেলিয়াস ডি স্কুডার-এর সঙ্গে কথা বলছি?

হ্যাঁ, আপনার অনুমান অভ্রান্ত।

আপনার নিবাস তো পেনসিলভানিয়ায়, তাই না?

হ্যাঁ। আপনাকে একটা অনুরোধ করতে চাচ্ছি।

আরে এত সঙ্কোচের কি আছে? কি বলতে চাইছেন, বলেই ফেলুন।

যদি অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গে মিনিট কয়েকের জন্য বাইরে যান তবে দু'জনে একটু চা পান করে নেওয়া যায়, যাবেন?

কিছু মনে করবেন না মিঃ স্কুডার, স্বাস্থ্যের পক্ষে এমন ক্ষতিকর একটা কাজে নষ্ট করার মত আমার সময়ের খুবই অভাব তার ওপর ইচ্ছার চেয়ে অনিচ্ছাই বেশী।

দুঃখিত। আমি না জেনেই আপনাকে অনুরোধটা করে ফেলেছি প্রফেস, কিছু মনে করবেন না।

না, এতে মনে করার তো কিছু থাকতে পারে না। আপনি আপনার কর্তব্য, মানে সৌজন্য প্রকাশ করেছেন, এর বেশী কিছু তো নয়।

যাক গে, যে কথা বলতে চাইছি, আমি ব্যবসার তাগিদে নিউ ইয়র্ক থেকে ফিরে এসেছি। ব্যবসা বলতে আমি ভাস্কর্যশিল্পের কথা বলছি।

মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলে স্কুডার বলল—ব্যবসা?

হ্যাঁ, আমার উদ্দেশ্যের কথা বললেই সবকিছু আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমি জানতে পেরেছি, আপনি দ্বিতীয় রামেসিস-এর আমলের একটা মূর্তির স্বত্বাধিকারী। সে মূর্তিটা হচ্ছে, হাতির দাঁতের একটা ছোট্ট ভাস্কর্য নিদর্শন যাতে পদ্মফুলের মধ্যে রানী আইরিশ-এর মাথা খোদাই করা আছে, ঠিক কি? আর এরকম দুটো মাত্র ভাস্কর্য নিদর্শনের কথাই আজ পর্যন্ত জানা গেছে। অনেকদিন আগেই তার একটা খোয়া গেছে। এখন আমি ভিয়েনার একটা সংগ্রহশালা থেকে খোয়া-যাওয়া সে মূর্তিটা খুঁজে পেয়েছি। ব্যস, আর দেরি না করে সেটা খরিদ করে ফেলেছি।

এ যে অসাধ্য সাধন করেছেন প্রফেসর।

সে যা-ই হোক, এখন আমার ইচ্ছে আপনার কাছে যে মূর্তিটা আছে সেটাকেও কিনে নেব।

সে কী!

হ্যাঁ, আর সে জন্যই তো আপনাকে কষ্ট দিয়ে এখানে আনিয়েছি। বলুন মিঃ স্কুডার ওই মূর্তিটার

বিনিময়ে আপনি কত ডলার প্রত্যাশা করেছেন?

এ যে রীতিমত অবিশ্বাস্য ব্যাপার প্রফেসর। খোয়া-যাওয়া মূর্তিটা আপনি পেয়ে গেছেন, মানে সংগ্রহ করে ফেলেছেন?

বললামই তো, মূর্তিটা এখন আমার জিম্মায়। কিন্তু এর জোড়া মূর্তিটা, অর্থাৎ আপনারটা না পাওয়া অবধি আমার মন কিছুতেই শান্ত হবে না। অনুগ্রহ করে বলুন ওটার জন্য কত চান?

প্রফেসর, আপনার জানা নেই যে কর্নেলিয়াস স্কুডার যে জিনিসটাকে শখ করে ঘরে তোলে সেটাকে কোন পরিস্থিতিতেই বিক্রি করে না।

কিন্তু আমি যে—

আমাকে থামিয়ে দিয়ে স্কুডার বলল, ভাল কথা প্রফেসর, খোয়া-যাওয়া সে মূর্তিটা কি আপনি সঙ্গে নিয়ে এসেছেন?

অবশ্যই।

অনুগ্রহ করে একবারটি দেখতে পারি কি?

আমি কোটের পকেট থেকে মূর্তিটা বের করে স্কুডার-এর হাতে দিলাম। সে বার বার ঘুরিয়ে দেখতে লাগল।

আমি মুচকি হেসে বললাম, কি বুঝছেন মিঃ স্কুডার? মালটা খাঁটি তো?

মূর্তিটাকে চোখের সামনে থেকে নামিয়ে সে অত্যুজ্জ্বল চোখের মণি দুটো মেলে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, হ্যাঁ, মূর্তিটা অবশ্যই খাঁটি।

তবে বলুন, অবিকল আপনার মূর্তিটার মত।

হ্যাঁ, যেন একই ছাঁচে গড়া, যাকে বলে একেবারে কার্বন কপি।

তার কথায় আমি উৎসাহিত হয়ে একটু নড়েচড়ে বসলাম। সে বলে চলল, সত্যি মূর্তি দুটো যেন একই ছাঁচে গড়া। প্রতিটি রেখা পর্যন্ত যেন একই রকম। তবে আমার মনের কথা বলব প্রফেসর?

আমি ম্লান হেসে বললাম, বলুন, নির্দ্বিধায় আপনার মনের কথা বলতে পারেন।

আপনি যখন অভয় দিচ্ছেন তখন বলেই ফেলি—আমার মূর্তিটা বেচার কথা তো আমি ভাবতেই পারি না, বরং এটাকে কিনে নিতে চাই। মূর্তিটার বিনিময়ে আমি আপনাকে আড়াই হাজার ডলার দিতে রাজি আছি।

মিঃ স্কুডার, আপনি যখন কিছুতেই বেচতে নারাজ তখন বাধ্য হয়ে আমাকেই বেচতে হবে। কারণ, একটা মূর্তি নিতান্তই বে-মানান।

তবে পঁচিশ হাজারে রাজি তো?

দয়া করে ছোট ছোট বিল না দিয়ে বড় বিল দেবেন, আমি অল্প কথার মানুষ। আর আজ রাত্রেই আমাকে নিউইয়র্কের ট্রেন ধরতে হবে।

আজ রাত্রের ট্রেনেই?

হ্যাঁ। কাল একোয়ারিয়ামে আমাকে একটা বক্তৃতা দেওয়ার কথা আছে।

স্কুডার সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে চেক-বই বের করে একটা চেক লিখে ফেলল। পাতাটা ছিঁড়ে আড়াই হাজার ডলারের চেকটা আমার হাতে তুলে দিল।

চেকটা হোটেলেই ভাঙিয়ে দিল।

আমার কাছ থেকে মূর্তিটা নিয়ে স্কুডার আর মুহূর্তমাত্রও দেরী করল না।

আমি নগদ আড়াই হাজার ডলার বুঝে পেয়ে নাচতে নাচতে হোটেলে অ্যান্ডি-র কাছে ফিরে গেলাম।

আমি ঘরের দরজায় পৌঁছে দেখি অ্যান্ডি অস্থিরভাবে ঘরময় পায়চারি করছে।

আমাকে দেখেই সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কণ্ঠস্বরে ব্যস্ততা প্রকাশ করে বলে উঠল, আরে, তুমি এসে গেছ! কি হল?

কাজ হাসিল। নগদ আড়াই হাজার ডলার বাগিয়ে এনেছি।

আমার কথা শুনে সে যেন মূর্চ্ছা যাবার যোগাড় হল। কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, আ-ড়া-ই হা-জা-র!

হ্যাঁ, ঠিক তাই। এই দেখ। ডলারের গোছাটা তার সামনে তুলে ধরলাম।

অ্যান্ডি বলল, চমৎকার! শোন, পশ্চিমগামী বি. অ্যান্ড ও ধরতে হলে মাত্র এগারো মিনিট সময় আমরা পাচ্ছি। হাত চালিয়ে তোমার মালপত্র গোছগাছ করে নাও।

আরে, এত ব্যস্ততা কিসের! কেনা-বেচা তো সরাসরিই হয়ে গেছে। আর আমাদের মূর্তিটা যদি আসল ভাস্কর্যটার নকলও হয়ে থাকে। তবুও সেটা ধরতে তার বেশ কিছু সময় লেগে যাবে।

তার চোখ-মুখ দেখে তোমার কি মনে হল?

বস্তুটা যে খাঁটি এ ব্যাপারে তার মধ্যে কিছুমাত্রও সন্দেহ নেই।

অবশ্যই। খাঁটি যে এ বিষয়ে সন্দেহ করার কোন কারণও নেই, আসলে ভাস্কর্যটা যে তারই।

আমি যন্ত্রচালিতের মত ঘাড় তুলে তার মুখের দিকে তাকালাম।

সে বলল—'হ্যাঁ, সত্যি বলছি, মালটা তারই। ব্যাপারটা তবে খোলসা করেই বলছি—গতকাল সে আমাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তার সংগ্রহশালাটা দেখাচ্ছিল। হঠাৎ জরুরী কাজের তাগিদে কয়েক মুহূর্তের জন্য বাইরে চলে গিয়েছিল। ব্যস, আমি সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ফেললাম। ঝট করে মূর্তিটাকে তুলে কোটের পকেটে চালান দিয়ে দিলাম। আর দেরী নয়, তুমি একটু হাত চালিয়ে তোমার মালপত্রগুলো গোছগাছ করে নাও।'

আমি সবিস্ময়ে বললাম, আশ্চর্য ব্যাপার তো! তবে আমার কাছে বন্ধকী দোকানের কথাগুলো বলেছিলে কেন?

আরে সেটা তো তোমার বিবেকের কথা ভেবেই আমাকে করতে হয়েছে। আর দেরী নয়। চল, স্টেশনের উদ্দেশে রওনা হয়ে পড়ি!

দ্য ম্যান হায়ার আপ

আমরা দু'জন প্রোভেঞ্জিনোর রেস্তোরাঁর এক কোণে মুখোমুখি চেয়ারে বসে। আমাদের সামনে দুটো চাউমিনের প্লেট।

হাতের চামচটা মুখের কাছ থেকে নামিয়ে জেফ পিটার্স আমাকে তিন রকম ধাপ্পাবাজির কথা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে লাগল।

আমি চামচটা দু'আঙুলের ফাঁকে ধরে রেখে মন্ত্রমুগ্ধের মত তার কথা শুনতে লাগলাম।

জেফ পিটার্স বলল, শোন, দু'রকম ধাপ্পাবাজি আছে যা আইন করে কঠোর হাতে নির্মূল করা উচিত।

দু'রকম ধাপ্পাবজি—ঠিক বুঝলাম না তো।

একটা হচ্ছে, ওয়াল স্ট্রীটের শেয়ার কেনা-বেচা, আর দ্বিতীয়টা চুরির ব্যাপার-স্যাপার।

তবে তো একটার ব্যাপারে প্রায় সবাই তোমার সঙ্গে গলা মেলাবে, মানে একমত হবে।

আমি বলব, কড়া আইন করে চুরির ব্যাপারটাকেও দেশ থেকে তুলে দেওয়া উচিত।

আমি যারপরনাই অবাকই হলাম। ভাবলাম, আমার বক্তব্যটা তবে হালে পানি পেল না।

আমি কিছু বলার আগেই জেফ আবার মুখ খুলল, বলছি তবে শোন, মাস তিনেক আগে আমার ওয়াল স্ট্রীটের শেয়ার কেনা-বেচা আর চুরির ব্যাপার উভয় বে-আইনি কাজ দুটোর সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সুযোগ হয়েছিল।

আমি মুচকি হাসলাম।

জেফ বলে চলল, সত্যি কথা বলতে কি, আমি তখন জন ডি. নেপোলিয়নের সাকরেদদের মধ্যে একজন হয়ে উঠেছিলাম। সেই সুবাদেই উপরোক্ত অভিজ্ঞতা লাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

আমি লম্বা হাই তুলে বললাম, যোগাযোগটা খুবই আকর্ষণীয়, স্বীকার করতেই হয়। ভাল কথা,

আমি কি তোমার কাছে বলেছি যে, গত হপ্তায় আমি রামাপোসে গিয়েছিলাম।

না, বল নি।

যাক, আমি সেখানে শিকার করতে গিয়ে একটামাত্র গুলিতে একটা মেঠো কাঠবিড়ালি আর একটা হাসকে দুনিয়া থেকে বিদায় দিয়েছিলাম।

বন্ধুবর জেফ-এর পেট থেকে কি করে গল্প বের করতে হয় তা-তো আমার ভালই জানা আছে।

হ্যাঁ, ওষুধে কাজ হয়েছে। আমার কথা শেষ হতে না হতেই জেফ বলতে আরম্ভ করল, 'আরে ভায়া, একটু আগেই তো তোমাকে বলেছি, মাস তিনেক আগে আমি একটা দু'নম্বরী কারবারীদের দলে ঢুকে গিয়েছিলাম। এসব ব্যাপারে মানুষের জীবনে অনেক ব্যাপার ঘটে থাকে। হয় সে একেবারেই নেতিয়ে পড়ে, নয় তো অর্থকড়ি কামিয়ে একেবারে টাকার কুমীর বনে যায়।

মুহূর্তের জন্য থেমে সে একটু নড়েচড়ে যুঁত হয়ে বসে আবার মুখ খুলল, একটা কথা কি জান ভায়া। কোন কোন সময় এমন অবিশ্বাস্য ঘটনাও ঘটতে দেখা যায় যে, নিতান্ত আইন সম্মত করবারেও দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে আসে।

আমি বললাম 'হ্যাঁ, এমনটা তো ঘটতেই পারে।

আমার নিজের কথাই বলছি—আমি একবার আর্কানসাসে যাই। সেখানকার এক চৌমাথায় দাঁড়িয়ে পথ নির্দ্ধারণ করতে লাগলাম। শেষমেশ ভুল পথই ধরে ফেললাম। হাজির হলাম পিভাইন শহরে। মনে হল, এক বছর আগে বসন্তকালে পিভাইন শহরটাকে আমি নিজে হাতে লণ্ডভণ্ড করে ফেলেছিলাম।

কিভাবে অপকর্মটা করেছিলে, খোলসা করে বলবে কি?

সে এক অবিশ্বাস্য কাহিনী। ছ'শ' ডলার দামের চেরি, কুল, পিচ আর ন্যাসপাতির ছোট ছোট চারাগাছ বেচে দিয়েছিলাম।

আমি অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে বলে উঠলাম, 'তারপর?'

আমার কাণ্ড দেখে পিভাইন শহরের বাসিন্দারা তো রেগে একেবারে কাঁই হয়ে গেল। তারা প্রতিটা পথে কড়া নজর রাখতে লাগল। পরিস্থিতি এমন হয়ে উঠল, আমি যে-পথেই যাই না কেন আমাকে পাকড়াও না করে ছাড়বে না।

এক সকালে সেন স্ট্রীট ধরে হাঁটতে হাঁটতে ক্রিস্টাল প্যালেস-এর একটা ওষুধের দোকানের সামনে গিয়ে আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বার-কয়েক এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিঃসন্দেহ হলাম, কারা যেন গোপন অন্তরাল থেকে আমার ঘোড়া বিল আর আমার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখছে।

মিনিট দু'-তিনের মধ্যেই পিভাইনের অধিবাসীরা আমার আর প্রিয় ঘোড়া বিল-এর ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারা যেসব কথা বলতে লাগল তার সঙ্গে ফলের চারার সম্বন্ধ আছে, আমার বুঝতে দেরী হল না।

তাদের মধ্যে জনা কয়েক আমার বগলের তলা দিয়ে একটা লোহার শেকল গলিয়ে দিল, আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল। তারপর একটা ফুল আর ফলের বাগানের ভেতর দিয়ে আমাকে নিয়ে চলল।

দেখলাম, তাদের ফলের চারাগুলো মোটেই তাদের আশানুরূপ হয়নি।

পথ পাড়ি দিতে দিতে আমি লক্ষ্য করলাম, গাছগুলোর অধিকাংশই জঙ্গলী ফল, খেজুর, পপলার গাছ, আর মাঝে মধ্যে দু'এক ব্ল্যাকজ্যাক গাছের ঝোপঝাড়ও চোখে পড়ল।

লোকগুলো আমাকে হাঁটতে হাঁটতে একেবারে শহরের শেষপ্রান্তের দিকে নিয়ে চলল।

হতচ্ছাড়া পিভাইবাসীরা তাদের প্রাপ্য হিসাবে আমার ঘড়ি আর যা কিছু ডলার ছিল সবই কেড়ে নিল। আর জামিনস্বরূপ মালপত্র ও বিলগুলো রেখে দিল।

আমি বিষণ্ণমুখে তাদের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারা সাফ কথা জানিয়ে দিল, জঙ্গলী গাছপালায় যখন প্রথম পীচফল ফলতে দেখা যাবে তখন আমি যেন তাদের সঙ্গে দেখা করে ঘোড়া আর মালপত্র নিয়ে যেতে পারব।

আরও কিছুটা পথ আমাকে হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়ে তারা আমার শেকলের বাঁধনটা খুলে দিল। তারপর আমাকে ঘা কতক দিয়ে রকি পর্বতমালার পায়ে ঢুকিয়ে দিল।

আমার সামনে তখন উত্তাল-উদ্দাম এক নদী দুর্গম পথ। আর এক গাছা লম্বা দড়ি ছাড়া আমার সঙ্গে আর কিছুই নেই।

নদীর পাড়ে পৌঁছেই আমি সংজ্ঞা হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম।

কতক্ষণ যে আমি সেখানে বে-হুঁশ হয়ে পড়েছিলাম বলতে পারব না। তারপর সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে ধীরে ধীরে উঠে বসলাম এবং তারপর ধীর পায়ে হাঁটতে লাগলাম।

কিছুদূর গিয়েই আমি বুঝতে পারলাম, আমি এ. টি অ্যান্ড এস. এফ রেলপথে একেবারেই অপরিচিত এক শহরের দিকে এগিয়ে চলেছি।

পিডাইনের অধিবাসীরা আমার যথা সর্বস্ব কেড়ে নিলেও অনুগ্রহ করে চিউইং গামের প্যাকেটটা রেখে দিয়েছিল। পথের ধারে একটা ঝাঁকড়া উইলো গাছের তলায় বসে চিউইং গামের একটা টুকরো মুখে পুরে পূর্ববর্তী ঘটনাগুলো রোমন্থন করতে লাগলাম।

একটু বাদেই শহরমুখী একটা মালগাড়ি কেন যেন আমার কাছাকাছি এসেই গতি কমিয়ে দিল।

আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ঠিক সে মুহূর্তেই গাড়িটার ভেতর থেকে কালো একটা পুটুলি আমার সামনে, একেবারে পায়ের কাছাকাছি এসে পড়ল।

পুটুলিটা বার কয়েক পাক খেয়ে এক সময় স্থির হল। পর মুহূর্তেই দাঁড়িয়ে পড়ল। এবার বুঝতে পারলাম পুটুলিটায় কোন মালপত্র নেই। তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা যুবক।

যুবকটা আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগল। গায়ে ভদ্র পোষাক পরিচ্ছদ। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার! লোকটা গাড়ি থেকে কিছুটা পথ গড়িয়ে গিয়েও দিব্যি মিট্ মিট্ করে হাসতে লাগল।

আমি বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম—' কি ভাই, গাড়ি থেকে পড়ে গেলে নাকি? যুবকটা মুখে অনুরূপ হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, কি যে বলেন, গাড়ি থেকে পড়ে যাব কেন?

তবে? আমি যা দেখলাম, তাতে তো মনে হল বুঝি গাড়ি থেকে পড়েই গেছ।

অবশ্যই না। আমি তো গাড়ি থেকে নামলাম। আমার গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেছি বলে গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। এটা কোন্ শহর বলুন তো?

আমার পক্ষে এখনও মানচিত্র খুলে শহরটার নাম দেখা হয় নি।

এ আবার কি রকম কথা হল?

এটাই শতকরা একশ' ভাগই সত্যি কথা। আসলে তুমি গাড়ি থেকে নামার মিনিট পাঁচেক আগেই আমি এখানে পৌঁছেছি। ভাল কথা, তোমার কি কোথাও চোটটোট লেগেছে?

যুবকটা এবার একটা হাত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বলল—

হ্যাঁ, তা-তো লেগেছেই চোটটা খুব জোরেই লেগেছে।

লেগেছে? কোথায় বল তো?

প্রথমে ভেবেছিলাম ঘাড়েই লেগেছে। কিন্তু এখন দেখছি তা নয়। নয়, ভাববেন না, তেমন কিছু নয়।

আমার সঙ্গে কথা বলতে যুবকটা পোষাক খুলে ধূলো বালি ঝাড়তে লাগল। হঠাৎ তার পোশাকের ভেতর থেকে কি যেন একটা বস্তু মাটিতে পড়ে গেল।

আমি অনুসন্ধিৎসু নজরে সেটার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। দেখি একটা সিঁধকাঠি পথের ধারে পড়ে রয়েছে। ইস্পাতের তৈরী। চকচক করছে। ইঞ্চি কয়েক লম্বা।

সে যন্ত্রচালিতের মত ব্যস্ত হাতে সেটাকে মাটি থেকে তুলে নিল। তোলার সময় আমার দিকে মুহূর্তের জন্য তাকাল। ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলল। পরমুহূর্তেই করমর্দনের জন্য আমার দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিল। অন্য হাতে সিঁধকাঠিটা কোটের পকেটে চালান দিয়ে দিল।

মুখের হাসিটুক অক্ষুণ্ণ রেখেই সে বলে উঠল, আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করুন।

আমি করমর্দনের জন্য হাতটা বাড়াতে না বাড়াতে সে-ই আবার বলতে লাগল, গত গ্রীষ্মে আপনাকেই তো দেখেছিলাম, আধা ডলার দামের চা-চামচ আর রঙীন বার্লি বিক্রি করছিলেন, ভুল বলেছি?

আমি নীরব চাহনি মেলে তার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম।

সে এবার বলল, আরে মিসৌরিতে—এরই মধ্যেই ভুলে গেলেন! সে রঙীন বার্লি তেলের বাতিতে ছিটিয়ে দিলে নাকি বিস্ফোরণ ঘটে না। এবার মনে পড়েছে?

আমি বললাম, আরে, কী ঝকমারি শুরু করলে হে! তেলে কিছুতেই বিস্ফোরণ ঘটে না।

তেলে বিস্ফোরণ ঘটে না? তবে বাতির বিস্ফোরণ ঘটার কারণ কি?

বাতি জ্বলার সময় যে গ্যাস জমে তা-ই বিস্ফোরণ ঘটায়।

কথাটা বলেই আমি হাতটা বাড়িয়ে তার সঙ্গে করমর্দন সারলাম। যুবকটা আমার হাতটা ধরে জোরে জোরে বার কয়েক ঝাঁকুনি দিয়ে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলে বলল, আমার নাম বিল বাসেট। কথাটা বলেই সে পকেটে হাত গলিয়ে দিয়ে সিঁধকাঠিটা বের করে আমার মুখের সামনে ধরে বলল—দেখুন, এটাকে যদি অহমিকা আখ্যান না দিয়ে ব্যক্তিগত বৃত্তির গর্ব বলে মনে করেন তবে আপনাকে বলছি, মিসিসিপি নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে যত সিঁধেল চোর তাদের কাজকর্ম করে তাদের মধ্যে যে চোরের সর্দার তার সঙ্গেই আপনার এ মোলাকাৎটা ঘটেছে, এবার বুঝেছেন তো?

ব্যস, বিল আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হতে আর দেরী হল না।

আমি তাকে নিয়ে পথের ধাবের একটা বড়সড় পাথরের ওপর মুখোমুখি বসলাম। অচিরেই আমাদের মধ্যে পুরোদস্তুর আলাপ জমে গেল। কথাবার্তা থেকে বুঝতে পারলাম, তার পকেটে একটা সেন্টও নেই। যাকে বলে সে একেবারেই নিঃস্ব রিক্ত।

আমারও তো পকেট ফুটো। তাই আমাদের মধ্যে ভাব আরও তাড়াতাড়ি জমে উঠল।

আমাদের মধ্যে মনের মিল এমনই হয়ে উঠল যে, উভয়েই গলা চড়িয়ে নিজ নিজ অতীত কীর্তি-কাহিনী বলতে শুরু করলাম। একটা বিন্দু বিসর্গও কেউ কারো কাছে গোপন করলাম না।

বিল বাসেট প্রসঙ্গক্রমে জানাল যে, লিটল রক-এ এক যুবতী কাজের মেয়ে তার সঙ্গে বাটপাড়ি করার জন্যই যে তড়িঘড়ি সেখান থেকে চম্পট দিয়েছে।

অতীত জীবনের কেচ্ছা কাহিনী শেষ করে বিল এবার বলল—

একটা কাজ করলে কেমন হয়?

কাজ? কোন্ কাজ?

হাতসাফাইয়ের কাজের কথা বলছি।

শহরটার অবস্থা দেখে তোমার কেমন মনে হচ্ছে?

চোখের মণি দুটোকে মুহূর্তের জন্য শহরটার দিকে বুলিয়ে নিয়ে সে বলল, 'ওপর ওপর দেখে তো মনে হচ্ছে, এ শহরের বাসিন্দারা রাত্রে ঘরে ইয়েল তালা ব্যবহার করে না।

তাই বুঝি? এখান থেকে দেখেই শহরের অধিবাসীদের সম্বন্ধে ধারণা করে নিতে পারলে?

এ-তো খুবই মামুলি ব্যাপার। তবে পকেটের যা অবস্থা তাতে ছোটখাটো কারবার একটা কিছু করতে পারলে নিত্যকার খরচ খরচা চালিয়ে নেওয়া যেত।

কিন্তু হঠাৎ করে কিছু করতে যাওয়াটা কি উচিত হবে?

আরে ধ্যাৎ! কি যে বলেন! ভাল কথা, আমার মনে হয় না যে, আপনার কাছে কি চুলের টনিক বা রোল্ড গোল্ডের ঘড়ি চেন, নইলে ওরকমই কোন বে-আইনি মালপত্তর সঙ্গে আনেন নি।

সেগুলো বেচে দিলে বেশ দু-চার টাকা কামিয়ে নেওয়া যাবে, আছে কি?

না হে, আমার সঙ্গে নেই বলতে কিছুই নেই।

কিচ্ছু নেই?

না, এখন আর কিছুই নেই। আমার ঝোলার মধ্যে যে সব মনোলোভা পাটাগোনিয়ান হীরের দুল আর বৃষ্টি-বারণ দাওয়াই ছিল পিভাইন শহরে সবই ফেলে চলে এসেছি। সেখানকার জঙ্গলী গাছ গাছালিতে যতদিন চাপানি কুল আর হলুদ ফল থাকবে ততদিন আমার সব কিছু ঝোলাসহ সেখানেই গচ্ছিত থাকবে। অতএব এখন আমার বরাত ঠুকে বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই।

ঠিক আছে, তার জন্য আক্ষেপ করার কিছু নেই। আমি, মানে আমরা তো আছি। তবে আমরা যা পারি তাই করব। হয়তো রাত্রির অন্ধকার নেমে এলে কোন মেয়ে মানুষের কাছ থেকে একটা চুলের কাঁটা ধার করে নেব।

আমি চোখ দুটো কপালে তুলে বললাম সে কী! চুলের কাঁটা? চুলের কাঁটা কোন্ কাজে লাগাবে, মাথায় ঢুকছে না তো!

চুলের কাঁটাটা ব্যবহার করেই ফার্মার্স 'অ্যান্ড মেরিন ব্যাঙ্ক'-এর দরজার তালা খুলে ফেলব।

আমরা যখন পাথরটার ওপরে বসে এসব কথা আলোচনায় মগ্ন ঠিক তখনই একটা যাত্রীবাহী ট্রেন অদূরবর্তী একটা ডিপোতে ঢুকল। গতি ক্রমে মন্থর হতে হতে এক সময় থেমে গেল।

ট্রেন থেকে প্লাটফর্মের বিপরীত দিকে একটা লোক ট্রেন থেকে নামল তার মাথায় একটা খাড়া টুপি। গুটিগুটি সে আমার দিকে আসতে লাগল। লোকটা বেঁটে হলেও মোটাসোটা, টিয়া পাখির মত বাঁকানো নাক আর চোখ দুটো ইঁদুরের মত পিটপিট করতে লাগল। তার পোষাক পরিচ্ছদের ওপর চোখ বুলিয়ে দেখলাম কেবলমাত্র চকচকেই নয়, দামীও বটে।

লক্ষ্য করলাম, লোকটা চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে অগ্রসর হচ্ছে। ঝোলাটার দিকে তাকিয়ে মনে হল সেটার মধ্যে রেলের দলিলপত্র বা ডিম রয়েছে।

মিনিট দু'-তিনের মধ্যেই সে এগোতে এগোতে এক সময় আমাদের পাশে ফেলে এগিয়ে গেল। ব্যাপারটা এমন মনে হল যে, শহরটা যেন তার চোখেই পড়েনি। সে দেখতেই পায় নি।

বিল তার পিছন পিছন যেতে গিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে আমাকে বলল, আসুন। চলে আসুন।

আমিও গলা নামিয়েই বললাম। কোথায়? কোথায় যাচ্ছ?

বিল কপালে করাঘাত করে বলে উঠল, হায় ঈশ্বর! পোড়া কপাল আমার! আপনি কি ভুলে গেছেন যে এখন মরুভূমিতে অবস্থান করছেন?

আমি তেমনি বিস্ময়ভরা চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সে কণ্ঠস্বরে বিরক্তি প্রকাশ করে এবার বলল, আরে, আপনার সামনে ট্রেন থেকে কে নামলেন, দেখতে পান নি?

কে? কে তিনি?

তিনি স্বয়ং কর্নেল মান্না।

আমরা লম্বা লম্বা পায়ে হেঁটে জঙ্গলের কাছাকাছি যেতেই নবাগত লোকটাকে ধরে ফেললাম পিছন থেকে ডেকে তাকে দাঁড় করালাম।

তখন সূর্য পশ্চিম আকাশে ডুবে গেছে। জায়গাটা খুবই নির্জন-নিরালা। তাই আমরা কারোরই নজরে পড়লাম না।

নবাগত লোকটার মাথা থেকে বিল হাত-বাড়িয়ে টুপিটা খুলে নিল। তারপর সেটাকে ঝেড়ে মুছে আবার তার মাথায় বসিয়ে দিল।

লোকটা সবিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে বেশ একটু গম্ভীর স্বরেই বলে উঠল, এটা হচ্ছে কি? এর অর্থ কি জানতে পারি?

বিল মুচকি হেসে বলল, দেখুন, আমি নিজে যখন এ টুপি ব্যবহার করতাম আর অস্বস্তি বোধ করতাম তখন এরকম ঝেড়ে মুছে নিতাম। এখন তো আর এরকম টুপি আমার মাথায় নেই। তাই আপনার টুপিটাকেই নিজের মনে করে সাফ সুতরা করে দিলাম।

নবাগত লোকটা হাঁ করে তার কথা শুনতে লাগল।

বিল বাসেট বলে চলল, দেখুন, প্রসঙ্গটা যে কিভাবে শুরু করব ভেবে উঠতে পারছি নে। তাই আপনাকে আমরা কোন্ কাজে ব্যবহার করব তা আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারছিনে।

আমি আবার আপনাদের কোন্ কাজে লাগতে পারি তা-তো আমারও মাথায় আসছে না।

আমরা প্রথমে আপনার পকেট দুটো হাতড়ে দেখব।

আমার পকেট! এ কী অরাজকতা। আমার পকেটে হাত দেবেন কোন্ অধিকারে?

অধিকারের ব্যাপার স্যাপার আমি একটু কমই বুঝি। আমি যা করব ভেবেছি, অবশ্যই করব।

কথাটা বলেই বিল বাসেট নবাগত লোকটার পকেট দুটো হাতড়ে দেখতে লেগে গেল।

পকেট হাতড়াবার সময় তার চোখে মুখে কিন্তু বিরক্তির ছাপই আমি লক্ষ্য করলাম।

সে দ্বিতীয় পকেটটা থেকে হাতটা বের করে বিরক্তিভরে বলে উঠল, ধ্যুৎ! একটা ঘড়িটড়িও মিলল না! এই যে, শ্বেত পাথরের মূর্তি, বলি লজ্জা শরমের মাথাও খেয়েছেন নাকি? প্রধান

ওয়েটারের মত পোষাক তো গায়ে চাপিয়েছেন দেখছি। আর চালচলনও কাউন্টের মত। আর এদিকে যে পকেটে ছুঁচোর কেত্তন চলছে। গাড়ি ভাড়াটাও দেখছি পকেটে নেই। আর বদলির কাগজটাই বা কোথায় রেখে এসেছেন, দয়া করে বলবেন কি?

নবাগত লোকটা এবার মুখ খুলল, আমার পকেট হাতড়ে কষ্ট করার দরকারই ছিল না। আমাকে জিজ্ঞেস করলেই তো ল্যাটা চুকে যেত। মোদ্দা কথা শুনুন, আমার মালকড়ি বা মূল্যবান সামগ্রী কিছুই নেই।

বিল বাসেট তার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারল না। সে ঝট্ করে তার হাত থেকে ঝোলাটা ছিনিয়ে নিয়ে ঝটপট ভেতরে হাত চালিয়ে দিল। ভেতর থেকে বের করে আনল—কয়েকটা মোজা, কলার আর খবরের কাগজের অর্ধেকটা। খবরের কাগজের কাট-টুকরোটা উল্টেপাল্টে বিল বাসেট পড়তে লাগল। কাগজটা ভাঁজ করতে করতে সে নবাগত লোকটার দিকে করমর্দনের জন্য হাতটা বাড়িয়ে দিল।

তারপর বলল, কিছু মনে করবেন না স্যার। আমরা কৃতকর্মের জন্য মার্জনা ভিক্ষা করছি। আমার নাম বিলি বাসেট চোর বিলি বাসেট।

পরমুহূর্তেই ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে সে বলল, মিঃ পিটার্স, আপনিও নবাগত মিঃ আলফ্রেড ই. রিক্সকে ভাল করে চিনে রাখুন। আরে, আপনি এখনও হাত গুটিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন! হাত বাড়িয়ে দিন, করমর্দন করুন।

আমি থতমত খেয়ে ঝট করে হাতটা বাড়িয়ে দিলাম। তার সঙ্গে করমর্দন সারলাম।

বিলি বাসেট বলে চলল। মিঃ রিক্স দুষ্কর্মের ব্যাপার-স্যাপারে মিঃ পিটার্স-এর অবস্থান আপনার আর আমার মাঝামাঝি জায়গায়। মালকড়ি হাতাতে পারলে তার বিনিময়ে সে সব সময়ই তাকে দিয়ে থাকে। এটাই তার রীতি।

এবার মুহূর্তের জন্য থেমে সে আবেগভরে বলতে লাগল, মিঃ পিটার্স আর মিঃ রিক্স আপনাদের দু'জনের সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় আমি যে কী খুশি হয়েছি তা বুঝিয়ে বলতে পারব না। বিশ্বাস করুন, আমি জীবনে এই প্রথমবার কঙ্গর জাতীয় মহাসভা'-র পূর্ণ সভায় যোগদান করার সৌভাগ্য লাভ করলাম। এ সভায় বাটপাড়ি, ধাপ্পাবাজি, সিঁধেল চোর আর লগ্নীকার এসব দলের প্রতিনিধিই উপস্থিত আছেন।

এবার আমার দিকে ফিরে সে বলল, মিঃ পিটার্স, একটু কষ্ট করে মিঃ রিক্স-এর আস্থাপত্রগুলো একবারটি পরীক্ষা করে দেখুন তো।

বিল বাসেট কথা বলতে বলতে খবরের কাগজের কাটা-টুকরোটা আমার হাতে গুঁজে দিল। তাতে রিক্স-এর একটা ছবি ছাপা হয়েছে। এবার সে মুখ খুলল, ওই টুকরোটা শিকাগোর একটা খবরের কাগজের টুকরো। এর প্রতিটা পরিচ্ছেদেই কৃতী রিক্স-এর দুষ্কর্মের কথা ছাপা হয়েছে। কাগজের বক্তব্য পড়ে আমি যা কিছু জানতে পারলাম তা হচ্ছে—ফ্লোরিডা রাজ্যের যেসব অঞ্চল পুরোপুরি জলে ডুবে গেছে তার পুরো অংশটাই মহামান্য রিক্স শিকাগোর অফিসে বসে জনা কয়েক নির্দোষ নিষ্কলঙ্ক লগ্নিকারকের কাছে বেচে দিয়েছেন।

আমি অত্যুগ্র আগ্রহান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কি বললে? বেচে দিয়েছে?

তবে আর বলছি কি? খবরের কাগজের পাতার টুকরোটায় সবই বিস্তারিতভাবে ছাপা হয়েছে, পড়ে দেখুন।

তারপর? তারপর?

এ দশ লক্ষ ডলার আত্মস্যাৎ করার পর একজন অহেতুক হৈ হট্টগোল করা স্বভাবের ক্রেতা-নৈশভোজের আগেই তার কেনা জমির তদারকি করার জন্য চলে যান, জমি মাপামাপির জন্য একজন আমিনও তিনি সঙ্গে করে নিয়ে যান।

জমি মেপে কি ফল হল? আমি বললাম।

নিয়ম মাফিক মাপামাপি করে দেখা গেল—'প্যারাডাইস হলে' বিজ্ঞাপনে এ নামটারই প্রচার করা হয়। এ নামে সমৃদ্ধশালী নগরটা হ্রদের ঠিক কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করছে।

সে নগরটা কোন্ হ্রদে অবস্থিত?

ওফী হ্রদে।

তারপর? তারপর কি হল?

সে লোকটার জন্য যে জমিটা নির্দিষ্ট করা ছিল সেটা তখন ছত্রিশ ফুট জলের নিচে অবস্থান করছে। আর কুমীর, বিরাট বিরাট মাছ আর কাঁটাওয়ালা জলজ উদ্ভিদ সেখানে দীর্ঘদিন ধরে সহাবস্থান করছে। এমন একটা জমির দখল নেওয়া অবাস্তব চিন্তা।

তাই নিতান্ত অনন্যোপায় হয়েই লোকটা শিকাগো শহরে যেতে বাধ্য হল। সেখানে গিয়ে সে আলফ্রেড ই. রিক্সি'কে রীতিমত জ্বালিয়ে খেতে লাগল।

রিক্স তার কথাগুলোকে হেসে উড়িয়ে দিলেও কুমীরের অস্তিত্ব ও প্রতাপকে অস্বীকার করতে পারল না।

দু'-চারদিন যেতে না যেতেই দেখা গেল, একদিন ব্যাপারটা বিস্তারিতভাবে খবরের কাগজে ছাপা হল। বে-গতিক দেখে রিক্স শিকাগো শহর থেকে গোপনে চম্পট দিতে বাধ্য হল।

জমির সব ক্রেতারা তাকে আচ্ছামত উত্তম-মধ্যম দিয়ে সেই জামার বাক্সের কাছে নিয়ে যায় যেখানে ডলারগুলো জমা করে রাখা হয়েছিল।

আর রিক্স যেদিন শহর থেকে চম্পট দেয় সেদিন তার বাজারের নলের ভেতরে ছিল এক ডজন ১৫১/২ ইংরেজি থোক। সে ট্রেনে চেপে বসল। তার টিকিটটা শেষ হতে তখনও যতখানি পথ বাকি ছিল তার বলেই শহর পেরিয়ে মাইল কয়েক দূরের এ নির্জন-নিরালা অঞ্চলেই গাড়িটাকে ধাক্কে ফেলে দেয়। আর সে জন্যই সে বিল বাসেট আর আমার কাছে এসে হাজির হয়।

আলফ্রেড ই. রিক্সি কাতর স্বরে জানাল, আমি খুব ক্ষুধার্ত। কিছু দানাপানি পেটে না দিলে জ্বালা কমবে না।

এভাবেই আমাদের, ত্রিমূর্তির মিলন এভাবেই ঘটেছে। আমরা মিলিত হলাম পরিশ্রম, অধ্যবসায়, বাণিজ্য আর মূলধনের প্রতিনিধি হিসাবে। আমরা যেন তিনে মিলে একে পরিণত হয়ে গেলাম।

বিল বাসেট আমাদের সম্বোধন করে বলল, ডাকাত-বন্ধুরা, বিপদের মুহূর্তে কোন সঙ্গীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন কবা আমার স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ।

জঙ্গলের ভেতরে, অদূরে একটা বাড়ি আমি দেখেছিলাম, চলুন আমরা সেখানে গিয়ে অবস্থান করি। অন্ধকার ঘনিয়ে না আসা অবধি আমরা সেখানেই কাটিয়ে দেব।

জঙ্গলের ভেতরের পুরনো বাড়িটায় আমরা তিনজন গিয়ে মাথা গোঁজলাম। পরিত্যক্ত একটা বাড়ি। একটামাত্র ঘর। বিল বাসেট আধঘণ্টার জন্য বেরিয়ে গেল। যাবার সময়ে বলে গেছে আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরবে।

হ্যাঁ, আধ ঘণ্টার মধ্যেই সে ফিরে এল। আর সঙ্গে নিয়ে এল কিছু মটরশুঁটি, রুটি আর মাংসের কিছু হাড়গোড় নিয়ে সে ফিরে এল।

খাদ্যবস্তুগুলো আমায় তুলে দিলে আমি এক ঝলক সেগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে বলে উঠলাম, কোত্থেকে এগুলো ঝাড়লে, বল তো বিলি?

বিলি নির্দ্বিধায় বলল—ওয়াশিটা অ্যাভেনিউর গোলাবাড়ি থেকে হাত সাফাইয়ের দৌলতে যোগাড় করেছি। কথা রেখে এখন মৌজ করে খেয়ে আনন্দ করুন। কথায় বলে না, আগে পেটের যোগাড় কর।

আকাশে রূপালী চাঁদের খেলা চলছে। চারদিকে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। আমরা চাঁদের ঝকমকে আলোতে বসে মাংসের হাড়গোড় চিবোতে লাগলাম।

মুখভর্তি মটরশুঁটি নিয়ে বিল বাসেট দম্ভের সঙ্গে বলল, আপনারা যখন কাজকর্মের বিচার করতে বসে নিজেদের উঁচু দরের লোক বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন তখন আমি আর ধৈর্য ধরতে পারি না। কথা বলতে কি, আমার পক্ষে তখন নিজেকে সামলে রাখাই দায় হয়ে পড়ে।

আমি ম্লান হাসলাম।

বিলি বলে চলল, আপনি আমার কথাটাকে হেসে উড়িয়ে দিচ্ছেন।

আমি একটা মাংসের হাড় মুখ থেকে নামিয়ে বললাম, হাসছি না, তুমি বলতে চাইছ, বল।

একবারটি ভেবে দেখুন তো, যে মহাসমস্যার মধ্যে আমরা পড়েছিলাম সে অবস্থা থেকে বেরিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ানোর কোন পথ কি আপনারা বের করতে পারতেন, বলুন তো? রিক্স, আপনিই বলুন, সম্ভব হত কি?

মুখের মটরশুঁটিগুলি কোঁৎ করে গিলে প্রায় অস্ফুটস্বরে রিক্স বলল, 'বিলি, আমি অকপটে স্বীকার করে নিচ্ছি এ সঙ্কট থেকে উত্তোরণের কোন উপায়ই আমার পক্ষে বের করা সম্ভব হত না।

তবেই ভেবে দেখুন, ব্যাপারটা নিয়ে আমি গর্ববোধ করতে পারি, কি না?

অবশ্যই। তবে সত্যি কথা বলতে কি, আমার মাথায় সব সময় বড় বড় কাজের পরিকল্পনা খেলে। আর করিও বড় বড় কাম কাজ। তাই ছোটখাটো মতলব আমার মাথায় আসতেই চায় না। আমি কাজ করতে গেলে—

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বিল বাসেট বলে উঠল, আরে, আমাকে আর খুলে বলতে হবে না, সবই জানি, বুঝি?

কি জান? বোঝই বা কি?

আমি জানি যে, আপনার কাজ শুরু করতে গেলে গোড়াতেই একটা টাইপ মেশিনের প্রথম কিস্তির জন্য পাঁচ শ' ডলার চাই-ই চাই।

রিক্স মুচকি হাসল।

বিল বাসেট বলে চলল, আর দরকার পড়ে ওক কাঠের আসবাবপত্রে সাজানো গোছানো চার কামরার একটা অফিস ঘর। এ ছাড়াও বিজ্ঞাপনের চুক্তির জন্য আরও পাঁচশ' ডলার দরকার। এবার অধীর প্রতীক্ষা।

আমি জিজ্ঞাসা দৃষ্টিতে বিল বাসেট-এর মুখের দিকে তাকালাম। সে আমার জিজ্ঞাসা দূর করতে গিয়ে বলল, আরে, চার তো সবে ফেললেন। চার ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই কি মাছ উড়ে এসে আপনার ফেলা-টোপটাকে গিলে ফেলবে নাকি? টোপ যে সে ফেলবেন তার জন্য সময় দিতে হবে না? তাই মাছের ঝাঁক এসে টোপে ঠোকরাবার জন্য হপ্তা দুই ধৈর্য ধরে বসে থাকতে হবে। আর সিঃ পিটার্স-এর কাজও ঝটপট সেরে নেওয়া সম্ভব হয় না।

আমি আর মুখ না খুলে পারলাম না। বললাম, বিল ভায়া, তুমি জাদুকাঠিটা ঠেকিয়েই ভেল্কি দেখাতে পার এমন কোন কেরামতি তো আজ অবধি আমার চোখে পড়ল না।

বিল বাসেট নীরবে ম্লান হাসল।

আমি এবার বললাম, তুমি যে কাজটা হাসিল করে এমন বড়াই করছ, তা যে কোন মানুষই জাদুর আঙটি ঘষে ঘরে বসেই যোগাড় করতে সক্ষম।

ঠোঁটের কোণে বড়াইয়ের ছাপটুকু অক্ষুণ্ণ রেখেই বিল বাসেট এবার বলল, আরে এটা তো সবে একটা নমুনা দেখালাম। মনে করতে পারেন, সিঁড়ির প্রথম ধাপ, একটা কুমড়ো ফালি করার মত কাজ। ওগো মিস সিন্ডেরেলা, অচিরেই তোমার অজ্ঞাতসারে একটা দু'ঘোড়ার গাড়ি আপনার দরজায় এসে হাজির হবে। তখন সেটাকে চালাবার মত পরিকল্পনা অবশ্যই আপনার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে।

আমি মুখ না খুলে পারলাম না। বেশ একটু গম্ভীর স্বরেই এবার বললাম, ভায়া, আমি তোমার চেয়ে কম করেও পনের বছরের বড়। তবু এখনও একটা মেয়াদি জীবনবীমার পলিসি করার মত যুবক, সামর্থ্য আমার অবশ্যই আছে, ঠিক কি না?

বিল বাসেট মুচকি হেসে নীরবে ঘাড় কাৎ করল।

আমি বলে চললাম, আমার কথাটাকে তুমি হেসে উড়িয়ে দিলেও আমি বলব, আধ মাইল খানেক দূরবর্তী ওই শহরটার আলোগুলো দেখার মত জ্যোতি আমার চোখে এখনও আছে। নরম চর্বি মাখানো পোষাক পরে মানুষগুলো শহরের বুকে চলাফেরা করছে। একটা গ্যাসোলিন বাতি, দু'ডলারের শক্ত অথচ কুচোকুচো সাবান আর শুকনো জিনিসপত্রে ঠাসা একটা বাক্স। তখন দেখবে কেরামতি কাকে বলে।

বিল বাসেট সঙ্গে সঙ্গে উঠল, সবই তো বুঝলাম। কিন্তু সেই ডলার দুটো কোথায় পাবেন, জানতে পারি কি?

বিল বাসেট ভাবল, এ চোরটার সঙ্গে বকবক করে ফয়দা কিছুই নেই, তাই সে এবার বলল, আপনারা দু'জনই বাটপাড়ি কাজের ব্যাপারে নেহাৎই শিশু, হামাগুড়ি দিচ্ছেন। ধনকুবেরের কাঠের বাক্সটায় তালা পড়ে গেছে। আপনারা উভয়েই হতাশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন, মজুরটা কখন গাড়ির চাকা চালু করবে।

আমি কি বলব ভেবে না পেয়ে মুখে কলুপ এঁটেই রাখলাম।

বিল বাসেট বলে চলল, বহুৎ আচ্ছা। আমার কথাটা আপনারা মেনে নিন। আজ রাত্রেই বিল বাসেট তার ভেল্কি দেখাবার জন্য ময়দানে নামছে।

খাবারগুলোর সদ্ব্যবহার হওয়ার পর বিল ঝটপট হাত ধুয়ে নিল। প্যান্টের পিছনে ভেজা হাতটা মুছতে মুছতে সে বলল, আমি কেরামতি দেখাতে চললাম। আমি ফিরে না আসা অবধি এমন কি ভোরের আলো দেখা দিলেও আপনারা এখান থেকে এক পা-ও নড়বেন না।

কথাটা বলেই সে মনের আনন্দে শিস্ দিতে দিতে এগিয়ে গেল। আমি আর রিক্স তার ফেলে যাওয়া পথের দিকে নীরব চাহনি মেলে তাকিয়ে রইলাম।

তখন রাত্রি প্রায় দুটো। রিক্স তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। সে আমাদের কাছে ফিরেই ছোট্ট একটা লাথি মেরে রিক্সকে তুলল। আর আমার সামনে এক হাজার ডলারের পাঁচটা বান্ডিল ছড়িয়ে দিল।

রিক্স সদ্য খোলা, ঘুম-জড়ানো চোখ দুটো ডলতে ডলতে ডলারের গোছাগুলো দেখতে লাগল। আমিও বিল-এর কেরামতিতে কম অবাক হলাম না।

আমাদের বিস্ময়ের ঘোর কাটার আগেই বিল বলতে আরম্ভ করল, শুনুন, শহরটা সম্বন্ধে আগে দু'-চার কথা বলে নিচ্ছি। তারপর না হয় আমার কেরামতির কথা বলব। শহরটার নাম রকি স্প্রিংস্। শহরটার কেন্দ্রস্থলে একটা মন্দির তৈরী হচ্ছে। পাকা মন্দির। দেখে মনে হল, সর্বজন মান্য পোপ এসে মেয়র পদের প্রার্থীর মাথায় জল ঢালবেন। আর প্লুরিসি রোগাক্রান্ত জজ টাকার-এর সহধর্মিণী সম্প্রতি কিছুটা সুস্থ আছেন। মুহূর্তের জন্য থেমে সে এবার বলল, আসল কথাটা এবার পাড়া যাক। 'ল্যাম্বারম্যান'স ফাইডেলিটি অ্যান্ড প্লাউম্যান'স নামে এ শহরে একটা ব্যাঙ্ক রয়েছে। গতকাল বত্রিশ হাজার রূপোর ডলার নগদ নিয়ে ব্যাঙ্কের কাজ কর্ম বন্ধ হয়েছিল। বত্রিশ হাজারের পরিবর্তে আঠারো হাজার ডলার নিয়ে আজ সকালে সেটা খুলবে। তাই তো আমি আরও বেশী হাতিয়ে নিয়ে আসি নি। যাক গে, আপনারা এতেই সন্তুষ্ট তো?

রিক্স হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়ে সোল্লাসে বল উঠল, তোমার হাতসাফাইয়ের কাজের উত্তরোত্তর উন্নত হোক। কী অবিশ্বাস্য কাণ্ড! তুমি ব্যাঙ্কটা লুট করেছ বিল! চমৎকার! চমৎকার!

'লুট' কথাটা বিশ্রি শোনায়, এ কথাটা বলবেন না তো।

ঠিক আছে। এবার বল তো অবিশ্বাস্য কাজটা তুমি সারলে কি করে, ভেবে অবাক হচ্ছি।

বলছি তবে শুনুন, আমি প্রথমেই খুঁজে বের করলাম, ব্যাঙ্কটা কোন্ পথে। শহরটা খুবই শান্ত। শহরটা এত শান্ত যে, সত্যি বলছি ওই পথের বাঁকটায় দাঁড়িয়েই আমি নিরাপদ তালার চাবি ঘোরানোর শব্দগুলো পরিষ্কার শুনতে পেয়েছি, ডানদিকে 'পঁয়তাল্লিশ', বাঁদিকে দু'বার 'আশি', ডানদিকে একবার 'ষাট' আবার বাঁয়ে 'পনের'।

তাই বুঝি? আমি বললাম।

বিল বলে চলল, হ্যাঁ, উৎকর্ণ হয়ে সবই লক্ষ্য করলাম। তারপর কি বলছি শুনুন—এ শহরের সবাই খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠে। তারপরই প্রাতরাশ সেরে নেয়।

তারপর রিক্স-এর দিকে ফিরে বলল, আপনার কারবার শুরু করার জন্য মূলধন কত দরকার বলুন?

রিক্স ইঁদুরের মত পিছনের পায়ে ভর দিয়ে বলল, বন্ধু বিল, আমার যেসব বন্ধু ডেনভারে আছে, তাদের সাহায্য-সহযোগিতা আমি পাব বলেই আশা করছি। আমার হাতে অন্তত একশ' ডলার যদি থাকত তবেই আমি।

তার কথাটা শেষ হবার আগেই বিল কারেন্সি নোটের একটা গোছা থেকে কুড়ি ডলারের পাঁচটা নোট রিক্স-এর হাতে গুঁজে দিল।

বিল এবার আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার কত চাই, বলুন?

আমি বললাম, সে যা হয় পরে দেখা যাবে। এখন নোটগুলো গুছিয়ে রাখ বিল।

কেন? আপনার কিছুই লাগবে না?

কারো কষ্টে উপার্জিত অর্থ আমি স্পর্শ করি না। যে সব যুবকদের পকেটে বাড়তি মালকড়ি থাকে, তদের কাছে বোঝাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়, তাদের পকেট হাল্কা করতে সাহায্য করার জন্যই আমি উৎসাহী হই।

বিল কৌতূহল মিশ্রিত বিস্ময়ের সঙ্গে বলে উঠল, তাই বুঝি?

হ্যাঁ, ঠিক তা-ই। তারপর কি বলছি শোন, কোন রাজপথের মোড়ে দাঁড়িয়ে আমি যখন একটা কুত্তার বাচ্চাকে হীরে বসানো একটা নিরেট সোনার আঙটি তিন ডলারে বিক্রি করি তখন আমি ২·৬ ডলার মুনাফা পকেটে ভরি।

তিন ডলার দামে বিক্রি করে ২·৬০ ডলার মুনাফা!

আরে আঙটিটা হাত করতে খরচাপাতি কিছু তো হয়-ই।

হ্যাঁ, ব্যাপারটা এবার মাথায় ঢুকেছে।

যাক গে, এবার কি বলছি শোন, আমি তো ভালই জানি, যে যুবক আঙটিটা খরিদ করছে যে কোন মেয়েকে সেটা দিয়ে একশ' পঁচিশ ডলার দামের সুযোগ সুবিধা আদায় করে নেবে। তবে দেখা যাচ্ছে, এতে সে মুনাফা পিটবে একশ' বাইশ ডলার। এবার বিচার করে বল তো, আমাদের সবচেয়ে বড় ভিখারী কে?

আর আপনার ব্যাপারটা তো বলছেন না। বিল বলল, আপনি যখন বাতিদান না কাটাব প্রতিরোধক হিসাবে পঞ্চাশ সেন্টের বিনিময়ে এক-এক মুঠো বালি বিক্রি করেন, তখন? বালির দাম যদি প্রতিটা চল্লিশ সেন্ট হয় তবে রোজগার কত হবে বলে আপনি মনে করছেন?

ঠিক আছে। এবার যা বলছি ধৈর্য ধরে শোন—আমি ক্রেতাকে বুঝিয়ে বলি সে যেন বাতিদানটা সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে আর ভালভাবে বালি বোঝাই করে রাখে।

আমি বিল-এর মুখের দিকে মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে আমার বক্তব্যের প্রতি আগ্রহটুকু যাচাই করে নিলাম।

পূর্ব প্রসঙ্গের জের টেনে এবার বললাম, বাতিদানটা পরিষ্কার আর বালি ভর্তি করে রাখলে যে সেটা কোনদিনই ফাটবে না এটা তো তার ভালই জানা আছে। তাই ব্যাপারটা নিয়ে তার কোনই দুর্ভাবনা থাকবে না, থাকার কথাও তো নয়। এটাকে কি বলা হয়, জান?

বিল কোন উত্তর না দিতে পেরে আমার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে নীরবে তাকিয়ে রইল।

আমি এবার বললাম, এটাকে বলে শিল্প সম্পর্কিত খ্রীস্টীয় বিজ্ঞান, বুঝেছ বাছাধন?

বিল নীরবে ঘাড় কাৎ করল।

আমি আবার বলতে শুরু করলাম ওই মেয়ে মানুষটার পঞ্চাশ খরচ করার ফলে মিসেস এডি আর রকফেলার উভয়েরই কাজ জুটে গেল। দুই সোনার কারবারীর কাজ জুটিয়ে দেওয়া কি সামান্য কাজ নয়।

তখন রিক্স-এর অবস্থা এমন যে, সে পারলে বিল বাসেট-এর জুতোর ধুলো জিভ দিয়ে চেটে পরিষ্কার করে দেয়।

ভাবাপ্লুত গলায় সে বলল, প্রিয় বন্ধু বিল, তোমার এ উদারতার কথা আমার মনে আমৃত্যু গাঁথা থাকবে। এর জন্য পরম পিতা তোমাকে পুরস্কৃত করবেন। তবে তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ রাখতে চাইছি।

অনুরোধ? আমার কাছে? কি ব্যাপার বলুন তো?

হ্যাঁ, তোমারই কাছে। আমি তোমাকে বারবার অনুরোধ করছি, অপরাধ আর হিংসাত্মক কার্য কলাপ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে এসো।

বিল আপন মনে বলল, নেংটি ইঁদুর কাহিকার। তোমার এসব উপদেশের দাম আমার কাছে কানাকড়িও নয়। তোমার ওই অন্তসারশূন্য বড় বড় গালগপ্প তোমাকে কি দিয়েছে? না, কামনা বাসনার এক তিলও পূরণ হয়নি। বরং পেয়েছ, নিরবচ্ছিন্ন দারিদ্র্য, অভাব অনটনের জ্বালা, অনাহার আর অর্দ্ধাহার। এবার মুখ খুলল, দেখুন, পিটার্স তাঁর কারবারের বিধি বিধানের মাধ্যমে দস্যু বৃত্তের

বিধানকেও নিদারুণভাবে, ছাড়িয়ে গিয়েছেন। তিনিই বা ন্যায় নীতির দোহাই দিয়ে কি পেয়েছেন? শেষমেশ দেখা গেল ফলাফল শূন্য। তিনি নিজেও নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নিয়েছেন, তার আর্থিক পরিস্তিতি বর্তমানে খুবই সঙ্গীন হয়ে পড়েছে।

এবার উভয়ের মুখের দিকে অনুসন্ধিৎসু নজরে তাকিয়ে নিয়ে সে বলল, একটা কথা কি জানেন? আপনারা দু'জনই গিল্টি করা নীতির পূজারী। আর তা অবলম্বন করেই আজও দিব্যি পৃথিবীতে টিকে আছ। পিটার মশাই, আপনিও বরং আমার সংগৃহীত ডলারগুলো থেকে কিছু ভাগ নিন।

আমি আবারও বিলিকে বললাম, তোমার ডলারগুলো পকেটে ঢুকিয়ে রাখ বিল। আমি চৌর্যবৃত্তিকে কুনজরে না দেখলেও কোনদিন নিজেকে সে দলের মনে করি না।

তবে আপনি এর ভাগ নেবেনই না?

অবশ্যই না! কারণ, একটাই কিছু না দিয়ে কারো কাছ থেকে কিছু নেওয়া আমার নীতিবিরুদ্ধ কাজ।

হুম্।

আমার এ কাজের পিছনেও একটা যুক্তি আছে। আমি টাকাকড়ির বিনিময়ে যা-ই দেই না কেন, যে বস্তুটা তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যাতে সে দ্বিতীয়বার আর অন্য কারো ফাঁদে না পড়ে।

এদিকে আলফ্রেড ই. রিক্স আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল।

আমি এক গাল হেসে বললাম, মূলধন হাতে পেয়ে মিঃ রিক্স দেখছি বিদায় নেবার জন্য তৈরী হয়ে পড়েছেন।

আমার কথায় লোকটা যেন একটু বিমর্ষ হয়ে পড়ল। ম্লান হেসে বলল, হ্যাঁ, ডলারগুলো এ মুহূর্তে আমার বড়ই দরকার ছিল। মিঃ বাসেট আমার কী যে উপকার করলেন তা আর বলার নয়। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি আপনার ভবিষ্যতের দিনগুলো শুভময় হয়ে উঠুক।

রিক্স আবারও বিল বাসেট-এর পা ছুঁয়ে এবং আমার সঙ্গে করমর্দন করল।

বিদায় মুহূর্তে রিক্স বলল, আমি এখন যাত্রা করলে একটা গোলা-বাড়িতে একটা দলের দেখা পেয়ে যাব। তাদের সঙ্গে নিচের স্টেশনে নেমে যাব। সেখান থেকে ডেলডার-এর ট্রেন ধরব।

স্বীকার করছি, রিক্স বিদায় নিয়ে আমাদের ছেড়ে যাওয়ায় আমি খুশিই হয়েছি। তবে এ-ও সত্য যে, সে লোকটা যে চিরদিনের মত খতম হয়ে গেল তার জন্য অনুশোচনাও কম করলাম না।

আমি বললাম, মাত্র তো একশ'টা ডলার তার সম্বল। মোটা অঙ্কের কোন মূলধন হাতে না পেলে সে যে কিভাবে ব্যবসা চালাবে মাথায় আসছে না।

হ্যাঁ, তাকে আমরা যেভাবে ছেড়ে দিলাম তাতে তো তাকে একটা ওল্টানো কাছিমের সঙ্গেই তুলনা করা চলে। আর তার যেটুকু যোগ্যতার পরিচয় পেলাম তা সম্বল করে একটা ছোট্ট মেয়ের কাছ থেকে তার স্লেট-পেন্সিলটাও বাগিয়ে নেওয়াও তার পক্ষে সম্ভব নয়।

আমি বললাম, হ্যাঁ, কথাটা ঠিকই বলেছ। লোকটা নিতান্তই নিরীহ গো-বেচারা। কি যে করবে, ঈশ্বর জানেন।

সে রাত্রেই আমি আর বিল বাসেট পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম।

আমি একা-একা পথ পাড়ি দিতে দিতে নতুন একটা মতলব এঁটে ফেললাম। আমার মধ্যে জেদ চাপল, ওই চোর বিলটাকে দেখিয়ে দিতেই হবে শ্রমিক আর কারবারীর মধ্যে তফাৎ কি?

আমি এতক্ষণ বলব বলব করেও যে কথা বলতে পারি নি শেষপর্যন্ত নিজের মনের সঙ্গে দীর্ঘ বোঝাপড়ার পর কথাটা তাকে বলেই ফেললাম, বিল, তোমার কাছ থেকে কোন অর্থকড়িই আমার পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয়।

হুম।

আমি এটাকে নিছকই 'দান' বলে মনে করছি।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিল বাসেট বলল, 'দান! এটাকে আপনি নিছকই 'দান' বলে মনে করছেন! সদ্য গড়ে ওঠা হলেও আমাদের বন্ধুত্বের কোন দামই আপনি দিচ্ছেন না?

দেখ বিল, তোমাকে দুঃখ দেওয়ার এতটুকুও ইচ্ছে আমার নেই। তবু বলছি, আমি নীতি থেকে এতটুকুও সরে যেতে পারি না।

বিল একটু রাগত স্বরেই এবার বলল, ঠিক আছে—ঠিক আছে।

আপনাকে তো আর আমি নীতিভ্রষ্ট হতে বলতে পারি নে।

আমি তোমার অর্থকড়ির অংশ নিতে পারি একটা মাত্র যুক্তির ওপর নির্ভর করে।

যুক্তি? কি সে যুক্তি?

যুক্তিটা হচ্ছে। এখানকার সংকট থেকে অব্যাহতি না পাওয়া অবধি তুমি যদি তোমার সফরের সঙ্গী হিসেবে আমার রাহা খরচটা দাও তবেই আমি বর্তে যাই।

আমার কথায় বিল বাসেট-এর মুখে হাসির রেখা দেখা দিল। সে আমার প্রস্তাবে উল্লসিত হয়ে সম্মত হল। এক গোছা নোট আমার পকেটে জোর করে গুঁজে দিল।

আমরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্য তৈরী হয়ে পড়লাম।

পশ্চিমগামী একটা ট্রেন ধরার জন্য আমরা লম্বা-লম্বা পায়ে স্টেশনের দিকে হাঁটতে লাগলাম।

আমাদের ট্রেনটা উল্কার বেগে ধেয়ে চলল। আমরা আরিজোনার অন্তর্গত লস পেরস শহরে পৌঁছলাম। সেখানে এক হোটেলে দুপুরের খাওয়া সারার সময় আমি একথা সে কথার পর বিল-এর কাছে প্রস্তাব রাখলাম. টেরাকোটা দিয়েই আমাদেব ববাতটাকে একবার ঠোকাঠুকি করে দেখা যাক।

বিল বলল, টেরাকোটা?

হ্যাঁ. টেরাকোটা। সেখানেই আমার প্রাক্তন গুরু মন্টেগুসিলভার-এর ঘর। বর্তমানে তিনি কাজ থেকে অবসর নিয়েছেন, আমি যদি মন্টেগুকে দেখিয়ে দিতে পারি যে, সে অঞ্চলে একটা মাছি বা মশা গুনগুনিয়ে বেড়াচ্ছে তবে আমার জাল বোনার ঝুঁকিটা সে-ই নেবে।

বিল বাসেট বলল দেখ. আমার কাছে সব শহরই সমান।

বিল-এর পক্ষে এমন কথা বলাই স্বাভাবিক। কারণ, তার কাজকর্ম যা কিছু সবই তো রাতের অন্ধকারে চলে।

বিল বাসেট-এর ইচ্ছাতেই আমরা লস পেবস স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে পড়লাম।

আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম, বিল বাসেট-এর অজ্ঞাতেই কাজ হাসিল, মানে পকেটের মালকড়ি হাতিয়ে নেব।

কিন্তু কিভাবে তার পকেট খালি করব? ঘুমন্ত অবস্থায় তার মালকড়ি হাতিয়ে নেব? না, সে সুযোগ নেব না। তবে? তার জন্য একটা চার হাজার সাতশ' পঞ্চান্ন ডলারের লটারির টিকিট কোটের পকেটে রেখে যাব। আমার বিশ্বাস, ট্রেন থেকে নামার সময় তার পকেটে এ পরিমাণ মালকড়িই ছিল।

আমি যখন তার কাছে আমার মতলবের বিনিয়োগের কথাটা পাড়লাম তখন সে বলল, বন্ধু পিটার্স, আমি মনে করি যেকোন রকম উদ্যোগে ঝুলে পড়াটাই আসল কথা। এখন ভাবছি, আমি আপনার সঙ্গেই থেকে যাব। আবার এ-ও সত্য যে, আমি তোমার সঙ্গে থেকে গেলে সমস্যাও আছে।

সমস্যা?

হ্যাঁ, সমস্যাই তো বটে, ব্যাপারটা এমনই ঠাণ্ডা মেরে যাবে যে, রবার্ট ই. পিয়াড়ি আর চার্লি ফেয়ার ব্যাংক্স ছাড়া অন্য কেউ-ই 'বোর্ড অব ডিরেক্টরে' বসাতেই পারবে না, পারবে কি?'

আমি ম্লান হেসে বললাম, আমি কিন্তু অন্য রকম ভেবেছিলাম।

অন্যরকম? অন্যরকম বলতে কি রকম, জানতে পারি কি?

আমার ধারণা ছিল, তুমি বুঝি ডলারগুলোকে বাড়াবার ধান্ধাতেই আছ।

আমি প্রায়ই সেটা ইচ্ছা করি। এক পাশে শুয়ে তো আর সারাটা রাত্রি কাটানো সম্ভব নয়। পরিবর্তন চাই-ই চাই।

কোন মতলব মাথায় আছে কি?

হ্যাঁ, মতলব তো একটা করেই রেখেছি?

সেটা কি, খোলসা করে বলবে কি?

আমি ভেবে রেখেছি, পোকার খেলার একটা আড্ডা বসাব।

তুমি পোকার খেলার আড্ডা—শেষ পর্যন্ত জুয়ার আড্ডা বসাবে?

কেন? জুয়ার আড্ডার নামে আপনি এমন নাক কোঁচকাচ্ছেন কেন, বুঝছি না তো? বড়সড় কোন ডাকাতি বা ওয়ালডর্ফ এস্টোরিয়ার দাতব্য বাজারে কলম পেন্সিল বিক্রির মাঝামাঝি ব্যাপারে পোকার খেলা মানে জুয়ার কারবারটাকে কিন্তু মোটেই খারাপ মনে করি না।

আমি একটু ক্ষোভ প্রকাশ করেই এবার বললাম, বিল বাসেট, আমার ছোটখাট কারবারের ব্যাপারে তুমি তবে মুখ খুলতেই উৎসাহী নও?

আপনি বোধ হয় আমার ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছেন। আপনার কারবারের ব্যাপারে আমি কেনই বা নিরুৎসাহী হতে যাব, বলতে পারেন? কিছু মনে করবেন না, একটা কথা বলছি—আমি যে অঞ্চলে বাস করি তার পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে একটা পাস্তুর ইন্সটিটিউট আপনার পক্ষে খোলা সম্ভব নয়। আমি ঘন ঘন মত পরিবর্তন পছন্দ করি না।

এরকম চিন্তা করে বাসেট দোতলায় একটা সুন্দর, আলোবাতাসযুক্ত বড়সড় একটা ঘরভাড়া করে ফেলল। এবার সে আসবাবপত্র ও তৈজসপত্রের খোঁজে ঘোরাফেরা করতে লাগল।

আমি সে রাত্রেই মন্টি সিলভার-এর বাড়ি হাজির হলাম। সে আমাকে মুখোমুখি চেয়ারে বসিয়ে সে ধৈর্য ধরে আমার সব কথা শুনল।

আমার কথা তার মনে ধরল বুঝতে পারলাম যখন দেখলাম সে আমার হাতে দু'শ' ডলার গুঁজে দিল।

মন্টি সিলভার-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি লস্ পেরস-এর একমাত্র তাসের দোকানটায় হাজির হলাম। সে বাড়িটার সবগুলো ছাউনিওয়ালা ঘরই ভাড়া নিয়ে নিলাম।

পরদিন সকালে আমি আবার সে তাসের দোকানে গেলাম। তখনও দোকানটার ঝাপ খোলা হয় নি। পথের ধারে দাঁড়িয়ে দোকান খোলার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

না, দোকানটা খোলার জন্য আমাকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। একটু বাদেই মাঝ বয়সী দোকানের মালিক এল।

আমি নগদ অর্থ মিটিয়ে দিয়ে দোকানের সবগুলো তাস কিনে ফেললাম।

পরদিন সকালে আবার আমি সে তাসের দোকানটায় হাজির হলাম। দোকানিকে বললাম, তাসের ব্যবসায় উৎসাহী আমার বন্ধুটা হঠাৎ মত পরিবর্তন করে ফেলেছে। তাই আমি অনন্যোপায় হয়ে তাসগুলো ফেরৎ দিতে এলাম।

দোকানি প্রথমে তাসগুলো ফেরৎ নিতে রাজি হল না। শেষ পর্যন্ত আমার অনুরোধ ফেলতে পারল না। উভয়ের মধ্যে একটা রফা হয়ে গেল। অর্ধেক দামে তাসগুলো যে কিনতে রাজি হল। আমার তখনকার অবস্থা, যা হাতে পাওয়া যায়।

হ্যাঁ, তখন পর্যন্ত আমাকে পঁচাত্তর ডলার লোকসানের বোঝা কাঁধে নিতে হয়েছে।

আমি একটামাত্র রাত্রের মধ্যেই পরিকল্পনা মাফিক কাজ হাসিল করে নিয়েছিলাম। কাজটা ছিল, প্রতিটা তাসেই বিশেষ চিহ্ন দিয়ে রাখা। আমি এ ব্যাপারটা নিয়ে যা কিছু পরিশ্রম করেছি সবই সে রাত্রেই করেছিলাম। ব্যস, তারপরই শুরু হল আমার আসল খেল্।

কারবারের প্রথম কিস্তির খেলা তারপরই শুরু হয়ে গেল।

সত্যি বলছি, আমি যে রুটি জলে ছুঁড়ে দিয়েছিলাম তা-ই দ্রুত ফিরে আসতে আরম্ভ করল মদের চাটসহ পুডিংয়ের রূপ নিয়ে।

তবে এ-ও সত্য যে, বিল বাসেট-এর তাসের পোকার খেলার প্রথম তাসটা, আমিই বাগিয়ে নিতে পেরেছিলাম, মানে নিয়েছিলাম।

বিল বাসেট সারা শহরটা তোলপাড় করে একটামাত্র তাসের প্যাকেটই সে খরিদ করতে পেরেছিল। আমি তো সে রাত্রেই কাজ সেরে রেখেছিলাম। রাত্রি জেগে প্রতিটা তাসের গায়ে চিহ্ন দিয়ে রেখেছিলাম। আর সে চিহ্নগুলো এত পরিষ্কার যে, ঠিক যেন আয়নায় নিজের মুখ দেখার মত একটা ব্যাপার।

দীর্ঘসময় ধরে খেলা চলল। আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী আমিই জয়ী হলাম। বিল-এর পাঁচ হাজারেরও কিছু বেশী ডলার আমার পকেটে এসে গেল।

আর বিল বাসেট? তার বরাতে কি জুটেছিল? সে ম্যাস্কট হিসেবে যে কালো বিড়ালটা কিনেছিল সেটাই তার বরাতে জুটেছিল।

আমি বিদায় নিয়ে যাবার সময় বিল ম্লান হেসে আমার সঙ্গে করমর্দন করল। সে হাসিটা যে নিতান্তই সৌজন্যের বর্হিপ্রকাশ তা আমার অন্তত বুঝতে দেরী হল না।

করমর্দন সারতে সারতে বিল বাসেট শুকনো গলায় বলল, বন্ধু পিটার্স, এবার স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি, আমার দ্বারা কারবার টারবার হবে না। মোদ্দা কথা যা বুঝলাম, আমার কপলে শ্রমিক হবার কথাই বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে। আর এ-ও নিঃসন্দেহ হলাম যে, তোমার তাসের বরাত খুব—খুবই ভাল। তোমার ভবিষ্যৎ শুভময় হোক বন্ধু।

সেদিনই বিল বাসেট-এর সঙ্গে আমার শেষ দেখা। না, তারপর আর এক মুহূর্তের জন্যও তার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি।

শেয়ালের মত ধূর্ত আর দুঃসাহসী লোকটার প্রসঙ্গ শেষ হয়েছে ভেবে আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। আমি বললাম, একটা কথা মন-খোলসা করে বল তো জেফ—।

কি? কি কথা, নির্দ্বিধায় বলেই ফেল না।

ডলারগুলো আশা করি তোমার পকেটেই রয়ে গেছে, কি বল? এবার আমি হেসে বললাম, কোন ব্যবসা ফাঁদার পরিকল্পনা যদি মনে থাকে তবে ওই ডলারগুলো মূলধন হিসেবে ভালই হবে।

জেফ বলল, ওই পাঁচ হাজারের যে একটা সুব্যবস্থাই করে ফেলেছি সেটা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পার।

বার দু'-তিন কোটের বুক-পকেটে টোকা মেরে জেফ এবার বলল, এর প্রতিটা শেয়ারের মূল্য পঞ্চাশ হাজার ডলার। একটা বছরের মধ্যেই শতকরা পাঁচশ' হবেই। সবচেয়ে বড় কথা, কোন কম ঝুঁকির ব্যাপারই নেই। এক মাস আগেই আবিষ্কৃত হয়েছে। শোন,তোমার কাছে যদি বাড়তি কানাকড়ি থাকে তবে কিছু কিনে রাখলে ভালই হবে।

শেয়ার? কিসের শেয়ার তা-তো বললে না।

ব্লুগফার খনি। সোনার খনি, বুঝলে?

কিন্তু ওই সব খনি অনেক সময়—'

এতে কোনই দ্বিধার কারণ নেই। বুড়ো হাঁসের মতই খনিটা নির্ভরযোগ্য। অর্থকড়ি মার যাবার প্রশ্নই ওঠে না।

সে কোটের পকেট থেকে একটা খাম বের করে টেবিলের ওপর উপুড় করে ধরল। এবার আমার দিকে মুখ তুলে সে বলল, এটাকে আমি সর্বদা পকেটে করেই চলাফেরা করি। কোন পুঁজিবাদী এটাকে হাতাতে পারবে না। আবার চোরের পক্ষে এটাকে নষ্ট করা সম্ভব নয়।

আমি কৌতূহল মিশ্রিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে খামটার দিকে তাকালাম। তারপর বললাম, জেফ, এটা তো কলোরাডোর জিনিস।

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ।

একটা কথা, বেঁটেখাঁটো সে লোকটা ডেনভার গিয়েছিল তার নামটা যেন কি বললে?

আলফ্রেড ই. রিক্স।

এবার বুঝেছি, এ খনি কোম্পানির প্রেসিডেন্ট স্বাক্ষর করেছে—এ. এল. ফ্রেডেরিক্স। তাই আমি অবাক হয়ে ভেবে চলছিলাম—

আমার হাত থেকে সার্টিফিকেটটা জেফ প্রায় ছিনিয়েই নিয়েছিল আর কি। তারপর বলল, তোমার সার্টিফিকেটটা একবার দাও তো দেখি।

আমি মদ পরিবেশককে ডেকে আর এক বোতল মদ দিয়ে যেতে বললাম, ভাবলাম, আমার পক্ষে তো এটুকু অন্তত করা সম্ভব।

হার্ট অব দ্য ওয়েস্ট

দ্য র‍্যানসোম অব ম্যাক

ম্যাকলেসবেরি আর আমি সোনার খনির কারবার থেকে সরে পড়লাম। প্রত্যেকে হাতে পেলাম, চল্লিশ হাজার করে ডলার।

ম্যাক-এর বয়স একচল্লিশ। কিন্তু আমরা তাকে 'বুড়ো ম্যাক' বলে সম্বোধন করি।

একদিন আমার দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে ম্যাক আমাকে বলল, 'শোন অ্যান্ডি, এতসব ঝামেলা হুজ্জতি আমার আর মোটেই ভাল লাগছে না। তিন-তিনটে বছর ধরে আমরা দু'জনে এক সঙ্গে, পাশাপাশি কাজ করেছি।

মুহূর্তের জন্য থেমে ম্যাক আবার বলতে শুরু করল, তাই বলছি কি, এতদিন তো একসঙ্গে জোয়াল কাঁধে নিয়ে চললামই। এবার আমরা পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে কেমন হয়, বল তো?

বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া।

তার মানে টাকে হাতে বুলিয়ে যা কিছু মালকড়ি কামাই করেছি, সেগুলোকে একটু আরাম আয়েশ করে খরচ করতে চাই, বুঝলে?

আমি মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলে বললাম, তোমার প্রস্তাবটাকে আমি সোৎসাহে মেনে নিচ্ছি, চমৎকার প্রস্তাবই বটে। কিছুদিনের জন্য নবাব বাদশাহ বনে দিন কাটিয়ে দেখাই যাক না কেন, কেমন লাগে।

তুমি তবে রাজি?

হ্যাঁ, রাজি তো বটেই। কিন্তু একটা কথা।

কি? কি কথা?

কথাটা হচ্ছে, মালকড়ি খরচ করার মনের মত একটা জায়গা তো দরকার। কি করা যায়। কোথায় যাওয়া যায় ভেবে বল তো?

কোথায় যাবে ভাবছ? তুমিই একটা জায়গা পছন্দ করে ফেল।

আমি তো ভাবছি, নায়েগ্রা জলপ্রপাতে গিয়ে ডেরা বাঁধব, নাকি তাসের জুয়ায় মেতে যাব?

ম্যাক বলল, 'আমি কিন্তু বহুদিন আগে থেকেই ভেবে রেখেছি, কোনদিন যদি অপর্যাপ্ত টাকা হাতে আসে তবে কোথাও গিয়ে দু'কামরার একটা বাসা ভাড়া নেব।

আমি আগ্রহ প্রকাশ করে বললাম, 'আর কিছু? আর কিছু ইচ্ছে করে না?

হ্যাঁ, আরও আছে, রান্নাবান্নার জন্য একজন চীনা রাঁধুনি রেখে দেব। আর পায়ে হাঁটু পর্যন্ত মোজা পরে বাক্‌ল্‌-এর 'সভ্যতার ইতিহাস' বইটা সকাল বিকেল পড়ব। কী চমৎকার জীবন, ভাবতে পার!

তোমার বক্তব্যে রাজে'আড়ম্বরের ইঙ্গিত নেই, কেবল আত্মসুখে মজে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ পাচ্ছে। আমি মেনে নিচ্ছি, এর চেয়ে সৎভাবে অর্থকড়ি খরচ করার উপায় আমার অন্তত জানা নেই।

তবে? কেমন মতলবটা মাথা দিয়ে বের করলাম, বল?

আমাকে একটা কোকিল ডাকা ঘড়ি আর সেপ—উইনার-এর 'নিজে শেখো' বই জোগাড় করে দিও।

'নিজে শেখো' বই? কথাটা বলেই ম্যাক হো হো করে হাসতে লাগল।

আমি বললাম 'হ্যাঁ, তুমি তো তোমার 'সভ্যতার ইতিহাস' বইয়ের পাতায় মুখ গুঁজে পড়ে থাকবে। আর আমার সময় কি করে কাটবে, বলতে পার?

ঠিক আছে, তোমার বাঞ্ছাও পূরণ করা হবে।

আমি আর ম্যাক এক সপ্তাহ পরে ডেন্‌ভার থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরবর্তী 'পিনা' নামক ছোট্ট একটা শহরে পৌঁছলাম।

সামান্য খোঁজাখুঁজির পর আমাদের দু'জনের থাকার মত দু'কামরার একটা বাড়ি পেয়ে গেলাম।

আধমুঠো ডলার পিনা ব্যাঙ্কে জমা দিলাম। আর? শহরের তিনশ' চল্লিশজন নাগরিকের সঙ্গে হেসে হেসে করমর্দন সারতেও দেরী হল না।

ডেনভার থেকে যাওয়ার সময়ই আমরা সঙ্গে করে একজন অভিজ্ঞ চীনা রাঁধুনি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। আরও আছে—বাক্‌ল্, কোকিল ডাকা ঘড়ি আর নিজে শেখা পুঁথিও সঙ্গে করেই নিয়ে গিয়েছিলাম। সত্যি বলছি, বাসাটায় বসে আমার মনে হতে লাগল, এ যেন ভাড়া করা বাসা নয়, নিজেরই বাড়ি।

অর্থ কোনদিন সুখের সন্ধান দিতে সক্ষম নয় তবে ভুলেও যেন তাদের কথা বিশ্বাস করবেন না। ম্যাক নীল সুতোর মোজায় পা দুটোকে মুড়িয়ে জানালার ওপর রেখে তার দোলনা চেয়ারে বসে চশমার ফাঁক দিয়ে বাক্‌ল্-এর বইয়ের পাতায় ডুবে রয়েছে এ দৃশ্যটা যদি আপনি দেখতেন তবে এমন একটা সন্তুষ্টির ছাপ লক্ষিত হত যাতে রকফেলারকেও ঈর্ষাকাতর করে তুলতে পারে।

আর আমি? আমি ব্যাঞ্জোতে আঙুল বুলিয়ে পুরনো জিপ কুন-এর সুরটা তোলার চেষ্টায় ডুবে রয়েছি, কোকিল ডাকা ঘড়িটা প্রতিটা মিনিট আর ঘণ্টা নির্দেশ করছে, আর চীনা রাঁধুনি আচিং-এর রান্না করা ডিম আর শূকরের মাংসের গন্ধে পুরো বাড়িটাই যেন আমোদিত হয়ে উঠেছে।

অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে এলে যখন 'নিজে শেখো' আর বাক্‌ল্-এর 'সভ্যতার ইতিহাস' অর্থহীন হয়ে ওঠে, তখন ম্যাক আর আমি নিজের নিজের পাইপে অগ্নি সংযোগ করে আলোচনায় মেতে যাই—মুক্তোর খোঁজে সমুদ্রে তল্লাশি চালানো, মিশর, বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনা, কটি-বাত, বাণিজ্য বায়ু, মাছ চামড়া, ঈগল পাখি আর কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় যাদের ব্যাপারে আমরা ইতিপূর্বে কোনদিন ভুলেও ভাবতে পারি নি তা নিয়ে গভীর আলোচনায় ডুবে যাই।

এক সন্ধ্যায় কফির কাপ হাতে কথাবার্তা বলার সময় ম্যাক আমাকে জিজ্ঞাসা করল, মেয়েদের চালচলন আর অভ্যাস সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণা আছে কি?

আরে মেয়েদের সব ব্যাপারই আমার নখদর্পণে। আলফ্রেড থেকে ওমাহা পর্যন্ত আমার সব খবরই জানা আছে। তাদের রীতিনীতি আমার খুব ভালই জানা আছে। তাদের খুঁটিনাটি প্রতিটা ব্যাপারেই আমি ওয়াকিবহাল।

ম্যাক চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, শোন অ্যান্ডি, নেহাৎ তুমি বলেই মন খোলসা করে বলছি। বিশ্বাস কর, মেয়েদের এসব ব্যাপার-স্যাপারের প্রতি কোনদিনই আমার আগ্রহ ছিল না। তবে তাদের কাছাকাছি পাশাপাশি থাকার ঝোঁক আমার থাকতেও পারে। কিন্তু সে ঝোঁকের শিকার হবার চেয়ে আমার সময়ের অভাব ছিল খুবই বেশী।

কেন? সময়ের অভাব না থাকার কারণ কি ছিল?

আরে ভাই, চৌদ্দ বছর বয়স থেকেই আমাকে পেটের ভাত যোগাড় করতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়েছে। তাই এসব ব্যাপার-স্যাপারের প্রতি আগ্রহ বা সময় সুযোগ কোনটাই আমার ছিল না।

হুম!

কিন্তু এখন কোন কোন সময় ভাবি মেয়েদের ব্যাপারে একটু আধটু প্রবণতা থাকলেই হয়তো ভাল হত, তুমি কি বল অ্যান্ডি?

পিনাতেই আমরা স্থায়ী আস্তানা গড়ে তোললাম। কারণ, জায়গাটা আমার আর ম্যাক উভয়েরই খুব মনে ধরে গেল।

একদিন আমি সুইট-এর কাছ থেকে একটা টেলিগ্রাম পেলাম। মেক্সিকোর একটা খনিতে সে কাজ করে। সে খনিটার সঙ্গে কিছুদিন আমার স্বার্থের সম্পর্কও ছিল। তাই সেখানে গিয়ে আমাকে দুটো মাস কাটিয়ে আসতেই হল।

দু'মাস হতে না হতেই আমি পিনা-তে ফিরে জীবনটাকে উপভোগ করার জন্য যারপরনাই ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

পিনা-তে পৌঁছে বাসার দরজায় পা দিতেই আমার ভিমড়ি খাবার উপক্রম হল।

ম্যাক'কে দরজাতেই পেয়ে গেলাম। পরীরা কোনদিন যদি কাঁদে তবে তারা হাসবে না-ই বা কেন তার কারণ আমি খুঁজে পেলাম না।

তার পরণে লম্বা কোট আর পালিশ করা চকচকে জুতো আর গায়ে দুধের মত ধবধবে সাদা ভেস্ট ও মাথায় একটা রেশমের উঁচু টুপি চাপিয়েছে।

সত্যি বলছি, ম্যাক যেন একটা দর্শনীয় বস্তু হয়ে পড়েছে। বরং তার চেয়েও খারাপ কিছুই বলা যেতে পারে। হঠাৎ করে দেখে মনে হল, সে যেন অবিকল লিক মানমন্দিরের বড় বড় দূরবীক্ষণ যন্ত্রটা বনে গেছে।

পিত্তশূলের ব্যথায় জর্জরিত শিশুর মত মুখটা বিকৃত করে ম্যাক কপট হাসি হাসতে লাগল।

আমাকে দরজায় দেখেই ম্যাক বলে উঠল, আরে, অ্যান্ডি যে! তুমি পিনা ছেড়ে যাবার পর এখানকার হালচাল অনেক বদলে গেছে।

জানি। কিন্তু দৃশ্যটা খুবই জঘন্য। ম্যাক, সৃষ্টিকর্তা তো তোমাকে এভাবে সৃষ্টি করেন নি। একটা কদাকার চেহারা তৈরী করে কেন তার সৃষ্টিকে জলাঞ্জলি দিচ্ছ, জানতে পারি কি?

আরে, তুমি জান না অ্যান্ডি। তুমি পিনা ছেড়ে যাবার পর ওরা যে আমাকে শান্তির অধিকর্তার পদে বহাল করেছে।

অনুসন্ধিৎসু চোখে তাকিয়ে তাকে লক্ষ্য করলাম। কেমন যেন চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা তার মধ্যে ভর করেছে। সত্যি কথাই তো বটে, একজন শান্তির অধিকর্তাকে তো ক্লান্তি ভুলে যেতেই হবে।

ঠিক তখনই পাশের গলি থেকে একটা যুবতীর মুখ উঁকিঝুঁকি মারছে লক্ষ্য করলাম। ঘাড় ঘুরিয়ে ম্যাক-এর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তার মুখে হাসির প্রলেপ ফুটে উঠেছে। আর ও হাসিমাখা রক্তিম মুখে মাথার টুপিটা খুলে সে তাকে অভিবাদন করল।

মেয়েটা তার দিকে মুখ তুলে মুচকি হাসল। পরমুহূর্তেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললাম, ম্যাক, তোমাকে নিয়ে আর কোন আশাই নেই। এ বয়সেও দেখছি তোমার মধ্যে মেয়ে মানুষের প্রতি আকর্ষণ—আমি তো নিঃসন্দেহ ছিলাম, এ যোগ তোমার হবার নয়।

মুচকি হেসে ম্যাক বলল, অ্যান্ডি, ওই যে মেয়েটাকে দেখলে শিগগিরই আমি তাকে বিয়ে করে ঘর বাঁধছি।

আরে, ডাক ঘরে একটা জিনিস ফেলে চলে এসেছি। কথাটা বলেই আমি সেখান থেকে কেটে পড়লাম।

আমি লম্বা-লম্বা পায়ে হেঁটে সে যুবতীটাকে ধরে ফেললাম। আমার নামটা বললাম। উনিশ বছর তার বয়স। বয়সের তুলনায় একটু ছোটখাটোই বটে। মুখে গাঢ় রঙের প্রলেপ। শান্ত চোখেই আমার দিকে নীরব চাহনি মেলে তাকাল।

আমি ঠাণ্ডা গলায়ই বললাম, শোনলাম শিগগিরই তোমাদের বিয়ে হচ্ছে?

হ্যাঁ, আজ রাত্রেই। আপনার কি আপত্তি।

সে কথাটা শেষ না করেই থমকে গেল। পর মুহূর্তেই সে আবার মুখ খুলল—মিস রেবোসা বেড় আমার নাম।

শুনেছি। রেবোসা শোন, তোমার বাবার কাছ থেকে টাকাকড়ি কর্জ করার মত বয়স আমার নেই। আর ওই ফিটফাট বুড়োটা আমার বন্ধু, অন্তরঙ্গ বন্ধু ভাবতে পার। তাকে বিয়ে করার জন্য তুমি কেন—

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মেয়েটা বলে উঠল—কেন? কারণ, এটাই আমার একমাত্র সুযোগ বলে মনে করছি।

বাজে কথা! তোমার যা বয়স ও রূপ তা দিয়ে তুমি যেকোন পুরুষকে বশ করে ফেলতে পার।

রেবোসা নীরবে আমার কথাগুলো শুনতে লাগল।

আমি বলে চললাম—এবার কি বলছি শোন রেবোসা। তুমি যাকে ছিপে গেঁথেছ সে কিন্তু আসলে বুড়ো ম্যাক নয়। তুমি যখন ছোট্ট ছিলে তখন সে ছিল বাইশ বছরের যুবক। তাই বলছি কি, তার এই ফুলের মত জৌলুস দীর্ঘস্থায়ী হবে না। এখনই জরা আর বার্ধক্য তাকে গ্রাস করে ফেলেছে।

রেবোসা তবু মুখ খুলল না।

বাধ্য হয়ে আমিই বলে চললাম—তার ওপর বুড়ো ম্যাক সর্দি-কাশির ব্যামোর শিকার হয়ে দীর্ঘদিন ভুগছে। রেবোসা; এর পরও কি এ বিয়েটার প্রতি আগ্রহ হবে?

হব না-ই বা কেন? আমি অবশ্যই তাকে বিয়ে করতে রাজি। আর আপনার বন্ধুও সেটাই চায় বলে আমার বিশ্বাস।

তোমাদের বিয়েটা কখন হওয়ার কথা, বল তো?

সন্ধ্যে ছ'টায়।

আমি সে মুহূর্তেই কর্তব্য স্থির করে ফেললাম। চেষ্টা করে দেখতে হবে বুড়ো ম্যাককে যদি কোন রকমে বাঁচানো যায়। তার মত নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক সৎ কিন্তু অযোগ্য একটা লোককে যদি একটা শিকারী মেয়েব হাত থেকে রক্ষা করা যায়। তার মত একটা নিরীহ লোক একটা মেয়ের হাতের পুতুল হয়ে সারাটা জীবন কাটাবে এটা আমার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়, কিছুতেই নয়।

আমি ইতিপূর্বে মেয়েদের মনের হদিস যতটা পেয়েছি, তাদের সম্বন্ধে যতটা জেনেছি তার ওপর নির্ভর করেই আমি আগ্রহ প্রকাশ করে বললাম—পিনা, একটা সত্যি কথা বলবে?

কি? বলুন, কি জানতে চান?

আজ পর্যন্ত এখানকার এমন কোন যুবকের সঙ্গে কি তোমার পরিচয় হয় নি যাকে তুমি মনে মনে অনেক ভেবেছ?

হ্যাঁ, অবশ্যই পরিচয় হয়েছিল, এখনও আছে। কিন্তু আপনার মনের কথা খোলসা করে বলুন তো?

তোমাকে তার ভাল লাগে? সে কোথায় থাকে?

আরে সে তো একটা বদ্ধ পাগল। সর্বক্ষণ সে বাড়ির সামনের সিঁড়িতে বসে কাটায়।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ। তার মা সিঁড়িতে জল ঢেলে তবেই তাকে সেখান থেকে সরাতে পারে।

কথাটা বলেই মেয়েটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। তারপর আবার মুখ খুলল—ব্যস, আজ রাত্রের পরই তার সিঁড়িতে বসাটা বন্ধ হয়ে যাবে।

আর একটা কথা, তোমাদের মতে যেটা ভালবাসা, ম্যাক-এর প্রতি সে রকম কোন অনুভূতি তোমার মধ্যে আছে কি?

হায় ঈশ্বর! অবশ্যই না। আমি তো তাকে একটা ব্যাঙাচির মতই মনে করি।

রেবোসা, যাকে তুমি ভালবাস তার পরিচয়, মানে তার সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি?

এক মুদির দোকানের কর্মচারী, খাতা লেখার কাজ করে। তার মাসিক আয় পঁয়ত্রিশের বেশী নয়।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ। এলা নোয়েক্স্ তো এক সময় তার মন পাওয়ার জন্য পাগল হয়ে গিয়েছিল। সাধ্যাতীত চেষ্টা চালিয়েও—

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আমি বললাম—তাকে লাভ করতে পারে নি, এই তো?

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন।

ম্যাক-ই আমাকে বলেছে, সন্ধ্যে ছ'টায় সে তোমাকে বিয়ে করে ঘরে তুলবে।

হ্যাঁ, ছ'টায় লগ্ন স্থির হয়েছে। আর বিয়েটা হবে আমাদের বাড়িতেই।

আমি এবার বললাম—রেবোসা, আমি কি বলছি একটু ধৈর্য ধরে শোন। এডি বেলেস-এর যদি নগদ এক হাজার ডলার থাকত, 'এক হাজার ডলার' কথাটা মাথায় রেখো, তবে তা দিয়ে সে নিজেই একটা মুদির দোকান খুলে বসত। তবে কি তুমি আজ সন্ধ্যে ছ'টায় তার গলায় বরমাল্য পরিয়ে দিতে রাজি হতে, ভেবে বল?

তার চোখের দিকে তাকিয়ে আমি তার চিন্তার ভারে অস্থির মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে ধারণা করে নিতে পারলাম।

নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়ার পর সে মুখ খুলল—এক হাজার ডলারের কথা বললেন তো?

হ্যাঁ, এক হাজার।

ঠিক আছে, আমি রাজি আছি।

চমৎকার! তবে এক কাজ কর, আমার সঙ্গে চল। তার সঙ্গে দেখা করে যাবতীয় কথাবার্তা পাকা করে নেবে চল।

আমি মেয়েটাকে সঙ্গে করে ক্রসবি-র দোকানে হাজির হলাম। এডি'কে দোকানেই পেয়ে গেলাম। তাকে ডেকে বাইরে নিয়ে এলাম। দেখে শুনে তাকে একজন ভদ্রলোক বলেই মনে হল। আমার মুখে সব কিছু শুনে সে যেন হাতে স্বর্গ পেয়ে গেল।

এডি মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বলল—বিকাল পাঁচটায়?

আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম—হ্যাঁ, ঠিক পাঁচটায়। আর নগদ—আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই এডি এবার কেটে কেটে উচ্চারণ করল—এ-ক হা-জা-র ডলার?

হ্যাঁ, নগদ—মানে এক হাজার ডলার একেবারে হাতে নাতে লাভ, ভেবে দেখুন।

স্যার, আমার একটাই অনুরোধ, দয়া করে আমাকে এমন প্রলোভন দেখাবেন না। আপনার পরিচয় তো সেই ধনকুবের মেসো। ভারতবর্ষে মশলার কারবারে লিপ্ত। সম্প্রতি অবসর জীবন যাপন করছেন, ঠিক বলি নি? বুড়ো ক্রসবি-র দোকানটা আমি কিনে নেব, আর আমি নিজেই দোকানটা চালাব, ভাবছি।

আমরা দোকানের ভেতরে গিয়ে বুড়ো দোকানি ক্রসবিকে আমাদের ইচ্ছার কথা বললাম। তার হাতে এক হাজার ডলারের চেক তুলে দিলাম।

আর এডি ও রেবোসা যদি পাঁচটায় বিয়ে করে তবে ডলারগুলো তখনই তাদের হাতে দেওয়া হবে স্থির হল।

কথাবার্তা পাকা করে আমি কিছু সময়ের জন্য সেখান থেকে চলে গেলাম।

নির্জন-নিরালা প্রান্তরে একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর বসে আমি জীবন, রাশিচক্র, বার্ধক্য, নারীচরিত্রের বিভিন্ন দিক আর জীবনের বিনিময়ের ব্যাপার-স্যাপার সম্বন্ধে গভীর ভাবনায় ডুবে গেলাম।

আমি নিজেকে প্রবোধ ও ধন্যবাদ দিতে লাগলাম এই বলে যে বুড়ো ম্যাককে ভারতীয় সর্দি জ্বরের ব্যামো থেকে রক্ষা করতে পেরেছি।

আমি তো নিঃসন্দেহ ছিলামই, সে যখন ব্যাপারটা নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ভাববে, আসল ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারবে তখন এ মোহ তার মন থেকে উঠে যাবে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বুড়ো ম্যাককে এরকম নিশ্চিত একটা অধঃপতনের হাত থেকে অব্যাহতি দিতে পারাটা এক হাজার ডলার থেকে অনেক, অনেক বেশী মূল্যবান।

আমি সবচেয়ে বেশী খুশি হলাম এই ভেবে যে, নারীচরিত্র সম্বন্ধে আমার ধারণা খুবই পাকা, আর তাদের ভালবাসার নামে ন্যাকামিতে মজে যাওয়ার পাত্র আমি নই। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আমি কাঠের গুঁড়ির আসন ছেড়ে উঠে পড়লাম।

বাড়ি ফিরে আমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি পাঁচটা বেজে গেছে। বারান্দায় গিয়ে দেখি, বুড়ো ম্যাক হাঁটুর ওপর 'সভ্যতার ইতিহাস' বইটা খুলে রেখে বসে রয়েছে।

আমি যেন কিছুই জানিনা এমন ভাব দেখিয়ে নিরীহ গোবেচারীর মত বললাম—কি হে ম্যাক, ছ'টায় তোমার বিয়ে। কিন্তু এখনও সাজগোজ শুরু না করে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে কি ভাবছ, বল

তো?

হাত বাড়িয়ে তামাক নিতে গিয়ে সে বলল—আরে, সে কাজটার সময় ছ'টার পরিবর্তে পাঁচটা করা হয়েছিল।

আমি চোখে-মুখে কৃত্রিম বিস্ময়ের ছাপ এঁকে বলে উঠলাম—সে কী হে, পাঁচটা?

হ্যাঁ, পাঁচটা। একটা চিঠি পাঠিয়ে কথাটা আমাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বিয়ের পাট তো চুকে গেছে। কিন্তু তুমি এতক্ষণ বাইরে কাটিয়ে এলে কেন?

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—বিয়ের খবরটা তুমি কি শুনেছ ম্যাক?

ম্যাক বলল—আরে, আমিই সে বিয়ের ব্যবস্থাটা করেছিলাম। আমি শান্তির অধিকর্তার পদে বহাল হয়েছি, তোমাকে তো আমি আগেই বলেছি অ্যান্ডি, বলি নি? এডি আর রেবোসাকে আমি এক মাস আগেই কথা দিয়ে রেখেছিলাম। আসলে তাদের বিয়ের পাটটা মিটিয়ে দেবার মত লোক শহরে একমাত্র আমি ছাড়া আর কেউ-ই ছিল না। ছেলেটা কিন্তু সত্যি খুব ভাল। সে নিজেই একদিন একটা মুদিখানা খুলতে পারবে, দেখে নিও।

হ্যাঁ, তা পারবে বটে। আমি তার কথা সমর্থন করলাম।

কথাটা বলেই ম্যাক মৌজ করে সিগারেট টানতে লাগল।

এক সময় সে ঠোঁট থেকে সিগারেটটা নামিয়ে এনে বলল—বহু মেয়েই বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল।

ভাল কথা, তাদের কাছ থেকে মেয়েদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কিছু লক্ষ্য করেছিলে?

আরে ধ্যুৎ! লক্ষ্য করার মত তেমন কিছুই তো আমার চোখে পড়ল না। আমি কিন্তু ভেবেছিলাম, মেয়েদের চরিত্র সম্বন্ধে তুমি আমাকে যা কিছু বলেছিলে সেগুলোর কিছু অন্তত তাদের কাছ থেকে পেয়ে যাব।

ব্যাঞ্জোটা হাতে তুলে নিতে নিতে সে এবার বলল—তুমি তো দু'মাস আগেই আমাকে ওসব কথা বলেছিলে। প্রমাণ কিছু পেলাম না।

দ্য পিমিয়েন্টা প্যানকেক

গরু-মোষের পাল চরাবার সময় একটা মরা মেসকিট্ গাছের খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে থাকা ডালে আমার কাঠের বারকোষটা আটকে যায়। আর তাতেই আমার একটা পায়ের গোড়ালি মচকে গেল। আর এজন্যই আমাকে তাঁবুতে দু'সপ্তা বিছানায় শুয়ে কাটাতে হল।

সে শুয়ে-বসে থাকার সময় তৃতীয় দিনে আমি হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে আমাদের রান্নার গাড়িটার কাছে হাজির হলাম। সেখানে পাচক জুড্সন্ ওডোম-এর সঙ্গে গল্পে মজে গেলাম।

অধিকাংশ সময় বকবক করে কাটানোই জুড্সন্-এর চারিত্রিক দোষ। কিন্তু কপালগুণে সে এমন একটা পেশায় নিযুক্ত হয়েছে সেখানে গল্প করা তো দূরের ব্যাপার কথা বলার মত লোকই মেলে না, তার বকবকানি শুনবেই বা কে?

তাই সত্যি কথা বলতে কি, জুড্সন্-এর মরুময় জীবনে আমিই হলাম একমাত্র স্রোতধারা। এমন সব খাবারের জন্য মাঝে মধ্যে আমার জিভ লকলক করত যা শিবিরের খাদ্য-তালিকায় স্থান পায়নি।

আমি নিজের রসনাকে সংযত রাখতে না পেরে একদিন আমতা আমতা করে জুড্সন্‌কে বলেই ফেললাম—জুড্সন্, একটা কথা বলব বলব করে বলেও তোমাকে বলতে পারি নি। যদি—

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই জুড্সন্ মুচকি হেসে বলল—এত দ্বিধার কি আছে? কি বলতে চাচ্ছ, বলেই ফেল।

কথাটা হচ্ছে, তুমি প্যানকেক তৈরী করতে পার কি?

সে অবিশ্বাস্য সন্দেহের দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—তুমি সত্যি করে বলতো,

কথাটা কি তোমার মনের কথা?

মনের কথা ছাড়া আর কি-ই বা হতে পারে?

আমার সঙ্গে তুমি রসিকতা করছ না তো?

রসিকতা? রসিকতা করতে যাব কেন?

না, মানে এখানকার কম বয়সী ছোকরারা প্রায়ই আমার সঙ্গে রসিকতা করে কিনা, তাই কথাটা না বলে পারলাম না।

আরে না, রসিকতা নয়, সত্যি সত্যি বলছি।

মুচকি হেসে জুড্‌সন্ বলল—প্যানকেক বুঝি তোমার খুবই প্রিয় খাদ্য?

তা আর বলতে। নিউ অর্লিয়েন্সের এক ঝুড়ি প্যানকেকের বিনিময়ে আমি তাকে আমার প্রিয় টাট্টু ঘোড়া আর জিনটা হাসিমুখে দিয়ে দিতে পারি।

জুড্‌সন্ একগাল হেসে বলল—তাই বুঝি?

অবশ্যই। আরে, প্যানকেক সম্বন্ধে কি একটা গল্প আছে না?

জুড্‌সন্-এর গল্পটা জানা থাকায় আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি আবার বললাম—প্যানকেকের গল্পটা আমি কোনদিন শুনিনি।

গল্পের কথায় সে হাতের কাজ ফেলে রেখে যন্ত্রচালিতের মত দাঁড়িয়ে পড়ল।

আমি বললাম—গল্পটা খুবই জমাটে, তাই না?

জুড্‌সন্ আর কথা বাড়িয়ে অহেতুক সময় নষ্ট না করে খাবারের গাড়ি থেকে কয়েকটা খালি বস্তা আর টিন নামিয়ে নিল। তারপর সেগুলোকে বয়ে নিয়ে গেল ঝাঁকড়া হ্যাকবেরি গাছটার ছায়ায়। একটু আগেই আমি সেখানে শুয়ে-বসে সময় কাটাচ্ছিলাম।

জুড্‌সন্ বস্তা আর টিনগুলো বিছিয়ে বসার মত জায়গা করতে শুরু করল।

আমি বস্তার বিছানায় শুয়ে তার মুখের দিকে তাকালাম। জুড্‌সন্ ইতিমধ্যে টিনগুলোর ওপর জুঁত করে বসে পড়েছে।

গল্প শোনা আর শোনানো দু'-এর প্রতিই জুড্‌সন্-এর আগ্রহ সমান।

তার মুখ দেখে মনে হল, আমাকে প্যানকেক-এর গল্পটা না শোনানো পর্যন্ত সে যেন স্বস্তি পাচ্ছে না।

আমি বললাম—জুড্‌সন্ তোমার গল্প শোনার জন্য আমি কিন্তু তৈরী। আর দেরী কেন, শুরু করে দাও।

জুড্‌সন্ সামান্য নড়েচড়ে জুঁত হয়ে বসতে বসতে বলল—একটা কথা কি জান? এটাকে ঠিক গল্প বলা যাবে না। বরং একটা সত্যি ঘটনা বলাই উচিত।

আমি অত্যুগ্র আগ্রহ প্রকাশ করে বললাম—সত্যি ঘটনা? মানে ঘটনাটা সত্যি সত্যি ঘটেছিল?

অবশ্যই। বলছি তবে শোন—আমি তখন সান মিগুয়েল-এ থাকতাম। বুড়ো বিল টুসির পশু-খামারে কাজ করতাম।

আমি তার কথার মাঝখানে বলে উঠলাম—সেখানে তোমাকে কি কাজ করতে হত? সেখানেও কি রান্নাবান্নাই—

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই জুড্‌সন্ বলে উঠল—আরে ধ্যাৎ। আমার কাজ ছিল বিল টুসির খামারে গরু-দাগানো। সেখানে প্রায় একই রকম খাদ্যবস্তু দিয়ে উদর পূরণ করতে হত।

এ-তো সত্যি খুবই কঠিন সমস্যা।

হ্যাঁ, সমস্যা তো বটেই। তাই একদিন সখ হল নতুন কিছু খাব। ব্যস, আর মুহূর্তমাত্র দেরী না করে আমি এক লাফে আমার টাট্টুটার পিঠে চেপে বসলাম। জানোয়ারটার পিঠে দু'-একবার চাবুক হাঁকতেই সেটা উল্কার বেগে ধেয়ে চলল।

পিমিয়েন্টা চৌমাথার কাছে এমস্‌লি টেলফেয়ার-এর দোকানের সামনে যেতেই আমি লাগাম টেনে ধরে টাট্টুটা দাঁড় করালাম।

তখন প্রায় তিনটে বাজে। একটা মোটাসোটা মেস্‌কিট গাছের ডালে ঘোড়ার লাগামটা ঝুলিয়ে রাখলাম। তারপর পায়ে হেঁটে অবশিষ্ট বিশ গজ পথ পাড়ি দিয়ে বুড়ো এমসলি কাকার দোকানের

সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

আমাকে দরজায় দেখেই সে আমাকে অভ্যর্থনা করে দোকানের ভেতরে নিয়ে গেল। নড়বড়ে একটা বেঞ্চ দেখিয়ে আমাকে বসতে বলল।

প্রাথমিক কুশল বার্তাদি আদান-প্রদানের পাট চুকিয়ে আমার দরকারি জিনিসপত্রের প্রসঙ্গ পাড়লাম।

এমসলি কাকা কোন রকম জিজ্ঞাসাবাদ বা কৈফিয়ৎ ছাড়াই আমার বাঞ্ছিত জিনিসপত্র বের করে আমার সামনে জমা করতে লাগল।

আমি বেঞ্চ ছেড়ে উঠে এমসলি কাকার জড়ো-করা জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করে দেখতে লাগলাম। এমন সময় হঠাৎ তার উঠোনের দিকে আমার চোখ পড়ল।

তার বসত বাড়িটা দোকানের একেবারে লাগোয়া।

উঠোনটার দিকে চোখ পড়তেই আচমকা এক জায়গায় আমার দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। এক যুবতী মনোলোভা এক ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে।

আমার চোখে চোখ পড়তেই মেয়েটা ঝট্ করে মুখটা ঘুরিয়ে নিল।

মেয়েটার চেহারা ছবি আর পোশাক-আশাকই বলে দিচ্ছে, সে স্থানীয় নয়, বহিরাগত। বাইরের কোন অঞ্চল থেকে এমসলি কাকার বাড়ি মেহমান হয়ে এসেছে।

পর মুহূর্তেই সে ঘাড় ঘুরিয়ে আবার আমার মুখের দিকে আড় চোখে তাকাল।

আমি অনুসন্ধিৎসু নজরে রূপসী তন্বী যুবতীটার দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করলাম, ব্যাটের মত কি যেন একটা বস্তু হাতে নিয়ে অনবরত নাচিয়ে চলেছে।

হ্যাঁ, যা ভেবেছিলাম ঠিক তা-ই। হাতের বস্তুটা নাচানোব বাহানা করে মেয়েটা আমার হাবভাবের ওপর নজর রাখছে।

আমার মনের জমাটবাঁধা কৌতূহলটুকু এমসলি কাকার নজর এড়াল না। সে একবার মেয়েটার, পর মুহূর্তেই আবার আমার দিকে তাকিয়ে নিয়ে ম্লান হেসে বলল—ও আমার ভাই-ঝি।

আমি ঘাড় ঘুরিয়ে তার দিকে তাকিয়ে নীরবে মুচকি হাসলাম।

এমসলি কাকা বলে চলল—হ্যাঁ, আমার ভাই-ঝি। মিস উইল্লেল্লা লিয়ারাইট ওর নাম।

আমি নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললাম—তাই বুঝি? ভারি মিষ্টি নাম তো। বাইরে থেকে এসেছে বুঝি?

হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। এখানে দিন কয়েকের জন্য বেড়াতে এসেছে।

কোথায় থাকে বলুন তো? আমি আগ্রহান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না।

এমসলি বলল—প্যালেস্টাইন থেকে বেড়াতে এসেছে। যদি বল তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই, কি বল?

পরিচয় করতে আর আপত্তির কি থাকতে পারে?

এমসলি কাকা উঠোনের দিকে এগোতে এগোতে উইল্লেল্লা-র নাম ধরে ডাকাডাকি শুরু করে দিল।

আমি প্রায় স্বগতোক্তি করলাম—মিস লিয়ারাইট-এর পরিচিত হবার সুযোগ পেলে আমি খুব খুশিই হব।

মিস উইল্লেল্লা আসতে দ্বিধা করছে দেখে এমসলি কাকা আমাকেই উঠোনে তার কাছে নিয়ে গেল। উভয়ের মধ্যে পরিচয় করিয়ে দিল।

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, মেয়েদের ব্যাপারে আমি কোনদিনই লাজুক নই। এতটুকুও জড়তা আমার মধ্যে কেউ, কোনদিন দেখে নি।

একটা ব্যাপার কিছুতেই আমার মাথায় আসে না, কোন কোন পুরুষ অন্য যাবতীয় কাম কাজে পারদর্শী হলেও মেয়েদের মুখোমুখি হলেই কেন সে ভিজে বেড়ালটি বনে যায়। সাত কিল দিলেও তখন তাদের মুখে রা-ফুটতে চায় না।

মাত্র আট মিনিটের মধ্যেই মিস উইল্লেল্লা-র সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা জন্মে গেল। তারপর আমাদের মধ্যে ভাব এমন জমে গেল যে, আমরা দু'জনে দ্বিতীয় ভাই-বোন বনে গেলাম।

মিস উইল্লেল্লা লিয়ারাইট-এর সঙ্গে আমার পরিচয় হবার পর অল্পদিনের মধ্যেই আমি তার কাছের মানুষ, একেবারে আপনজন হবার অধিকার অর্জন করতে পারলাম।

দিন যতই পার হতে লাগল, আমাদের হৃদ্যতার সম্পর্ক ক্রমেই ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠতে লাগল।

মিস উইল্লেল্লার লিয়ারাইট-এর স্বাস্থ্য খুবই ভাল। উদ্ভিন্ন যৌবনা। রূপের আকর বললেও অত্যুক্তি হবে না। আর প্যালেস্টাইন অপেক্ষা এখানকার আবহাওয়া শতকরা চল্লিশ ভাগ বেশী।

আবহাওয়া আর স্বাস্থ্যের জন্যই পিমিয়েনটা জায়গা হিসাবে আজও চৌরাস্তাই রয়ে গেছে।

কিছুদিন ধরে আমি সপ্তাহে একদিন তার সঙ্গে ঘোড়া হাঁকিয়ে দেখা করতে যাই।

কিছুদিন সপ্তাহে একদিন করে তার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার পর আমার মাথায় ভাবনার উদয় হ'ল, আমার যাতায়াত যদি দ্বিগুণ করি তবে আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ আরও বেশী হবে।

সপ্তাহে দু'বার করে যেতে যেতে কোন এক সপ্তাহে আমি তৃতীয় বার তার সঙ্গে দেখা করতে সে বাড়িতে হাজির হই। ব্যস, সেদিনই সেখানে প্যানকেকের ব্যাপারটা ঘটেছিল।

আমি আর মুখ বুজে থাকতে পারলাম না। কৌতূহলের শিকার হয়ে বলেই ফেললাম—এমসলি কাকার বাড়িতে প্যানকেকের ঘটনাটা ঘটেছিল? ব্যাপারটা কি, খোলসা করে বল তো?

আরে, আমি তো গল্পটাকে এগিয়ে নিয়েই যাচ্ছিলাম। তুমিই তো মাঝখান থেকে কথা বলে লাগাম টেনে ধরলে।

জুড্সন্ এবার বলল—যাক, ধৈর্য ধরে শোন। কোন্ পর্যন্ত যেন বলেছিলাম? হ্যাঁ, মনে পড়েছে। প্যানকেকের কাণ্ডটা এমসলি কাকার বাড়িতেই ঘটেছিল।

সে সন্ধ্যাতেই আমি দুটো খেজুর আর একটা পিচফল মুখে পুরে দোকানে বসেছিলাম।

এমসলি কাকা দোকানের মালপত্র বিক্রি করতে ব্যস্ত। আমি কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর ভেতরে ভেতরে এক অবর্ণনীয় অস্থিরতা অনুভব করতে লাগলাম।

শেষ পর্যন্ত ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। ক্ষণিক ইতস্ততের পর এমসলি কাকাকে জিজ্ঞাসা করলাম—মিস উইল্লেল্লাকে দেখছি না যে। সে কোথায় বল তো?

কাজের ফাঁকে আমার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে এমসলি কাকা বলল—সে কি, তুমি জান না?

কি? কিসের কথা বলছ?

উইল্লেল্লা তো ঘোড়ায় চেপে জ্যাক্সন বার্ড-এর সঙ্গে গেছে।

জ্যাক্সন্-এর সঙ্গে গেছে?

তবে আব বলছি কি।

তার সঙ্গে সে কোথায় গেছে বল তো?

আরে ধ্যুৎ! কোথায় গেছে আবার জিজ্ঞেস করছ? আরে বেড়াতে গেছে—বেড়াতে, বুঝলে এবার?

সবই তো হল, কিন্তু জ্যাকসন বার্ড-এর পরিচয়টা দয়া করে বলবেন কি?

জ্যাকসন বার্ড কানাডার একজন বড় ভেড়া-ব্যবসায়ী। তার কথাটা শোনামাত্র আমি দুটো খেজুরের বীচি আর একটা পিচের বীচি কোঁৎ করে গিলে ফেললাম।

এমসলি কাকার দোকান ছেড়ে আমি তখনই বেরিয়ে পড়লাম।

অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে আমি সেই মেসকিট গাছটার সঙ্গে আচমকা একটা ধাক্কা খেলাম। সেটার সঙ্গেই আমার বাহন তেজী ঘোড়াটা বাঁধা ছিল।

আমি ঘোড়ার গলাটা জড়িয়ে ধরে তার কানে কানে বললাম—ওরে শুনলি তো? ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে গেছে। আমার রূপসী ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে গেছে! কি রে, কার সঙ্গে বেড়াতে গেছে জিজ্ঞেস করলি না তো? কানাডা থেকে আসা বার্ডস্টৌন জ্যাক-এর সঙ্গে গেছে। কানাডা থেকে এসেছে, ভেড়ার খামারের মালিক। মস্ত বড়লোক।

আমি আবার এমসলি কাকার বাড়ি ফিরে গেলাম। আমাকে দেখে সে চশমার ফাঁক দিয়ে নীরবে তাকিয়ে রইল। আমি সরাসরি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি তো তাঁকে ভেড়ার কারবারীই বললে, ঠিক কিনা?

হ্যাঁ, বলেছিই তো। ঠিক একথাই বলেছি।

তার ভেড়ার ব্যবসাটা কেমন, মানে কত বড়, জান কি?

আঙুলের ডগা দিয়ে চশমাটাকে সামান্য ওপরের দিকে তুলে দিতে দিতে এমসলি কাকা বলল—জ্যাকসন বার্ড-এর নাম তুমি অবশ্যই শুনে থাকবে, শোন নি?

আমি নীরব রইলাম।

এমসলি কাকা একটু নড়েচড়ে বসে সোৎসাহে এবার বলল—আরে সে সত্যিকারেরই বড় এক ব্যবসায়ী। তার আট-আটটা ভেড়ার দল মাঠে চড়ে বেড়ায়।

তাই বুঝি?

তবে আর বলছি কি। আরও আছে, তার চার হাজার ভেড়া আছে উত্তর মেরু অঞ্চলে। এবার বুঝতে পারছ, সে কোন্ দলের লোক?

আমি আর কথা বাড়ালাম না। ধীর-পায়ে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে দোকানের এক পাশে গিয়ে ছায়ায় মাটিতেই বসে পড়লাম।

তারা এক ঘণ্টা বাদে ঘোড়ার পিঠে চেপে ফিরে এল। দোকানের সামনে ঘোড়া থেকে নামল।

আমি আড়-চোখে তাদের ব্যাপার-স্যাপার, বিশেষ করে মস্ত বড়লোক জ্যাক্সন বার্ডকে নীরব চাহনি মেলে দেখতে লাগলাম।

ভেড়ার মালিক জ্যাকসন বার্ড মিসকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামতে সাহায্য করল। সে প্রায় কোলে করেই রূপসীকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নিচে নামিয়ে আনল।

তারা মুখোমুখি ঘনিষ্ঠ হয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে কি সব কথাবার্তা বলল। শোনা না গেলেও আমি নিঃসন্দেহ হলাম, তারা অন্তরঙ্গ কথাবার্তা সারছে।

তারপর জ্যাক্সন বার্ড রূপসীর কাছ থেকে বিদায় নিল। সে বিষণ্ণ মুখে, নিতান্ত নিরুপায় হয়েই যেন মনের মানুষটাকে বিদায় দিল।

জ্যাক্সন বিদায় নিয়ে এক লাফে ঘোড়ার জিনের ওপর চেপে বসল। চাবুকের ঘা পড়তেই তার ঘোড়াটা জোর কদমে ছুটতে লাগল। ঘোড়াটা এবার তার ভেড়ার খামারের দিকে উল্কার বেগে ছুটে চলল।

জ্যাক্সন বার্ড আধা মাইল যেতে না যেতেই আমিও ঝটপট ঘোড়ার পিঠে চেপে বসলাম। ঘনঘন চাবুকের ঘা খেয়ে আমার তেজী ঘোড়াটা যেন বাতাসের চেয়েও দ্রুত গতিতে ছুটতে লাগল। বেশী দূর যেতে হ'ল না। আমি তাকে ধরে ফেললাম।

আমি ঘোড়াটাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে তার পথ রোধ করে দাঁড়ালাম।

জ্যাক্সন বার্ড এমন একটা সম্পূর্ণ অভাবনীয় ব্যাপারে সবিস্ময়ে আমার দিকে তাকাল। তার চোখের ক্রোধের ছায়াটুকু আমার নজর এড়াল না। রাগে সে রীতিমত ফুঁসতে লাগল।

আমি সৌজন্যের খাতিরে ম্লান হেসে বললাম—শুভ অপরাহ্ণ!

জ্যাক্সন বার্ড ক্ষুব্ধস্বরেই বলল—এটা হচ্ছে কি, জানতে পারি?

আমি তার কথায় কর্ণপাত না করেই বললাম—আপনার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে ছুটে এলাম।

আপনাকে চিনি না, জানি না—এভাবে ঘোড়া দাঁড় করিয়ে এ কি রকম রসিকতা?

আরে, আমার পরিচয়টাই তো আপনাকে দেওয়া হল না। শুনুন, এখন আপনার সহযাত্রী এমন এক ঘোড়সওয়ার সবাই যাকে নিশ্চিত-মৃত্যু জুড্সন বলেই জানে—সম্বোধন করে। তার কারণ কি জানেন?

চোখে-মুখে ক্রোধ মিশ্রিত বিস্ময়ের ছাপটুকু অব্যাহত রেখেই জ্যাক্সন বার্ড বড় বড় চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি এবার বললাম—আমাকে এ নামে সম্বোধন করার কারণ একটাই, আমার পিস্তলের গুলি কখনই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না।

সে জোর করে মুখে হাসির ছোপ ফুটিয়ে তুলে বলল—চমৎকার! চমৎকার! আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়ে খুবই আনন্দিত হলাম মিঃ জুড্সন। আমার পরিচয়টাও তো আপনাকে

দেওয়া উচিত। শুনুন, আমার নাম জ্যাক্সন বার্ড। সাইরেড্ ভেড়ার খামার থেকে এসেছিলাম। এখন আবার সেখানেই ফিরে যাচ্ছি।

তার কথা শেষ হতেই আমার চোখে পড়ল, মানে একটা চোখে দেখতে পেলাম, একটা মেঠো কোকিল দু'ঠোঁটের চাপে ছোট একটা মাকড়সাকে নিয়ে পাহাড় থেকে নিচের দিকে আসছে। আর দ্বিতীয় চোখে? সে চোখে দেখলাম, একটা জলজ গাছের বাঁকা-মরা ডালে একটা বাজপাখি বসে রয়েছে। জলাশয়টার ওপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ।

জ্যাক্সন বার্ডকে আমার আঙুলের কেরামতি দেখাবার জন্যই আমার ৪৫ থেকে পরপর গুলি ছুঁড়ে সগর্বে বললাম—তিনের মধ্যে দুই। আমি যেখানেই যাই না কেন পাখিরা আমার শিকার হবেই হবে।

ভেড়ার মালিক তখনও ঘোড়ার পিঠেই বসে রয়েছে। আর ততক্ষণে বিস্ময়ের ঘোরটুকু কাটিয়ে কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। সে জোর করে মুখে হাসির ছোপ ফুটিয়ে তুলে বলল—আপনার নিশানা সত্যি প্রশংসনীয়। নিশানা ভালই বটে।

আমি সগর্বে তার মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগলাম।

জ্যাক্সন বার্ড এবার বলল—আপনার তিনের মধ্যে দুই, মানে তিনটের মধ্যে দুটো গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না, এবারও যে হল না তা-তো নিজের চোখে দেখতে পেলাম। কিন্তু আপনার তৃতীয় গুলিটা? সেটা কি মাঝে-মধ্যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না?

আমি সামান্য ক্রোধ প্রকাশ করেই বলে উঠলাম। ওসব কথা ছাড়ান দিন। কাজের কথায় আসুন।

কাজের কথা? এ মুহূর্তে কাজের কথা কোন্টা তা-ই তো আমি বুঝতে পারছি না।

আমার সাফ কথা শুনে রাখুন, আপনি যে পিমিয়েন্টায় এসে রূপসী যুবতীদের নিয়ে অশ্বারোহণে বের হন এ অভ্যাসটা মোটেই ভাল নয়।

জ্যাক্সন বার্ড ভ্রূ কুঁচকে বলে উঠল—খারাপ? ঠিক বুঝতে পারলাম না তো।

না বোঝার মত কথা তো বলি নি। যাক গে, ব্যাপারটাকে আমি মোটেই ভাল চোখে দেখছি না, মনে রাখবেন।

সে নীরবে আমার কথাগুলো শুনতে লাগল।

আমি ক্ষুব্ধ স্বরেই বলে চললাম—আর এ-ও শুনে রাখুন, এর চেয়ে তুচ্ছ কারণেও কিন্তু আমি খাদ্যে পরিণত হতে দেখেছি, মানে খাদ্যে পরিণত করেছি।

জ্যাক্সন বার্ড কি বলবে ভেবে না পেয়ে মুখে কুলুপ এঁটেই ঘোড়ার পিঠে বসে রইল।

আমি এবার রীতিমত গলা চড়িয়েই বললাম—আর এ-ও শুনে রাখুন, পক্ষীতত্ত্বের জ্যাকসনীয় শাখার কোন টিটমাউস পাখির ঠোঁটে বোনা ভেড়ার লোমের বাসায় আশ্রয় নেবার মত দুর্ভাগ্য আপনার আকাঙ্ক্ষিতা উইল্লেল্লা-র কোনদিনই হবার নয়, অবশ্যই হবে না। এবার ব্যাপারটা কিন্তু আপনার ইচ্ছার ওপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করছে।

জ্যাক্সন বার্ড হঠাৎ মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল। মুখ না খুলে আর পারল না। সে বলল—ব্যাপারটা, মানে কোন্ ব্যাপারটার ইঙ্গিত আপনি দিচ্ছেন, পরিষ্কার করে বলবেন কি?

আমি গম্ভীর স্বরেই বললাম—আমি জানতে চাইছি, আপনি কোন্ পথ বেছে নেবেন? মানে মানে এ জায়গা ছেড়ে যাবেন, নাকি আমার অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু-অস্ত্রটার মুখোমুখি নিজেকে দাঁড় করাতে উৎসাহী হবেন, বলুন?

আমার কথা শুনে জ্যাক্সন বার্ড-এর মুখটা সামান্য রক্তিম হয়ে উঠল। পরমুহূর্তেই হো-হো করে হেসে উঠল। যাকে বলে রীতিমত অট্টহাসিতে ফেটে পড়ার উপক্রম হল।

হাসতে হাসতে সে বলল—মিঃ জুড্সন, আমি কিন্তু বলব—

আমি তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলাম—ধ্যুৎ! আপনি আবার কি বলবেন? কি-ই বা আপনার বলার থাকতে পারে?

আমাকে তো আপনি কিছু বলতে দিতেই চাইছেন না। আপনি তখন থেকে এক তরফাই বলে যাচ্ছেন।

আমি আগের মতই গম্ভীর স্বরেই বললাম—ঠিক আছে, বলুন শুনি, আপনি কি বলতে চাইছেন?

আমি আপনাকে একথাই বলতে চাইছি, ব্যাপারটাকে আপনি ভুল পথে নিয়ে গিয়ে মিছেই উত্তেজিত হচ্ছেন।

আমি ব্যাপারটাকে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছি!

অবশ্যই।

কি রকম, জানতে পারি কি?

আপনি যে কথা ভেবে আমার ওপর ক্ষুব্ধ হচ্ছেন, আমার ওপরে চড়াও হয়েছেন তা সম্পূর্ণ ভুল। অবশ্য আপনি যদি শুনতে আগ্রহী হন তবে আসল ব্যাপারটা খোলসা করেই বলতে পারি।

বলুন, আপনার আসল ব্যাপারটা তবে শোনাই যাক।

দেখুন, মিস লিয়ারাইট-এর কাছে আজই প্রথম নয়, এর আগেও আমি বহুবার এখানে এসেছি। তবে আপনি যে রকম সন্দেহের চোখে ব্যাপারটাকে দেখছেন সে রকম উদ্দেশ্য নিয়ে আমি অবশ্যই আসা-যাওয়া করি না।

তবে? আসল উদ্দেশ্যটা কি, জানতে পারি কি?

আমার এখানে আসাটা নিতান্তই আহারাদি সংক্রান্ত। আমি হাতের পিস্তলটা শক্ত করে ধরলাম। রীতিমত কর্কশ গলায়ই বললাম—শোন, কোন ধূর্ত নেকড়ে যদি আত্মম্ভরিতার বশবর্তী হয়ে আমাকে অসম্মানজনক —

আমাকে থামিয়ে দিয়ে সে বলে উঠল—আরে, থামুন, থামুন! একটু ধৈর্য ধরে আমার কথাটা শেষ পর্যন্ত শুনুন। আরে ধ্যাৎ, আমি একটা ঘরনি নিয়ে করবটা কি, বলতে পারেন?

তার মানে?

আমার ভেড়ার খামারে আপনি কি কোন দিন গেছেন?

না, সে দুর্ভাগ্য আজ পর্যন্ত আমার কোনদিনই হয়নি।

দুর্ভাগ্য, নাকি সৌভাগ্য, সে কথা আমার বক্তব্য নয়। আমি বলতে চাইছি, আমার নিজের রান্নাবান্না থেকে শুরু করে খুটিনাটি কাজকর্ম সবই আমি নিজে হাতেই করে নেই।

এসব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর মত সময় আমার নেই। আপনার আর কিছু বলার আছে কি?

আরে, আসল কথাটা এখনও শুরুই করলাম না। যা শুনলেন তাকে নিছকই মুখবন্ধ বলতে পারেন। আসল কথাটা এবার তবে বলেই ফেলি, কি বলেন?

ধানাই পানাই রেখে যা বলতে চাইছেন ঝটপট বলে ফেলুন।

একটু আগে আপনাকে যে বলেছি, আমার এখানে আসাটা নিতান্তই আহারাদি সংক্রান্ত—কথাটা কিন্তু শতকরা একশ' ভাগই সত্য। কি? বিশ্বাস করতে উৎসাহ পাচ্ছেন না, তাই না? ঠিক আছে একটা কথা, আপনি কি কোনদিন মিস লিয়ারাইট-এর হাতের প্যানকেক খেয়েছেন?

মিস লিয়ারাইট-এর হাতের প্যানকেক কথাটা শুনে আমি তো অবাক হয়ে ভ্রূ কুঁচকে তার মুখের দিকে তাকিয়ে স্থাবরের মত দাঁড়িয়ে রইলাম।

আমাকে নীরব দেখে জ্যাক্সন বার্ড বলল—কি ব্যাপার মিঃ জুড্সন, চুপ করে রইলেন কেন? আমার কথার জবাব দিন। মিস লিয়ারাইট-এর হাতের প্যানকেক খেয়েছেন কোনদিন?

আমি? মিস লিয়ারাইট-এর হাতের প্যানকেক? না, তা কোনদিন খাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি।

তবে? তবে আর জীবনে করলেন কি মিঃ জুড্সন!

আসলে সে যে রন্ধন-বিদ্যায় এতটা পারদর্শিনী সেটা তো আমাকে কেউ-ই কোনদিন বলে নি।

আরে ভায়া, সেটা একটা সোনালি রোদ। বিশ্বাস করুন, সে প্যানকেকের রন্ধন-প্রণালীটা তার কাছ থেকে আদায় করার ধান্ধায় আমি তার পিছনে ঘুর ঘুর করছি। আর এ জন্য আমি দুটো বছর ব্যয় করতেও রাজী আছি। এবার মাথায় গেছে, আমি কেন মিস লিয়ারাইট-এর কাছে মাঝে-মধ্যেই ছুটে আসি?

আমি আর মুখই খুলতে পারলাম না। তাকে ভুল বোঝার জন্য মনে মনে নিজেকে ধিক্কার

দিতে লাগলাম।

জ্যাক্সন তারপর বলল—জানেন, গত পঁচাত্তর বছর ধরে প্যানকেক তৈরীর এ প্রাচীন পদ্ধতিটা এ পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। আর এটা তাদের মধ্যে বংশ পরম্পরায় রয়ে গেছে। আর সেটাকে বাইরের কারো কাছেই ফাঁস করতে রাজী নয়।

এবার চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলল—দেখুন, যদি কোন রকমে প্যানকেক তৈরীর প্রণালীটা বাগাতে পারতাম তবে নিজেই খামারে বসে কেক তৈরী করে মৌজ করে খেতে পারতাম। একবার ভেবে দেখুন তো, তবে আমি কী খুশি হতাম!

আমি এবার মুখ খুললাম—হ্যাঁ, ব্যাপারটা অবশ্যই খুশি হবার মতই হত বটে।

মিঃ জ্যাক্সন হেসে বললেন—আমি তো এ কথাটাই আপনাকে এতক্ষণ ধরে বোঝাতে চাইছি মিঃ জুড্সন।

তবে আপনার কথায় এটাই বোঝা যাচ্ছে, যে হাত মনোলোভা প্যানকেক তৈরী করে সে হাত বা হাতের মালিকের প্রতি আপনার কোন আকর্ষণ নেই?

অবশ্যই। তবে মিস লিয়ারাইট কিন্তু মেয়ে হিসেবে খুবই ভাল। যাকে বলে শতকরা একশ' ভাগই সত্যি। তবে সে সঙ্গে এ-ও বলছি, সম্প্রতি আমার বাঞ্ছা কিন্তু আহারাদির ব্যাপারটা ছাড়িয়ে—আমার হাতটা পিস্তলটার দিকে দ্রুত এগোচ্ছে। নজর পড়ামাত্র সে ঝট করে তার বক্তব্যটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলে উঠল—প্যানকেক প্রস্তুত-প্রণালীটা জেনে নেওয়া ছাড়া অন্য কোন ধান্ধাই আমার নেই। এ পর্যন্ত বলে সে থেমে গেল।

আমি মিঃ জ্যাক্সন-এর প্রতি সুবিচার প্রদর্শন করতে গিয়ে বললাম—মিঃ জ্যাক্সন, আপনার সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলে আমি যা বুঝতে পেরেছি—

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই মিঃ জ্যাক্সন অত্যুগ্র আগ্রহান্বিত হয়ে বলে উঠল—কি? কি বুঝতে পেরেছেন মিঃ জুড্সন? আমার সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি হয়েছে?

আসলে আপনি কিন্তু মানুষ হিসেবে খারাপ নন। আমি তো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তই নিয়ে নিয়েছিলাম—

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত? কি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মিঃ জুড্সন? আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জ্যাক্সন বলে উঠল।

বলতে দ্বিধা নেই মিঃ জ্যাক্সন, আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, আপনার ভেড়াগুলোকে মনিবহীন করে তবেই ক্ষান্ত হব।

তারপর? এখন কি ভাবছেন?

এ যাত্রায় আপনাকে ছেড়েই দিলাম। তবে একটা কথা কিন্তু মনে রাখবেন—

কি বলতে চাইছেন?

বলতে চাইছি, আপনার অভিযানটা যেন প্যানকেকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কেক প্রস্তুত-প্রণালীটা জেনে নেওয়ার বাইরে কিছু করার চেষ্টা করলে কিন্তু পিতৃদত্ত জীবনটা খোয়াতে হবে।

দেখুন, কথাগুলো যে আমি শতকরা একশ' ভাগই মনের কথা বলছি সেটা আপনাকে বোঝাবার, মানে নিশ্চিত বিশ্বাস করাবার জন্য আমি আপনার কাছে আর একটু সাহায্য প্রত্যাশা করব।

যা বলবার ঝটপট বলে ফেলুন।

মিস লিয়ারাইট আর আপনার মধ্যে হৃদ্যতার সম্পর্ক ঘনতর বলেই সে কাজটা সে হয়ত আমার জন্য করবে না, আর তা হয়ত আপনার জন্যই করতে সম্মত হয়ে যাবে।

ধানাইপানাই ছেড়ে মোদ্দা কথাটা বলেই ফেলুন না।

ওই প্যানকেকের প্রস্তুত-প্রণালীটা, মানে তার একটা কপি যদি আমাকে পাঠিয়ে দেন তবে আমি আপনাকে একটা প্রতিশ্রুতি দিতে পারি।

প্রতিশ্রুতি? কি সে প্রতিশ্রুতি?

প্যানকেকের প্রস্তুত-প্রণালীটা পেয়ে গেলে আমি ভুলেও কোনদিন ওই মেয়ের ত্রিসীমানায়ই যাব না।

আমি হেসে বললাম—এটা তো খুবই সঙ্গত কথা।

আমি হাত বাড়িয়ে জ্যাক্সন বার্ড-এর সঙ্গে করমর্দন করলাম। ব্যস, তারপর আর একটা কথাও নয়, আমরা নিজের নিজের পথে ঘোড়া হাঁকিয়ে দিলাম।

সে ঘটনার পর পাঁচদিন পরে আমি আবার ঘোড়া হাঁকিয়ে পিমিয়েন্টার পথে যাত্রা করলাম।

এমসলি কাকার বাড়ির দরজায় পৌঁছেই মিস উইল্লেল্লার দেখা পেয়ে গেলাম। তাকে পাশে বসিয়ে আমি একটা মনের মত সন্ধ্যা কাটালাম। সে আমার পাশে, একেবারে ঘনিষ্ঠ হয়ে আমাকে মধুরস্বরে গান গেয়ে শোনাল, পিয়ানোও বাজাল চমৎকার।

দেখতে দেখতে রাত্রি দশটা বেজে গেল। তখন মুখে মিষ্টি হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে মিস উইল্লেল্লাকে বললাম—আমার একটা সাধ—

আমাকে মুখের কথা শেষ করতে না দিয়েই মিস উইল্লেল্লা বলল—সাধ? কি সে সাধ জানতে পারি কি?

প্যানকেক—ঝোলাগুড়ে ভেজানো গরম গরম প্যানকেক যদি খেতে পেতাম কী আনন্দই না হত! আহা কী চমৎকার! কী আনন্দ!

আমার কথাটা শেষ হতে না হতেই মিস উইল্লেল্লা যন্ত্রচালিতের মত লাফিয়ে পিয়ানোর টুল থেকে উঠে পড়ল। অদ্ভুত—একেবারেই অত্যাশ্চর্য একটা দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমি ব্যাপার কিছু বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম।

সে আচমকাই বলে উঠল—এক মুহূর্তের জন্য আমাকে মার্জনা করে দেবেন।

কথাটা বলতে বলতে সে তাঁর চোখে আমার দিকে তাকাতে তাকাতে পাশের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

মিস উইল্লেল্লা পাশের ঘরটাতে ঢুকতে ঢুকতেই এমসলি কাকা আমার ঘরে ঢুকল। তার হাতে এক কলসি জল। সে কলসিটাকে দরজার এক পাশে মেঝেতে রেখে দিল।

তারপর গ্লাসটা আনার জন্য দু'পা এগিয়ে টেবিলটার দিকে পিছন ফিরতেই তার প্যান্টের পিছনের পকেটে রক্ষিত ৪৫ পিস্তলটার ওপর আমার চোখ পড়ে গেল।

আমি মুহূর্তের মধ্যে সোজা হয়ে বসে পড়লাম। বার-কয়েক ঢোক গিললাম। পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে ভাবলাম, হয়ত প্যানকেকের প্রস্তুত-প্রণালীটা কতগুলো পাতা জুড়ে লেখা আর সেটা এতই গোপনীয় সম্পদ যাকে আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে' কি জানি, আমার ধারণাটা সত্যি হলে হতেও পারে।

এমসলি কাকা কলসি থেকে জল ভরে গ্লাসটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল—নাও, জলটুকু খেয়ে নাও।

হঠাৎ জলের গ্লাস দেখে আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে নীরবে তাকালাম।

সে মুখে ম্লান হাসি ফুটিয়ে বলল, কি হল, গ্লাসটা ধর। জলটুকু খেয়ে নাও। আজ তোমাকে অনেকটা পথ ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে হয়েছে জুড্সন। তাই তোমাকে বেশ উত্তেজিতই দেখা যাচ্ছে। জলটুকু খেয়ে তোমার ভাবনাটাকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা কর, স্বস্তি পাবে।

সে রাত্রে প্যানকেকের ব্যাপারে আর বেশী দূর অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পেলাম না। মোদ্দা কথা, আমার সেদিনকার প্রয়াস ব্যর্থই হয়েছে।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবলাম, আমিই যখন হালে পানি পেলাম না তখন জ্যাক্সন বার্ড-এর পক্ষে কী দুষ্কর ব্যাপার।

জ্যাক্সন বার্ড-এর সঙ্গে প্রায় এক সপ্তাহ পরে আমার দেখা হল। তখন আমি ঘোড়া থেকে নেমে পিমিয়েন্টাতে ঢুকছি, আর সে সেখান থেকে বেরিয়ে আসছে। ফলে আমাদের মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল।

আমাকে দেখেই জ্যাক্সন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মুচকি হেসে উভয়ে কুশল সংবাদ আদান-প্রদান করলাম। তারপর খুঁটিনাটি বিষয়ে দু'-চারটে কথা হল।

কথা প্রসঙ্গে প্যানকেকের আলোচনাও হল।

তার কথার জবাব দিতে গিয়ে আমি ফ্যাকাসে বিবর্ণ মুখে বললাম—আমি তেমন আশান্বিত হতে পারছি না।

সে প্রায় আঁৎকে উঠে বলল—আঃ।

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছি মিঃ বার্ড। আমার তো মনে হচ্ছে কাজটা খুবই শক্ত।

তাই বুঝি? চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জ্যাক্সন বার্ড বলল—তাই বুঝি?

আরে, এখনই এত হতাশ হবার কিছু নেই। আপনি আপনার বুদ্ধি-বিবেচনা অনুযায়ী চেষ্টা চালিয়ে যান, আর আমিও দেখি কতদূর কি করতে পারি।

আপনি বলছেন?

এ ছাড়া তো করারও কিছু নেই। ধৈর্য ধরে কাজে লেগে থাকতে হবেই। আমি এখনও বিশ্বাস রাখি আজ না হোক কাল তার শিঙে দড়ির ফাঁস পরাতে পারবই পারব।

জ্যাক্সন-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি বাড়ির ভেতরের দিকে পা-বাড়ালাম।

আমি আর জ্যাক্সন উভয়েই মিস উইল্লেল্লা-র কাছ থেকে প্যানকেক তৈরীর গোপন পদ্ধতিটা বের করার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলাম।

আশ্চর্য ব্যাপার। আমি অন্য সব কথা বলার সময় মিস উইল্লেল্লা স্বাভাবিক ভাবেই কথা বলে। কিন্তু প্যানকেকের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা মাত্রই কেমন ফ্যাকাসে মুখে চট করে দূরে সরে যায়। আড়চোখে আমার দিকে তাকায় আর ভ্রূ দুটো কুঁচকেই রাখে।

তারপর খুবই সতর্কতার সঙ্গে সে অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়। তারপরও যদি আমি ব্যাপারটা নিয়ে পীড়াপীড়ি করি তবে সে বিরক্ত হয়ে ঘর ছেড়ে চলে যায়।

আরও আছে, কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই এমসলি কাকাকে এক গ্লাস জল হাতে আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। আর তার পকেটে দিয়ে দেয় একটা হাওইটজার।

একদিন আমি নীল ফুলের একটা তোড়া নিয়ে ঘোড়া হাকিয়ে এমসলি কাকার দোকানে হাজির হলাম।

ঘোড়া থেকে নেমে আমি দোকানের বেঞ্চটায় গিয়ে বসতেই এমসলি কাকা একটা চোখ বুজে ফুলের তোড়াটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

আমি তার ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে একবার তার বন্ধ চোখটার দিকে পরমুহূর্তেই হাতের ফুলের তোড়াটার দিকে তাকাতে লাগলাম।

এমসলি কাকা একই ভঙ্গিতে ফুলের তোড়াটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই বলল—তুমি খবরটা শোন নি?

আমি সবিস্ময়ে বললাম—কোন্ খবর? কিসের খবর? কই, আমি তো কারো কাছ থেকে কিছুই শুনি নি।

আজ সকালের ডাকেই চিঠিটা পেয়েছি।

আমি ভ্রূ কুঁচকে বললাম—চিঠি? কার চিঠি? কিসের চিঠি?

জ্যাকসন বার্ড আর উইল্লেল্লা-র বিয়ে হয়ে গেছে।

বিয়ে হয়ে গেছে! কবে?

গতকাল।

কোথায় তাদের বিয়ে হয়েছে, লিখেছে?

হ্যাঁ তা-ও লিখে জানিয়েছে। প্যালেস্টাইন নগরে তারা বিয়ের পাট মিটিয়ে নিয়েছে।

কথাটা শুনে আমি যেন একেবারে আকাশ থেকে পড়লাম। বেঞ্চটা আঁকড়ে ধরে স্থবিরের মত বসে রইলাম। কখন যে ফুলের তোড়াটা আমার হাত থেকে খসে মাটিতে পড়ে গেছে, টেরই পাইনি।

আমি কোন রকমে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললাম—এমসলি কাকা, কথাটা আর একবার বলবেন কি?

ম্লান হেসে সে বলল—কেন? আমার কথাটা শুনতে পাওনি?

না, মানে এমনও তো হতে পারে আমার শুনতে ভুল হয়েছে।

গতকাল তাদের বিয়েটা হয়ে গেছে।

এখন কি তবে প্যালেস্টাইনেই—

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই এমসলি কাকা বলে উঠল—না। মধু-চন্দ্রিমা যাপন করতে তারা নায়েগ্রা জলপ্রপাত আর ওয়াকোর উদ্দেশ্যে পাড়ি জমিয়েছে। আরে ব্যাপারটা কি, বল তো?

কি? কিসের ব্যাপার?

বলছি কি, তোমার চোখে কি কিছুই পড়ে নি? যেদিন তাকে সঙ্গে করে জ্যাক্‌সন বার্ড ঘোড়ায় চেপে বেড়াতে গিয়েছিল তখন থেকেই তো তাদের মধ্যে পুরোদমে পূর্বরাগের পালা চলছিল হে।

আমি চিল্লিয়ে বলতে লাগলাম—তবে কেন সে আমাকে বারবার প্যানকেক সম্বন্ধে ভুরি ভুরি গালগল্প শুনিয়েছে? সেটাই আমি শুনতে চাই, আপনি জবাব দিন!

আমার মুখ থেকে প্যানকেক-এর কথাটা শোনামাত্র এমসলি কাকা যন্ত্রচালিতের মত দ্রুত কয়েক পা পিছিয়ে গেল। জুল্‌জুল্‌ করে আমার দিকে তাকাতে লাগল।

আমি ক্ষুব্ধ স্বরেই বললাম—কেউ না কেউ আমাকে অবশ্যই প্যানকেকের কথা বলে ধাপ্পা দিয়েছে। আমি যে করেই হোক খুঁজে বের করবই করব। প্রয়োজনে চিরুনি তল্লাশি চালাব।

এমসলি কাকা আগের মতই নীরবে জুল্‌জুল্‌ করে তাকিয়েই রইল আমি এবার বললাম—শোনেন এমসলি কাকা, আমার কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস, সে ধাপ্পাবাজটাকে আপনি চেনেন।

এমসলি কাকা আঁৎকে উঠে বললেন—আমি? আমি কি করে—

তাকে মাঝ পথে থামিয়ে দিয়ে আমি বলে উঠলাম—শুনুন এমসলি কাকা, এখনও সময় আছে, ব্যাপারটা খোলসা করে বলুন। তা যদি না করেন তবে আমি এখানে একটা তুমুল কাণ্ড, প্রয়োজনে রক্তনদী বইয়ে ছাড়ব, বলে রাখছি।

আমি বেঞ্চ ছেড়ে উঠে এমসলি কাকার দিকে এগিয়ে গেলাম। আমাকে বেঞ্চ ছেড়ে উঠতে দেখেই এমসলি কাকা ঝট্‌ করে বন্দুকটার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল। না, সেটার নাগাল সে পেল না, কারণ, সেটা রয়েছে টানার মধ্যে। মাত্র দু'ইঞ্চির জন্য তার হাতটা বন্দুকটা পর্যন্ত পৌঁছতে পারল না!

আমি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার কোটটা সজোরে মুঠো করে চেপে ধরলাম। তারপর ছোট্ট একটা ধাক্কা দিয়ে তাকে একপাশে ঠেলে দিলাম।

আমি গুলি-খাওয়া বাঘের মত গর্জে উঠলাম—আমার সাফ কথা শুনে রাখুন, প্যানকেকের ব্যাপারটা যদি আপনি খুলে না বলেন তবে আমি কিন্তু আপনাকেই প্যানকেক তৈরী করে ফেলব।

আরে আরে এটা করছেন কি মিঃ জুড্‌সন! আপনার পিস্তলের মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে—

তাকে থামিয়ে দিয়ে আমি বলে উঠলাম—ধ্যুৎ! ধানাইপানাই রেখে আসল কথাটা বলুন। পিস্তলের মুখ ঘুরাব তখনই যখন বুঝব আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে।

শান্ত হন, মাথা ঠাণ্ডা করে আমার কথা শুনুন মিঃ জুড্‌সন। উইল্লেল্লা সারা জীবনে একটা প্যানকেকও বানায় নি। আর আমি সেটা কোনদিন চোখেও দেখি নি, বিশ্বাস করুন।

আবারও ধানাইপানাই—

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত এমসলি খুড়ো আগের মতই কাঁপা কাঁপা গলায় বলতে লাগল—আপনি শান্ত হন মিঃ জুড্‌সন। মাথা ঠাণ্ডা করুন। আপনি খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। আর আপনার মাথার ওই ক্ষতটাই আপনার বুদ্ধি-বিবেচনাকে ঘুলিয়ে দিয়েছে। আমার কথা শুনুন, জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসা প্যানকেকের চিন্তাটাকে মাথা থেকে ঝেড়েমুছে ফেলে দিন।

ধ্যুৎ! বাজে কথা ছাড়ান দিন এমসলি কাকা। আমার মাথায় কিছু হয় নি, বরং আমি পুরোপুরি সুস্থ, প্যানকেকের কথা আমি জ্যাক্‌সন বার্ড-এর মুখ থেকেই শুনেছি।

জ্যাক্‌সন বার্ড!

হ্যাঁ-হ্যাঁ সে-ই আমাকে বলেছে। আমাকে সে বলেছে, প্যানকেক বানাবার পদ্ধতিটা জানার জন্যই সে মিস উইল্লেল্লার পিছন পিছন ঘুরঘুর করে। আর এ-ও সে আমাকে বলেছে, ব্যাপারটা বিস্তারিত ভাবে জানার জন্য সে আমার সক্রিয় সাহায্য প্রত্যাশা করে। আর আমি মনে-প্রাণে কেবলমাত্র সেটুকুই করেছি। আর আমার প্রয়াসের পরিণতি তো আপনি নিজের চোখেই দেখতে

পাচ্ছেন।

এমসলি কাকা বলল—আমার কোটের কোণটা আবার চেপে ধরলেন যে! মুঠোটা একটু আল্‌গা করুন। কথা দিচ্ছি, সব কথা আপনাকে বলব, একটা বর্ণও মিথ্যে বলব না, গোপনও করব না।

আমি তার কোটটা ছেড়ে দিলাম।

এমসলি কাকা এবার বলল—শুনুন মিঃ জুড্‌সন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জ্যাক্‌সন বার্ড আপনাকে কিছুটা ধাপ্পা দিয়েছে।

আপনার এরকম বিশ্বাস হবার কারণ কি?

তা-ও বলছি, সে যেদিন ঘোড়ায় চড়ে উইল্লেল্লা'কে নিয়ে হাওয়া খেতে গিয়েছিল সেদিন আমার বাড়ি ফিরেই উইল্লেল্লা আমাকে বলেছিল, কেউ যদি প্যানকেক সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করে তবে যেন তার ওপর আমরা সতর্ক দৃষ্টি রাখি।

আপনি বা উইল্লেল্লা কেউ-ই তার কাছে কারণ জানতে চান নি?

আমরা কারণ জানতে চাইলে সে বলেছিল, আপনি নাকি কোন এক সময় যে শিবিরে থাকতেন সেখানে ফ্ল্যাপজ্যাক তৈরী হ'ত।

ফ্ল্যাপজ্যাক কথাটা শোনামাত্র আমি ভ্রূ কুঁচকে এমসলি কাকার দিকে তাকালাম।

সে মুচকি হেসে বলল—ফ্ল্যাপজ্যাক মানে হচ্ছে চওড়া প্যানকেক। যাক গে, তারপর জ্যাকসন যা বলেছিল শুনুন—ঠিক তখনই নাকি একজন প্যান দিয়ে আপনার মাথায় আঘাত হেনেছিল। আঘাতটা নাকি খুব জোরেই করেছিল।

আমি তার কথা শুনে রাগে ভেতরে ভেতরে ফুঁসতে লাগলাম। এমসলি কাকা বলে চলল—জ্যাক্‌সন তারপর আমাদের যা বলেছিল শুনুন—আপনার মাথাটা যখনই গরম হয়ে যায় বা আপনার মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় তখনই আপনি নাকি উন্মাদের মত হয়ে পড়েন। সবশেষে সে আমাদের একথাও বলেছিল, আপনার মাথা থেকে প্যানকেকের উদ্ভট চিন্তাটা সরিয়ে দিতে পারলেই আপনার দিক থেকে আর কোনই বিপদের সম্ভাবনা থাকবে না।

মুহূর্তের জন্য থেমে একটু দম নিয়ে এমসলি কাকা এবার বলল—জ্যাক্‌সন-এর মুখ থেকে কথাগুলো শোনার পর উইল্লেল্লা আর আমি সাধ্য মত সে প্রয়াসই চালিয়ে যেতে লাগলাম। আরে, কেন মিছে নিজেকে এমন করে কষ্ট দিচ্ছেন জুড্‌সন। জ্যাক্‌সন বার্ডকে মন থেকে মুছে ফেলুন—একেবারে ভুলে যান।

জুড্‌সন প্যানকেকের গল্পটা বলতে বলতেই ধীরে ধীরে তার বস্তা আর টিনের ভেতর থেকে অত্যাবশক জিনিসপত্র বের করে আসল কাজটা হাসিল করে চলতে লাগল।

গল্পটা শেষ করেই সে নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসে পড়ল। পরমুহূর্তেই সদ্য তৈরী জিনিসটা আমার সামনে রাখল।

টিনের ফলাটার দিকে তাকাতেই আমার তো চক্ষুস্থির হয়ে যাবার জোগাড় হল। দেখলাম, থালাটায় রাখা আছে দুটো গরম গরম প্যানকেক। আর ভাল মাখনের একটা তাল ও এক বোতল মদও সে আমার সামনে রাখল।

জুড্‌সন-এর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি বললাম—ঘটনাটা কতদিন আগে ঘটেছিল, বল তো?

জুড্‌সন বলল—তিন বছর আগে ঘটেছিল। তারা সবাই তখন সাইরেড পশু-খামারে এক সঙ্গে থাকত। তাই আমি প্রায়ই প্যানকেক তৈরী করে খাওয়াতাম। তারাও খুশি মনে কেকের সদ্ব্যবহার করত।

একটা কথা, প্যানকেক তৈরীর প্রণালীটা কার কাছ থেকে শিখেছিলে, বলবে কি?

জুড্‌সন বলল—একটা খবরের কাগজের পাতায় প্যানকেক তৈরীর পদ্ধতিটা ছাপা হয়েছিল। সেটাই আমি কেটে রেখেছিলাম। খেতে কেমন হয়েছে, বললে না তো?

খুবই সুস্বাদু। তুমি একটা টুকরো খাচ্ছো না কেন?

আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম, তার ফুসফুস নিঙড়ে যেন দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

ফ্যাকাসে বিবর্ণ মুখে জুড্‌সন বলল—এসব আমি কোনদিন খাই না।

টেলিমেকাস ফ্রেন্ড

একবার শিকার সেরে ফেরার সময় দক্ষিণগামী ট্রেনটা এক ঘণ্টা দেরী করে ফিরছিল। তাই অনন্যোপায় হয়ে আমাকে নিউ মেক্সিকোর ছোট্ট একটা শহরে কিছুক্ষণের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

হোটেল সামিট হাউস-এর বারান্দায় হোটেলের মালিক টেলিমেকাস হিক্‌স-এর সঙ্গে মুখোমুখি চেয়ারে বসে জীবনের কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনায় লিপ্ত হয়েছিলাম।

আমি কথা প্রসঙ্গে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—বহুদিন আগে কোন্ জানোয়ারের আক্রমণে তার বাঁ কানটা এমন বিকৃত হয়ে গেছে।

টেলিমেকাস আমার কথার কোন জবাব না দিয়ে অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে উদ্যোগী হল।

আমি নিজে একজন শিকার-প্রিয় মানুষ। তাই কোন না কোন শিকারের কবলে পড়ে তার এরকম একটা সর্বনাশ হয়েছিল বলেই আমার মনে হল।

আমি নাছোড়বান্দা। প্রশ্নটা আবার তাকে উদ্দেশ্য করে ছুঁড়ে দিলাম।

হিক্‌স এবার আর মুখ বুজে থাকতে পারল না, সে বলল—আমার এ কানটা প্রকৃত বন্ধুত্বে এক ধ্বংসচিহ্ন।

আমি চোখ দুটো কপালে তুলে বলে উঠলাম—প্রকৃত বন্ধুত্বের ধ্বংসচিহ্ন? ব্যাপারটা ঠিক মাথায় এল না তো?

বন্ধুত্ব রক্ষা করতে গিয়ে—

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আমি এবার বললাম—কোন দুর্ঘটনার ফল কি?

দেখুন, কোন বন্ধুত্বকেই দুর্ঘটনা আখ্যা দেওয়া চলে না। টেলিমেকাস স্বাভাবিক কণ্ঠেই আমার প্রশ্নের উত্তর দিল।

আমি আর কোন প্রশ্ন খুঁজে না পেয়ে চুপ করে গেলাম।

টেলিমেকাস এবার বলল—আমার যতগুলো প্রকৃত বন্ধুত্বের নিদর্শন জানা আছে তাদের মধ্যে সেরা নিদর্শন হচ্ছে, একজন কনেকটিকাট-এর অধিবাসী আর একটা বানরের মধ্যে গড়ে ওঠা প্রীতির সম্পর্ক।

আমি ভ্রূ কুঁচকে বললাম—মানুষ আর বানরের মধ্যে হৃদ্যতার সম্পর্ক! আজব ব্যাপার তো!

হ্যাঁ, ঠিক তা-ই। এবার কি বলছি, ধৈর্য ধরে শুনুন। করানকুইলাব নারকেল গাছ থেকে বানরটা মানুষটার জন্য গাছের ফল ছিঁড়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিত। আর মানুষটা সেগুলোকে দু টুকরো করে কেটে কেটে হাতা তৈরী করে প্রত্যেকটা দু' রিয়াল দামে বাজারে বিক্রি করত।

আমি তার কথার ফাঁকে বলে উঠলাম—নারকেলের মিষ্টি জল আর শাঁস কে খেত?

ওগুলো বানরটা নিজে খেত।

পকেট থেকে চুরুট বের করতে করতে টেলিমেকাস বলল—গাছ থেকে পাওয়া বস্তুর এরকম ভাগাভাগিতে মানুষ আর বানর উভয়েই যারপরনাই খুশি। আর এখুশির ফল হিসেবে তারা পরস্পরের ভাইয়ের মত কাছাকাছি পাশাপাশি বাস করতে লাগল।

দেখুন, একটা কথা তো আর অস্বীকার করা যাবে না। মানুষে-মানুষে গড়ে ওঠা বন্ধুত্ব খুবই ঠুনকো, বলতে পারেন একটা ক্ষণস্থায়ী ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়। কোন রকম জানান না দিয়েই বন্ধুত্বে চিড় ধরানো, এমন কি বিচ্ছেদও ঘটানো সম্ভব।

টেলিমেকাস হাতের চুরুটটায় অগ্নিসংযোগ করে একগাল ধোঁয়া হাল্কা বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে আবার মুখ খুলল—এবার শুনুন, এক সময় আমার একটা বন্ধু ছিল। 'পেইস্‌লি মাছ' বলে সবাই তাকে সম্বোধন করত।

আমি মুচকি হেসে বললাম—এ রকম একটা বিদ্‌ঘুটে নাম ধরে ডাকলে আপনার বন্ধুটি প্রতিবাদ বা আপত্তি করত না?

না, ব্যাপারটাকে সে গ্রাহ্যই করত না, হেসেই উড়িয়ে দিত।

যাক গে, তারপর?

আমার কিন্তু বিশ্বাস ছিল, আমাদের বন্ধুত্ব, গাঢ় হৃদ্যতার সম্পর্ক অনন্তকাল ধরে টিকে থাকবে।

চুরুটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে টেলিমেকাস বলল—পুরো সাত-সাতটা বছর আমরা উভয়ে খনিতে পাশাপাশি কাজ করেছি, গরু-মোষ চরিয়েছি, ভেড়া চরিয়েছি, ঘুরে ঘুরে মন্থন-পাত্র বেচেছি, ফটো তুলে বেড়িয়েছি—এরকম আরও কত কাজ যে আমরা একসঙ্গে করেছি তার ইয়ত্তা নেই।

তখন আমাদের উভয়ের বদ্ধমূল ধারণা কি ছিল জানেন?

আমি কি জবাব দেব ভেবে না পেয়ে ফ্যালফ্যাল করে টেলিমেকাস-এর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

আমাকে নীরব দেখে সে-ই মুচকি হেসে আবার বলতে শুরু করল—তখন তো বিশ্বাস করতাম, খুন-খারাপি, স্থাবকতা, টাকাকড়ি, কথা কাটাকাটি, ভুল বোঝাবুঝি আর মদ খাওয়া—কোন কিছুই আমাদের বন্ধুত্বে বিচ্ছেদ ঘটানো তো দূরের ব্যাপার সামান্য চিঁড়ও ধরাতে পারবে না। আপনি ভাবতেও পারবেন না, আমাদের বন্ধুত্বের বন্ধন কী সুদৃঢ় ছিল।

কেবলমাত্র ব্যবসার ব্যাপার-স্যাপারেই নয়, অবসর যাপন বা অন্য যে কোন ব্যর্থতা আর বোকামির ক্ষেত্রেও আমাদের মধ্যে সাময়িক মত পার্থক্য দেখা দিলে তা আলোচনার মাধ্যমে আপোষে মিটিয়ে নিতাম। আবার পরস্পরের পাশে হাসিমুখে দাঁড়াতাম। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের দিনগুলো কাটত দাসন-এর মত, আর পাইনিয়াস-এর সাত কাটত রাতগুলো।

গ্রীষ্মের একদিন বন্ধুবর পেইসলি আর আমি জোর কদমে ঘোড়া হাঁকিয়ে দূরবর্তী ওই সান আন্দ্রোস পর্বতশ্রেণীতে চলে গেলাম। আমাদের পরিকল্পনা ছিল বিশ্রাম আর হাসি-আনন্দের মধ্য দিয়ে সেখানে কাটিয়ে দেব।

পার্বত্য শহর লস পিনোস-এ আমরা মাথা গোঁজলাম। সেটাকে শহর না বলে পৃথিবীর সেরা বাগিচা-গৃহ বলাই সঙ্গত। জমাট দুধ আর মধুরস্রোত এখানে প্রবাহিত হয়।

শহরটার বুকে দু'-একটা চকচকে ঝকঝকে পাকা রাস্তা আছে যেগুলো এঁকে এঁকে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে চলে গেছে। শহর হলে কি হবে, খোলামেলা খুবই। মুরগি মেলে, খাবার-ঘর সবই আছে। আর কি-ই বা চাই? এ-ই তো আমাদের পক্ষে যথেষ্ট, অতএব ব্যবস্থাদি দেখে আমরা খুবই খুশিই হলাম।

প্রতিদিন সন্ধ্যার অন্ধকার নামতে না নামতেই আমরা দুই বন্ধু শহরে ফিরে আসি।

একটু রাত্রি হলেই খাবার ঘরে গিয়ে ভাল-মন্দ যা পাই তা দিয়েই নির্দ্বিধায় উদর পূর্তি করি।

এক সন্ধ্যার কিছু পরে খাবাব ঘরে বসে আহারাদির পর সবে প্লেটগুলোকে চেটেপুটে শুকনো করে তুলেছি, ঠিক তখনই বিধবা জেসুপ গরম গরম যকৃত-ভাজা আর বিস্কুটের পাত্র নিয়ে ঘরে ঢুকল।

জেসুপ আসলে এমন এক মহিলা সে যেকোন দাপটি মানুষকে তার প্রতিজ্ঞা থেকে সরিয়ে আনতে পারে। তার চোখে-মুখে অভ্যর্থনার ছাপটুকু ছিল তার বিশেষত্ব। আর এরই জন্য তার সঙ্গ লাভ বাঞ্ছনীয়। তার মুখে পাচিকাসুলভ ছাপ বিরাজ করে যা সহজেই নজরে পড়ার মত। আর তার মুখের সর্বক্ষণ লেগে-থাকা হাসির ছোপটুকু যেন ডিসেম্বরের কনকনে শীতেও গাছকে ফুলেফুলে সাজিয়ে তুলতে পারে।

আমাদের পাশের টুলটার উপর জুঁত হয়ে বসে বিধবা জেসুপ একনাগাড়ে অনেক কথাই বলতে লাগল। ইতিহাস, টেনিসন আর আবহাওয়া থেকে শুরু করে ছাগ-মাংসের বড়ই অভাব আর শুকনো ফুলের গোছা পর্যন্ত কিছুই বাদ দিল না। সব কিছু বলা হয়ে গেলে আমাদের উভয়ের মুখের দিকে এক ঝলক করে তাকিয়ে নিয়ে সে বলল—কত্তা মশাইরা, আপনারা এখানে কোথায় এসেছেন?

আমি তার প্রশ্নের জবাব দিলাম—বসন্ত উপত্যকায়।

সেদিনই আমি প্রথম লক্ষ্য করলাম আমার আর পেইসলি-এর অভিন্ন হৃদয় বন্ধুত্বের বিচ্ছেদ ঘটার প্রথম লক্ষণ।

যারা বেশী বকবক করে, মানে বাচাল প্রকৃতির তাদের আমি যে কতখানি অপছন্দ করি তা

সে ভালই জানে। তবু কত সব মন্তব্যের মাধ্যমে সে হাজারো বার আমাদের কথার মধ্যে আগ বাড়িয়ে কথা বলতে লাগল।

মানচিত্রে 'বড় বসন্ত উপত্যকা' নামে জায়গাটার উল্লেখ করা আছে সত্য। তবে আমি নিজের কানে শুনেছি পেইসলি নিজেই জায়গাটাকে 'বসন্ত উপত্যকা' বলে সম্বোধন করেছে। না, আমার শুনতে এতটুকুও ভুল হয়নি।

আমি মিছে আর কথা না বাড়িয়ে প্রসঙ্গটাকে দীর্ঘ করতে উৎসাহী হলাম না। ফলে 'বড় বসন্ত উপত্যকা', নাকি 'বসন্ত উপত্যকা' তা মানচিত্রের পাতায়ই রয়ে গেল।

খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে আমরা রেলপথের ধারে হাজির হলাম। তারপর রেলপথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে এগোতে লাগলাম। উভয়েই নির্বাক, কারো মুখে টু-শব্দটি পর্যন্ত নেই। সে বা আমি কেউই জানতে পারলাম না কার মনের মধ্যে কোন্ প্রসঙ্গ বা কোন্ কথা ঘুরপাক খাচ্ছে।

হ্যাঁ, পেইসলি-ই প্রথমে নীরবতা ভঙ্গ করল। সে গম্ভীর স্বরেই বলল—আমি ধরে নিয়েছি তুমি বুঝতে পেরে গেছ যে, আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি ওই বিধবাই হবে আইনসম্মতভাবে আমার যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবরের উত্তরাধিকারী, মানে উত্তরাধিকার সূত্রে আমি যা কিছু পাব সব কিছুরই একমাত্র দাবীদার ও-ই হবে।

আরে এত ব্যাখ্যা করে বোঝাবার দরকার নেই। তোমার কেবলমাত্র একটা কথাতেই আমি তোমার বক্তব্যটা পুরোপুরি উপলব্ধি করে নিয়েছি।

টেলিমেকাস-এর মুখে হাসির ঝলক ফুটে উঠল। আমি বলেই চললাম—টেলিমেকাস, এবার আমার কথাটাও শুনে রাখ—আমার বিশ্বাস তুমিও হয়ত বুঝে থাকবে যে, আমি গোপনে এমন এক প্রয়াসে লিপ্ত যার পরিণতি হবে—

পরিণতি? পরিণতিতে আবার কি দেখতে পাব। টেলিমেকাস আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠল।

হ্যাঁ, ওই বিধবাটি তার পদবী পরিবর্তন করে 'হিক্স' পদবী ধারণ করবে, বুঝলে?

টেলিমেকাস আমার মুখের দিকে নীরবে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

আমি বলে চললাম—তখন তোমার একমাত্র কর্তব্য হবে, খবরের কাগজের সামাজিক অনুষ্ঠানের দপ্তরে চিঠি লিখে জানা সে বিয়েতে নিত-বরকে জাপানিকা অর্থাৎ সেলাই ছাড়া মোজা ব্যবহার করতে হবে কিনা।

তোমার প্রস্তাবটায় কিছু কিছু ফাঁক-ফোঁকড় রয়ে গেছে, আমি সেগুলো পূরণ করে দিতে চাইছি। পেইস্‌লি মুচকি হেসে বলল।

ফাঁক-ফোঁকড়? আমি তার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললাম।

সে-ও ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বলল—হ্যাঁ, একথাই তো বলতে চাইছি। দেখ, অন্যসব ব্যাপারে আমি তোমার বক্তব্যকে সমর্থন করতে পারি। তবে একটা ব্যাপারে আমার আপত্তি আছে।

কোন্ ব্যাপারের ইঙ্গিত দিচ্ছ, জানতে পারি কি?

ব্যাপারটা হচ্ছে, মিসেস জেসুপ-এর ব্যাপারে আমরা উভয়ে নিজের নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে যাব। এতে কারো কাজে আমরা কেউ-ই নাক গলাব না। এ কথাটাই আমি আগে ভাগেই বলে রাখছি।

পেইস্‌লি-র প্রস্তাবটাকে আমি মেনে নিয়ে বললাম—ঠিক আছে, তোমার প্রস্তাবে আমি সম্মত।

আমার কথায় পেইসলি খুশি হল। তারপর আমি আমাদের শর্তের ধারা এবং উপধারাগুলো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললাম : দেখ, একজন পুরুষের সঙ্গে অন্য একজন পুরুষের বন্ধুত্ব একটা প্রাচীন ঐতিহাসিক ব্যাপার, জানই তো?

হ্যাঁ, কেবলমাত্র আমি কেন, এটা সবারই জানা আছে।

সে ব্যাপারটাকে তারা আজ অবধি মেনে চলেছে। আর আশাকরি আমার মত তুমিও বহু জায়গায় শুনে থাকবে, মহিলারাই এগিয়ে এসে পুরুষে-পুরুষে গড়ে ওঠা হৃদ্যতার সম্পর্কে চিড় ধরায়, ঘটায় বিচ্ছেদ। ব্যাপারটা কেমন, তাই না? ঠিক আছে, আমিই তোমাকে ব্যাপারটা খোলসা

করে দিচ্ছি।

পেইস্‌লি চোখে-মুখে আগ্রহের ছাপ এঁকে আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমি এবার বললাম—এতে অবাক হবার কিছুই নেই পেইস্‌লি। যকৃত-ভাজা আর গরম বিস্কুটের থালা-হাতে বিধবা জেসুপ-এর প্রথম আবির্ভাব আমাদের উভয়ের অন্তরের অন্তঃস্থলে অভাবনীয় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল, কথাটা তো অস্বীকার করার নয়।

আমতা আমতা করে হলেও সে আমার কথাটা মেনে না নিয়ে পারলো না।

আমি এবার অধিকতর দৃঢ়তার সঙ্গে বললাম—তাই আমি বলছি কি, আমাদের মধ্যে যার হিম্মত আছে সে-ই রূপসী বিধবাকে লাভ করুক, কি বল?

পেইস্‌লি হ্যাঁ বা না কিছুই বলল না।

আমি তার মতামতের জন্য অপেক্ষা না করেই আবার বলতে শুরু করলাম—আমার সাফ কথা শুনে রাখ, আমি এ খেলায় কোন রকম বাহানা বা লুকোচুরির আশ্রয় না নিয়ে খোলাখুলিই খেলতে উৎসাহী। এর মানে, আমার পক্ষ থেকে তাকে যা কিছু বলার তোমার উপস্থিতিতেই বলব, আর তা খোলসা করেই বলব। এর কারণ, এ ব্যাপারে তুমিও যাতে সুযোগ-সুবিধা পাও।

হুম্!

একটা কথা আমার মাথায় আসছে না, এরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করলে আমাদের বন্ধুত্ব কেন ভাঙবে, কেনইবা আমরা পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ব! পড়ার কোন কারণই আমি অন্তত দেখতে পাচ্ছি নে।

পেইস্‌লি-র মুখে হাসির প্রলেপ দেখা দিল। সে আবেগ ভরে আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বারবার ঝাঁকুনি দিতে লাগল।

তারপর মুখের হাসির প্রলেপটুকু অক্ষুণ্ণ রেখেই সে বলে উঠল—চমৎকার! চমৎকার! এরকম কথাই আমিও বলতে চাচ্ছিলাম। আমরা উভয়েই একই ভাষায়, একই পদ্ধতি অনুসরণ করে তার মন জয় করতে ব্রতী হব—চমৎকার পদ্ধতি!

ঠিক তা-ই। আমরা নির্দ্বিধায় এ ব্যবস্থাটাকে মেনে নিতে পারি।

এর ফলে হবে কি, আমাদের মনে কোনরকম চাতুরির আশ্রয় নেবার প্রবণতা দেখা দেবে না। আর রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটারও কোনই সম্ভাবনা থাকবে না। আর হারি বা জিতি অর্থাৎ বিধবাটার মন জয় করতে পারি আর না পারি আমাদের বন্ধুত্ব বিচ্ছেদের কোন সম্ভাবনাই থাকবে না।

আমাদের বাঞ্ছিতা মিসেস জেসুপ-এর খাবার ঘরের গায়েই একটা ঝাঁকড়া উইলো গাছ রয়েছে। তার তলায় একটা দড়ির খাটিয়া দেখতে পেলাম।

দক্ষিণের ট্রেনটা বেরিয়ে যাবার পর প্রতি রাত্রির মত সে রাত্রেও হোটেলের আহারাদির পাট চুকে গেল।

আর প্রতি রাত্রে আহারাদির পাট মিটিয়ে মিসেস জেসুপ গাছতলার ওই খাটিয়াটার ওপর কিছু সময় একা বসে নিরবচ্ছিন্ন নীরবতার মধ্যে বিশ্রাম করে।

সে রাত্রে আহারাদির পর আমরা গুটিগুটি সেখানে, মিসেস জেসুপ-এর সামনে হাজির হলাম। আমাদের উভয়েরই ইচ্ছা, তার সান্নিধ্যে কিছুটা সময় কাটিয়ে তবে দুটো মনের কথা শোনাব। আমরা উভয়েই এতই সম্মানীত ব্যক্তি যে, আমাদের মধ্যে কেউ যদি মুহূর্ত কয়েক আগেও মিসেস জেসুপ-এর কাছে হাজির হয়ে যাই তবে প্রেম নিবেদনের পর্বটা শুরু করার জন্য অন্য জনের উপস্থিতির অপেক্ষায় নীরবে বসে থাকি।

আমাদের মতলবের কথা মিসেস জেসুপ যখন জানতে পারল তারপর প্রথম সন্ধ্যায়ই আমি পেইস্‌লি আসার আগেই ব্যস্তভাবে তার কাছে হাজির হয়ে গেলাম। একটু আগেই খাবার ঝামেলাটা মিটেছে।

একটা মনোলোভা গোলাপী পোশাক পরে মিসেস জেসুপ খাটিয়াটার ওপর শরীর এলিয়ে দিয়ে বসেছে। পোশাকটা নতুন। সবে পাট ভেঙে পড়েছে বলেই আমার মনে হল।

কুশল সংবাদ বিনিময়ের মাধ্যমেই বুঝে নিলাম, তার মেজাজ মর্জি অন্য দিনের চেয়ে অনেক ভাল। ভেবে দেখলাম, আমার বাঞ্ছিত কাজ শুরু করার পক্ষে এটা উপযুক্ত সময়ই বটে।

আমি তার পায়ের কাছে মাটিতে নিজের জায়গা করে নিলাম। আমি ভাবলাম প্রাথমিকভাবে কুশল সংবাদাদি আদান-প্রদানের পর্ব তো সারা গেল। তারপর? নতুন করে আলাপ শুরু করতে গিয়ে আমি থমকে গেলাম।

বার-কয়েক ঢোক গিলে শেষ পর্যন্ত প্রকৃতিদেবীর সৃষ্ট রূপ-সৌন্দর্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম। আর এর পিছনে কারণও ছিল যথেষ্টই। এ জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে প্রকৃতি অপরূপ সৌন্দর্যের ডালি নিয়ে চোখের সামনে উপস্থিত। নিতান্ত নিরস মানুষের মনেও রোমাঞ্চ জাগাতে বাধ্য। তার ওপর দূরের পাহাড়-বাহিত ঝিরঝিরে বাতাস দেহ-মনে এক অনাস্বাদিত পুলকের সঞ্চার করছে। আর, ইয়া বড় থালার মত রূপসী চাঁদটা আকাশের গায়ে যেন আলতো ভাবে ঝুলছে।

মিসেস জেসুপ আমার দিকে কখন যে সামান্য সরে এসে বসেছেন বুঝতেই পারি নি। আমি যখন উদাস-ব্যাকুল দৃষ্টিতে প্রকৃতির খেলা দেখার জন্য মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম ঠিক তখনই মিসেস জেসুপ আমার দিকে সরে এসেছিলেন।

আমি বাঁ-দিকে আচমকা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়েই দেখি মিসেস জেসুপ আমার গা-ঘেঁষে বসে আছে।

আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই মিসেস জেসুপ বলল—মিঃ হিক্স, প্রকৃতির রূপ কী অপরূপ তাই না?

বাস্তবিকই খুবই মনোলোভা।

এমন একটা রাত্রে পৃথিবীতে সে একেবারেই নিঃসঙ্গ সে কি নিদারুণ একাকিত্ব বোধ করে না?

আমি মুহূর্তের মধ্যে যন্ত্রচালিতেব মত দ্রুততার সঙ্গে খাটিয়াটার কাছ থেকে সামান্য সরে গেলাম। আগের মতই মাটিতে বসে রইলাম।

আমার আচরণে মিসেস জেসুপ যারপরনাই স্তম্ভিত হয়ে গেল। কণ্ঠস্বরে বিস্ময় প্রকাশ করে বলে উঠল—একী অদ্ভুত কাণ্ড! আপনি এমন করে সরে গেলেন যে বড়!

আমি বার কয়েক ঢোক গিলে আমতা আমতা করে বললাম—মিসেস জেসুপ, আমাকে মাপ করবেন। এ প্রসঙ্গে আমি এখন ভাল-মন্দ কিছুই বলতে পারব না।

মিসেস জেসুপ আমার মুখে এমন একটা অপ্রত্যাশিত উত্তর শুনে ভ্রূ কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে বলল—কি ব্যাপার বলুন তো? এর জন্য আবার সময় বাছাবাছির ব্যাপার থাকতে পারে বলে আমার জানা নেই।

আমি আগের মতই আমতা আমতা করে বললাম—আসলে আমার বন্ধু পেইস্‌লি না-আসা পর্যন্ত আপনার সঙ্গে এরকম কোন প্রসঙ্গে আলোচনা করতে পারব না, কিছুতেই না। সে আসা পর্যন্ত আমার অপেক্ষা না করে উপায় নেই।

মিসেস জেসুপ-এর পীড়াপীড়িতে আমাদের উভয়ের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছে সে কথা তার কাছে খোলসা করে বলতেই হল। আর সে সঙ্গে শর্তের উপধারাগুলোও বিস্তারিত ভাবে তাকে ব্যাখ্যা করে না শুনিয়ে পারলাম না।

মিসেস জেসুপ আমার কথাগুলো যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে এবং মনোযোগ সহকারেই শুনল।

আমার বক্তব্য শেষ হলে সে কয়েক মুহূর্ত গম্ভীর মুখে নীরবে ভাবল।

এক সময় নীরবতা ভঙ্গ করে সে গলা ছেড়ে এমন হো-হো করে হেসে উঠল যে, অদূরবর্তী বনভূমিতেও যেন রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি করল।

মিনিট কয়েকের মধ্যে চাপাস্বরে গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে পেইস্‌লি সেখানে হাজির হল। তার মাথার তেলের গন্ধ বাতাস-বাহিত হয়ে আমাদের নাকে এসে লাগতে লাগল।

পেইস্‌লি এগিয়ে এসে খাটিয়াটার গায়ে, মিসেস জেসুপ-এর অন্য পাশে ধপাস্ করে মাটিতে বসে পড়ল।

আমিও সামান্য এগিয়ে আগের জায়গাটায় বসলাম। পেইসলি আয়েশ করে বসেই রোমাঞ্চকর এক অভিযানের কাহিনী শুরু করে দিল—

এ পূর্বরাগের সূচনার মুহূর্ত থেকেই একটা নারী-হৃদয় জয় করার জন্য আমরা দু'জনে ভিন্ন-

ভিন্ন পথে অগ্রসর হচ্ছিলাম।

মিসেস জেসুপ চোখের তারায় কৌতূহল মিশ্রিত আগ্রহের ছাপ এঁকে পেইস্‌লি-র মুখের দিকে তাকিয়ে তার কথাগুলো শুনতে লাগল।

পেইস্‌লি এমন অদ্ভুত পন্থা অবলম্বন করে যাদের একটা হচ্ছে, কতগুলো অত্যাশ্চর্য বিবরণ দিয়ে মেয়েদের মনকে পাথর করে তোলা যাদের সে নিজের চোখে দেখেছে, নয় তো অধিকাংশই খবরের কাগজে বা বইয়ের পাতায় পড়েছে।

আমার বিশ্বাস, পেইস্‌লি শেক্সপীয়রের ওথেলো নাটক থেকে পরীর মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করার কৌশল রপ্ত করেছিল, প্রেরণাও পেয়েছিল ওই একই বই থেকে। সে নাটকে আলকাতরার মত কালো এক মানুষের চরিত্র আছে, সে জমিদার নন্দিনীর মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল, পুরোপুরি মন জয় করে নিয়েছিল।

কিভাবে? নিউ ডক্‌স্টেলার, ডাঃ সার্কথার্স্ট আর বাইডার হাগার্ড-এর লেখার একটা পাঁচ মিশেলি গল্প শুনিয়ে ওথেলো তার প্রেয়সীর মন জয় করেছিল। তবে এ ক্ষেত্রে পূর্বরাগের ধারাটা নাট্যশালায় ছাড়া মোটেই কাজ করে না।

এক রাত্রে পেইস্‌লি-র একটু আগেই আমি খাটিয়াটায় পৌঁছে গিয়েছিলাম। এমনই সামান্য সময় আগে যে, সে সময়টুকুতে বড় জোর সিগারেটে একটা সুখটান দেওয়া চলে। তবে যতই সামান্য সময় হোক না কেন তারই মধ্যে আমাদের বন্ধুত্বে অন্তত কিছুটা চিঁড় ধরে গিয়েছিল।

সেদিন আমি কথার ফাঁকে মিসেস জেসুপকে প্রশ্ন করে ছিলাম, ইংরেজি বর্ণমালার 'জে'-এর চেয়ে ইংরেজি বর্ণমালার 'এইচ' অক্ষরটা লেখা অপেক্ষাকৃত সহজ কিনা।

আর এদিকে মাত্র এক সেকেন্ডেই মিসেস জেসুপ-এর মাথার চাপে আমার বুকের বোতামের ঘরে গেঁথে-রাখা ফুলের পাপড়িগুলো একেবারে পিষে গেল।

আর আমি? আমিও হঠাৎ তার মুখের ওপর ঝুঁকে—ধ্যুৎ বাজে কথা। আমি সে কাজটা করিনি।

আমি ঝট করে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

মিসেস জেসুপ আমার আকস্মিক আচরণে রীতিমত হতভম্ব হয়ে গেল।

আমি মিসেস জেসুপ-এর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বললাম—দেখুন, পেইস্‌লি আসার আগে যে আমার পক্ষে এ কাজটা কিছুতেই করা সম্ভব নয় মিসেস জেসুপ। সে আসা পর্যন্ত আমাকে অবশ্যই অপেক্ষা করতেই হবে। আমার বন্ধুত্বের দিক থেকে অসম্মানজনক কোন কাজই আজ পর্যন্ত আমি করি নি, আজও নয়। তাই বলছি কি, আজকের এ কাজটাও আমার পক্ষে অবশ্যই সঙ্গত হবে না।

আমার কথা শুনে মিসেস জেসুপ বিচিত্র এক ভঙ্গীতে আমার দিকে তাকাল। তারপর সে বলল—মিঃ হিক্‌স, এ একটা ফলস্বরূপই আপনাকে আমি বলছি, আপনি এখনই, মুহূর্তের মধ্যে নিচে চলে যান। আর মনে রাখবেন, ভবিষ্যতে কোনদিনই আমার সামনে এসে দাঁড়াবেন না।

কিন্তু মিসেস জেসুপ, দয়া করে বলবেন কি, আপনার এরকম নির্দেশের পিছনে কোন্ কারণ জড়িয়ে আছে?

কারণ একটাই, বন্ধু হিসেবে আপনার মত এত ভাল মানুষ কোনদিনই একজন ভাল স্বামী হওয়ার উপযুক্ত নয়, হতে পারবেও না।

আমার আর জেসুপ-এর মধ্যে এ ধরনের কথাবার্তা চলার মিনিট পাঁচেক পরে সেখানে হিকস এসে হাজির হল। সে এসেই মিসেস জেসুপ-এর পাশে রীতিমত জাঁকিয়ে বসল।

তবে এ-ও সত্য যে, সে পেইস্‌লির বিচার করতেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করবে।

পেইস্‌লি আচমকা আর্তনাদ করে উঠল। সে আর্তস্বরেই বলে উঠল—লেম, আমরা সাত-সাতটা বছর ধরে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ আছি, ঠিক কিনা?

হ্যাঁ, আমাদের বন্ধুত্ব সাত বছরেরই বটে।

তাই বলছি কি, মিসেস জেসুপকে এমন জোরে জোরে চুম্বন করলেই ভাল করতে। বলে রাখছি, আমিও ঠিক ওরকমই করব।

ভাল তো। সে রকম আপত্তি কিছু নেই।

শোন, তুমি যদি আমার সত্যিকারের অভিন্ন হৃদয় বন্ধু হয়েই থাক তবে মিসেস জেসুপকে অমন করে আলিঙ্গন করবে না, বুকে জাপ্টে ধোরো না।

আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকালাম।

সে বলে চলল—তোমার সে কাজটার জন্য খাটিয়াটা অস্বাভাবিক রকম লাফালাফি করে উঠল।

তার কথায় আমার মুখটা যেন লজ্জায় একেবারে এতটুকু হয়ে গেল। তার কথার জবাব দেওয়ার মত ভাষা খুঁজে পেলাম না।

পেইস্‌লি কিন্তু এতেই থামল না। সে বলেই চলল—তুমিই তো প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে প্রতিটা ক্ষেত্রেই আমাকে তোমার সমান অধিকার দেবে, বল নি?

অবশ্যই, এমন শর্তই আমাদের মধ্যে—

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই মিসেস জেসুপ পেইস্‌লির দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল—দেখুন মিঃ পেইস্‌লি, আপনার বহু বায়নাক্কা আমি বরদাস্ত করেছি, আর নয়। আমি চাই, এবার আপনি বোচকা বুচকি নিয়ে এখান থেকে বিদায় হন।

এবার আমি পূর্বরাগের ক্ষতি না করার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে ভাবী বর হিসাবে বললাম—দেখুন মিসেস জেসুপ, মিঃ পেইস্‌লি আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু। আমাদের পরস্পরের মধ্যে কথা হয়েছে সব ব্যাপারেই আমরা সমানে সমানে চলব। আর যতদিন আমার সুযোগ থাকবে ততদিন তাকেও সমান সুযোগই দেব।

কি বলললেন—সুযোগ? তবে এ-ও সত্য যে তিনি মনে করতে পারেন তার একটা সুযোগ এখনও আছে। তবে আমার বিশ্বাস, সে রকম সুযোগের প্রত্যাশা তিনি করবেন না।

আমি সবিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে বললাম—কারণ কি?

কারণ একটাই। আজ একটু আগে তিনি যে আচরণ করলেন তারপর আর তার পক্ষে কোন রকম সুযোগের প্রত্যাশা করা একেবারেই সম্ভব নয়।

এ ঘটনার এক মাস বাদে আমার আর মিসেস জেসুপ-এর বিয়েটা মিটে গেল। বিয়ের কাজ সম্পন্ন করলেন নাসপিনোস-এর মেথাডিস্ট গীর্জার পুরোহিত।

বিয়ের সময় আমরা দু'জন পাশাপাশি দাঁড়ালাম। বৃদ্ধ পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করতে লাগলেন। আর ক্রিয়া কর্মাদিও নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করতে লাগলেন।

আমি তাঁর কাজের ফাঁকে কিছুটা সময় চাইলাম। বৃদ্ধ পুরোহিত আমার দিকে নীরবে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন।

আমি বললাম—আমার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু পেইস্‌লি এখনও এসে পৌঁছোয় নি।

পুরোহিত একটু বিরক্ত হয়েই বলে উঠলেন—কে এল আর এল না তার জন্য কি বিয়ের কাজ—

হ্যাঁ, সে না-আসা অবধি আমাকে যে অপেক্ষা করতেই হবে। একবার যার সঙ্গে সত্যিকারের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে সে চিরকালই বন্ধুই থেকে যায়—এটাই টেলিমেকাস হিক্‌স।

মিসেস জেসুপ আড় চোখে তাকিয়ে আমার কথাগুলো শুনতে লাগলেন। কিন্তু আমার নির্দেশ বা অনুরোধ যা ভেবেই হোক, পুরোহিত মন্ত্র পাঠ-করা বন্ধ করে দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই পেইস্‌লি গীর্জার পাশের রাস্তা দিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হল। তার গায়ে কড়া আস্তিনের একটা জামা।

গীর্জায় পৌঁছেই সে আমাদের কাছে এসে তার বিলম্বের কারণ হিসাবে বলল—আরে, বিয়ে উপলক্ষে সব পোশাকের দোকান অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই আমার পছন্দ মাফিক পোশাক কিছুতেই যোগাড় করতে পারছিলাম না।

আমি বললাম—কিন্তু এ জামাটা তো দেখছি নতুন, কি করে যোগাড় করলে?

আরে আর বোলো না। উপায়ান্তর না দেখে শেষ পর্যন্ত একটা দোকানের পিছনের জানালা ভেঙে কোনরকমে একটা জামা যোগাড় করতে পেরেছি।

কথা বলতে বলতে পেইস্‌লি ওপরে উঠে কনে জেসুপ-এর কাছে দাঁড়াল। পুরোহিত আবার বিয়ের মন্ত্র-পাঠ শুরু করলেন।

আমার কিন্তু এখনও বিশ্বাস, পেইস্‌লি হিসাব করে শেষ সুযোগটা নিয়েছিল। শেষ সুযোগ হিসাবে বৃদ্ধ পুরোহিত ভুল করে তার সঙ্গে বিধবা জেসুপ-এর বিয়েটা দিয়েছেন।

বিয়ের অনুষ্ঠান ভালয় ভালয় শেষ হয়ে গেল। বিয়ের পাট মিটে গেলে আমরা ফল আর মাংস দিয়ে বিয়ের চা-পর্ব সারলাম।

বিয়ের পাট মিটে গেলে বিয়ের আসরে উপস্থিত সবাই এক-এক করে বিদায় নিল।

নিমন্ত্রিত অতিথিরা বিদায় নিয়ে চলে গেলে বন্ধুবর পেইস্‌লি আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে মৃদু ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলল—বন্ধু, তুমি কিন্তু সবই সমান সমানই করেছ, আর তোমার মত একজন বন্ধু পেয়ে আমি যারপরনাই গর্বিত।

আমি তার মুখের দিকে নীরব চাহনি মেলে তাকিয়ে রইলাম। তার কথার কি জবাব দেব ভেবে পেলাম না।

পথের ধারে, মোড়ের কাছে বৃদ্ধ পুরোহিত ছোট্ট একটা বাড়িতে বাস করে। তিনি নিজে গীর্জায় থাকেন। আর বাড়িটা একটা পরিবারকে ভাড়া দিয়েছিলেন। তারা উঠে যাওয়ার পর এখন খালিই পড়ে রয়েছে। আমাদের বিয়ের পাট মিটে যাওয়ার পর সে বাড়িটাকেই তিনি আমাকে আর আমার সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী মিসেস হিক্‌সকে সে রাত্রিটা কাটাবার জন্য ছেড়ে দিলেন।

আমরা আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম, বিয়ের পরদিন সকাল দশটা চল্লিশ মিনিটের ট্রেন ধরে মধু-চন্দ্রিমা উপলক্ষে এল পাসো যাত্রা করব।

সে রাত্রে ঘড়িতে দশটার ঘণ্টা বাজল। আমি বাড়িটার সদব দরজার সামনে বসে পা থেকে বুট জুতা আর মোজা খুলে সবেমাত্র একটু ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় বসেছি, আর মিসেস হিক্‌স ঘরে কাপড় চোপড় গোছাতে ব্যস্ত।

হঠাৎ বাড়ির ভেতরের বাতিটা নিভে গেল।

আমি শুনতে পেলাম, মিসেস হিক্‌স যেন ভয়ার্ত কণ্ঠে আমাকে ডাকাডাকি করছে। কণ্ঠস্বরে কিছুটা অধৈর্যও প্রকাশ পাচ্ছে। সে বলছে—লেম, তোমার কি এখনও আসার সময় হয় নি?

আমি উঠতে উঠতে কণ্ঠস্বরে ব্যস্ততা প্রকাশ করে বললাম—আরে, যাচ্ছি বাবা, যাচ্ছি!

আমি ব্যস্ত-পায়ে ঘরের ভেতরে মিসেস হিক্‌স-এর সামনে গিয়ে বললাম—আরে, আমি কি আর শুধু শুধু বসেছিলাম নাকি? বন্ধু পেইস্‌লির জন্য অপেক্ষা করছিলাম। সে যদি—এ পর্যন্ত বলেই টেলিমেকাস হিক্‌স থেমে গেল। সে উপসংহারে বলল—তখন আমার যেন মনে হল, আমার কানের কাছে দুম্ করে একটা বোমা ফাটল।

শেষ পর্যন্ত বুঝলাম, বোমাটোমা কিছুই নয়। আসলে মিসেস হিক্‌স-এর হাতের মুড়ো ঝাঁটাটা দুম্ করে আমার মাথায় আছড়ে পড়েছে।

হাইজিয়া অ্যাট দ্য সোলিটো

আপনার যদি মুষ্টিযুদ্ধের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু ধ্যান-ধারণা থেকে থাকে তবে অবশ্যই নয়ের দশকের গোড়ার দিকের একটা ঘটনার কথা আপনার জানা থাকত।

একজন দিগ্বিজয়ী বীর মুষ্টিযোদ্ধা আর অন্য এক ভাবী দিগ্বিজয়ী মুষ্টিযোদ্ধা একটা আন্তর্জাতিক নদীর অধিকার নিয়ে মাত্র এক মিনিট কয়েক সেকেন্ডের জন্য তারা পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল।

এমন ক্ষণস্থায়ী একটা যুদ্ধে, বিশেষ করে মুষ্টিযুদ্ধে কারোরই মন ভরে না।

সাংবাদিকরা ব্যাপারটা নিয়ে খবরের কাগজের পাতায় যতই হৈচৈ, যতই আলোড়ন সৃষ্টি করুন না কেন, ব্যাপারটা তো আসলে স্বল্পকাল স্থায়ী।

বিজয়ী বীর মুষ্টিযোদ্ধা তার বিরোধী পক্ষকে ঘায়েল করে তার পিছন দিকে ঘাড়টা ঘুরিয়ে

কেবল বলল—বেচারির কী অবস্থা যে করেছি তা একমাত্র আমিই জানি।

কথাটা ছুঁড়ে দিয়েই সে দস্তানাটা খুলে নেবার জন্য হাতটা বাড়িয়ে দিল।

মুষ্টিযুদ্ধের পরদিন সকালে একদল ধৈর্যচ্যুত পোশাক আশাকে সুসজ্জিত ভদ্রলোককে একটা যাত্রী বোঝাই পুলম্যান গাড়ি থেকে বিরক্তি ভরে হৈ হট্টগোল করতে দেখা গেল।

আর এদিকে পরাজিত বেচারি মুষ্টিযোদ্ধা ম্যাক্গুইরকেও গাড়ি থেকে নেমে টলতে টলতে উঁচু প্ল্যাটফর্মে বসতে দেখা গেল। সে বুকে হাতটা চেপে ধরে অনবরত কাশতে লাগল।

ঠিক তখনই পশু-খামারের কার্টিস রেইডলার সে পথ দিয়ে হেঁটে যেতে লাগল। তার উচ্চতা ছ'ফুট দু' ইঞ্চির কম নয়।

কার্টিস রেইডলার দক্ষিণগামী ভোরের ট্রেনটা ধরে পশু-খামারে যাবে। তাই কাক-ডাকা ভোরেই সে স্টেশনে হাজির হয়েছে।

কার্টিস রেইডলার স্টেশনে পা দিয়েই প্ল্যাটফর্মের এক ধারে যন্ত্রণাকাতর ম্যাক্গুইরকে বিমর্ষমুখে বসে থাকতে দেখে ধীর পায়ে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

মুষ্টিযোদ্ধার দিকে মুহূর্তের জন্য অনুসন্ধিৎসু চোখে তাকিয়ে নিয়ে সে বিদ্রূপের স্বরে বলল—কি হে ভায়া, জব্বর দাওয়াই খেয়েছ, কি বল?

প্রাক্তন মুষ্টিযুদ্ধবিজয়ী বীর এ বিদ্রূপাত্মক কথাটা শুনে আড় চোখে মুহূর্তের জন্য তার দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল।

শেষ পর্যন্ত নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে ক্ষুব্ধ নেকড়ের মত দাঁত খিঁচিয়ে উঠল—হতচ্ছাড়া এখান থেকে ভাগ! ঝুটমুট ঝামেলা করতে এসেছিস কেন? এখনও বলে দিচ্ছি, পাতলা হ।

কার্টিস রেইডলার নীরবে তার দিকে তাকিয়ে রইল। মুষ্টিযোদ্ধা ম্যাকগুইর আগের মত খেঁকিয়ে উঠল—জানিস হতচ্ছাড়া, পুরো একটা বছর আমি রিং-এ পা-ই দিইনি।

আবার—আবারও জোর কাশি উঠল। এবারের কাশিটা তাকে খুবই অস্থির ও দুর্বল করে দিল। সে কোনরকমে একটা বস্তায় হেলান দিয়ে কাশির ধাক্কাটাকে সামাল দিল।

তার কাশির জন্য রেইডলার ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগল। প্ল্যাটফর্মের চারদিকে সাদাটুপি, নাতিদীর্ঘ ওভারকোট, হাঁটুর তলা পর্যন্ত ঝুলে-পড়া ওভারকোট আর লম্বা-লম্বা চুরুটে ছেয়ে ফেলেছে।

রেইডলার উপস্থিত ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীদের ওপর মুহূর্তের জন্য চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল—এরা সবাই বুঝি মুষ্টিযুদ্ধ দেখতে এসেছিল? সবাই উত্তরের বাসিন্দা, তাই না?

ম্যাক্গুইর আগের মতই বীতশ্রদ্ধভাবে বলে উঠল—ধ্যুৎ! মুষ্টি কিসের হে! এটাকে তুমি যুদ্ধ বল, নাকি এরা কেউ বলবে?

তার মানে? মুষ্টিযুদ্ধই হয়ে গেল।

বাজে কথা রেখে বরং বল, হাইপোডারমিক সিরিজের একটা খোঁচা। একটা মোক্ষম ঘুষি হাঁকালাম, ব্যস, এক্কেবারে ধরাশায়ী। হ্যাঁ, যুদ্ধই বটে!

খামারের মালিক কার্টিস রেইডলার হাসিতে ফেটে পড়ার যোগাড় হল। ভেতর থেকে কোনরকমে ঠেলে বেরিয়ে আসা হাসিটাকে কোনরকমে চেপে রেখে বলল—অবশ্যই! অবশ্যই! বিশেষ করে তুমি যে হেরে ভূত হয়ে গেছ।

ক্রোধোন্মত্ত মুষ্টিযোদ্ধা বড় বড় চোখ করে খামারে মালিকের দিকে তাকাল।

খামারের মালিক এবার বলল—বাছাধন, যা হবার তা-তো হবেই। এমন আড়ালে বসে ফোঁস ফোঁস করে ফয়দা তো কিছু নেই। তার চেয়ে বরং এখান থেকে বেরিয়ে কোন ফাঁকা হোটেলে গিয়ে মাথা গোঁজ গিয়ে। আমি বলছি, তোমার বিশ্রাম দরকার।

ধ্যুৎ! এখানে দাঁড়িয়ে বকবক না করে পাতলা হও তো বাপু।

তুমি মিছেই ক্ষোভের অপব্যবহার করছ বীর মুষ্টিযোদ্ধা। তবু আমি বলব, কাশিটা তো জব্বর বাঁধিয়েছ। খুবই খারাপ এ কাশিটার লক্ষণ। আচ্ছা, এরকম কাশি কতদিন যাবৎ তোমার বুকে বাসা বেঁধেছে বল তো?

কাশি? ফুসফুস? ফুসফুসের দফা রফা হয়ে গেছে। হতচ্ছাড়া ডাক্তাররা তো বলেছে ছ'মাসের

আগে এ ব্যামো সারাবেনা, এক বছরও লেগে যেতে পারে। আশা করেছিলাম, নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নিতে পারব।

কিন্তু তারপর?

আরে, আমি তো এতদিন পাঁচে-এক-এর ওপর আস্থা করে বসেছিলাম।

তাই বুঝি? মুচকি হেসে খামার মালিক কথাটা ছুঁড়ে দিল।

মুষ্টিযোদ্ধা আগের মতই খেঁকিয়ে উঠল—অত কথায় তোমার দরকার কি হে বাপু?

পর মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল—তুমি যখন নাছোড়বান্দা তখন বলছি শোন—একে-পাঁচ খেলাটায় জিততে পারলে সে টাকাকড়ি দিয়ে তো ডালসির কাফেটাই খরিদ করে রমরমা কারবার গড়ে তুলতাম হে।

প্রায় কুঁকড়ে বসে-থাকা লোকটার ওপর আর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে খামারের মালিক এবার বলল—বাপু, ঝুঁকিটা একটু বেশীই, মানে সামর্থের বাইরেই নিয়ে ফেলেছিলে। যাক গে, কোন হোটেলে গিয়ে একটু বিশ্রাম নাও গে।

আরে ভায়া, তোমাকে তো বলেছিই, আমি সর্বস্ব খুইয়ে ফিরছি। বর্তমানে মাত্র একটা ডাইস আমার পকেটের কোণায় পড়ে রয়েছে। একবার ইওরোপে কিছুদিন থাকলে, নইলে একটা ডিঙি নৌকা নিয়ে সমুদ্রের বুকে ঘুরে বেড়াতে পারলে ব্যামোটা হয়ত কমে যেত, তোমার মত কি?

এক খবরের কাগজের ফেরিওয়ালাকে দেখে সে হাতে ইশারা করে তাকে কাছে ডাকল। পকেট থেকে ডাইসটা তাকে দিয়ে একটা খবরের কাগজ কিনল। নিজেরই মুষ্টিযুদ্ধের খবর আর সমালোচনা পড়তে লাগল।

খামারের মালিক কার্টিস রেইডলাব এতো অল্পেতে রেহাই দেবার পাত্র নয়। সে মওকা বুঝে ঠোঁট বাঁকিয়ে বলে উঠল—যাক গে, আমার সঙ্গে চল। আমার সঙ্গে খামারেই চল। সেখানেই থাকবে।

খামারে? তোমার সঙ্গে খামারে—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই খামারের মালিক বলে উঠল—হ্যাঁ। খামারেই থাকবে। আরে ভায়া, এক মাস সেখানে থাকলে দেখবে, শরীর ও মন দু'ই চাঙ্গা হয়ে উঠবে।

কথাটা বলেই সে ম্যাক্‌গুইর-এর একটা হাত ধরে টানতে টানতে স্টেশনের দিকে নিয়ে চলল।

খামারের মালিকের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে ম্যাকগুইর বলতে লাগল—আরে, এটা করছ কি? করছ কি শুনি? টাকাকড়ির ব্যবস্থা কি হবে সেটাও তো আমার জানা দরকার।

রেইডলার নিজেকে কিছু সময় ধরে ছাড়িয়ে নেবার ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়ে হাল ছেড়ে দিল।

খামারের মালিক বলল—আরে ধ্যৎ! খালি টাকা-টাকা করছ। তোমার আবার টাকা লাগবে কেন? ওসব চিন্তা আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। দক্ষিণাগামী ট্রেনের বগিতে তারা পরস্পরের মুখোমুখি চলল। অন্য যাত্রীরা দু'-একটা কথাবার্তা একে-অন্যের সঙ্গে বললেও খামারের মালিক কার্টিস রেইডলার আর ম্যাকগুইর উভয়েই নির্বাক। তারা নীরবে পরস্পরের দিকে তকিয়ে রইল। ট্রেনের চাকাগুলো গুরুগম্ভীর আওয়াজ তুলে অনবরত ঘুরেই চলল।

ট্রেনের অন্যান্য যাত্রীরা তাদের মুখোমুখি বসে থাকতে দেখে, দুই বিপরীত মেরুর মিলন দেখে যারপরনাই অবাক হল।

ম্যাক্‌গুইর পাঁচফুট এক ইঞ্চি। মুখের আদলে অনেকটা ইয়োকোহামা ডাব্‌লিন-এর সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ্যিত হয়। আর চোখ দুটো? চকচকে ও গোল গোল। চোয়াল আর গাল রীতিমত শক্ত, কাঠখোট্টা। আর মুখে অসংখ্য দাগ। এ রকম মানুষ যে নতুন এরকম কথা বলা চলে না, আবার অপরিচিতও নয়।

আর খামারের মালিক কার্টিস রেইডলার? সে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের মানুষ। ছ'ফুট দু'ইঞ্চি লম্বা। চওড়া বুক। সে যেন পশ্চিম আর দক্ষিণের মিলনের প্রতীক। সুদর্শন বললেও অত্যুক্তি হবে না।

খামারের মালিক কার্টিস রেইডলার আর ম্যাক্‌গুইর ট্রেনে চেপে দক্ষিণমুখী ছুটে চলেছে। পশু-খামারের মুলুকে।

ট্রেনের কামরার এক কোণে মুখ গুঁজে নীরব চাহনি মেলে কার্টিস রেইডলার-এর কথা শুনছে আর ভাবছে, এ লোকটা তাকে কেন সঙ্গে করে নিজের খামারে নিয়ে চলেছে? কোন্ খেলা খেলার শখ পূরণ করার উদ্দেশ্য নিয়েই তার মত একটা একেবারেই মূল্যহীন বোঝাটাকে সঙ্গে করে নিয়ে চলেছে? একেই কি বলে বিশ্বপ্রেম? হ্যাঁ, বিশ্বপ্রেম ছাড়া একে আর কি-ই বা আখ্যা দেওয়া যেতে পারে?

ম্যাক্গুইর আপন মনে ভেবেই চলেছে—খামারের মালিক কার্টিস রেইডলার নিজে কৃষক নয়। লেখাপড়ায় দিগ্গজ পণ্ডিত। বলা চলে ক-অক্ষর গোমাংস। তবে? লোকটা কি চায়? কি-ই বা তার উদ্দেশ্য?

ট্রেনটা সান এন্টোনিও থেকে একশ মাইল দূরবর্তী রিন্কন স্টেশনে দাঁড়াল। তারা ট্রেন থেকে নামল।

স্টেশনের প্রধান ফটক দিয়ে বাইরে বেরিয়ে তারা সদর রাস্তায় নামল। এখান থেকে তাদের গন্তব্যস্থলের দূরত্ব ত্রিশ মাইল। স্টেশনের বাইরে, সদর দরজার কাছাকাছি কার্টিস রেইডলার-এর জন্য একটা গাড়ি অপেক্ষা করছে।

এ গাড়িটা চড়েই তারা ত্রিশ মাইল পথ পাড়ি দেবে। রাস্তাটা সমতল ভূমির ঘাসে-ঢাকা প্রান্তরের ওপর দিকে এঁকেবেঁকে চলে গেছে।

অনায়াস ভঙ্গীতে তাদের গাড়িটা উল্কার বেগে ছুটে চলেছে। চাকাগুলো অনবরত বনবন্ করে ঘুরছে তো ঘুরছেই। বাতাস-বাহিত মিষ্টি-মধুর গন্ধ এসে তাদের নাকে লাগছে, দেহ-মনে রোমাঞ্চ জাগিয়ে চলেছে।

ম্যাকগুইব নিজের শিরদাঁড়ার ওপর হেলান দিয়ে বসে বাইরে প্রকৃতির ওপর অলস চোখের মণি দুটো বুলিয়ে চলেছে। সে অঞ্চলটাকে একটা মরুভূমি ছাড়া অন্য কিছুই ভাবতে পারছে না। একটা মাত্র চিন্তা ছাড়া আর কোন কথাই তার মনের ওপব প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না।

রেইডলার যত এগোচ্ছে তার মনে একটা অবিশ্বাস যেন ততই দানা বাঁধছে। তার অন্তরের অন্তঃস্থলে একটা চিন্তাই জগদ্দল পাথরেব মত চেপে বসেছে। তার চিন্তাটা কি তাই না? চিন্তাটা হচ্ছে—লোকটার উদ্দেশ্য কি? কি চায় সে? কেন তাকে সঙ্গে করে নিজেব খামারে নিয়ে চলেছে? তাকে দিয়ে কোন্ মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির ধান্ধায় লোকটা তাকে সঙ্গী করেছে? গাড়ির জানালা-পথে বাইরের প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে সে একই চিন্তার শিকার হয়ে নিশ্চল-নিথর ভাবে বসে রয়েছে।

কথাটা খুবই সত্যিই যে, সোলিটো পশু-খামারে নতুন অতিথি আগমনের ব্যাপারটা মোটেই নতুন নয়।

খামারের মালিক কার্টিস রেইডলার বাস্তবিকই এক বিচিত্র প্রকৃতির মানুষ। সহায় সম্বলহীন দুস্থ মানুষ থেকে শুরু করে গৃহপালিত অক্ষম পশু পর্যন্ত যা কিছু তার চোখে পড়ে তাকেই সোলিটো খামারে নিয়ে এসে আশ্রয় দেয়।

পরোপকারব্রতী খামারের মালিক কার্টিস রেইডলার-এর নির্দেশে কোচোয়ান লাগাম টেনে গাড়িটাকে খামারের দরজায় দাঁড় করাল।

কার্টিস রেইডলার তার আশ্রিত সঙ্গী ম্যাক্গুইরকে ছেঁড়া কম্বলের একটা পুঁটলির মত দু'হাতে জাপ্টে ধরে তুলে গাড়ি থেকে নামিয়ে আনল। তারপর এভাবেই তাকে বয়ে নিয়ে খামারের বারান্দায় নামাল।

মালিকের কাজে খামারবাসী কর্মচারীরা মোটেই অবাক হল না। আসলে এ রকম দৃশ্য যে তাদের হামেশাই দেখতে হয়।

ম্যাক্গুইর বারান্দার এক ধারে বসে বিস্ময় মাখানো দৃষ্টিতে চারদিকে তাকিয়ে সবকিছু দেখতে লাগল।

এ তল্লাটে খামার-বাড়িটা একটা উল্লেখযোগ্য বাসস্থান। একশ' মাইল দূরবর্তী অঞ্চল থেকে গাড়ী বোঝাই করে ইঁট এনে বাড়িটার দেওয়ালগুলো গাঁথা হয়েছে। বাড়িটা একতলা। ঘরের সংখ্যা চারটা। চারদিকে মাটির বারান্দা দিয়ে প্রতিটা ঘরকেই ঘিরে দেওয়া হয়েছে।

উঠোনের এখানে-ওখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে গাড়ি, জিন, বন্দুক আর গরু-দাগানোর সামগ্রী। আর ঘোড়া ও কুকুরও বেঁধে রাখা হয়েছে উঠোনের এক পাশে।

শহরবাসী ম্যাক্‌গুইর-এর চোখে এখানকার সবকিছুই যেন কেমন বে-মানান মনে হতে লাগল।

আগন্তুক ম্যাক্‌গুইরকে উৎসাহ দেবার জন্য খামারের মালিক কার্টিস রেইডলার বলল—আমরা সবাই এখানে একই পরিবারের সদস্যের মত মিলে মিশে বাস করি।

ম্যাক্‌গুইর বার-কয়েক কেশে বলল—সে যা-ই হোক, তোমার আস্তানাটাকে দেখে তো নরক ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে উৎসাহ পাওয়া যায় না।

আরে, তুমি যাতে আরামে থাকতে পার সে ব্যবস্থা আমরা করে দেব, ভেবো না। শোন, বাড়ির ভেতরটা দেখে তোমার গা ঘিনঘিন করলেও বাইরেটা কিন্তু তোমার ভালই লাগবে। এখানেই তুমি থাকবে। আমরা সাধ্য মত তোমার চাহিদা পূরণ করতে চেষ্টা করব। তোমার যখন, যা দরকার হবে কোন রকম সঙ্কোচ না করে চাইবে, মনে থাকবে তো?

সে নবাগত অতিথি ম্যাক্‌গুইরকে নিয়ে পূব দিককার ঘরটায় ঢুকল। প্রয়োজনীয় দরজা-জানালা থাকায় ঘরের ভেতরটা খোলামেলা। পর্যাপ্ত আলো-বাতাস আছে। বাতাসে জানালার পর্দাগুলো তিরতির করে উড়ছে।

ঘরের ভেতরে রয়েছে একটা বেতের দোলনা-চেয়ার, দুটো বড়-বড় বেতের চেয়ার, লম্বা একটা টেবিল আর খবরের কাগজ, পাইপ, তামাক, বন্দুক আর কার্তুজ সবই জায়গা মত রাখা আছে।

আর দেওয়ালের গায়ে রয়েছে কয়েকটা হরিণের মাথা আর ইয়া লম্বা হাতলযুক্ত একটা বর্শা। ঘরের প্রায় কেন্দ্রস্থলে একটা চওড়া খাটের ওপর বিছানা পাতাই রয়েছে।

এ অতিথিশালাটাকে নুয়সেস জেলার অধিবাসীরা এটাকে একটা আদর্শ বাসস্থল আখ্যা দিয়েছে।

কিন্তু ম্যাক্‌গুইর আড় চোখে সবকিছু দেখার ফাঁকে পকেট থেকে তার নিকেলকরা মুদ্রাটা বের করে একবার বাজিয়ে দেখে নিল। হাতের মুদ্রাটার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল—এটাই তো আমার শেষ সম্বল।

মুদ্রাটাকে আবার সে পকেটে চালান দিয়ে দিল। তারপর আবার স্বগতোক্তি করল—কিন্তু এখানে থাকা-খাওয়া আর পোশাক-পরিচ্ছদের টাকা কে যোগাবে?

তার আপাদমস্তক একবারটি দেখে নিয়ে খামারের মালিক বলল—শোন ভায়া, ভবিষ্যতে কোন দিন আমার কাছে টাকাকড়ির কথা উত্থাপন না করলেই খুশি হব। এক সময় অনেক কিছুই এখানে ছিল। আমি এখানে নিয়ে এসে যাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছি তাদের একটা কানাকড়িও দিতে হয় না, আর তারা দিতে চায়ও না।

আধ ঘণ্টার মধ্যে কিছু খাবার আর ঠাণ্ডা পানীয় এসে গেল। চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে ম্যাক্‌গুইর বলল—সে ঘণ্টাটা কোথায় গেল?

ঘণ্টা? কোন্ ঘণ্টার কথা বলছ, বল তো?

কোন কিছুর দরকার হলে চিল্লাচিল্লি করব নাকি? ঘণ্টাটা বাজিয়ে দিলেই তো হাতের কাছে সবকিছু পেয়ে যাব। সে ঘণ্টাটাই তো দেখতে পাচ্ছি না।

খামারের মালিক তার কথা শুনে নীরবে মুচকি হাসল।

সে বলে চলল—আমার সাফ কথা শোন, আমাকে এখানে নিয়ে আসার জন্য তোমার হাতে-পায়ে ধরি নি। এমন কি একবার মুখ ফুটে বলিনি পর্যন্ত। আর একটা সেন্টও তোমার কাছে ভিক্ষা চাইনি। উপযাচক হয়ে নিজের দুঃখ-কষ্টের কাহিনীও তোমাকে ভুলেও শোনাই নি। আর তুমি কিনা শহর থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে, এক অন্ধ পাড়া গাঁয়ে আমাকে টেনে আনলে। আমি অসুস্থ। খুবই দুর্বল। নড়াচড়ার ক্ষমতাও যেন হারিয়ে ফেলেছি।

তোমার তো নড়াচড়ার দরকারও নেই। না চাইতেই সবকিছু হাতের কাছে মজুদ পেয়ে যাবে।

ধ্যুৎ! যত্তসব বাজে ব্যবস্থা! এখানে, এই পরিবেশে কোন ভদ্দর লোক থাকে নাকি!

কথাটা বলেই ম্যাক্‌গুইর চৌকিটার ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

খামারের মালিকের ডাকে এক মেক্সিকান যুবক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল।

খামারের মালিক তাকে লক্ষ্য করে বলল—তোমাকে আমি কথা দিয়েছিলাম, রেডিও

জলপ্রপাতের ধারে মান কার্লোস পশু-খামারে তোমাকে 'ভাক্যুয়েরো'-র পদে বহাল করব, তাই না?

হ্যাঁ, সেনিওর, আপনি এরকমই বলেছিলেন বটে।

শোন, এ আগন্তুক আমার প্রিয়জন, বন্ধু। খুবই অসুস্থ—শয্যাশায়ী। তুমি সর্বক্ষণ এর কাছেই থাকবে। ধৈর্য ও যত্নসহকারে এর সেবাযত্ন কোরো। যখন যা দরকার হয় হাতের কাছে যেন পায়। একটু সুস্থ হলেই আমি একে 'ভাক্যুয়েরো'-র বদলে লাস পিয়েদ্রাস-এর 'মেয়র ডোমো' করে দেব ভাবছি।

কথাটা বলেই খামারের মালিক নিজের কাজে চলে গেল। ইয়েলারি ও রেইড্‌লার-এর কাছে রয়ে গেল।

ম্যাক্‌গুইর-এর জন্য ইয়েলারিও কিছু সিগারেট, কিছু গুঁড়ো বরফ, স্নানের জন্য গরম জল, টোস্ট, দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম আর একটা জিন এনে সামনে রাখল।

একটু বাদে ইয়েলারিও ম্যাক্‌গুইর-এর ঘর থেকে বেরিয়ে খামারের মালিক রেইডলার-এর কাছে গেল। তাকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়ে নিবেদন করল—স্যার, ছোট সেনিওর একটা টেলিগ্রাম পাঠাবার কথা আপনাকে বলতে বলেছে।

রেইডলার এক বোতল হুইস্কি তার হাতে দিয়ে বলল—এটা নিয়ে যাও, তাকে দেবে।

সোলিটো পশু-খামারের ত্রাসের রাজত্ব এভাবেই চলতে লাগল। কয়েকদিন ধরে অনবরত গরু-দাগানোর কর্মচারীরা ম্যাক্‌গুইর-এর কাছে আসতে লাগল। তাদের উদ্দেশ্য নতুন আমদানি-করা মালটাকে চোখে দেখা। ম্যাক্‌গুইর এটা নিয়ে খুব হৈ চৈ করল, তীব্র প্রতিবাদ জানাল।

কিন্তু তীব্র প্রতিবাদেও যখন তার চারদিকে গরু-দাগানোর কর্মচারীদের ভিড় কমল না তখন সে ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিল। তাদের কাছে ডেকে ভাব জমাল, গল্প করতে বসল।

একদিন গরু-দাগানোর কর্মচারীদের সামনে বসিয়ে ম্যাক্‌গুইর তাদের বুঝিয়ে বলতে লাগল মুষ্টিযুদ্ধের আইন-কানুন, আঘাত করা আর আত্মরক্ষার যাবতীয় কৌশল। তবে তার কথাবার্তা দুর্বোধ্য ও অশালীন। কিন্তু এতেই শ্রোতাদের বেশী খুশি হতে দেখা গেল। এভাবেই ম্যাক্‌গুইর-এর সামনে এক নতুন জগতের দরজা খুলে গেল।

দেখতে দেখতে দুটো মাস কেটে গেল। এবার ম্যাক্‌গুইর অভিযোগ জানাতে লাগল যে তার অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়ে পড়েছে। তারপর থেকেই সে কল্পলোকের সর্বগ্রাসী এক ঈগল, এক বিষধর খনিদৈত্যের মত সে সর্বদা নিজেকে চার দেওয়ালে ঘেরা খুপরিটার মধ্যে নিজেকে আটকে রাখতে লাগল। আর সে সঙ্গে অনবরত অভিযোগ আর অভিযোগ খামার-বাড়ির পরিবেশকে উত্তাল করে তুলল।

ম্যাক্‌গুইর-এর অভিযোগগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশী করে উচ্চারিত হতে লাগল—তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেন ভুলিয়ে ভালিয়ে তাকে এখানে নিয়ে আসা হল? এ নরকে তাকে এনে ফেলার পিছনে কোন দুরভিসন্ধি রয়েছে? অবহেলা আর আরামের অভাবে আজ সে যমের দক্ষিণ দুয়ারে পৌঁছে গেছে। মৃত্যু তার শিয়রে হাজির।

ম্যাক্‌গুইর তার ক্রমবর্ধমান রোগ ব্যাধির কথা নিয়ে যতই ঘ্যানর ঘ্যানর করুক না কেন অন্য সবার চোখে তার রোগবৃদ্ধির কোন লক্ষণই চোখে পড়ছে না। চোখ দুটোতে শুকনো ফলের মতই উজ্জ্বল চকচকে ঝকঝকে আর নিষ্ঠুরতার ছাপ সুস্পষ্ট। আর কথাগুলোও আগেকার মতই করাতের শব্দের মত শোনায়, আর মুখটা আগেকার মতই নির্বিকার নিস্পৃহ।

আর তার শরীরের দিক থেকেও কোনই পরিবর্তন নজরে পড়ে না। এক নজর দেখলেই মনে হয় শুকনো চামড়ার নিচে খটখটে হাড়গুলো নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে। মাংসের নাম গন্ধও বুঝি তার শরীরে নেই।

ম্যাক্‌গুইর তার সঙ্গী ইয়ালারিও-র জীবনটাকে বরবাদ করে দিতে চলেছে। তবে একমাত্র মেথরডোমো-র পুরস্কার লাভের লোভটাই তাকে এ হতচ্ছাড়াটাকে তোয়াজ করে চলার প্রেরণা যোগাচ্ছে। নইলে সে এরকম বীতশ্রদ্ধ ভাব নিয়ে কাজ করতে অবশ্যই উৎসাহী হত না।

ম্যাক্‌গুইর-এর পিতৃদত্ত জীবনটাকে টিকিয়ে রাখার সবচেয়ে বড় সহায়ক হচ্ছে মুক্ত বাতাস।

কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, তার হুকুম, সর্বক্ষণ দরজা-জানালা বন্ধ রাখতে হবে। আর সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘরটার বাতাস সর্বদা বিষাক্ত হয়ে থাকে। তাই ঘরটার ভেতরে ইয়ালারিও পা দেওয়া মাত্র তার দম বন্ধ হয়ে আমার উপক্রম হয়। আর দম বন্ধ হয়ে আসা এ নরককুণ্ডে বসে তাকে এ হতচ্ছাড়াটার মুখোমুখি বসে তার জীবনের নানা কুকর্মের কাহিনী কেচ্ছা শুনতে হবে। অসহ্য!

এত কিছু সত্ত্বেও সবচেয়ে অসহনীয় ও বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, ম্যাক্‌গুইর আর তার উপকারী ইয়ালারিও-র সম্পর্কটা।

খামারেব মালিক রেইড্‌লার-এর প্রতি এ রুগ্ন, পঙ্গু আর অক্ষম ম্যাকগুইর-এর মনোভাব ছিল মাত্রাতিরিক্ত প্রশ্রয় দেওয়া বাবার প্রতি একটা বিপথগামী পুত্রের মত। রেইড্‌লার খামারের বাইরে কোথাও গেলেই তার বিষণ্ণতা আর নীরবতা যেন কোন্ অতলে ডুবে যায়। সে যেন স্বাভাবিক হয়ে উঠল, কিন্তু সে আবার খামারে পা দেওয়ামাত্র তার খুঁতখুঁতে ভাব প্রকট হয়ে ওঠে। রেইড্‌লার-এর প্রতি আবার খড়্গহস্ত হয়ে ওঠে।

আবাব এ পোষ্যটাব প্রতি খামারের মালিকের মনোভাবটা কিন্তু সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য। তার কথাবার্তা আচার-আচরণে প্রকাশ পায় যে, এ অক্ষম রোগজীর্ণ লোকটার সার্বিক দায়িত্ব যেন তারই ওপর বর্তেছে। অসীম ধৈর্য আর সহানুভূতি দিয়ে তার যাবতীয় ক্ষোভকে সে হাসিমুখে বরদাস্ত করত।

খামারের মালিক একদিন ম্যাক্‌গুইরকে ডেকে বলল— ভরা, আরও বেশী করে মুক্ত বায়ু সেবন কর। একটা কথা তোমাকে বলতে এসেছি, যদি বাইরে কোথাও বেড়াতে যেতে চাও তবে তোমার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করে দেব। আমি চাই তুমি রোজ বিকেলের দিকে কিছুক্ষণের জন্য বেড়াতে বেরোও। তোমাকে সুস্থ করে তুলতে সবচেয়ে বেশী করে দরকার মাটি আর মুক্ত বায়ু। কারণ, এ দুটো উপাদানেই ঔষধিগুণ বর্তমান। আরও উপকার পাবে যদি রোজ কিছু সময় ঘোড়ার পিঠে চেপে ঘুরে বেড়াও। এখানে তেজী টাট্টুও আছে। তুমি চাইলেই পেয়ে যাবে।

খামারের মালিক কথা শেষ করলে ম্যাক্‌গুইর গুলি-খাওয়া নেকড়ের মত খেঁকিয়ে উঠল— আমি তোমার কোন্ পাকা ধানে মই দিয়েছি, বল তো? আমি কি ঘুণাক্ষরেও তোমাকে বলেছিলাম, আমাকে তোমার খামারে নিয়ে চল? আমাকে নিয়ে তোমার যদি তিলমাত্র সমস্যা, মানে অসুবিধে হয়ে থাকে তবে আমাকে এখান থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় কর নতুবা বুকে ছুরি বসিয়ে খতম করে দাও। আর সে সঙ্গে তোমার আপদ বিদায় হবে।

বার দু'-তিন কেশে ম্যাক্‌গুইর আবার বলতে লাগল—ধ্যাৎ! তুমি আমার সঙ্গে রসিকতা করতে এসেছ নাকি হে! যে ভালভাবে বসতে পর্যন্ত পারে না তাকে তুমি বলছ কিনা, ঘোড়ায় চড়ে হাওয়া খেতে! আমি যে একটা পা-ও তুলতে পারি না। আমি এতদিনে সেরে উঠতাম। তোমার এ নরককুণ্ড খামারটাই তো আমার এ হাল করেছে।

কেন? এমন একটা চমৎকার খামারের ওপর তুমি কেন যে এমন বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছ, আমি ভেবেই পাচ্ছি না।

চমৎকার! বলিহারি তোমার রুচিবোধ! এমন একটা নরককুণ্ডকে তুমি বলছ কিনা চমৎকার! নরককুণ্ড!

তা ছাড়া আর কি-ই বা এটাকে বলতে পারি, বল তো? এখানে ভাল-মন্দ খাবার নেই, ভাল পানীয় নেই, দেখবার মত কোন মনোলোভা জিনিস নেই, এমন কি দু'দণ্ড কথা বলার মত একজন মনের মত লোক পর্যন্ত নেই। এমন নরককুণ্ড পৃথিবীতে দ্বিতীয় একটা আছে বলে আমার অন্তত জানা নেই।

কথাটা বলেই ম্যাকগুইর চোখে-মুখে বিতৃষ্ণার ছাপ এঁকে খামারের মালিকের মুখের দিকে বাঁকা-চোখে তাকিয়ে রইল।

তার কথায় রেইডলার-এর মুখটা যেন লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেল।

প্রায় মার্জনা ভিক্ষা করার ভঙ্গীতে সে বলল—আর যাই হোক, জায়গাটা যে শান্ত, খুবই নির্জন-নিরালা তা-তো তুমি অস্বীকার করতে পারবে না।

ধ্যাৎ! অনবরত নিজের সাফাই গেয়ে চলেছে। মুখ বিকৃত করে ম্যাক্‌গুইর প্রায় স্বগতোক্তি করল।

রেইডলার এবার বলল—তুমি আমার প্রতি যতই বীতশ্রদ্ধ হও না কেন, আমার আন্তরিক ইচ্ছা কিন্তু তোমাকে রোগমুক্ত করা। যাক গে, যে কথা বলতে চাচ্ছি—তোমার যখন, যা কিছু দরকার হবে তোমার তত্ত্বাবধায়ক ইয়েলোরি বা এখানকার কর্মচারী-ছেলেদের বললেই তা যে করেই হোক তোমাকে এনে দেবে।

চাড মার্চিসন নামক এক গো-দাগানো কর্মচারীই প্রথম আবিষ্কার করল ম্যাক্‌গুইর মোটেই অসুস্থ নয়। তার অসুখটা পুরোপুরিই ধাপ্পাবাজি ব্যাপার। সে ম্যাক্‌গুইর-এর জন্য ত্রিশ মাইল দূরবর্তী অঞ্চল থেকে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে এক ঝুড়ি ভাল জাতের আঙুর নিয়ে এসেছে।

আঙুরের ঝুড়িটা রেখে ম্যাক্‌গুইর-এর ধোঁয়ায় ভরা ঘরটা থেকে বেরিয়েই সে রেইডলারকে তার সন্দেহের কথাটা গোপনে জানাল।

রেইডলার-এর কানের কাছে মুখ নিয়ে প্রায় ফিসফিসিয়ে চাড বলল—আরে, লোকটার হাতটা এমন শক্ত যে, হীরের চেয়েও নিরেট আর শক্ত। বেয়াড়া ঘোড়ার চাট খাবার চেয়ে অনেক, অনেক বেশী জোরে সে আমাকে মোক্ষম একটা ঘুষি মারল। আসলে লোকটা তোমাকে বোকা বানিয়ে চলেছে। আমি বলছি, সে আমার চেয়েও সামর্থ্য।

খামারের মালিক অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

চাড বলেই চলল—আরে, হতচ্ছাড়াটার ব্যাপার-স্যাপারের কথা বলতে আমার মুখে বাঁধছে, ঘেন্নাও কম করছে না। তবু তোমাকে না বলে পারছি না। বেঁটেখাটো নচ্ছাড়টা দিনের পর দিন তোমাকে টুপি পরিয়ে চলেছে।

খামার—মালিক রেইডলার সহজ-সরল মানুষ। চাড-এর কথাটাকে সে বিশ্বাস করতে পারল না। তবে রেইডলার চাড-এর কথাগুলো মন থেকে ঝেড়ে ফেলে না দিয়ে গোপনে ম্যাকগুইর-এর ওপর নজর রাখতে লাগল। কিন্তু না, তার আচার ব্যবহারে সন্দেহ করার মত কিছুই পেল না।

এক দুপুরে দু'জন অপরিচিত লোক খামারবাড়ির সদর-দরজার সামনে গাড়ি থেকে নামল। সোজা ভেতরে গিয়ে খাবার টেবিলে বসে পড়ল। এ অঞ্চলের রীতিনীতিই এরকম। নিমন্ত্রণ ছাড়াই যে, যখন খুশি খাবার টেবিলে বসে যায়।

আগন্তুকদের মধ্যে একজন কৃতি চিকিৎসক। সান এনোনিও-তে চিকিৎসাবিদ্যা চর্চা করেন। কোন এক ধনী পশু-খামারের মালিকের কঠিন ব্যাধির চিকিৎসা করানোর জন্য তাকে ডেকে আনা হয়েছে। সে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে শয্যাশায়ী।

খাবার টেবিল থেকে উঠল রেইডলাব। চিকিৎসককে এক পাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাব হাতে একটা কুড়ি ডলারের নোট দিল।

রেইডলার এবার চিকিৎসককে বলল—ডাক্তার, আমার খামারে একটা লোক দীর্ঘদিন কঠিন ব্যামোর কবলে পড়ে শয্যাশায়ী। পাশের ঘরেই আছে। আমার ইচ্ছা, আপনি অনুগ্রহ করে তাকে একবারটি দেখুন।

দীর্ঘদিন অসুস্থ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

অসুখটা কি, বল তো?

অসুখটা কি তা জানার জন্যই তো আপনাকে অনুরোধ করছি। তবে মনে হচ্ছে খারাপ ধরনের ক্ষয় রোগ। আপনি পরীক্ষা করে দেখুন, বুঝুন তার রোগটা কি? আর এ পরিস্থিতিতে আমাদের কি-ই বা করণীয় আছে?

চিকিৎসক নাকের ডগায় নেমে-আসা চশমাটাকে আঙুল দিয়ে সামান্য ঠেলে দিয়ে যথাস্থানে তুলে দিয়ে বললেন—আচ্ছা, এই মাত্র যে খাবার খেলাম তার জন্য আমাকে কত দাম দিতে হবে বলুন তো?

রেইডলারকে নীরব দেখে চিকিৎসক ভদ্রলোক তার পিছন পিছন ম্যাকগুইর-এর ঘরে ঢুকলেন।

ম্যাকগুইরকে ওপর ওপর দেখেই চিকিৎসক যন্ত্রচালিতের মত লাফিয়ে উঠে বললেন—মিঃ রেইডলার, আপনি কাকে রোগী বলছেন। এ যে সদ্য ছাপাখানা থেকে বেরনো একটা ডলারের

মতই সুস্থ ও সতেজ।

বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে রেইডলার চিকিৎসকের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইল। তারপর কেটে কেটে উচ্চারণ করল—তার ক্ষয় কাশের রোগ তার ফুসফুস?

তার ফুসফুস আমার ফুসফুসের চেয়ে অনেক, অনেক ভাল।

অন্যান্য পরিস্থিতি?

তার নাড়ির গতি, শ্বাস-প্রশ্বাস আর দৈহিক তাপ প্রভৃতি সবই স্বাভাবিকই দেখছি। কোনদিক থেকেই দুর্বলতার সামান্যতম লক্ষণও নেই।

চোখ দুটো কপালে তুলে, কণ্ঠস্বরে অধিকতর বিস্ময় প্রকাশ করে রেইডলার এবার বলল—ডাক্তারবাবু, আপনি ঠিক বলছেন?

হ্যাঁ, যা বলছি ঠিক তা-ই। তার রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তার নামের পাশে প্রয়োজনে আমার নামটাও বসিয়ে দিতে পারেন। আশ্চর্য ব্যাপার, মাত্রাতিরিক্ত ধূমপান আর দরজা-জানালা বন্ধ করে সর্বক্ষণ এ অন্ধকার কুঠরিতে দিনের পর দিন কাটানোতেও তার এতটুকু ক্ষতি হয় নি।

কিন্তু সে যে খুব কাশে। কাশতে কাশতে দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার যোগাড় হয়—ব্যাপার কি বলুন তো?

মুচকি হেসে চিকিৎসক ভদ্রলোক বললেন—ভাল কথা, তাকে বলে দিন, কষ্ট করে আর কাশতে হবে না। আপনি জানতে চেয়েছিলেন, তার জন্য আপনাদের কিছু করণীয় আছে, কিনা?

হ্যাঁ-হ্যাঁ, তা-তো বলেই ছিলাম।

তাকে বলুন, শুয়ে না থেকে বেয়াড়া ঘোড়ার পিঠে চেপে সকাল-বিকেল পুরো অঞ্চলটা চক্কর মারতে, কোদাল দিতে মাটি কাটুক। কথাটা বলেই চিকিৎসক লম্বা-লম্বা পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে-থাকা গড়িতে গিয়ে বসলেন।

গরু-ঘোড়া দাগানোর সময় চলে এল বলে।

পরদিন ভোরে গরু-দাগানো দলের সর্দার রস হারগিস্ খামারের জনা পঁচিশেক কর্মী নিয়ে কার্লোস অঞ্চলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার জন্য সদর-দরজার কাছে হাজির হয়েছে। কার্লোস থেকে কাজটা আরম্ভ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

গরু-দাগানোর কর্মীরা যে যার ঘোড়ায় চেপে কার্লোস অঞ্চলের উদ্দেশ্যে রওনা হতে যাবে ঠিক তখনই খামারের মালিক রেইডলার তাদের একটু অপেক্ষা করতে বলল।

মিনিট খানেকের মধ্যেই খামারের এক ছোকরা কর্মচারী জিন-পরানো একটা তেজী ঘোড়া এনে রেইডলার-এর সামনে দাঁড় করাল।

রেইডলার ব্যস্ত-পায়ে সামান্য এগিয়ে ম্যাকগুইর-এর দরজায় পৌঁছে দুম্ করে একটা লাথি মেরে দরজাটা খুলে ফেলল।

সে দরজায় দাঁড়িয়ে দেখল, ম্যাক্‌গুইর চিৎ হয়ে শুয়ে, পায়ের ওপরে পা তুলে মৌজ করে সিগারেট টানছে।

খামারের মালিক বেশ কর্কশ অথচ স্পষ্ট স্বরে উচ্চারণ করল—উঠ-উঠে পড়।

সে কী! উঠে পড়ব মানে! আমাকে কি করতে হবে?

উঠে ঝটপট পোশাক পরে তৈরী হয়ে নাও। একটা ঝুমঝুমি সাপকে আমি বরদাস্ত করতে পারি বটে, কিন্তু মিথ্যাবাদীকে আমি অন্তর থেকে ঘৃণা করি। ওঠার কথা কি আমাকে আবার বলতে হবে?

ম্যাকগুইর বিছানা ছেড়ে উঠতে গড়িমশি করছে দেখে রেইডলার তার ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে, ঘাড় ধরে বিছানার ওপর বসিয়ে দিল।

ম্যাকগুইর ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলতে লাগল—আরে ভায়া, এটা করছ কী! ব্যাপার কী। আমাকে কোথায় নিতে চাচ্ছ, কিছুই বুঝতে পারছি না তো? আমি যে অসুস্থ, কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত তা-ও তুমি ভুলে গেছ নাকি? নড়াচড়া করলেই আমার যে কান্না পায় তা কি তোমাকে আমি বলি নি?

রেইডলার তার গলা চড়িয়ে ক্রোধোন্মত্ত বাঘের মত গর্জে উঠল—বাহানা রেখে যা বলছি,

তাড়াতাড়ি কর। ঝটপট তৈরী হয়ে নাও।

নিতান্ত নিরুপায় হয়ে ম্যাক্‌গুইর কাঁপা কাঁপা গলায় তাকে শাপ শাপান্ত করতে করতে জামা-প্যান্ট-কোট পরতে লাগল।

সে তৈরী হতে না হতেই রেইডলার তার হাত ধরে টেনে হেঁচড়ে প্রথমে উঠোনে তার সদর-দরজার কাছে ঘোড়াটার ধারে নিয়ে হাজির করল। তারপর ঠেলে ধাক্কে তাকে ঘোড়ার পিঠে তুলে দিল।

ঘোড়া ছাড়ার মুখে রস হারগিসকে বলল—হতচ্ছাড়াটাকে নিয়ে যাও। কোন একটা কাজে লাগিয়ে দিও। তাকে দিয়ে বেশী কাজ করাবে, খেতে দেবে বেশী, আর ঘুমোতেও বেশী দেবে, খোশ থাকে যেন। এর জন্য আমি যে কত কী করেছি তা-তো আর তোমাদের অজানা নয়। গতকাল শহরের সেরা চিকিৎসক এসে বলে গেছেন এর ফুসফুস গাধার ফুসফুসের মত, আর এঁড়ে বাছুরের মত শরীরটা। একে দিয়ে কি করাতে হবে তা তোমার ভালই জানা আছে।

কথা কটা বলেই খামারের মালিক রেইডলার খামারবাড়ির ভেতরে চলে গেল।

রেইডলার চলে গেলে রস হারগিস-এর দিকে মুখ বাড়িয়ে ম্যাক্‌গুইর খ্যাঁক খ্যাঁক করে বলতে লাগল—নচ্ছাড় কোথাকার! নচ্ছাড়টা বুঝি বলে গেল, আমি সুস্থ—খুব ভাল আছি? আর বলল, আমি তাকে ধাপ্পা দিয়েছি তাই না? তুমি যদি আমার শরীরের অবস্থাটা একটু বিচার-বিবেচনা করে দেখতে। থাক নচ্ছাড়টা যখন বলে গেছে আমি সুস্থ আছি তবে তা-ই হোক, তুমি যে কাজ করতে বলবে, আমি তা-ই করব। চল, আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চাচ্ছ, নিয়ে চল।

কথাটা বলেই ম্যাক্‌গুইর এক লাফে ঘোড়ার পিঠে চেপে বসল।

সবাই যখন সাম কার্লোস থেকে বেরিয়ে গেল তখন ম্যাকগুইর সবার আগে আগে ঘোড়া হাঁকিয়ে চলতে লাগল।

গরু-দাগানো লোকগুলো হৈ হৈ করে ম্যাক্‌গুইর-এর পিছন পিছন যেতে লাগল।

ম্যাক্‌গুইর এক মাইল পথ পাড়ি দিতে না দিতেই কৌশলে সবার পিছনে পড়ে গেল। একটা ঝোপের কাছে পৌঁছে সে ঘোড়াটার লাগাম টেনে তাকে থামিয়ে দিল। নিজের মুখে একটা রুমাল গুঁজে দিল।

একটু বাদে যখন সে রুমালটা টেনে বের করল তখন দেখা গেল, রুমালটা রক্তে ভিজে একেবারে জবজবে হয়ে গেছে। টাটকা রক্ত। রুমালটা পাশের ঝোপের মধ্যে ছুঁড়ে দিল।

রক্তে-ভেজা রুমালটা ঝোপের মধ্যে ফেলে দিয়ে ম্যাকগুইর আবার জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে গরু-দাগানো দলটাকে ধরে ফেলল। সবার পিছন পিছন তার ঘোড়াটা ছুটতে লাগল।

দু'মাস বাদে রেইডলার বাড়ি থেকে ফিরল। পশু-খামারের পা দিয়ে সে থমকে গেল। দেখল, ইয়েলারিও ছাড়া সেখানে দ্বিতীয় কোন প্রাণী নেই। মালিকের অবর্তমানে খামারের কাজকর্ম সে একাই সামাল দিচ্ছে।

খামারের মালিক রেইড্‌লার ইয়েলারিও-র মুখে শুনল, গরু-দাগানোর কাজকর্ম এখনও চলছে। সম্প্রতি ওয়াড়ালুপ উপত্যকার তাঁবুতে থেকে কর্মীরা কাজ করছে।

রেইড্‌লার-এর হঠাৎ ম্যাক্‌গুইর-এর কথা মনে পড়ে গেল। ইয়েলারিওকে জিজ্ঞাসা করল—আরে ভাল কথা। গরু-দাগানোর লোকগুলোর সঙ্গে যে লোকটাকে—ম্যাক্‌গুইরকে পাঠিয়েছিলাম, তার খবর-টবর কিছু জান? সে কি এখনও কাজ করছে, জান কিছু?

আমার ঠিক জানা নেই স্যার। আসলে তাঁবু থেকে খুব কম লোকই এখানে আসে। তাদের বাজে ঝামেলা খুব বেশী বলেই আসার ফুরসৎ পায় না। তবে আমার বিশ্বাস, ম্যাক্‌গুইর হতচ্ছাড়াটা অনেক আগেই মরে হেজে গেছে।

মরে গেছে! তুমি বলছ কী ইয়েলারিও!

স্যার, ম্যাক্‌গুইর লোকটা খুবই অসুস্থ ছিল। এখানেই মরো-মরো হয়ে উঠেছিল। তারপর এখান থেকে যাবার পর খুব কম দিনই সে বেঁচে ছিল বলেই আমি মনে করি। মাস দুইয়ের মধ্যে হয়ত টেঁসে গেছে।

লোকটা তোকেও ধাপ্পা দিয়েছিল, ঠিক কিনা? তাঁর চিকিৎসক তো পরীক্ষা করে বলেছিল,

তার শরীরটা মেস্‌টি গাছের মত শক্ত। তার মধ্যে কোন রোগ ব্যাধিই নেই।

কোন চিকিৎসক? সেই চিকিৎসক তো? স্যার, সত্যি কথা বলতে কি সে চিকিৎসক তো তাকে দেখেনই নি। রোগীকে পরীক্ষা করে তো রোগ সম্বন্ধে মন্তব্য করা দরকার, তিনি তা করেছিলেন কি?

রেইড্‌লার তাকে ধমক দিয়ে বলল—চুপ কর হতচ্ছাড়া! পাগলের মত কী সব আছে বাজে বকছিস। যা জানিস না তা নিয়ে কথা বলবি না।

স্যার, অপরাধ নেবেন না। চিকিৎসক যখন ম্যাক্‌গুইর-এর ঘরে এসে ছিলেন তখন তো সে ঘরেই ছিল না। সে জল খাওয়ার জন্য বাইরে গিয়েছিল। চিকিৎসক আমাকে ধরেই আমার বুকে আঙুলগুলো দিয়ে ঠুকতে শুরু করলেন। ঝট্ করে আমার বুকের ওপর হাতটা রাখল। তাঁর ব্যাপার—স্যাপার দেখে আমি তো অবাক। আমার বুদ্ধিতেই কুললো না। তিনি কেন আমাকে নিয়ে এমন সব অদ্ভুত কাণ্ড করে চলেছেন।

বলছিস কী ইয়েলারিও! পাগলের মত কী সব বলছিস!

না, স্যার, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। চিকিৎসক কি তারপর করেছিলেন বলছি শুনুন—আমার বুকে কান ঠেসে ধরে তিনি কি যেন শোনার চেষ্টা করলেন। কি তার উদ্দেশ্য, আমি কিছুই বুঝতে পারি নি।

তারপর? তারপর কি করলেন?

তাঁর ছোট কাঁচের লাঠিটা আমার মুখে ঢুকিয়ে দিলেন, কিছু বুঝতে পারিনি। ঝট্ করে আমার কব্জির কাছটায় আঙুল রাখলেন, গম্ভীর মুখে কি যেন ভাবলেন।

কি? কি বললে? তোমার কব্জি ধরে—

রেইড্‌লারকে থামিয়ে দিয়ে ইয়েলারিও আবার বলতে লাগল—স্যার, ধৈর্য ধরে শেষ পর্যন্ত শুনলই না। হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম—হ্যাঁ, মনে পড়েছে—তিনি আমার কব্জিটায় আঙুল ঠেকিয়ে গম্ভীরমুখে কি যেন ভাবতে লাগলেন। তারপর অনুচ্চ কণ্ঠে আমাকে গুনতে বললেন—কুড়ি, একুশ, বাইশ—

তারপর মুখ বিকৃত করে বিরক্তি ও তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে উঠলেন—ধ্যুৎ। কিছু পাওয়া গেল না।

মুহূর্তের জন্য নীরব থেকে সে আবার বলতে লাগল—এখনও বুঝতে পারছি না, আমাকে নিয়ে চিকিৎসক এমন সব আজেবাজে কাজে মেতেছিলেন কেন?

রেইডলার-এর মধ্যে অস্বাভাবিক অস্থিরতা লক্ষিত হল। সে ব্যস্ত-কণ্ঠে বলল—ইয়েলারিও, আমার ঘোড়া তৈরী কর।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই রেইড্‌লার ঘোড়া হাঁকিয়ে খামার থেকে বেরিয়ে গেল।

এক নাগাড়ে দু'ঘণ্টা ঘোড়া ছুটিয়ে সে ওয়াড়ালুপ-এর জলাজমির ধারের গরু-দাগানোব কর্মীদের তাঁবুর কাছে পৌঁছে গেল।

তাঁবুতে একমাত্র রাঁধুনি ছাড়া দ্বিতীয় কোন মানুষ নেই। আবার রাঁধুনিও কাজে ব্যস্ত।

রেইডলার তার আগ্রহটাকে সরাসরি প্রকাশ না করে একটু ঘুরিয়ে রাঁধুনিকে জিজ্ঞাসা করল—এখানকার খবরা-খবর কি, সব ভাল তো?

ভাল বটে, তবে ঝড়ে আমাদের খুবই নাস্তানাবুদ করেছিল। চল্লিশ মাইল দূর পর্যন্ত আমাদের ছুটোছুটি করে বেড়াতে হয়েছিল।

তাই বুঝি? গরু-দাগানোর কর্মীরা—ভাল আছে তো?

স্যার, ঝড়ের দাপট সামলে সুমলে যারা বেঁচে গিয়েছিল তারা এখন ভালই আছে।

সে কি, ঝড়ে বেঁচে গিয়েছিল বলতে তুমি কি বুঝতে চাচ্ছ?

কথাটা বলেই সে ম্যাক্‌গুইর-এর কবরের খোঁজে উদ্ভ্রান্তের মত চোখের মণি দুটোকে ঘোরাতে লাগল। ঠিক তখনই একটা শ্বেতপাথর তার মনের কোণে উঁকি মারতে লাগল, আলাবাসার গীর্জার প্রাঙ্গণে ঠিক যেমনটা সে দেখেছিল।

পেট বলল—স্যার—স্যার, 'যারা বেঁচে গিয়েছিল' বলতে দু' মাসে গোয়ালের অনেক

পরিবর্তনই হয়েছে। কিছু তো মারা যাবেই, কি বলেন?

রেইড্লার-এর পা দুটো কাঁপতে লাগল, গলা শুকিয়ে আসতে লাগল। কোনরকমে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে, বার-কয়েক ঢোক গিলে সে এবার বলল—সেই ছেলেটা—সেই যে সে ছেলেটা? ম্যাক্‌গুইর—যাকে আমি পাঠিয়েছিলাম—সে? সে ওকি—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই পেট এবার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল—স্যার, সে এক ভয়ানক লজ্জার ব্যাপার। ছিঃ ছি! তার মত একজন অসুস্থ লোককে কি গরুর শিবিরে পাঠানো উচিত! তার যে একটা পা কবরে ঢুকে গেছে একথা সে চিকিৎসক বোঝে না, তার পিঠের চামড়া তুলে নেওয়া উচিত বলেই আমি মনে করি।

মুহূর্তের জন্য নীরব থেকে পেট আবার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল—স্যার, লোকটা একটা জব্বর খেলোয়াড় বটে!

অধৈর্য হয়ে খামারের মালিক রেইড্লার বলে উঠল—ধানাই পানাই রেখে আসল কথাটা বল।

তবে সে কী কাণ্ড করেছে, বলছি। প্রথম রাতের কথা, তাঁবুতে সচরাচর যা ঘটে—গরু-দাগানোর ছোকরাগুলো তার পিছনে লাগল।

রোগা লোকটাকে রস হারগিসও মোক্ষম একটা ঘুষি মারল। স্যার, ভেবে দেখুন তো সে তখন কি করল? সে তার রোগজীর্ণ শরীরটাকে কোন রকমে সোজা করে দাঁড়াল। তারপর রসকে তার প্রাপ্য মিটিয়ে, মানে মোক্ষম দাওয়াই দিল। একের পর এক মোক্ষম ঘুষি হাঁকতে লাগল।

রস হারগিস কোনরকমে উঠে টলতে টলতে এগিয়ে গিয়ে একটা ঘাসের জমি বেছে নিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল।

একটু বাদে ম্যাক্‌গুইরও সেখানে গিয়ে ঘাসের বিছানায় শুয়ে পড়ল। তার মুখ দিয়ে তখন গল্‌গল্ করে রক্ত পড়ছে।

একনাগাড়ে আঠারো ঘণ্টা সেখানেই পড়ে থাকল। সে নিজে থেকে তো সরলই না, অন্য কেউও সরাতে পারল না।

রস হারগিস-এর স্বভাব সত্যি অদ্ভুত। যে তাকে আচ্ছা মত দাওয়াই দিতে পারে তাকেই সে মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। সে রোগী ম্যাক্‌গুইর-এর পাশে বসে সেবা করতে লাগল। তাকে একটা ভাল তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল।

রস হারগিস আর জনসন উভয়ে মিলে তাকে কাঁচা মাংস আর মদ খাওয়াতে লাগল।

আসলে লোকটার সুস্থ হয়ে ওঠার আগ্রহই ছিল না।

এক রাত্রে ম্যাক্‌গুইর চুপিচুপি তাঁবু থেকে পালিয়ে গেল। সবাই মিলে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিল। শেষ পর্যন্ত একটা মাঠে তাকে পড়ে থাকতে দেখা গেল।

সবাই ছুটোছুটি করে কাছে যেতেই শুনতে পেল ম্যাক্‌গুইর ঘাসের ওপর শুয়ে অনবরত বলে চলেছে—আমাকে ছেড়ে দাও। আমাকে মরতে দাও, আমার ইচ্ছামত মরতে দাও। সে বলে, আমি নাকি ফেরেববাজ, ধাপ্পা দেওয়াই আমার স্বভাব। আমি নাকি মিথ্যাবাদী। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তার সঙ্গে প্রতারণা করেছি। আমার নাকি কিছু হয়নি। অসুখের বাহানা করে আমি নাকি তাকে ধাপ্পা দিয়েছি। আমাকে একা থাকতে দাও। শান্তিতে মরতে দাও।

তারপর? তারপর কি হল?

এখানে, ঘাসের ওপর শুয়েই সে দু'দুটো সপ্তাহ কাটিয়ে দিল। কেউ তাকে এতটুকুও সরাতে পারল না। পাত্তাই দিল না কাউকে।

তার কথাটা শেষ হতে না হতেই পেট অস্থির হয়ে পড়ল। ঝোড়ো বাতাস উঠল। জনা কুড়ি দৈত্যাকৃতি মূর্তি লাফাতে লাফাতে সেখানে হাজির হল।

উপায়ান্তর না দেখে পেট আর্তনাদ করে উঠল—হায়! একী হল! এ যে নাম-করা ঝুমঝুমি সাপের দল তেড়ে এল। তিন মিনিটের মধ্যে রাতের খাবারের বন্দোবস্ত না করতে পারলে হয়ত আমাকেই খতম করে গায়ের ঝাল মেটাবে।

রেইড্লার-এর চোখে একটা বস্তুই ধরা পড়ল। ঘোড়া থেকে নেমে বাদামি মুখের একটা লোক হাসতে হাসতে আগুনের আলোর মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। কিন্তু ম্যাকাগুইর তো দেখতে এমনটা

ছিল না।

মুহূর্তকাল পরে রেইড্লার হাতটা তার কাঁধের ওপর রেখে রেখে বলে উঠল—বাছা, কেমন আছ, বল তো? এর বেশী আর কিছু উচ্চারণ করতে পারল না।

কাঠির মত শক্ত আঙুলগুলো দিয়ে রেইড্লার-এর হাতটা দৃঢ়ভাবে মুঠো করে ধরে গলা ছেড়ে বলে উঠল কেমন আছি? তুমি যা যা বলতে—রেইড্লার বার দু'-তিন নীরবে ঢোক গিলল।

ম্যাক্গুইর আগের মতই গলা ছেড়ে বলল—তুমি বলতে না, মাটির কাছাকাছি থাকা চাই? আমার যা কিছু সবই আমি সেখানে খুঁজে পেয়েছি—স্বাস্থ্য, শক্তি আর শান্তি। আর আমি কিনা এক সস্তা নাটুকেপনার পথে এগোতে যাচ্ছিলাম! তোমাকে অজস্র ধন্যবাদ ভায়া।

রেইড্লার কি বলবে ভেবে না পেয়ে ড্যাবাড্যাবা চোখে তার মুখের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইল।

ম্যাক্গুইর বলে চলল—হ্যাঁ, তোমাকে ধন্যবাদ জানাতেই হয়। কেন, তাই না? আরে ভায়া, তুমি যে আমাকে লাথি মেরে মেরে সেখান থেকে বের করে দিয়েছিলে তার জন্যই তো তোমার ধন্যবাদ প্রাপ্য! একটু ভেবে দেখ, সবই এক-এক করে মনে পড়ে যাবে।

একটু থেমে ম্যাক্গুইর আবার মুখ খুলল—আর দাঁড়কাকের মত দেখতে ওই নচ্ছাড় চিকিৎসকটা, কী মস্করাটাই না সেদিন করল, ঠিক কিনা?

কথাটা বলেই সে ঝক্ঝকে দাঁতের পাটি দুটো বের করে বিশ্রী স্বরে খিলখিল করে হেসে উঠল—আরে, আমি তো জানালা দিয়ে নচ্ছাড়টার কাণ্ডকারখানা সবই দেখেছি। ওই ছেলেটার বুক, পেট আর হাতের কব্জির কাছের শিরা-উপশিরা নিয়ে নচ্ছাড়টা কী নক্সাই না করছিল। তার ব্যাপার দেখে আমি তো হেসেই খুন!

খামারের মালিক রেইড্লার আর মুখ বুজে থাকতে পারল না। সে রাগে গম্গম্ করতে লাগল—হতচ্ছাড়া, সেদিন কেন বললে না যে, চিকিৎসক তোমাকে মোটেই পরীক্ষা করেন নি?

হায়! আমাকে বোকা বানাবে এমন লোক দুনিয়ায় পয়দা হয় নি। তুমি তো তখন আমার কাছে কিছু জানতেই চাও নি। আমাকে কেন যে তুমি সেখান থেকে লাথি-ঝাঁটা মেরে তাড়িয়ে দিলে তা তুমিই জান। আমি মুখ বুজে তোমার দেওয়া শাস্তি মাথা পেতে নিলাম। মুহূর্তে ল্যাটা চুকে গেল।

রেইড্লার খেঁকিয়ে উঠল—ল্যাটা চুকে গেল! একবার মুখ ফুটে—

তাকে মাঝ-পথে থামিয়ে দিয়ে ম্যাক্গুইর বলতে লাগল—ব্যস, এ নিয়ে আর হল্লা করে ফয়দা কি হবে? যাক গে, এবার বল তো, গরু-দাগানোর কাজটা কি ভাল? আমি ঠিক এরকম একটা কাজের ধান্ধাতেই ছিলাম, বিশ্বাস কর। আমাকে এখানে রাখবে তো—রাখবে, বল?

রেইড্লার চোখের তারায় বিস্ময়ের ছাপ এঁকে অদূরে দাঁড়িয়ে-থাকা রস হারগিস-এর দিকে তাকাল।

রস ভাবাপ্লুত কণ্ঠে বলল—ওর কথা আর বলবেন না স্যার। ঠেলাধাক্কা মারতে ওর জুড়ি মিলবে না। যে কোন গরু-দাগানো তাঁবুর ক্ষেত্রে রীতিমত ভয়ঙ্কর!

অ্যান আফটারনুন মিরাকল

আন্তর্জাতিক নদীর সেতুটার যুক্তরাষ্ট্রের দিকের ছোট্ট একটা ঝুপড়ি ঘরে বসে চারজন বনরক্ষী মেক্সিকোর দিক থেকে আসা পিছিয়ে-পড়া একটা যাত্রী-দলের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে গিয়ে অসহ্য গরমে খুব কষ্ট ভোগ করছে।

বাড ডসন নামে একটা লোক, টপ নচ্ সেলুনের মালিক গতরাত্রে অশিষ্ট ব্যবহারের অভিযোগে লিওনার্দো গার্সিয়া নামক এক ব্যক্তিকে জোর জবরদস্তি তার বাড়ি থেকে ঘাড় ধরে বের করে দেয়।

তার নিরাপত্তার যাবতীয় ব্যবস্থা করে ফিরে আসার জন্য গার্সিয়া চব্বিশ ঘণ্টা সময় নেয়।

এ মেক্সিকান লোকটা খুবই আত্মম্ভরি হলেও সাহসীও ছিল যথেষ্ট। তার এ গুণটার জন্যই নদীর উভয় তীরের মানুষই তাকে সম্মান-খাতির করে। সে আর একদল অনুগামী অকুতোভয় যুবকের মজার খেলাই হচ্ছে শহরবাসীদের একঘেয়ে জীবন থেকে রক্ষা করা।

গার্সিয়া প্রতিশোধ নেবার জন্য যে দিনটাকে বেছে নিল সেদিনটাই আবার আমেরিকানরা পশু-খামারের কর্মীদের একটা সমাবেশ, একটা ষাঁড়ের লড়াই, আদি বাসিন্দাদের সমাবেশ আর চড়ুই ভাতির জন্য স্থির করে।

লোকটা যে এক-কথার মানুষ তা-তো আর কারো অজানা নয়। আর তিনটে সামাজিক প্রমোদ-অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত দিনটায় শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখা উচিত এরকম ভেবেও সেখানে প্রহরারত বনরক্ষীদের সর্দার ম্যাক্‌নুল্টি তার এক সহকর্মী আর তিনজন রক্ষীকে সেতুটার একেবারে শেষ প্রান্তে প্রহরায় মোতায়েন রেখেছেন।

রক্ষীদের ওপর কঠোর নির্দেশ ছিল, একা বা সদলবলে হামলা-হুজ্জতি করতে আসা গার্সিয়ার লোকদের আক্রমণ যে করেই হোক প্রতিহত করতে হবে!

সে প্রচণ্ড গরমের বিকেলে যাত্রীর সংখ্যা কমই ছিল।

আর বনরক্ষী-দলও গলা নামিয়ে, অনুচ্চকণ্ঠে কথাবার্তা বলছে। কিন্তু চোখ-কান খোলা রেখে চলেছে।

এক ঘণ্টা সময় পেরিয়ে গেল। ইতিমধ্যে মাত্র একজন যাত্রীই তাদের চোখে পড়ল। একটা বুড়ি। ঠেলাগাড়িতে করে জ্বালানী কাঠ নিয়ে ধীরে ধীরে তাদের সামনে দিয়ে নিজের পথে চলে গেল।

বুড়িটা এগিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ বাদেই তিন-তিনটে গুলি ছোঁড়া হল। শান্ত পরিবেশ আর অনুকূল বাতাসে গুলির শব্দ স্পষ্ট কানে এল।

বনরক্ষী চারজনই হঠাৎ সচকিত হয়ে সোজাভাবে বসে পড়ল। শব্দটার উৎসস্থলের দিকে উৎকর্ণ হয়ে রইল।

কিন্তু বনরক্ষীদের মধ্য থেকে একজন আচমকা খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল। অন্য তিনজন তার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে নীরবে তাকিয়ে থাকল।

তারা তিনজনই তো জানে যে, ভারপ্রাপ্ত লেফটেনান্ট বব বাকলে স্বয়ং সেখানে উপস্থিত। অতএব তিনি থাকতে অন্য কাউকে অনুসন্ধান করতে যাওয়ার জন্য কিছুতেই অনুমতি দেবেন না।

লেফটেন্যান্ট-এর হাসিমাখা মুখে কোনরকম ভাবান্তর লক্ষিত হল না। তিনি নিজের পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়েই মেতে রইলেন পোশাক পরে তিনি ব্যস্ত-পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। সেতুটার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য সতর্ক করে দিয়ে দুপুরের চনমনে রোদের মধ্যে পথে নামলেন।

রক্ষী তিনজন আবার কর্মহীন অপেক্ষায় প্রহর কাটাতে লাগল। কথার ফুলঝুরি ছোটানো ছাড়া আর কোন কিছুতেই তারা উৎসাহী নয়।

সদর রাস্তার দুটো স্কোয়ার পেরিয়ে টপ নচ্ সেলুন। সেলুনটার কাছাকাছি পৌঁছে গণ্ডগোলের কিছু ব্যাপার স্যাপার লেফটেন্যান্ট বাকলে-র নজরে পড়ল। সদর-দরজার সামনে কিছু সংখ্যক

পথচারী গোল হয়ে দাঁড়িয়ে জটলা করছে। বাকলে ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকে বাড ডসনকে দেখতে পেলেন। তার কাঁধে যে একটা পিস্তলের গুলি গেঁথেছিল সে ব্যাপারটাকে সে পাত্তাই দিল না। তবে যে হতচ্ছাড়াটা তাকে গুলি করেছে তার লাশটা ফেলে দিতে পারল না বলে সে চোখের জল ঝরাতে ঝরাতে কেবল আপশোষ করতে লাগল।

বাকলে সমবেদনা প্রকাশ করতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল—লোকটা এখানে ঢুকল কি করে, বল তো?

সে যে গার্সিয়া তা-তো গোড়াতে বুঝতেই পারি নি। একটা মেয়ে মানুষ ভেবে তাকে তাচ্ছিল্য করেছিলাম। মুহূর্তে গর্জন করে সে আমার যে কি হাল করে ছাড়ল নিজের চোখেই তো দেখছেন। শেষমেশ তাকে চিনতে পারলাম।

ব্যস, কাজ হাসিল করেই সে পাশের রাস্তাটা দিয়ে চোখের পলকে গা-ঢাকা দিয়ে দিল।

তার সঙ্গে আর কেউ ছিল, নাকি—

তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল—আরে না—না। একা—একদম একাই ছিল। অতএব অনুমান করা যাচ্ছে, রাত অবধি কোথাও না কোথাও গা-ঢাকা দিয়েই থাকবে।

কেন? রাত অবধি অপেক্ষা করবে কেন?

তার সাকরেদদের জন্য তাকে অপেক্ষা করতেই হবে। ডিপোর নিচের দিকে মেক্সিকানদের পল্লীতে গেলে তার হদিস মিলবে। আর পাঞ্চা সেলেস নামে এক যুবতীও সেখানে থাকে।

বাকলে ভ্রূ কুঁচকে মুহূর্তকাল ভেবে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল—তার সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র কি ছিল, বলতে পার?

মুক্তো-বসানো হাতলওয়ালা দুটো পিস্তল আর একটা চকচকে ছুরি।

নিজের উইনচেস্টারটা তার হাতে গুঁজে দিয়ে লেফটেন্যান্ট বললেন—বিলি, এটা তোমার কাছে রেখে দাও।

বাকলে আবার বীরদর্পে পথ চলতে লাগলেন। সামান্য এগিয়েই গলার মধ্যে কেমন অস্বাভাবিক একটা শ্বাসরোধকারী সঙ্কোচন অনুভব করতে লাগলেন। অসহ্য। দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম।

তার টুপির তলা, দু'কানের কাছ থেকে ঘাম ঝরতে লাগল।

কেন হঠাৎ তার এমন হাল হল? আসলে তার পুরনো মারাত্মক হৃদরোগটা আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। দম বুঝি বন্ধ হয়ে যাবে।

সেদিন মেক্সিকান সেন্ট্রাল-এর ভোরের ট্রেনটা তিন ঘণ্টা দেরী করে হাজির হয়। তাই নদীর অন্য তীরের আই. অ্যান্ড জি. এন. ট্রেনটা তিনি ধরতে পারেন নি।

লস এন্টাডোম উনি ডোস ট্রেনটার দু' দেশের যাত্রীরা অনন্যোপায় হয়ে দো-আঁশলা শহরটার বুকে কিছুটা সময় আনন্দ স্ফূর্তি করার ধান্ধায় পথে নামল।

ট্রেনের যাত্রীদের শহরের বুকে সময় কাটানোর উপযোগী কোন উপায়ই নেই। কাল আগামীকাল ভোরের আগে এ শহর ছেড়ে যাবার মত কোন ট্রেনই নেই।

কিন্তু কথা হচ্ছে, ওদিকে, আর দু'দিন বাদেই সান-এন্টোন-এর মেলা আর ঘোড়-দৌড় শুরু হয়ে যাবে। আর তখনই সান-এন্টোন হয়ে উঠবে লোকে লোকারণ্য। তামাশা দেখার জন্য কত কৌতূহলী মানুষ যে সেখানে এসে ভিড় করবে তার হিসাব মিলবে না। কয়েকটা দল ইতিমধ্যেই সেখানে পৌঁছে গেছে, আর কয়েকটা দল পথে আছে, শহরের দিকে দ্রুত-পায়ে এগোচ্ছে।

ছোট-ডিপোর প্রধান ফটকের পাশের রাস্তার ধারে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রাইভেট গাড়ি। মেক্সিকান ট্রেনটা গাড়িটাকে এ ডিপোতে রেখে গেছে। আগামীকাল ভোরের আগে এটাকেও নিশ্চল-নিথরভাবে এখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

এক সময় অন্য দশটা গাড়ির মতই এ গাড়িটার হালও ছিল। আজ খোল-নলচে পাল্টে এর রূপের আমূল পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে।

আর তার গায়ে স্পষ্ট করে লেখা হয়েছে—আলভারিটা অর্থাৎ সর্পরানী। রানীসাহেবা গাড়িটার মালিক। মেক্সিকোর নাম করা শহরগুলোকে মাতিয়ে দিয়ে এবার তার লক্ষ্য সান এন্টোনিও মানুষের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করবে। ট্রেনে গোলযোগের জন্যই গাড়িটাকেও পুরো একটা দিন ও রাত্রি

জঘন্য এ শহরটার বুকেই অতিবাহিত করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

গাড়িটার সামনের দরজা সপাটে খোলা। একটা পর্দা দিয়ে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। সামনের অংশটাকে অভ্যর্থনা কক্ষ হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। সেখানে সাংবাদিক ও অনুগামীদের ভিড়।

আব্রাহাম লিঙ্কনের একটা ছবি দেওয়ালে শোভা পাচ্ছে। অন্য সব ছবির মধ্যে একটায় একদল স্কুলের ছাত্রী আর অন্যটায় ইস্টার লিলির একটা তোড়া।

গাড়ির পর্দাটা সরিয়ে এক মহিলা ভেতরে ঢুকে এল। মাঝ-বয়সী মহিলা। তার এক হাতে অর্ধেকটা খোসা-ছাড়ানো একটা আলু আর অন্য হাতে একটা সব্জী-কাটার ছুরি দেখা যাচ্ছে।

মহিলা ভেতরে ঢুকেই বলল—আল্‌ভারি, একটা কথা ছিল। তুমি খুব ব্যস্ত নাকি?

আমি কাগজে চোখ বুলাচ্ছি, আশ্চর্য ব্যাপার। বাঁদরমুখী মার্টিন্‌ভা নাকি দেশের সেরা সুন্দরী নির্বাচিত হয়েছে, পুরস্কারও পেয়ে গেছে, ভাবা যায়।

ধ্যুৎ! এটা একটা বিচার হল নাকি। আল্‌ভারি, আমি হলফ করে বলতে পারি, তুমি বাড়ি থাকলে বিড়ালের ভাগ্যে কিছুতেই শিকে ছিঁড়ত না—হতচ্ছাড়ি হত দেশের সেরা সুন্দরী, অসম্ভব!

মুহূর্তকাল নীরবতার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে মাঝ-বয়সী মহিলাটি আবার মুখ খুলল—যাক গে, আমি ওই প্রসঙ্গে কথা বলতে আসিনি।

আল্‌ভারি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—কি, তবে কি কথা বলতে এসেছ মা?

একে দেশময় ঘুরে ঘুরে সাপের খেলা দেখিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি তার ওপর আবার বড় সাপটা কোন্ সুযোগে কেটে পড়েছে। গাড়িটার প্রতিটা কোণা পর্যন্ত তন্নতন্ন করে খুঁজেছি, কিন্তু কোথাও তার টিকির নাগালও পেলাম না।

তাই নাকি? সেটা কতক্ষণ আগে পালিয়েছে বলে তুমি অনুমান করছ।

এক ঘণ্টার কম নয়। মনে হচ্ছে, ঘণ্টা খানেক আগে সেটাকে মেঝেতে খস্‌খস্ আওয়াজ করতে শুনেছিলাম।

মেঝেতে আওয়াজ শুনেও তখন ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামালে না মা!

আরে, আমি তো আবার ভেবেছিলাম তুমি বুঝি টের পেয়ে ওটাকে ধরে ফেলেছ আল্‌ভারি।

আল্‌ভারি হাতের কাগজটা সশব্দে টেবিলে ছুঁড়ে ফেলে বলে উঠল—উফ!। আমি বুঝতে পেরেছি, যত দোষ ওই বুড়োটার। এবার নিয়ে তৃতীয়বার হল ওটা পালাল। আশ্চর্য ব্যাপার! জর্জ কিছুতেই বাক্সের ঢাকনাটা বন্ধ করবে না। বারবার বলা সত্বেও—

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মহিলাটি এবার বলল—হাজারবার ওকে একই কথা বলা হয়েছে। তারপর এর আগে দু'-দু'বার সাপটা পালিয়ে যাওয়াতেও হতচ্ছাড়া জর্জ-এর কানে জল ঢুকল না।

আমার কিন্তু বিশ্বাস, জর্জ ক্যাকু'কে যমের চেয়েও বেশী ভয় করে। চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে এবার বলল—এবার দেখছি, আমি নিজে না বেরোলে আর চলছে না।

দেখ, কাজটা যত তাড়াতাড়ি করা যায় ততই মঙ্গল। নইলে কে, কখন তাকে আঘাত করে বসবে, তার কোন ঠিক আছে।

আল্‌ভারি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে বলল—সে রকম কোন আশঙ্কাই নেই। ক্যাকু'কে দেখতে পেলেই প্রাণ হাতে নিয়ে সবাই ব্রোমাইড কেনার অজুহাতে যে যেদিকে পারবে, ছুটে পালাবে। তুমি কি বল?

হ্যাঁ, কথাটা সত্যি বটে। কিন্তু ওকে কোথায় খুঁজতে যাবে?

স্রোতের জল পাস করায় গত দু'বছরই ঝর্নার কাছে চলে গিয়েছিল। সেখান থেকেই ওটাকে ধরে এনে আবার বাক্সবন্দী করেছিলাম।

মিনিট কয়েক পরেই আলভারি সাপের খোঁজে বেরোবার জন্য প্লাটফর্মে পা দিল। তার গায়ে অত্যাধুনিক ফ্যাশানের একটা স্কার্ট। হঠাৎ করে দেখলে মনে হয় বুঝি বা বিজ্ঞাপনের মডেল। মাথায় এক রাশ কোঁকড়ানো চুল। তার ওপরে একটা পুরুষালি টুপি চাপানোর ফলে সব মিলিয়ে তার রূপ-সৌন্দর্য অনেকটা খোলতাই হয়েছে।

আল্‌ভারি-র মা তাকে প্রশ্ন করল—তুমি এই যে যখন তখন একা বাইরে বেরিয়ে যাও, তোমার ভয় করে না? চারদিকে কত লোক বাজে ধান্ধায় ঘুরে বেড়ায়, বলা যায়—

মায়ের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আল্‌ভারি বলে উঠল—কই মা, আজ পর্যন্ত এমন কিছু তো চোখে পড়েনি যাকে সমঝে চলা দরকার, ভয় করা চলে। বিশেষ করে মানুষ, তার ওপর আবার পুরুষ মানুষ।

আল্‌ভারি-র মা তার দিকে নীরবে আড়-চোখে তাকাল।

আল্‌ভারি মুচকি হেসে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল—মা, তুমি কেন যে এমন কপালের চামড়ায় ভাঁজ এঁকে, ভ্রূ কুঁচকে তাকাচ্ছ, আমার মাথায় আসছে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার, পলাতক হতচ্ছাড়াটাকে খুঁজে বের করে আমি ফিরে এলাম বলে।

পথের কাছাকাছি ঘাসহীন, ধুলো-ভরা সাপের আঁকা-বাঁকা চলার চিহ্ন আল্‌ভারিটার নজরে পড়ল।

উন্মুক্ত প্রান্তরটা পেরিয়ে, ডিপোর গা-ঘেঁষে এগিয়ে গিয়ে সাপের চলার আঁকাবাঁকা চিহ্নটা ঝর্নার দিকে এগিয়ে গেছে।

পরিস্থিতিটা শান্ত ও স্বাভাবিক লক্ষ্য করে আল্‌ভারিটা নিঃসন্দেহ হলে যে, এ অঞ্চলের বাসিন্দারা এখন পর্যন্ত তাদের হিংস্র বিষধর অতিথিটার মুখোমুখি হওয়া তো দূরের ব্যাপার দেখা পর্যন্ত পায় নি।

আলভারিটা আরও কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে দেখল, বালির ওপরেও সাপের চলার আঁকাবাঁকা চিহ্ন সুস্পষ্ট।

তার মনে আর কিছুমাত্রও সন্দেহ রইল না যে, ঝর্নার জলধারার আকর্ষণেই সাপটা ছুটে এসেছে। নির্ঘাৎ ধারে কাছে কোথাও না কোথাও সে ঘাপ্‌টি মেরে রয়েছে।

এরকম বিশ্বাসের ওপর আস্থা রেখে সে আর বেশী দূর না গিয়ে একটা ঝাঁকড়া উইলো গাছের তলায় বসে পড়ল। উদ্দেশ্য একটু বিশ্রাম করে ক্লান্তি দূর করে নেওয়া।

গাছটার তলায় বসে সে অলস-হাতে মাথা থেকে টুপিটা খুলে মাটিতে রাখল। তারপর লম্বা চুলগুলো টেনে দু'ভাগ করে বেণী বাঁধল।

আলভারিটা যে গাছটার তলায় বসে তাব ঠিক পাঁচ গজ দূরে একটা ঝোপের আড়াল থেকে রত্নের মত উজ্জ্বল দুটো গোলাকার বস্তু অন্তরাল থেকে এক দৃষ্টে তাকে দেখতে লাগল। অত্যুজ্জ্বল দুটো চোখ। সেখানেই ঝোপের ফাঁক দিয়ে উঁকি দেওয়া এক টুকরো রোদে কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে রয়েছে তার বাঞ্ছিত ময়াল সাপ ক্যাকু। তার উপস্থিতি টের না পাওয়া যায় এমন কোন আওয়াজ না করে ময়াল সাপটা তার মনিবটিকে চোখে-চোখে রাখছে।

এদিকে গড়িতে দীর্ঘ-সময় ধরে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ায় আল্‌ভারিটা এখানে গাছের ছায়ায়, ফুরফুরে বাতাসে, স্রোতস্বিনী ঝর্নার সোঁদা গন্ধ আর শরীর মাটি আর পাথরের স্পর্শ পাওয়ায় দেহ-মন রোমাঞ্চে ভরপুর হয়ে উঠেছে।

আবার অতিকায় ময়াল সাপটা ভাবছে অচিরেই তার মনিবানি তাকে দেখতে পেয়ে গাড়ির ছোট্ট বাক্সটায় ভর্তি করে বাড়িতে নিয়ে যাবে। অতএব যতক্ষণ মুক্ত পরিবেশে কাটানো যায়।

আল্‌ভারিটা ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে বাতাসে চোখ দুটো বন্ধ করে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় পুরো আরামটুকু উপভোগ করছে ঠিক তখনই পাথরের টুকরোর ঠোকাঠুকি আওয়াজ শুনতে পেল। সে যন্ত্রচালিতের মত দ্রুত সোজা হয়ে বসে চোখ মেলে তাকাল।

অনুসন্ধিৎসু নজর মেলে এদিক-ওদিক তাকাতেই তার চোখে পড়ল এক মেক্সিকান পুরুষ তার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে। রীতিমত দশাসই তার চেহারা। দেখে মনে হল অমিত শক্তিধরও বটে। অবাঞ্ছিত মেক্সিকান পুরুষটার চোখে দুঃসাহসী পাপদৃষ্টি।

পুরুষটা নীরবে ঠোঁটের কোণে কুচক্রীর হাসি ফুটিয়ে তুলে অপলক চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

মুহূর্তকাল পরে আগন্তুক মেক্সিকান পুরুষটা মুখ খুলল—সেনিওরিটা, বিশ্বাস কর, তোমাকে আঘাত করার তিলমাত্র ইচ্ছাও আমার নেই। অতএব আমার দিক থেকে তোমার ভয়ে কিছুই নেই।

তুমি তবে কথা দিচ্ছ, আমাকে আঘাত করবে না?

হ্যাঁ, কথা দিচ্ছি, অবশ্যই তোমাকে আঘাত করব না। কিন্তু-কিন্তু—

কিন্তু, কি?

মানে একটা চুমু খেতে যদি দাও তবে—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই আল্‌ভারিটা গর্জে উঠল—নচ্ছাড় কাঁহাকার। যাও, এখান থেকে কেটে পড়। কাল মানুষটার শখ দেখে গা জ্বলে যায়। ভাগ—কেটে পড় বলে দিচ্ছি।

'কালো মানুষ' কথাটা কানে যেতেই মেক্সিকান পুরুষটা গুলি খাওয়া নেকড়ের মত গর্জে উঠল—তুমি-তুমি এক নীচ ভদ্রমহিলা! আমি আ-ফ্রি-কা-ন নই। এরকম উক্তির জন্য তোমাকে উপযুক্ত মূল্য দিতে হবে। তোমার—তোমাকে—

কথাটা শেষ না করে সে দ্রুত পা দুটো আগে বাড়াল। তাকে এগোতে দেখেই আল্‌ভারিটা চোখের পলকে একটা পাথরের টুকরো তুলে তার বুকটা লক্ষ্য করে সজোরে ছুঁড়ে দিল।

পাথরটা তার বুকে আঘাত লাগতেই কালো মানুষটা টলতে টলতে কয়েক পা পিছিয়ে গেল।

চোখ তুলে তাকানোমাত্র এমন একটা একেবারেই অভাবনীয় দৃশ্য তার চোখের সামনে ভেসে উঠল যার ফলে মেয়েটার প্রতি লালসাটুকু নিঃশেষে তার মন থেকে উবে গেল।

সজাগ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে সে দেখল, কুড়ি গজ দূর থেকে লালচে বাদামি কোঁকড়ানো ঝাঁকড়া চুলের রাশি মাথায় নিয়ে এক সুঠামদেহী মানুষ তার দিকে লম্বা-লম্বা পদক্ষেপে তার দিকে এগিয়ে আসছে।

মেক্সিকান কালো মানুষটার কোমরে ঝুলছে অস্ত্রবিহীন দুটো খাপ। একটা পিস্তলের আর অন্যটা ছুরির খাপ। অস্ত্র দুটো খুলে একটা পাথরের ওপর রেখে বিশ্রাম করছিল। রূপসী তন্বী যুবতী আল্‌ভারিটাকে আচমকা দেখেই তার রূপের আকর্ষণে উদ্ভ্রান্তের মত ছুটে এসেছে। বিপদের সম্বল অস্ত্র দুটো সেখানেই পড়ে রয়েছে।

বিশালদেহী লোকটাকে এগিয়ে আসতে দেখেই স্বভাব বশতঃ সে ঝট্ করে কোমরের খাপের কাছে হাতটা চালান করে দিল। কিন্তু হাতে আগ্নেয়াস্ত্রটা ঠেকল না। তাই নিতান্ত হতাশ দৃষ্টিতে ধাওয়ান শত্রুর দিকে তাকিয়ে রইল।

তার অসহায় অবস্থায় প্রত্যক্ষ করে নবাগত বিশালদেহী লোকটা নিজের কোমর থেকে আগ্নেয়াস্ত্র দুটো সমেত বেল্টটা খুলে পাশের পাথরের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায় বীরদর্পে এগোতে লাগল।

আলভারিটা জ্বল্‌জ্বলে চোখে নবাগত আগন্তুক বীরপুরুষটাকে লক্ষ্য করে সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল—চমৎকার! চমৎকার!

নবাগত দীর্ঘদেহী যুবা পুরুষটি আর কেউ নয়, সে স্বয়ং বব বাক্‌লে। সে বীরদর্পে শত্রুর দিকে এগোতে লাগল। কিন্তু দীর্ঘদিনের ভয়-ডর হঠাৎ তার মধ্যে সজাগ হয়ে উঠল। অনিবার্য ভীতি তাকে গ্রাস করে ফেলল।

তার প্রায় বন্ধ হয়ে আসা শ্বাসনালীর ভেতর দিয়ে নিঃশ্বাস যেন বাঁশির মত করুণ সুরে বেরোতে আরম্ভ করল।

আর? তার পা দুটো ক্রমে সিসার মত ভারি ও অচল হয়ে আসতে লাগল। মুখের ভেতরে জিভটা যেন শুকিয়ে কাঠের মত অসার হয়ে আসছে। শিরা-উপশিরা দিয়ে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে আসায় তার হৃৎপিণ্ডটা দাপাদাপি শুরু করে দিয়েছে।

বব বাক্‌লে কিন্তু তবু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল না। মজ্জাগত অহঙ্কার বশেই সে ধীর-পায়ে এগিয়েই যেতে লাগল।

উভয়ের ব্যবধান ক্রমেই কমে আসতে লাগল।

মেক্সিকান কালো মানুষটা স্থাবরের মত একই জায়গায় প্রতিপক্ষের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল।

উভয়ের মধ্যে দূরত্ব কমতে-কমতে যখন মাত্র পাঁচ গজে এসে ঠেকেছে তখন ওপর থেকে আচমকা বৃষ্টির মত বেশ কয়েকটা পাথরের টুকরো এসে বনরক্ষী বব বাক্‌লের পায়ের কাছে পড়ল। স্বাভাবিক সতর্কতা বশতঃ সে হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে ওপরের দিকে তাকাল। উজ্জ্বল অগ্নিময় দুটো

কালো চোখের দৃষ্টি বব বাক্‌লের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করল। সমগ্র রিওব্রাভো মুল্লুকের সর্বাধিক ভীত-সন্ত্রস্ত হৃদয় ও সর্বাধিক সাহসী হৃদয় এক নীরব ও অভাবনীয় যোগসূত্র একত্রে বাঁধা পড়ে গেল। লক্ষণীয় ব্যাপারই বটে।

আল্‌ভারিটা এখন ঝোপের আড়ালে, গাছটার তলায়ই দাঁড়িয়ে। বুক সমান উঁচু ঝোপের ওপর থেকে কেবল তার মুখটা দেখা যাচ্ছে। তার একটা হাত আল্‌তো ভাবে বুকের কাছে রেখে দিয়েছে। তবে তার এ অবস্থাটা দূর থেকে চোখে পড়ছে না।

তার চোখের তারায় জমাট-বাঁধা বিস্ময়ের ছাপ। বাক্‌লের মুখের দিকে নিষ্পলক চোখে সে তাকিয়ে।

এমন একটা একেবারেই অভাবনীয়, অলৌকিক ঘটনা কিভাবে ঘটল এরকম প্রশ্ন করে যেন আবার নাকাল করার চেষ্টা করবেন না, আর কিছু একটা অনুমানও যেন করে বসবেন না।

চার চোখের মিলনের মাধ্যমে যুবকটা তার পৌরুষের সম্মান পেল। তার নিজেকে দেউলিয়া করে সে যে অমূল্য সম্পদ লাভ করল সেটাকে সে নিজের অন্তরের অন্তঃস্থলে সংগোপন রাখল।

মেক্সিকান কালো মানুষটা অনন্যোপায় হয়ে তার মোজার ভেতর থেকে একটা ঝকঝকে চকচকে ছুরির ফলা হেঁচকা টানে বের করে মুঠো করে ধরল।

তার হাতের ছুরির ফলাটার দিকে তাকিয়ে বব বাক্‌লে খুশি-হওয়া স্কুলের পড়ুয়ার মত সরবে হেসে উঠল। পরমুহূর্তেই সে সজোরে একটা লাফ দিয়ে সামনের পাথরের চাঁইটার ওপর গিয়ে দাঁড়াল। আর গার্সিকাও বীরদর্পে তার পথ রোধ করল।

পরস্পরের দিকে আগুয়ান মেক্সিকান কালো মানুষটা নিয়ম অনুযায়ী নিম্নমুখী আঘাত না করে হাতের ছুরির ফলাটা দিয়ে প্রতিপক্ষকে ছোট্ট করে একটা আঘাত করল।

বাক্‌লেও নিষ্ক্রিয় থাকল না। মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করে বাক্‌লেকে একটা ঝুঁকি নিতেই হল। সে প্রতিপক্ষকে সজোরে একটা ঘুষি হাঁকাল। আকস্মিক আঘাতটা সহ্য করতে না পেরে গার্সিয়া একেবারে ধরাশায়ী হয়ে পড়ল। অদূরবর্তী ঝোপের মধ্যে সে ছিটকে পড়ল।

বনরক্ষক বব বাক্‌লে ঘাড় ঘুরিয়ে সর্পরানী আল্‌ভারিটার দিকে তাকাল।

চোখে-মুখে হাসির প্রলেপ মাখিয়ে আলভারিটা উত্তাপ-উদ্দাম ঝর্নার মত লাফাতে লাফাতে ক্রমে নিচে নেমে আসতে লাগল।

বনরক্ষক বব বাক্‌লে ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বলল—বরাত ভাল যে, সময় মত আমি হাজির হতে পেরেছি।

এই যে মশাই, আপনি কিন্তু আমাকে জব্বর ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন। অনুচ্চ কণ্ঠে রূপসী যুবতী আল্‌ভারিটা বলল।

একটু আগেও ঝোপের ভেতর থেকে ময়াল সাপটা যে হিস্‌ হিস্‌ শব্দ করছিল এখন আর তা মোটেই শোনা যাচ্ছে না।

কেন? অতিকায় সাপটা হঠাৎ এমন মিইয়ে গেল কেন? হয়ত বা এ-ও হতে পারে, যে যুবতীকে সে এতদিন নিষ্কল্প-নিষ্কলঙ্ক বলে মনে করে এসেছে আজ চোখের সামনে তার এমন অধঃপতন দেখে সে মর্মাহত হয়েছে, থমকে গেছে। এ কারণেই হয়ত তার কণ্ঠ রোধ হয়ে গেছে।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই পৌর-কর্তৃপক্ষের কর্মীরা ছুটতে ছুটতে সেখানে হাজির হল।

লেফটেন্যান্ট শান্তি-ভঙ্গকারী ভূপতিত প্রায় সংজ্ঞাহীন গার্সিয়াকে তাদের হাতে সঁপে দিল।

পৌরকর্মীরা তার সংজ্ঞাহীন দেহটাকে টেনে হিঁচড়ে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে শহরের দিকে নিয়ে চলল।

আর বব বাক্‌লে ও আল্‌ভারিটা? তারা সেখানেই রয়ে গেল। অন্যান্যরা বিদায় নিলে তারা নির্জন-নিরালা ঝর্নার ধার দিয়ে ধীর-পায়ে হাঁটতে লাগল।

একসময় বিদায়ী সূর্যটা পশ্চিম-আকাশের গায়ে হেলে পড়ল। একটু বাদেই প্রকৃতির বুকে নেমে এল আলো-আঁধারীর খেলা। পাহাড়ী নালাটাও হাল্কা অন্ধকারে ঢেকে গেল।

আল্‌ভারিটা হঠাৎ বিকট আর্তনাদ করে এক লাফে দু'পা সরে গেল।

বব বাক্‌লে সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে ফেলল। নইলে সে হয়ত পথের মাঝে এলিয়েই

পড়ত। কে? কোন্ বস্তু সর্প-রানীর জীবনের অবসান ঘটাতে যাচ্ছিল?

বব বাক্‌লে অনুসন্ধিৎসু নজরে এদিক-ওদিক তাকাতেই চোখে পড়ল একটা শুঁয়োপোকা অনেকগুলো পায়ে ভর দিয়ে রাস্তা পার হচ্ছে। ছোট্ট অথচ কদর্য ও বীভৎস চেহারার ইঞ্চি দুই লম্বা একটা শুঁয়োপোকা।

সত্যি—সত্যি ক্যাকু, আজ তুমি এতদিনের অত্যাচারের প্রতিশোধ নিলে।

এভাবেই সর্প-রানী স্বেচ্ছায় পদ থেকে সরে দাঁড়াল—সর্প-রানীর জয় হোক!

বাপিড অ্যা লা ক্যারটে

জেফ পিটার্স মেয়েদের স্বভাব প্রকৃতি বিষয়ে নিজের অভিমত প্রকাশের পর আবার মুখ খুলল—মেয়েদের প্রকৃতি সর্বদাই বৈচিত্র্যময়। তোমার কাছে যা নেই সেটাই তার দরকার। কোন একটা জিনিস যত বিরল সেটা পাবার জন্যই তার আগ্রহ তত বেশী। যে বস্তুর কথা সে কোনদিন শোনেওনি সেটাই তার পছন্দ, পাবার জন্য আগ্রহান্বিতা।

কথা প্রসঙ্গে সে এ-ও বলল—এটাকে আমার দুর্ভাগ্যই বলা চলে যে অন্য অনেক মানুষের চেয়েই আমি যে কোন বিষয়কে একটু তলিয়ে দেখতে আগ্রহী।

বিভিন্ন কাজের তাগিদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সব শহরেই আমি ঘুরে বেড়িয়েছি। ভাল-মন্দ বহু লোকের সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয়ও হয়েছে। দেশে দেশে চক্কর মেরে বেড়াবার সময় বহু মেয়ের সঙ্গেও আমার পরিচয় হয়েছে।

খুবই সত্য যে, কোন একটা বিশেষ নারীকে বিশেষভাবে জানতে হলে একটা পুরুষের সারাটা জীবন কেটে যায়। তবে সে যদি অন্তত দশটা বছর পরিশ্রম করে, আগ্রহী আর কৌতূহলী হয় তবেই তার পক্ষে নারী জাতির আসল স্বরূপটা উপলব্ধি করা সম্ভব হয়।

খাবার জন্য একটা ভাল জায়গা বেছে নেওয়া আমার বহুদিনের স্বভাব। খুঁজতে খুঁজতে মনের মত একটা জায়গা পেতে দেরীও হল না।

সবেমাত্র একটা প্রতিষ্ঠান তাঁবু গেড়ে রেস্তোরাঁ পেতেছে। সেখানে তারা কোন রকমে থাকার ও খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। পাশেরই একটা তাঁবুতে আহারাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে। খাবার খেতে খেতেই ম্যাস ডুগান-এর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।

ডুগান-এর বয়স হয়েছে—বৃদ্ধ। উচ্চতা ছয় ফুট। একটা দোলনা চেয়ারে বসে বসেই তাকে দিন কাটাতে হয়। আর সেখানে বসেই ছিয়াশির দুর্ভিক্ষের স্মৃতিমন্থন করে।

মাদাম ডুগান রান্নাবান্না করে আর খাদ্যদ্রব্য পরিবেশনের দায়িত্ব পালন করে ম্যাস ডুগান।

ম্যাসকে দেখেই আমি উপলব্ধি করতে পারলাম, লোক গণনার কাজের ক্ষেত্রে বড় রকমের একটা ভুল হয়েছে। তার চেহারা বা আচার-আচরণের বর্ণনা দেওয়ার কাজটা মোটেই সহজ নয়। সহজ ভাষায় বলতে হয়, সে যেন জীবন, আমোদ-প্রমোদ আর খোলা হাওয়ার প্রতীক হিসেবে বিরাজ করছে।

তাঁবু-রেস্তোরাঁয় আহারাদি সারাটা কিছুদিনের মধ্যেই আমার একটা নিত্যকার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। যখনই মন চায় তখনই সেখানে হাজির হই, সময়-অসময়ের বিচার করি না। তাতে কোনই সমস্যা হয় না। কারণ, সেখানে লোকজনের ভিড় তেমন হয় না।

আমি তাঁবু-রেস্তোরাঁয় পা-দেওয়ামাত্র মুখে হাসির প্রলেপ মাখিয়ে ব্যস্ত-পায়ে ম্যাস আমার সামনে এসে দাঁড়াল। তার পরনে কালো পোশাকের ওপরে সাদা এপ্রন।

আমার কাছে, একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ম্যাস বলে উঠল—এই যে জেফ, খাবার সময় তুমি আস না কেন, বল তো? তখন কতই না খাবার-দাবার মজুত থাকে।

আমাদের কথা বলার সময়েই আর একজন সেখানে হাজির হল। এড কোলিয়ের তার নাম। তার আর আমার কথা বলতে গেলে সহজ উদাহরণ হচ্ছে, সে যেন প্রাতরাশ আর আমি নৈশভোজ।

আর মধ্যাহ্ন ভোজ আর নৈশভোজের মাঝখানে একটা সেতুবন্ধন হয়ে দাঁড়ালাম। আর তাঁবুটাকে তিন-প্রদর্শনীর সার্কাস হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

আর ম্যাস? সে সব সময়ের পরিবেশনকারিণীর ভূমিকা পালন করছে।

সেই কোলিয়ের লোকটি কূপ-খনন, জীবন-বীমা বা অন্য কি সব কাজ করতে যেন ভুলেই গেছে। তার আচার-ব্যবহার খুবই ভাল, ভদ্রোজনোচিত। আর কথাবার্তাও খুবই মিষ্টি।

অতএব কোলিয়ের আমি আমি সেখানে হামেশাই হাজির হতে লাগলাম। ম্যাস তখন নিরপেক্ষতা ও প্রদর্শনের ব্যাপারে উভয়ের প্রতি সমভাবাপন্নর ভূমিকা পালন করে। তার একটা হাত আমার দিকে আব দ্বিতীয় হাতটা কোলিয়র-এর দিকে বাড়িয়ে দেয়।

স্বাভাবিকভাবেই অচিরেই আমার আর কোলিয়ের মধ্যে পরিচয়-হৃদ্যতা গড়ে উঠল। লোকটার ব্যবহার বাস্তবিকই ভাল।

একদিন তার মনোভাবটা পরীক্ষা করতে আমি উৎসাহী হলাম। সুযোগ পেয়ে একদিন তাকে বললাম—আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, অন্য সব অতিথিরা আহারাদি সেরে বিদায় নেবার পর তুমি এখানে আস, ঠিক কিনা?

মুহূর্তের জন্য ভেবে নিয়ে কোলিয়ের আমার কথার জবাব দিল—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ বটে।

কারণটা জানতে পারি কি?

কারণ তেমন কিছু নয়।

তবু, কিছু না কিছু কারণ তো থাকতেই হবে।

বাজারে বসে আহারাদি সারতে, মানে খাবার ঘরে হৈ হট্টগোল আমি মোটেই বরদাস্ত করতে পারি না।

আমিও ঠিক তা-ই। মেয়েটা খুবই ভাল, তোমার মত কি?

মুখে হাসি ফুটিয়ে কোলিয়ের বলল—তাই বুঝি? নেহাৎ কথাটা তুমি উত্থাপন করলে বলেই বলছি, আমিও লক্ষ্য করে দেখেছি, মেয়েটা সত্যি নয়নাভিরাম—মনে দাগ কাটার মতই বটে।

সত্যি কথা বলতে কি, আমি তো তাকে এক ঝলক দেখতে পেলেই খুশি। অস্বীকার করব না, তার দিকে আমার একটু সুনজর যে পড়েছে মিথ্যে নয়। সুযোগ পেয়ে তোমাকে কথাটা বলে রাখলাম।

শোন, তোমার মতই আমিও খোলামেলা হতে চাই। দেখো, আমার কথায় আবার মুষড়ে পোড়ো না যেন।

ব্যস, এবার থেকে কোলিয়ের আর আমি দৌড় প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হলাম।

এদিকে ম্যাস প্রতিদিন হরেক রকম খাদ্যবস্তু পরিবেশন করতে লাগল। সত্যি কথা বলতে কি, ম্যাস-এর চোখে আমরা দু'জনই সমান। সে খুশি মনে উভয়েরই সেবায় নিজেকে লিপ্ত রেখেছে।

লক্ষ্য করলাম, ডুগান-এর রেস্তোরাঁয় মদনদেব এবং পাচিকার কাজের সময় অনেকাংশে বেড়ে গেছে।

সেপ্টেম্বরের এক রাতের ঘটনা। একরাত্রে আহারাদি সেরে আমি ম্যাসকে নিয়ে তাঁবুর ধার-কাছ দিয়েই একটু হাওয়া খেতে গেলাম। সেদিনই ব্যাপারটা খোলসা হয়ে গেল। হাঁটতে হাঁটতে আমরা একেবারে শহরের একান্তে চলে গেলাম। একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর দু'জনে পাশাপাশি বসলাম। এরকম একটা মওকা খুব কমই মেলে। তাই সুযোগ বুঝে তার কাছে মনের কথা খোলসা করেই বললাম।

কথা প্রসঙ্গে আমি ইনিয়ে বিনিয়ে তাকে বুঝিয়ে দিলাম, আমার যা কিছু বিষয়-সম্পত্তি আছে; আমাদের দু'জনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পক্ষে যথেষ্ট।

আমার কথা শুনে সে মুহূর্তকাল আমার দিকে ভাবাবেগে আপ্লুত চোখ দুটো মেলে নীরবে তাকিয়ে রইল।

আমি বুঝলাম, এ-ই মওকা। তখন বলেই ফেললাম—আমার ইচ্ছা, তোমার 'ডুগান' পদবীটাকে বদলে অচিরেই পিটার্স করে নেওয়া হোক।

সে মুহূর্তে ম্যাস হ্যাঁ বা না কিছুই বলল না। তবে লক্ষ্য করলাম, আমার কথাটা শুনেই সে

যেন কেমন শিউরে উঠল।

আমি তার ফ্যাকাসে মুখের দিকে অনুসন্ধিৎসু নজরে তাকালাম। তার শিহরণ ও মুখের বিবর্ণতায় আমি যেন কিছুটা ধারণা করে নিতে পারলাম।

বেশ কিছুক্ষণ মুখে কুলুপ এঁটে থাকার পর এক সময় সে মুখ খুলল—শোন জেফ, তোমার কথাগুলো আমাকে মর্মাহত করেছে। অন্য পাঁচজন মানুষের মতই তোমাকে আমি পছন্দ করি।

আমি যেন ফুঁটো বেলুনের মত চুপ্‌সে যেতে লাগলাম।

ম্যাস বলে যেতে লাগল—আমার মনের কথা শুনে রাখ, এ দুনিয়ায় এমন কোন মানুষের অস্তিত্ব নেই যার গলায় আমি বরমাল্য দিয়ে, বিয়ে করে স্বামীত্বে বরণ করে নেব। আর তেমন মানুষ কোনদিন থাকবেও না।

একটু থেমে দম নিয়ে সে আবার বলতে লাগল—জেফ, একজন পুরুষ মানুষকে আমি কি নজরে দেখি তা কি তোমার জানা আছে? আমি বলব, অবশ্যই না। আমার চোখে একজন পুরুষ মানুষ একটা সমাধি-কবরখানা ছাড়া কিছুই নয়।

সে আরও বলল—পুরুষ মানুষকে আমি একটা পাথরের শবাধাররূপেই গণ্য করি যেখানে যাবতীয় খাদ্য সামগ্রী গিয়ে জমা হয়। তাদের আমি এর বেশী কিছু মনে করতে পারি না। দু'-দুটো বছর ধরে আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, তারা কেবল খায়ই।

আমি বিষণ্ণ মুখে তার কথাগুলো শুনতে লাগলাম।

ম্যাস বলেই চলল—তাই তো আমি তাদের জাবর-কাটা দু'পেয়ে প্রাণী ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে উৎসাহই পাই না। টেবিলে সাজানো ছুরি, কাঁটা আর চামচের কাছে ঘুরঘুর করা ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেই পারে না। আমার ধারণা, আমার স্মৃতিতে তাদের ছবিই গাঁথা হয়ে গেছে। বিশ্বাস কর জেফ, আমি তাদের মন জয় করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমি পারি নি, হেরে গেছি।

জেফ, আমি দেখে শুনে ও বুঝে অবাক হয়ে যাই যে, মেয়েরা তাদের মনের মানুষ, নিতান্ত আপনজনের জন্য অস্থির হয়ে পড়ে, পাগল হয়ে যায়। আমি কিন্তু কোনদিনই ভেতর থেকে তেমন কোন তাগিদই অনুভব কবি নি।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে এবার বলল—জেফ, আমি স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি—

তাকে কথাটা শেষ কবতে না দিয়েই আমি বলে উঠলাম—কি—কি সিদ্ধান্ত নিয়েছ?

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি, কোনদিনই আমি বিয়ে করে কোন পুরুষকে স্বামীত্বে বরণ করে নেব না, নিতে পারবও না।

তোমার এরকম সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণটা খোলসা করে বলবে কি ম্যাস?

কারণ?

শোন তবে, আমার পক্ষে এমন কোন দৃশ্য দেখা সম্ভব নয় যে, সে একবার বসে প্রাতরাশ খাচ্ছে, একবার মধ্যাহ্ন ভোজন খাচ্ছে আবার গপাগপ রাতের খাবার গিলছে। কেবল খাচ্ছে আর খাচ্ছে—উফ্!

আমি দৃঢ়তার সঙ্গেই বললাম—আমার কথা শোন ম্যাস, তোমার মনের এ বদ্ধমূল ধারণাকে আমি বদলে দেবই দেব। আসলে এ দৃশ্যটা তুমি বড্ড বেশী করে দেখে ফেলেছ। আমি বলছি, তুমি একদিন না একদিন বিয়ে করে ঘর বাঁধবেই।

অসম্ভব।

আজ তুমি যা-ই বল না কেন, একদিন আমার কথাই বাস্তব রূপ পাবে। আরে বাবা, একজন মানুষ তো আর দিনভর খাওয়া নিয়েই মেতে থাকে না।

না, কিছুতেই আপনার কথা আমি মেনে নিতে পারি না। আমি নিজের চোখের যতদূর দেখেছি, তারা কেবলই খায় আর খাওয়ার ভাবনায় ডুবে থাকে।

কথাটা বলার পরই ম্যাস যেন হঠাৎ অবর্ণনীয় উত্তেজনার শিকার হয়ে পড়ল। তার চোখের মণি দুটো অস্বাভাবিক জ্বল্ জ্বল্ করতে লাগল।

ম্যাস পর মুহূর্তেই নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলল—তবে বলছি, ধৈর্য ধরে শুনুন—সুসি ফস্টার নামে একটা মেয়ে আছে। টেরে হাউসে বাস করে। সে আমার অভিন্ন হৃদয়া বান্ধবী।

টেরে হাউসের রেলপথের খাবার ঘরে সে কাজ করে, সে শহরেরই একটা রেস্তোরাঁয় আমিও কাজ করেছি। সুসির অভিজ্ঞতা আমার চেয়েও বেশ খারাপ।

কারণ কি, বল তো?

হ্যাঁ, কারণ তো অবশ্যই আছে।

আরে, সেটাই তো আমি জানতে চাচ্ছি। বল, তার অভিজ্ঞতা তোমার চেয়ে খারাপ কি করে হল?

শুনুন তবে বলছি—রেলের রেস্তোরাঁয় যারা আহারাদি সারতে আসে তারা কিন্তু খেতে আসে না, আসে কেবল গিলতে। তারা কেবল গেলে আর গেলে, কেবল গিলেই চলে। কেবল এ-ই নয়, খেতে খেতে আবার ন্যক্কারবাজিও শুরু করে দেয়। তাই তো, সুসি আর আমি ভাবনা চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

কিন্তু তোমাদের সারাটা জীবন—

আমাকে থমিয়ে দিয়ে ম্যাস বলে উঠল—আমাদের সারাটা জীবন কিভাবে কাটবে, এই তো?

হ্যাঁ, সে সম্বন্ধে তোমরা, মানে তুমি কি ভেবেছ?

আমরা অর্থকড়ি জমাতে শুরু করেছি। দরকার অনুযায়ী অর্থকড়ি যখন জমে যাবে তখন ছোট্ট একটা কুঁড়েঘর আর পাঁচ একর জমি কিনে ফেলব। আমরা দু'জন এক সঙ্গে থাকব। ভায়োলেট ফুল চাষ করব। পূর্বের বাজারে সেগুলো চালান দেব। আর এ-ও সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি, কোন পুরুষ মানুষকেই আমাদের ধারে-কাছে ঘেঁষতে দেব না।

সবই মেনে নিচ্ছি। কিন্তু কেবলমাত্র মেয়েদের পক্ষে কি আর—

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে ম্যাস এবার বলল—না, তাদের কোন দরকারই পড়বে না। আসলে তারা তো কিছু করেই না। মাঝে-মধ্যে একটু-আধটু ঠোকরায়। ব্যস, এ পর্যন্তই তাদের হিম্মৎ।

আমি কিন্তু জানতাম—

ধ্যুৎ! খালি একই কথা নিয়ে ঘ্যানর ঘ্যানর করছেন। দোহাই আপনার, এ প্রসঙ্গটা ছাড়ান দিয়ে অন্য কিছু বলুন।

না, আমার কাছে ব্যাপারটা, মানে নৈশ বিহারটা মোটেই সুখদায়ক হল না।

কিন্তু হায়! আমি যে কি করব ভেবেই পেলাম না। ম্যাসকে ছাড়া আমার পক্ষে একটা মিনিট পৃথিবীতে টিকে থাকা সম্ভব নয়। আবার এ-ও সত্য যে জীবন থেকে খাবার অভ্যাসটা ছেড়ে দেওয়াও যারপরনাই পীড়াদায়ক। খুবই সত্য যে, অভ্যাসটা বহুদিনের জন্মলগ্ন থেকেই চর্চা করে আসছি।

সাতাশটা বছর ধরে খাবার অভ্যাসটার কাছে আত্মসমর্পণ করে পৃথিবীতে নিজের অস্তিত্ব অব্যাহত রেখে চলেছি। মারাত্মক ক্ষুধা নিদারুণভাবে খাদ্যবস্তুকে প্রতিনিয়ত চুম্বকের মতই আকর্ষণ করে চলেছে। সে আকর্ষণকে কাটিয়ে ওঠার জন্য বড্ড বেশী দেরি হয়ে গেছে।

সত্যি, ম্যাস খুবই সঙ্গত কথা বলেছে। আমি একটা জাবর-কাটা জীবন ছাড়া তো কিছু নেই।

আমি ডুগান-এর তাঁবু—রেস্তোরাঁয়ই আহারাদি চালিয়ে যেতে লাগলাম। এত কিছুর পরও আমি আশায় ছিলাম, ভবিষ্যতে কোন না কোনদিন ম্যাস-এর মন ঘুরলে ঘুরতেও পারে।

আমার বিশ্বাস, আমার মত কোলিয়েরও একই প্রস্তাব দিয়েছে। আর তার কাছ থেকে একই উত্তর পেয়েছে।

বাধ্য হয়ে আমাদের খাদ্য তালিকাটা কাটছাঁট করে কিছুটা সংক্ষিপ্ত করে নিতেই হল।

খাদ্য-তালিকাটা কেন সংক্ষিপ্ত করলাম, তাই না? এর উদ্দেশ্য কিছু না কিছু আছেই। আসলে এতে আমাদের প্রতি ম্যাস-এর মন কিছুটা ভেজে, তার মন পাওয়া যায়।

এ ঘটনার পরই একদিন কোলিয়ের কে তাঁবুতে আর দেখা গেল না।

এর-ওর জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারলাম, সবাই শহর ছেড়ে চম্পট দিয়েছে। ফলে আমি একাই সেখানে রয়ে গেলাম। না, একটুখানি ভুল হয়ে গেছে। একমাত্র খাদ্য তালিকাটা আমার সঙ্গী হিসাবে রইল।

ম্যাস-এর চোখে আমার অবস্থা? তার চোখে আমি একটা জাবর-কাটা দো-পেয়ে জীবই রয়ে গেলাম। জাবরকাটা আর জাবারকাটাই নাকি আমার একমাত্র কাজ।

কোলিয়ের শহর ছেড়ে বে-পাত্তা হয়ে যাবার প্রায় এক সপ্তাহ বাদে একটা সঙের দল শহরের বুকে পা দিল। রেলপথের ধারে তারা তাঁবু গাড়ল। তাঁবুর মাথায় পতাকা উড়িয়ে দিল।

একদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর ম্যাস-এর কাছে গেলাম। আমার সঙ্গে সঙ্ দেখতে যাওয়ার জন্য তার কাছে প্রস্তাব করব ইচ্ছা ছিল।

ম্যাস-এর মা মাদাম ডুগান ঘর থেকে মুখ-বাড়িয়ে বলল, তার ভাই টমাসকে নিয়ে সে সঙ্ দেখতেই গেছে।

সে সপ্তাহে পরপর তিন দিন একই প্রস্তাব নিয়ে ম্যাস-এর কাছে গেলাম। প্রতিবারেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল।

শনিবার রাতে আমি অনন্যোপায় হয়ে ম্যাস-এর পথের ধারে দাঁড়িয়ে ছিলাম। উদ্দেশ্য যে ফেরার পথে তাকে ধরব। ধরলামও।

সিঁড়িতে পাশাপাশি বসে দীর্ঘ সময় ধরে আমরা বহু গল্প করলাম। সত্যি বলছি, তার কথাবার্তা থেকে আমার যেন মনে হল তার মানসিক অবস্থার কিছু পরিবর্তন হয়েছে। আর তার চোখের সে উগ্রতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়ে নরম হয়ে এসেছে, আগের চেয়ে উজ্জ্বলও হয়েছে।

আমি পরীক্ষা করার জন্য তাকে ছোট্ট একটা টোকা দিলাম—ম্যাস, যদি কিছু মনে না কর তবে তোমাকে একটা কথা বলি।

কথা? এত ইতস্ততের কি আছে, কি বলতে চাইছেন, বলেই ফেলুন।

কথাটা হচ্ছে, সঙ্ দেখে তার আকর্ষণে তুমি যেন কেমন মোহিত হয়ে পড়েছ, ভুল বলেছি কি?

দেখুন, মোহিত হবার মতই বটে, বিশ্বাস করুন।

একটা কথা, তুমি যদি এভাবে প্রতিদিন সঙ্ দেখতে যাও তবে কিন্তু অচিরেই তোমার মধ্যে আমূল পরিবর্তন ঘটে যাবে।

আপনার কাছে আমার একটাই অনুরোধ মিঃ জেফ, আপনি দয়া করে আমার ওপর রাগ করবেন না যেন।

আমি কৃত্রিম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললাম—না-না, রাগ করব কেন! যার-যার রুচি ও মর্জি মাফিক কাজ করবে, এর মধ্যে তো রাগের ব্যাপার থাকার কথা নয়।

আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, এই সঙ্ আমার কাজকর্ম—সব কিছু ভুলিয়ে দেয়। আমি যেন কেমন উন্মনা হয়ে পড়ি।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বোকার মত বলে উঠলাম—এতেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে নাকি? তাই বলছি, সঙ্টঙ্ নিয়ে বেশী মাতামাতি করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, একেবারেই অনুচিত, কাজেই ওসব মাথা থেকে ঝেড়ে মুছে ফেলে দাও ম্যাস।

সেদিন এ পর্যন্তই। আসলে আমিই প্রসঙ্গটাকে আর দীর্ঘ করতে উৎসাহ পেলাম না। ম্যাসকেও ক্লান্ত মনে হল।

সোমবার রাত্রে ম্যাস-এর খোঁজে আমি তার তাঁবুতে গেলাম। তার মা দরজা দিয়ে গলা বাড়িয়ে একই জবাব দিল—ম্যাস সঙ্ দেখতে গেছে।

ম্যাস-এর ব্যাপার-স্যাপার লক্ষ্য করে আমি মনস্থ করলাম—আমি নিজে গিয়ে দেখে আসব সঙ্-এর ব্যাপারটা আসলে কি? আর সেটা এমন কি মনোলোভা জিনিস যার আকর্ষণে মানুষ সেখানে উদ্ভ্রান্তের মত ছুটে যায়।

পরদিন সঙ্ দেখতে যাওয়ার আগে আমি ম্যাস-এর খোঁজে তাঁবুতে গেলাম। আমি তো জানতামই তার দেখা পাব না, তবু গেলাম। সত্যি তাকে পেলামও না। সেদিন ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়েও সঙ্ দেখতে যায় নি। কিভাবে জানতে পারলাম? কারণ টম-এর সঙ্গে তাঁবুতেই আমার দেখা হয়ে গেল।

আমি তার দিদির খোঁজ করছি শুনে টম বলল—মিঃ পিটার্স, আপনাকে একটা খবর দিতে

পারি। কিন্তু—

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আমি বলে উঠলাম—কিন্তু—কিন্তু কি?

ব্যাপারটা হচ্ছে, আপনাকে যদি একটা খবর দেই তবে বিনিময়ে আমাকে আপনি কি দেবেন?

টম, আমি কথা দিচ্ছি, তুমি যা চাইবে আমি তা-ই দেব।

তবে বলছি শুনুন, কোন্ এক খেলোয়াড়ের সঙ্গে আমার পূজনীয়া দিদি মজে গেছে।

খেলোয়াড়? কে সে?

এটাই নিশ্চিত করে বলতে পারব না। তবে মনে হচ্ছে, ওই সঙের দলের কেউ হবে।

লোকটা কেমন—মানে আচার ব্যবহারের কথা বলছি।

আমার সাফ কথা শুনুন মিঃ পিটার্স, লোকটাকে আমি মোটেই বরদাস্ত করতে পারি না। তবে লক্ষ্য করে দেখেছি, তাকে দিদি খুবই পছন্দ করে। আমি তাদের দু'জনকে আড়ালে ফিসফিস করতেও শুনেছি।

আমি অত্যুগ্র আগ্রহ প্রকাশ করে বলে উঠলাম—তুমি-তুমি তাদের ওই অবস্থায় দেখেছ টম?

নইলে আর বলছি কি, মিঃ পিটার্স। আমার ধারণা ছিল আপনি হয়ত ব্যাপারটা জানেন। থাক গে, আপনার সঙ্গে যে শর্ত ছিল—আমি যে আপনাকে এমন গুরুত্বপূর্ণ একটা খবর দিলাম, বিনিময়ে আমি দুটো ডলার আশা করতে পারি কি?

আমি তার কথার জবাব না দিয়ে কোটের ভেতরের পকেট থেকে অনেকগুলো আধুলি-সিকি মুদ্রা তার টুপির মধ্যে ফেলে দিতে দিতে বললাম,—টম, তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ।

টম টুপি থেকে ব্যস্ত-হাতে মুদ্রাগুলো তোলায় ব্যস্ত থাকলেও আমি কিছুক্ষণ আমতা আমতা করে বললাম—টম তুমি যে খেলোয়াড়ের কথা বলছে সে কোথায় থাকে? মানে তার নাম আর ঠিকানাটা আমাকে দিতে পার?

আমার কথাটা শেষ হতে না হতেই টম কোটের পকেট থেকে একটা হলুদ রঙের কাগজ, হ্যান্ডবিল বের করে আমার মুখের সামনে ধরল।

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সেটার দিকে তাকিয়ে বললাম—এটা কি?

সে বলল—মিঃ পিটার্স, এ লোকটার কথাই তো আপনাকে বলেছি, এর সবচেয়ে বড় পরিচয় কি জানেন?

আমি তার কথার জবাব না দিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে নীরবে তাকিয়ে রইলাম। আমাকে নীরব দেখে টম-ই তার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলল—এ লোকটা পৃথিবীর উপবাসকারীদের মধ্যে প্রথম স্থানাধিকারী।

আমি সবিস্ময়ে বলে উঠলাম—তাই নাকি? আজব ব্যাপার তো!

তবে আর বলছি কি? আর এ জন্যই তো দিদির মনটা ইদানিং একটু নরম হয়েছে। বললে হয়ত আপনি বিশ্বাস করবেন না, আজ ঊনপঞ্চাশ দিন যাবৎ লোকটা নির্জলা উপবাস করে রয়েছে। আর এটা তার সব চেয়ে বড় পরিচয়।

কথা বলতে বলতে টম হ্যান্ডবিলে ছাপানো তার নামটার পাশে আঙুল রাখল। আমি পড়লাম—প্রফেসর এডুয়ার্ডো কোলিয়ের।

আমি খামটা পড়া শেষ করে প্রায় অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করলাম—হ্যাঁ, নামটা মন্দ নয়। এড় কোলিয়ের। ফন্দিটা খারাপ নয়। ভালই কৌশল করেছে টম।

টম ঝট্ করে মুখ তুলে আমার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল। আমি বলে চললাম—তোমার এ চালটার জন্য তোমার প্রশংসা না করে পারছি না। কিন্তু ম্যাস যতদিন মিসেস সঙ্ না হচ্ছে ততদিন তাকে কিছুতেই আমি তোমার হাতে যেতে দেব না।

আমি সঙের তাঁবুর দিকে এগোতে লাগলাম। হাঁটতে হাঁটতে তাঁবুর পিছনে দিকটায় যেতেই একটা একেবারে অপ্রত্যাশিত ঘটনার মুখোমুখি হলাম। দেখলাম হঠাৎ একজন ক্যানভাসটাকে সামান্য উঁচু করে তার তলা দিয়ে সরীসৃপের মত বার কয়েক হেলেদুলে এঁকে বেঁকে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। মুখে তার হাল্কা হাসির প্রলেপ।

আমি বললাম—এই যে সঙ্ সাহেব, একটা মুহূর্ত চুপ্‌টি করে দাঁড়াও তো, তোমার রূপটা

ভালভাবে দেখে নেই।

কথাটা বলেই আমি খপ্ করে তার ঘাড়টা চেপে ধরলাম। একটু জোরেই চাপ দিলাম।

তার কণ্ঠ রোধ হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলেও রীতিমত গোঙাতে গোঙাতে বলল—আরে আরে, করছ কী! জেফ পিটার্স, গলাটা ছেড়ে দাও। —লাগছে, বড্ড লাগছে! আমাকে ছেড়ে দাও, খুব তাড়া আছে। আরে, হাতটা সরিয়ে নাও।

ধ্যুৎ! তোমার গলাটা না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি, জানতে পারি কি?

সে আমার মুখের দিকে নীরবে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল। আমি বললাম—বুঝতে পারছ না সঙ্ সাহেব? আমি বলতে চাচ্ছি, তুমি যে শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেছ হে! শরীর বলতে তো অবশিষ্ট কেবলমাত্র পেটটাই সম্বল হয়েছে। চেহারাটা নিরামিষাশী বিড়ালের মত করে ফেলেছ!

চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে অনুশোচনার স্বরে কোলিয়ের বলতে লাগল—জেফ, মিস ডুগান কিন্তু বড় ভাল মেয়ে। রূপসী তন্বী যুবতী। তার রূপের আভায় চোখ দুটোকে যেন ঝলসে দেয়।

আমি তার ভাবাবেগে আপ্লুত মুখটার দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলাম। সে এবার বলল—মেয়েটা সত্যি বড়ই ভাল। জেফ, তাকে আপন করে, সহধর্মিণীরূপে পাওয়ার জন্য তোমার সঙ্গে উপবাস করার প্রতিযোগিতায় নেমে আসি তো প্রায় জিতেই গিয়েছিলাম। কষ্ট করে উপোষ করার ব্যাপারটাকে আরও দিন কয়েক দাঁতে দাঁত চেপে থাকতে পারলেই বাজিমাৎ করে দিতাম।

মুহূর্তের জন্য নীরব থেকে অধিকতর ভাবাপ্লুত কণ্ঠে সে বলল—প্রিয় জেফ, ম্যাস ডুগানকে আমি সত্যি মনে-প্রাণে ভালবাসি। বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, তার মন পাওয়ার জন্য আমি দু-দু'টা সপ্তাহ উপবাস করে কাটিয়েছিলাম। কেবলমাত্র এক কামড় মুখে দিয়েই আমি দিনের পর দিন কাটাচ্ছিলাম।

তাই নাকি? তারপর? তারপর কি হল?

চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে বলল—জেফ, একদিন কি হল জান? সেদিন কি যে হল ছাই, এক খদ্দের স্যান্ডুইচের প্লেট সামনে নিয়ে সবে বসেছে। আমি অতর্কিতে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘাড়ে এমন এক গুঁতো মারলাম যে সে চেয়ার নিয়ে এক পাশে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। ব্যস, তার স্যান্ডুইচের প্লেটটা হাতে তুলে নিয়ে গপ্ গপ্ করে গিলতে লাগলাম। ব্যস, আমার কপাল গেল পুড়ে।

তার মানে? কপাল পুড়ল মানে? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

আবার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে বলল—কপাল পুড়ল না বলছ কী! সে অপরাধে ম্যানেজার আমার বেতনই কেটে নিল। তা নিক গে। বেতন নিয়ে আমার তিলমাত্র মাথা ব্যথাও নেই। আমি সব কিছু ছেড়ে ছুড়েও ওই মেয়েটাকেই মনে-প্রাণে চেয়েছি। বরাতে তা-ও টিকল না। জেফ, একটা কথা কি জান? ক্ষুধা খুবই একটা অনুভূতি। প্রেম-প্রীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবার, ধর্ম, শিল্প-কলাচর্চা আর দেশপ্রেম—যতই বল না কেন, একজন উপবাসী. মানে অনাহারক্লিষ্ট মানুষের কাছে প্রেম-ভালবাসা বা অন্য সবই একটা নিছকই কথার কথা মাত্র। কেবলমাত্র আমিই নই, পৃথিবীর সবাই একবাক্যে স্বীকার করে নেবে, খাওয়াটাই জীবনে আসল ব্যাপার।

আমি এতক্ষণ কোলিয়ের-এর ঘাড়টা সাঁড়াশির মত ধরেই রেখেছিলাম।

কোলিয়ের হাত বাড়িয়ে তার হাতটা সরিয়ে দেবার জন্য চেষ্টা করতে গিয়ে বললাম—জেফ, আমার পরিতাপের ব্যাপারটা তো শুনলেই তো। এখন আমার ঘাড়টা ছেড়ে দিলে আমি স্বস্তি পাব, খুশিও কম হব না।

আমি তার ঘাড় থেকে হাতটা সরিয়ে নিলে সে একটু নড়েচড়ে দাঁড়াল। তারপর আবার বলতে শুরু করল—জেফ, আমি আবারও না বলে পারছি না। পেটে জ্বালা, মানে ক্ষুধা ভীষণ ব্যাপার। এবারটা আমাকে মাফ করে দাও, দূরে কোথাও শূকরের মাংস ভাজা হচ্ছে। বাতাসে গন্ধ পাচ্ছ না? তার গন্ধ আমার নাকে কিন্তু লাগছে। সে দিকে যাওয়ার জন্য আমি তাঁবুর ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছি। আমার পা দুটো চঞ্চল হয়ে পড়েছে।

আমি তাকে ভরসা দিতে গিয়ে মুচকি হেসে বললাম—কোলিয়ের, আমি কিন্তু তোমার ওপর মোটেই রাগ করিনি। তোমার এ পরিস্থিতির জন্য আমি বাস্তবিকই দুঃখিত, মনে করতে পার

এক সময় দেখা গেল, আমি পথটা হারিয়ে ফেলেছি। কি করে এমন একটা অভাবনীয় কাজ ঘটে গেল মালুমই হল না।

আসলে পথের দু'দিকে গাছ-গাছালির ঝোপঝাড়, লম্বা-লম্বা ঘাসে ছাওয়া প্রান্তর, তার ওপর আমার গা-ঘেঁষে বসে রয়েছে বহু আকাঙ্ক্ষিতা ম্যাস। তাই আমার বিচার-বিবেচনা আর মনোযোগ দু'-ই ভোঁতা হয়ে গেছে। আর এ পরিস্থিতিতে এমনটাই স্বাভাবিক। আমার এ অজুহাত সঙ্গত কি অসঙ্গত সে বিচারের ভার আপনাদের ওপর।

যা-ই হোক, আসল কথা হচ্ছে, আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি। আর বিকেলের গোধূলির আধো আলো-আধো অন্ধকার মুহূর্তে যখন আমাদের ওকলাহামা শহরে পৌঁছে যাওয়ার কথা তখন আমরা এক পার্বত্য অনাবিষ্কৃত নদী-খাতের পথে অনবরত চক্কর মারছি।

একে পথ হারিয়ে আমি চোখে সর্ষেফুল দেখছি, তার ওপর নেমে গেল মুষলধারে বৃষ্টি।

আমরা দু'জনে—ম্যাস আর আমি উভয়েই কাক-ভেজা ভিজে গেলাম।

বরাত ভাল যে, নির্জন-নিরালা নদী-খাতে চোখে পড়ল একটা বাড়ি—ছোট্ট কাঠের বাড়ি।

ছোট-বড় গাছ গাছালি আর লম্বালম্বা ঘাস বাড়িটাকে প্রায় ঢেকে রেখেছে। বাড়িটাকে এক নজরে দেখলেই কাঁটা দিয়ে ওঠে।

গাড়ি থামিয়ে আমরা নামার উদ্যোগ নিলাম। গোপন করব না, কাক-ভেজা কম্পমান ম্যাসকে প্রায় জড়িয়ে ধরেই গাড়ি থেকে নামিয়ে আনতে হল। রাত্রিটা ভয়ঙ্কর, সে পরিবেশেই কাটাতে হবে।

একটা ব্যাপার আমাকে যারপরনাই অবাক করল। এরকম অভাবনীয়, একেবারে অবাঞ্ছনীয় পরিবেশে আমাদের রাত্রি কাটাতে হবে বুঝেও ম্যাস ফোঁ-ফাঁ করা তো দূরের ব্যাপার, টু-শব্দটিও করল না। বুঝলাম, পুরো ব্যাপারটাই সে আমার ওপর ছেড়ে দিয়েছে।

আমি ম্যাস-এর হাত ধরে গুটিগুটি বাড়িটার ভেতরে ঢুকতে লাগলাম। সামান্য এগিয়েই নিঃসন্দেহ হলাম, একটা পোড়ো বাড়ি। উঠোনের একধারে একটা ঘাস-পাতার ছাউনি দেওয়া চালাঘর। হয়তো এক সময় ভেড়ার পালের আশ্রয়স্থল হিসাবে ব্যবহৃত হত। ঘরের সামনে কিছু পুরনো খড় দেখলাম। এর থেকে ক্ষুধার্ত ঘোড়াগুলোকে কিছু খেতে দিলাম।

কয়েক আঁটি খড় নিয়ে ঘরের মেঝেতে রাখলাম। ভাবলাম আর কিছু না জুটলেও এগুলো মেঝেতে বিছিয়ে অন্তত রাত্রি কাটানো যাবে। গাড়ির পুরু আসন দুটো পেতে ম্যাস আর আমি মেঝেতে বসে পড়লাম। পথ-শ্রম আর না-জানা আতঙ্কে আমাদের শরীর ও মন দু'-ই দুর্বল।

কনকনে ঠাণ্ডায় হাত-পা যেন বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। গায়ের রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়ার উপক্রম।

খড়ের আগুনের তাপে শরীর গরম হতে দেরী হল না। ম্যাস-এর মুখের দিকে বার বার আঁড়চোখে তাকাতে লাগলাম। তাকে তেমন বিষণ্ন মনে হল না। বরং নতুন পরিবেশে খড়ের আগুনের তাপ পেয়ে তাকে বেশ হাসিখুশিই দেখলাম। সে হেসে হেসে অনর্গল বকবক করতে লাগল।

আমি পকেট থেকে চুরুটের বাক্সটা বের করে তা থেকে একটা চুরুট দাঁতের পাটি দুটো দিয়ে চেপে ধরে তাতে অগ্নি সংযোগ করলাম। আর দু'-এক গোজ ব্রাজিলীয় অলঙ্কার বের করে ম্যাসকে পরার জন্য দিলাম। তাতে নেক্‌লেস, ব্রেসলেট থেকে শুরু করে আংটি পর্যন্ত সবই আছে।

ম্যাস উৎসাহের সঙ্গে সেগুলো পরল। তারপর ঝলমল অলঙ্কারগুলো সমেত শরীরটাকে আয়নায় দেখতে না পাওয়ার জন্য বারবার আক্ষেপ করতে লাগল।

ক্রমে রাত্রি বাড়তে লাগল। বিছানা পাতা দরকার। খড়গুলো মেঝেতে বিছিয়ে গাড়ি থেকে আনা গদি ও বিছানাপত্র দিয়ে মোক্ষম শোবার ব্যবস্থা করে ফেললাম।

বিছানা তৈরী হয়ে গেলে ম্যাসকে শুয়ে পড়তে বললাম। আর আমি পাশের খুপড়িটায় বসে সারা রাত্রি চুরুটটা টানলাম।

দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে চুরুট টানতে টানতে আমি ভাবতে লাগলাম—সমাধিতে আশ্রয় নেবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সত্তরটা বছর ধরে একটা মানুষকে কতসব অদৃষ্টের বিড়ম্বনাই সহ্য করতে

হয়।

ভোরের আলো ফোটার আগে আমার হয়ত একটু তন্দ্রাভাব এসেছিল। কারণ আগের দিনের পথের ধকল তার ওপর রাত্রি জাগরণে দু'চোখের পাতা বন্ধ হয়ে আসারই কথা।

যখন চোখ খুলে তাকালাম তখন ঘরের বাইরে রোদের ঝলমলে আলো। দেখলাম আমার সামনে চুপ্‌টি করে দাঁড়িয়ে ম্যাস মিটিমিটি হাসছে। চুলগুলো পরিপাটি করে বেঁধেছে, সাধ্যমত নিজেকে সাজিয়ে তুলেছে, আর জীবনের জয়গানে চোখের তারা দুটো ঝিক্‌মিক্ করছে।

আমি তন্ময় হয়ে ম্যাসকে দেখতে লাগলাম। আমি মুখ খোলার আগেই সে অস্থির কণ্ঠে বলে উঠল—জেফ, আমার বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে। পেটের ভেতর আগুন জ্বলছে। আমি এতগুলো খাবার খেতে পারি।

আমি চোখ তুলে তার চোখে চোখ রাখতেই তার মুখটা হঠাৎ আরও বিমর্ষ হয়ে গেল। চোখের তারায় সন্দেহের ছাপ এঁকে সে আমার দিকে তাকাল। আমি সরবে হেসে উঠলাম। আচমকা এমন করে হেসে ওঠাটাই আমার স্বভাব। কিন্তু এক্ষেত্রে বোধহয় সীমা ছাড়িয়েই গেল।

হাসি থামিয়ে সে যখন আত্মস্থ হল তখন দেখলাম, ম্যাস আমার পিঠে হেলান দিয়ে গম্ভীর মুখে বসে।

আমি আবেগ মধুর স্বরে বলে উঠলাম—ম্যাস, রাগ কোরো না। আমি যেন না হেসে থাকতে পারছিলাম না। তুমি চুলগুলোর জন্য যে সময় দিয়েছ ও যত্ন করে বেঁধেছ তাতে আমি হাসি চাপতে পারিনি। আমার আক্ষেপ হচ্ছে, আয়নায় তুমি নিজেকে দেখতে পেলে কী আনন্দই না পেতে। আহা! কী দুঃখই না আমার হচ্ছে!

মনগড়া গল্প শোনানোর কোন দরকার আছে বলে আমি মনে করছি না জেফ। তুমি যে কেন এমন করে হাসছ তা আর আমার অজানা নয়। বাইরের দিকে একবারটি চোখ ফেরালেই সব বুঝতে পারবে।

অমি ঘাড় ঘুরিয়ে কাঠের ছোট্ট জানালাটা দিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই চোখে পড়ল, নদীতে বান ডেকেছে। জল ফুলে-ফেঁপে উৎলে উঠেছে। আমাদের আশ্রয়স্থল বাড়িটা যেন একটা দ্বীপে পরিণত হয়ে গেছে। তার চারদিকে কম করেও একশ' গজ চওড়া জলস্রোত। বৃষ্টি মুষল ধারে পড়েই চলেছে।

জলস্রোত আর বৃষ্টি আমার মনে প্রভাব বিস্তার করলেও তখন আমার সবচেয়ে বড় চিন্তা, কিভাবে কিছু খাবার জোগাড় করা সম্ভব। সে মুহূর্তে কত রকম খাবারের ছবি যে মনের কোণে উঁকি দিতে লাগল তা বলে শেষ করা যাবে না।

ম্যাস আমার মুখোমুখি একটা আসনে বসে। সারাটা দিন অঝোরে বৃষ্টি পড়েই চলল। আবার রাত্রির অন্ধকার নামল।

আমি বাঁকা চোখে ম্যাস-এর মুখের দিকে তাকালাম। তার মুখের বেপরোয়া ভাবটা আমার নজর এড়াল না। মেয়েরা ক্ষিধের জ্বালায় কাতর হয়ে পড়লে মুখে এরকম ভাব ফুটে ওঠে।

দ্বিতীয় রাত্রে তখন এগারোটার কাছাকাছি বাজে। আমাদের ডুবো জাহাজটার ছোট খুপরিটায় আমরা দু'জনে গম্ভীর মুখে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। হরেক রকম খাদ্য বস্তুর চিন্তা যা মনের কোণে উঁকি ঝুঁকি মারছে সেগুলোকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। কিন্তু সেগুলো যে নাছোড়বান্দা। আবার ঘুরে ফিরে সেই একই চিন্তা এসে মনের কোণে আশ্রয় নিতে লাগল।

শোনা যায় ডুবে-যাওয়া একটা মানুষ অতীতের বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে যেন চোখের সামনে দেখতে যায়। আর কোন মানুষ যখন দীর্ঘ অনাহারে কাল কাটায় তখন সারা জীবন যা কিছু ভাল ভাল খাদ্যবস্তু উদরস্থ করেছে সে সব খাবারের ভূত তাকে পেয়ে বসে। আর হরেক রকম সুখাদ্যের কথা তার মনকে অস্থির করে তোলে।

বোধ হয়, সে সব সুখাদ্যের চিন্তা আমাকে এমনই তন্ময় করে ফেলেছিল যে নিজের অজান্তেই এক সময় আমি কাল্পনিক পরিবেশনকারীর উদ্দেশ্যে গলা ছেড়ে বলে উঠলাম—আরে, করছ কী! করছ কী! আরও ঘন করে কাট, অবিকল ফরাসী ভাজার মত করে কাটা। তারপর টোস্টের ওপর

সেগুলো ছড়িয়ে দাও।

ম্যাস চট করে ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকাল। তার চোখের মণি দুটো জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে। তার ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা। সে একনাগাড়ে বলতে লাগল—এটা-ওটা—সবই চাই। আহা জেফ! কী মজাটাই না হবে। সবশেষে আমার চাই ভাজা-মুরগির মাংসের ঝোল আর গরম গরম ভাত। না, আরও আছে। আইসক্রীমসহ এক কাপ কাস্টার্ডও আমাকে দিতে হবে। সে সঙ্গে—

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আমি বলে উঠলাম—আরে ম্যাস, বলে যাও—বলে যাও। পৃথিবীতে তো আর খাদ্য বস্তুর অভাব নেই। যত পার বলে মনকে প্রবোধ দাও। বল, আরও খাদ্যবস্তুর কথা বল।

আমার সে কথা শেষ হতে না হতেই আমরা একনাগাড়ে দশ মিনিট ধরে রেস্তোরাঁর যাবতীয় খাদ্যবস্তুর নাম আওড়ে যেতে লাগলাম। তবে এ-ও সত্য যে, ঘোড়দৌড়ে আমি ম্যাসকে টপকে যেতে পারলাম না। হ্যাঁ, তারই জিত হল।

এবার আমি ভাবলাম—ম্যাস-এর মন থেকে এবার হয়ত খাদ্যবস্তুর প্রতি বীতশ্রদ্ধভাবটা মুছে গেছে।

তৃতীয় দিনের ভোরে দেখলাম, বন্যার জল নেমে গেছে। আমরা অনন্যোপায় হয়ে আশ্রয়স্থল ওই বাড়িটা ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। জল-কাদা ডিঙিয়ে হাঁটাহাঁটি করে আমরা পথের খোঁজ করতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত পথের হদিস পেয়েও গেলাম।

বুঝতে পারলাম, আমরা পথ ভুল করে মাত্র কয়েক মাইল পথ এগিয়ে এসেছি।

গাড়ি হাঁকিয়ে আমরা দু'ঘণ্টার মধ্যেই ওকলাহামা শহরে পৌঁছে গেলাম।

শহরে ঢুকে পথ চলতে গিয়ে প্রথমেই একটা রেস্টুরেন্টের সাইনবোর্ড আমাদের নজরে পড়ল।

গাড়ি থামিয়ে আমরা ব্যস্ত-পায়ে রেস্টুরেন্টটায় ঢুকে পড়লাম। একটা চেয়ার টেনে ম্যাস-এর মুখোমুখি বসলাম। খাদ্য পরিবেশনকারী আমাদের দু'জনের সামনে খাদ্যবস্তুর প্লেট আর ছুরি ও কাঁটা-চামচ দিয়ে গেল। ম্যাস-এর চোখে খাদ্যের প্রতি বিতৃষ্ণার ছাপ লেশমাত্রও নজরে পড়ল না।

আমি খাদ্য-তালিকা দেখে এক এক করে সুখাদ্য পরিবেশন করতে বললাম। আমার কথা শুনে পরিবেশনকারী ছোকরাটা ঘাড় ঘুরিয়ে দরজায় দাঁড়ানো গাড়িটার দিকে একবারটি তাকিয়ে নিল। তার উদ্দেশ্য, দেখে নেওয়া গাড়ি থেকে আর কতজন নেমে আসবে। এতসব খাদ্যবস্তু তো আর দু'জনের পক্ষে উদরস্থ করা সম্ভব নয়।

আমি আর ম্যাস উভয়েই বেশ জাঁকিয়ে বসলাম। একের পর এক সুখাদ্য ভর্তি প্লেট এসে আমাদের টেবিলে জমা হতে লাগল। ব্যাপারটা এমন হয়ে দাঁড়াল যে, আমরা দু'জনেই একডজন হয়ে উঠেছি।

টেবিলের বিপরীত দিকে বসে-থাকা ম্যাস-এর দিকে চোখ পড়তেই আমি ফিক্‌ করে হেসে উঠলাম। অতীতের ব্যাপার-স্যাপার আমার মনে পড়ে গেল।

ম্যাস একবার আমার মুখের দিকে তাকাল। পরমুহূর্তেই আমার প্লেটগুলোর ওপর দৃষ্টি ফিরিয়ে আনল। তার চোখ দুটো জলে ভরে এল।

ম্যাস এবার রীতিমত মোলায়েম স্বরে বলল—জেফ, ভাবতে নিজেরই অবাক লাগছে, আমি কি বোকাই না ছিলাম! পুরো ব্যাপারটাকেই ভুল মাপকাঠি দিয়ে বিচার করেছিলাম। এ ব্যাপারটা সম্বন্ধে আগে কোনদিনই এরকম অভিজ্ঞতা হয়নি। দুনিয়ার সব মানুষই ক্ষিধের জ্বালায় এরকম কষ্ট পায়, তাই না?

আমি নীরবে মুচকি হাসলাম। নিজে কিছু বলার চেয়ে তার বক্তব্য শোনার আগ্রহই আমাকে নীরব থাকতে উৎসাহিত করল।

ম্যাস বলে চলল—যাদের কঠোর পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করতে হয় তারা তো গলা পর্যন্ত ঠেসে খাবেই। শরীরের ঘাটতি পূরণের জন্য এটা তাদের অবশ্যই দরকার। জেফ, একদিন তুমি আমার কাছে প্রস্তাব করেছিলে, মানে বলেছিলে, তুমি যদি এখনও আগ্রহী থাক তবে, তোমার

সঙ্গে এক টেবিলে বসে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে খেতে পারি। জেফ, এমুহূর্তে আমার একটাই অনুরোধ, আমাকে কিছু খেতে দাও, পেট ভরে খেতে দাও।

আমি তো বহু আগেই বলে রেখেছি, একটা নারীর মাঝেমধ্যেই তার দৃষ্টিভঙ্গীটার কিছু পরিবর্তন করাই দরকার।

নারীরা দীর্ঘদিন একই দৃশ্য দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। বহুদিনের পুরনো খাবার টেবিল, পুরনো বাসনপত্র আর পুরনো সেলাই মেশিন দেখে দেখে তাদের মধ্যে ক্লান্তি আসে, বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে।

অতএব নারীর জীবনকে বৈচিত্র্যে ভরিয়ে তুলতে হয়। একটু আধটু বিশ্রাম, ধারে-কাছে ছোটখাট ভ্রমণ, হরেকরকম গৃহস্থালীর দ্রব্য সামগ্রী, আর সে সঙ্গে ঠোঁটের কোণের এক টুকরো হাসি, টুকরো টুকরো ঠাট্টা তামাশা, খুনসুটির পর একটু আদর সোহাগ—এরকম আর যা কিছু সম্ভব।

দ্য স্ফিন্ক্স অ্যাপল

সূর্যোদয় নগরের পনের মাইল আগে, স্বর্গভূমি থেকে বিশ মাইল দূরে বিল্‌ডাড রোজ যাত্রী-গাড়িটাকে থামাল।

দিনভর অনবরত বরফ পড়েছে। এখন আট ইঞ্চি পুরু হয়ে বরফ জমেছে। অবশিষ্ট পথটুকু দিনের আলোতেও নিরাপদ নয়। উঁচু-নিচু পাহাড়ের বুক, বুকের ওপর আঁকাবাঁকা পথটা চলে গেছে।

বিল্‌ডাড রোজ বলল—বরফের স্তূপ আর রাত্রির অন্ধকারে পথটা ঢাকা পড়ে গেলেও অবশিষ্ট পথটুকু পাড়ি দেওয়ার চিন্তা করাই উচিত নয়।

পথের বিপদের কথা ভেবে সে গাড়িটাকে থামাল। ঘোড়া দুটোকে খুলে পথের ধারের একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে দিল। তারপর যাত্রী পাঁচজনকে জ্ঞান দানে মেতে গেল।

জজ মেনেফির ওপরেই দল পরিচালনা আর প্রাথমিক কাজকর্ম সম্পাদনের সার্বিক দায়িত্ব দিয়ে পুরুষ যাত্রীরা নিজেদের কাজ হাল্কা করে নিয়েছে। সে জন্যই তো মেনেফি লাফিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। অন্য গাড়িটা

চারজনও তাকে অনুসরণ করল। পঞ্চম যাত্রী নামল না, গাড়িতেই রয়ে গেল। বয়সে সে যুবতী।

পাহাড়ের ওপরের দিককার একটা ধাপের ওপর বিল্‌ডাড গাড়িটা দাঁড় করিয়েছে। লোহার গারদের বেড়া বসিয়ে সামনের পথটাকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

সেখান থেকে পঞ্চাশ গজ ওপরে অবস্থিত বাড়িটাকে কালো একটা বিন্দুর মত দেখা যেতে লাগল।

বাড়িটার দিকে চোখ পড়তেই জজ মেনেফি আর তার সহযাত্রীরা হৈ হৈ করে পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠতে আরম্ভ করল।

কঠোর পরিশ্রম করে পাহাড় ভেঙে বাড়িটার দরজায় পৌঁছে তারা প্রথমে গলা ছেড়ে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করতে লাগল। তারপর বেশ জোরে দরজা ধাক্কাতে লাগল। জানালায়ও বহুবার ধাক্কা দিল। কিন্তু হায়! ভেতর থেকে কোন সহৃদয় কণ্ঠস্বর ভেসে এল না।

শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে তারা হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। অখণ্ড নীরবতা যে তাদের কেবল হতাশ করল তা-ই নয়, ভীত সন্ত্রস্তও কম হল না।

কিন্তু হাল ছেড়ে দিয়ে হতাশা বুকে ফিরে যেতে তারা মোটেই রাজী নয়। যা হোক একটা হস্তনেস্ত করতেই হবে। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই তারা দরজা ভেঙে ঘরের ভেতরে ঢোকার সিদ্ধান্ত নিল, করলও তা-ই।

গাড়িটার পাহারায় যারা নিযুক্ত তারা লক্ষ্য করল বাড়িটার দরজা দিয়ে আলো বেরিয়ে আসছে। একটু বাদেই বরফের চাঁই ডিঙিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে তরতর করে নেমে এল অভিযাত্রীরা। গাড়িটার কাছে ফিরে এসে জজ মেনেফি হাঁফাতে হাঁফাতে যা বলল তা হচ্ছে, বাড়িটা ফাঁকা।

মানুষজনের চিহ্নমাত্রও নেই। আসবাবপত্রের বালাইও নেই। ঘরে মেঝের কেন্দ্রস্থলে একটা অগ্নিকুণ্ড, অনবরত দাউ দাউ করে জ্বলছে। তারা ফিরে আসার সময় দেখে এসেছে বাড়িটার পিছনে শুকনো কাঠ পাঁজা দিয়ে রাখা হয়েছে। অতএব এমন হাড়-কাঁপানো এত বড় রাত্রিটা কাটিয়ে দেবার মত সুব্যবস্থা বরাতে না থাকলেও জোটে না।

জর্জ মেনেফি গাড়ির খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে মাথার টুপিটা নামিয়ে ব্যস্তকণ্ঠে বলল—মিস গারল্যান্ড, নিতান্ত অনন্যোপায় হয়েই আমাদের যাত্রার বিরতি ঘটাতে হচ্ছে। গাড়ির কোচোয়ান বলছে, এ পার্বত্য পথে, বরফ-ঝরা পরিবেশে গাড়ি চালানোর কথা ভাবাই যায় না।

গাড়ির ভেতর থেকে মিস গারল্যান্ড-এর ভয়ার্তকণ্ঠ ভেসে এল—তবে এখন উপায়?

উপায় একটাই আছে। পাহাড়ের সামান্য ওপরে একটা ছোট্ট বাড়ি আছে। জনমানবহীন। ভোরের আলো না ফোটা অবধি আমাদের সেটাতেই আশ্রয় নেওয়া উচিত। ছোটখাট কিছু অসুবিধা ছাড়া রাত্রিটা কাটানোর ক্ষেত্রে তেমন অসুবিধার কিছু নেই।

এত সব ব্যাপার কিভাবে জানা গেছে?

অন্যান্যদের নিয়ে আমি নিজে গিয়ে বাড়িটা দেখে এসেছি। আর যা-ই হোক দুর্যোগের রাত্রিটা কোন রকমে কাটিয়ে দেওয়া যাবে বলেই আমি অন্তত মনে করছি।

মুহূর্তের জন্য থেমে সে এবার বলল—মিস গারল্যান্ড, আমি কথা দিচ্ছি, আপনি যাতে কিছুটা আরামে রাত্রি কাটাতে পারেন সে ব্যবস্থা আমি করে দিতে পারব বলেই আশা করছি।

কিন্তু—কিন্তু আমি কিভাবে গাড়ি থেকে—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই জর্জ মেনেফি এবার বলল—মিস গারল্যান্ড, আপনি অনুগ্রহ করে অনুমতি দিলেই আমি আপনাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে আনার ব্যবস্থা করি।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই গাড়িটার যাত্রীরা দুর্যোগের রাত্রেও আগুনের কুণ্ডটার দৌলতে বেশ আরামেই বাকি রাত্রিটুকু কাটাতে লাগল।

আগুনের রক্তিম আভায় মহিলাটির সুন্দর মুখটি আরও বেশী উজ্জ্বল দেখাতে লাগল।

ঘরের বাইরে উদ্দাম বাতাস রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি করে চলেছে।

দমকা বাতাস-তাড়িত বরফের কুঁচি দরজা-জানালা ফাঁক দিয়ে বারবার ঘরের ভেতরে হানা দিচ্ছে, দু'জন যাত্রীর ওপর কনকনে ঠাণ্ডার নিরবচ্ছিন্ন আক্রমণ চলছে। এমন যন্ত্রণাদায়ক শৈত্যের মধ্যেও একজন নায়কের অভাব ঘটেনি। সে হাসি-আনন্দের মধ্যে সবাইকে মাতিয়ে রেখেছে। তার একর পর এক মজাদার গল্পে সবাই এমন তন্ময় হয়ে পড়ল যে প্রাকৃতিক কষাঘাত পর্যন্ত ভুলে গেল।

সত্যি জর্জ মেনেফি-র তুলনা হয় না। কষ্ট-যন্ত্রণার মুহূর্তে তার মত একজন মানুষ বাস্তবিকই অপরিহার্য।

কেবল পুরুষ যাত্রীরাই নয়, মহিলা যাত্রীটি পর্যন্ত তার কথায় যারপরনাই মুগ্ধ হয়ে পড়ল, মন্ত্রমুগ্ধ বললেও অত্যুক্তি হবে না।

গল্পগুলোর ফাঁকে ফাঁকে মেনেফি শ্রোতাদের সাহস ও উৎসাহ দানের জন্য বলতে লাগল—আমার কিন্তু পরিবেশটা খুবই ভাল লাগছে! বরাতে থাকলে সব অসম্ভবই সম্ভব হতে পারে।

বলতেই হয় যাত্রীদের মধ্যে একজনের গল্পের প্রতি তেমন আকর্ষণ নেই বলেই মনে হল। সে বার বার আসর ছেড়ে উঠে বাইরে বেরিয়ে যেতে লাগল। অবশ্য প্রতিবারেই সে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আবার ফিরেও আসে। তার এ রকম অস্থিরতার কারণ একটাই, রেডরুথ নামে সে বুড়োটা এক সময় এ বাড়িটায় থাকত, সব কিছু আগলে রাখত, তার কোন বিশেষ নিদর্শন যদি আবিষ্কার করতে পারে। না, লক্ষ্যণীয় কোন কিছুই সে আবিষ্কার করতে পারল না।

বিলডাড্-এর অস্থিরতাটুকু অন্যান্য অভিযাত্রীদের মনে কৌতূহলের সঞ্চার ঘটাল। তারা এবার তাকে পেয়ে বসল। বাড়িটার ইতিহাস বলার জন্য তাকে রীতিমত পীড়াপীড়ি শুরু করে দিল।

বিলডাড্ বার কয়েক আমতা আমতা করে শেষ পর্যন্ত অভিযাত্রী শ্রোতাদের ফরমাশ অনুযায়ী গল্পটা বলতে রাজি হল।

সে খুশি মনেই গল্পটার অবতারণা করল—

বছর বিশেক আগে এক অতি বৃদ্ধ পানকৌড়ি এখানে আস্তানা গড়েছিল।

বুড়োটা হৈ হট্টগোল মোটেই বরদাস্ত করত না। তাই সে কাউকেই কোনদিন তার কাছে থাকতে দেওয়া তো দূরের ব্যাপার বাড়িটার ছায়া পর্যন্ত মাড়াতে দিত না।

কোন বিপদাপন্ন অভিযাত্রী-দল গাড়ি নিয়ে এসে আশ্রয় প্রার্থনা করলে সে দরজাটা পুরোপুরি না খুলে, আধখোলা দরজার ফাঁক দিয়ে নিজের অক্ষমতার কথা সাধ্যমত সংক্ষেপে জানিয়েই দুম্ করে দরজাটা বন্ধ করে দিত। তারপর ব্যস্ত-হাতে দরজার ছিটকিনিটা তুলে দিয়ে নীরবে মুখ বুজে বসে থাকত।

আর যা-ই হোক, বেঁচে থাকার উপযোগী জিনিসপত্র তো চাই-ই চাই। সেসব সে অদূরবর্তী স্যাম টিলি-র দোকান থেকে সংগ্রহ করত।

এক আগস্ট মাসের কথা। ঘরে মুদিখানার কিছু জিনিসপত্র বাড়ন্ত হল। সে সেগুলো লাল একটা বিছানার চাদর দিয়ে আপাদমস্তক মুড়িয়ে নিয়ে স্যাম টিলি-র দোকানে হাজির হল।

তার এমন অদ্ভুত কাণ্ডের সঙ্গে মুদি স্যাম টিলি-র দীর্ঘদিনের পরিচয়। অতএব তার এরকম আচবণে সে কিছুমাত্রও বিস্মিত হল না।

এমন উদ্ভট পোশাকে নিজেকে সাজিয়ে নিয়ে বুড়োটা মুদি স্যাম টিলি-র দোকানে গিয়ে বলল—শোন হে মুদি ভায়া, আমি কে, জান?

মুদি তার চাঁদির চশমার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে বলল—হ্যাঁ, সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

শোন, যে কথা বলার জন্য তোমার কাছে ছুটে আসা—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই মুদি স্যাম টিলি বলে উঠল, আমার সঙ্গে আপনার এমন কি জরুরী কথা আছে যার জন্য আপনাকে এমন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসতে হল?

আছে—আছে। জরুরী কথা না হলে কি আর আমার মত মানুষ কখনও তোমার কাছে ছুটে আসত, বুঝতে পারছ না।

ধ্যৎ! কাজের সময় যত্ত সব ঝামেলা! ধানাই পানাই রেখে যা বলবার সংক্ষেপে বলে পাতলা হন তো মশাই।

যাক গে, যে কথা বলছিলাম, আমি হচ্ছি রাজা সলোমন। আর রানী আসছেন আমার সঙ্গে মোলাকাৎ করতে।

তার ঘরে টাকা কড়ি আর রূপার মুদ্রা যা কিছু ছিল, সব একটা থলের মধ্যে ভরে চাদরের তলায় করে নিয়ে এসেছিল। সেটাকে সে দুম্ করে স্যাম-এর কাঠের বাক্সটার মধ্যে ছুঁড়ে দিল।

তার ব্যাপার দেখে মুদি রীতিমত হৈ হৈ করে উঠল—আরে করছেন কি! করছেন কি!

তোমার মাথায় ঘিলুর নামগন্ধও আছে বলে মনে হচ্ছে না! আরে বুঝছ না কেন? আমার কাছে কিছু মালকড়ি আছে জানতে পারলে সে আর এ পথ মাড়াবে মনে করেছ?

ব্যস, বুড়ো রেডরুথ আর এক মুহূর্তও সেখানে দাঁড়াল না। যেমন ব্যস্ত-পায়ে সে মুদির কাছে এসেছিল ঠিক তেমনই হন হনিয়ে পাহাড় ভেঙে নিজের আস্তানার দিকে হাঁটা জুড়ল।

নারী আর বিত্ত সম্পদের প্রতি তার মনের এমন বদ্ধমূল ধারণার কথাটা প্রচার হতে দেরী হল না। আর এমন ব্যাপার তো বাতাসের আগে চলে।

যা-ই হোক তার এমন আকস্মিক মানবিক পরিবর্তনের কথা প্রচার হয়ে গেলে সবার বিশ্বাস হল, তার মাথার দোষ দেখা দিয়েছে।

স্যাম টিলি-র পরিচিত শুভানুধ্যায়ীরা নিঃসন্দেহ হয়ে তাকে জোর করে পিছমোড়া করে বেঁধে পাগলা গারদে নিয়ে গেল। এবার তার স্থান হল, চার দেওয়ালে ঘেরা পাগলা গারদের খুপ্‌ড়ি।

অভিযাত্রীদের মধ্য থেকে এক অত্যুৎসাহী যুবক সামান্য নড়েচড়ে জুঁত হয়ে বসতে বসতে বলে উঠল—যদি কিছু মনে না করেন তবে একটা প্রশ্ন করি।

আরে ভায়া, একটা কেন, হাজারটা প্রশ্ন করতে পার।

স্যাম টিলি কি কোন মহিলার প্রেমে মজেছিল?

আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দাও, তারপর তোমার কৌতূহল নিবৃত্ত করব। তোমার মনে অন্য কোন প্রশ্ন না জেগে প্রেমের ব্যাপারটা কেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, বল তো?

তোমার এরকম ধারণা হওয়া খুবই স্বাভাবিক বলেই আমি মনে করছি। তা যদি না-ই হয়ে থাকত তবে তিনি কেন স্বেচ্ছা নির্বাসন বেছে নিলেন, মানে এমন নির্জন-নিরালা পরিবেশে আস্তানা গড়ে তুলতে উৎসাহী হলেন কেন?

না, সে রকম কোন ঘটনার কথা আমার জানা নেই, কারো মুখে শুনিও নি। তবে কিছু সাধারণ গণ্ডগোল—

বিলডাড্-এর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে যুবকটা ভ্রূ কুঁচকে বলল—তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। লোকের মুখে শোনা, বুড়োর যখন যৌবন ছিল তখন নাকি এক রূপসী তন্বী যুবতীর সঙ্গে তার প্রেমের ব্যাপারে কিছু দুর্ভাগ্যের সূচনা হয়েছিল।

জজ মেনেফি বলল—হায়! নিঃসন্দেহে একটা প্রতিদানহীন প্রেমের ব্যাপার হবে।

বিলডাড্ বলল—আরে না, না। অবশ্যই তা নয়। সে মেয়েটা তো তাকে বিয়েই করে নি। বহুদিন আগে বুড়ো রেডরুথ-এর নগর থেকে আসা একটা লোকের সঙ্গে স্বর্গনগর-এর সামাডিউক-এর দেখা—সাক্ষাৎ হয়।

তার মুখে শোনা গিয়েছিল রেডরুথ ছিল একজন সত্যিকারের সৎ যুবক। কিন্তু আশ্চর্য এক ব্যাপার! তার পকেটে টোকা দিলেই একটা চাবির রিং আর এক গোছা চাবির ঝনঝনানি শোনা যেত।

সে যুবতীর নামটা কি ছিল, জানেন?

নিশ্চিত করে বলতে পারব না। তবে শুনেছি, যুবতীটার নাম মিস এলিস বা এরকমই একটা নাম ছিল। আর এ-ও শুনেছি, তার সঙ্গে রেডরুথ-এর বিয়ের কথা হয়েছিল। যুবতীটা সত্যি চোখে লাগার মতই ছিল। আর রেডরুথ-এর পছন্দও হয়েছিল।

তারপর? তারপর কি হল? যুবকটা সোৎসাহে কথাটা বলল।

বিলডাড্ বলল—তারপর কি হল বলছি—একদিন নগরে এক নতুন যুবক এল। সে ছিল প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক। তার স্বভাবটাই ছিল সহজ-সরল।

এলিস বাকদত্তা হওয়া সত্ত্বেও নবাগত যুবকটার সঙ্গে পরিচিত হয় আর উভয়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা—সাক্ষাৎও হতে লাগল।

তারা কোথায় মিলিত হত? নদীর ধারে, নাকি কোন বনের ধারে?

আরে না, ডাক-ঘরের কাছে বা ওই রকমই কোন একটা জায়গায় তারা মিলিত হত, দীর্ঘসময় ধরে কথাবার্তা বলত।

এক সকালের ঘটনা—রেডরুথ আর মিস এলিস সদর দরজার ধারে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগল। ব্যস, তারপরই যুবকটা টুপিটা মাথায় চাপিয়ে বিদায় নিল।

নগরের অধিবাসীরা সে যুবকটাকে সেই সময়েই শেষ দেখতে পেয়েছিল। আর যা-ই হোক, তবে সে লোকটার এরকমই জানা ছিল।

এবার বলুন তো সে যুবতীটার কি গতি হল?

বিলডাড্ তার প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বলল—তা-তো কোনদিন শুনিনি ভায়া।

জজ মেনেফি বলল—কী মর্মান্তিক ব্যাপার!

মহিলা অভিযাত্রীটা সুরেলা কণ্ঠে বলে উঠল—কী চমৎকার! কী মন-মাতানো গল্প!

গল্পটা এ পর্যন্ত এগোবার পর আর অগ্রসর হল না। সবাই চুপ করে গেল। দমকা বাতাসের দাপাদাপি ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না।

অভিযাত্রীরা মেঝেতে বসেই রইল। একজন একটু নিরিবিলিতে কিছুক্ষণ কাটবার জন্য বাড়িটার সামনে একটু পায়চারি করতে লাগল।

হঠাৎ সে যুদ্ধ-বিজয়ী সৈনিকের মত গলা ছেড়ে চিল্লিয়ে উঠল। ইতিমধ্যে সে যে কখন গুটিগুটি ঘরে ঢুকে গেছে কেউ টেরই পায় নি।

সে বার দুই চিল্লিয়ে ঘরটার প্রায়ান্ধকার কোণ থেকে কিছু একটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল। জ্বলন্ত আগুনের কাছাকাছি আসতেই দেখা গেল তার হাতে পাকা বীজগাছের একটা আপেল, গায়ে লাল ছিটছিট। বেশ কড়সড়ও বটে।

ঘরটার এক কোণের একটা তাকের ওপর আপেলটা রাখা ছিল।

আপেলটা রীতিমত তাজা। দেখলেই মনে হয় মাত্র দু'-একদিন আগে সেটা তার জন্মদাতা গাছের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। অতএব সেটা আগস্ট মাস থেকে ওই তাকটার ওপর দীর্ঘ অবহেলা সহ্য করে পড়ে রয়েছে, ওরকম কথা কিছুতেই মেনে নিতে উৎসাহ পাওয়া যায় না।

অতএব নিঃসন্দেহ হওয়া যেতে পারে যে, কোন না কোন নিশাচর আপেলটাকে পরিত্যক্ত বাড়িটার তাকের ওপর রেখে গেছে।

অকারণে কেউ এখানে, এমন একটা পাণ্ডব বর্জিত স্থানে আপেলটা রেখে দেওয়ার জন্য এসেছিল—অসম্ভব।

আরে, কেবলমাত্র আপেলটা রাখার জন্য কেউ এখানে আসতে যাবে কেন? এমনও হতে পারে, এ বাড়িটায় বসে রাতের খাবার সেরে তাকটাতে অতিরিক্ত আপেলটা ফেলে রেখে চম্পট দিয়েছে।

লোকটার নাম ডুনউডি। হাতের আপেলটা সহ-অভিযাত্রীদের সামনে উঁচিয়ে ধরে সে রীতিমত গর্বের সঙ্গে বলল—মিসেস ম্যাকফারল্যান্ড, একবার আমার হাতেব দিকে চেয়ে দেখুন, আমি কি পেয়েছি।

আপেলটাকে আরও উঁচুতে তুলে ধরায় আগুনের আলোতে সেটার রং আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

আপেলটার দিকে মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে মহিলা অভিযাত্রীটা ছোট্ট করে শান্তভাবে হাসল, তার স্বভাবই শান্ত।

মুখে হাসির রেখাটুকু অক্ষুণ্ণ বেখেই নিচু গলায় উচ্চারণ করল—বাঃ! কী চমৎকার দেখতে আপেলটা!

গল্প কথক জজ মেনেফি কথাবার্তা অন্য দিকে মোড় নেওয়ায যেন একটু ক্ষুব্ধ। অপমানিত, বিব্রত এবং সবার কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করল।

সে যেন হতাশ হয়ে ভাবছে, উত্তেজনা সৃষ্টিকারী এবং সবার মন কেড়ে-নেওয়া আপেলটার আবিষ্কারক কেন সে না হয়ে অন্য আর একজন হতে গেল? বিধাতা পুরুষের একী অবিচার! তিনি তো ওই হতচ্ছাড়াটাকে বাদ দিয়ে তাকেও আপেল-আবিষ্কারক হিসাবে নির্বাচন করতে পারতেন।

আর বিধাতা পুরুযের সামান্য ত্রুটির ফলে এখন রূপসী তন্বী মহিলা যাত্রীটা ডুনউডি-র দিকে হাসিমাখা মুখে, সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে কথা বলছে। তার মুখের ভাবটা এমন যে এরকম একটা মহৎ কাজ সম্পাদন করা যেন অন্য কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

অভিযাত্রী ডুনউডি যেন আলাদিন-এর আশ্চর্য প্রদীপের দৌলতে পাওয়া আপেলটা হাতে নিয়ে উপস্থিত সবারই মন কেড়ে নিয়েছে।

ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করে উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন বিচারকটা নীরবে বসে ভেতরে ভেতরে একটা মতলব এঁটে চলেছে যাতে সে আবার সবার মন জয় করে নিতে পারে। কিন্তু তা কিভাবে সম্পন্ন করবে?

জজ মেনেফি এবার ভারাক্রান্ত মনে, বিষণ্ণ মুখে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে দু'পা এগিয়ে গেল। ডুনউডি-র হাত থেকে আপেলটা নিল। এমন একটা ভাব চোখে মুখে ফুটিয়ে তুলল যেন আপেলটা একবার নিজের হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে চাইছে।

আপেলটা হাতে নিয়ে মুহূর্তকাল অনুসন্ধিৎসু নজরে বার-কয়েক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে মুখ খুলল—সত্যি আপেলটা চমৎকারই বটে! মিঃ ডুনউডি, অস্বীকার করার উপায় নেই যে, খাদ্য বস্তু সংগ্রাহক হিসেবে আপনার জুড়ি মেলা ভার।

মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে সে আবার বলতে শুরু করল—সত্যি কথা বলতে কি, এ আপেলটা হচ্ছে কোন রূপসীর মন-প্রাণ উজাড় করে যোগ্যতম ব্যক্তিকে উপহারের প্রতীক। আপেলটার দিকে তাকিয়ে আমার বক্তব্যের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারেন।

একজন ছাড়া অভিযাত্রীরা সবাই এক বাক্যে তার কথাটাকে সমর্থন করে নিল। সে ম্লান হেসে বলল—কথাটা মন্দ বলেন নি, আপনাদের মত কি?

জজ মেনেফি যেন তাকে অভিযুক্ত করে মন্তব্য করল—সম্প্রতি আপেলের কদর খুবই কমে

গেছে। আসলে এ-ফলটা খাবার-দাবার আর ব্যবসাব সঙ্গে এত বেশী জড়িয়ে গেছে যে, এখন আর একে ভাল ফলের দলে ফেলা যেতে পারে না। সুদূর অতীতে কিন্তু এরকমটা ছিল না।

বাইবেল ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে আর ইতিহাসে বহুবার ও বহুভাবে আপেলকে ভাল ফলের তালিকায় স্থান দেওয়া হয়েছে। কোন বস্তুর খুব বেশী মর্যাদা দিতে গিয়ে আমরা এখন প্রবাদবাক্য হিসেবে ব্যবহার করি 'চোখের আপেল'। অন্য কোন ফলকেই আমরা অলঙ্কার শাস্ত্রে এত বেশী মর্যাদা দেই নি।

উপস্থিত অভিযাত্রীদের কারো মুখে কোন কথা নেই। মন্ত্রমুগ্ধের মত নীরবে সবাই তার কথা শুনতে লাগল।

জজ মেনেফি বলেই চলল—এ ফলটা খাওয়ার জন্য আমাদের আদি পুরুষের যখন সৎ এবং সম্পূর্ণতার আসন থেকে পতন ঘটে তখন এ আপেল-ফলটা যে মর্যাদা লাভ করেছিল সে গুরুত্বের দিকে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার কোন দরকার আছে বলে আমি মনে করি না।

অভিযাত্রীদের মধ্য থেকে বায়ু-কলের লোকটা বলল—বর্তমানে শিকাগোর বাজারে এরকম আপেলের একটা পেটির দাম সাড়ে তিন ডলার।

তার দিকে মুচকি হাসি ছুঁড়ে দিয়ে জজ মেনেফি এবার বলল—এখন আমি আপনাদের কাছে যে প্রস্তাবটা উত্থাপন করতে চাইছি তা হচ্ছে, ভোর না হওয়া অবধি আমাদের এখানেই থাকতে হবে, মানে আমরা থাকতে বাধ্য। শরীরকে গরম রাখার মত পর্যাপ্ত কাঠ এখানে মজুদ আছে। এখন সবচেয়ে বেশী দরকার কিছু আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা। আমার দিক থেকে প্রস্তাব থাকছে, মিস গারল্যান্ড-এর হাতে আপেলটা দিয়ে দেওয়া হোক।

বায়ু-কলের লোকটা বলল—এতে আমার সামান্যতম আপত্তিও নেই। তবু বলছি, অন্য কারো কথা না বলে আপনি কেন মিস গারল্যান্ডকেই নির্বাচন করছেন, জানতে পারি কি?

আমি তো আগেই বলে রেখেছি, এখন আর এটাকে কিন্তু সামান্য একটা ফল হিসেবে গণ্য করা সঙ্গত হবে না। এটা একটা মহান ভাবের প্রতীক, একটা বিশেষ পুরস্কার। আর মিসেস গারল্যান্ডকেও সামান্য একজন ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা সমীচীন হবে না। তাকে নারী জাতির প্রতীক বলেই মনে করতে হবে—সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টির অন্তর এবং মস্তিষ্ক স্বরূপ। ওরকম চিন্তা-ভাবনা মাথায় রেখেই আমরা উদ্ভুত প্রশ্নটার বিচার করে সিদ্ধান্তে উপনীত হব।

আপনারা এবার আমার বক্তব্যটাকে অন্তর দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করুন—মিনিট কয়েক আগে মিঃ রোজ এ বাড়িটার প্রাক্তন মালিকের জীবনের আংশিক প্রেম-কাহিনী আমাদের উপহার দিয়েছেন।

আমি তো ভাবছি, তা থেকে আমরা যেটুকু জানতে পেরেছি তার ফলে অনুমানের একটা আকর্ষণীয় ক্ষেত্রের দ্বার আমাদের সামনে উন্মুক্ত হয়েছে। আর তাকে ভিত্তি করে আমরা একটা গল্পের ছক কষে নিতে পারি।

এ সুযোগটাকে আমরা কাজে লাগাতে চেষ্টা করি, কেমন?

স্বেচ্ছা নির্বাসন লব্ধ, আশ্রমবাসী রেডরুথ আর তার ভালবাসার পাত্রীকে নিয়ে আমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের চিন্তাধারা অনুযায়ী একটা করে গল্প ফাঁদলে কেমন হয়?

আর সে গল্পটা সেখান থেকেই শুরু করতে হবে যেখানে মিঃ রোজ বর্ণনাটা শেষ করেছেন, অর্থাৎ সদর-দরজায় দাঁড়িয়ে সামান্য কথাবার্তার পর প্রেমিক-প্রেমিকা যখন পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিল, সে মুহূর্তটা থেকে, কেমন?

মুহূর্তের জন্য নীরবে ভেবে সে আবার মুখ খুলল—তবে গল্পটা শুরু করার আগে সবাইকে মাথায় রাখতে হবে, রেডরুথ পাগল হয়ে গেল, সে পৃথিবীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ এক সন্ন্যাসী। আর তার জন্য তার যুবতী-প্রেমিকাকে দায়ী করা যাবে না।

আমরা প্রত্যেকে একটা করে গল্প বলার পর মিসেস গারল্যান্ড 'নারীর রায়'-টা ঘোষণা করবে। তিনিই নারী জাতীর প্রতীক হিসেবে রায় দেবেন, কোন গল্পটা শ্রেষ্ঠ আর মানবিক প্রেমকে কোন্ গল্পের মাধ্যমে সুচারুরূপে তুলে ধরা হয়েছে। আর নারীর বিচারে রেডরুথ-এর বাকদত্তার চরিত্র এবং কর্মধারার বিশ্বস্ত বিচার বলে গণ্য করা হবে। এ পর্যন্ত বলে সে থামল। এবার ক্ষণিক

নীরবতার মধ্য দিয়ে সবার মুখের দিকে তাকিয়ে তার প্রস্তাবটা সম্বন্ধে সবার মনোভাবটা যাচাই করে নেবার চেষ্টা করল।

তারপর সে আবার মুখ খুলল—আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে, অর্থাৎ সবাই যদি একমত হন তবে প্রথম গল্প শোনাবার জন্য আমি মিঃ ডুনউডি'কে অনুরোধ করব।

প্রস্তাবটা বায়ু-কলের লোকটার খুব মনে ধরল। সে সোল্লাসে বলেছিল—চমৎকার! চমৎকার প্রস্তাব। তিনি বিচারপতির মত প্রথম শ্রেণীর রায় দিয়েছেন।

আপনাদের হয়ত জানা নেই, এক সময় আমি স্প্রিংফিল্ড-এ একটা খবরের কাগজে সংবাদদাতার কাজে নিযুক্ত ছিলাম। তখন হাতে তেমন কাজ না থাকলে আমি একটা নকল গল্প ফেঁদে ফেলতাম। তাই আশা করছি গল্প বলার দায়িত্বটা আমি ভালভাবেই সম্পন্ন করতে পারব।

মহিলা অভিযাত্রীটিও হাসিমুখে বলল—প্রস্তাবটাকে আমিও স্বাগত জানাচ্ছি। এটাকে চমৎকার একটা খেলা বলেই আমি মনে করছি।

এবার জজ মেনেফি আপেলটাকে মহিলার হাতে সঁপে দিতে দিতে বলল—আসলে প্যারিস নগরীর শ্রেষ্ঠতম সুন্দরীকে একটা সোনার আপেল উপহার দেওয়া হত। আর সে ফলটা আমাদের সামনে তুলে ধরবে একটা নারী হৃদয়ের রহস্য আর গোপন বাসনাকে।

মিস গারল্যান্ড মুচকি হেসে আপেলটা হাতে নিল।

জজ মেনেফি বলল—মহাশয়া, আমাদের সবার মুখ থেকে এক-এক করে প্রেম-কাহিনী শুনুন। তারপর আপনি যার কাহিনীটা সবচেয়ে রসসিক্ত ও মনোজ্ঞ বিবেচনা করবেন তাকেই পুরস্কারস্বরূপ আপেলটা দান করবেন।

মহিলাটি এবার ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বায়ু-কলের মালিককে বললেন—গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আপনাকেই তো গল্পটা প্রথম শোনাতে হবে।

বায়ু-কলের মালিক তার গল্প শুরু করতে গিয়ে বলল—উপস্থিত সুধীজন, আমি তো আর পাই ডি. মোঁপাসা নই যে, গল্প শুনিয়ে আপনাদের সন্তুষ্ট করতে পারব। তবু যখন আমার ওপর এ আসরে প্রথম গল্প বলার গুরু দায়িত্ব বর্তেছে তখন কর্তব্য পালন করতে আমি মোটেই অনাগ্রহী নই'

আমি মার্কিনী কায়দায় আপনাদের কাছ গল্পটা বলছি।

গল্পটা আমি এভাবে আপনাদের সামনে তুলে ধরছি ঃ

রেডরুথ অবশ্যই জোর ধাক্কা খেয়েছিল। আর্থিক সঙ্গতি সম্পন্ন, মানে ধনকুবের লোকটা নির্ঘাৎ যুবতীটাকে তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেবার জন্য তৎপর হয়েছিল।

মেয়েটা হয়তো কথায় কথায় তাকে বলেছিল, মিঃ গোল্ড বন্ডস্ আমার অন্য দশটা বন্ধুর মতই একজন বন্ধুমাত্র। সে আমাকে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে মনোলোভা জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যায়, থিয়েটার দেখায়, আরও কত কী যা তুমি আমার জন্য কোনদিনই কর না। আচ্ছা, আমার কি কোন শখ আহ্লাদই থাকতে নেই?

তার কথার উত্তরে প্রেমিক রেডরুথ বলল—ও সব বড় বড় কথা মন থেকে মুছে ফেল। তোমার বিড়ালছানাটা তুমি যাকে খুশি দিয়ে দাও, আপত্তি করব না। কিন্তু তোমার জুতোজোড়া যেন ভবিষ্যতে কোন দিনই আমার ওয়ার্ডরোবে দেখতে না পাই, মনে রেখো।

এরকম একটা মনে জ্বালা-ধরা ফরমান জারি করলে যে মেয়েটার সামান্য আত্মমর্যাদাবোধ আছে সে স্বাভাবিক কারণেই সেটাকে বরদাস্ত করতে পারে না।

এবার শুরু হল জোর মন কষাকষি। প্রেমিকা-মেয়েটা নিতান্ত অনন্যোপায় হয়েই আঙুল থেকে আংটিটা খুলে তার প্রেমিকের গায়ে ছুঁড়ে মারল। ব্যস, সে মুহূর্তেই তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

তবে আমার বিশ্বাস, এর জন্য মিস এলিসও কম অন্তর্দাহে দগ্ধ হয় নি। সে আর অন্য কোন যুবকের হাতে নিজেকে তুলে দিতে উৎসাহী হয় নি। জীবনে সে আর বিয়েই করেনি। মুখের চামড়ায় ভাঁজ পড়তে আরম্ভ করলেই সে টাইপরাইটারকে জীবনের সর্বক্ষণের সঙ্গী করে নিল।

টাইপরাইটারটা নিয়ে মেতে থাকার অবসরে সে একটা বিড়াল ছানাকে লালন পালন করতে লাগল।

এ পর্যন্ত বলে বায়ু-কলের মালিক শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলল—একটা কথা। সৎ ও সহজ-সরল নারীদের ওপর আমি অনেক আস্থা রাখি। তারা অকারণে, এমন কি সামান্য কারণে কখনই আত্মজনের কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয় না।

মহিলা যাত্রীটি এবার মুখ খুলল—আমার ধারণা, এরকম একটা চরিত্র যদি—

তাকে থামিয়ে দিতে গিয়ে জজ মেনেফি বলে উঠল—উফ্! মিস গারল্যান্ড,'অনুগ্রহ করে কোনরকম মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকুন।

মহিলা যাত্রীটি তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাকাল।

জজ মেনেফি এবার বলল—আপনাকে একথা বলার অর্থ—এতে অন্য গল্প কথকদের প্রতি অবিচার করা হবে।

এবার যুবকটার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে সে বলল—আপনি এবার আপনার গল্পটা বললে আমরা ধন্য হব।

যুবকটা গল্প বলার জন্য অনুরুদ্ধ হয়ে সবিনয়ে বলতে শুরু করল—উপস্থিত সুধীজনের সম্মতি পেয়ে আমি এ প্রেমের ঘটনাটা সম্বন্ধে কেবলমাত্র এটুকুই বলতে চাই, সদর-দরজার কাছে তারা যখন পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিল তখন কিন্তু তাদের মধ্যে কোন রকম বাক্‌বিতণ্ডা বা মন কষাকষি হয়নি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, রেডরুথ তার প্রেমিকার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাবার পর কি করল? আমার বিশ্বাস, সে ভাগ্যের সন্ধানে বৃহত্তর পৃথিবীর পথে পা বাড়িয়েছিল।

সত্যি কথা বলতে কি, তার মনে দৃঢ় প্রত্যয় ছিল তার প্রেম নিখাদ এবং দীর্ঘস্থায়ী। কোন দিনই তাদের প্রেমে চিড় ধরবে না। সে ভুলেও ভাবতে পারে নি, তার বিশ্বস্ত প্রেমিকার মনে অন্য কোন পুরুষ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। এরকম কিছু ভাবতে ঘৃণায় তার বুক ভরে উঠল।

তাই তো প্রেমিক প্রবর রেডরুথ তাব প্রেমিকাকে ফেলে সম্পূর্ণ নির্দ্বিধায় এবং নিঃসঙ্কোচে দূরদেশে পাড়ি জমাতে পেরেছিল। কিন্তু কোথায় এবং কোথায় সে ভাগ্যান্বেষণে যেতে পারে? একটু গভীরভাবে ভাবলেই আমরা বুঝতে পারব যে, সে প্রেমিকার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওয়াইয়োমি-এর রকি পর্বতে পাড়ি দিয়েছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল সেখানে সোনার খোঁজ করা।

পথে সে একদল জলদস্যুর কবলে পড়ল। তারা জাহাজ থেকে নেমে তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলল। তাদের অধিকৃত খনিতে হানা দিলে তারা ছেড়ে কথা বলবে কেন? তারপরই—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই অভিযাত্রীদের মধ্য থেকে একজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি আগ বাড়িয়ে বলে উঠল—এ কী অসম্ভব ব্যাপার! এ যে গল্পের গরু পাহাড়ে ওঠার মত ব্যাপার দেখছি।

গল্প কথক ভ্রূ কুঁচকে বলল—কেন? আমার গল্পের মধ্যে এমন কি অসঙ্গত বক্তব্য আছে যাতে এমন কথা উঠতে পারে?

একদল জাহাজী জলদস্যু পাহাড়ে পৌঁছে গেল। তারা কোন্ বিশেষ ধরনের পাল উড়িয়েছিল যার ফলে একেবারে জল ছেড়ে পাহাড়ে উঠে যেতে পারল?

আরে হলই-বা তারা জলদস্যু। তারা তো তখন জাহাজ থেকে নয়, নেমেছিল ট্রেন থেকে।

ঠিক আছে, তা-ই মেনে নিলাম। তারপর কি হল?

জলদস্যুরা রেডরুথ'কে পাহাড়ের একেবারে নির্জন-নিরালা প্রান্তের একটা গুহার ভেতরে কয়েদ করে রেখেছিল।

দিন কয়েক গুহাটার মধ্যে আটকে রাখার পর তারা কয়েদিকে গুহাটা থেকে বের করে আনল।

তাকে মুক্তি দিয়ে দিল?

মোটেই না, বন্দীকে নিয়ে তারা কয়েক শ' মাইল দূরবর্তী আলাস্কার অরণ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে তারা তাকে নিয়ে আলাস্কার গভীর অরণ্যে হাজির করল। সেখানে একটা কুটীর তৈরী করে তাকে বন্দী করে রাখল।

রেডরুথ গভীর জঙ্গলে বন্দী-জীবন যাপন করতে লাগল। সেখানে এক আদিবাসী মেয়ের

সঙ্গে তার পরিচয় হয়। তাদের মধ্যে ক্রমে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

আসলে কিন্তু রেডরুথ-এর মন এলিস-এর কাছেই জমা পড়ে রইল।

আর একটা বছর সে আলাস্কার বনে বনে ঘুরে কাটাল। তারপর একদিন সে কোচড় ভরে হীরে নিয়ে ফিরে এল।

হীরে? এ কী আজব কথা! আলাস্কার জঙ্গলে হীরে পেল কোথায় শুনি? অজ্ঞাত পরিচয় অভিযাত্রীটা প্রশ্ন করে বসল।

গল্প কথক সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল—আলাস্কায় থাকার সময় পেরুভিয়ার মন্দিরের এক ঘোড়ার জিন প্রস্তুত কারকের সঙ্গে তার পরিচয়-খাতির হয়।

ঘোড়ার জিন প্রস্তুতকারকের সঙ্গে পরিচয়-খাতিরের সঙ্গে হীরের কোন্ সম্পর্ক থাকতে পারে তা-তো মাথায় আসছে না।

সে লোকটাই হীরেগুলো বন্ধুত্বের স্মারক হিসেবে তাকে দিয়েছিল, এবার বুঝলেন তো? সে-যাই হোক, সে যখন হন্তদন্ত হয়ে বাড়িতে পৌঁছল তখন এলিস তাকে দেখে আকুল হয়ে কাঁদতে শুরু করল। তাকে নিয়ে সে উইলো গাছের তলায় একটা ঘাসে-ঢাকা ঢিবির কাছে গেল।

চোখের জল মুছতে মুছতে এলিস-এর মা বলল—বাছা, তুমি চলে যাবার পর তার বুকটাও ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। দুনিয়াটা তার মধ্যে বিষময় ও অর্থহীন হয়ে পড়ল।

রেডরুথ দু'পা এগিয়ে সমাধিটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। হাঁটু গেড়ে বসল। নতজানু হয়ে প্রার্থনা করল।

প্রার্থনা সেরে সে চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল—আমার প্রতিদ্বন্দ্বী মানে সে চেস্টার মাকিন্টোস-এর পরিণতি কি হল?

এলিস-এর মা জবাব দিল—চেস্টার বহুসাধ্য সাধন করেও যখন এলিস-এর মন জয় করতে পারল না তখন সে নিশ্চিত হল যে, তার মনটা পুরোপুরি তোমাকেই অর্পণ করেছে। সে শুধুমাত্র তোমারই। তখন সে দিনের পর দিন অশেষ দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করল।

তারপর? তারপর?

মনের দুঃখে সে এ জায়গা ছেড়ে গ্র্যান্ড র‍্যাপিডস্-এ চলে গেল। সেখানে একটা আসবাবপত্রের দোকান খুলল।

এখনও কি সেখানেই—

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে এলিস-এর মা বলে উঠল—না-না।

তবে? তবে কোথায় সে, করছে কি?

এই তো ক'দিন আগেই আমরা শুনেছি, ইন্ড-এর অন্তর্গত দক্ষিণ মোড়-এর অদূরে ক্রোধোন্মত একটা হরিণের শিঙের আঘাতে তার মৃত্যু হয়েছে।

সে হঠাৎ সেখানে গিয়েছিল কেন, বলতে পারেন?

সভ্য মানুষের কাছ থেকে দূরে থাকার জন্য ওরকম একটা জায়গা বেছে নিতে সে উৎসাহী হয়েছিল।

একথা শোনার পর রেডরুথও যারপরনাই মনমরা হয়ে গেল। সে মানুষের সংস্রব থেকে দূরে, বহু দূরে এসে সন্ন্যাসীর মত জীবন যাপন করতে লাগল—একথা তো আমাদের সবারই জানা আছে।

অন্য যুবকটা তার গল্প শেষ করে একটু পিছিয়ে গিয়ে পরবর্তী বক্তার জন্য জায়গা করে দিল। তারপর কি ভেবে সে-ই আবার বলতে শুরু করল—দেখুন, আমার পরিবেশিত গল্পটাতে সাহিত্য-গুণের অভাব থাকতে পারে বটে। তবে এটাই সত্য, আমি একটা কথাই বুঝাতে চেয়েছি যে, রূপসী যুবতীটা শেষ অবধি বিশ্বস্তই থেকে গিয়েছিল। তার কাছে বিত্ত-সম্পদের তুলনায় সত্যিকারের ভালবাসার মূল্য অনেক, অনেক বেশী।

মুহূর্তের জন্য থেমে সে আবার সরব হল—দেখুন, নারী জাতির প্রতি আমার যে প্রগাঢ় বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও বিস্ময় তাতে আমার পক্ষে অন্য কোনরকম বশবর্তী হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

সামনে বসে-থাকা মহিলা-অভিযাত্রীর দিকে বাঁকা-চোখে মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে যুবক-বক্তা

তার গল্প শেষ করল।

এবার জজ মেনেফি গাড়ির চালক বিলডাড্ রোজ-এর দিকে তাকাল।

বিলডাড্ রোজ তার চোখের ভাষাতেই বুঝে নিল, এবার তার গল্প বলার পালা।

গাড়ির চালক এবার একটু নড়েচড়ে গল্প বলার জন্য তৈরী হল। মুহূর্তের জন্য শ্রোতাদের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল—আমি কিন্তু বেহায়া নেকড়ের মত জীবনের যাবতীয় হতাশা-হাহাকার আর দুঃখ-দুর্দশার জন্য নারীর ওপরই সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে নিজেকে ধোয়া-তুলসি পাতা প্রতিপন্ন করতে প্রয়াসী হব।

সে এ পর্যন্ত বলে বিচারক যুবতী-অভিযাত্রীটির দিকে মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনোভাবটা সম্বন্ধে আঁচ করে নেবার চেষ্টা করল। এবার সে বলল—মাননীয় বিচারক, কাল্পনিক গল্প প্রসঙ্গে আপনি আমার বক্তব্য জানতে চেয়েছেন। সেটা হচ্ছে—

রেডরুথ কেন—কেন পেয়েছে? আমি বলব তার আলস্যের জন্য। সে লোকটা যদি আরও সক্রিয়, মানে উদ্যমী হয়ে ধনকুবের প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াত, আর যদি সে এলিসকেও নিজে হাতের মুঠোয় রাখত তবেই ব্যাপারটা অবশ্যই অন্য দিকে মোড় ঘুরত না, অনায়াসেই ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয়ে যেত।

আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, সে কি তা করেছিল? আপনারাও আশা করি আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, সে অবশ্যই তা করল না। আর সে সেখান থেকে চম্পট দিল।

রেডরুথ হয়ত ভেবেছিল, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আমরা জেনেছি, সে তা আদৌ করল না। আর সে এ-ও ভেবেছিল, কোন না কোন ছুতোনাতায় সে তাকে ডেকে পাঠাবে। আর এরই ফলে তার মুখে দেখা দেবে হাসির প্রলেপ। হাসি মুখেই সে ফিরে যাবে।

এলিস কিন্তু তা করে নি। কেন সে এমন আচরণ করল? এ পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলব, কোন মেয়েই হ্যাংলার মত পুরুষের পিছনে ছুটতে উৎসাহী হয় না। আর এটাই তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

আমি মনে করি, মানে আমার বিশ্বাস, রেডরুথ প্রায় ন'টা বছর এলিস-এর আগ্রহের প্রত্যাশায় ছিল। তার দিক থেকে একদিন না একদিন ডাক আসবেই এরকম আশা সে অন্তরের অন্তঃস্থলে পোষণ করেছিল।

কিন্তু তার আশা পূর্ণ হয় নি। এলিস-এর দিক থেকে কোন সাড়াই পায়নি।

শেষ পর্যন্ত সে হতাশ হয়ে ভাবল—না, তার আশা ফলপ্রসু হবার নয়।

রেডরুথ তার প্রেমিকা এলিসকে ফিরে যাবার আশা চিরদিনের মত মন থেকে মুছে ফেলল।

হতাশায় জর্জরিত রেডরুথ শেষ পর্যন্ত সন্ন্যাসের পথে পা-বাড়ানোকেই একমাত্র উপযুক্ত পথ বলে মনে করল। সে করলও তা-ই। সে সন্ন্যাসী সেজে নির্জন-নিরালা এ অঞ্চলে এসে ডেরা বাঁধল। তার মুখে গজাল ইয়া লম্বা দাঁড়ি। আমাদের ভালই জানা আছে, আলস্য আর দাড়ি-গোঁফের সঙ্গে সম্পর্ক বিদ্যমান। তারা এক সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে।

এ-তো গেল রেডরুথ-এর কথা। আর রূপসী যুবতী এলিস? সে যে শেষ পর্যন্ত অবিবাহিতাই রয়ে গেছে একথা আমি দৃঢ়তার সঙ্গেই বলতে পারি।

অন্য কোন পুরুষকে পতিত্বে বরণ করে ঘর বাঁধতে উৎসাহী না হয়ে বরং এলিস নিঃসঙ্গ জীবনকেই আঁকড়ে ধরল।

আর রেডরুথ সে দাড়ি না কেটে নাপিতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করল, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করা ছেড়ে দিল। তার জন্য আমি অবশ্যই তাকে দোষারোপ করব না। আশা করি এ জন্য তার ঘাড়ে দোষ চাপানো তার প্রতি অবিচারই করা হবে।

বিলডাড্ রোজ তার গল্প শেষ করে নিজের জায়গায় চলে গেল।

এবার অজ্ঞাতপরিচয় যাত্রীর পালা।

জজ মেনেফি তাকে গল্প বলার জন্য অনুরোধ করল।

তার নামটা পর্যন্ত অন্যান্য অভিযাত্রীদের কেউ-ই জানে না। সে 'স্বর্গ-নগর' থেকে 'সূর্যোদয়-নগর' পর্যন্ত অভিযাত্রীদের সঙ্গ নিয়েছে।

বিচারক মেনেফি-র আহ্বানে সে এগিয়ে এসে সামনের খালি-জায়গাটায় বসল। তার পরনে

বাদামি রঙের পোশাক, মসৃণ চুলগুলো পরিপাটি করে আঁচড়ানো, নাকটা চোখে লাগার মত লম্বা, চোখ দুটো মাছের মত আর একমাত্র বন-দেবতার মুখের সঙ্গেই তার মুখটার তুলনা করা চলে। আর কণ্ঠস্বর খুবই ফ্যাঁসফ্যাঁসে।

সে গল্প শুরু করার মুখেই বলে বলল—এতক্ষণ ধরে বিভিন্ন বক্তা বিভিন্ন রকম বক্তব্য রাখলেন। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রেমিক আর প্রেমিকার কৃতকর্মের বিচার বিশ্লেষণ করলেন। কিন্তু আমি বলব, আপনারা সবাই ভুল পথে ছুটেছেন।

উপস্থিত শ্রোতারা সবাই একসঙ্গে মুখ তুলে গল্প কথকের মুখের দিকে তাকাল। সবার চোখেই জিজ্ঞাসার ছাপ সুস্পষ্ট।

গল্প কথক আবার মুখ খুলল—আরে, আপনারা কেউ-ই আসল কথার ধার কাছ দিয়ে গেলেন না।

শ্রোতাদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠল—আসল কথা? আপনার আসল কথাটা কি, শুনতে পারি কি?

আরে, কমলা ফুল ছাড়া কি প্রেম হয়, নাকি প্রেম কোনদিন গাঢ় হয়? কথাটা বলেই সে হো-হো করে হেসে উঠল।

তারপর এক সময় হাসি থামিয়ে বলতে লাগল—প্রেমের ক্ষেত্রে কমলা-ফুল অপরিহার্য। যে যুবক প্রজাপতিটাই ব্যবহার করেছে আর পকেটে রয়েছে সচল চেক, আমি তার হয়ে যে কোন বাজি ধরতে পারি।

এবার গল্পের শুরুতে চলে যাওয়া যাক। সদর দরজা থেকেই প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন, মানে দূরে চলে গেল, কথাটা তো মিথ্যে নয়? ঠিক আছে তা-ই না হয় মেনে নিলাম।

রেডরুথ এক সময় বে-পরোয়া হয়ে বলে উঠল—তুমি কি কোনদিন এক মুহূর্তের জন্যও ভালবেসেছ, নাকি এখন ভালবাস? আমি কিন্তু তোমার ভালবাসার ব্যাপারে যথেষ্ট ঘৃণা করি। যদি ভালই বাসতে তবে কি আইসক্রিম কিনে দেবার আর্থিক সঙ্গতি আছে বলেই তুমি অন্য একজনের সঙ্গে কথা বলতে উৎসাহী হও। তা নইলে কখনই তোমার মধ্যে এ প্রবণতা জাগত না।

এলিস তার প্রেমিকের কথার জবাব দিল—তুমি মিথ্যার স্বর্গে বাস করছ। আমি অন্তর থেকে লোকটাকে ঘৃণা করি।

গিল্টি-করা বাক্স লেস দিয়ে বেঁধে যে মাখন—টফি আমাকে পাঠিয়েছে তাকে আমি অন্তর থেকে খুবই তুচ্ছ জ্ঞান করি, ঘৃণাও করি কম না।

সে যখন আমাকে উপহারস্বরূপ মুক্তোর লকেট আর পিরোজা মণিটা আমার হাতে তুলে দিয়েছিল তখন আমার কিন্তু মনে হয়েছিল ছুরির ফলাটা তার বুকে আমূল গেঁথে দেই। জাহান্নামে যাক সে। আমি শুধু তোমারই। শুধু তোমাকেই ভালবাসি।

সে রাত্রেই জন ডব্লু ক্রুমাস আর তার কাছে এল। নেকটাই-এর মুক্তোর পিনটা ঠিক করে নিল। তারপর সে সবিস্ময়ে বলে, এ কী এলিস তোমার চোখে জল—তুমি কাঁদছ! ব্যাপার কী বল তো? তোমার চোখে জল, এ যে আমার পক্ষে নিতান্তই অসহনীয়!

চোখের জল ফেলতে ফেলতে এলিস ধরা-গলায় বলল—তুমি নিষ্ঠুর : তুমি পাষণ্ড!

এ কী বলছ, এলিস!

হ্যাঁ—হ্যাঁ, ঠিকই বলছি!

তোমার এ ধরনের আচরণের কারণ জানতে পারি কি?

তুমি পাষণ্ড না হলে কিছুতেই আমার মনের মানুষ, আমার ভালবাসার পাত্রকে কিছুতেই তাড়িয়ে দিতে পারতে না।

সে আমতা আমতা করে বলল—আমি মানে—

তাকে থামিয়ে দিয়ে এলিস বলল—হ্যাঁ-হ্যাঁ, তুমিই তাকে তাড়িয়েছ। আমি তোমার মুখ দর্শন করতে চাই না। আমি—আমি তোমাকে অন্তর থেকে ঘৃণা করি।

জন ডব্লু কোটের পকেট থেকে দামী সিগারেটের প্যাকেটটা বের করল। তা থেকে একটা সিগারেট বের করে তাতে অগ্নি সংযোগ করল। তারপর এক গাল ধোঁয়া ঘরের হাল্কা বাতাসে

ছড়িয়ে দিয়ে বলল—তা-ই যদি সত্যি হয় তবে আমাকেই বিয়ে কর।

এলিস গুলি-খাওয়া বাঘিনীর মত গর্জে উঠল—কি বললে? তোমাকে বিয়ে! তোমাকে বিয়ে করব আমি! অসম্ভব! একেবারেই অসম্ভব!

জন ডব্লু নীরবে সিগারেট টেনে চলল।

এলিস ফুঁসতে লাগল। তারপর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলল—শোন্, আগে এ ধাক্কাটা সামলে নেই। কিছু কেনাকাটা সেরে ফেলি, আর তুমিও লাইসেন্সের ব্যাপারটা দেখ।

তার বক্তব্যের আসল কথাটা বুঝতে না পেরে জন ডব্লু নীরবে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

এলিস পূর্বস্বর অনুসরণ করেই বলে চলল—আর তুমি লাইসেন্সের ব্যবস্থাটা আগে দেখ। পাশের বাড়িতে ফোন আছে। প্রয়োজনে জেলার কেরানির সঙ্গে কথা বলতে চাইলে সেরে নিতে পার।

উপস্থিত শ্রোতারা উপহাসের স্বরে হেসে উঠল। বক্তার মুখেও মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল।

হাসির পর্ব মিটে গেলে বক্তা আবার গল্প বলায় মন দিল—আমাদের এবার ভাবা দরকার, রেডরুথ আর এলিস-এর বিয়েটা হয়েছিল কি? বলুন তো, হাঁস কি ফড়িংটাকে গিলেছিল?

যাক, এবার আমি রেডরুথ-এর প্রসঙ্গে কিছু বলছি। আমার ধারণা, বিচার-বিবেচনা অনুসারেও মনে করতে পারেন, আপনারা একে-একে সবাই ভুল করেছেন, মানে ব্যাপারটাকে ভুল দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন।

রেডরুথ কেন সন্ন্যাসী হতে উৎসাহী হল? কেন সে সন্ন্যাসী হয়ে এমন একটা নির্জন-নিরালা প্রান্তরকে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো কাটিয়ে দেবার জন্য নির্বাচন করল? কেন, কিসের জন্য?

তার সন্ন্যাস জীবনকে বেছে নেবার কারণ হিসেবে আমার পূর্ববর্তী গল্প-কথকদের কেউ কেউ তার আলস্যকেই সর্বতোভাবে দায়ী করেছেন। কেউ বলেছেন, নেশার ঝোঁকেই সে সন্ন্যাসীর মত জীবনধারণ করতে উৎসাহী হয়েছিল। আবার কেউ এমনও ভেবেছেন, অনুশোচনার জ্বালা সইতে না পেরে সে বিবাগী হতে বাধ্য হয়েছিল।

মুহূর্তের জন্য নীরব হয়ে বক্তা কি যেন ভেবে নিল। তারপর আবার মুখ খুলল—এবার আমার মত বলছি শুনুন—তাকে সন্ন্যাসী হতে বাধ্য করে নারী। হ্যাঁ, নারীই তার এ কাজের জন্য একমাত্র দায়ী।

শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মত নীরবে তার কথাগুলো শুনতে লাগল।

সে বলে চলল—আমার এবারের জিজ্ঞাস্য, সে বুড়ো রেডরুথ-এর বয়স এখন কত? প্রশ্নটা করতে করতে সে বিলডাড্ রোজ-এর দিকে চোখ ফেরাল।

বিলডাড্ রোজ বার কয়েক আমতা আমতা করে বলল—তা-তো কম নয়, পয়ষট্টি তো হবেই।

ভাল কথা। দীর্ঘ বিশটা বছর সে আশ্রম-জীবন কাটিয়েছিল, মানে এখানে, পাণ্ডববর্জিত এ অঞ্চলে কাটিয়েছিল।

আমরা মনে করতে পারি যখন সে ওই সদর-দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তার প্রেমিকার কাছ থেকে শেষবারের মত বিদায় নিয়েছিল তখন তার বয়স পঁচিশ বছর। আপনারাই বলুন, এরকম মনে করা যায়, কি না?

উপস্থিত সবাই প্রায় সমস্বরেই বলে উঠল—অবশ্যই-অবশ্যই।

বক্তা এবার বললেন—তবে হিসেব মত বাকি রইল বিশ বছর। তবে দেখা যাচ্ছে বিশ আর পঁচিশে মিলে হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ বছর, ঠিক কিনা?

শ্রোতারা আবার সমস্বরেই বলে উঠল—অবশ্যই ঠিক। ঠিক তো হতেই হবে; এ-তো অঙ্কের ব্যাপার।

যা-ই হোক, তবে পঁয়ষট্টি বছর থেকে বাদ বলে গেল পঁয়তাল্লিশ বছর। এখন রইল বিশ বছর। আমাদের সমস্যা হচ্ছে, এ বিশটা বছর, মানে এ দশ বছর আর দুটো পাঁচ বছর। এতগুলো বছর সে কোথায় ও কিভাবে কাটিয়েছে? আপনারা কেউ-ই কিন্তু এদিকটা এর আগে ভুলেও চিন্তা-ভাবনা করেন নি, ভুল বলেছি?

উপস্থিত শ্রোতারা নীরব চাহনি মেলে একে অন্যের মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

গল্প কথক ম্লান হেসে এবার বলল—অবশ্য এমুহূর্তে আমার মাথায় যে ভাবনার উদয় হয়েছে আপনারাও হয়ত ঠিক তা-ই ভাবছেন। আর যদি তা না-ই হয় তবে আমার ভাবনাটা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি, দীর্ঘ বিশটা বছর ধরে সে বিয়ের ধান্ধায় ঘুরে বেড়িয়েছে। এর জন্য তাকে বহু ঘাটের জলই খেতে হয়েছে। কিন্তু না, কোথাও হালে পানি পায় নি। কোথাও সুবিধে করতে না পেরে সে স্বভাবতই হতাশ হয়ে পড়ল।

শ্রোতারা নীরব চাহনি মেলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো শুনতে লাগল। আসলে তার বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতা দেখে সবাই স্তম্ভিত।

গল্প কথক বলে চলল—তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সে যাদের ধার-কাছ দিয়ে বিয়ের জন্য ঘুরঘুর করেছে সবাই তাকে একটা কথাই বলেছে—মানে মানে কেটে পড়, নিজের পথ দেখ।

তার মাথায় তখন একে-একে বহু ভাবনার উদয় হতে লাগল। আশ্রমের কারবারে এখনও তেমন ভিড়ভাট্টা হয় নি। সেখানে এখনও স্টেনোগ্রাফাররা দরখাস্ত-হাতে হামলা করতে ভিড় করে না। অতএব সন্ন্যাসীর জীবনটাকেই আঁকড়ে ধরা হোক। সন্ন্যাসীদের সুখের জীবনই হোক আমার ভবিষ্যতের দিনগুলো কাটাবার উপায়।

একটু আগে তো আপনাদের মধ্য থেকে একজন নির্দ্বিধায় বলেছেন, সে নিজেকে রাজা সলোমন বলে পরিচয় দিয়েছিল বলে পাগলা গারদে তাকে ঢুকতে হয়েছিল, বলেন নি?

শ্রোতাদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠল—হ্যাঁ, একথা তো বলা হয়েছিলই।

কিন্তু আমি বলব, কথাটা অবশ্যই যুক্তিগ্রাহ্য নয়। বাজে কথা বলেই সেটাকে উড়িয়ে দিতে পারেন।

কারণ? এ কথার পিছনে কোন্ যুক্তি আপনি দেখাতে চাচ্ছেন?

আমি সেটাকে বাজে কথা বলে উড়িয়ে দিতে চাচ্ছি এজন্য যে, এ গল্পের নায়ক রেডরুথ ছিল প্রকৃত পক্ষে একজন সাধারণ সলোমন।

এ পর্যন্ত বলে গল্প-কথক মুহূর্তের জন্য থামল।

মুহূর্তকাল নীরবতার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে সে আবার মুখ খুলল—আমার গল্প এখানেই শেষ। আপেলের প্রত্যাশী আমি নই, কোন দরকারই নেই। ডাক টিকিট সেঁটে দিলাম। অবশ্য আমার গল্পটা পুরস্কার লাভের যোগ্য বলে আমি মনে করছি না।

জজ মেনেফি তো আগেই স্পষ্ট ভাষায় নিষেধাজ্ঞা জারি করে রেখেছিল যে, কোন গল্প সম্বন্ধেই কেউ, কেনরকম মন্তব্য করতে পারবে না।

পূর্ব-ঘোষিত নিষেধাজ্ঞার কথা বিবেচনা করে শ্রোতারা গল্পটা সম্বন্ধে মন্তব্য করা থেকে বিরত রইল। কেউ এ প্রসঙ্গে টু শব্দও করল না।

এবার প্রতিযোগিতার সুবক্তা একটু নড়েচড়ে বসে, বার-কয়েক ছোট্ট করে কেশে গলাটাকে পরিষ্কার করে নিয়ে গল্প শুরু করার জন্য তৈরী হয়ে নিল।

জজ মেনেফির ভেতরটা যেন তখন উত্তেজনায় কাঁপছে। মুহূর্তের মধ্যে সে নিজেকে সামলে নিয়ে গল্প বলা শুরু করল—

দেখুন, অভিযাত্রী-বন্ধুরা, আমাদের গল্পের মুখ্য বিষয় একটা নারীর হৃদয়। আপনারাই ভেবে দেখুন তো, কেউ কি কোনদিন নারী-হৃদয়ের পরিমাপ করতে পেরেছে?

আর এ-ও স্বীকার না করে পারা যাবে না, পুরুষের কামনা-বাসনা বিচিত্র পথে চলে।

আমার ধারণা সম্বন্ধে যদি জিজ্ঞেস করেন তবে আমি অবশ্যই বলব, দুনিয়ার সব নারীর হৃদয়ের সুর একই তালে আর একই পুরনো প্রেমের তালে বাজে। আশা করি আপনারাও আমার এ বক্তব্যকে সমর্থন করবেন।

একটা নারী কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রেমকে বিচার করে আপনারা বলুন তো?

উপস্থিত সবাইকে নীরব দেখে গল্প কথকই প্রশ্নটার উত্তর দিল—আমি বলব, একটা নারীর বিচারে প্রেম ভালবাসা হচ্ছে, আত্মবলিদান। 'নারী' নামের যোগ্য হতে হলে সোনাদানা, ধন-দৌলত পদ-মর্যাদা কখনই প্রেম-অনুরাগের চেয়ে ভারী, মানে বড় হতে পারে না।

উপস্থিত আমার শ্রোতা-বন্ধুগণ, রেডরুথ বনাম এলসি-র প্রেম ভালবাসায় মামলার শুনানী

চলেছে। তবু আমার জিজ্ঞাস্য, এখন বিচার হচ্ছে কার?

আমি বলব, রেডরুথ-এর বিচার অবশ্যই হচ্ছে না।

তার কথায় শ্রোতারা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে নীরবে তাকাল। জজ মেনেফি পূর্ব প্রসঙ্গের জের টেনে বলতে লাগল—না, রেডরুথ-এর বিচার করার তো কিছু থাকতে পারে না। কারণ কি? কারণ একটাই, তার প্রাপ্য শাস্তি তো সে পেয়েই গেছে, পায় নি?

এবার কি বলছি, ধৈর্য ধরে শুনুন—তা-ই যদি মেনে নেওয়া যায় তবে বিচার হচ্ছে কার? এখানে উপস্থিত প্রতিটা অভিযাত্রীকেই একটা মাত্র প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে। প্রশ্নটা কি, তাই না? আমাদের বুকের মধ্যে অবস্থান করছে কে, অর্থাৎ কি? অন্ধকার, নাকি পৌরুষ? আর আমাদের, বিচারকের ভূমিকায় কে অবস্থান করছে? এ প্রশ্নের উত্তর আমরা সবাই জানি আর উত্তর একটাই—এক নারী। আর সে অবস্থান করছে একটা ফুলের মতই অপরূপা হয়ে। আর আমাদের বাঞ্ছিত পুরস্কারটা ধরা আছে তারই হাতে। সে পুরস্কারটা আপাত দৃষ্টিতে খুবই নগণ্য হলেও সেটা আমাদের প্রচেষ্টারই যোগ্য পুরস্কার।

সে রূপসী যুবতীর রূপ-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে রেডরুথ তাকে মন-প্রাণ সঁপে দিয়ে দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল। ঘটনাটাকে আরও বেশী দূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আগে আমরা পূর্ববর্তী গল্প-কথকদের বক্তব্য সম্বন্ধে প্রতিবাদ করব যেখানে একটা নারীর স্বার্থপরতা, বিবেকহীনতা, ভোগলালসা আর বিশ্বাসঘাতকতা তাকে পার্থিব জীবন থেকে ঠেলে ধাক্কে দূরে, বহুদূরে নিয়ে চলে গিয়েছিল।

মুহূর্তের জন্য নীরব থেকে, একটু দম নেবার চেষ্টা করে সে বলতে শুরু করল—দেখুন উপস্থিত সুধীজন, আপনারা কি বলবেন আমার জানা নেই। তবে আমি কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গেই বলছি, কোন নারীকে এমন স্বার্থপর, হৃদয়হীন আর বিশ্বাসঘাতক হতে আমি অন্তত দেখি নি।

তবে এ পরিস্থিতিতে আসল কারণটা আমাদের জানার উপায় কি? আমাদের আসল কারণটা খুঁজতে হবে পুরুষের হীন প্রকৃতির আর নীচ উদ্দেশ্যের মধ্যে। আশাকরি, আমার যুক্তিটা আপনাদের সবার সমর্থন পাবে।

সহ-অভিযাত্রী সুধীজন, চলুন, এবার আমরা সে সদর দরজাটার কাছে ফিরে যাই যেখানে প্রেমিক রেডরুথ আর প্রেমিকা এলিস শেষবারের মত মিলিত হয়েছিল। সে মুহূর্তে সেখানে প্রেমিক-প্রেমিকাদ্বয় বাক্‌বিতণ্ডা, ঝগড়ালিপ্ত হয়েছিল এরকম কথা অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আর রেডরুথ ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়েছিল এরকম ভাবাটাও মোটেই অসম্ভব নয়। ঈর্ষায় জর্জরিত হয়ে সে দেশ ও পরিচিত জনের কাছ থেকে দূরে গিয়ে কোথাও মুখ ঢাকার জন্য একদিন উধাও হয়ে গিয়েছিল। আমার জিজ্ঞাস্য, তার এ কাজের পিছনে তা-ই কি যথেষ্ট কারণ ছিল? এ প্রশ্নের যুক্তিসঙ্গত উত্তর আমাদের জানা নেই।

দেখুন সুধীজন, প্রেমিক রেডরুথ-এর নিরুদ্দেশের উপরোক্ত কারণের নির্ভরযোগ্য কোন কারণই আমাদের হাতে নেই। আছে কি?

শ্রোতারা নীরব চাহনি মেলে গল্পকথক জজ মেনেফি-র মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

কারো কাছ থেকে কোন জবাব না পেয়ে জজ মেনেফি-ই আবার বক্তব্য শুরু করল—এরকম কোন প্রমাণ না থাকলেও এর চেয়ে অনেক বড় প্রমাণ আমাদের হাতে রয়েছে। আমরা চিরকালই নারীজাতির সততার ওপর আস্থাভাজন।

সত্যি কথা বলতে কি, লোভের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও আমরা নারী-চিত্তের দৃঢ়তার ওপর বিশ্বাস রাখি। আবার অগাধ অর্থের প্রলোভন সত্ত্বেও নারীর বিশ্বস্ততার ওপর আমরা মোটেই বিশ্বাস হারাতে পারি না, ঠিক কিনা?

আমি যেন চোখ বন্ধ করলেই দেখতে পাই, একটা একরোখা প্রেমিক ব্যর্থতার জ্বালা বুকে নিয়ে, অনুশোচনার জ্বালা অন্তরের অন্তঃস্থলে বয়ে নিয়ে হা পিত্যেশ করতে করতে পৃথিবীর পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আর? আর আমি চোখ বন্ধ করলেই এ দৃশ্যই দেখতে পাচ্ছি সে কিভাবে দ্রুত নিচে নেমে যাচ্ছে।

প্রেমিকা কর্তৃক প্রতারিত হতভাগা প্রেমিক চূড়ান্ত হতাশা বুকে নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াবার সময় যখন সে উপলব্ধি করছে যে জীবন তাকে অমূল্য সম্পদটাকে উপহার দিয়েছিল তাকে সে অবহেলা ও অবজ্ঞাভরে হারিয়েছে। সে আজ তার একেবারেই নাগালের বাইরে।

তারপর? তারপর এ দুঃখ-যন্ত্রণার আগার এ পৃথিবী থেকে দূরে, বহু দূরে চলে গেল। নির্জন-নিরালা প্রান্তরে অবস্থান করার সময় তার মধ্য থেকে যাবতীয় বোধবুদ্ধি আর বিচার বিবেচনা শক্তি ক্রমে লোপ পেতে লাগল।

এবার আপনাদের কাছে আমার ধ্যান ধারণার কথা ব্যক্ত করছি। অর্থাৎ ঘটনাটাকে আমি কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছি, কি দেখেছি? আমার মতামত আমি সুধীশ্রোতা বিচারকের কাছে পেশ করছি। আমরা দেখেছি, দিন যতই অতিবাহিত হচ্ছে একটা নারী হৃদয় ততই শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে। আর আমরা এ-ও দেখেছি, এত কিছু সত্ত্বেও সে সহজে বিশ্বাস হারায় নি। বিশ্বাসে ভর দিয়ে সে আরও বেশ কিছুদিন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে। আর দিনের পর দিন তার বহু আকাঙ্ক্ষিত সুখটাকে খুঁজে বেড়িয়েছে। আর বহু আকাঙ্খিত ও সুপরিচিত প্রত্যাশা বুকে নিয়ে সে পদধ্বনি শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে রয়েছে।

কিন্তু কিছুতেই সে নিজের মনকে প্রবোধ দিতে পারছে না। সে তাকে ছেড়ে চলে গেছে সে আর কোনদিন ফিরে আসবে না, কোনদিনই না।

দিনের পর দিন, বছরের পর বছর পেরিয়ে গেছে। ইতিমধ্যে নদী দিয়ে বহু জলই বয়ে গেছে। আর আমাদের নায়িকা এলিস-এর মাথার চুলে পাক ধরেছে, দাঁত হয়ে গেছে নড়বড়ে। মোদ্দা কথা, সে বুড়ি হয়ে গেছে। তবু সে মিথ্যা আশায়, যে আশা কোনদিনই পূরণ হবার নয়, সে আশায় বুক বেঁধে সে পথের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে ঘরের দরজায় বসে থাকে।

আমি কেন মিস এলিস সম্বন্ধে এরকম একটা ভাবনা অন্তরের অন্তঃস্থলে সযত্নে পোষণ করে চলেছি, তাই না?

নারীর প্রতি আমার মনের দৃঢ় বিশ্বাসই আমাকে এরকম ভাবতে প্রেরণা জোগাচ্ছে।

আমরা তো জানিই, পৃথিবীর বুকে প্রতিদিন কতই না প্রেমিক-প্রেমিকা বিরহ-জ্বালায় দগ্ধে মরছে, চির বিচ্ছেদ ঘটছে কত নারী আর পুরুষের। তবু প্রতীক্ষার শেষ নেই। কেন এ প্রতীক্ষা? আশার ছলনে ভুলি নারী এমন করে দীর্ঘ প্রতীক্ষায় ব্রতী হয়। স্বর্গ মিলনের প্রত্যাশা নিয়েই নারী প্রতীক্ষা করে, আজও বহু নারী প্রতীক্ষায় লিপ্ত। আর পুরুষ হতাশার ফাঁকে দিন দিনই তলিয়ে যাচ্ছে।

অজ্ঞাত পরিচয় অভিযাত্রী যুবকটা ভিড়ের মধ্য থেকে মুখ বাড়িয়ে বলে উঠল—লোকটা সম্বন্ধে আমার কিন্তু অন্য রকম ধারণা ছিল।

জজ মেনেফি সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল—অন্যরকম? কি? কি ধারণা? বলবেন কি?

আমার ধারণা সে বাড়িটা ছারপোকার ডিপো। তাই উপায়ান্তর না দেখে সে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেছে।

তার কথায় জজ মেনেফি-র মুখে অধৈর্যের ছাপ ফুটে উঠল। আর মুখ ফিরিয়ে নিল। অন্যান্য শ্রোতারা মাথা নিচু করে বিচিত্র এক ভঙ্গীতে বসে রইল।

বাড়িটার বাইরে ঝড়ের তাণ্ডব অনেকাংশে কমে গেছে। আর আগেকার সে বৃষ্টির দাপাদাপিও নেই। তবে থেকে থেকে দরজার ফাঁক দিয়ে হাল্কা বাতাস ঢুকে আসছে। আর আগুনের কুণ্ডটাও ক্রমে নিভতে বসেছে।

একটু পুটুলির মত জুবুথুবু হয়ে মহিলা অভিযাত্রীটা আবছা অন্ধকারে নীরবে বসে রয়েছে।

জজ মেনেফি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। মুহূর্তের জন্য উপস্থিত সুধীজনের ওপর চোখের মণি দুটো আলতোভাবে বুলিয়ে নিল।

এক সময় সে মহিলা অভিযাত্রীটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলল—মিস গারল্যান্ড, আমাদের কাজ মিটে গেছে। এখন বাকি রইল আপনার কাজ। আপনাকে এবার পুরস্কার প্রাপক নির্বাচন করার পালা। কিসের ওপর ভিত্তি করে এ পুরস্কার প্রদান করা হবে? নারীত্বের প্রকৃত মূল্যায়ন।

মিস গারল্যান্ড মুখ তুলে জজ মেনেফি-র দিকে তাকাল।

জজ মেনেফি এবার বলল—এবার বলুন তো, কোন্ প্রতিদ্বন্দ্বী বাঞ্চিত প্রসঙ্গটার সবচেয়ে

কাছাকাছি পৌঁছতে পেরেছে বলে আপনি মনে করছেন?

মহিলা অভিযাত্রী মিস গারল্যান্ড নীরব রইল। সে নীরব চাহনি মেলে তার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

জজ মেনেফি সবিনয় অনুরোধের ভঙ্গীতে মিস গারল্যান্ড-এর দিকে তাকাল।

অজ্ঞাত পরিচয় যুবক-যাত্রীটা গলা নামিয়ে হলেও কর্কশ গলায় হেসে উঠল। কোন কথাই জিজ্ঞাসা করল না।

মহিলা অভিযাত্রী মিস গারল্যান্ড ঘুমিয়ে পড়ল। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই সে গভীর মুখে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

জজ মেনেফি তার ঘুম ভাঙিয়ে উঠিয়ে বসাবার চেষ্টা করতে গিয়ে তার দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিল। শেষ পর্যন্ত সে মুহূর্তে স্তম্ভিত হয়ে যন্ত্রচালিতের মত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কেন? তার মধ্যে এমন অভাবনীয় পরিবর্তনের কারণ কি? মিস গারল্যান্ড-এর কোলের ওপর রাখা ছোট্ট, গোলাকার ও ঠাণ্ডা বস্তুটা তার হাতে ঠেকল।

জজ মেনেফি আপেলের ভেতরের অংশটা অভিযাত্রীর দেখাবার জন্য উঁচু করে ধরে দে ভীত-সন্ত্রস্ত গলায় চিৎকার করে উঠল—হায়! একী হল! মিস গারল্যান্ড যে আপেলটা খেয়ে ফেলেছেন!

দ্য ক্যাবালেরো'স ওয়ে

বলা যায় মোটামুটি ন্যায়যুদ্ধে কিস্‌কো কিড ছ'জনকে হত্যা করেছে। তার দ্বিগুণ সংখ্যক মানুষকে খুন করেছে। তাদের অধিকাংশই মেক্সিকোর অধিবাসী। আরও বহু মানুষকে ডানা কেটে ছেড়ে দিয়েছে, যাদের সংখ্যা সে হিসাব করে রাখেনি। অতএব একটা মেয়ে তাকে ভালবেসেছিল। আর তারই জন্যই এতগুলো মানুষকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে।

কিড পঁচিশ বছর বয়স্ক এক যুবক। কিন্তু তাকে দেখলে মনে হবে বছর কুড়ি বয়স। আর যেকোন সাবধানী বীমা কোম্পানি তার সম্ভাবিত মৃত্যুর সময় ছাব্বিশ বছর বয়স ধরে নেয়।

আর তার বাসস্থল? রিও গ্রান্ড আর ফ্রায়োর মাঝামাঝি কোন জায়গায় সে বাস করে।

কিস্‌কো কিড কেন খুন করতে উৎসাহী হত? আসলে খুন করে সে আনন্দ পায় বলে খুন করতে উৎসাহী হয়। কিন্তু এ-ভাললাগার পিছনে কোন যুক্তি রয়েছে? সত্যি কথা বলতে কি তার চরিত্রটা হচ্ছে বদ মেজাজী। তার পক্ষে একটা খুন করার জন্য যেকোন একটা কারণই যথেষ্ট। কোন একটা কারণ তার পক্ষে প্রতিবন্ধকতা করলেই তার মাথায় খুন চেপে যায়। ব্যস, মারণাস্ত্র হাতে সে ছুটে যায়, খুন করে তবেই সে স্বস্তি পায়।

অতীতে সে বহুবার হাতকড়া এড়াতে পেরেছে কারণ, সে কোন রেঞ্জার বা যে কোন শেরিফের চেয়ে পাঁচ সেকেন্ড বেশী দ্রুততায় পিস্তল থেকে গুলি ছুঁড়তে সক্ষম।

কেবলমাত্র পিস্তলের অব্যর্থ লক্ষ্যই বা দ্রুততাই নয়, একাজে তার প্রিয় বাহন ঘোড়াটার কেরামতির কম নয়। এন্টোনিও থেকে মাটাফোরাস পর্যন্ত সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলের রাস্তা-ঘাট, বন-জঙ্গল আর ঝোপ-ঝাড় সবই পরিচিত।

যে রূপসী তন্বী যুবতী কিস্‌কো কিডকে ভালবাসে, টোনিয়া পেরেজ তার নাম। সে আধা ম্যাডোনা আর আধা কারমেন। আর বাকি অর্ধেককে একটা গায়ক-পাখির সঙ্গে তুলনা করা চলে।

একটা মেক্সিকান বস্তির কাছাকাছি ঘাস-লতা-পাতায় ছাওয়া একটা কুটীরে টোনিয়া বাস করে। জায়গাটা ফ্রায়োতে অবস্থিত।

না, সে একা থাকে না, তার সঙ্গে থাকে এক বৃদ্ধ যাকে ঠাকুরদা বা বাবা—যে কোন একটা কিছু ভাবা যেতে পারে, যার বয়স এক হাজার বছরের কিছু কম হতে পারে। সে রোজ একশ' ছাগল মাঠে চরাতে নিয়ে যায়, আর অবশিষ্ট সময় গলা অবধি মদ গিলে বুঁদ হয়ে পড়ে থাকে।

কুটিরটার পিছনে ন্যাসপাতির একটা বিশাল বাগিচা। তাকে বাগিচা না বলে জঙ্গল বলাই উচিত।

যা-ই হোক-ন্যাসপাতির বাগিচাটা এগোতে-এগোতে বর্তমানে একেবারে কুটীরের দরজা পর্যন্ত চলে এসেছে।

কিস্‌কো কিড এ বাগিচাটার আঁকা-বাঁকা পথ-বেয়ে ফুটফুটে একটা তেজী ঘোড়ার পিঠে চেপে মেয়েটার সঙ্গে মিলিত হতে আসে।

এক বিকালে কিস্‌কো কিড উঁচু ঘাসবনের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়ে আসা পথ বেয়ে সরীসৃপের মত এগোতে থাকার সময় অতর্কিতে সে শুনতে পেল তার প্রেয়সী শেরিফের সহকারীর কাছাকাছি গা-ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে বসে অনুচ্চকণ্ঠে, ধরতে গেলে ফিসফিস করে চুটিয়ে গল্প করছে।

শেরিফের সহকারীর ইংরেজি ও স্প্যানিশ ভাষার মিশ্রণে অদ্ভুত ভাষার কথার স্রোতে টোনিয়া পেরেজ তার মনের মানুষটার পদধ্বনি তিলমাত্রও টের পায় নি।

একদিন রাজ্যের এডজুটান্ট জেনারেল, যিনি রেঞ্জার-বাহিনীর কমান্ডোর পদও অধিকার করে রয়েছেন। তিনি দশম কোম্পানির ক্যাপ্টেন ডুভালকে কয়েকটামাত্র ছত্রের একটা চিঠি পাঠালেন।

চিঠিটা হাতে পেয়ে ক্যাপ্টেন সেটাকে সে অঞ্চলের আইন-শৃঙ্খল-রক্ষার ভারপ্রাপ্ত অফিসার রেঞ্জার লেফ্‌টেন্যান্ট স্যান্ড্রিজ-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

লেফটেন্যান্ট স্যান্ড্রিজ চিঠিটা পাওয়া মাত্র সেটাকে কোটের পকেটে ঢুকিয়ে দিলেন।

পরদিন ভোর হতে না হতেই লেফটেন্যান্ট স্যান্ড্রিজ তার উঁচু-লম্বা তেজী ঘোড়ার পিঠে চেপে বিশ মাইল দূরবর্তী মেক্সিকান বস্তির উদ্দেশ্যে ছুটলেন।

লেফটেন্যান্ট স্যান্ড্রিজ কিস্‌কো কিড-এর খোঁজে বস্তির প্রতিটা অলিতে গলিতে উদ্ভ্রান্তের মত ছুটোছুটি করে বেড়ালেন। ছ' ফুট দু'ই ইঞ্চি লম্বা মেশিন গানের মত ভয়ালদর্শন তার চেহারা। হঠাৎ করে তাকে দেখলে তাবড় তাবড় বীরপুরুষের বুকের ভেতরে ধুকপুকানি শুরু হয়ে যায়।

কিন্তু লেফটেন্যান্ট স্যান্ড্রিজ তার সে শত্রুর খোঁজে সম্পূর্ণ বস্তিটা চষে ফেলছেন। তার ঠাণ্ডা-মাথার প্রতিহিংসাকে মেক্সিকানরা আইনের চেয়েও অনেক, অনেক বেশী ভয় করে। তাই বস্তিবাসীরা সবাই তাকে একই কথা বলল যে, কিস্‌কো কিড কোথায়, কি অবস্থায় আছে তাদের কিছুই জানা নেই।

মোড়ের মাথায় একটা দোকান আছে। দোকানের মালিকের নাম ফিং। সে একসঙ্গে বহু দেশের নাগরিক। ভাষাও জানে বহু। কেবলমাত্র দোকানটা নিয়েই সে নিযুক্ত নয়। বরং বিভিন্ন রকম কাজকর্মে সে নিজেকে জড়িত রেখেছে। আর তার মাথায় প্রতিনিয়ত বহু ভাবনা-চিন্তা চক্কর দেয়।

লেফটেন্যান্ট স্যান্ড্রিজ-এর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে দোকানি ফিং বলল—স্যার, ওই মেক্সিকানদের কাছে কিস্‌কো কিড-এর খবর জানতে চেয়ে ফয়দা কিছুই হবে না।

কপালের চামড়ায় বিস্ময়ের ভাঁজ এঁকে লেফটেন্যান্ট স্যান্ড্রিজ বললেন—কেন? এ কথা বলছ কেন, জানতে পারি কি?

একগাল হেসে ফিং বলল—স্যার, আসলে বস্তির মানুষগুলো কিস্‌কো কিডকে যমের চেয়েও বেশী ভয় করে। তারা যাকে কিড বলে ডাকে এটা কিন্তু তার আসল নাম নয়।

ভ্রূ কুঁচকে লেফটেন্যান্ট স্যান্ড্রিজ বললেন—সে কী, কিস্‌কো কিড তার আসল নাম নয়। তবে আসল নামটা কি, বল তো?

গুডমল্ল। বলতে দ্বিধা নেই, সে দু'-একবার আমার দোকানেও এসেছিল।

তাকে কোথায় পাওয়া যেতে পারে সে ব্যাপারে তুমি আমাকে সাহায্য করতে পার?

স্যার, তাকে কোথায় পাওয়া যেতে পারে সে সম্বন্ধে আপনাকে কিছুটা আভাস আমি দিতে পারি বটে।

অত্যুগ্র আগ্রহ প্রকাশ করে লেফটেন্যান্ট স্যান্ড্রিজ বলে উঠলেন—কোথায়? কোথায় গেলে মহাপুরুষটির দর্শন পাওয়া যাবে তুমি বলতে পারবে?

তা পারব, মানে পারতাম বটে। কিন্তু—

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে লেফটেন্যান্ট স্যান্ড্রিজ বললেন—পারতাম মানে? এখন পারবে না?

না স্যার। বস্তীর লোকগুলোর মত আমার পক্ষেও বলা সম্ভব নয়। আসলে তার মত ক্ষীপ্র

গতিতে পিস্তল চালানো আমি এখনও রপ্ত করতে পারি নি। এবার তার দিকে সামান্য ঝুঁকে, গলা নামিয়ে সে বলল—স্যার, ওই মোড়ের কাছে একজন আধা-মেক্সিকান মেয়ে মানুষ থাকে। কিস্‌কো কিড তার কাছে যাতায়াত করে। আপনি বরং তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। মোড়ের কাছের বস্তিতেই সে থাকে। সে হয়তো বা—না স্যার, সে-ও মুখ খুলবে বলে আমার মনে হয় না।

তবে আর মিছে তার কাছে ধর্না দিয়ে লাভ কি?

এক কাজ করলে আপনার ইচ্ছা পূরণ হবে বলেই আমি মনে করছি।

কি কাজ? কি সে উপায়?

আপনি বরং ওই বস্তিটার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখুন। কোন না কোন সময় ফল পাবেন বলেই আমার বিশ্বাস।

লেফটেন্যান্ট স্যান্ড্রিজ দোকানির পরামর্শ অনুযায়ী পেরেজ-এর বস্তীর দিকে তার তেজী ঘোড়াটাকে ছুটিয়ে দিলেন।

ইতিমধ্যে পশ্চিম-আকাশের গায়ে হেলে-পড়া রক্তিম বিদায়ী সূর্যটা অনেকটা নেমে গেছে।

ন্যাসপাতি বাগিচার ঘন গাছগুলো কুটীরটা অনেকটা ঢেকে দিয়েছে। কুটীরের দরজার কাছাকাছি এক পাল ছাগল বেঁধে রাখা হয়েছে।

ঘাসের ওপর কম্বলের বিছানা পেতে বুড়ো মেক্সিকানটা শুয়ে সারাদিনের ক্লান্তি অপনোদন করছে। গলা অবধি মদ গিলে সে এখন বুঁদ হয়ে রয়েছে। সে হয়ত 'নতুন পৃথিবী'-র স্বপ্নে মশগুল। যখন সে পিজারো মদের বোতল নিয়ে মেতে থাকত তখনকার দিনগুলোর কথা হয়ত তার মাথায় ভিড় করত।

রূপসী যুবতী টোনিয়া পেরেজ কুটীরটার দরজায় বিশেষ এক ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে।

লেফটেন্যান্ট স্যান্ড্রিজ অদূরে ঘোড়ার পিঠে বসে যুবতী টোনিয়া পেরেজ-এর রূপ-সৌন্দর্য উপভোগ করছেন। তার চোখের পলক পর্যন্ত পড়ছে না।

কিস্‌কো কিডও অন্যান্য কৃতি ও কুখ্যাত খুনীদের মতই আত্মম্ভরী। সম্প্রতি সে যে দু'জন মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলে সগর্বে বিরাজমান, মাত্র একবারের দৃষ্টি বিনিময়ের মাধ্যমে তারা যে অকস্মাৎই তাকে মন থেকে ঝেড়ে মুছে ফেলে দিয়েছে এমন কথাটা তার কানে গেলে তার অন্তরের গম্ভীরেও হয়ত চাঞ্চল্য জেগে উঠত।

সত্যি, টোনিয়া পেরেজ ইতিপূর্বে কোথাও, কোনদিনই এরকম অন্য কোন মানুষকে চোখের সামনে দেখে নি।

লোকটার যেন রক্তাভ তত্ত্ব আর সূর্য কিরণের সমন্বয়ে তার দেহসৌষ্ঠব গড়ে তোলা হয়েছে। তার সুন্দর মুখে যেন ন্যাসপাতি-বাগিচার অন্ধকারও যেন মিলিয়ে গিয়ে আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এমন একটা অভাবনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যেন সূর্য নতুন করে উদিত হয়েছে।

টোনিয়া পেরেজ এত দিন যে সব মানুষকে দেখেছে তারা সবাই যেন এর কাছে খর্বকায় ও কালো।

কেবলমাত্র তার দেখা অন্যান্য মানুষই নয়, এমন কি গুণধর কিস্‌কো কিড ও আগন্তুকের তুলনায় বড় কিছু নয়।

তার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা অপরিচিত লোকটার ঘন ও খাড়া খাড়া কালো চুল আর পাথরের মত ঠাণ্ডা মুখটা বুঝি দুপুরের রোদের তেজকেও ম্লান করে দিয়েছে।

নতুন করে আবির্ভূত দুপুরের সূর্যটা দু'পা এগিয়ে তার মুখোমুখি দাঁড়াল। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে মিষ্টি-মধুর সুরেলা গলায় তার কাছে এক গ্লাস খাবার জল চাইল।

টোনিয়া পেরেজ আনন্দে বন-ময়ূরীর মত নাচতে নাচতে বাড়ির ভেতরে চলে গেল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আগের মতই নেচে নেচে হেলেদুলে জলের গ্লাস-হাতে এগিয়ে ভালোলাগা অগন্তুকটার সামনে এসে দাঁড়াল। হাতের জলের গ্লাসটা তার দিকে বাড়িয়ে দিল।

লেফটেন্যান্ট স্যান্ড্রিজ জলের গ্লাসটা নেবার জন্য জিনের ওপর থেকে এক লাফে মাটিতে নামল। তারপর রূপসী যুবতীর হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে ঢকঢক করে জলটুকু গলায় ঢেলে দিল।

আমি গুপ্তচর বৃত্তির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করি না। মানুষের মনের কথা জানার বিশেষজ্ঞও

আমি নই। তবু এক গল্পকারের অধিকার বলে আমি ব্যক্ত করছি যে, মাত্র সিকি ঘণ্টার মধ্যেই একেবারেই অভাবনীয় কাণ্ডটা ঘটে গেল। কেবলমাত্র আলাপ-পরিচয় বললে ভুল হবে, লেফটেন্যান্ট স্যান্ড্রিজ আর টোনিয়া পেরেজ-এর মধ্যে মন দেওয়া-নেওয়ার কাজটা পাকাপাকি একটা সমঝোতা হয়ে গেল। সদ্য পরিচিত দু'জনই যেন পরস্পরের দীর্ঘদিনের পরিচিত হয়ে গেল।

লেফটেন্যান্ট স্যান্ড্রিজ নিজের তাঁবুতে বসে তার অধীনস্থ কর্মীদের কাছে সাফ কথা প্রচার করে দিলেন, কিস্‌কো কিড'কে তিনি মেরে ঘাসের জমিতে পুঁতে রাখবেন, নতুবা বিচারক আর জুরিদের সামনে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেন।

এবার থেকে লেফটেন্যান্ট স্যান্ড্রিজ ঘোড়া হাঁকিয়ে সপ্তাহে দু'-তিন দিন ফ্রায়ার চৌরাস্তার মোড়ের বস্তিটায় গিয়ে ঘুরে আসত।

এদিকে কুইন্টানা পাহাড়ের ঢালে অবস্থিত ছোট্ট একটা গ্রামে কিস্‌কো কিড এক নগর-কোতোয়ালকে কোতল করে ঘোড়া হাঁকিয়ে পালিয়েই যাচ্ছিল। পথ পাড়ি দিতে গিয়ে হঠাৎ তার মনের কোণে একটা কথা জেগে উঠল, তার ভাললাগা ভালবাসার পাত্রীটাকে একবারটি চোখের দেখা দেখে যেতে পারলে হয়ত তার অস্থির মনটা একটু শান্ত হত। সে শান্তি পেত।

সে সিদ্ধান্ত নেওয়া মাত্র লাগাম টেনে ঘোড়ার মুখটাকে ঘুরিয়ে নির্দিষ্ট দিকে যাত্রা করল। পুরো দমে ন্যাসপাতি বনের ভেতর দিয়ে পথ তৈরী করে দ্রুত ঘোড়া হাঁকিয়ে তার প্রেয়সীর কুটীরের সামনে হাজির হলেন।

তখন তার ঘোড়াটা দশ মাইল এলাকা জুড়ে অবস্থিত ন্যাসপাতি বাগিচার ভেতর দিয়ে, আঁকাবাঁকা পথ ধরে এগোতে লাগল।

তার তেজী ঘোড়াটা বস্তির দু'-এক মাইলের মধ্যে উপস্থিত হতেই তার গা-গতরে ব্যথা শুরু হয়ে গেল। শরীরের মাংসপেশীগুলোও ক্লান্ত হয়েছে পড়েছে।

গায়ে ফুটফুট দাগওয়ালা ঘোড়াটা ন্যাসপাতি জঙ্গলের ভেতরে চক্কর মারতে মারতে এক সময় চৌ-মাথার কাছের বস্তিটায় হাজির হল।

কিস্‌কো কিড সেখানেই লাগাম টেনে ঘোড়াটা দাঁড় করাল। তারপর এক লাফে ঘোড়ার জিন থেকে মাটিতে নামল।

হাঁটতে-হাঁটতে সামান্য এগিয়ে সে একটা কুঁড়ে ঘরের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সেখানে ঘরের ছায়ায় বসে যুবতী টোনিয়া পেরেজ আপন মনে কাঁচা-চামড়ার দড়ি দিয়ে ফাঁস দড়ি বুনে চলেছে।

এ পর্যন্ত সবই ঠিকঠাক আছে। আপত্তি করার মত কোন ব্যাপারই ঘটে নি।

তবে আমাকে যদি সত্য গোপন না করে সব কিছু খোলাখুলি ভাবে বলতেই হয় তবে আমি বলতে বাধ্য হব, টোনিয়া এখানে অবশ্যই একা বসে দড়ির ফাঁস বুনছে না। তবে? সে তার মাথাটা রেখেছে দীর্ঘাকৃতি ও সুঠামদেহী একজন মানুষের চওড়া আরামদায়ক বুকের ওপর। আর? সে লোকটা এক হাত দিয়ে রূপসী তন্বী যুবতীর দেহ-পল্লবটাকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে।

বাড়িটার কাছে পৌঁছতে না পৌঁছতেই অকস্মাৎ একটা অভাবনীয়, একেবারে অবিশ্বাস্য একটা খসখস আওয়াজ লেফটেন্যান্ট স্যান্ড্রিজের কানে এল।

তিনি উৎকর্ণ হয়ে আওয়াজটাকে বোঝার এবং তার উৎসস্থল সম্বন্ধে ধারণা নেবার চেষ্টা করলেন।

হ্যাঁ, আওয়াজটা লেফটেন্যান্ট স্যান্ড্রিজ-এর খুবই পরিচিত মনে হল। তাঁর মনে হল যেন আচমকা একটা দু'-ঘরা বন্দুকের হাতলে চাপ পড়ল। তার খাপ থেকে ঠিক যেন এরকমই একটা শব্দ বের হয়।

ব্যস, এটুকুই। অবাঞ্ছিত শব্দটা মাত্র একবারই হল। দ্বিতীয় বার আর তিনি শুনতে পেলেন না।

টোনিয়া পেরেজ আর লেফটেন্যান্ট স্যান্ড্রিজ তখন মৃত্যুর ছায়ায় শরীর এলিয়ে দিয়ে পরমানন্দে প্রেমালাপে মগ্ন।

ন্যাসপাতি গাছের আড়াল থেকে কিস্‌কো কিড তাদের কার্যকলাপের প্রতিটা মুহূর্ত দেখতে

লাগল আর জুলাই মাসের শান্ত অপরাহ্নে তাদের প্রেমালাপের প্রতিটা কথা বাতাস-বাহিত হয়ে তার কানে আসতে লাগল।

টোনিয়া পেরেজ হাতের চামড়ার দড়িটাকে এক পাশে রেখে লেফটেন্যান্ট স্যান্ড্রিজ-এর গলাটা জড়িয়ে ধরে ভাবাপ্লুত কণ্ঠে বলল—প্রিয়তম আমার, যদিও তোমাকে কথাটা বলতে আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে তবুও আমি তোমাকে না বলে পারছি না।

তার কথাটা শেষ হতে না হতেই লেফটেন্যান্ট স্যান্ড্রিজ বললেন—প্রিয়তমা, এমন কি কথা, যা বলতে তুমি এত ইতস্তত করছ?

তার গালে নিজের গালটাকে আলতো করে বুলিয়ে নিয়ে টোনিয়া পেরেজ চাপা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল—এবার থেকে আমি না ডাকলে তুমি আর এ মুখো হোয়ো না।

কেন? একথা বলছ কেন?

তুমি বুঝছ না। সে অচিরেই এখানে আসবে।

তাই বুঝি? কি করে জানলে?

আমি একজনের মুখে শুনেছি সে নাকি তাকে তিনদিন আগে ঘোড়ায় চেপে ওয়াড়্লুপ-এ আসতে দেখেছে।

ওয়াড়্লুপ-এ দেখেছে তো আমাদের এনিয়ে ভাবনার কি আছে, বুঝছি না তো?

তুমি জান না, সে যখনই ওয়াড়্লুপ পর্যন্ত আসে তখনই একবার এখানে ঘুরে যায়। সে এসে যদি তোমাকে এখানে দেখতে পায় তবে কি কেলেঙ্কারী করে বসবে তুমি ভাবতেও পারছ না প্রিয়তম। আমি নিশ্চিত জানি, সে তোমাকে খুন করে ফেলবে।

লেফটেন্যান্ট স্যান্ড্রিজ-এর মুখে বিষণ্ণতার ছাপ ফুটে উঠল।

টোনিয়া পেরেজ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল—প্রিয়তম, আমার মঙ্গলের কথা বিবেচনা করেই তোমাকে কথাটা বলতে বাধ্য হচ্ছি, ভবিষ্যতে আমি না ডাকলে তুমি আর আমার কাছে এসো না।

সে না হয় হল। কিন্তু তারপর? কিন্তু এভাবে তো আর দীর্ঘদিন চলতে পারে না। তারপর কি হবে?

তারপর তুমি সুযোগ বুঝে লোকজন নিয়ে এসে তাকে খুন করে ফেলবে। তা যদি না কর তবে একদিন সে-ই তোমাকে খুন করবে। জেনে রাখ।

তুমি কি জান না প্রিয়তমা, আত্মসমর্পণ করার পাত্র সে নয়? আর পরিণামে কি ঘটতে পারে তা-ও তোমাকে বলছি। সে যদি জানতে পারে কোন অফিসার তার বিরুদ্ধে গেছে তবে তাকে জান দিতেই হবে, না হয় তার আগেই তাকে খতম করে নিজের জান বাঁচাতে হবে।

না, তাকেই মারতে হবে, জান খতম করে দিতে হবে। তা যদি না করতে পার তবে তুমি আর আমি পৃথিবীতে শান্তিতে বাঁচতে পারব না।

হুম!

তোমার তো আর অজানা নয় যে, সে অনেককেই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছে। আমি মনে-প্রাণে চাই, এবার সে-ই পৃথিবী থেকে সরে যাক।

তবে তুমি আমাকে কি করতে বলছ?

তুমি সশস্ত্র লোকজন নিয়ে এসে তাকে ঘিরে ফেল। পালাবার সুযোগ যেন না পায়। যে কোন উপায়ে তাকে খুন না করলে তুমি আর আমি কিছুতেই পাশাপাশি থাকতে পারব না।

লেফটেন্যান্ট স্যান্ড্রিজ বলল—তুমি তো এতদিন তাকে নিয়ে সুখেই ছিলে। তবে আজ তার ওপর এমন বীতশ্রদ্ধ—

টোনিয়া পেরেজ ঝট্ করে ফাঁস তৈরীর চামড়ার দড়িটা হাত থেকে ফেলে দিয়ে দু' হাতে লেফটেন্যান্ট স্যান্ড্রিজ-এর গলাটা জড়িয়ে ধরে নিজের গালটাকে তার গালে আলতোভাবে ঘষতে লাগল।

তারপর এক সময় গলা নামিয়ে আবেগ-মধুর স্বরে বলল—প্রিয়তম, তখন তো আমি তোমাকে দেখি নি, আপন করে কাছে পাই নি।

লেফটেন্যান্ট স্যান্ড্রিজ তার গালে ছোট্ট করে একটা টোকা দিয়ে বলল—তাই বুঝি?

হ্যাঁ, গো, হ্যাঁ। পাহাড়ের মত বিরাট এ লাল পুরুষটাকে তখন দূর থেকে দেখতাম আর না-পাওয়ার বেদনায় ভেতরে ভেতরে দগ্ধে মরতাম।

বিশ্বাস করি না। আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না।

তুমি বিশ্বাস না করলে কারো সাধ্য আছে তোমাকে জোর করে বিশ্বাস করাতে পারবে? তোমাকে যতটুকু আমি বুঝেছি, তুমি একজন সত্যিকারের দয়ালু। আর যথার্থ ভাল মানুষ বলতে যা বোঝায় তুমি ঠিক তা-ই। আর সে সঙ্গে তোমার যৌবন, পেশীবহুল দীর্ঘাকৃতি সুঠামদেহ একবার যে মেয়ের চোখে পড়বে সে কি তোমার ওপর থেকে লোলুপ দৃষ্টি তুলে নিতে উৎসাহী হবে? তার ওপর তুমি একজন অমিত শক্তিধর, যথার্থ বীরও বটে।

লেফটেন্যান্ট স্যান্ড্রিজ তার গালে আলতোভাবে হাত বুলাতে লাগল।

টোনিয়া পেরেজ আগের মতই ভাবাপ্লুত কণ্ঠে বলে চলল—হ্যাঁ, মরুক! আমি মনে-প্রাণে তার মৃত্যু-কমনা করছি। সে দুনিয়া থেকে সরে গেলে আমাকে আর প্রতিটা মুহূর্ত ভয়ে ভয়ে কাটাতে হবে না। কখন সে অতর্কিতে হাজির হয়ে আমাদের বিশেষ করে তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

সে কখন আসবে তা আমার পক্ষে কি করে জানা সম্ভব হবে?

সে এখানে যখনই আসে দু'দিন. আবার কখনও বা তিনদিন, এখানে আমার কাছে কাটিয়ে তবে ফিরে যায়।

সে না হয় বুঝলাম। কিন্তু আমি সে খবরটা কি করে পাব?

শোন, লুইসির ছোট ছেলে গ্রিগরিও-র একটা তেজী ও দ্রুতগামী টাট্টু ঘোড়া আছে। নচ্ছাড়টা এখানে আসামাত্র আমি তাকে তোমার কাছে চিঠি লিখে পঠিয়ে দেব।

চমৎকার! চমৎকার মতলব!

আর সে চিঠিতেই আমি তোমাকে লিখে জানিয়ে দেব, কিভাবে তাকে ফাঁদে ফেলা সম্ভব হবে।

মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে সে আবার মুখ খুলল—একটা কথা মনে রেখো, সঙ্গে করে বহু সশস্ত্র লোক তোমাকে নিয়ে আসতে হবে।

তারপর তার গলাটা জড়িয়ে ধরে বলল—লাল বন্ধু আমার। খুব সতর্কতার সঙ্গে কাজ করতে হবে, মনে রেখো। একটা কথা যেন ভুলে যেয়ো না, ঝুমঝুমি সাপ যত দ্রুত ছোবল মারতে পারে তার চেয়ে অনেক, অনেক বেশী দ্রুত সে পিস্তল থেকে গুলি ছুঁড়তে পারে নইলে চোখের পলকে সর্বনাশ ঘটিয়ে ছাড়বে।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে লেফটেন্যান্ট স্যান্ড্রিজ বলল—কিস্‌কো কিড-এর পিস্তলের হাত খুব ভাল তা আমার অবশ্যই জানা আছে। পরমুহূর্তেই নিজের মনকে শক্ত করে বলে উঠল, না, প্রিয়তমা, আমি কাউকে সঙ্গে আনব না। যখন তার মুখোমুখি হতে আসব তখন একাই আসব। আমি নিজে, একদম একাই আমি নেকড়েটার মোকাবেলা করব। আর যদি তা না পারি তবে ছেড়ে দেব।

কোমরের পিস্তলটার খাপের ওপর হাত বুলাতে বুলাতে এবার বলল—প্রিয়তমা, তুমি শুধু একবারটি আমাকে জানিয়ে দেবে কিস্‌কো কিড কখন তোমার এখানে আসছে। ব্যস, তারপরের দায়িত্ব আমার। বাকি যা কিছু করণীয় তা আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

লেফটেন্যান্ট স্যান্ড্রিজ বিদায় নেবার মুহূর্তে তার প্রিয়তমা টোনিয়া পেরেজ-এর মনোলোভা দেহপল্লবটা দু' হাতে নিজের বুকে জড়িয়ে ধরলেন। চুম্বন করলেন বারকয়েক।

প্রিয়তমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে লেফটেন্যান্ট স্যান্ড্রিজ ন্যাসপাতির জঙ্গলের ভেতরের আঁকাবাঁকা পথে ঘোড়া হাঁকিয়ে এগোতে লাগলেন।

না, কোন রকম শব্দ বা চলাচলের আওয়াজ অদূরবর্তী ঘন ন্যাসপাতির জঙ্গলে নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা ও শান্তিকে এতটুকু নষ্ট করল না।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বেচারা লেফটেন্যান্ট স্যান্ড্রিজ-এর দেহটা অদূরবর্তী বালিয়াড়িটার ওপরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। কেউ কিছু জানল না, এতটুকু টেরও পেল না। চোখের পলকে সব মিলিয়ে গেল।

তারপরই কিস্‌কো কিড ব্যস্ত-পায়ে ন্যাসপাতি গাছে বেঁধে রাখা তার তেজী ঘোড়াটার কাছে

এগিয়ে গেল। বাঁধন খুলে সে এক লাফে তার জিনের ওপর চেপে বসল। ঘোড়াটা যে পথে এসেছিল সে আঁকাবাঁকা পথেই উল্কার বেগে ধেয়ে চলল।

না, কিস্‌কো কিড বেশী দূর গেল না, লাগাম টেনে ঘোড়াটাকে থামাল। আধঘণ্টাকাল ন্যাসপাতি বাগিচার নির্জন-নিস্তব্ধ পরিবেশে অপেক্ষা করল।

একটু বাদেই টোনিয়া পেরেজ-এর কানে এল কিস্‌কো কিড-এর বে-সুরো গানের কলি। আর সে কণ্ঠস্বরটা ক্রমে তারই দিকে এগিয়ে আসছে বুঝতে অসুবিধা হল না।

টোনিয়া পেরেজ ব্যস্ত-পায়ে বারান্দা থেকে নেমে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছুটতে ছুটতে এগিয়ে গেল তার ভাল না-লাগা নাগরটার সঙ্গে দেখা করতে।

সে ন্যাসপাতির বাগিচার ভেতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে গিয়ে এক সময় কিস্‌কো কিড-এর মুখোমুখি দাঁড়াল।

কিস্‌কো কিড সচরাচর হাসে না। লোকে বলে, নিতান্ত বরাতে না থাকলে কারো পক্ষে কেউ তার মুখে হাসি দেখতে পায় না। এখন কিন্তু সে টোনিয়া পেরেজকে দেখেই হো-হো রবে হেসে উঠল। আর একটু আগে মাথার টুপিটা খুলে তার দিকে তাকিয়ে বারকয়েক নাড়িয়েছিলও বটে। তার এরকম অভাবনীয় কাণ্ড টোনিয়া পেরেজ-এর মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করল, সন্দেহ নেই।

টোনিয়া কাছে আসতেই কিস্‌কো কিড এক লাফে জিনের ওপর থেকে লাফিয়ে মাটিতে নেমে পড়ল। তার দিকে হাত দুটো বাড়িয়ে দিল।

টোনিয়াও বাঁধ না মানা জোয়ারের জলের মত তার চওড়া বুকটার ওপর সবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কিস্‌কো কিড বলল—আমার বন ময়ূরী, কেমন আছ?

টোনিয়া পেরেজ ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বলল—ওগো আমার মনের মানুষ, আমার চোখের মণি, তোমার পথ চেয়ে চেয়ে আমার চোখ দুটো যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। যে শয়তানের কাঁটা-বন পেরিয়ে তুমি এখানে, আমার কাছে আস, সেদিকে চোখ রেখে যে আমার দৃষ্টিশক্তি কমে যেতে চলেছে।

মুহূর্তের জন্য থেমে একটু দম নিয়ে আবার বলতে শুরু করল—ওগো আমার মনের মানুষ, তুমি তো এখন আমার কাছে, একেবারে বুকে চলে এসেছ। এখন তো আর তোমাকে তিরস্কার করা চলে না। এখন কেবলমাত্র আদর-সোহাগই তোমার প্রাপ্য। দেব, সবই তোমাকে দেব, আমার মনের ভালবাসা তোমাকে নিংড়ে দিয়ে আমি নিঃস্ব রিক্ত—একেবারে দেউলিয়া হয়ে যাব। তুমি পথশ্রমে ক্লান্ত। যাও, ঘরে গিয়ে বিশ্রাম কর। আমি তোমার টাট্টুটার পরিচর্যা করছি। ঘরের ভেতরে, দরজার কাছে তোমার জন্য ঠাণ্ডা জল রাখা আছে।

কিস্‌কো কিড তাকে আবার বুকে জড়িয়ে ধরে সস্নেহে বার-বার চুমু খেল।

তারপর বিদায়ী সূর্যের শেষ রক্তিম আভাটুকু মিলিয়ে গেল প্রকৃতির বুকে, ন্যাসপাতি বাগিচার গাছের মাথায় মাথায় সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার নেমে এল। তারপর দেখতে দেখতে চারদিকে নেমে এল রাতের গাঢ় অন্ধকার। রাত হতে না হতেই তারা লণ্ঠনের আলোয় মুখোমুখি বসে রাতের খাবার খেতে বসল।

খাওয়া শেষ হলে কিস্‌কো কিড একটা চুরুটে অগ্নি সংযোগ করে ঘন ঘন ধোঁয়া ছাড়তে লাগল।

এদিকে পূর্বপুরুষ সে অতি বৃদ্ধ লোকটা তার ছাগলের পালকে খোঁয়াড়ে ঢুকিয়ে দিয়ে বারান্দায় উঠে এল। সামান্য কিছু খাদ্যবস্তু দিয়ে রাতের খাবার সেরে নিল। সস্তা দামের একটা চুরুট ধরিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে ধোঁয়া ছাড়ল। তারপর আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল।

খাবার দাবার মিটিয়ে টোনিয়া পেরেজ তার সখের গিটারটা নিয়ে বাইরে গেল। ঘাসের দোলনাটায় বসে মৃদু মদু দোল খেতে খেতে গিটার বাজিয়ে গুনগুন করে গানের কলি ভাঁজতে লাগল।

প্যান্টের পকেটে হাত দুটো গলিয়ে দিয়ে পায়চারি করতে করতে কিস্‌কো কিড আপন মনে, টোনিয়া পেরেজ'কে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগল—আমার পুরনো বুন-ময়ূরীটা কি আমাকে আগের মতই ভালবাসে?

কপালের ওপর ঝুলে-পড়া চুলগুলোকে হাত দিয়ে একটু ওপরে তুলে দিতে দিতে টোনিয়া

পেরেজ মুচকি হেসে বলল—ঠিক আগের মতই। কিগো, বিশ্বাস হচ্ছে না?

শোন, আমাকে একবারটি ক'টা চুরুট কেনার জন্য মোড়ের কাছে ফিংস্-এর দোকানে যেতেই হবে।

আবার দোকানে গিয়ে কিছুটা সময় নষ্ট করবে?

আরে, ভেবেছিলাম পকেটে আরও একটা প্যাকেট আছে। টোনিয়া পেরেজ-এর গালে আলতো করে একটা টোকা দিয়ে মুচকি হেসে বলল—বন-ময়ূরী আমার। দেরী করব না, মিনিট পনেরোর মধ্যেই ফিরে আসব।

যাবে আর আসবে। যত তাড়াতাড়ি পার আমার কাছে ফিরে আসবে, মনে থাকে যেন। ভাল কথা, বেরোবার আগে আমাকে বলে যাও, এবার ক'দিন আমার কাছে থেকে সঙ্গ-সুখ দান করবে? আমাকে দুঃখ-যন্ত্রণা দিয়ে কালই এখান থেকে চম্পট দেবে, নাকি তোমার মধুমিতা টোয়ার সঙ্গে কয়েকটা দিন কাটিয়ে তাকে অনেক, অনেক আনন্দ দিয়ে তবে যাত্রা করবে?

উফ্! ইচ্ছা আছে, এবার তোমার কাছাকাছি পাশাপাশি কয়েকটা দিন কাটিয়ে যাব।

চমৎকার! চমৎকার! কী মজাই না পাব!

দিন কয়েক খুবই পরিশ্রম গেছে। এবার আরাম-আয়েশ করে ক'টা দিন কাটিয়ে শরীর ও মনকে একটু চাঙা করে নিতে চাচ্ছি।

কিস্কো কিড প্রায় আধ ঘণ্টা পরে চুরুট নিয়ে ফিরে এল। সে ফিরে দেখে টোনিয়া পেরেজ দড়ির দোলনায় বসে হাসি মুখে মৃদু-মৃদু দোল খেয়ে চলেছে।

কিস্কো কিড দোলনার দড়িটা আলতোভাবে ধরে চোখে-মুখে কৃত্রিম বিষণ্ণতার ছাপ এঁকে বলল—আমার যেন কেমন অবিশ্বাস্য রকম ভয়-ভয় লাগছে!

ভয়! কিসের ভয়? কাকে ভয়?

মনে হচ্ছে কে যেন আমার মৃত্যু-বাণ হাতে নিয়ে ন্যাসপাতি বনে সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে। আর কিছু নয়, আমার বুকের তাজা রক্তই তার কাম্য।

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে টোনিয়া পেরেজ বলল—ভয়! তোমার ভয় করছে? এমন কথাটা যে আমি ভাবতেও উৎসাহ পাচ্ছি না।

প্রিয়তম আমার, তুমি তো অবশ্যই ভয় পাও নি, তাই না? আমার এ বীর পুরুষটাকে কেউ, কোন ভয় পাওয়াতে পারে নি। এবার তার হাত দুটো চেপে ধরে আবেগের সঙ্গে বলল—প্রিয়তম, তুমি আমার কাছে, তোমার মনের মানুষটার কাছে থেকে যাও, কেউ তোমার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না। তোমার অনিষ্ট করা তো দূরের ব্যাপার, তোমার খোঁজও কেউ পাবে না।

প্রায় মধ্যরাত্রে এক ঘোড়সওয়ার চিৎকার চেঁচামেচি করতে করতে লেফটেন্যান্ট স্যান্ড্রিজ-এর শিবিরে হাজির হল।

লেফটেন্যান্ট স্যান্ড্রিজ কয়েকজন রক্ষীকে সঙ্গে করে ব্যাপারটা জানার জন্য শিবিরের বাইরে বেরিয়ে এলেন।

ঘোড় সওয়ার নতজানু হয়ে অভিবাদন করে জানাল, সে ফ্রায়োড-এর মোড় থেকে এসেছে। ডোমিঙ্গো সেলেম তার নাম।

আগন্তুক-এ ও জানাল যে, লেফটেন্যান্ট স্যান্ড্রিজ-এর জন্য একটা নিয়ে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে এখানে হাজির হয়েছে।

চিঠিটা তার হাতে তুলে দিতে দিতে আগন্তুক ঘোড়সওয়ার এবার বলল—দেখুন, লুইমার গ্রেগোরিও রোগশয্যায়। তাই তার পক্ষে ঘোড়ায় চড়ে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে এখানে আসা সম্ভব নয় বলে তারই অনুরোধে সে পত্র-বাহকের ভূমিকা পালন করে এখানে এসেছে।

লেফটেন্যান্ট স্যান্ড্রিজ লণ্ঠনের আলোয় চিঠিটা পড়লেন। চিঠিটার বক্তব্য—প্রিয়তম আমার, এসে গেছে, সে এসে গেছে। তুমি বিদায় নিয়ে চলে যাবার একটু বাদেই ন্যাসপাতির বন থেকে সে বেরিয়ে আসে।

আমি কৌশলে তার মুখ থেকে জেনে নিয়েছি, সে এখানে তিন বা তারও বেশী দিন আমার এখানে থাকবে।

হ্যাঁ, তারপরই তার মধ্যে অস্বাভাবিক পরিবর্তন আমি লক্ষ্য করছি। সে যেন একটা ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত হয়ে গেছে।

আমি লক্ষ্য করছি, অধিকাংশ সময়ই সে অস্থিরভাবে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। আবার ধূর্ত শেয়ালের বাঁকা-চোখে এদিক-ওদিক তাকায়, আর থেকে থেকে থমকে গিয়ে, উৎকর্ণ হয়ে কি যেন শোনার চেষ্টা করে।

একটু পরপরই সে বলে, রাত্রির অন্ধকার কেটে গিয়ে ভোরের আলো ফোটার আগেই সে এখান থেকে পলিয়ে গিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে থাকবে।

পরমুহূর্তেই তার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, সে যেন আমাকে সন্দেহ করছে। সে এমনভাবে চোখ পিটপিট করে তাকায় যে, তার চোখে চোখ পড়ামাত্র আমার বুকের ভেতরে রীতিমত ধুকপুকানি শুরু হয়ে যায়। সর্বাঙ্গ যেন অবশ হয়ে আসতে থাকে।

বিশ্বাস কর, তার বর্তমান অবস্থা আমার মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন ভীতির সঞ্চার করেছে।

আমার প্রতি তার মনের আস্থা বজায় রাখার জন্য আমি তাকে প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হয়েছি—আমি তারই, একমাত্র তারই টোনিয়া। আমি তাকে মনে প্রাণে ভালবাসি।

আমার কথা শুনে সে বলেছে, আমি সত্যি সত্যি একমাত্র তারই টোনিয়া এটা আমাকে প্রমাণ করে দেখাতে হবে, বুঝলে?

আর একটা কথা, সে ধরেই নিয়েছে, সে যখন আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে ঘোড়ায় চেপে ন্যাসপাতি বাগিচায় ঢুকবে তখনই তাকে খুন করার জন্য কারা নাকি ওৎ পেতে রয়েছে, তাকে নাকি খুন করে ছাড়বে। এ মুহূর্তে এটাই তার সবচেয়ে বড় আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সব শেষে সে কি মতলব করেছে, জান? গোপন শত্রুদের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য সে আমার কাছে বলেছে, আমার সাজ পোশাক পরে তবেই বাড়ি থেকে বেরোবে।

আমার নীল ঘাঘরা, আমার লাল স্কার্ট আর আমার ঘোমটাটা দিয়ে নিজের মুখটাকে ঢেকে নিয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে চম্পট দেবে।

শুধু কি এ-ই? সে আরও বলেছে, আমাকেও পরতে হবে তার শার্ট, কোট আর প্যান্ট আর টুপি।

তার পোশাকে সজ্জিত হয়ে আমাকে ঘোড়া ছুটিয়ে তার সঙ্গে মোড় ছাড়িয়ে সদর রাস্তা দিয়ে কিছুদূর পর্যন্ত যেতে হবে। তারপর আবার ঘোড়া ছুটিয়ে আমাকে বাড়ি ফিরে আসতে হবে। কাজটা আমাকে করতে হবে সে এখান থেকে বিদায় নেবার আগেই। কারণ? সে নিজের চোখে দেখতে চায়, আমি তাকে অন্তর থেকে ভালবাসি কিনা। অর্থাৎ আমি তার প্রতি বিশ্বস্ত, অনুরক্ত কিনা প্রমাণ করতে হবে এবং তাকে গুলি করার জন্য কেউ ঝোপঝাড়ে আত্মগোপন করে আছে কিনা।

প্রিয়তম আমার, একবারটি ভেবে দেখ তো, ব্যাপারটা কী ভয়ঙ্কর, আমার পক্ষে কী অভাবনীয় ও অবর্ণনীয় মর্মান্তিক।

আমি আর সহ্য করতে পারছি না প্রিয়তম। তুমি শিগগির চলে এসো। হিংস্র নেকড়েটাকে হত্যা করে তোমার প্রেয়সী টোনিয়াকে কাছে নিয়ে যাও, তাকে তোমার বুকে ঠাঁই দাও।

আর একটা কথা' ভুলেও কিন্তু তাকে জীবন্ত অবস্থায় ধরার চেষ্টা কোরো না, তাকে দেখা মাত্র গুলি করে তোমার পথের কাঁটা চিরদিনের মত সরিয়ে ফেল।

প্রিয়তম আমার, সবই তোমাকে বললাম, সবই তো জানলে। অতএব ভয়ঙ্কর এ কাজটা তোমাকেই সারতে হবে। মনে রেখো, অনেক আগে থাকতে তুমি এসে বস্তির ধারের কুঁড়ে ঘরটায় আত্মগোপন করে থাকবে, যেখানে মালগাড়ি আর জিনিসপত্র ঢিবি করে রাখা হয়, জায়গাটা চিনতে পেরেছ?

প্রাণেশ্বর, তোমার জন্য একশ' চুম্বন জমা রইল। ভুল কোরো না। অবশ্যই আসা চাই। আর দেখামাত্র গুলি চালিয়ে দেবে, বুঝলে? চিঠির শেষে টোনিয়া পেরেজ-এর স্বাক্ষর করা রয়েছে।

চিঠিটা পড়েই লেফটেন্যান্ট স্যান্ড্রিজ তার অধীনস্থ কর্মীদের ডেকে সেটার জরুরী অংশটুকু পড়ে শোনালেন।

তিনি ঘোড়া নিয়ে যাত্রার প্রস্তুত নিতে আরম্ভ করলে রেঞ্জাররা সবাই তাঁর পথ আগলে দাঁড়াল।

কিছুতেই তাকে একা ছাড়তে রাজি নয়।

লেফটেন্যান্ট স্যান্ড্রিজ মুচকি হেসে বললেন—আরে, তোমরা মিছেই ভয়ে কুঁকড়ে মরছ। আমি অনায়াসেই তাকে কব্জা করে ফেলতে পারবই, পারব।

আপনি একা, একদম একা এমন একটা দুর্ধর্ষ লোকের বিরুদ্ধে—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে লেফটেন্যান্ট স্যান্ড্রিজ বলে উঠলেন—ধ্যুৎ! কিসের দুর্ধর্ষ—আমার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না। আরে, তোমরা একটা কথা বুঝছনা কেন? ভূত তো আশ্রয় নিয়েছে সর্বের মধ্যে।

সর্ষের মধ্যে ভূত, ঠিক বুঝলাম হয় তো? রেঞ্জাররা প্রায় সমস্বরে বলে উঠল।

ব্যাপারটা হচ্ছে, এ ব্যাপারে যার ওপরে সে সবচেয়ে বেশী নির্ভরশীল সে-ই চাচ্ছে হতচ্ছাড়াটাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে ফেলা হোক, বুঝলে? তার কৌশল অনুযায়ীই আমি কাজটা হাসিল করব।

কথা বলতে বলতে তিনি এক লাফে ঘোড়ার জিনের ওপর চেপে জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন।

পূর্ব নির্দ্ধারিত চৌমাথার কাছাকাছি পৌঁছে ঘোড়াটাকে এক গোপন-অন্তরালে বেঁধে রাখল।

এবার কোমরের খাপ থেকে উইনচেস্টারটাকে এক হেঁচকা টানে খুলে হাতে তুলে নিল। এবার সতর্কতার সঙ্গে চারদিকে নজর রাখতে রাখতে তিনি পেরেজ-এর বস্তির দিকে এগোতে লাগলেন।

মাথার ওপরে টুকবো-টুকরো মেঘের ফাঁক দিয়ে আকাশের গায়ে ঝুলে-থাকা চাঁদটা থেকে থেকে উঁকি দিচ্ছে।

লেফটেন্যান্ট স্যান্ড্রিজ আরও কয়েক পা এগিয়ে মালগাড়িগুলোর কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। এদিক-ওদিক তাকিয়ে বুঝলেন, মালগাড়ির চালাটায় থাকার মত আত্মগোপন করে প্রশস্ত জায়গা বটে। যে চিন্তা সেই কাজ। তিনি ঝটপট নিরাপদেই চালাটার ভেতরে ঢুকে গেলেন।

বস্তির কাছাকাছি একটা ঝোপের ছায়া তাঁর নজরে পড়ল, বেঁধে রাখা ঘোড়াটা অস্থিরভাবে অনবরত মাটিতে পা ঠুকে চলেছে।

লেফটেন্যান্ট স্যান্ড্রিজ প্রায় এক ঘণ্টা মালগাড়ি চালাটার ভেতরে অপেক্ষা করার পর হঠাৎ সচকিত হয়ে সোজাভাবে দাঁড়িয়ে পড়লেন। অনুসন্ধিৎসু নজরে লক্ষ্য করে নিঃসন্দেহ হলেন, বস্তির ভেতর থেকে বেরিয়ে-আসা ছায়ার মত মূর্তিদুটো মনুষ্য মূর্তিই বটে।

মনুষ্য মূর্তি দুটো আরও কয়েক পা এগিয়ে আসার পর যে পুরুষের পোশাকে সজ্জিত সে অতর্কিতে এক লাফ দিয়ে ঘোড়ার পিঠে বসল। লাগাম ধরে হেঁচকা টান দিতেই ঘোড়াটা জোর কদমে ছুটে চলল সামনের ঘোড়াটার দিকে।

পরমুহূর্তেই মেয়েদের পোশাক পরিহিত লোকটা জ্যোৎস্নালোকে দাঁড়িয়ে ঘোড়সওয়ারের দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইল।

লেফটেন্যান্ট স্যান্ড্রিজ আড়ালে দাঁড়িয়ে ভাবলেন টোনিয়া পেরেজ ফিরে যাবার পূর্ব মুহূর্তেই তিনি কাজটা হাসিল করে ফেলবেন। আশা করছে, ঘটনাটা ঘটে যাবার পর সে হয়ত মুহূর্তের জন্যও পিছন ফিরে তাকাবে না।

লেফটেন্যান্ট স্যান্ড্রিজ হাত বাড়িয়ে যন্ত্রচালিতের মত উইনচেস্টারটা হাতে নিয়ে শক্ত করে ধরলেন। তারপর গলা ছেড়ে বলে উঠল—হাত দুটো ওঠাও।

ছায়া মূর্তিটা ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল। কিন্তু তার হুকুম মাফিক হাত তুলল না।

লেফটেন্যান্ট স্যান্ড্রিজ মুহূর্তমাত্রও সময় নষ্ট না করে পরপর তিনটে বুলেট ছুঁড়ে দিলেন। তারপর আরও দু'-দুটো বুলেট তার পিস্তল থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। এরও কারণ রয়েছে, কিস্কো কিড পিস্তলের গুলির আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না।

আবার মেঘে-ঢাকা হাল্কা জ্যোৎস্নার আলোতেও দশ পা দূরবর্তী স্থান থেকে লক্ষ্যচ্যুত হওয়ার এতটুকু সম্ভাবনাও থাকার কথা নয়।

এদিকে পর পর এতগুলো গুলির শব্দে বারান্দায় কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে থাকা অতিবৃদ্ধ পূর্বপুরুষটার ঘুম চটে গেল। সে হুড়মুড় করে উঠে বসে পড়ল।

কম্বলের তলা থেকে মুখ বের করে হতচকিত দৃষ্টি মেলে চারদিকে তাকাতে লাগল। উৎক হয়ে লক্ষ্য করে সে শুনতে পেল, মৃত্যু-যন্ত্রণা কাতর একটা পুরুষ কণ্ঠ। বিকট আর্তনাদে তার বুকে ভেতরে ধুকপুকানি শুরু হয়ে গেল। এখনকার মানুষগুলোর যাচ্ছেতাই কাম কাজ দেখে বিতৃষ্ণা গস্‌গস্ করতে করতে সে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বুড়োটা হঠাৎ দেখতে পেল, উঁচুলম্বা সুঠামদেহী একটা লোক ছুটতে ছুটতে আবছা অন্ধকা কুটীরটার ভেতরে ঢুকে গেল। কাঁপা-কাঁপা হাত বাড়িয়ে দেওয়াল থেকে জ্বলন্ত লণ্ঠনটা নামিে হাতে নিয়ে নিল। অন্য হাতে পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে লণ্ঠনটার আলোর সামনে ধরল

লোকটা গলা ছেড়ে বলে উঠল—পেরেজ, এ চিঠিটা দেখ।

বৃদ্ধ পূর্বপুরুষটা এগিয়ে এসে চিঠিটার দিকে মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে চমকে উঠে বলল—হা ঈশ্বর! এযে সেনিওর স্যান্ড্রিজ, আর এ চিঠিটা লিখেছে এল চিভেটো। আর টোনিয়া পেরেজ এর পুরুষ মানুষটাকে তো সবাই ওই নামেই সম্বোধন করে।

গায়ের কম্বলটা একটু গুছিয়ে নিতে নিতে সে এবার বলল—সবাই বলে লোকটা নাকি হাড় বজ্জাত। তার মত খারাপ লোক সচরাচর দেখা যায় না। তবে আমি এসব ব্যাপার—স্যাপার কিছুই জানি না।

টোনিয়া পেরেজ যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল তখন সে চিঠিটা লিখেছিল। আর সেটাবে এ বুড়োকে দিয়েই ডোমিঙ্গো সেলেস-এ আপনার হাতে দিয়ে আসতে বলেছিল। চিঠিটাতে বি কোন খারাপ খবর কিছু লেখা আছে নাকি?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে এবার বলল—আজ আমার বয়স হয়েছে, বুড়ো হয়েছি, কোন কিছুই ঠিক ঠিক বুঝে উঠতে পারি না।

লেফটেন্যান্ট স্যান্ড্রিজ সে মুহূর্তে কর্তব্য স্থির করতে না পেরে ঘর থেকে বেরিয়ে গুটিগুটি গায়ক-পাখিটার গায়ের ধুলোর ওপর মুখ নিচু করে দুম্ করে আছাড় খেয়ে পড়ে গেল।

একজন ফরাসী ভদ্রলোকের যে বুদ্ধিটুকু থাকা দরকার তার লেশমাত্রও তার নেই। তাই প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার সূক্ষ্ম কাজটা তার মাথায় ঢুকল না।

এদিকে যে ঘোড়সওয়ারটা মালগাড়ি ছাউনিটার পাশ দিয়ে ছুটে গিয়েছিল সে প্রায় এক মাইল পথ পাড়ি দিয়ে কর্কশ গলায় বে-সুরো একটা গান ধরল।

দ্য মিসিং কর্ড

রাশ কিনে-র ভেড়ার খামারে আমাকে একটা রাত্রি কাটাতে হয়েছিল। ভেড়ার খামারটা নুয়েসেস-এর বালির রাজ্যে অবস্থিত।

মিস রাশ কিনে আর আমার যখন প্রথম দেখা হয় তখন আমরা উভয়েই উভয়ের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলাম।

আমাদের প্রথম পরিচয়-মুহূর্ত থেকে পরদিন সকালে যাত্রা আরম্ভ করার সময় পর্যন্ত আমরা উভয়ে টেক্সাসের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী পরস্পরের অভিন্ন হৃদয় বন্ধুতে পরিণত হয়ে গিয়েছিলাম।

রাতের খাবারের পাট মিটে যাবার পর আমি আর ভেড়ার খামারটার মালিক দু'কামরার বাড়ির বাইরের বারান্দায় দুটো চেয়ার পেতে মুখোমুখি বসে পড়লাম।

এলস চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে কাঠের খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে এল টোরো তামাকে ধূমপান করতে লেগে গেলাম। আর সে সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন টুকরো টুকরো ঘটনা নিয়ে আপোষে বাক্‌বিতণ্ডায় মেতে গেলাম।

পাহাড়ের অদূরবর্তী একটা ঢালের ওপর ভেড়ার খামার-বাড়িটা তৈরী করা হয়েছে।

আমরা দু'জনে মাথার ওপরে পরিষ্কার আকাশটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে চুপচাপ বসে রইলাম।

আর আকাশের গায়ে ঝুলে রয়েছে রূপোলি চাঁদটা। বাস্তবিকই পরিবেশটা খুবই মনোরম।

মিঃ কিনে-র যুবতী স্ত্রী সংসারের কাজে ব্যস্ত।

আমরা একটা ঘরে বসে আহারাদি সারলাম। অকস্মাৎ পাশের একটা ঘর থেকে গানের কলি ভেসে এল।

পিয়ানো বাজানোর ব্যাপারে সামান্যতম অধিকারও যদি আমার থাকে তবে অনায়াসেই আমি বলতে পারি যে-লোকটা পিয়ানোতে এমন অপূর্ব সুর সৃষ্টি করতে সক্ষম, পিয়ানোর কী-বোর্ড সম্পূর্ণ তার দখলে।

স্বীকার না করে উপায় নেই, এমন একটা সাধারণ ভেড়ার খামারবাড়িতে একটা পিয়ানো এবং এমন সুরের ঝঙ্কার কেবলমাত্র অসাধারণই নয়, অবিশ্বাস্য ঘটনাই বটে।

আমার এ বিস্ময়টুকু কিনে-র নজর এড়াল না। সে সরবে হেসে উঠে আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়িয়ে মিটমিট করে হাসতে লাগল।

সে হাসতে হাসতেই বলল—হয়ত বা একটা ভেড়ার খামারে পিয়ানোর এমন সুর-মূর্চ্ছনা প্রত্যাশা করা যায় না। তাই বলে আমরা জঙ্গলের বাসিন্দা বলে পিয়ানো বাজাতে পারব না এমনটা তো হবার নয়।

মুহূর্তকাল পরে সে আবার বলল—দেখুন, একজন মহিলার পক্ষে জায়গাটা খুবই নির্জন নিরালা, এ-তো আর অস্বীকার করা যাবে না। তাই যদি গান-বাজনা নিয়ে মেতে থেকে একটু-আধটু উন্নতি করতে পারে, ক্ষতি কি? আমি কিন্তু এ ব্যাপারটাকে এ দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করেছি।

তোমার মতলবটা মন্দ নয়। আর মিসেস কিনের হাত ভাল, সুন্দর বাজাল। সঙ্গীত-বিজ্ঞানে যদিও আমার দখল মোটেই নেই তবু মেনে নিচ্ছি তিনি একজন অসাধারণ সঙ্গীত-শিল্পী।

মিঃ কিনে বলল—জোড়া এলম গাছের মোড় দিয়ে আসার সময় পুরনো পরিত্যক্ত বস্তিটা দেখতে পেয়েছিলে কি?

হ্যাঁ, দেখতে পেয়েছি। এক পাল ভেড়াকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ঘুরে ঘুরে ঘাস খেতে দেখেছি।

আর কিছু?

তার পাশেই দেখলাম ভাঙা চোরা একটা পুরনো পরিত্যক্ত বস্তি আর ভাঙা একটা খোঁয়াড়।

কি বুঝলে?

কেউ সেখানে থাকে না, এরকম ধারণাই তো হল।

এখন কেউ থাকে না বটে, তবে সেখান থেকেই এ গান-বাজনার সূত্রপাত হয়।

সেখান থেকে? কিভাবে?

বলছি তবে শোন, এই বস্তিতে ক্যাল অ্যাডামস নামে এক বুড়ো থাকত। [illegible] বিভিন্ন রকমের আটশ' ভেড়ার মালিক ছিল আর একটা উদ্ভিন্ন যৌবনা সুন্দরী একটা মেয়ে থাকত।

দেখ, তোমার কাছে আমার বলতে দ্বিধা নেই, ভেড়া চরানো আর লোম কাটা ও গোছানোর ফাঁকে সময় সুযোগ পেলেই আমি সেখানে হাজির হতাম।

মিস মারিলা ছিল তার নাম। আমিও অভিজ্ঞতা সম্বল করে হিসেব-নিকেশ করে সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিলাম একদিন না একদিন লোমিটো খামার-এর মালিকানা তার ওপরই বর্তাবে। সে-ই হবে খামারের মালিক। সার্বিক কর্তৃত্ব সে-ই লাভ করবে।

আর আজ? সে ভেড়ার খামারটার মালিক রাশ কিনে যে এস্কোয়ারের একজন সম্মানীত অতিথি, বুঝলে।

মুহূর্তের জন্য থেমে একটু দম নিয়ে সে আবার মুখ খুলল—আসলে খোয়াড়ের মালিক বুড়ো ক্যাল অ্যাডামস্-এর ভেড়া পালনের ব্যাপার-স্যাপার সম্বন্ধে মোটেই অভিজ্ঞতা ছিল না। কিন্তু যুবতী মারিলা-র রূপ-সৌন্দর্য বুকে রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি করত।

আমি ছিলাম বুড়ো ক্যাল অ্যাডামস-এর সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশী। আর সে জন্য আমি সপ্তাহে ন' থেকে ষোলবার জোড়া এলম গাছতলায় হাজির হতাম। আর রূপসী মারিলাকে দেখার অজুহাতে সঙ্গে করে কিছুটা হরিণের মাংস না হয় টাটকা মাখন নিয়ে যেতাম অজুহাতটা হাস্যকর

হলেও আমি কোনদিন এ দুটোর একটা সঙ্গে করে নিয়ে যেতে ভুলতাম না।

আমি আর মারিলা অচিরেই এক-অন্যের সঙ্গে এতই ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়লাম যে, আমি নিঃসন্দেহ হয়ে পড়লাম, শিগগিরই দড়িগাছা তার গলায় জড়িয়ে তাকে একেবারে আমার লোমিটো খামারে নিয়ে তুলতে পারব।

বুড়ো ক্যাল অ্যাডামস কিন্তু আমার আকর্ষণের মাত্রা দেখে ব্যাপারটাকে পাত্তা দিত না।

সত্যি বলছি, বুড়ো ক্যাল অ্যাডামস-এর মত জ্ঞানী অথচ বুদ্ধিহীন মানুষ আগে কেউ-ই আমার চোখে পড়েনি। তার কোন ব্যাপারই অজ্ঞাত ছিল না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন শাখা নেই যা সে গুলে খায় নি। মারিলার ফ্যাশান সংক্রান্ত একটা মেয়েদের পত্রিকা হাতে নিয়ে আমি একদিন জোড় এলম গাছতলায় হাজির হলাম। আর সঙ্গে নিয়েছি বুড়ো ক্যাল অ্যাডামস-এর জন্য একটা বৈজ্ঞানিক সংক্রান্ত প্রবন্ধ।

আমি ঘোড়াটাকে বাঁধার সময় মারিলা আমাকে একটা খবর দিতে উদ্ভ্রান্তের মত ছুটে এল। আমার কাছে এসেই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে খুশিতে ডগমগ হয়ে সে বলল—এই যে রাশ, তুমি কি ভাবছ। বাবা আমার জন্য একটা সুন্দর পিয়ানো খরিদ করছে। কী আনন্দ যে হচ্ছে তা তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। আমার নিজের একটা পিয়ানো কোনদিন হবে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি।

আমি মুচকি হেসে বললাম—সত্যি সুখবরই বটে। পিয়ানোর সুর মূর্চ্ছনা আমার খুবই প্রিয়। হ্যাঁ, বুড়ো ক্যাল অ্যাডামস কাজটা খুবই ভাল করছে।

আমি কিন্তু দো-টানায় পড়ে মন স্থির করতেই পারছি না।

কি? কোন্ ব্যাপারটার কথা বলছ?

ব্যাপারটা হচ্ছে, পিয়ানো, নাকি অর্গান, কোনটা নেব ভেবেই পাচ্ছি না।

আমি হাসতে হাসতে বললাম—দেখ, একটা ভেড়ার খামারের নিরবচ্ছিন্ন নির্জনতাকে হ্রাস করার পক্ষে পিয়ানো আর অর্গান উভয়ই প্রথম শ্রেণীর বাদ্যযন্ত্র। আর আমার কথা যদি জানতে চাও তবে বলব, সন্ধ্যায় ঘোড়া হাঁকিয়ে খামার-বাড়িতে ফিরে একটা ওয়ালজ-এর চেয়ে কোন কিছু ভাল আছে বলে মনে করি না।

এসব কথা এখন ছাড়ান দাও। বাবা আজ বেরোন নি, বাড়িতেই বিশ্রাম করছেন। শরীরটা তেমন ভাল যাচ্ছে না।

মারিলা-র পিছন পিছন আমি বাড়ির ভেতরে গেলাম। দেখলাম, বুড়ো ক্যাল অ্যাডামস একটা খাটিয়ায় কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে। খারাপ ধরনের কাশির ব্যামো তাকে ধরেছে।

রাতের খাবার সারার জন্য আমি সেখানেই রইলাম। আমি কথা প্রসঙ্গে বুড়ো ক্যাল অ্যাডামসকে বললাম—শুনলাম, মারিলার জন্য একটা পিয়ানো কিনছেন?

হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছ বাছা। একটা বাজনার জন্য বহুদিন ধরে সে বায়না করছে। এবার ভাবছি, কিনেই দেব। এ মরশুমে ভেড়ার লোম বেচে ছ' পাউন্ডের কাছাকাছি পেয়েছি। তা দিয়েই মারিলা'কে যন্ত্রটা কিনে দিয়ে তার শখ পূরণ করব।

দেখুন, ওটা পাবার যোগ্যতা তার আছে বলেই আমি মনে করছি।

হ্যাঁ, আমি তা-ই ভেবেছি। এবার পশমের শেষ বস্তাটা নিয়ে সাম এন্টোনে গিয়ে পছন্দ মাফিক একটা পিয়ানো খরিদ করে নেব।

পরামর্শ দেবার ভাব নিয়ে আমি বললাম—আমার মনে হয় মারিলাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে ভাল হয়। তবে সে নিজেই পছন্দ করে কিনে নিতে পারবে, আপনি কি বলেন?

আরে না। তার আর দরকার হবে না। সারা পৃথিবীটা ঘুরে এলে আমার চেয়ে ভাল বাদ্যযন্ত্রের সমঝদার পাবে না। আমার এক কাকা এক পিয়ানো কারখানার ভাগীদার ছিলেন। তার সঙ্গে থেকে থেকে হাজারটা পিয়ানো ঘাঁটাঘাঁটি করেছি। পিয়ানোর যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা কম নয়।

প্রসঙ্গটাকে আর এগোতে না দিয়ে মারিলা মুখ খুলল—ওটাই ভুল, তুমিই দেখে শুনে পছন্দ করে একটা কিনে এনো। এ ব্যাপারে তোমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতাই আছে।

মঙ্গলবার ভোরে বুড়ো ক্যাল অ্যাডামস ভেড়ার লোমের শেষ বস্তাটা নিয়ে সান এন্টোনের

উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

বুড়ো ক্যাল অ্যাডামস-এর অনুপস্থিতিতে মারিলার কাকা বেন বার্ডসটেল থেকে এসে খামার বাড়িটায় বাস করতে লাগল।

সান এন্টোনে নগরের দূরত্ব খামার বাড়িটা থেকে নব্বই মাইল। আর নিকটবর্তী রেল-স্টেশন থেকে দূরত্ব মাইল চল্লিশেক।

ক্যাল কাকা যাত্রা করার চারদিন পরের কথা—সে দিন সন্ধ্যার আধো আলো—আধো অন্ধকারে আমি জোড়া এলম-এর নিচে হাজির হই। এমন সময় একটা মালবোঝাই গাড়ি হেলে দুলে সেখানে এসে থামল।

আমি অনুসন্ধিৎসু নজরে গাড়িটার দিকে তাকিয়ে বুঝলাম। পিয়ানো বা অরগ্যান যা হোক কিছু একটা ভেতরে রয়েছে।

গাড়িটা খামার-বাড়ির দরজায় থামতে না থামতেই মারিলা আনন্দে নাচতে-নাচতে সেখানে এল। উল্লসিত হয়ে এক নিঃশ্বাসে বলতে লাগল—উফ্ কী মজা! কী মজা! বাবা, সেটা এনেছ তো? এনেছ?

ক্যাল কাকা মুখে হাসি ফুটিয়ে সগর্বে বলে উঠল—সান এন্টোন নগরের সবচেয়ে ভাল পিয়ানো। খাঁটি রোজ উডের তৈরী। আওয়াজ একেবারে গম্‌গম্ করে। দোকানদার নিজেই আমাকে বাজিয়ে শুনিয়েছে। আমার পছন্দ হয়ে গেল। ব্যস, নগদ টাকা ফেলে দিয়ে পিয়ানোটা গাড়িতে তুলে দিলাম।

আমি, ক্যাল, বেন কাকা আর খামার বাড়ির এক চাকর মিলে ধরাধরি করে যন্ত্রটাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেলাম। যন্ত্রটা তেমন বড় বা ভারি কোনটাই নয়।

যন্ত্রটা নামাতে না নামাতেই বুড়ো ক্যাল অ্যাডামস কাৎরাতে কাৎরাতে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল। কোনরকমে উচ্চারণ করল—আমি খুবই অসুস্থ বোধ করছি।

আমি তার গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম, গা খুব গরম, অস্বাভাবিক জ্বর। আর সে সঙ্গে বুকের ব্যথাটাও বেড়েছে।

আমরা ধরাধরি করে, প্রায় পাঁজা-কোলা করে বিছানায় তুলে দিলাম।

মারিলা ছলছল চোখে দাঁড়িয়ে অসুস্থ বাবার পরিস্থিতি দেখতে লাগল। এক সময় সে চোখ মুছতে মুছতে বাবার জন্য কিছু পানীয় আনার জন্য পাশের ঘরে চলে গেল।

তারপর সে পিয়ানোটাকে জড়িয়ে ধরে ছোট শিশুদের যেমন করে আদর করে ঠিক তেমনই সেটার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে আদর করতে লাগল। তাদের বড়দিনের খেলনাটা যে সত্যিকারের আদরের সামগ্রীই বটে।

আমি মাঠ থেকে ফিরে মারিলাকে পিয়ানোটার ঘরেই দেখতে পেলাম। যন্ত্রটাকে বেঁধে-রাখা দড়ি আর বস্তাগুলো মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে দেখলাম। বুঝতে অসুবিধা হল না, সে ই পিয়ানোর বাঁধন খুলেছে।

দেখলাম, মারিলা আপন মনে যন্ত্রটাকে আবার বেঁধে রাখতে ব্যস্ত।

আমি দরজায় দাঁড়িয়েই বললাম—একী মারিলা, যন্ত্রটাকে বাঁধন যখন খুলেই ছিলে তবে আবার বাঁধাছাধা করছ কেন, বল তো?

মারিলা কাজের ফাঁকে চোখে-মুখে জিজ্ঞাসার ছাপ এঁকে নীরবে আমার দিকে তাকাল।

আমি পূর্ব প্রসঙ্গের জের টেনে এবার বললাম—মারিলা, যন্ত্রটার বাঁধন যখন খুলেইছ তখন দু'-একটা স্বর বাজিয়ে দেখলেই তো ভাল হত।

না রাশ, আজ রাত্রে নয়।

কেন? আজ রাত্রে বাজাবে না কেন, বল তো?

না, আজ রাত্রে আমি বাজাব না।

আমি আর কথা না বাড়িয়ে পাশের ঘরে গেলাম। দেখলাম, বুড়ো ক্যাল-এর ব্যামোটা সত্যি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। ব্যামোটা খুবই গুরুতর হয়ে উঠেছে।

বুড়ো ক্যাল-এর পরিস্থিতি এতই সঙ্গীন যে, বেন কাকা ডাক্তার আনার জন্য ঘোড়া হাঁকিয়ে

বার্ডসটেল-এ গেছে। তার ইচ্ছা, ডাক্তার সিম্পসনকে নিয়ে তবে ফিরবে।

আমি সেখানেই রয়ে গেলাম। কোন দরকার হলে মাধ্যমও কিছু তো অন্তত কাজ করতে পারব।

বাবার শিয়রে বসে তার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে মিস মারিলা আবেগ-মধুর স্বরে বলল—বাবা, কী সুন্দর পিয়ানোটাই না তুমি কিনেছ! আগে কোনদিনই এমন কোন পিয়ানো দেখার সৌভাগ্যই আমার হয়নি। চমৎকার।

বুড়ো ক্যাল অ্যাডামস বলল—কিন্তু বাছা, এখনও তো তোমাকে পিয়ানোটা বাজাতে শুনলাম না। একটু বাজাওনা শুনি। বুকের কাছের ব্যথাটা এখন আর তেমন অসহ্য বোধ হচ্ছে না। একটু বাজাও।

না বাবা, তুমি আগে ভালভাবে সেরে ওঠ। কথা বলতে বলতে সে তাকে ছোট্ট শিশুর মত খুবই সন্তর্পণে পাশ ফিরিয়ে শোয়াল।

ডাক পেয়ে ডাক্তার সিম্পসন ছুটে এলেন। রোগীকে পরীক্ষা করে মন্তব্য করলেন—খুবই খারাপ ধরনের নিউমোনিয়া হয়েছে। আর তাঁর বয়স ষাটের ঊর্ধ্বে হয়ে গেছে বলে খুব বেশী হাঁটা চলা যেন না করেন।

তার অসুখের ব্যাপারে বেন ও মিসেস বেন তার রোগ নিরাময়ের জন্য সাধ্যমত প্রয়াস চালাচ্ছেন।

একদিন বেন ও মিসেস বেন রোগীর ঘরে উপস্থিত। একটু বাদে ডাক্তার সিম্পসন সেখানে এলেন। রোগীকে পরীক্ষা কবলেন। ক্যাল অ্যাডমস মেয়ে মারিলাকে ডেকে পাঠাল পিয়ানোর কথা বলার জন্য।

মারিলা এলে সে ক্ষীণকণ্ঠে বলতে লাগল—গান-বাজনার ব্যাপাবে যা কিছু করণীয় আমি সাধ্যমত সব কিছুই করেছি। সান এন্টোন থেকে দামেব তুলনায় সবচেয়ে ভাল মালটাই খরিদ করে এনেছি। মারিলা, যন্ত্রটা তো ভালই হয়েছে, তাই না?

ভালই শুধু নয়, খুবই ভাল। এমন গমগমে স্বর আমি আগে কোন যন্ত্রেরই শুনিনি। এসব কথা পবে হবে বাবা। তুমি এখন একটু ঘুমোতে চেষ্টা কর।

না, এখন আমি ঘুমোব না, ঘুম আসবে না। পিয়ানোটার বাজনা একটু শুনতে চাই। বাপের কথা রাখতে এখন একটু বাজাতে পারবে না মারিলা?

ডাক্তার সিম্পসন মারিলাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন—বাছা, তোমার বাবা যা বলছেন কর। বেন আর মিসেস বেনও তাকে একই কথা বলল।

আমিও তাকে কিছু বলার প্রয়োজনবোধ কবলাম। তাকে বললাম—এক কাজ কর মারিলা, খুব মৃদু স্বরে দু'-একটা স্বর বাজিয়ে শোনাও। নিজের হাতে কিনে সঙ্গে করে বয়ে আনা পিয়ানোটা তুমি বাজালে তিনি খুবই খুশি হবেন। একটুখানি বাজাতে পারবেনা, আপত্তি কিসের?

মারিলা নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখের কোল-বেয়ে টপটপ করে জলের ফোঁটা পড়তে লাগল।

পরমুহূর্তেই সে ছুটে গিয়ে রোগ শয্যায় শায়িত ক্যাল অ্যাডামস-এর গলা জড়িয়ে ধরে সে ভাবাপ্লুত কণ্ঠে যা বলল সবাই শুনতে পেল।

মারিলা বলতে লাগল—একী কথা বলছ বাবা! গত রাত্রে তো আমি অনেকক্ষণ ধরেই তোমাকে পিয়ানোটা বাজিয়ে শুনিয়েছি। সত্যি বলছি, অনেকক্ষণ ধরেই তো বাজিয়েছি। বাদ্যযন্ত্রটার আওয়াজ কী সুন্দর, রীতিমত গমগমে। 'এন্‌ভিল পোল্কা', 'বোনি ডান্ডী' আর 'নীল ডেনিউব' এরকম আরও কত সুর আমি বাজিয়েছি। বাবা, তুমি শোন নি? তোমার শরীর খারাপ বলে উঁচু লয়ে বাজাইনি।

ক্যাল অ্যাডামস বলল—ভাল কথা। আমিও হয়ত শুনে থাকব। কিন্তু মনে নেই। অনেক সময়ই আমার মাথাটা কেমন গোলমাল হয়ে যায়। কেনার আগে, দোকানেই আমি পিয়ানোটার বাজনা শুনেছি, খুবই ভাল লেগছে। যন্ত্রটা তোমার পছন্দ হয়েছে শুনে আমি খুবই আনন্দ পেয়েছি।

এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ কথা বলায় ক্যাল অ্যাডামস হাঁপাতে লাগল। একটু দম নিয়ে তারপর আবার বলতে শুরু করল—মারিলা, তুমি কাছে থাকলে আমি হয়ত একটু ঘুমোতে পারব। তুমি আমার শিয়রে কিছুক্ষণ থাক।

মারিলা এবারই আমাকে খুব চিন্তায় ফেলল। বুড়ো বাবাকে নিয়ে সে খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। সে কিছুতেই বাবার কেনা পিয়ানোটা বাজাবে না। একটা ব্যাপার আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, সে কেন তার বাবাকে বলল, গত রাত্রে পিয়ানোটা বাজিয়েছিল। কারণ মালগাড়ি থেকে নামানোর পর মালগাড়ির পর্দাটা দিয়ে সেটাকে দ্বিতীয়বার ঢেকে দেবার পর সেটা আর মুহূর্তের জন্যও খোলা হয়নি।

আর মারিলা যে একটু-আধটু পিয়ানো বাজাতে জানে তা আমার আগেই জানা ছিল। কারণ, একবার 'চারকো লারগো খামার'-এ একটা পুরনো পিয়ানোতে যে নাচের সুরটা বাজিয়েছিল মোটামুটি ভালই শোনা গিয়েছিল। আমি নিজের কানে সেটা শুনেছিলাম। এখনও যেন সুরটা আমার কানে লেগে রয়েছে।

তারপর ক্যাল অ্যাডামস নিউমেনিয়ার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে গেল। নিউমোনিয়াই জয়ী হল।

বার্ডসটেল-এ তার শেষ কৃত্য সম্পন্ন করা হল। আমরা সবাই সেখানে উপস্থিত ছিলাম।

সমাধিক্ষেত্র থেকে মারিলা আমাদের সঙ্গেই বাড়ি ফিরে এল। তার বেন কাকা ও তার স্ত্রী কয়েকটা দিন মারিলাকে সঙ্গদান করে নিজেদের বাড়ি ফিরে গেল।

যেখানে পিয়ানোটা রক্ষিত আছে মারিলা আমাকে নিয়ে সে ঘরটায় ঢুকল। অন্য সবাই বারান্দাতেই রয়ে গেল।

মারিলা আমার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল—রাশ, এদিকে এস। একটা জিনিস তোমাকে দেখাতে চাচ্ছি।

সে দড়ির গিঁট খুলে পিয়ানোটার ওপর থেকে ঢাকনা সরিয়ে ফেলল।

আপনি যদি কোনদিন জিনছাড়া ঘোড়ার পিঠে চেপে থাকেন, অথবা গুলি না ভরে বন্দুকের ঘোড়াটার টিপ দিয়ে থাকেন, নইলে যদি কোন খালি-বোতলে চুমুক দিয়ে থাকেন তবে বুড়ো ক্যাল অ্যাডামস যে যন্ত্রটা খরিদ করে এনেছিল সেটা বাজিয়ে সুর তুলে একটা বা দুটো বাজনার আসরকে আতঙ্কিত করে তোলা আপনার পক্ষে অসম্ভব নয়।

বুড়ো ক্যাল অ্যাডামস তার মেয়ে মারিলার জন্য পিয়ানোর বদলে এমন একটা বাদ্যযন্ত্র খরিদ করে এনেছে যেটা তারা পিয়ানো বাজানোর জন্য আবিষ্কার করেছে।

একটা বাঁশের বাঁশির সঙ্গে তার ছিদ্রের যে সম্পর্ক সেটা ঠিক ততখানিই যন্ত্রটার সঙ্গে সুরের সম্পর্ক।

বুড়ো ক্যাল অ্যাডামস সে রকমই একটা যন্ত্র পছন্দ করে মেয়ের জন্য খরিদ করে বাড়ি নিয়ে এসেছিল।

মারিলা কিন্তু যন্ত্রটার ব্যাপার-স্যাপার বিন্দু বিসর্গও বাবাকে জানতে দেয় নি।

মিঃ কিনে বলল—তুমি একটু আগেই যে সুরলহরী শুনলে, সেটা কি জান? সেই ডেপুটি পিয়ানো। সাধারণ পিয়ানোর সঙ্গে এর যেটুকু তফাৎ তা হচ্ছে, তার সঙ্গে দু'শ ডলারের একটা পিয়ানো জুড়ে দেওয়া হয়েছে—আমি মারিলাকে আমাদের বিয়ের ঠিক পরপরই পিয়ানোটা খরিদ করে দিয়েছিলাম।

দ্য চ্যাপার‍্যাল প্রিন্স

শেষমেশ সত্যি ন'টা বাজল। আর সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনি শেষ হল।

লেনা 'খনি-হোটেল'-এর সাড়ে তিনতলায় তার নিজের কামরায় উঠে গেল।

লেনাকে দিনভর কেনা গোলামের মত হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে হয়। একটা বয়স্ক মেয়ে মানুষের পুরো কাজটা তাকে সারতে হয়—ঘষে মেজে ঘরের মেঝে সাফসুতরা করা, ভারী ভারী লোহার কাপ-প্লেট ধোয়া, একটা ভিড়ের হোটেলের যাবতীয় কাঠও জোগান দেওয়া প্রভৃতি সব কাজই লেনাকে একা হাতে করতে হয়।

খনির সারা দিনের কর্মকোলাহল থেমে গেছে। ড্রিলিং, ব্লাস্টিং, বিশাল বিশাল ক্রেনের কর্কশ আওয়াজ আর ফোরম্যানদের চিল্লাচিল্লি সবই এখন থেমে গেছে।

নিচের তলায়, হোটেলের অফিস-ঘরে তিন-চারজন মজুর চেকার খেলা নিয়ে চিৎকার-চেঁচামেচি করে চলেছে।

আর বাড়িটার বাতাসে হরেক রকম খাদ্য বস্তুর গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে।

লেনা মোমবাতিটা জ্বেলে কাঠের নড়বড়ে চেয়ারটায় শরীর এলিয়ে দিল।

এগারো বছর তার বয়স। চেহারা রোগা, হাড্ডিসার। অপুষ্টিজনিত রোগে চেহারাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

তার পিঠ আর অন্য সব প্রত্যঙ্গে ব্যথা-বেদনা—একেবারে অচল হয়ে পড়তে বসেছে।

তবে তার বুকের ব্যথাটা সবচেয়ে বড় সমস্যা, সবচেয়ে বড় বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার ছোট দুটো কাঁধে বুঝি সেটাই শেষ খড়ের বোঝা চেপেছিল।

তারা গ্রিমকেও সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। সে যতই পরিশ্রান্ত হোক না কেন রাত্রে তার কাছ থেকেই স্বস্তি, আরাম এবং আশা ভরসা টুকু পায়।

গ্রিম সব সময় তার কানে ফিসফিস করে বলে—এক রাজকুমার বা এক পরী এসে যাদুমন্ত্রে এর কবল থেকে তাকে উদ্ধার করবে।

প্রতিটা রাত্রেই গ্রিম তাকে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও মনোবল জাগিয়েছে।

যে সব কাহিনী সে পড়ে তার মধ্যেই সে নিজের পরিস্থিতির মিল খুঁজে পায়। কাঠুরের বে-পাত্তা হয়ে-যাওয়া ছেলে, দুঃখী হাঁস-মেয়ে, যন্ত্রণা কাতর সৎ-মেয়ে আর ডাইনীর চালায় বন্দিনী ছোট্ট মেয়েটা প্রভৃতি সবাই যেন খনিশ্রমিক হোটেল-এর কর্মক্লান্ত হেঁসেলের সহকর্মিণী লেনা-রই বিভিন্ন মূর্তি।

আর লেনার দুঃখ-যন্ত্রণা যখন একেবারে অসহনীয়, চরম রূপ ধারণ করে তখনই তাকে উদ্ধার করার জন্য হাজির হয় এক ভাল পরী নয়তো সাহসী রাজকুমার।

অতএব এখানে, এ রাক্ষসের রাজপ্রাসাদে অশুভ মন্ত্রবলে ক্রীতদাসী লেনা একমাত্র গ্রিম-এর ওপরেই নির্ভর করে আছে, কবে শুভশক্তি অশুভ শক্তিকে পরাজিত করে জয়লাভ করবে।

কিন্তু আগের দিনের ঘটনা, মিসেস মালোনি হঠাৎ তার কামরায় ঢুকে বইটা দেখতে পেয়েছিল। ফিরে যাবার সময় সেটাকে হাতে করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। যাবার সময় কড়া স্বরেই বলে গিয়েছিল, দাসী রাত্রে পড়াশোনা করতে পারবে না।

তখন থেকে লেনার রাত্রের ঘুম উঠে গেছে।

মাত্র এগারো বছরের একটা মেয়েকে যদি মাকে ছেড়ে বহু দূরে গিয়ে থাকতে হয়, সে যদি খেলাধুলা করার মত সামান্য সময়ও না পায়, তবে গ্রিমকে ছাড়া তার কি টিকে থাকা সম্ভব? কাজটা যে কী কঠিন তা একবারটি চেষ্টা করে দেখলেই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারবেন।

লেনা টেক্সাসের ছোট্ট শহর ফ্রেডেরিক্স বার্গ-এর বাসিন্দা। শহরটা পেডারনালেস নদীর তীরে ছোট পাহাড়গুলোর মধ্যে অবস্থিত। জায়গাটা জার্মানী অধ্যুষিত। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলেই তারা বিয়ারের টেবিলে বসে আর খেলাধুলা নিয়ে মেতে যায়। তারা সবাই অর্থকড়ির ব্যাপারে খুবই হিসাবী—মিতব্যয়ী। তাদের মধ্যে আবার সবচেয়ে হাড়কিপ্টে হচ্ছে লেনা-র বাবা পিটার

হিন্ডেস্‌ মুলার।

অর্থকড়ির ব্যাপারে খুবই হিসাবী বলেই পিটার তার মেয়ে লেনাকে ত্রিশ মাইল দূরবর্তী খনির হোটেলে কাজ করতে পাঠিয়ে দেয়।

সরাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির মাধ্যমে সে হোটেল থেকে সপ্তাহে তিনটে করে ডলার পায়। সে মুদ্রাগুলোকে পিটার তার সুরক্ষিত দোকানে খাটায়।

পিটার আশা রাখে, সে একদিন না একদিন প্রতিবেশী হুগো হেফেল বাগুয়ার-এর মত ধনকুবের বনে যাবে।

এখন লেনা-র কাজ করার মত বয়স হয়েছে। অর্থকড়ি সঞ্চয়ের কাজে সে বাবাকে সাহায্যও করতে পারে।

তবে একটা কথা একবারটি ভেবে দেখুন তো, এগারো বছরের এক বালিকাকে যদি রাইন নদীর তীরের একটা গ্রামের ভাললাগা একটা বাড়ি ছেড়ে এক রাক্ষসের রাজপ্রাসাদে হাড়ভাঙা খাটুনিতে লিপ্ত হতে হয়, আবার গ্রিমকেও যদি তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া হয় তবে তার পরিস্থিতিটা কেমন হয়ে উঠবে!

লেনা একটা চিঠি লিখতে বসল। টমি রিয়ান চিঠিটাকে বালিঙ্গার-এ ডাকবাক্সে ফেলবে। টমি সতের বছরের এক কিশোর।

টমি খনির কর্মী, কাজের ছুটির পর প্রতিরাত্রে সে বালিঙ্গার-এর বাড়িতে ফেরে।

টমি এখন লেনার জানালার কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। চিঠিটা লেখা শেষ করে সে সেটা তাকে দেবে। লেনা একমাত্র এভাবেই তার ফ্রেডেরিক্সের বাড়িতে চিঠি পাঠাতে পারে।

সে চিঠিপত্র লিখে বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ রাখুক এটাকে মিসেস মালোনি মোটেই সুনজরে দেখেন না।

লেনা মোমবাতির আলোয় চিঠিটা লিখতে লাগল—

প্রিয় বাবা,

তোমাকে একবারটি চোখে দেখার জন্য মনটা খুবই উতলা হয়ে উঠেছে। আর বড্ড ইচ্ছা করছে, ছোট্ট এডলফ, গ্রেটেল ও ক্লজ আর হেইন্‌রিক'কে দেখতে। আমি বড় ক্লান্তি বোধ করছি। তোমাকে দেখার জন্য মন-প্রাণ আকুল হয়ে পড়েছে।

একটা কথা তোমাকে না বলে পারছি না, মিসেস মালোনি আমাকে কষে একটা থাপ্পড় মেরেছে। আমি যথেষ্ট কাঠ কুড়িয়ে আনতে পারি নি। কারণ আমার হাতে আঘাত লেগেছে।

জান, গতকাল মিসেস মালোনি রাগারাগি করে আমার বইটা কেড়ে নিয়েছেন। ওই যে. গ্রিমভাইদের রূপকথা বইটার কথা বলছি। কাকা লিও বইটা আমাকে দিয়েছিলেন। কিন্তু সময়-সুযোগ মত বইটা পড়লে কারো কোন অসুবিধা হয় বলে মনে হয় না। অসুবিধা না হবারই তো কথা।

তুমি বিশ্বাস কর, আমি সাধ্য মত ভালভাবেই কাজকর্ম করতে চেষ্টা করি। আমাকে এখানে এত বেশী কাজ, এত বেশী পরিশ্রম করতে হয় যে, তোমাকে বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়।

রোজ রাত্রে আমি কিছু কিছু পড়ি।

আমি এখন কি করার মনস্থ করেছি, কি করতে চলেছি তা তোমাকে বলছি। আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাবার জন্য যদি লোক না পাঠাও তবে নদীর জল যেখানে সবচেয়ে বেশী সেখানেই আমি ডুবে মরব, বলে রাখছি। আমি ভালই জানি, ডুবে মরা খুবই খারাপ। কিন্তু বাবা, আমি যে তোমাকে একবারটি চোখে দেখতে চেয়েছি। পৃথিবীতে আমার যে আর কেউ নেই।

আমার শরীর ও মন দু-ই খুবই ক্লান্ত। আর টমিও চিঠিটার অপেক্ষায় জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে।

প্রণামান্তে তোমার আদরের মেয়ে

লেনা।

চিঠিটা লেখা শেষ করে লেনা এদিক-ওদিক সতর্ক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে দেখে নিল, ধারে-কাছে কেউ আছে কিনা। তারপর জানালার কাছে গিয়ে চিঠিটা জানালার গরাদের ফাঁক দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিল।

টমি সন্তর্পণে পথ থেকে চিঠিটা তুলে নিয়ে কোটের ভেতরের পকেটে চালান করে দিল।

টমি জানালাটার কাছ থেকে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় পাহাড়ি পথ বেয়ে উঠে যেতে লাগল। লেনা জানালা দিয়ে তার ফেলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে রইল।

তারপর জানলার কাছ থেকে ফিরে সে পোশাক-পরিচ্ছদ কিছুই না ছেড়ে মেঝেতে পেতে রাখা বিছানাটার ওপর শুয়ে পড়ল। অস্বাভাবিক ক্লান্তির জন্য মিনিট কয়েকের মধ্যেই সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

বুড়ো বালিঙ্গার রাত্রি দশটা নাগাদ মোজা-পরা পায়ে গুটি গুটি হেঁটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। জ্বলন্ত পাইপটাকে দাঁতের পাটি দুটো দিয়ে কাপড়ে ধরে ধীরে ধীরে টানতে টানতে প্রধান ফটকটার কাছে এসে দাঁড়াল। ফটকটার ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে পাইপটা টানতে লাগল। তার চোখের মণি দুটো এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করতে লাগল।

শুক্লপক্ষের ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় নিচের পথটা রীতিমত ঝকঝক করছে। মোটামুটি এ সময়েই ফ্রেডেরিক্সবার্গ-এর ডাকটা পথ-বেয়ে ওপরে উঠে আসে।

মিনিট কয়েক মাত্র অপেক্ষা করার পরই রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ঘোড়ার ক্ষুরের বাঞ্ছিত আওয়াজটা তার কানে এল। অল্প সময়ের মধ্যেই ডাকগাড়িটা এগোতে এগোতে তার ফটকের সামনে এসে দাঁড়াল।

বালিঙ্গার রীতিমত উল্লসিত হয়ে ডাকবাবুকে স্বাগত জানাল।

ডাক-হরকরা এক লাফে গাড়ি থেকে নেমে ঝটপট ঘোড়া দুটোর মুখ থেকে রশিগুলো খুলে দিল। তাদের দানা-পানি খাওয়াবে। সে রোজই এখানে তাদের বিশ্রাম ও দানাপানি খাইয়ে সুস্থ করে নেয়।

বালিঙ্গার ডাকের ব্যাগটা এনে অন্য দিনের মতই গাড়িটার ভেতরে ছুঁড়ে দিল।

তিনটে বিষয় নিয়ে ফ্রিটজ বার্গম্যান-এর যা কিছু চিন্তা ভাবনা, চারটেও বলা চলে। তবে সত্যি কথা বলতে কি, গাড়ির বাহন ঘোড়া দুটো নিয়েও তার চিন্তা ভাবনা কম নয়।

ঘোড়া দুটোই ফ্রিটজ্ বার্গম্যান-এর জীবনের প্রধান আকর্ষণ আর যা কিছু আনন্দ ফূর্তি। তারপরই জার্মানির সম্রাট আর লেনা হিল্ডেস মুলার-এর কথা বলতে হয়।

গাড়িটা ছাড়াব জন্য প্রস্তুতি নিলে বুড়ো ফ্রিটজ বার্গম্যান বলল—আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করার ছিল।

বুড়ো বালিঙ্গার চশমার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল—কি? কি কথা?

বলতে পারেন, খনি থেকে পিটার হিল্ডেস মুলারকে লেখা বা এরকম নামে লেখা কোন চিঠি থলেটাতে আছে কি?

বুড়ো বালিঙ্গার ভ্রূ কুঁচকে স্মৃতিমন্থন করে চলল।

আগের ডাকে যে চিঠিটা এসেছিল তাতে সে লিখেছিল, সে একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তার খবর জানার জন্য তার বাবা খুবই উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। ফ্রিটজ বার্গম্যান বলল।

বুড়ো বালিঙ্গার একটু ভেবে নিয়ে বলল—হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে। মিসেস হেল্টার স্কেল্টার বা এরকমই কোন একটা নামের চিঠি আছে বটে। টমি রিয়ান বাড়ি আসার সময় চিঠিটা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। মহিলার ছোট্ট মেয়েটা তো সেখানেই কাজে নিযুক্ত, তাই না? তুমি তো এরকমই বললে মনে হচ্ছে।

ফ্রিটজই চেঁচিয়ে তার কথার জবাব দিল—এগারো বছরের এক মেয়ে। হোটেলে থাকে। হাড়কিপ্টে ওই হোটেলের মালিকি পিটার হিল্ডেস মুলার। একদিন মুগুর দিয়ে তার মাথাটা চৌচির করে দেব। লেনা হয়ত এ চিঠিটার মারফৎ জানিয়েছে যে, এখন সে অনেক ভালই আছে। কারণ, কথাটা জানতে পারলে তার বাবা খানিকটা নিশ্চিন্ত হতে পারবে।

কথাগুলো বলে সে বালিঙ্গার-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠল।

চাবুকের ঘা খেয়ে কালো ঘোড়া দুটো গন্তব্যস্থলের দিকে দ্রুত ছুটে চলল।

ঘোড়া দুটো বালিঙ্গার-এর ডাকঘর থেকে রওনা হয়ে জোর কদমে ছুটতে ছুটতে আট মাইল দূরবর্তী একটা বড় জঙ্গলের আঁকাবাঁকা রাস্তায় চলতে আরম্ভ করল।

জঙ্গলের পথে চলার সময়ই হঠাৎ তারা শুনতে পেল পিস্তল থেকে গুলি ছোটার শব্দ।

মুহূর্তের মধ্যেই এমন বুক-কাঁপানো হাসি শুরু হয়ে গেল যেন আদিম হিংস্র উপজাতি একসঙ্গে গলা ছেড়ে হো হো করে হাসছে।

আরও কিছুটা এগোতেই একদল ঘোড়সওয়ার জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে ডাকগাড়িটাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল।

গাড়ির ভেতর থেকে একজন দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ডাকগাড়ির চালকের দিকে পিস্তল ধরে গর্জে উঠল—গাড়ি থামাও।

অন্য দু'জন গাড়িটা থেকে নেমে দু'পাশ থেকে এক হাতে পিস্তল বাগিয়ে ধরে অন্য হাতে ঘোড়ার রশি মুঠো করে ধরল।

ব্যাপার দেখে ফ্রিটজ্ উন্মাদের মত চেঁচিয়ে উঠল—ব্যাপার কি শুনি? এসব হচ্ছেটা কি খবরদার! ঘোড়া ছেড়ে দাও। ভুলে যেয়ো না, এটা যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের ডাকগাড়ি। খবরদার বলছি—

তার মুখের কথা শেষ হবার আগেই একজন খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠল—ওলন্দাজ, বাজে কথা রেখে আমার হুকুম মাফিক কাজ কর। ব্যাপারটা কি, বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে কি? কথা না বাড়িয়ে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে গাড়ি থেকে ঝটপট নেমে এস।

হোন্ডো বিল-এর দোষ-গুণ যা-ই ধরে নেওয়া যাক না কেন, একটা কথা কিন্তু অনায়াসেই বলা যায় ডাক গাড়িটার ওপর হামলাটা করা হয়েছে নিতান্তই রসিকতার ছলে। ডাকগাড়িটাকে লুঠ করার জন্য অবশ্যই নয়। মেইনহের ফ্রিটজ্-এর ডাকগাড়িটার ওপর কারো কোন ক্ষোভ বা লিপ্সা নেই।

সত্যি কথা বলতে কি, নৈশ অভিযানে তাদের যা করণীয় তা সেরেই তারা এখানে এসেছে।

একটা এক্সপ্রেস ট্রেনের ভাড়া ইঞ্জিন দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বিশ মাইল দূরে রেললাইনের ওপর দাঁড়িয়ে। আর তারই অদূরে লুঠ হয়ে যাওয়া একটা ডাকগাড়ি এবং ভীত-সন্ত্রস্ত একদল যাত্রীও দাঁড়িয়ে ইষ্টনাম স্মরণ করছে। হোন্ডো বিল এবং তার সাকরেদরা একটু আগে এ কাজটাই সেরে এসেছে।

কাজ সেরে ডাকাতরা মেক্সিকোর কোন এক নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে বন-পথ দিয়ে এগোচ্ছে। প্রচুর রুপো এবং কারেন্সি নোটের বান্ডিল তারা পকটস্থ করে সম্প্রতি খুশি মনে চলেছে।

বেপরোয়া ডাকাতরা এক্সপ্রেস ট্রেনের লুটের মাল হাতিয়ে নিয়ে এখন হামলা হুজ্জতিতে মেতেছে।

চশমাটা কোন রকমে সামলে নিয়ে ফ্রিটজ্ ভয়ে বা আতঙ্কে নয় আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগার জন্য কাঁপতে কাঁপতে গাড়ি থেকে দুম্ করে লাফিয়ে নিচে নামল।

গাড়ির সামনে পথ আগলে দাঁড়িয়ে ভয়ঙ্কর প্রকৃতির রজার্স। সে ধরে রাখা ঘোড়ার রশিটায় আচমকা সজোরে একটা চাপ দিল।

আচমকা হেঁচকা টান লাগায় ঘোড়াটা আর্তস্বরে চিঁহিয়ে উঠল। ব্যস, ফ্রিটজ্-এর মাথায় রক্ত উঠে যাওয়ার জোগাড় হল।

ফ্রিটজ্ উন্মাদের মত দশাসই চেহারাধারী রজার্স-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার গায়ে অনবরত কিল-চড়-লাথি হাঁকাতে লাগল। মুহূর্তের মধ্যে মোটাসোটা লোকটা একেবারে ধরাশায়ী হয়ে পড়ল।

পথের ধূলোয় পড়ে কাৎরাতে কাৎরাতে ফ্রিটজ্ গোঙানির স্বরে বলতে লাগল—ছোটলোক, কুকুর কোথাকার। সুযোগ পেলে তোর ধড় থেকে মুণ্ডুটাকে নামিয়ে তবে ছাড়ব, শুনে রাখ!

তার কথা শুনে রজার্স হো হো করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে পিছন ফিরে সে বলল—নচ্ছাড়টার গলা তো মন্দ নয়! ওরে, তোরা কে আছিস, আয় তো। হতচ্ছাড়াটাকে আরও ঘা-কতক না দিলে ঠাণ্ডা হবে না।

ডাকাতগুলোর সহকারী বেন মুডি সর্দারের ডাক শুনে হৈ হৈ করতে করতে ছুটে এল। ফ্রিটজ্-এর কোটের পিছন দিকটা শক্তভাবে মুঠো করে ধরল। তারপর শরীরের সবটুকু শক্তি নিঙড়ে, দাঁতে দাঁত চেপে টানতে শুরু করল। আর এদিকে রজার্স-এর বাছাবাছা গালাগালিতে জঙ্গলটা যেন

গম্‌গম্‌ করতে লাগল।

সহকারী বেন মুডি বে-আদপ ফ্রিটজ্‌কে টানতে টানতে কয়েক গজ দূরে নিয়ে গিয়ে হোল্ডো বিলকে ডাকল।

হোল্ডো বিল হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলে সে বলল—দেখ, ডাকের থলেগুলোতে মূল্যবান বহু সম্পদ, বিশেষ করে নোটের তাড়া থাকতে পারে।

নোট থাকতে পারে বটে, কিন্তু অন্য কোন সম্পদ—

আরে ধ্যাৎ! বেন মুডি'কে ধমকের স্বরে বলল—বাজে তর্ক রেখে আমি যা বলছি, কর। ফ্রেডেরিক্সবার্গ-এর প্রতিবেশী অঞ্চলগুলোর মানুষের সঙ্গে আমি দীর্ঘদিন কারবার করেছি।

কারবার? কিসের কারবার?

ঘোড়া কেনা-বেচার কারবারের কথা বলতে চাচ্ছি। তাই বলছি কি, তাদের ব্যাপার-স্যাপার আমার নখদর্পণে।

তবে তো অনেক কিছুই তোমার জানার কথা।

হ্যাঁ, যা বলতে চাচ্ছিলাম, অনেক সময় ওই ডাকের থলেগুলোতে এত বড় বড় নোটের গোছা বোঝাই হয়ে শহরের ডাকঘরে পাঠানো হয়।

তাই বুঝি?

অবশ্যই। আরে, এ ছাড়া আরো ব্যাপার আছে। ব্যাঙ্কের মারফতে এসব চিঠিপত্রের থলের ভেতরে তারা হাজার হাজার ডলারও পাঠায়। তাই বলছি কি, ব্যাপারটাকে হেসে উড়িয়ে দেওয়া ঠিক হবে না।

হোল্ডো বিল তালগাছের মত লম্বা। ছ'ফুট দু'ইঞ্চির বেশী ছাড়া কম নয়। শান্তস্বরে কথাবার্তা বলতেই সে অভ্যস্ত। কিন্তু কাজকর্মের বেলায় আবেগ-উচ্ছ্বাসই বেশী প্রকাশ করে থাকে।

বেন মুডি-র জন্য অপেক্ষা না করে সে নিজেই তড়িঘড়ি চিঠিপত্রের থলেগুলোকে টেনেহিঁচড়ে নামাতে শুরু করল।

কয়েকটা থলে নামানোর পর হাতের ছুরিটা দিয়ে খস্‌খস্‌ আওয়াজ করে পাটের মোটা থলেগুলো কাটতে লাগল।

আবছা অন্ধকারে সবাই তার হাত দুটো বার বার ওঠানামা করতে দেখল। আর বস্তা কাটার খস্‌খস্‌ আওয়াজ স্পষ্ট শুনতে পেল।

ডাকাতরা ব্যস্ততার সঙ্গে থলে থেকে চিঠিপত্র বের করে পথের মাঝে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলতে লাগল।

বেন মুডির পরামর্শ মত কাজ করে তারা মূল্যবান সম্পদ, বা গোছাগোছা ডলার তো দূরের কথা ছোট কোন নোট পর্যন্ত না পেয়ে যারপরনাই হতাশ হয়ে চিঠির লেখকদের চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে গায়ের জ্বালা মেটাতে লাগল।

না, তন্নতন্ন করে খুঁজেও ফ্রেডেরিক্সবার্গ-এর ডাকের থলেগুলোর মধ্যে একটা ডলারও পাওয়া যাচ্ছে না।

ব্যাপারটা হোল্ডো বিল-এর মধ্যে ক্রোধের সঞ্চার করল, ক্রোধে সম্বরণ করতে না পেরে সে গম্ভীরস্বরে ডাকবাবুকে বলল—তুমি কি লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে বসেছ নাকি হে! এতগুলো ডাকের থলি বোঝাই করে নিয়ে চলেছ কেবলই চিঠি আর কাগজপত্র! এ সবের মানে কি, আমি জানতে চাই?

ডাকবাবুর চোখে-মুখে এখনও ভীতির ছাপ সুস্পষ্ট। সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নিতান্ত অপরাধীর মত ফ্যাল ফ্যাল করে হোল্ডো বিল-এর দিকে তাকিয়ে থাকল।

ক্রোধোন্মত্ত হোল্ডো বিল পূর্বস্বর অনুসরণ করে বলে চলল—তোমরা ওলন্দাজ, তোমরা মালকড়ি কোথায় লুকিয়ে রাখ, বল তো?

হোল্ডো বিল তবু থামল না। হাতের ছুরি দিয়ে একটার পর একটা ডাকের থলে কেটেই চলেছে। তার কারবার দেখে ফ্রিটজ্‌ তো শিকারী বিড়ালের মত রাগে ভেতরে ভেতরে ফুলতে লাগল।

হোল্ডো বিল চিঠি আর কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে লেনার লেখা চিঠিটা যে থলেটাতে

আছে সেটাকে কাছে টেনে নিল।

হোল্ডো বিলকে থলেটা কাছে টেনে নিয়ে তার গায়ে ছুরি বসাতে দেখে ফ্রিটজ্ রীতিমত হায়-হায় করে উঠল। আর ডাকাতের সর্দারকে নানাভাবে অনুরোধ করতে লাগল যাতে এ থলেটা কাটা না হয়।

হোল্ডো ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বলে উঠল—ওলন্দাজের বাচ্চা, তোমার কথায় খুবই প্রীত হলাম। কিন্তু আমারও যে ওই চিঠিটার প্রতি লোভ রয়েছে হে।

তার কথায় ফ্রিটজ্-এর মুখটা শুকিয়ে একেবারে আমসি হয়ে গেল।

হোল্ডো বিল এবার বলল—সত্যি বলছি, ওই চিঠিটাই আমার দরকার। ভাল কথা, ডলারের গোছাটা তো এ থলেটাতেই আছে, কি বল?

সে থলেটার পেট কেটে চিঠিটা হাতে নিয়ে বলল—এ-ই তো আমার বাঞ্ছিত চিঠিটা পেয়ে গেছি।

এবার ফ্রিটজ্--এর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল—কি হে ওলন্দাজের বাচ্চা, একটা আলো জোগাড় করতে পার। চিঠিটা একবারটি পড়ে দেখা দরকার।

খামের মুখটা খুলে সে লেনা-র লেখা চিঠিটা বের করল। আলোর কাছাকাছি নিয়ে গিয়ে চোখ বুলাতে লাগল। তার মুখে বিতৃষ্ণার ছাপ ফুটে উঠল। সে স্বগতোক্তি করল—ধ্যুৎ! কী সব হিজিবিজি এঁকে রেখেছে! একটা বর্ণও যদি উদ্ধার করা যায়।

আসলে জার্মান ভাষা পড়ার মত বিদ্যা তার নেই। তাই সে ভাষায় লেখা লেনা-র চিঠিটার একটা বর্ণও পড়তে না পারায় তার মধ্যে ক্রোধ-মিশ্রিত হতাশা সৃষ্টি হয়েছে।

এবার ফ্রিটজ্-এর দিকে তাকিয়ে সে বলল—ওহে ওলন্দাজের বাচ্চা, এ চিঠিটার জন্যই তুমি এত উতলা হয়ে উঠেছিলে? তোমার কাছে এ চিঠিটা এতই মূল্যবান!

ফ্রিটজ্ নীরবে মুচকি হাসল।

হোল্ডো বিল তেমনি বিরক্তির সঙ্গে বলে উঠল—আচ্ছা, ডাক বিলির ব্যাপারে আমরা কি তোমার সঙ্গে সহযোগিতা করি না? তবে তুমি চিঠির বস্তাগুলো আর লেনা-র চিঠিটার জন্য এমন করে হা-পিত্যেশ করলে কেন? আমি কিন্তু তোমার কাজটাকে বাজে রসিকতাই বলব।

ডাকবাবু হোল্ডো বিল-এর কাঁধে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। তারপর ক্ষীণকণ্ঠে বলল—চিঠিটা চীনা ভাষায় লেখা। এ ভাষা তোমার তো জানার কথাও নয়।

ডাকাত-দলের এক যুবক চিঠিটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল—আরে এ যে শর্টহ্যান্ড। আমি বছর কয়েক আগে এরকম লেখা দেখেছিলাম বটে।

ফ্রিটজ্ বলল—ধ্যুৎ! কী সব বাজে কথা বলছ। মোটেই শর্টহ্যান্ড নয়। পরিষ্কার জার্মান হরফ, জার্মান ভাষায় চিঠিটা লেখা হয়েছে। একটা ছোট মেয়ে চিঠিটা তার বাড়িতে পাঠিয়েছে। অদৃষ্ট বিড়ম্বিতা মেয়েটা বাড়ি থেকে বহুদূরে এক হোটেলে পড়ে রয়েছে। সেখানে সে কাজ করে। তোমরা ডাকাতি কর বটে। তাই বলে বিবেক হারিয়ে তো আর বস নি।

ডাকাত-দলের প্রায় সবাই তার দিকে তাকাল।

সে এবার অধিকতর নরম-গলায় বলল—দয়া করে ওই চিঠিটা আমাকে দিলে বড়ই ভাল হয়। সবচেয়ে বড় কথা, একটা দুখিনী কিশোরীর চিঠি তো তোমাদের কোন স্বার্থসিদ্ধি করবে না, ঠিক কিনা?

তুমি কি আমাদের বিবেকের কথা বলে রসিকতা করছ নাকি হে?

হোল্ডো বিল বলে উঠল—মেয়েটা অসুস্থ হয়ে দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছে। তার ব্যাপারে চিন্তিত হবার মত বিবেক চৈতন্যটুকুও আমাদের নেই?

তুমি কিন্তু আমাকে সত্যি সত্যিই ভুল বুঝেছ ডাকাত ভায়া। আমি কোনরকম বিদ্রূপ বা রসিকতা মোটেই করি নি।

এই নাও তোমার চিঠি। এবার জোরে জোরে চিঠিটার বক্তব্য পড়ে পরিষ্কার যুক্তরাষ্ট্রের ভাষায় অনুবাদ করে আমাদের শোনাও তো।

হোল্ডো বিল হাতের দু'-ঘড়া পিস্তলটাকে বেটে ফ্রিটজ্-এর মাথা থেকে বেশ কিছুটা উঁচুতে

তুলে ঘোরাতে ঘোরাতে ধমকের স্বরে বলল—কি হল, মুখ বুজে রয়েছ যে বড়! চিঠিটা পড়ে আমাদের অনুবাদ করে শোনাতে বললাম যে। ভাল চাও তো, যা বলছি কর।

ফ্রিটজ্ চিঠিটা পড়ে ইংরেজিতে অনুবাদ করে শোনাতে আরম্ভ করল। আর ডাকাতরা সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মত চিঠিটার বক্তব্য শুনতে লাগল।

ফ্রিটজ্ পড়া শেষ করে চিঠিটা ভাঁজ করতে করতে হোল্ডো বিল-এর মুখের দিকে তাকাল।

সে কপালের চামড়ায় চিন্তার ভাঁজ এঁকে ফ্রিটজ্‌কে বলল—মেয়েটার বয়স কত, বলতে পার?

বছর এগারো মাত্র।

কোথায় থাকে বল তো?

ওখানকার পাহাড়ে খনির গায়ের একটা হোটেলে।

এতটুকু একটা মেয়ে লিখেছে সে জলে ডুবে মরবে। কতখানি জ্বালা যন্ত্রণায় পড়লে এতটুকু একটা মেয়ের মধ্যে মরার ভাবনা জাগতে পারে। চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে এবার বলল—সে সত্যি সত্যি এমন একটা ভয়ঙ্কর কাজ করবে কিনা।

ফ্রিটজ্ বলল—ভাবনা তো এ ব্যাপারটা নিয়েই।

আমার সাফ কথা শোন, ওলন্দাজের বাচ্চা, মেয়েটা যদি সত্যি সত্যি এমন ভয়ঙ্কর কাজটা করে বসে তবে আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, ওই পিটার হিল্ডেস মুলারকে আমি নিজে হাতে গুলি করে মারব।

ফ্রিটজ্ কি বলবে ভেবে না পেয়ে নীরবে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

হোল্ডো বিল বলে চলল—বিশ্বাস কর, তোমাদের মত জঘন্য প্রবৃত্তি সম্পন্ন ওলন্দাজদের দেখে দেখে আমার মধ্যে বিতৃষ্ণা, বিতৃষ্ণা না বলে ঘেন্না শব্দটাই ব্যবহার করলেই আমার মনোভাব যথাযথ ব্যক্ত করা হবে।

আমি বহু দেখেছি তোমাদের বাচ্চাদের যখন পড়াশুনা আর পুতুল খেলা নিয়ে মেতে থাকার বয়স তখন তোমরা তাদের পাঠিয়ে দাও কাজ করাতে। নরকের কীটের চেয়েও অধম আমরা। তোমাদের সমুচিত শিক্ষা না দিলে নিজেকে নিতান্তই অপরাধী মনে হবে। চলে এসো ভাই সব!

হোল্ডো বিল তার সাকরেদদের হাত কয়েক দূরে নিয়ে গিয়ে ফিসফিসিয়ে কি যেন পরামর্শ করল।

কয়েক মুহূর্ত পরেই সর্দারের হুকুমে ডাকাতরা ফ্রিটজ্‌কে নিয়ে পথের ধারে, একটু নিরালা জায়গায় নিয়ে গেল। সে কিছু ভাবতে না ভাবতেই ডাকাতরা তাকে একটা গাছের সঙ্গে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল।

আর অন্য একটা গাছের সঙ্গে বাঁধল তার সঙ্গী সাথীদের।

হোল্ডো তাদের আশ্বাস দিতে গিয়ে বলল—তোমাদের ভয়ের তেমন কিছু নেই। কথা দিচ্ছি, বেশী মারধোর করব না। আর এ অবস্থায় কিছুক্ষণ বাঁধা থাকলে খুব বেশী কষ্ট হবে বলেও মনে করি না।

আর মুহূর্তমাত্র দেরী না করে ডাকাতরা সর্দারের হুকুমে ঝটপট নিজের নিজের ঘোড়ার পিঠে চেপে বসল। লাগাম টেনে জোর কদমে ফ্রেডেরিক্সবার্গ-এর দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। এদিকে বাঁধা-অবস্থায়, যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে নয়, ফ্রিটজ্ প্রায় দু' ঘণ্টা কাল গাছটার গায়ে হেলান দিয়ে বসে রইল।

সে ওই গাছটার গায়ে হেলান দিয়ে কখন যে ঘুমিয়ে পড়ল তা সে নিজেই বুঝতে পারে নি। কতক্ষণ সে যে ঘুমিয়ে কাটিয়েছে তা তার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

এক সময় শক্ত একটা হাতের ঝাঁকুনিতে সে হকচকিয়ে সোজা হয়ে বসে পড়ল।

শক্ত হাত দুটো তার বাঁধন খুলে দিতে লাগল। সদ্য ঘুম-ভাঙা চোখে যারপরনাই বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে সে ব্যাপারটা সম্বন্ধে ধারণা নিতে নিতে দাঁড়াল।

বার-কয়েক চোখ কচলে ফ্রিটজ্ বুঝতে পারল, আগেকার ডাকাত-দলটার সামনে সে দাঁড়িয়ে।

হোল্ডো বিল বাজখাই গলায় চেঁচিয়ে উঠল—ওলন্দাজের বাচ্চা, আমাদের অনেক ভুগিয়েছ। যদি জানে বাঁচতে চাও তবে যত শিগগির পার এখান থেকে কেটে পড়।

কথাটা বলেই হোন্ডো বিল এক লাফে ঘোড়ার পিঠে চেপে লাগাম ধরে হেঁচকা টান দিল। তেজী ঘোড়াটা সঙ্গে সঙ্গে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে আরম্ভ করল।

ক্লান্ত অবসন্ন ফ্রিটজ্ ডাকাতদের কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে নিজের পথে যাত্রা করল।

তার গাড়িটা নির্দিষ্ট সময়ে ফ্রেডেরিক্সবার্গ-এ পৌঁছলে দিনের আলো থাকার কথা ছিল। কিন্তু দুর্ঘটনার দৌলতে শহরে পৌঁছতে রাত্রি এগারোটা বেজে গেল।

ফ্রিটজ্‌কে ডাকঘরে যাওয়ার সময় তাকে পিটার হিল্ডেস মুলার-এর বাড়ির গা দিয়েই যেতে হবে।

তার বাড়ির সদর-দরজায় গাড়িটা দাঁড় করিয়ে সে গলা ছেড়ে হিল্ডেস মুলাকে ডাক দিল।

বেশী ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করতে হল না। হিল্ডেস মুলার তার জন্যই এতক্ষণ দরজায় অপেক্ষা করছিল। ফ্রিটজ্-এর গলা শুনেই সে ব্যস্ত-পায়ে বাইরে বেরিয়ে এল। না, সে একা নয়, গোটা পরিবারটাই সদর-দরজায় এসে দাঁড়াল।

হিল্ডেস মুলার হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—লেনা-র কোন চিঠি আছে কি?

ফ্রিটজ্ গাড়ি থেকে নেমে পুরো ঘটনাটা তার কাছে ব্যক্ত করল।

ডাকাত-দলের কাণ্ডকারখানার কথা বলা হয়ে গেলে সে এবার লেনা-র চিঠিটার বক্তব্যও তাকে জানাতে বাদ দিল না।

সব কিছু শুনে হিল্ডেস মুলার শিশুর মত হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

কান্না-ভেজা চোখ দুটো ডলতে ডলতে সে ভাবছে, তার আদরের ছোট্ট লেনা জলে ডুবে মরতে চাইছে! তারা কেনই বা বাড়ি থেকে তাকে এতদূরে পাঠিয়েছিল। কিন্তু এ পরিস্থিতিতে তার কর্তব্য কি? বাড়ি থেকে লোক পাঠিয়ে সে যে তাকে আনাবে সে সময়ও হাতে নেই।

সে ঘাড় ঘুরিয়ে রীতিমত গর্জন করে তার বৌকে বলল—তুমি যে কেন মেয়েটাকে এত দূরে কাজ করতে পাঠাতে গেলে তা এখনও আমার মাথায় আসছে না।

তারপর দু'পা পিছিয়ে বৌয়ের দিকে সরাসরি তাকিয়ে সে আবার মুখ খুলল—শুনে রাখ, মেয়েটা যদি সত্যি সত্যি কোন অঘটন ঘটিয়ে বসে, যদি আর কোনদিনই বাড়িতে ফিরে না আসে তবে সব দোষ তোমার ওপরেই বর্তাবে।

সবারই বিশ্বাস, লেনা-র বাবারই সব দোষ। তাই তার কথা কেউ পাত্তা দিল না।

মিনিট খানেক বাদেই একটা অপরিচিত ক্ষীণ কণ্ঠ সবার কানে এল—মা! মা!

হিল্ডেস মুলার প্রথমে ধরেই নিল, এটা লেনা-র প্রেতাত্মার কণ্ঠস্বর। ভয়ে তার বুক কেঁপে উঠল। অনন্যোপায় হয়ে সে এক দৌড়ে ফ্রিটজ্-এর পর্দা-ঢাকা মালগাড়িটার পিছনে চলে গিয়ে ঘাপ্‌টি মেরে রইল।

মুহূর্তের মধ্যেই লেনা সেখানে হাজির হল। তাকে দেখেই সে এক দৌড়ে এগিয়ে এসে অবর্ণনীয় আনন্দে চিৎকার করে উঠল। সোল্লাসে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বারবার চুমু খেতে খেতে বলল—লেনা! মা আমার! লেনা!

লেনা শারীরিক দুর্বলতা ও পথশ্রমে এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে যে, ঘুমে তার চোখ দুটো যেন বুজে আসতে চাইছে।

লেনার চোখ দুটো ঘুমে বুজে আসতে চাইলেও সে তার মা মিসেস হিল্ডেস মুলার-এর দিকে, যাকে একবারটি চোখে দেখার জন্য এমন উতলা হয়ে পড়েছিল তার দিকে ধীর-পায়ে এগিয়ে গেল।

লেনা এতক্ষণ ডাকগাড়িটার থলেগুলোর মধ্যে পাঁজা-করা কম্বল আর কম্ফর্টারের মধ্যে ঢুকে আরামে গভীর নিদ্রায় ঢুকেছিল। একটু আগেই বাইরের কথাবার্তা চেঁচামেচিতে তার ঘুম ভেঙে গেছে।

লেনা'কে দেখেই ফ্রিটজ্-এর বিস্ময় বিস্ফারিত চোখ দুটো যেন চশমার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

ব্যাপারটা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পেরে সে কাঁপা কাঁপা গলায় বলে উঠল—এ কী অবাক কাণ্ড রে বাবা! এবার লেনার দিকে তাকিয়ে বলল—আরে, আমার গাড়িটার ভেতরে ঢুকলে কি

করে ভেবেই পাচ্ছি না।

লেনা কি যেন বলার চেষ্টা করল। তাকে কিছু বলতে না দিয়েই ফ্রিটজ্ ততোধিক বিস্ময়ের আবার বলতে শুরু করল—সত্যি আমি ভেবেই পাচ্ছি না, তুমি আমার গাড়িটায় কখন, কিভাবে ঢুকলে? আমি কি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে এমনই নিজেকে হারিয়ে বসেছিলাম যে, আজ্ই ডাকাতদের গুলিতে প্রাণ দেব, নতুবা ফাঁসির দড়িতে প্রাণ দেব!

হিন্ডেস মুলার চোখের জল ফেলতে ফেলতে কান্না-ভেজা গলায় বলল—ফ্রিটজ্, তুমি—হ্যাঁ, তুমিই আমার আদরের মেয়ে লেনাকে আমার বুকে ফিরিয়ে দিয়েছ। তোমাকে ধন্যবাদ দেবার ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না। তুমিই আমার লেনা-র প্রাণ রক্ষা করেছ।

হিন্ডেস মুলার এবার লেনা-র দিকে ফিরে বলল—আমাকে বল মা, তুমি কি করে তুমি ফ্রিটজ-এর মালগাড়ির ভেতরে ঢুকেছিলে?

লেনা চোখ দুটো কচলাতে কচলাতে বলল—কেমন করে যে গাড়ির ভেতরে ঢুকেছিলাম তা আমি নিজেই জানি না বাবা। তবে হোটেল থেকে কিভাবে বেরিয়েছিলাম তা কিছু কিছু মনে আছে বটে।

কিভাবে, কি করে তা-ই বল মা?

এক রাজকুমার আমাকে হোটেল থেকে পাজা-কোলা করে বের করে এনেছিল।

রাজকুমার! রাজপুত্র! ফ্রিটজ্ উন্মাদের মত চেঁচিয়ে উঠল।

হ্যাঁ, সে রাজকুমারই বটে। অচিন দেশের রাজকুমারেরই মত এক যুবক।

আমরা কি তবে সবাই পাগলা হয়ে গেলাম।

গাড়ি থেকে নামানো, পথের ধারে রাখা নিজের ভাঁজ-করা বিছানার চাদরটার ওপর বসে-পড়ে লেনা বলতে আরম্ভ করল—সে যে আসবে আমার গোড়া থেকেই জানা ছিল। হ্যাঁ, সত্যি আমি জানতাম।

উপস্থিত সবাই বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে গভীর উৎকণ্ঠার সঙ্গে তার কথা শুনতে লাগল।

লেনা একটু দম নিয়ে আবার মুখ খুলল—হ্যাঁ, সে যে আসবে আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম। তারপর সে সত্যি সত্যি এল। কাল রাত্রেই সে সশস্ত্র নাইটদের সঙ্গে করে এসে হাজির হল। রাক্ষসদের দুর্গটাকে পুরোপুরি অধিকার করে নিল। থালা-বাসন যা কিছু ছিল আছড়ে আছড়ে সব ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিল। সব ঘরের দরজা লাথি মেরে মেরে ভেঙে ফেলল।

তারা একটা জলের পাইপের মধ্যে মালোনিকে ঢুকিয়ে দিল। তার সারা গায়ে ময়দা ছড়িয়ে দিল।

তারপর আবার লেনা মুহূর্তের জন্য থামল। একটু দম নিয়ে আবার বলতে আরম্ভ করল—তারপর তারা পিস্তল থেকে ঘন ঘন গুলি ছুঁড়তে লাগল। হোটেলের কর্মীরা আতঙ্কে জানালা দিয়ে লাফিয়ে জঙ্গলের দিকে পড়ি কি মরি করে ছুটতে লাগল।

তারপর তারা আমাকে শোয়া থেকে টেনে তুলল। আমি আতঙ্কিত চোখে সিঁড়ির নিচের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম।

ঠিক তখনই রাজকুমার পিছন ফিরে ছুটে এসে আমাকে চাদর দিয়ে জড়িয়ে ফেলল। কোলে তুলে হোটেল থেকে বের করে বাইরে নিয়ে এল।

আমি চাদরের ফাঁক দিয়ে দেখলাম রাজকুমার দীর্ঘাকৃতি, সুঠামদেহী আর অমিত শক্তিধরও বটে।

তারপর তার মুখের দিকে তাকালাম। মুখটি ঝাঁটার মতই কর্কশ। কথা বলে খুব আস্তে আর মিষ্টি গলায়।

মুহূর্তের জন্য থেমে লেনা আবার বলতে শুরু করল—আমাকে চাদর-মোড়ানো অবস্থায় বাইরে নিয়ে এসেই রাজকুমার আমাকে তার নিজের ঘোড়ায় তুলে নিল। তারপর নাইটদের যাত্রা করার নির্দেশ দিয়ে নিজে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। সে আমাকে তার আরও কাছে, একেবারে তার বুকের সঙ্গে মিশিয়ে ধরে জোর কদমে ঘোড়া ছোটাতে লাগল। সে অবস্থাতেই আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

যখন আমার ঘুম ভাঙল তখন আমরা আমাদের বাড়ির দরজায় পৌঁছে গেছি।

ফ্রিটজ বার্গম্যান বাজখাই গলায় চেঁচিয়ে উঠল—বাজে কথা! সম্পূর্ণ বাজে কথা। তুমি বানিয়ে বানিয়ে রূপকথার গল্প বলছ। সবই না হয় মেনে নিচ্ছি। কিন্তু তুমি খনি থেকে আমার ডাকগাড়িতে উঠলে কি করে?

বিশ্বাস করুন, রাজকুমারই তো আমাকে নিয়ে এসেছে। চাদরটা আমার গায়ে জড়ানোই ছিল।

ফ্রেডেরিক্সবার্গের ভাল-মানুযরা আজ অবধি লেনা-র মুখ থেকে এর চেয়ে ভাল কোন ঘটনার বর্ণনা শুনতে পায় নি।

ক্রিস্টমাস বাই ইন্‌জাংশন

চেরোকি।

ইয়েলোহামার পুরোপিতা চেরোকি।

চেরোকি-র আরও একটা বিশেষ পরিচয় আছে। তিনি খনি-আবিষ্কারক হিসাবেও সবার কাছে পরিচিত।

আছোলা আর ক্যাম্বিশ গাছে ছাওয়া এক চমৎকার পরিবেশে এ খনি-শহরটা অবস্থিত।

চেরোকি একদিন খনিতে মন দিয়ে কাজ করে চলেছে। তার বাহন গাধাটা যখন কাঁটা-ঝোপের মধ্যে ঢুকে ঘাস-লতা-পাতা খেতে ব্যস্ত ঠিক তখনই তিনি একটা গাঁইতির মুখে একটা ত্রিশ আউন্স ওজনের ধাতুর টুকরো গেঁথে নিয়ে নাচতে নাচতে সেখানে হাজির হলেন।

চেরোকি লোকটার একটা বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উদারতা এবং অতিথি পরায়ণতা। তাই তার আকস্মিক সৌভাগ্যের অংশীদার হবার জন্য তিনি পরিচিত বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় পরিজনদের নিমন্ত্রণ করে এক ভোজ-সভার আয়োজন করলেন।

আমন্ত্রিত অতিথি অভ্যাগতদের মধ্যে কেউ দুঃখ প্রকাশ করে ভোজ-সভায় অনুপস্থিত থাকলেন না। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দলে দলে কাতারে কাতারে নিমন্ত্রিতরা এসে ভোজ-সভাটাকে রীতিমত জমজমাট করে তুলল।

কিছুদিনের মধ্যেই হাজার খানেক নাগরিক এসে ইয়েলোহামা শহরে স্থায়ী বসতি গড়ে তুলল। তারাই এ জায়গাটার নামকরণ করল ইয়েলোহামা। আর একটা কমিটি গঠন করল। সে কমিটির সদস্যরা চেরোকি'কে দামী একটা ঘড়ি উপহার দিয়ে সম্মানিত করল।

উৎসব-অনুষ্ঠানাদির পাট মিটে গেলেই চেরোস্কি তার খেল্ দেখানো শুরু করল। সত্যি কথা বলতে কি ভাগ্য দেবতা যেন তার কপালে সাফল্য ও খ্যাতির কথা বড় বড় হরফে লিখে দিলেন।

ব্যস, এবার থেকে বিধাতার বরপুত্র চেরোকিকে আর মুহূর্তের জন্যও পিছন দিকে তাকাতে হল না। আর তার এক হাজার নিমন্ত্রিত অতিথি আর ইয়েলোহামার বাসিন্দাদের বরাত যেন ফিরে গেল।

স্বর্ণ-সন্ধানী একটা দল তার নামকরণ করল 'ইয়েলোহামার পিতা'।

সে বছরের মে মাসের কথা। সে মাসের গোড়ার দিকে চেরোকি তার নিজের অত্যাবশ্যক দ্রব্য-সামগ্রী গাধার পিঠে চাপিয়ে উত্তরাঞ্চলের দিকে যাত্রা করলেন।

তাকে ইয়েলোহামার সীমান্ত পর্যন্ত এগিয়ে দেবার জন্য শহরের বহু নাগরিক তাঁর সঙ্গে গেল। তারা সাড়ম্বরে উল্লসিত হয়ে তাঁকে বিদায় সম্ভাষণ জানাল। বহুমূল্য সব উপহার দিতেও তারা ভুলল না। আর তারা তাঁকে জানিয়ে দিল, দাড়ি কামানোর গরম জল থেকে শুরু করে আহারাদি পর্যন্ত যাবতীয় অত্যাবশ্যক সামগ্রী ইয়েলোহামার নাগরিকরা তাকে জোগান দেবে।

বিশে ডিসেম্বর।

সেদিন সকালে ডাক-গাড়ীর চালক বলডি ইয়েলোহামা শহরে একটা খবর বহন করে নিয়ে

এল।

বলডি উকিল সংস্থার সদস্যদের ডেকে বলল—আরে আপনারা কি কোন খবরই রাখেন না। আমি আলবুকার্কে শুনে এলাম, দেখে এসেছিও মনে করতে পারেন, চেরোকি তুরস্কের জার বনে সিংহাসন দখল করে বসেছেন।

আমার বিশ্বাস চেরোকি নির্ঘাৎ সোনার খনির হদিস পেয়েছে। কিন্তু লোকটা সহজ-সরল সাদাসিধে মানুষ। তার এ সাফল্যের জন্য তার কাছে আমরা বাধিত না থেকে উপায় নেই। আবেগে উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে ক্যালিফোর্নিয়ার এড কথাটা ছুঁড়ে দিল।

অন্য আর একজনের কণ্ঠে উষ্মা প্রকাশ পেল। সে বলে উঠল—আমার তো মনে হয়, ইয়েলোহামায় এসে পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে যাওয়া অবশ্যই উচিত ছিল। দুনিয়ার নিয়মই এটা। ভুলে যাওয়া কৃতজ্ঞতার সবচেয়ে ভাল

দাওয়াই হচ্ছে, সমৃদ্ধি অবস্থার অভাবনীয় উন্নতি। তাই আমি বলছি কি—

তাকে থামিয়ে দিয়ে বলডি বলল—আরে এত উতলা হবেন না। ধৈর্য ধরুন। আমি তো সে কথাও বলব। চেরোকি আমাকে আদর করে ছোট্ট একটা কামরায় নিয়ে গেল। সেটা বাচ্চাদের হরেক রকম খেলনায় বোঝাই।

খেলনা, মানে পুতুল!

হ্যাঁ, খেলনা। সে সব কেন সেখানে ঢাই করে রেখেছেন, জানেন?

কেন? খেলনা দিয়ে কি করবেন?

আরে, সে কথা আপনারা স্বপ্নেও ভাবতে পারবেন না। তবে কথাটা চেরোকি-র মুখ থেকেই আমার শোনা। তিনি বলেছেন খেলনা-পুতুলগুলো নিয়ে ইয়েলোহামা শহরেই আসবেন। ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের উপহার দেবেন। ক্রিস্টমাস-ডে উৎসবে তিনি সেগুলো এ শহরেরই ছেলে-মেয়েদের হাতে তুলে দেবেন। তিনি যা জোগাড় করেছেন সে রকম কাঁদুনে পুতুল, ক্রিস্টমাস ট্রি আর দত্যি-খোকার এমন যন্ত্রপাতির বাক্স প্রভৃতি আজ অবধি হাটেরাস অন্তরীপের পশ্চিমের মানুষ চোখে দেখা তো দূরের কথা নামও শোনে নি।

বলডির মুখ থেকে এমন একটা অত্যাশ্চর্য কথা শোনার পর কয়েক মুহূর্ত কারো মুখে আর রা সরল না। তারপরই সম্বিত ফিরে পেয়ে সবাই রীতিমত হৈ চৈ শুরু করে দিল। মদের বোতল নিয়ে মাতামাতি শুরু করে দিল।

খনির মালিক ত্রিনিডাড বললেন—তুমি তাকে বলনি?

বলডি আমতা আমতা করে বলল—না, বলা হয় নি। আসলে আমি সময়-সুযোগই পাই নি। আসল ব্যাপারটা কি জানেন? আমি যাওয়ার অনেক আগেই চেরোকি ক্রিস্টমাসের খেলনাগুলো কিনে ফেলেছিল। দামও শোধ করা হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া ব্যাপারটা নিয়ে সে এমন মেতে গিয়েছিল যা আপনাকে বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়।

জজ সাহেব এবার মুখ খুললেন—আমি কথাটা না বলে পারছি না যে, আমাদের বন্ধু চেরোকি তার নিজের শহরটা সম্বন্ধে এমন একটা ভুল ধারণা অন্তরে পোষণ করতে পারেন।

আরে এ-তো আর একেবারে অবাক হয়ে পড়ার মত কোন ব্যাপার নয়। বলডি বলল, ইয়ে-লোহামা শহরে গত সাত মাস চেরোকি অনুপস্থিত। ইতিমধ্যে দু'-চারজন নতুন অতিথি এসে যে হাজির হবেন এটা তো আর তার জানা থাকার কথা নয়। আবার আমিও ভাবতে পারছি না যে, শহরের বুকে শিশুদের মিছিল বের করা সম্ভব।

তাই যদি হয় তবে দু'-একটা বাচ্চা তো মিছিলের স্রোতে ভেসে আসতেও পারে। ক্যালিফোর্নিয়ার এড বলল।

চেরোকি ক্রিস্টমাস ট্রি-র চমক সৃষ্টি ছাড়াও সান্টা ক্লজ-এর একটি প্রতিমূর্তিও জোগাড় করেছেন। আর সেটাও উপহার দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শুনেছি, তার জন্য সাদা পরচুলা আর গোঁফও ঠিকই জোগাড় করে নিতে পারবেন।

ত্রিনিডাড আগ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—চেরোকি সদলবলে কবে এখানে হাজির হচ্ছেন, বলতে পারেন?

ক্রিস্টমাসের ভোরে। একটা কামরা আর একটা ঘর যেন আপনারা জোগাড় রাখেন, তাঁর ইচ্ছা-অনুরোধও মনে করতে পারেন।

ইয়েলোহামার দুর্ভাগ্যের কথা তো আপনাদের কাছে আগেই বলা হয়েছে। সেখানকার বাড়িঘরগুলো আজ অবধি শিশুর কান্নায় মুখরিত হয়ে ওঠে নি, ছোট-ছোট পায়ের স্পর্শ পায় নি। ভবিষ্যতে তারা হয়ত আসবে। কিন্তু বর্তমানে ইয়েলোহামা শহর একটা তাঁবু ছাড়া কিছুই নয়। কোন অত্যুৎসাহী ছোট ছোট হাত সান্টার মন-ভোলানো উপহারের দিকে এগিয়ে আসবে না। নতুন দিনের ভোরে শিশু-সূর্যের দিকেও বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে তাকাবে না।

হিসাব মাফিক সারা ইয়েলোহামা শহরে নারীর সংখ্যা মাত্র পাঁচজন। লাকি স্ট্রাইক হোটেলের মালকিন, ধাতু পরিমাপকের স্ত্রী আর ধোপার বৌ—এরাই স্থায়ী নারী। আর অবশিষ্ট দু'জন স্প্যাঙ্গলার ভগিনী। একজন মিসেস এরমা আর দ্বিতীয়জন মিসেস ফ্রাঁসো।

ক্রিস্টমাস উৎসবের দিন পড়েছে বৃহস্পতিবার।

ত্রিনিডাড মঙ্গলবার সকালে কাজে না গিয়ে লাকি স্ট্রাইক হোটেলে গিয়ে জজ সাহেবের সঙ্গে দেখা করলেন।

তিনি জজ সাহেবকে বললেন—চেরোকি যদি ক্রিস্টমাস ট্রি নিয়ে ইয়েলোহামা শহরে হাজির হয় তবে ব্যাপারটা খুবই লজ্জার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। শহরটা তাঁরই হাতে তৈরী এরকম কথাই হয়ত আপনি বলবেন। তবে সান্টাক্লজ-এর ব্যাপারটা সামাল দেবার দায়িত্ব আমি নিচ্ছি।

আমি অতীতে বহুভাবে তাঁর দ্বারা উপকৃত হয়েছি। তাই তিনি আমার সাহায্য-সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হবেন না। সত্যি বলছি, আমি এতদিন শিশুদের অনুপস্থিতির ব্যাপারটাকে বিলাসিতা বলেই মনে করেছি। কিন্তু এক্ষেত্রে আমার মাথায় কিছু আসছে না।

আমি এখনি গিয়ে চেরোকি-র সান্টাক্লজ-এর জন্য একদল বাচ্চা জোগাড় করে নিয়ে আসছি। প্রয়োজনে কোন অনাথ-আশ্রম লুঠ করতেও দ্বিধা করব না।

চমৎকার! সাবাস! সাবাস! জজ সাহেব সোল্লাসে বলে উঠলেন। আমিও আপনার সঙ্গে যাব।

সারা ইয়েলোহামা শহরের মানুষের এক ঘণ্টার মধ্যেই ত্রিনিডাড আর জজ সাহেবের মতলবটার কথা বাতাসের কাঁধে ভর দিয়ে ছড়িয়ে পড়ল।

এদিকে ইয়েলোহামা শহরের এক কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে শহরের অধিবাসীদের আত্মীয়স্বজনদের যত শিশু সন্তান আছে সবাই ত্রিনিডাড আর জজ সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করল। তারপর ত্রিনিডাড যানবাহন জোগাড় করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

গোড়ার দিকে ইয়েলোহামা শহর থেকে পনের মাইল দূরবর্তী একটা জোড়া কাঠের বাড়িকে ঘাঁটি হিসাবে বেছে নেওয়া হল। স্থির হল, ঘরে দরজায় একদল শিশু দাঁড়িয়ে নবাগতদের অভ্যর্থনা জানাবে।

কাজটা এরকম পরিকল্পনা মাফিকই সম্পন্ন করা হল। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে গিয়ে ত্রিনিডাড বলল—আমরা ইয়েলোহামা থেকে এসেছি। রীতিমত আদর-যত্নেই এদের নিয়ে এসেছি। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে, আমাদের শহরের নেতৃস্থানীয় এক ব্যক্তির মাথায় সান্টাক্লজ-এর ঝোঁক চেপেছে। হরেক রকম খেলনা, পুতুল এবং অন্যান্য বহু দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে সে আগামীকাল শহরে হাজির হচ্ছে।

মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে এবার তিনি বললেন—ইয়েলোহামা শহরের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে সবচেয়ে কম-বয়সী যে খোকাটাকে আমরা আবিষ্কার করেছি তার বর্তমান বয়স পঁয়তাল্লিশ। আর দাড়ি কামানোর ক্ষুর পেয়েছি তার সঙ্গী হিসাবে।

তবে সমস্যা একটা রয়েই গেছে। যখন ক্রিস্টমাস ট্রি-র কাছে মোমবাতি জ্বালানো হবে তখন সেখানে আহা উহু করার মত লোক খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয় নি। তাই বলছি কি, আপনি যদি আমাকে ক'টা বাচ্চা ধার দেন তবে ক্রিস্টমাস উৎসবের পাট মিটে গেলে তাদের আবার নিরাপদে প্রচুর উপহার সমেত জায়গা মত পৌঁছে দেব, কথা দিচ্ছি। এখন আপনার মতামত জানতে চাইছি।

তার কথা শুনে খামার-বাড়ির মালিক সাফ জবাব দিল—এখান সুবিধে হবার নয়। তাই আমি ভাবছি, এখানে আটকে রেখে মিছে সময় নষ্ট করার দরকার নেই। কারণ, আমার আর বুড়ির সাত

বাচ্চাকাচ্চা আছে বটে। তবে তাদের একজনকেও কাছছাড়া করা আমাদের কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

জজ সাহেব আর ত্রিনিডাড অনন্যোপায় হয়ে সেখান থেকে বিষণ্ণ মুখে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অন্য একটা খামার-বাড়ি দরজায় হাজির হল। উইলি উইলসন তার মালিক। ত্রিনিডাড এক নিঃশ্বাসে তার কাছে তাদের আবেদনটা উত্থাপন করল।

মিনিট কয়েকের মধ্যে দুটো গোলাপী শিশুর হাত ধরে মিসেস উইলসন এসে দরজার সামনে দাঁড়াল।

না, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না। এখান থেকেও তাদের প্রত্যাখ্যাত হয়ে হাঁটা জুড়তে হল।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসার আগেই জজ সাহেব আর ত্রিনিডাড অর্ধেকেরও বেশী নাম শেষ করে ফেললেন।

পথের ধারের একটা হোটেলে রাত্রিটা কাটিয়ে তাঁরা পরদিন ভোর হতে না হতেই আবার যাত্রা শুরু করলেন।

ত্রিনিডাড দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—এ যে দেখছি, ক্রিস্টমাসের সময় বাচ্চাকাচ্চা ধার পাওয়া মহাসমস্যার ব্যাপার। আমার তো মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার জোগাড় হয়ে গেল।

জজ সাহেব আর ত্রিনিডাড ক্রিস্টমাসের আগের দিন ত্রিশ মাইল গাড়ি ছুটিয়ে চার-চারটে জায়গায় থামলেন। নিজেদের প্রয়োজনের কথা জানালেন। কিন্তু ফয়দা কিছুই হল না। একটা বাচ্চাও তারা জোগাড় করতে পারলেন না।

তাঁরা গাড়ি নিয়ে বিকেল পাঁচটায় গ্র্যানিট স্টেশনে হাজির হলেন। সবেমাত্র ট্রেনটা স্টেশন ছেড়েছে।

তারা খাবার ঘরের সিঁড়ির ওপর দশ বছরের একটা একেবারে শীর্ণ চেহারার বালককে ফুঁকফুঁক করে সিগারেট টানতে দেখল। খাবার ঘরের চেয়ারে একটা অল্পবয়সী মেয়েকে ক্লান্ত দেহে শরীর এলিয়ে বসে থাকতে দেখতে পেল। ত্রিনিডাড ব্যস্ত-পায়ে তাদের দিকে এগিয়ে গেলেন। নিজের উদ্দেশ্যের কথা মেয়েটার কাছে ব্যক্ত করলেন। তার মুখ থেকে সবকিছু শুনে মেয়েটা বলল—দেখুন স্যার, আপনি যদি অনুগ্রহ করে ববিকে নিয়ে যান তবে খুশিই হব। তাকে ফেলে আমাকে উদয়াস্ত পথে পথে কাটাতে হয়। ফলে বাজে লোকের সঙ্গে তাকে সারাটা দিন থাকতে হয়। আর সবচেয়ে বড় কথা ক্রিস্টমাস উৎসবে যোগ দেবার তার একমাত্র সুযোগটা আমি হাতছাড়া করতে চাই না।

তার সম্মতি পেয়ে ত্রিনিডাড উল্লসিত হয়ে ছেলেটার কাছে গিয়ে ক্রিস্টমাস উৎসব এবং উপহার সমগ্রীর কথা তাকে বলতে লাগলেন।

তাঁর পিছন পিছনই জজ সাহেবও এগিয়ে গিয়ে ছেলেটাকে নানাভাবে প্রলোভন দেখাতে মেতে গেলেন।

উপহার সামগ্রী অর্থাৎ পুতুল খেলনার কথা শুনে ছেলেটা মুখ বিকৃত করে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে উঠল—ধ্যুৎ! ওসব পুতুল-খেলনা নিয়ে নাড়াচাড়া করা আমি অনেকদিন আগেই ছেড়ে দিয়েছি। এখন আমার সবচেয়ে বেশী দরকার একটা রাইফেল। খেলনা-রাইফেল নয়, আসল রাইফেল।

রাইফেল! আসল রাইফেল! ত্রিনিডাড চমকে উঠে বিষণ্ণ মুখে বললেন।

হ্যাঁ, রাইফেল। সত্যিকারের একটা রাইফেল যা দিয়ে বনবিড়াল মারা যায়।

কিন্তু ক্রিস্টমাস উৎসবে—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ববি বলে উঠল—আমি তো সে কথাই বলতে চাচ্ছি। মনে হয় আপনাদের ক্রিস্টমাস ট্রি-তে রাইফেল টাইফেল নেই, কি বলেন?

এ ব্যাপারটা সম্বন্ধে সঠিকভাবে আমার পক্ষে কিছু বলার নেই, জানিও না। আবার থাকাটাও অস্বাভাবিক নয়। আমাদের সঙ্গে গেলেই তো সব কিছু বুঝতে পারবে।

যা-ই হোক, জজ সাহেব এবং ত্রিনিডাড-এর চেষ্টায় ছেলেটা শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে গেল।

ছেলেটাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে জজ সাহেব ও ত্রিনিডাড বাড়ির দিকে যাত্রা করলেন।

ইয়েলোহামার একটা খালি গুদামঘরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে সাজিয়ে গুছিয়ে অ্যারিজোনার পরীর কুঞ্জের মত করে তোলা হল।

ঘরটার ঠিক কেন্দ্রস্থলে রাখা হল সুসজ্জিত ক্রিস্টমাস ট্রি। তার পাতায় পাতায় চুমকি, ডালগুলোতে মোমবাতি, শিশুদের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক খেলনা দিয়ে সাজানো হল।

শিশু-সংগ্রহকারীদের জন্য সবাই অধীর প্রতীক্ষায় পথের দিকে তাকিয়ে রইল।

দুপুরের দিকে নতুন একটা স্লেজগাড়ি বোঝাই করে বিভিন্ন আকৃতির বাক্স পেটি আর গাটি নিয়ে চেরোকি হাজির হলেন।

কিন্তু ছোট্ট ছেলেটার ব্যাপারে ইয়েলোহামার শোচনীয় দুরবস্থার কথাটা কেউ-ই তাঁর কানে তুলল না। জজ সাহেব আর ত্রিনিডাড-এর ওপরই সবাই ভরসা করে আছে।

সূর্য ডুবে গেলে চেরোকি সান্টাক্লজ-এর পোশাকের প্যাকেট আর অপ্রকাশিত বিশেষ কিছু উপহার সামগ্রী সঙ্গে নিয়ে বিশ্রাম নিতে পাশেরই একটা ঘরে চলে গেল।

একটু বাদেই শিশুদের গাড়িটা এসে গেল। গাড়ির ভেতরের শিশুর দল রীতিমত হৈ চৈ জুড়ে দিয়েছে।

গাড়িটা এগিয়ে গিয়ে সুসজ্জিত গুদাম ঘরটার দরজায় দাঁড়াল। উপস্থিত মহিলারা আনন্দ ও উত্তেজনায় নাচতে নাচতে মোমবাতিগুলো জ্বালাতে ছুটল। আর পুরুষরাও আনন্দে ছুটোছুটি শুরু করে দিল।

জজ সাহেব ও ত্রিনিডাড একটামাত্র ওছামার্কা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে গুদামঘরটায় ঢুকলেন।

ধাতু-পরিমাপকের স্ত্রী, যাবতীয় সামাজিক অনুষ্ঠানের নেত্রী বললেন—অন্য সব শিশুরা, কোথায় তারা?

ফ্যাকাসে-বিবর্ণ মুখে, দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ত্রিনিডাড তাঁর প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বললেন—ম্যাডাম, চুনের মধ্যে রূপোর খোঁজ করা আর ক্রিস্টমাসের সময় শিশুদের খুঁজে পাওয়া একই সমস্যা। দু'দিন ধরে জাল ফেলে ফেলে একটামাত্র শিশুকে ডাঙায় তুলতে পেরেছি।

মিস এরমা শিশুটার পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন—খোকাটার মুখটা সত্যি খুব মিষ্টি।

ববি পিঠ থেকে তাঁর হাতটাকে এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে খেঁকিয়ে উঠল—আরে ধ্যুৎ! চুপ কর, কে খোকা! আমি।

আরে বাবা! এ যে রীতিমত ডেঁপো ছেলেরে বাবা। এ ছেলে, নাকি ছেলের বাবা!

ত্রিনিডাড বললেন—দেখুন, মিস এরমা, শিশু জোগাড় করতে আমরা চেষ্টার ত্রুটি করিনি। চেরোকি দুঃখ পাবেন, জানি। কিন্তু আমাদের কিছুই করার ছিল না।

চেরোকি সান্টাক্লজ-এর সর্বজন পরিচিত পোশাকে দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেন। বুক অবধি নেমে-আসা ঢেউ খেলানো সাদা দাড়ি, আর লম্বা চুল মুখটাকে প্রায় ঢেকে রেখেছে। কাঁধে একটা ঝোলা ঝুলছে। তিনি ঢুকলে ঘরের সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। ছেলেমানুষী ক্রিস্টমাস গাছটার দিকে ববি তাকিয়ে রইল।

চেরোকি কাঁধ থেকে ঝোলাটা নামিয়ে রেখে বিস্ময় মাখানো দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাতে লাগলেন। তিনি আশা করছেন গোপন অন্তরাল থেকে হঠাৎ একদল শিশু হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকবে। এবার তিনি ববি-র দিকে এগিয়ে গিয়ে বিড়ালছানার মত হাতটা বাড়িয়ে তার কাঁধে রাখলেন।

তার কাঁধে হাতটা রেখেই তিনি বললেন—আনন্দের ক্রিস্টমাস, ছোট্ট খোকা! গাছে ঝুলন্ত যা-যা তুমি চাইবে তারা সবই তোমাকে এনে দেবে।

চোখে বিতৃষ্ণার ছাপ এঁকে ববি তার মুখের দিকে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেন তাকাল।

চেরোকি এবার বলল—খোকা; তুমি কি সান্টাক্লজ-এর সঙ্গে করমর্দন করবে না?

সে এক ঝটকায় তার কাঁধ থেকে চেরোকির হাতটা নামিয়ে দিয়ে বলল—ধ্যুৎ! যত্ত সব বাজে জেরুকি! সান্টাক্লজ বলে কেউ আছে আমি বিশ্বাস করি না। তুমি বুড়ো ছাগলের নকল দাড়ি-গোঁফ মুখে লাগিয়ে এখানে এসেছ?

খোকা! এ তুমি কি বলছ?

খোকা-খোকা করবে না। আমি খোকা নই। পুতুল আর টিনের ঘোড়া আমার কোন কাজে

লাগবে? গাড়ির চালকের মুখে শুনেছিলাম, তোমার কাঁধে একটা বন্দুক থাকতে পাবে।

বন্দুক! আজকের দিনে, তাও আবার তোমার মত শিশুর মুখে বন্দুকের কথা!

হ্যাঁ, বন্দুক। কিন্তু এখন দেখছি, তা-ও নেই। আমি বাড়ি যাব। আমার যাবার ব্যবস্থা করে দাও

ত্রিনিডাড এগিয়ে উভয়ের মাঝখানে গিয়ে করমর্দন করলেন।

তার হাত দুটো ধরে ছোট্ট করে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বললেন—চেরোকি, আমি দুঃখিত। ইয়েলোহামাতে কোনদিন ছোট শিশু ছিল না, এখনও নেই। আমরা সারা শহর তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। একটা মাত্র সার্ডিন মাছ ছাড়া আর কিছুই জালে পড়ে নি। ছেলেটা নাস্তিকের শিরোমণি।

চেরোকি ববির দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে মুহূর্তের জন্য তাকালেন।

ত্রিনিডাড বলে চলল—হতচ্ছাড়া নাস্তিকটা সান্টাক্লজ বলে কিছু ছিল বা আছে বলে মানতেই নারাজ। ব্যাপারটা আমার পক্ষে অপমানজনক।

তাই তো দেখছি।

জজ সাহেব আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল সে আপনার মজার খেলাটাকে জমিয়ে তোলার জন্য একদল খেলোয়াড় জোগাড় করতে পারব। কিন্তু সার্ডিন মাছটাকে ছাড়া কিছুই জোগাড় করতে না পারায় আমাদের হতাশ হয়েই ফিরে আসতে হল।

যাক গে, খরচাপাতি তো আর তেমন কিছু হয় নি। খেলনা-পুতুলগুলো এক জায়গায় ফেলে রাখলেই হবে। আমি যে কি সাব্যস্ত করেছিলাম, তা আমি নিজেই ভাল জানি না।

হুম্!

বিশ্বাস করুন, আমার জানাই ছিল না যে, ইয়েলোহামায় কোনদিনই শিশু ছিল না, আজও নেই।

ববির গায়ে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে চেরোকি বলল—খোকা, তোমার বাড়ি কোথায়? চোরেকি স্টেশনে।

চেরোকি মুখের দাড়ি-গোঁফ খুলে ফেললেন। টুপিটাও খুলে হাতে নিলেন। তার মুখের দিকে আর একবার তাকিয়ে নিয়ে ববি বলে উঠল—তাই বুঝি? তাই তো তোমার মুখটা আমার খুবই চেনা-চেনা মনে হচ্ছে।

কি ব্যাপার, তুমি আমাকে আগে কোনদিন, কোথাও দেখেছ?

তা-তো বলতে পারব না। তবে তোমার ছবিটা বহুবার দেখেছি।

আমার ছবি দেখেছ? কোথায় দেখেছ? বল তো?

বাড়িতে। আমাদের ডেস্কের ওপরে তোমার ছবিটা দেখেছি।

বাছা, তোমার নামটা কি বল তো?

রবার্ট লম্‌স্‌ডেন। আমার মায়ের কাছে ছবিটা আছে।

চেরোকি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকালেন।

ববি বলে চলল—হ্যাঁ, সত্যি বলছি, আমার মা রোজ রাত্রে ছবিটাকে বালিশের তলায় রেখে তবেই শোয়।

তোমার মা? তোমার মা—

হ্যাঁ, ঠিক বলছি। শুধু কি এ-ই? ছবিটাকে একবার তাকে চুমু খেতেও দেখেছি। আমি হলে কিন্তু কিছুতেই কোন ছবিতে চুমু খেতাম না। আসলে মেয়েদের ব্যাপার-স্যাপারই এমন।

চেরোকি যন্ত্রচালিতের মত দ্রুত দাঁড়িয়ে পড়লেন। ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। হাতে ইশারা করে ত্রিনিডাডকে কাছে ডাকলেন।

ত্রিনিডাড এলে তাকে বললেন—তুমি এক মুহূর্তের জন্য এ ঘর ছেড়ে যাবে না, বুঝলে?

ত্রিনিডাড সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকালেন।

চেরোকি এবার বললেন—আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি এখানে, এ ঘরেই থাকবে। আর এ ছেলেটাকে তোমার জিম্মায় রেখে গেলাম, মনে থাকবে তো?

ত্রিনিডাড ঘাড় কাৎ করে সম্মতি জানাল।

চেরোকি বলে চললেন—আমি ক্রিস্টমাসের এসব জিনিসপত্র ফেলে দিয়ে স্লেজগাড়িটা খালি করে নিচ্ছি।

স্লেজগাড়ি? এখন আবার সেটা কোন কাজে লাগবে?

এ ছেলেটা, মানে ববিকে আমি নিজের বাড়ি নিয়ে যাব।

চেরোকি কথা বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। চেরোকি বিদায় নিলে ত্রিনিডাড খালি চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলেন।

তারপর ববির দিকে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে বলল—তুমি তো জব্বর চিজ হে! রীতিমত একজন বিধর্মী!

ববি কি যেন বলতে গিয়েও চেপে গেল।

ত্রিনিডাড বলে চলল—এবার ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, খ্রীস্টধর্মের প্রতি তোমার আস্থা না থাকার জন্য, আর এত পাকা-বুড়ো হওয়ার জন্যই খেলনা-পুতুল আর মিছরির টুকরোর প্রতি তোমার তিলমাত্রও আস্থা নেই।

ববি রাগে গস্ গস্ করতে করতে বলল—আমি তোমাকে একদম পছন্দ করি না। আসলে তোমার কথার একদম দাম নেই।

আমার কথার দাম নেই? কি করে আমি কথার খেলাপ করেছি, বল তো?

কথার খেলাপ কর নি?

কিন্তু কখন, কিভাবে কথার খেলাপ করলাম, তা-তো বলবে?

একটা বন্দুক পাওয়া যাবে, বল নি। ত্রিনিডাড তার কথার জবাব না দিতে পেরে আমতা-আমতা করতে লাগল।

ববি রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে এবার বলল—তোমার এখানে কোন সুব্যবস্থা আছে, তুমিই বল?

সুব্যবস্থা? অব্যবস্থারই বা কি দেখছ, বুঝছি না-তো?

একটু-আধটু ধূমপান যে করব তারও তো ব্যবস্থা দেখছি না।

ত্রিনিডাড আচমকা মুখ তুলে তার দিকে তাকাল।

সে রীতিমত দৃঢ়তার সঙ্গেই বলল—হ্যাঁ-হ্যাঁ, ধূমপান। এর চেয়ে বাড়িতে থাকলেই আমি ভাল করতাম।

চেরোকি স্লেজ গাড়িটা নিয়ে এসে গুদামঘরটার দরজায় দাঁড় করাল। সবাই মিলে ধরে ববিকে সেটার ওপর বসিয়ে দিল। ঘোড়াগুলো শক্ত ও সমতল বরফের ওপর দিয়ে ছুটতে আরম্ভ করল।

চেরোকির গায়ে পাঁচশ' ডলারের শিল মাছের চামড়ার ওভারকোট।

ববি পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাতে গেল। চেরোকি গম্ভীর স্বরে বললেন—ববি, সিগারেটটা ফেলে দাও।

ববি আড় চোখে তার মুখের দিকে তাকাল।

চেরোকি এবার একই স্বরে বললেন—যা বলছি, কর। ওটা ফেলে দাও।

ববি একটু ইতস্তত করে হাতের সিগারেটটা গাড়ির বাইরে ফেলে দিল। চেরোকি অধিকতর গম্ভীর স্বরে, আদেশের ভঙ্গীতে বললেন—হাতের সিগারেটের বাক্সটাও ফেলে দাও।

আগের চেয়েও অধিকতর অনিচ্ছার সঙ্গে সে হাতের বাক্সটা ছুঁড়ে ফেলে দিল।

ববি কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে বসে রইল।

চেরোকিও আর কিছু বললেন না।

এক সময় ববি ধীরে ধীরে মাথা তুলল। তারপর মুহূর্তের জন্য বাঁকা-চোখে তার মুখের দিকে তাকাল।

ববির চোখে চোখ পড়তেই চেরোকি অন্য দিকে মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন।

ববি ক্ষণিক ইতস্ততের পর মুখ খুলল—দেখুন, আমার মনে হচ্ছে, আপনি মানুষটা খারাপ নন।

চেরোকি ম্লান হেসে বললেন—তাই বুঝি?

হ্যাঁ, আর এই জন্যই আপনাকে আমার ভাললেগে গেছে।

কেন?

কেন? তা-তো বলতে পারবো না।

তবুও তো কাউকে ভাল বা খারাপ লাগলে তার পিছনে কোন না কোন কারণ অবশ্যই থাকবে।

ওই যে বললাম, কারণ বলতে পারব না। তবে একটা কথা, আজ অবধি যা করতে চেয়েছি তা আমাকে দিয়ে না-করানোর সাধ্য কারো হয় নি।

এবার একটু নরম গলায় চেরোকি বললেন—খোকা, ভাল করে ভেবে বল তো, তোমার মা আমার ছবিটাকে চুমু খেয়েছিল, এ ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত?

হ্যাঁ, অবশ্যই নিশ্চিত। শতকরা একশ' ভাগই সত্যি মনে করতে পারেন।

তুমি তবে নিজের চোখে দেখেছ সে—

তাঁকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই সে এবার বলল—আরে, বলছি তো, একেবারে সামনে থেকে একেবারে নিজের চোখে দেখেছি।

ভাল কথা, তুমি একটা বন্দুকের কথা বলছিলে না?

বলেছিলাম। অবশ্যই বলেছিলাম। আপনি কি আমাকে একটা বন্দুক দেবেন?

দেব।

দেবেন? একটা বন্দুক দেবেন?

দেব। কাল দেব। রূপো-বাঁধানো বন্দুক।

চেরোকি কোটের পকেট থেকে ঘড়িটা বের করে তার ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন। বললেন, সাড়ে ন'টা বাজে। আমরা ক্রিস্টমাস দিবসের সময় মতই জংশন স্টেশনে পৌঁছে যেতে পারব।

ববি-র দিকে ফিরে এবার বললেন—তোমার কি শীত করছে বাবা? কাছে এসো,—আমার আরও কাছে বস।

দ্য রিফরমেশন অব ক্যালিয়োপ

ক্যালিয়োপ ক্যাটেসবির এমনিতেই একটু খামখেয়ালি প্রকৃতির মানুষ। সম্প্রতি তার এ স্বভাবটা একটু বেশী রকমই চাঙা হয়ে উঠেছে।

সত্যি কথা বলতে কি বর্তমানে তার অবসাদ দেখা দিয়েছে। এ পৃথিবীটা সুন্দর একটা অন্তরীপের মত। তার ওপর তার যে অংশটাকে সবাই চোরাবালি নামে জানে বর্তমানে সেটা তার কাছে মারাত্মক কিছু বাষ্পের সংমিশ্রণ ছাড়া বেশী কিছু নয়।

মাথার মধ্যে যখন খেয়াল চাপে এবং সেগুলো যখন উত্যক্ত করতে থাকে তখন একজন দার্শনিক স্বগতোক্তির মধ্যে তার মীমাংসা সন্ধান করতে পারে, আমার সহধর্মিণী চোখের জল ঝরিয়ে সান্ত্বনা পায় আর নিরীহ-নম্র প্রকৃতির পূর্বদেশের বাসিন্দারা তাদের পরিবারের মহিলাদের পোশাক-পরিচ্ছদের অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য বকাবকি শুরু করে দেয়। তবে এগুলোর কোনটাই কিন্তু চোরাবালির অধিবাসীদের পক্ষে যথেষ্ট নয়। আর ক্যালিয়োপ-এর কথা তো একেবারেই স্বতন্ত্র। বিশেষ করে সে তো নিজের মানসিক অবসাদকে নিজের পছন্দ মাফিকই প্রকাশ করতে আগ্রহী।

আসন্ন মানসিক অবসাদের বহু লক্ষণই ক্যালিয়োপ-এর মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে।

সে তার নিজের পোষা কুকুরটাকে পশ্চিমী হোটেলে দুম করে এক লাথি মেরেছে। শুধু কি এ-ই? এ কাজের জন্য সে মার্জনা ভিক্ষা করতেও আপত্তি জানিয়েছে।

আরও আছে, কথাবার্তা-আলাপ-পরিচয়ের ক্ষেত্রেও সে অন্যের দোষ-ত্রুটি ধরতে আর খামখেয়ালিপনা প্রকাশ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে।

বেড়াতে বেরোলেও তার মধ্যে চূড়ান্ত খামখেয়ালি স্বভাবটা প্রকাশ পায়। পথের ধারের মেস্কিট গাছের দিকে সে আচমকা হাতটা বাড়িয়ে দেয়। টান দিয়ে গাছ থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে মুখে দেয়। তারপর তৃণভোজী প্রাণীর মত সেটাকে হালুম হালুম করে চিবোতে শুরু করে। যে কোন অবস্থাতেই কাজটা নিঃসন্দেহে অশুভ।

তার মানসিক অবসাদের কথা যারা জানে তাদের দৃষ্টিতে একটা ভয়াবহ লক্ষণ হচ্ছে তার

ক্রমবর্ধমান নম্রতা, বিনয় আর বড় বড় কথা বলার প্রবণতা। খেঁক খেঁক করে কথা বলার পরিবর্তে অস্বাভাবিক নরম সুরটাও তো কম ভাবিয়ে তুলছে না। আর সে সঙ্গে বিপজ্জনক সৌজন্যবোধ এসে যোগ দিয়েছে।

ব্যস, তারপরই তার হাসিটা বাঁকা হয়ে ওঠে। আর মুখের ওপরের দিকটা বিশ্রীভাবে উল্টে যায়। আর তাকে ধরে ফেলার জন্য চোরাবালি তৈরী হয়ে যায়।

এরকম পরিস্থিতিতে ক্যালিয়োপ অধিকাংশ সময়েই মদের বোতল নিয়ে মেতে যায়।

শেষ পর্যন্ত বাড়ি ফেরার পথে যার সঙ্গেই দেখা হয় তাকেই মাত্রাতিরিক্ত বিনয় প্রকাশ করে নতজানু হয়ে বার বার অভিবাদন করতে থাকে। ক্যালিয়োপ কিন্তু তখন পর্যন্ত মানসিক অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েনি।

সে যে হোটেলটায় মাথা গুঁজে দিন কাটাচ্ছে তার জানালার গবরাটে বসে অনবরত বে-সুর আবৃত্তি করতে শুরু করল। সঙ্গে থাকে গীটারে সুর-তালহীন টুং-টাং শব্দ। এভাবে সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত চলে।

পরদিন সকাল ন'টায়ই দেখা গেল ক্যালিয়োপ আবার পুরোপুরি সুস্থ-স্বাভাবিক হয়ে গেল।

তারপর সর্বাঙ্গে কার্তুজের বেল্ট জড়িয়ে বেশ কয়েকটা পিস্তলসহ আর প্রচুর পরিমাণে মদ গিলে সে চোরাবালির প্রধান রাস্তা দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করল।

নিঃশব্দে অতর্কিতে আক্রমণ করে একটা গোটা শহরকে অধিকার করে নিতে সে মোটেই আগ্রহী নয়।

সামান্য এগিয়ে একটা মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে সে তার ধ্বনিগুলো বারবার গলা ছেড়ে আওড়ে যেতে লাগল—ভয়ঙ্কর সব কপচানি যার ফলে তার খ্রীস্টীয় নামের পরিবর্তে নতুন একটা নাম তার বরাতে জুটেছে।

তার আকাশ-বাতাস-কাঁপানো ঘোষণা শেষ হতে না হতেই .৪৫ পিস্তল থেকে পরপর তিনটে গুলি সশব্দে বেরিয়ে এল।

পিস্তলের শব্দে পশ্চিমী হোটেলের মালিকের বাছুরের মত বড় কুত্তাটা মাত্র একবার আর্তনাদ করেই মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল।

ব্লু ফস্ট মুদিখানা থেকে বেরিয়ে আসা মেক্সিকানটা আঙুলে ঝোলানো দড়িতে বাঁধা কেবলমাত্র বোতলের মুখটা নিয়ে পড়ি কি মরি করে ছুটতে লাগল। আর? বিচারক বিল-এর দোতলার ছাদে-বসানো গিল্টিকরা বায়ু-মোরগটা টুকরো-টুকরো হয়ে বাতাসে দোল খেতে লাগল।

ক্যালিয়োপ-এর লক্ষ্য অব্যর্থ। গুলি ছোঁড়ার ব্যবস্থাদিও মোক্ষম।

ডাইনে-বাঁয়ে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে সে সামনের দিকে এগোতে লাগল। পথের ধারের বাড়িগুলোর জানালার কাঁচ ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে শিলাবৃষ্টির মত পথময় ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

পথবাসী কুকুরগুলো আর্তস্বরে চিল্লাতে চিল্লাতে মরিয়া হয়ে পালাতে লাগল। মুরগির ছানাগুলো কর্কশ স্বরে ডাকতে ডাকতে উড়ে যেতে লাগল। আর ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে মেয়েরা নিজ নিজ শিশুদের বুকে জাপ্টে ধরে কাঁপতে লাগল।

ক্যালিয়োপ-এর মেজাজ বিগড়ে গেলেই বুঝি কুইক-স্যান্ড-এর সবকিছু বন্ধ হয়ে যায়।

ক্যালিয়োপ-এর আবির্ভাবের খবর পাওয়া মাত্র পথের ধারের অফিস-কাছারির কেরাণিরা দমাদম দরজা-জানালা বন্ধ করে দিয়ে আতঙ্কে কাঁপাকাঁপি জুড়ে দেয়।

সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, তার কাজে কেউ বাধা দিতে সাহসী হয়ে এগিয়ে না আসার জন্যই ক্যালিয়োপ-এর অবসাদ বোধটা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেতে লাগল।

তবে ক্যালিয়োপ গোটা চারেক মোড় পেরোতেই পাল্টা আক্রমণের তোড়জোড় চলেছে।

তার কার্যকলাপের কথা অগণিত সাংবাদিক সিটি মার্শাল বাক প্যাটার্সনকে আগেভাগেই সতর্ক করে দিয়েছিল। তার ১০×১২ মাপের অফিস ঘরে মার্শাল তারই পথ চেয়ে অধীর প্রতীক্ষায় প্রহর গুণতে থাকল। সতর্কবার্তা পাওয়া মাত্র মার্শাল ব্যস্ত-হাতে পিস্তলের বেল্টটা কোমরে লাগিয়ে তৈরী হয়ে নিল।

আর সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধবিশারদ দুই ডেপুটি শেরিফ আর তিনজন নাগরিক ক্যালিয়োপ-এর

মোকাবেলা করার জন্য তৈরী হয়ে নিল। কোন কথা নয়, দেখামাত্রই দেবে গুলি চালিয়ে। আর গোপন অন্তরাল থেকে তারা একযোগে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাকে ঘায়েল করে তবেই ছাড়বে। পিস্তলের লক্ষ্য অব্যর্থ বটে কিন্তু তার বন্দুকের লক্ষ্য অব্যর্থ নয়। এবার তার অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়বে।

তবু সাবধানের মার নেই। ক্যালিয়োপ-এর পিস্তলের লক্ষ্য অব্যর্থ—কথাটা তো আর মিথ্যা নয়।

বাক প্যাটারসন দীর্ঘদেহী। পেশীবহুল চেহারা। গায়ে হাতির শক্তি ধরে। আর মুখাবয়ব গম্ভীর।

বাক প্যাটারসন-এর পরিকল্পনাটা হচ্ছে নিজেদের ক্ষয় হতে না দিয়ে ক্যালিয়োপ নামক সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীকে কব্জায় নিয়ে আসা।

পাল্টা আক্রমণ হতে পারে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ক্যালিয়োপ দু'ধারে পিস্তলের গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে স্বাভাবিক গতিতেই এগোতে লাগল। পাল্টা আক্রমণকারীরা সামনেই যেন অবস্থান করছে এরকম সন্দেহ তার মনের কোণে জেগে উঠল।

কয়েকটা শুকনো ফলের পেটির আড়াল থেকে সিটি মার্শাল ও একজন ডেপুটি বন্দুক থেকে গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করল। আর দলের অন্যান্যরা পথের দু'ধারে দাঁড়িয়ে অনবরত গুলি ছুঁড়তে লাগল।

বন্দুকের প্রথম গুলির ঝাঁকেই ক্যালিয়োপ-এর পিস্তলের ঘোড়াটা উড়ে গেল। আর কোমরের কার্তুজে গুলি লাগায় তার বুকের পাঁজরের কয়েকটা হাড়ই ঝলসে দিল।

কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, সবকিছু যেন তার অবসাদের ক্ষেত্রে মহৌষধরূপে কাজ করল। সে যেন নতুন মনোবল পেয়ে গেল। নতুন বলে বলীয়ান হয়ে উঠল।

সে সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধোন্মত্ত বাঘের মত প্রচণ্ড হুঙ্কার ছেড়ে নতুন উদ্যমে পিস্তল থেকে গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করল।

সে আইন-রক্ষকদের আয়ত্ত থেকে দূরে সরে গিয়ে যেন গুলি বৃষ্টি বর্ষণ করতে লাগল। কার্তুজের একটা উত্তপ্ত খণ্ড ছিটকে গিয়ে মর্শালের গলায় গেঁথে গেল। গলগল করে রক্ত ঝরতে লাগল।

ক্যালিয়োপ তার যুদ্ধ-কৌশল পরিবর্তন করে প্রতিপক্ষের কৌশলই অবলম্বন করল। সবার চোখের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে আক্রমণকে প্রবলতর করে তুলল।

সে যে জায়গাটাকে বর্তমানে নিরাপদ আশ্রয় হিসাবে বেছে নিয়েছে সেটা ছোট্ট একটা রেলওয়ে স্টেশন। স্টেশনের বাড়িটা শক্তপোক্ত একটা বাক্সের মত। ভূমি থেকে ফুট চারেক উঁচু একটা বেদীর ওপর বসানো রয়েছে। আর প্রতিটা দেওয়ালে রয়েছে একটা করে ছোট জানালা। ফলে স্টেশন-বাড়িটা যেন একটা সুরক্ষিত দুর্গের অভাব পূরণ করতে লাগল।

মার্শালের দল তাড়া করে তাকে ঘায়েল করার আগেই সে খরগোসের মত ক্ষিপ্র গতিতে ছুটে স্টেশন-বাড়িটায় ঢুকে যায়। ব্যস, নিরাপদ।

ক্যালিয়োপ নিঃসন্দেহ হয়ে গেল, শত্রুপক্ষের যে-ই প্রথম স্টেশনবাড়ির ফাঁকা জায়গাটায় হাজির হবে তাকেই সোজা যমালয়ের দক্ষিণ দুয়ারে পাঠিয়ে দিতে পারবে।

আর এদিকে প্যাটারসন আর তার দলবল অনন্যোপায় হয়ে একটা কাঠের স্তূপের আড়ালে গিয়ে ঘাপ্‌টি মেরে রইল। উভয় দলের মধ্যবর্তী অঞ্চলটা বড়জোর ত্রিশ গজ। ফাঁকা জায়গা।

সিটি মার্শাল নিঃসন্দেহ ক্যালিয়োপ-এর অসহ্য উল্লাস আর কোনদিন চোরাবালির বাতাসকে বিষিয়ে তুলতে পারবেনা। আতঙ্কে মুষড়ে পড়বে না শহরের অধিবাসীরা। একথা তিনি বহুবার ও বহুভাবে প্রচারও করছেন।

এ-তো খুবই স্বাভাবিক কথা, শহরে শান্তিরক্ষা করার সার্বিক দায়িত্ব ও কর্তব্য তারই।

পাশেই ভেজা-লোমে বোঝাই একটা ঠেলাগাড়ি দাঁড়িয়ে। খামার থেকে ভেড়ার লোম এনে এনে এখানে জড়ো করা হয়েছে।

মার্শাল আর তার অনুগামীরা পর্বত প্রমাণ উঁচু ভেড়ার লোমের ঢিবির লোমগুলো ঝটপট কয়েকটা বস্তায় ভরে অন্য আর একটা ঠেলাগাড়িতে তুলে ফেলল। এবার গাড়িটাকে ক্যালিয়োপ-

এর দুর্গের দিকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলল।

মার্শালের দলের লোকজন চারদিকে ছড়িয়ে বন্দুক বাগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাদের উদ্দেশ্য ক্যালিয়োপ যদি মার্শালের গতি রোধ করতে আরম্ভ করে তবে তারা সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ক্যালিয়োপ কিন্তু হতাশ হয়ে নিশ্চেষ্টভাবে বসে রইল না। সে জানালা দিয়ে বার-কয়েক দমাদম গুলি চালিয়ে দিল। সেগুলো মার্শালের লোমের বস্তা ভেদ করে বাতাসে মিলিয়ে গেল।

না, ক্যালিয়োপ-এর গুলি বর্ষণে কোন পক্ষেরই ক্ষয়-ক্ষতি হল না।

মার্শাল তার যুদ্ধ-জাহাজটা ঠেলে ধাক্কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এতই ব্যস্ত হয়ে পড়ল যে সকালের ট্রেনটা স্টেশনে ঢোকার কয়েক ফুট আগেও এতটুকুও টেরই পায় নি।

ট্রেনটা 'চোরাবালি' স্টেশনে মাত্র এক মিনিটের জন্য দাঁড়াল। ক্যালিয়োপ-এর ক্ষেত্রে এটাই একমাত্র আত্মরক্ষার অপূর্ব সুযোগ। শত্রুপক্ষের বিপরীত দিকের যেকোন একটা দরজা খুলে হাওয়া হয়ে গেলেই একেবারে কেল্লা ফতে।

এদিকে বাইক ও তার সহ-যোদ্ধারা বন্দুক বাগিয়ে ধরে স্টেশন চত্বরে পৌঁছে গেল। তারা বাইরে দাঁড়িয়ে বন্দুকের গুলির একটা অস্পষ্ট শন্ শন্ শব্দ শুনতে পেল। পরমুহূর্তেই আবার নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা নেমে এল।

আহত লোকটা এক সময় চোখ মেলে তাকাল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মূর্চ্ছা ভাবটা কাটিয়ে সে ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাল। আর হৃত অনুভব ও চিন্তাশক্তি সে ফিরে পেল।

সে চোখ মেলে তাকিয়ে এদিক-ওদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বুঝতে পারল যে একটা চওড়া বেঞ্চের ওপর শুয়ে রয়েছে। তালগাছের মত লম্বা একটা লোক, মুখভর্তি খোঁচ-খোঁচা দাড়ি নিয়ে তার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে। তার বুকে 'সিটি মার্শাল' লেখা তকমা আঁটা।

কালো পোশাক পরিহিত বেঁটেখাটো বুড়ি ঠাণ্ডা-জলে ভেজানো একটা রুমাল তার কপালে চেপে ধরে রেখেছে।

আহত লোকটা বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে মুখ খোলার আগেই বুড়ি মুখ খুলল ঃ ব্যস, মানুষের মত মানুষটা সংজ্ঞা ফিরে পেয়েছে।

সে এবার তার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল—বুলেটটা তোমার তেমন ক্ষতি করতে পারে নি, কি বল? কপালের গা-ঘেঁষে যাবার সময় একটু-আধটু আঁচড় কেটে দিয়ে গেছে ব্যস, এর বেশী কিছুই ক্ষতি করতে পারে নি।

আহত লোকটা দুর্বল একটা হাত তোলার চেষ্টা করল। বুড়ি তার হাতটা চেপে ধরে বলে উঠল—ক্ষতস্থানটায় হাত দিও না বাছা। আমি এরকম ঘটনার কথা এর আগেও যে শুনিনি তা নয়। তোমরা একে কন্‌কাশান নাকি এরকমই কি যেন বল। ঠিক এভাবেই আবেশ ওয়াডকিন্স কাঠবিড়ালী গুলি করে মারত।

ভয়ের কিছু নেই বাছা। কপালটা সামান্য একটু ছড়ে গেছে বৈ তো নয়। শিগগিরই সেরে উঠবে।

আহত লোকটা এবার চোখ দুটোকে এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে বুড়িটাকে দেখতে লাগল। বুড়ি এবার ম্লান হেসে বলল—তুমি আমাকে চিনতে পারছ না তো? না, এতে অবাক হবার কিছু নেই। আমার ছেলেকে দেখার জন্য আমি আলাবাসা থেকে এ ট্রেনটাতেই আসছি। বেশ বড়সড় হয়েছে। সে যে একদিন ছোট্ট শিশু মানে এই এত্তটুকু ছিলে দেখলে তোমার মনেই হবে না। স্যার, এ-ই আমার সেই ছোট্ট ছেলেটা।

আহত লোকটা এবার মাথাটাকে সামান্য কাৎ করে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার মুখের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

বুড়িটা এবার বলল—স্যার, আট বছর যাবৎ আমার ছেলেটা আমার কাছ থেকে দূরে সরে রয়েছে। তাকে একবারটি চোখেও দেখতে পাইনি। আমার এক ভাইপো রেলের কর্মী। সে আমাকে এখানে আসার এবং আলাবাসায় ফিরে যাওয়ার একটা পাশ দেওয়াতেই আমার পক্ষে এখানে আসা সম্ভব হয়েছে।

বুড়ি মুহূর্তের জন্য থেমে একটু দম নিয়ে আবার আবেগের সঙ্গে বলতে শুরু করল, একবারটি

ভেবে দেখুন তো, আমার সেদিনের সেই ছোট্ট ছেলেটা আজ একটা শহরের মার্শাল হয়েছে, কম কথা! সে আমাকে এসব ব্যাপার-স্যাপার সম্বন্ধে কিছুই জানায় নি। সে হয়ত ভেবেছিল, আমার ছেলে এত বড় অফিসার হয়ে বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে চাকরি করছে শুনে আমি যদি মুষড়ে পড়ি, তাই আমার কাছে চেপে গেছে।

কিন্তু স্যার, আমি আইনকে সাক্ষী রেখে বলছি, এত সহজে মুষড়ে পড়ার মত মেয়ে আমি নই। আর মন খারাপ করে ফয়দাই বা কি বলুন?

যাক গে, যে কথা বলতে চাইছি, ট্রেন থেকে নেমেই বন্দুকের গুলির শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম। ডিপোর ভেতর থেকে ধোঁয়া বেরোতেও দেখেছি।

পর মুহূর্তেই জানালা দিয়ে মুখে বের করতেই আমার ছেলের মুখটা চোখে পড়ল। এক ঝলক দেখেই আমি তাকে চিনে ফেললাম।

তারপর সে-ও দরজার কাছে ছুটে এসে আমাকে এমনভাবে জাপ্টে ধরল যে, আর একটু হলেই আমার প্রাণটা বেরিয়ে যেত!

পর মুহূর্তেই ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি তুমি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় এখানে পড়ে রয়েছ। তাই তোমাকে শুশ্রূষা করে তোলার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলাম।

তার কথা শেষ হলে কন্‌কাশান-এর রোগীটা মুখ খুলল—এবার বোধ হয় আমি উঠে বসতে পারব। ইতিমধ্যেই অনেকটা সুস্থ বোধ করছি।

কথা বলতে বলতে সে ধীরে-ধীরে উঠে দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসল। দুর্বলতা কাটিয়ে এখনও পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠেনি।

তার চেহারা রুক্ষ-রুষ্ট, অমার্জিত। তার ওপর ঝুঁকে দাঁড়ানো মানুষটার বুকে আটকানো মার্শাল-এর তকমাটার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

বুড়ি তার পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বলল—আরে ঘাবড়াচ্ছ কেন বাছা। তুমি যখন সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়েছিলে তখন ছেলে আমাকে সব কথাই বলেছে। আমার ছেলে তোমাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছে বলে তুমি যেন আবার তার ওপর ক্ষুব্ধ হোয়ো না। একজন অফিসার হয়ে আইনকে মর্যাদা দেওয়া তো তোমার কর্তব্য। অন্যায় করলে তাকে অবশ্যই দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করতেই হবে।

একটু থেমে দম নিয়ে বুড়ি আবার বলতে শুরু করল—শোন, আমার ছেলের ওপর দোষারোপ কোরো না যেন। তার কিন্তু কোন দোষই নেই। সে ছেলেবেলা থেকেই ভাল ছেলে, অনুগত সৎ চরিত্রবান।

আমি একজন বুড়ো মানুষ। তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি। মদ ছেড়ে দাও, ভাল মানুষের মত জীবন যাপন কর। অসৎ সংসর্গ থেকে নিজেকে দূরে রাখ।

বুড়ির কথা শেষ হলে সে মুখ খুলল—এ ব্যাপারে মার্শালের বক্তব্য কি? তিনি কি আপনার পরামর্শকে সৎ-পরামর্শ বলে মনে করেন? যদি মার্শাল বলেন যে, কথাগুলো খুবই সঙ্গত, তবে?

তার কথায় লম্বা লোকটা একটু নড়েচড়ে এক হাতে বুকের তকমাটা আর অন্য হাতে বুড়িকে জাপ্‌টে ধরে বুকের আরও কাছাকাছি নিয়ে গেল।

বৃদ্ধার তোবড়ানো গালে তিন-কুড়ি বছর বয়সের মায়ের চিরন্তন হাসির ঝিলিক। সে আঁকা বাঁকা হাতে লোকটাকে আদর জানাতে লাগল।

তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে অন্য লোকটার চোখে চোখ রেখে সে বলতে লাগল—দেখ, আমি শুধুমাত্র এটুকুই বলতে পারি, আমি তোমার জায়গায় থাকলে এ কথাগুলো অবশ্যই মেনে চলতাম। আমি মাতাল, ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলে না হলে অবশ্যই কথাগুলোর দাম দিতাম।

আর আমি যদি তোমার জায়গায় থাকতাম আর আমার জায়গায় থাকতে তুমি তবে আমি কিন্তু সবই পুরোপুরি মেনে চলতাম। আর বলতাম, মার্শাল তুমি যদি একটিবার আমাকে সুযোগ দাও তবে এ অসৎ পথে উপার্জনের পথ থেকে আমি সরে দাঁড়াব। কথাটা আমি শপথ করে বলতে রাজী আছি।

আমি ছেড়ে দেব অসৎ পথে বন্দুক-পিস্তল নিয়ে খেলা করা। রেসের মাঠ মুখোও কোনদিন

হব না।

বুড়ি ফোকলা দাঁতে হেসে বলল—শোন, আমার ছেলের কথা। তুমি আমার কাছে শপথ করে বল, তুমি আজ থেকে ভাল ছেলে হবে, তবেই সে তোমার কোন ক্ষতিই করবে না।

মুখে হাসির ঝিলিক ফুটিয়ে তুলে বুড়ি এবার সোল্লাসে বলল—জান, একচল্লিশ বছর আগে আমার আর হৃৎপিণ্ড একই সঙ্গে চলত, আজও তা-ই চলছে।

তবে তুমি যদি আমার জায়গায় থাকতে তবে একথাই তুমি বলতে, তাই না?

হ্যাঁ, অবশ্যই বলতাম।

আর আমি যদি মার্শাল হতাম তবে আমি বলতাম, তুমি মুক্ত হলে, কথা রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কোরো, কেমন?

বুড়ি আচমকা চিৎকার করে উঠল—আরে, কী সর্বনেশে কাণ্ড! আমার বাক্সটার কথা একদম মনে ছিল না!

বাক্স? কোথায়, কি হয়েছে?

আমি যখন জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আমার ছেলের মুখটা দেখছিলাম ঠিক তখনই একজন বাক্সটাকে প্লাটফর্মে রেখে দিচ্ছিল। কথাটা আমার একদম মনে ছিল না! এখন উপায়?

কথা বলতে বলতে বুড়ি উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগল।

বুড়ি চলে গেলে ক্যালিয়োপ সব কথা বাক প্যাটার্সনকে বিস্তারিত ভাবে বলল ঃ শোন বাক, এ ছাড়া আমার কোন উপায়ই ছিল না।

বাক বলল—তার মানে?

আমি জানালা দিয়ে দেখলাম, বুড়ি উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে আসছে। সত্যি, আমার এ জঘন্যতম জীবনযাত্রার কথা সে বিন্দু বিসর্গও জানত না। আমি যে আজ একটা ওছাটে লোক হয়ে গেছি। সমাজ-সংসার থেকে বিতাড়িত, মানে আমাকে নির্মমভাবে ত্যাগ করেছে।

তারপর?

দেখ, কথাটা তার কাছে ব্যক্ত করার মত আমার মনোবল দৃঢ় ছিল না।

তারপর এক মুহূর্তের জন্য থেমে সে আবার মুখ খুলল—আমার পিস্তলের গুলির আঘাত লাগায় তুমি সেখানে মরার মত পড়েছিলে।

হঠাৎ মতলবটা আমার মাথায় এল—তোমার বুকের তকমাটা খুলে নিয়ে আমার বুকে আটকে নিলাম। আর আমার যা কিছু খ্যাতি তোমার ওপর দিলাম চাপিয়ে।

মাকে বলতে আমি এতটুকুও দ্বিধা করলাম না—আমিই মার্শালের পদাধিকারী, আর তুমিই 'চোরাবালি'র সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী।

কথা বলতে নিজের বুক থেকে মার্শাল-এর তকমাটা খুলে বাক প্যাটার্সন-এর দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল—আমার কাজ মিটে গেছে, এবার তোমার তকমাটা ফিরিয়ে নাও বাক।

ক্যালিয়োপ কাঁপা কাঁপা হাতে বুক থেকে তকমাটা খুলে ফেলতে চেষ্টা করল।

বাক বলল—ক্যালিয়োপ ব্যাপারটাকে একটু সহজ দৃষ্টিতে দেখ।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে ক্যালিয়োপ তাঁর দিকে তাকাল।

বাক বলে চলল—হ্যাঁ, মার্শাল-এর তকমাটা তোমার বুকেই লাগানো থাক।

কেন? একথা বলছ কেন, জানতে পারি কি?

অবশ্যই! অবশ্যই বলব। মোদ্দা কথা শোন, তোমার মা যতদিন এখানে আছেন ততদিন তকমাটা তোমার কোটের সঙ্গেই আটকানো থাক। তিনি অন্তত এটাই জানবেন যে, তুমিই এ শহরের মার্শাল।

কিন্তু তাতে যদি—

আমি এখনই শহরের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে বলে আসছি, কেউ যেন তোমার মার কাছে আসল কথাটা ফাঁস করে না দেয়।

তাই ভাল।

এবার বল তোমার মা যেসব হিতোপদেশ দিলেন তুমি সেগুলো মেনে চলবে তো? আমি

কিন্তু সেগুলোর কিছু অন্তত মেনে চলব, দেখে নিও।

ক্যালিয়োপ আবেগ ভরে বলল—দেখ বাক, আমি সেগুলো মেনে না-ও চলতে পারি। তবে অন্তত এটুকু আশা রাখছি যে—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই বাক বলল—চুপ! চুপ কর ক্যালিয়োপ! ওই যে তোমার মা ফিরছেন।

স্ট্রিকটলি বিজনেস

আমি মনে করছি যে, নাট্যশালা এবং নাট্যশালার সঙ্গে জড়িত সব মানুষের সব কথাই আপনারা অবগত আছেন। অভিনেতারা আপনাদের মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে।

খবরের কাগজের পাতায়, সাপ্তাহিক পত্রিকায় ভেনিসের বিখ্যাত সেতু, নাট্যশালার কোরাসের মেয়ের দল আর লম্বা চুলওয়ালা ট্রেজিডিয়ানদের সম্বন্ধে যেসব ঠাট্টা-তামাশা-রসিকতার সমালোচনা ছাপা হত সবই আপনারা পড়েন, এটাও আমি ধরেই নিচ্ছি।

আমি মনে করি রহস্যে মোড়া নাট্য-জগৎ সম্বন্ধে আপনাদের ধ্যান ধারণার একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা বানালে সেটার সঙ্গে নিচে বর্ণিত তালিকার অনেকখানি সাদৃশ্যই খুঁজে পাওয়া যাবে।

প্রথমেই আমরা প্রধান অভিনেত্রীদের দিকটা আলোচনা করি। তাদের স্বামী থাকে পাঁচ-পাঁচটা। গায়ে নকল হীরের দ্যুতি আর চেহারার ও রূপ-সৌন্দর্য? আপনাদের গৃহিণীর চেয়ে তেমন কিছু নয়।

তারপর আসি কোরাসের মেয়েদের প্রসঙ্গে। তারা পেরক্সাইড, পিটসবার্গ আর প্যাকহাউসের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। যাবতীয় প্রদর্শনী শেষ পর্যন্ত নিউইয়র্কে গিয়ে দেখতে হয়।

যাবতীয় সমালোচনার উর্দ্ধে অভিনেত্রীরা কমিক জমিদারের সহধর্মিণীর ভূমিকাটা জমিয়ে রাখে পথের কাকি-পিসি-মাসিদের জন্য।

কার্লে বেলিউ-এর প্রকৃত নামটা হচ্ছে বয়েল ও কেলি। জন ম্যাকমুলার-এর যত হম্বিতম্বি ফোনগ্রাফ মারফৎ কানে আসে বিলকুল এলেন টেরি-র স্মৃতিকথা থেকে চুপি চুপি হাতিয়ে নেওয়া।

জো ওয়েবার ই. এইচ. সেমার্ন-এর চেয়ে অনেক, অনেক বেশী আকর্ষণীয়, কিন্তু হেনরি মিলার যেন আগের চেয়ে দ্রুত বয়স বেড়ে বুড়োর দলে নাম লিখিয়েছে।

রঙ্গমঞ্চের সবাই রাত্রে রঙ্গালয় থেকে ফিরে পরের দুপুর পর্যন্ত চিংড়ি মাছ আর মদ গিলে এলিয়ে পড়ে থাকে।

বর্তমানে আমাদের মধ্যে খুব কম লোকই রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে জড়িত মানুষগুলোর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখে বা রাখতে উৎসাহী হয়। যদি উৎসাহী হত তবে এ পেশাটায় আরও অনেক লোক এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ত।

সত্যি কথা বলতে কি, অভিনেতা আর অভিনেত্রীদের প্রতি আমরা একটু বেশী মাত্রায়ই করুণা প্রকাশ করতে উৎসাহী হয়ে পড়ি। আর বাড়ি ফিরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তাদের ভাব-ভঙ্গী নকল করতে মেতে যাই।

বর্তমানে রঙ্গমঞ্চের অভিনেতাদের সম্বন্ধে নতুন এক মন্তব্য শোনা যাচ্ছে, তারা নাকি মোটরে চেপে মাত্রাতিরিক্ত মদ খাওয়া হীরে জহরতের পরিবর্তে নাকি ইদানিং পুরোমাত্রায় ব্যবসায়ী মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে। বাড়ি-ঘর তৈরী করে, বিষয়সম্পত্তি বাড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। হৈ হুজ্জতি ছেড়ে দিয়ে আইন-শৃঙ্খলা মাফিকই জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে, আমরা সবাই যেমন সংসার যাত্রা নির্বাহ করে যাচ্ছি।

পুরনো ও নতুন মতামতের মধ্যে কোনটা যে সত্যি তা অনুমানের ব্যাপার।

তাই কেবলমাত্র দু'জন ভ্রাম্যমান অভিনেতার ছোট কাহিনীটা আপনাদের কাছে তুলে ধরছি।

আমি প্রমাণস্বরূপ বলতে পারি, ফিটোর-এর নাট্যশালার প্রবেশ-পথেই আমি শেষ বারের মত চেরিকে দেখেছিলাম। বাসায়-ফেরা চড়ুই পাখির মতই সে দ্রুত মঞ্চের দিকে যাচ্ছিল নিজের চরিত্র অনুযায়ী সাজসজ্জা সেরে নেবার জন্য।

বব হার্ট আর চেরির রঙ্গ-নাটিকার দলটার খুবই খ্যাতি ছল। এমন একটা রসের রঙ্গ-নাটিকার দল নিয়ে বব হার্ট পূর্ব আর পশ্চিম অঞ্চলের সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে লাগল। নাটকটার বিষয়বস্তুর মধ্যে পড়ে একক সংলাপের চমৎকারিত্ব, সঙ্গতিসহযোগে তিন রকমের আলোর চিত্তাকর্ষক সমারোহ, পক্ষীরাজ হরিণের ধেই ধেই করে নাচানাচি আর নকল নবীশদের এক জোড়া নকল নাচ—ব্যস।

এক বিকেলে বব হার্ট গম্ভীর মুখে প্রতিদ্বন্দ্বী নাট্য-সংস্থার বক্স অফিসের দরজায় এসে দাঁড়াল। আর অর্কেস্ট্রা-আসনের একটা কুপন জোগাড় করে নিল।

নাট্যানুষ্ঠান শুরুর মুখে সাদা পর্দার ওপর শিল্পীদের নাম একে একে উঁকি দিতে লাগল। কিন্তু কেউ-ই বব হার্ট-এর মনে এতটুকুও দাগ কাটতে পারল না। তার মুখে ক্রমেই বিষণ্ণতার ছাপ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল।

অন্য যেসব দর্শক অনুষ্ঠান দেখছিল তাদের মধ্যে হতাশার লক্ষণ প্রকাশ পেতে লাগল। শেষমেশ তারা রীতিমত হৈ হল্লা জুড়ে দিল।

বব হার্ট নির্বিকার। সে মুখে কলুপ এঁটেই মুখ গোমড়া করে বসে রইল। একটু বাদে চেরি মঞ্চে অবতীর্ণ হওয়ামাত্র বব হার্ট যন্ত্রচালিতের মত সোজা হয়ে বসে পড়ল। চরিত্র উপযোগী গীত, অন্য অভিনেতার অবিকল নকল অভিনয় ক্ষমতা, প্রভৃতিতে পারদর্শিতার কথাই উইনেলা চেরির প্রচারের বিশেষত্ব ছিল।

উইনেলা চেরি মাত্র দু'বার মঞ্চে এসেছিল। প্রথমে ফুলের সাজি হাতে গ্রাম্য যুবতীর ভূমিকায়, আর একটু পরেই দ্বিতীয়বার মঞ্চে আসে এক প্যারিসীয় রূপসী তন্বী যুবতীর ভূমিকায়।

প্রথম দর্শনেই তাকে দেখে মনে হয়েছিল স্বয়ং মলীরুজ বুঝি মঞ্চে উপস্থিত।

আর বাকি যা কিছু সবই তো আপনাদের ভালই জানা আছে। বব হার্ট-এরও অবশ্যই অজানা নয়।

বব হার্ট কিন্তু চেরির মধ্যে আরও অতিরিক্ত কিছু দেখতে পেল। সে নিঃসন্দেহ হ'ল যে, সে হেলেন গ্রাইমস-এর চরিত্রে চমৎকার মানাবে। আর একে নিয়েই যে সে একটা স্কেচ লিখেও পাণ্ডুলিপিটাকে বাক্সে-বন্দী করে রেখে দিয়েছে। নাটিকাটার নামকরণ করেছিল 'নেংটি ইঁদুর মাতবে খেলায়।'

বব নাটিকাটা লেখার পর এতদিন ধরে অন্তরের অন্তঃস্থলের গোপন বন্দরে আশা পোষণ করে আসছে, একদিন না একদিন সে এমন একজন অংশীদারের হদিস পেয়ে যাবে যাকে হেলেন গ্রাইমস-এর ভূমিকায় চমৎকার মানাবে। হ্যাঁ, চেরি তো একজন সাক্ষাৎ হেলেন গ্রাইমস। আঃ! যা মানাবে না!

অভিনয় শেষ হলে বব হার্ট বক্স অফিসে গিয়ে ম্যানেজারের কাজে সরাসরি উইনেলা চেরীর ঠিকানাটা চাইল। পেয়েও গেল মুহূর্তের মধ্যেই।

পরদিন সকালে বব হার্ট ওয়েস্ট ফর্টিস-এর একটা সাবেকী আমলের বাড়িতে গিয়ে উইনেলা চেরির সঙ্গে মুখোমুখি দেখা করল।

উইনেলা চেরির সাদাসিধে পোশাক-পরিচ্ছদ, সহজ-সরল কথাবার্তা, নিষ্পাপ চোখদুটো দেখেই বব হার্ট-এর মনটা ভিজে একেবারে গলে গেল। আর নিঃসন্দেহ হল, এখনও নামকরণ হয়নি এমন নাটকে সে প্রুডেন্স ওয়াইজ-এর চরিত্রকে চমৎকার ফুটিয়ে তুলতে পারবে।

চেরি মুচকি হেসে বলল—মিঃ হার্ট, আপনার অভিনয় আমি দেখেছি। এখন বলুন তো, আমার কাছে আসার উদ্দেশ্য কি?

গতকাল রাত্রে আপনার অভিনয় আমি দেখেছি। দু'জনের জন্য লেখা একটা স্কেচ আমি কিছুদিন বাক্স-বন্দী করে রেখেছি।

মুচকি হেসে চেরি বলল—তাই বুঝি? এ তো আনন্দের কথাই বটে।

আমার দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে দ্বিতীয় চরিত্রটাকে আপনি যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হবেন। তাই আপনার সঙ্গে দেখা করে কথাবার্তা মিটিয়ে নেবার জন্য সশরীরেই উপস্থিত হলাম।

একটু নড়েচড়ে বসতে বসতে চেরী বলল—হ্যাঁ, আমিও ঠিক এরকমই আশা করেছিলাম। তবে কারো বদলি-অভিনেত্রী হিসেবে নয়। চরিত্রটাতে আমি নিজেই অভিনয় করতে আগ্রহী।

বব হার্ট কোটের পকেট থেকে 'নেংটি ইঁদুর মাতবে খেলায়' নাটিকাটার পাণ্ডুলিপির আগাগোড়া চেরীকে পড়ে শোনাল।

নাটিকার বিষয়বস্তু শুনে মিস চেরি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজের মতামত ব্যক্ত করল না।

কয়েক মুহূর্ত নীরবতার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে এক সময় সে ভুরু কুঁচকে বব হার্ট-এর দিকে তাকাল। তারপর হাতের পেন্সিল দিয়ে বার-কয়েক দাঁতে ঠুকল।

দাঁত থেকে পেন্সিলটা সরিয়ে এক সময় মিস চেরি মুখ খুলল, মিঃ হার্ট, আপনার গল্পটা আমি শেষ পর্যন্ত শুনলাম।

কেমন বুঝলেন মিস চেরি?

হ্যাঁ, ঘটনাটা বাস্তবিকই জমাটে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস নাটিকাটা ভদ্রলোকরা খাবে।

গ্রাইমস ভূমিকাটার কথা আপনাকে—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে মিস চেরি বলে উঠল—মিঃ হার্ট, গ্রাইমস-এর চরিত্রটা আমার একেবারে মন-পসন্দ হয়েছে।

বব হার্ট সামনের দিকে ঝুঁকে অত্যুগ্র-আগ্রহান্বিত হয়ে বলে উঠল—আপনার পছন্দ হয়েছে? গ্রাইমস-এর চরিত্রটা আপনার মনে দাগ কাটতে পেরেছে?

হ্যাঁ, সে কথাই তো বলতে চাইছি। আর এ চরিত্রটা আমাকে মানাবেও ভাল। আমি চরিত্রটাকে যথাযথ ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারব বলেই মনে করছি।

বব হার্ট-এর মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল।

মিস চেরি বলে চলল—মিঃ হার্ট, আপনার কাজ ইতিপূর্বে দেখার সুযোগও আমার হয়েছিল। তাছাড়া অন্য ভূমিকাতেও আপনি যে ভেল্‌কি দেখাতে পারেন তা-ও আমার অজানা নয়।

আমি কিন্তু গ্রাইমস-এর ভূমিকাটা সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে এসেছি, মিস চেরি।

অবশ্যই-অবশ্যই! কিন্তু একটা কথা হচ্ছে, ব্যবসাটা ব্যবসাই।

আমতা আমতা করে বব হার্ট বলল—সে তো নিশ্চয়ই।

একটা কথা, বর্তমানে আপনি যে অভিনয় করছেন তার জন্য সপ্তাহে দক্ষিণা কত পান, দয়া করে বলবেন কি?

দু'শ। সপ্তাহে দু'শ।

আর আমি অভিনয় করে সপ্তাহে পাই একশ'। মেয়েদের মোটামুটি এরকমই দেওয়া হয়। তা দিয়েই আমি ঘর ভাড়া ও অন্যান্য খরচ চালিয়ে নিই।

হুম্!

দেখুন মিঃ হার্ট, রঙ্গমঞ্চের ব্যাপারটা ঠিকই আছে। আমি তাকে পছন্দ করি। এ ছাড়া আরও কিছু আছে যাকে আমি আরও অনেক, অনেক বেশী পছন্দ করি।

কি? সেটা কি মিস চেরি?

গ্রাম্য পরিবেশে ছোট্ট একটা বাড়ি, যা আজ না হোক কাল হবেই হবে। প্লিপাথ পাহাড়ে থাকবে মুরগির ছানা, আর ছ'টা হাস উঠোনে চরে বেড়াবে। আবেগ মথিত গলায় মিস চেরি কথাগুলো বলল।

তবে শুনুন, মিঃ হার্ট, আমি কিন্তু একজন রীতিমত ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি সম্পন্ন মানুষ। এবার মোদ্দা কথাটা শুনুন, আপনার বিপরীত চরিত্রে অভিনয় করার জন্য যদি সত্যি সত্যি আমাকে নির্বাচন করেই থাকেন তবে আমি অবশ্যই অভিনয় করতে রাজি আছি।

বব হার্ট-এর মুখের হাসির রেখা আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠল।

মিস চেরি এবার বলল—আমার কিন্তু এ বিশ্বাসটুকু অবশ্যই আছে যে, আমাদের দুজনের আন্তরিক প্রচেষ্টায় নাটকটা বাস্তবিকই জমজমাট হয়ে উঠবেই। আর এটা চলবেও ভাল।

সে তো নিশ্চয়ই।

তবে এ ব্যাপারে আমার আরও কিছু বক্তব্য আছে মিঃ হার্ট। অন্য সব মেয়েরা যেমন অফিস-আদালত ও দোকানে কাজ করে অর্থোপার্জনের জন্য, আমিও ঠিক একই কারণে গায়ে-মুখে রঙ মেখে রঙ্গমঞ্চে নামি। একদিন না একদিন আমার কদর ফুরিয়ে যাবে, সে দিনের জন্য আমাকে কিছু কিছু করে সঞ্চয় করতেই হবে। অমিতব্যয়ী অভিনেত্রীদের জন্য যেসব 'বৃদ্ধ-আশ্রম' বা 'বৃদ্ধ-আবাস' আছে সে সব আমার জন্য নয়, সে সবে আমার দারুণ অনীহা।

আমার সাফ কথা শুনুন মিঃ হার্ট, আপনি যদি আমাকে নিয়ে অংশীদারী কারবারে নামতে আগ্রহী থাকেন তবে আমি তাতে সম্মত। রঙ্গনাটিকার ব্যাপার-স্যাপার সম্বন্ধে আমার কিছুটা বিশ্বাস আছে।

হুম!

আমার ইচ্ছা, সে রকমই একটা দল গড়ে উঠুক। দু'পয়সা রোজগারের জন্য আমি রঙ্গমঞ্চে নামতে উৎসাহী হয়েছিলাম, আপনাকে আমার মনের কথা বোঝাতে পারছি কিনা জানি না।

ঠিক আছে, আপনি বলে যান মিস চেরি।

মিস চেরি নিজের চেয়ারটায় একটু নড়েচড়ে বসে এবার বলল—আমি ভবিষ্যতের জন্য কিছু কিছু সঞ্চয় করতে আগ্রহী তা-তো আপনাকে বললামই। এবার বলছি—আমি কে এবং কি, সেটা আপনার অবশ্যই জানা দরকার। যেসব রেস্তোরাঁ রাতভর খোলা থাকে সে সবে আমি ভুলেও পা দেই না। পথের ধারের অতিসাধারণ দোকান থেকে চা কিনে খাই। পাঁচটা সঞ্চয় ব্যাঙ্কে আমি টাকা জমিয়েছি এবং জমাচ্ছি। তারপরও শুনুন মিঃ হার্ট, রঙ্গমঞ্চের প্রবেশ-দ্বারে আমি ভুলেও কোন পুরুষের সঙ্গে কথা বলি না।

মিস চেরি, আপনার যাবতীয় মতামতই তো শুনলাম। 'কঠোরভাবে ব্যবসায়িক' কথাটা আমার টুপিতে স্পষ্টাক্ষরে লিখে রেখেছি। আমার মেক-আপ বাক্সটার গায়েও লেখা আছে। লং-আইল্যান্ড-এর উত্তর তীরে পাঁচ-পাঁচটা বাংলোর স্বপ্ন আমি চোখ দুটো বন্ধ করলেই দেখতে পাই। আর সে সব বাংলোর একটার দোলনা-চেয়ারে শরীরে এলিয়ে দিয়ে আমি দোল খাচ্ছি এরকম স্বপ্ন তো আমি আকছাড়ই দেখি। দোল খেতে খেতে আমি কতদিন যে স্ট্যানলির লেখা 'আফ্রিকার আবিষ্কার' বইটা পড়ছি এরকম স্বপ্নও আমি দেখি। আফ্রিকা নিয়ে তো আপনার মধ্যে কোনদিনই কৌতূহল ছিল না, তাই না?

অবশ্যই ছিল না। টাকা হাতে পেলে আমার প্রথম ও প্রধান কাজ ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া। আমি সামান্য যে বেতন পাই তার ভিত্তিতেই হিসাব করে দেখেছি, দশ বছরে আমার আয় হবে মাসে পঞ্চাশ ডলার। আর তা হবে একমাত্র সুদ থেকেই। আর মূলধনের কিছুটা অংশ তো আমি ছোট কোন কারবারে—যেমন টুপি সেলাই, বা বিউটি পার্লারে বিনিয়োগ করে বেশ কিছু পরিমাণ ডলার উপার্জনও করতে পারি।

দেখুন, আপনার পরিকল্পনাটা ঠিকই আছে। তবে যেকোন খ্যাতনামা অভিনেতাই উপার্জনের অর্থকড়ি উড়িয়ে না দিয়ে ভবিষ্যতের সম্বল হিসেবে কিছু সঞ্চয় করতে পারে। এ ব্যাপারে আপনার ব্যবসায়িক ও বৈষয়িক বুদ্ধির তারিফ না করে আমি পারছি না মিস চেরি।

তবে আপনি আমার যুক্তিটাকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করছেন?

অবশ্যই। তবে সে সঙ্গে এ-ও বলছি, আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী রঙ্গনাটিকা যদি চালানো যায় তবে কেবলমাত্র তা থেকেই আমরা উভয়ে আয়ের দ্বিগুণ অর্থ পেয়ে যাব।

নাটিকাটিকে এবার কিছু কাটছাঁট করে, সংলাপেরও কমবেশী পরিবর্তন ঘটিয়ে সেটাকে রীতিমত রোমহর্ষক ও আকর্ষণীয় করে তোলা হল। হার্ট অ্যান্ড চেরি কোম্পানীর নাটিকাটি পর্যন্ত দর্শককে আকর্ষণ করার ক্ষমতা সম্পন্ন হয়ে উঠল।

অভিনয়ের সময় আসল গুলি ভরা একটা আসল ৩২ ক্যালিভারের পিস্তল ব্যবহার করা হতে লাগল।

হেলেন গ্রাইমস্ একটা পশ্চিমী মেয়ে। দুঃসাহসী। তার বাবা এক ধনকুবের। তাঁর নাম আরাপাহো গ্রাইমস। তাঁর ব্যক্তিগত সচিবের পদে বহাল আছেন ফ্রাংক ডেসমন্ড।

হেলেন গ্রাইমস ফ্রাংক ডেসমন্ড-এর প্রেমে পড়ে রীতিমত খাবি খাচ্ছে।

তার বাবা আড়াই লক্ষ ডলারের মালিক। তার একটা বড়সড় পশু খামার আছে। দৃশ্যপট দেখে মনে হয় স্থানটা ব্যাডল্যান্ডস্, নইলে আমাগানসেট।

শিকারীর ও পায়ে ফেট্টিবাঁধা পোশাক পরিহিত এল. আই. ডেসমন্ড, আসলে সে মিঃ বব হার্ট সে নিজের বাড়ির ঠিকানা বলে নিউইয়র্ক শহর। ব্যাপারটা দর্শকদের মনে বিস্ময় সৃষ্টি করার মতই বটে। একটা পশু-খামারের মালিকের পায়ে এমন অদ্ভুত কায়দায় ফেট্টি বাঁধাই বা কেন?

আসলে এ ধরনের নাটক রাশিয়ার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত 'সিম্বেলিন' আর 'ব্লুবেয়ার্ড জুনিয়র' নাটকের মাঝামাঝি ঢঙে লেখা নাটক। আমরা স্বীকার করি আর না-ই বা করি এরকম নাটকই আপনার, আমার—সবারই পছন্দ।

'নেংটি ইঁদুর মাতবে খেলায়' নাটিকার পার্ট ছিল মাত্র আড়াইটে।

পার্ট দুটোর মধ্যে একটা মিঃ হার্ট আর একটা মিসেস চেরির। আর অবশিষ্ট আধখানা পার্ট নাট্যকর্মীদের মধ্যে যার যখন হাত খালি থাকে সে-ই চালিয়ে দেয়।

সে সব বিষয়ের আলোচনা এখন শিকেয় তুলে রাখা যাক। এবার রোমহর্ষক নাটকটার প্রসঙ্গে আসা যাক।

এক রাত্রে এনজাইনা পেক্টোরিস ব্যামোতে বুড়ো আরাপাহো পরলোকে পাড়ি জমাল। একমাত্র তার ব্যক্তিগত সচিব ছাড়া দ্বিতীয় কেউ-ই সেখানে উপস্থিত ছিল না।

খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেল খামারে তার জিম্মায় ছিল ছ' লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার ডলার। খামারের এক পাল পশু বিক্রি করে এ অর্থ সে পেয়েছিল।

আরপাহো গ্রাইমস দুনিয়া ছেড়ে যাওয়ামাত্র ডলারগুলোও খামার ছেড়ে চলে গেল। পশুর পাল বিক্রির সময় একমাত্র ব্যক্তিগত সচিব ডেসমন্ড সেখানে উপস্থিত ছিল। তবে ডলারগুলো কে হাতিয়ে নিয়েছে?

আরে আসল ব্যাপারটা তো তা-ই। হেলেন গ্রাইমস অবিবেচনার একেবারে শেষ ধাপে পৌঁছে গেল। তার দৃঢ় বিশ্বাস, ফ্রাঙ্ক ডেসমন্ড কেবলমাত্র একজন পয়লা নম্বরের প্রবঞ্চকই নয়, একজন টাকার কুমিরও বটে।

এক দানে একেবারে ছ' লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার ডলার আর অশ্বারোহীর সাজে সজ্জিত প্রেমিককে হারালে যেকোন সুস্থ-স্বাভাবিক মেয়েরই মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটারই কথা।

খামার-বাড়ির লাইব্রেরীতে তারা দাঁড়িয়ে।

হেলেন ধরেই নিয়েছে, ফ্রাংকই টাকাগুলো হাতিয়েছে। সেখানে আর কে ছিল যে এতগুলো ডলার গায়েব করেছে?

হেলেন সব রকম বিচার বিবেচনার সীমা ছাড়িয়ে ক্রোধবশতঃ-এর ওপর রীতিমত হম্বিতম্বি শুরু করল—তুমি বিশ্বাসঘাতক, তুমি ডাকাত-চোর—তোমার কপালে এ শাস্তিই লেখা ছিল।

কথা বলতে বলতে সে ক্রোধবশতঃ হেঁচকা টানে ৩২ ক্যালিবারটা বের করে ফেলল। পিস্তলটা বের করে তার দিকে উঁচিয়ে ধরল। পর মুহূর্তেই সেটাকে নামিয়ে নিয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল—না, আমি তোমাকে দয়া করব। তোমাকে না মেরে বাঁচিয়ে রাখব। আর এটাই হবে তোমার কৃতকর্মের শাস্তি।

হাতের পিস্তলটাকে কোমরে গুঁজতে গুঁজতে এবার বলল—তোমাকে আমি দেখিয়ে দিতে চাই কত সহজে তোমাকে আমি যমালয়ে পৌঁছে দিতে পারি যা তোমার অবশ্যই প্রাপ্য।

এবার ম্যান্টেলের ওপরের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে বলল—ওটার ওপর আমার ছবিটা রয়েছে। যে গুলিটা তোমার বুকে গেঁথে দিতে পারতাম সেটা দিয়েই ওই সুন্দর মুখটাকে আমি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেব।

হ্যাঁ, সে তা করলও বটে। হেলেন-এর ছোঁড়া পিস্তলের গুলিটা ফটোগ্রাফের মুখটাকে ছিন্নভিন্ন করে দিল। ফটোগ্রাফটাকে ভেদ করে গুলিটা দেওয়ালের স্লাইডিং প্যানেলের অদৃশ্য স্প্রিংটার ওপরে দুম্ করে আঘাত হানল।

আরে বাপ্স! এ কী অত্যাশ্চর্য, একেবারে অবিশ্বাস্য কাণ্ড! প্যানেলটা স্থানচ্যুত হওয়ামাত্র ছ'

লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার ডলারের গোছাটা দুম্ করে মেঝেতে পড়ে গেল। কেবল নোটের গোছাই নয়, ব্যাগভর্তি সোনাও সশব্দে মেঝেতে আছাড় খেয়ে পড়ল।

হ্যাঁ, ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য হলেও কি করে ঘটল তা আপনাদের জানা আছে।

মিস চেরি তার বোর্ডিং হাউসের ছাদে পুরো দুটো মাস ধরে নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করে পিস্তল থেকে গুলি করা অনুশীলন করছিল। ফলে তার লক্ষ্যভেদটা একেবারে নিখুঁত হয়ে যায়।

আসলে বুড়ো আরা পাহোই ডলারের গোছা ও সোনা-দানার থলেটাকে গোপন স্থানে লুকিয়ে রেখেছিল।

আর জ্যাক? সে তার প্রাপ্য বেতন ছাড়া একটা কানাকড়িও নেয় নি।

এভাবেই বব হার্ট এবং মিস চেরির 'নেংটি ইঁদুর মাতবে খেলায়' রঙ্গ নাটিকাটি যখন নিখুঁত হয়ে ওঠে তখন তারা একটা বড়সড় রঙ্গমঞ্চ ভাড়া নেবার জন্য চেষ্টা করতে লাগল। পেয়েও গেল।

নাট্যানুষ্ঠান দেখার জন্য নাট্যশালায় দর্শক যেন একেবারে উপচে পড়তে লাগল।

প্রদর্শনী শেষ হতে না হতেই বুকিং এজেন্টরা ব্ল্যাঙ্ক চেকে স্বাক্ষর করে বব হার্ট ও মিসেস চেরির কলম ধরিয়ে দিতে লাগল। প্রতি সপ্তাহে পাঁচশ' ডলার করে আমদানি হতে লাগল।

বব হার্ট নাট্যশালা থেকে বেরিয়ে মিসেস চেরিকে তার হোটেলের দরজায় পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিতে চাইল।

মিসেস চেরি তাকে বলল—মিঃ হার্ট, একটু ভেতরে চলুন। এতদিন পর আমাদের হাতের মুঠোয় যে সুযোগটা এসেছে তার পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করা দরকার। আমাদের অনেক, অনেক ডলার জমাতে হবে। সাধ্যমত খরচ খরচা কমিয়ে যত বেশী সম্ভব অর্থ জমাতে হবে।

হ্যাঁ, কথাটা ঠিকই বলেছেন মিসেস চেরি, নাটক করাটা আমার কাছেও একটা ব্যবসায়ের সামিল। আপনার ইচ্ছা ডলার জমিয়ে জমিয়ে পাহাড় তৈরী করে ফেলতে, আর আমার ইচ্ছা মনের মত একটা বাড়ি তৈরী করতে। আর যত বেশী ডলার জমানো যায় সে দিকে আমি অবশ্যই সজাগ থাকব।

মিঃ হার্ট মিনিট খানেকের জন্য ভেতরে চলুন। আপনার সঙ্গে একটা পরামর্শ করা দরকার যাতে আমাদের খরচ অনেকাংশে কমে যেতে পারবে, যার ফলে আপনার মনের মত বাড়ি তৈরীর লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেন আর আমার ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার কাজেও আমাকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারবেন। সব কিছুই কিন্তু ব্যবসায়িক ভিত্তিতেই করা সম্ভব।

নিউইয়র্ক শহরে এক নাগাড়ে দশ-দশটা সপ্তাহ ধরে 'নেংটি ইঁদুর মাতবে খেলায়' নাটিকাটা আশাতীত দর্শক সমাগমের মধ্য দিয়ে অভিনীত হল।

দশ সপ্তাহ পরে শুরু হল ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী। এক নাগাড়ে দু' বছর ধরে প্রদর্শনী চলার পরও তার জনপ্রিয়তা এতটুকুও হ্রাস পেল না। যখন, যেখানেই নাট্যানুষ্ঠান হোক না কেন যেন দর্শকের ঢল নামে।

নাটকটা সম্বন্ধে অনেক কথাই তো বলা হল। এবার আসল কাহিনীটা সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যাক—

'নেংটি ইঁদুর মাতবে খেলায়' নাটকটি দ্বিতীয় মরশুমে আবার নিউইয়র্কে ফিরে এল। এবারের লক্ষ্য গ্রীষ্মকালীন মঞ্চে আর ছাদের বাগানে অনুষ্ঠান করার জন্য।

টিকিটের দাম অস্বাভাবিক রকম বাড়িয়ে দিলেও বুকিং-এর দিক থেকে এতটুকুও ঘাটতি দেখা গেল না।

এদিকে বব হার্ট বাড়িটার দাম প্রায় শোধ করে দিল। আর মিস চেরি-র ব্যাংকে জমার পরিমাণও পর্বতপ্রমাণ হয়ে উঠল।

আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, আমি এতগুলো কথা বললাম—রঙ্গমঞ্চের কর্মীদের অধিকাংশই ভেতরে ভেতরে বহু রকম উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন, সাধারণ মানুষ ঠিক যেমন প্রেসিডেন্ট হতে উৎসাহী হয়, মুদি দোকানের কেরানি যেমন ফ্ল্যাটবুশ-এ একটা বাড়ি কিনতে চায়।

তাই বলছি কি, যা বলছি ধৈর্য ধরে শুনুন—

দ্বিতীয় মরশুমে নিউইয়র্ক শহরের নব নির্মিত ওয়েস্ট ফেলিয়া রঙ্গমঞ্চে 'নেংটি ইঁদুর মাতবে খেলায়' নাটকটি অভিনয় শুরু হবার প্রথম রজনীতেই মিসেস চেরি কেমন যেন অস্বাভাবিক আবেগে ডগমগ হয়ে পড়ল।

অভিনয় চলার সময় মেন্টেলার ওপরে রাখা পশ্চিমী সুন্দরীর ছবিটাকে লক্ষ্য করে মিসেস চেরি পিস্তল থেকে গুলি ছোঁড়ামাত্র উত্তপ্ত সিসার গুলিটা গিয়ে বব-এর গলার বাঁ দিকের নিচে আঘাত করল।

গুলিটা যে সেখানে এসে লাগবে সেটা না জেনেও বব রীতিমত নিখুঁতভাবে ঢলে মঞ্চে পড়ে গেল।

আর এদিকে মিসেস চেরিও শিল্পীসুলভ ভঙ্গীতেই মঞ্চে আছাড় খেয়ে পড়ে গিয়ে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল।

দর্শকরা ধরেই নিল যে, তারা একটা বিয়োগান্ত নাটক দেখার বদলে একটা হাসির নাটকই দেখছে, যেখানে নায়ক-নায়িকা বিয়ের মালা গলায় পরবে, নতুবা পরস্পরের মিলন ঘটবে। তাই তো তারা জোরে জোরে করতালি দিয়ে নায়ক-নায়িকাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে নাটকটি উপভোগ করতে লাগল।

বাঁশি বেজে উঠল। দ্রুত যবনিকা পড়ে গেল।

যবনিকা পতন ঘটামাত্র দু'জন দৃশ্যপট পরিবর্তনকারী-কর্মী বব আর মিস চেরিকে মঞ্চ থেকে বের করে নিয়ে গেল।

তারপর নাটকের অবশিষ্টাংশ যথারীতি অভিনীত হল।

রঙ্গমঞ্চের কর্মীরা প্রধান ফটকের কাছে একজন তরুণ চিকিৎসককে পেয়ে গেল। তারা তাঁকে অনুরোধ করে নাট্যশালার ভেতরে নিয়ে এল।

চিকিৎসক ববকে পরীক্ষা করে সরবে হেসে উঠল। চিকিৎসক পরীক্ষা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন—দেখুন, মিঃ হার্ট নিজের নামটাকে খবরের কাগজের শিরোনাম হিসেবে তুলতে সক্ষম হলেন না। পিস্তলের গুলিটা আর মাত্র দু' ইঞ্চি বাঁ দিকে আঘাত হানলেই ক্যারোটিড ধমনীটাই ছিঁড়ে দু'টুকরো হয়ে যেত। বরাত ভাল সে এ যাত্রায় প্রাণে বেঁচে গেছেন।

এ পর্যন্ত বলে চিকিৎসক এদিক-ওদিক তাকিয়ে আবার বলতে শুরু করল—আপনারা বরং এক কাজ করুন, মেয়েদের কাছ থেকে এক চিলতে ন্যাকড়া জোগাড় করতে পারেন কিনা চেষ্টা করে দেখুন। সেটা দিয়ে ক্ষতস্থানটা বেঁধে একে বাড়ি নিয়ে যান। তারপর কোন একজন ডাক্তারকে নিয়ে একটা ব্যান্ডেজ করিয়ে নিলেই তিনি মোটামুটি সুস্থ হয়ে উঠবেন।

চিকিৎসক বিদায় নিলে বব মুখ তুলে তাকাল। এখন সে অনেক সুস্থবোধ করছে।

মুহূর্তকাল পরেই বব-এর কাছে ভবঘুরে বাজিকর ভিনসেন্ট। সে গম্ভীর প্রকৃতির, ব্র্যাটলবরো ভিটির অধিবাসী। স্যাম্ গ্রিগস্ বলে সবাই তাকে ডাকে।

শহরে খেলা দেখানোর সময়ই স্যাম্ দুটো মেয়েকে খেলনা আর আখের গুড় পাঠিয়ে দেয়।

স্যাম বর্তমানে ভিনসেন্ট নামে 'হার্ট অ্যান্ড চেরি' দলের সঙ্গে থেকে খেলা দেখায়। স্যাম গম্ভীর স্বরে বলল—মিঃ হার্ট, বরাত ভাল যে আরও খারাপ হয়নি।

হার্ট ম্লান হাসল।

স্যাম এবার ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বলল—আরে ওই বেঁটেখাটো মহিলাটা তো আপনার চিন্তায় পাগল হয়ে যাবার জোগাড়।

কে? কার কথা বলছ?

কার কথা? রসিকতা করা হচ্ছে? কিচ্ছু বুঝতে পারছেন না? আরে মশাই, মিসেস চেরি, চেরির কথা বলছি।

তিনি এখন কোথায়?

ম্যানেজার আর তিনটে মেয়ে মিলে তাকে সামলাচ্ছেন।

এটা তো নিছকই একটা দুর্ঘটনা ছাড়া কিছু নয়। মিসেস চেরির মনটা হয়ত ভাল ছিল না। তাই এরকমটা ঘটে গেছে। এর মধ্যে কোন ভুল বোঝাবুঝি বা মন কষাকষির ব্যাপার নেই।

চিকিৎসক কি বলে গেছেন?

আঘাতটা মোটেই গুরুতর নয়। দিন তিনেকের মধ্যে আবার মঞ্চে নামতে পারব। স্যাম্ কিছুটা স্বস্তি পেল।

বব এবার বলল—তুমি গিয়ে তাকে বল, দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই।

মশাই, আপনি কি দাবার ঘুঁটি, নাকি মানুষের দেহধারী পিনকুশন? আপনার জন্য মেয়েটা কেঁদেই অস্থির, বুকফাটা আর্তনাদ করছে।

কী সর্বনাশ!

সর্বনাশ তো অবশ্যই। তিনি কেবলই 'বব, বব' বলে বুক চাপড়াচ্ছেন আর 'হায় ঈশ্বর, হায় ঈশ্বর' করছেন। তাঁরা জোর করে তাঁকে আটকে রেখেছেন, কিছুতেই আপনার কাছে আসতে দিচ্ছেন না।

তার এমন করে ভেঙে পড়ার কারণ কি, বুঝছি না তো? তবে সে বড্ড বেশী ব্যবসায়িক।

স্যাম নীরব রইল।

বব আবার বলতে শুরু করল—মাত্র তো তিনটে দিনের ব্যাপার। তিন দিনের মধ্যেই তো আবার নাটকটা শুরু হয়ে যাবে।

স্যাম এবার মুখ না খুলে পারল না—অপরাধ নেবেন না, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, আপনি অন্ধ, মাথায় কিচ্ছু নেই।

বিস্ময় মিশ্রিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে বব স্যাম-এর মুখের দিকে তাকাল।

স্যাম বলে চলল—হ্যাঁ, আপনি অন্ধই বটে। মেয়েটা আপনাকে মনে-প্রাণে ভালবেসে ফেলেছে। আপনি এসবের কিছুই বুঝতে পারছেন না?

মিস চেরি আমাকে ভালবাসে! সে আমাকে ভালবাসে—বলছ কি! সে—কিন্তু এ যে সম্ভব নয়—অবিশ্বাস্য!

আপনি যদি তাঁর আকুল আর্তনাদ একটা বারও নিজের কানে শুনতেন, তাঁর পরিস্থিতিটা নিজের চোখে দেখতেন তবে আর এমন অবাক হতেন না।

সে কী? এ যে ভাবাই যায় না! একেবারেই অসম্ভব? এমন কিছু তো আমি ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারি নি।

দেখুন, কোন মানুষের পক্ষে এত বড় ভুল করা সম্ভব নয়। আপনার প্রেমে সে দেউলিয়া, মনে করতে পারেন পাগলই হয়ে গেছে। আমি ভেবে পাচ্ছিনে—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই বলে উঠল—কি? কি ভেবে পাচ্ছ না স্যাম?

আমি ভেবে পাচ্ছিনে, আপনি এত বড় অন্ধ হলেন কি করে মিঃ হার্ট!

হায় ভগবান! এ কী হয়ে গেল। কিন্তু স্যাম দেরী হয়ে গেছে, বড্ড দেরী হয়ে গেছে। এটা হতেই পারে না—একেবারেই অসম্ভব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, নির্ঘাৎ তোমার কোথাও না কোথাও ভুল হচ্ছে।

কিন্তু আমিই নিঃসন্দেহ মিঃ হার্ট, সে আপনাকে মনে-প্রাণে ভালবাসে। আপনার জন্যই কেঁদে আকুল হচ্ছে। আপনি কি জানেন, আপনাকে মনে-প্রাণে ভালবাসার জন্য তিন-তিনজনের সঙ্গে তলে তলে লড়াই করে চলেছে।

আমাকে ভালবাসার জন্য! কিন্তু আমি তো তোমাকে বলেইছি বড্ড দেরী হয়ে গেছে। সত্যি বড্ড দেরী হয়ে গেছে।

স্যাম বিস্ময় মাখানো দৃষ্টিতে বব-এর মুখের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইল।

বব ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে স্যাম-এর কাঁধে হাতটা তুলে দিল। তার কাঁধে মৃদু চাপ দিয়ে বলল—আরে ভায়া, দু'বছর আগেই তো চেরি আর আমার বিয়ের পাট চুকে গেছে।

দ্য ডে রেসারজেন্ট

সব সময়ই ব্যাপারটা আমার চোখে পড়ে, একজন চিত্রশিল্পী ইস্টার-এর ছবি আঁকতে বসলেই পেন্সিলের পিছন দিকটা অনবরত কামড়াতে থাকে। কারণ, হ্যাঁ, কারণ তো অবশ্যই আছে। কারণ হচ্ছে, ওই উৎসবের সঙ্গে যে সব মূর্তি জড়িত তাঁদের সম্বন্ধে তার যে সম্যক ধারণা রয়েছে তার সংখ্যা মাত্র চার।

তাদের মধ্যে সবার আগে মনের কোণে উঁকি দেয় বসন্তের পৌত্তলিক দেবী ইস্টার-এর রূপ-চেতনা।

দেবী ইস্টার এক রূপসী যুবতী। মাথায় ঢেউ-খেলানো একগোছা সুন্দর চুল, অলঙ্কারাদি শোভিত পদাঙ্গুলি—এটুকুই তো যথেষ্ট। এর জন্য স্বনামধন্যা মডেল রূপসী মিস ক্লারিস সেন্ট ভাবাসুর হলেই তো অনায়াসেই কাজ মিটে যেতে পারে।

আর দ্বিতীয়—প্রস্ফুটিত পদ্মে উপবিষ্টা উর্দ্ধনয়না বিষণ্ণতার প্রতিমূর্তি এক নারী। সত্যি কথা বলতে কি, পত্রিকার প্রচ্ছদের ব্যাপারেও এর ওপর অবশ্যই নির্ভর করা যেতে পারে।

তৃতীয়-পঞ্চম এভিনিউতে ইস্টার রবিবারের ভক্তদের শোভাযাত্রায় মিস হান্টানা-র কথা ভাবা যেতে পারে।

চতুর্থ-ম্যাগি মারফি—গ্র্যান্ড স্ট্রীট প্রদর্শনীর ম্যাগির কথা বলছি। পুরনো খড়ের চওড়া টুপির মাথায় টকটকে লাল একটা ফুল গোঁজা। মুখে খুশির প্রলেপ মাখানো।

সেসব ছবিতে খরগোস স্থান পাক আর না-ই পাক তার জন্য কোন পরোয়া নেই। আর ইস্টার-এর ডিমের প্রসঙ্গে একই কথা বলা চলে। উন্নতমনা সমালোচকরা তো ডিমের ব্যাপারটাকে বাদই দিয়ে দিয়েছেন।

সত্যি কথা বলতে কি, ইস্টার উৎসব সম্বন্ধে আপনারা অবশ্যই সম্যক ধারণা নিতে পারবেন ড্যানি ম্যাক্রি-র রচনা অনুসরণ করলে।

শনিবার থেকে সোমবারের মধ্যে যেন কোন একটা দিনে ক্যালেন্ডারের পাতায় ইস্টার রবিবারের আনন্দোচ্ছল দিনটা দেখা যাবে।

পাঁচটা চব্বিশ মিনিটে সূর্যদেব আত্মপ্রকাশ করল। তাকে অনুসরণ করে ড্যানিও সকাল দশটা ত্রিশ মিনিটে বিছানা ছাড়ল।

ফ্ল্যাটের সামনের দিককার ঘরে তার বাবা আরাম কেদারায় শরীর এলিয়ে দিয়ে চুরুট টেনে চলেছে। আর তার মা রান্নাঘরে শূকরের মাংস ভাজছে।

ড্যানির বাবা দু' বছর আগে এক বিস্ফোরণে চোখ দুটো হারিয়েছে সত্য, কিন্তু সে চুরুটের নেশাটা ছাড়তে পারে নি।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় অন্ধরা ধূমপানে আগ্রহী হয় না। এর কারণ কি? কারণ একটাই, ধোঁয়ার খেলটা দেখতে পায় না বলে।

আজ ইস্টার উৎসব। আমদানি বাড়ির মালগাড়ির চালক ড্যানি খুঁজে খুঁজে 'সাবাথ' উৎসবের উপযোগী তার সবচেয়ে ভাল পোশাক গায়ে চাপিয়ে সেজে নিল।

বুড়ো ম্যাক্রি কণ্ঠস্বরে কিছুটা উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বলল—ড্যানি, আজ, উৎসবের দিনে তুমি যে একটু হলেও বাইরে যাবেই তা-তো আমি জানিই।

ড্যানি জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তার মুখের দিকে তাকাল।

বুড়ো ম্যাক্রি বলে চলল—আজ রবিবার, ইস্টার উৎসবের দিন, কী মনোলোভা হাওয়া বইছে! চারদিক কী মনোরম সাজে সেজেছে।

আমি কেনই বা বাড়ির বাইরে যাব না, বলতে পার? আমি কি একটা ঘোড়া নাকি যে, ঘরের কোণে বেঁধে রাখবে? হপ্তায় একটা দিন মাত্র বিশ্রাম পাই। বাড়ি-ভাড়ার টাকা, সবেই তো সকালের জলখাবার খেলে। টাকাগুলো কে রোজগার করে এনেছে, খোঁজ রাখ?

আরে বাবা, এমন চটাচটি করছিস কেন? আমি তো আর তোকে বারণ করছি না। আমার যখন

চোখ দুটো ছিল তখন তো এক-এক রবিবার আমার কাছে অমূল্য বিবেচিত হত। সেদিন বিকেলের দিকে বেড়াতে না বেরোলে স্বস্তিই পেতাম না। আমার সঙ্গী তো চুরুটই আছে। এমন আনন্দ মুখর দিনে তোমারও সে একটু-আধটু বিশ্রাম দরকার, তা কি আমি বুঝি না?

মুহূর্তের জন্য নীরব থেকে এক সময় দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বুড়ো ম্যাক্রি বলল—বাছা, আজ তোর মা যদি পড়তে পারত তবে জলহস্তীর বাকি কথাগুলো আমি শুনতে পেতাম। যাক গে, সে যা হয় হবে।

ড্যানি রান্নাঘরের গা দিয়ে যেতে যেতে তার মাকে বলল—মা, তিনি জলহস্তীর কথা বলছেন, ব্যাপার কি, তুমি কি বাবাকে নিয়ে চিড়িয়াখানা দেখতে গিয়েছিলে?

কই, আমি তো নিয়ে যাই নি। তিনি তো দিনভর জানালার ধারেই বসে কাটান।

একজন অন্ধ আর গরীব মানুষের পক্ষে এটুকুই তো যথেষ্ট। আমার বিশ্বাস, যারা চোখে দেখতে পায় না তারা মনে-মনেই হাঁটাহাঁটি করে। চোখ দুটো যখন ছিল তখন ওর চেয়ে ভাল মানুষ, ওর চেয়ে শক্তিধর সচরাচর চোখেই পড়ত না। বাছা, আজকের দিনটা বড় ভাল। সকালটা একটু বেড়িয়ে সময় কাটিয়ে এসো। সন্ধ্যায় আমি সাধ্যমত ভাল খাবার জোগাড় করে রাখব।

সদর দরজার কাছে দারোয়ানকে পেয়ে ড্যানি তাকে জিজ্ঞাসা করল—জলহস্তীর কথা তুমি কিছু শুনেছ কি দারোয়ানজী?

কই না তো। কিছুই শুনি নি। আপনি কি জলহস্তী ভাড়া করছেন?

আরে না-না। বুড়ো মানুষটা বলেছিল। এমনি হয়ত বলেছে।

ড্যানি হাঁটতে হাঁটতে শহরের কেন্দ্রস্থলে যেখানে আধুনিক ইস্টার উৎসব পালন করা হয় সেখানে হাজির হল।

আকাশচুম্বী গীর্জাগুলো থেকে আনন্দ-সঙ্গীত ভেসে আসছে। হয়ত ফুলের মত তাজা সুন্দরী মেয়েরা এমন মধুর স্বরে গান গাইছে।

আরও সামান্য এগিয়ে ড্যানি পুলিশ-অফিসারের দেখা পেল। নাম তার করিগান। সে তার পূর্ব পরিচিত।

করিগানকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সে জানতে পারল, এটা মোটেই ইস্টার-উৎসব না, বার্ষিক উৎসব।

একমাত্র নিউইয়র্কেই এরকম জাঁকজমকের সঙ্গে বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। আর এর সঙ্গে রাজনীতির নাম গন্ধও নেই।

তৃতীয় ডেপুটি কমিশনারের ভঙ্গীতে কথাটা ড্যানির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে পুলিশ অফিসার করিগান থামল।

ড্যানি তার এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। তাই তার বাচন ভঙ্গীটাকে গায়ে মাখল না।

করিগান নীরবে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ড্যানি তার দিকে সামান্য এগিয়ে গিয়ে অত্যুগ্র আগ্রহ প্রকাশ করে বলল—তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করার ছিল।

কি? কি কথা? কি জানতে চাইছ?

জলহস্তীর ব্যাপারে কিছু শুনেছ কি?

জলহস্তী? ধ্যুৎ! সমুদ্রের কচ্ছপের চেয়ে বড় কোন প্রাণীর কথা জানা নেই।

হুম! প্রায় অস্ফুটস্বরে শব্দটা উচ্চারণ করে ড্যানি আবার হাঁটতে আরম্ভ করল।

কিছুটা পথ পাড়ি দেবার পর সে আপন মনে ভাবতে লাগল—আজ রবিবার, আর সে সঙ্গে ইস্টার-উৎসবের দিন—একই সঙ্গে দু' দুটো আনন্দের সুযোগ। এমন অপূর্ব একটা ছুটি কিছুতেই হাতছাড়া করা যায় না।

ড্যানি হাঁটতে-হাঁটতে দুগান-এর কাফেতে পৌঁছে গেল। ভেতরে ঢুকে সে সোজা পিছনের একটা ফাঁকা ঘরে গিয়ে বসল। ফুরফুরে বাতাসে কিছু সময় বসার পরই তার দেহ-মন জুড়িয়ে গেল।

একটু বাদে ওয়েটারকে কাছে পেয়ে ড্যানি বলল—টিম, বলতো লোকে কেন ইস্টার উৎসব

পালন করে?

টিম তার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে এক নাগাড়ে কি যে সব বকবক করে গেল যার বিন্দু বিসর্গও সে বুঝতে পারল না।

দুগান-এর কাফে থেকে বেরিয়ে ড্যানি হতাশ মনে আবার পথে নামল। সে আবার হারা উদ্দেশ্যে পথ পাড়ি দিতে লাগল।

একটা মোড় পেরিয়ে সে এভিনিউ এ-তে হাজির হল। এভিনিউএ-র ধারেই কেটি কনলন-এর বাড়ি।

আরও একটা ব্লক পেরোতেই ড্যানির কনলন-এর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল।

কেটি কনলন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গীর্জায় যাচ্ছে।

ড্যানিকে দেখেই কেটি হাসতে হাসতে বলল—কি হে, তুমি যে সাজগোজ-করা ঢিবির মত হয়ে গেছ! তোমার কি হয়েছে, বল তো? ড্যানি নীরবে ম্লান হাসল।

কেটি বলল—এক কাজ কর, আমার সঙ্গে গীর্জায় চল। সেখানে গেলে আনন্দ পাবে।

গীর্জায়? আচ্ছা, সেখানে তোমরা কেন যাও, বল তো?

চোখ দুটো কপালে তুলে কেটি বলে উঠল—এ কী কথা বলছ হে! আজ যে ইস্টার রবিবার, তুমি জান না?

এই ইস্টার-এর অর্থ কি কেটি?

কেটি আমতা আমতা করতে লাগল।

বিষণ্ণ মুখে ড্যানি বলল—তুমিই শুধু নও কেটি, আমার বিশ্বাস ইস্টার-এর অর্থ কেউ-ই জানে না।

আরে তোমার মত কেউ বোকা হাঁদা আর কানা নয় ড্যানি। আমার মাথায় নতুন ঝকঝকে টুপিটার দিকে ভুলেও তাকালে না! আর এ ঝলমলে স্কার্টটা।

হ্যাঁ, সে তো দেখতেই যাচ্ছি।

আরে বোকা হাঁদা, এ সময়ই তো সবাই নতুন আর ঝলমলে পোশাক পরে, গীর্জায় যায়।

যত বোকা হাঁদাই হই না কেন তোমাকে দেখে অন্তত এটা বুঝতে পারছি।

যাক গে, তুমি আমার সঙ্গে এখন গীর্জায় যাচ্ছ তো?

ড্যানি ম্লান হেসে বলল—যাব, অবশ্যই যাব। তবে তোমার নতুন টুপি আর স্কার্টটার জন্য অবশ্যই নয়।

কেটির সঙ্গে ড্যানি গীর্জার প্রার্থনা কক্ষে হাজির হল।

প্রার্থনা-পর্ব সাঙ্গ হলে গীর্জার বৃদ্ধ পুরোহিত অনেক কথা আলোচনার মাধ্যমে বুঝিয়ে দিলেন। তার বক্তব্যে একটা কথাই বার বার উচ্চারিত হল—পুনরুত্থান। না, নতুন সৃষ্টি নয়। পুরাতনের ভেতর থেকেই নতুনের আবির্ভাব, নব জীবনের উত্থান।

গীর্জার প্রার্থনা শেষ হলেও ড্যানি সেখানে দাঁড়িয়েই রইল। আর কেটি চোখের তারায় ক্ষোভের ছাপ এঁকে তার দিকে কটমট করে তাকাতে লাগল।

কেটি এক সময় মুখ না খুলে আর পারল না। সে বলল—ড্যানি, তুমি আমার সঙ্গেই বাড়ি যাচ্ছ তো? তবে আমি কিন্তু একাই যেতে পারব। কিন্তু তোমার সঙ্গে সুবিধামত কোথাও দেখা করতে পারব কি?

ড্যানি বাঁ দিকে বাঁক ঘুরে পথটা পাড়ি দিতে দিতে বলল—প্রয়োজনে বুধবার রাত্রেই যেতে পার।

কেটি রাগে গস্‌গস্‌ করতে করতে এগিয়ে চলল।

এদিকে ড্যানি লম্বা লম্বা পায়ে দুটো ব্লক অতিক্রম করে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার বুকের ভেতরে সমুদ্রের উন্মাদনা চলছে। প্রেয়সীর আহ্বানের চেয়েও এ উন্মাদনা অধিকতর প্রবল। কারণ, গত বছরটা তো কেটির রূপ-সৌন্দর্য তাকে বেঁধে রেখেছিল। সে কি তার দিক থেকেও বীতশ্রদ্ধ হয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয় নি? কিন্তু তার বুকের ভেতরে যে কিসের উন্মাদনা বিরাজ করছে তা সে নিজেই কিছু বুঝতে পারছে না।

পথের ধারেই দাঁড়িয়েই ড্যানি মহা উল্লাসে নিজের থাইয়ের ওপর আচমকা একটা চাপড় মেরে আপন মনে বলে উঠল—জলহস্তী! সেটাই কি তোমাকে ব্রনস্ক-তে পাঠিয়ে দেবে না? বহুদিন আগে শোনা এ শব্দটা আজও তার স্পষ্ট মনে আছে।

সে একটা গাড়ি ধরে আবার পিছন দিকে চলতে লাগল। বুড়ো ম্যাক্রি এখনও জানালার ধারে বসেই চুরুট থেকে সমানে ধোঁয়া ছেড়ে যাচ্ছে।

সে ক্ষুব্ধস্বরেই অনুচ্চ কণ্ঠে বলতে লাগল—এ বাড়িটার ভাড়া কে মেটায়, খাবার দাবারই বা কে সংগ্রহ করে?

তারপর চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে আবার বলতে লাগল—আমি কি ভেতরে ঢোকার অধিকারও পাব না? বুড়ো ম্যাক্রি ঠোঁট থেকে চুরুটটা নামিয়ে বলল—বাছা, তুমি তো আমার লক্ষ্মী ছেলে। বলতো, এখন সন্ধ্যা হয়েছে কি?

ড্যানি ঘরে ঢুকে তাকের ওপর থেকে একটা মোটা বই নামিয়ে হাতে নিল। বইটার ওপরে বড় বড় হরফে লেখা 'গ্রীসের ইতিহাস'। কাগজ দিয়ে চিহ্নিত জায়গাটা বের করল।

বইয়ের পাতাটার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই সে বলল—তুমি কি এটাই চাইছিল যে, জলহস্তীর কথা তোমাকে পড়ে শোনাই?

বুড়ো ম্যাক্রি অত্যুগ্র আগ্রহ প্রকাশ করে বলে উঠল—হ্যাঁ বাছা, আমার এটাই ইচ্ছে ছিল, এখনও ইচ্ছেটা বুকের ভিতরে হ্যাঁচড় ফ্যাঁচড় করছে।

তাই তো আমি—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ম্যাক্রি বলে উঠল—বাছা, আমি কি তবে তোমার বইটা খোলার শব্দটাই শুনতে পেয়েছি?

তা-ই হয়ত হবে।

সেই যে কবে আমার ছেলে আমাকে বইটা পড়ে শুনিয়েছিল সে কথা আজ আর আমার মনেই নেই। তবে একটা কথা আজও পরিষ্কার মনে আছে, গ্রীকদের আমার খুব ভাল লেগেছিল।

মুহূর্তের জন্য নীরব থেকে একটু দম নিয়ে ম্যাক্রি আবার মুখ খুলল—ভাল কথা, কোন্ পর্যন্ত যেন পড়েছিলে বাছা?

ড্যানি খোলা-বইটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই বলল—পেল-পেলোপেনেসাস পর্যন্ত পড়েছিলাম। জলহস্তী পর্যন্ত পড়া হয়নি।

হুম্!

সেখানেই তো যুদ্ধটা শুরু হয়েছিল। ত্রিশ বছর ধরে এক নাগাড়ে যুদ্ধটা চলেছিল।

বুঝলাম।

বইটার শিরোনাম হিসেবে লেখা ছিল—ম্যাসিডনের ফিলিপ নামে এক ব্যক্তি খ্রীস্টপূর্ব তিনশ' আটত্রিশ অব্দে চের চেরেকিয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করেন। তার ফলে তিনি ম্যাসিডনের সিংহাসনে বসেন।

—পড়। তারপর থেকে পড় বাছা।

ড্যানি গলা ছেড়ে যুদ্ধটার কাহিনী পড়তে লাগল।

বুড়ো ম্যাক্রি মন্ত্রমুগ্ধের মত শেষ পর্যন্ত শুনল। তার চোখের কোণে জল দেখা দিল।

সে এবার জানালা থেকে উঠে পা টিপে টিপে রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল।

মিসেস ম্যাক্রি মাংসের ঝোল রান্নায় ব্যস্ত।

বুড়ো ম্যাক্রি বলল—হ্যাঁ গা, আমার ছেলে যে আমাকে ইতিহাস পড়ে শোনাল তুমি কি তার দু'-চারটে ছত্র শুনেছিলে? সব কিছু শোনার পর আমার এখন মনে হচ্ছে, আমি যেন হৃত দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছি।

মিসেস ম্যাক্রি বাপ-ছেলেকে খাবার পরিবেশন করল। খেতে-খেতে বুড়ো ম্যাক্রি সোল্লাসে বলল—জান বাছা, আজ বড়ই খুশির দিন। আজ ইস্টার উৎসব। তুমি বরং সন্ধ্যা হলেই কেটির কাছে চলে যাও। তার সঙ্গে দেখা কর। সেটাই হবে আনন্দের ব্যাপার। তুমি আর সে উভয়ের পক্ষেই খুশির ব্যাপার।

ক্ষুব্ধস্বরে ড্যানি বলে উঠল—এ বাড়িটার ভাড়া কে মেটায়? এ বাড়িতে যা কিছু রান্না আর আহারাদি হয় তা-ই বা কে খরিদ করে আনে?

বুড়ো ম্যাক্রি নীরবে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

ড্যানি আগের মতই ক্ষুব্ধ স্বরেই বলে চলল—একটা কথা আমি শুনতে চাই, আমার কি এ বাড়িতে থাকার কোন অধিকারই নেই?

মুহূর্তের জন্য সে থামল।

বুড়ো ম্যাক্রি-র দিক থেকে কোন জবাব না পেয়ে সে আবার বলতে লাগল—রাত্রের আহারাদি মেটার পরই তো আবার ইতিহাস বইটা খোলা হবে। পড়া শুরু করা হবে খ্রীষ্টপূর্ব একশ' ছেচল্লিশ অব্দের করিন্থ-র যুদ্ধের কথা যখন এ গোটা রাজ্যটাই রোমক সাম্রাজ্যের এক বিশেষ অংশে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।

আচ্ছা, আমার কি এ বাড়িতে কোন অধিকারই নেই? আমি এ বাড়ির কেউ-ই নই?

বেবিস ইন দ্য জাঙ্গল

পশ্চিমের সবচেয়ে কৃতি ফেরিওয়ালা মন্টেগু সিলভার। এ অঞ্চলে তার মত ধাপ্পাবাজ দ্বিতীয় আর একজন মিলবে না।

একবার ধাপ্পাবাজ মন্টেগু সিলভার আমাকে বলেছিল—বিলি, তুমি যদি কোনদিন কোন রকম সমস্যার সম্মুখীন হও, সৎপথে বাটপাড়ি করার ব্যাপারে নিজেকে যদি অচল—সেকেলে মনে কর তবে কিছুমাত্রও দ্বিধা না করে সোজা নিউইয়র্কে চলে যেয়ো।

পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে যারা খায় এমন মানুষ প্রতি মিনিটে একজন করে পশ্চিমে জন্মগ্রহণ করে।

দু' বছর বাদে আমার মাথায় এল যে রাশিয়ার নৌ-সেনাপতির নামগুলো মনে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। আর লক্ষ্য করলাম, আমার বাঁ কানের ধারের চুল পাকতে শুরু করেছে।

সে সময়েই আমার মাথায় এল, মানে বুঝলাম, সিলভার-এর পরামর্শটা মানার মত বয়সে আমি পা দিয়েছি।

এক দুপুরে আমি নিউইয়র্কে পৌঁছে ব্রডওয়ে ধরে হাঁটার সময় হঠাৎ সিলভার-এর সঙ্গে আমার মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল।

সিলভার তখন সারা শরীরে সাজ সজ্জার উপকরণাদি ফিতে, জরি অর সেফ্‌টিপিন প্রভৃতি ঝুলিয়ে একটা হোটেলের দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে একটা রেশমি রুমাল দিয়ে নখ পরিষ্কার করতে ব্যস্ত।

আমি সবিস্ময়ে বললাম, 'এ কী সিলভার! আংশিক পঙ্গুত্ব নাকি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছ?

আমার কথা শেষ হতে না হতেই সে আবেগ উচ্ছ্বাস ভরে বলে উঠল, আরে বিলি যে! তোমাকে দেখে আমি কী যে খুশী হয়েছি তা আর বলার নয়।

আমিও কম খুশি হই নি। তার সর্বাঙ্গে শোভিত দ্রব্য সামগ্রীর দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম এসব কি, জানতে পারি কি?

আমার কথায় কান না দিয়ে সে তার নিজের কথাই বলে চলল, আমার বিশ্বাস সম্প্রতি পশ্চিমের মানুষগুলোর চোখ ফুটে গেছে। এখন ভাল খাবার-দাবার জোটানো মহা সমস্যা হয়ে পড়েছে। কিন্তু গরীব মানুষগুলোর পকেটে আঙুল চালাতে আমার বিবেক আত্মসম্মান দুটোতেই বাধে।

আমি আগের মতই চোখের তারায় বিস্ময়ের ছাপ এঁকে নীরবে তাকিয়ে রইলাম।

সে বল চলল, 'আরে ভায়া। মার কাছে কিছু কাজকর্মের হাতে খড়ি তো হয়েছিল, ঠিক কিনা?

তবে ইদানিং এখানে তোমার বাজার খুবই খারাপ যাচ্ছে, কি বল?

এ সব কথা ছাড়ান দাও তো, পরে না হয় শোনা যাবে। আগে আমার ডেরায় চল, সব বলব।

সে পা বাড়িয়েও আবার থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'বিলি, আমরা আবার আগের মতই এক সঙ্গে কাজকর্ম করব, কি বল?

সে আমাকে সঙ্গে করে তার হোটেলে নিয়ে গেল। চুরুট টানতে টানতে সিলভার বলতে শুরু করল, জান বিলি, শহরে হাবাগোবাদের পকেটের টাকাকড়ি হাতিয়ে নেবার বহু উপায় আছে।

বহু উপায়?

হ্যাঁ, সে সব উপায় আমার নখদর্পণে। এখানকার অপদার্থগুলো যেকোন টোপ গিলতে অভ্যস্ত।

তার মানে?

সাধারণ কথাটা বুঝলে না! এদের মাথায় গোবর ভর্তি। মাথায় বুদ্ধি সাধারণত নেই বললেই চলে।

আমি মুচকি হেসে বললাম, তাই বুঝি? বুদ্ধির ঢেকি, তাই না?

হ্যাঁ, ঠিক তা-ই। এই তো সেদিন একটা লোক জে.পি. মরগ্যান-এর মাথায় হাত বুলিয়ে বরফেলার জুনিয়রের আঁকা ছবিকে আদ্রেঁয়া দেন সার্ত্রো-র আঁকা তরুণ সন্ন্যাসী জন-এর বিখ্যাত ছবি বলে ধাপ্পা দিয়ে মোটা মালকড়ি বাগিয়ে নিয়েছে।

এবার ঘরের কোণের একটা কাগজের বাণ্ডিলের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সিলভার বলল, 'বিলি, ওটা সোনার খনির স্টক। আমি ওইগুলো বেচতে বেচতে বন্ধ করে দিলাম।

কারণ কি?

আরে, পথ অবরোধের অভিযোগে আমাকে গ্রেপ্তার করেছিল। মানুষ স্টক কেনার জন্য যেন পাগলের মত হয়ে পড়েছিল। বস্তুটাকে না তুলে উপায়ও ছিল না।

কেন? আপত্তি কি ছিল?

আপত্তি ছিল মাত্র একটাই, সাধারণ মানুষের মালকড়ি আমার পকেটে আসুক এটা আমার অভিপ্রায় নয়। আমার গর্ব ক্ষুণ্ন হতে দেওয়া আমার পক্ষে সবচেয়ে বড় আপত্তি ছিল।

মুহূর্তের জন্য থেমে সে আমার মনোভাব বোঝার চেষ্টা করে আবার বলতে শুরু করল। 'জান বিলি, আমার গর্বকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য আমাকে অর্থকড়ি লেন-দেন-এর ব্যাপারে কিছুটা বিবেচনা করে, মানে লাগাম টেনে ধরেই চলতে হয়।

অবার সহজে চালু হওয়া আরও ছোটখাট চাল ছিল যেটা আমি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম।

কথা বলতে বলতে একটা নীল কালির বোতলের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সে এবার বলল 'বিলি, একবার আমার বিপরীত দিকে একটা নোঙরের ছবি উল্কি করে আমি সোজা ব্যাঙ্কে চলে যাই। নিজেকে নৌ-সেনাপতি ডিউই-র ভাইপো বলে পরিচয় দিলাম। তার নামে কাটা আমার হাজার ডলারের ড্রাফ্‌টটা তারা ভাঙিয়ে দিতেও রাজি হল। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছিল আমার কাকাবাবুর প্রথম নামটাই আমি জানতাম না।

সে কী, এক হাজার ডলারের চেক?

তবে আর বলছি কি। এ থেকেই অনুমান করতে পারছ যে, এখানকার মানুষগুলো কী রকম সাদাসিধে।

আর চোরদের ব্যাপার-স্যাপার?

আরে ভায়া, কোন বাড়িতে গরম ভাতের থালা আর জনা কয়েক কলেজের ছেলে সেখানে হাজির না থাকলে চোররা সেখানে মাথা গলাবেই না।

আর শহরটার উঁচু অঞ্চলের মানুষগুলো কর্মভীরু, কুঁড়ের বাদশা।

আমার ধারণাটা কি জান? শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত যত অধিবাসী আছে সবাই একই ছাঁচে ঢালা। বেধড়ক দাওয়াই দাও আর চালাও গুলি—ব্যস, সব ঠাণ্ডা।

দেখ সিলভার, মানহাট্টান সম্বন্ধে তুমি যা বললে তার শতকরা একশ' ভাগই সত্যি?

তবে আর বলছি কি ভায়া।

হ্যাঁ, এ ব্যাপারে আমার একটু আধটু সন্দেহ থেকে যাচ্ছে। মাত্র দু'ঘণ্টা আগে আমি এ শহরে

পা দিয়েছি। কিন্তু আমার মুহূর্তের জন্যও মনে হয়নি যে, শহরটা টপ্ করে আমাদের হাতের মুঠোয় চলে আসবে।

তোমার অনুমান অভ্রান্ত। এরা সবাই প্রবাসী। নিউইয়র্ক শহরটাই 'লিটল রক' অথবা ইউরোপের চেয়ে আকারে বড়। যেকোন বিদেশী এ শহরটাকে সমঝে চলে। আরে ভায়া, সময়মত সবই রপ্ত হয়ে যাবে। এখানকার মানুষগুলোকে কব্জা করতে কষ্ট হবে না। আমার চিন্তা একটাই, সবগুলো পকেট যখন ডলারে বোঝাই হয়ে যাবে তখন আমার পকেটের চুরুটগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে।

ওসব গালগপ্প রেখে এখন আগে বল, এমন কোন উপায় কি তোমার মাথায় আছে যাতে অন্যের পকেটের মালকড়ি, মানে দু'একটা ডলার আমার পকেটে চলে আসতে পারে?

বন্ধু, এক ডজন উপায় আমার জানা আছে। তোমার মূলধন কত আছে?

বারো শ' ডলার।

যৌথ কারবার শুরু করলে বড়সড় একটা কারবারই আমরা শুরু করতে পারব। দশ লাখ রোজগারের মত এত বেশী পথ খোলা আছে যে, কোনটা যে আঁকড়ে ধরব ঠিকই করতে পারছি না।

পরদিন আমরা দু'জনই সিলভার-এর পরিচিত একজন লোকের সাহায্যে জে. পি. মরগ্যান-এর সঙ্গে দেখা করলাম।

লোকটার পায়ে একটা টার্কিস তোয়ালে জড়ানো। একটা বেতের মোটা লাঠিতে ভর দিয়ে দিয়ে চলাফেরা করেন।

সিলভার-এর পরিচিত যে লোকটা জে. পি. মরগ্যান-এর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয় তার নাম ক্লিন।

ক্লিন আমাদের সঙ্গে জে.পি. মরগ্যান-এর পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাকে বলল, 'মিঃ পেসকুড আর মিঃ সিলভার, একজন শ্রেষ্ঠ আর্থিক ব্যক্তিত্বের নাম ঘোষণা করা বাহুল্য ছাড়া কিছু নয়।

ক্লিন, ওসব কথা ছাড়ান দাও তো। মিঃ মরগ্যান বললেন—এঁদের সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে আমি বড়ই প্রীত হলাম। পশ্চিমের ব্যাপার-স্যাপার জানার জন্য আমি খুবই আগ্রহী।

এবার আমাদের দিকে ফিরে বললেন—'আমার বিশ্বাস, সে অঞ্চলে আমাদের দু'একটা রেলপথ আছে।

তারপর মুহূর্তের জন্য থেমে আমাদের লক্ষ্য করেই মিঃ মরগ্যান আবার বললেন, আপনারা যখন লিটল রক-এর ধারে কাছে কোথাও থাকতেন তখন কি 'এক চক্ষু পিটার্স' বলে কোন লোককে চিনতেন?

আমরা কিছু বলার আগেই তিনিই আবার মুখ খুললেন, ভদ্রলোক নিউ মেক্সিকোর স্কটল্যান্ডের অধিবাসী ছিলেন।

আমাদের উত্তরের অপেক্ষা না করেই তিনি বেতের লাঠিটায় ভর দিয়ে পায়চারি শুরু করে দিলেন।

ক্লিন হেসে বলল, তারা কি আজই স্ট্রীট-এ আপনার স্টককে ধ্বংস করতে চেষ্টা করেছিল?

স্টক! আমার স্টক! ক্রোধোন্মত্ত বাঘের মত মিঃ মরগ্যান গর্জে উঠলেন।

হ্যাঁ, সে কথাই তো বলছি।

না। সে ছবিটা কেনার জন্য তো আমি আমার এজেন্টকে ইউরোপে পাঠিয়েছিলাম। ব্যাপারটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

তিনি কি সেটা সংগ্রহ করতে পেরেছেন?

সে আজই টেলিগ্রাম মারফৎ আমাকে জানিয়েছে, ইতালিতে তন্ন তন্ন করেও সে ছবিটা পায় নি। সে ছবিটার জন্য কালই আমি পঞ্চাশ হাজার, না পঁচাত্তর হাজার ডলার পাঠিয়ে দিতে চাচ্ছি।

তা মন্দ নয়।

আমার মাথায় আসছে না, আর্ট গ্যালারিগুলো কেন যে ডি ভিঞ্চির একটা ছবিকে এভাবে—।

ক্লিন ভ্রূ কুঁচকে বললেন, আমি তো রীতিমত অবাক হচ্ছি মিঃ মরগ্যান। আমার তো ধারণা ছিল ডি. ভিঞ্চির যাবতীয় ছবি আপনার হেফাজতে রয়েছে।

ছবিটা কেমন দেখতে বলুন তো মিঃ মরগ্যান? আশা করি ফ্ল্যাট আয়রণ বিল্ডিং-এর মতই সুবিশাল হবে, কি বলেন? সিলভার কৌতূহল দমন করতে না পেরে আগ বাড়িয়ে কথাটা বলল।

ছবিটার মাপ ছিল, ২৭ ইঞ্চি × ৪২ ইঞ্চি। আর তার নাম ছিল, 'প্রেমের অলস কাল'। ছবিটার বিষয়বস্তু ছিল—লাল নদীর পাড়ে অনেকগুলো ঘড়ির মডেল জোড় পায়ে হাঁটছে। টেলিগ্রামের খবরে জানা গেছে, ছবিটা নাকি এ দেশেই আনা হয়েছে।

তাই নাকি? এদেশেই—

হ্যাঁ। ভাবছি, ছবিটা না নিতে পারলে আমার সংগ্রহশালাটা পূর্ণত্ব লাভ করবে না। কথাটা বলেই তিনি ঘুমোবার জন্য ক্লিনকে নিয়ে চলে গেলেন।

আমি আর সিলভার আলোচনা করতে লাগলাম, প্রতিষ্ঠিত, মানে বড়মাপের কৃতী মানুষদের মন খুবই সরল থাকে, আর অসন্দিগ্ধও হয়ে থাকে।

সিলভার বলল, মিঃ মরগ্যান-এর মত এমন বড় মাপের মানুষের সঙ্গে বাটপাড়ি করে টাকাকড়ি নিতে আমি উৎসাহ পাচ্ছি না।

আমি বললাম, আমিও কাজটাকে অসঙ্গত বলেই মনে করছি।

রাত্রে আহারাদি সেরে আমি, ক্লিন আর সিলভার প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখার জন্য অষ্টম এভিনিউ-র দিকে হাঁটতে লাগলাম।

সেখানকার একটা বন্ধকী দোকানের জানালায় সাজানো এক জোড়া কাফলিংক দেখতে পেয়ে ক্লিন-এর খুবই পছন্দ হয়ে গেল।

কাফলিংটাকে কেনার জন্য আমরা দোকানের ভেতরে ঢুকে গেলাম। কাফলিংকটা কিনে আমরা আবার হোটেলে ফিরে এলাম। একটু বাদে ক্লিন বিদায় নিল।

ক্লিন বিদায় নিলে সিলভার বলল, মিঃ মরগ্যান যে ছবিটা খরিদ করতে এত আগ্রহী সেটা যে ওই বন্ধকী দোকানের ডেস্কের পিছনে ঝোলানো ছিল, লক্ষ্য করেছিলে?

আগে, জায়গা মত বললে না কেন?

ক্লিন, তখন আমাদের সঙ্গে ছিল বলে আমি মুখ খুলি নি। ওটা নির্ঘাৎ মরগ্যান-এর বাঞ্ছিত সে ছবিটা।

হ্যাঁ, তবে তো সমস্যা ছিলই।

যাক, ছবিটায় মেয়েগুলোকে স্বাভাবিক করেই আঁকা হয়েছে। লাল নদীর তীরে তারা রাজহংসীর মত ডানা মেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

হ্যাঁ, মরগ্যান ঠিক এরকম ছবির কথাই বলেছিলেন বটে।

আচ্ছা, মরগ্যান ছবিটার জন্য কত যেন দিতে চেয়েছিলেন, বল তো? কী অমূল্য সম্পদই যে বন্ধকী দোকানটায় রয়েছে তা তো তারা জানতেই পারল না।

পরদিন সকালে আমি আর সিলভার ওই বন্ধকী দোকানটায় ঢুকে কৃত্রিম অন্যমনস্কতার ভান করে আমরা পুরনো ঘড়ির চেনগুলো দেখতে লাগলাম।

একটু বাদে সিলভার পায়ে পায়ে বন্ধকী দোকানের মালিকের কাছে গিয়ে এ গল্প সে গল্প জুড়ে দিল। তারপর এক সময় প্রসঙ্গটা উত্থাপন করতে গিয়ে বলল, মশাই, ওই যে ওখানে ব্রেমো নির্মিত যে বস্তুটা রেখেছেন ওটা তো চমৎকার জিনিস! পক্ষীরাজ ঘোড়া সমেত ওই মেয়েদের ছবিগুলো আমার খুবই পছন্দ হয়েছে।

দোকানি বলল, ভাল কথা। পছন্দ যদি হয়েই থাকে তবে কিনে নিলেই তো হয়।

আচ্ছা, ২.২৫ ডলারের বিনিময়ে ওটা পাওয়া যাবে কি?

দেখুন ভাই, এক বছর আগে ইতালির এক ভদ্রলোক পাঁচ শ' ডলারের বিনিময়ে আমার কাছে বন্ধক রেখে যায়। মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে। ছবিটার নাম—'প্রেমের অলস কাল'। লিওনার্দো ডি ভিঞ্চি ছবিটা এঁকেছিলেন।

দীর্ঘ সময় ধরে দর কষাকষি করে আমি দু'হাজার ডলারের বিনিময়ে ছবিটা খরিদ করে দোকান

থেকে বেরিয়ে এলাম।

হোটেলে ফিরেই সিলভার মিঃ মরগ্যানকে ছবিটার খবর দেবার জন্য ছুটল।

ঘণ্টা দুই পরে সে ফিরে এল।

তার মুখে শুনলাম, মিঃ মরগ্যান এক মাসের জন্য ইউরোপে পাড়ি জমিয়েছেন।

একটু বাদে সে ফ্যাকাসে বিবর্ণ মুখে বলল, বিলি, ব্যাপারটা আমার যেন কেমন সুবিধের মনে হচ্ছে না।

আমি যন্ত্রচালিতের মত ঘাড় তুলে তার দিকে তাকালাম।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সিলভার বলল, সমস্যাটা হচ্ছে, সব কটা বিভাগীয় বিপণীতে ফ্রেমে বাঁধানো একই ছবি রাখা আছে। দাম কত জান? মাত্র ৩.৪৮ ডলার।

আমি চোখের তারায় হতাশার ছাপ একে নীরবে তার মুখের দিকে তাকালাম।

সে বলে চলল, কথাবার্তার মাধ্যমে জানতে পারলাম। কেবল ফ্রেমটার দামই ৩.৫০ ডলার। ব্যাপারটা তো বড্ড ভাবিয়ে তুলেছে বিলি।

দ্য পয়েট অ্যান্ড দ্য পিসেন্ট

আমার এক কবি বন্ধু প্রকৃতির কোলে জীবনটা কাটিয়ে দিচ্ছে।

আমার সে কবি বন্ধু একদিন একটা কবিতা রচনা করে এক সম্পাদকের দপ্তরে হাজির হল।

তার সে কবিতার প্রতিটা পংক্তিতে পাওয়া যাবে খোলা মাঠ আর প্রান্তরের মুক্ত বাতাস, পাখি-পাখালির গানের আবেশ।

আমার বন্ধুবর যখন কবিতাটার খোঁজ নিতে গেল তখন তার বাঞ্ছিত আদর আপ্যায়ন বরাতে জুটল না।

পুরু কাঁচের চাঁদির চশমার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে সম্পাদক মহাশয় যে মন্তব্য করলেন তা নিচে উল্লেখ করা হল—

খুবই কৃত্রিম।

একদিন আমরা জনা কয়েক খাবার টেবিলে মিলিত হলাম। আমরা সেখানে বসেই এ সম্পাদক মহাশয়ের জন্য একটা কবর খুঁড়ে ফেললাম।

আমাদের দলে একজন ঔপন্যাসিকও উপস্থিত ছিল। তার নাম ছিল কোলান্ট। এক্সপ্রেসের জানালা ছাড়া সে কোনদিন প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করেনি।

সত্যি কথা বলতে কি, লেকম কোলান্ট সারাটা জীবন এসফল্টের পথে পথে ঘুরেই কাটিয়েছে।

হরিণী ও কল্লোলিনী, নাম দিয়ে কোলান্ট একবার একটা কবিতা লিখে ফেলল। কবিতার তলায় সে নিজের নামটা স্পষ্টাক্ষরে লিখল।

ব্যস, আর দেরী নয়, কোলান্ট-এর নাম লেখা 'হরিণী ও কল্লোলিনী' নামক কবিতা আমরা ওই একই সম্পাদক মহাশয়ের কাছে পাঠিয়ে দিলাম।

তবে এ গল্পটার সঙ্গে এ ঘটনাটার সম্পর্ক খুবই সামান্য।

কবিতাটা হাতে পাওয়ার পর সম্পাদক মহাশয় পরদিন সকালে কবিতাটা যখন পড়তে লাগলেন ঠিক তখনই একজন নৌকো চেপে পশ্চিম পাড়ে নামল। তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে ফর্টিসেকেন্ড স্ট্রীটে উঠে সোজা হাঁটতে লাগল।

তাকে লোক না বলে বরং যুবক বলাই উচিত। তার মাথায় উস্‌কো খুস্‌কো চুল, মা-বাপ হারা ছেলের ঠিক যেমনটা দেখা যায়। আর নিচের ঠোঁটটা ঝুলে পড়া, চোখের মণি দুটো নীলাভ। আর জামা-কাপড়ে গ্রাম্য ছাপ সুস্পষ্ট। কানের কাছে একটা ছোট্ট খড়ের টুকরো গোঁজা—সে যে গ্রামের মানুষ এটাই তার প্রমাণ দিচ্ছে।

শহরের পথচারীরা তার আদব কায়দা বুঝতে পেরে হেসে নিজের কাজে চলে যেতে লাগল। মোদ্দা কথা সবাই তাকে অগ্রাহ্য করে চলে গেল।

কেবলমাত্র ভিড় পথেই নয়, গাড়ি ঘোড়ার ভিড়ভাট্টার মধ্যেও সে সার্কাসদলের ভাঁড়ের মত অবলীলাক্রমে পথ পাড়ি দিতে লাগল।

গ্রাম্য যুবকটার হাবভাব দেখে খবরের কাগজের ফেরিওয়ালা ছেলের দলও ঠোটের কোণে বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়ে তুলে, তার দিকে বার বার আঁড় চোখে তাকাতে লাগল।

বাংকো হ্যারি এইটথ এভিনিউতে দাঁড়িয়েছিল। গ্রাম্য যুবকটাকে একটা গহনার দোকানের জানালার দিকে বিস্ময় মাখানো দৃষ্টিতে তাকিয়ে মৃদু মৃদু মাথা নাড়তে দেখে সে গুটিগুটি তার কাছে এগিয়ে গেল।

বাংকো তার দিকে তাকিয়ে, মুচকি হেসে বলল, বাছা, জানালার কাঁচটা বড্ড বেশী পুরু। ওদিকে উজবুকের মত তাঁকিয়ে কিছুই ফয়দা হবার নয়।

গ্রাম্য যুবকটা বলল, মশাই, আপনার কথাটা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না তো।

কোত্থেকে আমদানি হয়েছ হে? বাংকো ঠোট বাঁকিয়ে বলল।

উলস্টার কাউন্টি থেকে সবে এ শহরে এসেছি।

তাই নাকি? শহরটাকে কেমন মনে হচ্ছে?

আরে ব্বাস। আমার ধারণার চেয়েও পাঁচগুণ বড়। আর সর্বক্ষণ হৈ চৈ লেগেই রয়েছে।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। আর না বললেও চলবে। আমি প্রথম দর্শনেই তোমার অবস্থাটা বুঝে নিয়েছি।

গ্রাম্য যুবকটা ফ্যালফ্যাল করে বাংকোর দিকে তাকিয়ে রইল। হারি এবার বলল, শোন হে ছোকরা। আমি তোমাকে একটু আধটু জ্ঞান দিতে চাচ্ছি, বুঝলে?

গ্রাম্য যুবকটা কিছু না বুঝেই ঘাড়টা কাৎ করল। হ্যারি তার হাতটা ধরে বলল, 'যাকগে, কথাবার্তা পরে হবে। তার আগে চল গলাটা একটু ভিজিয়ে চাঙা হয়ে নেবে, রাজী?

এক গ্লাস বীয়ার চলতে পারে বটে।

বাংকো তাকে নিয়ে কাছেরই একটা কাফেতে ঢুকল।

গ্রাম্য যুবকটা বীয়ার-এর গ্লাসটা হাতে নিয়ে বলল, 'মশাই, এত কথা হল, কিন্তু আমার নামটা তো আপনি শুনতে চাইলেন না।

তাই তো, কি নাম তোমার?

হেলক্স।

ঠোট থেকে গ্লাসটা নামিয়ে হেলক্স বলল, 'মশাই, গ্রাম থেকে এসেছি বলে যেন আবার ভেবে বসবেন না যে, আমার পকেট খালি।

বাংকো মুচকি হেসে বলল, আমি তা ভাবতে যাব কেন, বল তো? তার মুখের কথা শেষ হবার আগেই হেলক্স কোটের পকেট থেকে এক গোছা বিল বের করে টেবিলের ওপর রাখল।

বাংকো এমন একটা ভাব দেখাল যেন টাকা-পয়সার ব্যাপারে তার দারুণ অনীহা।

হেলক্স বলল, 'ঠাকুমার খামারের আমার অংশ হিসাবে এগুলো পেয়েছি। এতে ন'শ' পঞ্চাশ ডলার আছে। এগুলো কোন্ উদ্দেশ্যে নিয়ে এসেছি, বলুন তো?

তোমার মনের কথা আমি কি করে জানব?

ভেবেছিলাম এগুলো দিয়ে শহরে কোন কারবার ফেঁদে বসব।

ডলারের গোছাটা হাতে নিয়ে বাংকো হাসিমুখে ওঠার দিকে আঁড় চোখে তাকাল।

তারপর সে সমালোচনার ভাব নিয়ে বলল, শোন হে, তোমার চেয়ে সঙ্গীন অবস্থার মানুষও আমি দেখেছি। শোন-এ পোশাক শহরে অচল। স্যুট-কোট, বুট আর খড়ের চওড়া টুপি পরতে হবে। বুঝলে আরও আছে। শেরি সহযোগে প্রাতরাশ সারতে হবে। আর মুখে অনর্গল পিটসবার্গ ও ভাড়ার তারতম্যের কথা বলতে হবে।

হেলক্স ডলারের গোছাটা নিয়ে কাফে থেকে বেরিয়ে যাবার পর বাংকো-র এক সাকরেদ অনুচ্চকণ্ঠে বলল, ওর লাইন কি ওস্তাদ?

বাংকো বলল, আমার তো বিশ্বাস অদ্ভুত কিছু একটা হবে।

তার মানে? দু'-তিনজন প্রায় সমস্বরে বলে উঠল।

তা যদি না-ই হয় তবে ও জেরম-এর দলের সাকরেদ।

আর তা যদি না হয়, তবে?

তা যদি না-ই হয় তবে ধাপ্পাবাজির মতলব নিয়ে শহরে এসে হাজির হয়েছে। এমন হওয়াটাও অস্বাভাবিক নয়—আমি তো এখন অবাক হয়ে ভাবছি—না, ডলারের নোটগুলো জাল, কিছুতেই আসল হতে পারে না।

কিছুক্ষণ পথে ঘুরে বেরিয়ে হেলক্স একটা মদের দোকানে ঢুকে এক বোতল বীয়ার কিনল।

মদের দোকানের কাছে কয়েকটা বদমায়েশ লোক ঘুর ঘুর করছে। হেলক্স কে এক ঝলক দেখেই তাদের মনের কোণে দুর্বুদ্ধি চাঙা হয়ে উঠল।

কিন্তু পর মুহূর্তেই তার গ্রাম্য পোশাকটার কথা ভেবে তাদের মধ্যে সাবধানী সন্দেহের উদ্রেক ঘটল।

হেলক্স তাদের দিকে নজর না দিয়েই হাতের থলেটা নিয়ে পথ ধরে হাঁটতে শুরু করল। থমকে দাঁড়িয়ে সে আবার পিছিয়ে এল।

একটা চুরুট ধরিয়ে সে বলল, মিস্টার, এটা একটু ধরুন তো। ওই দিক থেকে একটু ঘুরে ফিরে আবার আপনাদের কাছেই ফিরে আসব। এটার মধ্যে ন'শ' পঞ্চাশ ডলার আছে। আমার হাবভাব দেখে কথাটা আপনাদের বিশ্বাস না হবারই কথা।

মদের দোকানের মালিক থলেটাকে লাথি মেরে সরিয়ে দিয়ে খেঁকিয়ে উঠল, 'তোমরা কি আমাকে বোকা হাঁদা ঠাওরেছ নাকি হে? আমি এ ফাঁদে পা দেব, ভাবলেটা কি করে? আমার বিশ্বাস গেঁয়ো যুবকটা ম্যাকআডু-র সাকরেদ। তা থলেতে যদি ন'শ' পঞ্চাশ ডলার থাকেই তবে সেটা আটানব্বই সেন্ট ওয়াটারবেরি।

মিঃ এডিসন-এর যাবতীয় খেলা সামনে দেখে নিয়ে হেলক্স থলেটা নেবার জন্য ফিরে এল।

হেলক্স এবার ব্রডওয়েতে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করল। তার দিকে কেউ ফিরেও তাকাল না। আসলে শহরের বুকে এরকম গেঁয়ো মাল হামেশাই ঘুরে বেড়ায়।

একটা সিঁড়ির ধাপে বসে হেলক্স ডলারের গোছাটা বের করে সবার ওপরের নোটটা টেনে বের করে নিল। তারপর একটা খবরের কাগজের ফেরিওয়ালাকে ডেকে বলল, 'ভাই, এ নোটটা কোথাও থেকে ভাঙিয়ে এনে দিলে বড়ই উপকার হয়। আমি এখনও খাওয়া-দাওয়া সারতে পারি নি। নোটটা ভাঙিয়ে এনে দিলে তোমাকে একটা নিকেল বকশিস দেব।

ফেরিওয়ালা ছেলেটা নোটটা না নিয়ে খেঁকিয়ে উঠল, যত্তসব বাজে আব্দার! আমার বকশিসের দরকার নেই। যদি পার নিজেই ভাঙিয়ে আন। যদি ভাল চাও তবে তোমার ওই সব জাল নোট নিয়ে মানে মানে সটকে পড়।

এক জুয়ার আড্ডার পরিচালক কাছে দাঁড়িয়ে তাদের কথোপকথন শুনল। হেলক্স-এর চোখে চোখ পড়তেই তার মধ্যে ধর্ম ভাবের উদয় হল।

হেলক্স তাকে বলল, 'মহাশয়, শুনেছি শহরের বুকে নাকি বাজি ধরে হরেক রকম খেলা হয়। আমার এ থলেটাতে ন'শ' পঞ্চাশ ডলার আছে। আমি পুরনো উলস্টার গ্রামের বাসিন্দা।

এখন কি করতে চাইছ? জুয়ার আড্ডার পরিচালক বলল।

ন'বা দশ' ডলার নিয়ে খেলা যায় এমন কোন জুয়ার আড্ডার ঠিকানা কি আপনার জানা আছে?

জুয়ার আড্ডা? তুমি খেলবে?

হ্যাঁ, আমি খেলতে আগ্রহী কারণ যাতে অদূর ভবিষ্যতে কোন ব্যবসা কিনে নিতে পারি।

ওসব নক্করবাজি ছাড় তো বাপু! এমন কোন সোনার খনির পাত্তা আমার জানা নেই যেখানে একটা টেক্কা মারতে পারলে এক ওয়াগন পেট্রোল মিলে যায়। ভাগ এখান থেকে।

শহরের মানুষের কাণ্ডকারখানা দেখে, বার বার হোঁচট খেয়ে হেলক্স আপন মনে ভাবতে লাগল, আমার পোশাকটাই যত ঝকমারির মূল। সবার একই বিশ্বাস, আমি একটা বোকা হাঁদা নিষ্কর্মার ঢেকি। আমাকে দিয়ে কিচ্ছু হবার নয়। এবার হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি, নিউইয়র্ক শহরবাসীদের

পোশাক গায়ে না চাপালে এখানে হালে পানি পাওয়া যাবে না।

রাত্রি ন'টায় একটা লোক গলিপথে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে এল।

উলস্টার কাউন্টির মানুষ তাকে দেখেই থমকে যায়। হবে নাই বা কেন? স্যুট-কোট বুট আর শহরের মানুষের মত লম্বা টুপি মাথায় চাপিয়ে সে যে রীতিমত কেদাদুরস্ত শহুরে ফুলবাবু বনে গেছে।

সে পথের ধারে গিয়ে মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। পর মুহূর্তেই দৃঢ় পদক্ষেপে পথ পাড়ি দিতে লাগল।

সে যে পথের ধারে মুহূর্তের জন্য থামল তার মধ্যেই শহরের বিজ্ঞ চোখগুলো তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

হোটেলের সামনে জটলার মানুষগুলোর মধ্য থেকে তো কেবলমাত্র দুটো বন্ধুকেই তার পক্ষে বেছে নেওয়া সম্ভব হল।

লোকটা এগিয়ে এসে হেলক্সকৈ লক্ষ্য করে বলল, 'সত্যি বলছি, গত ছ'মাসের মধ্যে আজই প্রথম একজন রসিক গ্রাম্য মানুষ—যুবক চোখে পড়ল। এস আমার সঙ্গে।

রাত্রি সাড়ে এগারোটায় একজন হন্তদন্ত হয়ে পুলিশ স্টেশনে হাজির হল। তার উদ্দেশ্য তার অপরাধের কাহিনীটা শোনাবার জন্য। সে ভারপ্রাপ্ত অফিসারের সামনে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, স্যার, ন'শ' পঞ্চাশ ডলার।

পুলিশ অফিসার ভুরু কুঁচকে বলল, কি বললে, ন'শ' পঞ্চাশ ডলার?

হ্যাঁ, স্যার। ঠাকুমার খামারের আমার অংশের এ ডলারগুলো।

ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার তার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নিয়ে নিল।

লোকটা নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলল, 'আমার নাম জাবেজ বুলটাং।

ঠিকানা?

লোকাস্ট ভ্যালি খামার, উলস্টার কাউন্টি।

পুলিশ অফিসার এবার তার কাছ থেকে এক এক করে দীর্ঘদেহী শক্ত-সামর্থ্য লোকগুলোর পূর্ণ বিবরণ শুনে নিল।

কোলান্ট যখন তার কবিতার ভাগ্যের কথা শোনার জন্য সম্পাদক মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেল তখন তাকে ভেতরের ছোট্ট ঘরটায় নিয়ে গেল।

সম্পাদক উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে বলতে লাগল, 'বুঝলেন মশাই, আপনার কলমের জোর আছে বটে। আমি যখন 'হরিণী ও কল্লোলিনী' কবিতাটার প্রথম পংক্তিটা পড়ি তখনই আমার মধ্যে ধারণাটা প্রকট হয়ে ওঠে।

ধারণা? কোন ধারণার কথা জানতে চাইছেন, বলুন তো?

আমার ধারণা হয়েছিল, কবিতাটার রচয়িতা এমন একজন যে প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে মিশিয়ে একাত্ম হয়ে যেতে পেরেছে।

সত্যি কথা বলতে কি, পংক্তিটার কাব্য-নৈপুণ্য এ সত্যকে আমার কাছে ছাই চাপা দিয়ে রাখতে পারে নি।

মুহূর্তের জন্য থেমে পুলিশ অফিসার আবার মুখ খুলল, আর একটা চমৎকার উপমার সাহায্যে কবিতার পংক্তিটার ব্যাখ্যা করা যেতে পারে—এ যেন অরণ্য আর প্রান্তরের একটা বন্য প্রকৃতির মুক্ত শিশুকে কেতাদুরস্ত পোশাকে সজ্জিত করে ব্রডওয়ের কোলাহল মুখর জনারণ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

আর? পোশাক-পরিচ্ছদের আড়ালে লুকিয়ে রাখা আসল রূপটা প্রকাশ পাচ্ছে।

কোলান্ট মুচকি হেসে বলল, 'ধন্যবাদ! আশা রাখছি, আগামী বৃহস্পতিবারই চেকটা হাতে পাব।

ধ্যুৎ! গল্পটার নীতিকথাটাই গুলিয়ে ফেলেছি। 'খামারবাড়িতে বসবাস কর, না হয় কবিতা লিখতে যেয়ো না', এদের মধ্য থেকে পছন্দ মাফিক যেকোন একটাকে আপনি বেছে নিতে পারেন।

দ্য র‍্যাব অব পিস্

যে কোন বড় শহরে একটার পর একটা রহস্য সঞ্চারকারী ঘটনাগুলো যে, পাঠকরা আর জনি বেলচেম্বার্স-এর বন্ধু-বান্ধবরা প্রায় এক বছর আগে তার উধাও হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটাতে কিছুমাত্রও বিস্মিত হয় নি।

এ বিশেষ রহস্যটার এখন কিনারা করা সম্ভব হয়েছে।

তবে রহস্যভেদের সমাধানটা জনসাধারণের মনে এমন অত্যাশ্চর্য এবং অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়েছে যে, বেলচেম্বার্স-এর সঙ্গে যে গুটিকয়েক মানুষের ঘনিষ্ঠতা ছিল একমাত্র তারাই ব্যাপারটা অন্তর থেকে মেনে নেবে।

কার না জানা আছে যে, জনি বেলচেম্বার্স সম্ভ্রান্ত মহলের একেবারে ভেতরের লোক।

পোশাক-আশাকের ভড়ং ভাড়ং ছাড়াই সে একজন সর্বজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ। আর এরই ফলে সে সমাজের সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে শোভা বর্দ্ধন করে।

কেতাদুরস্থ এ লোকটাকে নিউইয়র্কের অধিবাসীরা গোটা আমেরিকার শ্রেষ্ঠতম কেতাদুরস্ত মানুষের সম্মানে সম্মানীত করেছে।

সত্যি কথা বলতে, একটা কানাকড়িও মজুরি না নিয়ে কোন দর্জি যদি তার পোশাক তৈরীর সুযোগ পায় তবে সে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করে। তার তৈরী পোশাকটা সে যদি পরে তবে সেটাই হবে তার সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞাপন।

কিন্তু বেলচেম্বার্স দুম্ করে উধাও হয়ে গেল। তার নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার ঘটনাটা তিনদিন পর্যন্ত তার বন্ধু, আপনজনদের মনে আতঙ্ক সঞ্চার করল না।

তিন দিন পেরিয়ে গেলে তারা আর নিশ্চেষ্ট হয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারল না। চারদিকে খোঁজ খবর নিতে লাগল।

না, ফয়দা কিছুই হল না। তাদের সব প্রয়াস ব্যর্থ হল। আসলে সে যে কোন রকম সূত্রই রখে যায় নি।

এবার তার বে-পাত্তা হয়ে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধান পর্ব শুরু হয়ে গেল। তা তা-ও ব্যর্থ হল।

কিন্তু বেলচেম্বার্স-এর কোন শত্রু ছিল বলে তো শোনা যায় নি। কারো কাছ থেকে ঋণ করেছে বলেও তো শোনা যায় না, আবার কোন নারীঘটিত ব্যাপারও তো ছিল না।

ব্যাঙ্কে তার নামে হাজার কয়েক ডলার জমা রয়েছে। তার স্বভাব চরিত্রে কোন উদ্ধত আচরণের আভাসও তো পাওয়া যায় নি। আসলে লোকটা ছিল খুবই শান্ত—নিরীহ নম্র প্রকৃতির লোক।

বেলচেম্বার্সকে খুঁজে পাওয়ার সব রকম চেষ্টাই করা হল। আর সবই হয়ে গেল ভষ্মে ঘি ঢালার সামিল।

মে মাসে বেলচেম্বার্স-এর দুই পুরনো বন্ধু ল্যামসেল্ট গিলিয়াস এবং তার টম আইরেস তার খোঁজে দেশের বাইরে চলে গেল।

সুইজারল্যান্ড আর ইতালির-র পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে তারা শুনতে পেল, সুইস আল্পস-এ এমন একটা মঠ রয়েছে যেখানে পর্যটক আকর্ষক ছাড়াও অন্য একটা কিছুর অস্তিত্ব রয়েছে।

মঠটা পাহাড়ের দুর্গম অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় সাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দর্শনার্থীদের মনে তেমন আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে না। কিন্তু মঠটায় প্রথম সন্ন্যাসীদের দ্বারা তৈরী এমন একটা আনন্দদায়ক ঐশ্বরিক পদার্থ আছে যার গুণগত মান অন্য সব তরল পানীয় বড়িটড়ির চেয়ে অনেক বেশী।

আর এমন অত্যাশ্চর্য একটা পিতলের ঘণ্টা ঝোলানো রয়েছে যেটাকে তিন শ' বছর আগে বাজানোর পর আজও নিরবিচ্ছিন্নভাবে আওয়াজ করেই চলেছে। আরও আছে, আজ অবধি মঠটাতে কোন ইংরেজের পদচিহ্ন পড়ে নি।

গিলিয়াস ও আইরেস আলোচনার মাধ্যমে এ সিদ্ধান্ত নিল যে, এ তিনটে ব্যাপারই অনুসন্ধান করার মত।

গিলিয়াস ও আইরেস দু'দিন ধরে কঠোর পরিশ্রম করে মঠটার দরজায় পৌঁছতে পারল।

জমাটবাঁধা একটা অতিকায় শিলাস্তরের ওপর মঠটা অবস্থান করছে। চারদিকে চলমান বিপজ্জনক বরফের চাঁই অবস্থান করছে।

আচমকা কোন কোন অতিথি এলে তাদের সেবা যত্ন করে দু'জন সন্ন্যাসী। গিলিয়াস ও আইরেস'কেও তারা অভ্যর্থনা করে ভেতরে নিয়ে গেল।

যে বিশেষ তরল পদার্থ তাদের পান করতে দেওয়া হল, কিন্তু সেটা তাদের কাছে তেমন শক্তিবর্দ্ধক মনে হল না। তারা সে বিশেষ ঘণ্টা ধ্বনিটা উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল। আর কথা বলে জানতে পারল ইংরেজদের পদচিহ্ন পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র পড়লেও এ মঠে তারাই প্রথম পা দিয়েছে।

দু'টো গোথামাইট যুবক সজ্জন ভাই ক্রিস্টোফার মঠের পথটায় দাঁড়িয়ে দেখল একদল সন্ন্যাসী খাবার ঘরের দিকে যাচ্ছে। সন্ন্যাসীরা তাদের পাশ দিয়ে যাবার সময় আইরেস হঠাৎ গিলিয়াস-এর একটা হাত চেপে ধরে বলে উঠল এখন তিনি তোমার ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থান করছেন। আর তাঁর পাশে যিনি কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে তিনিই জনি বেলচেম্বার্স বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

গিলিয়াস কেতাদুরস্ত বে-পাত্তা হয়ে যাওয়া মানুষটা সহজেই সনাক্ত করতে পারল।

গিলিয়াস ভেবেই পাচ্ছে না বুড়ো বেলচেম্বার্স হঠাৎ কেন এখানে এসে মাথা গুঁজেছে। সে যে এমন ধর্মাশ্রয়ী তা-তো আগে শোনা যায় নি।

আইরেস দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, তিনি অবশ্যই বেলচেম্বার্স। তার পোশাক-আশাকই তাকে চিনতে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করছে।

ফ্যাশান-প্রিয় এ লোকটা এসেছেন মঠে প্রায়শ্চিত্ত করতে, এ যে ভাবাই যায় না।

তারা এগিয়ে গিয়ে ভাই ক্রিস্টোফার-এর কাছে রহস্যটা সম্বন্ধে জানতে চাইল।

ক্রিস্টোফার সবিস্ময়ে বলল, বেলচেম্বার্স? সেন্ট গড্রাম-এর ভাইরা দীক্ষা নেবার সময় তাদের পূর্ব নাম পরিত্যাগ করে নতুন নামধারণ করেন।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ। আপনারা কি ভাইদের মধ্যে কারো সঙ্গে দেখা করতে আগ্রহী?

ভাই ক্রিস্টোফার-এর সঙ্গে গিলিয়াস ও আইরেস খাবার ঘরে গিয়ে অঙ্গুলি নির্দেশ করে জনি বেলচেম্বার্সকে দেখিয়ে দিল। ভাই ক্রিস্টোফার বলল, ঠিক ধরেছেন। উনিই বেলচেম্বার্স।

গিলিয়াস ও আইরেসের মঠাধ্যক্ষের কাছ থেকে তার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পেতে অসুবিধা হল না।

তারা দরজায় দাঁড়িয়ে নিঃসন্দেহ হল, ইনিই বেলচেম্বার্স। তবে তার চোখের চাহনি ইদানিং খুবই বদলে গেছে। তার চোখে মুখে বিরাজ করছে পরিপূর্ণ প্রশান্তির সুস্পষ্ট ছাপ।

নিউইয়র্কে অবস্থান কালে তার পোশাক-আশাক যেমন ফিটফাট ছিল আজও ঠিক তেমনই আছে। তবে অবশ্যই কিছুটা স্বতন্ত্র ধরনের।

জনি বেলচেম্বার্স আগেকার সে বিশেষ ভঙ্গীতেই আগন্তুক দর্শনার্থীদের সঙ্গে করমর্দন সারল।

আবেগ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে আইরেস হঠাৎ বলে উঠল, 'ভাই, তোমাকে দেখে বড়ই প্রীত হলাম। তোমাকে যে এখানে পেয়ে সব এটা বাস্তবিকই কল্পনাতীত।

বেলচেম্বার্স নিরুত্তর রইল।

আইরেস বলে চলল, তবে কাজটা মন্দ করনি। সমাজের যে দুরবস্থা তা আর বলার নয়। সে চক্কর থেকে বেরিয়ে এসে অবসুর জীবন-যাপনের পথটা বাস্তাবিকই সুন্দর সিদ্ধান্ত।

হুম।

পূজা পাটের মধ্য দিয়ে জীবনের বাকি দিনগুলো কাটিয়ে দেওয়ার বাসনাটাকে সাধুবাদ দিতেই হয়। এখানে কিছুটা স্বস্তিবোধ করছ তো?

ওসব কথা ছাড়ান দাও টম। তোমাদের এ পথে আসতে বলব না। এখন আমিই এখানকার এমব্রোস। ভাইদের সঙ্গে দিব্যি সময় কেটে যায়।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, ঠিক তাই। তোমাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য আমাকে মাত্র দশ মিনিট সময় দেওয়া হয়েছে। ব্রড ওয়েতে বুঝি এখন এরকম সব পোশাকের চল হয়েছে?

গিলিয়াস খুশিতে ডগমগ হয়ে বলে উঠল, আরে এ-ই তো আমাদের জনি—জনি বেলচেম্বার্স! কোন হতচ্ছাড়া—মানে আমি বলতে চাচ্ছি, তোমাকে এখানে কে নিয়ে এল, বল তো?

আইরেস তার দিকে তাকিয়ে চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

পরমুহূর্তেই আইরেস নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলল, 'জন, তোমার গায়ের পোশাকটা খুলে ফেল। এসব ছেড়ে ছুড়ে আমাদের সঙ্গে চল। এ পথ তোমার জন্য নয়।

এ কী কথা বলছ!

ঠিকই বলছি, আজ, এখনই পদত্যাগ পত্র জমা দিয়ে মঠের সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে আমাদের সঙ্গে চল।

কিন্তু, কিন্তু।

এর মধ্যে আর কোন কিন্তু নেই। এমন কিছু একটা ব্যবস্থা কর যাতে এ বরফের কারাগার থেকে মুক্তি পেতে পার। তোমাকে ফিরে পেলে পুরনো বন্ধুরা যে কী খুশি হবে তুমি কল্পনাও করতে পারছ না।

ম্লান হেসে জন বেলচেম্বার্স বলল, তোমরা যে কি বলছ তা তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারছ না। তোমরা যে আমাকে ফিরিয়ে নিতে আগ্রহী বাস্তবিকই আনন্দের ব্যাপার। এর জন্য নিছক ধন্যবাদ জানিয়ে তোমাদের ছোট করার ইচ্ছা আমার আদৌ নেই।

ওসব ছেদো কথা ছেড়ে যা বলছি—।

তাকে মাঝ পথে থামিয়ে দিয়ে জন বেলচেম্বার্স বলল, তোমাদের আন্তরিক ইচ্ছার কথা আমি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আমার পক্ষে কিছুতেই এ মঠ ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এখানে এসে ধর্মকর্মের মাধ্যমে আমি যাবতীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষার ঊর্দ্ধে উঠে গেছি।

নিকুচি করি তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষার।

তার কথায় কর্ণপাত না করেই জন বেলচেম্বার্স বলে চলল, আমি এখান থেকেই পেয়েছি পরিপূর্ণ সুখ আর আত্মতৃপ্তি। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি এখানে, এ মঠেই পুর্ণকর্মের মধ্য দিয়ে কাটাতে চাচ্ছি। এবার সে নিজের গায়ের আলখাল্লাটার দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, এই যে ঢিলেঢালা পোশাকটা দেখতে পাচ্ছ এটা কোনদিনই আমার হাঁটু দুটোকে চেপে ধরবে না। আজ আমি এমন এক নতুন জীবনের আলোর সন্ধান পেয়েছি যা আমাকে—।

তার মুখের কথা শেষ হবার আগেই সুবিশাল ঘণ্টাটা বিকট আওয়াজ তুলে বাজতে লাগল। প্রার্থনা সভায় মিলিত হবার ঘণ্টাধ্বনি।

ভাই এমব্রোস ঘণ্টাধ্বনি হতেই মাথাটা নত করল। নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় পিছন দিকেই হাতটা ঘুরিয়ে সামান্য নাড়ল। বোধহয় পুরনো বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নেবার এটাই এখানকার প্রচলিত রীতি।

বন্ধুবর জন বেলচেম্বার্স-এর সঙ্গে আর দেখা না করেই গিলিয়াস ও আইরেস বিষণ্ণ মনে মঠ ছেড়ে চলে এল।

ল্যামসেন্ট গিলিয়াস ও টম আইরেস তাদের বর্তমান ইউরোপ সফর সেরে এ গল্পটা নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছে।

দ্য আন্নাস্ কোয়ান্টিটি

লংফেলো কি একজন কবি, নাকি জ্ঞানের আবিষ্কর্তা সুখ্যাত কন্‌ফিউসিয়াস?

বুড়ো সেন্টিমাস কিন্‌সলভিং নিউইয়র্কের বাসিন্দা। তিনি বর্তমান শতাব্দী শুরু হবার মাত্র বছর কয়েক আগে নতুন একটা আবিষ্কার করে বসলেন।

বুড়ো সেন্টিমাস-এর নতুন আবিষ্কারটা কি? তিনি আবিষ্কার করেছেন রুটি তৈরী হয় ময়দা থেকে, গম থেকে মোটেই নয়।

এক বছর রুটির ফসলের উৎপাদন কমে গেল আর গমের উৎপাদন গেল কমে। কিন্তু এ ব্যাপারটা স্টক এক্সচেঞ্জের ওপর কোন প্রভাবই পড়ল না।

ব্যাপারটা দেখে মিঃ কিন্‌সলভিং ময়দার বাজারকে একেবারে কোণঠাসা করে তবেই স্বস্তি পেলেন।

রুটির মূল ফসল ময়দা, নাকি গম—কিন্‌সলভিং যখন গবেষণা অর্থাৎ পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে মেতে রয়েছেন তখন তার ছেলে ডান কলেজের পঠন-পাঠন করছে।

এবার বুড়ো কিন্‌সলভিং রুটির কারবার থেকে অবসর নিলেন। ইতিমধ্যে তিনি কারবার চালিয়ে প্রচুর মালকড়ি কামিয়ে নিয়েছেন। বর্তমানে তাঁকে একটা টাকার কুমির বললেও অত্যুক্তি হবে না।

বাড়ি ফিরে বাবার সঙ্গে করমর্দন সেরেই ডান ছুটল তার পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। কেন উইজ তার নাম। গ্রীনউইজ গাঁয়ের বাসিন্দা। যে একজন যথার্থই বিদ্যোৎসাহী, মানবদরদী, সমাজবাদের পূজারী আর ধনীদের পরম শত্রু।

শিক্ষায়তনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে সে বর্তমানে তার বাবার ঘড়ির দোকানে বসেছে।

আর ডান? সে রাজা রাজরাদের প্রতি শ্রদ্ধাভাজন।

বন্ধু দু'জন মানসিকতার দিক থেকে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী হলেও তাদের হৃদ্যতার সম্পর্ক অটুট। তারা আনন্দ স্ফূর্তির মধ্য দিয়েই কয়েকটা দিন কাটিয়েছিল।

ক'দিন বাড়িতে কাটিয়ে ডান বন্ধুবর কেন উইজ ও বাবা মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শহরে, কলেজে পাঠাভ্যাস করতে চলে গেল।

চার বছর বাদে ডান ওয়াশিংটন স্কোয়ারে এসে এল. বি. এ. ডিগ্রি লাভ করল।

তারপর সে বেরলো ইউরোপ পর্যটনে।

সে গ্রীনউইজে এসে সেন্টিমাস কিনসলভিং-এর সমাধি স্তম্ভটার ওপর ঝুঁকে কয়েক ফোঁটা চোখের জল ফেলল।

এবার সে একান্ত আগ্রহের সঙ্গে পারিবারিক উকিলের মুখোমুখি বসে দলিল-পত্র নিয়ে দীর্ঘসময় ধরে একঘেয়ে আলোচনায় মেতে রইল।

এক সময় সে বুঝতে পারল, সে একজন নিঃসঙ্গ ধনকুবের বনে গেছে। এবার সে সিক্সথ এভিনিউর অলঙ্কারের দোকানের গদিতে পাকাপাকিভাবে বসে পড়ল।

কেনউইজ বাবা মাকে ভাল একটা বাড়িতে এনে তুলল। এবার সে ঘড়ির ভেতরের ছোট ছোট কলকব্জা ঘাঁটাঘাঁটি ছেড়ে বাইরের কাজের দিকে মন দেবার চেষ্টা করতে লাগল।

কেনউইজ ডান-এর সঙ্গে ওয়াশিংটন স্কোয়ারে চলে গেল। সেখানকার বেঞ্চে আসন নিল।

ডান-এর আচার-আচরণ ও ভাবভঙ্গী তেমন পরিবর্তন হয় নি। আর কেনউইজ? তার মধ্যে দেখা দিয়েছে শিক্ষালাভের আরও বেশী আগ্রহ আরও বেশী কর্মনিষ্ঠা ও একগ্রতা, আরও বেশী সমাজবাদী আর আরও বেশী দার্শনিক মনষ্কতা।

ডান অনেকক্ষণ ধরে আমতা আমতা করার পর মুখ না খুলে পারল না। অনন্যোপায় হয়ে সে বলেই ফেলল—এবার সবকিছু আমার মাথায় ঢুকছে। বুড়ো বাবার সম্পত্তি ও নগদ অর্থ মিলে যোগফল দাঁড়িয়েছে দু'লক্ষ ডলার।

আর তিনি এমন ডলারের পাহাড় জমিয়েছিলেন, যেসব হতভাগ্য লোকগুলো যারা পেনির হিসাবে নিত্যকার প্রয়োজন অনুযায়ী তার কাছ থেকে রুটি খরিদ করে, তাদের পকেটে নির্মমভাবে

কাঁচি চালিয়ে।

কেনউইজ তার মুখের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল।

ডান এবার বলল, কেনউইজ, তুমি তো অর্থশাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা করেছিলে, তাই না?

হ্যাঁ, তা করেছিলাম বটে।

এ বিষয়ে জ্ঞানও যথেষ্টই অর্জন করেছ, ঠিক বলি নি?

জ্ঞান যথেষ্ট কিনা তা বলা মুশকিল।

যাক গে, তবে একচেটিয়া কারবারে, মজুরদের অধিকার ও প্রাপ্য। সাধারণ মানুষের চাহিদা আর অক্টোপাসদের ব্যাপার-স্যাপারে তোমার জ্ঞান যথেষ্ট এটুকু অন্তত আমি মনে করতে পারি, তাই না।

কেন উইজ কোন কথা না বলে আগের মতই নীরবে মুচকি হাসল। ডান বলেই চলল, দেখ, আগে কোনদিনই এসব ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে কিছুমাত্রও মাথা ঘামাই নি।

কেন উইজ ছোট্ট করে বলল, তাই বুঝি?

অবশ্যই। এসব বিষয় চিন্তাকে মাথার ধারে কাছেও ঘেঁষতে দেই নি। ফুটবল খেলা আর ফুটবলের নিয়ম-কানুন নিয়ে সর্বক্ষণ মেতে থাকতাম। আর কলেজ জীবনটা তো ইয়ার দোস্তদের নিয়ে হৈ হুল্লোড় করেই কাটিয়ে দিয়েছি।

তারপর কলেজের পাঠ শেষ করে বাড়ি ফিরে—।

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ডান বলল, 'বাড়ি ফেরার পর বুঝতে পারলাম আমার বাবা ডলারের পাহাড় তৈরী করে ফেলেছেন।

তারপর কি করলে?

বাবার অর্থোপার্জনের পথটা বের করার চেষ্টায় ব্রতী হলাম।

চেষ্টার ফল কি পেলে?

নিশ্চিত হলাম, বাবা স্বাভাবিক উপায়ে অর্থোপার্জন করেন নি।

তবে তুমি নিঃসন্দেহ হতে পেরেছ যে, তোমার বাবার ডলারের পাহাড় বাঁকা পথে উপার্জিত, কি বল?

অবশ্যই। তারপর কোন সিদ্ধান্ত নিলাম শোন, মনস্থির করে ফেললাম, আমার বাবা যাদের মুখের খাবার কেড়ে নিয়ে অগাধ সম্পত্তি ও বিপুল অর্থের মালিক হয়েছেন তার কানাকড়ি পর্যন্ত আমি তাদের ফিরিয়ে দেব।

এটা কি তোমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত? কেনউইজ ভ্রূ কুঁচকে বলল।

অবশ্যই। এতে আমার ডলারের পাহাড়টার উচ্চতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়ে যাবে।

তা-তো অবশ্যই হ্রাস পাবে।

তা হোক গে। আমি ডলারগুলোকে তাদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে ভোগ করতে আগ্রহী। তোমার কি এমন কোন উপায় জানা আছে যাতে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে? কি, পারবে কোন মতলব আমাকে বাৎলে দিতে?

কেন উইজ-এর ঠোটের কোণে ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠল। তারপর সে বন্ধু ডান-এর একটা হাত চেপে ধরে বলল, না, এরকম কোন কাজ তুমি করতে পার না বন্ধু। তবে তোমার মানসিকতা, চিন্তা ভাবনার ভূয়সী প্রশংসা না করে পারছি না। কিন্তু কিছুই করতে পারবে না। সে বেচারাগুলোর অমূল্য টাকাকড়ি কেড়ে, মানে লুঠ করা হয়েছিল সে অন্যায়ের প্রতিকার করা আজ আর সম্ভব নয়। তুমি সেসব অর্থ তাদের হাতে ফিরিয়ে দিতে পারবে? অবশ্যই না।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ডান বলল, 'হ্যাঁ, এক দিক থেকে তোমার কথা সত্য বটে। কারণ সে সব প্রবঞ্চিত মানুষগুলোকে আজ খুঁজে পাওয়া খুবই দুষ্কর, বলতে গেলে সম্ভবই নয়।

তবে? আমার কথা ঠিক কিনা এবার বল?

কিন্তু কিছু না কিছু সংখ্যক মানুষকে আমি খুঁজে বের করতে পারবই পারব। তাদের তো অন্তত বাবার নেওয়া অর্থকড়ি ফিরিয়ে দিতে পারব। এটুকু করতে পারলেই আমি কিছুটা স্বস্তি পাব। কেন উইজ, নিজের কাজের ফাঁকে আমার দিকটা নিয়েও একটু ভাবনা-চিন্তা কোরো।

তোমার দিকটা বলতে অর্থকড়ি ফেরৎ দেওয়ার ব্যাপারটা তো?

হ্যাঁ। বঞ্চিত মানুষগুলোর অর্থকড়ি যত বেশী ফেরৎ দিতে পারব ঠিক ততটাই স্বস্তি আমি পাব বন্ধু।

দান ধ্যানের তো সুযোগের অভাব নেই।

আরে সে পথ তো খোলাই রইল। মনে কর, শহরটাকে আমি একটা বাগানে পরিণত করে দিতে পারি, নইলে হাসপাতালে একটা বেড করে দিতে পারি।

হ্যাঁ, তা-তো পারই।

কিন্তু একজন পিটারের কাছে সোনার ইট বিক্রি করে আমার যে অর্থাগম হবে সে অর্থগুলো নিয়ে একজন পল এখান থেকে পিঠটান দেবে, এটা আমার বাঞ্ছা নয়।

কিন্তু তোমার উদ্দেশ্যটা সিদ্ধ করার কোন উপায় কি তুমি ভেবে রেখেছ?

আমার একান্ত ইচ্ছা মানুষের রুটির অভাব দূর করি।

এর জন্য কি পরিমাণ অর্থ তোমাকে খসাতে হবে ভেবে দেখেছ কি?

আমতা আমতা করে ডান এবার বলল—না, এটা তো ভাবি নি।

কেবলমাত্র বাঞ্ছা পূরণের পথটাই বেছে রেখেছ? খরচ খরচা—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ডান বলে উঠল, আমার উকিল বলেছেন, আমি বিশ লাখের মালিক।

ধ্যুৎ! বিশ লক্ষ তো খইয়ের মত উড়ে যাবে হে! এক কোটি ডলার থাকলেও তোমার পরিকল্পনাটাকে বাস্তবায়িত করতে পারবে না বন্ধু।

একটামাত্র পেনির এমন কোন আক্ষেপ বা দুঃখ থাকা সম্ভব নয় যা একটা ডলারের পক্ষেও দূর করা সম্ভব নয়।

তোমাকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি, আশা করি তাতে আমার বক্তব্যটা খোলসা হয়ে যাবে।

বল কি সে উদাহরণ?

টমাস বয়েন-এর ছোট একটা রুটির কারখানা ছিল। দীন-দরিদ্রদের কাছে সে রুটি বিক্রি করত। ময়দার দাম বাড়ার ফলে স্বাভাবিকভাবেই তাকে রুটির দামও বাড়িয়ে দিতে হল।

ফল কি দাঁড়াল?

ফল দাঁড়াল, তার ক্রেতাদের পক্ষে বর্ধিত দাম দেওয়া সম্ভব হল না। ব্যস, বয়েন-এর কারবার শিকেয় উঠল।

তারপর?

তারপর যা হবার তা-ই হল। তাকে এক হাজার ডলার খোয়াতে হল।

মানে ডলারগুলো—।

হ্যাঁ, লোকসান হল। সারা দুনিয়ায় তার হাজার ডলারই সম্বল ছিল।

ডান গলা ছেড়ে বলে উঠল, তোমার এ উদাহরণটাকেই আমি গ্রহণ করলাম বন্ধু।

তার মানে?

আমাকে একবারটি বয়েন-এর কাছেই যেতে হবে। তুমি আমাকে তার কাছে নিয়ে চল।

কেন? হঠাৎ তার কাছে যাবার ইচ্ছে হল কেন?

তার খোয়া-যাওয়া এক হাজার ডলার আমি কেবল ফিরিয়েই দেব না, একটা রুটির কারখানাও তাকে দিয়ে দেব।

কেনউইজ শান্ত স্বরেই বলল, তবে এক হাজার ডলারের চেকটা লিখেই ফেল। আর তার ফলে দাবিদাররা শুনে ছুটে এসে যে বিশাল লাইন দেবে তাদের প্রাপ্য চেকগুলো লিখে শেষ করে ফেল।

ডান জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইল। কেনউইজ বলে চলল, আর পরের চেকটা কাটবে পঞ্চাশ হাজার ডলারের, বুঝলে?

পঞ্চাশ হাজার ডলার কেন?

কারখানাটা ডকে ওঠার ফলে বয়েন-এর মাথা খারাপ হয়ে গেল। ভাড়া বাকি পড়ায় বাড়িওয়ালা তাকে তাড়িয়ে দিয়ে ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। তার ফলে ক্ষতির পরিমাণ কোথায় গিয়ে ঠেকল,

ভাবতে পারছ? শেষ পর্যন্ত পাগলা গারদে বয়েন শেষ নিঃশ্বাস ফেলল।

তবু আমি তার দৃষ্টান্তটা সামনে রেখে লড়ে যাব। আমার দানের ব্যাপারে কোন বীমা কোম্পানি আমার নাম নথিভুক্ত করেছে বলে তো দেখি নি।

শোন, পরের চেকটা কাটবে এক লক্ষ ডলারের।

এটা আবার কেন?

বয়েন-এর ছেলে বখাটে হয়ে যায়। খুনের আসামী হয়। তিন বছর কেস চলার পর গত হপ্তায় সে খালাস পেয়েছে। মামলাটা চালাতে যে ব্যয় হয়েছে সেটা রাজ্য সরকার শহরের করদাতাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে।

ধ্যুৎ! যত্তসব বাজে কথা নিয়ে কচলাকচলি! রুটির কারখানার কথা বল।

এ উদাহরণের শেষটা চল যাই তোমাকে দেখিয়ে নিয়ে আসি। কথা বলতে বলতে কেনউইজ বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

তারা হাঁটতে হাঁটতে দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত অসহায় মানুষগুলোর এলাকা ভারিক স্ট্রীটে হাজির হল।

অক্টোপাসের অনুতাপ জ্বালায় জর্জরিত সন্তান ডানকে নিয়ে কেনউইজ একটা ভাঙাচোরা বাড়ির অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে খুবই সতর্কতার সঙ্গে ওপরে উঠে যেতে লাগল।

দরজায় ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। প্রায়ান্ধকার ঘরে একটা মেয়ে পুরনো পোশাক-পরিচ্ছদ সেলাই করতে ব্যস্ত। ছোট্ট খুপড়ি দিয়ে এক টুকরো রোদ এসে তার চুলে পড়ে ঝিকমিক করছে।

কেনউইজকে দেখেই মেয়েটা ছোট্ট করে হাসল। এভাবেই আলোচ্য উদাহরণটার দৃশ্যটা ডান-এর দেখা হল।

মেয়েটা জানাল, ত্রিশ ডজন জামা সেলাই করে চার ডলার রোজগার করে ফেলেছে। সে আরও বলল, দিন দিনই তার কাজের উন্নতি হচ্ছে। কিন্তু এত ডলার দিয়ে সে কি করবে ঠিক করে উঠতে পারছে না। কেনউইজ নির্মম নিষ্ঠুর কাকের মত ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলল।

মেয়েটার দিক থেকে আর কোন কথা শুনতে না পেয়ে কেনউইজ মুখ খুলল, ইনি আমার বন্ধু মিঃ কিন্সলভিং—ডান কিন্সলভিং।

মিস বয়েন মুচকি হেসে তাকে স্বাগাত জানাল।

কেনউইজ এবার বলল, 'পাঁচ বছর আগে যিনি রুটির দাম বাড়িয়ে দিয়ে প্রচুর ডলার কামিয়ে নিয়েছিলেন এ তাঁরই ছেলে।

মিস বয়েন আবার ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়ে তুলল। কেনউইজ বলে চলল, আমার বন্ধুবর ভাবছে, রুটির দাম বাড়ানোর ফলে যার অসুবিধায় পড়েছিল তাদের সাহায্যের জন্য কিছু করবে।

মিস বয়েন নীরবে দরজাটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল। ব্যাপারটা ডান-এর মোটেই মনঃপূত হল না।

ডান বিষণ্নমুখে বন্ধু কেনউইজ-এর পিছন পিছন ভারিক স্ট্রীটে হাজির হল। কেনউইজ-এর মুখে ডান-এর বাবা মৃত অক্টোপাসের অর্থ লালসার প্রতি বিতৃষ্ণার ছাপ ফুটে উঠল।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ডান বলল, বন্ধু কেন, বাস্তবিকই আমি বাধিত হলাম। একবার নয়, হাজার বার বাধিত হলাম।

ঘড়িওয়ালা আর্তনাদ করে উঠল, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে! তার চোখ থেকে চশমাটা খুলে পথের ওপর পড়ে গেল। এত বছরের মধ্যে এমন ঘটনা এই প্রথম ঘটল।

এর দু'মাস বাদে কেনউইজ লোয়ার ব্রডওয়ের এক রুটির কারখানায় গেল। তার চোখে উঠেছে সোনার ফ্রেমের একটা চশমা। কারখানার ভেতর থেকে এক মহিলার কণ্ঠস্বর ভেসে এল, কি বললেন, এ রুটিগুলোর দাম দশ সেন্ট?

হ্যাঁ। করণিক বলল।

থাক, রুটির অর্ডার লিখবেন না।

কারণ কি?

আরে মশাই, কয়েক পা এগিয়ে গেলেই তো এ রুটিগুলো আট সেন্ট দামে মিলে যাবে।

ঘড়িওয়ালা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সে উৎকর্ণ হয়ে সব কথা শুনে আপন মনে বলে উঠল, কণ্ঠস্বরটা কেমন যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

মহিলাটি কারখানা থেকে বেরিয়ে আসার সময় দরজার কাছে কেনউইজকে দেখেই বলে উঠল, আরে, মিঃ কেনউইজ যে! কোথায় চললেন? আছেন কেমন?

ভাল। কণ্ঠস্বরটা কানে যেতেই চিনতে পেরে গেছি, মিস ব্রায়েন।

না, মিসেস কিন্সলভিং। আপনাকে জানানো হয়ে ওঠে নি।

সে তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু সে সৌভাগ্যবানটা কে, জানতে পারি কি।

অবশ্যই। ডান। একমাস আগে আমরা গীর্জায় গিয়ে বিয়েটা সেরে এসেছি।

দ্য গার্ল অ্যান্ড দ্য গ্র্যাফট্

ফার্গুসন পোগ আমার বহুদিনের বন্ধু। সেদিন হঠাৎ তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

ফার্গুসন পোগ একজন পয়লা নম্বরের ধাপ্পাবাজ। পশ্চিম গোলার্ধে বেশ কয়েকটা জায়গায় তার বড় বড় ঘাঁটি আছে।

আর তার কারবার? শহরের বাড়ি জমি কেনা বেচা থেকে শুরু করে বাচ্চাদের কানেকটিকাট-এর কাঠের খেলনা পুতুল বিক্রি পর্যন্ত কিছুই সে বাদ দেয় না।

ফার্গুসন মাঝে মধ্যে যখনই এক বড় রকমের দাঁও মারে তখনই কিছুদিন বিশ্রাম নেওয়ার জন্য নিউইয়র্কে ফিরে আসে। বিশ্রাম—নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম যাকে বলে।

সে বলে, কারবারের নিঃসঙ্গ প্রান্তরে এক বোতল মদ, ভাল রুটি আর তুমি—আমার কাছে সবচেয়ে সুখের বিশ্রাম শান্তি আর স্বস্তি।

ফার্গুসন তো প্রায়ই বলে, একটা বড় শহর না হলে আমার ছুটি কাটাতে মন ওঠে না। ছুটি কাটাবার উপযুক্ত শহরই হচ্ছে নিউইয়র্ক। সেখানকার মানুষগুলো আমার খুব মনের মত নয়। আর মানহাট্টান? ধ্যুৎ! পৃথিবীর মধ্যে সেটা এমন একটা জায়গা যেখানে আমার চাহিদা মাফিক কিছুই পাই না।

নিউইয়র্ক শহরে অবস্থানকালে ফার্গুসনকে দুটো জায়গার কোন না কোন একটায় মিলবেই। তাদের একটা এইটিন্থ স্ট্রীটের হল—শয়নকক্ষ, আর অন্যটা হচ্ছে ফোর্থ এভিনিউ-র একটা ছোট পুরনো বইয়ের দোকান। বইয়ের দোকানটায় বসে সে ইসলাম ধর্ম আর চামড়া সম্পর্কিত বই পড়াশোনা করে।

আর হল—শয়নকক্ষে বসে সে 'জিদার' বাজায়। বছরের পর বছর ধরে সে ওয়াবালা-র কূলে সুরটার চর্চা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কিছুতেই আসর জমানো তার পক্ষে সম্ভব হচে না।

বাক্সটার ওপর তার মুখোমুখি বসি। ফার্গুসন চুরুট টানতে টানতে অনবরত তার কথা বলতে থাকে। সে তার নিজস্ব বৃত্তির প্রশংসা রীতিমত গর্বের সঙ্গেই বলতে থাকে।

আমি একদিন প্রসঙ্গক্রমে বললাম, আচ্ছা ফার্গুসন, পরিচিত কোন নারী কি তোমার বৃত্তিট গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করছে?

নারী? না, নারীরা সচরাচর আসে না।

আসে না? কারণ কি, বলতে পার?

ধাপ্পাবাজির মত বৃত্তির দিকে তাদের উৎসাহিত না হওয়ার কারণ, তারা সবাই সাধারণ কাজকর্মেই ব্যস্ত থাকে।

কেন?

আরে, তাদের যে এটা অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। বল তো, পৃথিবীতে ধন-দৌলতের মালিক কারা? পুরুষরা।

তোমার কথার অর্থ ঠিক বুঝতে পারলাম না।

না বোঝার তো কিছুই নেই। ভেবে দেখ তো, তোমার চেনা জানা এমন কোন পুরুষ কি আছে যে বাছবিচার না করে নারীকে একটা ডলারও দেয়?

ফার্গুসন, তোমার বক্তব্যে কিন্তু নির্মমতার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

কেন? এর মধ্যে তুমি আবার নির্মমতা পাচ্ছ কোথায়?

তুমি যাকে 'ধাপ্পাবাজ' বলছ সে আর কোথাও থাক আর না-ই থাক, দম্পতির মিলনের ক্ষেত্রে কখনও চোখে পড়ে না।

কিন্তু এ রকম ক্ষেত্রেও তো পুলিশকে এগিয়ে যেতে হয়। অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে—ধর, তুমি একজন ফিফ্থ এভিনিউর লাখপতি। রাত্রে বাড়ি ফেরার সময় তুমি স্ত্রীর জন্য নব্বই লক্ষ ডলারের একটা হীরের ব্রুচ্ নিয়ে গেলে। সে উফ্ জর্জ! বলে তোমাকে আলিঙ্গন করে বার বার চুমু খেল। আর তার কাছ থেকে চুম্বনটুকু পাওয়ার প্রত্যাশায়ই তুমি সারাটা দিন অধীর প্রতীক্ষায় ছিলে। তোমার বাঞ্ছা পূরণ তো হলই। এটাকেও কি তুমি ধাপ্পাবাজি বলবে?

আচ্ছা, আর্টেমিসিয়া ব্লাই-এর কথা তো তোমাকে আমি বলেইছিলাম, বলি নি? আমি ঘাড় কাত করে তার প্রশ্নের উত্তর দিলাম।

সে বলে চলল, কনসাস থেকে সে এসেছিল। রীতিমত সুদর্শন।

তোমাদের নিভৃত শহরটায় শেষবার যখন গিয়েছিলাম তখন ভাউক্রশ নামের একজনের সঙ্গে আমার দেখা হয়। সে ছিল যাকে বলে একজন ধনকুবের। দশ লাখ ডলারের মালিক।

আমি তার পেশা সম্বন্ধে জানতে চাইলে সে বলেছিল, রাজপথে ব্যবসা করে। 'পথের কারবারী' বলে আমি তার সঙ্গে রসিকতা করতাম।

মুচকি হেসে সে জবাব দিত, কথাটা পুরোপুরি ঠিক। পাকা পথের প্রতিষ্ঠানের অংশীদার।

সত্যি কথা বলতে গেলে, আমি সে কাজেই ভিড়ে গেলাম। এর পিছনে যে কারণ ছিল না একথা বলা যায় না।

এক রাত্রে তার সঙ্গে আমার যখন সামনাসামনি দেখা হল তখন আমার মানসিক পরিস্থিতি, বরাত, বাসস্থান-এর এমনকি তামাকেরও সমস্যা ছিল।

আর সে তখন হীরে জহরত আর ভাগ্যের সুপ্রসন্নতা নিয়ে মেতেছিল।

তখন আমার বরাত খুবই খারাপ। পকেটে সম্বল ছিল মাত্র—সে আলোচনার জের টেনে যাওয়া যাক।

ভাউক্রশ আমার সঙ্গে দু'-চারটে কথা বলেই রাত্রের আহারাদি সারার জন্য বড়সড় একটা রেস্তোরাঁয় আমাকে নিয়ে ঢুকল। ভেতরে তখন হরেকরকম আনন্দদায়ক ব্যাপার চলছে।

বলতে লজ্জা নেই, আমার পরিস্থিতি তখন একজন খবরের কাগজের শিল্পীর মতই মর্মান্তিক।

ভাউক্রশ তখন আমার সঙ্গে একজন ভল্লুক শিকারীর মতই আচরণ করতে লাগল। আমাকে বলল, মিঃ ফার্গুসন, আমি আপনাকে কাজে লাগিয়ে দিলাম।

আপনি নির্দ্বিধায় চালিয়ে যান মিঃ ভাউক্রশ।

লোকটা একজন নির্ভেজাল নিউইয়র্কার। কিভাবে সবার দৃষ্টিতে পড়া যাবে এটাই তার অন্যতম লক্ষ্য। একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়ে উঠবে এটাই তার একান্ত আগ্রহ। সে স্বীকারও করেছে, জীবনভর এটাই সে মনে-প্রাণে চেয়ে এসেছে। সবাই তাকে মান্য করুক, শ্রদ্ধার চোখে দেখুক এটাই তার ইচ্ছা।

সে তো আর দশ লাখ ডলারের মালিক ছিল না। তাই টাকাকড়ি উড়িয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

সে নিজের মুখেই বলেছে, গরীব লোকরা যাতে বিনা পয়সায় রসুন ব্যবহার করতে পারে সে

জন্য সে বেশ কিছুদিন রসুন চাষে লেগে ছিল।

তার কথা শুনে কার্নেগী তার থাকার জন্য ও ভাল ভাষার এক গ্রন্থাগার করার জন্য তাকে সেখানে একটা বাড়ি তৈরী করে দিলেন।

তিন-তিনবার সে চলন্ত মোটরগাড়ির সামনে লাফিয়ে পড়েছিল। আর সে জন্য তার পাঁচটা পাঁজর গুঁড়িয়ে যায়।

ব্যাপারটা খবরের কাগজের পাতায় ছাপা হয়েছিল, উচ্চতা পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি, চারটে দাঁত বাঁধানো, এমন চেহারার অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তি গাড়ি চাপা পড়েছে। আর এ-ও লিখেছে অনুমান করা হচ্ছে যে, সে কুখ্যাত রেড লিয়ারি দলের সর্বশেষ প্রতিনিধি।

একটা কথা, আপনি কি কোন দিন সাংবাদিকদের কাছে ধর্ণা দিয়েছিলেন?

আর সে আর বলব কী! গতমাসে সাংবাদিকদের দুপুরের আহারাদি সারতেই আমার ১২৪.৮০ ডলার খরচ হয়ে গেছে।

ফল হয়েছিল কিছু?

মনে পড়েছে, এবার মনে পড়েছে, আরও ৮.৫০ ডলার পেপসিনের জন্য যোগ করুন।

বলুন তো, আপনার ওই বিশিষ্ট হয়ে ওঠার উল্টোপাল্টা প্রয়াস আমি কিভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি? উল্টো কোন ব্যবহারের মাধ্যমে?

আজ রাত্রে ওরকমই কিছুই করা দরকার। এতে আমি মর্মাহত হলেও কাজটা আমাকে করতেই হবে।

কথা বলতে বলতে সিদ্ধ-আলু মাখছে এমন এক জনের কাছে গিয়ে অভিযোগ জানাতেই হল।

তখনই আনন্দে ডগমগ হয়ে তিনি বললেন, সে একজন পুলিশ কমিশনার।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, দেখুন, মানুষের পক্ষে উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকা তো মঙ্গলের। তবে যেখানে-সেখানে ছুটোছুটি করাটা সঙ্গত নয়।

ঠিক সে মুহূর্তেই নতুন একটা মতলব আমার মাথায় খেলে গেল। তাকে বললাম, মনে করুন, যদি এমন ব্যবস্থা করা যায় যে, একটা সপ্তাহ ধরে রোজ আপনাকে নিয়ে সব কটা খবরের কাগজে এক কি দু'কলম লেখা ছাপা হয়, আর সে সঙ্গে আপনার বহু ছাপা হয় তবে তার জন্য আপনি কত ডলার ব্যয় করতে পারবেন?

মুহূর্তের মধ্যেই ভেবে নিয়ে তিনি বললেন, হাজার দশেক। কিন্তু একটা শর্তে।

শর্ত? কি সে শর্ত?

শর্ত হচ্ছে, কোন রকম খুন-জখমের ব্যাপারে চলবে না।

আর কিছু?

আর একটা শর্ত, কোন নাচের আসরে আমি লাল প্যান্ট পরব না। মনে থাকে যেন।

আরে না, ওসব কোন কিছুই আপনাকে করতে বলব না। আমার প্রস্তাবটা সম্মানের তো বটেই, অবশ্যই নারীসুলভ নয়, আশা করি স্বীকার করবেন।

ওয়েটারকে বলে একটা ছোট পাত্র আর কিছু সব্জি আনিয়ে নিলাম। উদ্দেশ্য তাকে কার্যপ্রণালীটা বুঝিয়ে দেওয়া।

সম্পূর্ণ ব্যাপারটা তাকে বুঝিয়ে দিলাম। সে রাত্রেই সালিনাতে মিস আর্টেমিসিয়াকে একটা টেলিগ্রাম করে দিলাম।

সকালের মধ্যেই সে দুটো ফটোগ্রাফ আর চতুর্থ প্রেস বিটেরিয়ান গীর্জার এক প্রধানের স্বাক্ষর সম্বলিত একটা চিঠি যোগাড় করে নিল। আর কিছু জিনিসপত্র আর আশি ডলার সঙ্গে নিয়ে নিল।

আসার সময় পথে গাড়ি থামিয়ে একটা ট্রাস্ট কোম্পানির সহ সভাপতির বরাবর একটা প্রেমপত্র। প্যাকেটের ওপর আড়াই শ' ডলার লেখা পাঁচ ডলার নোটের একটা গোছার বন্দোবস্ত করে নিল। আর সে সঙ্গে একটা ফ্ল্যাসলাইটও যোগাড় করে ফেলল।

মিস আর্টেমিসিয়া আমার টেলিগ্রাম পেয়ে পরবর্তী পঞ্চম রাত্রে সাজপোশাকে সুসজ্জিত হয়ে আমার অপেক্ষায় ছিল। আমরা তাকে নিয়ে এমন একটা হোটেলে গেলাম যেখানে ঢুকতে গেলে বিশেষ ধরনের সিগারেট ও তাস খেলায় দক্ষ না হলে কোন নারীই প্রবেশাধিকার পায় না।

ভাউক্রশ মেয়েটাকে দেখামাত্রই বলে উঠল, আরে, এ যে ডানা-কাটা পরী? মেয়েটার রূপ যে মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার মত।

আমরা তিনজন মিলে যে পরিকল্পনার ছক এঁকেছিলাম পুরোটাই অর্থকড়ি লেনদেনের ব্যাপার।

ভাউক্রশ মিস ব্লাই-এর পিছনে এক মাস ধরে এঁটুলির মতে লেগে থাকবে। তবে উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করাতে এটা কোন উল্লেখযোগ্য ব্যাপারই নয়। আর নিউইয়র্কে এমন ব্যাপার-স্যাপার প্রায়ই ঘটে।

ভাউক্রশকে তো এ মেয়েটাকে দুটো প্রেমপত্র লিখাতে হবে। একেবারেই বাজে ধরনের প্রেমপত্র। মনে করতে পারেন, আপনার মৃত্যুর পর আপনার সহধর্মিণী খবরের কাগজের পাতায় সে সব বক্তব্য ছাপাবে। আর তা-ও আবার রোজই একটা করে প্রেমপত্র লিখতে হবে।

একমাস বাদে ভাউক্রশ মেয়েটাকে ছেড়ে দেবে। আর মিস আর্টেমিসিয়া? সে কথা খেলাপের অভিযোগে দশ হাজার ডলার দাবী করে আদালতে মামলা রুজু করবে।

তারা একটা রাত্রি কাটাতে রাজি হল। আমি ফিফ্‌থ এভিনিউর একটা রেস্তোরাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম।

পরোয়ানা বাহক ভেতরে ঢুকে ভাউক্রশ-এর হাতে একটা কাগজ দিল। সবার নজর তাদের ওপর।

আমি তো নিঃসন্দেহই হয়েছি, দশ হাজার আমাদের হাতের মুঠোয় মধ্যে এসে গেছে। আমি ব্যাপারটি নিয়ে ভাবতে ভাবতে ঘরে চলে গেলাম।

মিস আর্টেমিসিয়ার সঙ্গে চুক্তি হয়েছে, দশ হাজার ডলার মিস আর্টেমিসিয়া পাবে। মামলায় হেরে গেলেও সে-ই ডলারগুলো পাবে।

আমি ঘরে ঢোকার পর প্রায় দু'ঘণ্টা বাদে কে যেন আমার ঘরের দরজার কড়া নাড়ল।

আমি ব্যস্ত হাতে দরজা খুলেই দেখি, ভাউক্রশ আর মিস আর্টেমিসিয়া সামনে দাঁড়িয়ে।

ভাউক্রশ আমাকে বলল—আমরা বিয়ের পাট মিটিয়েই এলাম।

আমার টেবিলের ওপর একটা মোড়ক রেখে তারা শুভরাত্রি জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ফার্গুসন কাহিনীটা বলা শেষ করে মুহূর্তের জন্য থামল। তারপর এক সময় উপসংহার হিসাবে সে বলল, দেখ, কোন মেয়ে তার স্বাভাবিক বৃত্তিগত কাজকর্ম আর আত্মরক্ষার খাতিরে সে সহজাত ধাপ্পাবাজির প্রবৃত্তি অর্জন করে তা নিয়েই সে এতই ব্যস্ত থাকে যে, অন্য কোন বৃত্তিতে সে সুবিধে করতে পারে না।

স্বাভাবিক কৌতূহলের শিকার হয়েই আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার টেবিলে যে মোড়কটা তারা রেখে গিয়েছিল সেটার ভেতরে কি ছিল, বল তো?

মিঃ ভাউক্রশ-এর দু'জোড়া পুরনো প্যান্ট।

আর কিছু?

কনসাস স্টেশন পর্যন্ত একটা ট্রেনের টিকিট। ফার্গুসন বলল।

দ্য থিংস দ্য প্লে

খবরের কাগজের এক প্রতিবেদকের সঙ্গে আমার খাতির পরিচয় রয়েছে। তার দুটো ফ্রী পাশ রয়েছে। সে সুযোগে আমাকে কয়েকটা রাত্রি আগে আমাকে রঙ্গমঞ্চে একটা অনুষ্ঠান দেখতে যেতে হয়েছিল।

অনুষ্ঠানটার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল এক সুদর্শন শিল্পীর বেহালাবাদন।

লোকটার বয়স চল্লিশের কিছু বেশী। মাথায় এক রাশ সান পাটের মত সাদা চুল।

গান বাজনার ভক্ত আমি নই। তাই তার বাজনা আমার কান দুটোর

প্রবেশাধিকার পায় নি।

আমার চোখ দুটো কিন্তু বেহালা বাদকের ওপর স্থির হয়ে রইল। খবরের কাগজের প্রতিবেদক আমাকে লক্ষ্য করে বলল, 'লোকটা সম্বন্ধে দু'এক মাস আগে একটা গল্প আমি শুনেছিলাম। রঙ্গশালার কর্তৃপক্ষ কাজটার দায়িত্ব আমার ওপরই চাপিয়ে দিয়েছিল।

সে আমাকে বলেছিল, 'তুমি যে প্রতিবেদনটা লিখবে সেটা হবে পুরো একটা কলমের। আর হাসি-ঠাট্টায় ভর্তি থাকবে, পারবে তো?

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, অবশ্যই পারব। সম্প্রতি আমি একটা হাসির নাটক লিখছি। অতএব আমার কাছে এটা কোন সমস্যাই নয়।

তারপর আমি নাট্যশালায় গিয়ে অত্যাবশ্যক তথ্যাদি সংগ্রহ করে ফেললাম।

না, আমার দ্বারা প্রতিবেদনটা আর লেখা সম্ভব হল না। কারণ, আমাকে হঠাৎই একটা শোক সংবাদ লেখার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হল।

কেন যে আমি কথা দিয়েও প্রতিবেদনটা না লিখে শোক সংবাদটা লেখার কাজে মেতে গেলাম তা আমার পক্ষে খোলসা করে বলা সম্ভব নয়। আসলে সব কাজ সবার দ্বারা সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না।

ভাল কথা, ঘটনাটা নিয়ে একটা বেশ জমাটে বিয়োগান্ত নাটক লিখে ফেলতে পার। নাটকটার মালমশলা যা কিছু দরকার আমিই তোমাকে সরবরাহ করব।

অনুষ্ঠানটা শেষ হলে খবরের কাগজের প্রতিবেদন লেখক বন্ধুবর এক নাগাড়ে আমার কাছে বলে চলল।

আমি সব কিছু শুনে বললাম—আমি ভেবেই পাচ্ছি না। এসব তথ্য ব্যবহার করে তুমি কেন একটা জমাটে হাসির নাটক লিখতে পারলে না!

প্রতিবেদন লেখক বলল, 'তবে তুমি চেষ্টা করে দেখ, করবে তো?

করব।

শেষ পর্যন্ত লিখেও ফেললাম।

আমি লেখাটা পড়ে তাকে দেখিয়ে দিলাম, কিভাবে সে-ই ইচ্ছা করলে খবরের কাগজের জন্য একটা হাসির কলম লিখে ফেলতে পারত।

এবিংডন স্কোয়ারের একটা বাড়ির নিচতলার একটা ঘরে পঁচিশ বছর ধরে একটা দোকান চলছে। খেলনা ও স্টেশনারী জিনিসপত্র বিক্রি হয়। সে বাড়ি আর দোকানটার মালিক এক বিধবা রমণী।

বিশ বছর আগের ঘটনা—সে বাড়িটার ওপর তলায় তখন একটা বিয়ের অনুষ্ঠান হয়েছিল।

বিয়েটা হয়েছিল ফ্রাংক বারি আর হেলেন-এর। নিতবর হয়েছিল জন ডিলানি, উভয়েই বয়সে তরুণ। বহুদিনের বন্ধুত্ব। উভয়েই হেলেনকে ভালবাসত। আর তাকে বিয়ে করার জন্য উভয়েই বহুভাবে চেষ্টা চরিত্র কম করে নি। শেষ পর্যন্ত ফ্রাংক বারিই প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে।

বিয়ের পাট মিটে গেলে স্থির হল ফ্রাংক আর হেলেন ওল্ড পয়েন্ট কমফোর্টে এক সপ্তাহের জন্য মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে যাবে।

প্রতিবেশীরা তাদের বিদায় সম্বর্ধনা জানানোর জন্য ভুট্টার ছাতু আর পুরনো গুল্ফচ্ছদ নিয়ে অপেক্ষা করছে।

প্রেমোন্মাদ জন ডিলানি হঠাৎ ঘরে ঢুকল। তার মাথার চুল উস্কো খুস্কো।

কণ্ঠস্বরে আবেগ প্রকাশ করে সে বলে উঠল, 'তোমার স্মৃতিটুকু অন্তরের অন্তঃস্থলে এঁকে নিয়ে আমি পৃথিবীর অন্তিমতম প্রান্তে চলে যাব। অন্যের প্রতি তোমার আসক্তি জন্মেছে জানার পর আর তোমার সান্নিধ্যে থাকা সম্ভব নয়, উচিতও নয়।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে হেলেন তার দিকে তাকাল।

জন ডিলানি বলে চলল, হ্যাঁ, আমি বহুদূরে, আফ্রিকায় চলে যাব।

তোমার কাছে আমার একটাই মিনতি, এখনই এখান থেকে চলে যাও। কেউ এসে পড়লে প্রমাদ ঘটে যাবে।

জন ডিলানি তার সামনে নতজানু হয়ে বসল যাতে সে তাকে চুম্বন করতে পারে। হেলেন

নায়িকা সে আগে না হলে পরে হলেও নিজের জীবন-কাহিনী নাট্যশালার ম্যানেজার বা খবরের কাগজের প্রতিবেদকের কাছে বলবেই বলবে। তার ভাল লাগা পাত্রীর রামন্টি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হাতটা ধরে ছোট্ট করে চুমু খেল। তারপর বিষণ্ণ মুখে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে নিজের ঘরের দিকে ধীরে পায়ে এগিয়ে গেল।

আর হেলেন? সে চোখের তারায় বিষণ্ণতার ছাপ এঁকে মুহূর্তকাল নিজের হাতটার দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইল। এ একই হাতে তিন-তিনজন পাণিপ্রার্থী চুমু খেয়েছে।

তারপর এক-এক করে সবাই ঘোড়ার পিঠে চেপে চলে গেছে। একটা ঘণ্টা পেরোতে না পেরোতেই রহস্যময় অতিথিটা আবার ধীরমন্থর গতিতে ঘরে ঢুকল।

হেলেন বনহরিণীর মত সিঁড়ি দিয়ে লাফাতে লাফাতে নেমে ঘরে ঢুকল। অতিথিটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে নিজের প্রেমের কাহিনী বলতে শুরু করল। সে বলল, 'তুমি কি আমাকে চিনতে পারছ না হেলেন? তোমার চোখ দুটো দেখে কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, সেই চোখ, সেই মুখ ঠিক যেন কার্বন কপি।

মুহূর্তের জন্য নীরব থেকে তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে-ই আবার বলতে শুরু করল—হেলেন, তুমি কি অতীতকে ক্ষমা করতে পার না? পার নাকি আমাদের বিশ বছরের ভালবাসাকে স্মরণ করতে? বিশ্বাস কর হেলেন, বিশটা বছর ধরে আমি অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ হচ্ছি। হেলেন বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে তার মুখের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইল।

সে বলে চলল—আজ আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। তোমার প্রতি যে নির্মম-নিষ্ঠুর আচরণ আমি করেছি তা বাস্তবিকই ক্ষমার অযোগ্য।

মুহূর্তের জন্য থেমে সে আবার বলতে আরম্ভ করল, 'তুমি হয়ত প্রশ্ন করতে পার, আমি যদি নিজের অমানবিক কাজের জন্য সত্যি অনুতপ্ত হয়ে থাকি তবে কেন এতদিন তোমার কাছে ফিরে আসিনি। আমার দিক থেকে এর একটাই উত্তর—ভয়ে। হ্যাঁ, ভয়েই সাধ থাকলেও তোমার কাছে ফিরে আসার সাধ্য আমার হয় নি। কিন্তু আজ আমার ভালবাসার আকর্ষণ সব যুক্তিকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে হেলেন।

হেলেন আগের মতই সবিস্ময়ে তার মুখের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইল।

চেয়ারে সোজা হয়ে, সাধ্যমত হেলেনের দিকে ঝুঁকে সে এবার বলল, হেলেন, প্রিয়তমা আমার, তুমি কি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে না। হেলেন ক্ষমা কর—আমাকে ক্ষমা করে দাও।

হেলেন চেয়ার ছেড়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল।

রহস্যময় অতিথিও চেয়ারটাকে পিছনে ঠেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কাঁপা কাঁপা হাতে হেলেনের হাতটা টেনে নিল।

মুহূর্তে কর্তব্য ঠিক করতে না পেরে হেলেন নিশ্চল নিথরভাবে বজ্রাহতের মত সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

হেলেন-এর বুকে ধীরে ধীরে জাগতে লাগল অবিস্মরণীয় প্রথম প্রেমের স্মৃতি। একের পর এক টুকরো টুকরো ঘটনা আর কথা তার মনকে কানায় কানায় অর্ধেকটা মন ভরিয়ে দিল। আর বাকি অর্ধেকটা? বাকি অর্ধেকটা যে তখনও অন্য কিছুতে ভরা রয়েছে। সে সব কি? উত্তর কালের পূর্ণতর, নিকটতর কিছু।

সত্যি হেলেন দো-টানায় পড়ে গেছে। কি করবে, কি করা উচিত আর কোন পথই বা সে বেছে নেবে তা স্থির করা তার পক্ষে দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। আসলে যে তার বুকের মধ্যে শুরু হয়েছে নতুনের সঙ্গে পুরাতনের লড়াই।

হেলেন ঘরের আলোটা কমিয়ে দিয়ে আধো আধো অন্ধকারে একাকী চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে আকাশ পাতাল ভেবে চলল। ঠিক সে মুহূর্তেই ওপরের ঘর থেকে বাতাস বাহিত বেহালার করুণ স্বর তার কানে এল।

বেহালার করুণ আর্তি আর সুরকার যেন তাকে বার বার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

হঠাৎ দরজায় বেহালা-বাদক অতিথির ছায়ামূর্তি ভেসে উঠল।

হেলেন তার দিকে নীরব চাহনি মেলে তাকিয়ে রইল।

রহস্যময় অতিথির কণ্ঠস্বরে শুনে হেলেন তার দিকে অনুসন্ধিৎসু নজরে তাকাল।

রহস্যময় অতিথি আগের চেয়েও করুণ স্বরে বলল, 'হেলেন, তুমি কি সত্যি কোনদিন আমাকে ক্ষমা করতে পারবে না? তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

হেলেন মুখ খুলল, 'ক্ষমা? যাকে তুমি ক্ষমা করতে বলছ, যাকে ভালবাসার কথা বলছ, তার কাছে বিশটা বছরের ব্যবধান যে খুবই দীর্ঘ সময়।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে রহস্যময় অতিথি বলল, তোমাকে আমার মনের কথা বুঝিয়ে বলার মত ভাষা নেই। তোমার কাছে আমি কিছুই গোপন করব না। সে রাত্রে লোকটা যখন চলে গেল তখন আমি তার পিছু নিয়েছিলাম। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, ঈর্ষা আমাকে উন্মাদ করে তুলেছিল।

তারপর মুহূর্তের জন্য ভেবে নিয়ে সে আবার বলতে শুরু করল, 'আমি তার পিছু নিয়ে কিছুদূর গেলাম। অন্ধকার একটা পথের ওপর আমি তাকে পিস্তল দিয়ে গুলি করলাম। সে ধড়াস করে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ে গেল। ব্যস, সে আর উঠে দাঁড়ায় নি।

দুরু দুরু বুকে আমি এগিয়ে গিয়ে তাকে পরীক্ষা করলাম। একটা পাথরের ওপর তার মাথাটা আছাড় খেয়ে পড়ে। আঘাত লাগে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে এবার প্রায় কাঁদো কাঁদো স্বরে এবার বলতে লাগল, বিশ্বাস কর, আমি তাকে অবশ্যই মেরে ফেলতে চাইনি। আর এ-ও বিশ্বাস কর, মনের অকৃত্রিম প্রগাঢ় ভালবাসা আর ঈর্ষা আমার মধ্যে রীতিমত উন্মাদনা জাগিয়ে তুলেছিল। আমি যেন পাগল হয়ে গিয়েছিলাম।

অদূরবর্তী একটা মোটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আমি দেখেছিলাম। বিকট আওয়াজ তুলে একটা অ্যাম্বুলেন্স ছুটে এল। তার কাছে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর কয়েকজন মিলে তাকে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে নিল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সেটা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। যদিও তুমি তাকেই বরমাল্য পরিয়ে দিয়ে বিয়ে করেছিলে। হেলেন, তুমি কি—'

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, কে, কে তুমি? খুলে বল, কে তুমি?

আমাকে তুমি চিনতে পার নি হেলেন?

কে? কে তুমি? কথাটা বলেই হেলেন নিষ্পলক চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল। নীরবে স্মৃতি মন্থন করতে লাগল।

সে বলল, হেলেন, আমি সেই লোক যে তোমাকে অতীতের মতই আজও একই রকম ভালবাসি।

তুমি—তুমি কি তবে—

তার কথা শেষ হবার আগেই রহস্যময় অতিথি বলে উঠল, হ্যাঁ, আমি—আমি জন ডিলানি। তুমি যদি আমাকে ক্ষমা করতে পার হেলেন—

তার কথা শেষ হবার আগেই হেলেন এক দৌড়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠার সময় সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে বলতে লাগল—'ফ্রাংক! ফ্রাংক!'

আমার সংবাদপত্রের প্রতিবেদক বন্ধুবর নাকি তার মধ্যে মজা পাওয়ার মত কিছুই দেখতে পেল না।

এ র‍্যাম্বল ইন অ্যালচাসিয়া

আমরা যে রকম অভ্যস্ত সেদিন সকালেও ঠিক তেমনিভাবেই আমি এবং আমার স্ত্রী বিদায় নিলাম।

সে তার হাতের চায়ের কাপটা রেখেই আমার সঙ্গে দরজা পর্যন্ত এল।

দরজায় দাঁড়িয়েই সে আমার বুক খোলা কোটের ভেতর থেকে অদৃশ্য ব্যান্ডেজের টুকরোটাকে তুলে হাতে নিয়ে আমাকে হুকুম দিল—'খবরদার ঠাণ্ডা লাগাবে না।

আমি চুম্বন দিয়ে তার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। সে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

রওনা হবার মুহূর্তে আগামীতে কি ঘটবে, কি ঘটার সম্ভাবনা আছে তা নিয়ে আমার কিছুমাত্রও চিন্তা বা আশংকা কোনটাই ছিল না।

আক্রমণটা কিন্তু অকস্মাৎই এসে গেল।

মাত্র দিন কয়েক আগে সে বিখ্যাত রেলপথ মামলায় আমি ঢ্যাং ঢ্যাং করে জিতে গেছি। তার জন্য বেশ কয়েক সপ্তাহ আমাকে দিন-রাত্রি কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছিল।

সত্যি কথা বলতে কি, মামলাটা জেতার জন্য আমাকে বেশ কয়েকটা বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে বহু আইনের বই ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয়েছে। সে যে কী অমানুষিক পরিশ্রম আমাকে করতে হয়েছে তা কারো কাছে বলার নয়, বলে বিশ্বাস করানোও সম্ভব নয়।

আমার ব্যাপার-স্যাপার দেখে আমার বন্ধু ও ডাক্তার ভোলনে আমাকে বার বার সতর্কও করে দিয়েছিল।

সে প্রায় শাসনের স্বরেই আমাকে বলেছিল, 'আমার সাফ কথা শোন, তুমি যদি এভাবে কঠোর পরিশ্রম করতেই থাক, কাজের চাপ না কমাও তবে হঠাৎ কঠিন রোগ তোমাকে পেয়ে বসবে।

আমি কিছু বলতে না পেরে আমতা আমতা করতে লাগলাম। সে আমার বক্তব্য শোনার জন্য অপেক্ষা না করেই আবার একই স্বরে বলতে আরম্ভ করল, 'শোন, কঠোর পরিশ্রমে তোমার মস্তিষ্ক, বিশেষ করে তোমার স্নায়ুগুলো কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে।

আমি প্রায় অস্ফুট উচ্চারণ করলাম—'হুম্! সে এত সহজে দমবার পাত্র নয়। বলেই চলল, 'তুমিই বল তো বেলফোর্ড, এমন একটা সপ্তাহের কথা তুমি বলতে পার যে, খবরের কাগজের পাতায় এফার্সিয়া, যাকে বলে বাক্‌শক্তিহীনতার কথা চোখে পড়ে না? যেমন মনে কর, কোন একজন নিজের অতীত আর নিজের পরিচয়ের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে নাম গোত্রহীন অবস্থায় অহেতুক পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ সব কিসের জন্য ঘটে বলতে পার?

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে নীরবে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম।

আমি জানি, তুমি বলতে পারবে না। আর যদি পারতেই তবে অবশ্যই এমন অক্লান্ত কঠোর পরিশ্রম তুমি করতে না, কিছুতেই না। বলছি শোন, এক নাগাড়ে দীর্ঘদিন কঠোর পরিশ্রমই এর কারণ। আর সে সঙ্গে দুশ্চিন্তাও ছোট মস্তিষ্কটা জমাট বেঁধে যাওয়ার মূলে কাজ করে।

আরও মুহূর্তকাল নীরবতার মধ্য দিয়ে ভেবে নিয়ে আমি মুখ খুললাম—'দেখ ডাক্তার, আমার বিশ্বাস, সে সব ক্ষেত্রে আসলে মস্তিষ্ক জমাট বাঁধে খবরের কাগজের প্রতিবেদকের মাথায়।

আমার কথার উত্তরে ডাক্তার ভোলনে বলল, 'আরে, রোগটা তো আছেই। অতএব এ পরিস্থিতিতে তোমার ক্ষেত্রে বিশ্রাম ও বায়ু পরিবর্তন একান্তই অপরিহার্য।

আমতা আমতা করে আমি বললাম, একটা মানুষের ক্ষেত্রে যে বিশ্রামটুকু একান্ত দরকার সেটুকু তো আমি—

আমাকে থামিয়ে দিয়ে বেশ একটু রাগতস্বরেই সে এবার বলে উঠল—'আরে রাখ তোমার বিশ্রামের কথা! তোমার বিশ্রাম তো কেবলমাত্র আইনের বইপত্র পড়া। বাকি সময় আদালত, অফিস আর বাড়ি, মিথ্যে বলেছি? শোন, সময় থাকতে সতর্ক হওয়াই উচিত।

আমি নিজের সাফাই গাইতে গিয়ে বললাম, প্রতি বৃহস্পতিবার রাত্রে আমি আর আমার সহধর্মিণী মুখোমুখি বসে 'ক্রিবিজ' খেলে দীর্ঘ সময় কাটাই, তুমি তো জানই ডাক্তার।

এবার রবিবারের কথা বলছি—প্রতিটা রবিবার সে তার মায়ের সাপ্তাহিক চিঠিপত্র নিয়ে আমার সাথে আলোচনা করে তা-ও আবার দীর্ঘ সময় ধরে, জান?

না, এসব বিশ্রামের পর্যায়ে পড়ে না।

আইনের বইগুলো পড়া যে এক বিশেষ ধরনের বিশ্রামের আওতায় পড়ে না, তা-ও আজ অবধি প্রমাণিত হয় নি ডাক্তার।

সেদিন সকালে পথ চলতে চলতে আমি ডাক্তারের কথাগুলো ভাবতে লাগলাম। তখন বেশ সুস্থবোধ করতে লাগলাম। মেজাজও চাঙা ছিল

দিনের বেলার গাড়ির ধকল ও মাংসপেশীর আড়ষ্টতা ও শিরা-উপশিরায় টান লাগায় আমার ঘুম চটে গেল।

এক সময় আপন মনেই বলে উঠলাম, আরে আর যা-ই হোক না কেন, আমার তো একটা নাম অবশ্যই আছে।

পকেটগুলো হাতড়ে কোন কার্ড বা চিঠি কিছুই পেলাম না। এমন কি এক চিলতে কাগজও হাতে ঠেকল না।

শেষ পর্যন্ত কোটের ভেতরের পকেট থেকে অনেকগুলো বিল পেলাম। প্রায় তিন হাজার ডলারের বিল। আপন মনেই বললাম, অবশ্যই আমি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। কথাগুলো বারবার বলে ভাবতে শুরু করলাম। যাত্রী বোঝাই গাড়িটা ধীর-গতিতে এগিয়ে চলেছে।

একজন যাত্রী নামার প্রস্তুতি নিতে লাগল। আমার পাশের আসনটা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। চশমাধারী একজন মোটাসোটা ভদ্রলোক ধপাস করে প্রায় আমার গায়ের ওপরই বসে পড়লেন।

আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে মুচকি হেসে তিনি একটা খবরের কাগজ খুললেন।

খবরের কাগজটা মুখের সামনে ধরা অবস্থাতেই আমাদের দু'জনের মধ্যে বাক্য-বিনিময় চলতে লাগল।

ভদ্রলোক বললেন, 'বোধহয় আপনিও আমাদেরই লোক। এবার সম্মেলনে পশ্চিম থেকে ভাল ভাল লোক লোক পাঠানো হচ্ছে। আর সম্মেলনটা নিউইয়র্কে ব্যবস্থা করায় আমি খুবই খুশি হয়েছি। আসলে এর আগে আমার আর পূর্বাঞ্চলে আসা হয়ে ওঠে নি।

জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারলাম, আমার গা ঘেঁষে বসা ভদ্রলোকের নাম পি. আর বোল্ডার—বোল্ডার অ্যান্ড সন। মিসৌরি-র হিকোরি-র অধিবাসী।

এবার আমার পালা। আমি তৈরী না থাকলেও প্রথা তো বজায় রাখতেই হবে।

আমাকেও তো নাম, পেশা প্রভৃতি বলতেই হয়, আমার সহযাত্রী ভদ্রলোকটার গায়ের উগ্র গন্ধ আমার দুর্বল মস্তিষ্ককে সাহায্য করল। আর সে সঙ্গে তাঁর হাতের খবরের কাগজের পাতটার একটা বড়সড় বিজ্ঞাপন আমার ধারণাটিকে আরও পাকা করে দিল।

আমি দ্বিধাহীন গলায় উচ্চারণ করে ফেললাম, এডোয়ার্ড পিংহামার আমার নাম। কানসাস-এর কর্ণোপোলিস-এ বাড়ি। একজন ওষুধ বিক্রেতা।

আরে মশাই, আপনাকে দেখেই আমি ধরে ফেলেছি, আপনি একজন ওষুধ বিক্রেতা। আপনার ডান হাতের তর্জনির দাগটা দেখেই বুঝতে পেরেছি আপনাকে হামান দিস্তা দিয়ে ওষুধ গুঁড়ো করতে হয়।

হুম্।

আপনিও তো সম্মেলনের প্রতিনিধি, তাই না?

গাড়ির সবাই-ই কি ওষুধ বিক্রেতা?

হ্যাঁ। এরা প্রায় সবাই আপনার মতই পুরনো ওষুধ বিক্রেতা।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ, ঠিক তা-ই। ভদ্রলোক এবার আমার দিকে মুখটাকে আরও বেশী করে এগিয়ে নিয়ে এসে বললেন, 'মশাই, আপনাকেই শুধু আগে থাকতে বলছি, এবারের সম্মেলনে আমি একটা নতুন প্রস্তাব রাখব। সবাই তো নতুন চিন্তা ভাবনার কথাই জানতে চায়।

তা-তো নিশ্চয়ই।

আপনি তো তাকের ওপরের বিভিন্ন উপকরণ ঘাঁটাঘাঁটি করেন। তাদের কোন্টা বিষ, আর কোনটা নির্বিষ আপনার জানাই আছে। তবু ওই বোতল দুটো ভুল হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। মানেন তো?

হ্যাঁ, ভুল হবেই না এরকম কথা জোর দিয়ে বলা যায় না।

আপনারা বোতল দুটোকে আলাদা আলাদা তাকে রাখেন যাতে ভুল না হয়, ঠিক কি না?

ঠিক তা-ই।

আমি বলব, বোতল দুটো একই তাকে পাশাপাশি রাখলে ভুল হবার সম্ভাবনা কম থাকে। কারণ, ব্যবহার করার সময় দুটোকে হাতে নিয়ে মিলিয়ে দেখতে পারবেন। এর ফলে সহজেই ভুল-ভ্রান্তি এড়িয়ে চলতে পারবেন। চশমার ফাঁক দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে তিনি এবার বললেন, আমার এ প্রস্তাবটা আপনার কেমন মনে হচ্ছে?

আমার কাছে তো খুবই যুক্তিগ্রাহ্য—মানে ভাল মনে হচ্ছে।

তবে আমি প্রস্তাবটা তোলামাত্র আপনি সমর্থন করবেন, করবেন তো?

আমার সাহায্য আপনি—আরে, কিসের—বোতল দুটো কিসের।

পটাশ আর টার্টেট অব এন্টিমনি, এবং পটাশ আর টার্টেট অব সোডা-র বোতলের কথা বলছি।

আমি বেশ জোরেই উচ্চারণ করলাম, এখন থেকে বোতল দুটোকে পাশাপাশিই রাখতে হবে।

আমার কথা শেষ হতেই মিঃ বোল্ডার-এর দিকে তাকিয়ে দেখি তিনি পুরু কাঁচের চশমার ভেতর দিয়ে বাঁকা চোখে যেন অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন।

কয়েক মুহূর্ত পরে তিনি খবরের কাগজের প্রবন্ধটার ওপর আঙুল রেখে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, আরও একটা এফাসিয়ার বানাট দৃষ্টান্ত এখানে রয়েছে। আমি মনে করি এসব দৃষ্টান্তের দশটার মধ্যে ন'টাই ফাঁকিবাজি। একটা মানুষ সর্বক্ষণ কাজে মেতে থেকে হতোদ্যম হয়ে পড়ে, আত্মীয় স্বজনকেও সহ্য করতে পারে না, তাই দিন কয়েক স্বস্তিতে কাটাতে চায়। হঠাৎ কোথাও চলে যায়, আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু বান্ধব যখন তাকে খুঁজে বের করে তখন স্মৃতি ভ্রংশতার ভান করে। এমন কি নিজের নামটা পর্যন্ত ভুলে যায়। এমন কি স্ত্রীর বাঁ-কাঁধের রক্তাভ জন্ম দাগটাও চিনতে পারে না। এফাসিয়া! আরে ধ্যুৎ! তারা বাড়িতে থাকতেই সব কিছু স্মৃতি থেকে মুছে যায় না?

আমি কাগজটা তাঁর হাত থেকে নিয়ে চোখ বুলাতে লাগলাম।

ডেনভার, ১২ই জুন। প্রখ্যাত উকিল এল্‌উইন সি-বেলফোর্ড রহস্যজনকভাবে নিজের বাড়ি থেকে গত তিন দিন আগে নিখোঁজ হয়েছেন। তাঁকে খুঁজে বের করার যাবতীয় চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। তিনি বিবাহিত। সুন্দর একটা বাড়ির মালিক। উপার্জনও যথেষ্টই। আর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারটা রাষ্ট্রের মধ্যে বৃহত্তমের দাবীদার।

নিরুদ্দেশ হবার দিনই মিঃ বেলফোর্ড ব্যাঙ্ক থেকে প্রচুর টাকা তুলেছেন। ব্যাঙ্ক থেকে বেরনোর পর তাঁকে দেখেছেন এমন কোন লোকের হদিস মেলে নি।

মিঃ বেলফোর্ড শান্ত স্বভাবের মানুষ। নিজের বাড়ি ও বৃত্তিতে সন্তুষ্ট — সুখী।

তার নিখোঁজ হবার পিছনে কোন কারণ থাকলে তার গন্ধ হয়ত ঘটনাটার মধ্যেই মিলতে পারে যে, গত মাস কয়েক ধরেই তিনি এক্স-ওয়াই-জেড রেলপথ কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ মামলাটা নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত কাজকর্ম ও চিন্তাভাবনায় মেতেছিলেন।

চিকিৎসক ও অন্যান্যরা আশঙ্কা করছেন যে, অতিরিক্ত কাজের বোঝা দীর্ঘদিন মাথায় চেপে থাকার ফলেই তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে বসেছেন।

নিখোঁজ হয়ে যাওয়া মিঃ বেলফোর্ড-এর সন্ধান পাবার যাবতীয় প্রয়াসই চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

খবরের কাগজের বক্তব্যটা পড়া শেষ করে আমি বললাম, মিঃ বোল্ডার, আমার মনে হচ্ছে, আপনি একজন বৈরাগ্যধর্মবিরোধী লোক অবশ্যই নন। আর খবরের কাগজের বক্তব্যটাকে তো সত্য ঘটনা বলেই আমার বিশ্বাস হচ্ছে। সমৃদ্ধশালী, বিবাহিত জীবনে সুখী, যথেষ্ট সম্মানের অধিকারী, তিনি কেন সব কিছু ছেড়েছুড়ে বে-পাত্তা হয়ে গেলেন? এ রকম স্মৃতিভ্রংশ কোন কোন মানুষের হয় তা আমিও জানি। নাম গোত্র আর পরিচয়হীন বহু মানুষ পথে পথে ঘুরে বেড়ায় তা-

ও আমার অজানা নয়।

'ধ্যুৎ মশাই! আজগুবি কথা! তারা সবাই নিশির ডাক নিয়ে মাথা ঘামায়। আজকালকার পণ্ডিতরা এসব ঘটনার কিনারা করতে না পেরে এফাসিয়ার দোহাই দেয়। মেয়েরাও সব কিছু মিটে গেলে মুখ মুছে বলে ফেলে—ও আমাকে তুকতাক করেছিল।

মিঃ বোল্ডার কথাটাকে এভাবে অন্যদিকে নিয়ে গেলেন। তাঁর বক্তব্য আমার কোন সহায়কই হল না।

রাত্রি দশটা নাগাদ নিউইয়র্কে পৌঁছে একটা হোটেলে গেলাম। আমি নিজের নাম লেখালাম এডোয়ার্ড পিংকহামার। ব্যস, আমার মনটা এতে অনেকটা হাল্কা হয়ে গেল।

হোটেলের কেরানিটা আমার দিকে একটু বেশী সময়ই তাকাল। আমি মুচকি হেসে বললাম—'ওষুধের কারবারী। ওষুধ বিক্রেতা সম্মেলনের প্রতিনিধি।

সে আবার আমার মুখের দিকে কেমন যেন অনুসন্ধিৎসু নজরে তাকাল।

আমি এবার একটু আমতা আমতা করেই বললাম, 'আমার ট্রাঙ্কটা এখনও পৌঁছোয় নি। কথা বলতে বলতে পকেট থেকে নোটের গোছাটা বের করলাম।

হঠাৎ করে মুখে হাসি ফুটিয়ে লোকটা বলল, 'তাই বুঝি? পশ্চিম আগত বহু প্রতিনিধিই এ হোটেলে আশ্রয় নিয়েছেন।

এক যুবক কর্মীর পিছুন পিছুন আমি চৌদ্দ নম্বর ঘরে হাজির হলাম।

পরদিন দোকানে গিয়ে কিছু পোশাক-আশাক ও দরকারী জিনিসপত্র কিনে আনলাম। ব্যস, এডোয়ার্ড পিংকহামার-এর জীবনযাত্রা শুরু হয়ে গেল।

তবে আমি অতীত জীবনের সমস্যাগুলো মেটাবার কিছুমাত্রও চেষ্টা বা চিন্তা করলাম না।

আমার হোটেল জীবন সুখেই কাটতে লাগল। এডোয়ার্ড পিংকহামার—হিসাবে যার বয়স মাত্র ঘণ্টা কয়েক, পুরোপুরি স্বাধীন এবং সম্পূর্ণ একটা নতুন জগতে পরমানন্দেই সময় কাটাতে ব্যস্ত।

নাট্যশালা আর যাবতীয় আনন্দ-সুখ, গান-বাজনা, রূপসী মেয়ে আর মন রাঙানো হাসির নাটকের মেলায় আমার সময় কাটানো। স্থান, কাল ও পাত্রের কথা বিবেচনা না করেই আমি ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

এক বিকেলে হোটেলে পা দিতেই বারান্দায় আমাকে এক মোটা গোঁফ-ওয়ালা লোকের মুখোমুখি হতে হল।

লোকটা মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলে অতি পরিচিত ব্যক্তির মত অশোভন ভাষায় বলে উঠল, 'এই যে বেলফোর্ড! নিউইয়র্কে বসে কোন্ রাজ্য জয় করেছ? তোমার বইয়ের পাহাড় থেকে কোন কিছুর আকর্ষণ যে তোমাকে বাইরে বের করে আনতে পারে তা আমি ভাবতেই পারছি না।

আমি চোখে মুখে বিরক্তির ছাপ এঁকে তার মুখের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলাম।

সে বলে চলল, একটা কথার জবাব দাও তো বেলফোর্ড, তুমি কি মিসেস বি.কি-র সঙ্গেই আছ, নাকি—

আমি তার মুঠো থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, 'মশাই, আপনি আমাকে চিনতে পারেন নি। আমি বেলফোর্ড নই। আমার নাম পিংকহাম।

আমার কথা শুনে লোকটা অবাক হয়ে মুখ কাচুমাচু করে একটু সরে দাঁড়াল। আমি এবার সোজা হোটেলের কেরানির কাছে গিয়ে বেশ একটু রাগত স্বরেই বললাম, আমি আধঘণ্টার মধ্যেই হোটেল ছেড়ে দিচ্ছি। যেখানে গুপ্তচররা বিরক্ত করে সেখানে একটা দিনও থাকার ইচ্ছে নেই।

আমি সে রাত্রেই ফিফথ এভিনিউর শান্ত পরিবেশের একটা সাধারণ হোটেলে গিয়ে উঠলাম। এক বিকেলে হেটেলের অদূরের একটা সাজানো গোছানো রেস্তোরাঁয় পা দিতেই হঠাৎ কে যেন পিছন থেকে আমার কোটের পিছনটা ধরে টান দিল।

আমি আচমকা ঘাড় ঘোরাতেই সে বলল, 'আরে মিঃ বেলফোর্ড যে!

ঘাড় ঘুরিয়েই দেখি এক মহিলা হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে। বছর ত্রিশেক বয়স। চোখ দুটো টানা টানা—চমৎকার।

তার চাহনি দেখে আমার মনে হল, কোন এক সময় বুঝি আমি তার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু ছিলাম।

সে এবার গম্ভীর মুখে বলল, 'তুমি আমাকে দেখেও না দেখার ভান করে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিলে। আমাকে চেনো না, এরকম কথা যেন বলে ফেলো না।

মুহূর্তের জন্য থেমে চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে আবার মুখর হল, 'দীর্ঘ পনেরোটা বছরের মধ্যে আমরা কেন করমর্দন করতে পারি নি, বল তো?

আমি ছোট্ট করে এক হেঁচকা টানে তার মুঠো থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ভেতরে চলে গেলাম

সে এত সহজে ছাড়ার পাত্রী নয়। আমার মুখোমুখি চেয়ারটা টেনে নিয়ে ধপাস্ করে বসে পড়ল।

আমি তার মুখের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে বললাম, 'তুমি কি আমাকে চেন? নিশ্চিত জান যে, আমার নাম বেলফোর্ড?

না, এ ব্যাপারটায় কোনদিনই আমি নিশ্চিত ছিলাম না।

এখন যদি শোন যে, আমার নাম বেলফোর্ড নয়, এডোয়ার্ড পিংকহামার। আর আমি কনসাসের কর্নোপোলিসের বাসিন্দা, তবে?

আমি ধরেই নেব যে, তুমি মিসেস বেলফোর্ডকে সঙ্গে নিয়ে নিউইয়র্কে আসো নি। তবে আমি বলব তাকে সঙ্গে নিয়ে এলেই ভাল করতে।

মুহূর্তের জন্য থেমে রূপসী আবারও চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। তারপর মুখ খুলল, 'তোমার স্ত্রী মারিয়ানকে একবারটি দেখতে পেলে খুশি হতাম।

হুম্!

সে এবার বলল, 'এলুইন, তুমি কিন্তু খুব বেশী পাল্টাও নি।

লক্ষ্য করলাম, সে আমার মুখে দিকে নিষ্পলক চোখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে

সে আবার বলল, 'হ্যাঁ গো মশাই, তুমি অনেক বদলে গেছ।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, আমি নিঃসন্দেহ যে, ভুলে তুমি যাও নি, ভুলতে পার না। পনেরোটা বছরের মধ্যে একটা মুহূর্তের জন্যও তুমি আমাকে মন থেকে মুছে ফেলতে পার নি।

আমি অস্বস্তি বোধ করলেও না বলে পারলাম না, 'সত্যি আমি তোমার কাছে মার্জনা ভিক্ষা করছি। আসল গোলমালটা তো সেখানেই। সত্যি আমি ভুলে গেছি। সব কিছু মন থেকে মুছে ফেলেছি।

আমার এড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারটাকে সে হেসেই উড়িয়ে দিল।

আমার মুখে সে হয়ত এমন কিছু খুঁজে পেয়েছে যার ফলে সে ঠোঁট টিপে টিপে হাসতে লাগল।

তারপর সে নিজের কথাটা শুধরে নিয়ে বলল, 'শোন, মাঝে মাঝে তোমার কথা আমি শুনি। পশ্চিমের একজন বড় উকিল হয়েছ, কত নাম ডাক হয়েছে তোমার! আচ্ছা ডেনভার, নাকি লস এঞ্জেলেস-এ?

আমি মুখ খুলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলাম।

সে বলেই চলল, তোমার স্ত্রী মারিয়ান অবশ্যই তোমাকে পেয়ে খুব খুশিই হয়েছে, গর্বিতও বটে। তোমার হয়ত জানা নেই, তোমার বিয়ের ছ'মাস পরে আমি বিয়ে করেছি।

হুম!

খবরের কাগজের পাতায় হয়তো আমার বিয়ের খবরটা পড়ে থাকবে। একমাত্র ফুলশয্যাতেই দু'হাজার ডলার খরচ হয়েছিল।

সে বলেছে পনেরো বছর। পনেরো বছর সময়টা খুবই দীর্ঘ। ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এখন যদি তোমাকে অভিনন্দন জানাই তবে কি খুবই দেরী করা হবে, বল?

তুমি সাহস করে যদি সেটা করতে পার তবে হবে বলে আমার মনে হয় না।

সে অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে এবার বলল, একটা কথা আমি বলতে চাচ্ছি, যে কথাটা দীর্ঘদিন ধরেই আমার শোনার খুবই আগ্রহ—আসলে একটা নারীর কৌতূহলেরই ব্যাপার, সে রাত্রিটার পর তুমি কি কোনদিন সাদা গোলাপ স্পর্শ করেছ, গন্ধ শুঁকেছ, তার দিকে তাকিয়েছ—বৃষ্টি ভেজা

সাদা গোলাপ?

আমি মনে করছি এ কথাটা নিতান্তই অর্থহীন যে, সব অতীতের ঘটনাই আমার স্মৃতি থেকে মুছে গেছে। আমার স্মৃতিশক্তিটাই পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে।

মুহূর্তের জন্য নীরব থেকে তারপর আবার মুখ খুললাম—স্মৃতি-ভ্রংশের ব্যাপারটা যে আমার কাছে কী মর্মান্তিক তা আশা করি তোমাকে আর বলার দরকার নেই।

মহিলাটার মুখে হাসি ফুটে উঠল। তার হাসিটুকু সুখের হাসি, দুঃখের হাসিও বটে।

আমি তার দিক থেকে মুখটা সরিয়ে নিলাম। সে বলল, বেলফোর্ড, উফ্, আমি জানি তুমি যা বলছ, সবই মিথ্যা।

না, আমার নাম এডোয়ার্ড পিংকহামার। ওষুধ বিক্রেতাদের জাতীয় সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধিদের সঙ্গে এখানে এসেছি।

আমাদের কথাবার্তা চলার সময়েই একটা ল্যান্ডো এসে রেস্তোরাঁর দরজায় দাঁড়াল।

মহিলাটা ঝট করে উঠে দাঁড়াল। আমি তার হাতটা ধরে মাথা নোয়ালাম, মুচকি হাসলাম। তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললাম—'আমার যে কিছুই মনে পড়ছে না তার জন্য যারপরনাই দুঃখিত। আমি হয়ত কিছু বুঝিয়ে বলতে পারতাম, কিন্তু তুমি বুঝতে পারতে না।

সে নীরবে আমার মুখের দিকে তাকিয়েই রইল। আমি বলে চললাম, 'আমি জানি পিংকহামারকে তুমি মন থেকে মেনে নিতে পারতে না। আর তুমি যে সাদা গোলাপের কথা বললে সবই আমার ধ্যান ধারণার বহির্ভূত।

বিষণ্নমুখে দুঃখের হাসি হেসে মহিলাটা বিদায় নিয়ে চলে গেল। সে রাত্রেই রঙ্গালয় থেকে হোটেলে ফিরে দেখি কালো পোশাক পরিহিত একজন শান্ত চেহারার মানুষ এসে আমার পাশে দাঁড়াল।

আমি কিছু বলার আগেই আগন্তুক বলল, মিঃ পিংকহামার। আপনার সঙ্গে দুটো কথা বলতে চাই। তবে যদি আপনার তেমন আপত্তি না থাকে।

না, আপত্তির কি থাকতে পারে। আমি বললাম। লোকটা আমাকে নিয়ে ছোট্ট একটা ঘরে ঢুকল। ঘরে ঢুকেই দেখি, এক ভদ্রলোক আর এক মহিলা চেয়ারে বসে। ক্লান্তি, অবসাদ আর দুশ্চিন্তার বোঝা মাথায় না থাকলে মহিলা দেখতে সুন্দরীই হতেন বলেই মনে হল।

কাঁপা কাঁপা একটা হাত বুকের ওপর রেখে ভদ্রমহিলা আতঙ্কিত চোখে আমার আপাদমস্তক দেখতে লাগলেন। মনে হল, ভদ্রমহিলা আমার দিকে এগিয়েই আসতেন। কিন্তু ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে তার পথ রোধ করে দিলেন। তারপর তিনি নিজেই আমার দিকে এগিয়ে এলেন।

ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশ বছর। মাথার চুল সাদা হতে শুরু করেছে। মুখে চিন্তার ছাপ।

ভদ্রলোক কঠিন মুখে বললেন, 'মিঃ বেলফোর্ড, আবার তোমাকে দেখতে পেয়ে আমি খুশিই হয়েছি। তবে সবই ঠিকঠাক আছে, আমার জানাই আছে। আশা করি তুমি ভুলে যাওনি যে, মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রম কোরো না। যাক গে। এখন আমাদের সঙ্গে ফিরে চল। শীঘ্রই তুমি সুস্থ স্বাভাবিকতা ফিরে পাবে।

ব্যঙ্গের হাসি হেসে আমি বললাম, ইতিমধ্যে আমি এতবার, এতভাবে বেলফোর্ড হয়েছি যে, কথাটার গুরুত্ব ক্রমেই কমে যাচ্ছে। আমার নাম এডোয়ার্ড পিংকহামার। আর সারা জীবনে আপনাদেরকে এক মুহূর্তের জন্যও দেখি নি। তিনি আমার কথার জবাব দেবার আগেই ভদ্রমহিলাটি প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন।

এক ঝটকায় ভদ্রলোকের হাতটা সরিয়ে দিয়ে তিনি এগিয়ে এসে বলে উঠলেন, 'বেলফোর্ড! বেলফোর্ড! ব্যস আর কিছু বলতে না পেরে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগলেন।

পরমুহূর্তেই চোখ মুছতে মুছতে বললেন, বেলফোর্ড, তুমি আমার বুকটা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিও। আমি তোমার সহধর্মিণী, তোমার স্ত্রী। মাত্র একটিবার আদর করে আমার নামটা ধরে ডাক।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি আবার সরব হলেন, 'বেলফোর্ড, তোমাকে এ অবস্থায় দেখার চেয়ে তোমার মৃতদেহ দেখাই যে আমার কাছে অনেক শান্তির ছিল। হায় ঈশ্বর!

আমি একটু বল প্রয়োগ করেই হাতটা টেনে নিয়ে রাগত স্বরেই বললাম, 'মহাশয়, আমি যদি

বলি চেহারার মিলকেই আপনি দৃঢ় সত্য বলে মনে করছেন তবে আমাকে মার্জনা করবেন। খুবই পরিতাপের বিষয় যে, আমি মিঃ বেলফোর্ড আর আমাকে পাশাপাশি রেখে প্রমাণ করতে পারছিনা যে, আমি আপনার বাঞ্ছিত জন নই।

ভদ্রমহিলা তাঁর সঙ্গীর কাছে ফিরে গেলেন। কাঁদো কাঁদো স্বরে তাঁকে বললেন,ডাক্তার ভোলনে, ব্যাপার কী, বলুন তো? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি নে!

ভদ্রলোক তাকে দরজার কাছে নিয়ে গিয়ে অনুচ্চকণ্ঠে বললেন—মিনিট কয়েকের জন্য তুমি নিজের ঘরে যাও।

তারপর?

আমি একান্তে তাঁর সঙ্গে ক'টা কথা বলব।

ভদ্রমহিলা পিছন ফিরে জলে ভেজা চোখ দুটো মুছতে মুছতে নিজের ঘরের দিকে হাঁটতে লাগলেন।

ডাক্তার ভোলনে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে স্বগতোক্তি করলেন, 'উফ! তার মনটা! না, কেবল মস্তিষ্কের একটা অংশ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাকে সারিয়ে তোলা যাবে।

ভদ্রমহিলার পিছন পিছন কালো পোশাক পরা লোকটাও সেখান থেকে সরে গেল।

ডাক্তার ভোলনে ধীর পায়ে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে শান্ত স্বরে বললেন, মিঃ পিংকহামার, যদি আপনার আপত্তি না থাকে তবে দুটো কথা বলি।

যদি নেহাতই কিছু বলার থাকে তবে অবশ্যই বলবেন। তবে সংক্ষেপে সারবেন। আমার শরীর ও মন দু-ই ক্লান্ত।

ধানাই পানাই রেখে আসল কথাটাই বলে ফেলা যাক, 'শুনুন', আপনার নাম অবশ্যই পিংকহামার নয়।

আমি শান্ত স্বরেই বললাম, আমার নাম যে কি সেটা আপনি যতটা জানেন আমিও ঠিক ততটাই জানি। তার দিকে তাকিয়ে মনোভাবটা বোঝার চেষ্টা করে এবার বললাম, 'একজন মানুষের তো কোন না কোন নাম থাকতেই হবে। আমার তো বিশ্বাস পিংকহামার নামটায় কোন অসুবিধে হচ্ছে না।

আমি আবারও বলছি, আপনার নাম অবশ্যই পিংকহামার নয়। এলুইন মিঃ বেলফোর্ড আপনার আসল নাম। আপনি এফাসিয়া রোগগ্রস্ত বলে নিজের নাম পরিচয় সবই ভুলে গেছেন। আর আপনার পেশাগত কাজ নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করার জন্যই এ রোগের উৎপত্তি হয়েছে। একটু আগে যে ভদ্রমহিলা আপনার সঙ্গে কথা বলে গেছেন তিনি আপনার সহধর্মিণী।

মুহূর্তের জন্য থেমে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে আমি বললাম, 'দেখুন, আমার মতে তিনি একজন সুন্দরী ভদ্রমহিলা। আর তিনি এমন সুন্দরী যার রূপ সৌন্দর্যের জন্য বড়াই করা যেতে পারে।

দেখুন আপনি নিরুদ্দেশ হওয়ার পর থেকে তিনি দু'সপ্তাহ ধরে রাতের পর রাত নির্ঘুম অবস্থায় কাটাচ্ছেন। আর সর্বক্ষণ চোখের জল ফেলে চলেছেন।

আমি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ভদ্রলোকের মুখের দিকে নীরবে তাকালাম। তিনি বলে চললেন, ইসিডোর নিউম্যান নামক ভেন্ডার থেকে আসা এক যাত্রীর টেলিগ্রাম মারফৎ আমরা জানতে পারি আপনি নিউইয়র্কে রয়েছেন। তিনি আপনার মুখোমুখি হলে আপনি নাকি তাকে চিনতেই পারেন নি।

মুহূর্তের জন্য ভেবে নিয়ে আমি বললাম, 'হ্যাঁ, ঘটনাটা আমার মনে পড়ছে বটে।

মনে পড়ছে?

হ্যাঁ, ভদ্রলোক আমাকে বারবার বেলফোর্ড বলে সম্বোধন করছিলেন।

যা স্বাভাবিক তিনি তা-ই করেছেন।

একটা কথা, আপনার পরিচয়টা দেওয়া উচিত বলে কি আপনি মনে করছেন না?

ডাক্তার এবার নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বললেন, 'আমার নাম বরাট ভোলনে। ডাক্তার ভোলনে বলেই সবাই চেনে, আপনার দীর্ঘ বিশ বছরের বন্ধু। আর পনের বছর ধরে আপনার

পারিবারিক চিকিৎসক।

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকালাম। তিনি এবার বললেন, 'টেলিগ্রামটা পেয়েই আমি আপনার সহধর্মিণীকে নিয়ে নিউইয়র্কের উদ্দেশ্যে পা-বাড়াই। মিঃ বেলফোর্ড, স্মরণ করার চেষ্টা করুন।

কোন ফয়দা নেই। চেষ্টা করে কোনই ফয়দা হবার নয়। আপনি একজন চিকিৎসক, তাই তো বললেন।

হ্যাঁ, বলেছিই তো।

এবার সত্যি করে বলুন তো, চিকিৎসার মাধ্যমে এফাসিয়া রোগ কি সারানো সম্ভব? স্মৃতিভ্রষ্ট মানুষের স্মৃতি কি হঠাৎ করে, নাকি ধীরে ধীরে সারে, যে স্বাভাবিকতা ফিরে পায়, বলুন তো?

দু'ভাবেই মানুষ হঠাৎ যেমন স্মৃতি হারিয়ে ফেলে ঠিক তেমনই আবার হঠাৎই ফিরে পায়। আবার ধীরে ধীরেও কিছুটা স্মৃতি ফিরে পেতে পারে।

একটা কথা বলবেন কি ডাক্তার ভোলনে?

ডাক্তার আগ্রহান্বিত হয়ে বললেন, 'কি? কি কথা?

আপনি কি আমার চিকিৎসার ভার নিতে রাজি আছেন?

আরে মশাই, আপনি আমার পুরনো বন্ধু। আপনার রোগ মুক্তির জন্য আমি অবশ্যই সাধ্যাতীত চেষ্টা করব। বিজ্ঞানের যতটুকু ক্ষমতা আমি অবশ্যই আপনার ওপর প্রয়োগ করব।

চমৎকার। তবে এ মুহূর্ত থেকে আপনি আমাকে আপনার রোগী বলেই মনে করবেন। তবে একটা শর্ত।

আমার মুখের কথা শেষ হবার আগেই তিনি বলে উঠলেন, শর্ত? কি সে শর্ত?

শর্তটা হচ্ছে, আপনাকে সব কিছু গোপন রাখতে হবে—বৃত্তিগত গোপনীয়তা যাকে বলে, রাজি?

অবশ্যই রাজি। আমাদের এটা কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে মিঃ বেলফোর্ড।

আমি পিছন ফিরতে চোখে পড়ল সাদা গোলাপের একটা তোড়া কে যেন সারিয়ে রেখে গেছে।

আমি যন্ত্রচালিতের মত দ্রুত এগিয়ে গিয়ে সেগুলোকে জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। ঠাণ্ডা মাথায় আবার ফিরে এসে চেয়ারটায় শরীর এলিয়ে দিলাম।

কয়েক মুহূর্তের জন্য নীরবে ভেবে নিয়ে তারপর মুখ খুললাম। 'বব, এটাই সবচেয়ে ভাল হল—আমি হঠাৎই নীরোগ হয়ে গেলাম।

ডাক্তার ভোলনের মুখে হাসির ঝিলিক দেখা দিল। আমি বললাম, ডাক্তার ভোলনে, আমি খুবই ক্লান্ত। আপনিও না হয় পাশের ঘরে গিয়ে একটু বিশ্রাম করে নিন।

মিঃ বেলফোর্ড,—উত্তেজনায় ডাক্তার ভোলনে কথাটা আর শেষ করতে পারলেন না।

আমি বললাম, 'আর একটা কাজ করবেন দয়া করে—আমার স্ত্রী মারিয়ানাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

ডাক্তার ঘর ছেড়ে যাবার জন্য পিছন ফিরতেই দুম করে তার পাছায় একটা লাথি মেরে বললাম, ওহে ডাক্তার, ব্যাপারটা কি গৌরবের—গর্বের?

দ্য মিউনিসিপ্যাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রে তিনটে বড় ও বিখ্যাত শহরের অস্তিত্ব রয়েছে যাদের 'গল্পের শহর' বলা যেতে পারে। তাদের মধ্যে অবশ্যই নিউইয়র্ক, নিউ অর্লিয়েন্স আর সবার ওপরে স্থান পাওয়ার যোগ্য সান ফ্রান্সিস্কো শহর।

ক্যালিফোর্নিয়ার অধিবাসীদের মতে পশ্চিমাঞ্চল বলতে সান ফ্রান্সিস্কো শহরকেই বোঝায়।

শিকাগো শহরের অধিবাসীদের যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, তাদের শহরটাকে তারা কেন এত ভালবাসে? তার উত্তরে বার-কয়েক ঢোক গিলে তারা মাছের হ্রদ আর নতুন গড়ে তোলা অড ফেলোজ বিল্ডিং-এর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে।

আর ক্যালিফোর্নিয়াবাসীদের জিজ্ঞাসা করলে তারা তাদের শহরের গৌরব-গাঁথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে।

টেনিসি রাষ্ট্রের রাজধানী আর বন্দর নগর ন্যাসভিল। আর টেনিসি নগরটা ক্যাম্বারল্যান্ড নদী আর এন.সি.অ্যান্ড এস.টি.এল ও অ্যান্ড এল রেলপথের গায়ে অবস্থিত।

শহরটার আরও একটা পরিচয় আছে। দক্ষিণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবেও ন্যাসভিল শহরকে গণ্য করা যায়।

আমি আটটায় ট্রেন থেকে নামলাম। শহরটার বর্ণনা যা পেয়েছিলাম সে উপযোগী কোন কিছু নজরে না পড়ায় সেটাকে আমার কাছে ওষুধের ব্যবস্থাপত্রের মতই মনে হল। শতকরা ত্রিশ ভাগ লন্ডনের কুয়াশা, পঁচিশ ভাগ সূর্যোদয়ের সময় ইট-বাঁধানো স্থানে জমা হওয়া শিশির, বিশ ভাগ গ্যাস লিক, দশ ভাগ ম্যালেরিয়া আর পনেরো ভাগ হলুদ ফুলের সুগন্ধ। ব্যস, এবার ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী মিশ্রণটা তৈরী করে ফেললেই হয়।

মিশ্রণটা তৈরী হয়ে গেলে এটা থেকে আপনি ন্যাসভিল শহরের ইলশে-গুঁড়ি বৃষ্টি সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা পেতে পারবেন।

আমি একটা জঞ্জালের গাড়িতে চেপে হোটেলে পৌঁছলাম। সেটা নতুন করে সংস্কার করা বাড়িতে গড়ে তোলা হয়েছে। এর পরিচালনা খুবই খারাপ। আর পরিষেবা দক্ষিণী ভদ্রতায় পূর্ণ। খুবই ধীর গতিতে আহারাদি সরবরাহ করা হয়।

আমি রাত্রে খেতে বসে এক নিগ্রো পরিবেশনকারীকে কাছে ডাকলাম। সে কাছে এলে জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে দর্শনীয় কি আছে, বলতে পার?

মুহূর্তের মধ্যে ভেবে নিয়ে সে বলল, 'স্যার, সূর্য ডুবে যাওয়ার পর এখানে দর্শনীয় আর কিছু আছে বলে তো আমার জানা নেই। সূর্য ডোবার অনেক আগে থেকেই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। তাই সে দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য আমার হল না। কিছুটা হতাশ হলেও হাল ছেড়ে দিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে না থেকে পথে নেমে গেলাম ছিঁটে ফোঁটা যেটুকু পাওয়া যায় দেখে নেবার প্রত্যাশা নিয়ে।

ঢেউ খেলানো ভূমির ওপর শহরটাকে গড়ে তোলা হয়েছে। বছরে বত্রিশ হাজার চারশ' সত্তর ডলার ব্যয় করে বৈদ্যুতিক আলো জ্বালানো হয়।

আমি হোটেল থেকে বেরিয়ে পথে পা দিতেই হঠাৎ একটা দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল। জাতি-দাঙ্গা।

দলে দলে মানুষ ছুটোছুটি করছে। একদল মুক্ত মানুষ অথবা জুলু, অথবা আরব—সবার হাতেই বন্দুক না হয় চাবুক দেখলাম।

আধো আলো-আধো অন্ধকারে এক ঝাঁক কালো গাড়ি আমার চোখে পড়ল। গাড়িগুলোর কোচম্যানদের নিরবচ্ছিন্ন হাঁকাহাঁকি, স্যার, শহরের যে কোন জায়গায় নিয়ে যাব। মাত্র পঞ্চাশ সেন্ট ভাড়া নেব।

আমি বহু কষ্টে তাদের বুঝিয়ে বললাম, 'বাপু, আমি একজন যাত্রী মাত্র, তোমাদের শিকার মনে করলে ভুল করবে।

আমি উঁচু-নিচু পথ ধরে হাঁটতে লাগলাম। কয়েকটা গাড়িকে যাত্রী নিয়ে বিভিন্ন দিকে ছুটে যেতে দেখলাম।

ছোট ছোট পথগুলো মোটামুটি ফাঁকাই দেখলাম। বহু বাড়ির পর্দা ঝোলানো জানালার ফাঁক দিয়ে আলো উঁকি দিতে দেখা যাচ্ছে। আর অল্প সংখ্যক বাড়ি থেকে পিয়ানোর মিষ্টি মধুর শব্দ ভেসে আসছে শুনতে পেলাম।

হাঁটতে হাঁটতে আমি অনেকটা পথই পাড়ি দিয়ে ফেললাম। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার—কোনরকম কাজকর্মের দৃশ্য তো চোখে পড়ল না।

আরও কয়েক পা এগিয়ে স্বগতোক্তি করলাম, 'এখন বুঝছি, আরও আগে বেরিয়ে পড়াই উচিত ছিল।

এতটা পথ পাড়ি দিয়েও উল্লেখযোগ্য মনের খোরাক কিছু নজরে পড়ল না। অনন্যোপায় হয়ে হোটেলেই ফিরে গেলাম।

আঠারো শ' চৌষট্টির নভেম্বরে সন্ধিবদ্ধ জেনারেল হুড ন্যাসভিল আক্রমণ করে বসলেন আর জেনারেল টমাস-এর অধীনস্থ এক জাতীয় বাহিনীকে বন্দী করলেন।

তারপর তারাও এক আকস্মিক আক্রমণ করে ঘোরতর যুদ্ধ শুরু করে দেয়। তারপর তারাও সন্ধিবদ্ধ বাহিনীকে পরাজিত করে বদলা নিল।

আমি সারাটা জীবন ধরে শুনেছি, মুগ্ধ হয়েছি আর চাক্ষুষ করেছি দক্ষিণের অঞ্চলের শান্তিপূর্ণ লড়াইগুলোতে দক্ষিণীদের সূক্ষ্ম লক্ষ্যভেদের দক্ষতার কথা। কিন্তু একটা বিস্ময় আমার হোটেলের ভেতরেই আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। বড় বৈঠকখানা ঘরটার বারোটা পিতলের ঝকঝকে চকচকে পিকদানি রাখা ছিল। তাদের প্রত্যেকটার আকার এতই বড় যে, সমাধি-পাত্র বললেও অত্যুক্তি হয় না।

কিন্তু একটা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ তখন ঘটছিল, তাতে শত্রুপক্ষের কোনই ক্ষয়-ক্ষতি হয়নি। তারা কেবল অক্ষতই নয়, যেন নতুন অবস্থাতেই অবস্থান করছিল।

ন্যাসভিল-এর যুদ্ধের কথা কিছুতেই আমার মন থেকে দূর হবার নয়।

আমি এবার বংশগত লক্ষ্যভেদের প্রসঙ্গে কিছু অনুমান নির্ভর বক্তব্য তুলে ধরার চেষ্টা করছি। এখানেই আমার মেজর ওয়েস্টওয়ার্থ ক্যাসওয়েল-এর সঙ্গে প্রথম মোলাকাৎ হয়েছিল।

প্রথম দর্শনেই মেজরকে আমি প্রতীক চরিত্র হিসেবে চিনে নিতে সক্ষম হই। ইঁদুরের কোন ভৌগোলিক বাসস্থান নেই। এটা আমার পুরনো বন্ধু এ.টেনসন-এর উক্তি। তিনি সব কিছু ভালভাবেই ব্যক্ত করেন।

এ লোকটা হোটেলের বৈঠকখানাটাকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াতে লাগল। ক্ষুধার্ত কুকর যেমন তার হারিয়ে যাওয়া হাড়ের টুকরোটাকে খুঁজে বেড়ায় ঠিক তেমনি ভাবে সে-ও বৈঠকখানাটার খোঁজ করতে লাগল।

মেজর ক্যাসওয়েল যখন একটা পিকদানিকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছে তখন আমি তার পাঁচ ফুটের মধ্যেই অবস্থান করছিলাম।

প্রথম দর্শনেই আমি বুঝতে পারি যে, গোলন্দাজ কাঠবেড়ালি মারার বন্দুকের পরিবর্তে গ্যাটলিং দিয়ে বাহাদুরি দেখাচ্ছিল।

আমি তাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করতেই সে যখন বুঝতে পারল যে, আমি তার শত্রুপক্ষের যোদ্ধা নই তখন সে আমার কাছে মার্জনা ভিক্ষা করল।

সে বড্ড বেশী কথা বলে। চার মিনিটের মধ্যেই সে আমার বন্ধুতে পরিণত হয়ে গেল। ব্যস, আর দেরী নয়, আমাকে টানতে টানতে বার-এ নিয়ে হাজির করল।

আগেই বলে রাখছি, আমি একজন দক্ষিণী, তবে বৃত্তি বা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অবশ্যই দক্ষিণী নই।

আমি মাত্রাতিরিক্ত পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করি না। অর্কেস্ট্রাতে 'ডিক্সি' বাজার সময় হাসি না। চামড়ার আসনে বসি, এক বোতল মদের অর্ডার দিই। আর তখন মনে মনে বলি—লংস্ট্রীটে যদি আমার একটা থাকত। কিন্তু একথা ভেবে ফয়দাও তো কিছু নেই।

বারে গিয়ে মেজর ক্যাসওয়েল মোক্ষম একটা ঘুঁষি হাঁকিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল। আর প্রথম গুলিটা সাম্পটার দুর্গে প্রতিধ্বনিত হল।

পরপর অনেকগুলো গুলি চালিয়ে সে নিজের বংশ-তালিকা আওড়াতে শুরু করল। আর সে প্রমাণ করে ছাড়ল যে, আদম ছিল তার বংশের তৃতীয় 'তুতো' ভাই।

বংশ তালিকার পাট চুকিয়ে এবার সে তার পারিবারিক গোপন কথা বলতে শুরু করল। কিন্তু যখন বিলটা এল তখন সে একটা রুপোর ডলার দুম্ করে বার-এর ওপর ছুঁড়ে মারল। তারপর আর একটা বোতলের অর্ডার দেওয়া তার খুবই উচিত ছিল।

বিলটা মিটিয়ে দিয়ে আমি হঠাৎ তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বার ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। কারণ তার সঙ্গ আমার মোটেই ভাল লাগছিল না।

আমি বার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগেই সে চিৎকার করে আমাকে তার স্ত্রীর উপার্জনের পরিমাণটা শুনিয়ে দিল।

আর? এক মুঠো রুপোর মুদ্রা বের করে আমার সামনে তুলে ধরল।

কেরানি কথা প্রসঙ্গে বলল, 'স্যার, ক্যাসওয়েল যদি কোনদিন বিরক্ত করে, আর আপনি যদি তার বিরুদ্ধে নালিশ করেন তবে তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দেব।

হুম্!

হ্যাঁ, স্যার লোকটা একটা পয়লা নম্বরের গোবর গণেশ। পেটের ভাত যোগাড় করার মত কোন কাজই সে করে না। যাকে বলে একটা ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলে। আইনত আমরা তাকে তাড়িয়েও দিতে পারি না।

মুহূর্তের জন্য ভেবে আমি বললাম, অভিযোগ করার মত কোন কাজ তো সে করে নি। তবে তার সঙ্গ আমি পছন্দ করি না। একটা কথা, আপনাদের শহরে বহিরাগতদের জন্য আমোদ-প্রমোদের কোন ব্যবস্থা আছে কি?

আগামী বৃহস্পতিবার এখানে একটা উৎসব হবে।

উৎসব? কিসের উৎসব বলুন তো?

ঠিক আছে, খুঁজে দেখি, একটা প্রচার পত্র পেয়ে গেলে আপনার ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে জানালা দিয়ে বাইরের প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে আপন মনে বললাম, পরিবেশটা খুবই শান্ত। পূর্ব, পশ্চিমের শহরগুলোর জীবনের বৈচিত্র্য এখানে অনুপস্থিত। কেবলমাত্র উন্নতিশীল গতানুগতিক এক প্রসিদ্ধ বাণিজ্য শহর।

দেশের ম্যানুফ্যাকচারিং কেন্দ্রগুলোর মধ্যে ন্যাসভিল সর্বশীর্ষে অবস্থান করছে। যুক্তরাষ্ট্রের এটাই জুতোর সবচেয়ে বড় কারখানা, মিছরি আর বাজি তৈরীর কারখানা এখানে অবস্থিত। আর মুদির ব্যবসা, ওষুধের কারবার আর শুকনো খাবারের ব্যবসা এখানে খুবই ভাল চলে।

আমি এবার আপনাদের কাছে অবশ্যই প্রকাশ করব, কি করে আমি ন্যাসভিল-এ পৌঁছেছি। গল্পের মাঝ পথে এমন একটা আলোচনা আপনাদের আর আমার উভয়ের কাছেই সমান বিরক্তির উদ্রেক করার কথাই বটে।

উত্তরাঞ্চলের একটা সাহিত্য পত্রিকার বিশেষ একটা দায়িত্ব আমার ওপর বর্তে ছিল। কাজটা হচ্ছে, প্রকাশনা-সংস্থার অন্যতমা লেখিকা আজালিয়া এডেয়ার-এর মধ্যে ব্যক্তিগত যোগসূত্র আমাকে স্থাপন করতে হবে।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, এডেয়ার-এর হাতের লেখা ছাড়া অন্য কোন সূত্রই আমাকে দেওয়া হয় নি। আর আমাকে দেওয়া হয়েছিল তার লেখা কয়েকটা প্রবন্ধ ও কবিতা।

ব্যস, তাঁরা আমার ওপর লেখিকা এডেয়ারকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব চাপিয়ে দিলেন।

আমি প্রকাশন-সংস্থার কাছ থেকে দায়িত্বভার বুঝে নিয়ে যাত্রা করার পূর্বমুহূর্তে আমাকে বিশেষ করে বলে দেওয়া হল, অন্য কোন প্রকাশক প্রতি শব্দের জন্য দশ বা বিশ সেন্ট দর হাঁকার আগেই আমি যেন তাঁকে দিয়ে দুই সেন্ট দরে প্রকাশের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়ে নেই। আর এটাই নাকি হবে আমার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব।

পরদিন সকালে বৃষ্টি মাথায় নিয়েই আমি রওনা হলাম। মোড়ের মাথায় পৌঁছতেই সিজার

খুড়োর সঙ্গে দেখা। সে এক বিশালদেহী নিগ্রো। প্রবীণ। মনে হয় স্বয়ং ব্রুটাস বুঝি চোখের সামনে দাঁড়িয়ে।

সিজার খুড়োর কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে কয়েক পা এগোতেই স্বর্গীয় রাজা চেট্টিওয়া-র মুখোমুখি হতে হল : তার গায়ের কোটটার মত কোট অন্য কারো গায়ে দেখা যায় না, দেখার আশাও রাখি না। রংচটা কোটটা তার গোড়ালি পর্যন্ত নেমে গেছে। এর বৈচিত্র্যের কারণ রোদ, বৃষ্টি আর বয়স। এর পাশে যোসেফ-এর কোটটাকেও খুবই নগণ্য বোধ হয়।

স্বর্গীয় রাজা চেট্টিওয়া-র কোটটার এমন বিশদ বর্ণনা দেওয়ার যুক্তি অবশ্যই আছে। কারণ এ গল্পে কোটটারও বিশেষ একটা ভূমিকা আছে।

আর গল্পটা শুরু করতে দেরী হওয়ার কারণ, ন্যাসভিল-এ কেউ আশাই করতে পারবে না যে কোন ঘটনা যথা সময়েই ঘটবে, খুবই সত্য।

মনে হয়, এক সময়ে কোটটা কোন এক সামরিক অফিসারের গায়ে ছিল। তার কলারটা কবেই খসে গেছে। আর বুকের তকমাটাও ধুয়ে মুছে সাফ-সুতরো হয়ে গেছে। সে জায়গাটা পূরণ করেছে শনের সুতো। তা-ও আবার বেশ কয়েক জায়গায় ছিঁড়ে ঝুলে পড়েছে। বোতামগুলো নিশ্চিহ্ন হতে হতে বর্তমানে একটাই তাদের অতীত অস্তিত্বের কথা জানান দিচ্ছে।

ঝরঝরে একটা পুরনো গাড়ির সামনে বিচিত্র-এ কোটটা পরে নিগ্রোটা স্থবিরের মত দাঁড়িয়েছিল।

আমি কাছে যেতেই সে ঝট করে দরজাটা খুলে সরাসরি বলে উঠল, স্যার, সোজা ভেতরে পা রাখুন। এক রত্তি ধুলোও ভেতরে নেই। এইমাত্র কারখানা থেকে ফিরছি।

আমি কোটের পকেট থেকে এডেয়ার-র ঠিকানাটা বের করে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবার যথাস্থানেই রেখে দিলাম।

গাড়িতে ওঠার আগে নিগ্রোটাকে বললাম, আট 'শ একষট্টি জেসমিন স্ট্রীটে পৌঁছে দেবে।

আমি গাড়িতে উঠতে যাওয়ার মুখে নিগ্রোটা তার মোটাসোটা সবল হাতটা বাড়িয়ে আমাকে আটকে দিল।

আমি বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে তার মুখের দিকে তাকালাম। সে গুরু গম্ভীর গলায় বলে উঠল, 'স্যার, সেখানে কেন যেতে চাচ্ছেন?

আমি মুচকি হেসে বললাম, তা জেনে তোমার ফয়দা কি হবে?

না, কিছুই না। একেবারেই ফয়দা কিছু হবে না স্যার।

তবে আর অহেতুক এ প্রশ্ন করছ কেন?

শহরের ওদিকটা খুবই নির্জন নিরালা। আর খুব কম লোকেরই সেখানে যাবার দরকার হয়। গাড়িতে উঠে বসুন। সবে কবরখানা থেকে ফিরছি। এক রত্তি ধুলোও নেই।

ঠিকানা অনুযায়ী পৌঁছতে আমার এক ঘণ্টা সময় লেগে গেল। ঝিরঝিরে বৃষ্টি ছাড়া অন্য কোন শব্দই কানে এল না। আর নিগ্রোটার ঝরঝরে গাড়িটার ঘটাং-ঘটাং শব্দ তো আছেই। ছুটন্ত গাড়ির জানালা দিয়ে ভূতের মত দাঁড়িয়ে থাকা পথের দু'ধারে পুরনো বাড়ি ছাড়া কিছু নজরেও পড়ল না।

শহরটার আয়তন দশ বর্গ মাইল। মোট এক শ' একাশি মাইল রাস্তার এক শ' সাইত্রিশ মাইল পাকা। সাতাত্তর মাইল প্রধান নক্সাসহ বিশ হাজার ডলার জল সরবরাহের ব্যবস্থার জন্য খরচ হয়েছে।

আট শ' একষট্টি জেসমিন স্ট্রীটে একটা ভাঙাচোরা বাড়ি। সদর রাস্তা থেকে ত্রিশ গজ ভেতরে ঝোপঝাড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটা। একটা দড়ি দিয়ে প্রধান ফটকটা বেঁধে রাখা হয়েছে।

প্রধান ফটক দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই জাঁকজমক পূর্ণ সৌন্দর্যের মধ্যে একটা ছায়া, একটা প্রেতাত্মার মত দাঁড়িয়ে আছে আটশ' একষট্টি নম্বর বাড়িটা।

এখনও কিন্তু আসল গল্পটা আমি শুরুই করিনি। গাড়োয়ানের হাতে তার প্রাপ্য পঞ্চাশ সেন্ট মিটিয়ে দিলাম। আর বকশিস হিসাবে সিকি ডলার তার হাতে গুঁজে দিলাম। সেটা সে ফেরৎ দিয়ে দিল। কিছুতেই নিতে রাজি হল না।

সে বলল, স্যার, ভাড়া দু'ডলার।

আমি সবিস্ময়ে বললাম, সে কী হে! হোটেলের সামনে তুমি তো বারবার চিল্লিয়ে বলছিলে, শহরের যে কোন অঞ্চলে পঞ্চাশ সেন্ট।

স্যার, দুটো ডলারই দিয়ে দিল না। হোটেল থেকে জায়গাটা কত দূর বলুন তো?

কিন্তু জায়গাটা তো শহরের সীমার মধ্যেই। আমাকে একজন কাঁচা ইয়াংকি ভাবলে কিন্তু ভুল করবে। পাহাড়গুলোর ওই ওপরের অংশে আমার কাজ। বুড়ো নিগ্রো কাহাকার! মুখ দেখেও মানুষ চিনতে পার না? যত্তসব ঝকমারি!

সে এবার গলা নামিয়ে মোলায়েম স্বরে বলে উঠল, স্যার, দক্ষিণে আপনার নিবাস। আপনার জুতো জোড়াই প্রমাণ দিচ্ছে।

তার মানে?

স্যার, দক্ষিণের কোন ভদ্দরলোক এমন ছুঁচলো মুখ জুতো ব্যবহার করে না।

তবে ওই পঞ্চাশ সেন্ট ভাড়াতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

স্যার, ভাড়া পঞ্চাশ সেন্ট-ই।

তবে আর কচলাকচলি করছে কেন?

স্যার, দুটো ডলার যে আমার খুবই দরকার। এটা আমার দাবী মনে না করে আব্দার হিসেবে নিতে পারেন। তবে আজ রাত্রের মধ্যেই আমায় দুই ডলার জোগাড় করতে হবে।

আমি খেঁকিয়ে উঠলাম, হতচ্ছাড়া নচ্ছাড় বেহায়া, পুলিশ ডেকে তোমাকে ধরিয়ে দেওয়া দরকার, বুঝলে বুড়ো নিগ্রো?

তার গোমড়া-মুখে এই প্রথম হাসি দেখলাম। তার জানা ছিল, সবই তার জানা ছিল।

আমি তার হাতে দু' ডলারের একটা বিল গুঁজে দিলাম। তখনই তার হাতের দুর্দশাটা চোখে পড়ল। ডান হাতের ওপরের দিকটা অনুপস্থিত। একেবারে মাঝামাঝি কেটে আবার জুড়ে দেওয়া আছে। বুড়ো নিগ্রোটাকে খুশি করে আমি এগিয়ে গেলাম। সদর দরজার দড়ির বাঁধনটা খুলে গুটিগুটি বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেলাম।

এমন একটা পুরনো বাড়ি কেন যে এতদিন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে নি সেটাই আমার কাছে অবাক লাগল।

আজেলিয়া এডেয়ার-এর বয়স পঞ্চাশ বছর। মাথার চুলগুলো শন পাটের মতই সাদা।

তিনি এক অশ্বারোহী যোদ্ধা পরিবারের বংশোদ্ভুতা। তার শরীরটা বাড়িটার মতই ভঙ্গুর। গায়ে সস্তা অথচ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক-আশাক। হাবভাব অবিকল রাণীরই মত।

আজেলিয়া এডেয়ার আর আমার মধ্যে অনেক কথাই হল। তার মধ্য থেকে যৎকিঞ্চিৎ আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। ভদ্রমহিলা প্রাচীন দক্ষিণী পরিবারের সন্তান। লেখাপড়া সামান্যই করেছেন আর তা করেছেন বাড়িতে বসেই।

আমার বুঝতে এতটুকুও ভুল হল না যে, আজেলিয়া এডেয়ার খুবই দৈন্য দশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। পত্রিকাটার প্রতি কর্তব্য আর কবি ও লেখকদের প্রতি আনুগত্য ও সহানুভূতির দো-টানায় আমি যেন হঠাৎ কেমন মিইয়ে দিলাম।

আমি নিঃসন্দেহ হলাম। অন্তত এ পরিস্থিতিতে আমার পক্ষে চুক্তির প্রসঙ্গটা তোলা সম্ভব নয়।

আরও কিছুটা আলাপ আলোচনা এগিয়ে যাওয়ার পর আমার ব্যবসায়িক বুদ্ধিটা একটু চাঙা হল। আমি চোখ কান বুজে ঝট করে আমার আসার উদ্দেশ্যটা ব্যক্ত করলাম। স্থির হল বিকেল তিনটের সময় চুক্তিপত্রের ব্যাপারটা মিটিয়ে নেওয়া হবে।

আমি স্থানটার নির্জনতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে তিনি ম্লান হেসে বললেন, 'এ ব্যাপারটা নিয়ে তো কোনদিন ভাবনা চিন্তা করি নি। তবে এমন শান্ত সুন্দর পরিবেশেও কি কোন বড় ঘটনা ঘটে না?

তবে কোন কোন অন্য শহরের তুলনায় চাকচিক্য একটু বেশীই দেখা যায়—মানে রোমান্সের ব্যাপার-স্যাপারে কথা বলতে চাইছি।

আরে মশাই, সেটা তো উপরে উপরে থাকে। আমি বহুবার পৃথিবীটাকে চক্কর মেরে দেখেছি,

তবে বই আর স্বপ্ন সম্বল করেই আমি পৃথিবীটাকে দেখেছি। কাল্পনিক ভ্রমণে তুরস্কের সুলতান নিজের হাতে তার বেগমদের অনবরত চাবুক মেরে চলেছে। কারণ কি? তারা প্রকাশ্যে মুখের ঘোমটা খুলে ঘোরতর অন্যায় করেছে।

আমি এ-ও দেখেছি, ন্যাসভিল-এর একজন মানুষ তার থিয়েটারের টিকিটগুলো কুঁচিকুঁচি করে ছিঁড়ে ফেলেছে। এর কারণ হল বৌটা চালের গুঁড়ো মুখে মেখে বাইরে বেরিয়েছিল।

আবার সানফ্রান্সিসকোর চায়না টাউনে আমি দেখেছি, ক্রীতদাসী মেয়ে সিঙ্গকে মুখ থেকে কেবলমাত্র একটা কথা বের করার জন্য আস্তে আস্তে এক ইঞ্চি করে ফুটন্ত তেলে চোবানো হচ্ছে। কথাটা হচ্ছে, সে আর কোনদিন তার মার্কিনী প্রেমিকের সঙ্গে কথা বলবে না, দেখাও করবে না। কী মর্মান্তিক ব্যাপার! সে ফুটন্ত তেলে হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যাওয়ার পর সে প্রস্তাবটা মেনে না নিয়ে আর পারল না।

বেশীদিন আগের কথা নয়, এক রাত্রে পূর্ব ন্যাসভিল শহরের এক নৈশভোজের আসরে আমি দেখেছি স্কুলের সাতজন সহপাঠী ও সারা জীবনের বন্ধু মিলে কিটি মরগ্যানকে নির্মমভাবে খুন করেছে। কারণ তেমন কিছু নয়। বাড়ির রঙের মিস্ত্রিকে সে বিয়ে করেছিল।

ফুটন্ত তেলটা তার বুক অবধি উঠে গিয়েছিল। কিন্তু একটা টেবিল থেকে অন্য টেবিলে ঘোরাঘুরির সময় তার মুখের ম্লান হাসিটুকু যদি একবারটি দেখতে পেতেন! উফ্!

হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন মশাই এ শহরটা একেবারেই বৈচিত্র্যহীন—একেবারেই গতানুগতিক। এখানকার জীবনযাত্রা বড়ই এক ঘেয়ে।

আমরা যখন শহরটার পরিবেশ নিয়ে কথা বলছি, ঠিক তখনই কে যেন বার কয়েক দরজায় টোকা দিল।

আজেলিয়া এডেয়ার আমার কাছ থেকে কিছুটা সময় চেয়ে নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন।

তিন মিনিট বাদেই তিনি আবার আমার কাছে ফিরে এলেন। তাঁর মুখ দেখে মনে হল তাঁর কাঁধ থেকে বুঝি দশ বছরের বোঝা নেমে যাওয়ায় স্বস্তি পেয়েছেন।

তিনি ঘণ্টা বাজালেন। এক বুড়ি নিগ্রো ঘরে ঢুকল। সে বুড়ো আঙুলটাকে মুখে পুরে সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

বুড়ি নিগ্রোটা ঘরে এলে আজেলিয়া এডেয়ার একটা থলি থেকে একটা ডলার বের করল। তার ওপরের দিকটা ছিঁড়ে যাওয়ায় টিসু পেপার দিয়ে তাপ্পি দেওয়া হয়েছে।

যে বিলগুলো আমি নিগ্রোকে দিয়েছিলাম, এটা তাদেরই একটা, চিনতে অসুবিধা হল না।

নিগ্রোটা মেয়েটার হাতে ডলারের নোটটা দিয়ে বলল, 'শীঘ্র মিঃ বেকার-এর দোকান থেকে চা, চিনি আর দশ সেন্ট দামের চিনিকে নিয়ে এস। মেয়েটার বয়স খুব বেশী হলেও বারো বছর।

নিগ্রো মেয়েটা ঘর ছেড়ে যেতেই বারান্দা থেকে এক তীব্র আর্তস্বর বেরিয়ে এল।

আমার তিলমাত্রও সন্দেহ ছিল না যে, সেটা নিগ্রো মেয়েটারই আর্তস্বর।

পর মুহূর্তেই শোনা গেল, গম্ভীর এক পুরুষ কণ্ঠ। তার সঙ্গে মেয়েটার আর্তনাদ মিশে গেল।

আমি লক্ষ্য করলাম, ব্যাপারটা আজেলিয়া এডেয়ার-এর মুখে এতটুকুও উদ্বেগ উৎকণ্ঠার ছাপ আঁকতে পারে নি। তিনি ধীর পায়েই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

তারপরই দু'মিনিট ধরে কর্কশ পুরুষ কণ্ঠের হাঁকাহাঁকি কানে এল। একটা শপথের সঙ্গে কিছুটা আস্ফালন আর ধস্তাধস্তিও চলল।

একটু বাদেই আজেলিয়া এডেয়ার ঘরে ফিরে আবার নিজর চেয়ারটায় শান্তভাবে বসে পড়ল।

আমার মুখের বিস্ময়ের ছাপটুকু তাঁর নজর এড়াল না। আমাকে উৎকণ্ঠামুক্ত করতে তিনি ম্লান হেসে বললেন, সুবিশাল এ বাড়িটার এক অংশে এক ভাড়াটে থাকে।

আমি নিশ্চিত হয়েছিলাম যে, নিগ্রো মেয়ে ইম্পি দোকানে যাবার জন্য বাড়ি থেকে বেরোবারই অবকাশ পায় নি।

গাড়িটা অনেকখানি পথ পাড়ি দেবার পর আমার হঠাৎ মনে পড়ল, কি করলাম! আজেলিয়া এডেয়ার-এর নামটাও শুনে আসা হল না। পর মুহূর্তেই নিজের মনকে প্রবোধ দিলাম, আগামীকাল জেনে নেওয়া যাবে। আর সে দিন থেকেই আমি শহরটার অন্যায় অসামাজিক কাজকর্মের জোয়ারে

গা ভাসিয়ে দিলাম। হ্যাঁ, আমি অন্যায়ের পথকে আঁকড়ে ধরলাম।

আমি মাত্র দু'দিন শহরটায় কাটিয়েছিলাম। এ সময়টুকুর মধ্যেই আমি টেলিগ্রাফের মাধ্যমে একের পর এক মিথ্যা কথা বলে গেলাম। আর একটা খুনের সহযোগী হলাম। অন্যায় আর কাকে বলে।

আমার হোটেলের দরজার কাছাকাছি যাবার কথা বলতেই সে নিগ্রো বুড়োটা আমাকে ধরল। তার গাড়ির দরজাটা খুলে আগেকার সে বাধা গৎ আওড়াতে শুরু করল, 'স্যার, উঠে পড়ুন। এক রত্তি ধুলোও নেই। সবেই কবরখানা থেকে ফিরছি। পঞ্চাশ সেন্টে শহরের যেকোন স্থানে নিয়ে যাব।

আমাকে চিনতে পেরেই দাঁত বের করে হেসে বলল, মার্জনা করবেন স্যার, আপনাকেই তো আমি ওই বাড়িটায় পৌঁছে দিয়েছিলাম, তাই না?

হ্যাঁ। আটশ' একষট্টি নম্বর বাড়িটায় আগামীকাল বিকেল তিনটায় আবার আসব। তোমাকে পেলে—মিস এডেয়ারকে তো তুমি চেনই।

তেনার বাবা জজ এডেয়ার ছিলেন আমার প্রভু।

বর্তমানে মেয়েটা খুবই অভাবে আছে, তাই না?

রাজা চেট্টিওয়া-র হিংস্র মুখটা আমার নজর এড়াল না। পর মুহূর্তেই বদলে গিয়ে সে আবার বুড়ো গাড়োয়ান বনে গেল।

সে এবার বলল, 'স্যার, তবে না খেয়ে মরার মেয়ে তিনি মোটেই নন। বুদ্ধি আছে। ঠিক বেঁচে থাকার ব্যবস্থা যা হোক করে নেবে।

শোন, এবার কিন্তু তুমি পঞ্চাশ সেন্টই পাবে, বুঝলে?

তাই দেবেন। আসলে সকালে ওই ডলার দুটো খুবই দরকার ছিল। হোটেলে ফিরেই টেলিগ্রাফ মারফৎ মিথ্যার ঝোলা খুলে নিয়ে বসলাম।

পত্রিকার অফিসে টেলিগ্রাম করে জানালাম, মিস এ.এডেয়ার প্রতি শব্দের জন্য আট সেন্ট দাবী করছেন। এর নিচে নামতে নারাজ। টেলিগ্রাফ মারফৎ জবাব এল—তাই দাও।

নৈশভোজের আগে আমার পুরনো ভুলে যাওয়া বন্ধু মেজর ওয়েস্টওয়ার্থ ক্যাসওয়েল জোর করে ধরে বার-এ নিয়ে গেল। লাখ টাকা বের করছে এমন ভঙ্গীতে পকেট থেকে দুটো এক ডলারের বিল বের করল মদের দাম মেটাবার জন্য।

আরও একবার আমার নজরে পড়ল আগেকার সেই এক ডলার নোটের ওপর যার ডানদিকের ওপরের কোণটা ছিল না, আর মাঝের ছিঁড়ে যাওয়া অংশটা টিসু পেপার দিয়ে তাপ্পি দেওয়া।

হ্যাঁ, আমারই দেওয়া ডলারই বটে। কিছুতেই অন্য ডলার নয়। আমি নিজের ঘরে ফিরে গেলাম। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। বুড়ো গাড়োয়ান রাজা চেট্টিওয়া পরদিন সময় মত নির্দিষ্ট জায়গায় হাজির হল।

আগের দিনের মত সারা ভাঙা পথে বার বার আছাড় খেতে খেতে বহু কষ্টে আটশ' একষট্টি নম্বর বাড়িটায় হাজির হলাম।

আমাকে পৌঁছে দিয়ে সময় মত আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

আজেলিয়া এডেয়ার শব্দ প্রতি আট সেন্টে স্বাক্ষর করে তাকে যেন আরও বিমর্ষ দেখাতে লাগল।

চেয়ার ছেড়ে ওঠার সময় সে এলিয়ে পড়ে যাওয়ার সময় আমি হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে ফেললাম। প্রায় জাপ্টে ধরে চেয়ারে বসিয়ে দিলাম।

মুহূর্তমাত্র দেরী না করে দৌড়ে রাস্তায় গেলাম। ইয়া দশাসই চেহারাধারী বুড়ো গাড়োয়ানকে অনুরোধ করলাম তাড়াতাড়ি একজন ডাক্তার নিয়ে আসার জন্য।

মিনিট দশেকের মধ্যেই একজন পাকা চুল ও শক্তপোক্ত ডাক্তারকে নিয়ে সে ফিরে এল।

ডাক্তার আমাকে দেখেই চোখে মুখে কৌতূহল ও জিজ্ঞাসার ছাপ এঁকে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

এ রহস্যময় বাড়িটাতে আমার আগমনের কারণটা আমি তাঁকে সাধ্যমত সংক্ষেপে বুঝিয়ে বললাম।

সব কিছু বুঝে মুচকি হেসে তিনি আমার দিকে মাথাটা নোয়ালেন। আমার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে পর মুহূর্তেই তিনি বুড়ো নিগ্রো সিজার খুড়োর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন।

নিগ্রো বুড়ো সিজার খুড়ো এগিয়ে এসে হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়াল।

ডাক্তার বাবু বললেন, 'এক দৌড়ে আমার বাড়ি থেকে ঘুরে আসতে পারবে?

বলুন স্যার, কি করতে হবে?

লুসির কাছ থেকে এক ঘটি টাটকা দুধ আর এক বোতল পেটি মদ নিয়ে এস। বুড়ো নিগ্রোটা পিছন ফিরে যাত্রার উদ্যোগ নিতেই ডাক্তার বাবু বললেন, গাড়ি নিও না যেন, দৌড়ে যাও। আমি চাই না যে, তুমি এ সপ্তাহের মধ্যেই ফিরে এস।

আমি বুঝে নিলাম, বুড়োটার ঘোড়ার দৌড়োবার ক্ষমতার প্রতি ডাক্তার বাবুর ভরসা নেই। বুড়ো চলে যাবার পর ডাক্তার বাবুর আচরণে আমি একটু বিরক্তই হলাম। তিনি রোগীকে পরীক্ষা নিরীক্ষা না করে বার বার আমাব আপাদমস্তক দেখতে লাগলেন।

তারপর এক সময় মুখ তুলে বললেন, 'তোমাকে দিয়েই কাজটা চলে যাবে।

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আজ্ঞে, কাজ? কোন্ কাজের কথা বলছেন, বুঝতে পারলাম না তো?

এটা অপুষ্টিজনিত রোগ। আরও সহজভাবে বলতে গেলে দীর্ঘ নিরবচ্ছিন্ন দারিদ্র, অনাহার আর অহমিকার ফল।

হ্যাঁ, আমিও এই রকমটাই অনুমান করছি।

দেখুন, ওই যে অহমিকা কথাটা বললাম তা কিন্তু সম্পূর্ণ যথার্থ বলেছি।

ঠিক বুঝতে পারলাম না তো?

ব্যাপারটা হচ্ছে কি, মিসেস ক্যাসওয়েল-এর বহু অনুরাগী আছেন যাঁরা এর জন্য কিছু করতে পারলে নিজেদের ধন্য জ্ঞান করবেন।

হ্যাঁ, এটাই তো স্বাভাবিক।

কিন্তু ইনি ওই বুড়ো সিজার খুড়ো ছাড়া আর কারো কাছ থেকে হাত পেতে কিছু নিলেন না। আজও নেবেন বলে মনে হয় না।

উফ্!

এক সময় এর পরিবারটিই ছিল ওই বুড়ো নিগ্রোটার প্রভু।

মিসেস ক্যাসওয়েল! মিসেস ক্যাসওয়েল! আমি দু'পা পিছিয়ে ডাক্তারের চোখের আড়ালে গিয়ে চুক্তিপত্রটার ওপর আর একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। দেখলাম, তিনি স্বাক্ষর করেছেন 'আজেলিয়া এডেয়ার ক্যাসওয়েল'।

আমি ফিরে এসে আবার ডাক্তারের মুখোমুখি দাঁড়ালাম। আমার মুখের চিন্তার ছাপটুকু ডাক্তারের নজর এড়াল না।

তিনি উৎকণ্ঠার সঙ্গে বললেন, মশাইকে চিন্তামগ্ন মনে হচ্ছে যেন।

না, কিছু না। ভাল কথা, আমার ধারণা ছিল ইনি মিস এডেয়ার।

আরে মশাই, এক মাতাল, লম্পট, ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলেকে ইনি বিয়ে করেছিলেন।

উফ্!

তার খরচ খরচা চালাবার জন্য বুড়ো নিগ্রো চাকরটা যা দেয় তা পর্যন্ত তার স্বামী দেবতাটা ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

একটু বাদেই বুড়ো নিগ্রোটা দুধ আর মদ নিয়ে ফিরে এল। গরম দুধ আর মদ খাইয়ে ডাক্তার কিছুক্ষণের মধ্যেই আজেলিয়া এডেয়ারকে সুস্থ করে তুললেন।

আজেলিয়া এডেয়ার ধীর ধীরে উঠে বসলেন। জানলা দিয়ে বাইরের প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে হেমন্তকালের সৌন্দর্যের কথা বলতে লাগলেন।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন—এখন্ সুস্থবোধ করছেন তো?

হ্যাঁ। ও কিছু না, আসলে হৃৎপিণ্ডের একটা পুরনো অস্বাভাবিক রকম স্পন্দনের ফলেই সংজ্ঞা লোপ পেয়েছিল বলে মনে হচ্ছে, আপনার কি মত ডাক্তারবাবু?

আমিও একই কথা বলতে চাচ্ছি।

আমি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দরজা পর্যন্ত গেলাম। তিনি বিদায় নেবার মুহূর্তে আমি বললাম, 'আজেলিয়া এডেয়ার-এর সঙ্গে একটা পত্রিকার পক্ষ থেকে আমি আজই একটা চুক্তি করলাম।

তিনি চশমার ফাঁক দিয়ে আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন, আমি তাঁর জিজ্ঞাসা নিবারণ করতে গিয়ে বললাম, তিনি যেসব লেখা পাঠাবেন তার জন্য পত্রিকাটার পক্ষ থেকে কিছু মোটা অর্থ অগ্রিম হিসেবে দেওয়ার ইচ্ছে আমার রয়েছে।

আমার কথা শুনে ডাক্তার খুশি হলেন।

তারপর ডাক্তার বললেন, 'মশাই, আপনি হয়ত জানলে খুশিই হবেন, আপনি যাকে গাড়োয়ান হিসেবে পেয়েছেন সে আসলে এক রাজপরিবারেরই লোক।

অ্যাঃ! আমি চমকে উঠে বললাম।

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছি। বুড়ো নিগ্রো সিজার-এর ঠাকুরদা ছিলেন কঙ্গো-র রাজা। আশা করি আপনি নিজেই লক্ষ্য করে থাকবেন, সিজার-এর হাবভাবও প্রায় রাজারই মত।

ডাক্তার আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পথে নামলেন।

আমি দরজা থেকে ভেতরে যাবার জন্য পা বাড়িয়েও আবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। সেখান থেকেই সিজার বুড়োর কণ্ঠস্বর কানে এল, মিস জলিয়া, ওই দুটো ডলার কি তোমার কাছ থেকেই নিয়েছিল?

আজেলিয়া এডেয়ার-এর দুর্বল ক্ষীণ কণ্ঠ আমার কানে এল, হ্যাঁ সিজার।

আমি সেখানে আর অপেক্ষা করার দরকার মনে না করায় ধীর পায়ে ভেতরে ঢুকে গেলাম।

আমার লেখিকার সঙ্গে ব্যবসায়িক লেনদেন টুকু সেরে ফেললাম। পকেট থেকে পঞ্চাশটা ডলার বের করে তাঁর হাতে দিয়ে বললাম, 'এটা অগ্রিম হিসেবে দিলাম। আমাদের চুক্তিটাকে পাকা করার জন্য এটাকে আমাদের প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত আনুষ্ঠানিক রীতি মনে করতে পারেন।

একটু বাদেই বুড়ো নিগ্রো সিজার-এর গাড়ি চেপে আমি সেখান থেকে চলে এলাম।

আমি যতটুকু জানি তাতে বলা যেতে পারে গল্পটা এখানেই শেষ। তার পরের অংশটুকু ঘটনাবলীর বিবরণমাত্র।

আমি সন্ধ্যা ছ'টার কাছাকাছি সময়ে একটু পায়চারি করতে বেরোলাম।

পূর্ব নির্দিষ্ট মোড়ের কাছে যেতেই বুড়ো নিগ্রো গাড়োয়ান সিজার-এর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে গাড়ির দরজা খুলেই পুরনো সে গৎ আওড়াতে লাগল, 'স্যার, উঠে পড়ুন। শহরের যেখানেই যাবেন ভাড়া পঞ্চাশ সেন্ট। ভেতরে এক রত্তি ধুলোও নেই। সবে কবরখানা থেকে ফিরছি।

পরমুহূর্তে আমার মুখের দিকে চোখ পড়তেই সে আমাকে চিনতে পারল। লক্ষ্য করলাম তার পায়ের পাতা পর্যন্ত নেমে আসা কোট থেকে শুরু করে তার চোখ মুখের অবস্থা আরও অনেক বেশী মলিন দেখাচ্ছে।

ঘোরাঘুরি করে ঘণ্টা দুই পরে ওষুধের দোকানটার কাছাকাছি এসেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। দেখলাম, একদল মারমুখী জনতা দোকানটাকে অবরোধ করে রেখেছে।

আমি অবাকই হলাম। যে বৈচিত্র্যহীন শহরে কোন কিছুই ঘটে না সেখানে তো এটা একটা বড় রকমের ঘটনাই ঘটে।

মুহূর্তকাল দূরে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটাকে লক্ষ্য করে এক সময় ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেলাম।

হঠাৎ চোখ পড়ল ভেতরের একটা বেঞ্চের দিকে। দেখলাম, মেজর ওয়েস্টওয়ার্থ ক্যাসওয়েল-এর নশ্বর দেহটা এলিয়ে পড়ে রয়েছে।

একজন ডাক্তার পরীক্ষা করলেন। এক সময় বিষণ্ণ মুখে রায় দিলেন, অনেক আগেই তার প্রাণ-বায়ু দেহছাড়া হয়ে অনন্ত সুন্দরের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছে।

এক সময়ের মেজরকে অন্ধকার একটা রাজপথে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। কয়েকজন পথচারী তাকে ধরাধরি করে ওষুধের দোকানে নিয়ে আসে। সদ্য মৃত মেজর যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধে

অংশগ্রহণ করেছিলেন তা তাকে দেখেই বোঝা গেল।

একথাও সত্য যে, এ মেজর ছিলেন ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলে প্রকৃতির লোক। তবে তিনি যে একজন বড় যোদ্ধা ছিলেন একথা স্বীকার না করে উপায় নেই। তা সত্ত্বেও তাঁকে পরাজয়ের গ্লানি গায়ে মাখতে হলো।

উপস্থিত পথচারীদের একজন বলল, ওয়েস্টওয়ার্থ যখন চৌদ্দ বছরের যুবক তখন সে বিদ্যালয়ের এক সেরা ছাত্র ছিল।

আমি কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াতেই মৃত মেজরের হাত থেকে একটা বস্তু আমার পায়ের কাছাকাছি পড়ে গেল। আমি সাধ্যমত সন্তর্পণে নিঃশব্দে সেটাকে পা দিয়ে চাপ দিয়ে দিলাম।

একটু বাদে পা-টা সরিয়ে সেটাকে তুলে কোটের পকেটে চালান দিয়ে দিলাম।

আমি অনুমানে বুঝলাম, যুদ্ধের সময় মৃত মেজরের অজান্তেই ওই বস্তুটা তাঁর হাতে এসে পড়েছিল। তিনিও সেটাকে তার হাতের মুঠোয় রেখে দিয়েছিলেন।

সে রাত্রে হোটেলের বাসিন্দাদের কেবলমাত্র নিষিদ্ধ বিষয় এবং রাজনীতি ছাড়া আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল মেজরের মৃত্যুর প্রসঙ্গ।

একদল হোটেলের বাসিন্দাকে লক্ষ্য করে একজনকে গলা চড়িয়ে বলতে শুনলাম, আমি বলতে পারি কিছু সংখ্যক অজ্ঞাত পরিচয় নিগ্রোই অর্থের জন্য মেজরকে খুন করেছে। আজ বিকেলেও তিনি যে হোটেলের জনা কয়েক বাসিন্দাকে পঞ্চাশ ডলার দেখিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃতদেহ যখন পাওয়া গেল তখন ডলারগুলো তাঁর কাছে ছিল না।

পরদিন সকাল ন'টায় আমি শহর ছাড়লাম।

আমার ট্রেনটা যখন ক্যাম্বারল্যান্ড নদীর সেতুর ওপর দিয়ে যাচ্ছিল তখন একটা শিং-এর তৈরী ওভার কোটের বোতাম আমার কোটের পকেট থেকে বের করলাম।

সেটা একটা পঞ্চাশ সেন্ট মুদ্রার আকৃতি বিশিষ্ট। আর তার গায়ে জড়িয়ে রয়েছে শন পাটের সুতোর কয়েকটা আঁশ।

আমি কয়েক মুহূর্ত নিষ্পলক চোখে হাতের বোতামটার দিকে তাকিয়ে থেকে এক সময় চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম।

তারপরই জানালা দিয়ে নিচের কর্দমাক্ত জলে হাতের বোতামটাকে ছুঁড়ে দিলাম। সেটা চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাফেলো এখন কি অবস্থায় আছে—আমি অবাক হয়ে বিষণ্ণ মুখে ভাবতে লাগলাম।

এ বার্ড অব বাগদাদ

খলিফা হারুণ অল রসিদ-এর মানসিকতা আর প্রতিভার একটা বড় ভগ্নাংশই মারগ্রেভ আগস্ট মাইকেল ভন পলসেন কুইগ-এর ওপর যে বর্তেছিল সে বিষয়ে কিছুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই।

চতুর্থ এভিনিউতে কুইগ-এর রেস্তোরাঁটা অবস্থিত।

শহরের চারদিকে উন্নতি হলে সেই রাস্তাটা তার মন থেকে হয়ত মুছেই গিয়েছিল।

চারদিকে যে কত সব পরিবর্তন হয়েছে তা ভাষায় বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়। রীতিমত একটা ঝলমলে শহরে পরিণত হয়েছে।

মনে করা যাক এখন রাত্রির অন্ধকার থেমে এসেছে। মরচে ধরা বর্ম পরা মানুষগুলো জানালায় দাঁড়িয়ে বাইরের প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

যে সব সাহসী বীরপুঙ্গব সৈন্য আর সৈন্যাধ্যক্ষরা কবে মরে কবরে চলে গেছেন, তাঁদেরই ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র আজ ভৌতিক আলোর ছোঁয়া পেয়ে রহস্য সঞ্চার করে চলেছে।

সে সব অতীতস্মৃতি সম্বল করে কোন রাজপথের কি নিজের অস্তিত্ব অব্যাহত রাখা সম্ভব?

তাই তো চতুর্থ এভিনিউ কবেই মরে হেজে গেছে।

চতুর্থ এভিনিউর কাছাকাছি কোথাও কুইগ-এর রেস্তোরাঁটা অবস্থান করছে। কুইগ তার মায়ের দিক থেকে উপাধিটা পেয়েছে।

তার মায়ের কোন পূর্বপুরুষ স্যাক্সনির অন্তর্গত মারগ্রেভ অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। টামানির এক অসমসাহসী বীর ছিলেন তার বাবা।

বংশের একেবারে শেষ ধাপে এসে কুইগ বুঝতে পারল, সে কোন শক্তিধর জমিদার হতে পারবে না। আর সিটি হল-এ একটা চাকরি জোগাড় করাও তার পক্ষে সম্ভব হবে না।

সবদিক বিচার বিবেচনা করে কুইগ একটা রেস্তোরাঁ খুলে বসল। রেস্তোরাঁ ভালই চলতে লাগল। এটা তার জীবন ধারণের ব্যবস্থা করে দিলেও চিন্তাশীল ও পাঠানুরাগী কুইগ-এর মন কিন্তু ব্যবসাতে পুরোপুরি বসল না।

কুইগ-এর বংশের একটা ধারা থেকে সে পেয়েছে কবিমনস্কতা। আর অন্য একটা ধারা থেকে সে পেয়েছে অভিযানের মন।

কুইগ সারাদিন একটা রেস্তোরাঁর মালিক হয়ে অর্থকড়ি রোজগারে মেতে থাকে।

আর রাত্রির অন্ধকার নেমে এলে রেস্তোরাঁর মালিক কুইগ বনে যায় এক খলিফা, বোহেমিয়ার রাজকুমার বনে শহরের প্রতিটা পথে পথে রহস্য সঞ্চারক্ষম, দুর্বোধ্য আর দুর্জ্ঞেয় কোন কিছুর খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

একদিন রাত্রি ন'টার কথা। এ সময়ে কুইগ রোজ রেস্তোরাঁ বন্ধ করে।

দোকানের ঝাঁপটা কোন রকমে বন্ধ করেই সে তার অনুসন্ধান-পর্বের তাগিদে পথে নেমে পড়ল।

সামরিক ও শিল্পরুচির সংমিশ্রণে তৈরী একটা পোশাক তার গায়ে। তবে কোটটা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশ ছোট। কাঁচা-পাকা দাড়ির নিচে কোটের সবচেয়ে ওপরের বোতামটা আটকানো।

কোটের বুক-পকেটে নানা রকম কার্ড উঁকি দিচ্ছে। সেগুলোর গায়ে কি যেন লেখা। তবে কার্ডগুলো সঙ্গে না নিয়ে সে কোন রাত্রেই পথে নামে না। আসলে সেগুলোতে যে টাকার পরিমাণ লেখা আছে তাতেই তার রেস্তোরাঁর কাজ সচ্ছন্দে চলে যায়। কি লেখা রয়েছে কার্ডগুলোতে? এক প্লেট ঝোল, স্যান্ডুইচ, কফির প্রভৃতির দাম আলাদা আলাদা কার্ডে লেখা রয়েছে। আবার কোন কার্ডে এক, দুই, তিন বা আরও বেশী দিনের জন্য দু'বেলা খাবারের কথা। আবার এমন কার্ডও আছে যাতে লেখা রয়েছে নিয়মিত একবেলা খাবারের কথা আবার এক সপ্তাহ চলার মত কার্ডও রয়েছে পকেটের ওই কার্ডের গোছার মধ্যে।

সত্যি কথা বলতে কি, কুইগ-এর বিত্তসম্পদ কিছুই নেই। তবে তার যেটা আছে সেটা হচ্ছে এক খলিফার মন।

কুইগ-এর মাথাটার আকার যদি হারুণ অল রসিদ-এর মাথার চেয়ে ছোট হয়-ই তবে তাকে মার্জনা করা যেতে পারে।

কুইগ-এর গো-মাংস সেদ্ধতে মানহাট্টার জেলে আর এক-চক্ষু দরবেশরা যে মনের উত্তাপ আর যে আশার আলোর সন্ধান পায় ততখানি উত্তাপ আর আশা হয়তবা বাগদাদের ব্যাপারীরা সোনার মোহর থেকেও লাভ করতে পারে না।

রোজ রাত্রে এভাবে পথে পথে দুঃখ-দুর্দশার খোঁজে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে এক রাত্রে কুইগ দেখতে পেল, ব্রডওয়ের মোড়ে একদল মানুষ ছুটোছুটি করে জড়ো হয়ে হৈ হট্টগোল জুড়ে দিয়েছে।

সে ছুটে সেখানে গিয়ে দেখতে পেল, এক যুবক বিষণ্ণ মনে মুঠো মুঠো রূপোর মুদ্রা খইয়ের মত ছিটিয়ে দিচ্ছে। তার হাতটা যতবারই কোটের পকেটে ঢুকছে ততবারই ভিড়-করা লোকগুলো উল্লাস প্রকাশ করতে লাগল।

ভিড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটা পুলিশ গলা-ছেড়ে চেঁচিয়ে সবাইকে সরে যেতে বলছে। কিন্তু উল্লসিত মানুষ তার কথায় কান না দিয়ে বারবার উপুড় হয়ে পথ থেকে রূপোর মুদ্রা কুড়োচ্ছে, কুড়োতে চেষ্টা করতে লাগল।

ব্যাপারটা দেখেই কুইগ ভেবে নিল, মানুষের মনের ক্রিয়া-কাণ্ডের জ্ঞানলাভের যে পিপাসা তার মধ্যে রয়েছে এখান থেকেই তা মিলতে পারে।

সে লম্বা-লম্বা পায়ে যুবকটার কাছে এগিয়ে গিয়ে তার হাতটা চেপে ধরল। কোন রকম ভূমিকা না করেই সে বলল—আর দেরী নয়, আমার সঙ্গে এসো ভাই।

যুবকটা নির্বিকার চোখে তাকিয়ে বলে উঠল—আমাকে সাঁড়াশি দিয়ে চেপে ধরেছে। এক ব্যথা-বেদনা নিবারক দাঁতের ডাক্তার আমাকে সাঁড়াশি দিয়ে চেপে ধরেছে। আমাকে একটু আলো-বাতাসের মধ্যে নিয়ে যেতে পার ভাই?

কুইগ বলল—আরে ভাই, আমি তো তোমার বাঞ্ছিত স্থানেই নিয়ে যেতে চাইছি।

দুনিয়ায় কেউ ডিম পাড়ে, কেউ পাড়ে না। মুরগি কখন ডিম পাড়ে বলতে পার ভাই?

কুইগ তার কথায় কর্ণপাত না করে তাকে অদূরবর্তী একটা পার্কে নিয়ে গেল।

যুবকটাকে একটা বেঞ্চে বসিয়ে যার ভেতরে মহান খলিফার মায়া-মমতার ক্ষুদ্র হলেও একটা অংশ বর্তমান, সে কুইগ করুণা ও মহানুভবতার সঙ্গে যুবকটাকে বলল—বল তো ভাই, তোমার ওপর কোন শয়তান ভর করেছে?

যুবকটা নীরব চাহনি মেলে তার মুখের দিকে নীরবে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

কুইগ পূর্ব স্বরেই বলে চলল—কোন্ শয়তান তোমার মনকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে, ঠেলে দিয়েছে নির্বোধের মত নিজের যথা সর্বস্ব বিলিয়ে দেওয়ার পথে, ধ্বংসের পথে, বলতে পার?

তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে যুবকটা পাল্টা প্রশ্ন—আমার নাম পম্পটন।

সে না হয় বুঝলাম, কিন্তু—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই যুবকটা আবার বলতে লাগল—আমি এন. জে. সম্পাদিত 'মন্টি ক্রিস্টো'-র ভূমিকায় অভিনয় করছিলাম, না?

সবাই যাতে হৈ হুল্লোড় করে সবাই যাতে কুড়োতে, কাড়াকাড়ি করতে মেতে যায় তাই ছোট ছোট রূপোর মুদ্রা পথে ছিটিয়ে দিচ্ছিলে?

হ্যাঁ, তা করছিলাম বটে। যতবার বীয়ারের বোতল কেনো, তারপর মুরগির ছানাদের খাবার ছুঁড়ে দাও—আহা!

কুইগ সহানুভূতির সঙ্গে বলল—দেখ ভাই, আমি তোমার বিশ্বাস দাবী করছি না, করবও না কোনদিন। কেবলমাত্র অনুরোধ রাখছি—

সে কথাটা শেষ করার আগেই যুবকটা তার দিকে মুখ তুলে তাকাল।

কুইগ বলে চলল—শোন ভাই, আমি পৃথিবীটাকে চিনি, পৃথিবীর মানুষগুলোকেও চিনি। মানুষ আমার পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্গত। মানুষকে আমি দেখি সহানুভূতি, মায়া-মমতার দৃষ্টি দিয়ে। সর্বজন শ্রদ্ধেয় শাসক খলিফা হারুণ অল রসিদ-এর নাম তো তোমার শোনাই আছে, কি বল?

যুবকটা নীরবে ঘাড় কাৎ করে নিজের বক্তব্য জানাল।

কুইগ বলে চলল—রাত্রির অন্ধকারে বাগদাদ নগরের প্রজাদের মমত্ববোধের অভিযানের মাধ্যমে তিনি তাদের দুঃখ-যন্ত্রণা লাঘব করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

মুহূর্তের জন্য নীরব থেকে সে আবার মুখর হল—বিশ্বাস কর ভাই, আমি তাঁর সুমহৎ পথ ধরেই এগিয়ে চলেছি।

তাই বুঝি? বিস্ময়-মাখানো দৃষ্টিতে যুবকটা তার দিকে কথা ছুঁড়ে দিল।

কুইগ এবার বলল—আজ রাত্রে তোমার বিস্ময়কর কাজে আমার মনে একটা গল্প উঁকি দিচ্ছে। আর একটা কথা, তোমার আচরণে এক অমিতব্যয়ী অস্বাভাবিক আচরণের চেয়েও অনেক, অনেক বেশী কিছু আমি লক্ষ্য করেছি।

বিষণ্ন মুখে যুবকটা ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারণ করল—তাই বুঝি?

হ্যাঁ, ঠিক তা-ই। আর যে কথা বলতে চাইছি তা হচ্ছে, তোমার চোখে-মুখে আমি গভীর দুঃখ-যন্ত্রণা আর হতাশার ছাপ দেখেছি। আমি আবারও বলছি, তোমার বিশ্বাসকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। তোমার দুঃখ-যন্ত্রণা নাশ করার আর সৎ যুক্তি দেবার ক্ষমতা আমার আছে বলে আমি মনে করি।

মুহূর্তের জন্য থেমে সে এবার বলল—তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করবে না ভাই?

যুবকটা উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে বলে উঠল—আহা! কী সুন্দর করে গুছিয়ে গাছিয়ে আপনি কথা বলেন!

কুইগ-এর মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল।

যুবকটা এবার বলল—যে বৃদ্ধ তুর্কীর কথা একটু আগে আপনি বললেন তার কাহিনী আমার মনে আছে। সেই ছেলেবেলায়ই আমি 'আরব্য রজনী'-র কাহিনী পড়েছি। তবে মোদ্দা কথা কি জানেন, আমার বক্তব্যে আপনি আজগুবি কোন কিছুর গন্ধ পাবেন না।

কুইগ অত্যুগ্র আগ্রহ প্রকাশ করে বলল—ভাই, তোমার কাহিনী আমি শুনতে চাচ্ছি, শোনাবে?

শোনাব, অবশ্যই শোনাব। তবে বলছি, শুনুন—আমার কাহিনীর নাম এক যুবক আর ঘোড়ার সাজের কাহিনী।

আমি তখন রাত্রে গ্র্যান্ট স্ট্রীটের হিল্ডেব্রান্ট-এর ঘোড়ার সাজ আর দিনের বেলায় কারখানায় কাজ করি। পাঁচ বছর সে কাজে লেগে রয়েছি। হপ্তার শেষে আঠারোটা করে ডলার বেতন পাই। এটা বিয়ে করার পক্ষে যথেষ্ট মনে করি, আপনি কি বলেন?

কুইগ নীরবে মুচকি হাসল।

যুবকটা বলে চলল—তা সত্ত্বেও আমি কিন্তু বিয়ের ঝামেলায় যাচ্ছি না। আমার মনিব অন্য সব মজার মানুষদের একজন—যারা কথায় কথায় লোককে হাসায়, আনন্দে মাতিয়ে তোলে মজার মজার গল্প বলে।

আমার বুড়ো মনিবের মাথায় জমা হয়ে আছে লাখ লাখ ধাঁধা আরও অনেক কিছু যা সে রজার্স ভাইদের কর্তা-দাদার কাছ থেকে চুরি করেছে। বিল ওয়াটসনও সেখানকারই কর্মী। বিল আর আমাকে তার রসসিক্ত কথাগুলোকে নীরবে হজম করতে হয়।

আমরা কেন তার কথাগুলো শুনি? চাকরি তো আর পথে-ঘাটে, বনে-জঙ্গলে মেলে না। তার ওপর সেখানে যে লরা থাকে।

লরা কে? আরে বুড়ো মনিব হিল্ডেব্রান্ট-এর রূপসী যুবতী। সে রোজই কারখানায় আসে। তার বয়স উনিশ বছর। সে পটে আঁকা ছবির মতই সুন্দরী।

আর আমি? এ নিয়ে এত ভাববার কি আছে বুঝছি না তো! আমার না হয় বিল-এর বরাতে—লরা আমাদের দু'জনকেই সমান চোখে দেখে।

বিল তো লরা-র জন্য রীতিমত পাগল। আর আমি? আরে আজ রাত্রেই তো আপনি আমাকে রাজপথটাকে রূপো দিয়ে মুড়িয়ে দিতে দেখেছেন, দেখাননি? আমি এটা কেন করেছি বলুন তো?

পারলেন না তো? আরে, লরা-র জন্যই আমি কাজটা করেছি।

সে আমাকে নিয়ে কি করেছে, জানেন? আস্ত একটা গাধা বানিয়ে দিয়েছে। আমি যা হতে চেয়েছিলাম সেটা হওয়া আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হল না।

কেন? কি করে? শুনুন, আজ বিকেলেই আমার বুড়ো মনিব হিল্ডেব্রান্ট বিল আর আমাকে ডেকে বলল—বাছারা, তোমাদের জন্য আমি একটা নাদুস-নুদুস গাধা বেঁধে রেখেছি।

তারপর একটু থেমে আমাদের উভয়ের মুখের উপর চোখের মণি দুটো বুলিয়ে নিয়ে বলল—তোমাদের একটা ধাঁধার উত্তর দিতে হবে। যে যুবক এ ধাঁধাটার উত্তর দিতে পারবে না তার পক্ষে কাজকর্ম করে সংসার চালানো সম্ভব নয় বলেই আমি মনে করি।

এবার সে আমাদের কাছে একটা ধাঁধা বলল। আগামীকাল সকাল পর্যন্ত আমাদের সময় দিয়েছে উত্তরটা বলার জন্য। সে আরও বলেছে, আমাদের মধ্যে যে সঠিক উত্তরটা দিতে পারবে সে-ই আগামী বুধবার তার মেয়ের জন্মদিনের উৎসবে যোগদান করার যোগ্যতা অর্জন করবে। এর অর্থ—লরা আমাদের দু'জনের মধ্যে একজনের হবে। কারণ, সে-ও একটা স্বামী পাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আর তার স্বামী দেবতা তো হব আমি, নয়তো বিল ওয়াটসন।

কেন? আরে, বুড়ো মনিব হিল্ডেব্রান্ট যে আমাদের দু'জনকেই পছন্দ করে। আর সে চায়, তার মেয়েকে এমন একজন বিয়ে করুক যে তার মৃত্যুর পর কারবারের লাগামটা ভালভাবে ধরতে পারবে।

ধাঁধাটা কি? সেটা হল—কোন জাতের মুরগি সবচেয়ে বেশী সময় শুয়ে কাটায়?

একবার ব্যাপারটা ভাবুন! কোন জাতের মুরগি সবচেয়ে বেশী সময় শুয়ে কাটায়? কথাটা নিরেট বোকার মত নয় কি?

আমি অস্পষ্ট উচ্চারণ করলাম—হুম!

সে বলেই চলল—যত্তসব আহাম্মকি কারবার! আরে, কোন মুরগি বেশী সময় নাকি কম সময় শুয়ে থাকে এটা জেনে ফয়দা কি হবে? একটা কথা, আপনি কি শিস দিয়ে এমন একটা পরীকে আনতে পারেন যে এ মুরগির ধাঁধাটার ব্যাপারটা ফয়সালা করতে পারে? নাকি সেটাও আপনার পক্ষে সম্ভব নয়?

যুবকটা তার বক্তব্য থামালে কুইগ বেঞ্চ ছেড়ে উঠে পড়ল। বার-কয়েক ওদিক-এদিক পায়চারি করল। আবার ফিরে এসে আগের জায়গায়ই বসে পড়ল।

তারপর পাশ বসে-থাকা যুবকটার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল—ভাই আমাকে স্বীকার করতেই হবে নতুন কিছু পাওয়ার আশায় আর মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণা লাঘব করার জন্য যে দীর্ঘ আটটা বছর আমি রাত্রির অন্ধকারে পথে পথে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি তাতে এর চেয়ে হতবুদ্ধিকর আর আকর্ষণীয় কোন পরিস্থিতির মুখোমুখি আমাকে হতে হয়নি।

যুবকটা ম্লান হেসে বলল—তাই বুঝি?

অবশ্যই, আজ এ মুহূর্তে আমি তো আশঙ্কা করছি আমার অভিযান আর গবেষণা আর পরীক্ষার কাজে আমি মুরগিদের প্রতি দারুণ অবহেলা করেছি।

কিন্তু কিভাবে অবহেলা করেছেন বলে আপনি মনে করছেন?

তাদের অভ্যাস মানে তাদের স্বভাব-চরিত্র, প্রসবের সময়কাল ও পদ্ধতি, তাদের বিভিন্ন রকম বৈচিত্র্যময় কার্যকলাপ আর সংকর-প্রজন্ম, আর—

আরে ধ্যুৎ! একী শুরু করলেন মশাই। দোহাই আপনার! এটাকে নিয়ে একটা ইবসেন-নাটক শুরু করবেন না।

নাটক? ইবসেন নাকি?

তা ছাড়া কি? ধাঁধা, বিশেষ করে আমার মনিব বুড়ো হিল্ডেব্রান্ট-এর ধাঁধার কোন গুরুগম্ভীর সমাধান করতে বসলে ভুলই করবেন। তার সব ধাঁধা—সব হেঁয়ালিই হাল্কা বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

হাল্কা বিষয়?

অবশ্যই। ঠিক যেমনটি পাবেন হ্যারি ফর্স্টন পেক আর সিম ফোর্ড যেমন করেন।

ভাল কথা, তুমি কি ধাঁধাটার কোন সমাধান খুঁজে পেয়েছ?'

আরে না, সমাধানের কোন সূত্রই পাইনি।

বিল ওয়াটসন পেয়েছে বলে জান?

কি জানি, সে হয়ত পেলে পেতেও পারে, কালই সেটা জানা যাবে।

হুম!

দেখুন, ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আপনিও আমার মত নাস্তানাবুদ হওয়ায় আমি খুশিই হব।

বিষণ্ণমুখে আমি বললাম—তুমি খুশি হয়েছ?

হব না? সমগোত্রীয় আর একজন পেলে তো খুশি হবার মত ব্যাপারই বটে। আমার বিশ্বাস, এরকম একটা ধাঁধার খপ্পরে পড়লে হারুণ অল রসিদও ল্যাজে-গোবরে হতেন। যাক গে, আমি তবে এবার বিদায় নিচ্ছি।

কথাটা বলতে বলতে যুবক বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

কুইগ অপ্রসন্নমুখে যুবকটার দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিল।

যুবকটা দু' হাতে তার হাত জড়িয়ে ধরে হাল্কা ঝাঁকুনির মাধ্যমে করমর্দন সারল।

কুইগ বুক পকেট থেকে একটা কার্ড টেনে নিয়ে যুবকটার হাতে দিল।

যুবকটা সবিস্ময়ে কার্ডটার দিকে তাকিয়ে বলল—এটা কি?

এতে আমার নাম-ঠিকানা-পরিচয় সবই পেয়ে যাবে। জীবনে চলার পথে হয়ত এমন কোনদিন

আসতে পারে যেদিন কার্ডটা তোমার সহায়ক হতেও পারে।

যুবকটা কার্ডটা কোটের পকেটে রাখতে রাখতে বলল—ধন্যবাদ।

আরে, তোমার নামটাই তো জানা হল না।

সিমন্স।

পাঠক-পাঠিকাদের বলছি, কাল সকালেই একটাবার ঘোড়ার সাজ আর জিঁন-এর কারিগর হিল্ডেব্রান্ট-এর কারখানায় হানা দেই। কারখানার মনিব হিল্ডেব্রান্ট তখন তার দু'শ' পাউন্ডের বিশালায়তন দেহটাকে চওড়া একটা বেঞ্চের ওপর রেখে কাঁচা চামড়ার একটা মার্টিঙ্গল মেরামত করে চলেছে।

প্রথমে ঘরে ঢুকল বিল ওয়াটসন।

সার্কাসের জোকারের মত থলথলে শরীরটাকে দুলিয়ে হাসতে হাসতে হিল্ডেব্রান্ট বলল—কি হে, খবর কি? ধাঁধাটার সমাধান খুঁজে পেলে?

বিল ওয়াটসন মুখ তুলে তার দিকে নীরবে তাকাল।

হিল্ডেব্রান্ট এবার মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে বলল—কি হে, জবাব দিচ্ছ না কেন? কোন্ জাতের মুরগি সবচেয়ে বেশী সময় শুয়ে কাটায়, বলতে পারবে?

আজ্ঞে, মনে হয় সমাধান করতে পেরেছি।

হিল্ডেব্রান্ট দশাসই চেহারাটাকে সোজা করে সোল্লাসে বলে উঠল, পেরেছ? ধাঁধাটার সমাধান করতে পেরেছ? তবে আর ঝুটমুট দেরী করছ কেন? বল, কোন্ জাতের মুরগি সবচেয়ে বেশী সময় শুয়ে কাটায়?

ভেবে চিন্তে আমি তো এটাই বুঝতে পেরেছি, যে মুরগিটা সবচেয়ে বেশী দিন জীবিত থাকে—ঠিক কিনা?

আরে ধ্যুৎ! সারারাত্রি ভেবে শেষ পর্যন্ত এ-ই সমাধান বের করলে? না, সঠিক উত্তরটা তোমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব হল না।

এটা তবে আপনার ধাঁধার সঠিক উত্তর নয়?

না, না—অবশ্যই না।

মুখ ব্যাজার করে বিল ওয়াটসন নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বর মাল্যটা তার বরাতে জুটল না।

একটু বাদেই আরব্য রজনীর ব্যর্থ নায়ক সিমন্স গুটিগুটি ঘরে ঢুকে গেল। বিষণ্ণ বিবর্ণ তার মুখ। হিল্ডেব্রান্ট মুহূর্তের জন্য চোখ তুলে তার দিকে তাকাল।

সিমন্স দুরুদুরু বুকে আরও কয়েক পা এগিয়ে হিল্ডেব্রান্ট-এর মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াল।

হিল্ডেব্রান্ট ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বলল—কি হে, তোমার খবর কি? আমার ধাঁধাটা নিয়ে ভাবনা চিন্তা কিছু করলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ফল কি দাঁড়াল? ধাঁধাটার সমাধান করতে পারলে?

সিমন্স বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে নীরবে মনিবের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সে ভাবতে লাগল, সে কি ভয়ঙ্কর হেঁয়ালির রাজাকে অভিসম্পাত করে মৃত্যুবরণ করে সব সমস্যার সমাধান করবে? কিন্তু কেন সে—না, তবে লরার কি গতি হবে?

সিমন্স-এর অবস্থা খুবই সঙ্কটাপূর্ণ। মুখ দিয়ে রা সরছে না। মনিব হিল্ডেব্রান্ট মুখের হাসিটুকু অক্ষুণ্ণ রেখেই আবার বলল—কি হে সিমন্স, মুখে কুলুপ এঁটে দাঁড়িয়ে রইলে যে? কিছু তো বল?

সিমন্স তবু মুখ খুলতে পারল না। সে কোটের পকেটে হাতটা চালান করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে কুইগ-এর দেওয়া কার্ডটা তার হাতে ঠেকল। ধীরে ধীরে কার্ডটাকে বের করে আনল। সেটাকে চোখের সামনে তুলে নিয়ে তার ওপর মুহূর্তের জন্য চোখ বুলিয়ে নিল। দড়ি-বেয়ে ওপরে উঠতে থাকা একটা মাছির দিকে আসামী মুহূর্তের জন্য হলেও যেমন তাকায় ঠিক সে দৃষ্টিতেই সিমন্স কার্ডটার দিকে তাকাল।

ব্যাপার কিছু বুঝতে না পেরে হিল্ডেব্রান্টও কার্ডটার দিকে অপলক চোখে হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

কুইগ-এর দেওয়া কার্ডটার গায়ে বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে—কার্ডটার বাহক পাবে রোস্ট-করা একটা মুরগি।

মুহূর্তে সিমন্স-এর চোখের তারা দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হিল্ডেব্রান্ট কার্ডটার ব্যাপার কিছু বুঝতে না পেরে বলল—কি হে, আমার ধাঁধার উত্তর কি হল? ভেবে চিন্তে উত্তর বের করতে পারলে কি, কোন্ মুরগি সবচেয়ে বেশী সময় শুয়ে কাটায়?

সিমন্স হাতের কার্ডটার 'মুরগির রোস্ট' কথাটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই বলল—মরা মুরগি। মুরগি মরে গেলে সবচেয়ে বেশী সময় শুয়ে কাটায়।

হিল্ডেব্রান্ট আচমকা বেঞ্চটা থেকে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে সোল্লাসে চিল্লিয়ে উঠল—সাবাশ! চমৎকার বলেছ সিমন্স! তুমি সঠিক সমাধানই করেছ। রাত্রি আটটায় তুমি আমার পার্টিতে উপস্থিত থেকো।

কম্পলিমেন্টস অব দ্য সিজন

বড়দিন উপলক্ষে লেখার মত কোন গল্প আর নেই। উপন্যাস শেষ হয়ে গেছে। ভাল জিনিস বলতে আর যা কিছু আছে তাদের মধ্যে খবরের কাগজের প্রতিবেদন যার লেখক সে সব ধীশক্তি সম্পন্ন ও বুদ্ধিমান যুবক সাংবাদিক। কম বয়সেই যারা বিয়ের পাট চুকিয়ে জীবনটাকে দুঃখময় বলে জ্ঞান করে।

তাই কালোপযোগী কোন প্রসঙ্গ নিয়ে কিছু লিখতে হলে অবশিষ্ট আছে দুটো খুবই বিতর্কিত বিষয়। তাদের একটা হচ্ছে দর্শনশাস্ত্র আর অন্যটা ঘটনা।

আমরা যে উপকরণ নিয়ে গল্প শুরু করছি সেটাকে আপনারা যা খুশি আখ্যা দিতে পারেন।

তবে এক কাজ করা যাক, কাপড়ের সিংহ, কাপড়ের পুতুল আর পঁচিশে ডিসেম্বর দিয়েই গল্পটা শুরু করি, কেমন?

সে মাসেরই দশ তারিখে এক ধনকুবের শিশু-মেয়ের কাপড়ের পুতুলটা হারিয়ে গেছে। কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কী ঝকমারিতে না পড়া গেল বলুন তো?

ধনকুবের লোকটার প্রাসাদে অনেক দামী-দামী লোক কাজ করে। তারা বাড়ি ও আশপাশের সর্বত্র পাতিপাতি করে পুতুলটার খোঁজ করল। কিন্তু কোথাও সেটার হদিস পেল না।

কোটিপতির মেয়েটার বয়স পাঁচ বছর। এ বয়সেই সে পাকা ঝানু হয়ে গেছে। সে বহুমূল্য হীরে-বসানো খেলনার জন্য বায়না ধরে মা-বাবার মাথা খারাপ করে দিতে লাগল।

মেয়ের কান্নাকাটি সহ্য করতে না পেরে ধনকুবের অনন্যোপায় হয়ে বহুমূল্য জার্মান ও ফরাসী পুতুল খরিদ করে আনার জন্য ডলারের গোছা দিয়ে ক'জন চাকরকে বাজারে পাঠিয়ে দিল।

চাকররা কিছুক্ষণের মধ্যে বহুমূল্য পুতুলের ঝুড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরল। কান্নায় ভেঙে-পড়া মেয়েটার সামনে ঝুড়িটাকে ঢেলে দিল।

কিন্তু এত ভাল ভাল লোভনীয় পুতুল পেয়েও ধনকুবের-এর আদরের দুলালী রাচেন-এর মন ভরল না। সে ডুকরে ডুকরে কেঁদে পাঁজা করা পুতুলগুলোকে সক্রোধে লাথি মেরে চারদিকে ছড়িয়ে দিল।

উপায়ান্তর না দেখে ধনকুবের শহরের সবচেয়ে বড় ডাক্তারকে তলব করল।

কোটিপতির জরুরী তলব পেয়ে বিখ্যাত ডাক্তার তার সর্বক্ষণের সঙ্গী চামড়ার হাত ব্যাগটা দোলাতে দোলাতে হন্তদন্ত হয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকল।

দীর্ঘসময় ধরে ছোট্ট শিশুটাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ডাক্তার শিশি ভর্তি রঙীন ওষুধ দিল।

বৃথা চেষ্টা। ওষুধ ফুরিয়ে গেল, কিন্তু রোগিণী স্বাভাবিকতা ফিরে পেল না।

এবার এল শহরের নাম করা অভিজ্ঞ বদ্যি। রোগিণীকে পরীক্ষা করে হরেকরকম জড়িবুটি দিয়ে সে বিদায় নিল।

না, অভিজ্ঞ বদ্যির প্রয়াসও নিষ্ফল হল। না, রাচেল-এর কান্না থামল না।

শেষ পর্যন্ত গৃহকর্তা ধনকুবের ডাক্তার-বদ্যি আর দাস-দাসীদের নিয়ে জরুরী বৈঠক করলেন।

দীর্ঘ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, যত শীঘ্র সম্ভব রাচেল-এর হারানো-পুতুলটাকে খুঁজে বের করতে হবে।

পুতুল বের করে কচি মেয়েটার কান্না থামাতে পারলে মা-বাবাও স্বস্তি পাবে।

পুতুল-হারানো রহস্যভেদ করার জন্য যদি ওয়াটসন ডাক্তারের রহস্যভেদী বন্ধুকে ডেকে আনা যেত তবে তিনি হয়ত এসে বাড়িতে পা দেওয়ামাত্র দেখতে পেতেন দেওয়ালের গায়ে রক্তচোষা বাছুর-এর একটা ছবি।

ব্যস, আর দেরী নয়। এবার অনুমানের ওপর নির্ভর করে শুরু হয়ে যাবে চিরুনি তল্লাশি। তারপরই দুম্ করে কাপড়ের পুতুলটার ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো, হাড়গোড় আর মাথার গুটি কয়েক চুল বেরিয়ে পড়বে।

কেবলমাত্র ন্যাকড়ার পুতুলটার কথাই বলি কেন? পুতুলটার পরই নাম করতে হয় বাড়ির পোষা কুকুর ফ্লিপ-এর। পুতুলটার মতই কুকুরটাও তার প্রাণ।

ফ্লিপ দিনভর বাড়ির সুবিশাল হল ঘরটায় ছুটোছুটি করে বেড়ায়। আবার কখনও বা ঘরের এক কোণে শরীর এলিয়ে দিয়ে পরমানন্দে ল্যাজ নাড়তে থাকে। কিন্তু হাড়? একটা হাড় পেলে সেটাকে নিয়ে কুকুরটা কি কাণ্ডই করে। ব্যস, সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে, সবই মিটে গেছে।

আদরের কুকুর ফ্লিপ-এর সামনের পা দুটো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা তো খুবই সহজ ব্যাপার।

আরে ওয়াটসন, এই যে—এদিকে দেখ।

কি?

এই যে কুকুরটার পায়ে মাটি—শুকনো মাটি লেগে রয়েছে।

কুকুরটা অবশ্যই—কিন্তু শার্লক হোমস তো এখানে আসেন নি।

তবে?

তবে অন্য পথে চলতে হবে। কাজটা হাসিল করার জন্য আমাদের ভূমি-সংস্থাপক-এর শরণাপন্ন হতে হবে, নতুবা স্থাপত্যবিদ্যার কোন বিশারদের কাছে ছুটতে হবে।

ধনকুবের-এর বাড়ির গায়েই রয়েছে বেশ বড়সড় একটা বাগিচা। আদরের কুকুর ফ্লিপ রাচেল-এর ঘর থেকে কাপড়ের পুতুলটাকে দাঁতে কামড়ে, টেনে টেনে নিয়ে বাগিচার ভেতরে গেল। তারপর সেটাকে এক কোণে নিয়ে গেল। পায়ের নখ দিয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে একটা গর্ত খুঁড়ে ফেলল। গর্তটার ভেতরে পুতুলটাকে ফেলে আবার পা দিয়ে মাটি ফেলে ফেলে গর্তটাকে বন্ধ করে দিল। ব্যস, এখানেই তো সমস্যাটার সমাধানটা পাওয়া গেল।

ব্যাপারটা যখন মিটেই গেল তখন আমরা বরং এবার গুটিগুটি ব্যাপারটার বড়দিনের অন্তরে প্রবেশ করি। আপত্তি আছে?

ফুজি। সবাই তাকে মাতাল বলে জানে, তবে সে কিন্তু একেবারে পাড় মাতাল নয়। অদৃষ্ট বিড়ম্বিত এক ভদ্রগোছের মাতাল ফুজি।

পার্ক, পার্কের বেঞ্চ, সিঁড়ি, রান্নাঘরের দরজা—এসব নিয়েই তার জীবনের ইতিহাস গড়ে উঠেছে।

ধনকুবের-এর বাড়ির লাগোয়া পথটা দিয়ে ফুজি মাতাল নদীর দিকে চলেছে। হঠাৎ দেখল রাচেল-এর ন্যাকড়ার পুতুলের একটা পা বেড়ার ধারে উঁকি দিচ্ছে। অকাল সমাধির ভেতর থেকে পায়ের অংশ বিশেষ বেরিয়ে রয়েছে। মাতাল ফুজি বেড়ার ফাঁক দিয়ে হাত বাড়িয়ে বেরিয়ে-থাকা পা-টা ধরে হেঁচকা টানে পুতুলটাকে সমাধি-গহ্বর থেকে তুলে ফেলল।

ফুজি এবার বার-কয়েক ঝাঁকুনি দিয়ে পুতুলটার গায়ে জড়িয়ে থাকা শুকনো মাটির গুঁড়োগুলো

ঝেড়ে ফেলে দিল। তারপর সেটাকে হাতে নিয়ে সে আবার পথ-চলা শুরু করল।

আপনাদের তো আর বলা হয়নি, ফুজি যে-পথে নদীর দিকে যাচ্ছে সে পথটারই গায়ে রয়েছে গ্রোগান-এর সেলুন।

পুতুলটা হাতে করে দোলাতে দোলাতে মাতাল ফুজি গ্রোগান-এর সেলুনের ভেতরে ঢুকে গেল। তার বিশ্বাস ছিল, কৃষি-দেবতার গায়ক ও অভিনেতা হিসাবে এক-আধ পেগ মদ তার বরাতে জুটে যাওয়ায় অস্বাভাবিক নয়।

সে বার-এর ওপর বেটসিকে রেখে এমন হাস্যকর অঙ্গভঙ্গী করে ভক্তি-ভালবাসার গান গাইতে শুরু করল যা দেখে সবাই ভাববে পুতুলটা বুঝি তার প্রিয়তমা। ব্যাপারটা দেখে ভবঘুরে বাউণ্ডুলে মাতালরা খুবই মজা পেল। বার-এর মদ পরিবেশনকারী ফুজিকে এক পেয়ালা মদ দিয়ে বলল—আরে ভাই, আমরা বুঝি না বটে। কিন্তু অনেকেই কাপড়ের পুতুল নিয়ে পরমানন্দে চলাফেরা করে।

স্টোভটাকে ঘিরে বসে রয়েছে 'পায়রা' ম্যাকার্থি, কালো রাইলি ও এক কানকাটা মাইক। একটা খবরের কাগজ নিলে তারা টানাটানি করতে লাগল। তাদের সবারই নজর একটা বিজ্ঞাপনের দিকে। তার শিরোনামটা হচ্ছে, 'পুরস্কার এক শ' ডলার'।

পুরস্কারটা পেতে হলে ধনকুবেরের বাড়ি থেকে 'হারিয়ে-যাওয়া', 'খোয়া-যাওয়া' অথবা 'নিরুদ্দিষ্ট হয়ে-যাওয়া' কাপড়ের পুতুলটাকে উদ্ধার করে ফিরিয়ে এনে দিতে হবে।

অতএব বোঝা যাচ্ছে, ছোট মেয়েটার কান্না এখনও থামেনি। সে স্বাভাবিকতা ফিরে পায় নি।

বাড়ির এতগুলো দাস-দাসী বাড়ি এবং তার চারদিকে তন্নতন্ন করেও কাপড়ের পুতুলটার হদিস করতে না পারায় বিজ্ঞাপনটাকেই শেষ অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

স্টোভের পিছন থেকে বেরিয়ে এসে কালো রাইলি লম্বা-লম্বা পায়ে ফুজির দিকে হাঁটতে লাগল।

ফুজি ততক্ষণে পুতুল বেটসি'কে আরও শক্ত করে বগলে চেপে ধরল, যেন স্বয়ং যমরাজ এসেও তার কাছ থেকে এটাকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

রাইলি কোমরে হাত রেখে খল-নায়কের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে বলল—বাছাধন, সত্যি করে বলতো, এমন সুন্দর একটা পুতুল কোত্থেকে হাতিয়েছ?

ফুজি সঙ্গে সঙ্গে দাঁত বের করে হেসে জবাব দিল—পুতুল? মানে এ পুতুলটা? আরে ভায়া, বেলুচিস্তানের সম্রাট আমাকে এটা পুরস্কার দিয়েছিলেন।

ন্যাক্কারবাজি করার আর জায়গা পাওনি! বেলুচিস্তানের সম্রাট পুরস্কার দেওয়ার আর লোক খুঁজে পেলেন না।

আরে ভায়া, আমার বাড়িতে এমন পুতুল আরও কয়েক ডজন রয়েছে।

ধ্যুৎ। বাজে কথা ছাড়! পুতুলটাকে কারো বাড়ি থেকে স্রেফ হাতিয়ে নিয়ে এসেছ।

কি বাজে কথা বলছ!

ঠিক বলছি। যাক গে, কাপড়ের পুতুলটার বিনিময়ে যদি পঞ্চাশ সেন্ট উপার্জন করতে চাও তবে ওটা আমাকে দিয়ে সেন্টগুলো নিয়ে মানে মানে কেটে পড়।

ফুজি পঞ্চাশ সেন্টের কথা শুনে আঁৎকে উঠে কেটে কেটে উচ্চারণ করল—প-ঞ্চা-শ সে-ন্ট!

হ্যাঁ, একেবারে হাতে হাতে পেয়ে যাবে। আরে ভাই, বাড়িতে ভাইয়ের একটা বাচ্চা আছে। পুতুল ছাড়া তার আবার অন্য কোন খেলনাতেই মন ভরে না।

রইলি এবার পকেট থেকে কতগুলো সেন্ট বের করে ফুজির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল—এই নাও, ভাল করে গুণে নাও।

মাতালদের যোগ্য ভঙ্গীতে সরবে হেসে ফুজি বলল—মশাই আপনি বরং বার্ন-এর অফিসে চলে যান।

কি? কি বললে বার্ন-এর অফিসে? কেন? সেখানে কেন?

তার কাছে একটা আবেদন পত্র পেশ করুন। তিনি যদি অনুগ্রহ করে আজকের রাত্রের শো

থেকে রেহাই দেন।

একী আজব কথা!

হ্যাঁ, একবার গিয়েই দেখুন। সেখানেও যে এরকমই একটা হাসি উপহার পাবেন তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

রাইলি একবার ভাবল, ফুজির বগল থেকে পুতুল-সুন্দরীকে বলপূর্বক ছিনিয়েই নেবে। হাতদুটো তার দিকে বাড়াতে গিয়েও থমকে গেল। আসলে বিশালদেহী ফুজির দশাসই চেহারা এবং পেশীবহুল হাত দুটোর দিকে চোখ পড়তেই তার বুকের ভেতরে ধড়াস্ করে উঠল।

বল প্রয়োগের মাধ্যমে কাজ করা সম্ভব নয় নিঃসন্দেহ হয়ে রাইলি সে ধান্ধা থেকে সরে গিয়ে অধিকতর মোলায়েম স্বরে বলল—পঞ্চাশটা সেন্ট পেয়েও যখন তুমি সন্তুষ্ট নও তখন খোলসা করে বলেই ফেল না, কাপড়ের ওই পুতুলটার জন্য তুমি কত ডলার আশা করছ?

ডলার? ধ্যুৎ মশাই, ডলারের বিনিময়ে এটাকে খরিদ করতে পারবেন না।

এত সহজে কাজ হাসিল করা যাবে না ভেবে রাইলি অনন্যোপায় হয়ে 'এক কানকাটা' মাইক আর 'পায়রা' ম্যাকার্থিকে নিয়ে বার-এর বাইরে চলে গেল। গোপন অন্তরালে গিয়ে আলোচনার মাধ্যমে নতুনতর কোন একটা নির্ভরযোগ্য মতলব বের করার চেষ্টা করতে লাগল।

তাদের তিনজনের চেহারাই ভাগাড়ের শকুনের মত। তাদের হাড় বের-করা পাঁজর, হাত দুটো পাটকাঠির মত সরু সরু আর চোখ দুটো গর্তে-বসা। মারদাঙ্গা করে কালো পাহাড়ের মত ফুজির কাছ থেকে পুতুলটাকে বাগিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়।

পুতুল বেটসিকে নিয়ে ফুজি কস্টিগান নাট্যশালার সদর দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে যাবে ঠিক তখনই তিন বন্ধু তাকে ডেকে একটু আড়ালে নিয়ে গেল। তার চোখের সামনে খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনটা মেলে ধরল।

ফুজি একটা-আধটু লেখাপড়া জানে। এ ছাড়া আরও অনেক কিছুই সে জানে।

মুহূর্তের জন্য ভেবে নিয়ে ফুজি ম্লান হেসে বলল—দেখুন, আপনাদের আমি সত্যিকারের বন্ধু বলেই মনে করি। তাই বলছি কি, ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভাবনা চিন্তা করার জন্য আমাকে মাত্র সাতটা দিন সময় দিন।

সত্যিকারের শিল্পীর তৃষ্ণা তো সহজে মেটার নয়।

তিন সাকরেদ আবার তাকে বুঝিয়ে বলল—শোন ভাই, ব্যাপারটা নিয়ে এত কচলা-কচলি করাটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে, তুমিই বল?

আমি তো বলছি, মাত্র সাতটা দিন—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই তিন সাকরেদ প্রায় সমস্বরেই বলে উঠল—তুমি এটা বলছ কী! তোমার মত একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির পক্ষে এমন একটা সিদ্ধান্ত নেওয়াটা কি ঠিক হবে?

মাত্র তো সাতটা দিন। এরমধ্যে পৃথিবীটা লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে নাকি?

তুমি ব্যাপারটাকে একটু তলিয়ে দেখার চেষ্টা কর। বিজ্ঞাপনদাতার আজকের প্রয়োজনটা কাল, মানে সাতদিন পরে না-ও থাকতে পারে।

ফুজি চোখে-মুখে চিন্তার ভাঁজ এঁকে বলল—একশ' ঠিক একশ' ডলার! পাহাড়ের মাথায় রাত্রির অন্ধকার একটু একটু করে নেমে আসতে লাগল।

তিন সাকরেদ ফুজিকে পাহাড়ের গায়ে নিয়ে গেল। পাহাড়টার ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে ধনকুবের-এর সুবৃহৎ সুদৃশ্য বাড়িটা।

বাড়িটার কাছাকাছি গিয়েই ফুজি থমকে দাঁড়াল। তাদের দিকে রুখে দাঁড়াল। সে কর্কশ গলায় বলে উঠল—আরে, তোমরা তো একপাল ভোতা-মুখ ভোঁতা-দাঁতের শিকারী কুকুর। যদি প্রাণে বাঁচতে চাও তবে এখান থেকে কেটে পড়।

পরিস্থিতি সঙ্গীন অনুমান করে সাকরেদ তিনজন সেখান থেকে সরে গিয়ে কয়েক পা দূরে দাঁড়াল।

আর সাকরেদ তিনজনের কাছেই পিস্তল আর মাংস কাটার ছুরির মত ঝলমলে অস্ত্র রয়েছে।

কালো রাইলি তার সাকরেদ দু'জনকে লক্ষ্য করে বলল—দেখ, আনা-নেওয়ার ঝামেলায়

আমরা না-ই বা গেলাম। এ কাজটা সে-ই করুক না কেন? তারপর বখরা নেবার বেলা আমরা না হয় এগিয়ে যাব, কি বল?

অন্য দু'জন বলল—আরে আগে দরকার জিনিসটা নিয়ে আসা। সেটা নিয়ে আসার পর—

তার মুখের কথা শেষ হবার আগেই ফুজিকে ধনকুবের-এর বাড়ির প্রধান ফটকের ভেতর দিয়ে ঢুকে যেতে দেখা গেল।

ফুজি হাত বাড়িয়ে দরজার ঘণ্টাটা বাজাল।

এক পরিচারিকা দরজা খুলে অপরিচিত ফুজিকে সামনে দেখে কপালের চামড়ায় ভাঁজ এঁকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকাল।

পরমুহূর্তেই তার বগলে চেপে-রাখা প্রবেশ পত্রটার দিকে চোখ পড়তেই উল্লসিত হয়ে তাকে স্বাগত সম্ভাষণ না জানিয়ে পারল না। সে ফুজির বগলে মনিব-কন্যার কাপড়ের পুতুলটার দিকে বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

পরিচারিকা এবার ফুজিকে নিয়ে গেল বাড়ির সুসজ্জিত হলঘরে। মিনিট পনেরোর মধ্যেই অন্য আর এক দাসী শিশু-কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে হলঘরে হাজির হল।

শিশুটা এখনও আকুল হয়ে কাঁদছে। ফুজির কাছ থেকে পুতুলটা নিয়ে তার হাতে দিল।

ব্যস, মুহূর্তের মধ্যে ভোজবাজির মত শিশুটার কান্না থেমে গেল। সে তার প্রিয় পুতুলটা বুকে জড়িয়ে ধরল। আর মুখে ফুটিয়ে তুলল পরম প্রাপ্তির হাসির ঝিলিক।

আর ফুজি, যে লোকটা তাকে নিরবচ্ছিন্ন হতাশা, হাহাকার আর মর্মবেদনা থেকে উদ্ধার করেছে তার দিকে বার বার আঁড় চোখে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল।

শিশু-কন্যাটার অভাবনীয় আচরণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ফুজি যেন নিজেকে বড়ই অপরাধী মনে করতে লাগল।

মেয়েটা আবার তীব্র আর্তনাদ করে উঠল। তার আদরের পুতুল বেট্‌সিকে আরও জোরে বুকে চেপে ধরল।

দাসী তাকে ধরে হলঘর থেকে বাইরে নিয়ে বাড়ির অন্দরমহলে নিয়ে গেল।

একটু বাদেই সচিব মশায় হলঘরে ঢুকল।

ফুজি সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে তাকে অভিবাদন করল। সচিব মশায় দশটা দশ ডলারের নোট ফুজির হাতে তুলে দিলেন। নোট ক'টা তাব হাতে তুলে দিয়ে সচিব মশায় নিজের কাজে চলে গেলেন।

নোট ক'টা হাতে পাওয়া মাত্র ফুজি ভাবল এক দৌড়ে সেখান থেকে পালিয়ে যাবে।

নোট ক'টা কোটের পকেটে চালান করে দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে সে ভাবতে লাগল, তার চোখের সামনে একশ' ডলারের নোট, স্বর্গের সিঁড়ির দরজা তার সামনে খুলে দিয়েছে। কাপড়ের ছেঁড়া পুতুলটা জাদুদণ্ডের মত কাজ করেছে। এর ফলে ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, গৃহহীন, বন্ধু-বান্ধবহীন আর শীতার্ত ফুজি এখন স্বর্গের চাবি হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছে।

এদিকে ফটকের বাইরে প্রায়ান্ধকার পথে রাইলি আর তার দুই সাকরেদ অস্থিরভাবে পায়চারি করে চলেছে।

তাদের প্রত্যেকের কোটের তলায় লুকিয়ে রাখা আছে নিশ্চিত মৃত্যুর দূত আগ্নেয়াস্ত্র। যাদের একটামাত্র গুলি দিয়ে একশ' ডলার অনায়াসেই হাতিয়ে নেওয়া সম্ভব, তারা নেবেও।

ফুজি ফটকের সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কেন যেন বার কয়েক এদিক-ওদিক তাকাল।

ভুলে গেলে চলবে না যে, ফুজি বর্তমানে পাঁড়মাতাল। নেশার ঘোরে সবকিছু যেন ঝাপসা দেখাচ্ছে। বর্তমানটা ক্রমে দূরে সরতে সরতে অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে যেতে লাগল।

তার চোখের সামনে ভেসে উঠল ফুল-মালায় সজ্জিত একটা সুবিশাল হলঘর। বাড়িটার ভেতর থেকে যেমন মিষ্টি-মধুর স্বরের গানের কলি ভেসে আসছে অতীতেও সে হলটার ভেতর থেকে বাতাস বাহিত গানের কলি ভেসে আসছিল। তবে আজ যে বড়দিন। ফুজি নেশার ঘোরে এটা ভুলেই গিয়েছিল।

পর মুহূর্তেই সে আবার বর্তমান থেকে দূরে, বহু দূরে এক মায়াচ্ছন্ন অন্ধকার লোকে চলে গেল। সুদূর অন্ধকার ভেদ করে বেরিয়ে এল ক্ষণস্থায়ী বিস্মৃত প্রেতমূর্তি—এক অভিজাত আত্মা।

ইতিমধ্যে কালো রাইলি, কানকাটা মাইক আর ম্যাকার্থি বিড়ালের মত সন্তর্পণে পা টিপেটিপে এগিয়ে এসে ফটকটার এক পাশে ঘাপ্‌টি মেরে দাঁড়িয়ে থাকল।

ফুজি সদর দরজা দিয়ে পথে নামার উদ্যোগ নেওয়ার আগেই পরিচারক জেমস ব্যস্ত-পায়ে সেখানে এল।

ফুজি জেমস-এর দিকে ফিরে দাঁড়াল। তারপর নেশার ঘোরেই বলল—একটা কাজ বড্ড ভুল হয়ে গেছে হে।

জেমস বলল—কি? কোন কাজ? কিসের কথা বলছেন?

বড়দিনের সন্ধ্যায় কোন ভদ্রলোক কোন ভদ্রলোকের বাড়ি এলে বাড়ির কর্তার সঙ্গে একবারটি দেখা না করে যাওয়াটা একেবারেই সৌজন্য বহির্ভূত কাজ। তাঁর সঙ্গে করমর্দনের মাধ্যমে নমস্কার বিনিময় করাটা প্রচলিত রীতি।

হ্যাঁ, আমিও তো তা-ই মনে করি।

দুনিয়া রসাতলে গেলেও আমি এ বাড়ির কর্তার সঙ্গে দেখা না করে অবশ্যই যাচ্ছি না।

জেমস মুখে তার বক্তব্য সমর্থন করলেও আসলে সে কিন্তু মন থেকে চায়না মাতালটা আর এক মুহূর্ত এ বাড়িতে থাকুক।

ফুজিকে নাছোড়বান্দা দেখে জেমস বাধ্য হয়ে তাকে আবার বাড়ির ভেতরে নিয়ে গিয়ে হলঘরে বসতে দিল। ফুজিকে বসতে দিয়ে জেমস ব্যস্ত হয়ে অন্দরমহলে চলে গেল। একটু বাদেই এক সুন্দী মহিলা হলঘরে ঢুকল।

ফুজি নির্লজ্জ বেহায়ার মত তার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। আসলে সে জীবনে এমন সুন্দরী মহিলা আর কোথাও দেখে নি।

মহিলাটি তার আচরণ গায়ে না মেখে তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন। একটা পুতুলের ব্যাপার নিয়ে কিছু বললেন।

ফুজি পুতুলের ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারল না। আসলে নেশায় তার মন থেকে সবকিছু উবে গেছে। সে ব্যাপারে একটা কথাও মনে করতে পারল না।

তাদের কথাবার্তা চলার ফাঁকে এক পরিচারিকা একটা রুপোর থালায় করে দামী মদ ভর্তি গ্লাস নিয়ে এল। মহিলাটি একটা গ্লাস নিজে নিলেন আর দ্বিতীয়টা তুলে দিলেন ফুজির হাতে। ফুজি মদের গ্লাসটা হাতে নেওয়ামাত্র তার ভেতর থেকে যাবতীয় দুর্বলতা অক্ষমতা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। ফিরে পেল হৃত দৈহিক বল।

মদের গ্লাসটা শক্ত করে ধরে সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। আর আমাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই যা ঘটে না—সেক্ষেত্রে স্বয়ং মহাকাল ফুজির সব কিছু সহজতর করে তোলার জন্য সুদূর অতীতে চলে গেলেন।

ত্রিশ ক্রিঙ্গল-এর ধবধবে সাদা নকল দাড়ির চেয়ে অধিকতর সাদা দাড়িওয়ালা ভুলে যাওয়া বড়দিনের প্রেতাত্মা বুঝি গ্রোগান-এর মদের ভেতর দিয়ে উড়ে বেড়াতে শুরু করল। কিন্তু তার সম্পর্ক কি মালুম হচ্ছে না তো।

মদের গ্লাস-হাতে ভদ্রমহিলার মুখের হাসিটুকু ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে লাগল। তার চোখের তারা দুটো গম্ভীর ও স্থির হয়ে গেল। ছেঁড়া পোশাক-পরিচ্ছদ আর স্কচ টেরিয়ারের মত দুধের মত সাদা গোঁফের আড়ালে এমন কিছু তার চোখে পড়ল যার তিলমাত্রও তার বোধগম্য হল না।

ফুজি গ্লাসটা ঠোঁটের কাছে তুলে নিতে নিতে ম্লান হাসল। তারপর মুখ খুলল—মহাশয়া, আমাকে মার্জনা করবেন।

কেন? হয়েছে কি?

গৃহকর্তার সঙ্গে বড়দিনের সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ না করে আমি কিছুতেই এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে পারলাম না। এটা যেকোন ভদ্রজনের পক্ষেই রীতি বিরুদ্ধ বলে আমি মনে করি।

তারপর সে বলল, প্রাচীন অভিবাদন-রীতি আর এ পরিবারের পুরুষরা চুনুট করা পোশাক ও পাউডার ব্যবহার করত।

ফুজি আর কিছু মনে করতে পারল না। উভয়ে মদের গ্লাসে চুমুক দিল।

এদিকে কালো রাইলি অস্থিরভাবে ফটকটার একটা গরাদ মুঠো করে ধরল। তার বুক থেকে ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল।

মহিলাটি ঠোঁট থেকে গ্লাসটা নামিয়ে ভুরু কুঁচকে অতীত-স্মৃতি মন্থন করে চলেছেন। তিনি ভেবেই পাচ্ছেন না, লোকটা কে? এক সময় কতজনই তো বাড়িতে আসত। অবাক হয়ে ভাববার মত ব্যাপারই বটে, সে সব মানুষ যখন নামতে নামতে একেবারে এমন নীচে নেমে যায় তখন স্মৃতিটা তাদের কাছে অভিশাপস্বরূপ, নাকি আশীর্বাদ হয়ে ওঠে?

ফুজি আর জেমস দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

মহিলাটি তখন পিছন থেকে ডাকলেন—জেমস! জেমস!

জেমস ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। কয়েক পা পিছিয়ে তাঁর দিকে গেল।

ফুজি একা দাঁড়িয়ে রইল। তার ভেতরের স্বর্গীয় আগুনের শিখাটা একেবারেই নিষ্প্রভ, নিভে গেছে।

এদিকে কালো রাইলি অস্থিরভাবে মাটিতে পা ঠুকছে আব গ্যাস পাইপটাকে মুঠো করে ধরে ক্রমেই চাপ প্রয়োগ করে চলেছে।

ভদ্রমহিলা বললেন—জেমস, লুইসকে বলে দাও, মার্সিডিজটা বের করে সে যেন ভদ্রলোককে তার ঠিকানা অনুযায়ী পৌঁছে দিয়ে আসে।

এ নাইট ইন দ্য নিউ অ্যারাবিয়া

ভূগর্ভ-পথের ধারে গড়ে-ওঠা শহরটায় খলিফাদের আধিক্য খুবই বেশী। সেখানে ভোগ বিলাসের ছড়াছড়ি।

ভূগর্ভ-শহরটায় এমন একজন ক্ষুধার্তকেও দেখা যাবে না যে উপহার পাওয়া বইতে তার কোমরবন্ধটাকে একেবারে পূর্ণ করে নেয়নি। আবার এমন একজন পণ্ডিতকেও পাওয়া যাবে না যার বাড়িতে দাতব্য প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা এসে রান্না-করা মুরগি ভর্তি উৎসবের উপহার রেখে না যায় আর তা দেখে সে বেচারার লজ্জায় মরে যাওয়ার জোগাড় হয়।

অতএব হারুণ অল রসিদ অধ্যুষিত পথে-পথে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায় একচক্ষু দরবেশ, ছোট কুঁজো আর নাপিতদের সম্পর্কের ভাইটা যাতে খলিফারূপী সুলতানদের কব্জায় না পড়ে যায়।

আপনারা তো আরব্য রজনীর অনেক মজার মজার গল্প আগেই পড়েছেন বা শুনেছেন, যেমন ধরা যাক শক্তিশালী জিন রক এফের কাহিনী যে আলিবার তেলের ভাণ্ডার লুঠ করতে চল্লিশটা ডাকাতকে পাঠিয়েছিল। আর খলিফা কার-নেগ-ঝির কাহিনী যে রাজপ্রাসাদটাই দান করে বসে, জেলে আর বোতলের কাহিনী, পাপের বেসাদে লিপ্ত সৈলবাদ-এর মত সাত-সাতটা সমুদ্রযাত্রার কাহিনী, কাল্পনিক বসতবাটীর কাহিনী আর অত্যাশ্চর্য গ্যাস-মিটারের সাহায্যে আলাদিন-এর ঐ আশ্চর্যশালী হওয়ার কাহিনী।

কিন্তু এবার এক শাহজাদীর জন্য যখন দশজন করে সুলতান রয়েছেন তখন তাকে নিয়ে তো আর কোন গল্প বানানো সম্ভব নয়।

তাই তো আমি আগেভাগেই বলে রাখছি যে, বহু চেষ্টা চরিত্রের পর ভুল ভ্রান্তিতে ভরা যে গল্পটা আমি বলতে চাইছি তার শিরোনামটা হচ্ছে—

বিবেকচ্যুত খলিফার গল্প

বৃদ্ধ জেকব স্প্রাগিন্স তার বারো শ' ডলার দামের ওক কাঠের দেরাজের ওপর গ্লাসটা রেখে নিজের ব্যবহারের জন্যই খনিজ জল আর স্কচ মেশাতে ব্যস্ত।

আর পরমুহূর্তে তারই প্রভাবে টেবিলে সশব্দে একটা কিল মেরে চিল্লিয়ে উঠল—নরকের চিতার দোহাই, এটা অবশ্যই দশ হাজার ডলার! এটা হাতে পেলে খেল কাকে বলে দেখিয়ে দেব

আপনাদের কৌতূহলটাকে এভাবে চাঙা করে তুলে আসল গল্পটাকে এখানেই ঝুড়ি-চাপা দিয়ে রাখছি। আর এখন আপনাদের বিচার-বিবেচনার জন্য শুরু করছি পঞ্চাশ বছর আগের একটা এক ঘেয়ে জীবন-কাহিনী।

যৌবনে আজকের বৃদ্ধ জেকব পেনসিলভেনিয়ার এক কয়লাখনিতে কয়লা ভাঙার কাজে লিপ্ত ছিল। তার কাজটা যে ঠিক কি বা কি রকম ছিল তা আমার সঠিক জানা নেই।

তবে একথা ঠিক যে, জেকব বলে একটা যুবক ছিল। কিন্তু অস্বাভাবিক কাজের জন্য ন'বছর বয়সেই মা-বাবাকে বিপদে ফেলে দেবার বদলে এখানে-ওখানে কয়েকটা করে ডলার লগ্নি করে বর্তমানে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে বিশ কোটি ডলার জমিয়েছে।

প্রসঙ্গটা এখানেই খতম হয়ে গেল। এক মুহূর্তের জন্যও কি দম ফেলার সময় পেয়েছেন? তবে আমি এমন জীবনী-গ্রন্থও দেখেছি—থাক গে এসব প্রসঙ্গ ছাড়ান দেওয়া যাক।

এখন আপনাদের কাছে বলতে চাইছি জেকব স্প্রাগিন্স, এস্কোয়ারের কাহিনী। আর সেটা বলতে চাইছি জীবন-সিঁড়ির সপ্তম ধাপে পা দেবার পর থেকে। 'ধাপ' বলতে আমি কর্মযজ্ঞের কথা বলতে চাচ্ছি।

খুবই নিচুতলা থেকে তার সে কর্মকাণ্ড শুরু হয়—প্রথমেই বলতে হয় নিচুতলা থেকে শুরু করে দ্বিতীয় ধাপ প্রাপ্য পদোন্নতি। কারবার যথাক্রমে স্টক-হোল্ডার, মহাজনী কারবার, অভিজাত ন্যাস-ধারী, ধনকুবের দুরাচার, খলিফা, আর অষ্টম ধাপটা অজ্ঞাত—এটা উচ্চতর গণিতের জন্য আলাদা করে রেখে দেওয়া যাক। সক্রিয় কাজকর্ম থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সে জেকব অবসর গ্রহণ করল।

লোহা, কয়লা, স্থাবর সম্পত্তি, রেলপথ, তেল, বিভিন্ন কলকারখানা আর কর্পোরেশন থেকে স্রোতের জলের মত ডলার অনবরত তার হাতে আসতে লাগল।

তবে একথাও খুবই সত্য যে, চারদিক থেকে অর্থোপার্জন হতে থাকলেও তার হাতে এতটুকুও কলঙ্ক কোনদিন লাগতে পারে নি।

নব নির্মিত ছবির মত সুন্দর বাগদাদ শহরের নবাব এভিনিউর মোড়ে জেকব স্প্রাগিন্স-এর প্রাসাদোপম বাড়িটা সদম্ভে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এটা তৈরী করতে ত্রিশ লক্ষ ডলার খরচ হয়েছে।

এবার থেকে হারুণ অল রসিদ-এর উত্তরাধিকার তার ওপর বর্তেছে বলেই জেকব স্প্রাগিন্স মনে করছে।

কোন ব্যক্তির আয়-উপার্জন যখন এত বেশী হয়ে যায় যে একটা কসাই পর্যন্ত সেদ্ধ-মাংস তাকে পাঠিয়ে দেয় তখনই তার মাথায় ভাবনার উদয় হয়—কিভাবে তার আত্মার উন্নতি হবে, মুক্তিলাভ করবে।

জেকব স্প্রাগিন্স যেদিন একটা সুঁচের পিছন দিককার ছিদ্রের সঙ্গে উটের চোখের তুলনা করতে আরম্ভ করল তখনই সে মনস্থির করে ফেলল, বিশ উপচিকার্যু সমিতিকে দশ লক্ষ ডলারের একটা চেক দান করবে। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে সচিবকে দিয়ে সে মহৎ উদ্দেশ্যটাকে সেরে ফেললে।

এবার জেকব স্প্রাগিন্স সর্বাধিক অনুদান পাওয়া কলেজটাকে দু'শ ডলার ব্যয় করে একটা গবেষণাগার তৈরী করে দেবার প্রস্তাব দিল।

কিন্তু সে কলেজটার বিজ্ঞান-শাখা নেই। ফলে কলেজ-কর্তৃপক্ষ সে ডলারগুলো দিয়ে বড়সড় ও সুসজ্জিত একটা স্নানাগার তৈরী করে নিল।

এভাবে চলতে চলতে এক সময় জেকব স্প্রাগিন্স-এর ভেতরের বিশ্বপ্রেমের ব্যাপারটা ঝিমিয়ে পড়ল। তার মন আকৃষ্ট হল গণ সংযোগ গড়ে তোলার দিকে।

জেকব স্প্রাগিন্স-এর নবাব এভিনিউর মোড়ের তিন লক্ষ ডলারের বাড়িতে তার বোন হেনরিয়াটা বাস করে। সে কোক টাউনের অন্তর্গত পঁচিশ সেন্টের ভোজনালয়ের জন্য রান্না করার কাজে লিপ্ত। আর তার মেয়ে সেলিয়া-ও সে বাড়িতেই বাস করে।

সেলিয়া সবে শহরের আদব কায়দা রপ্ত করে বোর্ডিংস্কুল থেকে ফিরেছে।

সেলিয়া অকর্মঠ হলেও সুদর্শনা, আর লাজুক প্রকৃতির, চোখের মণিদুটো চিকচিকে আর ঠোঁটের কোণে সর্বক্ষণ হাসির রেখা জেগেই থাকে।

সেলিয়া অধিকাংশ সময় জানালার পৈঠায় বসে বাইরে রাস্তার ওপর চোখের মণি দুটোকে সজাগ রাখে।

সেলিয়া একদিন পথের বিপরীত দিকের এক যুবক মুদীকে তার মনটা সঁপে দিল। যুবকটা লম্বাটে আর ছিপছিপে চেহারাধারী।

ব্যস, শুরু হয়ে গেল দু'জনের প্রেম-প্রেম খেলার পালা। জানালায় বসেই সেলিয়া শিস দিয়ে তার প্রেমিককে সজাগ করে অনুচ্চকণ্ঠে বলল—আমার সেলিয়া নামটা তোমার পছন্দ তো? বল, আমার নামটা—

তার কথাটা শেষ হবার আগেই রাস্তা থেকে বাতাস-বাহিত কণ্ঠস্বর তার কানে এল—চমৎকার! খুব পছন্দ।

তোমার নামটা কি বললে না তো?

টমাস ম্যাকলিয়ড, পছন্দ?

সেলিয়া মুচকি হেসে ঘাড় কাৎ করে নিজের মত ব্যক্ত করল।

একটা কথা খুবই সত্যি যে, পূর্বরাগের ব্যাপার-স্যাপার নিছকই ব্যক্তিগত ব্যাপার। অতএব অনধিকার চর্চা থেকে বিরত থেকে আমরা বরং মূল গল্পটকেই আঁকড়ে ধরি।

আশাকরি আপনাবা ভুলে যান নি, টেবিলে কিল মেরে জেকব স্প্রাগিন্স একদিন দশ হাজার ডলার নিয়ে একটা রহস্যময় উক্তি করে বসেছিল। তা থেকেই প্রমাণ হয়ে যায় কিছু গল্প আর কিছু জীবন চক্রবৎ পরিবর্তিত হয়ে থাকে।

অতএব আমরা মর্মবেদনার সঙ্গে জেকব স্প্রাগিন্স-এর জেকব-এর কথাগুলো তুলে ধরব।

যখন সে বিশ বছর বয়সের যুবক তখন তার সৌভাগ্য শুরু হতে থাকে।

এক গরীব কয়লা-কাটা মজুর তিল তিল করে অর্থ সঞ্চয় করে এক পাহাড়ি অঞ্চলে কিছু জমি খরিদ করে চাষ আবাদ শুরু করবে ভেবেছিল।

তখনই জেকব-এর কানে কানে কে যেন বলল—ওহে, ওই জমিটার তলায় অফুরন্ত কয়লা জমা রয়েছে।

ব্যস, আর দেরী নয়, সে একশ' পঞ্চাশ ডলারের বিনিময়ে জমিটা খরিদ করে ফেলল। মাত্র এক মাস বাদেই সে ওই জমিটা দশ হাজার ডলার দামে বেচে দিল।

ব্যাপারটা কানে যাওয়ার পরই জমিটার আগেকার মালিক মনের দুঃখে মদের বোতল সম্বল করে ঘরের কোণে আশ্রয় নিল। মদের বোতল বগলে নিয়েই সে দুনিয়া ছেড়ে চলে গেল।

আজ চল্লিশ বছর পর জেকব স্প্রাগিন্স-এর মনে অদ্ভুত একটা ভাবনার উদয় হল—এ ডলারগুলো যদি জমির আগেকার মালিকের উত্তরাধিকারীর হাতে তুলে দিতে পারে তবে সেটাই হবে তার মুক্তি, পরম প্রাপ্তি।

জেকব স্প্র্যাগিন্স এবার বে-সরকারী গোয়েন্দা ভাড়া করল প্রাক্তন খনির মালিক-এর উত্তরাধিকারীকে খুঁজে বের করার জন্য।

আপনাদের মত আমিও জানি টমাস ম্যাকলিয়ডই হবে প্রকৃত উত্তরাধিকারী। নামটাকে গোপন রাখা আমার পক্ষে কিছুমাত্র অসুবিধা হবার কথা নয়। কিন্তু আমি কেনইবা এমন একটা রহস্যকে টিকিয়ে রাখব।

আমার নিযুক্ত গোয়েন্দারা শেষ পর্যন্ত মুদি টমাস ম্যাকলিয়ডকে ধরে বসল। তারা তার কাছ থেকে লিখিত স্বীকৃতি আদায় করে নিল যে হিউ ম্যাকলিয়ড ছিলেন তার পিতামহ। আর এ-ও লিখিয়ে নিতে ভুলল না যে, তার আর কোন উত্তরাধিকারী ছিল না, আজও নেই।

গোয়েন্দারা এবার কোন একটা অফিসে বুড়ো জেকব স্প্রাগিন্স আর মুদি দোকানদার টমাস ম্যাকলিয়ড-এর সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করল।

যুবক ম্যাকলিয়ডকে জেকব-এর দেখেশুনে মনে ধরে গেল। জেকব এবার বিশটা পাঁচ ডলারের বিল টমাস ম্যাকলিয়ডকে দিল। সে-ও নির্দ্বিধায় নোটগুলো কোটের বুক পকেটে চালান দিয়ে দিল।

সে বলল—এ ডলারগুলো যে পাঠিয়েছে তাকে আমার পক্ষ থেকে সহস্র ধন্যবাদ জানাবেন।

জেকব এবার তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল—তোমার নামটা তো জানা গেল। কিন্তু বাড়ি কোথায়, কি কর এসব জানার জন্য আমি বড্ড আগ্রহী। ভাল কথা তোমার জীবনের লক্ষ্য, আর তোমার কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে কি?

তার দিক থেকে সন্তোষজনক কোন উত্তর না পেয়ে জেকব বলল—আমার খুব ইচ্ছা, তোমাকে একবারটি আমার বাড়িতে নিয়ে যাই, যাবে?

সে না হয় গেলাম, কিন্তু কেন বলুন তো?

কারণ তেমন কিছু না। তবে আমার সঙ্গে গেলে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ডলারগুলো লগ্নী করলে মুনাফা বেশী হবে।

আর কিছু?

বুড়ো জেকব আমতা আমতা করে এবার বলল—হ্যাঁ, আরও একটা ইচ্ছা আমার বুকের ভেতরে চক্কর মারছে। তবে বলেই ফেলি, আমার একটা মেয়ে আছে। তুমি আমার সঙ্গে গেলে তার সঙ্গে তোমার আলাপ-পরিচয়ের ব্যবস্থা করতে পারব।

আপনার মেয়েকে আমার সঙ্গে পরিচয়—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই বুড়ো জেকব বলে উঠল—আরে আমি তেমন বাবা নই। আর মেয়েকেও এতটুকু বে-আদপি করতে দেই নি। সত্যি কথা বলতে কি, মেয়েকে যার-তার সঙ্গে কথা বলতে, আলাপ পরিচয় করতে দেই না।

ধন্যবাদ। কিছু মনে করবেন না, একটা মেয়েকে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছি। আমি যে বাড়িতে মুদিখানার মালপত্র সরবরাহ করি সেখানেই সে পরিচারিকার কাজে নিযুক্ত। তবে অবশ্য বেশীদিন তাকে দাসীবৃত্তি করতে হবে না।

ক্ষণিক ইতস্ততের পর টমাস ম্যাকলিয়ড বলল—আমাকে যে এখন বেরোতেই হবে। কাঁচা ফল-পাকড়ে বোঝাই আমার গাড়িটা সদর দরজায় অপেক্ষা করছে। পরে না হয় আপনার সঙ্গে একদিন দেখা করব।

তখন বেলা এগারোটার কাছাকাছি। টমাস ম্যাকলিয়ড কিছু সব্জি স্প্রাগিন্স-এর প্রাসাদে নামিয়ে দিল।

তার বয়স বাইশ। যৌবনের মেজাজ তার দেহ-মনে। তাই সে ডলারের নোটগুলো নাচাতে নাচাতে পথ চলতে লাগল। একইভাবে সে বাড়িতে ফিরল।

তার কাণ্ড দেখে বাড়ির পরিচারিকা আনেট ম্যাক্‌কর্কল-এর মুখটা ক্রীম-মাখানো পিঁয়াজের মত হয়ে গেল। সে দৌড়ে গিয়ে পাচিকাকে বলল—আমি তোমাকে বলিনি তিনি কাউন্ট না হয়ে যায় না।

বৃদ্ধা পাচিকা বলল—তাতে তোমার অসুবিধের কি থাকতে পারে, বুঝছি না তো বাছা? তুমি দেখে নিও আমার দিকে সে ফিরেও তাকাবে না।

ঠিক তখনই কথা ভেসে আসতে লাগল। টমাস ম্যাকলিয়ড সেলিয়াকে বলছে—এ নোটের গোছাটা তিনি আজই আমার হাতে তুলে দিয়েছেন। আর এগুলো আমার ঠাকুরদার জমিদারী থেকে এসেছে। আমি আজই কাজটা ছেড়ে দিচ্ছি। আর মিছে দেরি করে ফয়দাই বা কি? আগামী সপ্তাহে আমাদের বিয়ের ব্যাপারটা মিটিয়ে নেবার কোন আপত্তি থাকতে পারে না, কি বল?

শোন টমাস, আমি কারো বাড়ির পরিচারিকা নই। তোমার সঙ্গে আমি এতদিন স্রেফ মজা করেছি।

তবে কে তুমি? কি তোমার পরিচয়?

আমি মিস স্প্রাগিন্স—সেলিয়া স্প্রাগিন্স। খবরের কাগজের বক্তব্য, দিন কয়েকের মধ্যেই আমি

লক্ষ লক্ষ ডলারের মালিক বনে যাব।

তবে তো নিঃসন্দেহ হতেই হয়, আগামী সপ্তাহে তুমি আমাকে বিয়ে করে ঘর বাঁধছ না, কি বল?

না। আগামী সপ্তাহে তোমাকে আমি অবশ্যই বিয়ে করছি না।

বিয়ে করছ না, কথাটা এত সহজে তুমি—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই সেলিয়া বলে উঠল—আমার দিক থেকে আপত্তি না থাকলেও আমার বাবা এক মুদি দোকানদারের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে রাজি হবেন না, কিছুতেই না।

তবে-তবে—

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সেলিয়া এবার বলল—তবে তুমি যদি রাজি থাক তবে আজই আমাদের বিয়েটা মিটিয়ে নেওয়া যেতে পারে টমি।

বুড়ো জেকব স্প্রাগিন্স রাত্রি সাড়ে ন'টায় বাড়ি ফিরল। তার পকেটে সদ্য কিনে আনা চুনি-বসানো একটা গলার হার। তার উদ্দেশ্য মেয়ে বুঝুক, তার বাবা তাকে কত ভালবাসে।

জেকব সদর-দরজা দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে মেয়ের নাম ধরে ডাকাডাকি করল। কিন্তু তার সাড়া পেল না। পরিচারিকারাও তার কোন হদিস দিতে পারল না।

একটু বাদে পরিচারিকা আনেট তার ঘরে ঢুকল। বিষণ্ণ মুখে মনিবকে জানাল—সেলিয়া অনেক আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথায় যেন গেছে। শুনেছি, তারা নাকি আজ রাত্রেই বিয়ে করবে। আমি তাকে বহুভাবে বুঝিয়েছি, বাধা দিয়েছি। ফল কিছুই হল না।

বুড়ো জেকব গর্জে উঠল—কে সে হতচ্ছাড়া যুবক, বলতো?

এক ধনকুবের—কোটিপতি। এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছদ্মবেশী যুবক। আসলে মুদির দোকানটা তো মানুষের চোখে ধুলো দেবার মতলব।

জেকব-এর গাড়ি উল্কার বেগে ছুটে চলল ভাড়াটে গাড়িটাকে ধরার জন্য।

জেকব তার গাড়ির কোচোয়ানকে বার বার তাড়া দিতে লাগল যেনতেন প্রকারেণ সামনের গাড়িটাকে যাতে ধরতে পারে।

জেকব-এর গাড়িটা আরও কিছুটা পথ দ্রুততম গতিতে পাড়ি দিয়ে সামনের গাড়িটাকে প্রায় ধরে ফেলতে চলেছে।

জেকব চিৎকার করে বলল—ওহে ছোকরা. আমার বাড়ির যে পরিচারিকাকে তোমার বিয়ে করার কথা ছিল তার কি করলে?

দু'বছর পরের কথা। জেকব স্প্রাগিন্স একদিন তার ব্যক্তিগত সচিবকে বলল—তোমার কাজ কতদূর এগোচ্ছে?

সচিব মশায় বলল—'সম্মিলিত প্রচার সমিতি' কোরিয়ানদের ধর্মান্তর করার জন্য ত্রিশ হাজার ডলার অনুদান প্রার্থনা করে চিঠি দিয়েছে।

ভাল কথা, ডলারগুলো পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর।

আর একটা চিঠি আছে।

কাদের চিঠি?

প্লামভিল বিশ্ববিদ্যালয় জানিয়েছে যে, তাদের প্রাপ্য পঞ্চাশ হাজার ডলারের সময়টা পার হয়ে গেছে। তাদের কি জানাব?

জানিয়ে দাও যে তাদের বাঞ্ছিত্ অর্থ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

লং দ্বীপের ক্ল্যাম কোভ-এর বিজ্ঞান সমিতির কাছ থেকে অনুদান প্রার্থনা করে একটা চিঠি পাঠিয়েছে।

কত ডলার?

দশ হাজার ডলার।

চিঠি বাতিল করে দাও।

একটা গল্‌ফ খেলার মাঠ তৈরী করার জন্য শ্রমজীবী মহিলা আরাম-বিরাম ব্যবস্থাপক সমিতি বিশ হাজার ডলার অনুদান প্রার্থনা করেছে।

লিখে দাও তারা যেন সৎকার সমিতিতে খোঁজ খবর নেয়।

বাতিল-বাতিল, সব বাতিল করে দাও। আমার আর ভাল মানুষ থাকার ইচ্ছে আদৌ নেই

সচিব মশাই কৌতূহল মিশ্রিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকাল। জেকব বলে চলল—আমি যত ডলার বাঁচাতে পারি তার প্রতিটা কানাকড়ি পর্যন্ত আমার চাই, শুনে রাখ। আর একটা কাজ তোমাকে করতে হবে।

বলুন, আমার প্রতি কি নির্দেশ, দয়া করে বলুন।

প্রতিটা কোম্পানির ডিরেক্টরকে জানিয়ে দাও সবার বেতন থেকে যেন দশ শতাংশ করে কেটে নেওয়া হয়। নষ্ট করার মত অর্থ ও ইচ্ছা কোনটাই আমার নেই।

আপনার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হবে।

ভাল কথা, আমাদের গুদামে যথেষ্ট পরিমাণ ভিনিগার আছে, নাকি—

তার কথা শেষ হবার আগেই সচিব মশায় বলা শুরু করল—বর্তমানে মশলার বাজার তো 'বিশ্ব মশলা কোম্পানি' নিয়ন্ত্রণ করছে।

ভিনিগারের দাম টন প্রতি দু'সেন্ট বাড়িয়ে দাও।

জেকব এবার দু'-তিন পা এগিয়ে গিয়ে তার ব্যক্তিগত সচিবকে তর্জনীর একটা লাল দাগ দেখাল।

সচিব মশায় সবিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকাল। জেকব ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বলে উঠল—আরে কামড়ে দিয়েছে! কামড়ে দিয়েছে।

কামড়ে দিয়েছে, কে? কার এমন দুঃসাহস যে—

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জেকব বলে উঠল—আশ্চর্য ব্যাপার, মাত্র তিন সপ্তাহেই তার দাঁত যে কোত্থেকে এল ভেবেই পাচ্ছি না।

কিন্তু কার দাঁতের কথা বলছেন?

আরে, এটা যে আমার মেয়ে সেলিয়া-র বাচ্চা জ্যাকি ম্যাকলিয়ড-এর কাণ্ড। সে যখন একুশ বছরে পা দেবে তখন সে কোটি কোটি ডলারের মালিক বনে যাবে। আর এটা যাতে বাস্তবায়িত হয় তার জন্য যা কিছু করা দরকার সবই আমাকে করতেই হবে, বুঝলে?

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে গিয়ে জেকব হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর বলল—শোন, ভিনিগারের দামটা দুই নয়, তিন সেন্টই বাড়িয়ে দাও।

খলিফা হারুণ অল রসিদ-এর সত্যিকার কাহিনী ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে, তাঁর রাজত্বের শেষের দিকে তিনি বিশ্বপ্রেম-এর ব্যাপারে বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েন। আর যারা আরব্য রজনীর বিভিন্ন অভিযানের সঙ্গে লিপ্ত ছিলেন তাঁর সঙ্গী ও আত্মীয়জন তাদের সবারই গর্দান নেবার ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন।

আর বর্তমানে আমরা একটা ব্যাপারে খুবই সুখী এজন্য যে, বর্তমানের খলিফারা যখন মৃত্যুদণ্ড দান করেন তখন সেটাকে কারবারীর বিলের হিসাবে ধার্য করা হয়।

দ্য ড্যুয়েল

নিউইয়র্ক শহরে চারলক্ষ রহস্যময় নবাগতরা বসবাস করে। তারা বিভিন্ন দেশ থেকে আর বিভিন্ন কারণে এখানে এসে জড়ো হয়েছে।

এখানকার প্রতিটি মানুষকে এখানে লড়াইয়ে সামিল হতে হয়। সে বা তার প্রতিপক্ষ যখন জয়লাভ করে তখনই লড়াইটার সমাপ্তি ঘটে। সেখানে এক এক রাউন্ড লড়াইয়ের পর কোন বিশ্রামের ব্যবস্থা থাকে না। কারণ এ যুদ্ধে তো কোন রাউন্ডের ব্যাপার নেই।

গোড়ার দিকে লড়াইটা ধীরগতিতে শুরু হয়। আর ভয়ঙ্কর লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। তোমার প্রতিপক্ষ কে? এ শহরটা।

যখনই তুমি এ শহরে পা রাখবে তখনই শহরটার সঙ্গে তোমার লড়াই শুরু হয়ে যাবে। আর যতক্ষণ না শহরটা তোমার হাতে মুঠোর মধ্যে চলে আসবে ততদিন তোমাকে যুদ্ধটাকে অব্যাহত রাখতে হবে। অথবা তোমাকে পরাজিত করে সে শহরটাকে কব্জা করে নেবে।

তোমার পকেটে দশ লক্ষ ডলারই থাক আর এক সপ্তাহ চলার মত অর্থই থাক একই ঘটনা ঘটবে।

সে যুদ্ধটার মাধ্যমেই স্থির হয়ে যাবে যে, তুমি একজন নিউইয়র্কবাসী হবে, নাকি একেবারে নিচু তলার পরদেশী ও ফিলিস্তিন হয়ে বসবাস করবে। আরে, দু'জনের মধ্যে কোন না কোন একজন তো অবশ্যই হতে হবে। নিরপেক্ষ হয়ে চোখ বন্ধ করে তো আর তোমার পক্ষে থাকা সম্ভব নয়। পক্ষে বা বিপক্ষে, ভালবাসার পাত্র বা শত্রু নইলে অভিন্ন হৃদয় সুহৃদ বা সমাজচ্যুত তোমাকে হতেই হবে।

অন্য যেকোন শহরের বুকে তুমি নবাগতের মতই যতদিন মন চায় পথে পথে ঘুরে কাটিয়ে দিতে পার। আবার মন চাইলে নবাগতই থেকে যেতে পার।

শিকাগো শহরে দীর্ঘদিন কাটিয়ে এলেও, এখানকার নাগরিকত্ব লাভ করে নিলেও, বোস্টন শহরে বড় থাকলেও আর সেখানকার ভূয়সী প্রশংসায় লিপ্ত থাকলেও কেউ-ই তোমাকে গালমন্দ করবে না।

অন্য কোন শহরে তুমি একজন কেউকেটা বনে যেতে পার, সে শহরের বাড়ি-ঘর, রাস্তা-ঘাট দেখে নিন্দায় পঞ্চমুখ হতে পার, তবু কেউ-ই তোমার গায়ে হাত দেবে না।

কিন্তু নিউইয়র্কে পা দিলে তুমি একজন নিউইয়র্কার বনে যাবে, নতুবা কাঠের ঘোড়ার মধ্যে, সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতার মধ্যে আত্মগোপন আধুনিক ট্রয় নগরীর একজন বিদেশী আক্রমণকারী হয়েই অবস্থান করবে।

এরকম একটা ভয়ঙ্কর ভূমিকার অবতারণা করতে উৎসাহী হলাম কেন? এর কারণ একটাই—জ্যাক আর উইলিয়ম-এর সঙ্গে তোমাকে পরিচিত করার উদ্দেশ্যে। ব্যস, এর বেশী কিছু নয়।

জ্যাক আর উইলিয়ম উভয়ে একই সঙ্গে পশ্চিম থেকে এসে এখানে নোঙর ফেলেছিল। সেখানে তারা বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। ভাগ্যের খোঁজে, ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে দুই বন্ধু এখানে এসে ঘাঁটি গেড়েছে।

খেয়াঘাটেই নিকার-বোকার বাবার সঙ্গে তাদের মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল।

প্রথম দর্শনই সে ডান হাতে একজনের নাকে সজোরে এক ঘুষি হেঁকে বসল আর বাঁ হাতে অপর জনের থুৎনিতে জব্বর এক আঘাত হেনে প্রায় ধরাশায়ী করে দেবার জোগাড় করল।

আসলে তার কাছে এটা তেমন কোন ব্যাপারই নয়। লড়াইটা যে শুরু হয়ে গেছে এটাই শুধু নবাগত বন্ধু দু'জনকে জানিয়ে দিল।

জ্যাক আর উইলিয়ম উভয়ের শহরটায় আসার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কলাবিদ্যা চর্চার উদ্দেশ্য নিয়ে জ্যাক এখানে হাজির হয়, আর উইলিয়ম-এর উদ্দেশ্য ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থোপার্জন করা।

তারা উভয়েই যুবক। আর উভয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষীও বটে।

আমার বিশ্বাস, তারা মিসৌরী, মিনেসোটা বা নেব্রাস্কা থেকে এ শহরে এসেছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে উভয়েই এসেছে জীবনে সাফল্য লাভের অত্যুগ্র প্রত্যাশা নিয়ে।

একটা হোটেলে চার বছর বাদে জ্যাক আর উইলিয়ম-এর দেখা হল। কারবারী লোকটা বাতাসের মত উড়ে এসে জুড়ে বসল। চেয়ারটা টেনে দুম্ করে বসে পড়ল, খাদ্য পরিবেশনকারীর দিকে মাথার টুপিটা ছুঁড়ে দিল। তারপরই বিশেষ ভঙ্গীতে দু' আঙুলের সাহায্যে খাদ্য-তালিকাটা তুলে নিল। এবার পনির থেকে শুরু খাদ্য তালিকার সব কটা খাদ্যবস্তুর অর্ডার দিল।

ইতিমধ্যে তার শিল্পী বন্ধুটা একবার মাথাটা নাড়া ছাড়া আর কিছুই করল না। পরমুহূর্তেই তার দু'চোখের তারায় একটু ঠাট্টা-তামাশার হাসি ফুটে উঠল।

রসিকতার স্বরে সে বলল—বন্ধু বিলি, তোমার কম্ম ফতে। তোমাকে শহরটা গ্রাস করে ফেলেছে। সে তোমাকে ধরে নিজের মত করে গড়ে তুলেছে, আর তোমার গায়ে নিজের ছাপটা দেগে দিয়েছে, বুঝলে?

মুহূর্তের জন্য থেমে আবার মুখ খুলল—আজ তুমি দশ হাজার মানুষগুলোর সঙ্গে মিলেমিশে এমন একাকার হয়ে গেছ যে, তোমার জামায় লন্ড্রীর চিহ্নটা না থাকলে আমার পক্ষে তোমাকে সনাক্ত করাই সম্ভব হত না।

উইলিয়ম জবাব দিল—আরে বন্ধু, এক সময় আমার ধারণা ছিল, পশ্চিমটাই গোলাকার পৃথিবী। আর মেরুদ্বয় সামান্য চাপা।

তুমি হয়ত জান না, আমি একটা মুদির দোকানেও চাকরি করেছি। কিন্তু তখনও তো আমার নিউইয়র্ক শহরটাকে দেখা হয়ে ওঠে নি।

জ্যাক ম্লান হাসল।

উইলিয়ম বলে চলল—আর আজ? আজ আমার কাছে নিউইয়র্ক শহরটাই যথা সর্বস্ব। সত্যি কথা বলতে কি, আজ আমি মনে করি ষষ্ঠ এভিনিউ-ই পশ্চিম দেশ। ক্রুশোর গানে আছে দ্বীপময় মরুটার মালিক সে। আমিও ওই একই কথা বলি।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জ্যাক বলল—হায়রে, বেচারা বিলি! বিলি, তোমার একটা কথা মনে আছে?

কি? কোন কথার ইঙ্গিত দিচ্ছ, বল তো?

পূর্ব দেশে পাড়ি দেবার সময় এ মহান, অত্যাশ্চর্য শহরটা সম্বন্ধে আমরা কত কথাই না বলাবলি করতাম। তখন আমাদের লক্ষ্য কি ছিল, বল তো?

উইলিয়ম আমতা আমতা করতে লাগল।

শিল্পী জ্যাক বলে চলল—আমাদের লক্ষ্য ছিল শহরটাকে আমরা জয় করব, কখনই আমাদের সর্বস্ব একে জয় করে নিতে দেব না।

শোন উইলিয়ম, আমরা অতীতে যা ছিলাম, ভবিষ্যতেও তা-ই থাকব। এ শহরটাকে কিছুতেই, কোন অবস্থাতেই আমাদের মাথায় চেপে প্রভু হতে দেব না, তাই তো? হায়রে বুড়ো উইলিয়ম! এ শহর যে তোমাকে কুপোকাৎ করে দিয়েছে, তুমি পরাজিত সৈনিক।

উইলিয়ম ভুরু কুঁচকে বলল—জ্যাক, তুমি যে কি বলতে চাইছ কিছুই আমার মাথায় আসছে না। বাড়িতে থাকতে যে আমি নীল ট্রাউজারের সঙ্গে কোট পরতাম এখন তা পরি না। আমাকে মেপে কাটছাঁট করে শহরটার উপযোগী করে তুলেছে। তা-ই হয়, তবে হয়েছেটা কি তা-তো মাথায় আসছে না। কাটছাঁট করে করে পোশাককে কালোপযোগী করে দেওয়া কি ভাল নয়? তুমি কি বল?

বন্ধুর মুখে চোখের মণি দুটোকে বুলিয়ে নিয়ে উইলিয়ম আবার বলতে আরম্ভ করল—শোন, রোমে যদি থাকতেই হয় তবে তোমাকে তো ডাগোদের মতই চলাফেরা করতে হবে, কি বল?

দেখ জ্যাক, রেল-পথের প্রসঙ্গটা উঠলেই আমার মনের কোণে ভেসে ওঠে প্যারিস, শিকাগো, ফ্রান্স, সেন্ট জো প্রভৃতি তারকা-চিহ্নিত স্টেশন।

জ্যাক, একটা কথা মন খোলসা করে বলতো, এ শহরটার বিরুদ্ধে তোমার মত কি? তবে এখানে

খেয়া নৌকো—এটা নিয়ে আমার কোন ভাবনা নেই।

জ্যাক বলল—এ শহরটাকে একটা জোঁক মনে করা যেতে পারে, এটা সারা দেশের রক্তকে নিজের দেহে শুষে নিচ্ছে। যে এখানে একবার এসে মাথা গোঁজে সেই দ্বন্দ্বযুদ্ধে মেতে যায়, মানতে তো হবেই। দেশের ছোট-বড় ভাল-মন্দ সবাইকে প্রণাম জানাতে হয়, চলতে হয় সমীহ করে। প্রতিটা নবাগতকে এ বিশালদেহী, অমিত শক্তিধর দানবের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতেই হয়।

মুহূর্তের জন্য ভেবে নিয়ে জ্যাক আবার মুখ খুলল—আরে বিলি, তুমি কিন্তু হেরে গেছ। আমাকে জয় করা তোমার পক্ষে কেবল আজ নয়। কোনদিনই পারবে না। আমি তাকে চরম ঘৃণা করি, পাপের মত ঘৃণা করি। তার বিশালত্ব আর অমিত শক্তি ঘৃণার চোখে দেখি।

তুমি যা-ই বল না কেন বিলি, কেবলমাত্র এ শহরটাতেই আছে ধনকুবের, যাকে তোমরা কোটিপতি বল। ক্ষুদ্রতম সুমহান ব্যক্তি, রাজভিখারী, সবচেয়ে সহজ-সরল সুন্দরী, আকাশচুম্বী সবচেয়ে ছোট বাড়ি আর আছে বিষণ্নতম সুখ-শান্তি।

আরও আছে বিল, এ শহর নিজেকে সংস্কৃতির দাবীদার জ্ঞান করে, অথচ সে নিজেই চরম অসৌজন্য আচরণ করে। সে নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে প্রচার করলেও প্রকৃতপক্ষে সে অধমের সেরা। তার বাইরের আবরণটা ওপর থেকে সরিয়ে ফেললেই তার আসল রূপ সঙ্কীর্ণতম চেহরাটা বেরিয়ে পড়বে। আমি সুযোগ পেলে মুক্ত বাতাস আর মুক্ত মনের পশ্চিমের দেশে চলে যেতাম। দেরী নয়, সম্ভব হলে কালই আমি সে দেশের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাতাম।

মাঝ-রাত্রি, জ্যাক-এর ঘুম আসছে না। সে জানালাটা খুলে বাইরের পরিবেশের মুখোমুখি বসল। যা কিছু দেখল তাতে তার বুকটা আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠল। অথচ সে তো এ দৃশ্য শতবার চাক্ষুষ করেছে। অনুভব করেছে অন্তর দিয়ে।

জানালাটা থেকে নিচের, অনেক নিচের শহরটা বন্ধুর একটা রঙীন স্বপ্নের মত অবস্থান করছে। শহরটার আশ্চর্য নির্মম, মন-ভোলানো হতবুদ্ধিকর ভয় ভয়ঙ্কর হলেও মহান শহরের শহরটা যেন বাতাস-বাহিত হয়ে তার নাকে এল, তার রক্তের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল।

দরজার কড়া নড়ে উঠল। একটা টেলিগ্রাম এসেছে। পশ্চিম থেকে আসা টেলিগ্রাম। টেলিগ্রামের পাতায় লেখা রয়েছে—বাড়ি চলে এসো। উত্তরটা হবে হ্যাঁ।—ডলি।

লোকটাকে সে মিনিট দশেক অপেক্ষা করতে বলল। তারপর টেবিলে গিয়ে কাগজ-কলম নিয়ে টেলিগ্রামের জবাবটা লিখে ফেলল—এ মুহূর্তে এখান থেকে ফিরে যাওয়া অসম্ভব।

সত্যি কথাটা কি জানেন, এটা আসলে কোন গল্পই নয়। এ শহরটার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে নায়ক দু'জনের মধ্যে কে বিজয়ীর সম্মান লাভ করে। তাই আমার বহুদিনের পুরনো এক বন্ধুর বাড়ি গেলাম। তাকে পুরো ব্যাপারটা খোলসা করে বললাম।

তার মতামত জানতে চেয়ে অধীর প্রতীক্ষায় রইলাম।

সব কিছু শুনে সে জবাব দিল—শোন হে, দয়া করে আমাকে আর না ঘাঁটালেই ভাল করবে। বড়দিনের উপহার কেনার জন্য আমার একবারটি বেরনো দরকার।

আমার গল্পের এখানেই ইতি টানলাম। আর আপনাদের ওপরই নিজ নিজ মতামত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব দিলাম।

. হোয়াট ইউ ওয়ান্ট

রাত্রির অন্ধকার নেমে এল। পাতাল-পথের বাগদাদ নামে সুপরিচিত সে মহান নগরটার বুকে রাত্রির অন্ধকার নেমেছে।

আর সে রাত্রির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে নেমে এসেছে এমনই এক মায়াবী কুহক একমাত্র আরবই যার দাবীদার নয়।

নগরের সর্বত্র উৎসবের জাঁকজমক। নগরের আবাল-বৃদ্ধবণিতা উৎসবের জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিয়েছে।

উৎসব-মুখর শহরের বুকে একসময় উদ্ভ্রান্তের মত ঘর ছেড়ে পথে নেমে যেতেন আমাদের পুরনো রসিক-বন্ধু পরলোকগত হারুণ অল রসিদ।

হারুণ অল রসিদ প্রাচীন বাগদাদ নগরকে যেমনটা দেখেছিলেন সেখানে তখনকার পোশাক-পরিচ্ছদের কায়দা কৌশলের আমূল পরিবর্তন হলেও নগরের মানুষরা এগার শ' বছরের পুরনো পোশাক-আশাকই পরিধান করেছে। এতদিন বাদেও তারা যেন মনের দিক থেকে সেই একই মানুষ রয়ে গেছে।

বিশ্বাসের চোখ নিয়ে যদি দেখেন তবে প্রতিটা ব্লকেই আপনার নজরে পড়বে সেই যে সেই কুঁজো দর্জি, নাবিক সিন্দবাদ, এক-চক্ষু দৈত্য আর পারসিক সুন্দরীকে।

আরও একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে আপনার চোখে পড়বে নাপিত আর ছ'ভাইকে।

আর? আর দেখতে পাবেন সে আমলের অন্যান্য সব আরবীয় মানুষরাই সেখানে উপস্থিত। তবে দেখার মন আর চোখ কিন্তু থাকা চাই।

না, আর আশপাশ দিয়ে ঘোরাঘুরি না করে আমরা বরং জায়গামতই ফিরে যাই।

টম ক্রোলি। সবাই তাকে বুড়ো টম ক্রোলি বলেই জানে।

স্টক, বন্ড আর সোনাদানা মিলে তার মোট সম্পত্তির পরিমাণ বিয়াল্লিশ কোটি ডলার।

বর্তমান যুগে খলিফা চিহ্নিত হতে হলে অগাধ ধনসম্পত্তির মালিক হতে হবে।

হারুণ অল রসিদ সে আমলে যে রকমের খলিফাগিরি করতেন বর্তমানে তা মোটেই নিরাপদ নয়।

এখনকার দিনে আপনি যদি কোন অপরিচিত লোককে কোন গলির মুখে বা নিরিবিলি জায়গায় ধরে তার ব্যক্তিগত কথা, পারিবারিক ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ-দুর্দশার কথা জানতে চান, তবে? আপনার আর রক্ষা থাকবে না। রহস্যভেদী বা পুলিশ আপনার গায়ে-গায়ে এঁটুলির মত লেগে থাকবে। আপনাকে পাকড়াও করে ফাটকে আটক করে তবেই ক্ষান্ত হবে।

ক্লাব, রঙ্গমঞ্চ, গান-বাজনা, নাচের আসর আর ধন-দৌলত নিয়ে বুড়ো টম ক্রোলি আজ পুরো দস্তুর হাঁপিয়ে উঠেছে, ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এরকম পরিস্থিতিতেই মানুষের মধ্যে খলিফা বনার প্রবণতা দেখা যায়।

দুনিয়ার যাবতীয় ভোগ্যবস্তু পেয়ে পেয়ে ক্লান্ত বুড়ো টম ক্রোলি শেষমেশ ভাবতে বসল।

দীর্ঘ ভাবনা-চিন্তার পর সে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিল—আমি সম্পূর্ণ শহরটাকে বারবার চক্কর মারব। তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখব নতুনতর কিছু পাই কিনা।

সে শুনেছে, বহু বছর আগে, সেই আমলে কোন এক রাজা নাকি নকল দাড়ি-গোঁফ লাগিয়ে হন্যে হয়ে পথে পথে চক্কর মারতেন। আর অপরিচিত কোন মানুষ সামনে পড়লেই তাকে কাছে ডাকতেন। তাকে পাশে বসিয়ে গল্প জুড়তেন।

ব্যাপারটা নিয়ে ভাবলে কিন্তু মন্দ লাগে না। টমি ক্রোলি ভাবল, আমারও অগাধ বিত্তসম্পদ আছে। আজ রাত্রেই মুসাফির সেজে নগরের বুকে নেমে পড়া যাক না। পরীক্ষা করেই দেখা যাক না, ফল কি দাঁড়ায়।

বুড়ো টমি ক্রোলি গায়ে অতি সাধারণ পোশাক চাপিয়ে রাত্রির অন্ধকারে নগরের পথে নেমে পড়ল।

মাঝ রাত্রে অন্ধকার পথে হাঁটতে হাঁটতে সে প্রথমে পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেল। তারপর তার গতি হল দক্ষিণমুখী পথে।

অন্ধকার পথে, নিস্তব্ধ পরিবেশে একা-একা হাঁটার সময় হঠাৎ যেন তার ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্ন হয়ে উঠল।

আচমকা তার নজরে পড়ল, বিশ ব্লক দূরে একটা যুবক মুহূর্তের জন্য দেওয়াল ঘড়িটার দিকে তাকাল। তারপরই সে হাতে ভাঁজ-করা কোটটা গায়ে পরল।

যুবকটার নাম জেমস টার্নার। সে ষষ্ঠ এভিনিউতে একটা টুপির দোকানের কর্মী। টুপি পরিষ্কার করার কাজে লিপ্ত।

অপরিচিত যুবক জেমস টার্নার সম্বন্ধে কিছু জানার কৌতূহল আপনাদের থাকলে থাকতেও পারে। তাই তার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ আপনাদের সামনে তুলে ধরছি ঃ

তার ওজন একশ' আঠারো, উচ্চতা পাঁচফুট ছ' ইঞ্চি, পরনে দশ ডলার দামের সবুজ-নীল সুট, পকেটে খুচরো তেষট্টি সেন্ট আর অন্য পকেটে দুটো চাবি।

দোহাই আপনাদের ওপরের বিবরণটা শুনে যেন আবার ভুল করে বসবেন না। সেদিনের সে টম টার্নার আজ হয় হারিয়ে গেছে, নতুবা তার অপমৃত্যু ঘটেছে।

সে সব কথা ছাড়ান দেওয়া যাক।

টম সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একনাগাড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ করে। দিনের শেষে পা দুটো যেন তার দেহভার বইতেও অক্ষম হয়ে পড়ে। কিন্তু উপায় নেই। সপ্তাহের শেষে তাকে যে ডলারগুলো হাতে পেতেই হবে।

টুপি পরিষ্কার ও সেলাইয়ের কাজ করে টম টার্নার সপ্তাহে বারোটা ডলার হাতে পায়।

আমাদের দশজনের মত টম টার্নার-এরও সুখ আর আরাম আয়েশ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত একটা ধারণা আছে। তবে সত্যি কথা বলতে কি, তার ধারণাটা অন্য দশজনের ধারণা থেকে একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির।

দিনের শেষ কাজ থেকে উঠেই সে সরাসরি বোর্ডিং হাউসে চলে যায়। সামান্য কিছু মুখে গুঁজেই সে সোজা ছ' তলার পিছন দিককার হল-ঘরটায় হাজির হয়।

তারপর লোহার খাটের ঠাণ্ডা রডটার ওপর মাথা রেখে সে ক্লার্ক রাসেল-এর সমুদ্র সম্বন্ধীয় গল্পের বইয়ের মধ্যে ডুবে যায়।

তার প্রিয় বইয়ের ভাল-লাগা গল্পগুলো মুহূর্তের জন্য তার মনে ক্লান্তির উদ্রেক করে না।

জেমস টার্নার-এর মত আরাম ও স্বস্তি কোন ধনকুবেরও ভোগ করতে পারেন না।

টুপি পরিষ্কারের দোকান থেকে ছুটি পাওয়ার পর সে সোজা চলে যায় বিপরীত দিকের পুরনো বইয়ের দোকানে। সেখান থেকে খুঁজে খুঁজে ক্লার্ক রাসেল-এর বই অর্ধেক দামে কিনে নেয়।

টম টার্নার যখন বাতিল পুরনো একটা বই কিনে নিয়ে বন্ধুর বাড়ি হয়ে বোর্ডিং-হাউসে ফিরছে, সেই মুহূর্তে তার পাশ দিয়ে বুড়ো কোলি যাচ্ছিল।

দীর্ঘ বিশ বছর ধরে সাবান তৈরীর অভিজ্ঞতা দিয়ে গরীব ও পণ্ডিত যুবকটাকে দেখেই সে চিনতে পারল, সে যেমন লোকের খোঁজে পথে নেমেছে, এ ঠিক তা-ই।

সে তখন যুবকটাকে জিজ্ঞাসা করল—কি হে! এত রাত্রে কোত্থেকে ফিরছ, যাবেই বা কোথায়?

জেমস টার্নার হাতের 'এ ম্যাচ ম্যারেজ' আর 'সার তোর রেসার তাম' বই দুটো দেখিয়ে বলল—এ বই দুটো খুঁজে পেতে এমনিতেই দেরী হয়ে গিয়েছিল তারপর এক বন্ধুর বাড়ি—

জেমস-এর কথায় কান না দিয়ে খলিফা বলল, শোন হে যুবক, পড়াশোনা—জ্ঞানার্জনের প্রতি তোমার ঝোঁক খুবই বেশী। শিক্ষা, মানে জ্ঞানার্জনের মত মহৎ কাজ দ্বিতীয় আর একটাও নেই। লেখাপড়ায় আমার মন বসেনি। কিন্তু অন্যের বিদ্যার্জনের প্রতি আগ্রহ দেখলে আমি যারপরনাই খুশি হই।

মুখে হাসি ফুটিয়ে যুবক জেমস বলল—বিদ্যা-শিক্ষার প্রতি আপনার যে প্রবণতা আছে তা-তো আপনার কথাই প্রমাণ দিচ্ছে।

শোন বাছা, তোমার হাতে যে বই দুটো রয়েছে হয়ত তার ঘটনাবলী আমার কিছুই জানা নেই।

যুবক জেমস মুচকি হাসল।

বুড়ো টম ক্রোলি এবার বলল—আমি যা জানি না তা অন্য কেউ জানে যদি দেখতে পাই তবে আমার খুবই ভাল লাগে। তুমি যদি কিছু মনে না কর তবে আমি তোমার কাছে একটা প্রস্তাব রাখতে চাইছি।

বলুন, কি বলতে চান?

শোন, আমি চল্লিশ কোটি ডলারের মালিক, আর রোজই আমার বিত্তসম্পদ বেড়ে পাহাড় তৈরী হচ্ছে।

বুড়োর কথা শুনে জেমস তো মূর্চ্ছা যাবার জোগাড় হল।

বুড়ো টম ক্রোলি তার দিকে খেয়ালমাত্র না করেই বলতে লাগল—তোমার জানতে ইচ্ছে করছে না, আমি কিভাবে একজন টাকার কুমীর বনে গেছি?

সঙ্কুচিতভাবে জেমস বলল—ইচ্ছে থাকলে এ প্রসঙ্গে কিছু বলতে সাহস পাচ্ছি না।

ধ্যুৎ পাগল ছেলে! আমি তো মন খোলসা করে, একেবারে বন্ধুর মত কথা বলছি, আর তুমি বলছ কিনা—যাকগে, শোন, আমি অগাধ অর্থ উপার্জন করেছি এবং এখনও করে চলেছি প্যাটি খুড়ির সিলভার সোপ আবিষ্কার করে।

সাবান! সাবান আবিষ্কার করে চল্লিশ কোটি ডলার?

হ্যাঁ, ঠিক তা-ই। কথাটা অবিশ্বাস্য মনে হলেও শতকরা একশ' ভাগই সত্যি।

তবে সাবানটা আবিষ্কারের মাধ্যমে উপার্জন করেছি ন' কোটি ডলার। আর অবশিষ্ট একত্রিশ কোটি ডলার?

অবশিষ্ট ডলারগুলো কামিয়েছি খাদ্য শস্যের কারবার করে।

বুঝলাম।

যে কথা তোমাকে আমি বলতে চাইছি, সাহিত্যের প্রতি তোমার অনুরাগ দেখে যে কথা আমি ভেবেছি, তোমাকে খোলাখুলি বলছি।

তবে বলেই ফেলুন।

ইওরোপের সেরা কলেজে পড়াশোনা করতে তোমার যা খরচ হবে সবই আমি বহন করব।

একী বলছেন আপনি! চোখ দুটো কপালে তুলে যুবক জেমস বলে উঠল।

তারপর কি বলছি, ধৈর্য ধরে শোন বাছা—সারা ইওরোপ মহাদেশে ঘুরে বেড়াতে এবং শিল্প-প্রদর্শনী দেখতে তোমার যা কিছু খরচ হবে সে সবও আমি বহন করব।

কিন্তু—কিন্তু—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই বুড়ো টম ক্রোলি এবার বলল—শোন বাছা, আমি সোজা কথাই পছন্দ করি। সাবান তৈরীর কাজকর্ম যদি তোমার পছন্দ না হয় তবে তুমি ইওরোপ থেকে ফিরে আসার পর তোমার পছন্দ মাফিক একটা কারবার তোমাকে করে দেব।

নব নিউইয়র্ক শহরের মানুষগুলোর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—অবিশ্বাস!

যুবক জেমসকে নীরব দেখে বুড়ো টম ক্রোলি-ই আবার মুখ খুলতে বাধ্য হল—শোন বাছা, তোমাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে, খুব একটা সচ্ছল অবস্থার মধ্যে তোমার দিন কাটছে না। তাই আমার বিশ্বাস, তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মতি না দিয়ে পার না। এবার বল তো বাছা, কবে থেকে তুমি আরম্ভ করতে চাইছ?

জেমস কয়েক মুহূর্ত নীরবে বুড়ো টম ক্রোলি-র মুখের দিকে অনুসন্ধিৎসু চোখে তাকিয়ে থেকে [illegible]—বলুন তো মশাই, আপনি কোন্ লাইনের কর্মী? জুতোর ফিতে—না, মশাই, এরকম কোন কিছু কেনার ইচ্ছা আমার আদৌ নেই। আর বহুমূল্য ফাউন্টেন পেন, সোনার চশমা, কোম্পানির সার্টিফিকেট বা শেয়ার বাজারের কাগজপত্র কিছু আমাকে গছানো আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না। তাই বলছি কি, এসব ধান্দা ছেড়ে—

খলিফা টম ক্রোলি সবিস্ময়ে বলে উঠল—বাছা, একী কথা বলছ তুমি? আমি তো আগেই তোমাকে বলেছি, আমি বর্তমানে চল্লিশ কোটি ডলারের মালিক। আমার কাম্য নয়, আমার মৃত্যুর

পর ডলারগুলো আমার শবাধারে স্থান পাক। আমি জ্ঞানার্জনের ব্যাপার স্যাপার সম্বন্ধে কিছু করে যেতে আগ্রহী। তোমার হাতে বই দুটো দেখে আমি ধরেই নিয়েছি তুমি আমার মনের মত পাত্র। তোমার পাশে দাঁড়ানো আমার অবশ্য কর্তব্য বলে আমি মনে করছি। একটা মিশনারী স্কুলকে আমি দু' কোটি ডলার দিয়েছি। সেখান থেকে সচিবের একটা সার্টিফিকেট ছাড়া আমি কিছুই পাইনি।

কিন্তু কতলোকই তো বইপত্র হাতে নিয়ে পথ দিয়ে—

পথ দিয়ে যাতায়াত করে ঠিকই বলেছ। কিন্তু মানুষ চিনতে আমার ভুল হবার তো কথা নয়। তাই তো আমি তোমাকে বেছে নিতে পেরেছি। আমি দেখতে চাই ধন সম্পদ থাকলে একজন মানুষকে কতবড় করে তোলা সম্ভব।

না, এত কথার পর টম ক্রোলি যুবক জেমস-এর মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারল না। আসলে সে একজন টুপি সেলাইয়ের কারিগর হলে কি হবে, তার মনটা খলিফার মনেরই মত।

আমি তো বলেইছি, আমার কাছে আপনি ন্যক্কারবাজি করে মোটেই সুবিধে করতে পারবেন না। কেটে পড়ুন। চল্লিশ কোটি ডলারের বিল ভাঙানো ছাড়া আপনার আর কোন ধান্ধা, ভোজবাজির খেল্ দেখাতে এসেছেন, জানতে পারি কি? আপনি যদি মানে মানে এখান থেকে চলে না যান তবে এমন এক দাওয়াই দেব যা জন্মেও ভুলতে পারবেন না, জেনে রাখুন।

খলিফা বলল—তুমি তো এক মহানচ্ছাড় হে যুবক!

জেমস চোখের পলকে বুড়ো টম ক্রোলিকে মোক্ষম একটা ঘুষি হাঁকিয়ে বসল।

বুড়ো টমও ছেড়ে কথা বলল না। সে-ও তাকে একটা লাথি হাঁকাল।

প্রহরারত এক পুলিশ তাদের কাণ্ডকারখানা দেখে ছুটে এল।

সে উভয়কে কয়েকটা ডাণ্ডার ঘা মেরে থানায় নিয়ে গেল।

সবকিছু শুনে পুলিশ সার্জেন্ট চোখ গরম করে বলল—তিনশ' করে ডলার দিলে তোমরা জামিন পেতে পার।

জেমস বলল—আমার কাছে সর্ব সাকুল্যে তেষট্টি সেন্ট আছে। আর খলিফা টম ক্রোলি খুচরো ও নোট মিলিয়ে চার ডলার বের করতে পারল।

তারপর বলল—স্যার, আমি এখন তিনশ' ডলার বের করতে না পারলেও চল্লিশ কোটি ডলারের মালিক।

সার্জেন্ট-এর নির্দেশে এক পুলিশ তাদের উভয়কেই হাজতে ঢুকিয়ে দিল।

হাজতের মেঝেতে কম্বল পেতে শুয়ে জেমস ভাবতে লাগল নচ্ছাড় বুড়োটার কাছে চল্লিশ কোটি ডলার থাকতে পারে, আবার না-ও থাকতে পারে।

পরমুহূর্তেই তার মনে ভাবনার উদয় হল—তার কাছে ডলারগুলো যদি থাকেই তবু অন্যের ব্যাপারে সে মাথা ঘামাতে যাবেইবা কেন? আর বুড়োটাই বা তার ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে পড়ল কেন? তার আসল উদ্দেশ্যটা কি?

তারপর সে তার ভাবনাটাকে অন্য দিকে চালনা করে দিল। একটু বাদেই সে ঝট্ করে পা থেকে মোজা জোড়া খুলে ফেলল। তারপর কম্বলের বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু কম্বলের তলায় কি যেন রয়েছে, উঁচু উঁচু ঠেকছে।

কম্বলের তলায় হাতটা চালান করে দিয়ে একটা বই বের করে আনল। সন্ধ্যার পর পুরনো বইয়ের দোকান থেকে যে দুটো বই সে খরিদ করেছিল এটা তাদেরই একটা—'ক্লার্ক ও এক নাবিকের প্রেয়সী'।

তার ফুসফুস নিঙড়ে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

বইটা সে যেই খুলতে যাবে সে মুহূর্তেই এক প্রহরী এসে গারদের বাইরে দাঁড়িয়ে বলল—আরে ভায়া। তোমার সঙ্গে যে-বুড়োটা হাজতে ঢুকেছে তাকে মালদার লোক বলেই মনে হচ্ছে।

কি করে বুঝলে?

একটু আগেই সে তার এক বন্ধুর কাছে ফোন করেছিল।

তাতে আমার কি লাভ?

সে তোমাকেও খালাস করতে চায়।

আর কিছু?

তুমি গিয়ে তার সঙ্গে দেখা কর।

আরে ধ্যুৎ! যত্তসব ধান্ধা! তুমি গিয়ে তাকে বল, আমি নেই।

সাইছে অ্যান্ড দ্য স্কাইস্ক্রেপার

আপনি একজন দার্শনিক হলে এ কাজটা আপনার পক্ষে করা সম্ভব, আকাশচুম্বী একটা বাড়ির মাথায় উঠে যান, তিন শ' ফুট নিচে অবস্থানরত আপনার পরিচিত ব্যক্তিদের দিকে তাকান আর কীট-পতঙ্গের মত তুচ্ছাতিতুচ্ছ জ্ঞান করুন। গ্রীষ্মে এঁদো পুকুর আর ডোবার কালো কালো পোকার মত তারাও বে-আক্কেলের উদ্দেশ্যহীনভাবে চলাফেরা—নড়াচড়া করে। তবে তাদের মাথায় কিন্তু পিঁপড়ের মত পাকা বুদ্ধি নেই। কারণ, পিঁপড়েরা সব সময়ই জানে তাদের গতি ঘরমুখো।

তবে? তবে বাড়ির মাথায় অবস্থানরত দার্শনিকের দৃষ্টিতে মানুষ কিন্তু বুকে-হাঁটা ঝিঁ ঝিঁ পোকা ছাড়া কিছু নয়। কবি, সাহিত্যিক, দালাল, ধনকুবের, রাজনীতিবিদ আর জুতো পালিশওয়ালা—সবাই, সবাই সমান—একাকার হয়ে যায়। সবাই এতটুকু একটা বুড়ো আঙুলের চেয়েও বড় নয়। আশ্চর্য ব্যাপার!

উঁচু ছাদের ওপর অবস্থানরত দার্শনিকের চোখে আজ সমুদ্র একটা পানা-পুকুর, আর পৃথিবীটা গল্‌ফ খেলার মাঠে পরিণত হয়ে যায়।

তার মন থেকে জীবনের যাবতীয় তুচ্ছতা-ক্ষুদ্রতা লোপ পেয়ে যায়। অনন্ত অসীম মুক্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকার ফলে তার মনের ওপর বিশালত্বের প্রভাব পড়ায় মনটা প্রসারিত হয়ে যায়।

আর? আর সে অনুভব করে সে মহাকালের সন্তান ছাড়া কিছুই নয়।

নিঃসন্দেহ হওয়া যায় যে, একজন দার্শনিকের মধ্যে এ চিন্তাগুলো ছবির মত ভেসে উঠবে।

ধরুন, আপনার নাম ডেইজি। আপনি অষ্টম এভিনিউর মোরব্বার দোকানের কর্মী, বয়স উনিশ বছর। বেতন পান হপ্তায় ছ' ডলার। স্যাঁতসেঁতে ছোট্ট একটা ঘরে থাকেন। রোজ দশ সেন্ট দিয়ে দুপুরের খাওয়া সারেন। সকাল সাড়ে ছ'টায় ঘুম থেকে উঠে ন'টা পর্যন্ত কাজ করেন। দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎও পড়াশুনা করেননি।

সবই মেনে নিলাম। সে সবের সঙ্গে এর সম্পর্ক কি?

সম্পর্ক একটাই, যা বললাম তা যদি সত্য হয় তবে একটা আকাশচুম্বী বাড়ির মাথায় দাঁড়ালে আপনি অবশ্যই সব কিছু এমনটাই দেখতে পাবেন।

দার্শনিক জ্ঞানহীন ডেইজির দু'জন পাণিপ্রার্থী আছে। তার পাণিপ্রার্থীদের একজন নিউইয়র্কের সবচেয়ে ছোট একটা দোকানের মালিক। তার নাম জো। সে ফলমূল, মোরব্বা, খবরের কাগজ, সিগারেট, লেমোনেড আর গানের বই সবই দোকানে রাখে। ছোট্ট ফলমূলের দোকানের মালিক হলেও ব্যবসায়ী বুদ্ধি রাখে যথেষ্টই, কর্মঠও বটে। এ মার্কিন যুবকটা এর মধ্য থেকে বেশ মালকড়ি জমিয়ে ফেলেছে।

জো জমানো অর্থকড়ি সম্বন্ধে ভাবে, এগুলো খরচাপাতি করার সময় ডেইজি পাশে পাশে থেকে তাকে সাহায্য সহযোগিতা করবে।

সত্যি কথা বলতে কি একবার নয়, জো তিন তিনবার ডেইজিকে আপন করে পাশে পেতে উদ্যোগীও হয়েছিল।

রোজ সকালে ডেইজি কাজে যাওয়ার সময় জো-র দোকানের সামনের রাস্তাটা দিয়ে যায়।

রাস্তা পাড়ি দিতে গিয়ে জো-র দোকানের সামনে হাজির হলেই গলা ছেড়ে বলে—এই যে, দুই গুণ চার ; তোমার দোকানটা মনে হচ্ছে কেমন ফাঁকা ফাঁকা, ব্যাপার কি?

ঠোটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে জো জবাব দেয়—আমার দোকানটা যে ছোট্ট, দেখছই তো।

তাই বুঝি?

আরে জায়গা যত কমই হোক না কেন, তোমার জন্য জায়গা ফাঁকাই আছে ডেইজি। ডেইজি মুচকি হাসে।

জো বলে চলে—আমি আর আমার দোকানটা উভয়েই তোমার পথ চেয়ে বসে। কবে তোমার যে সময় হবে তা তুমিই জান। কথাটা বলেই সে চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

ডেইজি ঘৃণায় নাক সিঁটকে বলল—সার্ডিন মাছের পেটি, বলেই ফেল! আমার অপেক্ষায় আছে, বললে না? চমৎকার! একশ' পাউণ্ড মোরব্বা কাটতে হবে সবার আগে, আমি আর ওর মধ্যে মাথা ঘামাচ্ছি না, শুনে রাখ জো।

পরদিন আবার একই রকম সম্বোধন ও কথাবার্তা হয়। রোজই।

অন্য আর এক যুবক ডেইজির পিছনে ঘুর ঘুর করতে আরম্ভ করছে জো-র মাস কয়েক পরে। ডেইজি যে বাড়িটায় থাকে সেখানেই সে ঘর ভাড়া নিয়েছে।

ডেইজির দ্বিতীয় পাণিপ্রার্থী যুবকটার নাম মিঃ ডাবস্টার।

মিঃ ডাবস্টার একজন দার্শনিক। তবে এ বিষয়ে তার জ্ঞান 'অ-আ-ক-খ' পর্যন্তই।

এক শনিবার বিকেলে ডেইজি আর মিঃ ডাবস্টার জো-র দোকানে এল। ডাবস্টার-এর মাথায় চওড়া রেশমী টুপি। টুপিটা দেখে জো মোটেই মিইয়ে গেল না। তাদের আসার উদ্দেশ্য একটামাত্র আনারসের চুইংগাম কেনা।

ডেইজি তার পাণিপ্রার্থীদের মধ্যে পরিচয় করিয়ে দিল। তারপর কথাটা জো-র কাছে পাড়ল—জান, মিঃ ডাবস্টার আমাকে নিয়ে বহুতল বাড়িটার মাথায় উঠে চারদিকের দৃশ্যাবলী দেখাবে। এর আগে আমি কোন দিন কোন বহুতল বাড়ির মাথায় উঠিনি।

জো প্রায় অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করল—তাই বুঝি?

ডেইজি বলে চলল—এত উঁচুতে উঠলে কী মজাই না লাগবে!

মিঃ ডাবস্টার বলল—ব্যাপারটায় কেবলমাত্র নতুন অভিজ্ঞতা লাভই হবে না, শিক্ষাও কম লাভ করা যাবে না। আশা করছি, মিস ডেইজি-র মন প্রাণ খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠবে।

ডেইজি ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল—জো, তোমাকে একটা খাঁচা-বন্দী মমির মত দেখাচ্ছে।

হুম!

দোকানটা তো দেখছি মালপত্রে বোঝাই। কথাটা বলেই সে ফিক্ ফিক্ করে বিশ্রী স্বরে হাসতে লাগল।

কয়েক মিনিট বাদেই ডেইজি মিঃ ডাবস্টার-এর হাত ধরে লিফ্‌ট থেকে বহুতল বাড়িটার ছাদের ওপরে নামল। খোলা ছাদ।

ডাবস্টার এবার তাকে নিয়ে ছাদের রেলিঙের কাছে গেল। রেলিং থেকে নিচের রাজপথের দিকে উঁকি দিয়েই ডেইজি কাঁপা কাঁপা গলায় বলে উঠল—আরে ব্বাস! ওগুলো কি?

দু' পেয়ে প্রাণী। মাত্র তিন শ' চল্লিশ ফুট উঁচু থেকে তারা কেমন দেখায়! ঠিক যেন কীট-পতঙ্গগুলো হাঁটা চলা করছে।

আরে ধ্যুৎ। তা হতে যাবে কেন। মোটেই তা নয়। তারা যে মানুষ—নারী পুরুষ। আরে একটা মোটরগাড়িও তো এখন পর্যন্ত চোখে পড়ে নি। উফ্! কী যে মজা পাচ্ছি।

তাই বুঝি! খুব মজা পাচ্ছ?

পথের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই বলল—আসলে আগে কোন দিন যে এত উঁচুতে উঠিনি।

নিচের শহরটাকে তাদের চোখে সাজানো গোছানো একটা পুতুলের সংসার বলেই মনে হতে লাগল। শীতের সন্ধ্যার প্রথম আলোর ঝলকানি যেন আকাশের তারাগুলোর মত মনে হতে লাগল।

আর? দক্ষিণ ও পূর্বে উপসাগর আর সমুদ্র যেন রহস্যজনকভাবে আকাশের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

এসব ডেইজি-র কাছে বেশীক্ষণ ভাল লাগল না। সে বিষণ্নমুখে বলল—এ সব আমার ভাল

লাগছে না। মিছে এখানে দাঁড়িয়ে না থেকে চল, নিচে যাওয়া যাক।

দার্শনিক মিঃ ডাবস্টার ডেইজির প্রস্তাবটাকে স্বাগত জানাতে পারল না।

মিইয়ে যাওয়া বীতশ্রদ্ধ ডেইজিকে সে কাতর মিনতির স্বরে বোঝাতে লাগল—শোন, পাগলামি কোরো না। এমন অপূর্ব একটা সুযোগ সচরাচর পাওয়া যায় না।

হোক গে। চল, নিচে যাই।

শোন, মানুষের ক্ষুদ্রতার কথা আমরা হাতে নাতে প্রমাণ পাচ্ছি, তাই না?

তা হোক, নিচে চল।

মিঃ ডাবস্টার তার কথায় কান না দিয়ে বলে চলল—পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে মাত্র এতটুকু দূরত্বে মানুষ আর তার কর্মকাণ্ড কত তুচ্ছ, কত নগণ্য মনে হচ্ছে।

তোমার কথার মধ্যে আমাকে জড়িয়ো না। যে উচ্চতা মানুষকে মাছির মত করে দেয় ততখানি উঁচুতে ওঠা রীতিমত এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার ছাড়া কিছু নয়।

শোন-শোন ডেইজি—

তাকে থামিয়ে দিয়ে ডেইজি এবার বলল—মাছির মত দেখতে ওই মানুষগুলোর মধ্যে জো-ও তো একজন হতে পারে। আরে, এর চেয়ে আমরা তো নিউজার্সিতেও গিয়ে থাকতে পারি। আসলে এতটা উঁচুতে ওঠায় আমার বুকের ভেতরে ধুকপুক করছে।

জান, মহাশূন্যে সমগ্র বিশ্বটাই তো একটা যবের দানার সমতুল্য। ওই-ওই যে, ওদিকে ওপরের দিকে তাকাও।

ডেইজি আতঙ্কিত চোখের মণি দুটো মেলে ওপরের দিকে তাকাল। সবে আকাশে তারা ফুটতে শুরু করেছে।

ডাবস্টার একটা তারার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলল—ওটা শুকতারা, সন্ধ্যাতারা বলেও সম্বোধন করা হয়।

হ্যাঁ।

সূর্য থেকে ওটার দূরত্ব তেষট্টি কোটি মাইল।

ধ্যুৎ! বাজে কথা। আমি কোত্থেকে এসেছি বলে তুমি মনে কর? ব্রুকলিন থেকে?

মিঃ ডাবস্টার নীরব রইল।

ডেইজি এবার বলল—জান, আমাদের সঙ্গে কাজ করে সুসি প্রাইস নামে একটা মেয়ে, তার ভাই তাকে সানফ্রান্সিসকো যাবার একটা টিকিট পাঠিয়েছে।

তা পাঠাতেও পারে। তার সঙ্গে শুকতারার সম্পর্ক—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ডেইজি বলল—সান ফ্রান্সিসকোর দূরত্ব তো মাত্র তিন হাজার মাইল। আর বলছ, সূর্য থেকে শুকতারার দূরত্ব এত? তেষট্টি কোটি—যত্তসব আজগুবি কথা!

দার্শনিক ডাবস্টার ক্ষমার হাসি হেসে বলল—সূর্য থেকে আমাদের পৃথিবীটার দূরত্ব কত জান?

ডেইজি বিরক্তি মিশ্রিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকাল।

ডাবস্টার তার জিজ্ঞাসা দূর করতে গিয়ে বলল—একানব্বই কোটি মাইল। বড়সড় আঠারোটা তারা আমাদের কাছ থেকে সূর্যের চেয়েও দু'লক্ষ এগার হাজার মাইল দূরে অবস্থান করছে।

আরও অবাক হবার মত কথা, তাদের মধ্যে যেকোন একটা তারা নিভে গেলে আমরা সেটাকে নিভে যেতে দেখব আরও তিন বছর বাদে।

আকারের বিচারে ছ'হাজারটা ষষ্ঠ শ্রেণীর তারার অস্তিত্ব রয়েছে। তাদের যেকোন একটা তারার আলো ছত্রিশ বছরে পৃথিবীতে পৌঁছোতে পারে। আঠারো ফুট টেলিস্কোপের সাহায্যে আমরা তেতাল্লিশ কোটি তারা দেখতে পাব।

বাজে কথা। আমাকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্য তুমি আমাকে ধাপ্পা-মিথ্যা কথা ফাঁদছ।

আরে না-না!

হোক গে, আমার ভয় লাগছে! আমি নিচে যাব।

কথাটা বলেই ডেইজি দুম্-দুম্ করে পা ঠুকতে লাগল। অনন্যোপায় হয়ে ডাবস্টার তাকে নিয়ে

লিফ্‌টে উঠল। ডাবস্টার লক্ষ করল, ডেইজির সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপছে।

লিফ্‌টের দরজা দিয়ে বেরিয়েই ডেইজি ডাবস্টার-এর চোখের আড়ালে—উধাও হয়ে গেল। কোথাও তাকে খুঁজে পেল না।

সংখ্যা বা সংখ্যাতত্ত্ব কোনটাই ডেইজিকে খুঁজে বের করার কাজে তাকে সাহায্য করতে পারল না।

জো-র ঘরের দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল। ডেইজি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে তার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ডুকরে ডুকরে কেঁদে সে বলতে লাগল—জো আমার জো, আমি বহুতল বাড়িটার মাথায় উঠেছিলাম। সেটা আরাম আয়েশের জায়গা নয়। জো, আমি তোমার জন্য মনকে তৈরী করে ফেলেছি।

ডেইজি! ডেইজি!

হ্যাঁ, আমি মনের সঙ্গে নিজের বোঝাপড়া করে ফেলেছি। তুমি এখন চাইলেই আমাকে পেয়ে যাবে।

দ্য গোল্ড দ্যাট গ্লিটার্ড

একদিন দুপুরে পঞ্চাশ নম্বর জেটিতে একটা মার্কিন জাহাজ থেকে কার্টাজেন থেকে আসা জেনারেল পেরিকো জিমেনেস ভিল্লাব্রাঙ্কা ফ্যালকন নামধারী এক যাত্রী নামলেন। তাঁর উচ্চতা পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি আর কোমর বিয়াল্লিশ ইঞ্চি। তার গোঁফজোড়া দেখতে অবিকল বন্দুক দাগার গ্যালারির মত। আর পোশাক আশাকে দেখলে তাকে একজন আইন-কানুন অজ্ঞ প্রতিনিধি বলেই মনে হয়।

এল রেফুজিও নামক রাস্তাটা খুঁজে বের করার মত সামান্য ইংরেজিটুকুও জেনারেল ফ্যালকন-এর আছে।

রেস্তোরাঁটার কাছাকাছি যেতেই তার চোখে পড়ল 'হোটেল এস্পানল' লেখা সাইনবোর্ড ঝোলানো লাল ইটের বাড়িটা। আর বাড়িটার জানালায় একটা বোর্ডে লেখা দেখল—আকুই সে হাব্‌লা এস্পানল।

আরাম আয়েশে থাকা যাবে ভেবে জেনারেল হোটেলের সদর-দরজা দিয়ে সোজা ভেতরে ঢুকে গেলেন।

হোটেলের মালিক মিসেস ও'ব্রায়েন। তারমধ্যে অমায়িকতার বড়ই অভাব। নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে জেনারেল বললেন—ম্যাডাম, আমি কলম্বিয়ার অধিবাসী। জানালায় ঝোলানো বিজ্ঞাপনটা বলে দিচ্ছে, এখানে স্প্যানিশ ভাষার চল, ঠিক কিনা?

মুচকি হেসে ম্যাডাম বললেন—আপনি তো স্প্যানিশ ভাষায় ভালই কথা বলছেন। আমি এ ভাষায় এত ভাল কথা বলতে পারি না।

জেনারেল একটা ঘর ভাড়া নিয়ে হোটেল এস্পানলে মাথা গোঁজার জায়গা করে নিলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলেই পথে নামেন, ঘুরে ঘুরে শহরের আশ্চর্যজনক সব কিছু দেখে বেড়ান। পথ চলতে চলতেই মাদময়জেল ও'ব্রায়েন-এর সোনালি চুলের ছবি যেন ছায়াছবির মত তার মনের কোণে ভেসে ওঠে।

আপন মনেই তিনি বলে ওঠেন—বিশ্বশ্রেষ্ঠ রূপসীর দেখা এখানেই মিলবে।

না, কারও রূপ-সৌন্দর্যের ব্যাপার নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা তো জেনারেল ফ্যালকন-এর কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না।

একদিন রিয়ালোটাব আর ব্রডওয়ের মোড়ে জেনারেল যেন কেমন আনমনা হয়ে গেলেন। এক ঠেলাগাড়িওয়ালা তাঁকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল।

কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে জেনারেল আবার এগিয়ে চললেন। কিন্তু কয়েক পা এগিয়ে যেতেই এক বাদামওয়ালা এমন জোরে শিস দিতে লাগল যে জেনারেলের কানে তালা লেগে যাওয়ার জোগাড় হল। তিনি তাকে পরিচয় দেবার জন্য হম্বিতম্বি করতে লাগলেন।

শহরের মানুষের বেয়াদপি দেখে জেনারেল মুখ বিকৃত করে আপন মনে বলে উঠলেন—কী বিশ্রী ব্যাপার স্যাপার রে বাবা! যত্তসব ভূতুড়ে কাণ্ড!

রাজপথের জনস্রোতের মধ্য থেকে দু'জন কুখ্যাত শিকারী জেনারেলের দুরবস্থার ব্যাপারগুলো দেখতে পেল। তাদের একজন কেলি আর ম্যাকগুইর। উভয়েই শহরের দুর্ধর্ষ গুণ্ডা বলে পরিচিত।

কেলি শিকার জেনারেলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সে কুনুই দিয়ে সজোরে একটা গুঁতো দিয়ে ম্যাকগুইর-এর আক্রমণ প্রতিহত করে দিল।

কেলি-র দাবী, সে সবার আগে জেনারেলকে দেখেছে।

বেগতিক দেখে ম্যাকগুইর মাথা নিচু করে সেখান থেকে কেটে পড়ল।

কেলি এবার জেনারেলের টুপিটাকে পথ থেকে তুলে নিয়ে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বলল—স্যার, আপনাকে ভিড়ের মধ্যে নাজেহাল হতে দেখলাম। তাই আমাকে এগিয়ে আসতেই হল।

জেনারেল তাকে পরোপকারী বলেই মনে করলেন। তিনি কেলিকে বললেন—ভাই, আমি ও'ব্রায়েন-এর হোটেলে যেতে চাই। এ নুয়েভাইয়র্ক শহরে দেখছি, নিরাপদে চলাফেরাই সমস্যা।

নিজের মর্যাদাবোধের তাগিদেই কেলি জেনারেলকে তার হোটেলে পৌঁছে দিতে সাহস করল।

কেলি এস্পানল হোটেলটাকে 'দাগোদে'র ঘাঁটি বলেই জানে। সে সব বিদেশীদের দুটো শ্রেণীতে ভাগ করেছে—ফরাসি আর দাগো।

হোটেলের দরজায় পৌঁছে কেলি বলল—স্যার, চলুন, ভেতরে একটু পানাহার করতে করতে আমাদের পরিচয়টাকে একটু সেরে নেওয়া যাক।

ঘণ্টাখানেক বাদেই সবাই দেখল, কেলি, জেনারেল ফ্যালকন এল রেফুজিও-র ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে একই টেবিলে বসে।

জেনারেল একাধিকবার কেলিকে জানাল, কেন তিনি এ শহরে হাজির হয়েছেন। আগ্নেয়াস্ত্র কেনার জন্যই তাকে এতটা পথ পাড়ি দিয়ে এখানে আসতে হয়েছে।

কেলি বলল—আগ্নেয়াস্ত্র? আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে আপনি—

তার কথা শেষ করার আগেই জেনারেল বলে উঠলেন—কলম্বিয়ার বিপ্লবীদের জন্য আমার দু'হাজার উইন্‌চেস্টার রাইফেল প্রয়োজন।

সে তো অনেক টাকার ব্যাপার।

পঁচিশ হাজার ডলারের ড্রাফ্‌ট আমার পকেটেই আছে।

পাশের টেবিলগুলো থেকে অন্যসব বিপ্লবীরা তাদের রাজনৈতিক গোপন কথাগুলো সহ-বিপ্লবীদের কাছে বলাবলি করতে লাগল।

জেনারেল বেশ জোর গলায়ই কেলিকে বললেন যে তার সংবাদটা খুবই গোপনীয়। কোনক্রমেই যেন খরচটা দশ কান না হয়।

কেলি আবেগে-উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে জেনারেলের সঙ্গে করমর্দন করল।

করমর্দন সারতে সারতে কেলি বলল—জেনারেল, আপনার দেশ কোনটা আমার জানা আছে। আমি কিন্তু সে দেশেরই পক্ষে। আর আমি এ-ও জানি, আপনার দেশটা যুক্তরাষ্ট্রেরই একটা শাখা। আমি বলব, বরাতের জোরেই আজ আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল।

আমিও ব্যাপারটাকে ভাগ্যের ব্যাপার বলেই মনে করছি।

দেখুন, আমি একমাত্র লোক যে আপনাকে আপনার বাঞ্ছিত বন্দুকগুলো সরবরাহ করতে সক্ষম। যুক্তরাষ্ট্রের সমর-সচিব আমার এক গ্লাসের দোস্ত।

তবে তো আমি সেটাকে সৌভাগ্যের ব্যাপার বলেই মনে করছি।

যে কথা বলছিলাম, সম্প্রতি তিনি এ শহরেই অবস্থান করছেন। কালই আমি তাঁর সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হচ্ছি। কালই আপনাকে নিয়ে তাঁর কাছে যাব ভাবছি।

কথা বলতে বলতে জেনারেলের কোটের পকেটের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে কেলি এবার বলল—আপনার পকেটের ডলারের নোটগুলো পকেটে ভালভাবে গুঁজে দিন।

জেনারেল নোটগুলোকে পকেটের ভেতরে ঢোকাতে ঢোকাতে বললেন—ধন্যবাদ।

কেলি এবার বলল—দেখুন, নিউইয়র্ক থেকে বন্দুক পাচার করার ব্যাপারটাকে আপনি যদি সহজ কাজ বলে মনে করেন তবে কিন্তু দারুণ ভুল করবেন।

তা কি করে ভাবব, বলুন তো?

স্বয়ং ম্যাকক্লাস্কি-ও কাজটা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে পারেন না।

কেলি হোটেল এস্পানল-এর দরজায় দাঁড়িয়েই করমর্দন সেরে প্রফুল্ল মনে জেনারেলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পথে নামল।

কেলি সেখান থেকে ব্রডওয়ের ম্যাক্‌ক্র্যারি কাফেতে ঢুকে জিমি ডুনকে ফোন করল।

কুশলবার্তাদি সেরে কেলি বলল—জিমি ডুন, তুমি একটা ডাঁহা মিথ্যাবাদী। তুমি তো এখন সমর-সচিব বনে গেছ। একটা বড়সড় মাছকে প্রায় বঁড়শিতে গেঁথে ফেলেছি। এমনটা সচরাচর মেলে না। পকেট ভর্তি ডলারের নোট।

আরে, তাই নাকি?

তবে আর বলছি কি। তুমি ওখানেই অপেক্ষা কর, আমি পরের গাড়িতেই গিয়ে তোমার সঙ্গে মিলিত হচ্ছি।

সে রাত্রেই তারা মিলিত হল। কেলি তাকে পুরো ব্যাপারটা খোলাখুলিই বলল।

কেলি বলল—শোন, শিকারটা কলম্বিয়া থেকে এসেছে। সেখানে একটা ধর্মঘট, নাকি গৃহযুদ্ধ চলছে। দু' হাজার উইনচেস্টার কিনতে এ শহরে পাড়ি দিয়েছে। সে আমাকে পাঁচ হাজার ডলারের দুটো নোট আর দশ হাজার ডলারের দুটো ড্রাফট দেখিয়েছে।

আরে ব্বাস!

শান্ত হও, মাথা ঠাণ্ডা রাখ। সে ব্যাঙ্কে গিয়ে ড্রাফট দুটো ভাঙিয়ে আনা পর্যন্ত আমাদের ধৈর্য ধরতেই হবে।

তবে এক কাজ কর, কাল বিকেল চারটেতে ব্রডওয়েতে নিয়ে এসো, কি বল?

তাই হবে।

ডুন আর কেলি পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পরস্পরের বিপরীত দিকের পথ ধরল।

কেলি এবার লম্বা-লম্বা পায়ে হেঁটে এস্পানল হোটেলে হাজির হ'ল। জেনারেল ফ্যালকন-এর খোঁজ করল।

জেনারেল এদিকে মিসেস ও' ব্রায়েন-এর সঙ্গে মধুর আলোচনায় মেতে রয়েছেন।

একটু বাদেই কেলি তাঁকে খুঁজে বের করল। ব্যস্ত কণ্ঠে বলল—আরে, আপনি এখানে আর সমর-সচিব আমাদের জন্য দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করছেন।

অসমসাহসী কলম্বিয়াবাসীকে নিয়ে কেলি ব্রডওয়েতে উপস্থিত হলেন। তাকে একটা সুসজ্জিত অফিস ঘরে বসিয়ে রেখে কেলি ঘর ছেড়ে কোথায় যেন চলে গেল।

একটু বাদে অফিসেরই অন্য আর একটা ঘরে কেলি তাঁকে নিয়ে গেল।

জেনারেল ঘরটার দরজায় দাঁড়িয়ে দেখল ঘরের ভেতরে এক ভদ্রলোক টেবিলের ওপরে ঝুঁকে নিবিষ্ট মনে কি যেন লেখা ঝোকায় ব্যস্ত।

কেলি যুক্তরাষ্ট্রের সমর সচিবের সঙ্গে জেনারেল ফ্যালকন-এর পরিচয় করিয়ে দিল।

তারপর কেলি তার পুরনো জিগরিদোস্ত সমর-সচিবকে জেনারেলের শহরে আসার উদ্দেশ্যটা বলল।

সবকিছু শোনার পর সমর-সচিব অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে জেনারেলের দিকে তাকিয়ে বললেন—ওঃ বুঝলাম। কলম্বিয়াবাসী?

কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে এবার সে বলল—এ ব্যাপারে কিছু সমস্যা আছে। সে দেশকে সাহায্য করার ব্যাপারে আমার আর প্রেসিডেন্টের মধ্যে মতপার্থক্য যথেষ্টই রয়েছে।

কারণ কি, জানতে পারি? জেনারেল বললেন।

সচিব বললেন—কারণ, প্রেসিডেন্ট প্রতিষ্ঠিত সরকারের প্রতি বেশী সহানুভূতিশীল।

পরমুহূর্তেই রহস্যজনক অথচ উৎসাহব্যঞ্জক হাসির ছোপ মুখে ফুটিয়ে তুলে বললেন—জেনারেল, আশা করি আপনার অবশ্যই জানা আছে, টসালি যুদ্ধের পর কংগ্রেস একটা আইন পাশ করেছে, বাইরে আগ্নেয়াস্ত্র রপ্তানী একমাত্র সমর বিভাগের হাত দিয়ে হবে।

তবে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার উপায়?

আপনার জন্য আমি যদি কিছু করি বা করতে পারি তবে তা অবশ্যই আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু কেলি-র অনুরোধ রক্ষা করার জন্যই। জেনারেল, মুহূর্তের জন্য থেমে সচিব আবার মুখ খুললেন—জেনারেল একটা কাজ কিন্তু আপনাকে অবশ্যই করতে হবে।

বলুন, আমাকে কি করতে হবে?

খুবই গোপনীয়তার সঙ্গে কাজটা হাসিল করতে হবে, মনে রাখবেন। আমি তো একটু আগেই বলেছি, প্রেসিডেন্ট কলম্বিয়াতে আপনাদের বিপ্লবাত্মক কর্মকাণ্ডকে মোটেই সুনজরে দেখেন না।

সচিবের তলব পেয়ে এক আর্দালি ঘরে ঢুকে অভিবাদন জানিয়ে আদেশের ভঙ্গিতে দাঁড়াল।

সচিব বললেন—শোন, ছোটখাটো আগ্নেয়াস্ত্রের বি. তালিকাটা আমার দরকার, নিয়ে এস।

একটু বাদেই আর্দালি একটা ছাপা কাগজ নিয়ে ফিরে এল। সচিব সেটা হাতে নিয়ে চোখের সামনে ধরলেন।

এবার জেনারেল ফ্যালকন-এর দিকে ফিরে বললেন—জেনারেল, সরকারী ন' নম্বর গুদামে মরক্কোর সুলতানের প্রার্থনা অনুযায়ী দু' হাজার উইনচেস্টার বন্দুক জাহাজে চালান যাবার কথা। কিন্তু প্রার্থনা-পক্ষের সঙ্গে সুলতান বন্দুকের জন্য দেয় অর্থ পাঠাতে ভুলে গেছেন।

এতে আমার কোন্ সুবিধা—

জেনারেলকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই সচিব এবার বললেন—হ্যাঁ, সুবিধা কিছু হবার সম্ভাবনা তো আছেই। আমাদের সরকারের নির্দেশ মালের অনুরোধ জানাবার সময় মালের সম্পূর্ণ মূল্য ফিরিয়ে দিতে হবে।

এবার কেলির দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তিনি বললেন—বন্ধু কেলি, আপনার বন্ধু জেনারেল ফ্যালকন চাইলে কারখানার দরেই বন্দুকগুলো পেতে পারবেন।

কেলি মুচকি হাসল।

সচিব এবার কণ্ঠস্বরে ব্যস্ততা প্রকাশ করে বললেন—এবার আমাদের পরস্পরের কাছ থেকে সরে থাকা দরকার।

কারণ?

কারণ, জাপানী মন্ত্রী আর কার্লস মারফির আমার দপ্তরে আসার কথা আছে। আর যেকোন সময় তিনি এখানে চলে আসতে পারেন।

এবার সচিব মশায় দু'দিন আর জেনারেলকে তাঁর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দিলেন না। কারণ, তিনি দু' হাজার শূন্যগর্ভ বন্দুক কিনে তার ভেতরে ইটপাটকেল-ভরার কাজে ব্যস্ত রইলেন।

রাত্রে জেনারেল হোটেলে ফিরে গেলেন। হোটেলের মালিক মিসেস ও'ব্রায়েন তার কাছে এসে অনুচ্চকণ্ঠে, প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল—মশায়, ওই কেলি নচ্ছাড়টা আপনার পিছনে কেন ছিনে জোঁকের মত লেগে রয়েছে, বলুন তো?

মিসেস ও' ব্রায়েন এবার জেনারেলকে নিয়ে পাশের একটা ঘরে গিয়ে নিরিবিলিতে ব্যাপারটা সম্বন্ধে আলোচনায় বসল।

প্রায় এক ঘণ্টা ধরে উভয়ের আলোচনা হল।

তারপর এক সময় জেনারেল বললেন—তবে আপনি বলছেন যে, আঠারো হাজার ডলারের বিনিময়ে বাড়িটা কেনা যাবে? আবার প্রয়োজনে আসবাবপত্র সমেত বাড়িটা লিজও পাওয়া যাবে?

এর চেয়ে সস্তায় আশা করছেন কি?

হায় ঈশ্বর! যুদ্ধ আর রাজনীতি নিয়ে আমি আর মাতামাতি করতে চাই না। যুদ্ধটা চালিয়ে যাবার মত বহু বীরযোদ্ধা আমাদের দেশে রয়েছে। মানুষের প্রশংসা আমার কোন ফয়দা এনে দেবে!

মিসেস ও'ব্রায়েন মনে মনে বলল—হ্যাঁ, ওষুধে কাজ হচ্ছে।

জেনারেল বলে চললেন—এ জায়গাটা আমার খুব পছন্দ। আমার মনের মানুষকে তো এখানেই পেয়ে গেছি। তবে এস, আমরা এ হোটেল এস্পানলটা কিনে ফেলি। তুমি যদি আমার কাছাকাছি পাশাপাশি থাক তবে আর বন্দুক কিনে ডলারগুলো জলে ঢালব না।

মিসেস ও'ব্রায়েন জেনারেলের কাঁধে মাথাটা রেখে সোল্লাসে বলে উঠল—উফ্! সেনিওর, তুমি যে কী ভাল মানুষ!

দু'দিন বাদে আগ্নেয়াস্ত্রগুলো জেনারেলের হাতে তুলে দেবার কথা হয়েছিল।

সচিব একটা ভাড়া-করা গুদামে বন্দুকের পেটিগুলোকে সাজিয়ে রেখেছেন।

পাশের ঘরে বসে অস্থিরচিত্ত সচীব অধীর অপেক্ষায় প্রহর গুনতে লাগল তার জিগরি দোস্ত কখন শিকার জেনারেলকে নিয়ে হাজির হবে।

কেলি হন্তদন্ত হয়ে হোটেল এস্পানলে গিয়ে জেনারেলের সঙ্গে দেখা করল।

জেনারেল সরাসরি বললেন—আমি হঠাৎ সিদ্ধান্তটা বদলে ফেলেছি।

তার মানে?

আমি আর বন্দুকগুলো কিনব না। আজই এ হোটেলের যাবতীয় জিনিসপত্র কিনে নিয়েছি।

হোটেলের জিনিসপত্র কিনে নিয়েছেন?

হ্যাঁ, আর মাদাম ও'ব্রায়েন-এর সঙ্গে আমার বিয়ের পাট আজই মিটিয়ে নেব, সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি।

কথাটা শোনামাত্র কেলি-র মাথায় তো আকাশ ভেঙে যাবার জোগাড় হল। সে চিল্লিয়ে উঠল—তুমি দেখছি একটা পয়লা নম্বরের ফেরেকবাজ! বাটপাড়ি করার আর জায়গা পাওনি! দেশের কাজের জন্য মালকড়ি নিয়ে এসে নিজের জন্য হোটেল কিনে বেইমানি করেছ।

আরে ভায়া, তোমাদের ভাষায় এটাই তো সবচেয়ে বড় রাজনীতি।

রাজনীতি কাকে বলে—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই জেনারেল বলে উঠলেন—আরে, মিছে চটাচটি করছ কেন? রাজনীতি-যুদ্ধ-বিপ্লব এসব আমার জন্য নয়। তার চেয়ে বরং একটা হোটেল আর এক রূপসীকে লাভ করে ঘর-সংসার করা অনেক বেশী সুখের, অনেক বেশী আনন্দের, তোমার কি মত?

দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড দ্য ডোর

সাধারণ পাঠকের কাছে আপনার লেখা যাতে কদর পায় তার জন্য একটা প্রচলিত কৌশল হচ্ছে রীতিমত দৃঢ়তার সঙ্গে বলা, এটা সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা।

আর তারপরই বলতে হবে যে, সত্য ঘটনা উপন্যাসের চেয়েও অত্যাশ্চর্য।

তবে এখন যে গল্পটা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি তার সত্যতা সম্বন্ধে হলফ করে কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

তবে ফলবাহী স্টিমার 'এফ. এল. কারো'-র স্পেন দেশীয় হিসাব রক্ষক সাঁতাগুয়াদালুপ-এর পবিত্র তীর্থের নামে দিব্যি কেটে আমাকে এক সময় বলেছিল যে, যুক্তরাষ্ট্রের লাপাজ-এর ভাইস-কন্সালের মুখ থেকে ঘটনাগুলো সে শুনেছিল।

আমার মুখে গল্পটা শুনে এক পুলিশ অভিভূত হয়ে বলেছিল যে, এরকমটা তো হতেই পারে।

নিউইয়র্ক শহরের এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ধনকুবের প্রমোটার এইচ. ফার্গুসন হেজেস।

যে সন্ধ্যার ঘটনা নিয়ে গল্পটা শুরু হয়েছে সেদিন ফার্গুসন-এর এক ভোজসভায় পাঁচজন ভাল মানুষ জড়ো হয়েছিল।

তার দালাল বন্ধু ওয়েড আর বালফ মেরিয়াম শ্রোতাদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সী ছিল।

বিবাদপ্রবণ আর উদ্ধত প্রকৃতির বলে ফার্গুসন-এর পরিচিত মহলে যথেষ্ট সুনাম রয়েছে।

যাক গল্পের আসর জমতে না জমতেই খুবই তুচ্ছ একটা ব্যাপার নিয়ে কথাকাটি শুরু হয়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত পরিণতি ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে নিল।

ক্রোধোন্মত্ত ফার্গুসন যন্ত্রচালিতের মত তড়াক্ করে লাফিয়ে একটা চেয়ার তুলে নিয়ে সেটাকে মেরিয়াম-এর মাথা লক্ষ্য করে ছুড়ে দিল। আর মেরিয়ামও এক হেঁচকা টান দিয়ে পিস্তলটা বের করে ফার্গুসন-এর বুক লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল।

ব্যস। বিকট চিৎকার করে দলপতি ফার্গুসন চোখের পলকে মেঝেতে পড়ে যন্ত্রণায় গড়াগড়ি দিতে লাগল।

ওয়েড পাশের দরজা দিয়ে মেরিয়ামকে বের করে মোড় অবধি হেঁটে গেল। একটা ভাড়াটে গাড়িতে তাকে নিয়ে চেপে পড়ল। কিছুদূর গিয়ে একটা অন্ধকার জায়গায় গাড়ি থেকে নেমে পড়ল।

পথের বিপরীত দিকের একটা সেলুনের পিছনে নিরিবিলি একটা জায়গায় গেল।

সেখানে মেরিয়ামকে অপেক্ষা করতে বলে পরিস্থিতিটা সম্বন্ধে আঁচ নিয়ে আসার জন্য নিজে চলে গেল।

তখন একটা বাজতে দশ মিনিট বাকি, ওয়েড ফিরে এল। সে খবর নিয়ে এল, লোকটা মারা গেছে। তারপর বলল—বুড়ো, ভাল চাও তো ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে তুমি এখান থেকে কেটে পড়।

তারপর দিন বেলা এগারোটায় ওয়েড বুড়ো মেরিয়ামকে সঙ্গে করে নতুন একটা সুটকেস হাতে করে পাঁচশ' টনের একটা মালবাহী স্টিমারে করে ইস্ট রিভার-এর একটা জাহাজ-ঘাটে পৌঁছে গেল।

জাহাজে ওঠার সময় তার পকেটে ছিল বড় বিলে দু' হাজার আটশ' ডলারের ব্যাঙ্ক-চেক আর একটা হাতচিঠি। চিঠিটায় লেখা রয়েছে নিউইয়র্ক শহর থেকে যত বেশী দূরে সম্ভব চলে যাওয়ার নির্দেশ।

মেরিয়াম বার দু'-তিন স্কুনার ও স্লুপ পাল্টে পাল্টে সোলান-এ হাজির হল।

পানামায় যোজকটা অতিক্রম করল। তারপর মেরিয়াম একটা এক-মাস্তুলের ছোট স্টিমারে চেপে বসল।

দীর্ঘ ভাবনা চিন্তার পর সে লা-পাজ-এ স্টিমার থেকে নেমে পড়ল। ছোট শহর লা-পাজ। রূপসী লা-পাজ! সবুজে ঢাকা, পাহাড়ে ঘেরা ছোট শহরটা সত্যি মনে দাগ কাটার মত।

ক্যাপ্টেনের সহকারী মেরিয়াম-স্টিমার থেকে নামে শহরটার হাল-চাল দেখে নেবার জন্য। আর সে সঙ্গে নারকেলের বাজারটা সম্বন্ধেও একটু ধারণা নিয়ে নিতে চাইছে।

মেরিয়াম নামার সময় সুটকেসটা নিয়ে নামল। জায়গাটা তার মনে ধরে গেল। আর স্টিমারে না উঠে লা-পাজেই রয়ে গেল।

ভাইস-কন্সাল কাল্‌ব।

তিনি যুক্তরাষ্ট্রের একজন এক গ্রীক-আর্মানি নাগরিক। হেসে-ডার্মস্টাডে তার জন্ম। প্রাথমিক বিদ্যালয়েই তার পড়াশুনা সাঙ্গ করতে হয়। তাঁর চোখে সব মার্কিনীই ব্যাংকার ও ভাইয়ের সমান।

অল্প ক'দিনের মধ্যেই মেরিয়াম-এর সঙ্গে ভাইস-কন্সালের গভীর হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠল।

আর লা-পাজ শহরে যত সৌখিন ভদ্রজন আছে তাদের প্রায় সবার সঙ্গেও অল্প ক'দিনের মধ্যে মেরিয়াম-এর বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। এর মূলে অবশ্য অমায়িক ও বন্ধু বৎসল ভাইস কন্সালের বন্ধুপ্রীতি বেশী করে কাজ করেছে।

এখানে সমুদ্রের দিকে মুখ করে একটা ছোট কাঠের হোটেল রয়েছে। এখানে মুখ বদলাবার জন্য বিদেশীদেরই বেশী সমাগম ঘটে।

কাঠের হোটেলেই ভাইস-কন্সাল কাল্ব-এর মধ্যস্থতায় এক জার্মান ডাক্তারের সঙ্গে পরিচয় ও ক্রমে হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

তারপর এক ফরাসী সোনার কারবারী, এক ইতালীয় রবারের বণিক আর তিন-চারজন মার্কিনী মেহগনি কাঠের ব্যাপারীর সঙ্গেও অচিরেই মেরিয়াম-এর পরিচয় হয়, তবে এ-ও সত্য যে, মানুষ হিসেবে তারা কেউ-ই বন্ধু হিসাবে বাঞ্ছনীয় নয়।

এক রাত্রে খাবারের পাট চুকিয়ে হাইড্রলিক সাইনিং-এ উৎসাহী এক যুবকের সঙ্গে হোটেলের বারান্দার এক কোণে মুখোমুখি চেয়ারে বসল। যুবকের নাম বিব।

কথা প্রসঙ্গে যুবক বিব বলল—মাত্র আর একটা বছর আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। তারপরই আমি ঈশ্বরের দেশে ফিরে যাব। এ দেশটা যে সুন্দর তা স্বীকার করছি। কোন কিছুরই অভাব নেই।

মেরিয়াম বলল—তবে এ দেশ ছেড়ে যাবার চিন্তা করছ কেন?

সব থাকলেও এখানে শ্বেতাঙ্গদের বাসোপযোগী সবরকম ব্যবস্থা নেই।

যেমন?

দেখ, আমাদের মধ্যে যার-ই সমুদ্রে ডুবে মরার সাধ হয় তখনই সে রূপসী মিসেস কোনান্ট-এর কাছে ছুটে যায়।

কেন? কপালের চামড়ায় ভাঁজ এঁকে মেরিয়াম প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বিব বলল—তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাড়তে।

তারপর?

আরে ভায়া, জলে ডুবে মরার চেয়ে মিসেস কোনান্ট-এর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হওয়া যে অনেক, অনেক বেশী মধুর।

অবিশ্বাসের ছাপ চোখের তারায় এঁকে মেরিয়াম নীরবে বিব-এর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

বিব এবার বলল—অনেকে বলে, সমুদ্রের জলে ডুবে মরা নাকি এক মহাআনন্দময় অনুভূতি। স্বপ্নাতীত ব্যাপারও বলা চলে।

মিসেস কোনান্টকে এখনকার অনেকেরই পছন্দ, তাই না? মেরিয়াম প্রশ্ন করল।

সব ব্যাপারে অবশ্যই নয়।

তার মানে?

আরে ভায়া, লা-পাজ শহরে মিসেস কোনান্টই-তো একমাত্র শ্বেতকায়া।

সে কতদিন যাবৎ এখানে আছে?

বছর খানেক আগেই এ শহরে পা দিয়েছে।

আগে কোথায় ছিল?

এ ব্যাপারে নানা জনের নানা মত। কেউ বলে ফ্লোরিডা, কেউ বলে ওসকোশ থেকে এসেছে। আবার হয়ত কারো মুখে শুনবে কড অন্তরীপ থেকে এসে এখানে আস্তানা গেড়েছে।

রীতিমত রহস্যময়ী নারী, তাই না?

হ্যাঁ, তার ভাব ভঙ্গি তো সে রকমই ভাবতে উৎসাহী করে। তবে একটা ব্যাপার কিন্তু খুবই লক্ষ্যণীয়।

কি? কিসের কথা বলছ?

চালচলন আর কথাবার্তায় খুবই ছিমছাম। দর্শনার্থীরা কেবলমাত্র রাত্রের খাবার খেতে এখানে ভিড় করে। কিন্তু কেবলমাত্র বার্লি ছাড়া এখানে খাবার মত আর কি-ই বা আছে, বল? মেরিয়াম, তুমি ওই শ্বেতকায়া স্ফিনস্ক-এর পাণিপ্রার্থনা করতে পার।

তবে অল্প কথায় বলেই ফেলি—মেরিয়াম তার দরজায় হানা দিয়েছিল। তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল। তার চপল চাপল চোখের মণি দুটোতে রহস্যের চমকানি থাকলেও মেরিয়াম তাকে একটা সাধারণ মেয়ে হিসাবেই দেখেছিল।

স্ফিনস্ক-এর সঙ্গে মেরিয়াম-এর প্রেমের ব্যাপারটা তিন মাস স্থায়ী হয়েছিল। এ সময়টুকুতে দেশ থেকে তার কাছে কোন খবর আসে নি। ওয়েডও তার খবর নেয় নি। আর ওয়েড-এর ঠিকানা

জানা না থাকায় সে-ও তার খবরাখবর নিতে পারে নি। সবচেয়ে বড় কথা সে ওয়েড'কে চিঠি দিতে ভয় করে।

মেরিয়াম এ মুহূর্তে ভাবছে, নৌকো ভাসতে ভাসতে যেদিকে যায় যাক।

এক বিকেলে মেরিয়াম ও স্ফিনস্ক দুটো টাট্টু ঘোড়া ভাড়া করে চলে গেল পাহাড়ী নদীটার কাছে।

নদীটার কাছে পৌঁছে তারা জলপান করার জন্য ঘোড়া থেকে নামল। নদীর ধারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মেরিয়াম বিব-এর পরামর্শমাফিক স্ফিনস্ক কোনান্ট-এর কাছে বিয়ের প্রস্তাবটা পেড়ে বসল।

কথাটা শোনামাত্র স্ফিনস্ক চোখে-মুখে এমন একটা ভাব ফুটিয়ে তুলল যে, মুহূর্তে তার মধ থেকে বিয়ের সাধ উবে গেল।

একটু বাদেই মেরিয়াম নিজেকে সামলে নিয়ে কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে উঠল।

সে ঝট করে স্ফিনস্ক-এর হাতটা ছেড়ে দিয়ে কাতর স্বরে বলে উঠল—মিসেস কোনান্ট, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। তবে এটুকু জেনে রেখো, যা বললাম, শতকরা একশ' ভাগই আমার মনের কথা।

স্ফিনস্ক নিষ্পলক চোখে নদীটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

মেরিয়াম বলে চলল—দেখ, আমাকে বিয়ে করার জন্য তোমার ওপর জোর খাটাতে পারি না, সে ইচ্ছাও আমার নেই। নিউইয়র্কে আমি এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে কাপুরুষের মত গুলি করে হত্যা করেছি। আমি খুনী। তবু প্রস্তাবটা তোমাকে না দিয়ে পারলাম না।

হুম্।

তবে তুমি জেনে রাখ স্ফিনস্ক, এটাই আমার চিরদিনের বাসনা হয়ে রইল।

একটা লেবুগাছের ডাল থেকে অন্যমনস্কভাবে কয়েকটা পাতা ছিঁড়তে ছিঁড়তে স্ফিনস্ক কোনান্ট ভাঙা ভাঙা গলায় উচ্চারণ করল : আমার মতও ঠিক তা-ই। সেটা তো পুরোপুরি তোমার ওপরই নির্ভর করছে মেরিয়াম। আমার শরীরেও যে তোমার মতই সততার চিহ্ন আঁকা আছে।

মেরিয়াম যন্ত্রচালিতের মত মুখ তুলে তার দিকে জিজ্ঞাসা দৃষ্টিতে তাকাল।

স্ফিনস্ক বলে চলল—হ্যাঁ, আমার কথা একবিন্দুও মিথ্যে নয়। আমার স্বামীকে আমি বিষ খাইয়ে মেরেছি। নিজের হাতে বিধবা সেজেছি।

তাই নাকি!

তুমিই বল মেরিয়াম, কেউ জেনেশুনে কোন খুনী মেয়েকে বিয়ে করা তো দূরের কথা, ভালবাসতে পারে, তুমিই বল? তাই আমারও বিশ্বাস, আমাদের প্রেমের এখানেই সমাধি ঘটল।

উভয়ের চোখেই নেমে এল হতাশার ছাপ।

মহূর্তে স্ফিনস্ক-এর চোখ দুটো দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরোতে লাগল। সে হাত দুটো মুঠো করে প্রায় আর্তনাদ করে উঠল—আমাকে হয় অভিসম্পাত কর, নতুবা ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নাও। কিন্তু দোহাই তোমার, আমার দিকে অমন করে নীরবে তাকিয়ে থেকো না।

পরমুহূর্তে অধিকতর আর্তস্বরে সে উচ্চারণ করল—মার খেতেই আমি এসেছি। আমার বাহুতে, পিঠে আর এখানে-ওখানে কত যে ক্ষতচিহ্ন তা যদি তোমাকে দেখাতে পারতাম—সবই এক বছর আগেকার।

স্ফিনস্ক!

হ্যাঁ, সবই ওই পশুটার আদরের চিহ্ন। যেকোন মঠবাসিনীই বর্বরটাকে এক ছোবলে খতম করে দিত। আমি স্বীকার করছি, আমি তাকে খুন করেছি—আমি নিজের হাতে তাকে দুনিয়া থেকে তাড়িয়ে নিজের দুঃখ-যন্ত্রণা লাঘব করেছি।

মেরিয়াম নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

স্ফিনস্ক বলে চলল—সেই অভিশপ্ত শেষ রাত্রে সে আমাকে যে কুৎসিত, ভয়ঙ্কর কথা বলেছিল তা যেন আজও আমার কানে বাজে। আজও রাত্রে ঘুমোলেই সে দৃশ্য যেন ছবির মত চোখের সামনে ফুটে ওঠে! উফ! কী ভয়ঙ্কর সে সব কথা! কী পাশবিক তার আচরণ।

হ্যাঁ, তারপরই আমার ধৈর্যের বাধ ভেঙে গেল। ভেতরে জেগে উঠল লিপ্সা আর মুক্তির

আকাঙ্ক্ষা।

আমি বিষ জোগাড় করে ফেললাম। রোজ রাত্রে রাম আর মদ মিশিয়ে খাওয়া ছিল তার বহুদিনের অভ্যাস। আর মিশ্রণের গ্লাসটা আমাকেই এগিয়ে দিতে হত।

কারণ কি?

কারণ একটাই, সে ভালই জানত, মদের গন্ধ আমি সহ্য করতে পারি না। সে রাত্রে পরিচারিকা মদের গ্লাসটা আমার হাতে এনে দিয়ে নিজের কাজে চলে গেল।

তারপর গ্লাসটা নিয়ে আমি সন্তর্পণে আমার ঘরে গেলাম। তাতে এক চামচ একোনাইট টিংচার মিশিয়ে দিলাম।

একোনাইট টিংচার! শুনেছি এটা খুবই তেজী বিষ।

হ্যাঁ, যে পরিমাণটা দিয়েছিলাম তাতে তিন-তিনজন মানুষের মৃত্যুর পক্ষে যথেষ্ট।

তারপর যা বলছি শোন—ব্যাঙ্ক থেকে আমার সঞ্চিত ছ' হাজার ডলার আমি আগে তুলে এনেছিলাম, আর সে রাত্রেই ডলারগুলো সম্বল করে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

লাইব্রেরীর পাশ দিয়ে যাবার সময় তার পায়ের শব্দ, আর্তস্বর কানে এল। পরমুহূর্তেই কোচের ওপর তার দশাসই দেহটাকে আছাড় খেয়ে পড়তেও শুনেছিলাম।

যাক, বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা নিউ অর্লিয়েন্স স্টেশনে এসে রাত্রের ট্রেনে উঠে পড়ি। এখানে-ওখানে ঘুরে ঘুরে লা-পাজাতে এসে থিতু হলাম।

সে মেরিয়ামের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে তারপর বলল—এবার তুমি কি বলতে চাচ্ছ, বল? তুমি কি মুখ খুলতে পারবে, বল?

মেরিয়াম নীরবে দু'পা এগিয়ে গিয়ে তার হাত দুটো চেপে ধরে আবেগের সঙ্গে বলল—স্ফিনস্ক, তবু আমি তোমাকে চাই। তোমার অতীত-কাহিনী নিয়ে আমার এতটুকুও ভাবনা নেই।

স্ফিনস্ক মধুর আর্তনাদ করে উঠল—মেরিয়াম, মেরিয়াম, তুমি হও আমার নতুন জগৎ—নতুন জীবনেব—

কথা সে আর শেষ করতে পারল না। অবিশ্বাস্যভাবে সে নিজের দেহটাকে এমনভাবে এলিয়ে দিল যে, মেরিয়াম হঠাৎ ধরে না ফেললে মাটিতে আছড়েই পড়ত।

মেরিয়াম হোটেল এরিল্লা ডেলমার-এর হলঘরে স্ফিনস্ক-এর সঙ্গে তার বিয়ের কথা ঘোষণা করল।

চারজন স্থানীয় আর আটজন বিদেশী অ্যাস্টর মেরিয়াম-এর পিঠ চাপড়ে অভিনন্দন জানাল।

মেরিয়াম আর স্ফিনস্ক একে, অন্যের জগৎ হয়ে উঠল।

হারিয়ে যাওয়া, ফুরিয়ে যাওয়া স্ফিনস্ক-এর মধ্যে আবার প্রাণের স্পন্দন ফিরে এল। তারা মুখোমুখি বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ভবিষ্যতের কতই পরিকল্পনা করতে লাগল।

এক সকালে জাহাজ-ঘাটে একটা স্টিমার ভিড়ল। লা-পাজ-এর মানুষগুলো যেন সেখানে একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। এখানকার মানুষগুলোর এটাই প্রচলিত অভ্যাস।

স্টিমারটার নাম পাজরো। শহরবাসীদের সঙ্গে মেরিয়ামও সমুদ্রের তীরে হাজির হল।

স্টিমারটা থেকে নেমে এল ক্যাপ্টেন, ভাণ্ডারী আর দু'জন যাত্রী।

জাহাজঘাট থেকে বেরিয়ে তারা হোটেলের দিকে এগিয়ে চলল। একটু দূরে দাঁড়িয়ে মেরিয়াম কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাদের দেখতে লাগল। তাদের মধ্যে একজন যেন কেমন চেনাচেনা মনে হতে লাগল।

অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে সে লোকটার দিকে তাকাতেই তার শরীরের সব ক'টা স্নায়ু যেন এক সঙ্গে শিথিল হয়ে আসতে লাগল।

সেই বিশালদেহী পোশাক-আশাকে কেতাদুরস্ত ফার্গুসন তার থেকে মাত্র দশ ফুট দূর দিয়ে জাহাজের অন্যান্যদের সঙ্গে হোটেলের দিকে হেঁটে চলেছে।

আশ্চর্য ব্যাপার। রীতিমত স্তম্ভিত হবার মত ব্যাপারই বটে। সে তো এ লোকটাকেই খুন করেছিল।

মেরিয়ামকে দেখেই ফার্গুসন যেন কালি ছিটিয়ে দিল। পরক্ষণেই মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলে বলে উঠল—আরে, মেরিয়াম যে! তোমাকে দেখে কী যে খুশি হলাম তা আর বলার নয়! কুইনবি, এ আমার বহুদিনের বন্ধু মেরিয়াম।

মেরিয়াম প্রথমে ফার্গুসন-এর সঙ্গে, তারপর কুইনবি-র সঙ্গে করমর্দন সারল।

এবার ফার্গুসন বলল—মেরিয়াম, এখানে ভাল কোন পানাহারের জায়গা থাকলে নিয়ে চল।

মেরিয়ামের বিস্ময়ের ঘোরটুকু তখন পুরোপুরি কাটেনি। সে সবাইকে নিয়ে 'হোটেল এরিল্লা ডেলমা'র দিকে হাঁটতে লাগল।

পথে যেতে যেতে ফার্গুসন তাকে তাদের এখানে আসার উদ্দেশ্যটা বুঝিয়ে বলল—শোন, আমি আর কুইনবি কিছু মালকড়ি লগ্নি করার জন্য এখানে এসেছি। স্টিমারটা ভাড়া-করা, ক্যাপ্টেন-এর মুখে শুনেছি, কাছাকাছি নাকি রূপোর খোঁজ মিলতে পারে।

কুইনবিকে হোটেলে বিশ্রাম করতে বলে ফার্গুসন মেরিয়ামকে নিয়ে নিরালা এক কোণে গেল। তারপর কর্কশ স্বরে খেঁকিয়ে উঠল—এসবের অর্থ কি, জানতে চাই মেরিয়াম?

মেরিয়াম বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

ফার্গুসন এবার বলল—অবাক কাণ্ড তো! আমাদের সে বোকামি কাণ্ডটার জন্য তুমি আজও পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ! সত্যি, অবাক করলে মেরিয়াম।

মেরিয়াম আমতা আমতা করে বলল—আমি ভেবেছিলাম—শুনেছিলাম—মানে অনেকেই বলেছে, আমি নাকি তোমাকে—

ধ্যুৎ! যত্তসব বাজে কথা। তুমিও কিছু কর নি, আর আমিও কোথাও যাই নি। স্রেফ মাসখানেক এক বে-সরকারী হাসপাতালে আমাকে থাকতে হয়েছিল। ব্যস, এখন তো নিজের চোখেই দেখছ আমি দিব্যি আছি। আমি আর ওয়েড তোমাকে হন্যে হয়ে খুঁজেও কোন হদিস পাই নি।

তবে? তবে তুমি সত্যি—

হ্যাঁ, আমি জীবিত। আর এখন তোমার মুখোমুখি বসে কথা বলছি, দেখতেই তো পাচ্ছ।

এবার মেরিয়াম-এর হাতটা ধরে ফার্গুসন বলল—শোন, ব্যাপারটায় দোষ তোমার যেমন ছিল, আমারও কোন অংশে কম ছিল না। অতএব সে সব কথা মন থেকে মুছে ফেল।

এগারোটায় প্রাতরাশ সারতে সারতে মেরিয়াম বলল—ফার্গুসন, ওই যে পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে, আর সমুদ্র আর ঝলমলে রোদ যা কিছু দেখছ, সবই আমার। সব কিছুরই মালিক আমি একা।

মিসেস স্ফিনস্ক পিছনের বারান্দায় দোকানটায় বসে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় নিজেদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছে।

হোটেল থেকে রাত্রের খাবার খেয়ে মেরিয়াম-এর তার কাছে আসার কথা। তারপর তারা পরস্পরের হাত ধরাধরি করে নারকেল বাগানের ভেতর দিয়ে খুশিতে ডগমগ হয়ে কিছুটা সময় হাঁটাহাঁটি করে হোটেলে ফিরবে। ক্রমশ রঙিন-ভাবনায় স্ফিনস্ক যখন হাবুডুবু খাচ্ছে ঠিক তখনই হাতের খবরের কাগজের শিরোনামটার ওপর তার চোখ পড়ল।

খবরের কাগজে ছাপা রয়েছে—লয়েড বি. স্ফিনস্ক বিবাহ-বিচ্ছেদ পেয়ে গেছেন।

তারপরই অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট হরফে ছাপা হয়েছে বিখ্যাত সেন্ট লুই রং প্রস্তুতকারক মামলাটায় জয়লাভ করেছে তার স্ত্রীর এক বছর যাবৎ অনুপস্থিতির কারণ দেখিয়ে। তার রহস্যজনক নিরুদ্দেশের ব্যাপারটা এখানে স্মরণীয়। ব্যস, তারপর থেকে তার কোন খবরই মেলেনি।

সবারই ব্যাপারটা স্মরণে থাকার কথা যে, গত এক বছর আগে মার্চ মাসে স্ফিনস্ক এক সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। একটা কথা চারদিকে প্রচার হয়ে গিয়েছিল যে লয়েড বি কোনান্ট-এর সঙ্গে তার বিয়ে, সংসার-জীবন মোটেই সুখের হয় নি। আর বহু খোশ গল্পও লোকের মুখে-মুখে ঘুরে বেড়াত, মিঃ কোনান্ট স্ত্রীর প্রতি ভয়ানক নিষ্ঠুর আচরণ করত। স্ফিনস্ক নিরুদ্দেশ হবার পর তার শোবার ঘরে পাওয়া গিয়েছিল ভয়ঙ্কর বিষ টিংচার অব একোনাইটের একটা শিশি।

স্ফিনস্ক যে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তার প্রমাণ এ বিষের শিশিটা থেকেই পাওয়া যায়। তবে এ-ও মনে করা যেতে পারে, পরবর্তীকালে সে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত থেকে সরে গিয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়।

স্ফিনস্ক কোনান্ট হাতের খবরের কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অস্থিরভাবে দু'হাতে মাথাটা চেপে ধরে আর্তনাদ করে উঠল—হায় ঈশ্বর! আমাকে অবসর দাও—আমাকে ভাবতে দাও।

বিষের শিশিটাতো আমি সঙ্গেই নিয়ে এসেছিলাম। আর সেটাকে ট্রেনের জানালা দিয়ে ছুঁড়েও ফেলেছিলাম। হ্যাঁ, মনে পড়েছে, বাক্সের ভেতরে আরও একটা শিশি ছিল।

দুটো বোতল পাশাপাশি ছিল। একটাতে ছিল 'ভ্যালেরিয়াম' যেটা আমি ঘুম না হলে ব্যবহার করতাম। আর দ্বিতীয়টায় ছিল 'একোনাইট'।

মুহূর্তের জন্য ভেবে নিয়ে সে আবার স্বগতোক্তি করতে লাগল। কিন্তু একোনাইট-এর শিশিটা তো ভর্তিই ছিল, তবে কেন—

কিন্তু সে লোক তো আজও জীবিতই আছে। তবে? এমন একটা অসম্ভব কি করে সম্ভব হল? আমি কি তবে তাড়াহুড়োর মধ্যে ঘুমের ওষুধই মদের গ্লাসে ঢেলে দিয়েছিলাম! তবে তো আমি খুনী নই—খুন আমি করি নি। মেরিয়াম! খুন আমি করিনি মেরিয়াম। হায় ঈশ্বর, এটাকে যেন আবার স্বপ্নে পরিণত করে দিও না।

স্ফিনস্ক ঘরে ঢুকে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল। টেবিলের ওপরে রাখা মেরিয়াম-এর ফটোটার দিকে বারবার তাকাতে লাগল।

হাত বাড়িয়ে ফটোটা তুলে নিল। তার ওপরে চার ফোঁটা চোখের জল ফেলল।

একটু বাদে সে হোটেলের বুড়ো কর্মচারী মাতিওকে ডাকিয়ে আনাল, সে দো-আঁশলা। খুবই কর্মঠ।

স্ফিনস্ক তাকে জিজ্ঞাসা করল—মাতিও, বল তো, আজ রাত্রে বা আগামীকাল যে জাহাজ এখানে থেকে ছাড়বে তার একটা টিকিটের ব্যবস্থা করে দিতে পারবে?

মাদাম, আগামীকাল ভোরে একটা স্টিমার সান ফ্রান্সিসকো-র উদ্দেশ্যে নোঙর তোলার কথা আছে।

তবে আগামীকাল ভোরে আমাকে স্টিমারটা ধরিয়ে দিতে হবে। কথাটা বলেই সে কিছু নোট তার হাতে গুঁজে দিল। বুড়ো মাতিও ঘর ছেড়ে চলে গেল।

স্ফিনস্ক এবার পরিচারিকা এঞ্জেলাকে নিয়ে মালপত্র বাঁধাবাঁধি করতে আরম্ভ করল।

স্ফিনস্ক গোড়া থেকেই তার সিদ্ধান্তে অটল। তার সামনে দরজা আজ সপাটে খুলে গেছে। সেখানে সারা জগৎটা ঢুকে পড়ুক।

মেরিয়াম-এর প্রতি স্ফিনস্ক-এর ভালবাসা এতটুকুও হ্রাস পায় নি। কিন্তু সে ভালবাসাকে এ মুহূর্তে আশাহীন এবং অবাস্তব মনে হচ্ছে।

এতদিন মেরিয়ামকে নিয়ে সংসার করার যে রঙীন স্বপ্ন সে দেখেছে, যে ছবিকে আনন্দঘন ও পরিপূর্ণ জ্ঞান করেছে সেটাও তার মন থেকে মুছে গেছে।

স্ফিনস্ক এখন বার বার নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করছে যে, তার এ ত্যাগ মেরিয়াম-এর জন্যই, অবশ্যই নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দের জন্য নয়।

এ পরিস্থিতিতে কি তার নিজের বোঝাটা মেরিয়াম-এর কাছে খুবই ভারী বলে মনে হবে না?

বাঁধাবাঁধির কাজ মিটতেই স্ফিনস্ক মেরিয়াম-এর ছবিটাকে বুকে জড়িয়ে ধরল আর অনাহাতে এক জোড়া জুতো ডালা-খোলা ট্রাঙ্কটার মধ্যে ছুড়ে ফেলল।

সন্ধ্যা ছ'টায় মাতিও খবর দিল গাড়ি প্রস্তুত। স্ফিনস্ক এর আগেই কাজকর্ম সেরে ঢিলে রেশমী পোশাকটা পরে তৈরী হয়ে অপেক্ষা করছে। অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসতেই সে মাতিও-র সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল।

দু'পা এগিয়েই সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মাতিওকে বলল—তার সঙ্গে একবারটি দেখা করে যেতে হবে। তবে এখনও সে তার সিদ্ধান্তে অবিচল।

মুহূর্তের মধ্যেই সে একটা পরিকল্পনা নিয়ে নিল, যাতে সে তার কাছে যাবে, কথা বলবে, কিন্তু তার অজ্ঞাতেই এখান থেকে চলে যেতেও পারবে।

সে হোটেলটার দরজায় দাঁড়িয়ে কাউকে বলবে মেরিয়ামকে ডেকে দিতে। যেকোন তুচ্ছ কারণ, অজুহাত দেখিয়ে তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলবে। সব শেষে বলবে, সাতটায় আবার বাড়িতে দেখা

হবে। এ প্রত্যাশাটা তার মনের মধ্যে গেঁথে দিয়ে সে বিদায় নিয়ে পথে নামবে।

সে অনায়াসেই পরিকল্পনা মাফিক মেরিয়াম-এর সঙ্গে দেখা করার কাজটা সারতে হোটেলের দরজায় হাজির হল।

সাদা পোশাক পরিহিত তিওপাঞ্চো নামক একজন মোটাসোটা লোকের মুখে সে শুনল, মেরিয়াম আজ তিনটায় 'পাজরো'তে চেপে পানামা রওনা হয়ে গেছে।

দ্য হাইপোথিসিস অব ফেইলিয়োর

ব্যবহারজীবী গুচ নিজের পেশার প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। তবে একটা ব্যাপারে তিনি যৎকিঞ্চিৎ কল্পনাশ্রয়ী।

ব্যবহারজীবী গুচ-এর অফিসটা তিন কামরার। এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যাতায়াত করা যায়। আবার প্রয়োজনে দরজাগুলো বন্ধ করেও রাখা যায়।

নিজের অফিসের ঘরগুলোর প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে গুচ হয়ত বলবে, জাহাজ নির্মাণের সময় নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করেই তার নিচেকার প্রত্যেকটা খোপকেই জল-নিরোধক করা হয়।

কোন কারণে কোন খোপের তলদেশে ছিদ্র হয়ে গেলে তবে সে খোপটাই কেবলমাত্র জলে বোঝাই হয়ে পড়ে। জল-নিরোধক ব্যবস্থা না থাকলে জল ঢুকে ঢুকে পুরো জাহাজটাই জলে বোঝাই হয়ে যেত আর জাহাজটা যেত ডুবে।

প্রায়ই এমন ঘটনা ঘটে যে, গুচ মক্কেলদের নিয়ে কাজে ব্যস্ত থাকে। তখন অন্য বহু ব্যাপার নিয়ে বহু মক্কেল এসে হাজির হয়। এ ব্যবস্থা থাকার ফলে মক্কেলরা প্রয়োজন অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ঘরে চলে যায়। এতে তার বাণিজ্য-জাহাজটা নির্বিঘ্নে পথ পাড়ি দিতে পারে।

ব্যবহারজীবী গুচ-এর অধিকাংশ অর্থাগমই হয় বিবাহ সংক্রান্ত দুঃখ-দুর্দশা মারফৎ। তারও আবার হরেক রকম ব্যাপার আছে।

যারা সাদাসিধে সহজ-সরল প্রকৃতির মানুষ তারা বলে যে, বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে গুচ যা আয় উপার্জন করে ঠিক সে পরিমাণ অর্থই আবার পেয়ে যায় আবার তাদের অন্য কারো সঙ্গে বিয়ে দিয়ে।

আবার কেউ কেউ এমন কথাও বলে যে, এতে তার ফি-টা দ্বিগুণে গিয়ে দাঁড়ায়। কারণ, সব ক্ষেত্রেই অনুতপ্ত স্বামী-স্ত্রী কিছুদিন যেতে না যেতেই আবারও বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা নিয়ে তার কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

জুন মাস। মরা-মাস। তার ওপর সে বছর জুন মাসটা এমন শুকা গেল যে, গুচ-এর বিবাহ-বিচ্ছেদের কারবারের জাহাজ প্রায় ডুবতে বসল। আসলে জুন মাসটা প্রজাপতির দখলে থাকে।

এক বিকেলে গুচ তার মাঝখানের ঘরটায় মক্কেলবিহীন অবস্থায় গালে হাত দিয়ে বসে কাটাচ্ছে।

তার কর্মচারী আর্চিবল্ড পাশের ছোট্ট ঘরটায় টুল পেতে বসে। দর্শনার্থী কেউ এলে সে তাকে মনিবের কাছে হাজির করে।

সেদিনই অফিসের সব শেষের দরজাটায় হঠাৎ দুম্ করে একটা শব্দ হল। শব্দটা প্রচণ্ড জোরেই হল।

আর্চিবল্ড দৌড়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দিতেই দর্শনার্থী তাকে আমল না দিয়েই লম্বা-লম্বা পায়ে ব্যবহারজীবী গুচ-এর কামরায় ঢুকে সামনের সোফাটায় থপ্ করে বসে পড়ল।

কোন রকম ভূমিকার সাহায্য না নিয়েই আগন্তুক সরাসরি বলে উঠল—আপনিই কি অ্যাটর্নি-অ্যাট-ল ফিনিয়াস সি. গুচ?

তার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়েই অভিজ্ঞ উকিল নীরবে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকে বুঝতে চেষ্টা করতে লাগল।

আগন্তুক দশাসই চেহারাধারী, সুবেশধারীও বটে। আর এক নজরে দেখলেই নিঃসন্দেহ হওয়া যায় লোকটা সাহসী ও উদ্ধত প্রকৃতির।

শেষ পর্যন্ত গুচ স্বীকারোক্তি করল—হ্যাঁ, আপনার অনুমান অভ্রান্ত, আমিই গুচ।

হুম!

দেখুন, আপনার কার্ড তো আমি পাইনি, তাই আমি ইচ্ছে করেই—

এবার ঠাণ্ডা গলায়ই আগন্তুক বলল—কার্ড যে আপনি পান নি আমি তো জানিই। আর এখনই পাবার সম্ভাবনাও নেই।

ব্যবহারজীবী গুচ চশমার ফাঁক দিয়ে সবিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

আগন্তুক অনর্গল বলেই চলল—আপনি তো একজন বিবাহ বিচ্ছেদের উকিল, তাই না?

হুম!

আগন্তুক পকেট থেকে একটা চুরুটের কৌটো বের করল। গুচ-এর দিকে সেটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল—একটা চলবে কি?

না। ধন্যবাদ।

যাক গে, যে কথা বলতে ছুটে এসেছি—মশাই, আপনার কারবার তো দাম্পত্য-জীবনের কঙ্কাল নিয়ে, ঠিক কিনা?

গুচ নির্বাক রইল।

আগন্তুক চুরুটটা ঠোঁট থেকে নামিয়ে এনে বলল—আপনি এমন একজন শল্য-চিকিৎসক যে ভুল দম্পতির বুকে বিদ্ধ হওয়া কামদেবের জ্বালাময় তীরটাকে তুলে দিয়ে শান্তি বিধান করেন, ঠিক বলি নি?

আপনার বক্তব্য আমি মেনে নিচ্ছি। এবার খোলাখুলি বলুন, আপনি কি আমার বৃত্তির দিকটা নিয়ে আলোচনা করতে উৎসাহী?

হ্যাঁ। কিন্তু এখনই, এ মুহূর্তেই নয়। যে মূল কাজটার ফলে এ দুষ্কর্মটার প্রতি উৎসাহী হতে হচ্ছে সেটা ঘটাবার আগেই সে সাবধানতাকে অবলম্বন করা দরকার ছিল, আমরা এবার ঠিক ততটুকু সাবধানতার সঙ্গে প্রকৃত বিষয়টাতে যেতে পারি। একটা বিবাহ সম্পর্কিত জট বেঁধে গেছে মিঃ গুচ।

বিবাহ সম্পর্কিত জট?

হ্যাঁ, আপনাকে সে জটটা ছাড়িয়ে দিতে হবে।

কার, মানে কাদের বিবাহ?

নাম দুটো বলার আগে আপনার বৃত্তিগত পরামর্শ আমি প্রত্যাশা করছি। আর এ ব্যাপারে কি পরিমাণ ঝুঁকি নিতে হবে তা-ও আপনার কাছে আমি বিস্তারিতভাবে জানতে চাইছি।

হুম্!

আর এ-ও মনে রাখবেন, এ ব্যাপারে আমি একজন তৃতীয় পক্ষ মাত্র। আমি আগে আপনাকে একটা গল্প বলছি। সব কিছু শুনে তারপর আপনার মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন, বুঝতে পেরেছেন?

বুঝলাম। আপনি সম্ভাব্য একটা দৃষ্টান্ত খাড়া করতে চাচ্ছেন, এই তো?

হ্যাঁ। যাক ঘটনাটা আমি তুলে ধরছি ঃ

মনে করুন কোন এক নারী, রীতিমত সুন্দরী। তার রূপের আভা চোখ ঝলসে দেয়।

সে তার স্বামী-সংসার সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে পালিয়ে গেছে। সে এমন এক পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে যে একটা অস্থাবর সম্পত্তি কেনা-বেচার তাগিদে শহরে এসে ঘাঁটি গেড়েছিল।

সে নারীর নাম টমাস আর বিলিংস।

আর দুশ্চরিত্র ছেলেটার নাম হেনরি কে. যেসুপ।

সুসানভিল নামক ছোট্ট একটা শহরে বিলিংস দম্পতি সুখে সংসারযাত্রা নির্বাহ করত। সেটা এখান থেকে বহু দূরে। দু'সপ্তাহ আগে যেসুপ সুসানভিল শহর ত্যাগ করে। ব্যস, মিসেস বিলিংস পরদিনই তাকে অনুসরণ করে। যুবকটার জন্য নারীটা যে একেবারে উন্মাদ হয়ে গেছে এ ব্যাপারে আমি হলফ করে আপনাকে বলতে পারি।

মক্কেলের কথা উকিল গুচ-এর কাছে বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়াল। আগন্তুক একটু দম নিয়ে আবার মুখ খুলল—মনে করুন, মিসেস বিলিংস তার সংসার নিয়ে সুখী ছিল না। আসলে সে যা পছন্দ করে বিলিংস উপহার হিসাবেও সেটা নিতে আগ্রহী নয়।

মিসেস বিলিংস বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ছাত্রী ছিল-উচ্চশিক্ষিতা। সভা-সমাবেশে ভাল বক্তৃতা দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মত তার বক্তব্য শোনে।

কিন্তু বুড়ো বিলিংস? সে এসবের ধার ধারে না।

অতএব বুঝতেই পারছেন মিসেস বিলিংস তার স্বামী-দেবতার তুলনায় অনেক, অনেক ওপর তলার মানুষ।

মিঃ গুচ, এবার আপনিই বিচার বিবেচনা করে বলুন তো, মিসেস বিলিংস যদি ভাল-মন্দের বিচারে তার স্বামীকে ঠেলে ফেলে দিয়ে একজন মনের মানুষকে আঁকড়ে ধরে তবে সেটাকে আপনি অন্যায় আখ্যা দেবেন?

চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে উকিল গুচ বলল—এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই যে, চরিত্রগত অমিলই অধিকাংশ বিবাহ-বিচ্ছেদে মুখ্য ভূমিকা নেয়। আর এটাই সাংসারিক জীবনের বিরোধ ও অশান্তির মূলে কাজ করে। আর তাই তো এর ন্যায়সঙ্গত প্রতিকার হিসেবে বিবাহ-বিচ্ছেদকেই সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া হয়েছে। একটা কথা বলছি, আবার ভুল বুঝবেন না যেন।

বলুন। কি বলতে চাইছেন, নির্দ্বিধায় বলুন মিঃ গুচ।

আপনার কাহিনীর যেসুপ লোকটা কি এমন কোন এক ব্যক্তি যার ওপর মিসেস বিলিংস পুরোপুরি আস্থা রাখতে পারে, বলুন তো?

বলেন কী মশায়। যেসুপের ওপর আমি যেকোন রকম বাজি রাখতে পারি। মিসেস বিলিংস'কে নিয়ে দশজন দশ কথা বলতে পারে ভেবেই তো সে সুসানভিল শহর ছেড়ে অন্যত্র গেছে। কিন্তু বিবাহিতা মহিলা স্বামী-ঘর সব কিছু ছেড়ে তাকে অনুসরণ করেছে। আর এখন তো এঁটুলির মত তার সঙ্গে সেঁটে থাকবে।

হুম!

সে যখন আইন আর ন্যায়সঙ্গত বিবাহ-বিচ্ছেদে পেয়ে যাবে তখন কিন্তু যেসুপ উচিত কাজই করবে।

দেখুন, আমার সাহায্য-সহযোগিতা যদি আপনি অপরিহার্যজ্ঞান করেন তবে তো এখন—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব—

ধ্যুৎ! এসব ধানাই পানাই—মানে ধারণা-টারণা ফেলে রাখুন। তবে এবার দেখছি সরাসরিই কথা বলার দরকার। আপনার মত একজন বিচক্ষণ উকিলের ইতিমধ্যেই বোঝা উচিত ছিল, আমি কে?

বুড়ো উকিল গুচ আবার নতুন করে আগন্তুকের মুখের ওপর চোখের মণি দুটো বুলিয়ে নিল।

আগন্তুক পূর্ব প্রসঙ্গের জের টেনেই এবার বলল—আমার ইচ্ছা, ওই মহিলা বিবাহ-বিচ্ছেদ পেয়ে যাক। তার জন্য যত অর্থকড়ি দরকার আমিই দিয়ে দেব। আর যেদিন তার বিবাহ-বন্ধনে বিচ্ছেদ ঘটে যাবে সেদিনই আমি পাঁচ শ' ডলার হাতে দিয়ে দেব।

ঠিক সে মুহূর্তেই উকিলের কর্মচারী আর্চিবল্ড ঘরে ঢুকে জানাল, এক মহিলা তার সঙ্গে দেখা করার জন্য পাশের ঘরে অপেক্ষা করছেন।

উকিল গুচ তার মক্কেলকে মিনিট পাঁচেকের জন্য পাশের ঘরে গিয়ে বসতে বলল। তারপর বলল—একটা জরুরী উইলের ব্যাপারে এক ভদ্রমহিলার আসার কথা ছিল। হয়ত তিনিই এসেছেন। আপনার বেশী সময় নষ্ট করব না।

একটু বাদেই এক সুন্দরী মহিলা ঘরে ঢুকলেন। দীর্ঘদেহী ও প্রভাবসম্পন্না। রানীর মত ঝলমলে পোশাক পরিচ্ছদে সজ্জিতা। গুচ-এর অনুরোধে সামনের চেয়ারটা টেনে তিনি বসলেন।

তারপর মিষ্টি-মধুর সুরেলা কণ্ঠে বললেন—আপনিই কি ব্যবহারজীবী ফিনিয়াস সী গুচ?

হ্যাঁ। আপনি উকিল গুচ-এর সঙ্গেই কথা বলছেন।

কোন রকম ভনিতা না করেই মহিলাটি তার বক্তব্য শুরু করলেন—মিঃ গুচ, একজন প্রবীণ

আইনজ্ঞ হিসেবে আপনি অবশ্যই মানুষের মনের ব্যাপারে কিছু জ্ঞান অর্জন করেছেন। আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, মানুষের কৃত্রিম সমাজ-জীবনের নীচতা—হীনম্মন্যতা একটা উদার হৃদয়ের প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে যখন সে উপলব্ধি করে যে, তার জীবন-সঙ্গী অপদার্থ পুরুষদেরই দলভুক্ত?

উকিল গুচ একটু বেশ কঠিন স্বরেই বলল—মাদাম, এটা কিন্তু একটা আইন-ব্যবসায়ীর দপ্তর। আর আমি কিন্তু একজন দর্শনশাস্ত্র বিশারদ নই, একজন আইনজীবী মাত্র। তা ছাড়া আমার অন্য মক্কেলরা অপেক্ষা করছেন।

হুম!

তাই আমার অনুরোধ, আপনার যা কিছু বক্তব্য সংক্ষেপে ও সরাসরি বলুন।

ম্লান হেসে মহিলাটি বললেন—মিঃ গুচ, আপনার এতটা কঠোর হবার প্রয়োজন ছিল না। আমিও প্রয়োজনের তাগিদেই আপনার কাছে ছুটে এসেছি। একটা ব্যাপারে আপনার পরামর্শ নিতে এসেছি। মানে নীচশীল ব্যক্তিরা যাকে বিবাহ-বিচ্ছেদ আখ্যা দেয়। যাক গে, মিসেস গাট্রুড এথারটন, তলস্তয়, মিঃ এডোয়ার্ড বক আর ওমর খৈয়াম—তাদের লেখা আমি পড়েছি। তাঁরা ঠিক আছেন।

মুহূর্তের জন্য থেমে তিনি আবার বলতে শুরু করলেন—মিঃ গুচ, আপনার ভাল-মন্দ বক্তব্য শোনার আগে আমি ব্যাপারটাকে একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরে নিয়ে উত্থাপন করতে চাচ্ছি।

আপনি এমন একটা মেয়ের কথা ভাবুন যে মনে-প্রাণে একটা পরিপূর্ণ জীবন কামনা করে।

আর তার স্বামী? সে বিদ্যা, বুদ্ধি, রুচি ও চিন্তাধারা সব ব্যাপারেই তার চেয়ে নিম্নস্তরের। আর সে একটা পশু—পাষণ্ড ছাড়া কিছুই যে আখ্যা দেওয়া যায় না।

বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, সাহিত্যকে সে অন্তর থেকে ঘৃণা করে। পৃথিবীর বিখ্যাত চিন্তাবিদদের সুমহান বাণী কানে গেলেই সে নাক সিঁটকায়। স্থাবর সম্পত্তি আর পার্থিব ব্যাপার স্যাপার নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা ডুবে থাকে।

এবার আপনিই বলুন মিঃ গুচ, যে মেয়ের ভেতরে আত্মা বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব আছে তাব জীবন-সঙ্গী সে হতে পারে, নাকি হওয়া উচিত?

এবার কি বলছি শুনুন—অদৃষ্ট বিড়ম্বিতা সে মেয়েটা তার আদর্শ পুরুষের মুখোমুখি হল, পরিচয়-হৃদ্যতা হল। সে পুরুষের আছে উদার মন, প্রখর বুদ্ধি আর শক্তি সামর্থ, সবই আছে। মেয়েটা তার সঙ্গে মেলামেশা করে তাকে ভালবেসে ফেলল।

হুম!

কিন্তু সে পুরুষটা এতই উদার-মহৎ ও সম্মানিত যে নিজেকে প্রকাশ করা তার পক্ষে সম্ভব হল না। সে অনন্যোপায় হয়ে প্রেয়সীর ধরা-ছোঁয়া থেকে দূরে, বহু দূরে চলে গেল। কিন্তু মেয়েটা তার পিছুন ছাড়ল না।

মুহূর্তের জন্য থেমে ভেবে চিন্তে তিনি এবার বললেন—আচ্ছা মিঃ গুচ, একটা বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য কত খরচাপাতি করতে হয়?

উকিল গুচ মুখ খোলার আগেই মহিলাটি আবার বলতে শুরু করলেন—আমি জানি 'সাইকামোর ল্যাপ'-এর কবি এলিজা এন টিসিন্স তিন শ' চল্লিশ ডলারের বিনিময়ে বিবাহ বিচ্ছেদ পেয়েছিলেন। আমি—মানে ওই মহিলাটিও কি এত কম খরচে—

মাদাম, দেখুন সম্ভাব্য ব্যাপার স্যাপারকে দূরে ঠেলে দিয়ে আমরা আসল নাম ও কাজের ব্যাপারটা নিয়ে কি সরাসরি আলোচনা করতে পারি না?

অবশ্যই। সেটাই আমার করা উচিত মিঃ গুচ। যে পাষণ্ডটার কথা বললাম তার নাম টমাস আর বিলিংস। সে তার আইনসম্মত স্ত্রীর সুখ-শান্তির প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর যে মহিলাটির কথা বললাম, আমিই সে অদৃষ্টবিড়ম্বিতা আর স্বামী কর্তৃক অপমানিতা-লাঞ্ছিতা নারী। আর আমার ভাল-লাগা মানুষটা হচ্ছে, হেনরি কে. যেসুপ। এবার আপনিই বিবেচনা করুন—

তাঁর মুখের কথা শেষ হবার আগেই বুড়ো কর্মচারী আর্চিবল্ড দরজায় দাঁড়িয়ে বলল—স্যার, এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য উদ্গ্রীব।

উকিল গুচ বললেন—মিসেস বিলিংস, অনুগ্রহ করে মিনিট কয়েক পাশের ঘরে গিয়ে বসুন। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের আমার সঙ্গে দেখা করার কথা। একটু বাদেই আবার আপনার সঙ্গে বসব

এবং আলোচনাটা সেরে ফেলব।

নবাগত মক্কেল ভদ্রলোক ঘরে ঢোকামাত্র উকিল গুচ নিজে উঠে নিজের হাতে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

আগন্তুক সরাসরি বক্তব্য শুরু করলেন—শুনেছি, বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলায় আপনার বিশেষ দক্ষতা ও খ্যাতি আছে।

হুম্!

আমি একটা কেস নিয়ে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। তবে কেসটার সঙ্গে আমি নিজে জড়িত কিনা গোপন রাখতে চাইছি।

আপনি তবে একটা সম্ভবপর মামলার কথাই বলতে চাচ্ছেন, তাই তো?

এরকমই মনে করতে পারেন। সাধ্যমত সংক্ষেপে আমার বক্তব্য আপনার কাছে তুলে ধরছি।

নড়েচড়ে গোছগাছ হয়ে বসে এবার তার উদ্দেশ্যের কথা বলতে শুরু করলেন—আমি একজন সাদাসিধে—ব্যবসায়ী। এক মহিলার কথা প্রথমে বলছি, যার বিয়ে হয় অসম প্রকৃতির এক পুরুষের সঙ্গে। বিভিন্ন দিক থেকে সে পুরুষটার তুলনায় একটু উঁচুতলার মানুষ।

অস্বীকার করার উপায় নেই, মহিলাটি খুবই সুন্দরী। সাহিত্যের প্রতি খুবই অনুরাগ।

আর স্বামী সাহিত্য টাহিত্যের ধার ধারে না। ব্যবসার জগতে একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে সে পরিচিত। ফলে যা স্বাভাবিক তা-ই হল। তাদের সংসার সুখের হল না। স্বামীটির দিক থেকে সংসারের সুখ-শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে এতটুকুও ত্রুটি ছিল না।

কিছুদিন আগে সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন মানুষ স্থাবর সম্পত্তি বেচার তাগিদে শহরে এল। মহিলাটির সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হল। ক্রমে সে পরিচয় গভীর হতে হতে প্রেমের রূপ নিল।

নবাগত লোকটা বুঝে নিল, শহরটা তার পক্ষে নিরাপদ নয়। তাই শহরটা ছেড়ে চলে গেল।

আর সে মহিলাটিও স্বামী-সংসার সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে সে লোকটার পিছু নিল। এ পর্যন্ত বলে নবাগত লোকটি থামল।

হুম।

নবাগত পুরুষটি এবার অপেক্ষাকৃত বিমর্ষমুখে এবং কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন—এক অবিবেচক নারী নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য একটা সংসারকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিল। এর চেয়ে পরিতাপের ব্যাপার আর কি-ই বা থাকতে পারে, আপনিই বলুন?

হ্যাঁ, সে তো নিশ্চয়ই।

নবাগত আগন্তুক এবার বললেন—মিঃ গুচ, মহিলাটি যে পুরুষকে সুখী করতে গিয়েছে সে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাকে সুখী করতে পারবে না, আমি হলফ করে বলতে পারি।

বুঝলাম। তারপর?

সত্যি কথা বলতে কি, স্বামীর সঙ্গে মহিলাটির যতই মনের অমিল হোক না কেন, তবু সে-ই একমাত্র মানুষ যে তার স্ত্রীর প্রতি মমত্ব ও সহানুভূতিশীল। অদ্ভুত প্রকৃতির সঙ্গে বোঝাপড়া করে, চলার ক্ষমতা তার আছে। তবে এ সত্যটাই সে আজও উপলব্ধি করতে পারছে না। আমি কি আপনাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে পেরেছি?

আপনি কি এক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদকেই যুক্তিসঙ্গত পথ বলে মনে করছেন?

বিবাহ-বিচ্ছেদ!

হ্যাঁ। আপনার মতামত—

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই নবাগত আগন্তুক চমকে উঠে বললেন—না, না মিঃ গুচ? বিবাহ-বিচ্ছেদ নয়। আমি শুনেছি, আপনি বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য উদ্‌গ্রীব এমন বহু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যস্থতা করে সহানুভূতির সঙ্গে তাদের বিচ্ছিন্ন-সম্পর্ককে দূর করে পুনরায় মিলন ঘটিয়ে, নতুন করে সংসারযাত্রা নির্বাহ করার ব্যবস্থা করেছেন!

হুম্!

আর ধানাই পানাই না করে সত্য মোদ্দা কথাটা বলছি, সে হৃদয় বিদারক ঘটনাটার ভুক্তভোগী আমি নিজে।

উকিল গুচ চশমার ফাঁক দিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে নীরবে মুচকি হাসলেন।

নবাগত আগন্তুক এবার বললেন—আর ঘটনাটার অন্য চরিত্রগুলোর আসল নাম বলেই দিচ্ছি—আমার নাম টমাস আর বিলিংস, আমার স্ত্রী মিসেস বিলিংস-এর নাম মদালসা বিলিংস। আমার স্ত্রী যার প্রতি অনুরক্তা তার নাম হেনরি কে. যেসুপ। এ পর্যন্ত বলে উকিল গুচ-এর তিন নম্বর মক্কেল থামলেন।

পরমুহূর্তেই আচমকা উকিল গুচ-এর হাতটাকে চেপে ধরে আগন্তুক প্রায় আর্তনাদ করে উঠল—ঈশ্বরের দোহাই মিঃ গুচ! আমার এ চরম সঙ্কটের মুহূর্তে আপনি আমাকে বিমুখ করবেন না। মিসেস বিলিংসকে আমি কিভাবে খুঁজে পেতে পারি সে পরামর্শ—সাহায্য করুন।

নবাগত আগন্তুকের মুঠো থেকে নিজের হাতটাকে সরিয়ে আনতে আনতে উকিল গুচ বললেন—আপনি ঠিকই শুনেছেন মিঃ বিলিংস, বিবাহ-বিচ্ছেদকামী বহু দম্পতির সঙ্গে কথা বলে, অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝিয়ে-শুনিয়ে তাদের আবার পূর্বের জীবনে ফিরিয়ে আনতে পেরেছি।

তবে আমাদের মধ্যেই বা কেন পুনরায় শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারবেন না?

হাত-ঘড়িটার দিকে চোখ পড়তেই উকিল গুচ আমতা-আমতা করে বললেন—দেখুন, আমার হাতে সময় খুবই কম।

এ ব্যাপারে আমিও খুবই সচেতন মিঃ গুচ। তবু নিজের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে না বলে পারছি না, অনুগ্রহ করে আপনি যদি কেসটা হাতে নেন আর আমার স্ত্রীকে আমার বাড়িতে ফিরিয়ে আনতে পারেন—যে লোকটার পিছনে সে হন্যে হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে সে লোকটাকে যদি সুখে একলা পথ চলতে সাহায্য করতে পারেন তবে সেদিনই আপনার হাতে দক্ষিণাস্বরূপ এক হাজার ডলার তুলে দেব।

উকিল গুচ হাত-ঘড়িটার দিকে মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে বললেন—মিঃ বিলিংস, অনুগ্রহ করে কিছুটা সময় এখানেই অপেক্ষা করুন।

মিঃ বিলিংস নীরবে ঘাড় কাত্ করলেন।

মিঃ গুচ ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে বললেন—পাশের ঘরে আমার এক মক্কেল অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন, খেয়ালই ছিল না।

অবশ্য তাঁর অফিসের তিনটে ঘরেই মক্কেল অবস্থান করছেন।

মিঃ গুচ বাইরে বেরিয়েই তিনি অফিসের কর্মী আর্চিবল্ডকে ডেকে বললেন—জলদি বাইরের দরজায় তালা লাগিয়ে দাও, বাইরের কাউকেই ঢুকতে দেবে না।

এবার লম্বা-লম্বা পায়ে তিনি প্রথম মক্কেলের ঘরে গেলেন। উকিলকে দরজায় দেখেই সোল্লাসে বলে উঠলেন—মিঃ গুচ, আপনি মনস্থির করেছেন তো? নগদ পাঁচশ' ডলার অগ্রিম দিলেই মহিলাটিকে বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যবস্থা করে দেবেন তো?

উকিল গুচ-এর ধান্ধা, যেকোন ভাবে যতদূর সম্ভব অর্থ তিনজন মক্কেলের কাছ থেকে খিঁচে নেওয়া।

হ্যাঁ, দেখি কি করা যায়। তবে এক হাজার দু' শ' ডলার খরচ করতে হবে, পারবেন তো?

দেখুন, সুসানভিল-এর একটা ছোট স্থাবর সম্পত্তি থেকে শুধুমাত্র পাঁচশ' ডলারই আমার আয় হয়েছে। টুপিটা হাতে নিতে নিতে তিনি বললেন—তবে তো আমাকে কোন একজন সস্তা দামের উকিলের খোঁজ করতে হবে।

প্রথম মক্কেল সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় উকিল গুচ মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়ে তুলে বললেন—মিঃ যেসুপ বিদায় নিলেন।

তিনি আবার মাঝখানের ঘরে গিয়ে তিন নম্বর মক্কেলকে বললেন—আমি ধরেই নিচ্ছি, মিসেস বিলিংস-এর সে পুরুষটার পিছনে ছুটোছুটি বন্ধ করে তাঁর বাড়িতে ফিরিয়ে নিতে পারবই পারব।

পারবেন! পারবেন মিঃ গুচ, আমার কাছে তাকে ফিরিয়ে দিতে?

যদি পারি তবে কি আপনি আমাকে এক হাজার ডলার দিতে রাজি আছেন? ব্যাপারটা কিন্তু এক পুরোপুরি আমারই হাতে, বুঝতেই পারছেন।

এক হাজার ডলার? হ্যাঁ, আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে সঙ্গে সঙ্গে এক হাজার ডলার আপনার

হাতে তুলে দেব, কথা দিচ্ছি।

তবে শুনুন মিঃ বিলিংস, মিসেস বিলিংস এখন আমারই জিম্মায়, মানে পাশের ঘরেই অবস্থান করছেন।

কী সব অবিশ্বাস্য কথা বলছেন মিঃ গুচ! মিসেস বিলিংস, মানে আমার স্ত্রী এখানেই আছেন?

মিঃ বিলিংস, চলুন, আমরা তাঁর কাছে যাই। আমাদের সম্মিলিত অনুরোধ আশা করি তিনি উপেক্ষা করতে পারবেন না মিঃ বিলিংস!

তার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই তৃতীয় মক্কেলটি আচমকা হাতের থলিটাকে উকিল গুচ-এর কপালটা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিলেন। সেটা ছুটে এসে দুম্ করে তার দু' চোখের মাঝখানে আঘাত হানল।

সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে তিনি জানালার কাছে ছুটে গেলেন। দেখলেন, দুষ্কৃতকারী পাশের এক চালা ঘরের ওপর থেকে নামছে। আর কুমীরের চামড়ার থলেটা মেঝেতে পড়ে রয়েছে। তার ভেতরের জিনিসপত্রগুলো ঘরময় ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি মেঝে থেকে একটা কলার, একটা চিরুনি, ভাঁজ করা একটা মানচিত্র, একটা ব্রাশ আর একটা সাবান কুড়িয়ে এক জায়গায় জড়ো করলেন।

আইনবিদ গুচ দেখতে পেলেন, কলারটার গায়ে বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে—এইচ. কে. জে, অক্ষর তিনটি। তার প্রতিটা জিনিসের গায়ে লেখা—হেনরি কে. যেসুপ এস্কোয়ারকে।

ক্রোধোন্মত্ত উকিল গুচ ঘর ছেড়ে বেরোতে বেরোতে অফিস-কর্মী আর্চিবল্ডকে ডেকে বললেন—আমি সুপ্রিম কোর্টের ঘরে চললাম। পাঁচ মিনিট পরে তুমি অপেক্ষারত মহিলাটিকে বলবে কিছুই করা সম্ভব হল না। কথা বলতে তিনি সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন।

দ্য থিয়োরি অ্যান্ড দ্য হাউন্ড

আমার এক বন্ধু গ্রীষ্মাঞ্চল থেকে এসে দিন কয়েক আগেও এ শহরেই অবস্থান করছিল। বর্তমানে সে বন্ধুবর যুক্তরাষ্ট্র সরকারের রাতোনা দ্বীপের কন্সালের পদে বহাল রয়েছে। সে এখানে আসার পর দিনগুলো আনন্দেই কাটাচ্ছিল।

এক বিকালে আমরা দু'জন ব্রডওয়ের সমান্তরাল একটা পথ ধরে হাঁটতে লাগলাম। আমাদের পাশ দিয়ে এক ঘরোয়া অথচ রূপসী মহিলা হেঁটে এগিয়ে গেল। তার হাতে একটা কুকুরের বাচ্চার শেকল দেখলাম। কুকুরের বাচ্চাটা তার সঙ্গে এগিয়ে চলেছে।

মহিলাটির হাতের শিকলটা আমার বন্ধুবর ব্রিজার-এর দু' পায়ের ফাঁকে জড়িয়ে যাওয়ায় সে বে-কায়দায় পড়ে গেল। চোখের পলকে কুকুরের বাচ্চাটা তার পায়ে দিল কামড় বসিয়ে।

ব্রিজার সঙ্গে সঙ্গে তার পেটে এমন জোরে এক লাথি হাঁকাল যে, তার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে যাবার জোগাড় হল।

ব্যাপার দেখে কুকুরের মালকিন মহিলাটি গলা ছেড়ে আমাদের দু'জনকে গালি গালাজ করতে করতে কুকুরের বাচ্চাটাকে একরকম টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলে গেল।

গজ দশেক গিয়েই আমরা এক বৃদ্ধার মুখোমুখি হলাম। ভিক্ষার জন্য সে আমাদের কাছে হাত পাতল। ব্রিজার পকেট থেকে একটা সিকি বের করে তার হাতে দিল।

পরের মোড়ে পা দিতেই পোশাক-আশাকে কেতাদুরস্ত এক মোটাসোটা ভদ্রলোককে দেখলাম, মোটা একটা শিকল দিয়ে বাছুরের মত বড়সড় একটা কুকুর বাঁধা বুল ডগ। আর বেঁটেখাটো এক মেয়ে মানুষ পুরনো ছেঁড়া পোশাক পরে ভদ্রলোকটার সামনে দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলে চলেছে। আর ভদ্রলোকটা অনবরত তাকে অভিসম্পাত করে চলেছে। ব্যাপারটা দেখে ব্রিজার ম্লান হাসল। তারপর পকেট থেকে একটা ডাইরি বের করে খস্‌খস্ করে কি যেন লিখে নিল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—ব্যাপারটা কি ব্রিজার?

সে জবাব দিল—একটা নতুন মতবাদ। রাতোনা আসার আগেই আমি এটাকে অনুশীলন করে নিচ্ছি। যেখানে যা কিছু মনের মত ব্যাপার দেখি, এতে ঢুকে রাখি।

মুহূর্তকাল পরে সে আবার মুখ খুলল—জান, পৃথিবীটা এখনও এ মতবাদের উপযুক্ত হয়ে উঠেনি। তবে তোমার কাছে আমি সবই বলব। তারপর তোমার স্মৃতিমন্থন করে তুমি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পার।

সে তখন আমাকে যে গল্পটা বলেছিল সেটাকে আমার ভাষায় তার দায়িত্বে তুলে ধরছি ঃ

আপনাদের অবশ্যই জানা থাকার কথা দক্ষিণ আমেরিকার প্রজাতন্ত্রের বিশ মাইল দক্ষিণে গেলে রাতোনা দ্বীপটা পড়বে। এটা প্রজাতন্ত্রের শ্রেষ্ঠতম বন্দর।

একদিন বিকেল তিনটের সময় রাতোনা দ্বীপবাসী একটি ছেলে, পাজরো আসছে! পাজরো আসছে! আহা পাজরো আসছে!—চিৎকার করে বলতে বলতে সমুদ্র তীর ধরে ছুটোছুটি করতে লাগল।

সারা রাতোনা শহর উৎকর্ণ হয়ে সে চিৎকার শুনল। বাতাসের কাঁধে ভর করে সে খবরটা দ্বীপের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল।

তারপর কোন এক সময় রাতোনা দ্বীপবাসীর নজরে পড়ল, তাল গাছের মাথার ওপর দিয়ে একটা ফলবাহী স্টিমার ধীর-মন্থর গতিতে দ্বীপটার দিকে এগিয়ে আসছে।

উত্তাল-উদ্দাম সমুদ্রের বুকে ভাসমান দ্বীপটার মানুষ আরাম-আয়েশ ও পরম শান্তিতে দিন কাটায়। গ্রীষ্মকালে সবই একযোগে থাকে। তারপর ফুরিয়ে যায়, কবরে চলে যায়।

গ্রীষ্মের প্রচুর ফলমূলই দ্বীপবাসীর আহারের সংস্থান করে দেয়। সমুদ্রের গায়ের বন্দরটা পেরোলেই চোখে পড়ে সাগরে ঘেরা, সবুজে ঢাকা ছবির মত সুন্দর একটা গ্রাম। সেখানকার আটশ' অধিবাসী রঙীন স্বপ্নে বিভোর হয়ে দিন যাপন করে।

দ্বীপবাসীদের মধ্যে বেশীরভাগই স্প্যানিশ-ইন্ডিয়ান বর্ণসংকর মানুষ। আর অবশিষ্টের মধ্যে কিছু সংখ্যক সান ডোমিংগো নিগ্রো, এক দল স্প্যানিশ কর্মচারী, খুবই কম সংখ্যক তিন-চারটে পথপ্রদর্শক শ্বেতকায় জাতি যারা রাতোনা দ্বীপে এসে প্রথম ডেরা বেঁধেছিল।

একমাত্র ফলবাহী জাহাজ ছাড়া অন্য কোন জাহাজ রাতোনা দ্বীপে ভেড়ে না। ফলবাহী জাহাজগুলোই মূল ভূখণ্ড থেকে খবরের কাগজ থেকে শুরু করে খাদ্যবস্তু ও পরিধেয় পর্যন্ত যাবতীয় জিনিসপত্র দ্বীপে পৌঁছে দেয়।

সংক্ষেপে বলতে গেলে সুবিশাল পৃথিবীর সঙ্গে রাতোনা দ্বীপবাসীদের যোগসূত্র স্থাপন করে চলেছে।

বিশাল স্টিমার 'পাজরো' ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে বন্দরে ভিড়ল। বন্দরের জলরাশি থেকে বিশ গজ দূরে একটা উইলো গাছের ছায়ায় সরকারী ভবনে কন্সাল ব্রিজার বন্দুকের নলটা পরিষ্কার করছেন।

কাজের ফাঁকে মুখ তুলে তাকাতেই তার নজরে পড়ল একজন মোটাসোটা মানুষ দরজা আগলে দাঁড়িয়ে। বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি। মাথায় যৎসামান্য চুল, মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ি-গোঁফ আর চোখে-মুখে সরলতার ছাপ সুস্পষ্ট।

আগন্তুক মোটাসোটা লোকটা ভারি গলায় উচ্চারণ করল—আপনিই কন্সাল মিঃ ব্রিজার, ঠিক বলি নি?

বন্দুকটাকে হাতে ধরে রেখেই ব্রিজার মুচকি হেসে বললেন—হ্যাঁ, আপনার অনুমান অভ্রান্তই বটে।

ওরা আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

উদ্দেশ্য?

ওই যে, সমুদ্রের ধার দিয়ে সারিবদ্ধভাবে গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে সেগুলোর নাম কি, জানতে চায়।

একটা চেয়ার দেখিয়ে আগন্তুককে বসতে অনুরোধ করে কন্সাল বললেন—ওগুলো নারকেল

গাছ।

ওই ফলগুলোকে আপনারা কি বলেন?

ডাব। ডাব নারকেল।

বাধিত হলাম।

এবার আপনার নামটা জানতে পারি কি?

চেয়ারে একটু নড়ে চড়ে আয়েশ করে বসতে বসতে আগন্তুক বলল—আমার নাম প্লাংকেট।

পরিচয়?

আমি কেন্টাকির চাথাম কাউন্টির শেরিফ।

এখানে আগমনের উদ্দেশ্য কি, জানতে পারি কি?

এ দ্বীপেরই একজনকে গ্রেপ্তার করার পরোয়ানা আমার পকেটে রয়েছে। এ দেশের প্রেসিডেন্ট তাতে স্বাক্ষর করে দিয়েছেন।

তার নাম কি?

ওয়েড উইলিয়ামস।

পেশা?

নারকেলের কারবারের সঙ্গে জড়িত।

তার অপরাধ?

দু' বছর আগে তার স্ত্রী খুন হয়েছে। তাই তাকে গ্রেপ্তার করা দরকার হয়ে পড়েছে।

হুম!

আপনাকে একটা অনুরোধ করতে পারি কি?

অবশ্যই। বলুন, আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি?

তাকে কোথায় পাওয়া যেতে পারে, হদিস দিতে পারেন?

একটা চোখ বন্ধ করে আর অন্য চোখের দৃষ্টি রাইফেলের নলের ভেতরে চালান করে দিয়ে কন্সাল বললেন—উইলিয়ামস্ নামের কোন লোক তো এ দ্বীপে নেই।

হ্যাঁ, না থাকাটাই স্বাভাবিক। অন্য কোন নাম ধারণ করে হয়ত এখানে এসে মাথা গুঁজেছে।

দেখুন, আমি ছাড়া রাতোনা দ্বীপে আর মাত্র দু'জন আমেরিকান আছে।

তাদের নাম?

একজন হেনরি মরগ্যান, আর দ্বিতীয়জন বব রীডস।

আমি যার খোঁজে এখানে এসেছি সে নারকেলের ব্যাপারী।

এবার বন্দুকের নলটা থেকে চোখ সরিয়ে এনে, অঙ্গুলি নির্দেশ করে কন্সাল বললেন—ওই যে, নারকেল বাগিচাটা দেখছেন, বব রীডস তার মালিক। আরও ভাঁটিতে যেসব গাছ দেখতে পাচ্ছেন তাদের অর্ধেকের মালিকানা হেনরি মরগ্যান-এর, বুঝলেন?

শেরিফ বলল—ওয়েড উইলিয়ামস এক মাস আগে চাথাম কাউন্টির একজনের কাছে একটা গোপন চিঠি লিখেছিল। তাতে সে লিখেছিল, সে কোথায় আছে এবং কেমন আছে। যে লোকটা সে চিঠিটা পেয়েছিল সে এসব কথা ফাঁস করে দেয়। দুঃখের বিষয় সে চিঠিটা হারিয়ে গেছে। তাদের অনুরোধেই আমি তার খোঁজে এখানে হাজির হয়েছি।

হুম!

দেখুন প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র আমার সঙ্গেই রয়েছে। আমার কিন্তু বিশ্বাস এখানকার ওই নারকেল বাগান দুটোর মালিকদের মধ্যে একজন নির্ঘাৎ আমার বাঞ্ছিত সে লোক।

তার ছবিটা অবশ্যই আপনার সঙ্গেই আছে। কিন্তু মরগ্যান আর রীডস-এর কথা ভাবাও আমি পাপ বলেই মনে করি।

কারণ?

কারণ একটাই। তারা উভয়েই মানুষ হিসেবে চমৎকার—অকল্পনীয়।

না, উইলিয়ামস-এর ছবি সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। আর আমি নিজের চোখেও তাকে কোনদিন দেখি নি। তবে তার চেহারার মোটামুটি বিবরণ জানতে পেরেছি। লম্বা প্রায় পাঁচ ফুট এগার ইঞ্চি,

মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা আর চোখের মণি দুটো কালো, রোমানদের মত নাক। আর কথায় কথায় হাসে, কথাও বেশী মাত্রায় বলে।

হুম!

আরও আছে, কথা বলতে বলতে আপনার চোখে চোখ রেখেই বলবে, পঁয়ত্রিশ বছর বয়স। শুনলেন তো, নারকেল বাগানের মালিক দু'জনের মধ্যে কারো সঙ্গে এ বিবরণের মিল আছে কি?

কম্পাল বন্দুকটাকে হাত থেকে নামিয়ে বললেন, আপনাকে কি করতে হবে তা আমি বলে দেব। চলুন, তাদের দু'জনের কাছেই আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।

শেরিফ চেয়ার ছেড়ে ওঠার চেষ্টা করল।

শেরিফ বলে চললেন—দেখুন, আপনার বিবরণের সঙ্গে কার মিল আছে তা-তো আমার চেয়ে আপনারই ভাল জানা-বোঝার কথা, ঠিক কিনা?

কম্পাল তার সর্বক্ষণের সঙ্গী বন্দুকটা হাতে নিয়েই উঠে দাঁড়ালেন। তারপর নবাগত শেরিফকে সঙ্গে নিয়ে পথে নামলেন।

পাহাড়ের গায়ের একটা ঘরের সামনে গিয়ে কম্পাল দাঁড়িয়ে পড়লেন। ঘরের ভেতরে দু'জন লোক মধ্যাহ্ন ভোজনে বসার উদ্যোগ করছে।

শেরিফ যে বিবরণ দিয়েছে সেটা তাদের উভয়ের মধ্যেই প্রযোজ্য। উচ্চতা, নাক, চোখ, গায়ের রং, শরীরের গড়ন সবই উভয়ের সঙ্গেই মেলে।

কম্পালকে দরজায় দেখে দু'জনেই এগিয়ে এসে সাদর অভ্যর্থনা জানাল।

কম্পাল শেরিফ প্লাংকেট-এর সঙ্গে মরগ্যান আর রীডস-এর পরিচয় করিয়ে দিলেন।

শেরিফ তার অভিজ্ঞ চোখ দুটো দিয়ে মরগ্যান আর রীডস-এর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে নিল।

তারপর সে আপন মনে বলল—সত্যি তো, উভয়ের চেহারায় পুরোমাত্রায় সাদৃশ্য রয়েছে। তবে মরগ্যান-এর তুলনায় রীডস-এর উচ্চতা ইঞ্চি খানেক বেশী। মরগ্যান-এর চোখ দুটোর রঙ গাঢ় বাদামি আর রীডস-এর চোখের মণি দুটো কালো।

মরগ্যান আর রীডস তাড়াতাড়ি আরও দুটো চেয়ার টেনে এনে খাবার টেবিলের পাশে রাখল। তাদের দু'জনের মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা হয়ে গেল।

মরগ্যান আর রীডস উভয়েই অতিথি দু'জনকে মধ্যাহ্ন ভোজন সারার জন্য অনুরোধ করল।

কম্পাল তাদের অনুরোধ রক্ষা করতে যখন খাবার টেবিলে বসার উদ্যোগ করল ঠিক সে মুহূর্তেই শেরিফ শান্ত গলায় বলে উঠলেন—ওয়েড উইলিয়ামস, খুনের অভিযোগে তোমাকে গ্রেপ্তার করা হল।

মুহূর্তের মধ্যেই মরগ্যান ও রীডস্-এর মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হল। আর সে দৃষ্টিতে বিস্ময় ও জিজ্ঞাসার ছাপ সুস্পষ্ট।

পরক্ষণেই তারা উভয়েই বক্তা শেরিফের দিকে হতভম্বভাবে তাকাল।

মুখে হাসি ফুটিয়ে মরগ্যান বলল—মিঃ প্লাংকেট, আপনার কথার কিছুই তো বুঝতে পারিনি। আপনি কি উইলিয়ামস-এর নামটা বললেন?

রীডস মুচকি হেসে বলল—ব্রিজার, এটা কিরকম রসিকতা তা-তো আমার মাথায় আসছে না।

ব্রিজার মুখ খোলার আগেই প্লাংকেট আবার বলতে লাগল :

বুঝে শুনেই আমি বলছি। আপনাদের দু'জনের মধ্যে কারো কাছেই ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। আর ব্যাখ্যা করতে হলে তা করব যাতে অন্য জনের জিজ্ঞাসা নিবারণ করা যায়।

মুহূর্তের জন্য থেমে প্লাংকেট আবার সরব হল—আপনাদের মধ্যে একজন সেন্টারির চাথাম কাউন্টির ওয়েড উইলিয়মাস্। দু' বছর আগে পাঁচই মে তারিখে আপনি স্ত্রীকে খুন করে

ফেরার হয়েছেন। তার আগে পাঁচ বছর ধরে তার ওপর চরম নির্যাতন, দুর্ব্যবহার করেছেন।

ব্রিজার প্রায় অস্ফুট উচ্চারণ করলেন—হুম!

প্লাংকেট বলে চললেন—আপনাকে গ্রেপ্তার করে সেখানে নিয়ে যাবার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় কাগজপত্র আমার সঙ্গেই আছে। আর আপনাকে আমার সঙ্গে যেতেও হচ্ছে। তবে একটা কথা আমি নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নিচ্ছি, আপনাদের মধ্যে কে সে ‘উইলিয়ামস তা আমার নিশ্চিত জানা নেই। তবে এ-ও সত্য যে, আগামীকাল যে জাহাজ এখান থেকে ছাড়বে তাতে ওয়েড উইলিয়ামস যে চাথাম কাউন্টিতে ফিরে যাচ্ছে, কোন সন্দেহই নেই।

মরগ্যান আর রীডস সরবে হেসে উঠল।

পরমুহূর্তেই মরগ্যান যেন কিছুই হয় নি এমন এক ভাব করে গলা ছেড়ে বলে উঠল—মিঃ প্লাংকেট, এদিকে খাবারগুলো যে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। আসুন, বসে পড়ুন।

মুচকি হেসে প্লাংকেট বললেন—আমি তো রাজিই আছি? ক্ষিদেও পেয়েছে খুবই।

রীডস টেবিলে মদের বোতল আর গ্লাস সাজাতে লাগল। এমন সময় শেরিফ প্লাংকেট প্রায় আর্তস্বরেই বলে উঠল—উইলিয়ামস, উইলিয়ামস।

সবাই একই সঙ্গে তার মুখের দিকে তাকাল। রীডস লক্ষ্য করল শেরিফ প্লাংকেট-এর চোখ দুটো তারই মুখের ওপর স্থির নিবদ্ধ।

তারপর সে বলল—মিঃ রীডস, আমার ইচ্ছে নয় যে, আপনি—

মরগ্যান খাবারের থালাগুলোকে সাজাতে সাজাতে বলল—মিঃ প্লাংকেট, আশা করি আপনি অবশ্যই বুঝতে পারছেন যে ভুল করে একজনকে এখান থেকে কেন্টাকিতে নিয়ে গেলে আপনি হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়বেন।

আমি কিন্তু একজনকে সঙ্গে করেই ফিরব। আপনাদের দু'জনের মধ্য থেকে একজনকে ভুলের মাশুল আমাকে দিতে হবে জেনেই আমি সঠিক মানুষটাকে নিয়ে যাব, মানে সাধ্যমত চেষ্টা করব।

মরগ্যান স্বাভাবিক কণ্ঠেই বলল—আপনি বরং আমাকেই নিয়ে যান, আমার আপত্তি বা অসুবিধে কোনটাই নেই।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে শেরিফ তার মুখের দিকে নীরবে তাকাল।

মরগ্যান বলে চলল—আরে মশাই, এখানে বেকার পড়ে থাকলেই বা ফয়দা কি হবে। এ বছর নারকেলের কারবারে মোটেই সুবিধে করতে পারি নি। লোকসান—ডাঁহা লোকসান। ধান্ধা করে দেখাই যাক না, অতিরিক্ত কিছু যদি কমিয়ে নিতে পারি।

না, সেটা উচিত হবে না। শেষ যে নারকেলগুলো জাহাজে তুলেছি তার বিনিময়ে আমি মাত্র ষোল ডলার হাতে পেয়েছি। তাই বলছি কি মিঃ প্লাংকেট, আপনি বরং আমাকেই নিয়ে যান।

আমি ঠিক—ওয়েড উইলিয়ামসকেই নিয়ে যাব।

মরগ্যান ব্যাপার দেখে থ বনে গেল—ওরে বাবা! একী অদ্ভুত কাণ্ড! এযে দেখছি ভূতের সঙ্গে, খুনীর ভূতের সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজন সারতে বসেছি!

শেরিফ ঠাণ্ডা মেজাজেই খাবারের সদ্ব্যবহার করতে লাগল। যেন নিজের বাড়িতে, নিজের টেবিলে বসে খাচ্ছে।

ব্যাপার দেখে কন্সাল মহাঅস্বস্তিতে পড়লেন।

পদাধিকার বলে শেরিফ প্লাংকেটকে সাহায্য-সহযোগিতা করা তাঁর নৈতিক কর্তব্য। আবার মরগ্যান আর রীডস-এর সঙ্গেও তাঁর হৃদ্যতার সম্পর্ক যথেষ্টই। তাই তিনি নীরবতার মধ্য দিয়েই ব্যাপারটাকে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

আহারাদির পর রীডস ভাল জাতের চুরুট অতিথিদের সামনে রাখল।

মরগ্যান মুখে হাসি ফুটিয়ে, কন্সাল-এর দিকে মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে নিয়ে বলল—আমি জানতে চাইছি, আমি কি একজন নিরেট বোকা? মহামান্য শেরিফ কি আমাদের মত দুটো কচি খোকাকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্য এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন? এই

উইলিয়ামসকে কি আমাদের সত্যি গুরুত্ব দেওয়ার দরকার আছে?

শেরিফ শান্তস্বরেই বললেন—দেখুন, আমি জীবনে কোন ব্যাপার নিয়েই কারো সঙ্গে মস্করা করিনি। আর আপনারাই ভেবে বলুন তো, এ ব্যাপারে কোন রঙ্গ তামাশার সুযোগ থাকতে পারে কি?

উপস্থিত সবাই নীরবে তাঁর বক্তব্য শুনতে লাগল।

শেরিফ বলে চলল—আর আমরা এখানে যে সব কথাবার্তা বলছি, সবই উইলিয়ামস শুনছেন। পাঁচ-পাঁচটা বছর তিনি নিজের স্ত্রীকে কুকুরের মত জঘন্য জীবন যাপন করতে বাধ্য করেছেন। মহিলাটি যে অর্থকড়ি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন সেগুলো তাঁর স্বামী-দেবতা উইলিয়ামস ঘোড়ার মাঠে, তাসের জুয়ায় আর শিকারের পিছনে ফুঁকে দিয়েছেন।

সবার মুখের দিকে তাকিয়ে পরিস্থিতিটা সম্বন্ধে সামান্য আঁচ করে নিলেন।

তারপর আবার মুখ খুললেন—বাইরে তার মত ভাল মানুষ আর দেখা যায় না। কিন্তু নিজের বাড়িতে, স্ত্রীর কাছে ছিলেন একজন চরমতম অত্যাচারী দৈত্য। আগে আমি ক্যাম্বারল্যান্ড পাহাড়ের প্রান্তবর্তী শহরে ছিলাম।

ওয়েড উইলিয়ামস তার স্ত্রীকে নৃশংসভাবে খুন করার পরের বছরই আমি শেরিফ নির্বাচিত হয়ে চাথাম কাউন্টিতে চলে আসি। আমার কর্তব্যবোধই আমাকে এখানে ছুটে আসতে বাধ্য করেছে।

রীডস গ্লাসে মদ ঢালতে ঢালতে কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল—পশু! উইলিয়ামস দেখছি একটা সত্যিকারের পশু!

মরগ্যান বলল—এক কেন্টাকি মহিলাকে খুন করে পাষণ্ডটা জঘন্যতম অন্যায় করেছে। আমি আগেও শুনেছি তারা হাড়কিপ্টে।

উভয়ের কথাবার্তা চালচলনই হাল্কা মেজাজের। তবে কথাবার্তার মধ্যে যে চাপা উত্তেজনা ও ঔদাসিন্য রয়েছে সেটা কম্সালের ঠিকই নজরে পড়ল।

তাদের কথাবার্তা চলাকালীনই একটা শিকারী কুকুর হঠাৎ ঘরে ঢুকে তাদের দু'জনের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল।

শেরিফ অনুচ্চকণ্ঠে কি যেন বলতে বলতে কুকুরটার পেটে সজোরে একটা লাথি হাঁকাল। কুকুর মোক্ষম দাওয়াই খেয়ে বিকট আর্তনাদ করে উঠল।

মরগ্যান অতর্কিতে এক লাফে খাবার টেবিলটার ওপর উঠে অতিথিকে আঘাত করার জন্য হাত তুলল।

আর সে সঙ্গে গুলি-খাওয়া বাঘের মত গর্জে উঠল—জানোয়ার কাহাকার। কেন এ কাজটা করলে?

শেরিফ বে-গতিক দেখে মার্জনা ভিক্ষা করে ব্যাপারটাকে কোন রকমে সামাল দিল।

মরগ্যান শান্ত হল।

পরমুহূর্তেই শেরিফ হাতকড়া দ্রুত শিথিলদেহী মরগ্যান-এর কব্জি দুটোতে পরিয়ে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে বাজখাই গলায় গর্জে উঠল—হতচ্ছাড়া নচ্ছাড়! কুকুরপ্রেমী শয়তান নরঘাতক! নাও এবার তোমার প্রভুর সামনে করজোড়ে দাঁড়াও।

ব্রিজার গল্পটা শেষ করে একটু নড়েচড়ে বসল।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—একটা কথা জানতে চাইছি?

ব্রিজার মুচকি হেসে বলল—বল, কি কথা?

শেরিফ প্লাংকেট কি আসল লোকটাকে পাকড়াও করেছিল?

অবশ্যই। আসল লোকের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল।

ব্যাপারটা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম—কি ভাবে ধরল?

শেরিফ প্লাংকেট পরদিন তাকে 'পাজরো' স্টিমারে তোলার আগে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তখন করমর্দন সারতে সারতে আমিও তাকে একই প্রশ্ন করেছিলাম।

আমার জিজ্ঞাসা নিবারণ করতে গিয়ে সে বলেছিল—মিঃ ব্রিজার, আগেই তো বলেছি,

আমি কেন্টকির অধিবাসী। জীবনে বহু কিছুর মুখোমুখি হয়েছি। জানোয়ারও কম দেখি নি। ঘোড়া আর কুকুরকে মাত্রাতিরিক্ত ভালবাসে এরকম মানুষও আমার চোখে কম পড়ে নি, কিন্তু একটি মহিলার প্রতি এতখানি নির্মম নিষ্ঠুর হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।

কলওয়ে'স কোড্

এইচ. বি. কলওয়ে'কে 'দ্য নিউইয়র্ক এন্টারপ্রাইজ'-এর পক্ষ থেকে রুশো-জাপ্-পোর্টস্ মাউথ যুদ্ধের বিশেষ সাংবাদিক হিসাবে পাঠাল।

কিন্তু কলওয়ে পুরো দুটো মাস টোকিও আর ইয়োকাহামায় অন্য সাংবাদিকদের সঙ্গে পাশা খেলায় মজে রইল।

কার্যত দেখা গেল পত্রিকাটার পক্ষ থেকে তাকে বিস্তর অর্থ ব্যয় করে যে কাজের জন্য পাঠাল তার কিছুই সে করে না।

তবে কাজ না করার জন্য কলওয়ে'কে দোষারোপ করা যায় না। কারণ, 'এন্টারপ্রাইজ' পত্রিকা পড়তে পারার মত লোক সেখানে নেই।

যে সাংবাদিকদের দলটা প্রথম বাহিনীটার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে গেল কলওয়ে তাদের সাথে ইয়ালুতে চলে গেল।

একটা কথা কিন্তু গোড়াতেই বলে রাখছি, এটা ইয়ালু নদীর যুদ্ধের ইতিকথা নয়।

যেসব সাংবাদিক তিন মাইল দূর থেকে যুদ্ধের ভয়ঙ্কর দৃশ্য চাক্ষুষ করেছেন তারা এসব তথ্য লিখেছেন।

তবে এটাও জেনে রাখা দরকার যে, জাপানিরা আরও কাছে এগিয়ে গিয়ে সবকিছু চাক্ষুষ করার ব্যাপারটাকে আগেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছিল।

যুদ্ধ আরম্ভ হবার অনেক আগে থেকেই কলওয়ের অন্যান্য অবদান আরম্ভ হয়। যুদ্ধের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আক্রমণের খবরটা পাঠাল।

রুশ সেনাপতি জাসুলিচ-এর বাহিনীর ওপর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর আক্রমণের বিস্তারিত খবর প্রকাশিত হয়।

পরবর্তী দু'দিনের মধ্যে কোন খবরের কাগজেই সে আক্রমণটা সম্বন্ধে একটা কথাও ছাপা হয়নি। তবে এন্টারপ্রাইজ ছাড়া একমাত্র লন্ডনের একটা খবরের কাগজেও খবরটা ছাপা হয়। কিন্তু পুরো খবরটাই ছিল একেবারে মিথ্যা আর ভুল তথ্য।

একাজটা কলওয়ে সম্ভব করেছিল এমন একটা পরিস্থিতিতে সেনাপতি কুরোকি যখন পরিকল্পনাগুলোর ছক আঁকতেন এবং সৈন্য পরিচালনা করতেন সবার অজ্ঞাতে ও গোপনীয়তার সঙ্গে।

সেনাপতি কুরোকি সব সাংবাদিককে নিষেধ করে দিয়েছিলেন কেউ যেন ছিটেফোঁটা খবরও বাইরে না পাঠায়। আর তার মারফৎ যেসব খবর পাঠানো হয় তার প্রত্যেকটা খবর কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

সেনাপতি কুরোকি-র একটা বিবরণ লণ্ডন পত্রিকার সাংবাদিক তার মারফৎ পাঠায়। সেটা আগাগোড়া ভুলে ভরা থাকার জন্য সেন্সর সেটাকে বাতিল করে নি।

অতএব পরিস্থিতিটা এরকম হয়েছিল যে, কুরোকি বিয়াল্লিশ হাজার পদাতিক সৈন্য নিয়ে ইয়ালু নদীর এক তীরে অবস্থান করছে। আর পাঁচ হাজার ঘোড়সওয়ার ও একশ' চব্বিশটা কামানও তাঁর সঙ্গে রয়েছে।

আর মাত্র তেইশ হাজার সৈন্যসহ জাসুলিচ নদীর অন্য তীরে অবস্থান করছে। আর ইয়ালু নদীটা প্রহরীরূপে অবস্থান করছে।

এন্টারপ্রাইজ-এর সাংবাদিক কলওয়ে এমন কিছু গোপন তথ্য হাতে পেয়ে গেল যেটা জায়গা মত পৌঁছে গেল। এ রকম একটা খবর যদি সেন্সরকে ফাঁকি দিয়ে কোনক্রমে পাঠানো সম্ভব হত—নতুন সেন্সর অফিসারটি তো ঠিক সেদিনই কাজের দায়িত্ব বুঝে নিয়েছে।

বর্তমানে যে কাজটা করা দরকার সাংবাদিক কলওয়ে তা-ই করল। সে একটা কামানের গাড়িতে ঘাপ্‌টি মেরে বসে ব্যাপারটার ভাবনা-চিন্তায় ডুবে গেল।

এখানেই আমরা কলওয়ের প্রসঙ্গটা ধামাচাপা দিয়ে রাখছি। কারণ অবশিষ্ট কাহিনীটার মালিক 'এন্টারপ্রাইজ' পত্রিকার সাংবাদিক ডেসি সে সপ্তাহে ষোল ডলার রোজগার করে।

কলওয়ের টেলিগ্রামটা বিকেল চারটায় পরিচালক সম্পাদকের হাতে পৌঁছায়। পরিচালক-সম্পাদক মশায় খবরটা হাতে পাওয়ামাত্র পর পর তিনবার পড়লেন।

তারপর হাতের কাগজটা ভাঁজ করতে করতে তিনি সহকারী রয়েড-এর টেবিলে হাজির হলেন। অবশ্য সাধারণ দরকারে তিনি তাকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠান। যাইহোক, সহকারীর সামনে গিয়ে তিনি তারবার্তাটা তার চোখের সামনে ধরলেন।

তারবার্তাটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সহকারী রয়েড ওপরওয়ালার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

পরিচালক-সম্পাদক বললেন—তারবার্তাটা কলওয়ে পাঠিয়েছে। এ ব্যাপারে কি করণীয় ভেবে দেখুন।

উই-জু থেকে তারবার্তাটা পাঠিয়েছে।

সহকারী রয়েড তারবার্তাটা দু'-দুবার পড়ল। তারপর চোখ-মুখে বিতৃষ্ণার ছাপ এঁকে বললেন—ধ্যুৎ! এটা কোন খবরই না।

পরিচালক-সম্পাদক প্রশ্ন করলেন—এ-অফিসে কেউ, কোনদিন সংকেত-বাক্যের মত কিছু শুনেছ, একটা গোপন সংকেত বাক্য?

পরিচালক-সম্পাদক দু'বছর যাবৎ এ অফিসে কাজে বহাল হয়েছেন। কেবলমাত্র আসা-যাওয়াই পরিচালক-সম্পাদকদের কাজ।

ওপরওয়ালার প্রশ্নের জবাবে রয়েড বললেন,—কই, এরকম কিছু তো কোনদিন শুনিনি। আদি-অন্তে অর্থবিশিষ্ট কোন কবিতা টবিতা নয় তো?

আমি এদিকটাও ভেবে দেখেছি কিন্তু গোড়ার অক্ষরগুলোর মধ্যে চারটে মাত্র স্বরবর্ণের উপস্থিতি লক্ষিত হচ্ছে। এটা একটা সংকেত-বাক্য না হয়েই যায় না।

পরিচালক-সম্পাদক ও তার সহকারী মিলে ব্যাপারটা নিয়ে বহু দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবনা-চিন্তা করতে লাগলেন। কিন্তু ফলাফল হল শূন্য।

তখন সহকারী ভদ্রলোক শহর সম্পাদক স্কটকে ডাকিয়ে আনালেন। তিনি বরাত ঠুকে কাজে লেগে গেলেন।

তবে সাংকেতিক লিপি সম্বন্ধে স্কট-এর কিছু কিছু ধারণা আছে। কিন্তু এ ব্যাপারে তার বিদ্যা কোন কাজেই লাগল না। অর্থহীন বর্ণ ও অক্ষরের অর্থ খুঁজে বের করা কি যে-সে কাজ?

দীর্ঘ ভাবনা চিন্তার পর শহর-সম্পাদক নিজের মত প্রকাশ করলেন—এটা যে একটা সংকেত-লিপি এ বিষয়ে আমার তিলমাত্র সন্দেহ নেই। তাই সূত্রটা না-পাওয়া অবধি এটা পাঠোদ্ধার করার কথা চিন্তাই করা যায় না। আচ্ছা, এ-অফিসে আগে কোনদিন সংকেত-বাক্য ব্যবহার করা হত কি?

অফিসের সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ল, কত কিছু যে আনা হল তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু রহস্যজনক লেখাটার একটা বর্ণ কারো পক্ষেই উদ্ধার করা সম্ভব নয়। সেটা যে অন্ধকারে ছিল সেখানেই রয়ে গেল।

এবার ডেসি এগিয়ে এলেন।

ডেসি সবচেয়ে কম বয়স্ক সাংবাদিক। সে এমন পোশাক-পরিচ্ছদ পরে তা দেখে কেউ বুঝতেই পারে না, সে কোন দেশের মানুষ।

সে অফিসের কর্মীদের ভিড় ঠেলে এগিয়ে গিয়ে পরিচালক-সম্পাদকের হাত থেকে তারবার্তাটা নিলেন।

ডেসির ওপর নির্ঘাৎ কোন না কোন দেবতা বর্ষিত হয়েছে ; তাই তো বিভিন্ন ভয়ঙ্কর সব কাজ করেও সে কি করে যে অব্যাহতি পেয়ে যায় সেটাই ভাবনার ব্যাপারই বটে।

তারবার্তাটা চোখের সামনে ধরে বলল—কলওয়ের ইচ্ছা যে করেই হোক আমরা যেন এটা পাঠোদ্ধার করার ব্যবস্থা করি।

উপস্থিত উৎসাহী সংকেত-পাঠকরা সমস্বরে বলে উঠল—চমৎকার! চমৎকার!

রয়েড এবার বললেন—এ তারবার্তাটা যে করেই হোক আমাদের পাঠোদ্ধার করতে হবে।

পরিচালক-সম্পাদক বললেন—তুমি এটা আমাদের দিয়ে দাও হে। এটা আমাদের পাঠোদ্ধার করতেই হবে।

অপেক্ষা করুন—একটু অপেক্ষা করুন। দেখুন, আমার মনে হচ্ছে, একটা সূত্র বুঝি পেয়ে গেছি। মাত্র মিনিট দশেক সময় আমাকে দিন। আমি আপনাদের বাঞ্ছা পূরণ করতে পারব।

কথা বলতে বলতে ডেসি তার নিজের টেবিলে গিয়ে বসল।

ডেসি টেবিলে বসেই কলম নিয়ে খস্‌খস্‌ করে লিখতে আরম্ভ করে দিল। ডেসির ব্যাপার দেখে এন্টারপ্রাইজ পত্রিকার জ্ঞানী, উচ্চশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ কর্মী ঠোঁট টিপে হাসতে লাগল। আর সে সঙ্গে টুকরো টুকরো কথা চারদিক থেকে ভেসে আসতে লাগল।

ডেসি আরও পনের মিনিট সময় চেয়ে নিল।

যথা সময়ে সে পরিচালক-সম্পাদকের হাতে একটা প্যাড এগিয়ে দিল যাতে সে সংকেত-সূত্রগুলো লিখেছে।

প্যাডটা পরিচালক-সম্পাদকের হাতে তুলে দিয়ে ডেসি বলল—মশায়, ওই তারবার্তাটা দেখেই তার ঝোঁকটা আমি বুঝে নিয়েছিলাম। চমৎকার! চমৎকার! কলওয়ে দীর্ঘজীবী হোক।

ডেসি এবার তারবার্তাটার লিপি সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলল—আসল ব্যাপারটা কি জানেন? তারবার্তাটা খবরের কাগজের ইংরেজি, ব্যস এটুকুই।

আমি 'এন্টারপ্রাইজ' পত্রিকার জন্য এ ভাষা ব্যবহার করে বহু খবর লিখেছি যে এসব আমার নখদর্পণে। এবার মন দিয়ে তারবার্তাটা পড়ে দেখুন। আর কলওয়ে তারবার্তার মাধ্যমে আমাদের কাছে যা জানাতে চেয়েছে এতে সবই লেখা রয়েছে।

কথা বলতে বলতে ডেসি আর একটা কাগজ পরিচালক-সম্পাদকের হাতে দিল।

কোনরকম আলোচনা-কথাবার্তা না বলে মাঝরাত্রেই কাজের সময়টা ঠিক করা হল।

খবর পাওয়া গেছে এক বিশাল অশ্বারোহী বাহিনী আর একটা দুর্দমনীয় পদাতিক বাহিনীকে যুদ্ধক্ষেত্রে নামানো হবে।

পরিস্থিতি অনুকূলে। তবে প্রতিবন্ধক বলতে একটা ছোট্ট বাহিনী।

টাইমস-এর বিবরণ মেনে নেবেন না। কারণ, ওই পত্রিকার সাংবাদিকের সঠিক ঘটনা জানা নেই।

রয়েড উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে চিৎকার করে উঠল—জব্বর খবর! জব্বর খবর! কুরোকি আজ রাত্রেই ইয়ালু নদী অতিক্রম করে আক্রমণ করে বসবে।

পরিচালক-সম্পাদক ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বললেন—মিঃ ডেসি, যে খবরের কাগজটা তোমাকে চাকরি দিয়ে রুটির বন্দোবস্ত করে দিয়েছে তার সাহিত্যগত মান সম্পর্কে তুমি বিরূপ মন্তব্য করছ। তবে এ-ও স্বীকার করতেই হবে, তুমি বছরের সেরা 'স্কুপ' খবরটা প্রকাশের কাজে আমাদের যথেষ্ট সাহায্যও করেছ।

তিনি ডেসির মুখের দিকে মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে তার মনোভাবটা বোঝার চেষ্টা করে আবার মুখ খুললেন—তোমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে, নাকি উচ্চতর বেতন দান করে পুরস্কৃত করা হবে সেটা দু'-এক দিনের মধ্যেই তোমাকে জানিয়ে দেওয়া হবে।

শহর-সম্পাদক ও আমেস এক রুদ্ধ-দ্বার বৈঠকে সামিল হলেন।

আলোচনার মাধ্যমে তাঁরা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমেস সাংবাদিক কলওয়ের

সংক্ষিপ্ত খবরটাকে খবরের কাগজের প্রথম পাতায় স্থান দেওয়ার উপযোগী একটা আকর্ষণীয় বিবরণ খাড়া করল যা সমগ্র বিশ্বের আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠতে বাধ্য।

সে জাপানি অফিসারদের রুদ্ধদ্বার বৈঠকের বিবরণ লিখল ; কুরোকির সম্পূর্ণ জ্বালাময়ী ভাষণটাই তুলে দিলেন, পদাতিক আর অশ্বারোহী বাহিনীর সৈন্য-সংখ্যার সঠিক হিসাব উল্লেখ করলেন, রাতারাতি সুইকাউচেন-এ একটা সেতু নির্মাণের কথা লিখলেন। এ সেতুটাই অতিক্রম করে মিকাডোর সহস্রাধিক সৈন্য হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে জাসুলিচকে তাক্ লাগিয়ে দিয়েছিল।

সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই ছিল একটা বিস্ময়কর ঘটনা।

আর? আর কথার কারসাজিতে কলওয়েও যে সেন্সরকে পুরো বোকা বানিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারে যে, তার খবরটা ছিল নিছকই একটা ভাওতা। এটাও কম অবাক হবার ব্যাপার নয়। এর চেয়ে বিস্ময়কর ডেসি। সবই বিস্ময় উদ্রেককারী।

শহর-সম্পাদক পরবর্তী দ্বিতীয় দিনে ডেসির টেবিলের কাছে এলেন।

সাংবাদিকটি নিবিষ্ট মনে একটা গল্প লেখার কাজে ব্যস্ত। তার গল্পটার বিষয়বস্তু কয়লার গর্তে পড়ে একটা লোকের পা ভেঙে যাওয়া।

সত্যি কথা বলতে কি, সে গল্পটার মধ্যে আমেসও একটা হত্যা রহস্যের ইঙ্গিত পান নি।

স্কট কোনরকম ভূমিকা না করেই বলল—তোমার বেতন সপ্তাহে বিশ ডলার বেড়ে যাচ্ছে।

ডেসি কলম বন্ধ করে তার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

স্কট এবার বলল—বুড়োর মুখে শুনেছি।

ভাল কথা। বরাতে যা জোটে সেটাই তো লাভ।

মুচকি হেসে স্কট বলল—সে তো অবশ্যই।

ডেসি দু'হাতের মধ্যে কলমটা ঘোরাতে ঘোরাতে বলল—আচ্ছা, স্কট, বল তো, এটা সম্বন্ধে তোমার কি মত? কিছুমাত্রও প্রতিবাদের আশঙ্কা না করে আমাদের পক্ষে কি খবরটবর লেখা সম্ভব?

স্কট মুখ খোলার আগেই ডেসি আবার বলল—প্রতিবাদের আশঙ্কা দূরে ঠেলে রেখে কোন প্রতিবেদন লেখা কি নিরাপদ, তুমিই বল তো?

এ মেটার অব সিন এলিভেশন

এক শীতের মরশুমে নিউ অর্লিয়েন্স-এর 'আলকাজার অপেরা কোম্পানি' মধ্য আমেরিকা, মেক্সিকো এবং দক্ষিণ আমেরিকার সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলোতে একটা পরীক্ষামূলক সফর সেরে ফিরে এল।

অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মার্কিন-স্প্যানিশ শ্রোতারা ডলার আর প্রশংসা-ধ্বনির মাধ্যমে তাদের একেবারে তুঙ্গে তুলে দিল।

দলের অভাবনীয় সাফল্যে ম্যানেজার ভদ্রলোক আনন্দে একেবারে ডগমগ হয়ে উঠলেন।

শ্রোতাদের 'বাহাবা' আর তারই ফলে ম্যানেজারের যে আত্মতুষ্টি ঘটল তাতে তিনি রীতিমত উদার হয়ে উঠলেন। দলের প্রায় সবারই বেতন বাড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তই তিনি নিয়ে ফেললেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি অনেক কষ্টে আবেগ-উচ্ছ্বাসের লাগাম টেনে ধরে কোম্পানির পক্ষে ক্ষতিকর সিদ্ধান্তটাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলেন।

ভেনেজুয়েলার মাকুটু নামক অঞ্চলে 'আলকাজার অপেরা কোম্পানি' তার সবচেয়ে বড় সাফল্যটা লাভ করেছে।

একবারটি ভেবে দেখুন তো, সম্পূর্ণ কোনি দ্বীপটা স্পেনের একটা অঞ্চলে পরিণত হয়ে গেছে, তবেই মাকুটুর অবস্থাটা আপনার পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হবে। চারদিকের নিকট ও দূরবর্তী অঞ্চল থেকে দলে দলে কাতারে কাতারে লোক এসে জড়ো হয় ছুটি উপভোগ করার জন্য।

সবচেয়ে বড় কথা সেখানকার মানুষগুলোর গান-বাজনার প্রতি গভীর অনুরাগ। স্থানীয় ব্যান্ডের বাজনা শুনে তারা তেমন আনন্দ পায় না। তাই তো অপেরা কোম্পানি আসায় তারা আনন্দে রীতিমত ডগমগ হয়ে উঠল।

ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট ও ডিরেক্টর গুজম্যান ব্লাংকো সপারিষদ প্রমোদ-ভ্রমণে বেরিয়ে মাকুটুতে এসে মাথা গুঁজেছেন।

কারকাস-এর 'গ্র্যান্ড অপেরা'কে শক্তিধর শাসক গুজম্যান ব্লাংকো প্রতি বছর চল্লিশ হাজার পেসো অনুদান দেন।

এ বছরও সরকারী গুদামটা খালি করে একটা অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চ গড়ে তোলার জন্য আদেশ দিয়েছেন।

প্রেসিডেন্টের হুকুমে সাত তাড়াতাড়ি একটা রঙ্গমঞ্চ তৈরী করে ফেলা হয়েছে।

মাকুটুতে কোম্পানিটা দু' সপ্তাহ অবস্থান করেছিল। প্রতিটা প্রদর্শনীতেই দর্শক কানায় কানায় ভরে যেত। শুধু কি এ-ই? খোলা-দরজা আর জানালাগুলোতেও দর্শকদের সে কী ভিড়।

প্রেসিডেন্ট গুজম্যান ব্লাংকো ফাউস্ট-এর অভিনয় চলার সময় রত্নসঙ্গীতটা শুনে খুশিতে এতই মাতোয়ারা হয়ে পড়েছিলেন যে, মোহরের থলিটাকে মঞ্চের ওপর ছুঁড়েই দিলেন।

আর? মার্গুয়েরাইট-এর উদ্দেশ্যে গণ্যমান্য সেনিওররা এবং অন্যান্য দর্শকরা অন্য সবার দেখাদেখি কত সব গহনাপত্র যে ছুঁড়ে দিল তার ইয়ত্তা নেই। অপেরা কোম্পানির প্রচারপত্রে অভিনেত্রী মার্গুয়েরাইট-এর নাম দেওয়া হয়েছে মাদময়জেল নিনা গিরো।

আমাদের গল্পের বিষয়বস্তু কিন্তু মোটেই 'আলকাজার অপেরা কোম্পানি'-র সাফল্য নয়। তবে এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তো বটেই।

মাকুটুতে একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল। এমন একটা রহস্য এর মধ্যে ছিল যার কিনারা করা সম্ভব হয়নি, আর তা আনন্দ মুখর মুহূর্তটাকে বিষণ্ণতায় ভরে দিয়েছিল। এক সন্ধ্যায় লাল-কালো পোশাকে সজ্জিতা মাদময়জেল নিনা গিরো-র মঞ্চের ওপর দ্রুত চক্কর মারার কথা, ঠিক সে মুহূর্তেই ছ' হাজার জোড়া চোখ আর মাকুটুর অধিবাসীদের সমান সংখ্যক মানুষের মন থেকে মুছে গেল।

ব্যস, তাকে খুঁজে বের করার জন্য চারদিকে ছুটোছুটি দাপাদাপি শুরু হয়ে গেল, সে যে ফরাসি হোটেলটাতে আস্তানা গেড়েছিল সেখানেও লোক ছুটল। সব প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে গেল। মাদময়জেল বে-পাত্তা হয়ে গেল।

দেখতে দেখতে আধঘণ্টা পেরিয়ে গেল। তবু সে ফিরল না, ফিরিয়ে আনাও সম্ভব হল না।

নাটক-নির্দেশকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটার জোগাড় হল।

দর্শকদের মধ্য থেকে একজন এস. ডি. কং ম্যানেজারের কাছে খবর পাঠিয়ে সাফ কথা জানিয়ে দিল যবনিকা তুলতে আর এক মুহূর্তও দেরী করলে পুরো দলটাকেই নিয়ে গিয়ে ফাটকে আটক করার ব্যবস্থা করবে।

অপেরা কোম্পানির ম্যানেজার তখনকার মত মাদময়জেল গিরোকে ফিরে পাওয়ার আশা ছেড়ে দিয়েছেন।

অপেরা কোম্পানিও কয়েক বছর ধরেই একটা মওকার প্রত্যাশায় ছিল। ম্যানেজারের নির্দেশে সে ঝটপট পোশাক পরে তৈরী হয়ে নিল।

ব্যস, অপেরা আবার অপেরা চলতে লাগল।

ভবিষ্যতেও যখন সে নায়িকার হদিস মিলল না তখন অপেরা কোম্পানির কর্তৃপক্ষের সাহায্য প্রার্থনা করা ছাড়া গত্যন্তর রইল না।

প্রেসিডেন্ট ব্যস্ত হয়ে সেনাবাহিনী, পুলিশবাহিনী আর প্রতিটা নাগরিককে নায়িকা মাদময়জেল গিরোর খোঁজে নিযুক্ত করলেন।

এবারও সব প্রয়াস বিফলে গেল। মাদময়জেল গিরোর হাফিস হয়ে যাওয়ার কোন সূত্রই পাওয়া গেল না।

পূর্বে বায়না নিয়ে রাখা বায়না অনুযায়ী 'আলকাজার অপেরা কোম্পানি' আরও ভাঁটির দিকে এগিয়ে গেল।

বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে অভিনয় সেরে ফেরার পথে স্টিমারটা মাকুটু বন্দরে এসে নোঙর করল।

ম্যানেজার আবারও লোকজন লাগিয়ে খোঁজ খবর করলেন। কিন্তু হায়! নায়িকাটির কোন হদিসই পাওয়া গেল না।

শেষমেশ হতাশ হয়ে সিদ্ধান্ত নিতেই হল, আর কিছুই করার নেই। ভবিষ্যতে সে যদি কোনদিন ফিরে আসে এরকম চিন্তা করে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া নায়িকার যাবতীয় ব্যক্তিগত জিনিসপত্র হোটেল-ম্যানেজারের জিম্মায় রেখে 'আলকাজার অপেরা কোম্পানি' এবার নিউ অর্লিয়েন্স-এর উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাল।

দুটো খচ্চরের পীঠে বিভিন্ন রকম লোহার দ্রব্য সামগ্রী—ছুরি, কাঁচি, দাঁ আর কাস্তে প্রভৃতি কাটার যন্ত্রপাতি। খচ্চরের মালিক ডন জনি। সে দূরবর্তী পার্বত্য অঞ্চলের আদিম ইন্ডিয়ানদের কাছে সোনার গুঁড়োর বিনিময়ে তারা অ্যান্ডিয়ান নদীর জল থেকে মিহি জাল দিয়ে ছেঁকে ছেঁকে তোলে। তারপর সেগুলোকে পাখির পালক আর থলির মধ্যে জমিয়ে রেখে দেয়।

সোনার গুঁড়োর ব্যবসাটা খুবই লাভজনক।

সেনিওর আর্মস্ট্রং-এর একান্ত ইচ্ছা তিনি শিগগিরই একটা কফির বাগিচা খরিদ করতে পারবেন।

উপজাতীয় ধনী বণিক বৃদ্ধ পেরেন্টো মিনতির স্বরে বলল—সেনিওর, বিদায় মুহূর্তে সন্তদের আশীর্বাদ করে যান, যেন ছেলেপুলে নিয়ে সুখে-শান্তিতে বেঁচেবর্তে থাকতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের আঞ্চলিক কন্সাল জার্মান রুকার বলল—স্যার, আপনি বরং সঙ্গে করে কিছু কুইনাইন নিয়ে যান। রোজ রাত্রে শোবার আগে দু' গ্রেণ করে সেবন করবেন।

লুইস মুচকি হাসল।

কন্সাল বলে চলল—আর একটা কথা, সফরটাকে যেন বেশী দীর্ঘ করবেন না। আপনাকে আমাদের খুব দরকার।

লুইস-এর নির্দেশে পুরো দলটা আবার চলতে আরম্ভ করল। আর্মস্ট্রং হাত নাড়িয়ে অধিবাসীদের কাছ থেকে বিদায় নিল।

তারা এক সময় 'হোটেল ইঙ্গলেস'-এ পৌঁছলো।

হোটেলের সবাই হাত নেড়ে আর্মস্ট্রংকে বিদায় জানাল।

এগোতে এগোতে তারা প্লাজাটা অতিক্রম করার সময় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনেই গুজম্যান ব্লাংকোর ব্রোঞ্জের মূর্তিটা সদম্ভে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে।

গুজম্যান ব্লাংকোর মূর্তিটার সামনে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে তারা আবার যাত্রা শুরু করল।

এক সময় দলটা শহর ছাড়িয়ে গ্রামের কাঁচা রাস্তা ধরল। রাস্তার ধারে ধারে মাকুটুর উলঙ্গ ছেলের দল দাঁড়িয়ে বিস্ময়ভরা চোখে নবাগতদের দেখতে লাগল।

আরও কিছুটা এগিয়ে খচ্চর-বাহিনী একটা ছোট নদী পাড়ি দিয়ে চড়াইয়ের পথে নামল। এবার তারা উপকূলীয় সভ্যতার কাছ থেকে বিদায় নিল। ধীর-মন্থর গতিতে খচ্চরগুলো চড়াইয়ের পথ পাড়ি দিতে লাগল।

আর্মস্ট্রং এবার লুইস-এর পরামর্শে একটা সপ্তাহ ধরে পাহাড়ি পথে এগোতে লাগল।

পঁচিশ পাউন্ডের কাছাকাছি ওজন বিশিষ্ট মূল্যবান ধাতু থলিতে ভরে নিয়ে এবং পাঁচ হাজার ডলার মুনাফা পিঠে খচ্চরগুলোকে আবার উৎরাইয়ের পথে চালিত করা হল।

গুয়ারিকো নদীর উৎসস্থলে যেখানে পাহাড়ের ভেতর থেকে জলরাশি প্রবল বেগে বেরিয়ে আসছে সেখানে লুইস তার দলবল নিয়ে থামল।

লুইস এবার আর্মস্ট্রংকে বলল—সেনিওর, এখান থেকে একবেলার পথ পাড়ি দিয়ে টাকুজামা গাঁয়ে পৌঁছে যাওয়া যাবে। আমি অবশ্য কোনদিন সেখানে যাই নি। তবে আমার বিশ্বাস, সেখান থেকে বেশ কিছু পরিমাণ সোনার গুঁড়ো পাওয়া যাবে। একবার পরীক্ষা করে দেখতে গেলে হয়, যাবেন?

লুইস-এর কথায় আর্মস্ট্রং রাজি হয়ে গেল।

পুরো দলটা এবার টাকুজামা গাঁয়ের পথ ধরল। গভীর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথটা এগিয়ে গেছে।

এক সময় জঙ্গলের বুকে রাত্রির অন্ধকার নেমে এল। চারদিকে জমাট-বাঁধা অন্ধকার।

সামনে একটা বড়সড় কালো গর্ত দেখতে পেয়ে লুইস আবার দলটাকে থামিয়ে দিল। যতদূর দেখা যায় রাস্তাটা দু'ভাগ হয়ে দু'দিকে এগিয়ে গেল।

খচ্চরের পিঠ থেকে নেমেই লুইস গর্তটার পাড় ধরে এগোতে লাগল। কিছুদূর এগিয়েই সে গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠল—পেয়ে গেছি! একটা সেতু পেয়ে গেছি!

চামড়ার সেতুটার ওপর দিয়ে লুইস সদলবলে গর্তটার বিপরীত প্রান্তে অনায়াসেই পৌঁছে গেল।

এখান থেকে প্রায় আধ মাইল পথ এগিয়ে গেলেই টাকুজামা গাঁও। জঙ্গলের পাথর আর মাটি দিয়ে এখানকার বাড়িগুলো তৈরি। গাঁ-টার সবই কুঁড়ে ঘর।

লুইস-এর দলটা গাঁওটার দিকে যতই এগোতে লাগল একটা নারী-কণ্ঠের মিষ্টি-মধুর গান ততই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল। ইংরেজি গান। তার কথার সঙ্গে আর্মস্ট্রং-এর পরিচয় আছে। তাই তার সঙ্গীতের জ্ঞানের সঙ্গে নারী-কণ্ঠের গানটার কিছুমাত্রও মিল নাই, লক্ষ্য করল।

আর্মস্ট্রং কৌতূহল দমন করতে না পেরে খচ্চরের পিঠ থেকে দুম্ করে নেমে পড়ল। তারপর খুবই সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে গিয়ে যে জানালা দিয়ে গানের কলি ভেসে আসছে সেটা দিয়ে ঘরের ভেতরে উঁকি দিল।

সে দেখতে পেল এক রূপসী নারী ভাবে বিভোর হয়ে গান গেয়ে চলেছে।

সত্যি আশ্চর্য সে নারী। তার গায়ে চিতাবাঘের চামড়ার পোশাক। আর একটু এগিয়ে একেবারে জানালাটার গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কুঁড়ে ঘরটার ভেতরে চোখ ফেরাতেই দেখতে পেল, ঘরটার মেঝেতে, নারীটাকে ঘিরে বসে রয়েছে এক দল উপজাতীয় পুরুষ।

গানটা শেষ করে সে নারীটা কয়েক পা এগিয়ে ছোট্ট জানালাটার কাছে গিয়ে বসে বাইরের প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

এবার অধিকতর বিস্ময়কর একটা দৃশ্য আর্মস্ট্রং-এর নজরে পড়ল। সে দেখতে পেল, উপস্থিত শ্রোতারা সে নারীর পায়ের কাছে একটা করে ছোট থলি নিয়ে রাখতে আরম্ভ করেছে।

কোন সুযোগ হাতের মুঠোয় এলে সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে কাজে লাগানো আর্মস্ট্রং-এর একটা বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

সে ছোট্ট জানালাটার কাছে গুটি গুটি এগিয়ে গিয়ে গলা নামিয়ে, প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল—সুন্দরী, আমার দিকে মুখ না ঘুরিয়েই যা বলছি, ধৈর্য ধরে শোন।

মেয়েটা একই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে উৎকর্ণ হয়ে রইল।

আর্মস্ট্রং এবার বলল—শোন, আমি একজন আমেরিকান। তোমার কোন সাহায্যের দরকার থাকলে আমাকে নির্দ্বিধায় বলতে পার, কিভাবে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি?

সে নারী বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল—উপজাতি ইন্ডিয়ানরা আমাকে এখানে কয়েদ করে রেখেছে। সাহায্য আমার একান্ত দরকার।

কিন্তু কি ভাবে?

দু'ঘণ্টা পরে এখান থেকে বিশ গজ দূরের, পাহাড়ের দিকের কুঁড়েঘরে চলে এসো। দেখবে

ঘরের ভেতরে আলো জ্বলছে। আর জানালার ধারে লাল একটা পর্দা ঝোলানো থাকবে।

আর? আর কিছু?

সদর-দরজায় সব সময় রক্ষী মোতায়েন থাকে। তাদের চোখে ধুলো দিতে হবে।

হুম!

ঈশ্বরের দোহাই, আসতে যেন ভুলো না পরোপকারী পুরুষ।

যথা সময়ে আর্মস্ট্রং কুঁড়ে ঘরটার সদর দরজায় হাজির হল। একজন রক্ষীকে দেওয়ালে হেলান দিয়ে ঝিমোতে দেখল।

সে বিড়ালের মত সন্তর্পণে, পা টিপেটিপে এগিয়ে গিয়ে আচমকা তার গলাটা সজোরে টিপে ধরল। তার নশ্বর দেহটা এলিয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

ব্যস, আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে আর্মস্ট্রং মাদময়জেল গিরোকে নিয়ে সেখান থেকে দ্রুত চম্পট দিল।

মাদময়জেল গিরো টাকুজামায় ছ'মাস অবস্থান কালে বেশ কয়েক পাউন্ড সোনার গুঁড়ো উপার্জন করেছে। যাবার সময় থলিভর্তি সোনার গুঁড়ো সঙ্গে করে নিয়ে যেতে ভুলল না।

উপজাতীয় ইন্ডিয়ানবা সঙ্গীতপ্রিয়। তারা কারাবোকো উপাজাতীয় ইন্ডিয়ান বলে পরিচিত। তাদের অনেকেই আলকাজার অপেরা কোম্পানির অভিনয় দেখতে গিয়েছিল।

অভিনয়ে মাদময়জেল গিরোর অভিনয় তাদের খুবই মনে ধরেছে। অতএব তাকে তাদের চাই-ই চাই।

এক সন্ধ্যায় তারা গোপনে রঙ্গমঞ্চ থেকে তাকে ছিনতাই করে সেখান থেকে চলে এল।

উপজাতীয় ইন্ডিয়ানরা তার প্রতি কোনরকম অসৎ আচরণ তো করলই না, বরং পরম আপনজনের মত আগলে রাখল। তবে রোজরাত্রে মাত্র একটা করে গান শুনে, এক মুঠো করে সোনারগুঁড়ো উপহার দিয়ে যে-যার ঘরে ফিরে যেত।

এদিকে জন আর্মস্ট্রং তাকে একটা খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলল। পরম শান্তিতে উভয়ে পথ পাড়ি দিতে লাগল।

মাদময়জেল গিরো আর্মস্ট্রং-এর কাছে পবিত্রতার প্রতীক রূপে গণ্য হতে লাগল। তার প্রতি তার মনের আকর্ষণের অর্ধেক মানবিক প্রেম-ভালবাসা আর বাকি অর্ধেক স্বর্গের দেবীর প্রতি পূজার অর্ঘ।

উদ্ধার করে নিয়ে আসার পর থেকে মাদময়জেল গিরোর মুখে মুহূর্তের জন্যও হাসি দেখা গেল না, তার পরনে এখনও চিতাবাঘের চামড়াটা রয়েছে।

আর্মস্ট্রং মাদময়জেল গিরোকে চরম বিপদ থেকে উদ্ধার করে এনেছে সত্য। তবে তার কাছে একজন পুরুষের আর্তি জ্ঞাপন করার ব্যাপারটাকে সে জঘন্য অপরাধ বলে মনে করেছে।

তৃতীয় দিন খচ্চর দুটো তাদের নিয়ে পাহাড়ের উপত্যকা ও পাদদেশ অঞ্চলে পৌঁছে গেল। সেখানে পৌঁছে তারা প্রথম মানুষের চিহ্ন দেখতে পেল।

কফি বাগিচার ধার দিয়ে আরও কিছুটা পথ পাড়ি দিয়ে তারা কয়েকটা খচ্চর ও পথিকের দেখা পেল।

তারা যতই অগ্রসর হতে লাগল ততই অর্থপূর্ণ আরাম-আয়েশের জীবনযাত্রা দেখতে পেল।

স্বর্গের দেবী মাদময়জেল গিরো যেন ক্রমে মানবী হয়ে উঠতে লাগল। তারা এবার ক্রমে পার্বত্য অঞ্চল ছেড়ে সমভূমিতে নেমে আসতে লাগল।

মাদময়জেল গিরো এখন পরিপূর্ণ নারী। পৃথিবীর অন্য দশটা নারীর মতই সে-ও একজন। তার বুক থেকে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। মহাশূন্যতা যেন আজ তাকে পেয়ে বসেছে।

তারপর উত্তাল-উদ্দাম সমুদ্রের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে ভাবাপ্লুত কণ্ঠে মাদময়জেল গিরো বলে উঠল—মিঃ আর্মস্ট্রং, ওই দেখুন সমুদ্র। কী সুন্দর! পাহাড় দেখে দেখে আমার মন-প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে। একবার আমার ক'দিন আগেকার জীবনের কথা ভেবে দেখুন তো। ইন্ডিয়ানরা কী ভয়ঙ্কর জাতি। কী কষ্টটাই না আমাকে করতে হয়েছে। মাসের পর মাস আমি নিজের মুখটাও দেখতে পারি নি।

বুঝলাম। গম্ভীর মুখে আর্মস্ট্রং বলল।

আর্মস্ট্রং ভাবল তারা পরস্পরের এত কাছাকাছি চলে এসেছে যে, শীঘ্রই হয়ত এ নারী তার কাছে আত্মসমর্পণ করে বসবে।

এবার আর্মস্ট্রং নিজের পরিবর্তিত সাহসিকতার কথা মাদময়জেল গিরোকে বলল। তার হাতের ওপর নিজের হাতটা রাখল।

মাদময়জেল গিরো আর্মস্ট্রং মুঠো থেকে নিজের হাতটা টেনে নিল না। তাঁর চোখে ফুটে উঠল হাসির ঝিলিক। বুকের ভেতরে উত্তাল সমুদ্রের দাপাদাপি নিরবচ্ছিন্নভাবে হয়েই চলেছে।

আর্মস্ট্রং-এর হাতের মুঠোয় নিজের হাতটাকে রেখেই মাদময়জেল গিরো ভাবাপ্লুত কণ্ঠে বলল—মিঃ আর্মস্ট্রং, যদিও আমার খুবই ইচ্ছা করে আবার রঙ্গমঞ্চের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ি। খবরের কাগজের লোকেরা রসদ পেয়ে যাবে, তাই না?

অবশ্যই।

তারা হয়ত ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে লিখবে, অসভ্য জঙ্গলী ইন্ডিয়ানরা আমাকে বন্দিনী করে রেখেছিল। আরও কত কী-ই না আমাকে ফলাও করে লিখবে। কিন্তু সে সবে আমার মন আর টানে না।

তবে আপনি ভবিষ্যতের কথা কি ভেবেছেন?

আমার থলিতে যে অন্তত দু' হাজার ডলার দামের সোনার গুঁড়ো আছে তা-তো আর আমার অজানা নয়।

হ্যাঁ, তা আছে বটে।

অতএব ভেবে চিন্তে যা হোক একটা সিদ্ধান্ত নিলেই হবে।

আরও কিছুটা পথ পাড়ি দিয়ে তারা হোটেল ডি বুয়েন ডেসকাম্সার-এর সামনে হাজির হল। গতবার এসে মাদময়জেল গিরো এখানেই উঠেছিল, দিন কয়েক কাটিয়েও গিয়েছিল।

হোটেলে ঢুকে হলঘরের এক ধারের একটা টেবিলে মাদময়জেল গিরো বসল। তাকে হোটেলে রেখে আর্মস্ট্রং কিছুক্ষণের জন্য বাইরে চলে গেল।

মাদময়জেল গিরোর পরনে সাদা লনের ওপর চেরি রঙের ফিতের কাজ করা চমৎকার একটা পোশাক। সে গুনগুন করে একটা গান ধরল। গানটা শেষ হতে না হতেই আর্মস্ট্রং ফিরে এসে মাদময়জেল গিরোর টেবিলে দিকে এগিয়ে গেল।

মাদময়জেল গিরো চেয়ার ছেড়ে উঠে হাসিমুখে তাকে স্বাগত জানাল। বলল—এই যে তোমার চেয়ার খালিই রেখে দিয়েছি, বস।

আর্মস্ট্রং বলল—না, এখনও বহু কাজ বাকি। এখন বসতে পারছি না। কাজগুলো সেরে ফেলা দরকার।

সে আবার বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করল।

সদর দরজার কাছে হঠাৎ রুকা-র এর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

আর্মস্ট্রং তার সঙ্গে করমর্দন সারতে সারতে বলল—তোমার সঙ্গে এক হাত খেলার ইচ্ছে করছে। আসলে এমন কিছু চাচ্ছি যে, যা আমার জিভ থেকে সমুদ্রের স্বাদটাকে ধুয়ে মুছে দেয়।

গার্ল

রবিন্স অ্যান্ড হার্টলি, ব্রোকার।

ন'শ' বাষট্টি নম্বর কামরার দরজায় সোনালি হরফে লেখা—রবিন্স অ্যান্ড হার্টলি, ব্রোকার

বিকেল পাঁচটা।

কেরানিরা এক-এক করে সবাই চলে গেছে। কেবলমাত্র কয়েকটা মেয়ে বুরুশ হাতে অপেক্ষা করছে। তাদের ওপর আকাশচুম্বী বিশ তলা অফিস বাড়িটা পরিষ্কার করার দায়িত্ব রয়েছে।

হার্টলির বয়স উনত্রিশ বছর। একহারা চেহারা। দুর্বল। আর রবিন্স-এর বয়স পঞ্চাশ বছর। ভারিক্কী চেহারা। অংশীদারটির প্রতি ভেতরে ভেতরে ঈর্ষার ভাব পোষণ করে।

হঠাৎ হার্টলির ঘরের দরজাটা একটু ফাঁক হল। দরজা ঠেলে একজন রহস্য সঞ্চারকারী মানুষ ঘরের ভেতরে ঢুকে এল।

লোকটা চেয়ারে বসেই হার্টলির দিকে সাধ্যমত ঝুঁকে ফিসফিসিয়ে বলল—মেয়েটার ঠিকানাটা খুঁজে বের করতে পেরেছি। যদি—

হার্টলি হঠাৎ এমন চোখ গরম করে তার দিকে তাকাল যাতে তাকে বক্তব্যটা থামিয়ে দিতে হল।

হার্টলি এবার পোশাক ও চুল গোছগাছ করে নাগরিক প্রমোদ-অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার জন্য তৈরী হল।

গোয়েন্দাটা এবার আমতা আমতা করে তার দিকে ঠিকানা-লেখা কাগজটা এগিয়ে দিল।

হার্টলি গম্ভীর মুখে হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিল। হাতের কাগজটার দিকে সে চোখ রাখল। তাতে রয়েছে—ভিভিয়েন আর্লিংটন, তিন শ' একচল্লিশ নম্বর পূর্বতম স্ট্রীট, প্রযত্নে মিসেস ম্যাককোমাস।

গোয়েন্দাটা আবার মুখ খুলল—স্যার, হপ্তা খানেক আগে সে এ ঠিকানায় গেছে। আপনি চাইলে, আমার চেয়ে সুষ্ঠুভাবে কেউই কাজটা সমাধা করতে পারবে না।

হুম!

প্রতিদিন মাত্র সাত ডলার আর যা কিছু খবর হয়। আর প্রতিদিন একটা করে টাইপ-করা খবর পাঠিয়ে দিতেও—

তাকে থামিয়ে দিয়ে দালাল বলল—এরপর তোমার আর কিছু করার দরকার নেই। আমার কেবলমাত্র ঠিকানাটা দরকার ছিল। এর জন্য তুমি কত চাইছ?

একদিন লেগেছে। দশটা ডলার দিয়ে দিন।

হার্টলি তার প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়ে বিদায় করল।

সে এবার অফিস থেকে বেরিয়ে ব্রডওয়ের গাড়ি ধরল। তারপর আবার গাড়ি বদল করে পূর্বদিকে এগিয়ে চলল।

গাড়িটা তাকে ভাঙাচোরা পথ দিয়ে এগিয়ে নিয়ে একটা প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ অঞ্চলে পৌঁছে দিল। এক সময় এখানকার প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্য নিদর্শন শহরের গৌরব বৃদ্ধি করেছিল।

কয়েকটা স্কোয়ার বাদেই সে তার ঠিকানা অনুযায়ী বাঞ্ছিত বাড়িটায় পৌঁছে গেল। 'দ্য ভালামব্রোসা' নামক একটা ফ্ল্যাট-বাড়ি।

বাড়িটার সদর-দরজায় গিয়ে হার্টলি বোতামটা টিপল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দরজাটা সশব্দে খুলে গেল।

হার্টালি সিঁড়ি-বেয়ে ষষ্ঠ তলায় উঠেই দেখল, ভিভিয়েন দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ভিভিয়েন অভ্যর্থনা করে তাকে ঘরে নিয়ে বসাল।

তার মুখের দিকে মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে হার্টলি স্বগতোক্তি করল—না, আমার পছন্দের দিক থেকে ত্রুটিই নেই।

ভিভিয়েন পূর্ণ যৌবনা। বয়স একুশ। তার রূপের আভা যে কোন পুরুষের মনে দোলা দেবার ক্ষমতা রাখে। আর পরনে রাজকন্যার বেশভূষা।

হার্টলি তার মুখের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই বলল—ভিভিয়েন, আমার সর্বশেষ চিঠিটার উত্তর কিন্তু তোমার কাছ থেকে পেলাম না। এক সপ্তাহের চেষ্টায় তোমার এ নতুন ঠিকানাটা জোগাড় করতে পেরেছি।

ভিভিয়েন গম্ভীর মুখে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

হার্টলি বলে চলল—তোমাকে একবারটি চোখে দেখার জন্য, তোমার চিঠি পাবার জন্য কতখানি উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকি তা তুমি জেনেও কেন যে আমাকে অনিশ্চিতের মধ্যে রেখেছিলে আমার মাথায় আসছে না।

ভিভিয়েন মায়াচ্ছন্ন চোখে খোলা-জানালা দিয়ে বাইরের প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

মিনিটখানেক নীরবতার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত ভিভিয়েন মুখ খুলল—মিঃ হার্টলি, আপনার কথার কি যে জবাব দেব আমি ভেবে পাচ্ছি নে।

তার মানে?

আপনার প্রস্তাবের সব কটা সুবিধা সম্বন্ধেই আমার ধারণা আছে। তাতে করে আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে, আপনার সঙ্গে ঘর বাঁধলে আমি সুখেই থাকব কিন্তু আবার ভয়ও আছে।

ভয়, কেন? কিসের ভয়?

আমি বড় একটা শহরে জন্মেছি, মানুষও হয়েছি সেখানেই।

তাতে আমাকে বিয়ে করার বাধা কোথায়?

বাধা একটাই দেখা দিতে পারে, ছোট্ট এ শহরটার শহরতলীর নির্জন পরিবেশে যদি নিজেকে মানিয়ে নিতে না পারি, তখন?

তোমাকে তো আমি বহুবারই বলে রেখেছি, যদি আমার সাধ্যের মধ্যে থাকে তবে তোমার যে কোন সাধই আমি পূরণ করতে রাজি আছি। থিয়েটার দেখা, কেনাকাটা করতে যাওয়া বা বন্ধুদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করা কোন কিছুতেই আমার আপত্তি থাকবে না। তুমি কি আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পার না ভিভিয়েন?

অবশ্যই। পুরোপুরিই পারি। আমি নিঃসন্দেহ যে, আপনি হৃদয়বান এক সদাশয় ব্যক্তি। আপনাকে যে পাবে সে অবশ্যই সৌভাগ্যবতী।

হার্টলি নীরবে মুচকি হাসল।

ভিভিয়েন এবার বলল—মিঃ হার্টলি, আমি মন্টগোমেরিদের সঙ্গে বসবাস করার সময়ই আপনার সম্বন্ধে সব কিছু জানতে পেরেছিলাম।

আহা! সেখানে তোমাকে যেদিন প্রথম দেখি তখনই তোমার রূপ, তোমার মিষ্টি-মধুর কথা আমাকে পুরোপুরি মুগ্ধ করে ফেলেছিল।

ভিভিয়েন মুখে ম্লান হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলল।

হার্টলি পূর্ব প্রসঙ্গের জের টেনে এবার বলল—ভিভিয়েন, তোমার জন্য আমি পাগল হয়ে পড়েছি। তোমাকে আমার পাওয়া দরকার—চাই-ই চাই। আমার কথা বিশ্বাস কর, আমি ছাড়া এমন সুন্দর একটা ঘর তোমাকে দ্বিতীয় কেউ-ই দিতে পারবে না।

ঠিক সে মুহূর্তেই একটা ঈর্ষা-কাতর সন্দেহ হার্টলির মনের কোণে উঁকি দিল। সে কপালে চিন্তার ভাঁজ এঁকে বলল—আমাকে সত্যি করে বল তো ভিভিয়েন, তোমার জীবনে আর কেউ উৎসাহী কি?

মিঃ হার্টলি, আপনার কাছ থেকে এমন কোন প্রশ্ন কিন্তু আমি আশা করিনি।

তবে? তবে কি—

আপনার কাছে কোন কথাই গোপন করব না, করার ইচ্ছেও নেই। হ্যাঁ, আরও একজন আছে, সত্য বটে। তবে তাকে আমি কোন প্রতিশ্রুতি দেই নি।

তার নামটা জানতে পারি কি?

টাউনসেন্ড।

টাউনসেন্ড! রাফোর্ড টাউনসেন্ড! তার সঙ্গে তোমার পরিচয়, মানে সে তোমাকে চিনল কি করে বল তো? তার স্বার্থে আমি এতকিছু করা সত্ত্বেও—

ওই শুনুন, দরজায় গাড়ি থামার আওয়াজ। আসলে সে তার জবাবটা জানতে এসেছে।

হার্টলি উৎকর্ণ হয়ে আওয়াজটা শোনার চেষ্টা করল।

ভিভিয়েন অস্থিরভাবে বলে উঠল—হায় ঈশ্বর! আমি যে এখন কি করব, কি করা উচিত কিছু ভেবে পাচ্ছি নে!

ভিভিয়েন দরজা খোলার জন্য পা-বাড়াতেই হার্টলি বলল—তুমি এ ঘরেই থাক। আমি নিজে হলঘরে তার সঙ্গে কথা বলব।

দরজা খুলেই হার্টলি গম্ভীর স্বরে বলল—ফিরে যাও রাফোর্ড। তাকে দেখেই রাফোর্ড চমকে উঠল।

হার্টলি এবার পূর্বস্বরেই বলল—আমার সাফ কথা শোন রাফোর্ড, ফিরে যাও। এ শিকার আমার, এখানে হাত বাড়াবার চেষ্টা কোরো না।

সে কী!

হ্যাঁ, ঠিক তা-ই। জঙ্গলের আইন জান না?

জঙ্গলের আইন! ভ্রূ কুঁচকে রাফোর্ড বলে উঠল।

হ্যাঁ। তোমাকে তারা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেঁড়ে দিক এটাই কি তুমি চাও?

অনন্যোপায় হয়ে রাফোর্ড টাউনসেন্ড গোমড়ামুখে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল।

হার্টলি ঘরে ফিরে এসে রীতিমত দৃঢ়তার সঙ্গেই বলল—শোন ভিভিয়েন, তোমাকে আমার চাই-ই চাই। তৈরী হয়ে নাও।

ভিভিয়েনও এবার একটু দৃঢ় স্বরেই বলল—আপনি কি করে ভাবছেন যে, হেলয়েস যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার বাড়িতে আছে ততক্ষণ আমার পক্ষে কি সে বাড়িতে ঢোকা সম্ভব. নাকি উচিত?

তাকে চলে যেতে হবেই। সে মেয়েটাকে ঝুটমুট কেন আমার জীবনটাকে বরবাদ করতে দেব? তার সঙ্গে পরিচয়ের মুহূর্ত থেকে আমি একটা মিনিটের জন্যও শান্তি পাই নি।

ভিভিয়েন চোখের তারায় বিস্ময়ের ছাপ এঁকে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

হার্টলি বলে চলল—আজই—আজই আমি তাকে অনেক, অনেক দূরে পাঠিয়ে দেব।

মুচকি হেসে ভিভিয়েন এবার বলল—তবে আমিও জবাব দিচ্ছি 'হ্যাঁ'। হেলয়েসকে যখনই বাড়ি থেকে তাড়াবেন তখনই এসে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দেবেন, কি বলেন মিঃ হার্টলি?

আনন্দে ডমগম হয়ে হার্টলি বলল—তবে আগামীকাল।

ভিভিয়েনও হাসিমুখে বলল—হ্যাঁ, আগামীকাল।

হার্টলি আধঘণ্টার মধ্যেই সুন্দর একটা দোতলা বাড়িতে ঢুকে গেল।

সিঁড়ির মুখেই সাদা ঢিলেঢালা পোশাকে সজ্জিত এক নারীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

সে আনন্দে ডগমগ হয়ে হার্টলির গলাটা জড়িয়ে ধরে বলে উঠল—মাম্মা বাড়িতেই আছে। ডিনার খেতে এসেছে। ডিনারের ব্যবস্থা হয় নি।

হার্টলি বলল—যেহেতু তোমার মা-ও এখনেই আছে, আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাচ্ছি।

মেয়েটা বলল—কি? কি কথা, বলুন।

হার্টলি অনুচ্চকণ্ঠে, প্রায় ফিসফিসিয়ে তাকে কিছু বলল।

তার স্ত্রী আচমকা আর্তনাদ করে উঠল। তার মা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে হলঘরে ঢুকল। কালো চুলের মেয়েটা আবার করুণ আর্তনাদ করে উঠল।

মেয়েটা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে চেঁচিয়ে বলতে লাগল—জান মাম্মা, আমাদের রান্নাবান্না করার জন্য ভিভিয়েন আসছে। জব্বর খবর কি বল? মন্টগোমেরিদের বাড়িতে সে-ই তো এক বছর কাজ করেছিল।

বিলি এখনই হেঁসেলে চলে যাও। আজই হেলয়েসকে কাজ থেকে বরখাস্ত কর। অধিকাংশ দিনের মত সে আজও মদ নিয়ে বেঁহুশ হয়ে পড়ে রয়েছে।

সোসিওলোজি ইন সার্জ অ্যান্ড স্ট্র

একটা গল্প শোনাচ্ছি। সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক গল্প। নিউইয়র্ক শহরকে কেন্দ্র করে গল্পটা গড়ে তোলা হয়েছে।

লং আইল্যান্ডের দক্ষিণ উপকূলবর্তী ফিশাম্পটন শহর দুটো কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে— প্রথমত ভ্যান প্লাসভেন্ট পরিবারের গ্রীষ্মাবাস আর দ্বিতীয়ত-শুক্তি-পাঠ।

ভ্যান প্লাসভেন্ট পরিবারটি একশ' মিলিয়ন ডলারের মালিক। ফটোগ্রাফার আর ব্যবসায়ী হিসাবে তাদের যথেষ্ট খ্যাতি রয়েছে।

আরও আছে, টৌডিজ ম্যাগাজিন-এ ভ্যান প্লাসভেন্ট পরিবারের গ্রীষ্মাবাসটার ছবি আপনি বহুবারই দেখে থাকবেন। তাই বাড়িটার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া থেকে বিরত রইলাম।

যুবক হেউড ভ্যান প্লাসভেন্ট আমাদের বর্তমান গল্পের মুখ্য ভূমিকায় রয়েছে। তার বয়স ষোল বছর। একশ' মিলিয়ন ডলারের মালিক। ব্যবসা-জগতে তার প্রভাব ও খ্যাতি আকাশ-ছোঁয়া।

এক বিকেলে যুবক হেউড গ্রামের পথ দিয়ে হেঁটে চলেছে। সবকিছু সত্ত্বেও সে-ও তো মানুষ। তার মাথায় একশ' মিলিয়ন ডলারের বোঝা। আগে থাকতে কথাটা আপনাদের বলে রাখার অর্থ একটাই, ভবিষ্যতে যখন তার বহুমূল্য ঝলমলে পোশাক-পরিচ্ছদের কথা বলব, শখ আহ্লাদের ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরব তখন পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পারা এবং বিচার বিবেচনা করতে আপনারা কোন রকম ধন্ধে না পড়েন।

হাঁটতে হাঁটতে পার্সিমন সড়কটা পার হয়ে ডডসন গ্রামের পথে নামল। তার বয়স সাড়ে পনের বছর, সে ফিশাম্পটন শহরের সবচেয়ে বখাটে ছেলে।

আর সামান্য এগোতেই তার সঙ্গে হেউড-এর মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। হেউড সারাটা দিন সেখানেই গুজরান করে দিল।

ডডসনকে দেখে, তার ছেঁড়া ময়লা পোশাক-পরিচ্ছদের ওপর মুহূর্তের জন্য চোখ বুলিয়ে নিয়েই হেউড বুঝে নিল, সে অতি সাধারণ ঘরের এবং এক ওঁচাটে ছেলে।

তাকে দেখেই মুখে বিদ্রূপের ছাপ ফুটিয়ে তুলে ডডসন বলে উঠল—তোমাকে আমি চিনি হে। তারপর অঙ্গুলি-নির্দেশ করে সে আবার মুখ খুলল—তুমি তো ওই বড় বাড়িটায় থাক, ঠিক কিনা?

হেউড গর্জে উঠল—নচ্ছাড়! হতচ্ছাড়া কাহাকার!

তাই নাকি? বেড়া থেকে বাঁশের চটা তুলে নিয়ে কাঁধের ওপর রেখে ডডসন বলল—খুব যে হিম্মৎ দেখাচ্ছ হে! ঘুষি হাঁকিয়ে আমার কাঁধের ওপর থেকে এটাকে ফেলে দিতে পারবে?

আরে ধ্যুৎ! তোমার শরীরে হাত দেব কি, দেখেই আমার গা ঘিন ঘিন করছে।

বুঝেছি, একটা পাতিহাঁসের মুরোদও তোমার নেই। আমি বাঁ-হাতেই তোমার মোকাবেলা করতে পারি।

আরে তুমি তো একটা ক্যাড ছাড়া কিছু নও।

ক্যাড? ক্যাড আবার কি হে?

ক্যাড মানে বাজে, একেবারে ওঁচাটে লোক। আর সে লোকের সঙ্গে আচার-ব্যবহার করতে জানে না, নিজেকেও জানে না।

আর তুমি একটা পোষা বাঁদর যাকে তার মা ঝলমলে জামা-কাপড় পরিয়ে ছেড়ে দেয়। বাগান থেকে ফল কুড়িয়ে আনার জন্য।

শোন, তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি হতচ্ছাড়া, আমার পরিবারের অন্য কারো কথা আমি হজম করলেও মহিলাদের কথা তুললে বদন একেবারে বিগড়ে দেব, বলে রাখছি।

ধ্যুৎ! বাজে কথা ছাড় হে ধনকুবেরের ছেলে! সে সব শহুরে মেয়েমানুষদের কার্যকলাপ আমার আর জানতে বাকি নেই। তারা মদ গেলে, খিস্তি খেউর করে আর গরিলাদের নিয়ে

পার্টিতে নাচানাচি করে। খবরের কাগজে এসবই লেখা থাকে।

হেউড বুঝে নিয়েছে, এবার তাকে কি করতে হবে। চোখের পলকে টুপিটা খুলে তৈরী হয়ে নিল। তারপর দাঁত কিড়মিড় করতে করতে বলল—নচ্ছাড়, হতচ্ছাড়া, ছোটলোক কাঁহাকার। তোমাকে উচিত শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আমি করছি।

মুহূর্তে এক মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। উভয় দিক থেকে কিল, চড়, লাথি আর ঘুষি বিনিময় হতে লাগল।

কিছুক্ষণ তুমুল যুদ্ধ চালাবার পর হেউড হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—রঙবাজি! এবার বল তো কোথায় যাচ্ছিলে? পকেটে ওটা কি? বল নাকি?

নিশ্চয়ই। ওহে বাছাধন, 'হলুদ-কুর্তা' দলের সঙ্গে খেলার ইচ্ছে, মানে হিম্মৎ টিম্মৎ আছে নাকি? আমি লং আইল্যান্ডের ক্যাপ্টেন। নইলে কেচারও খেলতে পার, রাজি?

না, জীবনে কোনদিন খেলিনি। আসলে দু'-একজন জ্ঞাতি ভাই ছাড়া আর কেউ-ই আমার পরিচিতজন নেই।

শেখার ইচ্ছে আছে? ম্যাচে অংশ গ্রহণের আগে আমাদের একদিন অনুশীলন করতে হবে। আসতে রাজি আছ?

আমতা আমতা করে হেউড বলল—আমি—মানে—

আরে এত ঘাবড়াচ্ছ কেন? আমি তো থাকব। তোমাকে না হয় মাঠের বাঁ দিকে রেখে দেব। ভয় নেই, দেখে দেখেই খেলাটা রপ্ত করে ফেলতে পারবে। আমি শুধু জানতে চাই, তুমি রাজি কিনা?

ঠিক আছে, আমি রাজি। আমার অনেক দিনের সাধ, বেসবল খেলাটা শিখব। আজ তুমি যখন উপযাচক হয়ে শিখিয়ে দিতে চাইছ তখন সুযোগটা হাতছাড়া করতে চাইছি নে।

ব্যাপারটা নিয়ে চারদিকে রীতিমত হৈ চৈ পড়ে গেল। কম কথা! ধনকুবের ছেলে হেউড ফিশাম্পটন-এর এক গেঁয়ো ছেলের সঙ্গে বেসবল খেলছে।

ব্যাপারটা বাতাসের কাঁধে ভর দিয়ে চারদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেলে সারা দ্বীপে ফটোগ্রাফার আর সাংবাদিকদের বাজার গরম হয়ে উঠল।

শুধু কি এ-ই? সবার মুখে একই কথা—দ্বীপে গণতন্ত্রের সুবর্ণযুগ এসে গেছে।

খবরের কাগজগুলো আরও বাজার গরম করে দিল।

আধ পৃষ্ঠা জুড়ে হেউড ভ্যান প্লাসভেন্ট-এর ছবি ছাপা হল। দ্বীপের মন্ত্রী, শিক্ষাবিদ, সমাজবিজ্ঞানী আর সমাজের কর্তাব্যক্তিরা এ ঘটনাটাকে স্বাগত জানাল—মানবের বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ববোধের প্রথম ঘণ্টা-ধ্বনি হিসাবে। হ্যাঁ, ব্যাপার তো অবিশ্বাস্যই বটে!

এক বিকেলে আমি সাগরের তীরবর্তী একটা ঝাঁকড়া উইলো গাছের তলায় বসে একটু জিরিয়ে নিতে লাগলাম। আমার পাশেই একজন শ্রদ্ধেয় সমাজবিজ্ঞানী যুবক বসে।

সমাজবিজ্ঞানী যুবকটা কথা প্রসঙ্গে ভ্যান প্লাসভেন্ট-এর দৃষ্টান্তকে বর্তমান প্রজন্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতির লক্ষণ বলে উল্লেখ করল।

তখন আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে বেসবল খেলার মাঠ। ফিশাম্পটন-এর যুবক খেলোয়াড়রা এক এক করে সেখানে হাজির হল।

সমাজবিজ্ঞানী যুবকটা উল্লসিত হয়ে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলল—ওই-ওই যে, যুবক প্লাসভেন্টও এসে গেছে। তাদের দলেই আছে।

আমি তার অঙ্গুলি-নির্দেশিত পথে তাকিয়ে দেখলাম, ছেঁড়া লাল একটা সোয়েটার গায়ে, মাথায় পুরনো একটা গলা টুপি, দুমড়ানো ময়লা একজোড়া জুতো পায়ে সে পা ছড়িয়ে বসে। সারা দেহ মুখে ধুলো বালি লেগে রয়েছে।

আর তারই প্রায় গা-ঘেঁষে বসে রয়েছে ধনকুবেরের অন্তরঙ্গ বন্ধু ডডসন।

ডডসন-এর পরনে বহুমূল্য সার্জের স্যুট। চমৎকার একটা খড়ের ছড়ানো টুপি, সদ্য পালিশ করা লো-কাট জুতো, নামকরা কোম্পানির লেবেল আঁটা জামা, মনোলোভা একটা টাই আর হাতে রুপো-বাঁধানো একটা দড়ি।

ব্যাপার দেখে আমি আর হাসি চাপতে পারলাম না। আচমকা সরবে হেসে উঠলাম।

আমি হাসতে হাসতেই সমাজবিজ্ঞানী যুবককে বললাম—আপনাদের সাধ একটা 'দুষ্ট-চক্রে'র পাঠশালা গড়ে তুলতে, তাই না?

সে নীরবে মুচকি হাসল।

আমি বলে চললাম—দেখুন, আমার তো মনে হচ্ছে, সবকিছুই চক্রাকারে ঘুরছে—আর ঘুরছে।

তারপর?

কিন্তু কোন একটা বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছাচ্ছে না।

আপনার বক্তব্য কি, খোলসা করে বলুন তো?

ওই গেঁয়ো ডডসন-এর দিকে তাকালেই তোমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে।

সমাজবিজ্ঞানী যুবকটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে উঠল—তুমি চিরকাল বোকাই থেকে যাবে।

কথাটা বলেই সমাজবিজ্ঞানী যুবকটা গাছতলা ছেড়ে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় আমার চোখের আড়ালে চলে গেল।

দ্য র‍্যান্‌সম্‌ অব রেড চিফ

আমরা তখন দক্ষিণের ভাঁটি অঞ্চলের আলাবাসাতে আছি। 'আমরা' বলতে—আমি আর বিল ড্রিসকোল।

স্বীকার করতে বাধা নেই এ অপহরণের পরিকল্পনাটা তখনই আমাদের মাথায় খেলেছিল।

পরবর্তীকালে আমার সহকর্মী বন্ধু বিলই এটাকে এক সাময়িক ও মানসিক বিকার আখ্যা দিয়েছিল।

হ্যাঁ, সে খুবই দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেছিল—বিকার ছাড়া একে আর কিই বলা যেতে পারে?

কিন্তু আমিও এটা বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু বুঝতে অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল।

স্যামিট।

ভাঁটি-অঞ্চলে একটা ছোট শহরের নাম স্যামিট। সেখানকার অধিকাংশই চাষী পরিবার, সহজ-সরল আর আত্মতুষ্টিতে মাতোয়ারা চাষী।

বিল আর আমার দু'জনের অর্থ একত্রিত করে দাঁড়াল মোট দু'শ' ডলার।

আমাদের আরও দু' হাজার ডলার যত শীঘ্র সম্ভব জোগাড় করতেই হবে। পশ্চিম ইলিনয়-এর একটা জালিয়াতি কেনা-বেচার ব্যাপারে এ পরিমাণ অর্থ যেন তেন প্রকারেণ আমাদের চাই।

আমরা দু'জন হোটেলের নিরিবিলি জায়গায় বসে এ ব্যাপার নিয়ে আলোচনা সেরে ফেললাম।

একটা অপহরণের পরিকল্পনার ছক কষার পক্ষে জায়গাটা সত্যি খুবই উপযুক্ত সন্দেহ নেই।

আমরা নিঃসন্দেহ যে, স্যামিট-এর অধিবাসীরা জনাকয়েক পুলিশের চেয়ে বড় কিছু নিয়ে আমাদের অনুসরণ করতে পারবে না। আর তাদের হিম্মৎ গুটিকয়েক অনিচ্ছুক শিকারী-কুকুরকে আমাদের পিছনে লেলিয়ে দেওয়া। হ্যাঁ, আরও পারবে, 'সাপ্তাহিক ফার্মার্স বাজেট' পত্রিকায় গরম গরম প্রতিবেদন লিখে হৈ চৈ করতে।

এবেনজের ডরসেট নামক এক প্রতিষ্ঠিত ধনকুবেরের একমাত্র শিশুপুত্রকে আমাদের শিকার

হিসাবে নির্বাচন করে ফেললাম।

তার বাবা সমাজের প্রতিষ্ঠিত লোক হলেও একেবারে হাড়কিপ্টে। বন্ধকী কারবার আর এরকমই কিছু কাজকর্মের মাধ্যমে ডলারের পাহাড় তৈরী করে ফেলেছে।

ছেলেটার বয়স দশ বছর।

বিল আর আমি দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম, হাড়কিপ্টে এবেনজের-এর কাছে দু'হাজার ডলার মুক্তিপণ দাবী করলে হাতচ্ছাড়াটা একদম দু' সেন্টে নেমে যাবে। চক্ষু লজ্জাটজ্জা না থাকলে যা হয়।

সে যা হয় পরে বলছি। আমার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনাদের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে অনুরোধ করছি।

স্যামিট শহর থেকে মাইল দুই দূরে ছোট একটা পাহাড় সদম্ভে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে। পাহাড়টার শীর্ষদেশের পিছন দিকে একটা বেশ বড়সড় গুহা আছে। আর পাহাড়টার চারদিক ঘিরে রেখেছে পাইন, দেবদারু আর মেপল গাছের জঙ্গল। গুহাটাতেই আমরা খাবার দাবার মজুদ রাখি।

এক সন্ধ্যায় একটা বগি-গাড়িতে চেপে আমরা বুড়ো হাড়কিপ্টে এবেনজের-এর বাড়ির গা দিয়ে চলেছি। তার দশ বছরের ছেলেটা বিপরীত দিককার বেড়ার ওপরে বসে-থাকা একটা বিড়ালের বাচ্চাকে লক্ষ্য করে একের পর এক ঢিল ছুঁড়ে চলেছে।

বিল শিকার সামনে পাওয়া বাঘের মত জিভ দিয়ে ঠোঁটে দুটোকে ভিজিয়ে নিয়ে বলে উঠল—এই যে খোকা।

ব্যস, আর দেখতে হল না, বাচ্চাটার হাতের ঢিলটা চোখের পলকে বিল-এর কপালে এসে আঘাত হানল। বরাত ভাল যে, ঢিলটা খুবই ছোট—কপাল ফেটে রক্ত বেরোয় নি।

কপালে হাত বুলাতে বুলাতে বিল বলল—আমি বলে রাখছি, এর জরিমানা হিসেবে বুড়ো এবেনজারকে অতিরিক্ত পাঁচশ' ডলার দিতে হবে।

ছেলেটা ভালুকের মত ধস্তাধস্তি শুরু করে দিল। কিন্তু সে আর কতক্ষণ। আমরা তাকে জাপ্টে ধরে গাড়িতে তুলে নিলাম। গাড়ি উল্কার বেগে ছুটে চলল।

মুখে রুমাল চাপা দিয়ে গুহায় হাজির করলাম।

তিন মাইল দূরবর্তী এক পাড়া থেকে গাড়িটা ভাড়া করেছিলাম। আমি সেটাকে তার মালিকের কাছে পৌঁছে দিলাম।

অচিরেই বাচ্চাটা আমাদের, বিশেষ করে বিল-এর পুরোপুরি অনুগত হয়ে উঠল। অতএব সেখানে সে খোলা মেজাজেই সময় কাটাতে লাগল। বিল তার খেলার সাথী বনে গেল।

আমরা রাত্রের খাবার নিয়ে বসলাম। বাচ্চা ছেলেটা রুটি, শূকরের মাংস আর ঝোল দিয়ে মুখটা ভরে নিয়ে কথা বলতে লাগল—এখানে আমার খুব ভাল লাগছে।

বিল দাঁত দিয়ে রুটিটা ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলল—তাই নাকি? কেন ভাল লাগছে, বল তো?

আগে তো কোন দিন বাড়ির বাইরে থাকা তো দূরের কথা কোথাও যাইও নি।

স্কুলে যেতে তো?

হ্যাঁ, তা-তো যেতেই হত। তবে স্কুলে যেতে আমার মোটেই মন চায় না।

মুচকি হেসে বিল বলল—তবে তো তুমি পুরোপুরি ভাল ছেলে, কি বল?

বাচ্চাটা বলল—তারপর কি বলছি শুনুন—গত জন্মদিনে আমার বয়স হয়েছে ন' বছর। ইঁদুরে জিমি টালবট আন্টির ষোলটা মুরগীর ডিম উদরস্থ করে ফেলেছে।

এ পর্যন্ত বলে বাচ্চাটা মুহূর্তের জন্য থেমে, বার-কয়েক এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিয়ে বলল—একটা কথা, এ পাহাড়ে-জঙ্গলে কি সত্যিকারের ইন্ডিয়ানরা থাকে? আমাকে আর একটু ঝোল দিতে হবে। গাছগাছালি নাড়ানাড়ি করছে বলে কি বাতাস বইছে?

বিল খাওয়া বন্ধ করে বাচ্চাটার অসংলগ্ন কথাগুলো মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতে লাগল।

বাচ্চা ছেলেটা বলে চলল—আমার বাবার বস্তা-বস্তা ডলার আছে, জান?

হুম!

আচ্ছা, আকাশের তারাগুলো কি গরম? জান, শনিবার ওয়াকারকে আমি দু'বার চাবুক মেরেছি। মেয়েদের আমি একদম বরদাস্ত করতে পারি না। খবরদার, হাতে একটা দড়ি না নিয়ে যেন কোলাব্যাঙ করতে চেষ্টা কোরো না। বলতো, কমলালেবুর আকার গোল হয় কেন? গুহাটার ভেতরে শোবার ব্যবস্থা আছে কি? আমাদের পাড়ার আমোস মারের পায়ে আঙুলের সংখ্যা ছ'টা। কাকাতুয়া দিব্যি কথা বলতে পারে, কিন্তু মাছ বা বানর পারে না। বারো হতে গেলে কত-কত সংখ্যা ব্যবহার করতে হয়?

আমি বাচ্চাটাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা খোকা, তুমি কি বাড়িতে ফিরে যেতে আগ্রহী?

বাড়িতে?

হ্যাঁ—হ্যাঁ, বাড়িতে যেতে চাচ্ছ কি?

কেন? বাড়িতে কেন?

তোমার বাড়ি, তোমার বাবা-মা—

ধ্যুৎ! বাড়িতে আমার এক মুহূর্তও ভাল লাগে না। কোনই আনন্দ স্ফূর্তির ব্যবস্থা নেই।

তবে কি আছে?

আছে কেবল পড়া আর পড়া। স্কুলে যেতে আমার একদম ইচ্ছে করে না, ঘেন্না করে।

তবে? কি ভাল লাগে?

এরকম বাইরে বাইরে কাটাতে খুব মজা লাগে। আমি এরকম বাইরে থাকতেই চাই।

এবার কাঁদো-কাঁদো মুখে সে বলল—আপনারা আবার আমাকে বাড়িতে চালান দিয়ে দেবেন না তো, বলুন?

আরে না-না। এখনই পাঠাবার তো প্রশ্নই ওঠে না। অন্তত দিন-কয়েক এখানে থাক।

আরে ব্বাস! কী মজা।

খুশি হয়েছ তো? আমি ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বললাম।

খুশি হব না! এখানকার মত মজা আমি আগে কোনদিনই পাই নি।

ঠিক এগারোটায় আমরা গুহার মেঝেতে কম্বল পেতে শুয়ে পড়লাম।

ভোর হতে না হতেই বিল-এর গলা-ফাটা চিৎকারে আমার ঘুম ভেঙে গেল। হুড়মুড় করে উঠে পড়লাম। সেটা আর্তনাদ, চেঁচামেচি, হাহাকার কোনটাই নয়—ভয়ঙ্কর বিশ্রী একটা করুণ স্বর ছাড়া আর কোন ভাবে তাকে বোঝানো সম্ভব নয়।

আমি ঘাড় ফিরিয়েই দেখলাম, বাচ্চাছেলেটা আমার সহকর্মী বন্ধু বিল-এর বুকের ওপর গেঁট হয়ে বসে। তার বাঁ-হাতটা দিয়ে বিল-এর চুল মুঠো করে ধরা, আর ডান হাতে আমাদের মাংস-কাটার ঝকঝকে ছুরিটা শক্ত করে ধরা। এটা দিয়ে সে বিল-এর চামড়া ছাড়াবার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালাচ্ছে। সন্ধ্যায় আমরা ঠিক যেভাবে তার চামড়া ছাড়াবার কথা বলেছিলাম, সেভাবেই সে চেষ্টাটা চালাচ্ছে দেখলাম।

আমি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাত থেকে জোর করে ছুরিটা ছিনিয়ে নিলাম। তারপর তাকে কম্বলের ওপর শুইয়ে দিলাম।

এ ঘটনার পর বিল একদম মুষড়ে পড়ল। বিল নিজের জায়গাতেই শুয়ে পড়ল বটে। কিন্তু বিচ্ছু ছেলেটা যতক্ষণ জেগে থাকল ততক্ষণ সে ভুলেও মুহূর্তের জন্য চোখের পাতা বন্ধ করল না।

আমিও ঘুমোতে পারলাম না। প্রকৃতির বুকে আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসে পড়লাম। আমার মনে একটা কথাই বার-বার উঁকি মারতে লাগল—হতচ্ছাড়া ছেলেটা গতসন্ধ্যায় আমাকে চোখ রাঙিয়ে বলেছিল—সূর্য উঠলেই তোমাকে খুঁটির গায়ে বেঁধে আগুনে পুড়িয়ে মারব। সে মুহূর্তে আমি ভয় পাইনি সত্য।

বিল আমার দিকে তাকাল।

আমি বিষণ্ন মুখে বললাম—কাঁধে কেমন যেন ব্যথা-ব্যথা লাগছে।

বিচ্ছু ছেলেটা এক লাফে বসে পড়ে বলে উঠল—মিথ্যুক কাহাকার!

আমি তার মুখের দিকে তাকালাম।

সে গম্ভীর মুখে এবার বলল—তুমি, ডাঁহা মিথ্যে কথা বলছ। তুমি ভয় পেয়েছ। কথা হয়েছিল —আজ সূর্য ওঠামাত্র তোমাকে পুড়িয়ে মারা হবে, তাই না।

আমি জোর করে ম্লান হাসলাম।

সে বলে চলল—তোমার মনে ভয়টা জমাট বেঁধে রয়েছে। ভাবছ, কাজটা বুঝি করেই ফেলব, মিথ্যে বলেছি?

হুম!

আরে একটা দেশলাই পেলে কাজটাকে যে সেরেই ফেলতাম, এতে এতটুকুও সন্দেহ নেই।

বিল বা আমার কারো মুখ দিয়েই রা-সরল না।

বাচ্চাটা হো-হো করে হেসে বলল—তোমরা যদি ভেবে থাক যে, এরকম একটা বিচ্ছু ছেলেকে ফিরে পাবার জন্য আমার বাবা তোমাদের মালকড়ি দেবে তবে দারুণ ভুলই করবে।

আমি কাঁপা কাঁপা গলায় বললাম—দেবে, একশ'বার দেবে।

সে মুখ বিকৃত করে বলে উঠল—ধ্যুৎ! পাগলের প্রলাপ!

দেবে, নিশ্চয়ই দেবে। এরকম ওঁচাটে ছেলেরাই তো মা-বাবাব সবচেয়ে বেশী প্রিয় হয়ে থাকে।

আমি বিছানা ছেড়ে উঠে পাহাড়ের মাথায় উঠে চারদিকটা দেখে আসার জন্য গুহা ছেড়ে বেরিয়ে গেলাম।

না। চারদিক শান্তই বটে। অপহরণকারীদের খোঁজে আসার মত কাউকেই চোখে পড়ল না। নিশ্চিন্ত হয়ে গুহায় ফিরতে লাগলাম।

গুহাটার কাছাকাছি পৌঁছতেই আমার চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে যাবার জোগাড় হল। দেখলাম, বিচ্ছু ছেলেটা ইয়া বড় একটা পাথর হাতে নিয়ে বিলকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। আর বার বার শাসাচ্ছে তোমার মাথাটা ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ছাড়ব।

আমি অতিকষ্টে তার হাত থেকে পাথরটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম।

আমি ব্যাপারটা সম্বন্ধে জানতে চাইলে বিল বলল—হতচ্ছাড়াটা একটা সেদ্ধ গরম আলু আচমকা আমার পিঠে ঠেসে ধরেছিল। ব্যস, আমি তার কান বরাবর দুটো থাপ্পড় কষে দিলাম। স্যাম, তোমার কাছে পিস্তল আছে কি?

বাচ্চা ছেলেটা একটা লম্বা সুতোর এক প্রান্তে এক টুকরো কি যেন বেঁধে সেটাকে নাচাতে নাচাতে কিছুটা দূরে চলে গেল।

বিল গলা নামিয়ে, প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল—স্যাম, এবার সে কি করতে যাচ্ছে, বল তো? তবে এখান থেকে অবশ্যই পালিয়ে যাবে না, কি বল?

আরে ধ্যুৎ! পালিয়ে যাবার ভয় নেই। আর পাহাড়ে উঠেও কাউকে তার খোঁজে আসতেও দেখলাম না।

কি জানি, ব্যাপারটা—

তাকে থামিয়ে দিয়ে আমি বললাম—আমার মনে হয়, বাড়ির লোকরা ব্যাপারটা এখনও জানতেই পারে নি।

হতেও পারে।

শোন, আজ রাত্রেই আমরা তার বাবার কাছে খবর পাঠিয়ে মুক্তিপণ স্বরূপ দু' হাজার ডলার দাবী করব।

আমার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই যুদ্ধের হুঙ্কারের মতই ভয়ঙ্কর একটা আওয়াজ কানে এল—মহাপরাক্রমশালী ডেভিড গোলিয়াসকে কুপোকাৎ করার সময় ঠিক যেমন হুঙ্কার ছেড়ে ছিল।

সামান্য এগিয়ে দেখলাম, বাচ্চাটা একটা গুল্‌তি মাথার ওপর চক্রাকারে বন্ বন্ করে ঘুরিয়ে চলেছে।

আমি সামান্য সরে যেতেই একটা ভারি কিছু পড়ার শব্দে চমকে উঠলাম। আর সে সঙ্গে বিল-এর দীর্ঘশ্বাস তো আছেই।

ব্যাপারটা বিল-এর মুখ থেকে জানতে পারলাম, আমি বিল-এর কাছ থেকে সরে হুঙ্কার-এর উৎসের সন্ধানে এগিয়ে যাওয়ামাত্র একটা ঢিল বাতাসের বেগে ছুটে এসে বিল-এর পিঠে আঘাত হানল।

আচমকা আঘাতটা সামলাতে না পেরে বিল দুম্ করে গরম জলের কড়াইটার ওপর পড়ে যায়।

আমি ব্যস্ত হাতে বিলকে তুলে নিয়ে আধ ঘণ্টা ধরে তার গায়ে ঠাণ্ডা জল ঢেলে কিছুটা স্বাভাবিক করতে পারলাম।

বিল ক্ষীণ কণ্ঠে বলল—স্যাম, তুমি আর এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে একা ফেলে কোথাও চলে যেয়ো না।

আমি দৌড়ে বাচ্চাটার কাছে গিয়ে তাকে জাপ্টে ধরে শাসাতে লাগলাম—এসব হচ্ছে কি, জানতে চাই। তুমি যদি অনবরত এমন করতেই থাক তবে বাড়ি পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হব।

আরে ধ্যুৎ! এসব নিয়ে আপনারা এমন মাতামাতি করছেন কেন, বলুন তো? আমি তো মস্করা করছিলাম, ব্যস। বুড়ো বিলকে আমি মোটেই ইচ্ছে করে মারিনি। কিন্তু তিনিই বা আমাকে থাপ্পড় মারলেন কেন, বলুন? কথা দিচ্ছি, তুমি আমাকে বাড়িতে ফেরৎ পাঠিয়ে না দিলে আমি লক্ষ্মী ছেলে হয়ে থাকব। আমাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেবে না তো, বল?

সেটা তোমাকে আর মিঃ বিলকে স্থির করতে হবে।

দুপুরের পর আমি বিল-এর কাছ থেকে সম্মতি পেয়ে তিন মাইল দূরবর্তী 'পপলার গ্রোভ'-এ খবরা খবর জোগাড় করার জন্য—অপহরণটা ঘটার পর 'স্যামিট'-এ কেমন উত্তেজনা শুরু হয়েছে জানার জন্য যাত্রা করব ভাবলাম। আর সে সঙ্গে বাচ্চাটার বাবা এবেনজার'কে একটা চিঠি দিয়ে মুক্তিপণের ব্যাপারটা জানিয়ে দেব। আর আমাদের বাঞ্ছিত দু' হাজার ডলার সে বা তার পক্ষ থেকে আমাদের হাতে কোথায়, কখন আর কিভাবে পৌঁছে দেবে জানিয়ে আসব।

বিল কাঁপা গলায় বলল—স্যাম, তোমার তো অজানা নয়, অগ্নিকাণ্ড, ভূমিকম্প, মহামারী, বন্যা, ডিনামাইট আক্রমণ, পুলিশের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই আর ট্রেন ডাকাতি প্রভৃতি আরও বহু ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে নির্ভয়ে তোমার কাছাকাছি পাশাপাশি থেকেছি। কিন্তু আজ দোপেয়ে বিচ্ছুটা আমার কলজাটাকে একেবারে শুকিয়ে দিয়েছে। দোহাই তোমার, আমাকে একা ফেলে তুমি কোথাও যেয়ো না স্যাম।

বিকেলেই ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমি বিল-এর সম্মতি পেলাম।

আমাদের অতিথি গুহার মুখে ঘোরাঘুরি করছে।

আমি আর বিল মুক্তিপণের চিঠিটা লিখতে বসলাম।

বিল-এর সবচেয়ে বড় চিন্তা কিভাবে বিচ্ছুটাকে তাড়াতাড়ি ঘাড় থেকে নামানো যায়। সে বলল—স্যাম, দু' হাজার ডলার বড্ড বেশী হয়ে যাচ্ছে। আমরা বরং বুড়ো এবেনজার-এর কাছে পনেরো শ' টাকা মুক্তিপণ চাই।

আমি বললাম—এ তুমি বলছ কি বিল! এক দানে একেবারে পাঁচশ' ডলার কম! তোমার মাথাটাথা খারাপ হ'ল নাকি?

তুমি যা-ই বল না কেন, আমি কিন্তু দু' হাজার ডলার দাবী করে যমের বাহন এ বিচ্ছুটাকে ঘাড়ের ওপর রেখে দিতে রাজী নই। তোমার ওই পাঁচশ' ডলার আমিই না হয় তোমাকে দিয়ে দেব।

অনন্যোপায় হয়েই আমি বিল-এর প্রস্তাবে সম্মত হলাম। এবার আমরা মুক্তিপণের চিঠিটা লিখতে বসলাম ঃ

চিঠিটার বক্তব্য ঃ

"এবেনজার ডরমেট, এস্কোয়ার,

আমরা আপনার আদরের দুলালকে 'স্যামিট' থেকে দূরে, বহুদূরে লুকিয়ে রেখেছি। আপনার বা কোন অভিজ্ঞ গোয়েন্দার পক্ষে তার খোঁজ পাওয়ার চেষ্টা নিতান্তই বৃথা। আপনি যেসব শর্তপূরণ করে ছেলেকে ফিরে পেতে পারেন তা হচ্ছে—আপনাকে ছেলের মুক্তিপণ হিসেবে পনেরো শ' ডলার দিতে হবে। আজ মাঝরাত্রে যে বাক্সে আপনি আমাদের চিঠির জবাবটা ফেলবেন সে বাক্সেই মুক্তিপণের ডলারগুলো ফেলবেন, বাক্সটা কোথায় রাখা হবে সে কথা পরে উল্লেখ করছি।

আমাদের শর্ত পূরণ করতে যদি রাজি থাকেন তবে একটামাত্র সংবাদ বাহকের মারফৎ রাত্রি সাড়ে আটটায় আমাদের জানিয়ে দেবেন।

এবার বাক্সটার ব্যাপারে লিখছি—'পপলার গ্রোভ'-র পথ দিয়ে এগিয়ে 'আউলক্রিক' অতিক্রম হবার পরই শতখানেক গজ দূরে দূরে তিনটে লম্বা গাছ দেখবেন। আর তারই কাছাকাছি ডানদিকে একটা গম ক্ষেতের বেড়া দেখবেন। তৃতীয় গাছটার বিপরীত দিকে বেড়ার খুঁটির নিচের দিকে একটা ছোট কাঠের বাক্স দেখতে পাবেন।

সংবাদদাতা লোকটাকে বাক্সটায় আমাদের চিঠির জবাবটা ঢুকিয়ে দিয়ে 'স্যামিট'-এ ফিরে যেতে হবে।

মনে রাখবেন, বিশ্বাসঘাতকতা করলে আপনার আদরের দুলালকে অবশ্যই চিরদিনের জন্য হারাতে হবে।

আর একটা কথা, আপনি সময় মত যদি আমাদের বাঞ্ছিত পনেরোশ' ডলার দিয়ে দেন তবে তিন ঘণ্টার মধ্যেই আপনার ছেলেকে ফেরৎ পেয়ে যাবেন। আমাদের দাবি যদি পূরণ করার ইচ্ছা না থাকে তবে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবেন না।

চিঠির শেষে লিখল—"দুই বেপরোয়া"

আমি যাত্রার উদ্যোগ করলে বিল আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল—দোহাই তোমার স্যাম, যত তাড়াতাড়ি পার ফিরে এসো।

আমি ম্লান হাসলাম।

সে একই স্বরে এবার বলল—এখন আমি ভাবছি, মুক্তিপণটা পনেরোশ' না বলে এক হাজার বললেই ভাল হত।

কথা বলতে বলতে সে ঘাড় ঘুরিয়ে খেঁকিয়ে উঠল—এসব কি হচ্ছে, শুনি? তুমি লাথি মারা বন্ধ করবে নাকি, শুনতে চাই। আর একটা লাথি মারলে উঠে এমন দাওয়াই দিয়ে দেব যে, মাজা কাকে বলে টের পাবে। যত্তসব ঝকমারি শুরু হয়েছে! কী বিচ্ছু ছেলে রে বাবা!

লম্বা লম্বা পায়ে হেঁটে 'পপলার গ্রোভ'-এ হাজির হলাম। খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারলাম, এবেনজার-এর ছেলেটা বে-পাত্তা হয়ে যাওয়ায় 'স্যামিট' শহর জুড়ে তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে।

পোস্টমাস্টারের মুখে শুনলাম, এক ঘণ্টার মধ্যেই স্যামিট শহরের চিঠিপত্র নিতে ডাকহরকরা এসে যাবে।

পোস্ট অফিস থেকে বেরিয়ে আবার লম্বা লম্বা পায়ে হেঁটে গুহায় ফিরে গেলাম। গুহাটার মুখে যেতেই আমার শরীরের সবক'টা স্নায়ু যেন একসঙ্গে সচকিত হয়ে উঠল।

উদ্‌ভ্রান্তের মত চারদিকে খোঁজাখুঁজি করলাম। দু'-একবার মুখে আঙুল ঢুকিয়ে সিটিও দিলাম। না, কোন প্রত্যুত্তরই পেলাম না।

হতাশ হয়ে পাইপটা ধরিয়ে গুহার মুখে বসে পড়লাম।

আধঘণ্টা বাদে বিল হেলতে দুলতে গুহার মুখে এল, তার পিছন পিছন বাচ্চাটাও এল।

তার মুখে যুদ্ধজয়ের হাসি। সে যে পিছনেই এসেছে সেটা বিল জানে কিনা বুঝতে পারলাম না।

বিল বিষণ্ণ মুখে বলল—স্যাম, মানুষের সহ্যের একটা সীমা তো আছে! তুমি চলে যাবার পর থেকে আমাকে এতক্ষণ ঘোড়া হয়ে ছুটোছুটি করতে হয়েছে। তাকে বহুভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। কোন কথায়ই কান দিল না।

উপায়ান্তর না দেখে তার জামার কলারটা ধরে টানতে টানতে পাহাড়ের মাথা থেকে বিচ্ছুটাকে নামিয়ে আনলাম। পথে আসার সময় লাথি মারতে মারতে আমার পা দুটোতেই কালসিটে ফেলে দিয়েছে। আরও আছে, আমার বুড়ো আঙুলটায় দু'-তিনটে মোক্ষম কামড় দিয়েছে সে, পিতৃপুরুষের ভাগ্য ভাল যে, কেটে টুকরো হয়ে যায় নি। আর পাথর দিয়ে মেরে মেরে হাতটাকে একেবারে থেঁৎলে দিয়েছে।

আমি অতিষ্ঠ হয়ে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি। তাকে স্যামিট শহরের পথটা দেখিয়ে দিয়ে পাছায় সজোরে একটা লাথি মেরে তার বাড়ির দিকে ফুট আটেক এগিয়ে দিয়ে এলাম।

তারপর আমার মুখের দিকে মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে নিয়ে বলল—স্যাম, মুক্তিপণটা হারাতে হয়েছে বলে আমিও কম দুঃখিত নই।

হুম!

হ্যাঁ, এ কাজটা না করলে আমার পাগলা গারদে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় থাকত না স্যাম।

আমি মুচকি হেসে বললাম—বিল, একটা কথা আমার জানা দরকার।

কি? কি কথা?

তোমার পরিবারের কারো হৃদরোগ আছে?

না। ম্যালেরিয়া আর দুর্ঘটনা ছাড়া কোন ঘটনাই—

তার কথা শেষ হবার আগেই আমি বলে উঠলাম—তবে একবার ঘুরে দাঁড়িয়ে তোমার পিছন দিকটা দেখে নাও।

সে ঘাড় ঘুরিয়েই আঁৎকে উঠে বলল—আরে এ যে বিচ্ছুটা! নচ্ছাড় ছেলেটা ঠোঁট টিপে টিপে হেসেই চলেছে।

আমি লক্ষ্য করলাম, মুহূর্তে বিল-এর মুখটা চকের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

বিল-এর মানসিক অবস্থা আমাকে যারপরনাই ভাবিয়ে তুলল।

আমি উপায়ান্তর না দেখে বিলকে খোলাখুলি জানিয়ে দিলাম, বুড়ো এবেনজার যদি আমাদের কথা মত কাজ করে, মুক্তিপণটা মিটিয়ে দেয় তবে রাত্রের মধ্যেই আমরা গুহা-আশ্রয় ছেড়ে চলে যাব।

আমার আশ্বাস পেয়ে বিল স্বাভাবিকতা ফিরে পেল। পরমুহূর্তেই সে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসল।

আধ বয়সী ছেলেটা বেড়ার ধারের পোস্ট বোর্ডের বাক্সটা আবিষ্কার করে ফেলল। চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখে নিয়ে ভাঁজ-করা একটা কাগজ বাক্সটার ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। পরমুহূর্তেই 'স্যামিট' শহরের দিকে হাঁটা জুড়ল।

আমি বিড়ালের মত সন্তর্পণে এগিয়ে গিয়ে বাক্সটার ভেতর থেকে চিঠিটা বের করে পকেটে চালান করে দিয়ে সেখান থেকে চম্পট দিলাম।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমি গুহাটায় ফিরে গেলাম।

বিল তাড়াতাড়ি লণ্ঠনটা নিয়ে এল। লণ্ঠনের আলোয় চিঠি মেলে ধরে তার বক্তব্য নিজে পড়লাম এবং বিলকে শোনালাম।

চিঠিটার বক্তব্য এরকম ঃ

দুই বেপরোয়া।

মহাশয়রা,

আমার জনি-র জন্য মুক্তিপণ দাবী ক'রে আপনারা ডাক মারফৎ যে চিঠিটা পাঠিয়েছেন সেটা এই মাত্র হাতে পেলাম।

আপনাদের জ্ঞাতার্থে লিখছি যে, আমি মনে করি, আপনাদের দাবীটা আমার পক্ষে একটু বেশীই হয়ে গেছে। তাই ভাবনা চিন্তা করে আমি আপনাদের কাছে পাল্টা প্রস্তাব রাখছি। আশা করি আপনারা এটা মেনে নেবেন।

আপনারা আমার ছেলে জনি'কে বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়ে যান আর আমাকে নগদ দু'শ পঞ্চাশ ডলার দিন।

আপনাদের কাছ থেকে তাকে ফিরিয়ে নিতে আমি রাজি আছি।

আপনারা তাকে রাত্রির অন্ধকারে নিয়ে আসবেন। কারণ, আমার প্রতিবেশীরা ও পল্লীবাসীরা সবাই জানে যে, সে হারিয়ে গেছে। তাই বলছি কি? তারা যদি দেখে ফেলে যে, কেউ তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসছে তবে রাগের মাথায় তাদের পক্ষে কিছু ক'রে ফেলাটা অস্বাভাবিক নয়। তবে সে দায়িত্ব আমার পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয়।

নমস্কারান্তে
এবেনজের ভরসেট।

আমি চিঠিটা পড়া শেষ করে কাগজটা ভাঁজ করতে করতে বিল-এর মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম।

সে বলল, 'দেখ স্যাম, দু'শ পঞ্চাশ ডলারের তো মামলা। এটা তেমন কোন বড় সমস্যা নয়।

আমি যন্ত্রচালিতের মত দ্রুত মুখ তুলে তার দিকে সবিস্ময়ে তাকালাম।

সে ব'লে চলল—মাত্র তো দু'শ' পঞ্চাশ ডলার। এ পরিমাণ ডলার তো আমাদের কাছেই আছে। কিচ্ছুটা যদি আরও একটা রাত্রি আমাদের কাছে থাকে তবে আমাকে নির্ঘাৎ পাগলা গারদে পাঠিয়ে ছাড়বে। আমার কথা শোন, এমন অপূর্ব সুযোগটা তুমি কিছুতেই হাতছাড়া করো না।

হ্যাঁ, আমিও তা-ই ভাবছি। নচ্ছাড়টা আমাকেও কম বিব্রত করে নি। আমরা তাকে বাড়ি ফিরিয়ে দিয়ে মুক্তি পণ দিয়ে আসব।

সে রাত্রেই আমরা তাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাবার প্রস্তুতি নিতে লাগলাম। তাকে বোঝালাম, তার বাবা আমাদের কাছে খবর পাঠিয়েছে, তার জন্য এক জোড়া মোকাসিন আর একটা রুপো বাঁধানো বন্দুক কিনে রেখেছেন। আর বাড়ি পৌঁছবার পরদিনই আমরা তাকে নিয়ে গভীর জঙ্গলে শিকার ধরতে যাব।

আমরা রাত্রি বারোটায় এবেনজের-এর বাড়ি পৌঁছলাম। তার হাতে ছেলেটাকে তুলে দিলাম। আর যে হাতে তার কাছ থেকে দু'হাজার ডলার নেওয়ার কথা সে হাতেই দু'শ পঞ্চাশ ডলার বিলই তার হাতে গুঁজে দিল।

কিন্তু গোদের ওপর বিষ ফোঁড়া ছেলেটা যখন বুঝল যে, আমরা তাকে রেখেই তাদের বাড়ি থেকে চলে আসব ঠিক তখনই দু'হাতে কিলবিল ক'রে জোঁকের মত বিল-এর পা জড়িয়ে ধরল।

আর তার বাবা তাকে ছিনিয়ে নেবার জন্য প্রাণান্ত প্রয়াস চালিয়ে যেতে লাগল।

আমি বললাম, এভাবে আপনি কতক্ষণ তাকে ধরে রাখতে পারবেন?

—মিনিট দশেক।

বিল সোল্লাসে বলে উঠল যথেষ্ট—যথেষ্ট। দশ মিনিট সময় পেলেই আমি পুরো দেশটা ডিঙিয়ে কানাডা সীমান্তে চলে যেতে পারব। দয়া ক'রে জাপ্টে ধরে রাখুন।

বিল একে বিশালদেহী, তার ওপর জমাট বাঁধা অন্ধকার আবার রাস্তাও ঘনঘন চড়াই-উৎরাই। আর সে-ও আমার মতই দৌড়বীর।

তা সত্ত্বেও স্যামিট শহর ছেড়ে দেড় মাইল রাস্তা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে তবেই আমি বিল'কে কোন রকমে ধরতে পারলাম।

দ্য ম্যারী মান্থ্ অব মে

বুড়ো মিঃ কুলসন একটা বিকট আর্তনাদ ক'রে ইনভ্যালিড চেয়ারটায় সোজাভাবে বসে পড়লেন।

তার একটা পা বাতে পঙ্গু।

বুড়ো মিঃ কুলসন-এর গ্রামার্সি পার্কে একটা বাড়ি আছে। নগদ পাঁচ লক্ষ ডলারের মালিক। আর আপনজন বলতে আছে একটা মেয়ে।

মিসেস কুলসন উইড়্ডাপ নামে তার একটা গৃহ-রক্ষিণী আছে।

মিঃ কুলসন টানটান হয়ে বসে বার-কয়েক পা-টাকে অভিসম্পাত দিলেন। তারপর সামান্য ঝুঁকে টেবিলের ওপর রক্ষিত ঘণ্টাটা বাজাতে লাগলেন।

ঘণ্টার আওয়াজ শুনে মিসেস উইড়্ডাপ ব্যস্ত পায়ে ঘরে ঢুকল। দেখতে শুনতে সে ভালই। ফর্সা। বয়স চল্লিশ বছর। আর ধূর্ত বলে তার খ্যাতি আছে।

দরজায় পা দিয়েই সে বলল—স্যার, হিগিন্স একটা চিঠি ডাক বাক্সে ফেলতে গেছে। আপনার জন্য আমি কি করতে পারি, বলুন?

—আমার একোনাইট খাবার সময় হয়েছে। বোতলটা টেবিলে আছে। তিন ফোঁটা ঢেলে দাও তো। একটু জলে মিশিয়ে দিও। আমাকে দেখার নেই বলতে কেউ-ই নেই। এ চেয়ারটায় বসে মরে শক্ত হয়ে থাকলেও কারো কিছু যায় আসে না।

মিসেস উইড়্ডাপ একটা কাপে সামান্য জল নিয়ে তাতে তিন ফোঁটা একোনাইট ঢেলে তাঁর হাতে দিল।

ওষুধটুকু গলায় ঢেলে কাপটা আবার মিসেস উইড়্ডাপ-এর হাতে ফিরিয়ে দিলেন।

মুহূর্তের জন্য থেমে একটু দম নিয়ে নিজেই হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে মালিশের শিশিটা নিয়ে মিসেস উইড়্ডাপ—এর হাতে দিয়ে বললেন, ওষুধটা একটু বুকে মালিশ করে দাওতো।

মেয়েটার মুখ সঙ্গে সঙ্গে রক্তবর্ণ ধারণ করল, বুড়ো কুলসন খোলা-জানালা দিয়ে বাইরের প্রকৃতির দিকে মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন— মিসেস উইড়্ডাপ বসন্ত এসে গেছে, তাই না?

—হ্যাঁ, তা-তো এসেছেই। পার্কে লাল, নীল আর হলুদ ফুলের বিচিত্র সমারোহ।

—জান উইড়্ডাপ, বসন্ত প্রেমের পরশ বয়ে আনে। কথাটা বলেই বুড়ো কুলসন আবার দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

—সেটাই কি ঠিক নয়। আমিও তো বাতাসে তারই গন্ধ পাচ্ছি। বসন্তের মিষ্টি মধুর বাতাস।

বাত-ব্যাধিগ্রস্ত পা-টার দিকে তাকিয়ে মুখটা বিকৃত ক'রে কুলসন আবার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল—মিসেস উইড়্ডাপ, মাঝে মাঝে এ চেয়ারটায় বসে ভাবি, তুমি না থাকলে বাড়িটা একটা মরুভূমিতে পরিণত হয়ে যেত।

—হুম্।

—দেখ আমি না হয় একজন বুড়ো মানুষ। কিন্তু আমি তো অগাধ অর্থের মালিক। আর আছে বুকে ভালবাসার জোয়ার।

তাঁর কথাটা শেষ হবার আগেই হঠাৎ পাশের ঘরের একটা চেয়ার উল্টে গিয়ে প্রচণ্ড শব্দ হওয়ায় তাঁর প্রেমালাপে ছেদ ঘটল।

মুহূর্তের মধ্যে ঘরে ঢুকল মিস ভ্যান মীকার কন্সটান্টিয়া কুলসন। বয়স পঁয়ত্রিশ বছর।

তার আওয়াজ পাওয়া মাত্র মিসেস উইড়্ডাপ উপুড় হয়ে মিঃ কুলসন-এর বাতগ্রস্ত পায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধার কাজে লেগে পড়ল।

মিস ভ্যান মীকার বলল—আমার ধারণা ছিল হিগিন্স তোমার কাছে আছে।

মিঃ কুলসন বললেন, হিগিন্স চিঠি ফেলতে বাইরে গেছে। আমার ঘণ্টার শব্দ শুনে মিসেস

উইড্‌ডাপ ছুটে এসেছে। মিসেস উইড্‌ডাপ, আমি এখন অনেকটা সুস্থ হয়েছি। তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ।

গৃহ-রক্ষিকা মিসেস উইড্‌ডাপ বাইরে চলে গেল।

বৃদ্ধ কুলসন এবার বললেন, বাছা, বসন্তের বাতাসটা বড়ই মনোরম তাই না?

মিস ভ্যান মীকার বলল—অবশ্যই। মিসেস উইড্‌ডাপ কখন ছুটিতে যাবেন?

—শোনলাম এক হপ্তাহের মধ্যে চলে যাবে।

বসন্ত ঋতুকে মিস কুলসন উপেক্ষা করলেও তার অসীম শক্তির খবর তার অজানা নয়। বয়স্ক পুরুষ আর স্থূলকায়া নারীরা মে মাসের হাস্যকর রথে চেপে বসে। নির্বোধ বুড়ো ভদ্রজনরা তাদের গৃহ-রক্ষিণীদের বিয়ে ক'রে বসে এমন কথাও বহুলোক শুনেছে। কী লজ্জার ব্যাপার! এ অনুভূতিকেই লোকে ভালবাসা আখ্যা দেয়।

পরদিন সকাল আটটায় বরফওয়ালা বাড়ির সামনে এলে মিস কুলসন তাকে ওপরে উঠতে না দিয়ে ওপরতলা থেকেই হেঁকে বলল, এক হাজার পাউন্ড বরফ এনে দাও।

আর এও বলল, আগামী চারদিন ও রোজ যেন এক হাজার পাউন্ড করে বরফ দেয়। আর তা যেন নিচের তলার ঘরে রেখে যায়। তাদের নিয়মিত বিল ছাড়াও বাড়তি ঝামেলার জন্য তাকে কিছু অতিরিক্ত পয়সাও দিল।

দুপুরের দিকে মিঃ কুলসন যেন কেমন থেমে গেলেন। টেবিল থেকে দুটো গ্লাস নিয়ে দুম্ ক'রে আছাড় মেরে ভেঙে দিলেন, মোঁচড় মেরে ঘণ্টার ভেতরের স্পিংটা দিলেন ভেঙে।

হাতের স্প্রিং-ভাঙা ঘণ্টাটাকে ছুঁড়ে দিয়েই তিনি চিৎকার চেঁচামেচি ক'রে মেয়ে হিগিন্স'কে ডাকতে লাগলেন।

বাবার ডাকাডাকি শুনে হিগিন্স ছুটে এল।

তাকে দরজায় দেখেই তিনি হেড়ে গলায় বললেন, কোথায় থাক্ তোমরা! ডাকতে ডাকতে গলায় রক্ত উঠে গেলেও কাবো দেখা পাওয়া যায় না!

হিগিন্স বিরক্তির সঙ্গে বলল, ডাকছিলে কেন, বল?

—আমার একটা কুড়ুল চাই, কুড়ুল। আর তা যদি না থাকে এক কোয়ার্ট প্রুসিক এসিড এনে দাও।

—কিন্তু কিন্তু—।

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই কুলসন পূর্বস্বরেই ব'লে উঠলেন, যদি তা-ও না পাও তবে পুলিশকে তলব কর, এসে আমাকে গুলি করুক। ঠাণ্ডায় জমে যাওয়ার চেয়ে গুলি খেয়ে মরা ঢের ভাল।

হিগিন্স অপরাধী স্বরে বলল—এতক্ষণ আমি খেয়াল করিনি। আমি এখনই জানালাটা বন্ধ করে দিচ্ছি।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কুলসন বলল—তবে তাই কর। একেই সবাই বলে বসন্তকাল, তাই না?

একটু বাদেই মিস কুলসন তার ঘরে ঢুকল। বাতের ব্যথাটা বেড়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করল।

তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে কিছু কেনাকাটার জন্য পার্কের পথে ব্রডওয়ের দিকে চলে গেল।

মিস কুলসন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর পরই মিসেস উইড্‌ডাপ বাতগ্রস্ত লোকটার ঘরে ঢুকল।

তাকে দেখে বুড়ো মিঃ কুলসন মুচকি হেসে বললেন, হঠাৎ তুমি! আমি তো ঘণ্টা বাজাই নি।

—স্যার, গতকাল আপনি কি যেন বলতে চেয়েছিলেন। আমি তার মধ্যেই হঠাৎ বাধা সৃষ্টি করেছিলাম। তাই আমার কেমন যেন ভয়ভয় করছে।

—মিসেস উইড্‌ডাপ, ব্যাপার কি বল তো?

—কি? কিসের কথা বলতে চাইছেন স্যার?

এ ঘরটা এত ঠাণ্ডা কেন?

—হ্যাঁ স্যার, আর আপনি বলার পর যেন আরও বেশী ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে। বাইরে কিন্তু জুন মাসের মত গরম হাওয়া বইছে।

মুহূর্তের জন্য থেমে মিঃ কুলসন-এর মনের অবস্থাটা বোঝার চেষ্টা করে সে আবার মুখ খুলল, স্যার, এমন দিনে বুকের ভেতরে কেমন সাগরের ঢেউ বয়ে চলে। যাকে বলে রীতিমত উথাল পাতাল হওয়া। মনে হয় পথের ধারের আইভি লতাগুলো বুঝি হাত বাড়িয়ে কাছে ডাকছে। এমন দিনে ঘরে বসে থাকা যায়?

একটু আমতা আমতা ক'রে এবার বলে উঠল—স্যার, গতকাল আপনি যেন কি বলছিলেন?

—অপদার্থ মূর্খ নারী কোথাকার! আমি তোমাকে গোছা গোছা ডলার দেই এ বাড়িটা দেখাশোনা করার জন্য। আর আমি কিনা ঠাণ্ডায় একেবারে কেলিয়ে যাচ্ছি! তুমি যে আগ বাড়িয়ে এসেছ আমাকে আইভি লতার কাহিনী শোনাতে, মধ্য রাতে বসন্তের গান শোনাতে!

তার তর্জন গর্জন শুনে মিসেস উইড্‌ডাপ হঠাৎ কেমন যেন চুপসে গেল।

বুড়ো মিঃ কুলসন এবার বললেন—তুমি নিজের কাজে যাও।

মিসেস উইড্‌ডাপ বেরোবার উদ্যোগ করল।

মিঃ কুলসন তাকে ডেকে বললেন—শোন, হিগিন্স ফিরে এলেই তাকে বলবে 'রাম'-এর একটা গরম মিশ্রণ যেন আমাকে দিয়ে যায়।

আরে না, গল্পটা এখনও শেষ হয় নি।

রাত্রিটা কেটে ভোরের আলো ফুটে উঠল।

হিগিন্স পঙ্গু বুড়ো মানুষটাকে ধরে জানালার ধারে নিয়ে বসিয়েছিল। কোটের বোতামগুলোকে ঠিকঠাক ক'রে নিয়ে সে নিজের কাজে চলে গেল।

পর মুহূর্তেই অন্য দরজা দিয়ে মিসেস উইড্‌ডাপ সে ঘরে ঢুকে এল।

এক পা দু'পা ক'রে এগিয়ে গিয়ে তার চেয়ারটার গা-ঘেঁষে দাঁড়াল।

বুড়ো মিঃ কুলসন তাব চামড়া হাড় সর্বস্ব কাঁপা হাতটা বাড়িয়ে গৃহ-রক্ষিণীর মাংসল হাতটা সাঁড়াশির মত আঁকড়ে ধরলেন।

মিসেস উইড্‌ডাপ নিজের হাতটাকে ছাড়িয়ে নেবার এতটুকু চেষ্টাও করল না।

বুড়ো মিঃ কুলসন আগেকার স্বরে বললেন—মিসেস উইড্‌ডাপ, তুমি না থাকলে এ ঘরটাকে বাড়ির অংশ, মানে বাড়ি বলেই মনে হয় না। ঘরের ঠাণ্ডা মুহূর্তে যেন চলে গেছে। আমি পাঁচ লক্ষ ডলারের মালিক।

—হুম।

আমার এ অগাধ অর্থ আর বিগত যৌবন একটা মরুভূমির মত খাঁ খাঁ করা মনের সত্যিকারের প্রেম ভালবাসা এ শীতলতাকে কাটিয়ে—

তাঁর গায়ের সঙ্গে নিজের দেহটাকে ছুঁইয়ে দিয়ে মিসেস উইড্‌ডাপ বলল, এ শীতলতার কারণ আমি ধরতে পেরেছি।

—কি? কি সে কারণ?

—টন টন বরফ।

—বরফ!

হ্যাঁ। টন টন বরফ নিচের তলায় বাড়ির সর্বত্র রেখে দেওয়া হয়েছে। তারই ঠাণ্ডা বাতাস আপনার ঘরে ঢুকে আপনাকে চিরশৈত্যের মধ্যে রেখে দেওয়ার ফন্দি আঁটা হয়েছে। যে পথে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস আপনার ঘরে ঢুকছিল সেটা আমি অনেক আগেই বন্ধ ক'রে দিয়েছি।

—বরফ! ঠাণ্ডা বাতাস! এসব কি বলছ!

—হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। আহ্! কী চমৎকার ঝিরঝিরে বাতাস! এ মনোরম পরিবেশে আপনাকে ইচ্ছে করে বঞ্চিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

—কারণ? এর পিছনে এমন কি কারণ থাকতে পারে যে—

—বসন্তের উন্মাদনা যাতে আপনার মনকে দোলা—উথলি পাথালি করে না দেয়। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখুন মিঃ কুলসন, মে মাসটা আবার ফিরে এসেছে!

—আহা! কী শান্তি! কিন্তু মিসেস উইড্‌ডাপ, আমার মেয়ে যদি জানতে পারে—

তাঁকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই মিসেস উইড্‌ডাপ ব'লে উঠল, সে ভয় কেটে গেছে মিঃ কুলসন। আপনার মেয়ে কাল রাত্রেই বরফওয়ালার সঙ্গে চম্পট দিয়েছে।

এ টেকনিক্যাল এরর

আমাকে একবার স্যাম ডুর্কী-র পশু-খামারে যেতে হয়েছিল।

স্যাম-এর বয়স পঁচিশ বছর। পেটানো চেহারা। গায়ে শক্তিও রাখে যথেষ্টই। আর তার অন্ধকারে চলাচলের খ্যাতি আছে।

ক্রাক মাতির তাতুম নামক এক পরিবার ওপরে বাস করে।

আমি আগেই শুনেছিলাম, তাতুম পরিবার আর ডুর্কী পরিবারের মধ্যে দীর্ঘ বছর কয়েক ধরেই বিবাদ চলছে।

ইতিমধ্যে উভয় পরিবারের বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ কবরে আশ্রয় নিয়েছে, আর সবাই আশঙ্কা করছে, উভয় পরিবারেই আরও 'নেবুচাডনেজার'-এর আর্বিভাব ঘটবে। আর উভয় পরিবারেই নাবালক সন্তানরা ধীরে ধীরে গায়ে গতরে বেড়ে সাবালক হচ্ছে। আর সে সঙ্গে কবরের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে।

আমি আর যা শুনেছিলাম তা হচ্ছে তারা ন্যায় যুদ্ধেরই পক্ষপাতী। মুখোমুখি লড়াই করতেই তারা অভ্যস্ত—উৎসাহী। পিছন থেকে শত্রুকে আঘাত হানাকে ঘৃণার চোখে দেখে। আর কোন পক্ষেরই নারী ও শিশু কোনদিন আক্রান্ত হয়নি—আঘাত পায়নি।

কেবলমাত্র সে আমলেই নয়, আজও দেখা যাবে উভয় পরিবারেই নারীরা সম্পূর্ণ নিরাপদ। তারা তো জানেই আর কিছু না হোক তাদের গায়ে কেউ টোকাটাও দেবে না।

স্যাম ডুর্কী-র একটা পরমা সুন্দরী, ভিন্ন যৌবনা ও চোখে লাগার মত প্রেয়সী আছে। বেনেস তার নাম।

স্যাম আর বেনেস উভয়েই পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত। একে অন্যের প্রতি অগাধ বিশ্বাস।

একদিন স্যামই তার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেয়। তাদের কথাবার্তা ও হাবভাবেই আমি বুঝে নিয়েছিলাম, তারা উভয়ে পরস্পরের আপনজন, মনের মানুষ, আত্মিক সম্বন্ধযুক্ত।

কিংফিসার খামার থেকে বিশ মাইল দূরে মিস বেনেস থাকে। যখন মন টানে, মিলিত হবার ইচ্ছা হয় তখনই স্যাম ঘোড়া ছুটিয়ে প্রেয়সীর কাছে হাজির হয়।

একদিন অসীম শক্তিধর ও অসম সাহসী এক যুবক কিংফিসার-এ হাজির হল। বেঁটেখাটো চেহারা আর মুখটা তার খুবই মসৃণ।

খামার বাড়িতে পৌঁছেই সে এখানকার ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিল, স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হ'ল। সবার কাছে বলেছে, সে মাস্কোজীর অধিবাসী। তার হলুদ জুতো আর টাইটা-ও সে পরিচয়ই দেয়।

একবার আমি ডাকঘরে চিঠি আনতে যাই। সেখানেই নবাগত মাস্কোজীবাসীর সঙ্গে আমার দেখা ও পরিচয় হয়।

আমি তার নাম জানতে চাইলে সে বলল, বেভার্লি ট্রেভার্স তার নাম। সত্যি বলছি, আমার কাছে তার নামটা কেমন যেন বে-সামালই মনে হ'ল।

এক বিকেলে দেখলাম, বেভার্লি ট্রেভার্স এলা বেনেস'কে নিয়ে একটা হলদে গাড়িতে চেপে হাওয়া খেতে বেরিয়েছে। ·

স্যাম-এর কাছে খবরটা সুখদায়ক হবে না ভেবে আমি ব্যাপারটা তার কানে আর তুললাম না।

পরদিন দুপুরের কিছু পরে সিমন্স নামক এক প্রাক্তন মেষপালক এবং স্যাম-এর সাকরেদ ঘোড়ার পিঠে চেপে খামারে এল।

দু'-চার কথায় শুভেচ্ছা বিনিময়ের পরই সে গল্প শুরু করল। সে একটা চুরুটে অগ্নি সংযোগ করতে করতে বলল—'আরে স্যাম, তুমি কি আজকাল কোন খবরই রাখ না?'

ঠোঁট থেকে চুরুটটা নামিয়ে নিয়ে স্যাম মুচকি হেসে বলল—'কেন? কি হয়েছে? কোন্ খবরের কথা বলছ সিমন্স?

—বেভার্লি-এজেড ট্রেডার্স পরিচয় দিয়ে এক ধান্ধাবাজ কিংফিসার-এ আশ্রয় নিয়েছে।

—তারপর?

—দু-হপ্তা ধরে সে সেখানেই আছে। সেখানকার বাতাসকে রীতিমত বিষাক্ত করে তুলেছে, খবর রাখ?

স্যাম জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতেই তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

সিমন্স বলল—'লোকটা কে তোমার জানা আছে? বেন তাতুম তার নাম।

—বেন তাতুম?

—হ্যাঁ, 'ক্রাক নেসান' থেকে আগত এক মাল। সেই বুড়ো গোকার তাতুম-এর আদরের দুলাল।

স্যাম বিস্ময়-মাখানো জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে নীরবে তার কথাগুলো শুনতে লাগল।

সিমন্স এবার বলল—'কি, চিনতে পারলে না-তো? আরে, ওই যে গত ফেব্রুয়ারী মাসে যে লোকটা তোমার কাকা মিউট'কে গুলি ক'রে মেরেছিল, মনে পড়ছে?

—হ্যাঁ, এবার চিনতে পারলাম।

—নচ্ছাড়টা আজ সকালে কি করেছে, জান?

অত্যুগ্র আগ্রহান্বিত হয়ে, স্যাম জিজ্ঞাসা করল—'কি? কি করেছে?

—তার বাড়ির উঠোনেই সে তোমার ভাই লেস্টার'কে গুলি ক'রে হত্যা করেছে।

—সে কী! সে এমন একটা কাজ করেছে? লেস্টার'কে কে হত্যা করেছে?

—হ্যাঁ, গুলি তো কবেছেই।

—এ যে আমি ভাবতেও পারছিনে সিমন্স।

—কেবলমাত্র গুলি করে হত্যা করাই নয়। নচ্ছাড়টা আরও অনেক কিছুই করেছে।

—আর অনেক কিছুই—যেমন?

—সে তোমার মেয়েটাকে নিয়ে চম্পট দিয়েছে। আরে মিস এলা বেনেস-এর কথা বলছি। ভেবে দেখলাম, খবরটা তোমাকে জানানো আমার কর্তব্য। তাই হাতের কাজ ফেলে; ঘোড়া ছুটিয়ে চলে এলাম।

—সিমন্স, তুমি আসায় আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি।

—আমাকে কিন্তু আবার এখনই চলে যেতে হবে। শহর থেকে পশুখাদ্য নিয়ে যেতে হবে। আহা রে, গুলিটা লেস্টার-এর একেবারে পিঠে গিয়ে লেগেছিল!

—পিঠে? পিঠে গুলি করেছিল?

—তবে আর বলছি কি! তোমার ভাই তখন গাড়িতে ঘোড়া জুতছিল। আহা! সে যে কী ভয়ঙ্কর দৃশ্য তোমাকে আর বলব কি!

—তুমি বলছ—

—কেবল আমি কেন, সবাই সে নারকীয় দৃশ্যটা দেখেছে।

মুহূর্তের জন্য থেমে সে আবার মুখ খুলল—'আর সে ব্যাপারটার কথা যদি বল তবু একই উত্তর সবাই দেখেছে তারা, হলুদ একটা গাড়ি চড়ে মাস্কোজী-র দিকে উল্কার বেগে এগিয়ে চলেছে।'

—আমি—আমি এখনই—

তাকে থামিয়ে দিয়ে সিমন্স বলে উঠল—'আরে ধ্যুৎ! তুমি কি খেপেছ স্যাম। এখন গিয়ে তাদের ধরতে চাচ্ছ? অসম্ভব। বরং একদিন চলে এসো।'

জ্বলন্ত চুরুটটা দু'ঠোঁটের ফাঁকে চেপে ধরে সিমন্স ঘোড়ার লাগামে টান দিল।

স্যাম নিজের ঘরে ঢুকল। ব্যস্ত-হাতে বুক-কেস-এর ভেতর থেকে তিন-চারটে ছ'-ঘড়া পিস্তল বের ক'রে কোমরে, কোটের তলায় গুঁজে নিল, ঝকঝকে ছুরি পকেটে ঢুকিয়ে নিল।

আমি বললাম—'কি হে স্যাম, দুটো ঘোড়ার পিঠে জিন বসালে কেন?

—কেন? এর একটা তোমার জন্য, আর দ্বিতীয়টা আমার, বুঝলে?'

এক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা দু'জনে ঘোড়া হাঁকিয়ে দিলাম। আমরা প্রথম গুঠরি'-র মোড়ে তাদের দেখা পেলাম।

আমরা তখন পথশ্রমে বড়ই ক্লান্ত। ক্ষিদেও পেয়েছে খুবই। মোড়ের কাছেই একটা ছোটখাটো হোটেল দেখে আমি স্যামকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলাম।

হোটেলের ভেতরে ঢুকেই পলাতকদের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। তারা খাওয়া দাওয়া সারছে। এরই ফাঁকে ফাঁকে অনুসন্ধিৎসু নজর মেলে চারদিকে তাকাতে লাগল।

হ্যাঁ, ঠিকই। ওই যে, খুনী আর চুরি করা মেয়েটা।

প্রতিপক্ষের ভূমিকা নিয়ে আমি বলে উঠলাম—'স্যাম, মিছে দেরী করছ কেন? নচ্ছাড়টার প্রাপ্য এখনই মিটিয়ে দাও।

স্যাম নিজের অজান্তেই একটা বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সে মুখ খুলল--'তুমি বুঝতে পারনি বটে।

—বুঝতে পারিনি? কি? কিসের কথা বলছ স্যাম?

—তুমি বুঝতে না পারলেও সে কিন্তু ঠিকই বুঝেছে।

—হেয়ালি রেখে যা বলবার খোলসা করে বল।

—ভাই হে, সে তো ভালই জানে, নেশন-এর সাদা চামড়ার মানুষগুলোর মধ্যে একটা অনুশাসন প্রচলিত আছে।

—অনুশাসন? অনুশাসন প্রচলিত আছে? কি সে অনুশাসন স্যাম?

—নারী সঙ্গে থাকলে কেউ তার সঙ্গী পুরুষটাকে গুলি করতে পারে না!

—ধ্যুৎ! রেখে দাও তোমার অনুশাসন।

—কিন্তু সে অনুশাসন আজ পর্যন্ত কেউ ভেঙেছে বলে আমি অন্তত শুনিনি। তাই এটা আমরা করতে পারি না।

—তবে উপায়?'

—উপায় একটাই; একটা দলের মধ্যে তাকে পাকড়াও করতে হবে। আর কোন নারী ছাড়া, একা থাকা-অবস্থায়। আর এটা তারও জানা আছে, আমরা সবাইও জানি।'

—হুম।

স্যাম ভেতরে ভেতর ফুঁসতে লাগল।

মুহূর্তকাল পরে সে দাঁতে দাঁত ঘষে বলে উঠল—'তবে এ-ই মিঃ বেন তাতুম।

তারপর আমার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে আরও গলা নামিয়ে সে বলল—শোন, এ হোটেল থেকে বেরিয়ে গাড়িতে ওঠার আগেই আমি নচ্ছাড় খুনীটাকে আলাদা ক'রে ফেলব, মানে সঙ্গীহীন করে ফেলব। ব্যস, তারপরই হিসাব নিকাশ সেরে ফেলব।

আহারাদি সেরেই পলাতক কপোত-কপোতী খাবার ঘর থেকে চম্পট দিল। আমরা মাঝ-রাত্রি অবধি হোটেলের বসবার ঘর, হলঘর, সিঁড়ি সব জায়গায় তন্ন তন্ন করে তাদের খোঁজাখুঁজি করলাম। বৃথা চেষ্টা। পলাতকরা রহস্যজনকভাবে আমাদের, স্যাম-এর চোখে ধুলো দিয়ে চম্পট দিয়েছে।

ভোর হতে না হতেই ঘোমটা-ঢাকা মহিলা আর স্যাম-এর চরমতম শত্রু হোটেল ছেড়ে চম্পট দিল।

আমরাও দিলাম উল্কার বেগে ঘোড়া হাঁকিয়ে। কিছুদূর যেতে না যেতেই আমরা তাদের ধরে ফেললাম।

তাদের গাড়িটা তখন আমাদের থেকে মাত্র পঞ্চাশ গজ আগে আগে ছুটে চলেছে।

লক্ষ্য করলাম তাদের আর গাড়িটার গতি বাড়াবার কোন তাগিদ নেই। আসলে বেন তাতুম তো জানেই অনুশাসনই তাদের মোক্ষম রক্ষা-কবচ, সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা। সে একা থাকলে স্যাম চোখের পলকেই হিসাব মিটিয়ে ফেলত।

তার বরাত ভাল যে, তার পাশে এমন একজন অবস্থান করছে যার জন্য আমাদের পিস্তলের ঘোড়াই স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। তবে হাবভাব দেখে নিঃসন্দেহ হলাম, আমাদের শত্রুপক্ষ মোটেই ভীরু কাপুরুষ নয়।

তবেই আপনারা বুঝতেই পারছেন, একটামাত্র নারী অনেক সময় দু'জন ভয়ঙ্কর প্রকৃতির যোদ্ধাকে রক্তক্ষয়ী লড়াই থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে। তবে এক্ষেত্রে ব্যাপারটা কারো ইচ্ছায়, সচেতনভাবে ঘটেনি।

শত্রুর সঙ্গিনী নারীটা কিন্তু অনুশাসনের ব্যাপারটা ভুলেই গিয়েছে।

আমরা আরও পাঁচ মাইল ঘোড়া ছুটিয়ে ক্যাগুলার শহরে পৌঁছে গেলাম। আক্রান্ত আর আক্রান্ত, উভয়ের ঘোড়াগুলিই দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত।

সেখানে হোটেল মাত্র একটাই। তাই হোটেলের খাবার ঘরে আমাদের আবার মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল।

আমি মাংসের একটা হাড় নিয়ে নিবিষ্ট মনে লড়াই করে চলেছি। ঠিক তখনই আমার পাশের চেয়ারে বসে স্যাম খাওয়া বন্ধ ক'রে ফিস ফিস ক'রে বলতে লাগল—'অনুশাসনে আছে, কোন নারী সঙ্গে থাকলে পুরুষকে হত্যা করা যাবে না। কিন্তু অনুশাসনে তো একথা বলা নেই, পুরুষ সঙ্গে থাকলে কোন নারীকে হত্যা করা যাবে না।'

আমি মুখ তুলে তাকিয়ে তার কথার ইঙ্গিতটা ভালভাবে অনুধাবন করার আগেই স্যাম স্বয়ংক্রিয় 'কোল্ট' থেকে পর পর দু'টা গুলি ছুঁড়ল।

মুহূর্তেই বাদামী পোষাক পরিহিত রক্তাক্ত দেহটা চেয়ার থেকে আছড়ে পড়ে গেল।

হোটেলের কর্মীরা ছুটোছুটি ক'রে, এসে বেন তাতুম-এর রক্তাপ্লুত দেহটা মেঝে থেকে তুলে টেবিলের ওপরে রাখল।

মৃতের দেহটা তখন আপাদমস্তক নারীর পোশাক আর মুখোশে মোড়া। আর সে ছদ্মবেশের সুযোগ নিয়েই আমার বন্ধুবর হত্যাকারী স্যাম অনুশাসনের কঠোরতাকে এড়িয়ে যেতে সক্ষম হ'ল।

সুট হোমস অ্যাণ্ড দেয়ার রোমান্স

মিঃ অ্যাণ্ড মিসেস ক্লড টুর্পিন যে মহাসুখে বিবাহিত জীবন শুরু করে, তা বাটপাড়ির শহরের অন্য কোন দম্পতির পক্ষেই করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

সুন্দর একটা ফ্ল্যাটে মিঃ অ্যাণ্ড মিসেস ক্লড টুর্পিন তাদের সংসার গুছিয়ে নিয়ে শান্তিতে দিন যাপন করতে লাগল।

স্বীকার না ক'রে উপায় নেই যে, মিঃ অ্যাণ্ড মিসেস ক্লড টুর্পিন পরস্পরের প্রতি এতটুকুও বিদ্বেষ অন্তরে পোষণ ক'রে না।

আর তাদের জীবনযাত্রা অন্য দশজন ধনকুবেরের মতই বিলাসবহুল।

মিঃ টুর্পিন-এর মাসিক আয় দু'শ ডলার। যাবতীয় খরচ খরচা করার পর মাসের শেষে তাদের হাতে সে দু'শ ডলারই থেকে যায়।

নিউইয়র্কের দিনযাত্রার মতই টুর্পির্ন দম্পতি জীবনযাত্রা নির্বাহ করে।

মিঃ টুর্পিন দুপুরের খাওয়ার পাট শহরতলীতেই মিটিয়ে নেয়। রোজ সন্ধ্যা ছ'টায় বাড়ি ফিরে আসে। তারা রোজ রাত্রেই বাইরে খাওয়া দাওয়া সারে।

অতএব স্বীকার করতেই হয় টুর্পিন দম্পতি সুখেই জীবনযাত্রা-নির্বাহ করছে। সে অঞ্চলের বহু মানুষের সঙ্গেই তাদের হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

দিন যায়, বছর কাটে। এক সময় মিঃ টুর্পিন-এর মনে হ'ল, তার সহধর্মিণী বড্ড বেশী অর্থ ব্যয় ক'রে ফেলছে।

আপনি যদি বড় শহরের প্রায় ধনীদের পর্যায়ে পড়েন, আর আপনার আয় যদি মাসে দু'শ' ডলার হয়, আর যদি মাসের শেষে হিসাব মেলাতে বসেন তবে দেখা যাবে আপনি নিজে খরচ করেছেন একশ' পঞ্চাশ ডলার।

ব্যস, স্বাভাবিকভাবেই আপনাকে ভেবে অবাক হতে হবে দু'শ' ডলারের বাকি পঞ্চাশ কোথায় গেল? আর সঙ্গত কারণেই আপনার সহধর্মিণীর ওপর সন্দেহটা গিয়ে পড়তে বাধ্য। তখন আপনি হয়ত ধানাই পানাই করতে করতে এমন ইঙ্গিতও করেন, যেকোন একটা কারণে হিসাবটা জানা দরকার হয়ে পড়েছে।

এক বিকেলে কিছুক্ষণ ইতস্তত ক'রে মিঃ টুর্পিন বলল—'ভিভিয়েন, এ মাসে কুকুরটাব জন্য একটু বেশীই খরচ ক'রে ফেলেছ। ভাল কথা, দর্জিকে তার বকেয়া পাওনা কিছু মিটিয়েছ কি?'

মিসেস টুর্পিন তার কথার কোন উত্তর না দিয়ে আগের মতই সোফার ওপর শরীরটা এলিয়ে দিয়ে চুপচাপ বসেই রইল।

এক সময় মুখ না খুলে সে আর পারল না। সে বলল—তুমি কিন্তু আমার প্রতি মিছেই অবিচার করছ। দর্জিকে দশ ডলার অগ্রিম দেবার পর সে আর একটা সেন্টও আমাদের কাছ থেকে পায়নি ।

টুর্পিন-এর সন্দেহটা এবারকার মত দূর হল বটে।

ক' দিনের মধ্যেই মিঃ টুর্পিন-এর হাতে একটা বেনামী চিঠি এল। খামের মুখ ছিঁড়তেই তার চোখে পড়ল—

মশায়, আপনার সহধর্মিণীর ওপর নজর রাখুন। তিনি আপনার অজান্তে আপনার উপার্জিত অর্থ ব্যয় করছেন। আরে, আমিও আপনার মত দুর্দশার মধ্যে ছিলাম। স্থানটা?

তিনশ' পঁয়তাল্লিশ নম্বর ব্ল্যাঙ্ক স্ট্রীট। একজন বিচক্ষণ লোকের প্রতি— প্রভৃতি।

—এমন একজন যার সব কিছু নখদর্পণে।

মিঃ টুর্পিন চিঠিটা নিয়ে পুলিস অফিসারের শরণাপন্ন হ'ল।

পরদিন সকালেই টুর্পিন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে তিনশ' পঁয়তাল্লিশ নম্বব ব্ল্যাঙ্ক স্ট্রীটে গেল।

একজন সাদা পোশাকের লোক পুলিশের পোশাক পরে আগে থেকেই নিচের হলে অপেক্ষা কবছে।

তারা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠে দেখল, ঘরটা তালাবন্ধ। পুলিশ অফিসার পকেট থেকে একটা চাবি বের করে তালাটা খুলল।

তারা দু'জন ভেতরে ঢুকে গেল।

তারা দেখল, বিশাল একটা হলঘরে বিশ-পচিঁশটা সুসজ্জিতা মহিলা বসে। একজন পুরুষ টেলিফোন কানে ধরে ঘোড়দৌড়ের খবরাখবর নিচ্ছে।

ঘরের সবাই আগন্তুক দু'জনের দিকে আড়চোখে তাকাল।

পুলিশ অফিসার বললেন, মশায়, বেনামী চিঠিটার ব্যাপার-স্যাপার নিশ্চয় বুঝতে পেরে গেছেন। কি বলেন? খুঁজে দেখুন তো মিঃ টুর্পিন, মহিলাদের মধ্যে আপনার স্ত্রী-ও আছেন কিনা?

টুর্পিন উপস্থিত সবার দিকে অনুসন্ধিৎসু চোখে তাকিয়ে বলল—না, নেই।

সে পুলিশ অফিসার এবার বলল—তিনি থাকলে এদেরই একজন হতেন। এঁরা এখানে ব্রাউনিং সমিতি স্থাপন করেছেন। বোস্টনে এর মূল কেন্দ্র। যেখান থেকে কবিতার ব্যাখ্যা প্রচার করা হয়। মিঃ টুর্পিন, এদের ওপর নিজের সন্দেহের জন্য আপনার কিন্তু লজ্জিত হওয়া উচিত। আমি কিন্তু এখানে সন্দেহজনক কিছুর গন্ধ পাচ্ছি নে।

—কিন্তু আমার সহধর্মিণী কোন না কোন বাজে দলের সঙ্গে মিশে অর্থ ব্যয় করছে। এসব কাজের আড়ালে এখানে কোন চোরাই কারবার চলছে, এখনও আমি বিশ্বাস করি।

দেওয়াল জুড়ে ঘোড়দৌড়ের কাগজ টাঙানো। টুর্পিন পরপর ক'টা কাগজ ছিঁড়ে ফেলতেই একটা গোপন-দরজা বেরিয়ে গেল।

টুর্পিন বলল-আমার দৃঢ়বিশ্বাস, সে এখানেই আছে।

পুলিস অফিসার বাঁশি বাজাতেই নিচেতলার ঘর থেকেই একডজন পুলিস ছুটোছুটি করে ওপরে উঠে এল।

পুলিশ-অফিসারের হুকুমে ওই বিশেষ দরজাটাকে ভেঙে ফেলা হ'ল। ব্যস, পুলিস অফিসার তার লোকজনদের নিয়ে হুড়মুড় ক'রে ভেতরে ঢুকে গেলেন। টুর্পিনও তাদের পিছন পিছন গেল।

প্রায় এক কুড়ি মহিলার ওপর টুর্পিন চোখ বুলাতে লাগল। ব্যাপার দেখে মহিলারা ভয়ে ছুটোছুটি শুরু করে দিল।

পুলিশ অফিসার তাদের আশ্বাস দিতে গেয়ে বললেন—আপনাদের ভয়ের কিছু নেই। কথা দিচ্ছি, আপনাদের বন্দী করব না। তবে আপনাদের দুটো কথা বলতে চাই। দেখুন, আপনাদের স্বামীরা যে অর্থোপার্জন করেন সে কাজে কোন রকম সাহায্যে সহযোগিতা করা তো দূরের ব্যাপার, বরং আপনারা হেলায় তাদের কষ্টোপার্জিত অর্থ এভাবে নষ্ট করেছেন। এটা কি আপনাদের উচিত হচ্ছে, আপনারাই বলুন। বাড়িতে থেকে ঘর-সংসার করাই আপনাদের কর্তব্য। আজ থেকে আমার এলাকায় মদ বন্ধ।

উপস্থিত মহিলাদের মধ্যে মিসেস টুর্পিনও রয়েছে। সে নিঃশব্দে নিজেদের ফ্ল্যাটে ফিরে গেল।

বাড়ি ফিরে ভিভিয়েন টুর্পিন স্বামীর সামনে দাঁড়িয়ে এমন হাপুস নয়নে কেঁদে কেঁদে ক্ষমা চাইতে লাগলেন যে স্বামী-দেবতা তাকে ক্ষমা না ক'রে পারল না।

চোখের জল মুছতে মুছতে সে বলল—প্রিয়তম, আমার ভুল আমি অকপটে স্বীকার করে নিচ্ছি। কথা দিচ্ছি, ভবিষ্যতে অর্থ নষ্ট করা তো দূরের ব্যাপার, একটা আইসক্রীমও মুখে তুলব না। আমি বুঝতেই পারি নি যে, আমার স্বামী ধনকুবের নয়। আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। স্বীকার করছি, আমি মাত্র এগারো গ্লাস খেয়েছিলাম।

ক্লড টর্পিন তার কোঁকড়ানো ঝাঁকড়া চুলে হাত বুলাতে বুলাতে বলল—'থাকত আর বোলো না প্রিয়তমা।

—তুমি সত্যি আমাকে ক্ষমা করেছ তো, বল?

—সত্যি—সত্যি—সত্যি—। সহধর্মিণীকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে ক্লড টুর্পিন বলল। সুট হোমস অ্যাণ্ড দেয়ার রোমান্স।

জাস্টিস অব দ্য পিস বেনাজা উইড্ডাপ নিজের অফিসের দরজায় বসে পাইপ টানছেন।

র‍্যান্সি বিলরো আর তার বৌ অফিসটার সদর দরজার সামনে গরুর গাড়ি থেকে নামল।

জাস্টিস অব দ্য পিস দরজার সামনে থেকে উঠে নিজের টেবিলে গিয়ে বসলেন।

মেয়েটা ঘরের দরজায় পা দিয়েই সরাসরি বলল—'স্যার, আমরা দু'জনই বিবাহ-বিচ্ছেদ চাচ্ছি।

—আরে সংসার ভাঙা নয়, সংসার বেঁধে দেওয়াই আমার কাজ।

—আমরা বিবাহ-বিচ্ছেদ চাই।

—আরে হবে—হবে। আগে আপনারা বসুন। তারপর আপনাদের উভয়ের কথাই আমি শুনব।

চেয়ার টেনে বসতে বসতে র‍্যান্সি গম্ভীর স্বরে বলল—বিবাহ-বিচ্ছেদ। আমাদের কারোর পক্ষেই আর এক সঙ্গে থাকা সম্ভব নয়, স্যার।

—কারণটা জানতে পারি কি? জাস্টিস অব দ্য পিস চশমার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে কথাটা ছুঁড়ে দিলেন।

—স্যার, পুরুষ আর নারী যখন একে অন্যকে ভালবাসে তখন একা-একা পাহাড়ে বাস করলেও খুবই নির্জন মনে হয়। কিন্তু সে যখন বন-বিড়ালির মত অনবরত থুথু ছিটাতে থাকে,

অথবা প্যাঁচার মত বিশ্রী সুরে ডাকাডাকি করে তখন কোন পুরুষ আর তাকে এক সঙ্গে থাকার জন্য ডাকতে উৎসাহী হয় না, হয় কি?

জাস্টিস অব দ্য পিস মুখ খোলার আগেই মেয়েটা কাঁটার বিষের মত জ্বালাময়ী ভাষায় তার জবাব দিতে আরম্ভ করল। জাস্টিস অব দ্য পিস তাদের আর কথা বাড়াতে না দিয়ে টেবিল থেকে আইনের বইটা খুলে বিশেষ একটা জায়গায় দৃষ্টি স্থির করলেন।

এক সময় বললেন—'আমি দুঃখিত। এ আদালত বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন।'

পরমুহূর্তেই বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন—ন্যায় বিচার গঠনতন্ত্র অনুসারে যে বিধান উভয়মুখী কাজকর্মে উৎসাহ দেয় না তা কখনই হিতকরী হতে পারে না। একজন জাস্টিস অব-দ্য পিস যদি দম্পতিকে বিয়ে ঘর বাঁধার ব্যবস্থা করে দিতে পারে তবে তার বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটানোর ক্ষমতাও তার থাকতে বাধ্য।'

র‍্যান্সি ও তার বৌয়ের মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল।

জাস্টিস অব-দ্য পিস বিড় বিড় করে বলেই চললেন—এ অফিস বিবাহ-বিচ্ছেদের ডিক্রিটা জারি করে দেবে আর উচ্চতম আদালত তাকে মেনে নিলে এ অফিসও সে অনুযায়ী কাজ করবে।

র‍্যান্সি একটা ছেঁড়া কাপড়েব থলি বের করে তা থেকে একটা পাঁচ ডলারের নোট বের করে টেবিলে রাখতে রাখতে বলল—'স্যার, দুটো শেয়ালের চামড়া আর একটা ভালুকের চামড়া বেচে এ পাঁচটা ডলারই পেয়েছি। এর বেশী কিছু আমাদের সঙ্গে নেই, আগেই বলে রাখছি।

জাস্টিস অব-দ্য পিস নোটটা তুলে নিয়ে কোটের ভেতরের পকেটে চালান করে দিলেন। এবার একটা ফুলস্কেপ কাগজে ডিক্রিটা লিখতে আরম্ভ করলেন ঃ

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাচ্ছে যে, র‍্যান্সি বিলব্রো আর তাঁর স্ত্রী এরিয়েলা বিলব্রো আমার সামনে উপস্থিত হয়ে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, এ মুহূর্ত থেকে তাঁরা পরস্পরকে ভালবাসবেন না, সম্মান-খাতির করবেন না, কেউ কাউকে মেনে চলবেন না, এটা ভালর জন্যই হোক আর মন্দের জন্যই হোক, আর রাষ্ট্রের শান্তি ও মর্যাদা অনুযায়ী বিবাহ-বিচ্ছেদের ডিক্রি নিয়েছেন। একাজে তাঁরা কখনই অন্যথা করবেন না। ঈশ্বর আপনাদের সহায় করুন।—বেনেজা উইড্‌-ডাপ, পিডমন্ট কাউন্টির জাস্টিস অব-দ্য পিস, টেনেসি রাষ্ট্র।

লেখা শেষ করে জাস্টিস দলিলটা র‍্যান্সি-র দিকে এগিয়ে দেওয়া মাত্র এরিয়েলা প্রায় আর্তনাদ করে উঠল—হুজুর, এ দলিলটা এখন তার হাতে দেবেন না। আগে ব্যাপারটা পুরোপুরি মিটে যাক। আগেই আমার প্রাপ্যটা আমাকে মিটিয়ে দিতেই হবে। স্ত্রীকে একটা কানাকড়িও না দিয়ে কোন পুরুষ মানুষ তার স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলতে পারে না। আমি মনস্থ করেছি, আমি আমার বড় ভাইয়ের কাছে গিয়ে থাকব। তার জন্য আমার দরকার এক জোড়া জুতো, কিছু নস্যি আর খুচরো কিছু জিনিস।

জাস্টিস প্রায় অস্ফুট উচ্চারণ করলেন— 'হুম্‌।'

এরিয়েলার এবার অধিকতর কর্কশ স্বরে বলল—হুজুর, র‍্যান্সি-এর যদি বিবাহ-বিচ্ছেদের মুরোদই থাকে তবে আমার প্রাপ্য কানাকড়ি পর্যন্ত আমাকে শোধ দিয়ে দিক।'

সব কিছু শুনে র‍্যান্সি-র মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ার জোগাড় হল।

তিনি গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাস করলেন—এরিয়েন্স বিলব্রো, খোরপোষের কথা তো সে আগে ভুলেও তোলেনি। মেয়েমানুষদের কাজই শুধু ফ্যাকড়া বাঁধানো।

জাস্টিস মুহূর্তকাল ভেবে স্থির করলেন ব্যাপারটা নিয়ে একটু বিবেচনা করা দরকার।তার মেয়েটার পা দুটো সত্যি খালি।

তিনি গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলেন—এরিয়েল বিলব্রো, খোরপোষের অর্থের পরিমাণটা কত বলে তুমি ন্যায্য মনে করছ?

—জুতো আর অন্যান্য টুকিটাকি জিনিসপত্র মিলিয়ে পাঁচটা ডলার তো চাই-ই। খোরপোষের

ক্ষেত্রে এটা মোটেই বেশী নয়। তবে পাঁচটা ডলার হলেই আমি বড় ভাইয়ের বাড়ি পৌছে যেতে পারব। ব্যস, আর কিছু চাই না।

—অর্থের পরিমাণটা অযৌক্তিক নয়। র‍্যান্সি, ফরিয়াদীকে পাঁচ ডলার না দেওয়া পর্যন্ত বিবাহ-বিচ্ছেদের ডিক্রি জারি করা সম্ভব নয়।

—হুজুর, আমার কাছে যা ছিল সবই তো আপনাকে দিয়ে দিয়েছি। আর একটা সেন্টও আমার কাছে নেই।

— তোমার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা—

তাঁকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই র‍্যান্সি বলল—হুজুর, দয়া করে আগামীকাল পর্যন্ত সময় দিলে আমি তার চাহিদা অনুযায়ী অর্থ জোগাড় করে আনতে পারব। আসলে খোরপোষের ব্যাপারটা তো আমি এখানে এসে শোনলাম।

—মামলা আগামীকাল পর্যন্ত মুলতবী রইল। দু'জন আদালতে উপস্থিত হয়ে আইন মাফিক কাজ করলে তবেই বিবাহ-বিচ্ছেদের ডিক্রি জারি করা হবে, মনে রেখো।

র‍্যান্সি গাড়িটার একদিকে বসল, আর এরিয়েলা বসল তার বিপরীত দিকে। গাড়িটা এগিয়ে চলল।

জাস্টিস অব-দ্য পিস বেনেজা উইড্ডাপ এল্ডার একটা দু'কামরা বাড়িতে একাই থাকেন।

রাত্রের খাবার সারতে তিনি বাড়ি যাচ্ছেন। পথের ধারের একটা ঝোপের ভেতর থেকে হঠাৎ মনুষ্য মূর্তি বেরিয়ে এসে তার পথে আগলে দাঁড়াল। তার বুকে হাতের বন্দুকের নলটা চেপে ধরল।

ডাকাত বলল—তোমার কাছে মালকড়ি যা আছে বের করে আমার হাতে দাও।

জাস্টিস কাঁপতে কাঁপতে কোটের ভেতরের পকেট থেকে পাঁচ ডলারের একটা নোট বের করে ডাকাতটার হাতে দিয়ে বললেন— যা ছিল দিয়ে দিলাম। আর একটা সেন্টও নেই। একজন ডাকাতের হুকুমে নোটটাকে পাকিয়ে সেই নোটটা নিয়ে ডাকাতটা চোখের পলকে অন্ধকারে ঝোপের ভেতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পরদিন পূর্ব নির্ধারিত সময়ে আবার গরুর গাড়িটা আদালতের দরজায় হাজির হল। র‍্যান্সি আর তার সহধর্মিণী গাড়ি থেকে নেমে বিচারপতির ঘরের দরজায় হাজির হ'ল।

র‍্যান্সি কোন কথা হবার আগেই একটা পাঁচ ডলারের নোট জাস্টিসের টেবিলে রাখল।

জাস্টিস চশমার ফাঁক দিয়ে নোটটার দিকে তাকিয়েই চিনে ফেললেন, এ নোটটাই গত রাত্রে তিনি নিজে হাতে পাকিয়ে বন্দুকের নলের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন।

না, জাস্টিস সব কিছু বুঝেও কিছুই বললেন না, অন্য নোটও তো কেউ একইভাবে পাকিয়ে রাখতে পারে।

সাত পাঁচ ভেবে জাস্টিস ব্যাপারটা চেপেই গেলেন।

এবার তিনি র‍্যান্সি আর সঙ্গী মেয়েটার হাতে একটা ক'রে ডিক্রির দলিল তুলে দিলেন।

হাতের দলিলটা ভাঁজ করতে করতে মেয়েটা ধরা-গলায় বলল— 'তুমি তো বাড়িই ফিরছ। তাকের ওপরের টিনের কৌটোয় রুটি রাখা আছে। কুকুরে মুখ দিতে পারে ভেবে রান্না-করা শূকরের মাংসটা পাত্রেই ঢেকে রেখেছি। রাত্রে ঘড়িটায় দম দিতে ভুলে যেয়ো না যেন।

র‍্যান্সি বলল—তুমি তো তোমার বড় ভাই এড-এর বাড়িতেই যাচ্ছ, তাই না?

—হ্যাঁ, এছাড়া তো যাবার আর কোন জায়গা আমার নেই।

এরিয়েলা পাঁচ ডলারের নোটটাকে ভাঁজ করে বুকের কাছে, জামার ভেতরে চালান করে দিল।

জাস্টিস দেখলেন তার প্রাপ্য টাকাটা গায়েব হয়ে গেল।

এরিয়েলা আগের মতই ভাঙা ভাঙা গলায় উচ্চারণ করল—র‍্যান্সি, পুরনো ঘরে রাত্রে তোমার বড়ই একা লাগবে।

—তা লাগলে কি-ই বা আর করা যাবে। কেউ যদি পাগলের মত বিবাহ-বিচ্ছেদ দাবী করে, তবে তো কেউ সঙ্গী হয়ে পাশে থাকতে পারে না।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মেয়েটা বলল—বিবাহ-বিচ্ছেদ তো অন্য একজনও চেয়েছিল। আর কেউ তো চায় নি যে কেউ তার কাছে থাকুক।

—কাছে থাকতে চায় না, এমন কথাও তো কেউ জোর দিয়ে বলেনি।

—কিন্তু সঙ্গে থাকতে চায় এমন কথাও তো কেউ বলেনি।

মুহূর্তের জন্য র‍্যান্সি-র দিকে তাকিয়ে সে বলল, আমি বরং এখনই বড় ভাইয়ের বাড়ির দিকে হাঁটা ধরি। দেরী করলে রাত্রি হয়ে যাবে।

—ঘড়িতে কিন্তু কেউ দম দিতে পারবে, না বলে রাখছি।

—র‍্যান্সি, তুমি কি চাচ্ছ যে, আমি তোমার সঙ্গে গিয়ে ঘড়িতে দম দিয়ে আসব।

পাহাড়ি পৌঢ় র‍্যান্সি আর কোন কথা না বলে এরিয়েলার কাঁপা-কাঁপা হাতটা চেপে ধরল।

মেয়েটা আবেগে-উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে স্বামীর মুখের দিকে নীরব চাহনি মেলে তাকিয়ে রইল।

র‍্যান্সি তার হাতটা ধরে রেখেই বলল—আরে, শিকারী কুকুরগুলো তো তোমাকে এখন আর তাড়া করছে না।

—হুম্।

—আমি মেনে নিচ্ছি, সম্পূর্ণ দোষ আমার। এরিয়েলা, তুমিই ঘড়িতে দম দাও।

—তোমার মতই আমার মনটা এত দিনের ঘরটাতে ফিরে যাবার জন্য কাঁদছে। বিশ্বাস কর, আমি ভুলেও আর কোনদিন এরকম পাগলামি করব না। তবে চল এখনই আমরা রওনা দেই।

আদালত কক্ষ আর বিচারপতির উপস্থিতির কথা তারা ভুলেই গিয়েছিল।

জাস্টিস সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—তোমাদের আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, পাকাপাকিভাবে ডিক্রি জারি হয়ে গেছে। তোমরা বিবাহ-বিচ্ছেদের অংশীদার হয়েছ। তাই দাম্পত্য জীবনে তোমরা আর ফিরে যেতে পার না।

র‍্যান্সি আর মেয়েটা উভয়েই সমস্বরে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

জাস্টিস এবার বললেন—বিবাহ-বিচ্ছেদের পর যদি উভয় পক্ষ অনুতপ্ত হয়ে আবার দাম্পত্য-জীবনে ফিরে যেতে চায় তবে তার ব্যবস্থাও আইনে আছে।

তারা উভয়েই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে জাস্টিসের মুখের দিকে তাকাল। জাস্টিস এবার বললেন—তাদের পুনরায় বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে। আর তার জন্য খরচ হবে এ মামলার মত পাঁচ ডলার।

এরিয়েলা নিজের বুকের ভেতর থেকে পাঁচ ডলারের নোটটা বের করে জাস্টিসের টেবিলে রাখল।

র‍্যান্সি এবার তার স্ত্রী এরিয়েলা-র হাতটা ধরে জাস্টিসের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল।

তারা গরুর গাড়িটায় পাশাপাশি বসল। গাড়িটা পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলল।

এ স্যাকরিফাইস হিট

'হার্থস্টোন ম্যাগাজিন'-এর সম্পাদক মশায় নিজের প্রকাশনার ব্যাপারে পাণ্ডুলিপি নিদর্শন করতে গিয়ে নিজস্ব একটা রীতি অনুসরণ করে থাকে। তবে কাজটা তিনি অবশ্যই গোপনে সম্পাদন করেন না।

হার্থস্টোন নিজের কাজটা সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন—পাণ্ডুলিপি পড়ার জন্য কোন লোক নিয়োগ না ক'রে আমরা বিভিন্ন পাঠকদের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করি।

সম্পাদকীয় দপ্তরে পাণ্ডুলিপি জমা পড়ামাত্র পাঠ ক'রে মতামত দানের জন্য তিনি সেগুলোকে অফিসের কর্মচারী থেকে শুরু ক'রে, নিজের বাড়ির রাঁধুনি পর্যন্ত সমাজের সবস্তরের মানুষকে দিয়ে পড়ান।

হার্থস্টোন ম্যাগাজিন-এর দপ্তরে পাণ্ডুলিপি জমা পড়ামাত্র যেমন নিজেই ঘুরে ঘুরে পাঠ

করার জন্য বিতরণ করেন আবার নিজেই সেগুলোকে একইভাবে ফেরৎ-ও নেন। পাঠকরা পাণ্ডুলিপি ফেরৎ দেওয়ার সময় নিজ নিজ মন্তব্যও দান করে।

কেবলমাত্র ম্যাগাজিনই নয়, হার্থস্টোন প্রতিষ্ঠান ছাপা বইও প্রকাশ করে। বইয়ের পাণ্ডুলিপি নির্বাচনের ক্ষেত্রে একই রীতি অনুসরণ করা হয়। কালের প্রকাশিত বইগুলো সাফল্য লাভও যথেষ্টই করে। আর সে সঙ্গে অর্থাগম যে প্রচুর পরিমাণে হয় তা ফলে দরকার আছে বলে মনে করিনা।

এলেন-এর স্লেটন যখন তাঁর 'ভালবাসাই সব' উপন্যাসটা লিখে না শেষ করলেন তখনও তাঁর হার্থস্টোন রীতির ব্যাপারটা ভালই জানা ছিল। আর এ-ও তাঁর জানা ছিল হার্থস্টোন-এর সম্পাদক মশায় বিভিন্ন প্রসঙ্গের পাণ্ডুলিপিগুলো চারদিকে ছড়িয়ে দিলেও প্রেম ভালবাসা সংক্রান্ত গল্পগুলোর পাণ্ডুলিপি তার ব্যক্তিগত স্টেনোগ্রাফার মিস পাফকিন-এর টেবিলে পাঠিয়ে দেন।

সম্পাদক মশায়ের পাণ্ডুলিপি নির্বাচনের প্রচলিত রীতির মধ্যে আরও বৈশিষ্ট্য আছে—পাণ্ডুলিপি-পাঠকদের কাছে লেখক-লেখিকাদের নামটা গোপন রাখেন।

এলেন স্লেটন সারা জীবন ধরে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে যে ফসল পেয়েছেন তা এই 'ভালবাসাই সব' উপন্যাসটা। এটাকে পূর্ণাঙ্গ রূপদান করতে তিনি দু'মাস ধরে নিজেকে সেটার মধ্যে লিপ্ত রেখেছেন।

শিল্প সৃষ্টির মাধ্যমে খ্যাতি লাভ করার জন্য তিনি যাবতীয় পার্থিব সম্পদ ত্যাগ করতে রাজী।

তাঁর একটা বইও যাতে 'হার্থস্টোন' কোম্পানি থেকে প্রকাশিত হয় তার জন্য তিনি নিজের একহাতও কেটে ফেলতে রাজী আছেন।

এলেন স্লেটন তাঁর বহু আকাঙ্ক্ষিত ও মনের মত করে লেখা 'ভালবাসাই সব' উপন্যাসটা লেখা শেষ করেই বগলে নিয়ে 'হার্থস্টোন'-এর সম্পাদকের ঘরে হাজির হলেন।

বহু হুজ্জতি হাঙ্গামা সহ্য করে এলেন স্লেটন শেষ পর্যন্ত সম্পাদক মশায়ের দরজায় পৌঁছাতে পারলেন।

তিনি সদ্য শেষ করা 'ভালবাসাই সব' উপন্যাসটা সম্পাদক মশায়ের হাতে তুলে দিলেন।

সম্পাদক পাণ্ডুলিপির গোছাটা হাতে নিয়ে লেখকের সর্বাঙ্গে মুহূর্তের জন্য চোখ বুলিয়ে নিয়ে মুচকি হেসে বললেন—ধন্যবাদ। এক সপ্তাহ পরে পাণ্ডুলিপিটার প্রাপ্তি স্বীকার করে চিঠি দেব।

সম্পাদকের স্টেনোগ্রাফার মিস পাফকিন আর লেখক এলেন স্লেটন একই বাড়িতে বাস করেন।

মিস পাফকিন এক বয়স্কা কুমারী। কিছুদিন আগেই তাঁর সঙ্গে লেখক এলেন স্লেটন-এর পরিচয় হয়।

ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে বসে এলেন স্লেটন-এর মাথায় দুঃসাহসিক পরিকল্পনা উঁকি দিল। প্রেম ভালবাসা সম্পর্কিত উপন্যাসগুলো যে সম্পাদক মশায় তাঁর স্টেনোগ্রাফার মিস পাফকিনকে দিয়ে পড়িয়ে তবেই ছাপেন তা-তো তাঁর আগে থাকতেই জানা আছে।

'ভালবাসাই সব' উপন্যাসের মূলসূত্রটাই তো হচ্ছে প্রথম দর্শনেই প্রেম। অনুভূতি আবির্ভাবমাত্রই পুরুষ বা নারী তার মনের মানুষটাকে চিনে নিতে সক্ষম হয়।

লেখক এলেন স্লেটন মনে মনে স্থির করে ফেললেন, তিনি নিজে এ স্বর্গীয় সত্যটাকে মিস পাফকিন-এর মাথায় ঢুকিয়ে দেবেন। ব্যস, কাজ হাসিল করতে পারলে 'হার্থস্টোন'-এর সম্পাদক মশায় তার 'ভালবাসাই সব' উপন্যাসটা সম্বন্ধে অনুকূল অভিমত পাঠাতে বাধ্য হবেন।

ব্যস, আর দেরী নয়, সে রাত্রেই লেখক এলেন স্লেটন মিস পাফকিন-কে নিয়ে থিয়েটার দেখতে গেলেন।

তারপর দিনই তিনি মিস পাফকিনকে প্রেম নিবেদন করে বসলেন। অচিরেই মিস পাফকিন

লেখকের কাঁধে এলিয়ে পড়ল। আর এরই ফলে তার নিজের মাথায় সাহিত্যিক খ্যাতি-প্রতিষ্ঠার ছবি নাচতে আরম্ভ করল।

না, সাহিত্যিক এলেন স্লেটন কিন্তু কেবলমাত্র ভালবাসার খেলাটুকু খেলেই থেমে গেলেন না।

গালে হাত দিয়ে বসে ভাবতে ভাবতে আপন মনেই বলে উঠলেন—হ্যাঁ, আমার জীবনের মোড় যে এটাই ঘুরিয়ে দেবে এতে আমার তিলমাত্রও সন্দেহ নেই।

লেখক এলেন স্লেটন তার ভালবাসার খেলাটাকে সাঙ্গ না করে বরং আর একজন সফল খেলোয়াড়ের মতই পা টিপে টিপে তিনি শেষ পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন।

শেষ পর্যন্ত বৃহস্পতিবার রাত্রে তিনি মিস পাফকিন'কে নিয়ে গীর্জায় হাজির হলেন। সেখানেই তাঁরা বিয়ের পাট মিটিয়ে ফেললেন।

একটা চিলেকোঠায় সাহিত্যিক কাতুব্রিয়াঁ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন, এক বিধবা নারীর ভালবাসায় মজেছিলেন প্রখ্যাত কবি বায়রন। আর কিটস্? শেষ জীবনে তিনি অনাহারে-অ-চিকিৎসায় কষ্ট পেয়েছিলেন। মারাও গিয়েছিলেন একই কারণে। ডি. কুইন্সি পাইপটাই ভেঙেছিলেন, সাদা মোজা ব্যবহার করতেন সাহিত্য-সাধক ডিকেন্স। সামান্য একটা জ্যাকেট পরে দ্য মঁপাসা দিন কাটাতেন।

বিয়ের পরদিন শুক্রবার সকালে মিসেস স্লেটন বললেন—আমি 'হার্থস্টোন'-এর অফিসে গিয়ে সম্পাদক মশাই আমাকে যে পাণ্ডুলিপিগুলো পড়তে দিয়েছেন তার দু'-একটা পাণ্ডুলিপি তাঁকে ফিরিয়ে দেব।

বিষণ্ণ মুখে, কাঁপা কাঁপা গলায় এলেন স্লেটন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—সেকি! তারপর?

—তারপর স্টেনোগ্রাফারের পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে দেব।

—কিন্তু যে পাণ্ডুলিপিগুলো তুমি ফেরৎ দেবে মনস্থ করেছ তার মধ্যে কি—মনে কর—তোমার খুব ভাল লেগেছে, মনে দাগ কেটেছে এমন কোন উপন্যাস কি আছে।

—আছে, অবশ্যই আছে। একটা উপন্যাস আমার মনে খুব দাগ কেটেছে।

—ভাল লেগেছে! দাগ কেটেছে বলতে—

—চমৎকার। চমৎকার গঠনশৈলী!

—তাই বুঝি।

—সত্যি কথা বলতে কি,গত বছর কয়েকের মধ্যে সেটার তুলনায় অর্ধেকও ভাল জীবনমুখী গল্প আমি পড়ার সুযোগ পাই নি।

আর একটা দিনও নষ্ট না করে সাহিত্যিক এলেন স্লেটন 'হার্থস্টোন' অফিসে গেলেন।

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় তার বারবারই মনে হতে লাগল, পুরস্কারটা নির্ঘাৎ তার বরাতে জুটে গেছে।

আরে ব্বাস! হার্থস্টোন থেকে একটা উপন্যাস প্রকাশ হওয়ার অর্থই হচ্ছে, সাহিত্য খ্যাতি বরাতে জুটে যাওয়া।

সম্পাদক মশায়ের পাশের ছোট ঘরটায় তাঁকে বসতে দেওয়া হয়েছে। একটু বাদেই এক ছোকরা কর্মচারী মুখ কাচুমাচু করে ঘরে ঢুকল।

এলেন স্লেটন সোৎসাহে তাকে বললেন—কি হে, কোন খবর—

তাঁকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ছোকরা কর্মচারীটা বলে উঠল—স্যার, সম্পাদক মশায় আপনাকে বলতে বলেছেন, তিনি দুঃখিত।

এলেন স্লেটন-এর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। তিনি কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন—দুঃখিত!

—হ্যাঁ, আপনার পাণ্ডুলিপিটা এ ম্যাগাজিনে ছাপা সম্ভব হচ্ছে না।

ফ্যাকাসে বিবর্ণ মুখে এলেন স্লেটন এবার বললেন—একটা কথা, তুমি কি জান, মিস পাফকিন—আমার—আমি বলতে চাইছি মিস পাফকিনকে পড়তে দেওয়া হয়েছিল এমন কোন উপন্যাস কি তিনি আজ সকালে ফেরৎ দিয়ে গেছেন?

—হ্যাঁ।

তুমি ঠিক জান?

—হ্যাঁ, ঠিকই বলছি স্যার, ফেরৎ দেওয়ার সময় মিস পাফকিন'কে বলতে শুনেছি, গল্পটাকে একটা বসন্তের ফুল ছাড়া কিছুই আখ্যা দেওয়া চলে না।

মুহূর্তের জন্য ভেবে ছোকরা কর্মচারীটা এবার বলল—'স্যার, আপনার নামই এলেন স্লেটন, তাই না?

—হ্যাঁ, আমারই নাম এলেন স্লেটন।

—স্যার, আমিই ভুল করে গোলমালটা পাকিয়েছি। সম্পাদক মশায় সেদিন আমাকে কয়েকটা পাণ্ডুলিপি দিয়ে বলেছিলেন—যার যারটা তার তার হাতে দিয়ে এসো। আর আমি ভুল করে মিস পাফকিন-এর পাণ্ডুলিপি অফিসের দারোয়ানকে, আর দারোয়ানের পাণ্ডুলিপি মিস পাফকিন-এর টেবিলে দিয়ে আসি।

এলেন স্লেটন অনুসন্ধিৎসু নজরে তাকিয়ে দেখলেন, তাঁর 'ভালবাসাই সব' পাণ্ডুলিপির খামটার ওপর দারোয়ানের হাতের কয়লার টুকরো দিয়ে বড় বড় হরফে লেখা—"এটা আপনিই বলুন!"

এলেন স্লেটন খামের গায়ের লেখাটার দিকে বজ্রাহতের মত তাকিয়ে রইলেন।

দ্য রোডস্ উই টেক

'সানসেট এক্সপ্রেস' জল নেবার জন্য টাকসন থেকে বিশ-মাইল পশ্চিমের একটা পুকুরের কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বিখ্যাত ইঞ্জিনটায় জল নেওয়া ছাড়া আরও বেশ কিছু দামী জিনিসপত্র রয়েছে।

ফায়ার ম্যান যখন জলের হোস-পাইপটা ইঞ্জিন থেকে নিচে নামিয়ে দিতে ব্যস্ত ঠিক তখনই জন বিগডগ, বব টিউবল আর ডড্সন আচমকা ইঞ্জিনের ওপর লাফিয়ে উঠে পড়েই তাদের বন্দুকের নল তিনটে ড্রাইভারের সামনে উঁচিয়ে ধরল।

ব্যাপারটা বোঝামাত্রই ড্রাইভার দু'হাত ওপরে তুলে নিশ্চল-নিথর পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে পড়ল।

আক্রমণকারীদের সর্দার ডড্সন। তার নির্দেশে ড্রাইভার টেণ্ডার কামরা আর ইঞ্জিন বিচ্ছিন্ন করে দিল।

তারপর জন বিগডগ কয়লার ওপর বসে ড্রাইভার আর ফায়ার-ম্যানের দিকে দুটো বন্দুক বাগিয়ে ধরল।

দলনেতা ডড্সন এবার হুকুম দিল—ইঞ্জিনটাকে জলদি পঞ্চাশ গজ দূরে নিয়ে যাও।

ডড্সন আর বব টিউবল সাধারণ যাত্রী ট্রেনের মত ছোটখাট খনির দিকে হাত বাড়িয়ে ইজ্জৎ নষ্ট করতে নারাজ। অতএব এক্সপ্রেস ট্রেনের ওপরই তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

বব টিউবল এদিকে এক্সপ্রেস ট্রেনটার যাত্রীদের ডলারের নোট আর সোনাদানা কেড়ে নিতে লাগল। আর ডড্সন ততক্ষণে এক্সপ্রেস ট্রেনটার সিন্দুকটাই ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিল।

বিস্ফোরণটার ফলে নগদ অর্থ আর সোনাদানা মিলে ত্রিশ হাজার ডলার ডাকাতরা কামিয়ে নিল।

দলপতি ডড্সন আর বব টিউবল সোনাদানা আর নগদ অর্থ যা কিছু পেল সব একটা থলের মধ্যে ভরে এক্সপ্রেস ট্রেনটা থেকে লাফিয়ে নিচে নেমে এল।

এবার তারা লম্বা লম্বা পায়ে ইঞ্জিনটার দিকে এগিয়ে গেল। ড্রাইভার বিচক্ষণ ব্যক্তি। সে অচল ট্রেনটাকে ফেলে রেখে আগেই চম্পট দিয়েছে।

এবার এক্সপ্রেসের সংবাদ বাহক একটা উইনচেস্টার বন্দুক হাতে তার কামরা থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে। এটা দিয়েই সে একটা অবিশ্বাস্য কাণ্ড করে ফেলল।

এদিকে জন বিগডগ আগের মতই ইঞ্জিনের কয়লার ঢিবির ওপর একই ভাবে বসে রইল।

সে একেবারেই বোকার মত একটা কাজ করে বসল। সে হঠাৎ চিৎকার চেঁচামেচি জুড়ে দিল।

ব্যস, আর যাবে কোথায়? সংবাদ বাহক একটা মাত্র গুলির সাহায্যেই তার ভবলীলা সাঙ্গ করে দিল।

আর জন বিগডগ অক্কা পাওয়ার ফলে তার দলের অন্য দু'জনের বরাত খুলে গেল। প্রত্যেকের লুটের ভাগ একের ছয় অংশ বেড়ে গেল। কম ব্যাপার!

দলপতি ডডসন ড্রাইভারকে হুকুম দিল—ইঞ্জিনটাকে চালিয়ে নিয়ে দু'মাইল দূরে নিয়ে গিয়ে থামাও।

ড্রাইভার বেচারা দলপতির হুকুম তামিল করল।

ডাকাত দু'জন সুযোগটার সদ্ব্যবহার করল। তারা দ্রুত নেমে পাশের গভীর জঙ্গলে ঢুকে বে-পাত্তা হয়ে গেল।

জঙ্গলের একজায়গায় তিনটে ঘোড়া বাঁধা রয়েছে। তাদের একটা জন বিগডগ-এর। তার পিঠ থেকে জিন আর লাগামটা খুলে নিয়ে ডাকাত দু'জন সেটাকে জঙ্গলের আরও গভীরে গড়িয়ে দিল।

অন্য দুটো ঘোড়ার পিঠে চেপে ডাকাত দু'জন একটা নির্জনগিরি পথে হাজির হ'ল। সেখানে মিনিট কয়েক বিশ্রাম করে তারা আবার যাত্রা শুরু করল।

আরও কিছুদূর যেতে আচমকা পা হড়কে গিয়ে বব টিউবল-এর ঘোড়াটার সামনের একটা পা ভেঙে গেল। গুলি করে পঙ্গু জানোয়ারটাকে মেরে ফেলা হল।

এখন উপায়? যাত্রী দু'জন, আর ঘোড়া মাত্র একটা। উপায়ান্তর না দেখে তারা দু'জন দলপতি ডড্সন-এর ঘোড়ার পিঠে চেপেই এগিয়ে চলল।

পথ চলতে চলতে ডড্সন বলল—লুটের মাল দেখে তো মনে হচ্ছে ত্রিশ হাজার ডলার কামাতে পেরেছি। প্রতিটা থলেতে পনেরো হাজার ডলার করে রয়েছে।

আরও কিছুটা পথ পাড়ি দিয়ে সে আবার মুখ খুলল—বরাত ভাল যে, বুড়ো বলিভারটা ছিল। আহা! তোমার ঘোড়াটা হড়কে গিয়ে পা-টা ভেঙে না ফেললে, তারপর কিছুই ছিল না।

বব বলল—এখন বলিভারই ভরসা। একটা কথা আমি প্রায়ই ভাবি, পূর্বের দেশ থেকে এসে তুমি যে কি করে এখানে একেবারে জমিয়ে বসে পড়লে, আর সর্দার বনে আমাদের মত পশ্চিমীদের ঘাড়ে চেপে বসলে। আচ্ছা পূর্বে তোমার কোন দেশ ছিল, বল তো?

—নিউইয়র্ক।

—আর জন্মস্থল?

—উলস্টার কাউন্টির একটা খামার-বাড়িতে জন্ম হয়েছিল।

—নিউইয়র্কে এসেছিলে কবে, মানে কত বছর বয়সে?

—সতের বছর বয়সেই বাড়ি থেকে চম্পট দিয়েছিলাম।

—আর পশ্চিমে?

—এটা নেহাৎ-ই হঠাৎ করে চলে এসেছি। এক রাত্রে একটা পশ্চিমী নাটুকে দলের সঙ্গে ভিড়ে গেলাম। তারা ছোট-ছোট শহরে শো করে বেড়াচ্ছিল। তাদের ল্যাজ ধরেই চলে এলাম পশ্চিমে।

মুহূর্তকাল নীরবতার মধ্য দিকে কাটিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে এবার বলল—ভাইরে, এখন অবাক হয়ে ভাবি, তখন অন্য কোন পথ আঁকড়ে থাকলে হয়ত আমি আজ অন্য মানুষ হতাম।

ডড্সন কথা বলতে বলতে কয়েক পা দূরের একটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

বব টিউবল লুটের মালের থলের মুখটা শক্ত করে বাঁধতে লাগল। তারপর মুখ তুলে তাকিয়েই দেখল, ডড্সন হাতের ৪৫-এর নলটা তার দিকে তাক করে দাড়িয়ে রয়েছে

বব টিউবল কিছু বলার আগেই ডড্সন বলল—খবরদার! এক চুলও নড়বে না। শোন, তোমাকে বলতে আমার নিজেরই ঘৃণা বোধ হচ্ছে—আমাদের একজনই বেঁচে থাকতে পারবে।

—একী বলছ ডড্সন!

—ঠিকই বলছি। তুমিও হয়ত বুঝতে পারছ, আমার বলিভার পথ শ্রমে বড়ই ক্লান্ত। দু'জনকে বয়ে নিয়ে যাবার মত ক্ষমতা তার নেই।

তার মধ্য থেকে বন্ধুবৎসল মানুষটা ইতিমধ্যেই নিঃশেষে মিলিয়ে গেছে। সে যেন একটা ভয়ঙ্কর হিংস্র জানোয়ারে পরিণত হয়ে গেছে।

আচমকা ৪.৫-টা গর্জে উঠল। বব টিউবল-এর রক্তাপ্লুত দেহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। পরমুহূর্তেই 'সানসেট এক্সপ্রেস' লুঠ-করা দলের সর্দার, সর্বশেষ ডাকাতটা বলিভার-এর পিঠে চেপে উল্কার বেগে ধেয়ে চলেছে।

এবার ব্যাপারটা আপনাদের কাছে খোলসা করেই বলছি—ওয়াল স্ট্রীটের দালালী প্রতিষ্ঠান 'ডড্‌সন অ্যাণ্ড ডেকার'-এর ডড্‌সন ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাল। তার পাশে নীরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার ব্যক্তিগত করণিক পিবডি।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে পিবডি'কে দেখে ডড্‌সন বলল—ওহে পিবডি একটু ঝিমুনি এসেছিল। ব্যস, এ পার্যন্তিই খেয়াল আছে। কিন্তু কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, বুঝতেই পারি নি। এর মধ্যে আবার একটা মজার স্বপ্নও দেখে ফেলেছি।

স্যার, উইলিয়ামস-এর সঙ্গে আমি কথা বলেছি। তিনি তো আপনার একজন পুরনো বন্ধু। তিনি আটানব্বই করে স্টকটা বেচেছিলেন। তিন বাজার-দর ব্যাপারটার মিটমাট করে নিলে তার কারবার উঠে যেতে বাধ্য।

চোখের পলকে ডড্‌সন-এর মুখের ভাবটা বদলে গেল। নিদারুণ এক হিংস্রতা তার মধ্যে ভর করল। তার ভেতরের মানুষটা মুহূর্তের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

ডড্‌সন মুখ খুলল—না, তাকে একশ পঁচাশিতেই মেটাতে হবে। বলিভার-এর পক্ষে তো দ্বিগুণ বোঝা বহন করা সম্ভব নয়।

এ ব্ল্যাকজ্যাক বারগেনার

ইয়াঙ্গী গোরী!

ইয়াঙ্গী গোরী-র আস্তানায় গোরী নিজেই সবচেয়ে কুখ্যাত। নীল পর্বতমালার পাদদেশে বেথেল শহর গড়ে উঠেছে।

জুন মাসের ভ্যাপসা গরমের একটা দিন।

উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি খুইয়ে গোরী নিঃস্ব রিক্ত হয়ে পড়েছে।

গোরী সবার আগে খুইয়েজে পূর্বপুরুষের রেখে-যাওয়া কয়েক হাজার ডলার। তারপর বেচেছে পারিবারিক পুরনো পাকা বাড়িটা। সবশেষে তাকে খোয়াতে হয়েছে মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ আত্ম সম্মানটুকুও। আজ সে হয়ে উঠেছে একজন বিবেক ও মনুষ্যত্বহীন এক পাশবিক মনোবৃত্তি সম্পন্ন মানুষ।

গোরী আজ দল থেকেও বহিষ্কৃত হয়েছে।

আজ তার পরিচয় একজন জুয়াড়ী ও মাতাল।

সর্বস্ব খুইয়ে দল থেকে বহিষ্কৃত হয়ে গোরী আজ তার আখড়াতেই ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে।

ব্ল্যাকজ্যাক পাহাড়ের পাদদেশে ছোট্ট গ্রাম লরেল। এখানেই গোরী জন্মেছিল। গায়ে গতরে বড় হয়েও উঠেছিল এ গ্রামেই।

পাহাড়ের পাদদেশের ছোট্ট গ্রাম লরেল—এই এক সময় জন্ম নিয়েছিল কোলট্রেন বংশ আর গোরী বংশের বিবাদ। ছাল বাকলহীন এ প্রাণীটা ছাড়া গোরী বংশের কোন প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারীই আজ আর পৃথিবীর বুকে নেই।

আর কোলট্রেন বংশ? আজ এ বংশেরও একজন মাত্র পুরুষ উত্তরাধিকারী জীবিত আছে। তার নাম কর্নেল এবনার কোলট্রেন।

কর্নেল এবনার কোলট্রেন সমাজের একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। প্রচুর অর্থের মালিকও বটে। ওই অঞ্চলের প্রচলিত রীতি অনুযায়ীই পরিবার দুটোর মধ্যে বিসংবাদ দানা বেঁধেছিল। আর এ ইতিহাস বিদ্বেষ, অশান্তি আর রক্তের অক্ষরে লেখা।

গোরী আজ এ মুহূর্তে তার পারিবারিক বিদ্বেষ নিয়ে ভাবিত নয়। আজ তার সবচেয়ে বড় ভাবনা, নিজের ভুল ভ্রান্তি আর পৃথিবীতে নিজের অস্তিত্বটুকু টিকিয়ে রাখার উপায় বের করা।

বর্তমানে গোরী-র পারিবারিক হিতাকাঙ্ক্ষীরা তার থাকা খাওয়ার দায়িত্ব নিয়েছে সত্য। কিন্তু তার সব চেয়ে বড় চাহিদা মদ। তারা তো আর তাকে বোতল বোতল মদ জোগান দেবে না। কিন্তু মদ যে তার অবশ্যই চাই। মদ ছাড়া একটা বেলা কাটানোর কথাও সে ভাবতে পারে না।

গোরী-র আইনের ব্যবসা কবেই শিকেয় উঠেছে। গত দু'বছর কেউ ভরসা করে তার হাতে কোন ছোটখাটো মামলাও দেয় না।

অন্যের বোঝা হয়েই তাকে আজ দিন গুজরান করতে হচ্ছে। সে অবশ্য হাত-পা গুটিয়ে শুয়ে নিজের মনকে প্রবোধ দেয়, আর মাত্র একবার—আর মাত্র একটাবারও যদি বাজি ধরার সুযোগ পেত তবে অবশ্যই হালটা পাল্টে ফেলত। কিন্তু বেচেবর্তে অর্থ জোগাড় করার মত বলতে কিছুই নেই। হাতে মালকড়ি যা ছিল সব অনেক আগেই ফুঁকে দিয়েছে।

গত দু'মাস আগে যে গোরী পরিবারে পুরনো বাড়িটা বেচে মদ আর জুয়ার আখড়ায় উড়িয়ে দিয়েছে। একথাটা মনের কোণে উঁকি দিতেই সে আপন মনে হেসে উঠল।

পাইক গার্ভি নামক একটা লোক আর তার স্ত্রী পাহাড়ের পিছন দিককার ঘাঁটি থেকে এসেছিল। অদ্ভুত লোক বটে। সে-ই গোরী পরিবারের বাস্তু ভিটাটা খরিদ করে নিয়েছে। পাহাড়ী মানুষরা বে-আইনী মানুষের অঞ্চল অর্থে 'ঘাঁটি' শব্দটাকে ব্যবহার করে। আর সে সঙ্গে নেকড়ে আর ভালুকের দৌরাত্ম্য তো আছেই।

বুড়ো-বুড়ি বিশটা বছর সে ঘাঁটিতেই কাটিয়েছে। তাদের কোন সন্তান সন্ততি ছিল না। আর পাহাড়ের নিস্তব্ধতা ভাঙার মত কোন কুকুর পর্যন্ত তাদের ছিল না। বুড়ো-বুড়ি প্রতিদিনের একটা বড় ভগ্নাংশ ঘরের কোণেই কাটিয়ে দিত। ফলে সেখানকার অধিকাংশ মানুষই তাদের চিনত না।

হ্যাঁ একবার—মাত্র একবারই পাইক গার্ভি ঘাঁটির বাইরে গিয়েছিল। 'গিয়েছিল' বলতে সে যেতে বাধ্য হয়েছিল।

একদিন রাজস্ব বিভাগের দু'জন ষণ্ডামার্কা লোক আগে তাকে নিমন্ত্রণ জানায়। তারাই তাকে আদর করে ধরে নিয়ে গিয়ে পুরো দুটো বছর গারদে ভরে রেখেছিল। ব্যস, এটাই তার প্রথম ও শেষ বিদেশ ভ্রমণ অর্থাৎ ঘাঁটির বাইরে পা দেওয়া।

জেল থেকে ছাড়া যাওয়ার পর বুড়ো-বুড়ি সেই যে বন-বিড়ালের মত গর্তে সিঁধিয়েছিল তারপর বেরিয়ে এসেই গোরীদের বাস্তুভিটাটা খরিদ করে ফেলল। তারপর থেকে গার্ভি দম্পতি ব্ল্যাকজ্যাক পল্লীতেই থিতু হয়ে গেছে।

একদিন এক চশমা পরিহিত খনি সন্ধানী পাইক-এর বাড়ির পাশের অঞ্চলগুলোতে তল্লাসী চালাতে লাগল। তার সঙ্গে জানা কয়েক মজুরও রয়েছে।

গার্ভী ধরেই নিল এরা নির্ঘাৎ রাজস্ব বিভাগের লোক যারা তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে দু'বছর ফাটকে আটকে রেখেছিল।

ব্যস, আর এক মুহূর্ত দেরী না করে পাইক যন্ত্রচালিতের মত দ্রুত ঘরে ঢুকে দো-নলা বন্দুকটা নিয়ে তেমনি ব্যস্ত পায়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

এবার খনি সন্ধানীদের লক্ষ্য ক'রে দূর থেকে গুলি ছুঁড়ল। বরাত ভাল যে, গুলিতে কারো জীবনহানি ঘটে নি।

বিধাতা পুরুষের অধম অনুচররা পাইক-এর কান্ড দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল। তাদের দলপতি চশমাধারী লোকটা আতঙ্কিত হয়ে পাইক-এর সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলল। পাইক নিঃসন্দেহ হ'ল। আইন বা বিচার বিভাগের মত কোন বিভাগের সঙ্গেই আগন্তুকদের সম্পর্ক নেই।

পরবর্তীকালে তাদের ত্রিশ একর জমি গোছাগোছা নোটের বিনিময়ে তারা খরিদ করে নিল।

আর কারণস্বরূপ জানাল যে, এখানে মাটির তলায় প্রচুর পরিমাণে অভ্র সঞ্চিত আছে।

গার্ভি-পরিবার হঠাৎ এত বেশী অর্থের মালিক হয়ে গেল যে, যাকে আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনভাবে বর্ণনা দেওয়া চলে না।

এদিকে ব্ল্যাকজ্যাক পার্বত্য অঞ্চলের মানুষগুলোর জীবনযাত্রার মান ক্রমেই উর্দ্ধমুখী হয়ে উঠতে লাগল।

আর পাইক তো একেবারে আকাশের চাঁদটাই যেন হাতে পেয়ে গেল। নতুন পোশাক, চকচকে ঝকঝকে জুতো থেকে শুরু ক'রে তামাকের কৌটোটা পর্যন্ত বদলে ফেলল।

পাইক একদিন মার্টেলা'কে সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ের মাথায় উঠে গেল। সে একটা বিশেষ জায়গা দেখিয়ে সহধর্মিণীকে বলল—ভবিষ্যতে এখানে একটা কামান বসাতেই হবে।

কামানের কথা কানে যেতেই মার্টেলা ভুরু দুটো কুঁচকে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল, সেকি কথা গো! কামান বসাবার কথা ভাবছ কেন? যুদ্ধটুদ্ধ বাধবে নাকি?

পাইপটাকে ঠোঁট থেকে নামিয়ে পাইক মুচকি হেসে বলল—যুদ্ধ না বাঁধুক ডাকাতদের হামলা হুজ্জুতি মানে আক্রমণ হওয়াটা বিন্দুমাত্র বিচিত্র নয়। তবে আজই তো আর কামান বসাচ্ছি না। ভবিষ্যতে পরিস্থিতি বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাই আগেভাগে জায়গাটা বেছে রাখতে দোষ কি।

মানুষ ভাবে এক আর হয় আর এক। পাইক তার কাঠের বাড়িটায় শুয়ে অনেক কিছুই ভেবে চলেছে। কিন্তু বিধাতা পুরুষ তার কর্তব্য সম্পাদন করেই চলেছেন।

ব্ল্যাকজ্যাক পাহাড়ের বিশ বছরের জীবনে মিসেস গার্ভির বুকের ভেতরে নারীত্বের অতৃপ্ত ক্ষুধা অনবরত কীটের মত তাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খেতে লাগল। বিশটা বছর ধরে কেবল গাছের পাতার শন্‌শন্ শব্দ, পাহাড়ী নেকড়ের গর্জন ছাড়া আর কিছুই তার কানে আসে নি। বিষণ্ণতা ছাড়া আর কিছুই এতদিন তার জীবনে আসে নি। তার ভেতরে জীবনের চিরকালের কামনার শিখা তাকে দিনের পর দিন দগ্ধে মেরেছে। সে জীবনটাকে রূপে-রসের মধ্য দিয়ে ভোগ করতে চেয়েছে।

পাইক অনেক ভেবে চিন্তে, বিশেষ ক'রে স্ত্রী মার্টেলা-র পরামর্শের মর্যাদা দিতে গিয়ে পাহাড়ের ওপরে কামান বসাবার আগ্রহটাকে বাতিল করে দিল।

পাইক সিদ্ধান্ত নিল, এবার তারা মাটির পৃথিবীতে নেমে যাবে। সমাজ-জীবনের স্বাদটুকু অনুভব করে জীবনকে পরিপূর্ণ সার্থক ক'রে তুলবে।

পার্বত্য অঞ্চল ছেড়ে দু'পক্ষই লরেল পর্যন্ত নেমে এল।

লরেলে তারপরই ইয়াঙ্কি গোরী-র মধ্যেও বিষয় সম্পত্তিকে কিভাবে নগদ অর্থে পরিবর্তন করা যেতে পারে, আর এ যোগাযোগের সুবাদে তারা অমিতব্যয়ী বুড়োর পাতে চার হাজার ডলার গুঁজে দিয়ে গোরী কারিবারের বসত বাড়িটা খরিদ করে নিল।

এক দুপুরের কিছু আগে গোরী-র অফিসের সামনে একটা গরুর গাড়ী এসে থামল।

গাড়িটার সামনের সিটে বসে রয়েছে একজন দীর্ঘাকৃতি শীর্ণকায় ব্যক্তি। আর পিছনের সিটটা জুড়ে রেখেছে দু'জন মহিলার মার্টেলা গার্ভির মন প্রাণ হয়ত নতুন জীবনের বিলাসিতায় পুলকিত হয়ে উঠেছে।

গোরী চোখের মণি দুটোকে ঘুরিয়ে গাড়িটার ওপর নিবদ্ধ করল। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদের চাকচিক্যে সে অপলক চোখে দেখল ঠিকই, কিন্তু তার মন·সেদিকে তেমন আকৃষ্ট হ'ল না।

তারা গাড়ি থেকে সোজা তার অফিসে ঢুকে পড়ল। সে উঠে মুচকি হেসে তাদের অভ্যর্থনা জানাল।

নতুন সাজ পোশাকে সজ্জিত হলেও পাইক গার্ভিকে দেখে তার চিনতে অসুবিধা হ'ল না।

গোরী কিন্তু পাইক গার্ভির আসার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছুমাত্রও আঁচ করতে পারল না।

সে ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বলল, মিঃ গার্ভি, লরেলের খবর কুশল, মানে সবকিছু ঠিকঠাক আছে তো?

—হ্যাঁ কুশল। সেখানকার সবকিছুই ঠিকঠাকই আছে।

—যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

—আসলে সম্পত্তিটা পাওয়ায় আমিই শুধু নই, মিসেস গার্ভিও মহাখুশি হয়েছেন। আর আপনার পুরনো জায়গাটা মিসেস গার্ভি-র খুবই মনে ধরেছে। শুধুমাত্র তার কথাই বা বলি কেন প্রতিবেশীদেরও খুবই পছন্দ।

—তাই বুঝি?

—হ্যাঁ, আসলে সে একটা মনের মত সমাজ খুঁজছিল, পেয়ে গেছে। প্রায় প্রতিদিনই এর ওর বাড়িতে আমাদের নিমন্ত্রণ থাকে। আমরাও পরিচিতজনদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ ক'রে এনে ভাল-মন্দ খেতে দিই। এককথায় আনন্দেই দিন কাটছে।

—তবে তো মহানন্দেই দিন কাটচ্ছেন, কি বলেন?

—একটা কথা কি জানেন, এসব আমি মন থেকে মেনে নিতে পারি না। আমাকে শুধু ওই বস্তুটা দিন।

—মানে? কিসের কথা বলছেন মিঃ গার্ভি?

—আপনার এমন কিছু আছে যা খরিদ করার জন্য আমি আর মিসেস গার্ভি খরিদ করার জন্য অত্যুগ্র আগ্রহী।'

গোরী বিস্ময়ভরা চোখে বলল, 'খরিদ করতে আগ্রহী? আমার কাছ থেকে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। খরিদ করতে চাই।

—কিন্তু আমার যাবতীয় সম্পত্তি তো আমি আপনার কাছেই বেঁচে দিয়েছি মিঃ গার্ভি।

—আছে, আছে। আর সেটাই আমরা খরিদ করতে চাইছি। দামটা নিন, আর ন্যায্য দামে কেনা বেচার ব্যাপারটা সেরে ফেলা যাক, আমাদের জীবনযাত্রার আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে। আরে মশায়, আগে তো আমরা গরু-ছাগলের পর্যায়ে ছিলাম।

—হুম!

—মিসেস গার্ভি বললেন, বর্তমানে উঁচুতলার সমাজ এখন আমাদের জন্য জায়গা ক'রে দিয়েছে।'

ভালোই তো। খুবই আনন্দের কথা। গোরী ম্লান হেসে বলল।

—কিন্তু এখন আমাদের একটা কিছু চাই যার অভাবটা আমাদের কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। আর তা আমাদের নেই।

—সে অমূল্য বস্তুটা—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই গার্ভি বলল, বাজার থেকে সেটা খরিদ ক'রে নেওয়া যেতে পারে ঠিকই। বাজারে কেনা বেচা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেখানেও খোঁজ ক'রে পাই নি। যাকগে, দামটা বুঝে নিন, আর ন্যায্য দামে কেনা-বেচার কাজটা মিটে যাক।

তার ধানাই পানাইয়ে গোরী-র ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। খোলসা ক'রে বলুন।

এবার পাইক ঠাণ্ডায় গলায় বলল, আপনারও জানা থাকার কথা বটে, কোলট্রেন পরিবার আর আপনাদের গোরী পরিবারের মধ্যে একটা পুরনো বিবাদ আছে।

কথাটা শোনামাত্র গোরীর মুখ লাল হয়ে উঠল। কারো পারিবারিক প্রসঙ্গটা মুখের সামনে বলাটা পাহাড়ী রীতি বহির্ভূত। একথাটা উকিল গোরী যেমন জানে, তেমনই পাহাড়ী পাইক গার্ভি-র অজানা নয়।

পাইক বলতে লাগল—অসন্তুষ্ট হবেন না। এটা নিছকই ব্যবসার কথা। আমার স্ত্রী ব্যাপারটা নিয়ে বহু ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে বুঝেছে, উঁচু সম্প্রদায়ের পাহাড়ী পরিবারের এটা থাকেই। অন্য বহু পরিবার আছে যারা বিশ থেকে একশ বছর ধরে পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চালিয়ে যাচ্ছে।

—তা আমাকে এখন কি করতে হবে?

তার কথায় কান না দিয়েই পাইক বলে চলল, সর্বশেষ যে ব্যক্তি সেটা ঘটিয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন আপনার খুড়োমশায় জর্জ পেইসলি গোরী।

—হুম।

—তিনি আদালতের মুলতবী ঘোষণা করার মাধ্যমে লেন কোলট্রেন'কে গুলি ক'রে হত্যা করেছিলেন।

—হ্যাঁ, আমি এ-ও জানি।

—তাই আমার স্ত্রীর বক্তব্য নোটের গোছা নিয়ে আপনার বিসংবাদটাকে ন্যায্য দামে আমাকে কিনে নেবার সুযোগ দিন।' কথা বলতে বলতে পাইক কোটের পকেট থেকে এক গোছা নোট বের করে গোরী-র সামনে রাখল।

নোটের গোছাটাকে তার দিকে সামান্য ঠেলে দিয়ে এবার বলল, মিঃ গোরী, এতে পুরো দু'শ ডলার আছে। এটাকে আপনি আপনার পারিবারিক বিসংবাদের ন্যায্য দাম বলে মনে করতে পারেন বলেই আমার বিশ্বাস।

মুহূর্তের জন্য থেমে ম্লান হেসে আবার সে বলতে শুরু করল—এতদিন যে পারিবারিক বিসংবাদের বোঝা আপনার মাথায় ছিল আজ সেটাকে ন্যায্য দামের বিনিময়ে আমি নিজের মাথায় তুলে নিলাম।

বিবর্ণ মুখে গোরী বলল, 'এতে আপনার লাভ কি হতে পারে?'

লাভ? লাভ অনেকই হবে, এটা হাতে পেলে মিসেস গার্ভি সমাজের অনেক, অনেক উঁচুতলায় উঠে যেতে পারবে। পুরো দু'শ—নোটগুলো তুলে নিন।

গোরী গুলি খাওয়া বাঘের মত অতর্কিতে গর্জে উঠল। মশায়, আপনার রসিকতায় আমি শুধু বিস্মিতই নই, যারপরনাই ক্ষুব্ধও বটে।

—সে কী! সে কী! আপনি মিছে চটাচটি করছেন কেন মিঃ গোরী।

—এটা চটাচটি করার মত ব্যাপারই তো বটে।

—কারণ?

—এরকম একটা অপমানকর প্রস্তাব উত্থাপন করার পর আপনাকে সাধুবাদ জানানো সম্ভব বলে আমি অন্তত মনে করতে পারছি না।

—আরে মশায়, আমি তো ন্যায্য দামই দিয়েছি।

গোরী বুঝল, তার হঠাৎ এমন ক্ষোভ প্রকাশ বা অহঙ্কার পাইক গার্ভির আচরণের জন্য ঘটে নি, ঘটেছে নিজের প্রতি জমাট বাঁধা ক্রোধের জন্যই।

গোরী মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে একেবারে একজন পাকা ব্যবসায়ীতে পরিণত হয়ে গেল।

নিজের ভুল বুঝতে পেরে গোরী ভাবাপ্লুত কণ্ঠে এবার বলল— দু'শ ডলার দামটা খুবই কম হলেও নোটগুলো আমি গ্রহণ করলাম।

পাইক গার্ভি বলল— চমৎকার! চমৎকার! মিসেস গার্ভি এতে খুবই খুশি হবে।

—তাই বুঝি?

—অবশ্যই, এতে আপনি মুক্তি পেয়ে গেলেন আর বিসংবাদের বোঝাটা চাপল আমার কাঁধে, ঠিক কিনা?

—হুম।

—মিঃ গোরী, আপনি একজন উকিল। মুখের কথার চেয়ে লেখাপড়ার কদর আপনারা বেশীই দিয়ে থাকেন। তাই বলছি কি, বিসংবাদের ব্যাপারটা যদি দু'কলম লিখে দেন তবে ভাল হয়।

গোরী ব্যাপারটা সম্বন্ধে দু'কলম লিখে কাগজটা পাইক-এর হাতে তুলে দিল। কাগজটা দিয়ে গোরী দু'পা হেঁটে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। এবার পাইক-এর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, মশায়, দু'শ ডলারের বিনিময়ে আপনি যে শত্রুটাকে এইমাত্র খরিদ করে নিলেন, তাকে একবারটি নিজের চোখে দেখে যান। ওই—ওই যে, রাস্তা দিয়ে তিনি হেঁটে চলেছেন।

পাইক তার অঙ্গুলি নির্দেশিত পথে রাস্তার দিকে চোখ ফেরাতেই দেখল, কর্নেল এবনোর

কোলট্রেন ধীর গতিতে হেঁটে যাচ্ছে। তার বয়স পঞ্চাশ বছর। ছিপছিপে চেহারার সৌম্য দর্শন এক ভদ্রলোক।

—ওই—ওই লোকটার কথা বলছেন?' পাইক গার্ভি পথচারীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই ব'লে উঠল।

গোরী বলল—'হ্যাঁ, ওর কথাই বলছি।

—ওই লোকটাই তো একবার আমাকে গারদে ঢুকিয়েছিল।

এক সময় উনি জেলা এটর্নির পদে বহাল ছিলেন। আর একজন প্রথম শ্রেণীর শিকারী হিসেবেও ওর খ্যাতি আছে।

—তবে আমি একটা ভাল জিনিসই খরিদ করে ফেলেছি।

—হ্যাঁ, তা-তো অবশ্যই।

—তবে এখন, এ মুহূর্ত থেকে আমাকে শত্রুপক্ষের ওপর কড়া নজর রেখেই চলতে হবে দেখছি।

—সতর্ক তো থাকতেই হবে মিঃ গার্ভি।

—দেখে নেবেন মিঃ গোরী, আপনার চেয়ে ভালভাবেই আমি ওর মোকাবেলা কবব।

—আজ কি আপনার আরও কিছু খরিদ করার পরিকল্পনা আছে? যেমন মনে করুন কোন পারিবারিক প্রথা, গুপ্ত কোটি থেকে কোন নবকঙ্কাল বা পূর্বসূরীর প্রেতাত্মা বা এমন অন্য কিছু খরিদ করা।'

—মিঃ গোরী, আপনার তো জানাই আছে আপনার পুরনো বাড়ির গায়ের দেবদারু গাছটার তলায় একটা কবর আছে, কি বলেন?

—হ্যাঁ, তা আছে বটে, আমার অনেক পূর্ব পুরুষই সেখানে শান্তিতে নিদ্রা যাচ্ছেন।

—আর ওরা সবাই কোলট্রেনদের হাতে প্রাণ দিয়েছিলেন। স্মৃতিফলকে ওদের নামও খোদাই করা আছে।

—হ্যাঁ, তা-ও আছে বটে।

—আমার মিসেস বলে পারিবারিক বিসংবাদটা যদি আমরা হাতে পেয়ে যাই তবে ওটাও তো সঙ্গেই যাওয়া উচিত। আর স্মৃতিফলকে যেসব নাম লেখা আছে ওরা সবাই গোরী বংশের লোক। আমরা কিন্তু সে সব নামকে বদলে আমাদের বংশেব—

গোরী বিশ্রী স্বরে গর্জে উঠল—যাও। বেরিয়ে যাও। বেরিয়ে যাও। তুমি শযতান, পয়লা নম্বরের পিশাচ—নর পিশাচ! এখান থেকে দূর হয়ে যাও।

ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে পাইক তার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

গোরী বলেই চলল—'একজন চীনাম্যান পর্যন্ত তার পূর্বপুরুষের কববকে সযত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করে—তুমি পিশাচ! এখান থেকে দূর হয়ে যাও।

পাইক গার্ভি বে-গতিক দেখে গাড়িতে গিয়ে বসল। গাড়ি এগিয়ে চলল।

গোরী নোটের গোছাটা নিয়ে দ্রুত গাড়িটার উদ্দেশ্যে ছুটতে লাগল।

ভোর তিনটা।

সবাই মিলে ধরাধরি ক'রে তার সংজ্ঞাহীন দেহটাকে অফিসে দিয়ে গেল।

শেরিফ, ডেপুটি, কাউন্টের করণিক আর এটর্নি সবাই ধরাধরি করে তাঁকে অফিসের টেবিলে শুইয়ে দিল।

দীর্ঘদেহী শেরিফ বললেন, এটা মদ আর তাসের ব্যাপার হতে পারে!

—আজ রাত্রে সে কতগুলো ডলার যে উড়িয়েছে, কে জানে?

—দু'শ তো হবেই। কিন্তু এতগুলো ডলার সে হঠাৎ পেলই বা কোথায়! এক মাসের বেশী হ'ল সে প্রতিদিন একটা সেন্টও রোজগার করতে পারেনি। কথাটা বলেই শেরিফ একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

সবাই এক এক করে বিদায় নিল।

গোরী কতক্ষণ যে টেবিলের ওপর সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে আছে তা সে নিজেই জানে না যখন সে সংজ্ঞা ফিরে পেল তখন চোখ মেলে তাকিয়েই দেখল, কালো কোট গায়ে কর্নেল এবনোর কোলট্রেন তার মুখের ওপর ঝুঁকে অপলক চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে।

গত বিশ বছরের মধ্যে দুটো পরিবারের কোন পুরুষ-সদস্য শান্তিতে পরস্পরের সম্মুখীন হয় নি।

গোরীও মুহূর্তকাল নীরবে কোলট্রেন-এর মুখের দিকে তাকিয়ে ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারণ করল লুসি ও স্টেলা'কে সঙ্গে এনেছ তো?

কোলট্রেন বলল—ইয়াল্সি, তুমি তবে আমাকে চিনতে পেরেছ?

—কেন চিনব না? অবশ্যই চিনেছি। শেষমেশ হুইসল লাগানো একটা চাবুক তুমি আমাকে দিয়েছিলে, মনে পড়ছে?

কোলট্রেন ম্লান হেসে বলল—সে তো বিশ বছর আগেকার।

গোরী মুখ কাচুমাচু করে বলল—আমাকে ক্ষমা করে দিন। কাল রাত্রে একটু বেশী মাত্রায় মদ পেটে পড়ায় টেবিলের ওপরেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

কোলট্রেন বলল, একটু আগেই তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলে লুসি ও স্টেলা'কে সঙ্গে এনেছি কিনা, তাই না?

—হ্যাঁ।

—শোন ইয়াল্সি, তখনও তোমার ঘুমটা ভালভাবে কাটে নি, তাই তুমিও হয়ত স্বপ্নের ঘোরে ছিলে, তুমিও বুঝি এখনও সেই ছোট্ট খোকাটি আছ। এখন তোমার সে ঘোর কেটে গেছে। এখন যা বলছি, মন দিয়ে শোন—তুমি আমার পুরনো বন্ধুর ছেলে। তারা জানে, আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। তোমাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যেতে চাই। আজও তারা তোমাকে আগের মতই কাছে টেনে নেবে। তুমি ভোগ বিলাসের মধ্যে ডুবে জাহান্নামে গেছ। পুরনো বিসংবাদ ভুলে তুমি আমার সঙ্গে আমাদের বাড়িতে যাবে তো ইয়াল্সি?

বিবাদ বিসংবাদ? আমি তো কোনদিনই বিবাদ বিসংবাদের কথা জানতাম না। আমরা তো পরস্পরের বন্ধু হিসেবেই মেলামেশা করেছি। কিন্তু কর্নেল, আপনার বাড়ি তো আমার যাওয়া সম্ভব নয়, মানে যাওয়া উচিত হবে না।

—উচিত হবে না, কেনই বা সম্ভব নয়?

—কারণ একটাই। আমি আজ এক মাতাল আর জুয়াড়ি। আজ আমার একটাই পরিচয়—সমাজে নিকৃষ্ট জীব।

কর্নেল এবার নানা যুক্তি দিয়ে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করল। এমন কথাও বলতে বাদ রাখল না যে, এক সময় সে নিজেও তার মত নিকৃষ্ট জীবনযাপন করত।

কিন্তু তাতেও মিস গোরী'কে রাজী করাতে পারল না তখন কর্নেল তূণ থেকে মোক্ষম অস্ত্রটা বের ক'রে ব্যবহার করল, 'শোন, আমি পাহাড়ের ওপারের বড় বড় গাছ কেটে নিচে নামিয়ে আনার কাজে হাত দিয়েছি। আমি এখন বুড়ো হয়েছি। কর্মক্ষমতা লোপ পেতে বসেছে। তুমি নিজে কাজটার দায়িত্ব নিলে বড়ই উপকার হয়।

কাজের কথা ওঠায় গোরীর মনটা নরম হয়ে গেল। মুহূর্তে সে যেন এক নতুন জীবনের স্বাদ ফিরে পেল। খুশিতে তার মনটা নেচে উঠল। সম্প্রতি জীবনের তুচ্ছতা আর দীনতা গোরীর মন প্রাণ বিষিয়ে তুলেছে। কোলট্রেন-এর প্রস্তাবে সে সোল্লাসে রাজী হয়ে গেল।

আর নিজের বুদ্ধি কৌশলের সাহায্যে কাজটা হাসিল করতে পারায় কোলট্রেনও কম গর্বিত ও আনন্দিত নয়।

সে বিকালেই গোরী গাড়িতে কোলট্রেন-এর পাশাপাশি বসে শহরের দিকে এগিয়ে চলল।

গোরী নিজেই উপলব্ধি করল, খোলামেলা পার্বত্য পরিবেশ তার মানসিক ভারসাম্যকে অনেকখানি চাঙ্গা করে তুলতে পেরেছে।

কোলট্রেন কাঁধ-ব্যাগে মদের বোতল নিয়ে এসেছিল। তা থেকে একটা বোতল বের ক'রে গোরীর দিকে এগিয়ে দিল।

গোরী বিতৃষ্ণার সঙ্গে হাত দিয়ে সেটাকে সরিয়ে দিল। আর তাকে জানিয়ে দিল যে, সে জীবনে আর মদ স্পর্শই করবে না। শান্তভাবেই গোরী এতটা পথ পাড়ি দিল। এক সময় হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে সে বলে উঠল, কাল রাত্রে আমি পাকার খেলায় দু'শ ডলার হেরেছি।

—তাই বুঝি? মুচকি হেসে কোলট্রেন বলল।

—কিন্তু এতগুলো ডলার আমি পেলাম কোথায়?

—ওসব কথা ছাড়ান দাও ইয়াঙ্কি।

বিকালের মধ্যে তারা বেথেল থেকে লরেল পর্যন্ত মোট বারো মাইল পথের মধ্যে দশ মাইল পাড়ি দিয়ে ফেলেছে।

লরেল থেকে নিচের দিকে আধ মাইল দূরে গোরী পরিবারের পুরনো বাড়ি। সে গ্রামটা থেকে দু'মাইল দূরে বাস করতেন কোলট্রেন পরিবার।

কোলট্রেন লক্ষ্য করল, তার সঙ্গী গোরী ক্রমেই পাহাড় আর পার্বত্য বনানী দেখে মুগ্ধ হয়ে পড়েছে।

আর একটা পাহাড় পাশে ফেলে, বাঁক ঘুরতেই গোরী-র চোখে পড়ল তাদের বাড়ির পুরনো বাগিচাটা। আর পাহাড়ের আড়ালে বাড়িটা এখনও ঢাকা পড়ে আছে।

আরও কিছুদুর এগোতেই তাদের চোখে পড়ল নেকড়ের মত মুখধারী একজন লোক তাদের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রয়েছে। হঠাৎ তার মুখটা ঝোপের আড়ালে চলে গেল।

পর মুহূর্তেই তারা লক্ষ্য করল, কদাকার একটা মূর্তি দ্রুত আপেল বাগিচার ভেতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে সামনের বাড়িটায় ঢুকে গেল।

কোলট্রেন বলল, ও-ই পাইক গার্ভি। এর কাছেই তুমি সবটা সম্পত্তি বেচে দিয়েছ। লোকটা ছিটেল এতে কোন সন্দেহই নেই। ইয়াঙ্কি, ব্যাপারটা কি, বল তো?

গোরী কপালে জমে ওঠা ঘাম মুছতে মুছতে বলল—আমাকেও কি ছিটেল, অদ্ভুত প্রকৃতির মনে হচ্ছে?

মদের নেশা পুরোপুরি কেটে যাওয়ায় গোরী-র পুরনো টুকরো টুকরো বহু কথা, বহু ঘটনা মনে পড়তে লাগল। গত রাত্রের দু'শ ডলারের ব্যাপারটাও মানে নোটগুলো কোথায় পেয়েছিল মনে পড়ে গেল।

কোলট্রেন হেসে বলল, ইয়াঙ্কি, এখন ওসব ব্যাপার মাথা থেকে মুছে ফেল। পরে না হয় অবসর সময়ে হিসেব নিকেশ করা যাবে।

পাহাড়ের ঠিক গায়ে পৌঁছে গোরী বলল—মিনিট কয়েকের মধ্যে আমরা সে বাড়িটায় পৌঁছোব যেখানে জন্মেছিলাম আর গায়ে গতরে বেড়ে উঠেছিলাম। আমার পূর্বপুরুষরা প্রায় এক শতাব্দী কাল সেখানে বাস করেছিলেন। আজ সে জায়গাটা দখল করেছে কিছু নবাগত মানুষ। আমার পোশাক পরিচ্ছদের কী হাল হয়েছে। কেউ চিনতে পারলে—কর্নেল, আপনার মাথার চওড়া টুপিটা আমাকে দিন মুখটাকে ঢেকে রাখি।

কর্নেল নিজের মাথা থেকে টুপিটা খুলে গোরী-র মাথায় পরিয়ে দিয়ে দেখাতে চাইল যে, এ কাজে তার পুরোপুরি সম্মতি আছে।

কর্নেল-এর কোট আর টুপি পরে গোরী তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'এবার ঠিক আছে তো? কেমন মানিয়েছে কর্নেল?'

কর্নেল হেসে বলল—জব্বর!

কর্নেল আর গোরী'কে প্রায় দু'ভাইয়ের মত মনে হ'ল। উভয়ের উচ্চতা আর শরীরের গড়ন ও প্রায় একই রকম। তবে বয়সের পার্থক্য পঁচিশ বছর।

মুহূর্তের জন্য থেমে গোরী আবার মুখ খুলল—কর্নেল আমি চাই, এখানকার সবাই বুঝুক, আমি কোনদিক থেকেই বাতিল হয়ে যাইনি।

গোরী তার পারিবারিক সমাধিক্ষেত্রটার কাছে পৌঁছনোর পরই সে বিপরীত দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করল, সে যা খুঁজছিল তা তার চোখের সামনে ধরা দিয়েছে। দেবদারু গাছের ফাঁক দিয়ে সাদা ধোঁয়ার একটা কুন্ডলী। সে সঙ্গে সঙ্গে বাঁ দিকে কর্নেল-এর দিকে বেশ কিছুটা হেলে পড়ল।

কর্নেল এক হাত দিয়ে তাকে ধরে ফেলার মত সুযোগ পেয়ে গেল।

ব্যস, মওকা বুঝে কর্নেল বুলেটটাকে সেখানেই গেঁথে দিল ঠিক যেখানটার কথা আগেই ঠিক করে রেখেছিল।

গোরীর ভারী দেহটা অতর্কিতে কর্নেলের ওপর এলিয়ে পড়ল। সে একটা হাত বাড়িয়ে কি যেন ধরার চেষ্টা করল।

পর মুহূর্তেই গোরী প্রায় আর্তনাদ ক'রে উঠল 'বন্ধু' আমার পরম বন্ধু! ব্যস, সব শেষ।

দ্য সঙ্ অ্যান্ড দ্য সার্জেন্ট

মাঝরাত্রি!

আপার ব্রডওয়ের একটা রেস্তোরাঁয় আধডজন লোক রাত্রের খাবার খেতে খেতে বড্ড বেশী হল্লা ক'রে চলেছে।

রেস্তোরাঁর ম্যানেজার চোখে-মুখে বিরক্তির ছাপ এঁকে একবার নয়, তিন-তিনবার তাদের পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেন।

কিন্তু ম্যানেজারের বিরক্তিটুকু তারা লক্ষ্য করেছে কিনা বোঝা গেল না, আর বুঝতে পারলেও তারা হল্লা থামাবার চেষ্টাও করল না।

অন্যান্য খদ্দেররা ছ'জনের মুখ দেখেই বুঝে নিয়েছে, তারা কারোশ কমেডি কোম্পানি'তে কাজ করে।

হ্যাঁ, কারোশ কমেডি কোম্পানি-র কর্মীই বটে। তবে দু'জনের মধ্যে চারজন কোম্পানিতে কাজ ক'রে। আর একজন 'এক রসিক কপট প্রেমিক' নামক এক হাসির নাটকের লেখক। আর ষষ্ঠ ব্যক্তি একজন শিল্পকলার জগতের লোক। তবে তার একটা মাত্র অঙ্গুলি হেলনে শহরের বহু তাবড় তাবড় ব্যক্তিকে প্রাণ দিতে হয়েছে।

ছ'জন গলা ছেড়ে তর্কাতর্কিতে মেতে গেল।

'এক রসিক কপট প্রেমিক' নাটকের রচয়িতার বয়স বেশী নয়—যুবক। আর তাদের বাক্‌বিতন্ডার কেন্দ্র নায়িকা মিস্ ক্ল্যারিস কারোল। দলের প্রায় সবাই তারই ওপর সব দোষ চাপিয়ে তুমুল হৈ হট্টগোল ক'রে চলেছে।

তারা পঞ্চাশবার একই কথা বলতে লাগল। ক্ল্যারিস, সব দোষই কিন্তু তোমার। তুমিই দৃশ্যটাকে ঝুলিয়ে দিয়েছ। সম্প্রতি তোমার অভিনয় এত খারাপ হচ্ছে যে, আর কহতব্য নয়। আর এভাবে যদি চলতেই থাকে তবে অচিরেই নাটকটা তুলে নেওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না।

মিস কারোলও কথায় পিছিয়ে নেই। আক্রমণকারীদের লক্ষ্য করে সে-ও চোখা চোখা বাক্যবাণ ছুঁড়ে দিতে লাগল।

কিন্তু সে আর কতক্ষণই বা? একে সে এক নারী তার ওপর শিল্পী, তাই শেষমেশ ধৈর্য রাখা আর তার পক্ষে সম্ভব হ'ল না।

ক্রোধোন্মত্তা বাঘিনীর মত এক লাফে দাঁড়িয়ে পড়ে সে দু'হাতে টেবিলের সব গ্লাস, প্লেট ও বাটি মেঝেতে ফেলে দিয়ে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলল। তারপর আরও গলা চড়িয়ে ঝগড়া শুরু ক'রে দিল।

নাট্যকার নির্বিকারই রইল। তাকে আরও বেশী বিবর্ণ নিস্পৃহ দেখাতে লাগল।

ম্যানেজার বার বার শান্তিরক্ষার জন্য আবেদন জানাতে লাগলেন। কিন্তু কেউ-ই তার কথায় কান দেওয়ার প্রয়োজনও মনে করল না।

উপায়ান্তর না দেখে ম্যানেজার পুলিশ ডাকলেন।

ছ'জনের দলটাকে থানায়, সার্জেন্টের সামনে হাজির করা হ'ল।

'এক রসিক কপট প্রেমিক'-এর রচয়িতা এগিয়ে গিয়ে অভিনেতার মত গলা ক'রে বলল—সার্জেন্ট মশায়, আমি এ গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ জানাচ্ছি। রেস্টুরেন্টে খানাপিনা মরার সময় আমরা

ছ'জন একটা নাটকে অভিনয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম। হ'তে পারে আমাদের আলোচনাটা একটু চড়া গলায়ই হয়ে গিয়েছিল। তবে এ আলোচনাটা আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

—হুম। সার্জেণ্ট প্রায় অস্ফুট উচ্চারণ করলেন।

নাট্যকার এবার বলল, স্যার, আমি আশা করছি, আপনি ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্ব দেবেন না, আর এখনই আমাদের ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা করবেন।

আমার কাছে অভিযোগ এসেছে, আপনারা কেবলমাত্র গোলমালই নয়, রেস্তোরাঁর বাসনপত্র ভাঙচুর করেছেন।

—আমরা তো সেগুলোর দাম মিটিয়ে দিয়েছি। আর সেগুলো তো আর ইচ্ছে ক'রে ভাঙা হয় নি। উত্তেজনার বশে মিস ক্লারিস—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই মিস ক্ল্যারিস চেঁচিয়ে উঠল। না, আমার মোটেই দোষ ছিল না। তারা কোন্ সাহসে এরকম কথা আমাকে বলল, জানাতে চাই। এ নাটকের যতটুকু সাফল্য সবই আমার জন্য। বিশ্বাস না হয়, জনসাধারণকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।

নাট্যকার বলল, দেখুন, ও কথা আংশিক সত্য, মেনে নিচ্ছি, কিন্তু তিনি আগের মত অভিনয় কৌশল দেখাতে পারছেন না। আসলে পুরনো রীতিকে ছেড়ে নতুনকে আঁকড়ে ধরেই তিনি নাটকটাকে একেবারে ঝুলিয়ে দিয়েছেন।

—আমি বলব, সে দোষ মোটেই আমার নয়।

—কিন্তু সে দৃশ্যটায় তো কেবলমাত্র আপনি আর ডেলমার্স-ই আছেন। অতএব এ পরিস্থিতিতে—

—তবে আমি বলব, দোষটা তার, আমার নয়।

সার্জেণ্ট এবার মুখ খুললেন। নাট্যকার মশায়, আপনার বক্তব্য শোনলাম।

সার্জেণ্ট এবার সন্ন্যাসিনীর মত চেহারা অভিনেত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনারা যে দৃশ্যটার অভিনয় নিয়ে বিতর্কের চরম পর্যায়ে পৌঁছেছেন সেটা কার দুর্বল অভিনয়ের জন্য ডুবেছে, বলুন তো?

মহিলাটি বলল—দেখুন, আমি কাউকে আঘাত দিতে চাইনি। এটা আমার স্বভাব নয়। আমি যখন ক্ল্যারিসকে বলি, তোমার দৃশ্যটা কিন্তু মার খাচ্ছে, তখন দোষটা তো আর আমি অভিনেত্রীর ওপর চাপিয়ে দিচ্ছি না, আপনি কি বলেন স্যার?

সার্জেণ্ট বললেন, একি রকম কথা হ'ল। তবে আপনার মতে দোষটা কার?

—অভিনেত্রীর অবশ্যই নয়। দোষটা তার অভিনয় করার। তারই বিচার আমি করি। আর দৃশ্যটা অপূর্ব সন্দেহ নেই, কিন্তু অবশ্যই রসাল নয়, তাই আমার মত, সে যদি এরকমটাই চালিয়ে যেতে থাকে তবে নাটকটাই বন্ধ হয়ে যাবে।

—তবে বুঝতে পারছি, নাটকের ওই দৃশ্যে আপনি আর এ মহিলাই মঞ্চে উপস্থিত থাকেন। অতএব কার জন্য দৃশ্যটা ঝুলে যাচ্ছে সে প্রশ্ন তোলা অর্থহীন।

যুবকদের মধ্য থেকে মাঝবয়সী ও বেটে মত এক যুবককে সার্জেণ্ট জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি অভিনয় করেন?

যুবকটা হঠাৎ রেগে গিয়ে বলে উঠল, আমার হাতে কি আপনি কোনদিনই টিকের বর্শা দেখতে পাননি? তবে অবশ্যই আমাকে চিল্লিয়ে বলতেও শোনেন নি—ওই ওই দেখুন, সম্রাট আসছে।

সার্জেণ্ট একটু বিরক্তি প্রকাশ করেই বললেন—আরো মশায়, আমি জানতে চাইছি, যে দৃশ্যটাকে নিয়ে বিতর্কের ঝড় বয়ে চলেছে সে সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য কি? দোষটা কার, এ মহিলার, নাকি যে এতে অংশ গ্রহণ করে, তার?

মাঝ-বয়সী যুবকটা এতে আহত হ'ল।

সে বলল—'আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে মিস কারোলই দৃশ্যটার ওপর নিজের প্রভাব হারিয়ে ফেলেছেন।

—এ দৃশ্যটা ছাড়া নাটকের অন্য অংশে?

—অন্য অংশে তিনি নিজের প্রভাবটুকু রক্ষা করতে পারছেন। তবে আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, তার মত একজন অভিনেত্রীর পক্ষে এ দৃশ্যটাকেও চাঙ্গা ক'রে তোলা কোন কঠিন ব্যাপারই নয়।

অভিনেত্রীর বুকে হঠাৎ আনন্দের বন্যা বয়ে যেতে লাগল। এতক্ষণ পরে একজন অন্তত তার অভিনয় করার প্রশংসা করল।

অভিনেত্রী মিস কারোল চিৎকার ক'রে বলে উঠল, জিমি, অনেকদিন পর এমন একটা ভাল কথা শোনানোর জন্য তোমাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না। পরমুহূর্তেই ঘাড় ঘুরিয়ে সার্জেন্টের দিকে তাকিয়ে সে বলল—'স্যার, দোষটা প্রকৃতই আমার কিনা তা আপনাকে আমি দেখাব। আর এদেরও দেখিয়ে দিতে চাই, আমি সত্যিকারের ভাল অভিনয় করতে পারি কিনা।

সার্জেন্ট জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন।

অভিনেত্রী মিস কারোল এবার বলল, এদিকে আসুন মিঃ ডেলমার্স, আমরা দৃশ্যটা শুরু করি।

এবার সার্জেন্টের দিকে তাকিয়ে সে বলল—'স্যার, মাত্র আট মিনিট সময় আপনার কাছ থেকে চেয়ে নিচ্ছি।

সার্জেন্ট মুচকি হেসে ঘাড় কাৎ করলেন।

নাট্যকার বলল—মিস কারোল-এর যে দৃশ্যটা নিয়ে আমাদের বিতর্ক সেটা গেরিলা নৃত্য। পোশাক-পরিচ্ছদে তিনি এক অরণ্য-অপ্সরা হয়ে ওঠেন। গেরিলার ভূমিকায় অভিনয় করেন মিঃ ডেলমার্স।

আর সে দৃশ্যটায় চার-পাঁচবার 'এংকোর এংকোর' ধ্বনি হত। দৃশ্যটার মুখ্য বিষয় হচ্ছে, অভিনয় আর নাচ। পাঁচ মাস ধরে এটাই নিউইয়র্কের সবচেয়ে চটকদার ও মজাদার বিষয়।

সার্জেন্ট বললেন, এখন দৃশ্যটার অভিনয়ের সমস্যাটা কোথায়, বলুন তো?

—মিস কারোল-এর হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, ঘরের মানে মঞ্চের ঠিক মাঝখানে চলে এসেই তিনি দৃশ্যটাকে ঝুলিয়ে দেবেন।

মিস কারোল ব্যস্ত হাতে তার গায়ে লম্বা কোটটাকে একঝটকায় খুলে ফেলল। তার তলায় আগে থেকেই অরণ্য অপ্সরার পোশাক ছিল। হাঁটু পর্যন্ত নামানো ছিল ফার্ণ লতার ঘাঘরাটা

ব্যস, এবার নাচ শুরু হয়ে গেল। উচ্ছল নাচ, তার নৃত্য-কলা দেখে কারোল কমেডি কোম্পানি-র তিন সদস্য তো একেবারে থ বনে গেল।

নির্দিষ্ট সময়ে গেরিলাদের লম্ফ বা ঝম্ফকে নিখুঁতভাবে নকল করে ডেলমার্স এসে তার পাশে দাঁড়াল।

তার অভিনায় দেখে সার্জেন্ট বোতলের ছিপি খোলার মত আওয়াজ করে ফিক্‌ফিক্ করে হেসে ওঠে।

সার্জেন্ট ও অন্যান্য সবাই করতালি দিয়ে সমস্বরে বলতে লাগল—সাবাস! সাবাস কারোল বলিহারি তোমার অভিনয়।

প্রায় আট মিনিট ধরে নাচ, গান আর অভিনয় চলল। অভিনয়ের মাঝামাঝি জায়গায় নাট্যকার চেঁচিয়ে বলল, 'স্যার, এ জায়গাটায়! এখানে! আপনি যে তথ্যটা খুঁজছেন, এখানেই পেয়ে যাবেন।

সার্জেন্ট এবার সামনের দিকে ঝুঁকে অধিকতর মনোযোগ সহকারে নাটকের মুহূর্তটাকে দেখতে লাগলেন।

নাট্যকার বলেই চলল—'স্যার, যে কথা বলছিলাম, দু'সপ্তাহ ধরে, প্রতিদিন দৃশ্যটার ঠিক এ জায়গায় এসেই মিস কারোল পুরো ব্যাপারটাকে ঝালিয়ে দিচ্ছে। আমরা কেন ধৈর্য হারিয়ে ফেলি, এবার আপনি বুঝতে পারছেন। একটা গেরিলার গান শুরু চোখে জলের ধারা! ব্যস, এটুকুর জন্যই নাটকটা ঝুলে গেল।

ইতিমধ্যে অপ্সরার মনের ঘোর কেটে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। সে ডেলমার্স-এর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে চেঁচিয়ে উঠল। তোমার—তুমিই এর জন্য দায়ী। এর আগে তুমি কখনই এভাবে গানটা গেয়ে বুকের ভেতরে এমন উন্মাদনা সৃষ্টি করনি না।

সার্জেন্ট দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন—আমি হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছি। থানার বৃদ্ধা মেট্রন এগিয়ে এসে কারোল-এর গায়ে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল—' এ মানুষটা যে তোমার জন্য আজ এমন উতলা হয়েছে কারোল। তার গানের প্রথম কলিটা শুনেই কি তুমি বুঝতে পারনি যে, তোমাকে ছাড়া আজ পৃথিবীটাই তার কাছে অন্ধকার? সে গোরিলার মত যতই লাফালাফি করুক না কেন, আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারে নি।

মিস কারোল দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

বৃদ্ধা মেট্রন বলেই চলল, বাছা, তুমি কি চোখ থাকতেও অন্ধ। সব কিছু বুঝেও বোঝ না? তাই তো তারপক্ষে যথাযথ অভিনয় করা সম্ভব হচ্ছে না। তোমার ভালবাসা থেকে সে কি চিরকালই বঞ্চিত থাকবে। বাকী জীবনটা গোরিলা হয়েই কাটাতে হবে?

ডেলমার্স বলল, আমি তো গানের মাধ্যমে নিজের বুকের হাহাকার আর হা-হুতাশকেই ফুটিয়ে তুলি।

বৃদ্ধা মেট্রন বলল—বোকা ছেলে! মনের কথাটা তাকে সরাসরি বলনি কেন?

অরণ্য অপ্সরা কারোল চেঁচিয়ে বলল, না, তার কোন দোষই নেই। আমিই তাকে, তার মনের কথা বুঝতে পারি নি, হ্যাঁ, তার পথটাই সেরা। ববি, আমিও ঠিক এটাই চাইছিলাম।

সার্জেন্ট মুচকি হেসে বললেন—সবই বুঝতে পেরেছি। তোমরা এবার পাতলা হওতো বাছাধনরা। আমার হাতে এখন প্রচুর কাজ।

ওয়ান ডলার্স য়োর্থ

রিও গ্রান্ডের সীমান্তবর্তী জেলার যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত! এক সকালের ডাকের আদালতের জাস্টিস একটা চিঠি পেলেন।

খামের মুখটা খুলে জাস্টিস চিঠিটা বের করে চোখের সামনে ধরলেন। চিঠিটির বক্তব্য ঃ

জাস্টিস,

আমাকে চার বছরের কারাদণ্ডাদেশ দেবার সময় আপনি আমাকে কয়েকটা কথাও শুনিয়ে ছিলেন। অন্যান্য কঠোর বক্তব্যের সঙ্গে আমাকে ঝুমঝুমি সাপ বলে তিরস্কার করেছিলেন। কি জানি আমি তা হলেও হতে পারি। যা-ই হোক এবার আমার বিস্ময় বক্তব্য শুনুন--আমি গারদে ঢোকার এক বছর বাদে আমার মেয়েটাকে ইহলোক থেকে চলে যেতে হয়েছে।

তার মৃত্যু সম্বন্ধে সবাই একমত যে, দারিদ্র্য আর অসম্মান একই সঙ্গে জোট বেঁধে তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছে।

জাস্টিস, আপনারও একটা মেয়ে আছে। আর এবার আমি আপনাকে এটাই বোঝাতে চাচ্ছি, একটা মেয়েকে হারালে তার বাবার কেমন লাগে।

আমার বিরুদ্ধে যে জেলা এটর্নি লড়েছিল আমার বিষদাঁত থেকে সে-ও রেহাই পাবে না।

আজ আমি মুক্ত। আমি মনে করি আমি আবার ঝুমঝুমি সাপে পরিণত হয়ে গেছি। হ্যাঁ, আমার তো এরকমই মনে হচ্ছে। আমি বেশী কথার মানুষ নই। তবে জেনে রাখবেন, এটা আমার বিষদাঁতের খট্‌খট্ আওয়াজ। এখন খেয়াল রাখবেন, কোথায় বিষদাঁত ফুটিয়ে দেই।

নমস্কারান্তে

ঝুমঝুমি সাপ।

চিঠিটা এক নিঃশ্বাসে পড়ে জাস্টিস ভারওয়েট চিন্তিত ও বিবর্ণ মুখে ভাবতে লাগলেন চার বছর আগেকার সে আসামীটার মুখটা মনে পড়ে কিনা।

যে সব দুর্ধর্ষ প্রকৃতির মানুষ বিচারপ্রার্থী হয়ে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়ায় তাদের কাছ থেকে এরকম ভীতি সঞ্চারকারী চিঠি পাওয়ার ব্যাপারটা অবশ্য নতুন কোন ব্যাপার নয়।

তবে প্রথমটায় একটু থমকে গেলেও জাস্টিস মুহূর্তের মধ্যেই নিজের মনকে শক্ত করে বেঁধে নিলেন।

জেলা এটর্নির নাম লিটলফিল্ড। বয়সে তিনি এক যুবক।

জাস্টিস তাঁকে ডেকে সদ্যপ্রাপ্ত চিঠিটা দেখালেন। কারণ, চিঠিটায় তাঁর নামও উল্লেখ করা হয়েছে।

চিঠিতে জাস্টিসের মেয়ের বিপদের কথা শুনে তাঁর মুখটা মুহূর্তে চকের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল। চিঠিতে তাঁকেও শাসানো হয়েছে বটে, কিন্তু নিজের চেয়ে তার জন্যই তিনি বেশী ভাবিত হয়ে পড়েছেন। তবে এর কারণও রয়েছে যথেষ্টই। কারণ, জাস্টিসের মেয়ে ন্যান্সি ভারওয়েট-এর সঙ্গে তাঁর বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেছে। অচিরেই তাদের বিয়ে হবার কথা।

যুবক এটর্নি লিটলফিল্ড করণিকের কাছে গিয়ে পুরনো খাতাপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে বের করল, পত্র লেখকের নাম সীমান্তের কুখ্যাত ডাকাত ম্যাক্সিকান স্যাম।

চার বছর আগে একজনকে খুন করার অপরাধে তার চার বছরের কারাবাস হয়েছিল। কাজের চাপে প্রতিহিংসাপরায়ণ ঝুমঝুমি সাপটার কথা মন থেকে মুছে গিয়েছিল।

একদিন ব্রাউন্সভিল-এ আদালতের কাজ পুরোদমে চলেছে। সেদিন একটা মামলার শুনানী হওয়ার কথা রাফায়েল ওরটিজ নামক এক মেক্সিকান যুবকের বিরুদ্ধে। জাল রৌপ্যডলার চালান দিতে গিয়ে সে হাতে নাতে ধরা পড়েছিল।

রাফায়েল ওরটিজ নিশ্চিন্তেই আছে। বিচারের অপেক্ষায় এতদিন হেসে খেলেই কাটিয়েছে।

আদালতে আসার পর ডেপুটি ফিল প্যাট্রিক একটা জাল ডলার জেলা এটর্নির হাতে দিলেন।

ডেপুটি আর একজন ওষুধের কারবারী আগেই কথাবার্তা বলে তৈরী হয়ে গেছে। ওষুধের কারবারী ভদ্রলোক আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বলবেন, ওরটিজ একদিন তার দোকান থেকে এক শিশি ওষুধের দাম মেটাতে গিয়ে জাল রৌপ্য মুদ্রাটা তাকে দিয়েছিল। জাল মুদ্রাটা নরম আর সীসা দিয়ে তৈরী বলেই তার পক্ষে সহজেই চেনা সম্ভব হয়েছে।

জাল মুদ্রার মামলা আদালতে ওঠার আগের দিন সকালে জেলা এটর্নি বিচারের জন্য কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছিলেন।

ডেপুটি সক্রোধে বললেন, ওই বেটে নচ্ছাড়টা যে জাল মুদ্রা চালানকারীদের খাতায় নাম লিখেছে সেটা আমি আগেই জেনেছিলাম। বহুদিনের চেষ্টায় তাকে ধরা সম্ভব হ'ল। নদীর ধারের মেক্সিকানদের বস্তিতে তার নাকি একটা মেয়ে মানুষ আছে। একদিন আমি দেখেছিলাম সে লোকটার দিকে নজর রেখে চলেছে।

এমন সময় জাস্টিসের মেয়ে ন্যান্সি ভারওয়েট ঘরে ঢুকল।

জেলা এটর্নিকে বলল, শোন, তোমার কাজের চাপ যতই থাক না কেন, আমি কিন্তু আজ তোমার সঙ্গে শিকারে যাবই যাব।

তার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই এক কালো চোখ মেয়ে ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। কালো একটা চাদর দিয়ে তার মাথাটা ঢাকা।

মেয়েটার নাম জোয়া ট্রেডিনাস। রাফায়েল ওরটিজ-এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। সে তারই মেয়ে মানুষ।

জোয়া ট্রেডিনাস জেলা এটর্নিকে যা বলল তা হচ্ছে রাফায়েল ওরটিজ নির্দোষ। জাল ডলারটার মালিক সে নিজে। সেটাকে চালিয়ে দেবার জন্য সে-ই রাফয়েল'কে দিয়েছিল।

ডেপুটি এ পর্যন্ত শোনার পর আর মুখ বুজে থাকতে পারলেন না। তিনি লিটলফিল্ডকে বললেন, 'বিশ্বাস করবেন না, মোটেও মেয়ে মানুষটার কথা বিশ্বাস করবেন না, এদের স্বভাবই এরকম। এরা চোখেমুখে মিথ্যে কথা বলে, চুরি করে, ডাকাত দলের সঙ্গে ভিড়ে কাজ করতেও দ্বিধা করে না।

লিটলফিল্ড প্রায় অস্ফুট উচ্চারণ করলেন—'হুম।'

ডেপুটি ব'লে চললেন, শুনলে অবাক হবেন, দরকার হলে মনের মানুষের জন্য এরা খুন করতেও দ্বিধা করে না। আমার কথা মনে রাখবেন, ভুলেও যেন কোন দিন প্রেমে পড়া কোন মেয়েকে বিশ্বাস করবেন না।

মেয়ে মানুষটা আবার বলতে লাগল, হুজুর, আপনি রাফায়েল'কে জেল থেকে খালাস করে আনতে পারলে আমি নিজে তার পরিবর্তে জেল খাটতে রাজী আছি। আপনাকে বলছি হুজুর, সেদিন আমি জ্বরে প্রায় বে-হুশ হয়ে পড়েছিলাম। দোকানে গিয়ে ওষুধ কেনার মত সামর্থ্য আমার ছিল না। তাই ওই মুদ্রাটা দিয়ে রাফায়েল'কে বলেছিলাম ওষুধ এনে দিতে। সে জন্যই তো তাকে সীসার মুদ্রাটা চালাবার জন্য দোকানে যেতে হয়েছিল।

জেলা এটর্নির কাছে এমন গল্প পুরনো।

তাই মেয়ে মানুষটার কথা কানে না নিয়ে বেশ কর্কশ স্বরেই বললেন, শোনগো, আমার কিছুই করার নেই। আদালতেই তাকে লড়তে হবে।

ব্যাপার সুবিধার নয় ভেবে জোয়া ট্রেডিনাস ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার আগে সে ডেপুটিকে বলে গেল, যে মেয়েকে তিনি ভালবাসেন তার জীবনে কোনদিন যদি কোনরকম বিপদ ঘনিয়ে আসে তবে যেন রাফায়েল ওরটেজ'কে স্মরণ করেন।

সে সেলাম জানিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। জোয়া ট্রেডিনাস চলে গেলে ন্যান্সি বলল, বব, ওদের জন্য তোমার কি কিছুই করার নেই? একটা জাল ডলারের ব্যাপার। খুবই সামান্য একটা মামলা। এরই জন্য দুটো জীবন নষ্ট হয়ে যাবে! লোকটার অপরাধ তো খুবই সামান্য। অসুস্থ মেয়েটার জন্য ওষুধ কিনে আনতে গিয়ে সে ফেঁসে গেছে। ব্যস, এর বেশী কোন অপরাধ তো আমি দেখছি না। তোমাদের আইনে কি করুণা বলে কিছুই নেই?

আইন বড়ই নিষ্ঠুর। আইনে দয়া-মায়ার কোন স্থান নেই। তবে তোমাকে এ আশ্বাসটুকু দিতে পারি যে, সরকার পক্ষ কখনই ঈর্ষাপরায়ণ হয় না, এক্ষেত্রেও হবে না। তবে মামলা উঠলে তার যে শাস্তি হবেই এতে কোনই সন্দেহ নেই। সাক্ষীরা বলবে, আমার পকেটের জাল ডলারটা চালাতে গিয়েই সে ধরা পড়েছে।

—সে কী!

—হ্যাঁ, এটাই স্বাভাবিক। জুরিদের মধ্যে একজনও মেক্সিকান নেই।

—তা আমিও শুনেছি।

—জুরি রায় দেবে মিঃ গ্রিজার দোষী।

সেদিন বিকালে জেলা-এটর্নি ও তার প্রেয়সী ন্যান্সি ভারওয়েট শিকারের আনন্দে জোয়া ট্রেডিনাস-এর দুঃখের কথা ভুলে গেল।

গাড়ি ছুটিয়ে তারা শহর থেকে তিন মাইল দূরের পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলেছে। ঠিক তখনই দক্ষিণ দিক থেকে ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ তাদের কানে এল।

জেলা এটর্নি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন, একটা কালো মানুষ জঙ্গলের দিক থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে তাঁদের দিকেই আসছে। তাদের মধ্যে ব্যবধান আরও কমে এলো। জেলা এটর্নি ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরলেন!

লিটলফিল্ড ঘোড়সওয়ারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই স্বগতোক্তি করলেন, মেক্সিকান স্যাম, এবার তোমাকে চিনতে পেরেছি। তুমিই তবে সে চিঠির ঝুমঝুমি সাপ!

মেক্সিকান স্যাম বেশী সময় সন্দেহের মধ্যে থাকে না, আর বন্দুকের নিশানা তার ভুল হয় না।

ঠিক সে মুহূর্তেই সে হাতের উইনচেস্টারের ঘোড়াটায় চাপ দিল। একটা নয়, দু'-দুটো গুলি তার বন্দুকের নল দিয়ে বেরিয়ে এসে একটা ভারওয়েট আর অন্যটা লিটলফিল্ড-এর কাঁচের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেল।

জেলা এটর্নি তাঁর প্রেমিক ন্যান্সিকে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে গেলেন। লিটলফিল্ড বললেন, 'আমি ওকে জেলে পাঠিয়েছিলাম। এবার সে প্রতিশোধ নেবার জন্য বদ্ধপরিকর।

লিটলফিল্ড হাতের বন্দুকটা শক্ত করে ধরল। কিন্তু ম্যাক্সিকা স্যাম চেষ্টায় আছে নিজে নিরাপদ থেকে আড়াল থেকে বদলা নেবে।

কিছুক্ষণ উভয় পক্ষের গুলি বিনিময় হ'ল।

একটু বাদেই ন্যান্সি ভারওয়েট-এর মুখ থেকে বিকট আর্তনাদ বেরিয়ে এল। লিটলফিল্ড অতর্কিতে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন, তার গাল বেয়ে রক্ত পড়ছে।

ঠিক সে মুহূর্তেই মেক্সিকান মেয়েটার কথা লিটলফিল্ড-এর মনে পড়ে গেল, সে বলেছিল, যে মেয়েটাকে তুমি ভালোবাস কোনদিন যদি তার জীবনে বিপদ ঘনিয়ে আসে তবে রাফায়েল ওরটিজ'কে স্মরণ করো।

লিটলফিল্ড এবার চেঁচিয়ে বললেন, নান, একের পর এক গুলি চালিয়ে মিনিট খানেক কাটাও। এ অবসরে আমি চেষ্টা করে দেখি একটা মতলবকে কাজে লাগাতে পারি কিনা।

একটু বাদেই দেখা গেল অবিশ্বাস্য এক দৃশ্য। জেলা-এটর্নি ইচ্ছা করেই হাতের শট গানটাকে নিজের গলায় তাক করে ধরেছেন। পর মুহূর্তেই তাঁর রক্তাপ্লুত দেহটা আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

পরদিন সকাল দশটায় আদালতে যুক্তরাষ্ট্র বনাম রাফায়েল ওরটিজ-এর মামলা শুরু হতে চলেছে।

জেলা এটর্নি ব্যান্ডেজ করা হাত নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। আদালতকে উদ্দেশ্য ক'রে তিনি বললেন, মহামান্য আদালতের নির্দেশ পেয়ে আমি এ মামলাটি তুলে নেবার আবেদন করতে আগ্রহী। কারণ এ মামলার উপযুক্ত প্রমাণ আমাদের কাছে নেই। যে জাল রৌপ্য মুদ্রাটার ওপর ভিত্তি করে এ মামলাটা দায়ের করা হয়েছিল সেটা আমাদের হাতে নেই। তাই এ মামলা খারিজ করা ছাড়া অন্য কোন উপায়ই আমি দেখছি না।

ডেপুটি কিলপ্যাট্রিক জেলা এটর্নির ঘরে এলেন।

তিনি জেলা এটর্নিকে বললেন, মেক্সিকা স্যামকে দেখে এলাম। তাকে বাইরে শুইয়ে রাখা হয়েছে। আমি এমন অত্যাশ্চর্য দৃশ্য এর আগে কোনদিন দেখি নি, বন্দুকের গুলিতে কারো দেহে এমন অদ্ভুত গর্ত হতে পারে ব'লে আমার অন্তত জানা নেই। সত্যি ক'রে বলুন তো আপনি কোন্ অস্ত্র দিয়ে এমন এক দুর্ধর্ষ মানুষকে ঘায়েল করেছিলেন?

কি দিয়ে? জালিয়াতি মামলায় প্রদর্শিত বস্তুটা দিয়ে। বরাত ভাল যে, মুদ্রাটি সত্যিকারেরই জাল ছিল। অনায়াসেই সেটাকে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলা সম্ভব হয়েছিল।

মুহূর্তের জন্য থেমে তিনি আবার মুখ খুললেন, কিলপ্যাট্রিক, একবার বস্তিতে গিয়ে জেনে আসতে পারবে, সে মেক্সিকান মেয়েটা কোথায় থাকে? মিস ভারওয়েট জানতে চেয়েছে, পারবে কি?

ক্যাবাজেজ অ্যান্ড কিংস

দ্য পয়েম অ্যান্ড দ্য কার্পেন্টার

আঙ্কুরিয়ার সব মানুষের মুখেই আপনি শুনতে যাবেন যে, সে দেশের প্রায়ই পরিবর্তনশীল প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট মিরা ফ্লোরেস সমুদ্র উপকূলবর্তী শহর কোয়ালিওতে আত্মহত্যা করেছিলেন।

তিনি আসন্ন বিপ্লবের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য পালাতে গিয়ে ওই স্থানটা পর্যন্ত যেতে পেরেছিলেন। তিনি রাজকোষের এক লক্ষ ডলার একটা চামড়ার থলেতে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। ব্যস, এ পর্যন্তই। পরে তার আর কোন খোঁজ মেলে নি।

শহরের পিছন দিকে, জলাভূমির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করছে এমন ছোট্ট সেতুটার গায়েই সমাধি দেখা যাবে। সমাধিটার গায়ে একটা বাণী খোদাই করা রয়েছে যার বক্তব্য হচ্ছে, "আনন্দপ্রিয় এসব মানুষের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা কবরে যাবার পর কাউকে তাড়া করে

না। ঈশ্বরই তার বিচার করুন। হারিয়ে যাওয়া এক লক্ষ ডলারের প্রতি তাদের লোভ যতই থাক না কেন, কবরটা পর্যন্ত যাওয়ার পরই তাদের আস্ফালন থেমে গিয়েছিল।

নতুন কোন অতিথি এলেই কোয়ালিওর অধিবাসীরা তাদের প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের মর্মান্তিক পরিণতির গল্পটা শোনায়। তারা বিস্তারিত ভাবে বলতে থাকে, তিনি কিভাবে জনসাধারণের অর্থ আর আমেরিকার যুবতী অপেইরা গায়িকা ডোনা লিসাবেল. গুইলবার্টকে নিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যাবার ধান্ধা করেছিলেন। আর কিভাবে কোয়ালিতেও বিরোধী পক্ষের হাতে ধরা পড়লে রাজকোষের এক লক্ষ ডলার আর যুবতী সেনোরিটা গুইলবার্টকে তাদের হাতে সঁপে না দিয়ে নিজের মাথায় গুলি চালিয়েছিলেন। তারা এরকম আরও অনেক, অনেক কথা নবাগত অতিথিকে বলে।

মার্কিন ডন ফ্রাংক গুডউইন আর তার সহধর্মিণীর সম্পর্কে স্থানীয় অধিবাসীদের পক্ষে ভাল ছাড়া কিছু বলার মত ব্যাপার নেই। বছরের পর বছর তাদের সঙ্গে বাস করে ডন ফ্রাংক তাদের শ্রদ্ধা লাভ করেছেন। আর মহিলাটি ছিলেন তাদের সমাজ-জীবনের আনন্দদায়িনী। কোয়ালিওর অধিবাসীরা এখন অন্তত ডন ফ্রাংক-এর অনুরাগী।

সমাধির যে ফলকটাতে প্রেসিডেন্ট মিরা ফ্লোরেস-এর নামটা খোদাই করা আছে সেটাকে রোজ ঘষে মেজে পরিষ্কার করা হয়। এক বুড়ো ইণ্ডিয়ান কবরটাব দেখভাল করে। এমন সুরক্ষিত কবর দ্বিতীয় আর একটা মিলবে না।

অন্ধকারে থাকা ব্যাপারগুলোকে অনুসরণ করলেই বোঝা যাবে এমন একজন মানুষ বুড়ো ইণ্ডিয়ান গাল্‌ভেজকে কেন প্রেসিডেন্ট মিরা ফ্লোরেস-এর কবরটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য নিয়মিত অর্থ সরবরাহ করে। জীবিত বা মৃত কোন অবস্থাতেই অভাগা কূটনীতিককে একটাবারও চোখে পর্যন্ত দেখতে পায় নি। আর কেনই বা ওই কবরটাকে মুহূর্তের জন্য দেখে সম্মান প্রদর্শন করতে সন্ধ্যার আবছা আলোয় বেড়াবার অজুহাতে সেখানে হাজির হয়?

কোয়ালিওকে বাদ দিয়ে অন্য জায়গায় গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন ইসাবেল উইলবার্ট কিভাবে দ্রুত উন্নতি করেছিলেন। তার জন্ম হয়েছিল নিউ অর্লিয়েন্সে। আর স্পেনীয় ও ফরাসীদের কাছ থেকে পেয়েছে চরিত্র গঠনের পথ নির্দেশ। তার ফলে তার জীবনটাই ভরে উঠেছে ক্ষোভ ও উষ্ণতায়।

ইসাবেল বিদ্যার্জন কমই করেছিলেন। কিন্তু মনুষ্য চরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞান ও কাজের প্রেরণা লাভ করেছিলেন সহজাত প্রবৃত্তি থেকেই।

ইসাবেল অন্য দশজন নারীর চেয়ে অনেক বেশী নির্ভীক ও দুরন্ত প্রকৃতির ছিলেন। অজানাকে জানা এবং অচেনাকে চেনার জন্য তিনি যেকোন বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা করতেন না। তার বাসনা ছিল জীবনকে উপভোগ করা।

যে অগণিত মানুষ তাঁকে পাবার জন্য তাঁর কাছে মাথা নত করেছিল তাদের মধ্যে একজনই তার মনকে আকৃষ্ট করতে পেরেছিল। প্রেসিডেন্ট মিরা ফ্লোরেস-এর কাছেই নাকি তিনি ধরা দিয়েছিলেন। তা-ই যদি সত্য হয় তবে আমরা কেনই বা দেখছি যে, ফ্রাংক গুডউইন-এর সহধর্মিণী হয়ে পরম সুখে দিনাতিপাত করছেন একটা একঘেয়ে অলস জীবন?

অন্তরালের ঘটনাগুলো সূত্রগুলো কিন্তু বহু দূর, সাগরের তলদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত।

ফক্স ইন দ্য মর্নিং

কোরালিও দুপুরের ভ্যাঁপসা গরমে আরাম-কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম সুখ উপভোগ করছে।

শহরটা সমুদ্রের তীরে একটা উঁচু পাথরের ওপর অবস্থিত, এক সময় হঠাৎই শহর জুড়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল।

এক আদিবাসী যুবক রাস্তা দিয়ে ছুটতে ছুটতে চেঁচাচ্ছে, বুস্‌কা এল্‌ সিনিওর গুড্‌উইন। বা ভেনিডো উন্‌ টেলিগ্রামা পোর এল্‌।

খবরটা বাতাসের কাঁধে ভর করে শহরময় অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। কোরালিয়া শহরে কারো কাছে তেমন টেলিগ্রাম আসে না।

আবার সেনিওর গুড্‌উইন-এর নাম ধরে ডাকাডাকি করায় ব্যাপারটা বহু নিষ্কর্মা মানুষের কান সজাগ হয়ে উঠল।

খবরটাকে 'জায়গা মত পৌঁছে দেবার জন্য রাস্তায় উৎসাহীরা ভিড় জমাল।

কমাণ্ডেন্ট ডন সেনিওর এল কারোনেল এন কার্নেশিওন রিওস আদিবাসীদের প্রতি বিশ্বস্ত এক অফিসার। তিনি ভাবলেন, গুড্‌উইন নির্ঘাৎ বহিরাগতদের ওপর প্রসন্ন। তিনি তার ব্যক্তিগত ডায়েরীর পাতায় টুকে নিলেন, এদিনে সেনিওর গুড্‌উইন একটা টেলিগ্রাম পেয়েছেন।

যখন পুরোদমে হৈচৈ চলছে ঠিক তখনই বিলি কিয়োখ নামে একটা লোক একটা কাঠের বাড়ির দরজায় দাঁড়াল। দরজাটার গায়ে লেখা লিয়োম অ্যান্ড ক্যাপ্সি। মনে হয় কোন বহিরাগতেরই এ নামটা। এক সময় ক্যাপ্সি আর লিয়োম টিনের অক্ষর ও ফটোগ্রাফের অস্ত্র দুটো সম্বল করে সমুদ্র উপকূলে এসে হাজির হয়েছিল। তারপর দোকানটা খুলে বসে।

তারও আগে তারা ছিল 'স্প্যানিশ সেন' জলদস্যু।

কিয়োখ হৈচৈ-এর কারণ বুঝতে পেরে গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠল, এই যে! ফ্রাংক!

ডাকটায় অধিবাসীদের চিৎকার চেঁচামেচি অনেকাংশে চাপা পড়ে গেল। সমুদ্রের দিকে সামান্য এগোলেই কন্সালের বসতবাটি।

ডাকটা কানে যেতেই বাড়িটা থেকে ব্যস্ত গুডউইন বাইরে বেরিয়ে এল। পিছনের বারান্দায় কন্সাল উইলার্ড গেড্ডির সঙ্গে চুরুট টেনে চলেছে।

গুডউইনকে দেখেই কিয়োখ সাধ্যমত গলা চড়িয়ে বলল, জলদি এস। তোমার নামে একটা টেলিগ্রাম আছে। আর সেটাকে কেন্দ্র করে শহরের মানুষ দাঙ্গায় মেতেছে। আর ক'দিনের মধ্যেই তোমার হাতে গোলাপি রঙের একটা খাম আসবে। আর ইতিমধ্যে পুরো দেশটা জুড়ে বিপ্লব শুরু হয়ে যাবে।

গুডউইন লম্বা লম্বা পায়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এগোতে লাগল।

কিয়োখ আগের মতই চেঁচিয়েই বলতে লাগল, বাপু, এসব ব্যাপারে তোমাকে একটু সচেতন না হলে চলবে না। জনসাধারণের অবস্থাকে পাত্তা না দিলে চলবে না, বুঝলে?

গুডউইন এগিয়ে এসে সংবাদবাহী ছেলেটার সঙ্গে দেখা করে টেলিগ্রামটা হাতে নিল। তার দিকে নারী-পুরুষ সবাই হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

গুডউইন এসে টেলিগ্রামটা নিলে হৈ হল্লাকারীরা থেমে গেল। গুডউইন টেলিগ্রামটা হাতে নিয়ে কিয়োখ-এর দোকানে গেল। তার সিড়িতে বসে পড়ল। বক এঙ্গলহার্ট নামে এক ব্যক্তি টেলিগ্রামটা করেছে।

এঙ্গলহার্ট এক সোনার দোকানের মালিক। উৎসাহী বিপ্লবপন্থী হিসাবে তার পরিচয় আছে। এটা তার পাঠানো টেলিগ্রাম থেকেই বোঝা যায়।

একজন অভিজ্ঞ কূটনীতিবিদ হিসাবেও এঙ্গেল্‌হার্ট-এর খ্যাতি কম নয়। একমাত্র সাংকেতিক লিপির সাহায্যে সে নিরাপদেই অত্যাবশ্যক সংবাদটা জানাতে সক্ষম। আর তা সরকারী কর্মচারীদের বোকা বানিয়ে নিরাপদে যথা স্থানে পৌঁছে যায়। বর্তমান টেলিগ্রামটা সেরকমই সাংকেতিক ভাষায় লেখা যেটা নিরাপদেই গুডউইনের হাতে পৌঁছতে পেরেছে।

টেলিগ্রামটা গুড্‌উইন-এর কাছে কিছুমাত্রও রহস্যময় মনে হ'ল না। গুডউইন একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী আমেরিকান। প্রথম দিকে মাঞ্চুরিয়া অভিযানে এসেছিল সাফল্য লাভও করেছে। আমাকে তার অনুমান শক্তি এবং ভবিষ্যৎ দৃষ্টিকে বাস্তবায়িত করার ইচ্ছা তার যথেষ্টই আছে তাই অন্যান্য অভিযানকারীদের তুলনায় সে সাফল্যের উচ্চতম শিখরে উঠতে সক্ষম হয়।

গুড্‌উইন রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রকে একটা ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করেছে। আর বুদ্ধি কৌশলের ওপর নির্ভর করে সে কিছুটা প্রভাব বিস্তারও করতে সক্ষম হয়েছে। আর অর্থ দিয়ে কিনে নিতে পেরেছে কিছুসংখ্যক পদাধিকারিকেও।

গুড্‌উইন একটা বিপ্লবীমনের সঙ্গে জড়িত।

সম্প্রতিকালে একটা উদারপন্থীদল প্রেসিডেন্ট মিরা ফ্লোরেসকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। কাজটা ঠিক মত সমাধা করতে পারলে গুড্উইন সবচেয়ে সেরা কফি চাষের পঞ্চাশ হাজার মান্জানা জমি সে জলের দামে পেয়ে যেত।

গুড্উইন আর একটা বিষয় লক্ষ্য করছে যে, বিপ্লব ছাড়াই প্রেসিডেন্ট মিরা ফ্লোরেম-এর জমানা খতম হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এঙ্গলহার্ট-এর বর্তমান টেলিগ্রামটা গুড্উইন-এর যে বিশেষ ধারণাটারই ইঙ্গিত বহন ক'রে নিয়ে এসেছে।

মাঞ্চুরিয়া ভাষাবিদ্‌রা টেলিগ্রামটার মর্ম উদ্ধার করতে পারল না।

কিন্তু টেলিগ্রামটার খবরই গুড্উইন বুদ্ধি বাৎলে দিল। এর দ্বারাই সে জানতে পারল যে, প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্টে রাজকোষ শূন্য ক'রে সব অর্থ নিয়ে বিমান পথে চম্পট দিচ্ছেন। তাঁর সঙ্গী হয়েছে অপেরা গায়িকা ইসাবেল উইলবার্ট।

টেলিগ্রামটার কয়েকটা উল্লেখযোগ্য বক্তব্য কোরালিও আর রাজধানীর মধ্যে তখন প্রচলিত খচ্চরে চেপে যাতায়াত ব্যবস্থা; জাতীয় কোষাগারের শোধনীয় অবস্থা সদ্য ক্ষমতায় আসা দলটিরও স্পোনডিউলিক্সদের প্রয়োজন হবে। প্রতিশ্রুতিগুলি পূরণ না হলে আর লুটের জিনিসপত্র বিজয়ী কলের আনন্দ উৎসবে ব্যয় করা না হলে নতুন সরকারের অবস্থা কাহিল হয়ে পড়বে। তাই 'এক্লাব দ্য সেন গে' আর যুদ্ধ ও শাসন ক্ষমতা প্রধান কেন্দ্রগুলোকে দখল করা একান্ত প্রয়োজন।

গুডউইন বব এঙ্গলহার্ট-এর টেলিগ্রামটা কিয়োখ-এর হাতে দিল, পড়া শেষ করে কিয়োখ মুচকি হেসে বলল তাদের মতে এটা সাহিত্য সাংকেতিক ভাষা নয়। এ ভাষা আবিষ্কার করে খবরের কাগজগুলো। প্রেসিডেন্ট নরডিন গ্রান যে, এর ওপর সম্মতিসূচক ছাপ দিয়ে দিয়েছেন আমার আগে জানা ছিল না।

অভিধানগুলো এভাষাকে চালু করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কথ্য ভাষা ছাড়া অন্য কোনভাবে এটাকে চালাতে পারল না।

ভাষাতত্ত্বের কথা আমি জানতে চাইছি না বিল। এর অর্থটা তুমি উদ্ধার করতে পেরেছ কিনা এটাই আমার জিজ্ঞাস্য।

—অবশ্যই। আমার হাতে যে প্রবন্ধটা দেখছ এর অর্থ ভোরে শেয়ালের খেলা।

গুড্উইন তার হাতের প্রবন্ধটার দিকে মুহূর্তের জন্য অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকাল।

কিয়োখ বলে চলল শোন, 'ভোরে শেয়াল' মূল কথাটাই হাত ধরাধরি বিপক্ষে। খেলাটার পদ্ধতি বলছি শোন—মনে কর, প্রেসিডেন্ট আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা হচ্ছে খেলোয়াড়। দৌড় শুরু করার জন্য তারা সারিবদ্ধভাবে জড়িয়ে পড়ল, আর চিল্লিয়ে চলল—'ভোরে শেয়াল!'

তুমি আর আমি এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি। আমরা চেঁচিয়ে বললাম, মাত্র কয়েক মাইল, তবে তোমাদের পাগুলো যদি খুব লম্বা হয়। তোমরা ক'জন বেরিয়ে আসছ?

তারা জবাব দিল কজনকে তোমাদের ধরার ক্ষমতা আছে তার চেয়ে বেশী সংখ্যক।

ব্যস, তারপরই খেলা শুরু।

কপালের চামড়ায় চিন্তার ভাঁজ ফুটিয়ে তুলে গুড্উইন বলল কিলি, কোনক্রমেই আমাদের আঙুলের বাঁক দিয়ে হাঁস আর হাঁসিকে গলিয়ে যেতে দেওয়া হবে না।

—অবশ্যই না।

—কারণ, তাদের পালকগুলোর দাম খুবই বেশী। আমাদের লোকজন প্রস্তুত। এখনই সরকারের চেয়ারে বসার মত ক্ষমতা তাদের রয়েছে। কিন্তু শূন্য রাজকোষ নিয়ে ক'দিনই বা আমাদের পক্ষে ক্ষমতায় থাকা সম্ভব হবে?

—সে তো নিশ্চয়ই। কিয়োখ বলল।

—আমার পরিকল্পনার কথা তোমাকে বলছি শোন দেশ ছেড়ে কেউ যাতে যেতে না পারে তার জন্য আমরা শেয়ালের মত রুখে দাঁড়াব।

যদি খচ্চরের পিঠে চেপে আসে তবে সান মার্টিও থেকে এখানে পৌঁছতে পাঁচ দিন লাগবে। আমরা সীমান্ত ঘাঁটিগুলোতে ইতিমধ্যে ঘাঁটি বসিয়ে ফেলতে পারব। সমুদ্র পথে আসতে তিনটে জায়গা আছে। আমরা সেগুলোর ওপর কড়া নজর রাখব। ধ্বংস প্রায় পিতৃভূমির 'বুড়ল'কে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করে যারা বর্তমান শাসকদলকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিতে চেষ্টা করছে সে রাজনৈতিক দলের হাতে তুলে দিতে হবে।

কিয়োখ-এর রাজনৈতিক বিবরণটা একেবারে যথার্থ। রাজধানী শহর থেকে ভাঁটির পথে যাওয়া খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। পথ খুবই দুর্গম।

পর্বতের সানুদেশের পর পথটা তিনটা ভাগে বিভক্ত হয়ে এগিয়ে গেছে। আলাজানের দিকে এগিয়ে গেছে মাঝখানের পথটা। আর একটা গেছে কোরালি অভিমুখে আর তৃতীয়টা মলিটানের দিকে গেছে। অতএব পলাতক দলটাকে এ তিনটের মধ্যে কোন না কোন পথ ধরতেই হবে। নইলে সমুদ্র উপকূলে পৌঁছনো সম্ভব হবে না।

গুড্উইন-এর ইচ্ছা না প্রেসিডেন্টের পলায়নের খবরটা জনসাধারণের কানে যাক। সে আশা করছে, বব-এর এ খবরটা রাজনৈতিক দলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। নইলে সে গোপনীয়তা অবলম্বন করত না। সে লোক পাঠিয়ে টেলিগ্রাফেব তার কেটে দেওয়ার ব্যবস্থা করল, আর নিজে ছুটল ডাঃ জাব্বালার-এর সঙ্গে দেখা করতে।

কিয়োখ দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। গুড্উইন এই প্রথম তাকে দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে দেখল।

কিয়োখ বলল এটাই শেষ। আমি বিপদসঙ্কুল সততার জীবনের মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দিলাম। একটা বার ভাব তো, হাঁসা-হাঁসিদের আনন্দ-ফূর্তিভরা সুযোগ সুবিধার তুলনায় আমাদের কারবারটার দাম কত সামান্য।

—হুম!

—না, গুড্উইন আমার প্রেসিডেন্ট হওয়ার ইচ্ছা আদৌ নেই। আমি বরং ছবি তুলেই জীবনটা কোনরকমে কাটিয়ে দেব এটাও আমার বিবেক বিরুদ্ধ কাজ।

গুড্উইন নীরবে ম্লান হাসল।

কিয়োখ এবার বলল। আচ্ছা গুড্উইন, প্রেসিডেন্ট যে নারীকে সঙ্গে নিয়ে গেছে তাকে তুমি কোনদিন চোখে দেখেছ?

—তার নাম ইসাবেল গুইলবার্ট। তবে তাকে কোনদিন চোখে দেখিনি। তবে শুনেছি, তার রূপের আভা নাকি চোখ ঝলসে দেয়। আর তার মন পাওয়ার জন্য নাকি যেকোন পুরুষ আগুনে ঝাঁপ দিতে দ্বিধা করবে না।

বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে কিয়োখ তার কথা শুনতে লাগল। কিয়োখ বলল গুডউইন একবার প্রেসিডেন্টের অবস্থাটা ভেবে দেখ তো এক হাতে এক লক্ষ ডলার বা তার বেশী অর্থের থলি আর পরমা সুন্দরী এক নারীকে অন্য হাতে জড়িয়ে ধরে খচ্চরের পিঠে চেপে পথ, পাড়ি দিচ্ছেন!

—হুম্! গুডউইন চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

কিয়োখ এবার বলল আর বিলি কিয়োখ এখানে ধার্মিক মানুষ বলে সৎভাবে দিনাতিপাত করার জন্য টিনের কাজ করছে আর ছবি তুলে বেড়াচ্ছে এটাই কি বিধাতার বিচার গুডইউন।

ম্লান হেসে গুড্উইন বলল হায় কিয়োখ! তুমি দেখছি, ধূর্ত শেয়ালের মত হাঁসটার দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকাচ্ছ! এমনও হতে পারে ওই রূপসীর সঙ্গীটা যখন আমাদের হাতে ঘায়েল হবে তখন রূপের ডালিটা তোমার পাশে এসে হাজির হবে।

—এর চেয়েও খারাপ কিছুও তো হতে পারে। না, এমন কাজ সে করবে না বলেই আমার বিশ্বাস, সে রূপসী মানুষ হিসেবে সুবিধের নয়। আর এখন তো প্রেসিডেন্টের ভাগ্য খুবই সুপ্রসন্ন।

জরুরী কাজের তাগিদে কিয়োখ বাড়ির ভেতরে চলে গেল, আর গুড্উইনও পথে নামল।

গুচ্ছেরখানের চিন্তার জট ছাড়াতে ছাড়াতে গুড্উইন বার্ণাড ব্রানিংগার-এর বাড়ির দরজায় পৌঁছে গেল।

ঝলমলে পোশাক পরে এক সুন্দরী মেয়ে রেলিং ধরে পথের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে। গুড্‌উইন-এর চোখ পড়তেই সে মুখে দুষ্টুমি হাসির ছোপ ফুটিয়ে তুলল। পলা ব্রানিংগান তার নাম। হাসি থামিয়ে সে এক সময় বলল মিঃ গুড্‌উইন কোন খবর আছে কি?

—না, তেমন উল্লেখযোগ্য খবর নেই। গেড্ডি-র মেজাজ মর্জি দিন দিনই খিটখিটে হয়ে উঠছে। তার মনটাকে চাঙ্গা করার মত কিছু একটা না ঘটলে তার পিছনের বারান্দায় বসে আমাকে চুরুট টানাটাই ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু অন্য কোথাও তো যথেষ্ট ঠাণ্ডাও নেই।

আবেগ মধুর স্বরে পলা ব্রানিংগান বলল, কি যে বল! তার মেজাজ মোটেই খিটমিটে নয়। আব সে যখন পিছনের বারান্দায় বসে কাটায় তখন সে কথাটা আর শেষ করল না। কারণ, তার মা এক মেস্টিজো মহিলা, আর তার নিজের ধমনীতে স্পেনীয় রক্ত প্রবাহিত হওয়ায় তার মধ্যে এমন লাজুক লাজুক ভাব রয়েছে যা তার লোক দেখানো চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

(৩) লোটাস অ্যান্ড দ্য বটল

উইলার্ড গেড্ডি!

যুক্তরাষ্ট্রের কন্সাল উইলার্ড গেড্ডি কেরালিওতে বসে তাঁর বার্ষিক প্রতিবেদন লেখার কাজে ব্যস্ত।

প্রতিদিনের অভ্যাস মত গুড্‌উইন ঘরের দরজায় পা দিয়েই কন্সালকে খুবই ব্যস্ত দেখে বিষণ্ণ মুখে ফিসফিস ক'রে গালাগালি দিয়ে সেখান থেকে চলে এল। তার ক্ষুব্ধ হবার কারণ যে নেই তা-ও নয়। সে দরজায় দাঁড়িয়ে বই অথচ কন্সাল বসতে বলা তো দূরের কথা দু'-একটা কথা বলেও অতিথেয়তার পরিচয় দেয়ার দরকার মনে করলেন না।

ফিরে আসার মুহূর্তে যে অনূঢ় কণ্ঠে বলল সরকারের প্রতিনিধিত্ব করার এটা তোমার কেমন আচরণ বুঝছি না। মানুষ তোমার কাছ থেকে ভদ্রতা শিষ্টতা কিছুই পায় না। বলে রাখছি, আমি সিভিল সার্ভিস বিভাগে তোমার নামে নালিশ করব।

রাগে গম্ গম্ করতে করতে গুড্‌উইন সেখান থেকে চলে এল।

কন্সাল-এর বয়স মাত্র চব্বিশ বছর। মাত্র ক'দিন আগেই তিনি কোরালিও-তে এসেছেন।

এদিকে কন্সাল-এর দপ্তর থেকে ফিরে গুড্‌উইন কোয়ারেন্টাইন ডাক্তারের সঙ্গে এক হাত বিলিয়ার্ড খেলার প্রত্যাশা নিয়ে সোজা হোটেলে চলে গেল।

কন্সাল ভালই জানেন, যুক্তরাষ্ট্রে তার পরিচিত ব্যক্তিদের প্রতি পঞ্চাশ জনের মধ্যে একজনও কোরালিওর নামটা পর্যন্ত শোনে নি। তার তিনি এ-ও জানেন, অন্তত দু'জনকে তার প্রতিবেদনটা পড়তেই হবে। তাদের একজন ছাপাখানার কম্পোজিটার আর দ্বিতীয় জন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এক নিম্নপদস্থ কর্মচারী।

কম্পোজিটার হয়ত টাইপ সাজাতে সাজাতে বুঝবে, কোরালিও-র ব্যবসা বৃদ্ধির মুখে। আর এটা নিয়ে সে তার বন্ধুর সঙ্গে গল্প করবে।

কন্সার গেড্ডি প্রতিবেদনটা লিখতে স্টীমারের সাইরেন শুনতে পেলেন। মুহূর্তমাত্র দেরী না ক'রে তিনি সমুদ্র-তীরের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। তিনি নিঃসন্দেহ যে এটা 'কলাহান্না' স্টিমার। বিস্যুবিয়াস কোম্পানীর মাল নিয়ে যাতায়াত করে।

কেবলমাত্র কন্সালাই নন, কোরালিও যেকোন লোক সাইরেন শুনেই বলে দিতে পারে এটা কোন্ জাহাজ।

কোরালিওতে কোন পোতাশ্রয় নেই, তাই 'কলহান্না'-র মত বড় স্টীমারকে উপকূল থেকে মাইল খানেক দূরে নোঙর ফেলতে হয়। তারপর মালবাহী নৌকার সাহায্যে ফল বোঝাইয়ের কাজ সারা হয়। এখানে ফল বোঝাই জাহাজ ছাড়া অন্য কোন জাহাজ ভেড়ে না।

'কলহান্না'-র নৌকা আর কাস্টমসের নৌকা প্রায় একই সময়ে তীরে পৌঁছাল।

কলেজের ছাত্রাবস্থায় গেড্ডি ছিলেন একজন বড় বেস-বল খেলোয়াড়। স্টিমার যখনই আসে তখনই তাঁর জন্য একটা ক'রে খবরের কাগজ নিয়ে আসে। নৌকা থেকে তাড়াতাড়ি খবরের কাগজের মোড়কটি নিলেন।

এবার নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি নিজের বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন বাড়িতেই তার দপ্তর। একটা বৃহৎ জাতির প্রতিনিধির দপ্তর। খুবই সাধারণ আসবাবপত্রে তাঁর অফিসটাকে কোনরকমে সাজানো হয়েছে।

এগারোটার সময় তিনি খবরের কাগজের মোড়কটা নিয়ে বাড়ি ফিরলেন দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে তিনি কেদারায় শরীর এলিয়ে দিয়ে খবরের কাগজটার ওপর চোখ বুলাতে লাগলেন।

খবরের কাগজের এ প্রথম পাতাতে ছাপা হয়েছে, একটা জাহাজে ফটোগ্রাফ। ইভালিয়ার নামক জাহাজটার ছবি। আটশ'টন মালবহন ক্ষমতা সম্পন্ন একটা সুবিশাল জাহাজ। এর মালিক ভাল মানুষদের রাজা, ধনকুবের আর সমাজের শীর্ষস্থানীয় জে. গার্ড টালিভার।

ছবিটার পরেই ছাপা হয়েছে মিঃ টালিভার-এর স্থাবর সম্পত্তি আর বন্ডের তালিকা। তার পরই ছাপা হয়েছে ইয়াটের আসবাবপত্রের পূর্ণ বিবরণ।

একদল মনের মত মানুষ নিয়ে মিঃ টালিভার দু'সপ্তাহের জন্য সমুদ্র ভ্রমণে বেরোবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকা উপকুল ধরে আর বাহাসা দ্বীপপুঞ্জের অভ্যন্তরভাগ তাদের নিয়ে ভ্রমণ করবেন।

তাঁর ভ্রমণের সঙ্গীদের মধ্যে একজন হচ্ছেন, নরফোকের মিস ইডা পেন আর তার মিসেস কাম্বারল্যান্ড।

প্রতিবেদনটার লেখক পাঠকদের মনে রোমাঞ্চ জাগিয়ে তোলার জন্য চমৎকারভাবে বক্তব্য শুরু করেছেন। তিনি লিখেছেন মিঃ টালিভার আর মিস পেন-এর নাম দুটোকে বন্ধনীর মধ্যে রোখা আর ছোট্ট একটা পাখি'র আর মাদাম 'গুজব'-কে অবলম্বন করে এবং দু'জনকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রতিবেদনটা শেষ করেছেন। লেখার কৌশলের জন্য প্রতিবেদনটা বাস্তবিকই খুবই মনোজ্ঞ হয়ে উঠেছে।

মিঃ গেড্ডী খবরের কাগজটা থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। কিন্তু যে প্রতিবেদনটা সবে পড়া শেষ করেছেন তার জন্য মনটা বেশী মাত্রায় বিচলিত হয়ে না পড়ার জন্য স্বস্তি বোধ করলেন। তবে এ-ও সত্য যে, ইডা পেন'কে তিনি কোনদিনই মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে পারবেন না। আবার তার কথা ভেবে তিনি মুষড়েও পড়বেন না।

উভয়ের মধ্যে যখন ভুল বোঝাবুঝির জন্য বিবাদটা বেঁধেছিল তখনই তিনি ব্যস্ত হয়ে কন্সালের চাকরিটা বাগিয়ে নিয়ে বহু দূরে এখানে পাড়ি জমিয়েছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল একটাই মিস ইডা পেম-এর সান্নিধ্য থেকে যত দূরে চলে যাওয়া যায়। এভাবেই ইডা-র ওপর প্রতিশোধ নেবার উপযুক্ত পথ তিনি বেছে নিয়েছিলেন।

গেড্ডির উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

কোরালওতে বারো মাসের জীবনে তাঁদের দু'জনের মধ্যে কোন বাক্য বিনিময় তো হয়ই নি এমন কি পত্রালাপও হয় নি। তবে সেখানকার বন্ধুদের সঙ্গে পত্রালাপের মাধ্যমে তার খবরাখবর মাঝে মধ্যে পেয়েছেন সত্য।

তবে গেড্ডি-র মন-ময়ূরী মিস ইডা পেন যে আজও রয়ে গেছে, বরমাল্য দিয়ে কাউকে পতিত্বে বরণ করে নেয় নি, এটা ভেবে যারপর নাই আত্মপ্রসাদ লাভ করছেন।

ধ্যুৎ! এসব নিয়ে তিনি কেন মিছে মাথা ঘামাতে বসেছেন। মধুভাণ্ডের মধু তো তিনি প্রাণভরে পান করে নিয়েছেনই। আর সুন্দর এ দেশটার মুখেই দিনাতিপাত করছেন। সবচেয়ে বড় কথা, কলা ব্রানিংগান তো তার হাতের নাগালের মধ্যেই আছে।

পান'কে বিয়ে ক'রে ঘর বাঁধার জন্য গেড্ডী মনে মনে তৈরীও হয়েছেন। তবে পান-র সম্মতিটাও এক্ষেত্রে অবশ্যই প্রয়োজন।

কারণ যা-ই থাক না কেন, কঙ্কাল গেড্ডী আজও পাল্লা-র কাছে বিয়ের প্রস্তাবটা পাড়েন নি। বহুবার বলব বলব করেও বলা হয়ে ওঠেনি কিন্তু প্রতিবারেই রহস্যময় কোন একটা কিছু যেন তাকে পিছন দিক থেকে টেনে রেখেছে।

পলা-র সঙ্গে কোন আদিবাসী মেয়েরই তুলনা চলে না। পলাকে নিয়ে ঘর বাঁধলে তার দাম্পত্য-জীবন সুখেরই হ'ত দেখতে শুনতে ভাল। তার ওপর যে কনভেন্টে পড়াশোনা করেছে।

বার্নাড বানি গান কেরালিও-তে বেশ কয়েকটা ব্যবসা ফেঁদে বসেছেন। অগাধ অর্থের মালিক।

কাস্টিনলান বংশের মহিলাকে বিয়ে করে সুখে ঘর-সংসার করছেন। কঙ্কাল গেড্ডী তাঁর কাছে ইডা'কে বিয়ে করার প্রস্তাব পাড়তে তিনি সানন্দে সম্মতি দেবেন বলেই তাঁর বিশ্বাস।

খবরের কাগজটা দু'ঘন্টা ধরে পড়ার পরও পড়া শেষ হ'ল না। তিনি কাগজ বুকের ওপরে রেখে শরীরটাকে আরাম কেদারাটায় এলিয়ে দিলেন। অলস চোখের মণি দুটোকে সমুদ্রের দিকে স্থির রেখে বসে রইলেন।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সমুদ্রের বুকে একটা কালো বিন্দু দেখতে পেলেন।

প্রমোদ তরী ইডালিয়া দ্রুত গতিতে কুলার বরাবর এগিয়ে আসছে।

কঙ্কাল গেড্ডি-র বাড়ি থেকে 'ইডালিয়া-র দূরত্ব মাইল খানেক। একটু বলেই সেটার দূরত্ব বাড়তে বাড়তে ক্রমে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

না, ইডালিয়া-র নিঃশব্দে চলে যাওয়াটা তাকে বিচলিত করতে পারল না। বিকালে তিনি সমুদ্রের ধারে গেলেন। উদ্দেশ্য কিছু সময় মুক্ত বায়ুতে পায়চারি করা।

সমুদ্রের ধার দিয়ে হাঁটাহাঁটি করার সময় ঢেউয়ের কাঁধে ভর দিয়ে একটু ছিপি-আঁটা বোতল তীরে এসে আছড় খেয়ে পড়ল।

গেড্ডি বোতলটা হাতে নিয়ে তার ছিপিটা খুলে ফেলতেই তার ভেতর থেকে একটা দোমড়ানো কাগজ বেরিয়ে এল। আর ছিপিটার ওপর মোহরাঙ্কিত একটা ছাপের দিকে তার চোখ পড়ল। আর তার গায়ের আই.পি. অক্ষরটা ছাড়া বাকি অংশটা মুছে গেছে।

গেড্ডি সিলমোহরটার দিকে তাকিয়ে ভাবলেন, ইডাপেন তো মোহর অঙ্কিত একটা আংটি ব্যবহার করত। ব্যস, তার মনে অদ্ভুত একটা চাঞ্চল্য জেগে উঠল।

এবার তিনি বোতলের ভেতরের কাগজ দুটোর ভাঁজ খুলে চোখের সামনে ধরতে গিয়েও থমকে গেলেন। ভাবলেন এটা যদি. ইডাপেন-এর লেখা চিঠি হয়েই থাকে তবে এটা পুনর্মিলনের প্রয়াস ছাড়া কিছু নয়। তাই যদি হয় তবে সে এমন একটা হাস্যকর এবং অনিশ্চিত পথ যে কেন বেছে নিল! এটা তার হাতে পড়ার চেয়ে অন্য কারো হাতে পড়ার সম্ভাবনাই বেশী ছিল। সহজতর উপায় ডাক-ব্যবস্থার সাহায্য নেওয়ার বাধাই বা কি ছিল? কাজটাকে নেহাৎই ছেলে মানুষী খেয়াল ছাড়া আর কি-ই বা বলা যেতে পারে?

বোতলের ভেতরের লেখাগুলো পড়া যাচ্ছে না। গুটি কয়েক বড় বড় হরফ যা অস্পষ্ট হলেও দেখে বোঝা গেল ইডাপেন-এর হাতের লেখাই বটে।

না, কঙ্কাল গেড্ডি কাগজটাকে বোতলটার ভিতর থেকে বের করে পড়ার মত উৎসাহ পেলেন না, তাই ছিপিটাকে আবার যথাস্থানে এঁটে দিলেন।

তিনি বোতলটাকে টেবিলের ওপরে রেখে দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

বার্নাড ব্রানিংগ্রান-এর দরজার গিয়ে তিনি থামলেন। দরজায় দাঁড়িয়েই তিনি দেখলেন, তার মানস-প্রতিমা পলা চমৎকার পোশাকে সজ্জিত হয়ে দোলনায় বসে মৃদু মৃদু দোল খাচ্ছে।

গেড্ডির গান শোনামাত্রা পলা-র গাল দুটো যেন অকস্মাৎ রক্তিম হয়ে উঠল। তারা হাঁটতে হাঁটতে পাহাড় দিকে এগোতে লাগলেন।

এক সময় কঙ্কাল গেড্ডি তার প্রাণ-প্রেয়সী পলা'কে পাশে নিয়ে একটা গাছেব তলায় বসলেন। নির্জন-নিরালা এক মনোলোভা পরিবেশ।

এখানে পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে গেড্ডী তার কাছে মনের বিলম্বিত বক্তব্যটা পাড়লেন।

তাঁর প্রস্তাবটা শোনামাত্র পলা যেমন উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে প্রিয়তমার গালাটা জড়িয়ে ধরল তাতে গেড্ডীর মন-প্রাণ এক অনাস্বাদিত আনন্দে ভরে উঠল। তিনি আপন মনে বলে উঠলেন... এ-ই তো প্রেম ও বিশ্বস্ততায় পরিপূর্ণ নিষ্কলুষ একটা হৃদয়।

কন্সাল গেড্ডি লম্বা লম্বা পায়ে বাড়ি ফিরেই বোতলটাকে টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিয়ে সমুদ্রের দিকে হাঁটতে লাগলেন। ছিপিবদ্ধ বোতলটাকে তিনি সাধ্যমত দূর সমুদ্রে ছুঁড়ে দিলেন। জনা কয়েক মাঝি তাঁকে মৃতপ্রায় অবস্থায় সমুদ্র থেকে তুলে আনল। তারপর ডাঃ গ্রেগ বহু চেষ্টায় তাকে বাঁচিয়ে তুলতে পারলেন।

স্মিথ

প্রেসিডেন্ট মিরা ফ্লোরেন্স যাতে কোনক্রমেই পালিয়ে যেতে না পারেন তার জন্য গুডউইন ও মনে-প্রাণে দেশব্রতী জাবাল্লা সাধ্যমত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করল।

প্রেসিডেন্টের পলায়ন সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য গুড্উইন আল্সাজান ও সলিটাস-এর উপকূলবর্তী অঞ্চলের নেতাদের সতর্ক ক'রে দিতেও ভুলল না। আর এ-ও জানিয়ে দিল। পলাতক প্রেসিডেন্ট ও তার সহযাত্রীকে দেখামাত্র যেন গ্রেপ্তার করা হয়।

এঙ্গলহার্ট-এর টেলিগ্রামটা আমার চতুর্থদিনে নিউ আর্লিয়েন্স-এর ফলবহনকারী কালস্ফিন কোরালিও-এর অদূরে নোঙর করল। এটা ফল চালান দেওয়ার জন্য স্পেনিসমেন আর নিউ অর্লিয়েন্স-এর মধ্যে ঘন ঘন যাতায়াত করে।

যেসব বেকার মানুষ স্টিমারটাকে দেখার জন্য সমুদ্রের ধারে ভিড় করেছে তাদের মধ্যে গুড্উইনও আছে। কারণ, প্রেসিডেন্ট মিরা ফ্লোরেন্স যে কোন সময় এসে পড়তে পারেন বলেই তার বিশ্বাস, তাই জাহাজগুলোর ওপর কড়া নজর রাখছে।

স্টিমারটায় কোন যাত্রী-তালিকা না থাকায় কর্তৃপক্ষের সতর্কতা অচিরেই বন্ধ হয়ে গেল!

তখন বিকেল চারটে

এক এক ক'রে বেশ কয়েকটা ছোট-বড় স্টিমার এসে কুলে ভিড়ল।

একটা স্টিমার থেকে একজন যাত্রী জেটি পেরিয়ে গুড্উইন-এর দিকে এগিয়ে এল। কথাবার্তার মাধ্যমে জানতে পারল নবজাত যাত্রীটার নাম স্মিথ্।

একটা প্রমোদ-তরী চেপে সে এখানে এসেছে।

স্মিথ কন্সাল গেড্ডি-এর সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে তাঁর দপ্তরে হাজির হ'ল

কন্সোল গেড্ডি দোলনায় বসে দোল খাচ্ছেন। সে রাত্রে বালহাল্লা-র নৌকাটা তাঁকে সমুদ্র থেকে মৃতপ্রায় অবস্থায় তুলে আনার পর ডাঃ গ্রেগ বহু কষ্টে সুস্থ করে তুলেছিলেন। ডাঃ বলে গিয়েছিলেন, কিছুদিন যেন কোন কারণেই বাড়ি থকে বের না হ'য়।

বোতলটা সমুদ্রের বুকে ভাসতে ভাসতে হারা উদ্দেশ্যে যে কোথায় চলে গেল কেউ-ই তার খোঁজ জানে না।

আর বোতলটা যে সমস্যা সৃষ্টি করে গেল সেটা নিছকই একটা সাধারণ কোন-অঙ্কমাত্র। গণিতের নিয়ম অনুযায়ী এক আর একে দুই হয়। কিন্তু প্রেমের নিয়ম মানলে তা হয় 'এক'।

একটা অদ্ভুত প্রাচীন-কথা প্রচলিত আছে—মানুষের আত্মার অস্তিত্ব দুটো হতে পারে। একটা বাইরের যা সাধারণ কাজকর্মে লিপ্ত থাকে, আর দ্বিতীয়টার অবস্থান অন্তরের অন্তঃস্থলে যা কোন বিশেষ মুহূর্তে জেগে ওঠে। কিন্তু সে উদ্যম ও কর্মক্ষমতায় ভরপুর হয়ে ওঠে।

গেড্ডি-র মধ্যে প্রতিক্রিয়া হয় মৃদু। ভাসমান একটা বোতলের জন্য তিনি যা করেছেন তা গ্রীষ্মে সমুদ্রে সাতার কটার চেয়ে বেশী কিছু নয়।

তিনি 'কন্সাল-এর পদ থেকে ইস্তফা চেয়ে সরকারের কাছে চিঠি লিখে সেটাকে ঘরের টেবিলে রেখে দিয়েছেন।

গেড্ডি ভালই জানেন, ব্রানিংগ্রান অবশ্যই বিয়ের পর তাকে লাভজনক কোন কারবারে নিয়োগ করবেন—নিজের লাভজনক বিভিন্ন কারবারের অংশীদার করে নেবেন। ব্রানিংগ্রান ভবনে এখন তারই প্রস্তুতি জোর কদমে চলছে।

অপরিচিত এক ব্যক্তিকে দরজায় দেখে কন্সাল যন্ত্রচালিতের মত দোলনা থেকে উঠে পড়লেন। চেয়ার দেখিয়ে অভ্যর্থনাসহ তাকে বসতে বললেন। চেয়ারে বসতে বসতে আগন্তুক বললেন—আমার নাম স্মিথ্। এক প্রমোদ-তরী নিয়ে এখানে এসেছি।

সমুদ্রতীরে লম্বা-চওড়া এক ব্যক্তি কন্সাল-অফিসের রাস্তা বাৎলে দেওয়ায় আপনার দরজায় হাজির হয়েছি।

—হ্যাঁ, আপনার জলযানটাকে দেখার পর থেকেই আমি সেটার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেছি।

—জাহাজটার নামকরণ করেছি 'ব্যাম্বলার'। সেটা নিয়ে এই প্রথম আমি সমুদ্র-যাত্রায় বেরিয়েছি। যাক, যে কথা বলতে এসেছি, আমি নিউইয়র্ক থেকে এসেছি। নারকেল, বাঁদর আর কাকাতুয়া তো এখানেই মেলে, তাই না?

—সবই এখানে মেলে।

—এক জায়গায় একটা বড়সড় জাহাজে মাল বোঝাই হচ্ছে দেখলাম। তাতে কোন যাত্রী এসেছে কি?

—জাহাজটার নাম 'কালসিফিন'। না, তাতে কোন যাত্রী তো আসে নি। যাত্রীরা সাধারণও এখানে নামে না। ভ্রমণকারীরা আরও ভাঁটির দিকে একটা বড় পাথরে গিয়ে নামে।

—ধন্যবাদ। আপনাকে আর কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছা আমার নেই।

—আপনি যদি দিন কয়েক এখানে থাকেন তবে আমি সঙ্গে করে এখানকাব চার-পাঁচ জন আমেরিকান আর জনা কয়েক উচ্চাকাঙ্ক্ষী লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি।

—ধন্যবাদ, যাঁদের কথা বললেন তাঁদেব সঙ্গে দেখা করার সাধ থাকলে ও সাধ্য আমার নেই। বেশী দিন এখানে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ভাল কথা, সমুদ্র-তীরের ভদ্রলোকেব মুখে একজন ডাক্তারের কথা শোনলাম। একটু আগে আপনিও—

তাঁর মুখের কথা শেষ হবার আগেই কন্সাল গেড্ডি বললেন—ডাঃ গ্রেগ। পাশের হোটেলটায় গেলেই তাব দেখা পেয়ে যাবেন

কন্সাল-এর অফিস থেকে বেরিয়ে প্রমোদ-তরীব স্মিথ্ হোটেলটার স্থায়ী অতিথি ডাঃ গ্রেগ-এর কাছে গিয়ে নিজেব পরিচয় দিলেন।

ডাঃ গ্রেগ-এর বয়স পঞ্চাশ বা ষাট বছর. মুখে লম্বা দাড়ি। বন্দব-শহরের স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের চাকরি নিয়ে এখানে আছেন।

এখানকার সবচেয়ে বড় শত্রু 'পীতম্বর'।

ডাঃ গ্রেগ সরকার থেকে বেতনও কম পান না। কাজও তো নেই বললেই চলে। আর স্থানীয় মানুষদের চিকিৎসা করেও কম অর্থাগম হয় না।

ঠিক তখনই একজন আদিবাসী দরজায় এসে দাঁড়াল। তাব মুখটা দেখতে অবিকল পশুর মত। বুদ্ধির এতটুকুও ছাপ নেই।

ডাঃ গ্রেগ বললেন—অসুখ কার? তোমার নাকি—।

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই লোকটা কিছুটা দুর্বোধ্য ভাষায় আর কিছুটা ইঙ্গিতের সাহায্য নিয়ে বুঝিয়ে দিল—অসুস্থ স্ত্রী লোকটি তালপাতার ঘরে শুয়ে কোঁকাচ্ছে।

ডাক্তার এক মুঠো ক্যাপসুল তার হাতে গুঁজে দিলেন। আর বোঝাতে চাইলেন, প্রতি দু'ঘণ্টা অন্তর খেতে হবে। তিনি তাকে ব্যাপারটা বোঝাতে বারবার দুটো আঙুল তার সামনে নাড়ালেন আর ঘড়ির ডায়ালের ওপর একটা আঙুল দু'বার ঘোরালেন। ডাক্তার তাকে ব্যাপারটা বোঝাতে পারলেন।

লোকটা বিদায় নিলে ডাক্তার বললেন—মিঃ স্মিথ্, এরা খুবই মুর্খ। যাক গে, এবার বলুন তো, আপনি কোরালিও-তে কিভাবে এলেন?

স্মিথ্ নিজের প্রমোদ-তরীর কথা বললেন।

ডাঃ গ্রেগ বললেন—ন'বছর আগে আমি আমার নিজের শহরে চিকিৎসা-ব্যবসায় নিযুক্ত ছিলাম। একজনের মাথার খুলি থেঁতলে যাওয়ায় আমাকে ডেকে নিয়ে গেল। পরীক্ষা-নিরীক্ষার

পর বুঝলাম, মস্তিষ্কের ওপর একটা হাড়ের টুকরো চাপ প্রয়োগ করছে। ট্রিপ্যাকিং নামক একটা অস্ত্রোপচার করা দরকার।

পরামর্শ-সভায় একজন বিশিষ্ট ডাক্তার বলেন, রক্ত জমাট বেঁধে ওরকম হয়েছে, অন্য আর একজন মন্তব্য করেন, বিস্ফোটকের ব্যাপার।

জরুরী কাজের জন্য স্মিথ তখনকার মত বিদায় নিলেন।

বিকালের দিকে স্মিথ্ সমুদ্রের ধারের একটা নারকেল গাছে হেলান দিয়ে বসল। কতগুলো পোড়া সিগারেট চারদিকে ছড়ানো। নির্দোষ ফলবাহী জাহাজটার দিকে তার লক্ষ্য। তিনি নিঃসন্দেহ হলেন, ওই জাহাজটায় চেপে অবশ্যই কোন যাত্রী এখানে আসে নি।

ভোর হলে দেখা গেল, প্রমোদ-তরীটা নেই। স্মিথও উধাও। সে যে কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছিল তা কেউ জানতেও পারল না।

এদিকে ডাঃ গ্রেগ তার অপেক্ষায় বসে থাকেন। তাঁর বিশ্বাস, স্মিথ্ একদিন না একদিন এসে আবার তাঁর মুখোমুখি বসবেই। আর নারকেল গাছটার চারদিকে কেন পোড়া সিগারেটগুলো ছড়িয়ে রেখেছিল তার রহস্য খুলে বলবে।

মাঞ্চুরিয়ার মানুষ বহু চেষ্টা করে এ ধাঁধাটার উত্তর খুঁজে পায় নি।

কট্

পলায়মান প্রেসিডেন্ট মিরা ফ্লোরেস আর তার সাঙ্গো-পাঙ্গোকে আটকে দেবার যে প্রচেষ্টা করা হয়েছে তা ব্যর্থ হবার কথা নয়।

আলাজান বন্দরে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করার জন্য ডাঃ জাভাল্লা নিজে সেখানে গিয়েছিলেন।

উদারপন্থী দেশব্রতী কোরালিও-তে পাহারায় নিযুক্ত। তার ওপর অবশই ভরসা করা চলে।

আর গুড়উইন নিজে কোরালিও-র নিকবর্তী অঞ্চলগুলোর ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার দায়িত্বে আছে।

যে রাজনৈতিক দলটা ক্ষমতা লাভের জন্য তৎপর তার বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য সদস্যগণ ছাড়া অন্য একজনকেও প্রেসিডেন্টের পলায়নের খবরটা জানতে দেওয়া হয় নি।

সান মাটিও থেকে উপকূল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের টেলিগ্রাফের তারটা জাভাল্লারই কোন এক প্রতিনিধি আগেই কেটে দিয়েছে।

আর গুড়উইন কোরালিওর থেকে উপকূল রেখার এক মাইল পর্যন্ত কড়া সশস্ত্র পাহারার ব্যবস্থা করে রেখেছে। প্রেসিডেন্ট মিরা ফ্লোরেস যেন কোন পরিস্থিতিতেই গোপনে কোন জাহাজে উঠে যেতে না পারেন এরকম কঠোর নির্দেশ পাহারাদারদের ওপর দেওয়া রয়েছে।

গুড়উইন নিঃসন্দেহ যে, পাহারার যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন।

শহরের ঢুকে রাত্রির অন্ধকার নেমে এল। একটু বাদেই কোরালিও শহর গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল

গুড়উইন শিকারী বিড়ালের মত সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে সেনা-শিবিরের দিকে এগোতে লাগল। সেনা বাহিনী গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। রাত্রি ন'টার পর অ-সামরিক কোন লোকের সেনা-হেডকোয়ার্টারের এত কাছে যাওয়া নিষিদ্ধ। কাজের তাগিদে এমন ছোট-খাট ব্যাপারের কথা মনে থাকে না।

হঠাৎ এক সৈনিক চিৎকার করে তার পরিচয় জানতে চাইল। গুড়উইন বলল—'আমেরিকানো'। ব্যস, তাকে আর কোন কৈফিয়ৎ দিতে হ'ল না।

গুড়উইন ডান দিকের চৌরাস্তায় গিয়েই হঠাৎ থেমে গেল। দেখল, লম্বা একটা লোক কালো ব্যাগ হাতে লম্বা-লম্বা পায়ে সমুদ্রের দিকে যাচ্ছে। অনুসন্ধিৎসু নজরে তাকিয়ে সে দেখল, পুরুষটার সঙ্গে এক নারীও রয়েছে। সে বুঝে নিল, তাদের কেউ-ই কোরালিও-র বাসিন্দা নয়।

গুড্উইন চলার গতি বাড়িয়ে দিল। তাদের অনুসরণ করতে লাগল। তবে গোয়েন্দাসুলভ মনোভাবে নিয়ে অবশ্যই নয়।

পুরুষ ও নারী উভয়েই পথের ধারের হোটেল ডিলস এস্ট্রাঞ্জেরস-এ ঢুকে গেল।

গুড্উইন নির্জন-নিরালা পথের ধারে দাঁড়িয়েই একটা চুরুট ধরাল, আর হোটেলটার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে লাগল।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই পরামাণিক ডেলগাডো সে পথ দিয়ে বাড়ি ফিরে যাবার সময় গুড্উইনকে দেখে সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ল। সে একজন উদারপন্থী। একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার জন্য সে গুড্উইন-এর মুখোমুখি দাঁড়াল।

ডেলগাডো বলল—তুমি কি জান গুড্উইন, যে দাঁড়িওয়ালা লোকটার খোঁজে তোমরা হন্যে হয়ে ছুটোছুটি করছ—যাকে তোমরা দেশের প্রেসিডেন্ট বল—আজ আমি তাঁর দাড়ি কামিয়েছি। এক বুড়ির ভাঙা কুঁড়ে ঘরে ছিলেন। আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

—হুম!

—হ্যাঁ। মনে হ'ল, তাঁকে কেউ দেখে ফেলুক এটা তার অভিপ্রায় নয়।

—কি করে বুঝলে?

—যে লোকটা আমাকে ডেকে নিয়ে যায় সে বলে, যার দাড়ি তুমি কামাবে তার মুখ তুমি দেখতে পারবে না।

—তারপর—তারপর?

—আমার হাতে একটা মোহর গুঁজে দিয়ে বলল, আমি যেন কিছুতেই তার মুখের কাপড়টা পুরোপুরি না সরাই।

—ভেবে বলবে, এর আগে প্রেসিডেন্ট মিরা ফ্লোরেস'কে কোথাও, কোন দিন দেখেছ?

—একবার মাত্র। লম্বা-চওড়া চেহারা। সুন্দর দেখতে। মুখভর্তি কালো গোঁফ।

—আর একটা বলতো—।

—কি? কি কথা জানতে চাইছেন, বলুন?

—তার সঙ্গে আর কাউকে দেখেছ? কোন মহিলা—

তার কথা শেষ হবার আগেই পরামাণিক ডেলগাডো ব'লে উঠল—হ্যাঁ, খুবই সুন্দরী এক মহিলা।

—তোমাকে ধন্যবাদ! নতুন শাসকদল গদিতে বসলে তোমার কথা অবশ্যই ভুলে যাবে না।

এবার সে পরামাণিককে হোটেলের ব্যাপারটা বলল, আর সে যেন হোটেলটার দিকে কড়া নজর রাখে। কেউ যেন বেরিয়ে যেতে না পারে।

গুড্উইন এবার হোটেলের সদর-দরজায় গিয়ে দাঁড়াল।

হোটেলের মালিক তাকে দেখেই দৌড়ে এল, স্বাগত জানাল।

গুড্উইন বলল—আজ রাত্রে কি তোমার হোটেলে কোন অতিথি এসেছে?

—এই তো একটু আগেই এসেছেন। ওপরের ঘরে থাকতে দিয়েছি।

—ক'জন?

—দু'জন। একজন পুরুষ তার দ্বিতীয়জন এক সুন্দরী মহিলা।

খাওয়া দাওয়ার কথা কিছু বলেছে?

—ওপরের ন'নম্বর আর দশ নম্বর ঘরে আছেন। বলে পাঠিয়েছেন আহার বা পান কিছুই করবেন না।

জরুরী পরামর্শের অজুহাতে হোটেল মালিকের অনুমতি নিয়ে গুড্উইন সিঁড়ি-বেয়ে ওপরে ওঠার সময় হাত দিয়ে দেখে নিল। পিস্তলটা জায়গা মতই আছে।

তারপর সে ন'নম্বর ঘরের হাতল ঘুরিয়ে সোজা ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল। পরমুহূর্তেই সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

ঘরের কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই গুড্উইন ব্যস্ত হাতে টুপিটা খুলে বলল—'শুভ সন্ধ্যা ম্যাডাম। পাশের ঘরে কে আছেন, আমি ভালই জানি। আমি কারও নাম উল্লেখ করতে

চাই না, আর তার চামড়ার ব্যাগে কি আছে তা-ও আমার অজানা নয়। আর সেটার লোভেই আমি এখানে হানা দিয়েছি। যদি আপত্তি না থাকে তবে আমি আত্মসমর্পণের শর্ত জানাই।

মহিলাটি নির্বাক, নিশ্চল-নিথর পাথরের মূর্তির মত ঠায় বসে রইল। গুড়উইন এবার বলল—শুনুন, দেশের অধিকাংশ মানুষের মুখপাত্র হয়ে আমি কথা বলছি, মানে দাবী করছি। তাদের যে অর্থ চুরি করা হয়েছে তা ফেরৎ দেওয়া হোক। আর যদি আমাদের দাবী মেনে নেওয়া হয় তবে এ ব্যাপারে আমরা আর হস্তক্ষেপ করব না। ডলারের থলিটা আমার হাতে দিয়ে দিন। আর আপনিও আপনার সঙ্গীর ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করুন। আমার কথায় রাজী হলে, দেশবাসীর বাঞ্ছা পূরণ হলে আপনাদের জাহাজে চেপে পালিয়ে যাবার ব্যাপারে সাহায্য করব।

ভদ্রমহিলা এবার মুখ খুললেন— আপনার সব কথাই তো আমি ধৈর্যের সঙ্গে শোনলাম। এবার জানতে পারি কি, আমি কার দ্বারা অপমানিত হচ্ছি?

—দেখুন, আমার কাজ এবং উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন রকম গোপন উদ্দেশ্য নেই।

এ অধমের নাম ফ্রাংক গুড়উইন। স্রেফ ডলারগুলোর জন্য আপনাকে বিরক্ত করতে আসতেই হয়েছে। আপনার সঙ্গী লোকটা দেশবাসীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, লুঠ করেছে তাদের অর্থ, তাঁর সঙ্গে যদি আমাকে দেখা করতেই হয়, আর যদি প্রমাণিত হয়ে যে, তিনি একজন সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মী তবে কিন্তু তাঁকে গ্রেপ্তার করা ছাড়া আমার কোন উপায়ই থাকবে না। এ বাড়িটা ঘিরে ফেলা হয়েছে। তার চেয়ে বরং ডলার ভর্তি থলেটা আমার হাতে তুলে দিন, আমি মুখ বুঝে চলে যাই।

—আমি জানতে চাইছি, কোন অধিকারে আপনি আমাদের শান্তিভঙ্গ করতে এসেছেন?

—আমি প্রজাতন্ত্রের একটা অংশ বিশেষ। দশ নম্বর ঘরের ভদ্রলোকের গতিবিধি আমাকে টেলিগ্রাম মারফৎ আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

—শুনুন, ঠাণ্ডা মাথায় আমার কথা ভেবে দেখুন—আশা ছাড়বেন না মশায়। আপনার কথা আর কাজের মধ্যে আমি এমন এক গন্ধ পাচ্ছি যে আপনি বর্তমানে যে অবস্থায় আছেন, ভবিষ্যতেও ঠিক এমনি তুচ্ছ হয়েই থেকে যাবেন। কোথাও যেন একটা ভুল হচ্ছে, কিন্তু কোথায় বলতে পারছি না। যাক, তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। আজ রাত্রে তাকে আমি বিরক্ত করতে পারব না। একটা কথা, একটু আগেই আপনি তো বললেন, চোরাই অর্থ, ঠিক কিনা?

—হ্যাঁ, যা সত্য, তা-ই বলেছি।

—ভাল কথা, আপনার বাঞ্ছিত চামড়ার কালো ব্যাগটা এনে আপনাকে দেখাচ্ছি। এরপরও আমি বলব, কোথাও যেন একটা বড় রকেমর ভুল হচ্ছে।

কথা বলতে বলতে মহিলা দরজার দিকে পা-বাড়ালেন। গুড়উইন তাঁর বাহু স্পর্শ করে তাকে আটকে দিল।

তারপর বলল—দেখুন, ভুল যদি কিছু হয়েই যাকে তবে তা অবশ্যই আপনিই করেছেন। দেশবাসীর যে অর্থ নিয়ে পালিয়ে এসেছেন তার জন্য তাকে যতটা দোষ আমি দিচ্ছি তার চেয়ে বেশী দোষ আমি আপনাকে দেব।

মহিলা কণ্ঠস্বরে বিরক্তি প্রকাশ ক'রে বললেন—আপনার কথার মাথা মুণ্ডু কিছুই আমি বুঝছি না। আর থলেটা দেখার পর যদি আপনি আমাদের রেহাই দেন তবে সেটা দেখালেই ল্যাটা চুকে যায়। আর তাই করি।

একটু বাদেই বড় সড় একটা কালো থলে নিয়ে মহিলা ঘরে ঢুকে গুড়উইন-এর সামনে খুলে ধরলেন।

গুড়উইন থলের ভেতর থেকে দু'-তিনটে পোশাক টেনে বের করল। পরমুহূর্তেই বাঞ্ছিত পুটলিটা বেরিয়ে এল। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্ক ও ট্রেজারির নোটের গোছা। গুণে দেখা গেল মোট অর্থের পরিমাণ এক লক্ষ মার্কের কাছাকাছি।

গুড়উইন এবার মুহূর্তের জন্য মহিলার মুখের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করল, তিনি ভয়ানক আঘাত পেয়েছেন।

গুড়উইন নিঃসন্দেহ হ'ল, সরকারী নোটগুলোর কথা তার আদৌ জানা ছিল না। তারপর

ভাবল, এ ভ্রাম্যমাণ, বিবেকহীন গায়িকাকে নষ্ট চরিত্রের নারীরূপে বার বার ব্যক্ত করার পরও সে-ই বা তাকে কেন অন্য রকম ভাবতে উৎসাহী হচ্ছে?

ঠিক সে মুহূর্তেই দরজাটা সপাটে খুলে গেল। দরজায় দাঁড়িয়ে দশ নম্বর ঘরের লম্বা, বয়স্ক আর সদ্য দাড়ি—কামানো এক কালো মানুষ।

সব ছবিতেই প্রেসিডেন্ট মিরা ফ্লোরেস-এর মুখটা দেখা যায় দাড়ি ভর্তি। কিন্তু এ ব্যাপারটা তো পরামাণিক ডেল্‌গাভো আগেই বলে রেখেছে।

কালো লোকটা আচমকা এক লাফ দিয়ে ঘরে ঢুকেই বলে উঠলেন—এ সবের অর্থ কি? জানতে চাই। এখানে ডাকাতি করতে এসেছ?

—ডাকাতি করতে নয়, ডাকাতিকে ঠেকাতেই আমাকে এখানে ছুটে আসতে হয়েছে। গুড্‌উইন কর্কশ স্বরে জবাব দিল। শুনে রাখুন, পকেটে হাত ঢোকানোর আগেই আপনাকে গ্রেপ্তার করা হবে।

কালো মানুষটা পকেটে হাতটা চালান করার চেষ্টা করা মাত্র গুড্‌উইন-এর পিস্তলটা গর্জে উঠল। সঙ্গে একটা ভারি জিনিস মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ল।

গুলির শব্দে পরামাণিক ডেলগাভোই কেবল নয়, শহরের অর্ধেক মানুষ ঘুম ভেঙে হুড়মুড় করে উঠে পড়ল।

গুড্‌উইন এখন দেশের রাজকোষের জিম্মাদার। নোটভর্তি থলেটাকে সে দ্রুত জানলা দিয়ে বাইরের অন্ধকার কমলালেবু বাগিচার ভেতরে ফেলে দিল।

শহরের অগণিত মানুষ ছুটোছুটি করে হোটেলে হাজির হ'ল।

গুড্‌উইন আর পরামাণিক সনাক্ত করল, রক্তাপ্লুত ব্যক্তি পদচ্যুত প্রেসিডেন্ট। পরদিন ভোর হতে না হতেই টেলিগ্রাফের তার মেরামত করে দেওয়া হল। আর প্রেসিডেন্টের পলায়নের ঘটনাটা জনসাধারণের কাছে বাতাসের কাঁধে ভর দিয়ে প্রচার হয়ে গেল।

শহরের শেষপ্রান্তের একটা ছোট সেঁতুর কাছে বিনা মর্যাদায় মৃত ব্যক্তিকে সমাধিস্থ করা হল।

ক্ষমতার অধিকারী হ'ল গুড্‌উইন। আর ডোনা ইসাবেল গুইলবার্ট-এর পরবর্তী দিনগুলোতে গুড্‌উইন তার পাশে পাশে রইল। সে তার জীবনের সব দোষ-ত্রুটিকে মন থেকে মুছে ফেলল। আর তারা বিয়ে করে সুখে দিনাতিপাত করতে লাগল।

তবে কোরালিও-র অধিবাসীদের পক্ষে বলা সম্ভব নয়, গুড্‌উইন যে সে রাত্রে অন্ধকার কমলালেবুর বাগিচায় চামড়ার কালো থলেটা ফেলে দিয়েছিল সেটার কি গতি হ'ল? থাক সে কথা পরেই না হয় আলোচনা করা যাবে।

কুপিডস্ একসাইল নাম্বার টু

কন্সাল-এর পদ থেকে উইলার্ড গেড্ডি পদত্যাগ করার পর যুক্তরাষ্ট্রের কন্সাল-এর পদে আলাবাসার অন্তগর্ত ডেলস্‌বার্গ-এর অধিবাসী জন ডি গ্রাফানুবিড এটউড-কে নিযুক্ত করা হ'ল।

প্রাক্তন কন্সাল গেড্ডি মদনদেব-এর নির্বাসিত ভক্তের অভিনয় করতেই জুতোর.বাজারে সফল ব্যবসায়ীতে পরিণত হন।

কিন্তু গোলমালটা বাঁধতেও দেরী হ'ল না। ডেলসবার্গ-এ এলিজা হেমসেটার নামক এক ব্যক্তির একটা ছোট দোকান আছে। রোজিন নামে তার একমাত্র মেয়ে ছাড়া তার পরিবারে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি নেই।

উদ্ভিন্ন যৌবনা রোজিন-এর বিভিন্ন আকর্ষণ আছে। স্থানীয় যুবকদের মনে সাগরের উন্মাদনা জাগিয়ে তোলায় তার জুড়ি নেই।

সে সবচেয়ে মাতিয়ে তুলল জনি'কে। জাস্টিস এটউড-এর ছেলে। যুদ্ধের আগেই থেকেই এটউড পরিবার প্রভাবশালী বংশ বলে খ্যাত।

এটা তো খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার যে, রোজিন এমন একটা পরিবারের যুবককে খুশি মনেই বুকের ভালবাসা উজাড় করে দিল। বিয়ে করে তার রাজকীয় প্রাসাদে যেতে সম্মতিও সে দিয়েছে। কিন্তু ভাগ্য বাদ সাধল। দিগন্তে দেখা দিল পুঞ্জীভূত কালো মেঘ।

সে অঞ্চলেরই এক জোতদারের যুবক ছেলে সাহসে ভর ক'রে জনি-র সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামল। এটউড বংশের মেয়েকে বুকে পাবার জন্য সে সক্রিয় হয়ে উঠল।

এক রাত্রে রোজিন-এর কাছে জনি এমন একটা প্রশ্ন করল যা একটা যুবকের কাছে নিঃসন্দেহে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা যেতে পারে।

কিন্তু রোজিন-এর উত্তরটা জনি-র মোটেই মনঃপূত হ'ল না। সে নীরবে তার কাছে থেকে চলে গেল কিন্তু এতে তার বংশমর্যাদা আর প্রেমিক-মন দু'-ই টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

আশ্চর্য ব্যাপারই বটে! একজন এটউড যুবককে প্রত্যাখ্যান্। অভাবনীয়, একেবারেই অবিশ্বাস্য।

সে বছরের বহু দুর্ঘটনার মধ্যে একটা হচ্ছে এক গণতান্ত্রিক প্রেসিডেন্টের অপঘাতে মৃত্যু। এটউড একজন গণতন্ত্রের পূজারী।

জনি তার বাবার সাহায্যে কোরালিও-র কন্সাল নিযুক্ত হ'ল। তার এ স্বেচ্ছা নির্বাসন গ্রহণের কারণ একটাই, রোজিন বুঝুক যে, তার প্রেম নিখাদ আর সে যথার্থই বিশ্বস্ত। তার অবর্তমানে রোজিন-এর চোখ থেকে অন্তত দু'ফোঁটা জল তো পড়বেই

রোজিন-এর কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্য জনি তাদের বাড়ি গেল। সেখানে গিয়ে তাকে পিংক ডসন-এর মুখোমুখি হতে হ'ল।

কথা প্রসঙ্গে পিংক ডসন চারশ একর ফল বাগিচা, দু'শ একর গো-চারণ ভূমি আর তিন মাইল জুড়ে পাতাওয়ালা ঘাসের জমির গল্প শোনাল।

বিদায় মুহূর্তে জনিও নিতান্ত নিস্পৃহভাবে, দায়সারা গোছের ভাব নিয়ে রোজিন-এর সঙ্গে করমর্দন সারল।

ব্যস, আর দেরী না করে জনি মোবাইল একটা ফলবাহী জাহাজে চেপে কোরালিও-র উদ্দেশে যাত্রা করল।

জনি-র বয়স মাত্র বাইশ।

প্রথম দর্শনেই বিলি কিয়োখ নবাগত জনি-এর সাথে বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেলল। নব নিযুক্ত কন্সালকে সঙ্গে নিয়ে কোরালিও শহরটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাল এবং সমাজের মানুষগুলোর সাথে পরিচয় করতেও সাহায্য করল।

প্রাক্তন কন্সাল একদিন অফিসে এলেন নতুন কন্সালকে কাজকর্ম বুঝিয়ে দেবার জন্য।

দু'-চার কথার পর জনি মুচকি হেসে বল্‌ল—দেখুন মশায়, কাজ করার বাসনা নিয়ে তো আর আমি সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এখানে আসিনি।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে প্রাক্তন কন্সাল তার মুখের দিকে তাকালেন।

—সত্যি বলছি, আমি পৃথিবীর এমন একটা জায়গায় যেতে চেয়েছিলাম যেখানে কেউ জমিজমার কথা বলে না।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, ঠিক তাই। আচ্ছা মশায়, এখানে তো সেরকম কেউ নেই, নাকি আছে?

—আপনি যাদের কথা বলছেন, সেরকম কারো দেখা পাবেন না। চাষ-বাসের কারবার এখানে নেই। লাঙল আর কাস্তে মাঞ্জুরিয়ায় কোনদিন ছিল না। আজও নেই।

—চমৎকার। চমৎকার। এরকমই একটা দেশ আমার কাম্য।

টিনের কারবারী কিয়োখ সুযোগসন্ধানী ও মতলববাজ। ভাবল, নবনিযুক্ত কন্সাল-এর সঙ্গে একটু আন্তরিক ভাবে মেলামেশা করে তার মন জয় করতে পারলে আখেরে ফল পাওয়া যাবে।

এক বিকালে কিয়োখ আর জনি সমুদ্র সৈকতে পাশাপাশি কাছাকাছি বসে গল্পে মেতেছে।

'আণ্ডারডোর' নামে একটা ফলবাহী জাহাজ দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাল বোঝাই অবস্থায় সেটা যাত্রার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। পরদিন সকাল ছ'টায় স্টিমারটার ছাড়ার কথা।

একটু বাদেই একটা সলুপ ভাসতে ভাসতে তীরের দিকে এগোতে লাগল। আরও কিছুটা এগিয়ে আসতেই সলুপটার ভেতর থেকে মিষ্টি-মধুর স্বরের গান ভেসে আসতে লাগল।

গানটা শোনার পর ডেলেসবার্গ-র কথা জনি-র অন্তরের অন্তঃস্থলে জেগে উঠল।

কিন্তু কিয়োখ-র মনে ভ্রাম্যমাণ সঙ্গীত লহরী সম্পর্কে একটা ভাবনার উদয় হওয়ামাত্র সে দৌড়ে সমুদ্রের একেবারে গায়ে গিয়ে দাঁড়াল।

ঠিক সে মুহূর্তেই সলুপের ভেতর থেকে ভেসে এল—বিলি, বিদায়! বিদায় বিলি! দেশে ফিরে যাচ্ছি—বিদায়!

সলুপটায় চেপে সে ফলবাহী জাহাজটায় গিয়ে উঠল। মুহূর্তের মধ্যেই সে জাহাজের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কিয়োখ এবার জনি'কে ব্যাপার বুঝিয়ে দিতে গিয়ে বলল— ওনাকে আপনি চেনেন না, তাই না। উনি হচ্ছেন বুড়ো এইচ. সি. মেলিঞ্জার। নিউইয়র্কে ফিরে যাচ্ছেন। পালিয়ে-যাওয়া প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন। তার কাজ ফুরিয়েছে। তাই নিজের বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। এদেশে মেলিঞ্জার-এর একটা ধাপ্পাবাজি কারবার ছিল। যা পৃথিবীতে একটাই ছিল।

—ধাপ্পাবাজির কারবার? ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমি বিস্তারিতভাবে শুনতে চাচ্ছি। আশাকরি আমাকে হতাশ করবেন না।

—দেখুন, আমি গপ্প বলিয়ে নই।

—তা হোক, আমি ধাপ্পাবাজির কাহিনীটা শুনতে অত্যুগ্র আগ্রহী।

কিয়োখ বলল—বলব। তবে আমি তো বলেছিই, গপ্প বলার ক্ষমতা আমার নেই বললেই চলে। আপনি তো বিশ্বাসই করছেন না। ধাপ্পাবাজির ব্যাপারটাকে আমি কলা আর বিজ্ঞানের মতই আয়ত্ত করে ছিলাম।

দ্য ফোনোগ্রাফ অ্যাণ্ড দ্য গ্রাফ্‌ট

গপ্প শোনার জন্য পাগল মানুষদের মতাজনি অত্যুগ্র আগ্রহান্বিত হয়ে বলল—এখানে ধাপ্পাবাজিটা কি ছিল, বলুন তো?

কিয়োখ বলল—আপনি যখন নিতান্তই নাছোড়বান্দা তখন না বলে আর উপায় কি? বলছি তবে শুনুন—আমি আর হেনরি হর্সকলার প্রথম ফোনোগ্রাফটা এদেশে এনেছিলাম। হেনরি ছিল এক জন চিরোকী। পূর্ব দেশে ফুটবল খেলা শিখেছিল, হুইস্কির অভ্যাসটা রপ্ত করেছিল পশ্চিম দেশে। সে কিন্তু আপনার আমার মতই একজন তথাকথিত ভদ্রলোক ছিল। তার উচ্চতা ছিল পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি নইলে পাঁচ ফুট এগারো।

হেনরি একবার কলেজ ছেড়েছিল আর তিনবার ছেড়েছিল মাস্কোজী জেল। তাকে শেষের প্রতিষ্ঠানটায় আশ্রয় নিতে হয়েছিল এদেশে হুইস্কি চালু আর বিক্রির অপরাধে।

টেক্সারকাশায় হেনরি-র সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। সেখানেই ফোনোগ্রাফের মতলবটা প্রথম আমার মাথায় খেলে।

সংরক্ষিত একটা জমির লেন-দেন মারফৎ তার হাতে আসে তিনশ'ষাট ডলার।

আমি লিটল রক-এর সদর-রাস্তা থেকে একটা মর্মান্তিক ঘটনার মুখোমুখি হয়ে পালিয়ে এসেছিলাম।

একটা লোক পথের ধারে দাঁড়িয়ে কিছু সোনার ঘড়ি আর ছোটখাটো শৌখীন জিনিস বিক্রি করছিল। ঘড়িগুলোর পিছন দিকটা স্ক্রু দিয়ে শক্ত করে আটকানো। কিন্তু সেটাকে কানের কাছ ধরতেই ভেতর থেকে একটা নরম সুরের মজাদার টিক্‌টিক্ শব্দ শোনা যেত।

এক প্লেট ঘড়ির মধ্যে আসল বস্তু ছিল মাত্র তিনটে। আর বাকিগুলো সবই ছিল নকলি মাল।

হেনরি নগদ টাকা দিয়ে একটা খালি বাক্স খরিদ করল। তার ভেতরে ভরা ছিল একটা গুবড়ে পোকা যা সব সময় টিক্ টিক্ আওয়াজ করে।

লোকটা মুহূর্তের মধ্যে দু'শ অষ্টআশি ডলার বাগিয়ে নিয়ে কর্পূরের মত উবে গেল। ধাপ্পাবাজটা জানত যে, লিটল রক-এ থাকতে থাকতে যদি ঘড়িতে চাবি দেওয়ার দরকার হয় তবে ঘড়ির কারিগর নয়, এক কীটতত্ত্ববিদকে তলব করতে হবে।

যে কথা বলছিলাম, আমার ছিল দু'শ অষ্টআশি ডলার আর হেনরি-র ছিল তিনশ' ষাট ডলার।

দক্ষিণ আমেরিকায় ফোনোগ্রাফ চালু করার ধান্ধাটা প্রথম হেনরি-র মাথায়ই উদয় হয়েছিল।

আর আমার ছিল যন্ত্রপাতির ব্যাপারে অত্যুগ্র আগ্রহ। তাই আমিও বিনা বেতনে ফোনোগ্রাফ তৈরীর কাছে মেতে উঠলাম।

হেনরি কলেজ পড়ার সময়ই বড় বড় কথার নাগড় ছিল। সে ভাব নিয়েই আমাকে বলল—ফোনোগ্রাফ নিয়ে লাতিন দেশের মানুষগুলো হুজুগে মেতে উঠবে।

আমরা টেক্সারখানা থেকে ভাল একটা ফোনোগ্রাফ আর আধ-বাক্স রেকর্ড খরিদ করে নিয়ে এলাম। তারপর সেগুলো নিয়ে নিউ অর্লিয়েন্সে এসে দক্ষিণ আমেরিকার স্টীমারে চেপে বসলাম। নামলাম সলিটাস শহরে।

সলিটাস জায়গাটা চমৎকার। সমুদ্র শহরটাকে ছুঁয়ে রেখেছে। তার ওপর নারকেল গাছের সারির সৌন্দর্য তো আছেই।

আমাদের সঙ্গে জাহাজের ক্যাপ্টেনও তীরে নামলেন।

ক্যাপ্টেন যুক্তরাষ্ট্রের কন্সালের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আর একটা সাদা ফুট-ফুটওয়ালা মানুষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। লোকটা মার্সিনারি অ্যাণ্ড লাইসেন্সার দপ্তরের সর্বোচ্চ পদাধিকারী।

এক সপ্তাহ পরে আবার এখানে স্টীমার থামাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্যাপ্টেন বিদায় নিলেন।

আমরা শহরে ঘুরে ঘুরে আমাদের নিকেল-করা প্রধান গায়িকার মুখে সুমার বাজনার দলের টিনের খনির শ্রমিকদের নক্সা সুর শুনিয়ে কাড়ি কাড়ি ডলার কামিয়ে নেবার ধান্ধা করতে চাই শুনে ক্যাপ্টেন বলেছিলেন, আমাদের নাকি কৌশলে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হবে।

কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন, কোন বহিরাগত এখানে পা দিলেই ধরে নেওয়া হয়। সে এগ্‌লিস মামন আর দুধের দোকানের লোক।

শেষমেশ তিনি আমাদের পরামর্শ দিলেন, সমুদ্র সৈকতে দাঁড়িয়ে আমরা যেন যন্ত্রটাকে বাজাতে থাকি—আমার বাড়ির নেইকো জুড়ি।

হেনরি ব্যুরো অব মেশিনারি ডিপোজিশন থেকে বিশ ডলার দিয়ে লাল মোহর আর স্থানীয় ভাষায় লেখা একটা গপ্পের কাগজ খরিদ করে আনল।

আমরা কন্সালের সঙ্গে দেখা করলাম। ভদ্রলোক মদের নেশায় টলছেন। বয়স পঞ্চাশোর্ধ। আমার ধারণা, তিনি ওলন্দাজ জাতীয়। আর হাবভাব বলে দিল, দুঃখ-যন্ত্রণায় ভুগছেন।

আমাদের উদ্দেশ্যের কথা শুনে তিনি হাসতে হাসতে বললেন, দেখুন, ফোনোগ্রাফ নামক যন্ত্রটা আজও সমুদ্র তীরের মানুষগুলোর মনে স্থান পায় নি। আসলে এরা যন্ত্রটা ব্যবহার বা দেখা তো দূরের কথা, নামই শোনে নি। আর নাম শুনেও এর কার্যকারিতার কথা তারা বিশ্বাসই করবে। আসলে টিনের একটা বাদ্যযন্ত্রকে তারা পাত্তাই দেবে না। তবে লোকে যখন ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে তখন যন্ত্রটা বাজিয়ে দেখতে পারেন।

আমরা সমস্বরে বলে উঠলাম—তারপর?

ব্যাপারটা তাদের মধ্যে দু'রকমভাবে কাজ করতে পারে। এক, হয় বাজনা শুনে তারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়তে পারে, নতুবা উত্তেজিত কুড়ুল দিয়ে টুকরো টুকরো করে দিতে পারে। আর তোমাদের স্থান হবে কয়েদখানা।

—তা-ই যদি করে তবে আপনার ভূমিকা কি হবে?

—তখন কর্তব্য অনুযায়ী স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে টেলিগ্রাম করব। তারপর তোমাদের গুলিবিদ্ধ

রক্তাপ্লুত দেহ দুটোকে তারকা ও ডোরাখচিত পতাকা দিয়ে মুড়ে জনারণ্যকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সোনা রপ্তানিকারক ও বৃহত্তম সংরক্ষিত অর্থ তহবিলের মালিক মহাদেশের প্রতি হিংসাপরায়ণতার কথা বলব।

তার মুখ থেকে এরকম ভয়ঙ্কর সব কথা শুনেও আমরা সেদিন বিকালেই কালে ডিলস এঞ্জেলেসের বড় রাস্তার ওপরে একটা কামরা ভাড়া করে বাক্সটাকে নিয়ে হাজির হলাম।

পরদিন সকালে যন্ত্রটাকে নিয়ে রাস্তায় বেরোবার চিন্তা করতেই সাদা পোশাক পরিহিত এক সাদা চামড়ার মানুষ আমাদের কামরাটায় এল।

ঠোঁট থেকে চুরুটটা নামিয়ে আগন্তুক বলল—নিউইয়র্ক থেকে আসছেন বুঝি?

আমরা বললাম—হ্যাঁ, নিউইয়র্কেরই বটে। তবে সেখানে থাকি খুব কম।

—আপনাদের ভেস্টের কাটছাঁট দেখেই ধরে নিয়েছি। আসলে কোট সবাই কাটতে পারে বটে, কিন্তু এরকম ভেস্ট খুব কম জায়গায়ই কাটতে পারে।

তারপর লোকটা আমাদের কোট আর মুখের দিকে তাকিয়ে ব'লে উঠল—আরে তোমরাতো এখানে বাজেয়াপ্ত মাল হয়ে গেলে। যাক গে, তোমাদের চালু করার দায়িত্ব আমি স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিলাম। তোমাদের দীক্ষিত করতে হবে।

—দীক্ষিত!

—হ্যাঁ, দীক্ষিত। একটা মদের বোতল খুলে তোমাদের কপালে ঢেলে দিয়ে দীক্ষা দেব।

লোকটার নাম হোমার পি. মেলিঞ্জার।

আমাদের উদ্দেশ্যের কথা শুনে হোমার পি. মেলিঞ্জার দু'দিনের মধ্যেই কাজ গুছিয়ে নিলেন। মাঞ্চুরিয়ার তিনি একজন প্রভাবশালী লোক। তিনি হেনরি আর আমার অভিভাবক সেজে মাথার ওপরে রইলেন। আমাদের মধ্যে গলায় গলায় বন্ধুত্বও হয়ে গেল।

আমরা ফোনোগ্রাফটা সঙ্গে নিয়ে শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। বহু মেলা আর উৎসবেও গেলাম। ভিড়ের মধ্যে যন্ত্রটা চালিয়ে দিয়ে আমরা সবার আগ্রহের দিকটায় নজর রাখতে লাগলাম।

আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে লাগল। অর্থকড়ির সব দায় হোমার পি. মেলিঞ্জার-এর। কোথা থেকে যে তিনি এত অর্থ জোগান দিতে লাগলেন তা স্বয়ং ঈশ্বরও বুঝি জানেন না। আমরা যা বুঝলাম, সে ইচ্ছা করলে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ও গড়তে পারে, আর তাতেও দেশের লোকের ভোট কেনার মত অর্থের অভাব হবে না।

তার ধাপ্পাবাজির ব্যাপারটা নিয়ে হেনরি আর আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম। কিন্তু কোন কূল কিনারাই পেলাম না।

এক সন্ধ্যায় মদের গ্লাস হাতে নিয়ে আমাদের কাছে সব কথা খোলসা করে বলল।

সে বলল, 'বন্ধু', তোমরা ভেবো না, আমি বাড়িয়ে কিছু বলছি। আমি এদেশের সবচেয়ে পরিশ্রমী মানুষ। দশ বছর আগে আমি এখানে জাহাজ থেকে নামি। দু'বছর হয়ে গেল, আমি এদের প্রায় গ্রাস করে ফেলেছি। তোমরা আমার দেশের মানুষ। আর বন্ধু হিসাবেও বুকে ঠাঁই দিয়েছি।

বর্তমানে আমি এ প্রজাতন্ত্রী দেশের প্রেসিডেন্টের সচিবের পদে বহাল আছি। এখানকার অর্থকড়ির বিলে আমার নাম না থাকলে কলকাঠি আমিই নাড়াই। এইচ. পি. মেলিঞ্জার খসড়া করে দেয় নি এমন একটা প্রস্তাবও কংগ্রেসে হাজির করা হয় না, কোন সুযোগ-সুবিধাও আমার অজান্তে কেউ পায় না।

কোন কূটনীতিক প্রেসিডেন্টের দর্শনপ্রার্থী হয়ে এখানে এলে তাদের সঙ্গে গোপন যন্ত্রপাতি বা ডিনামাইট আছে কিনা আমাকেই পরীক্ষা করতে হয়। আবার পিছনের ঘরে বসে আমিই এ রাজ্যের মূল নীতিগুলো রচনা করি। মোদ্দা কথা, আমার অঙ্গুলিহেলনেই সরকার চলে।

তোমরা হয়ত অবাক হয়ে ভাবছ, এমন অসীম ক্ষমতা আমি কি ক'রে অর্জন করলাম, তাই না? আসলে এমন বাটপাড়ি তো দুনিয়ায় একটাই আছে।

তারপর ম্লান হেসে সে আবার মুখ খুলল, ছোটদের হাতের লেখার খাতায় বড় বড় হরফে লেখা থাকে, সততাই সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি—থাকে না?

আমরা দু'জন একই সঙ্গে ঘাড় কাৎ করলাম।

সে বলে চলল—দেখ, সততাকেই আমি ধাপ্পাবাজির কৌশল হিসেবে ব্যবহার করি। কেন না, এ রাজ্যে আমিই একমাত্র সততার ধ্বজাধারী লোক, সবাই জানে, আমি সর্বদা সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতার মূল্য দেই। কাউকে কোন কথা দিলে সেটা অবশ্যই রক্ষা করি। কেউ একচেটিয়া কারবার করার সুযোগ আমার কাজ থেকে পায় না। তাই তো ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এখানে কোন রকম প্রতিযোগিতার প্রশ্নই ওঠে না। আর কাড়িকাড়ি ডলার ঢেলে এখানে ব্যবসা করার সুযোগ নেই। তাই এখানকার মানুষ নাকে তেল দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে।

এইচ. পি. মেলিঞ্জার এক নিঃশ্বাসে এমন একটা দীর্ঘ ভাষণ দেওয়ার পর মুহূর্তের জন্য থামল।

একটু দম নিয়ে তিনি আবার মুখ খুললেন, এবার কি বলছি, ধৈর্য ধরে শোন, শহরের কয়েকজন নাগরিককে নিয়ে আজ সন্ধ্যায় একটা সঙ্গীতের আসরের ব্যবস্থা করেছি। আমি আশা করছি, যন্ত্রটা নিয়ে তোমরাও সেখানে উপস্থিত থাক, আপত্তি আছে?

আমরা সমস্বরেই ব'লে উঠলাম, না না, আপত্তির কি থাকতে পারে।

—আর তোমরা এমন একটা ভাব ফুটিয়ে তুলবে বাইরে থেকে যাতে ব্যাপারটাকে একটা উৎসব বলেই মনে হয়, বুঝলে।

আমরা উভয়েই মুচকি হেসে আবার ঘাড় কাৎ করলাম।

—কিন্তু সেটা কোথায় করা যায়, ভাবছি।

জায়গার ব্যবস্থা আমরাই করতে পারব। চৌত্রিশতম স্ট্রীটের মোড়ে একটা ভাল রেস্তোরাঁ আছে। যদি বলেন বিলি-র সঙ্গে—

—আরে ব্বাস! তোমরা যদি আগে আমাকে বলতে সে রেস্তোরাঁর মালিক তোমাদের পরিচিত তবে তোমাদের সন্তুষ্ট করার কম সে কম একশ পথ তোমাদের দেখিয়ে দিতে পারতাম। নিউইয়র্কে থাকার সময় ওই বিলি কিয়োখ আমার ডান-হাত ছিল। আমি সততাকে ধাপ্পাবাজির কৌশল হিসেবে ব্যবহার ক'রে মালকড়ি কামাচ্ছি। আর সে এ পথ এ পথে চলতে গিয়েও ফতুর হচ্ছে।

এখানকার মানুষগুলো একে অন্যের পিছনে লেগে থেকে ছিদ্রান্বেষণ করার ধান্ধায় থাকে। কেউ যদি ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারে যে, সে একজন মাতব্বর বনে গেছে তবে সে ঘোট পাকাতে মেতে যায়। তখন সরকারের পতন ঘটাতে সে আদাজল খেয়ে লেগে যায়। সচিবের কাজ ছাড়াও আমার আর একটা কাজ গোপনে এরকম ষড়যন্ত্রের খোঁজ খবর রাখা। কোথাও তেমন গন্ধ পাওয়া গেলে তাকে সমূলে উপড়ে দেওয়াই আমার কাজ।

শোন এবার মোদ্দা কথাটা বলছি, এ জেলার শাসনকর্তা তার সাঙ্গপাঙ্গকে নিয়ে একটা বিদ্রোহের ষড়যন্ত্রে মেতেছে। আজ রাত্রে আমি ফোনোগ্রাফের বাজনা শোনার জন্য তাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আর এখানে তাদের বরাতে যে কি ঘটবে তা তো আমি মনে মনে ভেবেই রেখেছি।

আমরা তিনজন একটা ছোট্ট রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসলাম। এইচ. পি. মেলিঞ্জার মদের গ্লাসটা ঠোঁট থেকে নামিয়ে বলতে লাগল এখানকার লোকগুলোর চোখে আমি সাক্ষাৎ ভগবান। আর প্রেসিডেন্টের সচিবের চাকরিটা নিয়ে আমার গর্বও কম নয়। আমার ইচ্ছে, বিলি রেনফ্রোকেও একদিন শুনিয়ে দেব, লাখ টাকা দিয়েও আমাকে কেউ কিনতে পারবে না।

মদের গ্লাসে আর একটা লম্বা চুমুক দিয়ে সে আবার মুখ খুলল—শোন, আমি যা কিছু রোজগার করি সবই সৎ পথেই করি, আর আমার এ-ও ইচ্ছে, বেশ কিছু মালকড়ি জমিয়ে বিলি-র সঙ্গে বসে কাভিয়ার খাব। আজ রাত্রেই তোমরা চোখের সামনেই দেখতে পাবে, এক দল দুশ্চরিত্র লোককে কি ক'রে টিট করতে হয়।

হেনরি আর আমি দু'জনই লক্ষ্য করলাম, মেলিঞ্জারকে কেমন যেন চঞ্চল দেখাচ্ছে।

আমি মনে মনে বললাম, লোকটার ভাবগতিক ব'ল দিচ্ছে, সে নির্ঘাৎ একটা টোপের দেখা পেয়েছে।

পূর্ব সিদ্ধান্ত মত সে রাত্রেই হেনরি আর আমি ফোনোগ্রাফের বাক্সটা নিয়ে লম্বা একটা স্যাঁত-স্যাঁতে ঘরে হাজির হলাম। ঘরের ভেতরে বেশ কয়েকটা চেয়ার পাতা। আর শেষ প্রান্তে একটা টেবিলও রাখা আছে।

টেবিলটার ওপরে আমরা ফোনোগ্রাফটা রেখে দিলাম। জলসায় আমন্ত্রিত অতিথিরা এক-এক ক'রে হাজির হতে লাগল। এইচ. পি. মেলেঞ্জার করমর্দনের মাধ্যমে সবাইকে সাদর সম্ভাষণ জানাতে লাগল। তবে তাকে কেমন যেন বিচলিত দেখাতে লাগল।

জেলার শাসনকর্তা থেকে শুরু করে মন্ত্রীরা পর্যন্ত জনা পঞ্চাশেক তাবড় তাবড় লোক সেখানে জমায়েত হ'ল।

অনুষ্ঠান শুরুর মুখে এইচ. পি. মেলিঞ্জার আবেগ মধুর স্বরে বলল, উপস্থিত সুধীজন, আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কারকে আপনাদের সামনে হাজির করতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।

পর মুহূর্তেই তার ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র হেনরি পিতলের মনোলোভা রেকর্ড বাজাতেই অনুষ্ঠানটার শুভ সূচনা হয়ে গেল।

রেকর্ডটার সুরটা বাজামাত্র উপস্থিত শ্রোতারা সমস্বরে ব'লে উঠল—সাবাশ! সাবাশ! চমৎকার!

শাসনকর্তা ভদ্রলোক চোখের তারায় অত্যুগ্র আগ্রহের ছাপ ফুটিয়ে ভাবাপ্লুত কণ্ঠে ব'লে উঠলেন, আমেরিকান অতিথি দু'জন কি স্প্যানিশ ভাষা বোঝেন?

মেলিঞ্জার সঙ্গে সঙ্গে ব'লে উঠল, না, একদম না।

লাতিন ভদ্রলোক এবার আগের মতই ভাবাপ্লুত কণ্ঠেই বললেন, উপস্থিত সুধীজন, আপনারা শুনুন, সঙ্গীত, গান-বাজনা অতি পবিত্র জিনিস। তা সত্ত্বেও বলব, এগুলো জীবনযাপনের অত্যাবশক ব'লে বিবেচিত হয় না। আর আমরা এখানে কেন সমবেত হয়েছি তা আপনাদের অবশ্যই জানা আছে।

এবার আমাদের প্রস্তাবগুলোর প্রসঙ্গে যাওয়া যাক। আমরা জানি আপনারা প্রেসিডেন্টকেই সর্বতোভাবে সমর্থন করেন। আর আপনাদের প্রভাব-প্রতিপত্তির কথাও আমাদের মোটেই অজানা নয়। সরকারের পরিবর্তন অবশ্যই ঘটবে। আপনাদের বন্ধুত্বের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা যথেষ্টই।

কথা বলতে বলতে শাসনকর্তা এবার কোটের পকেট থেকে একটা মোড়ক বের ক'রে বললেন, এতে আপনাদের দেশের মুদ্রায় পঞ্চাশ হাজার ডলার রয়েছে। এবার মেলিঞ্জারের দিকে আড়-চোখে তাকিয়ে বললেন, আপনি আমাদের বিরুদ্ধে গিয়ে আমাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবেন না।

এবার টেবিল থেকে ডলারের মোড়কটা তুলে মেলিঞ্জারের দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন, এখনকার মত এটা আপনার জিম্মায় রেখে দিন। আপনার প্রতি আমাদের বিশ্বাস আছে। আমরা চাই, আপনি রাজনীতিতে ফিরে গিয়ে আমাদের নির্দেশ মেনে কাজ করুন। আশা করি আমাদের প্রস্তাব আগ্রহ্য ক'রে বোকামির পরিচয় দেবেন না।

আমি লক্ষ্য করলাম, এইচ পি. মেলিঞ্জার-এর মুখটা হঠাৎ কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে গেছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে।

হেনরি আমাকে বোতাম টিপে বাজনটা থামিয়ে দিতে বলল।

আমি তার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস ক'রে বললাম, এইচ. পি. মেলিঞ্জার টোপটা গিলতে অনিচ্ছুক, প্রতিপক্ষও নাছোড়বান্দা।

পর মুহূর্তেই এইচ. পি. মেলিঞ্জার মুখ বিকৃত ক'রে নোটের মোড়কটাকে তুলে নিয়ে শাসনকর্তা ভদ্রলোকের মুখের ওপর দুম্‌ ক'রে ছুঁড়ে দিল।

এবার সে বলল, শুনুন, এভাবেই আমি জবাবটা দিলাম। কাল সকালে আর একটা বোমা ফাটবে, মনে রাখবেন। আপনারা প্রত্যেকেই যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এরকম প্রমাণ আমার কাছে আছে। তবে আজকের খেল্ এখানেই শেষ করছি।

শাসনকর্তা খেঁকিয়ে উঠলেন, ধুৎ মশায়! আপনার হিম্মৎ আমার জানা আছে। প্রেসিডেন্টের চিঠি নকল করা আর মাথা নিচু ক'রে তার হুকুম তামিল করাই আপনার কাজ। আপনার সঙ্গে আমি, স্বয়ং শাসনকর্তা বসে কথা বলছি। ভদ্রমহোদয়গণ আপনাদের মঙ্গলের কথা ভেবে আপনাদের হুকুম করছি, একে বন্দী করুন।

তার কথা শেষ হতে না হতেই দাগী ষড়যন্ত্রকারীরা তার দিকে হৈ হৈ করত করতে ছুটে গেল।

আমার বুঝতে বাকি রইল না, একটা বড় রকমের হাঙ্গামা শুরু হয়ে গেল বলে।

হেনরি-র কানে কানে বললাম—মেলিঞ্জার এতগুলো লোককে জড়ো ক'রে ভুল করেছে। আমাদের উভয়েরই বাটপাড়ি ব্যবসা ঠিকই। কিন্তু আমার আর তার বাটপাড়ির ফন্দি ফিকির যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

এতগুলো লোক এক জোট হয়ে মেলিঞ্জার-এর দিকে মার-মার ক'রে ধেয়ে এল। আর প্রতিপক্ষ, মানে আমরা সংখ্যায় মাত্র তিনজন। হেনরি আর আমি বাধ্য হয়ে দুর্বলতম পক্ষ অবলম্বন না করে পারলাম না।

সত্যি বলছি, হেনরি যাদুমন্ত্রের মত কাজটা করল। সে হৈ হট্টগোলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অভাবনীয় বিদ্যা ও বুদ্ধি প্রয়োগ ক'রে কাজটা সেরে ফেলল।

আমাদের দু'জনকে তার পিছনে দাঁড় করিয়ে হেনরি বলল, আমি একটা ব্যাক-সেন্টার করতে চলেছি। আমি নিঃসন্দেহ বাধা দেওয়ার মত শত্রুপক্ষে একজনও নেই। চোখের পলকে খেলটা শেষ ক'রে ফেলতে হবে।

পর মুহূর্তেই সে এমন প্রচণ্ড জোরে এক হুঙ্কার ছাড়ল যে, যা শুনে এতগুলো লাতিন পুঙ্গব একেবারে ভড়কে গেল। তারপরই হেনরি বন্দুকের গুলির মত তীর বেগে ছুটে গিয়ে শাসনকর্তার ওপর.এমন সজোরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল যে নাদুস-নুদুস লোকটা রেলিঙের ওপর আঁছাড়ে পড়ল।

উপস্থিত লাতিনরা কর্তব্য স্থির করার আগেই হেনরি আমাকে আর এইচ. পি. মেলিঞ্জারকে নিয়ে চোখের পলকে সেখান থেকে চম্পট দিল।

আমরা হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে ছুটতে তিন মিনিটের মধ্যেই সামরিক ঘাঁটিতে পৌঁছে গেলাম।

মেলিঞ্জারের নির্দেশে এক ব্যাটেলিয়ান পদাতিক সৈন্য, একজন জাঁদরেল কর্নেল জলসার আসরে পৌঁছে গেলেন।

কিন্তু ইতিমধ্যেই চাচা আপনা প্রাণ বাঁচা বলে ষড়যন্ত্রকারীরা আসর ছেড়ে চম্পট দিয়েছে।

পরদিন সকালে এইচ. পি. মেলিঞ্জার আমার আর হেনরির পকেটে দশ ও বিশ ডলার নোটের তাড়া জোর ক'রে পকেটে গুঁজে দিয়ে বলল— এ ফোনোগ্রাফটা আমি কিনে নিতে চাচ্ছি। আসলে গতকাল জলসায় যে সুরটা বাজানো হয়েছিল সেটা আমার মনে খুবই দাগ কেটেছে।

আমি বললাম, তাই বলে এতগুলো ডলার কেন? এগুলো তো যন্ত্রটার দামের চেয়ে অনেক, অনেক বেশী।

—ডলারগুলো তো খরচ করছে সরকার। সরকারের বিশ্বাস, যন্ত্রটাকে খুব সস্তায়ই খরিদ করছে।

মুহূর্তকাল পড়ে সে আবার মুখ খুলল—ভাল কথা, বিলি রেনফ্রো-র সঙ্গে যদি তোমাদের দেখা হয় তবে বোলো, সুযোগ পেলেই আমি আবার নিউইয়র্কে ফিরে যাব।

ক্যাপ্টেন কথা রেখেছে। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জাহাজ নিয়ে ফিরে এল।

আমরা জাহাজে ওঠার সময় বলল, কি হে, তোমাদের হাত যে ফাঁকা। সে যন্ত্রটা কোথায়?

—'জন্মভূমি আমার প্রিয় জন্মভূমি' গানটা বাজাবার জন্য সেটাকে এখানেই রেখে গেলাম।

মানি ম্যাঝ

মাঞ্চুরিয়ার নতুন সরকার রীতিমত উৎসাহ-উদ্যমের সঙ্গেই দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করতে লাগল।

সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তার প্রথম ও প্রধান কাজ হ'ল রাজকীয় হুকুম মাফিক কোবালিও-তে একজন প্রতিনিধি পাঠান। তার একমাত্র লক্ষ্য থাকবে, পলাতক প্রেসিডেন্ট অদৃষ্ট বিড়ম্বিত মিরা ফ্লোরেস যে বিপুল পরিমাণ রাজকোষের অর্থ নিয়ে বে-পাত্তা হয়ে গেছে যে অর্থের খোঁজ করা।

দেশের নতুন প্রেসিডেন্টের আসনে বসেছেন লোসাদার। আর তাঁর ব্যক্তিগত সচিবের পদে বহাল হয়েছেন এমিলি ক্যালকন।

প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত সচিব এমিলি ফ্যালকনকেই কোয়ালিওতে পাঠানো রাজকোষের অর্থের সন্ধান করার গুরুত্বপূর্ণ কাজটার ভার দিয়ে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত সচিবকে কূটনীতি, উর্দ্ধতনের দেহ রক্ষা, গুপ্তচর বৃত্তি, বিভিন্ন ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহের খোঁজ খবর নেওয়া প্রভৃতি কাজ দায়িত্ব নিয়ে সম্পন্ন করতে হয়।

কর্নেল ফ্যালকন কাসামেয়োনার একটা কামরায় তাঁর দপ্তর পাতলেন।

তিনি পরলোকগত প্রেসিডেন্টের মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত এবং গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক দুর্ঘটনার সঙ্গে জড়িত লোক সম্বন্ধে খোঁজ খবর দিতে পারেন এমন জনা কয়েককে নিয়ে বৈঠকে বসলেন।

জানা গেল, প্রেসিডেন্টের মৃতদেহ যারা সনাক্ত করেছিল তাদের মধ্যে দু'-তিনজন—পরামাণিক এবেস্টান তাদের মধ্যে অন্যতম। আর এ-ও তিনি জানতে পারলেন, সমাধিস্থ করার আগেই তারা প্রেসিডেন্টের মৃত দেহটা সনাক্ত করেছিল।

পরামাণিক এবেস্টান ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়ে বলল মৃতদেহটা যে প্রেসিডেন্টেরই এতে সন্দেহের এতটুকুও অবকাশ নেই।

একজনের দাড়ি কামাবো কিন্তু তার মুখটা দেখতে পাব না এটা কি সম্ভব? আমি তো এর আগেও তাঁকে দেখেছিলাম। সলিটাস-এ স্নান সেরে বেরোবার সময় আমি তাকে স্পষ্ট দেখেছিলাম। আর দাড়ি কামাবার পর আমাকে একটা স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে বারবার বলে দিয়েছিলেন, কথাটা যেন ঘুণাক্ষরেও কারো কাছে ফাঁস না করি। কিন্তু একজন দেশপ্রেমিক হয়ে আমার ব্যাপারটাকে চেপে যাওয়া উচিত নয় ভেবে আমি মিঃ গুড্উইন'কে সব কথা বলে না দিয়ে পারলাম না।

কর্নেল ফ্যালকন গম্ভীর মুখে বললেন—তিনি এ জায়গা ছেড়ে যাবার সময় কালো চামড়ার থলেটাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। আর তাতে প্রচুর মুদ্রা ছিল। একা পারে—তোমার মত কি, বল তো?

—না, আমি দেখি নি, শুনিও নি কারো মুখে। আমি যখন দাড়ি কামাই সেখানে এক সুন্দরী মেয়েও সেখানে ছিলেন। কিন্তু কোন অর্থ বা যে থলেতে অর্থ ছিল সে সব আমার নজরে পড়ে নি।

কর্নেলের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে কমান্ডেন্ট ও অন্য অফিসাররা বললেন, হোটেল ডি. এস্টারেঞ্জ-এর পিস্তলের আওয়াজ শুনে তাদের ঘুম ভেঙে যায়। দুরু দুরু বুকে তারা হন্তদন্ত হয়ে সেখানে ছুটে আসে। দেখলেন, একটা পিস্তল মুঠো করে ধরে একজন রক্তাপ্লুত অবস্থায় মরে পড়ে আছে। এক সুন্দরী যুবতী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। তারা সেখানে গুড্উইনকে দেখেছিল সত্য, কিন্তু কালো চামড়ার বা অন্য কোন থলিই সেখানে দেখেন নি।

হোটেলের মালিক মাদাম টিমোটি আর্টিজ বলল, আমার হোটেলে দু'জন অতিথি এসেছিলেন। আগে থাকতেই তাঁদের আসার কথা ছিল। যা-ই হোক তাদের মধ্যে একজন এক পরমা সুন্দরী যুবতী দিলেন। আর ছিলেন একজন সেনিওর খুব বুড়ো নন। খাদ্য বা পানীয় কিছু নিলেন না।

সোজা ঘরে চলে গেলেন। একটু বাদেই সেনিওর, গুড্‌উইন এলেন। তাঁদের সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিলেন। আমি ন'নম্বর আর দশ নম্বর ঘরের কথা বললাম। তিনি ওপরে উঠে গেলেন। তারপরই পিস্তলের প্রচণ্ড আওয়াজ হ'ল। সবাই বলাবলি করল প্রেসিডেন্ট আত্মহত্যা করেছেন। তাঁর সঙ্গে কালো চামড়ার থলি বা টাকাকড়ি দেখি নি, বা ছিল বলে শুনিও নি।

স্থানীয় লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে কর্নেল নিঃসন্দেহ হলেন যে, ফ্র্যাংক গুড্‌উইন ছাড়া এমন কোন লোক নেই যার কাছ থেকে হাফিস হয়ে যাওয়া অর্থ সম্বন্ধে কিছু জানা যেতে পারে।

প্রবীণ ও অভিজ্ঞ সচিব গুডউইন-এর কাছ থেকে কথা বের করার এক নতুন পথ অবলম্বন করলেন।

গুডউইন নতুন শাসক গোষ্ঠীর একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি অতএব তাঁর সাহস আর সততা সম্বন্ধে হেয় জ্ঞান করা সঙ্গত হবে না। তাই তাকে তলব ক'রে নিজের কাছে ডেকে আনতে তিনি দ্বিধা বোধ করলেন।

নানাদিক ভেবে সচিব মশায় যারপরনাই অনুরোধসহ গুড্‌উইন-এর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে একটা চিঠি পাঠালেন।

চিঠি পাওয়ার পর গুড্‌উইন সচিব মশায়কে নিজের বাড়িতেই নৈশ ভোজের অনুরোধ জানিয়ে চিঠি পাঠালেন।

যথা সময়ে সচিব মশায়ের গাড়ি গুড্‌উইন-এর বাড়ির দরজায় গিয়ে দাঁড়াল।

গুড্‌উইন দরজা পর্যন্ত ছুটে এসে তাকে অভ্যর্থনা ক'রে ঘরে নিয়ে গেল।

গুড্‌উইন-এর পরমা সুন্দরী সহধর্মিণী তখন জানালার ধারে বসে সমুদ্র সৈকতের একটা ছবি আঁকতে ব্যস্ত।

গুড্‌উইন অতিথিকে বৈঠকখানায় বসতে দিয়ে ভেতরের ঘরে, স্ত্রীর কাছে গিয়ে বলল— আমন্ত্রিত অতিথি এসে গেছেন। সান মাতিয়ে থেকে এসেছেন। নাম কর্নেল ফ্যালকন।

ক্যানভাসে তুলির টান দিতে দিতে তিনি প্রায় অস্ফুট উচ্চারণ করলেন, হুম!

—হারানো ডলারের থলেটার খোঁজে এসেছেন। তুলিটাকে তুলে এনে তিনি এবার বললেন।

—অনুমান অভ্রান্ত। গত তিনদিন ধরে স্থানীয় লোকদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে কোন কিনারা করতে না পেরে আমার শরণাপন্ন হয়েছেন।

—ডলারের থলেটাকে দেখেছে এমন কারো খোঁজ পেয়েছেন কি?

—না। তবে কোনক্রমে যদি প্রমাণ হয় যে, আমিই ডলারগুলো আত্মসাৎ করেছি তবে আধ ঘণ্টার মধ্যে আমাকে ফাটকে ভরে দেবে।

—হুম।

—না, কিছুতেই তা হতে দেওয়া যায় না। কোরালিও-র অনেক কিছু জেনেও যেমন না জানার, না বোঝার ভান করি এ ক্ষেত্রেও তা-ই করতে হবে।

—তোমার কি বিশ্বাস, তোমার ওপর আগন্তুকের সন্দেহ আছে?

—সন্দেহ না করাটাই তার পক্ষে শ্রেয়। কারণ, থলেটার ব্যাপারে একমাত্র আমি ছাড়া এখানকার দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিই কিছু জানে না। গুলিটা করার সময় আমি সেখানে ছিলাম। তাই যদি আমায় গভীরভাবে তদন্ত করার জন্য হাজির হয়েই থাকে তবে তো মনে করার কিছুই নেই।

—তবুও কি আমাদের ভয়ের কিছু থাকতে পারে?

—না, আমার মনে হয় একটা মার্কিনী বাটপাড়ি প্রয়োগ করলেই ব্যাপারটার ফয়সালা হয়ে যেতে পারে।

মিসেস গুড্‌উইন হাত থেকে তুলিটা নামিয়ে রেখে স্বামীর মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন! তার কাঁধের ওপর হাত দুটো তুলে দিয়ে আবেগের সঙ্গে বললেন, শোন, ফ্রাঙ্ক জানে যে ভয়ঙ্কর ভাবে দেশত্যাগ, তার মর্মান্তিক পরিণিতির পরও আমি অন্তর থেকে তাকে ভালবাসতাম। তারপর তুমিও আমাকে ভালবেসেছ, ভাল ব্যবহার করেছ আর সুখী করেছ। সব মিশে যেন একটা ধাঁধায় পরিণত হয়েছে। তারা জানতে পারলেই কি তুমি ডলারের থলিটা ফিরিয়ে দিতে?

—সত্যি, ব্যাপারটা ধাঁধাই হয়ে উঠেছে। আর আমি যদি নিজের থেকে ব্যাপারটাকে প্রকাশ না করি তবে ফ্যালকন আর দেশবাসীর কাছে ব্যাপারটা ধাঁধা হয়েই থাকবে। তাই এ ব্যাপারে সামান্যতম ইঙ্গিতও আমরা কারো কাছে দেব না। ফলে সবাই ভাববে প্রয়াত প্রেসিডেন্ট ডলারের কালো থলেটাকে যাত্রাপথেই কোথাও না কোথাও হারিয়েছেন। আর ফ্যালকন আমাকে সন্দেহ করছেন এটা আমি অবশ্যই মনে করছি না।

টেবিলে বসে পানাহার সারতে সারতে কর্নেল ফ্যালকন বললেন, মিঃ গুড়উইন, ডলারের থলেটা চোখে দেখেছে এমন একজনকেও আজ পর্যন্ত পাই নি। রাজধানীতে কিন্তু এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রেসিডেন্ট মিরা ফ্লোরেস সরকারের এক লক্ষ ডলার সঙ্গে করে সান মাটিও থেকে রওনা হয়েছিলেন। আর তার সঙ্গে দিলেন রূপসী যুবতী ইসাবেল গিলবার্ট।

মুহূর্তের জন্য থেমে গুড়উইন-এর মনোভাবটা বোঝার চেষ্টা ক'রে ফ্যালকন আবার মুখ খুললেন, তবে এ-ও সত্য যে, সরকারীভাবে কেউ-ই স্বীকার করতে উৎসাহী নয় যে, প্রেসিডেন্ট মিরা ফ্লোরেস-এর রুচি এত নিচে নেমে গিয়েছিল যে, সরকারি অর্থ এবং নারীকে নিয়ে পলায়নের প্রবৃত্তি হতে পারে।

গুড়উইন বলল, এবার মনে হয় আমার মুখ থেকে আপনার কিছু শোনা দরকার। সেদিন রাত্রেই আমাদের দলের একজন নেতার রাজধানীতে অবস্থানরত এঙ্গলহার্ট-এর কাছ থেকে একটা টেলিগ্রাম প্রেসিডেন্ট পায়। তাতে লেখা ছিল কালো থলেতে লক্ষাধিক ডলার আর রূপসী যুবতী অপেরা গায়িকাকে নিয়ে পলায়ন করেছেন। চোখের পলকে খবরটা রাষ্ট্র হয়ে যায়।

আমরা চারদিকে তল্লাশী চালালাম। ব্যর্থ হলাম। শেষমেশ শহরে ওৎ পেতে থাকলাম।

তখন রাত্রি দশটার কাছাকাছি, দেখলাম একজন পুরুষ এক নারীকে নিয়ে হোটেল ডি লস এস্ট্রেঞ্জেরোস-এ ঢুকে গেল। দুটো ঘর ভাড়া করল। বাইরে সতর্ক পাহারার ব্যবস্থা করে আমি সোজা হোটেলের দোতলায় উঠে গেলাম। পরামাণিকের মুখে আগেই শুনেছিলাম, সেদিনই সে প্রেসিডেন্টের দাড়ি কামিয়েছে। তাই তার দাড়ি কামানো মুখ দেখব ভেবেই হোটেলে ঢুকেছিলাম।

জনসাধারণের নাম ক'রে তাকে ধরার চেষ্টা করামাত্র তিনি পিস্তলের জন্য পকেটে হাত ঢুকিয়ে যন্ত্রচালিতের মত দ্রুত পিস্তলটা বের করে নিজেই নিজেকে গুলি ক'রে বসলেন। মিনিট কয়েকের মধ্যেই বেশ কয়েকজন পদস্থ কর্মচারী আর নাগরিকে ঘরটা ভরে গেল।

এ পর্যন্ত বলে সে বলল, এর পরের ঘটনা তো আপনার জানাই আছে।

কর্নেল ফ্যালকন এর পরও কিছু শোনার আশায় অধীর প্রতীক্ষায় রইলেন।

গুড়উইন আবার মুখ খুলল, দেখুন, কোন থলে বা মাঞ্চুরিয়া প্রজাতন্ত্রের কোন অর্থ অন্তত আমার চোখে পড়ে নি। এবার বলুন তো, আমার মুখ থেকে যে তথ্য আপনি সংগ্রহ করার জন্য আশা ক'রে এসেছেন তা আমার বিবরণের মধ্যে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছেন কি?

কর্নেল ফ্যালকন বিমর্ষমুখে বসে রইলেন। ভাবলেন, গুড়উইন স্বেচ্ছায় যা বলেছে তার ওপর কোন পীড়াপীড়ি করা সঙ্গত নয়। প্রথমত সে নতুন প্রেসিডেন্টের বিশেষ প্রিয়পাত্র এবং সরকারের একজন বিশ্বস্ত ও একনিষ্ঠ সমর্থক, সততাকে সামনে রেখেই সে অগাধ অর্থের মালিক হয়েছে। আর প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত সচিব মেলিঞ্জার-এর ধাপ্পাবাজীও তাকে প্রচুর অর্থ উপার্জনের সহায়ক করেছে।

ম্লান হেসে ফ্যালকন বললেন—মিঃ গুড়উইন, খোলাখুলি বিবরণ দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। একটা কথা, আমার ওপর নির্দেশ আছে ব্যাপারটা শেষ কোথায় আমাকে দেখতেই হবে। তবে এমন সূত্রের সন্ধান আমার কাছে আছে আমি এখনও যাকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করি নি।

—হুম!

—ফরাসীতে একটা বহুল ব্যবহৃত প্রবাদবাক্য আছে, কোন রহস্য আছে, সূত্র নেই—তখন একটা মেয়ের খোঁজ কর।

—তাই বুঝি? ম্লান হেসে গুড়উইন বলল।

—হ্যাঁ। আর এ ক্ষেত্রে মেয়ের খোঁজ করার দরকার নেই। কারণ প্রয়াত প্রেসিডেন্ট যখন

পালিয়ে যান তখন তাঁর সঙ্গে একজন মহিলা যে ছিলেন তা তো সর্বজন বিদিত। আপনার বক্তব্যে তার উল্লেখ আছে। অতএব—

—আপনার কথার মাঝখানে কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি ব'লে আমি দুঃখিত। আমি যখন প্রয়াত প্রেসিডেন্ট মিরা ফ্লোরেস'কে ধরার জন্য হোটেলে গিয়েছিলাম তখন তাঁর সঙ্গে যে মহিলাটি ছিলেন বর্তমানে তিনি আমার সহধর্মিণী।

—হ্যাঁ, শুনেছি বটে!

—আমি আপনাকে যা কিছু বলেছি থলে বা অর্থকড়ির ব্যাপারে তার মুখ থেকে আপনি অবশ্যই নতুন কিছু শুনতে পাবেন না।

কর্নেল নীরবে মুচকি হাসলেন।

গুড্‌উইন এবার বলল, আর একটা কথা আপনাকে বলে রাখছি, তাকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ বা উত্যক্ত করেন তা আমার অভিপ্রায় নয়।

কর্নেল ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত হতে লাগলেন।

কিন্তু নিজেকে সংযত রেখে ঠাণ্ডা গলায় বললেন—আরে না। তাঁকে সন্দেহ করার প্রশ্নই ওঠ না।

গুড্‌উইন-এর মুখে হাসির ছোপ দেখা গেল।

কর্নেল বলে চললেন, দেখুন, আমি তদন্তের কাজ সেরে ফেলেছি। একটা অনুরোধ মিঃ গুড্‌উইন, আপনার যে বারান্দা থেকে সমুদ্র দেখা যায় সেখানে একবারটি আমাকে নিয়ে যাবেন? তারপর হেসে বললেন—আরে মশায়, সমুদ্র দেখার আমার খুব সখ।

সে সন্ধ্যার কিছু পরে গুড্‌উইন তার অতিথিকে কালে গ্র্যান্ড-এর মুখে ছেড়ে দিল। তারপর বাড়ি ফেরার পথে বীলজিবাব ব্লাইথ্ নামে একটি লোক তার কাছে এল। কদর্য তার চেহারা। সমুদ্র সৈকতে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। বন্ধুদের সাহায্য সহযোগিতায় কায়ক্লেশে দিন গুজরান করে। আর সুযোগ পেলেই এর-ওর পকেটে আঙুল চালিয়ে মদের খরচ চালায়।

সে কাছে এসেই বিশ্রী স্বরে হেসে বলে উঠল, এই যে গুড্‌উইন, আজ তোমাকে ধরব আশা করে রয়েছি। তোমার সঙ্গে দেখা করা একান্ত দরকার বলেই তোমার খোঁজে ঘোরাফেরা করছি।

গুড্‌উইন মুখে বিতৃষ্ণার ছাপ এঁকে বলল কি বলতে চাইছ, খোলসা ক'রে বল।

—আশা করি তোমার অবশ্যই জানা আছে, প্রয়াত প্রেসিডেন্ট মিরা ফ্লোরেস-এর খোয়া যাওয়া ডলারের থলেটার খোঁজে এখানে একজন ঘুরঘুর করছে।

—জানি। কেবল জানিই না, তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে আর কথাও হয়েছে।

ভাল কথা।

তাকে নিয়ে একটা বার-এ গেলাম। দু'গ্লাস মদ নিলাম। সে গ্লাসটা মুখে তুলল। এবার খোলসা করে বলে ফেল তো আমার সঙ্গে তোমার কি দরকার।

—ওসব ছাড়ান দিন তো মশায়। কথাটা দু'জন ভদ্রলোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকাই ভাল নাকি?

—দেখ, আমাকে এখন উঠতে হবে। মিসেস গুড্‌উইন একা আছেন।

—তোমার কি বিশ্বাস হয় না, যে লোকটা সরকারের রাজকোষের একটা থলে নিয়ে কেটে পড়েছে তার পক্ষে প্রাচীন লোসাডা খুবই কঠিন স্থান?

—না, এতে কিছুমাত্রও সন্দেহ নেই, আমাকে এবার কিন্তু উঠতেই হবে। মিসেস গুড্‌উইন—তা ছাড়া এ মুহূর্তে তোমার তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার আছে বলে মনে হচ্ছে না।

কথাটা বলেই গুড্‌উইন চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বার ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

বিলজিবাব ছেড়া ও ময়লা একটা রুমাল দিয়ে চশমাটা মুছতে মুছতে স্বগতোক্তি করল—ধ্যুৎ! কাজটা করা হ'ল না। কারো কাছ থেকে গলা পর্যন্ত গেলার পর তার সঙ্গে বাটপাড়ি করা কি কোন ভদ্রলোকের কাজ!

দ্য অ্যাডমিরাল

নতুন সরকার ঔদাসীন্যের সঙ্গে ঘাটতিটা মেটাবার উদ্দেশ্যে আমদানি শুল্কের হার বৃদ্ধি ক'রে দিল। আর দেশের বিত্তশালী নাগরিকদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করল, তারা যদি সরকারকে সাধ্যমত অর্থ দান করেন তবে তাকে দেশভক্তি শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়াস ব'লে গণ্য করা হবে।

নতুন প্রেসিডেন্ট আশা করেছিলেন তার রাজত্ব সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠবে।

এদিকে কর্মচ্যুত প্রভাবশালী অফিসাররা আর তাদের প্রতি অনুরক্ত সামরিক নেতারা মিশে নতুন উদারনৈতিক দল গড়ে তুলল। এবার তারা নতুন ক'রে ক্ষমতা হস্তগত করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করার কাজে মাথা ঘামাতে লাগল।

এদিকে প্রেসিডেন্ট তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়ে এক গোপন সভার মধ্য দিয়ে একটা নতুন নৌ-বিভাগের উদ্বোধন ক'রে ফেললেন।

সদ্য গঠিত নৌ-বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হ'ল ফেলিপ কারেরা নামে এক বুদ্ধিমান ও কর্মঠ যুবককে।

আর ওরিলা ভেল মার-এর উপকূল বিভাগ থেকে আসা বুলেটিন থেকে জানা গেল, কোবালিও শহরের শুল্ক দপ্তরের অফিসাররা এস্ট্রেলা ডেল নোচ নামক এক জাহাজকে আটক করেছে। শুকনো খাবার ও অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী, চিনি, ব্র্যান্ডি আর পেটেন্ট ওষুধে জাহাজটা বোঝাই। আরও আছে—এক পিপে মার্কিন হুইস্কি আর ছ'টা বন্দুক প্রভৃতি।

চোরাই মাল পাচার করতে গিয়ে ধরা পড়ার ফলে জাহাজটা আইনত প্রজাতন্ত্রের দখলে চলে গেছে।

এতদিন মাঞ্চুরিয়ার কোন নৌ-বাহিনী ছিল না। তার কোন দরকার ছিল না।

সমর-মন্ত্রী নৌ-বাহিনী গড়ে তোলার প্রস্তাব দিলেন।

ডন ফেলিপ কারেরা'কে ফ্ল্যাগ অ্যাডমিরাল পদবীতে ভূষিত করা হ'ল। এভাবে ছোট দেশটা মিনিট কয়েকের মধ্যেই বিশ্বের অন্যান্য নৌ-শক্তিগুলোর পাশে দাঁড়ানোর মত নিজের স্থান করে নিল।

ফেলিপ এক গম্ভীর প্রকৃতির যুবক। কম কথা বলা তার স্বভাব। ভূ-পৃষ্ঠের উপরে থাকলে সে যেন নিজেকে বড়ই অসহায় ভাবে। কিন্তু জলে ভাসামাত্র একটা বিশেষ ক্ষমতা তাকে বিশেষ শক্তিশালী ও অন্য সবার সমকক্ষ করে তোলে।

পাল তোলা নৌকা চালানোর ক্ষেত্রে ফেলিপের মত দক্ষ নাকি খুব কমই দেখা যায়। তাই তো কালেক্টর কমিশনের কাছে তার নামটা প্রস্তাব করলেন। তার সুপারিশ সহজেই গ্রাহ্য হ'ল।

অফিসে কালেক্টরের ঘরের লাগোয়া তাঁর কেরানির ঘর। মাঝখানের দরজা দিয়ে যাতায়াত করা চলে।

ফেলিপ'কে কাজের উপযুক্ত ক'রে গড়ে তোলার দায়িত্ব কালেক্টরের ওপর বর্তায়।

ফেলিপ এক দীর্ঘাকৃতি ও সুঠামদেহী যুবক। তার বয়স বিশ বছর চোখে-মুখে অদৃষ্টের বিড়ম্বনার ছাপ।

কালেক্টর তাকে ডেকে বললেন, মিঃ কারেরা, প্রেসিডেন্টের নির্দেশেই আমি তোমাকে এখানে ডেকেছি। এস্ট্রেলা ডেল নোচ নামক জাহাজটা আটক করা হয়েছে, সেটার দায়িত্ব তোমার ওপর দেওয়া হ'ল, খুশি তো?

—ধন্যবাদ স্যার। ফিলিপ কারেরা বলল।

—আর চোরা চালান প্রতিরোধ করার জন্য তোমাকে উপকূলের রক্ষীর ভূমিকাও পালন করতে হবে।

—আমি চেষ্টার ত্রুটি করব না স্যার।

মাঞ্চুরিয়াকে পৃথিবীর নৌ-শক্তিগুলোর মধ্যে অন্যতম ক'রে তোলাই হবে তোমার প্রধান লক্ষ্য। কথা বলতে বলতে কালেক্টর একটা কাগজ তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, তোমার কমিশন-এর পত্র, ধর।

ফেলিপ কারেরা কালেক্টরের হাত থেকে কাগজটা নিল। তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল।

কালেক্টরের স্ত্রী সারাদিন দোলনায় বসে গিটার বাজান। তার জামার তলায়, অন্তরের অন্তঃস্থলে যে প্রেমবিলাসী-মন প্রতি নিয়ত হাহাকার করে তা কে জানে।

কালেক্টরের স্ত্রী খোদাই শিল্পের একটা পুরনো বইতে এমন একটা পতাকার ছবি দেখতে পেয়েছিলেন যেটাকে মাঞ্চুরিয়ার নৌ-বাহিনীর পতাকা হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছিল। সেটার একটা নক্সাও তিনি করে রেখেছিলেন। এবার তিনি নিজের হাতে নক্সাটা অনুযায়ী একটা পতাকা তৈরী করে ফেললেন।

সদ্য তৈরী পতাকাটা ফেলিপ কারেরা'কে উপহার দেবার সময় তিনি ভাবাপ্লুত কণ্ঠে বললেন, বীর নাবিক, এটা তোমার দেশের পতাকা। এর প্রতি বিশ্বস্ত থেকো। প্রাণ দিয়ে এ সম্মান রক্ষা করো।

ফেলিপ কারেরা শ্রদ্ধার সঙ্গে তার হাত থেকে পতাকাটা নিল।

নৌ-বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ ফেলিপ কারেরা'কে পরবর্তী কয়েক মাস গভীর উদ্বেগের মধ্য দিয়ে কাটাতে হল। উপরওয়ালার নির্দেশ ছাড়া তার ক্ষমতা কতটুকু সেনাধ্যক্ষ নিজেই জানে না। ওপর থেকে না কোন নির্দেশ, না এল তার বেতন।

তার সঙ্গে যৎসামান্য যা অর্থ ছিল সেগুলো ফুরিয়ে গেলে সে সোজা কালেক্টরের সামনে হাজির হ'ল। তার বেতনের কথা জানাল।

বেতনের কথা শোনামাত্র কালেক্টর রীতিমত চিৎকার ক'রে উঠলেন, বেতন! হায় আমার পোড়া কপাল! আরে তোমার কথা আর কি বলব। গত সাত মাস যাবৎ আমার নিজের বেতনই তো আসছে না। আর নৌ-সেনাধ্যক্ষের বেতন কত জানতে চাইছ। সেটা তিন হাজার পেসো-র কম হওয়া তো উচিতই নয়।

—হুম!

শীঘ্রই তুমি এদেশে একটা বিপ্লব ঘটতে দেখবে। সরকার কেবল পেসো পেসো কপচায়। কিন্তু দেওয়ার বেলা আর চিৎ-হাত উপুড় করে না।

ফেলিপ একটাও কথা না বলেই ফ্যাকাসে বিবর্ণ মুখে কালেক্টরের দপ্তর ছেড়ে বেরিয়ে এল।

বিদ্রোহ! বিদ্রোহ মানেই তো যুদ্ধ। যুদ্ধ বাঁধলে তার কাজ বেড়ে যাবে। সে সঙ্গে বাড়বে কদরও।

সে তার অধীনস্থ নৌ-সেনাদের ডেকে বলল, আমরা বুঝতে পারছি, সরকারের ভাড়ারে টান পড়েছে। আমাদের বেতন দেবার মত অর্থ তার নেই। বেঁচে থাকার সব অর্থ আমাদেরই উপার্জন করতে হবে। আর যে করেই হোক দেশের সেবা আমাদের করতেই হবে। আর আমরা তা করতে পারবও।

তার পরের কথাটা বলতে গিয়ে তার দু'চোখ ছলছল ক'রে উঠল। আমি জানি, সরকার সানন্দে আমাদের সাহায্য চাইবে।

এবার থেকে 'এল ন্যাশিওনাল' অন্য সব উপকূলবর্তী জাহাজের কায়দায় বাইরে বেরিয়ে অর্থোপার্জন করতে লাগল।

অন্য যেসব ছোট মালবাহী জাহাজ তার থেকে ফল বোঝাই ক'রে ফলবাহী বড়-বড় জাহাজে মাল তুলে দেয় তারাও সে কাজে যোগ দিল।

কথাটা তো সত্যি যে কোন নৌ-বাহিনী যদি স্বনির্ভর হতে পারে তবে সেটা একটা জাতির পক্ষে গৌরবের।

সময় সুযোগ পেলেই ফেলিপ কারেরা টেলিগ্রাফ অফিসে চলে যায়। উদ্দেশ্য রাজধানী থেকে কোন কাজের নির্দেশ আসে কিনা খবর নেওয়া।

এতদিনেও কোন কাজের জন্য সেনাধ্যক্ষ তার ডাক না পড়ায় তার গর্ব ও দেশপ্রেমে আঘাত লেগেছে।

এক সময় কালেক্টর বিপ্লবের যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, সেই বিপ্লবের আগুন হঠাৎই জ্বলে উঠল। বেশ কিছুদিন যাবৎ-ই তলে তলে বিপ্লবের প্রস্তুতি চলছিল।

বিপ্লবের সঙ্কেত পাওয়া মাত্র নৌ-বাহিনীর অধ্যক্ষ তার দলবল নিয়ে ধেয়ে চলল প্রতিবেশী এক বন্দরের দিকে। জাহাজ ভর্তি ফলের বিনিময়ে কিনে নিল পাঁচটা বন্দুকের জন্য প্রয়োজনীয় গুলি গোলা। তারপর ব্যস্ত পায়ে টেলিগ্রাফ অফিসে গিয়ে সরকারি নির্দেশের জন্য অধীর প্রতীক্ষায় রইল।

—না, সরকারের দিক থেকে কোন নির্দেশই আসে নি। টেলিগ্রাফ করণিক বলল,

—আরে মশায়, আমি নৌ-সৈন্যাধ্যক্ষ। সরকারকে আমার কাছে নির্দেশ পাঠাতেই হবে।

দ্য ফ্ল্যাগ প্যারামাউন্ট

ডন সাবাস প্লাসিডো! তিনি বিদ্রোহী দলের সর্বাগ্রে অবস্থান করছেন। তিনি একজন প্রবীণ ও অভিজ্ঞ থিবান আবার দক্ষিণ প্রজাতন্ত্রের হেক্টরও বটে। এ ছাড়া তিনি একজন কবি, সৈনিক, পর্যটক, শিল্প-বিচারক, কূটনীতিজ্ঞ আর বিজ্ঞানী।

সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার যে, তার মত এতগুলো গুণের অধিকারী একজন লোক এতদিন নিজের দেশের এক ছোট ও কোণঠাসা জীবন নিয়েই খুশি ছিলেন।

তার নাড়ি নক্ষত্র জানে এমন বন্ধু বলল, প্লাসিডো যে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র নিয়ে মেতেছে তাকে গুরুত্ব দেওয়ার কিছুই নেই, এটা তার নিছকই একটা খেয়াল মাত্র। আর মনে করা যেতে পারে সে যেন একটা নতুন জীবন আর নতুন গতির সন্ধান পেয়েছে।

তারপর মুহূর্তের জন্য থেমে আবার মুখ খুলল, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ বিপ্লবকে চুষে চুষে একেবারে ছোব্‌রা করে ছাড়বে। ব্যস, এক সপ্তাহ বাদেই তার মন থেকে সবকিছু ধুয়ে মুছে সাফ সুতরা হয়ে যাবে। আবার মেতে যাবে নিজের কাজকর্ম নিয়ে। তার নিজের কাজ? বিশ্বের সেরা সংকলন গ্রন্থ। কোন্ ধরনের সংকলন গ্রন্থ? হায়! এ-ও আবার নতুন ক'রে বলতে হবে? আরে, ডাকটিকিট থেকে প্রাগৈতিহাসিক মূর্তি পর্যন্ত যাবতীয় সংগ্রহ।

কিন্তু এসব ব্যাপার-স্যাপারে যারা নিতান্তই অনভিজ্ঞ তাদের কাছে অভিজ্ঞ প্লাসিডো যেন একটা নতুন জীবনের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে।

রাজধানীর সৈন্যরা সরকারের বিশেষ অনুগত থাকার জন্য তার সহকারীদের আহ্বানে সবাই একসঙ্গে সাড়া দিল।

আবার এমন গুজব চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল যে, বিসুভিয়াস ফ্রুট কোম্পানি এ বিপ্লবের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

আর এ-ও শোনা যায়, ফ্রুট কোম্পানি 'সালভাডর' আর 'ট্রাভেলার' নামক দুটো স্টিমার বিদ্রোহী সৈন্যদের উপকূলবর্তী বিভিন্ন শহরে পৌঁছে দিয়ে কর্তব্য সম্পাদন করছে।

সত্যি কথা বলতে কি, বিদ্রোহ বলতে যা বুঝায় কোরালিওতে এখন পর্যন্ত তা ঘটে নি। সামরিক আইন জারি করে বিদ্রোহ অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দিয়েছে।

ব্যস, তারপরই চারদিক থেকে বিদ্রোহীদের পরাজয়ের বার্তা আর রাজধানীতে বিদ্রোহীদের একেবারে নাস্তানুবাদ করে প্রেসিডেন্টের সৈন্যরা বিজয়ী হয়েছে।

গুজবের শেষ নাই। এমন কথাও শোনা যাচ্ছে যে, বিপ্লবের নেতারা বে-গতিক দেখে ল্যাজ তুলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে।

কোরালিও-র টেলিগ্রাফ অফিসে রাজধানীর খবরা-খবরের প্রত্যাশায় রাজভক্ত প্রজা আর সরকারি কর্মচারীরা ভিড় জমাতে লাগল।

একদিন হঠাৎ একটা টেলিগ্রাম এল। তাতে লেখা—জাহাজ নিয়ে যত শীঘ্র সম্ভব রিও রুইজ অভিমুখে যাত্রা কর। গো-মাংস ও খাদ্য-পানীয় আলফোরান-এর শিবিরে পৌঁছে দাও।

দেশের ডাক পাওয়া মাত্র নৌ-সেনাধ্যক্ষের বুকটা গর্বে ভরে উঠল। জীবনে এই প্রথম

পাওয়া ডাকটা যে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয় এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হলেও তাকে যে ডাকা হয়েছে এটা যথেষ্ট।

সে নাবিকদের তাড়াহুড়ো ক'রে তৈরী হয়ে নিতে বলল। নিজেও ব্যস্ততার সঙ্গে তৈরী হয়ে নিল।

এল ন্যাশানিয়াল বাতাসের টানে দ্রুত ভাঁটির দেশের দিকে এগিয়ে চলল।

অচিরেই এল ন্যাশানিয়াল, নদীর মোহনায় পৌঁছে গেল। ছোট-বড় গাছের জঙ্গল দু'তীর ছেয়ে রেখেছে। মানুষের কোন চিহ্নও নাই। এমন একটা জায়গা থেকে গো-মাংস বা খাদ্য-পানীয় সংগ্রহের চিন্তা পাগলের প্রলাপ ছাড়া কিছু নয়।

নৌ-সেনাধ্যক্ষের নির্দেশে এখানেই নোঙর ফেলা হ'ল। জাহাজ থেকে নেমে নৌ-সৈনাধ্যক্ষ সদলবলে জঙ্গলের ভেতরে সামান্য এগিয়ে যেতেই একটা অতিকায় নীল জন্তু দেখতে পেল। কিন্তু বাতাসের বেগে সেটা বে-পাত্তা হয়ে গেল।

নৌ-সেনাধ্যক্ষ চোখে দূরবীণ লাগিয়ে জঙ্গলটাকে চষে ফেলল। সূর্য পশ্চিম আকাশে ডুবতে বসেছে। এমন সময় হঠাৎ জঙ্গলের ভেতর থেকে একটা স্পষ্ট আওয়াজ ভেসে এল—ওহে!

পর মুহূর্তেই তিন তিনজন খচ্চরের পিঠে চেপে জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। তারা নদীর তীরে নেমে খচ্চরগুলোকে জঙ্গলের দিকে তাড়িয়ে দিল।

বিচিত্র চেহারার লোকগুলোকে দেখে মনে হ'ল তারা কিছু খাদ্য-পানীয় নিয়ে এসেছে। সবাই, বিশেষ করে একজন রীতিমত লম্বা-চওড়া শক্ত সামর্থ মানুষ। সবার কোমরেই লম্বা তরবারি।

লম্বা-চওড়া লোকটা এগিয়ে এসে সৈনাধ্যক্ষের হাতটা টেনে নিয়ে সশব্দে চুমু খেল। আমরা আগেই জানতাম, তোমাদের বিশ্বস্ততার ওপর আমরা ভরসা রাখতে পারি।

নৌ-সেনাধ্যক্ষ সবিনয়ে লোকটার কান্ডকারখানা দেখতে লাগল। লোকটা ব'লে চলল—আশা করি জেনারেল মার্তি, নিজের লেখা আমাদের টেলিগ্রাম তুমি অবশ্যই পেয়েছ।

নৌ-সেনাধ্যক্ষ প্রায় অস্ফুট উচ্চারণ করল—হুম্!

মোটাসোটা লোকটা এবার টেলিগ্রামটার বয়ানটা বলল। আল্‌ফোরান-এর সেনা শিবিরের জন্য গো-মাংস যে জোগাড় করা সম্ভব হয় নি তার জন্য কাসাইয়ের কোন দোষ নেই।

নৌ-সেনাধ্যক্ষ সবিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকাল।

লোকটা এবার বলল—হ্যাঁ, সত্যি তাকে দোষারোপ করা যাবে না। তুমি কিন্তু সময় মত পৌঁছে যাওয়ায় গরুগুলো প্রাণে বেঁচে গেল। তুমি এখনই আমাদের তোমার জাহাজে তুলে নাও।

আগন্তুক তিনজনকে জাহাজে তুলে নেওয়া হ'ল। জাহাজে উঠে উঁচু লম্বা লোকটা চিৎকার ক'রে বলে উঠল—ওহে নৌ-সেনাধ্যক্ষ, এমন সব বাজে খাবার খেয়ে তোমরা দিন কাটাচ্ছ!

নৌ-সেনাধ্যক্ষ আবার সবিনয়ে তার মুখের দিকে তাকাল। লোকটা ব'লে চলল—গো-মাংস আর খাদ্য পানীয়! হায় কপাল! আর একটু দেরী হলে আমরা তো বাধ্য হয়ে একটা খচ্চরের মাংসই চিবোতে আরম্ভ করতাম। আগে কিছু খাবার-দাবার দিয়ে আমাদের পেটের জ্বালা নেভানোর ব্যবস্থা কর তারপর আলফোরান-এর দিকে জাহাজ ছুটিয়ে দেব।

কারিবরা খাবার সাজিয়ে দিল। বুভুক্ষু লোক তিনজন সেগুলোকে গো-গ্রাসে গিলতে লাগল।

জাহাজের পাল তুলে দিতে সেটা তর্‌তর্ করে ছুটতে আরম্ভ করল।

জাহাজটা মাত্র কয়েক গজ যেতে না যেতেই জঙ্গলের দিক থেকে চিৎকার চেঁচামেচি ভেসে এল!

লম্বা-চওড়া লোকটা বলল নৌ-সেনাধ্যক্ষ, ওরাই সেই কসাইয়ের দল।

—তাই নাকি? কিন্তু—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই লোকটা বলল—কসাইরা কাজটা করতে বড্ড দেরী করে ফেলেছে।

নৌ-সেনাধ্যক্ষ আর একটা কথাও বলল না, জাহাজটা ধীর মন্থর গতিতে মোহনার দিকে এগিয়ে চলল।

লম্বা-চওড়া লোকটা অপলক চোখে নৌ-সেনাধ্যক্ষের মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল গম্ভীর, আশ্চর্য এ যুবকটা!

আসলে তার এ গম্ভীর মুখটাই লোকটাকে ধন্দে ফেলে দিয়েছে। সে নিজেও একজন পলাতক আসামী। ব্যর্থতা আর পরাজয়ের গ্লানি তার মন-প্রাণ বিষিয়ে তুলেছে। আজ এ নতুন ধরনের যুবকটাকে দেখে তার আগ্রহ চরম পর্যায়ে উঠে গেছে।

এক সময় আগন্তুক তিনজন শহর থেকে তিন মাইল দূরে বাঞ্ছিত জাহাজটাকে দেখতে পেল। হঠাৎ তারা তিনজন একজায়গায় দাঁড়িয়ে আলোচনা শুরু করল।

কিছুক্ষণ বাদে লম্বা-চওড়া লোকটা লম্বা-লম্বা পায়ে নৌ-সেনাধ্যক্ষের কাছে গিয়ে বলল—শোন হে সেনাধ্যক্ষ, সরকার যারপরনাই ভুল পথে চলছিল। আমি ও কথাটা বলতে ইতস্ততও করছি ও লজ্জিত হচ্ছি যে, তোমার একান্ত সেবা সম্পর্কে সরকারের অজ্ঞতাই সরকার পতনের দিকে ধেয়ে চলেছে।

সরকারের উচিত ছিল নৌ-সেনাধ্যক্ষের উপযোগী জাহাজ থেকে শুরু করে, সৈন্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করা।

তারপর মুহূর্তের জন্য ভেবে সে আবার মুখ খুলল, এ মুহূর্তে তোমাকে একটা জরুরী কাজ করতেই হবে।

নৌ-সেনাধ্যক্ষ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকাল।

সে বলেই চলল, ওই যে, জাহাজটা দাঁড়িয়ে আছে ওটায় নাম 'সালভাডর'। আমার আর আমার বন্ধু দু'জনের ইচ্ছা, আমাদের ওই জাহাজে পৌঁছে দেওয়া হোক।

নৌ-সেনাধ্যক্ষ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকাল।

সে এবার বলল, দেখ, সরকারি কাজের তাগিদেই আমাদের সেখানে পাঠানো হয়েছে। আর তোমার কর্তব্য সে অনুসারেই ঠিক ক'রে নেবে। আশা করি তুমি আমাদের এ উপকারটুকু থেকে বঞ্চিত করবে না।

তার কথার কোন জবাব না দিয়ে নৌ-সেনাধ্যক্ষ ক্যাপ্টেনকে জাহাজের মুখটাকে বন্দরের দিকে ঘুরিয়ে দেবার নির্দেশ দিল। সেটা দ্রুত তীরের দিকে এগিয়ে চলল।

তার আচরণে লোকটা বিস্মিত হ'ল। তারপর বলল—তুমি এটুকু কৃপা অন্তত কর যাতে আমি অন্তত ভাবতে পারি যে, আমার কথাটা তুমি ধরতে পেরেছ।

এ-ও হতে পারে, লোকটার বোধ আর বুদ্ধি উভয়ই ঘাটতি রয়েছে। সরবে হেসে সেন্যাধ্যক্ষ বলল, এর পরিণাম কি হবে জান?

—কি?

—তারা তোমাদের গুলি ক'রে মারবে। বিশ্বাসঘাতকদের তারা এ শাস্তিই দেয়। তোমরা আমার জাহাজে পা দেওয়া মাত্রই আমি তোমাদের চিনে ফেলেছি। তোমার ছবি একটা বইয়ের পাতায় আমি দেখেছিলাম। দেশের প্রতি যে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তুমি সেই বেইমান সাপ্লাসিডো। তোমার মৃত্যু অনিবার্য। আমরা যে ফ্র্যাংকেস্টিনের রাক্ষসকে সৃষ্টি করেছি তাকে পরখ করে নাও!

পরমুহূর্তেই দাঁতে দাঁত ঘষে নৌ-সেনাধ্যক্ষ এবার বলল শুনে রাখ, আমি নিজেই তোমাদের কাছে হাজির করব।

নৌ-সৈনাধ্যক্ষ ডন সাবার্স বন্দরের দিকে মুখ ক'রে দাঁড়াল। কোরালিও ওহরটা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

হালের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা নৌ-সৈনাধ্যক্ষের দিকে এগিয়ে গিয়ে লম্বা-চওড়া লোকটা আবার বলল—আমি দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছি, কথাটা সত্যি। আর এ-ও জেনে রাখো এর জন্য আমার সামান্যতম চিন্তাও নেই। প্রাসাদ আর শিবিরের দরজা সাপ্লাসিডোর-এর জন্য উন্মুক্ত। আমার কাছে হতচ্ছাড়া এ দেশটা নিতান্তই মূল্যহীন দেশ। রোমে, ভিয়েনায়, আর লণ্ডনে আমার মাথা গোঁজার মত জায়গা রয়েছে। কিন্তু আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, তোমার জাহাজের মুখ ঘোরাও। তোমার প্রাপ্য পাঁচশ' পোসো ধর। আমাদের অনুগ্রহ করে সালভাডর জাহাজে তুলে দাও।

তোমার সরকারের কাছ থেকে বিশ বছরে যা পাবে না তার চেয়ে অনেক বেশী অর্থ এতে আছে—ধর।

লোকটার হাতের নোটের গোছা বা তার মুখের দিকে না তাকিয়েই নৌ-সেনাধ্যক্ষ তীরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই বিড়বিড় করে বলতে লাগল—বন্দুকগুলো যাতে তোমাদের নজরে না পড়ে সে দিকে নজর রেখেই তারা কাজ ক'রে থাকে। হুম্! তোমরা মৃত্যুর শিকার হও।

এবার নৌ-সেনাধ্যক্ষ হঠাৎ নাবিকদের একটা নির্দেশ দিল।

ঠিক সে মুহূর্তেই লম্বা লোকটা বাঘের মত সজোরে ও ক্ষিপ্রগতিতে লাফিয়ে এগিয়ে গিয়ে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিল। তারপর তালা লটকে দিয়ে সরবে হাসতে হাসতে বলল—নৌ-সেনাধ্যক্ষ, কোন বন্দুক আসবে না আমি এক সময় একটা 'কারিব' ভাষায় অর্ধেকটা অভিধান রচনা করেছিলাম, তাই আমার পক্ষে তোমার নির্দেশটার অর্থ বুঝতে পেরেছি।

তার কথা শেষ হবার আগেই নৌ-সেনাধ্যক্ষ ক্ষিপ্রগতিতে তরবারিটা বের ক'রে লম্বা-চওড়া লোকটাকে আঘাত হানল। লোকটা অভাবনীয় কৌশলে সামান্য সরে গেল। আঘাতটা এড়িয়ে যেতে পারল। তবে গায়ে সামান্য আঁচড় লেগেছে।

তরবারির আঘাতটা এড়িয়েই লোকটা ছেঁড়া-ময়লা কোটের তলা থেকে পিস্তলটা বের করেই গুলি চালিয়ে দিল। চোখের পলকে নৌ-সেনাধ্যক্ষ বিকট আর্তনাদ ক'রে জাহাজের পাটাতনের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ল।

নৌ-সেনাধ্যক্ষ কাতর স্বরে উচ্চারণ করল, আঘাতটি বুকে লেগেছে। হায় ঈশ্বর! নৌ-বাহিনী লুপ্ত হয়ে গেল। সব শেষ!

লম্বা-চওড়া কর্নেল র‍্যাফেল এক লাফে এগিয়ে গিয়ে হালটা ধরে ফেলল। জাহাজের মুখটা এবার সালভাডর-এর দিকে ঘুরে গেল।

কর্নেল র‍্যাফেল-এর নির্দেশে জাহাজের পতাকাটি নামিয়ে ফেলা হ'ল।

এভাবেই সমর-মন্ত্রীর গল্পটা শেষ হ'ল। আর তা হ'ল যে তার সূচনা করেছিল। যাক, গল্পটা এ পর্যন্তই।

ডন সাবাস বিকট স্বরে চিৎকার ক'রে কোনরকমে ছুটে কর্নেল র‍্যাফেল-এর কাছে নৌ-বাহিনীর পতাকাটা হাতে তুলে নিল। দু'হাতে সেটাকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

সালভাডোর-এর কর্মীরা তাদের স্বাগত জানাতে অধীর অপেক্ষায় ছিল।

ছোট জাহাজটা বড় জাহাজ সালভাডোর-এর কাছে এগিয়ে যেতেই উৎসাহী নাবিকরা সেটাকে আঁকড়ে ধরল।

ডন সাবাস বলল—বিপ্লব, ওই যে বিপ্লব হয়েছে। হ্যাঁ, বিপ্লব হয়েছে বটে।

তাদের পালিয়ে আসার কথা আর জাহাজের বন্দীদের সব কথা শুনে ক্যাপ্টেন ম্যাকলিয়ড বলল, কারা? কারিররা? তারা সম্পূর্ণ নির্দোষ।

তারপর ক্যাপ্টেন ছোট জাহাজটায় গিয়ে এক লাথি মেরে দরজাটা খুলে ফেলল। কালো মানুষগুলো ঘামে ভেজা শরীরে ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। চোখে-মুখে কষ্টের নাম গন্ধও নেই, বরং মুখে ছড়িয়ে রয়েছে হাসির প্রলেপ।

ক্যাপ্টেন বললেন—ওহে, কালো ছেলের দল, আমি কি বলছি শোন। আমি বলছি, তোমাদের ভয়ের কিছু নেই। তবে আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে এখন পালাও।

তারা লক্ষ্য করল, ক্যাপ্টেন তাদের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে কথাগুলো বলছে।

ঘাড় ঘুরিয়ে তারা এও দেখতে পেল, ছোট জাহাজটার মুখ অদূরবর্তী বড় জাহাজটার দিকেই ঘোরানো।

এবার তারা ক্যাপ্টেনের দিকে বিমর্ষমুখে তাকিয়ে বলল—অবশ্যই! অবশ্যই!

তারা চারজনই—ক্যাপ্টেন, ডন সাবাস আর দু'জন অফিসার ছোট জাহাজটা ছেড়ে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগল।

ডন সাবাস সবার পিছনে রয়েছে। তার দৃষ্টি স্থির হয়ে রইল নিশ্চল নিথরভাবে এলিয়ে পড়ে থাকা নৌ-সেনাধ্যক্ষের ওপর।

সে প্রায় অনুচ্চ কণ্ঠে উচ্চারণ করল পোব্রেসোতো লোকো পোব্রেসোতো লোকো।

বিজয়ী হয়েও, বীরত্বের স্বাক্ষর রাখার পরও কিন্তু তার বিমর্ষ হাসির লেশটুকু প্রকাশ পেল না।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে স্বগতোক্তি করল—। পাগল! বেচারি মাথা খারাপ!

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সে সামান্য এগিয়ে গেল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে সামনের দিকে সামান্য ঝুকল। হাত বাড়িয়ে পাটাতনের ওপর পড়ে থাকা পতাকাটা তুলে নিল।

পতাকাটাকে সে বার তিনেক কপালে ঠেকাল। তারপর কোটের কলার থেকে খুলে নিলেন অর্ডার অব সাম কার্লোস স্মারক তারকাটাকে। এবার সেটাকে পিন দিয়ে পতাকাটার গায়ে আটকে দিল।

এবার অন্য সবার সঙ্গে ছোট জাহাজটা থেকে ধীর-পায়ে নেমে গেল। তারপর তাদের পিছন পিছন বড় জাহাজ সালভাডোর-এ উঠে গেল।

সে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গিয়ে জাহাজের ডেকের ওপর দাঁড়াল। অন্য তিনজন সহযাত্রী আগেই ডেকের ওপর পৌঁছে গিয়েছিল। সে তাদের পাশে বিমর্ষ মুখে দাঁড়াল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই 'এল্ ন্যাশনিয়াল'-এর নাবিকরাও অনন্যোপায় হয়ে তাদের জাহাজটা ছেড়ে দিতে বাধ্য হ'ল।

ছোট জাহাজটায় এখন রইল কেবলমাত্র কাবিররা। তরার দুর্বোধ্য ভাষায় চিল্লাচিল্লি করতে করতে ছোট জাহাজটার সঙ্গে তীরের দিকে এগোতে লাগল।

হের গ্রুনিজ-এর নৌ-পতাকা!

হের গ্রুনিজ-এর নৌ-পতাকার সংগ্রহটা সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে শীর্ষ স্থানীয়ের সম্মান পেল।

শ্যামরক অ্যাণ্ড দ্য পাম

এক রাত্রে পাঁচটা লোক ক্লান্সি ও কিয়োখ-এর ফটোর দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল।

কাবিরদের মত সাধারণ পোশাক পরে জনি অ্যাটউড ঘাসের বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে অনর্গল বকবক করতে লাগল।

ডঃ গ্রেগ মোটা গোঁফ জোড়ার অধিকারী বলে তাকে দরজার কড়া আর তাদের সঙ্গে টাঙানো দোলনাটা ছেড়ে দিয়ে খাতির করা হয়েছে।

কিয়োখ দোকান থেকে ছোট একটা টেবিল এনে ঘাসের ওপর রেখে দিয়েছে। ওটাকে সে ফটোগ্রাফগুলোকে বার্নিশ করার কাছে লাগিয়েছে। আপন মনে বার্নিশ ক'রে বলেছে

দলের অন্যান্যরা আরাম আয়েশে ব্যস্ত। একমাত্র কিয়োখই কাজের মধ্যে ডুবে রয়েছে।

বাতাস মোটেই বইছে না। ভ্যাঁপসা গরম পড়েছে। ফরাসী মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার বাইরের গরম থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য চোখে একজোড়া ঠাণ্ডা চশমা ব্যবহার করেছে। তার গায়েও ঠাণ্ডা পোশাক। ঠোঁট থেকে সিগারেটটা নমিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে ওপরে উঠে-যাওয়ার ধোঁয়ার দিকে সে অপলক চোখে তাকিয়ে রয়েছে।

আর ক্লান্সি দরজার কাছাকাছি বসে ছোট পাইপটা মৌজ করে টেনে চলেছে।

ক্লান্সি-র মেজাজ-মর্জি চুটিয়ে আড্ডা মারার অনুকূল বটে। কিন্তু অন্যান্যদের মধ্যে কারোরই তার কথা বা গল্প শোনার মত মানসিকতা নেই।

ক্লান্সি আইরিশ মানসিকতার মানুষ। আর সে জাতীয় সংস্কারমুক্ত বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ সম্পন্ন এক আমেরিকান।

জীবনে বহু রকম কাজে নিজেকে লিপ্ত করেছে। কিন্তু কোন কিছুর মধ্যেই বেশীদিন নিজেকে জড়িয়ে রাখে নি।

আসলে ক্লান্সি একজন চিরপথিক। তার রক্তে রয়েছে ভ্রমণের নেশা। বেশীদিন একজায়গায় থিতু হয়ে থাকাটা তার স্বভাব বিরুদ্ধ। ফলে হাঁপিয়ে উঠে ছোটে কোন পরিবেশের, অন্য কোন স্থানের উদ্দেশ্যে।

সে আপন মনে বিড়বিড় ক'রে বলতে লাগল—' আজকের রাত্রিটা আমাকে যেন নিয়ে যাচ্ছে অন্য আর একটা রাত্রে। যে রাত্রিটার কথা বার বার আমার মনের কোণে ভেসে উঠছে। আমি তখন এক স্বেচ্ছাচারী রাজার বিষ দৃষ্টি থেকে একটা জাতিকে মুক্ত করার মহৎ ব্রতে ব্রতী। সত্যি, কাজটা অবশ্যই খুবই কঠিন ছিল। সে কী পরিশ্রম। পিঠ রীতিমত ব্যথা হয়ে যেত আর হাত দুটোতে পড়ত কড়া।

এদিকে ঘাসের বিছানায় শুয়ে থেকেই অ্যাটউড অনুচ্চ কণ্ঠে বলতে লাগল, তুমি কোন কোন নিপীড়িত মানুষের হাতে তরবারি তুলে দিয়েছ, কই এমন কথা তো কোনদিনই আমার কানে আসে নি।

'—দিয়েছি। তরবারিও তুলে দিয়েছি হে। আর সে তরবারিকে তারা কোন্ কাজে লাগিয়ে ছিল, জান?

মুচকি হেসে ব্লাঁশার্ড বলল—'তোমার মুখ থেকেই শুনতে চাচ্ছি'।

—দেশোদ্ধারের কাজে না লাগিয়ে তার সে তরবারি দিয়ে লাঙলের ফলা তৈরী ক'রে জমি চষে বেরিয়েছে।

মুখের হাসিটুকু অব্যাহত রেখেই ব্লাঁশার্ড এবার বলল—তোমার কথা শুনে আমার হাসি পাচ্ছে।

গম্ভীর ভাবে ক্লান্সি বলল—হাসি? তার মানে? হাসির মত কি বললাম?

—কোন্ দেশের সৌভাগ্য হয়েছিল যারা তোমার সাহায্য নিতে এসেছিল?

তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ক্লান্সি আচমকা প্রশ্ন করে বসল—'কাম্চাটকা। জান কি, কাম্চাটকা কোথায়?

'—মেরু অঞ্চলের অন্তর্গত সাইবেরিয়ায় কোন অংশে হবে হয়ত।' ব্লাঁশার্ড সন্দিগ্ধ গলায় কথাটা ছুঁড়ে দিল।

—আরে, আমি, তো জানি, সেটা শীত প্রধান দেশ।

—তা অবশ্য ঠিক।

—দুটো নাম আমার কাছে যেন গোলমেলে মনে হয়। কেমন যেন গুলিয়ে যায়।

—কোন নাম দুটো, বল তো?

—তাদের একটা হচ্ছে, ওয়াতেমালা। গ্রীষ্ম প্রধান দেশ সন্দেহ নেই।

—হ্যাঁ, আমিও শুনেছি সেটা গরমের দেশ।

—আমি সে দেশেই তরবারি হাতে তুলে নিয়েছিলাম, জায়গাটা গ্রীষ্মমণ্ডলে অবস্থিত। আরে, মানচিত্র খুললেই তো জায়গাটার খোঁজ মিলে যাবে। ঈশ্বর দূরদৃষ্টি সম্পন্ন, কি বল?

ব্লাঁশার্ড হাসতে হাসতে বলল—'কেন? হঠাৎ এ-কথা বলছ যে?

—আরে ভায়া, জায়গাটা সমুদ্রতীরে অবস্থিত বলেই না ভূগোলবিদদের পক্ষে সহজেই জায়গাটার খোঁজ পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

ব্লাঁশার্ড এবার হো-হো ক'রে হেসে উঠল।

ক্লান্সি ব'লে চলল—সে শহরে আমি একাই জাহাজ নিয়ে গিয়েছিলাম।

—কেন? হঠাৎ সেখানে কেন?

—তখন দেশটা এক অত্যাচারী প্রজাপীড়ক রাজার শাসনাধীন ছিল। তার কবল থেকে একটা মাত্র গাঁইতি সম্বল ক'রে আমি দেশটাকে মুক্ত করতে চেষ্টা করেছিলাম।

—পুরো ব্যাপারটা কেমন গোলমেলে মনে হচ্ছে ভায়া। তোমার কথার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছি নে। যদি একটু খোলসা ক'রে—

—হ্যাঁ, আমিও ঠিক একই কথা ভাবছি। পুরো ব্যাপারটা ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে বলা দরকার।

ব্লাঁশার্ড সোজা হয়ে বসে ব্যাপারটা শোনার জন্য অত্যুগ্র অগ্রহান্বিত হয়ে মুখের দিকে তাকাল।

ক্লান্সি একটু নড়ে চড়ে গাঁট হয়ে বসে বলতে আরম্ভ করল—সেদিনটা ছিল পয়লা জুলাই।

সেদিন সকালে আমি নিউ অর্লিয়েন্সে ছিলাম। জাহাজ ঘাটায় নেমে নদীর ওপর ভাসমান জাহাজগুলো কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে দেখছিলাম।

একটু বাদেই আমার হঠাৎ মনে হ'ল, আমার ঠিক বিপরীত দিকের জাহাজটা সেটা এখনই নোঙর তুলে ছেড়ে যাবে।

জাহাজের চোঙ দিয়ে গলগল ক'রে ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

একদল কুলি হৈ হল্লা ক'রে অনেকগুলো বাক্স জাহাজটায় তুলে দিচ্ছে। প্রতিটন বাক্স চার ফুট লম্বা আর চওড়া চার ফুটের মত। কুলিদের পরিশ্রম দেখে মনে হ'ল সেগুলো খুবই ভারী।

আমি একলা দু'পা ক'রে হাঁটতে হাঁটতে বাক্সগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে আমি বাক্সগুলো দেখতে লাগলাম।

কুলিরা বাক্সগুলো তুলতে গিয়ে হঠাৎ একটা বাক্স ভেঙে ফেলল।

আমি কৌতূহলের শিকার হয়ে কুলিদের অজান্তে হঠাৎ সে বাক্সটার ঢাকনা খুলে ভেতরে দৃষ্টি ফেললাম।

এক ঝলক দেখেই আমি সচকিত হয়ে সোজাভাবে দাঁড়িয়ে পড়লাম। দেখলাম, বাক্সটা উইনচেস্টার রাইফেলে বোঝাই।

আমি আপন মনে বলে উঠলাম—বুঝেছি বুঝেছি। কে একজন নিরপেক্ষতা আইন ভাঙার ধান্ধায় আছে। যুদ্ধের অস্ত্রপাতি দিয়ে সাহায্য করছে। কিন্তু বন্দুকগুলো যাচ্ছে কোথায়?

হঠাৎ একটা কাশির শব্দ শুনে আমি সচকিত ভাবে খাড়া হয়ে পড়লাম।

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি, একটা বেঁটেখাটো, ঠিক যেন বলের মত গোলগাল মানুষ আমার ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চোখ-মুখ, গায়ের রঙ আর পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে মনে হ'ল প্রথম শ্রেণীর মানুষ। আঙুলে একটা দুই ক্যারাটের হীরের আঙটি জ্বলজ্বল করছে।

তার চোখ দুটোর দিকে তাকাতেই লক্ষ্য করলাম, প্রশ্ন আর শ্রদ্ধার ছাপ সুস্পষ্ট।

প্রথম দর্শনে মনে হল লোকটা বিদেশী। জাপান বা রাশিয়া অথবা দ্বীপপুঞ্জের মানুষ।

বলের মত গোলগাল লোকটা সাধ্যমত গলা নামিয়ে, প্রায় ফিসফিস করে বলল—ইয়ে!

আমি অতর্কিতে তার মুখের দিকে তাকালাম।

সে একই রকম গলায় বলল—যা দেখে ফেলেছেন তা খুব গোপন রাখবেন। মনে থাকবে?

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকালাম।

সে বলে চলল— মনে রাখবেন, ব্যাপারটা যেন জাহাজের কেউ-ই জানতে না পারে, মনে থাকবে?

আমি ঘাড় কাৎ করলাম।

সে এবার বলল—আপনাকে দেখে একজন ভদ্রলোক বলেই মনে হচ্ছে। হঠাৎ যে বস্তু আপনি দেখে ফেলেছেন সেটা যেন ভুলেও কারো কাছে ফাঁস করবেন না।

আমার অভিজ্ঞতায় মনে হল লোকটা একজন ফরাসী। তাই তাকে বললাম—মঁসিয়ে, আপনি অবশ্যই নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে, আপনার গোপন ব্যাপারটা জেমস ক্লান্সি অবশ্যই গোপন রাখবে। কাকপক্ষীও টের পাবে না। আর আমি আরও বলছি—ভীভলা লিবার্টি। আর এ-ও বলছি, যে মুহূর্তে আপনি শুনবেন, ক্লান্সি কোন চলিত সরকারকে উচ্ছেদ করার-কাজে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছে ঠিক সে মুহূর্তেই আপনি আমার ওপর শাসন জারি করে দেবেন, কেমন?

কালো গোলগাল লোকটা কালো গোঁফ জোড়ার ফাঁক দিয়ে ছোট্ট করে হাসল। তারপর বলল—মশায়, আপনি বড় ভাল মানুষ। চলুন না আমার জাহাজে। একটু কিছু পানীয়ের সাহায্যে আপ্যায়ন করার সুযোগ দিলে বড়ই খুশি হব।

আমিও কমতি যাই না।

দুই মিনিটের মধ্যেই আমি তার কেবিনে গিয়ে বসে পড়লাম। সে বসল আমার বিপরীত দিকে—মুখোমুখি। উভয়ের মাঝখানে রইল একটা বোতল আর দুটো নকসা আঁকা গ্লাস।

গ্লাসে মদ ঢালার সময়ও আমার কানে আসতে লাগল বাক্সগুলো ফেলার দুম্‌দাম শব্দ।

আমি অনুমান করলাম, জাহাজে বোঝাই করা বাক্সগুলোর ভেতরে অন্তত দু'হাজার উইনচেস্টার রাইফেল তো হবেই হবে।

চোখের পলকে আমরা দু'জনে মিলে বোতলটা খালি করে ফেললাম। গোলগাল বাদামী লোকটা আর একটা বোতল নিয়ে আসার জন্য ব্যস্ত পায়ে কেবিনের কোণের তাকের দিকে চলে গেল।

একটু বাদেই মদ আমাকে পেয়ে বসল। মাথার ভেতরে কেমন যেন ঝিম ঝিম করতে লাগল। গ্রীষ্ম মণ্ডলের এরকম বিদ্রোহের কথা আমি বহু আগেই শুনেছি। আর বিদ্রোহ-বিপ্লবের প্রতি আমার শ্রদ্ধাও কম নয়। তাই কোন রকম ভূমিকা না করেই আমি তাদের কাজের অংশীদার হবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলাম।

একটা কথা এতক্ষণ বলি-বলি করেও বলতে পারছিলাম না। শেষ পর্যন্ত বরাত ঠুকে বলেই ফেললাম—মঁসিয়ে, আপনারা নিজের দেশে একটা বিপ্লব শুরু করতে চলেছেন, ঠিক ধরেছি কি?

লোকটা হঠাৎ যেন গুলি-খাওয়া বাঘের মত গর্জে উঠে বলল—অবশ্যই, অবশ্যই। একটা বড় রকমের ধাক্কা দিতে চলেছি। আশা করি রীতিমত গতি ধুন্ধুমার কাণ্ড বাঁধিয়ে ছাড়ব।

মুহূর্তের জন্য থেমে নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে এবার বলল—বাটপাড়ি, পয়লা নম্বরের ধাপ্পাবাজ!

—যেমন?

—কি আর বলব, দিনের পর দিন শুধু প্রতিশ্রুতিই দিয়ে চলেছে। শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে সবই ধাপ্পা। বললে বিশ্বাস করবে না, সে কী মধুর প্রলেপ দেওয়া কথা। কিন্তু কাজের বেলা সবই ভোঁ-ভাঁ।

—তাই কি ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে—

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই লোকটা আবার তর্জন গর্জন শুরু করে দিল—দেখ, যাদের মোক্ষম দাওয়াই না দিলে কাজ হবার নয় তাদের কাছে আবেদন নিবেদনে তো কাজ হবার নয়। হয়ও নি। তাই আমরা আজ রুখে দাড়াবার প্রতিশ্রুতি নিয়েছি। একটা বড় রকমের ওলট পালট করতে না পারলে দেশের মানুষের স্বস্তি হবার নয়।

—যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি।

—দেখ, তোমাকে যখন আপনজন ভেবে নিয়েছি; আর তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছ আমাদের কোন কথাই ফাঁস করবে না তবে আমাদের কথার মধ্যে তো কোন দ্বিধা থাকার কথা নয়। বল, কি জানতে চাইছ?

—কথাটা হচ্ছে, আপনারা কি পাকাপাকি পরিকল্পনা, মানে অচিরেই রাজধানী শহরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন।

—অবশ্যই, অবশ্যই। ক'দিনের মধ্যেই আমাদের সৈন্যরা হৈ হৈ করে রাজধানী শহরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। ক্যারাম্বাস! ক্যারাম্বাস!

আরও একগ্লাস মদ গেলায় আমি অধিকতর উৎসাহের সঙ্গে ব'লে উঠলাম—দেখুন ভিভার মতই ক্যারাম্বাস শব্দটা খুবই জুঁতসই। প্রাচীনকালের ত্রিপাত্র—মানে কলা-আঙুর বা মটর পাতা যা-ই আপনাদের প্রতীক হোক না কেন সেটাই যেন ঊর্দ্ধকাশে চিরদিন উড়তে থাকে।

—এরকম চমৎকার কথাগুলো বলার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছিনা। এ মুহূর্তে আমাদের এমন সব মানুষ বেশী সংখ্যক দরকার যারা স্বেচ্ছায় ও উৎসাহের সঙ্গে কাজ করতে ইচ্ছুক। তাদের উৎসাহই আমাদের পতাকাকে ঊর্দ্ধে তুলে ধরুক।

—হ্যাঁ, ত্যাগের মানসিকতা ছাড়া তো এমন মহৎ একটা প্রয়াস সার্থক হতে পারে না।

—অবশ্যই, হায়! এক হাজার শক্তিশালী যুবক-প্রাণ যদি স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে জেনারেল ডি ভেগা-র পাশে এসে দাঁড়ায়, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজে লেগে পড়ত তবে তিনি দেশকে সাফল্য ও গৌরবান্বিত ক'রে দিতে পারতেন, তবে এ-ও অস্বীকার করার নয় কাজটা খুবই কঠিন।

—মানে?

—আরে বুঝছ না, স্বেচ্ছায় কাজ করতে এগিয়ে আসার মত মানুষ খুজে পাওয়া খুবই সমস্যা!

আমি আচমকা তার হাত দুটো চেপে ধরে বলে উঠলাম—মঁসিয়ে, আপনার পরিচয় আমার জানা নেই। এমন কি আপনার দেশটা যে কোথায় তা-ও আমার জানা নেই। তবু আপনার মুখ থেকে যেটুকু শুনেছি তাতেই আমার ভেতর কেঁদে আকুল হচ্ছে।

—হুম!

—তা একটা কথা বিশ্বাস করবেন, অত্যাচারিত—নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত মানুষ দেখলে ক্লান্সিরা মুখ বুজে হাত-পা গুটিয়ে থাকতে পারে না।

—চমৎকার! চমৎকার!

—ক্লান্সি-পরিবারটা জন্ম-বিদ্রোহী, ব্যবসার খাতিরে বিদেশী। তবে আমার অন্তরের কথা আপনারা শুনে রাখুন, আপনার দেশকে অত্যাচারী পাষণ্ডের কবল থেকে মুক্ত করতে জেমস ক্লান্সির পেশীবহুল সবল হাত দুটোকে যদি কাজে লাগাতে আগ্রহী হোন তবে আপনি নির্দ্বিধায় আদেশ করতে পারেন।

আমার কথায় জেনারেল ডি ভেগা-র মধ্যে কেমন একটা অবর্ণনার খুশির জোয়ার বয়ে যেতে দেখলাম। মুখে ফুটে উঠল হাসির প্রলেপ। আমি আবারও বললাম—আমাকে যদি আপনার কোন কাজে লাগবে বলে মনে করেন তবে আপনি নির্দ্বিধায় আমাকে যে কোন আদেশ করতে পারেন।

বাঁধন হারা খুশির জোয়ারে আপ্লুত হয়ে জেনারেল ডি. ভেগা যন্ত্রচালিতের মত চেয়ার ছেড়ে উঠে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

ব্যস, সে মুহূর্ত থেকেই আমি বিদ্রোহীদের দলে স্থান পেয়ে গেলাম।

আমাদের মধ্যে যে সামান্যতম বিভেদের প্রাচীর ছিল তা-ও মুহূর্তে ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। জেনারেল আমার জিজ্ঞাসা দূর করতে গিয়ে বললেন—তবে শোন যুবক বন্ধু—আমার দেশটার নাম 'গুয়াতেমালা'।

আমি উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে বলে উঠলাম—গুয়াতেমালা!

—হ্যাঁ, গুয়াতেমালা। পৃথিবীতে যত সমুদ্রধৌত ভূখণ্ড আছে তাদের মধ্যে সে দেশটাই সবার সেরা।

তারপর চোখের জলে ভিজে-ওঠা চোখ দুটো দিয়ে আমাকে বার বার দেখতে দেখতে আবেগের সঙ্গে জেনারেল বলতে লাগলেন— আহা! আহা! দীর্ঘ দেহী, পেশীবহুল এমন বলিষ্ঠ আর অসীম সাহসী যুবক! এরকম যুবকই তো আমার দেশ চায়।

কথা শেষ করে জেনারেল ডি. ভেগা এবার পকেট থেকে এক গোছা কাগজ বের করলেন। তারপর গোছাটা থেকে বেছে বেছে একটা দলিল বের করে আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—এতে একটা স্বাক্ষর কর। আমিও স্বাক্ষর করার সময় ইংরেজি বর্ণমালার ওয়াই অক্ষরের ল্যাজটাকে বাঁ দিকে একটু বেশী করেই বাঁকিয়ে দিলাম।

জেনারেল ডি. ভেগা-র কথায় ব্যবসায়ী-সুলভ মনোভাবের পরিচয় পেলাম। তিনি বললেন—শোন, তোমার যা কিছু রাহা-খরচ সবই তোমার বেতন থেকে কেটে নেওয়া হবে, বুঝলে?

আমি নীরবে ঘাড় কাৎ করে তার বক্তব্য মেনে নেব ভাবলাম। কিন্তু মুখ বুজে বক্তব্যটাকে মেনে নেওয়া সম্ভব হল না। বেশ একটু চড়া গলায়ই বললাম—তার আর দরকার নেই। আমিই আমার রাহা-খরচ দেব।

আমার কোটের ভেতরের পকেটে আগেভাগেই একটা একশ'ডলারের নোট রাখা ছিল। আমার মত একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে সেটাই যথেষ্ট বলে মনে করলাম।

জাহাজটা দু'ঘণ্টার মধ্যেই নোঙর তুলবে। কিছু দরকারী জিনিসপত্র সংগ্রহ করার জন্য আমি ব্যস্ত হয়ে তীরে চলে গেলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজে ফিরে এসে সদ্য কেনা কোটটা জেনারেল ডি. ভেগা'কে দেখালাম।

তিনি হাত বুলিয়ে ব'লে উঠলেন, সুন্দর হয়েছে। চিঞ্চিলা ওভার কোটটা সুন্দর হয়েছে।

তারপর এক এক করে লোমের টুপি, মেরুদেশে ব্যবহারোপযোগী ওভার-সু, কান-ঢাকার লোমের বস্ত্রখণ্ড, পশমী গলাবন্ধ আর হাত-মোজা কিছুই দেখতে বাদ দিলাম না।

বেঁটেখাটো বলের মত জেনারেল বলে উঠলেন—ক্যারাম্বাস! ক্যারাম্বাস! গ্রীষ্ম মণ্ডলে যাবার উপযুক্ত পোশাকই খরিদ করেছ বটে! কথাটা বলেই তিনি গলা-ছেড়ে হেসে'উঠলেন।

হাসতে হাসতেই তিনি ক্যাপ্টেনকে ডাকলেন। ক্যাপ্টেন ডেকে আনলেন কোষাধ্যক্ষকে আর তারা ডাকাডাকি করে ইঞ্জিনীয়ারকে নিয়ে এলেন। তারপর জাহাজের ছোট-বড় যত কর্মী ছিল সবাই ছুটোছুটি করে এসে আমার চারদিকে জড়ো হয়ে হেসে যেন একেবারে লুটোপুটি খেতে লাগল। আর বিস্ময়-মাখানো দৃষ্টিতে আমার গুয়াতেমোলা যাত্রার পোশাকগুলো দেখতে লাগল। আমি তো এমন একটা পরিবেশের মুখোমুখি হয়ে আধ-মরা হয়ে যাবার জোগাড় হলাম।

কিছুক্ষণ গম্ভীর মুখে ভেবে আমি জেনারেলকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার দেশটাকে কোন নামে ডাকা হয় বলুন তো?

জেনারেল এবার নামটা বললেন। আর আমিও সহজেই বুঝতে পারলাম 'গুয়াতেমালা' আসলে 'কামচাটকা'-রই অন্য নাম।

ব্যস, সে থেকেই দেশ দুটোর নাম, জলবায়ু, আবহাওয়া আর ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবেশ—সবই কেমন গুলিয়ে যেতে লাগল।

আমি রাহা-খরচ বাবদ চব্বিশ ডলার মিটিয়ে দিলাম। জায়গা পেলাম প্রথম কেবিনে। আর খাওয়া দাওয়া সারতে লাগলাম অফিসারদের সঙ্গে একই টেবিলে।

আমার নিচের ডেকে কিছু দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী দেখলাম। সংখ্যায় তারা প্রায় চল্লিশজন। তাদের চালচলন ও পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে মনে হল তারা দাগো এবং তাদেরই সমগোত্রীয়।

আমি অবাক হয়ে তাদের দেখি আর নীরবে ভাবি, এতগুলো লোক কিসের জন্য চলেছে। কি তাদের উদ্দেশ্য।

তিনদিনও পার হল না। দিন তিনেকের মধ্যেই আমাদের জাহাজটা গুয়াতেমালার তীর ঘেঁষে তরতর করে এগোতে লাগল।

আমি বিস্ময়-মাখানো দৃষ্টিতে নীলাভ দেশটাকে দেখতে লাগলাম, মানচিত্রের পাতায় যেমন হলদেটে দেখানে হয়েছে মোটেই তেমন নয়।

আমাদের জাহাজটা উপকূলবর্তী একটা শহরের গায়ে নোঙর করল।

আমরা এক এক করে জাহাজ থেকে নেমে গেলাম। সেখানে ছোট্ট একটা রেলপথের ওপর সারিবদ্ধভাবে গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম।

আমরা কাঠের বড় বড় বাক্সগুলো জাহাজ থেকে নামিয়ে গাড়িগুলোতে তুলে দিতে লাগলাম।

'দাগো'-র দলটাও একটা গাড়িতে উঠে পড়ল।

জেনারেল আমাকে নিয়ে প্রথম গাড়িটায় উঠলেন।

সত্যি কথা বলতে কি, গাড়িটা বন্দর ছেড়ে দেবার পরই আমি আর জেনারেল ডি. ভেগার-ই হলাম পুরো দলটার নেতা।

এক নাগাড়ে সাত ঘণ্টা চলার পর চল্লিশ মাইল দূরবর্তী একটা জায়গায় আমাদের গাড়িটা থামল। থামল মানে থামতে বাধ্য হল। কারণ এরপর আর রেললাইন নেই।

আমি গাড়ি থেকে নেমে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে চারদিকের দৃশ্যাবলীর দিকে চোখের মণি দুটোকে বার-কয়েক বুলিয়ে নিয়ে আপন মনে বললাম, বুঝেছি, এটাই তা বিপ্লবীদের ঘাঁটি। তবে এখানে বিপ্লবের পূজারী ক্লান্সিই হানবে মুক্তিলাভের এক প্রচণ্ড আঘাত। এটাই তবে সে অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত, নিপীড়িত ভূখণ্ড।

আমরা সবাই মিলে ধরাধরি করে বাক্সগুলোকে ট্রেন থেকে নামিয়ে পাশাপাশি সাজিয়ে রাখতে লাগলাম।

সেগুলোর মধ্য থেকে প্রথম যে বাক্সটার মুখ খোলা হল সেটা থেকে জেনারেল ডি, ভেগা

একটা করে উইনচেস্টার রাইফেল নিয়ে রোগাটে সৈন্যদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে লাগলেন। তারপর অন্য একটা বাক্সর মুখ খোলা হল। তার ভেতরে দেখলাম মাত্র একটা বন্দুক আর বাকি বাক্সগুলো কুড়ুল, কোদাল আর গাঁইতি বোঝাই।

গ্রীষ্ম মণ্ডলের কপালে অশেষ দুঃখ লেখা আছে—গর্বিত আমি আর দাগোরা সবাই একটা করে কুড়ুল, কোদাল বা গাঁইতি কাঁধে নিয়ে এগিয়ে চললাম ছোট রেল পথের কাজ সারতে।

রেললাইন পাতার জন্যই দাগোদের জাহাজ বোঝাই করে আনা হয়েছে। আর এ কাজ করার জন্য তাদের অজ্ঞাতে বিপ্লবীদের খাতায় তাদের নাম উঠে গেল। পরবর্তীকালে আমি এটা বিভিন্ন পরিস্থিতির মাধ্যমে বুঝতে পেরেছিলাম।

সে দেশের মানুষগুলো কুড়ের বাদশা। কোন কাজেই তাদের আগ্রহ উৎসাহ নেই। কাজ করার মত তেমন দরকারও হয় না।

আসলে তারা হাত বাড়ালেই প্রচুর ফলমূল পেয়ে যায়। তাই ঘুমেরও অসুবিধা হয় না। খাওয়া আর ঘুমানো ছাড়াও যে আর বহু কাজ থাকতে পারে এটা তাদের জানাই নেই।

অতএব বাইরে থেকে শ্রমিক জোগাড় করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আর এ কারণেই স্টিমারগুলো উপকূলবর্তী অঞ্চলে ঘুরে বেড়ায়—শ্রমিক জোগাড় তো করতেই হবে।

গ্রীষ্ম মণ্ডলের দূষিত জল আর উষ্ণ বাতাস বহিরাগত শ্রমিকরা বেশী দিন সহ্য করতে পারে না। কিছুদিন কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে লেগে যাবার পরই তাদের ইহলোক ছেড়ে যেতে হয়।

আর এ কারণেই তারা যখন এক বছরের চুক্তি-পত্রে স্বাক্ষর করে এখানে এসে কাজে লাগে তারপর থেকে তাদের ওপর কড়া নজর রাখা হয়, যাতে তারা অতিষ্ঠ হয়ে কেউ কেটে না পড়ে।

আমিও একটা পরিবারের সঙ্গে মিশে গিয়ে, তাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জোর কদমে কাজ শুরু করে দিলাম।

আমাদের দলে প্রায় একশ'জন কর্মী।

ক'দিনের মধ্যে একটা সুযোগ আমার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে গেল। এক সকালে কাজে যোগ না দিয়ে আমি জেনারেল ডি. ভেগার-র সঙ্গে দেখা করলাম।

আমাকে দেখেই তিনি দাঁত বের করে বিনম্র অথচ পৈশাচিক হাসি হাসল।

অভিজ্ঞ ও সুচতুর মানুষটা আমি কিছু বলার আগেই বলে উঠলেন—দেখ, গুয়াতেমালায় সবল মানুষের কাজের অভাব হয় না। বেতন মাসে ত্রিশ ডলার। পরিমাণটা কম নয়। কি বল, ত্রিশ ডলার কম?

আমি নীরবে ম্লান হাসলাম।

জেনারেল বলে চললেন—অচিরেই আমরা রেলপথটাকে রাজধানী পর্যন্ত সম্প্রসারিত করে ফেলব, সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি। আর একটা কথা, সরকারের ইচ্ছে, তোমরা হৈ হুল্লোড় করে কাজ চালিয়ে যাও। কাজ কর, মন দিয়ে কাজ করে যাও। শক্তিধর পুরুষ, বিদায়।

আমি কিছু বলার আগেই জেনারেল ডি. ভেগা তার যা কিছু বলার সব গুছিয়ে বলে আমাকে বিদায় জানালেন।

তারপরও আমি স্থবিরের মত সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম

সে মুহূর্তেই আমি নিজের মনকে শক্ত করে নিয়ে বললাম—মঁসিয়ে, এক ছোট্ট আইরিশম্যানকে একটা কথা বলার সুযোগ দিলে বাধিত হব।

জেনারেল বিতৃষ্ণার সঙ্গে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

আমি বললাম—মঁসিয়ে, আপনার মাকড়শার জাল ছোট জাহাজটায় যখন আমি উঠেছিলাম তখন আপনি আমাকে মদের গ্লাস দিয়ে স্বাগত জানিয়েছিলেন। আর উদারনীতি ও বৈপ্লবিক ক্রিয়া কাণ্ডের বড়বড় বুলি আওড়ে আপনি আমাকে শুনিয়েছিলেন, ঠিক কি না?

জেনারেল গম্ভীর মুখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

—আপনি কি মনে করেন যে, আপনাদের রেললাইন স্থাপনের মত তুচ্ছ কাজ সম্পন্ন করার জন্য আমি কুড়ুল আর গাঁইতি কাঁধে তুলে নিয়েছিলাম? আমি বলব, এটা একটা জঘন্য ষড়যন্ত্র।

দেশোদ্ধারের বড় বড় বুলি যখন আপনি আওড়েছিলেন তখন আপনি জানতেন যে, পায়ে বেড়ি-পরানো দাগোদের সঙ্গে আমাকেও একই দেয়ালে জুড়ে দেবেন।

বিকট হাসির জোয়ারে জেনারেলের বলের মত গোলগাল চেহারাটা নাচতে লাগল। হ্যাঁ, বেশ কিছুক্ষণ ধরেই তিনি দম ফাঁটা হাসিতে মেতে রইলেন। আর আমিও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার হাসির রকমসকম দেখতে লাগলাম।

আমাকে তবু দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি এবার গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—যত সব ভাঁড় নিয়ে আমার কারবার তোমরা কি আমাকে হাসিয়ে দম বন্ধ করে মারবে নাকি হে? এ যে দেখছি, আমার দেশের কাজে সাহায্য করার মত শক্তিমান ও বীর জোয়ান পাওয়া খুবই কঠিন। বিপ্লব? বিপ্লব? আমি কি একবারও বিপ্লবের কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেছি? না, ভুলেও বলিনি। তবে আমি কি বলেছি? আমি বলেছি, গুয়াতেমালার বড় মাপের শক্তিধর পুরুষ দরকার। তুমিই তো বিপ্লব বিপ্লব করেছ। অতএব ভুল আমি নয়, সত্যিকারের ভুলটা করেছ তুমি নিজে।

—কিন্তু—

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই তিনি আবার বলতে শুরু করলেন—

তুমিই তো আমার রক্ষীদের জন্য বাক্সের ভেতরে বন্দুকগুলো দেখেই বিপ্লব-বিপ্লব শুরু করলে। আর সবগুলো বাক্সেই বন্দুক ছিল এটাই কি তোমার ধারণা ছিল? কিন্তু না, মোটেই তা ছিল না।

আরে গুয়াতেমালায় যুদ্ধটুদ্ধ হয় না, হচ্ছেও না। তবে কাজকর্ম? তা যে ভালই আছে নিজের চোখেই তো দেখতে পাচ্ছ। একটা মাস কাজ করতে পারলেই ত্রিশ ডলার।

—তাই বলে—

—কাজ! কাজ! কাজ করে যাও। এক মাস কুড়ুল কাঁধে তুলে নিয়ে গুয়াতেমালার মুক্তি ও উন্নতির জন্য খনিতে কাজ কর, বিনিময়ে মাসে ত্রিশ ডলার ট্যাকে গোঁজ। আর সময় নষ্ট কোরো না। নিজের কাজে যাও। রক্ষীরা তোমার অপেক্ষায় আছে।

পুঞ্জীভূত ক্ষোভ সামলাতে না পেরে আমি গুলি-খাওয়া বাঘের মত গর্জে উঠলাম—কুত্তার বাচ্চা কাঁহাকার! ব্যাটা হারামজাদা, নচ্ছাড়! মনে রেখো, আমার দিনও একদিন না একদিন আসবে। এখনই হয়ত কিছু হবে না, করতে পারব না, কিন্তু খেয়াল রেখো, জে. ক্লান্সি যেদিন পাল্টা জবাব দিতে পারবে সেদিনই তোমার দফারফা হবে।

দলের সর্দার হেড়ে গলায় কাজের হুকুম জারি করতেই আমিও দাগোদের সঙ্গে দলে ভিড়ে গিয়ে হাঁটতে লাগলাম। দেশপ্রেমিক ও অপহরণকারী দামড়াটার শেয়ালের মত ফিক্ ফিক্ হাসিটা যেন আমার রক্ত গরম করে দিতে লাগল।

খুবই মর্মান্তিক ব্যাপার হলেও আমি দাগোদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশের স্বার্থে রেলপথ বসাতে লাগলাম। দিনে বারো ঘণ্টা করে কুড়ুল, কোদাল আর গাঁইতি চালিয়ে বন জঙ্গল কেটে সাফ করে দিলাম। গ্রীষ্ম মণ্ডলের দেশগুলোর জঙ্গলের অবস্থা দূরতম অঞ্চলের মানুষরা কল্পনাও করতে পারবেন না। তার ওপর জলে কুমির আর জঙ্গলে বাঘ তো আছেই। আর মশা? বোলতাও বুঝি তাদের চেয়ে আকারে ছোট আর হুলও ভোঁতা। ধুনি জ্বালিয়ে মশার উপদ্রব ঠেকাতে হয়।

সশস্ত্ররক্ষীরা সবকিছুর ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলে।

আমরা তিন-চারজন ছাড়া বাকি সবই দাগো কুলি রেললাইন বসানোর কাজে জড়িত। তবে জনা কয়েক স্পেন ও সুইডেনের অধিবাসীও আছে।

এক সমঝদার বুড়ো, হ্যালোরান তার নাম—সে-ই আমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলেছিল।

লোকটা এক বছর ধরে রাস্তা বানানোর কাজে লেগে রয়েছে। দু'মাস হবার আগেই তার দলের অনেকেই মারা গিয়েছিল। আর তার নিজের শরীরেও মাংস বলতে কিছু নেই, কেবল হাড়ের ওপর কোঁচকানো চামড়া জড়ানো। প্রতি তৃতীয় রাত্রে তার অস্বাভাবিক কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে।

সে জ্বরের ঘোরে কাঁপতে কাঁপতে বলল—এখানে পা দেবার পরই তোমার মনে হবে

রাতারাতি কেটে পড়ি, কিন্তু তারা তো রাহা খরচের জন্য প্রথম মাসের বেতনটা তোমার হাতে গুঁজে দিয়েছিল, আর তারই বলে গ্রীষ্ম মণ্ডল তোমার মাথায় চেপে বসেছে। চারদিকে গভীর জঙ্গল। বেবুন, বিষাক্ত সাপ আর সিংহ অনবরত তর্জন গর্জন করছে। ইয়া বড় বড় মশা তোমার খোঁজে দাপাদাপি করছে। কড়া রোদে তোমার চামড়া পুড়ে কালশিটে পড়ে যাবে। আর তোমার হাড়ের ভেতরে মজ্জাও গলতে আরম্ভ করবে।

কয়েক সেকেণ্ড থেমে একটু দম নিয়ে বুড়োটা আমায় বলতে শুরু করল—সারা জীবন ধরে যা কিছু রঙীন স্বপ্ন—সবই তোমার মন থেকে ধুয়ে মুছে একেবারে সাফসুতরা হয়ে যাবে।

সারাটা দিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর যখন পেটের জ্বালা নেভাতে পাতা সামনে নিয়ে বসবে তখন দাগো পাচক তোমার সামনে ধপ্ করে ফেলে দেবে কিছু নাড়িভুঁড়ি আর রবার গাছের ডগা সেদ্ধ। উপায়ান্তর না দেখে নাক টিপে ধরে সবকিছু গলা দিয়ে উদরে চালান করে দেবে।

তারপর? তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তুমি বলবে—ঢের হয়েছে, আর নয়। পরের হপ্তাহেই এখান থেকে কেটে পড়তে হবে।

কিন্তু প্রতি রাত্রেই শুতে গিয়ে নিজেকে মিথ্যাবাদী বলে ধিক্কার দেবে। কারণ, তুমি তো নিঃসন্দেহ যে, এ জন্মে আর তোমার দ্বারা পালিয়ে যাওয়া হচ্ছে না।

একে অসুস্থ তার ওপর এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলায় বুড়োটা রীতিমত হাঁপাতে লাগল।

এবার আমি মুখ খুললাম—'একটা কথা, যে গোলগাল লোকটা নিজেকে জেনারেল ডি. ভেগা ব'লে নিজের পরিচয় দেয় সে সর্দারটা আসলে কে, বল তো?'

বুড়ো হ্যালোরান বলল—আরে, সে হতচ্ছাড়াটাই তো রেললাইন পাতার জন্য ব্যস্ত। গোড়াতে একটা বে-সরকারী সংস্থা কাজটা শুরু করেছিল। ক'দিন পর তারা কাজটা ছেড়ে হাওয়া হয়ে গেলে জেনারেলই তারপর কাজটা হাতে নেন। আরে ভায়া, লোকটা একজন উঁচু দরের রাজনীতিবিদ। এ দেশের প্রেসিডেন্ট হবার রঙীন স্বপ্ন দেখছে।

জেনারেলের ইচ্ছে, জোর কদমে কাজ করিয়ে রেললাইন পাতার কাজটা সেরে ফেলেন। কারণ, এর জন্য তাদের মোটা অর্থ ট্যাক্স দিতে হয়। মনে করতে পার, রেলপাতার কাজটাই জেনারেল ডি, ভেগা-র প্রচারের একটা বড় মাধ্যম।

'—দেখুন, নিছক হম্বিতম্বি ক'রে, কাউকে শাসিয়ে দেবার ইচ্ছা আমার নেই। তবে এ-ও সত্য যে, একদিন না একদিন পত্তনের সর্দার আর জেমস ক্লান্সি-র মধ্যে চূড়ান্ত একটা বোঝাপড়া হবেই হবে।'

কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসে হ্যালোরান বিছানায় উঠে বসল। তারপর ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারণ করল—দেখ ভায়া, এক সময় এমন স্বপ্ন আমিও একবার দেখেছিলাম। তারপর আজ ছোট্ট-অবুঝ খোকা বনে গিয়েছি। এরজন্য কাকে দায়ী করা চলে, জান?

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকালাম। সে খুক্ খুক্ ক'রে কাশতে কাশতে বলল—এর জন্য দায়ী গ্রীষ্মমণ্ডলের উদ্দাম পরিবেশ, বুঝলে? এ দেশ মানুষের মনকে নতুন রূপে-রসে ভরিয়ে দেয়। আজ আমার কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে চুরুট ফোঁকা আর ঘুমিয়ে দিন কাটানো। এ হাল তোমারও একদিন হবে।

এবার চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে বলল—শোন হে ক্লান্সি, রঙীন স্বপ্নে বিভোর হয়ো না।

—স্বপ্ন, স্বপ্ন না দেখে আমি থাকতে পারি না। আমি বললাম, হাজারো স্বপ্ন আমার মাথার মধ্যে প্রতিনিয়ত চক্কর মারছে। আমি শিশুর মত সরল বিশ্বাসেই এ অবজ্ঞাত অবহেলিত আর অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশের বিপ্লবী দলের খাতায় নাম লিখিয়েছিলাম। আর চেয়েছিলাম—এ দেশের স্বাধীনতা, সম্মান আর সমৃদ্ধি দানের জন্য সংগ্রাম আত্মনিবেদন করতে। আর তার পরিবর্তে আমাকে কাজে লাগানো হয়েছে এমন সুন্দর একটা দেশের বন-শোভাকে কেটে মরুভূমি ক'রে দেওয়ার জন্য। এসব ভণ্ড নেতাকে একদিন না একদিন এর দাম কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দিতে হবেই হবে, শুনে রাখুন।

আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও দু'-দুটো মাস রেললাইন পাতার কাজে লেগে রইলাম। তারপরই কেটে পড়ার একটা সুযোগ আমার হাতের মুঠোয় চলে এল।

পোর্ট ব্যারিওজ-এ কিছু দাঁ, কুড়োল আর কোদাল ধার করতে দেওয়া ছিল। সর্দার কিছু লোক সঙ্গে দিয়ে আমাকে সেগুলো নিয়ে আসার জন্য পাঠালেন। সেখান থেকে যাত্রার মুহূর্তে আমি দেখলাম, ঠেলাগাড়িটাকে রেলপথের ওপরেই ফেলে রাখা হয়েছে।

সেদিন রাত্রি প্রায় বারোটা। বুড়ো হ্যালোরানকে ঘুম থেকে তুলে আমার মতলবটা বললাম। সব কিছু শুনে হ্যালোরান বলল—আরে ব্বাস! পালাবে? এটা কি সত্যি সত্যি তোমার মনের কথা? আরে, না-না, অত হিম্মৎ আমার নেই। উফ! আজ কী ঠাণ্ডা পড়েছে! হাড়ে পর্যন্ত কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছে। চোখ এখন ঘুমের বেশ। পালিয়ে যাব? ক্লান্সি তোমাকে তো বলেইছি, আমার কব্জির জোর কমে গেছে। এটা গ্রীষ্মমণ্ডলের প্রভাব।

মুহূর্তকাল গুম্ হয়ে ব'সে থেকে হ্যালোরান এবার ফ্যাকাসে-বিবর্ণ মুখে বলল—। না হে ক্লান্সি, গতিক সুবিধের মনে হচ্ছে না। আমাকে ছাড়ান দাও। বরং তুমি একাই কেটে পড়। আমি এখানেই রয়ে যাই।

অনন্যোপায় হয়েই হ্যালোরান'কে ফেলে রেখেই আমাকে যেতে হ'ল।

নিঃশব্দে পোশাক পাল্টে বিড়ালের মত পা টিপে টিপে তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

হঠাৎ হৈ হৈ ক'রে রক্ষী তেড়ে এল।

আমিও একটা ডাব নারকেল দুম ক'রে তার মাথায় মেরে দুনিয়া থেকে বিদায় দিয়ে দিলাম।

এবার রেললাইন ধরে আমি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগলাম। ঠেলাগাড়িটাকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। সেটা চেপে চলে গেলাম বন্দরে। দেখলাম, বন্দরে একট স্টিমার দাঁড়িয়ে। তার চোঙ দিয়ে গলগল ক'রে ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

ঘাটে একটা নৌকা নিয়ে এক নিগ্রো জোয়ানকে অপেক্ষা করতে দেখলাম। মনে হ'ল, যাত্রী নিয়ে শিগগিরই ছাড়বে।

আমি এগিয়ে গিয়ে নিগ্রোটাকে জিজ্ঞাসা করলাম—ভাইরে, ওটা কোন্ স্টিমার, বল তো? যাচ্ছেই বা কোথায়? ব্যাপারটা একটু খোলসা ক'রে বল। এখন সময় কত, বলতে পার?

নিগ্রোটা জবাব দিল—স্টিমারটা?'কঞ্চিতা'। নিউ অর্লিয়েন্স থেকে কলম নিয়ে এসেছে। মনে হচ্ছে, ঘন্টা দু'য়ের মধ্যে ছেড়ে যাবে।'

—তাই বুঝি?

—হ্যাঁ। আর দিনটা ভালই কাটবে। আর ভয়ঙ্কর একটা যুদ্ধের কথা তুমিও হয়তো শুনে থাকবে, শোন নি?

—যুদ্ধ? কোথায়, কবে—কাদের মধ্যে যুদ্ধ?

—আরে ভায়া, তুমি দেখছি, দুনিয়ার কোন খবর রাখ না। তুমি কি ভাবছ জেনারেল ডি ভেগা ধরা পড়ে যাবে? কি হে, হ্যাঁ, নাকি না?

—সাম্বো ভায়া, তুমি এসব কি বলছ, বুঝলাম না তো? যুদ্ধ? ভয়ঙ্কর যুদ্ধ? কোন্ যুদ্ধ? কাদের মধ্যেই বা যুদ্ধ?

—তুমি একটা কূয়োর ব্যাঙ দেখছি! কোন খবরই রাখ না।

—কিন্তু আমি তো অনেক ভেতরের একটা সোনার খনিতে দুমাস কাজ করেছি। কিন্তু যুদ্ধের কোন খবরই তো কানে আসে নি।

—আরে, এক সপ্তাহ আগেই তো গুয়াতেমালায় খুব বড় একটা বিপ্লব হয়ে গেল। আরে জেনারেল ডি. ভেগা প্রেসিডেন্ট হবার চেষ্টা করেছিল। এক পাঁচ বা দশ হাজার অনুগামী নিয়ে সে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে মেতেছিল, সরকার বিদ্রোহ দমন করার জন্য পাঁচ—চল্লিশ বা দশ লাখ সৈন্য পাঠিয়ে দেয়। গতকাল উপকূল থেকে উনিশ বা পঞ্চাশ মাইল ভেতরে উভয় পক্ষের তুমুল যুদ্ধ হয়। সরকারের সৈন্যরা জেনারেল ডি. ভেগাকে একেবারে নাস্তানাবুদ ক'রে ছেড়েছে। তার পাঁচশ—ন'শ'—কি দু'হাজার সৈন্য মারা গেছে। খুবই তাড়াতাড়ি বিদ্রোহকে অঙ্কুরেই বিনাশ ক'রে দিয়েছে।

বে-গতিক দেখে জেনারেল ডি. ভেগা খচ্চরের পিঠে চেপে অন্ধকারে বে-পাত্তা হয়ে গেছে। জেনারেল তো জান নিয়ে চম্পট দিল। আর সৈন্যরা? তারা দুর্বিপাকে পড়ে জান দিল।

সরকারের সৈন্য পলাতক জেনারেল ডি. ভেগার খোঁজে চারদিকে চিরুনি তল্লাসী চালাচ্ছে, চোখে দেখামাত্রই তাকে গুলি করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। সৈন্যরা তাকে ধরতে পারবে বলে তুমি মনে কর?

—ঈশ্বরের ইচ্ছায় তা-ই যেন হয়। সে লোক ক্লান্সির মত বীর ও মহান যোদ্ধাকে গ্রীষ্মমন্ডলের জঙ্গল সাফ করতে পাঠিয়ে ছিল; ঈশ্বরের সে বিচারটাই হবে ন্যায্য বিচার। তবে আমার কাছে এ মুহূর্তে যুদ্ধের চেয়ে বড় হচ্ছে নিরীহ অসহায় মানুষগুলোকে উদ্ধার করা। আমি এখন এ দায়িত্ব পদ থেকে সরে গিয়ে তোমাদের এ মহান, লাঞ্ছিত-নিপীড়িত দেশ শ্বেতকায় বিভাগের ওপর নির্ভর করতেই চাচ্ছি।

—হুম।

—সাম্বো ভায়া, তোমাকে পাঁচটা ডলার দিচ্ছি, তোমার নৌকায় নিয়ে গিয়ে ওই স্টীমারটা ধরিয়ে দাও।

কালো মানুষটা আমাকে নিয়ে স্টিমারটায় উঠিয়ে দিল।

তখন পূর্ব-আকাশ সবে একটু একটু করে পরিষ্কার হতে চলেছে। আশ্চর্য! স্টিমারে তখন একটা লোকও দেখতে পেলাম না। আমি কোন রকমে দড়ির মই বেয়ে বেয়ে ডেকের ওপরে উঠে গেলাম।

আমাকে আত্মগোপন করে চলতে হবে। স্টিমারে কারো নজরে পড়লে নির্ঘাৎ 'এমপ্লয়মেন্ট' ব্যুরো'-র জিম্মায় দিয়ে দেবে।

অতএব ধরা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় আমি খুবই সতর্কতার সঙ্গে কলার কাঁদিগুলোর মধ্যে ফাঁক তৈরী করে সেখানে নিজেকে চালান করে দিলাম।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ইঞ্জিনের বিকট আওয়াজ আমার কানে আসতে লাগল। স্টিমারটাও দুলতে আরম্ভ করল। বুঝলাম সেটা বন্দর ছেড়ে যাচ্ছে।

কিছুটা পথ যেতে না যেতেই দেখলাম, আমার থেকে হাত দু'-তিন দূরের কলার কাঁদির একটা গর্ত থেকে একটা হাত বেরিয়ে এসে টুক করে একটা পাকা কলা ছিঁড়ে নিয়ে আবার যথাস্থানে ফিরে গেল। উঁকি ঝুঁকি মেরে দেখলাম, সেই হতচ্ছাড়া জেনারেল ডি. ভেগা। সে কলার কাঁদির ফাঁকে ঘাপ্‌টি মেরে বসে রয়েছে।

সাধ্যমত গলা নামিয়ে সে বলল—আরে, তুমি! এ জাহাজে তুমি কি করে এলে?

আমি ঠোঁটের কাছে আঙুল রেখে বললাম—চুপ! পিছনের দরজা দিয়ে। আমরা তবে মুক্তির জন্য মোক্ষম আঘাতই হেনেছিলাম। কিন্তু প্রতিপক্ষের সৈন্য-সংখ্যা বেশী হওয়ার জন্যই আমরা হেরে গেলাম।

চোখের জল মুছতে মুছতে তিনি বললেন—মুক্তি সংগ্রামে তুমিও কি সামিল হয়েছিলে?

—একদম শেষ অবধিই ছিলাম। অত্যাচারী জানোয়ারদের বিরুদ্ধে আমিই তো শেষ মোক্ষম আক্রমণটা চালিয়েছিলাম। আর তাতেই তারা মরিয়া হয়ে উঠল আর আমরা পিছু হঠতে বাধ্য হলাম।

—হুম!

—আরে জেনারেল, যে খচ্চরটাকে বাহন করে আপনি বে-পাত্তা হয়ে গিয়েছিলেন সেটা তো আমিই খুঁজে দিয়েছিলাম।

আবারও চোখের জল ঝরাতে ঝরাতে জেনারেল বললেন—বীর দেহ প্রেমিক, তুমিও একথা বলছ? হায় অদৃষ্ট! আজ আমি নিঃস্ব। তোমার সেবার পুরস্কার দেবার মত আমার নেই বলতে কিছুই নেই। কোন রকমে পিতৃদত্ত প্রাণটা নিয়ে আমি পালিয়ে আসতে পেরেছি। রাত্রির অন্ধকারে পোর্ট ব্যারিওজে পৌঁছাতে পারলাম।

তারপর খচ্চরটাকে দিলাম ছেড়ে। লম্বা লম্বা পায়ে এখানে এসে দেখলাম ছোট একটা নৌকা বাঁধা রয়েছে। ব্যস, সেটাকে সম্বল করে স্টিমারটার কাছে এলাম। কেবলমাত্র ঝোলানো-সিঁড়িটা

ছাড়া ধারে কাছে কোন লোকই ছিল না। মইটা বেয়ে স্টিমারে উঠে এসে কলার কাঁদির ফাঁকে জায়গা করে নিয়ে ঘাপ্‌টি মেরে বসে পড়লাম। কারো নজরে পড়লে নির্ঘাৎ আবার গুয়াতেমালাদের হাতে চালান করে দেবে। তারা আমার ওপর ক্ষেপে রয়েছে। দেখলেই গুলি করে মারবে। তাই তো এখানে আত্মগোপন করে রয়েছি।

আমি প্রায় অস্ফুট উচ্চারণ করলাম—তোমার কতই না হম্বিতম্বি—

আমার কথাটা শেষ হবার আগেই চোখের জল মুছতে মুছতে ডি. ভেগা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—জান হে, জীবনটা বড়ই গৌরবের বস্তু। স্বাধীনতাও ভাল। তবে জীবনের মত অতটা ভাল নয়।

নিউ অর্লিয়েন্স তিন দিনের পথ। দায়ে পড়ে আমি আর ডি. ভেগা বন্ধুতে পরিণত হয়ে গেলাম। তিন দিন কাটাতে হলে খাবার আর জল তো চাই-ই চাই। পাকা কলা তো হাতের নাগালের মধ্যেই, আর রাত্রির অন্ধকারে জল।

ডি. ভেগা তো জানেনই, আমি তার দলের একজন বিপ্লবী ছিলাম। তার দলে অনেক মার্কিন আর বিপ্লবী ছিল, কথাটা তো তিনিই আমাকে বলেছেন। তিনি নিজেকে যত বড় বিপ্লবীই ভাবুক না কেন লোকটা গুলমারার দিক থেকে একজন সম্রাট। ষড়যন্ত্রটা ব্যর্থ হবার যাবতীয় দোষ ত্রুটি তিনি নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছেন। যে সব বোকা হাঁদারা খেয়ে আর ঘুমিয়ে কাটিয়েছে বা যারা বিপ্লবে মেতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে তাদের কারো বিরুদ্ধে আর কোন অভিযোগ আছে বলে মনে হল না।

আমাদের যাত্রার দ্বিতীয় দিন রাত্রে তিনি গল্প করার ফাকে আমাকে জানালেন, তিনি একটা দীর্ঘ রেলপথ পত্তন করেছেন। তখনকার এক বোকা আইরিশ যুবকের হাসির খানিকটা বলতেও বাদ দিলেন না। নিউ অর্লিয়েন্সের জাহাজে তার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়। তার কাঁধে একটা কুড়োল তুলে দিয়ে রেললাইন তৈরীর কাজে তাকে ভিড়িয়ে দিয়েছিলেন বলতেও বাদ দিলেন না। তার নামটাও বললেন—ক্লান্সি।

একটু বাদে তিনি আবার বলতে লাগলেন—সেই বোকা যুবকটাকে আমি বললাম—'গুয়াতেমালার জন্য কিছু শক্তিমান মানুষ চাই, ব্যস, সে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—আপনার পদদলিত লাঞ্ছিত-প্রপীড়িত দেশের জন্য আমি ওদের ওপর আঘাত হানব। তারপর হাসতে হাসতে আবার বলতে শুরু করলেন—জান ভায়া, সেই বোকা যুবকটা জাহাজ ঘাটায় একটা ভেঙে-যাওয়া বাক্সে রক্ষীদের জন্য আনা বন্দুক দেখেই ধরে নিয়েছিল সব বাক্সেই বুঝি বন্দুক আছে। আসলে তো অন্যসব বাক্সে ছিল কুডুল, কোদাল আর গাঁইতি। পরে যখন কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয় তখন তার মুখখানা যে কী রকম হয়ে গিয়েছিল তা আর বলার নয়।

আমাদের কলা-বোঝাই স্টিমারটা তখন নিউ অর্লিয়েন্স বন্দরে ভিড়ল।

আমি আর ডি. ভেগা হুড়মুড় করে উঠে আসা কুলিদের সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে কলার কাঁদিগুলো এগিয়ে দিতে লাগলাম।

ঘণ্টা খানেক কলার কাঁদি ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে এক সময় মওকা বুঝে আমরা স্টিমারটা থেকে নেমে গেলাম।

ডি. ভেগা'কে এক পার্কের বেঞ্চে বসিয়ে রেখে, কোথাও যেন বলে না যান এরকম কথা বলে আমি নিকটবর্তী পয়ড্রাম ও কারোন্ডেলেটের ..... মোড়ে হাজির হলাম। সেখানেই ও'হারার আখড়া। ও'হারা-র চেহারা বেশ উঁচা-লম্বা। হাতে একটা ডাণ্ডা।

আমি তাকে বললাম—এখনও '৫৩৪৬' কি কাজে লেগে আছে?

চোখের তারায় সন্দেহের ছাপা এঁকে ও'হারা বলল—ওভারটাইমে লিপ্ত। তোমারও কি কিছুটা চাই?

—আরে, জিমি ক্লান্সিকে কি তুমি চিনতে পারছ না?

এবার ও'হারা আমাকে ঠিক চিনে ফেলল।

তারপর সে আমাকে নিয়ে পাশের একটা ঘরে গেল। সেখানে আমি তাকে বললাম, আমার কি চাই; আর কেনই বা চাই।

সে আমাকে বলল, আমি যেন পার্কের সে বেঞ্চটায় ফিরে গিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করি। সে দশ মিনিটের মধ্যেই সেখানে হাজির হবে।

সময় মতই ও'হারা পার্কে হাজির হল।

তারপর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সে আমাকে আর গুয়াতেমালার প্রাক্তন জেনারেল ডি. ভেগা'কে নিয়ে থানায় পুলিস অফিসারের সামনে হাজির করল।

জেনারেল বলল, আমি যেন তার কর্মকাণ্ড আর পদমর্যাদার কথাটা সবার কাছে বলি।

আমি কিন্তু পুলিস অফিসারকে বললাম—এ লোকটা রেলপথ তৈরীর কাজে লিপ্ত ছিল। এখন সব খুইয়ে সম্পূর্ণ বেকার। চাকরি খুইয়ে এখন পায়রার খোপের মত একটা ছোট্ট কামরায় দিন কাটাচ্ছে।

—কেন ঝুটমুট মিথ্যে কথা বলছ ভায়া? আমাদের দেশে, আমাদের সৈন্যদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে তুমি তো যুদ্ধ করেছ। তোমার বরং বলা উচিত আমিই সেই জেনারেল ডি. ভেগা—একজন দেশপ্রেমিক—একজন সৈনিক।

তার কথা শেষ হবার আগেই আমি বলে উঠলাম—বাজে কথা, রেলপথের একজন সামান্য কর্মী ছাড়া তোমার দ্বিতীয় কোন পরিচয়ই নেই।

পুলিস অফিসার কাগজটা ঘাঁটাঘাঁটি করে ডি. ভেগা-র দিকে তাকিয়ে গম্ভীর মুখে বললেন—পঁচিশ ডলার, অনাদায়ে ষাট-দিন।

তার পকেটে একটা সেন্টও নেই। অতএব সে সময়টাই বেছে নিতে বাধ্য হল।

তারা আমাকে ছেড়ে দিল। আসলে ও'হারা পুলিস অফিসারের কানে কানে কি যেন বলল। তারপরই তিনি আমাকে বে-কসুর খালাসের হুকুম দিলেন।

এ পর্যন্ত বলে গল্প কথক ক্লান্সি থামল।

তারপর সে আবেগের সঙ্গে বলল—সঙ্গে একটা কানাকড়িও না থাকায় জেনারেল ডি.ভেগা তার শাস্তির দিনগুলো স্থানীয় কয়েদখানায় অন্য সব কয়েদিদের সঙ্গে উর্সুলাইন্স স্ট্রীটের ময়লা আবর্জনা সাফাই করতে লাগল।

আমি একটু বাদে বাদে পথে হাঁটাহাঁটি করে দেখতে লাগলাম বলের মত গোলগাল মানুষটা কোদাল আর বেল্‌চা-হাতে বিপ্লব চালিয়ে যাচ্ছে।

আমি মুচকি হেসে তাকে বললাম—এই যে মঁসিয়ে, নিউ অর্লিয়েন্সে মোটাসোটা গোলগাল লোকের খুবই দরকার। কাজটা ভাল করে কর।

দ্য রেম্‌ন্যান্টস্‌ অব দ্য কোড

কোরালিওর মানুষরা সকাল এগারোটায় প্রাতরাশ সারে। অতএব সকালে কারো বাজারে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

সেদিন সকালে সাগরমুখী দোকানের মালিকরা দোকানের মালপত্র না সাজিয়ে বসে বসে গল্পগুজবে মেতে রইল। কারণ তাদের জায়গা জুড়ে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে কুদর্শন বীল্‌জীবাব ব্লাইল নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। ছেঁড়া একটা মাদুরের ওপর শুয়ে থাকা তাকে দেখে মনে হল যেন স্বর্গচ্যুত এক দেবদূত।

বীলজীবাব-এর গায়ে কোঁকড়ানো দোমড়ানো, ছেঁড়া ও হাজারটা তালি-মারা মোটা শন পাটের পোশাক।

হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে থাকা বীলজীবাবকে হঠাৎ করে দেখলে মনে হয় কেউ বুঝি অবজ্ঞা ও অবহেলায় একটা কুশপুত্তলিকাকে বাজারে ফেলে রেখে গেছে।

কিন্তু ঘুমন্ত বীলজীবাব-এর চোখে, নাকের ওপর বসানো আছে একটা সোনার ফ্রেমের সুদৃশ্য চশমা। এটা তার অতীত গৌরবের একমাত্র স্মারক হিসাবে আজও টিকে আছে।

বেলা বাড়লে দোকানিদের সংখ্যাও ক্রমে বাড়তে লাগল। আর সে সঙ্গে বাড়তে লাগল তাদের কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা—হৈ হট্টগোল।

হঠাৎ বীলজীবাব-এর ঘুম ভেঙে গেল। সে চোখ ডলতে ডলতে উঠে বসল। এদিক-ওদিক ঘাড় ঘুরিয়ে দোকানিদের দেখল। কোটের পকেট থেকে রংচটা কোঁচকানো ছেঁড়া রুমাল বের করে চশমার কাঁচ দুটো মুছল।

দোকানিরা ভয়ে ভয়ে ভদ্র ভাষায় অনুবোধ করল তাদের ব্যবসা নষ্ট না করে তার এখনই জায়গাটা ছেড়ে দেওয়া উচিত।

বীলজীবাব রাজপুত্রের মত ভাব নিয়ে ধীরে ধীরে উঠে বসল। তার অবস্থা যতই খারাপ হোক না কেন সে তার রাজকীয় ভাব ভঙ্গিটাকে আজও সযত্নে আঁকড়ে রেখেছে।

গায়ের ছেঁড়া আর দোমড়ানো কোঁচকানো পোশাকটাকে ঝাড়তে ঝাড়তে সে বালির ওপর রাজকীয় দুল্‌কি চালে উদ্দেশ্যহীনভাবে হেঁটে এগিয়ে যেতে লাগল।

টাকাকড়ি-বিত্ত সম্পদ আজ বীলজীবাব-এর কাছে অতীত স্মৃতি মাত্র।

বন্ধু-বান্ধব আর পরিচিতদের কাছ থেকে সব রকম সুযোগ সে আদায় করেছে। বন্ধুদের দুর্বলতা ও উদারতার সুযোগ সে নিঃশেষে নিঙড়ে নিয়েছে। সারা কোরালিও-তে একটু করে খাদ্যবস্তু, এক ফোঁটা মদ যেখানে, যার কাছ থেকে পাওয়ার তিলমাত্র সম্ভাবনা ছিল তার সবটুকু সে নিঃশেষে নিঙড়ে নিতে ছাড়েনি।

বীলজীবাব কাকের মত সতর্ক দৃষ্টি মেলে পথ চলতে লাগল যদি ছিটেফোঁটা খাদ্যবস্তু কোথাও পড়ে থাকে।

মাডাসা ভাস্কুয়েন-এর খাবারে ঘরটার পাশ দিয়ে যাবার সময় সে দেখল, বোর্ডাররা নানা উপাদেয় খাদ্যবস্তু সামনে রেখে প্রাতরাশ সারছে। সে লোলুপ দৃষ্টিতে মুহূর্তের জন্য জানালা দিয়ে টেবিলটার ওপর চোখ দুটো বুলিয়ে নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে অনিচ্ছুক পা দুটোকে টানতে টানতে এগিয়ে চলল।

পথের ধারের দোকানি ও কর্মচারীরা আড়চোখে তার দিকে তাকাচ্ছে, কারণ সবাই যে তার পাওনাদার। হ্যাঁ, পাওনাদার ঠিকই কিন্তু কিছুই পাওয়ার আশা নেই।

চারদিকে খাবার আর পানীয় সাজানো। তার প্রাণ কিছু পানীয়ের জন্য ছটফট করছে, অথবা পানীয় কেনার জন্য কিছু অর্থ।

পথ চলতে চলতে পুরনে বন্ধু পলা, কিয়োখ আর উইলার্ড গেড্ডি-র সঙ্গে দেখা। সবাইকেই সে সাধ্যমত চুষে নিয়েছে। তাই সবাই তাকে না দেখি না দেখি করে পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

সবার পরিত্যক্ত যুবক বীলজীবাব পরপর তিনটে পানশালা ইতিমধ্যেই পেরিয়ে গেছে। তিনটে থেকেই বিশ্বাস আর অভ্যর্থনার পাট অনেক আগেই সে চুকিয়ে ফেলেছে।

বীলজীবাব-এর মনের অবস্থা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে, এক গ্লাস মদের জন্য সে যে কোন লোকেরই পা দুটো জড়িয়ে ধরতে পারে।

প্রথম পানশালা দুটোতে ঢুকে এক গ্লাস মদ চাইলে তারা এমন সৌজন্য প্রকাশ করল যে, সবচেয়ে জঘন্য ভাষায় তিরস্কার করলেও বুঝি মনে এর চেয়ে কম দাগা লাগত।

আর তৃতীয় দোকানের কর্মচারীরা তো বাছা বাছা কিছু খিস্তি দিতে দিতে চ্যাঙদোলা করে তাকে একেবারে সদর রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে যায়।

পথ চলতে চলতে বীলজীবাব-এর চোখে-মুখে ফুটে উঠল দৃঢ় একটা সঙ্কল্পের ছাপ।

হাঁটতে হাঁটতে মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে সে বিড়বিড় করে বলতে লাগল—উফ্! যে করেই হোক মদও যদি আমার জুটতো তবে সে ভাবনাটাকে মন থেকে ঝেড়েমুছে ফেলতে পারতাম—কিছুক্ষণের জন্য হলেও মন থেকে চিন্তা দূরে থাকত। তার জন্য যদি আমাকে ডান হাতটাকে কাজে লাগাতেই হয় তবে সে দায় তো কাউকে না কাউকে বইতেই হবে। মিঃ গুড়উইন তুমি মানুষ হিসাবে বড়ই ভাল, আমিও তো ভদ্রসন্তান। বাটপাড়ি? না, কথাটা জুঁতসই নয়, আমার ভাবনাটা তার পরের স্টেশনে গিয়ে ফলপ্রসূ হবে।

হ্রদটার ওপাড়ে গুড়উইন-এর জমি জিরাত। পথটা এঁকে বেঁকে তার বসতবাড়ির দিকে এগিয়ে গেছে।

গোপন উদ্দেশ্য বুকে চেপে বীলজীবাব দ্রুত পথ পাড়ি দিতে লাগল।

গুড্‌উইন-এর বাইরের বারান্দায় সবে প্রাতরাশ-পর্ব মিটেছে। সর্বজন অশ্রদ্ধেয় লোকটা কয়েক পা এগিয়ে সিঁড়ি পর্যন্ত গিয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিল।

গুড্‌উইন চোখ মেলে তাকিয়েই বলে উঠল—কে? বীলজীবাব ব্লাইথ? বল, আমি তোমার জন্য কি করতে পারি,

বীলজীবাব জরুরী কথা আছে বলে তাকে ডেকে বাইরে নিয়ে এল।

গুড্‌উইন বেরিয়ে এলে বীলজীবাব তার কাছ ক'টা মালকড়ি চাইল। গুড্‌উইন দুঃখ প্রকাশ করে নিজের অক্ষমতার কথা জানাল।

ম্লান-হেসে গুড্‌উইন বলল—তোমাকে তো অর্থকড়ি কিছুই দেওয়া চলে না। মদ তোমাকে মৃত্যুর হাতে সঁপে দিচ্ছে। তোমাকে বাঁচাবার জন্য বন্ধুরা চেষ্টার ত্রুটি করেনি। কিন্তু বাঁচতে তুমি চাওনা। তোমাকে অর্থ দিয়ে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়ার কোন যুক্তিই নেই।

—আমার সাফ কথা শোন গুড্‌উইন, সামাজিক ব্যাপার স্যাপারের পাট অনেক আগেই চুকে গেছে। মোদ্দা কথা শুনে রাখ, আজ আমি তোমার বুকে ছুরি বসাবার ধান্ধা নিয়ে এসেছি। আজই আমাকে বার থেকে লাথি মারতে মারতে পথে ফেলে দিয়েছে। তার মাশুল তো তোমাকেই দিতে হবে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে আবার মুখ খুলল—যখন আমি কারো কাছ থেকে হাত পেতে কিছু চাইতাম তখন আমি ছিলাম একজন মানুষ। মোদ্দা কথা, সম্প্রতি আমি নাটকের তৃতীয় অঙ্কের একখানা নায়ক। আমি নিজের চোখে দেখেছি প্রেসিডেন্টের চুরি-করা ডলারের থলেটা তুমি জোর করে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলে, নাও নি? আমি নিঃসন্দেহ এটা ব্ল্যাকমেল। তুমি আমার ঘনিষ্ঠ বন্দুদের একজন। তাই বেশী পীড়াপীড়ি করার ইচ্ছা আমার আদৌ নেই।

গুড্‌উইন বিষণ্ন মুখে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকাল। বীলজীবাব বলে চলল, শোন, পলাতক প্রেসিডেন্ট যে রাত্রে এ শহরে পা দিয়েছিলেন, সেদিন আমি মদের নেশায় বিভোর ছিলাম। হোটেলের পিছনে কমলা-বাগিচার ঘাসের বিছানায় শুয়ে আমি ঘুমোচ্ছিলাম। পিস্তলের গুলির শব্দে আমার ঘুম চটে যায় আর মদের নেশাটাও ফিকে হয়ে আসে। ঠিক তখনই ডলারের থলেটা এসে আমার মাথার ওপরের কমলা লেবুর গাছটার ওপরে পড়ল।

একটু বাদেই পুলিশের গাড়ি এসে পড়ল। আমি হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে ঝোপের ভেতরে সিঁধিয়ে গেলাম।

তারপর কাজ মিটিয়ে তারা আবার গাড়ি চেপে চলে গেল।

একটু বাদেই আমার প্রিয় বন্ধু গুড্‌উইন—একটা বর্ণও মিথ্যে বলব না—আমাকে ক্ষমা কর—আমি দেখলাম, তুমি শিকারী বিড়ালের মত পা টিপে টিপে পলাতক প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে ছিনিয়ে-নেওয়া ডলারের থলেটা কুড়িয়ে নিয়ে তেমনি চুপিচুপি ভেতরে চলে গেলে। একশ' হাজার ডলার এক সঙ্গে লাভ! উফ্‌! ভাবা যায়!

শোন, তখন আমি তোমাদের মত ভদ্রলোক ছিলাম বলেই ব্যাপারটা ঘুর্ণাক্ষরেও কারো কাছেই ফাঁস করিনি। একটু আগে বারের কর্মচারীদের লাথি মেরে মেরে আমার ন্যায়-নিষ্ঠা একেবারে নিঃশেষের চরম পর্যায়ে চলে এসেছে। মাত্র এক গ্লাস মদের জন্য আমি আজ ধর্মপুস্তকটা পর্যন্ত হাসিমুখে বেধে দিতে রাজী।

শোন, আমি তোমাকে বেশী চাপাচাপি করতে চাই না। সে রাত্রে মুখ বুজে ব্যাপারটাকে হজম করার মাশুল হিসেবে আমি তোমার কাছ এক হাজার ডলারও চাইতে পারি।

গুড্‌উইন ঠাণ্ডা গলায়ই বলল—কথা সাফ সাফ হওয়াই ভাল। আজ পর্যন্ত ধার নেবার অজুহাতে তুমি আমার কাছ থেকে নিয়েছ অনেক তা ছাড়া এ শহরে তুমি আর ডলার ধার করেছ?

—মোটামুটি পাঁচশ।

—যাও শহরের বন্ধু ও পরিচিত জনদের কাছে ঘুরে ঘুরে তোমার যাবতীয় ঋণের তালিকাটা তৈরী করে নিয়ে এসো। দু'ঘণ্টার মধ্যেই আমি সব শোধ করে দেব। আর তিনটায় তুমি নগদ

এক হাজার ডলার পেয়ে যাবে। আর এসবের বিনিময়ে তোমাকে কি করতে হবে সে না-ইবা বললাম।

সব বুঝলাম, আমাকে গা থেকে কোরালিও শহরের মাটি চিরদিনের মত ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে, তাই তো?

না, গুড়উইন স্বপ্নের পথ দেখতে চাই নে। আমি নিয়ম মাফিকই খেলতে চাইছি। তোমাকে আমি রেহাই দিয়ে দিলাম। সব কিছু মেনেই নিলাম। এখন এক গ্লাস মদ হলেই আমার চলে যাবে।

না, এক বিন্দু মদও তোমাকে দেওয়া হবে না। আধঘণ্টার মধ্যেই তুমি মদের নেশায় বে-হুঁশ হয়ে পড়বে। আগে সবার কাছ থেকে তোমার দেনার তালিকাটা তৈরী করে নিয়ে এসো।

কিন্তু বীলজীবাব-এর রক্তিম চোখের মণি, অবশ দেহ আর কাঁপা কাঁপা হাত দুটোর দিকে তাকিয়ে গুড়উইন আর চুপ করে থাকতে পারল না।

সে ঘরে ঢুকে এক গ্লাস মদ নিয়ে এসে ম্লান হেসে বলল—ঠিক আছে, যাবার আগে মেজাজটা একটু শরীফ করে নাও।

কিন্তু তার হাত দুটো এতই কাঁপতে লাগল যে গ্লাসটাকে উঁচু করে তুলে মুখের কাছে নেওয়াই সমস্যা হয়ে দাঁড়াল।

অনেক চেষ্টা চরিত্রের পর গ্লাসটা হাতে নিয়ে সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। মদের গ্লাসটা আচমকা নিজের মাথায় ঢেলে দিল। একফোঁটা মদও গিলল না।

তারপর কাঁপা কাঁপা পায়ে সেখান থেকে চলে যাবার সময় বলল—না, এ কাজ আমার দ্বারা করা সম্ভব হল না—কিছুতেই না। করতে চেয়ে পারলাম না। যাকে ব্ল্যাকমেল করেছে, কোন ভদ্রলোক তার সঙ্গে বসে মদ গিলতে পারে না।

সু'জ

রাত্রির অন্ধকার নেমে এলে জনি ডি গ্রাফেনরিড আর বিলি কিয়োখ ছোট দূতাবাসের বারান্দায় এক বোতল পদ্মফুলের ব্র্যাণ্ডি সামনে নিয়ে গুনগুনিয়ে অশ্লীল গান ধরেছে। স্থানীয় লোকরা তাদের সামনের পথ দিয়ে যাবার সময় মার্কিনী শয়তানি নাম নিয়ে নানারকম মস্করা করে।

একটু বাদে জনি-র মোজো ডাক-অফিস থেকে এক গোছা চিঠি নিয়ে এসে তার সামনে রাখল।

জনি বিতৃষ্ণার সঙ্গে বলে উঠল—সেই একই ব্যাপার। দেশের হাল হকিকৎ জানার জন্য যত্তসব বোকার দল চিঠি লেখে। তাদের জিজ্ঞাস্য ফল ফলাবার উপায়, কিভাবে বিনা পরিশ্রমে ধনকুবের বনে যাওয়া যায়। আবার তাদের অর্ধেক লোকই চিঠির উত্তর পাওয়ার জন্য সঙ্গে ডাকটিকিট পর্যন্ত পাঠায় না। তাদের বিশ্বাস একজন কন্সালের চিঠির উত্তর দেওয়া ছাড়া অন্য কোন কাজই নেই।

কন্সাল জনি-র নির্দেশে কিয়োখ চিঠিগুলো খুলে এক এক করে বক্তব্যগুলো তাকে শোনাতে লাগল।

চিঠি লেখকরা জানতে চায় আয়-উপার্জনের সম্ভাবনা, আবহাওয়া, ফসল, ব্যবসার সুযোগ-সুবিধা আর আইন-কানুন প্রভৃতি হরেকরকম খবরা খবর।

অল্প কর্মবিমুখ অফিসারটা বললেন—মিঃ কিয়োখ আপনি জানিয়ে দিন, কন্সালের পাঠানো সর্বশেষ প্রতিবেদনটা পরে দেখলেই তাদের জিজ্ঞাসার উত্তর পেয়ে যাবে।

—স্যার, আপনার তো দেখছি একডজন সহকারী দরকার। পরমুহূর্তেই কিয়োখ বলে উঠল—আরে, এখানে যে আরও একটা চিঠি রয়ে গেছে। চিঠির লেখকের মাথায় ঢুকেছে, আপনার কাছে চলে এসে একটা জুতোর দোকান খুলবে। জানতে চাইছে, ব্যবসাটা লাভজনক

কিনা। সমুদ্র উপকূলে ব্যবসাপত্র খুবই লাভজনক শুনেছে। তাই সে এখানে আসার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে।

—জুতোর দোকান! যত্তসব পাগলের পাল্লায় পড়া গেল রে বাবা! আমি তো ভেবেই পাচ্ছি নে, এরপর তারা আমার কাছে আর কি কি জানতে চাইবে! আমি তো ভাবছি, এরপর তারা এখানে ওভার কোটের কারখানা কেমন চলবে জানতে চাইবে, আরে বাবা, এখানকার তিন হাজার বাসিন্দার মধ্যে কতজন জুতো পায়ে দেয়?

জনি হেসে বলল—আমিও তো মাস কয়েক যাবৎ জুতো পায়ে দেই না

কিয়োখ বলল—জুতো না পরলেও তোমার তো এক জোড়া জুতো আছে। আর আছে ব্লাঁশার্ড ও গেড্ডি, গুড্উইন, লুট্জ ও ডোগ্রেগ আর কলার কারবারী ও দেলগাদো—আরে ধ্যুৎ! সে -তো চপ্পল পরে। আর হোটেলের মালকিন মাদাম আর্টিজ তো একজোড়া লাল চটি পরে সেদিন নাচের আসরে উপস্থিত হয়েছিল। আর তার যুক্তরাষ্ট্রের স্কুলে পড়ুয়া মেয়ে মিস পাসা—সে তো পাদুকার ব্যাপার স্যাপারে কিছু নতুন সভ্যভব্য ভাব আমদানি করেছে, আর কমাণ্ডান্টের বোন যে নিজের পা দুটোকে বেশ যত্ন সহকারে সাজাতে উৎসাহী। আর আছে মিসেস গেড্ডি—এ-ই তো হচ্ছে মহিলাদের হিসাব। এবার চোখ ফেরালে দেখা যাবে কি সামরিক দলের লোক, না, তারা সব সময় নয়, কেবলমাত্র মার্চ করার সময়ই জুতো ব্যবহার করে।

কিয়োখ-এর হিসাবটা মোটামুটি ঠিক। কন্সালও তার সঙ্গে একমত হলেন। তিন হাজারের মধ্যে বিশ জনের বেশী চলাফেরার সময় পায়ে চামড়া ব্যবহারের কথা ভাবেই না।

জনি বিমর্ষ মুখে বলল—আমি অবাক হয়ে ভাবছি, বুড়ো প্যাটারসন কি আমার সঙ্গে রসিকতায় মেতেছে। তবে এ-ও সত্যি যে, সে সর্বদা হাসি-ঠাট্টা নিয়েই মেতে থাকত। কিয়োখ রসিকতার জবাবে পাল্টা রসিকতা দিয়ে তাকে একটা চিঠি লিখে দাওতো। চিঠির বয়ানটা আমিই বলে দিচ্ছি।

কিয়োখ কাগজ-কলম নিয়ে চিঠি লেখার জন্য তৈরী হয়ে বসল। তারপর কন্সাল জনি-র কথামত লিখতে আরম্ভ করল।

চিঠিটার বক্তব্য হচ্ছে, জনি-র মতে জুতোর কারবার করার মত জায়গা কোরালিও ছাড়া পৃথিবীর তেমন ভাল জায়গা নেই। এ শহরে তিন হাজার অধিবাসী। কিন্তু একটাও জুতোর দোকান নেই। অবস্থাটা তো সহজেই অনুমান করা যাচ্ছে। ফলে নাগরিকদের একটা বড় ভগ্নাংশই জুতো ছাড়াই দিন কাটাচ্ছে।

আরও বলল—জুতোর অভাব ছাড়াও এখানে একটা চোলাই মদের কারখানারও একান্ত অভাব আর একটা কয়লাখনি, একটা গণিত শাস্ত্রের মহাবিদ্যালয় আর একটা পাঞ্চ আর জুড়ি প্রদর্শনীরও একান্ত অভাব।

কোরালিও-র অধিবাসীদের চিৎ হয়ে শুয়ে বৈচিত্র্যহীন ভাবে রাত্রি কাটানো ছাড়া কিছুই করার নেই। ন'টা বাজতে না বাজতেই রাস্তাঘাট একেবারে ফাঁকা হয়ে যায়।

প্রতি রাত্রেই কিয়োখ হাঁটতে হাঁটতে তার ওপরওয়ালা কন্সাল জনি-র বাড়িতে হাজির হয়। আর জনি বেদনাতুর কণ্ঠে তাকে শোনায় নিজের ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী। আর কিয়োখ-এর কাছ থেকেও একটা মুহূর্তের জন্যও সহানুভূতির অভাব লক্ষিত হয় না।

তারপর শুকনো গলায় জনি বলে—কিয়োখ, যে মেয়ের জন্য আমি নেতিয়ে পড়েছি তাকে আমি মন থেকে চিরদিনের মত মুছে ফেলেছি। সত্যি বলছি, এমুহূর্তে সে যদি দরজা ঠেলে ভেতরে ঢোকে তবুও আমার নাড়ির গতি এতটুকু বড়াবে না। সে সব পরিস্থিতি বহুদিন আগেই মিটে গেছে।

মুহূর্তের জন্য থেমে তিনি চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে এবার বললেন—হ্যাঁ, সে মেয়েটার জন্য আমি এতটুকুও ভাবি না, ভাবি কি?

—ঠিকই বলেছেন।

ডালেসবার্গের পোস্ট মাস্টারের চিঠি আর তার জবাবের কথা ক'দিনের মধ্যে দু'জন নির্ধারিত মানুষের মন থেকেই মুছে গেল।

কিন্তু ছাব্বিশে জুলাইয়ের জবাবের ফলটা দেখা দিল।

আবার কোরালিও-র উপকূলে ফলবাহী স্টিমার 'এগুাভোর' এসে ভিড়ল। দেখতে দেখতে সমুদ্রের ধারে ভিড় জমে গেল।

এক ঘণ্টা বাদে বিলি কিয়োখ তার দপ্তরে হাজির হ'ল। তারপর খুশিতে ডগমগ হয়ে হাঙরের মত খিক্ খিক্ করে হেসে জনিকে বলল—ব্যাপারটা অনুমান করতে পারছেন? আপনার জুতোর দোকানের লোকটা এ স্টিমারে এসে হাজির হয়েছে। দেখে এলাম, তার ইয়া বড় বড় বাক্সগুলো কাস্টমস্-হাউসে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

কিয়োখ সহজভাবেই কন্সালকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল।

কন্সাল মুচকি হেসে বলল—আশা করি তুমি অবশ্যই বলতে চাচ্ছনা যে, সে চিঠিটার গুরুত্ব দেবার মত বোকা হাঁদা কেউ আছে।

—আরে মশাই, সে বুড়োটা যখন চাঁদির চশমার ফাঁক দিয়ে সমুদ্রের পারে দাঁড়িয়ে-থাকা মানুষগুলোর খালি পা-গুলো দেখে কী যে খুশি হয়েছিল যদি দেখতেন তবে আপনিও কম খুশি হতেন না।

—খুব হয়েছে। তুমি বরং দুটো দিয়ে ওই বুড়োটার হাসিটা থামাতে পার কিনা দেখ।

কিয়োখ তবু থামল না। সে এবার বলল—বুড়োটার নাম হেমসেটার।

এমন সময়ে হঠাৎ দরজার কাছে এক বুড়ো আর এক যুবতীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কন্সাল জনি সচকিত হয়ে সোজাভাবে বসে পড়লেন।

তিনি কিয়োখ-এর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে ফিসফিসিয়ে বললেন—আরে একি দেখছি।! রোজিন আর তার বাবা। কিয়োখ আমাকে বাঁচাও, এখন উপায়? হায় ঈশ্বর! দুনিয়াটাই কি বোকা বনে গেল!

—আরে ইনি যে আপনার বহুবার কথিত সে মেয়ে—প্রেয়সী।

তা-ই বা আমি বুঝব কি ক'রে? এখন সবার আগে আমাদের উচিত একটা ভালবাড়ি জোগাড় করা। ভাল কথা, গুড্‌উইন-এর বাড়িটাই এর জন্য উপযুক্ত।

কথা বলতে বলতে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গুড্‌উইন-এর বাড়ির দিকে লম্বা-লম্বা পায়ে হাঁটতে লাগল।

কন্সাল জনিও অফিস থেকে বেরিয়ে বুকে সাহস সঞ্চয় ক'রে, ঘাড় ঘুরিয়ে প্রেমিকার মুখের দিকে তাকাল। গালে রক্তিম ছোপ এঁকে মুচকি হাসল।

রোজিন-এর বুড়ো বাবা মুখে অনুরূপ হাসির ছোপ এঁকে বলল—জনি, তোমাকে দেখে আমি কী যে খুশি হয়েছি তা আর বলার নয়। আমাদের পোস্ট মাস্টারের চিঠির জবাবটা যে তুমি খুব তাড়াতাড়ি দিয়েছিলে তার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। আসলে আমি একটা লাভজনক ব্যবসার খোঁজে ছিলাম। তুমি এখানে চলে আসার পরামর্শ দিয়েছ—ধন্যবাদ।

আমার স্থাবর অস্থাবর যা কিছু ছিল বেঁচে দিয়ে প্রচুর মালপত্র নিয়ে এখানে চলে এলাম, জুতোর কারবারটা তবে এখানে ভালই জমবে কি বল?

ঠিক সে সময়ই কিয়োখ এসে হাজির হওয়ায় বুড়ো আরও কিছু কথা বলে জুতোর কারবার সম্বন্ধে তথ্য জানতে পারল না।

কিয়োখ এসে জানাল গুড্‌উইন রোজিন আর তার বাবার জন্য ঘর ছেড়ে দিতে সানন্দে রাজী হয়েছে।

সে রাত্রে কন্সাল জনি আর কিয়োখ মিস রোজিন আর তার বাবার আগমনের ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনায় বসল।

জনি-র মুখের কথা শুনে কিয়োখ বলল—তবে তো তাদের এখান থেকে বিদায় ক'রে দেওয়াই উচিত। জুতোর কারবার খুলতে না দিয়ে—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই জনি আতঙ্কিত হয়ে ব'লে উঠল, আরে, না-না! তোমাকে আমি এতদিন যা বলেছি, আমার মনের কথা নয়—মিথ্যা। আসলে রোজিন'কে আমি মোটেই মুছে ফেলতে পারি নি।

—হুম!

—সত্যি বলতে কি, সে মাত্র একবার 'না' বলতেই আমি তার সংসর্গ ছেড়ে এখানে চলে এসেছিলাম। আজ সন্ধ্যাতেই আমি গুড্‌উইন-এর বাড়ি গিয়ে রোজিন-এর সঙ্গে গল্পও করে এসেছি। আসলে সে হতচ্ছাড়া চাষীটা সর্বক্ষণ তার গায়ে এঁটুলির মত লেগে থাকত। পিংক ডসন তার নাম।

তারপর একটু ভেবে নিয়ে বলল—তার বুড়ো বাবাকে নিয়ে আমি ছেলে মানুষের মত রসিকতায় মেতেছিলাম। বোকার মত চিঠিটা পাঠিয়েছিলাম, এখন বুঝছি। ব্যাপারটা সে যখন বুঝবে তখন তো সে অবশ্যই আমাকে ঘৃণা করবে। বুড়ো কোরালিও-তে জুতোর দোকান খুলে বসলে বিশ বছরেও বিশ জোড়া জুতো বেচতে পারবে না। এখনকার মানুষ কোনদিন জুতো পায়ে দেয় নি, আজও পরবে না। অতএব তাদের দেশে ফেরৎ পাঠাতে হলে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলতেই হবে। উফ্‌! রোজিন আমাকে কি ভাববে। কিন্তু কিয়োখ আমি যে তাকে পেতে চাই অবশ্যই পেতে চাই। আর সে যখন আমার কাছে ফিরে এসেছে তখন তাকে চিরদিনের মত হারাতে বসেছি।

কিয়োখ আশাবাদী। সে বলল—আরে, এত সহজে মুষড়ে পড়লে চলবে কেন? তাদের জুতোর দোকানটা খুলতে দিন। আমরা চেষ্টা করলে হয়তো দোকানটাকে হয়তো চাঙা করে তুলতে পারব। দোকান সাজিয়ে বসামাত্র আমি নিজেই দু'জোড়া জুতো কিনে ফেলব। তা দেখাদেখি অনেকেই কিনতে উৎসাহী হতেও পারে। আর এগারো জোড়া কিনতে চেয়েছে গেড্ডী পরিবার। কাপ্সি তার এক হপ্তার রোজগার জুতো কিনতেই খরচ ক'রে বসবে। আর তিন জোড়া কুমীরের চামড়ার বায়না রয়েছে বুড়ো ডক-এর। আর সে ফরাসী, তাই তার এক জোড়া জুতো তো চাই-ই চাই।

চার হাজার ডলারের মজুদ জুতোর ক্রেতা মাত্র এক ডজন। কন্সাল জনি মুচকি হেসে বলল, না, এতে কাজ হবার নয়। যাক, ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভাবা দরকার।

কিয়োখ হতাশ হয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

বেলা ন'টায় সে ধীরে সুস্থে অফিসে ঢুকল। তেত্রিশ ডলার ব্যয় ক'রে একটা টেলিগ্রাম করল।

সে টেলিগ্রামটা করছে পিংক ডসন'কে, ঠিকানা—ডালেসবার্গ, আলা। বক্তব্যটা হচ্ছে—পরের ডাকেই তোমার নামে একশ' ডলারের ড্রাফ্‌ট যাচ্ছে, শীঘ্র পাঁচশ' পাউন্ড শক্ত, শুকনো গেঁড়ি-শামুক জাহাজে পাঠিয়ে দাও। ললিতকলার কাজে এগুলো নতুন ব্যবহার করা হচ্ছে। বাজারদর পাউন্ড প্রতি বিশ সেন্ট। আরও ভাগ্যের সম্ভাবনা আছে। শীঘ্র পাঠাও।

শিপ্‌স্‌

এক সপ্তাহের মধ্যে কালে গ্রাঁদে-তে একটা প্রয়োজন অনুযায়ী বাড়ি পেয়ে বুড়ো মিঃ হেমসেটার জুতোর দোকান সাজিয়ে বসল, তাকের ওপর জুতোগুলো চমৎকারভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হ'ল।

কন্সাল জনি-র বন্ধু-বান্ধবরা তার পাশে এসে দাঁড়াল। কিয়োখ দোকানে এল, জুতোও কিনল।

ইংরেজীভাষী মানুষগুলোও জুতো কিনতে শুরু করল। কিয়োখ অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে ক্রেতাদের জড়ো করতে লাগল।

জুতো বিক্রির ব্যাপারটা মিঃ হেমসেটার-এর মধ্যে খুশির সঞ্চার করল, সন্দেহ নেই। কিন্তু জুতোর ব্যাপারে স্থানীয় অধিবাসীদের অনীহা দেখে সে অবাকও কম হ'ল না।

জনি তাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল—আসলে এখানকার স্থানীয় অধিবাসীরা খুবই লাজুক। তবে শীঘ্রই জুতো কেনা ও ব্যবহার রপ্ত ক'রে নেবে। তখন দেখা যাবে, কাতারে-কাতারে লোক এসে দোকানের সামনে ভিড় করবে।

জনি-র বিশ্বাস, আগামীকাল যে ফলবাহী জাহাজ আসার কথা সেটা চলে এলে হয়ত জুতোর দোকানটার অবস্থার কিছু উন্নতি হলেও হতে পারে।

কন্সাল জনি টেলিগ্রামটা পাঠাবার এক সপ্তাহ পরে এক ফলবাহী স্টিমারে বিশাল একটা গাঁইট এল। রহস্যময় গাঁইট।

মালবাহকরা ধরাধরি ক'রে দূতাবাসের সেটা একটা কামরায় ঢুকিয়ে দিয়ে গেল।

সে রাত্রেই গাঁইটটার একটা কোণা ছিঁড়তেই কিছু শুকনো গেঁড়ি-শামুক বেরিয়ে এল। শামুকগুলো আগস্ট মরশুমের। খুব পাকা আর শক্ত পাথরের মত কঠিন।

জনি গেঁড়ি-শামুকগুলো পরীক্ষা করার পর বিলি কিয়োখ-এর খোঁজে বেরিয়ে গেলেন।

রাত্রির অন্ধকার নেমে এলে জনি আর কিয়োখ গোপনে গেড়ি-শামুকগুলোকে মরু গলির ঘাসের জমিতে এক ফুট বাদে-বাদে পুঁতে দিল। সবশেষে বড় বস্তাগুলোকেও বাদ দিল না।

ভোরের আলো দেখা দেবার আগেই তারা কাজ মিটিয়ে বিশ্রামের জন্য চলে গেল। তাদের ভেতরে সেনাপতির মনের যুদ্ধজয়ের আনন্দ।

সূর্য উঠতে না উঠতেই মাংস আর ফলের কারবারীরা এক এক ক'রে জড়ো হতে আরম্ভ করল। দোকান সাজিয়ে বসল। বাজারটা সমুদ্রের ধারে যেখানে শামুক পোঁতার কাজ সারা সম্ভব হয় নি।

রোজ যে সময়ে বেচাকেনা শুরু হয় তারপরও বেশ কিছুক্ষণ দোকানিরা অপেক্ষা করল। কিন্তু একটা খদ্দেরও এল না। তারা অবাক হয়ে ভাবতে লাগল ব্যাপার কি? আজ খদ্দেরদের মড়ক লেগেছে নাকি! একটা খদ্দের আসছে না, কারণ কি?

অন্য দিনের মত তালপাতার ঝুপড়িগুলো থেকে কিলবিল ক'রে মেয়েরা বেরিয়ে এল।

বাড়ির দরজা পেরিয়ে গলিতে, ঘাসের ওপর, বড় রাস্তায় যেখানে তারা যায় পা ফেলেই বাবারে, মারে বলে লাফালাফি জুড়ে দিল। কেউ বা এক পা তুলে লাফাতে লাগল। অস্থির হয়ে কীট-পতঙ্গগুলোকে খুঁজতে লাগল যারা তাদের পায়ের তলায় হুল ফুটিয়ে রক্ত বের করে দিয়েছে। কিন্তু কিছুই খুঁজে পেল না।

শহরের সর্বত্র মেয়েদের কান্নার রোল পড়ে গেল। বাজারের দোকানিরা তখনও অবাক হয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, কেন এখনও একটা খদ্দেরও এল না।

এক বেলা বাড়লেই বীরপুরুষের দল পথে নামল। তারাও মাটিতে, আর ঘাসে পা দিয়েই ধেই-ধেই ক'রে লাফাতে আরম্ভ করল। ব্যাপারটা এমন দাঁড়াল যেন নারী-পুরুষ সবাই মিলে নাচের মহড়ায় মেতেছে। কেউ কেউ এক পায়ে দাঁড়িয়ে অন্য পায়ের হুল খুলতে খুলতে বলতে লাগল, হতচ্ছাড়া পোকাগুলো নির্ঘাৎ অজ্ঞাত প্রজাপতির বিষাক্ত মাকড়শা। রোদ একটু বাড়তেই ছেলে-মেয়েরা যে, যার বাড়ি থেকে নিত্যকার অভ্যাস মত খেলতে নেমে গেল।

ব্যস, আর যাবে কোথায়! তারাও বাবারে মারে বলে চিৎকার চেঁচামেচি জুড়ে দিল। তারা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পথ চলতে চলতে বিকট স্বরে আর্তনাদ করতে লাগল।

দিন যত যেতে লাগে ততই নারী, পুরুষ ও শিশুরা অসহায়ভাবে শক্ত কঠিন গেঁড়ি-শামুকের শিকার হতে লাগল।

বিপদ! ঘোরতর বিপদের মুখোমুখি হল কেরালিও-র অধিবাসীরা।

এ আকস্মিক বিপদের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য সবাই নিজেদের মধ্যে বলাবলি ক'রে পরামানিক এস্টেবান তেলগাড়ো-র শরণাপন্ন হ'ল। তার বুদ্ধিমত্তার ওপর স্থানীয় মানুষদের অগাধ বিশ্বাস। লোকটা বহুদর্শী, অনেক দেশ ঘুরে বেরিয়েছে আর পন্ডিতও বটে।

সে একটা পাথরের ওপর বসে শামুকের কুঁচিগুলো টানাটানি ক'রে বের করতে লাগল। মওকা বুঝে দু'হাতে রোজগারও করতে লাগল।

সে গম্ভীর মুখে যে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দিল তাতে সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতে লাগল।

সে বলল, শয়তানের ঘরগুলো দলবেঁধে আকাশে উড়ে বেড়ায়। মড়ক লাগার ফলে একটা রাত্রেই তারা ঝাঁকে ঝাঁকে মরে পৃথিবীর মাটিতে পড়েছে।

তারপর বলল, বললে তোমরা বিশ্বাস করবে না, আমি তাদের একটা ঝাঁক ইউকাতানে দেখেছিলাম। এক একটা দেখতে কমলালেবুর মত বড়। মুখে সর্বদা সাপের মত হিস্‌হিস্ ক'রে। বাদুড়ের মত ডানা। এদের মোকাবিলা করতে হলে দরকার জুতো পরা।

এস্টেবান নিজেও মিঃ হেমসেটার-এর দোকানে গিয়ে এক জোড়া জুতো খরিদ ক'রে ফেলল।

পরামাণিক এস্টেবান-এর দেখাদেখি এবার স্থানীয় অধিবাসীদের অনেকেই মিঃ হেমসেটার-এর দোকানে ছুটল। সাধ্যমত দামের জুতো কিনে পরেই স্বস্তি পেল।

মিঃ হেমসেটার একদিনেই তিনশ' জোড়া জুতা বিক্রি ক'রে ফেলল।

সেদিন সন্ধ্যায় কন্সাল জনি দোকানে পা দেওয়া মাত্র বুড়ো হেমসেটার বলল—আরে ব্বাস! কী কান্ড দেখেছ! আজ সারাদিনে তিনশ' জোড়া বিক্রি ক'রে ফেলেছি। আরে মশায়, গতকাল বিক্রি হয়েছিল মাত্র তিন জোড়া। আজ বাজিমাৎ ক'রে দিয়েছি।

—আমি তো আগেই বলেছিলাম, স্থানীয় লোকরা একবার আসতে শুরু করলে দলে দলে কাতারে কাতারে এসে হাজির হতে থাকবে। আর একটু ধৈর্য ধরুন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

—মজুদ বাড়াবার জন্য আমি তো আরও এক ডজন বাক্স পাঠিয়ে দিতে বলব, ভাবছি।

—আরও ক'দিন দেখেই না হয় সিদ্ধান্ত নেবেন। তখন অবস্থা বুঝে মাল চেয়ে পাঠালেই চলবে।

এদিকে গেঁড়ি-শামুকের বস্তাও খালি হয়ে গেল। কন্সাল জনি আর কিয়োখ আরও পাঁচশ' পাউন্ড মাল পাঠাবার জন্য পিংক ডসনকে প্রতি পাউন্ড দশ সেন্ট হিসাবে ডলার পাঠিয়ে দিল।

আর মিঃ হেমসেটারও হাতগুটিয়ে বসে নেই। সে পনেরশ' পাউন্ড মূল্যের জুতোর চাহিদার কথা জানিয়ে উত্তরাঞ্চলের প্রতিষ্ঠানের কাছে চিঠি লিখে ফেলল।

কন্সাল জনি সে রাত্রেই প্রিয়তমা রোজিন'কে নিয়ে গুড্‌উইন-এর প্রায়ান্ধকার বারান্দার এক কোণে বসল। একথা সেকথার পর তার কাছে গেঁড়ি-শামুক আর হঠাৎ জুতো বিক্রি বেড়ে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা ক'রে বলল।

রোজিন দারুণ ক্ষেপে গেল। সে বিষণ্ণ মুখে বলল—তুমি একটা বদের শিরোমণি। আমরা কালই এ জায়গা ছেড়ে চলে যাব। তুমি বলছ, পুরো ব্যাপারটা রসিকতা। ব্যাপারটা যে গুরুতর, আমি অন্তত মনে করছি।

তারপর আধঘণ্টা ধরে কথা কাটাকাটির পর তাদের আলোচনার মোড় অন্য দিকে ঘুরে গেল। বিয়ের পর ঘরের দেওয়ালটা কোন্ রঙের কাগজ দিয়ে সাজালে দেখতে ভাল হবে সে আলোচনায় মেতে গেল।

জনি পরদিন সকালে মিঃ হেমসেটার-এর দোকানে গেল। সব কথাই তার কাছে স্বীকার করল।

সবকিছু শুনে বুড়ো চশমার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে বলল—বাছা, তুমি তো চিরদিনই ফন্দিবাজ ছেলে। এখন একটা মতলব বের কর যাতে বাকি মালগুলো বিক্রি হয়ে যায়।

গেঁড়ি-শামুকের বস্তাটা এলে জনি সেটা এবং অবশিষ্ট জুতোগুলো একটা বস্তায় ভরে অলকাজানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

সেখানেও যে একই ফন্দি ফিকির ক'রে আগের মতই সাফল্য লাভ করল। আর থলে বোঝাই ক'রে ডলার নিয়ে সেখান থেকে ফিরে এল। আর বড় জোর একটা জুতোর ফিতে ছাড়া আর কিছুই সে ফিরিয়ে আনল না।

কোরালিওতে ফিরেই সে কন্সাল-এর পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে দিল। কন্সাল-এর পদে নিযুক্ত করার জন্য মিঃ উইলিয়াম টেরেন্স কিয়োখ'কে নিযুক্ত করার প্রস্তাব করা হ'ল। সে প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

জনি এবার মিঃ হেমসেটার আর রোজিন'কে সঙ্গে নিয়ে স্বদেশের অভিমুখে যাত্রা করলেন।

তারপর ক'দিন বাদে এক যুবক ফলবাহী স্টিমার থেকে নেমে এল। রোদে পোড়া তার চেহারা। তীক্ষ্ণ তার দৃষ্টি। বিস্ময়কর কোন কোন কিছু চোখে পড়লেই সে দিকে হ্যাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকে। আর যুবকটা হিসাবীও বটে।

সে জাহাজ থেকে নেমে একে-ওকে জিজ্ঞাসা করতে করতে কন্সাল অফিসের দরজায় হাজির হল।

কিয়োখ'কে চেয়ার বসে কাজ করতে দেখে সে জিজ্ঞাসা করল,—জনি অ্যাটাউড কোথায়?

কিয়োখ আগন্তুকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ ক'রে গম্ভীর মুখে জবাব দিল—এ জায়গা ছেড়ে চলে গেছে।

—শিগগিরই ফিরে আসবে কি?

—না, ফিরে আসবে বলে তো বোধ হয় না।

—ওর একটাই দোষ কোন কাজে বেশী দিন লেগে থাকা তার ধাতে সয় না। সে কি করে যে এখানে ব্যবসাটা চালাচ্ছে ভেবে অবাক হচ্ছি। ব্যবসা করতে হলে এক জায়গায়ই থিতু হতে হয়।

কিয়োখ কিছু একটা বলার চেষ্টা করল। পারল না।

আগন্তুক আবার প্রশ্ন ক'রে বসল—আচ্ছা, কারখানাটা কোথায়, বলতে পারেন?

—কিসের কারখানা?

—আরে মশায়, যে কারখানায় জনি গেঁড়ি-শামুক ব্যবহার করে, সেটার কথা বলছি। সেগুলো যে সে কোন্ কাজে লাগায় ঈশ্বরই জানেন! এবার দুটো জাহাজের খোলই গেঁড়ি-শামুক দিয়ে বোঝাই করা হয়েছে। জাহাজটা কোথায় নোঙর করলে সুবিধে হবে বলুন তো?

—আপনার নামটা জানতে পারি কি?

—পিংকনি ডসন।

নামটা শুনেই কিয়োখ আনন্দে এমনই অভিভূত হয়ে পড়ল যে এক লাফে চেয়ার ছেড়ে উঠে মেঝেতে পাতা শতরঞ্জির ওপর পা-ছড়িয়ে বসে পড়ল।

বাইরের বড় রাস্তা থেকে জুতো পরা পায়ের 'থপ্-থপ্' আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল।

মাস্টার্স অব আর্টস্

কিয়োখ সে মানুষটার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল যাকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র পদত্যাগী জনি অ্যাটাউড-এর স্থলাভিষিক্ত ক'রে কোরালিও-তে পাঠাবে।

কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই নতুন কন্সাল কোরালিও-তে উপস্থিত হয়ে কিয়োখ-এর অস্থায়ী কর্তব্যের বোঝা হাল্কা করলেন। যুবক উদ্ভিদবিদ্যার প্রতি অনুরাগী। এ পদটা লাভের ফলে তিনি গ্রীষ্ম মণ্ডলের উদ্ভিদজগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন আশা নিয়েই কন্সালের চাকরিটা নিতে উৎসাহী হয়েছেন।

কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বিচিত্র সব গাছগাছালি দিয়ে কন্সাল অফিসের বারান্দাটা ভরে ফেললেন।

কিয়োখ কিন্তু নব নিযুক্ত কন্সাল-এর এরকম অদ্ভুত আচরণে এতটুকুও বিরক্ত হ'ল না। ঈর্ষাপরায়ণও হ'ল না।

কিয়োখ ভাবল এ স্প্যানিস মেন-টি একঘেয়ে জীবন কাটানোর যে পরিকল্পনা নিয়েছে তাকে পরিপূর্ণ রূপ দিতে হলে তাকে সমুদ্র ভ্রমণে যাওয়া দরকার।

নারকেল বোঝাই জাহাজ 'কার্লস্‌ফিন' কোরালিও-র বন্দরে ফিরল। এখান থেকে ছেড়ে এটা যাবে নিউইয়র্কে।

কিয়োখ টিকিট কেটে কার্লস্‌ফিন-এ চেপে বসল। দশদিন পর সে নিউইয়র্ক শহরের দশম স্ট্রীটের একটা উঁচু বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। বাড়িটার শীর্ষে একটা স্টুডিওতে

সে হাজির হ'ল। স্টুডিওটার মালিক করোলাস হোয়াইট। তেইশ বছর মাত্র তার বয়স। ছবি আঁকা নেশা হলেও আজ পেশা হিসাবেই বেছে নিয়েছে।

কিয়োখ দু'চার কথার মাধ্যমে কুশল সংবাদাদি আদান প্রদানের পরই নিজের কথা পেড়ে বসল। সে বলল, দেখ হোয়াইট, দু'হাজার মাইল সমুদ্রযাত্রায় আমি বেরিয়েছি একটা বিশেষ জরুরী কাজের তাগিদে। তোমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাওয়াই আমার ইচ্ছা।

—আমাকে?

—হ্যাঁ। পরিকল্পনাটা মাথায় আসা মাত্রই তোমার নামটা চট ক'রে আমার মাথায় চলে এসেছে। তোমাকে একটা ছবি আঁকতে হবে, যেতে রাজী তো? যাতায়াতে নব্বই দিন লাগবে। আর পাবে নগদ পাঁচ হাজার ডলার।

—কেমন, মানে ছবিটা কেমন হবে?

—বলছি শোন, আমার পরিকল্পনাটা হচ্ছে, আমার সঙ্গে তোমাকেও কোরালিওতে ফিরে যেতে হবে। সেখানে তোমার পরিচয় দেবে, একজন প্রখ্যাত আমেরিকান প্রোর্টেট পেন্টার হিসাবে। আর দীর্ঘ কঠোর পরিশ্রমের পর কিছুদিন বিশ্রাম নেবার তাগিদে গ্রীষ্মমণ্ডল পর্যটন বেরিয়েছ। ব্যাপারটা আসলে তেমন কিছুই নয়। তোমাকে প্রেসিডেন্টের একটা প্রতিকৃতি আঁকতে হবে, ব্যস।

কিয়োখ দশ হাজার ডলার পারিশ্রমিক ঠিক করেছে। যাতায়াতের খরচ সে আর হোয়াইট উভয়ে বহন করবে। আর লাভটাও দু'জনে সমান ভাবে ভাগ ক'রে নেবে।

হোয়াইট তার প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল।

কিয়োখ'কে নিশ্চিন্ত করতে গিয়ে হোয়াইট বলল, আমি অবশ্যই যাব কিয়োখ।

পাঁচ হাজার। হ্যাঁ, আমি পাঁচ হাজারেই রাজী। ওই পাঁচ হাজারে আমি দু'বছর প্যারিসে আর এক বছর ইটালিতে কাটিয়ে আসব।

ব্যস, আর দেরি নয়, বাঁধাছাড়া শুরু হয়ে গেল।

বিকাল চারটায় কার্লস্‌ফিন জাহাজটা নোঙর তুলল।

বছরে পাঁচ মাস আঞ্চুরিয়ার নতুন বন্দরের রূপ নেয় কোয়ালিও। নভেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত কোরালিও-ই সরকারের মূল কেন্দ্রে পরিণত হয়।

কিয়োখ আর হোয়াইট যখন 'কার্লসফিন' থেকে বন্দরে নেমে এল তখন সেখানে সবে শীতের আনন্দ মুখর মরশুমটা জমে উঠেছে।

কিয়োখ শিল্পী হোয়াইট'কে সঙ্গে নিয়ে শহরের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাল। স্থানীয় কিছু সংখ্যক লোকের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিল।

চিত্রশিল্পী হিসাবে যাতে হোয়াইট-এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে সে চেষ্টার এতটুকুও ত্রুটি সে রাখল না।

তারপর কিয়োখ নিজের যে ইচ্ছাটাকে সে জনগণের মধ্যে প্রচার করতে আগ্রহী তার একটা দেখার মত প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করল।

হোয়াইট সমুদ্র সৈকতে ইজেলটাকে রেখে সাগর আর পাহাড়ের যে সব ছবি আঁকতে আরম্ভ করল সেগুলোকে স্থানীয় মানুষরা অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে হ্যাঁ ক'রে দেখতে লাগল।

আর কিয়োখ নিজে? সে একটা পকেট ক্যামেরা নিয়ে ছবি তুলে তুলে শিল্পীর একজন ধনবান ও অবসরভোগী বন্ধুর অভিনয় করতে মেতে রইল।

তারা এখানে পা দেবার পর দু'সপ্তাহের মধ্যেই তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে শুরু করল।

প্রেসিডেন্ট শিল্পী হোয়াইটকে বে-সরকারীভাবে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য তলব করলেন।

কিয়োখ শিল্পীকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিল যেন দশ হাজার ডলারের একটা কানাকড়ির কমেও রাজি না হয়। প্রেসিডেন্টের একান্ত ইচ্ছা শিল্পী হোয়াইটকে দিয়ে নিজের একটা প্রতিকৃতি আঁকান।

কিয়োখ এক ঘণ্টার মধ্যেই হোয়াইটকে নিয়ে হোটেলের দরজায় হাজির হ্ল। তাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজে সেখান থেকে চলে এল।

এক ঘণ্টা বাদে হোয়াইট আবার কিয়োখ-এর সঙ্গে মিলিত হ'ল।

আনন্দে ডগমগ হয়ে হোয়াইট বলল, কাজ হাসিল!

কিয়োখ সত্যি তুমি একটা বিস্ময়! তিনি এমন একটা ছবিই চাইছেন।

—ছবি? আমি তো জানতামই তিনি—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই হোয়াইট বলে উঠল, ভদ্রলোক একজন সত্যিকারের ডিক্টেটর—আশ্চর্য মানুষ বটে। তিনি যেমন ভদ্র ঠিক তেমনি দুরন্ত। যাক, দামের প্রশ্নটা উঠতেই আমি সঙ্গে সঙ্গে দশ হাজার হেঁকে বসলাম। আমার তো রীতিমত ভয় হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল রক্ষীকে ডেকে অর্দ্ধচন্দ্র দান ক'রে আমাকে ঘর থেকে বের করে দেবেন। কিন্তু কার্যত দেখা গেল, দশ হাজারেই তিনি রাজী হয়ে গেলেন।

—তারপর?

কাল আবার হোটেলে গিয়ে তাঁর সঙ্গে বসে ছবি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে।

পরদিন সকালে প্রেসিডেন্টের গাড়ি এসে শিল্পী হোয়াইটকে হোটেলে নিয়ে গেল। সে হোটেল থেকে ফিরল দুপুরের আগে।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হোয়াইট এবার বলল, না কিয়োখ, তার চাহিদা পূরণ করা আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়।

—সে কি! তুমি কি কথা বলছ!

—হ্যাঁ, যা সত্যি তাই বলছি। কিয়োখ, তুমি যখন আমার স্টুডিওতে বসে ছবির কথা বলেছিলে তখন আমার ধারণা ছিল, মামুলি একটা পোস্টারের কথা বলছ। কিন্তু আমি তো এখন চোখে অন্ধকার দেখছি। তুমি আমাকে রেহাই দাও কিয়োখ।

—এমন কি হ'ল যে তুমি এমন মুষড়ে পড়েছ?

—সে ধুরন্ধর লোকটার কথা তোমাকে বলছি—তিনি আগে থেকেই পরিকল্পনাটা করে রেখেছিলেন। পছন্দমাফিক একটা স্কেচও এঁকে রেখেছেন। কী ভয়ঙ্কর একটা ছবি তিনি আমাকে আঁকতে বলছেন, বলছি শোন—অলিম্পাসের শিখরে অবস্থানরত জুপিটার রূপে তিনি নিজেকে দেখাতে চাইছেন। মেঘরাশি থাকবে তার পায়ের তলায়। তার এক পাশে জর্জ ওয়াশিংটন সপার্ষদ অবস্থান করবে। আর তাঁর হাতটা থাকবে প্রেসিডেন্টের একটা কাঁধে। এক দেবদূত উড়ে এসে তার গলায় বিজয়মাল্য পরিয়ে দেবে।

—তাই নাকি?

—আরও আছে, ছবিটার পশ্চাৎপটে থাকবে কামান, সৈন্যদল আর দেবদূত, এবার বুঝলে? আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, কুকুরের আত্মার অধিকারী এমন কোন লোক ছাড়া এ ছবিটা আঁকতে পারবে না।

কয়েক মুহূর্ত নীরবে ভেবে নিয়ে কিয়োখ মুখ খুলল। শোন হোয়াইট, প্রেসিডেন্টকে তুমি আঁকো বুড়ো রাজার কোল, নইলে ভেনাসরূপে, ফ্রেস্কো, নইলে যে কোন বস্তুরূপে যা তিনি নিজেকে দেখতে চাচ্ছেন, ঠিক যে ভাবে তিনি চাইছেন যে রকমই কিছু একটা এঁকে দিয়ে হাতে হাতে তোমার প্রাপ্যটা নিয়ে নেবে। মনে রেখো, দশ হাজার ডলার। আর এত ভাববার কি আছে, বুঝছি না তো। কেন ভুলে যাচ্ছ, এটা ব্যবসার ব্যাপার। এক হাতে ছবি দেবে, অন্য হাতে তোমার প্রাপ্য দশ হাজার বুঝে নেবে।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হোয়াইট এবার বলল—আমি চেষ্টা করব। তবে আঁকব এমন কথা বলছি না—চেষ্টা করব। কাজটা শুরু করব, সাধ্যের মধ্যে পড়লে শেষও করব।

সুবিশাল একটা ক্যানভাস কারা মোরেনার প্রাঙ্গণে টাঙানো হ'ল, হোয়াইট প্রতিদিন দু'ঘণ্টা ক'রে সে লোকটাকে সামনে বসিয়ে রেখে ছবি আঁকতে লাগল।

হোয়াইট মন-প্রাণ সঁপে ছবি আঁকার কাজটায় ডুবে রইল। এক মাস ধরে তুলির আঁচড়ে হোয়াইট ছবিটা আঁকার কাজ সেরে ফেলল। ছবিটায় দেখা গেল, জুপিটার, জর্জ ওয়াশিংটন, মালা হাতে দেবদূত, কামান আর মেঘ সবই তাতে রয়েছে।

কিয়োখ-এর কাছে ফিরে গিয়ে সে বলল, আরে ভায়া, ছবিটা দেখে প্রেসিডেন্ট তো আনন্দে একেবারে আত্মহারা হয়ে যাবার জোগার। কূটনীতিতে ও মহাবীরদের জাতীয় চিত্রাশালায় ছবিটা রাখা হবে।

কিয়োখ বলল—তোমার প্রাপ্য দশ হাজার?

—হ্যাঁ, দশ হাজার ডলারের একটা ব্যাঙ্ক ড্রাফট আমাকে দিয়েছিলেন। আমি সে মুহূর্তেই সেটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলেছি। তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সেখান থেকে বেরিয়ে আসি। প্রেসিডেন্ট একটা কথাও বললেন না। তোমার পক্ষে ব্যাপারটা বড়ই মর্মান্তিক, কিন্তু বিশ্বাস কর কিয়োখ, আমার আর কোন উপায়ই ছিল না।

মুহূর্তের জন্য উৎকর্ণ হয়ে লক্ষ্য ক'রে হোয়াইট বলল, ওই শোন কিয়োখ, সমবেত কণ্ঠে বলছে—বিশ্বাসঘাতক নিপাত যাক। আমাকে লক্ষ্য করেই লোগুলো হুঙ্কার দিচ্ছে। আমি নাকি আর্টের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। ছবিটা যেখানে টাঙানো ছিল সেখান থেকে নামিয়ে ফেলেছে।

—তুমি একটা আস্ত গর্দভ। তুমি পুরনো পঁচা কম্বলের মত দশ হাজার ডলারের ড্রাফ্‌টা ছিঁড়ে ফেললে! আসলে ক্যানভাসের গায়ে যখনই তুমি মাত্র পাঁচ ডলারের রঙ মাখিয়ে দিয়েছ তখনই তোমার বিবেক চাঙা হয়ে উঠেছিল। কথা বলেই সে ক্রোধোন্মত্ত বাঘের মত চলে গেল। হোয়াইট তার ক্রোধ মিশ্রিত প্রতিবাদকে পাত্তাই দিল না, সে যে এমন একটা অভাবনীয় আত্মগ্লানির হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছে সে তুলনায় কিয়োখ-এর ক্রোধ আর ঘৃণা তো খুবই তুচ্ছ।

দেশের মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ার যোগাড় হ'ল। একজন ইংরেজের শহরে আগমনকে কেন্দ্র করেই দেশের মানুষের ক্ষোভের কারণ, প্রেসিডেন্ট নাকি তাকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছেন।

বিক্ষুব্ধ মানুষগুলো প্রেসিডেন্টের মূর্তিটাকে ভেঙে মাটিতে ফেলে দিল। সরকারি অফিসের প্রতিকৃতিগুলোকেও নষ্ট করে দেওয়া হ'ল। সারা রাত্রি ধরে চলল বিক্ষুব্ধ মানুষের দাপাদাপি।

দেশ জুড়ে যখন উত্তেজনার আগুন জ্বলছে তখন হোয়াইট দেশে ফেরার জন্য তৈরী হ'ল। দু'-তিন দিনের মধ্যেই জাহাজ ছাড়ার কথা।

সেদিন বিকালে কিয়োখ একটা ছোট ফটোগ্রাফ দেখিয়ে বলল—এটা কি বলতে পার?

—সমুদ্র সৈকতে উপবিষ্ট কোন এক সেনিওরিটার ফটোগ্রাফ।

—ভুল! ভুল! এটা একটা গুলতির ছবি। একটা ডিনামাইটের টিন, সোনার খনি একটা। তোমাদের প্রেসিডেন্টের ওপর বিশ হাজার ডলারের একটা হুন্ডি।—হ্যাঁ, এবার বিশ হাজার ডলার। আর আর্টের কোন নীতিই কপচানো চলবে না। একটা কোডাক ব্যবহার করেই আমি তোমাকে ঘায়েল করে দিয়েছি।

ছবিটার দিকে অনুসন্ধিৎসু নজরে তাকিয়ে থেকেই হোয়াইট বলে উঠল—এটা দেখলে সবাই হৈচৈ বাঁধিয়ে দেবে না তো? এটা পেলে কোথায়?

প্রেসিডেন্টের বাড়ির বাগানের ভাঙা প্রাচীরের ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম, একজন ইংরেজকে সামনে নিয়ে প্রেসিডেন্ট বারান্দায় বসে গল্পে মশগুল। ভাবলাম, আর্টের চর্চায় বাজিমাৎ করার মত এমন একটা সুযোগ হাতছাড়া করা নিতান্তই বোকামি। ব্যস, ক্যামেরার বোতামটা দিলাম টিপে। আর ঠিক সে মুহূর্তেই তারা দু'জন দরদস্তুর সেরে করমর্দন করলেন।

—এটা দিয়ে তুমি কি করতে যাচ্ছ?

—আরে ভায়া, প্রেসিডেন্ট-এর আর্টের কথা বিবেচনা ক'রে কিনতে আগ্রহী হন আর নাই হন, অন্তত এরকম একটা ছবির প্রচার বন্ধ করার জন্য হলেও তিনি প্রচুর অর্থ দিয়ে এটাকে কিনে নিতে বাধ্য হবেন।

বিকালে কিয়োখ 'কাসামেরোনা' থেকে ফিরে এল।

সে হোয়াইট'কে বলল—ভায়া, দান মেরে দিয়েছি, প্রেসিডেন্ট তো একজন ধনকুবের, মাথাটাও একদম পরিষ্কার। আমি তাঁর সামনে হাজির হয়ে ছবিটা তাঁর চোখের সামনে ধরলাম। দামটাও বলে দিলাম।

ব্যস, কাজ হাসিল। তিনি দোলনা চেয়ারটা থেকে নেমে সিন্দুক থেকে ডলারের গোছাটা বের ক'রে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন।

ঠিক সে মুহূর্তেই আমার ভেতরের শিল্পী মনটা মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠল। আমি নোটের গোছাটা তাঁর দিকে ঠেলে দিয়ে ব'লে উঠলাম—মাফ করবেন মিঃ লোসাডা। দাম দিতে হবে না। ফাটোগ্রাফটা আপনাকে বিনা পয়সাতেই দিচ্ছি।

মুহূর্তের জন্য ভেবে নিয়ে এবার বলল—হোয়াইট, আমাদের খরচখরচা কিছুটা ক'রে কমাতে হবে যাতে তোমার পক্ষে নিউইয়র্কে ফিরে যাওয়া সম্ভব হয়।

ডিকি

'স্পেনিস মেন'-এর উপকূল ভূমিতে আবার শান্তি নেমে এল, প্রেসিডেন্ট লোসাডার কুশাসনের বিরুদ্ধে দেশের মানুষ সাময়িকভাবে বিদ্রোহে সোচ্চার হয়ে উঠলেও কিছুদিনের মধ্যেই দেশে আবার শান্তি নেমে এল। কোরালিও-র পুরনো রাজনৈতিক শত্রুরা যাবতীয় বিভেদ মন থেকে মুছে ফেলে হাত মিলিয়েছে।

শিল্প প্রদর্শনী করতে গিয়ে কিয়োখ ব্যর্থ হয়েছে সত্য। কিন্তু এতে তাকে কুপোকাৎ করতে পারে নি।

সত্যি কথা বলতে কি, ভাগ্যের ভাল-মন্দ উভয় দিকের সঙ্গে বোঝাপড়া ক'রে চলার মত মানসিকতা তার আছে।

হোয়াইট যে দিন জাহাজে চেপে নিউইয়র্কের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমায় সেদিনই কিয়োখ পাঁচটা খচ্চরের পিঠে লোহার বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী ছুরি, কাঁচি, দাঁ, কোদাল ও কুড়ুল প্রভৃতি বস্তা বোঝাই করে সুদূর পার্বত্য অঞ্চলের দিকে যাত্রা করল।

সে পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতীয় ইণ্ডিয়ানরা নদী স্রোত থেকে সোনার গুঁড়ো সংগ্রহ করে। সেখানে কোনরকমে দরকারী জিনিসপত্র নিয়ে ফেলতে পারলে ঝোলা বোঝাই ক'রে সোনার গুঁড়ো নিয়ে দেশে ফিরে আসা যায়।

কোরালিও থেকে ক্লান্সি অনেক আগেই বিদায় নিয়েছে, গেডি ঘর-সংসার করছেন।

ডাঃ গ্রেগ আগের মতই গুন গুন ক'রে চলেছেন। গুড্উইন এখন বড় বড় পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য ব্যস্ত।

ঠিক তখনই কোরালিও-তে ফুর্তিবাজ ডিকি মালোনি-র আবির্ভাব ঘটল। হাসিখুশিতে শহরের মানুষগুলোকে মাতিয়ে তুলল। সে যে কোত্থেকে এখানে হাজির হয়েছে তার খবর কেউ রাখে না। এক রাত্রে সে এখানে এসেছে, এটাই যথেষ্ট। সে এখানে পুরনো মাতব্বরদের সঙ্গে সহজেই মিশে যেতে পেরেছে।

সে ইংরাজিটা ভালই জানে আর স্প্যানিশ ভাষায় কাজ চালিয়ে নিতে পারে।

তার হাবভাব দেখে মনে হয় তার কোটের পকেটে সর্বদাই প্রচুর রুপো থাকে।

ডিকি মালোনি কোন্ উদ্দেশ্যে যে এখানে এসেছে তা নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় নানা রকম আলোচনাও হয়ে চলেছে।

সে বড়সড় একটা তামাকের দোকান খুলে ডিকি মালোনি সব আলোচনা সমালোচনার অবসান ঘটিয়ে দিল।

ডিকি একদিন হঠাৎ পাশাকে দেখল। সে আর্টিজ-এর মেয়ে। এবার সে স্থানীয় যুবক

ভাসকোয়েজ-এর খোঁজে হন্যে হয়ে ছোটাছুটি শুরু করে দিল। তার বিশ্বাস, মেয়েটার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া একমাত্র তার পক্ষেই সম্ভব।

অন্য সব মেয়ের সঙ্গে লা মাডামা রাম বিক্রি করে। এখানকার সব চেয়ে জনপ্রিয় এ পানীয়টা।

সন্ধ্যার পরে রোজ সবাই যে যার ঘরে বসে মদ খায় আর হৈ হল্লা করে। তার পাশের ছোট্ট একটা ঘরে বসে পাশা আপন মনে গিটারে সুর তোলে।

কয়েক গ্লাস ক'রে মদ গলায় ঢালার পর স্প্যানিশ যুবকরা টলতে টলতে পাশা-র ঘরে ঢোকে। তারা পাশা'কে 'লা সন্তিতা নাবান জাদিতা' সম্বোধন করে। তারপর চলে প্রেম নিবেদনের প্রতিযোগিতা।

ডোনা পাশা তাদের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বললেও ভালই জানে—এ প্রেমপূজারীদের প্রেম নিবেদনের পুরো ব্যাপারটাই মিথ্যা!

মাডামা প্রায়ই সে ঘরটায় ঢুকে সব কিছু দেখে।

ডিকি মালোনি তাকে দেখার পর ক'দিনের মধ্যেই মক্ষিরানী পাশা-র ঘরে আসা-যাওয়া শুরু করল।

দেশের এক ওপর তলার পারিবারে পাশার জন্ম হয়েছিল। আর নিউ অর্লিয়েন্সের একটা স্কুলে দু'বছর যাতায়াতও করেছে। এতে উচ্চাকাঙ্ক্ষা তরতর ক'রে বেড়েই চলে। সব মিলিয়ে সে নিজেকে শহরেব অন্যান্য মেয়েদের তুলনায় একটু-আধটু স্বতন্ত্র করেই গড়ে তুলেছে।

এবার লাল মুখ আর সদা হাস্যকর যুবকটা এসে সরাসরি প্রেম নিবেদন ক'রে বসল।

ব্যস, কিছুদিনের মধ্যেই সে তার প্রেমিকাকে নিয়ে গির্জায় গিয়ে বিয়েটা মিটিয়ে ফেলল। পাশা এবার মিসেস মালোনি হয়ে গেল।

মিসেস মালোনি তামাকের দোকানের গদিতে বসে বেচাকেনায় লিপ্ত থাকে আর ডিকি গলা পর্যন্ত মদ গিলে ইয়ার দোস্তদের নিয়ে আনন্দ ফূর্তিতে মাতে।

ব্যাপারটা নিয়ে পরিচিত মেয়েরা মিসেস মালোনি'কে কত রকম কথা শোনায় আর হাসি মস্করা করে। মিসেস মালোনি কড়া কড়া কথা বলে তাদের ঘায়েল করে দিতেও ছাড়ে না—থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেয়।

সে গর্জে ওঠে—আমার মরদটা যতই মদ গিলুক না কেন, তার শরীরে বদ মানুষের রক্ত নেই, জেনে রেখো। তোমাদের মরদগুলো তো এক একটা ভেড়া ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু সে যখন বাড়ি ফেরে তখন সে অনেক উঁচু ঘরের মরদই থেকে যায়। আদরে সোহাগে আমাকে ভরিয়ে তোলে। আমাকে গান শোনায়, চুমোয় চুমোয় আমার মন-প্রাণ ভরিয়ে তোলে। আরে তোরা এসবের মর্ম কি আর বুঝবি। জীবনে তো আর মানুষের মত মানুষের ছোঁয়া পাননি।

রাত্রি গভীর হলে ডিকি-র দোকানে কিছু রহস্যজনক ঘটনা ঘটে। দোকানের পিছন দিককার ঘরে সে আর তার এক গ্লাসের ইয়ার দোস্তরা অনেক রাত্রি পর্যন্ত অন্ধকারে কি যেন আলোচনা করে।

তারপর রাত্রি আরও গভীর হলে সে চুপিচুপি তার মন ময়ূরীর কাছে হাজির হয়।

কিছুদিনের মধ্যে ডিকি আর তার বন্ধুদের গভীর রাত্রের কাজ কর্ম সবার নজরে পড়ে গেল। আবার নতুন ক'রে আলোচনা শুরু হয়ে গেল।

ডিকি একমাত্র গুড্‌উইন'কে একটু-আধটু সমীহ ক'রে সত্য। কিন্তু প্রতিবেশীদের সে মোটেই গ্রাহ্য করে না।

মিঃ ডিকি-র নামে ডাকে কোন চিঠি এলে পাশা-র বুকটা খুশিতে ভরে ওঠে। সে বুঝতে পারে ডিকি-র লাল মাথার বুদ্ধি-কৌশল সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু চিঠির বক্তব্য কি তা নিয়ে তার এতটুকুও মাথা ব্যথা নেই। হ্যাঁ, এরকম একটা মেয়ে মানুষই তো সব মরদরা কামনা করে।

কিন্তু ডিকি-র ডলারের বাক্সটা হঠাৎ খালি হয়ে গেল। আর দোকানেও তো একটা মাছিও বসে না। ব্যাপারটা একেবারে অসময়েই ঘটে গেল।

ডিকি যখন নিদারুণ অর্থ কষ্টের মধ্য দিয়ে দিন কাটাতে লাগল ঠিক তখনই এ পরিবারটা সেনাপতি এনকার্নেশন রিওস-এর নজরে পড়ল।

ডানা-কাটা পরীটাকে দেখেই তার বুকের ভেতরে উত্তাল উদ্দাম সমুদ্রের ঢেউ বয়ে চলল।

প্রেমের ছলাকলা সেনাপতি মশাইয়ের ভালই রপ্ত আছে। তিনি চোখে লাগার মত পোশাক-পরিচ্ছদ গায়ে চাপিয়ে ডিকি-র বাড়ির ধারকাছ দিয়ে ঘুরঘুর করতে লাগল।

একদিন পাশা-র মুখে হাসির ছোপ দেখে সেনাপতির বুকের ভেতরে রীতিমত উথালি পাথালি শুরু হয়ে গেল। তিনি ধরেই নিলেন, পাশা-র মুখের এ হাসি তাঁরই জন্য।

ব্যাপারটা নিয়ে নিশ্চিত হয়েই একদিন সেনাপতি সোজা ডিকি-র দোকানে হাজির হলেন।

সেনাপতিকে কাছে পেয়েই পাশা গুলিবিদ্ধ বাঘিনীর মত জ্বলে উঠল। তাকে দোকান ছেড়ে বেরিয়ে যাবার জন্য তর্জন গর্জন শুরু ক'রে দিল।

ঠিক সে মুহূর্তেই ডিকি দোকানে ঢুকল। মদ গিলে ফিরেছে। তার চোখে-মুখে শয়তানের ছায়া সুস্পষ্ট।

সে এক নাগাড়ে পাঁচ মিনিট ধরে সেনাপতি দাওয়াই দিল। কেবল তার হাড়গোড় ভাঙতে বাকি রাখল। তারপর তাঁর সংজ্ঞাহীন দেহটাকে লাথি মেরে মেরে দোকান থেকে রাস্তায় বের ক'রে দিল।

এক পুলিশ দূরে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখল। এবার সে ঘনঘন বাঁশি বাজাল। চারজন সৈনিকের একটা দল ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে সেখানে হাজির হ'ল।

জায়গা মত এসে তারা হকচকিয়ে গেল। দেখল, সেনাপতিকে দোকানদারটা মারধোর ক'রে রাস্তায় ফেলে দিয়েছে। তখন জোরে জোরে বাঁশি বাজিয়ে আরও আটজন সৈন্যের একটা দলকে নিয়ে এল।

ডিকিও সামরিক বিদ্যায় পিছিয়ে নয়। সেও সেনাপতির কোমর থেকে তরবারিটা টেনে নিয়ে শত্রুপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শেষ পর্যন্ত সৈন্যরা প্রাণের মায়ায় পালিয়ে বাঁচল।

কিন্তু পর মুহূর্তেই দু'জন দশাসই চেহারাধারী পুলিশ এগিয়ে এসে তাকে কোনরকমে কব্জা করে ফেলল। তারা কোমরে দড়ি পরিয়ে তাকে সোজা শ্রীঘরে চালান করে দিল।

একদিন ডিকি-র মন-ময়ূরী পাশা তার সঙ্গে দেখা করতে এল। বিষণ্ণ তার মুখ। ডিকি-র দিকে ছলছল চোখে তাকিয়ে রইল। ডিকি-র চোখ দুটোও জলে ভিজে গেল।

চোখের জল মুছতে মুছতে পাশা বলল, তোমাকে ছাড়া আমার জীবনটা দুঃসহ হয়ে উঠেছে। আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারি কিনা বল? আর যদি কিছু করারই না থাকে তবে আমি আরও কিছুদিন তোমার অপেক্ষায় পথ চেয়ে থাকব। সকালে আবার এসে তোমাকে দেখে যাব।

পাশা বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর অস্থিরচিত্ত ডিকি সারাটা রাত্রি পায়চারি করেই কাটিয়ে দিল। আর অর্থের অভাবের জন্য নিজের হাত নিজেই কামড়াতে লাগল। সে তো ভালই জানে, তার পকেট ভর্তি ডলার থাকলে সে অবশ্যই মুক্তি পেয়ে যেত। অর্থকড়ি ঢাললে হয় না এমন কোন কাজই নেই।

পাশা পরপর দু'দিন ডিকি-র জন্য খাবার নিয়ে জেলখানায় হাজির হ'ল। তার সঙ্গে দেখা করল, চোখের জল মুছতে মুছতে ফিরে গেল।

তৃতীয় দিন পাশা হাতে ক'রে কেবলমাত্র একটা পাউরুটি নিয়ে জেলখানায় এল।

পাউরুটিটা তার হাতে তুলে দিয়ে পাশা গলা নামিয়ে বলল, শেষ সেন্টাভোটিও খরচ হয়ে গেছে। এরপর তোমার জন্য যে কিভাবে, কি নিয়ে আসব, ভাবছি।

—দোকানের জিনিসপত্র বেচে দাও।

—সে চেষ্টাও করতে বাদ দেই নি। কেনা দামের দশভাগের এক ভাগও দিতে চায় না। শহরের কেউ-ই ডিকি-র নাম শুনে একটা কানাকড়ি দিতে চায় না।

—হারামজাদা সেনাপতিটাই এর জন্য দায়ী। ডিকি গর্জে উঠল। যতদিন সব কিছু ধরা না পড়ে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

—প্রাণেশ্বর তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না। আজ নিয়ে তিনদিন ডিকি কালো ঘোমটার ফাঁক

ᅟদিয়ে তার কঠিন কঠোর অর্থপূর্ণ চাহনিটা দেখতে পেল। এমন সময় সে হঠাৎ একটা স্টিমারের কর্কশ সঙ্কেত ধ্বনি শুনতে পেল।

প্রহরারত সান্ত্রী ডিকি'কে জিজ্ঞাসা করল, কোন্ জাহাজের সঙ্কেত, বল তো হে?

—ক্যাটারিনা।

ডিকি এবার বলল—পাশা, ফিরে গিয়ে তুমি মার্কিন কন্সালের সঙ্গে দেখা কর। তাঁকে বলবে, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আগ্রহী। তিনি যেন এখানে এসে আমার সঙ্গে কথা বলেন।

এক ঘণ্টার মধ্যেই কন্সাল এসে ডিকি-র সঙ্গে দেখা ক'রে বলল—মালোনি, তোমার বন্ধু-বান্ধবরা মনে করছে, তুমি নির্ঘাৎ একটা গোলমাল বাঁধিয়ে দিতে পার। আর এ-ও ভাবছে, আমিই তোমাকে উদ্ধার করব। কিন্তু এদেশের আইন-কানুনের অবস্থা তো আর তোমার অজানা নেই।

তার কথা শুনে ডিকি মনে মনে অশ্রাব্য একটা গালাগালি দিল। তারপর সে মুখে বলল—বুড়ো কীকের দলের গরু-গাধাগুলো যখন গীর্জার ভেতরে ঢুকেছিল আর অপরাধীরা তোমার বাড়িতে লুকিয়ে থাকতে চেয়েছিল তখনও তুমি ঠিক একই কথা বলেছিলে।

কন্সাল হঠাৎ চিৎকার ক'রে বলে উঠলেন, আরে, তুমিও কি ইয়েল-এর দলের সাকরেদ নাকি হে! কিন্তু মালোনি নামে তো কারো কথা মনে পড়ছে না। কর্ণেল থেকে একজন তো গতমাসেই স্টিমার থেকে এখানে নেমেছে। সে-তো একটা সাবের নৌকার মাঝি। তোমার জন্য আমি—

—আপনাকে কিছুই করতে হবে না। যদি পারেন তবে 'ক্যাটারিনা' জাহাজের কাপ্টেনকে দয়া ক'রে বলবেন, সময় সুযোগমত যেন আমার সঙ্গে দেখা করেন। ব্যস, এটুকুই।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই কাপ্টেন ডি. লুক্কো জেলখানায় এসে ডিকির সঙ্গে দেখা করলেন।

ডিকি বলল—আপনার কোম্পানির কাছে আমার কিছু অর্থ পাওনা আছে। এখানে টাকার খেলা চলছে, আপনার তো আর অজানা নয় যতশীঘ্র সম্ভব আমার প্রাপ্য—

ক্যাপ্টেন কোটের পকেট থেকে একটা খাম বের ক'রে ডিকি-র হাতে তুলে দিতে গিয়ে বলল—ক্রিস্টোবাল জাহাজে ক'রে আগেই আপনার প্রাপ্য ডলারগুলো পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেটা দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। এ মুহূর্তে আপনার অর্থের প্রয়োজন মনে করে আমি ডলারগুলো সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছি। এতে এক হাজার ডলার আছে, ধরুন। আপনার আরও ডলার দরকার হয় পেয়ে যাবেন।

ডলারগুলো চোখের সামনে ধরে রেখে ডিকি বলল—আচ্ছা ক্যাপ্টেন, পৃথিবীতে এমন কিছুর অস্তিত্ব আছে কি যা ডলারের বিনিময়ে কেনা সম্ভব নয়!

ম্লান হেসে ক্যাপ্টেন জবাব দিল, দেখুন, আমার তিনজন বিত্তশালী বন্ধু ছিল। শেয়ার মার্কেট থেকে একজন এক লক্ষ ডলার কামিয়েছে, একজন স্বর্গে পাড়ি জমিয়েছে আর তৃতীয়জন এক গরীবের দুলালীকে বিয়ে করেছে।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ডিকি বলল—লোকে বলে, একজন সম্পূর্ণ মানুষ সম্বন্ধে ধারণা করতে হলে মানুষকে অবশ্যই দারিদ্র্য, যুদ্ধ আর প্রেম জানতে হবে। এরা একই সঙ্গে চলতে পারে না।

ক্যাপ্টেন বিদায় নিয়ে চলে গেলে ডিকি জেলের সার্জেন্টকে জিজ্ঞাসা করল—আমাকে কি পৌর কর্তৃপক্ষের নাকি সামরিক বাহিনীর দ্বারা এখানে পাঠানো হয়েছে?

—এখানে সামরিক আইন বলে কিছু নেই।

ডিকি এবার একটা ভাঁজ করা নোট সার্জেন্টের হাতের মুঠোর মধ্যে গুঁজে দিয়ে বলল—জজ সাহেবকে জানিয়ে দিন আমি ন্যায় বিচারের রায় মাথা পেতে নিতে রাজী আছি।

ব্যস, ডিকি অচিরেই তার দোকানে গিয়ে বসল। তার ছোট্ট মন-ময়ূরী পাশা তার পাশে এসে বসল। তার হাতে হাত রেখে ভাবাপ্লুত কণ্ঠে বলল—তোমার বুকে মাথা রেখে সারা জীবন থাকতে পারলেই আমি খুশি।

রুজ এট নইর

এরকম একটা ভাবনা প্রচার করা হ'ল যে, লোসাডা প্রেসিডেন্টের পদ লাভ করার পর থেকেই রাজা-বিদ্বেষ ক্রমেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। এ ভাবটা ক্রমেই বাড়তে লাগল।

সমগ্র প্রজাতন্ত্র ব্যপী একটা অসন্তোষ ক্রমেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

এমনকি স্বয়ং লোকসভার পক্ষেও জনপ্রিয়তার প্রতীক হয়ে ওঠা সম্ভব হল না। এমন কি পুরনো রাজনৈতিক দলের জাভাল্লা, গুড্উইন আর অন্য দেশ প্রেমিকদের দ্বারা যারা পুষ্ট হয়ে উঠেছিল তারাও হতাশ হয়ে পড়তে লাগল।

সামরিক কর্তৃপক্ষের দ্বারা নাগরিকদের ওপর অত্যাচারের স্টিম রোলার চালানোর ব্যাপারটা লোসাডাকে আল্‌ফোরান-এর পরবর্তী কালের সবচেয়ে নিষ্ঠুর ও জঘন্য প্রেসিডেন্টে পরিণত করে তুলেছিল।

মন্ত্রীসভার সব সদস্যই তাঁর প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু যখন তারা 'বিসুভিয়াস ফুট কোম্পানি'কেও শত্রুতে পরিণত করল তখনই সবচেয়ে অরাজনৈতিক কাজটা সম্পন্ন করে ফেলল।

এ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানটা যখন বুঝল, ছোট্ট এ দেশটা তাকে শোষণ করার জন্য মেতেছে তখন স্বভাবিক কারণেই তারা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। সরকারি প্রতিনিধিদের অর্থ সাহায্যের আবেদন তারা প্রত্যাখ্যাত করতে বাধ্য হ'ল। প্রেসিডেন্ট কলার কাঁদির ওপর এক রিয়েল হিসাবে রপ্তানীকর চাপিয়ে তার প্রতিশোধ নিলেন।

বিসুভিয়াস কোম্পানি যদি এ কর দিতে অস্বীকার করে তবে তারা অনেক রকম সমস্যার সম্মুখীন হবে। ফলে তারা চার রিয়েল রপ্তানীকর দিয়েই আঞ্চুরিয়ার ফলমূল কিনতে লাগল। এতে চাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল না।

প্রেসিডেন্ট এখনকার মত জয়লাভকে ভুল বুঝলেন। ফল কোম্পানির প্রতিনিধির কাছে মিঃ ফ্রাঞ্জোনি' নামে একজন প্রতিনিধিকে পাঠিয়ে বৈঠকে মিলিত হবার জন্য অনুরোধ জানালেন।

আলোচনার গোড়াতেই এস্পিরেসন ঘোষণা করলেন, সরকারের উপকূল বরাবর একটা রেললাইন স্থাপনের পরিকল্পনা আছে। আর এর সুবিধা অনুপাতে রেললাইন স্থাপনের পঞ্চাশ শতাংশ বিসুভিয়াসকে দিতে হবে।

মিঃ ফ্রাঞ্জোনি এ প্রস্তাবে অসম্মত হলেন। কারণ এতে তার কোম্পানির কোন সুবিধাই হবে না। তিনি জানালেন, এর জন্য পঁচিশ ফ্রেসো পর্যন্ত দেবার দায়িত্ব তিনি নিতে পারেন।

এস্‌পিরেশন বুঝে নিল ফ্রেসো বলতে রৌপ্য মুদ্রা, স্বর্ণমুদ্রা নয়।

লোসাডার শাসনের দ্বিতীয় বছরের শেষের দিকে কোরালিওতে তখন সবে শীত পড়তে শুরু করেছ তখন সরকার এবং সমাজের উঁচু মানের লোকরা সমুদ্রের তীরে তাঁদের বার্ষিক অধিবেশন শুরু করলেন।

প্রেসিডেন্ট সদলবলে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করে কোরালিওতে উপস্থিত হলেন, শীত ঋতুর দশই নভেম্বর তারিখটা অশুভ লক্ষণ হয়ে উঠল।

প্রেসিডেন্ট লোসাডা মাঝ বয়সী এক সুপুরুষ। তার রক্তে ইণ্ডিয়ানার রক্তের মিশ্রণ বইছে।

শোভাযাত্রাটা এক সময় কালে গ্রাঁদের পথ দিয়ে কাসা ঘোরানার দিকে এগিয়ে চলল।

ঠিক তখনই অশুভ ইঙ্গিত নিয়ে বিসুভিয়াস লাইনের দ্রুততম জাহাজ কলহাল্লা প্রেসিডেন্টের শোভাযাত্রার ধার দিয়ে বন্দরে ঢুকল।

বিসুভিয়াস ফ্রুট কোম্পানি যে তাদের জন্য গোপনে কিছু নিয়ে এসেছে তাতে কোনই সন্দেহ ছিল না।

শোভাযাত্রাটা যখন সরকারি ভবনের দরজায় পৌঁছে গেছে তখনই জাহাজের ক্যাপ্টেন ক্রেনিলিন এবং কোম্পানির সদস্য মিঃ ভিনসেন্তি জাহাজ থেকে নেমে এলেন। তারা বেঁটে উপজাতীয়দের ভিড়ের মধ্যে একজনের মাথা উঁচু ক'রে চলতে দেখতে পেলেন। ড্রিকি মালোনি।

তার মুখের হাসিটুকু দেখেই বোঝা গেল তাঁদের দু'জনের উপস্থিতির কথা সে অনুমান করতে পেরে গেছে।

মিঃ ভিনসেন্তি অনুসন্ধিৎসু নজরে তার দিকে তাকালেন। স্বগতোক্তি করলেন, একী আশ্চর্য ব্যাপার! ও আবার কখন আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল!

জেনারেল পিলার গাড়ি থেকে নামলেন। তিনি প্রজাতন্ত্রের একজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি।

কাসা মোরেনার চাবিগুলো হাতে নিয়ে জেনারেল পিলার ভাষণ শুরু করলেন। তিনি মুক্তি আন্দোলনের গোড়ার দিককার কার্যকলাপ থেকে শুরু করে, প্রতিটা শাসনকাল, তার সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির কথা সংক্ষেপে ভাষণ দিলেন। তারপর উপস্থিত সবার সামনে চাবির গোছাটা নাড়াতে নাড়াতে বললেন, আঙ্গুলিয়ার নাগরিক বৃন্দ, আমরা যে এমন মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে পারছি, আমরা স্বাধীন আছি তার জন্য সাধুসন্তদের ধন্যবাদ জানাতেই হয়। পর মুহূর্তেই তিনি ওলিভারার শাসনকাল সম্বন্ধে বক্তব্য রাখলেন।

জেনারেল পিলার বললেন—আজ যদি আমি মৃত ওলিভারা'কে কবর থেকে তুলে আনতে পারতাম তবে তোমরা দেখতে পেতে এমন এক শাসককে যিনি মনে প্রাণে তোমাদেরই একজন।

ভিড়ের মধ্য থেকে একজন চিৎকার ক'রে বলে উঠলেন, কে বলে ওলিভারা মৃত? তিনি কবরে গেলেও তাঁর আত্মাকে তিনি ভালো লাগা মানুষদের কাছে রেখে গেছেন। হ্যাঁ, তার চেয়েও বেশী কিছু তাঁর অটুট মনোবল, তাঁর সাহস, তাঁর শিক্ষা আর তাঁর করুণাকে, তার যৌবন আর প্রতিমূর্তিকে রেখে গেছেন। আঙ্গুরিয়ার অধিবাসীবৃন্দ, তোমরা ওলিভার-এর পুত্র রামন'কে ভুলে গেছ?

ভিনসেন্তি আর ক্রেনিলিন দেখলেন ডিকি মালোনি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে টুপিটা ছিঁড়ে ফেলে তার লম্বা চুলগুলো ধরে টানাটানি শুরু করে দিয়েছে।

জেনারেল পিলার এবার চাবির গোছাটা মাথার ওপর তুলে তার উদ্দেশ্যে বললেন, তোমারই বল, এ চাবির গোছাটা আমি কার হাতে দেব, রামন ওলিভারা-র হাতে নাকি এন্‌রিকো ওলিভারা-র হত্যাকারীর হাতে?

সমবেত জনতা সমস্বরে চিৎকার ক'রে উঠল, রামন ওলিভারা-রামন ললিভারা-র হাতে।

কর্ণেল রোকাস এবার নিজে তরবারিটা রামন ওলিভারা পায়ের কাছে রাখলেন। নতজানু হয়ে অভিবাদন করলেন।

মন্ত্রিসভার চারজন সদস্য রামন ওলিভারা'কে আলিঙ্গন করলেন।

সে মুহূর্তে রামন ওলিভারাও প্রমাণ ক'রে দিলেন যে, তিনি নিজেও এক জন-প্রতিভাধর এবং রাজনীতিবিদ। ছোট-বড়, ভদ্র-অভদ্র সবাই বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

পরমুহূর্তে বিশিষ্ট প্রবীণ মানুষ জেনারেল পিলার গাড়ি থেকে নেমে পাশার কাছে এগিয়ে গেলেন। গলা নামিয়ে, প্রায় ফিসফিস ক'রে মেয়েটাকে কি যেন বলে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন, হয়ত বা ডিকি-র খোঁজেই তিনি হাঁটতে লাগলেন।

রামন ওলিভারা এবার জনতার ভিড়ে ঢুকে গিয়ে সানন্দে হাত দুটো বাড়িয়ে দিলেন। এক এক করে সবার সঙ্গে করমর্দন করতে লাগলেন।

আনন্দ হৈ হুল্লোড়ে পরিবেশটা রীতিমত গমগম করতে লাগল।

টু' রিকল্‌স্‌

নিউইয়র্ক শহরের নর্থ রিভার-এর সেতুটার এক ধার ঘেঁষে দু'জন বসে কথাবার্তা বলছে।

সেতুটার অন্যদিকে গ্রীষ্মমণ্ডল থেকে আসা একটা জাহাজ থেকে কমলালেবু ও কলা নামিয়ে পাঁজা ক'রে রাখা হচ্ছে।

লোক দু'জনের মধ্যে একজন দুর্গতির চরম সীমায় পৌঁছে গেছে। পোশাক-পরিচ্ছদ যারপর নাই ময়লা ও ছেঁড়া, আর শরীরে মদ্য পানের ছাপ সুস্পষ্ট। কিন্তু নাকের ওপর সোনালি ফ্রেমের চশমটা ঝক্‌ঝক্‌ করছে।

অন্যজন এতটা দুর্গতির পথে নেমে যেতে পারে নি। বেঁটে মোটা লোকটার চোখ দুটো অকেজো। পোশাক-আশাকও দামী ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। রহস্যজনক কাজ কর্মের সঙ্গে সে জড়িত। কে এ লোকটা? এক সময় সে বে-পাত্তা হয়ে গিয়েছিল—আজ আবার সে ফিরে এসেছে।

চশমা পরা লোকটা হাত বাড়িয়ে একটা কলা ছিঁড়ে নিয়ে খোসা ছাড়াল। তার কিছুটা মুখে দিয়েই থু-থু ক'রে ফেলে দিল।

তারপর সে বিতৃষ্ণার সঙ্গে ব'লে উঠল, কলাগুলো যেন শয়তানের খাবার। যেখানে এ কলাগুলো জন্মেছিল সে দেশে আমি দু'বছর ছিলাম।

স্মিথ অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ ক'রে বলে উঠল—তাই নাকি? তুমি সে দেশে গিয়েছিলে?

—বললামই তো দু'-দুটো বছর সে দেশে ছিলাম।

—বাঁদরের দেশটায় আমিও একবার গিয়েছিলাম। তবে মাত্র ঘণ্টা কয়েক ছিলাম। আরে, সেই যে কলম্বিয়া ডিটেকটিভ এজেন্সিতে যখন চাকরি করতাম, তখনকার কথা বলছি।

তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে আবার বলতে শুরু করল—আরে ভায়া, বাঁদরমুখো মানুষগুলোর খপ্পরে না পড়লে আমাকে চাকরিটা খোয়াতে হ'ত না। আজও চাকরিটা বজায় রেখে দিব্যি সুখে দিন কাটাতে পারতাম।

—তোমার চাকরিটা খোয়াবার কাহিনী—

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই স্মিথ মুচকি হেসে বলে উঠল, কাহিনীটা শুনতে চাচ্ছ, এই তো? বলছি তবে শোন ঃ

একদিন ওপরওয়ালার একটা চিঠি পেলাম। তিনি লিখেছেন ও'ডেকে এখানে শীঘ্র পাঠিয়ে দাও।

তখন আমিই ছিলাম কলম্বিয়া ডিটেকটিভ এজেন্সি-র পয়লা নম্বরের ডিটেকটিভ।

ওয়ালস্ট্রীট অঞ্চলের ঠিকানা থেকেই তিনি চিঠিটা পাঠিয়েছিলেন।

আমি ব্যস্ত পায়ে সেখানে পৌঁছে অফিসেই তাঁকে পেয়ে গেলাম। তাঁর পাশে একজন ডিটেকটিভও বসেছিলেন। তাঁদের মুখেই সম্পূর্ণ ব্যাপারটা শুনতে পেলাম। এক কোটি নগদ ডলার নিয়ে প্রজাতন্ত্রী বীমা কোম্পানির প্রেসিডেন্ট বে-পাত্তা হয়ে গেছেন। তাঁকে ফিরে পাওয়ার জন্য তার চেয়ে বেশী ক'রে ডলারগুলো ফিরে পাবার জন্য ডিরেক্টররা আগ্রহী। তাঁরা নাকি জানতে পেরেছেন, একটা ফলবাহী জাহাজে চেপে প্রেসিডেন্ট দক্ষিণ আমেরিকার পথে যাত্রা করেছেন। ব্যস, এটুকুই। তবে এটুকুও জানতে পেরেছেন, ডলারের থলেটা ছাড়া তাঁর মেয়ে একই সঙ্গে জাহাজে উঠেছে।

ডিরেক্টরদের একজন নিজের প্রমোদ তরণীটা আমার হাতে তুলে দিলেন।

আমি আর একটা মুহূর্তও দেরী না করে ফলবাহী জাহাজটার পিছনে ছুটলাম।

প্রেসিডেন্টের নাম জে. চার্চিল ওয়াড়ফিল্ড। তিনি কোন্ দিকে যেতে পারেন সে সম্বন্ধে আমার মোটামুটি ধারণা ছিল।

আমার বাষ্পীয় জলযানটা উল্কার বেগে ছুটে গেল। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও আমি ফলবাহী জাহাজটার পাত্তাই পেলাম পা। এমনও হতে পারে, আমার ধারণা ছিল ভ্রান্ত। হয়তো আমি ভুল পথেই চলে গিয়েছিলাম।

আমার বাষ্পীয় জলযানটাকে আঞ্চুরিয়ার দিকেই ছুটিয়ে দিলাম। ফলবাহী জাহাজটার গন্তব্যস্থলও সেটাই ছিল।

এক সকালে আমি বাঁদুরে উপকূলে জলযানটাকে দাঁড় করালাম।

বন্দরে একটা স্টিমার দাঁড়িয়ে। ফল বোঝাই চলছে। বাঁদরমুখো লোকগুলো মাথায় ক'রে ক'রে ফল নিয়ে স্টিমারটায় তুলছে।

বন্দরটা খুঁজে দেখার ইচ্ছায় আমি নিচে নেমে গেলাম। দু'-চার পা এগিয়ে দেখলাম, একজন আমেরিকান ভদ্রলোক বাঁদরমুখো একজনের সঙ্গে কথা বলছে। তিনিই আমাকে অফিসটা দেখিয়ে দিলেন।

এক যুবক কম্লালের পদে বহাল রয়েছেন। বড় ভাল মানুষ।

কম্লাল যুবকটার মুখেই শোনলাম, ফলবাহী জাহাজটার নাম 'কার্লস্ফিন', অধিকাংশ সময়ই নিউ অর্লিয়েন্সে যাতায়াত করে। তবে শেষবার নিউইয়র্কে গিয়েছিল।

আমি নিঃসন্দেহ হয়ে বললাম, আমার বাঞ্ছিত পলাতক প্রেসিডেন্ট এখানেই আছেন।

সবাই একই কথা বলল, এখানে নোঙর করার পর কেউই স্টিমার থেকে নামে নি।

আমি ধরে নিলাম সন্ধ্যার অন্ধকার নামার আগে পলাতক প্রেসিডেন্ট কিছুতেই স্টিমার থেকে নামবেন না, অতএব আমাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতেই হবে।

অন্যন্যোপায় হয়ে আমি বন্দরেরই একটা গোপন স্থানে বসে স্টিমারটার দিকে অনুসন্ধিৎসু নজরে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকার নামতে তখনও বহু দেরী, তাই কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করার জন্য গ্রামের দিকে যেতে লাগলাম।

প্রধান রাস্তা ধরে ভাঁটির দিকে হাঁটতে হাঁটতে সরু একটা গলিতে ঢুকে গেলাম।

রাস্তার ধারে একটা কুঁড়ে ঘর দেখে কৌতূহল হ'ল। গুটিগুটি এগিয়ে ভেতরে উঁকি দিয়েই চমকে উঠলাম। আপন মনে বললাম, আরে ব্বাস! শেষ পর্যন্ত এমন একটা পরিবেশে আমার বঞ্চিত লোকটা মাথা গুঁজেছেন!

হ্যাঁ, কুঁড়ে ঘরটার মধ্যেই আমার লোকদের পেয়ে গেলাম।

কিন্তু তাঁরা এখানে এলেনই বা কি ক'রে? তবে কি আমি যখন ঘুরে বেড়াবার জন্য জাহাজটা ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলাম তখনই তিনি সদলবলে বেরিয়ে এসে এখানে আশ্রয় নিয়েছেন?

আমি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে নীরবে তাঁর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করতে লাগলাম। দাড়ি কামানো পরিচ্ছন্ন মুখ, মোটা এক জোড়া ভুরু। আর সর্বাঙ্গ কালো পোশাকে মোড়া।

পাশেই একটা দড়ির খাটিয়াতে বসে থাকা একটা মোটাসোটা মেয়ে আমার দিকে কৌতূহলী নজরে তাকিয়ে। তার হাতে একটা থলে। দেখে মনে হ'ল, থলেটা খুবই ভারী।

দেওয়ালে পেরেকে ঝোলানো একটা বাতির মৃদু আলোক আমার প্রয়োজন মেটার পথে যথেষ্ট।

আমি নিঃসন্দেহ হওয়ার পরই দরজায় গিয়ে পথ আগলে দাঁড়িয়ে পড়লাম। গম্ভীর মুখে তাঁর মুখের দিকে তাকালাম।

তিনি কিছু বলার আগেই আমি গর্জে উঠলাম—মিঃ ওয়াড়ফিল্ড, আপনি আমার বন্দী।

—বন্দী!

—হ্যাঁ!

কে আপনি?

—যথা সময়েই আমার পরিচয় জানতে পারবেন। তবে আপনাকে এটুকুই বলতে পারি, আশা করি এ মহিলার মুখ চেয়ে, তাঁর সম্মানের কথা ভেবে আপনি ব্যাপারটাকে ভালভাবেই নেবেন। মুখে প্রকাশ না করলেও আপনি অবশ্যই জানেন, আমি কেন আপনার খোঁজে এত দূরে ছুটে এসেছি।

—আপনি কেন আমার কিছু নিয়েছেন, জানতে পারি কি?

—আমি কেন আপনাকে চাইছি, জেনেও না জানার, না বোঝার ভান করছেন; মিথ্যে বলেছি?

—তবু আমি জানতে চাইছি, আপনার পরিচয় আমার জানা দরকার।

—আমি কলম্বিয়া ডিটেক্টিভ এজেন্সির লোক।

—সে তো আপনার কথা থেকেই বুঝতে পারছি। কিন্তু নাম—কি নাম আপনার?

—আমি ও'ডে।

—হুম্!

—যদি আমার পরামর্শ নেন তবে আমি পরামর্শ দিচ্ছি, আপনি ফিরে যান। মানুষের মত আপনার ওষুধটা চালিয়ে যান। আর ওই থলেটা আমার হাতে তুলে দিয়ে নিজেকে মুক্ত করুন।

এভাবে কাজ করলে তারা আপনাকে ছেড়ে দেবেন বলেই আমি মনে করি। আপনি নির্ব্বিবাদে চলে যান। কথা দিচ্ছি, আমি আপনার হয়ে ওদের বলে দেব।

—তাই নাকি?

—অবশ্যই। বললাম তো, আমি আপনার মঙ্গলের দিকটা সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করব। আপনাকে কর্তব্য স্থির করার জন্য আমি আপনাকে পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি।

দড়ির খাটিয়ায় বসে থাকা যুবতী মহিলাটি মুখ খুললেন। সে বলল, আপনি দরজায় দাঁড়িয়ে কেন, ভেতরে আসুন। দরজায় দাঁড়িয়ে থেকে পথচারীদের বিরক্ত করবেন না, বিভ্রান্তির মুখে ঠেলে দেবেন না।

আমি বললাম—দেখুন, নির্দ্ধারিত পাঁচ মিনিটের তিন মিনিট কিন্তু ইতিমধ্যেই চলে গেছে। আরও দু'মিনিট পার হবার আগেই আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি।

—বলুন, কি জানতে চাইছেন?

—আপনিই তো প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট, ভুল বলেছি?

—হ্যাঁ, যা সত্যি তাকে তো আর অস্বীকার করা যাবে না, আমার ইচ্ছেও নেই।

—চমৎকার। তবে ব্যাপারটা আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাওয়াই উচিত। মন দিয়ে শুনুন, প্রজাতন্ত্রের জীবনবীমা কোম্পানির প্রেসিডেন্ট জে. চার্চিল ওয়াড়ফিল্ডকে নিউইয়র্ক শহরে খোঁজ করা হচ্ছে।

আর এ মুহূর্তে আমি আশা করছি, এ মহিলার হাতে যে থলেটা, মানে ডলারের থলেটা আছে আমার হাতে তুলে দেবেন।

—কারণ?

—কারণ একটাই, বে-আইনিভাবে এগুলো হাফিস ক'রে আপনারা পালিয়ে এসেছেন।

আমার কথাটা শেষ হতে না হতেই যুবতী মহিলাটি ব'লে উঠলেন—ও-হো, আপনি চাচ্ছেন যে, আমরা যেন নিউইয়র্কে ফিরে যাই?

—আপনি না গেলেও চলবে। কিন্তু—

—তবে কি একমাত্র আমার বাবাকেই আপনাদের দরকার?

—হ্যাঁ, মিঃ ওয়াড়ফিল্ডকেই আমাদের দরকার। কারণ, আপনার বিরুদ্ধে তো কোন অভিযোগ নেই। তবে যদি আপনি বাবার সঙ্গে নিউইয়র্কে ফিরে যেতে চান তবে আমাদের আপত্তি নেই।

যুবতী মহিলাটি হঠাৎ বিকট স্বরে আর্তনাদ ক'রে উঠল, হায় ঈশ্বর। একী কথা শুনছি বাবা? এটা কি সত্যি, বল? সে ডলারগুলো তোমার নয়, যেগুলোর ওপর তোমার কোন অধিকার নেই সেগুলো চুরি ক'রে নিয়ে পালাচ্ছ? বল বাবা, কথাটা কি সত্যি?

মেয়ের কথায় বুড়ো মানুষটা হঠাৎ কেমন যেন মুষড়ে পড়লেন। মুহূর্তকাল মুখ দিয়ে রা সরল না। হতভম্বের মত ফ্যালফ্যাল ক'রে মেয়ের মুখের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইল। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। শ্বাসক্রিয়া হয়ে উঠল দ্রুততর।

যুবতী মহিলাটি তাকে নিয়ে এক পাশে চলে গেল।

মিনিট খানেক ধরে বাবা মেয়ের মধ্যে অনুচ্চ কণ্ঠে কিসের কথা হ'ল।

তারপরই বুড়ো মানুষটা আঙুলের ডগা দিয়ে চশমাটাকে সামান্য তুলে দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। তার হাতের মুঠোটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন—আমি আপনার সঙ্গেই নিউইয়র্কে ফিরে যাব মনস্থ করেছি। একদিনে আমি বুঝে নিয়েছি, এমন একটা নির্জন ও নিরালা জায়গায় পচে-গলে মরার চেয়ে ওখানে ফিরে গিয়ে নিজেকে প্রজাতন্ত্র কোম্পানি'-র করুণার কাছেই আত্মসমর্পণ করব।

যুবতী মহিলাটি একেবারে কান্নায় ভেঙে পড়ল। ডুকরে ডুকরে কেঁদে বারবার একই কথা বলতে লাগল, বাবা বাবা, একী হ'ল। এ তুমি করলে কী।

কথা বলতে বলতে যুবতী মহিলাটি তার সুন্দর নিটোল হাতটা আমার জামার ওপর রাখল।

অকস্মাৎ আমার সর্বাঙ্গে কেমন যেন একটা অভাবনীয় শিহরণ খেলে গেল। আমি তাকে বললাম—আমি একটা যন্ত্রচালিত প্রমোদ তরীতে এসেছি।

—মিঃ ও'ডে এমন একটা ভয়ঙ্কর দেশে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। এমনই আমাদের এখন থেকে নিয়ে চলুন, নেবেন তো?

তাদের বিশেষ ক'রে তাকে সঙ্গে নেবার জন্য যে আমার ভেতরে উথালি-পাথালি শুরু হয়েছে সে ভাবটাকে চেপে রেখে বললাম—আপনার অনুরোধ রাখতে আমি চেষ্টার ত্রুটি করব না।

ব্যাপারটা সবাই জেনে ফেলে এরকম আশঙ্কা করে তারা কিছুতে শহরের ভেতর দিয়ে গিয়ে নৌকায় উঠতে রাজী হ'ল না। মহিলাটি জানাল, আমি যদি সবার অগোচরে তাদের নৌকায় না তুলতে পারি তবে তারা কিছুতেই এ জায়গা ছেড়ে যাবে না।

অনন্যোপায় হয়ে আমাকে তাদের কথাতেই রাজী হতে হ'ল।

আমি এগিয়ে গিয়ে আমার নৌকার মাঝিদের বললাম—তোমরা এক কাজ কর। নৌকাটা নিয়ে আধ মাইল খানেক পথ এগিয়ে গিয়ে অপেক্ষা কর, আমি সেখান থেকেই নৌকায় উঠে যাব।

আমরা প্রায় আধ মাইল রাস্তা পায়ে হেঁটে সমুদ্র পাড়ের নির্জন একটা স্থান থেকে নৌকায় উঠলাম।

আমি ডলার ও সোনাদানার থলেটা নিয়ে মালিকের কেবিনে গেলাম। সেটার মুখ খুলে ভেতরে যা কিছু ছিল বের ক'রে একটা তালিকা তৈরী করে ফেললাম।

তালিকাটায় লিখলাম, একশ পাঁচ হাজার ডলার, যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি নোট, একপ্রস্থ হীরের গহনা, আর শ' দুই হাভানা চুরুট।

কোম্পানির এজেন্ট হিসাবে আমি চুরুটগুলো বুড়োর হাতে ফিরিয়ে দিলাম। তার তালিকাটা সমেত নোট ও গহনাগুলোকে আবার থলেটার ভেতরে ভরে একটা বাক্সে তালা-চাবি বন্ধ করে রেখে দিলাম।

নিউইয়র্কে নেমেই আমরা ওপরওয়ালাকে ফোন করলাম। তাকে অনুরোধ করলাম, যেন যত শীঘ্র সম্ভব ডিরেক্টরের অফিসে চলে আসেন।

ডিরেক্টরের অফিসে পা দিতেই দেখলাম, আমাদের আগে ওপরওয়ালা একদল অর্থগৃধ্নু লোককে নিয়ে বসে আছেন।

আমি ঘরে ঢুকে থলেটাকে টেবিলের ওপর রেখে বললাম, এই নিন, আপনার বঞ্চিত সম্পদ।

তারপর আমি অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে আমার বন্দী মিঃ ওয়াড়ফিল্ডকে দেখিয়ে দিলাম।

আমার ওপরওয়ালা বুড়ো ওয়াড়ফিল্ড'কে সঙ্গে নিয়ে পাশের একটা ঘরে চলে গেলেন। দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলেন। দশ মিনিট পরে বুড়ো যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তখন তার মুখটাকে কয়লার মত কালো দেখা গেল।

ওপরওয়ালা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে বললেন—ভদ্রলোককে যখন প্রথম দেখেছিলে তখন কি এ থলেটা তাঁর কাছে ছিল?

আমি বললাম—হ্যাঁ, তাঁর কাছ থেকেই এটা পাওয়া গেছে।

এবার আমার ওপরওয়ালা উপস্থিত সবার উদ্দেশ্যে বললেন—

আপনাদের সামনে সে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি দাঁড়িয়ে তিনি আঙ্কুরিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট সেনিওর মিঃ মিরা ফ্লোরেস। তিনি অনুগ্রহ করে আমাদের বড় রকমের ত্রুটিটাকে উপেক্ষা করতে সম্মত হয়েছেন একটা শর্তে যে, তাঁকে যেন ব্যাপারটা নিয়ে কোন রকম প্রকাশ্য আলোচনার সম্মুখীন না হতে হয়। অতএব এদিকে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

আর তিনি যে অসম্মানের প্রতিকার আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে দাবী করতে পারতেন সেটাকে এড়িয়ে গিয়ে তিনি আমাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শনই করেছেন বলে আমি অন্তত মনে করছি।

আমার মতে, আমরা নির্দ্বিধায় তাকে প্রতিশ্রুতি দিতে পারি যে, আমরা অবশ্যই এ বিষয়ে গোপনীয়তা রক্ষা করব।

উপস্থিত সবাই ঘাড় কাৎ ক'রে তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি দান করল। আমি মুচকি হেসে ব'লে উঠলাম—তবে ইনিই বাঁদরদের প্রেসিডেন্ট। কথাটা তো তিনি আগে বললেই পারতেন।

—কথাটা কি তোমার কাছে শ্রুতিমধুর হ'ত?

দ্য ভিটাগ্রাফোস্কোপ

রঙ্গনাটক মুখ্যত কাহিনীভিত্তিক। আর নাটক বিভিন্ন অংশে বিভক্ত থাকে। আর নাটকের দর্শকমন্ডলী চরম পরিণতির ধার ধারে না।

আমাদের নাট্যানুষ্ঠানটা দু'একটা ছোটখাটো জমাটে দৃশ্যের মাধ্যমেই শেষ। ব্যস, তারপরই অভিনেতারা পর্দার আড়ালে চলে যান।

নিউইয়র্ক সিটির প্রজাতন্ত্র জীবনবীমা কোম্পানির ভাইস প্রেসিডেন্ট আঞ্চুরিয়ার অন্তর্গত কোরালিওর ফ্রাংক গুড্‌উইন'কে যে চিঠি দিয়েছেন তার একটা বিশেষ অংশ নিচে উল্লেখ করা হ'ল—

সুপ্রিয় মিঃ গুড্‌উইন,

নিউ অর্লিয়েন্সের মেসার্স হার্ডল্যান্ড অ্যান্ড ফোসেটি'-র জন্য আপনার দেওয়া চিঠিটা আমাদের হাতে এসেছে। আর এক লক্ষ ডলারের একটা ড্রাফ্‌টও পেয়েছি। এ কোম্পানির প্রাক্তন পরলোকগত প্রেসিডেন্ট জে. চার্চিল ওয়াড়ফিল্ড কোম্পানির তহবিল থেকে যে টাকাটা তুলে নিয়েছিলেন। কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারী আর পরিচালকমণ্ডলী সম্মিলিতভাবে আমাকে অনুরোধ করেছিলেন অর্থ চুরি যাওয়ার দু'সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ অর্থ ফেরৎ পাবার ব্যাপারে যেন যত দ্রুত সম্ভব ও তৎপরতার সঙ্গে আপনাদের জানিয়ে দেই তাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ। ব্যাপারটা যাতে কিছুমাত্র প্রচার হতে না পারে সে ব্যাপারে কি নিশ্চিত আশ্বাস দেওয়া সম্ভব....মৃত ওয়াড়ফিল্ড নিজের হাতে নিজেকে খুন করেছেন, এজন্য আমি যারপর নাই দুঃখিত। তবে মিস ওয়াড়ফিল্ড-এর সঙ্গে আপনার বিয়ের জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

চিঠির শেষে স্বাক্ষর রয়েছে—লুসিয়াস ই. এপল্‌ গেট।

আর স্বাক্ষরকারী পরিচয় হিসাবে লেখা প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রজাতন্ত্র জীবনবীমা কোম্পানি।

শেষ কাবাব রান্না

দৃশ্য পরিচিতি—

এক চিত্রশিল্পীর স্টুডিও। সুদর্শন এক যুবক শিল্পী একগাদা রেখা চিত্রের মাঝখানে বিষণ্ণ মুখে হাতের ওপর মাথা রেখে বসে রয়েছে।

স্টুডিও-র কেন্দ্রস্থলে একটা কাঠের বাক্সের ওপর একটা তেলের স্টোভ রয়েছে।

এক সময় শিল্পী উঠে দাঁড়াল। স্টোভটা ধারাল।

শেষ কাবাবটা তুলে নিল। বাক্সটা নাড়িয়ে চাড়িয়ে দেখে নিল। ভাজার পাত্রে কাবারের টুকরোটা রেখে সেটা স্টোভটার ওপর রেখে দিল। স্টোভটা ধীরে ধীরে নিভে গেল। সে নাড়িয়ে চাড়িয়ে দেখল, স্টোভটায় তেল নেই।

হতাশা হয়ে যুবক শিল্পী কাবাবের টুকরোটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। ঠিক সে মুহূর্তেই একটা লোক সেখানে ঢুকল। কাবাবের টুকরোটা গিয়ে আচমকা তার নাকে আঘাত করল। সে কঁকিয়ে উঠল। নাচানাচি শুরু করে দিল।

নবাগত লোকটা আইরিশ। একটু পরেই সে গলা ছেড়ে হেসে উঠল। এক লাথি মেরে স্টোভটাকে ফেলে দিল। তারপরই সে সঙের ভূমিকায় অভিনয়ে মেতে উঠল। পকেট থেকে

একটা ছোট পাউরুটির মত একটা নোটের গোছা বের করে সেটাকে মাথার ওপরে ঘোরাতে আরম্ভ করল। আর একই সময়ে জল খাবারের নির্বাক একটা অভিনয় দেখিয়ে দিল।

শিল্পী হঠাৎ টেবিলের ওপর থেকে টুপিটা তুলে চমৎকার কায়দায় সেটাকে মাথায় চাপিয়ে নিল। তারপর দু-একজনের সঙ্গে স্টুডিও ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

সমুদ্রসৈকতে লেখা

দৃশ্য পরিচিতি—

নাইস-এর সমুদ্রসৈকত।

জলের কাছাকাছি এক রূপসী যুবতী শুয়ে হাতের রেশমী ছাতার বাট দিয়ে ভেঁজা বালির ওপর অলস হাতে কি যেন লিখে চলেছে।

তারপরই সে তেমনি অলসভাবে বালির ওপর গড়াতে লাগল। আর বার বার 'ইসাবেল' শব্দটি বালির ওপর লিখতে লাগল।

কয়েক গজ দূরে এক যুবক বসে রয়েছে।

এ মুহূর্তে তারা কমরেড না হলেও পরস্পরের সঙ্গী।

পুরুষটা কালো আর মুখটা গম্ভীর।

তারা কথা বলছে খুবই কম।

পুরুষটা তার হাতের বেতের ছড়িটা দিয়ে অনবরত বালির ওপর আচড় দিয়ে চলেছে।

যুবকটা কি লিখছে? আঙ্গুরিয়া।

তার চোখের তারায় ফুটে উঠেছে মৃত্যুর চিহ্ন

দৃশ্য পরিচিতি—

গ্রীষ্মমণ্ডলের কোন এক ভদ্রলোকের জমিদারির সীমান্তবর্তী অঞ্চল।

তামাটে রঙের এক বুড়ো কবরের ওপরের ঘাস ছেঁটে চলেছে। সে ইণ্ডিয়ান, এক সময় হাতের কাস্তেটা থামিয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ল।

গোধূলি বেলার আবছা অন্ধকার এক ঝোপের দিকে সে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল।

ঝোপটার শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে এক পুরুষ ও নারী। পুরুষটা দীর্ঘদেহী। আর নারীটাকে দেখলেই মনে হয় শান্ত স্বভাব।

বুড়ো ইণ্ডিয়ানটা তাদের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। পুরুষটা একটা মুদ্রা তার হাতে দিল। কবর দেখভালের মজুরীস্বরূপ পাওয়া মুদ্রাটাকে সে গর্বভরেই গ্রহণ করল।

ঝোপের শেষ প্রান্তে অবস্থানরত নারী-পুরুষ দু'জন আধো আলো-আধো অন্ধকারে পরস্পরের হাত ধরাধরি করে ছায়াছবির দৃশ্যের মত এগিয়ে চলল।

ক্যাবেজেস অ্যান্ড কিংস

এক

শেয়াল বার হল সকালে

পাহারা ঘেরা হারেমে এক স্থূলবুদ্ধি সুন্দরীর আরাম করার মত মধ্যদিনের উত্তাপে কোরালিও বিশ্রাম নিচ্ছিল। সমুদ্রের একফালি পলিমাটির তীরভূমিতে এমারেল্ডের ব্যান্ডে গাঁথা একটি মুক্তোর মতো এই কোরালিও শহর। শহরের বুক বেয়ে সমুদ্রতটের লাইন ধরে শহরের পিছনে হুমড়ি খেয়ে ঝুঁকে আছে কর্ডিলিয়েরা পর্বতশ্রেণী। সামনে বিস্তারিত সমুদ্রের মসৃণ তীরে এসে ঢেউগুলি ঝুপ্ ঝুপ্ আওয়াজ করে মিলিয়ে যাচ্ছে। কমলা আর শিমুল গাছের ঝোপ থেকে তোতা জাতীয় পাখিরা চিৎকার করছে, প্রধানা গায়িকার আগমনের ইঙ্গিত পেয়ে, ঐকতানের কোরাসের মতো, তাল শ্রেণীর নমনীয় পাতাগুলি কাঁপছে।

হঠাৎ স্থানীয় একটি ছেলে ঘাসে ঢাকা রাস্তায় চেঁচিয়ে বলতে বলতে ছুটে আসে, বুসকা এল সেনিওর গুডউইন আভে জিদো উন তেলিগ্রামা পর এল।

খবরটি সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। কোরালিওতে সচরাচর কারুর টেলিগ্রাম আসে না। কয়েকটি মোসাহেবী গলায় সেনিওর গুডউইনের নামে হাঁকাহাঁকি করতে শোনা গেল। দেখতে দেখতে সমুদ্রতীরের সমান্তরাল রাস্তাটি লোকজনে ভরে গেল। সকলেই উত্তেজিত। সকলেই চায় খবরটি তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাক। মেয়েদের দল, রাস্তার কোণে কোণে জড়ো হয়ে করুণ সুরে বলতে লাগল, উন তেলিগ্রামা পর সেনিওর গুডউইন।

নগর কোটাল ৬৯ সেনিওর এল করোনেল এনকার নাসিওন রিও, যিনি স্বত্বারূঢ় দলের পক্ষীয়, সন্দেহ করেন গুডউইনের আনুগত্য সত্তার বাইরের দলের প্রতি।

নগর কোটাল বললেন, আহা, তারপর দোষ প্রমাণের সাক্ষ্য হিসাবে গোপন ডায়েরীতে লিখলেন, আজকের দিনে সেনিওর গুডউইন একটি টেলিগ্রাম পেয়েছেন।

এইসময় ছোট্ট একটি বাড়ির ভিতর থেকে এক ব্যক্তি বাইরে এসে দাঁড়াল। বাড়িটির দরজার ওপর একটি বিদেশী নামের বিজ্ঞাপন—'কেওগ ও ক্ল্যানসি'। ব্যক্তিটি বিলি কেওগ। সৌভাগ্য আর সমৃদ্ধির সন্ধানী বালসেনা, বর্তমানে স্প্যানিকা সমুদ্রতটে ভ্রাম্যমান। সে ও ক্ল্যানসি, টিনের পট আর ফোটোগ্রাফ, এই অস্ত্র নিয়ে নিরাশায় এই উপকূল আক্রমণ করেছে। দোকানের বাইরে দুটি বড় ফ্রেমে তাদের শিল্প ও কলার নির্দশন সাজানো রয়েছে।

কেওগ তার সাহসী ও হাসিখুশী মুখে কৌতূহলের ছাপ ফুটিয়ে, দরজার কাছে মাথা হেলিয়ে দাঁড়িয়েছিল। রাস্তার কোলাহল ও চাঞ্চল্যের প্রতি তার আগ্রহ। এই শোরগোলের কারণ জানতে পেয়ে কেওগ তার ভরাট গলায় চিৎকার করে উঠল, হে ফ্রাঙ্ক।

তার চিৎকারে সমস্ত কলরব চাপা পড়ে গেল ও থেমে গেল। সেই চিৎকারে পঞ্চাশ গজ দূরে অবস্থিত আমেরিকার কনসালের বাড়ির দরজা থেকে গুডউইন বাইরে বেরিয়ে এল। কোরালিওর সর্বজন স্বীকৃত শীতল জায়গায়, গুডউইন কনসালউইলার্ড গেডির সঙ্গে কনসুলেটের পিছনের বারান্দায় এতক্ষণ ধূমপান করছিল।

তাকে দেখে চিৎকার করে কেওগ বলল, চটপট এসো, তোমার নামে একটা টেলিগ্রাম এসেছে, তাই শহরে দাঙ্গা বেধে গেছে। তোমাকে এসব ব্যাপারে সাবধান হতেই হবে। জনগণের অনুভূতি নিয়ে হেলাফেলা করা ঠিক নয়। তোমার নামে ভায়োলেটের সুগন্ধভরা গোলাপী চিঠি শীঘ্রই আসছে। আর তারপরেই এ দেশে বিপদ নামবে।

গুডউইন রাস্তায় নেমে এগিয়ে এসে ছেলেটির হাত থেকে কাগজটি নেয়। এইসময় গবাক্ষিনীরা লজ্জাজড়িত সম্ভ্রমের চোখে তার দিকে চেয়ে রইল। গুডউইন দীর্ঘাকৃতি, মাথার রং লাল, পরনে সাদা লিনেনের খেলাধুলার পোশাক আর হরিণের চামড়ার জুতো। তার আচরণ অত্যন্ত শিষ্ঠ, যেন একধরনের করুণা মেশানো উদ্ধত ভাব স্বভাবসুলভ দয়ালুতায় প্রকাশিত।

গুডউইন টেলিগ্রাম নিয়ে বাহককে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিয়ে বিদায় করলে শান্ত হয়ে নগরবাসীরা তাদের পূর্বের জায়গায় ফিরে গেল। স্ত্রীলোকেরা রুটি সেঁকতে লাগল বা তাদের দীর্ঘ, সরল কেশদাম পরিচর্যা করতে শুরু করল, পুরুষেরা চায়ের দোকানে তাদের আড্ডা শুরু করল।

কেওগের দোকানের প্রবেশ পথের সিঁড়িতে বসে গুডউইন টেলিগ্রামটি পড়ল। টেলিগ্রামটি পাঠিয়েছে বব ঈঙ্গলহার্ট। রাজধানী নাজমাটেও-এর আশি মাইল ভিতরে সে থাকে। জাতিতে আমেরিকান, সোনার খনির মালিক ঈঙ্গলহার্ট, বিপ্লববাদী আর ভাল লোক। টেলিগ্রামটির রচনা কৌশল থেকে তার কল্পনা ও বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

রাজধানী থেকে গোপন সংবাদ কোরালিওতে বন্ধুর কাছে পাঠানোই ঈঙ্গলহার্টের কাজ ছিল। আঞ্চুরিয়ার রাজনৈতিক চক্ষু খুব সজাগ থাকার ফলে স্প্যানিশ বা ইংরেজিতে সংবাদ পাঠানো চলতো না। শাসকদল আর বাইরের দল সর্বদা তটস্থ। সেই কারণে কূটনীতিতে ঈঙ্গলহার্ট জোরালো এবং শক্তিশালী স্ল্যাং ভাষার সাহায্যে নিরাপদেই সে কাজ করতো। কৌতূহলী সরকারি কর্মচারীদের হাতের ভিতর দিয়ে পিছলে বেরিয়ে আসা খবর এখন গুডউইনের চোখের সামনে রয়েছে।

বব লিখেছে, হিস নিবস গতকাল জ্যাক র‍্যাবিট লাইন দিয়ে চলে গেছেন। কিটির মধ্যে সব খুচরো আর এক বান্ডিল ময়লিন সঙ্গে নিয়ে যার ব্যাপারে তিনি প্রায় উন্মাদ। বুডল্‌ ছয় অঙ্কের নীচে। আমাদের দঙ্গল ভালই আছে, তবে আমরা স্পনডুলিক গুলি চাই। তুমি পাকড়াবে। প্রধান ব্যক্তি আর শুকনো বস্তুগুলি জলের দিকে যাবে, কি করতে হবে তুমি জানো।

সংকেত বার্তা অদ্ভুত হলেও গুডউইনের কাছে তার মধ্যে কোন রহস্যই ছিল না। যে কয়জন ফাটকাবাজ আমেরিকান প্রথমে আঞ্চুরিয়াতে আসে গুডউইন ছিল তাদের মধ্যে সফলতম। সূক্ষ্মবিচার আর দূরদৃষ্টির সাহায্যেই সে সাফল্যের শিখরে উঠতে পেরেছে। সে রাজনৈতিক গোপন চক্রান্তকে ব্যবসারই একটি অঙ্গ হিসাবে নিয়েছিল। তীক্ষ্ণ মেধার সাহায্যে সে প্রধান চক্রান্তকারীদের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল এবং ধনী হবার ফলে নীচুস্তরের আমলাদের শ্রদ্ধাও সে লাভ করেছিল। একটি বিপ্লবী দল সবসময়ই থাকে আর বরাবরই সে সেই দলের সঙ্গে যুক্ত থাকে। কারণ যখনই নতুন সরকার আসে, তার অনুগতরা সেই সরকারের হাতে তাদের পরিশ্রমের পুরস্কার পায়। বর্তমানে প্রেসিডেন্ট মিরাফ্লোরেসকে একটি লিবারেল পার্টি সরাবার চেষ্টা করছে। তা সম্ভব হলে ত্রিশ হাজার একর শ্রেষ্ঠ কফি চাষের জমি গুডউইনের পাবার কথা। গুডউইন তার বিচক্ষণ বুদ্ধির দ্বারা বুঝতে পেরেছিল প্রেসিডেন্ট মিরাফ্লোরেসের সাম্প্রতিক কয়েকটি কাজকর্মের ফলে বিপ্লব ছাড়াই সরকারের পতন আসন্ন। এখন এই টেলিগ্রাম তার উপলব্ধির সমর্থন করছে।

আঞ্চুরিয়ার সরকারী ভাষাবিদেরা তাদের স্প্যানিশ বা প্রাথমিক ইংরেজী জ্ঞানের সাহায্যে যে টেলিগ্রামের ভাষা বুঝতে পারেনি তা গুডউইনের কাছে একটি উত্তেজক খবর পৌঁছে দিল। গুডউইন জানতে পারল, প্রেসিডেন্ট সরকারী অর্থভাণ্ডার সঙ্গে নিয়ে রাজধানী ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁর পলায়নের সঙ্গিনী হয়েছেন সেই বিজয়িনী দুঃসাহসী ইসাবেল গিলবার্ট, অপেরার গায়িকা। যার দলকে প্রেসিডেন্ট সম্প্রতি এমন আড়ম্বরে আপ্যায়িত করেছেন যা সাধারণত রাজকীয় অতিথিদের করা হয়। কোরালিও আর রাজধানীর মধ্যে খচ্চরের পিঠে আসা-যাওয়ার প্রচলিত ব্যবস্থাই জ্যাক র‍্যাবিট লাইনের অর্থ। বুডল ছয় অঙ্কের নীচে-এর মধ্যে জাতীয় তহবিলের করুণ অবস্থার ইঙ্গিত রয়েছে। যাদের পথ এখন পরিষ্কার, সেই পরবর্তী শাসকদলের এই অর্থ দরকার। জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করা হলে আর বিজয়ীদের অধিকারে অর্থ না থাকলে অবস্থা বেশ বিপদসংকুল। সেই কারণে প্রধান ব্যক্তিটিকে ধরে যুদ্ধ ও প্রশাসনের প্রধান সকল অর্থ ফিরে পাওয়ার একান্ত প্রয়োজন।

টেলিগ্রামটি কেওগকে দিয়ে গুডউইন বলল, পড়ে দেখ বিলি, বব ঈঙ্গলহার্ট পাঠিয়েছে। তারপর কেওগকে পড়তে দেখে আবার বলল; সাংকেতিক ভাষা কি তুমি ধরতে পারছ?

কেওগ টেলিগ্রামটি মনোযোগ দিয়ে পড়ার পর বলল, এটা কোন সাংকেতিক ভাষাই নয়। এর নাম সাহিত্য আর তার মানে ভাষা ব্যবহারের একটা রীতি যা লোকের মুখে দেওয়া হয়েছে।

যারা কল্পনার সাহায্যে লেখে তাদের কখনো শেখানো হয়নি। ম্যাগাজিনে এই ভাষা আবিষ্কৃত হলেও প্রেসিডেন্ট নরভিন গ্রীন তাঁর সম্মতি দিয়েছেন কিনা আমি জানি না। এখন এটা ভাষা সাহিত্য নয়। এর সংজ্ঞা দিতে চেষ্টা করে অভিধান সিদ্ধান্ত দেয় এটি কথ্য ভাষা। পশ্চিমের ইউনিয়ন এই ভাষা যেহেতু মেনে নিয়েছে সেই জন্যে খুব শীঘ্রই একটি জাতি গড়ে উঠবে যারা এই ভাষায় কথা বলবে।

গুডউইন বলল, তুমি বড় বেশী ভাষাতত্ত্বের কথা এনে ফেললে বিলি। তুমি কি এর মানেটা বুঝতে পেরেছ?

নিশ্চয়ই, তার কাছে সব ভাষাই সহজ হয়ে আসে যাকে তা বুঝতেই হবে। একটি গাদা বন্দুকের নল আমার পিঠে ঠেকিয়ে প্রাচীন চাইনীজ ভাষায় দেওয়া স্থান ত্যাগ করার আদেশও আমি একবার বুঝতে ভুল করতে পারিনি। আমার হাতে ধরা এই ছোট্ট সাহিত্যিক প্রবন্ধটির অর্থ "ফকস ইন দি মরনিং" নামের একটি খেলা। তুমি যখন ছোট ছিলে, তখন খেলেছ কি ফ্রাঙ্ক?

মনে পড়েছে, সবাই পরস্পরের হাত ধরে আর....

গুডউইনকে বাধা দিয়ে কেওগ বলে উঠল, না না, তা নয়। একটা চমৎকার দৌড়ঝাঁপের খেলা। তুমি অলরাউন্ড দি রাজ বুশের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছ। ফকস ইন দি মরনিং-এর আসল কথাটা হাত ধরাধরির একেবারেই উল্টো। কেমন করে খেলতে হয় শোনো, প্রেসিডেন্ট আর তার খেলার সাথী সান মাটেও থেকে উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলবে "ফকস ইন দি মরনিং'। তখন তুমি আর আমি এখানে দাঁড়িয়ে বলি "গুজ এন্ড দি গ্যান্ডার"। ওরা তখন বলবে "লন্ডন পৌঁছতে ক'মাইল পথ", তখন আমরা বলি, "অল্পই, যদি তোমার ঠ্যাং লম্বা, কতজন বেরিয়েছে?" এবার ওরা বলবে "অনেকে, অনেকজন ধরতে পারো কি?" আর সঙ্গে সঙ্গেই খেলা শেষ হয়ে যাবে।

বুঝলাম, কিন্তু গুজ অ্যান্ড দি গ্যান্ডারকে আমাদের হাতের ফাঁক দিয়ে পালাতে দেওয়া ঠিক নয়। তাদের পালকের দাম অনেক। গুডউইন বলল, আমাদের দল সরকারের খালি করা জুতো পায়ে গলাতে সক্ষম আর প্রস্তুত। কিন্তু ট্রেজারি খালি থাকলে তাহলে পোষ-না-মানা ঘোড়ার পিঠে একটি শিশু যতক্ষণ থাকতে পারে ঠিক ততক্ষণ আমরা ক্ষমতায় থাকব। তারা যাতে এই দেশের বাইরে পালাতে না পারে তার জন্য এই উপকূলের প্রতি ফুট জমির ওপর নজর রেখে আমাদের শেয়ালের খেলা খেলতে হবে।

হিসাব অনুযায়ী সান মাটেও থেকে খচ্চরের পিঠে এখানে আসতে পাঁচ দিন সময় লাগবে। আমাদের পাহারার ঘাঁটিগুলি তৈরি করতে অনেক সময় পাওয়া যাবে। কেওগ বলল, সমুদ্রতীরে তারা কেবল তিন জায়গা থেকে ভেসে যাওয়ার আশা করতে পারে। এখান থেকে, সলিটাস থেকে আর আলাজান থেকে। এই তিন জায়গায় পাহারা দিতে হবে। দাবার প্রবলেমের মত সহজ। ফকস-এর চাল আর তিন চালে মাত করতে হবে। ও গুজি, গুজি গ্যান্ডার, কোথা যাও ভাই! যারা সরকারের পরিবর্তন চাইছে সেই খাঁটি রাজনৈতিক দলের হাতে সাহিত্য পদবাচ্য টেলিগ্রামের কৃপায় এই তমসাচ্ছন্ন পিতৃভূমির সম্পদ অটুট থাকবে।

কেওগ অবস্থার যথার্থ বিশ্লেষণই করেছিল। পর্যটনের পক্ষে রাজধানী থেকে নেমে আসার রাস্তা অত্যন্ত ক্লান্তিকর। কখনো বরফের মতো ঠাণ্ডা, কখনো গরম, ভিজে স্যাঁতসেঁতে কখনো বা খরার মধ্য দিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে আসা। কোথাও পথ উত্তুঙ্গ পাহাড়ের গা বেয়ে, পচা দড়ির মতো পাক দিয়ে গিয়েছে, কোথাও বরফশীতল নদীর ভিতর নেমে গিয়েছে, কোথাও সূর্যের আলো পৌঁছতে পারে না এমন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সাপের মতো এঁকেবেঁকে গিয়েছে, যার মধ্যে মারাত্মক পোকামাকড় আর জানোয়ারের বাস। সানুদেশে এসে পথটি ত্রিশূলের মতো তিনদিকে চলে গিয়েছে। মধ্যেরটি গিয়েছে আলাজানে, একটি এসেছে কোরালিওতে, আর তৃতীয়টি সলিটাসকে দ্বিখণ্ডিত করেছে। পাহাড়ের সানুদেশ থেকে সমুদ্রের মধ্যে মাইল পাঁচেক চওড়া পলিমাটির তীরভূমি। নিরক্ষীয় বনমালা এইখানে সবচেয়ে ঘন, গভীর। জঙ্গলের এখানে-সেখানে খানিকটা করে জমি পরিষ্কার করে কলা, কমলালেবুর বাগান করা হয়েছে। বাকি অংশে বন্য প্রকৃতির উন্মাদ বিস্তার। বাঁদর, টেপির, জাগুয়ার, কুমীর আর প্রকাণ্ড সব সরীসৃপ আর পোকামাকড়ের বাস। কোথাও কোথাও চলার পথ ঘন লতাগুল্মের ঝোপে ঢেকে দিয়েছে। সুন্দরী

গাছের জলা ডিঙিয়ে নিরাপদে যেতে পারে ডানাহীন এমন প্রাণী বিরল। সেই কারণে, পলাতকেরা ওই রাস্তা তিনটির একটি দিয়েই সমুদ্রতীরে পৌঁছবার আশা করতে পারে।

গুডউইন কেওগকে বলল, ব্যাপারটা গোপন রাখো, বিলি। প্রেসিডেন্ট পালাচ্ছেন একথাটা আমরা গদীয়ানদের জানতে দিতে চাই না। ববের খবরটা আমার মনে হয় রাজধানীতে এখনো পর্যন্ত একটি স্কুপ, তা না হলে খবরটা সে গোপনে পাঠাত না। তাই যদি হতো তাহলে ব্যাপারটা সকলে জানতো। আমি ডাক্তার জাভাল্লার কাছে যাচ্ছি, একজন লোককে টেলিগ্রাফের তার কাটতে পাঠাতে হবে।

গুডউইন যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল। কেওগ তার টুপী খুলে পাশে ঘাসের ওপর ছুঁড়ে ফেলে একটা উচ্চনাদী দীর্ঘশ্বাস ফেললে গুডউইন বলল, কষ্টটা কিসের বিলি? এই প্রথম আমি তোমার দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনলাম।

এটাও শেষ, কেওগ বলল, এই বেদনাময় বাতাসের সঙ্গে সঙ্গেই প্রশংসনীয় কিন্তু বিরক্তিকর সততার জীবনে আমি নিজেকে ছেড়ে দিলাম। এই মহান, উচ্ছল রাজহংস-হংসীদের জাতের সুবিধাগুলির কাছে কোথায় লাগে টিনের পট শিল্পের ব্যবসা! না, না ফ্রাঙ্ক আমি প্রেসিডেন্ট হবো তা বলছি না। তাছাড়া টাকার থলিটা এত বড় অঙ্কের যে আমার পক্ষে তা সামলানো অসম্ভব, কিন্তু কেন জানি আমার মনে হচ্ছে, তাদের সঙ্গে পালিয়ে না গিয়ে, নিজেকে একটি জাতির ফোটোগ্রাফ তোলার নেশায় ব্যস্ত রাখার জন্য, আমার বিবেক আমাকে আঘাত করছে। ফ্রাঙ্ক, মহাশয় যাকে গুটিয়ে নিয়ে পালাচ্ছেন, তুমি কি সেই মসলিনের বান্ডিলটিকে কখনো দেখেছ?

হেসে গুডউইন বলল, ইসাবেল গিলবার্ট, না একবারও নয়। তার সম্বন্ধে যা শুনেছি তাতে মনে হয় নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সে সবকিছুই করতে পারে, কিন্তু বিলি, রোমান্টিক হয়ে উঠো না। তোমার শরীরে আইরিশ রক্ত আছে বলে মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ হয়।

আমিও তাকে দেখিনি, কিন্তু লোকে বলে যে তার তুলনায় পুরাণের, ভাস্কর্যের আর উপন্যাসের সমস্ত রমণী পটের ছবির মতো তুচ্ছ হয়ে যায়। কেওগ বলে চলে, ওরা বলে, কোন পুরুষের দিকে সে একবার তাকালে সেই পুরুষ সঙ্গে সঙ্গে বাঁদর হয়ে গাছে উঠে তার জন্য ডাব পেড়ে আনবে। একবার ভাব তো ফ্রাঙ্ক, এই প্রেসিডেন্ট ব্যক্তিটির কথা। সে তার এক হাতে ঈশ্বর জানেন কত লক্ষ ডলার আর অন্য হাতে এই মসলিনের মায়াবিনীকে নিয়ে, হামদরদী খচ্চরের পিঠে চড়ে পাহাড়ে গা বেয়ে নেমে আসছে। চারদিকে ফুল ফুটছে, পাখি গান গাইছে। আর এখানে এক পণ্ডশ্রমের ব্যবসাতে টিনের ওপর মিসিং লিঙ্কদের মুখের আদলের নকল করে বিলি কেওগ সাজা পাচ্ছে। কারণ সে সৎভাবে জীবন কাটাতে চায়। প্রকৃতির কি অবিচার।

খুশী থাকো ভাই, তুমি একটি ঝকঝকে শিয়াল, তোমার পক্ষে রাজহংসকে ঈর্ষা করা মানায় না। গুডউইন বলল, হতে পারে চিত্ত-চাঞ্চল্যকারিনী গিলবার্ট তার রাজকীয় সঙ্গীকে আমরা দরিদ্র করে ফেলার পরে, তোমার প্রতি আর তোমার পটচিত্রগুলিতে আগ্রহ দেখাবে।

উঠে দাঁড়িয়ে কেওগ বলল, সে আরো খারাপ কিছু করতে পারে, কিন্তু তা করবে না। সে একটি দুষ্ট স্ত্রীলোক আর এই প্রেসিডেন্ট ব্যক্তিটি ভাগ্যবান। কিন্তু, ওকে সব কাজ করতে হচ্ছে বলে, আমি ক্ল্যানসির শপথের আওয়াজ পাচ্ছি। এই বলে শিস দিতে দিতে কেওগ পিছনদিকে চলে গেল। তাকে দেখে মনে হল না যে কিছুক্ষণ আগেই সে পলাতক প্রেসিডেন্টের দুর্ভাগ্যের জন্য দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিল।

গুডউইন এবার বড় রাস্তার সঙ্গে লম্বাভাবে মিশেছে এমন একটি সরু গলি ধরল বড় রাস্তা ছেড়ে। এই গলিপথগুলি ঘন ঘাসে ঢাকা হলেও পুলিশের কোমরের তলোয়ার সেই ঘাসগুলিকে বেশী বাড়তে দেয় না। পাথরের রাস্তা চাতালের চেয়ে চওড়া নয়, নীচু নীচু অ্যাডোবির বা কাঁচা ইটের বাড়িগুলির পাশ দিয়ে চলে গেছে। গ্রামের সীমানায় এসে ক্ষীণ হতে হতে রাস্তাগুলি যেখানে মিলিয়ে যায় সেখান থেকেই তালপাতায় ছাওয়া ক্যারিবীয়ানদের কুটির, আরো গরীব লোকের ডেরা, জ্যামাইকা আর পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের নিগ্রোদের কাঠের ঝুপড়ি শুরু হয়। কালাবোথা বা জেলের ঘণ্টাঘর, হোটেল দেলোস্ এদত্রানজারোস্, ভিসুভিয়াস ফ্রুট কোম্পানীর এজেন্টের বাসস্থান, বার্নার্ড ব্রানিগ্যানের দোকান ও বাসস্থান, একটি ভগ্ন গীর্জা যেখানে একদা

কলম্বাস পদার্পণ করেছিলেন আর সবচেয়ে বেশী দর্শনীয়, আঞ্চুরিয়ার প্রেসিডেন্টের, গ্রীষ্মকালীন রাজভবন কাসা মোরে না, প্রভৃতি কয়েকটি ইমারত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তটের সমান্তরাল প্রধান রাস্তায় বড় বড় দোকান, সরকারী অফিস, পোস্ট অফিস, মদের দোকান, বাজার রয়েছে।

চলতে চলতে গুডউইন বার্নার্ড ব্রানিগ্যানের আধুনিক কাঠের দোতলা বাড়ি দেখতে পেল। একতলায় ব্রানিগ্যানের দোকান, দোতলায় থাকার অংশ। বাড়ির চারিদিকে বাইরের পাঁচিলের আধাআধি দূরত্ব পর্যন্ত শীতল বারান্দার রেলিংয়ে ঝুঁকে, সাদা পোশাকে সজ্জিত একটি সুন্দরী তরুণী দাঁড়িয়েছিল। গুডউইন বাড়ির সামনে এলে তরুণী তাকে দেখে হাসল। স্প্যানিশ উচ্চবংশীয়দের চেয়ে তার গায়ের রং বেশি গভীর না হলেও, নিরক্ষীয় চন্দ্রালোকের মতো সে ঝলমল করছিল।

দাঁড়িয়ে পড়ে টুপী খুলে গুডউইন হাসিমুখে বলল, গুড ইভনিং মিস পলা।

কিছু খবর আছে নাকি মিঃ গুডউইন। দয়া করে না বলবেন না। মিস পলা বলল, কি রকম গরম পড়েছে, না? যা গরম, আমি ঠিক ম্যারিয়ানার মতো নিজেকে ভাবছি তার পরিখা ঘেরা গ্রেঞ্জ-এর না কি রেঞ্জের মধ্যে।

না, বলবার মতো আপাতত কোনো খবর নেই। চোখে একটু দুষ্টুমি ফুটিয়ে গুডউইন এবার বলল, শুধু আমাদের গেডি দিন দিন আরো বিরক্ত, আরো গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে। ওর মনকে শান্ত করার মতো কিছু না ঘটলে আমাকে ওর বাড়ির পিছনের বারান্দায় ধূমপান করতে যাওয়া ছেড়ে দিতে হবে। যদিও ওরকম ঠাণ্ডা জায়গা আর কোথাও নেই।

আবেগের সঙ্গে পলা বলল, ওর মুখ গম্ভীর নয় তো! যখন ও—হঠাৎ থেমে গিয়ে লজ্জায় নিজেকে গুটিয়ে নিল। মুখ চোখ রাঙা হয়ে উঠল। কারণ, ওর মা ছিলেন একজন মেসতিদো মহিলা। আর স্প্যানিশ রক্ত পলার মধ্যে এনে দিয়েছিল এক ধরনের লাজুকতা, যা ছিল তার প্রকৃতির অপর অর্ধভাগের বহিঃপ্রকাশের প্রবণতার পাশাপাশি তার রূপের একটি অলঙ্কার।

দুই

কমল আর বোতল

কোরালিওতে নিযুক্ত আমেরিকার কনসাল, উইলার্ড গেডি, ধীরে সুস্থে তার বার্ষিক রিপোর্ট তৈরি করছিল। গুডউইন বেড়াতে বেড়াতে ভিতরে এসে ছিল বারান্দার ছায়ায় ধূমপান করতে। কিন্তু গেডিকে কাজে নিবিষ্ট দেখে চলে গেল।

যাবার সময় গুডউইন বলল, আমি নাগরিক সেবা দপ্তরের কাছে অভিযোগ জানাব। যদিও জানি না, ওটি একটি দপ্তর না কেবল একটি তত্ত্ব। তোমার কাছে কেউ না পায় নাগরিকসুলভ অধিকার, না পায় সেবা। তুমি না বলো কথা, না রাখো পান করার জন্য কিছু। নিজের দেশের প্রতিনিধিত্ব করার এ কেমন রীতি তোমার।

এই কথা বলে গুডউইন বেরিয়ে গেল হোটেলের দিকে, বন্দরের ডাক্তারকে এক দান যদি বিলিয়ার্ড খেলায় নামানো যায় এই আশায়। পলাতকদের আটক করার সব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে এখন শুধু অপেক্ষা করার পালা।

কনসাল তার রিপোর্ট সম্বন্ধে আগ্রহী ছিল। তার বয়স মোটে চব্বিশ। অল্প কয়েকদিন হল সে কোরালিওতে এসেছে। কনসাল তার রিপোর্টটিতে আবার চোখ বোলায়। রপ্তানি গতবছরের তুলনায় বিশ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

কনসালের দেহের মধ্যে দিয়ে একটু খুশীর ঝিলিক বয়ে গেল। সে নিজের মনে চিন্তা করতে শুরু করল হয়ত স্টেট ডিপার্টমেন্টে যখন এই রিপোর্টের ভূমিকা পড়ে লক্ষ্য করবে—হঠাৎ ভাবনা থামিয়ে চেয়ারে পিঠ ঠেকিয়ে সে হেসে উঠল। তার মনে পড়ল যে কোরালিওর মতো এক তুচ্ছ শহরে সে পড়ে আছে। যে শহরটি একটি তুচ্ছ রাষ্ট্রের দ্বিতীয় স্তরের সমুদ্রের গলিপথে অবস্থিত। এইসময় লন্ডনের ল্যানসেট পত্রিকার গ্রাহক, জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডাক্তার গ্রেগ-এর কথা মনে পড়ল। ডাক্তার গ্রেগ আশা করেন বিলেতের স্বাস্থ্য বোর্ডে পাঠানো ফিচার সম্বন্ধে তাঁর লেখা

রিপোর্টের উদ্ধৃতি ল্যানসেট পত্রিকায় থাকবে। কনসাল নিজের মনে ভাবতে লাগল, দেশে আমার পরিচিত পঞ্চাশজনের মধ্যে একজনও হয়ত কোরালিওর নাম শোনেনি। আমি জানি অন্তত দু'জন লোক এই রিপোর্ট পড়বে। স্টেট ডিপার্টমেন্টের ছোট পদের একজন কর্মচারী আর সরকারী ছাপাখানার কম্পোজিটার। যে ব্যক্তি অক্ষর সাজায় সে হয়ত বিয়ার ও পনিরের ফাঁকে তার কোন বন্ধুকে জানাবে যে কোরালিওতে বাণিজ্যের উন্নতি হয়েছে।

উইলার্ড গেডি সবেমাত্র লিখেছে যে, সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা এই যে, আমেরিকার বড় বড় রপ্তানীর ব্যাপারিরা কেন যেন উদাসীন হয়ে ফরাসী ও জার্মন ব্যবসায়ীদের হাতে সম্পদে ভরপুর এই দেশের ব্যবসায়িক দখল ছেড়ে দিয়েছে—এমন সময় সে একটি স্টীমারের ধরা গলার আওয়াজ শুনতে পেল। আওয়াজ শুনে সে বুঝল ভিসুভিয়াস ফল কোম্পানির ভাল-হাল্লা নামের ফলের জাহাজটি এসেছে। জাহাজটি নিয়মিত যাতায়াত করে। কোরালিওতে পাঁচ বছরের বাচ্চা পর্যন্ত ভোঁয়ের শব্দ শুনে জাহাজের নাম বলতে পারে।

কনসাল কলম রেখে তার পাজামা টুপী ও ছাতা নিয়ে একটু ঘুরে ছায়া ঘেরা পথে তীরে এল। অনেকদিনের অভ্যাসের ফলে সে তার চলার গতি এমন নিখুঁতভাবে নিয়ন্ত্রিত করল যে, সে যখন তীরে এল তখন নিয়মমাফিক পরিদর্শন সেরে কাস্টমস বিভাগের নৌকা ফিরে এসেছে।

কোরালিওতে কোনো বন্দর না থাকায় তীরের অন্তত একমাইল দূরে বড় জাহাজগুলি নোঙর করে। ফল নিয়ে যাওয়ার সময় ছোট ছোট নৌকা করে সেই ফল জাহাজে পৌছে দেওয়া হয়। মালটাসে সুন্দর বন্দর থাকায় সেখানে নানারকম জাহাজ দেখা যায়, কিন্তু কেবলমাত্র কয়েকটি ফলের জাহাজ শুধু কোরালিওর তট ছুঁয়ে যায়। অবশ্য কখনো কখনো একটি ভবঘুরে জাহাজ, বা স্পেনের কোনো রহস্যময় পালতোলা জাহাজ বা ফ্রান্সের এক স্টীমার কোরালিওর উপকূল থেকে কয়েক মাইল দূরে ভাল মানুষের মতো দাঁড়িয়ে আছে দেখা যায়। সেইসময় কাস্টমসের সব কর্মীদের তৎপরতা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। রাত্রে দেখা যায় দু-একটি পালতোলা নৌকা অনির্দেশ পাড়ি দিচ্ছে। আর সকালে কোরালিওর দোকানে দোকানে থ্রিস্টার হেনেসি, আঙুরের মদ আর অন্যান্য পানীয়ের আমদানী অনেক পরিমাণে বেড়ে যায়। লোকে বলে সেদিন কাস্টমসের কর্মীদের ট্রাউজারের পকেটে অনেক রূপোর টাকার ঝনঝনি শোনা যায়। অবশ্য কাস্টমসের জাবদা খাতায় আমদানী শুল্কের ঘরে নতুন কোনো অঙ্ক বসবে না।

কাস্টমসের আর ভাল হাল্লার নৌকা একই সময়ে তীরের থেকে পাঁচ গজ দূরত্বে অল্প জলের মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে গেল। অর্ধনগ্ন ক্যারবীয় ছেলেরা ঝাঁপিয়ে জলে নেমে পিঠে করে নৌকা থেকে ভালহাল্লার পারমার ও সুতির সার্ট এবং লাল ডোরাদার নীল প্যান্ট পরা কাস্টমস কর্মীদের নামিয়ে আনল।

কলেজে বেসবলে গেডির ফার্স্ট বেসম্যান হিসাবে নাম ছিল। গেডি ছাতা বন্ধ করে বালিতে গেঁথে রেখে হাঁটুতে হাত দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়াল। ভালহাল্লার স্টীমারে গেডির জন্য নিয়মিত আসা খবরের কাগজ সুতো দিয়ে বাঁধা, একটি ভারী বাণ্ডিল পারমার বেসবলের পীচারের ভঙ্গীতে তার দিকে ছুঁড়ে দিল। গেডি লাফিয়ে উঠে সেই বাণ্ডিল লুফে নেবার সময়, বেশ জোরে ঠক করে একটা শব্দ হলে, কোরালিওর জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ যারা তীরে বেড়াচ্ছিল, হাততালি দিয়ে হেসে উঠল। প্রতি সপ্তাহে তারা আশা করে এইভাবে গেডির হাতে খবরের কাগজ পৌছাবে। আর যেহেতু কোরালিওতে নতুনত্বের আবির্ভাব খুব কমই ঘটে তাই অরা কোনবারই নিরাশ হয় না।

ছাতা খুলে কনসাল তার কনসুলেটে ফিরে গেল। তার বাসস্থানটি ছিল কাঠের একটি দু-কামরার বাড়ি। যার তিনদিকে বাঁকা কাঠের খুঁটি আর নীলা জাতীয় তালগাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি বারান্দা। একটি কামরা সরকারী অফিস, একটি ডেস্ক, একটি দোলনা আসন, তিনটি বেতের চেয়ার দিয়ে সাধারণভাবে সাজানো। ঘরের দেওয়ালে দেশের প্রথম ও বর্তমান রাষ্ট্রপতির ছবি টাঙানো। অপর কামরাটি কনসালের থাকার ঘর।

কনসাল প্রাতরাশের সময় বেলা প্রায় এগারোটা নাগাদ ফিরল, চানকা নামে যে ক্যারিব মেয়েটি রান্না করে সে কোরালিওর সবচেয়ে ঠাণ্ডা বসবার জায়গা হিসাবে প্রসিদ্ধ সমুদ্রমুখী

বারান্দার দিকে খাবার সাজাচ্ছিল। প্রাতরাশে ছিল হাঙরের পাখনার স্যুপ, ডাঙার কাঁকড়ার স্ট্যু, ব্রেডফ্রুট, সিদ্ধ করা ইগুয়ানার স্টেক (মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার বন অঞ্চলে স্থলে ও গাছে বিচরণশীল কয়েক জাতের সরীসৃপ যাদের কোন কোন প্রজাতির মাংস ও ডিম সুস্বাদু খাদ্য), আগুয়াকেটিস (দ্রাক্ষা জাতীয় ফল), সদ্য কাটা আনারস, ক্লারেট আর কফি। গেডি আসনে বসে খবরের কাগজের বান্ডিল খুলল। মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দাদের কার্যকলাপের বিষয়ে অযথার্থ বিজ্ঞানের আজগুবি কাহিনীগুলি আমরা যেমন পড়ে থাকি ঠিক তেমনি কোরালিওতে বসে দু'দিন ধরে গেডি এখন পৃথিবীতে কোথায় কি ঘটেছে তা পড়বে। কাগজগুলি তার পড়া হলে ক্রমে ক্রমে তা ইংরেজী ভাষী নাগরিকদের কাছে পাঠানো হবে।

প্রথমে তার হাতে ঠেকল তোষকের মতো মোটা ছাপা বস্তু, গ্রাহকদের সাহিত্যের আমেজ লাগা দিবানিদ্রার জন্য ব্যবহার করা নিউইয়র্কের একটি সংবাদপত্রের রবিবারের সংখ্যা। পত্রিকাটা খুলে টেবিলে রেখে চেয়ারে পিঠে দিয়ে পত্রিকাটা গুছিয়ে নিয়ে কনসাল আস্তে আস্তে খেতে লাগল আর বিষয়বস্তুর ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে মাঝে মাঝে পাতা ওলটাতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে অর্ধপৃষ্ঠাব্যাপী বিশ্রীভাবে ছাপা একটি ছবির ওপর তার নজর পড়ল। ছবিটি আটশো টনের প্রমোদতরী আইডেলিয়া, যার মালিক টাকার বাজারের মিডাস, সৎ লোকদের সেরা, সমাজের মধ্যমণি জে ওয়ার্ড টলিভার।

কফিতে চুমুক দিতে দিতে গেডি খবরটি আস্তে আস্তে পড়তে শুরু করল। মিঃ টলিভারের বিষয় আশয়ের ফিরিস্তির পরে প্রমোদতরীর অঙ্গসজ্জার বিবরণ রয়েছে আর তারপরে ছাপা রয়েছে মিঃ টলিভার কয়েকজন বিশিষ্ট অতিথির সঙ্গে পরদিন তরী ভাসাবেন এবং ছয় সপ্তাহের জন্য মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলের ধারে এবং বাহামা দ্বীপপুঞ্জের আশে পাশে বেড়াবেন। অতিথিদের মধ্যে নরফোকের শ্রীমতি কামবারল্যান্ড পেন ও মিস আইদা পেন আছেন।

পাঠকের চাহিদা মত, মূর্খ সংবাদদাতা, সবজান্তার ভূমিকা নিয়ে একটি প্রেম কাহিনীর উদ্ভাবন করেছে। মিস পেন ও মিঃ টলিভারের নাম এমনভাবে জড়ানো হয়েছে যে পড়লেই মনে হবে বিবাহেরই শুধু অপেক্ষা। তার বর্ণনার মধ্যে "গুজবের রানী", "ছোট্ট পাখি", "কেহ আশ্চর্য হবে না" প্রভৃতি শব্দের চটুল ব্যবহার করা হয়েছে এবং সব শেষে অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

প্রাতরাশের পর গেডি খবরের কাগজ নিয়ে বারান্দার ধারে গিয়ে, তার প্রিয় ডেক চেয়ারে বসে একটি চুরুট ধরিয়ে, বাঁশের রেলিঙে পা ছড়িয়ে দিল।

সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আপনমনে গেডি বলতে লাগল, যে বেদনা এই কমলের দেশে আমাকে স্বেচ্ছা নির্বাসনে পাঠিয়েছিল তা আমি সম্পূর্ণ জয় করেছি। খবরটা পড়ে আমি মোটেই বিচলিত হইনি। যদিও আইদাকে আমি কখনও ভুলতে পারব না, তবুও তার কথা ভাবতে এখন আমার আর কোনো জ্বালা বোধ হয় না। আমাদের ভুল বোঝাবুঝি ও কলহের সময় আইদার প্রতি প্রতিশোধের বাসনায় ঝোঁকের মাথায় আমি এই কনসালের চাকরী যোগাড় করেছিলাম। তার সামনে থেকে তার জগৎ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টায় আমি সম্পূর্ণভাবে সফল হয়েছি। কোরালিওতে গত একবছরের জীবনযাত্রায় আমাদের মধ্যে কোনো বার্তা বিনিময় হয়নি। অবশ্য যে কয়জন বন্ধু আমাকে চিঠিপত্র লেখে, তাদের পত্রে মাসে মাসে আমি আইদার খবর পেয়েছি। তাহলে আইদা এখনো পর্যন্ত টলিভার বা অন্য কাউকে বিবাহ করেনি। টলিভার এখনো আশা করে আছে। যাইহোক আজ আর কিছু আসে যায় না। কমলের ফল খাওয়া আমার হয়ে গেছে। এই চিরন্তন শান্ত অপরাহ্নের দেশে আমি সুখী, তৃপ্ত। আমেরিকায় পুরনো দিনগুলি এখন জ্বালা ধরানো স্বপ্নের মতো মনে হয়। আইদা সুখী হোক এই কামনা করি। এখানে অলস রোমান্টিক লোকজনের মধ্যে বলগাহীন রূপকথার দিনগুলি, জীবন এখানে গান, ফুল আর নরম হাসি দিয়ে তৈরি। পাহাড় ও সমুদ্রের সান্নিধ্যের প্রভাব, উষ্ণমণ্ডলের স্বচ্ছ শুভ্র রাত্রির মায়া, প্রেম ও সৌন্দর্যের কত মোহময় প্রতিচ্ছবি, এসব নিয়ে আমি প্রকৃতই তৃপ্ত, আর আছে পলা ব্রানিগ্যান।

পলাকে নিয়ে আমি প্রকৃতই সুখী হবো, স্থানীয় কোনো মেয়ে তার ধারেকাছে যেতে পারবে না। নিউ অর্লিয়েন্সের এক কনভেন্টে পলা দু'বছর পড়েছে। সে নিজের পারদর্শিতার পরিচয় দিতে চাইলে, ম্যানহ্যাটান আর নরফোকের মেয়েদের সঙ্গে তার কোনো পার্থক্য বোঝা যেত না। কিন্তু

স্থানীয় মেয়েদের মতো কাঁধখোলা পুরোহাতা পোশাকেই তাকে বেশী রমণীয় দেখায়।

বার্নার্ড ব্রানিগ্যান কোরালিওর বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। দোকান ছাড়াও তার একদল মালবাহী খচ্চর আছে। যাদের সাহায্যে সে অন্তবর্তী শহর ও গ্রামগুলির সঙ্গে কারবার চালায়। স্থানীয় একটি উচ্চ স্প্যানিশ বংশোদ্ভবা মহিলাকে সে বিবাহ করেছিল, যার জলপাই রঙের গালের ইশারায় বোঝা যায় রেড ইন্ডিয়ানদের বাদামীর রেশ। আইরিশ ও স্প্যানিশ সংমিশ্রণে তাদের যে সন্ততিটি জন্মেছিল, সৌন্দর্যে ও বৈচিত্র্যে সে ছিল বিরল, ওরা ভারি চমৎকার লোক। ওদের বাড়ির দোতলাটা আমার আর পলার জন্যে সাজানোই রয়েছে, কেবল আমার মন দিয়ে প্রস্তাব করার অপেক্ষা।

ইতিমধ্যে দু-ঘণ্টা কেটে গেছে, চারপাশে ছড়ানো খবরের কাগজগুলোর মধ্যে বারান্দায় চেয়ারে শুয়ে শুয়ে স্বপ্ননিবিড় চক্ষে গেডি যেন এক স্বর্গরাজ্য দেখছে। একটি কলাগাছের ঝাড় তাদের চওড়া পাতার চাল দিয়ে সূর্যকে আড়াল করে রেখেছে। পাতিলেবু আর কমলার গাছ কনসুলেট থেকে সমুদ্রতীর পর্যন্ত ফুলে ফুলে ফেটে পড়ছে। সমুদ্র থেকে একটি ধারা খানিকটা জমি চিরে হ্রদের সৃষ্টি করেছে এবড়ো খেবড়ো স্ফটিকের মতো। প্রকাণ্ড একটা হালকা সবুজ শিমুল গাছ তার ওপর দিয়ে মেঘ পর্যন্ত সোজা উঠে গেছে। সারি সারি নারিকেল গাছের বড় বড় রোদলাগা সবুজ পাতা হাওয়ায় দুলে শ্লেট রঙের শান্ত সমুদ্রের ওপর ঝলমল করছে। বনপুষ্পের, বনফলের আর ক্যালবাশ গাছের নীচে চানকার মাটির উনুনের ধোঁয়ার ঘ্রাণ গেডির নাকে আসে। কুটীর থেকে ভেসে আসা নেটিভ মেয়েদের ক্ষীণ হাসির শব্দ সে শুনতে পায়।

এই সময় গেডি হঠাৎ লক্ষ্য করে তীরের ওপর প্রায় নিঃশব্দ মীড়ের মতো ভেঙে পড়া ঢেউ আর ধূসর সমুদ্রের মধ্যে দিগন্তে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠা একটি বিন্দু। অলস কৌতূহলে সে লক্ষ্য করল অস্পষ্ট সেই বিন্দুটি বড় হতে হতে আইডেলিয়ার আকৃতি নিয়ে, দ্রুতগতিতে তীরের দিকে ছুটে আসছে। নিজের জায়গা থেকেই গেডি কোরালিওর প্রায় সামনাসামনি ক্রমশ কাছে আসা সুন্দর সাদা প্রমোদ তরীটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখল। তাঁর থেকে এক মাইলের মধ্যে এলে সে ইয়টের গায়ের পিতলের অংশ থেকে ঠিকরে আসা আলো, ডোরাকাটা রঙিন ডেকের ছাদের বেশী কিছু দেখতে পেল না। ম্যাজিক লণ্ঠনের স্লাইডে দেখা জাহাজের মতো আইডেলিয়া কনসালের ছোট্ট জগতের আলোকবৃত্ত স্পর্শ করে চলে গেল। সমুদ্রের কিনারায় ভেসে থাকা ধোঁয়ার মেঘ না থাকলে মনে হত জাহাজটি কল্পনার, তার অলস মস্তিষ্কের সৃষ্ট একটি অলীক ছায়ামূর্তি।

অফিসে ফিরে গিয়ে গেডি তার রিপোর্ট নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করল। খবরের কাগজের সংবাদটি তাকে যেমন অবিচলিত রেখেছে তেমনি আইডেলিয়ার আসা ও নিঃশব্দে চলে যাওয়া তাকে আরো নির্লিপ্ত করেছে। এর ফলে একটি পরিস্থিতির সকল অনিশ্চয়তা দূর হয়ে আরো শান্তি এসেছে তার মনে। গেডি জানত নিজের মনের অগোচরে মানুষ কখনো কখনো আশা করে থাকে। দু'হাজার মাইল সাগর পেরিয়ে আজ যখন সেই মেয়েটি এসেছিল অথচ কোনো চিহ্ন না রেখে চলে গেল তখন—এমনকি তার অবচেতন মন থেকেও অতীতের সঙ্গে কোনো সংস্রব না রাখাই ভালো।

সূর্য পাহাড়ের পিছনে নেমে গেলে সন্ধ্যায় খাওয়ার পর, গেডি নারিকেল গাছের নীচে বালুবেলায় বেড়াতে গেল। মৃদু বাতাস বয়ে আসছে তীরের দিকে, ছোট ছোট ঢেউয়ে সমুদ্রগাত্র তরঙ্গিত একটি ছোটখাটো ব্রোকার কোমল 'সুইশ' শব্দ করে বালির ওপর ভেঙে পড়ল, সঙ্গে নিয়ে আসা একটি উজ্জ্বল বস্তু ঢেউয়ের সঙ্গে আবার সমুদ্রে চলে গেল। পরের তরঙ্গটিতে সেই বস্তুটি তীরে এসে আটকে গেলে গেডি সেটা তুলে নিল। বস্তুটি লম্বা গলার স্বচ্ছ কাঁচের একটি মদের বোতল, বোতলের মুখ পর্যন্ত ছিপিটা জোর করে এঁটে লাগিয়ে দিয়ে লাল গালা দিয়ে অংশটি সীল করে দেওয়া হয়েছে। বাইরের থেকে দেখা গেল একটা কাগজ বোতলের মধ্যে রয়েছে যেটা বেশ কুঁকড়ে গিয়েছে বোতলের ভিতরে ঢোকাবার সময়। সম্ভবত নামাঙ্কিত আংটির সাহায্যে সীলের ওপর মোহরের ছাপ দেওয়া হয়েছে। আন্দাজ করা যাচ্ছিল কোন নামের আদ্য অক্ষরের মনোগ্রাম কিন্তু তাড়াতাড়ি সীল করার ফলে কোনো অক্ষর বোঝা যাচ্ছিল না। পড়ে

গেডির যখন মনে হয় অক্ষর দুটি আই. পি. তখনি এক অদ্ভুত অস্বস্তি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। সে আরো নিবিড়, আরো ঘনিষ্ঠভাবে আইদা পেন-এর স্মৃতি অনুভব করল। যা প্রমোদতরীটি দেখার অনুভূতির থেকেও অনেক তীব্র। বাড়ি ফিরে সে ডেস্কের ওপর বোতলটি রাখল।

টুপী আর কোট ছেড়ে, একটি বাতি জ্বালিয়ে, গেডি সমুদ্র থেকে উদ্ধার করা বস্তুটিকে পরীক্ষা করা শুরু করল। আলোর নীচে বোতলটি ধরে নানাদিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে সে বুঝতে পারল ছোট ছোট অক্ষরের লেখায় ভরা দু'ভাঁজ করা একটি চিঠি লেখার কাগজ বোতলটার ভিতরে রয়েছে। কাগজের রং ও সাইজ আইদা যেমন ব্যবহার করত তেমন। হাতের লেখাটাও আইদার বলেই তার বিশ্বাস হলো। যদিও বোতলের কাঁচ নিঁখুত না হওয়ায় আলোর রশ্মি বেঁকেচুরে ভিতরে যাওয়ায় কোনো শব্দ পড়া যাচ্ছে না।

বোতলটি ডেস্কে নামিয়ে রাখার সময়ে গেডির চোখে বিহ্বলতা ও কৌতুকের হাসি দেখা দিল। টেবিলের ওপর তিনটে চুরুট রেখে বারান্দা থেকে ডেক চেয়ার এনে আরাম করে বসে চুরুট ধরিয়ে সমস্যাটি চিন্তা করতে লাগল।

বোতলটিই একটি সমস্যা হওয়ায় তার মনে হল সেটা না দেখতে পেলেই ভাল ছিল। কেন ওটা সমুদ্র থেকে ভেসে এল আমার মনের শান্তি কেড়ে নেবার জন্যে। এই স্বপ্নের দেশে, তার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল তুচ্ছ বিষয়ের ওপর অনেক সময় নিয়ে চিন্তা করা। কারণ এখানে সময় কোনো বিচারের ব্যাপারই নয়।

বোতলটির সম্বন্ধে গেডির মাথায় একে একে অনেক অদ্ভুত কথা আসতে লাগল আর সে সেগুলো এক এক করে বাতিল করতে থাকল। জাহাজ বিপন্ন হলে কখনো কখনো এই উপায় সাহায্যের আবেদন জানিয়ে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আইডেলিয়া তিন ঘণ্টা আগে নিরাপদ দ্রুতগতিতে চলে গেছে। জাহাজের কর্মচারীরা বিদ্রোহ করেছে এবং উদ্ধারের জন্য এই আবেদনটি পাঠানো হয়েছে। কিন্তু সেক্ষেত্রে বন্দী যাত্রীরা তাদের উদ্ধারের জন্য চারপাতা চিঠি লিখবে যত্ন করে?

এইভাবে সমস্ত কিছু বাদ দিতে দিতে গেডির মনে হলো তারই জন্য কোনো খবর এইভাবে পাঠানো হয়েছে। সে কোরালিওতে আছে একথা আইদা জানত। ইয়টটি যখন উপকূলের কাছাকাছি এসেছিল এবং বাতাস তীরমুখী ছিল সেই তখন বোতলটি পাঠিয়েছে।

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলে গেডির কপালে কুঞ্চনের দাগ পড়ল, মুখে দার্ঢ্যের ভাব ফুটে উঠল। দরজার বাইরে শান্ত রাস্তায় ভেসে বেড়ানো বড় বড় জোনাকির দিকে তাকিয়ে চুপ করে সে বসে রইল। যদি ওই বোতলে আইদার পাঠানো চিঠি থাকে তবে মিটমাট করে নেওয়ার উদ্যোগ ছাড়া আর কিই বা লেখা থাকবে তাতে। তাই যদি হয় তবে ডাক ব্যবস্থার সাহায্য না নিয়ে এই ভাবে কেন? একটা চিঠি বোতলে ভরে সমুদ্রে ফেলে দেওয়ার মধ্যে নিন্দনীয় বলা না হলে একটা হালকা আর খেলো আচরণ প্রকাশ পাচ্ছে।

এই চিন্তার ফলে বোতলটি পাবার পরে যে ভাবাবেগ পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল সেটা দমিত হয়ে তার অহমিকা জেগে উঠল।

কোট পরে, টুপী হাতে বাইরে বেরিয়ে গেডি একটি সরু রাস্তা ধরে একটি ছোট্ট চত্বরের কিনারায় যেখানে ব্যান্ড বাজছিল এবং নিরুদ্বেগ ও অলসভাবে মানুষজন বেড়াচ্ছিল সেই জায়গায় গিয়ে হাজির হল। কয়েকটি ভীরু মেয়ে তার দিকে সলজ্জ প্রশ্রয়ের দৃষ্টি রেখে দ্রুত চলে গেল। তাদের বিনুনী করা কালো চুলে জোনাকি লেগে রয়েছে। বাতাসে জুঁই আর কমলা ফুলের গন্ধে মনোহর।

কনসালের চলা থামল বার্নার্ড ব্রানিগ্যানের বাড়িতে এসে। পলা বারান্দায় একটা দোলনা আসনে বসে দুলছিল। গেডির গলার আওয়াজে তার কপোল রঙিন হল। বাসার দোলনা থেকে পাখির মতো সে নেমে এল। পলার পরিধেয় মসলিনের পোশাক, তার ওপর সাদা ফ্ল্যানেলের জ্যাকেট, সবকিছুতে স্টাইল আর পরিচ্ছন্নতা লক্ষ্য করে গেডি মুগ্ধ হল। তারা পাহাড়ের রাস্তায় পুরনো ইঁদারার দিকে বেড়াতে গিয়ে পাথরের চাতালে বসল। গেডি এইবার সেই আকাঙ্খিত কিন্তু বহু বিলম্বিত প্রস্তাবটি পেশ করল। তাকে 'না' শুনতে হবে না, এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকলেও

পলার সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের মাধুর্যে সে শিহরিত হল। প্রেম ও একনিষ্ঠতা দিয়ে তৈরী একটি হৃদয় সে এখানে পেল। এখানে খামখেয়ালীপনা নেই, প্রশ্ন নেই, নেই আদব কায়দার ত্রুটি বিচ্যুতিতে দোষ ধরা।

সে রাত্রে গেডি পলাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে যখন চুম্বনের পরে বিদায় নিল তখন তার সুখের সীমা নেই মনে হল। তার মনে হল তার ভবিষ্যৎ সে যেমনটি চায় ঠিক তেমনটি হবে। সে পেয়েছে স্বর্গরাজ্য, যেখানে সর্প নেই। তার আরও মনে হল সে প্রকৃতই তার অর্ধাঙ্গিনী হবে, মোহমুক্ত আর সেই কারণেই মোহময়ী। আজ রাত্রে সে সিদ্ধান্ত নিল, তার হৃদয় স্বচ্ছ, আশ্বাসিত পরিতৃপ্তিতে পূর্ণ।

গেডি, অপূর্ব বেদনাময় প্রেমের গান 'লা গোলোনদ্রিনা'র সুর শিস্ দিতে দিতে বাড়ি ফিরল। দরজায় পৌঁছতেই তার পোষা বাঁদরটা কিচ কিচ করতে করতে লাফিয়ে নেমে আসে। কনসাল বাঁদরটাকে দেবার জন্য তার ডেস্কের কাছে এসে কিছু বাদাম খুঁজতে গিয়ে সেই বোতলটা তার হাতে ঠেকায় চমকে উঠল। শীতল, গোল সাপের গায়ে হাত দিয়েছে বলে তার মনে হল। বোতলটি যে ওখানে রয়েছে তা তার মনেই ছিল না।

আলো জ্বালিয়ে বাঁদরকে খাওয়াবার পর, গেডি চুরুট ধরিয়ে বোতলটি হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে সমুদ্রতীরের দিকে গেল। চাঁদের আলোয় সমুদ্র ঝলমল করছিল। প্রত্যেক সন্ধ্যার মত বাতাস এখন ঘুরে গিয়ে স্থিরভাবে ভূমি থেকে সমুদ্রের দিকে বইছিল। জলের কিনারায় পৌঁছে গেডি সেই বোতলটা সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিলে মুহূর্তের জন্যে সেটা ডুবে গিয়ে পরক্ষণেই তার দৈর্ঘের দ্বিগুণ হয়ে সেটা ভেসে উঠল। উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গেডি দেখতে পাচ্ছিল বোতলটি ছোট ছোট ঢেউয়ের সঙ্গে একবার ডুবছে আবার ভেসে উঠছে। কখনো ঝলসে উঠছিল আবার কখনো বা ঘুরপাক খাচ্ছিল। এইভাবে বাতাস তাকে ধীরে ধীরে সমুদ্রের ভিতরে নিয়ে যাচ্ছিল। আস্তে আস্তে সেটা একটা বিন্দুতে পরিণত হবার পর সমুদ্রের বৃহত্তর রহস্যের মধ্যে তার রহস্য ঢাকা পড়ে গেল। ধূমপান করতে করতে জলের দিকে তাকিয়ে গেডি তখনো দাঁড়িয়ে রইল।

এইসময় হঠাৎ ভরী গলায় কেউ চিৎকার করল, সাইমন ও সাইমন, শীঘ্র ওঠ। মিশ্র জাতীয় ধীবর ও স্মাগলার বৃদ্ধ সাইমন ক্রুজ জলের ধারে তার কুটিরে থাকত।

কাঁচা ঘুম থেকে তাকে জাগানো হলে জুতো পায়ে সে বাইরে এলো। ভালহাল্লার একটি ছোট ডিঙি থেকে তখন সেই জাহাজের তৃতীয় মেট, যার সঙ্গে সাইমনের পরিচয় ছিল।

মেট সাইমনকে দেখে বলল, শীঘ্র যাও সাইমন, ডাক্তার গ্রেগকে এক্ষুণি ডেকে আনো বা মিঃ গুডউইনকে বা মিঃ গেডির কোনো কোনো বন্ধুকে।

ঘুম জড়ানো গলায় সাইমন বলল, স্বর্গের ঋষিরা! মিঃ গেডির কিছু হয়নি তো?

ডিঙির দিকে দেখিয়ে মেট বলল, তাকে ওই টারপলিনের নীচে রাখা হয়েছে। জলে ডুবে সে অর্ধমৃত। আমরা স্টীমার থেকে দেখতে পাই ও তীর থেকে প্রায় এক মাইল দূরে বাইরের দিকে ভেসে যাওয়া একটি বোতলের পিছনে পাগলের মতো সাঁতরে যাচ্ছে। বোতলটা প্রায় ধরে ধরে এমন সময় ওর দম ফুরিয়ে গেলে ডুবে যায়। আমরা ডিঙি নিয়ে ওর কাছে গিয়ে ঠিক সময়ে ওকে তুলে আনায় হয়ত বেঁচে যাবে। অবশ্য সেটা ডাক্তারই সঠিক করে বলতে পারবে।

একটা বৃদ্ধ দু'হাতে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বলল, একটা বোতল?

কোথায় সেই বোতল? সাইমন ঘুম চোখে জানতে চাইল।

সমুদ্রের দিকে দেখিয়ে মেট বলল, ভেসে যাচ্ছিল ওদিকে কোথাও, শীঘ্র যাও সাইমন।

তিন

স্মিথ

গুডউইন আর দেশভক্ত জাভাল্লা প্রেসিডেন্টে মিরাফ্লোরেস ও তাঁর সঙ্গিনীর দেশত্যাগ ঠেকানোর জন্য তাদের দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতার সাহায্যে নেওয়া সকল রকমের সাবধানতায়

নিশ্চিন্ত হয়ে, সলিটাস আর আলাজানে স্থানীয় নেতাদের কাছে, যদি তারা সেইসব অঞ্চলে পৌঁছয় এই পলায়নের বিষয়ে অবহিত করতে আর জলের লাইনে পাহারা বসাতে এবং যে কোন বিপদের সম্মুখীন হয়ে পলাতকদের গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়ে, বিশ্বাসী দূত পাঠালো। এরপরে বাকি রইল কোরালিও জেলার চৌকিদারী আর শিকার আসার অপেক্ষা করা। জাল বেশ ভালই বিছানো হয়েছে। রাস্তার সংখ্যা এত অল্প আর জাহাজে ওঠার সুবিধা এত কম এবং দুই বা তিনটি নির্গম পথ এত সুরক্ষিত যে দেশের এত বিপুল পরিমাণের সম্ভ্রম, রোমান্স ও আনুষঙ্গিক যদি জালের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যায় তবে সেটা আশ্চর্যের ব্যাপার হবে। যদিও এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে, প্রেসিডেন্ট যথাসম্ভব গোপনে চলাফেরা করবেন এবং তীরের কোনো নির্জন স্থান থেকে চোরের মতো নৌকায় চড়ার চেষ্টা করবেন।

ঈঙ্গলহার্টের টেলিগ্রাম পাবার পরে চতুর্থ দিনে সাইরেনের ধরা গলার তিনটি ভোঁ বাজিয়ে নিউইয়র্কের ফলের ব্যাপারীদের চার্টার করা নরওয়ের ফলের জাহাজ 'কার্লসফিন' কোরালিওর উপকূলের কাছাকাছি নোঙর করল। জাহাজটি বিভিন্ন ধরনের মাল বহন করা সখের মালবাহী জাহাজ। বাজারের ওপর কার্লসফিন-এর গতিবিধি নির্ভর করত। জাহাজটি কখনো কখনো নিউ অর্লিয়েন্স ও স্প্যানিশ সমুদ্র বরাবর নিয়মিত যাতায়াত করত আবার কখনো মবিল বা চার্লসটন বা উত্তরে নিউইয়র্ক পর্যন্ত ফলের বিতরণের রাস্তা ধরে চলে যেত।

গুডউইন বেড়াতে বেড়াতে তীরের যেখানে জাহাজ দেখতে ভিড় জমেছিল সেখানে এসে হাজির হল। যে কোন সময়ে প্রেসিডেন্ট তার দেশের সীমানা ছেড়ে চলে যেতে পারেন বলে কড়া পাহারা ও নজর রাখার আদেশ ছিল। তীরের ধারে আসা যে কোন জাহাজেই পলাতকরা পালাতে পারে বলে মনে করা হয়েছিল। তাই সেইসব জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে কোরালিওর সমুদ্রগামী বহরের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি ডিঙি ও পালতোলা নৌকার প্রতিও নজর রাখা হচ্ছে। গুডউইন আর জাভাল্লা কোনরূপ বাহুল্য না দেখিয়ে পলায়নের ফাঁকতালের প্রতি লক্ষ্য রেখে সর্বত্র বিচরণ করছিল। তারা দেখতে পেল কাস্টমসের কর্মীরা তাদের বোটে করে কার্লসফিন-এর দিকে চলে গেল। স্টীমার থেকে ভাণ্ডারী তার কাগজপত্র নিয়ে একটি বোটে করে তুলে কোরালিওর বহিরাগত রোগ নিয়ন্ত্রণের ডাক্তারকে তাঁর সবুজ ছাতা ও জ্বর মাপার থার্মোমিটার সমেত নিয়ে ফিরে গেল। সেইসময় একদল ক্যারিবীয় শ্রমিক তীরে রাখা হাজার হাজার কলার কাঁদি ছোট ছোট নৌকায় তুলে স্টীমারের দিকে চলতে লাগল। কার্লসফিন-এ যাত্রী না থাকায় সরকারী পরীক্ষা তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেলে ভাণ্ডারী জানালো আগামীকাল সকাল পর্যন্ত স্টীমারটি নোঙর করা থাকবে। সে আরও জানালো সম্প্রতি নিউইয়র্কে কমলালেবু আর নারিকেলের বোঝা সে রেখে এসেছে। দু-তিনটি বড় বড় মালবাহী নৌকা সে ভাড়া করেছে, যাতে তাড়াতাড়ি মাল বোঝাই শেষ করে সে আমেরিকায় ফিরে গিয়ে ফলাভাবের সুযোগ নিতে পারে।

বিকেল চারটে নাগাদ গুডউইনরা উপকূলে একটি অপরিচিত সামুদ্রিক যান দেখতে পেল। একটি সুঠাম বাস্পতরী, হালকা ছিমছাম হলুদ রং করা। তীর থেকে কিছু দূরে এসে ইয়টটি ভাসতে থাকে। বৃষ্টিপড়া পুকুরে হাঁসের মতো ঢেউয়ের তালে তালে সেটিকে একবার দেখা যায় আবার অদৃশ্য হয়। উর্দি পরা দাঁড়বাহীরা একটি দ্রুতগামী ডিঙি তীরে নিয়ে এলে একজন গাঁট্টাগোট্টা ব্যক্তি তার থেকে লাফিয়ে বালির ওপর নামে।

আগন্তুক তীরে আঙুরিয়ার পাঁচমিশেলী জনসমাবেশ দেখে বিরক্তি প্রকাশ করে গুডউইনের দিকে এগিয়ে গেল। গুডউইন তাকে সৌজন্যের অভিবাদন জানালে কথায় কথায় ব্যক্তিটি জানাল তার নাম স্মিথ, আর ঐ ইয়টটিতে সে এসেছে। কিন্তু কেন কে জানে গুডউইনের চোখে স্মিথ আর ইয়টের মধ্যে একটা বৈসাদৃশ্য প্রকট হল। স্মিথের মাথা বুলেটের আকৃতির, বাঁকা চোখ আর হোটেলে যারা ককটেল মেশায় তাদের মতো গোঁফ। ইয়ট থেকে নেমে আসার পূর্বে যদি সে পোশাক বদল না করে থাকে তবে তার মুক্তা-ধূসর ডার্বি টুপী, ঝকঝকে জামাকাপড় আর ক্লাউনের মতো গলার রুমাল তার নিখুঁত, পরিপাটী প্রমোদতরীর ডেককে অসম্মান করছে। প্রমোদতরীর মালিকেরা সাধারণত আরো সুসামঞ্জস্য পোশাক পরে।

স্মিথ কাজের কথায় যেমন ত্বরিত, আত্মপ্রচারে তেমন নয়। কোরালিওর প্রাকৃতিক দৃশ্যের

উল্লেখ করতে গিয়ে সে বলল, ভূগোলের বইয়ে যেমন থাকে তেমন দৃশ্য দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। তারপর সে বলল, এখানে আমেরিকার কনসাল কোথায়?

কমলালেবু গাছের ঝোপের আড়ালে, কনসুলেটের বাড়ির ওপর ওড়া, তারা ও ডোরাদাগের পতাকার দিকে দেখিয়ে গুডউইন বলল, কনসাল মিঃ গেডি বাড়ীতেই আছেন। কয়েকদিন আগে সমুদ্রে সাঁতার কাটতে গিয়ে উনি প্রায় ডুবে গিয়েছিলেন। ডাক্তার কয়েকদিন তাঁকে বাড়িতে থাকতে বলেছেন।

স্মিথ তখনই বালির ওপর দিয়ে পা চালিয়ে কনসুলেটের দিকে চলল। নিরক্ষীয় নীল সবুজের মাঝে তার সাজপোশাক দৃষ্টিকটু লাগছিল। ফ্যাকাসে মুখে ক্লান্ত ভঙ্গীতে গেডি তার দোলনায় বসেছিল। সে রাত্রে ভালহাল্লার নৌকো সমুদ্রের মধ্য থেকে মৃতপ্রায় অবস্থায় তাকে কূলে নিয়ে আসার পর, ডাঃ গ্রেগ আর তার অন্যান্য বন্ধুদের অনেক ঘণ্টার পরিশ্রমে জীবনের যেটুকু রেখা দেখা যাচ্ছিল তা বজায় রাখতে পেরেছে। সেই বোতল আর নিষ্প্রাণ খবর সমুদ্রের মধ্যে চলে গিয়ে, সহজ একটি যোগ অঙ্কের সমাধানে যে সমস্যা সেটা খুঁটিয়ে তুলেছিল তার অবসান হয়েছে। পাটিগনিতের নিয়মে একে একে দুই হলেও প্রেমের নিয়মে তা এক হয়।

মানুষের দুটি আত্মা থাকে, বহিরঙ্গের আত্মা সাধারণ অবস্থায় কাজ করে, আর কেন্দ্রীয় আত্মা মাত্র একবার বা দুবার বিচলিত হলেও তা হয় বেগের সঙ্গে, তেজের সঙ্গে। বহিরঙ্গ আত্মার অধীন হয়ে মানুষ দাড়ি কামায়, ভোট দেয়, ট্যাক্স জমা দেয়, পরিবারের হাতে টাকা তুলে দেয়, চাঁদা দিয়ে বই কেনে, সাধারণ নিয়মে নিজেকে মানিয়ে চলে। কেন্দ্রীয় আত্মা প্রবল হয়ে উঠলে চক্ষের পলকে সে আনন্দের অংশীদারের প্রতি গালিবর্ষণ শুরু করবে, ক্ষণে ক্ষণে রাজনীতি পাল্টাবে, মঠে বা নাচঘরে চলে যাবে, কবিতা বা গান লিখতে পারে, আত্মহত্যা করতে পারে বা চাইবার আগেই স্ত্রীকে চুমো খেতে পারে। জীবাণু আবিষ্কারের জন্য তার সব টাকাকড়ি দান করতে পারে। আবার বহিরঙ্গ আত্মা ফিরে এলে সুস্থ মস্তিষ্কের নাগরিককে ফিরে পাওয়া যায়। এটাই হল বাঁধাধরা নিয়মের বিরুদ্ধে অহং-এর বিদ্রোহ। এর ফলে অনু, পরমাণু ঝাঁকানি খায় যার যেখানে জায়গা সেখানে থিতিয়ে যাবার জন্য।

গেডি যে ধাক্কাটা খেয়েছিল সেটা হাল্কা ওজনের ভেসে যাওয়া একটা বোতলের পিছনে, গ্রীষ্মের সমুদ্রে সাঁতার কাটা। এখন সে আবার আত্মস্থ হয়েছে। তার ডেস্কের ওপর ডাকে দেবার অপেক্ষায় রয়েছে একটি চিঠি, সরকারকে লেখা তার কনসাল পদ থেকে ত্যাগপত্র। বার্নার্ড ব্রানিগ্যান গেডি তার লাভজনক ব্যবসার অংশীদার করে নিচ্ছে। ওদিকে পলা তাদের বাড়ির দোতলা নতুন করে সাজানোর পরিকল্পনায় ব্যস্ত ছিল।

এইসময় অপরিচিত স্মিথকে আসতে দেখে কনসাল তার দোলনা ছেড়ে উঠলে সে তার বড়োসড়ো হাত ভারিক্কী চালে নেড়ে বলল, যেমন ছিলেন বসেই থাকুন। আমার নাম স্মিথ। আমি একটি ইয়টে এসেছি। আপনিই কনসাল, তাই তো? ঠাণ্ডা প্রকৃতির একজন লম্বা চওড়া লোক সমুদ্রতীর থেকে আমাকে এই দিকে পাঠাল। জাতীয় পতাকাকে একবার সম্মান দেখানো উচিত বলে আমার মনে হয়েছিল।

বসুন, আপনার স্টীমারটি দৃষ্টির সামনে আসা থেকেই আমি মুগ্ধ হয়ে দেখছি। মনে হয় বেশ জোরে চলে। কত টনের?

স্মিথ বলল, আমাকে খানাতল্লাশ করুন যদি আমি জানি না, ওর ওজন কত। তবে ছোটে বেশ জোরেই, ব্যামলার ওর নাম। জলে চলার সময়ে ভেসে যাওয়া কোনো আবর্জনা ওকে স্পর্শ করে না। এই প্রথম আমি ওটায় চড়লাম। রাবার, লাল লঙ্কা আর বিপ্লব কোথায় জন্মায় দেখব বলে এই উপকূল বরাবর আমি পাড়ি জমিয়েছি। এখানে এত সুন্দর দৃশ্য থাকতে পারে আমার ধারণাই ছিল না। এই জঙ্গলে ভরা সরু গলার কাছে সেন্ট্রাল পার্ক লাগেই না, বাঁদর, নারিকেল আর তোতা তো এখান থেকেই রপ্তানী হয়, তাই না?

হ্যাঁ, ওসব এখানে প্রচুর আছে। আর সেন্ট্রাল পার্কের সঙ্গে তুলনায় আমাদের গাছপালা আর জন্তুজানোয়ারেরা প্রাইজ পাবে সে ব্যাপারেও আমি নিঃসন্দেহ।

তা হয়ত পাবে। আমি তো এখনো দেখিনি। তবে বুঝতে পারছি জানোয়ার আর গাছপালার

প্রশ্নে আমাদের আপনারা হারিয়ে দেবেন। আচ্ছা, এখানে কি বেশী লোকজন বেড়াতে আসে।

গেডি জিজ্ঞাসা করল, বেড়াতে আসে! আপনি বোধহয় স্টীমারে যাত্রী আসে কিনা বলছেন। না, কোরালিওতে কদাচিৎ দু-একজন অর্থ বিনিয়োগকারী নামে। তাও খুব কম। টুরিস্টরা এই উপকূল দিয়ে আরো দক্ষিণে যেখানে বন্দর আছে, সেই বড়ো শহরে যায়।

সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে স্মিথ বলল, ওই জাহাজটায় কলা বোঝাই হচ্ছে দেখা যাচ্ছে। ওই জাহাজে করে কোনো যাত্রী এসেছে কি?

কনসাল বলল, ওর নাম কার্লস্ফিন। বাউন্ডুলে জাহাজ ফল বয়ে নিয়ে যায়। গতবার নিউইয়র্ক গিয়েছিল। না, কোনো যাত্রী ওতে আসেনি। ওর নৌকা যখন তীরে আসে তখন কোনো যাত্রীকে ওতে আসতে দেখিনি। স্টীমার এলে দেখা, আর তাতে যদি যাত্রী থাকে, তবে সারা শহর ভেঙে পড়ে। এখানে অবসর বিনোদনের এই একটিই উত্তেজনার ব্যাপার আছে আমাদের। মিঃ স্মিথ, আপনি এখানে কিছুদিন থাকলে এখানকার কয়েকজন ব্যক্তির সঙ্গে আমি আপনার পরিচয় করিয়ে দেব। এখানে চার-পাঁচ জন আমেরিকান আছে যাদের সঙ্গে পরিচয় থাকা ভাল। আর স্থানীয় কিছু পদস্থ ব্যক্তিও আছে।

ধন্যবাদ, স্মিথ বলল, আমি আপনাকে কষ্ট দেব না। ওইসব ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচিত হবার ইচ্ছা থাকলেও আমি এখানে থাকছি না। একটু থেমে আবার বলল, আচ্ছা, সমুদ্রতীরের ঠাণ্ডা লোকটি একজন ডাক্তারের কথা বলছিল। বলতে পারেন কোথায় তাকে পাবো? ব্রডওয়ে হোটেলের মতো ব্যামলারে চলাফেরা করা সোজা নয়। অল্পবিস্তর সামুদ্রিক দুর্বলতা বোধ হয়ে থাকে কখনো কখনো। তাই ভাবছিলাম ডাক্তারের কাছে দু-এক মুঠো চিনির বড়ি আদায় করে নেব যদি কাজে লাগে।

কনসাল স্মিথকে বলল, ডাঃ গ্রেগকে আপনি হোটেলে পাবেন। কমলালেবুর গাছগুলির কাছে ওই যে ব্যালকনিওয়ালা দোতলা বাড়িটা দেখছেন ওটাই হোটেল।

হোলি সেপালকার সরণীর এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকা, পরিচিত বা অপরিচিত সকলেরই প্রায় পরিত্যক্ত, হোটেল দেলম ত্রসত্রান-জারোস ছিল একটি নিঃঝুম গাছপালা। একপাশে ছোট ছোট কমলালেবু গাছের ঝোপ, চারধারে নীচু পাথরের পাঁচিল, যা একজন লম্বা লোক অনায়াসে ডিঙিয়ে যেতে পারে। কাঁচা ইঁটের ওপর পলেস্তারা দেওয়া বাড়িটার সারা গায়ে নোনা বাতাস আর রৌদ্রের প্রভাবে নানা রঙের ছাপ। ওপরের ব্যালকনিতে ছিল একটি কেন্দ্রীয় দরজা, দুটি জানালায় ছিল কাঁচের পরিবর্তে চওড়া খড়খড়ি।

নীচের তলায় দু'পাশে দুটি দরজা। গলিপথ, পাথরের মেঝে। নীচের তলায় মালিকান মাদামা টিমোথিওরতিদ-এর পানশালার ছোট কার্বনঘরের পিছনে ব্রান্ডি, আনিসাডা বা স্কচ বোঁয়া আর অন্যান্য কমদামী বোতলের গায়ে কদাচিৎ আসা খরিদ্দারের হাতের আঙুলের ছাপ। অতিথিদের বাস করার জন্য ওপরতলায় চার-পাঁচটি কামরা। কদাচিৎ অতিথিরা তাতে বাস করত। কখনো হয়তো দালালের সঙ্গে আলোচনার জন্য বাগান থেকে ঘোড়ায় চড়ে এসে ফলের বাগিচার মালিক, একটি বিষণ্ণ রাত্রি ওই থমথমে হোটেলের ওপরতলায় কাটিয়ে গেছে। দপ্তরের কাজে এসে কখনো ছোটখাটো সরকারী কর্মচারী জাঁকজমকের বদলে মাদামার গোরস্থান-সুলভ আপ্যায়নে ভীত ও বিস্মিত হয়েছে। মাদামা কিন্তু বিনা ভাবনায় তাঁর মদের দোকানে বসে থাকতেন। ভাগ্যের সঙ্গে তাঁর কোন বিবাদ ছিল না। যদি কারো খাদ্য, পানীয় আর থাকার জায়গার দরকার থাকে তারা আসুক, তাদের তাই দেওয়া হবে। যদি কেউ না আসে না আসুক, এসতা বিউয়েনো, তাও ভালো।

সেই বিচিত্র ইয়টের মালিক যখন হোটেলের দিকে যাচ্ছিল, তখন সেই পোড়ো হোটেলের একমাত্র স্থায়ী বাসিন্দা ডাঃ গ্রেগ দরজায় বসে সমুদ্রের বাতাস সেবন করছিলেন।

পঞ্চাশ থেকে ষাট বছর বয়সী কোয়ারানটিন ডাক্তার ডাঃ গ্রেগ-এর মুখটা ছিল লাল, আর এত লম্বা দাড়ি টোপেকা থেকে টৈরা-ডেল-ফুয়েগো পর্যন্ত কারো ছিল না। তাঁর চাকরী দক্ষিণের কোন রাজ্যের স্বাস্থ্য বোর্ডের সৌজন্যে। দক্ষিণের সমুদ্র-বন্দরগুলির প্রাচীন শত্রু পীতজ্বরকে সেই

রাজ্য ভয় করত। প্রাথমিক লক্ষণের জন্য তাই ডাক্তার গ্রেগকে যারা কোরালিও ছেড়ে যাবে সেইসব নাবিক ও যাত্রীদের পরীক্ষা করতে হত। কাজ সামান্য হলেও তিনি যা বেতন পান তা কোরালিওর পক্ষে পর্যাপ্ত। তাছাড়া বিস্তর অবসর থাকায় এই সৎ ডাক্তার প্রাইভেট প্র্যাকটিস থেকেও কিছু আয় করেন। স্প্যানিশের দশটা শব্দ না জানলেও সেটা কোন বাধা ছিল না। নাড়ী দেখা আর ফি নেওয়ার জন্য ভাষাবিদ হবার প্রয়োজন নেই। ডাঃ গ্রেগ পরিচিত সকলকেই মস্তিষ্কের একটি অপারেশনের কাহিনী শোনাবার চেষ্টা করেন কিন্তু কোন শ্রোতাই তা শেষ পর্যন্ত শুনতো না। আর তিনি বিশ্বাস করতেন যে ব্রান্ডি একটি রোগ প্রতিষেধক।

ডাক্তার পাশের রাস্তাটিতে একটি চেয়ার টেনে এনেছিলেন। তাঁর গায়ে কোট ছিল না। দেয়ালের দিকে পিছন করে বসে ধূমপান করছিলেন আর দাড়িতে হাত বুলোচ্ছিলেন। সেইসময়ে বিচিত্র পোশাকে স্মিথকে দেখে তাঁর হালকা নীল চোখে বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠল।

স্মিথ তার টাইপিনের কুকুরের মাথাটিতে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, আপনিই তো ডাঃ গ্রেগ। কনস্টেবল মানে কনসাল আমাকে বলল যে আপনি এই পানশালায় থাকেন। আমার নাম স্মিথ, আমি একটা ইয়টে এসেছি। বাঁদর, আনারস, গাছ এই সব দেখতে দেখতে সমুদ্রে বেড়াচ্ছি। ভিতরে গিয়ে কিছু পান করা যাক, এই কাফের তো বেশ দুরবস্থা দেখছি। গলা ভিজোবার মতো কিছু পানীয় দিতে পারবে?

ডাঃ গ্রেগ তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বললেন, আমি সামান্য ব্রান্ডি চুমুক দিতে আপনার সঙ্গে যোগ দিতে পারি। এই আবহাওয়ায় ব্রান্ডি অনেক রোগ ঠেকিয়ে রাখে বলেই আমার বিশ্বাস।

বারে ঢুকতে যাবে এমন সময়ে সুতির সার্ট, ছেঁড়া লিনেনের ট্রাউজার আর চামড়ার বেল্ট পরনে স্থানীয় একটি লোক নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়ে স্প্যানিশ ভাষায় ডাক্তার গ্রেগকে কিছু বলল। উৎসাহ ও আন্তরিকভাবে সে অনেক কথা বললেও ডাঃ গ্রেগ কিন্তু তার একটি বর্ণও বুঝতে পারলেন না।

তার নাড়ী দেখে ডাঃ গ্রেগ জিজ্ঞেস করলেন, তোমার অসুখ?

সেই লোকটি তার নিজের ভাষায় বলল, মি জুহের এমতা এনপারমা এন লা কামা। যার অর্থ তার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে তাদের তালপাতা ছাওয়া কুটিরে পড়ে আছে।

কিছু না বুঝে ডাঃ গ্রেগ তাঁর প্যান্টের পকেট থেকে একমুঠো সাদা পাউডারে ভরা ক্যাপসুল বার করে তার থেকে গুনে গুনে দশটা তার হাতে দিয়ে তার তর্জনী আড়ম্বরের সঙ্গে তুলে ধরলেন।

ডাঃ গ্রেগ এবার বললেন, প্রতি দু'ঘণ্টা অন্তর একটা করে খাবে। এরপর নেটিভ লোকটির মুখের সামনে দুটি আঙুল দেখিয়ে জোরের সঙ্গে নাড়লেন।

তারপর নিজের ঘড়িটি বার করে ডায়ালের চারপাশে দু'বার আঙুল ঘুরিয়ে দেখিয়ে বললেন, দুই, দুই, দু-ঘণ্টা।

ভগ্ন গলায় লোকটি বলল, সে সেনিওর।

এবার একটি রূপোর ঘড়ি তার পকেট থেকে বের করে ডাক্তারের হাতে দিয়ে সামান্য ইংরেজিতে অতি কষ্টে লোকটি বলল, মি ব্রিঙ, আদার ওয়াচি টুমরো।

লোকটি ভগ্নহৃদয়ে ক্যাপসুলগুলো নিয়ে চলে গেলে ঘড়িটি পকেটে রাখতে রাখতে ডাঃ গ্রেগ স্মিথকে বললেন, মশায়, অত্যন্ত মুখ্যুর জাত। ও আমার চিকিৎসার নির্দেশকে ফি চাইছি মনে করেছে। অবশ্য ওর কাছে আমার পাওনা অনেক। আর দ্বিতীয় ঘড়িটি ও সম্ভবত আর আনবেই না। এদের দেওয়া কথায় মোটেই বিশ্বাস করা যায় না। হ্যাঁ, সেই ড্রিংকের কথা এবার, আচ্ছা মিঃ স্মিথ, কার্লসফিন ছাড়া আর কোনো জাহাজ আসার খবর তো আমি পাইনি। তবে আপনি কোরালিওতে এলেন কি করে?

সেই জনশূন্য বারে তারা আয়েশ করে বসে মাদামার রেখে যাওয়া কোনো আঙুলের দাগ না থাকা বোতল থেকে দু-চুমুক পান করার পর স্মিথ বলল, আপনি কি নিশ্চিত ডাক্তার, যে কার্লসফিন-এ করে কোনো যাত্রী আসেনি। এক বা দু'জন যাত্রী ছিল বলে আমি যেন সমুদ্রতীরে শুনলাম।

ওরা ভুল বলেছে, ডাক্তার বললেন, নিয়মমাফিক পরীক্ষা করার জন্য আমি নিজে গিয়েছিলাম কলার কাঁদি আজ বিকেলের মধ্যেই ভরা হয়ে যাবে আর কাল ভোর নাগাদ কার্লসফিন ফিরে যাবে। না মশায়, ওর কোন যাত্রী তালিকা ছিল না। তারপর খ্রিস্টার কেমন লাগল। গত মাসে একটি ফরাসী জাহাজ থেকে দু-নৌকো ওই জিনিস নেমেছে। যদি কোনো আমদানী শুল্ক আঞ্চুরিয়া সরকার এর জন্য পেয়ে থাকে তবে আপনি আমার টুপিটা নিয়ে যেঁতে পারেন। আপনি যদি আর না খান তবে আসুন বাইরে ঠাণ্ডায় একটু বসা যাক। আমরা নির্বাসিতরা বাইরের জগতের লোকের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ খুব একটা বেশী পাই না।

ডাক্তার আর একটা চেয়ার বাইরে টেনে আনার পর দু'জনে বসলে ডাক্তার গ্রেগ বললেন, আপনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। বহু জায়গায় ঘুরেছেন, আপনার অভিজ্ঞতাও অনেক। নীতি, দক্ষতা, ন্যায়বিচার ও পেশাগত সততার ব্যাপারে আপনার মতামত মূল্যবান। চিকিৎসার ইতিহাসে অভূতপূর্ব একটি কেসের বিবরণ যদি আপনি শোনেন আমি আনন্দিত হবো।

একটু থেমে ডাক্তার বলতে শুরু করলেন, আমি তখন আমার দেশের শহরে প্র্যাকটিশ করি। প্রায় ন'বছর আগেকার কথা সেটা। মাথার আঘাতের একটি কেসে আমাকে ডাকা হয়। আমি বুঝতে পারি হাড়ের একটি কুচি মস্তিষ্কের ওপর চাপ দিচ্ছিল আর তার জন্যে ট্রিপ্যানিং নামক একটি অপারেশন করা দরকার। রোগীটি ধনী এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠা থাকায় আমি মতামতের জন্য ডাকলাম ডাক্তার....

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বিনীত মার্জনার ভঙ্গীতে ডাক্তারের হাত ধরে স্মিথ বলল, বাঃ ডাক্তার, গল্পটা আমি আগাগোড়া শুনতে আগ্রহী। আমি জানি তার শুরুটা যেমন হয়েছে শেষটাও দারুণ হবে। আপনার আপত্তি না থাকলে বারন্নি ও ক্লিন অ্যাসোসিয়েশনের পরবর্তী মিটিংয়ে আমি গল্পটা বলতে চাই। কিন্তু আমাকে আমার কয়েকটা দরকারী কাজ এখনই সারতে হবে। কাজ সারা হবার পর সময় পেলে বাকিটা এসে শুনব, কেমন?

নিশ্চয়ই, আপনার কাজ সেরে আসুন, ডাক্তার বললেন, আমি অপেক্ষা করব আপনার জন্য। একবার ভেবে দেখুন, পরামর্শের জন্য যেসব বড়ো ডাক্তারকে ডাকা হয়েছিল তাদের একজন বলল একটি দলার জন্যেই না কি এই উৎসর্গ। আর একজন বলল, ফোড়া আর আমি আগাগোড়া....

তাকে থামিয়ে দিয়ে স্মিথ বলল, এখন বলবেন না ডাক্তার। গল্পটা জমছে না। আমি ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, আমি সমস্তটা শুনতে চাই, কেমন?

অ্যাপোলোর ঘরে ফেরা ঘোড়াগুলির মাঝামাঝি কদমের পদক্ষেপ ধারণ করার জন্য পাহাড়েরা তাদের প্রশস্ত স্কন্ধ দেশ বাড়িয়ে দিল। যেখানে নীল কাঁকড়ার দল তাদের রাত্রিকালের ভ্রমণের জন্য বেরুতে শুরু করেছিল, সেই নীচের হ্রদ, কলার ঝোপে আর সুন্দরীর জলায় দিনাবসান হচ্ছিল। সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের মাথায়ও অবশেষে দিনের শেষ হল। তারপর মথের ওড়ার মতো ক্ষণিক সময়ের জন্য গোধূলি এলো আর শেষ হলো। সাউদার্ন ক্রশ অর্থাৎ দক্ষিণ গোলার্ধে দৃশ্য তারামণ্ডল তার সবচেয়ে উঁচু চোখ তুলে পাম গাছের মাথার ওপর দিয়ে উঁকি দিল, জোনাকিরা তাদের মশাল জ্বালিয়ে কোমল পায়ে নেমে আসা রাত্রির আগমন ঘোষণা করল।

দূরে নোঙর করা কার্লসফিন দুলছিল, ফলে তার বাতিগুলির অসংখ্য প্রতিবিম্ব কেঁপে কেঁপে জল ভেদ করে গহন গভীরে নেমে গিয়েছে। এদিকে ক্যারিবীয় শ্রমিকেরা বড় বড় নৌকায় করে ফলের রাশি বয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে ব্যস্ত।

স্মিথ একটি নারিকেল গাছে হেলান দিয়ে বালুবেলায় বসে স্টীমারের দিক থেকে চোখ না সরিয়ে কিছু একটার প্রতীক্ষা করছিল। তার চারিদিকে অনেকগুলি সিগারের টুকরো ছড়ানো। বৈষম্যের প্রতিকৃতি ইয়টের মালিক তার সমস্ত কৌতূহল নির্দোষ ফলের জাহাজটির ওপর ন্যস্ত করে রেখেছে। দু'বার সে শুনেছে কোরালিওতে কোনো যাত্রী নামেনি। তবুও একজন অলস ভ্রমণকারীর পক্ষে বেমানান একাগ্রতা নিয়ে, সে মামলাটির আপীল নিজের চক্ষু কর্ণের ওপর বিচারের জন্য দায়ের করেছে। সে বিচিত্র গাত্রবর্ণের একটি গিরগিটির মতো নারিকেল গাছের তলায় ঝুঁকে বসে ওই প্রাণীটির সদৃশ পুঁতির মতো ঘূর্ণায়মান চোখে কার্লসফিনের ওপর তার

গুপ্তচরবৃত্তি চালিয়ে যাচ্ছিল।

সাদা পোশাকের একটি নাবিক সাদা বালুর ওপর সাদা ডিঙ্গিটি পাহারা দিচ্ছিল। তার অল্প দূরে তীর বরাবর রাস্তা কালেগ্রানদ-এর একটি পানশালায়, বাকি তিনজন নাবিক কোরালিওর একমাত্র বিলিয়ার্ড টেবিলের চারপাশে ঘুরছিল। আবহাওয়া যেন উচ্চকিত, যেন কিছু ঘটবে, এমন প্রত্যাশা যা কোরালিওর বাতাসে ছিল অভিনব।

আকাশে ভেসে যাওয়া উজ্জ্বল রঙিন পালকের পাখির মতো স্মিথ এই তালগাছে ঘেরা উপকূলে এসে নামে, ঠোঁট দিয়ে তার পাখা পরিষ্কার করে নিয়ে, নিঃশব্দে আবার উড়ে চলে যায়। সকাল হলে দেখা গেল স্মিথ নেই, অপেক্ষমান ডিঙ্গি নেই, ইয়ট নেই। স্মিথ যেমন তার আগমনের উদ্দেশ্য জানায়নি তেমনি এমন কোনো চিহ্ন রেখে যায়নি যা থেকে বোঝা যাবে কোরালিওর বালুর ওপরে তার পদক্ষেপ কোন রহস্যের পিছনে ছুটেছিল। সে এসেছিল, পীচের রাস্তা ও রেস্তোরাঁর প্রচলিত ভাষায় কথা বলেছিল, নারকেল গাছের নীচে বসেছিল আর তারপর অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। স্মিথবিহীন কোরালিও পরদিন প্রাতরাশে কাঁচকলা ভাজা খেতে খেতে বলেছিল ছবির মতো পোশাক পরা লোকটি চলে গেছে। ঘটনাটি দুপুরের ঘুমের সঙ্গে সঙ্গে একবার হাই তুলে ইতিহাসের ভিতরে হারিয়ে গেল।

স্মিথ আর কোনোদিন কোরালিওতে ফিরে আসেনি। ডাঃ গ্রেগ-এর কাছেও নয়। যিনি তাঁর নিঃসঙ্গ শ্রোতাকে সেই উদ্দীপনাময় ট্রিপ্যানিং আর রেষারেষির কাহিনী শোনাবার জন্য বৃথাই বসে থাকেন তার ফালতু দাড়ি নাড়তে নাড়তে। কিন্তু এই আলগা পাতাগুলির স্বচ্ছ বর্ণনার বাড়বাড়ন্ত হোক, স্মিথ আবার তার ডানা ঝাপটাবে তাদের মধ্যে। সেই রাত্রিতে কেন সে অতগুলি চুরুটের টুকরো নারকেল গাছের চারপাশে ছড়িয়েছিল যথাসময়ে সে এসে তা বলবে। তাকে এ কাজ করতেই হবে। কেন না, ভোরের আগে সে যখন চলে যায় তখন সে তার সঙ্গে নিয়ে যায় একটি ধাঁধার উত্তর যা এমনই গুরুভার ও অসম্ভব যে আঞ্চুরিয়াতে কেউই সেই উত্তরটি কল্পনা করতেও সাহস করেনি।

চার

ধরা পড়া

পলায়মান প্রেসিডেন্ট মিরাফ্লোরেস ও তাঁর সঙ্গিনীকে আটক করার পরিকল্পনা বিফল হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। আলাজান বন্দরে যথাযথ পাহারার ব্যবস্থা করতে ডাঃ জাভাল্লা নিজে সেখানে গিয়েছেন। লিবারেল দেশপ্রেমিক ভ্যারাস-এর ওপর সলিটাস-এর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আর গুডউইন নিজে কোরালিও ও তার আশপাশের সমস্ত জেলার দায়িত্ব নিয়েছে।

উপকূলের শহরগুলিতে ক্ষমতায় আসতে আগ্রহী রাজনৈতিক দলের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সদস্য ছাড়া অন্য কাউকে প্রেসিডেন্টের পলায়নের খবর জানানো হয়নি। জাভাল্লার একজন অনুচর পাহাড়ের রাস্তা ধরে সানমাটেও থেকে সমুদ্রতীর পর্যন্ত টেলিগ্রাফের তার কেটে রেখে এসেছে। এই তারগুলি মেরামত হওয়ার পর রাজধানী থেকে খবর এসে পৌঁছানোর অনেক আগেই পলায়ন ও গ্রেপ্তারের মীমাংসা হয়ে যাবে।

মিরাফ্লোরেস গোপনে সমুদ্রের তীরে কোনো নৌকো বা ডিঙ্গি জোগাড় করে জলে ভাসার চেষ্টা যাতে না করতে পারেন তার জন্য গুডউইন কোরালিওর দুই পার্শ্বে উপকূল বরাবর এক মাইল অঞ্চলে সশস্ত্র পাহারা বসিয়ে তাদের প্রতি কড়া নজর রাখার নির্দেশ দিয়েছে। পলায়মান ব্যক্তির শহরে আবির্ভাব ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে আটক করার জন্য একডজন রক্ষী কোরালিওর রাস্তায় সন্দেহ বাঁচিয়ে টহল দিতে লাগল। সকল প্রকার সাবধানতা নেওয়া হয়েছে বলে গুডউইন নিঃসন্দেহ হল। বব ইঙ্গলহার্টের নির্দেশ মতো এই চৌকিদারীতে ব্যক্তিগতভাবে অংশ নিতে গুডউইন নিজে ঘাসে ঢাকা গলির মতো সরু সরু কিন্তু গালভরা নামধারী রাস্তাগুলিতে ঘুরে বেড়াত।

সান্ধ্য প্রমোদযাপনের ইবদুষ্ক অধ্যায়টিতে শহরটি ব্যস্ত ছিল, সাদা ডাক্-এর পোশাক, ঝুলন্ত নেকটাই আর সরু বাঁশের ছড়ি দুলিয়ে, দু-একজন অলস ফুলবাবু, ঘাসে ছাওয়া গলিপথে তাদের

পছন্দমত সেনিওরিটাদের বাড়িতে যাচ্ছিল। সংগীত সাধনাকারীরা, গোঙানীর সুরে কনসার্টিনা বাজিয়ে চলেছে। কেউ আবার দরজা বা জানালায় বসে হাতের ছোঁয়ায় গীটারের বিষণ্ন সুর বাজিয়ে যাচ্ছে। লম্বা বন্দুক বর্শার মতো এক হাতে দোলাতে দোলাতে কখনও দু-একজন সৈনিক ব্যারাক থেকে বেরিয়ে দ্রুত পায়ে চলে যাচ্ছে। শহরের বাইরে যেখানে গলিপথগুলি জঙ্গলে মিশে নিশ্চিহ্ন হয়েছে সেখানে খাদ্যসংগ্রহের জন্য বেবুনের দল গলায় ঘড়ঘড় আওয়াজ করে আর মসীকৃষ্ণ খাড়িতে কুমীরের কাশির শব্দে জঙ্গলের স্তব্ধতা বিদীর্ণ করছিল।

রাস্তাগুলি রাত্রি দশটার মধ্যে জনশূন্য হয়ে পড়ে। কোন মিতব্যয়ী নগরকর্মী, যে কয়টি তেলের প্রদীপ রাস্তার কোণে কোণে জ্বলছিল, সেগুলো নিভিয়ে দিয়েছে। হরণকারীদের কোলের মধ্যে ঘুমানো চুরি করা শিশুর মতো, কোরালিও, একদিকে ঝুঁকে পড়া পাহাড় আর অন্যদিকে এগিয়ে আসা সমুদ্রের মধ্যে শান্তভাবে ঘুমোচ্ছিল। উষ্ণমণ্ডলের এই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে হয়ত পলিমাটির নিম্নভূমির বিস্তীর্ণ প্রান্তরের কোন ক্ষীণ সূত্র ধরে সেই মহৎ দুঃসাহসী আর তার সঙ্গিনী ভূমির শেষপ্রান্তে আসার চেষ্টা করছে। ফকস ইন দি মরনিং-এর খেলা শীঘ্র শেষ হতে চলেছে। মিলিটারীর দল যেখানে ঘুমোচ্ছিল সেই দীর্ঘ নীচু ব্যারাকের পাশ দিয়ে গুডউইন ধীর পদক্ষেপে যাচ্ছিল। রাত্রি ন'টার পর কোনো অসামরিক ব্যক্তির সামরিক ঘাঁটির কাছে আসা নিষিদ্ধ হলেও গুডউইন প্রায়ই সে সব ভুলে যেত।

এইসময় প্রহরী তার প্রকাণ্ড মাসকেট সামলাতে সামলাতে চিৎকার করে ওঠে, কিউয়েন ভিভে।

না থেমে গুডউইন চিৎকার করে বলল, আমেরিকানো। তারপর প্রথমে ডানদিকে পরে বাঁদিকে যে পথটা প্লাজা নাশিওনাল-এ গিয়েছে সেদিকে চলে গেল।

হোলি সেপালকার সড়কটির কাছে এসে সে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। গুডউইন দেখতে পেল কালো পোশাক পরিহিত, দীর্ঘকায় এক ব্যক্তি, মস্তো একটা ব্যাগ হাতে নিয়ে, সমুদ্রতীরের দিকে তাড়াতাড়ি হেঁটে যাচ্ছে। গুডউইন দেখতে পেল, পুরুষটির কনুই-এর পাশে থেকে একজন স্ত্রীলোক তাকে নিঃশব্দ ও দ্রুত গমনে এগিয়ে যেতে সহায়তা করছে। এরা দু'জন কোরালিওর বাসিন্দা নয়।

গুডউইন তাদের অনুসরণ করতে লাগল। সে নিজেকে আঞ্চুরিয়ার জনগণের প্রতিনিধি মনে করে। রাজনৈতিক কারণ না থাকলে সে তক্ষুণি তাদের সামনে গিয়ে টাকাগুলি দাবী করত। তাদের নীতি ছিল বিনা বাধায়, বিনা রক্তপাতে বিপন্ন অর্থকোষ ফিরে পেয়ে তা জাতীয় তহবিলে ফেরত দেওয়া এবং নিজেদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা। হোটেল দে লোস এসত্রাসজারোস-এর দুয়ারে এসে নরনারী দু'জন থেমে গেল। পুরুষটি অধৈর্য সহকারে দরজায় ধাক্কা দিল। মাদামার সাড়া না পাওয়া গেলেও অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আলো জ্বলে উঠে দরজা খুললে আগন্তুক দু'জন ভিতরে চলে গেল।

গুডউইন একটি সিগার ধরিয়ে নিস্তব্ধ রাস্তায় অপেক্ষা করতে লাগল। কয়েক মিনিটের মধ্যে সে দেখল ওপরতলার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে ক্ষীণ একটা আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে।

গুডউইন নিজের মনেই বলল, ওরা ঘর ভাড়া নিল। তার মানে ওদের সমুদ্র যাত্রার ব্যবস্থা এখনো ঠিক হয়নি।

এইসময় এসতেবান দেলগাদো নামের একজন নাপিত সেখানে এসে একই আদর্শের পথিক ভ্রাতা হিসাবে গুডউইনকে অভিবাদন করল। যে কোন প্রকার স্থিতাবস্থার বিপক্ষে উৎফুল্ল চক্রান্তকারী এই নাপিতটি চলতি সরকারের শত্রু। কোরালিওর সবচেয়ে বিষণ্ন সারমেয় এই ক্ষৌরকার প্রায়ই রাত্রি এগারটা পর্যন্ত বাইরে থাকে।

উগ্র লিবারেল এসতেবান গুডউইনকে বলল, ভাবেন কি, ডনফ্রাঙ্ক? আজ আমি দাড়ি কামিয়েছি লা বারবা আপনারা কি যেন বলেন—হুইসকার—এই দেশের প্রেসিডেন্টের হুইসকার, ভেবে দেখুন একবার। এই সেনিওর প্রেসিডেন্ট নিজেকে বেমালুম গোপন করতে চাইছেন। মনে হল কেউ তাঁকে চিনতে পারুক তা তিনি চান না—কিন্তু ক্যারাজো—মুখের দিকে না তাকিয়ে কেউ কি দাড়ি কামাতে পারে? উনি এই সোনার টাকাটি আমাকে দিয়ে চুপচাপ থাকতে বলেছেন।

এর মধ্যে কোনো ব্যাপার আছে বলে আমার মনে হয় ডনফ্রাঙ্ক।

তুমি কি প্রেসিডেন্ট মিরাফ্লোরেসকে কখনো দেখেছ?

গুডউইন-এর প্রশ্নের জবাবে এসতেবান বলে, একবার মাত্র, তিনি বেশ লম্বা, গালের জুলপী ইয়া চওড়া, কালো।

তুমি কামানোর সময় সেখানে আর কাউকে দেখেছ?

ওই বাড়ীরই লোক একজন বৃদ্ধা রেড ইন্ডিয়ান, আর একজন সেনিওরিটা, সম্ভ্রান্ত মহিলা, হে ভগবান, কি দারুণ সুন্দরী!

ঠিক আছে এসতেবান। খুব আনন্দের কথা তুমি এই কেশবিন্যাসের খবরটি দিলে। এরজন্য আগামী সরকার তোমার কথা মনে রাখবে।

এরপর গুডউইন অল্প কথায় এসেতেবানকে দেশের সঙ্গীন পরিস্থিতির কথা বুঝিয়ে দিয়ে, বাইরে থেকে হোটেলের দুই পাশের দুটি রাস্তার দিকে নজর রেখে, হোটেলের কোনো দরজা বা জানালা দিয়ে কেউ বাইরে যাবার চেষ্টা করছে কিনা লক্ষ্য করতে নির্দেশ দিল।

তারপর যে দরজা দিয়ে অতিথিরা ভিতরে গিয়েছে, সেই দরজা খুলে গুডউইন ভিতরে প্রবেশ করল।

এদিকে মাদামা ততক্ষণে তাঁর অতিথিদের আরামের ব্যবস্থা করতে উপর থেকে নীচে নেমে এসেছেন। বারের ওপর বাতি রেখে বিশ্রাম বিঘ্নিত হওয়ার জন্য এক থিমবল্ রাম সবে পান করতে যাবেন, সেইসময় গুডউইনকে প্রবেশ করতে দেখে বললেন, আহা, সেনিওর গুডউইন। কতদিন পরে গরীবের বাড়ীতে পায়ের ধুলো দিলেন।

গুডউইন সুলভ হাসি হেসে বলল, হ্যাঁ, এবার থেকে আরো ঘন ঘন আসতে হবে। আপনার কেনিয়াক শুনেছি উত্তরে বেলিজ থেকে দক্ষিণে রিও পর্যন্ত সবার সেরা। তার প্রমাণের জন্য আনুন একটা বোতল দু'জনের জন্য, উন ভাসিতো একটি বড়ো মাপের।

গর্বের সঙ্গে মাদামা বললেন, আমার আগুয়ার দিয়েন্তে, সবার সেরা। এ জিনিস কলাগাছের অন্ধকার ঝোপে সুন্দর বোতলে জন্মায়। হ্যাঁ সেনিওর, নাবিকেরা কেবলমাত্র মধ্যরাত্রে এদের তুলে আনে, দিনের আলো ফোটার আগে আপনার বাড়ীর পিছনের দরজায়। ভালো আগুয়ার দিয়েন্তে এমন এক ফল যাকে খুব কঠিন হাতে সামলাতে হয়।

প্রতিযোগিতার বদলে, কোরালিওতে ব্যবসার মূল সূত্র ছিল চোরা চালান। এই কারবার সাফল্যের সঙ্গে নিষ্পন্ন হলে এরা সেই কথা একধরনের অহঙ্কার মেশানো ধূর্ততার সঙ্গে বলত।

কাউন্টারের ওপর একটি রূপোর ডলার রেখে গুডউইন বলল, আপনার বাড়ীতে আজ অতিথি এসেছে?

মাদামা খুচরো গুনতে গুনতে বললেন, দু'জন, সবেমাত্র এসেছে। একজন সেনিওর ও একজন সুন্দরী সেনিওরিটা। ন্যুমেরো নয় আর ন্যুমেরো দশ নং ঘরে তারা উঠে গেছে।

ওই দু'জনের আসার প্রতীক্ষায় ছিলাম। ওদের সঙ্গে আমার একটা বিশেষ দরকারী আলোচনা আছে। আপনি কি আমাকে উপরে উঠে দেখা করতে দেবেন?

একটি দীর্ঘশ্বাস চেপে শান্তভাবে মাদামা বললেন, অবশ্যই, সেনিওর গুডউইন, তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করার জন্য কেন উপরে উঠবেন না।

গুডউইন, সবসময় তার কাছে রাখা, একটি আমেরিকান রিভলবার কোটের পকেটের ভিতর আলগা করে, অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল। দোতলার একটি বাতি জ্বলার ফলে কামরা চিনতে অসুবিধা হল না। নয় নম্বর কামরার দরজার তালা ঘোরালে দরজা খুলে গেল। কামরার ভিতরে ঢুকে গুডউইন দরজা বন্ধ করে দিল। দীন হীন আসবাবের মধ্যে টেবিলের এক কোণে বসে থাকা ইসাবেল গিলবার্টকে দেখে গুডউইনের মনে হল সংবাদ ওর সৌন্দর্যের যথাযথ বিবরণ দিতে ব্যর্থ হয়েছে। একটি হাতের ওপর মাথা রেখে ও বসেছিল। শরীরের প্রতিটি রেখায় অপরিসীম ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ইতিহাসের সমস্ত হৃদয়েশ্বরীদের মতো একই ছাঁদের চোখের তারা ধূসর বর্ণের। তার সাদা অংশ পরিষ্কার আর উজ্জ্বল, চোখের মণির ওপর সমান্তরাল ভারী পক্ষ দিয়ে ঢাকা যার নীচে তুষার শুভ্র রেখা দেখা যাচ্ছিল। গুডউইনকে প্রবেশ করতে দেখে

সে নির্ভয়ে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল।

গুডউইনের দুই আঙুলের ফাঁকে একটি চুরুট জ্বলছিল। গুডউইন স্ত্রীলোকটির পূর্ব ইতিহাস যা জানত তাতে প্রচলিত আদব-কায়দায় কোনো স্থান ছিল না। তাছাড়া সে আরও জানত মিস গিলবার্ট বাহুল্য পছন্দ করেন না।

গুডউইন নিজের প্রথাগত চেষ্টাকৃত স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে টুপি খুলে টেবিলের এক কোণে বসে বলল, গুড ইভনিং, একটু থেমে আবার শুরু করল, দেখুন ম্যাডাম, সরাসরি কাজের কথায় আসি। আমি কোনো নাম উল্লেখ করছি না, আপনি দেখবেন, কিন্তু পাশের কামরায় কে আছেন এবং তার ব্যাগে কি আছে তা আমি জানি। আমার এখানে আসার কারণ সেই ব্যাপারেই। আমি আত্মসমর্পণের শর্ত জানাতে এসেছি।

মহিলাটি কিছু না বলে স্থির দৃষ্টিতে গুডউইনের হাতের চুরুটের দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

গুডউইন চিন্তিতভাবে তার বাকদিকনের জুতোর ওপর চোখ রেখে বলে চলে, আমি জনতার একটা বিরাট অংশের হয়ে বলছি, আমরা চাই, তাদের চুরি করা অর্থ তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হোক। আমাদের শর্তগুলি এর থেকে বেশী কিছু নয়, সেগুলি খুবই সরল। আমাদের শর্তগুলি পালিত হলে নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে আমি কথা দিচ্ছি, আমরা বেশী বাধার সৃষ্টি করব না, অর্থ ফিরিয়ে দিয়ে আপনারা আপনাদের খুশীমত জায়গায় চলে যান। যে জাহাজ আপনারা পছন্দ করবেন সেই জাহাজে জায়গা করে দেবার জন্য প্রকৃতপক্ষে আপনাদের সাহায্য করা হবে। আর নিতান্ত আমার ব্যক্তিগত দায়িত্বে দশ নম্বরের ভদ্রলোককে আমি তাঁর স্ত্রী-সৌন্দর্যের সুরুচির জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি। চুরুট মুখে ফিরিয়ে আনতে গিয়ে গুডউইন লক্ষ্য করল তার চুরুটের ওপর মেয়েটির চোখ নিবদ্ধ ছিল। সে আরও বুঝতে পারল তার কোন কথাই মেয়েটির কানে যায়নি। গুডউইন চুরুটটি জানালার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সকৌতুকে হেসে টেবিল থেকে নেমে দাঁড়াল।

গুডউইন চুরুট ফেলে দিলে মহিলাটি বলল, এবার ঠিক হয়েছে, এখন আমার পক্ষে আপনার কথা শোনা সম্ভব। আর সদাচারের আর একটি শিক্ষা যদি নেন তাহলে কার দ্বারা আমি এভাবে অপমানিত হচ্ছি আপনি বলতে পারেন?

এক হাত টেবিলে রেখে গুডউইন বলল, আমার হাতে সময় এতই কম যে শিষ্টাচারের পাঠ নেওয়া সম্ভব হবে না বলে আমি দুঃখিত। শুনুন, আপনার শুভবুদ্ধির কাছে আমার একটি আবেদন আছে। নিজের সুবিধার ব্যাপারে আপনি বেশ সচেতন একথা আপনি অনেকবার প্রমাণ করেছেন। এখন এই অবস্থায় আর বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে। এর মধ্যে রহস্য কিছু নেই। আমি টাকার জন্য এসেছি, আমার নাম ফ্রাঙ্ক গুডউইন। ঘরে আমি আন্দাজে ঢুকেছি না হলে এতক্ষণে আমি টাকা পেয়ে যেতাম। দশ নম্বর কামরায় ভদ্রলোক তাঁর ওপর ন্যস্ত বিরাট এক বিশ্বাস ভঙ্গ করেছেন। তিনি তাঁর দেশবাসীর থেকে এক বিরাট অঙ্কের অর্থ ডাকাতি করে নিয়েছেন। আমি এই টাকা তাদের হারাতে দেব না। ওই ভদ্রলোককে আমি তা বলব না। কিন্তু আমাকে যদি জোর করে তাঁকে দেখতে হয় আর তিনি যদি রিপাবলিকের মস্ত বড়ো একজন কর্তাব্যক্তি হয়ে পড়েন তাহলে আমাকে আমার কর্তব্য করতে গিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করতে হবে। বাড়ীর ওপর পাহারা রাখা হয়েছে। পাশের ঘরের ভদ্রলোকের সঙ্গে আলোচনা না করলে নয় এমন নয়। আমি খুব উদার শর্ত দিচ্ছি। টাকার ব্যাগটা পেয়ে গেলেই এই ব্যাপারে ছেদ টেনে দেব।

মহিলাটি তাঁর আসন থেকে উঠে কিছুক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা করে বলে উঠল, আপনি এখানে থাকেন, মিঃ গুডউইন?

হ্যাঁ।

কোন ক্ষমতার বলে আপনি আমাদের ওপর চড়াও হয়েছেন?

আমি রিপাবলিকের একজন প্রতিনিধি, দশ নম্বর কামরার ভদ্রলোকের কথা আমাকে টেলিগ্রাম করে জানানো হয়েছিল।

আমি কি আপনাকে দু-তিনটে প্রশ্ন করতে পারি? কাপুরুষতার চেয়ে সত্যভাষণ আপনার পক্ষে সহজ বলে আমি বিশ্বাস করি। এটা কি ধরনের শহর, কোরালিও-ই তো এর নাম, তাই

না?

গুডউইন হেসে বলল, বলবার মতো শহর এটা নয়। কলার শহর যেমন হয় সেরকম। খড়ের কুঁড়ে। কাঁচা ইঁটের বাড়ী, পাঁচ ছটি দোতলা দালান, থাকার জায়গা খুবই কম। বাসিন্দারা দো-আঁশলা স্প্যানিশ, রেড ইন্ডিয়ান, ক্যারবীয় আর নিগ্রো। বেড়াবার রাস্তা নেই, নেই কোন আমোদ প্রমোদ। এদের নীতিবোধটাও কিছুটা আলগা, এই আর কি!

সামাজিক বা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এখানে বাস করার কোনো প্রেরণা আছে কি?

মহিলার প্রশ্নের উত্তরে গুডউইন হেসে উঠে বলল, অবশ্যই আছে। এখানে বিকালের চায়ের আসর নেই, হাত অরগ্যান বা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর নেই আর বহিষ্কারের সনদ নেই কোন দেশের সঙ্গে।

সামান্য ভ্রূকুটি করে কিছুটা নিজের মনেই মেয়েটি বলে, উনি বলেছিলেন, যে এই সব উপকূলে সুন্দর আর বড়োসড়ো শহর আছে, উনি এও বলেছিলেন যে সহজ সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে বিশেষ করে শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান আমেরিকানদের কলোনি এসব জায়গায় আছে।

গুডউইন বিস্মিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলল, আমেরিকানদের একটি কলোনি এবং তাতে ভালো লোক কিছু নিশ্চয় আছে। আইনের হাত থেকে বাঁচবার জন্য কয়েকজন দেশত্যাগী, পলাতক দু'জন ব্যাঙ্ক প্রেসিডেন্ট, ধোঁয়াটে অতীতের সেনা বিভাগের একজন খাজাঞ্চি, সেঁকো বিষের সন্দেহ করা একজন বিধবা আছে। আর আছি আমি, যদিও বিশেষ কোন অপরাধ করে বিখ্যাত হয়ে ওঠা হয়নি।

আশা ছাড়বেন না। আপনার আজকের আচরণের পরে আর আপনার অজ্ঞাত থাকার কোন নিশ্চয়তা আছে বলে মনে হয় না। মেয়েটি আরও বলে কোথাও একটা ভুল হয়েছে, কিন্তু সেটা যে কোথায় হয়েছে সেটাই বুঝতে পারছি না। আজ রাত্রে ওঁকে আর বিরক্ত করবেন না। পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে জামাকাপড় পরেই উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। আপনার টাকা চুরি করার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। চামড়ার ব্যাগটা আমি নিয়ে আসছি, আপনি যেখানে আছেন সেখানেই থাকুন।

দুটি কামরার মাঝখানের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে মেয়েটি গুডউইনের দিকে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রহস্যময় হেসে বলল, দরজা ঠেলে আমার ঘরে ঢুকে আপনি ইতরের মতো ব্যবহারের পরে নিন্দনীয় অভিযোগ করেন—দ্বিধায় পড়ে কথাটা শেষ না করেই মেয়েটি চুপ করে যায়। নিজের মনে কিছু চিন্তা করে নিয়ে আবার বলল, ব্যাপারটা আমার কাছে খানিকটা ধাঁধার মতো লাগছে। নিশ্চয়ই কোথাও একটা ভুল হয়েছে।

এই বলে মেয়েটি দরজার দিকে এগোলে ওর হাত মৃদু আকর্ষণ করে গুডউইন ওকে থামিয়ে দিল।

গুডউইন ছিল ভাইকিংদের মতো পুরুষ। লম্বা চওড়া সুদর্শন আর সময় যোদ্ধৃভাব। রাস্তায় চলার সময় মেয়েরা তার দিকে বারবার ফিরে তাকায়। মেয়েটির রং, ওর মেজাজ অনুসারে, শ্যামল, গর্বিত, উজ্জ্বল বা পাণ্ডুর। গুডউইন নিশ্চয়ই নিয়তির প্রথম যন্ত্রণা কিছুটা অনুভব করেছিল, কারণ মেয়েটির সামনে দাঁড়াবার পর থেকেই ওর সম্বন্ধে প্রচলিত জনশ্রুতি তাঁর কাছে তিক্ত লাগছিল।

এইসময় তীব্রস্বরে গুডউইন বলল, ভুল কোথাও হলে তা আপনার হয়েছে। আমি যতটা দোষ আপনাকে দিই ততটা দোষ তাকে দিই না যে তার দেশ, সম্মান তার সান্ত্বনা স্বরূপ চুরি করা সম্পদ হারাতে চলেছে। ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, এই অবস্থায় সে কেমন করে পৌঁছাল আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি। তার জন্য আমার অনুকম্পা হচ্ছে, আপনাদের মতো স্ত্রীলোকদের জন্যই এই হতচ্ছাড়া সমুদ্র উপকূলে যত হতভাগারা দেশান্তরী হয়ে আসে, যারা মানুষকে তুলিয়ে দেয় তাদের উপর ন্যস্ত বিশ্বাস, যা টেনে আনে।

হতাশার ভঙ্গী করে গুডউইনের কথা শেষ না করতে দিয়ে মেয়েটি বলে ওঠে আপনার আর অপমান করার প্রয়োজন নেই। আপনি কি বলছেন আমি বুঝতে পারছি না। পাগলের মতো কত আজগুবি ভুল যে করছেন আপনি জানেন না। একজন ভদ্রলোকের পোর্ট ম্যানটোর ভিতরে কি আছে দেখলে যদি আপনার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় তো আমি তা এক্ষুণি দেখিয়ে দিতে চাই।

নিঃশব্দে দ্রুত পায়ে পাশের ঘরে গিয়ে চামড়ার ব্যাগটা সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে এসে শান্ত ঘৃণার সঙ্গে

মেয়েটি তা গুডউইনের হাতে তুলে দিল। গুডউইন সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগটি টেবিলের উপর তুলে স্ট্র্যাপগুলি খুলতে লাগলে মেয়েটি মুখে অসীম ঘৃণা ও বিরক্তি প্রকাশ করে পাশে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে।

গুডউইন পাশ থেকে চাপ দিয়ে ব্যাগটি খুলে ফেললে প্রথমে তার থেকে দু তিনটি পোশাক বার হবার পর বাণ্ডিল বাণ্ডিল, বেশী মূল্যের আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্ক আর ট্রেজারীর নোট বার হল। কাগজের ব্যান্ড দিয়ে বাঁধা নোটগুলোর উপর লেখা মোটা অঙ্ক অনুযায়ী হিসাব করে গুডউইন দেখল প্রায় এক লক্ষ ডলার রয়েছে।

গুডউইন চকিতে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দেখে, মেয়েটি বাস্তবিক একটা ধাক্কা খেয়েছে। হঠাৎই একটা আনন্দের শিহরণ তার মধ্যে দিয়ে বয়ে গেল। মেয়েটি অবসন্ন ভাবে টেবিলের গায়ে শরীরের ভার রেখে হাঁফাচ্ছে, আর চোখ দুটি বড়ো হয়ে উঠেছে। এতে গুউইন বুঝতে পারল যে মেয়েটি জানত না, ওর সঙ্গী সরকারী অর্থকোষ লুঠ করেছে।

গুডউইন রাগত ভাবে নিজের মনেই নিজেকে প্রশ্ন করে, কেন আমি এই নীতিহীন, ঘুরে বেড়ানো গায়িকাটির সম্বন্ধে যতটা প্রচার করা হয়েছিল ও ততটা খারাপ নয় ভেবে খুশি হচ্ছি।

এই সময় অপর কামরায় একটা শব্দ হতে দুজনে চমকে উঠে তাকিয়ে দেখল একজন দীর্ঘদেহী বর্ষীয়ান গাঢ় গাত্রবর্ণের সদ্য ক্ষৌর করা ব্যক্তি দরজা খুলে দ্রুত তাদের কামরায় প্রবেশ করল।

প্রেসিডেন্ট সিরাক্লোরেসের যত্নে সাজানো ঘন কৃষ্ণবর্ণের জুলপী তাঁর সব ছবিতেই দেখা গেলেও নাপিত এসতেবান-এর কাহিনী গুডউইনকে নতুন কিছু দেখার ব্যাপারে প্রস্তুত রেখেছিল।

বাতির ঔজ্জ্বল্যে তার নিদ্রায় ভারি চোখ পিটপিট করতে করতে সেই ব্যক্তি প্রায় হুমড়ি খেয়ে এই ঘরে এসে পরিষ্কার ইংরেজিতে বললেন, এর মানে কি ডাকাতি?

প্রায় তারই কাছাকাছি। কিন্তু প্রায় ঠিক সময়ে এসে পড়ে সেটা আটকাতে পেরেছি বলেই আমার মনে হচ্ছে। গুডউইন আরও বলল, আমি সেই সব লোকের প্রতিনিধিত্ব করছি যারা এই অর্থের মালিক। আমি তাদের সেই টাকা ফিরিয়ে দিতে চাই বলে এসেছি। কথা বলতে বলতে গুডউইন নিজের আলগা লিনেনের কোটের পকেটে হাত রাখে।

অপর ব্যক্তির হাত দ্রুত পিছনের দিকে চলে যেতে দেখে গুডউইন তীক্ষ্ণস্বরে বলে ওঠে, বের করবেন না, আমি পকেট থেকে আপনাকে কভার করছি।

মেয়েটি সামনে এগিয়ে এসে একটি হাত তার দ্বিধাগ্রস্ত সঙ্গীর কাঁধে রেখে টেবিলের দিকে নির্দেশ করে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করে। সত্যি করে বলো, টাকাটা কার।

তিনি কোন উত্তর না দিয়ে গম্ভীর, বিলম্বিত একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঝুঁকে পড়ে মেয়েটির কপালে চুমো দিয়ে অন্য কামরায় ঢুকে দরজাটি বন্ধ করে দিলেন। গুডউইন তাঁর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে লাফ দিয়ে দরজার কাছে গিয়ে দরজার হাতলে হাত ঠেকানো মাত্র, পিস্তলের আওয়াজ তার হাতে প্রতিধ্বনিত হল। ভারী কিছু পতনের শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হতবাক গুডউইনকে সরিয়ে মেয়েটি পাশের ঘরে প্রবেশ করল।

হতাশ গুডউইনের মনে হল বীর যোদ্ধা আর স্বর্ণ হারানোর থেকে, অনেক গভীর যা সেই মোহিনী শরীর অন্তর নিংড়ে সেই মুহূর্তে ভেঙে ভেঙে বেরিয়ে এলো সেই রক্তাক্ত সম্মান হানির কামরা থেকে, সকল ক্ষমার, সকল কোমলতার, পার্থিব সান্ত্বনার সেই নাম, ওঃ, মা, মা, মাগো, মা।

এদিকে গুলির আওয়াজে নাপিত এসতেবান চিৎকার করে ওঠার শহরের প্রায় অর্ধেক বাসিন্দা জেগে উঠে বাইরে কোলাহল শুরু করে দিয়েছে। লোকের পায়ের শব্দ ও সরকারী নির্দেশগুলি রাস্তা থেকে শান্ত বাতাসে আন্দোলিত হতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে গুডউইন নিজের কর্তব্য স্থির করে ফেলে। অবস্থার ফেরে তাকে তার পছন্দ করা দেশের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিতে হয়েছে। সে দ্রুত সমস্ত অর্থ ব্যাগে ভরে ব্যাগটি বন্ধ করে সেটিকে জানালার বাইরে কমলালেবু গাছের ওপরে নামিয়ে দিল।

বিপদের সংকেত ধ্বনি বেজে ওঠায় আইনরক্ষীরা যে যেভাবে পারল ছুটে এলো। লালচটি আর রেঁস্তোরার প্রধান খানসামার মতো কোট পরে কমানভানট, দীর্ঘাকার বন্দুক নিয়ে সৈন্যরা আর

সোনালী তকমা ও কাঁধের ব্যাজ লাগাতে লাগাতে তাদের চেয়ে বেশী সংখ্যায় অফিসারের দল, খালিপায়ে কর্মদক্ষ পুলিশের দল আর তাদের সঙ্গে সকল বর্ণ ও আকৃতির নগরবাসীর দল ছুটে এলো। কপালে গুলি করার ফলে মৃত ব্যক্তির মুখের আকৃতি বিকৃত হয়ে গেলেও গুডউইন আর এসতেবান তাঁকে শনাক্ত করল। পরদিন, টেলিগ্রাফের তার মেরামত হলে পরে খবর আসতে শুরু করলে প্রেসিডেন্সির পলায়নের খবর নগরবাসীদের জানানো হলো। সানমাটেও-তে বিপ্লবীদল বিনা বাধায় সরকারের কার্যভার নিজেদের হাতে নিয়েছে আর সেই পারদ সদৃশ্-মতি জনগণের জয়ধ্বনি হতভাগ্য মিরাফ্লোরেসের বিষয়ে সকল কৌতূহল মুছে দিল।

যে অর্থ প্রেসিডেন্ট সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তার উদ্ধারের জন্য নতুন সরকার শহরগুলিতে বৃথাই, রাস্তার পাথর পর্যন্ত ওলট-পালট করে তল্লাসী চালাল। কোরালিওতে তল্লাসীদলের সর্দারীর দায়িত্ব নিজে নিয়ে চিমনী তল্লাসী চালিয়েও গুডউইন সেই টাকার কোনো হদিশ করতে পারে নি।

তারা মৃত ব্যক্তিকে, শহরের পিছনে, সুন্দরীর জলা ডিঙিয়ে যাওয়া কাঠের ছোট সেতুর পাশে, কোন সম্মান না দেখিয়ে, কবর দিল। হোটেলের মালিকান বৃদ্ধা রেড ইন্ডিয়ান, তাঁর কবরে একটি কাঠের ফলক তৈরী করে তাতে জ্বলন্ত শিঁক দিয়ে তাঁর নাম ধাম তাতে লিখে দিল।

এর পরের বিপদসংকুল দিনগুলিতে গুডউইন শক্তিমান দুর্গের মতো ইসাবেল গিলবার্টকে রক্ষা করল। গুডউইনের মনে ওর অতীত জীবনের ব্যাপারে কোনো সংকোচ থেকে থাকলে তা দূর হয়ে গেল। মেয়েটিরও খামখেয়ালী উদ্দামতা কিছু থেকে থাকলে তাও দূর হয়ে গেল। তারা বিয়ে করল।

এই আমেরিকান দম্পতি শহরের উপকণ্ঠে পাহাড়ের কোলে ইঁট, তালের গুঁড়ি, খড়, বাঁশ, কাঁচা ইঁট আর একটি সম্পত্তির সমান রপ্তানী মূল্যের স্থানীয় কাঠ দিয়ে, জটিল স্থাপত্যের নিদর্শন স্বরূপ একটি বাড়ী তৈরী করে বসবাস করতে লাগল। সেই বাড়ীর বাইরে ও ভিতরে স্বর্গের শোভা প্রকাশ পায়। স্থানীয় লোকেরা তার সৌষ্ঠবের কথা বলতে গিয়ে হাত পা নেড়ে প্রশংসায় উচ্ছ্বাসিত হয়ে ওঠে। তার মেঝের পালিশ আয়নার মতো, ইনডিয়ানদের হাতে বোনা সিল্কের তন্তুর কম্বল পাতা, কাগজে মোড়া দেয়ালে লম্বা লম্বা ছবি অলঙ্করণ আর বাদ্যযন্ত্র।

কমলালেবুর গাছের ভিতর গুডউইন যে টাকা ফেলে গিয়েছিল তার কি হলো কোরালিওর কেউ তা জানে না।

পাঁচ

প্রেমের জন্য দেশত্যাগী নম্বর দুই

কলসাল হবার উপযুক্ত কাঠের স্টক ভালো করে দেখে নিয়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ইস্তফা দেওয়া উইলার্ডগেডির ফলে ডেলসবার্গ আলাবাসার মিঃ জন ডি. গ্রাফনরিড অ্যাটউডকে নির্বাচন করল। মিঃ অ্যাটউড নিজেই এই চাকরিটি চেয়েছিল। সুন্দরী স্ত্রী লোকের কুহকী হাসি জনি অ্যাটউডকে, স্বেচ্ছানির্বাসিত গেডি-র মতোই ফেডারেল সরকারের চাকরী গ্রহণের মতো বেপরোয়া পদক্ষেপে ধাবিত করেছিল। তার নবীন জীবন বিপর্যস্ত করে দেওয়া সুন্দর মুখ যাতে আর না দেখতে পারে তাই অনেক দূরে চলে যেতে চেয়েছিল। কোরালিওতে কনসালের চাকরী যথেষ্ট দূরে সরে যাওয়ার একটা প্রকৃষ্ট আর রোমানটিক জায়গা, যা ডেলসবার্গ-এর জীবনের গ্রাম্য দৃশ্যপটে প্রয়োজনীয় নাটকের উপস্থাপনা করতে পারে। অতনুতাড়িত দেশান্তরীর ভূমিকায় অভিনয় করার সময় জনি, জুতোর বাজারের কলকাঠি নেড়ে, স্প্যানিশ সমুদ্রের বাত্যাহতদের তালিকায় নিজের নামটি যুক্ত করেছিল আর দেশের একটি অপদার্থ অগাছাকে অপরিচয় থেকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য পণ্য হিসেবে উন্নীত করে অতুলনীয় কীর্তি রেখে গেল।

একটি প্রেম থেকেই গোলমালের সূত্রপাত। ইলাইজা হেমস্টেটর-এর ডেলসবার্গে একটি মুদীর দোকান ছিল। হেমস্টেটর নামের পৌরুষ স্খলন করা রোজিন নামে একটি মেয়ে ছাড়া তার আর কেউ ছিল না। তরুণীটির প্রচুর দৈহিক আকর্ষণের ফলে সেই অঞ্চলের যুবকের দল বেশ চঞ্চল হয়ে ছিল। সেই সব যুবকদের মধ্যে ডেলসবার্গ-এর এক প্রান্তে পুরানো কলোনিয়াল

প্রাসাদের বাসিন্দা জর্জ অ্যাটউডের ছেলে, জনি একটু বেশী চঞ্চল হয়েছিল।

রাজ্য জুড়ে অ্যাটউড নামটির সম্মান ও প্রতিষ্ঠা বহুদিন থেকে থাকায় রোজিন ভালবাসার প্রতিদান সানন্দে দেবে এবং পুরানো প্রামাদোপম প্রায় জনশূন্য অ্যাটউডদের বাড়ীতে বধূ বেশে প্রবেশ করতে রাজী হতে মনে হলেও বাস্তবে তা হল না। কারণ একজন প্রাণবন্ত, ধূর্ত কৃষক অভিতাজ অ্যাটউডের প্রতিপক্ষ হয়েছিল।

একদিন রাত্রে অনুসঙ্গী হিসাবে চাঁদের আলো, করবী, ম্যাগনোলিয়া আর দোয়েলের গান-এর উপস্থিতিতে, জনি রোজিনের কাছে, যুবক যুবতীদের কাছে গভীর তাৎপর্য্যের একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল। সেই সময়ে পিঙ্কনি ডসন-এর ছায়া তাদের মধ্যে এসেছিল কিনা জানা না গেলেও রোজিনের উত্তর অসম্মতিবাচক ছিল। মিঃ জন অ্যাটাউড, প্রায় জমির ঘাসে মাথার টুপি ছুঁইয়ে অভিবাদন করে হৃদয়ে আর বংশতালিকায় ক্ষত নিয়ে ফিরে যায়।

সেই সময়ে অন্যান্য দুর্ঘটনার মধ্যে ছিল একজন ডেমোক্রাট প্রেসিডেন্ট। জনি, ডেমোক্রাট দলের বিশিষ্ট যুদ্ধাশ্ব, পিতা জর্জ অ্যাটউডকে ধরে বসল বিদেশে চাকরীর জন্য তদ্বির করতে। সে বহু দূরে চলে যাবে। তার প্রেম কত পবিত্র, সত্য, আর একনিষ্ঠ ছিল তা হয়ত অনেক বছর পরে ভেবে রোজিন একফোঁটা চোখের জল ফেলবে। রাজনীতির চাকা ঘোরার সাথে সাথে জনিও কোরালিওতে কনসাল নিযুক্ত হল।

যাত্রার পূর্বে জনি হেমস্টেটরদের বাড়ী বিদায় নিতে গিয়ে রোজিনের চোখে অদ্ভুত এক গোলাপী আভা দেখল। দুজনে একা হতে পারলে যুক্তরাষ্ট্রকে হয়ত আর একজন কনসাল খুঁজতে হত। কিন্তু পিঙ্ক ডসন সেখানে উপস্থিত থেকে তার প্রথামত চারশ একরের ফলের বাগান তিনশ মাইল লম্বা আলফালফার মাঠ ও দুশ একরের চারণভূমি করছিল। তাই দুদিনের জন্য মজট্ জেমারিতে যাবার মতো নিরুত্তাপভাবে জনি রোজিনের সঙ্গে করমর্দন করল। অথচ এই অ্যাটউডরা ইচ্ছা করলে তাদের আচরণ রাজা রাজড়ার মতো হতে পারে।

এই সময় পিঙ্ক ডসন বলল, ফালতু টাকা লগ্নী করার কোনো সুবিধার খোঁজ পেলে আমাকে একটা খবর দিও, জনি। কোনো লাভজনক কারবারে লাগাবার জন্য কয়েক হাজার ডলার সবসময় আমি হাতে রেখে দিই।

প্রসন্নভাবে জনি বলল, সে রকম কোনো কিছুর খবর পেলে আনন্দের সঙ্গে নিশ্চয়ই তোমাকে জানাবো, পিঙ্ক।

জনি মবিল-এ গিয়ে একটি ফলের স্টীমারে করে আঞ্চুরিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিল।

বাইশ বছর বয়সী নতুন কনসাল কোরালিওতে পৌঁছে সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। বার্ধক্যের মতো যৌবনে বিমর্ষতা সবসময় গায়ে লেগে থাকে না। দুঃখ সেখানে কখনো কখনো রাজত্ব করে। বাকি সময়ে উপলব্ধির তীব্রতায় সে পদচ্যুত হয়।

অল্প দিনের মধ্যেই বিলি কেওগ-এর সঙ্গে জনির বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। নতুন কনসালকে কেওগ সারা শহর ঘুরিয়ে দেখাল, কোরালিওতে অবস্থান করা বিদেশী গোষ্ঠীর কাছে নিয়ে গেল। তারপর স্থানীয় পদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করে দোভাষীর সাহায্যে তার পরিচয়পত্র পেশ করল।

দক্ষিণরাজ্যের এই যুবকটির মধ্যে এমন কিছু ছিল যা বিদগ্ধ কেওগের মনে ধরেছিল। তার শিশুর মতো সহজ ও সরল আচরণ, শান্ত অনায়াস পটুতা তাকে ভালো লাগায় সাহায্য করেছে। উর্জি বা খেতার, লালফিতা বা বিদেশী ভাষা, পাহাড় বা সমুদ্র-কোনো কিছুই তার প্রাণ চাঞ্চল্যকে দমিত করতে পারে নি। সে সকল যুগের উত্তরাধিকার সঙ্গে নিয়ে এসেছে। ডেলসবার্গ-এর একজন অ্যাটউড, যদিও তার মুখমণ্ডল থেকে জানা যায় তার মনের গভীরের মধ্যেও কোন চিন্তা রয়েছে।

নতুন কলসালকে অফিসের কাজকর্ম বুঝিয়ে দিতে ডোডি কনস্যুলেটে এসেছে। সে আর কেওগ কি ধরনের কাজ সরকার তার কাছে আশা করে তা বুঝিয়ে দিচ্ছিল।

সব শুনে জনি বলল, ঠিক আছে, করতেই হবে এমন কোনো কাজ এসে পড়লে সেগুলি তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবো। একজন ডেমোক্রাট তার প্রথম টার্মে খাটবে তা তোমরা আশা করতে পারো না।

ডোডি বলল, যে সব বিভিন্ন রপ্তানী পণ্যের হিসাব তোমাকে রাখতে হবে সেই সম্বন্ধে এই সব শিরোনামগুলি পড়ে দেখতে পারো। বিভিন্ন জাতের তালিকা ভুক্ত ফল, মূল্যবান কাঠ, কফি, রাবার...

ডোডিকে থামিয়ে দিয়ে অ্যাটউড বলল, শেষের হিসেবটা শুনে মনে হচ্ছে ওটাকে টেনে লম্বা করা যাবে। আমি একটা নতুন পতাকা, একটি বাঁদর, একটি গীটার আর এক পিপে আনারস কিনতে চাই। ওই খরচগুলি রাবারের হিসেবের মধ্যে ঢুকবে কি?

হেসে ফেলে ডোডি বলল, ওগুলি তো পরিসংখ্যান তুমি খবরের হিসেবের কথা ভাবছ। হ্যাঁ ওই হিসাবটা একটু নমনীয় হলে ভাল হয়। কালি কলমের হিসাবটা স্টেট ডিপার্টমেন্টে কখনো কখনো আলগাভাবে অডিট করা হয়।

কেওগ এবার বলে ওঠে, বৃথাই আমরা সময় নষ্ট করছি। এই লোকটি বড় চাকরী করার ক্ষমতা নিয়েই জন্মেছে। একবার দৃষ্টি বুলিয়েই সে এই বিদ্যার শিকড় পর্যন্ত চলে গিয়েছে। তার উক্তির প্রতিটি শব্দেই শাসন প্রতিভা লক্ষ্য করা যায়।

আমি এই চাকরীটা কাজ করার কারণে নিই নি। জনি বলল, যেখানে খামারের কথা শুনতে হবে না। আমি পৃথিবীর সেরকম কোনো একটি জায়গায় চলে যেতে চেয়েছিলাম। এখানে কোনো খামার নেই তো?

ডোডি বলল, না, কৃষিবিদ্যা এখানে পরিচিত না হওয়ায়, যে ধরনের খামারের সঙ্গে তুমি পরিচিত সেরকম কিছু এখানে নেই। আঞ্চুরিয়ার সীমানার মধ্যে লাঙল বা শস্যকাটার ব্যাপার কখনো ছিল না।

মৃদুস্বরে, এই দেশই আমার দেশ, বলে নতুন কনসাল তাঁর দোলনা আসনে ঘুমিয়ে পড়ল।

পটচিত্রের শিল্পী হাসিখুশী বিলি কেওগ-এর সঙ্গে জনির ঘনিষ্ঠতা দিন দিন বেড়ে চলল। সকলে বলতে লাগল যে কনস্যুলেটের পিছনের সেই আকাঙ্ক্ষিত শীতল বারান্দায় বসার সুযোগ পেতেই সে ঘনিষ্ট হচ্ছে আর কেওগ সে সুযোগও লাভ করল। প্রায় প্রতি দিন রাত্রেই নাগালের মধ্যে চুরুট আর ব্রাণ্ডি রেখে, রেলিঙের ওপর গোড়ালি তুলে তারা সমুদ্রের হাওয়ায় বিশ্রাম নেয়।

একদিন টি পূর্ণিমার রাত্রির অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতার প্রভাবে তারা দুজনে নিঃশব্দে বসে রয়েছে। আকাশে প্রকাণ্ড চাঁদ, শুক্তির মতো সমুদ্রের জল, অত্যন্ত মৃদুস্বরে বাতাস বইছে। সমস্ত শহর শুয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে রাত্রি জুড়োবার অপেক্ষা করছে, ভিসুভিয়াস লাইনের ফলের জাহাজ আনারস বোঝাই করে তীর থেকে কিছুদূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভোর ছটায় রওনা হবে বলে। চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় দুজনেই দেখতে পাচ্ছে ঢেউ এসে বার বার কূলের ওপর পড়ে থাকা নুড়িগুলি ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে আর চাঁদের আলোয় সেগুলি চকচক করছে।

তীর বরাবর কূলের অনেক দক্ষিণে সাদা পালতোলা একটা নৌকো সামুদ্রিক পাখির মতো ভাসছে। বাতাসের চক্ষুর বিশ ডিগ্রির মধ্যে তার যাওয়ার দিক থাকায় সেটা একটি স্কোরের মতো দীর্ঘ ছোট ছোট ধাক্কায় পাক খাচ্ছিল। তারপর চালকদের কৌশলে কনস্যুলেটের প্রায় মুখোমুখী চলে এল, আর সঙ্গে সঙ্গে ভেসে এল সুপরিচিত হোম, সুইট হোম-এর সুর।

কমলের দেশের জন্যই যেন এই দৃশ্য সাজানো উষ্ণমণ্ডলের সমুদ্রের আধিপত্য, অপরিচিত তরীর রহস্য আর চাঁদের আলোয় ঝলমল করা জলরাশির ভিতর থেকে ভেসে আসা সঙ্গীত স্বপ্নময় মোহ জাল ছড়িয়ে দিলে ডেলসবার্গের কথা মনে পড়ে গেল জনির।

ভ্রাম্যমান সঙ্গীতের বিষয়ে কিছু একটা চিন্তা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছে কেওগ রেলিঙে লাফিয়ে উঠে কামানের গোলার মতো কান ফাটানো চিৎকার করে কোরালিওর স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে উঠল, মেল-লিন-জার-সা-হয়...

নৌকাটির বহিরাভিমুখী থেকে স্পষ্ট ভাষায় জবাব এল, গুডবাই, বিলি, বাড়ী চললাম—বাই।

তরীটি আডাউরের দিকে যাচ্ছিল। নৌকার পারমিট আছে এমন কোনো উত্তরের দিকের যাত্রী ফলের স্টীমারের ফিরতি ট্রিপের যাত্রী হিসাবে তাতে উঠতে চলেছে বলে কেওগ-এর সন্দেহ হল। দেখতে দেখতে নৌকাটি আঁকা বাঁকা রাস্তায় ঘুরপাক খেতে খেতে ফলের স্টীমারের বৃহৎ শরীরের আড়ালে চলে গেল।

চেয়ারে বসে পড়ে কেওগ বলল, ও হল এইচ পি. হেলিংগার। নিউইয়র্কে ফিরে যাচ্ছে। ও, বিগত পলায়নপর প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত সচিব ছিল। ও, মনে হয়, ওর, চাকরী না থাকায় খুশী।

জনি বলল, ম্যাজিকের রানী জো-জো-র মতো সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে উধাও হচ্ছে কেন, ওদের দেখাতে চায় যে সে কোন কিছু তোয়াক্কা করে না।

শব্দটা ফোনোগ্রাফের। আমি ওকে ওটা বিক্রী করেছিলাম। এই দেশে ওর একটা গোপন রচনা ছিল যাতে ও অদ্বিতীয় ছিল পৃথিবীতে। ওই কলের গান তাকে একবার বাঁচিয়ে ছিল বলে সর্বদা ও ওটা নিয়ে ঘোরে।

ঘটনাটা আমাকে বলো।

কেওগ বলল, আমি বক্তব্যের জন্য ভাষা ব্যবহার করতে পারি। কাহিনী বর্ণনা করতে পারি না। একটি ঘটনা বর্ণনা করার সময়ে যখন কথাগুলো তাদের খুশী মতো আসে, তখন আবহাওয়া ঠিকঠাক মিলে গেলে অর্থ বোঝা যায়। না হলে যায় না।

জনি পুনরায় বলল, আমি ওর গোপন ব্যবসায় কথা জানতে চাই। তুমি না বলতে পার না, কারণ আমি তোমাকে ডেলসবার্গের সব কথা বলছি।

তুমি শুনবে বৈকি। আমি বলছিলাম সহজাত প্রবৃত্তিতে আমার বর্ণনা ঘুলিয়ে যায়। বিশ্বাস কোরো না। এই শিল্পে আমি শিখেছি, যেমন আয়ত্ত করেছি আরো অনেকগুলি কলা ও বিজ্ঞান।

ছয়

ফোনোগ্রাফ আর গোপন ব্যবসা

অধৈর্যের গলায় জনি বলল, কি ছিল সেই গোপন ব্যবসা।

শান্তস্বরে কেওগ বলল, সোজাসুজি কথা জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে কলা ও দর্শনের রীতির বিপরীত। গল্প বলার কায়দা হল যতক্ষণ মূল বিষয়বস্তুর সঙ্গে কোনো সম্পর্কে নয় এমন সব বিষয়ে প্রিয় মতামতগুলি বলা হচ্ছে, ততক্ষণ শ্রোতা যা শুনতে চায় তার সব কিছু গোপন রাখা, একটি ভালো গল্প ভিতরে চিনির কোটিং দেওয়া একটি তেতো বড়ির মতো। অতএব আমি আমার গল্পটা শুরু করছি চেরোকী জাতিকে নির্দেশ করা একটি জন্ম পত্রিকা দিয়ে।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে গল্পটা সাজিয়ে নিয়ে কেওগ বলতে শুরু করল। আমি আর হেনরি পুরসকলার এই দেশে প্রথম ফোনোগ্রাফ নিয়ে আসি। কোয়ার্টার ব্যাক চেরোকী, হেনরী ছিল সিকি আঁশলা, সে পূবের দেশে ফুটবল আর পশ্চিমের দেশে চোরাই লুইসকির কায়দাকানুন শিখেছিল। ছফুট লম্বা, রাবারের টায়ারের মতো চলাফেরা করা হেনরির চলন-বলন ছিল সহজ, ছটফটে। কলেজ একবার ছেড়েছিল আর রেড ইন্ডিয়ান অঞ্চলে লুইসকি বেচার জন্য মাসকোগী জেল ছেড়ে ছিল তিনবার। চুরুটের দোকানে এসে পিছন ফিরে তাকানোর মতো রেডইন্ডিয়ান সে ছিল না।

কেওগ বলে চলে, টেকসারকানাতে, যেখানে এই ফোনোগ্রাফের প্রকল্পটি স্থির হয়, আমার সঙ্গে হেনরির দেখা হয়। রেডইন্ডিয়ানদের জন্য নির্দিষ্ট কিছু জমি বন্টনের দরুণ তিনশ আট ডলার তার কাছে ছিল। আর একটি বেদনাময় দৃশ্য দেখে আমি লিটল রক থেকে সেখানে চলে এসেছিলাম। সেখানে এক ব্যক্তি একটা বাকসের ওপর দাঁড়িয়ে, প্যাচ দেওয়া কেস, গা-চাবি, এলজিন মেসিন, ভারি সুন্দর সোনার ঘড়ি ফিরি করছিল। যার দোকানের দাম ছিল কুড়ি ডলার। লোকে তিন ডলারে কেনার জন্য সেখানে মারামারি করছিল। এক ব্যাগ ভর্তি ঘড়ি লোকটি প্লেটে রাখা গরম বিস্কুটের মতো বিলোচ্ছিল। ঘড়ির পিছনটা খোলা না গেলেও ক্রেতারা কানের কাছে এনে টিক টিক শব্দ শুনে খুশী হচ্ছিল। তিনটি বাদে বাকি সব ঘড়িগুলিই ছিল নকল। ইলেকট্রিক বাতির চারপাশে ওড়া একধরনের কালো পোকা, যারা চমৎকার মিনিট আর সেকেন্ড গুণতে পারে, খালি কেসগুলির মধ্যে ভরা ছিল। সে দুশ অষ্টআশি ডলার রোজগার করে চলে গেল। কারণ সে জানত ঘড়িগুলি চাবি দেবার সময় একজন কীট বিজ্ঞানীর প্রয়োজন হবে যা সে ছিল না।

একটু থেমে শুরুর কথায় ফিরে এসে কেওগ বলল, হেনরীর ছিল তিনশ বাট ডলার আর আমার ছিল দুশ অষ্টআশি ডলার। কলকব্জার প্রতি ঝোঁক থাকায়, দক্ষিণ আমেরিকায় ফোনোগ্রাফের প্রবর্তন

করার পরিকল্পনাটা হেনরির হলেও, আমিও বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করি।

হেনরী তখন আমায় বলেছিল, ল্যাটিন জাতীয় লোকদের, কলেজে শেখা কায়দায়, ফোনোগ্রাফের শিকার হবার প্রবণতা রয়েছে। ওদের মনোবৃত্তি চারুকলার দিকে। সঙ্গীত, রং আর আনন্দের তৃষ্ণা ওদের মজ্জাগত। মুদীর আর খাবারের দেনা বাকি পড়ে থাকলেও হাত অর্গানের গায়ক আর তাঁবুর মধ্যে চারপেয়ে মুরগীকেও ওরা বাহবা দেয়।

হেনরির কথায় আমি বললাম, আমরা তাহলে ল্যাটিনদের টিনে ভরা সঙ্গীত রপ্তানী করব। যদিও ওদের সম্বন্ধে জুলিয়াস সীজারের করা উক্তিটি আমার মনে পড়ছে, ওমনাগ্যালিয়া ইন প্রেস পারতেন দিভিসা এসত, অর্থাৎ পার্টিকে গাছে বাঁধতে আমাদের বিদ্বেষের সবটাই দরকার হবে।

কেওগ বলে চলে, যে জমিটুকুর ওপর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেটুকু ছাড়া যে রেডইন্ডিয়ান জাতের কোন ধারই আমরা ধারি না। তাদের একজনের কাছে কথা বলার কায়দায় হারতে আমি রাজী নই, যদিও বিদ্যা জাহির করাকে আমি ঘৃণা করি।

সব চেয়ে ভালো কোম্পানীর একটি ট্রাঙ্ক রেকর্ড আর একটি চমৎকার ফোনোগ্রাফ টেকসার কানাতে আমরা কিনে মালপত্তর বেঁধে নিউ অর্লিয়েন্স-এর দিকে যাবার টি এন্ড পি ধরলাম।

তার প্রসিদ্ধ গুড় ও নিগ্রো সঙ্গীতের কেন্দ্র দক্ষিণ আমেরিকাগামী একটি স্টীমারে করে সলিটাসে এসে নামলাম। ওখান থেকে চল্লিশ মাইল উত্তরে। জায়গাটা দেখতে উপাদেয়। প্রাকৃতির দৃশ্যের মধ্য দিয়ে সাদা তক তকে বাড়িগুলির দিকে তাকালে মনে হবে লেটুস-এর সঙ্গে সিদ্ধ ডিম পাতে দেওয়া হয়েছে। শহরের উপকণ্ঠে শান্ত, আঁকাশছোয়া পাহাড়। এই অত্যন্ত চুপচাপ শহরে আমার মনে হল গ্যাব্রিয়েল যখন তার বাঁশি বাজানো থামাবে আর গাড়ীটা চলতে শুরু করবে আর ফিলাডেলফিয়া তার হাতল ধরে চলবে ও পাইনগালি আরকানসাস শেষ পাদানিতে লাফিয়ে উঠবে তখন এই সলিটাস শহর ঘুম ভেঙে জেগে উঠে জিজ্ঞেস করবে, কেউ কি কিছু বলছেন?

একটু চুপ করে থেকে বিলি আবার বলল, পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য স্টীমারের ক্যাপ্টেন আমাদের সঙ্গে তীরে এসে আমাকে ও হেনরিকে যুক্তরাষ্ট্রের কনসালের কাছে পরিচয় দিল। আরও একজন বিচিত্র বর্ণের লোকের সঙ্গে পরিচয় হল, সাইনবোর্ড দেখে বুঝতে পারলাম, যিনি ব্যবসা ও লাইসেন্স বিভাগের প্রধান।

পরিচয় হয়ে যাবার পর ক্যাপ্টেন বলল, আমি সাতদিন পরে আবার এই বন্দর ছুঁয়ে যাবো।

আমরা বললাম, ততদিনে, ভিতরের শহরগুলিতে, আমাদের গ্যালভানাইজড প্রধানা গায়িকার সাহায্যে টিনের খনি থেকে সুসা-র ব্যান্ডের মার্চের সুরের নকল তুলে এলে, আমরা টাকা কামাচ্ছি।

আমাদের কথায় ক্যাপ্টেন বলল, তোমরা সে সব কিছুই করবে না। তোমরা সম্মোহিত হয়ে যাবে। যেকোনো ভদ্রলোক দয়া করে স্টেজে উঠে এই দেশের চোখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলে, তিনি নিজেকে, এলগিন মাখনের কারখানায় একটি মাছি বলে বিশ্বাস করবেন। ঢেউ-এর মধ্যে হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে তোমরা অপেক্ষা করতে করতে তোমাদের এই পবিত্র সঙ্গীত কলা বিদ্যার মাংসের পরোটা পর হয়ে আসা মেসিনে "কোথা পাই হেন ঠাঁই গৃহ যেথা মোর" বাজাবে।

হেনরি, বাণিজ্য দপ্তর থেকে লাল ছাপ মারা একটি কাগজ, স্থানীয় ভাষায় লেখা একটি কাহিনী আর শূন্য কানাকড়ি পয়সা ফেরত পেল, কুড়ি ডলারের একটি নোট-এর বদলে।

কেওগ বলে চলল, তারপর একটি পরিচয় পত্রের জন্য কনসালকে আমরা লাল আঙুরের মদে পূর্ণ করে দিলাম। সে ছিল পঞ্চাশ বছরের বেশী বয়সী, অসন্তোষে পূর্ণ ফ্রেঞ্চ আইরিশ মেজাজের, একজন যুবক চেহারার লোক। সে ছিল চ্যাপটা হয়ে যাওয়া ব্যক্তি, পানীয় যার শরীরে দুঃখ আর মেদ সঞ্চয় করতে জমে থাকে। আমার মনে হয় সে ছিল ওলন্দাজ। তার মেজাজ অনুসারে। খুবই বিষণ্ণ আবার হাসি খুশী। সব শুনে সে বলল, ফোনোগ্রাফ নামক এই অত্যাশ্চার্য আবিষ্কার এই অঞ্চলে এখনো আসে নি। এর নাম পর্যন্ত এখানকার লোকেরা শোনেনি। শুনলেও এরা তা বিশ্বাস করবে না। এরা সরল হৃদয়, প্রকৃতির দুলাল। একটা টিন কাটারকে তানকারী বলে বিশ্বাস করতে, মেসিনে রাজ বিস্তার এদের রক্তাক্ত বিপ্লবের প্রেরণা দিতে পারে, প্রগতি এদের বাধ্য করেনি। সবচেয়ে ভালো হয়, যদি এটার পরীক্ষা তোমরা যখন করবে তখন এরা নিদ্রামগ্ন থাকে। দুভাগে এরা যন্ত্রটিকে গ্রহণ করতে পারে বলে আমার মনে হয় হয় আটলান্টা-র কর্নেলের মার্চিং থ্রু জর্জিয়া

শুনতে শুনতে যেমন হয় তেমনি একাগ্রভাবে শুনতে শুনতে বেঁহুশ হয়ে পড়বে অথবা কুড়ুলের সাহায্যে সঙ্গীতের যন্ত্রটিকে টুকরো টুকরো করে তোমাদের জেলে পুরতে পারে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমি আমার কর্তব্য করতে গিয়ে স্টেট ডিপার্টমেন্টকে একটা টেলিগ্রাম পাঠাব আর, পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশের তরফ থেকে, তোমাদের যখন গুলি করে মারা হবে আর তখন তোমাদের শরীরের ওপর তারা ডোরাদাগের পতাকাটা জড়িয়ে দেবো। পতাকাটা এখন এই কারণেই বুলেটের গর্তে ভরে গেছে। এখাকার আমেরিকানদের সুরক্ষার জন্য গোটা দুই গান বোট পাঠাবার অনুরোধ জানিয়ে এর আগে দুবার আমি আমার সরকারকে কেবল্ করেছিলাম। প্রথমবার স্টেট ডিপার্টমেন্ট আমাকে একজোড়া গামবুট পাঠিয়ে দেয়। দ্বিতীয়বার পীস্ নামে একটি লোকের ফাঁসী রদ করার জন্য কেবল্ পাঠালে ওরা কৃষিবিভাগের সচিবের কাছে আপীলটি পাঠিয়ে দেয়। আসুন আমরা বারের ওধারের সেনিওরকে একটু বিরক্ত করি, আরো কিছু লাল মদের জন্য। এই ছিল আমার ও হেনরির কাছে সলিটাসের কনসালের স্বগতোক্তি। এ সত্ত্বেও সেইদিন বিকেলে সে লস এঞ্জেলেস-এ তীরের সমান্তরাল প্রধান রাস্তায় একটা ঘর ভাড়া নিয়ে আমাদের ট্রাঙ্কগুলি সেখানে রাখলাম। ঘরটা একটু অন্ধকার হলেও মাঝামাঝি সাইজের বেশ ছিমছাম বিচিত্র নানান ছাঁদের বাড়ি আর সাজানো বাগানের গাছে ভরতি রাস্তার দুপাশে পায়ে চলা চমৎকার ঘাসের পথ দিয়ে কৃষকেরা যাওয়া আসা করছে। পৃথিবীর পটভূমিকায় যেন, রাজা কাফুজলাম-এর প্রবেশের পূর্বে, অপেরার কোরাস।

একনাগাড়ে বলে যাবার পর কেওগ একটু থেমে থেকে আবার বলতে শুরু করে, পরেরদিন, ব্যবসা শুরু করার পূর্বে যন্ত্রটি ঝাড়-পোঁছ করছি এমন সময়, সাদা পোশাক পরা, দীর্ঘদেহী একজন অতি সুদর্শন, শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি দরজার সামনে এসে ভিতরে তাকিয়ে দেখছে দেখতে পেয়ে, আমরা তাকে ভিতরে আসতে বললে, সে ভিতরে এসে আমাদের নিরীক্ষণ করতে লাগল। কুঞ্চিত, চিন্তাকুল চোখে লম্বা একটা চুরুটের প্রান্ত সে এমনভাবে চিবোচ্ছিল, যেন একটি তরুণী, পার্টিতে যাবার আগে কোন পোশাক পরবে ভাবছে।

শেষে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, নিউইয়র্ক।

তার কথার উত্তরে আমি বললাম, আদি নিবাস। তারপরে কখনো কখনো। সব চিহ্ন কি এখনো মুছে যায় নি?

লোকটি বলল, কি করে বললাম জানতে পারলে দেখবে ব্যাপারটা খুব সহজ। ওয়েস্ট কোটের ফিটিং দেখে। ওয়েস্ট কোটের কাটিং অন্য কোথাও ঠিক হয় না। কোট হলেও ওয়েস্ট কোট হয় না।

শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক এবার হেনরির দিকে তাকিয়ে ইতঃস্তত করছে দেখে হেনরি বলে উঠল, ইন্ডিয়ান, পোষমানা ইন্ডিয়ান।

এবার সেই ব্যক্তি নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, মেলিংগার, হোমর পি মেলিংগার। বন্ধুগণ তোমাদের আটক করা হল। একজন রেফারী বা অভিভাবকহীন শিশুদের জঙ্গলে যেমন অবস্থা হয়, তোমাদের ও সেইরকম অবস্থা হবে। তোমাদের ঠেকোগুলি সরিয়ে এই নিরক্ষীয় কাদার ডোবার মধ্যে, স্বচ্ছ জলে ভাসিয়ে নিয়ে তোমাদের চালু করে দেওয়া আমার কর্তব্য। তোমরা আমার সঙ্গে এখন আসবে আর আমি আঙুরের মদের একটি বোতল তোমাদের গলুই-এর উপর ভাঙব, আর, হয়েলের নিয়ম অনুসারে, তোমাদের নামকরণ হবে।

পুরো দুদিন ধরে মেলিংগার আমাদের অপ্যায়িত করল। সে-ই ছিল রাজা কাফুজলাম। হেনরি আর আমি জঙ্গলের শিশু হলে, সে ছিল সবচেয়ে উঁচু ডালের ব্যঙ্গমা পাখি। আমরা তিনজনে নানান জায়গায় ঘুরে ফোনোগ্রাফ বাজালাম, পানভোজন ও আমোদ প্রমোদ করলাম। যেখানেই দরজা খোলা পেয়েছি সেখানে ঢুকে পড়ে আমরা মেসিনটি বাগিয়েছি আর মেলিংগার সংগীতের কৌশলের কথা সকলকে বুঝিয়েছে ও তার সারা জীবনের দুইবন্ধু সেনিওরেস আমেরিকানদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। উত্তেজিত হয়ে যাত্রাদলের কোরাসের সেই দল আমাদের। সঙ্গে বাড়ি বাড়ি ঘুরেছে। প্রতিটি সুর বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে নতুন করে পানীয় পেয়েছি। একটি ডাবের মুখ কেটে তার জল ফরাসী ব্র্যান্ডি আর অন্যান্য আনুষঙ্গিক মিশিয়ে তৈরী করা পানীয়টির স্বাদ

এখনো মুখে লেগে রয়েছে।

সমস্ত খরচ হোমর পি মেলিংগার-এর। আমাদের টাকার দরকার পড়েনি। জাদুকর হারমান-এর পক্ষে বার করা অসম্ভব শরীরের এমন সব জায়গা থেকে ওই ব্যক্তি ছোট ছোট নোটের তাড়া বার করত। মনে হয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, অর্কিডের সংগ্রহশালা প্রভৃতি স্থাপন করার পরেও যা অর্থ তার হাতে থাকত তাতে সে সারা দেশের কৃষ্ণাঙ্গদের ভোট কিনে নিতে পারত।

হেনরি আর আমি প্রায়ই ভাবতাম তার গোপন ব্যবসাটি কি? একদিন সন্ধ্যায় সে নিজেই আমাদের বলল, বন্ধুগণ, আমি তোমাদের প্রতারিত করেছি। আমি এই দেশে সবচেয়ে বেশী পরিশ্রম করছি অথচ তোমরা আমাকে একটি রং করা প্রজাপতি ভাবতে পারো। দশবছর পূর্বে এই উপকূলে এলেও গত দুবছরে আমি তার চোয়ালে এসে পৌঁছেছি। হ্যাঁ, যে কোন রাউন্ডের শেষে, আমি এই জিঞ্জার কেক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে পারি। আমার পছন্দ করা দেশে সবচেয়ে নিকৃষ্ট শব্দে প্রস্তুতের অস্ত্র নিয়ে এলেও যেহেতু তোমরা আমার স্বদেশবাসী ও আমার অতিথি তাই তাই তোমাদের কাছে গোপনে বলব। আমি এই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির একান্ত সচিব এবং রাষ্ট্রটি চালানো আমার কর্তব্য। বিজ্ঞাপনে আমাকে শিরোনাম দেওয়া না হলেও আমিই শালাদের কাসুন্দি। এইচ পি. মেলিংগারের হাতের রান্না আর মশলা মেশানো ছাড়া, কোনো আইন কংগ্রেসে যায় না, একটি ব্যবসায়িক সুবিধাও মঞ্জুর হয় না, কোনো আমদানী শুল্ক বসানো হয় না। বাইরের অফিসে আমি প্রেসিডেন্টের দোয়াতে কালি ভরলেও বা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসা রাষ্ট্রনেতাদের পকেটে ছোরা বা ডিনামাইট আছে কিনা দেখলেও পিছনের ঘরে সরকারী নীতি আমার নির্দেশেই স্থির হয়। কেমন করে এটা আমি চালাচ্ছি তা তোমাদের চিন্তার বাইরে। এই একটা জায়গাতেই এই গোপন ব্যবসা চলছে। বইতে পড়েছি, সততাই শ্রেষ্ঠ নীতি, গোপন কারবারের মূলধন হিসেবে আমি সেই সততাকে ব্যবহার করছি। সরকার, জনগণ, ব্যবসায়ীরা জানে যে এই গনতন্ত্রে আমিই একমাত্র সৎ ব্যক্তি। ন্যস্ত বিশ্বাস রক্ষা করতে আমি সরকারকে বাধ্য করি। বিদেশী আমানত কোনো ব্যবসায়িক সুবিধা খরিদ করলে তারা মাল পায়। প্রতিযোগিতাহীন সোজাসুজি লেনদেনের একাধিকার চালাচ্ছি আমি। কর্নেল ডিওজেনিস এই অঞ্চলে তার লণ্ঠনের আলো ফেললে দু'মিনিটে আমার ঠিকানা খুঁজে পাবেন। মোটা অঙ্কের লাভ না থাকলেও সুনিশ্চিত এই ব্যবসার ফলে রাত্রে সুস্থির হয়ে নিদ্রা দেওয়া যায়।

এরপর কিছু চিন্তা করে এইচ. পি. মেলিংগার আমাদের বলল, বন্ধুগণ, আজ সন্ধ্যায় একদল বিশিষ্ট নাগরিককে দেওয়া পার্টিতে আমি তোমাদের সাহায্য চাই। তোমরা সঙ্গীতের এই হাসকিং মেশিনটা নিয়ে এসো যাতে করে ব্যাপারটার বাইরের চেহারা দেওয়া যাবে একটা জলসার। গম্ভীর বিষয়ের অবতারণা হলেও তা বাইরে থেকে বোঝা যাবে না। তোমাদের মতো লোকের সঙ্গে কথা বলে আমি আরাম পাই। কাউকে ঘুঁসি মেরে উড়িয়ে দিয়ে সেই কথা জাঁক করে বলার জন্য কত বছর ধরে কষ্ট পাচ্ছি আমি। যখন ঘণ্টা খানেকের জন্য একটা স্টেক আর কাভিয়ার স্যানডুইচ নিয়ে থারটি ফোরথ স্ট্রীটের এক কোণে বসতে পাই, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যখন রাস্তায় গাড়ী যাওয়া দেখতে পাই, গিসের্পের ফলের দোকানের পাশে ভাজা চিনে বাদামের গন্ধ পাই, তখন দেশের জন্য আমি কাতর হয়ে এখানকার চাকরীর সমস্ত উপার্জন ও অন্য সুবিধা ত্যাগ করতে ইচ্ছা হয়।

এবার আমি বললাম, সত্যিই থারটি ফোরথ স্ট্রীটের এক কোণে বিলি রেনফ্রোর দোকানে, ভারি চমৎকার ক্যাভিয়ার পাওয়া যায়।

আমার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মেলিংগার বলে ওঠেন, বিলি রেনফ্রোর সঙ্গে তোমাদের পরিচয় আছে আগে জানলে, ঈশ্বর জানেন, তোমাদের খুশী করতে হাজার উপায় বার করতাম, ওর মতো সাধু লোক প্রায় নেই বললেই চলে। এখানে সততার ব্যবসাতে আমি টাকা উপার্জন করছি আর ওই ব্যক্তি তার জন্য লোকসান দিচ্ছে। এই দেশ কখনো কখনো আমার বিবমিষা এনে দেয়। এখানকার সব কিছু গলিত। নিজেদের বন্ধুদের চামড়া খুলে নেবার জন্য, কফির দানা তোলা ব্যক্তি থেকে শুরু করে সরকারী আমলা পর্যন্ত সকলেই একজন অন্যজনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। একজন খচ্চর সহিস যদি কোন সরকারী আমালাকে টুপী খুলে অভিবাদন জানায় তবে সে নিজেকে জনপ্রিয় নেতা মনে করে বিপ্লব বাধিয়ে সরকার ওল্টাবার জন্য কলকাঠি নাড়তে শুরু করে দেয়।

এইসব বিপ্লবের গন্ধ কোথা থেকে আসছে খুঁজে বের করে, তারা বেরিয়ে পড়ে সরকারী সম্পত্তির রঙের আস্তরণের ওপর আঁচড় কাটবার আগে, তাদেরকে আটকে ফেলা, একান্ত সচিব হিসেবে আমার প্রধান কাজ। আর সেই কারণেই আমি এই উপকূলে রয়েছি। এই জেলার গভর্নর আর তার অনুচরেরা বিদ্রোহের ছক কষেছে। এইচ. পি. এম-এর সৌজন্যে, ফোনোগ্রাফের গান শোনার জন্য তাদের সকলকেই আজ আমি আমন্ত্রণ জানিয়েছি। এইভাবে সবকটাকে আজ সন্ধ্যায় জড়ো করব আর তারপর কিছু ঘটার সম্ভাবনা ওদের প্রোগ্রাম অনুসারে।

কেওগ বলে চলে, পিউরিপায়েড সেনটস্ ক্যানটিনের এক টেবিলে তিনজনে বসেছিলাম। চিন্তিত মেলিংগার গ্লাসে আঙুরের মদ ঢালে। আমিও চিন্তা করছিলাম।

চিন্তিতভাবে মেলিংগার বলল, এই দলটা খুব ধূর্ত। একটা বিদেশী রাবারের সিন্ডিকেটের কাছ থেকে পাওয়া টাকায় ওরা আকণ্ঠ ঘুষ দিতে প্রস্তুত। এই অবস্থা আমার সহ্য হচ্ছে না। সাসপেন্ডার পরে বেড়াতে বেড়াতে ইসট্ রিভারের ঘ্রাণ আমি আবার আমার নাকে পেতে চাই। এক এক সময় চাকরী ছেড়ে দেবার কথা মনে হলেও আমি এমনই একটা গর্দভ যে এই চাকরীর জন্য আমার গর্বও হয়। এখানে ওরা বলে, ওই যাচ্ছে মেলিংগার। দশলক্ষ টাকা দিলেও ওকে ছোঁয়া যাবে না। আমি এই রেকর্ড নিয়ে গিয়ে একদিন বিলিকে দেখতে চাই। যখন আমি মোটাসোটা একটি বস্তু দেখি যাকে একটি ভ্রূভঙ্গীতেই আমি কব্জা করতে পারি, আর সেই সঙ্গে আমার গোপন ব্যবসাটি খোয়াতে পারি, তখন সেই চিন্তাই আমার মুঠো শক্ত করে দেয়। আমাকে নিয়ে বাঁদর নাচ করাতে ওদের দেবো না। আর ওরা সেটা জানে। আমি আমার সৎভাবে উপার্জন করা অর্থ খরচ করি। কোনোদিন হয়ত কিছু টাকা জমিয়ে ফিরে গিয়ে বিলির সঙ্গে ক্যাভিয়ার খাবো। তুলো আর টিসু পেপারের আস্তরণ ছাড়িয়ে নিয়ে কি করে বানান করতে হয়, আজ রাত্রে তা আমি ওদের দেখাব।

হেলিংগার উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে পানীয় ঢালতে গিয়ে বোতলের গলায় ঠুকে গেলাস ভেঙে ফেলল। তখন তাই দেখে মনে মনে আমি বললাম, আমার ভুল হচ্ছে না, শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি, চোখের কোণ দিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি একটা ফাঁদ পাতা হয়েছে।

সেই রাত্রে ব্যবস্থা মতো, হাঁটু পর্যন্ত ঘাসে ঢাকা, ছোট রাস্তা ধরে, একটা কাঁচা ইটের বাড়ীতে, আমি আর হেনরি ফোনোগ্রাফটা নিয়ে গেলাম। লম্বা ঘরে তেলের বাতির আলোয় দেখতে পেলাম। অনেকগুলো চেয়ার আর শেষদিকে একটা টেবিল পাতা রয়েছে। মেলিংগারকে সেখানে পায়চারী করতে দেখলাম, ফোনোগ্রাফটাকে আমরা টেবিলের ওপর রাখলাম। সমস্যার চিন্তায় চঞ্চল মেলিংগার পায়চারী করতে করতে কখনও চুরুটটা চিবিয়ে থুথুর সঙ্গে ফেলে দিচ্ছিল আবার কখনও বা দাঁত দিয়ে বাঁহাতের নখ কাটছিল।

জোড়ায় জোড়ায় পা তিনজনের দলে আস্তে আস্তে গানের আসরে নিমন্ত্রিতের জড়ো হচ্ছিল। নানারকম তাদের গায়ের রং, মোলায়েম তাদের কথাবার্তা। সেনিওর মেলিংগারকে শুভ সন্ধ্যা জানাতে ওঁরা আনন্দে মরে যাচ্ছেন। আমি দুবছর মেকসিকোতে একটা রূপোর খনির পামপিং ইনজিন চালানোর ফলে ওদের স্প্যানিশ কথাবার্তা যে বুঝতে পারছিলাম তা ওদের বুঝতে দিলাম না।

প্রায় পঞ্চাশজন মতো আসার পর রাজ্যের গভর্নর এসে হাজির হল। দরজা থেকে মেলিংগার নিজে তাকে প্রধান বসবার আসন পর্যন্ত সঙ্গে করে নিয়ে এল। এই ল্যাটিন ব্যক্তিটিকে দেখে বুঝতে পারলাম সচিব মেলিংগারের কার্ডের সকল নাচাই কেড়ে নেওয়া হবে। বৃহদাকার, স্কোয়াশের মতো মুখের চেহারার লোকটির, রাবারের জুতোর মতো গায়ের রং আর হোটেলের প্রধান বেয়ারার মতো চোখের দৃষ্টি।

ঝরঝরে ক্যাস্টিলীয় ভাষায় তখন মেলিংগার বলল, যুগের আশ্চর্য, আমেরিকার বৃহত্তম আবিষ্কার, আমার সম্মানীয় বন্ধুদের কাছে উপস্থিত করতে পেরে, আমার আত্মা আনন্দে অস্থির হয়ে উঠছে।

ইঙ্গিত বুঝতে পেরে হেনরি একটি পিতলের ব্যান্ডের রেকর্ড চালিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উৎসব শুরু হল।

বাজনা থামলে, অল্প অল্প ইংরেজি জানা গভর্নর বলল, ভেরি ফাইন, গ্রর-রে-সিয়াস দি

আমেরিকান জেনটলমেন। দি সো এসপ্লেনেডীড মুজিক অ্যাজ টু পেইন।

লম্বা টেবিলটার একপ্রান্তে দেয়ালের দিকে আমি আর হেনরি বসেছিলাম। গভর্নর অন্য প্রান্তে। মেলিংগার এক পাশে ছিল। কেওগ বলে চলে, মেলিংগার কেমন করে এই দলকে সামলাবে সবেমাত্র ভেবেছি এমন সময় স্থানীয় প্রতিভা তার খেল শুরু করল।

এই গভর্নর ব্যক্তিটি বিদ্রোহ বা ষড়যন্ত্রের পক্ষে উপযুক্ত ছিল। সদা প্রস্তুত লোকটি খুব তৎপরও ছিল।

টেবিলে হাত রেখে দেশীয় ভাষায় মেলিংগারকে সে জিজ্ঞাসা করল, আমেরিকান সেনিওরেরা কি স্প্যানিশ জানেন?

না, জানে না।

মেলিংগার কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে ল্যাটিন ব্যক্তিটি বলল, তাহলে শুনুন, বাজনাটা চমৎকার হলেও অদরকারী। আমরা এখানে কেন এসেছি তা আমি ভালো করেই জানি, তাই কাজের কথায় আসা যাক। কারণ আমি এখানে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুদেরও দেখতে পাচ্ছি। সেনিওর মেলিংগার, আপনি গতকাল কানাঘুষোয় আমাদের প্রস্তাব শুনেছেন। আজ খোলাখুলি বলছি, আমরা জানি আপনি প্রেসিডেন্টের নেকনজরে আছেন, আর তাঁর ওপর আপনার প্রভাবও আমাদের অজানা নয়। সরকার বদল হবেই। আপনার কাজের মূল্যও আমরা বুঝি, আপনার সাহায্য ও বন্ধুত্ব আমাদের এতটাই কাম্য যে...

এই সময় মেলিংগার হাত ওঠায় কিন্তু গভর্নর তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, আমার বলা শেষ হলে আপনার যা বলার আছে আপনি বলবেন।

এবার গভর্নর কাগজে মোড়া একটা বান্ডিল পকেট থেকে বের করে মেলিংগারের হাতের কাছে রেখে বলল, এর মধ্যে আপনার দেশের মুদ্রায় পঞ্চাশ হাজার ডলার আছে, আপনি আমাদের বিরুদ্ধাচারণ না করলে আমাদের কাছে আপনার দাম অতগুলি টাকা হতে পারে। রাজধানীতে ফিরে গিয়ে আমাদের নির্দেশ মত কাজ করে যান। ওর সঙ্গে একটা কাগজে আপনার করণীয় সমস্ত কিছু লেখা আছে। আশা করি নির্বোদের মতো না বলবেন না।

গভর্নর থেমে গিয়ে মেলিংগারকে নিরীক্ষণ করতে লাগল। কেওগ বলল, আমি মেলিংগারের দিকে তাকিয়ে দেখি স্থানুর মতো দাড়িয়ে সে আঙুলের প্রান্ত দিয়ে প্যাকেটটিতে টোকা দিচ্ছে। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে। আমার মনে হল, বিলি রেনফো এসময়ে যে তাকে দেখতে পাচ্ছে না সেটাই ভালো। আমি নিজের মনে বললাম, কোলোরাডো মাডুরোর দল তার গোপন ব্যবসাটি আত্মসাৎ করতে চাইছে। একবার সে তার রাজনীতি পালটে, প্যাকেটটা পকেটে পুরে ফেলুক।

এই সময় ফিসফিস করে হেনরী বলল, অনুষ্ঠানে ছেদ পড়ল কেন?

আমিও একই ভাবে উত্তর দিলাম, এইচ. পি সেনেটারের মাপের বিরাট আকারের, ঘুষের খপ্পরে পড়েছে। এই কেলেগুলো ওকে ভাবিয়ে তুলেছে।

মেলিংগারের হাত প্যাকেটটির আরো কাছে চলে যাচ্ছে দেখে আমি ফিসফিস করে হেনরিকে বললাম, ও দুর্বল হয়ে পড়ছে।

হেনরী বলল, আমরা, নিউইয়র্কের থারটি-ফোরথ স্ট্রীটের বাদাম ভাজাওয়ালার কথা, ওকে মনে করিয়ে দেব।

হেনরী, অতি চমৎকার ও নিখুত, কর্ণেটের সোলো বাজানা, হোম, সুইট হোম নামক রেকর্ডটি, ঝুকে বাকস থেকে বের করে ফোনোগ্রাফে লাগিয়ে চালিয়ে দিল। সেই বাজনা চলাকালীন কেউ নড়াচড়া করেনি আর গভর্নর একদৃষ্টে মেলিংগারের দিকে তাকিয়ে ছিল। কেওগ বলে, এই সময় আমি দেখতে পেলাম মেলিংগারের মাথা আস্তে আস্তে উঁচু হচ্ছে আর তার হাতটা প্যাকেট থেকে সরে আসছে। রেকর্ডটি থামার সঙ্গে সঙ্গে মেলিংগার টাকার বান্ডিলটি তুলে নিয়ে গভর্নরের মুখে ছুঁড়ে মারল।

তারপর বলল, এটাই আমার উত্তর। আর একটা উত্তর কাল সকালে পাবে। তোমাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের যথেষ্ট প্রমাণ আমার কাছে আসে। অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে ভদ্র

মহোদয়গণ।

এইবার গভর্নর বলল, এখনো একটা অঙ্ক যে বাকি রয়েছে। তুমি তো প্রেসিডেন্টের চাকর। চিঠি নকল করো আর দরজায় কেউ ধাক্কা দিলে দরজা খুলে দাও। কিন্তু আমি এখানকার গভর্নর। এবার উপস্থিত অন্য সকলের দিকে ফিরে বলল। সেনিওরগণ, আমাদের আদর্শের খাতিরে, আমি আপনাদের আদেশ করছি, ওকে ধরুন।

ষড়যন্ত্রকারীদের দল চেয়ার ঠেলে একযোগে এগিয়ে এলে আমি বুঝতে পারলাম গ্র্যান্ড স্ট্যান্ডের নাটক করার লোভে দলবদ্ধভাবে শত্রুকে ডেকে মেলিংগার ভুল করেছে। অবশ্য ব্যক্তিগত বিচার বুদ্ধি অনুসারে মেলিংগার আর আমার ব্যবসা সম্বন্ধে মতভেদ থাকা অসম্ভব নয়।

সেই ঘরের সামনের দিকে একটি দরজা আর একটি জানালা ছিল। বিলি কেওগ বলে চলে, এদিকে জনা পঞ্চাশেক ল্যাটিন ব্যক্তি দলবেঁধে আসছে নিয়ম শৃঙ্খলার প্রতিভূকে বাধা দিতে।

আর ঠিক সেই সময়েই হেনরি পুরস কলার উঠে দাঁড়িয়ে দুহাত দিয়ে মাথায় দু'পাশের চুলগুলি সমান করে নিয়ে আমাকে ও মেলিংগারকে বলল, তোমরা দুজন আমার পিছনে এসো। আমি জিজ্ঞেস করি, কি করতে হবে, সরকার?

ফুটবলের ভাষায় হেনরি বলল, আমি ব্যাক সেন্টার করতে যাচ্ছি। ওদের মধ্যে কেউ ট্যাকল করতে জানে না। তোমরা দুজন খুব কাছাকাছি থেকে আমাকে অনুসরণ করো, আর জোরসে খেলা চালাও।

তারপর হেনরির মুখে একটা বিকট আওয়াজ শুনে সেই ল্যাটিন জনতা থেমে পড়ে, চিন্তিতভাবে ইতস্তত করতে শুরু করল। কারলাইলের যুদ্ধনাদ আর চেরোকী কলেজের জয়ধ্বনির মিশ্রণ ছিল তার চিৎকারে। একটি ছোট ছেলের নিগ্রো শুটার গুলতি থেকে বার হওয়া মটরদানার মতো সে সেই চকলেট রঙের জঙ্গলের মধ্য থেকে বেরুল। গর্ভনর তার ডান হাতের কনুই-এর ধাক্কায় ছিটকে ফায়ার প্লেসের জালির ওপর গিয়ে পড়ল। তাকে অনুসরণ করে আমি আর মেলিংগার তিন মিনিটে মিলিটারী হেড কোয়ার্টারে এসে একজন কর্নেল আর এক ব্যাটেলিয়ন খালি পায়ের পদাতিক নিয়ে সেই জলসার জায়গায় ফিরে গিয়ে দেখলাম চক্রান্তকারীর দল চলে গেলো। আমরা ফোনোগ্রাফটি ফিরে পেয়ে, যুদ্ধের সম্মান সহ, ছাউনিতে ফিরে এলাম "সব কালোই আমার কাছে একরকম" বাজাতে বাজাতে।

পরের দিন আমাকে আর হেনরিকে এক পাশে নিয়ে গিয়ে দশ আর কুড়ি ডলারের নোট ছাড়তে ছাড়তে মেলিংগার বলল। কালকের জলসার থেকে সুরটি আমার ভালো লেগেছিল, এই যন্ত্রটি আমি কিনতে চাই।

আমি বললাম, এতো মেসিনের দামের থেকে অনেক বেশী টাকা।

এতো সরকারী টাকা, মেলিংগার বলল, সরকার দিচ্ছে, তাছাড়া সুর বাজাবার এই যন্ত্রটি সরকার সস্তায় পাচ্ছে।

আমি ও হেনরি তা ভালোভাবেই জানলেও তাকে বলিনি যে আমরা জানতাম মেলিংগার যখন তার গোপন ব্যবসা প্রায় হারাতে বসেছে, তখন এই ফোনোগ্রাফ তা অটুট রেখেছে।

মেলিংগার এবার বলল, বন্ধুগণ, তোমরা এখন কিছুদিন এই উপকূল দিয়ে আরো নীচের দিকে চলে যাও। যতদিন না আমি এই বদমাশগুলো ধরছি। তোমরা না গেলে ওরা তোমাদের বিপদে ফেলবে। আর বিলি রেনফ্রোর সঙ্গে দেখা হলে তাকে বোলো সৎভাবে কিছু টাকা জমাতে পারা মাত্র আমি নিউইয়র্কে ফিরে আসছি।

আমি আর হেনরি কয়েকদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকার পর একদিন সেই স্টীমারটা ফিরে এলো।

বিলি জনকে বলল, তীরে ক্যাপ্টেনের নৌকা দেখে আমরা জলের কিনারায় গিয়ে দাঁড়ালে, আমাদের দেখে বিস্তৃত হেসে ক্যাপ্টেন বলল, বলছিলাম, তোমরা আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকবে। সেই মাসের পরোটা তৈরির মেসিনটা কোথায়?

আমি বললাম, ওটা এখন থেকে হোম, সুইট হোম বাজাবে।

ক্যাপ্টেন বলল, আমিও তাই বলেছিলাম। ওঠ নৌকায় ওঠ।

কেওগ বলল, এইভাবেই আমি আর হেনরি এই দেশে ফোনোগ্রাফের প্রচলন করি। হেনরি

স্টেটস-এ ফিরে যাবার সময় থেকে এই নিরক্ষীয় অঞ্চল আমি চুঁড়ে বেড়াচ্ছি। আমি জানতে পেরেছিলাম তারপর থেকে মেলিংগার নাকি ওই ফোনোগ্রাফটা ছেড়ে এক মাইল দূরেও থাকতে পারত না। আমার মনে হয় যখনি ও ঘুষদাতাদের ভৌতিক গলার আওয়াজ শুনতে পেত, আর তাদের চোখের ইশারা ও হাতে ঘুষের টাকা দেখতে পেত, তখনি ওটা ওকে ওর গোপন ব্যবসার কথা মনে করিয়ে দিত।

শেষে কনসাল বলল, আমার মনে হচ্ছে ও ওটা একটা স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে দেশে নিয়ে যাচ্ছে।

কেওগ বলল, না স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে নয়। একটা দিনে ও একটা রাত্রে বাজাবার জন্য নিউইয়র্কে ওর দুটো লাগবে।

সাত

টাকার ধাঁধা

উৎসাহের সঙ্গে সাঞ্চুরিয়ার নতুন সরকার তাদের কাজ শুরু করল। তাদের প্রথম কাজ হল, ট্রেজারি থেকে হতভাগ্য মিরাফ্লোরেসের সরানো অর্থ, যে কোন উপায়ে সম্ভব, উদ্ধার করার জন্য একজন প্রতিনিধিকে কোরালিওতে পাঠানো। এই জরুরী কাজের ভার দিয়ে পাঠানো হল নতুন প্রেসিডেন্ট লোসাদার একান্ত সচিব কর্নেল এমিলিও ফালকনকে। উষ্ণমণ্ডলের কাজ প্রেসিডেন্টের একান্ত সচিবের পদে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কূটনীতিজ্ঞ গুপ্তচর, প্রশাসক, প্রধানের দেহরক্ষী ভ্রাণ অবস্থায় গোপন চক্রান্ত বা বিস্ময়ের ষড়যন্ত্র ঘ্রাণশক্তির দ্বারা আন্দাজ করার ক্ষমতা সম্পন্ন হতে হবে। পিছনে থেকে সকল শক্তি বা নীতির নির্দেশ তিনিই দিয়ে থাকেন বলে, প্রেসিডেন্ট বিবাহের পাত্রী নির্বাচনের থেকেও অধিক যত্ন সহকারে তাঁকে নির্বাচন করেন। স্প্যানিস সৌজন্যতা ও সুস্মিত মেজাদের সুন্দর ও শিক্ষিত ভদ্রলোক কর্নেল ফালকন কোরালিওতে এলেন হারিয়ে যাওয়া টাকার থলি খুঁজে বের করার কাজ নিয়ে। কাসা মোরেনার একটি কামরায় অফিস বসিয়ে ফালকন, একক প্রধান জুরী হয়ে এক সপ্তাহ ধরে আধাসরকারী অধিবেশন ডাকলেন। এছাড়া মিলিটারী কর্তাদের সঙ্গেও তিনি আলোচনা করলেন। প্রয়াত প্রেসিডেন্টের মৃত্যুর মতো সামান্য ট্র্যাজেডির সঙ্গে ঘটা আর্থিক ট্রাজেডির ব্যাপারে সামান্য আলোকপাত করতে পারে, এমন সমস্ত ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দিতে তিনি ডেকে পাঠালেন।

সাক্ষ্য দিতে ডাকা ব্যক্তিদের মধ্যে দু তিন জন বলল যে তারা সমাধির পূর্বে প্রেসিডেন্টকে সনাক্ত করেছিল। এদের মধ্যে নাপিত এসতেবানও ছিল।

সচিবের সামনে দাঁড়িয়ে এসতেবান বলল, হ্যাঁ, সেই ব্যক্তি যে প্রেসিডেন্ট ছিলেন এই ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। চিন্তা করে দেখুন, যার দাড়ি কামাবো তার মুখ দেখবনা তা কি হয়? একটি ছোট বাড়িতে তিনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন তাঁর দাড়ি কামিয়ে দেবার জন্য। প্রেসিডেন্টকে গলিটাকে একবার অনেক দূর থেকে গাড়ীতে করে যেতে দেখেছিলাম। তাঁর দাড়ি কামিয়ে দিলে তিনি আমাকে একটি সোনার টাকা দিয়ে বলেছিলেন ব্যাপারটা কেউ যেন জানতে না পারে। কিন্তু আমি একজন দেশভক্ত লিবারেল। তাই সেনিওর গুডউইনকে কথাটা বলেছিলাম।

শান্ত স্বরে কর্নেল বললেন, বিগত প্রেসিডেন্টের সঙ্গে একটি বড়ো চামড়ার ব্যাগ ছিল বলে জানা গেছে। তুমি কি সেটা দেখেছিলে?

সত্যি বলতে কি, তা আমি দেখি নি। সেই ছোট বাড়ীতে তেলের বাতিতে প্রেসিডেন্টের দাড়ি কামাতেই অসুবিধা হচ্ছিল আমার, তাই এরকম কিছু থেকে থাকলেও আমি দেখতে পাই নি। অবশ্য কম আলোতেও, সে ঘরে একজন অতি সুন্দরী তরুনী মহিলা ছিল দেখতে পেয়েছিলাম। কিন্তু টাকা বা ব্যাগ কোনো কিছু দেখি নি।

হোটেল সে লোম এসত্রানজারোস থেকে আসা গুলির আওয়াজে জেগে উঠে সতর্ক হয়েছিল বলে কমানডানট ও অন্য অফিসারের সাক্ষ্য দিল। তারা জানাল যে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও সম্মান রক্ষার্থে তারা সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে এসে দেখতে পায় একজন মৃত ব্যক্তিকে যার হাতে একটা পিস্তল ধরা ছিল। সেই মৃত ব্যক্তির পাশে বসে একজন তরুণী খুব খুব কাঁদছিল আর সেনিওর

গুডউইন তখন সেই ঘরে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু টাকার ব্যাজ তারা দেখে নি।

মাদামা টি মোতি ওরতিজ বললেন, একজন সেনিওর ও একজন খুব সুন্দরী সেনিওরিটা আমার বাড়িতে এসে বলেছিল কোন খাদ্য ও পানীয় লাগবেনা। তারা নয় ও দশ নম্বর ঘরে চলে গেলে কিছুক্ষণ পরে সেনিওর গুডউইন এসে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে ওপরে চলে গেলেন। তারপরে কিছুক্ষণ বাদে ভীষণ জোর একটা শব্দ শুনলাম এবং পুরনো প্রেসিডেন্ট আত্মহত্যা করেছেন শুনতে পেলাম। এসতা বিউয়েনো আমি টাকার কথা কিছুই জানি না।

সেনিওর গুডউইন ছাড়া আর কারো পক্ষে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া টাকার সন্ধান দেওয়া অসম্ভব বুঝতে পেরে বিজ্ঞ সচিব অন্য রাস্তায় তার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা শুরু করলেন। কারণ কর্নেল ফালকন জানেন নতুন সরকারের শক্তিশালী বন্ধু সৎ ও সাহসী গুডউইনের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে কোন পন্থা গ্রহণ করা যাবে না। রাবারের রাজপুত্র ও মেহগিনির জমিদার গুডউইনকে সাধারণ নাগরিকের মতো জিজ্ঞাসাবাদ করতে ইতঃস্তত করে শেষ পর্যন্ত ফালকন একটি মধু সেরা পত্র লিখে পাঠিয়ে একটি সাক্ষাৎকার মঞ্জুর করতে অবেদন জানালেন গুডউইন তার উত্তরে তাঁকে তার বাড়িতে রাত্রে একসঙ্গে খাবার নিমন্ত্রণ জানালেন।

নির্ধারিত সময়ের পূর্বে গুডউইন নিজে গিয়ে বন্ধুভাবে অতিথিকে অভিবাদন করে দুজনে পায়ে হেঁটে তার বাড়ীতে এলো।

গুডউইন কর্নেল ফালকনকে পালিস করা কাঠে মেঝের বড়ো একটা ঠাণ্ডা ছায়া ঘেরা ঘরে বসতে দিয়ে কিছু সময় চেয়ে নিয়ে, গাছপালা ও জাফরী দিয়ে ছায়া করা একটি বারান্দা পেরিয়ে সমুদ্রের দিকে একটি লম্বা বড়ো কামরায় এসে হাজির হল যেখানে জানালার পাশে বসে তার স্ত্রী বিকেলের সমুদ্রের একটি জল রঙের ছবি আঁকছিল।

এই স্ত্রীলোকটিকে দেখলেই মনে হবে যে সে সুখী এবং তৃপ্ত। তার স্বামী ঘরে এলে সে মুখ তুলে তাকাল। চোখের পাতা কয়েকবার কেঁপে উঠল। মৃদু বাতাসে হিল্লোলিত উইলো গাছের মতো তার দেহ সামান্য তরঙ্গিত হল। দিনের মধ্যে বিশবার তার স্বামী তার কাছে এলে সে এইরকম একইভাবে সাড়া দিত। কোরালিওতে যারা মদের বোতল সামনে নিয়ে ই সাবেল ভিলেপটের জীবনের বিচিত্র কাহিনী আলোচনা করত তারা সেসব ভুলে যেত বা বিশ্বাস করতে চাইত না যদি সেই অপরাহ্ণে গৃহিনীর সম্ভ্রম ও মহিমায় তাকে দেখত।

গুডউইন স্ত্রীকে বলল, কর্নেল ফালকনকে আজ রাতের খাবারের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছি। সানমাটেও থেকে সরকারী কাজে ইনি এসেছেন। তার সঙ্গে তোমার দেখা হওয়ার কোনো কারণ আছে বলে আমার মনে হয় না। তাই আমি তোমার জন্য স্ত্রী সুলভ আর অনিন্দ্যনীয় মাথাধরার ব্যবস্থা করলাম।

স্কেচ দিকে তাকিয়ে থেকেই মিসেস গুডউইন বলল, সেই হারানো টাকার অনুসন্ধানের ব্যাপারেই এসেছে, না?

ঠিকই ধরেছ, স্থানীয় লোকেদের গত তিন দিন ধরে জেরা করলেও আঙ্কল স্যামের একজন প্রজাকে কাঠগড়ায় টেনে আনতে লজ্জা পাচ্ছিল বলেই ব্যাপারটাকে বাইরে থেকে একটা সামাজিক অনুষ্ঠানের চেহারা দিয়েছে। আর আমারই খাদ্য ও পানীয়ের সদব্যবহার করতে করতে আমাকে নির্যাতন করবে।

টাকার ব্যাগটা দেখেছে, এমন কোন লোককে পেয়েছ কি?

একজনও নয়। শুল্ক বিভাগের লোক কখন আসছে তা দেখার জন্য সর্বদা সর্তক মাদামা ওর-তিজ পর্যন্ত বলতে পারেননি কোন মালপত্র আদৌ ছিল কি না।

মিসেস গুডউইন তুলি নামিয়ে রেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ওই টাকার ব্যাপারে ওরা তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে বলে আমি খুব দুঃখিত ফ্রাঙ্ক। কিন্তু আমরা ওদের জানাতে দিতে পারি না। তাই না?

হেসে উঠে গুডউইন বলল, তা দিলে আমাদের বুদ্ধি বিবেচনার প্রতিই ঘোর অবিচার করা হবে।

এবার সেনেটিওদের কাছে চোখ একধরণের কাঁধ ঝাকানি দিয়ে গুডউইন আবার বলল, 'আমেরিকানো' যদিও আমি কিন্তু ওই টাকার ব্যাগটা আমরা আত্মস্যাত করেছি ওরা যেই জানতে

পারবে সঙ্গে সঙ্গে ওরা আমাকে কালাবোলায় নিয়ে যাবে। না, কোরালিওর আর পাঁচজন মূর্খের মতো টাকার ব্যাপারে আমরাও অজ্ঞ সাজব।

ভ্রূদুটি কুঁচকে শ্রীমতী গুডউইন বলল, লোকটি তোমাকে সন্দেহ করে বলে কি তোমার মনে হয়?

নিরুদ্বেগ গলায় গুডউইন বলল, সন্দেহ না করাই তারপক্ষে মঙ্গলজনক। ভাগ্যিস টাকার থলিটা কেবল আমার চোখে পড়েছিল। যেহেতু গুলি ছোঁড়ার সময় আমি সেই ঘরে ছিলাম তাই ওই ব্যাপারে আমার ভূমিকা ঠিক কতটা সেটা ওরা বিশেষ করে তদন্ত করবে। তুমি কিছু চিন্তা কোরো না। ঘটনার সূচী অনুযায়ী কর্নেলের একটি ভালো নৈশাহারের শেষে মিষ্টান্নের পরিবর্তে আমেরিকান ধাপ্পা পাওনা রয়েছে। আমার মনে হয়, এই ব্যাপারের এখানেই শেষ হবে।

মিসেস গুডউইন আসন ছেড়ে উঠে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালে গুডউইন তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। গুডউইনের শক্তিমান দেহের ওপর ভর দিয়ে তার স্ত্রী কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। জানালার সামনে উষ্ণমণ্ডলের ঘন সবুজ শাখা, পাতা ও লতার প্রাচুর্যের ভিতর দিয়ে নিপুণ দৃশপটের শেষে কোরালিওর সুন্দরী গাছের জলার পরিষ্কার করা অংশ। এই শূন্যময় সুড়ঙ্গের অন্যপ্রান্তে হতভাগ্য মিরাফ্লোরেসের সমাধি তাদের নজরে পড়ছে। বর্তমান সুখের পক্ষে বিঘ্নকারী না হলেও, বৃষ্টির জন্য যখন নিকটে যাওয়া সম্ভব না হলে, এই জানালা দিয়ে, গুডউইনের সবুজ ফলবান জমির ওপর থেকে তার স্ত্রী সেই সমাধির দিকে শান্ত ও বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

হঠাৎ মিসেস গুডউইন বলে উঠল, সেই পালানো আর তার ভয়ঙ্কর পরিণাম সত্ত্বেও আমি তাকে কত ভালবাসতাম ফ্রাঙ্ক। তুমি আমাকে কত দয়া, কত সুখী করেছ। সব কিছু কেমন জটিল ধাঁধার মতো হয়ে গেল। আচ্ছা টাকাগুলো আমরা পেয়েছিলাম তা ওরা জানাতে পারলে, ওরা কি তোমাকে সেগুলো সরকারকে ফেরত দিতে বাধ্য করতে পাবে?

নিশ্চয়ই ওরা সে চেষ্টা করত। ফালকন আর তার দেশের লোকেদের কাছে আজ না থেকে যতক্ষণ না এর সমাধান হচ্ছে ততক্ষণ তোমার কথা মতো ধাঁধা ধাঁধাই থাকুক। যার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী জানা, তুমি আর আমিও, সমাধানের অর্ধেকটা জানি। এই টাকার ব্যাপারে কোনো ইঙ্গিত আমরা বাইরে যেতে দিতে পারিনা। প্রেসিডেন্ট পাহাড়ের মধ্যে টাকাগুলি লুকিয়ে রেখেছিলেন বা এখানে পৌঁছবার আগেই জাহাজে করে টাকাগুলি বাইরে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলেন ইত্যাদি যে কোন থিয়োরীতে ওরা আসুক। ফালকন আমাকে সন্দেহ করে বলে আমার মনে হয় না। নির্দেশ মতো ফালকন খুব সতর্ক ভাবে নিখুঁত তদন্ত করার চেষ্টা যদিও করছে তবুও কিছুই জানতে পারবে না।

ওদের মধ্যে এই সব কথাবার্তা চলা কালীন কেউ গোপনে সেকথা শুনলেও সহজে বিশ্বাস করতে পারত না। কারণ এই সব কথাবার্তা চলাকালীন তাদের দুজনের মুখের চেহারায় ও ভঙ্গীতে দেখা যাচ্ছিল স্যাকসন সততা, গর্ব আর সম্মানযোগ্য চিন্তা। গুডউইন-এর স্থির চোখ আর দৃঢ় মুখভঙ্গীতে তার বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কোন ভাবই ফুটে ওঠে নি। আর দোষীসুলভ কথাবার্তা সত্ত্বেও তার স্ত্রীর মুখসৌষ্ঠব নিষ্কলুষতা ঘোষণা করছে। ভঙ্গীতে মহিমা, দৃষ্টিতে পবিত্রতা, তার স্বতস্ফূর্ত আত্ম নিবেদন একবারের জন্যও এই চিন্তা জাগায় না যে প্রেমের জন্য, প্রেমাস্বাদের অপরাধের ভাগ যে নিয়েছে। চোখের দেখা আর কানের শোনার মধ্যেই যা শুধু অসঙ্গতি রয়েছে।

সামান্য ঠাণ্ডা লেগে, শ্রীমতি গুডউইন মাথার যন্ত্রণায় অসুস্থ হয়ে উপস্থিতে থাকতে পারছেন না বলে, আমেরিকান জাহাজগামী সচিবের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করে নিল। এরপর লতা ও ফুলের মাঝখানে শীতল বারান্দায় গুডউইন আর তার অতিথি নৈশাহার সারতে বসল।

আহারের পর প্রথামতো কফি আর সিগার নিয়ে বসার পর, স্প্যানিশ সৌজন্যতার রীতি অনুসারে, যে বিষয় আলোচনার জন্য আজকের এই আয়োজন, গৃহস্বামী তা উত্থাপন করবেন বলে, কর্নেল অপেক্ষা করতে লাগলেন। খুব অল্পসময়ের মধ্যেই আমেরিকান কর্নেলের কাছে জানতে চাইল। মাননীয় সচিব মহাশয়ের তদন্ত হারানো টাকা ফিরে পাওয়ার ব্যাপারে এ পর্যন্ত কোনো আলোকপাত করতে পেরেছে কি?

ফালকন বলল, আমি এখনও পর্যন্ত হতাশা হয়ে পড়িনি, যদিও এমন একজনকেও দেখতে

পেলাম না যে সেই ব্যাগ বা টাকাটা দেখেছে। অপেরা গায়িকা ইসাবেল জিলবার্টকে সঙ্গে করে প্রেসিডেন্ট সিরাফ্লোরেস এক লক্ষ ডলার নিয়ে সানমাটেও থেকে রওনা হয়েছিলেন, এ ব্যাপারে যাবতীয় প্রমাণ রাজধানীতে রয়েছে।

একটু থেমে ফালকন হেসে বলল, আমাদের বিগত প্রেসিডেন্ট তাঁর পলায়ন পথে বাড়তি বোঝা স্বরূপকাম্য বস্তু দুটির একটিকেও পরিত্যাগ করবেন বলে, সরকার সরকারী ভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করতে চায় না।

গুডউইন বলল, এই ব্যাপারে আমার বক্তব্য আপনাকে জানাতে বেশী কথা খরচ করার দরকার হবে না।

কিছু সময় চুপ থাকার পর গুডউইন বলতে শুরু করে, সেই রাতে অন্য বন্ধুদের সাথে আমি এখানে প্রেসিডেন্টের সন্ধানে ছিলাম। ইতিপূর্বে আমাদের জাতীয় গোপন বার্তায় রাজধানীতে আমাদের নেতা, ইঙ্গলহার্ট-এর একটি টেলিগ্রামে আমাকে জানানো হয়েছিল। রাত্রি দর্শটা নাগাদ একজন লোক ও একটি স্ত্রীলোক দ্রুত রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে দেখে তাদের অনুসরণ করে হোটেল দেলোস এসত্রানজারোস-এ পৌঁছে ওপর তলায় তাদের ভাড়া দেওয়া ঘরে যাই। নীচে এসতেবান কে রেখে যাই যে সেইরাতে প্রেসিডেন্টের দাড়ি কামিয়েছে জানতে পারি। জনগণের তরফ থেকে তাঁকে অভিযোগ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পিস্তল বের করে নিজেকে গুলি করলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কয়েক মিনিটের মধ্যেই অনেক অফিসার আর নাগরিকেরা সেখানে এসে পড়ে। এর বারের ঘটনা আপনি জানেন বলেই আমার মনে হয়।

গুডউইন থেমে গিয়ে ফালকন-এর দিকে তাকিয়ে দেখে সে তার দিকেই চেয়ে আছে। তখন গুডউইন আবার বলল, আমি এখন যা বলব যত্ন করে শুনে তারপর আপনি আমাকে বাধিত করবেন। আমি মাঞ্চুরিয়া সরকারের টাকা বা কোন থলি দেখিনি। প্রেসিডেন্ট সিরাক্লোরেন্স নিজের বা সরকারী তহবিলের টাকা নিয়ে পালিয়ে থাকলেও, সেই সময়ে বা অন্য কোন সময়ে, সেখানে বা অন্যত্র, তার কোন চিহ্ন আমি দেখিনি। আমি আশা করছি আমার বিরুদ্ধে আপনার যা কিছু তদন্ত করার ছিল তা এই উক্তির ফলে মিটেছে।

কর্নেল ফালকন মাথা নত করে অভিবাদন জানালেন। তাঁর কর্তব্য শেষে হয়েছে। গুডউইন সরকারের অনুগত সেবক এবং তার প্রতি নতুন প্রেসিডেন্টের পূর্ণ আস্থা থাকায় তাঁর কথার প্রতিবাদ করা যায় না। মেলিংগারের গোপন ব্যবসা যেমন তাঁকে বিশ্বাসী করেছিল তেমনি চরিত্রের ঋজুতা গুডউইন কে করেছিল।

কর্নেল ফালকন বললেন, এই খোলাখুলি কথাবার্তা বলার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সেনিওর গুডউইন। প্রেসিডেন্টের কাছে আপনার মুখের কথাই যথেষ্ট। কিন্তু সেনিওর, এই ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি সূত্র ধরে আমাকে অনুসরণ করতে নির্দেশ দেওয়া হলেও এর একটির কাছেই এখনো আমি আসতে পারিনি। কোনো একটা রহস্যের হদিশ না পাওয়া গেলে আমাদের ফরাসী বন্ধুরা বলেন সেরেসে লা ফাম। এক্ষেত্রে অবশ্য আমাদের খুঁজে দেখতে হবে না। প্রেসিডেন্টের পলায়নের সময়ে তাঁর সঙ্গিনী নিশ্চয়ই...

কথা শেষ করতে না দিয়েই গুডউইন বলে উঠল, এক্ষেত্রে আমি আপনাকে বাধা দেব। এটা ঠিক কথা যে যখন আমি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সেই হোটেলে দেখা করতে আসি তখনো সেখানে একজন মহিলা ছিলেন। কিন্তু দয়া করে এটা মনে রাখবেন যে বর্তমানে তিনি আমার স্ত্রী। আমার বলা কথাগুলি আমাদের উভয়ের পক্ষ থেকেই বললাম। আপনাদের খোঁজা টাকা বা ব্যাগের বিষয়ে উনিও কিছুই জানেন না। মহামহিম প্রেসিডেন্টকে আপনি বলবেন যে তাঁর নির্দেশীতার নিশ্চয়তা দিচ্ছি। আমি চাইনা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বিরক্ত করা হোক।

কর্নেল ফালকন পুনরায় মাথা নামিয়ে অভিবাদন করে উচ্চ কণ্ঠে বললেন, না না, বিলক্ষণ। তবে আমার যে বহির্দৃশ্যের কথা আপনি বলেছিলেন আপনার গ্যালারি থেকে দয়া করে তা আমাকে দেখান। সমুদ্র আমার ভীষণ ভাল লাগে।

পরে গুডউইন তার অতিথিকে কালে গ্রানদের একপ্রান্তে বিদায় অভিবাদন জানিয়ে ছেড়ে দিয়ে বাড়ীর দিকে ফেরার সময়, একজন 'বীলজিবাব' ব্লাইদ একটা বার-এর দরজায় কিছু প্রাপ্তির আশায়

পাকড়াও করল।

অধঃপতনের বিরাটত্বের স্বীকৃতি হিসেবে ব্লাইদের নতুন নামকরণ হয়েছিল। একদা কোন অতীতে স্বর্গ হতে বিদায়ের কালে দেবদূতদের সঙ্গে মেলামেশা থাকলেও নিয়তি তাকে মাথা নীচু অবস্থায় উষ্ণ মণ্ডলে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল। তার বুকের মধ্যে ছিল পিপাসার জ্বালা যা কখনো মিটত না। রাম আর ব্রান্ডির সাহায্যে জীবনের নিরস সত্যগুলি বিশ্লেষণের প্রচেষ্টায় সে রত থাকলেও কোরালিওতে সকলে তাকে সমুদ্রতীরের কুড়ানো দলের একজন বলে। বীলজিবারের মতোই, তার হৃত ঐশর্যের চিহ্ন হিসাবে তার হাতের মুঠোয় অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে একটি সোনার ফ্রেমের চশমা, ধরে রেখেছিল। সমুদ্রতীরে টহল দিতে বেরুবার সময়, তার বন্ধুদের থেকে মাশুল আমাদের জন্য, দর্শনীয় বিশিষ্টতার সঙ্গে সে এই চশমা পরত। তার মদের প্রভাবে রক্তিম মুখমণ্ডল কোন অজানা উপায়ে মসৃণভাবে কামানো থাকত। পর্যাপ্ত মাতলামি আর বৃষ্টি ও হিমের হাত থেকে রক্ষা পাবার আশ্রয় পেতে প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য, বেশ মহিমার সঙ্গে সে যেকোন লোককে শোষণ করত।

সেই হতভাগা চেঁচিয়ে ডাকল, হ্যালো গুডউইন, আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম। চলো কথা বলা যাবে এখন কোথাও যাই। হতভাগ্য মিরাফ্লোরেস যে টাকাগুলি হারিয়েছিল সেগুলি উদ্ধারের জন্য একজন লোককে এখানে পাঠানো হয়েছে তুমি নিশ্চয়ই তা জানো।

হ্যাঁ, এতক্ষণ আমি তার সঙ্গেই কথা বলছিলাম। আমি তোমাকে মাত্র দশমিনিট সময় দিতে পারি। চলো এসপাদার দোকানে যাই।

তারা বার-এ কাঁচা চামড়ায় মোড়া ছোটছোট টুলে বসার পর গুডউইন বলল, কিছু পান করবে তো।

সকাল থেকে আমার ভিতরটায় খরা চলছে। যত তাড়াতাড়ি পারো আনাও। তারপর গুডউইনের অপেক্ষা না করেই সে একটি ছেলেকে চেঁচিয়ে বলল, ওকে ছোকরা আমাদের জন্য একটি করে ব্র্যান্ডি।

পানীয় দিয়ে যাবার পর গুডউইন বলল, আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলে কেন?

জড়িত গলায় ব্লাইদ বলল, চুলোয় যাক ভাই সে কথা, তোমার সাক্ষাৎ চাইলেও এখন এইটাই আমার পছন্দ।

সবটা ব্র্যান্ডি গলায় ঢেলে গিয়ে সতৃষ্ণভাবে সে গেলাসটার দিকে তাকিয়ে থাকলে গুডউইন বলল, আর একটা নাও।

ব্লাইদ বলল, ভদ্রলোকদের মধ্যে তোমার ওই একটি শব্দ আমি পছন্দ না করলেও, ওই শব্দটি যে ভাবমূর্তি বোঝাচ্ছে সেটি মন্দ নয়।

গেলাসগুলি আবার ভর্তি হলে মহানন্দে তাতে চুমুক দিয়ে আস্তে আস্তে ব্লাইদ প্রকৃত আদর্শবাদীর অবস্থার দিকে এগিয়ে চললে গুডউইন তাকে স্মরণ করিয়ে দিল, কোন বিশেষ কিছু বলার থাকলে বলে ফেল। কারণ দুই এক মিনিটের মধ্যেই আমাকে যেতে হবে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ব্লাইদ বলল, যে ব্যক্তি ট্রেজারির টাকা সরিয়েছে, তার পক্ষে এই দেশকে বুড়ো লোসাদা অত্যন্ত গরম করে তুলবে না? তুমি কি বলো?

গুডউইন আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে শান্তস্বরে বলল, নিঃসন্দেহে তা সে করবেই। মিসেস গুডউইন বাড়ীতে একলা রয়েছেন। আমাকে এবার যেতে হবে। বিশেষ কিছু দরকার তোমার ছিল না, কি বলো?

ব্লাইদ বলল, ঠিক আছে যাও, অবশ্য যাবার আগে যদি বার থেকে আর এক গ্লাস পানীয় পাঠিয়ে দাও। লাভ লোকসান খতিয়ে দেখে, বুড়ো এসপাদা আমার বাকির খাতায় বন্ধ করে দিয়েছে। আর লক্ষ্মীছেলের মতো তুমি নিশ্চয়ই এইসব গুলির দামও দিয়ে যাবে?

ঠিক আছে, শুভ রাত্রি।

ব্লাইদ তার মদের গ্লাসের সামনে বসে একটি নোংরা রুমাল দিয়ে সোনার চশমার ফ্রেম পালিশ করতে করতে নিজের মনেই বলল, ভেবেছিলাম পারব, কিন্তু পারলাম না। কারুর সঙ্গে পান করতে বসে কোনো ভদ্রলোক কি তাকে ব্ল্যাকমেল করতে পারে?

আট

নৌ সেনাপতি

আঞ্চুরিয়া সরকারের দুধের উৎস অনেকগুলি, আর ঘড়ির কাঁটা সব সময়ই দোহন করার কাল ইঙ্গিত করছে ফলে চলকে পড়া দুধের জন্য তার চোখে জল ঝরে না। স্বত্বারূঢ় দেশপ্রেমিকেরা ট্রেজারি থেকে চন্দ্রাহত মিরাফ্লোরেসের মসৃণ করা ঘন নবনীত-এর জন্য বৃথা হা হুতাশ করে সময় নষ্ট করল না। ঘাটতি পূরণের জন্য সরকার আমদানী শুল্ক বাড়িয়ে দিল আর দেশপ্রেমের পরিচয় দিতে ধনী নাগরিকদের যে যার সামর্থ্য মতো অর্থ সাহায্য করার ইঙ্গিত দিল। এদিকে ক্ষমতা চ্যুত পদাধিকারী ও সামরিক পেটোয়ারা নতুন একটি লিবারেল পার্টি তৈরী করে আবার ক্ষমতায় ফিরে আসার চেষ্টা শুরু করল। আঞ্চুরিয়াতে রাজনীতির খেলা শুরু হল।

প্রেসিডেন্ট আর তাঁর ক্যাবিনেটের একটি মামুলি বৈঠকে এক ডজন কোয়ার্ট শ্যামপেনের সঙ্গে একটি নৌবহরের সৃষ্টি হল যার নৌ সেনাপতি নিযুক্ত হল ডনফেলিপ ক্যারেরা।

শ্যামপেনের পরে, এই নিয়োগের বাহাদুরির অনেকটা প্রাপ্য সদ্য স্থায়ীকৃত যুদ্ধ মন্ত্রী ডন সাবাস প্লাসিডোর।

কয়েকটি রাজনৈতিক প্রশ্নের ও রাষ্ট্রের দৈনন্দিন কাজকর্মের আলোচনার জন্য প্রেসিডেন্ট ক্লান্তিকর ক্যাবিনেটের বৈঠক ডেকেছিলেন। ডন সাবাসের এক হঠাৎ পাগলামির মেজাজের ফলে রক্ষীর রাষ্ট্র চিন্তার মধ্যে এক চিমটে কৌতুকের মশলা মেশানো হল।

কার্যধারা বিলম্বকরণের মধ্যে ছিল কোরালিও শহরের ওরিলা দেল যার উপকূল অঞ্চলে কাসটম হাউসের আটক করা পালতোলা জাহাজ এসত্রেলা দেল নগ-এর বিষয় একটি রিপোর্টের আলোচনা ঔষধ, চিনি, থ্রিস্টার ব্র্যান্ডি, ছয়টি মার্টিনি রাইফেল ও আমেরিকান হুইসকি সমেত স্মাগলিং-এর মাঝে হাতে হাতে ধরা পড়ে আইনত জাহাজটি এখন রাষ্ট্রের সম্পত্তি।

জলযানটি সরকারী কাজে লাগানো উচিত বলে কাস্টমসের কালেকটর তাঁর গতানুগতিক রিপোর্টের বাইরে লিখেছিল।

দশবছরের মধ্যে তার ডিপার্টমেন্টের ওই একটাই সাফল্যের ফল কালেকটর তার নিজের ডিপার্টমেন্টের পিঠ চাপড়ানোর সুযোগ নিয়েছিল।

কালেকটর তাঁর রিপোর্টে এর উল্লেখ করেছিল যে সরকারী অফিসারদের উপকূল বরাবর নানা জায়গায় যাবার জন্য প্রয়োজনীয় কোনো যানবাহনের ব্যবস্থা নেই তাছাড়া একদল উপকূল রক্ষী দিয়ে জাহাজটি চালালে স্মাগলিং-এর প্রকোপও কমতে পারে।

এবার কালেকটর খুব জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন না হলেও বিশ্বস্ত আর এই অঞ্চলের সর্বশ্রেষ্ঠ নাবিক, ফেলিপ ক্যারেরার হাতে তরীটি ছেড়ে দেবার প্রস্তাব দেয়।

এই সময়ে যুদ্ধমন্ত্রীর একটি পরিহাসের ফলে সভার একঘেয়েমি দূর হয়ে তাতে প্রাণ সঞ্চার করল।

সমুদ্রতীরের এই কদলীরাষ্ট্রের সংবিধানে রাষ্ট্রের একটি নৌবহর রাখার ব্যাপারে একটি ধারা ছিল সেটা থাকলে ভুলেই গিয়েছিল। এই ধারাটি আরও অনেকগুলি সদ্বিবেচনা প্রসূত ধারার মতো প্রথম থেকেই কার্যকর না হওয়ায়। এতদিন আঞ্চুরিয়াতে কোনো নৌবহর ছিল না। বিদ্বান, আমুদে খামখেয়ালী ও দুর্বিনীত ডন সাবানের পত্রেই এটা সম্ভব হয়েছিল, যে সংবিধানের এই ভুলে যাওয়া অনুচ্ছেদটি পৃথিবীতে কৌতুকের ভার বৃদ্ধি করবে, নিদেনপক্ষে তাঁর উৎসাহী সহকর্মীদের হাসির দ্বারাও।

ছদ্মগাম্ভীর্যের সকৌতুক ভঙ্গীতে যুদ্ধমন্ত্রী একটি নৌবহর সৃষ্টির প্রস্তাব করার পর তার বিতর্কে এর প্রয়োজনীয়তা ও দেশের সম্ভাবনার কথা এমন হালকা, রঙ্গভরা উৎসাহে বললেন যার ফলে প্রেসিডেন্ট লোসাদার গাম্ভীর্যও, প্রহসনটির পরিহাসে প্রভাবিত হল।

গুরুতর রাষ্ট্র বিষয়ক আলোচনা পানীয় দ্বারা লঘু করার রীতি আঞ্চুরিয়ার গম্ভীর শাসক মহলে প্রচলিত না থাকলেও সেই সব তরলমিত রাজপুরুষদের শিরায় শিরায় ছিল উচ্ছল শ্যামপেন। আঞ্চুরিয়া প্রজাতন্ত্র ও ভিসুভিয়াস ফল কোম্পানীর মধ্যে কয়েকটি চুক্তি সম্পন্ন হবার পর হৃদ্য সম্পর্কের নিদর্শন হিসেবে সেই কোম্পানীর একজন প্রতিনিধি এই দাক্ষাসব ভেট পাঠিয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত সাড়ম্বরে, রঙীন শীলমোহর, ঝকমকে রিবন ও ফুলকাটা হস্তাক্ষরের সহি সমেত একটি সরকারী নথি তৈরি হল। সেনিওর ডন ফেলিপ ক্যারেবাকে এই সনদটি আঞ্চুরিয়া প্রজাতন্ত্রের ফ্ল্যাগ অ্যাডমিরাল রূপে ভূষিত করল। এর ফলে এক ডজন একস্ট্রা ড্রাই বোতলের প্রতাপে পাঁচ মিটের মধ্যে বিশ্বের নৌশক্তির এক সদস্যরূপে এই দেশ তার স্থান করে নিল। আর বন্দরে প্রবেশ করার পূর্বে উনিশ তোপের সম্মানের অধিকারী হল ফেলিপ ক্যারেরা।

কোনো ব্যক্তির প্রকৃতিদত্ত দুর্ভাগ্য বা দোষকে আমোদ প্রমোদের বিষয় করে তোলার মতো কৌতুকপ্রিয়তার অভাব, দক্ষিণের দেশের জাতিদের মধ্যে আছে। তাদের চরিত্রের এই ত্রুটির জন্যই বিকলাঙ্গ। অল্পবুদ্ধি বা পাগল দেখে, তাদের উত্তর দেশের ভ্রাতৃবর্গের মতো, তাদের হাসির উদ্রেক হয় না।

ফেলিপ ক্যারেরা তার বুদ্ধি বৃত্তির অর্ধেক নিয়ে এই পৃথিবীতে এসেছে। যে কারণে কোরালিওর লোকেরা তাকে বলত, বেচারা ছোট্ট পাগলা।

গম্ভীর যুবক, ফেলিপের পাগল আখ্যা ইতিবাচক ভাবে অসত্য। ডাঙায় সে কারুর সঙ্গে কথাবার্ত বলত না। সে জানত এই ডাঙার অনেক ব্যাপারে সে অপটু। ডাঙায় অনেক কিছু জানতে বা বুঝতে হয়। কিন্তু তার প্রতিভার বলে সে জলে সে যে কোন ব্যক্তির সমকক্ষ ছিল। ঈশ্বর যত্ন করে যে সব নাবিকদের তৈরী করেছিলেন তাদের মধ্যে কেউ তার মতো করে পালতোলা নৌকা চালাতে পারে না। অন্য যে কোন নাবিকের থেকে অন্তত পাঁচ ডিগ্রি, বাতাসের বিপরীতে সে তার নৌকা নিয়ে যেতে পারত। সে একজন অসম্পূর্ণ মানুষ হলেও একজন সম্পূর্ণ নাবিক ছিল। তার কোনো নৌকা না থাকায়, উপকূলে ভেসে বেড়ানো পালতোলা নৌকার মাঝি মাল্লার দলে সে কাজ করত। জলে তার সাহস ও দক্ষতার খ্যাতির কথা মনে রেখে এবং তার মানসিক অসম্পূর্ণতার জন্য অনুকম্পায় ধরাপড়া তরীটির ভোগ্য রক্ষক হিসেব কালেকটর তার নাম পাঠিয়েছিল। তার প্রস্তাব একটি আড়ম্বর পূর্ণ রাষ্ট্রীয় সনদরূপে তার কাছে এসে পৌঁছালে, তার মুখে হাসি ফুটে উঠল। কালেকটর তার তদ্বিরের ফল এত তাড়াতাড়ি ও অভাবিত হবে, আশা করে নি। ভবিষ্যৎ নৌ-সেনাধ্যাক্ষকে ডেকে আনতে একটি ছেলেকে পাঠাল।

কালেকটার তার সরকারী আবাসে অপেক্ষা করতে লাগল। সাদা লিনেনের পোশাক আর ক্যানভাসের জুতো পরে, কালে গ্রানদে সরনীতে তার অফিসে, একটি প্রাচীন ডেস্কে বসে সে কাগজপত্র পরা একটি শিশু খেলা করছে দেখা যায়। হাওয়ার মধ্যে একটি ছিপছিপে মেয়ে গীটার বাজায় আর ঘাসের দোলায় দোলা খায়। এইভাবে সরকারী দায়িত্ব পালন ও পার্থক্যসুখের প্রতিচ্ছবির মাঝে, নিষ্পাপ ফেলিপের ভাগের উন্নতির খবর পেয়ে কালেকটারের হৃদয়ে গভীর সুখের সঞ্চার হল।

বিশ বছরের যুবক ফেলিপ সুদূর চিন্তাকুল শূন্যতা মাখানো দৃষ্টি নিয়ে কালেকটারের কাছে এসে উপস্থিত হল। সামরিক পোশাকের আবছা অনুকরণে লাল ডোরা কাটা সাদা সুতীর প্যান্ট ও জ্যাল জ্যালে গলা খোলা নীল সার্টে পরনে, খালিপা। হাতে আমেরিকা থেকে আমদানী করা সবচেয়ে সস্তা দামের টুপী।

সনদটি দেখিয়ে কালেকটর গম্ভীর স্বরে বলল, সেনিওর ক্যারেরা, প্রেসিডেন্টের আদেশে আমি তোমাকে ডেকেছি, এই বার সনদটি তার হাতে দিয়ে কালেকটার বলল। এই দলিলটির বলে এখন থেকে তুমি এই মহান প্রজাতন্ত্রের নৌ-সেন্যাধক্ষ হলে। এখন থেকে এই রাষ্ট্রের সকল নৌসেনা ও রণতরী তোমার পরিচালনাধীন হবে। তুমি হয়ত ভাবছ আমাদের নৌবহর কোথায়। স্মাগলারদের হাতে আমার সাহসী কর্মীদের ছিনিয়ে নেওয়া এসত্রেলা দেশ নয়া নামের পালতোলা জাহাজটিকে তোমার অধীনে দেওয়া হচ্ছে। দেশের সেবার জন্য সরকারী কর্মচারীদের একস্থান থেকে অন্যস্থানে, উপকূল বরাবর নিয়ে যাওয়ার জন্য, তুমি সব সময় প্রস্তুত থাকবে। তুমি উপকূল পাহারা দিয়ে স্মাগলিং বন্ধ করতে তোমার সাধ্যমত চেষ্টা করবে। সমুদ্রে তোমার দেশের সম্মান ও স্বাধীনতা কায়েম রেখে বিশ্বের গর্বিত নৌশক্তি রূপে আঞ্চুরিয়াকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করবে। তোমার প্রতি এই নির্দেশগুলি জানাতে প্রেসিডেন্ট আমাকে আদেশ করেছেন যদিও এই পত্রে নৌবহরের কর্মী কারা হবে, সেজন্য অর্থব্যয়ের কথা কিছুই লেখা নেই। আমার যতদূর মনে হয়, তোমার

সহকর্মীদের তোমাকেই সংগ্রহ করতে নিতে হবে। তোমার উপর বিরাট সম্মান ন্যস্ত হয়েছে সেনিওর অ্যাডমিরাল। তুমি নৌকাটি নিতে প্রস্তুত হওয়া মাত্রই নৌকাটি তোমার হাতে তুলে দেবার আদেশ আমি দেব। এই পর্যন্তই আমার ওপর নির্দেশ রয়েছে।

কালেকটারের হাত থেকে সনদটি নিয়ে ফেলিপ, তার স্বভাব মতো নিরর্থক চিন্তাকুল দৃষ্টি দিয়ে, একবার সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে, একটি কথাও না বলে, রাস্তার গরম বালির ওপর দিয়ে দ্রুতপায়ে হেঁটে ফিরে গেল।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কালেকটর, পত্রেসিটো লোকো, বলার সঙ্গে সঙ্গে পোষা কাকাতুয়াটা চেঁচিয়ে উঠল, লোকো-লোকো-লোকো।

পরদিন সকালে নৌবহরের প্রধানকে সামনে রেখে এক অদ্ভুত মিছিল সারি দিয়ে কালেকটারের দপ্তরের সামনে এল। ফেলিপের পরনে কুড়িয়ে বাড়িয়ে সংগ্রহ করা সামরিক পোশাকের একটি করুণ প্রতিচ্ছবি। কোমরের বেল্টের সঙ্গে বাঁধা পাঁউরুটির কারিগর পেড্রো লাফিং-এর দেওয়া কোনো প্রাচীন জাহাজের তরবারি, যেটা দেখিয়ে সগর্বে সে বলছে সেটা তার পূর্বপুরুষ বিশ্ববিশ্রুত জলদস্যুর থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে তার হাতে এসেছে। অ্যাডমিরালের পায়ে পায়ে তার নতুন জাহাজের কর্মীদল আসছে।

ফেলিপ, কালেকটারের কাছে, খুবই সংক্ষেপে ও স্বমর্যাদায় আস্থাবান ভঙ্গীতে, তার জাহাজের ভার চাইল। আঞ্চুরিয়ার ফ্ল্যাগরূপে চিহ্নিত একটি ফ্ল্যাগের চিত্র কোন প্রাচীন বই-এ সে দেখেছিল। নৌবহর গড়ে ওঠে নি বলে জাতির প্রতিষ্ঠাতাদের পরিকল্পিত পতাকাটি বিস্মৃতির গর্ভে ঢাকা পড়েছিল। নীল সাদা জমির ওপর একটি লাল ক্রশ চিহ্ন দেওয়া পতাকাটির ধরনে একটি পতাকা কালেকটারের স্ত্রী বহু পরিশ্রমে তৈরী করেছিল। এখন সেটি তিনি ফেলিপকে দিয়ে বললেন, বীর নাবিক, এটা হল তোমার দেশের পতাকা। সত্যনিষ্ঠ হয়ে প্রাণপণে একে রক্ষা করবে। ঈশ্বর তোমার সহায় হোন।

নতুন পদে নিয়োগের পর এই প্রথম নৌ-সেনাধাক্ষ্যের মুখে ভাবাবেগ দেখা দিল। পতাকাটি নিয়ে ভক্তিভরে তার ওপর হাত বোলাতে বোলাতে কালেকটারের স্ত্রীকে সে বলল, আমি অ্যাডমিরাল। সমুদ্রে ওই পতাকা তার নৌবহরের মাস্তুলের ওপর উড়তে থাকলে সে তার মনের আবেগ যতটা প্রকাশ করতে পারত ডাঙায় দাড়িয়ে এর বেশী প্রকাশ করা তার পক্ষে সম্ভব হল না।

পরের দিন মহা উৎসাহে তারা সাদা রঙে নীল বর্ডারে, এসত্রেলা দেল নশকে নতুন করে তুলল। একগোছা উজ্জ্বল টিয়াপাখির পালক টুপীতে গুঁজে ফেলিপ নিজেকে আরো সাজালো। তারা তারপর হেঁটে কালেকটারের অফিসে গিয়ে জাহাজের নাম বদল করে এল নাশিওনাল রাখা হয়েছে আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করল।

অনেক গোলমালের মধ্যে পরের কয়েকমাস নৌবহরের কাটালো। যখন কী করতে হবে তার কোন নির্দেশ না আসে তখন একজন অ্যাডমিরালও বিচলিত হয়। কোন আদেশ না আসায় ও কোনো বেতন না আসায়, এল নাশিওনাল অলসভাবে নোঙর করা রইল।

ফেলিপের সামান্য পুঁজি ফুরিয়ে গেলে কালেকটারের দপ্তরে গিয়ে সে খরচের কথা বলায় কালেকটার অবাক হয়ে বলল, বেতন? আমার বেতনের এক সেনটাভোও গত সাতমাস আমি পাইনি। আর তুমি মাইনে চাইছ? বলো কি? তোমার মাইনে তিনহাজার পোসোর কম হবে না। এই দেশে খুব শিগগিরই একটা বিপ্লব আসছে। আর লক্ষণ হচ্ছে দরকার কেবল চাইছে পেমো। এদিকে দেবার বেলায় কিছু নয়।

অ্যাডমিরাল কালেকটারের অফিস ত্যাগ করল। বিপ্লব মানেই যুদ্ধ, আর সে সময় নিশ্চয় সে সেবা করার সুযোগ পাবে ভেবে তার গম্ভীর মুখে খুশির ভাব ফুটে উঠল। বেকার বসে থাকার বড় যন্ত্রণা। এদিকে কলা বা তামাক কেনার জন্য তার ক্ষুধার্ত কর্মচারীরা পয়সা ভিক্ষা করছে।

সে তার হাসিখুশী ক্যারিব সঙ্গীদের কাছে ফেরার পর তারা তার শিক্ষণ মতো লাফিয়ে উঠে তাকে স্যালুট করলে অ্যাডমিরাল বলল, এসো মুচাচোরা, সরকার দরিদ্র হয়ে পড়ছে দেখতে পাচ্ছি। আমাদের দেবার মতো তার টাকা নেই। বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় পয়সা আমরা রোজগার করে

দেশের সেবা করে যাব। তোমরা দেখো শীঘ্র তারা আমাদের সাহায্য চাইবে।

এরপর থেকে এল নাশিওনাল তীরের অন্যান্য তরীর মতো কলা বা কমলা তীর থেকে বয়ে নিয়ে নোঙর করে থাকা মাইল খানেক দূরের ফলের জাহাজে নিয়ে যাওয়া শুরু করল।

নিজের ও সঙ্গীদের জন্য যথেষ্ট রোজগার হলে ফেলিপ তার নৌবহর নোঙর করে রাখে আর ম্যানেজারের তাঁবুতে ধর্না দেওয়া যাত্রাদলের কোরাসের একজনের মতো টেলিগ্রাফ অফিসের আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়। তার হৃদয়ে সর্বদা রাজধানী থেকে আদেশ পাওয়ার আশা জাগত। তার গর্ব ও দেশাত্মবোধকে পীড়া দিচ্ছিল দেশের প্রয়োজনে অ্যাডমিরাল হিসেবে তাকে একবারও ডাকা হয়নি বলে। প্রতিবারই সে জিজ্ঞেস করে আর অপারেটার খুঁজে দেখার ভান করে বলে, এখনো দেখছি আসেনি সেনিওর এল আলমিরান্ত একটু সবুর করুন।

বাইরে লেবু গাছের নীচে কর্মীরা আখ চিবোয় পা দিয়ে ঝিমোয়। কিছু কাজ না পেয়েও তাদের দেশ খুশী বলে তারাও খুশী।

গ্রীষ্মের প্রথমদিকে একদিন হঠাৎ বিপ্লব বেঁধে গেল। বহুদিন ধরেই এমন একটা কিছুর আশঙ্কা ছিল। প্রথম বিপদের সংকেতে অ্যাডমিরাল তার নৌবহর নিয়ে পাশের এক রাষ্ট্রের বড় বন্দরে চলে গেল। ফলের বেসাতি করে নৌবহরের জন্য গুলি আর পাঁচটি মার্কিনি রাইফেল কেনার অর্থ সংগ্রহ করল। তারপর সে দ্রুত ধ্বংসের পথে চলা পোশাক পরে টেলিগ্রাফ অফিসে গিয়ে তার পছন্দের একটি কোণে বসে রইল। বহু বিলম্বিত কিন্তু শীঘ্র আসন্ন আকাঙ্ক্ষিত আদেশের জন্য দুই লাল পায়ের মাঝখানে তার প্রকাণ্ড তরবারিটা রেখে প্রতীক্ষা করতে লাগল।

টেলিগ্রাফের ক্লার্ক বলল, এখনো আসেনি, সেনিওর এল আলমিরান্ড।

টেবিলের ওপর রাখা টেলিগ্রাফ যন্ত্রের টরে টক্কা শুনে সে বলল, আসবে সেই আদেশ, আমি নৌ-সেনাপতি।

নয়

পতাকা সর্বোত্তম

দক্ষিণ প্রজাতন্ত্রের হেকটর, সুপণ্ডিত থিবীয়ান, ডন বাস প্লাসিডো, ছিলেন সেই বিদ্রোহীদের শীর্ষে। নিজের দেশের নিভৃত জীবন নিয়ে খুশী থাকা, ডন বাস প্লাসিডো ভ্রাম্যমান সৈনিক, কবি, বিজ্ঞানবেত্তা, রাজপুরুষ এবং সর্ববিদ্যা বিশারদ ও যোদ্ধা ছিলেন।

প্লাসিডোকে খুব ভালো করে জানত এমন একজন তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু বলত, প্লাসিডোর খামখেয়ালিপনা, রাজনৈতিক চক্রান্তে মেতে ওঠা।

প্লাসিডো যেন, সঙ্গীতের একটি নতুন মূর্ছনা, বাতাসে এক নতুন সুগন্ধ, নবীন ছন্দ অথবা বিস্ফোরক, খুঁজে পেয়েছেন। এই বিপ্লবকে নিংড়ে তিনি তার সকল চাঞ্চল্য নিষ্কাশিত করে ফেলার এক সপ্তাহ পরে একে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে, বিশ্বের সমুদ্রে ভেসে, তাঁর নিজস্ব দুই জাহাজে ভরে তুলবেন, পোস্টেজ স্ট্যাম্প থেকে প্রত্নতত্ত্বের পাথরের দেবমূর্তি পর্যন্ত তাঁর বিশ্ব বিখ্যাত সংগ্রহ।

একজন চারুকলাবিদ হিসেবে নান্দনিক প্লাসিডো, এক বেশ প্রাণবন্ত গোলমাল পাকিয়েছেন, জনগণ তাঁকে বাহবা দিত, তাঁর উজ্জ্বল কর্মধারা তাদের বুকে চমক জাগায়, আর তাঁর নিজের দেশের মতো তুচ্ছ ব্যাপারে তাঁকে উৎসাহিত হতে দেখে কৃতকৃতার্থ হয়। সৈন্যদল সরকারের অনুগত থাকলেও রাজধানীতে তাঁর সহযোগীদের আহ্বানে সাড়া দেয়।

সমুদ্রতীরের শহরগুলিতে জোর লড়াই বেঁধে যায়। গুজব শোনা যাচ্ছে বিপ্লবে ভিসুভিয়াস কল কোম্পানীর উসকানি ছিল, যাদের প্রভুত্ব, ভর্ৎসনার হাসি আর অঙ্গুলীহেলনে চাইত আঞ্চুরিয়াকে ভালো ছেলেদের দলে রাখতে। শোনা গেল এদের দুটি জাহাজ ট্রাভলার আর সালভাদর তীর বরাবর অনেক জায়গায় বিদ্রোহী সৈন্যদল বহন করে রেখে এনেছে।

এতদিন পর্যন্ত কোরালিওতে কোনো বিদ্রোহ হয়নি। সামরিক শাসন চলছিল। রাজধানীতে প্রেসিডেন্টের সৈন্যরা ক্ষমতাশালী হওয়ার গুজব শোনা যাচ্ছে বিদ্রোহীদের দলপতিরা পালাতে বাধ্য হচ্ছে আর তাদের পিছন থেকে তাড়া করা হচ্ছে।

রাজধানী থেকে আসা নির্দেশ জানাতে, সরকারী কর্মচারীর দল আর অজ্ঞাত নগরবাসীরা সব

সময় কোরালিওর ছোট্ট টেলিগ্রাফ অফিসে ভিড় করে রয়েছে।

একদিন সকালে টেলিগ্রাফ যন্ত্রটি বাজার কিছু পরে অপারেটর সরবে ঘোষণা করল। অ্যাডমিরাল ডন সিনিওর ফেলিপ ক্যাবেরোর জন্য একটি টেলিগ্রাম।

তক্ষুণি অ্যাডমিরাল তার জায়গা থেকে লাফিয়ে ঘরের মাঝখানে এসে টেলিগ্রামটি হাতে নিয়ে তার প্রতি দরকারী নির্দেশের একটি করে শব্দ বানান করে করে পড়তে লাগল। তোমার জাহাজ নিয়ে এখনি রওনা হয়ে রিও রুয়িথের মুখে অপেক্ষা করো, আলফোরাণের ব্যারাকে গরুর মাংস পৌঁছে দেবার জন্য। মারতিনেজ জেনারেল।

তার দেশের প্রথম আহ্বানে কোনো মহিমা না থাকলেও, আহ্বান আসায় অ্যাডমিরালের বুকে খুশীর জোয়ার, তরবারি বেল্ট আর একটি ছিদ্র পর্যন্ত টেনে বেঁধে দৌড়ে গিয়ে ঘুমন্ত সঙ্গীদের জাগিয়ে তুলল। পনেরো মিনিটের মধ্যে তীরের দিক থেকে বয়ে আসা বাতাস ঠেলে 'এল নাশিওনাল' জলদি উজান বেয়ে কূল বরাবর ছোট ছোট পদক্ষেপে পাড়ি দিল।

কোরালিওর দশমাইল দক্ষিণে সমুদ্রে পড়া রিও রুয়িথ একটি শীর্ণ নদী। উপকূলের সেই আদর্শ জনহীন আর জঙ্গলে পূর্ণ। কর্ডিলিয়েরার একটি গভীর খাতের মধ্য দিয়ে শীতল, ফেনিল রিও রুয়িথ বহে চলে মোহনার কাছে ধীর ও চওড়া হয়ে, পলিমাটির চরের ওপর দিয়ে সমুদ্রে মিশেছে।

দুই ঘণ্টার মধ্যে এল নাশিওনাল নদীমুখে প্রবেশ করল। নদীর তীরে বড়ো বড়ো গাছের সারির ঘন সন্নিবেশ। প্রভূত লতাগুল্ম ভূমিকে আচ্ছন্ন করে জলের মধ্যেও কিছুটা নিমজ্জিত। আরো নিবিড় নীরবতার রাজ্যে জাহাজ সেখানে নিঃশব্দে প্রবেশ করল। সমুদ্রগামী জল নৌকার গায়ের ওপর ওলটপালট হওয়ার শব্দ ছাড়া রিও রুয়িথের ছত্রকার নদীমুখে কোনো শব্দ শোনা যায় না বা কোনো চাঞ্চল্য দেখা যায় না।

অ্যাডমিরাল নোঙর ফেলার আদেশ দিলে শিকলের ঝনঝন আওয়াজে বনফুলী মুখর হয়ে উঠল। প্রাতকালীন নিদ্রায় মগ্ন রিও রুয়িথের নদীমুখে তোতা আর বেবুনের দল সরব হল।

আদেশ মতো নৌবহর ঘণ্টার পর ঘণ্টা নদীমুখে অপেক্ষা করতে লাগল। অ্যাডমিরাল একটি তিন ফুট লম্বা টেলিস্কোপ দিয়ে পঞ্চাশগজ দূরের দুর্ভেদ্য জঙ্গল দেখতে লাগলে কর্মীরা হাঙরের পাখনার স্যুপ, কলা, কাঁকড়ার পাল আর অম্লস্বাদের মদ দিয়ে ডিনার তৈরী করল।

সূর্যাস্তের কিছু আগে তাদের বাঁদিকের জঙ্গল থেকে হ্যালো-ও আওয়াজ শুনে তারা তার প্রতি উত্তর দিল। সঙ্গে সঙ্গে তিনজন ব্যক্তি খচ্চরের পিঠ চেপে তাদের দিকে ছুটে এসে নামলো। এরপর একজন তলোয়ারের খাপ দিয়ে খচ্চরদের পিঠে জোরে একটা করে বাড়ি মারলে সেগুলো দ্রুতবনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এই ব্যক্তিগুলি মাংস ও খাদ্য বয়ে নিয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের মতো নয়। একজন সুন্দর দেহসৌন্দর্যের অধিকারী লম্বা চওড়া, তৎপর, খাঁটি স্প্যানিশ টাইপের এবং হাবভাবে সৈনিকদের প্রধানের মতো। অন্যদুজনে ছোটখাটো বাদামী মুখ, সাদা মিলিটারী পোশাক ময়লা ও ছেঁড়া এবং ভিজে।

বৃহৎ ব্যক্তিটি চিৎকার করে বলল, ওহে, সিনিওর আলমিরান্ড। তোমার ডিঙি নামাও।

ডিঙি নামিয়ে ফেলিপ একজন ক্যারিবকে সঙ্গে নিয়ে তীরের দিকে চলল।

বৃহৎ ব্যক্তি জলের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছিল। ডিঙির হালের কাছে কাকাতুয়ার আকৃতি মানুষটিকে দেখে তার মুখে সকৌতুক আগ্রহ ফুটে উঠল। অ্যাডমিরালের জাঁকজমক, বিনা মাইনে বিনা মিষ্ট বাক্য আর অপরিসীম পরিশ্রমে, স্তিমিত হয়ে এসেছে। লাল ট্রাউজার ছেঁড়া ও তালি মারা কোটের সোনালি জরি আর বোতাম প্রায় সবই লুপ্ত। খালি পা, টুপীর সামনেটা চোখের কাছাকাছি ঝুলে পড়েছে।

বৃহৎ ব্যক্তিটি আবার চেঁচিয়ে বলল, প্রিয় অ্যাডমিরাল, তোমার একনিষ্ঠতার উপর আমরা নির্ভর করতে পারি আমি জানতাম, জেনারেল মার্তিনেজের পাঠানো তার তুমি পেয়েছ তা আমরা খবর পেয়েছি। ডিঙিটা আরও একটু কাছে নিয়ে এসো অ্যাডমিরাল। এই চলন্ত লতাঝোপের মধ্যে অতিকষ্টে আমরা দাঁড়িয়ে আছি।

ভাবলেশহীন মুখে তাকে লক্ষ্য করতে করতে ফেলিপ বলল, আলফোরানের সেনা ছাউনিতে

খাদ্য আর মাংস নিয়ে যেতে হবে।

কষাইদের কোনো দোষ নেই ভাই আলমিরান্ড। তোমার জন্য সে মাংস এখানে অপেক্ষা করে নেই। ঠিক সময়ে তুমিও এসে পড়তে গরুগুলি বেঁচে যাবে, এখনি তোমার জাহাজে আমাদের নিয়ে চলো। বৃহত ব্যক্তিটি এবার তাঁর সঙ্গী দুজনকে বলল, সৈনিকেরা তোমরা আগে যাও। ডিঙিটা ছোট। গিয়ে আমার জন্য পাঠিয়ে দিও।

দুজন অফিসারকে পালতোলা জাহাজে নামিয়ে দিয়ে ডিঙি আবার ফিরে বৃহৎ ব্যক্তিটিকে নিয়ে এল।

জাহাজে এসে বৃহৎ ব্যক্তিটি কাতরস্বরে বলল, ভাই অ্যাডমিরাল, খাবার দাবার কিছু কি আছে? আর সে সঙ্গে, কফি? আর কিছুক্ষণ দেরী হলে বিদায়ের আগে কর্নেল র‍্যাফেলের তরবারির খাপ দিয়ে হার্দিকভাবে অভিনন্দন জানানো খচ্চর তিনটির একটিকে আমরা ভক্ষণ করতাম। কিছু খেয়ে নিয়ে আলফোরানের সেনাছাউনির উদ্দেশ্যে যাত্রা সুরু করব কেমন।

ক্যারিবদের দেওয়া খাবার সেইতিনজন গোগ্রাসে গিলতে লাগল, সূর্যাস্ত নাগাদ নিয়ম মত ঘুরে গিয়ে পাহাড়ের দিক থেকে শীতল বাতাস হ্রদের ঘ্রাণ আর সুন্দরী গাছের জলাভূমির স্বাদ বয়ে নিয়ে এল। জাহাজের প্রধান পালটি তুলে দেওয়া হলে সেটা ক্রমবর্ধমান চিৎকার আর গোলমাল ভেসে আসছে শুনতে পেল।

বৃহৎ ব্যক্তিটি সেই আওয়াজ ভালো করে শুনে হেসে বলল, নৌ-সেনাপতি ভাই, বলিদানের পক্ষে অনেক দেরীতে হলেও কষাইরা আসছে।

অ্যাডমিরাল তাঁর নিজের কর্মীদের প্রয়োজনীয় আদেশ দেওয়া ছাড়া অন্য কোন কথা বলছিল না। সকলের ওপরের পাল এবং মাস্তুলের শীর্ষ পাল বিছিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ পিছলে খাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। সেই বিরাটকায় পুরুষ ও তার সঙ্গী দুজন নগ্ন ডেকে সাধ্যমত আরামে বসে এই বিপদ সংকুল তীর থেকে কিভাবে কত তাড়াতাড়ি পালানো যায় সেই চিন্তাই সম্ভবত করছিল। অ্যাডমিরাল জাহাজ ঘুরিয়ে তীরের সমান্তরাল যে পথে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তা দেখে তাদের উৎকণ্ঠা কমল এবং মুক্তির পরবর্তী ধাপগুলি নিয়ে চিন্তা করতে লাগল।

বৃহদাকার ব্যক্তি আরাম করে বসে অ্যাডমিরালকে লক্ষ্য করতে লাগলেন, এই গম্ভীর আজব ছেলেটির দুর্ভেদ্য ভাবলেশহীনতা তাঁকে ভাবিয়ে তুলল। তিনি নিজে একজন পলাতক, পরাজয় আর বিফলতার জ্বালায় মনপ্রাণ ছটফট করছে। প্রাণ নেবার জন্য জহ্লাদ ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিনি নিজের মনে ভাবতে লাগলেন, আমার পক্ষে মানানসই বাতুলের মতো মতলব স্থির করার পর সকল ঝুঁকি নিয়ে তা কার্যকর করা হয়েছে। উপকূলে জবড়জং পোশাক আর হাস্যকর পদবী নিয়ে ভেসে বেড়ানো এক উন্মাদ দেশপ্রেমিককে টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছিল। যদিও পলায়ন অসম্ভব মনে করে আমার সঙ্গীরা ভাবনায় চিন্তায় দিশাহারা হয়ে পড়েছিল তবুও আমি খুশী তাদের বলা পাগলামি আর সর্বনাশা পরিকল্পনাটি সফল হয়েছে বলে।

মুক্তা ঝলমল জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে ক্রান্তীয় দেশের হ্রস্ব গোধূলির ত্বরিত উত্তরণ হল। এবার তাদের দক্ষিণে অন্ধকারের ভিতর থেকে কোরালিওর উপকূলের বাতিগুলি একে একে দেখা যেতে লাগল। নৌসেনাপতি জালের কাছে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে মাঝে মাঝে কালো চিতাবাঘের মতো পালগুলি নিয়ন্ত্রণ করছে। তিনজন যাত্রী একমনে সামনের সমুদ্রের দিকে চেয়ে রয়েছে।

শহরের একমাইলের মধ্যে এসে জলের গভীরে নেমে যাওয়া একটি স্টীমারের আকৃতি দেখতে পাবার সঙ্গে সঙ্গে তিনজনে একত্র হয়ে সরবে আলোচনা শুরু করল। তীর ও স্টীমারের মধ্য দিয়ে পথ করে যাবার মতো জাহাজটি ছুটছিল।

বৃহদাকার ব্যক্তিটি হঠাৎ সঙ্গীদের কাছ থেকে ফেলিপের কাছে এসে বললেন, প্রিয় অ্যাডমিরাল, সরকার অত্যন্ত অকর্মণ্য। তোমার এই সেবার খবর তারা রাখে না বলে আমি লজ্জা পাচ্ছি। একটা খুব ভুল করা হয়েছে। তোমার যোগ্য জাহাজ, নাবিকদল আর পোশাক শীঘ্রই তোমাকে দেওয়া হবে। তার আগে একটা দরকারী কাজ এখনি করতে হবে। সালভাদর নামে ওই যে স্টীমারটা ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখছ আমাদেরকে ওখানে নিয়ে চলো। সরকারের কাজেই আমাদের ওখানে যেতে হবে। আমরা যাতে ওতে পৌঁছাই তুমি তার ব্যবস্থা করো।

কোনো উত্তর না দিয়ে অ্যাডমিরালের হ্রস্ব একটি আদেশে জাহাজটি ঘুরে গিয়ে বেগে তীরের দিকে চলতে লাগলে অসহিষ্ণুভাবে বৃহদাকার ব্যক্তিটি বললেন, আমার কথাগুলো কি তুমি শুনতে পেয়েছ? তাঁর মনে হল ওর বুদ্ধি শুদ্ধির মতো জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিরও হয়ত ঘাটতি আছে।

কর্কশ হেসে নৌ সেনাপতি বলল, ওরা তোমাদের দেশদ্রোহীদের মারা হয়। তুমি আমার জাহাজে পা দেবার সময়েই আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি। তোমার ছবি আমি একটা বই-তে দেখেছি। তুমি প্লাসিডো, দেশের প্রতি বিশ্বাসহন্তা। আমি তোমাকে ওদের কাছে নিয়ে যাবো।

প্লাসিডো মুখ ফিরিয়ে হেসে সঙ্গীদের বললেন, যোদ্ধৃগণ, কৌতুককর সনদটি তৈরী করার সময়কার বৈঠকের কথা আমি তোমাদের বলেছি। আজ আমাদের ঠাট্টা আমাদের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হচ্ছে। ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের দৈত্য কেমন আমরাই সৃষ্টি করেছি দেখ।

এবার তীরের দিকে মুখ ফিরিয়ে ডন সাবাস দেখলেন কোরালিওর বাতিগুলি ক্রমশ কাছে আসছে। বোদেগা নাশিওনালের গুদাম ঘর সৈন্যদের ব্যাপক আর তার পিছনে কাঁচা ইঁটের তৈরী একটি দীর্ঘ উঁচু দেয়াল চাঁদের আলোয় দেখা যাচ্ছে।

দেয়ালের দিকে মুখ করিয়ে গুলি করে মারার দৃশ্য মনে করে হালের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা ফেলিপের দিকে চেয়ে তিনি আবার বললেন, দেশ ছেড়ে আমি যাচ্ছি এটা সত্য হলেও তার জন্যে আমি বিন্দুমাত্রও বিচলিত নই। সাবাস প্লাসিডোর জন্যে রাজদরবার গর্বের রণভূমি সবই উন্মুক্ত। আমার মতো ব্যক্তিত্বের কাছে ইঁদুরের গর্বের জড়ো করা মাটির ঢিপির মতো প্রজাতন্ত্রী, শুয়োরের মাথার মতো এই দেশের কি দাম? আমি রোম, লণ্ডন, প্যারিস, ভিয়েনা সর্বত্র আদৃত হই। এবার শোনো, যে নাম তোমার পছন্দ জেনো তা আমার, বেবুনবাবু, অ্যাডমিরাল, জাহাজ ফিরিয়ে সালভাদরে আমাদের তুলে দাও। আর এই নাও এসতাদোস উনিদোসের পাঁচশ পেসো। তোমার পরিশ্রমিক যা তোমাকে বিশ বছরে তোমার সরকার দেবে না।

ডন সাবাস মোটোমোটা একটি থলি অ্যাডমিরালের হাতে দিলেও সে কোনোকিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করল না। জ্ঞানের আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠা বুদ্ধিহীন মুখ নিয়ে সে জলের কাছে দাঁড়িয়ে রইল। জাহাজ স্থির গতিতে তীরের দিকে চলেছে।

তোতাপাখির হাসির মতো মুখে ফেলিপ প্লাসিডোকে বলল, বন্ধুক যাতে দেখা না যায় সেইজন্য দেয়ালের দিয়ে মুখ করিয়ে ওরা গুলি করে। ওরা গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালের দিকে মুখ ফেরানো অবস্থাতেই ধুপ করে তুমি পড়বে।

এবার ক্যারিবদের দিকে ফিরে নৌসেনাপতি একটি আদেশ দেবার সঙ্গে সঙ্গে তার তাদের হাতে ধরা পালের দড়িদড়াগুলি বেঁধে রেখে জাহাজের খোলের ঢাকনা তুলে ভেতরে নেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ডন সাবাস চিতাবাঘের মতো লাফ দিয়ে সামনে এসে জাহাজের খোলের ঢাকনা বন্ধ করে দিয়ে সহাস্যে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন।

এবার ফেলিপকে বললেন, ভাই অ্যাডমিরাল, রাইফেল না আনাই ভালো। একসময় আমার খামখেয়ালিপনা আমাকে ক্যারিব ভাষায় একটা অভিধান রচনা করতে প্রবুদ্ধ করেছিলে বলে তোমার দেওয়া আদেশের অর্থ আমি বুঝতে পেরেছি। এখন হয়ত তুমি—

কথা শেষ করার পূর্বেই তিনি দেখতে পেলেও পেদ্রো লাফিও-এর তরবারি কোষমুক্ত করে অ্যাডমিরাল তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে। অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে বৃহদাকার ব্যক্তিটি তরবারির আঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করলেন। তরবারিটা কাধে সামান্য ছুঁয়ে চলে গিয়েছে। পুনরায় লাফানোর পূর্বেই প্লাসিডো পিস্তল বার করে অ্যাডমিরালকে গুলি করে ভূপতিত করলেন।

এরপর ঝুঁকে পড়ে অ্যাডমিরালের দিকে দেখে নিয়ে সাবাস প্লাসিডো বললেন, বন্ধুগণ, সোজা হৃদপিণ্ডে গিয়ে লেগেছে। নৌবহর বাতিল করা হল।

কর্নেল র‍্যাফেল লাফিয়ে গিয়ে হাল ধরলে অন্য অফিসারটি প্রধান পালের দড়িগুলি আলগা করে দেবার সঙ্গে সঙ্গে মাস্তুল ঘুরে গেল, সার এল নাশিওনাল দিক পরিবর্তন করে সালভাদরের দিকে ধীরে ধীরে যেতে শুরু করল।

এই সময় কর্নেল র‍্যাফেল চেঁচিয়ে বলল, সেনিওর, পতাকাটা নামিয়ে ফেলুন। আমরা কেন ওই পতাকার অধীনে তরী ভাসিয়েছি স্টীমারে আমাদের বন্ধুরা সেকথা ভাবতে পারে।

ডন সাবাস, ঠিক বলেছ, বলে মাস্তুলের দিকে এগিয়ে গিয়ে পতাকাটা ডেকের ওপর মৃত অ্যাডমিরালের পাশে নামিয়ে রাখলেন।

আচমকা নির্বাপিত নৌবহরের পতাকাটি হাতে তুলে নিয়ে একদিকে ঢালু ডেক ধরে কর্নেল র‍্যাফেলের কাছে দৌড়ে গিয়ে উল্লাসে চিৎকার করে ডন সাবাস বলে উঠলেন, সেই ভালুক সদৃশ ওস্ট্রিখের চিৎকার আমি যেন এখনই শুনতে পাচ্ছি। তার সংগ্রহশালা সম্পূর্ণ করতে ওই ব্যক্তিটি বিশ্বের অনেক স্থানে গিয়েছে। আমার বন্ধু হের গ্রুনিতস-এর কথা আমি বলছি। আর তুমি এটাও জানো যে আমি কিউরিও সংগ্রহ করি। গত বছর হের জুনিতস দুটি দুষ্প্রাপ্য নমুনা সংগ্রহ করার আগে পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন নৌবহরের পতাকা সংগ্রহ সবার সেরা ছিল আমার। হের গ্রুনিতস এর সংগ্রহ করা বারবারি অঞ্চলের একটি রাজ্যের আর ম্যাকারুর পতাকা দুটি আমার নেই গুইগুলি সংগ্রহ করা সম্ভব হলেও এই পতাকা? তুমি কি জানো এটা কি? নীল আর সাদা জমির ওপর এই লাল ক্রুশ চিহ্ন দেখ। তুমি এটা এর আগে দেখ নি, না? এটা হচ্ছে তোমার দেশের নৌবহরের পতাকা। এই পচা কাঠের টবটি ছিল তার নৌবহর আর কাকাতুয়াটি ছিল তার সর্বাধিনায়ক। এইরকম পতাকা আর হয়নি, হবেওনা। পৃথিবীতে এরকম আর একটিও নেই। ভেবে দেখ, একজন পতাকা সংগ্রাহকের কাছে এর কি অর্থ। তুমি ভাবতে পারো কর্নেল, এর জন্যে হের গ্রুনিতস অন্তত দশ হাজার সোনার ক্রাউন খরচ করতে রাজী। কিন্তু লক্ষ মুদ্রায়ও এটি পাবে না। স্বর্গ থেকে খসে পড়া অপূর্ব, একমাত্র পতাকা। এবার ডন সাবাস হাওয়ায় কথা ছুঁড়ে দিল, ওহে সাগর পাড়ে খুঁতখুঁতে বুড়ো। একটু সবুর করো। ডন সাবাসকে আসতে দাও। তোমাকে একবার এই পতাকায় আঙুল ছোঁয়াতে দেওয়া হবে।

বিফল বিপ্লবের কথা বিস্মৃত হয়ে, বিপদ, ক্ষতি আর পরাজয়ের গ্লানি ভুলে সংগ্রামকের অপরিসীম মোহে আচ্ছন্ন হয়ে প্লাসিডো অনিন্দ্যসুন্দর পতাকাটি বুকে আঁকড়ে ধরে ছোট ডেকে হেঁটে বেড়াতে লাগলেন। সমুদ্রের ওপারে বৃদ্ধ গ্রুনিতসের কানে পৌঁছে দিতে চেয়ে তিনি তাঁর অমূল্য পুরস্কারের প্রশস্তি চিৎকাব করে গাইতে লাগলেন। পালতোলা জাহাজটি সালভাদরের কাছে এসে পড়ল নাবিকেরা ফল বোঝাই করার নীচু ডেকের কাছে অতি কষ্টে তাকে থামাতে পারল।

এই সময় ক্যাপ্টেন ম্যাকলাউড বলল, কি খবর, সেনিওর, খেল খতম শুনলাম।

হতচকিত হয়ে ডন সাবাস বললেন, খেল খতম? ও হ্যাঁ বিপ্লবের কথা বলছেন?

ক্যাপ্টেন পলায়ন ও বন্দী নাবিকদের কথা শুনে বললেন, ক্যারিব? ওদের ভয় করার দরকার নেই। এরপর ক্যাপ্টেন জাহাজে এসে খোলের ঢাকনিটা খুলে ফেলে, কৃষ্ণবর্ণের ছেলেগুলি হাসি মুখে ঘর্মাক্ত কলেবরে বাইরে এলে, বললেন, ওহে কালো ছোকরার দল। ইউ সাবি, ক্যাচি বোট ক্র্যান্ড ভামোস ব্যাক দেম পেনস কুইক।

ওরা দেখল ক্যাপ্টেন তাদের পালতোলা জাহাজ আর কোরালিও দেখাচ্ছে।

ওরা বলল, ইয়াস, ইয়াস, ওরা হেসে মাথা নাড়লে ডন সাবাস আর তাঁর দুই সঙ্গী এবং ক্যাপ্টেন জাহাজটি ছেড়ে যাবার জন্য তৈরী হল।

ডন সাবাস, দীনহীন বেশবাস সমেত হাত পা ছড়িয়ে মরে পড়ে থাকা অ্যাডমিরালের দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, পব্রসিটো লোক।

ডন সাবাস উচ্চপদের সঙ্গে মেলামেশা করা একজন ভাদরের বিশ্ব নাগরিক ছিলেন। তৎসত্ত্বেও এই দেশের লোক তাঁরই স্বজাতি, একই রক্ত তাঁর ধমনীতে বইছে, এক স্বভাবও। মৃত অ্যাডমিরালের দিকে চেয়ে তিনি, কোরালিওর সরল চাষীদের মতো বললেন, হতভাগ্য পাগল বেচারা।

এবার ঝুঁকে পড়ে অ্যাডমিরালের কাঁধ দুটি অল্প একটু তুলে ধরে সেই অমূল্য পতাকাটার কিছুটা কাঁধের নীচে গুঁজে দিয়ে বাকিটা বুকের ওপর বিছিয়ে দিলেন। তারপর নিজের কোট থেকে হীরের তারকা খচিত অর্ডার অফ সেন্ট কার্লস খুলে সেখানে আটকে দিলেন।

এরপর আস্তে আস্তে তিনি অন্যদের সঙ্গে গিয়ে সালভাদরের ডেকে দাঁড়ালেন। নাবিকরা ঠেলা দিয়ে এল নাশিওনালকে সরিয়ে দিলে ক্যারিবেরা কথা বলতে বলতে জলের দড়িদড়া টানতে লাগল। জাহাজটি তীরের দিকে চলল। হেরগ্রুনিতসের নৌযুদ্ধের পতাকার সংগ্রহ এখনও সবার সেরা হয়ে রইল।

দশ

শ্যামরক আর তালবৃন্ত

একদিন রাত্রে পাঁচজন ব্যক্তি কোরালিওতে কেওগ আর ক্ল্যান্সির ফোটোগ্রাফের দোকানের দরজার পাশে জড়ো হলো। দিনের কাজকর্মের শেষে, বিদেশী বস্তুর নিন্দায় ঘরে মুখর হয়ে, নিজেদের জাতিকুল গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য, বিশ্বের সকল রৌদ্রতপ্ত বিদেশ বিভূঁই-এ এইভাবে ককেশীয়রা জড়ো হয়।

ক্যারিবদের ঘরোয়া পোশাকে ঘাসের ওপর শুয়ে জনি অ্যাটউড মিনমিনে গলায় ডেলসবার্গের কাঁকুড়ক্ষেতের পাশের পাম্পের ঠাণ্ডা জলের কথা বলছিল। ডাঃ গ্রেগ তাঁর শুভ্রদাড়ির গৌরব আর ডাক্তারীর গলাগুলি না বলার অঙ্গীকারের ঘুষ হিসাবে দরোজার খুঁটি আর ক্যালাবান গাছের ডালে বাঁধা দোলনায় আসীন। কেওগ ফোটোগ্রাফ বার্ণিশ করার যন্ত্র সমেত একটি টেবিল ঘাসের ওপর টেনে নিয়ে এসে কাজ করছে। কোরালিওর বাসিন্দাদের ছবিগুলি ধীরে ধীরে বার্নিশের রোলারের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসছে। গরমের ব্যাপারে উদাসীন ফরাসী মাইনিং ইঞ্জিনিয়র, প্লানচার্ড, শীতল লিনেনের পোশাক পরে চশমার ভিতর দিয়ে তাঁর সিগারেটের ধোঁয়া দেখছে। গল্প বলিয়ের মেজাজে ক্ল্যানসি সিঁড়িতে বসে ছোট পাইপে ধূমপান করছে। গরমে আর ভ্যাপসানিতে অন্যদের অবস্থা অকর্মন্য শ্রোতাদের পর্যায়ের।

প্রবণতার বিশ্ব নাগরিক আর চরিত্রে আইরিশ ক্ল্যানসি একজন আমেরিকান। অল্পদিনের জন্য বহু পেশাই তাকে নিজের বলে দাবি করেছিল। তার শিরায় শিরায় ভবঘুরের রক্ত প্রবহামান। টিনের পটচিত্র শিল্প সেই বহু পেশার একটি যা তাকে নানা রাস্তায় ভ্রাম্যমান করে রেখেছে। কখনো কখনো সে তার বিচিত্র এক চাঞ্চল্যকর ভ্রমণপঞ্জীর অংশবিশেষ বর্ণনা করত।

নিজে থেকেই একসময় ক্ল্যানসি বলে উঠল, গেরিলা যুদ্ধের পক্ষে, চমৎকার আবহাওয়া। অত্যাচারীর বিষাক্ত বাতাসময় বদ্ধ মুষ্টি থেকে, একটি জাতির মুক্তি যুদ্ধে যখন আমি লড়াই করেছিলাম, সেই সময়কার কথা আমার মনে পড়ছে।

অত্যন্ত কঠিন সেই কাজটা করতে গিয়ে পিঠে ব্যথা, হাতে কড়া পড়ে গিয়েছিল।

ফিসফিস করে অ্যাটউড বলল, অত্যাচারিত জনগণের পক্ষে তুমি কখনো কোথাও তরবারি ধরেছ এখবর তো আমি জানতাম না।

হ্যাঁ ধরেছিলাম, ওরা সেই তরবারি পালটে লাঙলের ফাল করে দিয়েছিল।

প্লানচার্ড তাচ্ছিল্য ভরে বলল, তোমার সাহায্য পেয়ে ধন্য হয়েছিল কোন ভাগ্যবান দেশ?

ক্ল্যানসি হঠাৎ বলল, কামচাটকা কোথায় কেউ বলতে পার?

কোন একজন বলল, কেন, উত্তরের হিমমণ্ডলে, সাইবেরিয়ার কাছাকাছি একটা কোথাও।

ক্ল্যানসি খুশীতে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, তার মানে সেই ঠাণ্ডা জায়গাটা, দুটো নাম আমি প্রায়ই গুলিয়ে ফেলি। তার মানে গরম যে যায়গায় আমি লড়াই করেছিলাম, সেটা ছিল গুয়াতেমালা। ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত দেশটা তোমরা ম্যাপে দেখতে পাবে। ঈশ্বরের দূরদৃষ্টির ফলে দেশটি সমুদ্রের ধারে অবস্থিত হওয়ার ভূগোলের লোকেরা জলের মধ্যে সে দেশের শহরগুলির নাম লিখেছে। স্প্যানিশ ভাষায় লেখা, নামগুলি ছোট হরফে এক ইঞ্চি করে লম্বা। হ্যাঁ, সেই দেশের অত্যাচারী সরকারের বিপক্ষে একা হাতে একটি খালি একনলা গাইতি নিয়ে, সেই দেশকে মুক্ত করতে পাড়ি দিয়েছিলাম। তোমরা কিছু বুঝতে পারছ না তো? আমি যা বললাম সেটা ব্যাখ্যা করার ও মাফ চাইবার অপেক্ষা রাখে না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ক্ল্যানসি বলতে লাগল জুন মাসের পয়লা নাগাত একদিন সকালবেলা নিউঅর্লিয়েন্সের জেটিতে দাঁড়িয়ে আমি নদীর উপর জাহাজ দেখছিলাম। ছেড়ে যাবার জন্য তৈরী হয়ে একটি স্টীমার আমার ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। জেটিতে সাজিয়ে রাখা কতকগুলি বাক্স একদল ষণ্ডা চেহারার লোক স্টীমারটিতে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। ফুট চারেক লম্বা দুফুট বাই দু ফুট বাক্সগুলি দেখে খুব ভারি বলে মনে হচ্ছিল।

আমি ঘুরতে ঘুরতে বাক্সের গাদার দিকে গিয়ে দেখি নাড়াচাড়া করতে গিয়ে একটি বাক্স ভেঙে গেছে। কৌতূহলের বশে আলগা ডালাটি তুলে দেখি উইনচেস্টার রাইফেলে বাক্সটি ভর্তি। আমি

নিজের মনেই বললাম, বেশ বেশ। কেউ নির্বিবোধিতার আইনটির অন্য অর্থ করছে। আমি ভাবতে লাগলাম কেউ বুঝি যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছে। কোন্ সেই দেশ যেখানে গুলতিগুলি যাচ্ছে? এই সময় কারুর কাশির শব্দ শুনে ঘুরে দেখি বাদামী মুখের একজন গোলাকৃতি মোটা ব্যক্তি, সাদা পোশাক, হাতে চার রতি হীরের আংটি, চোখে জিজ্ঞাসা ও সম্ভ্রম নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমার মনে হল লোকটি বিদেশী, রাশিয়ান বা জাপানী বা দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী।

সেই ব্যক্তিটি এইবার খুব সংগোপনে বলল, সেনিওর আপনি যা দেখতে পেয়েছেন তা জাহাজের লোকেরা যেন জানতে না পারে। আপনি ভদ্রব্যক্তি, আকস্মিক ঘটে যাওয়া ব্যাপারটা যেন প্রকাশ করে ফেলবেন না।

আমি তাঁকে ফরাসী ভেবে নিয়ে বললাম, মঁসিয়ে, জেমস্ ক্ল্যানসির কাছে আপনার গোপন ঘরে নিরাপদে থাকবে। এ ছাড়া, আমি জানাচ্ছি, স্বাধীনতা দীর্ঘ জীবি হোক। দীর্ঘজিবী হোন। জোরালো গলায় বলছি, যদি কোনদিন কোন ক্লানসিকে দেখেন চলতি সরকারের উচ্ছেদের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধতা করছে তাহলে পরবর্তী ডাকে সেই খবরটি আমাকে পৌঁছে দেবেন।

হেসে মোটা লোকটি বলল, সেনিওর ভালো লোক। এক গ্লাস আঙুরের মদ পান করার জন্য আমার জাহাজে যদি দয়া করে আসেন।

স্টীমারে উঠে আমি আর সেই ব্যক্তিটি, মাঝখানে একটি বোতল রেখে মুখোমুখি বসলাম। ভারী বাক্সগুলি জাহাজের খোলে এনে রাখার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। ক্ল্যানসি বলে চলে, প্রায় দুই হাজার মতো উইনচেস্টার ভর্তি করা হল বলে আন্দাজ করলাম। দুজনে মিলে বোতলটি শেষ করলে সে সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বোতল আনতে দিল। উষ্ণমণ্ডলের দেশগুলিতে প্রায়শই লেগে থাকা বিপ্লবের কথা শুনতে শুনতে একটাতে অংশ নেবার ইচ্ছা হতে লাগল।

আমি বললাম একটু চোখ টিপে। আপনি আপনার দেশে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন, মঁসিয়ে।

টেবিলে ঘুঁসি মেরে বেঁটে লোকটি বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেশে একটা বিরাট পরিবর্তন আসছে। কোনোদিনই ঘটাবে না এমন সব স্তোকবাক্য দিয়ে জনগণকে বহুদিন ধরে কেবল আশ্বাস দেওয়া হয়েছে আর নানাভাবে তাদের পীড়ন করা হয়েছে। বিরাট একটা কাজ করতে হবে। হ্যাঁ, ক্যারামবস, আমাদের শক্তি শীঘ্রই রাজধানী গিয়ে পৌঁছবে।

মদ্যপানের সঙ্গে সঙ্গে আমার উৎসাহ বাড়তে থাকায় আমি বললাম, ক্যারামবসই হচ্ছে সেই শব্দ তেমনি ভিভা, যা আমি আগেও বলেছি। অতীতের মতো শামরক। আমি বলতে চাইছি, আপনাদের নিপীড়িত দেশের স্বাধীনতার চিহ্ন, কলাপাতা বা অন্য কিছু প্রতীক, চিরকাল উড়তে থাকুক।

গোলগাল লোকটি বলল, আপনার এই প্রীতিপূর্ণ কথার জন্য আপনাকে হাজারো ধন্যবাদ। দেশকে উন্নতির শিখরে তোলার মতো মহান আদর্শ সিদ্ধির জন্য আমাদের সবল লোক দরকার যাদের অনেক কাজ করতে হবে। দেশকে সাফল্য ও মহিমায় ভূষিত করার কাজে জেনারেলকে ভেগার সাহায্যের জন্য যদি একহাজার সবল, সৎলোক পেতাম। এই কাজে সাহায্য করার মতো সৎলোক পাওয়া সত্যিই কঠিন কাজ।

টেবিলে ঝুঁকে তার হাত ধরে আমি বললাম, মঁসিয়ে, আমি জানিনা কোথায় আপনার দেশ। কিন্তু আমার হৃদয় থেকে রক্ত ঝরছে। নিপীড়িত জনগণের দৃশ্য দেখতে পেলে ক্ল্যানসির হৃদয় কখনো বধির হয় না। ব্যবসাগত দিক দিয়ে বিদেশী এই বংশ জন্মসূত্রেই বিপ্লবী। আপনারা দেশকে অত্যাচারীর জোয়াল থেকে মুক্ত করার কাজে জেমস ক্ল্যানসির বাহুবল আর বুকের রক্ত যদি কাজে লাগাতে পারেন তবে তারা আপনার অধীন।

তাঁর দুর্বিপাকে আমার সহানুভূতি পেয়ে জেনারেল দে ভেগা আনন্দে অধীর হয়ে টেবিলের ওপর দিয়েই আমাকে আলিঙ্গন করার চেষ্টা করলেন কিন্তু তাঁর মোটা দেহ, মাঝখানে টেবিলও তার ওপর রাখা মদের বোতল তাঁকে সেই কাজে বাধা দিল। ক্ল্যানসি তাদের দোকানের কাছে জড়ো হওয়া সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বলে চলল, এইভাবে আমি সানন্দে বিপ্লবীদলে ভর্তি হয়ে গেলাম।

এবার জেনারেল আমাকে বলল, তাঁর দেশের নাম গুয়াতেমালা। মহাসাগরের তীরে অবস্থিত

বিশ্বের সেরা দেশ। আমার দিকে তাকানোর সময় তাঁর চোখে জল এসে যায়। তিনি বলেন, আমার দেশ এখন শুধু শক্তিশালী ও সাহসী লোক চায়।

জেনারেল দে ভেগা এবার একটি দলিল বার করে আমাকে সই করতে বলায়, ক্ল্যানসি বলে চলে, আমি সই করে দিলাম।

এবার ব্যবসায়ীর গলায় জেনারেল বললেন, পরে আপনার মাইনে থেকে আপনার স্টীমার ভাড়া কেটে নেওয়া হবে।

তা হবে না। আমার ভাগ আমি নিজেই দেবো। আমার কাছে একশ আশি ডলার ছিল আর অন্নবস্ত্রের জন্য লড়াই করা সাধারণ গোরিলাও আমি হতে চাই নি।

স্টীমার ছাড়ার দেরী থাকায় আমি দু-একটা জিনিস কিনে ফিরে জেনারেলকে আমায় চমৎকার চিনচিলার ওভার কোট, হিমমগুলের ওভার সু, ফার-এর টুপী, পশমের লাইনিং দেওয়া দস্তানা, পশমের মাফলার, দেখালাম।

আমার পোশাক দেখে জেনারেল অবাক হয়ে বলল, ক্যারামবস্, এই পোশাকে আমাদের দেশে যাবেন! এবার জেনারেল হাসতে হাসতে ক্যাপ্টেনকে ডেকে আনল, ক্যাপ্টেন ভাণ্ডারীকে, তার চীফ ইঞ্জিনিয়ারকে আর এইভাবে একে একে পুরো দলটা এসে আমার সংগ্রহ করা পোশাক দেখে কেবিনের দেয়ালে হেলান দিয়ে হাসতে লাগল।

আমি গম্ভীরভাবে চিন্তা করে জেনারেলের মুখে তাঁর দেশের নাম আর একবার শুনে বুঝতে পারলাম কামচাটকার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছি আমি।

আমি প্রথম শ্রেণীর কেবিনের জন্য চব্বিশ ডলার ভাড়া দিলাম। নীচের ডেকে নিগ্রো কুলি জাতের চল্লিশ জন দ্বিতীয় যাত্রীকে দেখে আমি চিন্তা করতে লাগলাম এত কুলি কোথায় যাচ্ছে।

শেষপর্যন্ত তিনদিনের দিন আমরা গুয়াতেমালার উপকূলে গিয়ে হাজির হয়ে সেখানকার একটি শহরে নামলাম। সংকীর্ন একটি রেললাইনের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা কতকগুলি রেলের কামরায়, স্টীমার থেকে বাক্সগুলি নামিয়ে ভর্তি করে কুলির দল তাতে চড়ে বসল, আমি আর জেনারেল উঠলাম প্রথম কামরায়।

উপকূলের শহর ছাড়িয়ে আমি আর জেনারেল দে ভেগা সেই বিপ্লবের শীর্ষে চললাম। দাঙ্গার স্থলে পুলিশের গতিবেগের সমান বেগে ট্রেনটি ছুটচিল। ভূগোলের বইতে দেখা প্রাকৃতিক শোভা সমৃদ্ধ অঞ্চলের মধ্য দিয়ে ট্রেনটি সাত ঘণ্টায় প্রায় চল্লিশ মাইল যাবার পর থেমে গেল। সামনে আর রেলের রাস্তা ছিল না। স্যাঁতস্যাতে একটা পাহাড়ী ঝরণার ধারে নির্জন, বিষণ্ণতায় ভরা জায়গাটা যেন একটা ক্যাম্প রেললাইন এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সামনের দিকে বন কাটা আর রাস্তা তৈরীর কাজ চলছিল দেখতে পেলাম। আমি নিজের মনেই বলে উঠি, বিপ্লবের রোমানটিক জগৎ। এইখানে আমি, মহান জাতির বংশোদ্ভব হওয়ার গুণে আর আইরিশ কৌশলে, স্বাধীনতার জন্যে প্রচণ্ড আঘাত হানব।

ওরা বাক্সগুলি ট্রেন থেকে নামিয়ে তার ওপরের ঢাকনাগুলি ভাঙতে শুরু করল। প্রমথটির ডালা ভাঙাই ছিল। জেনারেল দে ভেগা একদল গম্ভীর প্রকৃতির সৈন্যদের একটি একটি করে উইনচেষ্টার রাইফেল দিলেন। তারপর অন্যসব বাক্সগুলি খোলা হলে আমি অবাক হয়ে দেখতে পেলাম সেগুলি কোদাল আর গাঁইতিতে ভরা ছিল।

এবার আমার ও হতাভাগা কুলিদের হাতে একটি করে কোদাল বা গাঁইতি দিয়ে ছোট নোংরা রেল রাস্তায় মার্চ করিয়ে নিয়ে গেল। এবার বুঝতে পারলাম এই কাজের জন্যই কুলির দলকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে, আর না জেনে আমি এই কাজের জন্যই কনট্রাকট সই করেছি। পরে জানতে পারি কায়িক পরিশ্রমের ব্যাপারে সে দেশের বুদ্ধিমান বাসিন্দারা অলস হওয়ার এই কাজের জন্য উপযুক্ত সবল লোক পাওয়া যাচ্ছিল না।

প্রকৃতই, ঋষিরা জানেন, তার কোন প্রয়োজন নেই। এক হাতের মধ্যে বিশ্বের সবচেয়ে দামী আর সুস্বাদু ফল পাওয়া যায় আর, সাতটার বাঁশি বা সিঁড়িতে পাওনাদারের পায়ের শব্দ শুনতে না হওয়ায়, অন্য হাত ছড়িয়ে দিনের পর দিন নিদ্রা দেওয়া যায়, বলে নিয়মিত ভাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে স্টীমারে করে শ্রমিক নিয়ে আসে এরা। সাধারণত, নিয়ে আসা এইসব শ্রমিকের

দল পচাজল খেয়ে উষ্ণমণ্ডলের বাতাসের ঘ্রাণ নিয়ে দু-তিন মাসের বেশী বেঁচে থাকত না। সেজন্য এরা একবছরের চুক্তি করে নিয়ে আসত আর পালিয়ে না যেতে পারে বলে সমগ্র পাহারার সেখানেই গিয়ে হাজির হতাম। আর ঠিক এই কারণেই ক্রান্তিয় অঞ্চলে আমি বোকা বনেছিলাম।

একটা গাইতি আমাকে দিলে আমি সেটা হাতে নিয়েই বিদ্রোহের কথা ভেবেও উইনচেস্টার রাইফেলগুলি নিয়ে পাহারাদারদের বেয়াড়াভাবে নাড়াচাড়া করতে দেখে সে চিন্তা ত্যাগ করে মনে মনে বললাম, সিরে বুদ্ধি গেরিলা যুদ্ধের প্রধান আদর্শ। আমরা সব মোট প্রায় একশজন কাজ শুরু করার জন্য এগিয়ে যাবার আদেশ পেলাম। ক্ল্যানসি বলে চলে, আমি স্যরি থেকে বেরিয়ে, খুশীতে ডগমগ হয়ে চুরুট টানতে টানতে চারিদিক তাকাচ্ছিল দেখে, জেনারেল দেভেগার দিকে এগিয়ে যাই।

আমার দিয়ে শয়তানের হাসি হেসে সে বলল, গুয়াতেমালাতে লম্বা চওড়া বলশালী লোকেদের কাজের অভাব নেই। আর। মাসে ত্রিশ ডলার হিসাবে মাইনেটাও ভালোই। তুমি শক্তিমান সাহসী ছোকরা। রেল রাস্তাটা আমরা রাজধানী পর্যন্ত তাড়াতাড়ি এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। তোমাকে কাজ করতে ডাকছে। এখন কাজে যাও।

আমি যাবার কোনো লক্ষণ না দেখিয়ে বললাম। মঁসিয়ে, আপনি কি একজন বোকা আইরিশম্যানকে এটা বুঝিয়ে দেবেন, আপনার স্টীমার পাদিয়ে আপনার এক দ্রাক্ষাসবের ওপর আমি যখন বিপ্লব আর মুক্তির কথা বলছিলাম, তখন কি আপনি এই রেলরাস্তায় গাঁইতি চালাবার জন্য আমি আপনার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছিলাম, ভেবেছিলাম। আর দেশপ্রেমের উদ্ধৃতি দিয়ে আমার কথায় জবাব দেবার সময়ে তারকাখচিত স্বাধীনতার সংগ্রামকে যখন উঁচুতে তুলছিলেন তখন কি আমাকে এইসব কুলিদের পর্যায়ে ফেলেছিলেন? আমার এই কথায় সেই ব্যক্তি হাসিতে ফেটে পড়ল।

উচুঁ গলায় অনেকক্ষণ হাসার পর চিৎকার করে আমাকে বলল, তুমি তো বেশ রগড়ের লোক হে। তুমি তো আমাকে হাসিয়ে মেরে ফেলবে দেখছি। আমরা সাহসী ও বলশালী লোক পাইনা আমাদের দেশকে সাহায্য করার কাজে। আর বিপ্লব? আমি কি বিপ্লবের কথা বলেছিলাম? জেনারেল আরও বলল, গুয়াতেমালার বড়ো চেহারার লোক চাই, এই কথাই আমি বলেছিলাম। সুতরাং ভুল যা কিছু তা তোমারই, পাহারাদারদের জন্য একটা বাক্সে করে নিয়ে আসা বন্দুক দেখেই তুমি ভেবে নিলে সবকটা বাক্সতেই বন্দুক আছে। গুয়াতেমালাতে কোনোরকম যুদ্ধ বিবাদ নেই। তবে ও মাসে ত্রিশ ডলারের অনেক ভালো কাজ আছে। সেনিওর। গুয়াতমালার স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধির জন্য একটা গাঁইতি কাঁধে নিয়ে খুঁড়ে যাও। পাহারাদার তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে, যাও কাজে যাও।

রাগে ও দুঃখে উচলতে উচলতে আমি খুব আস্তে আস্তে বললাম, বেঁটে, মোটা, কেলে কুত্তা, তোমার আমি দেখে নেব। এখনি কিছু বলতে পারছি না ঠিকই কিন্তু বদলা আমি নেবই, একটু সবুর করো।

দলের সরদারের নির্দেশ মতো আমি নিগ্রো কুলিদের সঙ্গে এগিয়ে যেতে যেতে সেই মোটাটা ফুর্তিতে হাসছে শুনতে পেলাম।

একটু থেমে ক্ল্যানসি একবার সবার দিকে দেখে নিয়ে আবার বলতে শুরু করল। আট সপ্তাহ ধরে আমি সেই দেশে রেলের রাস্তা তৈরী করলাম। রেলপথের বাধা দান কারি বৃক্ষলতা কেটে ফেলার জন্য প্রত্যহ বারোঘণ্টা ধরে আমার সংগ্রাম চলত একটা গাইতি আর কোদাল নিয়ে। আমরা, দুষ্প্রাপ্য সব মহামূল্যবান ফুললতা শাক সবজী মাড়িয়ে জলার মধ্যে কাজ করতাম সেখানে গন্ধ পেতাম যেন গ্যাসের পাইপ ফুটো রয়েছে। গাছগুলি লম্বা হতে হতে আকাশের দিকে উঠে গিয়েছে। নিচের ঝোপে কাঁটা আর সূচীমুখ লতাগুল্ম। গাছের শেকড় ধরে হাঁটু পর্যন্ত পচা জলে দাড়িয়ে গুয়াতেমালার মুক্তির জন্য লড়াই করতে করতে চারিদিকে বাঁদর লাফাচ্ছে, কুমির আর লম্বা, লেজের মার্কিংবার্ড ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখতে পেতাম। রাত্রে মশা তাড়াবার ধুনীজ্বেলে বসে থাকার সময়েই পাহারাদারেরা সশস্ত্র হয়ে আমাদের চারপাশে ঘুরে বেড়াত। এই রেল রাস্তার কাজে বেশীরভাগ নিগ্রো, স্প্যানিশ, কিছু সুইডিশ আর তিন চার জন আইরিশ মিলিয়ে, সব মোট প্রায়

দুশ জন কাজ করত।

প্রায় বছর খানেক ধরে কাজ করা, জাতিতেও চরিত্রে আইরিশ, হ্যালেরান নামে, একজন বুড়ো ছিল তার চেহারা হাড় সর্বস্ব হয়ে গিয়েছিল আর চুল দাড়ি লোমে এসে ঠেকেছিল। দুই তিনদিন অন্তর রাত্রে তার কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসত।

হ্যালোরান আমাকে বুঝিয়ে বলল, এখানেই এসেই তুমি চলে যাবে ভাবলেও পারবে না, গাড়ীভাড়া বাবদ তোমার প্রতি মাসের মাইনে কেটে রেখে দিয়ে ওরা তোমাকে এইখানে আটকে রাখবে। তোমার চারিদিকে অতি ছ্যাঁচড়া সব জীবজন্তুতে ভরা দুস্তর জঙ্গল। রোদের ভীষণ তাপে তোমার হাড়ের ভিতরের মজ্জা পর্যন্ত গলে যাবে। তোমার অবস্থা দুদিনে কবিতার বইয়ের লোটাস ইটারদের মতো হয়ে যাবে। দেশপ্রেম, প্রতিশোধ, শান্তিভঙ্গ করা বা ফরসা একটা সার্ট পরার মতো জীবনের উচ্চতর ভাব অনুভূতিগুলি তুমি ভুলে যাবে। খাদ্য বলে নিগ্রো রাঁধুনির দেওয়া কেরোসিন তেল আর বাবার পাইপের টুকরো খাও আর কাজ করে যাও। পাইপে তামাক ভরে খেতে খেতে সামনের সপ্তাহে পালাবে ভেবে নিয়ে ঘুমোও আর পালাতে পারবে না জেনে নিজেকে মিথ্যাবাদী বলো।

এবার আমি হ্যালোরান কে বললাম, নিজেকে জেনারেল দে ভেগা বলা এই লোকটা কে?

এই লোকটা রেলরাস্তাটা পুরো করতে চাইছে। দে ভেগা প্রেসিডেন্ট হতে আগ্রহী একজন বড়ো রাজনৈতিক নেতা। একটা প্রাইভেট করপোরেশনের হাতে থাকা এই প্রকল্পটি করপোরেশনটি উঠে গেলে গভর্নমেন্ট প্রকল্পটি নিজের হাতে নেয়। এর জন্যে জনগনকে ট্যাক্স দিতে হয় বলে তারা চায় রেলরাস্তাটা সম্পূর্ণ হোক। নির্বাচনের প্রচারের একটি চাল হিসেবে দে ভেগা এই রেলপথটি তৈরীর কাজ নিয়েছে।

আমি বললাম, একটা বোঝাপড়া বাকি রইল আমার সঙ্গে এই রেল রাস্তার লোকটির, যদিও কাউকে ভয় দেখানো আমার স্বভাব না।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল হ্যালোরান বলল, যতদিন লোটাস ইটারে পরিণত হইনি ততদিন আমিও এইরকমই ভেবেছিলাম। এই উষ্ণমণ্ডলের আবহাওয়া শরীরের কর্মক্ষমতা কমিয়ে দেয়। কবির কথা মতো, এই দেশটায়, সকল সময়ই যেন ভোজনের পরের কাল। আমি আমার কাজ করি। পাইপ টানি আর ঘুমোই। এখানে এছাড়া আর করার কিছুই নেই। তুমিও শীঘ্রই এরকম হয়ে যাবে। তাই কোন ভাবপ্রবণতা মনে পুষে রেখো না ক্ল্যানসি।

আমি ভাবাবেগে পূর্ণ হয়ে আছি। না রেখে তাই পারছি না। এই অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশের মুক্তি সম্মান ও রূপোর বাতিদানের জন্য সরলবিশ্বাস এদের বিপ্লবী সেনাদলে আমি ভর্তি হলাম। যুদ্ধ করতে। তার বদলে কিনা শেকড় খেয়ে দৃশ্যপটের অঙ্গচ্ছেদ করছি। এই মোটা জেনারেলকে এর মূল্য দিতে হবে।

পালাবার প্রথম সুযোগ পেতে পেতে আমার প্রায় দুমাস লেগে যায়। ক্ল্যানসি বলে চলে সম্পূর্ণ হয়ে আসা রেলপথের শেষপ্রান্তে পোর্ট ব্যারিওস থেকে কতকগুলো ভোঁতা গাঁইতি ধার দিয়ে আনতে একদিন আমাদের একটা দলকে পাঠানো হয়েছিল। একসময় আমি দেখতে পেলাম গাঁইতি বয়ে নিয়ে আসা হাতগাড়ীটি রেললাইনের ওপর রাখা রয়েছে।

রাত্রি বারোটা নাগাদ হ্যালোরানকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে আমার মতলবের কথা বললে সে বলল, পালাবে? হে ভগবান, ক্ল্যানসি তুমি মিথ্যা কথা বলছ না তো? বাইরে বড় ঠাণ্ডা আর ঘুমটাও পুরো হয় নি। আমার এত সাহস নেই পালাবো। এই উষ্ণমণ্ডলের কারণেই নিজের ওপর আমার আর কোনো আস্থা নেই। কবি যেমন বলেন, ভুলে গেছি বন্ধুদের দূরে ফেলে এসেছি যাদের, শূন্যগর্ভ কমলের দেশে, আরামে বাঁচা শুয়ে বসে। তারপর আবার বলল, তুমি যাও ক্ল্যানসি, আমার আর যাওয়া হবে না। এখন মাঝরাত্রি, বাইরে ঠাণ্ডা, ঘুমে আমার চোখ জুড়ে আসছে।

শেষ পর্যন্ত একাই জামা কাপড় পরে তাঁবুর বাইরে এলাম। হঠাৎ একজন পাহারাদার এসে যাওয়ায় তাকে ভাবের বাড়ি মেরে কাত করে রেললাইনের দিকে ছুটে গিয়ে হাতগাড়ী টায় চড়ে বসে সেটা চালিয়ে দিলাম। ভোরের কিছু আগে মাইল খানেক আগে পোর্ট ব্যারিওসের আলো দেখে হাতগাড়ীটা সেখানে থামিয়ে পায়ে হেঁটে শহরের বড়ো বড়ো সংস্থাগুলির এলাকা সন্তর্পণে

এড়িয়ে গেলাম। গুয়াতেমালার সৈন্যদলকে ভয় না পেলেও আমি তাদের কর্ম সংস্থানের অফিসের সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই করার কথা চিন্তাও করতে সাহস পাই না। এই দেশ সহজেই লোককে চাকরী দিয়ে তাকে ধরে রাখতে পারে।

তখনও দিনের আলো ফোটেনি, এমন সময় বন্দরের কাছে গিয়ে একটা স্টীমারের চিমনী দিয়ে ধোঁয়া বার হচ্ছে দেখতে পেলাম, সরু একটা ঘাসে ঢাকা গলি দিয়ে জলের ধারে এসে দেখলাম একজন বাদামী রঙের ছোটখাটো নিগ্রো ঠেলে ঠেলে একটা ডিঙি নামাচ্ছে। আগের কোনো চাকরীর ফাঁদে না পড়ে এই দেনা থেকে কি করে পালাবে তখন সেটাই শুধু আমার চিন্তা।

সেই সময় আমি সেই নিগ্রোটিকে ডেকে বললাম। সামনে, একটু দাঁড়াও। সাভে ইংলিশ?

চমৎকার একটু হেসে সে বলল, হ্যাঁ, প্রচুর।

আমি বললাম, এটা কোন স্টীমার? যাচ্ছে কোথায়? ভালো মন্দ কোনো খবর কি আছে, কটা বেজেছে?

নিগ্রো লোকটি বলল, এটা দি কনচিটা। নিউঅর্লিয়েন্স থেকে কলা নিয়ে যেতে এসেছে। আর দু-এক ঘণ্টার মধ্যেই ছাড়বে। দিনটা আজ ভালো যাবে। লড়াইয়ের খবর কিছু রাখো কি? জেনারেল দে ভেগা ধরা পড়বে, না পড়বে না।

ভারি লড়াই? কোথায়? কারা জেনারেলকে ধরতে চায়? মাস দুই মতো আমি আমার পুরোন সোনার খনিতে ছিলাম। একেবারে ভিতরে হওয়ায় কোনো খবরই আমি পাইনি। কি ব্যাপার স্যামবো!

গুঁয়াতেমালায় এক সপ্তাহ আগে বড় সড় একটা বিপ্লব হয়ে গিয়েছে। জেনারেল দে ভেগা প্রেসিডেন্ট হতে চায়। ওর হয়ে এক, পাঁচ, দশ হাজার সৈন্য লড়াই করছে সরকারের বিরুদ্ধে, বিদ্রোহ দমন করতে সরকার পাঁচ, চল্লিশ, এক হাজার ফৌজ পাঠায়। এখান থেকে উনিশ বা পঞ্চাশ মাইল দূর পাহাড় অঞ্চল লোমাগ্রানদে গতকাল ভীষণ যুদ্ধ হয়েছে। সরকারী ফৌজ জেনারেল দেভেগার পাঁচশ, নশ, দুহাজার লোক মেরেছে। খুব তাড়াতাড়ি বিপ্লব চুরমার হয়ে যেতে জেনারেল একটা বড়ো খচ্চরের পিঠে চেপে পালিয়েছে। জেনারেলকে গুলি করে মারার জন্য সরকারী সৈন্যরা তাকে ধরতে চায়। জেনারেল ধরা পড়বে, তোমার কি মনে হয়?

এবার আমি বলি, ঈশ্বরের বিধান অনুযায়ী সেটাই হওয়া উচিত। কোদাল গাইতি দিয়ে ক্রান্তিয় জঙ্গল সমতল করার কাজে একজন ক্ল্যানসির যোদ্ধৃ বিদ্যায় প্রতিভার কিনা অপচয় করল। কিন্তু এখন বিদ্রোহের থেকে ভাড়াটে কুলির সমস্যাটা আমার কাছে বড়ো। দায়িত্ব শীল একটি চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে আমি ব্যগ্র হয়েছি তোমাদের মহান ও হতশ্রী দেশের সাদা ডানার বিভাগের শরণাপন্ন হতে। তোমার এই ছোট্ট ডিঙিতে করে ওই স্টীমারের আমাকে নিয়ে গেলে আমি তোমাকে পাঁচ ডলার দেব।

ছোট খাটো লোকটি বলল, তুমি পাঁচ ডলার দেবে? সিঙ্কো পেসোস্।

লোকটা ভালো ছিল। দেশ ছেড়ে যেতে পাসপোর্ট কাগজপত্র ইত্যাদি লাগে বলে প্রথমে রাজী না হলেও স্টীমারের ধারে নিয়ে গেলে অল্প ফোটা দিনের আলোয় স্টীমারে লোকজনের কোনো চিহ্ন দেখতে পেলাম না। নিগ্রো লোকটি ডিঙি থেকে আমাকে খানিকটা তুলে ধরলে আমি স্টীমারের ফল বোঝাই করার ডেকে উঠে পড়লাম। খোলের খোলা ঢাকনাদিয়ে ভিতরে তাকিয়ে দেখতে পেলাম, ডেক থেকে মাত্র ছফুট নীচে ভিতরটা কলাতে বোঝাই। নিজেই নিজেকে বলি, লুকিয়ে জাহাজে চড়ে পালিয়ে যাওয়াই নিরাপদ। স্টীমারের লোকেরা দেখতে পেলে আবার হয়ত কর্মখালি অফিসে ভর্তি করে দেবে। হুঁশিয়ার না থাকলে, আবার ধরবে।

ক্ল্যানসি বলতে লাগল, আমি তাই কলার কাঁদির ওপর লাফিয়ে পড়ে তার মধ্যে একটা গর্ত করে লুকিয়ে থাকলাম। ঘণ্টাখানেক পরে ইঞ্জিনের শব্দ শুনে ও স্টীমারের দোলায় বুঝতে পারলাম, আমাদের সমুদ্র যাত্রা শুরু হল। ফল গুলিতে হাওয়া লাগবার জন্য খোলা রাখা ঢাকনাগুলির মধ্য দিয়ে আসা আলোর ভিতরটা মোটামুটি দেখা যাচ্ছিল। একটু খিদে পাওয়ার ফল দিয়ে হালকা লাঞ্চ করে নেবার কথা ভেবে গর্ত থেকে বার হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে দশফুট দূরে একটা লোককে হামাগুড়ি দিয়ে কলার গাদা থেকে বার হয়ে একটা কলার খোসা ছাড়িয়ে খেতে

দেখলাম। লোকটা নোংরা, মুখ কালো, জামা কাপড় ছেঁড়া, অত্যন্ত কদাকার আকৃতির। ভালো করে লক্ষ্য করতেই বুঝতে পারলাম এটি আর কেউ না, গাঁইতি আমদানীকারী, মহান বিপ্লববাদী, খচ্চর চালক, জেনারেল দে ভেগা। আমাকে দেখে ঘাবড়ে গিয়েছে মুখ ভর্তি কলা নিয়ে কথা বলতে পারছে না।

এই সময় আমি একটা ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলাম যে জেনারেল আমাকে চিনতে পারবে না। জঙ্গলে জঘন্য কাজ করার ফলে আমার চেহারা অনেক বদলে গিয়েছে। মুখে আধ ইঞ্চি পাঁচমিশেলি দাড়ি, পরণে নীল ওভার অল আর লাল সার্ট।

আমি বললাম হিসট। একটি কথা বললেই ওরা আমাদের নামিয়ে দিয়ে হাঁটতে বাধ্য করবে। স্বাধীনতা দীর্ঘজিবী হোক।

মুখের কলা ভিতরে চালান করে জেনারেল বলল। পিছনের দরজা দিয়ে কি জাহাজে এলে, সেনিওর?

আমি বললাম, স্বাধীনতার জন্য মহান আঘাত হেনেও সংখ্যায় আমরা হেরে গেলাম। আসুন, বীরত্বের সঙ্গে আমরা পরাজয় মেনে নিই ও আরো একটা কলা সেই সঙ্গে খাওয়া যাক।

কলার কাঁদির ওপর জেনারেলের চোখের জল ঝরে পড়ে। জেনারেল বলল, তুমিও কি স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে ছিলে সেনিওর?

আগাগোড়া। অত্যাচারীর ভৃত্যদের বিপক্ষে শেষের বেপরোয়া আক্রমণ আমিই পরিচালনা করেছিলাম। কিন্তু তারা পাগলের মতো লড়ায় আমরা হেরে গেলাম। জেনারেল আপনার জন্য খচ্চরটি আমিই জোগাড় করে দিই। ওই পাকা কাঁদিটা আমার দিকে একটু ঠেলে দেবেন জেনারেল।—ধন্যবাদ।

কাঁদতে কাঁদতে জেনারেল বলল, সাহসী দেশপ্রেমিক, তোমার ভক্তির প্রতিদানে কিছু যে দেব সে ক্ষমতা এখন আমরা নেই। প্রাণটা শুধু প্রতিদানে কিছু যে দেব সে ক্ষমতা এখন আমার নেই। প্রাণটা শুধু কোনরকমে বাঁচাতে পেরেছি। সেই শয়তান খচ্চরটায় চড়ে ঝড়ের মধ্যে জাহাজের মতো ধাক্কা খেয়েছি কেবল। কাঁটা আর লতায় খসে চামড়া ছিড়ে গিয়েছিল। কমকরে একশোটা গাছে ধাক্কা খেয়ে নরকের জন্তুটা আমার পায়ের বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছে। রাতে পোর্ট ব্যারিওস-এ পৌঁছে শয়তানটাকে ছেড়ে পায়ে হেটে জলের দিকে এসে একটা ছোট ডিঙি বাঁধা রয়েছে দেখে সেটায় চড়ে স্টীমারের কাছে এলাম। কোনো লোকজন দেখতে না পায়ে একটা দড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এই কলার মধ্যে লুকিয়ে রইলাম। আর নিজের মনেই ভাবতে লাগলাম, জাহাজের ক্যাপ্টেন আমায় দেখলে ওই গুয়াতেমালাতে আবার আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। তাহলে গুয়াতেমালা আমাকে গুলি করে মারবে। সে সব ভাল নয় বলে লুকিয়ে রয়েছি চুপ করে। স্বাধীনতা বেঁচে থাকার চেয়ে নিশ্চয়ই ভালো নয়।

নিউঅর্লিয়েন্স তিনদিনের পথ হওয়ার আমরা পাকা রঙের বন্ধু হলাম। শেষ পর্যন্ত কলা দেখলেই চোখ জ্বালা করতে লাগলেও নিরুপায় হয়ে কলাই খেয়ে কাটাতে লাগলাম। রাত্রি হলেই সাবধানে নীচের ডেকে এসে এক বালতি স্বাদু জল জোগাড় করি। জেনারেল দে ভেগার অনজলি বকবকানির জ্বালায় যাত্রার একঘেয়েমি আরও বেড়ে দিয়েছিল। তার দলে অনেক আমেরিকান আর বিদেশী থাকায় সে বিশ্বাস করে নিয়েছিল আমি তার দলেরই একজন বিপ্লবী। বক্তা হিসেবে হামবড়া আর অহঙ্কারী জেনারেল নিজেকে একজন বীর বলে মনে করত। তার নিজের প্লটে ভেস্তে যাবার জন্যই তার যত দুঃখ। তার এই বিপর্যস্ত বিপ্লবের সঙ্গীদের বিষয়ে একটি কথাও বলার ছিল না।

দ্বিতীয় দিন, একটি খচ্চরের দয়ায় আর চুরি করা কলার কল্যাণে প্রাণে বেঁচে থাকা একজন পলাতক চক্রান্তকারীর আত্মস্মৃতি আর অহংকারের গল্প আমার কাছে বাড়াবাড়ি মনে হল। যে আমাকে, তার বিরাট রেললাইন তৈরীর কথা আর সেই প্রসঙ্গে একটি মজার ঘটনার কথা সে আমাকে বলছিল। তার মর্গের মতো রেলপথে গাঁইতি চালাবার জন্যে নিউআর্লিয়েন্স থেকে ফুসলে আনা এক আইরিশ ব্যক্তির কথা। সেই অপমানকর কাহিনী বলার সময় সে খুব হাসছিল আর আমার শুনতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। দেশহীন, বন্ধুহীন কালোমুখ ছন্নছাড়া বিদ্রোহী গলা পর্যন্ত কলার মধ্যে ডুবে হেসে গড়িয়ে পড়তে লাগল।

হাসতে হাসতে সে চলল, সেই বোকা আইরিশের কথা শুনলে তুমি না হেসে থাকতে পারবে না সেনিওর। আমি তাকে বললাম। গুয়াতেমালায় লম্বা চওড়া লোক দরকার।

সেই বোকা আইরিশ কি বলল জানো। সে বলল, তোমাদের নিপীড়িত দেশে আমি জোর আঘাত হানব।

জেনারেল বলল, আমি বললাম, তা তো করতেই হবে।

জেনারেল আবার আমায় বলতে লাগল, কী মজার যে সেই লোকটা কি বলব। জেটিতে প্রহরীদের জন্য আনা এক বাক্স বন্দুক সে দেখে মনে করল সব বাক্সেই বোধহয় বন্দুক রয়েছে। আসলে বাকি বাক্সগুলোর কোদাল আর গাঁইতি ছিল। তাকে কাজে লাগাবার সময়ে তার মুখের চেহারাটা যদি তুমি দেখতে সেনিওর।

হালকা রসিকতার গল্প বলে কর্মসংস্থানের প্রাক্তন কর্তা যাত্রার একঘেয়েমি বজায় রেখে গেল। স্বাধীনতা বা খচ্চরের বিষয়ে কথা উঠলে কলার কাঁদির ওপর মাঝে মাঝে চোখের জল ফেলে।

স্টীমারটা নিউঅর্লিয়েন্সের জেটিতে ধাক্কা খাবার শব্দটা কানে বড়ই মিষ্টি লাগল। অল্প কিছুক্ষণ পরেই জাহাজের খোলের ভিতর থেকে ডেকের ওপর নিগ্রোকুলিদের পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে, ওরা যাতে আমাদের কে ওদেরই দলের লোকভাবে সেইজন্য ওদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কাঁদিগুলি উঠিয়ে দিয়ে ঘণ্টাখানেক বাদে স্টীমার থেকে জেটিতে এসে পড়লাম। একজন নগন্য ক্ল্যানসির পক্ষে একটি মহান দেশের বিদ্রোহীদলের একজন প্রতিনিধিকে আপ্যায়ণ করতে পারা ভাগ্যের ও সম্মানের কথা। প্রথমেই আমি আমাদের দুজনের জন্য বড়ো মাপের গ্লাসে পানীয় আর কিছু খাদ্য কিনলাম। জেনারেল তার সমস্ত দায়িত্ব আমার হাতে ছেড়ে দিয়েছে এইভাবে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল। লাফায়েৎ স্কোয়ারে গিয়ে আমি তাকে একটা বেঞ্চে বসলাম। পরিতৃপ্ত গোলগাল একটা বাউণ্ডুলের মতো সে ঝুকে বেঞ্চে বসে পড়ল। ওই ভাবে বসা অবস্থায় প্রকৃতিদত্ত বাদামী রং ধুলোয় আর নোংরায় মলিন হয়ে গিয়েছে দেখে খুশী হলাম।

আমি তাকে বললাম, জেনারেল, আপনি নিজের বা অন্য কারুর কোন টাকা পয়সা সঙ্গে করে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন কি?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেঞ্চে কাঁঠ ঠুকে সে বলল, এক সেন্টও নয়। উষ্ণমণ্ডলের দেশ থেকে আমার বন্ধুরা পরে হয়ত আমার জন্যে টাকা পাঠাবে।

ক্ল্যানসি এবার বলল, আমি তাকে বেঞ্চে বসে থাকতে বলে জয়ড্রাম ও কারনডেলেটের কোণে ওহায়ার বিট-এ গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করলাম। ওহারা লম্বা চওড়া, চমৎকার ব্যক্তি। মুখ লাল ঝকঝকে জামার বোতাম হাতে একটি ডাণ্ডা। আমি ভাবলাম, গুয়াতেমালাতে এখন ওহারার মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে সপ্তাহে দু'একবার ডাণ্ডা দিয়ে বিপ্লব থামানোটা তার পক্ষে বেশ মনোরঞ্জন হবে।

তার কাছে গিয়ে আমি জানতে চাই, ৫০৪৬ কি এখনো চালু আছে ড্যানি?

আমার দিকে সন্দেহের চোখে দেখে সে বলল, ওভারটাইম খাটছে। তোমার খানিকটা প্রয়োজন নাকি!

৫০৪৬ হচ্ছে সেই আইন যার সাহায্যে পুলিশের কাছে তাদের অপরাধ গোপন করতে সক্ষম ব্যক্তিদের আটক সাজা ও জেল হয়।

আমি বললাম, ওরে গোলাপি গলার দানব। জিমি ক্ল্যানসিকে কি তুই চিনতে পারছিস না।

উষ্ণমণ্ডলের কল্যাণে আমার বাইরের আকৃতি লজ্জাকর হওয়ায় ওহারা এতক্ষণ আমাকে চিনতে পারছিল না। আমার কথা শুনে চিনতে পারলে আমি তাকে একটি কোণে নিয়ে গিয়ে আমি কি চাই কেন চাই তাকে বুঝিয়ে বললাম।

সব শুনে ওহারা বলল। ঠিক আছে, জিমি। তুমি ফিরে গিয়ে ওই বেঞ্চেই থাকো। দশ মিনিটের মধ্যে আমি আসছি।

পরের দশমিনিট লাফায়েৎ স্কোয়ারে ঘুরতে ঘুরতে ও'হারা বেঞ্চ নোংরা করা দুটি উয়েরি উইলিকে আবিষ্কার করে। আর পরের দশ মিনিটের মধ্যে ক্ল্যানসি ও জেনারেল থানায় হাজির হয়। জেনারেল খুব ভয় পেয়ে আমাকে তার পদমর্যাদা ও বিশিষ্টতার কথা বলতে লাগল।

থানায় হাজির হয়ে আমি পুলিশকে বললাম। ক্ল্যানসি বলে চলে, রেললাইনে কাজ করা এই লোকটি বেকার হবার পর প্রায় উন্মাদ হয়ে গিয়েছে।

ফোঁস করে উঠে জেনারেল বলল, ক্যারামবট্, তুমি আমার দেশে আমার দলের হয়ে লড়াই করলে আর এখানে মিথ্যে কথা বলছ? আমার সত্যিকার পরিচয়টা দাও।

আমি আবার বললাম। রেলের লোক, বেকার কোনো কাজের নয়। একবার ওর দিকে চেয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন। চুরি করা কলা খেয়ে গত তিন দিন ও কাটিয়েছে।

ম্যাজিস্ট্রেট জেনারেলের, পচিশ ডলার বা ষাট জিন-এর সাজা ঘোষণা করলে তার কাছে টাকা না থাকায় সে জেলেই গেল। যে কয়দিন আমি সেই মহান দেশ কামাদ্য-গুয়াতেমালায় গাঁইতি চালিয়েছিলাম ঠিক সেই কয়দিনের জন্যেই সে জেলে গেল। আমার কাছে পয়সা থাকায় ও ও'হারা আমার হয়ে বলায় আমি ছাড়া পেলাম।

গল্প শেষ করে ক্ল্যানসি হাসে। তার পোড় খাওয়া মুখে উজ্জ্বল তারার আলো মুখস্মৃতি জনিত তৃপ্তির সুতি এনে দিয়েছিল। কেওগ তার অংশীদারের পিঠে একটা হালকা চাপড় মেরে হেসে বলল, তারপর জেনারেলের সেই কৃর্তি কর্মের বদলা কেমন করে নিলে বল?

কেওগের কথায় খুশিভরা গলায় ক্ল্যানসি বলল, টাকা না থাকায়, উরসুলাইনস স্ট্রীট রাস্তাটি মেরামতের কাজে সেই অঞ্চলের জেলের একদল কয়েদীদের সঙ্গে ওর জরিমানার টাকাটা রোজগার করার জন্য। ওকে কাজ করতে দিয়েছিল। চমৎকার করে সাজানো, ইলেককট্রিক পাখা আর ভালো ভালো ঠাণ্ডা পানীয়ের, একটা বার কাছাকাছি ছিল। ওই বারটাকে আমি আমার প্রধান কার্যালয় করলাম। সেই ছোটখাটো লোকটির বেলচা-কোদাল হাতে সংগ্রাম কেমন চলছে প্রতি পনেরো মিনিট অন্তর সেখানে তা দেখতে পেতাম। আজকের মতোই ভ্যাপসা গরম তখন নিউঅর্লিয়েন্স।

আমি, হে মঁসিয়ে, বলে ডাকলে, সে কালো হাড়ি মুখে আমার দিকে তাকাতো। জায়গায় জায়গায় মাটির ওরপ ঘাস ফুটে উঠেছে দেখতে পেতাম।

তখন আমি জেনোরেল দে ভেগাকে বলতাম, এখন নিউঅর্লিয়েন্সে মোটা তাগড়া লোকের ভীষণ প্রয়োজন। হ্যাঁ, ভালো করে কাজ করে যেতে হবে। ক্যারামবস্! বুক ফুলিয়ে বলো, আর্য়াল্যান্ড।

এগার

আচার সংহিতার ভগ্নাংশ

কোরালিওতে প্রাতরাশের সময় বেলা এগারোটা। সেই জন্য সেখানকার লোক দেরী করে বাজার যায়। একটা ছাঁটা ঘাস। একটি সবুজ পাতায় ঘেরা ব্রেডফ্রুট গাছের নীচে বাড়িটা অবস্থিত। বাড়িটার চারিদিকে ঘিরে ধরেছে ফুট ছয়েক বারান্দা।

ব্যাপারীরা তাদের বেসাতি নিয়ে সকালে ধীরে সুস্থে বাজারে এসে সদ্য কাটা গোমাংস, মাছ, কাঁকড়া, দেশীয় ফল, ডিম, শকের কন্দ, মিষ্টান্ন, গাদা দেওয়া মকাই-এর রুটি প্রভৃতি সামগ্রী তারা তাদের তক্তার ওপর সাজিয়ে রাখে।

বারান্দার যে জায়গায় তারা দোকান দেয় সেখানে আজ বীলজিবার ব্লাইদের অসুন্দর নিদ্রিত অবয়ব পড়ে থাকায় ব্যাপারীরা তাদের জিনিসপত্র বাজার কুঠির সমুদ্রের দিকে সাজিয়ে ছোট ছোট দলে জড়ো করা হাত পা নেড়ে কথা বলছে। ছোবড়ার এক টুকরো ছেঁড়া মাদুরের ওপর পতিত দেবদূতের মতো সে শুয়েছিল। হাজারো জায়গায় দুমড়ে কুঁচকে, সেলাই খুলে যাওয়া, মোটা শনের ময়লা পোশাক তাকে অস্বাভাবিক ভাবে আবৃত্ত করে রেখেছে। তা সত্ত্বেও, তার প্রাচীন গৌরবের অবশিষ্ট তকমা স্বরূপ, তার উঁচু নাকের মাঝখানে সোনার ফ্রেমের চশমা দৃঢ়ভাবে রাখা রয়েছে।

ব্যাপারীদের গলার আওয়াজে ও সূর্যের রশ্মি সমুদ্রের ছোট ছোট ঢেউ থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে কেঁপে কেঁপে মুখের উপর পড়ায় ব্লাইদের ঘুম ভেঙে গেল, চোখ পিট পিট করতে করতে উঠে বসে দেয়ালে ঠেসান দিল। পকেট থেকে একটা নোংরা সিল্কের রুমাল বার করে চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে সে লক্ষ্য করল ভদ্র, বাদামী আর হলুদ গাত্র বর্ণের লোকেদের দ্বারা, বাজারের দ্রব্যসামগ্রী রাখবার জন্য, তার শয়নকক্ষ আক্রান্ত হয়েছে।

এই সময় ব্যাপরীদের মধ্য থেকে একজন এগিয়ে এসে অনুরোধের গলায় তাকে বলল, আপনার অসুবিধা ঘটিয়ে কষ্ট দেবার জন্য আমরা দুঃখিত। শীঘ্রই খদ্দেররা সওদা করার জন্য আসতে আরম্ভ করবে, তাই সেনিওর, যদি দয়া করে এই জায়গাটা আটকে না রাখেন।

ব্লাইদ দুমড়ানো পোশাক ঝেড়ে ঝুড়ে তক্তা থেকে রাস্তায় নেমে, উদ্দেশ্যহীন ভাবে, তপ্তবালুর ওপর দিয়ে কালে গ্রানদে ধরে চলল। সেই সময় ছোট্ট শহরটি অলসভাবে তার রোজকার জীবনে নড়ে চড়ে উঠতে শুরু করেছে। ব্লাইদ দেখতে পেল সোনালী গাত্রবর্ণের শিশুরা ঘাসের ওপর একজন অন্যের গায়ে ঢলে পড়ছে। সমুদ্রের বাতাস পায়ে লাগতেই তার খিদে পেয়ে গেল। ক্রান্তীয় অঞ্চলের ফুলের তীব্র সুগন্ধে, বাইরের মাটির উনুনে সেঁকা রুটির গন্ধে, আর সেই উনুনের ধোঁয়ার গন্ধে যারা কোরালিও তার প্রাতকালের সুবাসে ভরপুর। যেখানে ধোঁয়া নেই সেই জায়গায় পরিষ্কার বাতাস কিছুটা বিশ্বাসের নিশ্চয়তার সাহায্যে পাহাড়কে তুলে সমুদ্রের পাশে এত কাছে এনে ফেলেছে যে পাহাড়ের গায়ে বৃক্ষের সারির পাশে পাশে উপর প্রান্তরগুলি এক এক করে গোনা যাচ্ছে। জলের ধারে ক্যারিবেরা তাদের কাজের তৎপরতায় দ্রুত হালকা পায়ে চলাফেরা করছে। কলার বাগান থেকে বার হয়ে বনপথ দিয়ে চলা ঘোড়ার সারির মাথা আর যা নড়ছে দেখা যাচ্ছে। ঘোড়াগুলোর শরীর সবুজ সোনালী কলার কাঁদির বোঝায় ঢাকা। জানালায় বসে লম্বা কালো চুলে চিরুণী চালাতে চালাতে মেয়েরা রাস্তার এক পার থেকে অন্য পারের মেয়েদের নাম ধরে ডাকাডাকি করছে। শুষ্ক বৈচিত্র্যহীন শান্তি বিরাজ করছিল কোরালিওতে।

সেই উজ্জ্বল প্রভাতে বীলজিবাব ব্লাইদ তার পতনের শেষ ধাপে এসে পৌঁছেছিল। গত রাত্রে রাস্তায় শোয়া সেই শেষ ধাপ থেকে তার নীচে নামা সম্ভব নয়। একটি ছাদের আচ্ছাদন একজন ভদ্রলোককে বনের পশু ও বাতাসে ওড়া পাখির থেকে আলাদা রাখে।

ব্লাইদের কাছে টাকা এখন কেবলমাত্র স্মৃতি। সে তার বন্ধুদের সজ্জনোচিত সাহায্যের সবটুকু নিঃশেষ করে নিয়ে তাদের দানশীলতার শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত নিংড়ে নিয়ে শেষে অপমানকর ছিটেফোঁটা ভিক্ষার জন্য তাদের আচরনের মতো কঠিন হয়ে আসা বুকের পাষাণে আঘাত করেছে।

তার বাকির খাতা শেষ রেয়াল পর্যন্ত পূর্ণ হয়েছে। কোরালিওতে, কোথা থেকে এক গ্লাস রোম, একবারের আহার বা একটি রূপোর টাকা আদায় করা যাবে, তার উৎস সম্বন্ধে সে নির্লজ্জ পরভোজীর তীক্ষ্ণ বিচক্ষণতায় সচেতন ছিল। সে ক্ষুধা আর তৃষ্ণায় কাতর হয়ে, আন্তরিক নিপুণতা ও গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে, সেই উৎসগুলি একের পর এক সাজিয়ে বিবেচনা করছিল। ব্লাইদের খোলা শেষ হল তার চিন্তার জঞ্জাল থেকে একটি আশার কণা আলাদা করতে সমস্ত আশাবাদ ব্যর্থ হওয়ায়। খোলা আকাশের নীচে একটা রাত্রি কাটানোয় তার সমস্ত স্নায়ুগুলি আলগা হয়ে গিয়েছে। প্রতিবেশীর সঞ্চয় থেকে দাবি করার মতো দুএকটা ভরসার স্থলে এখনো তার হাতে রয়েছে। এখন থেকে ধারের বদলে ভিক্ষা করতে হবে। সরকারী বাজারে কাঠের তক্তার ওপর রাত কাটানো মানুষটিকে ঘৃণার সঙ্গে ছুঁড়ে দেওয়া মুদ্রাটিকে আর কোনোভাবেই ঋণ বলে চালানো যাবে না।

নরকের পথে প্রত্যেক প্রভাতের স্টেশনে প্রশমিত করা, মদ্যপের প্রাতকালীন তৃষ্ণা রাক্ষসের মতো তার গলা টিপে না ধরলে, এই প্রভাতে কোন ভিক্ষুক তার মতো তত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে দান করা মুদ্রাটি নিত না।

দুঃসময়ে অমৃতলাভ হওয়ার লক্ষ্যে ধীরে পায়ে ব্লাইদ রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। মাদামা ভাসকুইজের খাবার দোকানের পাশ দিয়ে যাবার সময় সে দেখল মাদামার খদ্দেররা খেতে বসেছে আর মাদামা পরিবেশন করছে। মাদামা তাঁর লাজুক, বিষণ্ন নির্বিকার দৃষ্টি নিয়ে জানলোর বাইরে তাকিয়ে ব্লাইদকে দেখে তাঁর দৃষ্টি আরো লাজুক ও বিড়ম্বিত হয়ে পড়ল। তিনি ব্লাইদের কাছে কুড়ি পেসো পাবেন। বীলজিবাব মাথা নামিয়ে অভিবাদন জানিয়ে এগিয়ে চলল।

ব্যবসায়ীরা বা তাদের কর্মচারীরা তাদের দোকানের ভারি কাঠের দরজাগুলি খুলছে। ব্লাইদ যখন তার পূর্বতন খুশীর চালের অবশিষ্টাংশটুকু সম্বল করে তাদের সামনে দিয়ে যাবার সময়ে তারা ভদ্র কিন্তু শীতল দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল। এরা সকলেই তার পাওনাদার।

প্লাজার ফোয়ারায় এসে রুমাল ভিজিয়ে অতি সংক্ষেপে হাত মুখে ধুয়ে নিল ব্লাইদ। খোলা

চত্বরের ওপাশে জেলের কয়েদীদের আত্মীয় বন্ধুরা তাদের সকালের খাবার হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখেও তার খাবার বাসনার উদ্রেক হল না। তার আত্মা তখন পানীয় বা তা কেনার অর্থ কামনা করছিল।

রাস্তায় একসময়ে তার বন্ধু ও সমকক্ষ অনেকের সঙ্গে তার দেখা হল। পুরনো ইনডিয়ান রাস্তায় ঘোড়ায় চড়া শেষ করে ফেরার সময়ে উইলাভ ডোডি আর বলা তার দিকে একবার শীতল ও রূঢ় মাথা নেড়ে চলে যায়। ব্লাইদের মনে হল, তাকে সাহায্য করতে চেয়ে সবচেয়ে বেশী বার নিজের পকেটে হাত দেওয়া বিলি কেওগও, ক্লানসি ও তার নিজের প্রাতরাশের জন্য কতকগুলি টাটকা ডিম নিয়ে শিস দিতে দিতে যাবার সময়, তাকে দেখে আরো আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজেকে সুরক্ষিত করছে। ব্লাইদ বেপরোয়াভাবে আবার একটি ছোট্ট ঋণের কথা বলার ভাবার সময়ই কেওগ-এর ছোট্ট অভিবাদনও ধূসর চোখের ভীতি পূর্ণ দৃষ্টি ব্লাইদের চলার গতি বাড়িয়ে দিল।

বহুদিন পূর্বে, অর্থ, বাকির খাতা বা সমাদর, শেষ হয়ে যাওয়া, তিনটি পানশালায় একে একে সে গেল। এই সকালে এককোঁটা আগুয়ার নিয়ন্তের জন্যে শত্রুর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়তে পারে বলে ব্লাইদের মনে হচ্ছিল। দুটি বার-এ পানীর চেয়ে গালির চেয়ে বেশী জ্বালা ধরানো ভদ্রভাষায় প্রত্যাখ্যাত হবার পর তৃতীয় দোকানে গেলে ঘাড় ধাক্কা খেয়ে রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ল। এই শারীরিক অপমান ব্লাইদের অন্তরে এক অদ্ভুত পরিবর্তন নিয়ে এল। আস্তে আস্তে উঠে পড়ে চলে যাবার সময়ে তার মুখে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ততার ভাব ফুটে উঠল। তার মুখে লেগে থাকা সংকোচ কৃত্রিম হাসির ভাব মুছে গিয়ে শয়তানী দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভাব ফুটে উঠল। বদমায়েশির সমুদ্রে, ভদ্রজগতের একটি ক্ষীণ সূত্র কোনরকমে আঁকড়ে ধরে সে হাবুডুবু খাচ্ছিল। যে জগৎ তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে। ব্লাইদের মনে হল সেই সূত্রটি এই ধাক্কায় ছিঁড়ে গেল আর ডুবন্ত মানুষ বাঁচার চেষ্টা ছেড়ে দেবার পরে যেমন হয় তেমনি প্রশান্তি সে অনুভব করল।

রাস্তা থেকে উঠে এক কোণে দাঁড়িয়ে ব্লাইদ জামা-কাপড়ের ধুলোবালি ঝেড়ে, চশমা পরিস্কার করে নিল।

এবার নিজেকে নিজে বলল, এ আমাকে করতেই হবে। এক কোয়ার্টর রাম পেলে আরো কিছুকাল এ কাজ করা থেকে নিজেকে ঠেকিয়ে রাখতে পারতাম। আমার জন্য আর রাম নেই। পাতালের আগুনের দোহাই, শয়তানের ডানহাতে যদি আমি বসি তবে কোর্ট খরচা কাউকে দিতেই হবে। তোমাকে এবার কিছু খসাতেই হবে, মিঃ গুডউইন। তুমি লোক খারাপ নও কিন্তু লাথির ঘায়ে নর্দমায় পড়ে যাবার পর কোন ভদ্রলোক আর ভদ্রতার সীমায় থাকতে পারে না। আমার চলার পথের পরবর্তী রাস্তাটার নাম শুনতে ভালো না হলেও ব্ল্যাকমেল তার নাম।

নিগ্রোদের নোংরা ঝোপড়ি পেরিয়ে, গরীব মেসতিজোদের কুটীর ছাড়িয়ে, শহরের মধ্য দিয়ে সমুদ্র তীরের বিপরীতের পাড়ার দিকে ফিরে উদ্দেশ্য নিয়ে ব্লাইদ চলতে শুরু করল। পথ চলতে চলতে মাঝে মাঝে সে গাছের ছায়ার ফাঁকে জঙ্গলে ভরা টিলার ওপরে গুডউইনের বাড়ী দেখতে পাচ্ছিল। ছোট হ্রদের পুলটি পেরিয়ে যাবার সময়ে সে, থিরাক্লোরেসের নাম খোদাই করা কাঠের কলকাটি, বৃদ্ধ ইনডিয়ান গালভেজ, পরিষ্কার করছে দেখতে গেল। হ্রদের পর থেকেই গুডউইনের জমি আস্তে আস্তে উঁচু হয়ে গেছে। একটি ঘাসে ছাওয়া সড়ক, দুপাশে বদান্য ক্রান্তীয় অঞ্চলের বহুবিধ ছায়াঘেরা ফুলগাছের শোভা কলার বাজানোর পাশ দিয়ে ঘুরে গিয়ে, আবাসস্থলে গিয়ে শেষ হয়েছে। ব্লাইদ এই রাস্তা ধরে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলল।

এদিকে গুডউইন সেই সময় তার শীতল বারান্দায় বসে তার সেক্রেটারীকে মুখে মুখে চিঠির জবাব বলছিল।

হঠাৎ ব্লাইদ সিঁড়ি পর্যন্ত এসে দাড়িয়ে একটি হাত বাড়িয়ে দিলে গুডউইন বলল, সুপ্রভাত ব্লাইদ। উঠেছ এসে বসো। তারপর বলো তোমার জন্যে আমি কি করতে পারি।

ব্লাইদ বলল, আমি তোমার সঙ্গে একান্তে কয়েকটা কথা বলতে চাই।

গুডউইন তার সেক্রেটারীকে ইঙ্গিত করলে সে দূরে উঠে চলে গিয়ে একটা সিগারেট ধরায়। তার খালি করা চেয়ারে বসে পড়ে একগুঁয়ের মতে ব্লাইদ বলল, আমার কিছু টাকা চাই।

গুডউইন সোজাসুজি বলল আমি দুঃখিত, তুমি একটা পয়সাও পাবে না। মদ খেয়ে খেয়ে

তুমি মরবে। তোমার বন্ধুরা যথাসাধ্য চেষ্টা করলেও তুমি নিজে ভাল হবার কোনো চেষ্টা করলে না। তোমার ধ্বংসের পথে টাকা যুগিয়ে কোন লাভ নেই।

ব্লাইদ পিছন দিকে চেয়ারটা হেলিয়ে বলল, আরে ভাই, সামাজিক অর্থনীতির প্রশ্ন নয়। সে পালা কবেই চুকে বুকে গেছে। আমি তোমাকে ভালবাসি গুডউইন, আর তাই আজ আমি তোমার পাঁজরে ছুরি চালাতে এসেছি। এসপাদার সেলুন থেকে আজ সকালে আমাকে লাথি মেরে বার করে দিয়েছে। সমাজ আমার আহত অনুভূতির খেসারত দিতে বাধ্য।

আমি তো তোমাকে লাথি মারি নি।

গুডউইনের কথায় ব্লাইদ বলল, তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু সাধারণভাবে তুমি সমাজের প্রতিনিধি আর একটি বিশেষ কারণে আমার শেষ আশা। নিরুপায় হয়েই আমাকে এটা শেষ পর্যন্ত করতে হচ্ছে। মাসখানেক আগে লেখাদার লোকেরা এখানে এসে তোলপাড় করার সময়ে একবার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু তখন করতে পারি নি। এখন পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে। আমার এক হাজার ডলার প্রয়োজন, গুডউইন। তুমি এই টাকা আমাকে দেবে?

সপ্তাহে তুমি একটি মাত্র রূপোর ডলার চেয়েছিলে।

লঘু স্বরে ব্লাইদ বলল, এটা প্রমাণ করে যে চাপের মধ্যে থাকলেও তখনো আমি সৎ ছিলাম। পাপের বেতন এক পেসো বা আটচল্লিশ সেন্টের কম হওয়া উচিত নয়। এসো কাজের কথা বলি। আমি তৃতীয় অঙ্কের খলনায়ক। আমার স্বল্পকালের খেটে খুটে পাওয়া হাততালি আমাকে পেতে দাও। প্রেসিডেন্টের ব্যাগভর্তি টাকা সরকার সময়ে আমি তোমাকে দেখেছিলাম। মূল্যের ব্যাপারে আমি খুব উদার যদিও আমি জানি এটা ব্ল্যাকমেল। আমি জানি। আমি করাতকলের যাত্রাদলের মতো, একজন সস্তা দরের খলনায়ক। যেহেতু তুমি আমার বিশিষ্ট বন্ধু তাই বেশী চাপ তোমাকে দেব না।

চিঠিগুলি গুছাতে গুছাতে শান্ত স্বরে গুডউইন বলল, একটু খুলেই বল না।

ঠিক আছে। ব্যাপারটা তুমি সহজভাবে নিয়েছ দেখে আমার ভাল লাগছে। যাত্রা করা আমার পছন্দ হয় না।

একটু চুপ করে কথাগুলো মনে মনে গুছিয়ে নিয়ে বীলজিবাব বলতে শুরু করে।

পলায়নপর প্রেসিডেন্ট যেদিন রাত্রে শহরে এলেন সেদিন আমি অত্যন্ত মাতাল হয়েছিলাম। আমার এই উক্তিতে আমি গর্ব প্রকাশ করে থাকলে তুমি আমায় মার্জনা করো। কিন্তু যেই অবস্থায় পৌঁছান আমার পক্ষে কঠিন আরাম সাধ্য ব্যাপার ছিল। মাদামা ওরতিজের হোটেলের বাইরে কমলালেবু গাছের নীচে রাখা একটা চৌকিতে আমি পাঁচিল টপকে এসে শুয়ে ঘুমোচ্ছিলাম। একটা কমলালেবু গাছ থেকে আমার নাকে পড়ে ঘুমটা ভাঙিয়ে দেয়। মহাকাশের থিয়োরী আপেলের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখার জন্য আমি শুয়ে শুয়েই কিছুক্ষণ স্যর আইজাক নিউটনকে গালি দিলাম। এই সময় ট্রেজারির ব্যাগ হতে নিরাফ্লোরেন্স ও তার প্রেয়সী হোটেলে এলেন। তারপর দেখলাম নাপিতের সঙ্গে তোমাকে কথা বলতে। তুমি চলে গেলে আমি আবার ঘুমোবার চেষ্টা করছি এমন সময় দোতলা থেকে পিস্তলের আওয়াজে আমার বিশ্রাম বিঘ্নিত হল। কিছুক্ষণের মধ্যে কমলালেবু গাছের ওপর চামড়ার ব্যাগটা পড়ল দেখে এরপরে কিসের বৃষ্টি হবে বুঝতে না পেরে আমি উঠে বসলাম। সেনাও পুলিসেরা তাদের তলোয়ার খুলে, পাজামা স্যুটের ওপর মেডেল, ব্যাজ লাগাতে লাগাতে আসতে লাগলে আমি হামাগুড়ি দিয়ে কলাগাছের ঝোপের মধ্যে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ঘণ্টাখানেকের পরে উত্তেজনা থিতিয়ে যাওয়ার পর লোকজনেরা সব চলে গেলে তুমি ফিরে এসে সেই পাকা রসভরা ব্যাগটা কমলালেবু গাছ থেকে তুলে নিয়ে বাড়িতে ঢোকার সময় পর্যন্ত আমি তোমাকে অনুসরণ করলাম। এক মরশুমে একটা কমলালেবু গাছ থেকে লক্ষ ডলারের ফসল আমার মনে হয় ফলের ব্যবসার রেকর্ড।

একটু চুপ করে থেকে গুডউইনের মনোভাব বুঝতে চেষ্টা করে ব্লাইদ আবার বলতে লাগল। আমি একজন ভদ্রলোক, তাই এই ঘটনার কথা তখন কাউকে বলি নি। আজ আমাকে লাথি মেরে সেলুন থেকে বের করে দিয়েছে। কনুই-এর ধাক্কায় আমার আচার সংহিতা ছিটকে পড়েছে। তিন আঙুল আগুয়ার দিগন্তের জন্য আমি আমার মায়ের দেওয়া উপাসনার বই পর্যন্ত বিক্রি করতে

পারি। আমি জানি নাট বেশী টাইট দিতে চাইলে তা কেটে যায়। যেইদিন রাত্রে কিছু না দেখে একবারও না জেগে উঠে সারাক্ষণ চৌকিতে আমার ঘুমিয়ে থাকাটা তোমার কাছে নিশ্চয়ই এক হাজার ডলার মূল্যের হবে।

এবার গুডউইন দুটো চিঠি খুলে পেন্সিলে কিছু নোট করে তার সেক্রেটারীকে ডেকে বলল, ম্যানুয়েল, এরিয়েল, কখন ছাড়বে?

যুবক সেক্রেটারী বলে, তিনটের সময়, সেনিওর। তীর বরাবর নীচের দিকে পুনতা সলেদাদ পর্যন্ত গিয়ে ফল বোঝাই হবার সঙ্গে সঙ্গে সোজা নিউঅর্লিয়েন্সে যাবে।

বেশ, এই চিঠিগুলি কিছুক্ষণ তবে অপেক্ষা করতে পারে।

সেক্রেটারী আমগাছের নীচে ফিরে গেলে ব্লাইদকে গুডউইন বলল, আমার কাছে ছাড়া, এই শহরের অন্য সব লোকদের কাছে তোমার মোট কত টাকা ধার আছে?

পাঁচশ আন্দাজ।

এবার গুডউইন বলল, যাও, শহরের কোনো জায়গায় গিয়ে তোমার মোট ধারের একটা তালিকা বানিয়ে নিয়ে দু ঘণ্টার মধ্যে ফিরে এসো। আমি ম্যানুয়েলের হাতে টাকা দিয়ে তোমার সঙ্গে পাঠাব আর এর মধ্যে তোমার জন্যে এক জোড়া ভদ্র পোশাক জোগাড় করে রাখব। তিনটের সময় ম্যানুয়েল তোমাকে এরিয়েল-এ চাপিয়ে দিয়ে আসবে। সেখানেই সে তোমার হাতে এক হাজার ডলার দেবে। এর বদলে তোমার করণীয় কি হবে সে-সম্বন্ধে মনে হয় আমাদের আর আলোচনা করার দরকার হবে না।

গুডউইনের কথায় খুশী হয়ে ব্লাইদ বলল, হ্যাঁ, তা আমি জানি। প্লাদামা ওরতিজের কমলালেবু গাছের নিচে আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। কোরালিও ছেড়ে চিরদিনের জন্যে আমাকে চলে যেতে হবে। বেশ তাই হবে, আমার পার্ট আমি করব। আমার আর কমলে কাজ নেই। অতি উত্তম প্রস্তাব। তুমি ভালো লোক বলেই তোমাকে আমি অল্পে ছেড়ে দিলাম, গুডউইন। কিন্তু ভাই আমার, আমার যে ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে...

ব্লাইদকে কথা শেষ করতে না দিয়ে দৃঢ়স্বরে গুডউইন বলে উঠল, এরিয়েলে চড়ার আগে এক সেনটোভোও নয়। এখন টাকা হাতে পেলেই তুমি আধঘণ্টার মধ্যে মাতাল হয়ে যাবে।

এই সময় বীলজিবারের দিকে তাকিয়ে গুডউইন দেখল তার দেহ শিথিল হয়ে গিয়ে হাত পা কাপছে, চোখের কোণের শিরাগুলিতে রক্ত জমে আছে।

গুডউইন নীচু জানালা ডিঙিয়ে খাবার ঘরে গিয়ে একটি গ্লাস আর ডিকানটাবে ব্রাণ্ডি নিয়ে এসে ব্লাইদকে দিয়ে বলল, যাবার আগে এক চুমুক খেয়ে যাও।

ব্লাইদের সমস্ত অন্তরাত্মা যে জন্য পুড়ে যাচ্ছিল, সেই আকাঙ্খিত তৃপ্তি চোখের সামনে দেখে তার চোখ জ্বল জ্বল করে উঠল। আজ তার বিষাক্ত স্নায়ুগুলি তাদের সৈন্যের জন্য প্রয়োজনীয় মাত্রা না পেয়ে ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক প্রতিশোধ নিচ্ছিল। ডিকানটাটা আঁকড়ে ধরলে, হাতের কাঁপুনিতে গ্লাসের সঙ্গে তার মুখটা ঠোকাঠুকি হতে লাগল। গ্লাসটি পূর্ণ করে, পতনের অতল তল থেকে সোজা হয়ে মাথা উঁচু করে উঠে দাঁড়িয়ে, এক হাতে গ্লাসটি উঁচু করে ধরে সহজভাবে মৃদু স্বরে গুডউইনকে মাথা নেড়ে অভিবাদন করল। তারপর সে গুডউইনের স্বাস্থ্য করে হঠাৎই সে গ্লাসটি না ছুঁয়েই এত দ্রুত নামিয়ে রাখল যে ব্রাণ্ডি চলকে উঠে তার হাতে পড়ল। শুকনো ঠোঁটে, দু'ঘণ্টার মধ্যে শব্দগুলি উচ্চারণ করে সিড়ি দিয়ে নেমে শহরের দিকে চলতে শুরু করল। কলাবাগানের শীতল এক কোণে এসে বীলজিবাব দাঁড়িয়ে পড়ে বেলটের বাকল টেনে অন্য একটি গর্তে তার জিবটি পরিয়ে দিল।

বাতাসে দোলখাওয়া কলাগাছের পাতার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল। আমি চেয়েছিলাম কিন্তু পারলাম না। একজন ভদ্রলোক যাকে সে ব্ল্যাকমেল করছে, তার সঙ্গে কিভাবে পান করবে!

বারো

জুতো

জন ডি. গ্রাফনরিড অ্যাটউড কমলের ফুল, ডাঁটা, শেকড় সমেত খেয়ে ফেলল, উষ্ণমণ্ডল

তাকে আত্মসাৎ করে ফেলেছে। তার কাজ ছিল রেজিনকে ভুলবার চেষ্টা করা। মহা উৎসাহে সে তার কাজের মধ্যে ডুবে গেল।

কমল যারা খায় তার সঙ্গে ঝাঁঝালো কোন চাটনি দিয়ে খায়। জনির মেনু কার্ডে চোলাই কারীদের তৈরী এই চাটনির নাম ছিল ব্রান্ডি। সে আর বিলি কেওগ যখন কনস্যুলেটের বারান্দায় দুজনের মাঝখানে একটি বোতল রেখে রাত্রে বসে বসে অভব্য গান গাইত, তখন ডায়ারলোম আমেরিকানদের সম্বন্ধে নিজেদের মনে বিড় বিড় করে মন্তব্য করতে করতে স্থানীয় লোকেরা দ্রুত পায়ে রাস্তা দিয়ে চলে যেত। একদিন জনির বাচ্ছা চাকর ডাক নিয়ে এসে টেবিলে ঢেলে দিয়ে গেলে জনি তার থেকে চার পাঁচটা চিঠি নেড়েচেড়ে দেখে বলল। সেই পুরনো খবর। বোকা লোকগুলো চিঠি লিখে এই দেশের সব খবর জানাতে চায়। সবাই জানতে চায়। কাজ না করে বসে বসে কিভাবে ধনী হওয়া যায়। ফলের চাষ কিভাবে করতে হয়। অথচ এদের মধ্যে বেশীরভাগ লোক জবাবের জন্য স্ট্যাম্পও পাঠায় না। ওরা মনে করে ওদের চিঠির জবাব দেওয়াটাই কনসালের একমাত্র কাজ, আমি এত দুলছি যে আমার আর নড়াচড়া করতে ইচ্ছা করছে না। আমার হয়ে চিঠিগুলো খুলে দেখ ওরা কি চায়।

কেওগ টেবিলের একপ্রান্তে বসে কাগজকাটা ছুরি দিয়ে একটা তেঁতুল বিছের পাগুলি কাটছিল। জনির কথায় কেওগ মুখে আদেশ পালনের হাসি ফুটিয়ে চিঠিগুলো খুলতে শুরু করল। চারটি চিঠি ছিল, কোরালিওর কনসালকে খবরের একজন বিশ্বকোষ মনে করে, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নাগরিকদের লেখা। তারা সংখ্যানুক্রমে সাজানো, জলবায়ু উৎপন্ন দ্রব্য, সুযোগ সুবিধা, আইনকানুন, ব্যবসার সুবিধা ও অন্যান্য পরিসংখান জানতে চেয়ে, লম্বা লম্বা প্রশ্ন তালিকা পাঠিয়েছে।

জনি বলল, বিলি, সাম্প্রতিক কনসুলার রি পোর্টটি পড়ে দেখবার জন্য স্টেট ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়ে দেবে বলে, ওদের এক লাইন লিখে দাও। নীচে আমার নামটাই সই করে দিও। তোমার কলমের খচ্‌খচ্‌ শব্দ শুনলে আমার ঘুম ভেঙে যাবে।

হাসিমুখে কেওগ বলল, নাক ডাকিয়ে না ঘুমালে, তোমার কাজ আমি করে দেব। তোমার একদল সহকারী দরকার। তোমার রিপোর্টটি কি করে তৈরী করবে বুঝতে পারছি না। এক মিনিটের জন্য জেগে ওঠ। তোমার শহর ডেলসবার্গ থেকে একটা চিঠি এসেছে।

তাই নাকি, কি ব্যাপার!

কেওগ বলল, পোস্টমাস্টার লিখেছে, শহরের একজন বাসিন্দা বলছে তোমার দেশে একটি জুতোর দোকান খোলার মতলব। এই ব্যবসায় লাভ হবে কি না, সে ব্যাপারে তোমার মতামত জানতে চায়। সে বলছে যে সে শুনেছে এখন এই উপকূলে ব্যবসার তেজীভাব চলছে। তাই সে সুযোগটা প্রথম থেকে নিতে চায়।

গরম আর বদমেজাজ সত্ত্বেও জনির হাসিতে তার দোলনা দুলতে লাগল। কেওগ হাসতে লাগল। ডেলসবাগের চিঠি খানির ওপর শ্লেষাত্মক টিপ্পনি শুনে জনির পোষা বাঁদরটাও বইয়ের তাক থেকে কিচ্‌ কিচ্‌ করে উঠল।

হাসি থামিয়ে চেচিয়ে কনসাল বলল, জুতোর দোকান গণ্ডমূর্খগুলো সব এবার মনে হয় ওভারকোট ফ্যাকটরি সম্বন্ধে জানতে চাইবে। আমাদের তিনহাজার নগরবাসীর মধ্যে কতজনকে জুতো পরতে দেখেছ, বিলি?

কেওগ চিন্তা করে হিসাব শুরু করে বলল, আমি আর—

কেওগকে থামিয়ে দিয়ে বলল, আমি নই।

একটা পা হরিণের চামড়ার জাপাতো দিয়ে ঢাকা রয়েছে দেখায়, যদিও কথাটা সত্যি নয়।

এবার আবার জনি বলল, বেশ কয়েক মাস আমি জুতোর শিকার হইনি।

কিন্তু, তোমার তো জুতো আছে। আর আছে গেডি লুটস্‌, গুডউইন, ব্লানচার্ড, ডঃ গ্রেগ আর সেই ইটালিয়ান কলার কোম্পানীর দালালের জুতো আছে। দেলগান, না সে খড়ম পায়ে দেয়। সেদিন রাত্রে লাল একজোড়া জুতো মাদামা ওরতিজ-এর পায়ে দেখেছি। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে স্কুলে পড়তে গিয়ে পদসেবার আধুনিক চিন্তাধারা বয়ে নিয়ে আসা মাদামার মেয়ে পাশার আছে। উৎসবের

দিনে পা সাজান কামানগগনটের বোন-এর জুতো আছে, মিসেস গোর্ড ও জুতো পরেন। স্প্যানিশ মেয়েদের মধ্যে এরাই মোটামুটি জুতো ব্যবহার করে সৈন্যদের কেউ কি ছাউনিতে জুতো পায়ে দেয়। না, মার্চ করার সময়ে ছাড়া তাদের ছোট ছোট পায়ের আঙুলগুলি তারা ব্যারাকে ঘাসের ওপরেই ফেলে।

কেওগ-এর সঙ্গে একমত হয়ে কনসাল বলল, মোটামুটি ঠিকই আছে তোমার হিসাব। হাঁটার সময়ে চামড়ার ব্যবহার তিনহাজারে বিশজনের বেশী করে না। তাহলে সওদা হাতছাড়া করতে না চাওয়া একটি উদ্যোগশীল জুতোর দোকানের পক্ষে কোরালিও নিশ্চয়ই আদর্শ জায়গা। ভেবে পাচ্ছি না বুড়ো প্যাটারসন কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করল। ঠাট্টা বলার মতো অনেক মজার জিনিস ওর মাথায় থাকতো আমারাও ওর সঙ্গে কিছু ফিরতি ঠাট্টা করলে কেমন হয়। আমি বলে যাচ্ছি তুমি লেখ বিলি।

অনেক বার থেমে, ধোঁয়া ছেড়ে, বোতল আর গ্লাসের চলাফেরার পর ডেলসবার্গের চিঠি খানির জবাবে কেওগ জনির বলে যাওয়া চিঠিটা লিখল।

মিঃ ওবেদিয়া প্যাটারসন,

ডেলসমার্গ, আলাবামা।

প্রিয় মহাশয়,

আপনার ২রা জুলাইয়ের পত্রের উত্তর আমার বিনীত নিবেদন এই যে আমার মতে, কোলিও শহর ব্যতীত, এই জনবহুল পৃথিবীতে এমন জায়গা চোখে পড়ছে না যেখানে প্রথম শ্রেণীর একটি জুতোর দোকানের প্রয়োজনীয়তার সকল তথ্য ইঙ্গিত করছে। তিন হাজার মানুষের বাস, এই শহরে একটিও জুতোর দোকান নেই। পরিস্থিতিই আপনাকে বলে দিচ্ছে। এই উপকূল খুব দ্রুত উদ্যেগশীল ব্যবসায়ীদের লক্ষ্যস্থল হয়ে উঠছে কিন্তু জুতোর ব্যবসা করুণভাবে উপেক্ষিত। প্রকৃতপক্ষে এই শহরে অনেকেরই বর্তমানে কোনো জুতো নেই।

এছাড়াও এখানে, একটি ভাটিখানা, উচ্চতর গণিতের কলেজ, কয়লার আড়ৎ ও পরিচ্ছন্ন পাঞ্চ এন্ড জুডি শো-এর অভাব আছে।

নিবেদনান্তে ইতি

আপনার বিশ্বস্ত ভৃত্য, জন ডি. প্রাফনরিড অ্যাটউড।

ইউ এস কনসাল, কোরালিওতে নিযুক্ত।

পুনশ্চঃ-হ্যালো ওবেদিয়া কাকা, পুরোন বার্গ শহর কেমন চালিয়ে যাচ্ছে। তুমি আর আমি না থাকলে সরকার কি করে বলতো চলতো। খুব তাড়াতাড়ি একটি সবুজ মাথা টিয়া পাখি আব এক কাঁদি কলার প্রত্যাশা করতে পারো। তোমার পুরোন বন্ধু জনি।

জনির কথামত চিঠি লেখা শেষ করলে জনি কেওগ কে বলল, ওবেদিয়া কাকা যাতে চিঠিটার সরকারী যুগের জন্যে দোষ ধরতে না পারে তাই পুনশ্চটা দিলাম। বিলি তুমি এটা জুড়ে দিয়ে পোষ্টাপিসে পাঞ্চোকে পাঠিয়ে দাও। আজ ফল বোঝাই হতে হলে আবিয়াদিনে জাহাজ কাল ডাক নিয়ে যাবে।

কোরালিওর দিনলিপিতে অপরিবর্তিত রাত্রের অনুষ্ঠানগুলিতে নগরবাসীদের আমোদ-প্রমোদ ছিল সাদামাটা ও নিদ্রাতুর। তারা খালি পায়ে ইতস্তত ঘুরে বেড়ায়। মৃদু স্বরে কথা বলে, সিগার বা সিগারেট টানে।

রাস্তার মিট মিটে আলোর দিকে তাকালে দেখা যায় জোনাকির উন্মত্ত মিছিলের সঙ্গে বাদামী ভৌতিক আকৃতির চলন্ত একটি সূত্রজাল জড়িয়ে গিয়েছে।

গীটারের করুণ টুং টাং আওয়াজ রাত্রির বিষণ্ণতা বাড়িয়ে দেয়। বাউল দলের শেষের লোকটির বামতালের আওয়াজের মতো তারস্বরে কয়েকটি গেছো ব্যাঙ কট্ কট্ আওয়াজ তুলছে। রাত্রি নটার মধ্যে রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে যায়।

কনস্যুলেটের অনুষ্ঠান লিপিও বৈচিত্র্য হীন। প্রতি রাত্রে কনসালের পিছনের সমুদ্রসংলগ্ন বারান্দায় কেওগ আসে।

ব্রান্ডি সচল থাকা কালীন মধ্যরাত্রের পূর্বেই বলত তার প্রেমপর্বের কথা। আর কেওগ

সহানুভূতির সঙ্গে তার সেই কাহিনী শোনে।

শেষ পর্যন্ত জনি বলত, আমি সেই মেয়েটির জন্যে কষ্ট পাচ্ছি তা তুমি ভেব না। তার কথা আর আমার মনেও আসে না। সে সব চুকে বুকে গেছে। এখন এই সামনের দরজা দিয়ে সে এলেও আমার নাড়ীর গতি একই থাকবে।

কেওগ বলে, আমি জানি তুমি সব কিছু ভুলে গেছ। তোমার নামে, ডিঙ্ক পসনের বানিয়ে বলা কথা তার শোনা উচিত হয় নি। তুমি যা করেছ ঠিক করেছ।

ঘৃণার গলায় কনসাল বলে, পিঙ্ক ডসন। হতভাগা ছিল সাদা ছাই। পাঁচশ একর চাষের জমিই শেষ পর্যন্ত বড়ো হল। একদিন এর বদলা আমি নেব। ডসনরা কেউ না।

কিন্তু আলাবামায় অ্যাটউডদের চেনে না এমন কেউ নেই। তুমি জানো বিলি, আমার মা একজন ডি গ্রাফনরিড ছিলেন।

কয়েকশ বার শুনলেও কেওগ বলে, তাই, এটা তো আমি জানতাম না।

জনি বলে, সত্যি, হ্যানকক কাউনটির ডি গ্রামানরিড। কিন্তু ওই মেয়ের কথা কি তারে আমি চিন্তা করি, বিলি?

এক মুহূর্তের জন্যেও নয়।

জনি এরপর আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়লে কেওগ, প্লাজার এক কোণে, ক্যালাপশগাছের নীচে, তার নিজের বাসায় ফিরে আসতো।

দু-একদিনের মধ্যেই তারা ডলসবার্গের পোষ্টমাস্টারের লেখা চিঠি ও তার উত্তরের কথা ভুলে গেল।

কোরালিওতে নিয়মিত যাতায়াত করা আনন্দের নামে ফলের জাহাজটি, ২৬শে জুলাই, দূরে নোঙর করতে দেখে, তীরে দর্শকেরা সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কেয়াবান টিনের ডাক্তারআর কাসটম হাউসের কর্মীরা তাদের কর্তব্য পালন করতে জাহাজে গেল।

এদিকে ঘণ্টাখানেক পরে, পরিচ্ছন্ন সাদা লিজেনের পোশাক পরে, হাসি মুখে, বিলিকেওগ বেড়াতে বেড়াতে কনস্যুলেটের এসে হাজির হল।

দোলায় বিশ্রামরত জনিকে কেওগ বলল, কি হতে পারে। আন্দাজ করো।

এই গরমে আন্দাজ করা যায় না।

কেওগ বলল, সারা মহাদেশ, ঘেরা ডেল ফুয়েগো পর্যন্ত বিতরণ করার মত স্টক নিয়ে, তোমার জুতোর দোকানের লোকটি এসে গেছে। ছটা বজরা একবার ভরতি হয়ে এসে, আবার আনতে গেছে। কাসটম হাউসে বাক্সগুলি এখন রাখা হচ্ছে। মহাপুরুষদের জয় হোক, কিরকম মজার ব্যাপার হবে যখন ঠাট্টাটা বুঝতে পারবে আর মিঃ কনসালের সঙ্গে একটা সাক্ষাৎকার কেমন জমবে। সেই মজার মুহূর্তটি উপভোগ করার জন্যে এই উষ্ণমণ্ডলে নয় বছর থাকা যায়।

কেওগ হাসি পেলে প্রাণ খুলে হাসে। হাসতে হাসতে যে মাদুর পাতা মেঝেতে শুয়ে পড়ল।

এই সময় জনি চোখ পিট পিট করতে করতে তার দিকে ফিরে বলল, ওই চিঠিটাকে সত্যি বলে মনে করার মতো বোকা কেউ ছিল বলে আমাকে বোলো না।

হাসতে হাসতেই কেওগ বলল, তুমি ভাবো চার হাজার ডলারের স্টক! নিউ ক্যাসেলে কয়লা নিয়ে যাবার কথা আছে না? ব্যবসাই যদি করবে তো স্পিটস বার্গেজে এক জাহাজ তাল পাতার পাখা নিয়ে এল না কেন। বুড়ো গর্দভটাকে সমুদ্র তীরে দেখলাম। চশমার মধ্যে দিয়ে চোখ ট্যারা করে, ঘিরে থাকা শ পাঁচেক নাগরিক খালি পায়ে দাঁড়িয়ে আছে, দেখছিল।

কনসাল বলল, সত্যি বলছ বিলি। ভদ্রলোকের সঙ্গে আসা মেয়েটিকে তোমার দেখা উচিত ছিল। তার পাশে এখানকার সুরকী রঙের সোনিওরিটাদের আলকাতরার শিশু মনে হবে। কেওগ বলল।

জনি কেওগকে বলল, গাধার মতো হাসিটা বন্ধ করে যা বলার বলো। তোমার মতো একজন ধাড়ি লোক নিজেকে হাস্যকর হায়েনার পরিণত করছে দেখলে ভলো লাগে না।

হাসি থামিয়ে কেওগ বলল, নাম হেমস্টেটের উনি উনি একজন, হঠাৎ জনি নাম শুনে দোলনা থেকে নীচে লাফিয়ে নেমে পড়ল কেওগ অবাক হয়ে বলল, হ্যালো, কি হলো এবার।

জনি বলল, এক্ষুণি না উঠলে এই কলমদানি তোমার মাথায় আমি ভাঙব, গাধা। হে ঈশ্বর, কেওগ আর তার বাবা। কী উন্মাদ বোকা প্যাটারসন। উঠে পড়ে আমাকে সাহায্য করো বিলি। হা ভগবান, এখন যে ঠিক করি। যারা পৃথিবী কি পাগল হয়ে গেছে।

কেওগ উঠে পড়ে গায়ের ধুলো ঝাড়াতে ঝাড়াতে বলল, জনি, ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। তুমি না বললে আমি জানতেই পারতাম না যে এই সেই মেয়ে আগে ওদের জন্য একটা ভাল থাকার জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে। তুমি যাও। আমি ততক্ষণ গুডউইনের কাছে গিয়ে ওদের থাকার ব্যাপারে কিছু করতে পারি কিনা দেখি।

বাঁচালে বিলি। আমি জানতাম তুমি আমার পাশে থাকবে। পৃথিবী ধ্বংস হতে শুরু হলেও দু'একদিন আমরা সেটা ঠেকিয়ে রাখতে পারবো বলেই মনে হচ্ছে।

কেওগ ছাতা মাথায় গুডউইনের বাড়ীর দিকে গেল। জনি ব্রান্ডির বোতলটা তুলেও পান না করে রেখে দিয়ে কোট গায়ে দিয়ে, হাতে টুপি নিয়ে পায়ে পায়ে সমুদ্রতীরের দিকে সাহসে ভর করে এগিয়ে চলল।

কাসটম হাউসের কাছে গিয়ে জনি দেখতে পেল একদল চোখ কপালে ওঠা নাগরিক পরিবৃত অবস্থায় মিঃ হেমস্টেটের আর রোজিনকে। কাসটমসের কর্তারা খানা-তল্লাশি করার সময়ে আনদেদরের ক্যাপ্টেন আগন্তুকদের আগমণের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে বলছে। স্বাস্থ্যোজ্বল, প্রাণবন্ত রোজিও চারপাশের অপরিচিত পরিবেশ আগ্রহ সহকারে লক্ষ্য করছিল ওর পূর্বতন প্রেমিককে অভিবাদন করার সময় সুগোল গণ্ডদেশ লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠল। কি হেমস্টেটর, যিনি বৃদ্ধ, বাস্তব বুদ্ধি বিরহিত, কোনো কিছুতেই খুশী না হওয়া ব্যবসায়ীদের একজন, জনির সঙ্গে হৃদ্যভাবে করমর্দন করলেন।

মিঃ হেমস্টেটর বললেন, তোমাকে দেখে ভারী আনন্দ হচ্ছে জন। আমাদের পোষ্টমাস্টারের লেখা চিঠির জবাব সঙ্গে সঙ্গে দেবার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। উনি তোমাকে আমার হয়ে চিঠি লিখতে রাজী হয়েছিলেন। আমি বেশী লাভজনক এরকম নতুন ধরনের ব্যবসার খোঁজ করছিলাম। কাগজের মাধ্যমে জানতে পারি আজকাল এই উপকূল অর্থ লগ্নীকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। তোমার কথার উপর নির্ভর করে এখানে এলাম। আমার সব কিছু বিক্রি করে উত্তর অঞ্চল থেকে সব চেয়ে ভালো জুতোর স্টক নিয়ে এসেছি। তোমার চিঠি পড়ে আন্দাজ করেছি ব্যবসাও তেমনই ভালো হবে, কেমন সুন্দর তোমাদের এই শহর।

সেই সময় কেওগকে আসতে দেখে জনি স্বস্তি পেল।

কেওগ কাছে এসে বলল, মিসেস গুডউইন মিঃ হেমস্টেটর ও তাঁর কন্যাকে থাকতে দিতে পারলে বাধিত হবেন।

কেওগ তাঁদেরকে নিয়ে গুডউইনের বাড়ীর দিকে যাত্রা করলে জনি জুতোর বাক্সগুলি ঠিক টাকা রাখা হয়েছে কিনা দেখার জন্য কাসটমসের গুদামে গেল।

এদিকে মিঃ হেমস্টেটর ও রোজিনকে পৌঁছে দিয়ে কেওগ গুডউইনকে খুঁজতে শুরু করল, যাতে সে তাঁদেরকে কোরালিওতে জুতোর ব্যবসার লাভ লোকসানের প্রকৃত অবস্থাটা বলে না ফেলে। কেওগ জনিকে অবস্থাটা সামলে নেবার একটা সুযোগ করে দিতে চাইছে, যদিও তা আদৌ সম্ভব হবে কি করে তা জানে না।

সেই দিন রাত্রে কনসাল আর কেওগ কনসুলেটের বারান্দায় বসে আলোচনা করার সময়ে জনিকে চিন্তান্বিত দেখে কেওগ বলল, ওদেরকে দেশে পাঠিয়ে দাও।

তাই দিতাম, কিন্তু বিলি আমি তোমাকে সত্যি বলিনি।

ঠিক আছে তাতে কি হয়েছে।

জনি আস্তে আস্তে বলল, আমি তোমাকে কয়েকশবার বলেছি, সেই মেয়েটিকে আমি ভুলে গেছি।

ধৈর্যের প্রতিমূর্তি কেওগ বলল, তিনশ পঁচাত্তর বার।

প্রত্যেকবারই আমি তোমার মিথ্যে বলেছি। তাকে আমি মুহূর্তের জন্যেও ভুলি নি। একবার সে 'না' বলায় গোঁয়ার গোবিন্দের মতো আমি চলে এসেছিলাম। গাধার মতো বেশী গর্ব ছিল বলে

ফিরে যেতেই পারি নি। আজ সন্ধ্যায় রোজিনের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম, পিঙ্ক ডসক, আমার সম্বন্ধে ওকে যা বলত ও কোনোদিনই তা বিশ্বাস করে নি। আমার সামান্য যেটুকু সুযোগ ছিল ওই চিঠিখানা সেটা বরবাদ করেছে। আমার মনে হচ্ছে আমাকে যেন বস্তায় পুরে সেলাই করে দেওয়া হয়েছে। এখন তার বৃদ্ধ বাবাকে নিয়ে ঠাট্টা করার কথা জানতে পারলে সে আমাকে ঘৃণা করবে। এখানে কুড়ি বছর ধরে কুড়ি জোড়া জুতোও বিক্রি করা যাবে না। স্প্যানিশ তা ক্যারির বাদামী ছেলেদের জুতো পরিয়ে দিলে, যতক্ষণ না তারা সেগুলি খুলে ফেলছে, ততক্ষণ শীর্ষাসন করে চেঁচাতে থাকবে। ওরা কোনদিন জুতো পরে নি, আর পরবেও না। ওদের সব কথা খুলে বলে দেশে ফিরে যেতে বললে সে কি ভাববে। মেয়েটিকে আমি আগের চেয়ে নিবিড়ভাবে চাই। একটু ঠাট্টা করতে গিয়ে আমার নাগালের আসার পরেও ওকে আমি চিরকালের জন্য হারাবো।

মনে ফুর্তি রাখো ওদের দোকান খুলতে দাও। কেওগ বলল, আমি আজ সারা বিকেল ধরে খেটেছি। জুতোর বাজারে সামরিক তেজীভাব আমরা জাগিয়ে তুলতে পারবো। আমি ঘুরে ঘুরে সকলের সঙ্গে দেখা করে দুর্বিপাকের কথা সবাইকে বুঝিয়েছি। দোকান খোলা হলেই আমি ছজোড়া জুতো কিনবো, ওরাও কেনার মতো ওদের পায়ের সংখ্যা ভেবে নিয়ে জুতো কিনবে। একজোড়া দুজোড়ার বদলে গুডউইনতো একবাক্স জুতো কিনবে। ক্ল্যানসি বহু সপ্তাহের সঞ্চয় লগ্নী করার কথা বলেছে। ডাঃ গ্রেগ দশ নম্বর জুতো থাকলে, তিন জোড়া কুমিরের চামড়ার চটি কিনবে, প্লানচার্ড একজন ফরাসী বলে কম করে বারোজোড়া জুতো ওর প্রয়োজন।

জনি এবার বলল, বারো জন খদ্দের আর চার হাজার ডলারের জুতো। এটা একটা মস্ত সমস্যা, ওসব মতলব চলবে না। যেকোন একটা সমাধান খুঁজে বার করতে হবে। তুমি বাড়ী যাও বিলি, আমি একটু একলা থাকি। দেখি একলা বসে কিছু বার করা যায় কিনা। ওই থ্রি-স্টারের বোতলটা যাবার সময় তুমি নিয়ে যাও। আমেরিকার কনসালের আর এক অর্ডেন্সও মদের প্রয়োজন নেই। সারা রাত আমি চিন্তার পর্দায় সুর চড়িয়ে বসে থেকে যদি কোন জায়গায় এই সমস্যার কোমল স্থান থাকে তা আমি খুঁজে বের করবোই। না থাকলে আরও একটি লোকের সর্বনাশের কৃতিত্ব শোভাময়ী উষ্ণমণ্ডল পাবে।

যে থেকে কোন কাজই আসবে না বুঝে, কেওগ চলে গেল। জনি টেবিলের ওপর কয়েকটি চুরুট রেখে, একটি ডেকচেয়ারে নিজেকে বিছিয়ে দিল। দিনের আলো ফুটে উঠে বন্দরের তরঙ্গগুলিকে রুপোলি রেখায় এঁকে দেবার সময় পর্যন্ত সে সেখানে বসে রইল। তারপর হঠাৎই সে উঠে পড়ে শিস দিয়ে একটা সুর বাজাতে বাজাতে চান ঘরে গিয়ে ঢুকল।

ঠিক্ নটার সময় সে ছোট্ট নোংরা টেলিগ্রাফ অফিসে পায়ে হেঁটে গিয়ে একটা খালি ফর্ম নিয়ে আধঘণ্টা ধরে চুপচাপ বসে বসে ভেবে নিয়ে লিখল,

পিঙ্কনি ডসন,

ডেলবার্গ, আলাবামা,

পরবর্তী ডাকে একশ ডলারের ড্রাফট যাচ্ছে। আমাকে এখনি জাহাজে করে পাঁচশ পাউন্ড শক্ত, শুকনো আলকুশীর ফল পাঠাও। শিল্পের প্রয়োজনে লাগছে। বাজারের দাম প্রতি পাউন্ড বিশ সেন্ট। আরো অর্ডার পাওয়া যেতে পারে। তাড়াতাড়ি করো।

শেষে নিজের নাম সই করে ও তেত্রিশ ডলার খরচ করে জনি বার্তাটি পাঠিয়ে দিল।

তের

জাহাজ

সপ্তাহ খানেকের মধ্যে কালে গ্রানদে সরণীতে পছন্দসই একটি বাড়িতে মিঃ হেমস্টেটরের জুতোর স্টক শেলফে সাজানো হল, মনোরম ভাবে। দোকানের ভাড়া খুব বেশী নয়।

বিশ্বস্ততার সাথে জনির বন্ধুরা তার পাশে এসে দাঁড়াল। প্রথম দিন আনমনে ঘুরতে ঘুরতে এক ঘণ্টা অন্তর দোকানে ঢুকে, একজোড়া করে চওড়া সোল, কংগ্রেস গেটার, বোতাম দেওয়া কিডস্কিন, নীচু হিলের কাফস্কিন, নাচের পামসু, রাবারের বুট, ট্যান, টেনিস সু, ফুলতোলা চটি, কেনার পরে, কেওগ জনিকে একপাশে ডেকে জিজ্ঞেস করল, আর কোন ডিজাইনের খোঁজ নেব। দরাজ হাতে বার বার

জুতো কিনে মহানুভবতার সঙ্গে ইংরেজ ভাষীরা তাদের ভূমিকা পালন করে গেল। সেনাপতির মতো কেওগ তাদের চালনা করে বেশ কয়েকজন খদ্দেরকে কয়েকদিন ধরে দোকানে পাঠালো।

এই কয়দিনের বিক্রিতে মিঃ হেমস্টেটর খুশী হলেন। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করলেন, স্থানীয় লোকেরা জুতো কেনার ব্যাপারে পিছিয়ে রয়েছে কেন।

ভয়ে ভয়ে জনি বলল, ওরা অত্যন্ত লাজুক। তাছাড়া ওদের অভ্যাসও নেই। আসতে একবার শুরু হলে দেখবেন ঝাঁকে ঝাঁকে সব আসছে।

একদিন বিকেলে না ধরানো চুরুট চিবোতে চিবোতে চিন্তিত মুখে কনসালের অফিসে ঢুকে কেওগ বলল, ভেবে কিছু মতলব ঠিক করে থাকলে যেটা দেখাবার সময় এসেছে। অনড় জুতোর স্টকের জন্য যদি তুমি পারো তো দর্শকদের মধ্যে থেকে একটা টুপি চেয়ে নিয়ে তার ভিতর থেকে অগুনতি খদ্দের বের করো। দশবছরের মতো জুতো দলের সকলেই কিনে ফেলেছে। আমি ওদিক থেকে আসার সময় দেখে এলাম তোমার পূজ্যপাদ বৃদ্ধমশায় দরজায় দাঁড়িয়ে চশমার ফাঁক দিয়ে দেখছেন তাঁর দোকানের সামনে দিয়ে খালি পায়ে লোকে চলেছে। এদেশের লোকেরা শিল্পী মেজাদের। আমি আর ক্ল্যানসি আজ আঠারোটা ফটো তুলেছি দুঘণ্টায়। আর মোটে এক জোড়া জুতো আজ বিক্রি হয়েছে। মিস হেমস্টেটরকে দোকানে থাকতে দেখে ব্লানচার্ড বাড়িতে পরার একজোড়া পশমের লাইনিং দেওয়া চটি কিনেছে। তার একটু পরে আমি দেখলাম হ্রদের জলে সে চটিজোড়া ছুঁড়ে ফেলে দিল।

জনি বলল, মবিল থেকে একটা ফলের জাহাজ কাল বা পরশু আসার কথা। তার আগে আমরা কিছুই করতে পারছি না।

তুমি চাহিদা সৃষ্টি করতে চাইছ?

রূঢ়ভাবে জনি বলল, রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি তোমার মাথায় কোনোদিনই ভালো ঢোকে না। চাহিদার প্রয়োজন সৃষ্টি করা যায় চাহিদার সৃষ্টি করা যায় না। আমি চাহিদার প্রয়োজন সৃষ্টি করতে চাইছি।

কনসালের টেলিগ্রাম পাঠাবার দু সপ্তাহ পরে কোন অজ্ঞাত একটা প্রকাণ্ড বাদামী রঙের গাঁঠরি তার নামে একটি ফলের জাহাজে এলো। নিজের প্রভাব খাটিয়ে জনি এরপর পরিদর্শন ছাড়াই কাসটম হাউস থেকে বস্তুটি ছাড়িয়ে নিয়ে এসে কনসুলেটের ভিতরের ঘরে যত্ন করে রেখে দিল।

যুদ্ধে যাবার আগে যোদ্ধার অস্ত্রপরীক্ষা করার মতো, জনি সেই রাত্রে গাঁঠরির একটা কোণ ছিঁড়ে একমুঠো আলুকুশীর ফল বের করে যত্ন সহকারে পরীক্ষা করতে লাগল। হেজেল বাদামের মতো শক্ত, যার গায়ে তীক্ষ্ণ সূচের মতো কাঁটায় ভরা, ফলগুলি আগস্ট মাসে পেকেছে। জনি শিস দিয়ে একটি সুর বাজাতে বাজাতে কেওগকে ডাকতে চলল।

গভীর রাত্রে, নিদ্রামগ্ন কোরালিওর নির্জন রাস্তায় তারা দুজনে নেমে পড়ল কালে গ্রানদের দুধার দিয়ে এসে, বালির মধ্যে দিয়ে গিয়ে সরু সরু গলির রাস্তায় বাড়িগুলির মাঝখানের ঘাসের মধ্যে, তারা তাদের বেলুনের মতো ফুলে থাকা কোটের পকেট থেকে মুঠো মুঠো আলকুশীর ফল নিয়ে ছড়িয়ে দিল। একটিও পার্শ্বসড়ক তারা বাদ দিল না। রাস্তা আর কন্টক ভাণ্ডারের মধ্যে অনেকবার যাওয়া আসা করার পর, মহান সেনাধ্যক্ষেরা যেমন যুদ্ধ নীতির পরিবর্তন করার পর বিশ্রাম নেয় তেমনি, তারা প্রায় ভোর নাগাত শান্তভাবে বিশ্রাম নিতে গেল। শয়তানের মতো নির্ভুল ভাবে সরে সেন্ট গলের একনিষ্ঠতার সঙ্গে তারা সেই ফল ছিটিয়েছে।

এদিকে রোজকার মতো সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারীরা এসে মজার কুঠীর ভিতরে তাদের বেসাতি সাজিয়ে বসল। কাঁটা ফল গুলি শহরের একপ্রান্তে সমুদ্রের ধারে অবস্থিত বাজার কুঠী পর্যন্ত পৌঁছায় নি। সাধারণত যে সময়ে কেনা বেচা শুরু হয় তা অনেক পর পর্যন্ত ব্যাপারীরা অপেক্ষা করেও একটা খদ্দেরেরও দেখা পায় না। একে অন্যকে চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করে, কি হে, ব্যাপার কি?

নির্ধারিত সময়ে পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় নানান জিনিস কিনে আনতে বাজার যাত্রীনি মেয়েরা বাড়ি থেকে বের হয়ে। খালি পায়ে সরু রাস্তা বা নরম ঘাসে পা দিয়েছিল।

প্রথম যারা বেরুল, বিহ্বল, চিৎকারে, এক পা তুলল সঙ্গে সঙ্গে। আর এক পা ফেলেই বসে পড়ে, তাদের পায়ে কামড়ানো যন্ত্রণাদায়ক পোকাগুলি টেনে বার করতে করতে ভয়ে মর্মান্তিক আর্তনাদ করে উঠল। কেউ কেউ রাস্তার বদলে ঘাসের উপর দিয়ে চলতে গিয়েও এই অজানা ছোট ছোট বলের মতো

পোকার কামড় খেল। শহরের সর্বত্র স্ত্রীকণ্ঠের করুণ বিলাপ শোনা যেতে থাকে। এদিকে ব্যাপারীরা বাজার কুঠীতে বসে অবাক হয়ে ভাবে এখনও কেন কোন খদ্দের আসছেনা।

স্ত্রীলোকদের পর পুরুষেরা মঞ্চে অবতীর্ণ হয়ে, প্রথমে লাফ, তারপরে নাচ, তারপরে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে গালি দেওয়া শুরু করল। ঘাবড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে তারা তাদের পায়ের পাতা ও গোছে আক্রমণ করা অভিশাপ, ঝুঁকে পড়ে তুলে নিল। এগুলি এক অজানা ধরনের বিষাক্ত মাকড়সা বলে কেউ কেউ ঘোষণা করল।

শিশুরা তাদের প্রাতঃকালীন ছুটোছুটিতে বেরুলে স্ত্রী ও পুরুষ কণ্ঠের সঙ্গে এবার যুক্ত হল পায়ে-কাঁটা-ফোটা শিশু কণ্ঠের কান্না। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন শিকারের সংখ্যাও বাড়তে লাগলো।

নিত্যকার অভ্যাস মতো রাস্তার ওপারের দোকান থেকে রুটী নিয়ে আসার জন্য, ডনিয়া মারিয়া কাস্তিলাম ই বেনভেনতুরা দ্য লা কাসা তাঁর সম্মানিত বাড়ির দরজা থেকে নামলেন। ফুল কাটা হলদে মাটিনের স্পার্ট। লিনেনের কুঁচি দেওয়া সেমিজ আর স্প্যানিশ হ্যান্ডলুমের বেগুনি ওড়না পরে। তাঁর পাতিলেবু রঙের পা কিন্তু খালি ছিল। রাজেন্দ্রাণীর ভঙ্গীতে ভেলভেটের মতো নরম ঘাসে তিন পা মাত্র এগোনের পরই জনির ছড়ানো কয়েকটি আলকুশীর ওপর ওঁর উচ্চ বংশীয় পায়ের পাতা পড়ল। বনবেড়ালের মতো চিৎকার করে তিনি ঘুরে পড়ে, জঙ্গলের পশুর মতো হাত আর হাঁটুর ওপর হামাগুড়ি দিয়ে উনি ওঁর সম্মানিত গৃহের চৌকাঠে ফিরলেন।

বিশ স্টোন ওজনের ডন সিনিওর ইলদেফেনসো ফেদারিকো ভালদাজার হুয়েজ দ্য লা পাজ, তাঁর বিপুল দেহ প্লাজার কোণে বারে নিয়ে গিয়ে প্রাতঃকালীন তৃষ্ণা নিবারণ করার চেষ্টায় ঠাণ্ডা ঘাসে তাঁর খালি পায়ের প্রথম পদক্ষেপ যেন লুকানো মাইনে আঘাত করল। ভেঙে পড়া একটি ক্যাথিড্রালের মতো ডন ইফদে ফেনসো পড়ে গিয়ে, বিষাক্ত কাঁকড়া বিছের কামড়ে তিনি মৃতপ্রায় বলে চিৎকার করতে শুরু করলেন। সবজায়গাতেই নগ্ন পায়ে নাগরিকেরা লাফাচ্ছে পড়ে যাচ্ছে, খোঁড়াচ্ছে আর পা থেকে তাদের বিপন্ন করে তোলা পোকাগুলি টেনে তুলছে।

বিদ্বান ও অনেক দেশ ঘোরা, নাপিত এসতেবান দেলগাদো, প্রথম এই বিপদ থেকে উদ্ধারের উপায় আবিষ্কার করল। একটি পাথরের ওপর বসে পড়ে পায়ের আঙুল থেকে কাঁটাগুলি তুলে ফেলে দিয়ে, কাছে পিঠে উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলতে শুরু করল, বন্ধুগণ এই দেখ সেই শয়তানী পোকা। পায়রার ঝাঁকের মতো আকাশের অনেক উঁচুতে এরা উড়ে বেড়ায়। এগুলি মরা, কাল রাত্রে পড়েছে। ইয়ুকুটানে এগুলো এক একটা কমলালেবুর মতো বড়ো হয়। এরা সাপের মতো হিস হিস শব্দ করে, বাদুড়ের মতো এদের ডানা আছে। এদের হাত থেকে বাঁচতে দরকার জুতোর। জুতোর দরকার।

এরপর এসতেবান খোঁড়াতে খেঁআড়াতে গিয়ে মিঃ হেমস্টেটের দোকান থেকে জুতো কিনল। তারপর দোকান থেকে বেরিয়ে, শয়তান পোকাগুলোকে গালি দিতে দিতে, বীরদর্পে রাস্তা দিয়ে চলতে লাগল। সুরক্ষিত নাবিককে দেখে যন্ত্রণায় কাতবানো স্ত্রী, পুরুষ, বালক সবাই চিৎকার করতে শুরু করল, জাপাতোস, জাপাতোস্।

চাহিদাব প্রয়োজন সৃষ্টি হলে চাহিদা সৃষ্টি হয়। সেই দিন মিঃ হেমস্টেটর তিনশ জোড়া জুতো বিক্রি করলেন।

সন্ধ্যার সময় জুতোর বিক্রি সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিতে জনি দোকানে এলে মিঃ হেমস্টেটর বললেন, বিক্রির অবস্থা দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। গতকাল আমি মাত্র তিনজোড়া জুতো বিক্রি করেছি।

কনসাল বলল, আমি তো আপনাকে বলেইছি যে ওরা যখন আসবে তখন দল বেঁধে আসবে।

উজ্জ্বল চোখে মিঃ হেমস্টেটর বললেন, মালতো দোকানে রাখা দরকার। আরো ছয় বাক্স অর্ডার করে দিই বলো?

আগে বিক্রি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় দেখে নিয়ে তারপর অর্ডার দিন।

প্রত্যেক রাত্রে জনি আর কেওগ বীজ ছড়ায় আর দিনে তার থেকে ডলারের ফসল ওঠে। দশ দিনে জুতোর স্টকের দুইতৃতীয়াংশ বিক্রি হয়ে গেল আর আলকুশীও ফুরিয়ে গেল। পিঙ্ক ডসনকে আরও পাঁচশ পাউন্ড পাঠানোর জন্য জনি তার করে দিল। দাম আগের মতই পাউন্ড পিছু বিশ সেন্ট। মিঃ হেমস্টেটর ভেবেচিন্তে উত্তরের জুতোর কোম্পানীদের দেড়হাজার ডলারের একটি অর্ডার লিখে জনির হাতে সেটাকে ডাকে ফেলতে দিলে জনি সেটা পোস্টাপিসে পৌঁছনোর আগেই নষ্ট করে ফেলল।

সেই দিনই রাত্রে জনি রোজিনকে গুডউইনের বারান্দার পাশে আমগাছের নীচে নিয়ে গিয়ে সব কথা খুলে বলল।

রোজিন জনির চোখের দিকে চেয়ে বলল, তুমি ভীষণ খারাপলোক, বাবা আর আমি বাড়ি ফিরে যাবো। তুমি ওটাকে ঠাট্টা বললেও আমি এটা খুব গুরুতর বিষয় বলে মনে করি।

এই নিয়ে কিছুক্ষণ তর্ক চলার পর তাদের কথাবার্তা অন্য দিকে মোড় নেয়। শেষপর্যন্ত, বিয়ের পরে অ্যাটউডদের বাড়ী সাজানোর সময় দেয়ালের কাগজ হালকা নীল না গোলাপী রঙের হবে তা নিয়ে দুজনের মধ্যে কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলল।

পরের দিন সকালে জনি মিঃ হেমস্টেটরকে সব কথা বললে তিনি চশমার ভিতর দিয়ে জনিকে লক্ষ্যকরে বললেন, তুমি একটি দুষ্টু ছেলে। আমি বিচক্ষণ ব্যবসা বুদ্ধি দিয়ে ব্যাপারটা পরিচালনা করেছিলাম বলে এই সব মালের স্টক লোকসান হয় নি। এখন বাকি মালটার কি ব্যবস্থা করবে?

আলকুশীর পরের চালান এসে পৌঁছালে জনি সেইগুলি আর বাকি জুতো নিয়ে একটা নৌকায় করে তীর বরাবর আরো দক্ষিণে আলাজানে গেল। সেখানেই সেই শয়তানী উপায়ে সে সফল হল ফিরে এল এক থলি টাকা নিয়ে।

কমল আর জনিকে প্রলুব্ধ না করার সে তার পদত্যাগ পত্র গ্রহণের জন্য ছাগলদাড়ি ভূষিত মহান আঙ্কলের কাছে আবেদন জানালো। জনি ডেলসবার্গের পালংশাক, কলমীলতার জন্য কাতর।

সামরিক কাজ চালানোর জন্য উইলিয়াম টেরেনস্ কেওগের নাম কোপলিওর কনসালের পদের জন্য গৃহীত হলে জমি হেমস্টেটরের সঙ্গে দেশে ফিরে গেল।

কেওগ তার অভ্যস্ত স্বচ্ছন্দ্যে বিনা কাজের আমেরিকার কনসালশিপের উচ্চপদের চাকরীতে মানিয়ে নিল। টিন টাইপের দোকানটি শীঘ্রই বন্ধ হয়ে যাবে যদিও এই ব্যবসা বন্ধ হবে না। ভাগ্যের সন্ধানী ধীরগতি পদাতিকদের আগে আগে, অন্বেষার কাজে, বেরিয়ে পড়ার জন্য চঞ্চল অংশীদারেরা ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। তারা ভিন্ন দিকে যাত্রা করবে। ক্লানসি পেরুতে বিদ্রোহের সূচনার গুজব শুনতে পেয়ে সেদিকে যাওয়ার কথা চিন্তা করল। কেওগ মনে মনে, টিনের ওপর মানুষের মুখের অপটু অনুকরণের থেকেও সাংঘাতিক এক পরিকল্পনার খসড়া করছিল।

কেওগ দিস্তে দিস্তে সরকারী চিঠির দিকে তাকিয়ে নিজের মনে বলে, অভিনবত্ব আর বেশ কিছুটা ঝুঁকি আছে এমন প্রকল্পই ব্যবসার ব্যাপারে আমার পছন্দ। যেদিকে এত লোকের ভিড় নেই যে ডাকযোগে চিঠিপত্রের সাহায্যে ভদ্রগোছের লোক ঠকানো শেখানো হয় আমি সবসময় দূরের দিকে থাকি। কিন্তু আমি আমার সাফল্যের জন্য নামমাত্র সুযোগটুকু পেতে চাই। তার আমার উপার্জিত টাকার বাণ্ডিলের মধ্যে বিধবা বা অনাথদের টাকা থাকুক তা আমি চাই না।

কেওগের জুয়া খেলার সবুজ টেবিল ছিল ঘাসে ঢাকা পৃথিবী। তার উদ্ভাবন করা খেলাগুলোই সে খেলত। দ্বিধাগ্রস্ত লাজুক ডলার সে পেতে চাইত না। তুরী ভেরী আর কুকুর দিয়ে তাড়া করেও সে তাদের শিকার করত না। সে চাইত অভিনব, উজ্জ্বল মাছির টোপ ফেলে অজানা নদীর জল থেকে তাদের গেঁথে তুলতে। তবুও কেওগ একজন ব্যবসায়ী এবং তার পরিকল্পনাগুলি অদ্ভুত হলেও নির্ভুল।

জনি চলে যাবার তিনদিন পরে দুটি ছোট পালতোলা জাহাজ এসে কোরালিওর কূলের অদূরে ভিড়ল। তারপর একটা ডিঙ্গি করে একজন রোদে রাঙা যুবককে তীরে নিয়ে এল। যুবকটি হিসেবি ও ধূর্ত চোখ দিয়ে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চারিদিক দেখতে দেখতে একজনের কাছে কনসালের অফিসের খবর জেনে সেদিকেই রওনা হয়।

কেওগ তখন সরকারী চিঠির প্যাডে আঙ্কলের মুখের ক্যারিকেচার আঁকায় ব্যস্ত ছিল। আগন্তুক প্রবেশ করলে কেওগ তার দিকে তাকায়।

কাজের কথার সুরে যুবকটি বলে, জনি অ্যাটউড কোথায়।

আঙ্কল স্যামের নেকটাইটা যত্নকরে আঁকতে আঁকতে কেওগ বলল চলে গেছে।

টেবিলে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে যুবকটি এবার বলল, ঠিক ওরই মতো। কাজে মন না দিয়ে সে সবসময়ই ঘুরে বেড়ায়। শীঘ্র ফিরবে কি?

মনে হয় না।

আগন্তুক বলল, সে তার কোন আজে বাজে কাজে গিয়েছে বলেই আমার মনে হয়। সাফল্যের

জন্য জনি কোন সময়ই কোন কাজে বেশীদিন গেলে থাকতে পারে না। আমি বুঝতে পারছি না নিজে দেখাশুনা না করে এখানকার কাজকর্ম সে চালায় কি করে।

কাজকর্ম সব এখন আমিই দেখাশুনা করি।

যুবকটি বলে, তাই, তাহলে সেই ফ্যাকটরিটা কোথায় বলুন তো।

কোন ফ্যাকটরি?

কেন? যে ফ্যাকটরিতে আলকুশীর ফলগুলো কাজে লাগানো হয়। যুবকটি বলল, ঈশ্বর জানেন, ফলগুলি কোন কাজে লাগে। দুটো জাহাজ ভর্তি করে ওই ফল নিয়ে এসেছি। সস্তায় এগুলি আপনাদের দেব। ওই কাঁটা ফলগুলি সংগ্রহ কবার জন্য ডেলসবার্গের ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ সকলকে গত একমাস ধরে লাগিয়েছিলাম। সেই দেখে সবাই বলল আমার মাথাটাই নাকি খারাপ হয়ে গিয়েছে। পাউন্ড পিছু পনেরো সেন্ট দাম দিলে এগুলি ডাঙায় এনে দেওয়া হবে। আরো দরকার থাকলে আলাবামা জোগান দিতে পারবে। জনি দেশ ছেড়ে আসার সময় আমাকে বলেছিল, এ দেশে টাকা আমদানী করার সম্ভাবনা আছে এমন কোনো কারবারের খবর পেলে সে আমাকে জানাবে। জাহাজ দুটো আরো কাছে নিয়ে এসে মাল নামানো শুরু করি?

কেওগের মুখে অবিশ্বাস্য আনন্দের ভাবের উদয় হল। সে পেনসিল ফেলে দিয়ে যুবকের দিকে তাকিয়ে আন্তরিক ব্যগ্রতার সঙ্গে বলে। ঈশ্বরের দিব্যি, তুমি কি পিঙ্ক ডসন?

আমার নাম পিঙ্কনি ডসন।

উন্মত্ত আবেগে বিলি কেওগ আস্তে আস্তে তার চেয়ার ছেড়ে নেমে, মেঝেতে তার প্রিয় এক চিলতে ম্যাটিং-এর উপর শুয়ে পড়ল সেই উত্তপ্ত বিকেলে কোরালিও খুবই শান্ত রয়েছে। ধূর্ত চোখে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকা একজন রোদে রাঙা যুবকেব সামনে একজন আইরিশ আমেরিকানের উন্মত্ত আবেগে অভব্য হাসির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে জুতো পায়ে হেঁটে যাওয়ার মচ্ মচ্ শব্দ হচ্ছে। আর শোনা যাচ্ছে ঐতিহাসিক স্প্যানিশ সমুদ্রের জনশূন্য তটরেখা ধুয়ে যাওয়া তরঙ্গের ধ্বনী।

চৌদ্দ

কলা বিদ্যার দুই বিশারদ

দুই ইঞ্চি একটা পেনসিলের টুকরো ছিল কেওগের জাদুদণ্ড যা দিয়ে সে জাদুবিদ্যার প্রাথমিক খেলাগুলি দেখায়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র জনি অ্যাটউডের ত্যাগ করা পদের জন্য নতুন কনসাল না পাঠানো পর্যন্ত কেওগ বসে বসে সেই পেনসিল দিয়ে কাগজের ওপর কতকগুলি রেখা ও সংখ্যা লিখল।

আঞ্চুরিয়ার নতুন প্রেসিডেন্টের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও দুর্বলতার ওপর ভিত্তি করে তৈরী করা নতুন প্রকল্পটি সে তার মন থেকে উদ্ভাবন করেছে।

অনেকের মতে প্রেসিডেন্ট লোসাদা ছিলেন এক নায়ক। তাঁর প্রতিভার সঙ্গে কয়েকটি হীন ও ক্ষতিকর লক্ষণ মিশে না থাকলে, তাঁর প্রতিভা তাঁকে অ্যাংলো স্যাকসনদের মধ্যে বিশিষ্ট করতে পারতো। তাঁর মধ্যে ওয়াশিংটনের দেশভক্তি, নেপোলিয়নের তেজ আর ঋষিদের জ্ঞান ছিল। তাঁর অত্যুগ্র আত্মম্ভরিতা তাঁকে নিম্নমানের একনায়কের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে, না হলে তাঁর গুণগুলির জন্য "প্রোজ্বল ত্রাণকর্তা" খেতাব গ্রহণ সঙ্গত হত।

তিনি দেশের অনেক উন্নতি করেছেন। কঠোর হাতে তিনি তাকে প্রায় মুক্ত করে এনেছেন অজ্ঞতা আর আলস্য থেকে, সেই সব পরজীবী থেকে, যারা তাকে শোষণ করছিল। বিশ্বের দেশ সমূহে তিনি তাঁর দেশের স্থান করে নিয়েছেন। স্কুল, হাসপাতাল স্থাপন করেছেন। রাস্তা, সেতু, রেললাইন, প্রাসাদ গড়েছেন। কলা ও বিজ্ঞানের প্রসারের জন্য সরকারী অর্থ দান করেছেন। অন্যান্য প্রেসিডেন্টরা লোভী ও অবিবেচক ছিলেন। লোসাদা অনেক অর্থের মালিও হলেও জনগণ উন্নতির অংশ পেয়েছে।

এত কিছুর পরেও তাঁর ধর্মে যেখানে ফাটল আছে সেটা হচ্ছে স্মৃতিস্তম্ভ ও তাঁর নিজের মহিমা চিরায়ত করার নিদর্শনের প্রতি মোহ। তাঁর মহত্বের প্রশস্তি সহ তাঁর প্রতিমূর্তি প্রত্যেক শহরে তিনি স্থাপন করেছেন। প্রত্যেক সরকারী ভবনে খোদাই করলেন তাঁর মহিমা আর কৃতজ্ঞ প্রজাদের সংকীর্তন। ছোট ছোট মূর্তি আর ছবি তাঁর লোকেরা তাঁর নির্দেশ মতো সারা দেশে ছড়িয়ে দিল। লোমাদা তাঁর সভার

একজন স্তাবকের তাকে সেন্টজন রূপে চিহ্নিত করা চিত্রটি রাজধানীর একটি চার্চে টাঙাবার ব্যবস্থা করলেন।

সারা য়ুরোপ চুঁড়ে নানা উপায়ে তিনি বিভিন্নদেশের শাসক সে রাজাদের তাঁকে খেতাব দানের জন্য প্ররোচিত করেছেন। যেকোন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে তাঁর কাঠ থেকে কাঁধ পর্যন্ত ক্রমে, তারকায় সোনার গোলাপে, মেডেল, রিবনে ঢাকা থাকে। শোনা যায়, কোন ব্যক্তি তার জন্য নতুন একটি খেতাব বা তাঁর মহত্ত্ব কীর্তনের নতুন উপায় বার করতে পারলে, সে অবাধে রাজকোষের গভীরে হাত ডোবাতে পারে।

এই ব্যক্তির দিকেই বিলি কেওগের নজর। প্রেসিডেন্টের বৃথাগর্ব পুষ্ট করতে সাহায্য করা ব্যক্তিদের প্রতি তাঁর কৃপাদৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে। এই তরল সৌভাগ্য বর্ষণের বিরুদ্ধে তাকে ছাতা ধরতে হবে একথা তার মনেই হয় নি।

এব পরে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে নতুন কনসাল এসে পৌঁছাল কেওগ অব্যাহতি পেল। উদ্ভিদ বিদ্যা অন্ত প্রাণ, নতুন কনসাল, সদ্য কলেজ ছাড়া যুবক। কোরালিওতে কনসালের পদে যোগ দেওয়ার উষ্ণমণ্ডলেব গাছপালা নিয়ে গবেষণা করার সুযোগ পেয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যে কনস্যুলেটের শীতল বারান্দায় বোতল আর চেয়ার রাখার জায়গা রইল না। এদিকে কেওগ তার নতুন প্লটের প্রয়োজনে সমুদ্র যাত্রা করার জন্য তল্পিতল্পা বাঁধতে বসল।

ভবঘুরে জাহাজ কার্লসফিন, নারকেলের বোঝা নিয়ে গিয়ে নিউইয়র্কের বাজারে নামাবে বলে, সেখানে এল। তার ফিরতি ট্রিপে কেওগ একটি আসন ভাড়া করল। তারপর সমুদ্রতীরে বিদায় নিতে আসা ব্যক্তিদের বলল, আমি নিউইয়র্ক যাচ্ছি, কিন্তু ফিরে আসব আমি নেই বোঝবার আগেই। যেহেতু আমি এই নানারঙের দেশে কলাবিদ্যা শেখাবার ভার নিয়েছি তাই টিনটাইপ শেখানোর প্রথম কষ্টকর দিনগুলিতে আমি এদেশ ছেড়ে চলে যেতে পারি না।

এরপর কার্লসফিনে চড়ে দশদিন পরে কেওগ, নিউইয়র্কের দশ নম্বর সড়কের একটি উঁচু বাড়ির ওপর তলায়, ক্যারোলাস হোয়াইটের স্টুডিওতে কোটের কলার উঁচু করে কাঁপতে কাঁপতে এসে পৌঁছাল।

কলাবিদ্যা সম্বন্ধে মহান থিয়োরীতে বিশ্বাসী, তেইশ বছর বয়সী ক্যারোলাস হোয়াইট সিগারেট টানতে টানতে, তেলের স্টোভের ওপর, ফ্রাইং প্যানে সসেজ ভাজছিল। রিলিকে ঢুকতে দেখে খালি হাতটি বাড়িয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল। বিলি কেওগ! অসভ্য জাতের কোন প্রান্ত থেকে জানতে পারি কি?

একটি টুল টেনে নিয়ে বসে বড়ে আঙুলগুলি স্টোভের দিকে বাড়াতে বাড়াতে কেওগ বলল, হ্যালো ক্যারি। তোমাকে এত তাড়াতাড়ি পেয়ে গিয়ে আমি খুশীই হয়েছি। এই কয়দিন ডাইরেকটরি আর আর্ট গ্যালারিতে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি আর মোড়ের অন্নসত্রের লোকটি চটপট তোমার ঘরের হদিশ দিয়ে দিল। তাইতেই বুঝলাম তুমি ওখানে ছবিই আঁকছ।

এবার কেওগ বোদ্ধার দৃষ্টিতে ঘরের চারিদিকে দেখতে দেখতে বলল, তুমিই পারবে। ওটার কি নাম দিয়েছ ক্যারি। ওইযে কোণের ওই বড়োটি, দেবদূত, সবুজ মেঘ আর বাদ্যবৃন্দ কোনি আইল্যান্ডের দৃশ্য, কি বলো? ঠিক ওইরকম আমাদের চাই।

ওটার নাম দেবো ভেবেছিলাম, ইলাইজার উত্তরণ। কিন্তু তোমার এই নামটি দেখছি আরো জুৎসই।

কেওগ বলল নামে কিছু আসে যায় না। আসল হচ্ছে ফ্রেমটা কত বড়ো আর কতগুলি রং তুমি ব্যবহার করেছ। আমার একটা পরিকল্পনার ব্যাপারে তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য আমি দুহাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে এখানে এসেছি। স্কীমটা আমার মাথার আসলে প্রথমেই আমার তোমার কথা মনে হয়েছে। আমার সঙ্গে একটা ছবি আঁকার জন্য তুমি যাবে। ট্রিপটা নব্বুই দিনের আর এই কাজটার জন্য তুমি পাঁচ হাজার ডলার পাবে।

হোয়াইট বলল, কর্নফ্লেকস না হেয়ার টনিক?

কোনো বিজ্ঞাপনের কাজ না।

ছবিটা কি ধরনের হবে?

কেওগ বলল, সে কথা বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হবে।

ক্যারোলাস বলল, বলে যাও। কিছু মনে না করলে, তোমার বলা পর্যন্ত এই সসেজগুলির দিকে আমার চোখ থাকবে ভাজাটা একটু বেশী বাদামী হলেই এগুলোর বারো বেজে যাবে।

কেওগ এবার তার পরিকল্পনাটা বুঝিয়ে বলল, আমরা কোরালিওতে ফিরে যাব। তুমি, একজন বিশিষ্ট শিল্পী তোমার শ্রমসাধ্য ও অর্থকরী কর্মজীবন থেকে বিশ্রাম পেতে উষ্ণমণ্ডলে এসেছ, এমন ভান করবে। আর আমরা আশা করতে পারি যে একজন কীর্তিমান শিল্পী হিসেবে প্রেসিডেন্টের মুখাবয়ব ক্যানভাসের ওপর চিরস্তন করবার একটি কাজ পাবেন এবং তাঁর দুর্বলতার অপূর্তির সহায়কদের ওপর বর্ষিত প্রেসের একটি বৃহৎ ভাগ আদায় হবে।

একটু থেমে কেওগ আবার বলল, তার মূল্য হবে দশ হাজার ডলার। চিত্রশিল্পীরা পোট্রেটের জন্য এর থেকে অনেক বেশী টাকাই পেয়েছে। আমাদের যাওয়া আসার ভাড়াটা আমরা নিজেরাই দেবো। সম্ভাব্য লাভের টাকা দুভাগ হবে।

একজন শিল্পী ও অন্যজন বেদুইন হবার অনেক আগে পশ্চিমাঞ্চলে তাদের চেনা শোনা হয়ে ছিল। তারা দুজনে কিছুক্ষণের মধ্যেই কাফের গরম কোণে গিয়ে বসল। সামনে পুরনো খাম ও কেওগের নীল পেনসিল নিয়ে অনেক রাত্রি পর্যন্ত তারা বসে রইল।

রাত্রি প্রায় বারোটা নাগাদ হাতের ওপর থুতনি রেখে চেয়ারে দু-ভাজ হয়ে বসে হোয়াইট বলল, আমি তোমার সঙ্গে যেতে প্রস্তুত বিলি। সসেজ আর গাড়ী ভাড়ার জন্য দু'তিনশ আমার জমা আছে। আমি সুযোগটা নিতে চাই। পাঁচ হাজার মানে ফ্রান্সে দু বছর আর ইতালিতে এক বছর কাটানো যাবে। আমি কাল থেকেই গোছগাছ শুরু করছি।

তুমি দশ মিনিটের ভেতর তা শুরু করবে, কারণ কাল এখনই হয়ে গেছে। বিকেল চারটের কার্লসফিন ছাড়বে। চলো আমি তোমাকে সাহায্য করছি।

কোরালিও আঞ্চুরিয়ার নিউপোর্ট থাকাকালীন বছরে পাঁচমাস শহরটিতে প্রাণের সাড়া জাগে। তখন এই শহর সরকারের প্রধান দপ্তর। প্রেসিডেন্ট তাঁর পরিবারসহ সেই সময়ে এখানে থাকাকালীন উচ্চতর সমাজ তাঁর অনুগমন করে। আমোদপ্রিয় জনগণের দ্বারা মরসুমটি লম্বা ছুটি আর প্রমোদ উৎসবে পরিণত হয়। রাজধানী থেকে আসা বিখ্যাত সুইশ ব্যাঙ্ক, প্রতি সন্ধ্যায় প্লাজায় বাজে। শহরের মোট চৌদ্দটি গাড়ী শহর পরিক্রমা করে। পর্বত অঞ্চল থেকে ইনডিয়ানটা তাদের হস্তশিল্পের পয়সা নিয়ে আসে। মুখর, মুখী, বেপরোয়া উদ্বেল মানবতরঙ্গ সরু রাস্তায় ভিড় জমায়। ছোট ব্যালের স্কার্ট পরা শিশুর দল সোনালি পাখা মেলে উচ্ছ্বসিত ভিড়ের নীচে উল্লাসে চিৎকার করে। বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট ও তাঁর দলবলের শুভাগমন মরসুমের শুরুতে খুব জাঁকজমক, দেশপ্রেমের প্রদর্শনী উৎসাহ ও স্ফূর্তির সঙ্গে পালন করা হয়।

শীতের আনন্দেব মরসুম শুরু হয়ে গেলে কেওগ আর হোয়াইট কার্ল সফিনের ফিরতি ট্রিপে কোরালিও এসে পৌঁছাল : সমুদ্রতীরে পা দিয়েই তারা শুনতে পেল প্লাজাতে ব্যান্ড বাজছে। তারা দেখতে পেল গাঁয়ের মেয়েরা কালোচুলে জোনাকি আটকে চটুল চাহনি হেনে পথে পথে ঘুরছে আর সাদা লিনেনের পোশাকে ফুলবাবুরা প্রেমের সন্ধানে ছড়ি ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছে। মানুষের তৈরী অস্তিত্বের অনুভূতিতে বাতাস পূর্ণ হয়ে রয়েছে।

কোরালিওতে আসার পরের দু-তিন দিন তাদের তোড়জোড় করেই কাটল। কেওগ হোয়াইটকে নিয়ে সারা শহর ঘুরিয়ে দেখাল, ইংরেজীভাষী ছোট সামাজিক বৃত্তে পরিচয় করে দিল, শিল্পী হিসেবে হোয়াইটের খ্যাতি ছড়াবার জন্য যেটুকু প্রয়োজন তা করল। তারপর কেওগ আরো দৃশ্যমানভাবে শিল্পীকে জনসমক্ষে উপস্থাপনা করার জন্য তারা দুজনে হোটেলে দে লস এসত্রানজারোস-এ ঘর ভাড়া নিল। দুজনের সাদা ডাক এর নিখুঁত পোশাক, আমেরিকান ঘাসের টুপী, সরু ছড়ি। স্বাচ্ছন্দ্য ও দর্শনীয়তার প্রতীক কেওগ বা তার বন্ধু মহান আমেরিকান বিদেশী বেশভূষায় কোরালিওর যে কোন সৈনিক বা অফিসারকে হার মানালো।

হোয়াইট তার ইজেল নিয়ে সমুদ্রতীরে গিয়ে পাহাড় ও সমুদ্রের চমৎকার স্কেচ আঁকল। স্কেচ করার সময় তার কাজ দেখার জন্য স্থানীয় জন সমষ্টি তার পিছনে একটি অর্ধবৃত্তাকার মুখর পরিমণ্ডল সৃষ্টি করল, মহান শিল্পীর বন্ধু হিসেবে কেওগের ভূমিকা ছিল খুঁটিনাটির দিকে লক্ষ্য করা। তার কাঁধ থেকে ঝোলানো ক্যামেরা এই ভূমিকার দৃশ্যমান চিহ্ন ছিল।

কেওগ বলে, একটি ক্যামেরা কোন ভদ্র, উন্নতি শীল ব্যক্তিকে ব্যাঙ্কের টাকা আর সহজ বিবেকের মালিকরূপে চিহ্নিত করতে যতটা কার্যকরী, একটি প্রমোদতরী ততটা নয়। কোন লোক বিনা কাজে

ঘুরে বেড়াচ্ছে তার ছবি তুলছে দেখলে জানবে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের তালিকার ওপর দিকেই তার নাম। বুড়ো বুড়ো কোটিপতিরা চারিদিকে ভালো করে দেখলেই ছবি তোলে। হীরের টাইপিন বা খেতাবের থেকে সাধারণ লোক কোডাক দেখে বেশী প্রভাবিত হয়।

কেওগ সর্বত্র সহজভাবে, বিভিন্ন দৃশ্যের, সসঙ্কোচ সেনিও বিটাদের, ছবি তুলতে লাগল আর হোয়াইট কলাবিদ্যার উচ্চতর মহলে দৃশ্যমান ভাবে উদিত হল।

দু'সপ্তাহ পরে একটি প্রেসিডেন্টের একজন এ ডি কং ঝকঝকে একটি ভিকটোরিয়া চড়ে তাদের হোটেলে এল। প্রেসিডেন্ট কাসা মোরেনাতে একবার ঘরোয়া ভাবে সেনিওর হোয়াইট-এর সঙ্গে দেখা করার বাসনা প্রকাশ করেছেন।

কেওগ পাইপটা দাঁতে চেপে বলল, দামটা ভুলো না, লোনা কিংবা তার তূল্য অর্থে, দশহাজারের এক সেন্টও কম নয়। তোমাকে যেন সস্তার কাউনটার থেকে টাকা নামের কাগজের তাড়া গছিয়ে না দেয়।

হয়ত অন্য কোন ব্যাপার।

হোয়াইটের কথায় অসীম বিশ্বাসে কেওগ বলল, গিয়েই দেখ। উনি চাইছেন তাঁর নিপীড়িত দেশ এখন বাস করা বিখ্যাত তরুণ আমেরিকান শিল্পী ও ষড়যন্ত্রকারীকে দিয়ে ওঁনার একটা ছবি আঁকিয়ে নিতে। বেরিয়ে পড়ো।

ভিকটেরিয়া শিল্পীকে নিয়ে চলে গেলে কেওগ পায়চারী করতে করতে পাইপ থেকে ধোঁয়ার তুফান তুলতে লাগল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ভিকটোরিয়া চেপে হোয়াইট ফিরে এলে কেওগ জিজ্ঞাসু চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

হোয়াইট চিৎকার করে বলল, বাগিয়েছি। বিলি, তুমি সত্যিই একটি আশ্চর্য মানুষ। উনি একটি ছবি চান। এই ডিকটেটর লোকটি কিন্তু খাসা। মাথার চুল থেকে আঙুলের ডগা পর্যন্ত, উনি একজন একনায়ক। সিপিয়া টোনে আঁকা চেহারার জুলিয়াস সীজার। শয়তান আর চানসি ডি পিও একসঙ্গে মেশানো ভদ্র, গম্ভীর তাঁর ব্যবহার। যে ঘরটায় আমি বসেছিলাম সেটা লম্বায় চওড়ায় প্রায় দশ একর। সাজসজ্জা মিসিসিপির স্টীমারের মতো, সোনালি আয়না আর সাদা পেন্ট রা। আমি সারা জীবন চেষ্টা করলেও তাঁর মতো ইংরেজি বলতে পারব না। দামের কথায় দশ হাজার বলার সময়ে আমি ভেবেছিলাম আমাকে হয়ত বাইরে নিয়ে গিয়ে গুলি করার আদেশ দেবেন। কিন্তু চোখের পাতা পড়ার আগে উপেক্ষার ভঙ্গীতে হাত নেড়ে বললেন, আপনি যা বলেন। ওঁর সঙ্গে খুঁটিনাটি বিষয়ে আলোচনার জন্য আমি কাল আবার যাবো।

কেওগের হেট মুখে আত্ম নিপীড়নের ভাব ফুটে উঠল। সে বলল, আমি হেরে যাচ্ছি, ক্যারি, এই সব পুরো মানুষ সাইজের মামলাগুলি হাতে নেবার আমি তার যোগ্য নই। এবার থেকে ঠেলাগাড়ীতে করে কমলালেবু বেচাটাই আমার পক্ষে উপযুক্ত হবে। পনের হাজার চাইলেও ও রাজী হতো। বলো ক্যারি, এরপরে এমন ভুল করলে কোন জড়বুদ্ধির আশ্রমে কেওগকে ভর্তি করে দেবে তো?

কাসামোরেনা একতলা উচ্চতার হলেও খয়েরী পাথরে তৈরী, ভিতরটা অত্যন্ত সুসজ্জিত। উষ্ণমণ্ডলের ঝলমলে গাছপালায় ছাওয়া পাঁচিল ঘেরা বাগানের মাঝে কোরালিওর এক প্রান্তে একটি নীচু টিলার ওপর অবস্থিত। পরের দিন প্রেসিডেন্টের গাড়ী শিল্পীকে নিয়ে চলে গেলে কেওগ তার ছবি তোলার বাক্স নিয়ে সমুদ্রতীরে বেড়াতে গেল।

হোটেলে ফিরে হোয়াইটকে ব্যালকনিতে একটি ডেক চেয়ারে বসে থাকতে দেখে কেওগ বলল, কি খবর। ছবিটা কি রমক হবে, তুমি আর হিস নিবস মিলে কিছু স্থির করলে।

হোয়াইট উঠে ব্যালকনিতে কয়েকবার পায়চারী করে দাঁড়িয়ে পড়ে হাসল। মুখ লাল, চোখ জ্বল জ্বল করছে।

তারপর কর্কশভাবে হোয়াইট বলল, তুমি আমার স্টুডিওতে গিয়ে ছবির কথা বলার সময়ে আমি ভেবেছিলাম পাহাড় বা মহাসমুদ্রের পটভূমিতে কোনো বিজ্ঞাপনের ছবি চাইছ। যে কাজে আমাকে নিয়ে এসেছ তার সঙ্গে তুলনা করলে এদুটোকে আমি উচুঁদরের শিল্প বলেই মনেকরি। শোন ওই পাষণ্ড কি চায়। সমস্ত নকশা করা হয়ে গিয়েছে। এমনকি একটা স্কেচ পর্যন্ত করে রেখেছে। বুড়োর আঁকার হাতটাও

খারাপ নয়। এ, আমাকে দিয়ে, জুপিটারের বদলে লিমপাস পাহাড়ের ওপর বসে আছে, আঁকিয়ে নিতে চায়। এক পাশে প্রেসিডেন্টের কাঁধে একটা হাত রেখে পূর্ণ সামরিক পোশাকে জর্জ ওয়াশিংটন দাঁড়িয়ে আছেন মাথার ওপর ডানা মেলে একজন দেবদূত, প্রেসিডেন্টকে সম্ভবত কুইন অফ মে খেতাবে ভূষিত করতে ওঁর মাথায় লরেলের একটি মালা পরিয়ে দিচ্ছেন। পশ্চাদপটে থাকবে কামান আরো দেবদূত আর সৈন্য। এ ছবি যে আঁকবে তার আত্মা কুকুরের এবং সে বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হবে। তলিয়ে যাওয়ার আওয়াজ শোনার জন্য লেজে টিনের কৌটোও বেঁধে দেওয়া হবে না।

কেওগের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। সে এই ব্যাপারটা চিন্তাই করতে পারে নি। এতক্ষণ পর্যন্ত সবকিছু সচ্ছল ছিল। হোয়াইটকে বসতে বলে কেওগ ব্যালকনিতে একটি চেয়ার টেনে এনে বসে আপাত প্রশান্তির সঙ্গে পাইপ ধরালো।

কিছুক্ষণ চুপচাপ পাইপ টানার পর কেওগ বলে উঠল, আমাদের মধ্যে আর্ট টু আর্ট আলোচনার দরকার। তোমার আর্ট তোমার কাছে, আমারটা আমার কাছে। বিয়ারের বিজ্ঞাপন বা ওলড মিলের অয়েল পেনটিং দেখলে, তোমার আর্ট তোমাকে নাক উঁচু করতে শেখায়। ব্যবসা আমার, আর্ট আমার এই প্ল্যানটি আমি মাথা খাটিয়ে বের করেছি। উনি যেমন করে বলবেন তেমন তাকে এই প্রেসিডেন্ট ব্যক্তির ছবি তোমাকে আঁকতে হবে। তুমি ক্যানভাসে রঙ লাগাও আর পকেটে টাকা পুরে নিয়ে এস। খেলার এই পর্যায়ে এসে আমাকে ধাক্কা দিও না ক্যারি। দশ হাজারের কথাটা একবার ভেবে দেখ।

হোয়াইট বলল, আমি সেটা ভুলতে পারছি না। আর সেটাই আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। আমার লোভ হচ্ছে সমস্ত আদর্শ বিসর্জন দিয়ে ছবিটা এঁকে দিই। পাঁচ হাজারে তিন বছর বিদেশে থেকে আমি শেখার সুযোগ পাবো বলে আমার আত্মাকেও আমি সম্ভবত বিক্রি করতে পারি।

কেওগ সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গীতে বলল, এটাকে একটা ব্যবসার প্রস্তাব হিসেবে ভাবলেই দেখবে আর ততটা খারাপ লাগছে না। এতটা রঙের পরিবর্তে এতটা সময় আর এতটা টাকা। তাছাড়া ছবিটা শিল্প রুচিকে তেমন ভাবে ধাক্কা দেবে বলেও আমার মনে হয় না। জর্জ ওয়াশিংটন ভালো লোক ছিলেন আর দেবদূতেই বা আপত্তির কি আছে। আমি তো বিশেষ কিছু খারাপ দেখছি না। জুপিটারের কাঁধে দুটো ফ্ল্যাপ দিয়ে, মেঘগুলি ব্ল্যাকবেরি গাছের ঝোপের মতো করে দিলে, যুদ্ধের দৃশ্য হিসেবে খুব একটা খারাপ হবে না। দামটা আগে থেকে ঠিক হয়ে গেছে তাই, তা না হলে ওয়াশিংটনের জন্যে আরো এক হাজার ডলার ও দেবদূতের জন্য আরো পাঁচশ ডলার দেওয়া উচিত।

অস্বস্তির সঙ্গে হেসে হোয়াইট বলল, তুমি বুঝছ না বিলি, আমরা যারা ছবি আঁকি, আমাদের অনেকের মধ্যে শিল্প বোধ অত্যন্ত তীব্র। আমি এমন একটি ছবি আঁকতে চাই যার সামনে দাঁড়িয়ে লোকে দেখার সময়ে ভুলে যাবে যে সেটা রং দিয়ে আঁকা। আমি চাই তারা যাবার সময় আমি আর কি কি কাজ করেছি যে বিষয়ে জানতে চাক। আমি আমার অন্য কোন কাজ তারা খুঁজে পাক চাই না। যেই ছবিটি ছাড়া আর কোন কাজ না। সত্যচ্যুত না হবার জন্য সেই কারণে আমি সসেজ ভাজা খেয়ে বেঁচে আছি। এই ছবিটা, বিদেশে আমাকে শিক্ষার সুযোগ করে দিতে পারে বলে, আঁকতে রাজী হয়েছিলাম। কিন্তু এই ক্যারিকেচার, হে ঈশ্বর, আমার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে। আমি কি বলছি তুমি বুঝতে পারছ, বিলি?

কেওগ হোয়াইটের হাঁটুতে হাত রেখে কোমল ভাবে বলল, নিশ্চয়। বুঝতে পারছি তোমার শিল্পবোধকে এভাবে মার খেতে দেওয়াটা ঠিক নয়। ব্যাটল অফ গেটিসবার্গ-এর মতো ছবিই তুমি আঁকতে চেয়েছিলে। তুমি মনে মনে একটা ছোট্ট স্কেচ করো। আমাদের সঞ্চয়ের শেষ সেন্টটি দিয়ে সংগ্রহ করা মূলধনের মধ্যে তিনশ পঁচাশি ডলার ইতিমধ্যেই খরচ হয়ে গেছে। বাকি যা আছে তা দিয়ে কোনরকম নিউইয়র্কে ফিরে যাওয়া যাবে। আমি দশ হাজারের আমার অংশটি চাই, যা দিয়ে ইডাহোতে তামার খনিতে লগ্নী করে লক্ষ ডলার আমায় রোজগার করতেই হবে। তুমি তোমার আর্টের ছাড় থেমে নেমে এসো ক্যারি। আমার ডলারে টুপি ভর্তি করি এসো।

এবার হোয়াইট বলল, বিলি, আমি চেষ্টা করব। করব বলছি না। আমি ওটা শেষে করার চেষ্টা করব।

এই তো কাজের কথা। এবার আর একটা কথা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজটা শেষ করতে হবে। দরকার হলে রংমেশাবার কাজে দুজন ছেলেকে নাও। এখানকার জনগণ মিঃ প্রেসিডেন্টের ওপর অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে বলে ইঙ্গিত পেলাম। সবাই বলছে বাণিজ্যিক সুবিধার ব্যাপারে তিনি বড় দরাজ।

ওরা বলছে দেশটাকে বেচে দেবার জন্য তিনি নাকি গোপনে ইংল্যান্ডের সঙ্গে চুক্তি করেছেন। কোন গোলমাল শুরু হবার আগেই আমরা টাকাটা আদায় করে নিতে চাই।

কাসা মোরেনার প্রকান্ড দালানে একটা বড় ক্যানভাসের নীচে হোয়াইটের অস্থায়ী স্টুডিওতে প্রেসিডেন্ট রোজ দুঘণ্টা বসেন।

বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করতে লাগলেও যত সময় যেতে লাগল হোয়াইটের জ্বালা, আত্মধিকার, থমথমে গাম্ভীর্য আর শ্লেষাত্মক উল্লাস বাড়তে থাকল। কেওগ নানাভাবে বুঝিয়ে তাকে ছবির কাজে ব্যস্ত করে রাখল।

মাসখানেক পরে হোয়াইট জানাল ছবি শেষ হয়েছে। মোজা টানটান, ফ্যাকাসে মুখে কেওগকে সে বলল, প্রেসিডেন্ট ছবি দেখে খুব খুশী। ছবিটা জাতীয় গ্যালারিতে রাজপুরুষ ও দেশনায়কদের মধ্যে রাখা হবে। কাল দাম নেবার জন্য কাসামোরেনাতে যাবো।

পরদিন নির্ধারিত সময়ে হোয়াইট কাসামোরেনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে কেওগ তার পাশে চলতে চলতে মহা উৎসাহে তার পরিকল্পনার সাফল্যের কথা বলতে লাগল।

কিছুদুর পর্যন্ত তার সঙ্গে গিয়ে কেওগ ফিরে এসে হোটেলে অপেক্ষা করতে লাগল। একঘণ্টা পরে ফিরে এসে হোয়াইট টুপিটা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে টেবিলে বসে বলল, বিলি, পশ্চিমে আমার ভাইয়ের চালান একটি ব্যবসায় কিছু টাকা আমার লগ্নী করা আছে। তার আর থেকে আমার যাবতীয় খরচ চালাই। আমি আমার অংশ উঠিয়ে নিয়ে এই পরিকল্পনার তোমার প্রাপ্য অংশ তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি।

কেওগ লাফিয়ে উঠে বলল, তুমি কি ছবিটার জন্য টাকা পাওনি?

হ্যাঁ পেয়েছিলাম। কিন্তু এখন আর সেই ছবি বা টাকার কোনটাই নেই। প্রেসিডেন্ট আর আমি ছবিটা দেখার সময় তাঁর সেক্রেটারী নিউ ইয়র্ক-এর এক ব্যাঙ্কের একটা ড্রাফট নিয়ে এসে আমার হাতে দেবার সঙ্গে সঙ্গে আমি যেন কেমন পাগলের মতো হয়ে গেলাম। কাগজখানা ছিঁড়ে টুকরো করে ফেললাম। তারপর দেয়ালের থামগুলিতে রংলাগানো এক মজুরের কাছ থেকে রং আর তুলি নিয়ে সেই দশ হাজার ডলারের বিভীষিকার সর্বত্র লাগিয়ে দিলাম। তারপরে প্রেসিডেন্টকে নমস্কার জানিয়ে ফিরে এলাম। ঘটনার আকস্মিকতায় অবাক প্রেসিডেন্ট নড়া চড়া করতে পারেননি। বিলি, এটা তোমার ওপর সুবিচার করা হল ঠিকই কিন্তু আমি পারলাম না।

এদিকে কোরালিওতে উত্তেজনা বাড়তে লাগল। বাইরে গোলমালের শব্দ শুনে হোয়াইট কেওগকে বলল, ওই যে শোন। আমার যেটুকু স্প্যানিশ জানা আছে তাতে ওরা বলছে বিশ্বাসঘাতক নিপাত যাক। এই ধ্বনি আমি আগেও শুনেছি। ওই ধ্বনির লক্ষ্য আমি বলে আমার মনে হচ্ছিল। আমি আর্টের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি, ছবিটা তাই গেল।

ক্রুদ্ধ কেওগ চিৎকার করে বলল, নিরেট বোকা নিপাত যাক, তোমার পক্ষে মানানসই হত। পাঁচ ডলার দামের রং লেপার জন্য তোমার বিবেক আঘাত পেয়েছে বলে ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতো দশ হাজার ছিঁড়ে ফেলেছে। এরপরে কোন পরিকল্পনায় কোনো ব্যক্তিকে দরকার হলে তাকে সবার আগে 'আদর্শ' শব্দটি যে শোনে নি বলে নোটারির সামনে প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

কেওগ রাগে জ্বলতে জ্বলতে ঘর থেকে চলে গেল। হোয়াইট তার ক্ষোভের জন্য ব্যস্ত হল না। যে আত্মগ্লানির হাত থেকে সে রক্ষা পেয়েছে তার কাছে কেওগের হাহুতাশ তুচ্ছ।

কোরালিওতে উত্তেজনা বাড়তে থাকে। একটা বিস্ফোরণ আসন্ন, এই অসন্তোষ প্রদর্শনের কারণ ছিল ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে একজন লম্বা চওড়া ইংরেজের উপস্থিতি। সেই ব্যক্তি এসেছে একটি চুক্তি সই করতে যার বলে প্রেসিডেন্ট তাঁর দেশের জনগণকে বিদেশীদের হাতে তুলে দিচ্ছেন, এও অভিযোগ করা হচ্ছে যে কেবল মহামূল্যবান ব্যবসায়িক সুবিধাই ছেড়ে দেওয়া হবে না, সেই সঙ্গে জাতীয় ঋণ তাদের হাতে হস্তান্তর করা হবে আর প্রত্যাভূতি হিসেবে কাসটম হাউস তাদের দিয়ে দেয়া হবে। জনগণ তাদের প্রতিবাদ জোরালোভাবে জানাতে দৃঢ়মনা হয়েছে।

সেই দিন রাত্রেই কোরালিওর সঙ্গে সঙ্গে অন্য শহরেও তাদের উষ্মার উদ্গীরণ হল, সঘোষ জনতা রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে প্লাজার মাঝখানে প্রেসিডেন্টের ব্রোঞ্জের মূর্তি নিরবয়ব পিণ্ডে পরিণত হল। প্রোজ্বল মুক্তিদাতার মহিমা কীর্তিত ফলকগুলি সরকারী প্রাসাদ থেকে টেনে এনে খান খান করল। সরকারী অফিসে তাঁর ছবি ছিড়ে ফেলল, সৈন্যরা সরকারের অনুগত থাকায়, জনতা কাসা মোরেন

আক্রমণ করে তাদের তাড়িয়ে দেয়।

পরদিন দ্বিপ্রহরের মধ্যেই আবার শহরে শান্তি ফিরে এল। লোমাদা আবার সর্বাধিনায়ক। তিনি ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে ইংল্যান্ডের সঙ্গে আলাপ, আলোচনার কথা দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করলেন। স্যার স্টাফোর্ড মহান, নামে গোলাপী গণ্ড-দেশ ইংরেজও তাঁর উপস্থিতির কোন আন্তর্জাতিক তাৎপর্য নেই বলে, প্রচার করলেন। তিনি ভ্রাম্যমাণ, অন্য কোন উদ্দেশ্য তাঁর নেই। এমনকি এখানে আমার পর থেকে তিনি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করেননি বলেও প্রচার করলেন।

এই গোলমালের মধ্যেই হোয়াইট দুই বা তিন দিন পরে ছাড়বে এমন এক স্টীমারে দেশে ফিরে যাবার তোড়জোড় করতে লাগল। কেওগ দুপুরে প্রশান্ত শহরে চঞ্চল মনে ক্যামেরা নিয়ে বার হল সময় কাটাতে।

অপরাধের মাঝামাঝি সময়ে কেওগ হন্তদন্ত হয়ে হোটেলে ফিরে ফোটো ডেভলপ করার ছোট এক কামরায় গিয়ে ঢুকল।

কিছুক্ষণ পরে উজ্জ্বল চোখে, গম্ভীর মুখে নিষ্ঠুর হাসি হাসতে হাসতে হোয়াইটের কাছে ব্যালকানিতে এসে একটা কার্ডবোর্ডে মাউন্ট করা চার বাই পাঁচ ফোটো দেখিয়ে বলল, এটা কি জানো?

সৈকতে শয়ান, সেনিওরিটার স্ন্যাপশট, অনুপ্রাস চেষ্টাকৃত নয়।

উজ্জ্বল চোখে কেওগ বলল, ঠিক হল না। এটা একটা গুলতি, ডাইনামাইট হতে পারে এটা। একটা সোনার খনি। এটা দেখিয়ে তোমার প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে বিশহাজার ডলার আদায় করব, আর ছবি নষ্ট হবে না। শিল্পকলার কোন নীতিবোধ আর বাধা দেবে না। আর্ট! তুমি আর তোমার দুর্গন্ধ যুক্ত টিউবগুলি। একবার দেখে নাও, একটি কোডাক দিয়ে আমি তোমার ছাল ছাড়িয়ে তোমাকে শেষে করব।

হোয়াইট ছবিটা হাতে নিয়েই চিৎকার করে উঠে বলল, জোভ, এটা একবার দেখলে শহরে লোকজন ক্ষেপে উঠবে। এটা তুমি কিভাবে পেলে, বিলি?

কেওগ তখন বলল, সারা শহরের একটা বার্ডস আই নেবার জন্যে প্রেসিডেন্টের বাগানের উঁচু পাঁচিলে উঠেছিলাম। দেয়ালের এক জায়গায় একটা পাথর আর খানিকটা প্লাস্টার খসে একটা ফাটল হয়েছে দেখতে পেয়ে ভাবলাম এই সুযোগে প্রেসিডেন্টের বাঁধাকফিগুলি কেমন বড়ো হচ্ছে একবার দেখি। দেখতে গিয়ে প্রথমে দেখলাম ইংরেজব্যক্তি ও তিনি প্রায় কুড়ি পুট দূরে একটি ছোট টেবিল বসে আছেন। হাতের কাছে ঘাসের ওপর এক বালতি শ্যামপেন রাখা রয়েছে। আমাকে তক্ষুণি আর্টের সবচেয়ে বড় আঘাতটি হানতে হবে দেখে গর্তের মধ্যে ক্যামেরাটি বসিয়ে বোতাম টিপে দিলাম। সেই সময়ে দুই বুড়ো ছবিতে দেখতে পাচ্ছ, চুক্তি সই হবার পরে করমর্দন করছে।

এরপর কেওগ কোট পরে, টুপি হাতে নিলে হোয়াইট বলল, তুমি ওটা নিয়ে কি করতে চাও?

গোলাপী বিরন বেঁধে হোয়াটনটের ওপর টাঙিয়ে রাখব। ক্যারি, আসায় অবাক হয়ে যাচ্ছি তোমার প্রশ্নে। আমি বাইরে থাকাকালীন সময়ে তুমি এটা ভেবে ঠিক করে রাখো যে ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্য কোন জিজ্ঞারকেক রাষ্ট্রপতি এটা কিনতে চাইতে পারে।

বিলি তালগাছের মাথায় সূর্যাস্তের লালিমা ছড়িয়ে পড়লে কাসা মোরেনা থেকে ফিরে এল। চিত্রশিল্পীর জিজ্ঞেসু দৃষ্টির উত্তরে মাথা নেড়ে দুই হাতের ওপর মাতা রেখে খাটে শুয়ে পড়ল। তারপর বলতে লাগল, আমি তোর সঙ্গে দেখা করলাম। একজন ছোট্ট ব্যক্তির মতো টাকাও সে দিল। প্রথমে অবশ্য আমাকে ভেতরে যেতে দেয় নি। প্রেসিডেন্ট ব্যক্তিটি সর্ববিদ্যা বিশারদদের দলে। মগজের ব্যবহারের বেশ ব্যবসায়িক ধারা আছে ওঁর। আমি জরুরী প্রয়োজনে বলে তাঁর সামনে গিয়ে তাঁর দেখার মতো করে ফোটাগ্রাফটি তুলে ধরে শুধু দামটা বললাম। আমি যেমন এক ডলার পঁচিশ সেন্টের বিল শোধ করি ঠিক সেইভাবে, উনি হেসে, কাছেই রাখা একটি সিন্দুক থেকে কুড়ি খানা আমেরিকান সেন্ট ট্রেজারির হাজার ডলারের নোট টেবিলে রাখলেন।

কৌতূহলী হোয়াইট বলল, দেখি একটা, ছুঁতে কেমন লাগে।

সঙ্গে সঙ্গে কেওগ বলে, আমি হাজার ডলার নোট কখনো ছুঁই নি। এবার কিছুটা অন্যমনস্ক ভাবে কেওগ বলল, ক্যারি, তুমি তোমার আর্ট খুব বড়ো করে দেখ না?

আমার ও আমার বন্ধুদের আর্থিক মঙ্গলের পরিপন্থী হয়েছে সেটা।

কেওগ শান্ত ভাবে বলে চলে, যেদিন আমি তোমাকে বোকা ভেবেছিলাম। যদিও তুমি বোকা কিনা আমি ঠিক জানি না তবুও তুমি বোকা হলে আমিও বোকা। আমার মজার মজার সমস্ত ব্যবসাতেই আমি সৎ থাকার চেষ্টা করেছি সব সময় তার প্রতিপক্ষের সঙ্গে সমান পাল্লায় আমার বুদ্ধি ও মূলধন রাখতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু যখন প্রতিপক্ষ কোণঠাসা হয়ে পড়ার পরও তুমি প্যাঁচ ঘুরিয়ে চলেছ আর তাকে টাকা বের করতেই হবে তখন সেটা পুরুষের খেলা থাকে না বলেই আমার মনে হয়। এর একটা নাম আছে, না? আমি কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছ না? আমি ফোটোগ্রাফটি ছিঁড়ে ফেললাম। তারপর টুকরোগুলো নোটের ওপর রেখে সমস্তটা তাঁর দিকে ঠেলে দিয়ে বললাম, মাপ করবেন মিঃ লোমাদা। দামের ব্যাপারে আমার একটু ভুল হয়েছে। ফোটোটা আপনি বিনামূল্যে পাচ্ছেন। এখন ক্যারি, পেনসিলটা নাও, আমাদের কিছু হিসেব করতে হবে। আমাদের বাকি মূলধন থেকে তোমাকে আরো কিছু বাঁচাতে হবে। আর যখন তুমি নিউইয়র্কে যাবে, তোমার বাসায়, আমার জন্যে দু-একটা সসেজ ভাজা রাখবে।

পনেরো

ডিকি

স্প্যানিশ মেন বরাবর পারস্পর্য বলে কিছু নেই। কোন ঘটনা সেখানে কখনো কখনো ঘটে। এমন কি অবসর সময়ে মহাকাল তার হাঁসুয়া কমলালেবু গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে কিঞ্চিৎ দিবানিদ্রা দেয় বা একটি সিগারেট কাজ করে।

প্রেসিডেন্ট লোসাদের বিরুদ্ধে নিস্ফল বিদ্রোহের পর দেশ আবার আগের মতই চলতে লাগল। সকল মতানৈক্য দূরে রেখে। রাজনৈতিক বৈরিরা কোরালিওতে হাতে হাত মিলিয়ে চলতে লাগল। কেওগ, শিল্প অভিযানের বিফলতায় থেমে না পড়ে হোয়াইটের স্টীমারের ধোঁয়া আকাশে মিলিয়ে যাবার পূর্বের, নীল পেনসিলের টুকরো নিয়ে আবার হিসেবে বসল। ডোডিকে একবার বলতেই ব্রানিগান এন্ড কোম্পানি তাকে বাকিতে যত খুশী মাল দিল। হোয়াইট যেদিন নিউইয়র্ক পৌঁছাল সেদিন কেওগ, দেশের ভিতরের দিকে দুর্গম পাহাড়ী রাস্তায়, পাঁচটি খচ্চরের পিঠে লোহালক্কর আর ছুরি কাঁচির বোঝা চাপিয়ে রওনা হল। সেখানে রেড ইনডিয়ান প্রজাতির লোকে সুবর্ণবাহী নদী থেকে বালু ধুয়ে স্বর্ণরেণু সংগ্রহ করে।

কোরালিওতে এখন মহাকাল ডানা মুড়ে নিদ্রাতুর রাস্তায় ক্লান্ত পদক্ষেপে চলেছে। তার উষ্ণ প্রহরগুলিতে যারা সবথেকে বেশী উল্লসিত হয়েছিল তারা সব চলে গেছে। ক্ল্যানসি একটি স্প্যানিস জাহাজ চড়ে কলমের দিকে যাত্রা করেছে। গৃহবাসী ডোডি, এখন তার উজ্জ্বল অর্কিড পলাকে নিয়ে খুশী। নীল করা বোতলটির কথা সে স্বপ্নেও ভাবে না বা চিন্তা করে না। তার রহস্য সমুদ্রের গর্ভেই নিরাপদে ন্যস্ত রয়েছে। অদ্ভুত দুষ্ট বুদ্ধি ও অতিথিপরায়ণ অ্যাটউড চলে গেছে। ডাঃ গ্রেগ, তাঁর অন্তরে ট্রিপ্যানিং-এর কাহিনী ধূমায়িত, তিনি ছিলেন একটি দাড়িওয়ালা আগ্নেয়গিরি সর্বদা উদ্‌গীরণের লক্ষণে আক্রান্ত, আলস্য বা ঝিমুনি অপনোদনে সাহায্য করার দলে অবশ্য তাঁকে ফেলা যায় না। নতুন কনসালের বটানির নোট লেখা সমুদ্রের ঢেউ-এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছিল, তার মধ্যে শেহরাজাদ বা গোল টেবিলের কোন সংস্রব ছিল না। বড় বড় প্রকল্প নিয়ে ব্যস্ত থাকার সময় বাদে বাকি সময়টা গুডউইন বাড়ীতে থাকতেই ভালবাসে। সেই কারণে কোরালিওতে বিদেশী বাসিন্দাদের মধ্যে সখ্যতা বা আনন্দ উপভোগের বিষয়ের ঘাটতি দেখা দিল।

ঠিক এই সময় শহরে এসে উপস্থিত হল ডিকি ম্যালোনি।

ডিকি ম্যালোনি কোথা থেকে কিভাবে কোরালিওতে এল তা জানা গেল না। একদিন হঠাৎই তাকে দেখা গেল। পরে সে বলল ফলের জাহাজ থর-এ করে সে কোরালিওতে এসেছে। কিন্তু থরের সেই দিনের যাত্রী তালিকায় তার নাম ছিল না। তার আসার সম্বন্ধে কৌতূহল বেশী দিন রইল না আর ডিকি ক্যারিবিয়ান থেকে উৎক্ষিপ্ত কোন অজানা জীব হিসেবে তার জায়গা করে নিল। তার মতো অত্যন্ত কর্মঠ, বেপরোয়া হাসিখুশিতে ভরা যুবক, ধূসর আকর্ষণীয় চোখ, ভুবন ভোলান হাসি, কালো রোদে পোড়া গায়ের রঙ, মাথায় টকটকে লাল তুলা ইতিপূর্বে এই অঞ্চলে দেখা যায় নি। ডিকি অনর্গল স্প্যানিশ ও ইংরেজি ভাষায় কথা বলতে পারে আর পকেটে সবসময় প্রচুর টাকা অল্প দিনের মধ্যেই

সে একজন আকাঙ্ক্ষিত সঙ্গী হয়ে উঠল। ভিনো ব্ল্যাংকোর প্রতি তার প্রগাঢ় মোহ এবং শ্রীঘ্রই বেশী মদ খেতে পারা তিনজন যুবকের একজন হিসেবে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। তার লাল চুল আর সহজ আন্তরিক ব্যবহার স্থানীয় লোকেদের কাছে অত্যন্ত আনন্দের আর অনুকরণীয় স্টাইল রূপে গণ্য হল।

ডিকি একটি তামাক, মিষ্টান্ন, রেডইনডিয়ানদের হস্ত শিল্প সামগ্রী-র দোকান খুলে তার আসাও অবস্থানের বিষয়ে সৃষ্টি হওয়া সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটাল। যদিও এর ফলে তার তাস খেলা বা মদ্য পানের অভ্যাসের কোন পরিবর্তন হল না। দিবারাত্রির প্রায় অর্ধেক সময়ই তার এসবে ব্যয় হত। একদিন ডিকি, হোটেল দে লোম এসত্রনজারস-এর পাশেই দরজার ভিতরে। মাদামা ওরতিজের কন্যা পাসাকে, বসে থাকতে দেখল। কোরালিওতে আসর পর এই প্রথম সে পথ চলতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর হরিণের মতো ছুটে দেশীয় যুবক ভাসকুইথকে খুঁজে নিয়ে এল নিজেকে পরিচয় করে দেবার জন্য।

মাদামা ওরতিজ অন্য পানীয় বেচার অপরাধ স্খালন করতে রাম বেচতেন। রাম সরকারী উদ্যোগে উৎপাদিত হওয়ায় এবং একটি সরকারী বিতরণ কেন্দ্রের মালিক হওয়ার অর্থ হল সম্মান প্রতিপত্তি, বিশিষ্টতা যদি নাও হয়। তাছাড়া মাদামা দোকানটি পরিচালনাতেও কোন খুঁত রাখেন না। খদ্দেররা ভয়ে ভয়ে সেখানে পান করত। মাদামার সুপ্রাচীন ও বিখ্যাত বংশেগৌরবের জন্য রাম পান করেও কেউ হুল্লোড় করার সাহস পায় না। মাদামা ছিলেন ইগনেশিয়ান-এর বংশোদ্ভব এবং পিৎসারের সঙ্গে তিনি এই দেশে এসেছিলেন। আর তাঁর লোকান্তরিত স্বামী ছিলেন সড়ক ও সেতু বিভাগের কমিশনার।

সন্ধ্যায় পাশে জানলার বসে গীটারের তার আঙুল ছোঁয়ায় পাশের ঘরে জোড়ায় জোড়ায় ন তিনজনের দলে যুবক সেনারা এসে, দেয়ালের ধারে ফিটফাট সাজানো চেয়ারে বসে। ওরা লা সানতিতার হৃদয় হরণের জন্য ওখানে বসে। তাদের পদ্ধতি হল, বুক ফোলানো, মুখে সাহসিকতার ভাব ফুটিয়ে তোলা, এক থেকে দুগ্রোশ সিগারেট টানা। কিন্তু তার গিটারের সঙ্গীত নিকোটিনের পাথরের দেয়ালের মতো নীরবতা ভঙ্গ করতে করতে নিজের মনে ভাবত কাহিনীতে পড়া ধীর ও ঘনিষ্ঠ অশ্বারোহীদের কথা কি তবে ঠিক নয়।

চোখে আলোর ইশারা ফুটিয়ে, নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে মাদামা আসেন। আর সঙ্গে সঙ্গে এক একজন করে সৈন্য যুবক মাঞ্জা দেওয়া ট্রাউজারের খসখস-শব্দে করে বারে উঠে যায়।

ডিক ম্যালোনি শীঘ্রই এই প্রান্তরে এসে উপক্ষিতে হল এবং প্রথম দর্শনের অবিশ্বাস্য কম সময়ে পাশার দোলনার পাশে সে বসতে শুরু করল। ডিকির অভিধানে দেয়ালে পিঠ দিয়ে লড়াই করার কোন জায়গা ছিল না। তার নিয়ম ছিল, দুর্গ জয়ের জন্য একটি মাত্র প্রবল, গভীর আন্তরিক, উন্মুখর, অপ্রতিরোধ্য এসকালাদ বা তুঙ্গ যাত্রা।

পাশা দেশের সর্বাধিক গর্বিত স্প্যানিস বংশ জন্মগ্রহণ করেছিল। এছাড়া নিউ অর্লিয়েন্সের একটি স্কুলে দুবছর পড়ার ফলে ওর উচ্চাশা দেশীয় অন্যান্য কুমারী মেয়েদের থেকে ভিন্নতর ভাগ্যের আশা করে। কিন্তু লাল মাথা ছোকরা মধুর ধুলি আর মোহন হাসি দিয়ে প্রেম নিবেদন করে তাকে কাবু করে ফেলল।

ডিকির সঙ্গে শীঘ্রই প্লাজার এক কোনে অবস্থিত ছোট্ট একটি চার্চে গিয়ে সে তার অনেকগুলি বিশিষ্ট নামের সঙ্গে মিসেস মালোনি নামটিও যুক্ত করল। এবং স্থির চোখ আর মৃন্ময়ী মহামায়ার মূর্তি নিয়ে ভাগ্যের চালনায় ছোট্ট দোকানের কাউন্টারে বসতে লাগল। আর ডিকি মদ্যপান ও বাচাল বন্ধুদের সঙ্গ নিয়ে মত্ত। স্ত্রীলোকের তাদের স্বভাব সিদ্ধ অনুসন্ধান নিয়ে এবার ওকে ডিকির স্বভাবের ব্যাপারে সূক্ষ্মভাবে বিদ্রূপ করা শুরু করল।

তাদের কথায় পাশা বলে, তোরা মাংসের উপযুক্ত গাই গরু। তোরা মানুষ চিনতে জানিস? তোদের মেনি মুখো পুরুষেরা তো রোদ উঠে গা পুড়িয়ে না দেওয়া পর্যন্ত ছায়ায় বসে শুধু সিগারেট টানতেই পারে। তোদের দোলনায় তারা শুয়ে থাকে আর তোরা তাদের সেবা করিস। আমার মরদের গায়ে তেমন রক্ত নেই। সে মদ খায়, তো হয়েছে কি? তোদের পেটরোগা মরদের ডুবে যাবে এমন মদ খেয়ে বাড়ী ফিরেও তোদের হাজারটা জোরেসিটোসদের থেকে অনেকগুণ মরদ হিসেবে সে আমার কাছে আসে। আমার কেশ সমান করে দিয়ে, আমাকে গান শোনায়। নিজের হাতে জুতো খুলে দিয়ে প্রত্যেক পায়ে একটি করে চুম্বন করে। সে আমাকে তুলে ধরে, ওঃ! তোরা সেসব বুঝবিই না। তোরা তো অন্ধ পুরুষ কাকে বলে তোরা কি করে জানবি।

মাঝে মাঝে রাতের অন্ধকারে ডিকির দোকানের পিছনের ছোট্ট কামরায় ডিকি আর, কালো পোশাক ও টুপি পরা, চক্রান্তকারীদের মতো আকৃতির, বন্ধুরা গভীর রাত্রি পর্যন্ত কি সব গভীর আলোচনা করে। অনেক পরে আলোচনা শেষ সামনের দরজা খুলে সাবধানে তাদের বিদায় দিয়ে উপরতলায় দেবীর কাছে আসে। কিছু দিনের মধ্যেই ব্যাপারটা নিয়ে জল্পনা কল্পনা শুরু হয়ে যায়।

ডিকি শহরের বাসিন্দাদের সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করেনি। গুডউইনকে সে এড়িয়ে চলত আর যে তড়িৎ-গতি কূটনীতির সাহায্যে ডাঃ গ্রেগ-এর ট্রিপানিং-এর গল্প থেকে রেহাই পেয়েছিল তার কথা লোকে গল্প করে।

ডিকি ম্যালোনি বা সোনিওর ডিকি ম্যালোনি নামে অনেক চিঠিপত্র আসে। ফলে আমার গর্ব বাড়ে। তার লাল মাথা থেকে বিশ্বময় আলো ছড়িয়ে ছিল বলেই না এত চিঠি আসে তার নামে। যদিও ওইসব চিঠিতে কি বিষয় থাকে তা পাশা জানে না।

এদিকে হঠাৎই বড় অসময়ে ডিকির টাকা ফুরিয়ে গেল। দোকানে বিক্রি প্রায় কিছুই হত না। এদিকে তার ছোট্ট দেবী মূর্তিকে দোকানে বসে থাকতে দেখে কমানডান্ট ডন সেনিওর এল করোনেল এনকার সেসিওন রিওর চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটল। আর এরকম একটি অদ্ভুত খারাপ সময়েই টাকা আসার অজানা উৎস শুকিয়ে গেল।

কমানডান্ট শৌর্য-বীর্য করার জটিল কায়দাগুলি ভালমত রপ্ত করেছিলেন। মনের ভাব প্রকাশ করতে প্রথম পূর্ণ সামরিক পোশাকে জানলার সামনে দিয়ে গটমট করে যাওয়া আসা করতে শুরু করেন। পাসা তা দেখে তার পোষা টিয়া পাখির কথা মনে পড়ায় হেসে ফেলে। হাসিটি তার জন্য না হলেও কমানডান্ট যেটা দেখতে পান। আশানুরূপ ধারণার সৃষ্টি করা হয়েছে ভেবে তিনি দোকানে ঢুকে আস্থার সঙ্গে খোলাখুলি স্তুতিগান শুরু করলেন। পাসা যত কঠিন হয় সে ততো পেখম মেলে, পাসা রেগে আগুন হলে সে অবিবেচকের মতো জোর করে। পাশা দোকান থেকে বেরিয়ে যেতে বললে যে হাত ধরে টানতে যায়। এই সময় শরীরে দৈত্যের শক্তি, মুখে হাসি আর পেট ভর্তি সাদা মদ নিয়ে ডিকি দোকানে ঢোকে।

যন্ত্রণা যতটা সম্ভব দীর্ঘস্থায়ী হয় সেদিকে লক্ষ্য করে। বৈজ্ঞানিক প্রথায়, পাঁচমিনিট ধরে কমানডান্টকে সে শাস্তি দিল। তারপর অজ্ঞান অবস্থায় পাথরের ওপর তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

একজন খালিপায়ের পুলিশ দূর থেকে ব্যাপারটা দেখে হুইসিল বাজালে ব্যারাক থেকে চারজন সৈন্য ছুটে এল। তারা কাছে এসে অপরাধী ডিকিকে দেখে আবার হুইসিল বাজালে আরো আটজন এসে হাজির হয়। এবার নিরাপত্তাকারীর পক্ষে বিবেচনা করে তারা ডিকির দিকে অগ্রসর হয়।

যোদ্ধভাবে মত্ত ডিকি কমানডান্টের কোমর থেকে তরবারি উঠিয়ে নিয়ে আক্রমণ করল। তারপর খেলাচ্ছলে তাদের পিছনে তরবারির খোঁচা দিয়ে আর গোড়ালির ওপর কাটাকুটি করে। সে সেনাদলকে চারটি ব্লক পর্যন্ত তাড়া করে নিয়ে গেল। কিন্তু ছয়জন পেশীবহুল তৎপর পুলিশ তাকে পরাস্ত করে সোল্লাসে কিন্তু সাবধানতার সঙ্গে কারাগারে নিয়ে গেল।

কারাগারে সূর্যাস্তের সময়ে এই চত্বরের মাঝামাঝি একটা পথ দিয়ে আসে স্ত্রীলোকদের একটি বিষণ্ণ মিছিল। ফাটকের ভিতরে এক এক হতভাগ্য যাদের প্রতি সেই সব স্ত্রী লোকদের আনুগত্য রয়েছে তাদের জন্য করুণ মুখে তারা কলা, শকরকন্দ, রুটি আর ফল প্রভৃতি খাবার বয়ে আনে। দিনে দুবার, সকালে ও বিকেলে তাদের আসতে দেওয়া হয়। এই গণরাজ্য তার অনিবার্য অতিথিদের জল দেয়, খাবার নয়।

সেইদিন সন্ধ্যায় প্রহরী ডিকির নাম ধরে ডাকলে সে দরজার সামনে এসে দাঁড়ায় দেখে তার ছোট্ট দেবী দাঁড়িয়ে রয়েছে কালো একটি স্কার্ফ মাথায় ও কাঁধে বেড় দিয়ে জড়িয়ে। মুখে মহিমাদীপ্ত বিষাদ, দুটি চোখের দৃষ্টিতে বাসনা। ও একটা মুরগী, দু'একটা কমলা, মিষ্টান্ন এবং সাদা ময়দার রুটি এনেছে। খাদ্যটা পরীক্ষা করে দেখে একজন সৈনিক সেটা ডিকির কাছে পৌঁছে দিল।

পাশা তার স্বভাব মতো শান্তগলায় বলল, জীবনদেবতা আমার, তোমাকে ছেড়ে বেশীদিন যেন আমাকে থাকতে না হয়। তুমি ছাড়া আমার জীবন দুর্বিবহ। আমাকে বলো এই ব্যাপারে আমার কি করণীয়। না হলে কিছু সময় আমাকে অপেক্ষা করতেই হবে। আমি যাই, কাল সকালে আবার আসব।

অন্য কয়েদীরা যাতে বিরক্ত না হয় তার জন্য খালি পায়ে ডিকি জেলের মেঝের ওপর অর্ধেক রাত

পায়চারী করে কাটাল। নিজেকে অর্থের অভাবকে ও যে কারণে সেই অভাব তাকে ধিক্কার দিল। সে জানে তার হাতে টাকা থাকলে এক্ষুণি মুক্তি পাবে।

এরপরের দুদিন পাসা একই সময়ে এসে খাবার দিলে প্রতিবারই ডিকি তার নামে কোন চিঠি, প্যাকেট ইত্যাদি এসেছে কিনা জানতে চেয়ে প্রতিবারই না শোনে।

তৃতীয়দিন সকালে পাসা পূর্বের মতোই শান্ত ভাবে শুধুমাত্র একটি রুটি নিয়ে এল। তার চোখের নীচে বৃত্তাকার কালো দাগ।

ডিকি তা দেখে বলল, এই শুকনো খাবার। একজন জোয়ান লোকের জন্য তুমি এইটুকু খাবার নিয়ে এলে কি করে?

পাসা ডিকির দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বলল, ওইটা ভালো মনে খেয়ে নাও। এরপরে নিয়ে আসার মতো আর কিছুই নেই। শেষ সেনটাভো পর্যন্ত খরচ হয়ে গেছে।

পাসা গারদের শিকে নিজেকে ডিকির দিকে আরো চেপে দাঁড়িয়ে থাকলে ডিকি অস্থির গলায় বলল, যে কোন দামে দোকানের জিনিসগুলো বেচে দাও।

পাসা বলল, সে চেষ্টাও আমি করেছি। কেনা দামের দশভাগের একভাগ দামে দিতে চেয়েছি কিন্তু কেউ এক পেসোও দেবে না। এই শহরে ডিকি ম্যালোনির জন্য এক রেয়ালও কেউ দেবে না।

দাঁত কড়মড় করে ডিকি বলে উঠল, এর জন্য সেই কমানডান্ট দায়ী। হাতের সব তাস দেখা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।

প্রায় ফিসফিস করে পাশা এবার বলল, শোন আমার হৃদয়ের হৃদয়। তিন দিন হলে, আমি খুব সাহস করে থাকলেও তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারছি না।

ডিকি দেখতে পেল ওড়নার আড়ালে ওর চোখের দৃষ্টি ইস্পাতের ফলার মতো ঝিলিক দিচ্ছে। পাসার সুখের দিকে তাকিয়ে সে দেখল মুখে হাসি নেই, গম্ভীর, কঠোর, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এই সময়ে ধরাগলায় সাইরেনের ধ্বনি মারফত বন্দরে একটি স্টীমারের আগমন ঘোষণা হলে সে হাত তুলল আর তার মুখে সূর্যালোকের মতো হাসি ফিরে এল।

ডিকি দরজার বাইরে পায়চারী করা প্রহরীকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, কোন স্টীমার এলো?

দি ক্যাটারিনা।

ভিসুভিয়াস লাইনের?

নিঃসন্দেহে ওই লাইনের।

এবার আনন্দিত মনে সে পাশাকে বলল, ছবি আমার, একবার আমেরিকার কনসালের কাছে যাও। তাকে বলো আমি একবার তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই। এখনি যেন আসে। আর আমার দিকে দেখো। আমি তোমার চোখে এরকম দৃষ্টি দেখতে চাই না। আমি তোমার চোখে এরকম দৃষ্টি দেখতে চাই না। আমি কথা দিচ্ছি। তোমার মাথাটি আজ রাতে আমার বাহুর মধ্যে বিশ্রাম করবে।

কনসাল হাতের নীচে সবুজ ছাতা নিয়ে অধৈর্য ভাবে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে ঘণ্টাখানেক পরে এসে হাজির হল।

একটু সময় চুপ করে দম নিয়ে কনসাল রাগতস্বরে বলল, দেখ ম্যালোনি, তোমরা তোমাদের খুশী মতো ঝগড়া করবে আর তারপর আশা করবে আমি তোমাদের ছাড়িয়ে নিয়ে যাব। আমি যুদ্ধ বিভাগ বা সোনার খনি দুটোর কোনটাই নই। তুমি জানো নিশ্চয়ই যে সেনাবাহিনীকে মেরে অজ্ঞান করে দেবার বিরুদ্ধে এদেশে আইন কানুন আছে। সর্বদা গোলমাল বাঁধানো আইরিশদের স্বভাব। আমি কি করতে পারব তা জানিনা কিন্তু আর একটু স্বাচ্ছন্দ্য বা তামাক বা খবরের কাগজ চাও...

ডিকি গম্ভীর ভাবে বাধা দিয়ে বলল, এলির পুত্র। তুমি দেখছি একইরকম রয়ে গিয়েছ। কোয়েনের গাধা আর রাজহংসেরা চ্যাপেলের ছাদে উঠলে আর অপরাধীরা তোমার ঘরে লুকোতে চাইলে তুমি প্রায় একই রকম বক্তৃতা দিয়ে ছিলে।

কনসাল তাড়াতাড়ি চশমা ঠিক করে নিয়ে চিৎকার করে বলল, তুমি ইয়েলের ছেলে নাকি? কি আশ্চর্য, সেই দলে তুমি ছিলে? লাল ম্যালোনি নামের কারুর কথা তো আমার মনে পড়ছে না। কলেজের কত ছেলেই অবশ্য ভেসে বেড়াচ্ছে। যাকগে, ম্যালোনি আমি ডিপার্টমেন্ট লিখব। এরমধ্যে আমার যদি তামাক খবরের...

তুমি শুধু ক্যাটারিনার ক্যাপ্টেনকে গিয়ে বলো ডিকি ম্যালোনি তার সঙ্গে দেখা করতে চায়। যতশীঘ্র সম্ভব সে যেন আসে। আমি কোথায় আছি তাকে বোলো। একটু তাড়াতাড়ি। শুধু এইটুকু। আর কিছু তোমায় করতে হবে না।

সহজে ছাড়া পেয়ে খুশী মনে কনসাল ফিরে যায়।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই, জেলের প্রহরীদের হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে, মোটা সোটা, সিসিলির লোক, ক্যাটারিনার ক্যাপ্টেন দেখা দিল।

ক্যাপ্টেন বলল, এটা ঘটতে দেখে, আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আমি আপনার সেবায় রইলাম, মিঃ ম্যালোনি। আপনি যা চাইবেন তাই করা হবে যা আপনার দরকার সঙ্গে সঙ্গে আনা হবে।

ডিকি গম্ভীর ভাবে তার দিকে তাকিয়ে বলল, ক্যাপ্টেন দ্য লুকো, আমার বিশ্বাস আপনাদের কোম্পানীর হাতে আমার টাকা এখনো অনেক আছে। প্রচুর এবং আমার ব্যক্তিগত অর্থ। গত সপ্তাহে আমি কিছু টাকা চেয়ে পাঠালেও তা আসে নি। আপনি জানেন এই খেলায় শুধু টাকার প্রয়োজন। সে টাকা আসে নি কেন?

ক্যাপ্টেন লুচ্চো বলল, ক্রিসটাবল জাহাজে সে টাকা পাঠান হয়েছিল। কিন্তু সেটা কেপ আনটোনিওতে একটা শ্যাফট্ ভেঙ্গে পড়ে আছে। একটা ভবঘুরে জাহাজ তাকে নিউঅর্লিয়েন্সে যখন-এ টেনে নিয়ে যাচ্ছে। দেরী হলে আপনার অসুবিধা হবে ভেবে, আমি তীরে টাকা এনেছি। এই লেপাফায় হাজার ডলার আছে। দরকার হলে আরো আছে, মিঃ ম্যালোনি।

নরম সুরে এবার ডিকি বলল, বর্তমানে এতেই হবে।

খামটার এক কোণ ছিঁড়ে ভিজে ভিজে নোটগুলি অনুভব করে মৃদুস্বরে সে এবার বলল, লম্বা সবুজ। টাকায় কি না পাওয়া যায়, বলুন ক্যাপ্টেন।

এবার দ্য লুচ্চো বলল, আমার তিনজন বন্ধু ছিল, যাদের টাকা ছিল। একজন শেয়ার মার্কেটে সে টাকা লাগিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা কামায় আর একজন স্বর্গে গেছে আর তৃতীয়জন ভালবেসে একটি গরীব মেয়েকে বিবাহ করেছে।

ডিকি বলল, উত্তরটা তাহলে, ঈশ্বর, ওয়ালস্ট্রীট এবং অতনুর হাতে, তাই প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে।

অর্থপূর্ণ ভাবে ডিকির পারিপার্শ্বিকের দিকে চোখ বুলিয়ে ক্যাপ্টেন বলল, এটা কি আপনার ছোট দোকানের ব্যবসার সঙ্গে কোন ভাবে যুক্ত? আপনার প্ল্যান ঠিক আছে তো?

না, না, এটা আমার একটা একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। একটু ব্যবসার সিধে রাস্তার বাইরে বিচরণ, কথায় আছে সম্পূর্ণ জীবন পেতে হলে মানুষকে দারিদ্র্য, প্রেম ও যুদ্ধ সম্বন্ধে জানতে হবে। কিন্তু ক্যাপটেন আমার, তিনটি একত্রে কখনোই মেলে না। ছোট্ট দোকানটি ভালই চলছে।

এরপর ক্যাপ্টেন চলে গেলে ডিকি জেলের সারজেন্টকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, আমি মিলিটারী না পুলিশ কাদের বন্দী?

সেনিওর, এখন তো কোন সামরিক আইন কার্য কর নেই।

ডিকি বলল, বিউয়েনো, জেলের, জস্টিস অফ দ পীস আর চীফ অফ পুলিশ কে গিয়ে বলো আমি আইন মতো ফাইন দিতে প্রস্তুত।

এবার ডিকি একটি লম্বা সবুজ নোট সারজেন্টের হাতে গুঁজে দিল।

এবার, তার বন্দী দশা আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার জেনে, ডিকির মুখে হাসি দেখা দিল। প্রহরীর পায়ের আওয়াজের তালে গুনগুন করে গাইতে লাগল।

ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দেয় নর নরী,
সবুজ ঘাসের আসন পাবার তরে...

সেইরাত্রে ঘরে জানালার ধারে ডিকির কাছে বসে তার ছোট্ট দেবী সিলকের সূক্ষ্ম একটা সেলাই এর কাজ করছে। ডিকি গম্ভীর, চিন্তামগ্ন। তার লাল চুল গুলি এলোমেলো। ডিকি তার মাথার কখনো হাত দিতে দিত না, নাহলে পাশার আঙুলগুলি নিসপিস করছিল চুলগুলি সমান করে দেবার জন্য।

ডিকি কতকগুলি ম্যাপ, কাগজের তাড়া, বই পত্তরের ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখতে দেখতে তার দুই ভ্রূর মাঝখানে একটা রেখা পড়েছে দেখে, পাশার কষ্ট হল। পাখা ডিকির টুপি দিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়ালে ডিকি সপ্রসন্ন দৃষ্টিতে মুখ তুলে দেখল।

এবার পাশা বলল, তোমার এখানে কষ্ট হচ্ছে। বাইরে গিয়ে ভিনো ব্লাঙ্কো খেয়ে এসো। তারপর তোমার হাসি মুখ নিয়ে আমার কাছে ফিরে এসো। তোমার এরকম মুখ দেখলে আমার ভাল লাগে না।

ডিকি হেসে, কাগজ পত্র ছেড়ে উঠে পড়ে বলল, এক সময় সেটা কাজে লাগলেও, ভিনো ব্লাঙ্কের পর্ব শেষ হয়েছে। লোকের বলার থেকে অনেক কম আমার মুখে ঢুকত আর অনেক বেশী আমার কানে। তোমাকে কথা দিচ্ছি, আজ রাত্রে আর ম্যাপও নয় গোমড়া মুখও নয়। এসো।

ওরা জানলার ধারে নীচু আসনে বসে কাটারিনা জাহাজ থেকে বন্দরে প্রতিফলিত আলোর রশ্মি দেখতে থাকে।

শীঘ্রই তরঙ্গিত হল পাখির কাকলির মতো হাসি, পাশা খুব কমই উঁচ্চ কণ্ঠে হাসত।

ডিকি কিছু বলার আগেই পাশা বলতে শুরু করল, মেয়েদের মনে আজগুবি কত কিছুই যে আসে আমি তাই ভাবছিলাম। আমি আমেরিকার স্কুলে যাওয়ায় আমার মনে অনেক উচ্চাশার উদ্ভব হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট ছাড়া আর কাউকে বিবাহ করব না এমন চিন্তা করতাম। আর দেখ, লাল দস্যু, আমাকে কোন অজ্ঞাত ভবিতব্যতায় চুরি করে এনেছ।

ডিকি হেসে বলল, আশা ছেড়োনা, কারণ সাউথ আমেরিকার রাষ্ট্রে একাধিক আইরিশম্যান প্রেসিডেন্ট হয়েছে। ও হিগিনস নামে একজন একনায়ক ছিল চিলিতে। আনুচুরিয়াতে কেন প্রেসিডেন্ট ম্যালোনি হবে না।

ডিকির বাহুতে মাথা রেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাশা বলল, না, না ওগো আমার লাল চুলের দামাল মানুষ। এখানেই আমি সুখী।

ষোল

রুজ এ নোয়া।
লাল ও কালো।

লোমাদা প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হবার পর একবার অসন্তোষ দেখা দিলেও সেই অসন্তোষ অল্পকয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মিটে যায়। শান্তি ফিরে আসে। এই অসন্তোষের মনোভাব আবার বাড়তে শুরু করল। সমস্ত প্রজাতন্ত্রেই একটা নীরব অসন্তোষ দেখা যেতে লাগল। গুডউইন, জাভাল্লা ও অন্যান দেশপ্রেমিকদের সমর্থিত পুরোন লিবারেল পার্টি ও নিরাশ। লোমাদা নিজের ভাবমূর্তি জনপ্রিয় করতে পারে নি। তাছাড়া নতুন কর, আমদানী শুল্ক আর সেই সঙ্গে সেনাদলের অকথ্য পীড়নে বাধা না দেওয়ায় জনগণের কাছে লোমাদা ঘৃণ্য আলফোরাণের বহু সর্বাধিক নিন্দিত প্রেসিডেন্ট রূপে খ্যাত হন। তার মন্ত্রীসভার বহু সদস্যেরই তার প্রতি সহানুভূতি নেই। সে তার প্রধান এবং পর্যাপ্ত ভরসা সৈন্যদলকে জনগণের ওপর অত্যাচার করতে প্রশ্রয় দেয়। কিন্তু ভিসুভিয়াস ফল কোম্পানীর সঙ্গে বৈরিতা শুরু করে তারা সরকারী নীতির সবচেয়ে হঠকারী ভুলটি করল। এই কোম্পানীর বারোটি স্টীমার আছে। আঞ্চুরিয়ার সম্পদ ও ঋণের যোগফলের থেকে বেশী অর্থ এই কোম্পানীর নগদ ও মূলধনে আছে।

সেই কারণেই আঞ্চুরিয়ার মতো একটি ছোট্টরাষ্ট্র তাকে চাপ দিলে ভিসুভিয়াসের মতো লব্ধ প্রতিষ্ঠিত কোম্পানী বিরক্ত হল। তাই সরকারী প্রকসিরা ভরতুকীয় আবেদন করে একটি ভদ্র অস্বীকৃতি পেল। প্রেসিডেন্ট প্রতিশোধ নিতে প্রতি কলার কাঁদির ওপর এক বেয়াস রপ্তানী শুল্ক চাপিয়ে দিলেন। আঞ্চুরিয়ার উপকূল বরাবর এই কোম্পানী প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করে জেটি ও ফলের বাগিচা তৈরী করেছে। শহরে অনেক সুন্দর বাড়ি তৈরী করে তাদের কার্যালয় করেছে এবং এতদিন সরকারের সঙ্গে সদিচ্ছার ভাবনা ও দুপক্ষের সুবিধার ভিত্তিতে কারবার চালাচ্ছে। এই সময় তাদের চলে যেতে হলে প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হবে। ভেরাক্রুজ থেকে ত্রিনিদাদ পর্যন্ত এক কাঁদি কলার মূল্য তিন বেয়াল। এই নতুন চাপানো শুল্কের ফলে আঞ্চুরিয়ার ফল উৎপাদকেরা নিঃস্ব হয়ে পড়বে আর এই শুল্ক দিতে রাজী না হলে ভিসুভিয়াস কোম্পানী অত্যন্ত অসুবিধার সম্মুখীন হবে। উৎপাদকদের লোকসান হতে না দিয়ে ভিসুভিয়াস কেনো এক অজ্ঞাত কারণে চার বেয়াল দিতেই ফল কিনতে লাগল।

এদিকে এই আপাত জয়ের ফলে মহামহিম প্রতারিত হলেন। আরো খাবার জন্য তাঁর ক্ষুধা বাড়তে লাগল। ফল কোম্পানীর প্রতিনিধির সঙ্গে একটি বৈঠকে মিলিত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করে তিনি একজন

দূত পাঠালেন। ভিসুভিয়াস, একজন ছোটখাটো মোটামোটা, সর্বদা হাসি খুশি, ঠাণ্ডা মাথায়, মিঃ ফ্রানৎসনিকে পাঠায়। এসিকে আঞ্চুরিয়ার তরফে বালির বস্তা সাজাবার দায়িত্ব পড়ল অর্থ মন্ত্রকের সোনিওর এস. পিরিও সন-এর ওপর। ফলের কোম্পানীর জাহাজ সালভাদরের ক্যাবিনে বৈঠক বসল।

সেনিওর এসপিরিওন আলোচনা শুরু করতে গিয়ে বললেন, সরকার পলিমাটির উপকূল বরাবর একটি রেললাইন তৈরী করার পরিকল্পনা করেছেন। এবার ভিসুভিয়াসের স্বার্থের পক্ষে এই রেলপথ কতটা উপযোগী হবে ব্যাখ্যা করার পর বললেন, এই রেলপথ তৈরী হলে কোম্পানী যতগুলি সুবিধা লাভ করবে তার বদলে পঞ্চাশ হাজার পেসোর অনুদার খুব একটা বেশী হবে না।

এসপিরিওনের প্রস্তাবে মিঃ ফ্রানৎসনি বললেন, প্রস্তাবিত এই রেলপথ থেকে আমার কোম্পানী বিশেষ কিছুই উপকৃত হবে না। সেই কারণে কোম্পানীর তরফ থেকে আমার কর্তব্য স্বরূপ পঞ্চাশ হাজার পেসো দানের ব্যাপারে অক্ষমতা জানাচ্ছি। তবে যেটুকু সুবিধা পাওয়া যাবে তার জন্য আমি পঁচিশের দায়িত্ব নিতে পারি।

সোনিওর এসপিরিতিওন বললেন, সেনিওর আপনি পঁচিশ হাজার পেসোর কথা বলছেন।

কোন ভাবেই নয়, পঁচিশ পেসো তাও সোনায় নয়, রুপোয়।

সেনিওর এসপিরিতিগুন রাগে চেয়ার ছেড়ে উঠে চিৎকার করে বললেন, আপনার প্রস্তাব আমার সরকারের পক্ষে অপমানজনক।

উষ্মার সঙ্গে মিঃ ফ্রানৎসনি বললেন, তাহলে সেটা আমরা বদলাবো।

এই রকম অবস্থায়, লোসাদার শাসনকালের দ্বিতীয় বছরে, কোরালিওতে শীতের মরসুম শুরু হল। সেই সময় সরকারী দপ্তর ও গণ্যমান্য সমাজের সমুদ্রতীরের দিকে বার্ষিক নিষ্ক্রমণ শুরু দেখে অনুমান করা গেল প্রেসিডেন্টের আগমন তেমন অসীম উদ্দীপনার সঙ্গে উদ্যাপিত হবে না। ঠিক হল দশই নভেম্বর রাজধানী থেকে ফুর্তির দলবল কোরালিওতে পদার্পণ করবে। সলিটাস থেকে একটি ছোট রেলের রাস্তা কুড়ি মাইল ভিতরে গিয়েছে। সান মাটেও থেকে দলটি ঘোড়ার গাড়ীতে এই রেলপথের শেষ স্টেশনে এসে সেখানের থেকে ট্রেনে সলিটাস পৌঁছে পদব্রজে কোরালিওতে আসে। অন্যান্য বছর কোরালিওতে তাদের আগমনের দিনটি উৎসবে অনুষ্ঠানে পূর্ণ থাকলেও এবার দিনের আলো ফুটল দুর্লক্ষণ নিয়ে। বর্ষা অনেকদিন শেষ হয়ে গেলেও, নভেম্বরের দশ তারিখ বাষ্পাচ্ছন্ন জুন মাসের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। সকাল থেকে টিপটিপিয়ে বৃষ্টি হচ্ছে। অদ্ভুত নীরবতার মধ্যে দলটি কোরালিওতে ঢুকলো।

প্রেসিডেন্ট লোসাদা বৃদ্ধ, ধূসর দাড়ি, তাঁর দারুচিনির মতো গায়ের রঙে যথেষ্ট পরিমাণ রেডইনডিয়ান রক্তের ইশারা পাওয়া যায়। তাঁর গাড়িকে মিছিলের পুরোভাগে রেখে, চারিদিকে ঘিরে ক্যাপ্টেন ক্রুজ ও বিখ্যাত অশ্বারোহীর দল এল। কর্নেল রকাস পিছনে এক রেজিমেন্ট নিয়মিত সৈন্য নিয়ে।

জন্মসূত্রে হুজুগ ও জাঁকজমকের ভক্ত আঞ্চুরিয়ানরা সবাই রাস্তায় বার হলেও। সকলেই নির্বাক উদাসীন। তারা বজায় রেখেছে নির্বাক অভিযোগ। তারা গাড়ির চাকার দাগ পর্যন্ত রাস্তায় ভিড় করে দাড়িয়ে রয়েছে।

প্রতিটি ছাদের কার্নিশ পর্যন্ত তারা ঝুলে পড়লেও। তাদের থেকে একটি ভিভা আওয়াজও শোনা যাচ্ছে না। প্রথামত বর্ণাঢ্য কাগজের গোলাপ গুচ্ছ ঝোলায় নি, পাতার মালা তৈরী করে নি।

সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ছিল এক প্রকার ঔদাস্য, অনুজ্জ্বল মতবিরোধ জনিত আপত্তি যা ছিল আরো বিপদসূচক যেহেতু এটা দুর্বোধ্য। জনগণকে পরিচালনা করার মতো নেতা না থাকায় গোলমাল বাধার কোনো আশঙ্কা নেই। অসন্তোষকে কেলাসিত করে প্রতিবাদের দানা বাধাতে সক্ষম কোন ব্যক্তির নাম প্রেসিডেন্ট বা তাঁর অনুগতরা শুনতে পেলেন না।

শেষ পর্যন্ত অশ্ব বিদ্যার অনেক চাতুর্য প্রদর্শনের পর লাল বেল্ট আঁটা মেজর, সোনালি লেস ভূষিত কর্নেল এবং স্কন্ধে এলালুয়েট চিহ্নিত জেনারেলের দল বল নিয়ে মিছিল কালে গ্রানদে ধরে কাসামারেনার দিকে চলল। সবার আগে বিখ্যাত সুইশ ব্যান্ড মার্চ করে যাচ্ছে আর তার পিছনে বাছাই করা একদল সেনানী সঙ্গে স্থানীয় কমানডান্ট। তার পিছনে মন্ত্রী পরিষদের চারজন একটি গাড়ীতে। এরপরে প্রেসিডেন্টের গাড়ী তাঁর সঙ্গে অর্থ মন্ত্রী ও গৃহ মন্ত্রী। তাদের অনুসরণ করছে বাকী সরকারী

গণ্যমান্যরা, কোর্টের বিচারকরা, বিশিষ্ট সামরিক, সরকারী, বেসরকারী জনজীবনের শিরোমণির দল।

মিছিল চলতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে দুর্লক্ষণের পাখির মতো, প্রেসিডেন্ট আর তার দলবলের সামনে, ভিসুভিয়াস ফল কোম্পানীর সবচেয়ে দ্রুতগামী স্টীমার ভালহাল্না বন্দরে এসে ভিড়ল। একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান কোন জাতির সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা না করলেও বা তার আগমন বিপদের সূচনা না করলেও সেনিওর এসপিরিতিওন সহ গাড়ীতে বসে থাকা অন্যান্যদের মনে হল ভিসুভিয়াস ফল কোম্পানীর নিশ্চয়ই কোন মতলব আছে।

মিছিলের পুরোভাগ সরকারী ভবনে পৌঁছবার আগেই ভালহালনার ক্যাপ্টেন ক্রমিক আর ভিসুভিয়াস কোম্পানীর সদস্য মিঃ ভিনসেনটি তীরে নেমে ভিড়ের প্রতিলক্ষ্য না করে ঠেলেঠুলে এগিয়ে চলল। লক্ষণীয় সাদা লিনেনের পোশাকে তারা আঞ্চুরিয়ানদের ভিড় ভেদ করে কাসা মোরেনার সোপান শ্রেণীর কয়েক গজের মধ্যে এসে দাঁড়াল। জনতার মধ্যে তারা দেখতে পেল, সিঁড়ির নীচু ধাপগুলির পাশে দেওয়ালের ধারে ডিকি ম্যালোনির আগুন রঙের মাথা। ডিকি তার বিস্তৃত দন্তরটি মোহজাল ছড়িয়ে তাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করেছে দেখিয়ে দিল।

উৎসবের অনুষ্ঠানের জন্য ডিকি নিজেকে চমৎকার কালো পোশাকে সাজিয়েছে। তার পাশে পাশা রয়েছে মাথায় নিত্যসঙ্গী কালো ওড়না দিয়ে।

মিঃ নিভসেনটি পাশাকে মনোযোগ সহকারে দেখতে দেখতে বলল, বতিচেল্লির ম্যাডোনা। এ খেলায় ও কখন এসে ঢুকল সেটাই ভাবছি। আমি চাই না স্ত্রীলোক নিয়ে ও জড়িয়ে পড়ে। স্ত্রীলোকদের থেকে ও দূরে থাকবে সেটাই আশা করেছিলাম।

ক্যাপ্টেন ক্রুশিনের হেসে বলল, ওই রকম মাথা কি তার স্ত্রীলোকদের থেকে আলাদা থাকতে পারে? আর। একজন ম্যালোনি! ওর লাইসেনস আছে না? কিন্তু সম্ভাবনা কি রকম বলে আপনি মনে করেন। এটা আমার লাইনের বাইরের ব্যাপার।

ভিনসেনটি ভিকির মাথার দিকে তাকিয়ে বলল, লাল আর কালো। আমরা লালের ওপর বাজি ধরেছি।

ক্রনিন বললেন, খেলা ছোকরার। কিন্তু এসব আমার কেমন যেন যাত্রা মনে হচ্ছে। স্টেজের থেকে লম্বা বক্তৃতা, বাতাসে কেরোসিনের বাতির গন্ধ আর যারা দমকি তারাই দৃশ্যপট সরাচ্ছে।

জেনারেল পিলার প্রথম গাড়ীটি থেকে নেমে কাসা মোরেনার সবচেয়ে সোপান শ্রেণীর সবচেয়ে উঁচু ধাপে গিয়ে দাঁড়ালে তারা কথাবার্তা থামাল।

ক্যাবিনেটের প্রবীনতম সদস্য জেনারেল পিলার এই প্রজাতন্ত্রের সর্বাধিক সম্মানীত নাগরিক। য়ুরোপের রাজসভায় সম্মানিত অতিথি জেনারেল বিলার তিনটি যুদ্ধের এবং অসংখ্য বিপ্লবের নায়ক। তিনি সর্বোচ্চস্তরের আঞ্চুরিয়ানদের প্রতিভূ, সু ললিত বক্তা, জনগণের বন্ধু।

এক হাতে কাসা মোরেনার সোনালি চাবির গুচ্ছ নিয়ে তিনি তাঁর বক্তৃতা শুরু করে, প্রতিটি শাসন ব্যবস্থার উল্লেখ করে, প্রতিটি শাসন ব্যবস্থার উল্লেখ করে, স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ থেকে বর্তমান কল পর্যন্ত ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করে, তার সঙ্গে সভ্যতা-বিস্তার প্রগতি—উন্নয়নের কথা বললেন, এরপর লোমাদার শাসনকালের কথা বলার সময় এলে তিনি থেমে গিয়ে, চাবির গোছা মাথার ওপর তুলে ধরলেন। যে পিরণ দিয়ে চাবিগুলি বাধা ছিল সেগুলি পত পত করে উড়ছিল বাতাসে।

সকলে তাঁর দিকে তাকালে তিনি উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন এখনো বাতাস বইছে। আঞ্চুরিয়ার জনগণ, আজ রাত্রে আমাদের দেশের বাতাস এখনো মুক্ত রয়েছে বলে ঋষিদের ধন্যবাদ দিন।

এবার তিনি আঞ্চুরিয়ার সর্বাধিক জনপ্রিয় প্রাক্তন শাসক ওলিভারার প্রসঙ্গে বলতে লাগলেন। তিনি সপ্রেম বর্ণনার মধ্য দিয়ে ওলিভারার চিত্র তুলে ধরে জনগণের স্মৃতি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলেন। তাঁর সময়ে সাধারণ মানুষ যেসব সুযোগ সুবিধা ভোগ করেছে সেই সব চিত্র তুলে ধরলেন। তিনি এত স্মরণ করলেন, শীতকালে তিনি কোরালিওতে এলে প্রেমভক্তির সঙ্গে বজ্রনাদে ভিভা শোনা যেত আর আজকের দিনে এত পার্থক্য কেন।

সেই সময় এই প্রথম জনতার মধ্যে একটা ভাবাবেগ দেখা দিল। তীরের ওপর দিয়ে গড়িয়ে যাওয়া ঢেউয়ের মতো তাদের মধ্যে নিচু গলায় মর্মর ধ্বনি উঠল।

জনতার ভাবাবেগ লক্ষ্য করে মিঃ ভিনসেনটি বললেন, রাজ্ জিতবে। তার জন্য দশ ডলার বা সেন্ট

চার্লস-এ ডিনা বাজি।

ক্রনিন বললেন, আমার নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধে আমি কখনও বাজি ধরি না। বুড়ো, কি বিষয়ে বলছে।

ভিনসেনটি বলল, আমার স্প্যানিশ জ্ঞান মিনিটে দশটি শব্দ, ওর প্রায় দুশ, তবে যাই বলুক না কেন ওদের দেখছি বেশ তাতিয়ে তুলছে।

জেনারেল পিলার তখন বলে চলেছেন, ভাইগণ, বন্ধুগণ, আমি যদি আমার এই হাত সমাধির বেদনাময় নীরবতা অতিক্রম করে মহান ওলিভারের কাছে বাড়িয়ে দিতে পারতাম, তবে তাকে আমি তোমাদের কাছে এনে দিতাম। কিন্তু তিনি মৃত, কাপুরুষ হত্যাকারীর হাতে।

বক্তৃতার রাশ ধরে রাখতে চেয়ে বক্তা তাঁর হাত ঊর্ধ্বে বাড়িয়ে তাঁর দৃষ্টি প্রেসিডেন্টের গাড়ীর ওপর রাখলেন। প্রেসিডেন্ট আসনে বিছিয়ে বসে, রাগে নীরব এবং হতবুদ্ধি হলে হাত দুটি দিয়ে আসনের কুশন শক্ত করে ধরে, এই অভূতপূর্ব বক্তৃতা শুনছিলেন। এই সময় তিনি আসন থেকে উঁচু হয়ে একটা হাত বাড়িয়ে বক্তাকে কিছু ইঙ্গিত করে ক্যাপ্টেন ক্রুজকে একটি আদেশ দিলেন। কিন্তু একশত উড়ন্ত অশ্বারোহীর নেতা আদেশ শুনতে পেয়েছে বলে মনে হল না। পাণ্ডুর মুখে লোমদা তাঁর আসনের মধ্যে ডুবে গেলেন।

বক্তা আবার বলতে লাগল, কে বলে ওলিভার মৃত, তাঁর দেহ সমাধিতে শয়ান থাকলেও তিনি তাঁর অমর আত্মা দান করে গেছেন। শুধু কি তাই, তিনি তাঁর যৌবন, বিদ্যা, ভাবমূর্তি সবকিছুই আমাদেরকে দান করে গেছেন। আঞ্চুরিয়ার জনগণ, গুলিভারের পুত্র রামনকে কি তোমরা ভুলে গেছ!

হঠাৎ এইসময় সবাই দেখল ডিকি ম্যালোনি তাঁর টুপী খুলে ফেলে লাল চুলের বোঝা সরিয়ে দিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ির ওপব উঠে জেনারেল পিলারের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। যুদ্ধমন্ত্রী তাঁর বাহু যুবকের কাঁধ বেষ্টন করে রাখলেন। প্রেসিডেন্ট ওলিভারকে যারা চিনত তারা সেইরকম ভঙ্গী মুখাকৃতি, সেই একই রকম কালো চুলের মাঝখানে অদ্ভুত বাঁকা সিঁথি লক্ষ্য করল।

জেনারেল পিলার বলতে লাগলেন, এই চাবি এখন আমাকে দিতে হবে। আঞ্চুরিয়ার জনগণ, এই চাবি তোমাদের ঘরের চাবি, তোমাদের স্বাধীনতার চাবি। এখন তোমরা বল এই চাবি আমি, এমরিকো ওলিভারার হত্যাকারীর হাতে না তার পুত্রের হাতে তুলে দেব।

স্ত্রী, পুরুষ বালক নির্বিশেষে সকলে চিৎকার করে বলতে লাগল, ওলিভারা, ওলিভারা।

এই সময়ে কর্নেল রকাস উঠে এসে, রামন ওলিভারের পদপ্রান্তে তাঁর তরবারি সমর্পণ করলেন। মন্ত্রী পরিষদের চার জন সদস্য তাঁকে আলিঙ্গন কবল। ক্যাপ্টেন দ্রুদ-এর একটি আদেশ পেয়ে এল সিয়েনতো উইলানদোর কুড়িজন অশ্বারোহী নেমে এসে কাসা মোরেনার সোপান শ্রেণীর চারপাশে বেড়াজাল সৃষ্টি করল।

যুবক ওলিভারা বিজ্ঞ রাজনীতিবিদের মতো বিধিদত্ত প্রতিভার পরিক্ষিত কাজে লাগিয়ে হাতের ইশারায় সৈন্যদের সরিয়ে দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এসে একে একে সাধারণ মানুষদের আলিঙ্গন করতে লাগল।

এদিকে ক্রুজের সৈন্যদের দুজন তখন লোসাদার ঘোড়ার লাগাম ধরেছে আর অন্যরা গাড়ীর চারপাশে কড়া পাহারার অবরোধ সৃষ্টি করল। তারপর তারা অত্যাচারী ও তার দুজন কুখ্যাত মন্ত্রীকে কোরালিওতে থাকা কয়েকটি গরাদ দেওয়া সুরক্ষিত পাথরের প্রকোষ্টের একটির দিকে জোর কদমে ঘোড়া ছোটালে ভিনসেনটি শান্ত ভাবে একটি চুরুট ধরিয়ে বলল, রুজ জিতল।

ক্যাপ্টেন ক্রপিন সোপানের নীচে চারদিক লক্ষ্য করতে করতে বললেন, বাঃ খাসা ছেলে। আমি ভাবছিলাম ওকি ভুলে গেল ওর ক্যাথলিন মাভুর নিনকে।

যুবক ওলিভারা জেলারেল পিলারের কাছে এসে কিছু বলয়ে তিনি পাসার কাছে কিছু বললেন। পাশা সেই সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবাক চোখে সব কিছু দেখছিল। এইবার যুদ্ধ মন্ত্রী নিজের হাত বাড়িয়ে দিয়ে পাশাকে সঙ্গে নিয়ে কাসা মোরেনার সিঁড়িগুলি অতিক্রম করলে রামন ওলিভারা এগিয়ে এসে আমার দুটি হাত ধরে কাছে টেনে নিল।

অভিনন্দনের সোল্লাস ধ্বনি আবার নতুন করে ধ্বনিত হলে ক্যাপ্টেন ক্রনিন তার মিঃ ভিনসেনটি সমুদ্রতীরের দিকে। তাদের জন্য অপেক্ষারত ডিঙ্গির দিকে চললেন।

সমুদ্রতীরের দিকে যেতে যেতে চিন্তাকুল ভাবে ভিনসেনটি বলল, নতুন প্রেসিডেন্ট নিযুক্তির

ঘোষণাবার্তা আগামীকাল প্রকাশিত হবে। দেখা গেছে, নির্বাচিত প্রেসিডেন্টদের ওপর যতটা নির্ভর করা যায় এদের ওপর কতটা করা যায় না। যদিও এই ছেলেটার ভিতরে কিছু ভালো পদার্থ আছে। সমস্ত ব্যাপারটা ওরই পরিকল্পনা মতো হয়েছে। জানতো, ওলিভারার ধনী বিধবা, স্বামীর হত্যার পরে যুক্তরাষ্ট্রে চলে যায় ও সেখানকার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেকে লেখাপড়া শেখায়। ভিসুবিয়াস কোম্পানী তাকে খুঁজে বের করে এই ছোট্ট খেলাটায় তার পিছনে থেকে সাহায্য করে।

ঠাট্টার ছলে ক্যাপ্টেন ক্রমিন বলল, আজ-কালকার দিনে একটি দরকারকে তাড়িয়ে সেই জায়গায় নিজের পছন্দের দরকার বসানো খুবই গৌরবের কথা।

ভিনসেনটি বলল, এটা ব্যবসারই একটা অঙ্গ, সববতি লেবুর গাছ থেকে একটা বাঁদর নেমে এসেছিল। ক্রনিনের হাতে চুরুটের টুকরোটা দিয়ে ভিনসেনটি আবার বলল, দুনিয়া আজকাল এইভাবেই চলছে। কলার কাঁদির ওপর এক রেয়াল যে অতিরিক্ত কর বসানো হয়েছিল, সেটা তুলে ফেলার ফেলার দরকার ছিল। সেটা সরানোর সহজ রাস্তাটা কেবল আমরা খুঁজে বার করেছি।

সতেরো

দুটি প্রত্যাভিগমন

নিউইয়র্ক শহরের উত্তর জেটির তক্তার ওপর দুই ব্যক্তি বসে রয়েছে। জেটির ওপর সেই সময়ে ক্রান্তীয় অঞ্চল থেকে আসা একটি স্টীমার থেকে কলা ও কমলালেবু খালাস হচ্ছে। পেকে যাওয়া কাঁদি থেকে মাঝে মধ্যে দু'একটা কলা খসে পড়লে তারা এক একজন কুড়িয়ে এনে সঙ্গীর সঙ্গে ভাগ করে খাচ্ছে। দুজনের একজনের রৌদ্র, বৃষ্টি ঝড়ের পক্ষে যতটা সম্ভব বিপর্যয় ঘটে গিয়েছে দেখে মনে হচ্ছে সে দুর্দশার শেষ অবস্থায় এসে পৌঁছেচে। শরীরের ওপর মদ্যপান জনিত অত্যাচারের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। এতকিছু স্বত্বেও তার উন্নত লাল নাকের মাঝখানে একজোড়া নিখুঁত ঝকঝকে সোনার ফ্রেমের চশমা বসানো রয়েছে।

অন্য লোকটি অবশ্য অকর্মণ্যদের চালু রাস্তায় ততটা নীচে নামে নি। কোন জমিতেই পুনর্বার অঙ্কুরিত হবে না এমন কুসুম বীজে তার জীবন পরিণত হয়েছে। তা সত্বেও যেহেতু জীবনের চোরাগলিতে তার যাতায়তে অব্যাহত ছিল তাই দৈবের সহায়তা ছাড়াই আবার কার্যকরী জীবনের রাস্তায় তার ফিরে আমার সম্ভাবনা রয়েছে। বেঁটে, হৃষ্ট পুষ্ট লোকটির সংকর মাছের মতো, তির্যক চোখে মৃতের চাহনি। করে ককটেল মেশানো লোকেদের মতো গোঁফজোড়া স্মিথ।

তৃতীয় কলাটি খেতে খেতে চশমা নাকে লোকটি থুঃ থুঃ করে ফেলে দিয়ে বিরক্তির গলায় বলল, শয়তান এই কলা খাক। যে দেশে এই কলা জন্মায় সেখানে আমি দুবছর ছিলাম। ও স্বাদ ভোলার নয়। কমলাগুলো অবশ্য মোটামুটি ভালই দেখতো ভাঙা বাকস থেকে দু-একটা জোগাড় করা যায় কিনা।

স্মিথ বলল, তুমি বাঁদরদের সঙ্গে ছিলে নাকি? ঐ দেশে, যদিও কয়েকঘণ্টার জন্য, তবু আমিও একবার ভিয়েছি, কলম্বিয়া ডিটেকটিভ এজেনমিতে কাজ করার সময়। ওই বাঁদর দেশের লোকেদের জন্যই আমার চাকরীটা গিয়েছে। তাহলে গল্পটা শোন।

মনে মনে গল্পটা সাজিয়ে নিয়ে স্মিথ বলতে শুরু করল, একদিন অফিসে বস আমাকে একটা চিরকুট পাঠালো। বড়ো বড়ো কাজগুলি ওরা আমাকে দিত। সে সময় এজেন্সির সব চেয়ে বড় ডিটেকটিভ ছিলাম আমি, মালিক নোটটি পাঠিয়েছিল ওয়াল স্ট্রীট অঞ্চল থেকে, একটা বড় কাজের বার দেবার জন্য।

গিয়ে দেখি একটা প্রাইভেট অফিস ঘরে অনেক জন ডিরেকটর বসে রয়েছে। কেসটা আমাকে বুঝিয়ে বলল। ব্যাপারটা অনেকটা এইরকম. লক্ষ ডলার নিয়ে রিপাবলিক ইনসুর্যান্স কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট পালিয়েছেন। ডিরেকটররা তাকে আর তার থেকে বেশী করে টাকাটা ফিরত পেতে চান। ডিরেকটররা বৃদ্ধ ভদ্রলোকের গতিবিধি নজর করতে জানতে পেরেছেন কোন জায়গা থেকে সেইদিন সকালে একটি মেয়েও একটা বড়ো ব্যাগ সঙ্গে করে একটা ফলের জাহাজে চড়ে দক্ষিণ আমেরিকা অভিমুখে যাত্রা করেছে।

একজন ডিরেকটর তাঁর বাষ্পাচালিত প্রমোদ তরীটি বিনা সর্তে আমাকে দিয়ে বললেন যে চার ঘণ্টার মধ্যে ওটায় চড়ে ওই ফলের জাহাজটিকে দ্রুতবেগে অনুসরণ করতে হবে। আমাকে এও বুঝিয়ে দিল যে জে. চার্চিল ওয়ারফিল্ড নামের ভদ্রলোকটি কোথায় কোথায় যেতে পারেন। সেই সময় বেলজিয়াম ও আঞ্চুরিয়া ছাড়া আর সব দেশের সঙ্গেই আমাদের চুক্তি ছিল। ধূর্ত ওরারফিলডের কোনো ছবি নিউইয়র্কে না পেলেও তার সম্বন্ধে বর্ণনা পেলাম। তাছাড়া মেয়ে সঙ্গে যে কোন জায়গাতেই ধরা পড়তে পারেন। মেয়েটি সমাজের উঁচুস্তরের খাঁটি জিনিস জিনিস ছিল।

মহাসমুদ্র মস্ত বড়ো জায়গা আর আমরা অন্য পথে চলে গিয়েছিলাম বলে পথে জাহাজটিকে কোথাও দেখতে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত ফলের জাহাজটির গন্তব্যস্থল আঞ্চুরিয়ার দিকেই গেলাম।

একটু থেমে আবার বলতে শুরু করল, একদিন বিকেল চারটে নাগাদ সেই বাঁদরদের দেশের কূলে ভিড়লাম। তীর থেকে কিছুদূরে একটা জাহাজে কলা ভর্তি হচ্ছে দেখতে পেলাম। বুড়ো এই জাহাজে এসেছে না আসেনি সেই ব্যাপারে খোজ খবর নেবার জন্য তীরে গেলাম খবর নিতে। তীরে এসে, বাঁদরগুলির সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা, লম্বা চওড়া, ঠাণ্ডা প্রকৃতির একজন আমেরিকার কাছে জানতে পারলাম জাহাজটির নাম কার্লসফিন। সাধারণত নিউআর্লিয়নস যাতায়াতকরা জাহাজটি আগেরবার ফল নিয়ে নিউইয়র্ক গিয়েছিল। সকলে আমাকে এই জাহাজ থেকে কোন যাত্রী নামে নি বললেও আমি নিঃসন্দেহ হলাম যে আমার লোকেরা এতেই এসেছে। আমি জানতাম আমার ইয়ট দেখে লজ্জা পেয়ে তারা সন্ধ্যার আগে বার হবে না। আমি অপেক্ষা করা ও তীরে নামলেই পাকড়ানোর কথা ঠিক করলাম। আমার দরকার টাকাটা ফিরে পাওয়া নিয়ে কারণ বিতাড়নের চুক্তির কাগজ পত্র ছাড়া আমি জানতাম ওয়ারফিলডকে আমি গ্রেপ্তার করতে পারব না। যকন ওরা ক্লান্ত আর স্নায়ুগুলি উত্তেজিত হয়ে সেই সময় আঘাত হানা গেলে ওরা বাধা দিতে পারে না।

স্মিথ বলে চলে। অন্ধকার হলে কিছুক্ষণ সমুদ্রতীরে একটা নারকেল গাছের নীচে বসার চার শহরটা দেখতে বার হলাম। যা দেখলাম তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। সৎভাবে নিউইয়র্কে কেউ থাকতে পারলে সে যেন লক্ষ টাকার জন্যও ঐ বাঁদরদের দেশে না যায়। নিচু নিচু মাটির বাড়ি, রাস্তায় বড়ো বড়ো ঘাস জুতো ছাপিয়ে যায়। মেয়েরা নিচু গলা, ছোট হাতা জামা পরে মুখে সিগার নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গেছো ব্যাঙ ডাকছে। পিছনের উঠানে বড়ো বড়ো পাহাড়, পাথর কুচি এনে জড়ো করেছে। সমুদ্র রঙের ওপরের আস্তরণ চেটে তুলে ফেলেছে। সেই দেশে যাওয়ার থেকে যে কোন লোক বরং সদাব্রতে খেয়ে ঈশ্বরের দেশে পড়ে থাকবে।

সমুদ্রের কিনারা বরাবর বিছানো প্রধান রাস্তাটা বাঁশেব খুঁটি আর খড় দিয়ে তৈরী করা বাড়িগুলির কাছে একটি গলিতে গিয়ে শেষ হয়েছে। এই সময় বাঁদরগুলি যখন ডাবগাছে না ওঠেন তখন কি করে দেখতে গিয়ে প্রথম বাড়িটায় উঁকি দিতেই আমি আমার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু পেয়ে গেলাম। বছর পঞ্চাশ বয়সের, মসৃণ মুখমণ্ডল, মোট ভ্রূ, কালো ব্রড ক্লথের পোশাক পরণে, এক ব্যক্তি, একজন সোনার ইটের সমান ওজনের মনে হওয়া একটা ব্যাগ নিয়ে, কাঠের চেয়ারে বসে রয়েছে। সঙ্গে একটি সুন্দরী মেয়ে। দেয়ালের পেরেক পেলাম একটি বাতির আলোয় দেখলাম একটি বৃদ্ধা টেবিলে কফি আর জীনস্ রাখছে।

আমি ভিতরে ঢুকে পড়লে ওরা সবাই আমার দিকে তাকাল। আমি বললাম। মিঃ ওয়ার ফিলড, আমি আপনাকে বন্ধী করছি। আমি কি চাই তা আপনার অজানা নয়। আশা করি মহিলাটির মুখ চেয়ে আপনি ব্যাপারটা বুদ্ধিমানের মতোই জেনে নেবেন।

কে আপনি?

বৃদ্ধের প্রশ্ন আমি বললাম, আমি, কলাম্বিয়া ডিটেকটিভ এজেনসির, ও ডে। আমার সৎ পরামর্শ শুনুন, আপনি ফিরে গিয়ে পুরুষের মতো আপনার ঔষধ গলধঃকরণ করুন। টাকা ফিরে পেলে ওরা আপনাকে ছেড়ে দিতেও পারে। আমি ফিরে গেলে আমি আপনার হয়ে নিশ্চয়ই ওদের কিছু বলব। আমি ঘড়ি ধরে পাঁচমিনিট সময় ভাববার জন্য আপনাকে দিলাম।

এই সময়ে তরুণী মেয়েটি তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বলল, আপনার ওই পোশাক পরে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে গোলমাল না বাঁধিয়ে ভিতরে এসে বলুন আপনি কি চান।

তিন মিনিট হয়ে গিয়েছে। আর দুমিনিট বাদে আমি কথা বলব।

পাঁচ মিনিট পরে বৃদ্ধকে বললাম, আপনি রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট নন একথা অস্বীকার করতে পারেন।

হ্যাঁ, আমিই।

তাহলে, নিউইয়র্কে, রিপাবলিক ইনস্যুর‍্যান্স কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট, জে, চার্চিল ওয়ার ফিলড-এর, সন্ধান চাই আর, ওই কোম্পানীর অর্থ যা এখন ওই ব্যাগে বেআইনীভাবে উক্ত জে, চার্চিল ওয়ারফিলডের অধিকারে রয়েছে।

দ্রুত চিন্তা করে তরুণীটি বলল, তার মানে আপনি আমাদের নিউইয়র্কে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান?

আমি বললাম, মিঃ ওয়ারফিলডকে, মিস, যদিও আপনার বিরুদ্ধে আমাদের কোন অভিযোগ নেই তবুও আপনি আপনার বাবার সঙ্গে ফিরে গেলে আমাদের আপত্তির কিছু নেই।

মেয়েটি হঠাৎ আর্তনাদ করে লোকটির গলা জড়িয়ে ধরে বলল, বাবা, এ কথা কি সত্যি? বলো বাবা, তুমি কি কোন টাকা নিয়েছ?

স্মিথ বলে চলে, মেয়েটি ওরকম করতে থাকলে বুড়ো লোকটি প্রথমে কিছুটা ঘাবড়ে যায়। তারপর মেয়েটির কানে কি সব বলতে বলতে ডানদিকের কাঁধটি চাপড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

এবার মেয়েটি তাকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে মিনিট খানেক কি সব বোঝালে বৃদ্ধ চশমা চোখে দিয়ে আমার হাতে এসে ব্যাগটি দিয়ে দিলেন।

স্মিথ বলল, তিনি এবার বললেন, মিঃ ডিটেকটিভ আমি স্থির করেছি আপনার সঙ্গে ফিরে যাব। আমি বুঝতে পেরেছি এই অসন্তোষে ভরা জনহীন উপকূলে বেঁচে থাকার মানে মৃত্যুও অধিক। আমি ফিরে গিয়ে রিপাবলিক কোম্পানীর হাতে নিজেকে তুলে দেব। আপনি কি একটি শিপ এনেছেন?

আমি বললাম, ভেড়া, আমি তো একটাও—

তরুণীটি বলল, শিপ, কৌতুক করছেন। বাবা জন্মসূত্রে জার্মন বলে খাঁটি ইংরেজি বলতে পারেন না। আপনি এসেছেন কি ভাবে?

স্মিথ বলতে থাকে, মেয়েটি একেবারে ভেঙে পড়েছে, মুখে একখানি রুমাল ঢাকা। তারপর মেয়েটির আমার কাছে এসে আমার পোশাকের ওপর তার হাত রাখলে আমি বললাম, আমি একটা প্রাইভেট ইরটে এসেছি।

শুনে মেয়েটি বলল, এই হতচ্ছাড়া দেশ থেকে এক্ষুণি আমাদের নিয়ে চলুন মিঃ ওর্ডে। নিয়ে যাবেন তো।

আমি বললাম, আমি চেষ্টা করব। যদিও কতক্ষণে ওদের মত বদলে যাবার আগে লোনা জলের ওপর নিয়ে গিয়ে তুলবো সেইটাই আমার একমাত্র চিন্তা।

স্মিথ এবার বলল, শহরের মাঝখান দিয়ে নৌকায় চড়ার জায়গায় যাওয়ার ব্যাপারে ওরা দুজনেই আপত্তি জানাল। মেয়ের কথায় সম্মতি জানিয়ে তারা বলল, আমরা চাইনা প্রচার হোক। যেহেতু আমরা ফিরে যাচ্ছি তাই মনে হয় ব্যাপারটা গোপনই থাকবে এবং খবরের কাগজেও উঠবে না। ওয়ারফিলড আরো বলল, আমি কোন প্রাণীকে জানতে না দিয়ে ওদের পৌঁছে দিতে না পারলে ওরা ইরটে পা দেবে না।

স্মিথ বলল, আমি তাদের ইচ্ছা পূরণে রাজী হয়ে বললাম যে নাবিকেরা আমাকে তীরে পৌঁছে দিয়েছিল তারা আমার পরবর্তী আদেশের অপেক্ষায় জলের ধারে একটা বারে বিলিয়ার্ড খেলছে। সেখানে তাদের খবর পাঠাতে হবে যাতে তারা আধমাইল দূরে ডিঙ্গিটা সরিয়ে নিয়ে যায়।

কি করে সেই খবর তাদের কাছে পাঠানো যায় সেকথাই আমি ভাবছিলাম। কারণ টাকার ব্যাজটা আমি না পারছি রেখে যেতে না সঙ্গে নিতে।

এই সময় মেয়েটি বলল, বৃদ্ধাকে চিঠি লিখে দিলে ও নিয়ে যেতে পারবে।

আমি বসে চিঠি লিখে বৃদ্ধার হাতে দিয়ে কি করতে হবে বলে দিলে মিঃ ওয়ারফিল্ড বিদেশী ভাষায় তাকে কি সব বললেন আর সে শুধু পরবার, সে সেনিওর। বলে চিঠি নিয়ে চলে গেল।

বৃদ্ধা চলে গেলে মিস ওয়ার ফিল্ড বলল, বৃদ্ধা আগন্তা জার্মান ছাড়া আর কিছু বুঝতে পারে না। ওর বাড়িতে থাকার জায়গা খুঁজতে এলে ও আমাদের কফি খেতে বলল। ওর কাছে শুনলাম সান ডমিনিগোতে এক জার্মান পরিসরে ও মানুষ।

স্মিথ বলতে থাকে, আমি বললাম, আমাকে খুঁজে দেখতে পারেন সিকস্ ভেরস্তে আর 'নখ সাইসত' ছাড়া কোন জার্মান সঙ্গে যদি খুঁজে পান। বাজি ধরলে সে সেনিওর শব্দটিকে আমি ফরাসী বলতাম।

যাই হোক শেষ পর্যন্ত যাতে কেউ আমাদের না দেখতে পায় তার জন্য শহরের কিনার দিয়ে আমরা চুপচাপ বেরিয়ে পড়লাম। আর লতায়, কিনার দিয়ে আমরা চুপচাপ বেরিয়ে পড়লাম। আর লতায় ফার্ণে কলাগাছের ঝোপে আর উষ্ণমণ্ডলের প্রাকৃতির দৃশ্যের মধ্যে আমরা হারিয়ে গিয়ে ছিলাম।

শেষে তটরেখার ধারে এসে আমরা দেখতে পেলাম নারকেল গাছের নীচে দশফুট লম্বা বন্দুক পাশে রেখে একজন বাদামী রঙের লোক ঘুমোচ্ছে।

মিঃ ওরার ফিল্ড বন্দুকটা জলে ফেলে দিয়ে বললেন, তটরেখা প্রহরায় ন্যস্ত, বিদ্রোহ আর চক্রান্ত পেরে ওঠা ফলের মতো। এইবার ঘুমন্ত লোকটিকে দেখে তিনি বললেন, এইভাবে এরা দায়িত্ব পালন করে। শিশুর দল সব।

স্মিথ বলে, আমাদের ডিঙি আসছে দেখে. আমাদের অবস্থান জানাতে আমি দেশলাই কাঠি জ্বেলে একটা খবরের কাগজের টুকরো ধরালাম। এরপর আর্ধঘণ্টার মধ্যে আমরা ইয়টে পৌঁছে গেলাম।

ইয়টে পৌঁছে সবার আগে মালিকের ক্যাবিনে গিয়ে আমরা তিনজনে ব্যাগটা খুলে একটি তালিকা তৈরী করে দেখলাম ব্যাগের মধ্যে ছিল যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারির নোটে এক লক্ষ পাঁচ হাজার ডলার। অনেক হীরে জহরতের অলংকার এবং শ দুই হাবানা চুরুট। আমি এবার চুরুট গুলি ও কোম্পানীর তরফ থেকে বাকি মালগুলির একটি রসিদ বৃদ্ধকে দিয়ে, আমার থাকার জায়গায় তালাচাবির মধ্যে ব্যাগটি রেখে দিলাম।

স্মিথ এবার বলল, ওইরকম আনন্দের সমুদ্রযাত্রা আমি আর কখনো করিনি। সমুদ্রে ভাসবার পর থেকেই মেয়েটি খুশী হয়ে উঠল।

প্রথমে আমরা ডিনার খেতে বসলাম এবং স্টুয়ার্ট তার গ্লাসে শ্যামপেন ভরে দিল।

এই সময় মেয়েটি আমার চোখ দিয়ে ইশারা করে বলল, ডিটেকটিভ মশাই, গোলমাল ধার করে কি লাভ। তার চেয়ে আসুন এই কামনা করে পান করি যে সুরগিটি আপনার সমাধির ওপর চড়ে বেড়াবে আর আপনি সেটি খাওয়ার জন্য জীবিত থাকবেন।

ইয়টে থাকা পিয়ানোয় বসে বার বার শোনার মতো গান গাইল। অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের শিল্পী ও বড় ঘরানার আদব কায়দা জানা মেয়েটির অন্তত নয়টি অপেরা মুখস্ত ছিল।

বৃদ্ধাও সমুদ্রে যেতে যেতে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেলেন। একবার চুরুট বিনিময় করে খুশী মনে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আমাকে বললেন, মিঃ ওর্ডে, কেন জানিনা আমার খালি মনে হচ্ছে কোম্পানী আমাকে বিশেষ কষ্ট দেবে না। ব্যাগটা সাবধানে রাখবেন, কারণ যাত্রা শেষে যাদের টাকা তা তাদের ফেরত দিতে হবে।

নিউইয়র্ক পৌঁছে ডিরেকটারের অফিসে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য মালিককে ফোন করলাম। এরপর একটা ভাড়া গাড়ীতে চড়ে সেখানে পৌঁছে দেখলাম মালিক আমরা যাওয়ার আগেই সেখানে পৌঁছে গেছে। মালিকের সঙ্গে টাকার কুমীরদের পুরো দলটাও এসে হাজির হয়েছে।

স্মিথ বলে চলে, আমার হাতে থাকা টাকার ব্যাগটা টেবিলের ওপর তাদের সামনে রেখে আমি বললাম, এই সেই টাকা আর বন্দী।

এই সময় মালিক এগিয়ে এসে ওয়ারফিল্ডকে বললেন, আপনার সঙ্গে কয়েকটি কথা বলতে চাই।

স্মিথ বলল এবার, তিনি আর আমার মালিক মিনিট দশেক মতো অন্য একটি ঘরে কাটিয়ে ফিরে এসে একটন কয়লার মতো কালো মুখ করে মালিক আমাকে বলল, ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হবার সময়ে এই ব্যাগটা ওঁনার কাছে ছিল?

হ্যাঁ, তাই।

এবার ডিরেকটর ব্যাগটা তুলে নিয়ে বন্দীর হাতে দিয়ে মাথা নত করে অভিবাদন জানিয়ে অন্যান্য ডিরেকটরদের বলল, এই ভদ্রলোককে আপনার কেউ চেনেন?

স্মিথ বলল, তারা না বললে বস বলল, আঞ্চুরিয়ার রাষ্ট্রপতি, সেনিওর মিরাফ্লোরেসকে আপনাদের কাছে পেশ করতে আমাকে সুযোগ দিন। ঘটনাটি জনসাধারণের মন্তব্যের বিষয় না হলে উনি এই

লজ্জাকর প্রমাদটি উপেক্ষা করবেন বলেছেন। ওনার মহানুভবতার জন্যেই উনি এটা উপেক্ষা করলেন। না হলে তিনি এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক খেসারত চাইতে পারতেন। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গোপনতার প্রতিশ্রুতি দিতে পারি বলেই আমার মনে হয়।

সকলে সম্মতির ভঙ্গীতে সায় দিয়ে বস আমাকে বললেন, ওডে, প্রাইভেট ডিটেকটিভ হিসাবে এখানে নিজেকে অপচয় না করে, যুদ্ধক্ষেত্রে, যেখানে সরকারকে চুরি করে আনা বিধি নিয়মের ভিতরে পড়ে, সেখানে যাও, সেখানে তুমি অমূল্য হবে। এগারটার সময় অফিসে দেখা করো।

স্মিথ বলে, এই উক্তির অর্থ আমি জানতাম। আমি ভাবতে লাগলাম, তাহলে ওই লোকটা বাঁদরদের প্রেসিডেন্ট, কিন্তু কথামত আমাকে একবার বললেই পারতো।

এবার চশমা চোখে লোকটি স্মিথকে বলল, বললে কি তুমি ধাক্কা খেতে নাকি?

আঠার

ভিটাগ্রাফোস্কোজ

বিচিত্রানুষ্ঠান মূলত কাহিনী আশ্রিত এবং যোগসূত্র রহিত। এর দর্শকবৃন্দ রহস্যজালের উন্মোচন আশা করে না। প্রতিটি দৃশ্যের শেষে বেশী কিছু চাওয়া পাপ। কমেডির গায়িকা কতবার প্রেমে পড়েছে কেউ জানতে চায় না। খেলা দেখানোর কুকুরটা আগুনের শেষে রিংটা লাফ দেবার দর্শক মাথা ঘামায় না। তেমনি তারা বিবেচনা করে না দাম দিয়ে টিকিট কিনেছে বলে তাদের জানবার অধিকার আছে আইরিশ একক অভিনেতা আর মহিলা ব্যাঞ্জো শিল্পীর মধ্যে হৃদয় দেওয়া নেওয়ার সম্পর্ক আছে কি নেই।

টাকা হারানোর পর কিছুদিন বাদে, প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্ট রিপাবলিক ইনস্যুর‍্যানস্ কোম্পানী নিউইয়র্ক সিটি একটি চিঠি দেয়, মিঃ ফ্রাঙ্ক গুডউইন, কোরালিও, আঞ্চুরিয়া প্রজাতন্ত্রের পক্ষে ঃ

প্রিয় মিঃ গুডউইন,

আপনার লেখা পত্র নিউ অর্লিয়েন্সের হাউল্যান্ড অ্যান্ড ফুরসেট এর মাধ্যমে আমরা পেয়েছি। সেই সঙ্গে তাদের, কোম্পানীর তহবিল থেকে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট প্রয়াত জে. চার্চিল ওয়ার ফিলড-এর সারানো, এন ওয়াই-এব ওপর একলক্ষ ডলারের ড্রাফট। হ্যারনোর দু সপ্তাহের মধ্যে, হারানো সমস্ত টাকা ত্বরিত এবং প্রশংসনীয় প্রত্যাপর্ণের জন্য, কোম্পানীর অফিসার ও ডিরেকটর গণের তরফ থেকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন ব্যাপারটি গোপন রাখা হবে। মিঃ ওয়ারফিল্ডের স্বহস্তে মৃত্যর কথা জানতে পেরে আমরা দুঃখিত, কিন্তু অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

আপনার ও মিস ওয়ার ফিলডের বিবাহের প্রভূত সৌন্দর্য, সর্বজয়ী সু-স্বভাব, মহিয়সী নারীসুলভ প্রকৃতি এবং উচ্চতম নগর সমাজে শ্লাঘনীয় সুখ্যাতি—

আন্তরিক ভাবে আপনার,

লুসিয়াস ই অ্যাপলগেট

প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্ট, রিপাবলিক ইনস্যুর‍্যানস কোম্পানী।

উনিশ

চলচ্ছবি। শেষ·সসেজ

নিউইয়র্কে হোয়াইট তার স্টুডিওতে মহসী, অনুভাবী আকৃতি, বিষণ্ণ দৃষ্টিতে স্তূপীকৃত স্কেচের মধ্যে বসে রয়েছে নিজের দুটি হাতের মধ্যে মাথা রেখে। হোয়াইট হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে কোমরের বেলট টেনে বাকল্স-এর জিব অন্য একটি গর্তে লাগিয়ে, স্টুডিওর মধ্যস্থল পাইন কাঠের বাকসের ওপর রাখা একটি কেরোসিন স্টোভে আগুন ধরাল। এরপর সে পর্দার অর্ধেক আড়ালে ঢাকা পড়া টিনের রুটির বাকস উল্টে একটি মাত্র সসেজের গাঁট পেয়ে সেটা ফ্রাইং প্যানে রেখে স্টোভে চাপাল। তেল না থাকায় এই সময় স্টোভটা নিভে গেলে হোয়াইট হতাশ হয়ে সসেজটি তুলে ধরে। হঠাৎ রেগে গিয়ে ছুঁড়ে ফেলে। এই সময় দরজা খুলে বিলি কেওগ ঢুকতে গেলে ছোঁড়া সসেজটি তার নাকে গিয়ে লাগল।

কেওগ চেঁচিয়ে ওঠে নাচের ভঙ্গীতে দু-একটা পা দ্রুত তালে চলে প্রবল হাসিতে ফেটে পড়ে স্টোভটা লাথি মেরে ফেলে দিল। তারপর সান্ত্বনার ভঙ্গীতে হোয়াইটের পিঠ চাপড়াতে লাগল।

কেওগ এবার হোয়াইটকে বলল, তুমি নিউইয়র্কে ফিরে এলে আমি বর্ডিলিয়েরা পর্বত অঞ্চলে রেডইনডিয়ানদের কাছে স্বর্ণরেণুর বিনিময়ে হাঁসুয়া আর ক্ষুর বিক্রি করে অনেক অনেক টাকা রোজগার করেছি।

এরপর কেওগ তার পকেট থেকে ছোট পাঁউরুটির মাপের একটি নোটের তাড়া বের করে মাথার ওপর সেটা দোলাতে দোলাতে হোয়াইটকে বলল, চল শিল্পী, কোথায় গিয়ে একটু পান করা যাক।

হোয়াইট তার টুপী নিয়ে বিলির সঙ্গে বার-এর উদ্দেশ্যে স্টুডিও থেকে বেরিয়ে পড়ল।

বালির উপরে লিখন

একটি স্ত্রীলোক, সুন্দরী, এখনও যৌবন চলে যায় নি, সুচারু বেশবাস, আত্মতৃপ্ত, সমাহিতা, নাইস-এর সমুদ্রতটে। জলের ধারে ঝুঁকে বসে বালির ওপর ছাতার ডাঁটি দিয়ে আঁচড় কেটে লিখেছে ইসাবেল। ওর মুখের সৌন্দর্য দুর্বিনীত, ওর শিথিলভঙ্গী, সব কিছু মনে হচ্ছে সাময়িক। একটু অপেক্ষা করলেই হয়ত দেখা যাবে কোন এক অজ্ঞাত কারণে হঠাৎ পাষাণ, স্থির হয়ে থাকা চিতাবাঘ, যে কোন সময়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে বা পিছলে যাবে বা হামাগুড়ি দিয়ে চলতে শুরু করবে।

মেয়েটির পাশে কয়েকগজ দূরে এক ব্যক্তি বসে আছে। সাথী যদি নাও হয়, ওরা সঙ্গিনী যাচ্ছে। ওরা পরস্পর কোন কথা বলছে না। পুরুষটিও ছড়ি দিয়ে বালির ওপর আঁচড় কেটে লিখছে 'আঞ্চুরিয়া' এবার পুরুষটির দৃষ্টিতে মৃত্যুর দুর্জ্ঞেয়তা নিয়ে ভূমধ্যসাগর আর আকাশ একমাত্র মিশে যাওয়া দিগন্তে তাকায়।

অরণ্য ও তুমি

উষ্ণমণ্ডলের দেশে, এক ভদ্রলোকের জমিদারীর সীমানায়, মেহগনি রঙের মুখ, একজন বৃদ্ধ রেড ইনডিয়ান, সুন্দরী গাছের জলের ধারে, একটি সমাধিস্থলের ঘাস ছাঁটছে। কিছুক্ষণের মধ্যে সে উঠে পড়ে, ঘনিয়ে আসা গোধূলির ছায়ায় আচ্ছাদিত একটি কুঞ্জের দিকে চলতে লাগল। সেই কুঞ্জের কিনারায় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে, যার আকৃতি শক্তিশালী, ভঙ্গি বিনম্র, সঙ্গে শান্ত ও সুস্পষ্ট সৌন্দর্যের একটি স্ত্রীলোক। বৃদ্ধ রেডইনডিয়ান তাদের কাছে এলে তারা তার হাতে অর্থ দিলে সমাধিরক্ষক সেই অর্থ নিজের প্রাপ্যরূপে গ্রহণ করে চলে গেল।

এইবার দুজনে ঘনিষ্ঠভাবে অন্ধকার পথ ধরে কুঞ্জের কিনারায় ঘুরে বেড়ায়।